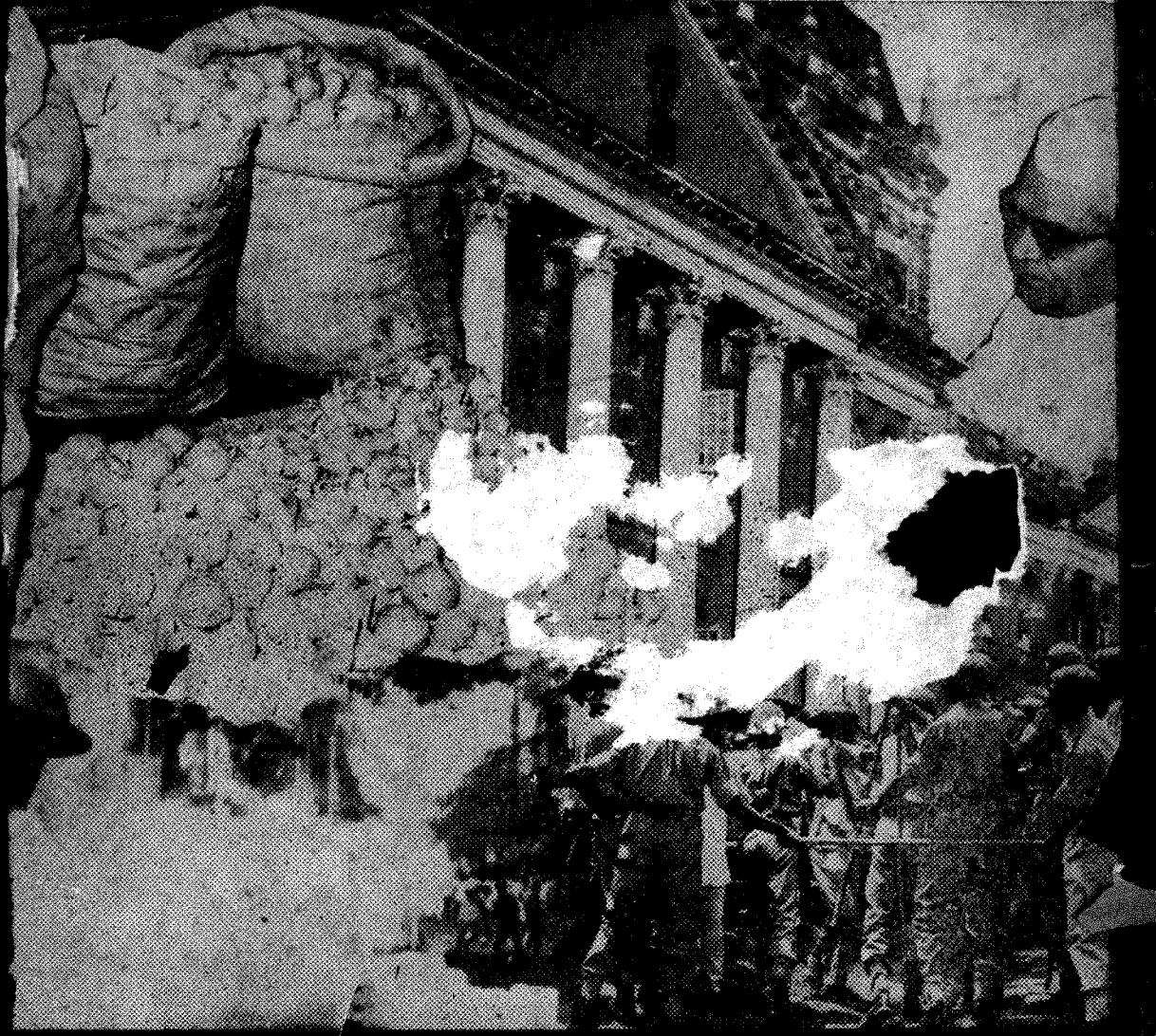


তাহিক সুমতী

রাষ্ট্রপতির শাসনে

পশ্চিমবঙ্গে সমাজ বিবোধীদের
এখন পোহাবারো

29



বৃহস্পতিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ]

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 2, 9th July, 197



CJK-401991-29-P36(98



P 36,198

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৭
আজকের মানুষ		৬৮
গুণাধর ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৬৯
বিদীর্ণ (কবিতা)	— সন্তোষকুমার অধিকারী	৭৫
বঙ্গদর্শন		৭৬
ভারতদর্শন		৮০
আন্তর্জাতিক		৮২
সপ্তাহের বোঝা	— কুন্তিলাস ওয়া	৮৪
স্রোতের সঙ্গে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৮৭
অঙ্গার (কবিতা)	— হরপ্রসাদ মিত্র	৯১
এক পাগল হাসছে (কবিতা)	— বেণু দত্তরায়	৯২
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	৯২
এক এক সময় কোন একটা পংক্তি (কবিতা)	— সাধনা মদ্যোপাধ্যায়	৯৩
চাকার চিহ্ন		৯৪

যে কান

গয়না

আর

আ। স ল

গ্র হ র ভ

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড প্র্যাণ্ডস অফ লেট

এম. বি. সরকার



এ.এরকার
শ্রীমতী

১৯১৭ রামবিহারী অডিন্স কলিকতা

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পাঠকমণ্ড	...	...
আনন্দরপম্ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	৯
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	১০০
গ্রামিক সংহতি—কেন ও কিভাবে	— সত্যানন্দ ভট্টাচার্য	১০৭
অশান্ত কল্যাণীয়া (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— সৌম্য মিত্র	১০৯
গ্রন্থমেলা	...	১১২
জনকের শোক (গল্প)	— প্রদোষ দত্ত	১১৩
রত্নগঙ্গা—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পাল	১১৮
রত্নগঙ্গা	...	১২০
বেলার রাজার রাজ্য	— শান্তিপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪
বেলাধুলা	— শান্তিপ্রসন্ন	১২৬

—সত্য প্রকাশিত হইয়াছে!!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

“নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মজারিঙ্গ। এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরের লিপি প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। ব্যয়বোধের ভায়ে নবীনবাবু বর্ণনার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। নবীনবাবুর যখন স্বদেশ বাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও স্বাধীন চাকিয়া বলিতে জানেন না।” —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

ন বী ন চ ছ সেনের গ্রন্থাবলী

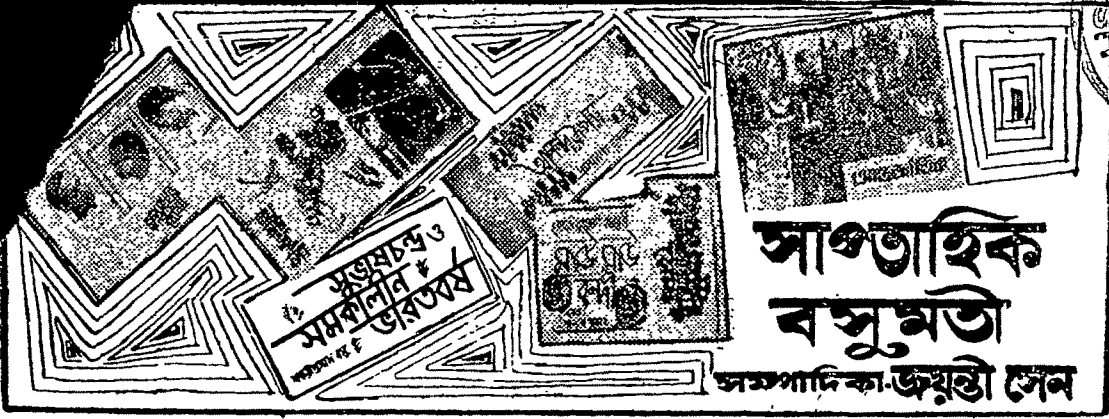
রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস



গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গান্ধী স্ট্রীট, কলিকাতা-১১



মুহূর্ত্তবিহার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিভাষী সর্বাধিক প্রচারিত
৭৫ বর্ষ : ২য় সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 9th July, 1976

সমাজবিরোধীদের কবলে

পশ্চিমবঙ্গ বোধ হয় পকেট ফাঁক করার রাজ্যে পরিণত হতে চলেছে। পাঁচ হাজারী উপদেষ্টাদের আমলে সমাজবিরোধীদের এখানে এখন পোষা-বারো। অথচ এ রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর দারুণ তপস্বীর সঙ্গে সরকারী বড় কর্তাদের, বিশেষ করে পুলিশের হোমরা-চৌমরাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, জ্যোতি বসুর জন্যই তাঁরা কিছু করতে পারেন নি। এবার তাঁরা সমাজবিরোধীদের নিম্নলিখিত করবেনই। সেই সমাজবিরোধীরাই এখন শাখা-প্রশাখায় বিস্তারলাভ করে রাজ্যের সর্বত্র জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে তুলেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে সংবাদপত্রগুলিও একযোগে তারস্বরে চাঁৎকার সুরু করেছিল—সমাজবিরোধীদের দৌরাণ্যে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়-তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, গেল, গোজায় গেল। এখন এ সব সংবাদপত্র নীরব ও নিশ্চিন্ত!

রাজ্যপালের উপদেষ্টারা কাজ করছেন না, এ কথা কেউ বলবে না। কাগজে কাগজে জমি দখল সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হলেও, আসলে তা রহস্যময় থেকে গেছে। কারণ সরকারের পুলিশ এখন কৃষকদের অধিকার রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে রণমুর্তি ধারণ করেছে। যুক্তফ্রন্টের আমলে যে সব কল-কারখানা চালু করার জন্য আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছিল, তার ভরাডুবি ঘটেছে; অপর দিকে আরো কিছু কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং বহু বেকারের সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়গুলিতে আজ পর্যন্ত অনুদান পৌঁছয় নি, শিক্ষকরা মহাধা-জাতা কবে পাবেন তার কোনো স্থিরতা

চলেছে। অথচ উপদেষ্টাদের মূখ্য দিগ্রে হে-চৈ করে প্রশাসনিক সমস্যা সাধনের কথা আড়ম্বরের সঙ্গে প্রকাশ করা হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের এক মাসের শাসনের মধ্যেই সংবাদপত্রে চুলচেরা বিচার সুরু হয়েছিল—ঐ সরকার জনসাধারণের কল্যাণের কাজ কতটুকু করতে পেরেছেন। আর কয়েক মাস পার হলেও, রাষ্ট্রপতির শাসনে অলাবস্থার সৃষ্টি হলেও, তা যেন তেমন কিছু ব্যাপার নয়। অথচ রাজ্যব্যাপী এখন বোমা-পটকা ও গুলীগোলায় তাড়ব চলছে, দিনের পর দিন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে সমাজবিরোধী গুন্ডারা। এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনে রাজ্যের বর্তমান প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন এ কথা বলতে কোন বিধা নেই। তবে উদ্যোগ-অয়োজনের অভাব নেই। সি-আর-পি, ইস্টার্ন রাইফেলস্, এন্টি বোম্ব স্কোয়াড প্রভৃতির নামে কয়েক হাজার সশস্ত্র পুলিশকে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে বহাল রাখা হয়েছে।

দলীয় রাজ্যের অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গে যারা আশা করেছিল এবার সমাজবিরোধীরা শাসনস্তা হবে, তাদের মোহভগ্ন হয়েছে। তাদের অনেকেই এখন অদৃষ্টের নোষ বলে সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। প্রশাসনিক কর্তব্যাক্ষিরা এ ব্যাপারে যে উদ্ভিন, তা তাদের কার্য-কলাপ দেখে বোঝা যায় না। সমাজবিরোধীদের দৌরাণ্য আজ এমনই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কলকাতার যে কোনো প্রকাশ্য রাস্তায় কিংবা অলিতে-গলিতে যখন-তখন তাদের দর্শন মিলবে। রাজ্য পুলিশ এবং কেন্দ্রীয়

গুন্ডারা পথচারীদের আক্রমণ করেছে এমন কি অনেক ক্ষেত্রে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে। অবাধগতিতে গুন্ডারা দমদম, পাতিপুকুর, মুকিয়া স্ট্রীট, গড়-পার, রামমোহন রায় রোড, বরানগর, বেলোঘাটো-নারকেলডাঙ্গা প্রভৃতি জম্জলে বোমাবাজী করে যাচ্ছে, ট্যাংরা-খাপা এলাকার নিরীহ লোকের বাড়িতে হানা দিয়ে বোমা বা ছোরা-র ভয় দেখিয়ে বোমা তৈরির জন্য জন্ম চাঁদা আদায় করছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিগৃহীত ব্যক্তিরা থানায় খবর জানাতেও ভয় পায়। ভয়ের কারণ অনেকেই, বিশেষ করে ভুক্তভোগীদের ভাল করেই জানা। মুহূর্ত্তের মধ্যে অভিযোগকারীদের নাম গুন্ডারা জেনে যায়। তাই থানা-পুলিশের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ দূরে থাকাই সমীচীন মনে করে।

উপরোক্ত অঞ্চলগুলিতে কোথাও কোথাও সন্ধ্যার এর এমন কি দিনে-দুপুরে রাস্তায় বের হওয়া হয়ে উঠেছে অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ রাস্তায় বের হওয়ার অন্য অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে হাসপাতালের দিকে পা বাড়ানো। রাজ্যের উপদেষ্টারা এই অসহনীয় অবস্থা আর কতদিন চালিয়ে যেতে দেবেন, তাঁদের কাছে আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা। সমাজ-বিরোধীদের নাম-ধাম ও তাদের দুষ্কার্য গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে থানায় থানায় অজানা থাকার কথা নয়। তবে তাদের শাসনস্তা করতে রাজ্য সরকার ব্যর্থ হচ্ছেন কেন? এখন তো আর যুক্তফ্রন্ট সরকার বা জ্যোতি বসুর রাজত্ব নেই।

সম্পাদকীয়

হোজার মানুষ

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাবান পুরুষ। ১১ বিধান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে যত ক্ষমতা দিচ্ছে মতখানি ক্ষমতা পৃথিবীর আর কোনো রাষ্ট্রনায়ককেই দেয় নি। কিন্তু যত চতুর প্রেসিডেন্টই হোন না কেন, তিনি ডিক্টেটর হতে পারেন না, স্বেরাচারী হতে চাইলেই বাধা পাবেন। প্রেসিডেন্ট নিগ্ননকে সেই ধাক্কাই খেতে হয়েছে। সেনেট বা প্রতিনিধিসভাকে ডিঙিয়ে তিনি চলতে চেয়েছিলেন। তাঁকে সম্মুখে দেওয়া হয়েছে কতদূর তিনি যেতে পারেন এবং কী তিনি পারেন না। সেনেটে কুপার-চার্ট সংশোধনী প্রস্তাবটা ৫৮-৩৭ ভোটে গৃহীত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিগ্ননের মতখানি বাড়ি বেড়েছিল, ঠিক ততখানি বাড়ি হাটাই করে তাঁকে তাঁর মূল কাঠামোতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, ৩০ জনের পর প্রেসিডেন্ট নিগ্নন আর সেনেটের অনুমোদন ছাড়া কম্বোডিয়ায় সৈন্য পাঠাতে বা এখানকার বিদেশী সৈন্যদের কোন অর্থসাহায্য দিতে পারবেন না। গত ৩০শে এপ্রিল কম্বোডিয়ায় মার্কিন অভিযানের কথা ঘোষণা করার আগে প্রেসিডেন্ট নিগ্নন এই গুরুতর বিষয়টি সেনেট বা প্রতিনিধিসভাকে জানানো প্রয়োজনই বোধ করেন নি। সে উদ্ভত চ্যালেঞ্জের জবাবই আজ সেনেট দিয়েছে।

কম্বোডিয়া অভিযানের ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রচণ্ড প্রশাসক-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। প্রেসিডেন্টের একতরফা সিদ্ধান্তে দেশের প্রবীণ আইনজ্ঞ এবং দৃঢ় মনের সাধারণ কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ক্ষেপে যান। কুপার-চার্ট সংশোধনী প্রস্তাব সেই বিরুদ্ধতারই প্রতিচ্ছবি।

জন শেরম্যান কুপার নিজে একজন

বিবেকবান আইনজ্ঞ। তার ওপর আবার তিনি একজন প্রবীণ, পোড়খাওয়া রাজনীতিকও বটেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর কুপার হার্ভার্ড ল' কলেজে যান আইন পড়তে। নিজ রাজ্য কেন্টাকির নিম্নতর পরিষদে কিছুদিন কাজ করার পর তিনি জজ হলেন। এ পদে বেশ কিছুদিন কাটলো তাঁর। রাজনীতির রংগমঞ্চে এলেন ১৯৪৬ সালে যখন তিনি



জন শেরম্যান কুপার

সেনেটে নির্বাচিত হলেন। কিন্তু বেশিদিন সে আসন তিনি রাখতে পারেন নি, '৪৮ সনে তাঁর হার হলো। লেগে রইলেন কুপার, সুফলও পেলেন '৫২ সনে, ফিরে এলেন সেনেটে। কিন্তু এবারও সেনেটের আসন তিনি বেশিদিন রাখতে পারেন নি।

তবে ১৯৫৬ সালে নির্বাচনে জিতেই কুপার সেনেটে জাঁকিয়ে শেকড় গেড়ে বসলেন।

সেনেটর কুপারের জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। গ্র্যাজুয়েট হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি যথার্থীতে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এবং ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছিলেন। যুদ্ধের শেষে ব্যাভারিয়ার বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন কমিশনের চেয়ারম্যান হন। পরে তিনি একটা আইন বিষয়ক সংস্থার সঙ্গে জড়িত হন।

বড় দায়িত্ব পেলেন কুপার ১৯৫৯ সালে যখন তাঁকে রাষ্ট্রসভ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব ডীন এ্যাচিসনের ন্যাটোবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবেও তিনি কিছুকাল কাজ করেছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব নিয়ে শেরম্যান কুপার কিছুদিন ভারতেও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি নিহত হবার পর তিনি কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

সেনেটের ডেমোক্রেটিক সদস্য ফ্রাঙ্ক চার্চের সঙ্গে যৌথভাবে গাল্ফ অফ টংকিন প্রস্তাবের সংশোধনী এনে জন কুপার একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করলেন। প্রেসিডেন্ট নিগ্ননের রিপারবিল-কান দলভুক্ত হয়েও কুপার 'বস'কে চ্যালেঞ্জ করার যে সংসাহস দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে লিখিত থাকবে। এবং কুপার-চার্ট নিশ্চয়ই আমেরিকার স্বাধীনচেতা তরুণদের মনে বহু দিন প্রেরণা ও সাহস যুগিয়ে যাবেন।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালীন শঙ্করীপ্রসাদ কসু ভারতবর্ষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

THE STATESMAN

PARTITIONING OF INDIA MOSLEM LEAGUE DEMAND RESOLUTION PASSED AT LAHORE 'ONLY CONSTITUTIONAL PLAN ACCEPTABLE'

LEAGUE & THE KHAKSARS

LAHORE RESOLUTION

DEMAND FOR REMOVAL OF BAN

LAHORE, Mar 24

A resolution deploring the loss of life which occurred in the clash between the Khaksars and the police on March 19 in Lahore and requesting the Punjab Government to institute an impartial inquiry into the police firing and to remove the ban on the Khaksar organization was unanimously passed at the open session of the All-India Moslem League to-night.

The resolution which was considered earlier by the Subject Committee, was moved from the chair when Mr. Jinnah made a statement on the Khaksar situation.

২৪শে মার্চ, ১৯৪০-এর স্টেটসম্যান পত্রিকার লাহোরে লীগ অধিবেশনে ভারত-বিভাগ প্রস্তাব পাশের রিপোর্টের চিত্র

বসু ও জিন্না—(১৮)

পাকিস্তান-নাজিরা এবার চাইলেন, কোনোদিন পাবেন না, এই বিশ্বাস নিয়ে। মহম্মদ ইকবাল এই পাকিস্তানের দার্শনিক গিতা।

ইকবাল কবি এবং দার্শনিক। ১৮৭৬ সালে তাঁর জন্ম; লাহোর, কোম্বলজ এবং মিউনিকে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত। দেশ-প্রেমের গান বিধে তিনি জাতীয়তাবাদী ভারতের অন্তরে ঠাই করে নিয়েছিলেন। তাঁর আশ্চর্যজনক সাফল্য এই—‘হিন্দুস্থান হামারা’ নামক অমর জাতীয় সঙ্গীতের স্রষ্টা

হয়েও একই সঙ্গে তিনি ভারতে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রথম পরিকল্পনাকারী হতে পেরেছিলেন। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণ করার পরে জিন্না বলেছিলেন, “ইকবাল আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু আজ যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তাহলে জেনে খুশি হতেন যে, আমাদের যা করতে তিনি বলেছিলেন, আমরা ঠিক তাই করেছি।”

১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগ সম্মেলনের সভাপতি হিমায়ে ইকবাল জানানেন, ভারতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্য ছিল: “অখণ্ড

মাসিক বঙ্গভাষা

ভারত—এই ধারণার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র নির্মাণের কিংবা ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মনোভাবকে ভারতে চাপানোর চেষ্টার অর্থ অজানিতে ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা।” পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের প্রস্তাব করে এই সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন:

“আমি দেখতে চাই, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্থান একত্র হয়ে একটি রাষ্ট্র হোক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন সহ বা বাইরে গিয়ে স্বাধীনতা সহ এই উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্রের গঠনই আমার বিবেচনায় ভারতীয় মুসলমানদের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের চরম নিয়তি।”

স্যার মহম্মদ ইকবাল গোলচৌকি বৈঠকে প্রতিনিধি হয়ে যোগদান করেছিলেন। সেখানে জিন্নার সঙ্গে তাঁর বহু আলোচনা হয়। ফলে সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। ইকবাল তাঁকে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রতত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেন। জিন্না তখনকার মত সেকথা মেনে নেন নি। তারপরে ১৯৩৭-এর নির্বাচন ঘটে গেছে, বিজয়ীর উপাসে নেহরু লীগকে নস্যাত করতে চেয়েছেন কথায় ও কাৰ্বে, “জিন্না ফিরে গেছেন মাউন্ট প্লেজেন্ট রোডের বাসভবনে আশাহত হয়ে, কিন্তু ভগ্নোদ্যম হয়ে নয়; নিঃসঙ্গ তিনি কাঙ্ক্ষ করেছেন। একগোছা চিঠি ছিল তাঁর ড্রয়ারে, সান্দ্রনার জন্য সেগুঁলি খুলে ওলটাতেন; সেগুঁলি লিখেছিলেন স্যার মহম্মদ ইকবাল, ১৯৩২-এ ইংলণ্ডে তাঁদের সাক্ষাৎ আলাপের পরে।” * ২৮শে মে, ১৯৩৭-এ ইকবাল তাঁর এই বিশ্বাস

লিপিবদ্ধ করেছিলেন—মুসলিম-ভারতের সমস্যা সমাধানের জন্য “দেশকে এমন নতুনভাবে গঠিত করতে হবে, যাতে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয় যেখানে মুসলমানদের সম্পূর্ণ সংখ্যাধিক্য।” জিন্নাকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “আপনি কি মনে করেন না—সেই দাবি উত্থাপন করার সময় ইতিমধ্যেই এসে গেছে?” জিন্না এই চিঠির কোনো উত্তর দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। ২১শে জুন একবার আবার লেখেন, “আপনি ব্যস্ত মানুষ তা আমি জানি। কিন্তু যদি প্রায়ই চিঠিপত্র লিখি, আশা করি, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে লিখি এইজন্য যে, যে ক্ষেত্র আসছে, তার মধ্যে ভারতীয় মুসলমানদের উপস্থিতিতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার মত মানুষ আপনি ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ে খুবদীর্ঘ কেউ নেই।”

পাকিস্তান শব্দটি কিন্তু ইকবালের বা জিন্নার দান নয়—এই মন্ত্রের স্রষ্টা কেম্ব্রিজের এক ছোকরা ছাত্র—চৌধুরী রহমৎ আলী। গোলচৌকি বৈঠকে যখন অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের পরিচালনা ওঠে, ইনি সেটাকে ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে প্রোজেক্ট বলে মনে করেছিলেন। ফেডারেশনের অর্থ হিন্দু সংখ্যাধিক্যের নিচে মুসলিম সংখ্যালঘুদের নিষ্পেষিত হওয়া। সুতরাং মহম্মদ আলী ১৯৩৩-এ ‘পাকিস্তান ন্যাশন্যাল মুভমেন্ট’ আরম্ভ করে দিলেন, যা পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণা করবে। ‘নাউ অর নেভার’ নামে একটি চার পৃষ্ঠার পুস্তিকা তিনি ব্যর করলেন, তার মধ্যে ফেডারেশনের বিরোধিতা করা হল এবং

* জওহরলাল নেহরুর অনপনয় ইকবাল-প্রীতি ছিল। তার অনেকগুলি কারণ নেহরুর লেখা থেকে অনুমান করা যায়। একটির কথা আগে বলেছি, ‘রাজনৈতিক’ জিন্নার তুলনায় ‘দেশপ্রেমিক’ নেহরুকে তিনি মৃত্যুশয্যায় প্রশংসা করেছিলেন—নেহরুর কাছেই। অন্য কারণগুলি—ইকবাল উদ্ ও ফাসীর বড় কবি এবং ইকবালের মধ্যে কাম্বোজী ব্রাহ্মণ-রক্ত প্রবাহমান। তা হলেও নেহরুকে বলতে হয়েছে, ‘Iqbal was one of the early advocates of Pakistan.’ একথা বলার পরেই নেহরু দ্রুত এই কথাগুলোর ওপরে চুনকাম করতে চেয়েছেন: “তবু ইকবাল পাকিস্তান পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত বিপদ ও উদ্ভট অসঙ্গতি বুঝতে পেরেছিলেন। এডওয়ার্ড টমসন লিখেছেন, তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকালে ইকবাল তাঁকে বলেছিলেন যে, মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন বলে কার্যত বাধ্য হয়ে তাঁকে পাকিস্তানের কথা বলতে হয়েছিল; কিন্তু তিনি অনুভব করেন যে, পাকিস্তান ভারতের পক্ষে সাধারণভাবে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষভাবে ক্ষতিকর হবে। সম্ভবত তাঁর মন বদলে গিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে তিনি পূর্বাঙ্কে বিস্মৃতভাবে ভাবেন নি, যেহেতু এই প্রশ্নের তখন বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তাঁর সমগ্র জীবনদৃষ্টি পূর্ববর্তীকালে পাকিস্তান ও ভারত বিভাগ ব্যাপারে যেসব নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তার সঙ্গে মেলে না।

“জীবনের শেষ বছরগুলিতে ইকবাল ক্রমেই বেশিভাবে সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আগ্রহী হন। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট অগ্রগতি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল।”

ইকবালের সমাজতন্ত্রের জাতি-চরিত্র ঠিক কি ছিল বলতে পারব না। এইটুকু দেখি যে, তিনি জীবনের একেবারে শেষ পর্ষায় জিন্নাকে সতর্ক করে বলেছিলেন, “যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সাধারণ মুসলমানের অবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ট নয়, তা জনগণকে আকর্ষণ করতে পারবে না।” জিন্নার জীবনীকার বলেন, ইকবালের ইঙ্গিত জিন্না গ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর নিঃসঙ্গ, জনসম্পর্কহীন নেতৃত্ব-প্রকৃতি ভাঙা করেছিলেন, তার ফলে ইকবালের মৃত্যুর মাসেই তিনি বলতে পেরেছিলেন: “লীগের শক্তি বাড়ছে প্রতিদিন। লখনৌ অধিবেশনের আগে সদস্যসংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র, কিন্তু মাত্র লক্ষ লক্ষ মুসলমান-লীগের পতাকা, ভলান, সমর্থিত।”

পাকিস্তান-পরিকল্পনাকারী ইকবালকে কেউ ঠিক বলেছিলেন জিন্না না নেহরু?

আধুনিক বসন্ত

১৯৫২-৫৩



সাদনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্মর্শে
সৌন্দর্য বিকশিত হয়

সাদনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

স্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখত্রে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাদনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

৫৪৫-২/৬৩

এমন কি ইকবালের পাকিস্তান পরিকল্পনাকেও যথেষ্ট নয় বলে বাতিল করে দেওয়া হল। “ইকবাল প্রস্তাব করেছেন, (মুসলিম) প্রদেশগুলিকে মিলিয়ে দিয়ে একটি অখণ্ড রাজ্য তৈরি করে তাকে অল ইন্ডিয়া ফেডারেশনের অঙ্গ করা হোক। কিন্তু আমরা প্রস্তাব করি যে, প্রদেশগুলি পৃথক থেকে নিজেদের মধ্যে একটি ফেডারেশন গঠন করুক। এদেশে কোনো শান্তি বা স্থিতি সম্ভব নয়, যদি মুসলমানদের বোকা বানিয়ে হিন্দুপ্রধান ফেডারেশনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে তারা নিজের ভাগ্যের প্রভু হবে না, হবে না নিজের আত্মার নিয়ন্তা।”

মহম্মদ আলীর এই কৌশল প্যামফ্লেট কিন্তু একালে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে গৃহীত হয় নি। ১৯৩৩-এর আগস্টে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সামনে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স এবং মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ দেখান নি। “পরিকল্পনাটিকে আমরা উদ্ভট এবং অবাস্তব বলে মনে করি”, “যতদূর জানি এটা একটা ছাত্রের পরিকল্পনা”—তারা বলেছিলেন। ছাত্র-সেবিন কিন্তু উদ্দীপনায় অক্লান্ত। রহমৎ আলী ১৯৩৫ সালে আর একটি পুস্তিকা বার করে ফেললেন। তারপরে ১৯৪০ সালে ইংলন্ড থেকে যে বিবৃতি দিলেন তাতে সূর্য গরম বই নরম হয় নি। দেখা গেল যে, উক্ত পাকিস্তান-পরিকল্পনায় বাংলা ও হায়দারাবাদ বাড়ানো যুক্ত হয়েছে।*

পাকিস্তানের উচ্চতম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে চৌধুরী মহম্মদ আলী বলেছিলেনঃ পাকিস্তান শব্দটি উর্দু ও পার্শ্ব দুই ভাষাতেই পাওয়া যাবে। মুসলমানের সকল হোমল্যান্ডের নামের ভিতর থেকে অক্ষর সংগ্রহ করে শব্দটি তৈরি হয়েছে। ঐ নিজস্ব ভূমিগুলি হল—পঞ্জাব, আফগানিস্তান (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), কাশ্মীর, ইরান, সিন্ধ (কচ্ছ ও কাথিয়াবাড় সহ), তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান। পাকিস্তান—পাক্ অর্থাৎ পবিত্র ও পরিস্কৃতদের বাসস্থান। তা মুসলিম জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও জাতিগোত্রের প্রতীক ইত্যাদি। (বলিথো)

[“Pakistan is both a Persian and Urdu word. It is composed of letters taken from the names of all our homelands—‘Indian’ and ‘Asian’ that is, Punjab, Afgania (North West Frontier Province), Kashmir, Iran, Sindh (including Kutch and Kathiawar), Tukharistan, Afganistan and Baloshistan. It means the lands of the Paks—the spiritually pure and clean. It symbolizes the religious beliefs and ethnical stocks of our people; and it stands for all the territorial constituents of our original fatherland.”]

অসম্ভব, অবাস্তব বলে লীগ যে পাকিস্তান প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিয়েছিল, তাকে সে আঁকড়ে ধরল কিছাদনের মধ্যেই। তার আগে স্বিজারল্যান্ডে অবশ্যই সে বিশ্বাস করেছিল। এই তত্ত্বেরও যুবক প্রফেট ছিলেন চৌধুরী মহম্মদ আলী। মাদাম হালিদা এদিকে মহম্মদ আলী বলেছিলেন, যে ভৌগোলিক অংশ নিয়ে তিনি পাকিস্তানের পরিকল্পনা করেছেন, তা কখনই ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—সেখানে মুসলমানেরাই থাকত এবং সেখান থেকে ভারতের ওপর অভিযানকারীরূপে আঁপিয়ে পড়েছিল। ইনি আরও বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানের সংঘর্ষ ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক কারণে নয়, তা হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সংঘর্ষ। হিন্দু ও মুসলমান মূলগতভাবে ভিন্ন জাতি। তাঁর মূল বক্তব্য, “আমাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, উত্তরাধিকার ব্যবস্থা, বিবাহ ব্যবস্থা হিন্দুদের থেকে মূলে পৃথক। তা কতকগুলি প্রধান নীতিতেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা মুসলিম, আমরা হিন্দুদের সঙ্গে বসে খাই না, আমাদের মধ্যে বিয়ে হয় না। আমাদের আচার-বিচার, পার্জ-পদ্ধতি, এমন কি আমাদের পোষাক ও আহারাদি পর্যন্ত পৃথক।”

১৯৪০-এর ৯ই মার্চ তারিখে জিম্মা টাইম এন্ড টাইড নামে এক প্রবন্ধে এই স্বিজারল্যান্ডে প্রথম খোলাখালি উপস্থিত করেছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক সূত্রে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি হিন্দু ও মুসলমানদের পার্থক্য সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিল, আনন্দের সঙ্গে সেগুলি উদ্ভূত করে জিম্মা বলেনঃ “ব্রিটিশ জাতি ধর্ম খৃস্টান; তারা নিজেদের ইতিহাসের ধর্মযুদ্ধগুলির কথা ভুলে যায়। আজ তারা ধর্মকে ব্যক্তিগত ব্যাপার মনে করে—যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে একান্ত সম্পর্কের ব্যাপার। হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু কদাপি ওভাবে চিন্তা করা যাবে না। কারণ এই দুই ধর্মই সূক্ষ্ম সমাজনীতির ভিত্তিতে স্থাপিত, যা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক যতখানি নির্ধারণ করে, তার থেকে মানুষের সঙ্গে তার প্রতিবেশীর সম্পর্ক কম নির্ধারণ করে না। এই ধর্মগুলি কেবল বিধি-ব্যবস্থা এবং সংস্কৃতিকেই নিরান্বিত করে না, সেই সঙ্গে সমাজজীবনের সকল অংশকেও তাই করে। এ ধরনের ধর্ম সম্পূর্ণভাবে আত্মস্বতন্ত্র, গন্ডীবদ্ধ বলে পান্ডিত্য গণতন্ত্র যে ধরনের চিন্তার একা এবং ব্যক্তিগততার বিলয় দাবি করে, তা এখানে থাকা সম্ভব নয়।”

এই প্রবন্ধেই জিম্মা প্রথম টু নেশন শব্দগুলি ব্যবহার করেন। বলেছিলেন যে, এমন একটি শাসনতন্ত্র উদ্ভাবন করতে হবে, যা ভারতে দুটি জাতি আছে স্বীকার করে নেবে।

[“A Constitution must be evolved that recognises that there are in India two

nations, who must both share the governance of their common motherland.”]*

আমরা আলাদা—আলাদা—আলাদা—। ঘৃণার মশলার স্বজাতিতত্ত্বকে মজবুত করবার জন্য জিন্না ঐ কথাগুলো ছোটোতে লাগলেন। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধলে কংগ্রেস ঐ জ্ঞানান, ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা না করলে সে দুঃস্বাবস্থায় সাহায্য করতে প্রস্তুত নয় এবং কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি ভারত সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করল। তখন জিন্না ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯ তারিখটিকে ‘মুক্তি দিবস’ বলে ঘোষণা করলেন, ইংরেজের দুঃস্বাবস্থায় সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেই লেন-দেনে ইংরেজের কাছ থেকে যতপ্রকার সম্ভব সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে সচেষ্ট হলেন। ইংরেজকে চাপ দেবার উপযুক্ত সময় বুঝে মুসলিম লীগ তার লাহোর অধিবেশনে ১৯৪০-এর ২৩শে মার্চ তারিখে পাকিস্তান-প্রস্তাব পাশ করল। প্রস্তাব উঠিয়েছিলেন বাংলার লীগ প্রধানমন্ত্রী। প্রস্তাবের বয়ানঃ—

“অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এই অধিবেশনের পূর্বেবিদিত এই অভিমত হল—এই দেশের জন্য কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা কার্যকরী হতে পারে না, বা তা মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, যদি না তা এই সকল মূলনীতির ওপরে নির্ভর করে নির্মিত হয়ঃ ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূখণ্ডের যে সকল স্থানে মুসলিম সংখ্যাধিক্য রয়েছে সেই স্থানের ভৌগোলিকভাবে সংশ্লিষ্ট

বিভিন্ন অঞ্চলকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে (সরকার হলে সেজন্য অঞ্চলের পুনর্বিভািন্যাসও করতে হবে), যাতে করে ভারতবর্ষে ঐ অঞ্চলগুলি ‘স্বাধীন রাষ্ট্র’রূপে স্বীকৃতি পায়।”

পাকিস্তান ‘অবাস্তব’ প্রস্তাব—জিন্নার থেকে কেউ বেশি জানতেন না। পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের কয়েকদিন আগে স্যার পার্সিভ্যাল গ্রিফিথস্ ও অন্য কয়েকজন জিন্নার সঙ্গে নৈশভোজে বসেছিলেন। জিন্না পাকিস্তান প্রস্তাব সেখানে ওঠালে সমবেত সকলে ঐ প্রস্তাবের অমৌলিকতার চেহারা খুলে ধরলেন। অর্থনৈতিক বিপদ, সীমান্ত সমস্যা, সামরিক এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা প্রভৃতির কথা তাঁরা বললেন। “জিন্না সব কিছুকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন, খুঁটি-নাটি বিষয় আলোচনায় একেবারে গররাজি হলেন।” স্যার পার্সিভ্যাল মুদ্রভাবে বলেছেন—“পারিস্কার একটা ধারণাকে আঁকড়ে ধরে, বাদবাকি খুঁটিনাটি বিষয়ের এবং রীতিনীতির সম্বন্ধে অবজ্ঞা করার সামর্থ্যই বোধ হয় মিঃ জিন্নার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি-উৎস।”

‘অবাস্তব’ পাকিস্তান কিন্তু বাস্তব হয়েছিল। পাকিস্তান হবার পরে জিন্না স্বীকার করলেন, পাকিস্তান হবে, তিনি কোনোদিন ভাবেন নি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দিন গভর্ণমেন্ট হাউসে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময়ে লেফটেন্যান্ট আসহানকে তিনি বলেছিলেনঃ “জানো, আমার জীবনে পাকিস্তান সম্ভব হবে ভাবি নি! আমরা যা অর্জন করেছি, তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।”

জিন্না কৃতজ্ঞতাবোধ করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে এবং

* বলিথো বলেছেন, এই প্রবন্ধেই জিন্না শেষবারের মত *Common Motherland* কথাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। ব্রিটিশ-সহায় জিন্নার নেতৃত্বের চাতুর্য এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের দুর্বলতা জিন্নার কলম থেকে ‘কমন মাদারল্যান্ড’ লিখবার প্রয়োজনীয়তা কেড়ে নিয়েছিল। জিন্নার থেকে কে বেশি জানতেন যে, স্বজাতিতত্ত্ব কোনো যুক্তিসিদ্ধ ভত্ত্বই নয়! ১৯৪৪-এর ৯ই সেপ্টেম্বর জিন্নার বাসভবনে গান্ধী-জিন্না আলোচনাসভা আরম্ভ হয়েছিল। ১৫ই নভেম্বর গান্ধী জিন্নাকে তাঁর স্বজাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব প্রশ্ন করে চিঠি লিখলেন, তাতে ঐ ভত্ত্ব একেবারে ফেঁসে গিয়েছিল। গান্ধী লিখেছিলেনঃ

“আমাদের আলোচনার মধ্যে আপনি তাঁর ভাবের সঙ্গে বলতে চেয়েছেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতি আছে এবং ভারতবর্ষ দুই জাতিরই বাসভূমি। যতই আপনার যুক্তিতর্ক এগিয়েছে, ততই আপনার উপস্থাপিত চিত্রখানি আমার কাছে আতঙ্কজনক মনে হয়েছে। যদি তা সত্য হয়, তা হলে তা প্রলোভনজনক হবে, কিন্তু আশঙ্কা হয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণত অবাস্তব। একদল ধর্মান্তরিত মানুষ ও তাদের বংশধরেরা পিতৃজাতি থেকে ভিন্ন জাতিত্বের দাবি করছে—ইতিহাসে এর দ্বিতীয় নজির আমি পাই নি। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ভারত যদি এক জাতি থাকে, তা হলে তার সন্ততিগণের বহু সংখ্যায় ধর্মান্তর সত্ত্বেও সে এক জাতিই থাকবে।” গান্ধীজী একটি মোক্ষম প্রশ্ন করেছিলেনঃ “সমস্ত ভারত যদি আজ মুসলমান হয়ে যায়, তা হলে কি সে আবার এক জাতি হয়ে যাবে?”

জিন্নার পক্ষে যুক্তি তখন একটা বাতিল ব্যাপার; পুনঃপুনঃ উচ্চারিত মিথ্যা সত্য হয়ে ওঠে—এই গোয়েবলস-নীতিই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু। সুতরাং উত্তরে বলেছিলেনঃ

“আমাদের ধারণা, জাতির যে-কোনো সংজ্ঞাই নেওয়া যাক, তদনুযায়ী মুসলমান ও হিন্দুরা দুটি বহু জাতি। দশ কোটি লোক নিয়ে আমাদের জাতি। তারও বড় কথা, আমাদের রয়েছে সুনির্দিষ্ট আকারের সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, নামরীতি, মূল্যবোধ, পরিমাণবোধ, আইন ব্যবস্থা, নৈতিকবোধ, রীতি, পঞ্জী, ইতিহাস, ঐতিহ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক ও নিজস্ব। আন্তর্জাতিক আইনের যে-কোনো বিধি অনুযায়ী আমরা জাতি।” (বলিথো, পৃঃ—১৪৯)

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

বোধ হয় তার পরেই ভেদধর্মের শিক্ষাপাঠ আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাছে! ১৯৩৯-এর ৩০শে তারিখে জিন্না উইল করে তাঁর সম্পত্তির একটা বড় অংশ আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছিলেন। সে উইল পার্টিশান হয়ে যাবার পরেও তিনি বদলান নি—ভেদশিক্ষাদানকে সাহায্য করার বাসনা তাঁর পক্ষে ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না।

কতখানি বিশ্বেষ ও আতঙ্ক থেকে পাকিস্তানের জন্ম, তার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় সামরিক বিষয়ে তাঁর মনোভাব থেকে। সামরিক ব্যাপারে সাধারণভাবে জিন্নার কোনো ধারণা ছিল না। রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সামরিক বাহিনীর কোনো স্থান আছে তা তিনি কার্যত বুঝতেন না (বুঝবেন কি করে, যখন তিনি জানতেন, ইংরেজের বাহিনী তাঁর রাষ্ট্র সৃষ্টি



১৯৪১-এর ২০শে জুন তারিখে পাইওনীর পরিচালিত প্রকাশিত কার্টুন। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তান-প্রস্তাবের সমন্বিত কার্টের ঘোড়ার গিঠে অনমনীয়ভাবে উপবিষ্ট জিন্না, তিনি সমস্ত দোষ কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। এখানে কঠোর মনোভাব নিয়ে নীচে কংগ্রেসের টানা কার্টের গাড়িতে বসে আছেন দৃঢ়ভাবে বকে হাত দিয়ে গান্ধীজী; আর দু'জনের মধ্যে একটা কথাবার্তার বোঝাপড়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে গুঁথে হাঁক দিচ্ছেন-বাংলার লীগ প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক। ফজলুল হক যদিও মোহর-অধিবেশনে পাকিস্তান-প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিলেন না।

বিদীর্ণ

সন্তোষকুমার অধিকারী

ভেঙেচুরে দিই—

যা কিছু দৃ'পাশে আসে, ক্ষেতখামার ছায়াশ্রিত নীড়
কলাবাগান কিম্বা ইন্টার ভার্টি,—
অথবা মন।

আমার জলস্রোতের উদ্দামতায় ভাসিয়ে নিতে চাই
যা কিছু দৃ'পাশে থাকে,—
শান্তির অপ্রয়, সুখের প্রত্যাশা অথবা খ্যাতি
কিম্বা ভালোবাসা।

শক্তির উদ্বেল আবেগে

কীর্তিনাশার মত উদ্দাম হ'তে হ'তে

দৃ'হাতে সমস্ত পৃথিবীকে ভাঙতে ভাঙতে

হয়ত কোন অচর্কিত মৃহুতে আমি

নিজেও প্রবাহিত হ'য়ে যাই।

উৎস থেকে ছুড়ে দেওয়া এক জলস্রোতের মত

ছিন্নমূল এবং

বিদীর্ণ।

করে দেবে!)। পাকিস্তান আর্মির প্রথম সেনাপতি স্যার
ফ্র্যাঙ্ক মেসারভেরী লিখেছেন: "তিনি যথার্থ স্থল সৈন্য-
বাহিনী সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন না, ও-বিষয়ে তাঁর কোনো
ধারণাই ছিল না; তিনি আমাকে বলেছিলেন, সামরিক
ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই; ওটা আমি আপনার
ও লিয়াকতের ওপরে ছেড়ে দিয়েছি।" স্থলসৈন্যের মত
বিমানবাহিনীর বিষয়েও তাঁর কোনো ঔৎসুক্য ছিল না।
বিমান তাঁর কাছে 'তাড়াতাড়ি যাতায়াতের যন্ত্র' ভিন্ন আর
কিছু নয়। কেবল তিনি নৌবাহিনী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।
"তিনি সম্ভবত বুঝেছিলেন, হিন্দুরা যতদিন শত্রুভাবাপন্ন
থাকবে, ততদিন যদি পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে
যোগাযোগ রেখে জাতিকে বাঁচাতে হয়, তা হলে সমুদ্রপথে
যোগাযোগই একমাত্র উপায়।"

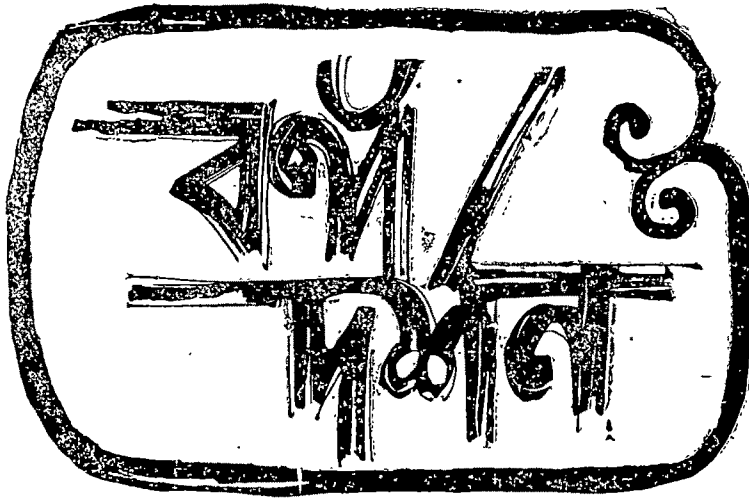
জিন্না তাঁর কল্পনাতীত বস্তু পেয়েছিলেন, সুতরাং
পাকিস্তানকে 'কীটদণ্ডরূপে' পেয়েছেন বলে আক্ষেপের
আধিকারও রেখেছিলেন। কাশ্মীর—মুঘল উদ্যানে পূর্ণ-
কাশ্মীরকে করায়ত্ত করতে না পারার মর্মান্তিক আঘাত
কায়েদে আজম কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কলঙ্কহীন
চন্দ্রই জিন্নার অভিশাপ ছিল। কাশ্মীরের মহারাজা যখন
কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করে দিলেন (২৬শে অক্টোবর, ১৯৪৮),

জিন্না চাইলেন যে, পাকিস্তান বাহিনীকে এখনই কাশ্মীরে
সরকারীভাবে পাঠানো হোক, কিন্তু ব্যাপারটাকে ভারত-
পাকিস্তানের ঘোষিত যুদ্ধে পরিণত করতে ফিল্ড মার্শাল
অর্চিনলেক আপত্তি করলেন। সেই আঘাত এবং কাশ্মীর
হাতছাড়া হওয়ার আঘাত জিন্না সামলাতে পারলেন না,
শয্যাগত হয়ে পড়লেন, ডাক্তাররা কঠোরভাবে নিষেধ করে
দিলেন—সংশ্লিষ্ট কোনো কাগজপত্র যেন জিন্নার কাছে
পাঠানো না হয়।

প্রত্যাশার অতীত প্রাপ্তিতে অভ্যস্ত জিন্নার পক্ষে
মর্মান্তিক ঐ আঘাত। ১৯৪৮-এর ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি
দেহত্যাগ করেন। ৫ই সেপ্টেম্বরের একটি চিত্র সবশেষে
বলিথোর রচনা থেকে তুলে দিই:

"৫ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় কায়েদে আজমের নিউ-
মোনিয়া দেখা গেল। তিনদিন ধরে তাঁর জ্বর বাড়তে
লাগল। অস্থির প্রহরে অধঃব্যস্তবরে মৃত্যুসমাজের মনের
কথা ফুটে বেরতে লাগল। একেবারে প্রায় শেষের অসংলগ্ন
কথাগুলি কাশ্মীর নিয়েই। ইঠাং রাগে গলা চড়িয়ে বলে
উঠলেন: 'কাশ্মীর কমিশনের আজ আমার সঙ্গে দেখা
করার কথা। তারা এলো না কেন? কোথায়—কোথায়
গেল তারা?'"

[সমাপ্ত]



ছয় পাঁচ ১৪ই জুলাই এবং আট পাঁচ ১৬ই জুলাই বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। দুই তরফের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য বেশি, বৈসাদৃশ্য কম, তথাপি দুটো পৃথক দিন ধার্য হয়েছে। এই বাংলা বন্ধের ঐতিহ্যিকতা নিয়ে অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের আশংকার কারণ অন্যর। আমরা যা আশংকা করছি তা হচ্ছে এই যে, দু'দিন পৃথক পৃথকভাবে বাংলা বন্ধ হলে নীট লাভ দাঁড়াবে কয়েকটি প্রাণহানি। যেহেতু এদেশে মানুষের জীবনের দাম সবচেয়ে সস্তা এবং যেহেতু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এই প্রাণহানির জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা যাবে না আইনানুযায়ী, সেইহেতু তাঁদের সিদ্ধান্তের বলি হবে কিছু মানুষ। ষোল তারিখে আট পাঁচ প্রস্তাবিত বাংলা বন্ধের দিন ছয় পাঁচের তরফ থেকে তাকে ভাঙার চেষ্টা করা হবে, তাতে যে সংঘর্ষ হবে তার ফলে কিছু প্রাণহানি ঘটবে এবং চৌদ্দ তারিখে ছয় পাঁচ প্রস্তাবিত যে বাংলা বন্ধ হবে, আট পাঁচের তরফ থেকে তা ভাঙবার চেষ্টা করা হবে, যার ফলেও সংঘর্ষজনিত প্রাণহানি সূচনিশ্চিত। কাজেই আমাদের বক্তব্য, যদি বাংলা বন্ধ করতে হয় তাহলে সেটা দু' তরফে একদিনে করলেই মঙ্গল, তাতে খামোকা প্রাণহানি ঘটবে না।

যেখানে দু'টি বিবদমান রাজনৈতিক গ্রুপ বর্তমান, সেখানে সংঘর্ষ আশংকা করাটাই স্বাভাবিক, এমন কি দু' তরফের নেতৃবৃন্দ যদি ক্যাডারদের শান্তি বজায় রাখারও নির্দেশ দেন, তা যে পালিত হবে এমন ভরসা করার কোন কারণ নেই। কারণ এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় স্বার্থও রীতিমত জড়িয়ে থাকে। পুরোনো শত্রুতা ও আক্রোশের বহিঃপ্রকাশের ক্ষেত্রই হচ্ছে এইরকম পরিস্থিতি। আশংকা করার রীতিমত

কারণ আছে যে, বিগত সতেরই মার্চের ধর্মঘটের জের আগামী বাংলা বন্ধ-গুলির উপরেও রীতিমত প্রভাব বিস্তার করবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের গতনের পর সতেরই মার্চ যে বাংলা বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেই উপলক্ষে বহু স্থলে রীতিমত শরিকী সংঘর্ষ হয়ে গেছে—যার ফলে হতাহত নেহাৎ কম হয় নি। সেই উপলক্ষে যেখানে যে পাঁচ অ্যাগ্জিউড রয়েছে, তারা বর্তমান ক্ষেত্রে পাণ্টা বাবলা নেবার ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। যে সব ক্ষেত্রে সেবারে সি পি এম মার খেয়েছে, এবার তারা সে সব ক্ষেত্রে মার দেবে এবং যে সব ক্ষেত্রে সেবার সি পি আই বা অন্য দল মার খেয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধ নেবে। তর্কক্ষেত্রে যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, উভয় তরফের নেতৃবৃন্দই শান্তির জন্য ফতোয়া দেবেন, তা কার্যকরী যে হবে না, সে কথা হলক করেই বলা যায়। কাজেই যদি ইতিমধ্যে দু' তরফের সূর্মতি ফিরে আসে এবং দু' তরফই যদি একটা দিনকেই বাংলা বন্ধের জন্য ধার্য করেন সেটা নিশ্চয়ই ভাল হবে।

রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসানের দাবিতে, সাধারণ নির্বাচনের দাবিতে, সি আর পি প্রত্যাহারের দাবিতে এবং আরও নানা কারণে বাংলা বন্ধ করা হচ্ছে—এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থার জন্য কি যুক্তফ্রন্টেরই শরিক দলগুলি দায়ী নন? আজ যদি তারা একজোট হন, তাহলে তো কালই এ অবস্থার অবসান হতে পারে। তা তারা হচ্ছেন না কেন? প্রত্যেকটি দলেরই সোজা যুক্তি, আমাদের কোন দোষ নেই, আমরা প্রত্যেকেই মার্কামারা সতী, এর জন্য অমূলক দলই দায়ী। এ হচ্ছে ঝড় এলে উটের আত্মরক্ষার যুক্তি অর্থাৎ কোন যুক্তি নয়। দায়িত্ব

প্রত্যেকেরই আছে, দোষ প্রত্যেকেরই আছে, কম-বেশি এই যা, ধরে নেওয়া গেল বারো আনা চার আনা, কিন্তু নিজেদের ওই চার আনাটুকুকেই স্বীকার করে তো বোঝাপড়ায় আসতে হবে। কিন্তু সে পথে কেউ যাবেন না। আমরা পূর্বে বহুবার বঙ্গদর্শনে লিখেছি যে, প্রতিজ্ঞার রাজত্ব যখন শূন্য হবে, তখন সি পি আই-সি পি এম ভেদ করা হবে না—কার্যত তা হচ্ছেও না, নতুবা সি আর পি রাখার বিরুদ্ধে প্রত্যেকেই কেন সোচ্চার? কিন্তু এ কথা কি কেউ অনুধাবন করেন নি যে, রাষ্ট্রপতি শাসন সি আর পি'র ওপর নির্ভর করেই চলে, সখীবাহিনীর ওপর নির্ভর করে নয়। কাজেই আমাদের কথা হচ্ছে, যে ইস্যু-গুলির বিরুদ্ধে বাংলা বন্ধের ডাক দু' তরফ থেকেই দেওয়া হয়েছে, সেগুলির প্রতিকার করা যায় সুবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে, পুনরায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে, বাংলা বন্ধ করে নয়।

কলকাতা বন্দরে অচলাবস্থা

কলকাতা বন্দরের মাঝি-মাজারা বহুদিন যাবৎ ধর্মঘট করে আছেন। এই ধর্মঘট মীমাংসার কোন চেষ্টা শুরুর হবার আগেই পোর্ট কমিশনের শোর লেবার নামে পরিচিত শ্রমিকরা গো শ্লে নীতি অবলম্বন করার ফলে বন্দরের কাজকর্ম একেবারে শল্যগত হয়ে পড়েছিল। এর ওপর গত পয়লা জুলাই থেকে জাহাজে মাল বোঝাই ও মাল খালাসের কর্মে নিযুক্ত ১৬ হাজার ডক-শ্রমিক অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট করার কলকাতা বন্দরের কাজ একেবারেই অচল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে কলকাতা বন্দরে ৪৩ খানা জাহাজ মাল বোঝাই ও মাল খালাসের অপেক্ষায় নোঙর করে আছে। তার মধ্যে পাঁচটা জাহাজ খাদ্যশস্যের। বন্দরের এই দীর্ঘদিনের শ্রম-বিরোধের ফলে ৩০ কোটি টাকার রপ্তানীযোগ্য মালপত্র গুদামে আটক পড়েছে। তার ফলে রপ্তানী-কারকেরা গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন। মালপত্র ক্রেতার কাছে যথাসময়ে চালান না গেলে তারা ক্ষতিপূরণ দাবি করবে, ব্যাংকগুলি প্রদত্ত অর্থের ওপর অতিরিক্ত সুদ দাবি করবে, রিজার্ভ ব্যাংক বৈদেশিক মদ্যার ব্যাংক-এর ওপর পেনাল্টি চাপিয়ে দেবেন, অনুরূপভাবে আমদানীকারকেরাও ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। সর্বোপরি খাদ্যবাহী জাহাজ-গুলি থেকে মাল খালাস বন্ধ হলে আর কয়েকদিনের মধ্যেই বহুস্তর কলকাতার রেশনিং ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবে। ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণ সম্পর্কে

শ্রমিক ফেডারেশনের সেক্রেটারী আর কে গুহ বলেছেন যে, “ক্যালকাটা ডক ওয়ার্কাস” (নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ) স্কীম ১৯৭০” প্রয়োগের বিরুদ্ধে শ্রমিকেরা এই ধর্মঘট করতে বাধ্য হয়েছেন। শ্রমিকেরা উক্ত স্কীমের কোন কোন অংশ সংশোধন করবার দাবি জানিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার সেই দাবি বিবেচনা করতে রাজি হন নি। শ্রীগুহ বলেছেন যে, উপরিউক্ত স্কীমে শ্রমিকদের কোন লাভ হবে না, লাভ হবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত এই স্কীম চালু না করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। আগে ডক শ্রমিকেরা কাজের ঘণ্টা অনুযায়ী পারিশ্রমিক পেতেন, নতুন স্কীমে তাঁরা নাকি কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবেন। শ্রমিকেরা প্রতিদিন ঘণ্টাভিত্তিক যতখানি কাজ করে যে পারিশ্রমিক পেতেন, নতুন স্কীমে সেই পরিমাণ কাজ করে যদি তাঁদের পারিশ্রমিকের হার কমে যায়, তাহলে তাঁদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ডক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, কলকাতা বন্দরে যে পরিমাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ পারিশ্রমিক ধার্য করা হয়েছে, অন্যান্য বন্দরে নাকি সমপরিমাণ কাজের মজুরি তার অধিক। এই বক্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তবে শ্রমিকেরা যে রকম ঐক্যবদ্ধভাবে ধর্মঘট করেছেন তাতে মনে হয়, তাঁদের অভাব-অভিযোগ বোধ হয় একেবারে ভিত্তিহীন নয়। সেই কারণেই বোধ হয় কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীবায়া বিরোধ মীমাংসার জন্য ৬ই জুলাই দিল্লীতে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক আহ্বান করেছেন এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের সেই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর নাকি আপোস-আলোচনা সাপেক্ষে ধর্মঘট প্রত্যাহারেরও আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু শ্রমিক ফেডারেশন সেই প্রস্তাবে রাজি হন নি। এখন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা দেখার জন্য অপেক্ষা করা উচিত আর কিছই করার নেই।

জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

গত কয়েক মাসের মধ্যে জলঢাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ চারবার বন্ধ হয়ে যায়, শেষবার বন্ধ হয় গত জুন মাসে। উত্তরবঙ্গে শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই একমাত্র ভরসা। বস্তুতপক্ষে উত্তরবঙ্গে প্রচুর অরণ্য ও কৃষিসম্পদ থাকা সত্ত্বেও

শিল্পবিস্তার না হবার অন্যতম প্রধান বাধা হ'ল বিদ্যুতের অভাব, যে কারণে জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্পের গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প রূপায়ণে চরম গাফিলতি ও দূর্নীতি এই প্রকল্পের সর্বনাশ করে দিতে বসেছে। ১৯৬৯ সালের আগস্টে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই প্রকল্পের কাজকর্ম সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন তার রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং একটি অনুগৃহীত কংগ্রেস প্রতিনিধিকে এই প্রতিষ্ঠানের কাজের শল্যগতির জন্য দায়ী করা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরুর হবার আগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া একটি সমীক্ষা মারফত জানিয়েছিলেন যে, প্রকল্পের স্থান ভূপ্রকৃতির দিক থেকে অত্যন্ত প্রতিকূল এবং সেই কারণেই এই প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব এমন প্রতিষ্ঠানের ওপর নেওয়া উচিত, যাদের অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ততা আছে। কিন্তু বর্তমান তদন্ত রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, সেই পরামর্শ প্রথম থেকে অগ্রাহ্য করে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ একটি টেন্ডার কমিটি মারফত এমন একটি কংগ্রেস প্রতিনিধিকে প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, যে প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে ছিল অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য। যদিও এর চাইতেও অধিক অভিজ্ঞতা ও খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান টেন্ডার দিয়েছিল। যে প্রতিষ্ঠানকে এই কাজের টেন্ডার দেওয়া হয়েছিল তাদের কাজকর্ম অত্যন্ত নিঃসমন্বিত, প্রতিটি ক্ষেত্রেই অযোগ্যতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। পরবর্তী পর্ষায়ে পাওয়ার হাউস, রাস্তা প্রভৃতি নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল, এই অনুগৃহীত প্রতিষ্ঠানটি টেন্ডার না দেওয়া সত্ত্বেও কোন একটি গড় কারণে (যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখবে না) এই সব কাজেরও দায়িত্ব পেয়েছিল। তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৫৮ সালে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ কমিশনের পরামর্শক্রমে গৃহীত পরিকল্পনাটাই অত্যন্ত অবাস্তব। তদন্ত কমিশন বলেছেন, এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, অন্তর্নিহিত গলদগুলি কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের মত একটি কারিগরী দক্ষ ব্যবস্থার কাছে ধরা পড়ে নি। আসলে যে-কোন উপায়েই হোক, ব্যাপারটা ম্যানেজ করা হয়েছিল। ফলে একদিকে প্রকল্পের ব্যয় অস্বাভাবিক

বৃদ্ধি পেয়েছে, অপরদিকে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়েছে। শুরুর প্রকল্পের ব্যয় ৪-৪০ কোটি টাকা হবে বলে ধরা হয়েছিল, এখন ব্যয়ের উক্ত পরিমাণ বিগতের বেশি হয়েছে—১০ কোটি টাকা। এবার বিলম্বের দিকটা দেখা যাক। প্রকল্পের প্রথম পর্ষায়ের কাজ ১৯৬৪ সালে শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু নয় হাজার কিলওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম যন্ত্র চালু হয় ১৯৬৭ সালের মার্চ, দ্বিতীয় যন্ত্র তার কয়েক মাস পরে চালু হয়। প্রথম পর্ষায়ে তৃতীয় আর একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র চালু করার কথা এবং দ্বিতীয় পর্ষায়ে চার হাজার কিলওয়াট শক্তিসম্পন্ন দু'টি যন্ত্র চালু করার কথা। তা কবে হবে বলা শক্ত। ১৯৬৮ সালের প্রবল বন্যায় জলঢাকা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। তিন মাইল লম্বা টানেল পলিমাটিতে বুজে যাবার ফলে উৎপাদন কেন্দ্রের কাজ মাসাধিককাল বন্ধ থাকে মেরামতের জন্য। তারপর থেকেই শুরুর হয়েছে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মাঝে মাঝে অচল হওয়া, যা আজও হয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের কাজ শেষ করতে দেরি হবার যেসব কারণ তদন্ত কমিশন নির্ণয় করেছেন তা হ'ল টানেল এলাকায় যে ধরনের মাটি রয়েছে তাতে কাজ করতে গেলে যে সব বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি লাগে, তা ওই অনুগৃহীত কংগ্রেস প্রতিনিধির নেই। তা ছাড়া ওই অনুগৃহীত প্রতিষ্ঠানের ওপর অত্যধিক কাজ চাপানো হয়েছে, যা তার ক্ষমতার বাইরে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন কর্তৃক কংগ্রেসকে কাজের নক্সা ও নিয়মাবলী সরবরাহ করতে অথবা বিলম্ব, প্রতি ক্ষেত্রে দুটি ও দূর্নীতি—সব কিছুই জন্য ওই কংগ্রেস প্রতিনিধি, রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এবং কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের কিছু পদস্থ ব্যক্তিদের অশুভ একটি আঁতাতের ফলেই সম্ভব হয়েছে। তদন্ত কমিশন আরও বলেছেন, উপযুক্ত অনুসন্ধান ছাড়াই এই প্রকল্পের কাজে হাত নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশন যদি পূর্বাঙ্কে ভূতাত্ত্বিক উপযুক্ত অনুসন্ধানের ভিত্তিতে নকশা প্রস্তুত করতেন, তবে, প্রকল্পের ব্যয় কমানো যেত। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদেরও জানা ছিল যে, সাভের তথ্যাদি পর্ষাপ্ত নয়, বরং অসম্পূর্ণ, কিন্তু তা সত্ত্বেও পর্ষদ জিওলজিক্যাল সার্ভের পরামর্শ অবজ্ঞা করেছে। তা ছাড়া তদন্ত কমিশন উ' অনুগৃহীত কংগ্রেস প্রতিনিধির প্রতিষ্ঠানের প্রতি

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মনোভাবের সমালোচনা করেছেন। টানেল তৈরির কাজ দু' বছরের মধ্যে শেষ করার কথা ছিল, কিন্তু শেষ করতে সময় লেগেছে ছয় বছর। টানেলের মুখ বন্ধ হয়ে গেলে বা টানেল স্থানে স্থানে ভেঙে পড়লে তা মেরামত করা হয়েছে সরকারী ব্যয়ে, অথচ সে ব্যয় বহন করার কথা উক্ত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানের। জলঢাকা প্রকল্পের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এই সব বিচ্যুতির ফলে এই প্রকল্পের স্থায়ী যে-কোন উপকারিতা সম্পর্কেই সন্দেহ করার বিলম্ব কারণ দেখা গেছে।

—৪ঠা জুলাই, ১৯৭০

খরা-রিলিফ-দুর্নীতি ও রাজনীতি

পটুয়াখালী ও বাঁকুড়া জেলা খরা-রিলিফ এলাকা বলে রাজ্যপাল কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে এবং এ জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট সাহায্যের আবেদন করেছেন। অবশ্যই ইতিমধ্যে সেখানকার অধিবাসীদের নানাভাবে সাহায্য করা আরম্ভ হয়ে গেছে।

প্রসঙ্গত ১৯৬৭ সালের কথা মনে পড়ছে। সরকারীভাবে ঘোষিত না হলেও পশ্চিমবঙ্গের চারটি জেলায় (পটুয়াখালী, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুর ও মানসিংহ) দুর্ভিক্ষের অবস্থা বিরাজ করছিল। কংগ্রেসী আমলে গ্রামকে মেরে শহরকে খাওয়ানোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল, বার ফলে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের অবস্থা শোচনীয়তম পর্যায়ে নেমে এসেছে। এতদিন ধরে গ্রামগুলি যেভাবে অবহেলিত হয়েছে কোন সভ্য দেশের উন্নয়নের ইতিহাসে এমন অব-হেলার পরিচয় পাওয়া যায় না।

১৯৬৭ সালের আর একটি কথা এর পাশাপাশি ফুটে-ওঠে চোখের সামনে। যুক্তফ্রন্টের পণ্ডিতমন্ত্রী শ্রীবিভূতি দাশগুপ্ত একটি বিবৃতিতে পটুয়াখালী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার বিভিন্ন জেলা পরিষদ ও সেগুলির অধীনস্থ আঞ্চলিক পরিষদ ও অঞ্চল পণ্ডিতসমূহের ১৯৬৬-৬৭ সালের গ্রাণকাৰ্য পরিচালনা ও হিসাবপত্র রাখার বহু বৈআইনী, অসংযত ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ করেছিলেন। ঐ বছরের জন্য বরাদ্দ টাকার হিসাব তখনো সম্পূর্ণ হয় নি। তিনি বিবৃতিতে বলেন—

“পটুয়াখালী জেলায় টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনাগুলি শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিষদের ফিনান্স এন্ড এস্টারিশমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি অথবা পটুয়াখালী জেলা পরিষদের অনুমোদন ব্যতীত গ্রহণ করা হয়েছে। জেলা পরিষদের নিকট থেকে আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিগণ যে নগদ টাকা পেয়েছেন, ক্যাশ বই-এ তার কোন হিসেব নেই। ফিনান্স এন্ড এস্টারিশমেন্ট স্ট্যান্ডিং কমিটিকে না জানিয়েই আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ‘পে-মাস্টার’ নিয়োগ করেছেন। কিন্তু ঐ চারজন পে-মাস্টারের কোন অস্তিত্বই নেই, অথচ খাতার তাঁদের নাম আছে। নিদারুণ খরা ও জলকষ্ট সত্ত্বেও টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার শতকরা ছিয়ানব্বইটি সম্পূর্ণ হয় নি।

“বাঁকুড়াতেও টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা স্ট্যান্ডিং ফিনান্স এন্ড এস্টারিশমেন্ট কমিটির নিকট পরীক্ষার জন্য যায় নি। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতিদের যে ৮৪ হাজার টাকা দিয়েছেন ক্যাশ বই-এ তা লিপিবদ্ধ হয় নি। পে-মাস্টাররা প্রায় এক লক্ষ টাকার ‘মাস্টার রোল’ দাখিল করেন নি।

“মেদিনীপুর জেলার গ্রাণ পরি-কল্পনার তালিকা ও তার সম্ভাব্য ব্যয় জেলা শাসককে আইনত জানানো কর্তব্য ছিল, কিন্তু তা জানানো হয় নি। জনৈক প্রান্তর এম-এল-এ’র আদেশে ময়না নুকে টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনার টাকা তার ওভারশিয়ারের মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে। নন্দীগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতির হাতে প্রায় দশ হাজার টাকা থাকার কথা, কিন্তু তা তিনি দেখাতে পারেন নি।

“চব্বিশ পরগনা জেলায় যে সকল টেস্ট রিলিফ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে তার অধিকাংশই বৈধভাবে অনুমোদিত হয় নি। ঐ পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান বৈআইনী কার্যকলাপে লিপ্ত। ১৯৬৬-৬৭ সালের জন্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ টাকার হিসাব এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। আঞ্চলিক পরিষদের ক্যাশ বইতে সকল হিসাব ঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয় নি।”

পূর্ববর্তী বিশ বছরে তাহলে কিভাবে টাকা তহনুজ করা হয়েছে তার চিত্রটিও বেশ ভাল করেই ফুটে উঠছে। প্রতিটি অঞ্চল পণ্ডিতে, আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদ দুর্নীতি ও দলীয় রাজনীতির শিকার হয়েছে। গ্রাম পণ্ডিতগণ গ্রাম্য অভিজাত-তন্ত্রের কবলিত। স্বভাবতই কংগ্রেসী আমলে (এখনও) এইগুলিই ছিল দলীয় স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার।

তাই কিভাবে রিলিফের নামে দুর্নীতি চলতো তারই কাহিনী এখানে নিবেদন করছি। একেবল গল্প নয়, নিছক রূপকাহিনী নয়। যা যা ঘটে ও ঘটেছে এবং যা প্রায় সর্বজন-বিদিত তারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেবল পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রতিকারের দুরাশা নিয়ে অপেক্ষা করা।

টেস্ট রিলিফ মানেই কাজের বিনি-ময়ে সাহায্য। এটা প্রযোজ্য হয় কেবল সক্ষম ব্যক্তির বেলায়। আর রিলিফ দেওয়া হয় অন্ধ, কানা, খোঁড়া, অকর্মণ্যদের। রিলিফ অর্থাৎ ভিক্ষা দেওয়া? এর আগে অর্থাৎ বিদেশী শাসনের আমলে এটা একটা কংগ্রেস-কলমের ব্যাপার ছিল। নেহাৎ দায়ে ঠেকেলে কোন কোন স্থানে সাময়িক খয়রাতী—যাকে চলতি কথায় ভিক্ষা বলা যায়—দেওয়া হত। ১৩৫০ সালের পর এই নেশে (বাংলা দেশে) ভিক্ষুকের দল যেন বেড়ে গেছে। দেশ বিভাগের পর ভিক্ষুকের দল আরও ভারী হয়েছে। দিন দিন বাড়তির পথে। ভিক্ষা করা সবচেয়ে লজ্জাকর কাজ। পারতপক্ষে কেউই এরূপ কাজে নাম লেখাতে চায়ও না। তা ছাড়া “দানের স্বারা দারিদ্র্য দূর হয় না, বরঞ্চ তা” পাকা হয়ে ওঠে।” (রবীন্দ্রনাথ)

বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে, তথাকথিত অনুমত, দরিদ্র ও ভূমিহীন পরিবারকে সাহায্য দিয়ে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্য যত না, খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের সুযোগে স্বাধীন যুগের দেশগতপ্রাণ লীডারগণ লীডারশিপ কায়দা রাখার উদ্দেশ্যে এবং অনুচরগণকে “ট. পাইন্স” পাইয়ে দেবার জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভিক্ষা শব্দটাকে রিলিফে রূপান্তরিত করেই লক্ষ লক্ষ লোককে এই ভিক্ষুকের পর্যায়ে ফেলেছেন। ভিক্ষা দিয়ে দিয়ে ও ভিক্ষা নিইয়ে নিইয়ে সাধারণ মানুষকে প্রমত্তাখপেক্ষী, অসহায় ও পণ্ডু করে ফেলেছেন। রিলিফ দিয়ে দল গড়া সহজ। শোনা যায়, আমে-রিকান সাহেবরা যখন প্রথম এ দেশে এল, তাদের দেখার জন্য ছেলে-বুড়োর দল হাজির হলে তারা নাকি পয়সা, রুটির হরিলুটে দিয়ে বাঙালীদের অভিনন্দন জানাত। আর সেই হরিলুটের মাল আমাদের সমগোত্রীয়রা কুড়িয়ে নেবার জন্য ছুটোছুটি, হুড়োহুড়ি করতো, তাই দেখে সাদা চামড়ার দল হেসে উঠতো হো হো করে। ভিক্ষা দিয়ে মজা লুটতো। আর আজ স্বাধীন যুগের সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার নামে দয়ার অবতার সেবক

শান্তিরা সরকারের কাছে বরনা দিয়ে কাগজে লিখে লিখে আটা, চাল, টাকা এনে দেশকে ভিক্ষুকে পরিণত করছেন। তাঁরা হাসেন না, পরিবর্তে জাতিকে দুর্বল করে চোখ রাঙিয়ে কাজ হাসিল করার পথ প্রশস্ত করেন। দেশকর্মীগণ কি জবাব দিতে পারবেন, রিলিফ-নামীয় ভিক্ষা দিয়ে জাতির যথার্থ কল্যাণ হয়েছে এবং হচ্ছে? 'সবরমতী, ওয়ার্ধা আর সেবাগ্রামের পরে আর কেন সবরমতী, ওয়ার্ধা ও সেবাগ্রামের সৃষ্টি হয় না? কল্যাণ কোথায়?

স্টেট রিলিফের ব্যাপারে তবু কিছু মাটি কাটা হয়। কিন্তু রিলিফে? চুরি করতে কোন কষ্ট নেই। কোনও-ক্রমে নামটা একবার লিফ্টভুক্ত করতে পারলেই চার মাসের খোরাকীর বন্দোবস্ত (কয়েক বছর টিকে থাকতে পারলেই পাকা বাড়িও তৈরি হয়)। রিলিফের লিফ্ট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখার কারও অবকাশ নেই। শতকরা কতজনকে রিলিফ দেওয়া হবে উপর-ওয়াল কর্মকর্তাদের শৃঙ্খল তাই জানালেই হবে।

মাত্র কয়েকজন দেশসেবকের (?) উপর দৃষ্টিবাদের জীবন-মরণ নির্ভর করে। এরা অন্ধকে পশুতোলা, কানাকে অন্ধ, দৃষ্টিবাদের ধনী, ধনীকে দৃষ্টিবাদের, বিধবাকে সধবা, সধবাকে বিধবা, কুমারীকে

বিবাহিতা, পঙ্গুকে সক্ষম, কমঠিকে অকর্মণ্য, ছেলেকে বড়ো, আবার বড়োকে জোয়ান করে দিতে পারেন বলে শোনা যায়। পি. সি. সরকারের ভোজবাজী সত্যি অনেক স্থলে এঁদের কাছে নসি। লিফ্ট তৈরির পর সকলের মধ্যে কমপক্ষে তিনজন সদস্য সাহি করে উপরে পাঠিয়ে দিলেই পাস। ডিলার নিষ্পত্ত হলোই আটা বা চাল এসে উপস্থিত।

এই প্রাথমিক আয়োজন সমাপ্ত হবার পর যে দৃশ্য অভিনীত হয় তা ভুক্তভোগী ব্যতীত বলা শক্ত। টোকেন লেখা হবে, একজন সনাক্তকারী সাক্ষী হবেন। ইস্যুইং অফিসার ইস্যু করবেন টোকেন। রিলিফের সেন্টারে যান, শুনতে পাবেন—‘নাম আছে রাব্দু আমার?’ উত্তর—‘নেই।’ ‘কেন, গতবারেও তো লিফ্টতে নাম ছিল।’ উত্তর—‘কিটে দেওয়া হয়েছে। তুমি তো আর অক্ষম নও, ভিক্ষে করেও তো খেতে পার। এ সব তোমরা পাবে না। তোমাদের চেয়ে আরো অনেক গরীব রয়েছে।’ কথা বলার অধিকার সংবিধানেই আছে। এখানে তার প্রয়োগ চলবে না। সুতরাং কপালে করাঘাত করে ঘরে এসে হরিষট্টর চিবানো ছাড়া গতান্তর থাকে না।

অনেক ভুয়া নাম না দিলে ন্যাক

চলে না। জলযোগ আছে, ডিলারের পাওনা আছে, ডিলারের বাড়তি-পড়তি-কমতি আছে, কণ্ট্রোলার অফিসের খরচাও যে কিছু নেই এমন নয়। তার উপর কাগজ-কলমের দামও আছে। এ সব জোটে কোথেকে? সরকার তো আর এগুলো দেন না। তা ছাড়া প্রত্যেককে যতটা দেবার ব্যবস্থা থাকে, কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই ঠিক ততটা দেওয়া হয় না, কিছু কম দিতেই হয়।

গ্রামের সদস্য ও এম-এল-এ মহাশয়রা কোনদিনই রিলিফ বিতরণ কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন না। কেন না তাঁরা থাকলে ন্যাক অনেক ভাল লোকদের রিলিফ নিতে লজ্জা হবে; সেক্ষেত্রে সবদিক (?) বজায় রাখার জন্যই ন্যাক তাঁরা সেন্টারে আসতে চান না।

বছর বছর ধরে সরকারী অর্থ ও খাদ্য এভাবে অপচয় না করার জন্য জনসাধারণকে চিন্তা করতে অনুরোধ করছি। আপনারা বুদ্ধন, জানন, এ সম্পদ আপনাদেরই। দুটো মিষ্টি কথা বলে আপনাদের নাম ভাঙিয়ে যাঁরা চলছেন তাঁদের দূর থেকে নমস্কার করুন। সম্মিলিতভাবে দেশের জনসাধারণ নিজেদের প্রাপ্য বৃত্তে নৈবার দিকে লক্ষ্য রাখুন। তবেই হবে নিজেদের ও দেশের মঙ্গল।

—মাখনলাল ঘোষ

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

রন্ধনশিল্পে অভিজ্ঞা পাকুল সেবগুপ্তের

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সন্তান মৃত্যুরোচক ও শূন্যচরিত্র খাদ্য তৈয়ারীর এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙালীর ছিল না বললেই হয়। বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—‘দেশদেশের জলখাবার’ বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শ্রদ্ধা নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভাগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিগ্রহে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার’ শিল্পের বহুবিচিত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগুদল অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে বিবরণে দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।’

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !! মূল্য : ছয় টাকা

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১ ১১১১১১



বায় ও দক্ষিণগঙ্গা জোট

প্রতিক্রিয়াশীল সিঁড়িকে গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বিভাজিত হবার পর তাঁদের নেতারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসী সরকারের পরমায়ু ঘনিষ্ঠে এসেছে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইন্দিরা সরকার কুপোকাত হবে। সেই সব সিঁড়িকে গোষ্ঠীভাবীদের ভবিষ্যদ্বাণী বার্থ করে ইন্দিরা-সরকার নিরাপদেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। সেই সরকারকে ওল্টাবার সকল প্রচেষ্টা তো ব্যর্থ হয়েছেই, উপরন্তু বিভিন্ন উপনির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস আঁত অন্যায়সেই সিঁড়িকে প্রার্থীদের ধরাশায়ী করেছেন। তাতে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, সিঁড়িকে পরমায়ুই ফুরিয়ে এসেছে এবং আগামী দ্বাদশ নির্বাচনে তাঁদের ভরাডুবি অনিবার্য। শেষের সে দিন ভয়ঙ্করের কথা চিন্তা করে সিঁড়িকে নেতারা একে-ঘারেই বে-সামাল হয়ে পড়েছেন। বেঁচে থাকার শেষ প্রচেষ্টায় গত সপ্তাহে সিঁড়িকেটাই হাই কমান্ড স্থির করেছেন যে, দেশের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল-গুলোকে নিয়ে তারা একটা “জাতীয় গণ-শান্তিক ফ্রন্ট” গঠন করবেন। এই ফ্রন্টে ফন্দের নেওড়া হবে, তা তাঁরা স্পষ্ট করে বলেন নি ঠিকই, তবে তাঁদের লক্ষ্য যে স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং এস এস পি দল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সিঁড়িকেটের এই নতুন সিঁধ্যালতে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র দল খুব খুশি হয়েছেন। স্বতন্ত্র দলের চেয়ারম্যান রাসানীর আর দোরি সহিছে না। তিনি বলেছেন, দোরি করার আর কোন দরকার নেই। এখনই পার্লামেন্টে একটা “জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট” গঠন করে ফেলা হোক। আগামী ২৭শে জুলাই পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হবে। তার আগেই প্রস্তাবিত ব্রক গঠন করে তার একজন নেতা নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে তিনি সংশ্লিষ্ট দলগুলির

একীকরণের পক্ষপাতী নন। মাসানী চান, ব্রকের প্রত্যেক দলের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে তাদের মধ্যে একটা মিত্রতা প্রতিষ্ঠিত হোক। তাহলে নির্দিষ্ট কার্যক্রমের ভিত্তিতে বিকল্প নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত হতে পারে। “গণতন্ত্রের কাঠামো বজায় রেখে কম্যুনিষ্ট চ্যালেঞ্জের সক্রিয় মোকাবিলার জন্য” মাসানী এই ধরনের ব্রক গঠনের পক্ষপাতী। মাসানী আশা করেন, আপাতত প্রস্তাবিত ব্রকের কাজ কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকলেও



মোরারজী দেশাই

পরে এটা রাজ্য পর্যায়ের সম্প্রসারিত হতে পারে। আগামী ২০শে জুলাই মাদ্রাজে স্বতন্ত্র দলের জেনারেল কার্ডিনালের বৈঠক বসবে। সেখানে ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্রক’ গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হবে না বলে মাসানী ঘোষণা করেছেন। সি রাজাগোপালাচারী এবং এন. জি. রংগ—দুজনেই এ ব্যাপারে মাসানীর সঙ্গে একমত হয়েছেন।

প্রস্তাবিত ব্রক সম্পর্কে জনসংঘ দলের আগ্রহ স্বতন্ত্র দলের চেয়ে কিছু কম নয়।

জনসংঘের নেতা “মাদোক বলেছেন, “জাতীয়তাবাদী” এবং “গণতান্ত্রিক” পার্টি-গুলোর মধ্যে এতদিনে একটা মিত্রতার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তিনি আশা করেন, শ্রদ্ধা স্বতন্ত্র আর জনসংঘ নয়, এস-এস-পি, পি-এস-পি, এবং বি-কে-ডিও প্রস্তাবিত ব্রকে যোগ দিতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, কংগ্রেস (ইন্দিরা পন্থী) এবং অন্যান্য দলেও এমন অনেক সদস্য আছেন, যারা জনসংঘের চিন্তাধারায় বিশ্বাস করেন। তাঁদের একসঙ্গে গেঁথে ফেলবার দরকার হয়ে পড়েছে।

এস-এস-পি দলের নেতা রাজনারায়ণ প্রস্তাবিত ব্রকের পক্ষপাতী বলেই মনে হয়। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্টকে ওল্টাবার জন্য দরকার হলে এস-এস-পি দল শয়তানের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আছে।

কিন্তু এই দলের মধ্য লিমায়ে এবং অপর দু’একজন নেতা কোন কমিউনিস্ট বিরোধী জোটে যোগ দিতে আনচ্ছুক।

এস-এস-পি দলের এক এক নেতা এক এক রকমের মতামত পোষণ করেন। কাজেই তাঁরা যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন তা অনুমান করা শিবেরও অসাধ্য বলে মনে হয়। তবে নানা মতভেদের ফলে দলের যা অবস্থা তাতে নেতারা যে পথেই যান না কেন, দলের ভাঙন অনিবার্য। বিহারেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সম্ভবত সেই ভাঙন এড়াবার জন্য এঁরা একটি তৃতীয় ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করছেন। এস-এস-পির সেক্রেটারী ফার্নান্ডেস এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা। তিনি বিষয়টা নিয়ে সিঁড়িকেটী নেতা মোরারজী দেশাই এবং স্বতন্ত্র নেতা রাজাগোপালাচারীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দেশাইকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত জাতীয় গণতান্ত্রিক ব্রক যদি কমিউনিস্ট বিরোধিতাকেই তাঁদের মূলমন্ত্র করেন,



মাসানী

তাহলে সেই রকম এস-এস-পি যোগ দিতে পারবে না।

অপর দিকে রাজাগোপালাচারী ফার্নান্ডেসকে বলেছেন যে, সি-পি-এম দলের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে তাঁর আপত্তি নেই। রাজাজীর ধারণা, "ভাগে-পাথী কমিউনিস্টরা একেবারেই গোম্ভায় গেছে। তারা মস্কোর বড়ো আঙুলের তলায় রয়েছে এবং তারা ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছে। অন্য দিকে সি-পি-এম দলের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা অপর কোন দেশের কোন সম্পর্ক নেই। তারা এখন আশপাশে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই তাদের অনায়াসেই 'জাতীয় কমিউনিস্ট' বলে গণ্য করা যায়।"

সি-পি-এম দলের পলিট ব্যুরোর আসন্ন বৈঠকে এস-এস-পির প্রস্তাব আলোচিত হবে। দলের নেতা রামমূর্তি বলেছেন যে, এস-এস-পি যে ফ্রন্ট গঠনে উদ্যোগী হয়েছে, সেটা সফল করবার জন্য তাঁরা চেষ্টা করবেন। রামমূর্তি আরও বলেছেন, সি-পি-আই ইন্দিরা গভর্নমেন্ট-বিরোধী কোন জোটে যোগ দেবে বলে তিনি মনে করেন না। দুই কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠতর হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই।

সব মিশিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সিপিএকট, স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ একটি জোটে সংঘবদ্ধ হতে চলেছে। সেটা যে রক্ষণশীল দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল জোট, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এস-এস-পির রাজনারায়ণ ও অন্যান্য কিছু নেতা সেই জোটে যোগ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু দলের অন্য নেতারা দক্ষিণপন্থীদের জোটে ভিড়তে চাইছেন না। তাই তাঁরা একটা তৃতীয় জোট গঠন করতে চাইছেন। সি-পি-এম সেই জোট সম্পর্কে নিরাসক্ত নন। অন্যান্য বামপন্থী পার্টিগুলো এখনও তৃতীয় জোট সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করেন নি। সেটা দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই জানা যাবে।

ঘটনার গতি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পর কোন একটি দলের পক্ষে ক্ষমতা লাভ করা বোধ হয় আর সম্ভব হবে না। সেই কারণেই সমঝোতাবলম্বী দলগুলো জোটবদ্ধ হবার চেষ্টা করছে। দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দলগুলোর জোটবদ্ধ হতে বিশেষ দেরী লাগবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বামপন্থীদের একজোট হওয়ার পথে অনেক বাধা আছে। একেবারে আর পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্টের তিস্ত অভিজ্ঞতাই তার সূচক। তবে এও ঠিক যে যুক্তফ্রন্ট ছাড়া বামপন্থীদের কোন পথ নেই। তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে খেয়ো-



ফার্নান্ডেস

খ্যে বন্ধ করে একজোট হতে পারেন, তবেই মঙ্গল। নচেৎ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃষ্টিশক্তির অনেক কারণ আছে।

পাঞ্জাব মন্ত্রিসভার সংকট

পাঞ্জাব বিধানসভার বিগত বাজেট অধিবেশনের সময় গুরনাম সিং-এর নেতৃত্বাধীন আকালী-জনসংঘ মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। বিরোধী দল মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে পারেন নি, ঘটিয়েছিলেন আকালী নেতা সন্ত ফতে সিং। তিনি গুরনাম সিংকে ভিতর থেকে ঘায়েল করে তাঁর মন্ত্রিসভার পরমায় শেষ করে দেন। অতঃপর আর একটি আকালী-জনসংঘ কৌশলশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং সন্ত ফতে সিং-এর প্রিয়পাত্র পি এস বাদল হন তার মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সম্প্রতি সেই মন্ত্রিসভার অবস্থাও কাহিল হয়ে পড়েছে। জনসংঘের সদস্যরা মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন এবং আকালী দলের অনেক সদস্যও আবার গুরনাম সিং-এর দলে ফিরে গেছেন। বিধানসভায় মোট সদস্যসংখ্যা ১০৪ জন কিন্তু ব্যাপক 'দলত্যাগের' ফলে বাদল মন্ত্রিসভার সমর্থকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৫ জন। কাজেই বিরোধী পক্ষ এখন শ্রীবাদলকে চেপে ধরেছেন—অবিলাসে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। বাদল গোড়ায় বলেছিলেন, বিধানসভার একটা অধিবেশনের পর ৬ মাস আর কোন অধিবেশন না ডাকলেও চলে। কাজেই সেই নিয়ম অনুসারে ৩০শে সেপ্টেম্বরের আগে বিধানসভার

অধিবেশন ডাকবার আর কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু বিরোধী পক্ষের চাপে তিনি এখন নতি স্বীকার করেছেন। স্থির হয়েছে, ৫ই আগস্ট বিধানসভার অধিবেশন বসবে এবং সেখানেই শক্তিপরীক্ষা হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা ২০শে জুলাই বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানাচ্ছেন। সিপিএকটী কংগ্রেস পাঞ্জাবে রাজ্যপালের শাসন চালু করবার আহ্বান জানিয়েছেন। অপর দিকে গুরনাম সিং বিধানসভা সাসপেন্ড করার দাবী জানিয়েছেন। গুরনাম সিং-এর দলে ১৪ জন সদস্য আছেন। তিনি ভেবেছিলেন, এস-এস-পি, সি-পি-আই, কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এবং পি-এস-পি সদস্যদের সহায়তায় তিনি গভর্নমেন্ট গঠন করতে পারবেন। কিন্তু সম্ভাব্য মিত্রদের ভাবগতিক দেখে তিনি ভরসা পাচ্ছেন না। সেই কারণেই তিনি বিধানসভা সাসপেন্ড করার দাবী তুলেছেন।

কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) দলও চূপ-চাপ বসে নেই। তাঁদের নেতারা একটি বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে তাঁদের নেতা সংপাল মিটল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি তাঁকে বলেছেন যে, কোন একটা আকালী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোঁ বাঁধা উচিত। তবে কৌশলশীল গভর্নমেন্ট গঠিত হলে তার নেতৃত্ব রাখতে হবে কংগ্রেসের হাতে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর পাঞ্জাবের সহকর্মীদের বলেছেন, পরিস্থিতি লক্ষ্য করে যান, হঠাৎ কিছু করবেন না।

মুখ্যমন্ত্রী বাদলের ধারণা, তাঁর মন্ত্রিসভার সামনে কোন সংকট নেই। তিনি মনে করেন, দলত্যাগীরা আবার দলে ফিরে আসবে এবং আকালী দলের বাইরের ১০।২২ জন সদস্য তাঁর গভর্নমেন্টকে সমর্থন করবে।

পাঞ্জাবে দলাদলির রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে বাদল মন্ত্রিসভার পরমায় আর বেশি দিন নেই বলেই মনে হয়। কিন্তু বিকল্প কোন মন্ত্রিসভার সম্ভাবনাও যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়। কাজেই শেষ পর্যন্ত সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার সম্ভাবনাই বেশি।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন যখন ক্ষুদ্র কম্বোডিয়ায় সশস্ত্র মার্কিন অভিযান শুরু করে দেন, তখন সারা দুনিয়ার শান্তিকামী মানব তো ক্রুদ্ধ হয়েছিলেনই, খোদ আমেরিকার অধিবাসীরাও কম ক্ষুব্ধ হন নি। মার্কিন ছাত্ররা নিক্সনের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পথে পথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বেরিয়ে পড়েন। নিক্সন তাঁদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের নৃশংস দমন-নীতির ফলে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও যুবক হতাহত হন। অপরাধকে মার্কিন সিনেট এবং প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যরাও চাপ-চাপ বসে থাকেন নি। তাঁরা অনেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গত সপ্তাহে

তাঁরা প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য কুপার-চার্চ (সংশোধনী) বিল পাশ করিয়ে নিয়েছেন। মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলে কংগ্রেসের অনুমোদন চাই। প্রেসিডেন্ট নিজের স্বশিমত আমেরিকাকে কোন যুদ্ধে জড়াতে পারেন না। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা সর্বোশেষে কংগ্রেসের এই অধিকার হরণ করে বিভিন্ন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট জনসনই সর্বপ্রথম এই অপকৌশল প্রয়োগ করেন। ১৯৬৪ সালের ৭ই আগস্ট টংকিং উপসাগরের একটি সাজানো ঘটনা সামনে রেখে জনসন ভিয়েতনাম যুদ্ধের মাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের তাৎপর্য উপলব্ধি না করে কংগ্রেসের উভয় সভা বিপুল ভোটাধিক্যে সেই প্রস্তাব

পাশ করে দেন। তাতে জনসনকে ভিয়েতনামের যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সনও সেই টংকিং উপসাগরীয় প্রস্তাবের ভিত্তিতেই কম্বোডিয়া আক্রমণ করেছেন। তাতে কংগ্রেসের সদস্যরা বেশ বুদ্ধিতে পারছেন যে, প্রেসিডেন্ট আসলে সংবিধানের নির্দেশ লঙ্ঘন করবার জন্যই টংকিং প্রস্তাবটা পাশ করিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার অধিকার প্রেসিডেন্টের হাতে ছেড়ে দিতে কংগ্রেস রাজী নয়। তাই তারা কুপার-চার্চ (সংশোধনী) বিলের দ্বারা প্রেসিডেন্টের আত্মসাৎ করা ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

সিনেটে ৫৮-৩৭ ভোটে অনুমোদিত উপরোক্ত বিলে প্রেসিডেন্টকে বলা হয়েছে যে, ৩০শে জুনের (১৯৭০) পরে প্রেসিডেন্ট কম্বোডিয়ায় কোন সামরিক অভিযান চালাতে পারবেন না অথবা সেই কাজে দিয়ে কোন বিদেশী ফৌজও নিয়োগ করতে পারবেন না। কারণ আমেরিকা কোন দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না করবে সেটা স্থির করার অধিকার এবং দায়িত্ব একমাত্র কংগ্রেসের।

কংগ্রেসের কাছে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যেভাবে অপমানিত হলেন, এর আগে আর কোন প্রেসিডেন্ট তেমনটা হয়েছেন বলে মনে হয় না।

সামরিক সরঞ্জাম বিক্রয় বিলের ওপর আলোচনাকালে রিপাবলিকান দলের শেরম্যান কুপার এবং ডিমোক্রাটিক দলের ফ্রাঙ্ক চার্চ উপরোক্ত সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, নিক্সন ৩০শে জুনের পর কম্বোডিয়ার যুদ্ধে একটি পয়সাও ব্যয় করতে পারবেন না। ব্যয় করতে হলে কংগ্রেসের অনুমতি চাই।

সিনেটের এই প্রস্তাবের ফলে কম্বোডিয়া অথবা ভিয়েতনামে মার্কিন সামরিক অভিযান বন্ধ হবে—এমন মনে করবার কোন হেতু নেই। মার্কিন সেনা-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এত ক্ষমতার অধিকারী যে সারা দুনিয়ায় আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যেতে তাঁর বিশেষ অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু মার্কিন সিনেট যে প্রেসিডেন্টের অসংযুক্ত রূপপাশা খর্ব করতে এগিয়ে এসেছেন, সেটাই একটা গম্ভীর সূত্রাঙ্গ বলে শান্তিকামী মানব মনে করেন। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গায়ের জোরের বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সেটা আর সম্ভব নয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই সত্য যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করেন, ততই মঙ্গল। “জোর যার মূলুক তার” নীতির দিন শেষ হয়ে গেছে।

সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!!
দুইখানি অমূল্য কাব্যসুভার

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ

কলিকাতা-১২

সাংগাহিক বঙ্গমতী

পশ্চিম এশিয়া:

পশ্চিম এশিয়ায় আরব-ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার জন্য গত সপ্তাহে নানা মহলেই তৎপরতা দেখা গেছে। শোনা যাচ্ছে ভারত সরকারও নাকি এই বিরোধ মীমাংসায় সহায়ক হতে ইচ্ছুক। প্রেসিডেন্ট নাসের এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সন দু'জনেই নাকি বিষয়টা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে সম্প্রতি চিঠি লিখেছেন। শ্রীমতী গান্ধী সেই চিঠির জবাব দিচ্ছেন।

ওদিকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নাসের বর্তমানে পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য মস্কায় রয়েছেন। সেখানে তাঁর দৌতোর ফলাফল এখনও জানা যায় নি। তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব-ইসরাইল বিরোধ মীমাংসার একটা নতুন ফর্মুলা দিয়েছে। সেটা আশা-যাজক বলে বিভিন্ন মহলের ধারণা।

স্ট্রাস্বেস্ক মহলের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তির যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে নাকি অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইসরাইলকে এখনই সরে আসতে বলা হয় নি। সোভিয়েত প্রস্তাবে নাকি বলা হয়েছে যে, প্রথম পর্যায়ে ইসরাইল অধি-

কৃত আরব এলাকা ছেড়ে আসতে স্বেচ্ছা করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে আরবরাও ঘোষণা করবে যে, ইসরাইলের সঙ্গে তারা সম্ভাব্যে বসবাস করতে রাজী আছে। পরে ইসরাইলকে অধিকৃত আরব এলাকার পুরোটা ছেড়ে আসতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন নাকি ইসরাইলের আঞ্চলিক অখণ্ডতার গ্যারান্টি দিতেও রাজী আছে। এর তাৎপৰ্য এই যে, আরব গভর্নমেন্ট-গুলো প্যালেস্টাইনী কমান্ডোদের ইসরাইলে অনুপ্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি করবে।

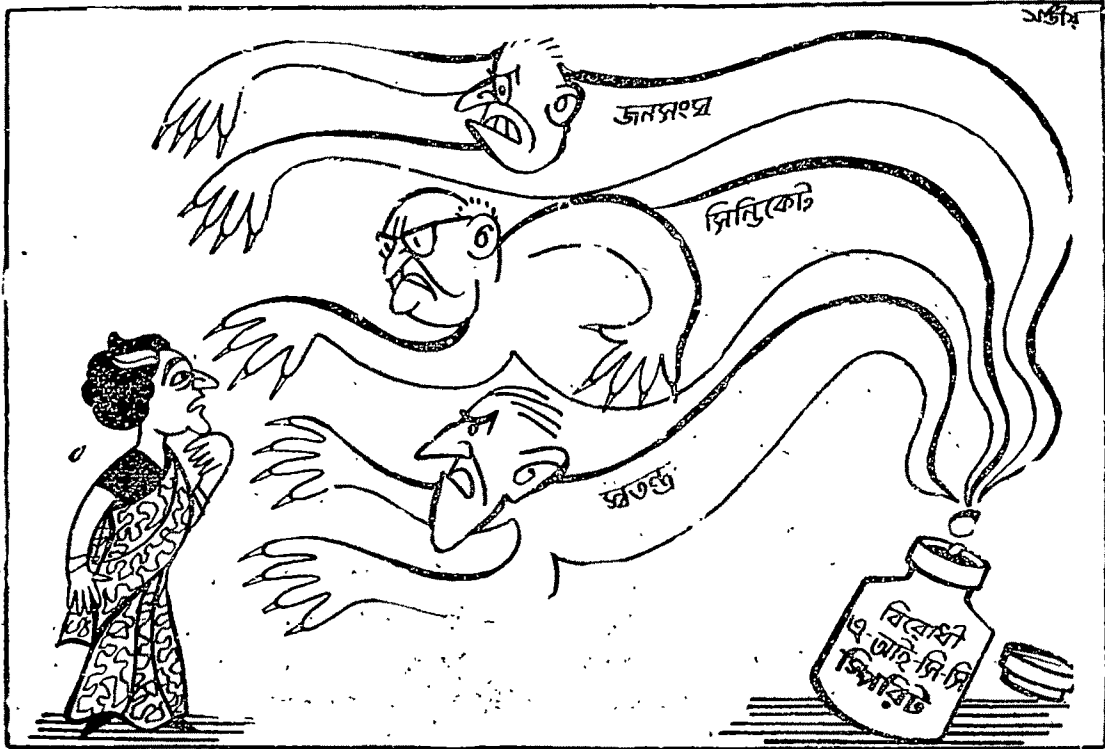
সোভিয়েত ইউনিয়নের এই প্রস্তাব ইসরাইল এবং আরব নেতারা কিভাবে গ্রহণ করেছেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নাসের মস্কো থেকে ফিরলে সেটা জানা যেতে পারে। তবে আরব নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ না করে রাশিয়া এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছে বলে মনে হয় না।

আরব-ইসরাইল সশস্ত্র বিরোধ যে রকম ক্রমবর্ধমান এবং সেখানে বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তি জোট-যেভাবে মূখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সেখানেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হওয়া অসম্ভব নয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন যে, পশ্চিম এশিয়ায় তিনি কিছুতেই শক্তিসাম্য নষ্ট হতে

দেবেন না। অর্থাৎ শক্তির পাল্লায় একদিকে থাকবে ইসরাইল আর অপর দিকে থাকবে আরব দেশগুলো। আরবদের দেশে তিনি আরবদের বাড়তে দেবেন না। ইসরাইলকে মদত যুগিয়ে আরবদের ঠেকিয়ে রাখবেন। তাই মনে হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মীমাংসার যে প্রস্তাবই উত্থাপন করুক না কেন, পশ্চিম এশিয়ায় বিরোধের মীমাংসা হওয়া খুব কঠিন। আরব দেশগুলি এক সময় ছিল অনুর্বর মরুভূমি কিন্তু এখন সেখানে তেলের স্রোত বইছে আর সেই স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে আমেরিকা এবং অন্যান্য পশ্চিম দেশগুলোর দিকে। পশ্চিম এশিয়ায় তেলের কারবার করে হাজার হাজার কোটি টাকা কামিয়ে নিচ্ছে আমেরিকার ব্যবসায়ীরা। আর পশ্চিম এশিয়ার মানুষ পাচ্ছেন তার ছিবড়োটা। আরবদের বেশি বাড়তে দিলে তেলের কারবারটা যদি তারা ছিনিয়ে নেয়? কাজেই ইসরাইলকে ঘাঁটি করে আরবদের ওপর ছাড়ি ঘোরাতে হবে। আমেরিকা যতদিন এই নীতি নিয়ে চলবে, ততদিন পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া খুব কঠিন।

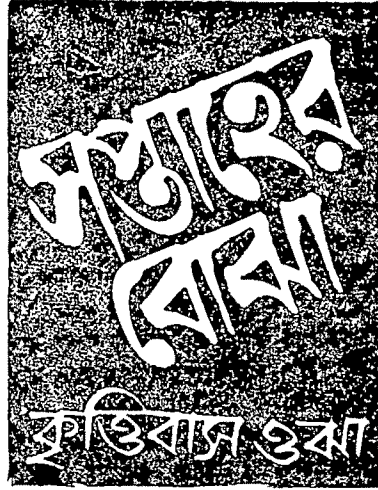
৫।৭।৭০



সিনেমা আমি দেখি না, কারণ সময় হয় না, তবে আমাকে সিনেমার নিত্য-নতুন বইয়ের পোস্টার দেখতে হয় ও পড়তে হয়। এর কারণ, আমার বাড়ির সামনে কয়েকটি বাড়ির দেওয়াল হল সিনেমার পোস্টার মারার নির্দিষ্ট জায়গা। প্রতি সপ্তাহে বা মাসে স্থানীয় সিনেমায় যেসব বই আসে, আগে থাকতে দেওয়ালে তার পোস্টার পড়ে যায়। এমনি একখানা বইয়ের পোস্টার পড়েছে সামনের বাড়ির দেওয়ালে। বইখানির নাম “শেষ থেকে শুরুর”। বইখানির অভিনেতা-অভিনেত্রী তালিকায় বেশ আকর্ষণীয় তারকা আছে। এইদিনই আবার সকালে কাগজ খুলে দেখি—রাজ্যের নরগঠিত রাজনৈতিক জোটের অন্যতম জোট আট-পার্টি ১৬ই জুলাই রাজ্যব্যাপী হরতাল-ধর্মঘট অর্থাৎ বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছেন। রাজ্যের অপর বামপন্থী জোট কয়েকদিন আগে ২০শে জুলাই হরতাল ডেকে বেখেছেন। অর্থাৎ রাজ্যবাসীর সামনে এখন দুটো হরতালের দিন বুলছে। ১৬ই ও ২০শে। আমি ভারিচলাম রাজ্য-রাজনীতিতেও এখন যে শো শুরুর হ’ল, সেটাও দেখছি “শেষ থেকে শুরুর”।

এতদিন দেখে এসেছি নানা দাবিতে জোরদার আন্দোলন হয়েছে, নানা নিষাধন-অত্যাচার হয়েছে, দমন-পীড়ন চলেছে তার-পর বাজনৈতিক দলগুলি তাঁদের সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে হরতাল-ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন। প্রশাসন, জনজীবন সবকিছু অচল স্তব্ধ করে আন্দোলনের পরিবেশকে তুঙ্গে তুলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে হরতালের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার হ’ত—অনেক ত্যাগ ও পরিপ্রমলম্ব পরিবেশে হরতালের ডাক



দেওয়া হ’ত, কিন্তু এবার কি হ’ল? কোন আন্দোলন নেই, জনজীবনকে আন্দোলনে একাত্ম করার কোন প্রস্তুতি নেই, শুধু আছে দাবিপত্র—সংবাদপত্রে প্রকাশ, সেই সঙ্গে হরতালের তারিখ ঘোষণা। অর্থাৎ যা হবার কথা সকলের শেষে, যা প্রয়োগ হবার কথা সর্বশেষ অস্ত্র হিসাবে, সেটাই হচ্ছে সকলের আগে। যা দিয়ে শেষ হবার কথা, তা-ই হরতাল দিয়ে আন্দোলন শুরুর হচ্ছে। তাই মনে মনে ভারিচলাম, সিনেমায় হচ্ছে “শেষ থেকে শুরুর” চিত্র, আর রাজ্য-রাজনীতির যা চলছে, সেটাও শুরুর হচ্ছে শেষ থেকে।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন কয়েম হবার মুখে শুধু সিপিএম-এর একার ডাকে ১৭ই মার্চ হরতাল হয়েছিল। সেই হরতালের স্মৃতি রাজ্যবাসীর মনে থেকে গড়ে যায় নি, সেই স্মৃতি সহজে যাবার নয়। বর্ধমান সাই বাড়ির ইত্যাকান্ড, কেশোরাম রেয়নে ইত্যাকান্ড, গৌরীপুরে ইত্যাকান্ড, দমদমের কাছে দক্ষিণদাড়ির ইত্যাকান্ড এখনও দৃশ্পন্ন হয়ে রয়েছে। বর্ধমান আর রেয়ন কারখানার ও দক্ষিণদাড়ির ঘটনা নিয়ে তদন্ত কমিশন বসেছে, তদন্ত চলেছে, খবর কাগজে এখনও বাঁধা দুই কলাম খবর বেরুচ্ছে। ১৭ই মার্চের এক দলের ডাকা হরতালের পরিণতিতে মরেছিল কম করে ১৭ জন। কিন্তু সে ছিল এক দলের হরতাল, আর এবার আর এক দল নয়—রাজ্য-রাজনীতির দুই শিবির। শুধু শিবিরে ভাগ হওয়া নয়, প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হচ্ছে এক দলের হরতাল আর এক দল বিরোধিতা করবে। অবস্থাটা অনুমান করা সম্ভবত দুঃসাধ্য নয়, রাজ্যে হরতাল-হাঙ্গামায় শহীদ সংখ্যা কত হবে। এই কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় ১৬ই



তারিখের হরতালের হাঙ্গামায় যদি ১০ জন শহীদ হয়, তবে ২০শের হরতালে শহীদ সংখ্যা ডবল করার চেষ্টা হবে নিশ্চয়ই। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বলেছেন—আট দলের হরতালের বিরোধিতা করা হবে, শ্রীঅশোক ঘোষ বলেছেন—ওঁরা যেমন করবেন আমরা সেই রকম করবো।

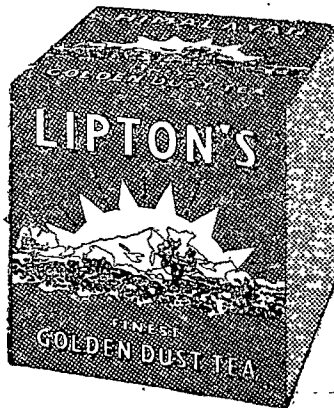
আমার প্রশ্নঃ আমরা কি শুধু শহীদ হলেই দায়িত্ব শেষ করবো? আমরা সকলেই সমাজবান্ধব ও পরিবেশগত নিত্যদিনেই শহীদ হচ্ছি, অনাহারে, বেকার থেকে, অচিকিৎসায়, অশিক্ষায়, জীবনের সবরকম ব্যর্থতায় শহীদের মৃত্যু বরণ করছি। সেই মৃত্যুর কি একটা

আইটেম বাড়বে? অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি হরতালের ডাক দিয়ে হাঙ্গামা করবে আর আমরা মরবো। সে না হয় মরলাম। রাগে মারলেও মরবো, রাবণে মারলেও মরবো, কিন্তু সবার আগে একটু বুঝে নিতে দোষ কি—কেন মরাছি, আর কার কাছে মরাছি?



সবার
প্রিয় চা

লিপটনের



হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট

তা তো হবেই! লিপটনের হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট তো আর যেমন তেমন চা নয়। এতে আছে তামাম লোকের ভালো লাগার তামাম গুণ। স্বাদে গন্ধে ভরপুর দস্তুরমত জোরদার নিকার। উপরন্তু এক প্যাকেটে চের বেশি কাপ চা। খেয়ে আর খাইয়ে অফুরন্ত আনন্দ।



লিপটন বলতেই ভালো চা

ইসাবটা একটু গোড়া থেকেই করা যাক। ছয় পাট হরতাল ডাকলো ২০শে জুলাই। কিন্তু কেন ডাকা হ'ল এই হরতাল? কোন আন্দোলনের শীর্ষে উঠে এই হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে? রাষ্ট্রপতি শাসনের অবসান যদি হরতালের উদ্দেশ্য হয়, পদলিখের অত্যাচার-নির্বাচন যদি হরতালের লক্ষ্য হয়, তবে দাবি যুক্তিসংগত সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য আজ পর্যন্ত যাকিছু করা হয়েছে, সেটা কি হরতাল ডাকার পক্ষে যথেষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য হরতাল ডাকা ও করার মধ্যে এখন কোন কণ্ট নেই। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দেবার অপেক্ষা করার দরকার বড় বেশি নেই। রাজ্যের কুটির শিল্পে বিপুল উৎপাদনলব্ধ মজুত হাতবোমা, পটকা কিছুর বাজারে ছাড়লে বাপ বাপ বলে ডাক ছেড়ে হরতাল হয়ে যাবে। কিন্তু হরতালের মহান উদ্যোগেরা শুধু একটু বদ্বিকিয়ে ধলবেন একদিন হরতাল হ'লে বর্তমান পরিস্থিতির কতটুকু পরিবর্তন হবে! আমরা রাজ্যের মানুষ যারা খুঁটায় বাঁধা ছাপেলের অংক জীবন যাপন করি, তাদের কতটা লাভ হবে হরতালে?

আমি জানি হরতালের পক্ষে অনেক যুক্তি হাজির করে আমাকে শেষ পর্যন্ত শয়তান, বজ্রাত সাংবাদিক বলে প্রমাণের চেষ্টায় যুক্তির কোন অভাব হবে না। কিন্তু ছয় পাটের নেতারা দয়া করে শুধু বলুন হরতাল পালনে তারা যদি সত্যি সিন-সিয়ার হন, তবে এই ২০শে জুলাই হরতালের দিন ঘোষণার আগে কতটা চেষ্টা করেছেন আট পার্টির সঙ্গে একমত হতে। বিশেষ করে ছয় পার্টি যখন এই বাস্তব অবস্থাটা জানে যে, ছয় পার্টির ফ্রন্টে নামে ছয় পার্টি হলেও সি পি এম ছাড়া অন্য সকলেই প্রায় এলে-বেলে, যাদের কাজ হ'ল খেলবার সময় বল মাঠের বাইরে চলে গেলে কুড়িয়ে আনা। মাঠে নেমে গোল, ব্যাক, সেন্টার ফরোয়ার্ডে খেলার কোন যোগ্যতা তাদের নেই, যত রং-বেরং-এর জার্সি তাদের পরানো হোক না কেন? অবশ্য আট পার্টির ফ্রন্টেও এমন জার্সি-সর্বস্ব প্রেরারের অভাব নেই। যা হোক, কতটা চেষ্টা হয়েছে যে, যাতে একটা দিনে রাজব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট-হরতাল হয়। বিশেষ করে ১৭ই মার্চের অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেই সঙ্গে আরো যখন জানা রয়েছে যে, রাজ্যের বামপন্থী শিবির এখন দুটো মতে বিভক্ত, আর সি পি এম যতই মনে করুক দেশের সব মানুষ তাদের পিছান আছে, গ্রান্ট দলও একেবারে শূন্যে ভেসে রাজনীতিক কব না। কিন্তু কোন সিনসিয়ার প্রচেষ্টা হয় নি, যাতে হরতাল ঘোষণার পরিস্থিতি কোন একমতে হয়। এই সঙ্গে এই কথাও ছয় পার্টি জানে,

তারা একটা তারিখ ঘোষণা করলে সেই তারিখ রক্ষা করা যেমন তাদের মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত হয়, তেমনি অপর পক্ষের সেই তারিখ সুবোধ বালকের মত মেনে নেওয়াও মোটেই মর্যাদার হয় না। এই সব পূর্বাপর পরিস্থিতি বিবেচনা না করে শুধু টেকা দেবার জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে তার ফল ভাল হয় না—সেই কথা বোঝা সি পি এম দলের নেতৃবৃন্দের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সব প্রশ্ন জেনে-বুঝেও সাত তাড়া-তাড়ি হরতালের তারিখটি ঘোষণা করে দেওয়া হল। সি পি এম-এর বিরুদ্ধে যে গায়ের জোরের নীতি পরিচালনার অভিযোগ অন্য অনেকে করেন এবং অনেকেই যারা মনে করেন সি পি এম-এর এই গায়ের জোরের নীতি চালাবার চেষ্টাই হ'ল রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট ভাঙবার অন্যতম কারণ, হরতাল ডাকার রাজনীতিতে সি পি এম ছয় দলের নামে সেই অভিযোগের ময়লাই আর একবার গায়ে মাখলো।

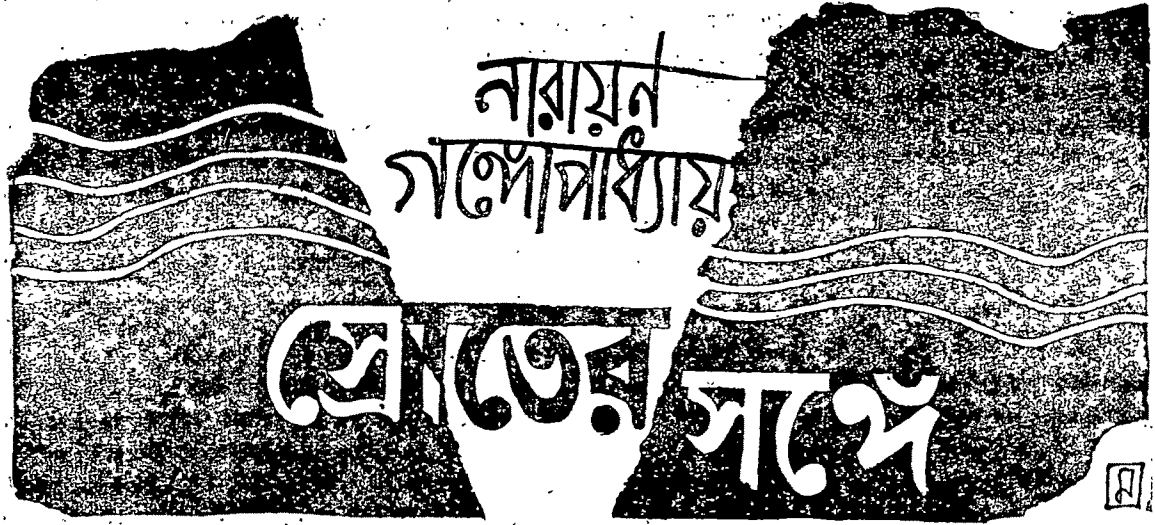
আর একটা প্রশ্ন: ২০শে জুলাই সোমবার হরতাল ডাকবার কারণ কি? সবাকিছুরই একটা নিয়ম আছে। তবে প্রচলিত নিয়ম ভাঙা যায় না, হয় না এমন নয়—কিন্তু একান্ত আকস্মিক জরুরী ব্যাপারে ছাড়া রবিবার ছাটির পরের দিন সোমবার হরতাল—কে কবে শনেছেন বলুন। না এটার মধ্যেও কোন রাজনীতি আছে। হরতালবাবু: সকলেই জানেন, হরতালে আমরা শুধু অনেকে শহীদ হই না, অনেককেই তাদের বেতনের কড়ি গুণতে হয়। সপ্তাহের মাঝে হলে যেখানে একদিন, সেখানে রবিবারের পর সোমবার হলে দু'দিন বেতন হারাবার সম্ভাবনা—এই তুচ্ছ ব্যাপারটা নেতারা ভুলতে পারেন কি? সব ছা-পোষা মানুষের পক্ষে কি ব্যাপারটা সহজ হবে?

এইবার প্রশ্ন আট পার্টির কাছে। বলি তাঁরা হঠাৎ হরতাল ডাকতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন কেন? আট পার্টিরই আন্দোলনের কথা বলতে যেয়ে একদিনও বলেন নি—আমরা জুলাই মাসে হরতাল কবাবো। ছয় পার্টি না হয় বহুবার বলেছে যে, জুলাই মাসের মধ্যে দাবি পূরণ না হ'লে হরতালের ডাক দেওয়া হবে, কিন্তু আট পার্টি তো বলে এসেছেন—আগে বিক্ষোভ, তারপর মহাকরণ ও সরকারী দপ্তর ঘেরাও, তারপর লাগাতর ঘেরাও করে প্রশাসন অচল করা। তাতেও যদি ফল না হয়, তবে আগস্ট মাসে যেয়ে সর্বাত্মক হরতাল। কিন্তু সর্ব সব কথা ভলে গিয়ে হঠাৎ ১৭ জুলাই রাতে গদা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোষণা করা হল—হরতাল, হরতাল তবে না ছয় পার্টি ডেকেছে ২০শে, আমরা করবো ১৬ই। কেন ১৬ই, চারদিন আগে। একবারও কি মান এই

প্রশ্নটা এল না—এক পক্ষ ২০শে ডেকেছে, আমরা ১৬ই ডাকলে এক সপ্তাহে রাজ্যে দুটো হরতাল হবে। কেন, তারিখ ঘোষণা কি একটু অপেক্ষা করে, একটু বিবেচনা করে করা যেত না? ওরা করছে বলেই আমাদের করতে হবে—কারণ খুঁটায় বাঁধা জীবরা ওদের কথা শুনবে, আমাদের কথাও শুনবে। গুরুত্ব কাছ থেকে জুতো মেরে মন্ত্র আদায় করা শিষ্য আমরা—গুরু মন্ত্র না দিয়ে যাবে কোথায়? তারপর কিসের দাবিতে হরতাল? না পদলিখ ও সি পি এম যোগসাজসে অত্যাচার করছে। অন্য অনেক দাবিও আছে, তবে সি পি এম-এর বিরুদ্ধেও একটা দাবি আছে। আবার এই দাবির অপর একটা অংশে রয়েছে যদি যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবন সম্ভব না হয়, তবে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাই। অর্থাৎ সি পি এম-কে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট পুনরুজ্জীবনও আমাদের কামনার অন্যতম—আবার সি পি এম-এর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও হরতাল। গৌজামিল শব্দটার সার্থক প্রয়োগ হবার জায়গা সম্ভবত আট দলের ১৩ দফা দাবির মধ্যে যেমন প্রশস্ত আঙ্গিনা পেয়েছে, তেমনটি সহজে পাবার নয়। তবে আমি সেই কথা ফাঁস করবো না কিভাবে ১৩ দফা দাবির মধ্যে সি পি এম-বিরোধী অংশ যুক্ত হয়েছে বা শ্রীঅশোক ঘোষের আট পার্টি ও ছয় পার্টির হরতাল আহ্বানের দিন এক করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

‘সপ্তাহের বোঝা’ লেখা শেষ হবার পর রবিবার রাতে ছয় পার্টির ডাকে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে ২০শে জুলাইয়ের হরতালকে এগিয়ে ১৪ই জুলাই তারিখে আনা হয়েছে। ১৬ই জুলাই আট পার্টির হরতালের দাঁড়ান আগে এগিয়ে আনা হ'ল ছয় পার্টির হরতাল। ছয় পার্টি নিশ্চয়ই সঙ্গত কারণে হরতালের দিন ২০শে জুলাই থেকে সরিয়েছেন। কিন্তু সরানোই যদি হ'ল, তবে সেই দিনটি ১৬ই জুলাই হ'ল কি ক্ষতি হ'ত এবং কেন ১৬ই জুলাই হ'ল না সেটা বোঝা গেল না। সব কথা সকলে বুঝবে এমন দাবি করি না, তবে ১৪ই আবার ১৬ই দু'দিন হরতাল জমাবে কেমন, সেটাই প্রশ্ন?

ছয় পার্টি ও আট পার্টি দুই পক্ষকেই ভেবে দেখতে বলবো—আন্দোলন করুন, দাবি আদায় করুন, নিষ্পত্তি যত পারেন লড়াই করুন, শত্রু নির্যাস জনগণকে অপয়োজনে শহীদ করে বাহবা কুড়াবার চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন এই জনগণ ২৮০-র বিধানসভায় আপনাদের ২১৮টি আসন দিয়ে ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংখ্যাধিক্য দলের সরকার গঠনের সুযোগ দিয়েছিল, সেই সরকার আপনারা রাখতে পারেন নি।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বোলো ॥

নিদারুণভাবে চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে গেল স্বপ্না। টলটল মৃদু শব্দকয়ে উঠল সঙ্গো-সঙ্গো।

‘অ্যাই কার্তিক, কী হচ্ছে? জামা ছাড় বলছি।’

‘জামা ছাড়ব মঙ্গল এমনিতেই? খুব ভন্দরলোক হয়ে গেছিস, না-রে শালা?’

জামা ছাড়ানোর নিশ্ফল চেষ্টা করে টলটল বুকুল, লাভ হবে না, জামাটাই ছিঁড়বে মাঝখানে থেকে। স্বপ্না সঙ্গ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে, এই কথা ভেবে লজ্জায় দুঃখে তার চোখে জল আসছিল। নিজের খুব দুর্বল সে নয়, অন্য সময় হলে এখন সোজা একটা ঘুরি বসিয়ে দিত কার্তিকের মুখে। কিন্তু স্বপ্না! জা ছাড়া দলে ওরা জন চারেক, আর মানিক বলছিল—

‘ঠান্ডা একটা ভয় শিরশিরিয়ে ছিড়িয়ে গেল বকের ভেতরে। সব ব্যাপারটাকে বেশ হালকা একটা রূপ দেবার চেষ্টা করল সে। স্বপ্না, ইয়ে—কিছু মনে কোরো না, মানে এরা আমার পুরোনো বন্ধ, মাঝে মাঝে এক-আধটা ঠাট্টা-ফাট্টা করে। এ হ’ল কার্তিক—এরা—’

কথাটা শেষ করতে পারল না টল, তার আগেই বানরের মতো দাঁত খিঁচিয়ে উঠল কার্তিক।

‘গ্যাটা! ব্যাটা কুস্তার জা—ব্যাটা হারামী! নিজের জান বাঁচাবার জন্যে দারোগার কাছে ফণেকে ফাঁসিয়ে এসেছিস, নইলে পুলিশ মালের খোঁজ পায় কী করে? আজ শালা এইখানে তোর লাশ ফেলে না যাই তো আমার নাম কার্তিক সমাদ্দারই নয়!’

দলের বাকী তিনজন সঙ্গো সঙ্গো তিন দিক থেকে একটা বৃহৎ মতো তৈরি করে ফেলল। কার্তিকের একটা হাত ঢুকে গেল পকেটের ভেতর, সেখানে বড়ো একটা আলদুর গায়ে সেফটি রেজরের একটি রেড্ গাঁথা। বেশ কিছু করবার দরকার নেই, বার কয়েক আলতোভাবে মুখের ওপর আলদাটা বুলিয়ে নিলেই চমৎকার-ভাবে বদন বিগড়ে যাবে।

কিন্তু হাতটা পকেট থেকে বেরবার আগেই সবাইকে হকচকিয়ে দিয়ে টল আর কার্তিকের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেল স্বপ্না। কৌমল গলায় ডাকল : ‘কার্তিকদা, আমার একটা কথা শুনুন আগে।’

খরখরে গলায় হেসে উঠল দলের একটা ছেলে।

‘লে মাইরি! এ শালার ময়না যে আবার দাদা বুলি ছাড়ছে রে!’

কার্তিকের হাতটা কিন্তু শক্ত হয়ে গিয়েছিল পকেটের মধ্যে। হঠাৎ চড়া গলায় একটা ধমক দিয়ে উঠল কার্তিক।

‘চপ কর, উল্লুক! ভন্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দেব।’

দলের তিনটে ছেলের চোখ গোল হয় উঠল। এ-রকম তো কথা ছিল না। দু’ মিনিটের মধ্যে মামলা মিটিয়ে দিয়ে সটকে পড়বার কথা বলেছিল কার্তিক। হঠাৎ ভন্দরলোকের মেয়েছেলেকে কথা কইতে দেবার সুবিশিষ্ট তার কোথা থেকে গজিয়ে উঠল? একজনের লম্বা দৃষ্টি স্বপ্নাকে লেহন করছিল, কার্তিকের কাজ শরৎ হয়ে গেলে সে নিজেও একটুখানি মতলব হাসিল কবে নিত। কিন্তু এ যে একবারে আলাদা ঠেকছে!

স্বপ্না বললে, ‘কার্তিকদা, বোনের মতো একটা অনুরোধ করছি। টলদা কী

অন্যায় করেছে জান না, কিন্তু আঁধার ওকে ছেড়ে দিন। আমার শরীর ভালো নেই, অনেক দূরে থাকি। টলদা সঙ্গ করে আমাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে।’

আশাভঙ্গে মরীয়া ছেলোটা বলে ফেলল : ‘মাইরি আর কী! বললেই ছেড়ে দিতে হবে? আজ এই শরীরকে আছান মতন ধোলাই দিয়ে তবে অন্য কথা। বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে ভাবতে হবে না, আদর করে—’

চার্টান আর গলার আওয়াজে স্বপ্না শিউরে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ ঠাস করে একটা প্রকাণ্ড চড়ের আওয়াজ। মাথা ঘুরে উলটে পড়তে গিয়ে সামলে নিলে ছেলোটা।

কার্তিক গজ্ঞন করে উঠল : ‘চোপ-রাও কুস্তার বাচ্চা! ইয়ার্কির জায়গা পাওনি আর? ফের যদি একটু বদীয়তী করোছিস স্লা, তাহলে একদম জবাই করে লেকের জলে ভাসিয়ে দেব।’

চড়-খাওয়া ছেলোটর দু-চোখ অক্ষম ক্রোধে জ্বলতে লাগল; হিংসার নীলটে আলো মিটিমিট করতে লাগল সেখানে। বাকী ছেলে দুটো যেন স্বপ্ন দেখছে, দাঁড়িয়ে রইল এমনিভাবে। টল একটা কাঠের পুতুলের মতো নিঃশব্দ হয়ে কার্তিকের দিকে চেয়ে রইল, আর স্বপ্নাও ঠোঁট দুটো কঁপতে লাগল থর থর করে।

কার্তিক একটা বোকার মতো হাসল। তাকালো স্বপ্নার দিকে।

‘কিছু মনে করবেন না দিদি ও স্লা ছোটলোক, ওর পেটে এক ডজন বোঝারলেও একটা ভাল কথা বেরবে না। আজ—চলে যান আপনারা। আপনার জনেই হারামীর বাচ্চা এই টলটল আজ ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ফয়সালা হয়ে গেল।’— বলে একটা ঘাড়খ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

টুলুকে হাত তিনেক আগয়ে দিলে : 'যা স্না—খুব বেঁচে গেলি আজকে।'

'বড় উপকার করলেন কার্তিকদা!—আবার নরম গলায় স্বপ্না বললে, 'আচ্ছা আসি তা হলে। নমস্কার।'

'আঁ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ন—নমস্কার।'

'চলো টুলুদা।'

ভূতে পাওয়ার মতো টুলু স্বপ্নার সঙ্গে পা বাড়ালো, আর এখানে দু'জন হাঁ করে দেখতে লাগল কার্তিককে, যেন তারা তাকে চিনতে পারছে না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল মার-খাওয়া ছেলোটো, চড়ের জুড়ালয় গাল চিনচিন করছে এখনো, চোখে ঝিক ঝিক করছে নীল হিংসা।

নীরবতা ভাঙল একজনের কথায়।

'এটা কী হল কার্তিকদা?'

আবার বোকার মতো হাসল কার্তিক। 'কিরকম করে কার্তিকদা বলে ডাকল রে মেয়েটো—সব গোলমাল হয়ে গেল। নিজেকে বেজায় ছোটলোক বলে মনে হল তখন। ভাবলুম, 'বলছে' বখন ভন্দরলোকের মেয়ে—

মার-খাওয়া ছেলোটো অশ্লীল গাল দিয়ে উঠল একটা।

'টুলো স্নার সঙ্গে আবার ভন্দরলোকের মেয়ে! কোথেকে—

লাফিয়ে উঠে কার্তিক তেড়ে গেল তার দিকে।

'আর একটা বদজোবান করবি তো তোকে এইখানেই সাবাড় করব আজকে।'

ছোকরা পাশের একটা রাস্তা দিয়ে জোর পায়ে দৌড় দিলে। যেতে যেতে বলে গেল, 'আচ্ছা শালা, দেখে নেব তোকে।'

আবার তিনজনের বিয়র্ষ সমাবেশ। সব অন্যরকম হয়ে গেল। কার্দির তল্লে-তল্লে ঘুরে টুলুটাকে আজ পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে কী যে হয়ে যায় কেউ জানে না।

কার্তিক একবার সঙ্গীদের দিকে তাকালো। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললে, 'কেন যেন বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল, না রে?'

সঙ্গীরা চপ।

'হাইরি—বোন-ফোন তো নেই—তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে চাঁদকে যাদের দেখেছি সব খেলোয়াড় মেয়ে। কিরকম গলায় যে কার্তিকদা বলে ডাকল, শুনে মেজাজই খারাপ হয়ে গেল! তবে টুলো শালা আর যাবে কোথায়—এক ঘণ্টা তো শীত যায় না, ইন্দুরের গর্তে লুকিয়ে থাকলেও টেনে বের করব।'

একজন গম্ভীর গলায় বললে, 'তবে হীরুটাকে না মারলেও পারাতিস। ও আবার কথায় কথায় চাকু চালায়।'

'যা—যা। ও—সব ছুঁচো-চামচকেই সমান্দার পরোয়া করে না। এখন

একটা সিগ্রেট দে—কিছু ভালো লাগছে না মাইরি।'

প্রবীর বলেছিল, 'তোমাকেই একটু চেষ্টা করতে হবে।'

সাবিত্রী জবাব দিয়েছিল, 'চেষ্টা করতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুমি সঙ্গে গেলে ভালো হয়।'

'উল্টো ফলও হতে পারে। আমি তো অন্য পার্টির লোক। সুজাতা বৌদি হয়তো ভাববে যে, স্বরাজদার কুপরামর্শে আমি ওর বিপ্লবের কাজ পণ্ড করতে এসেছি।'

'সে তো আমার সম্বন্ধেও ভাবতে পারে।'

'ভাববে কেন? তোমরা তো একসঙ্গে কলেজে-ইউনিয়ন করত।'

'করোঁছি। কিন্তু সুজাতা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না। বলত, আসলে আমার মন এ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে, আমি পুরো স্যার্কিফাইস করতে পারি না। ওদের মতো ভোকাল হওয়া আমার পক্ষে সব সময় সম্ভব হত না, প্রিন্সিপালের ঘরের সামনে অ্যাংগি ডেমনস্ট্রেশনে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতুম।'

'বুঝোঁছি।'

'তা ছাড়া কী জানো—' সাবিত্রীর মুখে একটা ছায়া পড়েছিল : 'ওদের সঙ্গে একটা জায়গায় আমার সম্পূর্ণ মত মিলত না। আমি বলতুম, পার্টি পলিটিক্স প্রত্যেকের আলাদাভাবে থাকে থাকুক, কিন্তু স্টুডেন্টস ফ্রন্টে আমাদের কতগুলো সাধারণ স্বার্থ—কমন প্রবলেম নিয়ে এগোতে হবে। সেখানে পার্টির চাইতেও বড়ো দরকার ইউনিট। প্রত্যেকে যদি নিজের দলের প্রোগ্রামকে স্টুডেন্টস ফ্রন্টে টেনে আনতে চায়, তা হলে ছাত্র-আন্দোলন নষ্ট হয়ে যাবে, জোর পাবে রি-এ্যাকশনারীরা। সেইখানেই ওদের আপত্তি। পার্টি জীভারীশিপের ডিক্টেশন ছাড়া ওরা পা ফেলবে না।'

প্রবীরের ভুরু কুঁচকে এসেছিল। সেই পার্টি! যজ্ঞফট সন্থার শ্বাস টানছে, ছাত্র-একা টুকরো টুকরো। কৃষক সংগঠন তো গেছেই, ট্রেড ইউনিয়নও হয়তো যাবে। চমৎকার!

প্রবীর বলেছিল, 'তুমি তো এখন পরোপদ্রি কলেজের দিদিমা। রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই।'

'তা বলতে পারো। সম্পর্ক রাখবার সময় কোথায়? এত কাজ! তার ওপর থিসিসটাতেও হাত দিয়েছি।'

'এবার ডক্টরেটও হবে তা হলে? এমনিতেই তো কত দূরে ছাড়িয়ে গেছ, এর

পরে একেবারে দূর আকাশের নক্ষত্রের মতো—

সাবিত্রী এবার দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল প্রবীরের গলা : 'খুব হয়েছে, আর চালাক করতে হবে না।'

'ছি, ছি, এমন ভালো ছাত্রী, অধ্যাপিকা, ভাবী ডাক্তার, শেষকালে একজন বি-এ ফেল কেরানীকে—

অমোঘ উপায়ে সাবিত্রী তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। কতকাল পরে! এই সময়, এই যন্ত্রণার কালে জীবনের এইসব সুখ—এই সব মৃদুতগুলোকে কীভাবে যে নির্বাসন দিতে হয়!

একটু পরে সাবিত্রী বলেছিল, 'তা হলে আমি গেলেই ভালো হবে বলছ।'

'আমার তাই মনে হয়। একালে কারো দল না থাকলে সে বরং সহনীয়, এমন কি খান-দক্ষিণপন্থীও অসহ্য নয়, কিন্তু এক লালকে দেখলেই আর এক লালের মাথায় আগুন ছোটো। তুমিই যাও।'

'কিন্তু রবিবারের আগে তো সময় পা না।'

'রবিবারেই যেরো।'

রবিবারেই এসেছে সাবিত্রী। এ বাড়ি তার অচেনা নয়—কলেজে পড়বার সময় এসেছে কয়েকবার, সুজাতার সঙ্গে বিয়ের পরেও। আর এই বাড়িতেই প্রবীরের সঙ্গে তার প্রথম দেখা—স্বরাজদার বন্ধু হিসেবে।

কতদিন আগে? আট-ন বছর নিশ্চয়। নীল তখন আসছে। প্রবীর বি-এ পড়ছে, সে বি-এসি। তার বছর তিনেকের সিনিয়র সুজাতা। দু'বার বি-এতে জুপ করে স্বরাজের সঙ্গে বিপ্লবী জীবনের জোড় মিলিয়েছে।

হ্যাঁ, অন্তত আট বছর, কিছু বেশিই হবে। এর মধ্যে কত বদলে গেছে জায়গাটা। মানুষ বেড়েছে, বাড়ি বেড়েছে, দোকান-পাট বেড়েছে, এত রিক্সা, এত বাসও বৃদ্ধি তখন ছিল না। কিন্তু বিশেষ বদলয় নি এই বাড়িটাই। সামনের একটুখানি ঘাসের জমিতে সেই রংগন গাছটা, একদিকে নালায় ধার ঘেঁষে তেমনি বুনো ওলের জগল।

সুজাতা বিকেলে গা ধুতে গিয়েছিল, তার মা এসে আদর করে বসালেন।

'তোমার মেসোমশাই কলে বেরিয়েছেন, ছেলেমেয়ে দুটো ব্যারাকপুরে গেছে তাদের পিসির কাছে বেড়াতে। বাড়িতে আমি আর মনুই আছি। বোসো—মনু একদুনি আসবে।'

মনু সুজাতার ডাক নাম।

ভেতরের একটি ঘরে গিয়ে বসেছিল সাবিত্রী। ঘরটা চেনা। কুমারী জীবনে এই ঘরেই থাকত সুজাতা, সেলফে এখনো বোধ হয় তারই বইপত্র। দেওয়ালে লেনিন-স্তালিন-মার্কসের ছবি। রবীন্দ্রনাথও



ও, এখানে তোমার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলে!

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়াতে আপনার ছেলে-মেয়েদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করিয়ে দিন, আর নিশ্চয় নিরাপত্তার ভাব নিয়ে ওদের জীবন শুরু করতে দিন।

চেক-সহ অপ্রাপ্তবয়স্কদের সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা যায় :

(ক) স্বাভাবিক অথবা আদালত নির্দিষ্ট অভিভাবক অ্যাকাউন্ট খুলে ছেলেমেয়েদের প্রাপ্ত-

Age: 5-1997 B1

বয়স্ক হওয়া অবধি অ্যাকাউন্টটি চালাবেন, যার পর, ওরা নিজেরাই সেই অ্যাকাউন্ট চালিয়ে যেতে পারবে।

খ) ১৪ বছর বা তার বেশী বয়সের ছেলে-মেয়েরা নিজেরাই অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা জমা দিতে আর তুলতে পারবে।

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

সাপ্তাহিক বসুমতী

আছেন। একদিকে একটা ভাঙামতন আলমারীর মাথায় একগদা পুরনো কাগজ-পত্র বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে, না দেখেও বুঝতে পারা যায় ওগুলো রাজনৈতিক পত্রিকা আর বুকলেট। বোধ হয়, ফিরে এসে এই ঘরেই আবার জায়গা নিয়েছে সৃজাতা। এদের মধ্যে বসে আবার পুরনো দিন-গুলোকে অনুভব করতে চায় সে।

বাইরে দিনের আলো বিষন্ন হয়ে আস-ছিল। গাছপালার ছায়া লম্বা হয়ে ছাড়িয়ে পড়ছে বাড়টার ওপর। পাখিদের ক্রান্ত ডাক। একটা উত্তপ্ত বেলা কেটে গেছে, এখন বেলা শেষের হাওয়ায় ঘোপ-জঙ্গল-মাটির সেই সোঁদা গন্ধ।

বেড-কভার ঢাকা বিছানাটার ওপর চুপ করে বসে রইল সাবিদ্রী, সৃজাতার মা বসেছেন সামনে একটা মোড়া টেনে। সাবিদ্রী দেখল, বিকেলের বিষন্নতায় ঘাসিমার মুখের ওপরেও ছায়া নেমেছে।

মাসীমা বললেন, 'কী করছ এখন?'
'একটা কলোজে গাছাই।'
'হ্যাঁ, শুনছি রটে। বিয়ে করবে না?'
একবার একটু রাঙা হল সাবিদ্রীর মুখ।

'এখনো ও নিয়ে ভাবি নি মাসীমা।'
ডাক্তারের স্ত্রী, ম্যাট্রিক পাশকরা মাসীমার কপালে কয়েকটা রেখা পড়ল।
'কী জানি, হয়তো বিয়ে না করাই ভালো। তোমাদের আজকাল ছেলেমেয়ে-দের আমরা চিনতে পারি না।'

সাবিদ্রী মাসীমার দিকে তাকালো। কথাটার অর্থ সে বুঝেছে। দশ বছর স্বরাজের সঙ্গে ঘর করবার পরে, নীলদুকে ফেলে কত সহজে চলে আসতে পেরেছে সৃজাতা। চীলিশ-বেয়াল্লিশ বছর আগে যে মাসীমা ম্যাট্রিক পাশ করে বিদ্যুৎবীরা মহিমা পেয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে সৃজাতা-দের মনের চেহারা আঁচ করা শক্ত। সৃজাতার বছর ছয়েকের বড়ো বোন

সুজতা—সেও গ্র্যাডুয়েট—সে তো বিয়েই করল না, চাকরি করছে মুশিদাবাদের কোন্ স্কুলে। না—একালের মন তিনি বুদ্ধিতে পারবেন না।

মাসীমা ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন।
'মন চলে এসেছে, জানো বোধ হয়।'
মাথা নামিয়ে সাবিদ্রী বললে, 'জানি।'
'কিছু বুঝতে পারছি না। কী নিয়ে এ-রকম হল? আমি স্বরাজকে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম। তাতে বললে, তুমি যদি ওদের চিঠি দাও তাহলে একদিন আমি এ-বাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো বেরিয়ে যাব, আর কোনদিন আমার খোঁজও পাবে না। জানো তুমি, কী হয়েছে?'

সাবিদ্রী শ্বিধা করল। প্রবীরের মধ্যে যেটুকু শুনছে, তা কি বলা যায়? বলা উচিত, স্বরাজ্যনা আর কোনো রাজ-নীতিতে বিশ্বাস করে না, আর সৃজাতা রাজনীতি বাদ দিয়ে জীবনটাকে ভারতে পারছে না? ওদের বিয়ের আসল মন্তাই ব্যর্থ হতে চলেছে?

আসতে আসতে ঘাড় নাড়ল সাবিদ্রী।
না—সে কিছুই জানে না।

'ওর বাবা তো রাতদিন তার ডাক্তারী নিয়ে আছে। বলে, কিছু না, একটু ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে, দু'দিন পরেই সব মিটে যাবে। এ-রকম হয়।'

'আমারও তাই মনে হয় মাসীমা।'
মাসীমা একটু চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। তাহলে নীলদুকে সঙ্গে করে আনল না কেন? কোনোদিন তো তাকে ফেলে আসে না। তা ছাড়া—'

নিঃশব্দ কৌতুহলে চেয়ে রইল সাবিদ্রী।

'জানো—' মাসীমা শিউরে উঠলেন :
'জানো, ওর সিঁথিতে এবার সিঁদুর নেই।'

শিউরে উঠল সাবিদ্রীও, অনেকদূর পর্যন্ত শিক ছাড়িয়েছে তাহলে। জোর করে হাসল একটু।

'ওরা ও-সব মানে না মাসীমা।'

জানি। কিন্তু বিয়ের পর থেকে বরাবর তো ও সিঁদুর পরত। আমার ভারী খারাপ লাগছে সাবিদ্রী। ঠিক কথা, স্বরাজের সঙ্গে ওর বিয়েতে আমা-দের মত ছিল না—মেয়েটা দুরন্ত, ছেলেও জেলেখাটা। কিন্তু বিয়ের পরে স্বরাজের দায়িত্ব এসে গিয়েছিল, চাকরি-বাকরি করত, দেখেছি অপার নয়। আর বেয়াই মশাই তো শিবভূলা লোক। কেন যে এতদিন পরে—'

মাসীমা থেমে গেলেন। ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ।
ডাকলেন, 'মন!'

'আইতাছি মা কাপড় ছাইড়া।'

মাসীমা স্বর নামালেন : 'সেই অসুখের পর থেকে মেয়েটার শরীর বলে আর কিছু নেই।' কিন্তু এখানে এসে আবার সেই সব পাগলামি আরম্ভ করেছে। পাটি অফিসে যায়, আবার সব দলের ছেলেমেয়েরা আসে, তর্ক করে, চেঁচামেচি করে। অথচ আমরা ভেবে-ছিলুম, ও-সব ও ছেড়ে দিয়েছে।'

এতদিনের নিষ্ক্রিয়তার প্রায়শ্চিত্ত তাহলে শ্বিগুণভাবে শূন্য করে দিয়েছে সৃজাতা।

'ওর বাবা বলছিল, শরীরে একেবারে হিমোগ্লোবিন নেই, যন্ত্র দরকার, বিশ্রাম দরকার। সে বিশ্রামের এই নমুনা? এ যে কী পাগলামি ওর আরম্ভ হয়েছে—'

এবার পায়ের শব্দ ঘরের দরজায়। তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন সৃজাতার মা। তারপর গলার স্বর বদলে ডাকলেন, 'মন—দ্যাখ—কেডা স্মারছে।'

কে?
দরজায় পা দিয়ে সৃজাতা থমকালো। ঘরে আলো জ্বলবার সময় নয়, অথচ বাইরের ছায়া এসে সব আচ্ছন্ন আর আবিষ্ট করে ধরছে। সেই ছায়াসগুণে সৃজাতা সঙ্গে সঙ্গেই সাবিদ্রীকে চিনতে পারল না। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে, বার কয়েক চোখ কুঁচকে, তারপর খুঁশিতে আর বিস্ময়ে বলে উঠল : 'সাবিদ্রী!'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'
'তুই এতদিন পরে? আকাশ থেকে পড়ল নাকি?'

'আকাশ থেকে পড়ব কেন? বাসে চেপে সোজা চলে এসেছি।'

সৃজাতা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরল সাবিদ্রীকে। এইমাত্র স্নান করে এসেছে, একটা শীতল শীর্ণ শরীরের হোঁয়ার সাবিদ্রী যেন কেঁপে উঠল একবার।

'যাক—তাইলে মনে পড়েছে আমাকে!—উল্লসিত গলায় সৃজাতা বললে, 'মা, হেনাদিরে এটু চা দিতে কও আমাগো।'

হেনাদি বাড়ির পুরনো ফাজের লোক। মা মোড়া ছেড়ে উঠে বললেন, 'হেনা ক্যান, আমিই যাইতাছি। খালি চা দিমু নাকি মাইয়াটারে?'

মা বেরিয়ে গেলে সাবিদ্রীর দিকে তাকালো সৃজাতা। ঘরের আবছায়া আলোতেও সাবিদ্রী টের পেলো, তাকে দেখে খুঁশি হওয়ার আনন্দটা হঠাৎ মিলিয়ে আসছে সৃজাতার, তার চোয়াল-ওঠা মুখটা শক্ত হয়ে আসছে একটু একটু করে।

[ক্রমশঃ]

বসুমতীর

যাবতীয়

গ্রন্থ ও

গ্রন্থাবলীর

প্রাপ্তস্থান

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা—১২

এবং

সান্যাল এন্ড কোং

১/১এ বার্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা—১২



অঙ্গার

হরপ্রসাদ মিত্র

কালের অঙ্গার এই তুমি আমি গ্রাম-গঞ্জময়
বেঁচে আছি রাগিবন,

—মৃত্যুর শিকার যতো মৃখ।

কোথাও গাড়া নেই। ফটকে ফটকে অবসাদ
আর মারীভয়।

উপমনা, রক্ত, দ্রোণ, দ্রুপদ, অর্জুন—কেউ নেই।

চালের ছোরাই কিংবা মদের বেসাতি, যাই হোক—

রূপান্তর প্রতিরোধহীন।

সমস্ত জীবন ক্রমে ছাইয়ে আর আগুনে জড়িয়ে
কী যে অন্যরূপ হয়।

দাঙ্গাই জীবিকা—এই

জীবিকাই সম্পূর্ণ জীবন।

ঘাসের জঙ্গল থেকে প্রতিটি ঘাসের শীষ খুঁটে

মনে হয় বলি শোনো—একলব্য গভীর শপথ

অরণ্যে শরণ্যে স্থির ঈষিকাকে ধুব লক্ষ্যভেদে
করেন নিপুণ।

তুমি ধর্ম সহজিয়া,—এ তোমার পরিবেশগুণ।

বীজে আর পরিবেশে অব্যাহত এই প্রচুরতা

কালের অঙ্গার।

পুকুর, বাগান, বাড়ি, ইন্স্কুল, মন্দির—সবই আছে।

কাঁচা রাস্তা বাড়ে কলোনিতে।

তবু শান্তি নেই।

মৃত্যুর শিকার যতো মৃখ।

এক পাগল হাসছে

বেণু দত্তরায়

রক্তে নেশাবিষ—এক অস্থির পাগল

মন্ব জপ করছে

অহর্নিশ

রক্তে এক উন্মাদ পাগল

অট্টহাসি হাসছে, গলির মোড়ে

এক যুবতী

ছুটে পালাচ্ছে

মাতালদের হাত থেকে দ্রুত এবং উত্তেজিত।

অস্থির এবং হাস, ...

সূর্য

আগুন ঢালছে, মধ্যদিন

রাস্তায় পীচ গলছে, সর্বনাশ

এখন সর্বনাশ—পালিয়ে যেতে হয়

এক অস্থির পাগল বেহেড় পাগল

মন্ব জপ করছে

রক্তলাল চোখ.....

বন্দ পাগল অট্টহাসি হাসছে।

মধ্যদিন গলির মোড়

কেঁপে কেঁপে উঠছে

হাসিতে

অট্টহাসিতে!

আকাশ-বাতাস কেঁপে কেঁপে উঠছে।



কলকাতার কালরাত্রিগুলি

ঠিক যখন রাতের বিবিধ ভারতীতে মতকর্ষণ ঘোষণা, 'নিরোধ ব্যবহার করুন', তখন কিন্তু জনসংখ্যার চাপে চ্যাপসা শহরের বাস থাকে হালকা। ধাক্কার বহর অপেক্ষাকৃত কম। তবে মাঝে-মাঝে দূ-একটি অর্ধচন্দ্রীয় গলাধাক্কার ঘটনা অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। ফুটবোর্ড থেকে কোথাও কোথাও দূ-একজন গন্ধরাজ যাত্রীকে জবরদস্তি নামিয়ে দিতে হয়। নাছোড় যাত্রী হাতল ধরে বদলেতে বদলেতে জড়িত কণ্ঠে আপত্তি জানান। বাসসম্বন্ধ দাবি ওঠেঃ নামিয়ে দিও মশায় গলাধাক্কা দিয়ে। মাতলামো করার আর জায়গা পায় নি।

বস্তৃত বাসযাত্রীদের আপত্তি অযৌক্তিক নয়। একে তো দিনান্তের ঘর্মাক্ত দেহ গাড়ির অভ্যন্তরভাগ গন্ধবিধর সমীরণে সমাকীর্ণ করে রাখে, তার ওপর রাত-কাসুলতান কণ্ঠিৎ ব্যক্তিবিশেষ গন্ধাবয়ব দৃষ্টি করলে কার না সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়! অথচ গন্ধরাজও তখন হাত-পা ছুড়ে-তার লম্বা লেকচার শুরুর করে। দাবি করে মদ্যপানের গণতান্ত্রিক অধিকার। যা অনস্বীকার্য। কারণ যদিও কলকাতার সর্বত্র সুরাপানীরের আইনত ব্যবসায় চালু আছে এবং যেহেতু স্মৈমিক প্রোহিবিটেড-এর মতো মদ্যপায়ীদের সম্বন্ধে কোনও লেবেল আঁটা নেই, সে কারণ প্রকৃত কোনও টিকটধারী মদ্যপ যাত্রীকে অর্ধচন্দ্র প্রয়োগ করা আইনানুগ নয়। অতএব এটা গণতান্ত্রিক অধিকারের

আধ-প্রয়োগ বলে মনে নিতে হয়। অধিকাংশের এবং সুনীগারের আপত্তিতে অর্ধচন্দ্রীয় অভিযানা ও "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" ব্যবস্থা সচল। অন্তত কোনও রাত-কাসুলতান দিনমানে কোর্টে গিয়ে বাস কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে নালিশ রুজু করে আসতে পারবেন না। তবে নালিশ হলে চালকের পেছনে পার্টিশনের ওপর আর একটি লেবেল আঁটতেই হবে, বড় বড় 'বারের' দরজায় সম্ভবত অমদ্যপদের উদ্দেশ্যে যেমন সতর্কবাণী থাকে ঃ রাইটস্ অব এ্যাডমিশন রিজার্ভড। মদ্যপায়ীদের লক্ষ্য করেও ট্রামে-বাসে এমন প্রাস্টিকবাণী অঙ্কিত থাকতে পারে। তবে তার বিশেষ প্রয়োজন নেই। রাত-কাসুলতানরা বাদশাহী মেজাজ গরম করার আগেই নিজের টলন্ত প্রতিরোধের উত্তেজনা নিজেসাই হস্তপদ বিক্ষেপণের ফলে পপাত ধরণীতে। এর পর মহারাজ নিরুদ্ভব নর্দমাশয্যায় কদমবমন-সিক্ত নির্বিঘ্ন বিগ্রাম গ্রহণ করেন।

সেকালে বেহেড মাতালের পায়ে 'তুড়ুন' ঠোকার রেওয়াজ ছিল ফরাসী চন্দননগরে। একলে এ শহরেও ব্যাপারটা চালু হ'লে শহুরে কালরাত্রির কুপা থেকে অনেক নিরীহ ঘরণী হয়ত অব্যাহতি পান। অনেক বাদশাহী মেজাজের মাতাল নাগরিক যখন স্ব স্ব গলিপথে আপন গৃহস্বারে এসে তাঁর নড়বড়ে বায়ুবাহিত শরীরটিকে খাড়া করিয়ে দেন, তখন নিশিভাগরক্তান্ত্র অসহায় ঘরণীর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হয়। পড়শিগৃহে নির্বিঘ্ন রাতের মাধ্যমে। বাদশাহের

কুটীরে একমাত্র বাঁদ হৃদয়ভের অপেক্ষায়। কেউ তার পাশে এসে দাঁড়বার নেই। কারও সহানুভূতি তার প্রহৃত অঙ্গের প্রলেপ নয়, বরং লজ্জা, শূণ্য এবং জ্বালায় কারণ। সমগ্র শহরে অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বাদশাহ মরে, ফিরে অতিরিক্ত অধিকার দাবি করে। কোথাও বা নষ্টামি সীমিতিক্রান্ত। আর এতো কোর্ট-কাছারী যে নগরে সেখানেও দুর্বল নারীর নেই কোনো কোর্ট অব আপীল। কেন না, স্ত্রী পরিজনের অত্যাচারিত না হওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার এখনও আদালতী গড়িমসি আর উকিলী সওয়ালের ঘোর-প্যাঁচে নিমজ্জিত। মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কার আজও স্বামী নামক (এমন কি দৃষ্টিভ্রাস্ত) দেবতাটিকেও প্রায় ইংল্যান্ডের ক্রাউন-হেন মর্বাদায় সন্মতি বানিয়েছে। ওদেশে যেমন ক্রাউন সব ভ্রান্তির উদ্ভেদ, অনুরূপে এদেশে গীদ হাজব্যান্ড ক্যান ড় নো রং'।

সুতরাং নিখুঁত ক্ষুদ্রে লাটসাহেব তাঁর রাতের 'স্যাডিজম' চরিত্রার্থ করে গৃহীতবাহিত ভোরের চায়ে যথারীতি সগর্বে চুম্বক দিয়ে থাকেন। অতঃপর পোষাকুলের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য কিছুক্ষণ প্রচণ্ড গৃহস্বামিসুলভ কর্তব্য পালনকরত সাম্য-বাদশাহী তথ্যের খাজনা সংগ্রহের জন্য কর্মচঞ্চল শহরের জনারণ্যে খাঁটি নির্ভাজ নাগরিকের মতো মিশে যান। সেই একই ট্রাডিশন চলেছে যুগ যুগ ধরে। সুতানুটি গোবিন্দপুত্রের গঞ্জকাসেরী মদ্যপ দর্শনার্থীরা কলকাতা কর্পোরেশনের শাওয়ারে গা ধুচ্ছেন অস্মানবদনে। শহরের কালরাত্রি ভোর হয় নি।

কিন্তু কোন কথ্য থেকে কোন কথায়। ভয়ঙ্কর কালরাত্রির আসল চিত্রে এখনো পেনসিলের দাগই পড়ল না, কলম খোঁচা দিয়ে গেল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সমস্যার বদলে।

ঘটনাটি সে রাতে আমাকে কিন্তু প্রথমে মদ্যপ সমস্যার ওপরই ভাবিত করে। তাই কলম ধরতে একই মানসিকতা ক্রিয়া করে গেছে। মূল বিষয় পশ্চাতে বিবেচ্য হয়েছে সে কারণেই। মূলেই অবরোধ করা যাক অতঃপর।

রাতের বাসে একটু সতর্ক হয়েই চলাফেরার অভ্যাস রপ্ত করতে হয়েছে উজ্জীখিত কারণে। সহযাত্রীটিকে সে রাতে তাই তীক্ষ্ণ চোখে প্রথমে পর্যবেক্ষণ করতে হ'ল। পাশে বসামাত্র সহযাত্রীটি বিনা ভূমিকায় বললেঃ ফ্র্যাংক রয়েসের দোর এখন খোলা পাওয়া যাবে? নাম শুনোছি, রোলস্ রয়েস। ইদানীং ও নামের গাড়ি কেন, একচেটিয়া দেশী, কোম্পানীর কল্যাণে অন্যতর গাড়িও দুল'ভ। কিন্তু...

এক এক সময় কোন একটা পংক্তি

সাধনা মৃৎখোপাধ্যায়

এক এক সময় কোন একটা পংক্তি
কোন একটা উক্তি
কোন একটা কথা
কুমারীর স্বপ্নের শিশুর মতো
বৃকের মধ্যে হাঁটু মূড়ে ধসে
নীরবে প্রতীক্ষা করে
অস্থি-মঞ্জারায় কোন আলিঙ্গনে
গভীর ইচ্ছের ফুল
কবে হবে উন্মিলন মুকুল
রক্তের ভিতরে।

এক এক সময় এক একটা গান
কোন একটা সুর
কোন একটা লয়
অতলে তলানো কোন স্মৃতি-গন্ধময়
তুলে আনে একটি উপল
কোন একটা শব্দ
কোন একটা ছন্দ
কোন একটা রঙ
পুরাতন এলুবামের বন্ধ-করা দরোজার
খোলে অর্গল।

এক এক সময় কোন একটা পাখী
কোন একটা পাতা
কোন একটা কড়ি
দুষ্টির সমুদ্রে যেন ভেসে-ওঠা আকস্মিক একটি ঝিনুক
তেমনই ইঞ্জিতবহ সাবধানে মৃতি ভরে রার্থ
ভারই শক্তি দিয়ে বহ্ন করে গড়তে একাকী
নিভুতে মৃকুট কোন কবিতার
কুড়োতে শব্দের সোনা বার বার
সখনি এ সেনানীতে
ছেয়ে দিই
রহস্যের খনি এই বৃক।

ফ্যাঙ্ক রয়েসটা আবার কী বস্তু?
সহযাত্রীটি প্রকৃতিস্থ তো? ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে
তীক্ষ্মতর করে পার্শ্বস্থ ব্যক্তির পরিমাপের
চেষ্টা করলাম। কিন্তু বোধ হল, ব্যাপারটা
নির্দোষ। যদিও তাঁর পোষাক অবিন্যস্ত।
ঝেড়ে জল হওয়ায় চতুর্দিকস্থানের কৃপায়
স্থানবিশেষ কদমাস্ত্রও বটে। ভবদ
পাকস্থলী-উত্তেজক পদার্থসেবী বলে মনে
হল না তাঁকে। সহযাত্রী এক টুকরো
কাগজ এগিয়ে ধরে বিমর্ষ ক্ষোভের সঙ্গে
বলল : ইনজেকশনটা কোথাও পাচ্ছি
না। শ্যামবাজার থেকে লেনিন সরণীর
বাঁক পর্যন্ত প্রত্যেকটা দোকান লক্ষ্য করে
আসছি। কী করি বলুন তো? রাতের
রোগীর জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। কী
শহর!—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল যুবকটি :
আমার বাবা হাসপাতালে। আমি বেকার,
জানেন!

এতক্ষণে বুঝলাম। ফ্যাঙ্ক রয়েস
নয়, ওটা ফ্যাঙ্ক রস—ডাক্তারখানা হবে।
প্রিয়জনকে হাসপাতালে রেখে রাতের
কলকাতায় উত্তর থেকে দক্ষিণ চলে বেড়াচ্ছে

একটি অসহায় নাগারক। হাসপাতালের
এমারজেন্সিতে ইনজেকশন নেই। অথচ
রাতের রোগীরা করবে কী? অসুখ-বসুখ
এমনিতেই রাগে ভয়ঙ্কর। বাবা গেলে
বেকার যুবক আর তার পরিবার করবে
কি!

মনে মনে দ্রুত সব ক'টি পরিচিত
ড্রাগিস্ট-কোমিস্টকে স্মরণে আনলাম।
কিন্তু কৈ? কিছুদিন আগে ট্যাক্সি নিয়ে
সামান্য একটা ট্যাবলেট খুঁজেই হতাশ
হয়েছি। 'ফ্যাঙ্ক-রস' চৌরঙ্গীতে রাত
দশটা, পার্ক স্ট্রীটে আটটায় বন্ধ। 'দে'জ
মেডিক্যাল'ও খোলা পাই নি। লিন্ডসে
সমবায়িকার উল্টো দিকে খোলা ডাক্তার-
খানা পেয়েছিলাম, ওষুধ পাই নি প্রয়ো-
জনীয়। পার্ক স্ট্রীটের সাহিব সিং সারা
রাত খোলা থাকে বটে। কিন্তু প্রয়ো-
জনীয় ইনজেকশন মিলবে কি? রাত
কলকাতায় ডাক্তারখানা প্রায় নেই-ই। দূর-
একটার ওপর ভরসা কি? আর উত্তর
থেকে দক্ষিণে যদি মাইল ছয়েকের
ব্যবধানে দূর-একটি থাকে তো শেষ

মুহূর্তের ওষুধ রোগীর ভাগ্যে জুটবে
কেমন করে! যুবকটিকে জানিত কয়েকটির
হাতিশ দিলাম। ঠিক এই সময় সামনের
আসন থেকে এক ভদ্রলোক চীৎকার করে
উঠলেন : এই বাস রোকো! যান দাদা
নেমেই ছুটে যান। চাঁদনীর ঐ
দোকানটায় সব তাল পড়ছে, ওখানে
না পেলে একটা গাড়ি নিয়ে.....

বাস এমারজেন্সির তোয়াক্কা করে না।
দাঁড়াল না। উদ্ভ্রান্ত যুবকটি লাফ
মারল বাস থেকে।

ফুটবোর্ড থেকে শক্তিকত কণ্ঠস্বর :
গেল, গেল!

যুবকটি পড়ে গেছে। বাস ছুটেছে।

জানি না, আমার সহযাত্রী ওষুধ
পেয়েছিলেন কি না। বিরক্ত দূর-একজন
সন্ধ্যাবেলাে চালকের উদ্দেশ্যে কটু মন্তব্য
করেছেন। চালক নির্বিকার। আমি বাড়ি
ফিরেছি নির্বিষে। অনেক রাত, পর্যন্ত
ঘুম আসে নি। শহরবাসের মধ্যে ভ্রম
দুঃস্বপ্ন দেখছি শুধু।



■ দৃশ্য ■

নির্লজ্জা বৃজ্জোয়া রাজনীতির প্রথম ও প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের, যে-কোনও বৃজ্জোয়া রাজনৈতিক দল এই নির্লজ্জতাকে তার প্রেম্য হাতিয়ার এবং অন্যতম রক্ষাকবচ বলে মনে করে। যে যত বেশী নির্লজ্জ, সে ঠিক সেই পরিমাণে সুবিধাবাদী, স্বার্থপর এবং নোংরা হতে পারে। নির্লজ্জতা তাকে যাবতীয় সমাজবিরোধী, গণ-বিরোধী কাজে প্রেরণা দেয় এবং এই নির্লজ্জতার প্রভাবেই তার কাছে সত্য ও মিথ্যার কোনও মূল্যভেদ থাকে না। পাকিস্তানের কনভেনশন লীগ সম্পর্কে ঠিক এই একই মন্তব্য করা যেতে পারে। কনভেনশন লীগ নেতাদের কলঙ্কিত ইতিহাসের যে বিবরণ এই পৃষ্ঠে আমার চিঠিতে দিয়েছি, তা থেকে তাদের নির্লজ্জতার সুস্পষ্ট প্রমাণ আপনারা নিশ্চয় পেয়েছেন। যারা আয়ুবের পতাকা-তলে দাঁড়িয়ে “বুনিয়াদী গণতন্ত্র”র পিরামিড তৈরি করেছে, কিংবা বলা যেতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ আওয়ালের জন্য গণ-তান্ত্রিক স্বর্গের সিঁড়ি বানিয়েছে, যারা ডিক্টেটর রাজত্বের এগার বছরে অগ্রগতির খুঁটিনাটি হিসাব দেখিয়ে, চুলচেরা বিচার করে পাকিস্তানকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অগ্রগামী দেশ হিসাবে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে, তারা ই আবার বছরের পর বছর পরম কর্তব্যপারায়ণ বি. ডি. সেক্রে “ওয়ার্কস প্রোগ্রাম”র ঢাকা চুরি করে লাল হয়ে গেছে। পাড়ার কুখ্যাত গুন্ডা রাতারাতি পরিণত হয়েছে লক্ষপতি বণিক, নেহাংই হা-ঘরে মেছো বা রিক্সাওয়ালা আশ্রয়স্থান দ্রুতগতিতে উঠে গেছে প্রতি-পন্ডিত শিখরে, যেন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পেয়েছে। আর যারা এই প্রদীপের আলো দেখেনি, তারা অর্থাৎ কোটি কোটি চাষী, শ্রমিক এবং মেহনতী মানুষ অনাহারে, অভাবে আধ-বাঁকা মেরুদণ্ড নিয়ে আরও নয়ে পড়েছে। আয়ুবশাহীর এগার বছরে কনভেনশনিস্টদের এই প্রকাশ্য লুণ্ঠনান্ধমানের মূল প্রেরণা ছিল জাদব নির্লজ্জতা। এই নির্লজ্জতা ছিল বলেই তারা অস্ত্রোপাশের মত দেশকে শোষণ করে

“আওয়াম”, “আজাদী”, “গণতন্ত্র” ইত্যাদি অর্থহীন গালভরা বুলি শুনিয়ে জনগণকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। আর এই নির্লজ্জতা আছে বলেই তারা নোংরা হাতে চোবড়ানো বাঁটি নিয়ে আবার ভোট ভিক্ষা করেছে। অন্যান্য যে-কোনও রাজনৈতিক দলের মত কনভেনশনিস্টদেরও উদ্দেশ্য দেশসেবা নয়, কালো-স্বার্থসেবা।

কিন্তু এই কথা খুব জোর দিয়েই বলা যেতে পারে যে, আসন্ন নির্বাচনে পাকিস্তানের মানুষ, বিশেষ করে যারা পূর্ব পাকিস্তানের, তারা কনভেনশনিস্ট-দের পক্ষে রায় দেবে না। যাদের পক্ষে তারা রায় দেবে, তারাও যে খুব সং এবং অপারিবার্য, সে কথা আমি বলছি না, কেন না তারাও ঘষা-পয়সার উটো পিঠ। তবে তাদের সম্পর্কে পাকিস্তানের মানুষের এখনও একটা ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহ আছে এবং এই ভ্রান্ত ধারণা এবং মোহের অবসানের জন্য এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। বৃজ্জোয়া সমাজব্যবস্থায় বাস করে, বৃজ্জোয়া-চিন্তা ও চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে দেশের মানুষ এখনও কেবল-মাত্র নির্বাচনকেই, একমাত্র অবলম্বন মনে করছে। নির্বাচনের অন্তঃসারশূন্য চেহারাটা তাদের সামনে স্পষ্ট না হলে বা নির্বাচিত বৃজ্জোয়াদের নগ্ন স্বার্থপরতা সুপ্রমাণিত না হলে তাদের মোহ-ভগ্ন হবে না। যাই হোক, কনভেনশন লীগের অবস্থা যে এইবার খুবই শোচনীয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ফকা চৌধুরী (ফজলুল কাদের চৌধুরী), সবুর খাঁ প্রমুখরা যতই কায়দা করুক না কেন, তাদের দলের ভরা-ডবি হবেই। কনভেনশনিস্টদের যাবতীয় ককীর্ত্ব পূর্ণ বিবরণ দিতে হলে যে বিরাট আরোজনের প্রয়োজন ছিল, আমার চিঠিগুলিতে তার একান্তই অভাব। প্রথমত রচনাগলি মূলতই চিঠি এবং সেই-হেতু সংক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়ত এতদূর থেকে পাঠানর অসুবিধাও যথেষ্ট। তা হলেও প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার আগে আয়ুবের এই অক্ষয় কীর্তিটি সম্পর্কে আরও কিছু লিখলাম। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হলে কনভেনশন লীগের ব্যর্থতার

কারণ যারা বিশ্লেষণ করতে চাইবেন, তাঁদের সুবিধা হবে।

যে আঞ্চলিক বৈষম্য পাকিস্তানের উভয় প্রদেশের জনগণের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলেছে, পারস্পরিক ঈর্ষা, ঘৃণা, অবিশ্বাস ও বিরোধের জন্ম দিয়েছে, মহামান্য আয়ুব খাঁ এবং তাঁর পেয়ারের কনভেনশন লীগ তাদের এগার বছরের শাহী জমানায় সেই আঞ্চলিক বৈষম্যকে আরও বিস্তৃত করেছে। আয়ুব খাঁ একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল (সম্ভবত “মিলিটারী ম্যান”দের এই সব থাকে), তিনি কারণে-অকারণে দেশের মানুষকে বোঝাতে চাইতেন যে, তাঁর মধ্যে বিশেষ মারপ্যাচ নেই এবং তিনি দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশের হিতার্থে তিনি যেসব কাজ করেছেন, তার মধ্যে ধাম্পা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। যেমন ১৯৬২ সালের শাসনভ্রমের ১৪৫(৮) ধারায় বলা হয়েছিল যে, প্রতি বৎসর জাতীয় পরিষদে অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। ঐ রিপোর্টে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং কি পরিমাণ সফল পাওয়া গেছে, এইসব তথ্য পরিষ্কার করে তুলে ধরা হবে। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখার প্রয়োজন আছে। এই রিপোর্ট আয়ুব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশ করতে চান নি। গত উনিশ শ’ বাষটি সালে যখন সারা পূর্ব পাকিস্তানের শোষিত মানুষ ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে, তখন আয়ুব খাঁ ভীড়ঘাড় করে এই ধরনের রিপোর্ট পেশ করার কথা ঘোষণা করেন। যাই হোক, জাতীয় পরিষদে পরিবেশিত বৈষম্য-মূলক রিপোর্টগুলি থেকে দেখা গেছে যে, আয়ুবের আমলে বৈষম্য কমা তো দূরের কথা, ক্রমশ বেড়েছে। উনিশ শ’ সাতষটি-আটষটি সালে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, সারা পাকিস্তানের মোট জাতীয় উৎপাদন ৮.৩ হারে বেড়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানে বেড়েছে ৮.৬ হারে। আয়ুবের পেটোয়া কাগজগুলি অর্থাৎ ডন, পাকিস্তান টাইমস, মর্নিং নিউজ ইত্যাদি ঘটা করে আঞ্চলিক বৈষম্যের ক্রমোন্নতি ঘোষণা করল। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তা খুব তাড়াতাড়ি টের পাওয়া গেল। ঠিক পরের বছর অর্থনৈতিক জরিপের (ইকনমিক সার্ভে) ফলে জানা গেল যে, সাতষটি-আটষটি সালে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন বেড়েছে ৭.৮ হারে। অর্থাৎ এই প্রদেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হার জাতীয় বৃদ্ধির হারকে এক বছরের জন্যও ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। ফলে বৈষম্য হ্রাসের প্রসঙ্গ উঠতেই পারে না। আটষটি-উনসত্তর সালে পূর্ব পাকিস্তানের উৎপাদন নানা কারণে

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

বাহ্যত হয়। শুধুও আশা করা হয়েছিল যে, উৎপাদনের হার আর না বাড়লেও কমবে না, কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল, তা সম্পূর্ণ অকস্মিক। কেন না, এই বছর মোট জাতীয় উৎপাদনের হার কমে দাঁড়াল ৫.২ এবং পূর্ব পাকিস্তানে ২.১। জাতীয় উৎপাদনের হার যে গতিতে নেমে গেল, পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদনের হার তিক্রমই গতিতে এবং অনুপাতে নামলেও ব্যাপারটা বোধগম্য হতে পারত। কিন্তু ৭.৮ থেকে একেবারে ২.১-এ পতন হওয়ায় স্পষ্টই বোঝা গেল, আরবের সময়ে ভূত ঢুকেছে। উনিশ শ' সাতাশটি-আটাত্তি সালে সারা পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ছিল চার শ' দুই টাকা, পরের বছর ওটা বেড়ে দাঁড়ালো চার শ' আট টাকা। অথচ এই দুই বছরে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় তিন শ' চার থেকে তিন শ' আট টাকায় নেমে গেল। নিচে সারা পাকিস্তান এবং পূর্বপশ্চিমবঙ্গের বৈষম্যের মাথাপিছু আয়ের একটি হিসাব দিলাম। পূর্বপশ্চিমবঙ্গের বৈষম্যের মাথাপিছু আয় একরকম বাড়ছে নি।

মাথাপিছু আয়

পাকিস্তান পূর্ব-পাকিস্তান

১৯৫৯-৬০	৩১৮ (টাকা) ---	২৬৯ (টাকা)
১৯৬০-৬১	৩২৬ " ---	২৭৭ "
১৯৬১-৬২	৩৩৭ " ---	২৮৬ "
১৯৬২-৬৩	৩৪০ " ---	২৭৭ "
১৯৬৩-৬৪	৩৫৯ " ---	২৯৯ "
১৯৬৪-৬৫	৩৬৫ " ---	২৯৮ "
১৯৬৫-৬৬	৩৭২ " ---	২৯৬ "
১৯৬৬-৬৭	৩৮১ " ---	২৯১ "
১৯৬৭-৬৮	৪০২ " ---	৩০৪ "
১৯৬৮-৬৯	৪০৮ " ---	৩০৩ "

একই সঙ্গে দুই প্রদেশের মাথাপিছু আয় এবং বৈষম্যের একটি হিসাব দিলাম।

মাথাপিছু আয় (টাকায়)

বছর	পূর্ব	পশ্চিম	বৈষম্য
	পাকিস্তান	পাকিস্তান	
১৯৫৯-৬০	২১৫	৩৫৩	৬৪%
১৯৬৪-৬৫	২৩১	৪১৬	৮০%
১৯৬৮-৬৯	২৪০	৪৬৯	৯৫.৪%

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় প্রদেশের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও অনেক বেশি। দুই প্রদেশে টাকার ক্রয়-ক্ষমতার যথেষ্ট তারতম্য থাকার দরুন এই বৈষম্য আরও ১২% বেশি ধরা উচিত। দ্বিতীয়ত আঞ্চলিক আয় হিসাবের সময় কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়

প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য খাণ্ডের ব্যয় ইত্যাদি যদি হিসাব করা যায়, তবে এই বৈষম্য আরও ২.৫% বেশি হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উৎপাদনকে বাড়িয়ে দোখিয়েছে। উদ্দেশ্য পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যাজেটের বরাদ্দ থেকে ফাঁকি দেওয়া। কিন্তু আসলে পূর্ব পাকিস্তানের কৃষিজাত ফলন না বেড়ে ক্রমশই কমেছে, ফলে বৈষম্যের পরিমাণ আরও ৬.৫% হারে বেড়ে গেছে।

পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য মানদণ্ড তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপেই ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্যের সূত্রীয়

জড়ালো অনুভব করছে। পূর্বাঞ্চলের কন-ভেনশন লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অভিযোগ এই যে, তারা বাঙালী হয়েও বাংলার সর্বনাশ করেছে। ব্যক্তিগত সুখ ও সম্পদের লোভে তারা উজ্জ্বলতার মত খাল কেটে ঘরের দ্বারের কুমীর এনেছে, অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে পার্কাপোন্তভাবে পশ্চিমাদের জন্য উপনিবেশ বানিয়েছে। মাথাপিছু আয়, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-সাধারণ মানদণ্ডের পক্ষে অপরিহার্য এই তিন বিষয়ের মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য গড়ে উঠেছে, তার খানিকটা আভাষ আপনারা পেয়েছেন। এইবার স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা সম্পর্কে কিছু লিখছি।

ভারবির অনন্য অর্থ

শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থমালা

● দ্বিতীয় পর্ব ●

ভারবির অনন্য করণীয় শৈলীতে

ত্রিশটি খণ্ডে

সবিশুদ্ধ-সমকাল থেকে সাম্প্রতিক কালের

ত্রিশজন শ্রেষ্ঠ কবি

সমগ্র কাব্যসাধনার শোভনসুন্দর সংকলন

কবিতা-প্রেমিক বিদগ্ধ পাঠকের জন্য একটি নির্দিষ্ট মানের গ্রন্থমালা, সুযোগ্য নিষ্ঠুর সম্পাদনায় বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ উল্লেখ্য কবির সুনির্বাচিত কবিতার এই সংরক্ষণীয় গ্রন্থমালার পরিচালনা। প্রকাশ-বণ্টনের সুবিধার্থে এই ত্রিশটি খণ্ড তিন পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম পর্বের দশটি খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে :

অমিয় চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৮'০০
সঞ্জয় ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৮'০০
অরুণ মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৭'০০
দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
মণীন্দ্র রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
অরুণকুমার সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
রাম বসুদেব শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
আলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
আলোক সরকারের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা	...	৬'০০

সর্বশ্রেণীর পাঠকের সুবিধার্থে দ্বিতীয় পর্বের দশটি খণ্ডের মূল্য, এককালীন অথবা নিম্নরূপে তিনটি কিস্তিতে অগ্রিম পরিশোধের শর্ত-সাপেক্ষ, ৬৫.০০ টাকার স্থলে মাত্র ৪৮.০০ টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে :

১১ জুলাইয়ের মধ্যে মধ্যে ১৬.০০

১১ অক্টোবর মধ্যে মধ্যে ১৬.০০

১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মধ্যে ১৬.০০

পুস্তক-বিক্রেতাদের ক্ষেত্রে ৬৫.০০ টাকার স্থলে ৪৫.০০ টাকা ; তিনটি কিস্তি ১৬.০০ হিসাবে পরিশোধ। ডাকে বই নিলে উভয় ক্ষেত্রেই ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

ভারবি

১০/১ বঙ্গবন্ধু চারুকলা, মুম্বাই, কলকাতা ২২

সামগ্রিক বস্তুমতী

জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য ডিকেডী আমলে পূর্ব পাকিস্তানে কোমর ও উন্নয়ন-যোগ্য কাজ হয় নি। যা হয়েছে, তা নেহাৎই লোকসেখানে, অর্থাৎ টেলিভিশন এবং রেডিওযোগে বিদেশী সাংবাদিক ও সরকারী প্রতিনিধিদের ধাপ্য দেওয়ার সুপারিকল্পিত প্রয়াস। এই বিষয়ে আর বেশি কথা না বলে কয়েকটি ফিগার তুলে দিচ্ছি। আশা করি, এইগুলি পরীক্ষা করে জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে, তা আপনারা বুঝতে পারবেন।

ডিসপেন্সারীর সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮	৩০৪	১,১১২
১৯৫৯	৩১২	১,১৫৫
১৯৬০	৩২৪	১,১৯৫
১৯৬১	৩৬০	১,২৫১
১৯৬২	৩৬০	১,৩৭৪
১৯৬৩	৩৯৬	১,৫১৪
১৯৬৪	৩৯৭	১,৬২৬
১৯৬৫	৪৮৮	১,৬৯৫
১৯৬৬	৪৮৯	১,৭৫৪

হাসপাতালের সংখ্যা

১৯৫৮	৭১	৩৩৮
১৯৫৯	৭১	৩৩৮
১৯৬০	৭১	৩৪৩
১৯৬১	৭১	৩৪৫
১৯৬২	৭১	৩৬৫
১৯৬৩	৭২	৩৬৯
১৯৬৪	৭২	৩৬৮
১৯৬৫	৭৬	৩৮৩
১৯৬৬	৭৬	৩৯৩

হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা

১৯৫৫	৩,৯০২	১৯,১৯৭
১৯৬০	৪,৯৭৮	২২,১০০
১৯৬৬	৬,৯৮৪	২৬,২০০

সরকারীভাবে স্বীকৃত চিকিৎসকের সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮	৪,৫৮০	৫,০৩৪
১৯৬০	৫,৪৯২	৬,১০২
১৯৬২	৬,১৪৯	৭,৫৪৩
১৯৬৪	৬,৬০৮	৯,০৬১
১৯৬৬	৬,৯৮৯	১০,৪৮৮

পাকিস্তানের মত অনুন্নত দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার একান্তই প্রয়োজনীয়। আয়ুব সাহাব তাঁর ডিকেডী আমলে প্রাথমিক শিক্ষার ক্রমোন্নতি হাঙ্গে বলে নানা রকম বিজ্ঞাপন ছেড়ে-ছিলেন এবং বিভিন্ন জনসভায় তাঁকে এবং তাঁর তাঁবেদার গোষ্ঠীকে প্রায়ই এই ব্যাপারে গলাবাজী করতে দেখা যেত, কিন্তু তাঁরা যাই বলে থাকুন না কেন, তাঁদের তত্ত্বাবধানে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। যেখানে ঊনিশ শ' ঊনষাট সালে পাকিস্তানে পাঁচ কোটি নিরানব্বই লক্ষ বাইশ হাজার লোক নিরক্ষর ছিল, সেখানে দশ বছর বাদে অর্থাৎ আয়ুবের পতনের সন্ধিক্ষণে এই সংখ্যা বেড়ে হয় সাত কোটি তিরানব্বই লক্ষ চুরাশি হাজার। গত গণ-আন্দোলনের সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা ও গ্রামে কাজ করতে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা ষাথখি স্মরণীয়। যেখানেই গিয়েছি, দেখেছি নড়বড়ে খুঁটি আর পচা খড়ের জরাজীর্ণ কতকগুলি কুঁড়েঘর। ভাঙাচোরা বেঞ্চি, হাতল-বিহীন চেয়ার, রঙচটা, ফাটা ব্রসকবোর্ড, আর অনাহারে, অস্বস্তি বেড়ে-ওঠা কিছ-ছাত্র-ছাত্রী। এরই নাম পাঠশালা। খুব কম করেও শতকরা নব্বইটি পাঠশালায় এই একই অবস্থা। তাও যদি উভয় প্রদেশে এই ধরনের পাঠশালাই সমানানু-পাতে গড়ে উঠত!

পাঠশালায় সংখ্যা

বছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৮-৫৯	২৬,৬৮৮	১৭,৫৩৬
১৯৫৯-৬০	২৬,৫৮৩	১৭,৯০১
১৯৬০-৬১	২৬,৬৬৫	২০,৯০৯
১৯৬১-৬২	২৭,৭৪৭	২৪,৯৩০
১৯৬২-৬৩	২৭,১৫৪	২৮,৩৩৮
১৯৬৩-৬৪	২৭,৫৬২	৩০,৯৫০
১৯৬৪-৬৫	২৭,৬৪৯	৩২,৫৮৩
১৯৬৫-৬৬	২৭,৭৩৬	৩৪,৩১৩

প্রাথমিক শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ যে, একজন সাধারণ ঘরামীর বাৎসরিক আয়ও তাঁদের থেকে বেশি। আমরা এমন পাঠশালা দেখেছি যার শিক্ষক মাস গেলে মাত্র দশ টাকা বেতন পেয়ে থাকেন! বলা বাহুল্য, এত অল্প-বেতনে সন্তুষ্ট হয়ে নির্ভর মগ্নে শিক্ষকতা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। নিচের ফিগারটি থেকে ঘরামী ও প্রাথমিক শিক্ষকদের আয়ের তারতম্য বুঝতে সুবিধা হবে।

শ্রমিকের আয়	২৩০ দিনের মজুরি (টাকা)
প্রধান রাজমিস্ত্রী	১৯৫২,৭০
রাজমিস্ত্রী	১৪৫৮,২০
ছুতার	১৪৬৯,৭০
কর্মকার	১১৭০,৭০
যোগাড়ী	৮২৮,০০
কুলি	৬৯০,০০

প্রাথমিক শিক্ষকের এক বছরের আয়

ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	
প্রধান শিক্ষক	১৩৫১,৪৪
ম্যাট্রিক প্রধান শিক্ষক	১১১১,৪৪
ম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	
সহকারী শিক্ষক	১১১১,৪৪
ম্যাট্রিক সহকারী শিক্ষক	৮৭১,৪৪
ননম্যাট্রিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত	
শিক্ষক	৭৯১,১৮
সাধারণ শিক্ষক	৫৪০,০০

আয়ুবের আমল অর্থাৎ কনভেনশন লীগের আমলে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের আয়, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঠিক এইভাবেই বান্ধ পেয়েছিল।

= সত্য বেরিয়েছে !! =

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

॥ পালামো ॥

মূল্য—দুই টাকা মাত্র

বস্তুমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমরা আপনার সম্পাদিত সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক। নিরপেক্ষ, নিভীক, প্রগতিশীল, বলিষ্ঠ মতবাদের মূখপত্র বলিয়া আমরা এই পত্রিকার প্রতি অত্যন্ত প্রশংসী। কিন্তু গত ২রা এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদকীয় 'রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হউক' আমাদের স্তম্ভিত করিল। ইহার পর আপনার পত্রিকার বিশেষণ হিসাবে আর যাহাই বলা যাউক না কেন, 'নিরপেক্ষ', 'প্রগতিশীল' বলা চলে না।

একথা আজ কাহারও বুঝিতে অসম্ভব হইবার নহে যে, আপনার এই শ্লোগানে কাহাদের সুর ধ্বনিত হইতেছে। যে বিশ্বাসঘাতকের দল পশ্চিম বাংলার মেহনতী জনগণের দীর্ঘ ভিত্তি রাজ-নৈতিক সংগ্রামের ফল তাহাদের প্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া ভাঙিয়া দিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির শাসনকে সসম্মানে আহ্বান জানাইয়াছে, বাংলার সংগ্রামী জনগণের ওপর পরোক্ষ কংগ্রেসী শাসন চাপাইয়া দিয়াছে, তাহারাই আজ আকাশ-বাতাস মূখরিত করিয়া রব তুলিতেছে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘমেয়াদী হউক। আপনিও ইহাদের সহিত সুর মিলাইয়াছেন।

পশ্চিম বাংলার জনগণের নিকট রাষ্ট্রপতির শাসন এই নতুন নহে। ইহার আগেও একবার তাহারাই এই রাজ্যের বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং এই-ধারও ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় নন্দী-ভূগী পদলিখ দল নিরীহ জনগণের ওপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। আর আপনারা রাষ্ট্রপতির শাসনের দীর্ঘমেয়াদ কামনা করিয়া এই অত্যাচারকেই দীর্ঘ-জীবী করিতে আহ্বান জানাইতেছেন। এই কথা হইতেই আপনার গায়ের 'নিরপেক্ষ' এবং প্রগতিশীলতার নামাবলী খসিয়া পাড়িয়াছে এবং আসল রূপ প্রকাশিত হইতেছে।

মাননীয়া সম্পাদিকা, আপনার নিকট ও আপনার অনুগামী রাজনৈতিক দলগুলির নিকট আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথমত রাষ্ট্রপতির শাসনের কারণ হিসাবে আপনারা যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কথা বলেন, সেই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য করি, প্রায় চার মাস হইল পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন বলবৎ হইয়াছে, কিন্তু আপনারা কি দেখাইতে পারেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার এতটুকু উন্নতি হইয়াছে? দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল যে, রাজ্যের জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে রাজ্যপালের নন্দী-ভূগী পদলিখের দল নিরীহ জনগণের ওপর যে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, সেই বিষয়ে আপনারা চুপ কেন? নাকি এই জনগণের কান্না

সাপ্তাহিক বসুমতী লেখকের

আপনাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াও করে না?

আপনাদের নিকট আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন, বর্তমানে নির্বাচন প্রসঙ্গে। আপনারা বর্তমানে নির্বাচনের বিরোধী—কারণ হিসাবে আপনারা বলেন, আগে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার পর নির্বাচন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইল যে, আপনারা তো মনে করেন, রাষ্ট্রপতি শাসন মানেই আইনের শাসন, তবে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়া অবিলম্বে মধ্যবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন কোন যুক্তিতে? আইন-শৃঙ্খলার অবনতির জন্য তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তাঁহার দল সি-পি-এমকে প্রধানত দায়ী করেন এবং নানাভাবে তাঁহাদের বিরুদ্ধে আপনারা উদ্ভাষা প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে আপনারা নিকট আমাদের প্রশ্ন যে, যদি জ্যোতি বসু এবং তাঁহার দল প্রকৃতপক্ষেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাইয়া থাকিবে, আর আপনারা কথামত তাঁহারা রাজ্যে বিভীষিকার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবে, তবে বাংলার জনগণ নিশ্চয়ই সেই বিষয়ে অবগত আছেন এবং এই হিসাবে তাঁহাদের সি-পি-এমকে বরদাস্ত করিবার কথা নহে, বরং ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করিবার কথা। অতএব এইদিক দিয়া সি-পি-এম'এর ভয় হইবার কথা ও আপনারা সাহস বাড়িবার কথা! কিন্তু কাষত দেখিতেছি, সি-পি-এম-ই জনগণের সামনে বুক খুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, নির্বাচনের আহ্বান জানাইয়াছে এবং আপনারা নানা দোহাই দিয়া নির্বাচনে অগ্রসর হইতে ভয় পাইতেছেন। ইহাতে আমাদের কি মনে হইতে পারে? আপনারা জনগণকে বিশ্বাস করেন না? নাকি সবকিছু জানিয়াও ন্যাকা সাজিয়া দেউলিয়া রাজনীতির বুলি আওড়াইয়া জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকা করিতেছেন।

আশা করি, সম্পাদিকা মহোদয়, দয়া করে এঁদের কর্তে বলা।

করিয়া আমাদের এই প্রশ্ন করটির উত্তর দিবেন।

—শ্রীসমীর দত্ত, শ্রীসমর চক্রবর্তী, শ্রীস্বপন রায় ও শ্রীঅজিত ডাওদাণ, কাঁচরাপাড়া, ডাঙ্গাপাড়া (চব্বিশ পরগনা)

“সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ”
প্রসঙ্গে

গত ২রা বৈশাখ, ১৩৭৭ সালের সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীশংকরীপ্রসাদ বসু “সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ” নামক রচনাটিতে পরলোকগত মুহম্মদ আলী জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন—“জিন্না কিন্তু সরোজিনীর কবিতায় নয়, শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়েছিলেন এক সুন্দরী পার্শী তরুণীর সৌন্দর্যে, মেরেটিও এঁগিয়ে এসেছিলেন, কন্যার পিতামাতার অমত ছিল বলে পালিয়ে গিয়ে তাঁরা বিয়ে করেন।”

এ সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। জনৈক সাংবাদিক ‘বিক্রমাদিত্য’ ছদ্মনামের আড়ালে “দেশে দেশে” নামে একটি বই লিখেছেন; বইটির প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। সম্ভবত ১৯৫৩ সালে এটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। যে সংস্করণ আমার কাছে আছে, তার বাইশ পৃষ্ঠায় জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রীর সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা আছে। অংশ বিশেষ নিচে উদ্ধৃত করা হলো।

যৌদিন জিন্নার দ্বিতীয়া স্ত্রী জন্মগ্রহণ করেন, সেদিন জিন্না ছিলেন স্যার দীনশার বাড়ির অতিথি। স্যার দীনশা এই নবজাত শিশুকে জিন্নার কোলে ভুলে দিয়ে বললেন, এর ভার নেবার অধিকার আমি তোমাকেই সর্বপ্রথম দিলাম। আঠারো বছর পরে জিন্না এই মেরেটিকে বিয়ে করেন।”

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, শংকরীবাবুর বক্তব্য অনুযায়ী পিতামাতার অমতের জন্য পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করার কাহিনীটি সঠিক নয়।

—কনক বসু,
কলকাতা-১২।

লেখকের বক্তব্য

শ্রীকনক বসুর পত্র সম্বন্ধে বক্তব্য—জিন্নার দ্বিতীয়া পত্নী বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছি, তা বলাই বাহুল্য আমার রচিত নয়। জিন্নার প্রামাণ্য জীবনী ‘হেইজার বলিথোর’ জিন্না গ্রন্থ থেকেই তা নেওয়া। পরলেখক যে বিক্রমাদিত্যের লেখা উদ্ধৃত করেছেন (কোন উৎস থেকে তা সংগৃহীত, জানি না, নিশ্চয় কোনো উৎস থেকেই সংগৃহীত), তা অবশ্যই ইণ্টারেস্টিং। ওর থেকে এইটুকু বুদ্ধিমান, কোনো শিশুকে জন্মের দিনে কোনো যুবকের কোলে ভুলে দিয়ে ভার নেবার কথা বলার মানে

আনন্দকাস

দ্রুতনাথ মেনন

[পেঁয়ালিবৃত্তি]

(৭)

সৈদিনটা ছিল বৃধবার, শান্তি-
নিকেতনে ছুটির দিন। সর্বত্র ছুটির দিন
বৃধবার, আর শান্তিনিকেতনে মহর্ষি
দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষা গ্রহণের দিন 'বৃধবার'
মলে এই দিনটি ছুটির দিন—নির্ধারিত
হয়েছে। প্রায় ১১টার সময় 'তনয়দা'
এলেন আমার কাছে, সঙ্গে 'শিল্পাচার্য'
নন্দলাল ধসু, (সবাই শুঁকে বলেন 'মাস্টার-
মশাই) ও তাঁর ছাত্র-অধ্যাপক বিনোদ-
বিহারী মধুপাধ্যায়। শশবাস্ত হয়ে
উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলাম। বললেন—
'তুমি দুদিন গিয়েছ আমার বাসায়, দেখা
পাও নি, তাই তনয়বাবুকে আর বিনোদকে
নিয়ে এলাম তোমার সঙ্গে দেখা করতে।
দেখলাম বলিষ্ঠ চেহারা, মাথায় কৌকড়া
চুল, গায়ে খন্দরের বেনিয়ান, পরনে
খন্দরের আটহাতি ধুতি প্রায় হাটুর কাছ-
কাছি উঠে এসেছে। মাথার উপর একটি
গামছা ভাঁজ করে রাখা। বললেন, 'কী
রোদ! মাথা বাটাতে হলে এই ভেজা
গামছাটা তাঁর সর্বধে'। তনয়দা তাঁর
কেশবিরল মাথাটা দেখিয়ে বললেন—'এই
খালি মাথায় আমি এলাম গুরু সঙ্গে, আর
মাথা ভাঁজ কালো চুল নিয়ে উনি এলেন
মাথায় ভেজা গামছা জড়িয়ে'। নন্দলাল
রাব হেসে বললেন—মাথায় কালো চুল
আছে বলেই তো গরম লাগে বেশি
আপনার মতো চকচকে টাক থাকলে

আলো-উত্তাপ প্রতিফলিত হয়ে চলে যেত
আমনার মতো'। তনয়দা বললেন—
'সত্যিই তো কথাটা আমার খেয়াল ছিল
না যে, কালো পদার্থ মাই সবটুকু আলো,
উত্তাপ শুষে নেয়'। নন্দলালবাবুর
চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত গভীর, মনে হয়
এখানে ফাঁকি চলবে না, নিরহংকার ও
নিরভিমান মানুষটি, অত্যন্ত সহজ ও
সরল। অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা
করলেন, অনন্যসাধারণ ওর মনীষা, মিত-
ভাষী কিন্তু রসগ্রাহী। শিল্পকলায় জ্ঞান
ওর অত্যন্ত গভীর, তাই বোধ হয় সবাই
বলেন, 'মাস্টারমশাই', কিন্তু পাণ্ডিত্যের
এতটুকু অভিমান ওর মধ্যে নেই। সত্যি,
এমন নিরহংকার মানুষ অত্যন্ত বিরল।
জ্ঞানের গভীরতা, অসামান্য প্রতিভা, রূপ
ও রসের পরিপূর্ণতার এক অপূর্ব
সমাবেশ এই মানুষটির মধ্যে। মনে হয়
শিল্পী নন্দলালের সঙ্গেই একটা শিক্ষা।
এর পর অনেকদিন ওর কাছে গিয়েছি,
কারণ ওর সহচর্যটা আমাদের কাছে ছিল
খুবই মূল্যবান। রং ও রূপের খর
জগতের মানুষ আমি নই, তাই শিল্পী
নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার আলোচনা করা
হবে নিতান্ত অনাধিকার চর্চা। মানুষ
হিসেবে তিনি যে কতো উদার ও মহৎ,
তাঁরই সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব।
স্বভাবশিল্পীকে কেবল যে আমরা দেখি
তাঁদের হাতের কাজে, তাঁদের রং-রেখার
ভাষায় তাঁর নির-দেখা-ধার তাঁদের ব্যবহারে,

তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় ও
ভঙ্গীতে। নিকটে থেকে নানা অবস্থায়
শিল্পীর অন্তরের মানুষটিকে সম্যক
জানবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল।

গুরুদেবের আমন্ত্রণে ১৯২২
খ্রীষ্টাব্দে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ
করে তিনি স্থায়ীভাবে বাস করতে এলেন
শান্তিনিকেতনে, তখন থেকে জীবনের শেষ
দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এই শান্তি-
নিকেতনেই। কলাভবনে একটি অপূর্ব
পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। তখনকার
দিনে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজে
ব্রতী হওয়ার অর্থ ছিল অনেক ত্যাগ
স্বীকার ও অস্বচ্ছলতা বরণ। এই অবস্থায়
তিনি প্রায় ১২ বছর কাটিয়েছেন কলা-
ভবনে, তখন তাঁর মাইনে ছিল মাত্র ২১৫
টাকা। এর ৬৭ গুণ মাইনেতে নানা
প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তন থেকে একাধিক-
বার ডাক এসেছে। প্রতিরাগেই নির্বিকার-
চিত্তে সন্নিহনে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেই
প্রাচুর্যের আহ্বান। তাঁর এই স্বার্থ-
ত্যাগের কাহিনী আজ শান্তিনিকেতনে
রূপকথার গল্প বলেই মনে হয়। এই যে
দুঃখবরণ ও ত্যাগ স্বীকার—এ হলো তাঁর
দায়িত্ব পালনের মূল্য। গুরুদেব শিল্পী
নন্দলাল সম্বন্ধে বলেছিলেন—'বিধাতা
যখনই প্রতিভা দেন তখনই তাঁর দায়িত্বও
দেন, এই দায়িত্ব পালন করেই প্রতিভার
মূল্য দিতে হয়।' শিল্পাচার্য নন্দলালও
সেই দায়িত্ব পালন করেছেন যেমন ত্যাগের

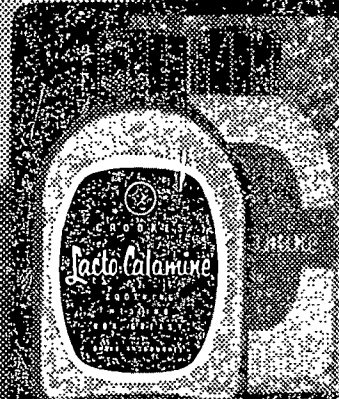
দাণ্ডারিক বন্দুস্ত

কুক্স
লীকটো ক্যালামাইন
কি একটি ফাউন্ডেশন?
হ্যাঁ তাই।

ফাউন্ডেশন-জাপে কুক্স লীকটো ক্যালামাইন ব্যবহার করুন।
নারীসময় আভা এনে দেবে, সমুদ্রপানে ঢেকে যাবে সব দাগ।
খাওয়াফলন মুন্দর হবে চেহারা।

ক্যালামাইন-ও উইচ হেজল সহ কুক্স লীকটো ক্যালামাইন
এছাড়াও আপনার এক পরিষ্কার ত্বাখে, আঙ্গুরা এনে দেয়।
এক মুহুরিত কুঁচক, দাগ ইত্যাদি হতে দেয় না।

লীকটো ক্যালামাইন
সমগ্র
জাতি/প্রসাধন
সামগ্রী



এখন
গিনি সাইজের আউট-বক্স

কুক্স ইন্টারকান লিমিটেড, বোম্বে-২৫

বিনামূল্যে :- আপনার বিনামূল্যে সোল্ডার
প্লেস্টিকার জন্য অদাই লিখুন-ডিপার্টমেন্ট-৪
পোঃ বক্স ৬৮৫২, বোম্বাই-১৮

Am. Cl. L.C. 15 BN

-সাহিত্যিক-বস্তুমতী

নিষ্ঠায়, তেমনি কঠিন শ্রমে। নিরলস প্রযত্নে তাঁর 'স্মৃতিধর্মী' জন নিয়ত স্মৃতি-কার্যে নিয়োজিত রেখেছেন, অপরাধকে ছাত্রদের নিরলস প্রেরণা খুঁটিয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকে যে 'সৌন্দর্য' সৃষ্টি করেছেন, কোথাও সে জন্য নিজের কৃতিত্ব দাবি করেন নিন। বলেছেন—“শেখাই নিন, এক মণ্ডে কাজ করছি, ছাত্রদের নিয়ে পাশা-পাশি বলে কাজ করছি। আমারটা দেখে দেখে ওরা শিখেছে, ওদেরটা দেখে আমি।” কে ছাত্র, কে ‘মাস্টার’ মনেই হয় নিন।” এই হচ্ছে ‘অদর্শ’ শিক্ষকের কথা, এই এক কথায় ‘শান্তিনিকেতনের’ শিক্ষাপ্রণালীর মূল কথাটি কন্দলাল ব্যক্ত করেছেন। ভারতের ‘অদর্শ’ অনুযায়ী গুরু-শিষ্যের যে সম্পর্কের কথা এতো পড়েছি, শুনছি, এ খুঁজে তা স্বত্বকে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। ছাত্রদের এতখানি রক্ষা-ভালোবাসা আজকের ভারতবর্ষে আর কোন্‌ো গুরু পেয়েছেন বলে জানা নেই।

‘শান্তিনিকেতনের’ প্রতিটি ‘আনন্দের আয়োজনে, অশ্রুসঞ্চার, অভিনয়ে, উৎসবে মন্দলালের অমর প্রতিভার ভূমিকা অনস্বীকার্য।’ গুরুদেব উৎসব অনুষ্ঠানে যে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন, মন্দলালের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শ না পেলে তা এমন চিত্তগ্রাহী ও সার্থক হতো কিনা সন্দেহ। ‘মহাকীর্তির’ অমর ভাবধারার সঙ্গে মিলন ঘটিছিল অস্বাভাবিকতার অমর শিল্পসৃষ্টির দ্বারা। তাই ‘শান্তিনিকেতনে’ উচ্ছল হয়ে উঠেছিল রূপে, রসে, গন্ধে ভরা এক অপূর্ব ‘অহাম’ জীবনধারা।

রবীন্দ্রনাথ যতদিন ছিলেন ‘ততদিন’ তিনিই কেন্দ্রীয় পুরুষ, তাঁকে ঘিরেই নিকেতনের ‘জীবনধারা’ প্রবাহিত ছিল। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর যদি কোনো এক ব্যক্তির প্রতি ‘শান্তিনিকেতন’ আনুগত্য দেখিয়ে থাকে তো তিনি ‘আচার্য’ মন্দলাল। বিভিন্ন দিবসগের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, কর্মী সকলের কাছে তিনি যে ‘আশ্রয়-মশাই’ নামে পরিচিত ছিলেন তাতেই প্রমাণ যে আগ্রহবাসী সকলেই তাঁকে ‘শিক্ষাগুরু’ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৬৬ সালে মন্দলাল পরলৌকগমন করেন। ‘কলাভবনের’ ‘মন্দির’ ‘মায়া ফাটনে’ মন্দলাল চলে গেছেন আর এক মন্দিরলোকে। ভারতের অস্বাভাবিক থেকে মনে পড়লো এক উজ্জ্বল জ্যোতিষক।

রবীন্দ্রনাথ তখন ‘শান্তিনিকেতনের’ কর্মসিঁচর ও সুরেব্রনাথের ‘অহাম’ স্ফূর্তি-কর্মসিঁচর। রবীন্দ্রনাথ ‘মানুষটি’ খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বহুগুণের অধিকারী, ব্যবহারে নিরীতিশয় ভদ্র। ‘সকল’ শিক্ষক কাজে খুবই দক্ষ, শুনছি ‘বাটিকের’ কাজে ও চামড়ার ওপর বাটিকের কাজ তিনিই

প্রথম বিশ্বভারতীতে প্রচলন করেন। এরকম ‘সহৃদয়’ উদার ও প্রতিবেদনমূলক অন্তঃকরণ বিরল; বিপদে-আপদে তিনি ছিলেন ‘শান্তিনিকেতনে’ সকলেরই ঊরবা-স্থল, এমন নিঃশব্দে তাঁর দান কায়স্থের হাতে পেয়েতো যে, দাতা ও প্রাপ্তি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি তা জানতে পারতেন না। ‘বিশ্বভারতীর’ প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ, নিজেও ছিলেন ‘অক্লান্তকর্মী’, আর ‘সহকর্মী’দের মধ্যে এমন সন্তুষ্টিভাবে কাজ ভাগ করে দিতেন, যাতে কোনো কাজই পড়ে থাকত না। খুবই প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন তিনি, রবীন্দ্রনাথের ছেলে বলে তাঁর প্রতিভার পরিমাপ হতো রবীন্দ্রনাথের ‘অসামান্য’ বহুমুখী প্রতিভার সঙ্গে, তাই রথিবাবুর প্রতিভার সম্যক স্বীকৃতি মেলে নিন। ‘বিশ্বের’ এক চেষ্টা ‘মনীষীর’ ও প্রতিভাধরের ছেলে হবার একটা মূল্যে ‘অসুবিধা’ এই যে, বাপের ‘অসাধারণ’ প্রতিভার তুলনায় তাঁর নিজস্ব প্রতিভা সহজেই ‘স্মান’ হয়ে যায়। রথীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাঁর ‘ব্যক্তিগত’ দিক ছয় নিন, কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা, দক্ষতা ও ব্যক্তিগত দীর্ঘায়ু বিচার করলে তাঁর প্রতিভা অনেক বেশি স্বীকৃতি পোত। প্রথম থেকেই এই নিরন্তর ‘ভদ্র’ মানুষটিকে খুব ভালো লেগেছিল। একদিন একটা কাজে রথিবাবুর অফিসে তাঁর ঘরে গিয়েছিলাম আমরা ‘করেকজন’। হঠাৎ রথিবাবুর হাতখড়িটা চামড়ার ব্যান্ড ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল। ভালো একটা দামী ঘড়ির হঠাৎ এই অপঘাতে সবাই খুব বিচলিত হলেন। রথিবাবু ঘড়িটাকে অনেক ঘাঁড়ান দীর্ঘে আবার চালাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, তাই দেখে বললাম যে, ‘ব্যালান্স হুইলের পিভট’ যদি কেউ না থাকে তাহলে এই ‘শকে’ ‘গ্র্যামফো-মেটর’ সীমার বাইরে চলে গেছে হুইলটা, খুলে দেখলেই বোঝা যাবে কি হয়েছে। ঘড়ির ডালাটা খুলে দেখা গেল ‘পিভট’ ভাগ্যক্রমে ভাঙে নিন, ‘গ্র্যামফোমেটর’ স্বস্থানে এনে দিতেই ঘড়িটা চলতে শুরু করলো। রথিবাবু বললেন—“ঘড়ি মেরামতের কাজ জানেন দেখছি।” বাবায় অনেক দামী ও ভালো ঘড়ি একেজো হয়ে পড়ে আছে, কলকাতার বড়ো বড়ো দোকানে সেগুলি দেখানো হয়েছে, দক্ষিণাও দিতে হয়েছে আমেক, ফল বিশেষ কিছু হয় নিন, দু’চারদিন চলার পর আবার অচল। একবার দেখেবন, এদের কোনো গতি করা যায় কিনা।” সেদিন বিকেলেই রথিবাবু একটা অচল ঘড়ি পাঠিয়ে দিলেন, ফেরং গেলেন অচল অবস্থায় দু’টিম দিনের মধ্যেই। এভাবে অনেক অচল ঘড়ি সচল-অবস্থা প্রাপ্ত হবার পর গুরুদেবের ক্ষমতা সেই পরম প্রমাণিত। তিনি

ডেকে বললেন যে, ওদের তিন পুরুষ আগেকার একটা খুব ভালো ঘোনার খড়ো ঘড়ি ওর কাছে রয়েছে। বেশ কয়েক বছর হলো ওটা অচল হয়ে পড়ে আছে, সুন্দর বাজনা বাজতো ঠিকতরে, সেটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার পরেই খড়োটা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। নামজাদা ঘড়ির ডালায়কে দেখিয়েও নাকি কোনো ফল হয় নিন একমাত্র অর্থ-ব্যয় ছাড়া। এ ঘড়িটার ওপর গুরুদেবের একটা বিশেষ মায়া আছে। ওর ইতিহাস হলো—গুরুদেবের ঠাকুরদা ‘প্রিন্স’ ‘স্বাধিকানাথ’ ঠাকুর এখন বিবর্তিত ছিলেন, বিখ্যাত ‘ঘড়ি’ ‘নিমাতা’ ‘M.C. Case’ নিজের হাতে ওর জন্য এ ঘড়িটি তৈরি করে ওকে উপহার দেন। ঘড়ির ডালাটার উপর ‘M.C. Case’-এর নিজের হাতে নাম সেই করা আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘড়িটি এসে পৌঁছলো গুরুদেবের টেবিলে, তিনি বললেন—“এটার যদি একটা সমস্যাটি করতে পার, একটা সার্টাটিকট দেব।” ঘড়িটা সত্যিই সাধারণ ঘড়ির পর্যায়ভুক্ত নয়, অদ্ভুত তার গঠন প্রণালী, স্বীকৃতি এই ধরনের ঘড়ির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। বেশ কয়েক ঘন্টা ধৈর্য ধরে ঘড়িটাকে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল একটা ছোটো স্প্রিং স্থানচ্যুত হয়েছে, তাকে স্বস্থানে স্থাপন করলেই বাজনাটা সুন্দর বেজে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটাও চলতে শুরু করলো। দু’দিন ঠিক মতো চলার পরে গুরুদেবকে ঘড়িটা ফেরং দিয়ে এলাম। খুব খুশি হলেন তাঁর সম্বন্ধে স্বীকৃত ঘড়িকে আবার সচল দেখে, বললেন—“এতোগুলি অচল ঘড়িকে যে সচল করেছে, তাকে আজ থেকে ‘ঘড়িরাল’ বসেই ডাকব, দেখো আমার যেন কেউ ‘ঘড়ি’ না বলে বসে।”

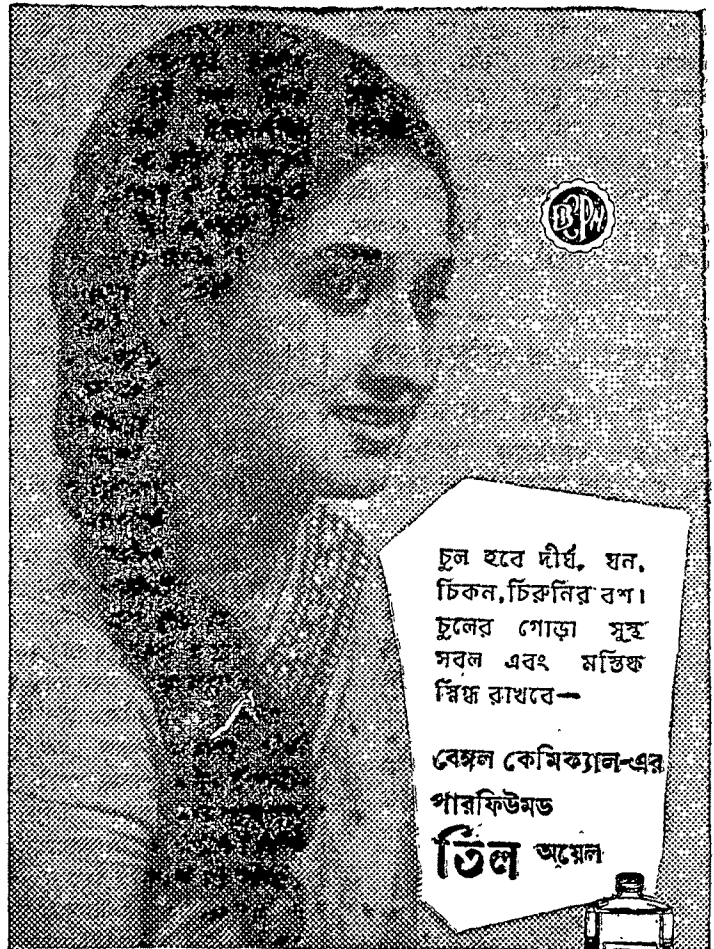
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কলেজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তদানীন্তন ‘অধ্যক্ষ’ অনাথ-বসু মহাশয় এসেছেন ‘শান্তিনিকেতন’ে। অনাথবাবু এখনকারই একজন প্রাক্তন অধ্যাপক। ক্ষীণতমোহন-বাবুকে ‘ঠাকুরদা’ বলে ডাকেন। তিনি, বিশেষ করে ক্ষীণতমোহনবাবুকে ধরে কলেন ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলতে। ক্ষীণতমোহনবাবু বলেন, “আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর মতের অনেক অমিল আছে, তাই সে সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় হবে না। তবে আগ্রহের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি কিছু আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু সেটা আধুনিক শিক্ষকশিক্ষকের দ্বারা অথবা বিশ্বাসী, তাঁদের পক্ষে হয়তো খুব অস্বস্তি হবে না। দেখো অনাথ, পরে আমাকে দশ দিও না। তুমি বরং আমার মতো প্রাচীনপন্থীকে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

যাদ দিলে আধুনিক শিক্ষণব্যবস্থার ধারক
এ বাহক যোগ্যতর ব্যক্তির সন্ধান কর।”
অনাথবাবু বললেন—“ঠাকুরদা, আপনার
গঠনমূলক সমালোচনা আমাদের ও
শিক্ষার্থীর কাজের ক্ষেত্রে অমূল্য পাথেয়
হয়ে থাকবে।” ক্ষতিমোহনবাবু খুব
সুন্দর বলতে পারতেন, বহু উপমা দিয়ে,
বেদ-উপনিষদ থেকে বাণী উদ্ধৃত করে
সুন্দরিত ভাষায় আঁত প্রাঞ্জল করে তিনি
তার বক্তব্য প্রোত্ববর্গের মর্মস্থলে পৌঁছে
দিতেন। সৌদীন শব্দ করলেন “মেথডস্
অফ্‌ এ্যাডুকেশন” নিয়ে—বর্তমান শিক্ষা-
পদ্ধতি, যার সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত
হয়েছে, তার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলেই
খামলেন—তারপর কণ্ঠস্বর আরো একটু
উচ্চগ্রামে তুলে বললেন—“আজকাল অবস্থা
যা দাঁড়িয়েছে, কোনো কিছু পদ্ধতিতে লেখা
থাকলে তা প্রায় সকলেই বিনা বিচারে
মেনে নেয়, আর সে-পদ্ধতি যদি বিদেশী
ভাষার পদ্ধতি হয় তাহলে তো কথাই নেই।
তাকে ক্ষেত্রজ ‘ট্রায়াল’ অর্থাৎ পরীক্ষণের
ব্যবস্থা করার প্রশ্নই যেন মনে আসে না।”
এই প্রসঙ্গে তাঁর ছেলেবেলায় কাশীতে
শিক্ষালাভ করার সময়কার একটি ঘটনার
উল্লেখ করলেন—তিনি, ললিতবিহারী
সেনরায় (যিনি পরে কাশীর রাজার
এস্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন) ও আর
একজন সহপাঠী (নামটা ভুলে গেছি),
এই তিন সতীর্থ একদিন ঔদের স্কুলের
লাইব্রেরীতে ‘হাউ টু টু লারন্‌ সুইমিং’
নামে একখানি সচিত্র বইয়ের সন্ধান
পেলেন। স্থির হলো, সবাই মিলে ঐ
পুস্তকে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ
করে সাঁতারটা তাড়াতাড়ি শিখে ফেলবেন।
ঘরে দরজা বন্ধ করে মেঝেতে সতরঞ্চ
বিছিয়ে তিন বন্ধুতে মিলে অদম্য উৎসাহে
Stroke No. 1, No. 2, No. 3, No. 4
ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি ছবিতে নির্ধারিত
ব্যবস্থা অনুযায়ী আয়ত্ত করার জন্য কঠিন
সাধনা শুরু করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই
সাঁতারের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এতো সড়গড়
হয়ে গেল যে, তিন বন্ধু নিঃসংশয়ে মেনে
নিলেন সাঁতার তাঁদের শেখা হয়ে গেছে,
পুঁথির লেখার ওপর এমনি দৃঢ় আস্থা
ভাঁদে। একদিন ললিতবিহারী বললেন,
“ক্ষতি, সাঁতার আমরা তো শিখেই গেছি,
তবু ‘ক্ষেত্রজ ট্রায়াল’ দেওয়াটা দরকার।
তোমার বাসা গঙ্গার খুব কাছেই, তুমিই
প্রথম ট্রায়ালটা দাও।” পুঁথিতে বর্ণিত
প্রক্রিয়ার ওপর এমনি অগাধ বিশ্বাস ছিল
যে, তিনি তার পরদিনই নিকটস্থ গঙ্গার
ঘাটে চলে গেলেন, গিয়ে দেখেন জীর্ণ-
ঘাটের সংস্কার চলছে; নদীর জলে অনেক
বাঁশ পুঁতে ভারা বেঁধে পুর্ণোদ্যমে
মেরামতির কাজ চলছে। কোনো রকমে
একটা বাঁশ ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন,

সঙ্গে সঙ্গে জলের নিচে তলিয়ে যেতে
লাগলেন। পর পর Stroke No. 1,
2, 3, 4 প্রয়োগ করে কোনো ফল হলো
না, যেতাই নতুন নতুন ‘স্ট্রোক’ প্রয়োগ
করলেন ততোই জলের উপরে না উঠে
আরো নিচে তলিয়ে যেতে শুরু করলেন,
পেটে তখন বেশ খানিকটা জলও ঢুকে গেছে।
দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে, মৃত্যু আসন্ন,
হঠাৎ হাতে পিছলু একটা কিছু ঠেকতেই
বুঝলেন সেটা ভারা-বাঁধা একটা বাঁশের
গুঁড়ি। দুই হাতে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ
করে ‘সনাতনপন্থা’ অবলম্বন করে বাঁশ
ধরেই তিনি জলের উপরে ভেসে উঠলেন,
পৈত্রিক প্রাণটা সে-যাত্রা রক্ষা পেল।
কাহিনী শেষ করে অনাথবাবুকে বললেন
—“দেখ অনাথ, যে-পদ্ধতিতে প্রাণটা বাঁচল
সেই ‘সনাতনপন্থা’কে ত্যাগ করা বুদ্ধি-
মানের কাজ নয়, তাই আজও আমি
প্রাচীনপন্থী হয়েই রইলাম।”

তারপর আশ্রমের শিক্ষার রূপ ও
শিক্ষার স্বাণীকরণ সম্বন্ধে একটি জ্ঞান-
গভ ভাষণ দিয়ে বললেন—আজকাল যেমন
তোমাদের ‘কন্‌ভোকেশনে’ মানপত্র পেলে
তবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার জন্মায়,
তেমনি আশ্রমের যুগেও গুরু ‘সমাবর্তন’
না দিলে কারও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের
অধিকার জন্মাতো না। কেউ তাকে কন্যা
সম্প্রদান করতো না, তিনি গৃহী হবার
অধিকার পেতেন না। পুরোনো দিনের
সেই ব্যবস্থার কিছুটা এখনও রয়ে গেছে,
তাকে একেবারে অপাতস্তের বলে এখনও
ত্যাগ করা সম্ভব হয় নি, তা এখন
অনেকটা আচারে পর্যাবসিত হয়েছে। যেমন,
হিন্দুবিবাহে এখনও বিবাহে প্রবৃত্ত হবার
আগে পাঠকে প্রকাশ্য বিবাহসভায় গুরুর
অনুমতি নিতে হয়। এই গুরু শিক্ষা-
গুরু নম্র, কুলগুরু তাঁর অনুমতি নেওয়া
আবশ্যিক। এই আচার বর্তমানে যে কী



চুল হবে দীর্ঘ, ঘন,
চিকন, চিকনিতর বশ।
চুলের গোড়া সুস্থ
সবল এবং মস্তিষ্ক
স্বিচ্ছ রাখবে—

বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর
পারফিউমড
তিল অয়েল

তসময়টিক ডিভিশন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী • মাদ্রাস

শ্যের অনাচারে পিয়ে দাঁড়িয়েছে তার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন। মাদারীপুরে এক ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়েতে তান উপস্থিত ছিলেন। পাত্র বিবাহে প্রবৃত্ত হবার আগে গুরুদেবের অনুমতি গ্রহণ করার শর্তমূহত যখন সমাগত, দেখা গেল, যে গুরুদেবকে সভায় উপস্থিত করা হলো তিনি ৬৭ বছরের একটি বাচ্চা ছেলে। রাত তখন প্রায় দশটা, সদ্য ঘুমভাঙা চোখে চারদিকে তাকিয়ে এতো জনসমাগম দেখে চাঁৎকার করে কেঁদে উঠলেন গুরুদেব, “মার কাছে যাব।” কিছুদিন আগে কুলগুরুদেব মৃত্যু হয়েছে, তাঁর ৬৭ বছরের ছেলে এখন শিষ্যবংশের ‘বাচ্চা-গুরুদেব’। পুরোহিতের নির্দেশে পাত্র যতো গলবস্ত্র হয়ে ‘গুরুদেব’ অনুমতি ভিক্ষা করছে “গুরুদেব আপনি অনুমতি দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হই”, গুরুদেব ততোই উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠছে “মার কাছে যাব।” বিয়ে পশ্চ হবার উপক্রম দেখে বরকর্তা ক্ষতিবাবুর শরণাপন্ন হলেন, এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির জন্য বরপক্ষ প্রস্তুত ছিলেন না। ক্ষতিবাবু বরকর্তাকে এই দায় থেকে মুক্ত করার আশ্বাস দিলেন। তিনি ক্রন্দনরত ‘গুরুদেব’ কোলে তুলে নিয়ে বিবাহমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে গৃহসংলগ্ন অশ্বকার বাগানে এসে অনেক ভয় দেখিয়ে প্রথমে তার কান্না শব্দ করালেন, তারপর বললেন, তিনি তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু একটু কাদলেই এই বনের মধ্যে তাকে

ফেলে দিয়ে যাবেন। এই অবস্থায় ‘গুরুদেব’ কোলে নিয়ে বিবাহসভায় ফিরে এসেই পাত্রকে বললেন, ‘গুরুদেব’ অনুমতি ভিক্ষা করার জন্য। পাত্র সঙ্গে সঙ্গে গলবস্ত্র হয়ে অনুমতি চাইলো—“গুরুদেব আপনি অনুমতি দিলে বিবাহে প্রবৃত্ত হতে পারি।” ঠিক সেই মূহুর্তে ক্ষতিবাবু ‘গুরুদেব’ কানের কাছে মুখ নিয়ে, আর কেউ শুনতে না পার, খুব চুপি চুপি বললেন, “মার কাছে যাবি?” বাচ্চা-গুরুদেব খুব খুশি হয়ে চোঁচিয়ে উঠলো “হ্যাঁ”। উপস্থিত অভ্যাগত সবাই শুনলেন পাত্রের অনুমতি-ভিক্ষার কথা আর সঙ্গে সঙ্গে ‘গুরুদেব’ “হ্যাঁ” বলে অনুমতি দান। এভাবেই শতবার আশ্রয় নিয়েই সেই বাচ্চা ভদ্রলোককে তাঁর ঐ বিষম দায় থেকে তিনি মুক্তি দিলেন। অনুশাসন বা পন্থাতি যখন আসল জিনিসটাকে চাপা দিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে, তখন অশ্ব সংস্কারের মতো তাকে অনুসরণ করতে গেলেই ঘটে প্রাতিপদে বিভ্রম।

এই প্রসঙ্গে আরো দু’জন সুরসিক অধ্যাপকের কথা মনে পড়ে। নেপালচন্দ্র রায় ও প্রমদারঞ্জন ঘোষ—দু’জনেই বেশ বয়স্ক। নেপালবাবুকে সবাই ‘দাদা-মশাই’, বলে ডাকতো। তিনি ছিলেন আপনভোলা মানুষ, ডান হাতের কব্জীতে বাঁধা চামড়ার ব্যান্ডের মধ্যে থাকতো একটি হাতঘড়ি, তবে সেই ঘড়ির সময় দেখে যে তিনি কোথাও যেতেন তা নয়। তাঁর একটা মহৎ গুণ ছিল, কাউকে কোনো বিষয়ে দোষারোপ করতেন না, অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটলেই ধরে নিতেন তাইই ঘটিতে ঘটেছে, বলতেন “তাই তো বড়ো অনায়াস হয়ে গেল” বা “তাই তো বড়ো গোলমাল হয়ে গেল।” ঔর অনামনস্ক স্বভাবের কথা সবাই বলতেন। একটা কাহিনী শুনছি, একবার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে হাওড়া থেকে বোলপুর আসবেন, গাড়িতে ওঁদের বসিয়ে দিয়ে তিনি প্র্যাটফরমের একটা বেঞ্চে বসে এমন তন্ময় হয়ে খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন, কখন যে ট্রেন ছেড়ে গেল, টেরই পেলেন না। যখন থেয়াল হলো দেখলেন, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ট্রেন চলে গেছে, তিনি স্টেশনে পড়ে আছেন। উঠে দাঁড়িয়েই নাকি বললেন, “তাই তো বড়ো গোলমাল হয়ে গেল।” আরো একটি কাহিনী শুনছি। নেপালবাবুর পাশের বাড়িতে যে অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর মেয়ে ও আর একজন অধ্যাপকের মেয়ে সম-বয়সী, একত্রেই তারা লেখাপড়া করতো, রাতে এক সঙ্গে একই ঘরে শুতো। নেপালবাবুর সঙ্গে দাদা-নাতনী সম্পর্ক, তাই কিছু রসিকতাও তিনি ওদের সঙ্গে করতেন। উঠতেন খুব তোরো, বেড়িয়ে

যখন ফিরতেন তখন এক অননুক্রমণীয় বেসরকারি গান্না গান ধরতেন “সখী জাগো”, এসেই ঘরে ঢুকে মেয়ে দুটির কপালে ঠান্ডা হাত ঠোকরে ওদের ঘুম ভাঙিয়ে দিতেন। এতো ভোরে রোজ এভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো মেয়ে দুটি মোটেই পছন্দ করত না, বিশেষত প্রচণ্ড শীতের ভোরে ওরা যখন আপাদমস্তক লেপ মড়ি দিয়ে ঘুমোতো। একদিন ঐ অধ্যাপকের মা এলেন ছেলের বাড়িতে, নাতনী ও অপর মেয়েটির সঙ্গেই তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা হলো। মেয়ে দুটি সে রাতে গোপনে কী যেন একটা পরামর্শ করলো। এদিকে নেপালবাবু যথারীতি খুব ভোরে “সখী জাগো” গান ধরে যখন আসছেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে দুটি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো; একটা পাশবালিস গভীর ঘমে আচ্ছন্ন অধ্যাপকের মায়ের পাশে লেপের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে দু’জনে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। মনে হলো যেন লেপ মড়ি দিয়ে দু’জনে বিছানার উপর ঘুমচ্ছে। এই মারামর্ক ষড়যন্ত্রের বিন্দুবিসর্গও এই অপনভোলা ভদ্রলোকটি জানতে পারলেন না, তাই অন্য দিনের মতোই অন্য দরজা দিয়ে “সখী জাগো” গাইতে গাইতে ঘরে ঢুকে যথারীতি লেপের নিচে ঠান্ডা হাত ঢুকিয়ে ভদ্রমহিলার কপাল স্পর্শ করতেই তিনি জেগে লাফিয়ে উঠে অশ্বকারে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চাঁৎকার করে উঠলেন, “কে রে, দাঁড়া তোর সখী জাগাচ্ছ”। মূহুর্তে অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করে নেপালবাবু প্রায় কেঁদে ফেললেন, “তাই তো বড়ো অনায়াস হয়ে গেল, বড়ো গোলমাল হয়ে গেল, সব দোষ ঐ মেয়ে দুটোর, আমি জানতাম না, মাপ করুন” বলতে বলতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কথাটা গুরুদেবের কানেও পৌঁছে গেল। সেদিন বিকেলে নেপালবাবু গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি ছন্দ-গান্ধীর্ষের সঙ্গে বললেন, “আশ্রমে দুনীতি প্রবেশ করেছে, এমন কি আগ্রম-বাসীর হাতে ভদ্রমহিলার সম্মান পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ হতে চলেছে। স্থির করছি অপরাধীকে দণ্ড দেব।” বলেই গুরুদেব তাঁর ঘরের কাগে রক্ষিত একটি লাঠি তুলে নিয়ে নেপালবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—“নিশ্চয়, দণ্ড গ্রহণ করুন, এই দণ্ডটি কাল এখানে ফেলে গিয়েছেন।” গুরুদেবের এই নির্মল পরিহাস উপস্থিত সকলেই খুব উপভোগ করলেন, স্বয়ং নেপালবাবুও। তাঁর বক থেকে একটা পাষণের ভার নেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন: “তাই তো বড়ো অনায়াস হয়ে গেল।”

[ক্রমশঃ]

সাপ্তাহিক বস্তুত্ব

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

তিন মাসের কম গ্রাহক প্রণীভুক্ত করা হয় না। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

চাঁদার হার

ভারতে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৮.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৯.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪.৫০ পঃ

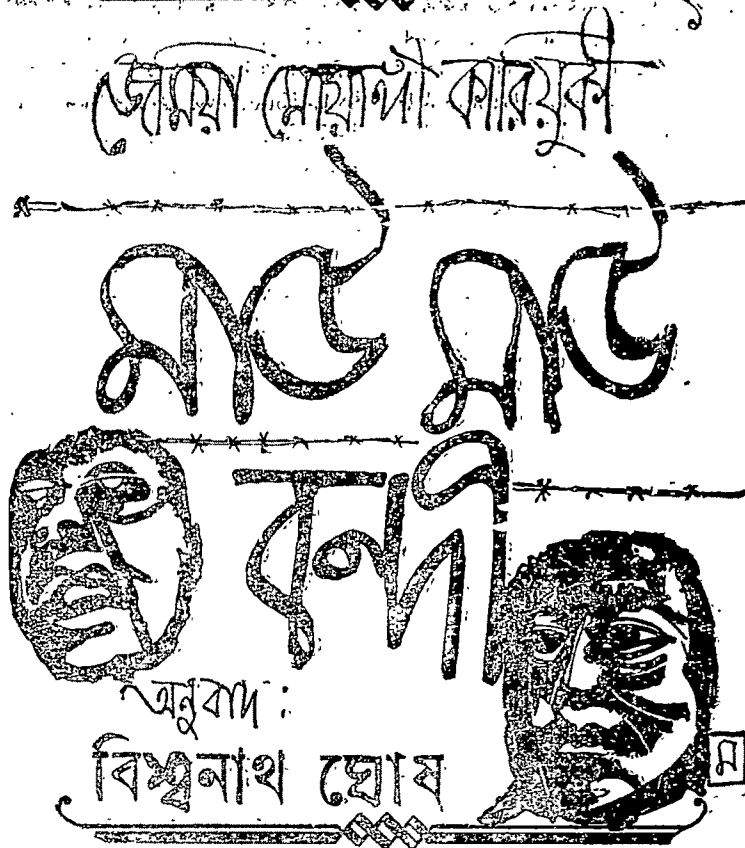
বিদেশে জাহাজে (সডাক)

বাৎসরিক—	৪০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	২০.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	১০.০০ পঃ

বিদেশে বিমানে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৭০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৮৫.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪২.০০ পঃ

প্রতি সংখ্যা (নগদ মূল্য) ৩০ পয়সা



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নকল গৃহদাদের আপাতদৃষ্টিতে এরকম অদেশাত্মক ব্যবহারের কারণসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমত, কেনিয়ার রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার যে সময় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি অর্ধাধি কেনিয়া সরকারও যে সমস্ত সংগ্রামীরা ১৯৫২ সালে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, তাদের অনমনীয়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠেছিল এবং দু' বছরের চেষ্টার পরে তারা আর দু' হপ্তা বা দু' মাসের ভেতর সংগ্রামীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার বড়-ফটাই করছিলেন না। মাউ-মাউ আন্দোলনের প্রারম্ভে সরকার পক্ষের যে অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চরমপন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করেছিল, তারও রূপান্তর দেখা যাচ্ছিল সরকারী ভাবধারায় ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি এবং নকল গৃহদাদের ভেতর অনেকে এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির কথা সংগ্রামীদের জানাতে ইচ্ছুক হয়ে উঠেছিলেন। তারা ভেবেছিলেন যে, পুনর্বাসন রাজনৈতিক পথেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সম্ভবপর হয়ে উঠছে, কাজেই সশস্ত্র সংগ্রামের আর কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত, নকল গৃহদা-

দের করেকজনকে কতৃপক্ষের শোকেরা প্রচুর মারধোর করেছিলেন, ফলে তাদের মনে ধারণা হয়েছিল যে, সরকারী নির্দেশমতো কাজ না করলে মারধোরের পরিমাণ আরও বেড়েই যাবে। কাজেই তারা অনেক সময় নিজের ইচ্ছার এবং যুদ্ধবন্দীর প্রতি সরকারী আচরণের যে সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়মাবলী আছে তার বিরুদ্ধেই আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তৃতীয়ত, এরা সংগ্রামরত আফ্রিকানদের একথাও জানাতে চেয়েছিলেন যে, "সংগ্রাম অথবা মৃত্যু" এই চরমপন্থা ছাড়া এক মধ্যপন্থেরও আবির্ভাব হয়েছে সরকারী ভাবধারায়, যার ফলে সংগ্রামীরা ধরা পড়ার পরও প্রাণে বাঁচবার আশা করতে পারে। অবশ্য জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের অনেকেই একথা ১৯৫৬ সালের অনেক পরেও বিশ্বাস করে নি, কারণ তারা শূন্য শূন্যেছিল যে, কেনিয়া সরকার মাউ-মাউ সংগ্রামীদের "বন্দী" করার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না, তারা তাদের সমলে উপাটন করেই চেয়েছিলেন। তাদের এ বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না, কারণ, চিগা নামক এলাকায় অনেকদিন পর্যন্ত কোন সংগ্রামীকে সরকার বন্দী করেন নি, ধরতে পারলে শূন্য হতাই করেছেন। ১৯৫৭ সালে কেনিয়ায় সাধারণ

নির্বাচন হবে এ২৭ বিধানসভায় আফ্রিকান সদস্যদের প্রত্যাশা হবে—৫৫ মর্শে সরকারী ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে। এর ফলেই আজ বহুল সংখ্যক সংগ্রামী জেনারেল বা সৈনিক নিরাপত্তা কেনিয়ার নানাস্থানে স্বাভাবিক নাগরিক জীবনযাপন করছেন চাষবাসে, ছোট্টো মালিক হিসাবে বা জীবজন্তুর বেচাকেনার কাজে। আজ আমরা আমাদের ঈশ্বর সব কিছাই পেয়েছি, কাজেই এখন আর নিরীহ নাগরিকদের ওপর কোনরকম আত্যাচার করা বা কোন গৃহপুত্র সমিতি ইত্যাদি চলনার স্বপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। যে করেকজন মদ্রিটমের দ্রাব্ত সংগ্রামী এখনো এই প্রকার অসামাজিক কার্যে লিপ্ত আছে, তারা আমাদের কোনই সমর্থন পেতে পারে না। বরং এখন স্বাধীন কেনিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের বিনষ্ট করতেই চেষ্টা করছি।

১৯৫৬ সালের ৮ই জুন তারিখে মানিয়ানি শিবিরের তথাকথিত ২০৮ জন সংগ্রামী 'দলপতিক' তিরিশ নম্বর তাঁবুতে একত্রিত করেন সেখানকার কতৃপক্ষ, তারপর তাদের প্রত্যেকের পায়ে বোড়ি পরানো হয়, সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া হ্রদের সাইয়ুসি নামক দ্বীপে নির্বাসনে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এইরকম অবস্থার ভেতরও আবার মিলিত হতে পেরে রবিনসন, গাদ এবং আমি অত্যন্ত খুশি হই এবং আমরা স্থির করি যে, পায়ে বোড়ি পরার ব্যাপারটাকে এমনভাবে নেব, যেন এটি খুব একটা কিছু আনন্দের বিষয়। আমরা সবাইকে বলি হাসিমুখে দৌড়ে গিয়ে নিজ নিজ বোড়ি নিয়ে আসতে, যাতে কি কতৃপক্ষ একবারও একথা মনে করতে না পারেন যে, তারা আমাদের স্বাধীনতালাভের উৎসাহকে নির্বাপিত করতে বিন্দুমাত্রও সক্ষম হয়েছেন। মাইয়ুসি ভিক্টোরিয়া হ্রদের পূর্ব-তীরবর্তী কিসুমু শহরের নিকটবর্তী এক দ্বীপ, পরিধি যার তিন বর্গমাইল মাত্র। কেনিয়া সরকার এ দ্বীপের তখন নামকরণ করেছিলেন : ফিরে না আসার দ্বীপ।

II. সপ্তম অধ্যায় II

শৃঙ্খল, দ্বীপ ও ধূলা

আমি জানি না, কে বা কারা পদ-শৃঙ্খল তৈরি করে, কিন্তু ১৯৫৬ সালে তাদের বাগিচা নিশ্চয় খুব ভাল হয়েছিল কারণ কেনিয়া সরকার ঐ সময় প্রচুর অর্থব্যয় করেছিলেন বহুসংখ্যক পদ-শৃঙ্খল কেনবার জন্য। আজকের দিনে খুব কম লোকেই এর ব্যবহারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পান, কয়েকশত বছর আগে রোমান ক্যাথলিক ধর্মতের বিরুদ্ধবাদীদের

মান করবার জন্য স্থাপিত বিচারালয়-
গুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গেই এর
ব্যবহার পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশেই
বন্ধ হয়ে গেছে। বহুল পরিমাণে
কমে গেছে। কাজেই আমি এখানে
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে
দু'এক কথা বললে অত্যাশ্চর্য হবে না।
শৃঙ্খলিত অবস্থায় যথাসম্ভব কম
চলাফেরা করা উচিত, কারণ মানুষের
মধ্যে চলচ্ছিত্ররীতি করার জন্যই এর
ব্যবহার। এই অবস্থায় বন্দীশিবির
থেকে তিন মাইল দূরে রেল স্টেশনে
হেঁটে যেতে আমাদের ভোর পাঁচটা
থেকে সকাল সাড়ে নটা অর্থাৎ পুরো
সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লেগেছিল।
পাঠকদের ভেতর অনেকেই হয়তো
জানেন যে, একজন সাধারণ মানুষ তিন
মাইল পথ এক ঘণ্টায় হেঁটে অতিক্রম
করতে পারে অনায়াসেই। ছোট মাপের
শৃঙ্খলের তুলনায় বড় মাপের শৃঙ্খল
পরে চলতে অসুবিধা হয় অপেক্ষাকৃত
কম, কিন্তু ছোট মাপের শৃঙ্খল পরে
বেশ দু'পা জোড়া করে লাফিয়ে
লাফিয়ে চলা যায়, যা বড় শৃঙ্খলে
সম্ভব নয়। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী
বন্দীদের অনেকেই প্রথমে বেশ খানিক-
ক্ষণ অবাধ লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে
যেতে-পেরেছিল শৃঙ্খল পরেই, তারপর
আর পারে নি। যেভাবেই চলা থাক-
না কেন, অল্প সময়ের মধ্যেই পায়ের
চামড়ার সঙ্গে শৃঙ্খলের ইস্পাতের
ঘর্ষণ হওয়ার ফলে পায়ের কোঁকা
পড়তে বাধ্য, আর তারপর আরম্ভ হয়
নরকযন্ত্রণা। কোন কোন শৃঙ্খলের
দু'পায়ের মধ্যবর্তী ইস্পাতের জোড়টি
বেশ বড়, ফলে পা ফাঁক করে
হাটলে একটু পরেই পায়ের ভীষণ ব্যথা
আরম্ভ হয়ে যায়। কাজেই সাধারণ-
ভাবে হাটলে এই জোড়ের কিছু অংশ
মাটি স্পর্শ করে এবং ফলে দু'পায়ের
মাঝে ধূলিকণার রাশি ক্রমশই বড় হতে
থাকে, ভুক্তভোগীর অগ্রগমন গতি আরও
শ্লথ ও কষ্টদায়ক করে তোলবার জন্য।
অনেক ভেবে আমরা শেষে একগাছা
দাঁড়ি যোগাড় করে তার এককোণ এই
জোড়ের মাঝে বেঁধে অন্য কোণ কোম-
রের বেণ্টের সঙ্গে টান করে বেঁধে দি
এবং এইভাবে জোড়টিকে মাটি থেকে
তুলে রাখতে সক্ষম হই। এইজন্যই
বোধ হয় গৃহীতজন বলেছেন যে,
প্রয়োজনই মানুষকে আবিষ্কার করতে
শেখায়।

এ ছাড়া আরও একটা অসুবিধা
ছিল আমাদের। পরনের প্যাণ্ট ছিল
আমাদের মাত্র একজোড়া করে এবং
তাকে মাঝে মাঝে শরীর থেকে পুরো
খুলে ফেলতে হ'ত কাচবার জন্য।

শৃঙ্খলপরা অবস্থায় কিভাবে এ কাজ
করা যেতে পারে তা ভেবে বার করতে
আমাদের অনেক সময় লেগেছিল।
জ্যোমো কেনিয়াটা পরে আমরা একবার
বলেছিলেন যে, লোকটা উগা-এ শৃঙ্খলা-
বন্ধ অবস্থায় থাকাকালীন তাঁরাও
প্রথমে পরনের প্যাণ্ট শরীর থেকে
পুরো খুলে ফেলার কোন সোজা উপায়
খুঁজে পান নি। যাক, এ বিষয়ে
আমাদের তিন্ত অভিজ্ঞতার পর আমি
চাই না যে, ভবিষ্যতে আর কেউ এই
অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়ুন, তাই
তাঁদের বলে রাখি এখনই যে, এ অবস্থায়
প্যাণ্ট খোলার এক বিশেষ কায়দা
আছে। এই পদ্ধতির মূল কায়দা হল
এক-পা এক-পা করে প্যাণ্ট খোলা।
প্রথম ধাপে কোমর থেকে নামিয়ে দিয়ে
যে-কোন একটা পায়ের বোঁড়র ভেতর
দিয়ে যথাসম্ভব প্যাণ্টকে নিচের দিকে
টানতে হয়, তারপর সে পায়ের বোঁড়কে
ওপরের দিকে যথাসম্ভব টানলে পর
সে পা থেকে প্যাণ্টকে মুক্ত করা যেতে
পারে। দ্বিতীয় ধাপে প্যাণ্টের সমস্ত
কাপড়কে প্যাণ্টমুক্ত পায়ের বোঁড়র
ভেতর দিয়ে গুলিয়ে ফেরা জানতে
হয় এবং দ্বিতীয় পায়ের সঙ্গে কিছু-
ক্ষণ ধরে আগের মতো কসরৎ করার
পর প্যাণ্টকে কাচার জন্য শরীর থেকে
সম্পূর্ণ মুক্ত করা যেতে পারে। তারপর
আবার প্যাণ্ট পরা তো খুবই সোজা,
শুধুমাত্র উপরোক্ত কর্মপন্থার বিপরীত
গতিতে চললেই সফলতা অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের নিয়ে রেলগাড়ি মানিয়ানি
থেকে নাইরোবি পৌঁছালে পর সেখান
থেকে আরও তিনজন বন্দীকে আমরা
সহযাত্রীরূপে পাই, এর ভেতর ছিলেন
মাউ-মাউ চরমপন্থীদের অন্যতম
নেতা জেনারেল কাহিংসা। তারপর
নাকুরু স্টেশনে পৌঁছে গাড়ি তিন
ঘণ্টাকাল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। ঐ
গাড়িতে মাউ-মাউ বন্দীরা আছে জানতে
পেরে শহর থেকে অনেক লোক
আমাদের দেখতে আসে, তার ভেতর
অনেকেই আমার পরিচিত। এরা বন্দী-
দের দেবার জন্য খাবার, তামাক
ইত্যাদি এনেছিল, কিন্তু প্রহরীরা
প্রথমে আমাদের এ সব জিনিস গ্রহণ
করতে দিতে রাজী হয় নি। গাথোগো
মুইটুম্বি নামক একজন বন্দীকে
প্রহরীরা এক কামরা থেকে অন্য
কামরায় ডেকে পাঠায় এবং তাকে পায়ের
শৃঙ্খলাবন্ধ অবস্থায় লাফিয়ে লাফিয়ে
যেতে দেখে সমবেত জনতা মডলী
ক্রুদ্ধ ও শোকাহত হয়ে পড়ে, অনেকে
তো দৃষ্টি কান্নায় ভেঙেই পড়ে।
আমরা তাদের এভাবে শোকে মূহ্যমান
হতে বারণ করি ও বোঝাই যে, আমাদের

আর এখন শৃঙ্খলাবন্ধ অবস্থায় থাকতে
কোন অসুবিধা হয় না, বরং একে
আমরা একরকম ছেলেখেলা বলেই ধরে
নিয়েছি। আসলে অবশ্য শৃঙ্খল পরে
থাকা খুবই কষ্টকর, কিন্তু আমরা
জনতাকে সে কথা বলতে চাই নি, কারণ
বিশেষ করে যাতে সমবেত কিছুমুদ্র
নারীরা এ কথা না ভাবে যে, আমরা
দৃষ্টি-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে ভেঙে
পড়ছি। তা ছাড়া কতৃপক্ষ যে আমাদের
এভাবে হয়রান করতে সক্ষম হয়েছেন,
তাও আমরা তাঁদের জানতে দিতে
চাই নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁরা
ভাবুন যে, আমরা বিশেষ কোন
অসুবিধাই ভোগ করছি না শৃঙ্খলাবন্ধ
হবার ফলে, তাহলে তাঁরা শেষ অবধি
এর ব্যবহার নাকচ করবেন। সমবেত
নারীদের ভেতর কাবুরা নামে একজন
কুকুয়ু সাহস করে আমাদের ভারপ্রাপ্ত
ইউরোপীয়ান কর্মচারীকে অনুরোধ
করে তাদের আনা খাবারদাবার আমাদের
হাতে দেবার জন্যে এবং তিনি
এ বিষয়ে প্রহরীদের নিষেধাজ্ঞা নাকচ
করে দেন। মাইয়ুদিস দ্বীপে পৌঁছে
আমরা কাবুরার সাহসের প্রশংসা করে
এবং অন্যান্য নারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে
এক গান রচনা করি।

আমরা ১১ই জুন ভিক্টোরিয়া হ্রদের
তীরবর্তী শহর কিসুমুতে পৌঁছাই
এবং রেলগাড়ি থেকে নেমে সোজা
সেখানকার ওডিয়াগা জেলে চলে যাই।
তার পরদিন আমাদের দুই দলে ভাগ
করা হয়, প্রথম দলের ১০০ জনকে
ওডিয়াগাতেই রাখবার এবং দ্বিতীয়
দলের ১০৮ জনকে মাইয়ুদিস দ্বীপে
নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমি দ্বিতীয়
দলে পড়ি, কিন্তু আমার সুহৃদ বন্ধু
রবিনসন মোয়ান্গি ওডিয়াগায় থাকতে
বাধ্য হয়। যদিচ তার সঙ্গে এভাবে
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় আমি বেদনা পাই,
তবু সরকারের এই ব্যবস্থার ফলে
দুই দলেই একজন করে শিক্ষিত লোক
থাকবে ভেবে আমরা সান্ত্বনা দিই
নিজেদের। ১২ তারিখের সকালে
আমরা সরকারী লরীতে চাপি, এক-
একটি লরীতে ৩৫ জন করে এবং
তারপর প্রহরীরা আমাদের লরীর
ওপরে জাল দিয়ে মাছ ঢাকার মতো ঢেকে
দেয়। এই নতুন পন্থায় অপমানিত ও
মানসিক বিপর্যস্ত করার চেষ্টায় খুবই
খারাপ লেগেছিল আমাদের, কিন্তু
আগেকার মতোই কতৃপক্ষকে আমরা
সে কথা বুঝতে দিতে চাই নি, কাজেই
জাল নিয়ে আমরা হাসাহাসি আরম্ভ
করে দিই যেন এটা একটা খুবই মজার
ব্যাপার। ওডিয়াগার জেলবন্দীরা এই
জাল তৈরি করেছিল এবং এর ছিদ্রগুলি

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

আকারে প্রায় ফুটবল খেলার গোল-পোস্টে যে রকম জাল ব্যবহার করা হয়, সেইরকমই ছিল। এভাবে আমাদের দৃঢ়তাকে বিনষ্ট করার প্রত্যেকটি সরকারী প্রচেষ্টাকে আমরা অবহেলাভরে বাতিল না করলে সরকারের পক্ষে খুবই সহজ হত মাউ-মাউ আন্দোলনকে বর্বার, সেকেন্দ্রে এবং বহু পুরাতনপন্থী এক প্রচেষ্টা বলে উড়িয়ে দেওয়ার এবং ফলে আমাদের নেতা জোমো কেনি-য়াটাকেও সহজেই একজন অদরদর্শী, অপরিণতবুদ্ধি লোক বলে জাহির করতে পারতেন তাঁরা। জালের ভেতর বসে বাইরের সব কিছুই বড় অদ্ভুত ও ঘোলাটে লেগেছিল আমাদের। এইভাবে বন্ডা এবং মাকুয়া গ্রাম পার হবার পর অবশেষে আমরা ভিক্টোরিয়া হ্রদের তীরে এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছাই যেখান থেকে মাইয়ুসি নদীপ খুবই কাছে। ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ যে, এই সময় আমাদের পায়ের শৃঙ্খল খুলে নিয়ে শৃঙ্খল হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়, ফলে আবার সোজা হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলার পথে পড়ি আমরা। যে নৌকায় চেপে আমরা মাইয়ুসি নদীপে যাই তার এক-একটিতে পঞ্চাশজন করে লোক ধরে। আমি জীবনে এই প্রথমবার নৌকাযাত্রা করে তার দোলানি অনুভব করি এবং আমাদের ভেতর অনেকেই দোলানির ফলে বমি করতে আরম্ভ করে।

মাইয়ুসিতে কর্মাধ্যক্ষ ও অন্যান্য কর্মচারীদের বাসস্থানগুলি ১৯৫৪ সালে এখানে আনিত মাউ-মাউ আসামীর তৈরি করেছিল। ১৯৫৫ সালের শেষের দিকে এদের কারাবাসের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছিল ধীরে ধীরে এবং সরকার তার জায়গায় মাউ-মাউ বন্দীদের আনছিল। ঘরবাড়ি তৈরির কাজ শেষ করার জন্য। আমাদের মাইয়ুসিতে পৌঁছাবার আগে মানিয়ানি থেকে প্রায় আটশত বন্দী এখানে এসে গিয়েছিল এবং আমাকে দেখে তারা যেভাবে চীৎকার করে উজ্জাস প্রকাশ করে, তাতে আমি একাধারে অত্যন্ত প্রীত এবং বিচলিত হই। আমাকে কাঁধে করে ফাটক থেকে তাঁবু অবধি নিয়ে গিয়ে তারা আরও অবাক করে দেয় এবং সেখানে খাঁটি মাখন ও পাউরুটি সহযোগে চা-পান করিয়ে আমার সম্বর্ধনা করে। প্রায় চার বছর পরে আবার আমার অন্যতম প্রিয় খাদ্য মাখন ও পাউরুটি খেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম আমি সেদিন। এখানকার বন্দীদের অনেকেই আমার সঙ্গে মানিয়ানির ১৩ নম্বর তাঁবুতে কিছুকাল কাটিয়েছিল। তাদের সঙ্গে

অনেকক্ষণ বসে গালগল্প করার পর অবশেষে আমি যখন আমার জন্য নির্ধারিত তাঁবুতে শ্রুতে যাই, ততক্ষণে আমার মনে আবার নতুন আশা ও উৎসাহের জোয়ার এসে গিয়েছে।

পরদিন সকালে এখানকার অন্যান্য বন্দীদের মতো আমাদের ওপরও হুকুম এল জন খাটেতে যাবার জন্য, কিন্তু এ আদেশ বিধি-বিরুদ্ধ জেনে আমরা তা পালন করতে অস্বীকার করি। বন্দীদের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য চারজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়, তাতে ছিলাম আমি, হ্যারি কামাণ্ডা নজোরোগে, গাথোগো মাইটুমি ও ওয়াম্বুগু কামুইর। আমরা কর্মাধ্যক্ষকে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানাই যে, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামী না হওয়ার ফলে জন খাটেতে কেউ আমাদের বাধ্য করতে পারে না এবং এইভাবে জন খাটেতে অস্বীকার করার স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক অস্থায়ী চুক্তির ১৮ ই খ নম্বর ধারার সমর্থনও আছে। তাঁকে আরও বলি যে, এ নিয়ে আমরা কোনরকম মারামারি বা অযুক্তিকর কাজ করতে চাই না, কিন্তু জন আমরা খাটব না। আমাদের প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষ মেনে নেন এবং বলেন যে, শৃঙ্খল খাওয়াগোয়া বা চান করার জন্য ছাড়া আমরা যেন তাঁবুর বাইরে না যাই। আমাদের তাঁবুগুলি খুবই বড় আকারের ছিল এবং এক-একটিতে ১০০ জন করে শ্রুতে পারতো; আমরা এগুলি ব্যারাক বা সৈন্যশিবির বলতাম। কোন কাজ না থাকায় আমরা সারাদিন রাজনৈতিক আলোচনা ও লেখাপড়া শেখার বা শেখানোর কাজে ব্যস্ত থাকতাম। এখানে আবার আমাদের কাগজ-কলম, বইপত্র কিনতে দেওয়া হবে জেনে আমি খুবই আশ্বস্ত হয়েছিলাম। আমরা কিছু কিছু ইংরাজী মাসিক পত্রিকা এবং একটি ইংরাজী অভিধান আনাই। পড়ানোর বিষয় বেশিরভাগ কাজের ভার ছিল জন গাকুয়ার ওপর, সে এখন নেয়েরী শহরে স্কুল মাস্টারের কাজ করছে। জন খুব ভাল পড়াতে পারতো এবং বন্দীদের সকলকেই সে খুব সাহায্য করেছিল তাদের 'নিরক্ষর' নাম ঘোচাতে। দলের নেতা হিসেবে অন্যান্য কাজ করার পর আমার আর পড়বার বিশেষ সময় থাকতো না। আমি বেশিরভাগ নিরক্ষর বন্দীদের হয়ে তাদের বাড়িতে চিঠিপত্র লিখে দিতাম, প্রয়োজনমতো প্রতিবাদ পত্রাতি লিখতাম, কর্মাধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতাম এবং শিবিরের পরিচালনার কাজ করতাম।

এ ছাড়া আমার আরও কাজ ছিল

'কামোংগো টাইমস্' নামক দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা করা, যা আমরা মাইয়ুসিতে আসবার পর চালু করেছিলাম। লুও উপজাতীয় ভাষায় কামোংগো শব্দের অর্থ হল একরকম বড় মাছ, যা ভিক্টোরিয়া হ্রদে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় প্রায় পাঁচ ফুট এবং চওড়ায় আঠারো ইঞ্চি অবধি হয়, তা ছাড়া খেতেও খুবই সুস্বাদু। মাইয়ুসি নদীপে অবস্থিত বন্দীরা প্রায়ই হ্রদের ধারে জলা জায়গায় এই মাছ ধরতো এবং এর খোল ও ভারি ভাল হয় খেতে। এই মাছদের খাদ্য অন্বেষণের ধারাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এরা জলো জায়গায় মাটির তলায় গর্ত করতে করতে দশ-বারো ফিট এগিয়ে আসে ডাঙার দিকে ও তারপর মাটি ভেদ করে ঘাঘের ওপর ওঠে, ফলে সেখানে একটি ছোট জলার সৃষ্টি হয়। তারপর গর্তের ভেতর লুকিয়ে থেকে তারা অপেক্ষা করে ছোট ছোট পোকা-মাকড় বা জীব-জন্তুর ঐ জলায় জল খেতে আসবার জন্য এবং তখন তারা শিকার হয় মাছের পেটে গিয়ে। বন্দীদের ভেতর কেউ ঐ রকম একটি জলা দেখতে পেলে আরও কয়েকজনকে ডেকে আনতো মাছ ধরবার জন্য এবং জলার মধ্যে শৃঙ্খল তার ল্যাজের অবস্থান থেকে মাথা কোথায় আছে তার আন্দাজ করে সবাই একসঙ্গে পাগা (দা জাতীয় অস্ত্র) চালাত—যদিচ মাথা এবং মাছের বাকি অংশ মাটির তলায় বন্দীদের দৃষ্টির অগোচরেই থাকতো। এভাবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা শিকার ধরতে সক্ষম হতাম, যদিচ কখনো কখনো শৃঙ্খল ল্যাজের টুকরাই পেতাম আমরা, আর ল্যাজহীন বাকি মাছ তখনকার মতো পালিয়ে বাঁচতো জলের ভেতর। কামোংগো মাছ ওজনেও খুব ভারি হয়, দু'জন লোকের কমে তাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

আমরা কিছুই উপজাতীয় লোক

কিডিজের স্ট্যান্ডার্ড-৭০

STANDARD-70

PRICE 165/-



GUARANTEED

ওমান্ড অল ওয়াল্ড পোস্টাল
ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিনতে।
প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারেন।

AMBA AGENCIES (69) MODEL TOWN, DELHI-9

কাজেই মাইয়ুসির মতো ছোট স্বীপে চারদিকে সবুজ শ্যামলিমা এবং হিংস্র কুম্বীরে ভর্তি অশ্রু হ্রদের জলের মাঝে থাকতো, রুড়ি অনুভূত লাগতো। এখান থেকে পালিয়ে খাবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না এবং কয়েকদিন থাকার পরেই আমাদের মনে ভাবনা উদয় হতে আরম্ভ করেছিল : এই জায়গা ছেড়ে কি কোনদিন আর আমাদের নীল পাহাড়, লাল মাটি এবং সবুজ প্রান্তরের মাঝে ফিরে যেতে পারবো? আমাদের কর্মধ্যক্ষ ছিলেন কেডাল বলে একজন কানাড়ার অধিবাসী, আমরা তাঁর নাম দিয়েছিলাম 'কারিমানজাগা'—উল্লেখ ফকির, কারণ, মাইয়ুসিতে থাকাকালীন তিনি শূদ্ধ ছোট্ট একটা হাফপ্যান্ট পরেই সময় কাটাতে, গায়ে অন্য কোন জামা বা গেঞ্জি না পরেই। তিনি আমাদের ওপর কোনরকম মারধোর করতেন না, কিন্তু জন খাটতে আপত্তি করার ফলে আমাদের ওপর তিনি একেবারেই সদয় ছিলেন না। আমরা মাইয়ুসিতে পেঁছবার আগে যে সব বন্দী সেখানে ছিল, তারা সবাই স্বীপের রূপক ক্ষেত-খামারে কাজ করতো। এখানে পেঁপে, কাসাভা (রোগা আলুর মতো শর্করাজাতীয় এক খাবার), ভুট্টা ও নানারকম তরিতরকারী প্রচুর পরি-

মাণে জন্মায়। আমরা স্বীপে যাবার পরেই যাতে এই সমস্ত বন্দীদেরও উস্কে দিতে না পারি, এই ভয়ে কতৃপক্ষ তাদের প্রায় সবাইকেই বদলি করে অন্য জায়গায় পাঠিয়ে দেন, শূদ্ধ জনা তিরিশেক চরম-পন্থী ছাড়া। এর ভেতর ছিল আমার পুরনো বন্ধু জেমস থুর্কু মান্গোথি, সে বহুকাল আগে ট্রাইয়নের ফার্মে এসে তার সঙ্গে পরিষ্কার ইংরেজীতে কথাবার্তা বলে আমার বালকমনেও ইংরেজী ভাষা শেখার স্পৃহা জাগিয়েছিল।

আমরা জন খাটতে আপত্তি জানিয়েছিলাম বলে কর্মধ্যক্ষ আমাদের র‍্যাশনের পরিমাণ কমিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। এই আদেশ বলবৎ হলে পর আমরা নিরস্ত্র সত্যাগ্রহ রত অবলম্বন করি এবং বন্দীরা সবাই আমাকে কর্মধ্যক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করতে অনুরোধ করে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন নিয়মের বলে তিনি আমাদের র‍্যাশন কমিয়েছেন এবং সে নিয়মের উল্লেখও করতে বলি তাঁকে। তিনি কোন লিখিত নিয়ম দেখাতে পারেন নি, বরং আমি যখন তাঁকে বন্দীদের নিম্নতম খাবার পরিমাণ কতটা হবে, এর নিয়ম-কানুনগুণি মতামত বলে শোনাই, তখন

তিনি খুবই অবাধ হয়ে গিয়েছিলেন। মানিয়ান শিবিরে দ্বিতীয় দফায় থাকা-কালীন আমি কুড়ি শিলিং খরচ করে এক আকাম্বা প্রহরীর সাহায্যে কেনিয়া সরকারের বন্দিশিবিরের নিয়মাবলীর একটি কপি যোগাড় করেছিলাম। আট পৃষ্ঠার এই চটি বই-এর জন্য কুড়ি শিলিং পয়সা খরচ করতে আমার খুবই গায়ে লেগেছিল, কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনবোধে আমি তা কিনেছিলাম ও অতি সাবধানে আমার কোটের আস্তরের ভেতর লুক্কায়িত টাকা-পয়সার সঙ্গে লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমি কর্মধ্যক্ষ কেডালকে বলি যে, আমরা এ বিষয়ে কোন গোল-মাল করতে চাই না, কিন্তু আমাদের র‍্যাশন যেন অবিলম্বে আগের মতো দেওয়া হয়। মাইয়ুসি শিবিরে মশার সংখ্যা ছিল অগুণ্টিত, কাজেই আমি তাঁকে আরও বলি যে, আমাদের ডাক্তারি চিকিৎসা ও ওষুধপত্রের বন্দোবস্ত আরও ভাল হওয়া প্রয়োজন। আমার দুর্দৃষ্টি নিবন্ধই গ্রাস্য হয়।

তথাপি, বন্দিশিবিরের মহাধ্যক্ষ আমাকে ষোলদিন যাবৎ নিঃসঙ্গ কারাগারে বন্দী করে রাখবার ও শূদ্ধমাত্র শাস্তিমূলক (খুব কম পরিমাণে) খাবার দেবার জন্য কর্মধ্যক্ষের অনুরোধকে মেনে নিয়েছিলেন। আমি বন্দীদের নেতা হিসেবে তাদের জন খাটতে বারণ করেছিলাম এবং তাদের নিয়ে জোট পাকিয়ে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহের আয়োজন করেছিলাম, তাই আমার জন্য এই শাস্তি নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু নিঃসঙ্গ কারাগারে ষোলদিন আমার মোটের ওপর ভালই কেটেছিল, কারণ, এখানকার লম্বা উপ-জাতীয় প্রহরীরা ছিল আমার প্রতি সহানুভূতিশীল, কাজেই তারা সানন্দেই আমাকে রাজ্যঘরে যে সব বন্দী কাজ করছিল তাদের পাঠান বাড়তি খাবার পেঁছে দিত। ফলে আমার ওজন কঠিনে একটু বেড়েই গিয়েছিল! আমার সব থেকে বেশি অসুবিধা হুয়েছিল এই কারণে যে, ঐ কঠিন আমি নিজের মনে ভাবনায় মগ্ন থাকা ছাড়া আর অন্য কিছুই করতে পারি নি। এভাবে আমার একা থাকার সময়ই কিছুমাত্র গুডিয়াগা বন্দিশালা থেকে বাদবাকি ১০০ জন বন্দীও মাইয়ুসিতে এসে পেঁছায়। এর ভেতর আমার বন্ধু রবিবসন মোয়ালগীও ছিল, তার কাছে আমি পরে জানতে পারি যে, যদিক সেখানকার অবস্থা খুব খারাপ ছিল না, তবুও তাদের খাবার-দাবার অন্তরীণ বন্দীদের বদলে শাস্তিপ্ৰাপ্ত বন্দীদের মতো ছিল। সে আরও বলে যে, তারা সবাই মাইয়ুসিতে আমাদের সঙ্গে মিশিত হবার জন্য উদ্যমী হয়েছিল।

এই বহুবিখ্যাত গ্রন্থের বহুকাল পরে বহু প্রত্যাশিত

পুনর্মুদ্রণ

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র বন্দীর

ওমর খৈয়াম

গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, "যাঁহারা 'ওমর' বলিতে শূদ্ধ বুলবুল ও গোলাপ, মরিচা ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দৌধবেন যে, লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট স্বাগত।"

"জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আলীর গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দীর 'ওমর খৈয়াম' এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পারের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গ ভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।"

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বঙ্গমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১২

শ্রমিক সংগঠন- কেন ও কিভাবে? // সত্যানন্দ ভট্টাচার্য //

দুর্নিয়ন্ত্রিত শ্রেণী-সংগ্রাম উদ্বেল হয়ে উঠছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির দাবানল জ্বলছে। পূর্বাঞ্চল উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই চলছে নিরন্তর কায়দায়। এ সবই শ্রেণী-সংগ্রামের অভিব্যক্তি। নির্বাতীতরা সারা দুনিয়ায় নিপীড়নকে রুখেতে আজ কদম ফেলছেন। বিশ্বব্যাপী মতাদর্শগত, রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক—সব রকমের শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র রূপ নিচ্ছে। শোষণ আর শোষিতের মধ্যে, নিপীড়িত আর নির্বাতন-কারীর মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রচণ্ডভাবে প্রকট হয়ে উঠছে।

বিভিন্ন শ্রেণী হল জনসাধারণের কতক-গুলো বড় বড় জোট। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় তারা কে কোন স্থান অধিকার করে রয়েছে তারই দ্বারা: উৎপাদনের উপায়-উপকরণের (কলকারখানা, যন্ত্র, খনি, পিট, জমি) সপক্ষে কার কি সম্পর্ক, তার দ্বারা এই জোটগুলোর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। উৎপাদনের এই উপায়-উপকরণগুলো যাদের কন্ডায় থাকে, তারা অপরের শ্রমকে শোষণ করে। যাদের কোনও সম্পদ নেই বা প্রায় নেই বললেই চলে, তাদের স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তিকে শুষে নিয়ে সেই মনোফায় এরা জীবন নির্বাহ করে ফলে-ফেঁপে ওঠে। গায়ের রং, জাতি-ধর্মের দ্বারা নয়—শ্রেণী-বিশিষ্ট সমাজে কিছু লোককে বিশেষ বিশেষ সুবিধা ভোগ করার ব্যবস্থা রাখা হয় অন্যদের দারিদ্র্য অধিকার-বিশিষ্ট শ্রেণী-পর্যায় শর্তে মনোফা কামানোর উৎস হিসেবে বজায় রাখার ষড়যন্ত্রের গহবরে।

পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ভিত্তি সৃজন কবাব সাথে একই সময়ে এক শক্তিশালী বৈপ্লবিক শক্তিকে—শ্রমিক শ্রেণীকে

জন্ম দিয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাথে সমগ্র মানবজাতির মুক্তির ব্যবস্থা করে—তার নেতৃত্বে মানুষ এমন দিগদর্শন পায়, যেখানে সামাজিক ও জাতীয় নির্বাতন থাকে না।

শ্রমিক শ্রেণী হল একমাত্র শ্রেণী, যাদের উৎপাদনের সম্পর্কগুলোর ওপরে মালিকানা অধিকার নেই এবং সে কারণে সাধারণ মালিকানাধীনে আনতে আগ্রহী। এরা সব সময় সবচেয়ে বেশি ধনবাদী শোষণ সম্পর্কে সচেতন। তার ফলে এই শ্রেণী ধনবাদী ব্যবস্থার অবিকলিত ও অপ্রতিরোধ্য শত্রু। এর মূলগত শ্রেণী স্বার্থই একে ধনবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রেরণা যোগায়।

বড় বড় শ্রমশিল্প প্রকল্পে স্রমেব অবস্থায় শ্রমিকদের সংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে।

শ্রমিক শ্রেণীর সুসংগঠিত অবস্থা, তার সূতীক্ষ্ম শ্রেণী-চেতনা, তাকে কার্যকরী বৈপ্লবিক শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে। সারা দুনিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর কাছে পুঁজিবাদই একমাত্র ও অভিন্ন শত্রু। তাদের উদ্দেশ্যও এক এবং অভিন্ন—পুঁজিবাদী শোষণ থেকে নিজদের মুক্ত করা, আর তার লক্ষ্যও অভিন্ন—তা হচ্ছে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিজম গড়ে তোলা। শ্রমিক শ্রেণী তাই আন্তর্জাতিক ভিত্তিতেই সংগঠিত এবং তার ব্যাপকতা বিশ্বব্যাপী।

শক্তি সংগ্রামে তাই অপব্যবহারহীনতাই জোটের চেয়ে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতাকে দায়িত্ব ও গুরুত্ব বেশি। মাত্র একটি শ্রেণী—সাধারণভাবে শ্রমশিল্প প্রকল্পের শ্রমিকরা ধনবাদী জোয়াল ভেঙে ফেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টিতে লড়াইয়ে সমস্ত মেহনতী জনতাকে নেতৃত্ব

দিতে সমর্থ। অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ওপরে আর তার স্নায়ুগুলোর ওপরে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক দিক থেকে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—দু'ভাবেই মেহনতী জনতার বিপুল সংখ্যাধিক্যের যথার্থ স্বার্থগুলির অভিব্যক্তি দিয়ে থাকে। সমকালীন বৈপ্লবিক মুক্তি আন্দোলনের জাতীয় মুক্তি ও গণতান্ত্রিক পর্যায়ে শ্রমিক শ্রেণীর সর্বাধিনায়ক শর্তহীনভাবে অপরিহার্য।

শ্রেণী-শত্রু উচ্ছেদের জন্য শ্রমিকের আক্রমণাত্মক সংগঠন হল তার পাঁচি। আর ট্রেড ইউনিয়ন হল শ্রেণী-শত্রুর আক্রমণ থেকে শ্রমিকের আত্মরক্ষার সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়ন অর্থনৈতিক দিক থেকে সৃষ্টিশীল শ্রেণীসমূহের দাবিদাওয়ায় সর্বাপেক্ষা অধিক স্বীকৃতি দেয়। একই কারণে সৃষ্টিশীলতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকের ওপর সমধিক গুরুত্ব দিতে হয়। আন্দোলনের ক্ষেত্র শূন্য অর্থনীতিতে সীমাবদ্ধ রাখা চলতে পারে না—রাষ্ট্র, গোষ্ঠী, পরিবার, ব্যক্তি তথা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সামাজিক প্রথা সর্বক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করতে হয়। অন্যথায় অর্থনীতিবাদী প্রবণতা প্রাধান্য লাভ করে চরম লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ততাবাদের গান্ডার ফেলে দেবে। শ্রমিক শ্রেণীকে তার সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ করে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গিক সংগ্রামের দিকে বশীভূত করার চেষ্টা করতে হবে।

সাম্রাজ্যবাদী শোষণের মূগয়া ক্ষেত্র এই ভারত। এখানকার ৫০ কোটি মানুষ সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস, সামন্তদের শোষণের ফলে দারিদ্র্যে জর্জরিত। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের পালের গোদা মার্কিন নয়া উপনিবেশবাদের সঙ্গে মহান সোভিয়েট দেশের দলত্যাগী রাষ্ট্রকর্তৃষ্ণ শূন্যমাত্র সহ-অস্তিত্বের শান্তিপূর্ণ বাহনই নয়—পরলুপ্ত ভাগ্যদার।

ভারতের ব্যাপক জনতার বৃদ্ধি তাই সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আরও তিন পাখা চপে তার দৈনন্দিন জীবনকে ওষ্ঠাগত করে ছাড়ছে। সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভঙ্গি পুঁজির উৎখাত ছাড়া ভারতের জনতার মুক্তির কোনও সটকাট নেই। স্বাভাবিকভাবে আধা উপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তর হল নয়া গণতান্ত্রিক—যার মূল লক্ষ্য কৃষি-বিপ্লব। কৃষক শ্রেণীই এর প্রধান শক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক ও মিত্র শ্রেণীর যুদ্ধই এর পথ এবং সমস্ত শোষণজর্জর গ্রাম এলাকাই এই লড়াই-এর প্রধান ঘাঁটি। এ যুদ্ধ

বিপ্লবী জনযুদ্ধ। বিপ্লবী জনযুদ্ধ জন-গণের যুদ্ধ, ব্যাপক জনগণকে জাগ্রত ও সমবেত করে এই যুদ্ধে চরম জয়ের জন্য শ্রমিক শ্রেণীকে তার যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বিপ্লবী পরিস্থিতি যখন চমৎকার, সে সময় শ্রমিক শ্রেণীকে নির্বাচনবিলাসী বা আমলানিষ্ঠের করে রাখা আন্তর্জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা।

এখন আর শান্তিপূর্ণ বিকাশের যুগ নেই। আইনসভার অন্তর্গত সংগ্রাম শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের মধ্যরূপ পরিগ্রহ করা কোনওরূমে সম্ভব তো নয়ই—পরন্তু আইনসভার মোহ কাটিয়ে সংঘাত শুরুর সময়ে প্রবেশ করা গেছে। প্রকাশ্যে বিপ্লবী লড়াই-এর যুগে শ্রমিক সংগঠন যে বিরাট ও চড়াবল গুরুত্ব লাভ করে, পূর্বে তার সে গুরুত্ব থাকে না। ভারতের শ্রমিক সংগঠনগুলো শান্তির পথে নিয়মতান্ত্রিকতার পথিক—সংগ্রামের হাতিয়ার নয়। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্য সাধনে শ্রমিকদের পরিচালনা করার উপযুক্ত জংগী সংস্থা নয়, শ্রমদপ্তর, সরকার ও মালিক শ্রেণীর কাছে ‘কনসেনস’ আদায়ের জন্য দর কষাকষির বস্তুমাত্র। উন্নত পর্যায়ে আইনসভার নির্বাচন ও সংসদীয় কায়দার কচকচানীতে পারদর্শিতা প্রদর্শনের শিক্ষায়তন হয়েছে। শ্রমিক সংগঠন পার্লামেন্টারী উপদলের লেজুড়ে পরিণত হলে এ অবস্থাই ঘটে। এহেন শ্রমিক সংস্থার নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণীকে বিপ্লবের পরিচালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার কোন স্বপ্ন দেখাও সম্ভব নয়।

মন্ত্রিসভার রঙের হেরফেরে শাসন-কাঠামোর চরিত্র বদলায় ও শাসনযন্ত্রের

ভূমিকার পরিবর্তন ঘটে বলে শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠনের মত্ব দিয়ে কিছু বদলি শাসকশ্রেণী ফুটিয়ে তুলছেন। অবশ্য এসব বদলির সঙ্গে বিপ্লবী অকেশ্যের সূর-ব্যঞ্জনা রেখে তাকে সংগ্রামী কোটিং ধরানো হচ্ছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিয়েছে যে, পুরনো শোষণকারী সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্যেই এই শাসনযন্ত্র। তারা কায়দা বদলিয়ে শোষণ ব্যবস্থার মেয়াদ আরও বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করে মাত্র।

অর্থনীতিবাদসর্বস্ব নেতৃত্ব দীর্ঘকাল সংগঠনকে কঙ্জায় রাখলেও অনুমত অর্থনীতির এই লীলাক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনসাধারণের দায়িত্বের প্রচণ্ডতায় বহু রক্তক্ষয়ী লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী একটা একা গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু আজ রঙ-বেরঙের শোষণবাদীরা এক অংশকে অপরের নানান ফন্দিতে প্রভাবিত অংশের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সেই একাকৈ চূর্ণ করছে এবং জঘন্য প্রয়াসকে পবিত্র রাজনৈতিক কর্তব্য বলে জাহির করে শ্রমিক শ্রেণীকে বিভ্রান্ত করার নিরলস প্রোগ্রাম রাখছে।

প্রতিক্রিয়াশীলরা সাম্রাজ্যবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের নির্দেশে জোর প্রস্তুতি চালাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদীরা ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে তাদের কঙ্জায় নিয়ে গেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কঙ্জা করেছে যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎশক্তির ক্ষেত্রগুলো। রাসায়নিক শিল্প ও সার তৈরির ক্ষেত্রেও তারা নাক গলিয়েছে। বিশ্বব্যাপ্তকের ঋণ ও সাহায্যের

মাধ্যমে তারা অনেক শিল্পকে তাহে এনেছে। ভারতীয় সাইনবোর্ড এন্টে মার্কিন নিয়ন্ত্রণ কয়েম করেছে। সোভিয়েট সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করেছে লোহা ও ইস্পাতশিল্পের সিকি ভাগ, তৈল শোধনের অর্ধেক এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশ। এ ছাড়া রপ্তানী বাণিজ্যের বহুলাংশে ওদের ‘খবরদারী’ এসে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের ওপর স্বত্বভোগ করে শত্রু যে জনগণকেই শ্রুণু ফেলছে, তাই নয়, এটা আগ্রাসী যুদ্ধের প্রস্তুতিও বটে। অর্থনীতি এবং প্রশাসনের ওপর তাদের থাকাকে দৃঢ়তর করার জন্যে শ্রমিক একাকৈ ধ্বংস করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে যে মনুষ্য-যুদ্ধ চলেছে; তাতে ভারতের শ্রমিকরা যাতে সামিল হবার, একাত্ম হবার সুযোগ না পায়, তার জন্যে বিপ্লবী বদলির আড়ালে শ্রমিকদের ছিদ্রাভিন্ন করার ঠিকাদারী কিছু তাঁবেদার সংগঠনকে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে জাতিদম্ভের প্রকাশ ঘটতে পারেলে শ্রমিকের আন্তর্জাতিকতাকে অঙ্কুরে নাশ করা যায়।

সামন্ততান্ত্রিক কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য নব চেতনার উন্মেষ যখনই লক্ষ্য করেছে, তখনই সাম্রাজ্যবাদের ভারতীয় সেবাদাসগোষ্ঠী চম্পল হয়ে উঠেছে এবং নতুন কায়দায় তাদের লড়াইকে পরিচালিত করতে চাইছে।

এ সর্বের জবাব শ্রমিকের সংহতি। সে সংহতি শ্রমিক নতুন কায়দায় লড়াই-এর পথ চালু করে গড়ে তুলতে পারে। যার ফলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে হবে গ্রাসের সম্ভার এবং শ্রমিকরা ক্রমান্বয়ে বেপরোয়া হয়ে উঠতে থাকবে। শ্রমিকরা কখনই ভুলতে পারে না যে, তাদের ক্ষমতা দখলের যুগ শুরুর হয়ে গেছে। প্রতিপক্ষের রক্ষক হচ্ছে রাষ্ট্রপন্থ। তার সঙ্গে নিরস্ত্র লড়াই-এর অর্থ মৃত্যু। শত্রুকে তার দুর্বল কেন্দ্রে আঘাত হেনেই তার পতন ঘটাতে হবে। মিত্র শ্রেণী আজ প্রস্তুত। তাদের নেতৃত্ব দেবার চরম মুহূর্তে শ্রমিক শ্রেণী তার সংহতিকৈ ধ্বংস করতে দিতে পারে না। বিজয়ের পথে এগুতে চরম ত্যাগের জন্য শ্রমিক আজ প্রস্তুত। সব চক্রান্ত তাই ব্যর্থ হবে—মোহজাল ছিল হবে। সংহতির বদলিতে এর জন্যে নতুন কোনও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র গড়ার দরকার নেই। পুরাতন কেন্দ্রের মাধ্যমেই শ্রমিকের সংহতি গড়ে উঠবে নতুন কায়দায় লড়াই-এর মধ্যে—ভবে তার মন্ত্র হবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা ও তার শ্রেণীবোধ এবং বিপ্লবী পরিস্থিতিতে তার কর্তব্য সম্পর্কে প্রেরণা।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নিষ্ঠারে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্মর্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন নীতারামের চরিত্র বর্ণনা

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট-লিমিটেড: ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



[পূর্বা-প্রকাশিতের পর:]

তাই ফরাসীরা যখন এদেশে হেড়ু যায়। তখন কম্বোডিয়ায় শূন্য শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎ-পাশ ছিল। তাই নয়, শিপেক্ষেত্রেও ছিল এক অনগ্রসর দেশ। উন্নয়নমূলক কাজ; রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যমূলক কাজ; কৃষি ও কারিগরী বিদ্যা; আমদানী-রপ্তানী ও নানা ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারে এক উদাসীন অধর্মিত নরনারীর বাস-স্থান। আশি বছর শেষে তবুও দেশে আটজন গ্রাজুয়েট ছিল; কিন্তু একটিও বড় কারখানা ছিল না। কম্বোডিয়াবাসীও ছিল তেমন। সারা দেশময় প্রচুর অনাবাদী জমি ছিল। কিন্তু নিজের প্রয়োজনীয় ধান উৎপাদনের বাইরে তারা বেশি জমিতে চাষ করত না। ফলে কৃষিযোগ্য জমির ওপর কোন চাপ ছিল না বলে জমি নিয়ে মানুষের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি হত না। জমিতে চাষও হত সেই সনাতন আদিম প্রথা। বলদ বা মোর দিয়ে হল-কর্ষণ। বাদব্যাকী কাজে মানুষের দুখানি অক্ষাত হাতই ছিল একমাত্র নিভরশীল; যন্ত্র। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার, প্রয়োজে দেশের; আবাদী-অনারাদী জমিতে চাষ হলে কম্বোডিয়া পৃথিবীর বহু অগ্রগত মানুষের মধ্যে হাসি ফুটতে পারবে, এবং অজিত রৈদেশিক মন্ডায় দেশের বহু সমস্যার সমাধান করতে পারবে, দেশের রূপ পাল্টে দিতে পারবে। কম্বোডিয়ায় আচ্ছ কৃষি-বিস্তার, শূন্য হলে; এটা একটা উন্নয়নযোগ্য ব্যাপার। কম্বোডিয়ায় মাছ ধরার পার্থক্যও আদিম। নদী, ও জলাশয়ে জাল ফেলে মাছ ধরা। ঠিক যেন বাংলা দেশের জেলের দের মাছ ধরা। বাংলা দেশের জেলেরা এক আলাদা সম্প্রদায়। তাদের পেশা ও জীবিকায় চমক মাছ ধরা ও মাছ বিক্রি। কিন্তু কম্বোডিয়ায় আলাদা সেরূপ কোন সম্প্রদায় নেই।

ওদেশে পেশা ও জীবিকাভেদে কোন বর্ণ সৃষ্টি হয় নি। ফলে স্বৈরম্যও নেই।

নেই তার; বিঘ্নিতরা, সবাই জাতিগতভাবে কম্বোডিয়াবাসী, ধর্ম রৌপ্য তাই মেরু; টর্নালিপে গ্রোটলেক; প্রভৃতির; তারে যারা বাস করে; তারা প্রায় সবাই মাছ ধরে; নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে। কারণ ও দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে মাছ-ভাত।

আরার কৃষিজীবী। বলেও কম্বোডিয়ায় পথের কোন সম্প্রদায় নেই। যার জমি আছে; সেই চাষ করে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি-জমি নেই এরূপ পরিবার বিরল। একই ধর্ম রিস্বাসী মানুষ বলেই হোক; কিংবা তেমন আনুষ্ঠান নেই বলেই হোক; কিংবা বর্ণ ও শ্রেণীর কুফলা না থাকার ফলেই হোক; সামারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ-বিস্তার ছিল না। প্রত্যেকের মনে একটা সম্প্রদায়ের শূন্যভাব বিরাজ করত। তাই দেশে কেউ হেন্স নয়, কেউ শ্রম নয়। সবাই সমান।

ইতিহাসের পাতা ওলটলে দেখা যায়, হাজার বছর আগে কম্বোডিয়ায় এক স্বাধীন নৃপতির অধীনে উন্নত জাতি, হিসাবে খ্যাত ছিল। শিক্ষায়-দীক্ষায়, শৌর্ষে, ভাস্কর্যে ও স্থপতিবিদ্যায় দেশ-বাসী বিশেষ পারদর্শী ছিল। সংস্কৃত-বিশেষজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতদের ও চীনা পরিব্রাজকদের নানা বিবরণ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।

বিশেষ করে আংকোর, ভাট মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ লিপি থেকে এবং তখনকার রাজধানী হারিহরালয়ের ধ্বংসস্থাপে, শিল্পাভিমান পাঠোন্মায় কবলে এ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। পরবর্তীকালে বাওতায় রেদাই-এর রৌপ্যনির্মিত বস্তুমূর্তি ও বৌদ্ধাচারিত বৌদ্ধ মন্দির-এর কিছু আভাস দেয়। আচ্ছ কম্বোডিয়ায় সেই স্বর্গাধিপতির দিনগীতি ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নিয়েছে।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে মধ্য শতাব্দী পর্যন্ত কম্বোডিয়ায় দক্ষিণে

হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। তাদের আধিপত্য উত্তর কম্বোডিয়া অধি বিস্তৃত ছিল। উত্তরের অধিবাসীরা ছিল খেমের জাতীয়। এই খেমেররা ছিল রাজার স্বজাতি। ইতিহাস-বিখ্যাত আংকোর, ভাট এবং পরবর্তী সময়ে আংকোর টম, জোয়া, সপর্মন্দির, মোরো প্রভৃতি উন্নত-যোগ্য মন্দির এই খেমেররাই তৈরি করেন। মন্দিরের চুড়ায়, বিষ্ণুমূর্তি ও ভেতরে বৌদ্ধমূর্তি, সপর্মূর্তি, কপিলরাজ বালী ও সূর্য্যারের যুদ্ধরত মূর্তি, গণেশমূর্তি প্রভৃতি তাঁদের সূক্ষ্ম ভাস্কর্য প্রতিভার পরিচয় দেয়।

চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণ, নানা ইতিবৃত্ত ও ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার গবেষকদের মতে, এখানে তখন ফুনান বংশ রাজত্ব করত। ফুনান রাজত্ব ব্রাহ্মণ ধর্মের প্রভাব ছিল। পরবর্তীকালে ফুনান সভ্যতা ও সামাজিক কাঠামো বৌদ্ধ প্রভাব পরিলাপিত হয়। তা হলেও দেশে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আচার-আচরণে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভাব পাশাপাশি অবস্থান করে মানুষের মনে এক অপূর্ণ সহনশীল ভাবের সৃষ্টি করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও দেশের মানুষ ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের শিরে লগুড়াঘাত করে নি। আজকের কম্বোডিয়ায় শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সদিচ্ছার মূল শেকড় মানুষের মনে সেই সময় থেকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ফুনান রাজত্ব দুর্বল হয়ে পড়ে, শাসনব্যবস্থায় নানা অযোগ্যতা প্রকাশ পায়। সে সময়ে চেনালা নামে এক সামন্ত নৃপতি দেশ আক্রমণ করে ফুনান রাজবংশের অবসানে সক্ষম হন।

দেশের উত্তর অংশে তখন কামবোজ নামে এক জাতি ছিল। এই কামবোজরা ফুনান বংশের এক শাখা ছিল বলে অনুমান করা হয়। তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাম-

গাথাহিক বসুধতী

বোজার শাসনকর্তা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং শাসনকর্তা ও তাঁর ভাই মিলে ফুনান সাম্রাজ্যের অধীনতামুক্ত হয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করেন। পরবর্তী শতাব্দীতে এই কামবোজা রাজবংশের উত্তরাধিকারগণ ফুনান রাজত্বের পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে সমস্ত দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। এই কামবোজা থেকেই সম্ভবত কম্বোডিয়া নামের উৎপত্তি।

এর পরবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কম্বোডিয়ার ইতিহাস এক গৃহযুদ্ধের কলঙ্কিত অধ্যায়। ফলে দেশ বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত হয়। পরিণামে জাভার দশটি গৃহযুদ্ধের ফলে বিখণ্ডিত কম্বোডিয়ার দক্ষিণ অংশ দখল করে রাজপুত্রকে বন্দী করে জাভায় নিয়ে যান। যুবরাজ বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করে কম্বোডিয়ায় ফিরে এসে রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মার নাম গ্রহণ করেন। তিনি কম্বোডিয়াকে জাভার অধীনতাশূন্য থেকে মুক্ত করে সারা দেশকে এক শাসন-শৃঙ্খলার আয়ত্তে আনেন। গ্রেট লেক জলাধারের কাছে আংকোর-এ রাজধানী স্থাপন ও পরবর্তীকালে আংকোর নগরে নানা কীর্তিকাহিনীর তিনিই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আংকোর নগরে তাঁর রাজপ্রাসাদের নামকরণ করা হয় হরিহরালয়। হরি ও হর অর্থাৎ বিষ্ণু ও শিবের মিলনক্ষেত্র। রাজপ্রাসাদের উপরে এই যুগ্মমূর্তি স্থাপন করা হয়। রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মার নিজেকে কম্বোডিয়াব অধীশ্বর ঘোষণা করা ছাড়াও নরদেহরূপী বিষ্ণু অবতার বলে সর্বত্র প্রচার চালাতে থাকেন। তিনি দেবরাজ বলে নিজেকে প্রচার করে বলেন যে, মৃত্যুর অর্থাৎ নরদেহ ত্যাগ করার পর তিনি স্বস্থান মেরু পর্বতে আপন গৃহে প্রস্থান করবেন। দ্বিতীয় জয়বর্মার পরবর্তী রাজারাও এই ধারণার জের টেনে মৃত্যুর পর বসবাসের জন্য পর্বতে কল্পিত দেবালয়ের অনুরূপ গৃহ নির্মাণ করে রাখতেন। এভাবে আংকোর টম-এর পল্লব হয়। আংকোর শব্দের অর্থ হচ্ছে রাজ-

ধানী বা রাজপ্রাসাদ। টম শব্দের অর্থ হচ্ছে নগরী, তাই সাধারণ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এই অতি বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, দেবতারা ও দেবপ্রতিনিধি রাজারা প্রস্তরনির্মিত গৃহে বাস করেন।

রাজা দ্বিতীয় জয়বর্মার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে রাজা সপ্তম জয়বর্মার কীর্তি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কম্বোডিয়ার সভ্যতা ও স্বর্ণযুগের প্রধান কীর্তিকাহিনীর তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারগণ আংকোর ভাট-এর হানা-বিধবস্ত মন্দির ও কীর্তিস্তম্ভ রক্ষায় সক্ষম হন নি। উপরন্তু তাঁরা শ্যাম ও চম্পকবাহিনীর অবিরত হানা ও আক্রমণ রোধে ব্যর্থ হয়ে চৌদ্দশ ব্রিটিশ খৃষ্টাব্দে আংকোর নগরী থেকে রাজধানী নমপেন-এ স্থানান্তরিত করেন। শ্যাম রাজারা এই পরিত্যক্ত নগরী কয়েক বছর দখলে রাখেন। অবশেষে নানা অবস্থা বিপর্যয়ে হতাশ হয়ে তাঁরা আংকোর ত্যাগ করে চলে যান।

আংকোর নগরীর জাঁকের প্রাসাদে অবধে জাঁকিয়ে পশুসমূহ ও টিকিটিকদের আসর জমে ওঠে। হানাদারদের স্থান দখল করে জগল বাহিনী। নানা তরুলতায় পরিবেষ্টিত হয়ে উঠে আংকোর নগরী। পাতায় ঢাকা পড়ে পাথরের খিলান। আস্তে আস্তে বিস্মৃতির গর্ভে চলে যেতে থাকে এক প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণরাজ্য। মৃত্যুতর্জলি। তখনকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের নিপুণ ও পারদর্শী খেমের জাতিদের বংশধরেরা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকে এই সব লতাগাতা-ধেরা মন্দির চড়াগালির দিকে। চেয়ে থাকে আর ভাবে, এই সব পরিত্যক্ত দেবলীলার মহিমার কথা। নানা গল্প-কাহিনীতে তাদের মনে ছড়িয়ে আছে এই সব প্রাচীন স্বর্ণরাজ্যের অধিবাসীদের মর্ত্যলীলা। কম্বোডিয়ার সেই স্বর্ণরাজ্যের কথা আজো ইতিহাসের গবেষণাগারে, চিত্রালিপি বিশারদদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়সূচীতে।

আংকোর নগরীর খেমের জাতীয় শিল্পী-কারিগররা শ্যাম রাজ্যের সেনাবাহিনীর তাম্বেদের ভয়ে নগরী ছেড়ে পালবার সময় শব্দ তাদের সক্ষম যন্ত্রপাতি ফেলে যায় নি, তাদের শিল্পমনকেও ফেলে গিয়েছিল। তারা যেন এক আত্মবিস্মত মানব। শিল্পের পেশা-নেশা ছেড়ে পাণধারণের তাগিদে ক্ষিত্রের বস্তিতে আত্মনিয়োগ করেছে। অশিক্ষার ফলে অল্প সংস্কারের এক অলৌকিক ধাবণা তাদের মনে বাসা বেঁধে আছে। ভারতই পারে না আংকোর নগরীর স্থাপত্যকীর্তি তাদের পরম্পরবাদের মহান অবদান।

কম্বোডিয়ার হীনবল রাজারা

চৌদ্দশ ব্রিটিশ খৃষ্টাব্দে তাঁদের রাজসিংহাসন আংকোর নগরীর রাজপ্রাসাদ হরিহরালয় থেকে সরিয়ে আনেন মেকং নদীর পশ্চিম তীরে স্থাপিত নতুন রাজধানী নমপেন-এ। তার ঠিক ৪৩০ বছর পরে ১৮৬২ সালে ফরাসীরা কম্বোডিয়া দখল করে। কম্বোডিয়ার তদানীন্তন রাজা বর্তমান প্রিন্স নরোদম সিহানুকুর প্রপিতামহ নরোদম একরকম বিনা প্রতিরোধে ফরাসী সেনাপতির হাতে রাজ্যের শাসনভার তুলে দেন। চতুর ফরাসীরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করল না বা রাজবংশের বিলোপ সাধনের পথে পদক্ষেপ করল না। তারা রাজা নরোদমকে মসনদে রেখে দেশ শাসন দণ্ডাট তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিল। প্রত্যক্ষভাবে রাজা রইলেন নরোদম, কিন্তু পরোক্ষে রাজার রাজা হলেন ফরাসী রেসিডেন্ট গভর্নর। ফরাসী গভর্নর অবশ্য রাজকোষের আসল চাবিকাঠিটো নিজের পকেটে রেখে দিলেন। কারণ অর্থবিহীন শাসনদণ্ড হল অর্থহীন।

বাহ্যত কম্বোডিয়ার একজন সাধারণ নাগরিকের দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তনের ছবি প্রতিভাত না হলেও মূলত সবই পালটে গেল। এনাটমীর ছবিতে শিরা-উপশিরায় রক্তসঞ্চালনের মত ফরাসী শাসন-শোষণের ক্রিয়াকলাপ দেশের সর্বত্র এক কম্পন সৃষ্টি করল।

রাজা নরোদম বৃদ্ধলেন, রক্তক্ষয় বৃথা। আধুনিক রণবিদ্যায় শিক্ষিত, সর্বপ্রকার মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত ফরাসী সেনাবাহিনীর কাছে কম্বোডিয়ার সেনাবাহিনীর শৌর্য, অস্ত্র অকিঞ্চিৎ। চার বছর আগে ফরাসী রণতরী ভিয়েৎনামের সায়গন ও টুরিন বন্দরে অবতরণও ছিল একপ্রকার বাধাহীন। আনাম ও চম্পক সেনারা ফরাসীদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি।

তা ছাড়া প্রায় সাড়ে চারশ বছরের ইতিহাসে কম্বোডিয়ার সিংহাসনে কোন রাজনৈতিক কোন সামরিক আবর্তের ছেউ লাগে নি। তাই রাজপুত্রীর বিলাস কামরায় থেকে থেকে রাজার মনোবলও গড়ে ওঠেন দৃঢ় সংকল্পে। নরোদম তেমন শক্ত ধাতুতে গড়া মানব ছিলেন না। সায়গন ও টুরিনের অবস্থাই যেন তাঁর কাছে নির্দেশের মত ছিল। তিনি বৃথা রক্তক্ষয়ের পথে এগোলেন না, শান্তির পথেই গেলেন।

পর্যায়ীতার বেদনায় বিক্ষুব্ধ হলেও জনসাধারণ নিরুপায়। রাজা রইলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। কিন্তু প্রধান নিয়ামক হলেন কম্বোডিয়ার

মাসিক ১০ টাকার কিস্কতে লাভ করুন

অ ল ও রা মর্ট
স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার
(জাপান মেক) জন-
প্রিয়। দে শ ব্যা পী
খ্যাত আছে। ডবল
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-
লাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।



Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7

সাম্রাজিক বন্দুত্ব

ফরাসী রেসিডেন্ট গভর্নর দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, আমদানী-রপ্তানী, রারার-বাণিজ্য, আর্থ ক্ষেত্রে, নারকেলকুঞ্জ, ধান-ক্ষেত্রে, মাছের আড়ত সবই ফরাসী জ্ঞানের অস্ত্রোপাশ প্রসারিত হল।

রাজকীয় বাহিনী এল পূর্ণ ফরাসী সামরিক কর্তৃত্বধানে। রাজার নিজস্ব কিছু লাঠিধারী সৈন্যই রইল বটে, কিন্তু দেশরক্ষার মূল কর্তা হল ফরাসী রিজিডেন্ট ও জেনারেলরা। বিস্তারিত সমস্ত উপনিবেশে এই একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কম্বোডিয়ায় ফরাসী কিছু ভিন্ন পথ নেয় নি শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে সব কিছু করতলগত করেছে। এইভাবে কয়েক দশক চলে গেল। রাজা নরোদম গেলেন। এলেন রাজা শিশোয়াত মণিভঙ। তিনিও ফরাসী শাসনের ছত্রছায়ায় কাটলেন দীর্ঘ কয়েক বছর। তাঁরও রাজত্বের কাল ফুরিয়ে এল এক সময়ে। এল রাজা নির্বাচনের পালা।

উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। রাজা নরোদমের উত্তরাধিকারী হিসাবে মণিরথ রাজা হবেন নিয়মমাফিক। কিন্তু বাধা এল ফরাসীদের থেকে। তারাই এখন কম্বোডিয়ার দৃষ্টিভঙ্গির কর্তা। সুতরাং রাজা নির্বাচনের দায়িত্ব তাদের। তারা দেখল বৃন্দ স্বল্প-শিক্ষিত মণিরথের চেয়ে নবীন উচ্চ-শিক্ষিত প্রিন্স নরোদম সিহান্দুক অনেক নিরাপদ। কাজেরও বটে। সবে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে এসেছে। গায়ের এখনো ফরাসী সুগন্ধের বিলাস। বহিরগে আধুনিকতা ও ফরাসী আভিভ্যাক্তর ছাপ। চোস্ত ফরাসী ও ইংরাজী বলে। এক প্রাণেচ্ছল সাহসী-শিক্ষিত নবীন যুবা। ফরাসীরা ত' এই-ই চায়। তারা বাইরে এ সব চেপে গেল। এতো মনের কথা। মুখে বলল মণিরথ প্রোট হয়েছেন। তা ছাড়া পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় দিক থেকেই সিহান্দুকের দাবি অনেক বেশি। আত্মকোর-এর রাজবংশের ধারা অনুযায়ী এটা তাঁরই প্রাপ্য।

রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রিন্স নরোদম সিহান্দুকের দাবি স্বীকৃত হল ফরাসীদের অভিপ্রায় অনুসারে। মণিরথের প্রতি এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাজধানী নমপেন-এ মদু গুজ্জন উঠল বটে, কিন্তু তা সোচ্চার হল না। ফরাসীরা এভাবে সম্পূর্ণ অজান্তে পদপহার ভেব কাটার মালা গলায় পরল। একেই বলে গ্রহের ক্ষেত্র, অদৃষ্টের পরিহাস।

উনিশ শ' একচল্লিশ সালে সিংহাসনে অভিষেকের সময় প্রিন্স

নরোদম সিহান্দুক মাত্র উনিশ বছরের এক নবীন যুবক রাজা হলেন বটে, কিন্তু রাজমুকুটের স্বর্ণশিখায় আচ্ছন্ন হয়ে হলেন না। বরং আচ্ছন্ন হলেন। দৃষ্টিপাত করলেন দেশের দুরবস্থার দিকে। দেশের শান্ত, সরল মানুষের দুঃখ-দুর্দশার দিকে। বিদেশী শাসন-শোষণ ও নিপীড়নের চিত্র তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে তুলল। রাজমুকুট তাঁর কাছে কাঁটার মুকুট। সিংহাসনের মন্ত্রপাত ধর্ম দীক্ষিত রাজপুত্র যেন নির্বাণের স্বপ্নে মেতে উঠলেন। তবে এ নির্বাণ সম্যাস গ্রহণ-মুখীন নয়, নয় আত্মকেন্দ্রিক। যেন দেশের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে এক মহা বিজয়যাত্রা, স্বাধীনতা, শান্তি প্রগতির এক মহানির্বাণ মিছিলের স্বপ্ন।

প্রিন্স নরোদম সিহান্দুক যখন রাজত্ব পেলে, তখন সারা বিশ্বজুড়ে দ্বিতীয় মহাসমরের নিধনযজ্ঞের তান্ডব-নৃত্য চলছে। ফ্যাসিবাদ ক্ষিপ্ত বাজ-পাখীর মত কাঁপিয়ে পড়েছে শিকারের উপদেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সূর্য হয়েছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবি, স্বাধীনতার আন্দোলন। বিভিন্নভাবে এই আন্দোলন রূপ নিয়েছে এশিয়ার দেশগুলিতে। ভিয়েতনামীদের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় ইন্দো-চীনে, বিশেষ করে ভিয়েতনাম অঞ্চলে এ আন্দোলন সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। দিন দিন এই আন্দোলন ব্যাপক হতে ব্যাপকতর হচ্ছে। ফরাসী উপনিবেশ শাসনের বিরুদ্ধে এই সশস্ত্র প্রতিরোধের ঢেউ ভিয়েতনামের সীমানা ছাড়িয়ে লাওস ও কম্বোডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঢেউ নমপেনের রাজপ্রাসাদের অলিন্দ ভেদ করে খোদ-রাজার অন্তরে এসেও আলোড়ন তুলেছে।

এর পর ইতিহাসের গতিপথে অনেক আবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ফরাসীদের হাত থেকে কম্বোডিয়া কেড়ে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৫ সালে ফরাসীরা আবার কম্বোডিয়ায় অধিকার করে। তাদেরও অবশেষে চলে যেতে হয় ১৯৫৪ সালে জেনিভা সম্মেলন অনুসারে।

ইতিমধ্যে প্রিন্স নরোদম সিহান্দুক প্রথমে সম্রাটত্ব ও পরে রাজত্ব বিলোপ করেন। রাজা রইলেন শুধু দেশে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে। তিনি নিজের রাজ্যভার ত্যাগ করে নিরাক্রান্ত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্র-

ক্ষমতা তুলে দেন। তিনি দেশে "সংকুল" দল প্রতিষ্ঠা করে নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানরূপে শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।

তারপরও বহু পরিবর্তনের শেষে তিনি ১৯৭০ সালের ১৮ই মার্চ অবধি রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। সেই দিনই তাঁর বিদেশ পরিদর্শনের সুযোগে দক্ষিণ-পশ্চিমী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সন নল, সিরিব মাটাক, চেং হেং প্রমুখ মিলে এক অভ্যুত্থান করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে। মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সৈন্য কম্বোডিয়ায় এসে এই দক্ষিণপশ্চিমী চক্রকে সহায়তা করছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতাকামী জনগণ এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়া চক্রকে সম্মুখে দেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করবার জন্য দৃঢ়পন সংগ্রাম করছে।

কম্বোডিয়া অশান্ত। অশান্ত তার স্বাধীন নিরপেক্ষ নীতির উপাসক জনগণ ও শান্তিকামী রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহান্দুক। কেন এই অশান্তি?

জেনারেল সন নল তাঁর কাছে কম্বোডিয়াকে "স্বাধীনতা" করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি সে প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সিহান্দুক কে? সন নল কে? দেশ কম্বোডিয়ার জনসাধারণের। তারা কি এই ভ্রাতৃবিক্ষেপ চেয়েছে? পিতৃভূমিকে স্বাধীন করে, দুর্বল করে চির অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে? তবে.....

আজ শান্তিপূর্ণ দেশবাসী তথাগত বুদ্ধের মূর্তির দিকে দৃষ্টি ফেলে শাস্বত জিজ্ঞাসা তুলেছে :-

"যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু
নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ
তুমি কি বেসেছ ভালো।"

॥ সমাপ্ত ॥

সংক্ষেপ

মূল, পদবিভাগ, অবয়ব, অনুবাদ ও শব্দার্থ-ব্যাখ্যাসহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। প্রতি খণ্ড তিন টাকা। গ্রাহকদের জন্য বিশেষ সুবিধা। বোগারোগ করুন—

পরিচালক ঠাকুর, বেদগ্রন্থমালা।
২৯, সদানন্দ রোড, কলিকাতা-২৬

জাহ্নবী

অবিস্মরণীয়—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চন্দ্র।
প্রাপ্তস্থান: ৫৯ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
অথবা 'মনীষা', কলকাতা-১২। মূল্য :
দশ টাকা।

“অবিস্মরণীয়”-এর প্রথম খণ্ডের সঙ্গে কৌতুহলী পাঠকদের নিঃসন্দেহে পরিচয় আছে। অবিস্মরণীয়-এর ১ম খণ্ড সম্বন্ধে বিস্ময়কর সংবাদ এই যে, ঐ গ্রন্থের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জনমনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, স্বাধীনতার বেদীমূলে যারা আত্মোৎসর্গ করেছেন—তারা কেউ নন! স্বভাবতই তার জন্য দায়ী সুবিধাবাদীর দল। অবস্থা এমন হয়েছিল যে, একদা যারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে স্পাইং করে-
ছিলেন তাঁরাই রামরাজ্য কাসেম করার চেষ্টা করেছিলেন। স্বেচ্ছানৈশেষ নয়। বিপ্লবীদের কথা লোকে যেমন ভুলতে বসে-
ছিল, তেমনি পচার সুদূর হয়েছিল তথ্য-
কথিত সাহিত্যের—যা মর্যাদাভিট ও সিনি-
সিজিমে ভর্তি এবং পঙ্কিল বর্ণনার গুণে
আবর্জনার স্তূপে তন্মূহূর্তে নিক্ষেপ
করার যোগ্য। বলা বাহুল্য, দিনগত
পাপক্ষয় হতে হতে ক্ষুধিত ও ক্ষুধ
মানুষ সে অবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের
আসল চেহারাটা বদল। তখন তাঁরাই
সাদরে অভ্যর্থনা জানাল মরণজয়ী বিপ্লবী-
দের, শুনতে চাইল নতুন করে তাঁদের
আত্মোৎসর্গের কাহিনী। মরণসাগর পারে
যাঁরা অমর তাঁদের অমরত্ব লাভের রোমাঞ্-
কর কাহিনী শুনে পেতে চাইল অনু-
প্রেরণা। সেই কারণে, সুদূর হল সত্যি-
কারের বিপ্লবীদের দিয়ে অগ্নিযুগের
কাহিনী লেখানো। আলোড়ন সৃষ্টি
কবল অনন্ত সিংহ ও ভূপেন্দ্রকিশোর
রক্ষিত রায়ের বিপ্লববাদ ও বিপ্লবীদের
নিয়ে লেখা মূল্যবান গ্রন্থগুলি।

“অবিস্মরণীয়”-এর বিপ্লবী লেখকের
প্রথম খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশের কালে সন্দেহ
ছিল, এই গ্রন্থ বিক্রয় হবে কি না—কিন্তু

দেশের বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থায়
“অবিস্মরণীয়” দ্বিতীয় সংস্করণের মর্যাদা
লাভ করায় একথা প্রমাণিত হল যে, দেশের
মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। তারা
নিজেদের নৈতিক মান ও চরিত্র সম্বন্ধে
সচেতন হয়েছে বলেই “অবিস্মরণীয়”-র
মতো গ্রন্থ থেকে বিপ্লবীদের মহান কর্ম-
যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তার আয়োজন-
সমাপনের চমকপ্রদ বিবরণগুলি পড়ে নতুন
সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হতে
চায়।

“অবিস্মরণীয়”-এর ঐতিহাসিক ও
দলিলভূক্ত ঘটনাগুলির সত্যাসত্য নির্ণয়
বর্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবী
লেখক সে দায়িত্ব সম্পর্কে স্বয়ং সচেতন
হওয়ায় গ্রন্থ রচনাকালে ও ২য় সংস্করণের
সংশোধনকালে অন্যান্য বিপ্লবীদেরই
পরামর্শ গ্রহণ করেছেন। শ্রীযাদুগোপাল
মুখোপাধ্যায় গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলেছেন,—
“গঙ্গানারায়ণবাবুর এই ইতিহাস লেখা
সাধক হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরও
ঐতিহাসিক তথ্য শুনবার জন্য অপেক্ষা
করে থাকব। ‘অবিস্মরণীয়’ ভারতের
স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অমূল্য গ্রন্থ।”

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংক্রান্ত
কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ ইতিমধ্যে বের
হয়েছে। ‘অবিস্মরণীয়’ সেখানে আর
একটি মূল্যবান সংযোজন এবং একথাও
মনে রাখতে হবে—সংশ্লিষ্ট প্রতিটি
বিপ্লবীর নিজের হাতে লেখা কাহিনীর
সমষ্টিগত ফল হবে ভারতের স্বাধীনতা
সংগ্রামের সত্যিকারের ইতিহাস—যা
কখনো বৈতনিক বা ভাড়াটে ঐতি-
হাসিকের পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। যথার্থ
বিপ্লবীর লেখা “অবিস্মরণীয়” অবিস্মরণীয়
হোক প্রতি বাঙালীর ঘরে ঘরে।

ইথারে সজাগ (বৈশাখ, ১৩৭৭)—
জয়ন্ত সাহা। নীলাঞ্জনা প্রকাশনী।
১০, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৬।
দাম—তিন টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের ৪২টি কবিতার

মধ্যে দিয়ে একাধি স্পর্শকাতর, অনুভূতি-
প্রবণ, দরদী কবি মনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার
ঘটে। আড়লতা দুল্লভ্য। কতকগুলি
কবিতা প্রতীকধর্মী বলে মনকে আকর্ষণ
করে, নাড়া দেয়। ‘একটি চাঁবি’ কবিতায়
ফৌরওয়ালার ‘হরেক তালার হাজার চাঁবি’
নয়, কবির দরকার একটি চাঁবি। এইরকমই
একনিষ্ঠ প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠছে
‘কম্পাস’ কবিতাটি। প্রেমের কবিতাগুলি
মিষ্ট, গীতিকবিতার সুর। ‘বাইরে যাব’,
‘বাইরে চলে’ এই দুটি কবিতায় কবি
পুণ্ডিতগন্ধময়, বিবর্ণ বর্তমান থেকে উন্নত-
তর নতুন সমাজে উত্তরণই চেয়েছেন, যার
প্রতিষ্ঠা কামনায় আপাতশাস্ত নির্বিরোধী
চিন্তেও তাঁর ‘বারুদজ্বালা’, ‘স্মৃতির
ভেতরে’ ও ‘ভিসা হাতে’ কবিতায় কবি
বেদনামুখর স্মৃতিচারণ করেছেন অবিভক্ত
বাংলার! সাধারণ জীবন উপজীব্য করে
লেখা ‘হাবুডুবু খেলায় মেতে’ ও ‘বাপকে
বেটা’ রমোত্তীর্ণ। শব্দ প্রয়োগে এবং
ছন্দে কিছুটা অনামনস্কতা আছে। ‘শপথ-
গুলো বিবধা পাহাড়’, ‘ঘুম আসে না কবর-
গুলো’, ‘সারা দুপুরে ঘুমু চরে বুকের
ভিটার’, ‘কুয়াশা নীরব দুটি চোখ’, ‘তখন
আমার বুকে ছিল সাদা কাগজ’ ইত্যাদি
চিরকল্প, সমাসোক্তি উপমা উল্লেখযোগ্য।
কাব্যগ্রন্থখানি কাব্যপিপাসুদের আনন্দ-
দান করবে।

লেনিন শতবর্ষ স্মারিককী সংখ্যা :
সম্পাদনা : প্রতুল দত্ত। ইউনিয়ন ব্যাংক
কর্মচারী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত।
ইউনিয়ন ব্যাংক কর্মচারী সমিতির
(হাওড়া ও কলকাতা) সদস্যরা যে
যথেষ্ট সমাজসচেতন সে কথা বোঝা
গেল সমিতির বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে
প্রকাশিত স্মারক সংখ্যাটি দেখে। লেনিন
জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই
সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছে। লেখা,
ছবি এবং সাজানোর দিক থেকে এই
সংখ্যা প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণের
উপযুক্ত। লেনিনের ছবি সম্বলিত
প্রচ্ছদপটটির তুলনা হয় না। এই সংখ্যায়
স্টালিন, হো চি মিনের লেখার সঙ্গে
ইংরেজী ও বাংলায় ইউনিয়ন ব্যাংক
কর্মচারীদের লেখা প্রবন্ধ ও কবিতা
রয়েছে। অক্টোবর বিপ্লবের শিক্ষায়
মলয় মুখার্জী, এস. বর্ধন এবং প্যারী
কমিউন সম্পর্কে শম্ভু মিত্রের ইংরেজী
প্রবন্ধ এবং কবিতাগুলি পাঠকদের
চিন্তার সহায়ক। হিন্দী এবং উর্দু
প্রবন্ধও এই সংখ্যায় রয়েছে, যাতে
ব্যাংকের প্রত্যেকটি কর্মচারী শতবর্ষ
উৎসবের তাৎপর্য অনুভব করতে
পারেন। বহু ছবি সম্বলিত এই
স্মারিককী সমস্ত রক্ষা করার মত।
সব সংবাদনার জন্য সম্পাদক ধন্যবাদ
ভাজন।



কপালের রেখাগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রিয়তোষের। আরও গভীর মনে হচ্ছে, যেন এটেল মাটি দিয়ে কৃষ্ণ-নগরের মৃৎশিল্পী মর্তি গড়েছে। মাটির মর্তির মতই বসে রয়েছে প্রিয়তোষ বাইরের রকে একটা ভাঙা তক্তপোষের ওপর। এমন করেই কপালের রেখাগুলো গভীর হয়, মোটা হয়ে ওঠে যখন সে তলিয়ে চিন্তা করে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরোনো গালে প্রিয়তোষ বার কয়েক হাত বোলায়। হাতের তালুতে খুঁতনিটা রাখে, দু'গালে আঙুলের চাপ পড়ে। রকে বসেই শুনতে পায় পাশের ঘরের কাঁড়-কারখানা। ঠিক পাশের ঘরটোতেই মোবের ওপর আলুখালুভাবে উপড় হয়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আরতি। কি ভীষণ যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা যার হয় সেই বোকে।

আকাশটা এমন বিস্তী হয়ে আছে, বিকেল কি সকাল বোঝবার উপায় নেই। সকাল থেকে শব্দ হচ্ছে বিষণ্ণ কান্নার মত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। বিকেল গড়াতে চললো, বৃষ্টি থামবার নাম-গন্ধ নেই। এই বৃষ্টির মধ্যেই ভিজে ভিজে দোকান-বাজার করতে হয়েছে, ডাক্তার ঠিক করতে হয়েছে, টাকা জোগাড় করতে হয়েছে আরতির জন্যে।

টাকা জোগাড় করতে তাকে প্রাণান্ত হতে হয়েছে আজ। এতটা অসুবিধে হতো না, যদি কারখানাটা খোলা থাকত। কারখানা পাঁচ মাসের ওপর বন্ধ। লক-আউট। একেতেই সংসার চলে না, তার ওপর পাঁচ মাস ধরে কারখানা লক-আউট। দমবন্দ হয়ে মারা যাবার দাঁখল। তার মত অল্প আয়ের লোকের বিয়ে করে সংসার করতে যাওয়াটাই ঝকঝকি হয়েছে। বিধবা মা, মেয়ে, বউ—তিন-তিনটি প্রাণীর খোর-পোষ জোগাড় করা এ বাজারে কম কথা? কম টাকার দরকার? বিয়ে করার হচ্ছে তার থাকলেও সামর্থ্য নেই সে জানতো। চরম খাদ্যাভাব, চড়া বাজার-দর দেখে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারতো না। ভাবলে ভয় লাগতো। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, মা এমন-ভাবে তাকে চাপ দিতে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে বাধ্য হোল সে। সকলেই বললে দায়িত্ব নেই বলেই ভাবতে অতো ভয় লাগছে। দায়িত্ব এসে পড়লেই দায়িত্ব রক্ষা করবার জন্যে সজাগ থাকতে হবে, কত বাবোহ এসে পড়বে। আপনা হতে সব ঠিক হয়ে

যাবে, সহজ হয়ে উঠবে। বিয়েটা করব না, করব না করে একটু বেশি বয়সেই করতে হয়েছে তাকে—যার পরে আর অন্তত বিয়ের জন্যে অপেক্ষা করা চলে না। মা বরাবরই অসুস্থ। রাজ্যবাসী সর্বাঙ্গ হয়ে উঠতো না। কোন কোন দিন প্রিয়তোষকেই রাজ্য করতে হোত দু'বেলা। এর ওপর কারখানায় ওভার-টাইম খাট। বাড়িতেও মন টিকতো না। কতকটা ঝগড় নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার মতই বিয়েটা করে ফেলতে হয়েছিল। ভেবেও দেখেছিল সে। বহু বছর ধরেই ভেবেছে। সবাই কি আর পাঁচশো টাকা মাইনে পেয়ে বিয়ে করেছে? না পাঁচশো টাকা মাইনে সকলেরই হয়? হিসেব করে দেখেছে প্রিয়তোষ কারখানায় কেরানীর কাজ করে সে যা জার করে তাতে কোনমতে তিনটি প্রাণীর চলতে পারে। তাতেও ধার-দেনা করতে হয়। বড বেশি হিসেব করে টিপে টিপে চলতে হয়। এ হিসেব বিয়ের আগেও করেছিল। এ অবস্থা জেনেও

একদিন হঠাৎই বিয়ে করে ফেলতে হয়েছিল। আশ্চর্য, অত অভাবের মধ্যে বিয়ে করেও ফুলশয্যার রাতে আরতিকে মুখোমুখি কাছে বসিয়ে পরিপূর্ণ মনে হয়েছিল সেদিন প্রিয়তোষের জীবনটা। মনে হয়েছিল, এটাই যেন জীবন—এরই মধ্যে রয়েছে ছন্দ, আনন্দ। বিস্ময়ে-পুলকে, অনন্যবোধে আহ্বারা হয়েছিল প্রিয়তোষ বয়সক মাস ধরে। তারপর দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মেনে হোল একটা। প্রথম পিতা হবার আদিম তীব্রতায় আর প্রচণ্ড আনন্দে অভাবের তাড়নাকে তুচ্ছ মনে হোল প্রিয়তোষের। উত্তাল রোমাঞ্চিত মন তখন। তবে টাকা-পয়সার প্রয়োজনটা যেন আরও তীব্রভাবে উপলব্ধি করল সে। চল্লিশের পরে বিয়ে করে প্রথম সন্তান হবার পুলকের ধরনটা প্রিয়তোষের কাছে মনে হয়েছিল উঠতি বয়সের ছেলে-ছোকরাদের মত চমকমনে। তখন যেন মনে হয়েছিল, বিয়েই যখন করল, আরও কয়েক বছর আগে করলেই ভাল হোত। বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজনদের বলতো নিজের ভাগ্যটাই নাকি সব নয়—স্বাধীন ভাগ্যের ওপরও কিছুটা ভরসা করতে হয়। কিন্তু এখন যা অবস্থা বাঁড়িয়েছে প্রিয়তোষের—চরম দুর্দশা। আত্মহত্যা বোধ হয় এর মুক্তির পথ। তার সংগেই রেকর্ড সেকশনে কাজ করে হারাধন চক্রবর্তী, সে নাকি সত্যিই আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল একদিন। এ বাজারে পাঁচটি ছেলে-মেয়ের বাবা সে। স্বাী ছাড়াও এক আইবুড়ো শালী আর বিধবা শাশুড়ি ঘাড়ে। হারাধন আত্মহত্যা করলে নাকি কাগজে কাগজে বেরুতো খবরটা। বিরাট কারখানা, পাঁচ মাসের ওপর লক-আউট। চরম দুর্দশায় পড়েছে কয়েক হাজার ধর্মঘটী। বোনাস আর কম্বী হাটাই নিয়ে বিরোধ চলছে মালিকের সংগে কর্মচারীদের।

পাশের ঘরে আরতির চিংকারটা আরও রেড়ে চলেছে, মনে হোল প্রিয়তোষের। বাড়বারই কথা। এরকম বাড়াবাড়ি দু'তিন দিন হয়ে গেল। আজ-বোঝ-হয় এ যন্ত্রণার শেষ। কাজরানিটা তাই বোধ হয় এতো বেশি। যন্ত্রণাটা অবশ্য এর আগেও বহুবার হয়েছে, তবে এ দু'তিন দিনের মত এতো তীব্র নয়, এতো প্রাণান্ত নয়। গর্ভাবস্থায় একবার ঘাড়তেই পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল আরতি। পড়ে যাওয়ার পর থেকে প্রায়ই যন্ত্রণা হোত। ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিল। ডাক্তার তেমন কিছু ভয়ের কারণ খুঁজে পান নি। নৈজেকশন, ওষুধও পড়েছিল বহুবার। উপশমও হয়েছিল যন্ত্রণা, কিন্তু

নিম্নলিখ হয় নি। কনকনে ব্যথা প্রচণ্ড হোত। তখন আরতির ছ'মাস। চার মাস পরে কাঁদন হোল আবার নতুন করে যন্ত্রণাটা বেড়েছে। ডাক্তার নাকি বলেছেন আজই হয়ে পড়বে। আরতির কাছে প্রিয়তোষের রক্তনা মা বসে রয়েছে সামনে। মারও সময়মত ওষুধ-পাখ্য পড়ছে না কাঁদন থেকে। পড়বে কি করে? আরতিই সব দেখাশোনা করে। চরকার মত ঘুরে ঘুরে কাজ করে আরতি। সাড়ে ছটার মধ্যে কারখানায় বেরিয়ে যায় প্রিয়তোষ। এখান থেকে কারখানাটা অনেক দূর। আটটার মধ্যে হাজারে দিতে হয়। একটু সময় হাতে রেখেই বেরোতে হয়। আজকাল ট্রামে-বাসের যা অবস্থা বাঁড়িয়েছে—একে ভো-বীভৎস রকম ভিড়-তার ওপর কথায় কথায় জ্যাম। খুব ভোরবেলাতেই উঠতে হয় আরতিকে। আঁকশাক করে উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপাতে হয়। প্রিয়তোষ খেয়ে বেরোবে—সংগে টিফিন নিয়ে যাবে। প্রিয়তোষ একটা এ্যালুমিনিয়ামের কৌটো কিনেছে টিফিনের খাবার নিয়ে যাবার জন্যে। কৌটোটা কাগজে মুড়ে কাপড়ের খলেতে ভরে নিয়ে যায় সংগে করে। তবুও ভো-যেদিন-যেদিন পেরে ওঠে না আরতি, ক্যানটিনেই খেয়ে নেয় প্রিয়তোষ। প্রিয়তোষ বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তটস্থ থাকতে হয় আরতিকে। তারপর নিজেদের জলখাবার হবে। নিরামিষ রান্না হবে একপাট বিধবা শাশুড়ীর জন্যে। এরই মাঝে ঘর গৃহনো আছে, বাসী বিহানা তোলা আছে; প্রিয়তোষের এলোমেলো জামা-কাপড়, টুকিটাকি জিনিসগুলো ঠিক করে গুছিয়ে রাখতে হয়। এর পরেও আছে শাশুড়ীর পুজোর বাসন মাজা, নিজের চান সেরে পুজোর জোঁগাড় করে দেওয়া। এই করতে করতেই বেলা দুটো বেজে যায়। এরই মধ্যে মেয়েটাকেও আবার দেখতে হয়। সাড়ে তিন বছরের মিঠুটা বড় দুটু হয়ে উঠেছে। আজ-কাল আর ঠাকুরার কাছে বৈশিষ্ট্য থাকতে চায় না। রান্নাঘরে ঢুকে গিঁট-পনা করে ডালের মধ্যে ফোরণ ফেলে দেবে, নুন ফেলে দেবে। বাটি করে বালতি থেকে জল নিয়ে ডালের মধ্যে ঢেলে দেবে। জুতো ঘেঁটে এসে খাবার জলে হাত ডুবিয়ে দেবে। এই দৃশ্য খেলা করছে বাড়িতে—ফুঁক করে কোন ফাঁকে বেরিয়ে পড়বে বাড়ির বাইরে, কেউ বন্ধুতেই পারবে না। প্রিয়তোষের মা ব্যস্ত হয়ে হাঁক পাড়বে। আরতি তক্ষুণি রান্না ফেলে রেখে হন্তদন্ত হয়ে খুঁজতে বেরুবে মিঠুকে। কোন কোন দিন মিঠু

কারোর সংগে মারামারি করে, অথবা পড়ে গিয়ে হাত-পা-ঠোঁট কেটে বাড়ি ফিরবে কাঁদতে কাঁদতে। চে'চামেটি পড়ে যাবে বাড়িশুদ্ধ। যেদিন সন্ধ্য কাচতে হয়, গুল দিতে হয়, বাসন কয়েকখানা বেশি মাজতে হয়, সেদিন দেহ যেন আর বহিতে চায় না আরতির—ইচ্ছে হয় বিহানায় পড়ে থাকে। এ সবই জানে প্রিয়তোষ। তবুও পাড়-মারি করে একলা হাতে সব কিছুই করতে হয় আরতিকে।

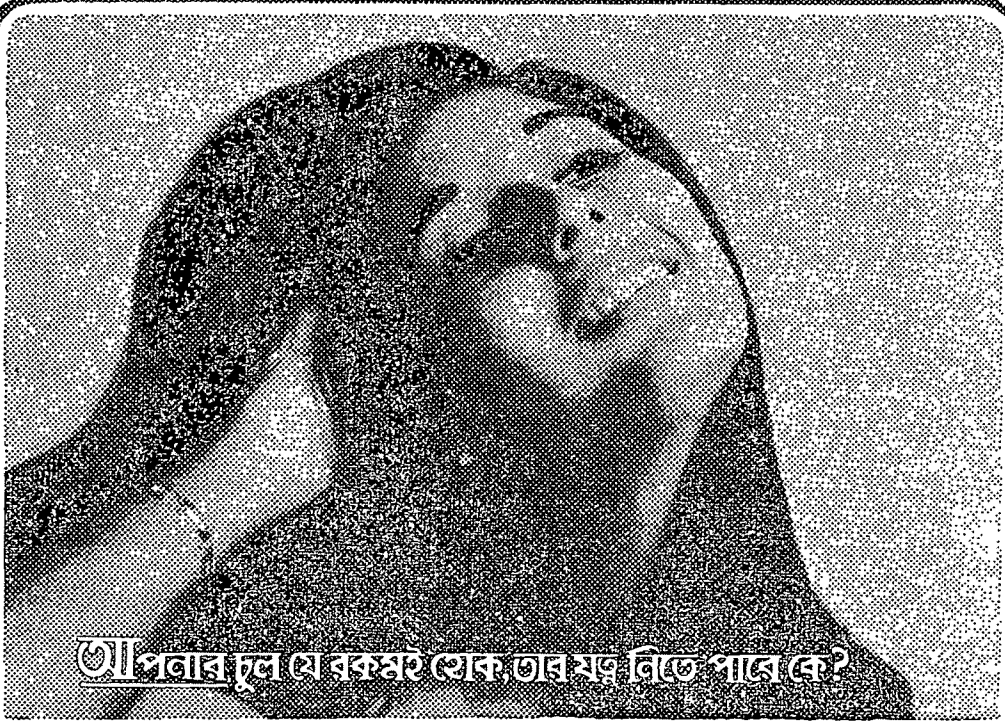
বাঁশ্টিটা এবারে জোরেই নেমেছে। মৃদল ধারে হচ্ছে। বাড়ির চাল অ্যাসবেসটাসের, রকের উপরের ছাউনিটাও অ্যাসবেসটাসের। বাঁশ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো বেশ আওয়াজ তুলেছে। চড়বড় চড়বড় আওয়াজ। প্রিয়-তোষের মনে হচ্ছে-বাঁশ্টির তোড়ে চাল বোধ হয় ভেঙ্গে পড়বে। বাড়িশুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মনে হচ্ছে অগাধ বাঁশ্টির মধ্যে সে তলিয়ে যাচ্ছে। এখুনি ডাক্তার আসবার কথা আছে—বার বার করে বলে এসেছে সে। কিন্তু ডাক্তার আসবে কি করে এই বাঁশ্টির মধ্যে? ডাক্তারের মোটর নেই। এলে রিক্সা করেই আসবে। আরতিকে হাসপাতালে পাঠালেই ভাল হোত কিন্তু সুযোগ-সুবিধে হবে উঠলো না। এখান থেকে হাসপাতাল অনেক দূর। তাছাড়া আরতি হাসপাতালে যেতেও চায় না। হাসপাতালের নাম শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে। প্রিয়তোষ নিজেও ভেবে দেখেছে আজকাল হাসপাতালগুলো সব কেমন যেন হয়ে গেছে। রোগী পাঠিয়ে ভরসা নেই। বেঁচে ওঠার লোক মারা যায় ডাক্তার আর নার্সদের চরম অবহেলায়। রোগী নিখোঁজ হয়, আত্মহত্যা করে। তারপর দু'খ চুরি, খাবার চুরি, ওষুধ চুরি। কাগজে এ সব ঘটনা প্রায়ই বেরোয় ফলাও করে। মিঠু অবশ্য হাসপাতালেই হয়েছিল। কোন যন্ত্র পায়নি আরতি সেবার। বস্ত্র অবহেলা করেছিল। তাই এবারে আরতিকে কিছুতেই পাঠানো গেল না হাসপাতালে। বাঁশ্টির বিপুল তোড়ের সংগে আরতির কাতরানিটা ফাঁপ শোনা যাচ্ছে। কখন কখন মনে হচ্ছে দু'বছর ওই নারকোল গাছটার ওপর বসে একটা শকুনি কাঁদছে। বিকেল গড়িয়ে গেছে। অন্ধকার, অন্ধকার। স্পষ্ট কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবুও মনে হচ্ছে প্রিয়তোষের নারকোল গাছটার ওপর সত্যিই একটা শকুনি বসে রয়েছে। ভিজছে—ভিজছে ভিজছে চাপসে ছোট হয়ে গেছে। ও গাছটার কাকের বাসা নেই। লক্ষ্য করল প্রিয়তোষ—একটা ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে রকের ওপর উঠে এলো। এ বাড়িতে এই

দাপ্তরিক বসন্ত

অবস্থা জল হলেই ব্যাঙ, কেঁচো এসে
হাজির হয়। একবার একটা সাপও
চুকছিল—সেটা মিঠু হবার আগে।
মিঠু এতক্ষণ ঘরের ভেতরেই ছিল।
ব্যাঙ দেখতে পেয়ে লাফাতে লাফাতে
বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ব্যাঙ ধরতে
এগিয়ে গেল। প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি
উঠে মিঠুর হাত দুটো চেপে ধরল।

ব্যাঙটাকে তাড়িয়ে দিয়ে মিঠুকে
কাছে নিয়ে তক্তাপোষটার ওপর উঠে
বসলো। অন্যান্য দিনের থেকে মিঠু
আজ একটু কম কথা বলছে, কম ছটফট
করছে। মায়ের অমন অবস্থা দেখে
ঘাবড়ে গেছে সে। প্রিয়তোষ মিঠুর
চুলগুলোতে হাত বুলোতে লাগল।
মিঠুর চুলগুলো খুব ভাল হয়েছে।

মাথা ভর্তি থোকা থোকা চুল। আরতির
মাথাতেও বেশ চুল। মিঠুকে দেখতে
তার মায়ের মতই হয়েছে। মদুখানা
তো কেটে বসানো। আরতির যেমন
লম্বা ছড়ালো চেহারা—বড় বড় চোখ—
ঢলঢলে রঙ—মিঠুটা কেবল আর একটু
বেশি ফরসা হয়েছে। মেয়েরা ফরসা
হওয়াই ভাল। তবে আরতির রঙ ছিল



আপনার চুল যে বকসই থেকে তার মত্ব নিতে পারে কে?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্মে— বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার
ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার স্বরংগে, মেয়ের মত উজ্জ্বল,
রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্মে— এতে আছে আলার্জিনিন যা
আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী শোভা,
চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

স্বাভাবিক চুলের জন্মে— এটি এমন ভাবে তৈরী
যাতে আপনার চুল সবসময় হৃদয় পরিপাটি থাকে, প্রতিটি
চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহা

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার
চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী



লিনটাস-SS. 11-140 BG

হিন্দুস্থান লিটারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

না, বললেও ভুল হবে। মিঠু হবার পরই রঙটা যেন তাগাটে হয়ে গেল। রিসের পর প্রথম কয়েক বছর আরাতকে দেখতে অপূর্ব ছিল। এই বে গোরাতি হয়েছে—দুশটুকুও ভাল করে খাওয়াতে পেরেছে প্রিয়তোষ? ভাল আহাব না পেলে—

চমকে উঠলো প্রিয়তোষ। দেওয়ালের ওপরে একজোড়া টিকটিকি ছুটোছুটি করছিল—অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল প্রিয়তোষ। জোড়া টিকটিকি তার পায়ের কাছে এসে থপ করে পড়ল। মিঠু ভয় পেয়ে প্রিয়তোষকে সজ্ঞায়ের আঁকড়ে ধরলো। বৃষ্টির জল গায়ে পড়তেই টিকটিকি দুটো ছাড়াছাড়ি হয়ে তক্ষণি চলে গেল।

ঝন্ ঝন্ ঝন্ বৃষ্টি। উঠোন রক বলে জলাকার। বাড়ির বাইরে অনেকখানি খোলা মাঠ। খোলা দরজা দিয়ে দেখলো প্রিয়তোষ বেশ জল দাঁড়িয়ে গেছে মাঠে। অল্প অল্প ওঠা সবুজ ঘাসগুলো ডুব গেছে। বাইরেটা কেমন ছায়াচ্ছন্ন। তবুও বোঝা যাচ্ছে বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে সব। রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম বরষা। বাইরে অশোক, বকুল, শিরীষ, ভিজছে, দূরের ওই নারকোলগাছটা, ভিজছে। শহরতলীর এই অ্যাসবেস্টাসের চাল দেওয়া বাড়িটাকে জেঁট বলে মনে হচ্ছে প্রিয়তোষের। এক ঝলক ঠান্ডা জোলো বাতাস তাকে ভিজিয়ে দিল। কিলিক দেওয়া খাড়া বিদ্যুত নিগল আলোকিত হোল এক মুহূর্তের জন্যে—ঝড়ঝড় করে মেঘ ডেকে উঠলো। মিঠু আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল প্রিয়তোষকে। মিঠু এবারে প্রিয়তোষের কোলে বসে নেই—পেছনটায় প্রিয়তোষের পিঠ ঘেঁষে বসেছে। প্রিয়তোষের গায়ে বৃষ্টির ছাট এসে লাগছে। বেশ ভালই লাগছে। বৃষ্টির ছাট প্রিয়তোষের ভালই লাগে। ছোটবেলায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে মকুলে যেতো—ইচ্ছে করেই ভিজতো, কত বহুনি খেয়েছে মার কাছে—এখনও ভেজে। আরতি ভীষণভাবে কসিয়ে উঠলো। আওয়াজটা বিদ্রী শোনালো—কেমন যেন ভয় ভয় করল প্রিয়তোষের। ঘরের ভেতর থেকে মা অসুস্থ গলায় চিৎকার করে বলে উঠল—প্রিয়, ডাক্তার আসতে আর কত দেরী রে? বউমা যে আর সহ্য করতে পারছে না।

প্রিয়তোষ কোন কথা বলল না। একটা আগেই আরতির অবস্থা জানিয়ে কল দিয়ে এসেছে ডাক্তারকে। তা ছাড়া, অত ভয়ের কি আছে? এই তো প্রথম নয়।

প্রিয়তোষের মা আরও হেঁকে বলে

উঠলো—কান ডাক্তার ঠিক করেছি। রে? সতীশ ডাক্তার? ওর হাতে প্রসূতি বাঁচে না—আর কয়েকটা টাকা বেশি দিয়ে—

আরতি বিকট চিৎকার করে উঠল। প্রিয়তোষ একটু ভয় পেয়ে ঘরের ভেতরে মৃদুটা বাড়ালো। লাইট জ্বলছিল দেড়তরে। লাইটের আলোয় দেখল—আরতি এবারে চিং হয়ে পা ছাড়িয়ে শুয়েছে। অসুস্থ শরীর নিয়েই মা আরতির মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে বাতাস করছে। মাঝে মাঝে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আরতি বহুগায় থাকতে না পেরে কখনো কখনো দুহাতে নিজের পেট চেপে ধরছে—কখনও মা ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। প্রিয়তোষ বাইরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

সতীশ ডাক্তারকেই ঠিক করেছে প্রিয়তোষ। সতীশ ডাক্তার বয়স্ক, প্রবীণ, অভিজ্ঞ। তা ছাড়া ভিজিট কম। বাহ্যকাঁচ কম ভিজিটের মেয়েদের আর ডাক্তার নেই। এখানকার মধ্যে নামকরা বিলেত ফেরৎ গায়নাকোলজির ডাক্তার প্রণবের। মনোজ্ঞানী। বাড়িতে নিয়ে আসতে গেলে ভিজিট অনেক। শুধু সতীশ ডাক্তারই আসবে না—সংগে একজন মিডওয়াইফও থাকবে। তাকেও আলাবা করে টাকা দিতে হবে। সারাদিন ধরে প্রসব করানোর আনুষ্ঠানিক জোগাড় করেছে প্রিয়তোষ—গজ, রোরিক, তুলো, কাপড়ের পাড়, ডেটল, বাইফ, বয় সাবান, শিশুদের কলাইকরা বাথ টাব। এগুলো কিনতেই কি কম টাকা লেগেছে? এর ওপর ডাক্তার আর মিডওয়াইফের ভিজিট আছে—ওম্ম, ইনজেকশন কিনতে হতে পারে। বেশি টাকা দিয়ে ডাক্তার আনবার ক্ষমতা কোথায় তার? পাঁচ মাসের ওপর মাইনে পায় না—কারখানা বন্ধ। এই দুর্দিনের বাজারে সংসারটা বড় হয়েই চলেছে। এ কটা মাস কেমন করে চলেছে সে শুধু প্রিয়তোষই জানে। আরতি আর মাঝে এতটুকুও জানতে দেয় নি সো। ইউনিয়নের অফিস থেকে ধর্মঘটী কর্মচারীদের মধ্যে কোটো বিল করেছে পয়সা সংগ্রহের জন্যে। লাল হরফে কাগজে কোম্পানীর নাম ছেপে—লক-আউটের কথা উল্লেখ করে ছোট ছোট টিনের কৌটায় কাগজখানা লাগিয়ে রাস্তায় রাস্তায় জনসাধারণের কাছে ট্রামে-বাসে ঘুরে ঘুরে পয়সা সংগ্রহ করতে হয়েছে প্রিয়তোষকে।

বিয়ের আংটি, রোতাম আরাতির দু'গাছা চুড়ি, ছাঁকা কাসান দুটো, জামবাটি, একটা ভাল ঘড়া বন্ধক রাখতে হয়েছে। কখনো কখনো একবেলার রান্না

দু'বেলা খেতে হয়েছে। কেবল মিঠুর জন্যে মা হোক করে চারবেলার বারস্থা রাখতে হয়েছে—মিঠু শিশু। সংসারে বোধ হয় শিশুদের নিয়েই ঝামেলা বেশি। আরার শিশু না থাকলে, ছেলেমেয়ে না থাকলে সংসারকে সংসার বলেই মনে হয় না। এই তো পাশের বাড়ির ভূপেনদার, সংসার। স্বামী-স্ত্রী। আর কেউ নেই। কোন সন্তানই হয় নি তাদের—আর হয়তো হবেও না। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে—তা বছর পনেরো তো হবেই। অনেক মদলি, ওম্ম, টোটকা, মায় অপারেশন—কিছুই হয় নি। বেশ আছে। বাড়ি ঝাপটের সংসার। কিন্তু মাঝে মাঝে সংসার আছে বলে মনে হয় না—প্রাণ্ডিকের ফুল দিয়ে ফুলদানী সাজিয়ে রাখার মত। কিন্তু পয়সা না থাকলো ছেলেমেয়ে থেকেই বা সুখ কোথায়? এটা হাড় হাড় বদতে পারছে প্রিয়তোষ—আলাভাবে সংসার করতে হলে, ছেলেমেয়ে মানুষ করতে হলে পয়সা থাকা চাই। প্রিয়তোষের কত আর আশা? সর্বসাকল্যে একশো পাঁচশুর টাকায়, ওয়ারাইম খেতে আরও পঞ্চাশ-ষাট টাকা বেশি হয়। কিন্তু এতেই বা সংসার চলে কি করে? বাড়ি ভাড়া, মাসে চারটে রেশন—এর ওপর ঘুটে-কল্যা, দোকান-বাজার, মিঠুর দুখ, ধোপা-নাপিত, ইন্ডিয়ান ফ্যাশন, দৈনিক হাতখরচা। আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসা-যাওয়া করছে। লোক-লোকিকতা রয়েছে। আবার জিনিসপত্রের দাম দেখে—আকাশছোঁয়া। আজ চালা কিনে নিয়ে এলো আড়াই টাকায়—কালকেই দেখ সেটা তিন টাকায় উঠেছে। সরষের তেল কিনে নিয়ে এলো চার টাকায়—কালকে দেখ সাড়ে চার টাকায় উঠে গেছে। কোন জিনিসটা না! ডাল, মশলাপাত, কাঁচা আনাফ, মাছ। এমন কি মিঠুর জন্যে সোদিন সামান্য চিড়ে কিনতে গিয়েছিল প্রিয়তোষ—আড়াই টাকা কিনে দর বলেছিল। আজকে মায়ের জন্যে কিনতে গিয়ে দেখে তিন টাকায় উঠে গেছে। এ যেন ঠিক ট্যাঙ্ক মটার ওঠার মত। বাজার দরের মিসর করে দিলেই তো হয়! প্রিয়তোষ ভাবে, শুধু বাংলা দেশই নয়, গোটা ভারতের চেহারাই যেন হঠাৎ পালটে গেছে। গোটা পৃথিবীটাই ঝড়ের মত কিপ গতিতে ছুটে চলেছে—রেসের মাঠ ঘোড়দৌড়ের মত। রেস খেলাতে একবার গিয়েছিল সো। জিতে পারে নি সেবার। পরে জমতে পেরেছিল। মোড়া ধরার হিসেবটা তার ভুল হতোই।

তাদের মত লোকদের এ পৃথিবীতে বঁচে থাকা যাবে না। প্রমিষ্ট-চাষী, কেরাণী-মাস্টার সকলেই যেন লাঞ্জনায় সম্পৃক্ত। চারিদিকেই জটুগৃহ, চারিদিকেই প্রচণ্ড ক্ষুধার গহবর, সকলেই উপবাসী—অনির্বাপ খাণ্ডবের মত সকলের বুক-পেট—এ জীবন ছোট হয়ে এসেছে হ্যান্ডগেনেডের মত। বিয়ে তো সে করতেই চেয়েছিল না। বিয়ে করা তার কোন মতেই উচিত হয় নি। কিছুতেই না, কখনো না।

প্রিয়তোষের চোখে পড়ল ওই দারুণ বৃষ্টিতেই বাইরে দু'খানা রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। বদ্বতে পারল সতীশ ডাক্তার এসে পড়েছে—সংগে মিডওয়াইফও রয়েছে। রিক্সা থেকে পদা সরিয়ে দু'জনেই বাড়ির দিকে ঊঁকি মারছে। তাড়াতাড়ি করে একটা ছেঁড়া ছাতা নিয়ে এগিয়ে গেল প্রিয়তোষ। পায়ে বড় আর ধূতির ওপর কোট পরে সতীশ ডাক্তার চাউস একটা ব্যাগ হাতে ছাতা মাথায় দিয়ে প্রিয়তোষের সংগে বাড়িতে এসে ঢুকল। পেছনে পেছনে মিডওয়াইফও এলো লোডিজ ছাতা মাথায় দিয়ে—পরনে পরিষ্কার খপধপে সাদা শাড়ি, সাদা ব্লাউস, পায়ে পা-ঢাকা জুতো—তারও সংগে একটা ব্যাগ।

সতীশ ডাক্তার আরতিকে পরীক্ষা করেই মিডওয়াইফের সংগে কি যেন আলোচনা করল। মিডওয়াইফ সতীশ ডাক্তারের মতেই মাথা নেড়ে সায় দিল। তক্ষুণি গরম জল চাইল সতীশ ডাক্তার। আজ প্রিয়তোষ নিজেই রান্না করেছে—কদিন থেকেই করছে। গুমো গুমো আঁচ রেখেই দিয়েছিল সে উদ্ভবের ওপর করলা ছড়িয়ে।

তাড়াতাড়ি করে জল বাসিয়ে দিল। ঘুঝল প্রিয়তোষ—প্রসবের সময় হয়েছে। ডেটল, গজ, কাপড়ের প্যাড, বাথ টব, ছেঁড়া পরিষ্কার কাপড় এগিয়ে দিল সে ডাক্তারের কাছে। মিঠুটা একবার প্রিয়তোষের পেছনে পেছনে ঘুরছে, একবার ঠাকুরার কোলে গিয়ে বসছে, একবার আরতির কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। সতীশ ডাক্তার বড় বড় দুটো বরসেপ, একটা কাঁচি, হাতে পরবার গ্লাভস, ওষুধ, ইনজেকশনের বড় একটা সিরিঞ্জ বার করল ব্যাগ থেকে। প্রিয়তোষের মা আর মিঠু দেখাছিল অবাক হয়ে। প্রিয়তোষ তাড়াতাড়ি করে সমস্ত কিছু জোগাড় করে দিয়ে মিঠুর কাছে এসে দাঁড়াল। হঠাৎ গম্ভীরভাবে মিডওয়াইফ প্রিয়তোষকে বাইরে যেতে বলল মিঠুকে নিয়ে। প্রিয়তোষ তক্ষুণি মিঠুর হাত ধরে বাইরের রকে চলে এলো। মিডওয়াইফ ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল। প্রিয়তোষ মিঠুকে নিয়ে

ভাঙা নড়বড়ে তক্তাপোষটার ওপর উঠে এসে বসল।

সন্ধ্যা উত্তরে গেছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। বাইরের লাইটটা জেরলে দিল প্রিয়তোষ। বৃষ্টির বিরাম নেই, সমানে পড়ে চলেছে—ঝম্ ঝম্ ঝম্। মুষলধারে পড়ছে। ভাবল প্রিয়তোষ, বিয়ে না করেও যে অস্বাভাবিক ছিল, মনের মধ্যে যে অস্থিরতা ছিল, অশান্তি ছিল, বিয়ে করেই বা তা গেল কোথায়? স্বেভায়াস্তি কোথায়, স্থিরতা কোথায়, শান্তি কোথায়? সংসারে আবার আর একটা মানুষের সংখ্যা বাড়ল আজ থেকে। কি করে সংসার চলবে বৃষ্টিতে প্যরছে না। এতদিন যা হোক করে চালিয়েছে। কারখানা কবে খুলবে তার কিছু ঠিক নেই। খুললেও তার যে চাকরি থাকবে তার কিছু নিশ্চয়তা নেই। আরতিকে ভাল চীনক খাওয়াতে হবে, একটু দুধ খাওয়ানো দরকার, কিছু ফলমূল, মাখন। অন্তত কয়েকটা মস। তা না হলে রোগে ধরে যাবে। এর ওপর বাচ্চটার ভাবনাও রয়েছে। অয়েল রুথ, মধু, মিছরি, বেবীফুড জোগাড় করা। বেবীফুড বাজারে মেলে না। আবার ছেলে হলে এক চিন্তা, মেয়ে হলে আর এক। মিঠুটাকে নিয়েই তার কম চিন্তা? এখন থেকে স্ক্যাপা কুকুরের মত ঘুরতে হবে টাকার জন্মে। ভাবল প্রিয়তোষ, গর্ভের শিশু কত নিশ্চিত! যতক্ষণ পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ না হচ্ছে ততক্ষণ পরম নিশ্চিন্তে আছে শিশু তার মায়ের গর্ভে। এ পৃথিবীর আলো দেখেই তো কেঁদে উঠতে হবে। এই মূহুর্তে প্রিয়তোষ নিজেকে শিশু মনে করল। গর্ভের বাসিন্দা ভাবতে ভাল লাগল। কোন যন্ত্রণা নেই, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-শোক কোন কিছুই নেই। খালি ঘুম—অকাতরে ঘুম—প্রগাঢ় ঘুম—ঘুম না তো যেন প্রশান্তি। সমুদ্রের গভীর তলদেশের মত শান্ত স্থির। পৃথিবীর মানুষের ঘুমের মধ্যেও অশান্তি। গর্ভ থেকে শিশুর বোরিয়ে আসার সময় হলে মাকে যেমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, সংগে সংগে শিশুরও যন্ত্রণার সূত্রপাত হয়। বোরিয়ে আসতে চায় সে এই পৃথিবীর আলোতে। বহুবিনের বহুকালের ধ্যান ছুটে যায়—কেঁদে ওঠে শিশু অপরিচিত জগৎ দেখে—হয়তো বৃষ্টিতে পারে সে, এ জগৎ যন্ত্রণার জগৎ, এ জগৎ লড়াই করবার জগৎ—তাই বোধ হয় অমন করে কেঁদে ওঠে সে পেট থেকে পড়েই। কিন্তু এ পৃথিবীতে আলো কোথায়? প্রতিদিন সূর্য ওঠাটাই কি আলো? হঠাৎ সিরসির করে উঠল প্রিয়তোষের গাটা। কি যেন চলে বেড়াচ্ছে ঘাড়ের ওপর।

তক্ষুণি হাত দিয়ে ঝটকা মেরে ফেলে দিল সে। একটা বড় মাকড়সা—লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য, মাকড়সাকে দেখলেই প্রিয়তোষের কেন যেন অকটোপাসের কথা মনে পড়ে যায়—যদিও কোন মিলই নেই চেহারায়। চলাটার মধ্যে বোধ হয় মিল খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সত্যিকার অকটোপাস দেখেই সে কখনও—দেখেছে ছবিতে—আর, আর—হ্যাঁ—আর দেখেছে সিনেমায়—ইংরেজী ফিল্মসে—টয়োন্টি থাউজেন্ড লীগ বিনিথ বি সী—

চমকে উঠল প্রিয়তোষ। অরাক হয়ে তাকিয়ে দেখল তার রক্তমা মা কোন ফাঁকে বোরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। মুখখানা থমথমে। প্রিয়তোষ কতকটা অস্থির আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠে জিগোস করে উঠল—কি খবর মা? এখনও হয়নি?

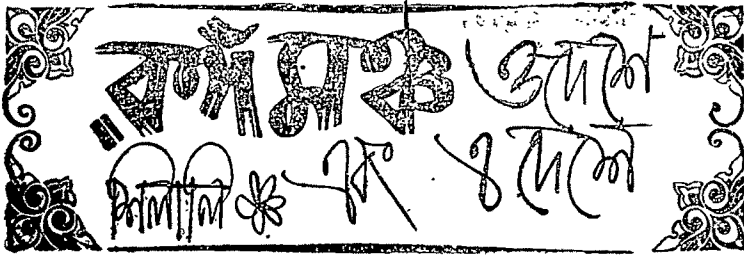
ঈষৎ বিষন্ন গলায় জবাব দিল প্রিয়তোষের মা—হয়েছে।

—কালো শুনলাম না তো?

—কাঁদবে কি? আরতি একটা মরা ছেলে প্রসব করেছে।

অশ্রুট আহত কণ্ঠে বলে উঠল প্রিয়তোষ—ম—মরা ছেলে!

রক্তের চাপটা যেন হঠাৎ নেমে গেল প্রিয়তোষের। স্নান দরজার ফাঁক দিয়ে তাকাল একবার সে। মৃত শিশু পড়ে আছে কাপড়ে জড়ানো, কেবল মুখখানা বোরিয়ে রয়েছে। ঘরেতে ডেটল আর নানারকমের ওষুধের তীর গম্ব। রক্তমাথা কাপড়। আরতি ক্রান্ত, প্রায় বেহুশ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সতীশ ডাক্তারের মুখখানা গম্ভীর, মিডওয়াইফেরও মুখখানা ভারাক্রান্ত। ডাক্তারী সরঞ্জামগুলো ব্যাগের মধ্যে ভরে নিতে ব্যস্ত তারা। মৃত শিশুটির দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ খানিকটা কেঁপে উঠল। আহত অনিমেষ চোখে চেয়ে থাকল খানিকক্ষণ। স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া করবার আর কিছুই নেই। কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, ভাল-মন্দ কিছুই আন্দাজ করতে পারল না সে সেই মূহুর্তে। প্রিয়তোষের মনে হোল, শিশুটি তার মায়ের গর্ভে যেমনটি ছিল, তেমনই পরম নিশ্চিন্তেই ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে থাকতেই সে চেয়েছিল, না কি এ পৃথিবীর যন্ত্রণার বলি হয়ে কটাক্ষ করে হাসছে সে? কেবলি হাসছে—হাসছে—হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ—যেন এ পৃথিবীর মানবিক সব অভিশাপ নিমেষে হয়েছে নষ্ট। পড়ে রয়েছে হিম মৃত্যুময় বরফের স্তূপ। প্রিয়তোষের ঠেতনো মহানদীর বান ডেকে উঠল—সেই বানে ভেসে চলল হাজার হাজার সরীসৃপ অজগর



জার্মান থিয়েটার :

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জার্মান থিয়েটার : গায়টের রচনা ভাই-মারের খুবক ডিউককে মুগ্ধ করে। ডিউক কার্ল অগাস্ট ছিলেন সে সময়কার জার্মানীর অনেক ছোট ছোট প্রিন্সদের মধ্যে অন্যতম। তিনি গায়টেকে ভাইমারে আসবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। বয়সে তিনি গায়টের থেকে আট বছরের ছোট ছিলেন এবং সুযোগ খুঁজছিলেন কিভাবে এই বিখ্যাত সাহিত্য-শিল্পীর সঙ্গে আলাপ করা যায়। প্রথমটায় ঠিক ছিল গায়টে অপরাধিনের জন্য ভাইমারে এসে থাকবেন—instead it became a life task.

১৭৭৬ সালে গায়টে ভাইমারে এসে হাজির হলেন। এটি ছিল একটি ছোটখাট জমিদারীর মত—এর সমগ্র জনসংখ্যা ১০০,০০০-এর বেশি ছিল না। আর শহরে লোক ছিল মাত্র ১০০০। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিউক কার্ল অগাস্ট ভাইমারকে জার্মানীর ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপিটাল হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। কারণ, তখনকার জার্মানীর সেরা প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব ডিউকের সাদর আমন্ত্রণ এবং অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়ে ভাইমারে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। গায়টে ছাড়া আর যারা এসেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন ভাইল্যান্ড, হার্ডার এবং শিলার।

শাসন সংক্রান্ত অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজে ডিউককে সাহায্য করতে হোত গায়টের। এর ফলে নানা বিষয়ে তাঁর মনের প্রসার এবং বাস্তবজ্ঞান বেড়ে যায়—কিন্তু সেই সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির অবসরও কমতে থাকে। এর বছর দশেক বাদে গায়টে ইটালী বেড়াতে যান (১৭৮৬-৮৮)। দীর্ঘ ইটালীয়ান জার্নি বইতে কবি তাঁর এই সফরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন (১৮১৬-১৭)। এই সফরের পর তাঁর রচনায় একটা বিরাট পরিবর্তন আসে—হার্ডারের পভাবমুগ্ধ হয়ে তিনি রচনা-ধারার ক্লাসিকাল গঠনের দিকে ঝুঁক পড়েন। তাঁর মনের এই পরিবর্তন তখনকার রচিত অনেকগুলি নাটকে প্রতিফলিত হয়।

১৭৮৮ সালে তাঁর রচিত গদ্য নাটক 'এগমন্ট' দেখা যায় হার্ডারের প্রভাব অপসারিত হচ্ছে এবং ক্লাসিসিজম মাথা-

চাড়া দিয়ে উঠছে কবির রচনায়। স্পেনের বিরুদ্ধে নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ এবং নেদারল্যান্ডের এক বীর সন্তানের চরিত্র নিয়েই নাটকটি লিখেছিলেন গায়টে। লেখার স্টাইল ট্র্যানজিশনাল। 'এগমন্ট' নাটকটি আর এক হিসাবেও বিখ্যাত। এতে গায়টে এবং বেটোফেন একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে জেরিম লেন লিখেছেন: 'In 1810 Beethoven worked on the incidental music to Goethe's "Egmont", a play that treated the theme of national liberation in the Netherlands and not in Germany. This brought him into contact with Goethe, the supreme writer of his day in Germany. Beethoven wrote to Goethe that he would soon receive the music for "Egmont", and he said—"I would like to hear your judgement. Criticism would be of profit to myself and my art and would be received as readily as the greatest praise." For Beethoven to write something like that, even to Goethe, showed a very high degree of admiration. In 1812 they met. Goethe said later—"His talent amazed me. Unfortunately he is a completely untamed person, not entirely wrong in regarding the world as detestable, but with an attitude that does not make it more enjoyable, either for himself or for others...."

'ঈফজেনিয়া ইন্ টাউরিস' নাটকটি গায়টে আগে গদ্য রচনা করেছিলেন। ১৭৮৭ সালে এটির সংস্কার করে নাটকটিকে ক্লাসিকাল কাব্য-নাটক রূপায়িত করলেন। ইটালিয়ান কবি টাসোর জীবনী নিয়ে আর একটি ক্লাসিকাল কাব্যনাট্য লেখেন গায়টে ১৭৯০ সালে—এটি একটি অসাধারণ নাটক। ১৭৯০ সালে গায়টে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ফাউস্টের অংশবিশেষ প্রকাশ

করেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ফাউস্ট প্রকাশিত হয় কয়েক বছর বাদে—প্রথম ভাগ ১৮০৮ সালে এবং দ্বিতীয় ভাগ ১৮০৯-এ। ইটালী থেকে ফিরে আসবার পর ভাইমারে গায়টের জীবন খুব ঘটনাবহুল নয়। সরকারী কাজকর্ম থেকে তাঁকে প্রায় অব্যাহতি দেওয়া হয়—অবশ্য আরও পঁচিশ বছর ধরে তিনি কোর্ট থিয়েটার পরিচালনা করেন। শিলারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয় ১৭৯৪ সালে এবং এর সমাপ্তি ঘটে ১৮০৫ সালে শিলারের মৃত্যুতে। এ বন্ধুত্ব দু'জনেরই নানাদিক থেকে উপকার হয়।

গায়টের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে বেশ বিচ্ছিন্নভাবে এবং নিজস্ব জীবনযাপন করতে হয়। তাঁর যশ এবং খ্যাতি এ সময় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সবাই তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ, সবাই তাঁকে অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু সত্যিকার বন্ধু এ সময় তাঁর কেউ ছিল না। থাকবেই বা কোথা থেকে—সমতুল প্রতিভাবান লোক না পেলে তো আর সত্যিকার বন্ধু হতে পারে না। সমসাময়িক লোকেরা এই সময় গায়টেকে অলিম্পিয়ান হাইটে তুলে দিয়েছেন—তিনি সেই উচ্চশিখরে উঠে তো আর নিচে নেমে এসে সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে পারেন না। জীবনের শেষ চরিত্র বছর তাঁর পক্ষে খুব সজ্জনশীল এবং ফলপ্রসূ হয়েছিল। শিক্ষা প্রসারের ব্যাপারে রণে মগ্ন কি বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা নিয়ে উপন্যাস লিখলেন 'উইলহেলম্ মাইস্টারস এ্যাপ্রেনটিসিসপ্' (১৭৯৫-৯৬)। একই আদর্শে ১৮২১-২৯ সালে রচিত হল 'উইলহেলম্ মাইস্টারস্ জার্নিয়ান ইয়াস'। এর পরেও তাঁর বহু প্রেমকাব্য, জীবনী ইত্যাদি ক্রমাগত প্রকাশিত হতে থাকে। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত ফাউস্টের দ্বিতীয় ভাগের কিছু অংশ কাব্যরসে ভরপুর হয়ে রচিত হয় এবং তাঁর মাস্টার-পিসকে সর্বোৎসাহিত করে সৃষ্টি করেন গায়টে।

মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই বিশ্ব-সাহিত্যে গায়টের একটা বিশেষ স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, এটা 'বিশ্বসাহিত্য' কথাটিও গায়টেরই আবিষ্কার। তাঁর রচনাব্যবস্থার অনুবাদ শুরু করেন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকেরা—যথা 'কার্ল হিল, স্কট, জেরার্ড' দ্য নার্ডেল পমথ।

He is now generally admitted to be the most recent writer who can confidently be placed in the class of the supremely great—the class of Homer, Dante and Shakespeare.

এই নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে একটি মধ্যযুগীয় কাহিনী গড়ে উঠেছিল। যোহান শতাধীর এক ভ্রমণকারী যাদুকর ইয়োহান ফাউস্ট (১৪৮৮-১৫৪১)। কিংবদন্তী ছিল যে, অলৌকিক ক্ষমতা লাভের জন্য তিনি শয়তানের কাছে নিজের আত্মাকে বিক্রি করেছিলেন। এই কাহিনী ফ্র্যাঙ্ক-ফার্টে একটি চ্যাপবুক বা প্রচার পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় ১৫৮৭ সালে এবং এর পর ইংল্যান্ডে এর ইংরাজী অনুবাদ করা হয়। ইংরাজী অনুবাদটির বিষয়বস্তু নিয়েই ক্রিস্টোফার মারলো (১৫৬৪-৯০) তাঁর বিখ্যাত নাটক দি ট্রাজিক্যাল হিস্ট্রী অফ ডক্টর ফাস্টাস (১৫৮৮) রচনা করেন।

ফরাসী সমালোচক এমিল লেগুই মারলোর নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'Marlowe divided the German Legend of Faust, as he had read it, into scenes. His forceful egoism is projected into the character of the necromancer who vows himself to the devil in return for sovereign knowledge and sovereign power, and who is thus able for twenty-four years to satisfy his appetites. They are poor and coarse enough in the legend, leading him mainly to play practical jokes on the great ones of his day, the pope and the cardinals, and to make poor wretches the butt of his magic. Marlowe takes little interest in these distractions, which he barely outlines. But when Faustus evokes the spirits of the past and obtains a vision of the Greek Helen, the poet, imagining her supreme beauty, is rapt to incomparable lyricism.

Retribution follows: Faustus has to keep his bargain with Lucifer, and tremblingly awaits death and hell. Marlowe, the atheist, alone in a Christian world, must also, at times, have felt to the full the horror of his denials and his blasphemies. He was too near faith to be indifferent. The very vehemence of his profes-

sions of impiety was a sign that his emancipation was incomplete. He shook his fist at heaven and feared at the same moment that heaven might fall and crush him. The last scenes of Faustus are among the most pathetic and most grandiose in Renaissance drama. They stand by themselves distinct from all the rest of the drama. They are unsurpassable, even by Shakespeare. Marlowe, incapable of a complete masterpiece, yet had genius to reach here and there, the sublime beauty which has no degrees. When Goethe took the same legend for the basis of one of the Chief accomplishments of modern poetry, he could not eclipse the poignant greatness of his forerunners scenes. He, who did not know how the impious tremble, could not recapture that anguish of horror.

সত্যিই মারলোর এগো-ইজমের প্রতিফলিত রূপায় দেখা যায় ডক্টর ফাস্টাসের চরিত্রে। তাঁর আগেকার নাটককারেরা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যবহার করেছেন জোনোভাবে—তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। মারলো তাঁর ব্র্যাঙ্কভাসকে পৌরুষপূর্ণ, ধর্মনিময় এবং প্রাণবন্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ট্যাম্বারলেন থেকে শব্দ করে তাঁর সমস্ত নাটকই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তা ছাড়া ক্রমশই তাঁর মধ্য সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং সে জ্ঞানকে তিনি পূর্ণভাবে কাজে লাগাচ্ছিলেন নাট্য রচনায়। তাঁর কাব্যিক প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। ডক্টর ফাস্টাসের শেষ দৃশ্যাঙ্কটি একদিকে বিষাদ-ঘন—আবার অন্যদিকে অপূর্ণ মাহাত্ম্য-মণ্ডিত। শেক্সপীয়ারের রচনাও এ সব দৃশ্যকে ছাপিয়ে উঠতে পেরেছে, একথা বলা চলে না। অত অল্প বয়সে মারা না গেলে তিনি যে শেক্সপীয়ারের সমকক্ষ হয়ে উঠতেন না, একথা বলা যায় না। হ্যাঁ, তিরিশ বছর পূর্ণ হবার আগেই একটি পাল্শশালায় কয়েকটি গুঁড়া প্রকৃতির লোকের সঙ্গে ঝগড়া এবং মারামারির ফলে মারলো মারা যান। অবশ্য নিজেও তিনি উগ্রস্বভাবের লোক ছিলেন। তবে ভীকে যে গ্লান করে হত্যা করা হয়েছিল, এ বিষয়ে আজ আর বিশেষ বিবর্ত নেই। একদিকে তিনি ছিলেন নাস্তিক—তা

হাজার তাঁর শিকড় মার্কিন এগো-ইজমের ছিল। তাঁর হত্যাকাণ্ডের বস ফাইলার। ফাইলারকে সাহায্য করেছিল শেক্সপীয়ার এবং গুপ্তচর রবার্ট পোলী। শেক্সপীয়ারের ওপর মারলোর প্রভাব বড় কম নয়—গ্যুরটেও ফাউস্ট লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ডক্টর ফাস্টাস পড়ে।

এ্যালানডাইন নিকল্ তাঁর 'ওয়ার্ল্ড ড্রামা' বইতে স্বীকার করেছেন যে, শেক্সপীয়ারের তুলনায় মারলো এবং শেক্সপীয়ার একই বছরে জন্মেছিলেন মারলোর অন্তরের পাবকশিখা ছিল বেশি উদ্দীপ্ত—শেক্সপীয়ারের প্রতিভার বিকাশ হয় ধীরে ধীরে এবং এই প্রতিভার পূর্ণ প্রস্ফুটনে সময় লেগেছিল, তবে বিকশিত হবার পর সে প্রতিভা দুই দশক সমভাবে প্রজ্জ্বলিত ছিল। মারলোর প্রতিভা বেশ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল শব্দ থেকেই, কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি।

"It burned too fiercely to have lasting qualities"—মন্তব্য করেছেন নিকল্।

মারলোর পর ফাউস্ট-কাহিনী ইংরাজ কমেডিয়ানদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে হতে আবার এর জন্মস্থান জার্মানিতে ফিরে আসে, অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি একে চন্দ্র রাধা হয় জনপ্রিয় প্যাপেট-শো-এ। কাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে একে ফের রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেন লেসিং ১৭৫৯ সালে। ফাউস্টের ভেতর লেসিং যেন নিজের জীবনের সমস্যার খোঁজ পেয়েছিলেন—

That of a scholar's enquiring mind in conflict with the limits imposed by the almighty.

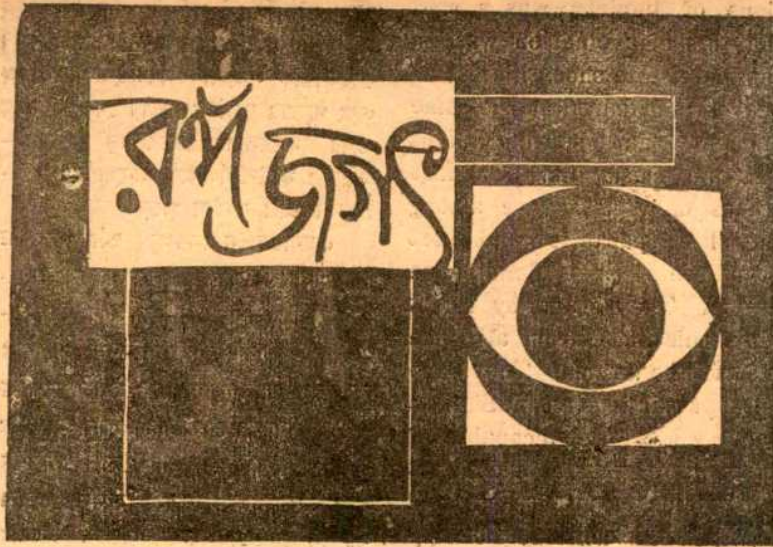
[কম]

কিন্তুতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ৫ টাকা
কিন্তুতে ৪ ব্যাণ্ড
অল ওয়াল্ড ব্যাণ্ড
স্প্রেড 'ন্যাশানাল'
ট্রানজিস্টার এখন
পাওয়া যায়। প্রতি শহরে এবং গ্রামে
পাঠানো যায়। আবেদন করুন:

VIJAY SALES (W.B.C.)

Arjun Nagar, Yusuf Sarai,
New Delhi



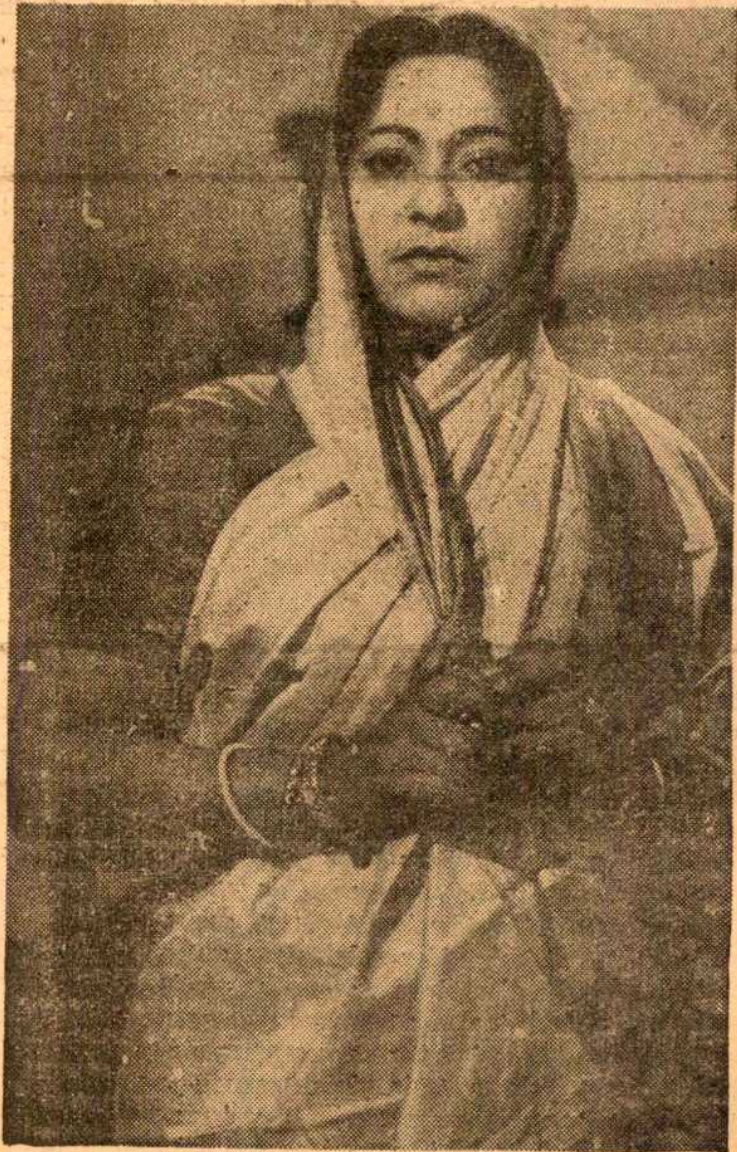
এই সাংস্কৃতিক আক্রমণ চলছে। সিনেমা-
গুলিতে মিনি স্কার্ট আর স্ট পেরা
ছেলেমেয়েদের অবাধ কৌলির দৃশ্য দেখে
বেধে সারা জগতে এক সংক্রামক রোগের
মত এই মিনি ফ্যাশান ছড়িয়েছে।
প্রত্যেক দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক
ঐতিহ্য ও রীতিনীতি ভুলে ঐতিহ্য-
বোধহীন তরুণ-তরুণীরা মিনির শিকার
হচ্ছে। ভারতে কিছ কিছু শাড়ীপড়া
মেয়ে মিনির অনুকরণে মেতেছে। এদের
প্রধান প্রেরণা অবশ্য সিনেমার নায়ক-
নায়িকারা। পর্দায় 'তারকা'দের নাভির
নিচে নামিয়ে কাপড় পরতে দেখে—তাকে
অনুকরণ করার জন্য প্রলুব্ধ হয়। পথ-
চারীদের নিজের নাভিদেশ দেখিয়ে দেহ
প্রদর্শনীর এক বিকৃত বাসনায় অনেককে
পেয়ে বসেছে। এই বিকৃত মানসিকতা

মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব

এক সংবাদে প্রকাশ, সিংহলের
সর্বোচ্চ পরিষদ মিনি স্কার্ট নিষিদ্ধ করার
সুপারিশ করেছেন। সিংহলের সরকারী
মহল থেকে এ খবর জানা গেছে। প্রধান-
মন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক
নিষুক্ত এই পরিষদ বলেছেন যে, সিংহলে
মেয়েদের অশোভন ও নীতিবিগর্হিত
পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান থেকে নিবৃত্ত
করা উচিত।

মিনি স্কার্ট কেবল সিংহলের মেয়ে-
দের মনে নেশা ধরায় নি, পৃথিবীর সব
দেশেই কমবেশী মিনির প্রভাব দেখা
যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো
মিনি স্কার্ট নগ্নতার পর্যায়ে পৌঁছেছে,
তার প্রভাব চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড
ও সোভিয়েতের মত সমাজতান্ত্রিক
দেশেও দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের
মিনি সম্পর্কে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে
যাওয়া হয়েছে, ইংল্যান্ডে গিয়ে সব দেখ,
কিন্তু সেখানকার মেয়েদের পোষাক অনু-
করণ করো না। অথচ যুদ্ধপূর্বকালে
এই ইংল্যান্ড রক্ষণশীল দেশ বলে
পরিচিত ছিল। আজও রক্ষণশীলরা
ভোটে জেতে।

মিনি স্কার্টের মূল রয়েছে ধন-
তান্ত্রিক সভ্যতার সংকট। ধনতান্ত্রিক
সমাজব্যবস্থা অতি দ্রুতগতিতে ভেঙে
পড়ছে, দেশে দেশে মানুষ নতুন
সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার জন্য আস্থার
হয়ে উঠেছে। নতুনকে পথ ছেড়ে না
দিয়ে ধনতন্ত্র মরণ কামড় দিয়ে
মৃত্যুর সংকট সৃষ্টি করছে। শৃঙ্খ-
লাভের জন্য, কম্বোডিয়ায় বোমাবর্ষণ
নয়, প্রত্যেক দেশের সংস্কৃতি ও নৈতিক
হুলোবোধকেও ভেঙেচুরে দেবার চেষ্টা
করছে। সিনেমার মাধ্যমে ধনিকশ্রেণীর



'জনতার আদালত' ছবিতে সন্ধ্যারানী। পরিচালক মধু কর

বিজাতীয় ফ্যাসনের প্রধান প্রচারক
সিনেমা।

সিংহলে শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দর-
নায়ক এই বিকৃত ফ্যাসানের বিপদ
সম্পর্কে যে সচেতন তা বোঝা যাচ্ছে।
কিন্তু ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর
সরকার কি বলেন? তাঁরা কি মার্কিন
সিনেমাগুলিকে অবাধ প্রদর্শনের সুযোগ
দিয়ে বিকৃত ফ্যাসনের পথ খোলা
রাখবেন?

—সুজন।

চিহ্ন আলোচনা

মা আউর মমতা

বোম্বাইর সুচিরা কলা মন্দিরের “মা
আউর মমতা” কলকাতায় মন্ডিলাভ
করেছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন
বাংলার খ্যাত পরিচালক অসিত সেন।
বক্তব্যের দিক থেকে ছবিটি অভি-
মন্দনীয়। বিশেষ করে যখন স্বাধীনতার
বাইশ বছর পরেও প্রতি বছর কোন না

কোন রাজ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-
হাঙ্গামা হচ্ছে। এখনো ধর্মের ভিত্তিতে
মানুষকে বিভাচার করা হচ্ছে—সে সময়
“মা আউর মমতা” দর্শকদের কাছে একটা
বলিষ্ঠ বক্তব্য নিয়েই উপস্থিত হয়েছে।
এই ছবির নায়িকা হিন্দু কুমারী, তার
পালক পিতার একজন মুসলমান ট্যান্সি
ড্রাইভার, সন্তান খুস্টান। এই তিনজনকে
কেন্দ্র করেই ছবির নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টি
হয়েছে মাহুদয়ের মমতায়।

মায়ার স্বপ্ন ছিল তার মনের মত
মানুষের সঙ্গে সংসার গড়ে তোলার।
কিন্তু ফাদার হেনরী গভীর রাতে
তার হাতে তুলে দিল এক শিশু। এই
শিশুকে নিয়ে অপবাদের অপমান মাথায়
নিয়ে সে বোম্বাই এসে আগ্রয় পেল
মুসলমানের বাড়িতে। শিশুটির
নাম হলো রাম। একদিন মায়ী জানতে
পারলো, যার বাড়িতে সে নার্সের কাজ
করে, সেই উইলিয়মের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র
রাম। মাহুদয়ের বেদনা সত্ত্বেও রামের
ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সে উইলিয়মের
কাছে জানালো রামকে গভীর রাতে
পাবার কথা। কিন্তু উইলিয়ম তাকে
ভুল বুদ্ধলো। শেষ পর্যন্ত ফাদার
হেনরী এসে সব মীমাংসা করে দিল।

ছবিতে মাহুদের মাধুর্য ও মমতায়
এক কুমারী নারী কিভাবে নিজের সুখ,



মুকার্ভিনয়ে তপন দত্ত

ভবিষ্যৎ বিসর্জন করে পরের ছেলেকে
মানুষ করলো, তার মহত্বকে ফুটিয়ে
তোলা হয়েছে। এই কাহিনী দর্শক-
মাগেরই ভাল লাগার কথা।

কিন্তু হিন্দী ছবির ছক এবং
মনোরঞ্জনী বিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায়,
পরিচালক বাস্তববোধের সঙ্গতি রক্ষা
করতে পারেন নি, ঘটনাবলীর
ঘোড়িকতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উপস্থিত
হয়েছে। গতানুগতিক মনোরঞ্জনের দিকে
আরো কম প্রাধান্য দিলে ছবির বিষয়-
বস্তু দর্শক-মনে বেশি রেখাপাত
করতো। এই ছবিতে ভাঙরা নাচ,
নৌকাবিহার গান থেকে কাংগালি
পর্যন্ত সবই রয়েছে। পরিচালক
অসিত সেন বোম্বাইয়েই দৃশ্যাবলীকে
কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়ে-
ছেন। বোম্বাইয়ের পারিপার্শ্বিক
অবস্থার দৃশ্যাবলী তিনি চমৎকার
উপস্থিত করেছেন, যা অন্য কোন
পরিচালকের দৃষ্টিতে এত সুন্দরভাবে
দেখা যায় নি। বাস্তবের দিক থেকে
সঙ্গত না হলেও, জাঁকজমকপূর্ণ সেট,
রঙিন দৃশ্যাবলী, নাচ, গান ও জনপ্রিয়
তারকা সম্মেলনে যারা মনোরঞ্জনী
ছবি পছন্দ করেন তাঁদের ভাল লাগবে।

ছবিতে অভিনয় করেছেন অশোক-
কুমার, নতুন, মমতাজ, জীতেন্দ্র, রেহমান,
জয়লত, শবনম, নিরুপা রায়, লীলা
মিশ্র, কেণ্ট মদুজারী প্রমুখ। মায়ার
চরিত্রে নতুনের অভিনয় অভিনন্দনীয়।
লক্ষ্মীকান্ত-প্যারেলাল প রি চা লি ত
গানগুলি সুগীত এবং চিত্র গ্রহণ
চমৎকার।



‘দুটি মন’ ছবিতে সুপর্ণা

সুডিত্তি খবর

ঐতিহ্যিক ঘটকের ছবি

রোম ভ্রমণের পর সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করে সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ঐতিহ্যিক ঘটক মাত্র চার মাসের মধ্যে শূন্য ফিল্মসের পতাকাতলে তিনখানি স্বল্পদীর্ঘ ছবি শেষ করেছেন। প্রথম ছবিটি পুরুলিয়ার লোকনৃত্য ছৌ সম্পর্কে। দ্বিতীয়টির নাম "আমার লেনিন" এবং তৃতীয়টি বিশেষভাবে ফরাসী টেলিভিশনের জন্য নির্মিত রঙীন ছবি, যার নামকরণ এখনও হয় নি।

বাংলার সামসাময়িক চিত্রশিল্পীদের নিয়ে গ্রীষ্মক ভার পরবর্তী ছবি করতে যাচ্ছেন। নাম "আনন্দ বেদনা"। একই সঙ্গে আর একখানি ছবি করছেন ঐতিহ্যিক লোকশিল্পের ওপর, নাম "নীরবতার ভাষা"। দুটি ছবিই, হলুই বাহুল্য রঙীন এবং "চিত্রবহা" চিত্র সংস্কার পতাকাতলে নির্মিত হচ্ছে। প্রযোজনা করছেন শ্রীঅমিতাভ রায়, যার সদ্য নির্মিত হিন্দী ছবি "গুপ-চুপ।" পরিচালক শ্রীদেবকুমার বোস।

এই দুটি আকর্ষণীয় ছবি নির্মাণে ঘটক-রায় জুটিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী, কবি বিষ্ণু দে, ভাষাবিদ বিনয় রায় এবং লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ স্কলার ডি. পি. ঘোষ। যশ্বেশ্বর কলীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবিগদ্যলি সম্পাদনা করার কথা। সুরারোপ করতে পারেন আলী আকবর খাঁ এবং রবিশঙ্কর।

ঘর ঘর কি কহানী

সুন্দর বাড়ি, পরিপাটি করে গাজনো বাসরঘর; বলরাজ সাহানী ঘর নিরুপা রায় উপস্থিত হলেন ওমপ্রকাশ আর শশিকলার ঘরে। এই দৃশ্যের ছবি তুললেন মাকাস বাটলে। বিজয় বাওহানি, স্টুডিওর বি. লেগী রোড প্রযোজিত ছবি 'ঘর ঘর কি কহানী'র এটি একটি দৃশ্য। একজন সাধারণ গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী নিয়ে ছবির চিত্রনাট্য। পরিচালনা করছেন টি. প্রকাশরাও। এই ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করছেন কল্যাণজী-আনন্দজী।



বর্ধমান রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'চন্দালিকা' নৃত্য-নাট্যের একটি দৃশ্যে মা ও প্রকৃতির ছানিকায় স্বপ্না সেনগুপ্তা ও কৃষ্ণা রায়।

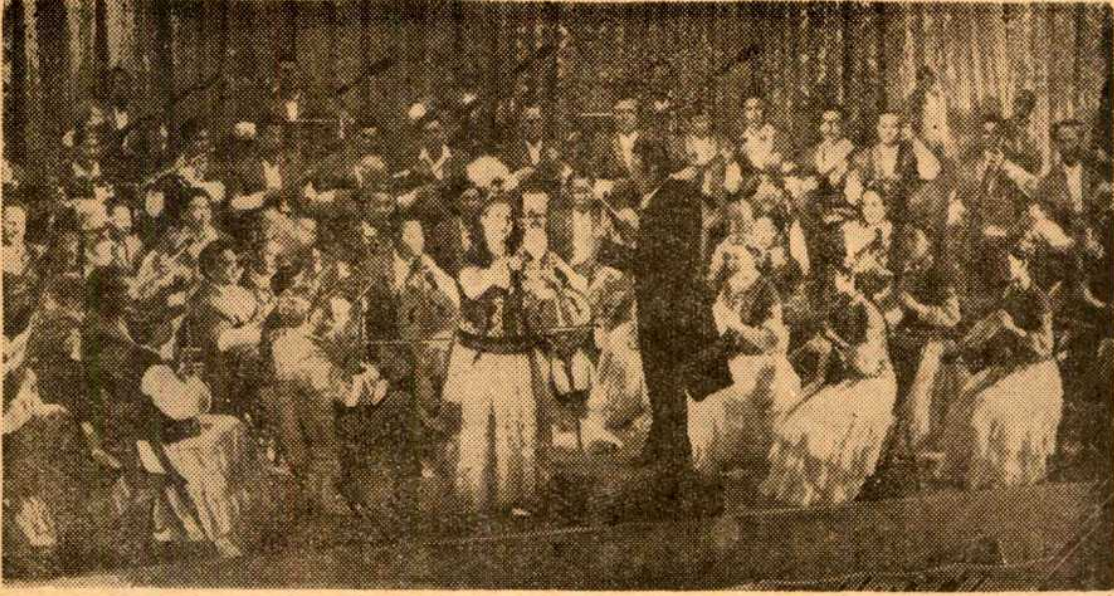
সংবাদ কলা

সোভিয়েতে অপেরা দর্শক

গত বছর সোভিয়েতে অপেরা দর্শকের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। সোভিয়েত সাংস্কৃতিক মন্ত্রী দত্তরের পরিচালনাধীন সঙ্গীতবিষয়ক ব্যবস্থাপনার উপ-প্রধান স্টেপান মিরোনভ বলেছেন, "সোভিয়েতে ইউনিয়নে ৩৮টি অপেরা গৃহ আছে। এগুলি ১৫টি ইউনিয়ন রিপাবলিক ও স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে। সব থেকে বড়

মস্কোর বলশই থিয়েটার, যার আসন-সংখ্যা ২,১০০। বলশই থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'শতাব্দী পূর্বে। এই থিয়েটার ঐতিহাসিক সম্পদ এবং উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত এবং মঞ্চনৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত। বলশই থিয়েটারের অন্তর্ধান নব নির্মিত কংগ্রেসসমূহের ক্রেমলিন প্রাসাদেও অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে আসনসংখ্যা ৬ হাজার। সোভিয়েতে ইউনিয়নে এটি সর্ববৃহৎ প্রেক্ষাগৃহ।

লেনিনগ্রাদের কিরভ অপেরা এবং ব্যালে থিয়েটারের খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। অন্যান্য বড় অপেরা হাউসগুলি হচ্ছে নভোসিবিস্ক, কুইবিশেভ, স্ভার্ড-লভস্ক, ওডেসা, কিয়েভ এবং খারকভ। জার্মানার সর্বপ্রাচীন অপেরা



কুরখানগাজার নামানুসারে কাজাক লোক বাদ্যযন্ত্র-এর একতান অনুষ্ঠান

রয়েছে টিভালিসিতে। সোভিয়েত অপেরার মাজ-সরঞ্জাম প্রচুর।

প্রতি বছর সোভিয়েতে অপেরা দর্শকদের সংখ্যা বাড়ছে। সোভিয়েত জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের এটি একটি লক্ষণ। টিকেটের দাম বেশ কম। বলশই থিয়েটারে সব-থেকে দামী টিকেটের দাম ৩-৫০ রুবল মাত্র। সবচেয়ে কমদামী টিকেট ৪০ কোপেক, এক প্যাকেট ভাল সিগারেটের দামের সমান। রাষ্ট্র প্রতি বছর এই থিয়েটার-গুলিকে অর্থ সাহায্য দান করে।

এ সব থিয়েটারে অন্যতম বৈশিষ্ট্য চিরায়তধর্মী নাটক, সংগীত ও নৃত্য। গত বছর চাইকোভস্কি "ইউজেন ওনেজিন" ৩৫০ রজনী অনুষ্ঠান হয়েছে। তার পরে জনপ্রিয় হয়েছে বরোদিন-এর "প্রিন্স ইগোর", রিমস্কি কর্সাকভের "দি জার্স বিট্রোথেন্ড" এবং মুসোগর্স্কির "বোরিস গডোনভ"। পশ্চিম ইউরোপের চিরায়ত নাটক সম্পর্কে আগ্রহ আছে। ভারি "রিগোলেট্টো" গত বছর ৬,৫০,০০০ দর্শক দেখেছে।

সোভিয়েত ব্যবস্থায় নতুন নতুন কম্পোজার এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ সাফল্যলাভ করেছেন সেগেই প্রকোফিয়েভের "ওয়ার এন্ড পীস", তখন থেওনিকভের "ইন দি স্টর্ম" আইভান বেনিস্কির "এন্ড কোরায়েট ফ্রোজ দি ডন", ডিমিত্রি থোসটা-কোভিচের "কার্তেরিনা ইজমাইলোভা"।

গত বছর ব্যালে নাচের দর্শক ছিল ১০ লক্ষ ৫০ হাজার।

ফ্যাসিবাদ-বিরোধী চলচ্চিত্র উৎসব

নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে আগামী ৮ই, ৯ই, ১০ই ও ১১ই জুলাই সরলা রায় মেমোরিয়াল হল প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টায় ফ্যাসিবাদ বিরোধী চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে। 'প্যাসেজার' (পোল্যান্ড), 'ফ্রোজেন লাইটনিং' (জি. ডি. আর), 'সাইলেন্ট ব্যারিকেড' ও 'মে স্টারস' (চেক-সোভিয়েত) দেখান হবে। ৮ই জুলাই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন মুহম্মদ আবদুল্লাহ রসুল।

বিচিন্তানুষ্ঠান

গত ১৩ই জুন শনিবার দিলীপ চক্রবর্তীর সৌজন্যে এ্যাঙ্গেল ক্লাবের পরিচালনায় একটি মনোরম বিচিন্তানুষ্ঠান হয়ে গেলো। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন সবশ্রী সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ চক্রবর্তী, অজয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, সমীরণ মন্সী ও আরো অনেকে। আবৃত্তিতে অরুণাভ গঙ্গোপাধ্যায়। যন্ত্র সংগীতে নিমাই দাস ও সম্প্রদায় এবং মর্কার্ডিনয়ে তপন দত্ত।

একক অভিনয়

গত ১৩ই জুন হাজরা রোডে শান্ত নীড় সংস্থার উদ্যোগে সাহাদৎ

হোসেন 'আমরা বাঙালী' নাটিকা একক অভিনয় করেন। এই সঙ্গে রুমা গুহ 'পৃথিবীর প্রথম আদম' মর্কার্ডিনয়ে করেন।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

২য় খণ্ড : শ্রুতশাস্ত্র, পরমহংস, গরাস, নীলরক্তচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, বৃদ্ধবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তরীয়াতীত, বাহুদেব, পাণ্ডিলা, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, যুগল, মাণ্ডকা, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগুরুব্রহ্ম, যাক্সবলকা, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কোষীতকা, অমৃতবিন্দু, কালিকা গর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪/০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

খেলা বাজার

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কলকাতার ইডেন উদ্যানে শুরু
হলো ভারত বনাম ইংলন্ডের দ্বিতীয়
টেস্ট ম্যাচ।

বাংলা দেশের ক্রিকেট উৎসাহীরা
এসে মাঠে হাধির হয়েছেন। ১৯৩৪
সালের ওই জানুয়ারী তাঁদের কাছে
স্মরণীয় দিন। কলকাতায় সেই প্রথম
অনুষ্ঠিত হলো সরকারী টেস্ট ম্যাচ।

সেদিনের ইডেন উদ্যানকে কেন্দ্র
করে শহুরে কলকাতা নয় বাংলা
দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে শুরু হলো
একটি নতুন অধ্যায়।

সারি সারি গাছে ঘেরা, দুর্বাঘাসের
সবুজে ভরা মনোহর ইডেন উদ্যান।
একপাশে কলকাতার হাইকোর্ট, তার
উল্টো দিকে বিশাল ময়দান। প্যাভি-
লিয়নের পেছনে গাছটি পার হলেই
রাস্তার ওপাশে গঙ্গা, আর এ পাশে
এ্যাসেম্বলি ভবন আর রাজভবন।

ইডেনের সেই মনোরম রূপ যিনি
দেখেছেন তিনিই সব ভুলেছেন। সত্যি-
কারের ভালো পিচ ছিল সেদিন ইডেন
উদ্যানে। সে পিচ থেকে সাহায্য পেয়ে-
ছেন ব্যাটসম্যানরা, সাহায্য পেয়েছেন
বোলাররাও। বড় বড় গাছে ঘেরা
ইডেন উদ্যানে শিশিরসিক্ত পিচ খেলার
প্রথম আধ ঘণ্টা ছিল পেস বোলারদের
কাছে স্বর্গ। ফাস্ট বোলারদের হাতের
বল তখন যেন কথা কইতো। যেন
বোলে বোলে সুইং করতে পারতেন
তাঁরা।

ওই জানুয়ারী সকালে প্রায় তিরিশ
হাজার দর্শকের উপস্থিতিতে শুরু
হলো দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ।

ভারতের অধিনায়ক সি. কে. নাইডু
ইসে ছেঁরে গেলেন। জার্ডিন প্রথমে
ব্যাটিংই নিলেন।

খেলা শুরু হলো।

ওয়ালটরস আর মিচেল শুরু
করলেন ইংলন্ডের ব্যাটিং। ভারতীয়
দলের আক্রমণের ভার পড়লো মহম্মদ
নিমার আর অমর সিং-এর ওপর। রান
উঠতে লাগলো ধীরে ধীরে। ২৯ রান
করে ওয়ালটরস আর ৪৭ রান করে
মিচেল আউট হয়ে গেলেন। বারনেটও
আউট হয়ে গেলেন খুব তাড়াতাড়ি।
তার সংগ্রহ মাত্র ৮ রান।

কিন্তু তারপর জোট বাঁধলেন
ল্যাপারিজ আর জার্ডিন। খেলার ধারা
গেল বদলে। ইংলন্ড যে বিপদের
সামনে পড়েছিল, সেই বিপদ কেটে
গেল আস্তে আস্তে। তবে ভারতের
বোলারদের তাঁর আক্রমণের সামনে বেশ
সংযতভাবেই খেলতে হল ইংলন্ডের
ব্যাটসম্যানদের।

তাই খুব একটা বেশি রান উঠলো
না। দিনের শেষে ইংলন্ড ৫টি উইকেট
হারিয়ে করলো ২৫৭।

পরের দিন বাকী ৫টি উইকেটে
ইংলন্ড যোগ করলো আরো ১৪৬ রান।
৪০০ রানের মাধ্যম শেষ হয়ে গেল
ইংলন্ডের প্রথম ইনিংস। ল্যাপারিজের
৭০ রানই ইংলন্ডের পক্ষে প্রথম ইনিংসে
সব চেয়ে বেশি রান। তারপর ছিল
জার্ডিনের ৬১ ও ভেরিটির ৫৫ রান।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সব
চেয়ে বেশি সাফল্য লাভ করেছিলেন
অমর সিং। তিনি ৪টি উইকেট লাভ
করেছিলেন ১১৬ রানের বিনিময়ে।
সি. কে. নাইডু ৪০ রান দিয়ে দখল
করলেন ৩টি উইকেট। আর তরুণ
খেলোয়াড় মনুতাক আলি তাঁর
জীবনের প্রথম টেস্ট উইকেটটি লাভ
করলেন জার্ডিনকে আউট করে।

দ্বিতীয় দিন ভারত শুরু করলো

তাদের প্রথম ইনিংস। নওমল জিওমল
আর দিলওয়ার হাসান এলেন ভারতের
ইনিংস সূচনা করতে।

কিন্তু শুরুরতেই বিপর্যয়।

মাত্র ২ রান করে নওমল আউট
হয়ে গেলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে
শক্ত হাতে ব্যাট ধরলেন দিলওয়ার হাসান
আর ওয়াজির আলী। খেলতে নেমেই
উইকেট হারাবার পর ভারত আবার
খেলতে লাগলো প্রাণ দিয়ে। রানও
উঠতে লাগল ধীরে ধীরে।

কিন্তু সেই গতি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী
হলো না। ৩৯ রান করে ওয়াজির
আলী আউট হলেন। আর তার পরই
মাত্র ৫ রান করে প্যাভিলিয়নে ফিরে
গেলেন সি. কে. নাইডু। তখন এলেন
লালা অমরনাথ।

জীবনের প্রথম টেস্টে দেশপুত্রী করে
অমরনাথ খ্যাতির উচ্চতম শিখরে।
অমরনাথের প্রথম টেস্টের খেলার কথা
তখন সকলের মুখে মুখে। ইডেন
উদ্যানের তিরিশ হাজার দর্শকের
সমবেত উল্লাসধ্বনির মধ্যে দিয়ে ধীর
পায়ে উইকেটের সামনে এসে দাঁড়ালেন
বম্বে মাঠের হিরো লالا অমরনাথ।

কিন্তু তারপর?

তারপর তিরিশ হাজার দর্শককে
হতবাক করে ক্রাকের বলে জার্ডিনের
হাতে ক্যাচ ভুলে প্যাভিলিয়নে ফিরে
গেলেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে ঘটে
গেল ঘটনাটা। দর্শকরা ব্যাপারটা
ভালোভাবে উপলব্ধি করার আগেই
অমরনাথ ফিরে গেলেন।

দাচারিক বন্দনতী

ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে এল।

করো অল নির্যাং। তবু শেষ বহুতে বিজয় মাচেস্টে (৫৪) আর সি. এস. মাইডু (৩৬) রান যোগ করে ভারতীয় হলেন হাল ধরতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সময়মতে পারলেন না তাঁরাও। ২৪৭ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস। আর ৬ রানের জন্যে ফলো অনের হাত থেকে রেহাই পেল না ভারত।

দ্বিতীয় ইনিংসে নওমল আর দিলওয়ার হাসান শক্ত হাতে ব্যাট ধরে খায়ে খায়ে রান তুলতে শুরু করলেন। কিন্তু এবারও সেই একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো ভারতকে। নওমল ৪০ আর দিলওয়ার হাসান ৫৭ রান করে প্রথম উইকেটে যে প্রয়োজনীয় কীভাবে পূর্ণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাদের পরবর্তী ব্যাটসম্যানরা পারলেন না তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে।

ওয়ার্ল্ডের আলী আউট হলেন কোন রান না করেই। সি. কে. নাইডু (৩৮) চেষ্টা করলেন খেলতে। কিন্তু পারলেন না। দ্বিতীয় ইনিংসেও অমরনাথ নিরাশ করলেন দর্শকদের। আর ৯ রান করে আউট হয়ে গেলেন লালাজী। সি. কে. নাইডু, নওমল আর দিলওয়ার হাসান ছাড়া কোন ব্যাটসম্যানই কুড়ির ঘরে পা দিতে পারেন নি।

ফলে আর ২৩৭ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। দু' ইনিংস মিলে ইংলন্ডের চেয়ে আর ৮১ রানে এগিয়ে থাকলো ভারত।

কিন্তু তখন আর পরাজয়ের কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ খেলার সময় শেষ হয়ে এসেছে। বাকী সময় মাঠে নেমে ইংলন্ড দু'টি উইকেট হারিয়ে করলো আর ৭ রান।

ফলে ইডেন উদ্যানের প্রথম ও ভারত কন্যা ইংলন্ডের দ্বিতীয় অরকারী টেস্ট ম্যাচ শেষ হলো অসমীয়াসিতভাবে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সব চেয়ে বেশি কীভাবে পারচয় দিয়েছিলেন ভারতের উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান। কারণ তিনিই ছিলেন তখন প্রথম উইকেটরক্ষক ইনিংস দু' ইনিংসেই করেছিলেন পাঁচশের বেশি রান।

ভারত বনাম ইংলন্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের ফলাফল নিচে দেওয়া হলো—

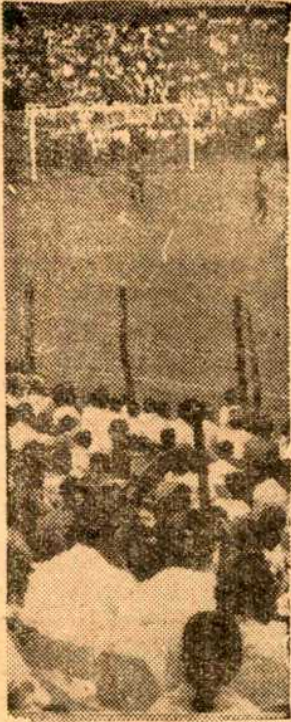
ইংলন্ড			
১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
সি ওয়ালটারস ক গোপালন ব অমর সিং	২৯	নট-আউট	২
এ মিচেল ক গোপালন ব সি কে নাইডু	৪৭		
সি বারনেট এল-বি-ডব্লিউ ব অমর সিং	৮	ক গোপালন ব নিসার	৩
জে ক্যাডরিক্স ক নিসার ব গোপালন	৭০		
ডি জাডিন ক সি কে নাইডু ব মুস্তাক আলি	৬১	স্টা: দিলওয়ার হাসান	
বি ভানজেনটাইন এল-বি-ডব্লিউ ব সি কে নাইডু	৪০	ব নওমল	৩
ডব্লিউ নেভেট ব সি কে নাইডু	৫		
এম নিকলস এল-বি-ডব্লিউ ব নিসার	১৩	নট-আউট	২
এল টাউনসেণ্ড ক দিলওয়ার হাসান ব অমর সিং	৪০		
এইচ তেরিট নট-আউট	৫৫		
ই কুর্ক ক মাচেস্টে ব অমর সিং	১০		
অতিরিক্ত (বা: ১৩, রে বা: ১০, নো: ২)	২৫		
		মোট	৪০৩ (২ উইকেটে)

ভারত			
১ম ইনিংস		২য় ইনিংস	
নওমল জিওমল ক জাডিন ব নিকলস	২	ক লেভেট ব টাউনসেণ্ড	৪১
দিলওয়ার হাসান ক জাডিন ব কুর্ক	৫৯	ব কুর্ক	৫৭
ওয়ার্ল্ডের আলি ক নিকলস ব ডেরিট	৩৯	ক নিকলস ব ডেরিট	০
সি কে নাইডু ব কুর্ক	৫	ক নিকলস ব ডেরিট	৩৮
অমরনাথ ক জাডিন ব কুর্ক	০	ক লেভেট ব কুর্ক	৯
বিজয় মাচেস্টে ব ডেরিট	৫৪	ক জাডিন ব ডেরিট	১৭
মুস্তাক আলি এল-বি-ডব্লিউ ব নিকলস	৯	ক বারনেট ব নিকলস	১৮
সি এস নাইডু ক ডেরিট ব নিকলস	৩৬	এল-বি-ডব্লিউ ব ডেরিট	১৫
অমর সিং ক নিকলস ব ডেরিট	১০	ক জাডিন ব টাউনসেণ্ড	১৮
মহম্মদ নিসার ক ওয়ালটারস ব ডেরিট	২	নট-আউট	০
এম গোপালন নট-আউট	১১	ক লেভেট ব কুর্ক	৭
অতিরিক্ত (বা: ৫, রে বা: ৫, নো ১০)	২০	(বা: ১০, রে বা ৪, নো ১ ১৫)	
		মোট	২৪৭

বোলিং

ভারতের পক্ষে					
১ম ইনিংস		২য় ইনিংস			
নিসার	৩৪ ৬ ১১২ ১	২ ১ ২ ১			
অমর সিং	৫৪ ৫ ১৩ ১০৬ ৪	২ ১ ১ ০			
গোপালন	১৯ ৭ ৩৯ ১				
মুস্তাক আলি	১৯ ৫ ৪৫ ১				
অমরনাথ	২ ০ ১০ ২				
সি এস নাইডু	৮ ১ ২৬ ০				
সি কে নাইডু	২৩ ৭ ৪০ ৩				
ইংলন্ডের পক্ষে					
কুর্ক	২৬ ৮ ৩৯ ৩	১৯ ২ ৪ ৫০ ৩			
নিকলস	২৮ ৬ ৭৮ ৩	২০ ৬ ৪৮ ১			
ডেরিট	২৩ ৪ ৬৪ ৪	৩১ ১২ ৭৬ ৪			
ল্যাডরিক্স	১৭ ৭ ২৭ ০	১০ ৪ ১৯ ০			
টাউনসেণ্ড	৮ ৪ ১৯ ০	৪ ৩ ২২ ২			
		বারনেট	২ ০ ৭ ০		

(চলবে)



জাহায্য ভাণ্ডার

কলকাতার ফুটবল খেলার মান নিয়ে আমরা অনেকেই অনেক সময় নানা রকম কথা বলি। এক সময় ছিল, কলকাতার ফুটবল বলতে পুরো ভারতবর্ষের কথাই বোঝাতো। সত্যি কথা বলতে কি এখন সে দিন আর নেই। ফুটবল খেলার বাংলাকে কোণঠাসা করার একটা পরোক্ষ চেষ্টা চলেছে। তাই সর্বভারতীয় বলে বাংলার খেলোয়াড়দের সংখ্যা দিনের পর দিন কমছেই। যদি বাংলা দলের খেলোয়াড়দের পরিপূরক হিসেবে সত্যিকারের ভালো এবং সর্বগুণে সেরা খেলোয়াড়দের দলে নেওয়া হতো তাহলে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু তাই কি হচ্ছে? ভেবে-চিন্তে দেখারও দরকার নেই, বিনা শ্রমধায় বলে দেওয়া যায় যে—তা হচ্ছে না। আর সে কথা সকলেরই জানা। তাই আজ অন্য কারো সম্বন্ধে কিছু না বলে আত্মসমালোচনা করাই ভালো। সত্যিই তো বাংলা দেশের খেলোয়াড়রা কি এমন খেলছেন যে তাঁরা ভারতীয় দলে চান্স পাবেন? কি ছোট দল, কি বড় দল—কোন দলের খেলায় খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তরিকতার ছিটে-ফোঁটাও দেখা যায় না। তাই আজ কথায় কথায় এসে পড়ে অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়দের কথা। এঁদের তুলনায় তাঁরা কতো বড় খেলোয়াড় ছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এঁদের মধ্যে ধরতে গেলে কেউই আজকের দিনের খেলোয়াড়দের মতো সুস্থ ও সুবিধে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখেন নি।

আজো দেখছেন না—আজো তাঁরা রয়ে গেছেন অন্ধকারেই। কিন্তু আমরা তাঁদের জন্যে কি করেছি আর আজই বা কি করছি? যে ক্লাবগুলিতে তাঁরা খেলতেন সেই ক্লাবগুলো তাঁদেরই সাহায্যের জন্যে কতোটুকু এগিয়ে এসেছেন। আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষ আর সরকারই বা এতোদিনে কি করলেন? সত্যি কথা বলতে কি, কেউ কিছুই করেন নি, অতীতের দিকপাল আর আজকের দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্যে। দিন কয়েক আগে বৃষ্টির জন্যে ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান বনাম মহম্মদান স্পোর্টিং দলের খেলা অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। এখন কথা উঠেছে টিকিটের টাকা ফেরৎ দেবার। কিন্তু সকলের কাছে কি টিকিটের ছোঁড়া অংশ আছে? মনে তো হয় না। কেউ কেউ মাঠে ঢুকেই টিকিটের অংশ ফেলে দেন, তা ছাড়া সেদিনের সেই কাক-ভেড়া বৃষ্টিতে টিকিটের অংশ হয়তো নষ্টই হয়ে গেছে। তাই টিকিটের দাম ফেরৎ দিলে কেউ পাবেন, কেউ পাবেন না। কেউ বা আবার ঐ সামান্য টাকার জন্যে ছুটোছুটি করতে চাইবেন না। ফলে অনেক টাকাই ফেরৎ দেওয়া হবে না। সেই টাকাগুলোর দশা কি হবে? তার চেয়ে এক কাজ করা যেতে পারে, টিকিটের টাকা ফেরৎ না দিয়ে সেই টাকা দিয়ে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সাহায্য ভাণ্ডার খোলা হোক আর প্রত্যেক মাসে দুঃস্থ খেলোয়াড়দের সেই ভাণ্ডার থেকে সাহায্য দেওয়া হোক। আমাদের এই আবেদন বাংলা দেশের ফুটবল-রসিকদের কাছে, ক্লাবগুলোর কাছে, আই. এফ. এ. কর্তৃপক্ষের কাছে এবং সরকারের কাছেও। আপনারা সকলে ভেবে দেখুন।

—শান্তিপ্রসন্ন

ফুটবল মাঠ

মোহনবাগান এখন শান্ত। রেজিলেও উৎসাহ-উদ্দীপনা আর বিজয় আনন্দের উত্তেজনার জোয়ার কমে এসেছে।

কিন্তু কলকাতায় ফুটবল খেলা নিয়ে উত্তেজনা এখন তুলে। একক লীগের পয়েন্ট এবার সুপার লীগের খেলার পয়েন্টের সংগে যোগ করা হবে। তাই বড় দলের, বিশেষ করে তিন প্রধানের প্রতিটি খেলাই এখন পরম আকর্ষণীয়। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহম্মেদান স্পোর্টিং পয়েন্ট সংগ্রহের দিকে নজর রেখে এগিয়ে চলেছে খাঁর শায়ে।



৥ বলাই দে ৥

মারডেকাগামী ভারতীয় ফুটবল দল গঠনের জন্যে আয়োজিত ট্রেনিং ক্যাম্পে বলাই দে'র ডাক না পড়ায় অনেকেই অস্বস্তি হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে যদি খেলার মানের কথা এসে পড়ে তাহলে আপশোসের আর সীমা থাকে না। দিন কয়েক আগে মোহনবাগান বনাম স্টোটিং ইউনিয়ন দলের খেলার যে হাল দেখা গেল তার তুলনায় মেলা ভার। মোহনবাগানের অতো খারাপ খেলা এর আগে খুব একটা দেখা যায় নি।

খারাপ খেলার পাশ্চাত্য ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহম্মেদান স্পোর্টিংও কম যায় না। ছোট দলগুলোর বিরুদ্ধে এদের খেলা দেখে শুধু একটা কথাই মনে হয় যে, ছোট দলের বিরুদ্ধে খেলাগুলোকে

অস্বস্তি বোধ হয় খেলা বলেই গণ্য করেন না।

তাই ধাপছাড়া খেলা, কোন বাঁধনী নেই, খেলোয়াড়রা ইচ্ছামত খেলছেন, কি আক্রমণ, কি রক্ষণ, কোন বিভাগেই নেই নিজেদের মধ্যে সহজ এবং সুন্দর বোঝাবুঝি। ফলে খেলার মান যেমন যায় নেমে, তেমনি খেলার দশা হয়ে ওঠে শোচনীয়।

যাই হোক পর পর তিনটে রবিবার কলকাতার ইডেন উদ্যানে তিনটি চ্যারিটি খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথম খেলায় বৃষ্টির মধ্যে খেলে ইস্টবেঙ্গল এক গোলে হারিয়ে দেয় মহম্মেদান স্পোর্টিংকে। দ্বিতীয় খেলাটি ছিল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে। এই খেলাটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাংলা যেন পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই খেলাটা প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির জন্যে বিস্তারিত পর আর অনুষ্ঠিত হতে পারলো না। পরিত্যক্ত হলো। সেই সময় ইস্টবেঙ্গল জিতছিল এক গোলে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকদের এমনই পোড়া কপাল—গালের বেধা সেদিন যদিও মিলল, কিন্তু জয়লাভের টিকি তাঁরা ছুতে পারলেন না। পরিত্যক্ত এই খেলাটা আগস্ট মাসের কোন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। এর পরের রবিবারে ছিল মোহনবাগান আর মহম্মেদান স্পোর্টিং দলের চ্যারিটি খেলা। কিন্তু খেলা আরম্ভ হবার আগে এমন বৃষ্টি শুরু হলো যে খেলা মোটে আশ্রয়ই করা গেল না।

অথচ এই খেলা দু'টির ব্যবস্থা যদি অন্য মাঠে অর্থাৎ মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গল মাঠে হতো তাহলে মনে হয় দু'দিনই খেলা শেষ পর্যন্ত চলতে পারতো। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি যে, ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলা চলতে পারে না। কারণ ইডেনের মাটি এটেল আর ঘাসগুলোও দুর্বল। ফলে বৃষ্টি হলেই খেলোয়াড়দের বুটের স্পাইক এটেল মাটিতে টেনে সরে আর বৃষ্টির জলেই দুর্বল ঘাসগুলো পেছল হয়ে যায়, তাই খেলোয়াড়রা পারেন না তাঁদের দেহের ভারসাম্য রক্ষা করতে। তাই ফুটবল মাঠে বালির ভাগ থাকে বেশি আর ঘাসগুলোও থাকে সাধারণ। সেইজন্যে বৃষ্টির সময় ইডেনে ভালো ফুটবল অসম্ভব। আশা করি, ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান-মহম্মেদান স্পোর্টিং দলের খেলার হাল দেখার পর এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন এবং এই কথাই বলবেন যে, দরকার নেই ইডেন উদ্যানে ফুটবল খেলার ব্যবস্থা করে।

[এই সপ্তাহের খেলা]

৮ই জুলাই : বৃহস্পতিবার
ইস্টবেঙ্গল : ব্রাহ্মসম্ম
কুমারটুলী : কালীঘাট
খিদিরপুর : বালী প্রতিভা

৯ই জুলাই : বৃহস্পতিবার
মহঃস্পোর্টিং : জর্জ টোলগ্রাফ
রাজস্থান : বাটা
এক্যাসিমিলানী : টালীগঞ্জ অগ্রগামী

১০ই জুলাই : শুক্রবার
মোহনবাগান : এগ্রিয়ান্স
ব্রাহ্মসম্ম : উয়ারী
স্পোর্টিং ইউনিয়ন : বি এন আর



৥ নিউকাম্বে ৥

ইউনাইটেড ফাইনালে তাঁর নিজের দলেরই খেলোয়াড় রোজওয়ালের প্রতিদ্বন্দ্বী।

১১ই জুলাই : শনিবার
ইস্টবেঙ্গল : ইস্টার্ন রেল
বালী প্রতিভা : হাওড়া ইউনি
জর্জ টোলগ্রাফ : খিদিরপুর

১০ই জুলাই : সোমবার
মহঃস্পোর্টিং : কালীঘাট
কুমারটুলী : উয়ারী

১৪ই জুলাই : মঙ্গলবার
ইস্টবেঙ্গল : হাওড়া ইউনিয়ন
বিএনআর : ইস্টার্ন রেল
এক্যাসিমিলানী : পোর্ট কমিশনার

প্রশ্ন-উত্তর

দেবেশ দাশ (হিন্দুস্থান পাক, কলকাতা)

উত্তর : সম্পাদিকা মহাশয়ের বাড়ির ঠিকানায় লেখা আপনার চিঠি আমাদের হস্তগত হয়েছে। কতকগুলো ক্লাবের মধ্যে কোন কোন দলের স্থান (ক্রমান্বয়ে) কোথায়—এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বিশেষ কোন বছরের ফলাফলের ওপর কোন মতেই নির্ভর করা চলে না। ক্লাবগুলির ঐতিহ্য, সূচনা, খেলার ধারা, বয়স, খেলোয়াড়ী মনোভাব, খেলার ফলাফল প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে ক্লাবগুলির শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ইন্স্টেবল ক্লাবের যে কোন অর্থ সমর্থকও মোহন-বাগানকে ইন্স্টেবলের আগেই স্থান দেবেন। আর ভিন্ন প্রদেশী দলগুলি যে কোনমতেই মোহন-বাগান কিম্বা ইন্স্টেবলের ধার কাছে আসে (কোন দিক দিয়েই) না—সে কথা বলাই বহুল। তাই আপনার অবগতির জন্যে জানাই যে, সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর কোন লেখাই কাউকে খুশি করার জন্যে লেখা কিম্বা প্রকাশ করা হয় না। আপনি যদি সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর নিয়মিত পাঠক হন তাহলে এ কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন। যাই হোক, সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর খেলাধুলা বিভাগ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানালে আমরা খুশি হবো এবং আরো কি কী করলে বিভাগটি আরো আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে—এ কথাও আশা করি আপনি জানাতে চুলবেন না। আমরা সব সময়ই আপনাদের সহানুভূতি কামনা করি।

শংকরপ্রসাদ মজুমদার (সংগ্রহী ক্লাব, আদাবাড় কলোনী, গোঁহাটি—১২)

প্রশ্ন : প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় কে-দত্তের ছেলে এখন কোন ক্লাবে

গল্প হলেনও প্রতি

ক্রিকেট অনুমোদনের যদি প্রশ্ন করা যায় রঞ্জি ট্রফিতে নাটকীয়তার ভরা বাংলা দলের কোন খেলাটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে?—তা'হলে অনেকেই একসঙ্গে বলবেন ১৯৫০ সালে ইডেন উদ্যানে হোলকারের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলাটির কথা। বাংলা টেস জিতে ব্যাটিং শুরু করে প্রথম দিনের শেষে পি. বি. দত্তের অপরাজিত ১৪০ রান পুঁজি করে ২ উইকেটে ২৬১ রান তুললো। দ্বিতীয় দিনে পি. বি. দত্তের ১৪১ রানে বিদায় নেবার পর নিমল চট্টোপাধ্যায় (৫২), এস. কে. গিরিধারী (৪৫), মন্টু বানার্জী (৩১), এন চৌধুরী (২৯ অপর) প্রমুখের দৃঢ় ব্যাটিং-এর ফলে বাংলার মোট রান হল ৪৭৯।

হোলকার ৩য় দিনে ব্যাট করতে নামলো। দু'শো মিনিট উইকেটে থেকে মনুতাক আলী ৯৯ রান করে আউট হলেন, বি. বি. নিম্বলকর কিন্তু ১১৫ রানে নট আউট রইলেন। দিনান্তে হোলকারের রান হল ৪ উইকেটে ৩৫৬। বাংলা দলের থেকে মাত্র ১২০ রান পিছনে, হাতে ছ'টি উইকেট। চতুর্থ দিনেও নিম্বলকর সবিক্রমে ব্যাট করতে লাগলেন এবং সবশেষে আউট হলেন ২১৯ রান করে, দলের তখন মোট রান ৪৯৬। বাংলা দলের থেকে ১৭ রান এগিয়ে। বাংলা দল খুব দ্রুত রান তুলতে লাগলো। ২য় ইনিংসে চতুর্থ দিনে ১৫৫ মিনিটে

৫ উইকেটে ২৫৭ রান করলো (নিমল চ্যাটার্জী ৫৪, বি. ফ্রান্স ৬২)। পঞ্চম দিনে বাংলা দল মিনিট দশেক ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩২০ রান করে ডিক্লারড করে দিল।

পুরো একটা দিনও হাতে সময় নেই। হোলকার দলে আছেন সি. কে. নাইডু, নিম্বলকর, মনুতাক আলি প্রমুখ বাঘা বাঘা খেলোয়াড়। তাঁদের দলের ১০ জনকে এক দিনে আউট করা খুবই অস্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা দল প্রায় তা ঘটাতে পেরেছিল। কিন্তু বাংলা দলের জেতার পথে বাদ সাধলেন ধানওয়াদে ও হীরালাল গাইকোয়াড়। এক মনুতাক ছাড়া ২য় ইনিংসে কেউ ৩০ পেরেন নি। মনুতাক করেন ৪৬ রান। হোলকারের শেষ জুটি ধানওয়াদে ও গাইকোয়াড়কে কিন্তু বাংলার বোলাররা চেষ্টা করেও আউট করতে পারলেন না। দশকরাও খুব নার্ভাস হয়ে পড়লেন। তাঁরা একবার আসন ছেড়ে উঠে ধান, আবার পর মনুতাকে বসে পড়েন। এই বুদ্ধি বাংলা জিতল, এই বুদ্ধি হেরে গেল। গাইকোয়াড় শ্লিপে ক্যাচ তুললেন সুনীত সোমের বলে কিন্তু উইকেটরক্ষক আর শ্লিপ ফিল্ডসম্যান ব্যর্থ হলেন ক্যাচটি ধরতে। ধরতে পারলেই বাংলা জিততো, কিন্তু উল্টে বাংলা দল এক উইকেটে হেরে গেল।

—প্রশান্ত বঙ্গ,

কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড, আসানসোল।

খেলছেন? তাঁর পুরো নাম ও ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : আমার ঠিক জানা নেই। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

অলোক রায়চৌধুরী ও অরুণ রায়চৌধুরী (বনগ্রাম, মতিগঞ্জ)

প্রশ্ন : এ বছরের বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় কণি দেশ অংশগ্রহণ করেছে—তাদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : আগেই জানানো হয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়ই।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিনিগনিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২

বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

বৃহৎ তন্ত্রসার—১ম ও ২য়

পাতা	খণ্ড	১৫-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০
বক্তিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—		
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড		৩-০০
বক্তিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—		
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড		৩-০০
মিহেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০
" "	২য়	৬-০০
" "	৩য়	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-০০
" "	২য়	৮-০০
প্রবন্ধ গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
চান্দোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
" "	২য়	৮-০০
" "	৪র্থ	৮-০০
অনুতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
" "	২য়	৮-০০
" "	৩য়	৮-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০
" "	২য়	৩-০০
জমলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—		৩-০০
বরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—		৫-০০
ফট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
" "	৩য়	৩-০০
মুপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থাঃ—		৮-০০
মাদের সংস্পর্শে এসেছি—		২-০০
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের		
পুর্বাভাস—		২-০০
A Hand Book of		
Commercial Law		২০-০০

Essential of Commercial

Law	৬-০০
দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৮-৫০
প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভষণ মুখোঃ গ্রন্থাবলী—	৮-৫০
রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০
" " ২য়	৩-৫০
মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থাঃ—১ম	৩-৫০
" " " ২য়	৩-৫০
অগনস্ত গ্রন্থাবলী—	৮-০০
সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৮-০০
" " ৪র্থ	৩-০০
রামপদ মুখার্জী গ্রন্থাবলী—১ম	৮-০০
" " " ২য়	৩-০০
হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০
মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০
বিভূতিভষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৮-০০
শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থাঃ—২য় ভাগ	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থাঃ—৩য়	৩-০০
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থাঃ—৫ম	৩-০০
বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০
কথাসরিৎসাগর —১ম ভাগ	৮-০০
" —২য় ভাগ	৮-০০
অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—	
২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৮-০০
লীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে	
৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০
ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী— ২য়	৮-০০
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৮-০০
বিলাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০
দত্তা মিত্র গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-০০
" " " ৩য়	৩-০০
রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০
নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	৫-০০
—২য় ভাগ	৫-০০
নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থাঃ— ১ম	১০-০০
অরুণবাহি—	৮-০০
কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৮-৫০
ক্রিয়াকাণ্ডবাহিণি ১ম	১০-০০
পরলোক—	৮-৫০
পরলোক রহস্য—	২-২৫
পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৮-৫০
দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
ভারত প্রতিভা—	৫-০০
প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
সাধক কমলাকান্ত—	২-৫০
মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
নানার মা—	৩-০০
জালিয়াৎ কাউন্সিল—	৩-০০
বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
বিসমার্ক—	২-০০
স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
*মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৮-০০
বিবরণ প্রমোদ সংগ্রহ— ১ম	৮-০০
২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রতি খণ্ড	৩-০০
বোন-মনোদর্শন	
৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৮-০০
৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৮-০০
৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ন্ত-	
কালিকন্দের ব্যাপারসমূহ	৮-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোঃ গ্রন্থাবলী—	৮-০০
ANANDAMATH	৮-০০
(শ্রীঅরবিন্দ কর্তৃক ইংরেজী অনবাদ)	
DAVID HARE	৮-০০
রাজভাষা	৮-০০

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীস্ট্রীট, কলি-১২

কল মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সফলি-

কুকুম্বি

চুলতা হয় তা!



কুকুম্বি
গুড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিচুপ্ত করে।
কুকুম্বি শিশুর খাওয়া
ও রুগীর
পাথা মির্ডায়
ব্যবহৃত হয়।

কুকুম্বি ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
গুড়ো মশলা।
এর পেছনে
রায়োছ ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক
কুকুম্বি দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কান্দিপুর



বাসুমতী

বিবদমান দু'টি বামপন্থী জোটের
ডাকে চোদ্দই জুলাই
বাংলা বন্ধ



ষ : ৩য় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ]

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 3, 16th July, 1

কলিকাতা-৩
হাউস,
কলিকাতা-৩



ফেমিলা ক্রিম
সব সুন্দরীর জন্য

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৩১
আজকের মানুষ		১৩২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৩৩
হিমেল সন্ধ্যায় বনের ধারে		
থাক্কে থাকা (অনুবাদ-কবিতা)	— অক্ষয়কুমার চন্দ্র	১৩৬
বঙ্গদর্শন		১৩৭
ভারতদর্শন		১৪০
আন্তর্জাতিক		১৪২
সপ্তাহের বোঝা	— ফকিরবাস ওঝা	১৪৪
স্রোতের সঙ্গে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১৪৬
মা আমার ভাঙা আঁধার (কবিতা)	— শান্তনু দাস	১৪৯
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	১৫০
গ্রামবাংলার কথা	— মাখনলাল ঘোষ	১৫২
ঢাকার চিঠি		১৫৩
পাঠকমন		১৫৫
দৃষ্টি-পরিভ্রম	— পদুমকেশ দে সরকার	১৫৬
উদ্ভাসিত আগমন প্রসঙ্গে	— সাগর বিশ্বাস	১৬১
ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ ও ব্যাংকশিল্পে নবদীপ্ত	— সমর দত্ত	১৬৫
আনন্দরূপ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	১৬৮

যে কোন

গয়না

আর

আমল

গ্রহরত্ন

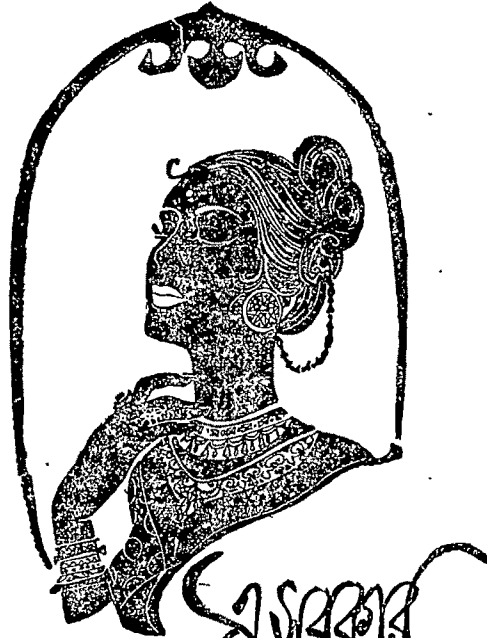
কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন অব লেট
এম. বি. সরকার



১৯১৭ রাণাবিহারী-চন্দ্র কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রাউ-রাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	বিশ্বনাথ ঘোষ	১৭১
সমৃদ্ধ আনন্দ ও নৃলিয়ালা (গল্প)	শচীন বসু	১৭৬
প্রথমোক্তা		১৮১
রংগমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	শিল্পী	১৮২
রংগজগৎ		১৮৪
খেলার রাজার রাজা	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	১৯০

আমুন... ইউবিআইতেই সঞ্চয় করুন

- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের বার্ষিক মুদ্রা পাবেন সেভেন্স অ্যাকাউন্টে শতকরা ৩ই টাকা, মেয়াদী অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ শতকরা ৬ই টাকা।
- ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয়ের ফলে ঠিক প্রয়োজনের সময়টিতে আপনার টাকা খরচ করতে পারবেন।
- ইউবিআইতে আপনার ও আরও অনেকের সঞ্চয় একত্র করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে, শিল্পে, কৃষিতে, রপ্তানীর জন্যে, আর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্যে সরকারকে আমরা আরও বেশী খণ্ড দিয়ে দেশের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করব।



ইউবিআই

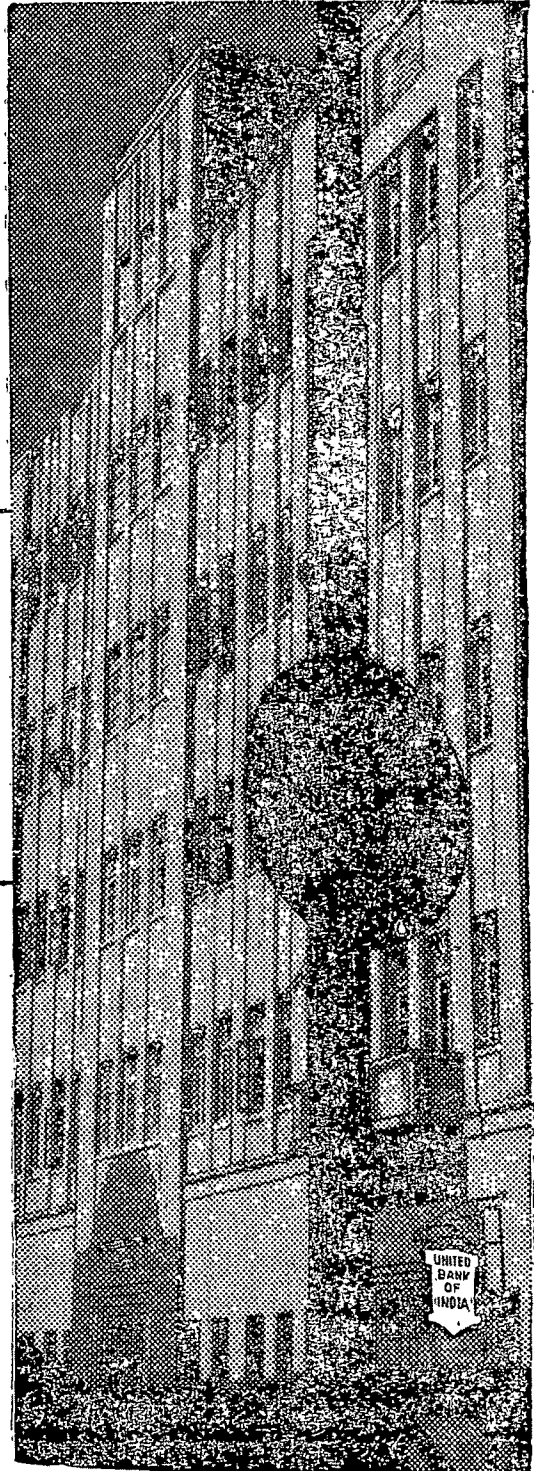
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

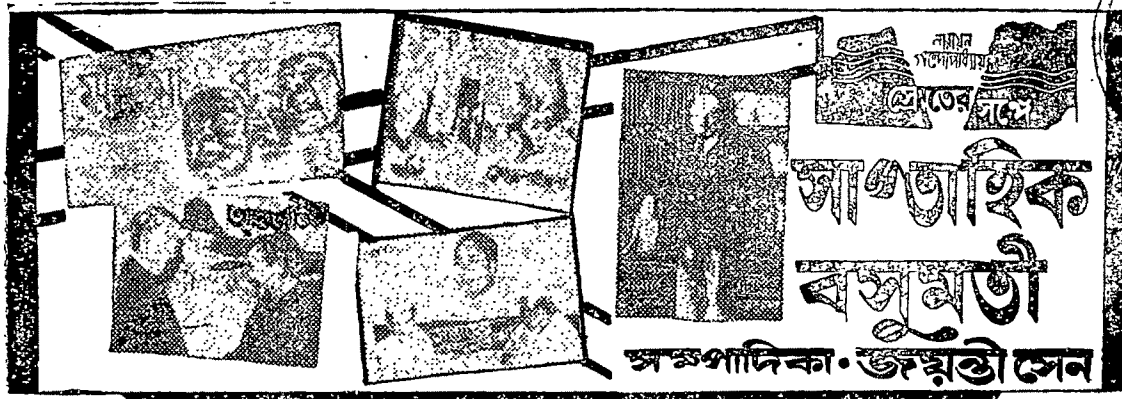
হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত সর্গাণ

(পূর্বতন ক্লাইভ হাট স্ট্রীট)

কলিকাতা-১

UBF-৪০-৬৪





বৃহস্পতিবার, ৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
৭৫ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 16th July, 1970

পরীক্ষা পদ্ধতি : বেকার সমস্যা

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার পর পাশের হার দেখে অনুমান করা গেছে, অভাবকদের টাকার প্রাপ্ত করাটা স্বল্পমাত্রায় কিশোর-বৃদ্ধদের গ্রাহ্যে অন্তর্ভুক্ত না হলেও পরীক্ষার বিচার-আচারের শাসনদণ্ড যাঁদের হাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে অভাবকদের ঘাড় মটকাচ্ছেন।

পরীক্ষার প্রচলিত রীতিতেই নাকি পরীক্ষা-কর্তাদের অধুনা! কোন্ নীতিটা আসলে ঠিক, তা যাঁরা নির্ণয় করতে আজো পর্যন্ত অপারগ, তাঁরা একমাত্র সক্ষম তাঁদেরই অর্থিক নিয়মবলে ফেলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে। ফেলের কারণানুসন্ধান করতে তাঁরা হয়তো যতো দোষ নন্দ ঘোষ মাস্টার মশায়দের গদর্দন নেবার হুকুম দেবেন। সেখানে হুকুম দানের ব্যাপারটা বেশ সহজ এবং সরল। ভবিষ্যৎ-গড়ার কাজ যাঁদের হাতে ন্যস্ত, তাঁদের নিজেদের ভবিষ্যৎ কিছ্ না থাক, ভবিষ্যতে তাঁদের গদর্দন নেবার হুকুমটা অনায়াসে দেওয়া যায়। আমরা কিন্তু পরীক্ষার হাজার হাজার ছাত্রের পতনপ্রমের জন্য দায়ী করতে চাই পরীক্ষা-কর্তাদের।

সম্প্রতি পরীক্ষা-কর্তাদের বিশেষজ্ঞ কমিটির এক প্রস্তাব কাগজে কাগজে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রস্তাবটি মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা-পদ্ধতির অদল-বদল সম্পর্কে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পর থেকে আশুতোষেরই ছত্র-ছায়ায় বহুবার পরীক্ষার নিয়মকানুন পালটানো হয়েছে। অধুনা পরীক্ষার সবজন্মজাত একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে—চাকরীপ্রাপ্তি। এখন পাশ করলেও চাকরী পাওয়া যায় না, ফেল করলে তো কথাই নেই। তাই পাশ বা ফেল যাই করুক—বাধ্য-অবাধ্য সব ছেলের প্রধান আগ্রহ পাড়ায় পাড়ায় বকবক। সেখানেই অথবা বকবক করে তারা তাদের ঘোরতর শত্রু সময়কে বখ করে। জীবনের এই যৌবন-মুহুর্তে প্রথম অনুভব করে সময়ের কোনো

মূল্য নেই। স্বভাবতই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে ধীরে ধীরে মনে গোষণ করতে শুরু করে অপ্রত্যা। অথচ এদের বিদ্যুৎস্রোত দায়িত্ব পালনে অক্ষম সমাজ ও রাষ্ট্রের হুকুম শোনা যাচ্ছে বড় বেশী। ষষ্ঠ জোট বা অষ্ট জোট, কিংবা অষ্ট জোটের বদলে নব জোটই হোক, অথবা নব কংগ্রেস কিংবা আদি কংগ্রেস যিনিই শাসনে থাকুন না কেন, এদের চাকরী দিতে না পারলে কারো রক্ষা নেই এবং এরাই যে একদা সমাজ ও রাষ্ট্রে ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ করবে সে কথা ব্যক্তিগতভাবে স্মৃতিপতি শ্রী ভি ভি গিরি কয়েকবারই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নাকি রাজ্যে রাজ্যে বেকারদের চাকরীতে নিয়োগ করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু চাকরী দেবার দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা তো নির্বিকার চিত্তে একটি একটি করে কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছেন।

স্রোটারি ক্লাবের অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেন বেশ বড় বড় কথা শুনিয়েছেন, তার মধ্যে আছে শান্তিপূর্ণ ছাত্রদের জন্য তাঁর সপ্রশংস পিঠ চাপড়ানি, অশান্তি সৃষ্টিকারী যে মুষ্টিমেয় ছাত্র বোমা, হাওয়া ও লাঠি নিয়ে অন্যান্য ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ধমক; এম এ, এস সি, এম-কম ছাত্রদের অধিকাংশ ব্যয়ভার জনগণের অর্থ-ভান্ডার থেকে আসে সেজন্য সেই জনগণের প্রতি আছে তাঁর দরদ; আর আছে রোটারিয়ানদের প্রতি ডঃ সেনের নিষ্ফল করুণ আবেদন। তিনি বলেছেন, “রোটারিয়ানদের উচিত এদের সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করা ওদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করার জন্য কিছু একটা ব্যবস্থা করা। তাহলে হয়তো তাদের এই ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দূর করা সম্ভব।”

ঐ অনুষ্ঠানে ডঃ সেনের পরস্পর-বিরোধী উক্তিগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়! একবার তিনি

বলেছেন, “কিন্তু এই মুষ্টিমেয় ছাত্র বোমা, লাঠি, ছোরা নিয়ে এক বিরাট সংখ্যক ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিচ্ছে। এটা চিন্তার বিষয়।” আবার তিনিই বলেছেন, ওদের বেকারত্ব দূর করা সম্ভব হলে, ওদের ধ্বংসাত্মক প্রবণতা দূর করা সম্ভব হবে। দেশের লাঠিগাছটি যাঁদের হাতে তাঁদের কাছে নিষ্ফল আবেদন করতেই কি ডঃ সেনের মতো খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদের কর্তব্য সমাপ্ত হয়ে গেল? কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শান্তি আনতে পারবেন না, কারণ সমস্যা আরো গভীর। আর আমাদের সরকার? সরকারী শিক্ষার মূল পীঠস্থান প্রেসিডেন্সিতে বৈশিষ্ট্য-চোরাগুলাি এখন ছত্র-শিক্ষকের অভাবে অপ্রজ্ঞ ফেলছে। একদা লাটসাহেবদের অফিস চালাবার জন্য যেখানে চাকুরীস্বার্থে সৃষ্টি করা হোত, এখন তা লাটে উঠতে বসেছে।

চারিদিকে এমন অনাসৃষ্টির মধ্যে লজ্জা নেই শত্রু পরীক্ষা-কর্তাদের। তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য পদ্ধতিতে ফেলের সংখ্যা বাড়ছে, কলেজে ভর্তির নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে আর পাশ করেও যে রাজস্ব চাকরী পাওয়া যায় না পরীক্ষা-কর্তারাই সে রাজস্বের ভিত ভাঙবার পথ প্রশস্ত করছেন। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদে ঋষি, বিজ্ঞানে অনগ্রসর এ দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তারা যদি নৈতিক নিয়মের দোহাই না পেড়ে আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচবার উদ্দেশ্যে অপহৃত মাটি পুস্করুদ্ভাবের আদেশ দিয়ে নতুন করে আবাদের ডাক দিতেন তাহলে অবশ্যই সোনা ফলত। কিন্তু সোনা ফলনের চেয়ে পরীক্ষার তালে তালে গেলে সবকিছুই ঢিলে তালে চলে। কিন্তু সেটাই কি শেষ সত্য?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

দুঃখ করে মন্ত্রিসভা ছেড়ে দিয়ে দেশাই-সাহেব রাজনীতিকদের তাজ্জব করে দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের নায়ক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন শ্রী ডি এস দেশাই। মন্ত্রিগিরি করছেন যুগাধিক কাল ধরে। নায়ক মন্ত্রিসভায়ও তাঁর স্থান ছিল। দ্বিতীয়, স্বয়ং মধ্যমন্ত্রী পরেই। মহারাষ্ট্রের পরবর্তী মধ্যমন্ত্রী গদি ছিল যাঁরা বাঁধা, তিনি কেমন অস্বাভাবিক বদলে সামান্য কারণে বৈরাগ্য প্রকাশ করলেন। আজ যখন চারদিকে ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা চলছে, মন্ত্রি বা একটু ক্ষমতার জন্যে এক-একজন দিনে তিনবার করে দলত্যাগ করতেও বিধা করছেন না, তখন ডি এস দেশাইয়ের জাগের এই দৃষ্টান্তে অনেকেই অবাক হলেন সন্দেহ নেই।

বিশ্বস্তের কারণে এখানে যে, শ্রীদেশাইয়ের মনে যে কিছুকাল থেকে যিকি যিকি ভ্রমের আগুন জ্বলছিল, এ-স্বপ্ন বাইরের বেশি লোক জানতো না, সাধারণ লোক তো নয়ই। শ্রী ভি পি নায়ক মন্ত্রিসভার রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন শ্রীদেশাই। দলত্যাগের কারণ হিসেবে অবশ্য শ্রীদেশাই যা বক্তব্য রেখেছেন তাতে বলা হয়েছে যে, মহারাষ্ট্র প্রদেশ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাতে তাঁর যে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছে, তার পর মন্ত্রিসভায় থাকা আর তিনি সঙ্গত মনে করেন নি। মন্ত্রিসভা বা ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রীদের সমালোচনা কোন দেশে না হয়ে থাকে? যে দলের সরকার দেশ শাসন করছে সে দল থেকেও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রীদের কাজের বা ভূমিকার বিস্তার সমালোচনা করতে দেখা যায়। একই সভায় মধ্যমন্ত্রী শ্রী ডি পি নায়কও সমালোচিত হয়েছিলেন। শ্রীনাথক টেলিফোনে শ্রীদেশাইকে অনুরোধও করেছিলেন, নাগপুর থেকে তাঁর না ফেরা পর্যন্ত তিনি যেন পদত্যাগ না করেন। কিন্তু মধ্যমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা দেশাই করেন নি।

কেন করেন নি? আর শ্রীদেশাইয়ের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হলো কেন? পদত্যাগের প্রত্যাহার করে নেবার কোনো অনুরোধই বা করা হলো না কেন? এখানেই সেই ভ্রমের আগুনের সন্ধান মিলবে। অভিযোগ উঠেছে যে, সেচমন্ত্রী শঙ্কররাও চাবন এবং সমবায়মন্ত্রী যশোবন্তরাও মোহিতই ষড়যন্ত্র করে। শ্রীদেশাইকে অপসারণের অসুস্থতা আবহাওয়া গড়ে তুলেছিলেন। শ্রীদেশাইয়ের কাজে মধ্যমন্ত্রী প্রায়ই হস্তক্ষেপ করে বাধা দিতেন বলেও কথা উঠেছে। শ্রীদেশাই কি সেজন্যই তিতি-দ্রিষ্ট হয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে,



ডি. এস. দেশাই

“কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষেই মন্ত্রিসভা বা (কংগ্রেস) সংগঠনে থাকা আর সম্ভব নয়?”

শ্রীদৌলতরায় শ্রীপংরাও দেশাই পরিচিত মহলো বাবাসাহেব দেশাই নামেই খ্যাত। পশ্চিম মহারাষ্ট্রের সাতারা জেলায় এক মারাঠা পরিবারে ১৯১০ সালে বাবাসাহেবের জন্ম—সাতারা জেলাই উপহার দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচাবনকে। কোল্‌হাপুরের মাইকুস

ল কলেজ থেকে আইন পাশ করার পর শ্রীদেশাই দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন রাজনীতিতে যোগ দিয়ে তিনি প্রথমে পাটনের গ্রামীণ উন্নয়নী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং দীর্ঘ ১১ বছর ধরে জেলা আঞ্চলিক বোর্ডের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য আবির্ভাব বোম্বাই রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই শ্রীদেশাই প্রতিশ্রুতি করে আসছেন এবং প্রতিবারই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে জিতে তিনি বিধানসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের মধ্য সচিবের পদ লাভ করেছিলেন। পরের বার ১৯৫৭ সনে জেতার পর তাঁকে পূর্তদপ্তরের মন্ত্রি দেওয়া হয়। যখন আলাদা রাজ্য হিসেবে মহারাষ্ট্র গঠিত হলো তখন শ্রীদেশাইকে তার প্রথম সরকারের শিক্ষাদপ্তরের ভার দেওয়া হয়, শ্রীচাবন ছিলেন তখন নতুন রাজ্যটির প্রথম মধ্যমন্ত্রী। এর পর ৬২-র নির্বাচনে জয়ী হয়ে শ্রীদেশাই শ্রীকান্নাময়্যারের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের কৃষিমন্ত্রী হন। মধ্যমন্ত্রী শ্রীনাথক পুরস্কার হিসেবে তাঁকে স্বরাষ্ট্রদপ্তর দেন বটে, কিন্তু ৬৭-র নির্বাচন জিতে যেন তিনি অপরাধ করে ফেললেন। কারণ তাঁর স্বরাষ্ট্রদপ্তর কেড়ে নেওয়া হলো, দেওয়া হলো রাজস্বদপ্তর।

এই প্রবীণ রাজনীতিক এবার কী করবেন? বি কে ডি থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় এসেছে, সংগঠনপন্থী কংগ্রেসীরাও চাইছেন এই অভিজ্ঞ, স্বাধীনতাগী দেশসেবককে। তাঁর পদত্যাগ মহারাষ্ট্র সরকারকেই গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করতে শ্রীদেশাইয়ের একটু সময় লাগবে বৈকি।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালীন ভারতবর্ষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বন্ধু ও জিন্না—(৩৯)

পাকিস্তান জিন্নার কাছে দ্রাণ স্বর্গ, সুভাষচন্দ্রের কাছে সমস্ত স্বপ্ন ও সাধনার সমাধিক্ষেত্র। পাকিস্তান—তার মানে ভারত-বিভাগ—তার মানে ভারতের পূর্ব ইতিহাসের প্রান্তের পুনরাবৃত্তি। পাকিস্তান স্বীকার করার অর্থ ঘৃণার ও বিম্বেষের শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার। একটা জাতিকে চিরদিনের জন্য অন্ধ ও খঞ্জ করে রাখার চক্রান্তে সায় দেবার চেয়ে বড় কাপুরুষতার কথা সুভাষচন্দ্র জানতেন না। তথাকথিত সর্বনাশের সামনে অর্থত্যাগের পান্ডিত হওয়াকে ক্ষয়িষ্ণু সুভাষচন্দ্র ঘৃণ্য মনে করতেন।

পাকিস্তান প্রস্তাব সরকারীভাবে মুসলিম লীগ গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই সুভাষচন্দ্র দেশবিভাগের সর্বনাশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। তাঁর হরিপুত্র-ভাষণের আলোচনা প্রসঙ্গে এ-ব্যাপারে তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে যা বলেছিলাম, তা এই প্রসঙ্গে আবার স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। ১৯৩৮ সালেই সুভাষচন্দ্র অনুভব করেছিলেন, স্বাধীনতা সন্নিকট এবং সেই স্বাধীনতাকে বানচাল করবার জন্য ইংরেজ সর্বপ্রকার ভেদনীতির আশ্রয় নিতে বধ্যপরিহর। ইংরেজের চক্রান্তের প্রথম প্রকাশিত রূপ ফেডারেশন পরিকল্পনা, যার দ্বারা দেশীয় রাজ্যের ভারত এবং অবশিষ্ট

ভারত—এই দুই ভাগে ভারতকে বিভক্ত করার মতলব করা হয়েছিল। ইংরেজের দ্বিতীয় চক্রান্ত, হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতের বিভাগ-পরিকল্পনা। দ্বিতীয় চক্রান্ত সম্বন্ধে হরিপুত্র-ভাষণে সুভাষচন্দ্র কী বলেছিলেন, তা পুনশ্চ উদ্ধৃত করছিঃ

“An internal partition is necessary in order to neutralise the transference of power...I have no doubt that British ingenuity will seek some other (other than the Federal Scheme) constitutional device for partitioning India and thereby neutralising the transference of power to the Indian people.”

সুভাষচন্দ্রের এই ‘দৈববাণী’ তখন দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দের বাঁধর কর্ণে কোনো সাড়া জাগায় নি। ইংরেজের যে কোনো রকম বদ মতলব থাকতে পারে তা নেহরু, অজাদ, প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তিরা সজোরে ভুলেছিলেন। যা কিছু দোষ সবই আমাদের; আর ইংরেজ, গণতান্ত্রিক শক্তির রামচন্দ্র—ওঁরা বিশ্বাস করতে চেয়েছিলেন। তা বিশ্বাস করতে তাঁরা আবার বাধ্য ছিলেন, কারণ অবিশ্বাসের অর্থ হাইকমান্ডের গদী ও বালিশ চলে যাওয়া।*

* ভারত বিভাগের রক্তনদীতে সোনার তরী ভাসিয়ে এবং তার উপরে ভারতীয় নেতাদের তুলে নিয়ে যে দুই ‘হে সুন্দর’, ‘হে সুন্দরী’ বিদেশী ও বিদেশিনী অর্থাৎ লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেন সর্বদুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের গুপ্ত ভাবের আশ্রয়লীলা, হায়, স্যান্ডহাস্ট শিখাপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট-জেনারেল এল পি সেনের কাছেও কিভাবে ধরা পড়েছিল, তার কিছু পরিচয় স্টেটসম্যান পত্রিকার ওই জুলাই, ১৯৭০ সংখ্যায় পেয়েছি। কাশ্মীর যুদ্ধের উপরে লেখা *Slender was the Thread* বইয়ের মধ্যে জেনারেল সেন পরিষ্কার লিখেছেন, কাশ্মীর সমস্যা ইংরেজেরই সৃষ্টি। কাশ্মীর যুদ্ধের প্রথম পর্বে ভারতীয় বাহিনী এমন একটি অবস্থায় পৌঁছেছিল, যখন তাঁর পেরিয়ে কিছু অগ্রসর হয়ে ডোঙ্গেল অধিকার করলে সাময়িক দিক থেকে বিশেষ সুবিধা ঘটে—তখন দিল্লীর ইংরেজ সমরকর্তারা সে প্রচেষ্টা বানচাল করে দেন। জেনারেল সেন আরও লিখেছেনঃ “যে বৃটেন ভারত ও পাকিস্তান এই দুই ডোমিনিয়নের জন্মক্ষেত্রে উভয় দেশের জন্য কমান্ডার-ইন-চীফ সরবরাহ করেছিল, সে ইচ্ছা করলে গোড়াতেই কাশ্মীর-সমস্যাকে নির্মূল করতে পারত। পাকিস্তান আর্মি হেড কোয়ার্টার যে বাড়িতে, সেই বাড়িতে বসেই উপজাতিদের কাশ্মীর আক্রমণের পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। ইংরেজ সৈন্যনায়ক একে বন্ধ করতে পারতেন; দ্বিতীয়ত তা না পারলে, ১৯৪৮ সালের গোড়ার দিকে পাকিস্তানের সরকারী বাহিনী যখন কাশ্মীরে প্রবেশ করেছিল, তখন বৃটিশ অফিসারদের সিরিয়ে নেবার হুমকি দিতে পারতেন। তাঁর পরিবর্তে বৃটেনের প্রতিনিধিরা মাউন্টব্যাটেন প্ল্যানের নিলম্ব লঙ্ঘন দেখেও দেখে নি।.....ব্যাপারটা যে কিছু ব্যক্তির দৃষ্টবোধ থেকে ঘটে নি, তা বোঝা গেল রাষ্ট্রসংঘ কাশ্মীর প্রশ্নে বৃটেনের প্রতিনিধিদের আচরণে।”

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা থেকেই সূভাষচন্দ্র কিংও ইংরেজের কট চোহারা সম্বন্ধে চোখের চামড়া-ছাড়ানো জ্বালায় দাঁগট খোলা রেখেছিলেন। রাজনীতির ইতিহাস পড়ে, উত্তম বক্তৃতায় বা ততোধিক উত্তম রচনায় ইংরেজের স্বরূপ প্রকাশ করে, তার দ্বারা বাহবা কুড়িয়ে আবার সময়-সুযোগমত তাকে ভুলতে পারতেন না। উদারনৈতিক আভিজাত ইংরেজদের বনভবনের সূর্য্য আতিথেয়তায় সূখাবিষ্ট হয়ে পড়তেন না। তাঁর বিশেষ দর্প ছিল, শৃংখলের মত ধৃত ইংরেজ যদি তাঁকে প্রতারণিত করতে না পারে পৃথিবীর আর কোনো শক্তি তা পারবে না। ইংরেজের ভেদনীতির চোহারা তিনি বারে বারে খুলে ধরে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে ইংরেজের ভেদনীতির ইতিহাস তিনি সংক্ষেপে বলেছেন। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের পরে ইংরেজ ভারতবর্ষকে নিরস্ত্র করতে আরম্ভ করে। ভারতবাসী সেই নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করে দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। এর ফলেই ক্ষুদ্র সর্বাধিকার একটি সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখতে পেরেছিল। তারপর সূভাষচন্দ্র লিখেছেন:

“এই নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার “ভেদ ও শাসন” নীতির প্রবর্তন করল। ১৮৫৮ থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৪৩) ভারতে ব্রিটিশ শাসনের এই হল মূল নীতি। ১৮৫৭-র পরে প্রায় ৪০ বছর ধরে তিন-চতুর্থাংশ ভারতকে সাক্ষাৎ নিয়ন্ত্রণে এবং বাকি অংশকে দেশীয় রাজ্যের অধীনে রাখার দ্বারা ভারতকে বিভক্ত রাখার নীতি অনুসৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ-ভারতের বড় বড় ভূম্যধিকারীদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতে লাগল। এক্ষেত্রে দেশীয় রাজাদের সম্বন্ধে ১৮৫৭-র পর থেকে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৭ পর্যন্ত ব্রিটিশ নীতি ছিল, যেখানে সম্ভব সেখানে দেশীয় রাজাদের হাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের রাজ্যের শাসনভার সরাসরি নিয়ে নেওয়া। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের সময়ে দেখা গেল, বীরগুণা কাঁসীর রাণীর মত কয়েকজন দেশীয় রাজ্যের শাসক যদিও ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, অধিকাংশই কিন্তু নিরপেক্ষ ছিলেন বা সক্রিয়ভাবে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন। নেপালের মহারাজা শেওজীদের অন্যতম। ইংরেজের চোখে সেই প্রথম ধরা পড়ল যে, দেশীয় রাজাদের নাড়া-চাড়া দেওয়া বোধহয় আর ঠিক হবে না; তাঁদের সঙ্গে চুক্তি ও বন্ধুত্ব করাই ভাল; বিপদের সময়ে তাহলে এঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। দেশীয় রাজাদের ত্যাগের ইংরাজ নীতির সূত্রপাত ১৮৫৭ সাল থেকেই। বর্তমান শতাব্দীর গোড়া থেকে অবশ্য ইংরেজ বৃদ্ধ, জনগণের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজা বা ভূম্যধিকারীদের কেবল লাগিয়ে রেখেই ভারতকে পদানত রাখা যাবে না। সুতরাং তারা লর্ড মিণ্টো ভাইসরয় থাকাকালে ১৯০৬ সালে মুসলিম সমস্যা আবিষ্কার করে ফেলল। তার আগে পর্যন্ত এই সমস্যা কোথাও ছিল না। ১৮৫৭-র মহান বিপ্লবের

সময়ে মুসলমান বাহাদুর শাহের পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে হিন্দু ও মুসলমান ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছে।

“গত বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) সময়ে ইংরেজ যখন দেখল যে, ভারতীয় জনগণকে আরও কিছু রাজনৈতিক অধিকার দিতেই হয়, তখন তারা বৃদ্ধ, শত্রু মুসলমানদের অন্য ভারতবাসীদের থেকে বিভক্ত করে রাখলেই যথেষ্ট হবে না। তখন তারা হিন্দুদের মধ্যেও বিভেদ ঘটাবার চেষ্টার নেমে পড়ল। এই পথে তারা ১৯১৮ সালে হিন্দুদের জাতিভেদ সমস্যা আবিষ্কার করে ফেলল ও সহসা তথাকথিত অনুন্নতদের সমর্থক ও মূর্খদাতা সেজে বসল। ১৯৩৭ পর্যন্ত ইংরেজ আশা করছিল যে, রাজন্যবর্গ, মুসলমান এবং তথাকথিত অনুন্নতদের বড় সমর্থক সেজে সে ভারতকে বিভক্ত রাখতে পারবে। কিন্তু ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী (১৯৩৭-এ) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে চমৎকৃত হয়ে দেখল, তাদের সকল কৌশল ও ধাপাঝাঁজ ব্যর্থ হয়েছে, সমস্ত জাতি ও অন্তর্ভুক্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। তখন ইংরেজ-নীতি শেষ আশার সূত্রটি মূর্খিতে ধরল: ভারতীয় জনগণকে যদি বিভক্ত করা না যায়, তাহলে ভারতবর্ষ নামক দেশটিকে ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিকভাবে ভাগ করে দিতে হবে। এই মতলবের নামই পাকিস্তান, জনৈক ইংরেজের উর্বর মস্তিষ্কে এর জন্ম, যার অপরাপর নাজির রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যত্র। যথা, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে যে-সিংহল ভারতবর্ষেরই অংশ, দীর্ঘদিন আগে তাকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। গত যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) পরেই চিরদিনের অখণ্ড আয়ারল্যান্ডকে ভাগ করে আয়ারল্যান্ড ও আইরিশ ফ্রি স্টেট করা হয়েছে। ১৯৩৫-এর আইনের পরে স্বদেশকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ভারত থেকে। আর যদি বর্তমান যুদ্ধ বাধা সৃষ্টি না করত, তাহলে দেখা যেত, প্যালাস্টাইন ইহুদী রাষ্ট্র ও আরব রাষ্ট্র—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে ব্রিটিশ করিডর। পাকিস্তান বা ভারত বিভাগ পরিকল্পনা আবিষ্কার করার পর থেকে ইংরেজ তার পক্ষে নিপুণ এবং বিপুল প্রচারণা চালাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের গরিষ্ঠ অংশ যদিও মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষকে চায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি যদিও একজন মুসলমান এবং ভারতীয় মুসলমানদের কিছু মানুষই মাত্র যদিও পাকিস্তান পরিকল্পনা সমর্থন করে—ব্রিটিশ প্রচারণা তা সত্ত্বেও সারা পৃথিবীতে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, ভারতীয় মুসলমানেরা স্বাধীনতা সংগ্রামের পিছনে নেই, তারা ভারত বিভাগ চায়। ইংরেজ নিজেই জানে সে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, তা হলেও তারা আশা করে বার বার একই মিথ্যা বলতে বলতে তারা পৃথিবীর সামনে সেটাকে সত্য করে তুলতে পারবে। উদ্ভট পাকিস্তান পরিকল্পনা যখন প্রথম উদ্ভাবন করা হয়, তখন তথাকথিত হিন্দু-ভারত ও তথাকথিত মুসলিম-ভারত—এই দুই ভাগে ভারত বিভাগের কথা বলা হয়েছিল। ইংরেজের উর্বর যান্ত্রিক বিভাগ-পরিকল্পনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে

এবং এ-ব্যাপারে যদি তারা স্বচ্ছন্দে কাজ চাליয়ে যেতে পারে, তাহলে ভারতকে দুটো রাষ্ট্রেই ভাগ করে দেবে না, পাঁচটি-ছটি রাষ্ট্র তৈরি করে ফেলবে। বৃটিশ রাজ-নীতিকরা বলছেন, দেশীয় রাজারা যদি বিচ্ছিন্ন হতে চায়, তাহলে তাদের 'রাজস্থান' নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়া উচিত। ভেটনাম শিখরা আলাদা হতে চাইলে তাদের রাষ্ট্র হবে খলিস্তান। ধূর্ত ইংরেজরা আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নিবাসী ভারতীয় মুসলমানদের—যাদের পাঠান বলা হয়—প্রতি বিশেষ দরদ দেখিয়ে বলছে, সেখানে পাঠানিস্থান নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়া দরকার। ঠিক বর্তমান মুহূর্তে পাঠানিস্থান বৃটিশ রাজনৈতিকদের কাছে দারুণ প্রিয় বিষয়। তারা আশা করে, এই পাঠানিস্থান পরিকল্পনার দ্বারা তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সর্বাধিক হস্তগাদায়ক, ব্যতিব্যস্তকর কিছু লোকের মন জয় করতে পারবে, ভারত ও আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী স্থানের স্বাধীন উপজাতিদের মনও জয় করবে, সেই সঙ্গে সহানুভূতি অর্জন করবে আফগানদের।*

পাকিস্তান পরিকল্পনা মুসলিম লীগ কর্তৃক গৃহীত হবার অপেক্ষেই স্ভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। অন্তরীণ থাকাকালেই তিনি ভারত ত্যাগ করেন। সুতরাং ভারতে থাকাকালে পাকিস্তান সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য খুলে ধরতে পারেন নি। অন্তরীণ অবস্থাতেই তিনি ভারত ত্যাগ করেন। তারপরে বেশ কিছু সময় যায় যে-উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগ করেছেন, তার ক্ষেপ্ত প্রস্তুতির কাজে। তারপরে যখন প্রথম সুযোগ পেয়েছেন, তখনই পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য খুলে বলেছেন। ১৯৪৩ সালের উজ্জিখিত রচনায় সুস্পষ্ট ভাষায় পাকিস্তান পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেনঃ “পাকিস্তান অশুভ, উদ্ভট পরিকল্পনা, একাধিক কারণে তা অবাস্তব প্রস্তাব। প্রথমত, ভারতবর্ষ ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে অবিভাজ্য। দ্বিতীয়ত, ভারতের অধিকাংশ জায়গায় হিন্দু ও মুসলমানেরা এমনভাবে মেশামেশি হয়ে আছে যে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। তৃতীয়ত, যদি জোর করে মুসলিম রাষ্ট্রগঠন করা হয়, তাহলে এসব জায়গায় নতুন করে সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্ভব হবে, যা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে।” স্ভাষচন্দ্র এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন—হিন্দু ও মুসলমান একজোট হয়ে লড়াই না করলে ইংরেজ দূর হবে না, আর ইংরেজ না গেলে হিন্দু বা মুসলমান কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রেই সম্ভব নয়। ভারতকে বিভক্ত হতে দেওয়া মানে ইংরেজের আধিপত্যকে বজায় রাখতে দেওয়া। স্ভাষচন্দ্র জিন্নার উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছিলেন, পাকিস্তান-সৃষ্টি ইংরেজের সহায়তা ভিন্ন সম্ভব নয়।*

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম স্ভাষচন্দ্রই করেছেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িক-দের কথা বাদ দিচ্ছি, হিন্দু-সাম্প্রদায়িকরাও ভারত বিভাগ চেয়েছিল, অন্য কারণে না হলেও অব্যাহতি-কামনায়। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ক্ষমতালোভে এবং সংগ্রাম-ভাটিতে তাকে মেনে নিয়েছিলেন। এবং পাকিস্তান মেনে নেওয়ার জন্য এখন যেসব ভারতীয় কামউনিষ্ট কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের বলদোংসগ্ গ্রাম্য প্রাতিদিন করছেন, তাঁরাই বিচিত্র, জটিল এবং একমাত্র নিনেদের পক্ষে বোধগম্য যুক্তিতে রাজাগোপালাচারীর সাহচর্যে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারে নেমে পড়েছিলেন (তাঁদের সেই পুরনো মূখ্য এখনো দেখা যায়, স্বাধীন কাস্মীরের ছদ্মবেশী সমর্থনের মধ্যে)। এইসব কাপুরুষতা ও স্বার্থপরতার মধ্যে ভারতের এই কালের সর্ববৃহৎ পুরুষ স্ভাষচন্দ্র ভারতের বাইরে নতুন ভারতবর্ষ গড়ছিলেন অশ্রু, রক্ত ও ত্যাগের উৎসর্গের মধ্যে। সে ভারত-বর্ষ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃস্টান, জৈন, পারসিক—সকলের। আশ্চর্য সেই ঐক্য—ভারতের অনৈক্য ব্যাখ্যাত গান্ধীজীকে তা এমনই মোহিত করেছিল যে, তিনি এই জন্য স্ভাষচন্দ্রের উচ্ছ্বাসিত স্তুতি করেছেন। সর্বপ্রণীর ভারতীয়ের এই ঐক্য স্ভাষচন্দ্র সম্ভব করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি দোকানদারীর রাজনীতিতে ছিলেন না, সংগ্রামের রাজনীতি করছিলেন। “তোমার সব দাও, সর্বস্ব দিয়ে ফকির হও”—তিনি ডাক দিয়েছিলেন। “রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব”—সকলে শিহরিত হয়ে শুন-ছিল। যারা সাড়া দিয়েছিল, তারা হিন্দু-হাত বা মুসলমান-হাত বাড়ায় নি, বাড়িয়েছিল ভারতীয়ের হাত, কিংবা মানুষের হাত। যুদ্ধক্ষেত্রে “ঐক্য, বিশ্বাস, বলিদানই” ছিল মন্ত্র, রক্তের সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারার হিসাব-নিকাশ সেখানে ছিল না। এই সমস্তই সম্ভব হয়েছিল—কারণ নেতাজী নিজে সত্যি বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের সবচেয়ে বিপদসংকুল যাত্রাগুলিতে, যেখানে মৃত্যু সামনে-পিছনে, উপরে-নিচে, সেখানে পাশে নিয়েছিলেন মুসলমান জাতিকে।

ভারতের বাইরে সকলের ভারতবর্ষকে স্ভাষচন্দ্র যখন গড়ছিলেন, তখন ভারতের ভিতরে দেশপ্রাণ নেতৃবৃন্দ কিন্তু দ্বিধা, চতুষ্কোণ কিংবা সুগোল টেবিল ঘিরে বসে আলোচনা চাליয়ে যাচ্ছিলেন, কি করে ঐ সাধনার ভারত-বর্ষকে টুকরো করা যায়। স্ট্যামফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছিলেন, ওয়াভেলের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করছিলেন, অক্লান্ত আলোচনার সংগ্রাম চাליয়ে যাচ্ছিলেন, ক্রিপসের সৌম্য চতুরতার লাঞ্চে মোহিত হচ্ছিলেন, ওয়াভেলের সামরিক চোয়ালের পুরুদাঁড়ি গঠন দেখে আনন্দ পাচ্ছিলেন, লাভের অঙ্কে একেবারে ঢেরা পড়তে থানিক

*ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের দ্বিতীয় খণ্ডে স্ভাষচন্দ্র লিখেছেনঃ

“It is noteworthy that in his latest utterances Mr. Jinnah, the President of the Muslim League, and a Champion of Pakistan, has acknowledged that the creation and maintenance of Pakistan is possible only with the help of the British.”

হিমেল সন্ধ্যায় বনের ধারে থমকে থামা

নবাবী প্রসঙ্গ

এ যে মালিক এই বনানীর, হরত সেটা জান—
ঝাঙ্কের গ্রামেই থাকে তো সে; ঐ, ঐ তো ঘরখানি।
দেখবে না-সে—থমকে গেছি—দেখাছি একমনে
তুবারে-তার উঠছে ভরে স্তম্ভ অরণ্যানি।

ছোট আমার টাট্টা। সেটাও ভাবছে ঠিকই মনে
আজব এখন থামা—থামার নাই যদি নিশ্চিনে
তুয়ার-জমাট জল-জংগল বিল-বাদারের মাঝে
এই বছরের চরম আঁধার যখন সান্ধ্য বনে।

ঘণ্টা-গাঁথা হাঁসুলি সে একটুখানি ঝাঁকায়,
ভুল-চুক তো হয় নি কিছ—যেন শূন্য শূন্য।
অন্য আওয়াজ সন্-সনানো হিমেল হাওয়ার শূন্য,
ঝিঝি-ঝিঝিয়ে তুলোট তুবার পড়ছে হেথায় সেথায়।

শোভন এ বন, গভীর আঁধার তার
তবু রাখতেই হবে অঙ্গীকার;
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহু দূর,
আর নিদ্রার আগে যেতে হবে বহু দূর।

অনুবাদক : অক্ষয়কুমার চন্দ্র

চটে গিয়ে ঘরে ফিরে কিছুর বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, সেই সঙ্গে
আবার কান খাড়া রাখছিলেন কখন ডাক পড়ে। সূভাষচন্দ্র
এইসব ভারতীয় নেতাকে চিনতেন, জানতেন যে, এঁদের
অসাধ্য কিছুর নয়, যে-কোনো অসম্মানজনক বা ক্ষাতকর
আপসে এঁরা রাজী হয়ে যেতে পারেন—অথচ এঁদের
বিবেকের কাছে আবেদন করা ছাড়াও তখন গতান্ত নেই।
ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে বারে বারে তিনি
সেই আবেদন জানিয়েছেন।

১৯৪২ সালে সূভাষচন্দ্র যখন জার্মানীতে, তখন
প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তাঁর ‘প্রস্তাব’
নিয়ে ভারতে আসেন। আসার কারণ, ইংলন্ডের পক্ষে তখন
সংকটময় বন্ধুপরিস্থিতি। ইংরেজ ভারতকে সতাই কিছুর
দিতে চায় নি, দেওয়ার নাম করে ভারতীয় স্বাধীনতা-
স্বপ্নহার তীব্রতা কিছুর হরণ করতেই চেয়েছিল। সেই সঙ্গে
সুপরিচিত ভেদনীতিকও ঝালিয়ে নিচ্ছিল। জার্মানী থেকে
২৫শে মার্চ, ১৯৪২-এ সূভাষচন্দ্র এক বেতার ভাষণে এ
বিষয়ে বলেনঃ “বৃটিশ সরকার ভারতের জন্য যে প্রস্তাব
হাজির করেছে এবং সেই সূত্রে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস যে
রেডিও বক্তৃতা করেছেন তাকে আমি খুব সতর্কভাবে
পরীক্ষা করেছি। তার ফলে পরিস্কার বুদ্ধিই যে, তিনি
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দীর্ঘপোষিত ‘ভেদ ও শাসন’ নীতিকেই
আবার চালাবার চেষ্টায় ভারতে গেছেন। ভারতের অনেকেই
কিন্তু আশা করেন নি যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস এই
খেলায় নামবেন, যা ইতিপূর্বে মিঃ আমেরী-জাতীয় রক্ষণ-
শীল রাজনীতিকদের জন্যই তোলা ছিল!.....”

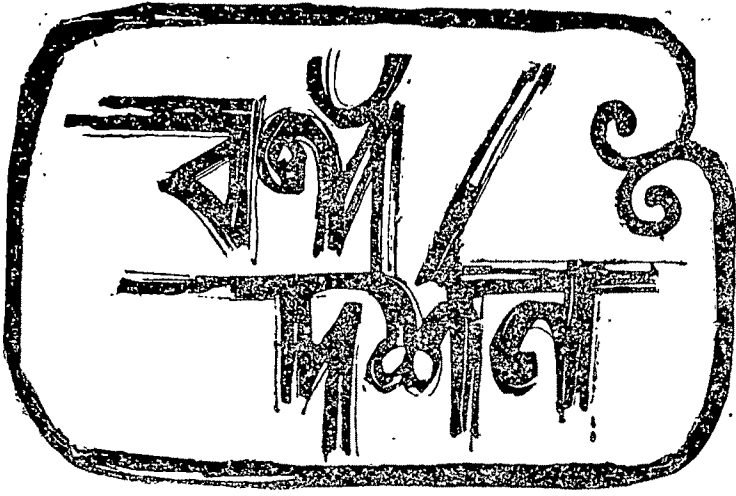
“স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস আমাদের বলছেন, ভারত একটি
উপ-মহাদেশ, নানা জাতির নানা ধরনের মানুষের দ্বারা
অধুষিত। আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বৃটিশ
জম্মাবার কয়েক শতাব্দী আগে ভারতবর্ষ মহান অশোকের
দ্বারা এক-সাম্রাজ্যে একাবদ্ধ হয়েছিল। ইংলন্ড একাবদ্ধ
হবার হাজার বছরেরও বেশি আগের সে ঘটনা।

“বৃটেন তার সাম্রাজ্যের অন্যর, যথা আমায়ল্যান্ড ও
প্যালেস্টাইনে ধর্মীয় ব্যাপারকে ব্যবহার করেছে জনগণকে
বিভক্ত করার কাজে। সেই একই অস্ত্র ভারতের ক্ষেত্রেও সে
ব্যবহার করতে চাইছে। না, তাতেই সে সন্তুষ্ট নয়—
অনন্তত সম্প্রদায়, দেশীয় রাজন্যবর্গ প্রভৃতি অন্যান্য সাম্রাজ্য-
বাদী অস্ত্রও ব্যবহার করেছে। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস
একই সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যসিঁদ্বির জন্য এখন এসেছেন
ভারতবর্ষে একই অস্ত্র হাতে নিয়ে। এটাও কম লক্ষণীয়
নয় যে, স্যার স্ট্যাফোর্ড এক সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে
বোঝাপড়া করে অন্য সম্প্রদায়কে দমিত করার পুরাতন
সাম্রাজ্যনীতি প্রয়োগ করে যাচ্ছেন।”

স্যার স্ট্যাফোর্ডের ভণ্ডামীর মূখোশ সূভাষচন্দ্র টেনে
ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। বৃটিশ যে কিছুর ক্ষমতা হস্তান্তরে
রাজী নয়, দৃষ্টান্তযোগে তা খুলে ধরেছিলেন। ইংরেজের
প্রলোভনে ধরা দেওয়ার অর্থ, বন্ধুত্ব পীড়ন ও অত্যাচারের
নতুন অভিজ্ঞতা লাভ—সতর্ক করে তা বলেছিলেন।
মুসলিম লীগকে ইংরেজ কিভাবে চেষ্টা করে ফাঁপিয়ে
তলেছে তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন।*

[ক্রমশ]

* “Since the beginning of this century, the British Government has been using another organisation as a counterblast to the Congress in order to reject its demands. It has been using the Muslim League for this purpose, because that party is regarded as pro-British in its outlook. In fact, British propaganda has tried to create the impression that the Muslim League is almost as influential a body as the Congress, and that it represents the majority of India's Muslims. This, however, is far from the truth. In reality there are several influential and important Muslim organisations which are thoroughly nationalist. Moreover, of the 11 provinces in British India, out of which only four have a majority of Muslims, only one, the Punjab, has a Cabinet which may be regarded as a Muslim League Cabinet. But even the Punjab Premier is strongly opposed to the main programme of the Muslim League, namely the division of India.”



এ সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী যখন প্রকাশিত হবে তখন চোন্দই জুলাই-এর বাংলা বন্ধের ঘটনা ঘটে যাবে। কোন অঘটন না ঘটলেই মঙ্গল। কেন না, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট পরিস্থিতি সেই সব মানুষেরই প্রাণহানি ঘটায়, যারা আসলে সর্বহারা শ্রেণীরই অন্তর্গত। অথচ যাদের বিরুদ্ধে আসল সংগ্রাম হওয়া উচিত তাদের গায়ে কোনদিনই আঁচড় লাগে না। দোষ রাম কি শ্যামের সেটা বড় কথা নয়, যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যত রাজনৈতিক হত্যা হয়েছে, তার বলি হয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক নিম্নবর্গের মানুষ-গুলিই। সুবিধাভোগী শ্রেণীর গায়ে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগানো যায় নি, তাদের মোটর বিহার, নাইট ক্লাবে গমনে কোন বাধাই পড়ে নি, অথচ তারাই আপার হ্যান্ড নিয়েছে এবং দেশজোড়া আইনশৃঙ্খলার ধুমো ভুলে প্রচার চালাবার সুযোগ পেয়েছে। বামপন্থী নেতারা যদি একটু সহৃদয় হতেন, একটু ধৈর্যশীল হতেন, একটু কম প্রভোকেটিভ হতেন তাহলে অনেক প্রাণের অপচয় অকালে ঘটত না।

তাই যখন পশ্চিমবঙ্গের পরস্পর-বিরোধী দুটি বামপন্থী শিবির ভিন্ন ভিন্ন দিনে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন, তখন আমরা স্বভাবতই শংকিত হয়েছিলাম এই কারণে যে, এর ফলে অনেকগুলি প্রাণহানি ঘটবে, যা রোখা অসম্ভব। এ আশংকা আমরা বিগত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছিলাম এবং নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করেছিলাম যে, তাঁরা যেন দু' তরফই একদিনে ধর্মঘট ডাকেন, তাহলে পরিস্থিতি একটু নিরাপদ হবে। আমাদের অনুরোধের ফলে না হোক ঘটনাচক্রে দু' তরফই যে শেষ পর্যন্ত একটা দিনেই এসে পড়েছেন, সেটা কম স্বস্তির কথা নয়। তবে চোন্দই জুলাই (ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে ওই তারিখেই বাস্তব দৃষ্টির পতন হয়) বর্তমান ব্যবস্থার ওপর কি প্রভাব ফেলবে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা। ঠিক এই মুহূর্তে বাংলা বন্ধের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, সেটা আমাদের বন্ধির অগম্য। রাষ্ট্রপতির শাসন যে পশ্চিমবঙ্গে খোলাখলিভাবে ব্যর্থ হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। কিন্তু বাংলা বন্ধের দ্বারা তো আর সে শাসনের অবসান হবার কোন সম্ভাবনা নেই, এটা বামপন্থী দলগুলির সদিচ্ছার ওপরই নির্ভর করে। কিন্তু যেহেতু দুটি বিবদমান বামপন্থী শিবির একত্র হবেন না বলে মনোভঙ্গ পণ করে বসে আছেন, তখন নির্বাচন ভিন্ন উপায় নেই। কাজেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন ও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া বাংলা বন্ধের কারণসচীর মধ্যে স্থান পেয়েছে।

শোনা যাচ্ছে যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হচ্ছে এবং তাই যদি হয় তাহলে নির্বাচনের দিনও একটা ধাফ করতে হবে। আসলে এটা অনিবার্যই ছিল। তার জন্য ধর্মঘট অত্যাবশ্যক ছিল না। তথাপি এই ধর্মঘট কেন? আসলে এটা একটা শক্তি পরীক্ষার মহড়া। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকে বামপন্থী দলগুলি শক্তির পরীক্ষার জন্য জনগণকে এই কয়লাস মিছিলে ও সমাবেশে কাতারে কাতারে হাজির হতে আহ্বান দিয়ে এসেছেন। এবার কত লোক কার ডাকে বাড়িতে বসে থাকেন তার শক্তি পরীক্ষাই

ছিল আসল উদ্দেশ্য। এদিকে আট পার্টি জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের ফলে একটি বিষয় সুস্পষ্টরূপে বোঝা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোন বিকল্প জনপ্রিয় সরকার হবার সম্ভাবনা নেই, বাংলা কংগ্রেস বাদে আর সব দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষ-পাতী। কাজেই আজ না হোক কাল বিধানসভা ভেঙে দেওয়াই হচ্ছে। কাজেই বাংলা বন্ধের রাজনৈতিক মনোফাও যে সত্যই কিছু আছে তা মনে করার কোন কারণ নেই। তবে এটা ঠিক কথা যে, রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে একটা

অসহনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আগেই আমরা বলছি যে, যারা এই অবস্থার প্রতিকার করতে পারতেন, তাঁরা নিজেরাই দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘায়িত হবার সুযোগ দিয়েছেন। এ তো গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।

রাজ্য রাজনীতি সংবাদ

আট পার্টি জোটের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বৈঠকের পর অবস্থা যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে। বৈঠকের ফলাফল দেখে বোঝা যায় যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টি জোটে যোগ দিচ্ছে না, যদিও সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেস কাছাকাছি কিছুটা এসেছে। এঁদের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী জানিয়েছেন যে, তের দফা দাবির ভিত্তিতে উভয়পক্ষের মধ্যে মনখোলা আলোচনা হয়েছে এবং এই আলোচনা উভয় তরফের কাছেই সন্তোষজনক বলে বিবোচিত হয়েছে। অপর এক সূত্র থেকে জানা গেছে যে, যে তের দফা দাবির ভিত্তিতে আট পার্টি মোর্চা ধর্মঘট আহ্বান করে-ছিলেন, সেগুলির প্রত্যেকটি দু'দিনের বৈঠকে আলোচিত হয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নাকি বলেছেন, কোথাও অন্যায়ভাবে জমি দখল হয়ে থাকলে আট পার্টি মোর্চা যদি তা সংশোধনের নির্দেশ দেন তা অবিলম্বে কার্যকরী হবে। তা ছাড়া পুলিশ নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকায় কয়েকটি স্থানে জোতদারদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে কৃষকেরা হিংসার পথ গ্রহণ করেছে। কিন্তু পুলিশকে যদি জনগণের সঙ্গে রাখা যায়, তাহলে অবস্থার এরকম অবনতি হবে না। আসলে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির মৌলিক পার্থক্যটা এই একটি বিষয়ে। বাংলা কংগ্রেসের যা শ্রেণী-চারিত্র, তার সঙ্গে জমি দখলের নীতি খাপ খায় না এবং এক্ষেত্রে যদি তঠাৎ কোন বোঝাপড়া হয়ে যায়, বাস্তবে হবে সেটা একটা একান্তই সাময়িক ব্যাপার হতে বাধ্য। তবে উপরি উক্ত দু' তরফের বৈঠক থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, শ্রীঅজয়কুমার মল্লিকোপাধ্যায় মন্ত্রিসভা গঠনের কোন প্রচেষ্টা করছেন না এবং আট পার্টি জোট বিধানসভা ভেঙে দেবার দাবি জানিয়েছেন। ফলস্বরূপ অনুমান করা চলে যে, রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষেত্র বর্তমানে কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তবে কয়েকদিনের মধ্যে বিধানসভা বাতিল হচ্ছে এটা প্রায় সর্নিশ্চিত, তবে নির্বাচনী দায়িত্ব করে পক্ষ বাজবে, সেটা এখনই বলা সম্ভবপর নয়।

কলেজে ভর্তি সমস্যা

গত সপ্তাহে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবার পর থেকে শহরের কলেজে-কলেজে ভর্তির লাইন পড়ে গেছে। এ বছরে মোট এক লক্ষ আঠার হাজার ছাত্র-ছাত্রী হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়েছিল, তাদের

মধ্যে ত্রিযান্তর হাজারের মত পাশ করেছে। কিন্তু এই ত্রিযান্তর হাজারের মধ্যে মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজারের মত ছাত্র-ছাত্রী প্রথম বিভাগে পাশ করেছে, দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছে সাতাশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং বাকি সাড়ে আটত্রিশ হাজার তৃতীয় বিভাগে। কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রথম ও দ্বিতীয়

বিভাগে উত্তীর্ণদের একটা মোটামুটি আশা থাকলেও তৃতীয় বিভাগে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীরা কোথাও পাসা পাচ্ছে না। প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে যারা পাশ করেছে, তারাও সকলে মনের মত বিষয়ে অনার্স পাচ্ছে না। কেমিস্ট্রিতে অনার্স চেয়ে ফিজিক্স নিতে বাধ্য হচ্ছে, ইকনমিক্স চেয়ে সংস্কৃত নিতে বাধ্য হচ্ছে।

এখন পাওয়া যাবে

পশ্চিম বাংলার ক্রমবর্ধমান সাগর-শহর দিঘা টাউনশিপে আবাসিক প্লট

সদ্য সম্প্রদারিত এন-২ সেক্টরে ৩০৪৫ থেকে ৪৫০৬৪।

কাঠার বিভিন্ন আকারের প্লট

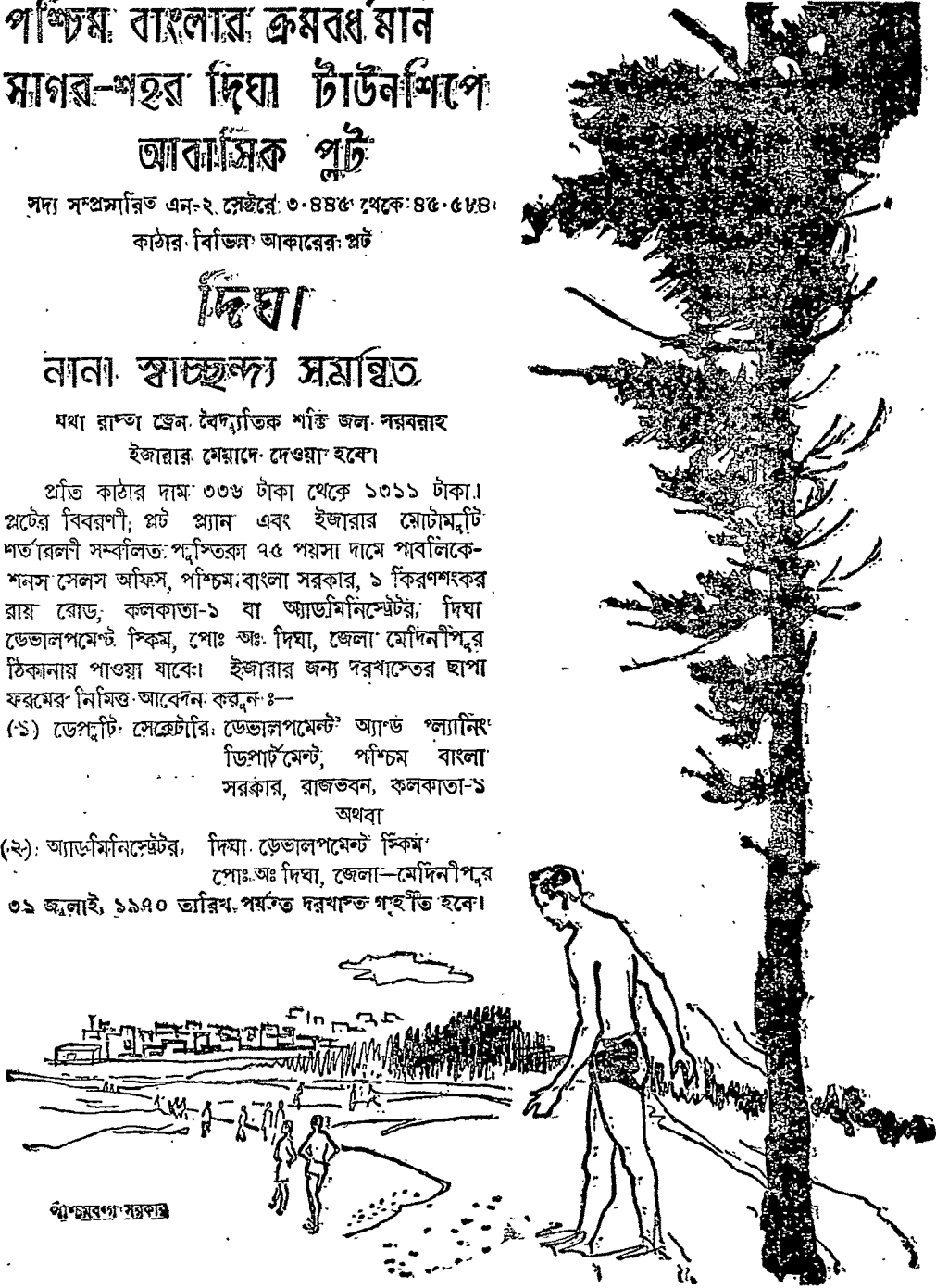
দিঘা

নানা স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবিত

যথা রাস্তা জেন বৈদ্যুতিক শক্তি জল সরবরাহ
ইজারার মোদা দেওয়া হবে।

প্রতি কাঠার দাম ৩৩৬ টাকা থেকে ১০১১ টাকা।
প্লটের বিবরণী, প্লট প্ল্যান এবং ইজারার মোটামুটি শর্তাবলী সম্বলিত পদুস্তিরা ৭৫ পয়সা দামে পাবলিকেশনস সেলস অফিস, পশ্চিম বাংলা সরকার, ১ কিরণশংকর রায় রোড, কলকাতা-১ বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, দিঘা ডেভেলপমেন্ট স্কিম, পোঃ অঃ দিঘা, জেলা-মেদিনীপুর ঠিকানায় পাওয়া যাবে। ইজারার জন্য দরখাস্তের ছাপা ফরমের নিমিত্ত আবেদন করুনঃ—

- (১) ডেপুটি সেক্রেটারি, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিম বাংলা সরকার, রাজভবন, কলকাতা-১ অথবা
- (২) অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, দিঘা ডেভেলপমেন্ট স্কিম পোঃ অঃ দিঘা, জেলা-মেদিনীপুর ৩১ জুলাই, ১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত গৃহীত হবে।



—ডক্টর বি (আই অ্যান্ড পি আর) অ্যাডভঃ নং ২১০০/৭০—

সাপ্তাহিক বসুমতী

অথচ অনার্স ছাড়া পাশ কোর্সে ডিগ্রী পাশ করা যে আজকে চাকরীর দর্শনায় কতখানি অপরাধজনক ব্যাপার তা কে না জানে। কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ইচ্ছামত বিষয়ে অনার্স নেবার উপায় নেই। আর তৃতীয় বিভাগে যারা পাশ করেছে তাদের তো কলেজের চোকাঠ ডিঙানোই দঃসাধ্য। বিশেষভাবে বিজ্ঞান বিভাগে। অনার্স পাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে না, যেমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে। জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সকলেই সমান করে না, এমন অনেক উদাহরণ আছে—যাঁরা প্রথম পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে পাশ করে পরবর্তী পরীক্ষাগুলিতে রীতিমত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শব্দ তাই নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে নিজের চিরস্থায়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিন্তু এখন প্রথম পরীক্ষাতেই ভাগ্য নির্ধারিত, তার জীবনে ওঠার রাস্তা একবারেই বন্ধ, তাকে সর্ব-নিম্ন বেতনের পেশাতেই দরিদ্রপূর্ণ আজীবন কাটাতে হবে।

সে কথা যাক। এমন অশুভ পরি-স্থিতি ঘটন কেন? কেন ছাত্র-ছাত্রীরা পাশ করে কলেজে চাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তার কারণ এই যে, প্রয়োজনের তুলনায় কলেজের সংখ্যা নিতান্তই কম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন-মোদনপ্রাপ্ত কলেজের সংখ্যা ২০১—যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামত ছাত্রভর্তি করতে পারেন না, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশ মেনে চলতে হয়, নইলে আর্থিক অনুদান মেলে না। ফল হয়েছে এই যে, কলেজের ইচ্ছা এবং ছাত্রের সামর্থ্য থাকলেও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। আজকাল কলেজের সংখ্যা বছরে দু-একটি করে বাড়লেও প্রতি বছর কলেজ পাঠেছ, ছাত্রের সংখ্যা বাড়ছে প্রায় দশ হাজার করে। আমাদের জিজ্ঞাস্য, কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না কেন? পাশ করলে কলেজে পড়তে দেবো না, কলেজ থেকে পাশ করে বেরলে চাকরী দেবো না, এরকম অমানবিক নীতি কোনো সভ্য রাষ্ট্রে চালু আছে বলে আমাদের জানা নেই। রাষ্ট্রব্যপ্ত এ ক্ষেত্রে একেবারেই ভাবনাহীন। মন-বাক-শরীরে এষ্ট বিপুল অপচয় একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব।

যারা ভাল রেজাল্ট করেছে তাদেরও ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ নেই বাপের টাকা না থাকলে। বাবার মাসিক আয় এত টাকার কম হলে চলবে না। এরকম দাবিও ছাত্রভর্তির ব্যাপারে বড় বড় কলেজ-গুলি করে থাকে। অর্থাৎ যারা সর্বিধা-ভোগী শ্রেণী নয়, তাদের জেলেমেয়েদের

শিক্ষার ক্ষেত্রেই সংকুচিত করে আনা হচ্ছে।

আমাদের জিজ্ঞাস্য : এ অবস্থা কতদিন সহ্য করা যায়?

স্বাস্থ্যদপ্তর প্রসঙ্গে

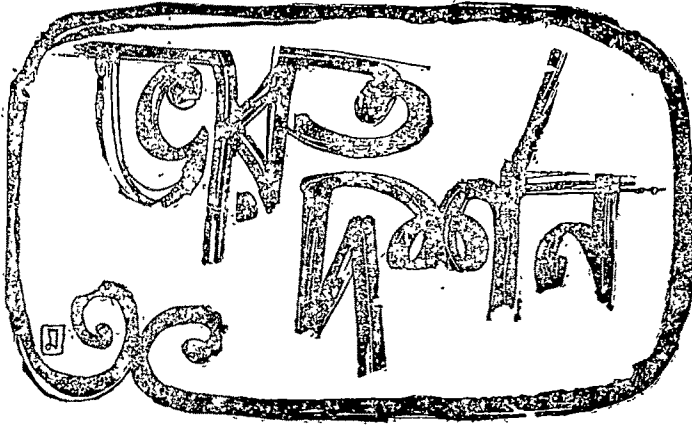
দীর্ঘকাল পরে আবার আমরা স্বাস্থ্য-দপ্তর প্রসঙ্গে ফিরে এলাম। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রেরই জানেন যে, স্বাস্থ্য-দপ্তর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ বরাবরের। কেন না, এই দপ্তরের সঙ্গে জনজীবনের সম্পর্ক খুব নিবিড়। কংগ্রেসী আমল থেকে যুক্তফ্রন্টের আমল পর্যন্ত এই দপ্তরের পক্ষোদ্ধারের চেষ্টা আমরা আন্তরিকভাবে করেছিলাম, আমাদের অবিরাম লেখার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ের প্রতিকার হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য হয়ও নি। কিন্তু আমাদের কতব্যে আমরা হ্রাসি করি নি। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রেরই জানেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তরে দীর্ঘকাল ধরেই কয়েকটি বিশেষ আমলার একচ্ছত্র অধিকার ছিল, আজও আছে, এটি একটি ঘৃণনর বাসা—যার বিনাশ নেই বললেই চলে। আমরা দেখিয়েছিলাম যে, এমন কি যুক্তফ্রন্টের আমলেও এই চক্র খোদ মন্ত্রীমশাইকেও হাতের মঠোয় পুরে ফেলোছিল। চক্রের মূল গায়নকে অবশ্য আমাদের লেখালেখির ফলে একদিনের জন্যও পদূর্নিয়োগ করা সম্ভব হয় নি, তিনি অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যে সব শিকড় তিনি রেখে গেছেন সেগুলি এখন বটবক্ষে রূপান্তরিত হয়ে দপ্তরের সকল রসই নিংড়ে নিচ্ছেন। বর্তমান স্বাস্থ্য অধিকর্তা দ্রুত প্রকৃতির লোক নন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর যথেষ্ট সাদিচ্ছা থাকলেও তিনি অসহায়। এই দপ্তরের উপদেষ্টারূপে যিনি এসেছেন, তাঁর সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গবাসীদের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। কতিপয় পদস্থ আমবা বিচিত্র রোগব্যাগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যদপ্তরে দুর্নীতি ও বৈরাচারের বন্যা বইয়ে চলেছেন, যথাকালে আমরা তা একের পর এক দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরব। এই সংখ্যায় নতুনভাবে পুনরায় স্বাস্থ্যদপ্তরের কাহিনী শুরু করছি একটি দুর্নীতির কাহিনী দিয়ে। এই কাহিনীর নায়ক জনৈক ক্লার্ক—যাঁকে সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে হসপিটাল সেক্রেটারী পদে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। অফিসার পর্যায়ের এই পদটিতে উক্ত ব্যক্তিকে নিয়োগ করার পিছনে যার নেপথ্য হস্ত রয়েছে, তিনি হচ্ছেন স্বাস্থ্যদপ্তরের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের জনৈক পদস্থ আমলা। উক্ত

পদটির জন্য তাঁরই একমাত্র আবেদন কমতে পারেন—যাঁরা বর্তমানে সুপার-ভাইজারী পদে নিযুক্ত আছেন। আমাদের আলোচ্য ক্লার্কটি তেমন কোন পদে নিযুক্ত কোনদিনই ছিলেন না, অথচ তাঁর পৃষ্ঠপোষক এই পদস্থ আমলা তাঁকে এই মর্মে একটি মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়ে-ছেন, যা তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে দাখিল করেন। তাঁর মজেলকে চাকরীটি পাওয়ার জন্য উক্ত পদস্থ আমলা নিজেই সিলেকশন বোর্ডে ডিপার্টমেন্টাল এক্সপার্ট-রূপে হাজির থাকেন। সিলেকশন লিস্টে উক্ত ক্লার্ক ভদ্রলোক তৃতীয় স্থান পেলে তাঁকে চাকরি দেওয়ার অসুবিধা দেখা যায়, কারণ হসপিটাল সেক্রেটারীর একটি পদই খালি ছিল। কিন্তু উক্ত প্রবল প্রতাপালবত পদস্থ আমলা এতে নিরস্ত হবার পাত্র নন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন পদ না থাকলেও পদের সৃষ্টি করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, যে গুণধরটির জন্য পদস্থ আমলা উঠে পড়ে লেগেছেন, তিনি নাকি পূর্বে সেন্ট্রাল মেডিকাল স্টোর্সে কর্মরত থাকাকালীন ঘৃণা নেবার দায়ে অপসারিত হয়েছিলেন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাণ্ডের পদস্থ আমলা সাহেবের কীর্তির শেষ অবশ্য এখানেই নয়, মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত তাঁর জনৈক আত্মীয়কে বিদেশে (কলম্বো প্রান) পাঠানোর ব্যাপার নিয়ে তিনি এমনই একটা বেচাল কান্ড বাধিয়েছেন যে, তাঁর সহযোগী একজন ডেপুটি ডিরেক্টরের পক্ষে তা হজম করা দঃসাধ্য হয়েছে, যে কাহিনী পরবর্তী একটি সংখ্যায় নিবেদন করব।

সাপন ভট্টাচার্য স্মরণে

নাট্যতত্ত্ববিদ ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য ১০ই জুলাই তারিখে অকালে পরলোক-গমন করেছেন। ডঃ ভট্টাচার্য রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও নাট্য বিভাগের ডীন ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন কৃতী, শিক্ষকজীবনে যশস্বী। নাট্য বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ও বাংলায় এম-এ পাশ করেন। এরিস্টটলের পোয়েটিকসের ওপর গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট হন। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের স্নেহধন্য। তাঁর রচনাসমূহের মধ্যে নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স, নাট্য-তত্ত্বের মীমাংসা, শিল্পতত্ত্বের ভূমিকা প্রভৃতি বিখ্যাত। আমরা তাঁর অস্বাভাবিক শান্তি কামনা করি এবং তাঁর শোকাত্ত পরিবার-পরিজনদের সমবেদনা জানাই।



বি-কে-ডি-কংগ্রেস সংযুক্তিকরণ

ভারতীয় জাতীয় দলের (বি-কে-ডি) সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) মিলনের যে কথাবার্তা চলছিল, গত সপ্তাহে তার পশ্চিম অংশে যবনিকাপাত হয়েছে। তবে উপসংহারটা এখনও থাকী আছে। বি-কে-ডির জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতি মিলনের প্রস্তাব নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করেছেন যে, পার্টির চেয়ারম্যান সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাতীয় কার্যনির্বাহক সমিতিকে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর মতামত জানাবেন। অর্থাৎ মিলনের প্রস্তাব কার্যনির্বাহক পরিষদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নি, তবে প্রস্তাবটা তাঁরা একেবারে বাতিল করে দেন নি। বিষয়টা বিবেচনা করবার ভার চেয়ারম্যানের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার চেয়ারম্যানকে দেওয়া হয় নি।

বি-কে-ডির কার্যনির্বাহক পরিষদের বৈঠকের যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই নাকি মিলনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু যেহেতু দলের নেতা চরণ সিং স্বয়ং মিলনের প্রস্তাব পার্টির সভায় বিবেচনা করতে চেয়েছিলেন, সেহেতু প্রস্তাবটা সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয় নি। একটু ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে মাত্র। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এই ধরনের প্রস্তাব জাতীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ আগে দু'বার অগ্রাহ্য করেছেন।

গত সপ্তাহের বৈঠকে মিলনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন উত্তর প্রদেশের কয়েকজন সদস্য (জয়নারায়ণ বর্মণ এবং উদিতনারায়ণ শর্মা প্রমুখ) কিন্তু প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন প্রভাবশালী সদস্য প্রকাশবীর শাস্ত্রী (এম-পি) এবং মোতিরাম শাস্ত্রী। চরণ সিং প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। পার্টির সেক্রেটারী এস কে সিং অভ্যন্ত

কঠোর ভাষায় মিলনের বিরোধিতা করেন। মধ্যপ্রদেশের তাক্তমল জৈনও মিলন প্রস্তাবের বিরোধী। উড়িষ্যার নেতা হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং পবিত্রমোহন প্রধান বৈঠকে যোগ দেন নি।

যাঁরা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) এখন নিজের খামেলায় ব্যস্ত। আগামী নির্বাচনের আগে সেই দলের অবস্থাটা যে কি দাঁড়াবে তা বোঝা যাচ্ছে না। তাদের কোন পতাকা অথবা নির্বাচনী প্রতীক চিহ্ন নেই। এ অবস্থায় বি-কে-ডির পক্ষে নিজের স্বাভাবিক ত্যাগ করা বাস্তবিকভাবে কাজ হবে না। কংগ্রেসের সঙ্গে পুনর্মিলিত হবার জন্য তো আর বি-কে-ডি জন্মায় নি। তার একটা পৃথক লক্ষ্য আছে। বি-কে-ডি-কংগ্রেস মিলন ঘটলে কংগ্রেসই লাভবান হবে বেশি। উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের যা অবস্থা তাতে বি-কে-ডির সাহায্য ছাড়া উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস দাঁড়াতেই পারবে

মিততা বজায় রাখতে বাধ্য হবে। নইলে সি বি গুপ্তের দল আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বি-কে-ডি মিলনের প্রস্তাব কার্যত অগ্রাহ্য করায় কংগ্রেস হাইকমান্ড খুব খুশি হতে পারেন নি। তাঁরা আশঙ্কা করেছেন, এর ফলে উত্তর প্রদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

মিলনের প্রস্তাবে বি-কে-ডির অনীহার কারণ সম্পর্কে দিল্লীর ওয়াকি-বহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, বি-কে-ডির সিঁড়িকেট ভক্ত সদস্যরা আসলে বি-কে-ডিকে সিঁড়িকেটের "জাতীয় গণতান্ত্রিক জোটে" ঢোকাবার মতলব এঁটেছেন। তাঁরা চরণ সিং-এর কানে মন্ত্র দিয়েছেন। চরণ সিং-এর সাহায্য ছাড়া ইন্দিরা গান্ধী উত্তর প্রদেশে এক পা এগুতে পারবেন না। চরণ সিং-এর নিজের মনেও সেই ধারণা বলবৎ হয়েছে। তারই ভিত্তিতে তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দর কষাকষি করছেন। তাঁদের দাবি হচ্ছে (১) কংগ্রেস নেতৃত্বকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, দুই দলের মিলনের পরও চরণ সিং মন্থ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং আগামী নির্বাচনের পরও চরণ সিংকে মন্থ্যমন্ত্রী করতে হবে। (২) চরণ সিং-এর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী কমলাপাণি গুপ্তাঠিকে রাজ্যের রাজনীতি থেকে সরিয়ে দিল্লীতে নিয়ে যেতে হবে এবং রাজ্যের কংগ্রেস সংগঠনের ভার ছেড়ে দিতে হবে চরণ সিং-এর ওপর। কোন কোন বি-কে-ডি নেতা নাকি আরো দাবি করেছেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বি-কে-ডি দল থেকে একজন মন্ত্রী নিতে হবে। তাঁদের ধারণা বি-কে-ডির সাহায্য ছাড়া ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে



প্রকাশবীর শাস্ত্রীর সঙ্গে বি-কে-ডি-কংগ্রেস সংযুক্তিকরণ প্রসংগ নিয়ে আলোচনায়
চরণ সিং (বাঁ দিকে)

উত্তর প্রদেশ থেকে ৬০/৭০ জন এম-পি'কে জি'তে নেওয়া সম্ভব হবে না। সি'ডিকেট ভুক্ত বি-কে-ডি সদস্যরা জানেন যে, শ্রীমতী গান্ধী এই আশ্বাস মেনে নিতে রাজী হবেন না। তখন চরণ সিং-এর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর মন কষাকষি হবে এবং চরণ সিং সদলবলে সি'ডিকেটের দলে ভিড়ে পড়তে বাধ্য হবেন।

চরণ সিং নাকি দক্ষিণপন্থী জোট গঠনের সি'ডিকেটী প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবার জন্যই দিল্লীতে এসেছিলেন।

অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো, তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছে বি-কে-ডি-কংগ্রেস মিলন দূর অস্ত। কিন্তু মিলন হব হব করে না হওয়ার ফলে দুই দলের মধ্যে মনোমালিন্য বেড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে উত্তর প্রদেশের বি-কে-ডি-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পরামর্শ নিয়েও টানাটানি পড়তে পারে। সি'ডিকেটের দক্ষিণপন্থী জোট গঠনের পন্থাটি কিভাবে এগোয়, তার ওপরই সেটা নির্ভরশীল বলে মনে হচ্ছে। বি-কে-ডি কোন সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে গঠিত পার্টি নয়। উত্তর প্রদেশে এই দল জাঠ সম্প্রদায়ের মধ্যপার বললেই চলে। কাজেই সুবিধানসম্মত কংগ্রেস অথবা সি'ডিকেট যে-কোন দলে ভিড়ে পড়তে তার কোন নীতিগত বাধা নেই। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, প্রাদেশিকতা ইত্যাদি কুসংস্কার স্বাক্ষর থাকতে এই ধরনের খান্দাবাজ পার্টির হাত থেকে দেশের মুক্তি লাভের কোন সম্ভাবনা নেই।

পাঞ্জাব সঙ্কট

পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ডঃ ডি, সি, প্যাভাতে আগামী ২৪শে জুলাই বিধানসভার অধিবেশন হবে বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন। কাজেই বাদল মন্ত্রিসভা (আকালী) শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন।

মুখ্যমন্ত্রী বাদল এবং আকালী দল নাকি কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) সঙ্গে একটা সমঝোতার আসবার চেষ্টা করছেন। কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক পাতাবার জন্য আকালী দল নিজের নীতি এবং কার্যক্রম রদবদল করতেও অরাজী নয়। আকালী দল সাম্প্রদায়িকতা ত্যাগ করে একটা ধর্মনিরপেক্ষ পার্টি হতে চায় এবং দলের সদস্য পদ যে-কোন সম্প্রদায়ের লোকের জন্য উন্মুক্ত করতে প্রস্তুত। কংগ্রেসের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করে কৃষি-সম্পত্তিকরের বিরোধিতা ত্যাগ করতেও আকালী দল নাকি পিছপা নয়।

পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন

মন্ত্রিসভা গঠনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বাদল কংগ্রেসের কাছে সহযোগিতার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে ২৪শে জুলাইয়ের আগেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে আকালী দলের একটা বোঝাপড়া হয়ে যেতে পারে। এই দুই দল নাকি বহুদিন ধরেই গোপনে গোপনে বোঝাপড়ার আলোচনা চালাচ্ছিলেন। কয়েকদিন আগে নাকি শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির প্রেসিডেন্ট সন্ত চান সিং (সন্ত ফতে সিং-এর পরেই এর স্থান) দিল্লীতে এসে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন।

গত সপ্তাহে সমগ্র বিষয়টা নিয়ে পাঞ্জাব কংগ্রেসের জ্ঞানী জৈল সিং হংসরাজ শর্মা, জেঃ মোহন সিং এবং ক্যাপ্টেন রতন সিং প্রমুখ নেতারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। জৈল সিং পরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন যে, পাঞ্জাবে কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ। যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, সেটা ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকরী করা হবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বরণ সিং-এর (কেন্দ্রীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী) উপদল বহু-কাল ধরেই আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনের পক্ষপাতী।

পাঞ্জাবের কংগ্রেস নেতারা নাকি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন যে, গুরুনাম সিংকে (প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) সমর্থন জানানো কংগ্রেসের পক্ষে খুবই বোকামী হবে। কারণ গুরুনাম সিং আকালী দল থেকে বেশি সদস্য যোগাড় করতে পারেন নি। কাজেই কংগ্রেস তার সঙ্গে যোগ দিলে কোন স্থিতিশীল গভর্নমেন্ট গঠিত হবে বলে মনে হয় না।

কংগ্রেস নেতা কে, ডি, মালব্য চণ্ডী-গড়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন যে, বাদল মন্ত্রিসভা যদি সমাজতান্ত্রিক কার্যক্রম অনুসরণ করে চলে, তা হলে কংগ্রেস সেই মন্ত্রিসভাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবে।

কিন্তু প্রস্তাবিত আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনের প্রধান প্রতিবন্ধক বোধ হয় সন্ত ফতে সিং। কংগ্রেস দল নাকি চান না যে, সন্ত ফতে সিং তৃতীয় শক্তি হিসাবে পাঞ্জাবে বিরাজ করুন। তাই গত সপ্তাহে জৈর গুরুজব রট্টোঁছিল যে, সন্ত ফতে সিং রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করছেন। সন্তের ঘনিষ্ঠ মহল নাকি এই গুরুজবের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করতে রাজী নন। শোনা যাচ্ছে, শ্রুৎ কংগ্রেস দলই নয়, আকালী দলের একটি শক্তি-শালী অংশও নাকি সন্ত ফতে সিং-এর অতিমাত্রায় মাতাম্বরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গুরুনাম সিং সন্ত উপদলের দ্বারা গদিচ্যুত হবার পর দাবি করেছিলেন যে, সন্ত ফতে সিংকে রাজ্যের রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে। তাঁর সেই দাবি শেষ পর্যন্ত পূরণ হওয়াও অস্বাভাবিক নয়।

আকালী-কংগ্রেস কোয়ালিশনে কে মুখ্যমন্ত্রী হবেন, সেই প্রশ্ন নিয়েও দুই দলের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়া অসম্ভব নয়। যাই হোক, পাঞ্জাবের দলীয় রাজনীতি যে পথে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে অদূর-ভবিষ্যতে সেখানে কংগ্রেস-আকালী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্য কোন ধরনের কোয়ালিশন গঠিত হওয়া একটু কঠিন। তবে সেই মন্ত্রিসভাই যে স্থিতিশীল হবে—এমন মনে করবার কোন হেতু নেই।

(১১-৭-৭০)

সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!!
দুইখানি অমূল্য কাব্যসম্ভার

রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

মূল্য তিন টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ

কলিকাতা-১২



বেলফাস্টে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে মডলিং

উত্তর আয়ারল্যান্ড:

প্রায় এক বছর ধরে উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রোটেষ্ট্যান্টদের সঙ্গে সংখ্যা-গরিষ্ঠ ক্যাথলিকদের এই দাঙ্গা থামাতে প্রাদেশিক সরকার ব্যর্থ হয়েছেন, বৃটেনের সরকারও ব্যর্থ হয়েছেন।

ক্যাথলিকরা আয়ারল্যান্ড বিভাগের বিরোধী এবং তারা আয়ার সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে উত্তর আয়ারল্যান্ড বা আলস্টারের মিলন চায়। প্রোটেষ্ট্যান্টরা এই একী-করণের বিরোধী। তারা বৃটেনের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে চায়। এই থেকে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ। মাঝে মাঝেই নানা ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

গত বৎসর নাগরিক অধিকারের দাবিতে ক্যাথলিকরা আন্দোলন শুরু করলে প্রোটেষ্ট্যান্টদের সঙ্গে তাদের জোর সংঘর্ষ বাধে। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহুজন নিহত ও আহত হয়।

দিন পনেরো আগে তরুণী ক্যাথলিক নেত্রী বার্নাডেটে ডেভলিনকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে ছয় মাসের জন্য কারাদণ্ডে দাঁড়িত করায় আবার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।

বার্নাডেটে ডেভলিন ক্যাথলিকদের

প্রিয় নেত্রী। সবে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গান্ডী পার হয়েছেন। এর মধ্যেই তিনি দু-দু'বার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্স-সভায় নির্বাচিত হয়েছেন। রাজধানী বেলফাস্টে, আলস্টারের অন্যত্র, লন্ডনে কমন্সসভায় কিংবা নিউ ইয়র্ক বা রাষ্ট্র-সংঘে, সর্বত্র তিনি ক্যাথলিকদের দাবির সমর্থনে জোর বক্তব্য রেখেছেন। ডেভলিনের জ্বালাময়ী ভাষণ ক্যাথলিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে।

তাই ডেভলিনের কারাদণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিকরা বেলফাস্টের পথে বিক্ষোভ জানাতে বেরিয়ে পড়ে। প্রোটেষ্ট্যান্টরাও পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। ৬ জন প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ১ জন ক্যাথলিক এই দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন এবং আহতের সংখ্যা ২৫০-এর বেশি। বহু ঘরবাড়ি পুড়েছে, সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জেমস চিসেস্টার-ক্রাকের সরকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনে ব্যর্থ হয়ে-ছেন। লন্ডন থেকে এগারো হাজার সৈন্য পাঠানো হয়েছে বেলফাস্টে দাঙ্গা থামাবার জন্য। জেনারেল স্যার ইয়ান ফ্রিল্যান্ডের অধীনে ব্রিটিশ সৈন্যদল এখন উত্তর আয়ারল্যান্ডের শান্তিরক্ষার দায়িত্বে রয়েছে। তাও দাঙ্গা থামছে না।

গত মাসে ব্রিটিশ সাধারণ নির্বাচনে

জয়লাভ করার পর প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের কাছে প্রথম বড় সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ডের দাঙ্গা। হিথ তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেজিনাল্ড মডলিংকে পাঠিয়েছিলেন বেলফাস্টে। রেজিনাল্ড মডলিং বেলফাস্টে উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃ-বৃন্দ এবং প্রাদেশিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী জেমস চিসেস্টার-ক্রাকের সঙ্গে কথা বলে লন্ডন ফিরে এসেছেন। বেলফাস্টে অবস্থান-রত ব্রিটিশ সৈন্যদলের প্রধান ইয়ান ফ্রিল্যান্ডের সঙ্গেও তিনি কথা বলেছেন। কিন্তু বিশেষ কোন ভরসা নিয়ে মডলিং বেলফাস্ট থেকে ফিরতে পারেন নি।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ উত্তর আয়ারল্যান্ডের জটিল সমস্যা আলো-চনার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভার প্রধান চার-জনের এক বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেছেন। এই চারজন হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেজিনাল্ড মডলিং ও অ্যাটর্নি-জেনারেল স্যার পিটার রলিনসন।

ব্রিটিশ সরকার বিশেষভাবে চিন্তিত। আগামী ২০শে জুলাই বেলফাস্টে প্রোটেষ্ট্যান্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বড় রকমের এক সংঘর্ষ বাধার আশঙ্কা রয়েছে।

প্রতি বৎসর এই দিনে হাজার হাজার প্রোটেষ্ট্যান্ট বেলফাস্টে 'অরেঞ্জ প্যারেডে' অংশ গ্রহণ করে। ২৮০ বছর আগে এই দিনটিতে বয়েন যুদ্ধ জয় হয়েছিল। এই যুদ্ধে দ্বিতীয় জেমসের নেতৃত্বাধীন ক্যাথলিকরা অরেঞ্জের উইলিয়ামের নেতৃত্বাধীন প্রোটেষ্ট্যান্টদের হাতে পরাজিত হয়। আয়ারল্যান্ডে ইংরেজ শাসন বাথার পক্ষে ছিলেন অরেঞ্জের উইলিয়াম ও প্রোটেষ্ট্যান্টরা।

গত বৎসর বয়েন যুদ্ধ জয়ের বার্ষিকী দিবস থেকেই সংঘর্ষ শুরু হয়।

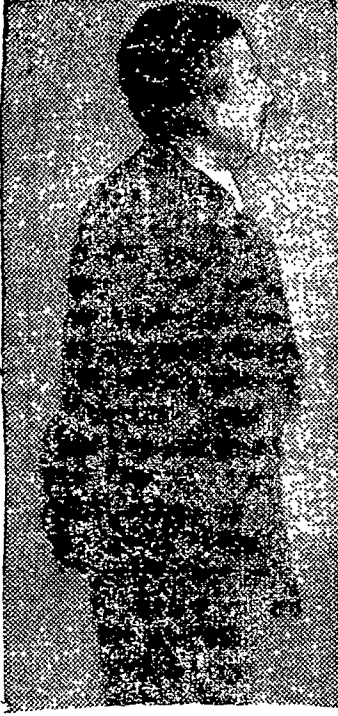
পাকিস্তান:

অক্টোবর মাসেই পাকিস্তানের প্রস্তাবিত সাধারণ নির্বাচন হবে কি-না, এই নিয়ে কথা উঠেছে।

অনেকেই বলছেন, এই সময়টা পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত সময় নয়। বর্ষা শেষ হলেও নদী-মাতৃক পূর্ব বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখনও জলমগ্ন থাকবে। গ্রামাঞ্চলে চলা-ফেরা করার বিশেষ অসুবিধা হবে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যারা পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষায় আগ্রহী, তাঁরা চান না পূর্ব পাকিস্তানের বেশি লোক নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক। তাই তাঁরা কায়দা করে এই সময়টা বেছেছেন।

এই কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু নেতা নির্বাচনের সময় পিছিয়ে দেবার জন্য দাবি করেছেন। কিন্তু সমস্যা হল,

সাম্প্রতিক বঙ্গমতঃ



মুজিবর নির্বাচনের তারিখ পেছানোর পক্ষপাতী নন।

এর পরেই রমজান মাস। রমজানের সময় নির্বাচন তো নয়ই, নির্বাচনের পক্ষে প্রচারকার্যও অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পছন্দ করবেন না। তা হলে?

শেখ মুজিবর রহমান তাই বলেছেন, নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। অনেক কষ্টে, অনেক চাপে পড়ে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনে রাজী হয়েছেন। একবার পিছিয়ে দেবার কথা উঠলে এই সুযোগে তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন বন্ধ করে দেবেন। পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী মানুষ অনেক প্রতি-কূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, দরকার হলে তারা প্রাকৃতিক অসুবিধার বিরুদ্ধেও লড়াই করবে। এতে ভয় পেলে চলবে না।

বামপন্থী মহলে নির্বাচন বজ্রনের কথাও উঠেছে। যে সরকারী আদেশবলে নির্বাচন হচ্ছে, তা অগণতান্ত্রিক। নির্বাচনের ফলে যে আইনসভা, বিশেষ করে সংবিধান রচনা পরিষদ বা গণপরিষদ গঠিত হবে, তার হাতে প্রকৃত কোন ক্ষমতা থাকবে না। সুতরাং এটি নির্বাচন প্রকৃত-পক্ষে একটা প্রহসন এবং এতে যোগদান করা উচিত নয়। এই বক্তব্য রেখেছেন পিকিংপন্থী মৌলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ তোফা। ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করায় তোফা তাঁর দলবল নিয়ে এই দল ত্যাগ করেছেন। মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগেও কিছ্ নেতৃ-

স্থানীয় ব্যক্তি এই মত পোষণ করেন। তাই মুজিবর রহমান ও তাঁর দল ১৮৮০নে দাঁড়িবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু লোক দল ছেড়ে ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগে যোগ দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনাস্থ্য হতে কিনা এবং প্রগতি-শীল শক্তি নির্বাচনে জরাজীর্ণ করলে তাঁদের সরকার চালাতে দেয়া হবে কিনা ও প্রগতিশীল একটি সংবিধান রচনার সুযোগ নবনির্বাচিত সদস্যরা পাবেন কিনা, এই সব বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের উভয় অংশের আধিকাংশ বামপন্থী, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দল ১৮৮০নে যোগ দিয়েছে। তাদের ভরসা, শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের জনমতের বিরুদ্ধে যাবার সাহস জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁ কিংবা সেনাবাহিনীর হবে না।

চরম দক্ষিণপন্থী, ধর্মীয় ও প্রতি-ক্রিয়শীল দল জমায়েতে ইসলাম দাবি করেছে; সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন পরিচালনা করতে হবে। এই দলের নেতা মৌলানা মাওদুদী ও ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতা নবাবজাদা নসরুল্লা খাঁ বলছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ প্রশাসন ও পুলিশ দেশদ্রোহীদের অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনবাদী বামপন্থীদের পক্ষে চলে গিয়েছে। এই অবস্থায় 'স্বাধীন নির্বাচন' যদি করতে হয়, তবে সৈন্যদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব দিতে হবে।

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ওয়ালি খাঁ, পিপলস পার্টির জুলফিকার আলি ভুট্টো, আওয়ামী লীগের শেখ মুজিবর রহমান, পিকিংপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মৌলানা ভাসানী প্রভৃতি সেনাবাহিনীর সাহায্যে নির্বাচন অনাস্থ্যের প্রস্তাবের তীব্র প্রতি-বাদ করেছেন। সেনাবাহিনীর হাতে নির্বাচন চলে গেলে তা আর নির্বাচন থাকবে না। সৈন্যদের খুশি মত লোকে-দের নির্বাচন করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের ভয়, পাকিস্তান সেনা-বাহিনীর শতকরা ৯৫ জন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী। এই অবস্থায় এদের দিয়ে নির্বাচন করলে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতি হবে।

জমায়েতে ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তানের পার্টি দক্ষিণপন্থী দল একত্র নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য একটি ইসলামিক জোট গঠন করেছে। বামপন্থী দলগুলির মধ্যে এখনও কোন মোর্চা গঠিত হয় নি।

তবে এবারের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগের সর্ব-বহু দলে পরিণত হবার বিশেষ সম্ভাবনা রয়েছে।

লাঞ্জেমবার্গঃ

ইউরোপীয় কমন মার্কেটের অন্তর্ভুক্ত ছয়টি দেশ, যথা—ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম ও লাক্সেমবার্গের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠক বসেছিল গত সপ্তাহে লাক্সেমবার্গে।

এবারেও কমন মার্কেট বৈঠকের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, বৃটেনকে কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে কিনা।

নতুন স্বাক্ষরশীল বৃটিশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম উপস্থিত ছিলেন লাক্সেমবার্গে যোগদানের আবেদন নিয়ে।

কেবল বৃটেন নয়, আয়ার, নরওয়ে ও ডেনমার্কও কমন মার্কেটে প্রবেশ করতে চায়।

বৃটেনের কমন মার্কেটে প্রবেশে সব-চেয়ে বেশি আপত্তি ফ্রান্সের। অনেকের আশা ছিল, ফরাসী রাজনীতি থেকে উগ্র



লাঞ্জেমবার্গ বৈঠকে ডগলাস হিউম

বৃটিশ বিরোধী চার্লস দ্য গলের বিদায় গ্রহণের পর নতুন রাষ্ট্রপতি জর্জ পাম্পদুর আমলে ফরাসী বিরোধিতা কমবে। কিন্তু এখনও তার বিশেষ কোন লক্ষ্য দেখা যাচ্ছে না। লাক্সেমবার্গ বৈঠকে ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস সাদুমান বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউমের সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করলেও কমন মার্কেটে বৃটেনের প্রবেশাধিকার সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি তিনি দেন নি।

তবে ঠিক হয়েছে, বৃটেন সহ যে চারটি দেশ কমন মার্কেটে যোগ দিতে চায়, তাদের যোগদানের বিষয় সম্পর্কে অবিলম্বে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার (ই-ই-সি) সদর দপ্তর ব্রাসেলসে আলোচনা শুরু করা হবে। হয়তো কয়েক মাস ধরে এই আলোচনা চলবে। (১২-৭-৭০)

বর্তমান সংগ্রাহের লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন রাজ্যের সাধারণ মানুষের বিপদের দিনটি কেটে গেছে। ১৪ই জুলাই হরতালের দিনকেই রাজ্য বাসীর কাছে বিপদের দিন বলে বলাছি। তবু এত দুঃখের মধ্যেও সুখের কথা হ'ল রাজ্যের দুই ফ্রন্ট অর্থাৎ ছয় পার্টি ও আট পার্টি তাঁদের হরতালের দিন একদিনে রেখেছেন, কাজেই রক্তগঙ্গা বইবার সম্ভাবনা কিছুটা হয়ত হ্রাস পেয়েছে—কিন্তু একেবারে চলে গেছে এই কথা বলা যায় না। যা হোক, সেই হিসাব-নিকাশ পরে হবে, এখন শুধু মনে মনে দুঃগানাম জপ করে বিপত্তারিণীর চরণ ভরসা করে দিন কাটানো। কেউ হয়ত বলবেন—কেন? বেশ তো, হরতালের দিন এক হয়ে গেছে, আবার বিপদটা কিসের? আবার ঋগভা-স্বপ্নের অবকাশ কোথায়? এর জবাব হ'ল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি যে ধারা ও গতিতে চলেছে, তার একমাত্র লজিক্যাল 'কনক্লুশন' হ'ল সংঘর্ষ—পরস্পরের মাথা ফাটানো।

আজ যদি মাথা ফাটানো আর বোমা ফাটানো বন্ধ হয়ে যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি রাজনৈতিক দলই বেকার হয়ে যাবে। স্বেচ্ছায় বেকার হ'ব বরণের কার্য কেউ নেবে না। এই তো দেখুন না, রাজ্যে হরতাল-ধর্মঘট ডাকা হয়েছে কেন? না, বিধানসভা বাতিল করতে হবে। কিন্তু বিধানসভা বাতিলের জন্য হরতাল-ধর্মঘট ডেকে আন্দোলন করার চেয়ে তো আরো একটা সহজ পথ ছিল। রাজ্য বিধানসভার কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস আর অন্য ছোটকো-ছোটকা দল মিলিয়ে মোট প্রায় একশত জন সদস্য বিধানসভা বাতিলের পক্ষে নন। কিন্তু অবাশিষ্ট



—খবরদার, আমাদের ডাকে ধর্মঘট দফল হয়েছে!



১৮০ জন সদস্য যে সব দলে যুক্ত আছেন, তাঁরা তো বিধানসভা বাতিল চান। এই দলগুলির মধ্যে সি পি এম, ফরোয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি দলও আছে। আচ্ছা, এই সব দল যদি মনেপ্রাণে বিধানসভা বাতিল চায়, তবে তারা নিজেরা চেষ্টা করলেই তো বিধানসভাকে ভেঙে দিতে পারে। সেই পথ হ'ল—যে সব দল বিধানসভা বাতিল চায়, সে সব দলের সকলে এক-যোগে পদত্যাগ করুন, এমন কি তাঁদের বিজয়দাকে (স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়), ডেপুটি স্পীকার শ্রীঅপূর্ব মজুমদারকে পদত্যাগপত্র দাখিল করে দিন না। দেখুন, বাপ বাপ বলে বিধানসভা বাতিল হয়ে যাবে। দেখুন কত সহজে এই কাজ হতে পারে। কোন হরতাল লাগবে না, ধর্মঘট লাগবে না, মাথা ফাটাফাটি হবে না—শুধু একখানা কাগজে চার লাইন লিখে সদস্যরা স্পীকারের কাছে দিন আর স্পীকার তাঁর পত্রখানি রাজ্যপালের কাছে দিন। দেখুন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়ে বিধানসভা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু জানি এই সহজ পথে যাওয়া অপেক্ষা আন্দোলন করা, লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় ঘটানো, অনেক মানুষের রক্তপাত ঘটানো অনেক সহজ কাজ।

সহজ কাজ এই কারণে—পদত্যাগ করলে মাসের নিয়মিত সদস্যপদের বেতন মারা যাবে। একেই ১৯৬৭ সালের পর থেকে সদস্যদের বড়ই লোকসানের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কারণ যে পটুজি নিয়োগ করে সদস্যরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন এবং সেই পটুজি নিয়োগ করতে গিয়ে যে ধার-দেনা হয়েছে, সেটা উসুলের কোন সন্যোগই সদস্যরা পান নি। '৬৭ সালের পরও কয়েক মাস নানা টাল-মাটালে দিন কেটেছে, একনাগাড়ে বেশ কয়েক মাস বিধানসভা চলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সেটাও শেষ পর্যন্ত কপালে সইল না, বিধানসভা বাতিল হয়ে গেল, আবার নির্বাচন এল।

নির্বাচন মানেই নতুন করে পটুজি নিয়োগ, আগের নির্বাচনের ধার-দেনা মেটান ও পটুজি উসুল হবার আগেই নতুন করে নির্বাচনে নামতে হওয়ায় অনেক সদস্যই মাথায় হাত দিয়েছিলেন।

যাই হোক, ১৯৬৯ সালে সরকার হল, সকলে বেশ একটু জাঁকিয়ে বসলেন, কিন্তু সেখানেও বিধি বাম হ'ল। বছর না ঘুরতেই সরকার গেল—তবু রয়েছে সদস্যপদটুকু। মাসের বেতনটা ঘরে আসছে—ঘর মানে পার্টির ঘর। তবুও সার্টিফিকেটটা লিখতে সন্যোগ পাওয়া যাচ্ছে। স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার অবশ্য মন্দের ভালোতে আছেন। স্পীকার মশায় বিধানসভা অচল হলেও দেশে-বিদেশে নিমন্ত্রণটা পাচ্ছেন, এই কাম্মীর বা এখানে-সেখানে যাবার সন্যোগ হচ্ছে। বিদেশে ছেলেদেরও দেখার সন্যোগ হয়েছে। ডেপুটি স্পীকার মশায় এখনও গাড়ি-বেয়ারা-টেলিফোন এইগুলোর সন্বিধা পাচ্ছেন; কাজেই এইগুলো ছেড়ে দিয়ে বিধানসভা ভাঙবার ব্যবস্থা করার চেয়ে মানুষকে লেলিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করা অনেক সহজ। কারণ এই হরতাল-ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে পার্টি সংগঠন মজবুত হয়, প্রচারের সন্যোগ মেলে—আরো কত কি।

আমি তাই হলফ করে বলতে পারি—বিধানসভা বাতিলের স্বার্থে স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার পদত্যাগ করবেন না, এমন কি বিধানসভা বাতিল হয়ে গেলেও স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়মমত পরবর্তী বিধানসভার বৈঠক পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যাবেন। 'আমার কি দায় কাজ চালাবার?'—কে তাঁকে মাথার দিবি দিয়ে বলেছে মড়া আগলে তাঁকেই বসে থাকতে হবে? এত ত্যাগ স্বীকারে তাঁর কি প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা



সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্ভবত তা নয়। রাজ্যের যে সব দল বিধানসভা বাতিলের জন্য আন্দোলন করছে, তারা একটা উদ্দেশ্য মনে করেই করছে—সেটা হল বিধানসভা বাতিল চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে এম-এল-এরা অবশ্য মাসোহারা ছাড়া থাকুন এটা চাই না।

হরতালের দিন ১৪ই জুলাই নির্দিষ্ট হওয়াতে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের মানুষ খুশি হলেও ছয় পার্টির আহ্বায়ক শ্রীসুধীন কুমার মোটেই খুশি হতে পারেন নি। আর শ্রীকুমারের কথায় যা প্রকাশ পেয়েছে সেটা যদি ছয় পার্টির বক্তব্য হয়, তবে বন্ধুতে হবে ছয় পার্টিও হরতাল এক দিনে হচ্ছে; এই সংবাদে খুশি নয়। আট পার্টির নেতারা দুই দিন বৈঠক করে ঘোষণা করলেন যে, দুই দিন হরতালের মধ্যে যে রক্তপাত ও সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে, সেটাকে এড়াতে তাঁরা হরতালের দিন ১৬ই থেকে ১৪ই করছেন। অবশ্য এই কথা বলতে গিয়ে সি-পি-এম ও সহযোগীদের তাবোদার বলে যা বলবার বলেছেন। কিন্তু আট পার্টি তাদের হরতালের দিন ১৬ই থেকে ১৪ই করাতে শ্রীসুধীন কুমার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললেন—“আট পার্টির রাজনৈতিক পরাজয় ঘটেছে।” সেই সঙ্গে শ্রীকুমার বলেছেন, “সি-পি-এম-বিরোধী বক্তব্য বলে আট পার্টি তাঁদের রাজনৈতিক পরাজয় ঢাকতে পারবেন না।” শ্রীকুমারের আরো বক্তব্য হল “১৪ই রবিবার হরতাল ডাকলেও আট দলের মোর্চা কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা ছাড়া নীতির কোন পরিবর্তন করে নি। তাই সি-পি-এম ও ছয় পার্টি জোট-বিরোধী মিথ্যা কুংসাই প্রচার করছেন। অবশ্য এতেও তাঁরা তাঁদের পরাজয় ঢাকতে পারেন নি।” বারো হাত কাঁকড়ের তের হাত বিচি অথবা ঠেঁটা ঢেঁকির বাদ্যি বড়—এই সব গ্রাম্য কথাগুলি প্রয়োগের এমন সার্থক জায়গা আর আছে কি না জানি না। রাজনৈতিক পরাজয় কার হয়েছে, সেই বিচার করতে চাই না। কিন্তু শ্রীকুমার এই কথা বলে কার হাত শক্তিশালী করলেন, সেটা একটু ভেবে দেখা দরকার। একেই রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক যা মনসা হয়ে আছে, তার ওপর আবার শ্রীকুমার কিছুটা ধোঁয়া দিয়ে সেই সাপকে আরো ক্ষেপিয়ে দিলেন। রাজনৈতিক পরাজয় যদি আট পার্টির দিন পরিবর্তনে হয়ে থাকে, তবে সেই পরাজয় তো শ্রীকুমারই ২০শে তারিখের ধর্মঘট ১৬ই তারিখের দুইদিন আগে এনে বরণ করেছেন।

আট পার্টি দিন পরিবর্তন করলে

রাজনৈতিক পরাজয় হয় আর শ্রীকুমার দিন পরিবর্তন করলে হয় না—এমন কথা কে মেনে নেবে? বেশ তো, শ্রীকুমার ভদ্রলোকের এক কথার মত হরতালের দিন ২০শে রেখে সফল করে হিম্মতের পরিচয় দিলেই তো পারতেন। বেশ তো বলেছিলেন সকালে যে, আট পার্টির সি-পি-এম-বিরোধী বক্তব্য রেখে ডাকা হরতালে তাঁরা বাধা দেবেন, ২০শে হরতাল সফল করবেন, হঠাৎ শ্রীকে জি বসু আর শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের শরণাপন্ন হয়ে শ্রীঅমিতাভ সেনকে ঘাঁটিয়ে ২০শে তারিখকে ১৪ই করা হল কেন? কতখানি দায়িত্ববোধের অভাব থাকলে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে এক সপ্তাহে দুই দিন হরতাল ডাকবার কথা চিন্তা করা যায়। সে আট পার্টি হোক আর ছয় পার্টিই হোক, তাদের ভিতরের ঝগড়া যাই হোক, সাধারণ মানুষের কথা তারা ভাবলে কখনই কি ২০শে ও ১৬ই বা ১৬ই ও ১৪ই হরতাল ডাকতে পারতেন! এ সব দলের নাকি আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য রাজ্য থেকে সি-আর-পি প্রত্যাহার করানো। হ্যাঁ, ওরা সি-আর-পি সরিয়ে পুরো মিলিটারী বসাতে চায়। নইলে ওরা কি আশা করে, ওরা তিন দিনের মধ্যে দুই দিন হরতাল করবে, রক্তগণ্য বইয়ে দেবার হুমকি দেবে আর সরকার তুলসীমালা হাতে নিয়ে হারিনাম জপ করবেন? আট পার্টি ও ছয় পার্টি

রাজ্যের মানুষকে অনেক উপহার দিয়েছে—যেমন এখন রোজ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয় শুধু পুষ্টিশ দিয়ে, সি-আর-পি দিয়ে শান্তিরক্ষা করতে। এবার তার সঙ্গে যোগ হবে মিলিটারী এবং মিলিটারীর খরচও রাজ্যকে দিতে হয়। যা হোক, এই অবস্থায় দুই পক্ষের এক দিনে হরতাল আহ্বানে যে সামান্য স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে শ্রীসুধীন কুমার এক পক্ষকে রাজনৈতিক পরাজয় স্বীকারকারী বলে প্ররোচনা দিলেন, যাতে তাঁরা পরাজয়ের প্লানি দূর করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কেন, শ্রীকুমার কারো হয়ে ঢাল না ধরে শুধু যদি বলতেন, যে বক্তব্য রেখেই হোক আর যে পরিস্থিতিতেই হোক আট পার্টি হরতালের দিন ১৪ই করাতে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের মানুষ এক হয়ে দাঁড়াবার সুযোগ সৃষ্টি করেছে, এর জন্য অন্তত তারা ধন্যবাদ দাবী করতে পারে। এই কথা বললে কতটুকু মানের কোণা খোয়া যেত ছয় পার্টি বা শ্রীসুধীন কুমারের? কিন্তু তা নয়, বিরোধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে শ্রীকুমার বলে রাখলেন রাজনৈতিক পরাজয় অর্থাৎ হরতাল সফল করলেও এই পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পাবে না আট পার্টি। তাই বিরোধ চলছে—চলবে, হরতালের পরও চলবে—সেই পথই পরিষ্কার করা হল।

—১০ই জুলাই, ১৯৭০

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদা প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মর্গী উপাদান বা পোলটি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলটি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশপত্রের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রাহুজ পিডিগ্রী পোলটি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিব

আধুনিক পোলটি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

নারায়ণ সদৌদাৰ্ঘ্য স্রোতের সঙ্গে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর:]

৪ সতেরো ৮

দু' বছরের সিনিয়র হলেও মেয়েদের ভেতরে দুরূহটা কম—স্বাভাবিক নিয়মেই কম। তারপরে এক সঙ্গে ইউনিয়ন করা। এওকে নাম ধরেই ডাকে। সাবিব্রী আস্তে আস্তে বললে, 'তুই খুব রোগা। ইয়ে গোছিস সজ্জাতা।'

ঘরে আলো জ্বলে নি, আলো জ্বলবার সময় হয় নি এখনো। সজ্জাতার ভাঙা গাল শব্দ হয়ে উঠছে, রেখা পড়ছে কপালের ওপর, ঘনিয়ে আসা ছায়ার ভেতরেও তা দেখতে পাচ্ছিল সাবিব্রী।

এক টুকরো বিস্বাদ হাসি ফুটল সজ্জাতার মুখে।

'বাংলা দেশের মেয়েদের মা হওয়ার দাম এমনি করেই দিতে হয়। সংসারও তার পাওনা ছেড়ে দেয় না।'

পাথরের মতো একটা আর, কিছুক্ষণ নেমে রইল দু'জনের ভেতরে। বাইরে থেকে বেলা শেষের সৌন্দর্য গন্ধ। মশার শব্দ উঠতে শুরু হয়েছে। কোথায় ডাক ডাকছিল। সামনের রাস্তা দিয়ে চলতি লরীর গর্জন কানে ওঠে। সজ্জাতার স্নান করা ঠান্ডা শরীরের চাইতেও গলার স্বরটা শীতল। মা হওয়ার সময় খুব ভুগতে হয়েছিল—ঠিক কথা, কিন্তু সৌন্দর্য সজ্জাতার চোখে অন্য আলো দেখেছিল সাবিব্রী: আর যত দূর মনে পড়ছে—সংসারটাকে সৌন্দর্য তার খুব খারাপ লাগে নি। এখন সজ্জাতা নিষ্ঠুর। এখন অন্য রকম। ছায়া ছড়ানো ঘরে, মশার ডাক আর সৌন্দর্য গন্ধের ভেতর হঠাৎ কেমন একটা অবসাদ বোধ করল সাবিব্রী। মনে হল, প্রবীর তাকে না পাঠালেই পারত, তার এখানে আসবার দরকার ছিল না। যেখানে রাগ, যেখানে উত্তেজনা, সেখানে

কিছু বলবার থাকে, স্নায়ুগুলো শান্ত হয়ে এলে তার সঙ্গে তর্ক করা যায়, বিচার করা চলে। কিন্তু 'বিত্ত্ব' আর অবসাদের ভার গলায় বেঁধে নিয়ে যে ডুবছে, তাকে তুলতে গেলে নিজেকেই বুঝি তুলিয়ে যেতে হয়।

সাবিব্রী টের পেলে, খুব খারাপ দেখাচ্ছে এই চাপ করে বসে থাকাটা—এখানে এসে সে যেন আরো বেশি বিষন্ন করে তুলছে সজ্জাতাকে। সতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে কিছু একটা শব্দ করতে চাইল।

'তোরই দোষ, শরীরের জো কোনো কেয়ার নিসনে।'

সজ্জাতা চেয়ে রইল, জবাব দিল না।

'নীলকে তো দেখাছি না, ওকে আনিস নি সঙ্গে করে?'

এবারও জবাব দিল না সজ্জাতা। উঠে পড়ল, সেইচ টিপে জবাব দিয়ে ঘরের আলোটা ফিরে এসে বসল নিজের জায়গাটিতে। বললে, 'সাবিব্রী!'

'কী বলছিস?'

'একটা সত্যি কথা বলবি?'

সাবিব্রী: অস্বস্তি বোধ হল।

'কেন বল না?'

'তোকে এখানে আসতে বলেছে কে? স্বরাজ?'

একবারে তীক্ষ্ণ সোজা কণ্ঠস্বর। সাবিব্রীর মনে পড়ে গেল কলেজের কমন রুম। ঠিক এইরকম ধারালো স্পষ্ট গলার প্রতিপক্ষের মুখের ওপর প্রশ্ন ছুড়ছে। কেমন কৃকড়ে গেছে অরুণতী রায়—হঠাৎ যেন তর্ক করতে ভলে গেছে। সজ্জাতা তাকে জিজ্ঞেস করছে: তোর এত আপত্তি কেন? যেহেতু তোর বাবার কলকাতা শহরে সাতখানা বাড়ি আছে বলে?

সাবিব্রী: একটা চোক গিলল।

'একথা বলছি—কেন? বছর তিনেকের ভেতরে স্বরাজদার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

'এমনই এসেছিস?'

'কোনো ক্ষতি আছে?'

'না—ক্ষতি নেই—' সজ্জাতা হাসল।

তোকে দেখলে এখনো ভালো লাগে। যদিও 'তুই' পলিটিক্সে চিরকাল গা বেঁধে চলেছিস, তবু তোর মন ভালো। কিন্তু সাবিব্রী, এতদিন যখন ঘনে পড়ল না—তখন এই কো-ইনসিডেন্সটা ঠিক বিস্বাস করা যায় না। তুই বরং বলতে পারতিস—বানিয়েও বলতে পারতিস—এদিকে একটু কাজ ছিল, যাওয়ার সময় জোরে সঙ্গে দেখা করে গেলুম।'

সাবিব্রীর গাল রাঙা হল একটু।

'তুই সিনিক হয়ে গোছিস সজ্জাতা!'

'সিনিক?—সজ্জাতা বললে, 'না—আমি মার্কসিস্ট। সিনিক হওয়ার মতো ডিজেনারেশন আমার ঘটে নি। তার স্পেসিমেन দেখতে চাস তো তোর স্বরাজদা আছেই।'

সাবিব্রী চাপ করে রইল। স্বাভাবিকভাবে কথা শব্দ করা যাচ্ছে না। সব বিস্বাদ করে দিচ্ছে সজ্জাতা।

সজ্জাতা আবার বললে, 'তুই সিনিয়রদের কাছ থেকে বাঁচতে চাই বলেই চলে এসেছি। সাবিব্রী—প্রটেকশনের কোনো মানে হয় না। সত্যি বল তো—কেন এসেছিস আজকে?'

আর কোনো মানে হয় না আডাল রাখবার। সত্যের মুখোমুখি হওয়াই ভালো।

সাবিব্রী সোজা সজ্জাতার মুখের দিকে তাকালো।

'সব আমি জানি না, কিছু শুনছি।'



"দুধাভার
করিয়ে
মজা
মুক্তিতে
ভরপুর"



গ্ল্যাক্সো

বিস্কুট

ছবের পুষ্টিতে ভরপুর এই বিস্কুট
বাল্যবয়সের শক্ত খাবার হিসেবে চমৎকার। কড়া নজর
রেখে সবচেয়ে তৈরী। আপনার বাল্যকে ও বাড়ীর
সবাইকে রোজই ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট দিন।



মানেই সেরা বিস্কুট



এই ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানী লিমিটেড
ট্রেন্সমিটের রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী

BBC. 100A

কিন্তু সজাতা, যে নিজেকে মার্কসিস্ট বলে দাবী করে—এত সহজেই তার ধৈর্য-চ্যুত হওয়া উচিত নয়। স্বরাজদার কেন এ-সব ফ্রান্সেশিয়ান এসেছে? অবজেকটিভ কনডিশ্যনগুলো তো ভেবে দেখাি তুই। এক সময় মনপ্রাণ দিয়ে কাজে নেমেছিল, পনেরো-ষোলো বছর পলিটিজ করছে। তারপর যদি দেখে কেবল কনফিউশ্যান—

‘কে বলেছে কনফিউশ্যান?’—কোটরের ভেতরে দপদপ করে জ্বলে উঠল সজাতার চোখ: ‘কনফিউশ্যান কোথাও নেই। সে যদি কতগুলো পুরোনো বিশ্বাসেই স্থির হয়ে থাকে, তা হলে দঃখ তাকে পেতেই হবে। কমিউনিজম স্ট্যাটিক নয়—সময় বদলায়, অবস্থা বদলায়, প্রত্যেক দেশের কতগুলো নিজস্ব প্রবলেম আছে। দেশকাল বদলে মার্কসের থিয়োরীকে প্রয়োগ করেছেন লেনিন, ব্যবহার করেছেন মাও সে-তুং, হো চি মিন কিংবা কাস্ত্রোকেও নতুন করে ভাবতে হয়েছে। স্বরাজ যদি এই সহজ সত্যটাকে বঃষতে না পারে, যদি বিশ বছর আগেকার পার্টি নীতিই তার লাস্ট ওয়ার্ড বলে মনে হয়, তা হলে তার ফ্রান্সেশিয়ানের জন্যে সে কারো সহানুভূতি পেতে পারে না।’

‘কিন্তু নিজের ভেতর ভাঙাভাঙি—’

‘কী করে ঠেকাবি? প্রথম দিকে একটা ব্লড আউট লাইন থাকে। তখন অনেকে এক সঙ্গে চলতে পারে। তারপর আন্দোলন যত এগোয়, কাজের চেহারা তত স্পষ্ট হয়, দায়িত্ব কঠিন হয়, অনেক বেশি স্যাক্রিফাইসের সময় আসে। তখনই ধরা পড়ে কে সাদা, কে মেকি, কে বিপ্লবী, কে ভীরু। ভাঙন তখন আসবেই। লেনিনও মেন্শেভিক আর সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের নিয়ে চলা শত্রু করোঁছিলেন, আর তারাই শেষে লেনিনকে খুন করবার জন্যে ফ্রেন্সে গিয়েছিল।’

অনেকদিন শীতল নির্বাণের পর হঠাৎ যেন জ্বলে উঠেছে সজাতা, অনেক বেশি জ্বলে উঠেছে। একটু চাপ করে রইল সাবিদ্রী। এইভাবে তর্ক চালিয়ে গেলে সারা রাতেও শেষ হবে না। সজাতা দশ বছর আগে ফিরে গেছে আবার। ঘরের ভেতরটা থমথম করতে লাগল।

তখন মাসিমা এলেন। সঙ্গে হেনাদি। পরোটা আর তরকারী করে এনেছেন, আর মিষ্টি।

সাবিদ্রীর যেন স্বস্তির শ্বাস পড়ল।

‘এত কেন মাসিমা?’

‘বেশ নয়, খাও।’

‘কিন্তু কেবল আমার জন্যে কেন? সজাতা খাবে না?’

সজাতা বললে, ‘বিবেকল আমি কিছু খেতে পারি না। মানে সহ্য হয় না।’

‘শরীরটাকে কী করেছিস বলতো?’

আবার সেই বিস্বাদ রেখা ফুটল সজাতার মুখে।

‘বাঙালী মেয়ের সংসার—বঃখালি। তার পরম তীর্থ। এতদিন যখন একাই আঁছিস, তুই আর ওই বোকামোটা করিস নি সাবিদ্রী।’

মাসিমার কপাল জুড়ে ছায়া নামল। একবার তাকালেন সাবিদ্রীর দিকে। তারপর বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সজাতা বললে, ‘হেনাদি, আমাগো চা দিলা না?’

‘হ—আনি।’

সাবিদ্রীর খিদে পেয়েছিল, অচ খাওয়ার স্বাদ মুখ থেকে মুছে গেছে এখন। একবার বলতে ইচ্ছে করল, মাসিমার সামনে কথাটা অমন করে না বললেও পারতিস, কিন্তু ভালো লাগছিল না, নিঃশব্দে তরকারীর একটা আলু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল সে।

সজাতা বললে, ‘থেকে যা আজ। অনেকদিন পরে দেখা হল, প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।’

‘গল্পের নমুনা তো দেখছি। আগুন হয়েই রয়েছিস তুই।’

সজাতার কঠিন মুখটা এবারে কোমল হয়ে উঠল একটু।

‘আলোচনা তো তুই-ই তুললি। স্বরাজের কথা টেনে আনিস নি, তা হলেই আর কোনো গোল থাকবে না।’

‘তুই আর ফিরে যাব না?’

‘না।’

‘কোনো উপায় নেই?’

‘না—ইটস্ এ সীলড্ চ্যাপটার।’

‘কী করবি তা হলে?’

‘সারা জীবন যা করতে চেয়েছি। আমি আমার কুমারী জীবনে ফিরে এসেছি আবার। ওদের ছেলের বয়েস বেশি হয় নি, চাকরী করে—সুপারই বলা যায়। ওরা স্বচ্ছন্দে আবার ছেলের বিয়ে দিতে পারবেন।’

বঃকের ভেতরে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সাবিদ্রী।

‘তুই এত নিষ্ঠুর হতে পারালি সজাতা?’

‘অনেক তর্ক করেছি, কেঁদেছি, তিন বছর ধরে প্রাণপণে অ্যাডজাস্ট করতে চেয়েছি। পারা গেল না। স্বরাজের স্যানিটি বলে আর কিছু নেই। ও বাড়ি-টারই হাড়ে হাড়ে ঘণ ধরেছে। তাই ওখান থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল আনন্দ। তার প্রাণ আছে, তার জোর আছে। যদিও একটা অন্ধ অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—তবু ওদের ওই থিয়োরীটা আমি মানি যে জলে না নামলে যেমন সাঁতার

শেখা যায় না—তেমনি বিপ্লবে নেমেই সৈনিক হতে হয়। তাকে একটা সত্য কথা বল সাবিদ্রী। ঠাকুরপো যদি ওই-ভাবে ভেঙে বেরিয়ে না যেত, তা হলে আমি এত তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারতুম না—ধীরে ধীরে তোদের স্বরাজদার সঙ্গে চুড়ান্ত ডিফিটিজমের চিতায় সহমরণে যাত্রা করতুম।’

হেনাদি চা দিয়ে গেল।

একটা পেয়লা তুলে নিয়ে সজাতা বললে, ‘ওকি, হাত খুঁছিস যে? খেলি না তো কিছই।’

‘আর খিদে নেই।’

‘মানে আমার ওপর রাগ করে তুই খেলি না।’

‘না—না—তা নয়।’—সাবিদ্রী হাতের ঘড়িটার দিকে তাকালো : ‘আর বেশিক্ষণ বসব না—এবার ফিরতে হবে রুলকাতার।’

‘ফিরবি কেন? থেকে যাবি আজকে।’

‘না রে, অনেক কাজ আছে।’

সজাতার মুখে শ্রান্ত একটা হাসির আভাস ফুটল : ‘আমাকে খুব অসহ্য লাগছে—না?’

চায়ে চুমুক দিয়ে সাবিদ্রী স্নান গলায় বললে, ‘সম্পূর্ণ ভালো লাগছে এ-কথা বলতে পারলে খুঁশি হতুম। তুই নীলুর কথাটাও একবার ভেবে দেখলি না?’

সজাতার চোখ নেমে এল। একটা যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে—সেটা চোখ এড়িয়ে গেল না সাবিদ্রীর। মাথা নামিয়ে সজাতা বললে, ‘ওকে নিয়ে এলে আমার শ্বশুরের ওপর দারুণ নিষ্ঠুরতা হত একটা—ওই মানুসিটা ভালো, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি। তা ছাড়া ওদের ছেলে ওরা ইচ্ছে মতন মানব করন—আমি দাবি করতে চাই না।’

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা রুঢ় মন্তব্য এসে গেল সাবিদ্রীর ঠোঁটে।

‘নিজের পথও তোর নিষ্কণ্টক থাকে—এই তো?’

হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ নিবে গেল সজাতা। বেদনার কালো হয়ে গেল মুখ।

‘তইও তো কম নিষ্ঠুর হতে পারিস না সাবিদ্রী।’

সঙ্গে সঙ্গে সাবিদ্রী অনুতাপ বোধ করল।

‘আমি—আমি ঠিক এ-ভাবে কথাটা বলতে চাই না সজাতা। মানে, আমি—’

‘তোরা দোষ নেই সাবিদ্রী—’ রান্স গলায় সজাতা বললে, ‘সকলে এই কথাটাই ভাববে। আমার কিরকম লাগছে তা আমিই জানি। কিন্তু বিপ্লবীকে দাম দিতে হয়।’

আবার ঘরের হাওয়াটা গরমোট হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এখন ঝাঁঝের ডাক। এখানে-ওখানে টুকরো-

মা আমার তায় আধার

শান্তনু দাস

তারা তিনজন—

কলের হাপরে হৃদপিণ্ড বাঙা করে ঘরে ফিরতো রোজঃ
হাপরের লাল আগুন তামের চোখ দুটো
যেন উন্মাদ কুস্তার মত জ্বলতোঃ

সেই আদ্যকালের অভ্যাস,
এক থালাতে ভাত খাওয়া।

ভাতের দলা
পাকাতে পাকাতে ঠাকুমা তুষের মধ্যে ঠেলে দিতোঃ

সেই স্মৃতির পিঠে চেপে

সে এবং দুই ভাই

তাদের মা

গায়ে গা লাগিয়ে মৃদু মৃদু দিয়ে সোঁদা জলের গন্ধে ভেসেছিলোঃ
ভেলার গায়ে লটকে ছিল কণ্ঠনালী,
ঘাবারঃ

খোড়ো বাতাস আগুন হয়ে মেঘ হয়েছে, মেঘের পরে মেঘ
ছাত ভেঙেছে বৃষ্টি,
তিনটে শালিখ বৃকের উপর বৃক রেখেছে
তাপের উপর তাপঃ

অথচ কেউ কাউকে চিনতে পারে না
আজ

মাঝরাতে চাবুক নাড়ালে মেঘ
তারা তিন ভাই, মায়ের গলা জড়িয়ে কেঁপে ওঠে না,
একা একাই হাতড়ে চলে পথ।
এক রাস্তার তিন ভাগেতে তিন সড়কে হোঁচট খেয়ে চলেঃ

তিন রাস্তার মোড়ে তাদের মা
রাত অন্ধ লম্ব হাতে দাঁড়িয়ে থাকে,
মাঁষ থেকে রাত, রাত বেয়ে হয় গভীরঃ

কোমরে ঝলসায় চাবুক

এপাশে ওপাশে

অন্ধকারে কারা যেন গেঁজে রাখে হাতঃ

সে কিংবা অন্য দুটি ভাই,

হাপরের মতো বৃক ওঠানামা করে, জ্বলে তিন জোড়া চোখঃ

সে নাকি অন্য দুটি ভাই?

সারারাত লম্ব জেরলে মা আমার তায় আধার।

টুকরো ছায়া জমে আছে মনের ভারের
মতো। দেওয়ালে লেনিনের ছবিটা যেন
জীবন্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।
হেনাদি এসে বললে, ‘দীপকবাবু আর
মন্টবাবু আসছে।’

‘বসতে কও হেনাদি—আমি আসতাইছি।’
—হেনাদি চলে গেল, সাবিত্রীর দিকে
তাকিয়ে সুজাতা বললে, ‘আমাদের পার্টির
ছেলোরা। তুই একটু বোস সাবিত্রী—
আমি দু-মিনিট ওদের সঙ্গে কথা কয়েই
ফিরব।’

সাবিত্রী বললে, ‘তুই বসি এখানে
এখন হোল-টাইম পার্টি ওয়াকার?’

‘কী করব বন? চারদিকে জমি-
দখলের লড়াই চলছে। এই মডেলনটো
মডি একবার দেখাওস সাবিত্রী! চিরকালের
এক্সপ্লয়টড ভাগ্যচামী আর ক্ষত-মজ্জার
ভূমিহীন মানবগণের একটুকরা জমিব
জন্মে কী আকলতা! চীনের থিসাববীই
ঠিক—আমাদের আগে দরকার কমি-বিপ্লব।
তুই একটু বোস—আমি দু-মিনিট ওদের
সঙ্গে কথা কয়ে আসছি।’

‘আমি উঠব। আমার দেবী হয়ে
যাবে।’

‘কিছু দেবী হবে না। বিস্তর বাস
পাওয়া যাবে অনেক রাত পর্যন্ত। এই
তো, সন্ধ্যা—বোস—বোস।’

আসবার আগে মাসীমা এক কোণায়
ডেকে নিয়ে বললেন, ‘কিছু বুঝলে? ও
কী করতে চায়?’

‘অনেকদিন বসে থেকে একঘেয়ে
লাগছিল মাসীমা, একটু রাজনীতি করে
দিন কয়েক ঝালিয়ে নিতে চায়। কিছু
ভাববেন না, স্বরাজ্যদাকে—নীলুকে ফেলে
ওকি থাকতে পারে? দু’দিন পরেই ফিরে
যাবে আবার?’

‘আগে যা করত, করত—কিন্তু এখন
ওই শরীর নিয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে—’

‘তুইদিন চালাতে পারবে না মাসীমা,
আপনিই ক্রান্ত হয়ে পড়বে।’

নিরাশ স্বরে মাসীমা বললেন, ‘কিছু
বসতে পারছি না। কিন্তু কপালের
সিঁদুরটা মজল কেন?’

‘ওটা খেয়াল, মাসীমা, নিশ্চিন্ত
থাকুন।’

‘আবার আসিস—’ সুজাতা বলিছিল।
‘মাসব।’

কিন্তু বাস যখন দু’ পাশের ঘরবাড়ি,
বাগান, খোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে ভীরবেগে
ছুটছে, তখন জানলার ওপর, হাওয়ার মধ্যে
মাথাটা মেলে দিয়ে সাবিত্রী ভাবছিল,
আসব? কেন আসব? এসে কী হবে?
প্রবীর তাকে মিথোই পাঠিয়েছিল এখানে।
যে সান্ধুনা সে মাসীমাকে দিয়ে এল,
নিজেই তা সে কি বিশ্বাস করে?

বাসে কে একজন ট্রানজিস্টর রেডিও
খুলেছে। সেই খবর। সেই তিক্ততার
ইতিহাস।

শরিকী সংঘর্ষ। মধ্যমন্ডরী উত্তর
প্রতিবাদে উপমধ্যমন্ডরী এক বিবর্তিতে
বলছেন—

হঠাৎ মনে হল, এই বাসটা—এই সব
যাত্রীরা—এক অন্ধকার আর অনিশ্চিত
লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাচ্ছে—কোন পরিণামে
গিয়ে যে পৌঁছোবে কেউ জানে না।
দূরে দমদম এয়ার পোর্টের রানওয়েতে
সারি সারি আলোগুলো চোখে পড়ল, বোধ
হল যেন একরাশ আলোয়া।

[ক্লেশ]



প্রেসিডেন্সীর প্রেসিডেন্সী নড়েছে

এতোদিনে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ইজ্ঞত গেছে। সংবাদপত্রে দেখলাম, এ বছর প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হওয়ার জন্য ভালো ছেলেমেয়ের মধ্যে তেমন আর প্রতিযোগিতা নেই। 'বুধু' ছাত্রমহল কেন, প্রেসিডেন্সীতে বদলী হয়ে আসার জন্য শিক্ষক মহলেও বেকালে উমেদারি চলত, হঠাৎ সে যুগেও ড্রপ সীন পড়েছে। প্রেসিডেন্সী বর্তমানে হানাবাড়ির মতো এক ভীতিপ্রদ হর্ম্যবিশেষ।

অথচ আমাদের কালে দেখছি, ঐ প্রেসিডেন্সীর কী রবরবা অহংকারী ঐশ্বর্য। তার চওড়া চওড়া সিঁড়ি ভেঙে দৈনিক ক্লাস করা ও ক্লাস শেষে কফি হাউজে অভিজাত ছাত্রছাত্রীদের আসর সাজানোর মধ্যে এক ধরনের শ্রেণী-আভিজাত্য বাকি ছাত্রসমাজকে জাত্যাভিমান তাজিল্য করার সন্যোগ ভোগ করত। ভর্তির সময় বাছাই-করা প্রথম শ্রেণী আর এক-একটা সজীব-হাই নম্বর রেজিস্টার-বন্দী করে প্রেসিডেন্সী বরাবরই তার রেজাল্ট-বাহাদুরী দেখিয়ে এসেছে। সরকারী আনুকূল্যেও প্রগতিভেদটুকু ছিল সুস্পষ্ট। সেই প্রেসিডেন্সীর প্রেস্টিজ এ্যাট স্টেক!

আমাদের প্রেসিডেন্সীতে পড়ার সৌভাগ্য হয় নি। মাহিনার জন্য তো বটেই, বাছাই-করা বড়মানুষীয়ানার জন্যও ওখানে বড় একটা ঘেঁষ নেওয়া সাহসে কুলায় নি। আমি তো ফর্ম ফিল-আপ করেও শব্দ লম্বা-চওড়া সিঁড়ি আর পালিশ করা রুম দরজাগুলি দেখে পালিয়ে এসেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখছি,

প্রেসিডেন্সীর ছাত্রছাত্রীরা একটা চাক বেঁধেই থাকত। মাস্টার মশায়রা কেমন যেন বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে তাদের প্রফেসরস রুমে গভীরভাবে প্রশ্রয় দিতেন। কি জানি, হয়ত ঈর্ষাই হত। এড়িয়ে চলতাম আমরাও। আবার হয়ত বা মনের কোণে কারণে-অকারণে কিছুর সমীহও জমা থাকত। দূরে থাকার সে-ও এক কারণ। অথবা এ-ও এক ধরনের শ্রেণী-বিশ্বেষ?

সেকালে রাজনীতি থেকে গা বাঁচিয়ে লাইব্রেরী অধিকারই ছিল প্রেসিডেন্সী-ছাপসারা ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য। রাজনীতি-সচেতন ছাত্রদের ধারেকাছেও ঘেঁষতই না তারা। ওয়া পড়তে ও প্রেমে পড়তে জানত। পরীক্ষার পর পড়ানোর চাকরি নিতে পারতো, অথবা বড় অফিসে মোটা মাইনের অফিসর বনতে পারতো, কিন্তু কখনই নিজের পায়ে রাজনীতির কুড়ুল মেরে আখের নষ্ট করতে দেখতাম না প্রেসিডেন্সী ফেরতদের। এক কথায় আমরা ওদের ভালো ছেলে আর ভালো মেয়ে বলেই জানতাম।

ভারি অবাক লাগে তাই, যখন দেখি, আজকের প্রেসিডেন্সীর চেহারা ঠিক উল্টো। রাজনীতির পেটো ওখানেই ফুটেছে ফাটেছে সমধিক! অধ্যক্ষ চাইছেন বদলী; অভিভাবকরা চাইছেন প্রেসিডেন্সীর স্পর্শ বাঁচিয়ে ছেলেমেয়েদের অন্য ব্যবস্থা করতে। সত্তরের দশকে এ একটা বাস্তব পরিবর্তন অনস্বীকার্য। ভালো ছেলেরা হেলায় কেরিয়ার করছে ক্ষয়!

অবশ্য প্রেসিডেন্সী যে শব্দ গোলমাল-বিমূখ রাজনীতিছড় পড়ুয়ার পীঠস্থান, এমন কথা বলা শক্ত। শহরের ইতিহাসে

সুভাষচন্দ্রের বিদ্রোহের সুত্রপাত ঐখান থেকেই। কিন্তু সুভাষ সৈনিক ছিলেন একটি। আজ প্রেসিডেন্সী থিওক্রেডে উত্তাল। কেন? চিন্তাবিদদের একই বক্তব্য : বেকারত্ব। ফ্রাসট্রেশন। হতাশা। মায় প্রেসিডেন্ট গিরিও বললেন : হতাশাই ছাত্র অসন্তোষের আশ্রয়মঞ্জী।

কিন্তু যদি তা-ই হবে, তবে কনসেন-ট্রেশন, বিশেষ করে প্রেসিডেন্সীতে কেন? বেছে-তোলা ছাত্রসমাজ চাকরির বাজারে তব প্রথম প্রেক্ষারেন্সই পাবে। পড়ে থাকবে না। বাংলা দেশে যদি বাঙালীর জন্য কাজ থাকে, তবে সেরা কাজে সেরা ছাত্রছাত্রীর ডাকও পড়বে। আর তাই যদি হবে তাহলে কেবলমাত্র কেরিয়ারগত হতাশা নিশ্চয় কলেজ স্ট্রীটের ঐ জাঁদরেল অট্টালিকায় বাসা বাঁধে নি। হতে পারে জুংসই কাজ জোটের সম্ভাবনা কম। কিন্তু তাই বলে ভালো ভালো কেরিয়ারের সম্ভাবনায় জলাঞ্জলি! ব্যাপারটা বোধহয় অত সহজ নয়।

অবশ্য বাঙালী ভালো ছাত্রকে 'লেগপুল' করে জাতীয় চাকরির ক্ষেত্রে অবাঙালীর ছলে-বলে-কৌশলে পদাধিকার, হতাশার (বেকারত্ব-সম্পর্কিত) অন্যতম কারণ হতে পারে। এ 'বুর্জোয়া শিক্ষা' ব্যবস্থা, এই কুটিল সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিকতার নিলম্ব রাজনীতি, বাংলার ছাত্র-অসন্তোষ, বিশেষ জুয়েল ছাত্রের অসন্তোষ তীব্রতর করে থাকতে পারে। মনে হয়, প্রেসিডেন্টের এ বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমান সুযোগের বাণীবক্তব্য-সম্মিলিত সংবিধান যে বিশেষ ক্ষেত্রে অসমান মনোভাবকে তাড়না করার ইতিকর্তব্য পালন করতে পারছে না। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট সৈদিকটা বরং ভাবুন না কেন। বাণীর ফুর্লুঝুরি চেকনাই দিতে দিতে বিশ বছরে স্থান হয়ে গেছে। দেউলে নেতৃত্বের মগজে কোনো সমস্যারই উপযুক্ত ব্যাখ্যা তো নেই-ই, সমাধানের সন্দিগ্ধতাও নেই। একে খুঁচিয়ে ওকে ত্যাগিয়ে তাকে পেড়ে ফেলে আপনি বেঁচে বাপের নাম রক্ষার ব্যস্ততায় কেমন যেন বড়ো-বেহুদ কচিকাচা একাধারে শশব্যস্ত। এমতাবস্থায় দেশব্যাপী পেটো-পিটানো বিক্ষোভ বিপ্লব তো হবেই। এসব যে বরং খুব কম কম হয়ে থাকে, এই তারই রকম-সকম বোঝা ভার। পারাবত নেতৃত্ব চিলের ছাদে বসে বকম বকম করবে বলে প্রকৃতির নিয়মে গ্রীষ্মের মাটি চিড় খাবে না, গাজের পাতা হিয়েল হাওয়ায় হলদে হবে না, বর্ষায় নদীপ্রান্তরে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেবে না এবং বসন্তের কোকিল গান গাইবে না, এ আবার হয় নাকি? হলে তো প্রলয়।

সতরাং আশংকার কিছ নেই। সব ঠিকঠাক নিয়ন্ত্রণই চলছে। সন্তোষের বৈনিয়মই যত্নে দৃষ্টিভার জন্য দায়ী, এ কথা খাটি সত্য।

সাতাহিক বঙ্গমতী

কলকাতার দিকে তাকিয়ে, যারা
দৃশ্য দেখছেন, তাঁরা আজও রূপকথার
রাজ্যে বোম্বাই ছবির অভিজ্ঞাসু দর্শক-
বৃন্দ। এঁদের সবেলিঙ্গ প্রশান্তির জন্য
তাম্র কলিকাতাও 'লিবার্টি'-মার্কা প্রেক্ষা-
গৃহে জাগতিক মূর্তির সম্মান করবে, এমন
গাঁড়াগোড়া বে-'হেড' সি-আর-পি দাবি
মশায় ধোপে টেকে না।

কিন্তু এসবও তো সেই অন্ধকারে

ইটক নিক্ষেপের বাগাড়ম্বরবিলাস।
আমরা কলমনবীশরাও এই হালকা সূত্রে
মদ্যমখে বেঁচে আছি। আসল ঘটনার
সদৃশ্য হর অজ্ঞাত, নয় অব্যক্ত। কিন্তু
তা সবে আমাহেন-মজলিস-অছ্যুতের শান্তি
নাই। মনে বড় প্রশ্ন; রাজনীতির রাগরূপে
মোহিত কেন প্রত্যেকেই বিদ্যাকদম্বলে
বেগুয়ারী অভিজাত প্রেসিডেন্সী? তার
ম্যাদামারা মাস্টার মাস্টার ভাবটা পাল্টে

যাচ্ছে। 'বর্তীক' বস্তুভাষ্য ফেলে তার যেন
নিরবের স্বপ্নভঙ্গা ঘটেছে। এই মৌল
চারিত্র্য পরিবর্তনের মাঝে বস্তু এক সত্য
নিহিত বার ব্যাখ্যায় অপারগম আমি।

বিরাত জিজ্ঞাসা তাই প্রেসিডেন্সী
ঘরে!

বস্তুত কী যেন ঘটে যাচ্ছে কলকাতার
সবচেয়ে অভিজাত বিদ্যাধী'মহলে'
প্রেসিডেন্সির 'প্রেসিডেন্সী' নড়ছে!



আপনার চুল যে বকুড়াই থেকে তার মত নিতে পারে কে?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যেরকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চর্চাচর্চা চুলের জন্মঃ- বাড়তি তেলধূয়ে দেয়; তার।
ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার, স্বরস্বরে, মেঘের মত উজ্জ্বল,
রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্মঃ- এতে আছে আলানট্রিয়েন যা
আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, কিরিয়ে আনে রেশমী শোভা,
চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

অভাবিক চুলের জন্মঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী
যাতে আপনার চুল সবসময় হৃদয়-পরিপাটি থাকে, প্রতিটি
চুল থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার
চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী



ট্রিটাইল: SS-11-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

গ্রামস্বাস্থ্য

কথা



নয়া জমানার কৃষক

কৃষককে নিয়ে রাজনীতির অন্ত নেই। অন্ত থাকার কথাও নয়। কৃষি-প্রধান ভারতের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি লোক যেখানে কৃষক, সেখানেই দলীয় রাজনীতি মূলত কৃষককে কেন্দ্র করে দানা বাঁধবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। তাই, কি কংগ্রেস, কি অ-কংগ্রেস—প্রায় প্রতিটি দলের রাজনীতিতে কৃষককে নিয়ে এত অজস্র কথা, এত মাথা ব্যথা, মাতামাতি, প্রায় মাতলামি পর্যন্ত। দাপাদাপি সারা ভারত ভূখণ্ডে। আরো লক্ষ্য করা যায়, সৌখীন এক রাজনৈতিক দলের সম্ভা কৃষক-দরদী সেজে বাহারুরী আর হাত-তালি নেবার হাস্যকর অপচেষ্টা। অংশত যার ফলে মাঠে-ময়দানে, গ্রামে-গঞ্জে, মুখে-মাইকে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য এত হৈ-ঠা আর দেশজোড়া সোরগোল।

কিন্তু এই প্রচণ্ড সোরগোলের আসল কথাটি ভুলে গেলে চলবে না, চলবে না ধামাচাপা দিয়ে মূল প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাওয়া। খতিয়ে দেখতে হবে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে দলীয় রাজনীতির কাছি টানাটানির ফলে কৃষকের স্বার্থ-রক্ষা হয়েছে কি না। দলীয় কাছি তাকে টেনে ওপরে তুলেছে, না ক্রমশ ফাঁস হয়ে তার গলায় চেপে বসেছে। এই প্রশ্নগেই এসে পড়ে দলীয় রাজনীতির কথা, বিভিন্ন দল আর তাদের ভূমিকার কথা। কৃষকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে তারা কি করেছে আর কি তাদের করা উচিত ছিল—তার খতিয়ান নিয়ে আলোচনা।

প্রথমেই আসে কংগ্রেসের কথা। দীর্ঘ ২২ বছরের কংগ্রেসী শাসনে কৃষক পায় নি প্রায় কিছুই। কৃষিঋণ, উন্নত বীজ, সার প্রভৃতি চাষের অপরিহার্য জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যাপারে সরকারী উদাসীন্য কৃষিজীবীদের দিন দিন অন্ধকারের পথে ঠেলে দিয়েছে। তাই কৃষকরা মহাজনের খপ্পরে পড়ে চক্র-বাঁশ্বহায়ে তার ঋণ শোধ করতে

পারেন নি। শেষে মহাজনের সিন্দুকে চাষীর জ্যেত-জমি, ঘরবাড়ি, ঘাট-বাটি সব বিক্রি হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। অথচ সরকারী কৃষিবিভাগ প্রচারের ঘুটি করেন নি, কিন্তু সময়োচিত সাহায্যের প্রত্যাশা তাঁদের কাছ থেকেও নিষ্ফল হয়ে ফিরে এসেছে। প্রাচীরে বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের রঙের খেলায় সরকারী সহায়তার সম্ভব ঘোষণা বাস্তবক্ষেত্রে কৃষকের কাছে কল্পনার বস্তুই থেকে গেছে।

কিন্তু জমি, সেচ, সার, ঋণ আর ছোট-বড় পরিকল্পনাগুলোর মারফৎ স্বসামান্য বা চাষী পেয়েছে সেটা তার রক্তের দাম। পুন্ড্রেশের বুলেট, জ্যেতদারের লাঠি আর জেলের লপসী খেয়ে সেটা তাকে আদায় করে নিতে হয়েছে। বিভূদার বাৎসরিক মুনামাকে ৩০০ কোটি টাকার অংকে আনতে গেলে রামা কৈবর্ত ও হাসিম শেখের আয় বাড়তে পারে না। তাই বাড়ি নি, বাড়তে পারে নি। কংগ্রেস জমিদারী উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু কৃষক জমি পায় নি। অথচ কোটি কোটি টাকা বেরিয়ে গেছে ক্ষতিপূরণ বাবদে, ঢুকেছে জমিদার আর চকদারদের পকেটে। কংগ্রেস তেভাগা আইন পাশ করেছিল, কিন্তু তার সংশোধন জড়িয়ে উচ্ছেদের লেজুড়। সে লেজুড় ঝাপটা মারে আর জমি থেকে চাষী ছিটকে পড়ে। এই তো হ'ল কংগ্রেসী আদর্শের খতিয়ান—কৃষক দরদের নমুনা। কিন্তু কৃষকের জিজ্ঞাসা এখানে থামে না। কারণ কৃষক জানে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কৃষকের স্বার্থরক্ষার যে দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপর ছিল—তা সে পালন না করে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার শাস্তি অংশত হলেও কংগ্রেস পেয়েছে। তার সাজানো সাম্রাজ্য আজ খান খান হয়ে ধসে পড়েছে। জখন্য আত্মবন্দে ও আত্মদন্ডে বিক্ষত কংগ্রেস আজ আসন্ন মৃত্যুর দিন গণে হাঁফাচ্ছে। গত ৪র্থ সাধারণ নির্বাচন আর তার পরবর্তী

ঘটনাবলি লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

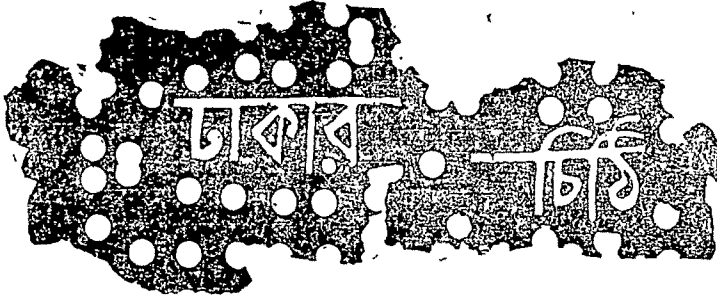
এর পরে স্বভাবতই সমাজতন্ত্রী আর লেনিনবাদী দলগুলির কথা ওঠে। মেহনতী মানুষের দল হিসাবে কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্বও অপরিসীম। তাই, কৃষক আন্দোলনকে সংহত করে রাজনৈতিক শিক্ষার আলোকে কৃষকসমাজের শ্রেণী-চেতনাকে স্পষ্ট করে তোলায় ক্ষেত্রে তাঁরা কতদূর কি করেছেন, প্রসঙ্গক্রমে তারও সালতামামির প্রয়োজন হয়।

সমাজতন্ত্র গঠনের পূর্বশর্ত হিসাবে মনীষী লেনিন বলেছেন যে, কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তোলাই হবে সমাজতন্ত্র রচনার প্রথম ধাপ। কারণ কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থ মূলত এক আর অভিন্ন। কিন্তু সে ঐক্য কি গড়ে উঠেছে? কৃষক আর শ্রমিক কি আজ একই বনিয়াদে এসে দাঁড়িয়েছে? কোন সমাজতন্ত্রী দল গেঁথেছে সে বনিয়াদ, নিরীক্ষণ শোষণের মুখে রুখে দাঁড়বার সেই সম্মিলিত পাঠান, সংহত মোর্চা?

বরং আমরা উল্টোটাই দেখলাম এ যাবৎ। গ্রামের চাষী যখন মার খায়, জ্যেতদারের হাতে, মহাজনের নিকট দেনার দায়ে যখন মাথার চুল পর্যন্ত বিকিয়ে যায়, যখন তারা স্বাধীন-পুত্রের হাত ধরে পথে নামতে বাধ্য হয়, তখন তো কই শহরে শ্রমিক গঞ্জে ওঠে না! ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ছুটে আসে না তো মিছিলে! আওয়াজ তোলে না লড়াইয়ের! আবার শহরে শ্রমিকের চাকুরী গেলে, বোনাস চেয়ে বুলেট পেলে গ্রামের চাষী নির্বিকার। চোখ বোজে আর ধোঁকে। কৃষকর্ণের ঘুম ভাঙে না।

গ্রামের চাষী অবশ্য কালে-ভদ্রে শহরে যায়। মিছিল বানায়, মিছিলে যোগ দেয়। খাদ্য চায়, জমি চায়—শ্লেগান দেয়। লাঠি, কাঁদানে গ্যাস আর মাঝে মাঝে পুন্ড্রী খেয়ে গ্রামে

১৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



II এগার II

আগার মৃণালযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য নির্বাচনের ময়দানে জামাত ও কনভেনশনীদের পাশাপাশি তাঁবু খাটিয়ে আর এক দল বুরজোয়া এবং পাতিবুরজোয়া নিয়মিত পায়তারা কষছে। তাঁবুর মাথায় বিরাট বংশদণ্ডের গায়ে ডোরাকাটা, বিচিত্র এক নিশান বাঁধা। তাতে লেখা আছে পি. ডি. পি, অর্থাৎ “পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি”। কিন্তু জনসাধারণ, যারা কৌতুহলী হয়ে ঘাঠের আশেপাশে ঘোরা-ঘুরি করছেন, তারা পড়ছেন, “পাকিস্তান ডেস্ট্রয়ার্স পার্টি”। এই ভুল শৃঙ্খরে দেবার জন্য পি. ডি. পি-ওয়ালারা প্রথমে নিশানটা নামিয়ে “ডেমোক্রেসী” কথাটাকে রঙ মাখিয়ে আরও ধ্যাবড়া করে দিয়েছিল, কিন্তু তাতেও কিছু হোল না দেখে এখন তাঁবুর চারপাশে চোঙা বুলিয়ে তারস্বরে “ডেমোক্রেসী”র বহুতর ব্যাখ্যার আয়োজন হয়েছে। নূরুল আমিন, আবদুস সালাম, মামুদ আলী, ফারিদ আমেদ, আজিজুল হক প্রমুখ পি. ডি. পি নেতারা পালাক্রমে তাঁবুর সামনে এক কেঠোমণ্ডে উঠে অজ্ঞ, অপদার্থ আওয়ামকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়ার উপদেশ দিচ্ছে এবং তাদের অনূর্বর মস্তিষ্কে “গণতন্ত্র”, “দেশসেবা”, “আত্মত্যাগ” ইত্যাদি অশ্রুত, অজ্ঞাত কথা চুকিয়ে দেওয়ার আগ্রহে নাছোড়বান্দা দালাল বা লটারীর টিকেটওয়ালার মত ধক্ ধক্ করছে। তাঁবুর পাশেই একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে বিনা টিকেটে পি. ডি. পি-র মহান রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও পটভূমির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ঢালাও সুযোগ আছে। যদিও দর্শকের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য—তা হলেও পি. ডি. পি-ওয়ালাদের উৎসাহের অভাব নেই, বোধ হয় তারা মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছে যে, সারা পূর্ব পাকিস্তান তাদের তাঁবুতে ভেঙে পড়েছে! এই পি. ডি. পি-ওয়ালাদের নিরেই আমার এবারের চিঠি শুরুর হোল।

নূরুল আমিন, মামুদ আলী, আবদুস সালাম প্রমুখ নেতারা তাদের দীর্ঘ রাজ-

নৈতিক জীবনে কেবলমাত্র একটি কাজই করেছে, তারা ক্রমাগত পুরনো দল ছেড়ে বা ভেঙে নতুন দল গড়েছে। বুরজোয়া স্বভাবসুলভ এই বিশেষ কাজটি ছাড়া তারা আর কোনও কিছুই দাবি করতে পারে না। দেশকে তারা কিছু দেয় নি, দিতে চায় নি কোনওদিন। তবুও নিরলসের মত গলা ফাটিয়ে দেশসেবার লম্বা ফিরিস্তি আওড়াতে তাদের জুড়ি মেলে না এবং এটাও তাদের বুরজোয়া মানসিকতার অপর এক লক্ষণ। নূরুল আমিন প্রথম জীবনে ছিল মুসলিম লীগার। পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্ভাগ্য যে, সে একটানা সাত বছর এই প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রিত্ব করে গেছে! অতঃপর আয়ুবের আমলে উনিশ শ' তেবটি সালে যখন এন, ডি, এফ বা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট হয়, নূরুল আমিন তাতে যোগ দিয়েছিল। এর কিছুদিন আগে আমিন সাহেব বুনিনাঙ্গী গণতন্ত্রের ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছিল। যে বুনিনাঙ্গী গণতন্ত্রকে গরু, মহিষের খাটাল অপেক্ষাও নোংরা মনে করা হোত এবং যার বিরুদ্ধে আমিন সাহেব নিজের অন্তরঙ্গদের কাছে অহোরাত্র বিমোক্ষার করেছিল, দেখা গেল, সেই বুনিনাঙ্গী নির্বাচনেই আটঘাট বেঁধে সে নেমে পড়েছে! নির্বাচনে জয়ী হয়ে নূরুল আমিন জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতা বনে গেল! দেশসেবার আর বাকী রইল কি? একদিকে এন, ডি, এফ, অপর-দিকে বিরোধী দলের নেতৃত্ব, কপালের দুই পাশে হঠাৎ গিজিয়ে-ওঠা এই দুই শিঙা বাগিয়ে নূরুল সাহেব আয়ুবশাহীর পাথুরে দেওয়ালে চু, মারতে লাগল।

অতঃপর, উনিশ শ' সাতবাঁটি সালে যখন প্রদেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে আয়ুবের শাহী জমানার পাথুরে দেওয়াল ধসে পড়ার উপক্রম হোল, তখন কোপ বৃক্ষে কোপ মারার আশায় নূরুল তারই মত সুবিধাবাদী এবং খুঁত কিছু লোকের সাথে হাত মিলিয়ে মিছিল আর বক্তৃতার বিপ্লব আমদানী করল এবং এই মজাদার ব্যাপারটার একটা গালভরা নমুও রাখল। সাতবাঁটির পরলা

ল্ল-র ভোরে ঢাক, ঢোল, জগবম্প ইত্যাদির আওয়াজে ঘুম ভেঙে উঠে ঢাকার মানুষ শুনল যে, “অদ্য হইতে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট শুরুর হইবে। আয়ুবের পতন ঘটাইয়া দেশে প্রকৃত, অর্থাৎ নিভেজাল গণতন্ত্র কায়েম না করা পর্যন্ত এই মুভমেন্ট চলিবেই।”

কিন্তু বক্তৃ আট্টিনি ফস্কা গেরোর মতই পি, ডি, এম মাত্র দুই বছরের মধ্যেই অতি-রিক্ত বিপ্লব করে হাঁপিয়ে উঠল। ইতিমধ্যে আয়ুবের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের সংঘবদ্ধ আক্রমণের কাছে বারংবার মার খেয়ে খাঁ সাহেবের মত জগী লোকও নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। নূরুল আর তার সাকরেদরা বুলল, “মহা মুস্কল, তারা তো পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রোগ্রেসিভ থাকছে না, অচ্চ দেশের স্বার্থে তাদের টিকে থাকা একান্ত প্রয়োজন। অতএব, নতুন কিছু করা।” “এবার কেবল ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট নয়, একে-বারে ডেমোক্রেটিক আকশন শুর, করে দাও।” তাই হোল। উনিশ শ' উনসত্তর সালের জানুয়ারীর আট তারিখে আরও বেশি জাঁকজমকের মধ্যে, আরও বেশি ঢাক, ঢোল আর ক্যানসতার পাটিয়ে নূরুল আমিন তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে “ডেমোক্রেটিক আকশন কমিটি” গঠন করল। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই “ডেমোক্রেটিক আকশন কমিটি” বানিয়ে নূরুল আমিন প্রমুখ গত গণ-আন্দোলনের যোদ্ধাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন না, সৈদিন আন্দোলনের তীব্রতা এবং গতিবেগ এতই বেশি ছিল যে, আয়ুব খাঁ তার মার্কিনী বা রুশ দাদাদের দেওয়া রকমারী বন্দুক, সঙ্গীন এবং টোটোর অবিরাম অপচয় করেও আমাদের রুখেতে পারছিল না। বাধা হয়ে খাঁ সাহেবকে চোরাগিলির পথে পা বাড়তে হোল। এক বেতার ভাষণে সে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে এক বৈঠকে বসার অনুরোধ করল। এই সেই বিখ্যাত গোলটেবল বৈঠক! সংগ্রামী আওয়াম আয়ুবের বেতার ভাষণের প্রকৃত অর্থ বুঝে নিয়ে লীডার বাহাদুরদের এই ধরনের কোনও বৈঠকে যোগ না দেওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিল। কেন না, তারা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরে-ছিল যে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাত্ত্বিক নিয়ে রুখে না দাঁড়ালে তার অত্যাচার ক্রমশই বেড়ে যায়। “কলসীর কানা খেয়েও জগাইকে প্রেম দিতে হবে”—এই রকম ধাবণা সংগ্রামী আওয়ামের চিন্তারও বাইরে ছিল। কিন্তু ডেমোক্রেটিক আকশন কমিটি, যার মধ্যে পাকিস্তানের প্রায় সব বুরজোয়া রাজনৈতিক দলগুলিই ছিল, তার নেতারা আওয়ামের পরামর্শে কান দিল না। কেন না, রাজনীতি প্রকৃষ্ট কাছে সৌধীন মজদুরী মাত্র বা সখের

গাণ্ঠাহিক বঙ্গমতী

শব্দ-পাখি শিকার। প্রকৃত শ্রেণী-সংগ্রাম এবং সম্প্রদায় বিপ্লবের কথা শুনেলেই ওদের পিঁলে চমকে ওঠে। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে গোল-টোবল বৈঠকে যোগ দিয়েছিল। প্রথমত আয়বের মত তারাও সমাজের তথাকথিত ধোপদুরন্ত শ্রেণীর মানুষ, যারা প্রকৃত বিপ্লবের কথা শুনেলেই কায়েমী স্বার্থকে প্রাপণে আঁকড়ে ধরতে চায়। সুতরাং, গণ-আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে তারা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। গোলটোবল বৈঠকে যোগ দিয়ে আয়বের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু কনসেশন আদায় করে নেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মিত্তীয়ত, এই ধরনের কনসেশন আদায়ের মাধ্যমে তারা দেশবাসীর কাছে নিজেদের প্রগ্রেসিভ প্রমাণিত করতে চেয়েছিল। যাই হোক, গোলটোবল বৈঠকে গিয়েও ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি শেষ রক্ষা করতে পারল না। আয়বের উপস্থিতিতেই তারা শেয়াল-কুকুরের মত পরস্পরের দফা নিয়ে সোর-গোল শুরু করে দিল এবং বৈঠকের শেষে দেখা গেল যে, কমিটি ভেঙে গেছে। কিন্তু জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়ার আর একটা চেষ্টা করল নেতারা। যেমন নসরুল্লা (কমিটির কনভেনর) ঘোষণা করল যে, জনগণের দাবি-দাওয়া সবই আদায় হয়েছে, সুতরাং কমিটিরও প্রয়োজন শেষ হোল! কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কখনই যায় না। পাকিস্তানের মানুষ বদ্বল যে, ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি তাদের ঠিকিয়েছে। সুতরাং, তাদের হাত থেকে ঝাচার জন্মে নেতারা গা ঢাকা দিল। এই নিলম্বজ দালালের দল-যারা দশ বছর ধরে আয়বের ছত্রছায়ায় থেকে গণ-বিরোধী কাজকর্ম চালাচ্ছিল, তারাই আবার নতুন জঙ্গী শাসক ইয়াহিয়ার রাজত্বে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি গড়েছে। দেশের মধ্যে যারা প্রকৃত বিপ্লবী, তারা সবাই জানে যে, পূর্বনো মদ নতুন পাত্রে ঢালা হয়েছে মাত্র। পি, ডি, পি তার রাজনৈতিক বিশুদ্ধতা প্রমাণ করার জন্য তার কর্মসূচী এবং লক্ষ্য যে সাংঘাতিক রকমের গণতান্ত্রিক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক, তা প্রমাণ করার জন্য নানা রকমের প্রচার চালাচ্ছে। তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হবে যেন পাকিস্তানে এত পবিত্র, এত সুং এবং এত আত্মত্যাগী আর কোনও

রাজনৈতিক দল ইতিপূর্বে জন্ম নেয় নি! বাহাদুরে নরুলের বাহাদুরি আছে বলতে হবে! প্রথমে মদসলিম লীগ, তারপরে এন, ডি, এফ, তারপরে পি, ডি, এম, তারপরে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি এবং বর্তমানে পি, ডি, পি। একটার পর একটা খেল দেখিয়ে সে আজও একেবারে তরুণ, তাজাই আছে।

II গ্রামবাংলার কথা II

[১৫২ পৃষ্ঠার পর]

ফিরে আসে। আন্দোলন ছাড়ে। কানমলা আর নাকথৎ খেয়ে জোতদারের উঠানে চাই পাত্রে। যথারীতি কংগ্রেসকে ভোট দেয়। জোড়াবলদের খুঁরে আর ধুলো থাকে না। পক্ষান্তরে, শহরের শ্রমিক গ্রামে আসে, এসেই ভাগচাষী উচ্ছেদে মদত জোগায়। অথচ সেই শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন করে। মালিকের বিরুদ্ধে লড়াই করে। কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট দেয়।

সমাজতন্ত্রের অপর একটি শর্তের কথা প্রসঙ্গক্রমেই এসে পড়ে। লেনিন বলেছেন, কৃষক ও শ্রমিকের সংহত একের মধ্যে টেনে আনতে হবে স্বল্পবিস্ত চাষীকে। শোষণ আর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারাও অংশীদার। প্রশ্ন ওঠে : এ শর্ত কি পূরণ হয়েছে? নিশ্চয়ই না। কারণ গ্রামের চির বিপরাতি। স্বল্পবিস্ত আর নিম্ন-মধ্যবিস্ত চাষী দিনের পর দিন পঞ্জিবাদী স্বার্থের ভাবেদার হয়ে পড়ছেন। নিম্নস্তরের কংগ্রেস সংগঠনের তাঁরাই হলেন ঝুটি। গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসনের তাঁরাই হলেন স্বরাট। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা কায়েমী স্বার্থেরই যন্ত্র। যে যন্ত্র নিয়ন্ত্র পিষছে, পিষে মারছে কৃষককে—অথচ যে কৃষকের সংগে তাঁদের স্বার্থের গটিছড়া বাঁধা। কিন্তু কোনো বামপন্থী দল তাঁদের টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে কি সাধারণ কৃষকের সারিতে, বেধেছে কি মিলন-সূত্রে, সমাজতন্ত্র গঠনের মহান শর্তে?

বরং দেখা গেছে, কোনো বিভ্রান্ত বামপন্থী কমিটি তাঁর গনগড়া শ্রেণী-বিশ্লেষণের দ্বারা সেই স্বল্পবিস্ত শ্রেণীকে পঞ্জিবাদী অথবা জোতদার বলে বর্ণন করেছেন। এ আত্মঘাতী রাজনীতির খেলা আজ প্রায় সর্বত্রই। লেনিনবাদের এ অপপ্রয়োগ প্রায় ফ্যানশনের মত সংস্কারক! কিন্তু এটা

বিপ্লব না অন্য কিছু তা চাষীরা বোঝে নি। কিন্তু যুদ্ধে চায়। তাই কৃষকও পথ খোঁজে। বাঁচতে চায়। বাচার ইচ্ছা তার উদ্দেশ্য। তার ছাপ দেহে-মনে পড়ছে। উদ্বেগ-নিচে, সামনে-পিছনে সে তার অপন্থ দাঁড় মেলো ধরে। হয়ত পথ পরে না, তাই ভুল করে।

কিন্তু রাজনৈতিক পটভূমি আজ পাল্টে গেছে, পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টে যাচ্ছে রাজনীতির ধারা। লয় তার দ্রুত। গতি তার অবাধ। তারই তালে তাল রেখে চাষীকেও আজ যথাসম্মত ঠিক করতে হবে তার পথ। অপন্থ আর টলবাহানা প্রগাড়ের শত্রু। জনগণ অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যায়। “নুনায়ার কোনো শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন পরাজয় স্বীকার করে নি।” তাই, নতুন পটভূমিকায় নতুন শিক্ষাটুকু নিয়ে কৃষককে আজ আসতে হবে এগিয়ে। গড়তে হবে সংগঠন। আনতে হবে সংহতি। যাতে ফাটল ধরাতে গিয়ে পঞ্জিবাদী কায়েমী স্বার্থ খান খান হয়ে ভেঙে পড়বে।

শ্রমিকেরা আজ তাঁর শোষণ অত্যাচারিত মেহনতী কৃষক সে তার প্রকৃত শত্রুকে চিনেছে। মধ্যবিস্ত বুদ্ধিজীবী ও সোশালিস্ট মতবাদী তান্ত্রিকেরাই আজ তাঁর নেই। তাই কৃষকের রাজনীতির রূপকার আজ কৃষক। জোতদার আর কায়েমী স্বার্থের দালাল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি হতে পারে না। তাঁদের হাতে অস্ত্র সে তুড়ে দেবে না তার রাজনীতি তথা ভাগ্য-রচনার ভার। নিজের মাথা বিকিয়ে দেবে সে আর দেউলিয়া হয়ে যাবে না। আজ এসেছে লসন ভূয়া গণতন্ত্রীদের ডাকবার—“ওরে তোমাদের গণতন্ত্র মিথ্যা আর ছিলনা। তোমরা এতদিন সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা বলে মিথ্যা বড়াই করেছ। কারণ, আমরাই সেই গরিষ্ঠ। আমরা শতকরা আশি—আমরা লক্ষ-হাজার-কোটি। তোমরা এতদিন গণ-তন্ত্রের নামে আমাদের ঘাড়ে বসে রক্ত শোষণ করেছ। তোমাদের দাঁতে আর নখে এখনো সেই রক্তচিহ্ন। কিন্তু আমরা পথে-মতে আজ এক। তাই আমরা সংহত, তাই দুর্বীর কার্য। বস্ত্র আর ঘামের পলি পড়ে সমাজ। সভ্যতার জন্ম হয়েছে, রক্ত আঁচ দিয়েই তাদের রাখতে হবে। তাই গোমাদের দন্ত-নখর গাটিয়ে নাও শরতান, নইলে ধূলিচূর্ণ হয়ে উড়ে যাবে।

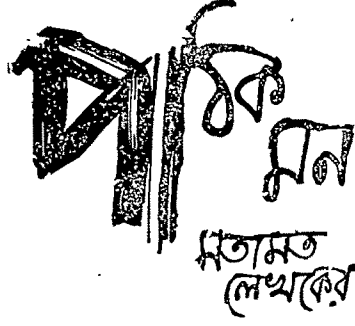
—গাখনদাল ঘোষ

সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

১৮ই জুন তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর ৫১শ সংখ্যার প্রকাশিত “সংগীত প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ” প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা নিবেদন করতে ইচ্ছা করি। লেখক ইন্দ্রনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের উদ্ভূত অবলম্বনে রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রসংগীতের ভাবমাধুর্য নিঃসন্দেহে সকল চিত্তকেই উদ্ভেলিত করে এক অনির্বচনীয় রসলোকে উত্তীর্ণ করে। কারণ এমন সহজ ভাষায়, এমন সুদল্লিত ভঙ্গীতে এত গভীর ভাবের প্রকাশ সারা পৃথিবীতেই, মনে হয়, খুবই দুলভ। কিন্তু আমার মনে হয়, সে কৃতিত্ব সুরকার রবীন্দ্রনাথের যতটা, গীতিকার রবীন্দ্রনাথের তার থেকে অনেক বেশি। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্টতার রবীন্দ্রসংগীত অতুলনীয়, কিন্তু সুরের একঘেয়েমির অভিযোগ থেকে খুব কম রবীন্দ্রসংগীতই অব্যাহতি পেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে বলেছেন, “কলা-কৌশলের কলা অংশটা থাকে গান-কর্তার ভাগে আর ওস্তাদের ভাগে কৌশলের অংশটা।.....ওস্তাদ মানুষ্টাই মাঝারি এবং মাঝারির প্রভুই জগতে সবচেয়ে বড় দুষ্টিনা।” আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ এখানে গীতিকার বা গান-কর্তার আসনে বসিয়েছেন তাঁর মত একজন লোকোত্তর প্রতিভাধরকে আর ওস্তাদের আসনে রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে। ওস্তাদ মানুষ্টা সকল সময়েই কিছু মাঝারি কিন্তু হয় না, আর গীতিকার মাঠেই প্রকটা হন না। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, শ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রমুখ কয়েকটি নামের পরে বাংলা দেশের আর ক’জন গীতিকারকে প্রক্টার পর্বাসে ফেলা যায়? কিন্তু বড় গোলাম আলির ঠুরি, ওস্তাদ আলি আকবরের সরোদ বা পিণ্ডিত রবিশঙ্করের সেতার অনবদ্য সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করার যোগ্য। উচ্চাঙ্গসংগীতে রাগ-রাগিণীর বাঁধা-বাঁধি আছে বলে সেখানে কোন কিছু সৃষ্টি করা যায় না, এ তথ্য আমার মনে হয় একটু একপেশে। মালকোষ রাগে কোন কোন স্বর লাগে তা অনেকেরই জানেন। শাস্ত্রীয় নিয়ম মেনেই সকলে মালকোষ গেয়ে থাকেন। তবু গোলাম আলির মালকোষ বা তারাপদ চক্রবর্তীর পুরিয়া বা গঙ্গুবাই হাঙ্গলের শুদ্ধ কল্যাণ আর সকলের থেকে পৃথক, যা সবার জানা বাঁধনের মধ্যেই এক অজানা রসলোকের সৃষ্টি করে।

তাহাড়া বর্তমানে যা দেখা যায়



তা হচ্ছে এই বাধ্যবাধকতাটা রবীন্দ্রসংগীতে যতটা প্রবল, উচ্চাঙ্গসংগীতে ততটা নয়। স্বরবিতানের স্বরালিপি সামান্য ইতরবিশেষ হলেই বিশেষজ্ঞরা হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে তাঁর স্বরালিপির কিছুটা হেরফের বা সরলীকরণ যে একেবারে হয় নি তা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুরের পরিবর্তন কখনও সহ্য করেন নি। জ্ঞান গোসাঁইয়ের মত শিল্পীকেও তিনি বিমুগ্ধ করেছেন। এ বিষয়ে দিলীপ-কুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর অনেক পরালোচনা হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, রবীন্দ্রনাথের “অল্প লইয়া থাকি তাই মোর” যেমন ভাব-মাধুর্যে অসাধারণ, তেমনি নজরুলের লেখা এবং জ্ঞান গোসাঁই-এর গাওয়া “শূন্য এ বুক পাখী মোর” সুর-মাধুর্যে অনবদ্য। কিন্তু এত বাধ্য-বাধকতা উচ্চাঙ্গসংগীতে নেই। রবীন্দ্রসংগীতে ছোট থেকে বড় গায়ক সকলে একইভাবে গাইতে বাধ্য, কিন্তু উচ্চাঙ্গসংগীতে তা নয়। বিভিন্ন শিল্পীর বৈশিষ্ট্য সেখানে চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়। দরবারী কানাড়ার রাগ-রূপ সকলেই জানেন। কিন্তু ওস্তাদ আমীর খাঁর হাতে যেটা হয় সৃষ্টি, সাধারণ শিল্পীর কাছে সেটা সুদল্লিত সংগীত হয় বটে, সৃষ্টি হয় না। স্বরালিপির সামান্য হেরফের সেখানে ধত্বের মধ্যেই নয়। দেশ রাগের গানে “পা নি সাঁ রাঁ”র স্থানে “মা পা নি সাঁ রাঁ” করলে গানের বিন্দুমাগ ও হানি হয় না বা সংগীতের সূত্রম কোর্টে কেউ মাগলা রুজু করেন না।

দ্বিতীয়ত, হিন্দুস্থানী সংগীতের সঙ্গে বাংলা গানের একটা বড় প্রভেদ এই যে, হিন্দুস্থানী সংগীতে সুরেরই প্রাধান্য, আর বাংলা গানে “সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন”। কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি সম্বন্ধে এ তথ্য সম্পূর্ণরূপে সত্য। কিন্তু বর্তমান বাংলা আধুনিক

গান রবীন্দ্রনাথ দেখে যাবার দুর্ভাগ্য লাভ করেন নি। করলে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা পরিবর্তিত হত। এতে বাণী তো নেই-ই, সুর যা আছে তাকে চীৎকার বলা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। বাংলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী তাঁর জনপ্রিয় হিন্দী গানের সুর অনুকরণে বাংলা গান রচনা করেছেন, “আহা ঐ আঁকা বাঁকা বে পথ” ইত্যাদি যে গানের পূর্বাপর সংগীত আবিষ্কার তাঁর নিজের পক্ষেও অসম্ভব। ব্যতিক্রম যারা ছিলেন এই উৎকট আধুনিক গানের রাজ্যেও, তাঁরা কেউ কেউ এদের বলে মেশার ব্যর্থ প্রয়াসের পরে হয় বিষণ্ণ অবসর নিয়েছেন অথবা নজরুলগীতি, শ্যামাসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ইত্যাদি প্রকৃত গানের মাঝে আশ্রয় নিয়েছেন। আর দিনের পর দিন ক্রমশ বেড়ে গেছে সংগীতের নামে উৎকট চীৎকার, লক্ষ-রূপ. উন্মত্ত যথেষ্টাচার। আর এই সব Record Sale-এর Record ক্রমশ আকাশ স্পর্শ করছে জনপ্রিয়তার। রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশকে শুদ্ধ নয়, সারা বিশ্বকে যা দিয়েছেন, তাতে তাঁর স্বপ্ন আমরা কোনদিনও পরিশোধ করতে পারব না। কিন্তু “বিশ্ববাঘার তালে তাল” রাখার জন্য তিনি বশ্বনদশা থেকে মৃষ্টি দিতে চেয়েছিলেন বাংলা গানকে। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভায় পুরাতন বিধিনিষেধ ভেঙে নতুন সৃষ্টির অমৃতলোক তিনি গঠন করলেন। কিন্তু তারপর আজ? আজকের অবস্থা দেখে মনে হয় এ বেড়া না ভাঙলেই বোধহয় ভাল হত। ঐ অসাধারণ প্রতিভা ছাড়া এ বেড়া কেউ ভাঙতে পারে না। আর প্রতিভার সঙ্গে যে প্রচলিত রীতি লঙ্ঘনের ইচ্ছা, তার সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সংঘম থাকে, সৃষ্টিকে যা কখনো বিপথগামী হতে দেয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ রীতি ভেঙেছেন, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কখনো বিপথগামী হয় নি। কিন্তু তাঁর পরের ক্ষমতাহীনরা উৎসাহের আতিশয্যে, আর্থিক লালসায় মানুষের রুচিবোধকে টেনে যেখানে নামিয়েছেন তাকে বলা যায় রুচিবিকার এবং নির্বোধ সেখানে সংগীতের রাজ্যে চলছে উন্মত্ত ব্যাভিচার। “পাওয়া-না-পাওয়ার বিরোধের ভিতর দিয়েই” এ সব অপসৃষ্টির আত্মপ্রকাশ, এ কথা বিশ্বাস্য নয়।

—ভূদেব গুপ্ত
ব্রিহত্তা (হুগলী)

দৃষ্টি পরিক্রমা

মুন্সিফ ম. মরকর

সচল জীবনে অবিরাম

।উত্তাপ।ঃ

‘গমাজের মতো সাহিত্যে বিতর্ক’ স্বাস্থ্যের লক্ষণ; ওতে আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে এ বয়ঃবর্ণনা। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও সেই এক কথা। সুতরাং, ঋতু আবর্তনে বৈশাখে যদি আদৌ প্রাকৃতিক কালবোশেখীর ঘনঘটা না-ই হয়, কিন্তু ২৫শে বৈশাখকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের আভিনায় ঝড় ওঠে, বৃষ্টি হতে হবে ওটা জীবনের লক্ষণ। ২৫শে বৈশাখে যিনিই ডাক দিলেন না কেন, কিছু রবীন্দ্র-প্রকাশকের হাঁক-ডাক শোনা যায় এবং দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সর্বজনীন পুজোর মধ্যে বিতর্কের বাজনও সাহিত্যের উপভোগ্যকে কিছু বাঁচিয়ে দেয়।

এ কেন হল, এমন অভিযোগ যারা তোলেন তাঁরা স্পষ্টতই লখীন্দ্রের লোহার গুরাদ থেকে বৌরয়ে আসতে ভয় পান। ভয় কি? জীব-বিজ্ঞানের শিক্ষাও এই যে, জলে অরণ্যে অগণিত অসংখ্য বিষধর জীব ও অতিকায় ম্যামথদের অস্তিত্ব করেই পিপড়ের মত মনুষ্যজীব সবার ওপরে সভ্য হয়ে উঠেছে। তেমনি যে-সমাজ ডাইনীত্বের আর শিলাতলে জড় হয়ে থাকতে চায় সে সমাজ ভাগ্যহীন। খৃস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধধর্মী দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের সৌভাগ্য যে, তারা ধর্ম নিয়ে, সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে বিতর্কের অবকাশে একদিকে অন্ধ যুগান্তে বীল দিয়েছে নতুন বাণী-বাহককে, আর একদিকে নববাণীকে আত্মস্থ করে এগিয়ে গেছে বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে। অথবা, প্রাথমিক কাপণ্য সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ঐদার্যে এদের সমন্বয় করেছে। নইলে মানুষ চাঁদে কোনকালে পদাংক করা দুরস্থান,

একটা গ্রামোফোনও তৈরী করতে পারত না, যন্ত্রবিজ্ঞান দুরস্থান ম্যালেরিয়া বিনাশের কারণ ও ঔষধীও আবিষ্কার করতে পারত না। যে-সম্প্রদায় বা ধর্ম বিতর্কে নারাজ, মানুষের অগ্রগতিতে তাদের কিছুমাত্র দান নেই, তাদের সে সামর্থ্যই রয়েছে আদিম গুহায় বন্দী। তাদের কাছে অনাগত মানবসমাজের কিছুমাত্র প্রত্যাশা নেই। তারা উপভোগ করে, সৃষ্টির আনন্দ জানে না।

রামায়ণ মহাভারত ইলিয়াড ওডিসিস কবেকার? কালজয়ী, কালাতীত, কালোত্তীর্ণ—না—আজকেরও? আজও, আজও এই চাঁদে-মাওয়া বিজ্ঞানের যুগেও মানুষ আনন্দ পায়—বিতর্ক তোলে। কিছুতেই এরা প্রাচীন জীর্ণ হয় না। স্বকম্বকে তর্কতর্কে। এবং বিতর্কই তাদের প্রাণপ্রবাহ। ওদের স্তুতি হয়েছে, পূজা হয়েছে, ভাব-সম্প্রসারণ, ভাব-চর্চা হয়েছে, আবার বিতর্কও হয়েছে। যার ভেতরেই মানবমনের কিছু মৌলিক কথা আছে তাই বার বার মানব-মনই আবার উল্টেপাল্টে ঘাচাই করে, তর্ক তোলে।

রামমোহন সেকালে জড় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ ঋজু হয়ে না দাঁড়ালে আমরা আজকের ১৯৭০-এর সমাজে আসতে পারতাম না। জ্ঞানবৃক্ষের ফল না খেলে আদম-ইভ আজও সবরকমে বিবস্ত্র নিঃসম্বল থেকে যেত। মনে আনন্দ-জাগে না যখন দেখি এই বিরাট পৃথিবীতে ছড়ানো বহু অরণ্যে পাহাড়ে প্রমত্ত হীন বন্য সভ্যতা ভ্রাতায় জড়িয়ে আছে। রামমোহন বৃক ফুলিয়ে না দাঁড়ালে অন্য বন্য-উপ বা-প্রজাতির হেড-হাণ্ডিংকে নিন্দা করতাম কি জোরে যদি জ্যান্ত বিধবা একটা মানুষকে আচারের ঐচ্ছিক দম্পত্যপ্রথা চালিয়েই যেতাম? তাকে সেন্টেসের মতো হ্যাঙ্গলক বিষ্ণু-করতাম হয় নি কেন না মানুষের

সৃষ্টির রথ-তখন অনেকটা এগিয়ে গেছে, কিন্তু নির্যাতন যন্ত্রণা কিছু কম হয় নি। আজও একমাত্র রাক্ষসেরাই টোলে টোলে মৃত সংস্কৃতির শিখা নাড়তেন ব্রাহ্মণের নির্বোধ শির-মালায় পা রেখে, যদি-না রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষাকে সর্বজনীন করার সংগ্রামে নামতেন। গঙ্গায় অগ্রমতী মায়েরা সন্তান নিক্ষেপে বিরত হতেন না।

এ সবই সম্ভব হয়েছে প্রচলিত সমাজ-বিধি এবং সর্বোপরি প্রশ্নাতীত বলে গণ্য শাস্ত্রের মন্ডনে, মূল্যায়নে, পুনর্মূল্যায়নে, তর্ক-বিতর্কে। আমাদের ষড়্‌দর্শনের ও অন্যান্য গ্রন্থেরও রচনার গভ এই তর্ক, বিতর্ক, পূর্ব-পক্ষ, উত্তরপক্ষ। গৌতম বুদ্ধ, চার্বাক মূর্খেরও আবির্ভাব ঐ একই গভ থেকে। বেদ-বেদান্তকে প্রশ্ন করে কীর সাধা? কিন্তু করেছিলেন তো বুদ্ধদেব ও চার্বাক? অথচ মানবসভ্যতায় কারোরই মৃত্যু হয় নি, কেউ বিলীন হয় নি। পরং, দেখা যায়, সেই একই বুদ্ধি, একই খন্ডন, একই বিচার পুনরাবৃত্তও হচ্ছে। জ্ঞান-বৃক্ষের এইটিই ফল; মানুষ বৃক্ষে নিতে চায়। সে কাঁটপাথর নিয়ে জন্মায়।

কাপালিকেরাও এককালে ছেয়ে গেছিল, এসেছিল তো বৈষ্ণবেরাও? বাংলা দেশের বৌদ্ধেরা ন্যাডোনিউর কেউনও তো করেছে? একেবারে চরমে গিয়ে হিন্দুর ছেলে খৃস্টান, মুসলমান হয়েছে অথবা আত্মহীনও করেছে? জ্ঞানবীর বোকাবার চেষ্টা মানুষের অশেষ। এজন্য ব্যাট-জীবনে যেমন সমাজজীবনেও তেমনি বারংবার প্রচলিত রীতির, প্রথার, শাস্ত্রের, গ্রন্থের নব-মূল্যায়ন হয়েছে।

আজকের মস্তানদের ছোরা-দেখানো চাঁদায় “শরবোয়ানিন” পুজোর জড় পুতুল প্রকৃত ভক্তমানদের যেভাবে দঃখভারে আড়াল করেছে, একদা নিঃপ্রাণ পৌত্তলিক-তার দৌরাণ্ডে বিক্ষুব্ধ সমাজকে তেমনি বাঁচালেন রামমোহন; ঐ ক্রিম আড়াল-সিরে

গাণ্ধ্যিক বস্তুমতী

বেদ উপনিষদকে বিমূর্ত্ত করলেন ব্রহ্মোপাসনায়া। আজকে যারা স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙে তৎপর হয়েছেন তারাও জড় পৌত্তলিক, তারা ইতিহাস বোঝে না বলেই স্বীকার করে না, স্বীকার করে না ক্রমাভিযুক্ত বা বিবর্তন বা বিপ্লব, ইভলিউশন বা রিভলিউশন, কোয়ান্টিটি থেকে কোয়ালিটির ক্রম-গল্লো দেবনাদায়ক; গভঃসম্মারের সঙ্গে সঙ্গে তাকে কেটে ছিঁড়ে বের করা যায় না। বাংলা দেশে তথা সারা ভারতবর্ষে, আমি বলব, মানবসমাজে রামমোহনের ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রাহ্মধর্ম শব্দকরের অর্থ তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসারই একটা ক্রম এবং আজকে ১৯৭০-এর বহু আলোকপ্রাপ্ত বঙ্গসমাজ বা ভারতসমাজের একটা ক্রম—কতকগুলো ভুলের বিশুদ্ধ মাল্য। নয়, অব্যাহত প্রাণ-প্রবাহের এক-একটা পথায়। আজই এই মূহুর্ত্তে রাষ্ট্র শূন্যকরে গেল না বলে যারা কপাল চাপড়ায় তারা নৈরাজ্যবাদী এনাকিস্ট; কয়েকটা বোমা মারলেই বা পিস্তল তুললেই প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায় না। গুণ্ডার জীবনও শান্ত নয়, তার আন্তিমও সঙ্কর নয়।

কিন্তু মূল্যায়ন, আরার মূল্যায়ন, আরারও মূল্যায়ন, মানুস ও সমাজের সজ্জল উজ্জ্বল প্রাণী জীবনের লক্ষণ। বেদ, বেদান্ত বা উপনিষদের কত ব্যাখ্যা হয়েছে তার অন্ত নেই। গীতার কত ভাষ্য হয়েছে কে তার ঠিকানা রাখবে? পুরাণে মন্দির আকারে তারা কতভাবে প্রবাহিত হয়েছে কে তার তালিকা করছে? রামায়ণ, মহাভারত, কতবার কতরকমে কত কথকতায়, যাত্রায়, নাটকে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, মনু, কৌটিল্য, চাণক্য নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, সমালোচনা হয়েছে।

মার্জবাদী; মাওবাদীরা যতই আশ্ফালন করুন এবং সফ্রেটিস-গ্যালিলিও নিধনের যত বম্বাজিই করুন, বিরাট-বিপুল জনসাধারণের অতি গভীরে রামায়ণ, মহাভারত, গীতা দৃঢ়মূল ছাড়িয়ে আছে। হানাহানি ও জ্বরদগ্ধিত গেলানর দৃষ্টিপ্রবৃত্তি মত্তেও এইসব গ্রন্থের বিক্রি ও প্রচার নাগাল পায় না এইসব আলোকপ্রাপ্ত প্রগতিবাদী নতুন পৌত্তলিকেরা।

অর্থাৎ, মূল্যায়ন, নব মূল্যায়ন, অপ-মূল্যায়ন যতই হোক যার যার মাহাত্ম্য ঠিকই আছে, থাকে এবং মানুস বর্তমান প্রাগৈতিহাসিক অসভ্যকাল উত্তীর্ণ হলে তাদের সমাদর আরও বাড়বে—একমাত্র এই কারণে যে, বর্তমান মানুস আন্তরিকভাবে অতীত-মুখী, অতীতেই তার বর্তমান পরিচয়। তাকে ফিরে ফিরে দেখতেই হবে, সে কে, কোথা থেকে এই চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে পা ফেলল; কিন্তু স্পেস-পারিক্রমার মূল চানটা থাকবে এই মাটির পৃথিবীতেই।

শুনছি, আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত সব চাইতে অগ্রসর সমাজবাদী সোভিয়েট রাশিয়ায়ও অনুদত, সমাদৃত। চীনে আজ শেন্সুপীয়ার দাহ্য হলেও ভবিষ্যৎ স্থিতিতকালে পুনর্বাসন হবে, বৌদ্ধ কনফুসিয়াস চিন্তাধারারও পুন-মূল্যায়ন হবে বারে বারে। সভ্যতার প্রগতি এই নিয়মচক্রেই এগিয়ে যায়।

রামায়ণে কি আছে যে তা মহাকাব্য হল? সত্যরক্ষা, পিতৃসত্য রক্ষায় রাজ-সিংহাসনের প্রলোভন ছেড়ে বনবাস, বনবাসে চরম দ্বৈত ঘটল সীতাহরণে, সূত্রীবেদ সঙ্গে সখ্য, তারপর স্বর্ণলঙ্কা জয়। তারপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ। আর কি আছে? সহোদর লক্ষ্মণ ও কাব্য-উপেক্ষিতা উর্মিলী। সহোদর ভারতের জ্যেষ্ঠের পাদুকা রক্ষা করে রাজ্যশাসন ইত্যাদি। মহাভারতে কি আছে? দ্রাক্ষ-মারায়াক কুরুক্ষেত্র, তারপর সমূহ সর্বনাশের সম্মানে প্যা ফেলে ফেলে মহাপ্রস্থান যাত্রা। আর কি আছে? —আছে যারা সংখ্যালঘু তাদের পক্ষে যদি ধর্ম থাকে, কৃষ্ণ সার্থী বা বোগ্য নেতৃত্ব থাকে তো অক্ষৌহিণী সৈন্য পরাস্ত হয়, ধর্মের জয় হয়। কৃষ্ণের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মুখে হো হো করে হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু সে-হাসির আয়ত ও কৃষ্ণের ধোঁয়ার মতই ক্ষণস্থায়ী। কতকগুলো এমন মৌলিক সত্য বা মানবিক বা সামাজিক নম্পকের চিরন্তন খিত্তিয়ে যে থাকে সর্বকিছু ধোঁয়া-ধূলি হয়ে যাবার তলায় সংশয়ী তা কানাচোখে দেখতেও পায় না।

তবু সংশয়ী, নাস্তিক, নব নব ভাষ্যকারেরা সাহিত্যসমাজের অপরিহার্য কল্যাণেরই উৎপাত। গাণ্ধ্যিক রামায়ণ, রামচরিতমানস, কৃষ্ণবাসী রামায়ণ থেকে সোজা বাঁদ আমরা বিদ্রোহী খৃষ্টানধর্মী মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ বধ মহাকাব্যে আস। সেখানে পাই মানব-সভ্যতার সাহিত্য-সমৃদ্ধিরই উপকরণ, অগ্রাহ্য করবার অনাদর করবার তো নয়। পয়রের মল না বাজিয়ে আমরাক্ষর ছন্দের বাজনা মাত্রও নয়। কেন প্রশ্ন হবে না স্বর্ণলঙ্কার মর্ম কথা সম্পর্কে ও—দ্রুত ধ্বংসের আর একটা দিক? অশোক কাননে বিন্দিনী সীতা নিঃসন্দেহে করুণার পাঠী। কিন্তু লঙ্কাধিপতি দশবাহু রাবণের সংযমও তো অনুপেক্ষণীয় নয়? এবং—সর্বোপরি আক্রান্ত লঙ্কার অধিবাসীদের দেশপ্রেম, সৌখ্য, বীরবাহু—গ্রন্থা করবে না মানুস? স্বীকার করবে না মেঘনাদের অতুলনীয় বীরত্ব? বিভীষণ, কুইসালি, রক্ষ-চর, চীনাচর, সাম্রাজ্যবাদী সখা খাল কেটে কুমীর আনলে সে-ই থাকবে চিরসত্য হয়ে? মেঘনাদ বধ-এ রামায়ণ ক্ষুদ্র

হয়েছে একথা যারা বলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমি মনে করি, রামায়ণ তারই মাহাত্ম্য সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখান থেকে তাকে অপসারণ করে এমন সাধ্য কারও নেই; কিন্তু 'মেঘনাদ বধ' তার স্বকীয়তার প্রোজ্জ্বল, সেখানেও অনস্বীকার্য চিরন্তন মাহাত্ম্য আমাদের মর্ম স্পর্শ করে। রামচন্দ্রের লঙ্কা জয়ে মধুসূদন রামায়ণের রেখায় রেখা টানলেন না, কনফর্ম করলেন না, এইটি ঠিক কথা? —না, তাঁর শিল্পকর্মে মেঘনাদের মত একটি নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, বিভীষণের মত একটি দেশদ্রোহী এবং অপসহীন সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে অকুণ্ঠ পদচারী রাবণের চরিত্র কোন ছোট কথা?

নির্বোধ শিখা-নাড়া দলে ভিড় বাড়ালে বিদ্যাসাগর মহন্ত হতেন, না, শাস্ত্রসমুদ্রের নব-মন্থনে সত্য মানবিক শাস্ত্র-রসোন্ধারে তিনি ছোট হয়েছেন? আজকের প্রগতিবাদীদের কাছে বাল-বিধবার করুণ আত-নাদ বা বহু-বিবাহের যন্ত্রণা তুচ্ছ বা সামান্য, হয়তো বা প্রতিদ্বন্দ্বীশীল—কেন না, একেবারে আদিয়ালের হেড হাণ্ডারদের মতো এইসব গ্রন্থ, গুণ্ডাকর, রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ চিন্তানায়কের আলোখা ভাঙার খেলায় মেতেছে তারা, নতুন এক দেবতাকে, দেবতার চিত্রপটে প্রতিষ্ঠিত করবে বলে। এইসব কালাপাহাড় এক সম্প্রদায়ের বিগ্রহমন্দির ভেঙে আর এক সম্প্রদায়ের প্রার্থনাভবন গড়ছে এবং অজান্তেই তাদের নবমন্দিরে ও চিত্রে নতুন দেবতার আসন প্রতিষ্ঠা করছে। করুক। কিন্তু এই অবচীন কৃতঘোরা জানে না যে, আজকে তাদের পায়ের নিচে লাফাবার যে মাটি, যে ভিত,



সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তা বিদ্যাসাগরের মতো প্রতিক্রিয়াশীলরাই তাঁর করেছেন; নতুবা এখনও তাদের সেকালের আবশ্য জলাশয়ে হাবুডুবু খেতে হ'ত। বিদ্যাসাগর তাঁর জীবদ্দশায়ই এত অপরিমেয় যন্ত্রণা সহ্য করেছেন যে, আলেখ্য-ভণ্ডের খবর যদি তাঁর কানে পৌঁছনো যেত, হাসতেন। হয়তো বা যে-হৃদয়বত্তা বিদ্রোহী মধুসূদনকে মায়ের মত রক্ষা করেছে, তা এদেরও অনায়াসে ক্ষমা করত। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বিতর্ক নেকালেও বিদ্যাসাগরকে খাটো করতে পারে নি, একালেও পারবে না; বিদ্যাসাগর যে বিতর্কের একটি বিষয়, এইখানেই তাঁর অম্লান মাহাত্ম্য।

সমাজে ও সাহিত্যে কালাপানি পারা-পারের পাপমস্ত হয়েছি আমরা অনেক-কাল; ঘরে এনেছি বিদেশী বহু; অস্পৃশ্যতাকে শূদ্ধ নোংরামীর মধ্যে রেক্ষেপ, মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। সাগর পার হলে বা জেলে গেলে প্রায়শ্চিত্তের প্রকাণ্ড কান্ড এখন বরং অগৌরবেরই। আজকের সামাজিক মানুষ বা সাহিত্যিক হয়তো জ্ঞানেনও না কখন কোন বিতর্ক, বিন্দুপ, লাঞ্চার মধ্য দিয়ে এ সত্য হয়ে উঠেছে।

সদুত্তরং, বঙ্গমচন্দ্রকে নিয়ে যদি বিতর্ক হয়ে থাকে এবং আজও হয়, তবে বুঝতে হবে বঙ্গমচন্দ্রের ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের ও শিল্পকর্মে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন তোলা আছে, যা বুঝে নেবার জন্য লোকের আগ্রহের সীমা নেই। বন্দে-মাতরম/আনন্দমঠ লেখা সত্ত্বেও তিনি কতখানি ভারতীয় স্বাধীনতার জন্য উৎকর্ষিত ছিলেন, সে তাঁর ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের কথা; তাঁর সাহিত্য, শিল্পকর্ম তাতে কুণ্ঠিত হয় না। যদি প্রশ্ন ওঠে, তাঁর দৃষ্টোপলব্ধি নীতি আইড্যান হোর প্রতিদ্বন্দ্বি, তৎকাল তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির ওপর দৃষ্টি-পাত অনিব্যাহিত হয়ে ওঠে।

একটা কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, আমি কখনো তাঁদের দলে নই, যাঁরা ব্যক্তিকে শিল্পকর্ম অথবা শিল্পকর্মকে আলাদা করে দেখেন। শিল্পকর্ম ব্যক্তিকে জড়িয়েই যেমন সমগ্রভাবে বুঝতে হবে, ব্যক্তিকেও তেমনি তাঁর কর্মক্ৰিয়া, এক্ষেত্রে, সাহিত্য-শিল্পকর্ম দিয়ে বুঝতে হবে। এ দুটি মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তা, একটা ছাড়িয়ে বা বাদ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করার অর্থ খণ্ড করে বোঝা, অসম্পূর্ণ করে বোঝা, অথবা ওটা মোটে বোঝাই নয়।

আরও একটি কথা। কে বুঝবে, কোথা থেকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝবে এটিও একটি বোঝাবুঝির ভিত্তি-গত কথা। ম্যাথু আর্নল্ড যেখানে বল-ছেন—পার্সোনাল এস্টিমেট, হিস্টরিকাল

এস্টিমেট ও রিয়াল এস্টিমেট, সেখানে আমি একমত নই। অথবা আমি জিনিসটা এভাবে বুঝি:

এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে বুঝবেন; ধরে নিচ্ছি, ব্যক্তির শিল্পকর্ম বা কীর্তিকেও বুঝবেন। যে ব্যক্তি বুঝবেন, তাঁর জ্ঞান ও উপলব্ধিশক্তি প্রথম কথা; যাকে বুঝতে যাবেন, তাঁর ওপর বিচারকের বিচারশক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি আলোকপাত করে। অর্থাৎ, তিনি তাঁর ছাঁচেই তাঁর নায়ককে বুঝবেন, বোঝাবেন। এ সোজা কথা নয়। যাকে বুঝতে হবে, তাঁর সমপর্যায় শূদ্ধ নয়, আরও একটু ওপরে ওঠা চাই, সাধারণ চোখ নয়, এক্স-রে চোখ চাই। সদুত্তরং, ব্যক্তিকে ব্যক্তির বোঝাবুঝি যিনি বুঝতে যাচ্ছেন, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও পরিবেশটাই প্রথম কথা, সেটিই ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ। বিজ্ঞানও এই কথা বলে। ফলে অবস্থিতি অনুসারে দৃষ্টিকোণ স্থির হয়। একই হলের মাঝখানে একখানি চেয়ার চারদিক থেকেই সব লোকে এক দৃষ্টিকোণ (angle of vision) থেকে দেখতে পারে না। রিপোর্টারদের মধ্যেও দেখা যায়, একই ঘটনা সবাই এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে না। একইভাবে লেখে না। একই এমফ্যাসিস দেয় না। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের এস্টিমেট একান্তভাবে যিনি করবেন, তাঁর নিজস্ব জীবনের এস্টিমেটটা অনুপেক্ষণীয় নয়; কেন না, তারই ওপর নির্ভর করবে ব্যক্তিগত এস্টিমেট। আমার এটি ব্যক্তিগত অভিমত এবং রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিটি এই—একথা বলা বড় সোজা নয়। আমার জীবনের যেমন অভিব্যক্তি, এমন কি ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্তন আছে, যে ব্যক্তির এস্টিমেট করতে যাচ্ছি, তাঁরও অভিব্যক্তি, ক্রমাভিব্যক্তি বা বিবর্তন আছে। পার্সোনাল এস্টিমেটের ভিত্তি হবে তাই।

দ্বিতীয়ত, হিস্টরিকাল এস্টিমেট ও রিয়াল এস্টিমেটের মধ্যে পার্থক্যটা কি? হিস্টরিকাল এস্টিমেটটাই রিয়াল এবং রিয়াল এস্টিমেটটাই হিস্টরিকাল। অর্থাৎ, এ বোঝাবুঝিটা হচ্ছে, বিনয় সরকারের ভাষায়, এ সমঝোতা হচ্ছে, যথাযথ পট-ভূমিকায়, ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কনটেক্সটে। বঙ্গমচন্দ্র সাহিত্যসম্রাট এবং বঙ্গদর্শন প্রসাদে সাংবাদিক হয়েও, তৎকালীন শাসক-শ্রেণীর সুরে সুর মিলিয়ে যদি বলে থাকেন, দেশে অসন্তোষ সৃষ্টির জন্য সংবাদপত্র বহুলাংশে দায়ী, তবে তা ঐ তৎকালিক পটভূমিকায় দেখতে হবে। আমি এই কালের দুরূহে দাঁড়িয়ে যদি তাঁর সে আচরণের নিন্দা করি (সেকালেও অমৃতবাজার পত্রিকা করেছিলেন) তবে বঙ্গমচন্দ্র সম্পর্কে সেইটেই শেষ কথা হবে না। ওটা বঙ্গমজীবন অভিব্যক্তির একটা দিক, একটা ক্ষণ, একটা কাল,

একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা।

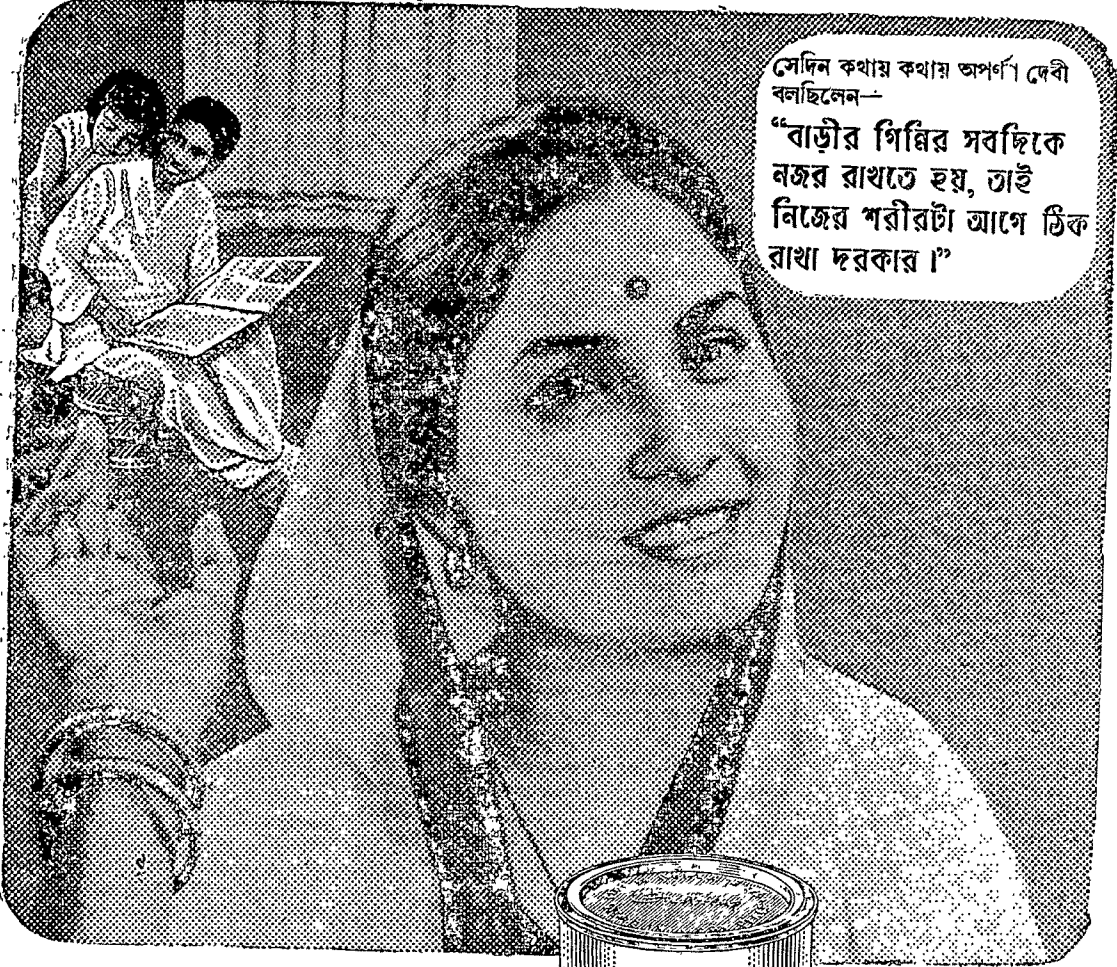
আর যদি যথাযথ হিস্টরিকাল পট-ভূমিকায় কাউকে, কারও শিল্পকর্মকে, কীর্তিকে, কর্মকাণ্ডকে বিচার করা যায় বা হয়, তবে তাই তো হবে রিয়াল বা আমাদের ব্রহ্মবাদীদের ভাষায় সং, আর সবই অসং বা অবিদ্যা বা আভাসিত মাত্র, প্লেটোর ছায়া মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞানও তাই বলে, বলে—যা তোমার দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত, আভাসিত, তা আসল বস্তু নয়, আসল বস্তু এদের আড়ালে—সেই চম্পল অগ্নি-পরমাণু। হিস্টরিকাল সত্যে পৌঁছনো অর্থই সেই রিয়াল সত্য, রিয়াল এস্টিমেটে পৌঁছনো। সমালোচকের এই গুরু-দায়িত্ব; এহ বাহা এই বাহা করতে করতে গভীরে, আরও গভীরে যেতে হবে।

রাম-শ্যাম-যদু-মধুকে নিয়েও বিতর্ক ওঠে, রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। সাহিত্যেও তার রঙ পড়ে। কিন্তু সেই শিল্পকর্মে যখন রাষ্ট্র-যন্ত্রের জ্বরদস্তি চলে তখনই ইলিয়া এলেনবুর্গের মতো কনফর্মিস্টকেও বিদ্রোহ করতে হয়।

এস্টিমেটের ক্ষেত্র থাকবে অবাধ, নিরঙ্কুশ। সেখানে ব্যক্তি আসে, ইতিহাস আসে, সত্য আসে। এ তিনের যেখানে সমন্বয় হয় না, প্রায়ই হয় না, তখনই তো বিতর্ক বাধে। আজ চার শ বছর ধরেও যদি শেক্সপীয়ারকে নিয়ে নানা বিতর্ক চলে থাকে, তাহলে রবীন্দ্রনাথ তো মাত্র ১০৯ বছরের শিশু। আতত ৬০।৬৫ বছর একনাগাড়ে বিস্তর লিখে গেছেন—কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ। বিস্তর। তাদের মূল্যায়ন শেষ হয়ে গেছে?

চেষ্টা চলেছে তাঁকে তাঁর কোন একটি কবিতা বা কোন একটি লেখা নিয়ে বোঝবার। হাস্যকর। যদি আগাগোড়া সকল লেখায় একটা সূত্র থাকে, তা যেমন বিস্ময়কর, যদি না থাকে তাও বিস্ময়কর। কিন্তু সত্য, রিয়াল, হিস্টরিকাল এবং পার্সোনাল এস্টিমেট, এই দুই সামঞ্জস্য-অসামঞ্জস্য, দুইয়ের বৈপরীত্য নিয়েই, একটিকে নিয়ে নয়।

এই সদৃশ্য ভূমিকার অবতারণা সেই বিদগ্ধ ব্যক্তিগোষ্ঠীদের বুঝে নেবার জন্য যাঁরা পরোক্ষে বলতে চাইছেন, আর তো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অবিরাম ধ্যানধ্যানানী ভাল লাগে না, ভালো লাগছে না লোকের; ও'র সম্বন্ধে কি শেষ কথা আজও হয় নি? বিরক্ত ব্যক্তিদের অনেকে এইটুকু বলা যায় যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যদি কাউকে শূদ্ধ লিচুইড দ্রবের ডায়েট দেওয়া হয় এবং দিনের পর দিন চলে, শরীরে অপারগ হলেও সজ্ঞান রোগীর চিন্তাও বিদ্রোহ করে ওঠে, সস্থ শরীরেও প্রতিদিন এক চেনা, দেখলে মন বিরূপ



সেদিন কথায় কথায় অপর্ণা দেবী
বলছিলেন—
“বাড়ীর গিন্নির সবদিকে
বজর রাখতে হয়, তাই
নিজের শরীরটা আগে ঠিক
রাখা দরকার।”



Benson's 144

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। স্বাভাবিক পরিমাণে কোকো,
চুপ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি ভৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—
প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি
একল' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ
ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

“এই দুর্দৈবে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি ! ডাইবে
আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক কাটছাঁট করতে হয়।
আর এর পুরো ব্যক্তিটাই মেরেরা নিয়ে নেন নিজেদের
ওপর—হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে
ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে
ডালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও
বোর্নভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ
আরামের লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও
সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।”

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

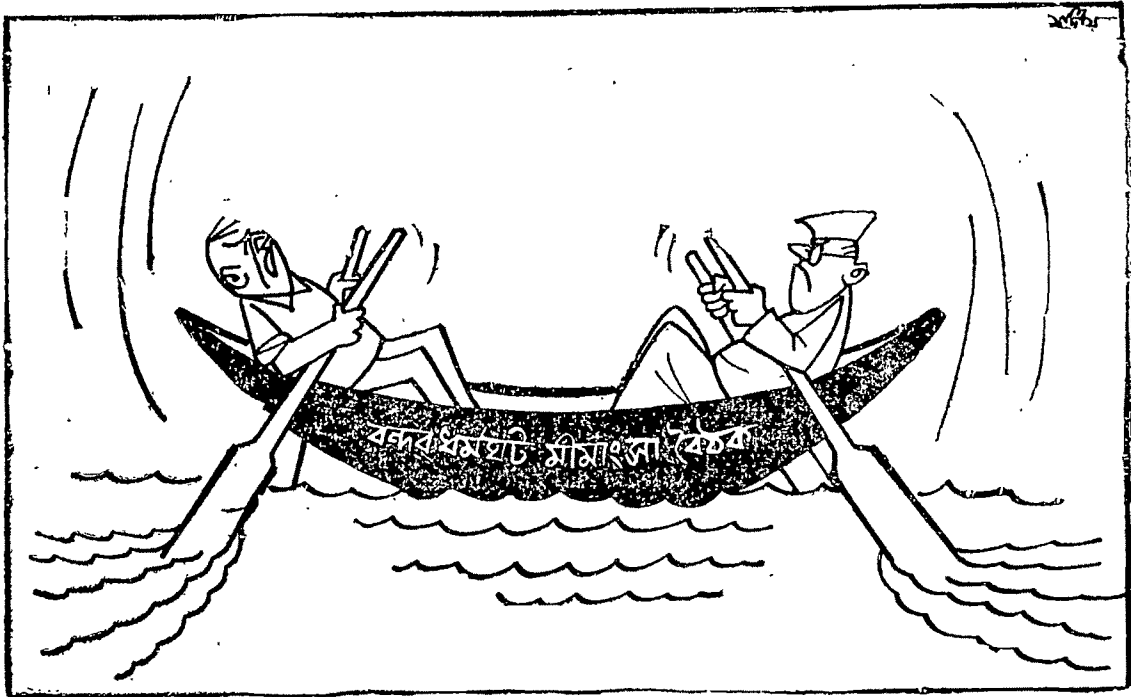
হতে পারে, তেমনি যদি সারাক্ষণ রবীন্দ্র-সঙ্গীতই শব্দ শুনতে হয়, তবে অতি ভয়ের 'অনীহা' আসতে পারে। কিন্তু সে ঐক রবীন্দ্রনাথের, না, পরিবেশকের দোষ? বাংলা-সাহিত্য দরিদ্র নয়, রবীন্দ্র-নাথও একক নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা, ব্যাপ্তি অন্য কোন মনে অসুয়ার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু যা সত্য, তা অনস্বীকার্য এবং বলোঁছি, ব্যক্তিগত বুদ্ধি-মেধার ওপর যখন বোঝাবুঝি নির্ভর করছে, তখন বিতর্কের অবকাশ থেকেই যাবে। আরও একটা সোজা কথা এই যে, সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য না পড়ে, রবীন্দ্র-জীবনী না জেনে এবং রবীন্দ্রকালকে না উপলব্ধি করে যারা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তোলেন, তাঁদের যারা আমল দেন, তাঁরাও সমবোধসম্পন্ন। দ্বিতীয়ত, এইসব তাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, একমাত্র তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কেই যে অসংখ্য বই বেরিয়েছে, তার খোঁজও হয়তো রাখেন না, রাখলে হয়তো তাঁদের এই নবতর আয়াস বা প্রয়াস অকারণ পুনরাবৃত্তি অব্যাহতর বা পণ্ডিতম মনে হতে পারত। রবীন্দ্রনাথ চিত্রও আঁকতেন। কেউ কেউ তা নিয়ে কিছু কট্ট মন্তব্যও করেছেন, সেটা তাঁর অভিরূচি: আমিও তাঁর বহু চিত্র উপলব্ধি করতে পারি নি। কিন্তু এ বুদ্ধি, এও রবীন্দ্রনাথের একটা দিক, যা

আমার বোধগম্য না হলেও আর কারও সহজবোধ্য হয়েছে। আমার বোধেরও একটা সীমা আছে। কিন্তু তাই বলে আমার এই অবোধ মনের মানদণ্ডে যদি রবীন্দ্র-নাথকে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্মকে, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনকে বিচার করতে বাস, সে কি সুবিচার হবে, না, আমারই অজ্ঞতা প্রকট হবে?

সম্প্রতি দেখছি, রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা উপলক্ষ করে অনেক ধূলিবাদী উৎসাহিত হয়েছে। 'গগনে গরজ মেঘ ঘন বরষা, কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা' কবিতাটি নিয়েও এককালে এত ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য ঘটেছিল, শেষে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথকেও বিতর্কের প্রাঙ্গণে নেমে স্বাস্থ্য-বাচন উচ্চারণ করতে হয়েছিল। এমনি হয়েছে তাঁর আরও অনেক কবিতা, অনেক উক্তি নিয়ে, অনেক গল্প, উপন্যাস নিয়ে। মাঝে মাঝে কবিকেও নেমে আসতে হয়েছে সেই তর্কের আসরে। আমি অবশ্য সে দলের ভক্ত নই, যারা তাঁর ব্যাখ্যাকেই শেষ চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বলে মেনে নেন; মানলে, আমরা সেই হিস্টরিকাল রিয়াল এস্টিমেটের সূত্রগুলো ধূলিয়ে ফেলব। রবীন্দ্র-নাথ নিঃসন্দেহে সচেতন লেখক, কিন্তু যেভাবে তার পরিবেশ তাঁকে তৈরি করেছে, সেইভাবে সচেতন, তাঁর চেতনার বাইরেও যে বহু জগৎ রয়েছে, তার প্রভাব তাঁর

সৃষ্টিকর্মে কিভাবে এসে পড়েছে তা তাঁর জানবার কথা নয়। তার আবিষ্কার হবে সমালোচক। একমাত্র তিনিই পাসে'নাল, হিস্টরিকাল, রিয়ালকে অখণ্ড করে দেখাতে পারবেন। প্রগটা যেখানে সাবজেকটিভ, সমালোচকও সেখানে সাবজেকটিভ, কিন্তু তারও কিছু অতিরিক্ত—অবজেকটিভ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বিতর্ক তাঁর জীবদ্দশায় হয়েছে, কখনো খোঁশ হয়েছে, কখনো বিরক্ত হয়েছে, জবাব দিয়েছেন নানাভাবে, তীক্ষ্ণ শ্লেষেও। আজ সেই ব্যক্তির শারীরিক অবস্থিতি নেই, তাঁর সৃষ্টিকর্ম রয়েছে। আজ প্রায় বছর দশেক তিনি নেই। কিন্তু শতবর্ষ পরেও তাঁর পাঠক আছে। এককালে যারা তাঁকে বুদ্ধিজীয়া বলে বর্জনের আন্দোলন করেছিলেন এবং একটি প্রদীপকে সমসূর্য করেছিলেন, তাঁদের অতিক্রম করেও তাঁর পাঠক অগণিত। বিরক্তিরে যারা প্রশ্ন করতে সাহস পান, তাঁদের 'নৈতি' 'নৈতি'র মধ্যেই তিনি সমগ্রতায় পরিষ্ফুট হয়ে উঠবেন। যে বিতর্কের ধূলিবাদী এখন চলছে, তা খিতিয়ে গেলে তাঁদের বক্তব্যের পরিধি মেপে দেখতে চেষ্টা করব। শব্দ বলি, একটিমাত্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে পরিমাপের অর্থ গোপদে জলে সূর্যকে পরিমাপ করা।

অচলাবস্থা—



উদ্ভাস্তু আহিমন প্রসঙ্গে



সাগর কিশ্বাস

দেশ বিভাগের সংগে সংগে বাংলা দেশ এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে যে চিরন্তন ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিলো, সেই ক্ষতস্থান থেকে আজও সমানে রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে। সেদিন বিজাতিকৃত্বের প্রবক্তরা এবং ভারতের রাজনৈতিক নৈত্বব্দ একটি জাতির জীবন কলমে একটি আঘাতে বিপর্যিত করে যে পাপ করেছিলেন, বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের রক্তে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় নি। পূর্ব বাংলা থেকে ১৯৫০ সালের সেই ঐতিহাসিক উদ্ভাস্তু আগমনের পর উদ্ভাস্তু আগমনের স্রোতে যে সামান্য ভাঁটা পড়েছিল, ১৯৬৪ সালে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার পর তার গতি কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভাস্তু আগমনে নতুন জোয়ার এসেছিলো। তারপর পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে সীমান্ত বন্ধ করে দেবার ফলে মানুষের এপার-ওপার হওয়া একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেলো। সীমান্তে তখন আয়ত্ব খানের সেনাবাহিনী বন্দুক উচিয়ে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু পথ রোধ করা যায় নি। আইনের কড়া অনুশাসন আর বন্দুকের উদ্ভাস্তু লৌহ-নালিকা অগ্রাহ্য করে শত শত মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে।

সম্প্রতি পূর্ব বাংলা থেকে নব-পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভাস্তু আগমন শুরু হয়েছে। ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে এ পর্যন্ত লক্ষাধিক উদ্ভাস্তু পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে উঠেছে। এ যাবৎ আমরা দেখেছি, যখনই পূর্ববঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ফলে ওখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার অভাব বোধ হয়েছে, তখনই সীমান্তে উদ্ভাস্তুর চাপ এসে পড়েছে। কিন্তু ১৯৭০ সালে পূর্ববঙ্গে কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হয় নি। সংবাদে দেখা যাচ্ছে এখনও প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিনশত উদ্ভাস্তু পরিবার সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এ পর্যন্ত সত্তর হাজার উদ্ভাস্তুকে

বিভিন্ন ট্রানজিট ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে। চল্লিশ হাজারের মত মানুষ এখনও হাসানাবাদ-বাসিরহাট সীমান্ত এলাকায় আশ্রয়-খড়-জল মাথায় করে সবাশয় ভারত সরকারের বদান্যতার আশায় প্রহর গুণতে। এই প্রহর গুণতে গুণতে, বলা বাহুল্য, অনেকেরই জীবনের শেষ প্রহর সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, পাশ্চাত্যজন উদ্ভাস্তু ইতিমধ্যে কলারায় মারা গেছে (হায়, ওরা বাঁচতে এসেছিল!)। হাসানাবাদ থেকে যখন এদের রেলগাড়িতে তুলে দেওয়া হয় এবং বারাসাত জংশনে যখন সেই গাড়ি থেকে নেমে ওরা প্লটফর্মে ছিড়িয়ে পড়ে তখনকার দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝা যায় না—উদ্ভাস্তু জীবন কি। আমি নিজে এ দৃশ্য অনেক দেখেছি। সম্প্রতি এদের মধ্যে অনেকটা সময়ও ব্যয় করেছি ঘুরে ঘুরে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আদ্য কোন হাঙ্গামা না হওয়া সত্ত্বেও এই উদ্ভাস্তু স্রোত কেন?

একটা কথা আমরা সকলেই জানি যে, স্বাধীনতার পরে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পাকিস্তানে উপযুক্ত নাগরিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু একটা কথা সকলে জানি না যে, ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট মধ্যরায়ে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলী জিন্না একটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করেছিলেন, “আপনারা আজ স্বাধীন। মন্দির, মসজিদ এবং পাকিস্তানের যে-কোন উপাসনার স্থানে যাবার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনাদের আছে। আপনারা যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত, যে-কোন ধর্মাবলম্বী হোন না কেন, তাতে আমরা যে পাকিস্তানের নাগরিক এই মূল নীতির কোন ব্যত্যয় ঘটবে না। আমার মনে হয় এবং আপনারাও দেখবেন একদিন আমাদের এই নবলব্ধ রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না। সেটা অবশ্যই ধর্মীয় দিক থেকে নয়, কারণ ধর্ম হলো মানুষের বর্ত্তগত বিশ্বাসের ব্যাপার।

সেটা সম্ভব হবে রাজনৈতিক দৃষ্টি-কোণ থেকে; আমরা প্রত্যেকেই পাকিস্তানী।” অপরদিকে ভারতের কংগ্রেস সরকার সেই সময় এক বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের উচ্চপদস্থ অফিসার-বের চাকুরী স্থানান্তর করার জন্য Option চেয়েছেন। এর ফলে বহু উচ্চপদস্থ অফিসার বিশেষত ইন্ডিয়ান ফ্রাণ্টয়ার রাইফেলসের সকল বিভাগের সমস্ত হিন্দু অফিসার পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে চলে এলেন। পূর্ব বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ঘটনা দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো এবং তারা নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে লাগলেন। শুরু হলো উদ্ভাস্তু আগমন। কিন্তু এহা বাহ্য। ১৯৪৮ সালে মহম্মদ আলী জিন্নার মৃত্যুর পর পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা যাবের হাতে এসে পড়লো তাঁরা জিন্নার দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হলেন এবং ধীরে ধীরে মোরাতন্ত্রের হাতে মর্টগেজড হয়ে গেলেন। ফলে পাকিস্তানের প্রতিজ্ঞাশীল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বার বার তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা বিঘাত করেছে। এবং একদিন পাকিস্তানী নেতারা পাকিস্তানকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করেছেন। জানি না মহম্মদ আলী জিন্নার কবরের মাটি সেদিন আচমকা কেপে উঠেছিল কিনা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, “রাজনৈতিক সীমান্ত সৃষ্টির ফলে আমাদের যেসব ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংগে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে এবং যাঁরা বর্তমানে এই নবলব্ধ স্বাধীনতার অংশীদার হতে পারছেন না তাঁদের কথা আমরা চিন্তা করছি। তাঁরা আমাদেরই আপনজন এবং যা কিছুই ঘটুক না কেন তাঁরা আমাদের আপনজন থাকবেন এবং আমরা তাঁদের সুখ-দুঃখের সমভাগী থাকবো।”

গণতান্ত্রিক বসন্ত

ওই বছরেই ১০ই জুন তারিখে গান্ধীজী বললেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি যদি সে দেশের সরকার বৈশেষিকের মত ব্যবহার করেন তবে তাঁদের পক্ষে সেখানে বাস করা সম্ভব নয়। "ভারতীয় ইউনিয়নের প্রদেশ-সমূহে এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীকে সাদরে আশ্রয় দেওয়া ও সর্বপ্রকার ন্যায়সংগত সুবিধা দেওয়া অবশ্য কতব্য। তাঁরা যেন অনুভব করেন যে, তাঁরা কোন অপরিচিত দেশে আসেন নি।"

গান্ধীজী এ পর্যন্ত বলেছিলেন, যে সকল হিন্দু পাকিস্তানে তাঁদের সম্পত্তি ফেলে রেখে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হবেন, স্বাধীন ভারত সরকার তাঁদের সেই সম্পত্তির পূর্ণ মূল্য তাঁদের দান করবে।

১৯৫০ সালেও নেহরু পাল্লামেটে দাঁড়িয়ে বললেন, "পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিপ্রায় আমাদের নেই। কিন্তু পাকিস্তানের বহু নরনারীকে অবর্ণনীয় ক্ষুধা ও নির্যাতন ভোগ করতে দেখেও আমরা উদ্বেগ বা সমবেদনা বোধ করব না, এমন কথা কলা সম্পূর্ণ নিরর্থক।" খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জাকর হলেও এই নেহরুর মুখেই পরবর্তীকালে উচ্চারিত হলো, "পূর্ব-বঙ্গের সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল সেটা অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমরা বহন করতে পারব না।... ভারত সরকার কিংবা কোন সর্ব-ভারতীয় নেতা কোন সময় এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নি যে, পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব আমরা অনির্দিষ্ট ভাবিষ্যৎ পর্যন্ত বহন করব। এটা অসম্ভব ব্যাপার।" (পাল্লামেটে বক্তৃতা, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৭)।

বিশ্বাসভঙ্গের এর থেকে বড় নজীর আর কি থাকতে পারে?

১৯৫৮ সাল থেকে ভারত সরকারের পুনর্বাসনমন্ত্রী গ্রীমেহেরচাঁদ খান্নার চক্রান্তে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মাই-গ্রেশন পাওয়া কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। মাইগ্রেশনের আবেদনকারীর সামনে দুটো শর্ত তুলে ধরা হলো : (১) আবেদনকারীকে অবশ্যই ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতে গিয়ে তিনি ভারত সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য নেবেন না, (২) আবেদনকারীর ভারতস্থ কোন আত্মীয়-স্বজনকে ঘোষণা করতে হবে যে, ভারতে আবেদনকারীর পরিবারের জীবনধারণের সকল ব্যয়ভার তিনি বহন করবেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই শর্তসাপেক্ষে একটি অন্ধকার

অনিচ্ছতের পথে পা বাড়ানো সহজসাধ্য নয়। এই ঘটনায় পূর্ব বাংলার অগণিত হিন্দু নরনারীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহরু, পুনর্বাসনমন্ত্রী খান্না এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সৈনিক বিশ্বাসভঙ্গের যে নজীর সৃষ্টি করলেন স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পাক-ভারতের ইতিহাসে তা বর্ণনার অমিতীয় নজীর হয়ে রইল।

এর পর আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার মা বসালেন পাকিস্তানের দোদুল্ল প্রতাপশালী জগী শাসনকর্তা আয়ুব খান। পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে জব্দ করবার জন্য তিনি দুটো কুখ্যাত আইন প্রস্তুত করলেন। তার একটি হলো, মাইনারিটি প্রপারটি এ্যাক্ট এবং অপরটি এনিমি প্রপারটি এ্যাক্ট। মাইনারিটি প্রপারটি এ্যাক্টের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাঁদের সম্পত্তি বিক্রয় করবার নৈতিক অধিকার হারালেন আর এনিমি প্রপারটি এ্যাক্টের বলে বহু হিন্দু-সম্পত্তি আয়ুব সরকারের করায়ত্ত হলো। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মঞ্চে যখন আয়ুব খানের অশ্রুত আবির্ভাব ঘটেছিল তখন আমি পূর্ববঙ্গেই ছিলাম। দেখেছি কত হিন্দু বণিকের অপরাধের বিচার হয়েছে সামরিক আদালতের খেলালী-পনার মানদণ্ডে। অপরাধ যত চাঘুই হোক না কেন কিংবা নাই বা থাকলো অপরাধ—সামরিক পুরুষদের বেগমাতের নির্মমতার মাথা তাকে হ্রাস হয় নি। ভারতে তাঁর কাপড়চোপড় কারো ঘরে থাকলেও সামরিক বিচারে তাকে দেশ-দ্রোহী হিসাবে বেগমাত করা হতো। কখনো কখনো এই অত্যাচারের মাথা এমনভাবে সহনশীলতার মাথা অতিক্রম করতো যে, অনেকে সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে বাধ্য হতেন। এমনি মামলা করতে দেখেছি ঢাকা জুট কোম্পানীর শ্রী এইচ. বি. নোপানীকে, খুলনার বিখ্যাত স্বর্ণ ব্যবসায়ী শ্রী জে. এল. দত্তকে। এমনি আরো অনেকে করেছেন। আদালতে কেউ হেরেছেন, কেউ জিতেছেন। সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু রাজনৈতিক অর্পণবর্তের সেই জটিল সন্ধিক্ষণে এটা অনেকেই আশা করেছিলেন যে, প্রগতি-শীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলি নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট হবে। কার্যত কিন্তু দেখা গেল একদা যাদের চোখে মহম্মদ আলী জিন্না হিরো ছিলেন, তাঁদের চোখেই আয়ুব খান ধীরে ধীরে হিরো হয়ে উঠলেন (পূর্ব-পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তখনও দানা বেঁধে ওঠে নি)। কিন্তু এহো বাহ্য। কয়েক বছর পরে তাঁদেরই দেখলাম দেওয়াল থেকে আয়ুব

খানের হাব টেনে নামিয়ে মাটির সঙ্গে গুঁড়িয়ে দিতে। সেদিনই বরোহিলায় মানুসের আত্মা জাগছে, আর এ আত্মা পরাভবকে বিশ্বাস করবে না।

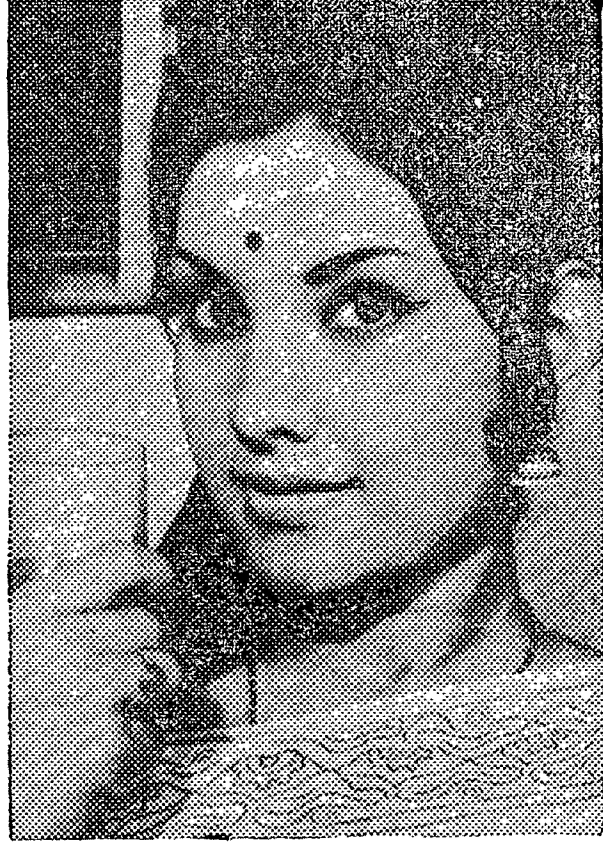
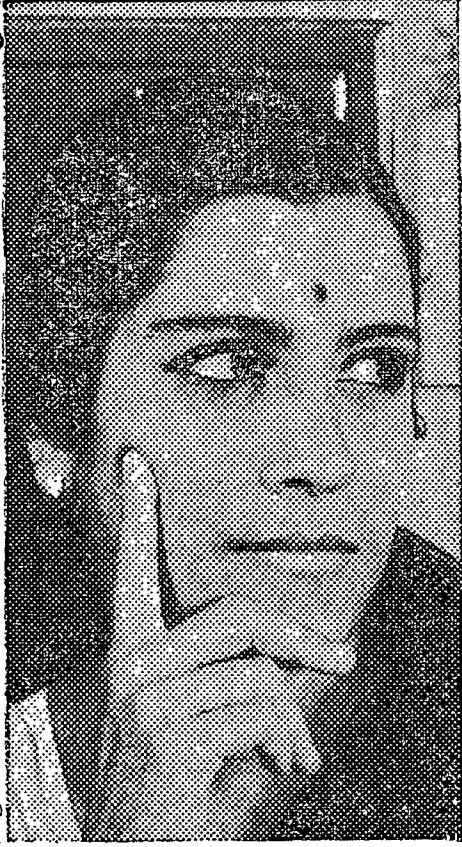
তবু আত্মহুঁপ্তি কোথায়? দিনের পর দিন যে একগ্রেণীর মানুষকে তাঁদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা হলো, এমন কি বারবার যাদের গরু-খোদা করে সীমান্তের এ পাশে ঠেলে দেওয়া হলো, সেই অনায়াস ও অবিচারের বিরুদ্ধে আগ্রত জনমতের কণ্ঠ সোচ্চার হলো কই? পূর্ব বাংলার সংগ্রামী জনতা ভাষার মর্ষাদা রক্ষা করেছে, সাহিত্য ও সংগীত-চর্চার স্বাধীনতা আদায় করেছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছাত্র-স্বার্থ সংরক্ষণ করেছে, এমন কি প্রতাপশালী ডিক্টেটর আয়ুব সরকারের পতন ঘরান্বিত করেছে। কিন্তু পারে নি পাকিস্তান সরকারের চিরাচরিত সংখ্যালঘু-বিশেষ নীতির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন সংহত করতে। এ কথা দুঃখের হলেও সত্য। আজ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না হওয়া সত্ত্বেও হাজার হাজার হিন্দু নরনারী সীমান্তের প্রকুটি অগ্রাহ্য করে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রতিদিন প্রায় তিনশত পরিবার পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত এলাকায় এসে দাঁড়াচ্ছেন। কিছুদিন ধরে আমি নিজে এর কারণ অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপৃত ছিলাম। তার জন্য বহুবার এই উদ্ভাসভূদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছে, সীমান্তে ছুটে গেছি করেকবার, সরকারের উদ্ভাসত পুনর্বাসন দপ্তর এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। অনুসন্ধানের ফলে যে কারণগুলি আমার চোখে ধরা পড়েছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ তুলে ধরিঃ

(১) পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকার পূর্বতন আয়ুব-সরকার প্রচলিত মাইনারিটি প্রপারটি এ্যাক্ট তুলে নেওয়ায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সামনে জমি-জমা বিক্রয় করবার একটা সুযোগ এসেছে। অনেকে এই সুযোগ গ্রহণ করে ভারতে চলে আসার ব্যবস্থা করছেন।

(২) পাকিস্তানের সর্বত্র অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে উঠছে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং খাদ্যমূল্যে যে হারে বেড়ে চলেছে সেই হারে মানুষের মজুরী বৃদ্ধি হয় নি। শ্রমসম্মত দিনমজুরী যাদের পেপা, তাদের মজুরী অস্বাভাবিকভাবে কমে যাওয়ায় জীবন অনেকটা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এই কারণে যে সকল উদ্ভাসত সম্প্রতি চলে আসছেন তাঁদের মধ্যে সর্ব হারার সংখ্যা প্রচুর। এঁদের মধ্যে কিছু কিছু মদুসলমানও চলে আসছেন বলে শুনতে পেয়েছি। কারণ ওই অর্থনৈতিক সংকট।

মাসিক বঙ্গমতী

যে মুখখানির দিকে
সবাই তাকিয়ে আছে
তিনিই বলবেন



কারণটা : হেজলীন স্নো



হেজলীন স্নো-র মোলায়েম হাফা পরশ সেয়া বিউটি ক্রীমেরই মতন।
আপনার মুখখানিকে দিবি সূক্ষ্ম নিটোল লাগণো ভরে দেয়।
অপকূপ তরুণ কোমল কাস্তিতে আপনার মুখখানি নির্মল হয়ে ওঠে।
ছোটোখাটো দাগ অতি স্বচ্ছনে ঢাকা পড়ে যায়...আপনার মুখে
ফুটে ওঠে এক দ্বিধা করণীয় আভা।
আজই আপনার হেজলীন স্নো-র সঙ্গে পরিচয় হোক...দিনের পর দিন
সে পরিচয়ের সার্থকতা আপনার মুখখানিকে ফুলের মত সহজ
সুন্দর করে তুলবে।

Benson's 3300-Bea

হেজলীন স্নো-তরুণের স্বপ্নমাখানো স্বাভাবিক কাস্তির উৎস


Wellcome

নাজীবিক বঙ্গবন্ধু

(৩) গ্রাম্য আন্দোলন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জাত্যভিমান, ব্যক্তিগত রেষারেষির ফলেও অনেককে চলে আসতে হচ্ছে।

(৪) নারীঘটিত সমস্যা জনিত ভীতি বা নিরাপত্তার অভাববোধ অনেককে সীমান্ত আশ্রয় করতে বাধ্য করছে।

(৫) আগামী অক্টোবর মাসে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা। পাকিস্তানের সর্বত্র এখন তাই নির্বাচনী প্রচারণার মত্ত হাওয়া। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ রাজনৈতিক দলগুলি জানে, এই নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কোনক্রমেই তাদের বাঞ্ছিত ভোট দেবে না। সেইজন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর পরোক্ষ চাপ সৃষ্টি করা চলছে বিভিন্ন ধরনের উপদ্রবের মাধ্যমে। সংখ্যালঘুরা যত চলে আসবে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির ততই ক্ষতি। আর নির্বাচনে প্রগতিশীলদের ক্ষতি মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণদের লাভ।

(৬) পূর্ব পাকিস্তানকে জনসংখ্যার দিক থেকে সংখ্যালঘু এলাকায় পরিণত করার পশ্চিম পাকিস্তানী চক্রান্ত। অথচ গরিবতার বিষয় হলো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির কণ্ঠে কোন দ্বিধার নেই। প্রতিরোধ করার চেষ্টাও তাদের কাছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে ছাত্র-সমাজ বিশেষত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগ কি কিছুই করছে না? উত্তরে জানতে পেলাম, না, তেমন কিছু করার সুযোগও নেই। কারণ গ্রামাঞ্চলে ছাত্রসমাজের প্রভাব এবং কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত নয়। অথচ এই সমস্ত অনায় উপদ্রবগুলি প্রধানত গ্রামাঞ্চলেই ঘটেছে এবং আজ যারা সীমান্ত পেরিয়ে এ পাশে চলে আসছে তারা প্রায় সবাই গ্রাম্য মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, গ্রামাঞ্চলে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী কি নেই? গ্রামের মানুষের ওপর তাদের কি কোনই প্রভাব নেই? যদি না-ই থাকে তবে তাঁরা আর কিছু না পারেন চীৎকার করে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেও কি পারেন না? অথচ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের অনেক দফা কর্মসূচী, অনেক দফা বড় বড়

দুর্নীতি বিশিষ্ট প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় আওয়ামী পার্টির যথাক্রমে ৬-দফা কর্মসূচী এবং ১১-দফা দাবির বিষয়গুলো সামনে রাখছি।

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচী:

(১) পাকিস্তানের সংবিধান হবে যুক্তরাষ্ট্রীয়, সরকার পাল্লামেন্টারী এবং আইনসভা হবে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয়গুলি প্রতিরক্ষা

এবং পররাষ্ট্রীয় বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(৩) (ক) পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য সহজে বাণিজ্যযোগ্য আলোচ্য মাদ্রাসা-ব্যবস্থা থাকা উচিত; অথবা, (খ) পূর্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন সরাবার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থাসহ একই মাদ্রাসা-ব্যবস্থা।

(৪) কর এবং রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা রাজ্যগুলির থাকবে; রাজ্য থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের একটি অংশ কেবল কেন্দ্রীয় সরকার পেতে পারেন।

(৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য আলাদা বৈদেশিক মাদ্রাসা হিসাব থাকবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রয়োজন দুই পাকিস্তান সমানদুপাতে মেটাতে পারে।

(৬) প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে একটি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী এবং একটি সামরিক শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হবে; যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর হেড-কোয়ার্টার পূর্ব পাকিস্তানেই স্থাপিত হবে।

জাতীয় আওয়ামী পার্টির ১১-দফা দাবি:

(১) শিক্ষা-প্রসার, ছাত্র-বেতন হ্রাস, সরকারী সাহায্যপুষ্ট ছাত্রাবাস, শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, অষ্টম গুণী পর্বন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবহনের ক্ষেত্রে ছাত্র-কনসেশন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা-কর্মিশনের রিপোর্ট বাতিল।

(২) ব্যাংক, বীমা এবং বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ।

(৩) কর এবং ভূমিরাজস্বের হ্রাস।

(৪) শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য মজুরী ও বোনাস।

(৫) বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(৬) সমস্ত নিরাপত্তা আইন এবং নিবর্তনমূলক আদেশ প্রত্যাহার।

(৭) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি।

(৮) সিয়াদো, সেটো থেকে পাকিস্তানের অপসারণ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্বিপার্সনাল চুক্তি বাতিল।

(৯) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র।

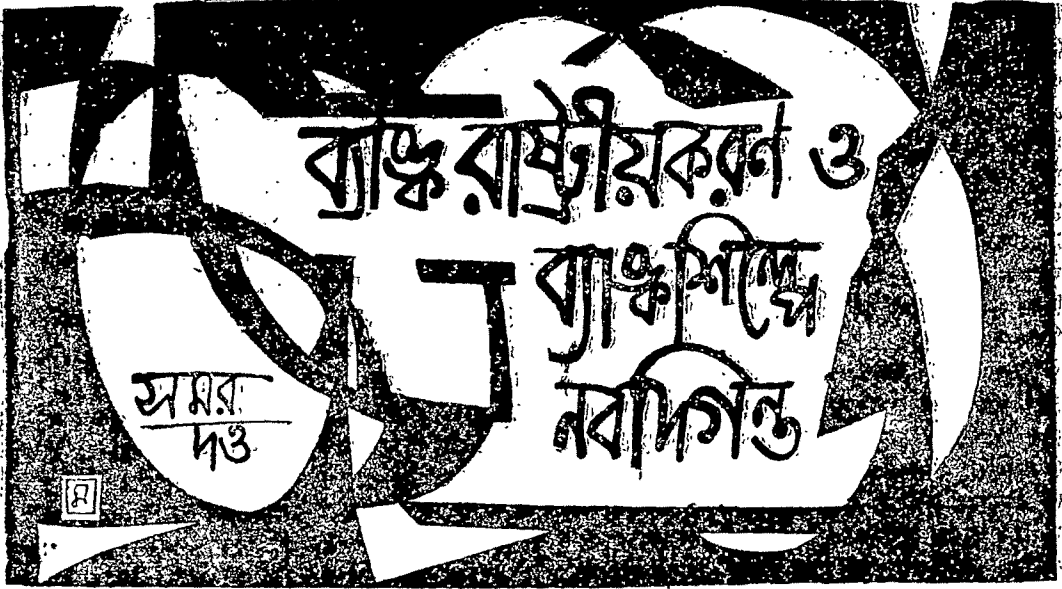
(১০) মাদ্রাসা, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সহ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার।

(১১) বেঙ্গালুরু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধুর জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

লক্ষণীয় যে, এই সকল কর্মসূচী বা দাবিপত্রের সবই আছে। নেই কেবল পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা, যে প্রশ্নটি স্বাধীনতার পরে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে একটি বিরাট বিতর্কিত

এবং বহু আলোচিত সমস্যা হয়ে আজও টিকে আছে। আমি জানি, এখানে হয়তো প্রশ্ন উঠবে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য যা যা প্রয়োজন, সমস্ত দাবি জানানো হয়েছে। এর ফলে মেজরিটি, মাইনরিটি সকল সম্প্রদায়ই তো ভোগ করবে। এক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের প্রশ্ন তোলাটাই একটা বিরাট সংকীর্ণতার পরিচায়ক। হ্যাঁ, সন্দেহ নেই এটা সংকীর্ণতা, অন্তত দুঃভঙ্গীর প্রসারতা এতে নেই। কিন্তু রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে এ প্রশ্ন অব্যাহত হতে পারে যদি সেই রাষ্ট্র কোন ধর্মনিরপেক্ষ এবং শ্রেণীসমন্বয়বাদী রাষ্ট্র হয়। পাকিস্তানের মতো একাট ইসলামী রাষ্ট্রে, সেখানকার সংখ্যালঘুদের সমস্যার কথা বিশ্বব্যাপক, এমন কি রাষ্ট্র-সম্ব পর্বন্ত জানে, সেখানকার প্রগতিশীল রাজনৈতিক দাবিপত্রে এই সমস্যার কথা থাকলে তা সংকীর্ণতা হতে পারে না। কারণ এটা সেখানকার একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা।

তাহাড়া প্রগতিশীল নেতারা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মঙ্গলামঙ্গল বা লাভালাভের কথা বলেন না এমনও তো নয়। এই তো কয়েকমাস আগে জাতীয় আওয়ামী পার্টির নেতা মৌলানা ভাসানী আমেদাবাদে মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধি হবার প্রতিবাদে সারা পূর্ববঙ্গে হরতাল আহ্বান করেছিলেন। সে হরতালের ডাক যদি শেষ পর্বন্ত প্রত্যাহার করা না হতো তাহলে কে বলতে পারে আর একবার পূর্ব বাংলার মাটি সংখ্যালঘু মানুষের রক্তে ধুসর হয়ে উঠতো না? তবু যে শূভবুদ্ধিটুকু মৌলানা ভাসানীকে হরতাল প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছিল, সেটুকুই আজ পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষের একমাত্র সহায়ক শক্তি। স্বাধীনতার পর থেকে এই শূভবুদ্ধির ক্রমবর্ধমান বিকাশ আমরা চোখেছি। কিন্তু আশাহত হতে হয়েছে বারবার। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসমাজের কাছে তাই আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তাঁরা যদি মনে করেন দেশ ইসলামীও থাক, আবার গণতান্ত্রিকও হোক, তাহলে ভাবনার ক্ষেত্রে আজ যে জটিলতার প্রশ্ন দিচ্ছি, তার জন্য গণতন্ত্রের কাছে তাঁদেরও একদিন জবাবদিহি করতে হতে পারে। পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সৈনিকদের তাই ন্যূনতম দৃষ্টান্তটুকুও ঝেড়ে ফেলে দূর্বীর হয়ে উঠতে হবে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক মর্যাদা দিতে হবে, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে সেই আন্দোলনের সাক্ষর করতে হবে। সমাজের সর্বস্তরে যে অন্যায় আর প্লাম্ব কর বিভেদ-শৃঙ্খলা ব্যালট বাক্স তা হচ্ছে দিতে পারে না।



ব্যাঙ্ক শিল্পের একটি বহু অংশ রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত হয়েছে। এই রাষ্ট্রীয়করণকে পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে গেলে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ এবং আর্থিক অবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে যে জিনিসটি অত্যাবশ্যক সেটি হল রাষ্ট্রীয়করণের অর্থনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা এবং সেই উদ্দেশ্যগুলিকে কর্মে রূপায়িত করে দেশের সবস্তরের মানুষ যাতে রাষ্ট্রীয়করণের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে যত শীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক কোম্পানী-গুলির অধিগ্রহণ এবং হস্তান্তর সংক্রান্ত আইনে রাষ্ট্রীয়করণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে—‘to serve better the needs of development of the economy in conformity with national policy and objectives and for matters connected therewith or incidental thereto.’

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কথায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের উদ্দেশ্য হল—‘to promote rapid growth in agriculture, small industries and exports, to encourage new entrepreneurs and to develop all backward areas.’

সম্প্রতিকালে ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চলে ব্যাঙ্ক শিল্পের পত্তন হয় নি অথবা যে সকল অঞ্চলে এই শিল্পের খুব সামান্যই পত্তন হয়েছে সেই সকল অঞ্চলে এই শিল্পের পত্তন এবং প্রসার ঘটিয়ে শিল্পটিকে উত্তরোত্তর জনকল্যাণকর এবং

জনপ্রিয় করে তোলবার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাঙ্কগুলির সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। যদুগণ অর্থলব্ধীর ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত ব্যাঙ্কগুলির নীতি এমনই হওয়া উচিত যাতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব একটা সমতা রক্ষিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় সংসদে ‘অর্থনৈতিক গণতন্ত্র’ বিষয়ে তাঁর একটি বক্তৃতায় বলেন— ‘Banking and Insurance are highly important in the economy of a country. Speaking from a strategic point of view it is essential that they should be controlled in any economy.’ এই বক্তৃতায় পণ্ডিত নেহরু ব্যাঙ্ক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর যে মতামত এবং মানসিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন তার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৫ সালে তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে স্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করায়। কেবলমাত্র পণ্ডিত নেহরু নন, ভারতবর্ষের প্রগতিশীল এবং এদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহী বহু ব্যক্তি ব্যাঙ্ক শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, বিশেষ করে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কে টি শাহ তো ভারতীয় সংসদে দিনের পর দিন তাঁর বক্তব্য রেখে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে অকাটা যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।

জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিগত ১৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয়কৃত স্টেট ব্যাঙ্ক

বড় বড় শহর ছাড়াও শহরতলী অঞ্চলে এবং গ্রাম ভারতের বিভিন্ন অংশে জনসাধারণের কাছে ব্যাঙ্ক শিল্পের সুযোগ-সুবিধা পেঁছে দিচ্ছে। এই রাষ্ট্রায়ত্ত্বকৃত ব্যাঙ্কটি কৃষিখণ্ডের ব্যবস্থা করছে; ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সম্প্রসারণে অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে; নতুন নতুন শিল্পোদ্যোক্তাদের ঋণ লাভের পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে; বাহিবাণিজ্যের সম্যক উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং দেশের সমবায় সংস্থাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থনৈতিক দান দিচ্ছে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে স্টেট ব্যাঙ্ক আজ একটা বিরাট কর্মক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। অপরদিকে রাষ্ট্রীয়করণের পরবর্তী ১৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১২ শ’ নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং আনুমানিক ৩৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার নতুন লোক প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কার্যালয়ে নিযুক্ত রয়েছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীয়করণের ফলে স্টেট ব্যাঙ্কের অবস্থার অবনতি তো হয়ই নি; বরং দেশহিতকর অর্থনৈতিক কর্মসম্পাদনে এই ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক পদচারণা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একথা অবশ্য ঠিক যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বিচারে স্টেট ব্যাঙ্ক একটি সত্যিকার, রক্ষণশীল, ধীরগতি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক অনুসৃত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে এবং সবস্তরের মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণসাধনে তথা জাতীয় উন্নয়নের পথ রচনায় স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা অবশ্যই বিবেচ্য। আমার বক্তব্য এই নয় যে, কেবলমাত্র স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ায় কর্মধারার উপর নির্ভর করেই বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলির রাষ্ট্রীয়করণের মূল্য নিরূপিত হওয়া উচিত। ব্যাঙ্ক

রাষ্ট্রীয়করণের যথাযথ মূল্য তখনই নিরূপিত হওয়া সম্ভব হবে যখন বর্তমানের ব্যাঙ্ক প্রথার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে। তথাপি আমি মনে করি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে নীতিগতভাবে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে গেলে স্টেট ব্যাঙ্কের কর্মপ্রণালীর এবং অভিজ্ঞতার আলোকে রাষ্ট্রীয়করণের পথ-পরিভ্রমণ করা অস্বাভাবিক হবে না।

ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিই এদেশের অর্থনৈতিক সম্পদের বৃহত্তম আধার। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-অবনতি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কর্তৃক অনুসৃত নীতির ওপরই নির্ভরশীল। এই কারণে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির কর্মপদ্ধতি এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাতে এই ব্যাঙ্কগুলির শাখা-কার্যালয়গুলির মাধ্যমে অথবা এদের সম-গোষ্ঠীয় প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা দেশের সব অঞ্চলের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির কর্তব্য দেশের সর্বস্তরের

মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে বৈষয়িক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে ঋণদান করা, যাতে দেশীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ অচিরে সম্পাদিত হয়।

এই প্রসঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণদান সবতোভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগের ৭ ভাগ কৃষিজীবী এবং মোট জাতীয় সম্পদের প্রায় অর্ধেক অংশই কৃষিজাত। কিন্তু অর্থনৈতিক দুরবস্থাহেতু কৃষক ও কৃষিকার্ষের অবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। সেইজন্য দেশের মাটিতে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় তাতে ৫০ কোটির ঊর্ধ্ব দেশবাসীর জীবনধারণ সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থার নিরাকরণ সম্ভব যদি এদেশে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যন্ত্রের সাহায্যে কৃষিকার্ষ সম্পাদনের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কাজে প্রচুর অর্থনিয়োগ প্রয়োজন। বুরায় ক্রেডিট রিভিউ কমিটি এই সিংহান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আগামী ১৯৭০-৭৪ সালে যে পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হবে তার জন্য দু'হাজার কোটি টাকার অর্থনৈতিক দান দানের প্রয়োজন হবে। এই টাকার

৪২.৫ শতাংশ অর্থাৎ ৮৫০ কোটি টাকা উন্নত ধরনের উৎপাদক শীতসম্পন্ন বাজ, সার এবং শস্য ধ্বংসকারী কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বাবদ ব্যয় করা হবে। কৃষিকার্ষের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে এই পরিমাণ অর্থের এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণ অর্থের যোগান দেবার উপায় রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলিকে উদ্ভাবন করতে হবে।

এরপর ক্ষুদ্রায়তন শিল্প। বলা বাহুল্য, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিকরণে বৃহদায়তন শিল্প অত্যাবশ্যক। কিন্তু কেবলমাত্র কল-কারখানা সৃষ্টি এবং যান্ত্রিক উৎপাদন দেশের নিদারুণ বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। বিগত কয়েক বছরে ভারতবর্ষে যন্ত্রশিল্পের খানিকটা উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেই অনুপাতে শিল্প-শ্রমিক কর্মে নিযুক্ত হয় নি। বেকার শ্রমিকদের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হচ্ছে। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি এবং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বৃহদায়তন শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপুষ্ট করে সেগুলিকে শিল্পপণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তোলবার জন্য শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ কর্তৃক করা আবশ্যিক। এ বিষয়ে কার্যকর মূলধন ছাড়াও মেয়াদী ঋণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঋণদানের ব্যাপারে স্টেট ব্যাঙ্কের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য। এমতাবস্থায় এই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পক্ষেত্রে ১৯৭০-৭২ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে। এই শিল্পে আরও অধিক অর্থনৈতিক দান দানের ব্যবস্থা এই ব্যাঙ্ক কর্তৃক অবলম্বিত হয়েছে। যদিও স্টেট ব্যাঙ্কের ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ঋণদানের শর্তগুলি বেশ খানিকটা উদারতার পরিচায়ক তথাপি এই ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এই মত পোষণ করেন যে, এই ধরনের ব্যবসায় অর্থনৈতিক লোকসানের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই, বরং দেশের আভ্যন্তরীণ অনায়াসত অঞ্চলে এই ব্যবসা লাভজনক। স্টেট ব্যাঙ্কের মত অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্যক উন্নতির জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য দানে অগ্রসর হতে পারে।

সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করে উপযুক্ত জামানত রেখে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর মধ্যে ঋণের কারবার চালায়। এই রকম ব্যবস্থার ফলে কারিগর, যানবাহন চালক, ছোট ছোট ব্যবসায়ী এবং এই ধরনের সাধারণ লোকদের পক্ষে

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

বহুকাল পরে সদ্য প্রকাশিত হইল।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাববোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭। মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সান্তাল গ্রুপ কোং ॥ কলিকাতা-৯

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

সামাজিক বসমতী

ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া সহজসাধ্য হয় না। কারণ এই ধরনের সাধারণ লোকেরা প্রয়োজনীয় জামানত রাখতে অক্ষম। কিন্তু এদের কাজের দ্বারা নিঃসন্দেহে দেশের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নয়ন পরোক্ষভাবে সাধিত হয়। সেইজন্য এই পর্যায়ের কর্মীগণ যাতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ লাভে সমর্থ হয় সে সম্বন্ধে রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব আছে। স্টেট ব্যাঙ্ক খুব কঠিন শর্ত আরোপ না করে এই পর্যায়ের সাধারণ মানুষদের অর্থনৈতিক দাদন দিয়ে তাদের ঋণ লাভের বহু পুরাতন সমস্যার বেশ খানিকটা সমাধান করেছে। স্টেট ব্যাঙ্কের মত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিও যদি এই ধরনের সাধারণ মানুষদের জন্য অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে তাহলে তারা যে পণ্যসামগ্রী উৎপন্ন করবে সেগুলির বাজার দর স্বভাবতই অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের হবে। ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই সুবিধা হবে এবং আলোচ্য সাধারণ মানুষেরা কিছু আর্থিক সমস্যারও সুযোগ পাবে। অপরদিকে দেশের মধ্যে বহু নতুন নতুন ক্ষেত্র থেকে ব্যাঙ্কের আমানত সংগ্রহের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

ভারতবর্ষের আরও একটি ক্ষেত্রের সম্যক উন্নতির জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই ক্ষেত্রটি রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্র। রপ্তানি-বাণিজ্যের সম্যক উন্নতি ব্যতিরেকে বৈদেশিক মদ্রা অর্জন করা অসম্ভব। বৈদেশিক মদ্রা অর্জনে অসমর্থ হলে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির সাধক রূপায়ণ সুদূরপরাহত। সম্প্রতিকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আনুক্রম্যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলি বহির্বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য শিল্পপতিদের সুবিধাজনক সুদের হারে ঋণ দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতে উৎপন্ন শিল্পপণ্য প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় করতে গেলে পণ্যসামগ্রী নিখুঁত এবং গুণগতভাবে উচ্চ ধরনের হওয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, নিখুঁত এবং গুণগতভাবে উচ্চ ধরনের শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন করা, আন্তর্জাতিক বাজার আয়ত্তে আনা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী চালান দেওয়া প্রচুর অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। সুতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য শিল্পপতিগণকে সুবিধাজনক শর্তে পর্যাপ্ত পরিমাণ দাদন দেওয়ার এক বিশেষ দায়িত্ব রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির ওপর এসে পড়েছে।

এতদিন ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি

শিল্পপতি এদেশে নতুন নতুন শিল্পসংস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং পরিচালনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু এমন বহু মানুষ আছে যারা দেশীয় শিল্পোন্নয়ন কর্মে পারদর্শী হয়েও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অভাবে এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে অক্ষম। এ সম্বন্ধে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির কতব্য শিল্পকর্মে দক্ষ ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পেয়ে যাতে ভারতবর্ষের শিল্পায়নের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতিষ্ঠান (টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউশনস) এবং শিল্প অঙ্গীকার (ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস)-গুলির সহায়তায় এই কাজ সম্পন্ন করা সুবিধাজনক। ভারতবর্ষের শিল্পোন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উচিত তাদের অধীন প্রযুক্তিবিদ্যার পারদর্শী এবং অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন কর্মচারীগণকে আপনাপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা গড়ে তোলবার অনুমতি দেওয়া। এই রকম ব্যবস্থায় তারা শিল্প সম্প্রসারণের সহায়ক বহু বস্তু উৎপাদনে সমর্থ হবে। এর ফলে, সুদক্ষ কর্মীগণ ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবে। যুগপৎ শিল্পায়নের ব্যাপারে দেশ উপকৃত হবে।

এতাবং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা একটা গতানুগতিক ধারায় চলে এসেছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক শিল্পের নবদিগন্ত নিরূপণের সময় এসেছে। এখন ব্যাঙ্ক শিল্প পরিচালনায় শুধুমাত্র পেশাদারী কর্মনিপুণাই যথেষ্ট নয়, যুগপৎ দেশ-কল্যাণের ব্যাপকতর স্বার্থে ব্যাঙ্ক পরিচালকগণের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্মপন্থা অত্যাবশ্যক। এই ব্যাপারে ব্যাঙ্ক-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতিকালে বম্বেতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এমনিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলিকে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে গেলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ প্রয়োজন। সেইজন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ আমানত সংগ্রহের ব্যাপারে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলিকে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দেশের অব্যবহৃত অর্থসম্পদ সংগ্রহ করা যাতে সম্ভব হয়; জনসাধারণের

মিতব্যয়িতার মনোভাব ও সঞ্চয়ী-মনোবৃত্তি যাতে গড়ে ওঠে এবং সর্বস্তরের মানুষ যাতে ব্যাঙ্ক কর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে সেই সম্বন্ধে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কগুলির কর্ম আয়োজন যাতে সম্প্রসারিত হয়, দেশের জনবহুল এবং অপেক্ষাকৃত জনহীন অঞ্চলগুলিতে ব্যাঙ্কগুলির নতুন নতুন কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই সম্বন্ধে রাষ্ট্রীকৃত ব্যাঙ্কগুলির ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালিত হওয়া উচিত।

এতদিন দেশের বৃহৎ বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলির ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে কারেমী স্বার্থের ধারক ও বাহকগণ শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে কল্পনাতীত মুনোফা অর্জন করেছে। দেশে যেটুকু অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তাতে ধনিকগণেরই লাভবান হয়েছে। বিশাল ভারতবর্ষের ৫০ কোটির উর্ধ্ব জনসংখ্যার বিরাট অংশ আজও কঠোর দারিদ্র্যের মসীময় অন্ধকারে নিমজ্জমান। তাই একথা আশা করা ভুল হবে বলে মনে হয় না যে, ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ একদিকে সরকারের হাত শক্ত করে তুলবে, অপরদিকে ছোট-বড় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী তথা জনসাধারণের মধ্যে নতুন কর্মচাম্চলা এনে দেবে। এমনি করে ভারতবর্ষের পরিকল্পিত অর্থনীতির এবং সমাজনীতির সার্বিক সাফল্যের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।



**পৃথিবীর
সুবচেত্রে
বি
গৃহ-
শিল্পের
উপভোগ
করুন**

টচ অথবা ইলেকট্রিক ৪ ফুট x ৩ ফুট
পর্দায় আপনার প্রিয় চিত্রভাস্করদের
আপনার থেকে নড়াচড়া এবং রোমাঞ্চ
কমিকগুলিতে স্বন্দরভাবে নাচতে, গাওয়া
করতে, কাটিয়ে টিক আসল সিনেমার মত
দেখান এবং উপভোগ করুন। সকল বয়সের
এবং প্রদর্শনীতে দেখাওয়া বিপুল অর্থ
উপার্জন করুন অথবা গৃহে বন্ধু-বান্ধব
ও পরিবারবর্গকে আনন্দ দিন। স্থানীয়
স্পেশাল প্রোজেক্টর: মূল্য ৪০ টাকা -
১০০ ফুট ফিল্ম স্ক্রিনিং এবং ফিল্ম
ভালিকা সহ বিনামূল্যে। (ডাক মাশুল
ও প্যাকিং ৬০ টাকা স্বতন্ত্র) ১০০ ফুট ফিল্ম
১০ টাকা। তৎপর হউন, অর্ডার জরুরি দিন।
American Cinema Supplies
Kalyanpura, Delhi - 6

মানবিকায়

দ্রুতমাত্রা মেনস্থ

(৮)

প্রমদারজন যোষ সদাশিব শান্ত মানদুষ্টি, সুদাসিক। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অতি সজাগ, ধুলো ও জীবাদু সম্বন্ধে খুবই সতর্ক। শান্তিনিকেতনে বসি হলে আগ্রমের ছেলেমেয়ে, শিক্ষক-শিক্ষিকা, এককথায় আগ্রমবাসী সবাই, বসিষ্ঠে ভেজার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসেন। খোয়াই দিয়ে গৈরিক জলের ধারা যখন প্রবলবেগে বয়ে যায় তার মধ্যে ঝাঁপঝাঁপি করে সবাই এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেন। এমনি একদিন বসিষ্ঠের পর শিশুবিভাগের ছোট ছোট ছেলেরা বাইরে বেরিয়ে পড়লো, মাঠে এসে 'হেলে সাপের' বাচ্চা দেখে তাদের লাজে ধরে একটু ঘুরিয়ে ছেড়ে দিচ্ছিল। প্রমদাবাবু ব্যাপারটা দেখে বলে উঠলেন, "বাঙালী, বাঙালী!" অর্থাৎ নির্বিষ হলে সাপ আর বাঙালীতে বিশেষ তফাৎ নেই, ছেলেদের হাতে এই লাজনা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'ফৌস' করে যে একটু প্রতিবাদ জানাবে তারও ক্ষমতা নেই, যেমন শত নির্যাতন ও অত্যাচারেও বাঙালী নির্বিকার। একদিন ক্লাশে 'লজিক' পড়বার সময় কী একটা উপমা দিতে গিয়ে তিনি বললেন, ".....ছচার মতন ইত্যাদি....."। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা বলে উঠল, "ছুচাটা কী, মশাই (ওঁকে সবাই 'মশাই' বলে ডাকতো)?" উনি নানাভাবে ঐ জীবটির আকৃতি-প্রকৃতির বর্ণনা করতে শুরু

[পূর্বানুবৃত্তি]

করলে ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো, "ও, ছুচো, তাই বলুন।" প্রমদাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, "ঐ হলো, জানিস না। (চন্দ্র-বিন্দু) পদ্মা পার হয় নি।" উনি পূর্ববঙ্গের লোক, পাণ্ডববর্জিত দেশের মতো পূর্ববঙ্গও বর্জিত। আর একদিন ঐ প্রসঙ্গে বললেন—রাজনৈতিক অপরাধীর identification parade-এ পূর্ববঙ্গের লোক identify করার যে-সহজ পন্থা শাসকবর্গ আবিষ্কার করেছেন সে হলো দশ-বারোজন সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিকে ধরে লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণতে বলা হতো। যে ব্যক্তি "পাঁচের" বদলে "পাচ" বলতেন তাঁকেই নিঃসন্দেহে পূর্ব-বঙ্গবাসী বলে সনাক্ত করা হতো।

এদিকে 'বিশ্বরচনা' বইয়ের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছিল। আরো দু'টি অধ্যায় 'নক্ষত্রলোক' ও 'গ্রহলোক' শেষ করে গুরুদেবের হাতে দিয়ে এসেছি। এই দু'টি অধ্যায়ই বেশ বড়ো হলো; বিশেষ করে 'গ্রহলোক' অধ্যায়ে পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হলো। পৃথিবীর জন্মকথা, তারপর আগ্নেয়াগ্নির একটা পিণ্ড থেকে কীভাবে ধীরে ধীরে প্রায় দুশো কোটি বছর ধরে তার বর্তমান কলেবর গড়ে উঠেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ খুব অল্প কথায় দেওয়া সম্ভব নয়, তাই এই অধ্যায়ের কলেবর হয়েছে বেশ বড়ো। একটা কঠিন স্থায়ী রূপ

নিতে পৃথিবীর কেটেছে বহু যুগ। প্রায় দেড়শো কোটি বছর ধরে চলেছে তার ওপর তেজের এক প্রবল উদ্দামতা, যার অভিঘাতে বিভিন্ন অজৈব পদার্থের ওলটপালট ভাঙাগড়ায় বিচিত্র সৃষ্টি ও পরিবর্তন চলছিল। এই ভাঙাগড়ার স্রবশে বহুকাল চলেছে ভূপৃষ্ঠে একটা ভয়ানক অস্থিরতা। তারপর তেজের উদ্দামতায় যখন কিছু ভাটা পড়লো তখনই কঠিন আবরণ একটু স্থিতির অবকাশ পেল; তারপর সেই বিরাট প্রাণহীনতার মধ্যে, কেমন করে জানি না, জেগে উঠলো এক অক্ষুদ্র প্রাণের স্পন্দন। এই প্রাণের প্রথম প্রকাশ হলো একটি অদৃশ্য জীবকোষকে বাহন করে, ধীরে ধীরে এরা সংঘবদ্ধ হয়ে উৎকর্ষ, বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে এই প্রাণলোককে নিয়ে চললো এক অভিনব সৃষ্টির পথে। নিজেকে বহুগুণিত করার একটা পরমাশ্রম শক্তি স্রাব্য ক্ষয়ের ভিতর দিয়ে তারা মৃত্যুকে জয় করলো।

ভূতত্ত্বের প্রশ্ন খুবই জটিল, এমন একটা সমস্যার খবর জানতে চাই যখন কোনো জীবই পৃথিবীতে আসে নি, বা এলেও এমন কোনো ভাষা তাদের ছিল না যা তারা লিখে রেখে গেছে। সেই না-জানা ইতিহাসের শূন্য পৃষ্ঠায় মানুষের দূর্বোধ্য ভাষায় পর পর যে-সব রহস্য সাজানো আছে তা আহরণ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। অতীত যুগের যে-সব চিহ্ন থেকে পৃথিবী-সৃষ্টির

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ইতিহাস রচনার জটিল কাজ সমাধান করতে হয়, তা বইয়ের পাতার মতো পর পর সাজানো নেই, ওলট-পালট হয়ে এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের পারস্পর্য স্থির করতেই চূতাব্জকের বহু যত্ন কেটেছে। শুধু পৃথিবী সম্বন্ধেই এতটা বিস্তারিত আলোচনা 'বিশ্বরচনা' গ্রন্থে দেওয়া সমীচীন হবে কিনা ভাবছিলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই গুরুদেব ডেকে পাঠালেন। বললেন যে, 'বিশ্বরচনা' বইটার যে-কালের হতে চলেছে তাতে

তার অঙ্গচ্ছেদ করা তিনি আবশ্যিক বলে মনে করেন। দুটো আলাদা বই হলেই ভালো হয়। স্থির করলেন, একটায় থাকবে পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌর-লোক, খুব সংক্ষেপে গ্রহলোক ও ভুলোক। আরেকটায় থাকবে পৃথিবী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা—বিভিন্ন মতবাদ সহ তার জন্মবৃত্তান্ত, ক্রমবিকাশ, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন, বায়ুমণ্ডল, আগ্নেয় প্রকাশ, প্রাক-কালীন প্রাণিবৃত্তান্ত, মানুষ্যের আবির্ভাব ও তার বর্তমান পরিণতি

ইত্যাদি। প্রথম বইটার নাম হবে "বিশ্ব-পরিচয়", দ্বিতীয়টার নাম "পৃথিবী-পরিচয়" গ্রন্থের কালের বৃন্দ্র সমস্যাটা গুরুদেব এভাবেই সমাধান করার সিদ্ধান্ত করলেন, আরও নির্দেশ দিলেন প্রথমে ছাপা হবে "বিশ্ব-পরিচয়" তারপর "পৃথিবী-পরিচয়"। আদেশ হলো, বিষয়বস্তু পুনর্বিব্যাসের কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র হওয়া চাই, বেশি দেরী করলে চলবে না। পুনর্বিব্যাসের কাজ খুবই কঠিন, ভুল-ভোগী ছাড়া আর কেউ এর জটিলতা ধারণাও করতে পারবেন না। তখন

বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বরে কষ্ট পাবেন কেন?



বিনাকা ফ্লোরাইড ব্যবহার করুন

ইহা দন্তক্ষয় ও কষ্টদায়ক ক্ষয়গহ্বরের যত্নসাধ থেকে বাঁচায়। বিনাকা ফ্লোরাইড আপনার দাঁত সুদৃঢ় করে এবং সুস্থ রাখে। ক্ষয়ের প্রারম্ভেই ইহা দাঁতের এনামেলকে সারিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

ভারতের মধ্যে একমাত্র ফ্লোরাইড টুথপেস্ট হোল-এই বিনাকা ফ্লোরাইড, যাতে সোডিয়াম-ফ্লোরাইড-ফসফেট (এস-এম-এফ-পি) আছে এবং যার বৈশিষ্ট্যঃ

- ১। মুখে ক্ষতিকর এসিড প্তন, রোধ করে,
- ২। দাঁতের এনামেলকে সুদৃঢ় করে
- ৩। বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বর প্রতিরোধ করে।



বিনাকা ফ্লোরাইড।

দন্তক্ষয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বর প্রতিরোধের
ত্রিবিধ উপায়

ULTRA-CLEAN

থেকেই পুণে দিয়ে বিশ্ব-পরিচয় গ্রন্থের নতুন পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেল।

তখন শীতকাল, একদিন অপরাহ্নে বনমালী এসে সমন ধরিয়ে দিল, গুরুদেব অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। অসময়ে এরকম জরুরী তলব! শংকিত হয়ে তক্ষণ বেরিয়ে পড়লাম। “বিশ্ব-পরিচয়” নতুন শুরুর-করা পাণ্ডুলিপিখানি নিয়ে। গুরুদেবের ঘরের কাছাকাছি যেতেই দেখি রূপার গায়ে এক ভদ্রলোক (তার নাম আমি করব না) তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন। কাছাকাছি এসে “এই যে” বলেই আরো দ্রুতবেগে চলে গেলেন। অন্যদিন দেখা হলে ভদ্রলোক অনেক কথা বলেন, সেদিন এই ব্যতিক্রম দেখে খুব আশ্চর্য হলাম। ঘরে ঢুকে দেখি গুরুদেব প্রসন্নমুখে বসে আছেন, হাতে Sir Arthur Eddington-এর একখানা Astronomy-র Popular Series-এর বই, সামনে প্রকাণ্ড টেবিলের ওপর আরো অনেক বই ও গুরুদেবের ছবি আঁকার ও লেখার সরঞ্জাম। স্মিতহাসে বললেন—“Popular Science Series-এর দু'খানা বই আনিয়াছি, একখানা Arthur Eddington-এর, আর একখানা James Jeans-এর। বড়ো ভালো লাগলো বই দু'খানা; এদের মধ্যে অনেক নতুন তথ্য আছে যা ‘বিশ্ব-পরিচয়’ গ্রন্থের পরমাণুলোক ও নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে একটা গোপন খবর দিচ্ছি।” বলেই একটা ছোটো ট্রে সামনে ধরে বললেন, “যেটা পছন্দ হয় নিয়ে নাও।” ট্রে-ভর্তি প্রায় ডজনখানেক ফাউন্টেন পেন, নানা রঙের; চমকে উঠে বললাম—“সে কী, আপনার কলম কেন নেব!” বললেন—“না দিলে তো আবার চাদর চাপা দিয়ে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে যাবে। সেদিন কলম কানে গুঁজে রেখে আমার কলম হারিয়েছিল, আর বনমালী তা খুঁজে বের করেছিল, সেই কলমটাই আমার চোখের ওপর দিয়ে আজ চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল। এই একটু আগেই যিনি এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ধীরে ধীরে গায়ের চাদরখানা দিয়ে কলমভর্তি এই ট্রে'র একাংশ ঢেকে ফেললেন, পরিষ্কার দেখলুম আমার কলমটায় হঠাৎ গতিসঞ্চার হলো, তারপর ভদ্রলোকের চাদরের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। লজ্জায় ঘণায় স্তম্ভ হয়ে রইলাম, কলমটা পরহস্তগত হতে দেখে আমিই লজ্জা পেলাম, কিন্তু গ্রহীতা নির্বিকার, প্রতিবাদ করতেও ঘণা বোধ হলো। তিনি চলে যেতেই মুহুর্তে

মনের স্বাভাবিক টেন্ডেন্স ফিরিয়ে এনে ক্ষুদ্রতার জগৎ থেকে প্রবেশ করলুম Eddington-এর লেখা এই উদার মহান নাক্ষত্রলোকে।”

তারপর নাক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে অপূর্ব সুন্দর এক আলোচনা করলেন, তার সারাংশ হলো—ভিডের মধ্যে দেখা যায় কেউ বা শিশু, কেউ বা যুবা, কেউ বা বৃদ্ধ; নক্ষত্রের ভিডের মধ্যেও দেখি কেউ বা নবীন, কেউ বা প্রৌঢ়, কেউ বা প্রাচীন। এই প্রৌঢ়ের দলেই সূর্যের স্থান। যে-ছায়াপথের এলাকায় আমাদের সূর্য রয়েছে তার দখলে আছে কোটি কোটি নক্ষত্র; আপাতদৃষ্টিতে স্থির বলে মনে হলেও এদের প্রত্যেকেই এই ছায়াপথের কেন্দ্রের চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে, সূর্য তার গ্রহপরিবার নিয়ে দৌড়োচ্ছে সেকেন্ডে প্রায় দুশো মাইল বেগে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এদের মধ্যে কেউ এই নাক্ষত্রজগতের শাসন ছাড়িয়ে বাইরে উধাও হয়ে যায় না। এক বাকী টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা খালি পাক খাচ্ছে। আমাদের নাক্ষত্রজগতের দূর-বর্তী বাইরের জগতেও এই ঘূর্ণিপাক। এদিকে পরমাণু জগতের অণুতম আকাশেও চলেছে প্রোটোন-ইলেকট্রনের এই ঘূর্ণিনাচ। কালস্রোত রয়ে চলেছে নানা জ্যোতির্লোকের নানা আবতে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বকে বলে ‘জগৎ’। অর্থাৎ এর সংজ্ঞা হচ্ছে : এ চলেছে, চলাতেই এর উৎপত্তি, চলাই এর স্বভাব। নাক্ষত্রলোকের দেশকালের পরিমাপ, পরিমাণ, গতিবেগ ও তার অগ্নি আবতের অচিন্ত্যময় প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি, একথা স্বীকার করতেই হবে, বিশ্বের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, মানুষ তাদের জানছে। ক্ষুদ্রদীপ ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্ব-সংস্থতির অণুমাাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীম বিশ্বলোকের অপরিমেয় বৃহৎ ও দূরবিধগম্য সূক্ষ্মের হিসেব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশেষ আর কিছু নেই। ভূমা বাইরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়। আরো একটা জিনিস দেখতে পাই, নক্ষত্রের অভ্যন্তরে তেজের যে দুর্নিবার উদ্দামতা চলেছে তারই প্রবল অভিঘাতে পরমাণুর বিনাশ ঘটে, পরিবর্তে সৃষ্টি হয় এক সুতীর তেজ। নক্ষত্রের ভাঙার এতো বৃহৎ যে, তার মধ্যে পরমাণু ধ্বংসের এই প্রলয়কাণ্ড বহুকাল ধরে চলতে পারে, এই অপরিমিত লোকসানেও তার রিক্ত হতে লাগে বহু কোটি বছর। নক্ষত্রের মধ্যে

একতরফা শূন্য লোকসানই ঘটে না, নতুন বস্তু সৃষ্টিতে তার ভাঙারে খানিকটা জমাও হয়। জানি না, নক্ষত্র-লোক বস্তুক্ষেয়ে ধ্বংসের দিকে চলেছে, না নতুন বস্তু সৃষ্টিতে গড়ে ওঠার দিকে চলেছে, না লাভ-লোকসানের সমন্বয়ে একটা স্থিতির দিকে চলেছে! কথাগুলি মনে রাখতে বললেন, ‘বিশ্ব-পরিচয়ে’ নক্ষত্রলোক অধ্যায়ে যথাস্থানে সন্নিবেশ করতে হবে; আরো অনেক অভিনব তথ্য এই দু'টি বইয়ের মধ্যে আছে যা পরমাণুলোক ও সৌরলোক অধ্যায়ে সংযোজন করা যেতে পারে। আলোচনা শেষ করে বললেন—“পৃথিবীর বৃহত্তর রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কেরা যদি জ্যোতির্বিদ্যার বইগুলি ভালোভাবে পড়তেন তাহলে স্বার্থে স্বার্থে সংঘাতের পরিসমাপ্তি হতো, পৃথিবীর বৃদ্ধ থেকে লুপ্ত হয়ে যেত হানাহানি, ক্ষয়, বিধ্বংস, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ। পৃথিবী হতো শিব ও সুন্দরের আবাসস্থল। ইচ্ছে হয় এদের এক সেট করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই উপহার দিয়ে দেখি পৃথিবীব্যাপী এই প্রলংকর হানাহানির উদ্দামতা প্রশমিত হয় কি না।” Carl Hujer নামে অস্ট্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের এম এম অধ্যাপক এলেন শান্তিনিকেতনে। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে, বিশেষ করে নীহারিকামণ্ডলী ও নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে, অতি প্রাজ্ঞ ভাষায় তিন দিনে এমন তিনটি সুচিন্তিত জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিলেন যে, যারা এই বক্তৃতামালা শুনছেন তারা সবাই অভিভূত হয়ে পড়েন। গুরুদেব খুবই খুশি হয়ে Carl Hujerকে বলে দিলেন—“আপনারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিন আপনাদের নব জ্যোতির্বিজ্ঞানের উদাত্ত বাণী, হিংসা ও ক্ষুদ্রতার অন্ধকূপ থেকে মানুষ মুক্ত হয়ে আলোর পুণ্য-ধারায় স্নান করে বৃহত্তর নবজীবনের মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।” শান্তিনিকেতনে ছেড়ে যাবার আগে প্রফেসর Hujer গুরুদেবের কাছে বিদায় নিতে গেলেন, বললেন—Poet, I would be grateful for a message from you. গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে লিখে দিলেন—“Science reveals light and light reveals life.” প্রফেসর Hujer এই message পেয়ে ভারি খুশি; বললেন, তিনি প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন কিন্তু এরকম মহান উদার বাণী আর কোথাও পাননি। এ একটি অমূল্য সম্পদ, তিনি সারা জীবন সযত্নে রক্ষা করবেন। [ক্রমশ]

জোয়া মোয়াদ্দা কারিগরী

মাউ মাউ

বন্দী

অনুবাদ.

বিশ্বনাথ ঘোষ

পূর্ব-প্রকাশিতের পর।

বন্দিশািবরের কর্মধ্যক্ষ আমরা জন ষাটতে আপত্তি করায় প্রহরীদের ওপর আদেশ দিয়েছিলেন যে, দিনে-রাতে সব সময় যেন আমাদের তাঁবুর ভেতরই রাখা হয়। আমরা এই নিয়মের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিলাম কিন্তু কোনই ফল হয় নি, কাজেই একদিন রামাঘর থেকে খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁবুতে ফেরবার সময় আমরা সবাই এক-জোটে ভেতরে ঢুকতে আপত্তি জানাই। প্রহরীরা তৎক্ষণাৎ আমাদের চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে ভেতরে নিয়ে যাবার জন্য। এইরকম যে হতে পারে তা আমরা আগে থেকেই আঁচ করে নিয়ে-ছিলাম এবং স্থির করেছিলাম যে, প্রয়োজন মতো আমরাও তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করব। ষাটপট করে সবাই পাথর, নুড়ি, থালা-বাসন যে যা হাতের কাছে পাই, তাই তুলে নিয়ে একযোগে প্রহরীদের প্রতি আক্রমণ করি; কিছু-সংখ্যক গাছের ডাল বেড়া তৈরি করবার জন্য এক জায়গায় জড়ো করে রাখা ছিল, তারও যথাযথ ব্যবহার করতে স্মিধা করি নি আমরা। রবিনসন এবং তার দলের লোকেরা পাশের তাঁবুতে তাল-বন্ধ অবস্থায় ছিল, আমাদের মারপিট.

হৈ-চৈ-এর আওয়াজ শুনে তারাও ভেতর থেকে জোর করে প্রহরীদের সরিয়ে বেরিয়ে আসে আমাদের দলবান্ধি করতে। উদ্ভত থালা-বাসন ও পাথরের টুকরার সংঘর্ষে এসে দু'পক্ষেই কিছু কিছু লোক জখম হয়েছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে আমরা প্রহরীদের হাটিয়ে দিতে সক্ষম হই। আমার বন্ধু গাদ্ কামাউ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বেশ চোট পেয়েছিল, কিন্তু সৌভাগ্যবশত অঙ্গপাদিনের ভেতরই সে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে আমরা চারবার গুলী ছোড়ার আওয়াজ পাই এবং দেখি যে, কর্মধ্যক্ষ কেডাল বন্দুক হাতে একা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি আমাদের সবাইকে চূপ করে বসতে বললেন এবং আমরা কতোজন বন্দী সেখানে উপস্থিত ছিলাম তা গোণবার পর সবাইকে তাঁবুতে ফিরে যেতে বলেন। আর কোন রকম মারামারি করতে নিষেধ করে তিনি বলেন যে, তারপর দিন সকালে আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে কথাবার্তা বলবেন।

আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার করে আমাদের অসন্তোষের কারণ বন্ধিয়ে বলি : এ নিচু টিনের ছাদের তাঁবুর ভেতর সারাদিন সারারাত বন্দী হয়ে থাকা এবং আগুন চুল্লির ভেতর গিয়ে বসে থাকা প্রায় একই ব্যাপার এবং বন্দী

হয়েছি বলে যে গরমে পুড়ে মরতে হবে, এমন কোন নিয়ম কোথাও লেখা নেই, কাজেই.....। কর্মধ্যক্ষ আমার যুক্তি মেনে নেন এবং তারপর থেকে সারাদিনের ভেতর বেশ কয়েকঘণ্টা বাইরে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন তিনি আমাদের। অবশ্য আমার তরফ থেকে এখানেই এর ইতি হতে দিইনি আমি। সমস্ত ঘটনা জানিয়ে আমি কেনিয়া সরকারের প্রধান কর্মসচিবকে একটি চিঠি পাঠাই এবং তাঁর নকল মিঃ মাথু এবং মিঃ আয়োরিকেও পাঠাই। তাঁরা তখন কেনিয়ার বিধান-সভায় মনোনীত আফ্রিকান সদস্যরূপে কাজ করছিলেন। যনিচ প্রহরীদের সঙ্গে মারামারি করার ফলে তাদের ও আমাদের ভেতর বিশেষ সম্ভাব ছিল না, তবু দু-একজনকে তার পরেও আমি হাতে রাখতে পেরেছিলাম এবং এদেরই এক-জনের সাহায্যে চিঠিগুলি যথারীতি ডাকে পাঠাতেও সক্ষম হই আমি। একজন প্রহরীর স্মৃতি ছুটিতে কিম্বু বেড়াতে যাচ্ছিল এবং সে নিজের অন্তর্বাসের ভেতর চিঠিগুলি লুকিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

মাগেটা নামক দ্বীপেও কিছু সংখ্যক মাউ-মাউ বন্দী ছিল, এ সময়ে এবং সেখান থেকে আগত কয়েকজন প্রহরীর কাছে আমরা জানতে পারি যে, সেখানেও বন্দীদের ভেতর যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। এই খবরে অবশ্য আমি আশ্চর্য হই নি, কারণ মানিয়ানি থেকে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়বার আগে আমরা সবাই স্থির করেছিলাম যে, সেখানেই পাঠান হউক না কেন বা যাই হউক না কেন, আর আমরা জন খাটব না। এই-ভাবে কাজ করতে অস্বীকার করাই ছিল কেনিয়া সরকারকে বিরত করার সবচেয়ে ভাল উপায় এবং আমরা এর যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করতে বন্ধপারিকর হয়েছিলাম।

বন্দীদের ভেতর অসন্তোষ বৃদ্ধির কারণ সম্বন্ধে খোঁজ-খবর এবং এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করার জন্য কেনিয়া সরকার পাঁচজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান আরক্ষা বাহিনীর কর্মচারীদের নিয়ে একটি কমিশন তৈরি করেন। তারা প্রথমে মাগেটা এবং পরে সাইয়ুদিস দ্বীপ পরিদর্শনে আসে এবং "যথাকর্তব্য" যে তারা করেছিল তাতে আর সন্দেহ কি! সাইয়ুদিসতে তারা বাছা বাছা বিষয়গুলি-জন বন্দীকে প্রশ্নাদির জন্য দপ্তরখানায় ডেকে নিয়ে যায় এবং সেখানে প্রত্যেককে যতদূর সম্ভব ভয় দেখানোর পর লাঠি ও মর্টার সহযোগে বেশ কয়েক-ঘা বসিয়ে দিতেও পেছপা হয় নি। তারা ছিল একসঙ্গে পাঁচজন, আর আমরা প্রত্যেকে একা. কাজেই বাধা দেওয়ার ক্ষমতা

আমাদের কারদুরই ছিল না। তবু যতদূর সম্ভব আমি নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছিলাম অথবা মারের হাত থেকে। এইভাবে মারধোরের পর আমাদের ভেতর থেকে পাঁচজন বন্দী সরকার পক্ষকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু আমরা বাকি সাঁইগ্রিশ জন ছিলাম অটল। আমাদের আরও সাজা দেওয়ার জন্য একটা কুঁড়েঘরে রবিনসন ও আমাকে বন্দী করা হয় এবং বাকি পঁয়ত্রিশ জনকে আর একটা বড় ঘরে চালান দেওয়া হয়। বোধহু প্রহারের চোটে আমাদের গায়ের জামা ছিঁড়ে একেবারে ফালি গেরে গিয়েছিল এবং সারা গায়ে ফুলো ফুলো দাগে ভরে গিয়েছিল। সে রাত্রি আমাদের বড় কষ্টে কাটে; গায়ে ঢাকা দেবার জন্য কোন কম্বল পাই নি আমরা, আর রাইবেলার দারুণ শীতে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরা ছাড়া শীত নিবরণের আর কোন উপায়ও খুঁজে পাই নি।

মেরানে আমাদের নিরাভরণ গায়ের উপর মশার অত্যাচারও হয়েছিল অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি এবং সব থেকে বেশি কষ্টকর হয়েছিল প্রস্রাব করার ইচ্ছাকে দমন করে রাখা, কারণ এর জন্যে কুঁড়েঘরের ভেতরে কোন বালতি বা কোন নালাও ছিল না। বহু অপেক্ষার পর দরজার তলা থেকে প্রভাসদূর্যের আলো দেখতে পেয়ে সৌন্দর্য আমাদের আবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি।

তার পরদিন আবার আমাদের কিসু-মুর ওডিয়াগা বন্দিশিবিরে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়; সেখানে মাগেটা স্বীপ থেকেও কয়েকজন বন্দীকে ফেরত আনা হয়েছিল এর ভেতর। তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ওডিয়াগাতে আমাদের সংখ্যা দাঁড়ায় সব সমেত প্রায় চার শত। আমাদের আগেকার সেই বোড়ি আবার পায়ে উঠে এবং প্রতি পদক্ষেপে তার 'রিনটিন' শব্দ আমাদের জানিয়ে দিতে থাকে যে, আমরা বন্দী, আমরা অন্তরীণ, আমরা দেশকে ভালবেসেছি এই মহান অপরাধে আগরাধী। এই ওডিয়াগাতেই সেবার আমার জোসেফ কিরিরার কারেডুর সাথে প্রথম জালাপ হয়, এবং তখন থেকেই আমরা সুহৃদ, বন্ধু ও সহকর্মীরূপে কাজ করছি আজ অবধি। জোসেফকে আমার প্রথম থেকেই খুব ভাল লেগেছিল, সে ভারি সং চরিত্রের এবং অক্লান্তকর্মী দেশসেবক হিসেবে সন্মান করেছি। রবিনসন, জোসেফ এবং আমি 'ইনজনে' মিলে স্থির করি যে, অন্য সমস্ত বন্দীর ভেতর জাতীয়তাবাদ, আত্মবিশ্বাস ও দেশোদ্ভবিত অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তোলাই হবে আমাদের কার্য-প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। ওডিয়াগার শ্রমবীর্যও আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল

ছিল, তাদের একজনকে পাঁচ শিলিং পয়সা দিয়ে আমরা একটি চিঠি কৈনিয়ার বন্দিশালার মহাধ্যক্ষের কাছে পাঠাই—তাতে আমাদের নালিশ ছিল যে এখানে আবার আমাদের রেশনের পরিমাণ কেটে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে।

কৈনিয়া সরকার বোধ হয় এর ভেতর আমাদের মতো চরমপন্থী বন্দীদের নিয়ে তীব্রবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং ঠিক কোথায় পাঠাবেন বা কি করবেন আমাদের নিয়ে তা স্থির করতে পারাছিলেন না। একদিন আরক্ষাবাহিনীর বিশেষ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ান কর্মচারী আমাকে বলেন যে, "কৈনিয়া সরকার এবার তোমাকে ও আরও কয়েকজনকে লডুওয়ার নামক এক বন্দিশিবিরে চালান করবেন, সেখানে ভীষণ গরমে তুমি পুড়ে মরতে পারবে সহজেই।" উত্তরে আমি শূন্য হেসে তাঁকে বলি যে এভাবে কোনদিনই সরকার আমাদের অনমনীয় উৎসাহকে বিনষ্ট করতে পারবেন না। সে বিষয়ে সবাই নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন। আমাদের ভেতর অনেকের মনেই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে, যত দুঃখকষ্ট, জ্বালা-বল্লগা আমরা এখাবৎ ভোগ করছি, তারপর আর কোন কিছুই আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। একমাস কাল ওডিয়াগায় থাকার পর ১৯৫৬ সালের ১১ই আগস্ট আমাদের কিসু-মুর বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়, লডুওয়ারে চালান করার জন্য। এখানে বলে রাখা দরকার যে, লডুওয়ার কৈনিয়ার উত্তরে মরু অঞ্চলের কাছে অবস্থিত, সেখানে কার্হেপটে কোন লোকালয় নেই এবং মোটর গাড়ি যাবার রাস্তাও খুবই খারাপ, কাজেই বিমানে যাতায়াত করাই সব থেকে সুবিধা। আমাদের মতো বন্দীদের ভাগেও তাই কিছু বিমানযাত্রা জুটে গিয়েছিল।

এই বিমানযাত্রার সময় আমাদের পায়ে বোড়ি খুলে নিয়ে তার বদলে দু'জন করে বন্দীকে একসঙ্গে করে একটি হাতকড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। আমার জোড়া হিসেবে পেয়েছিলাম আমি কিরোরি মটোরকে, ষাট বছরের জোয়ান এবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী এক কিছুমূকে। এই বয়োজ্যেষ্ঠ ঝগড়াটিকে নিয়েও কৈনিয়া সরকার কি করবেন ভেবে ঠিক করতে না পেরে শেষ অবধি আমাদের সঙ্গে লডুওয়ারে চালান দিচ্ছিলেন। কিরোরি মাউ-মাউ বন্দী হবার আগে নেয়েরী অঞ্চলের একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাদার এবং কেসখানকার আফ্রিকানদের হিতৈষী বন্ধু ছিল। ১৯৬১ সালে সে আবার নেয়েরী অঞ্চলে কে. আ. ন্যা. ইউর নির্বাচিত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হয়।

বিমানে আমরা সব সমেত পঁয়ত্রিশ জন বন্দী ছিলাম; ১৭ জোড়া হাতকড়ি ৩৪ জন বন্দীকে ধরে রেখেছিল এবং গাথোকিয়া নামক এক বৃক্ষের দুই হাত একসঙ্গে করে বাঁধা ছিল আর একজোড়া হাতকড়ি দিয়ে। বেচারা সারা পথ কুঁকড়ে-মুঁকড়ে এককোণে পড়ে ছিল এবং দুই হাত দিয়ে নিজের পেট চেপে ধরে ক্রমাগত কাঁপছিল, যেমন ভীষণ জ্বর হলে পর কারুর অবস্থা হয়। পরে সে আমায় বলেছিল যে, বিমানের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকালে পর সে দেখতে পায় যে, ইঞ্জিন থেকে টপ্‌টপ্‌ করে তেল চুইয়ে পড়ছে। প্রথমে সে ভেবেছিল যে, বিমানের চালককে এ বিষয়ে জানাবে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছিল যে, যদি চালক এ বিষয়ে তদন্ত করতে আসে, তাহলে তো তাকে বিমানের স্টিয়ারিং ছেড়ে আসতে হবে এবং তাহলে বিমানের ধ্বংসও অনিবার্য। অনেক ভেবে-চিন্তে বেচারা শেষ অবধি কাউকেই কিছু না বলে নিজের পেট চেপে ধরে যে-কোন মুহূর্তে ইঞ্জিনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কালাতিপাত করেছিল সারা পথ।

বিমান ছাড়বার অল্পক্ষণ পরেই যাত্রীদের বসবার জায়গার সামনের দেওয়ালে একটি লাল বাতি জ্বলে উঠে এবং স্বর-বিবৰ্ণক যন্ত্রের ভেতর থেকে ইংরাজীতে আমরা শুনতে পাইঃ "ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের জলে ভাসবার জন্য ব্যবহৃত উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন হলে আপনাদের জলে ভাসিবার জন্য ব্যবহৃত কটিবন্ধ প্রত্যেকের আসনের তলায় পাবেন।" বিমানের ভেতরের খুব কম সংখ্যক বন্দীই ইংরাজী বুঝতে পারতো, কাজেই আমরা যে কজন এই উক্তি মনে মনে ধারণা করতে পেরেছিলাম, তারা আর সবাইকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা এবং হাতকড়ি পরা অবস্থায়ই যথাসম্ভব চেষ্টা করি কটিবন্ধ টেনে বার করবার আসনের তলা থেকে। বেচারা গাথোকিয়া কোন-রকম নড়বার-চড়বার চেষ্টা না করে আগের মতোই নিজীব অবস্থায় পড়ে ছিল, হয়তো সে তখনো ইঞ্জিনের তেল চুইয়ে পড়ার কথাই ভাবছিল। কটিবন্ধের উপর কোন ভরসাই সে করতে পারে নি এবং দুই হাতই বন্ধ থাকার ফলে তার ক্ষমতাও ছিল না কিছু করবার এ বিষয়ে। আমরা ভাবছিলাম যে, যদি কোন কারণে বিমান জলেই নামতে বাধ্য হয় হঠাৎ করে, তা হলে কি চালক বা অন্য কেউ পারবে সময়মতো আমাদের হাতকড়ি খুলে দিতে? শেষ অবধি ভগবানের ভরসায় নিজেকে ছেড়ে দিয়ে গা এলিয়ে দিয়ে

চূপ করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নি আমরা।

আমরা যে সমস্ত বন্দী ঐ বিমানে লন্ডনে গিয়েছিলাম কিসদুদ থেকে, তারা সবাই খুব ভাগ্যবান বলতে হবে, কারণ আমাদের বিমান সেখানে পৌঁছেছিল সন্ধ্যার পর এবং ফলে লন্ডনের কতৃপক্ষের তরফ থেকে আয়োজিত "বন্দী-

অভ্যর্থনা" থেকে আমরা রেহাই পেয়েছিলাম। জোসেফ কিররা আমাদের আগের বারে লন্ডনে পৌঁছেছিল এবং তার কাছে আমি জানতে পারি যে, বিমান থেকে অবতরণ করবার পরই তাদের প্রত্যেককে মাথায় এককড়া পাথর নিয়ে দৌড়াইতে হবে বেড়াতে হয়, নিতান্ত অকারণে! তা ছাড়া সেখানকার তুর্কানা

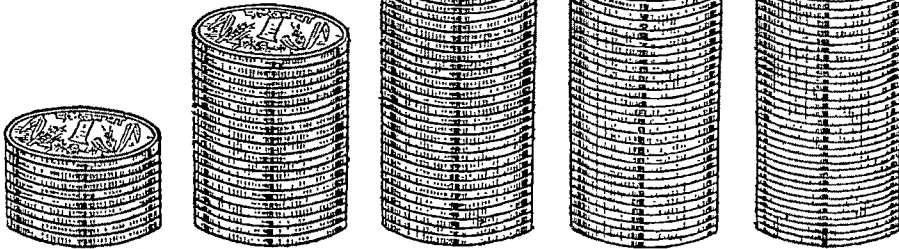
উপজাতীয় প্রহরীরা প্রত্যেককে ধরে বেশ একচোট মারধোরও করেছিল কোনরকম অন্যায় করবার আগেই। নুগুনি মোয়ারার নামক একজন বন্দী এতো আঘাত পেয়েছিল যে, বেচারার সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং তাকে স্ট্রেচারে করে শিবিরের ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হয় শব্দহীন করবার জন্য। মেরানেই আমি, রবিন্সন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আপনার জমা টাকা বেড়েই চলেবে

এখন ব্যাঙ্ক জমার ওপর বছরে ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদে আয়কর দিতে হয় না।
পিএনবি-তে আপনার টাকা জমা রাখুন, দেখবেন জমা টাকা কুমেই বেড়ে চলেবে।

আপনাদের সেবার জন্যে সারা ভারতে আমাদের ৬৬৫টির বেশী শাখা আছে। আমাদের সেভিংস বা ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে টাকা জমা রাখুন। ফিক্সড ডিপোজিটে সুদের হার বেশী পাবেন।

করমুক্ত ৩০০০ টাকা সুদ পেতে হলে আমাদের ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে কতদিনের মেয়াদে কত টাকা জমা রাখতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল :-



মেয়াদ	৯১ দিন	৬ মাস	৯ মাস	১২ মাস
টাকার পরিমাণ	৩,০০,০০০ টাকা	১,৩৩,৩৩৩/৩৩ টাকা	৮০,০০০ টাকা	৫৪,৫৪৫/৪৫ টাকা
বার্ষিক সুদের হার	৪%	৪২%	৫%	৫২%

ব্যাঙ্কে ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমার ওপর সম্পদ কর লাগে না।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবার নিয়োজিত

ক্যাংগোডিয়ান : এস. সি. ত্রিখা

আর জোসেফ তিনজনে মিলে শিবিরের কর্মধ্যক্ষ বাকস্টন নামক একজন ইউরোপীয়ানকে একটি নালিশ করে চিঠি লিখ এবং এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে তার পরদিনই কথাবার্তা বলতে অনুরোধ করি। তিনি এসেছিলেন এবং সব বন্দীকে একত্রিত করে ভাঙা ভাঙা শোয়াহিল ভাষায় যা বলছিলেন, তার মর্মার্থ হল : "তোমরা সবাই অত্যন্ত বদমাইস এবং চরমপন্থী মাউ-মাউ বন্দী; তোমরা সাইয়ুদিস এবং মাগেথা স্বীপে অবস্থিত বন্দি-শিবিরে থাকাকালীন জন খাটতে অস্বীকার করেছিলেন এবং সেখানকার কর্মধ্যক্ষদের জালিয়ে মেরেছিলেন। এখানে তোমরা সবাই জন খাটবে, তা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক এবং আমি যে-কোন উপায়েই তোমাদের বাধ্য করবোই এ বিষয়ে। যদি তোমরা এ আদেশ অমান্য করো, তাহলে এর ফল কি হবে তাও দেখতে পাবে।" এরপর তিনি আসন গ্রহণ করলে পর গাথোগো মাইটুমি উঠে দাঁড়িয়ে বাকস্টনকে বলে যে, তিনি যেন লডুওয়ারের জেলা মহাধ্যক্ষকে ডেকে পাঠান, কারণ তাঁর সাথে আমরা জন খাটার বিষয়ে কথাবার্তা বলতে চাই। বাকস্টন তড়াক করে লাফিয়ে উঠে উত্তর দেয় : "তোমরা—আমি চাই যে তোমরা খুব ভাল করে একটা কথা এখনি বুঝে নাও। আমি এই শিবিরের অধ্যক্ষ এবং আমি-ই তোমাদের ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুই মালিক। আমি লডুওয়ারের জেলা-মহাধ্যক্ষ এবং আমি-ই এখানকার রাজ্য-পাল। আমি লডুওয়ারের ভগবান! আমি সবরকমে তোমাদের শাস্যেস্তা করতে প্রস্তুত এবং আমার হুকুম না মানা পর্বন্ত যে-কোনভাবেই হোক না কেন, আমি তোমাদের চিট করবো।" গাথোগো তখন আবার জিজ্ঞাসা করে বাকস্টনকে যে, কোন সরকারী নির্দেশনায় তিনি আমাদের জন খাটাতে বাধ্য করতে পারেন এভাবে। বাকস্টন সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে উত্তর দেয় : "তোমরা যেসব নিয়ম-কানূনের কারিগরি সাইয়ুদিস ও মাগেথায় চালিয়ে ছিলে, সেগুলো ভুলে যাও বিলকূল এখানে। কেনিয়া সরকার কিছু বোকা নয়। তোমাদের শাস্যেস্তা করবার জন্য এখানে পাঠান হয়েছে এবং শাস্যেস্তা আমি করবোই। লডুওয়ারে আমার হুকুমই হল নিয়ম এবং সে নিয়ম তোমাদের মানতে হবে। জন তোমাদের খাটতেই হবে। বাস, আমার আর কিছু বলবার নেই। যাও তোমরা এখন।" এর পরেই সে আর কাউকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই সেখান থেকে চলে যায়। তার এই দৃঢ়তারতা, স্পষ্টভাষণ

এবং কর্মপরায়ণতা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যদিচ সে যা করতে চাইছিল, তা আমাদের পছন্দ হয় নি, তবুও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, সে তার উপর আরোপিত কর্মসূচী পালন করছিল মাত্র এবং তাতে কারুর হস্তক্ষেপ যে সে সহ্য করবে না, সে কথাও খুব প্রাজ্ঞ ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল। এইরকম স্পষ্টবক্তা লোকটিকে আমার প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিল, যার কথায় এক, আর কাজে অন্য নেই। বোধ হয় এই জনাই আফ্রিকান রাজনীতিজ্ঞরা বিপথগামী মনোবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও ব্রিগস্ এবং ক্যাম্বোডেশ-বেনটিঙ্ক প্রমুখ কেনিয়ার ইউরোপীয়ান রাজনীতিজ্ঞদের ব্রানডেল বা হেল্ডকের চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। এই মনোবৃত্তির কারণ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, একটি নরম ভুলার বালিশের চেয়ে একটুকরা শক্ত কাগজকে কাটা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য।

সভাস্থল থেকে শিবিরে ফেরবার পথে আমরা সবাই ভাবছিলাম যে, কি কারণে কর্মধ্যক্ষ এতো চরমপন্থী ব্যবহার করছেন আমাদের সঙ্গে। আমার জন্য ১০ নম্বর তাঁবু নির্দিষ্ট হয়েছিল লডুওয়ারে এবং সেদিন গভীর রাতি অবধি আমরা অনেকে সেখানে বসে বসে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার আলোচনা করেছিলাম। এই সময় কিছুসংখ্যক মাউ-মাউ বন্দী নাইরোবি শহরের নিকটস্থ "আর্থ-রীভার" শিবির থেকে বদলী হয়ে লডুওয়ারে এসেছিল এবং তারা বলে যে, সেখানেও তারা জন খাটত। এই দলের ভেতর জেরেমিয়া, কিরুম ওয়া কিয়েরুও ছিল। এখন সে আমার সহযোগীরূপে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তারা সবাই লডুওয়ারেও জন খাটার স্বপক্ষে রায় দেয়। কিন্তু ওডিরাগা ও মাগেথা থেকে আগত আমাদের দলের অনেকেই এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এবং বলে যে, যে-কোন অবস্থাতেই আমাদের কেবল শিবিরের প্রয়োজনীয় বা অপরিহার্য কাজকর্ম ছাড়া অন্য কিছু করা বাঞ্ছনীয় হবে না। এই বাগবিতণ্ডা, আলাপ-আলোচনার মধ্যে আমার মনে কেবলই বাজছিল যে, কর্মধ্যক্ষ আমাদের একেবারেই বাজে হুমকি দেন নি এবং নিশ্চয় এমন কিছু একটা হয়েছে, যার ফলে তিনি এতো স্থিরনিশ্চিতভাবে আমাদের অনুরোধ-উপরোধ অগ্রাহ্য করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাদের কিরুম, প্রথান-যায়ী এইরকম সংকটকালীন অবস্থায় স্থানীয় দলপতি আর সকলের বৃত্তব্য শোনবার পর প্রত্যেকের মতামতের বিচার করেন এবং তারপর তাঁর নিজস্ব অভিমত

প্রকাশ করেন, যার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হয় না। উপস্থিত সবাই তাদের বৃত্তব্য শেষ করার পর আমি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলাম সেদিন : "ভাই সব, আমি অনেকদিন থেকে তোমাদের দলপতির কাজ করছি এবং এই কাজে তোমাদের সবরকম বিপদাপদ থেকে রক্ষা করাই হল আমার মূল্য উদ্দেশ্য। উপস্থিত আমরা বন্দিজীবনের এক সংকটকালীন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। আমার মনে হয় যে, এখনকার অবস্থা ঠিক সক্রিয় যুদ্ধের মতোই এবং খুব সাবধানে না এগুলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত।" তারপর আমি তাদের সকলকে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাশিয়া অভিযানের কথা বলি, যখন তিনি সমগ্র ইয়োরোপ জয় করতে করতে রাশিয়া অবধি এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে রাশিয়ান সৈন্যরাও ক্রমাগত পিছনে হঠতে থাকে এবং বিজয়োদ্ভাসে মত্ত নেপোলিয়ান তাদের খেদাতে থাকেন। তারপর এলো বিরাট শীতকাল, আর নেপোলিয়ান তাঁর অজ্ঞ প্রত্যাশিতা নিয়ে দারুণ ঠান্ডায়, অনাহারে কিভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচবেন ঠিক করতে পারেন নি। প্রচুর সংখ্যক ফরাসী সৈন্য সেবার বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল বিজয়ের শেষ মুহূর্তে। এই ঘটনার উল্লেখ করার পর আমি সমবেত সবাইকে মনে করিয়ে দিই যে, কর্মধ্যক্ষ তাঁর বৃত্তব্য বলেছিলেন, যদিচ আমরা সাইয়ুদিস এবং মাগেথায় সরকারী নিয়ম-কানূনের জোরে জন খাটতে অস্বীকার করেছিলাম, তবুও কেনিয়া সরকার একেবারে বুদ্ধিহীন নন। আমার মনে হয়, এর একমাত্র অর্থ এই যে, হয় কেনিয়া সরকার, না হয় বিলেতের ঔপনিবেশিক দপ্তর এখন নিয়ম-কানূনের রদবদল করে দিয়েছেন, যার ফলে তাঁরা এখন আমাদের জন খাটতে বাধ্য করতে পারেন। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমরা বরাবরই নিয়মমায়িক লড়াইতে চেষ্টা করেছি। যতদূর সম্ভব আমরা কোন অন্যায় বা নীতিবিরুদ্ধ কাজ করি নি এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাতেই পেরোঁজি আমরা সব থেকে বেশি মানসিক বল। আমি একথা তোমাদের বলা উচিত বলে মনে করি যে আমার মতে এখন আর জন খাটার বিরুদ্ধে সরকারী নিয়মের আশ্রয় আমরা নিতে পারব না এবং বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ করা খুবই বোকামির কাজ হবে আমাদের পক্ষে, কারণ সরকার তাহলে সহজেই আমাদের একেবারে বিনষ্ট করে ফেলাতে সক্ষম হবেন। কাজেই আমার মনে হয় উপস্থিত আমাদের জন খাটতে রাজী হওয়া উচিত এবং অন্য কিভাবে আমরা

সাপ্তাহিক বঙ্গমত!

স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারি তার জন্য সব সময়েই সশস্ত্র থাকি ও উচিত।

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর আমরা সবাই সোমবারে ১৩ই আগস্ট থেকে জন খাটব এই সিদ্ধান্ত করি। সোঁদন খুব ভোরবেলাই কর্মক্ষেত্র প্রহরীদের ডেকে তাদের হাতে রাইফেল, বন্দুক ইত্যাদি দিচ্ছিলেন, কারণ তিনি তখনও জানতেন না যে আমরা কাজ করতে স্বীকৃত হব কি না। আমরা পরে জানতে পারি যে, লড্‌ওয়ারের জেলা কর্মক্ষেত্রও নিকটেই ১২০ জন কৈনিয়া আরক্ষাবাহিনীর লোক এবং চাঁদ্রিশ জন তুর্কানা উপজাতীয় সৈনিককে নিয়ে সশস্ত্র অবস্থায় লুকিয়ে ছিলেন, যাতে আমরা জন খাটতে অস্বীকার করলেই তারাও এসে আমাদের এ বিষয়ে বাধ্য করতে পারে। কিন্তু তারা স্থান দেখলো যে, আমরা সবাই কোনরকম গোলমাল না করে কাজ করতে যাচ্ছি, তখন একটা বিরাট জয়ের আনন্দে সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। হায়, তারা বুঝতে পারে নি যে, আমরা শুধু আমাদের কর্মপন্থাই বদলোচ্ছি, হার স্বীকার করি নি। আমার মনে এর ভেতরই ‘আন্তে-কাজ’ এই কৌশলের সম্ভাবনা উৎকীর্ণকি মারতে আরম্ভ করেছিল, যাকে পরে আমরা শামুক-গতি নাম দিয়েছিলাম। এ ছাড়া অন্য আরও ন্যায়সঙ্গত বিবরণিতার কথাও ভাবছিলাম আমি। সরকারী প্রহরীদের সশস্ত্র অবস্থায় দেখে আমাদের দলের সবাই খুব খুশি হয়েছিল। সেদিন যে, তারা আমার কথা মেনে নিয়েছিল, না হলে কিছুসংখ্যক বন্দী নিশ্চয় খুব জখম হতো জোর-জুলুমের ফলে।

কৈনিয়ার মরুভূমির উত্তরাংশে রুদ-লাফ হ্রদ থেকে চাঁদ্রিশ মাইল দূরে লড্‌ওয়ারের অবস্থিতি। এখানে বৃষ্টি হয় খুবই কম, আর সেখানকার বেলে মাটি সরাসরি খুলি-খুসর করে রাখে চারিদিক। লড্‌ওয়ার কৈনিয়ার রাজধানী নাইরোবি থেকে সাড়ে চারশো মাইল উত্তরে, এমন কি সব থেকে নিকটস্থ কিকটালে শহরও লড্‌ওয়ার থেকে দশো মাইল দূরে। কয়েক শিবিরের মতো এখানেও চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়ের গুপ্তী এবং নিকটস্থ টার্ক-ওয়েল নদী, গরমকালে শাকিয়ে একেবারে বালুর চর দেখা যায়, যদিচ বর্ষাকালে সামান্য কয়েকদিনের জন্য সে ফুলে-ফেঁপে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রথমে সূর্যের তাপ সকাল ছটার পর থেকেই শূন্যে মাটিকে তাড়িয়ে গরম কড়ার মতো করে দেয়, আর, রাজ্যে সে তাপ নির্মূলক হয়ে ধরশীল ঠান্ডা হবার আগেই পরের দিনের সূর্যদেব আবার দেখা দেন।

রাতের গরমে গায়ে কম্বল বা অন্য কিছু চাপা দেবার প্রশ্নই ওঠে না। লড্‌ওয়ারের কাছে পাঠে তুর্কানা উপজাতীয় লোকেরা বসবাস করে এবং তাদের দারিদ্র্যপূর্ণ কষ্টকর জীবনযাত্রা যে-কোন লোকের মনেই দয়ার উদ্রেক করবে। এদের অনেকেই গরমের এবং অভাবের হেতু সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে চলাফেরা করে দিনে-দুপুরেও এবং গৃহপালিত গবাদির দুধ এবং মাংস খেয়ে কালাতিপাত করে। তাছাড়া পেঁপে জাতীয় মৃকোমা নামক এক গাছের ফলের উপরও এরা নির্ভর করে প্রচুর পরিমাণে। এই গাছগুলি পরিপুষ্ট অবস্থায় পনেরো থেকে কুড়ি ফিট উচ্চ হয় এবং এদের ফল আকারে প্রায় আপেলের মতো। তুর্কানারা এই ফলকে পিষে গরু বা ছাগলের রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে বেটে খায়। জীবন্ত গৃহপালিত গরু-ছাগলের গলায় অতি ক্ষুদ্র এক তীর-ধনুকের সাহায্যে একটি ছোট ফুটো করে সেখান থেকে কিছু পরিমাণ রক্ত তারা প্রায়ই বার করে নেয়া খাবার জন্য এবং এই রক্তই মৃকোমা ফলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। এ ছাড়া ঐ ফলকে গাঁজিয়ে নিয়ে তার থেকে মদও তৈরি করে তুর্কানারা এবং গাছের নরম পাতা দিয়ে তৈরি করে কুড়ি, বাস্ক বা মাদুর। আমরা লড্‌ওয়ারে আসার পর মৃকোমার পাতা আমাদের কুঁড়েরের চালায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করি তাপ নিবারণের জন্য, কিন্তু তুর্কানারা তাকে এভাবে ব্যবহার করতো না। মাত্র কয়েক দিনের ভেতরই আমি এই পাতা দিয়ে কুড়ি, মাদুর ইত্যাদি তৈরি করতে শিখে ফেঁল এবং এই সব জিনিস প্রহরীদের কাছে পাঁচ থেকে কুড়ি শিলিং অবধি দামে বিক্রি করে যৎসামান্য আয়ের উপায় করি। আমাদের নেতা জোমো কৈনিয়াটাকে আমার হাতে তৈরি একটি বাস্ক এবং টুপি পাঠাই এবং কিছুদিন পরে তাঁর মারালাল নামক বান্দিশিবিরে নেওয়া কয়েকটি আলোকচিত্রে ঐ টুপিটির ব্যবহার লক্ষিত হয়। এর কিছুদিন পরেই তাঁকে লোক-ট্যাংগ শিবিরে বদলী করে পাঠান কৈনিয়া সরকার। বান্দিশিবিরের প্রহরীরাও প্রায়ই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী হত, ফলে আমরা তাঁর খবরাখবর পেতাম।

লড্‌ওয়ারের যে শিবিরে আমরা অন্তরীণ হিসেবে ছিলাম আসলে সেটাই সেখানকার বান্দিশালা। মাউ-মাউ বিদ্রোহের প্রথম দফায় শাস্তিপ্রাপ্ত লোকদের ঐ বান্দিশালায় পাঠান হয়েছিল সেখানকার বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য। বান্দিশালাটি একটি বড় চতুষ্কোণ জায়গাকে ডবল করে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে তৈরি করা হয়েছিল; ঘেরা জায়গাটিকে মাঝামাঝি দৃভাগ করে

নিম্নে প্রত্যেক অংশটিকে আবার তিনটি ফালিতে ভাগ করা হয়েছিল এবং এইভাবে গঠিত ছয়টি ফালিই অন্য ফালি-গুলি থেকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আলাদা করা হয়েছিল। প্রত্যেক ফালিতে একটি পাথরের তৈরি দেওয়াল ও টিনের ছাদ দেওয়া কুঁড়িঘরের মতো ছিল, যার ভেতর ছিল চারটি করে খুপার ঘর। কোন ঘরে কে কে শোবে তা আমরা নিজেরাই ঠিক করে নিতাম ১৩ নম্বর ঘরে আমি ও আরও এগারো জন বন্দী ছিলাম। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা ঐ চতুষ্কোণ জায়গার বাইরে আমাদের রান্নাঘর, অন্য একটি ঘরে সেলাই মেশিন সমেত জামা-কাপড় সেলাই করার জায়গা এবং আমাদের জন্য ব্যবহৃত তেলের বাতিগুলি পরিষ্কার করার জায়গা ছিল। কিরোরি মঠোঁকুর কাজ ছিল শিবিরের সব আলোগুলির দেখাশুনা করা। এই প্রথম আমরা বান্দিশিবিরে রাখে ব্যবহারের জন্য আলো পেয়েছিলাম। রান্নাঘর থেকে অল্প একটু দূরে একসঙ্গে আরও দুটি ঘর ছিল, এগুলি কোন বন্দীকে নির্জন কারাবাস দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত।

লড্‌ওয়ারে চৌদ্দ মাসকাল থাকার সময় জোসেফ কিবিরি ও আমি একই ঘরে একই বিছানায় শুতাম, কারণ সেখানকার নিয়মানুযায়ী এক-একটি বিছানায় দু'জন করে বন্দী শোয়ার বরাদ্দই ছিল। শোয়াইলি ভাষার একটি প্রবাদে বলা হয়েছে, “উসিমুয়ামিনি মটু, ইকিয়া হামজামলিজা গুণিয়া লা চুম্বি পামোজা”, অর্থাৎ কারুর সঙ্গে বাস করে এক বস্তা নুনে শেষ না করা অর্থাৎ তাকে তুমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারো না। জোসেফ এবং আমি এখন একত্রে বিবর্তী নুনের বস্তা ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছি; সে আমরা রাজনৈতিক জীবনের ও ব্যবসার অন্তরঙ্গ বন্ধুবেশ।

[ক্রমশ]

এজেন্ট আবশ্যিক

EARN
Rs 650/-
PER MONTH

জাপান আর্ট পার্জি, টেলিফোন ব্যাটল, বোডিনেড পোয়াকি, নাইলনের মোটা চাই, গুয়েলেক্স, গুয়েলেক্স, বালনপত্র, প্লেডিস অর্ডার বক করিয়া, মাসিক ৬৫০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন অথবা আকর্ষণীয় কমিশনে ‘স্বাচ্ছন্দ্য’ প্রস্তুত পারেন। ভৎপর ইউন। বিনামূল্যে সর্ভবলী এবং পুরা নাটকের নমুনা ‘কমি’ অর্থাৎ পত্রা নির্ধন।

HURRY BOMBAY AGENCIES
WRITE Kalyanpur, Delhi-6.



এ-দিকটা অপেক্ষাকৃত নিজনি। আমরা পাশাপাশি হাঁটছিলাম। কিছুক্ষণ আগে অন্যান্য বন্ধুরা বালুর উপর হুটোপুটি করছিল, হৈ-হুয়া করছিল। তারপর রাত হলে ওরা কে কোন্‌দিকে হারিয়ে গেল। আমি আনন্দকে কাছ-ছাড়া করছিলাম না। দুপুরে ওরা আনন্দকে জোর করে জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আনন্দ প্রবলভাবে আপত্তি করছিল, হাত-পা ছুঁড়ছিল, কৈউ শোনে নি সে কথা। তারপর বিরাট একটা ঢেউ ওদের দিকে যখন তীব্রবেগে ছুটে আসছিল, তখন আতঙ্কগ্রস্ত আনন্দ চিৎকার করে বলেছিল, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম—। আমরা সকলে ওর সংজ্ঞাহীন দেহটা টানতে টানতে বালুর উপর এনে ফেলেছিলাম। সেই থেকে আনন্দ চর্প করে আছে। ওর দিকে তাকাতে কখনও কখনও ও একটু মৃদু হেসেছে। জলকে, সমুদ্রকে ওর ভীষণ ভয়। বন্ধুদের উৎসাহে, হয়ত বা সমুদ্রের ধারে সে বেড়াতে এসেছে বটে, কখনও জল থেকে অনেক দূরে শুকনো বালুর উপর পায়চারীও করে, কিন্তু একদিনে একবারও সে সমুদ্রের জল স্পর্শ করে নি। বেশির ভাগ সময়ই সে ঘরে থাকে, শূন্য-বসে বইপত্রের পৃষ্ঠা উল্টায়, অথবা সব কিছুর অভাবে লুকিয়ে সে নিজে নিজে কথা বলে, গভীর একপ্রকার মগ্ন চিন্তায় ডুবে থাকে। বাইরে অশান্ত সাগরের উত্তাল তরঙ্গ যখন ভয়াবহ রূপ নেয়,

আত্নাদ করে বালুভূমিতে আছড়ে পড়ে, আনন্দ তখন ঘন ঘন সিগারেট টানে, চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়। আমরা যখন সাগরে নেমে লাফালাফি করি, জল ছিটাই, হুল্লোড়ে মাতি, তখন সে অদূরে রেস্তোরাঁর জানলার ধারে এক পেয়ালা চা নিয়ে বসে থাকে। দৃষ্টি তার সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোথায় কোন্‌ অতল রহস্যের জগতে হারিয়ে যায় কে জানে। এমনিতে সে কথা বলে কম। এখানে এসে একেবারে যেন থমকে গেছে। কী-সব ভাবে। সম্ভবত সেই জন্যই সে আমাদের ভীষণ আকর্ষণ করে। সমুদ্রের মত গভীর এবং রহস্যময় মনে হয় ওকে।

আমি বৃষ্টিতে পারছিলাম আনন্দের কথা বলা প্রয়োজন। সেই চেষ্টাই আমি করছিলাম। বন্ধুরা এখন নেই। দুপুরের ঝড়বনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, কেমন লাগছে আনন্দ? সমুদ্র তোমার কেমন লাগে?

আনন্দ বলল, সমুদ্রকে আমার ভয় করে। অথচ কী দুরবার আকর্ষণ, দুপুরের ঘটনায় আমি সত্যিই দর্শনীয় হিমাংশু। আমি এখন বৃষ্টিতে পারছি, আরও একটু সাহস সঞ্চয় করা প্রয়োজন ছিল।

নিশ্চয়ই! তুমি, আমরা এতগুলো লোক থাকতে জলে ডুবে যাবে—ভাবতে পার আনন্দ? আমাদের কি তুমি বিশ্বাস করতে পার নি?

আসলে নিজের উপর বিশ্বাস ছিল

না। এখন বৃষ্টি, একটা বড় ঝড়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমি আর-একবার হেরে গেলাম।

আমরা বালুর উপর বসলাম। শীত-শীত একটা নোনা বাতাস সাগরের উপর দিয়ে ভেসে আসছে। কতদূর থেকে এই হাওয়া আসছে, আমরা জানি না। আমি আনন্দের খুব কাছ। যখন হয়ে বসলাম। সে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছিল সামনে সাগরের দিকে তাকিয়ে।

আমার বাবা, মার মূখে শুনেছি, মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। পশ্চিমদীতে তখন এই রকম উত্তাল তরঙ্গ—

কথা কয়টা বলে আনন্দ সামনে অনেকদূর তাকিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করল। অনন্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন সমুদ্র প্রচণ্ড আকোশে ফুসছে। আমাদের সামনে বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ে ঢেউগুলি ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে অনেকটা আশ্বস্ত ভাবে বলতে লাগল আনন্দ, একখণ্ড কালো মেঘের ঝড়ে সেইদিনই বাবার মৃত্যু হওয়ার কথা। আমি অবশ্য বরাবর লক্ষ্য করছি, মৃত্যু—এই শব্দটা ব্যবহার করতে মন কখনও চাইত না। শব্দটাই এমন যে, মা শিউরে উঠত। বাবার সেই যুবক বয়সের চেহারা, সাহস, পশ্চিমপারে গাবনা শহরে তাঁর গোমস্তাগিরি, ঠাকুরমার কঠিন অসুখের



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্মরণে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

স্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

৯৯২/৫৭

সাপ্তাহিক বসুমতী

সংবাদ শুনে বিচলিত মন এবং নৌকাপথে বাড়ি ফেরার নিশ্চিত বর্ণনা দিয়ে কেনন করে সেই সাপ্তাহিক বিপদের হাত থেকে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পেরেছিলেন, ধীরে ধীরে মা সবই বলত। পরে আমি ভেবে দেখেছি, অন্তরালে একটা মৃত্যুভয় ছিল বলেই মা ঘটনাটাতে এমন গুরুত্ব আরোপ করত। মৃত্যু হতে পারত, খুবই নিশ্চিত ছিল, বলতে পার মৃত্যুর খুব কাছাকাছি থেকে বাবা ফিরে এসেছিলেন।

সামনে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে একজোড়া মরনারী ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। ওরা আজ অনেক হালকা, হেসে কথা বলছে। মশণ করে জীবনের স্মৃতি গ্রহণ করছে।

হাঁ, ঠিক। মৃত্যুর উদ্যত আলিঙ্গন থেকে তিনি ফিরে এলেন। ফিরে এলেন এবং আমাদের জন্ম হলো, আমাদের এবং আমার বোনের। একটাই মাত্র বোন আমার। আমাদের পিতার তারপর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তখন আমার বয়স তিন বছর এবং বোনটির দুই মাস।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আনন্দ বলল, ভয় কাকে বলে আমি জানতাম না। জল বল, আগুন বল, ট্রেন বল, অন্ধকার বা সূর্যালোক—কখনও ভয় করি নি। এখন, আজকাল, দেখলে তা আমি জলের মতো যেতে ভয় পাই। মনে হয় ডুবে যাব। কতদিন কেবল বসে থাকতে থাকতে আমি জলে ডুবে গেছি। আমার চার পাশে কোন অবলম্বন নেই, এক টুকরো খড়কুটো নেই, বন্ধুরা নেই—আমি তখন ঈশ্বরকে ডেকেছি। আমি মনে মনে কত বলেছি, আমাকে একটা অবলম্বন দাও, আমি তলিয়ে যাচ্ছি, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—তারপর এক সময় তাকিয়ে দেখি, বসে আছি চুপ করে, আমার সামনে বই, কখনও বা অফিসের ফাইল।

আনন্দ এই জাতীয় কথা মনে তলিয়ে থাক, এ আমি চাই না। তার দৃষ্টি ফেরানোর জন্য বললাম, তোমার ছেলে-

বেলার কথা বল, যখন ভয় কাকে বলে তুমি জানতে না।

ছেলেবেলার কথা। ছেলেবেলার কথা মনে হলে আমার পিসিমার কথা মনে পড়ে। পিসিমা আমাকে কোলে করে পাখি দেখাতে দেখাতে ভাত খাওয়াত। নতুবা আমি খেতে চাইতাম না। ছেলেবেলায় খেতে ইচ্ছা হত না, একটু বড় হয়ে চেয়েও পেতাম না—এই যা তফাৎ—আনন্দ শব্দ করে হাসল। কেন না দেশ ভাগ হলো, আমরা তখন ভেসে বেড়াচ্ছি—রেল স্টেশন, উদ্ভাস্ত কলোনী, সরকারী ক্যাম্প, ডোলের জন্য দীর্ঘ লাইন দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা! ধামা কাঠা ব্যাগ ডেকসিতে সেই ঠাসাঠাসি চরুরটা, ওফ! কী ভীষণ কুর্ভাসিত সেই জীবন!

: আনন্দ, ছেড়ে দাও এ-সব কথা, আমি তোমার ছেলেবেলার, খুব যখন ছোট ছিলাম—তখনকার কথা জানতে চাইছি।

: হাঁ, ছেলেবেলাকার কথা বলছি। আমাদের বাড়ির পাশে একটা বকুল গাছ ছিল। সেখানে দত্তদের মেয়ে পুতুলের সঙ্গে লাট্টু বোঝাতাম। কগজের নৌকা বানিয়ে পাশে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দিতাম। পুতুল অন্তত সব গম্প বলত। আমি শুনতাম। আমি নাকি রাজপুত্র, একদিন ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যেন চলে যাব। তারপর কোন এক ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত্রে টগবগিয়ে ঘোড়া ছটিয়ে ফিরে আসব। পুতুলকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে নিয়ে আবার ছুটেতে থাকব। সামনে আমাদের নদীনালা, খালিবল, তেপান্তরের মাঠ। অবশেষে আমরা পৌঁছব সেই বিরাট পাহাড়ের উপর, যেখানে সারা মাস বরফ পড়ে। সেই তুষারধবল পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় যেন আমাদের যেতে হবে। আমরা পাহাড়ে উঠব সন্তর্পণে। চারদিকে জীবজন্তু, ধারালো দাঁত আর নখ তাদের উদ্যত। আমরাও হুঁশিয়ার। তারপর এক সময় সে কী ভীষণ এক লড়াই!

আনন্দ চুপ করল। উদ্ভীর্ণ সন্ধ্যার নিজস্ব বালুবেলায় মহারহস্যকে সামনে রেখে আমরা দুজনে বসে আছি। দূরে অদূরে অন্ধকারে ঢেউ ভাঙছে। বিরাটাকার দৈত্য হা করে বেলাভূমি গ্রাস করতে ছুটে আসছে। কেন তার এ-আক্রোশ, কার উপর তার এ-রাগ কে জানে! আমি সৌন্দর্য থেকে আনন্দের দৃষ্টি ফেরানোর জন্য বললাম, তারপর রাজপুত্র আর রাজকন্যার কি হল?

আনন্দ বোধহয় একটু হাসল। বলল, রাজপুত্র প্রচণ্ড উৎসাহে পড়াশুনা শুরু করল। একদিন যে তাকে কোথায় যেন যেতে হবে পুতুলকে নিয়ে। ঘোড়ায় চড়ে

ধুলো উড়িয়ে। কিন্তু হায়রে কপাল! রাজপুত্রের আর সে সাধ পূর্ণ হলো না। রাজপুত্রের রাজকন্যা আর একজনের পাশে বসে, লালচেলি মালা চন্দনে শোভিত সুন্দর কচি মুখখানি ছবির মত, কোথায় হারিয়ে গেল। রাজপুত্রের জন্য রেখে গেল এই ছবিটুকু আর একটা দৃষ্টি, চোখের জলে ঝাপসা।

আনন্দের কথা শুনতে শুনতে আমারও কৈশোরকে মনে পড়ছিল। বাল্য-কৈশোর বোধহয় সকলেরই এক, সুখের এবং কামা-ভরা। আনন্দের সেই বয়স, পুতুল, কপন-প্রিয় বালকের প্রথম বিরোগ-ব্যথা, এই সমুদ্র—দেখতে দেখতে মন কোন এক অসীম অস্পষ্ট রহস্যলোকে চলে গেল!

আনন্দ বলল, মা আর বোনকে নিয়ে একদিন অজানার উদ্দেশে ভাসতে হলো। তুমি বৃদ্ধিতে পারছ হিমাংশু, দেশ তখন ভাগ হয়েছে। আর তোমাকে বলতে সত্যকোচ কি, তখন এবং এখনও দেশ বিভাগটাই আমার কাছে বড় ঘটনা। স্বাধীনতার ব্যাপারটা আমি আজ পর্যন্ত ভাল বুঝতেই পারলাম না। ফুলটা গাছ থেকে তুলে তুমি দেবতার কাছে লাগালে, প্রিয়জনকে উপহার দিলে, ভাল কথা, তাতে ফুলের বেদনা কমল কি, বা আর?

একটু চুপ করে আবার বলল সে, অবশ্য তার কারণও আমি ভেবে দেখছি, আমার জীবনে সুখ চুইয়ে পড়ার মত কোন ঘটনা নেই। আমি নিজেকে বুঝার চেষ্টা করি যখন, তখন এই বোকা আমাকে খুব পীড়িত করে তোলে যে, গাছ থেকে আমাকে না তুলে আনলে হয়ত আমি শূন্য হয়ে যেতাম না এমনি করে। অবশ্য বলতে পার, তার জন্য আমার বাবাও কষ্ট দায়ী নন। তিনি, আমি মার মুখে যেমন শুনোছি, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। পদ্মানদীর সেই ভয়ঙ্কর ঢেউ-এ তিনি জলমগ্ন হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রচণ্ড যত্ন করে বেঁচে গিয়েছিলেন। আট দশ মাইল সাঁতার কেটে তবে তিনি ডাঙায় উঠেছিলেন, মা বলতো চড়ায় এসে প্রায় সংজ্ঞাহীন দেহটা তাঁর আটকে ছিল। তুমি বলতে পার, ঠিক এই জায়গা থেকেই আমার জীবন শুরু। আমিও প্রায়শ সাঁতার কাটি, কেন না আমার অস্তিত্ব ঘিরে সর্বক্ষণ ঢেউগলি উত্তাল হয়ে আছড়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ডুবে যাই আবার ভেসে উঠি।

...তখন আমরা সরকারী ক্যাম্পে। দীর্ঘ লাইন দিয়ে খরচায় দানের জন্যে উদ্ভাস্ত প্রতীক্ষা! রোদে মাথা ফেটে যায় দুই ভাই-বোনের, তবুও লাইন থেকে সরতে পারি না। তখন দেখতাম মা

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়া ল্ড
স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার
(জাপান মেক) জন-
প্রিয়! দেশ ব্যাপী
খ্যাতি আছে। ডবল
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(P.C.) P.B. 2123, Delhi-7



সাপ্তাহিক বসন্ত

মাঝে মাঝে আঁচলে কয়েক মতো চাল বেঁধে কোথা থেকে আসত। সরকারী নির্দেশে একদিন আবার উঠতে হলো। বা বলতে পার, অন্যতর কোন মারাত্মক টেউ-এর মুখে আমাদের আর একবার ছেড়ে দেওয়া হল। নতুন কলোনীতে আমরা সামান্য মাথা গুঁজবার মত ঠাই পেয়েছিলাম। কিন্তু মা আর বোনটিকে আমি খাওয়াব কি? ভতোদিনে কোন্ ফাঁকে আমি বড় হয়েছি, বোনটিও। আমরা ট্রাইশন করে বা ছোট-খাটো কাজকর্ম করে বাঁচার জন্য লড়াই করতে লাগলাম। সঙ্গে পড়াশুনা। দুই ভাই-বোন পাশ করলাম বটে, কিন্তু চাকরি জুটল না। জুটল একটা উপসর্গ। পাড়ার একজন সহৃদয় আমাদের উপকারের জন্য এগিয়ে এল। তার দলবল ছিল ভারী। মা আর বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার ঝগড়া হতে লাগল। মা বলতে শুরু করল, খেতে দিতে পারি না, ওকে আমি শাসন করব কি দিয়ে? ওফ, আমাকে কিছ্ একটা করতেই হবে। আমি ক্ষ্যাপা কুকুরের মত হন্যে হয়ে ছুটে বেড়াই তখন। কিন্তু সময় আমাকে সুযোগ দিলে না। সময়ের অনিবার্য ফল পাওয়া গেল। প্রথমত, মায়ের শরীর শীর্ণ হতে হতে বিছানার সঙ্গে একেবারে মিশে গেল। মা আর উঠতে পারল না। তার হাত-পা শিথিল হয়ে গেল, মাথা নিচু হয়ে গেল। মিতীয়ত, বোনটির জীবন নষ্ট হয়ে গেল। হিমাংশু, এই দুটি ঘটনা—কটা কথায় বলা গেল—ঐচ্ছিক কতটুকু বলতে পারলাম। সেই ঘটনা, আমাদের সেই কলোনীর জীবন, লোকের চকুটি এবং নিজের বেকার স্ব মিলে ঐ দেশ বিভাগের কথাটাই আবার ভাবলাম। কতবার কতভাবে ঐ একই কথা ভাবলাম। স্বাধীনতার স্বাদ, সত্যি বলছি হিমাংশু, তখনও কিছ্ই বুঝতে পারি নি। ঝলতে পার, তখন পর্যন্তও জীবনের দিকে মূখ বাড়িয়ে কিছ্ খুঁজছিলাম। হৃদ-পিণ্ডের শব্দ গুনতাম। একে কি স্বার্থ বলবে, মোহ বলবে? এগন হতে পারে, লোকে যাকে অহং বলে, সে বস্তু পুরো-পুরি আমার মধ্যে তখনও বর্তমান। ফলে অন্যতর সত্য উপলব্ধি করতে আমি পারি নি। এই সেই অহং যা পশ্চানদীর অতল স্পর্শ থেকে ফিরে এসে বাবা আমাকে দিয়ে গেছে। সেই অহং যা পুতুলের টানা টানা চোখের বিস্মিত দৃষ্টি থেকে পেয়েছি, যা আমার শিক্ষক এবং সহৃদয় সহপাঠীদের নিকট থেকে পেয়েছি। আমার বাবা, পুতুল, শিক্ষক এবং বন্ধুদের আমি তখনও হারানো পারি নি। বসন্ত সেই অহং-বোম্বই আমাকে মাথা উচ- করে রাখতে সাহায্য করেছিল। বোনটির পিঠে হাত ঘালিয়ে জীবনের স্বপক্ষে অনেক কথা বললাম। মাকে বেঁচে থাকার কথা

বললাম। এমনভাবে আমিও কাজ করে চললাম, এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে সময়ও কাজ করে চলল। বোনটি দেখলাম একাদিন সেই সময়-প্রান্তেই গা ভাসিয়ে দিল। মা, আনন্দ এবং অনীতার মা, কত সহজে বলতে পারল, হতভাগী বেঁচেছে। মায়ের চোখে তখন অজস্র অশ্রুর বন্যা। পৃথিবীর প্রাণ যদি কঠিন না হোত হিমাংশু, সে চোখের জলে সব গলে যেত।

আনন্দ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বেশ নাটক নাটক মনে হচ্ছে, না? দাও, একটা সিগারেট দাও।

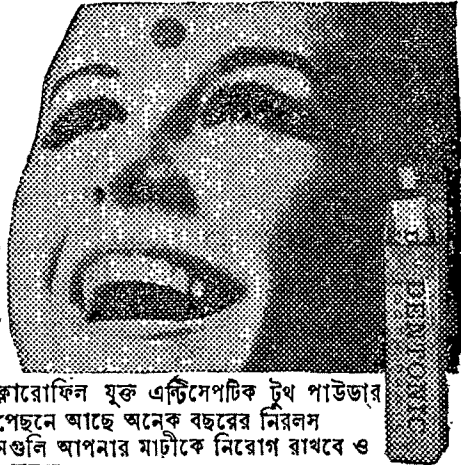
টিন খুলে সিগারেট দিলাম। শুন্যে ঘোঁরা ছাড়তে ছাড়তে বলল, গলা যে ভাই শুনিয়ে কাঠ হয়ে গেল। চল, চা খাওয়া যাক।

আমরা সাগরের তীর বেয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আনন্দ সাগরের স্পর্শ বাঁচিয়ে আমার ডান দিকে শূন্যে বালির উপর দিয়ে হাঁটছিল। মাঝে মাঝে সাগরের দৃ-একটা তরঙ্গ আমাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছিল। সমুদ্রকে আমিও ভয় করি। আবার আকর্ষণও অনুভব করি। সেদিন কোণারকের সমুদ্র দেখতে দেখতে আমার মনে হয়েছিল, সম্মোহিত হয়ে মানুষ সমুদ্রের জলে বাঁপিয়ে পড়তে পারে। বললাম, দেখেছ কী বিস্ময়। কী রহস্য এখানে! একে তুমি বুঝতে চাও না?

আনন্দও হয়ত এমনিভাবে কোন-রহস্যের কথাই ভাবছিল। বলল, মানুষের জীবনটাও কম রহস্যময় নয়। তোমাদের গল্প-কাহিনী বল, যে-কোন প্রাকৃতিক শক্তি বল, আমার মনে হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি রহস্যময় মানুষের জীবন। এখানে অনেক বড় নাটক আমরা নিত্য অভিনয় করে থাকি। আমরা অভিনেতার সারাক্ষণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছি বলে তার রস-টুকু তেমন গ্রহণ করতে পারি না।

রেস্টুরেন্টের জানলার ধারে আনন্দের প্রিয় টেবিলে আমরা বসলাম। চায়ের পেয়ালায় অনমনস্কভাবে চুমুক দিল সে। পূর্ব কথার সূত্র ধরে বলল, তুমি শুন্যে হয়ত দুঃখ পাবে হিমাংশু, আমার বোন অনীতার মৃত্যুর ঠিক পরে আমি একটি চাকরি পেয়ে গেলাম। তোমাকে বলতে ম্বেধা কি, আমি খুব সেন্ট্রিয়েশাল হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম, আমি এতদিনে মা এবং বোনের সম্মান রক্ষা করতে পারি। গঙ্গার ধারে ঘাসের উপর সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বসে ছিলাম। বাবার কথাও মনে পড়ছিল। এমনি এক নদীতে—আরও গভীর এবং ভয়ঙ্কর নদীতে ডুবতে ডুবতে বাবা জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। আমার চাকরি না-পাওয়া এবং পাওয়ার বোধ খুব পাশাপাশি, নিকট-সম্বন্ধযুক্ত। এর থেকেই বাবার মৃত্যু-সম্ভাবনা এবং আমার জন্মের বোধে চলে গেলাম। গঙ্গার জলে সেদিন

সৌন্দর্য
বিচ্ছু রিত
হাঁসি



ডেন্টনিক পেন ও ফ্লোরোফিল যুক্ত এন্টিসেপটিক টুথ পাউডার ও পেইস্ট আবিষ্কারের পেছনে আছে অনেক বছরের নিরলস গবেষণা। এর উপাদানগুলি আপনার মাটিকে নিরোগ রাখবে ও দাঁতকে স্বচ্ছ করে তুলবে।



কসমেটিক ডিভিশন



বেঙ্গল কেমিক্যালের
ডেন্টনিক

পেন ও ফ্লোরোফিল যুক্ত
এন্টিসেপটিক টুথপাউডার ও পেইস্ট

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা - বোম্বাই
কানপুর - দিল্লী - মাদ্রাস

গাথাহিক বসুমতী

বাবাকে দেখলাম, এই প্রথম জীবনে প্রত্যাবর্তনের মত। কী শব্দবলি শুনে আমার! আসলে আমরা ক্ষণে ক্ষণে, আমার পিতার মৃত্যু-সম্ভাবনা এবং জীবন ফিরে পাওয়ার মত, আর এক জীবনে ফিরে আসি নাকি? আসি এবং ছুটফট করি। হয়ত একটা যন্ত্রণার জগৎ সৃষ্টি করি, তবুও আসি।

এক পেয়ালি চা শেষ করে সে আরেক-পেয়ালার অভ্যর্থনা দিল। আনন্দকে যেন আজ কথায় পেয়েছে। এতদিনের অগল-বন্ধ জীবনের অনেক কথা বলতে পারলে সে বাঁচে যেন। একটা কথার সঙ্গে অন্যটার খুব যে একটা মিল ছিল তা নয়। না থাকাটা এই হয়ত স্বাভাবিক। পর পর সাজিয়ে-গুছিয়ে সে কিছুই বলছিল না। তবুও সমুদ্র ঘটনার মধ্যে দু'রাশ্রয়ী কোন যোগ হয়ত থাকেই, আনন্দের কাহিনীও সৌন্দর্য থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নয়।

আনন্দ বলল, চাকরির কথা যখন উঠল, তখন আমার চাকরির জীবনের দুটো-একটা ঘটনা বলি। কোন একটা সকালে অফিসে এসে খবরের কাগজের দিকে একটু তাকিয়েছিলাম। সৌন্দর্য কি যেন একটা পড়ার মত সংবাদ ছিল বলে আমি উৎসুক হয়েছিলাম। নতুবা খবরের কাগজ আমি বড় একটা পাড়ি না। তখন অফিসার ভদ্রলোক পেছন এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি বুদ্ধিতে পারি নি। পরে চোখ পড়তেই আমাকে উঠে দাঁড়াতে হল। তিনি বললেন, য়ু আর মার্কেড্‌ আবসেন্ট, যে গো হোম। তিনি তাঁর কামরায় ফিরে গেলে আমিও চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। বড়বাবু এলেন। ভদ্রলোক বিনীত কর্মী হিসাবে সুনাম কিনিছেন। যথার্থীতি উন্নতিও করেছেন। খুব ধীরে ধীরে কথা বলেন। তিনি আমাকে যা বললেন, তার মারমর্ম হল, নতুন চাকরি, নতুন উদ্যমে কাজ

করতে হবে, নিষ্ঠা এবং সত্যতা দেখাতে হবে। এখন থেকে অফিস এবং অফিসের কাজকে ধ্যান-জ্ঞান করতে হবে। আমাকে তিনি অফিসারের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং সৌন্দর্য কাগজ পড়ার অপরাধে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হল। এই অফিসারের ঘরেই আরও একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সে কথা বলে লাভ নেই। অফিস যে আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহার করে সবই তোমার জানা। আসলে আমাকে ঠিক আমার মত করে ওরা গ্রহণ করতে পারে নি। ওদের কাছে জীবিকা মানেই জীবনকে গলা টিপে হত্যা করা। দাসানন্দাস না বানাতে পারলে ওদের মেজাজ ঠিক থাকে না। এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ওরা হস্তক্ষেপ করতে চায়। সেই অফিসের একজন মহিলা কর্মীর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। আমরা একদিন একটা ইংরেজী ছবি দেখতে যাই সাহেব পাড়ায়। পরদিন অফিসার ভদ্রলোক আমাকে ডেকে নানা কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। কথাগুলো প্রত্যক্ষভাবে আমার ব্যক্তিত্বকে আঘাত করল। আমি সেই দিনই চাকরি ছেড়ে দিলাম।

ঃ ভালই করেছিলে, না হলে আমরা তোমাকে পেতাম না।

ঃ পেয়েই বা লাভ হলো কি? জানো, ঐ অফিসার ভদ্রলোকটির সঙ্গে একবার এই সমুদ্রের ধারে আমার দেখা হয়। আমি তখন সবে তোমাদের অফিসে ঢুকেছি। ভদ্রলোক আমাকে দেখে কিঞ্চিৎ বিচলিত-বোধ করলেন। এমন হতে পারে যে, তাঁর সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন বলে তিনি সহজ হতে পারছিলেন না। তাঁরই একজন অধস্তন কর্মচারীর স্ত্রী। তখনও খুব বিস্ময় লাগে, জলাক আমি মোটেই ভয় করতাম না। কাউকেই ভয় করতাম না। এখন সকালবেলা তোমরা যেমন স্নান কর,

আমিও তেমনি সমুদ্রের ঢেউ যেখানে ভাঙে না, সেখানে নেমে স্নান করতাম। সে কথা মনে হতেই এখন ঘামতে শুরু করি; হাত-পা শিথিল হয়ে আসে।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, সৌন্দর্য ভদ্রলোককে আমি ডেকেছিলাম, কিন্তু তিনি কল থেকে এক পা-ও সরেন নি। জানো হিমাংশু, এই ভদ্রলোক ঠিক আমার বাবার মত বা এখনকার আমার মত, জল দেখে ভয় পেয়েছিলেন। আমার বাবা শুনোছি, পশ্চিমবঙ্গীতে নৌকাডুবির পর, নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ফিরে পেয়ে জল দেখে খুব ভয় পেতেন। নদী তো দূরের কথা, মা বলত, কোনদিন একটা খাল-বিলও আর পাড়ি দেন নি। তোলা জল ছাড়া স্নান করতেন না।

পরদিন সকালে আনন্দ সমুদ্রের তীরে বালিয়াড়িতে দাঁড়িয়ে নুঁলিয়ারদের মাছ-ধরা দেখাচ্ছিলেন। আমি বালির উপর শুয়ে গিয়ে রোদ লাগাচ্ছিলাম। বন্ধুরা জলে নেমে হৈ-ঠে করে স্নান করছে। হঠাৎ আনন্দ আমাকে বলল, দেখ দেখ, কী মারাত্মক স্রোতের সঙ্গে ওরা লড়াই করছে!

আমি দেখলাম। কিন্তু কোন মন্তব্য করলাম না। মন্তব্য করার প্রয়োজনও ছিল না। কেন না, আনন্দ তখন মানুষের জীবন-সংগ্রামের আর এক রূপ দেখছে। এতদিনের অবরুদ্ধ মন তার অন্যতর জীবন-সংগ্রামকে দেখতে পেয়েছে। সে যুদ্ধবাস তন্ময়তার সঙ্গে নুঁলিয়ারদের ডাঙায় আসার প্রতীক্ষা করছিল।

মাথায় অশ্রুত টুপি, পরনে নেংটি, কালো দেহ, শব্দ-সামর্থ্য গড়া নুঁলিয়ারা যখন তাদের শোলা লটকানো জাল টেনে তুলল বালির উপর, আনন্দ তখন শিশুর মত সৌন্দর্যে দৌড়ে গেল! জালের মধ্যে ছোট ছোট সাদা জীবন্ত মাছগুলো লাফাচ্ছিল। আনন্দ নিজেই ধরে ধরে ওদের বাঁশের তৈরি পাত্রে রাখতে লাগল। জাল ঝেড়ে নুঁলিয়ারা মৃদুভাবে আবার ঢেউয়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের ছোট ডিঙির অস্তিত্ব তখন আছে কি নেই, বুঝতে পারা যায় না। আর দূর থেকে ওদের মাথার উপর টুপির ছুঁচলো প্রান্ত একটা বিন্দুর মত ভাসছিল।

আমি আনন্দের কাঁধে হাত রাখলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বললাম, আনন্দ, সমুদ্রে নামবে? আনন্দ যেন একটু চমকে উঠল। বলল, পারব?

আমরা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে এলাম। একটা বিরাট ঢেউ আসাচ্ছিল। বললাম, আনন্দ, হুঁশিয়ার, আমরা ঢেউ-এর মূখোমুখি ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চন্দ্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গানের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বো

(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি

(২) মস্কা বনাম পিউচেরি

(৫) রক্তের টান

(৩) প্রেমের পথ ঘোরায়ে

(৬) যখন তারা কথা-বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

বাঘ

বাঘ ও অজন্তা (বৈশাখ, ১৩৭৭) :
দেবরত মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী।
২০৬, বিধান সরণী। কলকাতা-৬। দাম—
ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য পুস্তকে শিল্পী দেবরত
মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতের দু'টি
গুরুত্বপূর্ণ শিল্পতীর্থ 'বাঘ' ও 'অজন্তা'
গুহা শ্রেণীর ভাস্কর্য ও শিল্প-সৌকর্যের
বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন।

মধ্য ভারতের মহু স্টেশন থেকে বাসে
যার শহর হয়ে বেতে হয় বাঘ গ্রামে।
বাঘিনী নদীর তীরে খাড়া পাহাড়ের
বুকে প্রায় ২,২৫০ ফুট লম্বা বাঘ গুহা-
শ্রেণীতে এখনো পর্যন্ত ৯টি গুহার
সন্ধান পাওয়া গেছে। নির্মাণকাল পঞ্চম
অথবা ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ। ভারতীয় শিল্পের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থটি আমাদের অনেকের
কাছেই অপরিচিত। এর তুলনায় অজন্তা
বহুআলোচিত। অজন্তা গুহাশ্রেণী
অবস্থিত মহারাষ্ট্রের ওরঙ্গাবাদ শহর
থেকে ৬৫ মাইল উত্তরে। আবিষ্কৃত গুহা
সংখ্যা ৩০টি। পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায়
পৌনে এক মাইল দীর্ঘ। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়
শতক থেকে সপ্তম খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন
সময়ে ঐগুলি নির্মিত।

সাধারণ রম্যরচনা বা ভ্রমণকাহিনী
এটি নয়। শিল্পীর সন্ধানী সজাগ দৃষ্টি
নিয়ে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা
করেছেন। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা,
স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত
হতে চান, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থটি
অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে।
তিনি যেন বিন্দুতে সিন্ধু ধরে রেখেছেন।
বাঘ ও অজন্তা গুহাশ্রেণীর শিল্পকলার
বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে ভারতীয়
শিল্পশাস্ত্রের তাল, মান, প্রমাণ ইত্যাদি
সম্বন্ধে, কলাকর্মের করণ, প্রকরণ এবং
উপকরণের সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়ম, নন্দন-
তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে সোমেশ্বরদেব,
ভুবনদেব, বৃন্দাবন, ভরত মুনি, মুনীশ্বর,
ভোজদেব, শ্রীকুমার প্রমুখ প্রাচীন শিল্প-
বেত্তাদের মতামত উল্লেখ করেছেন। পাশা-

পাশ রয়েছে অবনীন্দ্রনাথ, মদনমোহন মৈত্রী,
কুমারস্বামী ইত্যাদি একালের স্বনামখ্যাত
শিল্পবিশারদের মতামত। অধ্যাপক তুচ্ছ,
ডঃ গ্রিফিথস্ প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিত এই
সব অমর শিল্পকর্ম দেখে কি রকম
অভিভূত হয়েছিলেন, তারও কিছু কিছু
লেখক উল্লেখিত সহকারে দেখিয়েছেন।

ধ্বংসস্থলের মধ্যে ভাস্কর্য, স্থাপত্য
ও ভিত্তিচিত্রগুলি ছড়িয়ে আছে।

বাঘ ও অজন্তার শিল্প উৎস থেকে
একদিন গোটা পূর্ব এশিয়ার শিল্পধারা
জীবনরস আহরণ করেছিল। লেখকের
মতে, বাঘ ও অজন্তার চিত্রগুলি শিল্প-
দক্ষতার বিচারে সের্বস্বয়ম্ভুত। তবে,
অজন্তার বেশির ভাগই ধর্মমূলক। জাতক
ও বৌদ্ধ জীবনীকে ধরেই তার বিন্যাস।
বাঘ কিন্তু মানবীয় আবেগে মূর্ত। সম-
সাময়িক মানবের দুঃখ, আনন্দ, জীবন
ধর্মের অপূর্ণ সন্মিলন ঘটেছে বাঘের
অসাধারণ চিত্রগুলিতে।

গুহাগুলি একাধারে বিহার ও চৈত্যা।
বাঘ গুহার অবলোকিতেশ্বর-এর মূর্তি
বিরাট বিরাট স্তম্ভের বন্ধনীর কার্যকর
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বন্ধনীতে খোদিত
সিংহের এমন সরল রাজকীয় বীরত্ববাজক
ভঙ্গী ও উপস্থাপনা খুব কমই চোখে
পড়ে। ভিত্তিচিত্রগুলি স্বভাবস্বত আবেগ
ও দক্ষ তুলির রেখায় জীবন্ত। বৃন্দ এবং
উপাসক, বোধিসত্ত্ববৃন্দ, শোক ও সান্ত্বনা,
স্ত্রীমূর্তি বৃন্দ ইত্যাদি ভিত্তিচিত্রগুলি,
বলাকা, হংসমিথুন ইত্যাদি গুহার
অলঙ্করণ শিল্পমনকে স্রব্ধবতই স্পর্শ
করে। আর, অজন্তা বাঘ বাস্তবকেও
ভুলিয়ে দেয়। শিল্পী বলচন, 'বাঘগুহা
আমাকে অভিভূত করেছিল, অজন্তা
চমকিত করেছে।' বস্তুত অজন্তা গুহা-
শ্রেণীর অন্যতম ঐশ্বর্য যদি কালের করাল
গ্রাস এড়াতে পারত, তাহলে বিশ্বের
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাকেন্দ্রে পরিণত হত।
অজন্তা শিল্পের বৈশিষ্ট্য এর গতি-
শীলতা। কী মূর্তি, কী চিত্র, এখানে
সবই চলমান, জীবন্ত। ২০ সংখ্যক গুহার

হস্তীমূর্তির গতিবেগ, ১৭ সংখ্যক গুহায়
বিমানচারী গন্ধর্ববৃন্দ, অন্য গুহায় উড়ন্ত
মৃগদম্পতি ইত্যাদি এই সাক্ষ্য বহন করে।
শিল্পী এখানকার অগুন পদ্ধতির ক্ষয়-
বৃদ্ধির সাধক প্রয়োগের দিকটি, পরি-
প্রেক্ষিত চিত্রণের দিকটি সহজভাবে বুঝিয়ে
দিয়েছেন, মনোহারী রঙ-এর বিচিত্র
সুসমঞ্জস ব্যবহারের দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ
করেছেন, দেখিয়েছেন, ভিত্তিচিত্রাবলী
'ফ্রেসকোসেকো', অর্থাৎ পূর্বনির্মিত শূন্য
জমির ওপর বন্ধনী আঠামিশ্রিত (মাটি
টেস্পারা) জলরঙ-এর দ্বারা রচিত।
বিরাট শিল্পসৌধ গড়ে তোলার কায়দাও
ছিল অভূতপূর্ব। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী
নীচ থেকে শূরু করে উর্ধ্বমুখী গঠন-
পদ্ধতি ব্যবহার না করে শিল্পীরা কাজ
শূরু করেছিলেন ওপর থেকে। অন্ধকার
গুহায় কিভাবে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন?
কিম্বদন্তী—ধাতুফলকের দর্পণে সূর্যরশ্মি
প্রক্ষেপণ করে। আবার চিত্রচর্চায় দু'টির
দিকটাও আলোচনা করেছেন, ছবিতে
পাহাড় আঁকা, মেঘ আঁকতে পারা, বাতাস,
ঝড়, উত্তাল তরঙ্গ সমুদ্র আঁকতে আংশিক-
ভাবে অক্ষম ছিলেন সেকালের শিল্পবৃন্দ।

অজন্তা শিল্পকলায় নিহিত আছে
ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশ, সমসাময়িক
সভ্যতার নিরিখও কিছু ইতিহাস। কিন্তু
ধ্বংসের হাত এড়িয়ে এখনো যা ছিটে-
ফেঁটা রয়েছে, তাই দেখে সাধারণ দর্শকও
কম অভিভূত হন না। অবলোকিতেশ্বর
পদ্মপাণি, গন্ধজাতক, নাগনিবৃন্দ,
রাহুল ও যশোধরা, সিংগনী, সঙ্গীত
পরিক্রমা, বংশীবাদিকা, বৃন্দবাদ্যকার
প্রভৃতি ভিত্তিচিত্রগুলি অপূর্ব।

গ্রন্থশেষে ২৯টি মূল্যবান চিত্র
সন্নিবেশিত। অধিকাংশই শিল্পী আঁকিত।
একটি মাত্র আলোকচিত্র আছে অজন্তা।
গুহাশ্রেণীর সামনের অলিন্দপথ-এর।
প্রথম ছবি, 'ধার-এর এক ও বাস গুমটি'র
ইতিহাস আছে। শিল্পী যখন বাসের
টিকিট পাবেন না, এই ভেবে হতাশ হয়ে
বসে ছবি আঁকছিলেন, তখন তাঁর শিল্পী
তা জানতে পেরে স্থানীয় কলেজের ছাত্ররা
তাকে টিকিট যোগাড় করে দেয়। কলা-
কারকে কৃচ্ছ্রসাধন সহকারে এইসব শিল্প-
তীর্থ পরিদর্শন করতে হয়েছে। কৌতুক-
সহকারে 'লিটি' খেয়ে উদরপূর্তির কথা
বলেছেন লেখক। শিল্পীর মর্ষাদা এই
পোড়া দেশে যদি কিছুমাত্রও বেড়ে থাকে,
তাহলে তিনি সান্ত্বনা পাবেন। লেখার
ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার
করেছেন। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জীতে ৫৫-
খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। যেসব ভ্রমণ-
কারী 'বাঘ ও অজন্তা' যাবেন, তাঁরা এই
গ্রন্থখানি পড়লে উপকৃত হবেন।

প্রাচীন ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও
ভাস্কর্য আলোচনার ক্ষেত্রে 'বাঘ ও অজন্তা'
গ্রন্থটি একটি অমূল্য সংযোজন।

বঙ্গমন্ধু

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ফাউস্ট—লোসিং-এর জীবিতকালে ফাউস্ট সম্বন্ধে তাঁর রচনার দু'টি দৃশ্য-মাত্র প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাঁর লেখার ছোট ছোট অংশ এবং সে বিষয়ে যেসব প্রচলিত মতবাদ ও বর্ণনা তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়েছিল, তা থেকে জানা যায় যে, তাঁর পরিকল্পনা ছিল যে ফাউস্টের আত্মা শেষ পর্যন্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই ধরনের একটি বর্ণনায় আছে যে, দেবদূতের কণ্ঠস্বরে ঘোষিত হয়েছিল যে, মানুষকে যদি শেষ পর্যন্ত অনন্ত যন্ত্রণার রাজ্যেই নিক্ষেপ করা হবে, তাহলে তাকে ঈশ্বর মহৎ প্রবৃত্তিসম্পন্ন জীব হিসাবে সৃষ্টি করতেন না।

জার্মান সাহিত্যের স্টার্ম এবং ড্রাংগ পরিয়ড়ে ফাউস্ট কাহিনীর আকর্ষণ যেন বেড়ে গেল। [Sturm and Drang মূলমেন্টটি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা দরকার—এটি হচ্ছে ১৭৭০ সালের জার্মান সাহিত্যিক আন্দোলন। শেক্সপীয়ারের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করে লোসিং-এব যে প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হয়, তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছিল এই আন্দোলন এবং এর নেতারা—যথা, হার্ডার, গায়টে এবং শিলার। এর নামকরণ হয় ফ্রিডারিশ রিঙ্গার (১৭৫১—১৮৩১) রচিত Confusion or Storm and Stress নাটকটি থেকে। এ নাটক জার্মান নাট্য-সাহিত্যকে দ্রুত নিওক্লাসিকাল রচনা-ভঙ্গীর অনুকরণ প্রয়াস এবং প্রভাব থেকে মুক্ত করবার জন্য প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা কবলো। In its strictest sense the period of Sturm Und Drang extends from Goethe's Gotz Von Berlichingen in 1773 to Schiller's The Robbers in 1781.]

গায়টে, মল্লাব এবং ফ্রাইডল্যান্ড নিজের নিজের বিশেষ ভঙ্গীতে এ কাহিনী নিয়ে রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। মল্লাব যেসব দৃশ্য লিখেছিলেন, তাকে বলা যেতে পারে আন-রোমান্টিক রিয়ালিজম—ফাউস্ট যেন অসম্ভব আর্থিক দুর্গতিতে বাধ্য হয়ে

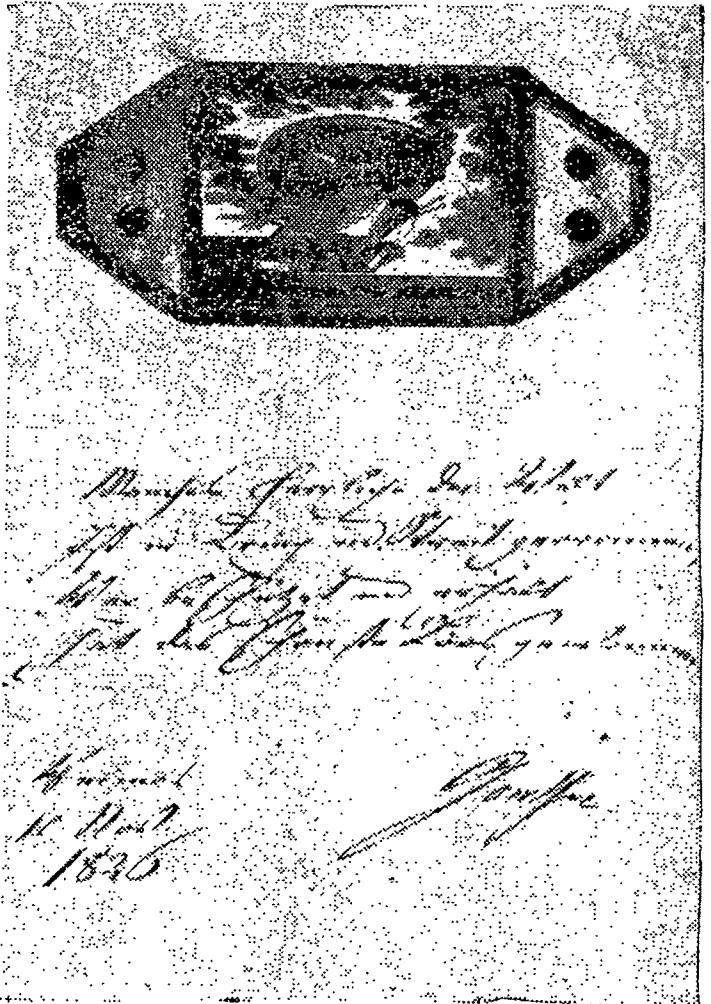
শয়তানের সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদনে উদ্যত।

ফ্রাইগারের উপন্যাসে ফাউস্ট চেষ্টা করছে নিজের ক্ষমতার দ্বারা জগতের অন্যায়ের প্রতিকার করতে। কিন্তু ফল হচ্ছে উল্টো—যতটা অন্যায়ের সে প্রতিকার করছে, তার কাজের ফলে আরও অনেক অন্যায়ের সৃষ্টি হচ্ছে। পরিণতিতে সে নরকে পতিত হয়ে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিতে থাকে।

গায়টের ফাউস্ট দু'টি পর্ব রচিত—প্রথম পর্বের রচনা শুরু হয় ১৭৭৪ সালে এবং এই পর্ব প্রকাশিত হয় ১৮০৮

সালে। দ্বিতীয় পর্ব তাঁর মৃত্যুর বছরে অর্থাৎ ১৮৩২ সালে ছাপা হয়।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, “How could Goethe, the young Titan (যিনি ফাউস্টের প্রথম পর্ব রচনা করেছেন) and Goethe, the aged Olympian (যিনি ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব রচনা করেছেন), have worked to the same plan? অর্থাৎ প্রশ্ন-কারীরা বোধ হয় বলতে চান যে, যৌবনে গায়টের যে বিরাট কাব্যপ্রতিভা ছিল, বাধকো নিশ্চয় তা ক্ষয় পেয়েছে এবং সেই কারণেই ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব প্রথম পর্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত হতে পারে নি। কথাটা ঠিক নয়—সমালোচক হের্জ জুলিয়াস ব্যাবের মতে—We have not here to do with a work of art begun and finished upon a clear plan. It is not, he insists, a ‘created’ work, but one which came into being and grew.



গায়টের হস্তলিপি

“যেসব কবি রা শিল্পী মহৎ কাব্য বা মহৎ শিল্প সৃষ্টি করেছেন, তাঁদের বয়স চল্লিশের কোঠার পৌছয় নি”—এই ধরনের একটি প্রচলিত মতবাদ আছে। এই সব মতবাদীরা এমন কথাও বলেন যে, চল্লিশে পৌছবার আগেই অনেক বড় কবি এবং শিল্পী মারা গেছেন, অথবা তাঁদের বিচার-বুদ্ধি এবং সৃষ্টি করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন। এ সম্পর্কে শিল্পী অগস্টাস জনের বক্তব্য প্রাধান্যযোগ্য—যদিও পেইণ্টিং সম্বন্ধেই তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেছেন, কিন্তু তাঁর এ উক্তি সমভাবেই সমস্ত শিল্প সম্বন্ধে প্রযোজ্য—
“But it must not be forgotten that good painters, like good wine, are apt to improve with age, and it is often the work of their later years which moves us most to admiration. Perhaps it is not till an artist is turned fifty that he can be unreservedly accepted. By that time, it is true, he will have shed the pleasant attributes of youth but will have preserved undimmed its inner vision and, with the experience of a lifetime, be on the way to grasp at last the long-sought magical formula by means of which he will be able to achieve that perfect fusion of his soul with external nature which is the touchstone of the greatest art. Doubtless he will have become in the process rather difficult to handle and may be almost impossible to understand, for he will necessarily have withdrawn himself somewhat apart from a world. Where Charity is made a Trade that men grow rich by, And the Sandy Desert is given to the Strong.”

গায়ট পড়তে গেল এবং বিশেষভাবে ফাউস্টের ক্ষেত্রে অগস্টাস জনের উপরি উক্ত কথাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

গায়টের ফাউস্ট শুধু জ্ঞান অর্জনের জন্যই আকুল নয়—সঙ্গে সঙ্গে তিনি চান বিবাহে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। গোট-সেনের (গোয়ার্টে) সঙ্গে ফাউস্টের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারটাকে মেফিসটোফেলিস আরও উত্তাপ দিয়ে বাড়িয়ে তোলেন। এই মেয়েটি অজন্ম পবিত্র স্বভাবের এবং

প্রেমাতুরা—শিশুহত্যার অপরাধে তাকে বধ্যভূমে প্রাণ হারাতে হয়—প্রথম পর্বের এইখানেই সমাপ্ত।

এরপর মেফিসটোফেলিসের ধারণা হয় যে হতাশা এবং অনুশোচনায় ফাউস্ট কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেবে। কিন্তু গায়টের ফাউস্ট নরকের সঙ্গে অতিাত করে না। সে শয়তানকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে, কারণ শয়তান তার মনের পূর্ণ সন্তোষবিধান করতে গিয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়।

ফাউস্ট এবার তার বিরাট শক্তি এবং কর্মক্ষমতাকে বিরাটত্বের দিকে বিস্তৃত করে—সমুদ্রকবলিত ভূমিকে নিজের আয়ত্তে এনে তাকে মানুষের কাজে এবং উপকারে লাগাতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়কার কাজের প্রেরণা মেফিসটোফেলিসের কাছ থেকে আসে না—আসে নিজের অন্তরের উৎস থেকে। শেষ দৃশ্যে মৃত্যু সমাগত—ফাউস্ট স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, সম্পূর্ণ আত্মসন্তোষের ভাব নিয়ে ধরা ত্যাগ করেছে—কিন্তু একথাও বোঝা যায় এ আত্ম-সন্তোষের উপর শয়তান কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ফলে তার আত্মার ওপর নরকের কোনও কর্তৃত্ব করবার অধিকার জন্মায় না এবং দেব-দূতেরা তাকে স্বর্গের পথে বহন করে নিয়ে যায়।

গায়টের এই বিরাট নাট্যকাব্যের কাহিনীকে মৌলিকত্বের কৌলিন্যে অভিযুক্ত করা চলে না। মূল বক্তব্য আগে থেকেই প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ পৈতৃক দুর্বলতা এবং অসাড়তাকে ছাপিয়ে ওঠবার জন্য মানুষের মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, জীবনের অর্থ, সৃষ্টিরহস্যের সমাধান বিষয়ক প্রশ্ন—এ সব তো শুধু গায়টের যুগেরই প্রশ্ন নয়—তার বহু আগে থেকেই এসব সমস্যা চিন্তাশীল মানুষের মনে দেখা দিয়েছে। গায়টের মহত্ব তাঁর চিন্তাশক্তির ব্যাপ্তিতে, তাঁর মনোভাবের বিরাট কাব্যিক রূপায়ণে। শুধু সাল তারিখ দিয়ে ফাউস্টের রচনাকাল নির্ধারণ করা যায় না। ১৭৭১ সাল থেকে (অর্থাৎ উরফাউস্টের পাণ্ডুলিপি শেষ করা থেকে) ১৮৩১ সাল অবধি, অর্থাৎ যখন মহাকাব্য ফাউস্টের দ্বিতীয় পর্ব সম্পূর্ণ করলেন—গায়ট তাঁর জীবনের বোশির ভাগ সময় এই নাট্যকাব্যের রচনা, পরিশোধন এবং পরিমার্জনে ব্যাপ্ত থাকতেন।

ফাউস্টের পরিস্ফুটন এবং বিবর্তনের ভেতর দিয়েই গায়টের কবিমানসের পরি-স্ফুটন এবং বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়—reflecting a mind as it grasps and develops ideas, matures in

its poetic concepts, and expresses the profound wisdom and considered philosophy of a creative genius.

যে মূল ভিত্তির ওপর গায়টে তাঁর ফাউস্ট কাব্যনাট্যের পরিকল্পনা করেছেন এবং ফাউস্টিয়ান স্পিরিটের অনুসন্ধিৎসার দিকটা, প্রথমেই সুন্দরভাবে পাওয়া যায় ‘প্রোলোগ’ ইন হেডেন—এ। এতে আমরা দেখতে পাই যে, ঈশ্বর অর্থাৎ সৃষ্টিকারী (দৈবশক্তি) এবং মেফিসটোফেলিস অর্থাৎ নৈতিবাদী (ধ্বংসকারী শক্তি) মানবাত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণে আলোচনা করছেন। ঈশ্বর বলেন—মানুষ দেবতার দ্বারা সৃষ্ট। সুতরাং যতই সে ভুল করুক, যতই সে প্রলোভনের বশীভূত হোক, চিরদিন সে দ্রান্তপথে বিচরণ করতে পারে না—কারণ he still has an “instinct of the one true way.” গায়টের ফাউস্ট এক মহৎ এবং বিরাট কাব্যনাট্য—এর ছন্দ-মাদুর্য এবং ছন্দবৈচিত্র্য একে যে কত গভীরভাবে রসযন করে তুলেছে তা নাটকটি না পড়ে বোঝা যায় না। এ নাটকের ঐক্যবন্ধনীর কাজ করেছে ফাউস্টের চরিত্র—এয়াকসন এর ইউনিফাইং ফোর্স নয়। নিছক নাটক হিসাবে ফাউস্টের অনেক অংশই অভিনয়ের অনুপযোগী এবং অপ্রয়োজনীয়—but as a history of man's cultural, intellectual and spiritual development as he strives to burst the bounds of physical limitations, Faust is without peer. Faust stands for every man who is inspired to action by dreams of power—both physical and intellectual and who is prevented from becoming a victim of his desires by the very nature of his activity.

He who strives is never lost—that is Goethe's central message in this monumental work which represents the best thought of sixty years of his life. [Goethe began the drama about 1770 and did not complete it till just before his death in 1832.]

সিনেমা কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট

পশ্চিমবঙ্গের সিনেমা কর্মীদের মধ্যে আবার বিক্ষোভ ধুমায়িত হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্র কর্মীরা চরমপন্থ দিয়েছেন—১৭ই জুলাই তারা প্রতীক ধর্মঘট করবেন। এই ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা।

সিনেমা কর্মীরা ইতোপূর্বে কয়েকবার ধর্মঘট করেছেন। গতবারের ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে যুক্তফ্রন্ট সরকারের হস্তক্ষেপে সেই ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। মীমাংসার পরে সকলে আশা করেছিলেন, আপাতত সিনেমা কর্মীদের দাবিদাওয়া সিনেমা মালিকরা মেনে নিলেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি হলো। সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘটে নাগরিক জীবন কিছুটা জড়িত হয়ে পড়ে। নাগরিক জীবনে চিত্তবিনোদনের সর্বাধিক সহজ মাধ্যম সিনেমা। সিনেমা বন্ধ থাকলে নাগরিক জীবন কিছুটা একঘেয়ে হয়ে যায়। সিনেমা বন্ধ থাকার ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পের ক্ষতি গুরুতর। এতে বাংলা ছবিগুলির ক্ষতি সর্বাধিক। ছবির মন্দির বিলম্বিত হয়ে যাওয়ায় বাংলা ছবির মন্দির পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সরকারী ক্ষতিও কম হয় না। প্রমোদকর এবং আনন্দাঙ্গিক কর থেকে সরকার বঞ্চিত হন।

এই ক্ষতির জন্য দায়ী কে? কর্মচারী ইউনিয়নের বক্তব্যে জানা যায়, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় মালিকরা যেসব দাবি মেনে নিয়েছিল সুযোগ বুঝে এখন তারা সে দাবি মানতে অস্বীকার করছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার সিনেমা কর্মীদের উন্নতির জন্য যে সব সুপারিশ করেছেন তা নাকি কিছুই



ভরুণ অপেরার 'লেনিন' মাত্রাপালায় শান্তিগোপাল

কাষকরী করা হয় নি। এই অভিযোগগুলি সিনেমা কর্মীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। মালিকপক্ষের উত্তর আমরা জানি না। কারণ আজ পর্যন্ত মালিক পক্ষ কিছু বলে নি। তবে গতবারে ধর্মঘটের সময় মালিক পক্ষ অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছিল, যার ফলে ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। একথা সকলের জানা আছে যে, বর্তমানে সিনেমা শিল্পে বড় লাভের অংশটা সিনেমা মালিকরা পেয়ে থাকেন। এ-ক্ষেত্রে সিনেমা কর্মীদের প্রতি তাঁদের আরো মানবিক বিবেচনা করা উচিত, যাতে ধর্মঘটের পথে কর্মচারীরা যেতে বাধ্য না হন। সিনেমা কর্মচারীরা যেমন নিজেদের দাবির কথা বলেছেন সেই সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া, সি আর পি প্রত্যাহার ইত্যাদির দাবিও তুলেছেন। এই দাবিতেই বোঝা যাচ্ছে সিনেমা কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবির সংগ্রাম রাজনৈতিক চেতনায় পরিচালিত। স্বভাবতই দেশের মানুষ এই সংগ্রামকে সমর্থন করবেন। —সুজন।

চি আলোচনা

আংকল টমস কেবিন

'আংকল টমস কেবিন' বইয়ের সঙ্গে মোটামুটি বাঙালী শিক্ষিত সমাজের পরিচয় আছে। অনেক বছর আগেই এদেশে অনুবাদ হয়েছে 'টম কাকার কুঠি'। এই বইটি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন দারুণ চাপ্তলা সৃষ্টি করেছিল। বোধ হয় পৃথিবীতে এমন ভাষা কম আছে যে ভাষায় 'আংকল টমস কেবিন' অনূদিত হয় নি। বহু বছর আগে এই কাহিনী চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। তখন হলিউডে সুস্থ কাহিনী চিত্রের যুগ ছিল। 'আংকল টমস কেবিন' এর আকর্ষণ আজো আছে। এই কাহিনী থেকে শিক্ষা নেবার এবং আজকের আমেরিকা অতীতকে কতদূর ছাড়িয়ে আসছে পেয়েছে তা বোঝবার পক্ষে সহায়ক। পরিচালক জর্জ রয়েথার বতমানকে সামনে রেখেই ছবিটি করেছেন এবং আধুনিক কৌশল ও রঙের ব্যবহারে ছবিটিকে আকর্ষণীয় করেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ছবিটি হবে আকর্ষণীয়; ইতিহাসের একটি অধ্যায়কে স্বচক্ষে তারা দেখতে পাবেন।

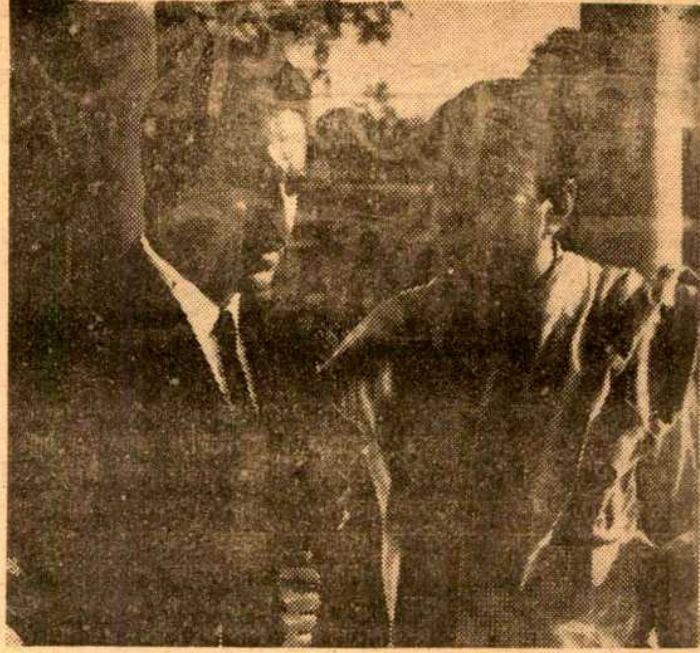
'টম কাকার কুঠি'র মূল বক্তব্য দাসপ্রথার বিরুদ্ধে, মানব কৃত্রিম মানুষ শোষণের বিরুদ্ধে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। এককালে আমেরিকায় নিগ্রোদের ওপর শাদা প্রভুরা কিভাবে অত্যাচার করতো, তাদের নিয়ে নিলাম হতো, কথায় কথায় গুলী করে হত্যা করতো, জন্তু-জানোয়ারের মত ব্যবহার করতো। এমন কি তাদের নারীকেও কোন দাম ছিল না শাদাদের কাছে। ক্রমে এই অবস্থা



অসহনীয় হয়ে ওঠে—কালোরা মুখ খেলতে থাকে। পালিয়ে পারিগ্রাহের কথা ভাবে। এই অসহনীয় অবস্থার নায়ক হুদয়হীন সাইমন লৌহ, সে প্রভুপ্রেমীর প্রতীক এক দয়াময়্যাহীন জানোয়ার। তারই বিপরীতে রয়েছে কালোদের প্রতীক টম-কাকা। ভদ্র, সাধারণ মানুষ। গানে, গল্পে প্রত্যেক মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, শিশুদের বন্ধু হয়ে পড়ে। এই টমকাকা সারাটা জীবন মানুষের উপকার করে গেল, যৌন দাসদের জন্য মৃত্তির সনদ স্বাক্ষরিত হলো সেদিন সে মৃত্যুপথযাত্রী। দাসদের বিরুদ্ধে মৃত্তি যে কত বেশি কাম্য তার প্রকাশ দেখা গেল কালো বউ এলিজার পলায়নে। সন্তান কোলে নিয়ে মিসিসিপি নদীর জমাট বরফের ওপর দিয়ে সে পালিয়ে গেল মৃত্যুকে তুচ্ছ করে। দাস শ্রমিক নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুমীরের পেটে গেল তবু দাসকে মেনে নিল না। শাদাদের মধ্যেও অনেকে এই দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে ছিল তার প্রমাণ দিয়ে গেল ধনী সিন-ক্রেয়ার। নিজের বাড়ির দাসদের মৃত্তি দেবার জন্য তাকে আততায়ীর গুলীতে প্রাণ হারাতে হলো।

এই পরিস্থিতি যখন চরম আকার নিতে বসেছে, শাদা আর কালোয় সংঘর্ষ শুরু হয়েছে তখন আব্রাহাম লিংকন দাস প্রথা অবসানের সনদ জারি করলেন। আর তারই জন্য আততায়ীর গুলীতে তাকেও প্রাণ হারাতে হল। পরিচালক ছবির শুরুতে আজকের আমেরিকা, তার লিবার্টি মূর্তি দেখিয়ে তারপরে উপস্থিত করেছেন লিংকনের হত্যাকাণ্ড। তারপরে কাহিনী এগিয়েছে সিনক্রেয়ারের হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত। পরের ঘটনা গৃহযুদ্ধের সূচনাপর্ব। কাহিনী উপস্থাপনায় এই মনশীলানায় দর্শকমনে উদয় হবে তুলনার কথা। মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে তাদের প্রেসিডেন্ট হত্যা যেমন নতুন কথা নয়, যেমন সং-বিবেকবান লোকদের সেখানে প্রাণ দিতে হয়, তেমনি দাসকে জিইয়ে রাখা এবং অত্যাচারীর ভূমিকায়ও তারা অশ্বিতীয়। শতবর্ষ আগে শাদারা যেমন কালোদের ওপর অত্যাচার করেছে, আজো তাদের ওপর লিখ করেছে, হোটলে, বারে ঢুকতে দিচ্ছে না। সেদিন যেমন দাস প্রথা বজায় রাখার জন্য বন্দক ধরেছিল, আজও ভিয়েতনাম-কম্বোডিয়ায় তারা সেই ভূমিকা নিয়েছে।

এই ছবির আর একটি আকর্ষণীয় দিক সঙ্গীত। গানগুলি শুনতে শুনতে পল রবসনের গানের কথা মনে পড়ে যায়। এর মধ্যে নিগ্গো-গায়িকা আর্থী কিটের 'মিসিসিপি-মিসিসিপি' গানটি এক অনবদ্য সঙ্গীত সৃষ্টি। এই গায়িকা আর্থী কিট ভিয়েতনামের যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্যাক্টগন



দীনেশ চিত্রমের 'সোনা বৌদি' ছবিতে নিরঞ্জন রায় ও অনিল চ্যাটার্জী। ছবিটি পরিচালনা করছেন পীম্ব গাঙ্গুলী।

অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হিপ-দের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল।

'আংকল টমস কেবিন' ছবিটি এদেশে পরিবেশনা করছে ফিল্মস ইন্টারন্যাশনাল। ছবিটি লাইট হাউস-এ মৃত্তি লাভ করেছে।

নাটকের কথা

চন্দ্রাবল্লু

কালচারাল সেমিনার গত ৬ই জুলাই বিশ্বরূপা মঞ্চে দুটি নাটক অভিনয় করেছে। প্রথম জ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রাবল্লু', দ্বিতীয়টি সমর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃতদেহ'। নাটক দুটি সু-অভিনীত এবং সু-পরিচালিত। দুটি নাটকই পরিচালনা করেছেন সমর মুখার্জী।

জ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পরিচিত নাট্যকার। তাঁর কয়েকটি নাটকই বহুবার অভিনয়-সার্থকতা লাভ করেছে। 'চন্দ্রাবল্লু' তাঁর সাম্প্রতিক নাটক। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম-সাময়িককালের সামাজিক শোষণ, অবিচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যারা মানুষকে সত্যের পথে

চালিত করতে পারে সেই লেখক-সাহিত্যিক-দের মেরুদণ্ডহীনতা, সব শেষে, সমাজকে পরিবর্তনের জন্য সংকল্প ঘোষণা।

নাটকের চরিত্রগুলি সমাজের জীবিত মানুষ নয়। একদা তারা জীবিত ছিল। কেউ মরেছে জমিতে নিজের অধিকার রাখতে গিয়ে, কেউ কারখানায় মালিকের জলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করে গিয়ে, কেউ সমাজকে পাঁচটার জন্য এগিয়ে এসে শহীদ হয়েছে, কেউ ইংরেজ আমলে জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ দিয়েছে। তাদের সঙ্গে আছে নির্ধারিত নারীদের প্রতীক একটি চরিত্র। দেশ বিভাগের সর্বাধিক আঘাত যাদের সহিতে হয়েছে। জীবনোত্তর এই চরিত্রগুলি অপেক্ষা করছিল এক নবাগতকে অভ্যর্থনা করতে। আগন্তুক একজন সাহিত্যিক। এসে তাকে জবাব দিতে হলো সমাজের এত অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে মানুষের পক্ষে সে কি লিখেছে। অবশেষে সকলে তারা বিদ্রোহের সংকল্প নিয়ে নতুন জীবনে চলে গেল।

এককালে লোকোত্তর চরিত্র নিয়ে হাসি-তামাসার গল্প লেখা হতো। কিন্তু কালের পরিবর্তনে হাসি-তামাসা এখন গভীর বক্তব্যে এসে পৌঁছেছে। এ ধরনের বিষয়-বস্তু নিয়ে বাংলার মধ্যে উৎপল দত্তের 'স্বপ্ন' এবং ঋষিক ঘটকের 'জুলাল' অভিনীত হয়েছে। এবার তৃতীয় নাটক জ্যোত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দ্রাবল্লু' দেখলাম। নাটকটির বক্তব্য বলিষ্ঠ। কালের চ্যেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা এতে রয়েছে।

পাঠ্যাহিক বন্যমতী

চাই সঙ্গে রয়েছে সাহিত্যিক, নাট্যকার-
জনের প্রতি জিজ্ঞাসা।।

কাল্পনিক নাটকে সংগীত-অঙ্গভূতির প্রশ্ন তেমন ওঠে না। কাজেই এক্ষেত্রে দুর্বল সাহিত্যিকের নেতৃত্বের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। এই কাল্পনিক নাটকটিকে কথারূপ দিতে পরিচালকের কল্পনালব্ধি প্রশংসনীয়। চরিত্রগুলির অভিব্যক্তি, এক্সেপ্টিভ এবং রিদম, তার সঙ্গে আলো-আধারী নাটকটিতে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি ও উপভোগ্য করতে সাহায্য করেছে।

বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেনঃ জয়ন্ত দে, সলিল পাল, গোবিন্দ দে, সন্দীপ ঘোষ, মানস দে, দিলীপ ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন দত্ত, সঞ্জীবা ঘোষ ও পদ্মলু চক্রবর্তী।।

আবার

গত ২৪শে জুন রূপা সংস্থা 'আবার' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বরূপায় মঞ্চস্থ করে।

মনোরঞ্জন বিশ্বাস 'আবার' নাটকের মাধ্যমে অবহেলিত কৃষক-স্রেণীর অভ্যন্তরে বৈপ্লবিক চেতনাকে মূর্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। রূপা সংস্থার দলগত অভিনয় প্রশংসাবোধ্য। প্রায় প্রতিটি শিল্পী তাঁদের চরিত্রগুলি সাবলীলভাবে রূপায়িত করেন। ওঁদের মধ্যে আবার চিত্র চট্টো-

পাধ্যায় অভিনয়ে অপূর্ব দক্ষতা দেখান। তাঁর অভিব্যক্তির তীব্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিকাশ ঘোষ ও দীপালী চক্রবর্তী সুন্দর অভিনয় করেন। এছাড়া নন্দা বর্মণ, সরোধ বলাধিকারী, হারাধন রায়, আনন্দ রায়, অশোক ব্যানার্জী, শেখর সেনগুপ্তও সুঅভিনয় করেন।

স্টুডিও খবর

"খুঁজে বেড়াই" ছবির মহরৎ

গত রবিবার ৫ই জুলাই রথযাত্রা দিনে সকাল ৯টায় ক্যালকাটা স্টুডিওতে গীতালি পিকচার্সের "খুঁজে বেড়াই" ছবির শুভমহরৎ উদ্‌যাপিত হয়েছে। শ্রীমতী গীতালি দত্ত নিবেদিত ছবিটির কাহিনী, চিত্রনাট্য, রচনা ও পরিচালনা করেছেন সলিল দত্ত। সরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে বিজয় ঘোষ ও অমিত্র মুখার্জী। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই কাহিনীর প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপ-

দান করছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অপর্ণা সেন, অনিল চ্যাটার্জী ও বিকাশ রায়। "খুঁজে বেড়াই"-এর নিয়মিত চিত্রগ্রহণ এই সপ্তাহেই শুরু হচ্ছে।

এস বি ফিল্মস ছবিটির পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

"সংসার" ছবির মহরৎ

গত রবিবার ৫ই জুলাই সকাল ৯টায় টেকনিসিয়ান স্টুডিওতে নন্দা পিকচার্সের 'সংসার' ছবির শুভমহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্বে আছেনঃ সলিল সেন। সংগীত পরিচালনা করেছেনঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করবেনঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্ম্যারণী, বসন্ত চৌধুরী, নন্দিনী মালিয়া, নিমলকুমার, সরতা চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, হরিধন, অজিত চট্টোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায় ও অজয় গাঙ্গুলী।

মিষ্টান্ন

স্বরসভার বর্ষামঙ্গল

গত ৫ই জুলাই স্বরসভার শিল্পিবৃন্দ "বর্ষামঙ্গল" পরিবেশন করেন বিড়লা একাডেমী হলে। রবীন্দ্রসংগীতে ও নৃত্যে সমৃদ্ধ এই অনুষ্ঠানটির সব ক'টি গানই সুগীত। বিশেষ করে বীণা দাসের "আমি কী গান গাব", লক্ষ্ম্যী গুপ্তের "বহুমাণিক দিয়ে গাঁধা", শাম্ভবতী গুপ্তের "এ আকাশ পরে" ও শিশুশিল্পীদের মিলিত কণ্ঠে "বাদল বাউল বাজায় রে" উপস্থিত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অকৃত্রিম প্রশংসা অর্জন করে। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে বাণী ঠাকুর, দীপ্ত রায়, মীলা দে শীল, রঞ্জিতা চক্রবর্তী, মণিদীপা শ্যাম ও রবীন মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নৃত্যে কাবেয়ী চট্টোপাধ্যায়, রীতা সেনগুপ্ত ও শান্তা বসুরায় সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নৃত্য-গীতি-বিচিত্রাটি পরিচালনা করেন রথীন চৌধুরী। এই দিনের অনুষ্ঠানে বাংলার অন্যান্য প্রখ্যাত সুরকারদের বর্ষাসংগীতও পরিবেশিত হয়। হিমাংশু লস্করের সুরে রচিত "বরষার মেঘ নামে", "ফিরে এলো শ্রাবণঘাটে" ও "শ্রাবণ রজনী ধীরে", নজরুলের "রিজা বিয়া রিজা" ও "রম্য রম্য রম্য রম্য" এবং অতুল প্রসাদের



তপন সিংহের 'এখনই' ছবিতে মৃণাল ও মোসম্মী

১৯৬৩

"বন্দু" এমন বাদলে" বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। গানগুনালি গেরে শুনিয়েছেন মমতা ঘোষ, উমা কর, তোড়া সরকার, সুস্মিতা রায়চৌধুরী, আরতি দত্ত ও শীলা সেনগুপ্ত। মন্ত্রসঙ্গীতে ও সঙ্গতে সহযোগিতা করেন শ্বপন মুখোপাধ্যায়, উমা দে শীল, বেণু মুখোপাধ্যায়, কিশোর নন্দী ও দুলাল ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌর বসাক ও রথীন চৌধুরী।

সংবাদ কলা

ঋতুক ঘটকের 'আমার লেনিন'

ঋতুক ঘটকের দুই রীলের ছবি 'আমার লেনিন' তৈরি হয়ে গেছে। ছবিটিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। পূর্বনো দিনের গণনাট্য সঙ্গীত ব্যবহার করা হয়েছে। ছবিটি এখনো



সুরসভার 'বর্ষাঙ্গল' উৎসবে নৃত্য পরিবেশনায় শান্তা রায়



সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র পায় নি। ছাড়পত্র না পাওয়ার সংশ্লিষ্ট মহলে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে।

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি মস্কোর ভ্যারাইটি থিয়েটারে সোভিয়েত সফররত ভারতীয় শিল্পীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের উত্তপ্রশংসা লাভ করেছে।

অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্য প্রদর্শন করেন যথাক্রমে কুমকুম দাস ও শ্রীমতী কমলা।

মস্কোয় অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয় নৃত্যশিল্পীরা রাশিয়ার অন্যতম প্রধান শিল্পনগরী তামবুভে তাঁদের অনুষ্ঠানে প্রশংসা পান। পরে তাঁরা লেনিনগ্রাদ ও তাসখন্দে অনুষ্ঠান করবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এ বছরেই দিল্লীতে আসছে জনপ্রিয় সোভিয়েত নৃত্যগোষ্ঠী "বেরিজকা"। আর একটি ভারতীয় শিল্পদল এই শরতেই সোভিয়েত সফরে যাচ্ছে।

শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী হলে হাওড়া পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক 'কাগিদাসম' নাটকে নৃত্যরতা কুমারী সুমিতা শেঠ (৫ বছর)। ফটো: রবীন্দ্রনাথ বসু।

খেলা রাজারাজা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ
হলো।

কিন্তু সেই অসীমাসন্ন সম্মানজনক
খুব একটা কিছু ছিল না। নিতান্তই
সময়ের অভাবের জন্যেই ভারত পরা-
জয়ের হাত থেকে রেহাই পেল আর
ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ডি আর জার্ডিনের
হাত থেকে ফসকে গেল আর একটি টেস্ট
জয়ের সুযোগ।

কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে
ইংল্যান্ডের দুই ফাস্ট বোলার ক্লার্ক আর
নিকলস জবরদস্ত বোলিং করে ভারতীয়
দলের ব্যাটিং-এর ভিত্তি ভেঙে গাড়িয়ে
দিতে সাহায্য করেছিলেন সব থেকে
বেশি করে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা
বিশেষভাবে বিরত হয়ে পড়েছিলেন
যখন ক্লার্ক আর নিকলস বিপরীতভাবে বল
লিফট করতে শুরু করলেন।

ভারতের অমর সিং আর নিসারের
তুলনায় ক্লার্ক বা নিকলস কিছুই নন।
কিন্তু অমর সিং কিংবা নিসার সম্মুখ
সমরে, খেলার মতো খেলে ব্যাটসম্যানদের
বিরুদ্ধে লড়তে চাইতেন। তাঁদের সে
লড়াই ছিল শক্তিশালী প্রতিপক্ষের
বিরুদ্ধে শক্তির দাপট।

কিন্তু ক্লার্ক ও নিকলস দ্বিতীয়
টেস্টে ফাস্ট বোলারদের স্বভাবলব্ধ আক্র-
মণ ধারার সাহায্যই নিতে চাইলেন সব
থেকে বেশি করে। তাই তাঁদের হাত
থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো তাঁর
গতিতে মাথ উঁচু করে ছুটে গেল
ব্যাটসম্যানদের শরীর লক্ষ্য করে। সেই
আক্রমণের হাত থেকে ভারতীয় খেলো-
য়াড়দের অনেকেই নিজেদের বাঁচাতে

পারলেন না। আহত হলেন অনেকেই।

তবু তার সুযোগ নিয়ে ইংল্যান্ড
জিততে পারলো না শুধুমাত্র সময়ের
অভাবে।

দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের হিরো ছিলেন
ভারতের উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান।
উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে তিনিই
প্রথম যিনি একটি টেস্ট ম্যাচের দুই
ইনিংসেই অর্ধশত রান করার কৃতিত্ব
অর্জন করলেন। প্রথম ইনিংসে তাঁর
৫৯ আর দ্বিতীয় ইনিংসের ৫৭ রান
চিরকাল মনে রাখার মতো। আত্ম-
বিশ্বাসে ভরপুর দিলওয়ার হাসানের
খেলায় যে সাবলীল ক্রীড়ানৈপুণ্যের
মনোরম রূপ সেই খেলার দর্শকরা দেখে-
ছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।

কিন্তু সেই দিলওয়ার হাসান একবার
প্রচণ্ডভাবে আঘাত পেলেন। নিকলস-
এর বলটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ভীষণ
জোরে আঘাত হানলো দিলওয়ারের
ঘাড়। আঘাতটির এতো জোর ছিল যে,
দিলওয়ারের প্যাভেলিয়নে ফিরে আসার
মতো অবস্থা হলো। কিন্তু দিলওয়ারের
জান বড় শক্ত। অন্য যে কোন খেলোয়াড়
হলে হয়তো প্যাভেলিয়নে ফিরে এসে
শুয়ে পড়তো। কিন্তু সেই প্রচণ্ড আঘাত
দিলওয়ার বেমালুম সামলে গেলেন।

তবে সোঁদিন যাঁরা মাঠে ছিলেন
তাঁদের সকলেরই ধারণা যে, খেলাতে
নেমে অমন সামান্য একটা আঘাত না
পেলে দিলওয়ার হাসান সোঁদিন আরো
ভালো খেলাতে পারতেন। বলা যায় না,
সেধুরীও করতে পারতেন তিনি।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কলকাতার টেস্ট
ম্যাচটা ছিল মুস্তাক আলীর জীবনের
প্রথম টেস্ট। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবে
কি ব্যাটিং, কি বোলিং—কিছুতেই
সুবিধে করতে পারলেন না মুস্তাক।
মুস্তাক তখন ব্যাটসম্যান নন। স্ট্রো-
বোলার হিসেবেই তখন তাঁর খ্যাতি।
কিন্তু সেই টেস্টে তাঁর বরাতে জুটলো
মাত্র একটা উইকেট। তবে সে উইকেটটি
ছিল যথেষ্ট মূল্যবান। ডি আর
জার্ডিনের উইকেটটি দখল করেছিলেন
মুস্তাক আলী। আর রান? সে-কথা
বোধহয় না বলাই ভালো। প্রথম ইনিংসে
মুস্তাক করলেন ৯ আর দ্বিতীয়
ইনিংসে ১৮ রানের বেশি করতে
পারলেন না।

তবে কলকাতার দর্শকদের বোধহয়
সব থেকে বেশি নিরাশ করেছিলেন
লালা অমরনাথ। বস্বের প্রথম টেস্টেই
প্রথম আবির্ভাবে শতরান করে অমর-
নাথ ভারতের প্রত্যেকটি ক্রিকেট অনু-
রাগীর হৃদয়ের নাথ হয়ে উঠেছিলেন।
তাই তাঁর খেলা দেখার জন্যে পাগল
হয়ে উঠেছিলেন বাংলা দেশের ক্রিকেট-
রাসিকরা।

বস্বের মাঠে তাঁর অদ্বিতীয়
সেধুরী আর দুই ইনিংসেই সেই মন-
মাতান খেলার কথা তখন গল্প হয়ে
ঘুরছিল লোকের মুখে মুখে। কিন্তু
সেই গল্প-কথার নায়ক লالا অমরনাথ
প্রথম ইনিংসে কোন রানই করতে
পারলেন না আর দ্বিতীয় ইনিংসে
৯-এর বেশি করতে পারলেন না।

তাই কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টেই

সাপ্তাহিক বসুমতী

পর লাভ-ক্ষতির খতিয়ানে ভারতের লাভের অঙ্ক একেবারে শূন্য না হলেও তার ঝোঁকটা ছিল শূন্যের দিকেই।

কিন্তু বাংলা দেশের দর্শকদের চোখে সব থেকে বেরনাদায়ক হয়ে উঠেছিল দীর্ঘদেহী মহম্মদ নিসারের ব্যর্থতা। ব্যর্থতা বলা বোধহয় ঠিক নয়, কারণ নিসার নামটির সঙ্গে ব্যর্থতা কথাটা ঠিক বেন খাটে না। তবু ৩৪ ওভার বল করে ১১২ রান দিয়ে একটা মাত্র উইকেট পাওয়াকে আর যাই হোক ভালো এ্যাভারেজ বলা যায় না। বলা বোধহয় সঙ্গতও নয়। কিন্তু মহম্মদ নিসারের অবিস্বাস্য অসহায়তা ক্রিকেট-রসিকদের কাছে নিঃসন্দেহে বেদনার বিষয়।

তাই মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্ট দল থেকে বাদ পড়লেন নিসার। বাদ পড়লেন গোপালনও।

১৯৩৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে শুরুর হবে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচ। এই টেস্টে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হলো। নতুন মুখ দলে না থাকলেও, স্লো বোলার হিসেবে মদুস্তাক আলী তৃতীয় টেস্টেও চান্স পেলেন।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী মনোনীত খেলোয়াড়রা হলেন—দিল-ওয়ার হাসান, নিওমল জিওমল, ওয়াজির আলী, সি কে নাইডু, অমর-নাথ, বি মাচেস্ট, এইচ পালিয়া, নাজির আলী, সি এস নাইডু, মদুস্তাক আলী ও অমর সিং।

আমাদের সান্নিধ্য মদুস্তাক আলী তৃতীয় টেস্টেও চান্স পেয়েছেন। ভাগ্যস পেয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় টেস্টেও কি তিনি খুব একটা সুবিধে করতে পেরেছিলেন,—না পারেন নি। তবে সে কথা থাক। পরের কথা পরে। তবে মদুস্তাকের তৃতীয় টেস্টে চান্স পাওয়াটাই যথেষ্ট। তা না হলে যারা মদুস্তাকের খেলা দেখেছেন, দেখেছেন মদুস্তাক আলীর যৌবনবীপ্ত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের স্মরণীয় স্বাক্ষর—তারা কি আর আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারতেন—

“মদুস্তাককে যারা দেখেন নি তাঁদের

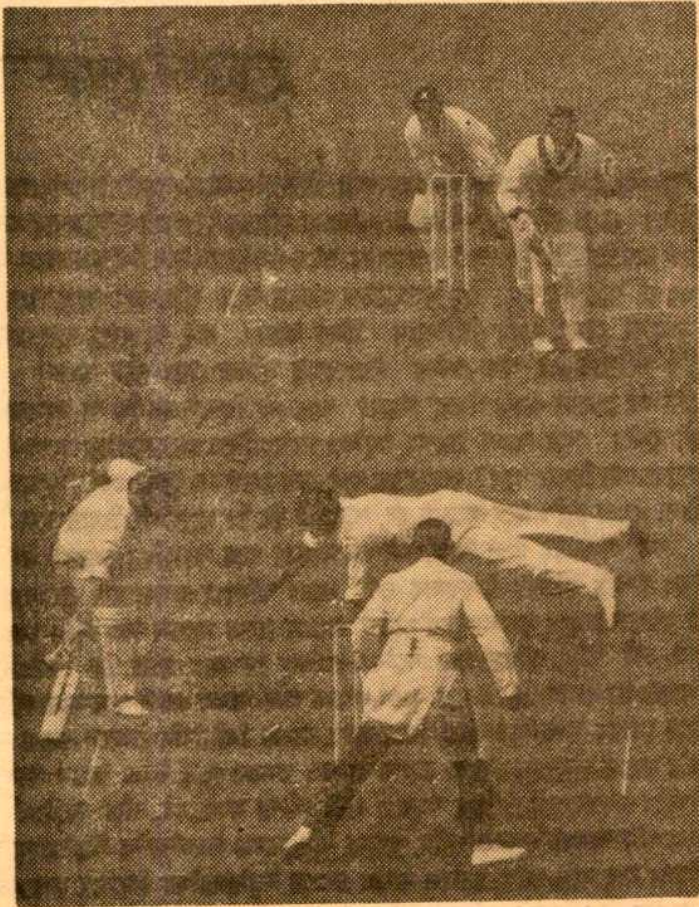
কাছে মদুস্তাক একটা বিগত রোমান্স। তাঁকে কেন্দ্র করে যা কিছু স্মৃতি ও রচনা, সে সবই মদুস্তাক তাঁর সামান্য অবস্থিতির মধ্যে ফিরিয়ে দিয়েছেন। সেই প্রথম বলেই রান, চার পা এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভ, অফের বল লেগে ঘোরানো, ফাঁকায় বল তুলে বাউন্ডারী, বোলারের হাত থেকে বল ছাড়া পাবার আগেই ক্রীজ ছেড়ে বোরিয়ে পড়া, সেই স্ট রানের ধৌকাবাজি ও দৌড়ের বদলে গটমট করে হেঁটে রান নেওয়া, পাট-নারের চেয়ে বেশি সংখ্যার স্ট্রাইক নেওয়া, মিস থ্রোর রান নিতে অবজ্ঞা এবং ক্যাচ তুলে দিয়ে অ্যাম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে প্যাডে-লিয়নের পথে পা বাড়ানো—সব কিছু। মদুস্তাক সব কিছু দেখালেন, সব কিছু জানালেন নিজের সম্বন্ধে। আত্মপ্রত্যয়ে মদুস্তাক করলেন, সাহসে বিস্মিত করলেন,

চমৎকৃত করলেন নৈপুণ্যে, নানা ভীষণে হাসালেন, মাতালেন মাতোয়ারা বাঙালীকে, খেলার শেষ রসটুকু শূন্যে নিয়ে যখন প্যাডেলিয়নের দিকে ফিরে চললেন, তখন নিজের ভূমিকায় তিনি সেরা অভিনয় করে গেছেন।

“এক শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মদুস্তাক আলী; তিনি তাঁর শিল্পকে জানেন.....।”

এই মদুস্তাক তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ক্রীটে মোটে সুবিধেই করতে পারলেন না। অবশ্য তিনি তখনো ধরেন নি তাঁর নিজ মতি। মদুস্তাক তখন বোলার। স্লো বোলার। ভারতে তখন সত্যিকারের ভালো স্লো বোলারের অভাব ছিল বড় বেশি। মদুস্তাক সেই অভাবটাই পূরণ করে ভারতীয় দলের একজন হয়ে রইলেন।

[চলবে]



নটিংহামে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড ও বিশ্বের অবশিষ্ট দলের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার তৃতীয় দিনে গ্যারি সোবার্স আন্ডারউডের বলে ড্রাইভ মেরে বাউন্ডারীতে বল পাঠিয়ে দেন। আন্ডারউড বলটি খামা বার ব্যর্থ চেষ্টা করতেন।



দেয়া-নেয়া

কলকাতা ময়দানের দর্শকরা যে কটা জিনিস দেখতে খুবই অভ্যস্ত, তার একটি হলো পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির চম্ফুলজাহাঁন প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা শুধুমাত্র লীগ তালিকার নীচের দিককার দলগুলোর প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকার জন্যে চলে তা নয়, পয়েন্ট সংগ্রহের প্রচেষ্টায় ছোট দলগুলোর সংগে একইভাবে নাম লিখিয়ে থাকে বড় দলগুলোও। অর্থাৎ ধান্দা সকলেরই এক—পার্থক্য শুধু লক্ষ্যে। বড় দলগুলোর সামনে থাকে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের ট্রফিটি আর ছোট দলগুলোর লক্ষ্য থাকে যে-কোনভাবেই হোক, প্রথম ডিভিশনে টিকে থাকা। এই দু'দলের মাঝখানে আরও একটি দল আছে, যারা সাধারণত পয়েন্ট সংগ্রহের এই অপপ্রচেষ্টায় দাতাকর্ণের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু এই পয়েন্ট নেওয়া-নেওয়া এমনিই চলে? না কি এর পেছনে একটা 'কিছু' আছে? আর এই কিছুটা যে কি তা জানতে বাংলা দেশের ফুটবলরসিকদের বোধহয় মোটেই থাকী নেই। তবে বাংলা দেশের ফুটবল মরশুমটিতে খোলামুচির মতো টাকা যেভাবে ছড়ানো হয় তাতে হয়তো এই পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া কিংবা পয়েন্ট কেনা-বেচা যাই বলা হোক না কেন, একটা কিছু হয়। ইদানীং খেলার মাঠে এই 'কিছুটির' আধিক্য এতো বেশি হয়ে পড়েছে যে, শুধু এ 'ছি ছি' ছাড়া এই বিষয়ে আর কিছু লেখার প্রবৃত্তি বোধহয় কারোরই হয় না।

কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছেলেখেলা আর কতোদিন চলবে? এইভাবে খেলার নামে ছেলেখেলা করে ভারতবর্ষের ফুটবল জগতে বাংলার মানসম্মান নষ্ট করার অধিকার কলকাতার ক্লাবগুলোকে কে দিয়েছে? আজ জানতে ইচ্ছে করে যারা গটআপ গেমের ব্যবস্থা করে পয়েন্ট সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন আর যারা কোন একটা কিছুর বিনিময়ে সানন্দে পয়েন্ট প্রদান করেন—সেই তাঁরা সত্যিকারের ফুটবল-প্রেমিক কি না? তাঁরা কি সত্যিই ফুটবল খেলাকে ভালোবাসেন? হাল-চাল দেখে তো সে কথা মনে হয় না। তবে এঁদের আজ আমরা একটা কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে—দিন বদলে যাচ্ছে, বাংলা দেশের খেলার রাজা ফুটবলকে নিয়ে আর আমরা ছিনিমিনি খেলতে দেবো না। খেলোয়াড় কিংবা ক্লাব-সমর্থকদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে আজ এগিয়ে আসতে হবে দর্শকদের, এগিয়ে আসতে হবে ক্লাব সমর্থকদের, এগিয়ে আসতে হবে তাঁদের সকলকেই, যারা ফুটবল খেলাকে ভালোবাসেন। এখনো সময় আছে, এখনো যদি আমরা অবহেলা করি, এখনো যদি আমরা স্বার্থসর্বস্ব কর্তৃপক্ষের হাতে ফুটবল খেলার ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকি, তাহলে বাংলা দেশের ফুটবলরসিক হিসেবে তার চেয়ে বড় অপরাধ, তার চেয়ে বড় পাপ, তার চেয়ে বড় অন্যায় আর কিছুই করা হবে না। তাই বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে, ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলা দেশকে আপন মহিমায় মহিমান্বিত করতে আমরা বাংলা দেশের আপামর ফুটবল উৎসাহী জনগণকে আহ্বান জানাই। —শান্তিপ্রস্থ

শাস্তাহিক বঙ্গমতী



গুলোর খেলোয়াড়দের মধ্যে দেখা যায় না আন্তরিকতার ছাপ, খেলা দেখে কখনো মনে হয় না যে, ফুটবল খেলাকে ভালোবেসেই ও'রা খেলেছেন। কলে খেলা কোন সময়ই ভালো হয় না। বড় দল-গুলোর নাম করা খেলোয়াড়রা সহজেই ছোট কিম্বা মাঝারি দলগুলোর খেলোয়াড়দের ওপর প্রভাব বিস্তার করে খেলতে পারেন। তাই গোলও হয়। কিন্তু এই পর্যন্তই! গতিবিধার ভালো খেলা দেখার সৌভাগ্য আর হয় না দর্শকদের।

সে যাই হোক, কলকাতা ময়দানের দুই প্রধানের মধ্যে ইস্টবেঙ্গল থেকে পাঁচজন পরম নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় গেছেন ট্রেনিং ক্যাম্পে। তবু যারা আছেন তাঁরাও তো কোন অংশে কম নন। তবু প্রথম বিভাগের নতুন দল দ্রাঘত্ব সঞ্চের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গল মোটে সুবিধেই করতে পারে নি। কোনমতে

একটা গোল দিয়ে দুটো পয়েন্ট ঘরে তুলেছে, এই পর্যন্তই।

প্রথম বিভাগে এ বছর যে চারটি নতুন দল খেলছে (দ্রাঘত্ব, কুমার-টুলী, একা সম্মিলনী আর টালীগঞ্জ অগ্রগামী) তাদের মধ্যে দ্রাঘত্ব সঞ্চের খেলাই দর্শকদের সবচেয়ে বেশি প্রশংসা অর্জন করেছে। দলের খেলোয়াড়রা ব্যয়সে প্রায় সকলেই তরুন। তাঁদের মধ্যে উৎসাহ আছে, উদ্দীপনা আছে আর আছে ভালো খেলার আগ্রহ।

এই কটি জিনিস প্রত্যেকটি দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে যদি থাকতো তাহলে বাংলা দেশের ফুটবল খেলার মান নিঃসন্দেহে উন্নত হতো। সবচেয়ে দুঃখের কথা, প্রথম বিভাগের অপর তিনটি নতুন দলের মধ্যে এই গুণ-গুলোর ছিটে-ফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না। আর সব থেকে দুঃখের ব্যাপার হলো পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়ার 'গটআপ' খেলায় এরাও মেতে উঠেছে।

॥ মার্গারেট কোর্ট ॥

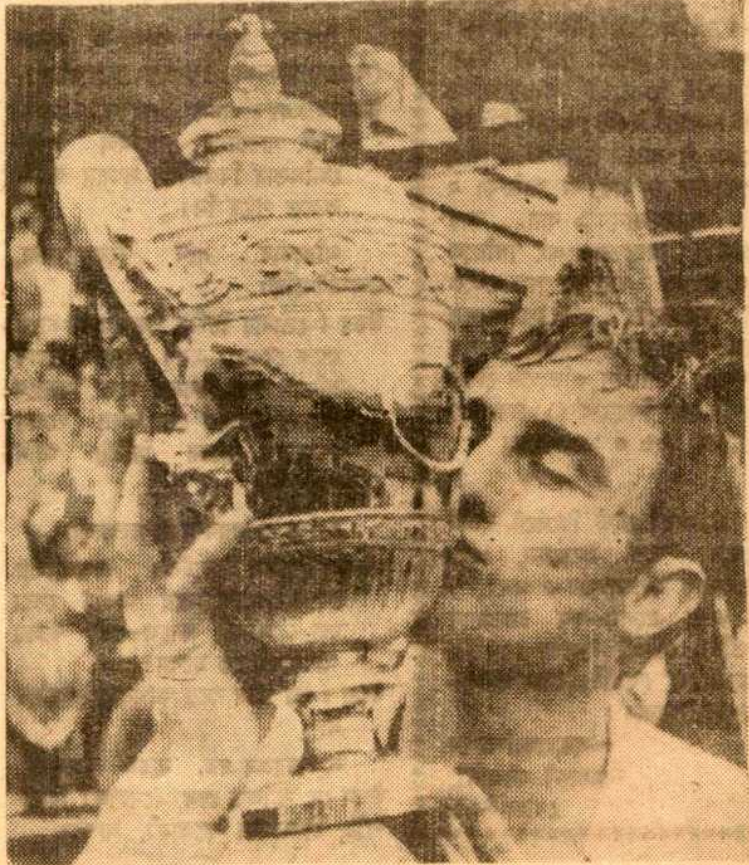
আমেরিকা বিলি জেন কিং কে হারিয়ে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মার্গারেট কোর্ট এবার উইম্বলডন টেনিস মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর তিনি ১৪-১২ ও ১১-৯ সেটে জেতেন।

ফুটবল মাঠ

কলকাতা ময়দানের কয়েকজন আমেরিকা খেলোয়াড় এখন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলে স্থান লাভ করার জন্যে বাংলার বাইরে গেছেন ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করতে।

এর জন্যে অবশ্য কলকাতার ফুটবলের আকর্ষণ এতোটুকুও কমে নি। দুপুর গাভিয়ে বিকেল হতে-না-হতে ফুটবলরসিকরা ছোটেন ময়দানে। তারপরই জমে ওঠে খেলা। ময়দানের ঘেরা মাঠ তিনটির মর্যাদাই এখন আলাদা।

কিন্তু সে মর্যাদা কলকাতা ময়দানের বড় দলগুলোর খেলোয়াড়রা কতোটা রাখতে পারছেন? কি মোহন-বাগান, কি ইস্টবেঙ্গল, কি মহম্মেডান স্পোর্টিং কিম্বা ছোটবড় অন্য দল-



॥ জয়লাভের আনন্দে বিভোর নিউকাস্বে ॥

দেশের কেন রোজওয়েলকে ৫-০, ৬-০, ৬-২, ০-৬ ও ৬-১ সেটে হারিয়ে দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার জন নিউকাস্বে।

প্রশ্ন-উত্তর

প্রদীপ বিশ্বাস (মোহরগাও টি এস্টেট, গুলমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : অতীতের বিশ্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ আজ হঠাৎ বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে এতো নিচে নেমে গেল কেন?

উত্তর : সমস্ত পৃথিবীতেই ক্রিকেট খেলার মান এখন বোধ হয় নিচের দিকে। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটি এখন কোন কোন খেলোয়াড়ের

ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। তাই তাঁদের ব্যর্থতাই দলের ওপর বড় বেশিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। আর সেই জন্যই বোধ হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের খেলার মান একটু নেমে গেছে।

হিরন্ময়, চিন্তা ও কৌশিক কর্মকার (গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৪৪)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর এতো দিনে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন। অরুণ আর খেলছেন না। সম্পৎ-কুমার বাংলার বাইরে একটি দলের পক্ষে সম্ভবত খেলছেন।

সুরেন নন্দী ও বিনয়কৃষ্ণ সরকার (বি ১/২৯২, কল্যাণী, নদীয়া)

প্রশ্ন : টেস্ট ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আজ পর্যন্ত ব্যাটিং ও বোলিং-এ কে কে রেকর্ড করেছেন?

উত্তর : অনেকেই তো করেছেন। কোন বিষয়ে জানতে চান জানাবেন। ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিং এ্যাভারেজ এর আগে বেশ কয়েকবার প্রকাশ করা হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

নির্মল, জয়, সনৎ ও প্রভাস (পারগোপালনগর, সিঙ্গুর, হুগলী)

উত্তর : ভারত এখন পর্যন্ত কোন-বারই মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারে নি।

পরিতোষ নাথ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : তোমার চিঠির উত্তর তো মাঝে মাঝে দেওয়া হয়। 'গল্প হলেও সত্যি' আর 'আমার মতে' বিভাগে তোমার লেখাও তো ছাপা হচ্ছে। তোমার খামের চিঠিটা আমি পাই নি।

খোঁস্ট ও ভাবলা (পোছলাড়া)

প্রশ্ন : বাংলার ফুটবল দলগুলির খেলোয়াড়দের নিয়ে একটি সেরা দল গঠন করুন-সে দলের অধিনায়ক কে হবেন?

উত্তর : দল গঠন করে আপনারাই পাঠান না!

সুভাষরঞ্জন দত্ত, সুরত চক্রবর্তী, উত্তম দে, সুজিত দেব (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, টাঙ্গুলা, কলোনী, পাণ্ডু)

উত্তর : বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার খেলা-গুলোতে পেলেন কোন মাদকদ্রব্য খেয়ে খেলতে নামেন নি, এটি গুজব।

কেরাম খেলা কোন সালে আরম্ভ হয় এবং কেরাম খেলার জন্মদাতা কে আমি তা ঠিক জানি না। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

সুখময় কুন্ডু (হর্সপিটাল রোড, টাঙ্গুলা, আসাম)

উত্তর : টেস্ট ক্রিকেটারদের মধ্যে কে কে জীবনের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসের প্রথম ওভারের প্রথম তিনটি বলেই বাউন্ডারী মেরেছেন, তা আমার জানা নেই।

মূল্য-অমূল্য

কিছুদিনের মধ্যেই লন্ডনে আন্তর্জাতিক ফুটবল প্রদর্শনীর আসর বসবে। এই প্রদর্শনীতে নানা রকম জিনিসপত্রের সঙ্গে থাকবে ফুটবল-সম্পর্কিত পেলের স্মরণীয় স্মৃতির কতগুলো সামগ্রী। পেলে এই জিনিসগুলো পঠাবেন। কিন্তু প্রত্যেকটির জন্যে আলাদা আলাদাভাবে ইনসিওর করতে হবে। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর পেলের সমর্থকরা যেভাবে পেলের জামা-প্যান্ট থেকে আরম্ভ করে তাঁর পোশাকের সব কিছু ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়েছিলেন সেই কথা মনে রেখেই বীমা করার ওপর পেলে এতো জোর দিয়েছেন।

কোন জিনিসের জন্যে কতো বীমা করতে হবে তার পরিমাণ নীচে দেওয়া হলো :

পেলে ১০০০টি গোল পূর্ণ করেছিলেন যে জার্সিটি গায়ে দিয়ে সেটির জন্যে—৩০,০০০ ডলার।

যে বলটি দ্বারা পেলে ১০০০ গোল পূর্ণ করেছিলেন সেটির জন্যে—৬০,০০০ ডলার।

১৯৫৮ সালে যে বর্টাটি পরে পেলে প্রথম বিশ্বকাপ খেলেছিলেন তার জন্যে—৬০,০০০ ডলার।

যে সার্ট পরে পেলে বিশ্বকাপ খেলেছেন সেটির জন্যে—৩০,০০০ ডলার।

চুপচুপ

এটা কসমে বাহুল্য যে, টেস্ট ম্যাচে শত রান করার গৌরব যথেষ্ট। একটি টেস্টের এক ইনিংসে অনেকেই 'সেঞ্চুরী' করেছেন। কিন্তু সরকারী টেস্ট খেলার একটি টেস্টের উভয় ইনিংসেই 'সেঞ্চুরী' করার নজির ক'টি?—মোট ২০টি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ করেছে ৭ বার, ইংল্যান্ড ৬ বার, অস্ট্রেলিয়া ৬ বার, দঃ আফ্রিকা ২ বার, পাকিস্তান ১ বার.....আর ভারত? ভারতেরও এই সিরিজের নাম আছে। ভারতের পক্ষ থেকে এই অভাবনীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করেছেন একমাত্র বিজয় জাজ্জারে। তিনি এডিলেড টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে (১৯৪৭-৪৮) করেছেন ১১৬ ও ১৪৫ রান।

সরকারী টেস্ট ক্রিকেটে ২০টি সেঞ্চুরী পূর্ণ করেছেন, এমন খেলোয়াড় আছেন মাত্র ৩ জন।

এরা হলেন—ডন ব্র্যাডম্যান (২৯টি), ওয়ালী হ্যামন্ড (২২টি), নীল হার্ডে (২১টি), কেন ব্যারিংটন এবং সোবার্স।

—সুদলকান্তি দে
নামবাড়ী কলোনী,
গোহাটি-১১

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত; ধর্মশাস্ত্র প্রচার-বৃত্তী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (স্ববোধিনী-টীকা সমং)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বুদ্ধবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবশিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মানসোচ্চাল :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমের-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম—৪-০০ এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মূল্য—প্রতি খণ্ড—৩-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিজ্ঞানিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৩-০০ টাকা ৩য় খণ্ড—৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, শেরঙসংহিতা, বুদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত, যোগরহস্যম্, পরমপরপ্রোক্ত যোগোপদেশ দুষ্প্রাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় শিষ্যদ্বিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। বহুবল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ডে বাঁধাই মূল্য—২-৫০ টাকা।

পবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জাই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

কিয়াকান্ড-বারিবি : (১ম খণ্ড)

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবোধিত সংশোধিত ও স্তবংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহুত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত অর্ধ সৎকর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বরূপ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত্ত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিদ্যারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীস্বপ্নীলকুমার সোমাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

হিন্দু ও আত্মজান :

মূল্য—৪-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিত। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

পদ্মতীর্থ সাহায্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ সাহায্যম্, শ্রীপ্রয়াগমাহাত্ম্যম্, শ্রীবন্দাবনমাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসাদকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

কল মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সফল -

কুকুমী

তুলতা হয় তা!

16 JUL 1970



কুকুমী
গুড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিভূপ্ত করে।
কুকুমী শিকার ঘাঙুর
ও রন্ধনের
পাতা নির্ভর
ব্যবহৃত হয়।

কুকুমী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
গুড়ো মশলা।
এর পেছনে
ব্রাহ্ম ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।



প্রস্তুতকারক
কুকুমী দত্ত (স্পাইজ)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর

সাপ্তাহিক বসুমতী



কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী



বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ]

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 4, 23rd July, 1957]

বোরোলীন
হাউস
কলকাতা-৩



ফেমিলা প্রো
সব তুলসীর জন্য

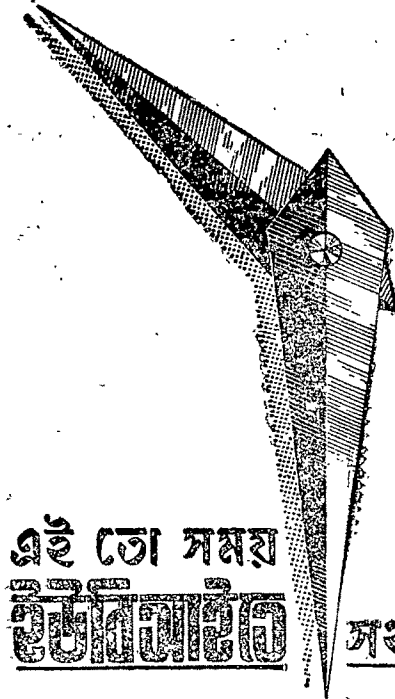
সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৯৫
আজকের মানুষ		১৯৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৯৭
বঙ্গদর্শন		২০৪
ভারতদর্শন		২০৬
আন্তর্জাতিক		২০৮
সপ্তাহের বোঝা	— কুন্তিবাস ওঝা	২১০
স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক		
বিশ্ববাদ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী	— গোরাচাঁদ কুন্ডু	২১৪
নিষ্ঠাবতী (কবিতা)	— অমিয়কুমার হাণ্ডি	২১৭
স্রোতের সংগে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২১৮
মেঘে আলোতে (কবিতা)	— জয়ন্তী সেন	২২০
বিসর্জনের ঢাক (কবিতা)	— রাধামোহন মহান্ত	২২০
ঢাকার চিঠি		২২১
পাঠকমন		২২৪
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	২২৫
আনন্দর পক্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	২২৭
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	২৩১

যে কোন গয়না আর আমল গ্রহরত্ন কেনার দক্ষিণ কোলকাতায় নামকরা প্রতিষ্ঠান ফোন : ৪৬-৬২৫৮	সন অ্যাণ্ড প্র্যাণ্ডসজ্জ অব লেডি এম. বি. সরকার	 এ.এরকার বল্ড ডিজাইন ১৯১৭ রাসবিহারী-জি.এ.এ.এ.এ.
---	---	---

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রস্থমেলা	...	২৩৬
উটপাখী (গল্প)	...	২৩৬
লোকসংগীতের একাল না আকাল	— জনিলকুমার দলুই	২৪১
রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে	— মুরশিদ	২৪৪
রঙ্গজগৎ	— শিলালি	২৪৭
খেলার রাজার রাজ্য	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৫২
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	২৫৪



এই তো সময়
ইউনাইটেড

সঞ্চয় করার

- * সেভিংস অ্যাকাউন্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
- * মাত্র ৫ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
- * চেকবই ব্যবহার করা যায়।
- * টাকা সহজেই তোলা যায়।
- * মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
- * পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন...আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন



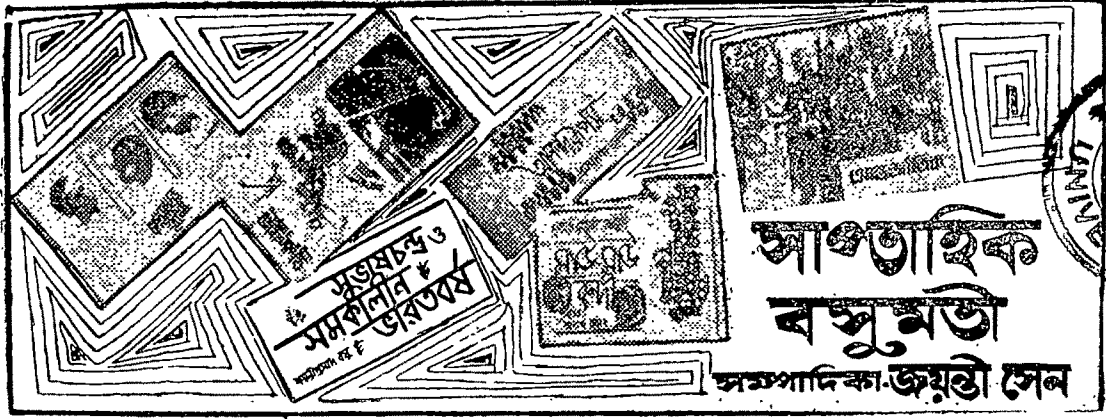
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

হেড অফিস :

৪, নবরেল চন্দ্র দত্ত সরণি

(পূর্বতন : ফ্রাইড হাট স্ট্রীট)

কলিকাতা-১



বৃহস্পতিবার, ৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 23rd July, 1970

আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ

শিক্ষার প্রয়োজন সর্বত্র। সর্বজনীন শিক্ষার সম্প্রসারণের দ্বারা সাতাকারের জনাহত করা সম্ভব। আমাদের দেশ অনুন্নত, সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ও নিরক্ষরতা ইমালয়প্রমাণ। এমন অজস্র পরিবার ভারতের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে, যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা বংশপরম্পরায় কখনোই পৃথিবীতে শিক্ষার সুযোগ পায় নি। পরাধীন ভারতে একদা তা হয়তো সম্ভব ছিল না, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পরও গ্রামের গরীব মানুষেরা শিক্ষা লাভের তেমন সুযোগ লাভ করে নি। ফলে, সারা ভারতে বর্ধিত শিক্ষার হার গৌরবজনক নয়। আর তেলো মাথার তেল দেওয়ার মতো—দেখা যায়, বংশপরম্পরায় যে সব পরিবারের ছেলেমেয়েরা সুযোগ পেয়ে আসছে, তাদের শিক্ষাব্যবস্থাটা অব্যাহতই থাকে। অবশ্য বর্তমানে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হওয়ায় দেখা যায়, উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে মর্ডেন্টমের ছাত্রছাত্রীই কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হ'বার সুযোগ পায়। তবে পরীক্ষায় ভালো রকম ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিভর করে নামকরা বিদ্যালয় ও কলেজগুলির ওপর। তাছাড়া যে সব অভিভাবক ছেলেমেয়েদের পড়াবার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করতে পারেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা ভালোভাবেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। এমন অবস্থার মধ্যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া স্বল্পআয়সম্পন্ন অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। স্বভাবতই শিক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে বিশেষ একটি শ্রেণীই শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে স্বাধীন ভারতে আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা দূরীকরণ মূল দাবি হওয়া উচিত এবং আমরা মনে করি, ১০০% লোক যদি সাক্ষর হন, তাহলে

শিক্ষাক্ষেত্রে যথার্থ বিপ্লব সম্ভব হবে। বর্তমানে গ্রামে নিরক্ষর ব্যক্তিদের মধ্যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোনোরূপ প্রচার নেই। প্রচেষ্টা নেই নিরক্ষরদের বিদ্যালয়ের গাঁওতে টেনে আনার। আধিকন্তু যত সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে, তা নিরক্ষরদের তুলনায় নগণ্য বলা যেতে পারে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকরাও স্বল্পবেতনভুক্ত। তাছাড়া সামান্য যে বেতন তাঁরা পান, তাও যথাসময়ে তাঁদের হাতে পৌঁছায় না। ঐ অবস্থার মধ্যে আদর্শবোধে উদ্ভুদ্ধ শিক্ষকরাও মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষা দিতে পারেন বলে মনে করা যায় না।

আমাদের দেশে আর একটি বিপদ উপস্থিত হয়েছে, তা হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি এক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর অনীহা। তারা ব্যবস্থার প্রতি অনীহা জানাতে গিয়ে এখন শিক্ষার গোড়াসন্ধ উপড়ে তুলে ফেলতে চায়। এতে মন্দ ছাড়া ভালো হতে পারে না। কারণ, দীর্ঘ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বর্তমানে যেটুকু সুযোগ পাচ্ছে, সেটুকুও লোপ পাবে। আর স্কুল-কলেজের গাঁওতে পা না মাড়িয়েও স্বচ্ছল অভিভাবকদের সন্তানসন্ততিগণ শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। তাই সকলের সামনে এখনো সুযোগ লাভের যে দরজা খোলা রয়েছে, তাও আত্মহননের রাজনীতিতে বন্ধ হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে বর্তমান শিক্ষাপন্থি সম্পর্কে যে সময় প্রশ্ন উঠেছে, শিক্ষাক্ষেত্রে অহেতুক তাণ্ডব শব্দ, হয়েছে, সেই মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ডাকে ভারতের মাটিতেই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ পালিত হচ্ছে। নয়াদিল্লীর মবলংকর অডিটোরিয়ামে গত ১৮ই জুলাই

আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি, ভি, গিরি। আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষ পালনের লক্ষ্য হচ্ছে—পৃথিবীর দেশগুলিকে তাদের বর্তমান শিক্ষাগত পরিস্থিতি, শিক্ষা কাঠামোর শক্তি ও দুর্বলতা পর্যালোচনা করতে বলা এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ ও সেগুলিকে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী হিসেবে কার্যকর করতে অনুরোধ করা।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতের শিক্ষার হার শোচনীয়। এই অবস্থায় রাষ্ট্রসংঘের কাছে ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার আসল চিত্র উদ্ঘাটন হওয়া উচিত। কারণ, অর্থভাবের জন্য এদেশে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব হচ্ছে না, এটা নিম্নম সত্য। সুতরাং, শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য রাষ্ট্রসংঘ যদি দক্ষিণা প্রদর্শন করেন, তাহলে এদেশে হয়তো বাস্তবভাবে সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হতে পারে। উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি বলেছেন, 'শিক্ষার বর্তমান ধারা এবং কাঠামোর প্রতি সারা বিশ্বের মোহমত্তি ঘটেছে। এর একটা প্রমাণ বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে অনুষ্ঠিত বিপ্লব।'

ঐ বিপ্লব আমাদের দেশে মর্ডেন্টমের এক শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এদেশের প্রতিটি নিরক্ষর যৌন সাক্ষর হবেন, সেদিনই হবে যথার্থ বিপ্লব-সাধন। কিন্তু সেই বিপ্লবের চাবিকাঠি সরকারের হাতে। আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বর্ষে সরকার সেই মরচে-ধরা চাবিকাঠিটিকে কি কাজে লাগাতে পারবেন?

সিদ্ধান্তদর্শী

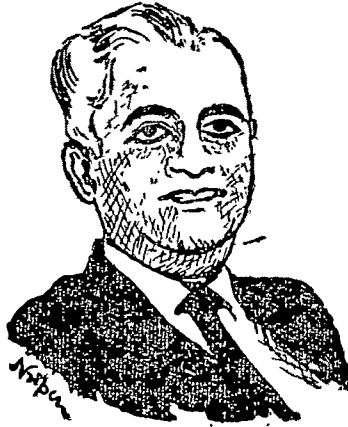
ভোজকের মানুষ

জীবনের একটা দীর্ঘ অংশ বিদেশে কাটাবার পর দেশে ফিরলে মনোভাব কী হয়? বিদেশের স্বাচ্ছন্দ্য ও নানারকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার পর দারিদ্র্য-জর্জর ভারতভূমিতে ফিরে ক'দিনের মধ্যেই প্রাণ আইচাই করা খুব অসম্ভাবিক নয়। এখানকার নানান সমস্যা ও অভাব দেখে চোখে জল এসে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। শ্রী এস কে ব্যানার্জি তেমনি প্রাচ্যের মধ্যে দীর্ঘকাল দিনযাপনের পর দেশে ফিরলেন। বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রাচ্য শাখার সেক্রেটারী হিসেবে কাজে যোগ দিলেন শ্রীব্যানার্জি। দেশে ফিরে তাঁর লাগছে কেমন, কে জানে? যতই প্রাচ্যের বন্যা বহুক না কেন, বিদেশ তো বিভূই। কাজেই দেশে ফিরলে কার না ভালো লাগে!

জাপান থেকে ফিরলেন শ্রীব্যানার্জি। এখানে ভারতের রাষ্ট্রদূতের গুরুদায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন তিনি। এখানকার ওসাকা শহরে যে বর্তমানে এক্সপো-৭০ বা বিশ্ব-বাণিজ্য মেলা চলছে, তাতে ভারতীয় পণ্যের প্রদর্শনীর সুব্যবস্থা করার ভার নিতে হয়েছিল শ্রীব্যানার্জিকে। প্রদর্শনীতে ভারতের পণ্য-প্যাভিলিয়ন যদি সুনাম ও প্রশংসা লাভ করে, তবে তার কৃতিত্ব অনেকখানি শ্রীব্যানার্জিরই প্রাপ্য।

জাপান যাত্রার আগে শ্রী এস কে ব্যানার্জি ছিলেন ব'ল-এ। পশ্চিম জার্মানীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হয়েও সেখানে ভারতের পণ্যের জন্য বাজার খুঁজে বার করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে পশ্চিম জার্মানী বিশ্বের প্রথম সারিতে। কাজেই সেখানে সূচ ফোটানো বা মাথা গলানো চাটখানি কথা নয়।

কিন্তু তারই মধ্যে বেছে নিতে হয়েছে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ভারতের পণ্য পশ্চিম জার্মানী তথা ইয়োরোপে কাটাতে হতে পারে, ভারতের শীর্ণ বৈদেশিক মদ্রাভাণ্ডারে খানিকটা শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে। পশ্চিম জার্মানীতে তখন জনবলের স্বল্পতা থাকার দরুন কিছু কিছু উৎপাদন ব্যাহত হিচ্ছিল, আর সেখানেই শ্রীব্যানার্জি ভারতীয় পণ্য চালু করে দিয়েছেন।



এস, কে, ব্যানার্জি

রাষ্ট্রদূত বা বৈদেশিক দপ্তরে শ্রীব্যানার্জির কার্যকাল নেহাৎ কম হলো না। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই তিনি একটার-পর-একটা দায়িত্ব নিয়ে বিদেশ যাত্রা করেছেন, যদিও শুরুর কয়েকটুকু সিঁড়ির তলা থেকেই। প্রথমে তিনি ফাল্ট সেক্রেটারীর পদ নিয়ে তেহরাণ যান—সেখানে সেবারই প্রথম ভারতের দূতাবাস খোলা হইয়াছিল। তার দু' বছর বাদে তাঁকে

ফিরিয়ে আনা হলো দেশে নয়, বিদেশে— যদিও ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সেটা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সেই পাকিস্তানের পুরনো রাজধানী লাহোরে— ডেপুটি হাইকমিশনার পদে।

কিন্তু এখানেও বেশিদিন থাকা হলো না, এর পরে তাঁকে যেতে হলো সুদূর মার্কিন মজুকে—সানফ্রান্সিসকোয় ভারতের কম্বাল-জেনারেল হিসেবে ১৯৫৪ সালে। অবশ্য সেও মাত্র দু' বছরের জন্যে। এর পরেই প্রমোশন পেয়ে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা নিয়ে সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস উপনীত হলেন শ্রীব্যানার্জি। মজুজ খাল জাতীয়করণের অব্যবহিত পরে। এশিয়ায় শ্রীব্যানার্জি সর্বশেষ রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব-পালন করেছেন সিঙ্গাপুরস্থ ভারতের হাইকমিশনার হিসেবে।

শ্রী এস কে ব্যানার্জি বাঙালী হলেও বাংলাদেশের বাইরেই তাঁর জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে। দেবাদন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করার পর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। এখানে একজন কৃতী ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের আই-সি-এস প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান দখল করে-ছিলেন। এরপর বিলেতের অক্সফোর্ডে তিনি দু' বছর পড়েন।

আই-সি-এস হিসেবে শ্রীব্যানার্জির কর্মজীবনও শুরু হয় বাংলার বাইরে, সেদিনকার মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে। এখানে প্রথমে তাঁকে এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার ও সাব-ডিভিশনাল অফিসারের পদ দেওয়া হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। তারপর আরো চারটি জেলার ডেপুটি কমিশনার হিসেবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর '৪৬ সালে তিনি রাজ্য সরকারের সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। দেশ স্বাধীন হলে তাঁকে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে নেওয়া হয়।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালীন ভারতবর্ষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বসু ও জিন্না—(২০)

শেষ পর্যন্ত ক্রিপসের সঙ্গে বোঝাপড়া হতে পারে নি। ফলে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসকে অগত্যা 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব নিতে হয়েছিল। ৩১শে আগস্ট, ১৯৪২ তারিখে সুভাষচন্দ্র জার্মানী থেকে সভারকর ও জিন্না প্রমুখ যারা ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করতে চান, তাঁদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন, আপনারা অনুভব করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিন এই পৃথিবীতে শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা যোগ দেবে, তাদের জন্যই মাত্র সম্মানের স্থান থাকবে ভারতবর্ষে। তিনি বিশেষভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন মুসলিম লীগের অন্তর্ভুক্ত প্রগতিশীল অংশের কাছে, যাদের কিছু লোকের সঙ্গে তিনি ১৯৪০-এ কলকাতা কংগ্রেসের ব্যাপারে সহযোগিতায় কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং মজলিস ই-অহর নামক জাতীয়তাবাদী মুসলমান দলের কাছে, যারা ১৯৩৯ সালে ভারতে ইংরেজের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন, যখন পর্যন্ত অন্য কোনো দল ঐ আন্দোলনে এগিয়ে আসে নি। আবেদন জানিয়েছিলেন, বিশিষ্ট মুসলমান দেশপ্রেমিক নেতা মুফতি খিফায়ত উল্লাহ পরিচালিত জমিয়ত-উল-উলুমা দলের কাছে, আজাদ মুসলিম লীগের কাছে, সেই সঙ্গে আকালি দলের কাছে এবং সর্বোপরি সুপরিচিত দেশহিতৈষীদের দ্বারা পরিচালিত বাংলার মুসলমান প্রজা পার্টির কাছে।

ক্রিপস-প্রস্তাবের আরও তিন বছর পরে যখন ওয়াশেল-প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে বিচলিত করে তুলেছিল, তখনো সুভাষচন্দ্র বারে বারে সতর্ক করে দিয়েছেন। আপোষমুখী নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, কংগ্রেসের সমর্থনে ভারতীয় সৈন্যদের ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লাগাবার জন্যই ওয়াশেল-প্রস্তাবের ধাপ্পা। কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগ না দেবার প্রতিজ্ঞা সে নিয়েছে, '৪২-এর আগস্ট-প্রস্তাবে সে বলেছে, স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত 'করেগে ইয়া মরেগে' তার মন্ত্র, এক্ষেত্রে কংগ্রেসের পক্ষে আজ-

মরাদা রেখে আপোষ করা চলে না—তাও বলেছিলেন। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে বর্ণহিন্দু ও মুসলিম লীগের সদস্য-সমতার মধ্যে ইংরেজের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি বলবৎ রাখার কোন চক্রান্ত চলেছে, তাও খুলে ধরেছিলেন। সেই সঙ্গে কঠিনভাবে বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি ওয়াশেলের ফাঁদে পা দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সমর্থনে সৈন্য পাঠায়—সেই প্রতিক্রিয়াশীল বাহিনীর বিরুদ্ধে আজাদ হিন্দ ফৌজের পক্ষে অস্ত্র উঠিয়ে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় থাকবে না। "If the Congress decides to accept Lord Wavell's offer and if, as an inevitable consequences of it, the Congress leaders come at the head of the Indian troops to fight Britain's imperialist war in the far East, then there will be no option for us but to fight with the Azad Hind Fauj against our own countrymen, who would then be allies of the British Imperialism."১

এই উদ্ঘৃতিটি আর কিছু না হোক, সুভাষচন্দ্রের একটি চেহারা অন্তত খুলে ধরেছিল—প্রয়োজনে তিনি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুত ছিলেন। যদি মনে করতেন যে, ঐ নেতৃত্ব জাতীয় উন্নতির এবং প্রগতির বিরোধী। অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ, দরকার হলে।

সুতরাং সুভাষচন্দ্র আব্রাহাম লিংকনও হতে পারতেন। যদি সম্ভব হত, তিনি নিশ্চয় দেশ বিভাগ-প্রশ্নে গৃহযুদ্ধের ঘড়ীক নিতেন, কারণ দেশ বিভাগকে তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার মৃত্যু-বিধান মনে করেছিলেন। দেশ ভাগের বিরুদ্ধে সতর্ক করে তিনি ব্রহ্মদেশ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪-এ একটি বেতার বক্তৃতা করেছিলেন। ঐ কালে গান্ধী-জিন্নার যে আলোচনা চলাছিল, তারই সূত্রে বক্তৃতাটি দেন। সূচনায় বলেন:

"বন্দুগণ, দেশবাসিগণ! ...আপনারা জানেন বোম্বাইয়ে গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্না হিন্দু-মুসলমান প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছেন এবং গান্ধীজী লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চান—যদি প্রয়োজন হয়, লীগের

দার্শনিক বুদ্ধমতী

পাকিস্তান-দাবি মেনে নিয়েও তা তিনি করবেন। লীগকে ছুঁট করবার জন্য গান্ধীজীর এই প্রয়াসের বিষয়ে বাইরের ভারতবাসী আমরা কী ভাব তা জানতে আপনারা উৎসুক, সে কথা আমরা জানি।

“পূর্ব এশিয়ার ভারতবাসী আমরা মৃত্ত ও অখণ্ড ভারতবর্ষের জন্য এখন সংগ্রাম করে চলেছি। মাতৃভূমিকে মৃত্ত করতে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; শেষ পর্যন্ত জয় আমাদের হবে সে বিষয়ে আমরা সন্নিহিত। সংগ্রাম যত দীর্ঘ এবং কঠিন হোক, আমরা বরোঁছি যে, পরিশেষে সত্য ও ন্যায়ের জয় অনিবার্য, সফল হবে ভারতের মৃত্তির জন্য আমাদের সংগ্রাম। সুতরাং আমরা কখনই বৃটেনের সঙ্গে আপোষের অংশীদার হতে পারি না। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ—এই কথাটাই আমাদের কাছে ঘৃণ্য। আমরা খুব তীব্রভাবে অনুভব করি যে, ঐ আপোষের অর্থ দাসত্বকে দীর্ঘায়িত করা। অখণ্ড মৃত্ত ভারত সৃষ্টি করার প্রতিজ্ঞা আমরা নিয়েছি বলে ভারতকে বিভক্ত করার, তাকে টুকরো টুকরো করার সকল প্রয়াসের বিরোধিতা আমরা করব। আয়ারল্যান্ড ও প্যালেস্টাইনের ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি। আমরা বরোঁছি যে, দেশকে বিভক্ত করার অর্থ, তাকে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করে ফেলা। আমেরিকা তার বর্তমান বিরাট রূপে পৌঁছতে পারত না, যদি আমেরিকান-পাকিস্তানীদের স্বেচ্ছামত কাজ করতে দেওয়া হত। বিদেশী শাসন থেকে মৃত্ত হলেই আমরা সহজে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারব। সোভিয়েট ইউনিয়নকে দৃষ্টান্তরূপে আমাদের নেওয়া উচিত। ভারতের থেকেও বেশি সংখ্যক জাতির বাস সোভিয়েট ইউনিয়নে। কিন্তু তা হলেও তারা আজ ঐক্যবদ্ধ। কেন? যেহেতু তারা স্বাধীন এবং বিদেশী শক্তির কাছে তাদের মাথা নামিয়ে থাকতে হয় না।

“ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঃ জিন্নার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। আমার ও আমার দলের (ফরোয়ার্ড ব্লক) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; অতীতে লীগের সঙ্গে সহযোগিতায় আমরা কাজ করেছি। আমি মুসলিম লীগ এবং তার সুবিখ্যাত নেতার বিরোধী নই। কিন্তু আমি দেশকে বিভক্ত করার ঐ পাকিস্তান পরি-কল্পনার প্রচণ্ড বিরোধী।”

সুভাষচন্দ্র এই বক্তৃতায় যুদ্ধনীতি ও পৌরবর্নীরিত মোটা কথাটা কংগ্রেসী নেতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। “যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসরে ইংরাজ ও আমেরিকানরা একের পর এক যুদ্ধে পরাভূত হয়েছে, কিন্তু কদাপি শতাব্দীতে যা নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের কথা ভাবে নি। তারা এই আশা রেখে লড়াই করে গেছে যে, শীঘ্র বা বিলম্বে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন হবে; তাদের আশা সার্থক হয়েছে: তারা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করেছে; কিন্তু তাই বলে তাবা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এতটুকু শিথিলতা দেখাচ্ছে না।” সুতরাং, সুভাষচন্দ্রের প্রশ্ন, কংগ্রেস কেন তা দেখাবে? যেহেতু ইংল-আমেরিকান পক্ষ কিছুটা জয়লাভ করেছে?

আমরা বুদ্ধিতে পারি, নৈরাশ্যপীড়িত, সংগ্রামের ক্ষমতা বা ইচ্ছাহীন কংগ্রেসের বুদ্ধ নেতৃবৃন্দের কাছে সুভাষ-চন্দ্রের আবেদনের কোনো মূল্য ছিল না। ইংরেজের সঙ্গে আপোষ এবং পাকিস্তান স্বীকারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র এর পরে আরও যা বলেছেন, আমরা জানি, তার বিষয়েও উদাসীন থাকার মত প্রাক্ত বর্ধিততা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অর্জন করে ফেলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা হয়ত আক্ষরিকভাবে সত্য হয় নি, কিন্তু সত্য হয়েছিল তাৎপর্ষ্যে, যা আরও মারাত্মক। বর্তমানে আমরা কি ভারতবর্ষ, নামক অতীতের “উপমহাদেশে” আমেরিকা, ইংলন্ড, রাশিয়া ও চীনের নিত্যলীলার সেবাদাসী হয়ে বিরাজ করছি না? সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ছিল:

“লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে চুক্তি বৃটেনের সঙ্গে বোঝা-পড়ার পূর্বভূমিকা হয়ে দাঁড়াবে। তা যদি হয়, তাহলে ভারত চিরদিন দাস হয়ে থাকবে। কংগ্রেস ও লীগ যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন থাকবে, ততক্ষণ বৃটিশের সঙ্গে কোনো আপোষ হবে না। সেই জন্যই যেসব কংগ্রেসী বৃটেনের সঙ্গে আপোষ করতে চান, তাঁরা পাকিস্তানের তেতো বাড়ি গিলতে রাজী হয়ে পড়েছেন। আমি কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের নেতৃবৃন্দকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, দুই পক্ষের মধ্যে পাকিস্তান প্রশ্নে যদি কোনো আপোষও হয়, তবু ইংরেজ স্বাধীনতা দেবে না। সে কথা তারা কার্যত জানিয়ে দিয়েছে—সংখ্যালঘুদের এবং দেশীয় রাজাদের স্বার্থের রক্ষা-কবচের কথা তুলে। যারা মনে করেন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে আপোষ হলে ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিতে প্রণোদিত হবে, তাঁরা আত্মপ্রভারণা করছেন। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে আমি এ ব্যাপারে কংগ্রেস-লীগের বোঝাপড়ার হেতু বুদ্ধিতে পারছি না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, পাকিস্তান মেনে নিলেও আমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। লীগ কখনো আমাদের মত ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করবে না। তার একমাত্র ইচ্ছা, ভারতকে হিন্দু-ভারত ও মুসলিম-ভারত—এই দুই রাজ্যে ভাগ করে ফেলা। চারটি মুসলিম রাজ্য তার ফলে গঠিত হবে, যোগদল বৃটিশ প্রভাবাধীন থাকবে। সুতরাং একটি ক্রীতদাস ভারতের পরিবর্তে আমরা চারটি ক্রীতদাস মুসলমান রাজ্য পাব, যারা বৃটেনের কুকর্মের সহায়ক ও প্ররোচক হবে। বৃটিশ যদি দেখে তার স্বার্থসিদ্ধি হচ্ছে না, তাহলে কংগ্রেস-লীগ চুক্তিকে অগ্রাহ্য করবে। ভারতের উপর থেকে তারা হাত তুলে নেবে না। ভারতের লক্ষ লক্ষ মুসলমান তরুণকে আমি প্রশ্ন করি: তোমরা কি মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার কাজে যোগ দেবে? বিভক্ত ভারতে তোমাদের মর্যাদা কী দাঁড়াবে? সুতরাং বুদ্ধগণ, যদি তোমরা স্বাধীনতা চাও, তার জন্য লড়াই করো, লাগি মেয়ে বৃটিশকে ভারত থেকে তাড়াও।” ইংরেজের সঙ্গে কোনো আপোষ চলবে না। আমাদের দিব্য মাতৃভূমিকে ছেদন করা চলবে না। ইন-কিলাব জিন্দাবাদ! আজাদ হিন্দ জিন্দাবাদ!”

[ক্লেশ]

২ সুভাষচন্দ্রের ইংরেজ-জীবনীকার হিউ চৌয় সুভাষচন্দ্রের এই সময়কার বক্তৃতাটি একদম পছন্দ করেন নি।

সংগ্রাহিক-বঙ্গমতী

সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্বেষ করেছেন। করাই স্বাভাবিক, তার দ্বারা তিনি নিজের ইংরেজ-স্বভাব দেখিয়ে দিয়েছেন। সুভাষচন্দ্র ইংরেজকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করতেন, তা প্রকাশও করেছেন বার্মাহীন ভাবায়, হিউ টোয়-এর স্বজাতিপ্রেম নিশ্চয় তাকে সানন্দে অস্বাদ করবে না। ১৯৪৪-এর ৯ সেপ্টেম্বর থেকে এক পক্ষকাল ধরে বোম্বাইয়ে গান্ধী-জিন্নার মধ্যে যে-আলোচনা হয়েছিল, যার মধ্যে গান্ধীজী 'কাষ'ত পাকিস্তান মেনে নিজেহীন—তার বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের প্রতিবাদ অবশ্যই হিউ টোয়-এর মতে গহিত ব্যাপার। আলোচনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছিল, কারণ জিন্না 'কাষ'ত পাকিস্তানে সন্তুষ্ট ছিলেন না—তিনি ইংরেজের বাড়ানো হাতের তলায় অঞ্জলি পেতে অবিমিশ্র পাকিস্তান লাভ করতে চেয়েছিলেন।

উপরে আমরা গান্ধীজী কতক পাকিস্তান মেনে নেওয়ার সম্ভাবনায় সুভাষচন্দ্রের প্রচণ্ড প্রতিবাদের কথা উদ্ধৃত করেছি। গান্ধীজী ঠিক কতখানি মেনেছিলেন, তা জানতে পাঠকের কৌতূহল হতে পারে। স্যার রেজিনাল্ড কুপল্যান্ড গান্ধীজীর প্রস্তাবকে সারসংক্ষেপ করে যেভাবে উপস্থিত করেছেন (হিউ টোয়-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত) তাই তুলে ধরিঃ

1. The Muslim League was to endorse the Indian demand for independence and to co-operate with the Congress in forming a provisional government for the 'transitional period.'

2. At the end of the war a Commission would demarcate those contiguous areas in N.-W. and N.-E. India in which the Muslims are in an absolute majority, and in those areas a plebiscite of all the inhabitants would decide whether or not they should be separated from Hindustan.

3. In the event of separation, agreements would be made for defence, commerce, communications and other essential purposes.

4. 'These terms shall be binding only in case of transfer by Britain of full power and responsibility for the governance of India.'

হিউ টোয়-এর বক্তব্য, সুভাষচন্দ্র, গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে কোনরকম বোঝাপড়ার বিরোধিতা করেছিলেন এই জন্য যে, তা ঘটলে ভারতবর্ষে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা টলমলে হয়ে দাঁড়াবে এবং তিনি ভারতের 'মুন্সিফদাতার ভূমিকা' করতে পারবেন না। সুতরাং সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রচারসচিব শিবরামকে এই আপোষ-আলোচনার বিরুদ্ধে পদ্যোদমে প্রচারণা চালাতে নির্দেশ দিলেন। হিউ টোয় জানিয়েছেন, শিবরাম এই 'অযন্য মতলবে' সায় দেওয়ার চেয়ে পদত্যাগ করাই সংগত বিবেচনা করেছিলেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, সুভাষচন্দ্রের মতলব জাপানীদের সাহায্যে নিজেকে ভারতের ডিক্টেটর করে তোলা। তাঁর নীতি ভারতে অশান্তি ও অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলবে—এও শিবরাম বুঝেছিলেন। হিউ টোয় অবশ্য এসব কথা জানাবার সময়ে জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, এইকালে যুদ্ধক্ষেত্রে আজাদ হিন্দ ফৌজের বিপর্যয়ের সংগে শিবরামের নবজাগ্রত গান্ধী-ভক্তির কতখানি যোগ ছিল।

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পরে লর্ড ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাব হাজির করেন। ওয়াভেল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 'রাতের পর রাত' সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, যত প্রকারে পারেন ঐ প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতাকে তিনি উন্মোচন করেছিলেন, সতর্ক করেছিলেন সুচতুর ব্রিটিশ রক্ষণশীল রাজনীতিকদের ধাম্পাবাজি সম্বন্ধে। ভাইসরয় যে কাউন্সিল প্রবর্তন করবেন বলেছেন, সেখানে কংগ্রেস সংখ্যাগুরু হয়ে দাঁড়াবে; তার ফলে যখন ভাইসরয় ও লীগ-সদস্যরা ভারত বিভাগের প্রস্তাব গুণাবেন, তখন তাঁকে বাধা দেবার শক্তি তাঁদের থাকবে না। সুভাষচন্দ্র তাই ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেনঃ এই ক্রান্তিকালে ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীরই হাতে; সারা দেশজুড়ে আবার 'ভারত ছাড়' আন্দোলন জাগুক যাতে কেউ আপোষ রফা করতে না পারে। [“At this critical hour the destiny of India lies in your hands. Now is your time for starting the 'Quit India' campaign all over the country, and thereby making it impossible for anyone to arrive at a compromise.”]

সুভাষচন্দ্র এও বলেছিলেন, ভারত যদি দরকষাকষি করতেই চায়, তাহলে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের পরে প্রাথমিক সরকার ক্ষমতায় এলে তা করা উচিত। চার্চিল সরকার আসল নির্বাচনে টোরীদের পক্ষে ভোট কুড়োবার জন্যই ওয়াভেল-প্রস্তাব এনেছে।

ওয়াভেল-প্রস্তাবের উপর কোনো বোঝাপড়া সম্ভব হয় নি। হিউ টোয় বিদ্বেষ-তিষ্ঠা স্বরে বলেছেন, “শেষবারের জন্য বোস নিজ ভোটে জিতে গেলেন।”

হিউ টোয়দের আনন্দবিধান করে বলাই বাহুল্য বোস জিতে পান নি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তারই ফলে হয়েছে। যে চার্চিল সরকারের আসল মতলবের কথা বঙ্গ বাহুরে বলেছিলেন, যার জন্য তিনি অতখানি ঘৃণাভাজন হয়েছেন, সেই সরকারের আসল মনোভাব কী ছিল, এক মূলকে তা সদ্য দেখা গিয়েছে। ১৯৪২ সালে ক্রিপস মিশনের সময়ে ভারতীয়দের এবং তাদের নেতাদের সম্বন্ধে লর্ড লিনলিথগোর মনোভাব কি ধরনের ছিল,

তার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখেছি ১১ই জুলাই, ১৯৭০-এর স্টেটসম্যান পত্রিকায়। ব্রিটিশ সরকার ঐ সময়কার সরকারী কাগজপত্র (Constitutional Relations Between Britain and India গ্রন্থে) প্রকাশ করাতেই ব্যাপারটা জানা গেছে। একালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের নিয়ে শাসনপরিষদ গঠন করবেন বলেছিলেন। অবশ্য ভারতীয়দের হাতে আসল ক্ষমতা কিছুই দেওয়া হবে না, তাও জানানো হয়েছিল। লিনলিথগোর ইচ্ছা ছিল, নেহরু ও জিন্নাহর হাতে কোনো শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা না দিয়ে জনগণের মনের জোর বাড়ানোর কাজে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে, কারণ ভয়কাতুরে কুলিগল্লোর সঙ্গে বাতচিৎ করে বিশেষ কিছু ঘটতে পারবেন, এমন ভরসা খাঁট লর্ড শ্রীযুক্ত লিনলিথগোর ছিল না।

[In reply to Mr. Amery's telegram of April 7, 1942—seeking his views about what changes he was contemplating in the event of the Cripps Mission—Linlithgow had some revealing comments to make. His plan was to see whether Mr. Nehru or Mr. Jinnah would take office without Administrative portfolio so that they might remain free 'to tour the country to boister up morale'. (As you know I don't hope for much out of pep talks to terrified coolies)."]

সংগ্রামে অনিচ্ছা এবং আশ্রয় ক্ষমতাপ্রাপ্তির লোভ এই সময়ে অর্থাৎ ওয়াভেল-প্রস্তাব আলোচনার সময়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কিভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায় মোলানা আজাদের 'ইন্ডিয়া উইনস্‌ ফ্রিডম' বই থেকে। বিস্ময়কর হলেও সত্য, কংগ্রেস-নেতৃত্বের মধ্যে সংগ্রাম-স্পৃহা যদি কোথাও থাকে, তা ছিল একমাত্র গান্ধীজীর মধ্যে। গান্ধীজী ভিন্ন 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করত না। জওহরলাল, আজাদ ও রাজাগোপালাচারীর তখন গলাগলি ভাব-ফ্যাসিস্ট-ভীতির ছুতায় তাঁরা 'গণতান্ত্রিক' ইংরেজের কোলে উঠে বসেছেন। দূর্বর্ষ জওহরলাল কিছু লজ্জায় ইংরেজের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় নেতৃত্ব নিতে পারছেন না—সে দায় কংগ্রেস-সভাপতি আজাদের ঘাড়ে চলে গিয়েছে এবং তিনি অক্লেশ আনন্দে তা বহন করছেন। কিভাবে তা করেছেন, তা তাঁর স্মৃতিকথা থেকেই দেখব। ১৯৪৫-এর ২৫শে জুন সিমলায় ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনাসভার আয়োজন করলেন। কংগ্রেস-সভাপতি আজাদ 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব কংগ্রেস মিউজিয়ামে ফেলে রেখে সেই আলোচনায় যোগ দেবার জন্য ছুটে গেলেন। তারপরঃ

"পরদিন সকাল ১০টায় আমি ভাইসরয়ের (লর্ড ওয়াভেল) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে সৌজন্যের সঙ্গে গ্রহণ করলেন এবং সংক্ষেপে জানালেন, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে কী প্রস্তাব তিনি এনেছেন। তিনি বললেন, যুদ্ধের মধ্যে কোনো সদৃশপ্রসারী শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটানো যাবে না, কিন্তু ভাইসরয়ের এঞ্জিকিউটিভ কাউন্সিল সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের দ্বারা গঠিত হবে এবং একটা রীতি দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হবে যে, ভাইসরয় সর্বদা কাউন্সিলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবেন। সরকারকে বিশ্বাস করবার জন্য ভাইসরয় আমার কাছে আবেদন জানালেন। তাঁর ঐকান্তিক মনোবাসনা, যুদ্ধের পরে ভারতীয় সমস্যার সমাধান অবশ্যই করা দরকার। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বললেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। সুতরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা যুদ্ধের বিজয়-সমাপ্তিতে অংশ নিলে ভারতেরই সুবিধা হবে। তারপর মুসলিম লীগের উল্লেখ করে তিনি বললেন, কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার।

"আমি তাঁকে পরিষ্কার বললাম, লীগের সঙ্গে বোঝাপড়া হওয়ার ব্যাপারটির কোনো স্থিরতা নেই। লীগের কর্তার ব্যক্তিদের ধারণা, সরকার তাদের পক্ষে আছে; সুতরাং তারা ন্যায়সংগত কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।

"ভাইসরয় জোর দিয়ে বললেন, সরকারের পক্ষে লীগকে সমর্থনের কোনো কথাই ওঠে না। মুসলিম লীগের নেতাদের তেমন কোনো ধারণা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আমাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, সরকার নিরপেক্ষ আছে এবং থাকবে।

"আমি তখন আহমদনগর দুর্গের কারাক্ষ থেকে তাঁর সঙ্গে যৈ-পত্নীলাপ করেছি, তার উল্লেখ করে বললাম, সেগদুলি প্রকাশ করলে নিশ্চয় তাঁর আপত্তি হবে না।

"ভাইসরয় বললেন, যদি সেগদুলি প্রকাশ করতে আমি ব্যগ্র হই, তাহলে তিনি আপত্তি করবেন না, কিন্তু তাঁর মতে ওগদুলির প্রকাশ এখন দরুণ্যজনক ব্যাপার হবে। তিনি বললেন, আমরা এখন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভারতীয় সমস্যার সমাধান করতে চাইছি; আমাদের ইচ্ছা, জনগণ তিস্ত অতীতের স্মৃতি ভুলে যায়। এই সময়ে যদি সেই পুরনো স্মৃতি-গদুলি জাগিয়ে তোলা হয়, তাহলে আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে, বন্ধুত্ব ও একাত্মবোধের মনোভাবের পরিবর্তে অবিশ্বাস ও ক্রোধের পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তিনি আবেদন জানিয়ে বললেন, ঐ চিঠিপত্রগদুলি প্রকাশ করার জন্য আমি যেন চাপ না দিই এবং যদি আমি তাঁর কথা রাখি, তাহলে তিনি আমার আচরণের যথেষ্ট তারিফ করবেন।

"আমি দেখলাম, ভাইসরয় খুবই আন্তরিক, যথার্থই তিনি আবহাওয়ার পরিবর্তন চান। আমি তাঁকে বললাম, নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির ব্যাপারে আমি তাঁর অভিপ্রায়ের অংশীদার; নতুন বন্ধুত্বের মনোভাব নিয়ে আমাদের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। এই পরিস্থিতিতে আমি এমন কিছু করব না, যাতে বিষম ঘটে। সুতরাং তাঁর কথা আমি মেনে নিলাম।

গাণ্ঠাহিক বসুমতী

"ভাইসরয় দ্বার বললেন, আমার এই মনোভাবের জন্য তিনি কৃতজ্ঞ।

"ভাইসরয় তারপর তাঁর প্রস্তাব বিস্তারিতভাবে জানালেন। প্রথমেই আমার মনে হল, ক্রিপস প্রস্তাবের সঙ্গে এই প্রস্তাবের সারাংশে কোনো পার্থক্য নেই। তবে পরিস্থিতির ক্ষেত্রে একটি বাস্তব পার্থক্য ঘটে গেছে। ক্রিপস প্রস্তাব করা হয়েছিল যখন ইংরেজের পক্ষে ভারতীয় সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। আর আজ ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, মিত্রপক্ষ সেখানে হিটলারকে পরাভূত করেছে। তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ সরকার ভারতে নতুন রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য পুরনো প্রস্তাবের পুনরুদ্ধাপন করছেন।

"ভাইসরয়কে বললাম, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তার প্রতিনিধিদের অধিকার আমাকে দিয়েছে সত্য কিন্তু তা হলেও সূনির্দিষ্ট উত্তর দেবার আগে আমি সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে চাই। তদনুযায়ী আমি প্রস্তাবের বিবেচনার জন্য সিমলায় ওয়াকিং কমিটির মিটিং ডেকেছি। সেখানকার আলোচনার পরে আমি সম্মেলনের সামনে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত উপস্থিত করতে পারব। লর্ড ওয়াভেলকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, সমস্যার সমাধান করবেই আমি চাইব, ঝগড়া বাধাব না।

"ভাইসরয় যখন তাঁর প্রস্তাব বর্ণনা করছিলেন তখন তাঁর খোলা মনোভাব এবং আন্তরিকতা দেখে আমি প্রভাবিত হয়েছিলাম। আমি দেখলাম, তাঁর মনোভাব রাজনীতিকের নয়, সৈনিকের; খোলাখুলি, সরাসরি তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন, ধানাইপানাই না করে মূল কথায় চলে এসেছিলেন। স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের সঙ্গে তাঁর আচরণের পার্থক্য বেশ চোখে পড়ল। ক্রিপস তাঁর প্রস্তাব যতখানি মনোহর করে হাজির করা যায় তাই করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভাল দিকটিকে বেশি উজ্জ্বল করে তুলে অসুবিধার অংশগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন যেন-তেনভাবে। লর্ড ওয়াভেল তেমন কোনো চেষ্টাই করেন নি এবং প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা থেকে সূনিশ্চিতভাবে বিরত ছিলেন। সোজা ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যুদ্ধ এখনো চলেছে এবং জাপান শক্ত শত্রু। এই অবস্থায় ব্রিটিশ সরকার কোনো দূরপ্রসারী পদক্ষেপে প্রস্তুত নয়। ও-ধরনের ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধশেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে তাঁর মতে তার ভিত্তি এখনই স্থাপন করা যায়। এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সম্পূর্ণ ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হবে। তার ফলে সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থা ভারতীয়দের করায়ত্ত হয়ে যাবে। একবার তা হয়ে গেলে সম্পূর্ণ নতুন অবস্থার সৃষ্টি হবে এবং যুদ্ধের পরে অধিকতর অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হবে।

"লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে আমার ইন্টারভিউ সিমলায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল। সেদিন রাতে তিনি রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। শুনলাম, আমার সম্বন্ধে তিনি খুব উচ্চ ভাষায় কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ থাকলেও গুঁরা ভদ্রলোক। ভাইসরয়ের এই মন্তব্য সারা সিমলায় ছড়িয়ে পড়ে সরকারী ও বেসরকারী মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কংগ্রেস সম্বন্ধে যারা অনেকটাই শীতল মনোভাব দেখাচ্ছিলেন, আমাকে প্রায় চিনছিলেন না, হঠাৎ আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের হৃদয়ে অনুরাগের ঠোপ দেখা গেল। তাঁরা অনেক উপহার এনে আমাকে দিলেন, আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ভিতরে ভিতরে তাঁরা সর্বদা কংগ্রেসের পক্ষেই আছেন এবং তাকে সমর্থন করেছেন।

"সর্দার হরনাম সিংয়ের বাড়িতে গান্ধীজী উঠেছিলেন, সেখানে ২৪ তারিখে বিকালে ওয়াকিং কমিটির সভা বসল। ভাইসরয়ের সঙ্গে আমার কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে বললাম, এই প্রস্তাব ক্রিপস-প্রস্তাবের সঙ্গে যদিও চেহারায় একই, তবু আমাদের একে গ্রহণ করা উচিত। আমার বক্তব্যের সমর্থনে আমি পরিবর্তিত অবস্থার কথা তুললাম। ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে এবং জাপানেও বেশিদিন টিকতে পারবে না। যুদ্ধ যদি একবার শেষ হয়ে যায়, তাহলে ইংরেজের পক্ষে আমাদের সহযোগিতা চাইবার বিশেষ কারণ থাকবে না। সুতরাং আমাদের পক্ষে লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। শর্ত মনঃপূত হলে তাকে গ্রহণ করব—এই মনোভাব নিয়ে সম্মেলনে আমাদের যোগদান করা উচিত।

"ওয়াকিং কমিটিতে বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হল। শেষে স্থির হল, সম্মেলনে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপরে জোর দেবঃ

"(১) এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সঙ্গে ভাইসরয়ের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার বিবৃতি চাই। কাউন্সিল যদি কোনো বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে কি ভাইসরয় সে সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন, কিংবা তেমন ক্ষেত্রেও তাঁর ভেটো থাকবে?

"(২) সৈন্যবাহিনীর ব্যাপারটিও নির্ধারিত হওয়া দরকার। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে বিভেদের রেখা টানা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন দরকার, যাতে করে ভারতীয় নেতারা সৈন্যবাহিনীর সম্পর্কে আসতে পারেন।

"(৩) ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর মতামত না নিয়েই ভারতকে যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছেন। কংগ্রেস এই অবস্থাকে মেনে নেয় নি। যদি কোনো বোঝাপড়া হয় এবং নতুন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠিত হয়, তাহলে যুদ্ধে পরবর্তী অংশ-গ্রহণের ব্যাপারটিকে লেজিসলেটিভ অ্যাসেমব্লির সামনে উপস্থিত করার অধিকার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের থাকবে। ভারত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের দ্বারা চালিত হয়ে নয়, তার নিজের প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

গাণ্ধীজী বঙ্গমতী

“গান্ধীজী ওয়াকিং কমিটির সভায় সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সহমতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু তাঁর এ কথাটা তোলেন নি—যুদ্ধে অংশ নেওয়ার মানে কংগ্রেসের পক্ষে অহিংসা ত্যাগ করা। অন্যভাবে বলতে গেলে, হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন তিনি কদাপি উত্থাপন করেন নি। এই প্রশ্নে যেসব ওয়াকিং কমিটির সদস্য পূর্বে পদত্যাগ করেছিলেন, তাঁরাও অনুরূপভাবে নীরব ছিলেন।”

সিমলা সম্মেলন হয়েছিল কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল। কংগ্রেস লর্ড ওয়াভেলের সব কথাই মেনে নিয়েছিল বলে কংগ্রেসের তরফে কোনো হাঙ্গামা ছিল না কিন্তু বাগড়া দিয়েছিলেন জিন্না। স্থির হয়েছিল, কংগ্রেস মনোনীত করবে পাঁচজন সদস্য, লীগও তাই; ভাইসরয় মনোনীত করবেন চারজন সদস্য। লীগের পক্ষে জিন্না বললেন, মুসলমান সদস্য মনোনীত করার অধিকার একমাত্র লীগেরই থাকবে। কংগ্রেস বলল, লীগ নিজের ভাগ সম্বন্ধে যা ইচ্ছে করুক, আমরা আমাদের পাঁচজনের মধ্যে দেব দু’জন হিন্দু এবং একজন করে মুসলমান, খৃস্টান ও পাশী। ভাইসরয় মনোনীত করলেন দু’জন অনুরূপ, একজন মুসলমান এবং একজন শিখকে। জিন্না কিন্তু লীগ মনোনীত করে নি, এমন দু’জন মুসলমান সদস্যকে কার্ডিন্সলে মেনে নিতে রাজী হলেন না। তার ফলে ১৪ জন সদস্যের কার্ডিন্সলে মুসলমান সদস্য যদিও সাতজনে দাঁড়াল, তবু জিন্না গোঁ ভরে আলোচনা ভেঙে দিলেন। মোলানা আজাদ গভীর হৃদয়-বেদনার সঙ্গে লিখেছেনঃ

“কংগ্রেস ও সরকারের মধ্যে আলোচনা এতাবৎকাল রাজনৈতিক কারণেই ভেঙে গেছে। বৃটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায় নি এবং কংগ্রেসও ভারতীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই এমন কোনো সমাধান মেনে নিতে রাজী হয় নি। সুতরাং আলোচনা ভেঙেছে রাজনৈতিক কারণে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে নয়। সিমলা সম্মেলনের সময়ে আমি কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিকে দিয়ে ওয়াভেল-প্রস্তাব মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। আর এখন ভারত ও বৃটেনের মধ্যে রাজনৈতিক প্রশ্ন যখন মীমাংসার পথে, তখন এজিকিউটিভ কার্ডিন্সলে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে আলোচনা ভেঙে গেল। ...মিঃ জিন্না অশ্রুত দাবি তুলেছিলেন, কংগ্রেস কেবল হিন্দু সদস্য মনোনীত করতে পারবে। সম্মেলনে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, কংগ্রেস কাকে মনোনীত করবে, না করবে, তা নির্ধারণ করার অধিকার মিঃ জিন্নার উপরে বর্তালো কিভাবে? ...লর্ড ওয়াভেলকে বলেছিলাম, তিনি পারস্কার বন্ধন, মুসলিম লীগের আচরণ যুক্তিসঙ্গত কি না? লর্ড ওয়াভেল উত্তরে বলেছিলেন, তিনি মুসলিম লীগের আচরণকে যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন, এ ব্যাপারটা কংগ্রেস ও লীগের মধ্যেই ঠিক করে নিতে হবে; সরকার বা ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোনো দলের উপরেই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারেন না।...

“কংগ্রেস যে-তালিকা দিয়েছিল তাতে মাত্র দু’জন হিন্দুর নাম ছিল।...সুতরাং জিন্নার বিরোধিতার ফলে সম্মেলন যদি ভেঙে না যেত, তাহলে ফল দাঁড়াত—যে-মুসলমানেরা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র, তারা ১৩ জনের কার্ডিন্সলে ৭ জন সদস্য পেত।”

সিমলা সম্মেলন ভেঙে যেতে আজাদের আর একটি বাসনা অচিরতার্থ থেকে যায় : “সিমলা সম্মেলন যদি সফল হত তাহলে জাপানের বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ কেবল বৃটেনের যুদ্ধ থাকত না, ভারতের যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াত।”

কংগ্রেসের সবচেয়ে দক্ষিণপন্থী একজন নেতার রচনা থেকে কংগ্রেসের আসল চেহারা দেখতে পেলাম। মোলানা আজাদ কোনোকালেই বিরাট কিছু সংগ্রামী পুরুষ নন। তিনি বিবেচনাপূর্ণ দেশপ্রেমিক। জীবনের প্রথম পর্ব বাদ দিলে মডারেট দৃষ্টিভঙ্গির মানব। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মডারেট মনোভাব আরও ঘন হয়েছে এবং যেভাবে হোক একটা আপোষ মীমাংসায় উপনীত হতে অধীর হয়েছেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা হিসাবে কংগ্রেসে যে মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন, জিন্নার ক্রমবর্ধমান শক্তি তাকে সজোরে নাড়া দিচ্ছিল। চরম বিপর্যয়ের আগে তিনি একটা মোটামুটি সম্মানজনক বোঝাপড়া করে নিতে চাইছিলেন। সুতরাং এইকালে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামের কথা যাঁরা ভাবছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে এ’র বিরূপতার সীমা ছিল না। ১৯৪০ সালে কংগ্রেস হাইকমান্ডের তাবদার হয়ে (কিংবা হাইকমান্ডকে তাবদার করে!!) তিনি সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে অত্যন্ত নীতিহীন আচরণ করেছিলেন, তার আলোচনা আমরা যথাসময়ে করব। আজাদের ইংরেজভক্তি এই সময়ে এত বেড়ে গিয়েছিল যে, সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আতঙ্ক এবং বিদ্বেষ ভিন্ন তাঁর মনে আর কিছু ছিল না। ১৯৪২ সালে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের বৈপর্য্য সাহসে অভিভূত হলে আজাদের অস্বস্তির সীমা ছিল না। নেতৃত্বের সংঘর্ষে সুবিধা বুঝে জওহরলালও আজাদের দিকে চলে পড়েছিলেন। এবং সকলে মিলে কংগ্রেসের মধ্যে যেটুকু সংগ্রামের ক্ষমতা ছিল নিঃশেষে মছে দিয়েছিলেন। পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়, একমাত্র যিনি লাড়াই করতে পারতেন, শত বিধা-সংকোচ সত্ত্বেও যিনি বারে বারে সংগ্রামের পথে দেশকে নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন, সেই গান্ধীজী নিজের বার্ষিক্যে এবং নিজের শিষ্য ও সমর্থকগণের লোভের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে পড়েছিলেন।

আজাদের লেখা দেখলে দেয়, এইকালে কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শবাদের তলানিও ছিল না। কী অপূর্ব এই কংগ্রেস! ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি যে-প্রতিষ্ঠান ‘ভারত ছাড়’ প্রস্তাব নিয়েছে, মাত্র তিন বছর পরে সে প্রস্তাব প্রত্যাহার না করেও সে আলোচনার বসে গেল; ত্রিপলের কব্জ থেকে আসা যে-প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেই মাথায় তুলে

সাংগ্ৰাহিক বসুমতী

নিল। আর সেই অসুস্থ কাঙ্ক্ষা পক্ষে যুক্তি কী? না, এখন যুদ্ধে ইংরেজের অবস্থা ভাল। সুতরাং, মানে মানে যা পাওয়া যায়, তাতে যদি স্বাধীনতার গন্ধও না থাকে, তাকেই পকেটস্থ কর। এই কংগ্রেস নাকি আদর্শবাদী, নীতিবাদী, সে নাকি বিরাট আদর্শে গর্ভবতী। শত্রুর ভাল-মন্দ অবস্থার সন্ধান স্ভাষ বোসের মত রাজনীতিকরাই করে থাকেন—এমন কথাই তো কংগ্রেস হাইকমান্ডের আদর্শবাদীরা এতদিন বলে এসেছেন।

আজাদের বর্ণনা অনুযায়ী গান্ধী ও তাঁর নৈমিত্তিক অনুগামীদের চেহারাও অপূর্ব দাঁড়িয়েছে। ইতিপূর্বে, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে অহিংসার সক্রিয়তা বজায় থাকবে কি না তাই নিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে কুলীন গান্ধীপন্থী ও ভগ্ন গান্ধীপন্থীদের মধ্যে তুমুল লড়াই হয়ে গেছে। কয়েক বছর পরে সেই একই প্রশ্ন যখন উঠল, দেখা গেল, মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা চরিত্র বজায় রেখেই হিংসার সহবাস করতে পারে, অন্তত আজাদ তাই বলতে চেয়েছেন।

আজাদের বিবরণ থেকে আরও দেখি, ইংরেজের রণছোড় সেনাপতি ওয়াভেল এবং কংগ্রেসের রণছোড় সেনাপতি আজাদের মধ্যে বোঝাপড়া ভালই হয়েছিল। বড়সাহেবদের কাছ থেকে একটু ভাল ব্যবহার পেলে ভারতীয় বড় নেতারা কিভাবে গলে যান, আজাদ নিজের খরচে তারও বিবরণ দিয়েছেন। ওয়াভেল-ভক্ত আজাদ তাঁর একই গ্রন্থে নেহরুর উপরে লর্ড ও লেডী মাউন্টব্যাটেনের প্রভাব নিয়ে কটাক্ষ করেছেন।

সিমলা-আলোচনা ব্যর্থ হলে একটি বিষয়ে আজাদের (এবং জওহরলালের) মর্মপিড়ার সীমা ছিল না। বোঝাপড়াটা হয়ে গেলেই তিনি বা তাঁরা ভারতীয় সেনাবাহিনীর স্যালাইট নিয়ে, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে, বীরদর্পে দেশপ্রেমের কথা শোনাতে পারতেন—তারপরে সেই বাহিনী ভারতের এবং এশিয়ার মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত—‘অর্ডার অব দি ডে’ আজাদই (বা নেহরু) লিখতেন (জাগানের পক্ষপাতিপ্রিত স্ভাষ বোস নয়)—সে একটা বিরাট কান্ড। জিন্নার জেদের ফলে তা ঘটতে পারল না বলে আজাদের আফশোসের অবধি ছিল না। জিন্না—আহমেদাবাদ দূর্গ থেকে সসম্মানে মৃত্ত বীর সেনানী আজাদের কল্পনা স্বর্গকে ভূপাতিত করে দিয়েছিলেন—জিন্নার অপরাধ অক্ষমণীয়।

অন্য একদিক দিয়ে আজাদের প্রয়াসের বিবেচনা করা যায়। লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় আজাদের বড়ই বিশ্বাস হয়েছিল। ধরা যাক, লর্ড ওয়াভেল উত্তম মানব ছিলেন। কিন্তু আজাদ কি করে ধরে নিলেন, ওয়াভেল মানে ব্রিটিশ সরকার? আজাদ স্বয়ং লিখেছেন, জিন্না যখন সদস্য মনোনয়ন নিয়ে বিচিত্র দাবি তুললেন, তাকে অর্থোডক্স বলে মনে করত ওয়াভেল বললেন, এক্ষেত্রে তিনি কিন্তু নাচার—কারো উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। এমন জিনিস ঘটবে, এটুকু বুদ্ধবার ক্ষমতা কি আজাদের ছিল না? ওয়াভেলের সরলতার মতই আজাদের সরলতাও ঐতিহাসিক।

আজাদ বলেছেন, এই প্রথম সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা রাজনৈতিক কারণে ভেঙে যায় নি। তা সত্য, কারণ এই প্রথম আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেস তার সমস্ত আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ইংরেজের কাছে অকুণ্ঠে আত্মসমর্পণ করেছিল।

কংগ্রেসের ‘ন্যাশন্যাল’ স্বভাবের বহু গুণগান আজাদ করেছেন, কারণ কংগ্রেস ১৪ জনের কার্ডিন্সলে ৭ জন মুসলমান সদস্য মেনে নিতে রাজী ছিল। উদারতার বিস্ফোরণ বটে! কিন্তু চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। উদারতার অভিনয় মানেই উদারতা নয়। স্ভাষচন্দ্র বস্তুপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, যে-কোনো সংখ্যাগ জাতীয়তাবাদী মুসলমান কার্ডিন্সলে আসুক, আপত্তি নেই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক মুসলমানেরা যেন ক্ষমতা ক্রায়ত্ত্ব করে না নেয়। কংগ্রেস যেখানে লীগের পাঁচজন সাম্প্রদায়িক মুসলমান সদস্য মনোনীত করার অধিকার মেনে নিয়েছিল, তখনই অপরাপর সম্প্রদায়গুলির আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের অধিকার মেনে নিতে নৈতিকভাবে বাধ্য ছিল। তা ছাড়া ১৪ জনের কার্ডিন্সলে কংগ্রেস প্রতিনিধিরা যেখানে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন, সেখানে কি করে দেশহিতের কাজ চালাবেন, আজাদ তা কখনো স্পষ্ট করে বলেন নি। তা বলবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না।

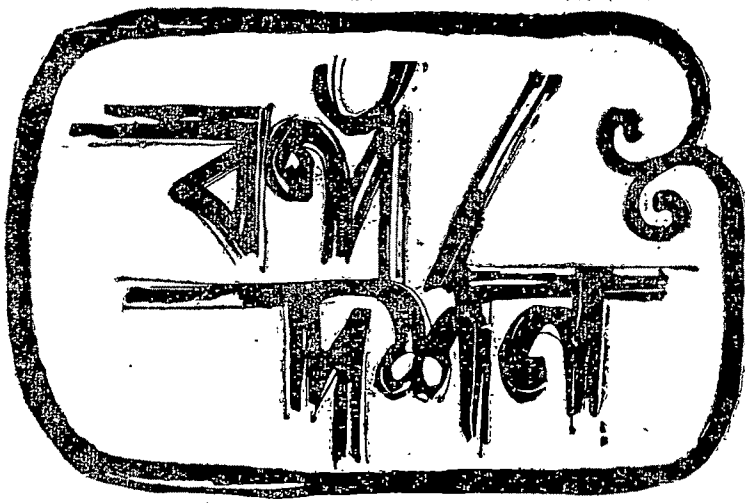
আজাদ এবং নেহরু প্রভৃতির আসল ভয় ছিল, যা তাঁরা মনে স্বীকার করেন নি—স্ভাষ বোসের সৈন্যবাহিনী এসে পড়ে আমাদের হঠিয়ে দেবার আগে যা হোক করে ইংরেজের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতা নিয়ে নেওয়া দরকার। সিমলা-আলোচনা ব্যর্থ হলে সে আশায় ছাই পড়ে। কিন্তু একথা ইংরেজ-প্রভুরা পরিস্কার বুঝে গিয়েছিলেন, ভারতবাসীর হাতে তাঁরা ক্ষমতা হস্তান্তর করুন বা না করুন, উল্লিখিত বিপদের ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দেশপ্রেমের অংশ ব্রিটিশ সরকার পেয়ে যাবে।

ইতিহাসের বিচিত্র বিধানে, যে স্ভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এত আতঙ্ক ও বিরূপতা, তাঁর কীর্তি ভাঙিয়েই পরবর্তীকালে আজাদ, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ ব্যক্তি ইংরেজের কাছ থেকে দেশবিভাগ সহ রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করে নিতে পেরেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় ইতিহাসের ঐশ্বর্য হয়ে আছে সমকালে স্ভাষচন্দ্রের এই উদ্দীপ্ত ঘোষণা—মহাত্মা গান্ধী আপোষ করলেও আমরা লড়াই করে যাবঃ

“As long as there is no compromise between Mahatma Gandhi and the British Government we have no reason to feel anxious. In any case the war has to be fought and we will go on fighting even if Mahatma Gandhi makes a compromise.”

(July 4, 1944)



প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সতেরই জুলাই তারিখে একাদিনের জন্য কলকাতায় এসে কতকগুলি স্পষ্ট ভাষণ দিয়ে গেছেন, যার ফলে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবার কোন আশাই নেই। তিনি খোলাখুলিভাবেই বলেছেন যে, ১৯৭২-এর আগে নির্বাচনের কথা ওঠে না। আপাতত রাজ্যপালের প্রশাসন চলে ও চলবে, এবং পশ্চিমবঙ্গের আমলাতন্ত্রকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন রাষ্ট্রপতি শাসন দীর্ঘস্থায়ী হবে, এই ভেবেই কাজকর্ম চালিয়ে যান। প্রধানমন্ত্রীর স্বল্প অবস্থানকালে পশ্চিমবঙ্গের চারটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে। এই চারটি দল হল ফরোয়ার্ড ব্লক, কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস ও নব কংগ্রেস। প্রথম দু'টি দল রাষ্ট্রপতির শাসন প্রত্যাহার ও মধ্যবর্তী নির্বাচন, এবং সি আর পি প্রত্যাহারের দাবি জানান। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মদুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্ভাব্য সরকার গঠন নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেন। বিধান-সভা অদূরভবিষ্যতে ভেঙে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কোন স্পষ্ট কথা বলেন নি। ঐদিন রাত আটটায় একটি বৈতর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা করেন। তবে একথা ঠিক যে, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ফলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে কোন মৌলিক পরিবর্তন যে অদূরভবিষ্যতে ঘটবে, তার কোন ইঙ্গিত নেই, থাকা সম্ভবও নয়। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতির সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী উদ্বেগ বোধ করেছেন, কিন্তু কিভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দেশ দেন নি। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলী তাঁর ভাষণে স্থান পেলেও সেগগুলি সম্পর্কে কেন্দ্র সভাই কি করতে চান, সে বিষয়েও তিনি কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন নি, আর তাহাড়া এই সমস্যাবলীর মূল কোথায় সে বিষয়েও তিনি কোন চিন্তা করেছেন বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হবার পর শ্রীমতী গান্ধীর এই প্রথম কলকাতায় আগমন।

অমার্জনীয়

ছাত্র বিক্ষোভের নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গত কয়েক বছরে অনেক কাণ্ডকারখানা ঘটেছে, কিন্তু গত ১১ই জুলাইয়ের ঘটনা জাতীয়ের হাঙ্গামার সকল রেকর্ডকেই ছাপিয়ে গেছে। ঐদিন দ্বারভাঙ্গা হলের দোতলার সিঁড়িতে স্যার আশুতোষ মদুখোপাধ্যায়ের বহু ঐতিহাসিক আবক্ষ মূর্তির উপর পবনত বিক্ষুব্ধ ছাত্রেরা আক্রমণ চালিয়েছে। আশুতোষের মর্মর মূর্তিটিকে বেনীহিত্য করে সিঁড়ির উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং বিক্ষোভকারীদের হাতে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার প্রহৃত হয়েছেন। গণ্ডগোলার সূত্রপাত প্রি-মেডিকেল ছাত্রদের একটি

দাঁবি কে কেন্দ্র করে। দাঁবি এই যে, তাদের বিনা পরীক্ষাতেই এম বি বি এস-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি করে নিতে হবে। উল্লেখযোগ্য যে, এবারের প্রি-মেডিকেল পরীক্ষা অনর্দীকৃত হবার কথা ছিল ১১ই মে। কিন্তু পরীক্ষার হলে হাঙ্গামার ফলে দু'-দুবার সেই পরীক্ষা পশ হয়ে যায়। অতঃপর নতুন করে এই পরীক্ষার দিন ঠিক হয় ২০শে জুলাই। কিন্তু এখানেই আপত্তি। ছাত্রদের দাঁবি যে, পরীক্ষা ব্যতীতই তাদের এম বি বি এস কোর্সে ভর্তি করে নিতে হবে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলারের ঘরের সামনে এই দাঁবি নিয়ে ছাত্ররা জড়ো হলে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ছাত্রদের জানান যে, তাদের দাঁবি বিবেচনা করার জন্য উপাচার্যের

নিকট পেশ করবেন। কিন্তু ছাত্রদের দাঁবি, বেলা একটার মধ্যেই তাদের সব দাঁবি মানতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা একটা আপোষ রফার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। বেলা দুটো নাগাদ বিক্ষোভকারীরা লস্কাকান্ড শুরু করে, সমস্ত কিছুর ভেঙে তখনই করে দেয়, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ বসু সহ কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী ও অধ্যাপককে দৈহিক আক্রমণ করে। এর পর তারা স্যার আশুতোষের মর্মর মূর্তিটি নষ্ট করে এবং বোমা ছুঁড়তে ছুঁড়তে পদাশ্রয়ের আসার আগেই অন্তর্হিত হয়।

বলাই বাহুল্য যে, স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ছাত্র বিক্ষোভের নামে এই জাতীয় চ্যাংডামি ও গন্ডামি আজকাল গা সওয়া হয়ে গেছে। তবুও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং সারা বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা বিন্ধতার সঙ্গে যার ঐতিহাসিক নাম বিজড়িত হয়ে আছে, সেই আশুতোষের মর্মর-মূর্তির ওপর এই বর্বর আক্রমণের সংবাদে যে কোন বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবেন। ছাত্রদের হাতে ছাত্রপ্রাণ আশুতোষের এই নিগ্রহ ঘটল এবং তা ঘটল তাঁরই কীর্তিক্ষেত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে! এই গন্ডামি যারা করেছে, তারা ছাত্র আন্দোলনের মদুখোই চুনকালি লেপে দিয়েছে এবং এভাবেই ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে জনসাধারণের চোখে হেয় করে সেই সব প্রতিজ্ঞাশীলদেরই সাহায্য করছে, যারা ছাত্র বা জনসাধারণের যে কোন অংশের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে স্তম্ভ করে দেবার জন্য তৈরি হয়ে আছে। নিজেদের দাঁবি প্রকাশের জন্য এবং যে দাঁবি মানতে গেলে ইউনিভার্সিটি রাখারই কোন গাধকতা নেই, যে পথ এই প্রি-মেডিকেল ছাত্ররা নিয়েছে তার দ্বারা ছাত্র আন্দোলনকে কলঙ্কিত করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নি। সারা বছর যারা পড়াশোনার ধারেকাছে যাবে না, পরীক্ষা হলে গন্ডগোল পাকিয়ে পরীক্ষা ভাঙল করবে, এবং চোখ রাঙিয়ে হামলা করে বিনা পরীক্ষায় পাশ করাবার দাঁবি জানাবে, এরা ছাত্র হলেও আসলে সমাজ-বিরোধী এবং তার থেকে বেশি কোন মূল্য এরা পেতে পারে না। যে কর্ম এরা করেছে তা আন্দোলন নয়, সূর্নান্দিত আইনসঙ্গত অপরাধ, এবং সে হিসাবে এরা যদি বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যায়, তাহলে সেই সব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি চড়াপ্ত অনায়াস করা হবে, যারা সত্যি পড়াশোনা করে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কড়া মনোভাব নেন।

কি ফল লভিলু ?

সৌভাগ্যের বিষয়, ১৪ই জুলাইয়ের বাংলা বন্ধ-এ বিগত ১৭ই মার্চের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় নি, তবু কয়েকটি ক্ষেত্রে সংঘর্ষ ঘটেছে, পুলিশকে গুলী চালাতে হয়েছে, দু'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনায় দু'জন নিহত হয়েছেন এবং ইতস্তত বিভিন্ন এলাকায় বোমাবাজিও হয়েছে। অন্যান্যবার হরতালে যেমন স্বতন্ত্রভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকে, এবার সেই সমর্থন যে ছিল না তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ এ হরতালের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মোটেই স্পষ্ট নয়। কি জন্য এই হরতাল? রাজ্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে? কিন্তু রাজ্যপালের শাসন ডেকে এনেছেন কারা? যে ছয় পার্টি ও আট পার্টি জোট রাজ্যপালের শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য হরতাল ডেকে-ছিলেন তাঁরা তো নিজেরাই রাষ্ট্রপতির শাসন ডেকে এনেছেন। নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানি, কলহ ও কুৎসা রটনা করে তাঁরাই তো যুক্তফ্রন্টকে ডেকেছেন। কিন্তু তাঁদের এই অপকর্মের দায় জনগণ বহন করবে কেন? বঙ্গতপক্ষে বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা প্রমাণ ছাড়া এই হরতালের দ্বারা আর কোন উদ্দেশ্য সাধিত হয় নি। এবারের হরতালের পক্ষে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ছিল না বলেই সাধারণ মানুষের মনে এই হরতালের ডাক কোন সাড়া জাগায় নি। আশঙ্কায় এবং নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষ পথে বার হয় নি, কাজ-কারবার খোলে নি, অফিস-আদালতে যায় নি।

জমির লড়াই

গত পয়লা জুলাই থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি জমি দখলের আন্দোলন শুরুর করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, খেদ পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা ৭৫ হাজার বিঘা জমি দখল করেছেন। এই দাবি ঠিক কি ভুল, তা আমরা নির্ণয় করতে বাসি নি, তবে এই আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জমি দখলের লড়াইয়ে রাজ্যের কয়েকটি জেলায় বেশ কয়েকটি সংঘর্ষ হয়েছে, এবং তাতে বেশ কয়েকজন আহত ও নিহত হয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির দেখানো অপরাধের বামপন্থী দলগুলিও শীঘ্র এই জাতীয় আন্দোলনে নামবেন আশা করা যায়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে তীব্র রেষা-রেবি এবং অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে,

তাতে এটা আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তখন বোনামী জমি কে দখল করবে সেই প্রশ্ন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ব্যাপক খুনো-খুনি বেধে যাবে। মাত্র কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গে ঝাড়মাস গ্রামে এই ধরনের ন্যস্ত জমি দখল করার প্রশ্ন নিয়ে সি পি এম ও আর এস পি-র সমর্থকদের মধ্যে ভরাবহ সংঘর্ষ হয়েছে এবং তাতে বহু লোক নিহত এবং বহু সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে। বোধহয় এই কারণেই রাজ্যপাল বলেছেন যে, এই আন্দোলনে কারণ উপকার হবে না, বরং ক্ষতি হবার সম্ভাবনাই বেশি।

পশ্চিমবঙ্গে জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দেশক আইনটি পাশ হয়েছিল ১৯৫৩ সালে। কিন্তু সেই আইন প্রয়োগের পর দেখা গেল, যে পরিমাণ জমি সরকারের হাতে ন্যস্ত হবার কথা ছিল সেই পরিমাণ জমি সরকারের হস্তগত হয় নি। অর্থাৎ প্রাক্তন জমিদার এবং জোতদাররা সমস্ত উৎকৃত জমি বোনামা করে নিজেদের খাস দখলেই রেখে দিয়েছেন। কংগ্রেস সরকার জমিদার, জোতদারদের সেই বেআইনী কার্যের প্রতিরোধ করার কোন চেষ্টাই করেন নি, বরং নিষ্ক্রিয় থেকে ভূস্বামী-দের সেই অপকর্মে সহায়তাই করেছেন। তার কারণ, নির্বাচনী যুদ্ধে এই ভূস্বামীরাই ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কংগ্রেসী সরকারের সেই অসাধু নিষ্ক্রিয়তার ফলে আইন যেমন মর্যাদা পায় নি, তেমনি ভূমি সংস্কারের নামে জনগণকে শুল্ক ভাণ্ডারই দেওয়া হয়েছে। ভূমির উপর সামন্ততান্ত্রিক প্রভু বিলোপ করা যায় নি বলে বেশের বৈষয়িক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। ভূস্বামী-দের বেআইনী কাজের সংখ্যা এত বেশি এবং পরিধি এত ব্যাপক যে, দেশের আদালতে মামলা-মোকদ্দমা করে সেই অন্যায়ের আশু প্রতিকার মোটেই সম্ভব নয়। কারণ মামলার পদ্ধতি দীর্ঘসূত্রী, কালহরক এবং ব্যয়বহুল। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই জমি দখলের আন্দোলন। বাস্তবে কার্যকর করতে না পারলে আইনের কোন অর্থ নেই, আর আইনসঙ্গতভাবে ভূমি সংস্কার আইন কার্যকর করা অসম্ভব, শিবেরও অসাধ্য। তাই ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়ম হবার সঙ্গে সঙ্গে বোনামা জমি দখলের আন্দোলন শুরুর হয়, ১৯৬৯ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে তা তীব্রতর হয়, এবং বেশ কয়েক লক্ষ বিঘা বোনামা জমি কৃষকেরা হস্তগত করে। এই জমি দখলের আন্দোলনই পশ্চিমবঙ্গে শরিকী সংঘর্ষের সূত্রপাত

করে, এবং এটাই শেষ পর্যন্ত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের কারণ হয়।

যুক্তফ্রন্টের আমলে যা হয় নি, রাজ্যপালের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন তা করতে সক্ষম হবে এটা আশা করাই বাতুলতা। কোন দলীয় বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও এবং হাতে সর্বময় ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমলাতন্ত্রনিষ্ঠ শাসনব্যবস্থা কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব দেখানো তো দূরের কথা, প্রতি পক্ষেপেই চূড়ান্ত অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমলাতন্ত্রের দ্বারা বা রাজ্যপালের ঘোষণায় ভূমিসংস্কার সম্ভব একথা একমাত্র বাতুলালয়ের অধিবাসীরাই বিশ্বাস করতে পারে। ওদিকে অতএব মিথ্যা গোহের কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু ভূমিসংস্কারের প্রয়োজন অসীম। একটিমাত্র উপায়ে তা করা সম্ভবপর। প্রথম দরকার একাধি নির্বাচিত বামপন্থী সরকার, যার সকল শরিক দলই ভূমিসংস্কার সম্পর্কে আন্তরিকভাবে আগ্রহী। দ্বিতীয় প্রয়োজন, সেই সরকারের শরিক দলের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, অর্থাৎ ভূমি দখলের আন্দোলন যেন গতবারের শরিকী সংঘর্ষের রূপ না নেয়। তৃতীয় প্রয়োজন, এই উদ্দেশ্যে গঠিত যুক্তফ্রন্ট কমিটি বা প্রতিটি গ্রামে গঠিত হবে। গতবারে যদি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি প্রতিটি গ্রামে মিলিতভাবে জমি দখলের আন্দোলনে নামতেন, তাহলে রক্তপাত ঘটত না এবং উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হত। এবং চতুর্থ প্রয়োজন, এই বিষয়ে ট্রেনিংপ্রাপ্ত সরকারী কিছু কর্মী, যারা উৎসাহিত জমিদারির ভিত্তিতে নতুনভাবে সেটেলমেন্ট করবে এবং যাদের হাতে নতুন জমি আসবে, তাদের সেই অধিকারকে আইনসঙ্গত করার কাজ করবে। অর্থাৎ চরিত্রের দিক থেকে বামপন্থী একটি নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পক্ষেই আন্তরিকভাবে ভূমিসংস্কারের কাজকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব। নিছক সরকারী আদেশই এখানে সব নয়, নিছক রাজনীতিই এর নিয়ন্তা নয়। সমস্যা জটিল, কিন্তু সমাধানের অতীত নয়। বামশক্তিগুলির ঐক্যই এই কাজ করতে পারে, আর সেই শক্তির মধ্যে বিভেদ হওয়ার অর্থই ভূমিসংস্কারকে পিছিয়ে দেওয়া।

মার্টিন রেল রাষ্ট্রায়ত্ত হোক

মার্টিন রেল বলতে স্বভাবই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত হাওড়া-আমতা [২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারত দর্শন

ভারতে মাদাম বিন

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এন গুয়েন থি বিন গত ১৮ই জুলাই রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেছেন। দিল্লীতে যাবার পথে তিনি দমদম বিমানঘাঁটিতে কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করেন। রাজ্যের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁকে স্বাগত জানাবার জন্য সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে তিনি বলেন, “সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে কিভাবে সাহায্য করতে হয়, তা কলকাতার মানুষ খুব ভাল করেই জানেন। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে ভিয়েতনামের জয় অনিবার্য।”

কলকাতা থেকে দিল্লীতে পৌঁছেও মাদাম বিন বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কনিউনিটি দেশের কূটনীতিকরা মাদাম বিনকে বিমানঘাঁটিতে স্বাগত

জানান। তবে জনসংঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির পক্ষ থেকে মাদাম বিনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও প্রদর্শন করা হয়। মাদাম বিন ৯ দিনের জন্য ভারত সফরে এসেছেন।

মাদাম বিনের ভারত সফরকে কেন্দ্র করে এদেশের দক্ষিণপন্থী মহাজোট (সিপিএম-স্বতন্ত্র-জনসংঘ) যে নোংরা-মির পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যিই লজ্জাজনক। তাঁরা এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন যে, মাদামকে আমন্ত্রণ করে ভারত গভর্নমেন্ট দেশের স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক দায়-দায়িত্ব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, মাদামের ভারত সফর বন্ধ করবার জন্য তাঁরা দু-দুবার দিল্লী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্ট তাঁদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ক্ষান্ত হন নি। মাদাম বিনের ভারতে পদার্পণের তিন দিন আগে আমাদের সাময়িকনিবাসিত কনসাল দুজন দক্ষিণ ভিয়েতনামী “ভদ্-

লোককে” ভারতে প্রবেশের ভিসা মঞ্জুর করেন। এই দুই ভদ্দলোক আসলে দুজন ঘড়িয়াল দলত্যাগী রাজনীতিক। ভিসা পাবার আগে এরা নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ভারতে তাঁরা কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করবেন না। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছেই এরা ভারত সরকারের আপত্তি সত্ত্বেও একটি সাংবাদিক সম্মেলনে হ্যানয় সরকার এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন স্বতন্ত্র পার্টি। মাদাম বিনের ভারত সফর যাঁদের আপত্তির কারণ ঘটাচ্ছে, তাঁরা ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পছন্দ করেন না। তাঁরা চান যে, ভারত ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী জোটের লেজুড় হয়ে থাকুক। দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিফ্রন্ট মার্কিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অবিরাম লড়াই চালিয়ে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করছেন। কাজেই সেই মুক্তিফ্রন্টের নেত্রী রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসাবে ভারত সফরে এলে আমেরিকা বিরতবোধ করতে পারে। ভারতের দক্ষিণপন্থী মহাজোট আমেরিকার সেই অবস্থিতি দেখে বেদনা অনুভব করছেন। কিন্তু তাঁরা ভুলে গেছেন যে, প্যারিসের শান্তি বৈঠকে আমেরিকার সরকারী প্রতিনিধি দিনের পর দিন মাদাম বিনের সঙ্গে এক টেবিলে বসে আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে যদি আমেরিকার কোন অপমান না হয়ে থাকে, তাহলে মাদামের ভারত সফরেই বা



দমদম বিমানঘাঁটিতে মাদাম বিনের সঙ্গে আলোচনারত প্রখ্যাত সাংবাদিক বিবেকানন্দ মুনোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তাদের এত গাত্রদাহের কারণ কি, তা বোঝা যাচ্ছে না। একেই বলে বাঁশের চেয়ে কণ্ডি দড়। কিন্তু মাদামের ভারত সফরের ঠিক তিন দিন আগে দক্ষিণ ভিয়েতনামের দুই ধরুন্ধর মতলববাজ 'পয়টক' সঙ্গে ভারতে সেকার সুযোগ পেল কি করে, সেটাই ঠিক আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

মাদাম এন গুয়েন থি বিন দু'বছর আগে প্যারিস শান্তি আলোচনায় ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের প্রতি-নিধিধ করে বিশ্বের দরবারে প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। তার আগে ভিয়েতনামের বাইরে তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। গত দু'বছর তিনি বিশ্বের নানা দেশ সফর করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তি সংগ্রামের অনূদুলে জনমত গঠনের প্রচেষ্টায় রতী আছেন। তিনি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর এক বছরের মধ্যে ২৫টি রাষ্ট্রের সঙ্গে সেই সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং তাঁরা সেই বিপ্লবী সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আরও ২৫টি দেশ অন্য নানাভাবে সেই সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৩০ বৎসর বয়স্কা মাদাম বিন সায়গনের স্কুলে লেখাপড়া শেখবার সময় রাজনীতির পথে পন্থাক্ষপ করেন। তাঁর পিতা কান চু গ্রিন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক হিসাবে যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, মাদাম বিন ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৫০ সালের মার্চ মাসে সায়গনে মার্কিন-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ গ্রহণ করার তৎকালীন ফরাসী ঔপনিবেশিক সরকার সর্বপ্রথম তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করেন। ১৯৫৪ সালে জেনেভা চুক্তির পর ফরাসীরা যখন ভিয়েতনাম ছেড়ে চলে যায়, তখন মাদাম বিন জেলখানা থেকে মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু বাইরের জীবনটা তখন আরও জটিল। ফরাসীরা দিয়েন-বিয়েন ফুর লড়াইয়ে ধরাশায়ী হয়ে সরে পড়ল বটে, তবে সেই সুযোগে সি আই-এর এক্সেস্ট এনগো দিন দায়েমের মাধ্যমে আমেরিকা স্বসৈন্যে ঢুকে পড়ল ভিয়েতনামে এবং দায়েমের বকলমে সে দেশে ব্যাপক অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব চালু করে দিল। মাদাম বিন আবার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ আর তার স্থানীয় দালালদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। প্যারিস বৈঠকে প্রতিনিধি

নিযুক্ত হবার আগে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভিয়েতনাম নারী মুক্তি ইউনিয়নের নেত্রী।

স্বর্গত প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের আন্তর্জাতিকায়ার সময় হ্যানয়ে ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীনেশ সিং-এর সঙ্গে মাদাম বিনের সাক্ষাৎ হয়। দীনেশ সিং তখনই মাদাম বিনকে ভারত সফরে আমন্ত্রণ জানান।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এক বছর

১৯৬৯ সালের ১৯শে জুলাই ভারতের ১৪টি বড় বড় ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। এই সপ্তাহে রাষ্ট্রায়ত্ত-করণের এক বছর পূর্ণ হল। কাজেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকিং শিল্পের এক বছরের ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত তথ্য জানবার জন্য সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল জাগাই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি থেকে যে তথ্য জানা গেছে, তাতে নিরুৎসাহ বোধ করবার কিছু নেই। এই এক বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক-গুলো সহস্রাধিক শাখা বিস্তার করে এমন সব এলাকায় ছাড়িয়ে পড়েছে, যেখানে আগে আধুনিক ব্যাংকিং-এর কোন কারবারই ছিল না। ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রধান কারবার বিবিধ। প্রথমত আমানত সংগ্রহ করা, দ্বিতীয়ত সেই আমানত ফলপ্রসূ এবং উন্নয়নমূলক কাজে লগ্নী করে দেশের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা করা। যতদিন ব্যাংকগুলো বড় বড় শিল্প-পতিদের তত্ত্বাবধানে ছিল, ততদিন বড় বড় শহরের বড় বড় শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া আর কোথাও ব্যাংকের টাকা বড় একটা লগ্নী করা হত না। তাতে ধনী শিল্পপতি এবং বাণিজ্যপতিরা ব্যাংকের টাকায় ক্রমাগত নিজদের বিষয়সম্পত্তি বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ছোট ছোট শিল্প-বাণিজ্যপতিরা বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলেন না। তা ছাড়া কৃষিক্ষেত্রে লগ্নীর দিকে ব্যাংকের কোন নজরই ছিল না। ভারতের ৮০ শতাংশ মানুষ এখনও কৃষির ওপর নির্ভরশীল। চাষের মরশুমে কৃষিক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকা লগ্নীর প্রয়োজন হয়। গরীব চাষীরা গ্রাম্য মহাজন, জোতদার এবং জমিদারদের কাছ থেকে অবিশ্বাস্য চড়া সুদে এই টাকাটা ঋণ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সেই ঋণ শোধ করতে মাঠের পুরো ফসলটা আবার সেই উত্তমর্গদের ঘরেই তুলে দিতে হয়। কাজেই গরীব চাষী সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটাতেই বাধ্য হন। তাই দেশের মানুষ দাবি তুলেছিল ব্যাংকের টাকার একাংশ কৃষিক্ষেত্রে লগ্নী করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের সম্প্রসারণ সেই পথটাকে প্রশস্ত করবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য কৃষিক্ষেত্রে ব্যাংক যে একেবারে অর্থ লগ্নী করত না, তা নয়, কিন্তু তাদের ঋণ ছিল তেলা মাখায় তেল ঢালা। অর্থাৎ গ্রামের বহু জোতদার-মহাজন প্রণীকে অর্থ সাহায্য করা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সেই ঋণ ত্যাগ করে গরীব কৃষকদের ঋণদানের উদ্যোগ ব্যবস্থা চালু না করতে পারলে, সেই ঋণদানের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আমরা যতদূর জানি, গরীব কৃষিজীবীরা এখনও ব্যাংকের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুবিধা পান নি। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে ব্যাংকের শাখা অফিস খুলে প্রথমেই সেই কাজে অগ্রণী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা হলে মুদ্রাটমের জোতদার-মহাজন আর ক্ষেতের ফসল নিয়ে ফাটকাবাজী করতে পারবেন না।

সরকারী রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, গত এক বছরে প্রতি মাসে ১২৭টি করে শাখা অফিস খোলা হয়েছে। আগের বছর শাখা বিস্তারের হার ছিল প্রতি মাসে ৪৮টি। ব্যাংকের শাখা বিস্তারের বর্তমান হার বজায় থাকলে ১৯শে জুলাইয়ের (১৯৭০) মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর শাখার সংখ্যা দাঁড়াবে ৬৬৬৩টি। রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার আগে তাদের শাখা অফিসের সংখ্যা ছিল ৪১৬৮টি। নতুন শাখা অফিসের দুই-তৃতীয়াংশ স্থাপিত হয়েছে গ্রামাঞ্চলে।

গত বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোয় আমানতের পরিমাণ ৪৮৬ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই নিয়ে আমানতের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩৬০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। আগের বছর (রাষ্ট্রায়ত্ত হবার আগের বছর) ব্যাংকের আমানত বেড়েছিল ৪৪১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে এ বছর আমানত বৃদ্ধির হার বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

১৯৭০ সালে মার্চ মাস পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে কৃষিজীবীরা মোট ৮০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঋণ পেয়েছেন। এটা আগের বছরের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। ছোট ছোট শিল্পগুলো আলোচ্য বছরে ঋণ পেয়েছে ১৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। আগের বছর পেয়েছিল ১৪৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা।

গভর্নমেন্ট একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির করেছেন যে, ভারতে ৩০৫টি জেলার প্রত্যেকটির অর্থনৈতিক তদারকির ভার পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক ব্যাংকের হাতে ছেড়ে [২১৩ পৃষ্ঠায় প্রত্যা]



এডওয়ার্ড হিথ

বুটেন :

এখন আর লুকোছাপার কিছু নেই। ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিতভাবে স্থির করেছেন, তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র ও অন্যান্য সামরিক জিনিষ বিক্রি করবেন। এবং, তাঁরা রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অমান্য করেই এই কাজ করবেন।

সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভ করে রক্ষণশীল দল সরকার গঠনের পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস-হিউম এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথেরও পূর্ণ সমর্থন আছে। আসলে, অনেক আগের থেকেই এ ব্যাপারে কথাবার্তা চলছিল। হ্যারল্ড উইলসনের নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক দলের সরকার অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দেয়ার রক্ষণশীল দল খুশি ছিলেন না। তাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে ভরসা দিয়েছিলেন, যদি তাঁরা সরকার গঠন করতে পারেন তাহলে আবার অস্ত্র বিক্রয় সুরু করা হবে।

তাই নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের জয়লাভের পর উল্লসিত হয়ে দক্ষিণ

আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ভোরস্টার তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলারকে পাঠিয়েছিলেন লন্ডনে হিউম ও হিথের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য।

মলার-দৌত্য সফল হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার অস্ত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই ব্যাপারে তাঁরা পুরোনো সাইমনস্ টাউন চুক্তি মেনে চলবেন।

স্যার আলেক ডগলাস-হিউমের যুক্তি হল : বুটেন নিজের স্বার্থেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করছে। পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলে সোভিয়েত যুনিয়নের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুয়েজ খাল খুললেও দেখা যাবে, এডেন সোভিয়েতের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই অবস্থায়, আফ্রিকার পূর্বাঞ্চল ও বিশেষ করে এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হলে বুটেনকে দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেপ ঘুরে যেতে হবে। সুতরাং, দক্ষিণ আফ্রিকাকে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ এই সব যুক্তির অবতারণা করে কমনওয়েলথ দেশগুলির প্রধানমন্ত্রীদের কাছে একটি চিঠিও দিয়েছেন।

বিরোধী শ্রমিক দল অস্ত্র বিক্রয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ বুটেনের প্রাক্তন প্রতিনিধি ও লর্ড সভায় শ্রমিক দলের বিশিষ্ট নেতা লর্ড ক্যারাডিন বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করলে বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ দেশ বুটেনের বিরুদ্ধে চলে যাবে। এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘের সর্বসম্মত প্রস্তাবের বিরোধিতা করার অর্থ হল, গত ছ' বছর ধরে বুটেন রাষ্ট্রসংঘে যে সব ভাল কাজ করেছে, তার সবটা নষ্ট করে ফেলা।

লর্ড ক্যারাডিন লর্ড সভাতেও অস্ত্র বিক্রয়ের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তবে স্বাভাবিকভাবেই, প্রতি-ক্রিয়াকারীদের ঘাঁটি লর্ড সভায় ৮৪-১৮৪ ভোটে ক্যারাডিনের প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়েছে। রক্ষণশীল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন অস্ত্র বিক্রয়ের স্বপক্ষে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করেন লর্ড সভায়।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে নির্দেশ দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকাকে কোন প্রকার সামরিক দ্রব্য বিক্রি না করার জন্য।

বুটেন আজ নিরাপত্তা পরিষদের এই সর্বসম্মত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যাচ্ছে। বুটেনের নিরাপত্তা, সুয়েজের পূর্বে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা, তেল আমদানির জন্য কেপের পথ ব্যবহার, এই সব কারণ কিছুটা থাকলেও (এবং, তার সবটাই কায়েরমী স্বার্থের সুবিধার জন্য) আসল কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র শ্বেতাঙ্গ বর্ণবৈষম্যীদের প্রতি ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের দরদ। এর জন্য তাঁরা বিশ্বজন-মতকেও উপেক্ষা করতে পিছপা নন।

রাষ্ট্রসংঘের ৪০টি আফ্রো-এশীয় দেশ বুটেনের অস্ত্র বিক্রয়ের ব্যাপার আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকের প্রস্তাব করেছে। বৈঠক ডাকাও হয়েছে।

বুটেনের এই অনায়াস ও বিপজ্জনক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমনওয়েলথ মহলে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ২৯টি কমনওয়েলথ দেশের মধ্যে ২০টি দেশ এই অস্ত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। এদের মধ্যে ভারতও আছে। এই আপত্তি সত্ত্বেও যদি হিথ সরকার অস্ত্র বিক্রয় করে দক্ষিণ আফ্রিকাকে সাহায্য করেন (যা তাঁরা করবেন বলেই মনে হচ্ছে) তাহলে তাঁরা কমনওয়েলথে বড় রকমের বিপদ ডেকে

জাত্যাহিক বঙ্গদ্রোহ

আনবেন। আগামী জানুয়ারী মাসে সিংগাপুরে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন ডাকা হয়েছে, সেই সম্মেলন হবে কি না, তাতেও সন্দেহ রয়েছে।

রুমানিয়া :

সোভিয়েত রুনিয়ন ও রুমানিয়ার মধ্যে নতুন মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত সপ্তাহে বুখারেস্টে এই চুক্তি হয়েছে।

১৯৪৮ সালে দুই দেশের মধ্যে বিশ বছরের যে মৈত্রী চুক্তি হয়, ১৯৬৮ সালে তার মেয়াদ শেষ হয়। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে মতভেদের দরুন এতদিন নতুন চুক্তির বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

সোভিয়েত রুনিয়ন ও অন্যান্য ওয়ারশ চুক্তিভুক্ত কমিউনিস্ট দেশ কর্তৃক ১৯৬৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছিল রুমানিয়া। অবশ্য পূর্বে থেকেই রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না। চীন-সোভিয়েত বিরোধে রুমানিয়া অন্য কমিউনিস্ট দেশের মত সোভিয়েত রুনিয়নকে সমর্থন করে নি। তারা অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছে রুমানিয়া। সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অর্থনীতি অনুসরণের চেষ্টা করছে রুমানিয়া। পশ্চিমী দেশগুলির সঙ্গে রুমানিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি মস্কোতে যে আন্তর্জাতিক লণ্ডী ব্যাংক স্থাপিত হয়েছে, পূর্বে রুদোপের অন্য সব কমিউনিস্ট রাষ্ট্র তাতে যোগ দিলেন, রুমানিয়া যোগ দেয় নি।

গত বৎসর মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন সরকারীভাবে রুমানিয়া সফর করেছেন এবং তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে। মোট কথা, নিকোলাই সোসেস্কুর নেতৃত্বে রুমানিয়া কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে স্বার্থ ও পছন্দমত স্বাধীন নীতি নিয়ে চলার চেষ্টা করছেন।

সোভিয়েত নেতারা এতে মোটেই খুশি নন। তাই নতুন মৈত্রী চুক্তিতে রুমানিয়াকে দিয়ে সোভিয়েত রুনিয়নের সামরিক কর্তৃক মানিয়ে নেবার চেষ্টা তাঁরা করেছেন। এতদিন ধরে সেই চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এতে তাঁরা বিশেষ সফল হন নি। নতুন চুক্তিতে কেবল এইটুকু বলা হয়েছে : “কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী যদি কোন সমাজ-তান্ত্রী রাষ্ট্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে,” তবে তা প্রতিরোধ করা হবে, এ ব্যাপারে উভয়ে রাজী।

অনেকে বলছেন, চুক্তির এই শর্তের অর্থ হল, চীন যদি কখনও সোভিয়েত রুনিয়ন আক্রমণ করে, তবে রুমানিয়া চীনের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রুনিয়নকে সমর্থন করবে। কিন্তু আর এক দল বলছেন, না, রুমানিয়া ওয়ারশ চুক্তির এস্তিয়ারের মধ্যে থেকে, অর্থাৎ, কেবল রুদোপের ব্যাপারেই, এই দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অন্য কোন ক্ষেত্রে নয়।

বাই হোক, রুমানিয়ার স্বাভাব্য মেনে নিয়েই এই চুক্তি হয়েছে।

সোভিয়েত রুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের স্বয়ং বুখারেস্টে আসার কথা ছিল এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। কিন্তু শেষ মুহূর্তে অসুস্থতার জন্য তিনি আসতে পারেন নি। তাঁর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন এসেছেন।

রুমানিয়ার নেতারা এতে ক্ষুব্ধ। তাঁদের ধারণা, ব্রেজনেভের অসুস্থতা একটা ছল মাত্র। তিনি এমন কিছু অসুস্থ হন নি। আসলে তিনি নিজে এসে রুমানিয়াকে মর্যাদা দিতে চান নি।

রুমানিয়াও তার জবাব দিয়েছে। রুমানিয়ার আসল নেতা নিকোলাই সোসেস্কু কোসিগিনকে সম্বর্ধনা জানাতে বিমানবন্দরে কিংবা অন্য কোথাও যান নি, কোসিগিনের সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায়, কোন সরকারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন নি, এমন কি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ও তিনি হাজির হন নি। কোসিগিনের সঙ্গে যা কিছু করার করেছেন রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান মরের, দলগত মর্যাদা যার অনেক কম। কেবলমাত্র একটি মধ্যাহ্নভোজে সোসেস্কু কোসিগিনের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলেন।

বুখারেস্টে কোসিগিনকে বিশেষ কোন সম্বর্ধনাও জানানো হয় নি। পর্যবেক্ষকদের ধারণা, নিকসনের আগমনের সময় বুখারেস্টের পথে যত লোক তাঁকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য উপস্থিত ছিল, কোসিগিনের আগমানে তার দশ ভাগের এক ভাগও ছিল না।

ইতালী :

প্রধানমন্ত্রী মারিয়ানো রুমোর রাষ্ট্রপতি সারাগাতের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

রুমোরের নেতৃত্বে মধ্যপন্থী ও বাম-পন্থীদের এই কোয়ালিশন সরকারে ছিল : ক্রিস্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি, রুনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি।

ঠিক ১০০ দিন টিকে থাকার পর রুমোর মন্ত্রিসভার পতন হল। এটা হল রুমোরের তৃতীয় মন্ত্রিসভা।

মন্ত্রিসভার পতনের আসল কারণ ইতালীর তাঁর অর্থনৈতিক সংকট। মদ্রাস্থকীতি চরম আকার ধারণ করেছে। শিল্পে বিনিয়োগ বন্ধ হয়েছে। কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে। বেকারে দেশ ছেয়ে গেছে। শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সংকট সমাধানে কোয়ালিশন সরকারের দলগুলি ঐকমত্য হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। বামপন্থী সোস্যালিস্টরা যা বলছেন, মধ্যপন্থী ক্রিস্চিয়ান ডেমোক্রেট ও বামপন্থী রুনিটারিয়ান সোস্যালিস্টরা তাতে রাজী হচ্ছেন না। এই জুলাই থেকে দেশব্যাপী শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট স্ট্রাইক হবার কথা। এই ধর্মঘটের ঠিক মুখে ৬ই জুলাই রুমোর পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

কিন্তু এই অর্থনৈতিক সংকট ছাড়াও কোয়ালিশনের দলগুলির মধ্যে মতভেদের আর একটি বড় ও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে।

সম্প্রতি ইতালীতে আঞ্চলিক সরকারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর্মিয়া, তাস্কানি ও এমিলিয়া রোমাগনা, এই তিনটি অঞ্চলে বামপন্থী সোস্যালিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্র সরকার গঠন করেছেন। এতে কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকারের দুই শরিক ক্রিস্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও রুনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি খুব চটেছেন। তাঁদের বক্তব্য : “এ জিনিষ চলবে না। কেন্দ্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্গে সরকার করবে, আর অঞ্চলে আমাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের নিয়ে সরকার করবে—এ হবে না। গাছেরও খাবে, আর তলারও কুড়াবে!”

এই নিয়ে গতভেদের পরিণতিতে কেন্দ্রের কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেল। (১৯. ৭. ৭০)

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়া ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার (জাপান মেক) জনপ্রিয়। দেশ ব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies (B.C.) P.B. 2123, Delhi-7

আমার চোখের সামনে রয়েছে সেই মর্মান্তিক ছবি। বাঙালী জাতি মৃত্যু খুবড়ে পড়ে আছে, বাঙালী জাতির মৃত্যু আলকাতারার কালো রং মাখানো হয়েছে। পুত্ররা পিতাদের, জন্মদাতাদের ঝাঝা মেরে ফেলে দিয়েছে, মৃত্যু চুন-কালি মাখিয়ে দিয়েছে। পিতাদের অপরাধ—কেন তাদের জন্ম দিয়েছে; কেন চোখের ওপর থেকে অন্ধকারের পর্দা সরিয়ে নিয়ে তাদের আলোর রাজ্যে নিয়ে এসেছে। এমনি আরো অনেক গুরুতর অপরাধে অপরাধী এই পিতৃপুত্র। “রেখেছ বাঙালী করে মানুষ কর নি”—এই কথা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বাঙালী সন্তানরা আজ উঠে পড়ে লেগেছে। তাই তো আশুতোষকে মাটিতে ফেলে দিয়ে আমরা প্রমাণ করি—আশুতোষ তুমি উচ্চশিক্ষায় বাঙালীকে প্রবেশের অধিকার দিয়ে, মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিয়ে মহা অপরাধ করেছ। কারণ আমরা মানুষ হই নি। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু কালি লেবড়ে দিয়ে প্রমাণ করি—জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। মানুসের সেবাকে সবচেয়ে বড় বলে, ভারতের প্রতিটি মানুষকে ভাই বলে, দরিদ্র চণ্ডাল অরতমসী, কামার, কুমোর, মৃত্যুকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার কথা অথবা বিশ্বের দরবারে বাঙালী হয়ে দাঁড়িয়ে ভারতের অধ্যাত্মবাণী ভোগে নয়, ত্যাগে মুক্তি এই কথা বলে অপরাধ করেছ। সেই অপরাধের কারণে আজ তোমার মৃত্যু কাদা-কালি দিলাম। আমরা মানুষ হতে চাই না—আমরা মানুষ হই নি। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, বিনোয়ালগর, রামমোহন,



সুভাষচন্দ্রকে মৃত্যু ফেলে প্রমাণ করবো—আমরা মানুষ হই নি।

১২ই জুলাই রবিবার আর ১৪ই জুলাই মঙ্গলবার খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুইখানি ছবি দেখ-ছিলাম। প্রথম ছবি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের দৌতলায় বাংলার বাঘ স্যার আশু-তোষের মর্মর মৃত্যুটি মৃত্যু খুবড়ে পড়ে আছে। দ্বিতীয় ছবি হল কলকাতায় গোলপার্কে স্বামীজীর মর্মর মৃত্যুটির মৃত্যু কালিতে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। অনেক দিন যত্ন আছি সংবাদপত্র জগতে। বহু দুর্লভ, দুঃসাহসিক, মর্মান্তিক ছবি দেখেছি—ফটোগ্রাফারকে দিয়ে তুলিয়েছি, ফটোগ্রাফারের ছবি তোলার সাক্ষী থেকেছি, কিন্তু এমন সময়োপযোগী প্রতীক-ধর্মী ছবি আমি কখনও দেখি নি। সেই দিন ১১ই জুলাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে যে ফটোগ্রাফাররা এই ছবিখানি তুলেছেন, তাঁদের কাছে আমার অন্তরের অভিনন্দন আরো বেশি করে পৌঁছে দিতে চাই, কারণ এমনি একটা ছবির বড় বেশি প্রয়োজন ছিল। কারণ নতুন যুগের যে যারা সুরু হয়েছেন—সেই যুগকালকে স্মরণীয় করে রাখতে এই ছবিটা একটা মাইলস্টোন হয়ে থাকবে। এই দিনের খবরটিও লেখা হয়েছিল অশুভ প্রতীকধর্মী করে। কয়েকটা লাইন তুলে ধরছি সেই দিনের রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টার লিখেছেন—“সিঁড়ির ওপর মৃত্যু খুবড়ে পড়ে আছেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ গুরুপাধ্যায়। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। কিন্তু যে সংবাদ আরো মর্মান্তিক, তা হলো তাঁরই প্রিয় ছাত্রদের হাতে স্যার আশুতোষের এই চড়ান্ত নিগ্রহ ও অবমাননা। এই দুঃঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার বেলা প্রায় দুটোর সময়—আশুতোষের প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শতাব্দের

ইতিহাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এমন ঘটনা আর কখনও প্রত্যক্ষ করে নি। একদল প্রি-মেডিক্যাল ছাত্র দ্বারভাঙা বিল্ডিংয়ের দৌতলা থেকে স্যার আশুতোষের মর্মর মৃত্যুটি বেদী থেকে টেনে হিঁচড়ে নিচে ফেলে দিয়েছে।”

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চলছে অনেক দিন, পরীক্ষা ভাঙল হওয়া নিয়েও নানা গুণ্ডগোল বহু সময় ঘটে আসছে। আগুন দেওয়া, গোড়ানো, ভাঙচুর করা প্রভৃতি অনেক বড় ঘটনা ইতিমধ্যে যা ঘটে গেছে সেই তুলনায় শনিবার বারবেলার ঘটনা হিসাবে যা ঘটেছে, সেটা নিতান্তই আটপোরে বলা যায়। কিন্তু এই ঘটনার দাম বাড়িয়ে দিয়েছে ছাত্ররা স্যার আশুতোষকে মাটিতে মৃত্যু খুবড়ে ফেলে। স্যার আশুতোষকে কেন সেই দিন এইভাবে ফেলা ও ভাঙা হল, সেই সম্পর্কে আমি অনেক চিন্তা করে দুটো কারণ আমার মনোমত পেয়েছি। প্রথম কারণ, স্যার আশুতোষ বাঙালী ছিলেন, আর পুত্রুষ ছিলেন। আজকের যুগে আমাদের কাছে এই দুটোই অসহ্য। স্যার আশুতোষ গাড়ি করে ফিরছেন সম্ভবত পাটনা থেকে, প্রথম প্রেশীর রেল কামরা তখন সাহেবদেরই কামরা। বাঙালী তথা ভারতীয়দের সেই কামরায় ওঠা ও চলাফেরা সাহেবরাও ভাল চোখে দেখতো না আর সকলের সাধ্য ও সাহসে কুলাতো না। এমনি এক সাহেবের সহযোগী হলেন স্যার আশুতোষ। সাহেব যাত্রী কোনরকমে



বিরতন।



কলংকাচিহ্ন



স্বাধীনতা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

স্বাধীনতা বিউটি স্নো

স্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ



স্বাধীনতা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

১৯৫২/৫৭

বিরক্তি প্রকাশ করে থেকে এক সময় সন্ধ্যোগ বন্ধে স্যার আশুতোষের জুতোজোড়া বাইরে ফেলে দিল। স্যার আশুতোষ ঠিক আবার সময় ও সন্ধ্যোগ বন্ধে সাহেবের কোটটা চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিলেন। পরে সাহেব যখন জিজ্ঞাসা করলো—আমার কোট কোথায়? আশুতোষ বললেন, আমার জুতো খুঁজতে গেছে। সাহেবের কোটকে বাঙালীর জুতো খুঁজতে পাঠানো সে যুগে কেন, এই যুগেও অসম্ভব। এমনি যার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব, তাঁর মত মানুষের মর্তি আমাদের চোখের ওপর থাকা অনেক দিন অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আর আজ আমরা সব “মিনি” হয়ে যাচ্ছি। চেহারায় স্যার আশুতোষের মত বাঙালী জন্মগ্রহণ করে না, এমনি করে গোর্ফ রাখা কল্পনা করা যায় না, আমরা চেহারায় বেটে হচ্ছি, গোর্ফ কামিয়ে ফেলেছি অথবা বাটারফাই রাখছি, পোষাকে সংক্ষিপ্ত হচ্ছি—আশুতোষের মত জমকালো চাপকান অথবা ধূতি, গলাবন্ধ কোট চিন্তা করা যায় না, আজ সকলের সঙ্গে, এমন কি পত্র-পত্রিকাও সব মিনি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এমন যে মিনির যুগ—সেখানে আশুতোষ ভয়ংকর বেসামান হয়ে উঠেছিল—একেবারে যাক বলে আসমান-জমিন ফারাক। তাই সেইদিন আশুতোষকে মৃৎ খুবড়ে ফেলে আমরা বাঙালী জাতিকে মৃৎ খুবড়ে ফেলে দিলাম। ফেলেছিলাম আরো এই কারণে যে, আশুতোষ তুমি শেষ। বাঙালী তুমি শেষ। তবে হ্যাঁ আরো কিছুকাল এখনও বাকী আছে—সেটা হল রাম-মোহন রায়ের স্মৃতি লুপ্ত করতে হবে—আরও যদি কিছু বাকী থেকে থাকে, তবে বিদ্যাসাগর আর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের যে দু’টো মর্তি ঐ আশুতোষের মর্তির কাছেই কলেজ স্কোয়ারে আছে—সে দু’টোকে গোল দাঁড়ির জলে ফেলে দিতে হবে। বেলুড় মঠ আর নিমতলা থেকে বিবেকানন্দ আর রবীন্দ্রনাথের সমাধি আর চিতা-ভূমি গঙ্গায় ফেলতে হবে। গোলপাকের স্বামীজীর মর্তিতে যে কালি মাখানো হয়েছে—ওটা মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ বিকৃতি নয়—অবলুপ্তির জন্য কাজ করতে হবে। গোলপাকের মর্তিটি স্বামীজী শতবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আরও একটা কাজ বাকী থাকবে—সেটা হ’ল আর একজন বাঙালী পুরুষ জন্মেছিলেন, বর্তমান বাঙালী জাতির পক্ষে সেও কম কলঙ্কের নয়। তিনি

হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেই সুভাষ-চন্দ্রেরও দু’টো মর্তি রয়েছে—একটা ঘোড়ায় চড়া আর একটা সামরিক পোষাক পরা। কি অপমান। আজকের এই মিনি যুগের বাঙালী পরেছে সামরিক পোষাক, বাঙালী চড়েছে ঘোড়ায়, বাঙালীর ঘরে জন্মে বোম্বা, সেনাপতি হয়েছে। মিনি সমাজ-কুলতিলকদের এর চেয়ে লজ্জার কিছু নেই। অতএব নেতাজীর মর্তি দু’টিও ভাঙতে হবে!

সেইদিন স্যার আশুতোষের মৃৎ খোঁড়ানো মর্তির যাঁরা ছবি তুলেছেন, তাঁদের কৃতিত্বের সঙ্গে একটা ঐতিহাসিক মর্তিও তাঁরা করেছেন। এই মর্তি চিরকাল আমাদের গনে অনুশোচনা সৃষ্টি করবে। সেটা হ’ল সেইদিন যে বীরেরা এই কাজ করেছে, তাদের কেন একটা ছবি তুলতে পারলেন না। কারণ সেই ছবিটাই যে হবে আমাদের আগামী দিনের মস্ত বড় এ্যাসেট। কারণ এই ছবি-গুলির মধ্যে দিগ্নেই আমরা চিনতে পারতাম এদের। এরা কারা, কি এদের পরিচয়? যেমন একটা তুষারমানবকে যদি হাতের কাছে পেয়েও তার ছবি না তোলা হয়, তাহলে সেটা মস্ত বড় বোকামী মনে হয় না কি? কর্তাদিন ধরে তুষার-মানব নিয়ে কত কথা হয়ে আসছে, কত গবেষণা হয়ে আসছে, কিন্তু সেই তুষার-মানবকে যদি কোন ফটোগ্রাফার হাতের কাছে পেয়েও তার ছবি না তোলে, তাহলে সেই অক্ষমতার কোন সীমা থাকে না। একটি মাত্র প্রধান সমস্যার সমাধান হ’ত এই ছবিতে—চেনা যেত এরা কারা?

অনেক নামে এদের পরিচয় দেওয়া হয়, কেউ বলে নকশাল, কেউ বলে সমাজ-বিরোধী, কেউ বলে আধারাজনীতি করনেওয়াল, আধা সমাজবিরোধী, কেউ বলে বিপ্লবী, কেউ বলে মাক্সবাদী-লেনিনবাদী।

এর কোন কথাটাই বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নকশালপন্থী হোক, সমাজ-বিরোধী হোক, রাজনৈতিক কর্মী হোক—সকলেরই কাজের একটা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-দর্শন থাকবার কথা। কিন্তু বর্তমানে যে কাজগুলি চলছে ও হচ্ছে, সেই কাজ-গুলির পিছনে কোন উদ্দেশ্য-লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় কি? দর্শনের কথা না বলাই ভাল। কোন দর্শন ও মতবাদে বিশ্বাসী, এরা কার ভক্ত, কার চেলা, এরা কোন দেবতা, কোন ঠাকুরের ভক্ত—কাজ পড়ে মনে হয় এরা সব নকশালপন্থী।

পশ্চিমবঙ্গে নকশালপন্থী বলে যে শব্দ চালু হয়েছে, সেটা একটা ধাঁধা ছাড়া কিছু নয়। কে নকশালপন্থী, কারা

নকশালপন্থী, কি তাদের কাজ, কি তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর কোনটাই হাঁস পাওয়া যাবে না এই সব কাজের মধ্য দিয়ে। কতকগুলি প্রাণহীন প্রতিচ্ছনে এরা হামলা চালায়—কতকগুলি নির্বিরোধী মানুষের ওপর এদের আক্রমণ চলে—কতকগুলি মৃত মানুষের ছবি এদের বিপ্লবের খোরাক হয়। এদের নকশাল-পন্থী বলতে আমি অন্তত রাজী নই। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আজ আর একটা শিকড়ে বেঁচে থাকা কোন নকশালপন্থী নেই। কম করে ১৪টা দলে ও মতে এরা বিভক্ত। যদি ধরে নিই চারু মজুমদার নকশালপন্থীদের মূল নেতা বা তিনিই সকলের নেতা, তবে এই ছাত্র নামাখারীরা যা করছে, সেটা তো চারুবাবুর কোন নির্দেশের মধ্যে পড়ে না। নকশাল-পন্থীদের রাজনৈতিক প্রস্তাব ও কর্ম-সূচী দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে চারু-বাবু কর্মীদের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশ-নামা দিয়ে থাকেন—যা দেশস্বতীতে প্রকাশিত হয়, তাও দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও এই জাতীয় কাজের নির্দেশ তো দেখি নি। অন্য কথা বলতে চাই না, শ্রীচারু মজুমদারকে আমি দেখেছি। এই দেখা চোখের দেখা নয়—হিল কার্ট রোডের বাড়িতে মৃৎখোঁড়ার বসে বহুদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটেছে, যতক্ষণ না “কালু ডাক্তার” তাড়া মেরে উঠিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগেকার কথা বলছি, তখনও আত্মগোপন করেন নি। কিন্তু সেই চারুবাবুর ঘরে দুই ব্যক্তির ছবি অতি সম্মানে রাখত আছে। ঘর একখানা—সব কাজে ব্যবহৃত হয়, ঘরে ছবি একটি রবীন্দ্রনাথের, অপরটি মাও সে-তুং-এর। মাও সে-তুং অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের ছবিখানি বড়। হ্যাঁ, আর দেখেছি চারুবাবুর ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করতে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড় মেয়েটি অত্যধিক ভাল ছাত্রী—ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করে, বাড়িতে যতদিন যতবার গেছি, তাকে সব সময় বারান্দা ঘিরে তৈরি হোট পড়ার ঘরে সর্বক্ষণ পড়তে দেখেছি। কাজেই চারু-বাবুর, পড়াশুনা করে ছেলেমেয়ে ভাল হোক, এর বিরোধী কখনও মনে হয় নি আর ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবিটাও ফেলে দেন নি। অন্য কোন কারণে না হোক, নাৎসী আন্দোলনের নেতা হিটলারের তাত্ত্বিক গুরু মার্সেলিনী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়ে কি একটা সার্টিফিকেট আদায় করেছিলেন, এই অভিযোগ করেও তো রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন নি। কাজেই এরা আর যাই

হোক, চারুবাবুর নির্দিষ্ট আদর্শ রূপায়ণ করতে এই সব কাজ করেছে—এই কথা চারুবাবু না বলা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে মন চায় না।

এর পর প্রশ্ন আসে—এদের এই সব কাজে বিপ্লব কতদূর এগুচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বা তার আগে-পরে রাজ্যের তথাকথিত শোধানবাদী দলগুলির কাজে মোট প্রায় ৪ লক্ষ একর জমি রাজ্যের জোতদার-জমিদারদের হাত থেকে কৃষকের হাতে এসেছে। কিন্তু নকশালপন্থী পরিচয়ে যারা গ্রামে গ্রামে জোতদারদের মৃত্যু কাটছে, তাদের কাছে ক'জন কৃষক কত একর জমি পেয়েছে। কৃষকরা জমি পায় নি, পেয়েছে সি আর পি, যে সি আর পি বগী বাহিনীর মত গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে অনেক নিরীহ মানুষকে হারান করেছে—নারীর মর্যাদা পর্যন্ত নষ্ট করেছে। নকশালপন্থী বলে পরিচয়ে ছাত্রদের কাছে একটি মাত্র লাভই হয়েছে, সে হল বিদ্যায়তনেও পুঁলিশ, সি আর পি ও আই-বি-দের অরায় গতা-য়াত সম্ভব হচ্ছে। আর ক'দিন পরে স্কুল-কলেজে শিক্ষকের পাশে একঘানা চেয়ারে একজন করে কনস্টেবল রসে থেকে শৈশি সহযোগে ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকের নিরাপত্তা রক্ষা করবে। হ্যাঁ, আরো উপকার হয়েছে, সেটা হল রাজ্যে যে পরিমাণ পুঁলিশ আজ নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে হিসার মত প্রতি পাঁচজন মানুষে একজন করে পুঁলিশ

আছে। আগামী দিনে এই পুঁলিশকে হয়ত প্রতি পরিবারে ভাগ করে দেওয়া হবে। চারুবাবু তাঁর বিপ্লবের লক্ষ্য-পরেণে এই কাজ করতে চেয়েছেন, এই কথা আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি না এই কারণে যে, এত ছোট কাজ করার জন্য একটি বিপ্লবী পার্টির সীমিত সম্ভব নয়—প্রসারও সম্ভব নয়। অত্যাচার নিপীড়নের কাজকে আমন্ত্রণ জানায়, শোষণের ক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী ও ব্যাপক করে, প্রস্তুতিহীন জনগণকে বিপ্লবের নামে রথচুম্বিতে টেনে নেবার পথ পরিষ্কার হয়—এমন কাজের জন্য মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না। আর এই ভুল পথের নিশানা যারা চারুবাবুর পার্টির কাছ থেকে পেয়েছে বলে দাবি করে—তারা সত্য কথা বলে না। কিন্তু এই সঙ্গে একটা দুঃখের কথাও আছে, সেই কথা হল চারুবাবু নিজে চূপ করে আছেন। চারুবাবুর আজ বলবার দিন এসেছে—হ্যাঁ, রাজ্যের সব কটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বন্ধ হয়েছে, এই সঙ্গে আরো যত কলেজ আছে বন্ধ হোক আমি চাই, আমি চাই পুঁলিশ ও সি আর পি স্কুল-কলেজে প্রবেশের অজুহাত খুঁজে পাক, আমি চাই পশ্চিমবঙ্গে মাথাপিছু একজন করে পুঁলিশ আসুক, আমি চাই নিরোধমূলক আটক আইন বা এই জাতীয় আরো কড়া আইন যত আছে সব চালু হোক, সব মিলিয়ে রাজ্য একটা কয়েদখানা তথা

বন্দিশিবিরে পরিণত হোক। আশু-তোষের মূর্তির মূখ ভেঙেছে, স্বামীজীর মূখে কালি পড়েছে, সে দেখেও আমরা চূপ করে থাকবো, কিন্তু চারুবাবুর মূখ থেকে কিছু শুনতে চাই।

II ভারতদর্শন III

[২০৭ পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি জেলার সম্পদ এবং অর্থনৈতিক সম্ভারনা সমীক্ষার ভারপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক, সেই জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করবে।

গত ১৫ই জুলাই অর্থমন্ত্রণালয়ের পার্লামেন্টারী উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অর্থমন্ত্রী চাবন বলেছেন যে, জাতীয় ঋণদান নীতি সম্পর্কে পরামর্শ দেবার জন্য একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের কথা তিনি চিন্তা করছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের কার্য-পদ্ধতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় বিভিন্ন সদস্য সেখানে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের আমানত বেড়েছে বটে, তবে তার হার আশানুরূপ না হওয়ায় অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক যে আমানত বেড়েছে (৩৮৬ কোটি ২০ লক্ষ), তার বেশির ভাগটাই সংগ্রহ করেছে স্টেট ব্যাঙ্ক (১৮৮ কোটি ৩০ লক্ষ)। কাজেই এই উদ্বেগ মোটেই অস্বাভাবিক নয়।



স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক বিলম্ববাদ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গোরাচাঁদ বুদ্ধ

॥ এক ॥

“একটা কথা উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের গোঁড়া ভক্তের দল এজন্য এই প্রবন্ধ লেখকের ভিতরে “অব্যাচীন”ের আশঙ্কা”র সম্ভান পাবেন বলে আশংকা আছে। তথাপি এ কথা স্পষ্ট করেই বলা প্রয়োজন যে, শঙ্করের মায়াবাদের প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। শঙ্কর বেদান্তের বিবেকানন্দকৃত ব্যাখ্যার ভিতরে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্য অনেক বেশি। মায়াবাদের তিনি কোথাও বিশেষ বিস্তৃত অর্থ করেন নি, অথচ বেদান্ত সম্পর্কে সাধারণভাবে তিনি অনেক বস্তুবাই উপস্থিত করেছেন।”

লিখেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীহেমন্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—“বিবেকানন্দ, বেদান্ত ও ভারতীয় সমাজ” নামক প্রবন্ধে। আবাদ নামে মাস্তাবাদী পত্রিকার ১৩৭৪ সালের শারদীয় বিশেষ সংকলন সংখ্যা দ্রষ্টব্য। উপরের উদ্ধৃতি বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে মনে হতে পারে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বুদ্ধি স্বামী বিবেকানন্দের মনুষ্যের প্রতি একেবারেই শ্রদ্ধাবান নন। আসলে কিন্তু তা মোটেই নয়। প্রবন্ধটি আগাগোড়া পড়লে এ কথা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্বামীজীর “মহতী প্রজ্ঞা”র প্রতি তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করেন। তবে তাঁর মতে শঙ্কর-বেদান্ত এবং আধ্যাত্মিকতা শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে এক অলৌকিক অবাস্তব জগতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁর বস্তু বা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করার আগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের

গোঁড়া ভক্তদের কাছ থেকে নিঃস্বাদ লাভের যে অশংকা তিনি প্রকাশ করেছেন, সে সম্পর্কে দু’একটি কথা সর্বিনয়ে নিবেদন করতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আসল ভাব-ধারা—যাকে এক কথায় বলা চলে সমন্বয় আর গোঁড়ামি একসঙ্গে চলে না। ধর্মের গোঁড়ামি, মতবাদের গোঁড়ামি, আচার, বিচার, সমাজনীতির গোঁড়ামি, এমন কি বিদ্যাবুদ্ধির গোঁড়ামি—সকল প্রকার গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ মর্মেই হয়ে উঠেছিল এই বাংলার মাটিতে উনিবিংশ শতাব্দীতে—এই মর্মেই প্রতিবাদেরই অপর নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়েছিলেন “আমারটাই শুদ্ধ ঠিক এ বুদ্ধি করিস নে। ওটা মড়ার বুদ্ধি।” বিবেকানন্দ বলেছিলেন—“আসুক চারিদিক হইতে রশ্মিধারা, আসুক তীর পাশ্চাত্যিকরণ। যাহা দুর্বল, দোষযুক্ত তাহা মরণশীল— তাহা লইয়াই বা কি হইবে? যাহা বীৰ্যবান, বলপ্রদ তাহা অবিনশ্বর; তাহার নাশ কে করে?”

[উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা]

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। একদা বোস্টনের এক সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ দেখলেন সম্মুখের সারিতে এসে বসেছেন এমনি একদল নরনারী—যারা বেশভূষায়, হাব-ভাব-ভঙ্গীতে, আচরণে ইন্দ্রিয়পর-তন্ত্রতার প্রতিমূর্তি বিশেষ। স্বামীজীর বুদ্ধিতে বাকী রইলো না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সরল বৈরাগ্যপুত্র আধ্যাত্মিক জীবনের কাহিনী এদের কাছে মূল্যহীন

উপহাসের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডল সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলো। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর বলা হয়ে উঠলো না। তার বদলে ভোগ-স্বপ্ন জীবনের ছলনা ও পার্শ্বকলতাকে কশাঘাত করে যে বস্তুতা তিনি করলেন, তার তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই বস্তুতাগৃহ থেকে সরে পড়লেন। পরদিন কিছু বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ স্বামীজীর সাহস, অকপটতা এবং সত্য ভাষণের দৃঢ়তাকে প্রশংসা করে খবরের কাগজে সংবাদ বেরুল। কিন্তু স্বামীজীর হৃদয়ে সৌন্দর্য না ছিল শান্তি, না ছিল আনন্দ। সারাক্ষণ এই চিন্তা তাঁকে পীড়িত করতে লাগলো যে, জীবনে যিনি কারুর দোষ দেখতে পেতেন না, সকল মত, সকল ভাব, সকল ধারা যে জীবনের মোহনায় মিলিত হয়েছে; সকল বস্তুবোর সারবস্তু গ্রহণ করে তাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়াই যার বৈশিষ্ট্য—তাঁর কথা বলতে গিয়ে তিনি এ কী করলেন! লজ্জা এবং দুঃখে স্নিয়মাণ হয়ে স্বামীজী সৌন্দর্য এক বিমর্ষ দিনব্যাপন করলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী এবং জীবনদর্শনের প্রতি যাদের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ আছে, তাঁরা অপরের সঙ্গে একমত না হতে পারেন, কিন্তু অপরের বস্তুবোর মধ্যে আশ্চর্য্যের সম্ভান করবেন এটা ভিত্তিহীন আশংকা বলেই মনে হয়।

আর, “শঙ্করের মায়াবাদের প্রকৃত দার্শনিক চরিত্র সম্পর্কে বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না”—বেদান্ত-কেশরী বলে পান্ডিত্যবান যাকে অভিহিত করেছেন, সেই বিবেকানন্দ সম্পর্কে এ

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

এক অভিনব সংবাদ বটে। কিন্তু এর প্রমাণ?

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় তাই প্রমাণ-স্বরূপ স্বামীজীর যে কথাগুলি উদ্ধৃত করেছেন তা হল—

“জগৎটা দ্রাবিড় মাত্র, সব কিছু মায়া। তুমি নশ্ব দিয়ে মাটি খুঁটেই খাবার খাও বা সোনার থালায় করেই খাও, তুমি প্রবল প্রতাপশালী রাজ-চক্রবর্তী হ’লে প্রাসাদেই বাস কর অথবা দীনতম ভিক্ষুকই হও, শেষ পরিণতি মৃত্যু, সব সমান সব মায়া। এই হল বিশ্বের প্রতি ভারতের Challenge”—

অতএব অধ্যাপক মহাশয় মন্তব্য করেছেন—“মায়াবাদের স্বরূপ বুঝতে এ কথাগুলি বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না। এ জাতীয় মায়াবাদের প্রচার হিন্দু-ধর্মের দর্শনানিভিজ্ঞ বৃন্দ-বৃন্দের দলও দিনরাত করে থাকেন। রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র মৃত্যুতে সব সমান; সংসার মিথ্যা মায়াময়—এর বেশি আর কিছুই বলা হল না।” শঙ্করের মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর অনভিজ্ঞতার প্রমাণস্বরূপ উপরোক্ত যে কথাগুলি অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেছেন, সেটা কলকাতার স্টার থিয়েটার গৃহে সমাগত জনসাধারণের সামনে পাঁচ-মৈশালী কথায় মেশানো এক বক্তৃতার অংশ।

আমরা এখানে স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলোর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোন মতবাদের প্রবৃত্তি হতে চাই না। অথবা শঙ্কর-বেদান্তে স্বামীজীর অধিকার কতখানি তা পরিমাপ করে দেখিয়ে দেবার মত ধৃষ্ট দাবিও করছি না। আমরা এখানে এইটুকুই শূদ্ধ বলতে চাই যে, শঙ্করের মায়াবাদকে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যে অর্থে বুঝেছেন, স্বামীজীর নিকট সে অর্থটুকু যে অনুসৃত ছিল না, এ বিষয়ে প্রমাণের অভাব নেই। নিচে আমরা অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়কৃত মায়াবাদের ব্যাখ্যা এবং মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামীজীর অপর একটা ভাষণের একটু অংশ পর পর উদ্ধৃত করছি। আশা করি এর থেকেই ব্যাপারটা সম্যক পরিষ্কৃত হবে।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যা—

“মায়াবাদের মূল কথা মায়া বা অবিন্যাসের ভাবরূপভা এবং অনির্বচনীয়তা।...জগতের অস্তিত্ব বা নাশিত্ব কোনটাই যুক্তি বা তর্কের দ্বারা, কোনো ন্যায়সঙ্গত ধারণার দ্বারা নিরূপণ করা যায় না; নির্বচন করা যায় না। সূত্রান্তর জগৎ অনির্বচনীয় অথচ একের অভাব বা শূন্য Negation বলেও কল্পনা করা যায়

না। জগতের প্রতীতিটা ভাবরূপেই হ’লে থাকে। এই অর্থেই জগৎ মায়াময়।”

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণের একাংশ—“এই ভ্রমকে অবিন্যাস বা মায়া বলা যায়। ইহারই প্রভাবে পরম সত্যকে অপরিবর্তনীয়কে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মায়া মহাশূন্য বা অস্তিত্বহীন কিছু নয়। সংসার নয় অসংসার নয়—ইহাই হইল মায়ার সংজ্ঞা; অর্থাৎ মায়া আছে একথাও বলা চলে না আবার নাই এ কথাও বলা যায় না। একমাত্র চরম সত্যকে সংসার বলা যায় না; সৌন্দর্য দিয়া দেখিলে মায়া অসংসার, মায়ার অস্তিত্ব নাই। আবার মায়া অসংসার একথাও বলা যায় না, কারণ তাহা যদি হইত তবে ইহা কখনও জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিত না। কাজেই ইহা এমন একটা বস্তু যাহা সংসার বা অসংসার কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্ত দর্শনে ইহাকে অনির্বচনীয় অর্থাৎ বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না বলা হইয়াছে।”

[পৃঃ ৪৪৭, ২য় খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।]

বাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় একদিকে বলেছেন, শঙ্করের মায়াবাদ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের স্পষ্ট ধারণা ছিল না, অন্যদিকে আবার একথাও বলেছেন যে, শঙ্কর-বেদান্তের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং শূদ্ধ তাই নয়, শঙ্করকে তিনি [স্বামীজী] নিজের দার্শনিক গুরু বলে মনে করতেন। বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের যে তত্ত্বটি একটি প্রধান মৌলিক তত্ত্ব, যা না বুঝলে শঙ্কর-বেদান্তের প্রায় কিছুই বোঝা হয় না, সেটি না বুঝেই স্বামীজী শঙ্করকে নিজের দার্শনিক গুরু হিসাবে স্বীকার করে নিলেন!—তবে কি স্বামীজী সত্যি এতটা কাঁচা ছিলেন?

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় আরও একটু গভীরে গেলে দেখতে পেতেন তাঁর চিন্তার গোড়ায় গলদ রয়েছে। আসলে শঙ্করের প্রথর মনীষা এবং বেদান্তের অশ্বৈতত্ত্ব স্বামীজীকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করলেও তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন এক স্বতন্ত্র পথে—যে পথের পথে আলো প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছেন সর্বভক্তের সমন্বয়মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ। স্বামীজী একদা নিজেই বলেছিলেন—

“শঙ্করাচার্যের মত বড় বড় ভাষ্যকারেরা নিজেরদের মত সমর্থন করবার জন্য স্থানে স্থানে শাস্ত্রের এরপ অর্থ করিয়াছেন। যাহা আমার সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।” [পৃঃ ২৪৬—৫৭ খণ্ড, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।] অন্য এক সময়ে নিজের গুরুতাই স্বামী অখণ্ডা-

নন্দের কাছে শঙ্করাচার্য সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—“কেবল ড্রাই ইন্টেলেক্ট [শুদ্ধ জ্ঞান বিচার]—তন্ময় ভয়ে Mob-এর ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাতশুদ্ধ কেটে ফেললেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখতে গেলে পৃথি লিখতে হয়।”

[পৃঃ ৩১৩-৩১৫—৬ষ্ঠ খণ্ড বাণী ও রচনা]

কিন্তু হায়, টেবিলে বসে পৃথি লেখায় অবসর তাঁর আর হয় নি। তবে তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা ও উক্তির পারস্পর্য অনুধাবন করলে এ ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শঙ্করাচার্যকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানসাধকদের পুরোভাগে স্থাপন করলেও তাঁর একান্ত অনুগামী তিনি ছিলেন না। কেন না তিনি শঙ্করাচার্যের ন্যায় জীবজগতের মিথ্যাস্ব প্রতিপাদন করেন নি। জীব-জগৎকে তিনি ব্রহ্মভূত এবং ব্রহ্মেরই প্রকাশিত রূপ বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁর বেদান্ত মত অবৈত, বৈত বিশিষ্ট। বৈত মতের সমন্বয়সূত্র—যে সূত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার আলোকে উদ্ভাসিত। তাঁর ব্রহ্ম কেবল নিগূঢ় নয়, কেবল সগূঢ়ও নয়—নিগূঢ়, সগূঢ় আবার সগূঢ় নিগূঢ়ের।

আজই সংগ্রহ করুন

মনোবিজ্ঞান রায়ের

শিক্ষা বিজ্ঞানের রূপরেখা

দ্বিতীয় একত্র মূল্য—১০.০০

(বি, টি ও বি, এড-এর চারটি আবশ্যিক বিষয় একত্র)

প্রথম ভাগ— মূল্য—৬.০০

(শিক্ষার মূলনীতি, পদ্ধতির ইতিহাস, বিদ্যালয় সংগঠন, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি একত্র)

দ্বিতীয় ভাগ— মূল্য—৮.০০

(শিক্ষাগ্রন্থী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ভাব-ধারণার ইতিহাস, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ, তাঁদের মতামত, শিক্ষার আধুনিক সমস্যা একত্র)

প্রকাশক :

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী

১/২ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা-১

পরিবেশক :

জি, এন ঘোষ এন্ড কোং

ইউ এন ঘর এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ

বিস্কম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

অতীত—অনির্দেশ্য, অনির্বচ্য। তিনিও বলেছিলেন, সূর্যালোকে গমনকারী কোনো পৃথক মহাকাশে তার গন্তব্য পথের বিভিন্ন স্থান থেকে যদি সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করে, তবে চিত্রগুলি একরূপ না হয়ে বিভিন্ন প্রকারের হবে, এমন কি বিরুদ্ধ-ভাবেও হতে পারে। তা হলেও সূর্য এক, চিত্রগুলি সেই একই সূর্যের, বিরুদ্ধ ভাবগুলিও সেই একই সূর্য সম্বন্ধে সমভাবে সত্য। সত্যকে হাজার রকম ধাক্কা প্রকাশ করা চলে এবং প্রতিটি ধাক্কাই সত্য।

যাই হোক, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা। তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধে স্বামীজীর চিন্তাধারার সঙ্গে মার্ক্সবাদের প্রধান কয়েকটি মূল তত্ত্বের একা ব্যাখ্যা করেছেন সর্নিপুণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

১—শ্রেণীস্বার্থ-সংঘর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ বিবর্তনের ধারা অনুধাবন, ২—সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং তারই সাহায্যে মানব সমাজের ইতিহাস ব্যাখ্যা, ৩—বৈশ্বাশাসনের নীরব অঞ্চল নিষ্ঠুর শোষণ, ৪—প্রাক-শূদ্র বিপ্লবগুলিতে শেষ পর্যন্ত শোষক শ্রেণীর হাতেই সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংরক্ষণ, ৫—শোষণমূলক বৈশ্বাশাসনের বিপ্লবাত্মক পরিণাম, ৬—বিপ্লবকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে শোষক শ্রেণী কর্তৃক শ্রমিক-প্রতিভাকে দলে টানবার কৌশল এবং ৭—শূদ্র-বিপ্লবের অপরিহার্যতা—স্বামী বিবেকানন্দের সমাজচিন্তার এই মূল সূত্রগুলির সঙ্গে মার্ক্সীয় সমাজদর্শনের আশ্চর্য একা লক্ষ্য করে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় স্বামীজীর মনীষার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তিনি বলেছেন, “শ্রেণী-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ-ইতিহাসের এই ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে এই কথাই প্রমাণ করে যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার জন্য শূদ্র-জন-সাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের বহুগুণ উদাত্ত আহ্বানবাণী শূদ্র একটা উজ্জল হৃদয়বেগের ক্ষণিক উজ্জ্বল মাত্রই ছিল না—এই আবেগের পিছনে ক্রান্তিহীন গবেষকের সাধনা মানবধর্মী বাস্তব চেতনা ও যুক্তিসম্মত ভাবনার সমন্বিত সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নিপীড়িত মানুষের মর্মসন্ধানী ভাবনার দীপ্তিময় দৃষ্টান্ত হিসাবে এ জাতীয় অজস্র লেখা বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী থেকে তুলে ধরা যেতে পারে। এজন্য সমাজ-বিপ্লবে বিশ্বাসী ভারতবাসী মাঝেই এই মহা-মনীষীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।”

কিন্তু প্রবন্ধটির দ্বিতীয় পর্যায় স্বামীজীর চিন্তাধারা বিশ্লেষণে এবং

তার পরিধি ও সীমারেখা নিরূপণে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় যে সব মন্তব্য করেছেন এবং যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, দৃষ্টের বিষয়, আমরা তার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য এবং আমাদের বক্তব্য যথাসম্ভব পর পর উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করবো।

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, শূদ্র-বিপ্লবের অবশ্যাব্যবস্থা এবং শ্রমজীবীর প্রভু প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিঃসংশয় হলেও “শূদ্র-চরিত্র সম্পর্কে” একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশা, শূদ্র-বিপ্লবের আত্মিক প্রকৃতি সম্পর্কে এক “হতাশাক্রান্ত সংশয়” স্বামী বিবেকানন্দকে আধ্যাত্মিকতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। “স্বচ্ছ দৃষ্টি, ক্ষরধার বদ্বন্দ্বি, বিজ্ঞানীসুলভ বিশ্লেষণী শক্তি, নিপীড়িত মানুষের কল্যাণ কামনায় এক দুরন্ত আবেগ—এ সব কিছু যেন কোনো এক অবসর সন্ধ্যায় চূড়ান্ত অবসান খুঁজেছে বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের পরম প্রশান্তির মধ্যে।” এর প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন ভগিনী হেলের কাছে লেখা স্বামীজীর একখানি চিঠির একাংশ—যাতে তিনি বলেছেন—

“সমাজের নীচেকার লোকটিও এই দুঃখময় পৃথিবীতে একটু সুদিনের মুখ দেখুক। এর ফলে তথাকথিত সূত্রস্বাদের অভিজ্ঞতা পার হয়ে এরা সবাই এসে শেষ পর্যন্ত পরমেশ্বরের শরণ নেবে। এই পৃথিবী তার গর্ভমেষ্ট আর তার যত সমস্যা সম্পর্কে এদের সকল মিথ্যা মায়ামোহ কেটে যাবে।”

অধ্যাপক মহাশয় আরো বলেছেন যে, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সাময়িক বিফলতা, ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনের স্তানিময় পরিবেশ, বটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ফলহীন প্রতিবাদ, নিপীড়িত শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সংহতির অভাব, শ্রমজীবী মানুষের নৈতিক ও আত্মিক চরিত্রের সীমাহীন দুর্বলতা—এ সব কিছু মিলিয়ে তাঁর হৃদয়ে মাঝে মাঝে হয়ত এমন এক হতাশার সঞ্চিত করত—যার ফলে মায়াবাদকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরার এক বিপরীত প্রেরণা অনুভব করতেন।”

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বক্তব্যের মধ্যে “হয়ত” কথাটি লক্ষণীয়। মনে হয় তিনি নিজের তাঁর মতের সারবত্তা সম্পর্কে একেবারে নিঃসংশয় ছিলেন না। নিমজ্জ-মান ব্যক্তি দিশেহারা হয়ে যেমন খড়কটোকে আশ্রয় করে, তেমনি হতাশা-সাগরে নিমজ্জিত স্বামী বিবেকানন্দ মায়াবাদকে আঁকড়ে ধরেছিলেন অথবা শূদ্র চরিত্র সম্পর্কে একটা নিদারুণ বেদনাময় হতাশায় কাতর হয়ে শেষ পর্যন্ত বেদান্তের ধর্ম-

মায়ার মধ্যে আত্মগোপন করে সকল সমস্যার চরম বিপ্লবান্তি খুঁজেছিলেন—অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় নিজে যাকে “বীর সন্ন্যাসী” বলে আখ্যাত করেছেন, তাঁর জীবনের বাস্তব ইতিহাস অথবা তাঁর জীবনদর্শন কোনোটার সঙ্গে এই ব্যাখ্যা মেলে না। এ হেন ব্যাখ্যাকে আমরা ভুল বলে মনে করি।

দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের আসল গোল বেধেছে “শূদ্র” শব্দটির ব্যাখ্যা নিয়ে। তাঁর ধারণা, স্বামীজী শূদ্র বলতে মনুষ্যত্বহীন অবস্থাকে বুঝেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ অধ্যাপক মহাশয় স্বামীজীর “বর্তমান ভারত” থেকে নিম্নের বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন—

“স্মরণাতীত কাল থেকে অত্যাচারের চাপে বিচ্যূত এই শূদ্রশ্রেণী ন্যাকারজনক দাসমনোবৃত্তি গ্রহণ করে কুকুরের মত উচ্চ বর্ণের পদলেহন করে এসেছে। আর না হয় অমানুষ নিষ্ঠুর পশুতে পরিণত হয়েছে। তাদের আশা-ভরসা বার বার ধুলিসাং হয়েছে। লক্ষ্যানুসন্ধানের দৃঢ়তা ও কর্মক্ষেত্রে অবিচল অধ্যবসায় বলতে তাদের কিছু নেই।”—অর্থাৎ অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় ইচ্ছাতে বলতে চান শূদ্র বলতে স্বামীজী দাসত্ব, পশুত্ব এবং অধ্যবসায়হীন অকর্মণ্যত্বকেই বুঝেছেন। তাঁর যুক্তির ধারা এই যে, যেহেতু স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে, দাসত্ব, পশুত্ব, অকর্মণ্য দিয়ে শূদ্র চরিত্র গঠিত, তাই সেই চরিত্রের উপরে তাঁর কোনো আস্থা ছিল না। তাই “শূদ্র-বিপ্লবের স্বারা মানুষের মনুষ্যত্ব যে দুর্বীর পদক্ষেপে অগ্রগামী হবে, এমন বিশ্বাসও তাঁর ছিল না।” অতএব বৈদান্তিক মায়ার আশ্রয়!

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের এই ব্যাখ্যা একেবারেই স্বকপোলকল্পিত। শূদ্রত্ব কথটির এই ব্যাখ্যা এবং তা থেকে উদ্ভূত অনসিদ্ধান্ত তিনি যে স্বামী বিবেকানন্দের ঘাড়ে অকারণ চাপিয়েছেন তা প্রমাণ করতে বেশি দূর যেতে হয় না। শূদ্রত্বের ব্যাখ্যা হিসাবে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ভূত স্বামীজীর উপরোক্ত কথ্যগুলি শূদ্রত্বের সংজ্ঞা বা Definition নয়, পরন্তু শূদ্র-শ্রেণীর তৎকালীন অবস্থার বর্ণনা। দৌভাগ্যের বিষয়, শূদ্রত্ব বলতে স্বামীজী যা বোঝাতে চেয়েছেন তা নিজেই ব্যাখ্যা করে বলেছেন। আমরা এখানে “বর্তমান ভারত” থেকে তাঁর নিজের কথা উদ্ধৃত করছি।

“তথাপি এমন সময় আসিবে যখন শূদ্র সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্য, ক্ষত্রিয় লাভ করিয়া শূদ্র জাতি যে প্রকার বলবীৰ্য প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম সহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে।” অতএব

নিষ্ঠাবতী

অগ্নিকুশল হাট

বেদনাসম্পন্নমানা, দুটি পায়ে কান্নার নুপুড়,
একক বিরহ ধ্যানে পুণ্ডিত হৃদয় ভরপুরে।
রক্তে নাচে বকুলেরা। চেয়েছিল স্বপ্নে উত্তরণ,
স্নায়ুতে গোলাপরাশি বেঁধেছিল সহস্র তোরণ।

অশান্ত দায়িত্ব তাকে স্পর্শ করিনি কোনদিন
জানো না, ভালবাসে কিনা বাসে। শূন্য দৃষ্টি মেলে
কী যেন সে খুঁজেছিল। বৃষ্টি তার মেলেনি সন্ধান ;—
তারপর চলে গেছে কাছে থেকে দূরে—আরো দূরে।

কী অঁতাব আছে প্রেমে ; কীভাবে সে শোধ করে স্বপ্ন?
কান্না নিয়ে খেলে শূন্য। নিষ্ঠাবতী ভাবে, দূত পেলে
মনের খবর নিতে। যৌবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান
কেন যে বিফল হ'ল, কোন অভিযোগে গেল পড়ে।

একালের প্রেমমেঘে বিচ্ছেদের ঝড়ের আভাস,
কে ধরে রেখেছে তার ব্যথাবীথি, কোন কালিদাস?

স্বামীজীর প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী শূন্য সহিত কথটির অর্থ শূন্যধর্মকর্ম সহিত। অর্থাৎ শূন্যের অর্থ শূন্যের ধর্মকর্ম। তাঁত, জেলা, মন্দির, মেথর, মজদুর, শ্রম-ছািবী, কৃষিজীবী, মেহনতী মানব দিয়ে গঠিত যে বৃহৎ শূন্যসমাজ—“শক্তির আধার সেই প্রজাপঞ্জ” —তাদের ধর্মকর্মের আত্মিক প্রকৃতি এবং বলবীর্ষের দ্বারা সমাজে একাধিপত্য লাভ করবে—এই তা স্বামীজীর কথার সাদা অর্থ। স্বামীজী যেখানে বলেছেন, “শূন্য সহিত অর্থাৎ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য লাভ করিয়া শূন্য জাতি যে প্রকার বলবীর্ষ প্রকাশ করিতেছে তাহা নহে”—এই অংশটি বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য। স্বামীজী লক্ষ্য করেছিলেন প্রাক-শূন্য বিপ্লবকালে যখন কোনো শূন্য নিজ বিদ্যা-বুদ্ধি বা গুণগরিমাবলে কিছু প্রভাব বিস্তার করতেন, তখনই তিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অর্জন করে উচ্চশ্রেণীভুক্ত হয়ে নিজ শ্রেণীস্বার্থ বিস্মৃত হতেন বা তার বিরুদ্ধাচরণ করতেন। শ্রমিক-মজদুর শ্রেণী থেকে উন্মূক্ত প্রাতিভাকে দলে টেনে নিয়ে উচ্চশ্রেণী তথা শোষণসমাজ শূন্যবিপ্লবকে দূরে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু শূন্যবিপ্লবকালে শূন্যকে তথাকথিত উচ্চশ্রেণী লাভে আর প্রয়াসী হতে হবে না।

অর্থাৎ অগ্রগামী সমাজ-বিপ্লবের ধারায় প্রাধান্য অর্জনে শূন্যকে আর শূন্য [অর্থাৎ শূন্যের ধর্মকর্ম] পরিহার করতে হবে না। স্বামীজী আরও বলেছিলেন, “শূন্যজাতিমাট্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন কিন্তু আশা আছে।” শূন্য-শ্রেণীর দাসত্ব এবং হীনাবস্থা যে নৈসর্গিক নিয়মের ফল এবং সে নিয়ম যে পাণ্টে যাবে নিয়মের-ই গতিতে, আশাবাদী সম্যাসীর দৃষ্টিতে সে তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল কেমন করে, নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলিই তার প্রমাণ—“এক্ষণে বৈশ্যকূল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতেছে। অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে

প্রজাপঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে—এ স্থানে এ শক্তির মূর্ত্তাবীজ উদ্ভূত হইতেছে।” [Marx-এর Inherent contradiction in capitalist system-এর ভিত্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়]

শূন্যবিপ্লবের মধ্য দিয়ে মনুষ্যের সমস্যা সমাধানে স্বামীজীর কোনো বিশ্বাস ছিল না—অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এ তথ্য কোথায় পেলেন জানি না। অগ্র-গামী সমাজ-বিপ্লবে শূন্য-প্রাধান্য অপরি-হার্য, স্বামীজীর এ বিশ্বাস যদি সত্য বলে মনে নিতে হয়, তবে এও সত্য যে, বিপ্লবোত্তর যুগের মনুষ্যের প্রতিও তাঁর বিশ্বাসের কিছু কমতি ছিল না। শূন্য-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী জেনে এবং তার সমগ্র ফলাফল অনুধাবন করে যদি তিনি সত্যই হতাশ হতেন, যদি সত্যই বিশ্বস্ততার তাঁর হৃদয় আচ্ছন্ন হ'ত, তবে তিনি কি বলতে পারতেন—

“তারা বলেন অস্ত্র গরীবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? মন্দিরময় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!! সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না এই তুমি, আমি, দশজন বড় জাত!!!

[স্বামীজীর পত্র সংখ্যা ৩৮৪, পৃষ্ঠা ২৪—৮ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]

অতএব, ভবিষ্যৎ মানবসমাজের জন্য হতাশা নয়—আশা এবং বিশ্বাসই ছিল

বিবেকানন্দের আসল কথা। তাঁর নিঃস্বাস বায়ুতে এই বিশ্বাস প্রতিধ্বনিত হ'ত। ক্লীবতার বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণে, বাণ্ডিত শোষিত মানবের মধ্যে অভীষ্ট মন্ত প্রচারে এবং তাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিঁরিয়ে আনবার প্রচেষ্টায় কেউ কখনো তাঁকে অবসর বা ক্লান্ত হতে দেখে নি। বেদনাত হৃদয়ে তিনি যেমন শূন্য শ্রেণী বা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর শোষিত অংশের দাসত্ব, পশুত্ব এবং অকর্মণ্যত্ব লক্ষ্য করেছেন, তেমনি বৃহত্তে পেরেছিলেন যে, সনাতন দৃষ্টি ভোগ করে “এরা পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। আশাখানা রুটি পেলে গৈলোকো এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্ত-বীজের প্রাণসম্পন্ন।” [পরিব্রাজক] এই অবহেলিত জনসমাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এমনই দৃঢ় যে, শেষ পর্যন্ত তা শ্রম্য এবং ভালবাসায় উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। হৃদয়ের যে দয়ার উন্মোচন করে তিনি পরমপূজ্য লোকজয়ী ধর্মবীর, রণবীর, কাব্যবীর-বৃন্দকে অভিধ্বন্য করেছেন, সেই একই দয়ার খুলে একই আসনে বসিয়ে সমধিক শ্রম্য শ্রমজীবীকেও অভিধ্বন্য জানিয়েছেন। ওই যারা চাষাভূষা, তাঁত-জোলা, নগণ্য মানব, শ্রমজীবী ছোট জাত, তাদের মধ্যে বিবেকানন্দ “অপার সহিষ্ণুতা, অনন্ত প্রীতি ও নিষ্ঠার কার্যকারিতা”র এক উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন। লোকচক্ষুর অন্তরালবতী সেই মহত্ত্ব তাঁকে যতখানি স্পর্শ করেছিল, পৃথিবীর আর কয়জন সমাজবিপ্লবী বা রাজনৈতিক নেতাকে তেমনটি করেছিল বা আদৌ করেছিল কিনা, ঐতিহাসিকেরা তা খতিয়ে দেখবেন। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিরপদদলিত শ্রমজীবীর প্রতি অগাধ বিশ্বাসে এবং শ্রম্য এই সাধক সম্যাসীর হৃদয় এমনি উদ্বেলিত যে, তাদের সামনে মাথা নত করে তিনি বলেছিলেন, “তোমরা ধনা, তোমাদের প্রণাম করি।” [পরিব্রাজক]

[চলবে]

নারায়ণ গদ্যোদ্যায় স্রোতের সঙ্গে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

II আঠারো II

বুড়োটার যেন আর কাজকর্ম নেই—
খাঁকশেলার মতো খাঁক খাঁক করছে
দমস্ত দিনটা। বাঁধানো দাঁত দিয়ে যে
অমন করে খিঁচোনো যায়—আশ্চর্য!
আমল দাঁতগুলো থাকলে কামড়েই দিত
থবে সম্ভব।

এই বুড়োটার জন্যেই মনে হয়—
দুত্তোর, দিই এই কচুপোড়ার চাকরি
ছেড়ে। কিন্তু তা হলে দিদি আর আসতো
রাখবে না। আর মনশীদা এলেই তো খবর
গেরেসভারী চালে পিঠ-ফিট চাপড়ে দেয়,
আড়ালে ডেকে নিয়ে বলে, ‘একটু মন দিয়ে
কাজকর্ম কোরো হে, আমার প্রেসিটজের
কথাটা মনে রেখো।’

তাও সরে পড়া যেত, কিন্তু আর ক’টা
দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই যে মাইনেটা
পাওয়া যাবে, সে-কথা ভোলা যাচ্ছে না।
নিজে রোজগার করবার একটা আশা
সুখ এখন নেশার মতো জড়াচ্ছে তাকে।
তা ছাড়া কিছু কিছু বাড়তি পয়সাও
আছে। এই হুণ্ডা তিনেকের ভেতরেই
অনেক কিছু শিখেছে সে—শিখে নিতে
হয়ছে। খুঁটিনাটি কাজে পয়সা মেলে,
জমি-বাড়ী বিক্রীর ব্যাপারে পার্টিকে
রোজিন্ট্রি অফিসে নিয়ে গেলে দুটো-একটা
টাকা হাতে আসে। এখন নিজের ওপর
একটা মর্বাদার বোধ আসছে ক্রমশ। আমি
কেবল রকবাজ নই—আরো দশজন বেকার
মস্তানের সঙ্গে হুজুড়াবাজী করে বেড়াই
মা—যে-সব কাজের লোকেরা ব্যতিব্যস্ত
হয়। দশটা-পাঁচটায় অফিসের বাস ধরে,
আমি তাদেরই একজন।

এ-সব ভালো, কিন্তু দুটো জিনিস।
বুড়োটাই জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল। আর
তা ছাড়া—তা ছাড়া কিছুতেই কোচিং
ক্লাসে ভর্তি হওয়া যাচ্ছে না। অথচ লেখা-

পড়াটা আরো একটু না শিখলে কিছুতেই
স্বপ্নার কাছে—

সঙ্গে সঙ্গে গলার কাছে যন্ত্রণা উঠল
একটা। মনে হল, কার্তিকের সেই শস্ত
হাতটা, এখনো যেন ফাঁসির মতো আটকে
আছে। হঠাৎ এই কাগজপত্র-ঠাসা গুমোট
ঘরটা যেন দম আটকে আনল তার।

বুড়োর কাছে সে বললে, ‘মাখনদা,
আমি একটু আসছি বাইরে থেকে চা খেয়ে।’
মাখনদা খানিকটা শর্টহ্যান্ডে লেখা
থেকে টাইপ করছিল। ব্যস্ত ছিল, তাতেই
দাঁত খিঁচোবার সময় পেলো না।

‘সাহেব একটু পরেই আসবে হাইকোর্ট
থেকে। অনেক কাজ আছে। আন্ডায় জমে
যেয়ো না।’

‘না-না, আমার দেরী হবে না।’
গাড়ীর সার, লোকের ভিড়। মাথার
ওপর সূর্যের আগুন। গঙ্গা ছুঁয়ে—গড়ের
মাঠ পৌঁছিয়ে যে হাওয়া আসছে, তাতে
পর্যন্ত গা জ্বালা করতে থাকে। এখানে
মামলা-মোকদ্দমা, বিষয়-সম্পত্তি, স্বার্থ,
আইনের কট-কচাল। মানুষের মূখের
চেহারা পর্যন্ত বদলে যায় এখানে এলে।
যেন চারিদিকে শিকার খুঁজে ফিরছে সব,
চোখগুলো ধূত তাম-ধারালো—এদের সঙ্গে
কোনো তফাৎ নেই মার্গিকের, ফণীর,
কার্তিকের।

আবার কার্তিক। টুল চোখ-কান বন্ধ
করে এগিয়ে চলল। মোড়েই খাবারের বড়ো
দোকানটা।

সব সময়েই জমাট, এখনো বিস্তর
লোক। তবু বসবার জায়গা মিলল।

‘দুটো সিঙাড়া, চা এক কাপ।’

খিদে পেয়েছে। সেই নটায় বেরতে
হয় বাড়ী থেকে। বাসের আঁকুনিতেই কখন
পেটের ভাত হজম হয়ে যায়।

সিঙাড়া এল। চামচে করে ভেঙে খেতে
খেতে অন্যান্যনস্ক হল টুল।

কার্তিক জামার কলারটা শস্ত হাতে
টেনে ধরেছিল। পকেট থেকে ছোরাই বের-
করতে যাচ্ছিল হয়তো, মাণিক যেন বলে-
ছিল, হয়তো তক্ষণি পেট ফাঁসিয়ে দিত।
শাল্য—খুঁনে!

অথচ, সব মিথ্যে। সে কারো নামে
চুকলি খায় নি। ওরা কসবার কোথায় বসে
রোমা বানায়, তা-ও সে জানত না। ইয়ার্কি-
ফাজলামো, এক-আধটু আজ্ঞে-বাবো ফুঁর্তি,
না-হয় হয়েই গেল কিছু, হাতাহাতি।
কিন্তু ও-সব বোম্ববাজী তার পোষায় না
—সে মাথাও ঘামায় নি কোনোদিন।

গৌরবাবু দারোগাকে মূচনেকা দেওয়া
ছাড়া আর কিছুই সে বলে নি। পুন্ডিলের
টিকিটাক কোথেকে বোমার খবর পেলে,
তারা জানে। অথচ হারামীর বাচ্চাদের
যত রাগ তারই ওপরে।

মাণিক নিশ্চয় কলকাতায় নেই। তার
কানে মন্ত্র দিয়েছে ওই পলিটিক্সের
দাদারা—কোথায় যেন কাদের হয়ে ধান
কাটতে গেছে সে। তাকে ভরসা দিয়েছে,
এ-সব কাজে নেমে পড়লে তার জীবনটাই
অন্য রকম হয়ে যাবে, আর ওয়ান ভাঙতে
হবে না, একেবারে সুখের স্বর্গে গিয়ে
চড়বে। হবে মোড়ার ডিম! পলিটিক্সের
দাদারা তো কেবল লাল কাপড় দু’লিয়ে
দেশবন্দু খাড়া খেঁপিয়ে তাদের লড়াই
দেখছে—আর নিজেরা বেশ মৌজের সঙ্গে
হাততালি বাজাচ্ছে।

ধুস্! সিঙাড়া থেকে এক টুকরো পচা
আলু মূখে পড়তে আরো মেজাজ খারাপ
হয়ে গেল টুলের। মাণিকটা থাকলে তবু
কার্তিকদের খানিক সামলে রাখতে পারত
—তার মাথা একটু ঠান্ডা। এ ব্যাটারা তো
খ্যাপা কুকুর হয়ে আছে, আবার বাগে
পেলে—

স্বপ্নাই বাঁচিয়ে দিলে এ যাত্রা।
স্বপ্না!

সাপ্তাহিক বসন্ত

টুলুর মাথাটা বঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। সম্মাটা তখন কি রকম হয়ে গিয়েছিল। আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে কী সবুজ দেখাচ্ছিল সাদার্ণ অ্যাভেন্যুর ঘাসগুলো, কী হাওয়া দিয়েছিল, লেকের গাছগুলোতে কী ফুল ফুটেছিল, আর কতদিন পরে হাতটা চেপে ধরেছিল স্বপ্না। টুলুর মনে হচ্ছিল, আবার সে আগের দিনগুলোর মতো ভালো হয়ে যাচ্ছে—এতদিন যা কিছু ঘটেছে, সব স্বপ্নের ভেতর, হঠাৎ স্বপ্না বলে বসবে, 'টুলুদা, এই অঙ্কটা পারছি না, বুঝিয়ে দাও।' এমনি করে টুলু যখন আবার ভালো, আবার নতুন হয়ে যাচ্ছিল, তখন কার্তিকরা এল। সমস্ত কালো হয়ে গেল, ঘালিয়ে গেল সমস্ত।

স্বপ্না তাকে আর একবার বাঁচিয়ে দিলে। সেই স্কুলের টাকা ভেঙে কেলেকারীতে জাঁড়িয়ে যাওয়ার পর নিজের গলার হার যেমন খুলে দিয়েছিল সেদিন। কার্তিক ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু আর সে দাঁড়াতে পারল না। একটা মোড় ঘুরতেই সামনে চলতি বাস—এক ল্যাফে উঠে পড়ছিল তাতে।

বাসটা কোন্ দিকে, কোথায় চলেছে সেটা বড়ো কথা নয়। কার্তিক তাকে ছোঁরা মারলেও হয়তো ভালো হত এর চাইতে। লজ্জায়, অপমানে সে যেন টুকরো-টুকরো হয়ে যাচ্ছিল তখন।

স্বপ্না বোধ হয় তাকে ডাকছিল। কিন্তু জোর করে পা-দানর ভাঁড় ঠেলে উঠে সে বোঝাই বাসের মধ্যে লুকিয়ে গেল। বাস কোথায় যাচ্ছে? সলট লেক? শিবপুর? যেখানে খুঁশি যাক।

দাঁতে দাঁত চাপল টুলু। নাঃ, বার বার এভাবে নীচু হওয়া যায় না। আমি ফিরেছি, আমি ফিরব। আমি চাকরি করব, আমি কোচিং ক্লাসে ভর্তি হবো, আমি মাথাটাকে ঘাড়ের ওপর সোজা করে ধরব, তারপর গিয়ে দাঁড়াব স্বপ্নার কাছে। কার্তিক ব্যাটাছেলে! কী করতে পারে আমার? এবার থেকে আমিও একটা ছোঁরাটোরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে। যদি মারতেই আসে, অন্তত একটাকে সাবাড় করে তবেই মরব।

আসলে আমি দল ছেড়েছি, তাতেই রাগ। আমি ভদ্রলোক হতে চেষ্টা করছি, তাইতেই জ্বালা ধরেছে শালাদের।

সেদিন বাসটায় চেপে ভবানীপূর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছিল। তারপর বাড়ী ফিরে সমস্ত রাত তার মাথায় আগুন জ্বলেছে। দাদার ওপরেও তখন বিদ্রোহ। রাগ হচ্ছিল তার। কী দরকার ছিল মরারি হালদারকে বলে সাত-তাড়াতাড়ি তাকে ছাড়িয়ে আনবার? না হয় আরো দরটো দিন ঠেঙিয়ে, কার্তিককে যেমন ছেড়েছে

তেমনিভাবে তাকেও ছেড়ে দিত। মাঝখান থেকে—

'টুলু, নাকি?'

টুলু একটা ঝাঁকুনি খেলো ভাবনার ভেতরে। চেয়ে দেখল, কালাঘাটের ভেটকি মিস্ত্রি। ওদের দলেই ঘর-ঘর করত, তারপর কিছুকাল বে-পান্তা। একটা ভালো নাম তার নিশ্চয় ছিল, কিন্তু ভেটকি নামেই সে বিখ্যাত। বড়োলোকের ছেলে চেহারাটা খুব চটকদার। জীবনে তার একটি মাত্র উদ্দেশ্য—মেয়ে শিকার করা। এ পর্যন্ত যত মেয়েকে কিভাবে সে মজিয়েছে, রসিয়ে রসিয়ে সেই গল্প করতেই আনন্দ। নোংরা কথা তাদের দলে সবাই বলে থাকে, কিন্তু বড়োলোকের ছেলে বলেই তার মুখ সব চেয়ে বেশি খোলা—খিস্তি করবার সময় জিভ যেন তার লক লক করত, এমন কি ফণী পর্যন্ত বলে বসত: 'থাম্ মাইরি, আর তো বরদাস্ত হয় না—তুই আমাদের চরিত্তের খারাপ করে দিবি যে!'

'আহা, কী সব চরিত্তের ধজা রে!'

এই ভেটকি মিস্ত্রির কিছুদিন পান্তা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ এখানে—এই হাইকোর্ট পাড়ায়?

ভেটকি মিস্ত্রির কেবল দোকানে ঢুকেছিল মনে হল, এসে বসে গেল টুলুর পাশে।

'তুই এখানে কী করছিস টুলু?'

'চাকরি করি একটা। চা খেতে এসেছি। খাবি তুই?'

'বলে দিয়েছি। কিন্তু ব্যাপার কী—আঁ? তুই চাকরি করছিস?'

'কেন, দোষ আছে?'

'না—দোষ আর কী, ভালোই তো। তোর দাদার পাঞ্জায় পড়ে বুঝি?'

'কেন, নিজে থেকে আমি একটা চাকরি নিতে পারি না?'

'পারিস বই কি, আলবৎ পারিস। তা দল-টল কি ছেড়ে দিলি?'

টুলু এড়িয়ে গেল কথাটা। বললে, 'তুই এ-পাড়ায় যে?'

'ভবানীপুরের একটা বাড়ী বিক্রী করে দিতে হল মাইরি। দেনায় এমন জড়িয়ে গেলুম যে—' ভেটকি মিস্ত্রির মুখটা খুলে পড়ল: 'খুব বাগিয়ে নিলে পাঞ্জাবী সর্দারজী—বুঝলি? কমে কমে দেড় লাখের বাড়ী—ছাড়তে হল পণ্ডাশে!'

'ছাড়লি কেন?'

'আর বলিস্ নি। মানে একটা মেয়ে—'

'শুধু একটা বলাইছিস কেন? তুই তো মেয়েদের গায়ের এঁটলি!'

ভেটকি মিস্ত্রির মুখটাকে বিদ্রোহ করল: 'ধুং—মেয়েছেলেতে এবার অরুচি ধরে গেছে!'

'বটে!'

'আরে, এটা ইস্কুলের মেয়ে। দেখতে

খাসা, বরোছিস? পটিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম একটা খালি কুঠিতে। বরাবের ফের—হল পদাংশ রেড! ধরে হাজতে। বলে নাবালাকা—পাঁচটি বছর খান ধোরাব তোমায়। সে ঝকঝক মেচাতে—বুঝাল, স্নেহ বিশটি হাজার টাকা। বাবা বন্দুক নিয়ে এল, বললে, যা চলে দেশের বাড়ীতে, কলকাতায় আর একাদিনও থাকবি তো তাজা পুস্তক করব। কী করা যায় বল্। তা মাস ছয়েক তো বনবাসে কাটল। তারপর বাবা হঠাৎ স্ট্রোক চোখ বুজলেন, ফিরে এসে সম্পত্তির প্রোবেট নিতে গিয়ে দেখি, কাকা তলায় তলায় সব ফাঁক করে রেখেছে। তার পরে ডেথ-ডিউটি, এটা-সেটা—যাঃ শালা, চোখে-কানে দেখি না। দিতে হল বাড়ীটা বেচে। ও ব্যাটার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ধার নিতুম, শেষে বাড়ীটা ওর পেটেই গেল। দুই—কিছু ভালো লাগছে না। নাঃ, মেয়ে-ছেলের মধ্যে আমি আর নেই। মা বিয়ে করতে বলছে, তাই করে ফেলব একটা!'

'মেয়েছেলের মধ্যে নেই তো বিয়ে করবি কাকে? বেটাছেলেকে?'

'বউ—বউ। তাকে কি মেয়েমানুষ বলে?—চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেটকি মিস্ত্রির বললে, 'তারপর আর খবর-উবর কী? প্রমোদ, ফণী, কার্তিক—'

সামনের ঘড়িটার তিনটে বাজল। চমকে উঠল টুলু। একটু পরেই হাইকোর্ট থেকে ফিরে আসবেন ঘোষ সাহেব।

'সব ভালো।—টুলু দাঁড়িয়ে পড়ল: 'আমি চললাম। কাজ আছে। পরে দেখা হ'ল আবার।'

'আসিস না একদিন আমার বাড়ীতে। এখন বাবা তো নেই, ভাবনারও কিছু নেই। আমিই মালিক। দরজায় নেম-প্রোব বসিয়েছি, বুঝলি? পি. মিটার, ল্যান্ড লর্ড। চলে আসিস!'

'দেখা যাবে!'

চা আর খাবারের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে টুলু নেমে পড়ল। সেই ভাঁড়, গাড়ীর সার, সেই ধারালো রোদ, জ্বালা ধরানো হাওয়া, মানুষের ধূর্ত হিসেবী চোখ। মনটাকে আরও বিদ্রোহ করে দিয়েছে ভেটকি মিস্ত্রি। জেল খাটলেই ভালো হত ওর।

যেতে যেতে, ভীড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে, প্রায় চোখ বুজে টুলু নিজেকে বলতে লাগল: আমি বেঁচেছি, এদের খম্পর থেকে আমি বেঁচেছি। কিছুই বলা যায় না—হয়তো ওর সঙ্গী হয়ে আমিও খালি কুঠিতে যেতুম—ও বেরিয়ে আসত টাকার জোরে আর আমাকে জেল খাটতে হত। আমি বেঁচেছি, আমি বাঁচব। কার্তিকদের ভয় করি না, দরকার হলে আমিও একটা ছোঁরা নিয়ে বেরুব সঙ্গে।

স্বপ্নার কাছে আমি ফিরে যাব মাথা উঁচু করে, বুক টান করে। যেতে যেতে

মেঘে ও আলোতে

জয়ন্তী সেন

এ সব পথের কথা পাথর হৃদয়
ইতিহাস মনে রাখা
আগ্নি জানি শুধু ফিরে আসা।
অনেক আশ্চর্য রৌদ্রে অন্ধকারে
মেঘে ও আলোতে
যেতে যেতে অভিজ্ঞতা বোধে স্থির হলে
সেই নিজেকেই ফেরা ভালোবাসা,
গাঢ় আত্মরসিক।
যে প্রকৃতি এত সূক্ষ্ম অপরেরা চোখে
সেও তো নিজেতে গম্ব
শান্ত, রুদ্ধ সব পরিবেশে।
তাইতো বেড়াতে বাই, কে বগোছে
জীবনের মালো
সুদূরেই সুখলভ্য তারা চেয়ে
বৃষ্টির ভিতরে
নিজের একান্ত কাছে বার বার
প্রতি আনতলো
যে রক্ত কমলা ফোটে—সেই সূক্ষ্ম
নীলা অন্ধকারো।

বিসর্জনের ঢাক

রাধামোহন, মহান্ত

অন্তিম সাইরেন বাজে বহুবর্ণ বিধির ডানায়
দার্জিলিং সান্দ্র থেকে সোনাপুর রায়না রাস্তা
দক্ষিণ-সাগর থেকে ঘন নীল উত্তরে তরাই—
গভীর চক্রান্তে কাঁপে অশরীরী ঘোর কালো রাত।
আবিষ্ট জনতা মন, শহরে এসেছে উঠে গ্রাম
কেউ বলে, 'ভয় নেই, শত সূর্য দেবো উপহার।'
'এনেছি নতুন দিনা'—কেউ বলে, 'চলছে সংগ্রাম,
মেহনতী মানুষেরে এনে দেবো পূর্ণ অধিকার।'
আমরা বোঝা ও কালা—হাতিয়ার এবং রসদ।
কেন না, আমরা সব গণবাদী প্রগত মানুষ,
আমরা কামের করি, ভাঙ-গড়ি পাকা মসনদ,
আমরা লড়াই করি, মরি-বাঁচি, বিবেক বেহুশ।
আমরা বিবেকবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী, ভাই,
বিসর্জনের ঢাক প্রয়োজনে আমরা বাজাই।

মনে হল, সেই সম্মানটির মতো স্বপ্না তার
হাত ঘরে আছে।

অফিসে মজুমদার সাহেব ঘেরাও।
সেন আর চ্যাটার্জী—আরো দু'জন কতা-
বাস্তি—গোলমাল শুনে ব্যাপারটা জানতে
এসেছিলেন, তাঁরাও আটকে পড়েছেন
জালের ভেতর। এখন খাবি-খাওয়া মাছের
মতন ছটফট করছেন তাঁরা।

পাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গরমে
দর দর করে ঘামছেন সূক্ষ্ম ভদ্রলোকেরা।
আর তাঁদের ঘিরে উঠছে শেলাগানের পর
শেলাগান।

'দালালো ধবংস হোক।'

'—মদাবাদ, মদাবাদ!'

মজুমদার সাহেব যে খবর চমৎকার
লোক তা নন। এক সময়ে সিংহবিক্রমে
চলতেন, এখন জমানা বদলের ফলে মেঘ-
শাবক। যুক্তফ্রন্টের টলমল অবস্থা দেখে
উৎসাহে একটু নড়ে বসেছিলেন, একটা
চাক্ষুশীট দিয়ে ফেলোছিলেন একজনকে,
তার ফলে আজ এই প্রায়শ্চিত্ত করতে
হচ্ছে।

একবার ক্ষীণ গলায় বলতে চাইলেন,
'দেখুন, উইদাউট নোটশ দিনের পর
দিন কামাই করলে—'

'শাট আপ।'

'আপনারা যে-রকম গবর্নমেন্ট চেয়ে-
ছিলেন, তাই তো হয়েছে।' এখন আপনারা
সবাই সিনিসায়ারলি—'

'শাট আপ—শাট আপ।' ব্যাট! শয়তান;

ধর্মকথা শোনাতে এসেছে প্যাঁচে
পড়ে।

তারপর চলল গালাগালি। ও'র স্ত্রীর
অঁচিরে বৈধব্য ঘটবে—এই কথাগুলো
জানানো হতে লাগল বেশ পরিষ্কার স্থূল
ভাষায়। দু-একটি অকথাও শোনা যাচ্ছিল
ফাঁকে ফাঁকে। সেন আর চ্যাটার্জীও বাদ
যাচ্ছিলেন না।

আসলে অনেক দিনের জ্বালা।
মজুমদারের ওপর রাগ থাকতে পারে,
থাকই স্বাভাবিক। ঘেরাও করতেও
কিছুমাত্র বাধা নেই। কিন্তু এইসব কুৎসিত
গালাগাল? আলো-পাখা সব বন্ধ করে দিয়ে
নিগ্রহ? এ-ও কি ঘেরাওয়ের নীতি? তা
হলে ঘেরাওয়ের দরকার কী—টেনে এনে
প্রচণ্ড প্রহার করলেই তো চুকে যায়।

প্রবীর দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে।
ঘেরাও হোক, কিন্তু এইটে ঠিক পছন্দ হয়
না তার। বামপন্থী রাজনীতির পদ্ধতিটা
কী? নীতি, না নৃশংসতা? সমর্যাবশেষে
নীতিও নিশ্চয় নির্মম হতে পারে, কিন্তু
যে-কোনো উপলক্ষে আন্দোলনকে উদ্দা-
মতায় পেঁছে দিলে—

কে জানে, ঠিক রোখা যায় না। আর
ইউনিয়ন তো প্রবীরদের হাতে নয়, তারা
মাইনিরিটি। তাদের দালাল বলা হয়ে থাকে।

তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন
থেকে যায়। কথা ছিল, যুক্তফ্রন্টের আমলে
আমবা প্রমাণ করব, আগের দিন আর নেই
—এখন দেশ আমাদের, দায়িত্ব আমাদের
হাতে। আমাদের সরকারকে সব দিক থেকে

দুর্নীতিমুক্ত করার আমরা—কাজ করব,
পরিগ্রহ করব, প্রশাসনের পথ মসৃণ করে
তুলব। তবু কেন আমরা কাজে চিলে দিই,
কামাই করি, মজুমদার সাহেবদের হাতে
সম্মোহন এনে দিই, আমরাই বিরোধী পক্ষের
হাতিয়ার হয়ে উঠি?

পাশে এসে দাঁড়ালো মৃদুল প্রামাণিক।
'চলো ব্যানার্জি—কী হবে দাঁড়িয়ে
থেকে? এদের রেভোলিউশ্যনের দৌড় তো
দেখছে।'

প্রবীর আশ্চর্য হল। মৃদুল এই
পক্ষেরই একজন উৎসাহী। সৈনিক বলে
এতদিন ধারণা ছিল তার।

'তুমি হঠাৎ—'

মৃদুল বললে, 'কিস্‌সদা হলে না।
আর্য্যাম, ডিজইলিউশ্যন ড। নকশাবাড়ীর
লাল আগুন ছাড়া কোনো পথ নেই, কোনো
পথই নেই। এ এক-আধটা মজুমদারকে
টচার করে কী হবে—ঝাড়ে-মূলে সব
জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। চলো, আমার
সঙ্গে—'

'কোথায় যেতে হবে?'

'চলোই না।'

প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে চলল।
একদিক থেকে নিষ্কৃতি। পেছনের ওই
প্রবল চিৎকার তার খুব ভালো লাগছিল না।
—অতত আজকের মানসিকতায় তো নয়ই।
কারিডোরে দুটি ছেলে কথা কইতে
কইতে যাচ্ছিল। 'আমাদের যুক্তফ্রন্ট—'

মৃদুল প্রামাণিক সংক্ষেপে বললে, 'এ
সেয়ারস জেস্ট!'

—ক্রমশ

ঢাকার চিঠি

৯ বারো ৯

আমার গতবারের চিঠিতে লিখেছিলাম যে, জনাব নূরুল আমিন তার "নয়া লাস্দ্" পি, ডি, পিকে বাজারে ছাড়ার আগে আরও কয়েকটি অভিনব আবিষ্কারে পাকিস্তানীদের চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়ে-ছিল। যেমন, প্রথমে "এন-ডি-এফ", তারপর "পি-ডি-এম", তারপর "ডাক"। সম্প্রতি সে যে জিনিসটি বানাতে ব্যস্ত তার নাম "ইসলামপসন্দ্ পাটি"। নামটা পড়ে ঘাবড়ে যাবেন না যেন, কেন না ঠিক এমনটি না হলে আমরা পাকিস্তানীরা কিছু অবাক হয়ে যেতাম! নূরুল আমিন বেঁচে থাকতে নয়া নয়া পাটি গিজিয়ে উঠবে না, গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা ইত্যাদি শ্লোগানে কানে তাল লাগবে না, এমন কখনো হয় নাকি? কাজেই "পি-ডি-পি"র লাস্দ্ যদি কড়াই থেকে নামাতে না নামাতেই বাস হয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে "ইসলামপসন্দ্"র আমদানী হবে না কেন? একশ' বার হবে! অততপক্ষে আমিন সাহাব যতদিন বেঁচে আছেন, ততদিন তো নিশ্চয়ই! তাই গত মাসের চত্বিশ তারিখ লাহোরে "জামাতে ইসলাম", "মরকজাই জামাতে-উল-ইসলাম", "জামাইতে আহলে হাদিস", এই তিন বাঘা ইসলামী দলের সাথে হাত মিলিয়ে জনাব আমিনের পি-ডি-পি "ইসলাম-পসন্দ্" নামক নবতম লাস্দ্টির মশলা পিষে এল। আশা করছি, আর কিছু-দিনের মধ্যেই তিনি এটা আমাদের পাতে পরিবেশন করবেন! আমিন সাহাবের ডক্তবন্দ অবশ্য এই লাস্দ্ তৈরির ব্যাপারে পি-ডি-পির সক্রিয় ভূমিকাকে চেপে যেতে চাইছে, কিন্তু কড়াই থেকে মাঝে মধ্যে যে খশব্দ বার হচ্ছে তা' নাকে টেনে আমরা দিবা বন্ধুতে পারছি এটা কোন উড়ের তৈরি। কাজেই, আমিন সাহাব, রাঁধতে বসে লজ্জা কেন?

বাহাদুরে নূরুল আমিন এবং তার ইয়ার বঙ্গীরা অর্থাৎ ফরিদ আমেদ, নূরুল্লা, মামুদ আলী, নওয়ারজাদা নছরুল্লা (সম্প্রতি নবাবপুঞ্জ ও নূরুল সাহাবের মধ্যে সতীনের কোন্দল চলছে, তবে আমরা

আশা করছি যে, খুব শিগ্গিরই এই কোন্দল থেমে যাবে এবং দু'জনে এক সাথে গোসল করে এক সানকীতে ছালন-ভাত খাবে) প্রভৃতি স্বনামধন্য লীডাররা কয়েকটি স্বার্থরক্ষার জন্য বার বার দল নিয়ে ভাঙা-গড়া খেলেছে। তাদের এই নোংরা অতীতের সামান্যতম পরিচয় পেলেই পি-ডি-পি এবং ইসলামপসন্দ্ সৃষ্টির রহস্যটা আগনারা পরিষ্কার বন্ধুতে পারবেন। কাজেই এই চিঠিতে নূরুল সাহাবদের অতীত-কীর্তির কথাই লেখা হোল।

পাকিস্তানের প্রথম জগ্গীশাসক আয়ুব খাঁ যখন পিণ্ডির-শাহীত্বতে চড়ে বসল, তখন তার ধারণা হয়েছিল যে, তামাম পূর্ব-পশ্চিমের অধিবাসীই বুদ্ধি ভয়ে ভয়ে গর্তে ঢকে গেছে। কিন্তু তাকে এই আশ্চর্য্য বোধদিন পেতে না দিয়ে বেদুচিস্থান আর গ্রামবাংলার যত্ন-তর আগুন জ্বলে উঠল। খাঁ বাহাদুর তার মার্কিনী দাদাদের নকল করে বেদুচিস্থানে বোমা ফেলে গাঁ এর পর গাঁ নিশ্চয় করে দিল আর পূর্ব-বাংলার জন্য পাঠাল তার তোয়াজের খাসী, পাঞ্জাবী সৈন্যদের। কিন্তু গুলীবাদ, লাঠি, টিয়ার গ্যাস ইত্যাদিতেও যখন কোনও কাজ হোল না তখন সে এক নয়া চাল দিল, সামরিক শাসনের অবসান ঘোষিত হোল পাকিস্তানে। ভাবখানা এই যে, দুনিয়াদী গণতন্ত্রের মাধ্যমে স্বপ্নব্দগের শৃঙ্খলনা হোল দেশে। প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসনের সব কিছুই বহাল তবিয়তে রইল, কেবল নামটা বদলে গেল। তবে সাধারণ মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ঐক্যবন্ধ গণ-আন্দোলনের শক্তি যে কোনও সৈবরা-চারী বা জগ্গী শাসনযন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি এবং আয়ুবের জালিম সরকারের জলদ্রমবাজীর মোকাবিলা করার জন্য এই হোল একমাত্র নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

জনাব নূরুল আমিন ও তার সাথো-পাঞ্জরা উনিশশ' আটাল থেকে বাঘটি, এই চার বছর সুবোধ বাণকের মত নিরাপদ দূরে বসে আত্মরক্ষা করছিল আর দিম গুণছিল কবে আবার নোড়ুন করে মদ্রুদ্বী সাজতে পারবে। সামরিক

শাসনের অবসান ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আমরা অর্থাৎ হতভাগ্য এবং অপদার্থ ছাত্র সম্প্রদায়, যারা আয়ুবের ঢাকা সফরকে বানচাল করে দিয়েছিলাম এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তনী উৎসবে তাকে ঠল, জ্বতা ও কালো পতাকা উপহার দিয়ে-ছিলাম, তারা সকালে উঠে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাটি পড়েই চমকে উঠলাম, কেন না আমিন সাহাব, হামিদুল হকচৌধুরী প্রভৃতি নয় নেতা (মতান্তরে পাকিস্তানী আওয়ামগণের নয়-দুশমন) এক "নতুন যুক্তফ্রন্ট গঠন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন"। খুব স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের মনে এই নয়া যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে সন্দেহের উদ্বেক হোল। পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকার ও দলের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল নূরুল আমিন নিজেই। আজ যে আঞ্চলিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে পি-ডি-পি'র জনসভায় তাকে গরম, গরম বুলি ছাড়তে শোনা যায়, সেই আঞ্চলিক বৈষম্যের সুত্রপাত হয়েছিল তারই আমলে। তারই যোগসাজসে গোলাম মুহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রভৃতি পশ্চিমা শয়তান শোষণের জাল পেতেছিল বাংলাদেশ জুড়ে। আর উনিশশ' বাহান্ন সালের সেই আগুনকরা দিনে, যে দিনের স্মৃতি পাকিস্তানের মেহনতী আওয়ামের রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য ছাত্রের বৃকের রক্ত ঝরাবার জন্য মৃত্যু দায়ী ছিল এই নূরুল আমিন। যখন মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশ ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী ছুড়ছিল ঠিক সেই সময়ে ঘটনাস্থল থেকে সামান্য দূরে বিধানসভায় আমিন সাহাব তার মিনিষ্টারী চালে লম্বা লেকচার ঝাড়তে ব্যস্ত। বিরোধীপক্ষের সদস্যরা তাকে ব্যাপারটা জানালে নেহাৎ নির্লিপ্তের মত সে উত্তর দিয়েছিল যে, এই বিষয়ে তার কিছুই করার নেই! উনিশশ' চুয়াত্ত থেকে বাঘটি, এই দীর্ঘ আট বছর নূরুল আমিন বা তার পূর্ববঙ্গীয় শিষ্য-পোষ্য-বর্গের কোনও পাস্তাই ছিল না। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ যদিও বা ভাঙা মাজমের উপর টিম্‌টিম করে জ্বলা চেঁরাগের মত কোনও মতে টিকেছিল, পূর্ব পাকিস্তানে তার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সুতরাং আমিন সাহাব এই কটা বছর দেশসেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে মনের দুঃখে হারেম, গোসলখানা আর তাসেব আড্ডা ইত্যাদি "নেহাৎ বিরক্তিকর, অসাধু সংসর্গ" সময় কাটাচ্ছিল। অতঃপর বাঘটিতে ঢাকার ছাত্র সম্প্রদায় এবং মেহনতী শ্রমিক, কৃষক যখন মাথার উপরে উদাত খজায়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে জগ্গীশাহীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল এবং আয়ুব খাঁ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ভড়কে গিয়ে মার্শাল ল' তুলে নিল তখন নির্ধিরাম নরুল তার দলবল সহ "হামলোগ আভীতক জিন্দা হ্যায়" হুঙ্কার দিয়ে মাঠে নেমে পড়ল। তাদের ধারণা ছিল এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহী জনসাধারণ তাদের মদত দেবে এবং লাঁড়ার বানিয়ে মাথায় তুলে নাচবে। কিন্তু বিপ্লবী নরুল বিপ্লব করার আগেই সরাসরি হাজতে চালান হয়ে যেতে বসেছিল, কারণ ধরমধর আয়ুব খাঁ পাকিস্তানে তার একনায়কত্ব কয়েম করার জন্য এক মোক্ষম অর্ডিন্যান্স রেড়ে রাজনৈতিক কাজকর্ম সংকুচিত করে রেখেছিল। এই অর্ডিন্যান্সের ভাষা অনুযায়ী, নয়া যুক্তফ্রন্ট গঠন করার বিবৃতি দিয়ে নরুল আমিন আইনভঙ্গের অপরাধে অপরাধী এবং তার কারাদণ্ড একরকম নিশ্চিত। কার্যত হয়ত তাই হোত। কিন্তু শহীদ সূরাবদী ঠিক সময় মত আবির্ভূত হয়ে নরুল-বাহিনীকে রক্ষা করল। এই কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, শহীদ সূরাবদী একজন আদর্শ বুজ্জোয়া রাজনীতিবিদ ছিল। বুজ্জোয়া রাজনীতির আঁস্তাকুড় ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহের দক্ষতার

স্বয়ং জিন্না সাহাবও তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি এবং তখনও বসেও যার ভয়ে আয়ুব খাঁ নিশ্চিন্ত হতে পারাছিল না সে এই একমেবাবান্ধবীয় সূরাবদী সাহাব। যাই হোক সূরাবদী নরুল আমিন প্রভৃতির নতুন দল গঠন করার অসুবিধাটা ভাল-ভাবে বুঝিয়ে দিল, বুঝিয়ে দিল যে, গোঁয়াতুর্গি না করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যাওয়াই উচিত, কেন না সবরে মেওয়া ফলে। সূচতুর সূরাবদী বন্ধুতে পেরেছিল যে, আয়ুব খাঁ নিজেই নিজের ফাঁদে ধরা পড়বে। খাঁ বাহাদুর যখন বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করেছে, তখন নিশ্চয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ও কাজকর্ম তাকে অচিরেই স্বীকার করে নিতে হবে এবং সবচেয়ে মজার কথা, যে রাজনৈতিক দলদলির বিরুদ্ধে সে লম্বা চণ্ডা ভাষণ ও বিবৃতি দিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদেরই কোনও একটিকে তার আগ্রহ করতে হবে, নতুবা বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনে তার পক্ষে দালালি করবে কে? এরপর আর রাজনৈতিক কাজকর্ম-বিরোধী অর্ডিন্যান্সটি প্রত্যাহার করা ছাড়া অন্য

কোনও উপায় আয়ুবের সামনে থাকবে না। তবে যতদিন তা' না হচ্ছে ততদিন সামলে চলাই প্রেরণ। সূরাবদী তাই উপদেশ দিল যে, সরাসরি দল গঠন না করে বর্তমানে একটা সাধারণ রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করা যাক। যুক্তফ্রন্টের পরিবর্তে হোক "জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট" বা "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট", সংক্ষেপে "এন-ডি-এফ"। ঊনিশশ' চৌষটি সালের চৌঠা অক্টোবর করাচীর এক জমকালো হোটেল সূরাবদী এন-ডি-এফের সূত্রপাত করল এবং এই প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিল যে, "পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও রাজনৈতিক স্বৈর্য বজায় রাখার জন্য এবং আওয়ামের স্বার্থে যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্যাবহারের জন্য জনগণের মনের মত একটা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন, এন-ডি-এফ এই আদর্শ গণতন্ত্র কয়েম করার দায়িত্ব নিল।"

এন-ডি-এফ চালু হোল বটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট কর্মসূচী, লক্ষ্য ও আভ্যন্তরীণ ঐক্য না থাকার দরুন শরুতেই তার কাজকর্মে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। আরও একটা অসুবিধার কারণ অসুস্থতার জন্য সূরাবদীর বিদেশ যাত্রা। সূত্রাং এন-ডি-এফকে দেখে কে? নিরুপায় নরুল আমিন মোলানা ভাসানীর স্বেচ্ছা হোল এবং এই ব্যাপারে ভাসানীকে হাত করার উপায় স্বরূপ বর্তমানের অন্যতম পি-ডি-পি ওয়াল্লা এবং তখনকার ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মামুদ আলীকে দলে টেনে নিল। ভাসানীর কাছে নরুলের সাহায্য চাওয়ার কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমত, যদিও তখন আয়ুবের অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কোনও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের পক্ষে কাজকর্ম শরু করা বেআইনী ও দণ্ডনীয় ছিল তা' হলেও একমাত্র ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই কর্মী সদস্য এবং সমর্থকের সংখ্যানুসারে প্রেক্ষিত দাবি করতে পারত এবং তখন এই দলকেই সবাই প্রগতিশীল মনে করত। সত্যি কথা বলতে আমরাও কমিউনিজমের শিক্ষানুযায়ী প্রগতিশীল দল হিসাবে ন্যাপকে (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) মদত দিতাম এবং মোলানা ভাসানীর কৃষক ও শ্রমিক ফ্রন্টের কাজকর্মে সক্রিয় ভূমিকা নিতাম। বলা বাহুল্য যে, সূরাবদীর পরিবর্তে ভাসানীকে গুরু বানিয়ে নরুল আমিন যথেষ্ট চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিল। ন্যাপ এবং তার নেতা ভাসানীকে হাত করার মানেই হোল গোটা পূর্ব বাঙলাকে পাশে পাওয়া। কাজেই ভাসানীকে সামনে খাড়া করে নরুল আমিন নানারকম রাজনৈতিক ভৌলিকবাজী দেখিয়ে একই সঙ্গে আয়ুব

উগাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উগাসক সম্প্রদায়

বহুকাল পরে সদ্য প্রকাশিত হইল!

ভারতবর্ষীয় উগাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অধ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭। মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সান্তাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯

উগাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উগাসক-সম্প্রদায়

সাপ্তাহিক বসুমতী

আর. আওয়ামকে অব্যাক করে দেওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। কিন্তু তার এই সাধে বাদ সাধলো মোলানা সাহাব স্বয়ং। আজকের নয়া শোধানবাদী মোলানা ভাসানীর সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সোদন কিন্তু তাঁকে তাঁর মতামতের জন্য আমরা আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলাম। কেন না সোদন তাঁর মাথায় আজকের মত ইসলামের ভূত এত বেশি লাফালফি করত না এবং তাঁর কথাবার্তা বা কাজের মধ্যে কোনও সুবিধাবাদ বা দলীয় স্বার্থের গন্ধ ছিল না। মোলানা ভাসানী এন-ডি-এফ-এ যোগ দিয়ে আরব-বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে নূরুল আমিনকে স্পষ্টাঙ্গপাতি তাঁর যে শতটি জানিয়ে দিলেন, তা হোল এই যে ন্যাপকে পুনর্গঠন না করলেও ন্যাপের লক্ষ্য ও কর্মসূচীকে এন-ডি-এফ-এর লক্ষ্য ও কর্মসূচী হিসাবে মেনে নিতে হবে। নূরুল আমিন এবং এন-ডি-এফ-এর অন্যান্য কর্মী ব্যক্তিদের পক্ষে ভাসানীর ঐ শত মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কারণ আওয়ামের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের দৃষ্টে সূখে লড়াই করার মনোভাব নিয়ে আমিনের দল রাজনীতিতে নামে নি, নেমেছে বজ্রতা ও বিবর্তি দিয়ে খবরের কাগজে ছবি ওঠাবার জন্যে, সহজ, সরল মানুষগুলোর সামনে বড় বড় বাক্য কপটে লীভার বনার জন্যে এবং বাঁ হাতের খেল দেখিয়ে পকেট ভরার জন্যে। নূরুলের আরও একটা অসুবিধা হোল আওয়ামী লীগকে নিয়ে। আওয়ামী লীগ ও তার চোঙধারী শেখ মুজিবুর আজকের মত সোদনও পুরোপুরি একটি অভিনব বাঙালী হিটলার ছিল এবং ন্যাপের মত আওয়ামী লীগকেও এন-ডি-এফ-এ ঢোকাতে গিয়ে নূরুল সাহাব একটা বিস্তী ফ্যাসাদে পড়ল, কেন না ন্যাপের জন্ম হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সাপ-নেউলের লড়াই বাধিয়ে দিল। ঐ লড়াই আজও চলেছে এবং যতদিন না আমরা অন্যান্য প্রতিরক্ষাশীল মোদ্রা পার্টি, শোধানবাদী এবং নয়া শোধানবাদীদের সাথে আওয়ামী-দের উচিত শিক্ষা দিচ্ছি, ততদিন এই রেষারেষি চলেবেই। আমাদের সঙ্গে আওয়ামীদের শত্রুতার কারণ আমরা মূলত ভাসানীর ন্যাপ থেকেই উদ্ভূত। কিন্তু আওয়ামীদের আমরা এই কথাটা মনে করিয়ে দিতে চাই যে, আমরা ভাসানীর ন্যাপ অপেক্ষা অনেক-অনেক বেশি মারাত্মক এবং যাবতীয় বুদ্ধোন্নত কর্মসূচী ও লক্ষ্য পিছনে ফেলে রেখে আমরা মেহনতী মানুষের পাশাপাশি জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে ছুটে চলছি। তোমরা আওয়ামীরা এমনিতেই মরবে।

কাজেই দুটো দিন যদি বেশি বেশি বেঁচে চাও তা' হলে সাধ করে মাথাটা বাঁড়িয়ে দিও না। যাই হোক, নূরুলের ধারণা ছিল যে, তার এন-ডি-এফ-এ প্যাবস্তানের সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি মাথা মড়ায়ে ঢুকবে এবং কালক্রমে ভাসানী ইত্যাদ নেতাদের সরিয়ে দিয়ে সে একা মধ্যদানের সূর্যের মত পাক-রাজনীতিতে জ্বল জ্বল করবে। কিন্তু একদিন ভাসানীর অনমনীয় মনোভাব, অপরদিকে আওয়ামী লীগ বনাম ন্যাপের রেষারেষি, এই উভয় সংকটের মাঝখানে পড়ে তার প্রায় শিশু ফৌকার অবস্থা হয়ে এল। এই অবস্থায় নূরুল আমিনকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মামুদ আলী। একদিন এই মামুদ আলীর জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লাঞ্ছিত মানুষের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমর্থন ছিল। যে ঘোরতর বিপদ মাথায় নিয়ে মামুদ আলী প্রথমে "ইসলাম লীগ" ও পরে "গণতন্ত্রী দল" গঠন করেছিল তা পাকিস্তানের বৈপ্লবিক ইতিহাসের এক অমর অধ্যায় এবং তার সেইদিনের সেই অমূল্য অবদান আমরা আজও বিস্মৃত হই নি। কিন্তু একই সঙ্গে এই কথাও বলব যে, মামুদ একটি আদর্শ বুদ্ধোন্নত রাজনীতি-ব্যবসায়ী। আগে না থাকলেও পরে সে ঠিক এইরকমই হয়েছে। বুদ্ধোন্নত বা পার্টি বুদ্ধোন্নত হলেই যে জনগণের সাথে হাত মিলিয়ে কাজ করা যায় না তা নয়। জন্ম একটা দুর্ঘটনা মাত্র। চেয়ার-ম্যান মাও ঠিকই বলেছেন যে, কোনও মানুষকে তার জন্ম বা প্রেণী দিয়ে বিচার করলে চলবে না, তাকে বিচার করতে হবে তার চিন্তা দিয়ে, চেতনা দিয়ে এবং তার কাজ দিয়ে। মামুদ আলীর ক্ষেত্রেও এই কথাগুলি খাটে। বুদ্ধোন্নত স্বভাবজাত অ্যাডভেঞ্চারিজমের পিছনে ধাওয়া করে সে

ন্যাপ পর্যন্ত এগিয়েছিল, কিন্তু তারপরেই শরতান নূরুলের হাতে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে তার চেতনা ফিরে এল। সে বুদ্ধল, "তাই তো কেন বৃথা মেঠো রাজনীতি করি, আরও বড় নেতা বনার অনেক সহজ পথ তো পড়েই আছে এবং সে পথে সেখোর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।" এই মামুদ আলীকে পটিয়ে নূরুল আমিন তেবটি সালের শেষাংশে ভাসানীকে প্রায় হাত করে ফেলল। মামুদ ভাসানীকে প্রতিশ্রুতি দিল যে, এন-ডি-এফ-এর প্রকৃত ক্ষমতা তাঁকেই দেওয়া হবে এবং তার পরিবর্তে তিনি ধীরে ধীরে বিভিন্ন দল ও এন-ডি-এফ-এর সমন্বয়ে "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি" তৈরি করবেন। আমাদের বরাত খুব ভালই ছিল বলতে হবে, কেন না ভাসানী সাহাব নূরুলের ফাঁদে পা বাড়াতে গিয়েও পিছন হটে এলেন। এন-ডি-এফ-এর কর্মসূচীর মধ্যে তিনি তাঁর ইচ্ছার কোনও প্রতিফলনই দেখতে পেলেন না। দ্বিতীয়ত শেখ মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দীন ইত্যাদি আওয়ামীওয়ালারা ইতিমধ্যে নূরুলকে তাদের নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে বড় কথা, এন-ডি-এফ-এর মধ্যে সাদা, কালো, লাল, নীল কোনও দলই বাদ ছিল না। চার পাশের নালা-নদমার নোংরা জল কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এটা একটা আন্তর্জাতিক এঁদো ডোবা হয়ে পড়েছিল। মোলানা ভাসানী সরে আসার নূরুলের বড় আশায় ছাই পড়ল ঠিকই, কিন্তু পুনরায় বর্ষপের ভরসায় সে ও তার একান্ত বিস্মৃত অনুচররা সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, কর্মমাক্ত ডোবায় গা ডবিয়ে ভেঁক-কীতন চালিয়ে যেতে লাগল।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরাসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| (১) মনের মত বো | (৪) প্রেমের বিচিত্র গতি |
| (২) মস্কা বনাম পিঁড়িচের | (৫) রক্তের টান |
| (৩) প্রেমের পথ ঘোরালো | (৬) মথুরা তারা কথা বলবে |

মুদ্রা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট প্রিন্টিং ॥ কলিকাতা-১২

‘যুক্তফ্রন্ট তত্ত্ব’ প্রসঙ্গে

২রা জুলাই-এর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত প্রবন্ধ আকারে একটি প্রতিবাদ পড়লাম, যা আমার ৩০শে এপ্রিলের একটি পত্রের জবাবে লেখা হয়েছে। এই প্রবন্ধের জবাব হিসাবে আমি এই চিঠি লিখছি না। কেন না, সেভাবে বাদানুবাদ চলেছে, তাতে প্রতিবাদের সঙ্গে যে লেখার প্রতিবাদ, সেই লেখাটা মিলিয়ে না দেখলে পাঠকের পক্ষে বোঝা মুশকিল, কতটা উল্লিখিত পয়েন্টের জবাব হয়েছে, কতটা উল্লিখিত পয়েন্টের বাইরে অন্য পয়েন্ট তুলে আকর্ষণ করা হয়েছে। অথচ প্রতিবাদের পাশে লেখাটা থাকে না। আর দুই-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধানও এত বেশি যে, অধিকাংশের পক্ষে পয়েন্টগুলো মনে রাখাও সম্ভব নয়। বর্তমান প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পড়ে আমার মনে হল, আমার পত্রের মূল বক্তব্যটা প্রতিবাদকারকরা ধরতে পারেন নি। আমি বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি-বিশ্লেষণ করি নি, আমি সংক্ষেপে পয়েন্ট আকারে তুলে ধরেছিলাম যুক্তফ্রন্টের চারটি সম্বন্ধে ডিমিউনিষ্টের বক্তব্যের দুটো দিক—একটা কমিউনিষ্ট ও সোঃ ডেমোক্রেসিস যুক্তফ্রন্টের বাস্তব ভিত্তি রচনা করার কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, আর একটা সোঃ ডেমোক্রেসিস মধ্যে ভাগ হওয়ার প্রকৃত অর্থ। কমিউনিষ্ট পার্টির দায়িত্ব পালন করার সময় কোন ভুলটি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, সে সম্বন্ধে ডিমিউনিষ্টের হুঁশিয়ারীর দিকে আমি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলাম। আমি উক্ত পত্রে প্রথমেই বলেছিলাম যে, বিশদ জবাব প্রবন্ধে ছাড়া দেওয়া সম্ভব নয়, সংক্ষেপে কতকগুলো কথা জানাচ্ছি। বর্তমান প্রতিবাদ-প্রবন্ধে আমার এই সংক্ষিপ্ত পয়েন্ট আকারের ধক্তব্যে বিশদ ব্যাখ্যার অনুপস্থিতির দুর্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমার রাজনীতি সম্বন্ধে কতকগুলো বিশেষণ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে।

প্রসঙ্গত, কঃ পার্টির leading role আর under the leadership of Com. Party—দুটো একার্থবোধক নয়। Leading role-এর অর্থ একটু ব্যাপক, প্রধান ভূমিকার অর্থ। Under the leadership of C. P. আরও সূনির্দিষ্ট অর্থ, যেটা একটা বিশেষ প্রতিনিধি-বিন্যাসের স্তরে এসে পড়ে। কঃ পার্টি একটাই হওয়া ইতিহাসসম্মত। কিন্তু তাই বলে কোনো অবস্থায় কোথাও কমিউনিষ্ট আন্দোলনে ভাগ হয়ে গেলেই কোনো একটা বিশেষ পার্টি-কে কঃ পার্টি বলা হবে, আর অন্যটিকে অ-কমিউনিষ্ট বলা হবে—এটা ইতিহাসসম্মত নয়।

যাই হোক, এই পত্র আলোচনার জন্য নয়। নিকট ভবিষ্যতে একটা প্রবন্ধে যুক্তফ্রন্ট সংক্রান্ত উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।



বলা বাহুল্য, সে প্রবন্ধ আমি লিখব আলোচনারই জন্য, বাদানুবাদের জন্য নয়।

—ভূষার চট্টোপাধ্যায়

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

‘সমাজবিরোধীদের কবলে’ শীর্ষক আপনার সুচিন্তিত সম্পাদকীয়টি (৯ই জুলাই) পড়লাম। সমাজবিরোধী দমনে প্রশাসন কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার যে চিত্র বর্তমান সম্পাদকীয়র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে, তা অত্যন্ত সময়োচিত সন্দেহ নেই। এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একস্থানে আপনি লিখেছেন,.....“যুক্তফ্রন্টের আমলে সংবাদপত্রগুলি একযোগে আরম্ভের চীৎকার সুরু (?) করেছিল সমাজবিরোধীদের দৌরাণ্ডে ও স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর নিষ্ক্রিয়তায় পশ্চিমবঙ্গ গেল, গেল, গেলোয় গেল। এখন ঐ সব সংবাদপত্র নীরব ও নিশ্চিন্ত।”..... যে-কোন শূদ্ভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি আপনার এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হবেন। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যুক্তফ্রন্টের আমলে যে-সব সংবাদপত্র (সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলিকে এ থেকে বাদ দেওয়া যায় কি?) সমাজবিরোধীদের দৌরাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গে ‘গেল গেল’ রব তুলেছিল, তাদের দলে কি ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ও যোগ দেয় নি? এ-ব্যাপারে কৃতিবাস ওঝার অনেক কীর্তি-কাহিনী কয়েক মাস পূর্বের ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র যে-কোন সংখ্যা খুললেই কি দেখতে পাওয়া যাবে না? তা ছাড়া, ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’র ২রা এপ্রিলের সেই সম্পাদকীয়ের (‘রাষ্ট্রপতির শাসন দীর্ঘস্থায়ী হোক’) কথা দেশবাসী এত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারেন না। সুতরাং আপনার মত্থে সংবাদপত্রের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা বোমানান লাগে। যা হোক, এতদ্ সত্ত্বেও আপনার বর্তমান (জনমতের চাপে পরিবর্তিত) ‘লাইন অফ্‌ অ্যাকশন’ এবং “সমাজবিরোধীদের কবলে” শীর্ষক ৯ই জুলাইয়ের সম্পাদকীয়র জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

—অজিতকুমার দাস

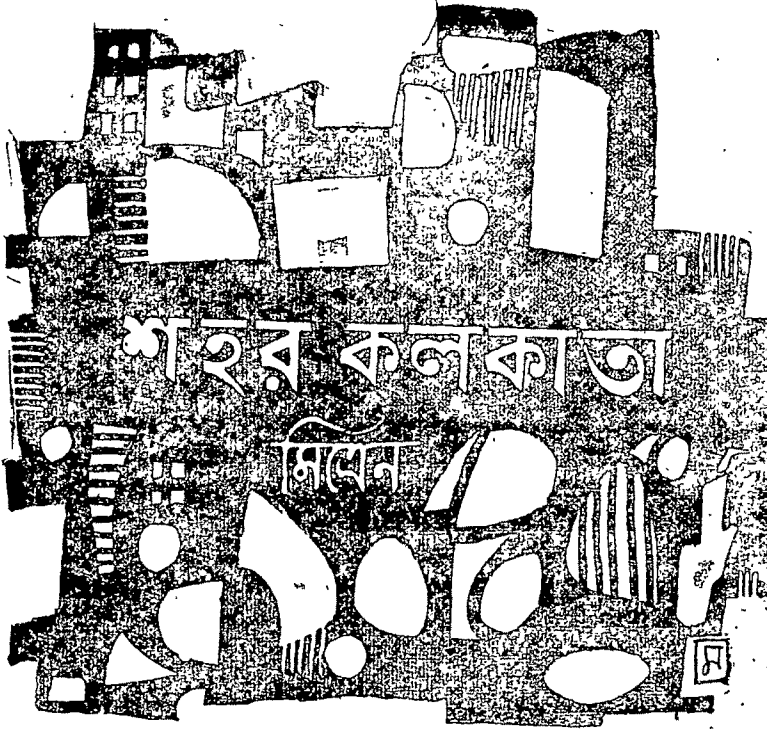
৮।২।১৩, লালবিহারী বোস লেন,

হাওড়া—৬।

বঙ্গদর্শন

[২০৫ পৃষ্ঠার পর]

এবং হাওড়া-শিয়াখালা এই লাইন দুটি বোঝায়। এ ছাড়াও বিহারে অবস্থিত আরা-সাসারাম লাইট রেল, ফতুয়া-ইসলামপুর লাইট রেল এবং উত্তরপ্রদেশের সাহদরা-সাহারানপুর লাইট রেল একই পরিচালন ব্যবস্থায় একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত। এই রেলপথগুলির যাত্রীসামগ্রণ এবং কর্মচারিবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরে এগুলির জাতীয়করণ দাবি করে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত রেলপথ দুটি হুগলী ও হাওড়ার বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে হাওড়া ও কলকাতার যোগাযোগ রক্ষায় জীবন-রেখার মতই কাজ করেছে। হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের সামগ্রী এই রেলপথগুলির মারফত প্রত্যহ যাতায়াত-আসা করছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ রেলপথগুলির উন্নতিসাধনে উদাসীন। মাশ্বাতার আমলের রেলপথ, প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্প গাড়ি, সমরানুবর্তিতার অভাব, সব কিছু মিলিয়ে মার্টিন রেল যেন এক চরম অব্যবস্থার নিদর্শন। কর্তৃপক্ষের নীতি সুস্পষ্টভাবেই অ্যান্টি-পিপল, অ্যান্টি-প্যাসেঞ্জার। যতদিন এই রেলপথ দুটি লাভের কাড়ি যুগিয়েছে মালিক-পক্ষ তাতে ভান্ডার বোকাই করেছেন, কিন্তু রেলপথগুলির উন্নতির কোন ব্যবস্থা করেন নি। সত্য বলতে কি, লাভের কাড়ির হিসাব গুণতে গুণতে কর্তৃপক্ষ সমস্ত রেলপথকেই জীর্ণ-দশায় উপস্থিত করেছেন, আর আজ হুমকি দিচ্ছেন লোকসানের অজুহাতে রেলপথগুলি বন্ধ করে দেবার। এভাবে কর্তৃপক্ষ শূদ্ধ জনসাধারণের স্বার্থের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করছেন না, মার্টিন রেলের চার হাজার কর্মচারীকেও আতঙ্কিত করে তুলেছেন। এই রেলপথগুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীন্য ও ক্ষমার অযোগ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি বহু পূর্বেই আরও বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত ছিল। রেল কর্তৃপক্ষকে মুনামা লোটোর অব্যবহৃত সুযোগ তাঁরা দিয়েছেন এবং সেই সঙ্গে রেলপথগুলিকে জীর্ণ থেকে জীর্ণতর হতে দেখেও তাঁদের কর্তব্যবোধ জাগে নি। জনসাধারণের কাছে যা অপরিহার্য তা রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই রেলপথগুলি মোটেই অলাভজনক নয়। বরং প্রয়োজনীয় পুঁজির ব্যবস্থা করলে এবং ব্যক্তিগত মুনামা শিকারীদের কৃষ্ণি থেকে বের করে নিলে এই রেলপথগুলি জনসাধারণ এবং সরকারের কাছে যথার্থই লাভজনক হয়ে উঠবে। আমরা এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।



বিকিকিনি

দেশী নাম ধারণা কলম। অবশ্য
এ নামে কেউ তার উল্লেখ করে না।
হকারবাহিত দিশী কলমের এ নামটাই
কিন্তু বাস্তবিক সার্থক। কালি একে-
বারে পাগলা ঝোরার মতো সাদা
কাগজের বুক ভাসিয়ে দেয়। অপটু
খুদী-হাতে যেমন রঙ, এ কলম হাতে
নিলে তেমন লেখকের পরিচয় আর
গোপন থাকে না। এর মধ্যে আবার
অধিকাংশের কালিই বিপথগামিনী।
নিবের মুখে না-ঝরে ধারাস্রোতে চুপসে
দেয় তজ্জনী, মধ্যমা আর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের
অগ্রভাগ। কোনোটা আবার ক্রোড়ের
টুটবেল শয্যাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই
পূরুরো গনিবের বিরহে শূন্যে কাঠ
হয়ে থাকে। নির্বাক, বোবাক নির্বাক।
স্নাত ঝাঁকানিতেও রা' কাড়ে না। তাদের
অসহযোগই সব চেয়ে অসহ।
বিরহিণীর বেনারসিপতে কোনোও
উত্তেজিত মূহুর্তে আছড়ে ভাঙতে হয়
এদের হাড়গোড়। এ যেন সেই বিদ্রো-
হিনী রাজপুতানী। নবাব হারমে জান
দেবে, তবু শাহেন শা-এর হাতে মান
খোয়াবে না। মানিনীর ত্যাদড়গি
ভাঙতে না পেরে শেষে অবসন্ন আমি
এমন কয়েকটিকে একটা চটা-ওঠা কাগা-
ভাঙা ফ্লওয়ার ভাসে চিরদিনের জন্য
চালান করে দিয়েছি। পরিত্যক্তরা
ভাস-কারাগারে শূন্যে মরছে।
বে-হিসেব এমন কতই সেখানে জমা
হয়েছে। নিজেদের মধ্যে মাথা ঠোকা-

ঠুক করে মরছে। তবু আমার হাতে
বাজেনি কেউ।

জানি, সন্তার তিন অবস্থা। দেশী
মাল বেগড়বাই করেই। তবু পথে-
ঘাটে ধারণা কলম দেখলে না-থেকেও
পারি না। দুঃখের বিষয় মনের
মতোটি জুটছে না। ফলত কলম
ডিসপেনসারিয়ার ভোগান্তি তিরিফি
মানসিকতার সৃষ্টি করেছে। ক্রমেই
রোগটা ক্রমিক দাঁড়াচ্ছে। নতুন কলমের
লোভ সামলাতেও পারি না, আবার
যথার্থ হজমও হয় না। না ভোগে যায়,
না ওগরায়।

সেদিন শিয়ালদার মোড়ে সাক্ষাৎ
এক ধ্বংসাত্মক সপ্তে দৈবাৎ মোলা-
কাৎ হয়ে গেল। হোয়াট-নট ফুটপাথে
স্যাণ্ডাইচড অবস্থা। তবু লোকটা
নজর আকর্ষণ করল। ফুটপাথ থেকে
সরে এঁটো সিমেন্টের চাতালে বোকান
পেতেছে। আধা অন্ধকারে কাঁচের
বাক্স কোলের গোড়ায় নিয়ে
নিরুত্তেজভাবে বসে আছে।
খরন্দার আকর্ষণে আদৌ কোনো
ব্যস্ততা নেই।

এই ব্যতিক্রমটুকুই আকর্ষণ করল
আমায়। সামনের জলচৌকিতে বসে
পড়ে বললাম : একটা কলম দিতে
পারেন!

মধ্যবয়স্ক লোকটা আমাকে ভালো
করে নিরীক্ষণ করল। দৃঢ়চোখে
অবিশ্বাসী দৃষ্টি। সম্ভবত এমন
সিরিয়াস, ঘাচক ক্রেতা সে ইতিপূর্বে
অবলোকন করে নি। বললে : একটা

কেন, একশটা দিতে পারি, যদি শেষ
পর্যন্ত নেন!

মেজাজটা এমনই বিগড়েছিল,
এবার সেটা বিটকেল হয়ে উঠছে।
ভেঁটি কেটেই বললাম যেন : কেন
শেষ পর্যন্ত কেউ আর নেন না বুদ্ধি?

: অনেকেই নাড়েন, ঘষেন, হাত
বোলান। ব্যস, তার পর আর কেড়ে
কাশেন না। এ পাশের দোকানগুলো,
বড় বাতির আলোয় যেখানে জলসাঘর
বসেছে, মাছির মতো সবাই এখানে
গিয়ে জালে ধরা পড়েন।...লোকটা তার
ময়লা দাঁত বার করে হাসল : যত
চেকনাই, তত চোরাই। নয়ত পেন
বেচে এমন পরিপাটি এসটাবলিশমেন্ট
চলে নাকি মশায়?

লোকটাকে সূতরাং বিশ্বাসযোগ্য
মনে না করার আর কোনও হেতু রইল
না। বাস্তবিক হক কথা বলেছে। শূন্য
পেন বেচেই লটারী বিক্রেতার মতো
লপচপানি চলছে কি করে, ব্যাপারটা
যদি পুরো ভাঙতাবাজিই না হয়।
লোকটা মনের কথা টের পায় হয়ত।
সোৎসাহে পুনশ্চ শূন্য করল : বিজলী
বাতির তলায় টয়লেট—টং-টং মেয়েমানুষ
দেখে অনেকেই পকেটের রেশত
নামিয়ে আসেন; কিন্তু কাছে গিয়ে
মোড়ক খুলুন। ভান্ডারতীর খেল,
বিলকুল ফল। ঝুলঝুলে, জবজবে,
ল্যাটপ্যাটে এ্যাকোটা লাস।...

তাড়াতাড়ি তার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে
বললাম : কলম আমার চাই। তবে ঠিক
মনের মতোটি।

: তাই বলুন! তা আপনার বাসনাটি
নিবেদন করুন।

টোক গিলে বললাম : মানে, দামে
সস্তা।

কর গোণার মূদ্রা সাজিয়ে লোকটা
আপন মনে আবৃত্তি করল : দামে
সস্তা।

: হুঁ! আর বেশ মোটামোটা, যাতে
একবার ফিল করলে এক দিস্তে অক্ষয়
সাজানো যায়।

: মোটামোটা। দিস্তে-পারানি।

: তার মানে?

: না। মানে, যে কলম দিস্তে পার
করতে পারে।...লোকটা কড়ে আঙুলের
তিন নম্বর দাগে বড়ো আঙুল সঙ্গে
সিরিয়াসভাবেই উত্তর দিল।

আমারও তখন কেমন একটা নেশা
ধরে গেছে। সোৎসাহে বললাম : ঠিক
তাই। আর কোনো টিউব-ফিউব চলবে
না।

: মাথা খারাপ, দিচ্ছে কে!...
লোকটা তার সাঁড়াশির মতো আঙুলে
আলতো করে একটা পেটমোটা বুল-
কাঠের মতো কলম টেনে বার করল।

পাণ্ডাহিক বসুমতী

ফললে : দেখুন তো এর মেদ, ফাঁপ, ওসার পছন্দসই কি না।

: পেগা গেলো। স্নাঙুলে কালি না...

: বিগলণ! খন্দের কাশলে রোগ টের পাই মশায়। কিসসু ভাববেন না। আপান ঠিক জল্পগায় এসেছেন। সন্তুষ্ট করাই আমার মতো। ওতেই বাণিজ্য বাড়ি। খন্দের স্বয়ং রম্মের মতো। এক থেকে বহু হয়। সেই যে বলে না, অহম্ বহুভ, তেমনি আর কি। আপান খুশ হলে পাঁচজনকে বলবেন। তাঁরা আসবেন। ডাক্তার, ঔকিল, প্রাইভেট টিউটর সব বিজ্ঞানসই এককরম মশায়।

অসহ্য! কী করে যে এতোক্ষণ লোকটাকে সহ্য করছি। মেলা বাজে বকে। বেশ বিরক্তির সঙ্গে বললাম : পাশের দোকানগুলোর তুলনায় আপনার বাড়-বাড়ন্ত দেখে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম বটে। এখন যদি একটু ভাড়াভাড়া করেন। বেশ গড় গড় করে লেখা যাবে তো?

: তাই কি যায়?

: তার মানে?

লোকটা আকর্ণ হেসে বললে : সন্তানগণ্ডার জিনিস, ফেলে ছাড়িয়ে ব্যবহার করবেন, তবেই না দেশে ব্যবসাপ্রতি চলবে, সারকুলেশন অব মানি ছাড়বে। জাতীয় আয়...

এতো বড় একটা থাম্পড এতোটা বয়সে আর কখনো হজম করেছি বলে মনে হয় না। সন্তান শরীরটা যেন জ্বলে উঠলো। আমি পশ্চাৎপ্রদর্শনের জন্য কাৎ হলাম।

লোকটা বললে : কী স্যার, চললেন মাকি? আগেই বলেছিলাম, শেষ পদস্ৰুত নেড়ে আর নাড়া দিয়েই সরে পড়বেন।

অন্তুত দুঃসাহস। অবশ্য বিক্রেতারাই আজকাল বিদ্রূপ করার মালিক। ক্রেতাকুল ছোকরাকে ছড়চোর মতো যত্ন বিক্রেতার বিদ্রূপ হজম করে ফেরে। তবে এ লোক কিছু স্রতগ্ন। আঘাত করলেও রসের ছুরিতে কাটে। জ্বালায় তবে তাড়ায় না।

তবু উগ্মা দেখলাম এবং সরে পড়ার লক্ষণটুকু চেপে গিয়ে তেরিয়া হয়ে বললাম : সরে পড়া বলতে কী মিন করছেন আপান, ফলত্ব কথা বলা দেখছি আপনার বদভ্যাস।

লোকটা অন্তুত ধীরকণ্ঠে বললে : চটবেন না স্যার, চটবেন না। ছেলেমানুষ এখনো, জানেন না চটা মানেই ঠকা। ঔকিলে সাক্ষী চটিয়ে কেস জেতে, ন্যবসাদারে স্পন্দে চটিয়ে ঝুটো মাল বেচে।

রাস্তাবিক লোকটা আমার বাপের বয়সী। আর কথাবার্তায় শুধু রাসিক নয়, সাধারণ জ্ঞানের পরিচয় আছে। সাধারণ দোকানী হিসেবে তার ব্যবহারের ওজন নিতে যাওয়া ভুল। আমি কেমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নট নড়ন-চড়ন দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম : আপানই তো উঠো গাইছেন এখন। বললাম, কালি ঠিকমত সরে চাই।

লোকটা হাসল : সরবে বঁক। সরালেই সরবে।

: কেমন করে সরাব?

: ঠিক ঠিক ব্যবহার করে। ঘড়ি, রেডিও, ঘরের বৌ আর কলম, সব এই ব্যবহারেই টেকে।

: তাহলে পদ্ধতিটাই বাংলা দিন।

: আগেই বাংলাব ?

: না, এই টাকা নিন। কলমটা নিলাম।

লোকটা নির্বিকারভাবে টাকা গুণে চেজ ফেরত দিয়ে বললে : বেশ এইবার লক্ষ্য করুন। এই যে দেখছেন নিবের আগায় জিব এটাকে নিবের ঠিক পয়েন্টে বাসিয়ে নিন। তারপব যথার্থ দাগে দাগে গলাটা ধড়ের সঙ্গে ফিট করুন। সাবধান। একটি প্যাঁচও যেন বেরাপ্পা না পড়ে। চেপে প্যাঁচ দিয়েছেন কি অজান্তে পচা, শিরা ছিঁড়ে কালি লিক করার পথ খুলে দেবে। রুইলেন না, এগুলো ঠিক শরীরের টিসুর মতো, বেশি দলেই আলগা, বিবর্তিকিছরি ব্যাপার।

আমি ততক্ষণে গলদঘর্ম। এবারে মানে মানে পথে নামতে পারলে হয়।

আদরসাতুর দোকানীর শাস্তায় অনেকক্ষণ হল।

লোকটা ভালো করে কলম গুণে সেটাকে রাড়িয়ে ধরল। বললে : এরকম সার্ভিস আর কোথাও পাবেন না স্যার। এইবার কাগজের ব্লকে সোনার কার্টিস্ট ছোঁয়াবেন। শক্তভূসম সাদা কাগজের ব্লকে মা কালী যেন দাঁপিযে দাঁপিযে হাসবেন।

কলমটি রাড়ি আনার পর মা কালী সত্যই হেসেছেন এবং দাঁপিযে দাঁপিযেই হেসেছেন। ভোলা মহেশ্বরের সর্বাঙ্গ সেই একই নিয়মে কালিকাবরণে অর্থাৎ কালিকরণে ছেয়ে গেছে। তবু লোকটার কাছে আর ফিরে যাই নি। বুকেছি, রূপারার কাছে ফিরে যাওয়া বৃথা। শহুরে ব্যবসার বাক্যবাগিতায় সে স্বেচ্ছা বীরত্ব দেখিয়েছে। আগ্রাণ করেছে। একটি দেশী কলম বেচবার জন্য মূখের লাল শূকিয়ে ফেলেছে। এর বেশি বিজ্ঞানস দেওয়ার উপায় তারও নেই। সে বরং বেশের ইন্ডাস্ট্রী চালু রেখেছে, মানি সারকুলেশনে অংশ নিয়েছে, জাতীয় আয় বাড়িয়েছে। হয়ত একদিন বৈঠকখানা বাজারে মর নিয়ে ফলাও বিলেনস করবে। তবে যে কলিকারির ওপর তাকে গুদাম বানাতে হবে, সেই জুয়াচুরির জালে সে নিজেকে একটা অসহায় পদটিমাছের মতো আটক পড়েছে মাত্র। তার কাছে ফিরে গিয়ে লাভ নেই। বরং ভাবতে ভালো লাগছে, আমার নিত্যকার লোকসানের ওপর নবভারতে কত লোকের নসীব ফিরে যাচ্ছে। উঠছে শহরজোড়া ইমারত। আমি বাস্তবিকই মহান। আমার সহনশীল কাঁধে এ মহাবেশের বাণিজ্যলক্ষ্মী তাঁর ভারী পদবৃগল চাপিয়ে রেখেছেন। আমি বহন করছি অস্বাভাবিক। দেশে ইন্ডাস্ট্রী হচ্ছে, জাতীয় আয় বাড়ছে, মাথাপিছু নয়, জনসংখ্যা দিয়ে আয়ের অঙ্ক ভাগ করে রেসিও কবে।

আমার এই নির্বাবাদ খরিশদারির মধ্যে এবং স্বদেশী দ্রব্য ক্রয়ের মহত্বের মধ্যে শুধু একফোঁটা গো-চোনা সয়সে ধরে রেখেছি অবশেষে। অর্থাৎ এক গোছা ব্যায়ামমুগ্ধ ইন্ডিয়ান মেড পেনের মধ্যে আমি ইদানীং একটি চোরাই চীনা পেন রাখতে গিয়েছি। এটা অবশ্য ওপেন মার্কেটেই কেনা।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়
সিনেমা উপভোগ করুন

ট ১০ খবর ইলেকট্রিক-৪ ফুট x ৩ ফুট
পরিমাণ আপনার প্রিয় চিত্রতারকার
আপনার থেকে নড়াচড়া এবং রোমাঞ্চ
কমিকগুলিতে হৃদয়ভাবে নাচে, গুড়াই
করতে, কাটুনি ঠিক আসল সিনেমার মত
দেখান এবং উপভোগ করুন। সকল মেলায়
এক প্রদর্শনীতে দেখাইয়া বিপুল অর্থ
উপার্জন করুন অথবা গৃহে বন্ধুবান্ধব
ও পরিবারবর্গকে আমন্ত্রণ দিন। সুপার
শোশাল প্রোজেক্টর যুক্ত।

১০০ ফুট ফিল্ম স্ট্রীম এক ফিল্ম
ভালিফা নং বিনামূল্যে। (ডাক মাওল
৩ প্যাকি ৬০০ টাকা স্বত্বাধীন) ১০০ ফুট ফিল্ম
১০০ টাকা। ১০০ ফুট ফিল্ম অর্থাৎ অর্ডার দিন।

American Cinema Supplies
Kalyanpur, Delhi-26

অনির্ভর্য কাম দমথনাথ সেনগুপ্ত

[প্ৰবাসবৃত্ত]

(৯)

অমূল্যকুমার বিশ্বাস কলকাতার একজন ইঞ্জিনীয়ার, একাদিন এলেন শান্তিনিকেতনে ছেলেকে নিয়ে। ইচ্ছে ছেলেকে পাঠভবনে ভর্তি করবেন, কলকাতায় নাকি লেখাপড়া কিছু হচ্ছে না। জীবনে অনেক ইঞ্জিনারার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই রকম একজন প্রাতিভাশালী ও দক্ষ ব্যক্তি বড়ো একটা চোখে পড়ে নি। শান্তিনিকেতনে তখন ভয়ানক জলকষ্ট, মে মাসের প্রথম দিকেই কুরোর জল খুবই কমে যায়, বিশ্বভারতীর সব বিভাগে তখন গ্রীষ্মাবকাশের ঘোষণা করে ছেলেমেয়েদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হয়। 'টিউবওয়েল' তৈরি করে জলাভাবের কষ্ট লাঘব করার জন্য দু'একবার চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি; মাটির অনেক নিচে পাইপ নানিয়েও পর্যাপ্ত জলের সন্ধান পাওয়া যায় নি। শনেছি খুব নামজাদা এক সাহেব কোম্পানী গুরুদেবকে ভরসা দিয়েছিলেন যে, তাঁদের উন্নততর যন্ত্রপাতির সাহায্যে গভীর নলকূপ খনন করে জলের সমস্যার নিশ্চিত সমাধান করে দেবেন, অন্যথায় তাঁরা এক পয়সাও নেবেন না। পাইপ কয়েকশো ফুট নিচে যাবার পর 'কাটার' (Cutter) এসে ঠেকলো কঠিন অভেদ্য এক পাথরের স্তরে, আর এগোনো হলো

না তাঁদের। সেই অবস্থায় কিছু পাইপ ও সাজ-সরঞ্জাম ফেলে রেখে কোম্পানী তাঁর নামের মর্যাদা রক্ষা করতে বিফল হয়ে ঐ কাজ পরিত্যাগ করলেন। অমূল্যবাবু এই বিবরণ শুনে বললেন, এখানে জলের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, কারণ তাঁর পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞরা একটা ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন বলে মনে হয় না। শান্তিনিকেতনের জমি অনেকটা কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু, আশে-পাশে বোলপুর, সদুল, গোয়ালপাড়া। এসব জায়গা থেকে শান্তিনিকেতন বেশ খানিকটা উঁচু। তাই মনে হয় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাটির নিচের জলবাহী স্তর তার স্বাভাবিক অবস্থিতি থেকে সরে গেছে। এক্ষেত্রে মনে হয় অনেক উপরে উঠে এসেছে। উত্তরায়ণে রথিবাবুর কাছে রক্ষিত শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরিক ভূস্তরের সমীক্ষা (Subsoil Survey) রিপোর্ট দেখে অমূল্যবাবু হঠাৎ খুব উদ্দীপ্ত হয়ে রথিবাবুকে বললেন—ইউরেকা, ৬০।৬৫ ফুট নিচেই এখানে জল পাওয়া যাবে, তার পরিষ্কার চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি। সাতদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে সরঞ্জাম এনে কাজ শুরু করব, দশ-পনের দিনের মধ্যেই আপনারা প্রচুর জল পাবেন। পর পর কয়েকবার বিফলতায় আস্থা হারিয়েছেন, তাই রথিবাবু ও'র দিকে তাকিয়ে একটু

অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। সেটা লক্ষ্য করে অমূল্যবাবু বললেন—বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই হাসছেন, আবার কয়েকদিন পরে সাফল্যের হাসি হাসবেন, তারপরে অবিশ্বাস করেছেন বলে আরো একবার হাসতে হবে। এসেছিলাম ছেলে ভর্তি করাতে, এখন দেখছি নিজেকেই এখানে কাজে ভর্তি করে নিতে হবে। অমূল্যবাবু তাঁর কথা রেখেছিলেন, ১৫ দিনের মধ্যেই মাত্র ৬৪ ফুট নিচে তিনি জলের উৎস খুঁজে বের করলেন, পাম্পের টানে প্রবল ধারায় পাইপ বেয়ে জল এসে ট্যাঙ্ক ভর্তি করে ফেললো। উপস্থিত সবারই মুখে আনন্দের হাসি, শান্তিনিকেতনে জলাভাব এবার বন্ধি ঘুচলো। রথিবাবু তো অমূল্যবাবুকে জড়িয়ে ধরে সেই জলধারার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তাঁর চোখের ভাষায় প্রকাশ পেল একটা পরম পরিভূষিত। অমূল্যবাবু গুরুদেবপন্থীর একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে থেকেই এই কাজ পরিচালনা করেছেন। বাড়ির গেটে একটা কাঠের ফলকে বড়ো বড়ো অক্ষরে তাঁর নাম লেখা ছিল "A. K. Biswas". কয়েকদিন পরে তাঁর চোখে পড়লো ঐ ফলকের গায়ে তাঁর নামের পরেই খাঁড়ি দিয়ে কাঁচা হাতের বাংলায় লেখা একটি শব্দ "করিও না", সবটা একত্রে পড়লে দাঁড়ায় "A. K. Biswas করিও না"। (এ কে বিশ্বাস করিও না) লেখাটা দেখে তিনি মহা খুশি, শান্তিনিকেতনের

শাণ্ঠাহিক বসুমতী

কোনো ছাত্রের রসজ্ঞান দেখে, যদিও লেখাতার অর্থ তাঁর অখ্যাতিরই পরিচায়ক। এই গল্প তিনি এখানে প্রায় সকলের কাছেই করেছেন, এমন কি গুরুদেবের কাছেও। গুরুদেব ও'কে বর্ণেছিলেন—রসের অমৃতটুকুই তুমি গ্রহণ করলে, এতে তোমার রসবোধ ও উদারতাই প্রকাশ পেলো। বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখেছি রসিকতা নিজের সম্বন্ধে হলে অনেকেই তা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেন না।

কথটা খুবই সত্য। শান্তিনিকেতনের কর্মসম্মেলনীতে একজন ছিলেন, তিনি প্রায় সবাইকে নিয়েই ব্যক্তিগত রসিকতা করতেন, কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কেউ কিছু রসিকতা করলেই বেশ গম্ভীর হয়ে যেতেন। কালীমোহন ঘোষ মহাশয় ছিলেন বিশ্বভারতী গ্রীষ্মকেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন ও লোকশিক্ষা সংস্থার অধিকর্তা। তিনি ছিলেন উদার চরিত্রের, অমায়িক ও আদর্শবাদী। খুব নির্বিরোধী মানুষ, তাই ও'কে নিয়ে ঐ ভদ্রলোক অনেক রসিকতা করেছেন। একদিন কালীমোহনবাবু ঐ ভদ্রলোককে নিয়ে কি একটা রসিকতা করায় তিনি খুব অসন্তুষ্ট হন। এর পর কালীমোহনবাবুকে দ্বন্দ্ব করার জন্য তিনি ও'কে নিয়ে একটা নিচুস্তরের রসিকতার আশ্রয় গ্রহণ করলেন গ্রামোন্নয়নের কাজে, সাঁওতালদের যাতে চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হয়, তার জন্য কালীমোহনবাবু তাদের অনেক উপদেশ দিতেন; ওরা যাতে মদ না খায় সেজন্য মদের কুফল সম্বন্ধে ওদের নাকি তিনি সবদা সজাগ রাখতেন। একদিন এক বৃদ্ধ সাঁওতাল নাকি কালীমোহনবাবুর উপদেশ ও আবেদন শ্রুনে বলেছিল—“তুই তো আমাদের খালি বলিস মদ রে! না, তাদের গুরুদেব যে গান শুনিয়েছে ‘মদের শান্তিনিকেতন’ (অর্থঃ হোমের শান্তিনিকেতন)।” শ্রুনেছি রসিকতা ধরেই কালীমোহনবাবু ব্যাপারটা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন ও গুরুদেবের নাম নিয়ে এ ধরনের মনোবৃত্তিকে কর্মসম্মেলনীর অনেকেই নিন্দা করেন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল—বাংলাদেশের একটা বিশেষ জেলার লোকদের রসিকতাবোধ সম্বন্ধে বিশেষ অখ্যাতি আছে। মাঝে মাঝে তাঁরা রসিকতা যে না করেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের নিয়ে কেউ রসিকতা করলে আর রক্ষা নেই! অবান্তর কোনো প্রশ্নও তাঁরা বদদাস্ত করেন না—যেমন, কাঁধে গামছা নিয়ে ভেল মেখে পুকুরের দিকে যাচ্ছেন কেউ, তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় “স্নানে যাচ্ছেন নাকি?” সঙ্গে সঙ্গে জবাব আসে “দেহ না (দেহ না) কই যাই।” বাজার থেকে ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কেউ,

তাঁকে যদি জিজ্ঞেস করেন “ইলিশ মাছ কিনলেন বুঝি?” সঙ্গে সঙ্গেই জবাব “না, পট্টামাছ।” বাঙালদের নিয়ে রসিকতা পশ্চিমবঙ্গে তখনকার দিনে খুব প্রচলিত। ‘পরশুরামের’ লেখা চিকৎসা-সম্বন্ধে কিছুদিন আগে বের হয়েছে, কবিবরাজ ‘ভারিণী স্যানের’ কথাবার্তা তখন অনেকেরই মুখে মুখে, ‘খুল্লনের উকিল যন্তিবাবুর চেনো’, ‘বমি অয়?’ ‘না’, ‘অয়, Zান্টি পার না’, ইত্যাদি। শৈলজারঞ্জন দত্তমজুমদার ছিলেন তখন শান্তিনিকেতনে রসায়নের অধ্যাপক, এদিকে গান-বাজনায় খুব দক্ষ ছিলেন বলে সঙ্গীতভবনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভদ্রলোক ভারি রসিক। একদিন কয়েকজন মাঠে বসে নানা গল্প-গুজব করছি, কথায় কথায় পূর্ববঙ্গের ভাষা নিয়ে কেউ কেউ রসিকতা করলেন। শৈলজাবাবু বললেন—এক বাঙালীর কলকাতায় ৭।৮ বছর থেকে কলকাতার ভাষা কত করার ফলে কী অবস্থা হয়েছিল সেই কথা শুনুন। “চন্দ্র-প্রকাশ দত্ত কলকাতায় থেকে কণ্ঠাষ্টরী করতেন, একদিন তাঁর বাল্যবন্ধু অসীম চন্দ্র দেশ থেকে এলেন তাঁর বাড়িতে। বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা—অসীমবাবু এসেই চন্দ্রপ্রকাশবাবুকে বললেন, “এই যে চন্দ্রপ্রকাশ, এখন কত খাঁ (এই যে চন্দ্রপ্রকাশ, এখন করছ কি)।” চন্দ্রপ্রকাশ বললেন—“খন্টাকটরী খরিছি, এখনও লাইসেন্সাস্ য়ইতে ফারি নাই (কণ্ঠাষ্টরী করছি, এখনও লাইসেন্সিয়েট (Licentiate) হতে পারি নি)।” অসীম বললেন—“তোমার খথাবার্তা বেশ সাফা সাফা বোধ আছে (তোমার কথাবার্তা বেশ পরিষ্কার বলে মনে হচ্ছে)।” চন্দ্রপ্রকাশ বললেন, “তা হবে না, আজ আট বছর খলখাতায় রইলুম খাশী, খাণ্ডী, মথুরা, ফশ্চিমবঙ্গের এই সব শহরে থাখতে থাখতে আমার খথাবার্তা এখেবারে খলখাতিয়া দরনের অয়ে গেছে। আমার যাইন ফরিবার আমার খথা বুঝতে তারও রীতিমতো খণ্ট অয় (তা হবে না, আজ আট বছর কলকাতায় রইলুম, কাশী, কাণ্ডী, মথুরা, পশ্চিমবঙ্গের এইসব শহরে থাকতে থাকতে আমার কথাবার্তা একেবারে কলকাতার ধরনের হয়ে গেছে। আমার যিনি পরিবার, আমার কথা বুঝতে তারও রীতিমতো কণ্ট হয়।)

আরো একটা গল্প শৈলজাবাবু বললেন—স্কুলের একজন শিক্ষক ছেলেদের একটা কবিতা পাড়িয়ে বঝাচ্ছেন—“খবি বলেছ্যান, আন্দারে ফথ চন্দ্ৰ ক্যাম্বায়, আমি খইলাম আন্দার তো আর নাই, আতে আমার হৃদয় রইছুন (কবি বলেছেন, আঁধারে পথ চলব কী করে, আমি বললাম আঁধার তো আর নেই, হাতে

আমার প্রদীপ রয়েছে।” শৈলজাবাবুকে হঠাৎ একজন প্রশ্ন করলেন তিনি নিজে বাঙালি দেশের ময়মনসিংহ জেলার লোক হয়ে এই রসিকতা করলেন—তিনি বললেন যে, শব্দরব্যাড়র দেশ সম্বন্ধে রাসিকতা করা শাস্ত্রে বিধান আছে, এতে কোনো দোষ হয় না। এভাবে অনেকেই অনেক রাসিকতা করলেন, সময় বেশ কাটাছিল। তারপর সবাই মিলে ধরলেন ঐ ‘বিশেষ জেলার’ লোকের সম্বন্ধে কিছু বলতে, ঐ অঞ্চলের ভাষায় নাকি আমার কিছু দখল আছে। রাজী হলাম, তবে একটা শর্ত—ঐ জেলায় বাড়ি এক বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, পাশেই বসেছিলেন—তিনি যদি অভয় দেন যে, রসিকতা শ্রুনে তিনি মারধোর করবেন না, তা হলেই বলতে পারি। তাঁর অভয় পেয়ে শব্দরব্যাড়র জেলায়—ঐ জেলার বৌশর ভাগ সঙ্গীত-পন্ন পরিবারের কর্তাব্যস্তিরা বাইরে বাইরেই কাজকর্ম করেন, পরিবারের আর সবাই থাকেন গ্রামে-বাড়িতে। এঁদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই দুর্গাপূজো হয়, তাই বছরে অন্তত একবার সবাই গ্রামে পদার্পণ করতেন, পূজোর যাবতীয় জিনিসপত্র মায় বলির পাঠাটি পর্যন্ত কিনে নৌকো বোঝাই করে। পাঠার স্বভাব হলো চাঁচানো, তারপর নৌকায় বেঁধে আনা অবস্থায় জল দেখে সেই জীবগর্গল তার-স্বরে চাঁচাতে শব্দ করতো। ছেলেমেয়েরা পূজোর আগে বাবা বাড়ি আসছেন খবর পেয়ে খালের ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো কখন তাদের বাবা আসেন। দূর থেকে নৌকার মধ্যে পাঠার চাঁৎকার শ্রুনেই তারা দৌড়ে গিয়ে তাদের মাঝে খবর দিত, “মা, বাবা আসছেন।” কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ‘বিশেষ জেলার’ বন্ধুটি তাঁর হাতের জুদন্ত সিগারেট বিদ্যুৎবেগে আমার বুকের উপর চেপে ধরে গর্জন করে উঠলেন, “আমরা সব পাড়া (পাঠা), এবার পাড়ার গুতা সামলাও।” উপস্থিত সবাই ওর ব্যবহারে বিমূঢ় হয়ে রইলেন, অভয় দিয়ে তারপর এরূপ ব্যবহার তাঁর কাছে কেউ প্রত্যাশা করে নি। বন্ধুর দৃষ্টিতে হয়েছেন এমন কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না, বললেন, “মারধোর করা তো দূরের কথা, গায়ে হাতও দিই নি, শব্দরব্যাড়র সিগারেটটা দূর থেকে চেপে ধরেছি, কথার খেলাপ তো করি নি।” সিগারেটের পোড়া ঘা শুকোতে প্রায় ২০।২৫ দিন লেগেছিল, কিন্তু তার দাগটা আজ ৩৫ বছরেও মিলিয়ে যায় নি। অরসিকে রস নিবেদন করতে গেলে অপঘাত ঘটা অসম্ভব নয়!

এই ‘বিশেষ’ জেলার লোকের সঙ্গে কাইজারের আমলের জার্মানীর কিছু লোকের শ্রুনেছি অনেক মিল আছে। তাঁরা রসিকতা করেন না, কেউ করলে তা বড়ো

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

একটা সহ্যও করেন না। একটা গল্প শুনোছি—প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্ত ঘোষণা করার পর ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রেই জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে করমর্দন করেন, কেউ কেউ পরস্পরকে আলিঙ্গনও করেন। আলিঙ্গন-বন্ধ অবস্থায় একজন ইংরেজ সৈনিক জার্মান সৈনিককে কি একটা রসিকতা করতেই আর যায়

কোথা, সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সৈনিক তাকে 'বেয়নেট' দিয়ে ফটো করে দিল। বরাত ভালো যে, আমার সহকর্মীর হাতে কোনো মারাত্মক অস্ত্র ছিল না, তাহলে হয়তো সৈন্যদলই ভবলীলা সাংগে হোত। উইল-হেলম কাইজার নাকি এর ব্যতিক্রম। শোনা যায়, মাঝে মাঝে দু'-একটি রসিকতা তিনি করতেন। তাঁর একটা প্রিয় রসিকতা ছিল

—জার্মানীর এক বিত্তশালী অভিজাত পরিবারের কর্তা তাঁর বয়স্ক ছেলেকে ডেকে বললেন যে, পরিণত বয়স না হওয়া পর্যন্ত সে যেন মদ্যপান শুরুর না করে, কখন কিভাবে মদ খাওয়া আরম্ভ করতে হবে সে বিষয়ে তিনিই তাকে দীক্ষা দেবেন। ছেলে পিতৃ আজ্ঞা শিরোধর্ম করে বিদায় নিল। কিছুদিন পর বিকেলে



আপনার চুল যে বকসাই থেকে তার যত্ন নিতে পারে কে?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যে রকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্মে- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার স্বরংগে, মেথের মত উদ্দাম, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্মে- এতে আছে অ্যালার্টিয়েন যা আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, কিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, চুলে এনে দেয় উজ্জল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

স্বাভাবিক চুলের জন্মে- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় হৃদয় পরিপাটি থাকে, প্রতিটি চুলে থাকে রেশমের মধুর বাঁহা

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী



লিনটাস-SS. 11-140 BG

হিন্দুস্থান লিটারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

বাপ ছেলেকে ডেকে নিয়ে বাগানে গিয়ে বসলেন। দু'জনে দু'খানা চেয়ারে মন্থা-মন্থা বসলেন, মাঝে একটা টোবলের উপর মদের বোতল ও ছোটো ছোটো দু'টি প্লাস। বাপ দুটো প্লাসে কিছু মদ ঢেলে ছেলের হাতে একটা তুলে দিয়ে আরেকটা নিলেন নিজেকে। বললেন, “এবার খেতে শুরু কর, প্রথমে অল্প পরিমাণ দিয়ে আরম্ভ করতে হয়, পরে ধীরে ধীরে মাত্রা বাড়তে পার, একবারে বেশ খেলে কিন্তু মাতাল হয়ে পড়বে।” এইভাবে বাপ-ব্যাটাৰ কিছুক্ষণ মদ্যপান করার পর ছেলে হঠাৎ বলে উঠলো, “Father, how do I know I am drunk (বাবা, কী করে বুঝব আমি মাতাল হয়েছি)। বাপ সামনে আগলি দেখিয়ে বললেন, “Yonder you see a couple of trees, when you see they are quadrupled you know you are drunk (ঐ যে দু'টি গাছ দেখতে পাচ্ছ, যখন দেখবে ওদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, তখনই বুঝবে তুমি মাতাল হয়েছি)।” ছেলে নির্বিকার চিন্তে বললো, “Father I see only one (বাবা, আমি তো মাত্র একটা গাছ দেখছি)।” আরো একটা রসিকতা কাইজারের নাকি খুব প্রিয় ছিল—জাৰ্মানীর একজন সৈন্যাধিনায়ক যখন ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত হয়ে সেনানী-মণ্ডলীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন, তাঁর ইচ্ছে হলো তাঁর পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস পরিদর্শন করবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকে এবিষয়ে জানালে তাঁরা এই মাননীয় অতিথিকে যথাযোগ্য সম্বৰ্ধনা করার ব্যবস্থা করলেন। এই ফিল্ড মার্শালের একটা মদ্যদোষ ছিল, কিছু একটা দেখলেই বলতেন, “The same old.” এমন কি বাপ, মা, ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা হলেও বলতেন, “The same old father, The same old mother, the same old brothers and sisters ইত্যাদি।” নির্ধাৰিত সময়ে ফিল্ড মার্শাল এলেন য়ুনিভার্সিটি পরিদর্শনে, যা-কিছ, দেখেন পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়, আর বলেন, “The same old lecture theatre, The same old library, The same old laboratory. তারপর এলেন ছাত্রাবাসে, এসেই বললেন, “The same old hostel, The same old block where I put up.” ধীরে ধীরে একটি ঘরের কাছে গিয়ে ঘরের নম্বর দেখেই মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, “The same old Room No. 13.” দবজা বন্ধ, একটু নক্ করলেন, দু'-এক মিনিট পরে দরজা খুলে গেল, ভিতরে একটি যুবক। ফিল্ড মার্শাল য়ুনিভার্সিটি

কৰ্তৃপক্ষকে নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে চেয়ার-টোবল দেখিয়ে বললেন, “The same old chair, The same old table.” তারপর দেয়াল-আলমারীর হাতল ধরে “The same old Admiral” বলে তার পাটটা টেনে খুলেই দু' পা পিছিয়ে এলেন—দেখা গেল আলমারীর মধ্যে জড়-সড় হয়ে বসে আছে একটি সুন্দরী যুবতী মেয়ে। মেয়েটিকে এ অবস্থায় দেখে ফিল্ড মার্শাল আরো একটু পিছিয়ে আসতেই ছেলেটি বলে উঠলো, “My Cousin, Sir!” মৰ্চাক হেসে ফিল্ড-মার্শাল বললেন, “The same old story.” এই ব্যাপার দেখে য়ুনিভার-সিটির রেজ্টার একেবারে অগ্নিমৰ্তি: কঠিন কণ্ঠে ছেলেটিকে বললেন যে, সে জানে ছেলেদের হস্টেলে মেয়েদের নিয়ে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এই নিয়মভঙ্গ করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। জেনে-শুনে সে এই অপরাধ করেছে, তাই তিনি তাকে য়ুনিভার্সিটি থেকে বহিস্কৃত করলেন। শুনাই ফিল্ড মার্শাল বলে উঠলেন, “The same old punishment”.

উচ্চারণ নিয়ে অনেক পরিহাসের কথা শোনা যায়। এক বাঙালি অধ্যাপকের একবার ভারি ইচ্ছে হলো গুরুদেবের লেখা নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। নিজের কথা নিজেকে বলতে সংকোচ, তাই শরণাপন্ন হলেন আর একজনের—যাতে তিনি তাঁর স্বপক্ষে গুরুদেবের কাছে আৰ্জি পেশ করেন। গুরুদেব শুনাই চমকে উঠলেন, তারপর বললেন—ঠিক আছে, তবে ছোটো একটা পাট ওকে দেবার চেষ্টা করব, অবশ্য যদি রিহার্শেলে উৎসে যায়। পাটের শুরু হলো “আকাশে ঘন মেঘ.....”, রিহার্শেলে আরম্ভ হলো, ঐ ভদ্রলোকের ডাক পড়লো, তিনি এসেই বললেন, “আকাশে গন ম্যাগ...”। এটুকু বলতেই গুরুদেব হাত তুলে বললেন, “ওরে থাম থাম, ওসব ম্যাগট্যাগ চলবে না। দাঁড়া, মেঘ শব্দটা বদলে ‘কুয়াশা না হয় করে দিচ্ছি’। এবার বলতো দেখি। ভদ্রলোক এবার সগৰ্ব পদক্ষেপে এগিয়ে এসে বেশ একটু feeling যোগ করে বললেন, “আকাশে গন খোয়াসা”। গুরুদেব প্রায় আতর্নাদ করে উঠলেন, “অচল, অচল”।

শান্তিনিকেতনে ‘বাঙালি সভা’ আয়োজন করেছিলেন কয়েকজন অধ্যাপক ও কর্মী। অনেকে অনেক গল্প বললেন, সব বিবত করা সম্ভব নয়, দু'-একটি নমুনা তুলে দিলাম—

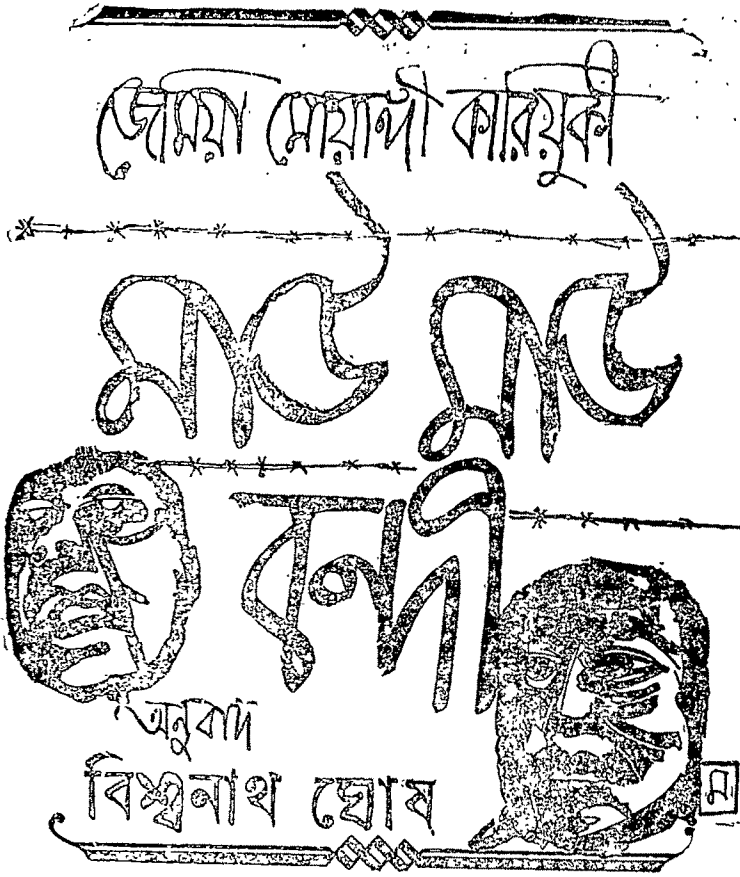
(১) ঢাকায় এক ভদ্রলোক বাজারে গিয়ে এক মাছওয়ালাকে জিজ্ঞেস করেছেন মাছ তাজা কিনা, সঙ্গে সঙ্গে মাছওয়ালার একটা মাছ তাকে তুলে নিয়ে ভদ্রলোকের

কাছে এনে মাছটাকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল, “কঃ, কঃ, বাবুদর সঙ্গে কথা কঃ” (“কঃ, বাবুদর সঙ্গে কথা কঃ”):

(২) ঢাকা স্টেশনের কাছে অনেক ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি থাকে। ট্রেন থেকে যাত্রী নামলেই গাড়োয়ানের দল এক সঙ্গে তাঁকে ঘিরে ধরে বলতে থাকে “আহেন, আহেন মহারাজ, পংখীরাজ গোড়া আমার, উড়াইয়া লইয়া যাইব (আসুন মহারাজ, পক্ষীরাজ ঘোড়া আমার একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে)। একদিন এক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে বললেন, গেন্ডারীয়া যাবেন, এক গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাড়া কত; গাড়োয়ান বললো, “৩।৪ মাইল রাস্তা, আট আনা লাগবে”। ভদ্রলোক বললেন, “দু’ আনা”। সঙ্গে সঙ্গে গাড়োয়ান ছুটে এসে তাঁর মূখ চেপে ধরে বললো, “চপ, চপ, গোড়ায় হনবো চপ, ঘোড়া শুনবে!”), অর্থাৎ এই অসম্ভব প্রস্তাব ঘোড়ার কানে গেলে সে গাড়ি চানতেই রাজী হবে না।

(৩) ঢাকায় এক দশাসই চেহারার ভদ্রলোক ওই গজ কাপড় কিনে এক দর্জির কাছে গিয়ে বললেন, ঐ কাপড় দিয়ে তিনি পাঞ্জাবী তৈরি করতে চান। দর্জি যখন তাঁর গায়ের মাপ নিচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কাপড় দিয়ে দুটো পাঞ্জাবী হয় কি না। দর্জি নির্বিকার চিন্তে বললো, “অয় (হয়)।” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, তিনটা পাঞ্জাবী হয় কিনা। দর্জি অশ্লান বদনে জবাব দিল, “তা বি অয় (তাও হয়)।” ভদ্রলোক মহাখুশি হয়ে তিনটা পাঞ্জাবীর অর্ডার দিয়ে আর কোন তারিখে পাওয়া যাবে তা জেনে নিয়ে চলে গেলেন। নির্ধাৰিত দিনে পাঞ্জাবী আনতে গেলে দর্জি ছোটো ছোটো তিনটা পাঞ্জাবী এনে হাজির করলো, দেখেই তো ভদ্রলোকের চক্ষু স্থির। ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “ইয়ার্কি পেয়েছ, এতো ছোটো পাঞ্জাবী গায়ে লাগবে কী করে?” দর্জি অবিচলিত, বললো, “হোনো মিঞা, গতরটা তো করছ মইবের মতো, কাপড় কিনছ মোটে হারে তিন গজ, ফরমাইস দিলা তিনটা পাঞ্জাবী বানাইবার। আবার কও গায়ে লাগবে কী কইয়া, লজ্জা করে না এই কথা কইতে। যাও, বাড়ি গিয়া দরজার ভিতরে জুলাইয়া রাখ, আইতে যাইতে গায় লাগবে এখন (শোনো বাবু, দেহখানা তো করেছ মোষের মতো, কাপড় কিনেছ মাত্র সাড়ে তিন গজ, আর অর্ডার দিলে তিনটে পাঞ্জাবী তৈরি করার। আবার বলছ গায়ে লাগবে কী করে, লজ্জা করে না এই কথা বলতে। যাও, বাড়ি গিয়ে দরজার ভিতর বুলিয়ে রাখ, আসতে-যেতে গায়ে লাগবে এখন)।

[ক্ৰমশ:]



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

লডওয়ার শিবিরে আমি আমার বন্দী জীবনের সব থেকে ভাল সংগঠন তৈরি করতে পেরেছিলাম। রবিনসন মোয়ানার শিবিরের দলপতি নির্বাচিত হয় এবং জোসেফ কিবরা হয় কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাপতি। প্রত্যেক কন্ডেম্নের থেকে আমরা একজন করে দলপতি নির্বাচন করেছিলাম, তারা সবাই জোসেফের সভাপতিত্বে সমিতির সদস্যরূপে কাজ করতো। এই সমিতিতে আমার কাজ ছিল শিক্ষাদীক্ষা এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে সাহায্য করা। আমাদের অধিবেশন হ'ত সাধারণত সপ্তাহে একবার করে, যদিও বিশেষ প্রয়োজনে যে কোন সময়ই কর্মাধ্যক্ষকে এবং দলপতিকে তলব দিয়ে অসাধারণ অধিবেশনও চালু করা যেত। মাইনা মুহীক আমাদের কর্মাধ্যক্ষের কাজ খুব নির্ভর করে পালন করতো, সে এখন নাইরোবিতে এক আন্তর্জাতিক নির্মাণ সংস্থার সম্পাদক। আমাদের সমস্ত অধিবেশনের লিখিত কার্যবিবরণী রাখা হ'ত এবং লডওয়ার ছেড়ে চলে আসার সময় তাকে নুট করে ফেলা হয়। শিবিরের দলপতি হিসেবে রবিনসন খুব ভাল কাজ করেছিল এবং কেউই কখনো তার কার্যধারার বিরুদ্ধে

কিছু বলে নি। কিয়ামবু, অগুলের জন গিয়াথি রবিনসনের সহায়কের কাজ করতো, সে এখন ইস্ট আফ্রিকান রুমারীর সংস্থায় বেশ ভাল কাজ করে। আমি নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া শেখান এবং নালিশভরা চিঠি ইত্যাদি লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। প্রত্যেক কন্ডেম্নের থেকে একজনকে পাচক হিসেবে কাজ করতে হ'ত এবং এই কাজের কতকগুলি বিশেষ সূবিধাদি থাকার জন্য পাচক পেতে আমাদের কোন অসুবিধাই হ'ত না; অবশ্য আমরা সব সময় একজন যোগ্যতাসম্পন্ন লোককে এই কাজে বহাল করতে চেষ্টা করতাম। আমাদের অর্থাৎ ১৩ নম্বর ঘর থেকে ওয়ামবুগু ওয়াচিরা পাচকের কাজে নিযুক্ত হয়েছিল এবং কোনদিনই সে আমাদের নির্বাচন ক্ষমতাকে সন্দেহ করার অবকাশ দেয় নি।

লডওয়ার বন্দিশিবিরে কেনিয়া সরকারের সমাজ উন্নয়ন সচিবালয় একটি পুস্তকাগারের বন্দোবস্ত করেছিলেন, যদিও সেখানে কোন বই স্থান পাবার আগে বিশেষভাবে বিবেচিত হ'ত ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা এবং রাজনীতি সংক্রান্ত একটি বইও আমাদের পড়বার উপযুক্ত বলে স্বীকৃত হয় নি। যাই হোক, নেই আমার চেয়ে কানা মামা ভাল এই

বোধে যে সমস্ত বই আমরা পেতাম তাই আগ্রহসহকারে পড়তাম, এবং একটি ইতিহাসের বইতে ক্রীতদাস প্রথা সম্পর্কে অনেক আলোচনা ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাতির বিবরণও পড়েছিলাম। পুস্তকগুলি আমাদের ঘরে রাখা হ'ত এবং ওয়াচিরা কারিগা, যে আমাদের গ্রন্থাগারিকের কাজ করতো, বিভিন্ন বন্দীদের জন্য তাদের উপযুক্ত বই বাছাই করতে সাহায্য করতো। রাজনীতি সম্পর্কিত বই না থাকার বিশেষ করে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, কিন্তু এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, সব বন্দীরাই তা আর সারাজীবন ধরে রাজনীতি করবে না, কাজেই তাদের এসব বই এখন না পড়লেও চলবে।

আমরা লডওয়ারে বন্দীদের লেখাপড়া শেখানোর জন্য প্রথম থেকে নবম শ্রেণী অবধি ক্লাসের বন্দোবস্ত করেছিলাম, যাতে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্যক্তিও কিছু লেখাপড়া শিখতে পারার সুযোগ পায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে পড়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ শিক্ষকের অভাববোধে আমরা ঠিক করেছিলাম যে, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্ররা পালা করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াবে, এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্ররা তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াবে। আমি সর্বোচ্চ দুইটি অর্থাৎ অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে পড়াতাম। আমাদের প্রায় সব ছাত্ররাই খুব ভালভাবে পড়াশুনা করতো এবং বর্তমানে আমাদের অনেক "ছাত্র"ই স্কুলের শিক্ষক হিসেবে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাদান করছেন। এই সূত্রে কিমানা ওয়াচুকু নামক এক সত্তর বছরের বৃদ্ধের লেখাপড়া শেখার অদম্য স্পৃহা আমার এখনো মনে পড়ে, সে রোজ প্রথম শ্রেণীর ক্লাসে এসে বসতো লিখতে এবং পড়তে শেখবার জন্য, এবং তার অধ্যবসায়ের ফলে কিছুদিনের ভেতরই দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলার আমরা সবাই কিমানার কাছে গিয়ে বসতাম এবং সে মঝে মঝে আমাদের কেনিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার ইতিহাস বলতো। তার কাছ থেকে আমরা ইউরোপীয়ানদের এদেশে আগমন এবং তারপর তারা কিভাবে আমাদের উপর রাজত্ব কবতে আরম্ভ করে, কি কি ভুল করে, এসব বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। লডওয়ারে থাকাকালীন বেশ কয়েকজন বন্দিজীবনে প্রথম আমাদের ক্লাসে যোগ দিয়ে লেখাপড়ার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এ বিষয়ে উৎসাহিত হয়ে ওঠে এবং তাদের অনেকেই এখনো নিয়মিতভাবে স্কুল কলেজে যাচ্ছে। একথাও বলা যেতে পারে যে, লডওয়ারে অনুষ্ঠিত আমাদের এই ক্লাসগুলিই পূর্ব আফ্রিকায় সর্বপ্রথম বিন্যবতনে শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা।

গাণ্ঠাহিক বন্দনতী

১. বান্দিশিবিরের পরিচালক সমিতি
আচার-ব্যবহারের মান নির্দেশ
করার জন্য। নিন্মলিখিত নিয়মাবলীর
প্রবর্তন করে, এবং সরকারী নির্দেশের
থেকেও অনেক বেশি পরিমাণে সেগুলি
আমাদের ওপর বলবতী ছিল।

(১) কোন বন্দীই কখনো অন্য কোন
বন্দীর সঙ্গে শিবিরের ভেতরে বা বাইরে
মারামারি ঝগড়াকাঁট করবে না।

(২) কোন বন্দীই কাছাকাছি গ্রামের
তুর্কানা নারীদের বা শিবিরের কর্মচারীদের
স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে সহবাস করবে না।

(৩) কোন বন্দীই অন্য কাউকে ভয়
দেখাবে না বা ঘৃণা করবে না বা অন্য
কোনরকমে জোর-জুলুম করবে না।

(৪) কোন বন্দীই শিবিরের ভেতর
যেখানে-সেখানে খুঁধু ফেলবে না বা
প্রস্রাব করবে না বা অন্য কোন রকমে
শিবিরকে ময়লা করবে না।

(৫) কোন বন্দীই শিবিরের ভেতরে বা
বাইরে কখনো গাঁজা-ভাঙ খাবে না বা
মদ্যপান করবে না।

(৬) কোন বন্দীই অন্য কোন বন্দী বা
কর্মচারীদের কোন জিনিস চুরি করবে
না বা পাঠাগারের কোন বই চিরকালের
জন্ম নিজের কাছে রেখে দেবে না।

(৭) কোন বন্দীই তার তাঁবু থেকে
ময়লার বালতি পরিষ্কার করার জন্য দেওয়া
দলপতির নির্দেশ অমান্য করবে না—তা
সে রাঁববারই হউক বা অন্য কোন ছুটির
দিনই হউক না কেন।

(৮) কোন বন্দীই নিজের ইচ্ছামত
কোন হালকা কাজ বেছে নিতে পারবে না।
কে কি কাজ করবে তা সর্বসম্মতিক্রমেই
ঠিক করা হবে।

(৯) আর সবাই যখন কাজ করছে
সে সময় কোন বন্দীই কাজে ফাঁকি
দেবে না।

(১০) কেউই শিবিরের কর্মকর্তার
সঙ্গে বা বাইরে থেকে আগত কোন
পরিদর্শকের সঙ্গে অযথা কটু কথা
ফইবে না বা দুর্ব্যবহার করবে না। এই-
রকম আচরণ করার কোন সংগত কারণ
থাকলেও এ বিষয়ে প্রথমে দলপতির
নির্দেশ গ্রহণ করবে।

(১১) কেউই কারুর সঙ্গে মিথ্যা-
কথা বলবে না।

(১২) কেউই খাবার নৈবার সময়
তার আগের লোককে ছলে-বলে-কৌশলে
ডিঙিয়ে যাবে না।

উপরেক্ত নিয়মাবলী সমস্ত বন্দীদের
একত্রিত করে একটি সাধারণ অধি-
বেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।
কেউ এর কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করলে
পর শিবিরের বিচারালয়ে তার যথার্থীতি
বিচার করা হ'ত এবং দোষীর সাজা

নির্ণয় হ'ত। বিচারকের কাজ করতেন
কিয়ামবুদু অঞ্চলের ওয়াকামোরে নামক
এক বন্দী এবং তাঁকে সাহায্য
করতেন পাঁচজন বয়োবৃদ্ধ
নিয়োগিত এক নির্ণায়ক সভা।
এই পাঁচজনের চারজনকে মধ্য-
প্রদেশের (central province) চারটি
জেলার মুখপাত্র হিসেবে নেওয়া
হয়েছিল এবং পঞ্চম জন ছিলেন নায়াজা
প্রদেশের লোক। আমাদের লডুওয়ার
বন্দীজীবনের সমাজে ফৌজদারী
মকদ্দমার সরকারী উকিল
ছিলেন পলু মুচেমি, এর বাবা
জন্ কুনিহা নেয়েরী অঞ্চলের সরকারী
ডিভিশনাল বিচারালয়ের সভাপতি
ছিলেন। পলের ফৌজদারী মামলা
চালাবার ক্ষমতা ছিল অম্ভুত এবং তার
পরিচালিত কোন কেসই আমাদের
বিচারালয়ে ফেসে গিয়েছিল বলে
আমার মনে হয় না। কার্শনিবাহক
সমিতি শিবিরের আরক্ষাবাহিনীর কাজ
নগদুরু নুভিরাংগুকে দেয়, তার প্রধান
কাজ ছিল সকলকার উপর নজর রাখা
এবং বন্দীদের সব অসদাচরণ দলপতির
নজরে আনা। নগদুরু নিভীকভাবে
এবং সমতার সঙ্গে তার কর্তব্য পালন
করেছিল; সে এখন তার গ্রামে
চাষবাসের কাজ করে এবং স্থানীয়
কে. এ. ন্যা. ইউর সে দলপতি।
আমাদের নিয়মাবলী এবং বিচার-
পদ্ধতির উপর সকলেরই আস্থা ছিল
এবং সবাই মোটামুটিভাবে এর নির্দেশ
মতো চলতো। বিচারালয়ের দেয়
সাজা সঙ্গে সঙ্গেই দোষীর উপর
আরোপ করা হ'ত, যদিচ এর বিরুদ্ধে
আপীল করবার অধিকার ছিল
সকলকারই। আপীল শোনবার জন্য
অন্য পাঁচজন বয়োবৃদ্ধকে নিয়ে আর
একটি সভা গঠিত হয়; এতে এমবুদু
ফেটি হল, কিয়ামবুদু এবং নেয়েরী
অঞ্চল থেকে চারজন এবং নায়াজা
প্রদেশ থেকে একজন কাজ করতেন।
খুব কম সংখ্যক বিচারের বিরুদ্ধেই
আপীল করত দোষীরা। বিচারালয়ের
অধিবেশন সাধারণত বিকেলবেলা কোন
একটি কুঁড়েঘরে বসতো। যে কোন
বন্দীই এর অধিবেশনে যোগ দিতে
পারতো, কিন্তু কুঁড়েঘরগুলিতে
স্থানাভাবের ফলে এবং সাধারণত সবাই
সে সময় কাজে ব্যস্ত থাকায় খুব কম
সংখ্যক বন্দীই সেখানে দর্শক হিসেবে
আসতো। প্রত্যেক নিয়মের বিরুদ্ধা-
চরণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম সর্বাধিক
সাজা দেওয়া হ'ত, যার ফিরিস্তি নিচে
দেওয়া গেল :

১ ও ২ নম্বর নিয়ম : কুঁড়েঘর-

গুলির জলের চোবাচ্চা ভর্তি করার জন্য
যদিও বালতি জল তোলা বা সমাজচ্যুত
হওয়া। (লডুওয়ারে কেবলমাত্র একবারই
এমবুদু অঞ্চলের এক যুবককে সমাজচ্যুত
করা হয়েছিল, সে একজন জেলরক্ষকের
প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমলাপ চালিয়েছিল
বলে)।

৩ নম্বর নিয়ম : দুর্দিনের জন্য রামা-
ঘরের জলের চোবাচ্চা ভর্তি করা (খুবই
কঠিন সাজা)।

৪ ও ৭ নম্বর নিয়ম : চারদিনের
জন্য পায়খানার বালতি খালি করা ও
পরিষ্কার করা।

৫ ও ৬ নম্বর নিয়ম : ছাব্বিশ
বালতি জল ভরা।

৮ নম্বর নিয়ম : আটশ বালতি জল
ভরা এবং হাটুর ওপর ভর দিয়ে একটি
কুঁড়েঘরকে আটবার প্রদক্ষিণ করা
(খুবই কঠিনকাজ)।

৯ নম্বর নিয়ম : হাটুর ভরে দশবার
কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা ও তৎক্ষণাৎ অন্য
কাজ আরম্ভ করা। শরীর খারাপের
দোহাইতে শব্দমাত্র বিচারালয় বিশেষ
অনুমতি দিলে তবেই তৎক্ষণাৎ কাজ
আরম্ভ করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত।

১০ নম্বর নিয়ম : হাটুর ভরে দশ-
বার কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা ও আটশ
বালতি জল তোলা বা সমাজচ্যুত
হওয়া।

১১ নম্বর নিয়ম : বারো বালতি
জল তোলা এবং আটবার হাটুর ভরে
কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করা।

১২ নম্বর নিয়ম : রান্নাঘরের অধি-
নায়ক নিজেই এর সাজা দিতেন যে অন্য
সমস্ত বন্দীর খাওয়া শেষ হওয়া অবধি
দোষীকে খাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে
হবে। বিচারালয়ের এক বিশেষ
অধিবেশনের ফলে এই সাজার বদলে
চোন্দ বালতি জল তোলা ও দশবার
হাটুর ভরে কুঁড়েঘর প্রদক্ষিণ করার
সাজাও দেওয়া চলতো। রান্নাঘরের
অধিনায়ক শিবির পরিচালক সমিতির
দ্বারা নির্বাচিত হতেন; তিনি এই
সমিতির সভ্য না হলেও বিশেষ বিশেষ
কারণে তাঁকে কখনো কখনো এর অধি-
বেশনে যোগদান করতে বলা হ'ত।

পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে,
বহিঃ বালতি জল তোলা কিছু এমন
কঠিন সাজা নয়। এ কাজের জন্য
নির্ধারিত সময় ছিল শব্দমাত্র বিকেল
চারটে থেকে ছটা, কারণ চারটের পর
রৌদ্রের তাপ কিছুটা সহ্য করা
যেত। জলের ট্যাঙ্ক ছিল
শিবির থেকে প্রায় চারশো গজ
দূরে, তাতে নিকটস্থ টাকুয়েল
নদী থেকে পাইপ করে জল আসতো।

গাণ্ঠাহিক বসুমতী

পাইপে জলের খারা ছিল খুবই আস্তে এবং দৃষ্টির ভেতর চার বালতি জলও সেখান থেকে ভরে আনতে পারলে "দোষী" নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতো। একদিন আমি এক খুব করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম ঐ ট্যাঙ্কের কাছে। এক বোচারা "দোষী" বহু কষ্টে দুই বালতি জল ভরবার পর পা পিছলে পড়ে গিয়ে এক বালতি জল উল্টে ফেলে, এবং সেট বালতিতে গিয়ে সে হুমাড়ি খেয়ে পড়ে অন্যটির ওপর ও ফলে তারও সব জল মাটিতে পড়ে যায়। বোচারার মূখের দিকে তাকিয়ে আমার মায়া হয়েছিল সেদিন। জলভরা বালতি যথাস্থানে এনে পৌঁছে দিলে তবেই তা গোণা হ'ত, মাঝপথে নষ্ট হয়ে গেলে তার কোন দামই পেত না "দোষী"রা।

দোষীদের সাজা প্রত্যেক কুঁড়েঘরেই সম্মুখবেলায় প্রচার করা হ'ত, এবং সেই সঙ্গে সবাই এও জানতে পারতো যে, কে কিজন্য কতটা সাজা পেয়েছে। পারতপক্ষে খুব বেশি কেস আসতো না আমাদের বিচারালয়ে, কারণ সাধারণত সব বন্দীই আমাদের নিয়মকানুনগুলি মেনে চলতো।

সরকারী প্রচারে অনেকবার বলা হয়েছে যে, শিবিরের ভেতরও মাউ-মাউ বন্দীরা শয়তানের পুজা করতো, এবং জনসাধারণের, বিশেষ করে কারাগারের কর্মচারীদের এর দ্বারা অনিশ্চয় করবার চেষ্টা করতো। এ বিষয়ে সবাইকে যথাযথ ওয়াকিবহাল করা প্রয়োজন, এবং যেহেতু লড্‌ওয়ারে থাকাকালীন আমি প্রত্যহ সকালে কুঁড়েঘরে প্রার্থনার সময় আচার্যের কাজ করতাম, সেহেতু এর বিশদ বর্ণনা আমি দিতে সক্ষম। সাধারণত আমরা সবাই বসে বসে প্রার্থনা করতাম, যদিচ বিশেষ বিশেষ দিনে (যেমন ২০শে অক্টোবর, যেদিন জোমো কেনিয়াটাকে কেনিয়ার ব্রিটিশ সরকার আটক করেন বা যখন কোন রাজনৈতিক নেতার বিচার চালু থাকতো সরকারী বিচারালয়ে) আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করতাম। বন্দীদের ভেতর শব্দ কিছু সংখ্যক লোকই খ্রীস্ট ধর্মাবলম্বী ছিল, কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে প্রার্থনা করতাম। আমরা মাউন্ট কেনিয়া পাহাড়ের চড়ার দিকে মুখ করে নিজেদের হাতের তালুতে ধুতু ফেলতাম। (আমাদের সামাজিক নিয়মাবলীর মতে কাউকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা দেখাতে হলে আমরা এভাবে নিজেদের হাতে ধুতু ফেলি।) তার পর আমরা দু'হাত একসঙ্গে খোলা অবস্থায়

মাথার উপর তুলে ধরতাম এবং আমাদের প্রার্থনা পরিচালক বলতেন :

১। হে ভগবান, সকল মানুষের সৃষ্টি ও বিনষ্টকরণের কর্তা;

হে ভগবান, আমাদের এই আফ্রিকার সৃষ্টিকর্তা; আমরা যারা তোমার কাছে অপরাধ করেছি তোমার ক্ষমা ভিক্ষা করি ও প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাদের এই বিনয়

আবেদন শুনবে : আমরা যখন এই নিষ্ঠুর রৌদ্রতাপে পুড়ে ঝলসে মরিছি, যাদের তুমি এই সুন্দর কিরিনয়াগার (মাউন্ট কেনিয়া) জমি দান করেছ,

যে জমি এখন সাদা মানুষেরা এসে জোরদখল করেছে ও আমাদের উপর অত্যাচার করেছে।

২। হে ভগবান, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে, যে জমি তুমি আমাদের দিয়েছ তা যেন কোন বিদেশী ভোগ না করতে পারে;

তোমার শক্তির উপর আমরা পুরো আস্থা রাখি যে তুমি কখনোই এমন হতে দেবে না। তুমিই তো সাদা লোকদের ইউরোপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরসমূহ দিয়েছ ভোগ করার জন্য, এবং আমাদের আলাদা আলাদা

রাখবার জন্যই তুমি আফ্রিকা ও ইউরোপের মাঝে এক বিরাত সমুদ্রের সৃষ্টি করেছ; আমরা তো তাদের জমির উপর নজর দিই না, তেমনি তুমি আমাদেরও ক্ষমতা দাও যাতে আমরা নির্বিচারে নিজেদের জমি ভোগদখল করতে পারি।

৩। হে ভগবান, তুমি আমাদের নেতা, কেনিয়াটা ও আরও সবাইকে সাহায্য করো, যারা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে, উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে।

হে ভগবান, যারা আহত হয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে বা হাসপাতালে পড়ে আছে, তাদের তুমি নিরাময় করে দাও, আর যারা ওষুধগরের অভাবে ভুগছে তাদের তুমি সাহায্য করো, যারা বিধবা বা যারা নিঃসম্বল, তাদের সবাইকে তুমি সাহায্য করো।

৪। হে ভগবান, এই দেশের বুক চিহ্নে বয়ে যাওয়া রক্তাক্ত নদীর তুমি শেষ করো, এবং পুনর্বীর এখানে তুমি শান্তির প্রলেপ দিয়ে দাও।

হে ভগবান, আমরা যেন সর্বদা তোমার উপর ভরসা করতে পারি এবং তোমায় স্মরণ করি, তুমি আমাদের সবাইকে এক আশ্বাসময় করে দাও, যাতে আমরা সবাই পৃথিবীর সব লোকদের কাছে একজোটে কথা বলতে পারি, আর আমাদের সমাজস্বার ভেতরের এই দারুণ ক্ষত তুমি নিরাময় করে দাও।

৫। হে ভগবান, তুমি আমাদের সব শত্রুদের মন ভাল করে দাও, যাতে তারা আমাদের স্বজন হতে পারে, এবং সম্পূর্ণ আফ্রিকাকে আবার স্বাধীন করে দাও, যাতে আমরা পরাধীনতার জ্বালা ভুলতে পারি।

৬। হে ভগবান, আমরা তোমাকে এ সবার জন্য জোরজুলুম করছি না, শব্দ এজন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করছি, তুমি সর্বশক্তিমান, মহান, ক্ষমাময়, তুমিই চিরকাল আছ এবং থাকবে, তোমার কাছে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের নামে প্রার্থনা করছি, গিকুয়ু ও মুম্বী, যাদের তুমিই এই কিরিনয়াগার জমিতে এনে বসিয়েছিলে, এই উর্বর জমি ভোগদখল করার জন্য।

আমরা তোমার উপর বিশ্বাস ও ভরসা করি, তুমি সর্বশক্তিমান, মহান, ক্ষমাময়, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক।

লড্‌ওয়ারে থাকাকালীন আমরা জন খাটার সময় সেখানকার হাসপাতাল তৈরির জন্য পাথর ভাঙতাম, আর কিছু সংখ্যক বন্দী জলবিভাগের লোকদের জন্য নিকটবর্তী জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতো; তাঁরা সেখানে জলের খোঁজ করছিলেন। যদিচ আমাদের সে সময় এই পাথর ভাঙার কাজ খুবই কষ্টকর ও পরিশ্রমের মনে হ'ত, কিন্তু পরে ঐ হাসপাতালেই আমাদের নেতা জোমো

কেনিয়াটা ও বহুসংখ্যক তুর্কানা নিরাময় হতে পেরেছিলেন জেনে আমরা খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। একদিন জঙ্গলে গাছ কাটতে নিযুক্ত তিনজন বন্দী, কর্নেলিয়াস গাথুন্থু, কিবোচা এবং কিবাকি সেখান থেকে পালাবার বন্দোবস্ত করে। সাধারণত বন্দীদের ভেতর কেউ এভাবে পালাবার ইচ্ছা করলে প্রথমে শিবির পরিচালক সমিতির অনুমোদন নিত, যাতে কিনা আমরা অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী সরকারী প্রতিশোধের জন্য তাঁর হতে পারতাম, কিন্তু এই তিনজন তাদের উদ্দেশ্যের কোন কথাই আমাদের জানায় নি। আমি নিজে অবশ্য কখনো বন্দিজীবন থেকে এভাবে পালিয়ে যাবার কথা ভাবি নি, কারণ আমার মনে হয়েছিল যে, এইসব হওভাগ্য নিরক্ষর বন্দীর সঙ্গে আমার থাকার দরকার আছে। বন্দী অবস্থায় থেকেও তারা সমানেই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল এবং আমি যথাসম্ভব তাদের এই কাজে সাহায্য করেছিলাম।

মানিয়ানি শিবিরে কেউ পালালেই তার পর কয়েকদিন ধরে আমরা যারা বাকি থাকতাম, তাদের সকলকে অশেষ কষ্টভোগ করতে হ'ত সরকারী নিষ্পীড়নের মাত্রাধিক্যের ফলে। কিন্তু এই তিনজন বন্দী "পালিয়েছে" জেনে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বাকস্টন আমাদের কাছে এসে হাসতে হাসতে বললেন : "তোমাদের ভেতর তিনজন পালিয়েছে! তোমরা শীঘ্রই দেখতে পাবে যে, সরকারের ক্ষমতা এখানে কতো বেশি। তোমরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকতে পারো যে, ওরা অন্য কোন জেলায় পা দেবার আগেই হয় প্রাণে মারা পড়বে, না হয় বন্দী অবস্থায় আবার এখানেই ফিরে আসবে।" বাকস্টনের কথা শুনাই আমার সন্দেহ হয়েছিল এবং এখানেও আবার আমার এ বিষয়ে ক্ষোভ শিবিরের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হয় : "সুস্বাদু ভুট্টার আটা এবং দুগ্ধপ্রাপ্য চাষের বদলে একজন দৃত বন্দীর মাথা, মৃত অথবা জীবিত," এই ছিল সরকার পক্ষ থেকে স্থানীয় তুর্কানাদের উপর নির্দেশ। বাকস্টন ঠিকই বলেছিলেন : সৈদীন রাগি হবার আগেই তিনজনেই আবার বন্দী অবস্থায় শিবিরে এসে পৌঁছায়। শৃঙ্খলার তাদের মাথাই এসে পৌঁছাত, কিন্তু স্থানীয় তুর্কানা চীফ তাঁর দলের লোকদের সময়মতো বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জ্ঞান্ভ মানুষগুলোকে তাদের পায়ে হাঁট্টয়ে ফেরত আনতে শিকারীদের কষ্ট হবে কম, কিন্তু ফলে পুরস্কার মিলবে

বেশি। শিকারীদের দেয় পুরস্কার অবশ্য আমাদের র্যাশন থেকেই কাটা হয়েছিল। যদিচ তারা এ বাবদ যে চাল পেয়েছিল, তার আবির্ভাব অন্য কোথাও থেকে হয়েছিল। কারণ আমরা র্যাশনে চাল পেতাম না মোটেই। পুনর্দৃত তিনজন বন্দীকে ছ' মাসের জন্য নিঃসঙ্গ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং তুর্কানা-দের হাতে যা হতে পারতো তার তুলনায় এ সাজা খুবই সামান্য বলে মনে হয়েছিল আমার। এই ঘটনার পর অন্য যারা পালাবার কথা ভাবছিল তারা নিজেদের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করার জন্য আর কোন উৎসাহ দেখায় নি। কর্নেলিয়াস পরে ১৯৬১ সালে "জমি স্বাধীনতা সৈন্যবাহিনীর" (Land Freedom Army) স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আবার ধরা পড়ে ও সাত বছরের জন্য তার জেল হয়, কিবোচা পরে নাইরোবির একটি দোকানে চাকরি পায় এবং কিবাকি ফোর্ট হল এলাকায় রাজনীতি করেছে এখন।

লড্‌ওয়্যারে আমরা জন খাটেতে রাজী হয়েছিলাম, কারণ এ বিষয়ে সরকারী নিয়ম ইতিমধ্যে বদল করা হয়েছিল, যার ফলে সরকার আমাদের জন খাটেতে বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু আমরা এও ঠিক করেছিলাম যে, এই কাজের পরিবর্তে কোন রকম পারিশ্রমিক নেব না আমরা। পাঠকের কাছে হস্তোত্তা এ সিদ্ধান্ত অব্যবহৃত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের খুবই ন্যায়-সঙ্গত কারণ ছিল এর সপক্ষে। সরকারী নিয়মমামফিক আমরা কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং এও ঠিক হয়েছিল যে, কাজের পরিবর্তে আমাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিক যে আমাদের নিতেই হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না সরকারী নিয়মে। আমাদের বিরুদ্ধে কোন সরকারী আদালতে কোনরকম অভিযোগ আনা হয় নি, কোন বিচার করা হয় নি বা কোন দোষে দোষীও সাব্যস্ত করা হয় নি : আমরা ছিলাম শৃঙ্খল বন্দী— আমরা নিজেদের রাজনৈতিক অন্তরীণ বলে মনে করতাম এবং আমাদের মতে রাজনৈতিক বন্দীকে জন খাটেতে বাধ্য করা মানুষের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করারই সামিল। যে সরকার এইরকম করে তারা আমাদের মতে মানুষকে ক্রীতদাসের মতো ব্যবহার করাব অপরাধে অপরাধী। আমরা জন খাটার বিনিময়ে পারিশ্রমিক স্বীকার করলে পৃথিবীর চোখে এই দাঁড়াত যে, আমরা কেনিয়া সরকারের এই অন্যায় নিয়মকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন

করাছি। কাজে কাজেই আমরা শিবিরের অধিনায়ককে বলিয়েছিলাম যে, জন আমরা খাটব, কিন্তু তার জন্য কোন পারিশ্রমিক নেব না। আমরা ক্রীতদাস হিসেবে কাজ করবো। অবশ্য আমরা এ কথা আশা করিনি যে, অধিনায়ক আমাদের বস্ত্রের গভীরতা বৃদ্ধিতে পারবেন এবং তিনি আমাদের নিরাশ করেন নি! এ বিষয়ে উপরওয়ালানের কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে এবং তাদের উত্তরেও আমাদের মূল বক্তব্য বৃদ্ধিতে না পারার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে সব সময়।

এই আচরণের ফলে আর একটি সুবিধা হয়েছিল আমাদের। আমরা পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করার সরকার বা তাঁর কর্মচারীরা আমাদের অত্যধিক শারীরিক পরিশ্রম করবে বাধ্য করতেন। পারেন নি। আমি শিবিরের পরিচালক সমিতির কাছে প্রস্তাব করি যে, এ বিষয়ে আমাদের বস্ত্র চিঠিতে কেনিয়ার রাজ্যপাল এবং বন্দিশালার প্রধান অধিনায়ককে জানান হ'ক এবং যে সমস্ত বন্দী এভাবে 'ক্রীতদাসের' মতো জন খাটেতে রাজী আছে তারা সবাই এ চিঠিতে স্বাক্ষর করবে। প্রায় সবাই আমার প্রস্তাব স্বীকার করে এবং লড্‌ওয়্যারের চারশো ছাব্বিশজন বন্দীর ভেতর চারশো জনেরও বেশি এ চিঠিতে স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করে। কয়েকজন কোন আবাজ কারণে সই করে নি এবং শৃঙ্খলার পাঁচজন বন্দী জন খাটার বদলে পারিশ্রমিক নেওয়া স্বীকার করে নিয়োঁছিল। চিঠির একটি কপি আমরা যথারীতি লুকিয়ে পাঠবার বন্দোবস্ত করি, কিন্তু দ্বিতীয় কপিটি রাজ্যপালের কাছে পাঠবার জন্য শিবিরের অধিনায়ককে দিই। তারপর আমরা যথা সম্ভব আদ্যে কাজ করতে আরম্ভ করি, যাতে কিনা একেবারে কাজ না করার অজুহাতে শৃঙ্খল প্রহরীদের হাতে মার না খেতে হয় এবং চিঠির ফলাফলের অপেক্ষা করি। এ ছাড়া আমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থার কিছু উন্নতি করাতেও সক্ষম হয়েছিলাম আমরা। পুরা ব্যাপারটা দু'পক্ষের ঠিক হয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল এবং ফলে কেউই কাউকে চট্টাতে সাহস করছিল না। কদিন বেশ উত্তেজনা-বিহীনভাবেই কেটে গিয়েছিল আমাদের, সরকারী উত্তরের অপেক্ষায়।

বাহুবলী

চত্বিশ পরগণার মন্দির—অসীম মুরখো-পাধ্যায়। আনন্দধারা প্রকাশন, ৮ শ্যামা-চরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম : ছয় টাকা।

বাংলা দেশের বৃক্কে ছড়িয়ে রয়েছে বহু প্রাচীন মন্দির—প্রায় সব মন্দিরেরই এক অবস্থা—তারা ধ্বংসপ্রায়।

বাংলা দেশের মন্দিরশিল্পের বিবর্তনের ধারাবাহিক চিত্রটিকে সঠিক পেতে হলে যাওয়া দরকার বাঁকুড়া এবং বীরভূমে। শ্রীযুক্ত অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মৃকুল দে এই দুই জেলার মন্দিরশিল্পের সামগ্রিক বিবরণী প্রকাশ করে ইতিমধ্যে অসাধ্যসাধন করেছেন। চত্বিশ পরগণার মন্দির সম্বন্ধে ইতিমধ্যে আলোচনার অভাব না থাকলেও অধুনা সে অঞ্চলে মন্দিরগুলির অবস্থা কী হয়েছে তার আলোচনা করেছেন শ্রীঅসীম মুরখোপাধ্যায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শতকের পর শতকের ধারাবাহিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন মন্দিরগুলির এবং পূর্বে অনালোচিত নতুন মন্দিরের সন্ধান দিয়ে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন। অথচ আমরা জেনেছি যে, শ্রীমুরখোপাধ্যায় বয়সে তরুণ, প্রায়-বিস্ত-হীন। কিন্তু মন্দির রক্ষার জন্য সরকারী অর্থ ব্যয় হলেও মন্দিরগুলি ধ্বংস হতে চলেছে। শ্রীঅসীম মুরখোপাধ্যায় চত্বিশ পরগণার মন্দিরের কথা লিখে প্রমাণ করেছেন যে, সরকার ও জনসাধারণ উদাসীন হলেও এখনো পর্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, অনসন্ধানী তরুণ গবেষক স্বীয় প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের প্রাচীনকালের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারেন।

‘চত্বিশ পরগণার মন্দির’ গ্রন্থটির রচনাব্যবস্থায়ও শ্রীমুরখোপাধ্যায়ের চিন্তা-ভাবনা প্রশংসনীয়। তিনি মন্দিরের মর্মান্তিকাল শিল্পীদের শিল্প দক্ষতা ও শিল্পকর্ম তুলে ধরেছেন। বাংলাদেশে মন্দিরশিল্পের ধাবা আলোচনাকালে তিনি ভৌতিক ম্যাক্সিমেলের মতো পাণ্ডিত্যের মতামত ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন।

মন্দিরশিল্পের যে চারটি রীতি প্রচলিত আছে, তার ওপর ভিত্তি করেই অসীমবাবু চত্বিশ পরগণার মন্দিরগুলির আলোচনা করেছেন এবং এই ধারানুসরণে যে বৈচিত্র্য দেখা গেছে, কার্যকারণ সহ তার বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। মন্দির-গুলির ধ্বংসের কারণগুলিকে তিনি যেমন সুস্পষ্ট অভিমত সহ ব্যক্ত করেছেন, তেমনি তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টি নিয়ে ধনী-দের মন্দির তৈরির পশ্চাত্তাত্ত্বিক বিবৃত করেছেন। তা ছাড়া এমন দৃষ্টান্তও তিনি দেখিয়েছেন যে, মুসলমান রাজার আমলে একই ধনী হিন্দু জমিদার মুসলিম আমলে এবং ব্রিটিশ আমলে যুরোপীয় শিল্পের অর্থ অনাকরণের ফলে রীতি বদলাতে বদলাতে কিভাবে এ দেশীয় শিল্পচর্চার ক্ষতিসাধন করেছেন (পৃঃ ৮৩)।

মন্দিরশিল্পের ধারাবাহিক কাহিনী, এই শিল্পের রীতি ও প্রণালী বিশ্লেষণের পর চত্বিশ পরগণার মন্দিরগুলির সঙ্গে শ্রীমুরখোপাধ্যায় আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। এই পরিচয় প্রসঙ্গে এসেছে মন্দির নির্মাণের সাল-তারিখ, কোন রীতিতে কোন মন্দিরটি গঠিত এবং কোন স্থানে কোন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। জটিল দেউল আবিস্কৃত হয় বন কেটে বসতি গড়ার সময়। তাহলে অবশ্যই একদা সেখানে বসতি ছিল। সেই ইতিহাস জানার এক প্রচণ্ড কৌতূহল শ্রীমুরখোপাধ্যায় আমাদের মনে জাগিয়েছেন। স্বভাবতই মনে হয় আরো মন্দির আবিস্কৃত হলে, তার শিল্পরীতি জানাই প্রধান বিষয় হবে না, তদন্তের ইতিহাসও হয়তো বের হয়ে পড়বে। ফলে বাংলা-দেশের ইতিহাস আরো সমৃদ্ধ হবে।

অসীমবাবু সমগ্র ২৪ পরগণার পূর্বে আবিস্কৃত মন্দিরগুলির নড়ন তথা উন্মোচন করেছেন এবং নিজেও পূর্বে অনাবিস্কৃত মন্দির চম্বে গিয়ে পা বাড়িয়েছেন। এও এক দঃসাধ্য ব্যাপার। তবে স্বার্থ গণ-গ্রাহীরা এর প্রশংসা করলেও আমাদের

সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের পাণ্ডিত্য-মতে হয়তো তা বেগার খাটো! মন্দির-শিল্প ছাড়া লেখক উপসংহারে ২৪ পরগণার অন্যান্য শিল্পের (যেমন পট, কাঠ, শোলা প্রভৃতি) কথাও ব্যক্ত করেছেন। ৩২টি ফটো চিত্র, ২৪ পরগণার একটি ম্যাপ ও মন্দিরশিল্প গঠনরীতির বহু-সংখ্যক স্কেচে গ্রন্থটি অধিকতর চিত্তা-কর্ষক ও মূল্যবান বিবেচিত হবে এবং প্রামাণ্য গ্রন্থের যোগ্য মর্যাদা লাভ করবে বলে আমরা মনে করি। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

কেতকী (আষাঢ়, ১৩৭৭)—সম্পাদক মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। শিয়াল-ডাঙা, পোঃ মনিহারী, পূর্বদুর্লিয়া। দাম—এক টাকা।

খরা-কবলিত পূর্বদুর্লিয়া জেলা থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র ‘কেতকী’। বাঙালীর প্রাণরসধারা অতি দঃখেও যে শুকিয়ে যায় না, এ তারই প্রমাণ। গ্রাম-বাংলার কণ্ঠস্বর ‘কেতকী’র মৃদু উপজীব্য। আধুনিক কবিতা যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা বেয়ে চলেছে, তার প্রতিফলন আছে ‘কেতকী’তে। হয়তো ভবিষ্যতে নতুন কবির জন্ম দেবে। দক্ষিণ-রঞ্জন বসু, দুর্গাদাস সরকার, মোহিনী-মোহন গাঙ্গুলী, অমিয়কুমার হাটি, সুবিনয়ল জানা, শাজাহান, বিশ্বপদ সামন্ত, উমাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা উল্লেখযোগ্য। মূলত মফস্বলের পত্র-পত্রিকার বিবরণসম্বলিত ‘সাহিত্য পরি-ক্রম’ করেছেন ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ‘কবি জীবনানন্দ’ একটি স্বাধীন রচনা। সম্পাদকীয়তে যে বলিষ্ঠ প্রত্যয় ও আদর্শ ঘোষিত হয়েছে, তা অনুসরণ করলে ‘কেতকী’ প্রতিষ্ঠা, মর্যাদা ও সম্মান অর্জন করবে।

সপ্তম্বীপা (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল, ১৯৭০), সম্পাদনায়—রবীন দত্ত ও জীবননয় দত্ত। এ১২৪, কংকরবাগ কলোনী, পাটনা-১। দাম—পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাংলা সাহিত্য এখন আর শুধু সখের ব্যাপার হয়ে থাকছে না। পাটনা থেকে প্রকাশিত ‘সপ্তম্বীপা’ তার প্রমাণ দেবে। বিহারের প্রগতিশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘সপ্তম্বীপা’ আছে নিষ্ঠার স্বাক্ষর। লেখাগুলি ভাবনা ও চিন্তা উদ্বেককারী। সুশীলকুমার বিশ্বাসের ‘পথ ও ভালবাসা’ গল্পটি মমতা-মাখা। শ্যামলী সরকার-এর কবিতা উল্লেখ্য। পুস্তক সমালোচনা বিভাগে জীবনানন্দ মন্সীর লেখায় কল-কাতার বাইরের কতকগুলি পত্র-পত্রিকার বিবরণ জানা গেল।

নরনাথ ফিরে আসেন। অন্ধকার ঘরে ঢুকে এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। রাস্তার আলো জানলার মধ্যে দিয়ে এসে পড়ে ঘরে। টেবিলের ওপরের রূপোর দোয়াত চিক চিক করে আলোর। দেয়ালে গান্ধীজীর ছবি অস্পষ্ট। ঘরের অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠতে পারে নি। একটা পাতলা আলোর হালকা আভান চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে।

তিনি আলো জ্বালেন না। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে চেয়ারে বসেন। সামনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি যায়। বার বার চমকে চমকে ওঠে হেড লাইটের আলো। বাস থামে, লোক নামে, কন্ডাক্টর ঘণ্টা দেয়, আবার বাস চলে। রাস্তার লোক চলে গল্প করতে করতে। তাদের কথার টুকরো শোনা যায়। রাস্তার ও-ফুটে বঙ্কুর চায়ের দোকানে খন্দের জমে। কত রকম লোকের জটলা। চা খায়, সিগারেট ফোঁকে। ক'টা ছেলে তর্ক করে জোর গলায়। ওদের গলার আওয়াজ ঘরে ভেসে আসেঃ এদেশের ছবিতে চন্দ্রন চসতে পারে কি না!

হঠাৎ নিজেকে তাঁর ভয়ানক একলা মনে হয়। দিরাট অকাশে সন্ধ্যাতারার মত নিঃসঙ্গ। বাইরে আলোর চলত স্রোত, মানুষের জীবন্ত জীবনের মিছিল, উত্তেজিত প্রাণের সব প্রকাশ আর তাঁর ঘরে ইতিহাসের স্তব্ধ নীরবতা। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে তিনি একক দর্শক—সকলের

থেকে দূরে সরে থাকা খারিজ-হওয়া একটা মানুষ।

তিনি চমকে ওঠেন। ফিকে অন্ধকারের মাঝ দিয়ে নিজের চেয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে শিউরে ওঠেন অজানা ভয়ে। চার-পাশে কেউ নেই—এ চিন্তা করা যায় না। ভাবতে গেলে মাথার রক্তের মধ্যে প্রলয় জাগে; তারপর বিম লাগে সারা শরীরে। দেহটার কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না। চোখের সামনে শব্দ পড়লো জগৎটার ছবি ভেসে ওঠে।

সারাদিনই প্রায় কোন কাজ থাকে না। সময় ভার হয়ে চেপে ধরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে থাকেন। এক-একটা মিনিট যে এতো দীর্ঘ, জানা ছিল না। ক' মাস আগে নিশ্বাস ফেলবার সময় পেতেন না। ঘড়ির কাঁটা এতো জোরে চলত, তাঁর মনে হত। জ্যাটপেকও ওর নাগাল পাবে না। কাজ, কাজ, কাজ। সকালে চোখ মেলেবার আগেই কাজের আশেষ লাইন দাঁড়িয়ে থাকত দরজার সামনে।

ধাসনা অনুরোধ করতেন—দিন-রাত

কাজ-কাজ করে শরীরের ঠিক হাল হয়েছে, দেখেছ। এতো কাজ না করলে ক্ষতি কি?

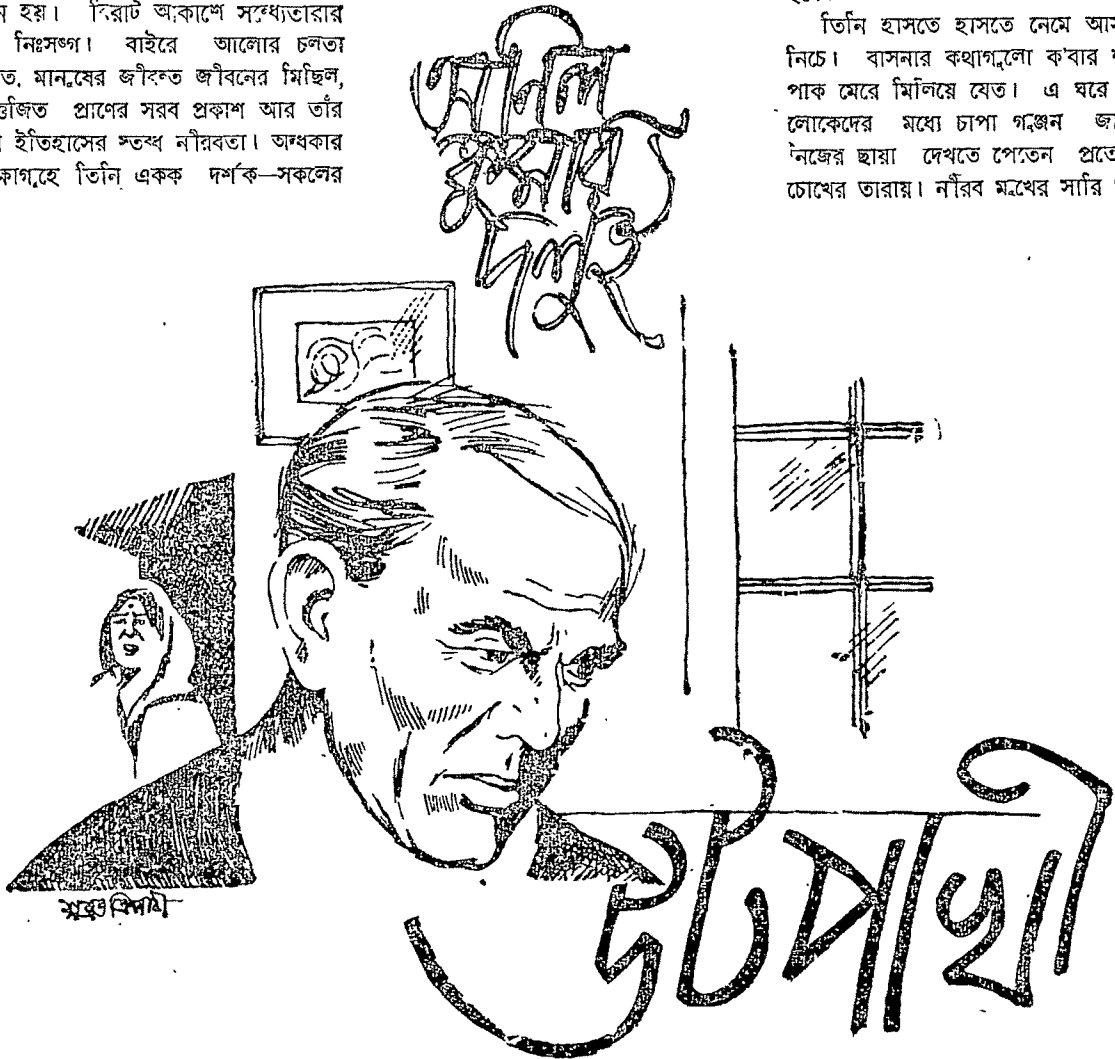
নরনাথ হাসতেন। মাথা—ওজ্বল করা হাসি। সেটা স্বতঃস্ফূর্ত না প্রেচ্ছাকৃত, নিজেই জানতেন না। চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে তোয়ালে দিয়ে আলতো ভাবে ঠোঁট মুছে বলতেন—লাভ-ক্ষতি বুঝি না। পাঁচটা লোক ভালবাসে, নানান অভাব-অভিযোগ নিয়ে আসে, যতটা পারি সাহায্য করি।

—ভালবাসে, না ছাই। সব স্বার্থপরের দল। যতদিন ওদের হয়ে করতে পারবে, ওরা তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবে। যেদিন পারবে না, ওরা তোমার ছায়া পর্বন্ত মাড়াবে না।

—এটা তোমার রাগের কথা। তুমি জান না, ওরা আমাকে কত ভালবাসে, আমার জন্যে ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে।

—যে লোক নির্বোধের স্বর্গে বাস করে তাকে কিছু বলতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। যদি চাকা কোন-দিন ঘোরে, সেদিন ওদের ভালবাসা যাচাই হবে।

তিনি হাসতে হাসতে নেমে আসতেন নিচে। বাসনার কথাগুলো ক'বার শুন্যে পাক মেরে মিলিয়ে যেত। এ ঘরে এলে লোকদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন জাগত। নিজের ছায়া দেখতে পেতেন প্রত্যেকের চোখের তারায়। নীরব মুখের সারি তাঁকে



গভীরভাবে আনন্দ দিত। এত তৃপ্তি, এত প্রশান্তি তিনি অনুভব করতেন যার মধ্যে কোন সন্দেহ উঁকি মারত না। তাঁর মনে হ'ত, বাসনা তাঁর জীবনের আদর্শ বসুধাতে পারেন নি। এবং সত্যি কথা বলতে কি, আজ এ অন্ধকারে বসে স্বীকার করেন, বাসনাকে সেদিন যোগ্য সহধর্মিণী মনে করতে শিখা বোধ করতেন। বাসনার সৎকীর্ণ মন তাঁকে পীড়িত করত। বার বার তাঁর মনে হত, তাঁর বাইরের বিপুলে খ্যাতি বাসনার মনে ঈর্ষা জাগাত। হয়ত বাসনা মনে মনে তাঁর খ্যাতিকে সহ্য করতে পারতেন না।

আজ এ সম্ভার পর বাড়িটা তাঁর ভীষণ নির্জন মনে হয়। কোথাও কোন নাড়া নেই। নিস্তব্ধতার নির্জন চরে তিনি জেগে আছেন একা। জমাট-বাঁধা পাথুরে স্তম্ভতাকে স্পর্শ করা যায় হাত দিয়ে কিংবা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে তুলে নেওয়া যায়। অথচ বাইরে বয়ে চলেছে প্রাণের প্রবল বন্যা। বঙ্কুর চায়ের দোকানের রৌডিতে চড়া সুরে গান হয়। ওপাশে মিস্ত্রিদের বাড়ির সামনে দুটো ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে। কি বলে শোনা যায় না। মেয়েটা হাসে—চোখের তারায় তেরু ছা আলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

পুরনো পৃথিবী তার অক্ষদণ্ডের ওপর ঘুরে চলে। কোথাও কোন পরিবর্তন চোখে পড়ে না। বাসনার সেদিনের কথা-গুলো নির্মম সত্যের রূপ নিয়ে নরনাথকে বেষ্টে। আজ মনের দিক থেকে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। বাসনার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব তীব্র ব্যঙ্গের তুরপুন চালায় ঝাঁজরে।

—সতীশ! —বাসনার স্বর।

—কি বলছেন, মা?

—বাবু এখনো ফেরে নি?

—না, মা।

—কি আশ্চর্য! আটটা বাজে, কোথা গেলেন!

বাসনার গলা শুনে নরনাথ ভীষণ অবসিত বোধ করেন। ঠিক এ মুহূর্তে কি যে করবেন, ভেবে পান না। একটা পায়ের শব্দ কাছে এগিয়ে আসে। তিনি উঠতে যান, চেয়ার সরে যায়। ককঁশ শব্দ হয়। পরক্ষণে ঘরের আলো জ্বলে ওঠে। হঠাৎ আলোর ঝাপটায় তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে যায়।

—ভীম এখানে! —একটা বিস্ময় কণকিয়ে ওঠে।

বাসনাকে সামনে দেখে নরনাথ বিপন্ন-বোধ করেন। নিজেকে অসহায় মনে হয়। কি জবাব দেবেন, ভেবে পান না; চপ করে বসে থাকেন। বাসনা এগিয়ে আসেন এক বুক ভেসে ও বিস্ময় নিয়ে। নরনাথ দেখেন, আলোর বস্তুর নিচে

বাসনার মূর্ত্তা-বসানো নাকছাবি কেঁপে কেঁপে ওঠে। বৃদ্ধ ওঠা-নামা করে ঘন ঘন। ডাগর-দীঘল চোখে একটা কালো-ছায়ার প্যাঁথি ছটফট করে ডানা ঝাপটায়।

—তোমার কি হয়েছে?

—কিছু না।

—তবে এমন করে অন্ধকারে বসে আছ কেন? কখন বোঁড়িয়ে ফিরলে? আমাদের ডাক নি কেন?

—এমনি।

ছোট জবাবে বাসনা খুঁশি হন না। নরনাথকে এরকম একান্ত অসহায়ের চেহারায় তিনি কোনদিন দেখেন নি। দীর্ঘদিনের বিবাহিত জীবনে নরনাথের মূর্ত্তের মাপা-হাসি কোনদিন মূছে যায় নি। তিনি পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইলেও বাসনা এত সহজে স্থির হতে পারেন না। সেদিনের পরাজয়ের পর নরনাথ নিভে গেছেন। নিজের অটল বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়েছে মাটির ধুলোয়। নড়ে-চড়ে বেড়ান ঠিক, তবু বাসনার মনে হয়, নরনাথ কাঁসা ছেড়ে যেন ছায়ার রাজ্যে চলে গেছেন। একটা দীর্ঘ ছায়া চলাফেরা করে নিঃশব্দে, নীরবে। তাঁর অস্তিত্বে সন্দেহ জাগে, ভয় হয়, শঙ্কা নেচে নেচে বেড়ায় চারধারে।

—তোমার শরীর ভালো আছে?

—হ্যাঁ।

—ওপরে যাবে?

—না, এখানে একটু বসি।

—কি পাঠিয়ে দোব?

—দাও।

বাসনা দাঁ পা এগিয়ে যান। থমকে দাঁড়ান। তাঁর পিছন দিকে আলো পড়ে। নরনাথ দেখেন বাসনার ঘাড়ের কাছে ঝগড়া সাদা চুল কালের ওপর ডোরা টেনে দিয়েছে। বাসনার বয়স বেড়েছে। কতদিন, না কত বছর, বাসনার দিকে এরকম করে তাকান নি। বাসনা পা ঘষেন। ঘাড় ফিরিয়ে বলেন—তোমার কাছে বসব একটু।

চমকে ওঠেন নরনাথ। অনেক দূর থেকে, অনেকগুলো বছরের কবরখানা মাড়িয়ে কটা শব্দ তাঁর মনের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়া দিবে যায়। একটা বিবর্ত আলোড়নের ঘর্পাবর্তে অন্ধের মত কি যেন হাতড়ে ফেরেন। একটা লম্বী তন্দুকা একবার হাতছানি গিয়ে মিলিয়ে যায় অন্ধকারে।

—থাক।

—একা বসে থাকবে?

—একটু পড়াশোনা করব।

বাসনা চলে যান। পাশের দাসীরা নই থেকে একটা বই টেনে নেন। টেবিলের ওপর বসে পড়তে থাকে। বাসনার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি একটা পক্ষিমত মত ঘরের বাতাসে

উড়ে বেড়ায়—একা বসে থাকবে? আজ তিনি একা। এ নির্মম সত্যকে না মেনে উপায় নেই। জানলার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ে, সে ছেলেমেয়ে দুটো মিস্ত্রিদের বাড়ির সামনে নেই। বঙ্কুর দোকানে লোকজন খই খই করে। বাড়ী ছেলেটা কাঁচের গেলাসে ও ভাঁড়ে করে চা দিয়ে যায়। দোকানের ভেতরটা ধোঁয়ায় ঢাকা—কটা অবয়ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

সতীশ কণি দিয়ে যায়। নরনাথ কণিতে চমক দিয়ে আরাম বোধ করেন। কটা মাস আগে এ ঘরে লোক ধরতো না। কথা-হাসি-টীকা-টিপ্পনীর বন্যা বয়ে যেত। বাইরে মটরের হর্ন বেজে উঠত সবাইকে সচকিত করে। একটু পরে দেখা দিত আগরওয়ালা, মূনিম খাঁ কিংবা যদু মধুসুজ্ঞে। লোক ঘরে ধরত না, বাইরের রাস্তায় লিটিয়ে যেত।

যদু মধুসুজ্ঞে তাঁকে পাশের ঘরে নিয়ে যেত। তিনি বসতে পারতেন, কোন গোপন আর্জি আছে তার। যদুর সম্বন্ধে নানা কথা তাঁর কানে আসত। কিন্তু তাকে হাতে রাখতে হ'ত, কারণ বিশেষ এক নিষিদ্ধ এলাকার ভোট থাকত তার পকেটে। খুব অমায়িক লোক। এত ভদ্রলোক সচরাচর চোখে পড়ে না।

যদু মধুসুজ্ঞে বলত—দাদা, ছোটভাই আবার আপনার শরণাপন্ন হয়েছে।

—কি ব্যাপার?

—আর কেন বলেন? আপনার কাছে বলতে লজ্জার মাথা কাটা যাচ্ছে, কিন্তু না বলেও উপায় নেই। আমার হয়েছে শাঁখের করাতে।

—কি হয়েছে?

লেটোকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। আজ আবার ছোরাছুরি চালিয়েছে। পদলিশের হাতে ধরা পড়েছে। আপনি একবার এস-পকে ফোন করুন।

—দিনকাল খারাপ। গুন্ডার জন্যে...

—সব বন্ধি, দাদা, বোকা তো নই!

এজেন্ট আবশ্যক



কার্পাস আট শাউ, টেরিলিন শাউস, বোভেনড পোথকি, নাইলনের মোটা, টাই, টেমুলেস ট্রিলের বাসনপত্র প্রভৃতির অর্ডার বহু করিয়া মাসিক ৬৫০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন অথবা আকর্ষণীয় কমিশনে কাজ করিতে পারেন। তৎপর হউন। বিনামূল্যে পরীক্ষণীয় এবং পূর্ণা মাপের নমুনার জন্য অগ্নাই পত্র লিখুন।

HURRY WRITE BOMBAY AGENCIES Kalyanpura, Delhi-6.

গাথাহিক বঙ্গমতী

কি করব, সামনে আবার ইলেকসন। লেটো না থাকলে...বোঝেন তো...

না বোঝবার কিছু নেই। নরনাথ সব বোঝেন। বিবেকের দংশন থাকে বলে, আজকাল আর বিশেষ অনভব করেন না। যদু মধুসূক্তের মত অনেকের অনেক অন্যান্য আশ্রয় সহ্য করতে হয়। না করে উপায় নেই। হয়ত অন্যান্য, তবু নিজের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সব করতে হয়। এমন একটা জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন যার মধ্যে থেকে পালাবার কোন ফাঁক নেই।

বাসনা মাঝে মাঝে বলতেন—এসব তো দূর্নীতি।

—দূর্নীতি বলে কিছু নেই। যে পুঙ্খের যে মন্ত্র—এ লাইনে থাকতে গেলে এসব করতে হয়, না করলে টিকতে পারবে না।

—লোকে গালাগাল দেয়।

—সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাও ছড়লে তা সূর্যের গায়ে লাগে না, যে ছোঁড়ে তার মাথায় এসে পড়ে।

—উপস্রাট বোধ হয় ঠিক হলো না। নিজেকে সূর্য ভাবা খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল—মাথা হেঁট করে স্বীকার করেন নরনাথ। চলার হাউল রেসে যখন সাফল্য আসে, তখন কোর্নদিকে তাকাবার চোখ থাকে না। একটা বন্য আদিম চলার নেশা চোখের সামনে ভাসতে থাকে। একবারও মনে আসে না, পতনের খাদ রয়েছে সামনে। যে-কোন সময়ে, যে-কোন মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারেন গভীর অভলে।

যদু মধুসূক্ত, আগরওয়ালা, মর্নিম খাঁ, লেটো, আরো কত লোক, যাদের নাম আজ আর মনে পড়ে না, মিলিয়ে গেছে হাওয়ায়। এতগুলো লোক এভাবে নিপাত্ত হয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস করা যায় না। এ ঘরের সীমানায় আর কেউ আসে না। আসার আর প্রয়োজন নেই। সোঁদনের বৃক্ষকন্ড নরনাথ আজ বামন হয়ে গেছেন। লোকের নজরের পাজার মধ্যে আর তিনি পড়েন না।

যদু মধুসূক্ত আশ্বাস দিত—দাদা কি ঘাবড়ে যাচ্ছেন?

—না, না, ঘাবড়াবার কি আছে। তবু কথ্যটা কি, এবারে ওরা জোট বেঁধে নরনাথ কিনা। লাজাড়া হাওয়াও বেশ সুবিধের মন হচ্ছে না।

—তাপনি নরকে সরষের তেল দিয়ে ঘাস লাগান। আমি যতক্ষণ আছি ঐ ইয়ে পান্ডার একটা ভোটও মনসা মিত্তিরের লাগান সন্দিগ্ধ না। তাপনার জ্ঞানে আমরা জান লিডার দেব। লেটো তাব দলবল নিয়ে লেটো নরকে পড়েছে, আপনার কোন ভয়-ভীতি নেই।

—তোমাদের পাঁচজনের শভেচ্ছা নিয়ে নাবিছ, দেখা যাক কি হয়।

—কী আবার হবে! মনসা মিত্তিরের হয়ে কে খাটবে? টাকার চার ফেলে সব কটাকে গেঁথে তুলব। তাছাড়া ঐ ইয়েরাও আপনার জন্যে খাটছে। মনসার কটা পান্ডাকে একবার কিরণবালার ঘরে তুলতে পারলে হয়। আপনি শব্দ পুর্লিশের হামলাটা সামলান।

—পুর্লিশের হামলা হবে কেন?

—কিরণবালার হাতে কটা মেয়ে এসেছে নতুন...বোঝেন তো সব। আপনার কাছ থেকে অভয় পেলে সবদিক সামল দিই।

—দেখি কি করতে পারি।

যদু মধুসূক্ত যতক্ষণ সামনে থাকে নরনাথ অস্বস্তি বোধ করেন। লোকটাকে সহ্য করতে পারেন না। পথ চলতে চলতে হঠাৎ পচা ইন্দুরের ফুলো দেহের ওপর পা পড়লে যেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে, লোকটাকে দেখলে ঠিক তেমনি অসহ্য বিবমিষায় গা গুলিয়ে ওঠে। তবু কিছু করার নেই। ওকে হাতে রাখতে হবে; কথা কইতে হবে হেসে হেসে। ওর অনুরোধগুলো পালন করতে হবে অমোঘ আদেশের মত।

যখন একা থাকতেন, যদিও তা সচরা-চর ঘটত না, মনে পড়ত ন্যায়-নীতি-আদর্শের কথা। নিজেকে ভীষণ দুর্বল মনে হত। ওসব থেকে সরে এসেছেন অনেক দূরে। ও শব্দগুলো মনে পড়লে ভয় পেয়ে চমকে উঠতেন। বেলসাজারের কাহিনী মনে পড়ত। নির্জন একটা হাত কি যেন লিখে যেত দেয়ালের গায়ে। ঘরের নির্জনতা একটা বিরাট ভয় হয়ে লাফিয়ে পড়তে চাইত তাঁর ওপর।

নিজেকে শক্ত করতে চাইতেন। বিরাট কিছু করতে গেলে ছোটখাট ভুলত্রুটি ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। দেশের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে কিছু করতে গেলে সবদিকে নজর দেওয়া যায় না। সম্ভব নয়। ক্ষেতকে ঘাস-মুস্ত করব বললেও দু-চারটে থেকে যাবেই। সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, আদর্শ আছে বলেই দেশের লোক তাদের চায়। চাষীর ঘরে পাকা ধান উঠে আসবেই চোখ-এঁড়িয়ে-যাওয়া ঘাসের মত লেটো-যদু মধুসূক্ত থাকা সত্ত্বেও।

বড় আনন্দ অনভব করতেন। গর্বে বৃকের ছাতি বিঘ্নথানেক বেড়ে যেত। বাইশ বছর দেশের অনেক কাজ করেছেন। লোকে সমালোচনা করে; গালাগাল দেয়। ওদের আমল দিলে চলে না—ভাবতেন নরনাথ। কাজ করতে গেলে ভুল হয়; সমালোচনা হয়। কিন্তু তার ফলে কাজ বন্ধ করা যায় না। দেশের প্রগতি তাঁদের ক্ষমা তাঁদের লক্ষ্য।

বাসনা বলতেন—তোমরা উটপাখির মত হয়ে গেছ।

—কি রকম?

—উটপাখি বালিতে মাথা গুঁজে দিয়ে ভাবে ঝড় আসে নি।

—এর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি?

—তোমরা স্তাবকদের কথায় ভুলে আছ। ভাবছ, কোথাও কোন গোলমাল হয় নি, সব আগের মত চলেছে। কিন্তু তোমাদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে—সাধারণ লোক তোমাদের চায় না।

নরনাথের মুখের ওপর খেলে যেত মাথা-হাসির চাপা চেউ। করুণা জাগত বাসনার ওপর। যীশুর বাণী মনে পড়ত : প্রভু, এদের আলোয় নিয়ে এস। ভাবতেন, অবলা জীব চিরটা কাল ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে কাটাল, বাইরের হাল-চাল বুঝবে কি করে? নরনাথ পালের সভায় কি পরিমাণ লোক হয়, কেমন করে জানবেন বাসনা? ওরা তাঁকে চায়—চায় তাঁর দলকে। তাঁরা জনসাধারণের জন্য ভাবেন, কাজ করেন। মনসা মিত্তির তো শব্দ লোক ক্ষেপিয়ে বেড়ায়। কাগজের জেলাওয়ারী হিসেব তাঁদের অনুকূলে। উটপাখী নরনাথ নন—মনসা মিত্তির। জনতার ক্ষোভের টাইফুনে ওদের ঝাণ্ডা উড়ে যাবে তেপান্তরের মাঠে।

হিসেবের কাঁড় বাঘে খেয়ে গিয়েছিল। সে সন্ধ্যার কথা নরনাথ ভুলে পাবেন না। যদু মধুসূক্ত আশ্বাস দিয়েছিল—আপনার জয় অনিবার্য। খবরের কাগজ খুলতে সাহস করতেন না: রেডিওর ধারে-কাছে যেতেন না। মহীরুহদের পতনের খবর কানে আসত। মনে হত, কালা হয়ে যাওয়া বোধ হয় ভাল ছিল। তবু মনের কোণে একটা ক্ষীণ আশা জাগত।

এলো সে সন্ধ্যা। মনসা মিত্তির ক'হাজার ভোটের ব্যবধানে জিতেছিল। রাস্তার আলো সব লাল। পথে পথে জনতার উল্লাস। মনসা মিত্তিরের বিজয় মিছিল থেমেছিল বাড়ির সামনে। পট কা ফাটল, বিউজল বাজল, চিৎকারে যেন বাড়ির ভিত কেঁপে উঠল। বাড়ির বাইরের দিকের সব জানলা-বরজা বন্ধ। ঘন ঘন পটকার শব্দে কাঁপছিল বাড়ির সকলে। মামথ যুগের টেরাডাকটিল আতঙ্কের কালো ডানা ছড়িয়ে দিয়েছিল বাড়িটার ওপর।

অন্ধকার ঘরে বাসনা সামনে বসে ছিলেন। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। বাসনা তাঁর একটা হাত ধরে ছিলেন। পটকার শব্দে চমকে চমকে উঠাছিলেন। নরনাথ বৃকতে পারেন নি কে চমকে উঠে ছিলেন—তিনি না বাসনা। কতকগুলো

হিজিবিজি ছবি চোখের সামনে দেখা দিয়েই মিলিয়ে গিয়েছিল। মিছিল, মিছিল, মিছিল। যদু মদুখুজ্জ, লেটো, আগরওয়ালা, মদুনিম খাঁ, আরো কত চেনা-অচেনা লোক।

অরপর কটা দিন কাটিয়েছিলেন বাড়ির মধ্যে। বাড়িটা এত স্তব্ধ আর বেনাবিন দেখেন নি। ইট-কাঠের ফিস্‌ফাস্‌ শব্দ কানে আসত। চমকে উঠতেন নিজের পায়ে শব্দ। চাকর-বাকর, ছেলে-মেয়ে-বাসনা সব যেন মিলিয়ে গিয়েছিল বাতাসে। বাসনাকে মাঝে মাঝে দেখতে পেতেন, কিন্তু তাঁর মনে হত, বাসনা যেন মাটিতে পা দিয়ে চলছেন না। অশরীরী ছায়ামূর্তি বাতাসে হেলতে-দুলতে ঘরের ফাঁক-ফোকরে মিলিয়ে যেত। তিনি ডাকতে যেতেন, গলায় স্বর ফুটত না; ধরতে যেতেন, মূর্তি হারিয়ে যেত হাওয়ার শূন্যময়তায়। তাঁর মনে হত, তিনি যেন পৃথিবীর আদিম মানুষ কিংবা কোন নতুন গ্রহে প্রকৃষ্ট একক প্রাণসত্তা।

বাসনা বলতেন—এ রকম করে বাড়িতে বসে থাকলে শরীর খারাপ করবে।

কোন কথা বলতেন না নরনাথ। বাসনার মূখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। হয়ত বাসনার মনের গভীরে দৃষ্টির জুবুরী পাঠিয়ে কি খুঁজে ফিরতেন। বাড়িতে বসে বাসনা যার আভাস পেয়েছিলেন, বাইরে ঘুরে তিনি তা পান নি।

—বাইরে থেকে কদিন ঘুরে এসে

মা।

—কোথা যাব?

—যেখানে তোমার মন চায়।

—তুমি সঙ্গে যাবে?

—আমি কি করে যাব! সংসার ক্রেতাদেশাশোনা করবে? তুমি সতীশকে নিয়ে যাও। শরীর-মন ভালো হচ্ছে।

—থাক, বাইরে যেয়েই বা কি হবে।

নরনাথের ফাঁকা মন আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল বাসনাকে। সব কিছু হারিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলেন বাসনার কাছে। কিন্তু তিনি হারিয়ে গেছেন সংসারের গোলকধাঁসায়। নরনাথকে সঙ্গ দেবার মত আজ আর কেউ নেই। বাইরের ঘরের দরজা আজকাল আর খোলা হয় না। লোকজন আর আসে না। একটা বিরাট নিঃসঙ্গতাকে বকে চেপে তিনি বসে থাকেন।

বিকেলবেলা একলা বোরিয়ে পড়েন। মায়ে হেঁটে বহুকাল বাড়ির বাইরে যান নি। একান্ত চেনা রাস্তা অচেনা মনে হয়। ভীষণ একটা অস্বস্তির কাটা শুটছিল বার বার। লোকে ফিস্-

ফাস্‌ করে কথা বললে, মনে হত, তাঁর সম্বন্ধে বড় কথা হচ্ছে। সকলেই যেন আঙুল তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে তাঁকে।

রাস্তাঘাট সব নতুন। লোকজনের মূখের ভাবে মনে হয়, চেনা সব। কিন্তু কেউ স্বীকৃতি জানায় না। তিনি এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান। কেউ তাঁকে ডাকে না, কথা বলে না। এতো মানুষের মধ্যে থেকেও নিজেকে নির্বাসিত মনে হয়। পৃথিবীর রং পালটে গেছে কার্‌নে।

দুটো ছেরের কথা কানে এল।

—নরনাথ পাল কত ভোটে হেরেছে?

—সাত-আট হাজার। লোকটার জন্যে মায়া হয়।

—কেন?

—লোকটা নাকি সাদ্ব্যাসি হয়ে গেছে।

—ইজ্‌ ইট্‌!

তাঁর চিংকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল : আমি তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে তোমরা চিনতে পারছ না? আমি নরনাথ পাল। চারদিকের পোস্তারগুলো নজরে পড়েছিল—জনগণের একনিষ্ঠ সেবক নরনাথ পাল আপনাদের ভোট প্রার্থনা করে। জনগণের সেবককে আজ কি কেউ চেনে না? তাঁর জনসভায় যে হাজার হাজার লোক জমায়েৎ হত, তারা কারা? কোথা থেকে আসত তারা?

সত্যি এটা নতুন পৃথিবী। সাধারণ লোকের সঙ্গে তাঁদের কোন যোগাযোগ

নেই। নরনাথের নাম সকলে জানে, লোকটাকে চেনে না সাধারণ মানুষ। মিছিলের লোক আসত জনসভায় তাঁর জয়ধ্বনিতে। আকাশ কাঁপিয়ে, কিন্তু তাঁকে কি তারা চিনত? দৃষ্টির রূপান্তর ঘটেছিল। অকস্মাৎ ঘুম থেকে উঠে ভাবিয়েছিলেন পরোনো পৃথিবীর দিকে—তিনি অপরিচিত এ জগতে, নবাগত আগন্তুক।

বাসনা বলেন—গাড়িতে করে বেড়াতে যাও না কেন?

—না, পায়ে হেঁটেই বেশি আরাম পাওয়া যায়।

—লোকের পাঁচ কথা বলতে পারে?

—আমাকে কে-ই বা চেনে! লোকে নরনাথ পালের নাম জানে, কিন্তু মানুষটাকে চেনে ক'জন? সাধারণ মানুষের সঙ্গে সত্যি আমাদের কোন পরিচয় নেই।

বাসনা আর কিছু না বলে চলে যান। নরনাথ সত্যকে স্বীকার করে গভীর তৃপ্তি উপলব্ধি করেন। এককাল অশ্বকারে ছিলেন বলে আপশেষ করেন। পরাজিত হয়ে প্রথমে খুব মদুর্ভেদে পড়েছিলেন। আঘাতটা বেজোঁ ছিল। শেলাঘাতের মত। বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পেয়েছিলেন। কিন্তু এখন ভাবেন, পরাজয় না হলে জালের আবরণ থেকে মুক্তি পেতেন না।

অথচ একদিন আদর্শ সম্বল করে দেশসেবার কাজে এগিয়ে এসেছিলেন।

ভারতের
আদিতন
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত



চ্যবনপ্রাশ মূতন ও পুরাতন-সর্দি কাশি, শ্বস্বাস ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী। টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যাত্মক পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ও বোম্বাই ক্যানপু

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

দেশ ও দেশের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু চিন্তা করতেন না। তখন বাস করতেন মানুষের কাছাকাছি। সাধারণ লোকের উত্তম হৃদয়ের অক্লিষ্ট ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না—ছিল না স্বার্থের স্পর্শ। তারপর কোথা থেকে কি হয়ে গেল। মাটি থেকে উঠে এলেন জনসাধারণের মাথার ওপর—নরনাথ পাল জননেতা, গণসেবক।

রাজ্য বিকেলে যখন আকাশের আলো মরে আসে, তখন তিনি বেরিয়ে পড়েন বাইরে। কোনদিন বা যান গঙ্গার ধারে: কোনদিন বা বসে থাকেন পার্কে; কোনদিন বা হেঁটে বেড়ান এদিক-ওদিক। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে খেলা করে। অকারণে উচ্ছল হাসির ফোয়ারা ছুঁড়ে দেয় আকাশের বদকে। কটা ছেলে-মেয়ে তাঁকে দাবু বলে ডাকে। একেবারে তাঁর কোলের মধ্যে ধরা দেয়। একরাশ কনকচাঁপা ফুটে ওঠে তাঁর চারপাশে।

দুটো ঘুবক এসে তাঁর পাশে বসে। দুজনে সিগারেট টানে। অন্ধকার ঘনিষে আসে। ছোট ছেলেরা ফিরে গেছে। পার্কে আলো জ্বলে ওঠে। লোক হাঁড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে এদিক-সেদিকে।

—কি রে, চাকার পেলি?

—না।

—মিউনিসিপ্যালিটিতে লোক নিল, দ্রুতান্ত করিস নি?

—করেছিলুম; কিন্তু ইন্টারভিউ দেবার আগে শুনলুম লোক নেওয়া হয়ে গেছে।

—তাহলে ইন্টারভিউ করে কি লাভ?

—আরে ওটা শুধু আই-ওয়াশের ব্যাপার। এস. ওয়াজেদ আলির লেখা মনে পড়ে: সেই ট্রাডিসন আজো চলিতেছে। আমি শালা বি. এ. পাশ করে ফ্যা ফ্যা করছি আর পার্টির লোক স্কুল ফাইনাল, চাকার পেয়ে গেল। গাঁদা বদলেছে, কিন্তু স্বজন-পোষণ চলেছে আগের মত। দুর্দিন আগে এরা গালাগাল দিত। জনসাধারণ-জনসাধারণ মুখে বলে, ওটা গ্রাফ ছাড়া কিছু নয়।

—প্রতিবাদ কর।

—তা হলেই চীৎকার শুরু করবে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। সরকার বদল হয়েছে, কিন্তু আমাদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। এরাও যে-যার ঘর গোছাতে ব্যস্ত। পার্টি লোক না হলে কিছু হবে না। আমরা যে ভীমরে ছিলুম সেই ভীমরেই

আছি। তবে জানবি, এ বণ্ডনার একদিন শেষ হবে, আমাদের একদিন আসবে।

সে সন্ধ্যার আবছা আলো, আবছা অন্ধকারে নরনাথ ওদের মুখ দেখতে পান না ভালো করে। সাধারণ চেহারার দুটো ছেলে—জনতার মাঝে সহজেই হারিয়ে যাবে। কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই ওদের কাঠামোয়। শুধু গলার স্বরে ব্যর্থতার মধ্যে একটা গভীর প্রত্যয় বেজে ওঠে। শব্দে চমক লাগে, চমকায় মিইয়ে-পড়া মনটা।

এরা আগেও অবহেলিত, আজো রাত। এদের জন্যে তাঁরাও চিন্তা করেন নি। এরাই মাটির কাছাকাছি সাধারণ মানুষ। এ চিন্তা আগে কোনদিন করেন নি। রাজনীতির ক্ষমতার যে উচ্চ মঞ্চে বসেছিলেন, সেখানে এদের কথা বলার কেউ ছিল না। তাঁর মনে হয়, পরিবর্তনের মধ্যে এদের সুর বেসুরো বাজলেও, কোথা একটা সত্য লুকিয়ে আছে।

তাঁর মনে পড়ে সেই চালওয়ালীর কথা। থানা থেকে দূরশো গজের মধ্যে বসে চাল বিক্রি করে। তাঁর অনভাস্ত চোখে কেমন অস্বাভাবিক লেগেছিল। থানার এত কাছে থোলা জায়গায় চালের কালোবাজারী চলে—পুলিশ কিছু বলে না কেন? চালওয়ালী বলিছিল—বাবু, ঘুর নেওয়া কি বন্ধ হয়েছে? আগেও ঘুর চলত, আজো চলে।

তিনি বলিছিলেন—কিন্তু সরকার তো বদল হয়েছে?

—তাতে কি হয়েছে। কটা মন্ত্রী পাণ্টে কি হবে বাবু? সেপাই তো সেই আগের আমলের। ঘুর পেলে এরা চোখ বজ্জে থাকবে।

—চেক পোস্টে ধরে না?

—বাবু, আপনি কিছু বোঝেন না। চেক পোস্টের পুলিশও তো আগেকার। ঘুর পেলে ওরা চাল বয়ে দিয়ে যাবে কাঁধে করে। বাবু, সবই চলছে, কিছু বন্ধ হয় নি। এখানে যত রেস্ট্রিক্ট আছে, ওখানে সন্ধ্যার পর ঢোলাই বিক্রি হয়। থানার বাবুরা মোটা খায়, তাই কিছু বলে না।

নরনাথের কেমন সব গোলমাল লাগে। রামরাজ্য তাঁরা গড়তে পারেন নি এবং চেষ্টা করলেও গড়া সম্ভব নয়! লোকে বলত, দেশের মাটির মধ্যে দর্শনীতি ঢুকে গেছে। তখন মনে হ'ত, এসব অপপ্রচার, তাঁদের হেনস্থা করবার একটা ফিকির মাত্র। কেবলমাত্র রটনা, ঘটনার স্পর্শ নেই এর মধ্যে। এখন চিন্তার দিগন্তে নতুন আলো দেখতে পান।

থানার পাশ দিয়ে আসবার সময় নজরে পড়ে, থানা থেকে বেরিয়ে আসছে মনসা

মিস্ত্রি। পিছনে যদু মৃধুজ্জের। ভীষণভাবে তিনি চমকে ওঠেন। নিছের চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না। মনসা মিস্ত্রির সঙ্গে যদু মৃধুজ্জের অতীত হয় কি করে? অঙ্কের হিসেব মেলে না। দুই আর দুয়ে কিছুতেই চার হয় না।

যদু মৃধুজ্জের তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়, পারে না। চোখাচোখি হয়ে যায়। থেমে পড়ে। নরনাথের দিকে এগিয়ে আসে। বলে—ভালো আছেন, দাদা?

—তুমি এখানে কি করছ?

—কাজ-কারবার থাকলে থানা-পুলিশের সঙ্গে দোস্তী রাখতেই হবে।

—মনসা মিস্ত্রির সঙ্গে দোস্তী আছে নাকি?

—দাদা, সব সময়ে আমরা সরকার পক্ষে।

—তোমাকে ওরা আমল দেয়?

—কেন দেবে না? লেটো আর তার দলবলকে কে না চায়? দাদা, সব পার্টিই চাইছে শক্তি বাড়াতে। সুতরাং বুঝতে পারছেন, আমাকে কেউ চটতে সাহস করে না। আপনিও আমার হয়ে তাঁর করেছেন, এরাও করে। জনসাধারণ ইত্যাদি বললেও সব নেতাই দেখে নিজের আর পার্টির স্বার্থ। দেখছেন না সকলে কি রকম খেয়োখোয়ি করছে। এর মধ্যে পড়ে পাবলিক মরে ভূত হয়ে গেছে। আচ্ছা, দাদা, চলি, পরে আবার দেখা করব।

বঙ্কুর চায়ের দোকানে খন্দের কমে আসে। রৌডিও চীৎকার করে। বাস থামে। ঘণ্টা বাজে। আবার বাস চলে। সব ঠিক আছে, কোথাও ছন্দ-পতন নেই। একান্ত সহজভাবে মসৃণ পথে জীবনযাত্রা গড়িয়ে চলে।

মনসা মিস্ত্রি ও যদু মৃধুজ্জের—উত্তর দক্ষিণ মেরুর মিলন। অশ্রুত মিলন। লেটোর প্রয়োজন আজো ফুরোয় নি। আগরওয়ালী-মুনিম খাঁ হয়তো অন্য কোন ঘাটে নৌকো বেঁধেছে। সব ঠিক চলছে।

বাসনার কথা তাঁর মনে পড়ে, উট-পাখি। তিনি বুঝতে পারেন, যদু মৃধুজ্জের আগরওয়ালী-মুনিম খাঁ-লেটো চোখে সামনে বদলিয়ে দেয় মোটা পর্দা। চোখে আলো পড়ে না, অন্ধকারের মধ্যে বাস করে মনে হয়, সব ঠিক চলছে। বিশ্বাসের দৃঢ়ভূমি যে চোরাবালির চর—বুঝতে পারা যায় না।

পার্কের সে-ছেলেটার কণ্ঠের প্রত্যয় ধ্বনিত হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পান ওর মধ্যে। উটপাখি বালিতে মৃদু গুঁজে পড়ে থাকে। পেছনে যে দরবার মরু-খড় তীরবেগে ছুটে আসে, তা সে বুঝতে চায় না। তবে খাদ আসে।

লোকসঙ্গীতের একগাল না আকাল?

মুরশিদ

মুরশিদের মোকামে ইদানীং হামলা দিয়েছে হনলুদুর হাওয়া আর ক্যালি-ফোর্নিয়ার বাউলী। সানফ্রানসিস্কা শহর থেকে এক বাউল ভাই-এর চিঠি পেলাম—“পুঞ্জনীয় দাদা...প্রথমে ব্যাকক, তারপর হনলুদু, পরে হংকং, তারপর টোকিও ঘুরে এলাম সানফ্রানসিস্কা। শহরের তুলনা হয় না। সে আর আপনাকে কি লিখব। আসার পর বেতারে, টেলিভিশনে, রেকর্ডে গান করলাম।... আমার সাথে আলী আকবর ও শংকর ঘোষ আছেন। এক সাথে জলসায় গান-বাজনা করি...” এর পরের চিঠিটাতে তাঁর সাফল্য, আমেরিকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর ফটো সহ পাবলিসিটি, কতো রকমারি খবর। এই নব্য বাউল ভাইটি হলেন শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী। কিছুদিন পরে সেখান থেকেই আরেকজনের চিঠি পেলাম—তিনি মুরশিদের অতি পিয়ারের দোতারা বাদক। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ দু’ ধরনের দোতারাতেই তাঁর দখল চমৎকার। কোলকাতার অলিতে গলিতে সেতারী পাবেন—কিন্তু দোতারা বাদক পাবেন না। লোকসঙ্গীতের ভান্ডারও তাঁর মন্দ নয়। সানফ্রানসিস্কা থেকে তিনিও চিঠি দেন। চিঠিতে প্রথমে তাঁর আকাশী ভ্রমণের এক মনোগ্রাহী বর্ণনা দিয়ে পরে লেখেন—

“হংকং এবং টোকিওতে ‘এয়ার লাইনস্’ আমাকে হোটেল থেকে ব্যবস্থা করেছিল। হংকং-এ যে হোটেল উঠি তাঁরা আমার হাতে দোতারা দেখে জিজ্ঞেস করে, এটা কি যন্ত্র? পরে তারা আমার নামে যায় এবং তাদের আমি দোতারা বাজিয়ে শুনাই। চাং-হুয়া বলে একটি ছেলে আমার সঙ্গে ‘বংগো’ বাজিয়েছিল। আমি যখন খেমটা তালে দোতারা বাজাতে থাকি, তখন লু-ফিং নামে একটি মহিলা নাচতে শুরু করেন।...হংকং এয়ার পোর্ট-এ ট্যাক্সি দিতে হয় ১০ হংকং ডলার। কিন্তু আমি তা জানতাম না। আমার কাছে কিছুই ছিল না। পরে হোটেল যারা আমার বাজনা শুনিয়েছিল—তারা

নিজেদের থেকে ঐ ট্যাক্সি দিয়ে গেল।..... আমি এখানে (সানফ্রানসিস্কাতে) খুব ভাল আছি, আমার ঘরটি বেশ সাজানো গোছানো। আমার ঘরে টেলিফোন, রেডিওগ্রাম, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন সব কিছু আছে।”.....

মনে পড়ে গেল টেপ মিগ্রার কথা। বহুদিন আগে কোচবিহারের চিরস্মরণীয় এই গ্রাম্য গায়কটি দোতারা বাজিয়ে আমাকে তাঁর গান শুনিয়েছিলেন—

ওরে কাঁঠল কাঠের দোতারা
তুই আমারে করিলি বাড়িরিয়া।

গরীব গ্রাম্য দোতারা বাদকের জীবনের দারিদ্র্য ও সমাজের অবহেলা সমস্ত যেন সেই গানটিতে দোতারার তারে তারে গুঞ্জন করে উঠেছিল। কিন্তু সানফ্রানসিস্কার এই দোতারা বাদকের জন্য এ গান তো অচল, তাই ভাবি তার জন্য একটা গান লিখে পাঠাইঃ

সাধের দোতারা রে, তুই আমার বন্ধু,
তুই আমার সখা
তোরেই দৌলতে আমি
আইলাম আমেরিকা।

যা হোক, কোলকাতার এই দোতারা বাদকটি হলেন শ্রীপরিতোষ রায়। তিনি এবং প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী তাঁরা দুজন এখন সেখানকার “বেংগল ফোক ব্যান্ডের” সভ্য। সেই বেংগল ফোক ব্যান্ড হলো সানফ্রানসিস্কার “লোকধর্ম মহাপ্রমের” অন্তর্গত। বিরাট জায়গা জুড়ে নাকি এই মহাপ্রমটি স্থাপিত। তাঁদেরই পরিচালিত Hindu School of Transcendental Music. সেখানে আমেরিকার ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হয়। ওদের ভারতীয় ‘মর্টিফে’ সঙ্গীত, সঙ্গীত প্রচারপত্রটি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সেখানে সেখানে হয় “Ancient Traditional Mantrams, Devotional Spiritual, Folk and classical songs and

the playing of instruments like Harmonium, Tabla, Tanbura, Ananda-Lahri, Sri Khole.. Mandira, Ektara, Dotara and Sitar.” সেখানে ভারতীয় নৃত্যের ক্লাসও হয়।

যা হোক, এখানে ‘বেংগল ফোক ব্যান্ড’ই হলো মুরশিদের আলোচনার এস্তিয়ারে। অনেকদিন আগে আমি লিখেছিলাম, লোকসঙ্গীতের আদার ব্যাপারীকেও এ যুগে জাহাজের নয়—উড়োজাহাজেরো খবর রাখতে হয়। কারণ মার্কিন মুলুকে এখন খমকের গব্বি আর লাউয়ার গুন-গুনিতে গুলজার।

এদিকে আবার আমাদের দেশে বংগো, কংগো আর মারাকাছের মারামারিতে পপ্ মার্কি বাংলা গীতের ছড়াছড়ি। মনে হলো ডি এল রায়ের গান—

হলো কিরে, হলো কি
এ তো বড়ো আশ্চর্য্য
বিলাতি ফেরৎ টানছে হুঙ্কা
সিগারেট খাচ্ছে ভটচাঁয়া।

যা হোক, এদেশে ভদ্রসমাজ থেকে এক তারা, দোতারা নির্বাসিত হয়ে যদি সাগর পারে মার্কিন মুলুকে আদর আর কদর পায়, তাতে মুরশিদের কেন, সকলেরই খুশির কথা। আজকাল লোকসঙ্গীতের আসরে পর্যন্ত একতারা-দোতারা কণ্ঠ পায় না—যদি বিদেশে সসম্মানে মারিজুয়ানার ধোঁয়া পায়, তাতে অখুশির কি থাকতে পারে!

অন্য কথায় যাবার আগে এই উলটপুড়ানোর প্রচ্ছদপটটা একবার এক নজরে দেখে নেয়া যাক। ইদানীং ‘ট্রেন্ডেন’ বলে একটা আওরাজ উঠেছে। দেশের সুদৃষ্ট-প্রতিভারা সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। কেউ এদেশের মাটিতে আর ভাল মেলতে পারছে না। খোরানা, নারলেকের আমাদের গর্ব, আমাদের লজ্জা। কিন্তু কৃতিত্ব আমাদের ছোটো-বড়ো শিল্পীদের।

উল্টা বিদেশকে তাঁরা 'ড্রেন' করে এদেশে নিয়ে আসছেন। কিন্তু তাতে যদি আমাদের রাগসংগীতেও এল, এস, ডি'র ধূপের ধোঁয়া লাগে—সেটা তেমন দৃশ্যীয় নয়। উচ্চাঙ্গসংগীতে রবিশঙ্কর যখন আত্মপ্রকাশ গোপেন, ভারতবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। বিদেশকে দিবার আমাদের আর কিছু আজ না থাকলেও আছে আমাদের সংগীত। বিশ্ব অর্লিম্পিকে আমাদের একচেটিয়া হকির গোল্ড মেডেলটি অন্যরা ছিনিয়ে নিলেও বিশ্ব-সংগীতে সেতার, সরোদের গোল্ড মেডেল কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু দেখতে না দেখতে ভারতীয় সংগীতের দরদী সমঝদার বিশ্ববিখ্যাত বেহালা বাদক ইহুদী মেনুইনের পাশ থেকে রবিশঙ্করকে ছিনিয়ে নিল 'পপওয়ালারা'। ম্যায় বীটলসরা তাঁর শিষ্য গ্রহণ করলো। রবিশঙ্কর হয়ে উঠলেন 'পপস্টার'। হিপিদের 'গুরু'। ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যে অভ্যন্ত মূল্যবান সংযোজন হলো সেতার, সঙ্গে কলিদার পাঞ্জাবী আর চুড়িদার পায়জামা এবং টনের পর টন হনুমান মার্কা বিড়ি। তার সাথে অদৃশ্য, অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণচেতন্য, হরেকৃষ্ণ, হরে রাম। আমরা আরো আশ্চর্য হলাম যখন রবিশঙ্কর জানালেন, তাঁর হাবরা নাকি খুব 'সিরিয়াস'। হিপিরা সেতার বগলদাবা করে ঘরে বেড়াতে লাগলো। এই 'অম্ভত' যন্ত্রটি দিয়ে ভারতীয় 'ডিভাইন মিউজিকের' সাহায্যে ইহজাগতিক চেতনা থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম-চেতনায় পৌঁছানো যায়। ভগবানের সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া চালানো যায়।

কিন্তু ইদানীং পণ্ডিত রবিশঙ্করের নাকি মোহ মাজি ঘটেছে। গত বছর ডিসেম্বর মাসের ৭ তারিখ অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির কাছে তিনি যা বলেন তা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি অব্যবহার করে দিচ্ছি।

"বিটল জর্জ হ্যারিসন আমার শিষ্য নৈবাব পব সেদেশে ফার্দিকে যেন এক জোয়ার এল। ভারতীয় সংগীতের প্রতি এই হজুগে সেখানে আমাদের দেশের সেতারবেব, লক্ষী স্নাইলের চুড়িদার পায়জামা আর পাঞ্জাবী, আতর প্রভৃতির এক বিবাহ বাজাব খলে গেলো।...রাত-রাত আমি ওদের মাঝে হয়ে গেলাম adored idol.....আমি এমন অবস্থায় পড়লাম যে, আমাকে পলিশের সাহায্য পর্যন্ত নিতে হলো...কিচ, জেলে ও মেয়েরা আমার ঘরের উঁচু দেয়াল বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে চুপি মারতে আরম্ভ করলো, ঠিক যেন আমি তাদের Pop Star!.....

ভারতীয় বন্ধুবা আমাকে সমালোচনা করতে লাগলেন...আমি নাকি ভারতীয়

সংগীতের পবিত্রতা বিসর্জন দিয়ে সম্ভ্রান্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করছি।...আমাকে ওরা গুরু বলে, কিন্তু ওদের মার্কিনী 'গুরু'দের সঙ্গে আমার পার্থক্য বজায় রাখবার চেষ্টা করলাম। আমি আমার কনসার্টে মেয়েদের কোমরধরা নেশাখোরদের আসতে নিষেধ করে দিলাম।

"ভারতীয় সংগীত হলো আধ্যাত্মিক। ..it has all the Psychedelic and spiritual experience you want. It is our upward urge, search for Divinity and as such should be heard with devotion."

"ফল হলো খুব ভাল, এখন তরল-মতি কেউ আসে না—যাঁরা ঐকান্তিক সত্যের সম্বন্ধী তাঁরাই কেবল আসেন। আমি ও আলী আকবর ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করতে থাকলেও ওরা মন্থমুগ্ধ অপ্রসিস্ত চোখে শুনতে থাকে।"

পণ্ডিত রবিশঙ্করের এই আত্ম-সমালোচনা কিংবা আত্মোপলব্ধিতে আমরা খুশি। কিন্তু পণ্ডিত রবিশঙ্কর ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে যে কথাগুলি বলেছেন—নতুন উপলব্ধি হলেও তা অতি পুরাতন কথা। মূর্খ মুরাশিদের উপলব্ধিতে তা আসে না। চোখের জলে কিছই প্রমাণ করে না। নেশায়ও চোখের জল আসে। আবার পদাবলী কীর্তনের আসরে গিয়ে দেখেছি কিছ পরম বৈষ্ণব গানের সরু থেকেই চোখের জল ফেলতে আরম্ভ করেন।

সংগীতের 'নাদব্রহ্ম' ও আধ্যাত্মিক, আর্থদৈবিক প্রভাবের কথা অনেক শুনছি। কিন্তু এই সংগীতপ্রিয় নাস্তিক তার কিছই উপলব্ধি করতে পারেন নি। Sidney Finkelstein তাঁর How music expresses ideas বইতে সংগীত-সৃষ্টি সম্বন্ধে লিখেছেন: "Works of music contain, at their core, human images, typical human actions and relationships. It is the presence of these human images that enables music to arouse emotions." পাশ্চাত্য সংগীত 'বহিমুখী' আর প্রাচ্য সংগীত অন্তর্মুখী হলেও মূলত সংগীত হলো "development of human images in sound"—একথা মুরাশিদ বিশ্বাস করেন। মূলত সেটা সৌন্দর্যনিষ্ঠতার ব্যাপার, কোনো তরীয়মাগের ব্যাপার নয়। কেন ঘন্টার পর ঘন্টা আলী আকবর আর রবিশঙ্করের বাজনা শুনে শোনে—এই মুরাশিদের মতো নাস্তিকরাও। ভারতীয় abstract music-এ যদি কেউ ইগজের অনর্ভূতি পান, তাহলে

মুরাশিদের বলবার কিছ নেই।

বর্তমানে এই 'ডিভাইনিটি' বা দেবত্ব বা ঈশ্বর শব্দটা কিন্তু আমার সন্দেহ উদ্রেক করে। এই 'ডিভাইনিটি'র সঙ্গে ডলারের সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ ডলার অর্জনের। একদিন ভারতের 'ডিভাইনিটি' আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যে প্রচার করতে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু বিবেকানন্দ চিরাদিনই রয়ে গেলেন ষোগী-ডিভাইনিটি। কিন্তু এযুগে পাশ্চাত্যে ভারতীয় 'ডিভাইনিটি'র প্রধান প্রচারক মহেশ ষোগী নিজের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত রোলস রয়েস গাড়িতে ঘুরে বেড়ান। সেকাল আর একাল।

আমেরিকায় বাংলা লোকসংগীত প্রচারের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে এই ভাণ্ডার প্রয়োজন ছিল। নামটা শুনলেই বুদ্ধিতে পারবেন Transcendental School of Hindu Music, তার পরিচালক ও সংগঠক হলেন শ্রীঅশোক ফাঁকির, যাঁর পরিচয় তাঁদেরই প্রচারপত্রে দেওয়া হয়েছে "Cultural and Spiritual Messenger" বলে। তাদের শাখা "বেঙ্গল ফোক ব্যান্ড"। তাতে প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী ও পরিতোষ রায় ছাড়াও আছেন বাঙালী গায়িকা ও নৃত্য-শিল্পী অপর্ণা দেবী ও কুমারী ললিতা। ওঁদের সেখানকার অনুষ্ঠান দেখি নি। কাজেই এ-বিষয়ে কোনো মন্তব্য করা অনর্ভূত। ভারতের বাইরে প্রচারপত্রে ভারতের সব শিল্পীকেই "ভারতের শ্রেষ্ঠ" বলতে হয়। তাতেও দোষ ধরতে চাই না। আমি শব্দ দুটো জিনিস: আলোচনা করবো—বাংলা লোকসংগীত ও ওঁদের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং ওদেশের দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রথমেই বলে রাখছি আমেরিকা বললেই আমার কোন বিরূপ ধারণা হয় না। আমার প্রিয়তম শিল্পীদের মধ্যে আছেন পল রবসন, পিটসিগার। আমার প্রিয়তম বিদেশী লোকসংগীত হলো নিগ্রো স্পিরিচুয়েল। নাম তার স্পিরিচুয়েল হলেও তাতে কোনো আধ্যাত্মিক ব্যাপার নেই, আছে নিপীড়িত মানবতার হৃদ-স্পন্দন। শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এগুলি অধিকাংশই Protest songs. কলকাতায় যাঁরা পিটসিগারের গান শুনছেন, তাঁরা জানেন—তাঁর লোক-সংগীতে গভীর জীবনবোধ ও আমেরিকার সাধারণ মানুষের মনের গুণিবাণ্ড আমাদের কি রকম অভিভূত করেছিল। যে গানটি ছিল একদিন স্পিরিচুয়েলের অন্তর্ভুক্ত, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে হাজার হাজার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের মিলিত পদক্ষেপে সেই 'We shall overcome' গানটি সংগ্রামী গানে

রূপান্তরিত হলো। পিটিসগারের কাছে আমরা সে গানটি অসীম আগ্রহে শিখে-ছিলাম। আমরা পেয়েছি আজকের আমেরিকার আর এক ছবি। ভিয়েনাম ও কম্বোডিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ক্যান্টের ছাত্র-শহীদদের রক্তে আঁকা সেই ছবি। কাজেই আমাদের লোকসঙ্গীত শিল্পীরা আমেরিকায় গেছেন বলেই সমালোচনা করবো না। মুরশিদ পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাংগীতিক বিন্যাসে বিশ্বাসী, বিশেষত লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের মধ্যে পৃথিবীর সাধারণ খেটে-খাওয়া মানবের একটি অখণ্ড ছবি পাওয়া যায়। খাঁটি লোকসঙ্গীতে 'ডিভি-নিটি' নয়, আছে 'হিউম্যানিটি'।

আমেরিকায় "বেঙ্গল হিন্দু ফোক ব্যান্ড" কি সেই উদ্দেশ্য সাধন করছে? 'গুরু' শ্রীঅশোক ফারকের কথায় 'ভারতের আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়বাদ প্রচার করছে।' একদিন এই 'আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয়' ভাব প্রচারের জন্যই সেদেশে গেছিলেন বাংলার বাউল শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস। কিন্তু তারও আগে আমেরিকার বীটনিক কবি গিন্সবার্গ বাংলাদেশে এসে বাউলদের গঞ্জিকাজাত তুরীয়মার্গে বিচরণ করে-ছিলেন এবং "কৃষ্ণচৈতন্য" মন্ত্র হয়ে আমেরিকায় গিয়ে প্রথম গঞ্জিকার সাথে "কৃষ্ণ কনসার্নেন্স" প্রচার করেন। (এই 'কৃষ্ণচৈতন্যের' সংগে বাউলদর্শনের কোন সম্পর্ক নেই)। যা হোক, হিপি ও বাউলের সমন্বয়ের পথে সেদেশে প্রথম পরিদর্শন করেন বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস। তখন দৈনিক স্টেটসম্যানের প্রতিনিধি যে রিপোর্ট পাঠান, তাতে তিনি লেখেন যে, বাউলের গানে আমেরিকানরা নাকি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় মাতাল হয়ে যান। শব্দ গানে নয়, বাউলের গেরুয়া আলখালা, রত্নাক্ষের মালা, খালি পা, লম্বা চুল, কপালে তিলক ইত্যাদির সাথে গুব-গুব, মন্দিরা ও একতারার মত ভারতীয় 'উম্ভট' যন্ত্রের মোহমগ্নে নাকি ফিলাডেলফিয়া ডব-ডব, বার্ক'লে ভেসে যায়। সেই রিপোর্টেই জানতে পেরে-ছিলাম বার্ক'লেতে 'প্রভো পাক' পূর্ণ দাসের গান আরম্ভ করার সংগে সংগে দল বেঁধে আমেরিকানরা "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ" এমনভাবে গাইতে শুরু করে যে, বাউল নিজেই নাকি বেসামাল হয়ে যান। বাউল নবনী দাস বিশ্ব-বাউল রবীন্দ্র-নাথের আসন্ন স্থান পেয়েছিলেন। আমেরিকায় কৃষ্ণচৈতন্যের পচারক নবনী দাসের সহযোগী পত্র বাউল পূর্ণচন্দ্র দাস ক্রেন্ডির লাম্পের টেবিলে নিমন্ত্রণ পেয়ে-ছিলেন। একি আমাদের কম গৌরবের কথা!

বেঙ্গল ফোক ব্যান্ডের সমুদ্রিত

প্রচারপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় সিলেটের একটি প্রচলিত ধামাইল গানের (আমি কি হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া) ইংরাজী অনুবাদ ছাপানো হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণকে Lord Krishna বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'Lord Krishna is the God of great beauty and eternal youth.'

কিন্তু আমরা জানি সামন্ততন্ত্রের বাধা-নিষেধের গুড়ীর মধ্যে গৃহবন্দী গ্রাম্য পুরনারীর মন্দির আকৃতি রাধাকৃষ্ণের প্রতীক অবলম্বনে ব্যস্ত হয়েছে। এই কৃষ্ণ ভাগবতের কৃষ্ণ নয়। এ গায়ের ছেলে।

রাধা গেল জল আনিতে

কানাই লাগিল পাছ

হাতের বাঁশী ভূমে থাইয়া

কানাই মারে মাছ।'

এ হলো মাছ-মারা কানাই। কিংবা—

'আজকে যদি থাকতো আমার শ্যাম

আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিতো ঘাম।'

এ হলো গৃহকর্মরত রাধার ঘাম মর্দিয়ে দেয়া শ্যাম। আমেরিকায় তিনি 'ডিভাইন' কৃষ্ণ। 'কৃষ্ণচৈতন্যের' কৃষ্ণ। তাই তাঁকে করা হয়েছে "লর্ড কৃষ্ণ"।

"লোকধর্ম মহাশ্রমের" এই সঙ্গীত শাখাটি 'লোক নয় অলৌকিক ধর্ম প্রচারে' সেখানে রতী। আমেরিকায় ভারত হলো বাঘ, সাপ, ম্যাজিক, সাধু ও অলৌকিকতার দেশ। কাজেই সেই ব্যাপার না হলে জমবে কেন? পি এল—৪৮০-এর গম খেয়ে, আগম-নিগমের যৌগিক সাধনায় মগ্ন ভারতের ছবিই শব্দে আমেরিকার বাজারে উলার অর্জন করতে পারে। কোনো পাঠক আমার এই বর্ণনাকে অত্যাঙ্কি যাতে মনে না করেন, সেজন্য সাপ্তাহিক "দেশ" পত্রিকায় প্রকাশিত গত এই মার্চ "ওয়ারাশং-টনের চিঠি" থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। সহৃদয় পাঠকরা মন দিয়ে পাঠ করুন... "এই প্লেল্যান্ডের কনসার্ট হলে এক সম্মোহন হিন্দু লোকসঙ্গীতের অনুষ্ঠানে হাজির

হলাম। সেদিন ওখানেই রক মিউজিক এবং নানারকম আনকনভেনশনাল নাচ-গানেরও বন্দোবস্ত ছিল। হলের ভিতর খুব ভিড়। গাঁজার ধোঁয়া, চরসের সুগন্ধ এসবেরও প্রাবল্য ছিল। প্রমত্ত যুগল নৃত্য, একক আন্দোলন, তৎসহ সরের সংস্পর্শ-শূন্য বিচিত্র চড়া পর্দার আওয়াজ ও ড্রামের 'গুরু গুরু, দুদুরো দুদুরো সুদুরভীর দুদুর দুদুর' এসব অনেক পর যখন থিতুয়ে এল, তখন মাস্টার অব দি সেরিমনি মাইকে ঘোষণা করলেন : বন্ধগণ, এবারে মঞ্চে আসছেন হিন্দু লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা। দু'লতে দু'লতে চলেতে চলেতে শ্রোতা দর্শক অনুষ্ঠাতারা কেউ কেউ বাইরে চলে গেল। অনেকে জমিয়ে বসল। বসার ব্যবস্থা মাটির ওপরে! গান আরম্ভ হল : 'হেরি মৃচ্চান্দে ঠেকিয়াছি ফান্দে.....সজনী গো কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া...' খমকের খচমচ আর ঘুঙুরের রুনবুন সব মিলে গোটা আসরের মধ্যে সংগে সংগে একটা নিবিড় পঞ্জীজন পরিবেশ আনন্দময় হয়ে উঠল। আনন্দলহরী বাজিয়ে হেলে দুলে ঝাঁকড়া চলে নাচিয়ে বাংলার যে সুদর্শন তরুণ বাউল সৌদীন মণ্ড মাটিতে দিয়ে-ছিলেন, তাঁর নাম প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী।"

সেই চিঠিতে আরো অমূল্য তথ্য থাকলেও এ পর্যন্ত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। পরপ্রেক্ষ মহাশয় এর মধ্যেও "পঞ্জীজন পরিবেশ" আবিষ্কার করেছেন: সেটাই সানফ্রানসিস্কোর পঞ্জীজন পরিবেশ। আর সেই পরিবেশেই "বেঙ্গল ফোক ব্যান্ড" বাংলার লোকসঙ্গীতের "কৃষ্ণচৈতন্য" হিপিজন হিতায়চ বিতরণ করছেন। তারপর মুরশিদ আর কি বলতে পারেন? "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" শুনলাম আমেরিকান গীত এই গানের রেকর্ডিং ইতিমধ্যে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে।

= সত্ত্ব প্রকাশিত হইল !!

ভৈষজ্য সংক্রান্ত একটি অমূল্য গ্রন্থ

রাঘব বাহাদুর তারকনাথ সাধু

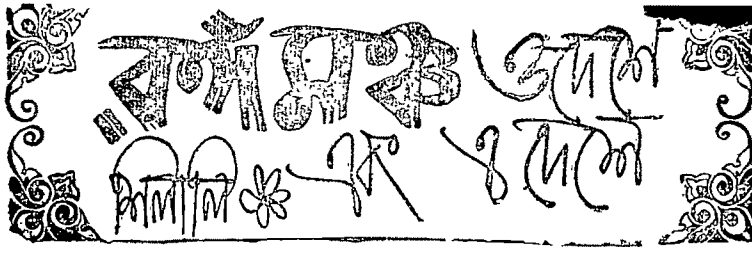
প্রণীত

॥ উপেক্ষিতের উপকারিতা ॥

মূল্য চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১২



জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মাইনজিগে অন্নরবাখস কেলার : ১৯৬৮ সালে এই জায়গাটি আমি দেখতে গৌছিলাম। এটি ১৫৩০-৩৮-এ প্রতিষ্ঠিত একটি পানীয় ও খাদ্যের রেস্টোরাঁ গোছের। এখানে গ্যায়টে এসে পানাহার করতেন এবং গল্পগদ্যে সমগ্র কাটাতেন—বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে এই পান্থ-শালায়—প্রত্যেকটি ঘরের দেওয়ালে ফাউস্টের বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি আঁকা আছে। ফাউস্টের প্রথম পর্বের পঞ্চম দৃশ্যটি এই অন্নরবাখস কেলার সম্বন্ধে।

This famous wine-room in Leipzig still attracts many visitors by virtue of its association with the early Faust-legend, with the academic years of the young Goethe, and with this scene (Sc. V., Part I.) of Faust, which is founded in the legend and in experience.

অন্নরবাখস কেলারে ফাউস্টের বিভিন্ন দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে মূগ্ধ হয়ে গেছিলাম। মনে পড়ে গেল গর্ডন ক্রেগ, ইসাডোরা ডাঙ্কানকে নিয়ে এ দৃশ্যগুলো দেখতে লাইপজিগে এসেছিলেন এবং মূগ্ধ-চিত্তে ইসাডোরাকে ফাউস্ট থেকে কোরাস মিস্টিকাস আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন।

Prissy Cat!

"All things transitory
But as symbols are sent:
Earth's insufficiency
Here grows to Event:
The Indescribable,
Here it is done:
The Woman-soul leadeth us
Upward and on!"

বোয়ার্ড টেলর এই কোরাস মিস্টিকাস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন :

Chorus Mysticus: These lines, famous in the original through the whole world of

poetry, mystically express the relation between the earthly and heavenly spheres. On the last two lines Taylor has the following excellent comment :

"Love is the all-uplifting and all-redeeming power on Earth and in Heaven; and to man it is revealed in its most pure and perfect form through Woman."

১৯৬৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৯শে ফেব্রুয়ারী আমি ভাইমারে ছিলাম। এই শহরকে বলা হয় দি টাউন অভ গ্যায়টে এ্যান্ড শিলার। এখানে উঠেছিলাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হোটেল এলিফান্টাতে।

বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস মান তাঁর 'লট্' ইন ভাইমার' নভেলে এই হোটেলটি সম্বন্ধে অতি সুন্দর এবং বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

The first letter of concession signed personally on February 17th 1696 by Wilhelm Ernst, by the Grace of God Duke of Saxony, Lilich, Cleves and Bergk—permission dictated to Christian Andreas Brittig and to his heirs and successors. Brittig was the tenant of the Black Beer, the oldest inn in Weimer.

ব্ল্যাক বিয়ার পান্থশালাটি ছিল আমাদের হোটেলের পরেই—এখানে আমি প্রত্যহ সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যায় আহার-পর্ব সমাধা করতাম।

গ্যায়টে ভাইমারে আসবার পর থেকেই এলিফান্টাতে ম্যাডিরা পান করতে আসতেন। সে সময়কার নামজাদা অস্ট্রিয়ান কবি ফ্রান্জ্ গিলপার্জার ১৮২৬ সালে গ্যায়টের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভাইমারে—এই এলিফান্টা হোটেল সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

"The Elephant inn, famous throughout Germany, at the same time the ante-chamber to Weimer's living Valhalla.."

বার্লিন মিষ্টিং আকাডেমীর কম্পোজার

ছিলেন গ্যায়টের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি তাঁর বার বছর বয়সের শিষ্য ফেলিক্স মেন্ডেল-শন বারথল্ডিকে নিয়ে ভাইমারে এসে উঠেছিলেন এই হোটেল। এখানে আসবার উদ্দেশ্য ছিল গ্যায়টের সঙ্গে দেখা করা। জুলাই মাসের তিন তারিখে ১৯২৬ সালে এবং ঐ বছরেই ২০শে অক্টোবরে হিটলার এই হোটেল এসে ওঠেন। পেশা লিখেছিলেন লেখক এবং জার্নালিস্ট।

ভাইমারে গ্যায়টে এবং শিলারের বন্ধুত্ব হয় এবং সে বন্ধুত্ব এমন ঘনিষ্ঠতার পর্ষায় যায়—যার তুলনা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। এই দুই বিরাট প্রতিভার সংযুক্ত প্রভাবে জার্মানীর জাতীয় কৃষ্টির অগ্রগতি অব্যাহত বেগে স্ফূরণের চরম শীর্ষে উন্নীত হয়েছিল।

গ্যায়টে প্রায় তিরিশ বছর ধরে ভাইমার থিয়েটারের পরিচালক এবং সর্বময় কর্তা ছিলেন। শিলারের সহযোগে তিনি চেষ্টা করেছিলেন to create a German Drama—an ideal Drama which was to represent the loftiest forms of Art.

এঁদের মধ্যে কে বড় কবি? এ প্রশ্ন নিয়ে জার্মানদের মধ্যে তখন দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। আজকের দিনেও এ বিষয়ে মতানৈক্য একেবারে অপসৃত হয়নি। রোমেও এক সময় শিল্পীদের ভেতর মত-বিভেদ দেখা যেত মাইকেল এঞ্জেলো এবং রায়ফায়েলের ভেতর তুলনা করে কে শ্রেষ্ঠ একথা প্রমাণ করতে গিয়ে। এ বিষয় গ্যায়টে বলেছেন—এঁদের যে-কোন একজনের শিল্পসৃষ্টির মাহাত্ম্য বুঝতে গিয়েই সারা জীবন কেটে যায়—এক সঙ্গে দুজনের প্রতিভার বিশ্লেষণ করবার জন্য অতি-মানবিক শক্তির দরকার। তাই লোকে নিজের দের কাজকে সহজ করবার জন্য এক এক দলে গিয়ে যোগ দেয়।

নিজের এবং শিলারের কাব্য-প্রতিভার তুলনামূলক সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৮২৫ সালে গ্যায়টে একজনকে বকেছিলেন : বিগত কুড়ি বছর ধরে জনসাধারণের মধ্যে বিতণ্ডা হয়েছে যে, আমার এবং শিলারের মধ্যে কে বেশি বড় কবি। জনসাধারণের এই ভেবেই পরিভ্রষ্ট থাকা উচিত যে, এ-জাতীয় তুলনা চলতে পারে—এমন দু'জন ব্যক্তিকে তারা একই সময়ে তাদের মাঝে পেয়েছে।

ইওহান ক্রিস্টিয়ান ফ্রিডরিশ শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) : শিলার হচ্ছেন প্রথম জার্মান নাট্যকার—যাঁর খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল। শহরমার ইংরাজীতেই তাঁর স্মরণিত নাটকের দৃশ্যের ওপর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে ১৭৯২ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শব্দ উচ্চারণ নাটকের লেখক

হিসাবেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে নি—
মধ্যবিত্ত সমাজের তিনি ছিলেন সব থেকে
প্রিয় কবি।

তাঁর জনপ্রিয়তার তিনটি বিশেষ কারণ
ছিল :

- (১) চিন্তাধারায় সত্যের আদর্শবাদ।
- (২) রচনাভঙ্গির বিষাদাত্মক ব্যঙ্গনা।
- (৩) সমস্ত রচনায় মনস্তত্ত্ববাদের প্রচার।

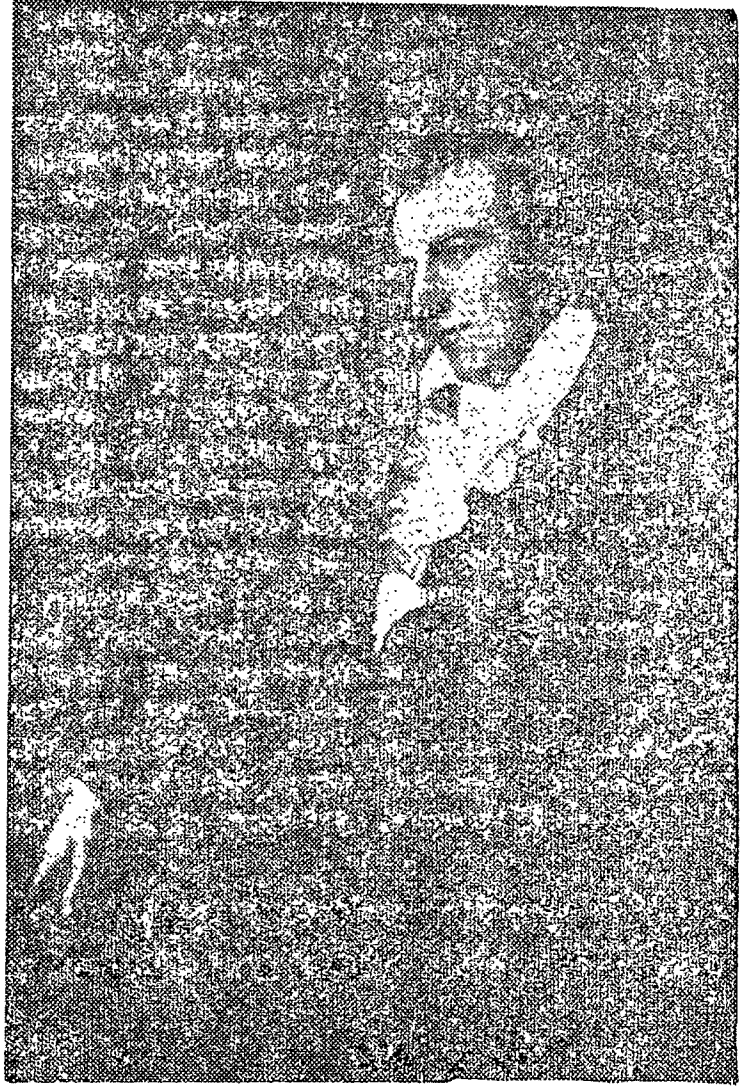
শিলার বড় ক্রাফটস্‌ম্যান ছিলেন—এ
বিষয়ে তিনি শিক্ষানবিশী করেছিলেন
মানহাইম এবং ভাইমার থিয়েটারে। হাই
স্ট্রাং চরিত্র বলতে যা বোঝায় শিলার
ছিলেন তাই। নিজের ভেতরকার মানসিক
দ্বন্দ্ব এবং চাপা উদ্বেজনা তাঁকে তাঁর
রচনায় অনুপ্রেরণা দিত। তাঁর রচিত
নাট্য নাটকেই পাকা শিল্পীর হাতের
পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রথম নাটক 'দি
রবার্স' (১৭৮১) ভাষা এবং গঠনের দিক
দিয়ে স্টার্ম এ্যান্ড ড্রাঙ্গ মনভ্রমের চরম
রূপায়ণের পরিচায়ক। মধ্যবিত্ত শ্রেণী
সম্বন্ধে একটিমাত্র ট্রাজেডী—'ল্যাভ এ্যান্ড
ইনট্রিগ' (১৭৮৪) লিখেছিলেন শিলা।
এটিও স্টার্ম এ্যান্ড স্ট্রেশ আন্দোলনের
চিন্তাধারার বাহক।

এর পর 'ডন কারলোস' (১৭৮৭),
'ওয়াল্টার স্কট' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন।

সমস্ত জীবনটাই তাঁর দারিদ্র্যের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কেটেছে। জীবনের
শেষ পাঁচ বছর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে
অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। মাত্র
পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শিলার মারা যান।
জীবনের শেষ দশ বছর গায়টের সঙ্গে
ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয় শিলারের—এদিকে দু'জন
অন্তরঙ্গ বন্ধু—আবার লেখার ক্ষেত্রে একে
অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এই প্রতি-
দ্বন্দ্বিতার ভেতর কোন নীচতা বা ব্যক্তিগত
বিশেষ ছিল না। দু'জনেরই সৃষ্টি হোত
অনবদ্য এবং জার্মান সাহিত্যের সমৃদ্ধি
উন্নতির চরম শীর্ষে গিয়ে উঠেছিল।

'ডন কারলোসের' পর শিলার যে সব
নাটক লেখেন তার সবই অমিত্রাক্ষর ছন্দে
রচিত। এর আগেকার নাটকগুলোতে
তিনি গদ্য ব্যবহার করেছেন।

১৮০১ সালে তাঁর ম্যারী স্ট্রয়ার্ট
প্রকাশিত হয়। এ নাটকের ট্রাজেডীকে
ছাপিষে উঠেছে ম্যারীর আধ্যাত্মিক মনস্তত্ত্ব
অনুভূতির দিকটা। তাঁর রোমান্টিক
ট্রাজেডী—'দি মেইড অফ অরলিয়েন্স'
শিলার জোন অভ আর্কে পুনঃ-
প্রতিষ্ঠিত করেছেন আধ্যাত্মিক এবং
নৈতিক চরিত্র হিসাবে এবং সেইসঙ্গেই
শেক্সপীয়ার হেনরী দি সিক্সথ নাটকে
জোনকে ভাইনী হিসাবে দেখিয়েছেন—
ভল্টেয়ার তাঁর La Pucelle-এ
জোনকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছেন। কিন্তু
শিলার এই সব মতবাদকে অগ্রাহ্য করে



শিলা

জোনকে জাতীয় জীবনে আবার আগের
সম্মানিত জায়গায় ফিরিয়ে এনেছেন।

শিলারেরই রচনা থেকে সুইসরা
তাদের ন্যাশনাল ফেস্টিভ্যাল প্লে 'উইলিয়াম
টেইল' (১৮০৬) নাটকটি পেয়েছেন।
উনিবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক এবং
গণতান্ত্রিক আন্দোলনে 'ডন কারলোস'
এবং 'উইলিয়াম টেইল' হচ্ছে শিলারের
রাজনৈতিক অবদান।

শব্দ নাটক এবং কাব্য রচনাতেই নয়,
প্রবন্ধ এবং গায়টের সঙ্গে লেখা চিঠিপত্র-
গুলোও শিলারকে জগৎসাহিত্যে অমর
করে রাখবে।

আগেই লিখেছি 'ডিউক কাল' অগাস্ট
ভাইমারকে জার্মানির ইন্টালেকচুয়াল
ক্যাপিটাল তৈরি করতে চেয়েছিলেন এবং
এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করার জন্য প্রথমে

গায়টে এবং পরে হাডার ও শিলারকে
ভাইমারে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন।

হার্ডারের সম্বন্ধে দু'এক কথা বল
দরকার। কারণ তদানীন্তন জার্মান
সাহিত্যিকদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল
অপরিসীম। ইয়োহান গট্‌ফ্রায়েড
হার্ডার (১৭৪৪—১৮০০) ছিলেন জার্মান
লোকসাহিত্যিক, সমালোচক এবং অনু-
বাদক। পেশাতে তিনি ছিলেন লেখারিয়ান
ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষক, কিন্তু তাঁর নেশা
ছিল সাহিত্যচর্চা। কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই
তিনি প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে আগ্রহী
হয়ে ওঠেন। রুশোর 'প্রকৃতির বন্ধু
ফিরে যাও' আন্দোলনের প্রতি তাঁর যথেষ্ট
সহানুভূতি ছিল। বর্ণিত-বিরোধী এক
ধরনের রহস্যবৃত্ত নতন দর্শন, যার সার
বক্তব্য হল—প্রকৃতি নিজেকে মর্মে করে

সাপ্তাহিক বঙ্গবর্তী

Herder directed the young

লিন্স্টের জীবনী শিল্পগোঁরব এবং
শিল্পযশে ভরা। কনসার্ট পিয়ানিস্ট
হিসাবে আজও কেউ বোধ হয় তাঁকে
ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। পিয়ানো-
সঙ্গীত, অক্টেব্রা-নিউজিক, অর্গানের
জন্য গান, কণ্ঠসঙ্গীত সব কিছুই তিনি
রচনা করেছেন—এবং এই সব সঙ্গীতের

[कथन]

দেশদেবশের জনস্বাবার ॥ দেশদেবশের জনস্বাবার ॥

দেশদেশের জলখাবার II দেশদেশের জলখাবার II দেশদেশের জলখাবার II

၁၈၆

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য স্মরণে

গত ১০ই জুলাই ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়েছে। খবরটি আকস্মিকতার আঘাত নিয়ে এসেছে, কারণ বয়সের হিসাবে তাঁর মৃত্যুর সময় এখন নয়। ডঃ সাধন ভট্টাচার্য বাংলার নাট্য আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁর নাট্য সমালোচনা আন্দোলনের গতি নিগমিত এবং নাটকের দলগুলিকে সমাজে যথার্থ ভূমিকা গ্রহণে সাহায্য করেছিল।

ডঃ সাধন ভট্টাচার্য বাংলার নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে যথার্থভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সমাজতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করার মত শক্তি তাঁর ছিল। পঞ্চাশ দশকে যত সভায় তিনি ভাষণ দিয়েছেন, তার প্রায় প্রত্যেকটিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তাঁর বক্তব্য বলিষ্ঠ ছিল। সে কারণে কোন কোন গোষ্ঠীর কাছে তিনি কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ সম্পর্কে বলে সমালোচিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎে যতদূর ব্যক্তিগত কোন দল বা মতের প্রতি তাঁর মোহ ছিল না। আবার কোন দল বা মত সম্পর্কে সংকীর্ণতা বা ছুঁতমাগীর্য মনোভাবও ছিল না। বাস্তবকে বিশ্লেষণ করার মত শক্তি ছিল এবং দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থাকার উটপাখির মত মানসিকতা তাঁর ছিল না। এ কারণে তাঁর বক্তব্য, নাটকের বিশ্লেষণ অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠতো। বাস্তবিকপক্ষে পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগে এত বেশি নাট্যানুষ্ঠানে তিনি ভাষণ দেন যে, নাটকের আগে তথ্যপূর্ণ ভাষণদান একটা রীতি হয়ে উঠেছিল। যদিও এই রীতি ভারতীয় গণনাট্য সম্মুখ সৃষ্ট, কিন্তু



ওড়িয়া নাচের ভঙ্গিতে মঞ্জুশ্রী চাকী।



তার জন্য উপযুক্ত বয়স হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন ডঃ ভট্টাচার্য।

নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে সুদৃশ্যিকভাবে ডঃ ভট্টাচার্যের প্রায় বোলটির মত বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখার সংখ্যা কম নয়। তাঁর লেখা বইগুলির মধ্যে নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার, ৫ খণ্ড, নাটক ও নাটকীয়তা, রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা, নাটক লেখার মূলসূত্র, শিল্প-তত্ত্বের কথা, নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা, রাজাইতিপাস, হোরোসের আসল পোয়েটিকা, এরিস্টটলের পোয়েটিক্স ও সাহিত্য তত্ত্ব, মহাকাব্য ক্রিগাসা ইত্যাদি রয়েছে। রবীন্দ্র-ভারতীতে বোণদানের পর থেকে তাঁকে আগের মত আর সভা-সমিতিতে পাওয়া যায় নি। নাটকের আন্দোলনের সঙ্গে

পূর্বের মত ঘনিষ্ঠতাও কমে এসেছিল। তা সত্ত্বেও নাটক এবং নাট্য আন্দোলন সম্পর্কে তার মতামত ও বিশ্লেষণের বিষয়ে অনেকই আগ্রহী ছিলেন। ডঃ ভট্টাচার্যের অকাল বিয়োগে বাংলার নাট্য আন্দোলন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলো। বাংলার নাটকের বিকাশের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নির্ভীক পর্যালোচকের প্রয়োজন, ডঃ ভট্টাচার্য পঞ্চাশ দশকে সে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই প্রয়োজন এখন আরো বেশি অনুভূত হবে।

—সুজন।

নাটকের কথা

‘শর্মিলা’ নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক অনুষ্ঠান

আগামী ২৫শে জুলাই শনিবার মধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারের ‘শর্মিলা’ নাটকের ৪০০তম অভিনয়ের স্মারক অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিমল মিত্র মহাশয় সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্যরসিক ডক্টর অজিত ঘোষ মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন। এতদুপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র মহাশয় নাট্যকার-পরিচালক, শিল্পী ও মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।



‘বিবর’ ছবিতে পরিচালক ও নায়ক উত্তমকুমার ও সুপ্রিয়া দেবী

ফিল্ম কার জন্য ? প্রশ্নোত্তরে ঋত্বিক ঘটক

[সম্প্রতি নর্থ ক্যালিফোর্নিয়া ফিল্ম সোসাইটির পক্ষ থেকে চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেই প্রশ্নোত্তরে উক্ত সংস্থায় মুখপত্র ‘চিত্রভাষা’-এর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান বাংলা ছবির জগতের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নোত্তরের গুরুত্ব বিবেচনা করে শ্রীঘটকের বক্তব্য আমরা পুনঃ প্রকাশ করছি।]

প্রশ্ন : আপনি কি উদ্দেশ্যে ফিল্ম করেন ?

উত্তর : মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষম প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি।

প্রশ্ন : সব স্ক্রিয়েটিভ আর্টস যেমন জীবনানন্দকরণ, আপনার মতে ফিল্মও কি সেরূপ জীবনের প্রতিচ্ছবি ?

উত্তর : ফিল্ম একটা নতুন কিছু না। সব শিল্পে যেমন, তেমনি ফিল্মও কতগুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি ছবি একটা শিল্প। এবং যখন শিল্প, তাকে দায়ী হতে হবেই। দায়িত্ব মানুষের প্রতি। এ-কথাটা ভুললে চলবে না।

প্রশ্ন : যদি জীবনানন্দকরণ—তবে সে কোন জীবন? সমাজজীবন অথবা ব্যক্তিজীবন ?

উত্তর : বর্তমানে ব্যক্তিজীবন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সমাজ-জীবনটা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। কাজেই, শিল্পের অনু-যায়্য থাকা উচিত মানবজীবনের সঙ্গে—স মাজ জী ব নের সঙ্গে। একটা ভাল লাগার প্রশ্ন আছে, যেটা না থাকলে শিল্পী হারিয়ে যায়। আমার মনে হয় সেটা শিল্পে বিকৃত একটা রূপ। এই কথাটা মনে রাখলে আমার আগেকার কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : আর পাঁচটা ফরম্ অব আর্ট থেকে (যেমন সাহিত্য, নৃত্য, গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি) ফিল্ম ফরমের কি কোন পৃথক গুণ আছে ?

উত্তর : কোন পৃথক গুণ নেই। মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং তাকে বিমোহিত করার যে ঘটনা, সেটা সব শিল্পেই সমান। এটা ফিল্ম সম্পর্কে বাড়ি বাড়ি করে কোন মূল্য দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। মানুষ মানুষই। তাদের স্নেহ একই ধারায় বর্ষিত হয় সব শিল্পে। এখানে ফিল্মকে বড় করে ধরার কোন মানে আমি বুঝতে পারি না। এর বেশি আমার কিছু বলার নেই।

প্রশ্ন : সমাজজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফিল্মেরও কি ফরম্ এবং কনটেন্ট পরিবর্তন ঘটে বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর : কনটেন্ট প্রথমে আসে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলে গিয়েছিলেন যে, আগে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। কথাগুলো মনে আপনারা ভাল করে বুঝে দেখবেন। ফরম্‌টা কিছু না, ওটা আকারমাত্র। যেমন তুলনা করতে পারি আঁদ্রে ভাইদা অনেক কন্ট পেয়ে যে-সব ছবি তুলেছে সেগুলি অভয়। মানবজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। তার থেকে কনটেন্ট রূপ গ্রহণ করে এবং ফরম্ তার নিজস্ব গতি গ্রহণ করে। সেইটে আজকাল খুব কম পাওয়া যায়। লুই বুনুয়েলের পর মিস্টার গুটি আজ নেই, ওজু আজ নেই, খালি কুরাসাওয়া করে যাচ্ছে ফেলিনী বিক্রী হয়ে গেছে। এন্টনি ওন—সমস্ত ব্যাপারটার গভীরে ঢোকার মত মানসিকতা তার নেই। বার্গমান একটা জোড়োর। কেচিও-য়ানিস্ কিছু ভাল চেষ্টা করেছিল ইলেকট্রো জাতীয় ছবিতে, কিন্তু সেও হারিয়ে গেল। ফরাসী নভাল ভাগ এবং তার অনুকরণে পোলিশ



‘প্রথম কদম ফুল’ ছবিতে নৌমির ও তনুজা

চেকোস্লোভাক নৃত্যাল ভাগ আমাকে পীড়িত করে। জাঁ পল সার্গে ও আলবেয়ার কামুর চিন্তাধারাকে গ্রহণ করেছিল, যোগদানো অত্যন্ত শিশুসুলভ। এর মধ্যে কোন গভীরতা নেই। ছবির জগতে জালিয়াতি শার্ল রুকার্কও করেছে তার কনেকশন ছবিতে, লিওসে এন্ডারসন করেছে, কিন্তু এরা কোন গভীরে প্রবেশ করতে পারে নি।

সমস্ত শিল্প প্রব শিল্প। ফিল্ম যদি সত্য হয় তাহলে আইজেন-স্টাইন, পুডোভকিন, গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন (প্রথমদিকের যুগ) এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সত্যিকার প্রচণ্ড শক্তির রূপ গ্রহণ করে। সেখানে আজকালকার বাদরামী আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। অবশ্য ফেলিনীর ‘দোলচা ভিটা’ বুনিয়েলের সমস্ত কাজ বাদে। এ সম্পর্কে আমার কিছ বলার নেই।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিককালের ইউরোপীয় চলচ্চিত্রগুলিতে সমাজতান্ত্রিক দেশের ফিল্মের ও অন্যান্য পশ্চিমী দেশের ফিল্মগুলির মধ্যে ফরম এবং কনটেন্টের কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে বলে আপনার মনে হয় কি?

উত্তর : আমার মনে হয় না। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলো ফরাসী চালিয়া-তীর অনুকরণ করতে আরম্ভ করেছে। এটাকে আমি গভীরভাবে ঘৃণা করি। তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই সব ছবির কোন মিল নেই। রাশিয়ান ছবিগুলো, দুই-একজন ডিরেক্টর ছাড়া, সম্পূর্ণ গাধার মত। সেগুলো নিয়ে কোন গভীর আলো-চনার অবকাশ নেই। ডিরেক্টরদের,

কিউবার, চীনের ছবি আমি দেখি নি—সুতরাং এই সব দেশের ছবি

সম্পর্কে কোন কথা বলার আমার অধিকার নেই। তারা যদি ভদ্র-লোকের মত ছবি করে থাকে তা হলে ধন্যবাদ। আমি ও-বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকারী নই।

প্রশ্ন : জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী কি কোন সিদ্ধান্তে আ-দেব পৌঁছে দেয়?

উত্তর : শিল্পী খুঁজে ফেরেন। কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, হয়ত কখনো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেন না। কিন্তু দুটোই ঠিক। শিল্পীর চেষ্টা থাকে, যে চেষ্টার অবসান একবার হয়। কিন্তু এ যে প্রশ্ন তুললো সেটাই মানুষকে আকর্ষণ করে, নাড়া দেয়, মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেইখানেই শিল্পীর সার্থকতা।

বুধবার ২২শে জুলাই অগ্রিম বুকিং স্ক্রু।

দুটি চরিত্রে উত্তমকুমারের অভিনয় দুনিয়াকে চমকে দেবে।

ডি.এম.পাল বিব্রাত

দুটি ঘন

(A)

উত্তমকুমার

(দেব চরিত্রে)

সুপারগানেশ

পৌষষবসু • সংগীত হেমন্ত মুখার্জী • অঙ্গুরা ফিল্মস পরিবেশিত

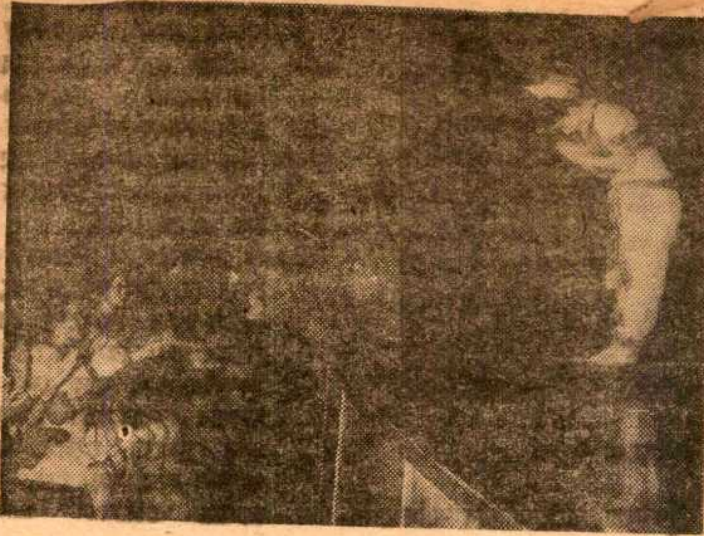
● শুভমুক্তি : ২৪শে জুলাই : শুক্রবার ●

উত্তরা ০ গুরুবী ০ উজ্জ্বলা ০ আলোছায়া ০ গন্ধজী

অুচিহ্না ॥ অরকা ॥ পার্বতী ॥ মায়া ॥ নিউতরুপ ॥ জয়া ॥ রমা

গৌরী ॥ উদয়ন ॥ স্বপ্না ॥ কল্যাণী ॥ শ্রীদুর্গা ॥ কৈরী ॥ শীনা

বাটা সিনেমা ॥ অনুরাধা ॥ মেঘদূত ॥



মস্কোর ভ্যারাইটি থিয়েটারে নৃত্য প্রদর্শন করে কুমকুম দাস দর্শকদের অভিভূত করেন।

প্রশ্ন : সেই সিংহাসনে যদি সমাজজীবনের গ্রহণযোগ্য বলে দর্শকসাধারণ মনে যা করেন, তবে সেখানে শিল্পীর কাজ কি হবে? নিজের সিংহাসনে অবিচল থাকা, না দর্শকসাধারণের সিংহাসনকে নতুন করে পরখ করে দেখা? এক্ষেত্রে শিল্পীর কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে কি?

উত্তর : নিজের সিংহাসনে অবিচল থাকাই শিল্পীর উচিত।

প্রশ্ন : সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী ও অপরাধিত সৃষ্টির পটভূমিতে যে জাতের প্রেরণা কাজ করেছে, নায়ক ও অরণ্যের দিন রাতের মধ্যেও কি সেই প্রেরণা অবিকৃতভাবে উপস্থিত? যদি কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে তবে সে পরিবর্তনের কারণ ব্যক্তিগত না সমাজগত?

উত্তর : এ প্রশ্নের আমার উত্তর দেবার কিছু নেই।

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে ভারতবর্ষে কি ধরনের ছবি হওয়া উচিত।

উত্তর : বর্তমান যুগে দু'ধরনের ছবি হওয়া উচিত। এক হচ্ছে মানুষকে খুশির আনন্দে ধুইয়ে দেওয়ার জন্য নানা প্রকার দৃশ্যবলী এবং নারীর মূর্তি দেখানো প্রয়োজন। আর একটি হচ্ছে—থেকে-থাওয়া মানুষের দাত্যকারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। এ দু'টোর মধ্যে লড়াই হোক। দু'জনের সম্পর্কে সমপরিমাণে তথ্য রাখা হোক। তারপর রোমাঞ্চ যাবে কে জেতে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ব্যাপারটা সমাধা হোক। আমি জানি কী ঘটবে।

স্টুডিও খবর

ইমালি

হিপিদের সম্পর্কে নানা আলোচনা চলেছে। হিপিদের এখন কলকাতার রাজপথে দেখা যায়। এদের কেন্দ্র করে পার্টিসানস্ নামে সংগঠন একটা ছবি তুলেছে। এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন দিলীপ চৌধুরী। ছবির নির্মাণে সহযোগিতা যারা করছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বিদেশী হিপি রয়েছে। এদের সঙ্গে তগন চ্যাটজী, পার্থ মুখার্জী, মিহির চ্যাটজী প্রমুখ রয়েছেন। এক সাংবাদিক সম্মেলনে উদ্যোক্তারা তাঁদের উদ্দেশ্য ইত্যাদির কথা বলেন।

সংবাদ কল্যাণ

লেনিনের কণ্ঠস্বরের সংকলন

এ পর্বন্ত লেনিনের ভাষণ ও আলোচনাদির যে সব টেপ-রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে একটি সংগ্রহ সম্প্রতি মস্কোর প্রকাশিত হয়েছে।

এই রেকর্ড-সংগ্রহের সঙ্গে পরিচিত

পুস্তিকাও রয়েছে, তাতে বহুতাবির পাঠ ও ঐতিহাসিক চিত্রাদিও আছে।

লেনিনের কণ্ঠস্বরের রেকর্ডিং ছাড়াও লেনিন সম্পর্কিত স্মৃতিচারণায় লেনিনের স্ত্রী নাদেজদা ক্রুপস্কাইয়া, সেগেই কিরভ, এলেনা প্তামোভা, জোসেফ স্তালিন, আনাতোলি লুনাচারস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কি ও কার্ল সেগেই এসেনিনের কণ্ঠস্বরও আছে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভের লেনিন শতবার্ষিকী ভাষণও আছে।

রেকর্ডিং-এ অন্যান্যদের মধ্যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের নেতারা লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিও আছে।

বৃত্যশিল্পী মঞ্জুশ্রী চাকী

বাংলার নৃত্যজগতে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রী চাকী এক সুপরিচিত নাম। বাংলার শুধু নয়, মঞ্জুশ্রীর পরিচিতি সারা ভারতে। ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় তিনি নৃত্য প্রদর্শন করে অভিনন্দন লাভ করেছেন এবং তাঁর নাচের মাধ্যমে ভারতের শিল্প-সৌন্দর্যের সঙ্গে বিদেশের পরিচয় ঘটিয়েছেন। ভারত-বঙ্গদূতের সংস্থা বৃন্দ করেছেন। শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীর নাচে এক সময় আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম, বিশেষ রবীন্দ্র নৃত্য ও গীতিনাট্যে তাঁর মনো-রম নৃত্যভিনয় এখনো আমাদের মনে আছে। কিন্তু গত কয়েক বছর তিনি ভারতে না থাকায় তাঁর নাচ আমরা দেখতে পারি নি। ১৯৬৪ সাল থেকে তিনি আমেরিকায় প্রাট ইনস্টিটিউটে ভিজিটিং স্কলার এবং নিউ প্যাজ-এর স্টেট ইউনিভার্সিটি অব নিউ ইয়র্ক-এ ভিজিটিং লেকচারাররূপে কাজ করেছেন। গত ১২ই জুলাই রবীন্দ্র সদন মঞ্চে শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে উপস্থিত করে সুরসম্ময়ন সংস্থা। আকস্মিক কারণে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পারলেও, মঞ্জুশ্রীর নাচের সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি থাকায় আমরা এই অনুষ্ঠানের সাধকতা অনুভব করি। দেশ-বিদেশের অভিজ্ঞতায় আশা করি মঞ্জুশ্রীর নাচ আরো সুন্দর হয়েছে।

মস্কিফিল্ম স্টুডিও পরিদর্শনে রাজক্যাপুর

বিশিষ্ট ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা রাজক্যাপুর সম্প্রতি মস্কোর মস্কিফিল্ম স্টুডিও পরিদর্শন করে সোভিয়েত চলচ্চিত্র-শিল্পী ও কুশলীদের অভিনন্দন

সাপ্তাহিক বঙ্গসত্য



‘মঞ্জুরী অপেরা’ ছবিতে জ্যোৎস্না
বিশ্বাস।

জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, এঁদের ‘মল্যবান সহযোগিতা বিনা’ তাঁর সাম্প্রতিকতম ছবি ‘মেরা নাম জোকার’ তোলা সম্ভব হত না। মস্কো থেকে এ খবর দিয়েছে এ. পি. এন.

রাজকাপুরের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার ও বোলশয় থিয়েটারের ব্যালোরিনা কসেনিয়া রিয়াবিনকিনা। রিয়াবিনকিনা ‘মেরা নাম জোকার’ ছবিতে অভিনয় করে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই ‘অভিজ্ঞতা তিনি কোন-দিন ভুলবেন না।’

রাজকাপুর তাঁর ছবি তোলার ব্যাপারে সোভিয়েত সহযোগিতার জন্য সোভিয়েত সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী একাতারিনা ফদুতসেভার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

তাশখন্দে আসার আন্তর্জাতিক আফ্রিশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে রাজকাপুর তাঁর ‘মেরা নাম জোকার’ ছবিটি প্রদর্শন করতে মনস্থ করেছেন।

মস্কোর ভারতীয় শিল্পীদের
নৃত্যানুষ্ঠান

সম্প্রতি মস্কোর ভারাইটি থিয়ে-
টারে সোভিয়েত সফলরত ভারতীয়
শিল্পীদের এক নৃত্যানুষ্ঠান দর্শকদের

উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে। এ খবর
দিয়েছে তাশ-এ এ. পি. এন.
অনুষ্ঠানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয়
নৃত্য প্রদর্শন করেন যথাক্রমে কুমকুম
দাস ও কমলা।

মস্কোর অনুষ্ঠানের পূর্বে ভারতীয়
নৃত্যশিল্পীরা রুশিয়ার অন্যতম প্রধান
শিল্পনগরী তামবুডে তাঁদের অনুষ্ঠানে
প্রশংসা পান। পরে তাঁরা লেনিনগ্রাদ
ও তাশখন্দে অনুষ্ঠান করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের
মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেয়ে
চলেছে। এ বছরেই দ্বিতীয়ে আসছে

জনপ্রিয় সোভিয়েত নৃত্যগোষ্ঠী
‘বেরিওজকা’। আর একটি ভারতীয়
শিল্পীদল এই শরতেই সোভিয়েত
সফরে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ

আগামী ৪ই আগস্ট শনিবার
বৈতানিক-এর প্রতিষ্ঠা দিবস। বৈতা-
নিকের শিল্পীরা ঐ দিন রবীন্দ্র সদনে
সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের
ক্রমবিকাশ নামে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের
আয়োজন করেছেন শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ
ঠাকুরের আলোচনা সহযোগে।

শুভমুক্তি শুক্রবার, ২৪শে জুলাই !

সংসার-কদম্বে দুঃকান্ত-কাকলীর স্বপ্নাভ্যাসের বর্ণনা সার্থক হয়েছিল কি ?



• চিত্রনাট্য-পরিচালনা-ইন্দর সেন-সংগীত-সুধীন দাসগুপ্ত •

শ্রী : গ্লাচা : ইন্দরা : অশোকা : শ্যামিনী : মায়াপুরী
রূপালী : মানসী : নিউ লাইট : জয়শ্রী : মৃণালিনী : শীমা
রূপমহল (বর্ধমান) নৈহাটি সিনেমা : চিত্রালয় (দুর্গাপুর)

৥ বুধবার থেকে অগ্রিম টিকিট ৥

খেলা বাজার



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯০৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজে আরম্ভ হলো ভারতের সংগে ইংল্যান্ডের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ।

বোম্বাই-এ প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ড জিতেছিল। কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হলো অসমীমাসিতভাবে। রাবার জয়ের সব কিছই তাই নির্ভর করছিল মাদ্রাজের তৃতীয় টেস্টের ফলাফলের ওপর। তবে দলগত শক্তির দিক দিয়ে ইংল্যান্ড ছিল অনেক বেশি শক্তিশালী। ইংল্যান্ডের শক্তির কাছে ভারত কিছই নয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় কোন টেস্টেই ভারত ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তীর প্রতি-দ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারে নি। দ্বিতীয় টেস্টে ভারত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল শুধুমাত্র সময়ের অভাবের জন্যেই।

তাই ভারতের অতি বড় সমর্থকও আশা করতে পারেন নি যে, মাদ্রাজ টেস্টে ভারত সাম্প্রতিক কিছ একটা অঘটন ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো 'রাবার' অসমীমাসিত রাখতে পারবে।

খেলাধুলায় সাধারণত কোন দলকে কিন্বা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে কখন ছোট ভাবে নেই অর্থাৎ আন্ডার এসটিমেট করতে নেই। জার্ডিনের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড দলের সেই দিকে ছিল তীক্ষ্ণ নজর। তাঁদের খেয়াল ছিল ১৯০২ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণের সময় ভারতীয় খেলোয়াড়দের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের কথা।

প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা তাই রান তোলায় দিকে নজর রেখে খেলতে

লাগলেন সতর্কভাবে। কারণ অমর সিং-এর বোলিং ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের প্রতি মূহুর্তাই আক্রমণের তীব্রতা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

তবে ইংল্যান্ডের সূচনাকারী ব্যাটসম্যানম্বর—বেকওয়েল আর ওয়ালটারস প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলেন। প্রথম উইকেটে তাঁরা যোগ করলেন ১১১ রান। মাত্র ১৫ রানের জন্যে বেকওয়েল শতরান করতে পারলেন না। ওয়ালটারস আউট হলেন ৫৯ রান করার পর।

এঁরা দু'জন ছাড়া ব্যাটিং-এ



৥ অমর সিং ৥

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে একমাত্র অমর সিং-ই দিয়েছিলেন অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয়।

নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন জার্ডিন (৬৫) আর শেষের দিককার খেলোয়াড় স্পিন বোলার ভেরিটি (৪২)। ইংল্যান্ডের আর কোন ব্যাটসম্যানই অমর সিং-এর দুরন্ত বোলিং-এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারেন নি।

প্রথম ইনিংসে অমর সিং-এর অসাধারণ বোলিং-এর কথা ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা চিরকাল মনে রাখবেন। অমর সিং-এর হাত থেকে ছাড়া পাওয়া বলগুলো ব্যাটসম্যানদের লক্ষ্য করে এসে সাপের মতো ছোবল দিতে চাইছিল।

তাই ৩৩৫ রানের মাধ্যম যখন ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল তখন দেখা গেল যে, মাত্র ৮৬ রান দিয়ে অমর সিং দখল করেছেন ৭টি উইকেট।

ভারত তার ইনিংস শুরু করলো ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। কলকাতা টেস্টের হিরো উইকেটরক্ষক দিলওয়ার হাসান আর নিওমল জিওমল নামলেন ভারতীয় দলের ইনিংস সূচনা করতে।

কিন্তু মাত্র ৫ রান করার পর আহত হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন নিওমল জিওমল। ওয়াজির আলী আউট হলেন ২ রান করে। দিলওয়ার হাসানও সুবিধে করতে পারলেন না। ভেরিটির বলে বারনেটের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফিরে গেলেন প্যাভেলিয়নে। তখন তিনি করেছেন মাত্র ১৩ রান।

ইংল্যান্ডের ন্যাটা স্পিন বোলার ভেরিটির মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে কিছই স্বাভাবিকভাবে খেলতে পারছিলেন না ভারতের ব্যাটসম্যানরা।

পর পর গড়ছিল উইকেট। সি. কে. নাইডু ২০ রান করে, অমরনাথ ১২ রানের মাধ্যম, মার্চেন্ট ২৬ রানে আর পাতিয়ালা মহারাজা ২৪ রান করে আউট হয়ে গেলেন। মাত্র ৪৯ রানের বিনিময়ে ভেরিটি পেলেন ৭টি উইকেট।

ফলে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে প্রথম ইনিংসে ভারত কিছুতেই পারলো না ১৪৫ রানের বোশ করতে। প্রথম ইনিংসেই রান সংখ্যার হিসেবে ইংল্যান্ড তখন ভারতের চেয়ে ১১০ রানে এগিয়ে।

তবু জার্ডিন ফলো-অন করলেন না ভারতকে। ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদেরই পঠালেন তাড়াতাড়ি রান তোলার ঘনো।

সেই দিক দিয়ে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করলেন ওয়ালটরস। ওয়ালটরস-এর বেপরোয়া ব্যাটিং ইংল্যান্ডকে তাড়াতাড়ি রান তুলতে খুব সাহায্য করেছিল। সত্যি কথা বলতে কি, ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়ালটরস ছাড়া আর কেউ খুব একটা ভালো খেলতে পারেন নি। ওয়ালটরস-এর ১০২ রান দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ডকে চন্দ্রগোছের রান তুলতে ঋণেট সাহায্য করেছিল।

কারণ বেকওয়েল (৪), মিচেল (২৮), জার্ডিন (অপরাজিত ৩৫ রান), ল্যাঙ্গারিজ (৪৬) আর নিকলস (২৬)—কেউই খুব একটা সুবিধে করতে পারেন নি। তবু তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের তৃতীয় দিনের শেষে ইংল্যান্ডের রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো সাত উইকেটে ২৬১তে। আর এই রানেই জার্ডিন ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

খেলার তখন আর মাত্র একদিন বাকী। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ দিনে ভারত যখন ব্যাট করতে নামলো তখন পিচের অবস্থা শোচনীয়। আর জয়লাভ করতে হলে ভারতকে তখন করতে হবে ৪৫২ রান। সে আশা একেবারেই ছিল না। তবে সময় কাটিয়ে দিনটাকে যদি শ্যর করে দেওয়া যায় তাহলে অন্তত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পায় ভারত।

কিন্তু খেলার শুরুরতই বোঝা গেল যে, সে সম্ভাবনাও নেই। কোন

রান করার আগেই আউট হয়ে গেলেন নিওল জিওমল। দিলওয়ার হাসান আর ওয়াজির আলী হাল করতে চেষ্টা করলেন। কিছুটা সফল তারা হয়েও ছিলেন। কিন্তু ২১ রান করে ওয়াজির আলী আউট হয়ে যাবার পর সি. কে. নাইডুও ফিরে গেলেন মাত্র ২ রান করে।

ভারত তখন নির্বাণ পরাজয়ের মুখোমুখি। ভাঙা পিচের সাহায্য নিয়ে ইংল্যান্ডের দুই স্পিন বোলার ভেরিটি আর ল্যাঙ্গারিজ লাঠির মতো বল ঘোরাতে শুরুর করেছেন। সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অসহায় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের যেন বিশেষ কিছু করারই ছিল না।

তবু শেষ চেষ্টা করে লালা অমরনাথ ম্যাটি কামড়ে পড়ে রইলেন। বিজয় মার্চেন্ট ঠিক মতো তাল দিতে গিয়েও পারলেন না। রানও যেমন উঠতে লাগলো তাড়াতাড়ি, তেমনি উইকেটও পড়তে লাগলো ঝটপট। মার্চেন্ট আউট হয়ে গেলেন ২৮ রান করার পর।

পাতিয়ালা মহারাজা খুব তাড়াতাড়ি রান তুলতে লাগলেন। ভাঙা উইকেটে স্পিন বোলারদের তীর আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি ঠিকভাবেই খেলছিলেন। কিন্তু ৬০ রান করার পর ল্যাঙ্গারিজের বলে ইলিরটের হাতে ক্যাচ দিয়ে যখন আউট হয়ে গেলেন

তখন বোঝা গেল যে, ভারতের ইনিংস প্রায় শেষ হয়ে এলো।

অমরনাথ তখনো ঠুকাঠক করে খেলছেন। কিন্তু পাতিয়ালা মহারাজার (তখন ছিলেন যুবরাজ) আউট হয়ে যাবার পর নাজির আলী ৮, সি. এস. নাইডু ০, আর মদুতাক আলী আউট হয়ে গেলেন মাত্র ৮ রান করে। শেষ উইকেটে অমরনাথের সংগে খেলতে নামলেন অমর সিং।

দশ করে নিজে যাবার আগে প্রদীপটা যেন একবার জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলোর চারদিক ভরিয়ে তুললো। অমরনাথ নিজের দিককার উইকেটটি বাঁচিয়ে রাখলেন আর অপর প্রান্তে অমর সিং তখন শুরুর করলেন তুলকালাম কাণ্ড।

রানের পর রান, বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী। খেলার চেহারা তখন গেল পাণ্টে। কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্যে নয়। ৪৮ রান করার পর ল্যাঙ্গারিজের বলে বারনেটের হাতে ক্যাচ দিয়ে অমর সিং আউট হয়ে গেলেন। সংগে সংগে ২৬৯ রানে শেষ হয়ে গেল ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস। ২৬ রান করে অপরাজিত রইলেন অমরনাথ।

তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ভারত পরাজিত হলো ২০২ রানে। ২-০ খেলায় ভারতকে হারিয়ে রাবার লাভ করলো ইংল্যান্ড।

[চলবে]

সাপ্তাহিক বসুমতীর

॥ বিশেষ ফুটবল সংখ্যা ॥

ফুটবলের এই ভরা মরশুমে বাংলা দেশের খ্যাতিনামা ক্রীড়া সাংবাদিকদের লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী সংখ্যাটি বিশেষ ফুটবল সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। অজস্র ছবি আর রেকর্ডস হবে এই সংখ্যাটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

ফুটবল খেলার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লিখছেন : অজয় বসু, আরবি, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক ঘোষাল, প্রশান্ত চক্রবর্তী ও বিপ্লব তালুকদার প্রমুখ।



— বিচিত্র এই দেশ —

বিশ্ব কাপের আসর শেষ হতে না হতেই সমস্ত বিশ্বকে মাতিয়ে তুলেছিল উইম্বেলডেন টেনিস প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্মৃতি ম্লান হয়ে যাবার আগেই শুরুর হয়ে গেলো কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠান, আর তারপরই কুয়ালালামপুরে বসবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। বিশ্ব কাপে আমরা ছিলাম না, উইম্বেলডেন টেনিসের গোড়ার দিকেই আমাদের খেলোয়াড়রা হেরে গেলেন। সামনে এখন কমনওয়েলথ ক্রীড়ানুষ্ঠান আর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। কমনওয়েলথ গেমস-এর কোন কোন বিভাগে ভারত নাকি ভালো ফল দেখাবে, ভারতের কয়েকজনের ভাগ্যে নাকি সোনার মেডেল জুটে যাবার সম্ভাবনাও আছে। এই সম্ভাবনা যদি বাস্তবে রূপ নেয় তাহলে তার চেয়ে সূর্যের বিষয় আমাদের কাছে আর কি হতে পারে! আমরা তো তাই চাই, প্রতি মূহুর্তে সেই সাফল্যই আমরা কামনা করি। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমস-এ আমাদের প্রতিনিধিরা কি করেন! তবে এই লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে, ততোদিনে কমনওয়েলথ গেমস শুরুর জমেই উঠবে না—এগিয়েও যাবে অনেকদূর। আর বোধহয় তারপরই শুরুর হবে কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা। এখানেও ভারত প্রতিদ্বন্দ্বী। জানিনে এবারও ভারত দেশের মানসম্মান ডুবোতে, লোক হাসাতে ওদেশে যাচ্ছে কিনা! গত বছর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী আর্টস্ট দলের মধ্যে ভারতের স্থানটি ছিল অষ্টম। এ কথা আমরা ভুলি নি। সহজে ভোলা বোধহয় সম্ভবও নয়।

সুতরাং আর যাই হোক, আমরা অন্তত আশাবাদী নই। খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে মিথ্যে আশার ছলনায় আর আমরা ভুলি না। আন্তর্জাতিক ফুটবল মাঠের সংগে আমাদের দেশের খেলার মানের তফাৎটা আমরা আজ ভালোভাবেই জানি। আর্টস্ট দলের মধ্যে অষ্টম স্থান অধিকার করার কৃতিত্বের জ্বালা সইতে সইতে আমরা আজ অনেক পোক্ত। আশা আমরা করি না বটে, সাফল্যের স্বপ্নে আমরা বিভোরও হই না, কিন্তু দিনের পর দিন এইভাবে পিছিয়ে পড়াকেও তো ঠিক স্বাভাবিকভাবে আমরা নিতে পারি না। কেন ভারতের আজ এই হাল—সব থেকে প্রয়োজনীয় এই প্রশ্নটি নিয়ে আজ আর কেউ মাথা ঘামান না। খেলোয়াড়রা যেজন্যে খেলেন তা ঠিক মত পেয়ে যান, ক্লাব পায় ট্রফি, অর্থ সমর্থকরা তাতেই খুশি—কিন্তু যাঁরা খেলাধুলার মান আরো উন্নত দেখতে চান, যাঁরা চান ভারতের খেলাধুলা আরো উন্নত হোক—তাঁরা তো আজ কোন মতেই দলতুণ্ট হতে পারছেন না। ফুটবল খেলায় ভারতের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা শূন্য অন্ধকারই দেখছেন। তবে ভারতীয় ফুটবল জগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা যে আলোতেই আছেন, তাতে আজ আর কারো সন্দেহ নেই। সত্যি, বড় বিচিত্র আমাদের এই দেশ.....! শান্তিপ্রিয়।

শাণ্ডাহিক বঙ্গমতী

ফুটবল মাঠ

ইস্টবেঙ্গল আগেই একটা পয়েন্ট ট করে বসেছিল। এখন পর্যন্ত মহা-মহাডান স্পোর্টিং নস্ট করেছে তিন য়েট। বাকী ছিল মোহনবাগান। প্রতি টালীগঞ্জ অগ্রগামীর সঙ্গে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ রায় মোহনবাগানও হারিয়েছে ষটি পয়েন্ট। মোহনবাগান আর স্টেবিশালের হারানো পয়েন্ট সংখ্যা এখন সমান সমান। তবে দু' দলের কেউই এখনো পরাজয় স্বীকার করে নি।

কলকাতা ময়দানে খেলার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। কিন্তু সেই সংগে াল দিয়ে যে খেলা পরিচালনা করার মানও নেমে যাবে, এ কথা কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি। নামকরা সব দেরারী বিজ্ঞ খেলার যেভাবে খেলা পরিচালনা করছেন তা অনন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। আর এর জন্যে সব থেকে বেশি দায়বদ্ধ দিতে হচ্ছে ছোট ছোট দলগুলোকে।

আমরা আশা করবো নিজেদের সুনাম বজায় রাখতে সি. আর. এ. কতৃপক্ষ আরো বেশি সচেতন হবে। বাংলা দেশের ফুটবল খেলোয়াড়দের মতো রেকার্ডারীও ছিলেন ভারতে সর্ব-সেয়া। শুব্দ তাই নয়—এদের কয়েক জনের ভাগ্যে জুড়েছে আন্তর্জাতিক সম্মানও।

কিন্তু এবার কলকাতা ময়দানে ার খেলা পরিচালনা করার যে যারা আমরা বার বার দেখছি তার ভুলনা খেলা ভার। কিন্তু কেন এই অবনতি?

ও কথা থাক। কলকাতা ময়দানে খেলার যারাপ্ত এবার শুব্দ একটা ভালো নয়। সুপার লীগে কোন্ কোন্ দল িত। এই নিয়ে এখন আরম্ভ হয়ে গেছে ার বিদ্বেষ। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং অবশ্য এই টাগ-অফ-ওয়ারের বাইরে আছে। মনে হয় এই তিনটি দলের প্রত্যেকটিই সুপার লীগে খেলবে। বাকী দু'টি দল নিয়ে বেনন লীগ তালিকার কিছুটা ওপর মহলে চলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তেমনি মিরভরী বিভাগে নেমে যাবার আশংকায় লীগ তালিকার ডলার নিককার দলগুলোর মধ্যে চলেছে প্রথম বিভাগে টিকে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা।

তাই সব মিলিয়ে কলকাতার

ফুটবল মরশুম এখন বেশ জমে উঠেছে। তবে বড় দলগুলোর নামী খেলোয়াড়দের অনেকেই এখন মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে অনুশীলন শিবিরে চলে যাওয়ায় বড় দলগুলো কোন কোন সময়ে একটু-আধটু বিপাকে যে পড়ছেই, এ কথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করবেন।

সমালোচনার দর্পণ

আগামী ৩০শে জুলাই থেকে কুয়াললামপুরে ১৩তম মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হচ্ছে। এবারের এই প্রতিযোগিতায় অংশ-গ্রহণকারী ১২টি দেশকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ভারতের স্থান 'এ' গ্রুপে। ভারত ছাড়া 'এ' গ্রুপের অন্য দলগুলো হলো—মালয়েশিয়া, বার্মা, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, সাউথ ভিয়েতনাম, ও তাওয়ান। গ্রুপ 'বি'-তে আছে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, সাউথ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং ও সিঙ্গাপুর।

নিচে খেলার সম্পূর্ণ সূচী দেওয়া হলো :

৩০শে জুলাই

মালয়েশিয়া : সাউথ ভিয়েতনাম
ভারত : তাওয়ান

৩১শে জুলাই

হংকং : সিঙ্গাপুর
স্যাঃ কোরিয়া : থাইল্যান্ড

১লা আগস্ট

বার্মা : ওঃ অস্ট্রেলিয়া
ইন্দোনেশিয়া : জাপান
তাওয়ান : সাঃ ভিয়েতনাম
মালয়েশিয়া : ভারত

২রা আগস্ট

থাইল্যান্ড : হংকং
স্যাঃ কোরিয়া : সিঙ্গাপুর

৩রা আগস্ট

ওঃ অস্ট্রেলিয়া : সাঃ ভিয়েতনাম
বার্মা : ভারত

৪ঠা আগস্ট

থাইল্যান্ড : সিঙ্গাপুর
মালয়েশিয়া : তাওয়ান

৫ই আগস্ট

ওঃ অস্ট্রেলিয়া : ভারত
বার্মা : সাঃ ভিয়েতনাম

৬ই আগস্ট

জাপান : হংকং
ইন্দোনেশিয়া : সিঙ্গাপুর

৭ই আগস্ট

বার্মা : তাওয়ান
মালয়েশিয়া : ওঃ অস্ট্রেলিয়া

৮ই আগস্ট

জাপান : থাইল্যান্ড
ইন্দোনেশিয়া : সিঙ্গাপুর

৯ই আগস্ট

সাঃ কোরিয়া : হংকং
মালয়েশিয়া : বার্মা
ওঃ অস্ট্রেলিয়া : তাওয়ান
ভারত : সাঃ ভিয়েতনাম

১০ই আগস্ট

জাপান : সিঙ্গাপুর
ইন্দোনেশিয়া : থাইল্যান্ড

১২ই আগস্ট

সেমিফাইনাল
গ্রুপ 'এ' বিজয়ী : গ্রুপ 'বি'
রানার্স এবং ৯ম ও ১০ম স্থানের
জন্যে খেলা

১৩ই আগস্ট

সেমিফাইনাল
গ্রুপ 'বি' বিজয়ী : গ্রুপ 'এ' রানার্স
এবং ১১শ ও ১২শ স্থানের জন্যে
খেলা

১৫ই আগস্ট

৩য় ও ৪র্থ এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ স্থানের
জন্যে খেলা

১৬ই আগস্ট

ফাইনাল খেলা
এবং ৭ম ও ৮ম স্থানের জন্যে
খেলা

কলংকিত নাট্যক/বিবিধ মানিকছোষালা

১৯৬৬-র বিশ্ব কাপ বিজয়ী ইংলন্ড দলের নেতা বিবি মুর সতীর্থ জনকয়েক খেলোয়াড়ের সংগে তখন সিনেমা হলে ছাঁবি দেখেছেন। এমন সময় একদল পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি নাকি ছশো স্টাটলিং দামের একটি রেস-লেট চুরি করেছেন।

রোভিও ও খবরের কাগজ মারফৎ সমগ্র বিশ্বের লোক জেনে গেলো এ ঘটনা। বিশ্ববাসী হতবাক। ইংলন্ডের জনগণ বিস্মিত। তবে তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, বিবি এ কাজ করতে পারে না। সুদর্শন, প্রভূত অর্থের অধিকারী বিবি মুরকে যারা চেনেন তাঁরা দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, বিবির দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। খবর শুনে বিবির স্ত্রী শ্রীমতী মুরও সাংবাদিকদের কাছে এর সামান্যতম সম্ভাবনার কথাও উড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল? কলম্বিয়া ও ইয়াকোডোর স্বল্প সফর শেষে ব্যোগোটায় এক জুয়েলারী দোকানে মুর ও কয়েকজন সহ-খেলোয়াড় কিছু কেনা-কেটা করতে ঢোকেন। এখানে ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে অনেক মস্তান্তর স্বর্ণালংকার পাওয়া যায়। কিছুকণ বাদে কোন কিছু কেনা-কাটা না করেই তিনি যখন ফিরে যাচ্ছেন তখন কয়েকজন পুলিশ তাঁকে আটকায়। তাঁর বিরুদ্ধে জর্নিশ সরানোর অভিযোগ শুনে তিনি তজ্জনি তাঁর দেহ সার্চের অনুমতি দেন। কিন্তু পুলিশ অফিসার জানান যে, দোকানের কর্মচারীর ধারণা যে, তা করে লাভ হবে না, কারণ তিনি সেটা এতক্ষণে পাচার করে দিয়েছেন।

দোকানের মালিক তখন দোকানে ছিলেন না।

যাই হোক, এ ব্যাপারটা এখানেই ধামাচামা পড়ে যায়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, একেবারে শেষ মুহূর্তে মেক্সিকো যাওয়ার পূর্বাঙ্কে আদালতের পরোয়ানা বলে মুরকে আটক করা হয়।

আদালতে গামলা ওঠে। প্রধান-মন্ত্রী উইলসন এ ব্যাপারে মুরের স্বপক্ষে ব্যবস্থা নিতে ওই দেশে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতকে নির্দেশ দেন।

দলনায়ক ছাড়াই ইংলন্ড দল মেক্সিকো রওনা হয়ে যায়। বিবিকে নজরবন্দী করে রাখা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে কুমারী ক্লারা নামে যে তরুণীটি মুরের বিপক্ষে প্রধান সাক্ষী ছিলেন তিনি শেষ মুহূর্তে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলার দরুন মামলা প্রায় ক্ষেঁসে যায়। বাধ্য হয়ে বিবিকে ছেড়ে দিতে হয়। যদিও তা শর্ত-সাপেক্ষে।

ব্যোগোটায় এ ধরনের ঘটনা নতুন নয়। সেখানে বিদেশী অতিথিদের এভাবে অপদস্থ করার সুপারিকল্পিত চক্রান্ত এ'টে দোকানদাররা বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে নেয়। অনর্থক পুলিশী কামেলা ও মিথ্যে অপবাদে ভয়ে অধিকাংশ মানুষকেই কিছু আক্সেল সেলামী দিয়ে রেহাই পেতে চায়।

ইতিপূর্বে গহনা চুরির দায়ে

জনিকা আন্ডারটনের তরুণীকে অভিযুক্ত করা হলে তিনি উক্ত দোকানদারকে নগদ ষাট পাউন্ড গাটগচ্চা দিয়ে রেহাই পান।

একজন আমেরিকান ট্যারিস্টকেও এভাবে নেকলেশ চুরির দায়ে নাইট ক্লাব থেকে ধরা হয়। তিনি কোনরূপ আপোষে সন্তুষ্ট না হওয়ায় বিচারে তাঁর দুশো পাউন্ড জরিমানা হয়।

ইতিপূর্বে উরুগুয়ে এবং ব্রাজিল ফুটবল দলকেও এভাবে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল বলে জানা গেছে।

মেক্সিকোতে জনৈক মার্কিনী ব্যবসায়ী এ সম্বন্ধে বলেন যে, ছমাস পূর্বে তিনি উক্ত শহরে একটি দোকানে গেলে একজন পুলিশ তাঁকে ঐ দোকানের আটটি চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করলে তাঁকে পুলিশ অফিসার আটচলিশ ঘণ্টা আটক রাখার হুমকি দেন। তখন দোকানদার তাঁকে একশো ডলার আপোষে দিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়। তিনি নিতান্ত বাধ্য হয়ে একশো ডলার জরিমানা দেন।

এই ঘটনার পর আমেরিকান আম-বাসী থেকে এই বলে মতামত জানানো হয় যে, তাঁরা আশ্চর্য হচ্চেন, কোন ব্রিটিশ হাই কমিশন ইংলন্ডের খেলোয়াড়দের এ বিষয়ে আগে সতর্ক করে দেন নি।

সে যাই হোক, এ ঘটনা যে বিবি মুরের জীবনের সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর পর বিবি মুর বিশ্ব কাপে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ পেলেও এ ঘটনা যে তাঁকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছে, এ কথা না বললেও চলে। পাঁচ ফুট দশ লম্বা ইংলন্ডের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফুটব খেলোয়াড় বিবি মুর চিরকালই বেশ-বাসীর কাছে প্রখ্যাত পাত্র হিসাবে থাকবেন। ব্যোগোটায় ব্রেশলেট চুরির অভিযোগ তাঁর সুনামে আঘাত হানতে পারবে না।

বিশ্ব কাপে এবারের ইংলন্ডের পরাজয়ের অনেক কারণের মধ্যে যেমন ব্যাংকসের না খেলা একটি কারণ, তেমনি এ ঘটনাও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছে বলে অনেকের অভিমত।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, মণিপুরবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১১
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥ গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

પ્રાઇવેટ લિમિટેડ । ૬૦૬, વિનિમલવિહારી ગ્રાહ્યતા સ્ટ્રીટ, તમિલ-૬૨

কণ্ঠ মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সজি-
তুলতা হয় না!

কুকুমী

28 JUL 1970



কুকুমী
গুড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিচুপ্ত করে।
কুকুমী পিণ্ডের খাতো
ও রুণীর
পাখা নির্ভর
ব্যবহৃত হয়।

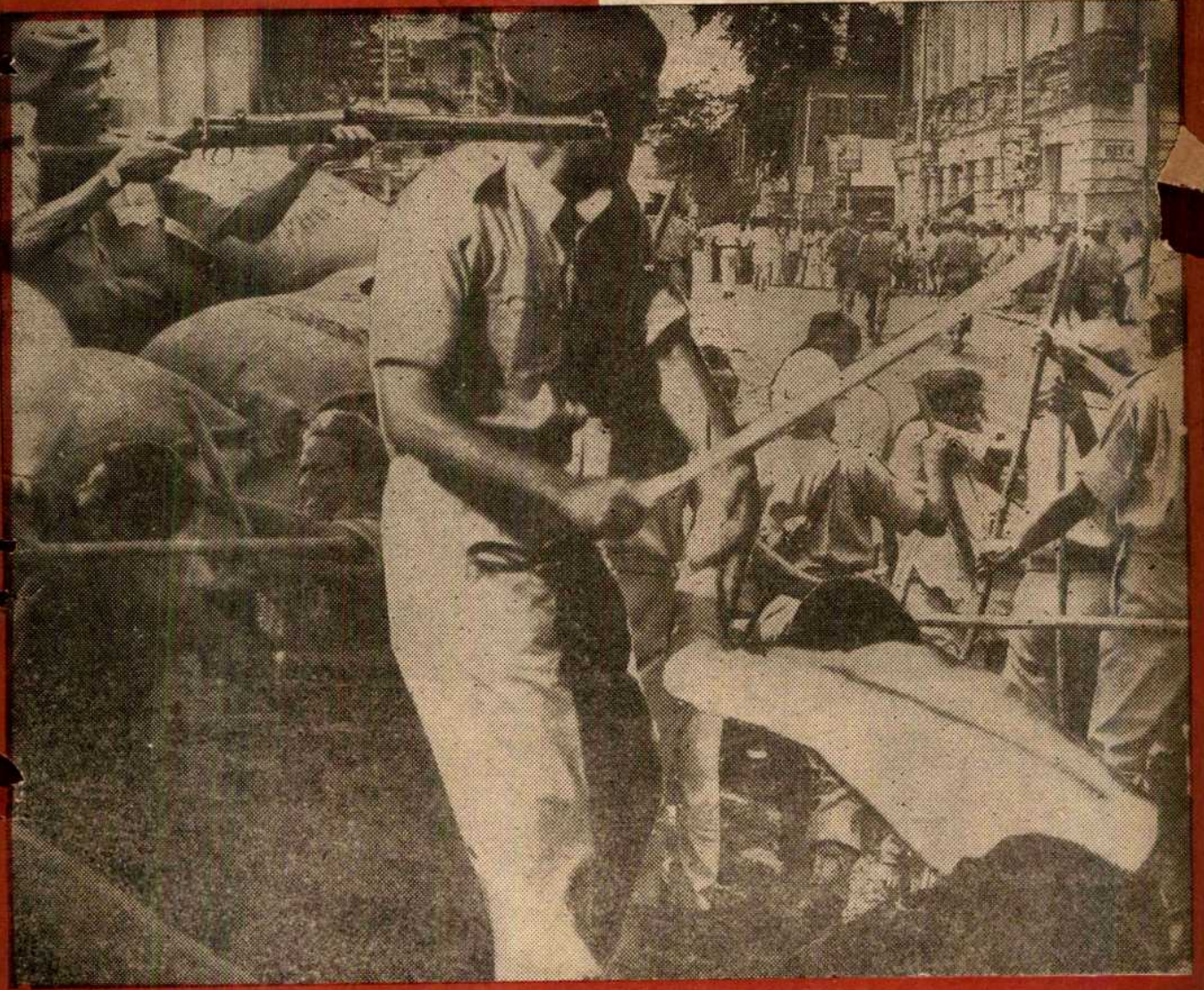
কুকুমী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
গুড়ো মশলা।
এর পেছনে
মায়েছ ১২০
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

অন্ততঃ
কুমিল্লা দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কলীপুর



সাপ্তাহিক বাসুমতী

সি আর পি'র বর্বরতার প্রতিবাদে
পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বিক্ষোভ, সভা-
সমাবেশ ও স্কুল-কলেজে ধর্মঘট



৫ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

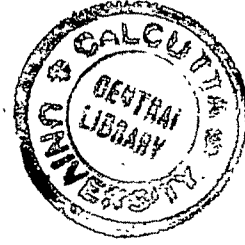
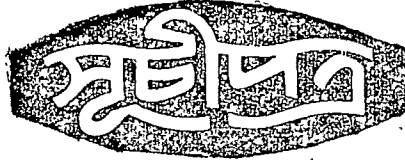
] OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 5, 30th July, 1970

বোরোলীন



ফেমিলা ক্রিম



বিষয়	লেখক				দাম
মুদ্রণকীর্তি	...	...	...	...	২৫৯
আজকের দান	...	...	...	...	২৬০
দুর্ভাগ্যচন্দ্র ও সহকালীন					
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	১-৩	—	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	...	২৬১
প্রাণতোষদা	১-৩	—	দুর্গাদাস সরকার	...	২৬৬
বঙ্গদর্শন	১-৩	...	...	...	২৬৭
ভারতদর্শন	১-৩	...	...	...	২৭০
আন্তর্জাতিক	১-৩	...	...	...	২৭২
সত্তাহের বোঝা	১-৩	—	কুন্তিবাস ওয়া	...	২৭৪
স্বাধীন বিবেকানন্দের বৈদান্তিক					
বিপ্লববাদ ও ন্যাক'সীয় দৃষ্টিভঙ্গী	...	—	গোরাচাঁদ কুন্ডু	...	২৭৬
সারা রাত্রি সারা দিন (কবিতা)	...	—	শ্যামলেন্দু রায়	...	২৭৮
স্রোতের সঙ্গ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	...	২৭৯
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	...	—	বিশ্বনাথ ঘোষ	...	২৮২
সৈনিকের জবানবন্দী (গল্প)	...	—	নীলকণ্ঠ পাল	...	২৮৪
রংগজগৎ	...	...	...	...	২৮৮
বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা খেলা					
থেকে-থেকে কত টাকা পান	...	—	...	...	২৯২
হাতে নকল লাড়, ঠকছে কে!	...	—	অজয় বসু	...	২৯৩

যে (কান

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ত

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড প্র্যাণ্ডসজ অব লেট

এম. বি. সরকার



এ.এরকার
এভএস

১৯১৭ রামবিহারী অজিত্য চন্দ্র



বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কলকাতার ফুটবল মনুছে	— আরবি	২৯৪
বিশ্ব ফুটবলের নিরিখে ওরা	—	—
ও আমরা	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৭
এক নজরে বিশ্বকাপের ফলাফল	—	২৯৯
কৌশিকের রণাঙ্গনে	— নীলিমেশ রায়চৌধুরী	৩০১
ফুটবল বিশ্বের সেরা ক'জন	— প্রশান্তকুমার চক্রবর্তী	৩০৪
ভালো লাগার মতো খেলা	—	—
খেলছেন মারা	— মানিক ঘোষাল	৩০৯
বিশ্বকাপের ফাইনালে গেলে কি	—	—
তিনবার খেলেছেন?	— বিপ্লব তালুকদার	৩১৪
রেকর্ডস-এর পাতা থেকে	—	৩১৬

বিভোদয়ের বই

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের	
নাট্যতত্ত্বমীমাংসা	১৩'০০
কানাই সান্নিতের	
চিত্রদর্শন	২৫'০০
শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের	
অলিম্পিকের ইতিকথা	২৫'০০
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [সংকলন]	
বিজ্ঞানী ঋষি	
জগদীশচন্দ্র	৬'০০
সুপ্রকাশ রায়ের	
১ ভারতের বৈজ্ঞানিক	
সংগ্রামের ইতিহাস :	১ম ২০'০০
২ ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ	
ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম :	১ম ১৬'০০
খগেন্দ্রনাথ মিত্রের	
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য	
[১৮১৮-১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ]	১০'০০
ডঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্যের	
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা	৯'০০
হর্ষজিৎপ্রসাদ মদ্যোপাধ্যায়ের	
বক্তব্য	৫'০০

মোহিতলাল মজুমদারের	
সাহিত্য-বিচার	৮'৫০
কবি শ্রীমধুসূদন	১০'৫০
বঙ্কিম-বরণ	৬'৫০
সাহিত্য-বিতান	৯'৫০
বাংলার নবযুগ	৮'০০
শ্রীকান্তের শরণচন্দ্র	[যন্ত্রস্থ]
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের	
ভারত মহিলা	৩'৫০
রাজকুমার মদ্যোপাধ্যায়ের	
স্কুল ও কলেজের	
গ্রন্থাগার পরিচালনা	৩'৭৫
শ্রীমন্তকুমার জানার	
ব্রবীজ মনন	৮'০০
সরোজকুমার রায়চৌধুরীর	
ময়ূরাসুখী	৪'০০
গৃহকপোতী	৩'০০
সৌমলতা	৪'০০
বৈষ্ণবিতা	৬'০০
জীবনে প্রথমা প্রেম	৪'৫০
সুশীল জানার	
বেলাভূমির গান	৬'৫০
সদ্যগ্রাম	৩'৭৫

এবারের শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম
পূজা-বার্ষিকী

শারদীয়া [১৩৭৭]
কিশোর ভারতী

বিষয়বস্তুর সামান্য আভাস :

- সমুদ্র-গর্ভে বাস্তুবে সার্থক অভিযানের শিহরণজাগানো ইতিকথা
- বহুকাল পরে সুদীর্ঘ রহস্যোপন্যাসে রহস্যভেদী করিচী রায়ের পুনরাবির্ভাব
- অতলান্ত সাগরতলে অবতরণের অমর গল্প-কাহিনী
- বাংলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় চৌদ্দটি চরিত্রের অতিবিত সমারোহ — যাদের দলপতি ঘনাদা, টেনিদা, হর্ষবর্ধনের মত মহাপুরুষেরা
- অনন্য পনেরটি উপন্যাস ও উপন্যাসের মত গল্প
- চিত্রে সুদীর্ঘ গোয়েন্দা-কাহিনী
- চিত্রে রঙ-বেরঙের হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী
- প্রায় শতাধিক লেখক-শিল্পীর সমাবেশ

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে।
মূল্য : ছয় টাকা ॥

কার্যালয় : ৮/৩ চিত্তমণি দাস ভেনু,
কলিকাতা ৯ ॥ ফোন : ৩৪-৩১৫৭

বিভোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ৯ কলিকাতা ৯ ফোন : ৩৪-৩১৫৭



সাপ্তাহিক বসুমতী

সংবাদিকা • জয়ন্তী সেন

বহুসপ্তিকার, ১০ই শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৫৫ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 30th July, 1970

আই-এম-এ আহৃত ধর্মঘট অর্থোক্তিক ও অমানবিক

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন-নেতৃত্ব চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও দুর্ভোগ, চিকিৎসকদের ওপর দলবদ্ধ হামলা ও গৃহভাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাধানোর উদ্দেশ্যে সাধা পশ্চিমবঙ্গে আগামী পয়লা আগস্ট কর্মবিরতির (ধর্মঘট) ডাক দিয়েছেন।

এসোসিয়েশনের স্টেট কার্ডিনালের পশ্চিম জন-সদস্য প্রস্তাবিত কর্মবিরতিকে জন-বিরোধী আখ্যা দিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। এ সদস্যদের অভিমতে (১) চিকিৎসক-ধর্মঘট জনগণের সঙ্গে ডাক্তারদের তিক্ততাই বৃদ্ধি করবে, (২) চিকিৎসক ধর্মঘট অমানবিক ব্যাপার, (৩) চিকিৎসক ও চিকিৎসা কেন্দ্র যে অপ্রতীক্ষণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং হচ্ছে, তা নিরসনের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের সঙ্গে চিকিৎসকদের সৌহার্দ্য বৃদ্ধি লাভ করতে পারে।

এতদ্ব্যতীত এসোসিয়েশন এ-যাবৎকাল যা করেছেন তা খুব সূক্ষ্ম নয়, এমন অভিযোগও এসোসিয়েশনের ধর্মঘট-বিরোধী পশ্চিম জন স্টেট কার্ডিনাল সদস্য তাঁদের বিবৃতিতে উত্থাপন করেছেন।

আমরা একথা সরল এবং অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে বলতে চাই যে, ডাক্তারদের ওপর যে-কোনো রকম হামলা ও গৃহভাঙ্গা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার, কিন্তু তার বদলা হিসেবে আই-এম-এ কর্তৃক কর্মবিরতির আহ্বান অমানবিক ও অর্থোক্তিক। তাই এ ধর্মঘট কোনো মতেই সমর্থনীয় নয়। একথা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধের সময়ও চিকিৎসক ও চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিকে শত্রু-পক্ষ নিধন ও ধ্বংস করে না। একমাত্র মানবিক কারণেই তা করে না। আর এই অনগ্রসর দেশে যখন চিকিৎসার অভাবে জনসাধারণ চরম দুর্ভোগ ভোগ করেছেন, তখন ডাক্তাররা সেবার মনোভাব না নিয়ে নিজের স্বার্থ বৃদ্ধি স্বাধা পরিচালিত হয়ে কিভাবে ধর্মঘটের সামিল হতে পারেন। তবু আশার

কথা, সব চিকিৎসকই প্রস্তাবিত ধর্মঘটের পক্ষে নন।

যে এসোসিয়েশন ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছে, তা কি পশ্চিমবঙ্গের গরিষ্ঠ-সংখ্যক চিকিৎসকদের প্রতিনিধিত্ব করে? সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গের মাত্র শতকরা পঁচিশ জন চিকিৎসক এসোসিয়েশনের সদস্য এবং অন্যান্য প্রদেশের সদস্য সংখ্যা আশো কম। অথচ এ এসোসিয়েশন ধর্মঘটের ডাক দিতে স্বেচ্ছা বোধ করে নি।

আমরা আগেই বলেছি চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে যে-কোনো রকম হাঙ্গামা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। কিন্তু এ কারণে প্রস্তাবিত ধর্মঘট ও প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে? তা কি সরকারের বিরুদ্ধে? বর্তমান সরকার তো সি-আর-পি আমদানী করা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। ডাক্তাররা কি চান তাঁদের পিছ পিছ সি-আর-পি বন্দুক ঘাড়ে করে যাক আর এভাবে ডাক্তাররা চিকিৎসা করতে থাকুন? নিশ্চয়ই এভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে জন-সাধারণের দুর্গতিই বাড়বে। এই মৌলিক দায়িত্বের কথা স্বীকার করে প্রস্তাবিত ধর্মঘট তুলে নেওয়া উচিত এবং চিকিৎসকরা যেমন জনসাধারণের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তেমন চিকিৎসকদের নিরাপদ-বোধের জন্য জনগণের স্বভঃস্বর্ভূত সাহায্য অনিবার্য—এই জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির দ্বারাই সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (আই-এম-এ) ইতিপূর্বে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত নানা অব্যবস্থা ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে নি এবং জনগণের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের পক্ষে সমিতির আগ্রহ দেখা যায় নি।

উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবীতে নাকি ধর্মঘট? আমরা এই প্রশ্নে আই-এম-এ সমীপে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই।

কলকাতার সরকারী হাসপাতালগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার (এঁদের মধ্যে সার্জেন, গাইনিকলজিস্টের সংখ্যাই বেশি) হাসপাতালে রোগীদের না দেখে প্রাইভেট চেস্বারে যেতে বাধ্য করছে, তাঁদের কাছ থেকে ৩২/৬৫ টাকা ফি আদায় করেন এবং প্রয়োজনে আরো অর্থের বিনিময়ে হতভাগ্য রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি সূপারিশ করেন—এ ধরনের নিত-অনুষ্ঠিত দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আই-এম-এ আজ পর্যন্তও কি কিছু করেছে? হাসপাতালে দিনের পর দিন দুঃস্থ রোগীরা যায়, কিন্তু সুচিকিৎসা পায় না। প্রবীণ চিকিৎসকদের বিশেষ করে বড় বড় ডাক্তারের মূখ দেখতে পাওয়াও পক্ষম সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে হয়। অবশ্য এমন ডাক্তারও রয়েছেন, যাঁদের ব্যবহারে, সদর সৌহার্দ্য ও সাহায্যে রোগীরা আশ্বস্ত হয়।

বছরের পর বছর ধরে হাসপাতালের অপ্রতুলতা, শয্যার অভাব, ঔষধের অভাব, রোগীর খাদ্যের নিম্নমান, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসকদের ও ঔষধপত্রের অভাব সম্পর্কে এসোসিয়েশন এতোকাল কি করেছে এ প্রশ্ন করাও নিশ্চয়ই অন্যায় নয়?

বর্তমানে এসোসিয়েশন জনসাধারণ ও চিকিৎসকদের মিলিত আন্দোলনের পক্ষে উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থার দাবি করেছে। নিশ্চয়ই সে দাবি কর্মবিরতির মাধ্যমে জন-সাধারণের অসুবিধা ঘটিয়ে পূরণ হতে পারে না। একমাত্র অধিকতর জন-সৌহার্দ্য লাভেই জনগণকে সঙ্গে লাভ করা যায়। আমরা মনে করি, সে কথা বিবেচনা করে আই-এম-এ নেতৃত্ব প্রস্তাবিত কর্মবিরতি থেকে বিরত থাকবেন।

সিদ্ধান্তদায়ী

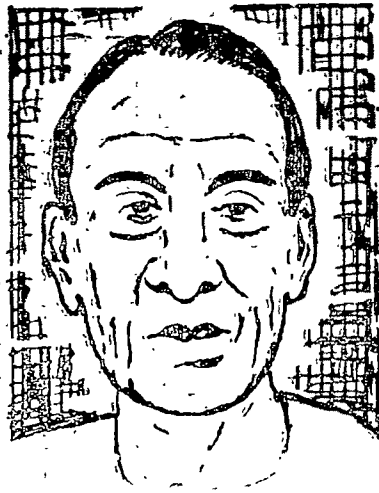
আচার্য কৃপালনী

রূপকথার কাহিনীতেই কেবল নয়, বাস্তব ঘটনার ক্ষেত্রেও জাতির জীবনেতি-হাসে এমন এক-এক মুহূর্ত আসে, যখন ঘটতে-কুড়ানির ছেলেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। আচার্য কৃপালনী অবশ্য সে-অর্থে ঘটতে-কুড়ানির সন্তান নন, বরং বোম্বাই-এর এক অভিজাত পরিবারেই তাঁর জন্ম। কিন্তু স্বতন্ত্র আর সিংডিকেট কংগ্রেসের মধ্যে তাঁকে মধ্যস্থের ভূমিকায় দেখে আমাদের ওই ভুলনাই মনে এসে গেল। ভারতের চঞ্চল ও গতিশীল রাজনৈতিক জীবন থেকে আচার্য কৃপালনী ছিলেন কার্যত বিচ্যুত, বিচ্ছিন্ন। আর সেই বিন্দুতপ্রায় হারিয়ে-যাওয়া অখর্বকে দেখা গেল আজ যুগোচিত প্রাণ-চামড়া নিয়ে মোড়লী করতে, নতুন খিয়ারী হাজির করতে। কৃপালনীজীর বয়স হলো কত? তা বিরাশি-তেরাশি তো হবে। সেই ১৮৮৮ সালে না তাঁর জন্ম?

মোড়লী করার হুকু একদিন আচার্যের অবশ্যই ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পদে ছিলেন তিনি, তাঁর অঙ্গুলি হেলনে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকার গাছপালা পর্যন্ত আন্দোলিত হতো। কিন্তু সে গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তো কৃপালনীজী নিজেই মলিন করেছেন। তাঁকে জরায় পেয়েছে, ফেলে-আসা ইতিহাসের পাতাও বেন আজ জীর্ণ। জাতির ইতিহাসের পাতায়-পাতায় আচার্য কৃপালনীর বহুল উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সে-ইতিহাসের সংগ্রামের অধ্যায়ের শেষে যখন শান্তি বা সংগঠনের পালা এলো, তখনই বেন তিনি আর টাল সামলাতে পারলেন না। ছিটকে পড়লেন তিনি দূরে, গেলেন সহযোগীদের সংস্পর্শ এড়িয়ে।

দীর্ঘকাল বাদে আজ বেন তিনি সেই পুরনো সাথীদের চিনতে পেরেছেন, অবলম্বন সংযোগ-সেতু খুঁজে পেয়েছেন। সেই রাজাঙ্গোপালাচারী, সেই মোরারজী দেশাই। আজ জাতির জীবনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নৈরীখে একদিকে দেশ আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে; আর অন্যদিকে শ্রীমতী গান্ধীর “সৈন্যাচার, একচেটিয়া ক্ষমতাপ্রিয়তা”র বিরুদ্ধে এক লাঠা হতে চাইছে “জাতীয় গণতান্ত্রিক” লগলি। সংগঠনপন্থী কংগ্রেসের এ-আই-সি-সি থেকে এক রাজনৈতিক প্রস্তাবের

মাধ্যমে টোপ ফেলা হয়েছে। উপরীকক্ষে নিক্ষিপ্ত সে-টোপ মাটি স্পর্শ করার আগেই লুফে নিয়েছেন স্বতন্ত্র, জনসংঘ ইত্যাদি রাজনৈতিক দলনেতারা। কিন্তু দুর্দিন্যার হালচাল আজকাল এমনই, নিচ-তলার কর্মীরা আজ এমনই রেয়াড়া হয়ে উঠেছে যে, পরমপ্রদেয় নেতারা যা উপরিপণ করেন, বিনা বাক্যব্যয়ে তাই গলাধঃকরণে তারা রাজী হয় না। কথা বা প্রস্তাবের ভাল-মন্দ বিচার করতে চায় সাধারণ রাস্ক এ্যান্ড ফাইল কর্মীরা। তাছাড়া সংগঠনপন্থী কংগ্রেস, স্বতন্ত্র ও জনসংঘের মহামিলনে যে গ্র্যান্ড এ্যালিয়েন্স বা মহানু একের কথা প্রচার করা হচ্ছে তা



আচার্য কৃপালনী

শেষ পর্যন্ত কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায়, তার খুঁটিনাটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নেতারাও এখনো একমত হতে পারেন নি। মতানৈক্য রয়েছে। আর সেই মতের বিভিন্নতার সুযোগ নিয়েই অগণিতপর বৃন্দ আচার্য কৃপালনী আসরে রাঁপিয়ে পড়েছেন, দু' পক্ষের সিংডিকেট কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র-হাত মেলাবেন বলে।

বোম্বাই এবং পুণয়ে পড়া-শোনা করার পর ১৯১২ সালে কৃপালনী অধ্যাপনার কাজ নেন। মজফরপুরের কলেজে অধ্যাপনার সময়েই তিনি রাজনীতির গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও অবশ্য তখন ছিল দস্তুরমতো নাটকীয়। গান্ধীজী ১৯১৭ সালে চম্পারণে নীল সত্যাগ্রহ

শুরু করেছেন। কৃপালনী সশ্রব হয়ে ক্রমে গেরুচার দিতে পারলেন না, ছুটে গিয়ে অনশনরত নেতার পদতলে নিজেকে নিবেদন করলেন। সেই থেকে কৃপালনী সারক।

চম্পারণে গান্ধীজীর কী আশীর্বাদ পেয়েছিলেন জানি না, কৃপালনীর কিন্তু পদোন্নতি ঘটলো। পুরো সময়ের জন্যে রাজনীতি করার ঋণিক নিতে তখনো তিনি সাহসী হন নি, অধ্যাপনায় ফিরে গেলেন, তবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে এবার। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৮ সনে। এখানে দু' বছর কাজ করার পর আবার ডাক এলো—কর্তব্যের আহ্বান। শরু হলো ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলন '২০ সালে—কৃপালনী তাতে সৈনিকের সামান্য ভূমিকায় অংশ নিলেন। কংগ্রেসে যোগ দিয়ে খাদি ও গ্রামোন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হলেন তিনি। গান্ধী-আশ্রমও গড়ে তুললেন। বহুস্থানকে বাদে আবার শিক্ষকতায় ফিরে গেলেন, যদিও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ বা আচার্যের পদ নিলেন, সেই থেকে কৃপালনীজী আচার্য।

ভীক্ষা, বৃন্দবৃদ্ধি, জালায়গরী বাস্মতা ইত্যাদি গুণের কারণে আচার্য কৃপালনীর পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভে বেশি দেরি হয় নি। ওয়াকিং কমিটির সদস্যপদ থেকে জেনারেল সেক্রেটারী; এ পদে ১৯৩৪—৩৬ সন পর্যন্ত থাকার পর কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের গৌরবান্বিত পদ পেলেন '৪৬ সালে। কৃপালনীজী গণপরিষদের সদস্য ছিলেন (১৯৪৬—৫১) কংগ্রেস দলভুক্ত হিসেবেই, কিন্তু '৫১ মনে কংগ্রেস ছাড়লেন।

তার পরবর্তী ইতিহাস শূন্য: যাওয়া-আসা, শূন্য স্রোতে ভাসার করণ কাহিনী। প্রথমে তিনি কৃষক-মজদুর-প্রজা পার্টির পত্তন করলেন ১৯৫১ সালে। সে দল সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবার পর পি-এস-পি'র নেতৃত্ব দিলেন। এ দলের চেয়ারম্যান পদ ত্যাগ করলেন '৫৪ সনে, কিন্তু '৬০ সাল পর্যন্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েই রইলেন। সম্পর্ক ত্যাগ করে কংগ্রেসের পরোক্ষ সমর্থনে নির্দল সদস্য হিসেবে পার্লামেন্টের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন, রেকর্ড ভোটের ব্যৱধানে শ্রীকৃষ্ণ মেননের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হলো। তবে, ১৯৫৭ ও '৬২ সালে অবশ্য কৃপালনীজী আবার জয়যুক্ত হয়েছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্য রয়েছেন। পার্লামেন্টে কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী স্বাভাব্যোধসম্পন্ন জোরাল বক্তা হিসাবে আচার্য কৃপালনীর যথেষ্ট সন্মাম রয়েছে, যদিও তাঁর সদাপরিবর্তনশীল মত ও নীতির কারণে তিনি যে কী চান বা কী চান না, তা বুদ্ধি ও ঠাট্টা মূলক হয়ে পড়ে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করাপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশের পর]

কামাল আতাভূক সম্বন্ধে

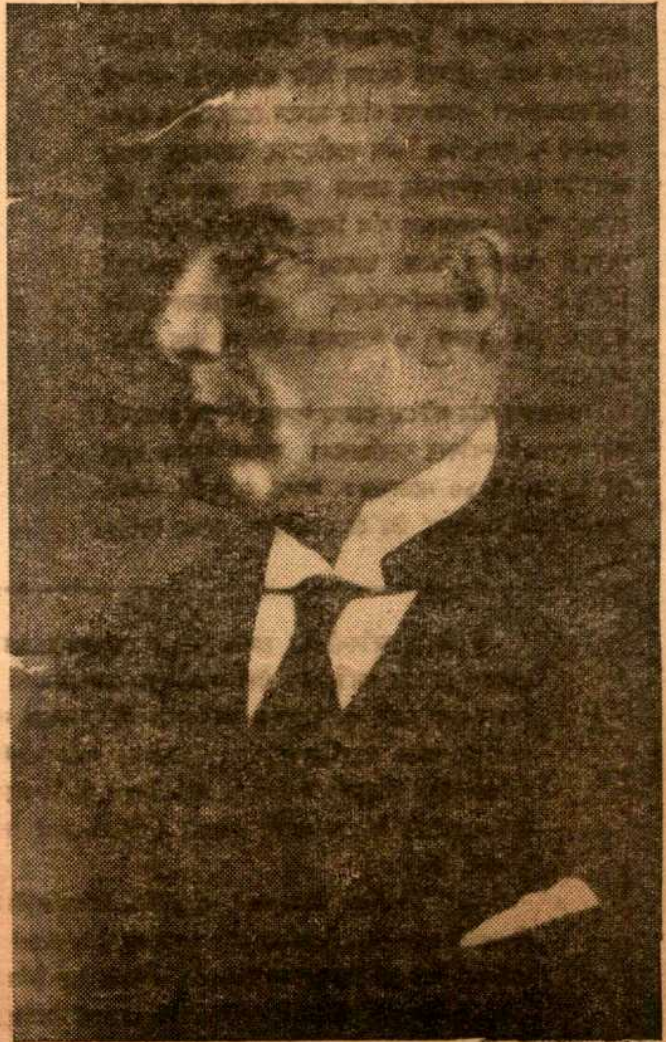
সুভাষচন্দ্র

বঙ্গ-জিন্না প্রসঙ্গের উপসংহারে কামাল আতাভূকের কথা স্বাভাবিকভাবে এসে যাচ্ছে। ভারতের স্বাধীনতাকামীদের সামনে প্রধান প্রতিবন্ধকরূপে সাম্প্রদায়িকতাব্যাপারটি এসে গিয়েছিল। কিভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে লড়াই করবেন—তা সুভাষচন্দ্রকে ভাবতে হয়েছিল। আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনকে তিনি অগ্রাহ্য করেন নি, কিন্তু স্পষ্টই জানতেন, তার দ্বারা সর্বাঙ্গীণ প্রাপ্তি সম্ভব নয়। সুভাষচন্দ্র চিরদিনই ইতিবাচক আদর্শে বিশ্বাস করেছেন এবং সংগ্রামের চেয়ে অধিক ইতিবাচক আর কিছু জানেন নি। সেই সংগ্রাম নানা পর্যায়ে নানাভাবে হতে পারে। কখনো তা মানবের শব্দবুদ্ধির প্রতি আবেদন, যা তিনি বারে বারে করেছেন নানা স্থানে বক্তৃতাকালে বা ঘরোয়া সভায় আলোচনার সময়ে। পূর্ববঙ্গে, পঞ্জাবে এবং লখনৌয়ে এইকালে সফরের সময়ে প্রায় প্রতিটি জনসভায় মুসলমানদের কাছে কংগ্রেসে যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান একথা সত্য নয়; যদি মনে হয় কংগ্রেস হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, তাহলে তার সে চরিত্র মুসলমানেরা দূর করতে পারে কংগ্রেসে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়ে, তার নেতৃত্ব অধিকার করে। কিন্তু কেন মুসলমানেরা কংগ্রেসে যোগ দেবে? উত্তরে একটি অকাটা যুক্তি তুলে ধরেছিলেন—কংগ্রেসই ভারতবর্ষে একমাত্র প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করছে।

স্বাধীনতায় বিশ্বাসী আইনসভার মুসলমান সদস্যদের সঙ্গে কোয়ালিশন করে মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক অভিসন্ধি নষ্ট করার প্রয়াসও তিনি করেছেন। বাংলার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে তিনি সফল হতে পারেন নি, সফল হয়েছিলেন আসামে, পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাপারটির আলোচনা করব। খাকসারদের সঙ্গেও স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি বোঝাপড়ার চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন—পরবর্তীকালে কলকাতা কংগ্রেস-লীগ প্যাঠ এবং হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ-আন্দোলনে সর্বশ্রেণীর

মুসলমানকে আকর্ষণ চেষ্টার মধ্যে তাঁর সেই প্রয়াসের রূপ লক্ষ্য করব।

এই সঙ্গে তিনি ভারতবাসীর সামনে একজন সংকীর্ণতাহীন, আধুনিক জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন বিখ্যাত



কামাল আতাভূক

জাতীয়ক বঙ্গদত্ত

মুসলমান নেতার জীবনরূপ তুলে ধরতে চেয়েছিলেন—তার নাম মস্তাফা কামাল পাশা—প্রথম মহাযুদ্ধেরকালে নবীন তুরস্কের পারদ্বাররূপে যার নাম ইতিহাসে অবিনাশী হয়ে আছে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সময়ে কামাল পাশার বিশেষ প্রভাব স্বাধীনতাপ্রিয় ভারতবাসীর উপরে পড়েছিল, বিশেষত যারা অহিংসায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কামাল পাশা যেহেতু মুসলমান ছিলেন, মুসলমান তরুণদের উপরে তার সাধারণ একটা প্রভাব ছিল—হিন্দুদের উপরেও প্রভাব কম ছিল না, হয়ত বেশি, কারণ কামাল স্বদেশে মোল্লাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেছিলেন এবং ইউরোপের অসুস্থ অঙ্গ তুরস্ককে সবল সূক্ষ্ম করে তুলেছিলেন কঠিন হাতের পরিচর্যায়। হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের কাছে তখন স্বাধীনতার পথে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা একটা প্রধান সমস্যা। কামাল পাশার আধুনিকতা এবং সামরিকতা নজরুল ইসলামের একটি প্রেরণ উদ্দীপক কবিতার জন্মদাতা।

রবীন্দ্রনাথও কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে সঙ্গ্রাম মনোভাব পোষণ করতেন। কামালের মৃত্যুর পরে শান্তিনিকেতনে তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ‘মানুষের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু অশ্ব কুসংস্কারের’ উৎপত্তির বিরুদ্ধে ‘অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন যিনি’ তাঁকে কবি নমস্কার জানিয়েছিলেন। কামালের চরিত্র সামনে রেখে, হিন্দু দেশবাসীকে সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাদের সমাজ অর্থহীন আনুষ্ঠানিকতার চাপের তলায় গোড়াচ্ছে। যদি তোমরা আচার-সংস্কারকে বলি দিয়ে নব যুগের আহ্বানকে স্বীকার করতে না পারো তাহলে সর্বনাশই তোমাদের নির্যাতন।’ সমালোচনা-অসাহিত্য, মুসলমান-দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কবি তুরস্ক ও পারস্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র তাঁর জীবনে কামাল পাশার বিপুল প্রভাবের কথা মৃত্যুকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন। কামাল পাশার মৃত্যু হয় ১৯৩০-এর ১০ নভেম্বরে। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ভারতবর্ষ উত্তর লোকান্তরিত মহান নেতার

উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। এইকালে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টি বস্তব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। কামালের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ১১ নভেম্বর তারিখে তিনি এক বিবৃতি দেন, যার মধ্যে ১৯ নভেম্বর তারিখে কামাল-দিবস পালনের জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন। ১৭ নভেম্বর তারিখে কপোরেশনে সুভাষচন্দ্র কামাল পাশা সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ বক্তৃতা করেছিলেন, তার কিছু বিবরণও সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। বিবৃতি এবং বক্তৃতার প্রকাশিত অংশ আমি অনুবাদ করে এর পরে উপস্থিত করব; তার আগে দু’একটি কথা বলে নেওয়া যায়। কামাল পাশা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য আমাদের কিছু বিস্মিত করেছে। আতাতুর্কের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার কথা আমরা জানি, তাঁর রচনাবলীতে ইতস্ততঃ সে বিষয়ে উল্লেখও দেখেছি; জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আতাতুর্কের অনুসরণীয় আদর্শের কথা তিনি বলেছেন; কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ঐ দুই প্রকাশিত বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আগে বোঝা সম্ভব ছিল না আতাতুর্কের প্রেরণা কত গভীর ছিল তাঁর জীবনে। পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, মেঘনাদ সাহার ‘সায়েন্স অ্যান্ড কালচার’ পত্রিকায় সুভাষচন্দ্র যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে রোমান লিপির উপযোগিতার কথা বলতে গিয়ে তিনি আতাতুর্কের স্মরণীয় প্রয়াসের উল্লেখ করেছিলেন। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের মধ্যে কয়েকবার আতাতুর্কের কথা আছে; সেখানে বিশেষভাবে বলেছিলেন—তুরস্কের খিলাফতকে উঠিয়ে দিয়ে আতাতুর্ক ভারতের খিলাফত-আন্দোলনকে সমূলে নষ্ট করেছিলেন। আতাতুর্কের সামরিক সাফল্যের উল্লেখও তিনি করেন।^১ ভিয়েনা থেকে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সোসালালিস্ট পার্টি সম্বন্ধে যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন (১৯০৫-এর ১৫ মার্চ, ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত) তার মধ্যে একটি বিষয়ে খুব পরিষ্কারভাবে কামালের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান কথা সেখানে আছে। তাঁর বক্তব্য ছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধে যে-দল জয়লাভ করে ক্ষমতা ক্রয় করবে, শাসন-তন্ত্র সেই তাঁর করবে—প্রভু-জাতির কাছ থেকে পরোয়ানা

১ রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু প্রতিবাদ করেছেন। কবি-কাষিত তুরস্কের ধর্মবিষয়ক উদারতার কথা মেনে নিলেও পারস্যে অনুরূপ উদারতা ছিল প্রভাতকুমার মানতে পারেন নি: “কবি তুর্কী ও পারস্যের ধর্মবিষয়ক যে-উদারতার কথা বলিলেন তাহা তুর্কীর ক্ষেত্রে সত্য হইতেও পারে—পারস্যের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নহে। পারস্যের শিয়া মুসলমান মোল্লাদের গোড়ামির কথা কবি ভালরূপে জানিতে পারেন নাই; তাহাদের ধর্মশিক্ষার ফলে বাহাই-রা কিভাবে নিষাতিত হইয়াছিল তাহা কবি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন; কবি বাহাইদের সম্বন্ধে ভালো করিয়াই জানিতেন এবং আবদুল বাহা সম্বন্ধে নিউইয়র্কে ভাষণ দান করেন।” (রবীন্দ্র-জীবনী, ৪৭)

২ “Before the end of 1922, Mustapha Kemal Pasha had succeeded in driving the Greeks out of Anatolia. Before the end of 1923 he succeeded in driving the Allied troops out of Constantinople. And by March 1924, he felt sufficiently strong to abolish the Khilafate altogether and bring into existence a new and powerful Turkey.” (ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল)

নিম্নে শাসনতন্ত্র তৈরি করা যায় না। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা-বিজয়ী দলই স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজ করবে এবং দেশে তখন উক্ত দলের ডিক্টেশিপ চলবে। এ ক্ষেত্রে কামাল পাশার দৃষ্টান্ত তিনি ভুলে ধরেছিলেন।

"I am of opinion that any party that aspires to win freedom for India should be prepared to draw up the constitution for India and after winning Swaraj should be prepared to put into effect the whole pro-

আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী কর্মসূচী

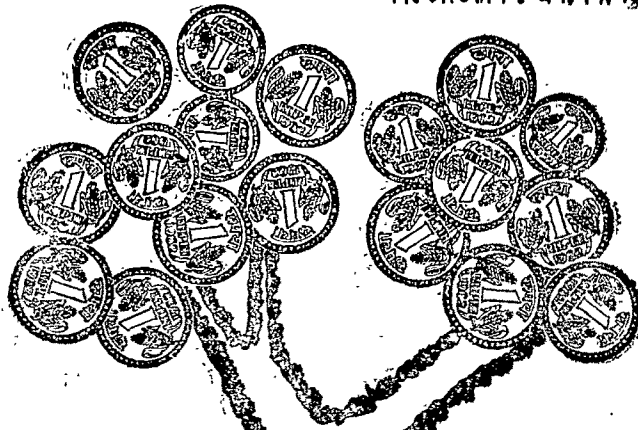
নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকদের সহজ শর্তে ঋণ দানের জন্য
আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে :

- ৩ পরিবহন চালক ৩ যন্ত্রশিল্পী এবং মেরামতকারী
- ৩ খুচরো বিক্রেতা ৩ ডাক্তার ৩ কৃষক ৩ রপ্তানীকারী
- ৩ ছাত্র ৩ ছোটখাটো শিল্পপতি ৩ চাকুরে

আপনি যদি এঁদের মধ্যে একজন নাও
হন অথচ আপনার আর্থিক সমস্যা রয়েছে
তাহলে আমাদের কাছে আসুন। আপনাদের
সেবার জন্য সারা ভারতে আমাদের ৬৪০ টিরও
অধিক শাখা আছে।

**পাঞ্জাব ন্যাশনাল
ব্যাঙ্ক**

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত
কান্টোডিয়ান:- এস. সি. ত্রিখা



১৮৯৫-১৯৭০
৭৫ বছরেরও
বেশী আমাদের
ব্যাংকিং এর অভিজ্ঞতা

programme of post-war reconstruction. There can be no question of giving up political power after the battle is won, there can be no question of dissolving the Congress after the Congress is victorious. Just as Ghazi Mustafa Kemal Pasha (Kemal Atatürk as he is now called) and his party won freedom for Turkey and thereafter remained in power in order to put Turkey on her feet and put into practice their programme of national reconstruction so also must we do in India. Dictatorship of the Party both before and after Swaraj is won—that must be our slogan for the future.” (বক্সলিপি লেখক-নির্দেশে)।

এসব সত্ত্বেও বলতে হবে, আতাতুর্কের মৃত্যুর পরে সুভাষচন্দ্র যেরকম আবেগের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তার নিদর্শন পূর্ববর্তী উল্লেখগুলির মধ্যে ছিল না।

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি ও বক্তৃতার বিবরণ—দুটিই অনুবাদ করে দিচ্ছি। কিছু পুনরুক্তি আছে পাঠক দেখবেন, কিন্তু তাহলেও নতুন কথাও মিলবে। বিবৃতির তুলনায় ভাষণে সুভাষচন্দ্রের প্রাণোত্তাপ স্বতঃই বেশি ছিল। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর তুরস্ক-ভ্রমণের কিছু স্মৃতিকথাও ছিল:

সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি:

“(প্রথম) মহাশুদ্ধি যে-সকল রোমান্টিক চরিত্রের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল, মস্তুফা কামাল পাশা নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম চমকপ্রদ চরিত্র। যশ ও জনপ্রিয়তার শিখরে তাঁর মত দ্রুত উত্থান ইতিহাসে সত্যই বিরল। কিন্তু কামাল পাশা নিছক রোমান্টিক চরিত্র বা বিজয়ী বীর নন—তিনি একই সঙ্গে ধূরন্ধর সমরবিদ, কুশলী কূটনৈতিক। জীবনে তিনি যে-অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন, তা মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের গুণাবলীর অপূর্ব সমন্বয় ভিন্ন সম্ভবপর হত না।

“কামাল পাশা আনাতোলিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রেই মাত্র বিপ্লবী ছিলেন না, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও তা ছিলেন। স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম করেছেন ও তাতে জয়ী হয়েছেন, তাঁরাই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে সফল করবেন—এই নীতির অসাধারণ দৃষ্টান্ত কামাল পাশার জীবন। সেনাপতি হিসাবে বিরাট, কূটনীতিবিদ হিসাবে বিরাট, সমাজসংস্কারক হিসাবে বিরাট, রাজনীতিবিদ হিসাবে বিরাট, সংগ্রামী হিসাবে বিরাট, সংগঠক হিসাবে বিরাট—কামাল পাশা বা কামাল আতাতুর্ক নিঃসন্দেহে এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব। ইউরোপীয় শাস্তিগম্ভীর চোয়াল থেকে নিজ দেশকে বাঁচিয়ে আনার এবং পূর্বতন অটোম্যান সাম্রাজ্যের ভস্মস্তুপের উপরে পুনর্জীবিত তুরস্ককে স্থাপন করার কৃতিত্ব তাঁরই। ইউরোপীয় শাস্তি আবার এশিয়ার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, তাহলে

কামালের তুরস্ক আমাদের মহাদেশের পশ্চিম পাক্ষিক প্রহরী হয়ে থাকবে। এহেন একজন অনন্যসাধারণ মানবের মৃত্যু অভিজ্ঞত করবে সারা পৃথিবীকে, বিশেষত আমাদের মত উৎপীড়িত ও শোষিত দেশগুলিকে। স্বাধীনতা ও মানবতার এই পরম প্রেমিকের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধানিবেদন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।” (অনুদিত; অমৃতবাজার, ১১ নভেম্বর, ১৯৩৮)

কর্ণীরেশনে সুভাষচন্দ্রের বক্তৃতা:

“তুরস্কের ঐ মহান সন্তানের জীবনী আমাকে যতখানি প্রেরণা দিয়েছে, খুব কম জীবনী থেকেই তা আমি পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, সমগ্র সভ্য জগতে এমন একজন নারী বা পুরুষের সাক্ষাৎ মিলবে না যিনি এই বিরাট পুরুষের স্মৃতির সামনে মাথা নামিয়ে না দেবেন।

“চার বছর আগে তীর্থযাত্রীর মনোভাব নিয়েই আমি বুখারেস্ট থেকে ইস্তাম্বুলে উড়ে গিয়েছিলাম—তুরস্কের এবং মানবসভ্যতার জন্য তিনি যা করেছেন তারই কিছু স্বচক্ষে দেখতে চেয়েছিলাম। ইস্তাম্বুলের গম্বুজ মিনার প্রতিটি কিংবা সহস্রা বক্ষোফারাসের সৌন্দর্য আমাকে যতখানি না আকৃষ্ট করেছিল তার থেকে বেশি আকর্ষণ করেছিল ইস্তাম্বুলের পথে পথে মুক্ত নরনারীর বিচরণের দৃশ্য।

“বিমান থেকে অবতরণের পরে প্রথম যে-জিনিসটি আমাকে নাড়া দিয়েছিল তা হল—সেখানে যেসব নরনারীকে দেখলাম তারা বুখারেস্ট, সোফিয়া বা ভিয়েনার নরনারীদের মতই। তুরস্কের নারীদের বিষয়ে একথা বলতে পারি—তাঁরা যেরকম সহজ সন্দর ছন্দে ঘোরাফেরা করছিলেন তাতে মনে হচ্ছিল বহু শতাব্দী ধরে তাঁরা এই জাতীয় স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমরা জানি, (প্রথম) মহাশুদ্ধির পরেই মাত্র তুরস্কের নারী-মুক্তি ঘটেছে।

“পূরাতন পারসী লিপির ব্যবহার উঠিয়ে দিয়ে সেখানে রোমান লিপি প্রবর্তিত হয়েছিল। সেজন্য বহিরাগতের পক্ষে ইস্তাম্বুলের পথের নাম বা তার দৃধারের সাইনবোর্ড পড়তে অসুবিধা হয় না। আমি স্বীকার করছি, এই সব ধাস্তব উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই ভারতের ভাবী জাতীয় লিপি সম্বন্ধে আমার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এশিয়ার একটি দেশে সর্বজনীন একটি লিপির প্রচলন ও তার সুবিধার রূপ দেখে আমার ধারণা হয়েছে—ঐ একই লিপি আমাদের দেশেও প্রবর্তন করলে অপারিসীম উপকার হবে।

“আর একটি ব্যাপার। সেখানকার নরনারী কেবল ইউরোপীয় পোষাকেই সজ্জিত নয়, যুদ্ধপূর্ব তুরস্কের বিশিষ্ট শিরোভূষণ ফেজ একেবারে অদৃশ্য। তার সঙ্গে বিদায় নিয়েছে মোল্লা-পুরুষদের নিজস্ব পোষাক। ধর্মীয় কাজ করবার সময়েই মাত্র মোল্লারা বিশেষ ধরনের শিরোভূষণ ব্যবহার করবার অধিকারী। তুরস্কের মাটিতে পা দিলেই এই ধরনের কতকগুলি বহিঃগ লক্ষণ দেখা যায়। এর থেকে বহিরাগত মানব-পর্যন্ত বুঝতে পারে, তুরস্কের অচিন্তনীয় বিপ্লব পরিবর্তন হয়েছে।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

“কামাল আতাতুর্কের মহিমার কথা আমরা সবাই কিছু কিছু জানি। আমরা জানি যে, তিনি তুরস্কের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে নয়, এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন। ইতিহাস ও রাজনীতির ছাত্র হিসাবে এই শোকপ্রহরে তাঁর গুণাবলীর কোনো কোনো দিক বিশ্লেষণের চেষ্টা আমাদের করা উচিত। মনে হয় সকলেই একথা মেনে নেবেন, ইউরোপীয় শাস্ত্রসমূহের কবল থেকে তুরস্ককে উদ্ধার করার ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা তুরস্কের যে কোনো সন্তানের চেয়ে বৃহৎ। দ্বিতীয়ত তিনিই সামন্ততান্ত্রিক রাজা ও মোল্লাশাসিত সাম্রাজ্যের ভিতর থেকে একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। সামন্ততন্ত্র ও মোল্লাতন্ত্র থেকে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তুরস্ককে নিয়ে যাবার কীর্তি তিনি নিভান্ত অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব করেছিলেন। এই কাজ, আমার বিশ্বাস, আধুনিক ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

“তৃতীয়ত, তিনি বিরাট বিপ্লবী ছিলেন, গ্যালিপলি বা আনাতোলিয়ার সমরাজ্যেই নয়, জাতীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও। শেষতঃ, একটিমাত্র পার্টির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসের জন্য তিনি চিরদিন স্মরণে থাকবেন। এক পার্টির শাসনে দেশ চালাবার প্রয়াস ইদানীং ইউরোপে একটা সাধারণ ব্যাপার। এ জিনিস এখন মহান রাশিয়ায় দেখি, নাজী জার্মানী ও ফ্যাসিস্ট ইটালিতে দেখি। কিন্তু একথা আমরা সর্বদা মনে রাখি না যে, এই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরীক্ষা কামাল আতাতুর্ক স্বদেশে চালিয়েছিলেন। একনাশকভঙ্গের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ মন্দের দিক মনে রেখেও বলতে হবে, ফলের বিচারে তার দ্বারা তুরস্কের অসম্ভবরকম উন্নতি হয়েছে।”

(অনুদিত; অমৃতবাজার, ১৮ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র কামাল আতাতুর্কের সর্বাঙ্গিক সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিতে গিয়ে তুরস্কের সংগঠন-রীতি এবং ভাবার উন্নয়নে তাঁর প্রয়াসের উল্লেখ করে-ছিলেন। সবশেষে বলেছিলেন, তাঁর প্রেরণা কেবল তাঁর স্বদেশেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, তা রয়েছে সমগ্র মানবের জন্য। এশিয়ার মানুষের পক্ষে তাঁর জীবন খুবই শিক্ষাপ্রদ। সুভাষচন্দ্র সব শেষে বলেন, সাম্প্রদায়িক মানবদের উচিত, তুরস্ক দেখে আসা।

সুতরাং দেখা গেল, সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন, আতাতুর্কের জীবনী তাঁকে যত প্রেরণা দিয়েছে, খুব কম জীবনী থেকেই তিনি তা পেয়েছেন। বিস্ময়ের কথা, দৃষ্টিভঙ্গিতে সুভাষচন্দ্রের চেয়ে যোজন-তফাতে যিনি ছিলেন, সেই জিম্মাকেও আতাতুর্কের জীবনী নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। জিম্মার জীবনীকার লিখেছেন:

“১৯০২ সালের নভেম্বর মাসের এক সকালে মহম্মদ আলী জিম্মা টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্টে এইচ সি আমস্ট্রং-এর লেখা ‘খুসর নেকড়ে’ নামক গ্রন্থের (Grey Wolf, An Intimate Study of a Dictator) সমালোচনা পড়লেন। প্রাতরাশের পরে... তিনি বইটি কিনে আনলেন। দুদিন ধরে জিম্মা কামাল

আতাতুর্কের জীবনীতে মগ্ন রইলেন। বইটি শেষ করবার পরে সেটি তাঁর ১৮ বছরের কন্যার হাতে ধরিয়ে ‘দিলে বললেন, ‘সোনামাণি, বইটি পড়ো। খুবই ভাল বই।’

“তারপরে বেশ কিছু দিন জিম্মার মনে আতাতুর্কের কথা লেগে রইল। এত বেশি সে কথা বলতে লাগলেন যে, তাঁর কন্যা ঠাট্টা করে তাঁকে ‘খুসর নেকড়ে’ বলে ডাকতে শুরু করল। কন্যা তখন বিলেতী স্কুল থেকে ছুটিতে ঘরে ফিরেছে।...বাবাকে তাগিদ দিত, ‘ও খুসর নেকড়ে, শুনছো, আমাকে মুকাভিনয় দেখতে নিয়ে চলো, মনে রেখো, আমি ছুটিতে বাড়ি এসেছি।’

“কামাল আতাতুর্কের কাহিনী পাঠ করে দেখে ভাবতে ইচ্ছা হয়, মহম্মদ আলী জিম্মার মনের উপরে বইটি কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করেছিল। ‘খুসর নেকড়ে’ মতই জিম্মাও বিদ্রান্ত মুসলমান জনসংঘের মধ্য থেকে একটি নেশন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।”

কামাল আতাতুর্ক বিদেশীর প্রভাবশূন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন তুরস্ক চেয়েছিলেন। মুসলিম রাষ্ট্রগোষ্ঠী-বৃহৎনার তিনি বিরোধী ছিলেন; তিনি জাতীয়তাবাদী এবং রাষ্ট্র-ব্যাপারে ধর্মনিরপেক্ষ। তিনি বলেছিলেন

“I am neither a believer in a League of all the nations of Islam, nor even in a League of the Turkish peoples. Each of us has the right to hold to its ideals, but the Government must be stable, with a fixed policy grounded on facts and with one view and one view alone—to safeguard the life and the independence of the nation within its national frontiers... Neither sentiment nor illusion must influence our policy. Away with dreams and shadows! They have cost us dear in the past.”

আতাতুর্কের সঙ্গে জিম্মার কোনো দিক দিয়েই মিল ছিল না। সে কথা স্বীকার করেও জিম্মার জীবনীকার উভয়ের তুলনার প্রলোভন দমন করতে পারেন নি। ‘নেকড়ে’ বিশেষগতি জিম্মা বোধ হয় পছন্দ করেছিলেন এবং আতাতুর্ক মুসলমান ছিলেন—কর্দাপ ভুলতে চান নি। সমস্ত ভারত-বর্ষ ও পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ যখন ধর্মীয় গোড়ামির বিরুদ্ধে যুদ্ধজয়ী বীররূপে আতাতুর্কের উদ্দেশে প্রত্যা-নিবেদন করছিলেন—ঠিক তখনই আতাতুর্কের মৃত্যুর পরে জিম্মা বলেছিলেন:

“আধুনিক ইসলাম-জগতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান। আমার স্থির বিশ্বাস, সমস্ত মুসলিম-জগৎ তাঁর বিদ্যায় গভীর শোকবোধ করবে।”

(অমৃতবাজার, ১১ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এবং জিম্মাই ঐ কথা বলতে পারতেন।

প্রাণতোষদা

দুর্গা দাস সরকার

প্রাণতোষ ঘটক অর্থাৎ আমাদের মতো অনুজদের প্রাণতোষনা চিরবিদায় নিলেন। চিরবিদায়ের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হয়। কিন্তু প্রাণতোষনা চলে গেলেন খুবই অকালে। মাত্র আটচালিশ বছর বয়সে।

২৯শে জুলাই টেলিফোনে সেই এক প্রশ্ন—প্রাণতোষবাবু কেমন আছেন, প্রাণতোষ কেমন আছে?

উত্তর দিয়েছিলাম। বেশি কথা বলার কিছুই ছিল না সেদিন। খবর যা পেরেছিলাম, তাকে নতুন আশার কথা শোনাতে পারি নি। তবু সাহিত্যিকরা সেদিনের খবর শুনে কি ভেবেছিলেন, নিদারুণ শোকাবহ ঘটনার জন্য আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা থাকি।

উদ্বেগ ও বেদনাক্লান্ত অগ্রজ সাহিত্যিকরা। প্রাণতোষদার অকাল-মৃত্যুতে কেউ বা গভীর সত্যায় স্বীকার করেছেন কৃতজ্ঞতাংশে প্রাণতোষ ঘটকের কাছে তাঁর ঋণ।

প্রাণতোষ ঘটকের কাছে সর্বাধিক ঋণ বোধহয় বাংলা দেশে তাঁর অনুজ লেখকদের।

প্রাণতোষ ঘটক যে সময় 'মাসিক বসুমতী' সম্পাদনার ভার নেন, তখনো বাংলা দেশে 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'পরিচয়' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলি পাঠকমহলে সমাদৃত। প্রাণতোষ ঘটক মাসিক বসুমতীর ভার নিয়ে তাকে শৃঙ্খল সমাদৃতই করলেন না। এতোকাল পর-পত্রিকাগুলি শহরে বা আধা-শহরেই ছিল সবচেয়ে বেশি প্রচারিত। মাসিক বসুমতী শহর থেকে দূর পল্লীতেই পাঠকদের চিত্ত জয় করল।

আর সেই সুবাদেই মাসিক বসুমতীর সঙ্গে অজ পাড়াগাঁয়ে বসেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মে উঠল।

কলকাতায় পা দিতেই আর একটি পত্রিকা দেখে আমরা চমকে উঠলাম। একেবারে নতুন রীতি নিয়ে হাজির। পত্রিকটির নাম 'নববাণী'। সম্পাদক : প্রাণতোষ ঘটক। পত্রিকটির আবির্ভাব নতুন রীতিতে, সুতরাং সেকালে বাজার-চল হয় নি। বেশ কয়েকটি সংখ্যা বেরবার পর পত্রিকটির অপমৃত্যু ঘটল। এমন এমন সব ফিচার ঐ পত্রিকায় থাকত যা রীতিমতো চাঞ্চল্য জাগাত। সাক্ষাৎকারের বিবরণীর মাধ্যমে আমরা ঐ পত্রিকাতেই তখন পেতাম বড় বড় লেখকদের সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি

কথা, আবার ঐ পত্রিকার মাধ্যমেই পরিচয় ঘটল বেশ কিছু শক্তিশালী নতুন লেখকের সঙ্গে। পত্রিকায় ছাপা হত, কারা কারা পত্রিকাটিতে নিয়মিত লিখবেন। সেই সব নামের আকর্ষণে সেকালে আমাদের মনে নেশা ধরত। আমরা তখন লেখা সবে শুরুর করছি। এমন কি লেখার মাত্রাজ্ঞান তখনো সড়গড় হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এতো সব আকর্ষণের মধ্যেও সে সময় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ছিলেন সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটক। শুনিয়েছিলাম তিনি বড়ঘরে মানুষ। না জানি, ব্যবহারই বা কেমন। মনে ছিল যেমন কোঁতুহল, তেমনি ভয়। ইতিমধ্যে মাসিক বসুমতীতে একটা লেখা পাঠিয়ে দিলাম। আশ্চর্য, অচেনা অজানা একাটি ছেলের লেখা ছাপা হয়ে গেল।



প্রাণতোষ ঘটক

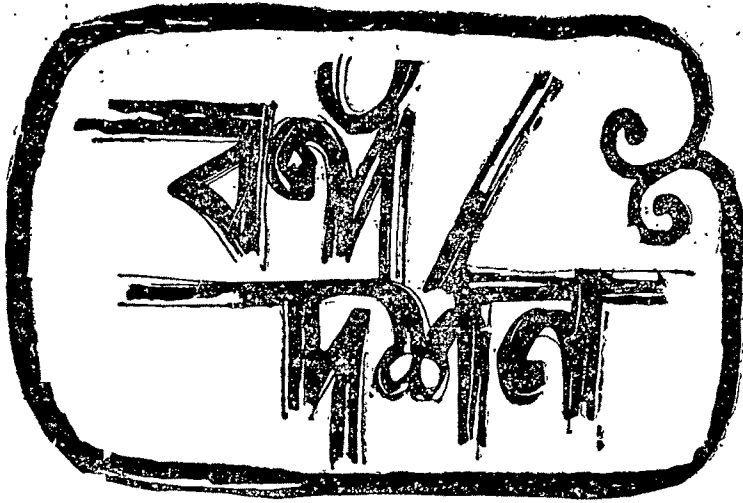
লেখা প্রকাশিত হবার পর, মনে হল, এরার বোধ হয় সম্পাদকের দরবারে যাবার প্রবেশপত্র পেয়ে গেছি। কলকাতায় জীবিকার কারণে থাকলেও গ্রাম্য খেলসটা আচার-আচরণে সম্পূর্ণভাবে আছে। তবু ভয়-ভাবনা যা থাকুক মনে, একদিন দুপুরবেলায় বসুমতী সাহিত্য মন্দিরে গিয়ে হাজির। সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকও উপস্থিত। তাঁকে না দেখে যেতো ভয় মনে মনে পেরেছিলাম, দেখার পর তার একবিন্দুও থাকল না। যদিও প্রথমে তিনি চুপচাপ ছিলেন, আমার পরিচয় দিতেই, তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এবার আমার

কল্পনার বাইরে ছিল, তাও আমি পেলাম। অর্থাৎ আমার লেখার জন্য পারিশ্রমিক। এবং পরবর্তী লেখার জন্য আমন্ত্রণ।

বাংলা দেশের তরুণ লেখকদের দরদী সমর্থক হিসেবে প্রাণতোষ ঘটকের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি যে-মত বা যে-পথের অনুসরণ করেন, তাঁর পত্রিকার লেখকরাও সেই মত ও সেই পথ অনুসরণ করবেন, তেমন কথা তিনি কখনো ভাবেন নি। তার প্রমাণ, মাসিক বসুমতীতে তিনি অগ্রজ বা অনুজ যে সব লেখকের লেখা প্রকাশ করেছেন, তাঁরা নানা মতের মানুষ, নানা পথের পথিক। মাসিক বসুমতীর সম্পাদনার ভার গ্রহণ করার পর হয়তো উক্ত কারণেই তিনি ঐ পত্রিকাকে দলমত-নির্বিশেষে প্রত্যেকের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের কাছে কৃতজ্ঞতা তাই বাংলা দেশের সকল লেখকের! ঐ কারণে বাঙালী পাঠকরাও উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু পাঠক হিসেবে প্রত্যেকেই প্রাণতোষ ঘটকের কাছে কণী হয়ে থাকবেন তাঁর লেখা প্রায় বিশবর্ষান বই-এর জন্য। এবং প্রাণতোষবাবুর অকাল-বিয়োগ হলেও তাঁর গল্প এবং উপন্যাসগুলিই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে দীর্ঘস্থায়ী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। অবশ্য প্রসঙ্গত এ কথাও অজ স্মরণীয়, সম্পাদনার কাজের মতো গুরুদায়িত্বভার পালন করেও তিনি আটচালিশ বছর বয়সের মধ্যে অতোগুলি গ্রন্থ উপহার দিতে পেরেছেন, তিনি অনন্যমন হয়ে যদি একমাত্র সাহিত্য সৃষ্টির কাজে নিযুক্ত থাকতে পারতেন, তাহলে বাংলা সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতে পারতেন।

প্রাণতোষ ঘটকের লেখা ছিল নেশা, সম্পাদনা ছিল পেশা। কিন্তু আর যা ছিল তা হচ্ছে চিরশিল্পের প্রতি। তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। অনেক সময় দেখা গেছে, তিনি তাঁর টেবিলে যখন বিশেষ কোনো কাজে ব্যস্ত নন, তখন আপন খোয়ালে টুকরো কাগজে শিল্প-রচনায় ব্যস্ত। যদিও সেই সব শিল্প লোক-হাটে বেশাতির জন্য নয়, কিন্তু সেগুলি দেখে বোঝা যেত তাঁর সুদক্ষ শিল্পবোধ এবং ঐ বোধের কারণে তিনি শিল্পীদেরও আপনজন করে নিতে পেরেছিলেন।

তাই, সম্পাদক - সাহিত্যিক - শিল্প-রসিক। প্রাণতোষ ঘটকের মৃত্যুর শোক শুধু তাঁর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে অজ-সীমিত নয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যিনিই তাঁর সংস্পর্শে একবার এসেছেন, তিনিই গভীর বেদনায় বিহ্বল বোধ করবেন।



পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুকাল ধরে যে অরাজক অবস্থা চলাছে, সে বিষয়ে কেউ গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন বলে মনে হয় না। দিনের পর দিন একমল ব্যক্তি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর হামলা চালাচ্ছে, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতি ও চেয়ার-টেবিল ভেঙে তছনছ করছে, বোমা-পটকা ছুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, কিন্তু তা বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। এই স্কুল-কলেজগুলির উপর হামলাবাজির পিছনে দু'টি শক্তি একত্রিত হয়েছে, একটি শক্তি যারা উগ্রপন্থী রাজনীতির কথা বলে এবং অপর একটি শক্তি, যারা কিছু মার্কামারা ছাত্র, স্কুলে-কলেজে যারা কোনদিন পড়াশোনা করে না। উগ্রপন্থী রাজনীতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শেষোক্ত শক্তি অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়েছে, নেই কাজ তো খই ভাজ, নিজেরাও পড়াশোনা করব না এবং যারা পড়াশোনা করতে চায় তাদেরও করতে দেবো না।

বিষয়টিকে ঠিক আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবে ধরলে ভুল করা হবে এবং সেই ভুলই করা হচ্ছে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে এই আবহাওয়া পরিবর্তন করা তো দূরের কথা, উল্টে আরও সমস্যা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। আসলে যে সব উগ্রপন্থী স্কুল-কলেজগুলির পিছনে উঠে-পড়ে লেগেছে, তাদেরও একটা বস্তু আছে—যে দিকটায় দৃষ্টি না দিলে বাস্তবতাকে অস্বীকার করা হয়। তারা বলে যে, এই বুদ্ধোন্নত শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যহীন, কেন না এ শিক্ষা আমায় বাঁচায় না, তিলে তিলে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়। যে শিক্ষা আমাকে করে খাবার সরোগ দেবে না, চাকরি দেবে না, একটা অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ ছাড়া যা আমায় কিছুই দিতে পারে না, সে শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি আমি ধ্বংস করার ব্রত নিই, কোন যুক্তিতে আমি অপরাধী? চাকরি-বাকরি পাওয়া তো বিদ্যাবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল, বড়ঘরের ছেলে, পয়সাকাড়ি আছে, পাঁচ জায়গায় আত্মীয়তা ও অন্যান্য যে কোন সূত্রে যোগাযোগ আছে, তাদের তো চাকরি পাওয়া আটকায় না। এ কথাটিকে কিভাবে অস্বীকার করা যায়? তাহলে উগ্রপন্থীদের যদি কোন ভুল থাকে, সেটা সিদ্ধান্তে, হেতুবাক্যে নয়।

সিদ্ধান্তে ভুল যদি থাকে, অনেকের সঙ্গে আমরাও মনে করি তা আছে, তাহলে দোষের দেওয়া দরকার যে, ভুলটা কোথায়। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বলতে আমরা যা বুঝি, সেই ব্যবস্থা চিরকালই শিক্ষাসংকোচনের পক্ষপাতী, সব দেশেই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার যারা চালক তাদের ছেলে-মেয়েরা উচ্চশিক্ষা পাক, সকল বড় বড় পদগুলি দখল করে বসুক, সমাজের মস্তিষ্কটাকে একচেটে করে রাখুক, পক্ষান্তরে নিম্ন আর্থিক শ্রেণীর ছেলে-মেয়েরা শব্দ দিন যাপনের, শব্দ প্রাণ ধারণের 'প্লাগ' নিয়েই টিকে থাকুক, সকল ধনতান্ত্রিক সমাজের এইটাই একমাত্র লক্ষ্য। এখন জিজ্ঞাস্য, উগ্রপন্থীরা যে স্কুল-কলেজে সুপারিক্যাপিতভাবে হামলা চালাচ্ছে এবং যাদের ভিতর থেকে মদত দিচ্ছে কিছু ফাঁকিবাজ, পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ছাত্র, তার দ্বারা কি ধনতান্ত্রিক শিক্ষানীতির এই মূল উদ্দেশ্যটা বানচাল করে দেওয়া সম্ভবপর হবে? আমাদের বিশ্বাস তা হবে না, কেন না ধনীর পন্থানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্য সকলের অগোচরেই তারা ঠিক কাজ চালিয়ে যাবে, এখানকার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হলে, তারা অন্যত্র যাবে, কলকাতা না হোক দিল্লী-বোম্বাই-দেহরাদুন, এমন কি বিলেত-আমেরিকা পর্যন্ত।

কাজেই তাদের যখন ঠেকানো থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে কোন যাবে না তখন দারিদ্র ও নিম্ন-মধ্যবিত্তের যুক্তিতে? প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাই তো মানুষকে কিছুটা আত্মসচেতন করেছে।

উগ্রপন্থী রাজনীতি করতে গেলেও তো; বিদ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়; বুদ্ধির মেতে ওঠা কিছু লোককে দিয়ে নিশ্চয়ই বিপ্লব হয় না। চার, মজুমদারও জে বুদ্ধোন্নত শিক্ষাব্যবস্থার ফল। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ধনতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নবর্ণের মানুষকে যেটুকু দেয়, সেটা এই কারণেই গ্রহণ করা দরকার; যতদূর সম্ভব রুশ বিপ্লবের পূর্বে লেনিন বুদ্ধোন্নত শিক্ষা গ্রহণে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের বাধা দেন নি এবং শ্রমিকদেরও যতদূর সম্ভব শিক্ষাদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। শিক্ষাই মানুষকে তার সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, কাজেই স্কুল-কলেজ লাটে না তুলে, যাতে সেগুলি আরও বাড়ি সেজন্য আন্দোলন করা প্রয়োজন। সাদা বিপ্লবী গড়তে গেলে সাদা ছেলে দরকার, অর্থাৎ তাদের শিক্ষায় যেন ফাঁকি না থাকে। টুকু পাশ করাই যে ছেলের মূলমন্ত্র, সে যখন লালবান্ডা কাঁধে নেবে, সেখানেও কিন্তু ওই ফাঁকির মনোবৃত্তি থাকবে। যে বিবেকানন্দের মর্মান্তিক মৃত্যু এ'রা কালি লেপন করেছেন, তিনিই বলে-ছিলেন যে, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কর্ম হয় না। এ ক্ষেত্রে মাও সেতুও কোন বিপরীত কথা বলেন না।

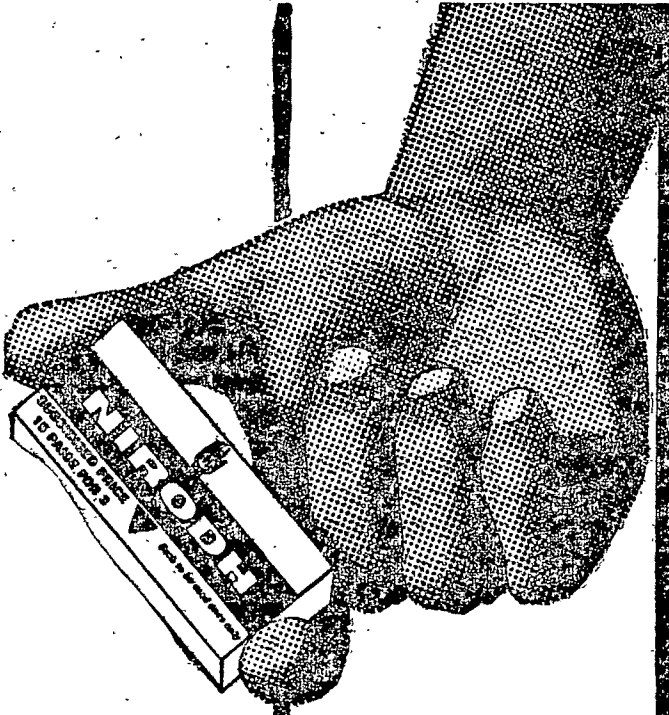
যে কথাটা বলা হল তা আসলে একটা আউটলাইন, যাকে নির্দিষ্ট একটি চিন্তার আকারে রূপ দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার, যাতে উগ্রপন্থীরা কোনরকম হঠকারিতামূলক ও বিপজ্জনক কাজ করার আগে তার পরিণতি সম্পর্কে কিছুটা চিন্তা করে এবং এই ব্যাপারে সংবাদপত্রের বিশেষ দায়িত্ব আছে। কিন্তু বাংলা দেশের সংবাদপত্রগুলি সে দায়িত্ব পালন করতে সোচ্চারভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। আসলে অভিনব সংবাদ প্রকাশের ব্যাপারেই তাঁরা অধিকতর আগ্রহী এবং প্রতিটি সম্পাদকীয়ই 'খরি মাছ না ছুই পানির' মত করে লেখা। উগ্রপন্থী রাজনীতির প্রভাবে বর্তমান শিক্ষায়তনগুলির যে অচল অবস্থা তার জন্য একদিকে উগ্রপন্থীদের কিছু দোষারোপ এবং অপর দিকে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ ছাড়া বহু সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় থেকে আর কিছুই আমরা দেখি নি। কিন্তু আমরা আগে যা দেখিয়েছি, স্কুল-কলেজগুলিতে হামলার পিছনে একটা ফিলজফি ক্রিয়াশীল রয়েছে, যাকে যুক্তি দিয়ে নস্যাত করতে না পারলে এই হামলাবাজিকে রোধ করা সম্ভবপর হবে না, তা পুলিশ, মিলিটারী গভর্নমেন্ট যতই আনন্দ না কেন, কিন্তু এক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলি, দেশের দুর্দশার কথা ভেবে যাদের

আফসোসের অন্ত নেই, কোন দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্রহণ করে নি। নকশালে-সি. পি. এম-এ খুনোখুনি হচ্ছে, সাড়ম্বরে এই সংবাদ প্রকাশ ও তার উপর কিঞ্চিৎ রসসিক্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সংবাদপত্রের দায়িত্ব এখানেই শেষ।

অনুদ্রুপভাবে বিশিষ্ট ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসাবে যাঁরা প্রসিদ্ধ, যাঁরা কথায় কথায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নিরাপদ দরজা থেকে

জ্ঞানের বোঝা খালাস করেন তাঁরাও নির্বিকার। এঁদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক রয়েছেন—যাঁরা প্রতিনিয়ত বিলাপ করেন, স্কুল-কলেজ সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, দেশটার হবে কি, তাঁরাও কিন্তু তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। সকলেই কাপুরুষের মত রণে ভগ্ন দিয়েছেন। কয়েকজনকে অনুরোধ করেছিলাম, তাঁরা যদি সত্যি বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার-

তনে উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ একটি অতীব দ্রাবত সিদ্ধান্তের ফল, তাহলে কেন তাঁরা তা ছাড়দের সামনে বলেন না, কেন তা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখেন না? সকল ক্ষেত্রে একটাই উত্তর আছে যা হচ্ছে প্রাণের ভয়। তার চেয়ে উটের মত বালিতে মূখ গড়ে থাকা ভাল, কপালে যা আছে তা হবে। দৃঢ়ভাবে অবস্থার মুখোমুখি হতে সকলেই নারাজ, সকলেই মনের দিক



মাত্র
5টি পয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

নিরোধ



পরিবার, পরিবেশের জন্যে
উন্নত ধরনের
রবারের জলনিরোধক
1.5 পয়সায় 3টি

সংস্কারী: সাহায্য, দায়, জম, ওয়া, হরেকা...

সময়ের ব্যবধানে সন্তান
উৎপাদনের জন্তে

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মার্কিন সময়ে ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। নিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্তে

জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর যত নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে হস্তস্বাস্থ্য আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। নিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম সুগতিস্বাধতে পারেন।

নিরোধ (কাগজ) পুরুষদের জন্যে উন্নত ধরনের রবারে তৈরী জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র নিরোধ ব্যবহার করা হস্তকারণ এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে, তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয় না। নিরোধ সব জায়গায় পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী দোকান, ওষুধের দোকান, সাধারণ রিপার, পানের দোকান আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

যেহেতু অপ্রস্তুত। প্রতিরোধ মানেই তা দৈহিক নয়। কোন প্রধান শিক্ষক কি কোন কলেজের অধ্যক্ষ, এককভাবে কি শিক্ষকগণের সংগে সম্মিলিতভাবে হামলার মুখোমুখি হয়েছেন? উগ্রপন্থী ছাত্রদের যে পন্থা ঠিক নয় তা কি তাদের সামনে (যারা তাঁদেরই ছাত্র) যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন? এক স্কুলে বা এক কলেজে তো প্রত্যহই হামলা হয় না। ক্লাসে তাঁরা কি ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, এ পথ ঠিক পথ নয়? আমাদের মনে হয় তাঁরা একেবারেই তা করেন নি। হামলা হয়ে গেলে পুলিশকে ফোনে জানিয়েছেন, সংবাদপত্রে খবরটি বেরিয়েছে, তার পর সংশ্লিষ্ট স্কুল বা কলেজটিকে অনির্দিষ্টকাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা খুশি, কেন না ক্লাস নিতে হচ্ছে না, ছুটি। কথাটা হয়ত তিক্ত, কিন্তু সত্য।

এর পর আসে রাজনৈতিক দল-গুলির কথা। সত্য বলতে কি, সি. পি. এম. ছাড়া অন্য দলগুলির কাছে, এমন কি দুই কংগ্রেসের কাছেও উগ্রপন্থীরা আশীর্বাদস্বরূপ। উগ্রপন্থীদের কাজ-কর্মের বিরুদ্ধে তাঁদের লিপ-লয়লাটি আছে, কিন্তু মনে মনে তাঁরা এতাই খুশি যে, এর দ্বারা সি. পি. এম.-কে কোণঠাসা করা যাবে। উগ্রপন্থীদের নিয়ে সি. পি. এম.-এর কিছুটা মাথা-ব্যথার কারণ আছে, তার কারণ, বিশেষ করে অদূর ভবিষ্যতে মধ্যবর্তী নির্বাচন না ঘটলে সি. পি. এম.-এর ক্যাডাররা ক্রমশই উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকবে। কাজেই আপাতত উগ্রপন্থীদের সংগে তত্ত্বগত লড়াইয়ের ভাবনা ছেড়ে দিয়ে মুখোমুখি লড়াই দরকার হয়ে পড়েছে। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের একটি সাম্প্রতিক বিবৃতিতেই তা অনুমান করা যায়। শ্রীদাশগুপ্ত বলেছেন, সরকার সরে যাক, সি. আর. পি. উঠে যাক, আমরাই দেখে নেবো। দলছুটদের তাঁরা চেনেন এবং নিশ্চয়-মধ্যবিস্ত, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর একাংশের মধ্যে তাঁদের কিছুটা প্রভাবও আছে এবং সেই ভরসায় তাঁরা একবার মুখোমুখি লড়াইতে চান। কিন্তু এক্ষেত্রে সেই পুরাতন সমস্যাটাই আবার এসে পড়েছে, শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু, সি. পি. এম.-বিরোধী দলগুলি তো মুখিয়ে আছে। এক্ষেত্রেও উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ঠিক সচল নয়।

সব শেষে সরকার। সরকার কথাটির অর্থ একটি অপদাৰ্থ। আমলাতন্ত্র, জনগণের সমস্যার ক্ষেত্রে নিজেদের চাকরি বজায় পদোন্নতি ও প্রগতিশীলতার সমস্যাই যাদের কাছে বেশি। সরকারের সংগে, মুষ্টিমেয় কিছু

সুবিধাভোগী বাদ দিয়ে, জনগণের সম্পর্ক অহ-নকুলের। উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন দমন করা যায় না, কিন্তু সরকার, আমলাতন্ত্র ও পুলিশ এতকাল ধরে যে মানসিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছে, সেখানে জনসাধারণের কোন মাথাব্যথা নেই সরকারকে সাহায্য করার এবং সরকারও তা বোঝেন সি. আর. পি. পুলিশ ও আমলাতন্ত্রের ভূমিকায় কোন কার্যকারিতার স্পর্শ থাকতেই পারে না। দিল্লীতে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পাঠিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ। প্রায় প্রত্যহই সরকারী উদ্যোগে কিছু স্টাফ দেওয়া খবর বেরোয় এবং পরদিন তা ভুল প্রমাণিত হয়। এ প্রাডিশন আপাতত বদলাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

অতএব, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলা চলেছে, চলবে, পথে-ঘাটে বোমাবাজি হচ্ছে, হবে। সকলেই নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে চলছেন—ছাত্র ইউনিয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-অধ্যাপক-অভিভাবক, সংবাদপত্র, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং সরকার। ফল সহজেই অনুমেয়।

তিস্তায় প্লাবন

জলপাইগুড়িতে আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ শুরু হয়েছে, তিস্তার বাঁধ আবার ভেঙেছে, জলপাইগুড়ি শহরের একাংশ জলপ্রাণিত। মাত্র দু' বছর আগে তিস্তায় প্রচণ্ড জলস্ফীতি এবং বাঁধ ভেঙে যাবার ফলে যে মহাপ্লাবনের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে যে কত মানুষ নিহত হয়েছিলেন, তার প্রকৃত সংখ্যা আজও নির্ণীত হয় নি। সেবারে বিপদের সংকেত আগে থেকে পেয়েও কর্তৃপক্ষের কর্তব্য পালনে গাফিলতির জন্য জলপাইগুড়ির অপর্যায় ক্ষতি হয়েছিল। এবারেও গত কাঁদন ধরে অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তার বান ডেকেছে। মঙ্গলঘাটে যে ১৫০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, তা তিস্তার জলের দুরন্ত তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে এবং হু হু করে শহরে জল ঢুকছে। বহু মানুষ ইতিমধ্যেই জলবন্দী হয়ে পড়েছেন। বাঁধ ভেঙে যাবার দরশন মঙ্গলঘাট এবং করলা নদীর মধ্য দিয়ে শহরে জল প্রবেশ করছে। তবে আশার কথা, ১৯৬৮ সালে তিস্তা যে ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করেছিল, এবার এখনো সেই উগ্র রূপ দেখা যায় নি। মঙ্গলঘাটের বাঁধটি মেরামতির জন্য সাময়িক বাহিনীর এবং পি-ডব্লিউ-ডির অসাময়িক বাহিনীর লোকেরা কাঁধ কাঁধ দিয়ে কাজ করছেন। স্থানীয় আধিকারীরা ১৯৬৮-র ঘটনা থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানের স্থান করছেন এবং সেনাবাহিনীর সংগে সহযোগিতা করছেন।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলি আকারে ছোট হলেও বিপদ ঘটাবার শক্তি তাদের প্রচণ্ড, বিশেষত তিস্তা নদীর তো কথাই নেই। কিন্তু বন্যা ও প্লাবন প্রতিরোধের জন্য যদি কোন স্থায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তাতে সমূহ ক্ষতি হবার আশংকাই বরাবরের মত থেকে যায়। দুর্যোগক্রমে এই বিষয়টি নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনো হয় নি। উত্তরবঙ্গের নদী শাসনের জন্য সরকারী স্তরে অনেক পরিকল্পনা এ পর্যন্ত হয়েছে, কিন্তু বেশির ভাগই আলমারীতে ফাইল-বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। এ সকল বিষয়ের দায়িত্ব শুধু রাজ্য সরকারের একার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক কিছু করণীয় আছে। ১৯৬৮-র বন্যার পর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে অনেক আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, তিস্তার বন্যা পাকাপাকি রোধ এবং জলপাইগুড়ি শহরের পুনর্গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দরাজ হাতে সাহায্য করবেন। একটি প্রতিনিধিদলও কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়েছিলেন এবং অনেক দরকষাকষির পর তাঁরা এই ব্যাপারে কিছু অর্থ প্রদানের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তারপর কি হয়েছে, তা কিন্তু অজানাই থেকে গেছে। সেই স্টাডি টীমের সুপারিশ অনুযায়ী কেন্দ্রের যা দেবার কথা ছিল, কেন্দ্র তা দিয়েছে বলে আমরা জানি না। ব্যাপারটি বোধ হয় কোন রহস্যের আবরণে ঢাকা আছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান আমলাতন্ত্র কি নিজেদের চাকরির ভবিষ্যতের কথা একটু কম ভেবে এদিকে নজর দেবেন?

সি আর পি'র অত্যাচার

আমরা ইতিপূর্বে বহুবার পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে সি-আর-পি'র উদ্দেশ্য-বিহীন, ফলবিহীন, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং জাতিবৈষম্য আচরণ ও অত্যাচারের কিছু কিছু বিবরণ বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পুলিশ-বাহিনী বেপরোয়া আচরণের যে চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ বেশিদিন যে তা বরদাস্ত করবে না সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত, কেন না, মুখ বুজে মার খাবার দিন বহুকালই চলে গেছে। কাজের ক্ষেত্রে এই বাহিনীর অপদার্থতার নিদর্শন নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর অহেতুক পীড়নে এরা অবিস্তারী। আমরা একটি মফস্বল শহরের ঘটনা উল্লেখ করছি। কলকাতা থেকে মাইল তিরিশ দূরে চুচুড়া শহরে মাত্র কয়েকদিন আগে সি-আর-পি বাহিনী নরুশাল দমনের অজুহাতে দেড়শো জন [২৭০ পৃষ্ঠায় চ্যুত]।



হিমালয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়

গত সপ্তাহে অলকানন্দায় আকস্মিক বন্যার ফলে বদ্রীনাথ তীর্থযাত্রীরা দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তাতে তীর্থযাত্রীবাহী ১৩ খানি বাস, ৫ খানি মোটর গাড়ী এবং ৬টি ট্রাক ভেঙ্গে যায়। ঐ সময় চামোলি এবং বদ্রীনাথের মধ্যে ৮০০ যাত্রীবাহী ২৩খানি বাস এবং অন্যান্য কয়েকটি যানবাহন চালু ছিল। সেগুলো হয় বদ্রীনাথের দিকে যাচ্ছিল, না হয় বদ্রীনাথ থেকে ফিরছিল। গোড়ায় যদিও অনুমান করা হচ্ছিল যে, এই দুর্ঘটনায় সৌভাগ্যবশত লোক মারা পড়েছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত নিহতের সংখ্যা তত বেশি হয় নি। আকস্মিক বন্যায় অলকানন্দা এবং সারদা উপত্যকার মৃত্যুর সংখ্যা দু' শ' আড়াই শ' হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই সপ্তে মন্দাকিনী নদীর বন্যায় একই এলাকায় দু'টি গ্রাম ভেঙ্গে গেছে। অলকানন্দা উপত্যকায় এ পর্যন্ত (২৫.৭.৭০) ৩৭টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। আরও ৬০।৬৫টি মৃতদেহ পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। সারদা উপত্যকায় ৭১টি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তবে সংখ্যাটা একশ' পৌঁছাতে পারে। উত্তরপ্রদেশ সরকার যে তথ্য পেয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে তীর্থযাত্রীবাহী বাসের অধিকাংশ যাত্রী বন্যার আবির্ভাব দেখে হাস থেকে নেমে হাটপথে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিলেন। তাই বন্যার করাল গ্রাস থেকে তারা বেঁচে গেছেন।

যোশী মঠের কাছে ঝাড়খলায় এক ভূমি ধসে ৭খানি গৃহ কবরস্থ হয়। সেখানেই মারা গেছেন ১৫ জন। যোশী মঠ এলাকায় মৃত্যুর সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশের মত হবে। দ্বিতীয় ধস নামে সারদা উপত্যকার পিথোরাগড় এলাকায় ১০।১৫ জন মারা গেছেন।

অলকানন্দায় অকস্মাৎ যে বন্যা দেখা দেয় তার উচ্চতা ছিল ৪০ ফুট। ক্ষয়-ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও নির্ণয় করা যায় নি। অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেটা করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা এখনও আমরা অর্জন করতে পারি নি। তবে প্রকৃতির এই রুদ্ধ রোষের কারণ অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়। প্রতি বছর সারা ভারতের হাজার হাজার তীর্থযাত্রী ঐ পথে বদ্রীনাথে তীর্থ করতে যান। কাজেই তাঁদের যাত্রাপথ যতদূর সম্ভব নিরাপদ করা দরকার। যারা এবারের দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন, উত্তরপ্রদেশ সরকার তাঁদের রিলাফ দেবার জন্য এগিয়ে গেছেন জেনে সকলেই স্বস্তি বোধ করবেন।

মহাজোটের মহা বিপত্তি

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই স্বতন্ত্র, জনসংঘ, এস-এস-পি, মুসলিম লীগ এবং সিন্ডিকেটকে এক মহাজোটে আবদ্ধ করে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্টকে উল্টে দেবার যে স্ট্রাটজি তৈরি করেছিলেন, তাতে স্বতন্ত্র এবং জনসংঘ মহা আনন্দে সাড়া দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বাদ সাধছে সিন্ডিকেট। গুজরাট শাখা। মোরারজীর তৎপর্য বাহক বলে এতকাল পরিচিত গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (সিন্ডিকেট) এক সাধারণ সভায় গত ২২শে জুলাই এই মর্মে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, সিন্ডিকেট যে আদর্শের উপর নিজেকে দাঁড় করিয়েছে, তার সপক্ষে কোন পর্যায়েই স্বতন্ত্র, জনসংঘ, মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি-গুলোর জোট গঠনের প্রস্তাব খাপ খায় না। কাজেই সেই প্রস্তাব আদৌ গ্রহণ

যোগ্য নয়। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি মনে করেন যে, সিন্ডিকেট কংগ্রেসের আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র।

গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (সিন্ডিকেট) এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন মাত্র একজন। মোরারজী দেশাই তাঁর মহাজোটের পক্ষে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেও গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেসকে (সিন্ডিকেট) নিজের দলে টানতে পারেন নি।

ভারতে সিন্ডিকেটের প্রভাব-প্রতিপত্তি শুধু গুজরাট আর মহাশূরই সীমাবদ্ধ। কারণ এই দুই রাজ্যে তাঁদের দল ক্ষমতায় আসীন। সেই গুজরাট মোরারজীর সমস্ত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে যখন "মহাজোটে"র বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তখন মোরারজীর দক্ষিণপন্থী মহাজোটের স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত ধূলিসাৎ হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। আর মহাশূরের অবস্থাও সিন্ডিকেটের পক্ষে খুব সুবিধাজনক নয়। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সেই রাজ্য সফর করতে গিয়ে যে বিপুল সমর্থনা লাভ করেছেন, তাতে সিন্ডিকেটের অনেক নেতারই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। গুজব রটেছে মুখ্যমন্ত্রী বীরেন্দ্র পাতিল সদলবলে কংগ্রেসে (ইন্দিরা-পন্থী) যোগ দেবার কথা চিন্তা করছেন।

ওদিকে দক্ষিণপন্থী মহাজোটের প্রশ্ন নিয়ে পার্লামেন্টে সিন্ডিকেট দলের নেতা ডঃ রামসুভগ সিং-এর সপক্ষে মোরারজীর নাকি আদৌ বিনিবনা হচ্ছে না। ডঃ রামসুভগ সিং নাকি দক্ষিণপন্থী মহাজোট গঠনের একেবারেই বিরোধী। তিনি নাকি মোরারজী এবং নিজলিপাঙ্গাপাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, নীতি বিসর্জন দিয়ে স্বতন্ত্র, জনসংঘের সপক্ষে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া একেবারেই অবাঞ্ছনীয় বলে তিনি মনে করেন। তাতে মিত্রতাপন্থীরা প্রকাশ্যেই ডঃ রামসুভগ সিং-এর বিরুদ্ধে উল্লা প্রকাশ করছেন। তাতে দু' পক্ষের তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, ডঃ রামসুভগ নাকি পদত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন।

সিন্ডিকেট দলের মধ্যেও মোরারজী দেশাইয়ের প্রাধান্য নাকি অনেক হ্রাস পেয়েছে। যারা কিছুদিন আগে পর্যন্ত মোরারজীর একান্ত ভক্ত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে এখন প্রকাশ্যে বলজে সন্দেহ করেছেন যে, মোরারজী প্রধানমন্ত্রী হবার লোভে এমন সব দলের সঙ্গে ভিড়তে চাইছেন, যাদের সপক্ষে কংগ্রেসের কোন সম্পর্কই থাকা উচিত নয়।

সাম্প্রতিক বঙ্গবন্ধু

গত বছর কংগ্রেস যখন দু'ভাগ হয়ে তখন মোরারজী দেশাইকে সিঁড়িকেটের পাল্লিগেটারী নেতা করতে অশোক মেটার ঘোর আপত্তি ছিল। সিঁড়িকেটের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জে বি কুপালনীর মধ্যস্থতায় তখন স্থির হয়েছিল যে, ডঃ রামসুভাগ সিং হবেন সিঁড়িকেটের লোকসভার নেতা এবং শ্রী এস এন মিশ্র হবেন রাজ্যসভার নেতা। কিন্তু এখন নারিক মেটার সঙ্গে ডঃ রামসুভাগের আদৌ বিনিবনা হচ্ছে না। মেটা নারিক এখন রামসুভাগকে নেতৃপদ থেকে হটিয়ে দিতে বন্ধপারিকর। বর্তমানে সলের মধ্যে মোরারজীর প্রধান সমর্থক নারিক অশোক মেটা।

সিঁড়িকেট আশা করেছিল, দক্ষিণ-গান্ধী মহাজোট গঠিত হলে ইন্দিরা গান্ধীর দল থেকে বহু সদস্য এসে তাঁদের দলে যোগ দেবেন। তখন মোরারজী দেশাই তাঁদের সবাইকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গণিতে গিয়ে বসে পড়বেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, মহাজোট দাঁড়াতে উঠেছে। মহাজোটের প্রশ্নে সিঁড়িকেট দলের মধ্যেই মতভেদ এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, মহাজোট গঠন নিয়ে মোরারজী-নিজলিগাপ্পা বেশি রাডারবার্ড করলে সিঁড়িকেটের অন্তত উজ্জয় দুই সদস্য ইন্দিরা গান্ধীর দলে গিয়ে যোগ দেরেন।

অন্যদিকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে, মোরারজীর মহাজোট শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যতায় বিলীন হয়ে সিঁড়িকেটের উজ্জয়ির পথই প্রশস্ত করবে।

বাদল মন্ত্রিসভা টিকে গেল

পাঞ্জাবের বাদল (আকালী) মন্ত্রিসভা ক্ষতিপরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। গত ২৪শে জুলাই সেই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটা অনাস্থা প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল কিন্তু ২১ জন সদস্যের সমর্থন লাভ করতে না পারায় সেই প্রস্তাব আলোচনার জন্যই গ্রহণ করা হয় নি। দেখা গেল বিধানসভার মাত্র ১৯ জন সদস্য প্রস্তাবটি আলোচনার পক্ষপাতী। বাকি সবাই নীরব। পাঞ্জাব বিধানসভার সদস্যের সংখ্যা ১০৪ জন। অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার পক্ষে ছিলেন জনসংঘ (৭), গুরুনামের রিদ্রোহী আকালী দল (৭), সি-পি-আই (৪) এবং এস-এস-পি (১)।

ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস দল (২৮) দু'দিন আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে, অনাস্থা প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁরা নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবেন। অর্থাৎ

বাদল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ভোট দেবেন না। তাঁরা সেই ঘোষণায় অটুট ছিলেন।

পাঞ্জাবের রাজনৈতিক পর্ববৈক্ষকদের ধারণা, মধ্যমন্ত্রী চালে ভুল করেছেন। মন্ত্রিসভার পতন এখন

সবিনয় নিবেদন

স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় প্রমথনাথ সেনগুপ্তের 'আনন্দরূপম', মিত্রেন-এর 'শহর কলকাতা', পুলকেশ দে সরকারের 'দৃষ্টি পরিক্রমা' ও শিলালির 'রংগমণ্ড—প্রদেশে এবং এদেশে' প্রকাশ করা গেল না। এর জন্য আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যায় রচনাগর্ভিত যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদিকা

অনিবার্য ছিল না তখন অনাস্থা প্রস্তাব ভুলতে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হত। অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনার পরে যদি সেটা ভোটে অগ্রাহ্য হত তাহলে কেউ আর এ কথা বঙ্গবার সুযোগ পেত না যে, তিনি একটা

সংখ্যালঘু সরকারের কর্ণধার। বাদলের দলে সদস্যের সংখ্যা মাত্র ৪৯ জন। কাজেই তিনি যে সংখ্যালঘু দলের সরকার পরিচালনা করছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আকালী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের (ইন্দিরাপন্থী) সমঝোতার কথাবার্তা যথারীতি চালু আছে। দুই পক্ষ সমঝোতার দিকে অনেকখানি এগিয়েছেন বলেই মনে হয়। নইলে কংগ্রেস দল নিশ্চয়ই অনাস্থা প্রস্তাবে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করতেন না।

গুরুনাম সিংকে আবার আকালী দলে ভেড়াবার জন্য কংগ্রেস দল যে চেষ্টা করছিলেন, সেটা নারিক বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নি।

গুরুনাম সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, সন্ত ফতে সিং-এর সঙ্গে তিনি কোন আলোচনায় আসতে রাজী নন। পাঞ্জাবে কংগ্রেস-আকালী সমঝোতার পথে গুরুনাম সিং কিছুটা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছেন। কারণ সন্ত ফতে সিং গুরুনাম সিংকে দেখতে পারেন না, অথচ গুরুনাম সিংকে বাদ নিয়ে আকালী-কংগ্রেস মিত্রতায় কংগ্রেস দলের বিবেকে রাখছে।

২৫।৭।৭০

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নারিক আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মৃগী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অথবা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বঙ্গবন্ধু থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রাহুজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রাহু

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ভারতমানে এক টাকা।

অরিগিনের অভ্যাস পেশ করুন

বঙ্গবন্ধু (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

আন্তর্জাতিক

সিংহল :

এ দেশের ইতিহাস নতুন করে লেখা হচ্ছে। দেশের নামই পালেট গেল, আরো পরিবর্তন, আরো নতুন করে তাকে সাজানো তো হবেই। সিংহল কথা আজ অচল, শ্রীলংকা বললে তবেই ভারতের দক্ষিণতম প্রান্তের এই ছোট্ট দ্বীপটিকে বোঝাবে। অবশ্য প্রাচীন ইতিহাসকে আশ্রয় করেই সিংহলের পুরাতাত্ত্বিক নাম শ্রীলংকা রাখা হলো।

শ্রীলংকায় আজ যে নবীন প্রাণের জ্বালায় দেখা দিয়েছে তার প্রধান উৎসই হলো প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক বা যুক্তফ্রন্ট। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত দেশের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট বিপুলভাবে জয়লাভ করে এখানে নতুন সরকার গঠন করেছেন। এ জয়লাভই যুক্তফ্রন্ট দলগুলিকে উৎসাহিত করেছে নতুন করে দেশ গঠনে। ছোটখাট পরিবর্তনের কথা ছেড়ে দিয়ে—যদিও তাদের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়—একটা বড় পরিবর্তনের উল্লেখ এখানে করবো যে-ঘটনা ঐতিহাসিক মর্যাদালাভ করবে এবং যার প্রতিগীয়া সদ্ব্যপসারী।

শ্রীলংকায় একটা গণপরিষদ গঠিত হয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের জন্য নতুন সংবিধান রচনা করা যার দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সংগে শেষ সম্পর্কটুকু পর্যন্ত ছিন্ন করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের আহ্বানে ১৫০০ বিশিষ্ট সিংহলী নাগরিক সাড়া দিয়ে নবরংগ থিয়েটার হল-এ মিলিত হয়েছিলেন। যোগদানকারীদের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষু, খ্রিস্টান বিশপ, আইনবিদ, বিজ্ঞানী, সমাজনেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো দেশের নতুন সংবিধান রচনার প্রয়োজনীয়তা বিরোধী দলগুলিও অস্বীকার করতে পারেন নি। তাই পার্লামেন্টের মোট ১৫৭ জন সদস্যই এ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। রাজনৈতিক দল-

গুলির মধ্যে ছিল শাসক পক্ষভুক্ত শ্রীমতী বন্দরনায়কের শ্রীলংকা ফ্রীডম পার্টি, ট্রটস্কিপন্থী লংকা সমসমাজ পার্টি, মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিরোধীপক্ষের ইউনাইটেড ন্যাশনাল পার্টি, ফেডারেল পার্টি এবং তামিল কংগ্রেস।

গণপরিষদের উদ্দেশ্য সংবিধান রচনার মাধ্যমে ১৭৫ বছরের ব্রিটিশ প্রভুত্বের চির অবসান ঘটানো এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে চালিত করা। যদিও ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ সরকার সিংহল ত্যাগ করে যান এবং সিংহল আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করে, তবুও কার্যত আইন ও সাংবিধানিক দিক থেকে সিংহল এখনো ব্রিটিশ শেকলে বাঁধা রয়েছে। এখনো বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলই সিংহলের শেষ আপীল আদালত। প্রিভি কাউন্সিলের এমন রুলিং জারী করা রয়েছে যার দ্বারা সিংহলের পার্লামেন্ট সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিলেও সংবিধানের কয়েকটি ধারার কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারবে না। অর্থাৎ সিংহল নামেই স্বাধীন, আসলে তার সার্বভৌমত্ব নেই। সে ব্রিটেনের ওপর নির্ভরশীল, অধীন।

এ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে সিংহলকে পুরোপুরি সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যই নতুন সংবিধান রচনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান সংবিধানটি রচিত হয়েছিল ১৯৪৬ সালে এবং এর জনক ছিলেন লর্ড সোলবেরি যিনি পরে সিংহলের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক বলেছেন যে, এমন সংবিধান চাই যার দ্বারা সিংহলের বহু জাতিক বহু ধর্মীয় নাগরিকরা একত্রে বোধ করতে পারেন। এই সংবিধান দেশবাসীর সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়তা করবে। নতুন সংবিধান দেশের স্বাধীনতা এবং জাতীয় মূল্য ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করবে।

পাকিস্তান :

বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এখানে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে, এখানকার রাজনৈতিক আবহাওয়া স্বভাবতই ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। স্থির রয়েছে যে, আগামী ৫ই অক্টোবর কেন্দ্রীয় আইনসভা বা জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হবে এবং ২২শে অক্টোবর হবে প্রাদেশিক বিধানসভার নির্বাচন। সরকারীভাবে যদিও এ দিন-গালি স্থির হয়েছে, তবুও এ-সম্পর্কে পাকিস্তানের পূর্বতন সরকারী কর্তৃপক্ষের পুরনো ইতিহাস স্মরণে রেখে কোনো কোনো রাজনৈতিক মহল থেকে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছেঃ নির্বাচন আদৌ হবে কি না। এ সংশয় উদ্ভবের একটা প্রধান কারণ ঘটেছে এখানে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘু বিতাড়ন এবং সরকারের নির্বাচনী প্রস্তুতিতে শিথিলতা।

জনাব এম এ এইচ ইস্পাহানি পাকিস্তানের একজন প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা, যিনি পাকিস্তানের জনক কয়েদ-এ-আজম জিন্নার সহযোগী ছিলেন। সম্প্রতি জনাব ইস্পাহানি দাবি জানিয়েছেন যে, অবাধ, মুক্তিযুদ্ধ এবং ন্যায়পূর্ণ নির্বাচনের খাতিরে ইয়াহিয়া খান সরকারের উচিত পদত্যাগ করা। অক্টোবরের দুই মাস আগে সরকারের পদত্যাগের দাবি করে সীমান্ত মুসলিম লীগ পরিষদ নেতা খান গোলাম মহম্মদ খানও বিবৃতি দিয়েছেন।

পাকিস্তানের গোঁড়া, দক্ষিণপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছিল যে, নির্বাচন অনুষ্ঠান সামরিক বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, তাহলেই নাকি তাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখা সম্ভব হবে। যদিও বামপন্থী প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়েছিল, তথাপি পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জানিয়েছেন যে, সাধারণ নির্বাচনের সময় পরিস্থিতির সামাল দেবার জন্য অসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখা হবে।

রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান যে পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বলা বাহুল্য, বাংলা দেশের গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক ঐতিহ্যের যে উত্তরাধিকার সে পেয়েছে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের ততখানি গর্ব করার মতো কী আছে? পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের বিমাতৃসুলভ আচরণের কারণেও পূর্ব বাংলার মানুষ ক্ষোভ। সম্প্রতি চট্টগ্রাম চেন্দার অফ কমান্ড এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রীর কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে এক অভিযোগ করা হয়েছে যে, পশ্চিম

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পাকিস্তানের কায়মী স্বার্থের গভীর ষড়যন্ত্রের জন্যেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দৃষ্টান্ত ব্যবধান রচিত হয়েছে। গত ২২ বছর ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে তার ন্যায্য প্রাপ্য দুই শতাংশ আঞ্চলিক উৎপাদন পণ্য এবং নয় শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

নির্বাচন যেমন দ্রুত এগিয়ে আসছে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর কর্ম-তৎপরতাও বেড়ে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, এখানকার পাঁচটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল এক নির্বাচনী আঁতাত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সে দলগুলি হল: নূরুল আমিনের পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক দল, মিঞা মমতাজ দৌলতানার কাউন্সিল মুসলিম লীগ, মাকারজি জমিয়ত-উল-উলমা-এ-ইসলাম, জমিয়ত-উল-উলমা পাকিস্তান এবং কেন্দ্রীয় জমিয়ত আহিলে হাদিথ।

দক্ষিণপন্থীদের এই জোট বাঁধার প্রতি-ক্রিয়া হয়েছে এই যে, অন্য দলগুলোও নির্বাচনী জোট বাঁধার জরুরী তাগিদ অনুভব করেছে। ইতিমধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ এবং খান ওয়ালি খানের মুসকপন্থী জাতীয় আওয়ামী লীগের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গিয়েছে। আবার পাকিস্তানি মৌলানা ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী দলের সঙ্গে আম্মুপন্থী কন-ভেনশন মুসলিম লীগের নির্বাচনী এক্যের কথা হয়েছে। অন্যদিকে আম্মু-বিরোধী আবদুল কোয়ামু খাঁর কনভেনশন মুসলিম লীগ নাকি আবার মৌলানা ভাসানীর কাছে সহযোগিতার হস্ত প্রসার করেছিল, কিন্তু ওদিক থেকে হাত এগিয়ে আসে নি!

তবে প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকর ভুট্টোর পিপলস পার্টি কোনো দলের সঙ্গে সুবিধাবাদী জোট গঠনের বিরোধী বলে জানিয়ে দিয়েছেন। নির্বাচনের এখনো দেরি, এখনো মনোনয়নপত্র ইত্যাদি দাখলের তারিখই ঘোষিত হয় নি। ততদিনে রাজনৈতিক আসর যে আরো জমে উঠবে, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে?

॥ বঙ্গদর্শন ॥

[২৬৯ পৃষ্ঠার পর]

ছেলেমেয়েকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং থানায় তাদের উপর দৈহিক নির্যাতন হয়। এদের অপরাধ, একটি স্বাধীন দেশে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে কেউ বাজারে যাচ্ছিল, কেউ খেলতে যাচ্ছিল, কেউ হাসপাতালে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত গুলোয় পড়ে থানা কর্তৃপক্ষ বাপ বাপ বলে তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এ তো একটিমাত্র ঘটনা, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রতিদিন এরকম ঘটনা

যে কতশত ঘটছে তার হিসেব নেই। গ্রামাঞ্চলে এই বর্বরের দল স্বেচ্ছা-সুবিধামত মেয়েদের উপরেও অত্যাচার করেছে, এরকম কয়েকটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে, যা আমরা পূর্বে বঙ্গদর্শনে উল্লেখ করেছি। সম্প্রতি শিয়ালদহ রেল স্টেশনে জৈনিক সি-আর-পি কর্তৃক একটি মহিলার শলীতাহানির সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

গত ২৪শে জুলাই যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সি-আর-পির বেপরোয়া অত্যাচারের যে কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তাতে যে-কোন মানুষই স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সি-আর-পির পিকেট, কিছুর সি-আর-পি আন্ডারওয়ার পরিহিত অবস্থায় তাস খেলছিল। হঠাৎ রটে যায় যে, বাইরে থেকে কে বা কারা যেন বোমা ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয় তাণ্ডব। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণের ভয়ে কোমরকমে ক্যান্টিন হলে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু সি-আর-পি বাহিনী ওই ক্যান্টিনের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের আত্ম চীৎকার এবং সি-আর-পির উদ্ভাসিত উল্লাসধ্বনির মধ্যে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এদের হাত থেকে অধ্যাপক, ছাত্র, কর্মচারী, কেউই রেহাই পান নি। কয়েক রাউন্ড গুলিও চলে, আহতের সংখ্যা আড়াইশোর বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অরবিন্দ ভবনের তিনতলা পর্যন্ত বিভিন্ন ঘরের দরজা-জানালা ও আসবাবপত্র চর্ণ-বিচর্ণ হয়ে যায়। নিচে ক্যান্টিনের সমস্ত খাবার লুণ্ঠন করা হয়। এই আক্রমণের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের পথচারী মহিলা, শিশু, রোগীও বাদ যান নি।

পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে সামান্য দেবার জন্য সি-আর-পি আমদানী করা হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে, তারা নিজেরাই আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজবিরোধীদের দিয়ে সমাজবিরোধীদের শাস্তাস্তা করা যায় না, এটাই তার প্রমাণ। আশা করি, দিগ্বী থেকে আমদানী করা এই সমাজবিরোধী-গুলি শেষ পর্যন্ত পার পাবে না।

যাত্রিসাঙ্ঘের দাবী

‘পশ্চিমবঙ্গ যাত্রিসাঙ্ঘ’ নামক সংস্থা কয়েকদিন পূর্বে একটি বিশেষ আধিবেশনে রেল-যাত্রীদের স্বার্থে দাবি করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে রেলপথ উন্নয়নের জন্য চতুর্থ যোজনায় ১২৫ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করা উচিত। শব্দে তাই নয়, দমদম-প্রম্পেপ হাট অর্ধচক্র রেল লাইন স্থাপন, জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ সেতু নির্মাণ, ছোট

লাইনগুলিকে ব্রড গেজে পরিণত করা, যেখানে সিংগল লাইন আছে, সেখানে অবিলম্বে ডবল লাইন চালু করা এবং রাজ্যের যেসব রেল লাইনে এখনও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা চালু হয় নি, সেখানে অবিলম্বে বৈদ্যুতিকরণ ব্যবস্থা চালু করার দাবি করা হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে, অর্ধচক্র রেল এবং ভূগর্ভ রেলের মধ্যে কোন বিরোধ তৈরি করা উচিত নয়, বরং কলকাতার পক্ষে আগে অর্ধচক্র রেল এবং তার তিন বছরের মধ্যে ভূগর্ভ রেল নির্মিত হওয়া প্রয়োজন। বলাই বাহুল্য, প্রতিটি প্রস্তাবই যুক্তিপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গের মত জনবহুল এবং শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যের রেল পরিবহণকে এখনো আরও উন্নত, নিখুঁত এবং আধুনিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা আছে। তা ছাড়াও রেলওয়ের উন্নয়ন-মূলক কাজ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আরও প্রসারিত হওয়া দরকার এই জন্য যে, রেল পরিবহণের আরও উন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটলে সমস্যাসঙ্কুল এই রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার এবং যাত্রীদের যাতায়াতের সুখ-সুবিধার অনেক সুযোগ ঘটবে। রেল দপ্তরের আরও মনে রাখা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মাল বহন এবং যাত্রী পরিবহণ বাবদ তাঁরা প্রতি বছর এক বিরাট অঙ্কের টাকা মুনুফা হিসাবে অর্জন করছেন। অতএব পশ্চিমবঙ্গে রেলপথের প্রবৃদ্ধি এবং যাত্রীদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ মেটানোর কাজটিকে একটি নৈতিক কর্তব্য হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তা ছাড়া চতুর্থ যোজনায় পশ্চিম-বঙ্গে যদি আরও ১২৫ কোটি টাকা উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হয়, সেটা আসলে একটা লক্ষ্যই হবে, তা রেলওয়ের আয় বাড়তেও সাহায্য করবে। যাত্রীদের সুখ-সুবিধার প্রতি রেল কর্তৃপক্ষ যে কত উদাসীন, সেটা যে-কোন একটা রেলের বর্ণী দেখলেই বোঝা যায়। বসবাস আসন নেই, জিনিসপত্র রাখার জন্য উপরের লোহার তাকগুলি নেই, পাখা নেই। বলা বাহুল্য, যাত্রিসাধারণ এগুলি চারি করেন না, বিশেষ লোকেই চারি করে এবং তা রেলরক্ষী বাহিনীর জাতসারেই এবং রীতিমত প্রশ্নে। ইলেকট্রিক ট্রেনের একটা কোচ বাহাজনের বসবার ও কুড়িজনের দাঁড়বার জায়গা আছে। কিন্তু প্রতিটি কামরা এর তিন গুণ লোক বহন করে এবং তাদের কাছ থেকে রেলওয়ে টিকিটের দামও পেয়ে থাকেন, অথচ যে যাত্রী রেলের লক্ষ্যী, তাদের প্রতিই এই বিরাট-হীন পীড়ন। ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে কোন নিয়মানুবর্তিতা নেই। কাজেই যাত্রী-সাধারণের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য তাদের সম্বন্ধ হওয়া ভিন্ন কোন উপা-নেই।

ঘট্টে পড়ছে, গোবর হাসছে।
আমরা সকলেই গোবর হাসছি—আমরা
জানি না আজ বাদে কাল গোবর হাসি
হবে, শুকিয়ে ঘট্টে হবে, তখন এই
ঘট্টেও পড়বে। এই কথা আমরা
জানি না, বুঝি না তা নয়, তবু
আমরা গোবর হয়ে ঘট্টের দুর্গতি দেখে
হাসি। রাজ্যব্যাপী নিত্যদিনের হানা-
ছানি, রক্তারক্তি, অগ্নিকাণ্ড, মৃত্যু, বোম-
বাজি সব মিলিয়ে যে অবক্ষয় চলছে
এবং যার ফলে রাজ্য হিসাবে পশ্চিম-
বঙ্গ আজ ডুবতে বসেছে, তা দেখে
‘আমরাকেউ-না-কেউ হাসছি’। শিয়াল-
দহ স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে
শ্রীদিরপুর ডাক পর্যন্ত সারা কলকাতা
ঘুরে খাঁদ দেখা যায়, তবে দেখা যাবে
একদিকে সব পড়ছে, জড়লছে, বন্ধ
হচ্ছে, আর একদিকে মানুষ হাসছে।

শিয়ালদহ স্টেশনে একটু দাঁড়ান,
তাকিয়ে দেখুন, চিলের নাগালে পাওয়া
যায় যতগুলো খাঁড় আছে, দ্বকদলি অচল
হয়ে গেছে, সব খাঁড় ভাঙা। লক্ষ
লক্ষ ব্যগ্রী শিয়ালদহ স্টেশনে নেমে খাঁড়
দেখে যাত্রা শুরু করে অথবা খাঁড় দেখে
ট্রেন ধরতে ছোট্টে, তাদের সামনে আজ
জার সেই সম্মান-নির্দেশের সচল খাঁড়
নেই। অচল ঘড়িগুলি পড়ে আছে।
এই ঘড়িগুলিই বর্ষা পশ্চিমবঙ্গের
জনজীবনের প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গে
জনজীবনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে, জন-
জীবন অচল হয়ে গেছে। কে ভেঙেছে
এই ঘড়িগুলো, কারা ভেঙেছে এই খাঁড়,
কি স্রাব্ধিস্থি হয়েছিল এই ঘড়িগুলি
ভেঙে—তার একটিমাত্র জরাব পাওয়া
যারে। সেই জরাব হল বিপ্লব আসছে,
বিপ্লব চলছে, তাই ঘড়ির কাঁটা অচল।
অচল কলেজ স্ট্রীট।

কলেজ স্ট্রীট হল শুরুর বাংলাদেশ
জয়, ভারতবর্ষের শিক্ষা, প্রগতি ও নব-
জাগরণের পীঠস্থান, ঊনবিংশ শতাব্দীর
রেনেসাঁর স্মৃতিসৌধ। ডিরোজিও,
ডেভিড হেন্সলি, মাইকেল, বিদ্যাসাগর
থেকে শুরু করে ওটেনের গুণে সভ্য-
সম্প্রদায়ের চাপেটামাত পর্যন্ত যে শিক্ষা-
অংশ্কাতি, বিপ্লব-প্রদোহের স্রোতাস্রা
সারা ভারতের বন্দ্য-ভূমিকে উরর
হয়েছে, তার উজ্জমুখ এই কলেজ স্ট্রীট
পাড়া। সেই কলেজ স্ট্রীট পাড়া আজ
অক্ষয়—কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় কেউ আর
রোশি জীবনরীতি না থাকলে অশেষ না।
আর ভারতের ভাল ছেলেরা একদিন
ছোট্টে আসত এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়
শিক্ষা গ্রহণ করতে, কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়
শিক্ষা না গেলে কোন শিক্ষাই স্বয়ং-
প্রাপ্ত হত না। আজ সেই কলেজ
স্ট্রীট পাড়ায় সারা ভারতের ভাল ছেলেরা
ছোট্টে আসে না, ছোট্টে আসে সারা
বিশ্বের বান্দ সাংবাদিকরা—জাপান,



আমেরিকা, ব্রুটন, হট্টাল থেকে।

দেখতে আসে কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়
বিপ্লব চলছে, নয়া কৈতর বিপ্লব—যে
বিপ্লবের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ নয়, সামন্ত-
বাদ নয়, পুঁজিবাদ নয়, পরাধীনতার
শৃঙ্খলমোচন নয়। এই বিপ্লবের
লক্ষ্য হল শিক্ষাব্যবস্থাকে বদলে দেওয়া।
কলেজ স্ট্রীট আজ আর হাজার হাজার
ছাত্র-ছাত্রীর কলতানে মূর্খরিত নয়,
মূর্খরিত বোমা-টিয়ার গ্যাসের সেলে,
বন্দকের আগুনে, পুঁজি-শি আর
পি'র ভ্যানের আনাগোনা। প্রেসিডেন্সী
কলেজের বিজ্ঞানের গবেষণাগার—যেখান
জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ সাহা,
রমন সাধনা করে গেছেন, সেই বাড়িতে
আজ আর বিজ্ঞানের সাধনায় নবতর
কোন আবিষ্কার ঘটে না, আবিষ্কার
ঘটে পুঁজিশির তজ্জাসীতে তাজা বোমা।
ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারত-
বর্ষের যত প্রতিভাবান মানুষ ভারতবর্ষ
ও বিশ্ববর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন,
তার মধ্যে শতকরা আশিজন কোন-না-
কোনভাবে এই কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় এসে
কিছু না কিছু তালিম নিয়ে গেছেন।
কিন্তু আজ কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় মূর্খের-
মতিহারি-শ্রীকাকুলাম থেকে অনেকে আসে
বোমাবাজির তালিম নিতে। একদা
ভারতের সমস্ত ভাল ছেলে ছোট্টে
কলেজ স্ট্রীট লক্ষ্য করে। কলেজ
স্ট্রীটে এসে শিক্ষাগ্রহণ না করলে কোন
শিক্ষাই যেন মর্যাদার হত না। রহি-
ভারতেই এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যা-
লয়কেই চিনতো সকলে। আজ অচল
সেই কলেজ স্ট্রীট। শিক্ষা নয়, ছাত্র নয়,
গবেষণা নয়, বালির বাঁধ আর তার পর
সদা-প্রস্তুত বন্দুক হল সত্য। জীবনের
জয়যাত্রা নয়, জীবনের সাধনা নয়—
প্রাণের বিনাশ, জীবনের নাশ হল সত্য।
অচল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা
শুরু প্রেসিডেন্সী কলেজ নয়—নামে
চললেও অচল যাদবপুর, কল্যাণী,

বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, বন্ধ
দর কলেজ।

চিকিৎসাশিক্ষায়ও বাংলাদেশ ত্রুটি
কলকাতার স্থান ছিল বিশ্বজোড়া,
ভারতবর্ষের কোন বড় ডাক্তারই রোধ
হয় এক সময় ছিলেন না—যিনি
কলকাতায় এসে চিকিৎসাশাস্ত্রে তালিম
নিয়ে না গেছেন। ভারতবর্ষের সর্বত্র
চিকিৎসাশাস্ত্রে কঠিন প্রশ্ন উঠলেই ডাক
পড়ত কলকাতার ডাক্তারদের। যে কোন
কঠিন রোগীকে বাঁচিয়ে তুলতে নিজে
আসবার চেষ্টা হত কলকাতায়।
ডাঃ বিধান রায়, ডাঃ নীলরতন সরকার,
ডাঃ প্রতাপ মজুমদার থেকে শুরুর
আজকের ডাঃ নলিনী সেনগুপ্ত, ডাঃ
নীহার মন্সী, ডাঃ মুরারী নুখাজী
পর্যন্ত হাজার হাজার ডাক্তার—সে
এ্যালোপ্যাথিক হোক, হোমিওপ্যাথিক
হোক আর ক্রীবারাজী হোক, চোখের
হোক, আর শ্লাস্টিক সার্জারীর হোক—
চিকিৎসাশাস্ত্রে কলকাতা ছিল সবার
ওপরে, সবার আগে। হাঁ, সেই চিকিৎসা-
বিদ্যা চর্চাও কলকাতা থেকে বিবায়
নিল। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য আর
কেউ কলকাতা আসে না, ভবিষ্যতেও
আসবে না। মেডিক্যাল কলেজসমূহের
গবেষণাগার আর ছাত্রাবাসগুলিও আজ
বোমাবাজির কবলে পড়েছে। এই বছর
প্রি-মেডিক্যাল পরীক্ষা ভণ্ডুল করে এক
বৎসরের জন্য কলেজে ভর্তির পথ বন্ধ
হয়ে গেছে।

কারিগরী তথা ইঞ্জিনীয়ারিং
শিক্ষায়ও কলকাতা তথা বাংলাদেশের
শিক্ষার মান ছিল সবচেয়ে উঁচুতে।
শিবপুর, যাদবপুর, খজপুর উপহার
দিয়েছে সারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ
ইঞ্জিনীয়ার। এই সব ইঞ্জিনীয়ারিং
কলেজে পড়বার জন্যও কাশ্মীর থেকে
কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সর্বত্র থেকে
ছেলেরা ছোট্টে আসত—আজ সেই ইঞ্জি-
নীয়ারিং কলেজগুলিও বন্ধ হয়ে গেছে,
যাচ্ছে। এই কলেজগুলিও আজ উন্নত
ধরনের কারিগরী বিদ্যার শিক্ষাকেন্দ্র নয়,
উন্নত ধরনের বোমা তৈয়ারির কারখানায়
পরিণত হয়েছে।

কলকাতার বন্দর ছিল ভারতের
প্রধান ও শ্রেষ্ঠ বন্দর। বিশ্বের নানা
স্থান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ কলকাতা
বন্দরে এসে নোঙর ফেঁদত। আজ
সকলেই পথ ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছে কাডলা-
ভিজাগাপত্তম। অচল হয়েছে কলকাতা
বন্দর।

কলকাতার সংবাদপত্রের মানও ছিল
খুব উঁচুতে। কলকাতার সংবাদপত্র ও
সাংবাদিকদের মান-খ্যাতির ছিল ভারতের
সর্বত্র। বিশ্বের সব সংবাদ সর্বত্রই
প্রতিষ্ঠান ও তার সাংবাদিকরা কল-
কাতায় থেকে কাজ করতেন, কিন্তু

দাণ্ডাহক বসুমতী

কলকাতার সেই সংবাদপত্র জগতেও অন্ধকার নেমে এসেছে। সাংবাদিকরা আজ আর মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে সংবাদ সংগ্রহের জন্য যে কোন স্থানে ছুটে যান না, আর সাংবাদিকদেরও সর্ব অবস্থায় আক্রমণের ঊর্ধ্বে রেখে চলা হয় না। সংবাদপত্রের গাড়িও সংবাদপত্র নিয়ে যে কোন পরিস্থিতির মধ্যে দূর-দূরান্তে সংবাদপত্র পৌঁছে দিতে পারে না। বোমা আর আগুনের কবলে পড়তে হয়েছে সাংবাদিক ও সংবাদপত্রকে।

তাই বলছিলাম—সব অচল। শিয়ালদহ স্টেশনের ঘড়ি থেকে জনজীবনের সব উন্নতিমুখী দিকগুলি অচল করে দেওয়া হয়েছে। সচল শব্দ বোমা, সচল পদলিশের গাড়ি-ভ্যান, গুলী-টিয়ার গ্যাস। কে এর জন্য দায়ী, আর কে পারে জাতিকে ফিরিয়ে আনতে—এই সর্বনাশা পথ থেকে? এই প্রশ্ন সত্যতাই ওঠে, তাই তার জবাবও দরকার। এই জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে একটা জবাব দেওয়া যেতে পারে, সেটা হল, যেদিন আমরা বুঝব আমরা গোবর, আগামীকাল ঘণ্টে হয়ে পড়তে হবে, সেইদিন আমরা বাঁচবার চেষ্টা করব এবং তখনই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

শব্দ একটা নজীর দিচ্ছি। বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গা এলাকায় সি পি এম-ফরোয়ার্ড ব্লক দল গত আট মাস এক-নাগাড়ে একে অপরকে খুন ও আক্রমণ করে চলেছে। কত মৃত্যু হয়েছে, কত মানুষ আহত হয়েছে, কত বোমা ফেটেছে, কত গুলী চলেছে, টিয়ার গ্যাস ছোড়া হয়েছে—তার হিসেব নেই। হিসেব নেই পদলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি আর তৎপরতার, কিন্তু কোন সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হয় নি। কেন না ঐ ঘণ্টে পড়ছে, গোবর হেসেছে। বেলেঘাটার এই বোমা—এই সংঘর্ষ সংক্রমিত হয়েছে সারা দেশে। এক বেলেঘাটা সহস্র হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষ যদি বেলেঘাটায় ঘণ্টে পোড়া দেখে গোবরের হাসি না হাসতেন, তবে কি পারতেন না থামাতে বেলেঘাটাকে? আজ পদলিশ ক্যাম্প বসিয়ে বেলেঘাটা শান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু পদলিশ নয়, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীঅশোক ঘোষ ক্যাম্প করলে শান্ত হবে বেলেঘাটা। প্রমোদবাবু হাত ধরুন শ্রীঅশোক ঘোষের অথবা অশোকবাবু প্রমোদবাবুর

সঙ্গে পদযাত্রা শব্দ করুন বেলেঘাটা-নারকেলডাঙ্গায়, বলুন, কি ফরোয়ার্ড ব্লক, কি সি পি এম আমাদের বোমায় না মেরে, আমাদের গুলী না করে পারবে না আর একটা বোমা ছুড়তে—যে বোমায় বস্তুবাসী মরে, সাধারণ মানুষ মরে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়। বেলেঘাটায় একদিন গান্ধীজী ক্যাম্প করে ছিলেন ১৯৪৬-এর দাঙ্গা থামাতে। গান্ধীজীর চেষ্টা শব্দ হয়েছিল বেলেঘাটা থেকেই। নিভেছিল নোয়াখালি-বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুন।

প্রমোদবাবু-অশোকবাবুকে গান্ধীবাদী হতে বলছি না, তাঁরা শব্দ হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলুন—শরিকী বিবাদ আমরা মিটাবো বহুবাজার আর আলি-মুন্সিন স্ট্রীটে বসে, কিন্তু তোমাদের আর বোমা ছুড়তে দেব না। দেখুন, বেলেঘাটা শান্ত হবে, নতুন নজীরে সারা দেশের বোমাবাজির পথে বাধা পড়বে। এই সর্বনাশা যাত্রাপথে একটা বাধা রচনা করতে পারবেন প্রমোদবাবু-অশোকবাবু।



স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক বিলম্ববাদ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গোরাচাঁদ বুদ্ধ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৯ দ্বিই ১৫

স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে অধ্যাপক
গণগোপাধ্যায়ের আর একটি বক্তব্য—

“বিবেকানন্দ যে আদর্শ রাষ্ট্রের স্বপ্ন
দেখেছেন, সে স্বপ্ন যে বাস্তবে রূপায়িত
হবে এমন ভরসা তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণের
প্রজ্ঞা, ক্ষত্রিয়ের শক্তি, বৈশ্যের সংগঠনী
প্রতিভা ও শূদ্রের সামান্যতর সমন্বিত
রূপই ছিল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের মূল
ভিত্তি। কিন্তু এই বলিষ্ঠ কল্পনাকে
তিনি একটি সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা চিহ্ন
দিয়ে সমাপ্ত করলেন—কিন্তু সে কি
সম্ভব?” তাঁর জীবনে এ জিজ্ঞাসার
উত্তর মেলে নি। মিশ্রধাকর্ষিত সমাজে
জীবনের এই নিরন্তর জিজ্ঞাসা, ব্যর্থত
আবেগের এই আশাহীন ব্যাকুলতা বোধ
হয়, তাঁকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পথে সকল সমস্যার
চরম বিপ্রান্তিত খুঁজতে বাধ্য করেছে।”

কিন্তু স্বামীজীর জীবনের বাস্তব
চীতহাস এবং তাঁর চিন্তাধারা এই বক্তব্যের
উল্টো সাক্ষ্যই বহন করে। তিনি সংসার-
ভাব বহনে অক্ষম হতাশা-ত্যাগিত বৈরাগ্য
ছিলেন না। সমাজচিন্তারও অনেক আগে
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁর জীবনে উদ্ভূত হয়েছে।
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ছিল তাঁর কৈশোরের
জ্যোতিষ, যৌবনের গবেষণা এবং
জন্মসময় সাধনা। কিন্তু সে কথা যাক।
প্রশ্নটি হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র নিয়ে। স্বামীজী
চেষ্টাছিলেন এমন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, যেখানে
প্রজ্ঞা, শক্তি, সংগঠনী প্রতিভা এবং সামান্য-
তর সমন্বয় ঘটবে অথচ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,
বৈশ্য বা শূদ্র শাসনের দোষগুণে তাতে
থাকবে না। শূদ্র বা শ্রমিক-মজুরপ্রধান
রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও কিছু কিছু কুফল দেখা

দেবে, স্বামীজী এরূপ মত পোষণ করতেন।
কিন্তু সেই কুফলকে পরিহার করে আদর্শ
রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্ভব কিনা বা কিরূপে সম্ভব,
সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের গবেষণা
হিসাবেই এ প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন
নিজের কাছে এবং সমাজতত্ত্ববিদদের
কাছেও। ১৮৯৬ সালে ভগিনী হেলের
কাছে লেখা স্বামীজীর চিঠি, যার উপর
ভিত্তি করে অধ্যাপক গণগোপাধ্যায় উপরোক্ত
মন্তব্য করেছেন—তার থেকে সংশ্লিষ্ট
অংশটি উদ্ধৃত করছি, তাহলে কথাটি
আরও পরিষ্কার হবে।

“যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে
পারা যায় যাতে ব্রাহ্মণ্যের জ্ঞান,
ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি
এবং শূদ্রের সামান্য আদর্শ—এই সবগুলিই
ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষ-
গুলি থাকবে না, তাহলে তা একটা আদর্শ
রাষ্ট্র হবে, কিন্তু এ কি সম্ভব?”

“অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না”
—কথাগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর
থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় আদর্শ রাষ্ট্র
রূপায়ণে মানুষের অক্ষমতার প্রতি
অবিশ্বাসবশতঃ নয়, পরন্তু সেই আদর্শ
রাষ্ট্র গঠনে সম্ভাব্য সকল দোষকে পরি-
হারের উপায়-চিন্তাই স্বামীজীকে এই
প্রশ্ন উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। প্রশ্নটি
যে কতখানি বাস্তবসম্মত এবং সংগত তা
আর এক দিক দিয়ে বিচার করা যেতে
পারে। সার্বজনীন কল্যাণের ভিত্তিভূমি
আবিষ্কার করতে গিয়ে মার্কসও
Socialist State বা শ্রমজীবীপ্রধান
রাষ্ট্রকে শেষ কথা হিসাবে গ্রহণ করতে
পারেন নি।

Socialist Stateও অত্যাচার ও

উৎপীড়নের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে
পারে। অতএব মার্কসীয় সমাজ-বিজ্ঞানে
শ্রমিক-মজুর শ্রেণী কতক যে রাষ্ট্র স্থাপিত
তা পূর্ণাঙ্গ নয়—অর্ধসমাপ্ত বা অসমাপ্ত।
তাই বৈশ্যশাসন যুগে বা ধনিকশ্রেণীর
আধিপত্যের সময়ে বা আদর্শ হিসাবে
অনুসরণীয়, কালান্তরে তা দোষদুষ্ট বলে
পরিভ্রাজ্য। সর্বমানবের কল্যাণের আদর্শে
মার্কস তাই এমন একটি অবস্থার কল্পনা
করেছেন [যা অগ্রগামী ইতিহাসের
ইংগিত] যা প্রকৃত শ্রেণীসংঘাতহীন
শান্তিপূর্ণ অবস্থা, যে অবস্থায় এক
মানুষকে অপরের প্রভু স্বীকার করতে
হবে না, যে অবস্থা সর্বপ্রকার শোষণ ও
নিপীড়ন থেকে মুক্ত। অতএব স্বামীজীর
যে প্রশ্নকে “সন্দেহাকুল জিজ্ঞাসা” নাম
দিয়ে অধ্যাপক গণগোপাধ্যায় চরম হতাশার
ফলপ্রসূতি বলে বর্ণনা করেছেন—এমন কি
মার্কসবাদের পরিপ্রেক্ষিতেও তা একটি
সংসঙ্গত প্রশ্ন এবং আধুনিক সমাজ
পরিরূপনায় অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক।

এই অধ্যাত্মবাদী ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সত্যাসী
বস্তুজগতে মানুষের সমাজ বিবর্তনের
গতিপথ নির্ণয়ে এবং তার সমস্যা সমাধানে
কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন
অর্থাৎ তাঁর সমাজ-ভাবনার সীমারেখা ও
পরিধি কতখানি বিস্তৃত আর তাঁর চিন্তার
ভিত্তি কত গভীরে প্রোথিত, তা আরও
একটু তালিয়ে দেখা যেতে পারে।

অগ্রগামী ইতিহাসের গতিপথ ধরে
ভাবী রাষ্ট্রের রূপরেখা নির্ণয়ে মার্কসের
চিন্তাধারার সঙ্গে স্বামীজীর চিন্তাধারার
কেমন সাদৃশ্য রয়েছে তা আমরা আগেই
দেখিছি। মার্কস যে দৃষ্টিকোণ থেকে
জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন, তিনি নিজেই

ঐতিহাসিক বস্তুতত্ত্ব

তার নামকরণ করেছেন “ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুতত্ত্ব—Historical and Dialectical Materialism.” ঐতিহাসিক শক্তির অমোঘ নীতি অনুযায়ী দ্বন্দ্বাত্মক পদ্ধতিতে চলেছে জড়জগতের বিবর্তন। দ্বন্দ্বের সাহায্যে সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা এই দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক বৈশিষ্ট্য। দ্বন্দ্বের ধারণাটি মার্কস হেগেলীয় দ্বন্দ্বতত্ত্ব থেকে নিয়েছিলেন। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ এবং মার্কসীয় দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, হেগেলের কাছে এই দ্বন্দ্বের নিয়ন্তা হল ভাব, চিন্তা বা চেতনা কিন্তু মার্কসের কাছে তা হল জড়ভূমি বস্তুজগৎ। এই দ্বন্দ্বের প্রভাবে মানব সমাজে যত বৈষম্য, শ্রেণীচেতনা আর শ্রেণীসংগ্রাম এবং তার ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোকে অবলম্বন করে সমাজ বিবর্তন।

শ্রেণীবৈষম্য এবং শ্রেণীস্বার্থ সংঘর্ষের গভীর মূলদেশে যে সমাজ-প্রকৃতির এই অপ্রতিরোধ্য দ্বন্দ্বশক্তি ক্রিয়াশীল, সমাজ-বিজ্ঞানী হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের সম্মান দৃষ্টিতেও সে সত্যটি ধরা পড়েছিল যথার্থরূপে। তাই দেখা যায়, হেগেল-মার্কসের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই মৌল প্রত্যয়টি স্বামীজীর বৈদ্যন্তবাদী সমাজ-দর্শনেরও একটি মূলকথা। স্বামীজীর চিন্তায় এর সুস্পষ্ট আভিযুক্তি রয়েছে। লন্ডনে তাঁর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার যে অনুলিপি রক্ষিত আছে তাকে দেখা যায় স্বামীজী বলেছেন—

“সমগ্র প্রকৃতিতে দুইটি শক্তি ক্রিয়া ফাঁরতেছে বলিয়া মনে হয়। একটি সর্বদাই এক বস্তু হইতে অপর বস্তুকে পৃথক ফাঁরতেছে, অপরটি প্রতিমুহূর্তে বস্তুগতালেকে সর্বদা একসঙ্গে বাঁধবার চেষ্টা ফাঁরতেছে। প্রথমটি উত্তরোত্তর পৃথক পৃথক সত্তা সৃষ্টি করিতেছে; অন্যটি যেন সত্তাগতালেকে একটি গোষ্ঠীতে পরিণত করিতেছে এবং এই সব পারিদৃশ্যমান পৃথকত্বের মধ্যে ঐক্য ও সাম্য আনিতেছে। মনে হয় এই দুইটি শক্তির ক্রিয়া প্রকৃতি এবং মনুষ্য-জীবনের প্রত্যেক বিভাগে বিদ্যমান। বাহ্যজগতে বা ভৌতিকজগতে এই দুইটি শক্তি অতি স্পষ্টভাবে সক্রিয়—আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই।...মানুষের সামাজিক জীবনেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজজীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্যস্থাপন করিতেছে: একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা জ্ঞাপিতেছে। সমগ্র বিশ্ব এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বক্ষেত্র বলিয়া মনে হয়। ...জগতে এই নিত্যক্রিয়াশীল বৈষম্য উৎপাদিকা শক্তি যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন জগৎ লোপ

পাইবে। বৈষম্য বা বৈচিত্র্যই দৃশ্যমান জগতের কারণ।” [পৃঃ ৩৪৪—৩৪৫ খণ্ড, বাণী ও রচনা]

দ্বন্দ্ব সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত এই শ্রেণী-সংঘর্ষ সমাজে অধিকার রক্ষা এবং অধিকার বিলোপের সংগ্রামে পরিণত লাভ করে। স্বামীজীর সমাজ-চিন্তায় এই সত্য অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল যে, জগতের প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক দেশের সমাজ-জীবন এই অধিকার বিলোপের সংগ্রামে লিপ্ত। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এক শ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর লোক অপেক্ষা স্বভারতই বেশি বুদ্ধিমান, ইহা মানব-সমাজের সমস্যা নয়, অথবা এক শ্রেণীর মানুষ স্বভাবাবিস্থ প্রবণতাবশতঃ অন্যের অপেক্ষা বেশি ধন সঞ্চয়ে সক্ষম—ইহাও তাদের সমস্যা নয়। প্রকৃত সমস্যা হল একশ্রেণী তাদের স্বাভাবিক সামর্থ্য হেতু অপর দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত কেড়ে নেবে কিনা বা অপর উপর প্রভু প্রতীতি করে উৎপীড়ন চালিয়ে যাবে কিনা। “এই অধিকারবাদের ধ্বংস সাধনই প্রকৃত কাজ।”

[পৃঃ ৩৪৯—৩৪৯ খণ্ড—বাণী ও রচনা]

সামাজিক নিয়মের গতিতে অগ্রসরমান মানবসমাজ—এই সমাজে ব্যক্তিগত অধিকার বা বিশেষ শ্রেণীগত অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যুগান্তরের শেষে এক নতুন ঐক্যবদ্ধ মানবসমাজের অভ্যুদয় ঘটবে। সেই নব অভ্যুদয়ে সকলেই এক—সকলেই ব্রাহ্মণ। স্বামীজী প্রজ্ঞানে সেই নব অভ্যুদয়ের সূচনা দর্শন করেছিলেন। স্বাধীন ভাষায় তাঁর ঘোষণা ধ্বনিত হয়েছে—

“আবার যখন যুগান্ত ঘটিয়া সেই সত্যযুগের অভ্যুদয় হইবে, তখন আবার সকলেই ব্রাহ্মণ হইবেন। সম্প্রতি যুগান্ত ঘটিয়া সত্যযুগের অভ্যুদয় সূচিত হইতেছে—আমি তোমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করিতেছি।”

অতএব সেই নবযুগের নতুন ঐক্যবদ্ধ সমাজের প্রত্যেক মানুষকে স্বামীজী ব্রাহ্মণ বলে অভিহিত করেছেন। কিরূপ এই ব্রাহ্মণের চরিত্র আর সেই ঐক্যবদ্ধ মানব-গোষ্ঠীর সামাজিক রূপটি বা কিরূপ?

স্বামীজী বলেছেন—

“তোমরা কি শোনো নাই যে শাস্ত্র লিখিত আছে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোনো বিধিনিষেধ নাই, তিনি রাজার শাসনাধীন নহেন, তাঁর বধশূল নাই? একথা সম্পূর্ণ সত্য। স্বাধীন অস্ত্র বান্ধিয়া যেভাবে বাখ্যা কবিমাজ্জ, অবশ্যই সেভাবে বান্ধিও না। প্রকৃত মৌলিক বৈদ্যাত্মকভাবে বান্ধিবার চেষ্টা কর। যদি ব্রাহ্মণ বলিতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি স্বার্থপরতা একেবারে বিসর্জন দিয়াছেন, যিনি জীবন জ্ঞান ও পেম লাভ করিতে ও উহা নিস্তার করিতেই নিযুক্ত—কেবল এইরূপ ব্রাহ্মণ ও

সম্ভবাব ধর্মপরায়ণ নরনারীদের স্বারা যে দেশ অধাষিত, সে জাতি, সে দেশ যে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধের অতীত হইবে। এ আর আশ্চর্য কি? এবং বিধি জনগণের শাসনের জন্য আর সৈন্যসামন্ত পুলিশ প্রভৃতির কি প্রয়োজন? তাহাদিগকে কাহারও শাসন করিবার কি প্রয়োজন? তাহাদের কোনোপ্রকার শাসনতন্ত্র অধীনে বাস করিবারই বা কি প্রয়োজন?”

[পৃঃ ৮৬-৮৭—৫ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]

মানবসমাজ বিবর্তনের ইতিহাস ব্যাখ্যায় স্বামীজীর উপরোক্ত কথাগুলির মধ্যে যে আশা ও বলিষ্ঠ চিন্তার বিকাশ দেখা যায়, যে কোনো মার্কসবাদী সমাজ-তত্ত্ববিদ তাকে সাগ্রে অভিনন্দিত করবেন। কেন না কমুনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে ভাবী সমাজ-স্বরূপের যে বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে স্বামীজী-বর্ণিত সমাজ-চিত্রের কোনো মৌলিক প্রভেদ নেই। মানবসমাজ সম্পর্কে স্বামীজীর ওই কথাগুলিই মার্কসবাদী সমাজকল্পনার শেষ কথা।

অতএব মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলেও আদর্শ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রহীন সমাজের রূপ-পারিকল্পনায় স্বামীজীর এবং মার্কসের চিন্তা প্রায় সমান্তরাল। সমাজবিপ্লবের অপরিহার্যতা, তার গাভ-প্রকৃতি, তার বৌদ্ধিকতা, তার আদর্শের রূপায়ণ এবং অনাগত ভবিষ্যতে তার অন্তিম পরিণতি—সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন পর্যায়ে এই সব তত্ত্ববিচারে বৈদ্যাত্মক বিবেকানন্দের সিদ্ধান্তগুলি বস্তুবাদী মার্কস-এংগেলসের সিদ্ধান্তের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত এক আশ্চর্য সাদৃশ্য বহন করছে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা নিশ্চয়ই স্মরণীয়। কথাটি এই যে, দীর্ঘদিনের অনলস শ্রমসাধনা দিয়ে মার্কস-এংগেলস আধুনিক সমাজতত্ত্বের যেমন একটা সুসংবদ্ধ কাঠামো গড়ে তুলেছেন, স্বামীজীর লেখায় সে রকমটি আমরা পাই না। তাঁর চিন্তাগুলি নানা স্তরের নানা বস্তুতা ও লেখায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বিশেষত কোন পথে, কি কি উপায় অবলম্বনে এই সমাজ-বিপ্লব সংগঠিত হবে বা হওয়া উচিত অর্থাৎ বিপ্লব সংগঠনের ব্যবহারিক কার্যক্রম বা কর্মপ্রকল্প কি—স্বামীজীর লেখায় তার বিস্তারিত বা সুসংহত কোনো পারিচয় এখনো অনাবিস্কৃত। আছে কিনা জ্ঞান না—হয়ত নেই। তার কারণও সহজেই অনুধাবনীয়। স্বামীজীর জীবনের মধ্য ভূমিকা সমাজ-বিজ্ঞানীর ভূমিকা নয়—ধর্মবিজ্ঞানীর ভূমিকা। ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমাজতত্ত্বও ওতপ্রোত জড়িয়ে। তাই মানুষকে ধর্মের তত্ত্ব শোনাতে গিয়ে তিনি সমাজ সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। খালি পেট ধর্ম হয় না—শ্রীরামকৃষ্ণের এই মোক্ষম বাণী এবং বাস্তব জীবনে তার

সারা রাত্রি সারা দিন

শ্যামলেন্দু রায়

সারা রাত্রি মনসা গরজার
বন্ধ বৃকের ছিন্ন দিয়ে
কার লেলিহান জিহবা নাচে
রক্ততে যে অবাক হিজল
চক্ষে নামে রুদ্ধ সাপ।

সারা রাত্রি ঘুম ভাঙনো
সারাটি দিন মিছিল শহরেতে
চায়ের কাপে গরম ধোঁয়া
পিচ গলে যায় ক্রান্ত দুপুরে।

কোথায় কারা যেন
দিশেহার
কেবল ছোট্টে এবং ছোট্টে
এবং ছোট্টে।

মধ্যযুগের উপলব্ধি তাঁকে সমাজচিন্তায়
উদ্বেগ করেছিল।

তিনি সমস্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সেই
সমস্যা সমাধানে যে মৌলিক দার্শনিক
দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করতে হবে তার কথা
বলেছেন, কিন্তু চিন্তাকে কার্শে রূপায়ণের
জন্য বাস্তব পন্থা উদ্ভাবনের দায়িত্ব রেখে
গেছেন অনাগত যুগের সমাজকর্মীদের
ওপর। সমাজ-সংসারত্যাগী ধর্মপথের
নিষ্পৃহ পৃথক সমাজবিপ্লব সংগঠনের
বাস্তব পন্থা আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ-
প্রকল্পে স্নেহে উঠবেন—এতটা আশা করাই
বোধ হয় আবাস্তব। আর তা ছাড়া উন-
চল্লিশ বছরের স্বল্প-পরিসর জীবনে তাঁর
অবসরই ছিল বা কতটুকু! এজন্য তাঁর
সমাজচিন্তায় তত্ত্বের দিকটাই প্রধান—
প্রযুক্তিবিদ্যার দিকটি গোঁণ। তিনি ছিলেন
এই বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক গবেষক—
'Technician' নন। তবু তাঁর লেখা ও
বক্তৃতার নানাস্থানে এমন সব চিন্তার বীজ
ছড়িয়ে আছে যা পরিস্ফুটিত হলে এর
ব্যবহারিক দিকের রূপরেখাটিও ফুটে
উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা
যেতে পারে যে, সম্প্রসারণশীল শিক্ষার
মাধ্যমে মানুষের আত্মশক্তি ও অধিকার-
বোধ জাগ্রত করে তোলার নীতিকে তিনি
বিপ্লব সংগঠনের একটা পন্থা বলে নির্দেশ
করেছেন।

যাই হোক, মানুষের সমাজ-সমস্যার
গতিপ্রকৃতি ও তার মূলগত তত্ত্বনিরূপণে
মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে স্বামী বিবেকান-
ন্দের গতবাদের আশ্চর্য একতা থাকলেও
যে দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে মার্কস
মানুষ এবং তার সমাজকে লক্ষ্য করেছেন,
স্বামী বিবেকানন্দের ভিত্তি তা থেকে
একেবারে পৃথক। মার্কসবাদীদের মতে,
জড় বস্তু প্রকৃতিই মানুষ, তার জীবন ও
জগতের নিয়ামক। মানুষের আত্মা বা মন
শেষ পর্যন্ত জড়প্রকৃতির এক বিবর্তিত
জটিল পরিণতি মাত্র: ধর্ম বা আধ্যাত্মিক
এষণা শোষণ-প্রয়াসী পটুজবাদী কলোঁয়া
শরণী, স্বারা উদ্ভাবিত এক মাদক দ্রব্য এবং
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অভিজ্ঞতাই একমাত্র

অভিজ্ঞতা বা real বা সত্য বলে অভি-
নির্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য। এই বস্তুতান্ত্রিক
জড়বাদ মার্কসীয় দর্শনে মূল ভিত্তি হিসাবে
গৃহীত হলেও স্বামী বিবেকানন্দ একে
ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন নি। তাঁর ভিত্তি
হল এক নতুন সমন্বয়ী বেদান্তবাদ, যার
মধ্যে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ পরস্পরের
পারস্পরিক। সমাজতত্ত্বের দিক দিয়ে
স্বামীজীর মতবাদের নামকরণ করা যেতে
পারে বৈদান্তিক বিপ্লববাদ। দার্শনিক
দিক দিয়ে একে বলা যায় ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদ।

উনিবিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদ যার উপর
ভিত্তি করে মূল মার্কসীয় প্রত্যয় গঠিত
হয় তা পরিবর্তিত হতে হতে বর্তমানে
এমন পর্যায়ে এসেছে যে, জড়বাদীদের
পারিকল্পিত মূল জড়বস্তু প্রকৃতি আসলে
যে কি বস্তু তা এখন তাদের নিকটও
অজ্ঞাত। বাস্তব সত্য বলে যা দাবী করা
হয় আসলে কিন্তু তা যে কতখানি বাস্তব
তা তাঁরা জানেন না। শ্রদ্ধা বলতে হয়,
একটা কিছু আছে। অর্থাৎ নিরেট বস্তুর
খোলস ছাড়াতে ছাড়াতে শেষ পর্যন্ত
যেটুকু অবশিষ্ট থাকে সেটুকু ঐ মনের
ভাব মাত্র। আবার অপর পক্ষে ভাববাদীরা
নাক চোখ কান বোজে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে
নিছক একটা ভাব বলে উড়িয়ে দেওয়ার
পর আকাশের বিদ্যুৎ নামক ভাবটা যখন
বজ্র হয়ে মাথায় এসে পড়ে, তখন কম্পিত-
বক্ষে বলতে হয়—

“না, হে—ভাবের প্রকাশ বলে একটা
বস্তুও তা আছে।” ব্রহ্মবিজ্ঞানবাদী
বিবেকানন্দ সত্যের এই দুই দিককে দুই
হাতে গ্রহণ করেছেন।

তাঁর মতে, জড় ও চেতন, দেহ ও মন
এক অব্যক্ত অনির্ব্যক্ত সামগ্রিক সত্তার
বিভিন্ন পরিণাম—ক্রমবিকাশধারায় প্রকাশ-
মান এই সামগ্রিক সত্তার নাকই রক্ত। তিনি
বলোঁছিলেন—

“আমার মতে, বাহাজগতের অবশ্যই
একটা সত্তা আছে। আমাদের মনের চিন্তার
বাইরেও উত্তর একটা অস্তিত্ব আছে।
সমগ্র প্রপঞ্চ চৈতন্যের ক্রমবিকাশের প মহান
বিধানের বশবর্তী হওয়া উন্নতির পথে

অগ্রসর হইতেছে। এই চৈতন্যের ক্রমবিকাশ
জড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক। জড়ের
ক্রমবিকাশ চৈতন্যের ক্রমবিকাশের প্রতীক-
স্বরূপ কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা হইতে
পারে না।”

[পৃ: ৪৯১—৯ম খণ্ড, বাণী ও রচনা]
জড়বাদীর ভূমিকায় নেমে এসে তিনি
বলোঁছিলেন—“সমগ্র বিশ্ব একটা জড়সমুদ্র
ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেই জড়-
সমুদ্রে ভূমি আমি যেন ছোট ছোট ঘাঁর্ণি।
খানিকটা জড়পদার্থ প্রত্যেক ঘাঁর্ণির স্থানে
আসিয়া ঘাঁর্ণির আকার লইতেছে, আবার
জড়পদার্থরূপে বাহির হইয়া যাইতেছে।
আমার শরীরে যে জড়পদার্থ আছে, কয়েক
বৎসর পূর্বে হয়তো তোমার শরীরে ছিল
বা সূর্যে ছিল বা হয়ত অন্য কোনো গ্রহে
বা অন্য কোথায়ও ছিল—অবিরাম গতি-
শীল অবস্থায় ছিল। আমার দেহ, তোমার
দেহ একবার অর্থ কি? সব দেহই এক।
চিন্তার বেলায়ও তাই। চিন্তাব একটি
অসীমপ্রসারী সমুদ্র রহিয়াছে। তোমার
মন, আমার মন সেই সমুদ্রের ভিতর দুটি
ঘাঁর্ণিবিশেষ। উহার ফল কি এখনই
প্রত্যক্ষ করিতেছ না? তোমার চিন্তা
আমার মনে এবং আমার চিন্তা তোমার
মনে প্রবেশ করিতেছে কি করিয়া?
আমাদের সমস্ত জীবনই এক, আমরা এক,
এমন কি চিন্তার দিক দিয়াও এক।”

[পৃ: ১৩৮-১৩৯—৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা]
আবার অধ্যাত্মবাদীর ভূমিকায়
আরোহণ করে তিনি বলেছেন—

“জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য, বা অন্য নামে
পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই
বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের প্রকাশ। আমরা
তাঁকে ‘পরম প্রভু’ বলিয়া অভিহিত করিব।
যাহা কিছু দেখ, শোন বা অনুভব কর
সবই তাঁর সৃষ্টি—ঠিকভাবে বলিতে গেলে
তাঁহারই পরিণাম—আরো ঠিকভাবে বলিতে
গেলে বলিতে হয় তিনি স্বয়ং... তিনি
জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। তিনিই
ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রম-
বিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন—ইহাই
জগতের রহস্য।” [চলবে]



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১১. উনিশ

নীলাঞ্জনের ঘর থেকে পড়বার শব্দ আসছে। গদনগদন করে কিছ্র একটা মন্থস্থ করছে মনে হয়।

বারান্দায় নিজের ইঞ্জি-চেয়ারটায় বসে শিবপ্রসাদ তাকিয়ে ছিলেন সামনের গন্ধ-রাজ গাছটার দিকে। সকালের রোদ ঝিক-ঝিক করছে ঘন সবুজ পাতাগুলির ওপর, খুঁশি হয়ে একটা টনটনি নাচানাচি করছে সেখানে। শিবপ্রসাদ জানেন, এবারেও কুঁড়িগুলো থাকবে না, সেই ছোট ছোট ছেলেরা আবার আসবে, জীবনে কোথাও যাদের রঙ নেই, স্বপ্ন নেই, আশা নেই—তারা জন্মগত বিস্ময়ে ভালো করে ফোট-ঘার আগেই কুঁড়িগুলোকে ছিঁড়ে নিয়ে যাবে। তারপর রাস্তায় কিংবা নদীর জলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়বে দেবে তাদের।

কাল বিকেলে বাড়ি থেকে বেরদ্বার সময় পথের পাশে দু'তিনটি প্রায়-শিশুর খেলা দেখেছিলেন তিনি। তাদের এক-আধটা কথার টুকরো কানে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল একবার।

একজন বাথারির একটা ছোট ফালি দেখিয়ে বলছিলঃ 'আমি মাস্তান, বুঝলি আমি মাস্তান। বেশি চালাকি করবি তো ছুরি মেরে দেব।'

আর একজন একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে জবাব দিচ্ছিলঃ 'আমার হাতে বম' দেখাচ্ছিস না? একবার দমে করে ঝেড়ে দিই তো—'

কাছেই একটি ছোট মেয়ে ঘাগরা ঘুরিয়ে নাচের ভিগ্ন করছিল একটা। ঘাগরা তার ছিল না, ছেঁড়া ফুরের একটা কোণা ধরে সে মহলা দিচ্ছিল, 'তুমি সে প্যার হো গরর'—গোছের একটি গানের কলি শোনা যাচ্ছিল তার মূখে।

এই এদের খেলা—বাংলা দেশের এইসব ছেলেমেয়ের খেলা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য-হীন, নৈরাজ্যের শিকার এই শিশুবা কোন-বাংলা দেশ, কোন-ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনা করছে?

সারা জীবনের আদর্শ, দেশসেবা, স্কুলের মাস্টারী। নিজে কী পেলেন, কী দিলেন দেশকে? নীলু হয়তো বস্তির এইসব ছেলেমেয়ের চেয়ে একধাপ ওপরে বাস করছে, কিন্তু আজ সকালে এই সুন্দর রোদ আর হাওয়ায়, তাঁর ছোট বাগানটির এই স্নিগ্ধতার মধ্যে, ওই টন-টনিটার খুঁশির ভেতরে—শিবপ্রসাদ স্খলিত হতে পারছিলেন না। নীলু বস্তির ছেলেদের চাইতে একটু ওপরে। কিন্তু কতদিন? হাওয়ায় যেখানে মড়ক ছড়ায়, সেখানে কতক্ষণ নীলুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন তিনি! আজ যারা অন্ধ-হিংসায় গন্ধরাজের পাণ্ডা ছিঁড়ছে, সেইখানেই থেমে দাঁড়াতে তারা? ইতিহাসের প্রতিশোধ নেই একটা?

অথচ সেই রাত। সেই পনেরোই আগস্ট। স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা!

সারা ভারতবর্ষের কথা ভাবতে শিবপ্রসাদের উৎসাহ হয় না। হয়তো স্খলিত আব সমৃদ্ধির মাত্রা দিনের পর দিন উঠছে উঠছে দিকে দিকে। কিন্তু বাংলা দেশকে এতবড়ো বণ্টন কেউ করে নি—কখনো না।

স্বপ্না এসে বলল, 'বাবা, তোমার চা'। পাশের ছোট টিপটি টেনে চা রাখল। শিবপ্রসাদ একবার মেয়ের দিকে তাকালেন। বিষণ্ণ, শান্ত চেহারা। দুই ছেলে, বড়ো ছেলের বউ, এ বাড়ির এদের সকলের চেয়ে মেয়েটি আলাদা। কোনোদিন রাজনীতির কথা ভাবে নি, মা-বাবাকে ভালোবেসেছে, লেখাপড়া করতে চেয়েছে,

বি-এটা পাশ করে চাকার জুটিয়েছে একটা, এখন প্রাইভেটে-এম-এ দেবার চেষ্টা করছে। স্ট্রী তো আনন্দ চলে যাওয়ার পরেই ডেঙে পড়েছিলেন, তারপর স্খলিত চলে যেতে এখন আদৌ স্বাভাবিক অবস্থায় আছেন কি না বোঝা যায় না। অকারণে চীৎকার করে ওঠেন, অহেতুক ধৈর্য হারান, একা-একাই বসে বসে কখনো কখনো। স্বরাজের সঙ্গে কথা বলতেই ভরসা হয় না তাঁর। শব্দ, এই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাগতির সমগ্র গদ

মূল্য : চার টাকা

চণ্ডিদাসের সমগ্র গদ

মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র গদ

মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র গদ

মূল্য : দুই টাকা

১১. প্রাপ্তিস্থান ১১

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সাব্যাল এণ্ড কোং

বাংকম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

সাপ্তাহিক বসুমতী

মেরোটিই এর ভেতরে স্থির হয়ে আছে
খাশাখা, শূন্য ওর কাছেই শিবপ্রসাদ যেন
মনের আগ্রহ পান খানিকটা।

স্বপ্না বললে, 'আবার আনি?'

অথন না। এটু পরে।'

স্বপ্না চলে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ তাকে
ডাকলেন।

'বস্! একটা কথা আছে।'

স্বপ্না একটা মোড়া নিয়ে বসে গেল
ঘাবার পাশে।

'পড়াশুনা কেমন চলছে?'

'একরকম। তবে খালি নোট পইড্যা
তো কিছু হয় না।' —স্বপ্না নিশ্বাস
ফেলল: 'দুই-একদিন ইউনিভার্সিটির ক্লাস
অ্যাটেন্ড করলে ভালো হইত। কিন্তু যামু
কখন? ইস্কুলে এত কাজের প্রেসার।'

'ইংরাজি হইলে আমি অংশ-স্বপ্ন
হেল্প করতে পারতাম। কিন্তু ফিলসফি
তো পড়ছি পাসকোর্সে, কিছুই জানি না।'

স্বপ্না বললে, 'দেখ, কী করন যায়।
পুজোর পরে না হয় দুই-চাইর দিন ছুটি
নিয়া ইউনিভার্সিটিতে যামু।'

একটু চপ। তারপর একবারের জন্যে
কান খাড়া করলেন শিবপ্রসাদ। তেমন
শুনগুন করে পড়ে যাচ্ছে নীল।

প্রায় নিঃশব্দ গলায় শিবপ্রসাদ জিজ্ঞেস
করলেন: 'নীলুরে কেমন বোকাভাস
অথন?'

স্বপ্নার মূখে-চোখে ছায়া ঘনিয়ে এল।
সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিতে পারল না।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'রাতিরে আর
কান্দে?'

'না।' —আবার নিশ্বাস ফেলল স্বপ্না:
'আমারে জড়াইয়া ধইয়া রাখে সমস্ত
রাতির। এটু পাশ-ফিরনেরও জো নাই।
কয়, পিসি, কই যাও?'

ভয়। মা চলে গেছে, পাছে পিসিও
চলে যায় সেই ভয়। শিবপ্রসাদ একবার
নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরলেন। তারপর
বললেন, 'অর মায় আর আইবো না—
না?'

'আইবো ঠিক-ই। কদিন পোলাডারে
ফলাইয়া থাকতে পারবো, বাবা?'

সান্দনা। শিবপ্রসাদ বিশ্বাস করে না,
স্বপ্নাও কি করে?

'কিছুই কওন যায় না—' স্বপ্না-
ভাষণের মতো শিবপ্রসাদ বললেন, 'অথন
সমস্তই অন্য রকম হইয়া গেছে। আমাদের
সময়ও ঘরের বৌ-কিরা যে পলিটিক্স
করত না, তা তো না। তখন ইংরাজ
আছিল সকলের শত্রু। দল আছিল ঠিকই,
কিন্তু অ্যাকটা লক্ষ্যও মোটামুটি সকলের
আছিল। অথন অনেক লক্ষ্য হইয়া গেছে—
অথন স্বামী-স্ত্রীর পথও আলাদা হইয়া
গেছে, অথন ঘরে ঘরে আমরা এ ওর শত্রু
হইয়া উঠি।'

স্বপ্না আনন্দ নয়, স্বরাজও নয়, এ-সব
চিন্তার উত্তর তার জানা নেই। আবার
নিঃশব্দ ঘনিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

আবার সান্দনার জেরটাই টেনে আনল
স্বপ্না।

'ক্যান্ এই সমস্ত ভাবতাছ বাবা?
বৌদি আসবো—ঠিক ফিরা আসবো।'

'হুঁ।'

কপালে ভ্রুকুটি ঘনিয়ে এল, শিবপ্রসাদ
কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন সামনের দিকে।
আকাশটা নিবিড় নীল। কয়েকটা নারকেল
গাছ দুলছে হাওয়ায়। ডানা-মেলা নিশ্চিন্ত
চিলের বিলুপ্ত। কিছুই দরকার ছিল না,
কিছুই না। সারাজীবনের চানা পরিশ্রম,
দেশের কাজ, হেড মাস্টারী—সব কিছু
মিটিয়ে, এখন—দুই যোগ্য ছেলের হাতে
সংসারের দায় তুলে দিয়ে আকাশের নীলে
দু' চোখ ডুবিয়ে বসে থাকতে পারতেন
শিবপ্রসাদ। কিন্তু—

কিন্তু স্বাধীনতা। নইলে কেন এমন
শূন্যতায় তলাবে স্বরাজ, কেন চলে যাবে
সুজাতা, কেন এমন করে ঝড়ের মধ্যে
ঝাঁপিয়ে পড়বে আনন্দ?

পনেরোই অগস্টের ঋণ শোধ করতে
হবে। অনেক—অনেক ঋণ।

সুজাতার কথায় আর একটা জিনিস
মনে এল শিবপ্রসাদের। বিব্রান্ত হয়ে
প্রবীরের কাছে ছুটে গিয়েছিলেন তিনি।
আবার ফিরে চাইলেন স্বপ্নার দিকে।

'এর মধ্যে প্রবীর আসিছিল নাকি
রে?'

'ভুলিয়া? কই, না তো?'

'আমি তো বাইর-টাইর হইয়া যাই,
আসে নাই ভুলু?'

'না, দেখি নাই।'

—ও।'

তার মানে কোনো খবর নেই। কিছুই
করতে পারে নি। নিজেকে ভারী ছোট
মনে হল। ও-ভাবে প্রবীরের কাছে সেদিন
ছুটে না গেলোই ভালো করতেন, কিন্তু
নীলুর ভাবনায় মাথাটা যেন কেমন গোল-
মাল হয়ে গিয়েছিল।

'প্রবীরদার কথা কইতাছ ক্যান?'

'এম-নেই। এ্যাকদিন গোঁছলাম অদের
ওইদিক। কইছিল, আইবো।'

'আসে নাই বাবা।'

প্রসঙ্গটা বদলে দেওয়া ভালো। স্নায়ুর
ওপর চাপ পড়ছিল অতিরিক্ত।

'বাবা, তোমার অশ্বক চা জুইড়িয়া জল
হইয়া গেল।'

'ভুইল্যা গোঁছলাম।'

'আর এক কাপ কইয়া আনি?'

'অথন খাউক।' —শিবপ্রসাদ একবার
মেয়ের দিকে তাকালেন। তাঁর যা হওয়ার
যোক, এই মেয়েটাকে এখন থেকে মৃত্তি

দিলে ভালো হয়। এ সংসার থেকে অন্তত
একজন নিকৃতি পাক, বেঁচে থাক সে।

'এ্যাটা কথা কই। রাগ করবি না মা।'

'কী কইতে আছো বাবা? রাগ করম
ক্যান?'

—স্বপ্না চকিত হল।

'বসন্ত চাটুজ্যার মাইজ্যা পোলা এম-
এসিস পাশ কইয়া কোন্ ফার্মে কোমিস্ট
হইছে। পোলাডা ভালো। তর লগে
মানাইবো। পাকে-প্রকারে চাটুজ্য কইল
কথাডা কইতাছিল। আমি গা করি নাই,
অথন ভাবতাছ—'

সাপের ছোবল পড়ার মতো চমকে
উঠল স্বপ্না। শিবপ্রসাদ থেমে গেলেন।

'না বাবা, ওই সব কাম নাই অথন।'

কিন্তু বিয়া তো তর একটা দেওন
লাগবো মা।'

'অথন খাউক বাবা।' —স্বপ্নার মূখে
রক্তের কথা জমতে লাগল, মাটিতে চোখ
নামালো সে: 'এই সব নিয়া ভূমি অথন
কিছু ভাববা না। এই সমস্ত অশান্তির
মধ্যে—'

'অশান্তি আছে, অশান্তি থাকবো।
কিন্তু তর জীবনডা তো আমারে দেখতে
হইবো।'

'আমার বিয়ায় কাম নাই বাবা। আমি
খুব ভালোই আছি।'

সেই টুলু? শিবপ্রসাদের মাথার
ভেতর দিয়ে যেন খানিকটা মল্লগা ছুটে
গেল: এখনো কি তার কথা ভুলতে পারে
নি মেয়েটা? এতদিন বাদে? এত কান্ডের
পরেও? অথচ শূন্য শিবপ্রসাদ কেন, এ
বাড়ির প্রত্যেকে জানে, টুলু সম্পূর্ণ নষ্ট
হয়ে গেছে, কতগুলো শয়তান ছেলের দলে
ভিড়েছে, তার বদনামে কান পাতা যায়
না, তার বাবার যাকে নিয়ে এত আশা
ছিল, চূড়ান্ত অধঃপাতে নেমে গেছে সে।

স্বপ্না এখনো তার কথা ভাবে?
এখনো?

প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা যায় না। কিন্তু
আর একটা উত্তর এল স্বপ্নার কাছ থেকে।
'অথন ওই সব ভাইবো না বাবা।
তাইলে মা আর বাচবো না, নীলু মইয়া
যাইবো।'

নীলু! তার মা-ই তার কথা ভাবল
না, অথচ—। শিবপ্রসাদ কিছু একটা
বলতে চাইছিলেন, এমন সময় ভেতর থেকে
চটির আওয়াজ এগিয়ে এল। স্বরাজ।

বিনা ভূমিকায় স্বরাজ বললে, 'বাবা,
তোমারে এটা কথা কই নাই।'

শুকনো, নীরস গলায় স্বর। বাপ আর
মেয়ের চোখ চকিতে ঘুরে গেল তার দিকে।

স্বরাজ দরজার একটা ধামে হেলান
দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল শব্দ হয়ে। তেমন
নীলু ভাগতে বললে, 'আমারে ট্রান্সফার
করছে কইলকাতা থিক্যা।'

ট্রান্সফার! —এক সপ্তেই এই দু'জনের চমক লাগল।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'তর পোষ্ট তো ট্রান্সফারবল্ না।'

'অপ্‌শ্যন দেওন যায়।'

'তুই ইচ্ছা কইয়া ট্রান্সফার নিতে আছস?'

স্বরাজ বললে, 'হ। কইলকাতায় আর থাকন যায় না। আর কিছুদিন এইখানে থাকলে আমার মাথাটা খারাপ হইয়া যাইবো।'

বাতাস স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে।

শিবপ্রসাদ বললেন, 'বাইতাছস' কই?'

'কানপরে।'

'কানপরে?'

স্বরাজ খানিকটা তিঙ্ক হাস হাসলঃ 'বাইতে পরে সকলেরই হইবো। এইখানে যা চলতাছে, অরা হেড্‌ অফিসও আর রাখব না—ফ্যাক্টরী তিনটারও ক্রোজার হইবো। আগে-ভাগে যাওনই ভালো।'

চমৎকার সম্ভাবনা! আনন্দ নেই, স্বরাজও চলল। তার মানে এখন সংসারের সব ভার বইবেন শিবপ্রসাদ, হাট-বাজার করবেন, অসুস্থ-উন্মাদপ্রায় স্ত্রীর মনো-যন্ত্রণায় প্রতি মর্হুতে একটু একটু করে জ্বলতে থাকবেন! রিটারার করবার পরে, নীল আকাশের শান্তিতে ডুবে থাকবার কী অপূর্ব অবসর!

স্বপ্নার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

'আর মায়-বাবারে দেখবো কে?'

'ছুটি-ছাটায় তো আসুই। আর তুই তো আছসই।'

একটা চাঁৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল স্বপ্নারঃ অপদার্থ, স্বার্থপর, কাওলাড্‌। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলে সে। খানী বৃদ্ধের মতো নিঃশব্দে বসে রইলেন শিবপ্রসাদ, আর স্বপ্নার চোখ জ্বলতে লাগল।

স্বপ্না বললে, 'আর নীলুর কী হইবো? তার দায় কে নিবো?'

স্বরাজের চোখেও এবার ছুরির শাপ পড়লঃ 'ভন্ন নাই, সে আমি ঠিক কইয়া ফালাইছি। তার জন্য তোমাদের অসুবিধায় পড়তে হইবো না। আমি তারে লইয়া যামু।'

শিবপ্রসাদ বলে ফেললেনঃ 'তুই!'

'হ। আমার পোলার রেসপন্সিবিলাটি আমরাই তো নিতে হইবো বাবা। তোমারে ক্যান্‌ ট্যাক্‌স্‌ করম?'

শিবপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। স্বপ্না বললে, 'তুমি তারে নিয়া রাখবা কই?'

'যে কোনো একটা বোর্ডিংয়ে।'

স্বপ্না এবারে প্রায় চাঁৎকার করে উঠলঃ 'তোমার মাথা সঁতাই খারাপ হইয়া গেছে বড়দা। ওইটুকু বাচ্চা থাকতে পারবো বোর্ডিংয়ে?'

'পারবো।' —স্বরাজ ঝাঁঝালো গলায় বললে, 'অর খিক্যা ছোট বাচ্চাও থাকে। কষ্ট হইবো প্রথম প্রথম, তারপর ঠিক হইয়া যাবো। এই বাংলা দেশে অরে

আমি রাখম না। এইখানে সব ভাশ-স্টেড হইয়া গেছে।'

স্বপ্না আবার তীক্ষ্ণস্বরে কী বলতে যাচ্ছিল, শিবপ্রসাদ বাধা দিলেন। অশ্চর্য শান্তস্বরে বললেন, 'সেই ভালো। আমার পোলা দুইডারে আমি তো মান্য করতে পারি নাই, তর পোলার ভার তুই-ই নে। লইয়া যা নীলুরে।'

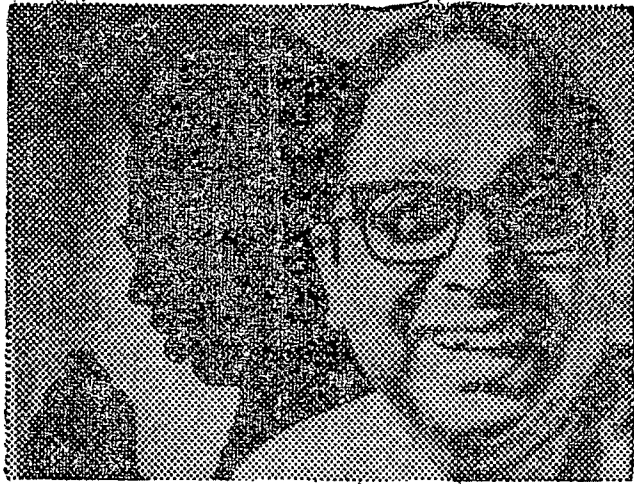
স্বপ্না বললে, 'বাবা!'

শিবপ্রসাদ আচ্ছন্নের মতো চোখ বুজলেন। আবার বললেন, 'হ, তুই-ই লইয়া যা।'

পড়ার ঘর থেকে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল নীলু।

[কথন]

সর্দি-কাশিতে নিম্নে আরাম!



অমৃতাজন

জাদু জানে!



সর্দিকাশি কি মাথাধরা, ফিৎ বাথা কি পেশীর ঘষণার অমৃতাজন লাগান—সঙ্গে সঙ্গে আরাম। ৭৫ বছরের ওপর ঘরে ঘরে নির্ভাবনা সবাই ব্যবহার করছেন। এক শিশি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। 'জ্বর' ও 'কমবায়ী' ছোট কোটোতেও পাওয়া যায়।

অমৃতাজন : সর্দিকাশি ও বাথা-বেহন।
উপশমে দশ ওষুধের এক ওষুধ।

অমৃতাজন লিমিটেড, মাদ্রাস

AM 5909

সোময়া মোহান্দী কারিয়ুক

মড মড

বন্দী

অনুবাদ :
বিশ্বনাথ ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বান্ধাশালার প্রধান অধিনায়ক লুইস নামক একজন ইউরোপীয়ান, কয়েকদিন পরে আমাদের শিবির পরিদর্শন করতে আসেন। তিনি কেনিয়া সরকারের নতুন নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করেন আমাদের কাছে, যার ফলে এখানে আমরা জন খাটতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমরা তাঁকে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নাদি করি এবং তিনি আরও বলেন যে, আমরা চাই বা না চাই, আমাদের প্রত্যেকের জন খাটার পরিমাণের হিসেব রাখা হবে এবং ঘন্দিজীবন থেকে মস্তিলাভের সময় যথাযোগ্য পারিশ্রমিক দেওয়া হবে আমাদের। আমরা কিন্তু তাঁকে এ কথা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিই যে, পারিশ্রমিক আমরা নেব না। এ ঘটনার কিছুদিন পরেই শিবিরের অধিনায়ক বাকস্টন ছুটিতে চলে যান এবং তাঁর জায়গায় যিনি আসেন তাঁর চরিত্র ছিল একেবারে ভিন্ন প্রকারের। তিনি এসেই কড়া আদেশ জারি করেন যে, ছেলে-বুড়ো অক্ষম-সক্ষম সবাইকে জন-খাটতেই হবে। তিনি প্রায়ই নিজে আমাদের থাকবার কুড়ে ঘরগুলি পরিদর্শন করতে আসতেন, যদিচ বাকস্টন কোন-দিন আমাদের ঘরের ভেতরে পা

দেন নি। তা ছাড়া আমাদের নতুন অধিনায়ক যখনই আমাদের সাথে কথা বলতেন তাঁর মুখে থাকতো অসন্তোষের ছাপ; ঘৃণা ব্যতিরেকে বোধ হয় তিনি কথা বলতেই জানতেন না। আমরা সবাই তাঁর ব্যবহার এতো বেশি অপছন্দ করতাম যে, তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করে ওপরওয়ালার কাছে একটা গুপ্ত চিঠি পাঠানর মনস্থ করি; এ রকম ব্যবহার আমরা বাকস্টনের বিরুদ্ধে কখনোই করতাম না। এই চিঠি পাঠানর কথা তিনি জানতে পারেন যথাক্রমে তাঁর ওপরওয়ালার কাছ থেকে এবং ফলে তাঁর ব্যবহার আরও খারাপই হয়ে যায়, ঘৃণার রেশ ছাড়িয়ে পড়ে আরও অধিক পরিমাণে। শিবিরের আবহাওয়া ফলে খুবই অসন্তোষজনক হয়ে পড়ে ততদিন অবধি, যতদিন পর্যন্ত না আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের (Red Cross) এক কমিটি জেনেভা থেকে আমাদের শিবির পরিদর্শনে আসেন। এর সভাপতি ছিলেন ফিলিপ জুনোদ বলে এক ইউরোপীয়ান। বান্দিশিবিরের তরফ থেকে পাঁচজন বন্দীকে নিয়ে এক প্রতিনিধিবর্গ তৈরি করা হয় তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলার জন্য। আমি ছিলাম এদের মধ্যগার এবং আমাদের

সমস্ত অসুবিধা, অসন্তোষ ও নালিশ সমিতির কাছে পেশ করার পর আমি অনেকটা শান্তিলাভ করি নিজের মনে। জুনোদ খুব বুদ্ধিমান ও প্রতিভাপন্ন লোক ছিলেন, তিনি আমাদের সমস্ত বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনেন। আমরা সবাই তাঁকে কিছুই ভাষায় "মুখুরী" য়া ইতাখি" নাম দি। এই নামের পেছনে আছে কিছুই জাতির গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির আবেশ; এর মালিক একজন বুদ্ধিমান শ্রম্ধের বয়ো-বৃদ্ধ বিচারক, যিনি বাদী-বিবাদীর কোন পক্ষেরই অন্যায় সমর্থন না করে প্রত্যেক অভিযোগের ন্যায্যবিচার মাত্র করেন। মুখুরী শব্দের অর্থ বয়োবৃদ্ধ; ইতাখি একটি গাছের নাম, যার পাতা ঝরোবৃন্দরা একত্রোত করে মাছি তাড়াবার জন্য ব্যবহার করেন। আবার এই গাছের ডালই গো-পালকেরা গরু মাঠ থেকে তাড়িয়ে ঘরে আনবার সময় ব্যবহার করে। জুনোদ সত্য-সত্যই খাঁটি লোক ছিলেন। তাঁর শিবির পরিদর্শনের পর আমাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হয় এবং প্রায় তিন মাস অবধি সেগুলি বলবৎ থাকে। প্রত্যেক-বারই আমি দেখতাম যে, কোনোরকম সরকারী খোঁজখবর বা পরিদর্শন হবার পরই আমাদের অবস্থার উন্নতি হতো অনেক, কিন্তু কয়েক মাসের ভেতরই আবার ধীরে ধীরে পূর্বাবস্থায় ফিরে যেত; সেই অসন্তোষ, সেই অন্যায়, সেই অসাধুতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। হয়তো বা একটা চিরস্থায়ী পরিদর্শক সমিতি প্রত্যেক বান্দিশিবিরের সঙ্গে থাকলে কাজ হত; হয়তো তাতেও হত না, কারণ কেনিয়ার তখনকার দ্রবিত আবহাওয়ায় এই চিরস্থায়ী সমিতিরও হয়তো মনোভাব বদলে যেত শিবিরের পরিশাসক-মন্ডলীর সংস্পর্শে এসে।

লুডুওয়ার শিবিরের অবস্থার আবার দ্রুত খারাপ হওয়ার মূল কারণ ছিল হয়তো ম্যানস্ফিল্ড নামক একজন ইউরোপীয়ান সহকারী অধিনায়কের আগমনে। ম্যানস্ফিল্ড ও তার ওপর-ওয়ালা ছিলেন প্রায় এক গোয়ালের গোরু এবং খারাপ হামানদিস্তা ও তার খারাপ ডাঁটি দিয়ে কোন জিনিস পিষলে যে তার স্বানও খারাপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? ম্যানস্ফিল্ডের আমরা নাম দিয়েছিলাম 'কামাও', যার অর্থ হলো জেলখানায় বন্দীদের জন্য ব্যবহৃত খুব ছোট আকারের একটি মগ বা স্জলপাত্র। তিনি উচ্চতায় ছিলেন মাত্র চার ফিট আট ইঞ্চি এবং চওড়ায় ছিলেন প্রায় হাতীর মতো। আমাদের সঙ্গে অহেতুক খারাপ ব্যবহার করতেন তিনি, ঠিকমতো কাজ করলেও

মারধোর করতেন এবং নিঃশব্দেই আমাদের খাবারের পরিমাণ প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজে-কাজেই একদিন আমরা সবাই জন খাটতে যেতে অস্বীকার করে ধর্মঘট করি এবং দাবী করি যে, আমাদের উপর মার-ধোর বন্ধ করা হউক এবং খাবারের পরিমাণ পূর্ববৎ করা হউক। আমাদের ধর্মঘটের কথা জানতে পেয়ে ম্যানস্ফিল্ড রেগে আগুন হয়ে ওঠেন এবং আমাদের জেকে হুমকি দেন : “ঠিক পাঁচ মিনিটের ভেতর তোমরা সবাই যে যার নিজের কাজে যাও, না হলে আমি পাগলা ঘণ্টা বাজিয়ে প্রহরীদের ডাকবো এবং তাদের দ্বারা জোর করে তোমাদের বার করবো।” তিন মিনিট পার হয়ে যাবার পর তিনি আরও এগিয়ে এসে বলেন : “আর মাত্র দুই (অপেক্ষা করে) মিনিট (অপেক্ষা করে) থাকি।” কেউ তাঁর কথার কোন চ্যালেঞ্জ করছে না দেখে তাঁর মূখের ভাব অত্যন্ত বিষাদময় হয়ে উঠেছিল; আমি সেদিন তাঁকে মনে মনে করুণা না করে পারিনি। কে আর চায় হুমকি খেড়ে তারপর এভাবে অপদস্ত হতে? আমাদের ভেতর একজন বলে উঠলো : “আমরা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করতে চাই না। তোমার যা করবার এখন করো।”

তিনি নির্বিকারিচণ্ডে আরও পাকা-পোক্ত দুই মিনিট অপেক্ষা করলেন, তারপর দৌড়ে গিয়ে পাগলা ঘণ্টার দাঁড়িতে একটা টান দিলেন, আমাদের দিকে ঘৃণাপূর্ণভাবে তাকিয়ে আবার টান দিলেন, আবার একবার আমাদের দিকে হতাশ হয়ে তাকিয়ে হুতীরবার দাঁড়িতে টান দিলেন। প্রহরীরা দৌড়ে এগিয়ে আসতে তিনি হুকুম দিলেন : “হতভাগাদুলোকে মেরে টেনে বের করো বাইরে।” কিন্তু সেদিন ম্যানস্ফিল্ডের কপালে অনেক হতাশা ছিল, কারণ প্রহরীরা তাঁর আদেশ পালন করবার কোন চেষ্টাই দেখাল না। তাদের অধিনায়ক, একজন জালদ্রো উপজাতীয় লোক বরং সব প্রহরীদের সতর্ক করে দিল যে, তারা যেন ভেবে-চিন্তে সাবধানে কাজ করে, কারণ একদিন বন্দীরা সব ছাড়া পাবে এবং তাদের উপর কে কি অত্যাচার করেছে, তা তাদের মনে থাকতে পারে। এই সাবধানবাণী ব্যতিরেকেও অবশ্য প্রহরীরা ম্যানস্ফিল্ডের অন্যান্য আদেশ পালন করতে স্বেচ্ছা বোধ করছিল, কারণ গত কয়েক মাস ধরে তারা এবং আমরা নির্বন্ধাটে এক সপ্তে বাস করছিলাম রক্ষাকর্তা এবং রক্ষিত

হিসাবে। তাদের ভেতর অনেকেই আবার আমার ছাত্র ছিল; আমি তাদের অবসর সময় পড়াতাম, ভুল শব্দ ধরে দিতাম ও নতুন প্রশ্নমালা লিখে দিতাম। তাদের অধিনায়ককেও আমি তার ঘরে আলাদা করে পড়াতাম এবং আমাদের দুজনের ভেতর বন্ধুত্বের স্থাপনা হয়েছিল অনেকদিন থেকেই। আমি সত্যসত্যি তাকে সাহায্য করতাম, কিন্তু তা ছাড়া আমার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল এই কাজের পেছনে। তার ঘরের রৌড়ও শোনবার ভয়ানক প্রয়োজন ছিল আমার, যাতে কি পৃথিবীর সমস্ত খবরাখবর আমি অন্যান্য বন্দীদের কাছে বলতে পারি; ফলে রৌড়ওতে সংবাদ প্রচারের সময়ই ঘটনাচক্রে আমার তাকে পড়াবার সব থেকে বেশি সুবিধা হত। প্রহরীদের ভেতর বেশির ভাগই ছিল ভাল লোক, তারাও আমাদের মতোই আশা-ভরসা-পূর্ণ মানুষ ছিল, তাদেরও মন কাঁদতো দেশের জন্য, যদিচ পেটের দায়ে তারা বিদেশী শাসকের হুকুমের তাবৎদার করতো। আসলে কিন্তু তারা ও আমরা ছিলাম একই গোয়ালের গরু।

ম্যানস্ফিল্ড ও আমাদের ভেতর এই অচল অবস্থার মীমাংসা করতে শেষ অবধি সেদিন শিবিরের অধিনায়ককে ডাকতে হল। তিনি ম্যানস্ফিল্ডকে আমাদের সামনে কিছুই বললেন না, কিন্তু আমাদের খাবারের পরিমাণ বাড়িয়ে পূর্ববৎ করা হবে ও মারধোর করা বন্ধ হবে বলে আশ্বাস দিলেন। কাজে কাজেই আমরাও তখন বেরিয়ে সেদিনের কাজ আরম্ভ করতে রাজী হলাম। এর আরও এক মাস পরে আমরা শুনলাম যে, আমাদের জন খাটার পরিমাণ স্থানীয় জেলা শাসকের মনোমতো হয় নি। এও শুনলাম যে, তিনি নাকি বলেছেন পাথর ভাঙার জায়গা থেকে দু'মাইল দূরে অবস্থিত হাসপাতাল বাড়ির জন্য পাথর মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে আমাদের আরও কম সময় লাগা উচিত। এই কষ্টকর কাজের জন্য কেঁনিয়া সরকার নাকি সে সময় কোন লরী বন্দোবস্ত করতে পারে নি। আসল কথা এই যে, সরকারের মতে যখন এতগুলো লোক আছে দাচ্ছে, আছে সেখানে, তখন তারাই নিয়ে যাক পাথর মাথায় করে দু'মাইল দূরে, দারুণ রোদের ভেতর, তার জন্য আবার লরী কেন? আমাদের স্থানীয় সংবাদ সংসদের নাম ছিল মনকোমা টাইমস্

তাকে প্রায় কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা রটনাই এড়িয়ে যেতে পারতো না। একদিন এর মারফৎ খবর পাওয়া গেল যে, আমরা নাকি বহুদিন পূর্বের ইহুদী সন্তানদের মতো, দুর্দম মিশরের রাজা ফারাওর ক্রীতদাস হয়ে তাঁর জন্য সেখানকার পিরামিড তৈরি করছি। যখন বন্দীরা জেলা শাসকের নামে প্রচারিত নিয়মের কথা প্রথম শোনে তারা সবাই অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে ওঠে ও বলে যে, তারা সকলে এক সপ্তে সব রকম কাজ করা একেবারে বন্ধ করে দেবে, তার ফল যাই হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের ভেতর একজন বন্দীর প্রাণনাশ হয়। আমি সেদিন তাদের বুঝিয়েছিলাম, এভাবে আদেশ অমান্য করে একজনের প্রাণ নষ্ট করে কি লাভ হবে আমাদের? বিশেষ করে যদি তারপর আমরা আবার সেই আগেকার অন্যান্য নির্দেশই মেনে নি? ঐ একজনের অকালমৃত্যুতে কি কোন সুবিধা হবে আমাদের? হয় আমরা সবাই মিলে একজোটে এর প্রতিরোধ করবো যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা সবাই প্রাণ দি, আর যদি আমরা এতো শয় পণ না করতে পারি, তাহলে না হয় কোঁকিহুর প্রতিবাদ না করেই সরকারের ও অন্যান্য নির্দেশও মেনে নেব। কিন্তু আমার মতে, এ ছাড়া একটা হুতীর রাস্তাও খোলা আছে আমাদের সামনে। আমরা সবাই আমাদের সব থেকে হালকা কাপড়-জামা পরে কাজ করতে যাব এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দৌড়াতে দৌড়াতে পাথরের বোকা মাথায় নিয়ে দু'মাইল রাস্তা পার করে দেব। যদি এরকম বেগে কাজ করতে আমাদের খুব কষ্ট হয়, তাতেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কয়েকবার এরকম পর পর করতে পারলেই তার ভাল ফল দেখতে পাবে তোমরা। আমাদের সপ্তে যে প্রহরীরা যায় তাদের পায়ে থাকে ভারি বুটজুতো ও মোটা ফোঁটি, গায়ে থাকে মোটা খাঁকি কাপড়ের কড়া করে মাড় দেওয়া শার্ট ও প্যান্ট, হাতে থাকে লম্বা বেটন-লাগান রাইফেল, শব্দ তারই ওজন নয় পাউন্ড (চার কিলোর বেশি)। ঐ রকম অবস্থায় আমাদের সপ্তে তাগ রেখে প্রহরীরা চলতেই পারবে না।

সৈনিকের জীবনবন্দী

নীলব্রত
পাল



সামরিক আবালতের বিচার।
জমজমাট ভাব; গুরুগম্ভীর পরিবেশ।
শুদ্ধিত আদালতক্ষেপে চেনা-চেনা
বাছাই করা কণ্ঠ মনুষ্যকে মাত্র প্রবেশের
ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। একটা সঙ্গভীর
নিস্তব্ধতা চারিদিকে। সরকারী
উকিলের উচ্চ পদীর কণ্ঠস্বর চার-
দিকের বেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে আরও
ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।
পাহাড়-পাহাড় অভিযোগ আকাশ-প্রমাণ
অপরাধের প্রাচীর তৈরি করেছে।

—মিঃ গভর্ন! আসামীর নিলি'প্ত
ওদাসীনে সরকারী উকিলের কণ্ঠস্বর
যেন ফেটে পড়ে।

—ওঃ আচ্ছা বলুন। ঠিক তেমনি
নিলি'প্ত নিরাসক্ত তাঁর কণ্ঠস্বর। তাঁর
সামনে কি এটে যাচ্ছে তিনি কিছুই
জানতেন না। কার আমন্ত্রণে সাড়া
দিয়ে তিনি যেন এইমাত্র পৃথিবীর
মাটিতে নৈমে এলেন। এবার একটু
নড়েচড়ে তিনি সম্মুখপানে তাকালেন
তাঁর দিকে ছুড়ে মারা কথাগুলো
শুনবার জন্যে।

—আপনি কি অস্বীকার করতে
পারেন যে আপনি নগুয়েন বিন্
খিনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন।
সরকারী উকিল তাঁর চার নম্বর অভি-
যোগের পুনরাবৃত্তি করলেন।

—নগুয়েন বিন্ খিন!—মিঃ
গভর্নের দৃষ্টো চোখে যেন কিসের ছায়া
পড়লো; নির্ভাজ কপালের চামড়া
মুহুর্তের জন্যে কঁচকে উঠলো।

—দেশদ্রোহিতার জন্যে সরকার
যাকে শাস্তি দেন তার প্রতি সহানুভূতি
দেখানো দেশদ্রোহিতারই সামিল নয়
কি?—প্রশ্ন ছুড়ে মারলেন সরকারী
উকিল মিঃ কিটিংস।

—দেশদ্রোহিতা!—ব্যগের হাসিতে
দৃষ্টো ঠোট নড়ে উঠলো খানিকটা।

নুয়ে সেন্সিটল জেলের এগারো নম্বর
খেলের তিনশো চার নম্বর কয়েদী
নগুয়েন বিন্ খিন। কি অমানুষিক
অত্যাচার চলেছে তাঁর উপর দিনের পর
দিন! তাঁর অপরাধ তিনি একজন
ভিয়েতকণ্ড। সুতরাং তাঁকে ভিয়েত-
কণ্ডদের গোপন ঘাঁটির সমস্ত
খবরাখবর ফাঁস করে দিতে হবে।

নগুয়েন বিন্ খিন নীরব। ওপর
থেকে নির্দেশ এলো চাবুকের আঘাতে
পেটের সমস্ত খবর বের করা চাই।

চাবুক চললো পিঠের উপর।
সমস্ত গায়ে; দিনের পর দিন। সমস্ত
দেহ বেয়ে রক্ত গাড়িয়ে পড়লো। দগদগে
ঘায়ে ছেয়ে গেল সমস্ত শরীর। কয়েদী
তবু মৃদু খোলে না। জেল কর্তৃপক্ষ
হতাশ হয়ে পড়লেন।

উপর মহল থেকে কড়া নির্দেশ
এলো, যে কোনো উপায়েই হোক গোপন
তথ্য বের করতেই হবে। কিন্তু হ্যাঁ,
যাতে ঝরে না যায়। কারণ ওরা মরতে
ভয় পায় না। কারণ ওদের বাঁচিয়ে
রেখেই প্রমাণ করতে হবে, বেঁচে থাকার
বিড়ম্বনা।

বাবু যত বলে পারিষদ দলে

বলে তার শতগুণ

চললো অত্যাচার। এইটুকু একটা
নারীদেহের উপর অত্যাচারের নজীর
পৃথিবীর যে কোনো অমানুষিক
নির্ষাতনের দৃষ্টান্তকে ছাড়িয়ে গেল।
হাত-পা বেঁধে দেহের বিশেষ বিশেষ
অঙ্গে বৈদ্যুতিক চার্জ করা হলো।
অঙ্গেকের মধ্যেই জ্ঞান হারালো কয়েদী।
জ্ঞান ফিরে এলে সৈন্যদের দিয়ে তাঁকে
এবার 'রেপ' করানো হলো। তারপর
আবার চললো চাবুক! চাবুকের
আঘাতে জর্জরিত হলো সমস্ত দেহ।
এবার বিগ্রাম। সময় দেওয়া হলো
একদিন, দু'দিন। নির্ষাতনের দৈহিক

ফলশ্রুতিগুলি এরই মধ্যে খানিকটা
সেরে উঠুক। নয়ত আবার একটানা
অমানুষিক নির্ষাতনের ফলে মরেই
যাবে। তাহলে ত সবই ভেস্তে যাবে।
এরই মধ্যে তাঁকে বোঝানো হয় তাঁর
এই অনমনীয় মনোভাবের জন্যে নির্মম
পরিণতির কথা।

আসামী একটুখানি ম্লান হাসলো।
সে হাসিতে উপেক্ষার ছাপ। মৃত্যুর
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে কে এভাবে
উপেক্ষা করতে পারে?

আবার শব্দ। অত্যাচারের নতুন
পদ্ধতি বের করতে হবে এবার।
হলোও তাই। সাবান গোলা জল
পিচকারি দিয়ে নাসারন্ধ্রের ভেতর
ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এরই ফাঁকে
ফাঁকে চললো চাবুকের বেদম প্রহার।
জেল-হাসপাতালের ডাক্তার এসে আশংকা
প্রকাশ করলেন। এঁরা যেন প্রতিজ্ঞা করে-
ছেন এঁরা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।
কর্তৃপক্ষ আবার মিটিং কথায় ভোলাতে
চেষ্টা করেন; জীবনের নির্মম পরি-
ণতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে
ভিয়েতকণ্ডদের গোপন ঘাঁটির তথ্য
আদায়ের চেষ্টা করেন।

আবার সেই উপেক্ষার হাসি।

দেখে কর্তৃপক্ষ রেগে যান। হুকুম
হয়—একটু সেরে উঠলেই নির্ষাতন
পুনরোদ্যোগ চলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না
কয়েদীকে নতি স্বীকার করানো
যায়।

সাপ্তাহিক বসন্তভাণ্ডার

দেখে মার্কিন সৈনিক মিঃ গর্ডনের মাথা শ্রম্ভায় নত হয়ে আসে।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র রিচার্ড গর্ডন। দর্শনের ছাত্র হলেও সাহিত্যই গর্ডনের প্রিয় বিষয়। ক্লাসের পড়ার ফাঁকে ফাঁকেই গর্ডন উপন্যাস পড়তো রাশি রাশি; কবিতা লিখতো লুর্দিকয়ে লুর্দিকয়ে। লুইটম্যানের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সে খাবার কথাই ভুলে যেতো। অর্থার মিলারের নাটক হাতে নিয়ে কত বিনোদিত রাত কাটিয়েছে। মা বলেন, পাগল হলে। বোর্দি বলেন, কাঁবা।

গর্ডন শুদ্ধ হাসে; ছকঝলক মিষ্টি হাসি। তার ঐ হাসির জন্যে সে বন্ধুবান্ধব, চেনা পরিচিত সবার নিকটই খুবই প্রিয়। কিন্তু তার সব চাইতে আপনজন হলো বই। তার লাইব্রেরীতে বই যতই বাড়তে থাকে সে ততই বন্ধুবান্ধবদের নিকট ডুমুরের ফুল হয়ে ওঠে। ডুবে থাকে বইয়ের সাগরের মধ্যে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস—সব কিছুই তার প্রিয় বিষয়। যেন এক ধ্যানমগ্ন ঋষি।

কিন্তু একদিন বইয়ের লাইব্রেরী থেকে ডাক পড়লো যুদ্ধক্ষেত্রে। সেটি উনিশশো পঁয়ষাট সালের সেপ্টেম্বর মাস।

সৈন্য চাই, প্রচুর সৈন্য। আরো কাতারে কাতারে সৈন্য পাঠাতে হবে ভিয়েতনামে। নয়তো সমস্ত ভিয়েতনাম এক্ষুণি আমেরিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

দেশবাসীর প্রতি মার্কিন সরকারের উদাস্ত আহ্বান,—আপনারা দেশের স্বার্থে দলে দলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে ভিয়েতনামকে কম্যুনিষ্টদের কবল থেকে রক্ষা করুন।

কিন্তু দেশপ্রেমের সে আহ্বান মাঠে মারা পড়লো। কেউ আর সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার জন্যে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো না।

কোথেকেই বা আসবে? এরই মধ্যে আড়াই লক্ষেরও বেশি মার্কিন সৈন্যকে ভিয়েতনামে পাঠানো হয়েছে। দেশবাসী, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়ের মনে এরই মধ্যে প্রশ্ন জেগেছে, ভিয়েতনামে আমেরিকার যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাংস্কৃতিকতা সম্বন্ধে। কেনই বা আমেরিকান মানুষ প্রাণ দিতে যাবে দূরপ্রাচ্যে?

পেন্টাগনের পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। কাতারে কাতারে আমেরিকার সৈনিক প্রাণ হারিয়েছে ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্রে। টুকরো টুকরো ভিয়েতনামের মাটি থেকে

মার্কিন সৈনিকরা পিছু হটে আসছে। মৃত অশ্রুর পরিধি যতই বাড়তে থাকে মার্কিন সরকার ততই চম্পল হয়ে ওঠে। জেনারেল ওয়েস্টমোরল্যান্ড খবর পাঠান, সৈন্য চাই, আরো সৈন্য। নইলে ভিয়েতনাম এক্ষুণি মার্কিন সরকারের হাতছাড়া হয়ে যাবে। আর ভিয়েতনাম থেকে চলে আসা মানেই সমস্ত এশিয়া থেকেই মার্কিন প্রভুত্বের অবসান। কিন্তু সরকারের সমস্ত আবেদন ব্যর্থ। দেশপ্রেমের ডাকে দেশবাসীরা আর সাড়াই দিলে না।

অগত্যা সরকারকেও অন্য পথের সন্ধান করতে হলো। পেন্টাগনের কড়া নির্দেশ বেরুলো, আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত অবিবাহিত যুবকদের অবিলম্বে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

সাজ সাজ রবে সরকার সমস্ত দেশকে চমকে দিলো। যুদ্ধ! দেশের যুবসম্প্রদায়ের চোখে যুদ্ধ নেই। যুদ্ধ টুটে গেল সমস্ত মার্কিন মায়েরদেহও, ছেলে হারাবার ভয়ে। শুদ্ধ শুদ্ধ ছেলে প্রাণ দিতে যাবে ঐ দূরপ্রাচ্যে যুদ্ধ করবার জন্যে? না—এ হতেই পারে না। মায়ের অশ্রু যেন বাঁধ মানে না।

কিন্তু সরকার:

সরকারের এ আদেশ অমান্য করলে কঠোর সাজা পেতে হবে।

তাহলে?—সবার মনে একই প্রশ্ন, একই ভীতি, একই শংকা।

সবাই যেন হঠাৎ একটা পথ খুঁজে পেলো। সেনাবাহিনীতে যোগ দেবার হাত থেকে বাঁচতে হলে এই পথেরই আগ্রয় নিতে হবে সবাইকে।

কি সে পথ?—সবারই উদ্ভ্রাণ জিজ্ঞাসা।

—বিয়ে।—পরস্পর পর স্পর্শের কানে যেন বাঁচার পথ বাতলে দিলে।

কিন্তু বিয়ে তো চাটখানি কথা নয়। আর এক মৃদুহৃৎের মধ্যে বিয়ে হয়েছে যায় না। তার জন্যে মন দেয়া-নৈয়ার পালা আছে; আরো কত কি!

চুলোয় ষাক ওসব। আগাত্ত প্রাণ বাঁচাতে হবে; অপমৃত্যুর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। তার জন্যে বিয়ে করা এক্ষুণি দরকার। প্রয়োজন হলে পরে ডিভোর্স করে নেয়া যাবে।

যুবসম্প্রদায়কে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে মেয়েরাও এগিয়ে এলো।

দিকে দিকে বিয়ের হিড়িক লেগে

প্রকাশিত হল

উ দ্বা স্ত

শ্রীহরিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(আই. সি. এস. অবসরপ্রাপ্ত)

পূর্বে পাকিস্তান থেকে উদ্ভাসতুরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম বছরগুলিতেও আগত উদ্ভাসতুর প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক তীব্র সঙ্কটের উদ্ভব হয়েছিল। এই মানুষগুলি পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের দ্বারস্থ হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কি ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা ছিল কতটা, উদ্ভাসতুরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জন্যে কি-পথ নিয়েছিল, উদ্ভাসতু নেতারা বা কি চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্ভাসতু সমস্যার সূত্র সমাধান হল না—এ সব কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক উদ্ভাসতু পুনর্বাসন বিভাগের মুখ্যসচিব ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন—এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ। উদ্ভাসতু সমস্যা সমাধানের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি—বহুলাংশে অভাব মেটাবে এই বই। প্রতিটি সচেতন পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য বই। [দশ টাকা মাত্র]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-১

(৩৫-৭৬৬১)

স্বাধীনতা

গেল। পার্কে, মাঠে, গয়দানে, লেকে—সব জায়গাতেই বিয়ের চুক্তি হতে লাগলো। অববাহিত যুবকরাই মেয়ে দেখলেই হাত তুলে বলে, ভিয়েতনাম!

মেয়েরাও বদ্ব্যভিচারে পারের ভিয়েতনামে যাবার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে ছেলেরা তার পাণিপ্রার্থী। ভাবলেন ছেলেরা নিয়ে গর্ভনের মায়ের চিন্তার শেষ নেই। চোখের জলে তিনি ছেলেকে অনুরোধ করেন, বাবা, তুই এবার একটা বিয়ে কর।

—তাই তো! গর্ভনও বেশ খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়ে।

ওয়েবস্টার পার্কে একদিন 'হাততোলা বিয়ের' চুক্তিতে সই করে সে মেরীকে ঘরে নিয়ে এলো।

মা হাঁক ছেড়ে বাঁচলেন। গর্ভনও নিশ্চিন্ত হলো। সে আবার বইয়ের সাগরে ডুব দিলে।

সে হুইটম্যান আবৃত্তি করে মেরীকে শোনায়; মেরী প্রশংসা করে।

গর্ভন লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে; মেরীকে পড়ে শোনায়। মেরী মনোযোগ দিয়ে শোনে, আর আবেগের আতিশয্যে তাকে জড়িয়ে ধরে; জড়িয়ে ধরে চন্দ্রমুখে চন্দ্রমুখে ভরিয়ে দেয় সমস্ত মধুখানা।

গর্ভনের মধ্যে মেরী একজন মিস্ট মানুুষের সন্ধান পায়; মেরীর মধ্যে গর্ভন পায় একজন প্রেমিকার।

দিন যায়; মাসও যায়।

উডোজাহাজ ভর্তি আমেরিকান সৈনিক চালান যায় এশিয়া ভূখণ্ডে; ভিয়েতনামের মাটিতে।

কিন্তু এতেও জেনারেল ওয়েস্ট-মোরল্যান্ডের ক্ষুধা মেটে না। তিনি খবর পাঠান, সৈন্য চাই; আরও সৈন্য। যে হারে সৈন্য আসছে তা মোটেই

পর্যাপ্ত নয়। এদিকে ভিয়েতকঙ্করা সায়গনের দরজায় এসে ঠোকা দিচ্ছে। সমস্ত এশিয়া ভূখণ্ড থেকে আমেরিকার প্রভু গেল বলে। এখানে পা শক্ত করে দাঁড়াতে হলে আরো সৈন্য চাই; প্রচুর সৈন্য।

কিন্তু সরকারই বা এত সৈন্য কোথায় পাবে? আইন করেও সফল পাওয়া যাচ্ছে না। সেনাবাহিনীতে যোগদানের সংখ্যা দিন দিন কমে আসছে। অথচ ভিয়েতনামের মার্কিন জেনারেলের চাহিদা বেড়েই চলেছে।

সরকার বিব্রত। কি করা যায় এখন তাহলে? প্রতিজ্ঞাশীল কুচক্রী সরকারী আমলারাই বুদ্ধি ফাঁদলে, নোটিশ দেবার পর যারা বিয়ে করেছে সেটা নিতান্তই কর্তব্য এড়ানোর ছলমাছ। সে বিয়েকে সরকার স্বীকার করবে না। ভিয়েতনামে তাদের যেতেই হবে।

তাহলে?

বাক পড়লো নব-বিবাহিতা অনেক তরুণীর মাথায়; অনেক মায়ের চোখের জল বাঁধ মানলে না।

চোখের জলে গর্ভনকে বিবাক দেয় মেরী; গর্ভন মেরীকে দেয় তার বহু-আকাঙ্ক্ষিত উপহার, যা তার শরীরের অভ্যন্তরে প্রতি রক্তবিন্দুর বিনিময়ে বেড়ে ওঠে।

মাস গড়িয়ে যায়; বছরও।

যুদ্ধ থামবার কোনো লক্ষণ তো দূরের কথা যুদ্ধক্ষেত্র আরো প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ভিয়েতনামে আমেরিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবী বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। খোদ আমেরিকার যুবসম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে সরকারের ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে।

দিন দিন ক্রান্ত হয়ে পড়ছে রিচার্ড গর্ভন।

আর্মি ক্যাম্পে শূন্যে শূন্যে গর্ভন চিঠির কীট লাইন বার বার পড়ছিল।

".....এডওয়ার্ড ভীষণ দুঃখী হয়েছে।

ওকে এতটুকু ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই; অর্মান ভীষণ কাঁদতে শুরু করে দেবে। আর কোলে নিলেই সামনের নতুন গজিয়ে ওঠা কীট দাঁত বার করে এত সুন্দর হাসতে পারে। সে এখন 'ড্যাড' বলতে শিখেছে।

রিচার্ড, তুমি কবে দেশে ফিরে আসবে? আমি কিন্তু তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। তুমি আমার অন্তহীন ভালবাসা জেনো।"

তোমারই একান্ত প্রিয় মেরী।

রিচার্ড সমস্ত ঘরময় পায়-চারী করে। একটা আনন্দের অন্তর্ভূত তার সমস্ত সন্তাকে নাড়া দেয়। এডওয়ার্ড 'ড্যাড' বলতে শিখেছে। সে

মেরীকে এত ভালবাসে যে, এক মুহূর্তের জন্যে দূরেও যেতে দেয় না; অর্মান কাঁদতে আরম্ভ করে।

সমস্ত ক্যাম্পে হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনা; নিদারুণ ব্যস্ততার সংকেত। চারিদিকে সাজ-সাজ রব।

ওপর থেকে নির্দেশ এসেছে এই মুহূর্তেই সমস্ত ব্যাটেলিয়ানকে রওনা দিতে হবে।

কোথায়, কেন?—মিলিটারী নিয়মানুবর্তিতায় এ সব প্রশ্নের কোন উত্তর নেই।

নিখুঁত রাত। অমাবস্যার কোনো একটা তিথি হয়তো হবে। নিকষ কালো অন্ধকারের গাঢ় ঘনিকায় ঢাকা পড়ে আছে সমস্ত পৃথিবীটা; পাশের লোকটিকেও চেনা যায় না। সুন্দর আকাশের গায় দু-একটি তারা যেন লুপ্তায় য়িমায় এ হেন অন্ধকারকে হেডলাইটের দাম্বিক আলোকে চিরে দু'ভাগ করে পুরো এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য বোঝাই করে চলেছে মিলিটারী ভ্যান। শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। পিচঢালা পথে অনেকক্ষণ চলার পর হঠাৎ গাড়ি এসে থামলো। আর তো গাড়ি যাবে না! এবার পায়ে হাঁটার পালা। গ্রামের পথে পথে ওরা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চললো। পূর্বদিকের আকাশটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। তাপ নেই; শুষ্ক মৃত্যু মৃত্যু আলো ছড়িয়ে প্রথম ভোরের সূর্য।

মি—লাই।

দক্ষিণ ভিয়েতনামেরই একটি গ্রামের নাম। গ্রামবাসীরা সবে ঘুমজড়ানো চোখে ঘুমের আবেশ ভাঙছিল। চাষীরা মাঠে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল।

সমস্ত ব্যাটেলিয়ন ঝাঁপিয়ে পড়ল এই গ্রামটার ওপর। ব্যাটেলিয়ন কমান্ডার লেঃ কঃ বার্নহার্ডের কড়া নির্দেশ, —ধ্বংস করে দাও সমস্ত গ্রামখানাকে। মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে দেশের অন্যান্য প্রান্তরের লোকদের যাতে চেতনা ফিরে আসে; যাতে ওরা নীতি স্বীকার করে।

সমস্ত গ্রামের লোকেরাই ভিয়েতকঙ্কদের ভক্ত। ভিয়েতকঙ্করা দিনরাত এখানে ঘোরাফেরা করে। এখান থেকে ওদের জন্যে পাহাড়ে-জঙ্গলে খাবার, অস্ত্রশস্ত্র চালান যায়। অথচ মার্কিন সেনাবিভাগ ও গোয়েন্দাবিভাগ তার কোনো হুঁশই পায় না।

লেঃ কঃ বার্নহার্ড দাঁত কড়মড় করেন, এ গ্রামবাসীদেরই কারসাজী। পুড়িয়ে ফেল সমস্ত গ্রামখানাকে; একজন গ্রামবাসীও যেন রেহাই না পায়। এই হবে তাদের চরম শাস্তি।

সামরিক নির্দেশ। জর্দনেল সামরিক অফিসার লেঃ কঃ বার্নহার্ডের

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়

মিউজিক উপভোগ করুন

ট. ১ অথবা ইলেকট্রিক ৪ ফুট x ৩ ফুট পর্দায় আপনাদের প্রিয়-চিত্রভাস্কর্যের, আপনাদের প্রিয়-নৃত্যচর্চা এবং রোমাঞ্চকমিকগুণিত প্রদর্শনভাষে নাচতে, গাওয়া করতে, কাটিয়ে চিক আসল সিনেমার মত প্রদর্শন উপভোগ করুন। সকল মেলায় প্রদর্শনীর জন্যেই বিপুল অর্থ উৎসাহ প্রদান করা গছে বন্ধ-বান্ধব ও পরিবারবর্গকে আনন্দ দিন। হুয়ার

২৫ টাকা

১০০ ফুট ফিল্ম স্থানীয় একটি ফিল্ম ভাস্কর্য সহ বিনামূল্যে। (ডাক মাস্তুল ও প্যাকিং ৬০০ টাকা স্বতন্ত্র) ১০০ ফুট ফিল্ম ১০ টাকা। শুধুপরি হুইট অর্ডার জরুরি দিন।

American Cinema Supplies
Kalyanpura, Delhi - 6

প্রায়ঃ—এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই। শত্রু হলো অপারেশন মানরাইজ।

শত্রু হলো ধ্বংসযজ্ঞ। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হলো সমস্ত গ্রাম-খানাতে। লেলিহান অগ্নিশিখা দাবানলের মত ছাড়িয়ে পড়লো দিগ্বিদিকে। মেয়েদের উরোল রক্তন আর শিশুদের আত্মচীৎকারে দিগন্ত কেঁপে উঠলো।

ঘর ছেড়ে উঠান; উঠান পেরিয়ে রাস্তায় পালাবার হাঁড়িক লেগে গেল। কিন্তু পালাতে পারলো না। মেশিনগান আর রাইফেল গর্জে উঠলো চারিদিক থেকে। শত শত নারী, পুরুষ আর শিশু ধরাশায়ী হলো বুলেটের আঘাতে। ওদের অপরাধ, ওরা নিজের দেশকে ভালবাসে; নিজের দেশের মুক্তির জন্যে যারা লড়াই করছে তাদের ধরিয়ে দেয় নি।

লাস; চারিদিকে লাসের ছড়াছড়ি। ঘরের দরজায়, উঠানে আর রাস্তায় মৃত্যুপথচারীর আত্মনাদ। বাধা দেবার মত আর লোক বেঁচে নেই। এবার শত্রু; নারীদের নিয়ে লোফাল্‌দুফি আরম্ভ হয়ে গেছে ততক্ষণে।

গর্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখাছিল। এ কি যুদ্ধ? রাইফেলের ডগায় নিরীহ গ্রামবাসীদের দুঃভাগ করা; নারী, বৃদ্ধ আর শিশুকে আগুনে পুড়িয়ে মারা; নারীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা? আবেগে আর উত্তেজনার সমস্ত দেহ তার থর থর করে কাঁপছেঃ

একি?

একজন সৈনিক এক তরুণীকে টেনে-হিঁচড়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? মেয়েটির আত্মনাদ বিরাট ধ্বংসযজ্ঞের সাথে মিশে গিয়ে এক পাপের ত্রৈলোক্য করেছে। ছোট্ট একটি শিশু তার মায়ের এই দুর্দশা দেখে অঝোরে কাঁদছে, আর মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

গর্জনের মনে পড়লো, এডওয়ার্ড বড় হয়েছে; সে মেরীকে ছেড়ে এক মৃদুহৃতেও থাকতে পারে না; জার্মান কাঁদতে আরম্ভ করে।

সে ছুটে গেল। ছুটে গিয়ে সৈনিকের কবল থেকে ছাড়িয়ে দিল তরুণীকে।

সরকারী উঁকল মিঃ কিটিংস অভিযোগের বয়ান দীর্ঘতর করেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের এ হেন আচরণ নিজের কর্তব্যের প্রতি অবহেলার চূড়ান্ত নিদর্শন। শত্রু তাই নয়, নিজের কমরেড সৈনিককে তার কতব্য পালনে বাধা দিয়ে মার্কিন সরকারের প্রতি চরম অসৌজন্য প্রকাশ করেছেন এবং

নিজেকে আসামীর কাণ্ডগাড়ার দাঁড় করিয়েছেন।

—মি লর্ড,—মিঃ কিটিংস তার অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন,—দেশে পাঠানো তাঁর স্বাক্ষর নিকট লেখা যে চিঠি মহামান্য সরকার সেন্সর করতে গিয়ে হস্তগত করেছেন তা থেকেই আমার অভিযোগের সত্যতা আরো দুঃস্বভাবের প্রমাণিত হবে।

এই বলেই মিঃ কিটিংস তাঁর পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে লাল পেন্সিলের দাগ বেওয়া বাছাই করা কপি লাইন পড়তে আরম্ভ করলেন।

“.....আজ তিন বছরেরও বেশি হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি। ভিয়েতনামে আমেরিকান সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও বেশি। অথচ আমরা এখানে কেন যে লড়াই করছি তার কোনো হৃদিশই আজো পর্যন্ত পেলাম না। প্রতিদিন অসংখ্য আমেরিকান সৈন্য মরছে। অথচ এই প্রাণদানের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে কি?

মেরী, আমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়াই, সেই ভিয়েতকণ্ডরা, সংক্ষেপে যাদের বলে ভি. সি.—তাদের আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা আর দেশপ্রেম আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। ওরা লড়াই দেশের জন্যে। কিন্তু আমরা?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি কুণ্ঠিত। আর সেজন্যেই একদিন ইতিহাসের ডাস্টবিনেই আমাদের স্থান হবে। আমরা অর্থাৎ আমেরিকানরা সভ্যতার বড়াই করি। অথচ উপনিবেশ স্থাপন করার জন্যে যুদ্ধ; যুদ্ধ করতে গিয়ে লুণ্ঠন, নারীধ্বংস আর শিশুহত্যা—এ কোন ধরনের সভ্যতা?

ওপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে একদিন আমাদের জাতিকেও ন্যায়ের যুদ্ধ, মুক্তির যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অথচ আজ কত সহজেই না আমরা সে কথা ভুলে গেছি! কোন মানবাধিকারের জন্যে আব্রাহাম লিঙ্কন সংগ্রাম করেছিলেন? জানো মেরী, রাতের অন্ধকারে এই দশ হাজার মাইল দূরে বসেও হোয়াইট হাউসের টাওয়ার থেকে ডি. সি. ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কনের ভৌতিক কণ্ঠস্বর যেন আমি শুনতে পাই, এডওয়ার্ড, এডওয়ার্ড, এডওয়ার্ড। বিদায়, বিদায়। আমি তো ভাবি এই ‘বিদায়’ কথার সাথে সাথে আমাদের রাষ্ট্র-নায়কদের শেষ মানবিকবোধটাও বিদায় নিয়েছে কি না।

মি-লাই—এটা একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র।

“এ ধরনের ঘটনা গত ক’বছরে অসংখ্য হয়েছে এবং হচ্ছে। এ জন্যে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না।.....”

—তোমার একান্তই প্রিয় রিচার্ড।

বিচারকক্ষে সুগভীর নিস্তব্ধতা। মিঃ কিটিংসের কণ্ঠস্বর চার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসছে, তাহলেই দেখুন, মি লর্ড, মহানুভব সরকারের প্রতি একজন সৈনিকের এই মনোভাব সরকারের ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। শত্রু তাই নয়, এই ধরনের চিঠি লেখাটাও একটা জঘন্য অপরাধ। কারণ, যারাই এই চিঠি পড়বে তাদের মনে সরকারের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এ প্রকাশ্য দেশদ্রোহিতারই সাক্ষি।

মিঃ কিটিংস প্রশ্ন ছাড়ে মারলেন আসামীর দিকে,—এ কথা কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন, মিঃ গডন? ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেশ টেনে মিঃ গডন বললেন, নিশ্চয়ই।

এবার বিচারক মৃদু খুললেন, নিজেকে ডিফেন্ড করার জন্যে আসামীর কোনো বক্তব্য আছে?

—মহামান্য বিচারক,—আ সা মী নিজের পক্ষ সমর্থন করে বললেন,—অসংখ্য কথা বৃকের ভেতর জমে আছে। সে সব কথা উজাড় করে দিয়েও কোনো লাভ হবে কি? কারণ আমার শাস্তি বিচারের আগেই নির্ধারিত হয়ে আছে। এ তো বিচারের প্রহসন মাত্র। তবু বলছি, আমার স্বাক্ষর লেখা চিঠির যে কপি লাইন মিঃ কিটিংস আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবার জন্যে পড়ে শোনালেন তাই হলো আমার বক্তব্যের মর্মার্থ। আমার জবানবন্দী।

একটি আশঙ্কা



EARN Rs 650/- PER MONTH

জাপানি আর্ট প্যাটার্ন, টেমপ্লেট, ড্রয়িং, পোশাক, নাইলনের মোসো, রাই, টেমপ্লেট, ট্রোল, বাসনপত্র প্রভৃতির অর্ডার করা করিয়া মাসিক ৬৫০/- টাকা উপার্জন করিতে পারেন। অথবা আকর্ষণীয় কমিশনে দ্রাক্ষা ক্রয়িতা পারেন।

জাপানি হুটন, সিনামার, বস্ত্রাদি এবং পূর্বা নগের নগর, কল্যাণপুর, বালি পত্র লিখুন।

HURRY! BOMBAY AGENCIES WRITE! Kalyanpura, Delhi.

ফিল্ম ফিনান্স কর্পো-

রেশনের খণ্ড

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকুলাটর মদুখপত্র দ্বিতীয় বর্ষের এক সংবাদে প্রকাশ, গত দেড় বছরে ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ২০টি ছবিতে খণ্ড দিয়েছে। এই খণ্ডের অঙ্ক এক একটি ছবির ক্ষেত্রে আড়াই লক্ষের বেশি নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম চেনন আনন্দের “হীর রানধা”; ছবিটির জন্য ৫ লক্ষ টাকা অগ্রিম খণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ যাবৎ ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশন ৮২টি ছবিতে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা খণ্ড দিয়েছে। এর মধ্যে বারোটি ছবির ১২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা খণ্ড অনাদায়ী থেকে গেছে। এই আর্থিক ক্ষতির জন্য কর্পোরেশন সম্প্রতি মাঝারি বাজেটের খণ্ড দানের সিদ্ধান্ত করেছে।

খণ্ড দানের এই নীতি অনুযায়ী ‘ভুবন সোম’-কে দেওয়া হয়েছে দেড় লক্ষ টাকা, বাসু ভট্টাচার্যের ‘অনুভব’ (হিন্দী)-কে ২ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, গুজরাটি ছবি ‘বহুদূরপা’-কে দেড় লক্ষ টাকা, রাজিন্দার সিং বেদীর ‘দস্তক’-কে ২ লক্ষ টাকা, কান্তিলাল রাঠোরের গুজরাটি ছবি ‘কাঙ্কু’-কে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা, মারাঠি ছবি ‘আলিয়া তুফান বরওয়ারালা’-কে ৭৫ হাজার টাকা, ওড়িয়া ছবি ‘আদিনা মেঘ’-কে দেড় লক্ষ টাকা, বাসু চ্যাটার্জীর ‘সারা আকাশ’-কে ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা, মণি কাউলের ‘উসকি রোটি’-কে আড়াই লক্ষ টাকা, ‘তালার’-কে আড়াই লক্ষ টাকা, মৃণাল সেনের হিন্দী ছবি ‘গোত্রান্তর’-কে ২ লক্ষ টাকা, প্রেম কাপড়ের ‘বদনাম’-কে ২ লক্ষ টাকা, চিবানন্দ দাশগুপ্তের বাংলা ছবি ‘স্বংকার’-কে ২ লক্ষ টাকা, মালয়ালম ছবি ‘গ্রিসম্মা’-কে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। তথ্যচিত্রের ক্ষেত্রেও

কয়েকটি ছবিতে খণ্ড দান করা হয়েছে। রেকর্ডিং বন্দ্রপাতি কেনার জন্যও কর্পোরেশন একটি প্রতিষ্ঠানকে খণ্ডদান করেছে।

ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনের খণ্ড দানের ক্ষেত্রে মাঝারি বাজেট এবং ছোট বাজেটের ছবি অগ্রাধিকার পাবার নীতি অনুসরণ করা উচিত। এই নীতি অনুসরণ করলে নতুন প্রযোজক-পরিচালকদের উৎসাহ দেওয়া হবে এবং এতে ছবির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাবে।

—সুজন।

চিহ্ন আলোচনা

প্রথম কদম ফুল

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসের চিত্ররূপ “প্রথম কদম ফুল” কলকাতা ও শহরতলীর সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটির পরিচালনা করেছেন ইন্দর সেন। চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি নবাগত। নতুন হাতের মিঠা মেজাজে এই কাহিনীচিত্রটি উপভোগ্য। প্রথম থেকে রোমাণ্টিকতা এবং সাম্পেসে ছবিটি দর্শকদের মনে কৌতূহল সৃষ্টি করে রাখে। চলচ্চিত্র বাংলা বা হিন্দী ঘেরূপ ‘গতানুগতিক’-তার চোরাগলি ধরে চলেছে, তার মধ্যে এই ছবিতে কিছুটা বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সুশান্ত আর কেতকী দুই সহপাঠীর মনে প্রেমের রঙ দেখা দিল। তারা ভালবেসে বিয়ে করল। বিয়েতে কেতকীর বাবার ভয়ানক আপত্তি, কারণ সুশান্তদের



‘পরদেশী’ ছবিতে মৃদুভাজ

তুলনায় আর্থিক দিক থেকে ওয়া উপরে; সমসঙ্গিতর রোজগারে ছেলেকে বিয়ে দেওয়া তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কেতকীকে কিছুতেই রাজী করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। অন্যদৃষ্টিতে সুশান্তের সঙ্গে কেতকীর বিয়ে হল এবং সে একামবর্তী সংসারের বো হয়ে এল।

সুশান্ত রিসার্চ করছে জলপানি পেয়ে। তার মার কাছে টাকাটাই আসল কথা, কাজেই বোয়ের জন্য চাকরির কথা বলতে তিনি ইতস্তত করলেন না। যদিও চাকরি করতে কেতকীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুশান্ত থেকে পরিবারের সকলের মনের অবস্থা দেখে সে সুশান্তের বন্ধুর দেওয়া চাকরি নিল। এবার পরিবারের সকলের চোখে সে বদলে গেল, সকলেই তাকে খাতির করে, সমীহ করে। সুশান্তের কাছেও তার মর্যাদা বেড়ে গেছে। মধ্যবিত্তের সংসারে টাকাটা মান-সম্মানের মাপকাঠি।

কিন্তু সুশান্তের মনে শান্তি ছিল না, যতই আধুনিক যুবক হোক, নারীর ওপর ‘প্রভু মানসিকতা’ প্রায় সকলের মধ্যেই রয়েছে। কেতকীর আর্থিক



স্বাভাব্য স্ফূর্তির মনের কোণে কোথায় যেন মেঘ জমে উঠেছে। একদিন তা ফেটে পড়ল, যখন তার গা এসে শোনালো যে, স্ফূর্তির বন্ধু আর কেতকীকে নিয়ে নানা কথা রটনা হচ্ছে। কথাটা তার বিশ্বাস হলো, কারণ বন্ধুর বাড়িতে একটা বইয়ের মধ্যে সে কেতকীর ছবি দেখেছে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, দ্বিধা ও ঘৃণায় স্ফূর্তির মন ভরে উঠলো। অপমানিতা হয়ে কেতকী বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

এ পর্যন্ত কাহিনীতে পরিচালক মধ্যবিত্ত সংসারে নারীর স্থান এবং আর্থিক সমস্যায় নারীকে চাকরির ক্ষেত্রে পাঠিয়েও যে রক্ষণশীল ও সংকীর্ণ মানসিকতার শিকার কিভাবে হয় তা চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন। আধুনিকতার বড়াই করলেও নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ চরম আনধুনিক। যে কেতকী বইয়ের ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে স্বেচ্ছা করলো না, সেই কেতকীর কাছে স্ফূর্তি দাবি করলো তার মতামতের ওপর কেতকীকে চলতে হবে, বাড়ির সকলের মন জুড়িয়ে লক্ষ্মী বোটি হয়ে। এই রক্ষণশীল মানসিকতার প্রতি পরিচালক কশাঘাত করেছেন। এ পর্যন্ত ছবিটি দেখতে বেশ ভাল লাগে।

শেষ পর্যন্ত স্ফূর্তি তার বন্ধুর কাছ থেকে জানতে পারলো ওর কাছে কেতকীর ছবি থাকার রহস্য। এখানেই কাহিনীর শেষ। কিন্তু পরিচালক পুরুষের প্রচুর মানসিকতার শিকার স্ফূর্তিকে দিয়ে সাময়িক বিচ্ছেদের অবসান ঘটাবার পরিবর্তে ভাস্করের ছেলে হারাবার ঘটনা উপস্থিত করে কাহিনীর মূল সূত্রে ভাঙন ধরিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত যে মানসিকতাকে বিদ্ভূত করেছেন, পরিচালক নিজেই সেই মানসিকতার শিকার হলেন হারানো শিশুর হাত ধরে কেতকীর প্রত্যাবর্তনে। অসম্মান ও অবিশ্বাসের পরিপূরণ করা হলো মমতা দিয়ে।

ছবিতে প্রধান দু'টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র ও তনুজা। মানসিক প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশে সৌমিত্র দক্ষতা দেখিয়েছেন। তনুজা বর্ষকদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছেন। বন্ধুর ভূমিকায় শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় কেতকীকে ভাললাগার প্রচ্ছন্ন প্রকাশে চমৎকার অভিনয় করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে প্রশংসনীয় সূত্রতা চ্যাটোজী, তরুণ-কুমার, ছায়া দেবী, অনুভা দেবী, শৈলেন মুখার্জী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধনা রায়-চৌধুরী, সীমান্তিনী রায়, শমিত ভজ ও শিশু অভিনেতাটি।



‘দুটি মন’ ছবিতে উত্তমকুমার ও কণিকা

ছবিতে সঙ্গীতের কাজ ছবিয় মেজাজ অনুরূপ বলতে পারি না। যে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং গঙ্গাতীরে দেশীয় যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার উপযুক্ত রস সৃষ্টি করতে পারত, সেক্ষেত্রে আধুনিক গান ও বিদেশী বাদ্যযন্ত্রের ঝংকার আমার কাছে রসহীন মনে হয়েছে। ফিল্মী কায়দায় সৌমিত্রের মূখে গান জুড়বার কোন দরকার ছিল না। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

ছবির ক্যামেরার কাজ প্রশংসনীয়। গঙ্গাতীরের কয়েকটি দৃশ্য দেখতে ভাল লাগে, সৌন্দর্যবোধের সহায়ক হয়েছে।

নাটকের কথা

মোচোর

গত ৮ই জুলাই সম্মানীয় বিশ্বরূপা গুপ্তমণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ফিসারিজ ডাইরেক্টরেট রিক্রিয়েশন ব্রাণের সপ্তম বার্ষিক প্রীতি সম্মেলনে শ্রীসিলিল সেনের ‘মোচোর’ নাটকটি সফলতার সাথে অভিনীত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডেপুটি ডাইরেক্টর শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ। প্রখ্যাত

নট ও নাট্যকার শ্রীশৈলেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে বর্তমান বাংলা নাটকের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতা শ্রীসুকমল সেন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভাষণ দেন। নাটকের আগে শ্রীসুকমল বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান বিশেষ উপভোগ্য হয়।

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলের গহীন অরণ্যে বাঘ-সাপ আর হিংস্র আরগাক প্রাণীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে জীবনে বেঁচে থাকার দুর্জয় সংগ্রাম, আমলাতন্ত্র আর মহাজনী শোষণের ষাঁতাকল থেকে মুক্ত হবার প্রত্যয় ঘোষণা নাটক ‘মোচোর’। সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের নাটক হিসাবে এটি একটি সফল নাট্য প্রযোজনা—একথা আগেই বলেছি। অভিনয়ে বংশী বাউল চরিত্রে দিলীপ গঙ্গোপাধ্যায়, ধর্মদাস চরিত্রে রমেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সনাতন মন্ডল চরিত্রে সুশীল আচার্য ও ময়না চরিত্রে প্রতিমা পালের অভিনয় মূগ্ধ হবার মতো। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে সফলতার সাথে রূপদান করেছেন অভয় মিত্র, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ ঘোষ প্রমুখ। নাটকের নায়ক রতন-চরিত্রে হিমালয় দেব অভিনয় কিছুটা নিম্নপ্রভ। দৃশ্য-পারিকল্পনায় কিছু দুটি ধাক্কা সত্ত্বেও সামগ্রিক নাট্যানুষ্ঠান বিশেষভাবে উপভোগ্য হয়।

সংবাদ কল্যাণ

যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

আগামী ১লা আগস্ট 'উদয়নের' উদ্যোগে কলামন্দিরে ভারতীয় মূকাভিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্ত একক মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন। আলো ও মণ্ড পরিচালনা করবেন তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত, আবহসঙ্গীত হিমাংশু বিশ্বাস, রূপসজ্জার অনন্ত দাশ, পোষাকে খালেদ চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় রাম গুপ্ত। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত এবার কয়েকটি নতুন মূকাভিনয় পরিবেশন করবেন।

আসন্ন দ্বিতীয় তাসখন্দ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

নোভিয়েত উজবেক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী তাসখন্দে আসন্ন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আফ্রোশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্রগুলি সোৎসাহে কাজ করে চলেছেন। নোভিয়েত ইউনিয়নের গম্ভীর পরিবর্ধের চলচ্চিত্রশিল্প কমিটির প্রথম সহ-সভাপতি ও উৎসবের সংগঠনী কমিটির সহ-সভাপতি ভ্যারিবার বাসকাকোভ নভোভিত্তির প্রতিনিধির সংগে এক সাক্ষাৎকারে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির নবজাগ্রত চলচ্চিত্রে শিল্পে তার প্রভাব সম্পর্কে মিঃ বাসকাকোভ বলেন যে, ১৯৬৮ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম চলচ্চিত্র উৎসব ছিল আফ্রোশীয় দেশগুলির

সাপ্তাহিক বসুমতী

চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সবচেয়ে প্রতি-নিধিমূলক। এই উৎসবে আফ্রোশীয় দেশের ১০০টি ফিল্ম প্রদর্শিত হয় ও ৪৯টি আফ্রোশীয় দেশের ৩০০ প্রতিনিধি উৎসবে যোগ দেন। তা ছাড়া জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর প্রতিনিধিও উৎসবে ছিলেন। এই উৎসব ছিল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্মেলন। ভারতের তথ্য ও বেতার দপ্তরের উপদ্রষ্টা শ্রীমতী নন্দিনী সংপথী উৎসবকে স্বাগত জানান। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিশিষ্টা অভিনেত্রী শ্রীমতী মাগদা কামাল বলেন, মৈত্রী ও শান্তির জন্য সোভিয়েত জনগণের অকৃত্রিম আগ্রহের প্রকাশ এ উৎসব।

উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল আর আন্তর্জাতিক "আলোচনা চক্র" চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের সমস্যাগুলি তাতে আলোচিত হয়। প্রথম তাসখন্দ উৎসবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলচ্চিত্র সম্পর্কে কয়েক শত বাণিজ্য-চুক্তি হয় এবং ফিল্মের কেনা-বেচা ও আদান-প্রদান চলে। আসন্ন দ্বিতীয় উৎসবটি আরও প্রতিনিধিমূলক ও আফ্রোশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও প্রযোজকদের কাছে আরও ফলপ্রসূ হবে বলে তিনি মনে করেন।

তাসখন্দ উৎসব সংগঠনী কমিটি বর্তমানে অসংখ্য বিদেশী চলচ্চিত্র প্রতি-ষ্ঠান, সমিতি ও প্রযোজকদের কাছ থেকে যোগদানের আবেদনপত্র পাচ্ছে। বেশে দেশে আসন্ন উৎসবের জনপ্রিয়তার এ এক উদাহরণ। উৎসবের আদর্শ হল : "শান্তি, সমাজ প্রগতি ও জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্য।"

উপসংহারে মিঃ বাসকাকোভ বলেন,



দ্বিতীয় নী মা' ছবিতে শ্বিঙ্গা ডায়াল

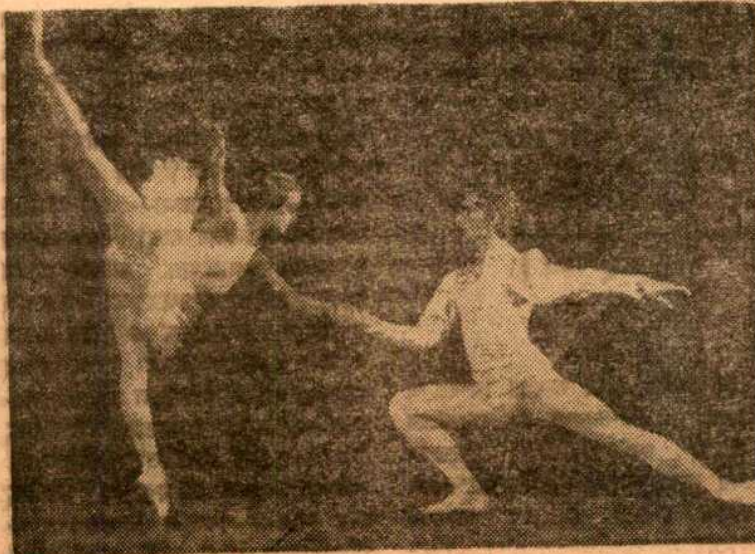
তাসখন্দ উৎসব সংগঠনী কমিটি এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুতি কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, যাতে এই উৎসবের আদর্শ ও মানবতাবাদী ঐতিহ্য জহ্বলু হয় ও আফ্রোশীয় দেশগুলির চলচ্চিত্রশিল্প আরও ঘনিষ্ঠ মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে এবং আসন্ন উৎসবটি চলচ্চিত্র-শিল্পের এক আন্তর্জাতিক সমারোহে পরিণত হয়।

সাক্ষরতার যুগপর্তি উৎসব

আগামী ৩১শে জুলাই মৃত্ত অঙ্গনে জনপ্রিয় নাট্যসংস্থা সাজঘরের যুগপর্তি উৎসবে খ্যাতনামা চিত্র পরিচালক ও নাট্যকার সলিল সেন পরিচালিত ও আলো দাশগুপ্ত রচিত "সুখের গায়রা" নাটকখানি অভিনীত হবে। এই উপলক্ষে সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে যথাক্রমে নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত ও রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী উপস্থিত থাকবেন।

অভিনেত্রী লীলাবতীর জীবনাবসান

মণ্ড ও চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী লীলাবতী (করালী) গত ১৫ই জুলাই পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৭ বছর। লীলাবতীর অভিনয় জীবনের সূচনা মিনার্ভা রণমণ্ডে আট বছর বয়সে 'বামনাবতার' নাটকে। তার পর থেকে মণ্ডে ও চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। বিশেষভাবে কয়েকটি টাইপ চরিত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।



নোভিয়েত ইয়ং ব্যালের একটি নাচ। ভরুণ-ভরুণীদের নিয়ে এই নাচের দল গঠিত।

॥ বিশেষ বিশেষ রচনায় ফুটবল ॥



বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রা খেলা থেকে বছরে কে কত টাকা পান

বিশ্ব ফুটবলের নামী-দামী খেলোয়াড়েরা শুধুমাত্র খেলার থেকে যে টাকা পান তার হিসেব নিয়ে দেখা গেছে—ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকার প্রায় ৩০ জন খেলোয়াড় পান বছরে ১০,০০০ পাউন্ড করে। এবং ১৫ জন খেলোয়াড় পান বছরে ১৫,০০০ পাউন্ড করে। আর ইংল্যান্ডের প্রায় ১২ জন খেলোয়াড় পান ২০,০০০ পাউন্ড করে।

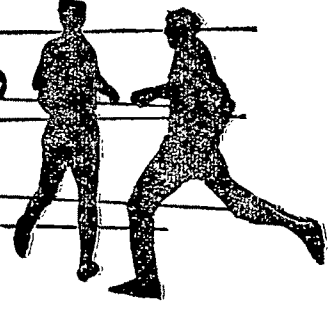
ইতালীর কাগলিরারি ক্লাবের খেলোয়াড় সুইসি রিভা এখন বিশ্ব ফুটবলের সব চাইতে দামী খেলে, তার উপার্জন কেবলমাত্র খেলা থেকে হল—প্রায় ৬৬,০০০ পাউন্ড।

এর পরেই হলেন ব্রাজিলের পেলে—শুধুমাত্র খেলা থেকে তিনি পান—৬০,০০০ পাউন্ড।

ইতালীর অন্যদশেক খেলোয়াড় পান ২৬,০০০ থেকে ৩০,০০০ পাউন্ড পর্যন্ত। এর মধ্যে আছেন হলার (জুভেন্টাস), রিভেরা (এ.সি.মিলান) কেটেটি ও ম্যাগোলা (ইন্টারন্যাশনাল)।

ইংল্যান্ডের অধিনায়ক ববি মুর পান প্রায় ২৫,০০০ পাউন্ড। ববি চার্লটন (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড) পান ২০,০০০ পাউন্ড। স্কটল্যান্ডের ইউরোবিগর বাবনার্ক পান ২০,০০০ পাউন্ড এবং আর্জেেন্টিনার পারফুমা পান ১৭,০০০ পাউন্ড।

হাতে নকল নাড়ু, ঠকছে কে! তজয় বসু



যতো দিন যাচ্ছে, কলকাতার ফুটবলের চেহারা ও চরিত্র দেখে চমকে উঠছি। যেমন তার বাইরের রূপ, তেমনি ভেতরটাও। বাইরে হাঁকডাক, অবদ্বন্দ্বের সোচ্চার কলকণ্ঠ, ভেতরটা মস্ত অন্তঃসারশূন্য। নিশ্চিত জানি, কলকাতার ফুটবল নামক বস্তুটিকে সুস্থ নেড়ে চেনবার চেষ্টা করলে অনেকেই আমার মতো চমকে উঠবেন।

দর্শক, খেলোয়াড় ও সাংবাদিক হিসেবে কলকাতার ফুটবলের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক দিনের পুরনো এবং নিবিড়। এই ফুটবলকে ইংরাজ আমলে দেখছি, মহামোড়ান স্পোর্টিংয়ের স্বর্ণযুগে খুব কাছ থেকেই সমস্ত সত্তা দিয়েই স্পর্শ করতে পেরেছি। তার পরের কালে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ওই ফুটবলের আদ্যোপান্ত নিরীক্ষণের সযোগও পেরেছি। কালের বিচারে বিভিন্ন পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু কোনো কালের অভিজ্ঞতা একালের অভিজ্ঞতার মতো বিস্বাদ, বিবর্ণ নয়। এই কালের প্রভাবনা থেকে কি আমাদের মূর্তি নেই!

প্রভাবনা? হ্যাঁ, বেছে বেছে ওই শব্দটিই আমি ব্যবহার করছি। কারণ, কলকাতার লীগ ফুটবলের নামে যে খেলার আয়োজন ঘটানো হয়, তা স্রেফ ফকিবাজী ছাড়া আর কি-ই বা! খেলার নামে ছেলে-খেলা, প্রতিযোগিতার নামে পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া। নেওয়া-দেওয়ার এই কারবারে অভিনয় করার অবকাশে দর্শকদের চোখে খুলো দেয়ার অপচেষ্টা। সব মিলিয়ে স্বকমারি জঞ্জালের পাহাড় জমে উঠছে, পাচা জলের স্রোত বয়ে চলেছে কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্র গড়ের মাঠে।

এ জিনিস সার্কাস, ম্যাজিকের চেয়েও অধম। সার্কাসে, ম্যাজিকে ওপরে আড়াল থাকে। লীগ ফুটবলে তাও নেই। হাত সাফাইয়ের কাজ বড় খোলামেলা যেন!

এই জঞ্জাল স্তূপের সাক্ষী আমি, আপনি এবং সবাই। ঘোলা জলে সবাই অবগাহন করছি। তবে আপনি, আমি শুধু নস্টাল্জি দেখে টিটকারি দিই, উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করি, হাতের কাছে প্রোতা পেলে বলি, এটা হচ্ছে কি? এর চেয়ে খেলার পাট তুলে দেওয়া কি ভাল নয়?

কিন্তু অন্য সবাই কি আপনার-আমার মতো অমন ক্ষুধাকণ্ঠে ফুটছেন, না, বেয়াদবী কাণ্ডকারখানাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইছেন?

অন্য সবাই মানে ক্লাব ও বাংলাদেশের ফুটবলের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ। তাঁরা কি কেউ কোনোদিন লীগ ফুটবলে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির বিরুদ্ধে ক্ষণিকণ্ঠে রা কেড়ে-ছেন? না, এমন বন্দোবস্তের খেলার পাট বন্ধে সভা-সমিতিতে একটি প্রস্তাব এনেছেন? না, তাঁরা কিছুই করেন নি। কি করেই বা তা করেন। লীগো পয়েন্ট ছাড়াছাড়ির গোপন কারবারে তাঁরা সবাই তো আর অনস্পৃশ্য নন। কাজেই চোখ বুলুয়ে অমন বিসদৃশ ব্যাপারটিকে তাঁদের মনে নিতে হয়।

তাঁরা মানছেন, দর্শকেরাও পয়েন্টকে মানতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলো মেনো নেওয়ার জন্যে একদল মানুষের জমায়ত ঘটছে গড়ের মাঠে ও তারা আনাচে-কানাচে। এই জমায়তকেই পরিভাষায় বলে 'পারামিসিভ সোসাইটি'—এই সমাজ টিকে থাকলে একদিন হয়তো মাঠের অঘটন, অন্যায় দেখেও আর কেউ চমকে উঠবে না। এখনও নীতিবোধের রক্তচক্ষু শাস্যনি রয়েছে। চক্ষুলালজ্ঞাও টিসিটিমা করছে। কিন্তু ওই 'পারামিসিভ সোসাইটি'র প্রভাবে নীতিবোধ, চক্ষুলালজ্ঞা উবে যেতে কতোক্ষণই বা লাগবে! মাঠের বাইরে যে বৃহত্তর জীবন, সেখানেও রাজনীতির নামে ধীরে ধীরে অনেক কিছু সেই নেওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছে—শরিকী সংঘর্ষ, লাঠি, বোমাবাজী, ছুরি-গুলী, কতো কি! সেখানেও এক 'পারামিসিভ সোসাইটি'র শিকার বৃহত্তর জনজীবন। দেখে মনে হয়, সবাইকে সবকিছু সেই নেওয়ারার জন্যেই বড়ি এ যুগে পালা-বদল শব্দ হয় গিয়েছে।

ইংরাজ আমলে কলকাতার ফুটবলে কালামখলার দ্বন্দ্ব রেফারিংয়ের নামে মাঝে-মাঝে বিচার-বিচারাট ঘটতো। সাহেব রেফারীরা সাহেব দলের পক্ষে যে টানতেন না, এমন নয়। গ্রিশের দশকে বাংলাদেশের শাসনভার যখন মুসলিম লীগের হাতে, তখনও দলসমর্থকদের দৃষ্টিতে উচ্ছৃঙ্খলতা

সইতে হয়েছে কলকাতার গড়ের মাঠকে। সেই গড়ের মাঠকে আজও পক্ষপাতদুষ্ট রেফারিংয়ের এবং দলসমর্থকদের দাপ্যাদাশি সইতে হচ্ছে। সেদিনে ও আজকে তফাৎ কোথায়? বরং অবক্ষয়ের কাল আজ আরও পূর্ণ হয়েছে। যেহেতু সকালে লীগে পয়েন্ট ছাড়াছাড়ি করা হোতো না! আজ হচ্ছে। বিগত গ্রিশ-চরিশ বছরে জীবনের অন্য ক্ষেত্রে অন্য কিছু ঘটুক বা না ঘটুক, কলকাতার ক্রীড়া জীবন যে সুশিক্ষিত হতে পারে নি এবং সেই জীবনের ওপর প্রগতির প্রতিফলন ঘটে নি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সৎ শিক্ষার আশীর্বাদ পেলে খেলার নামে নিজেদের ঠকাবার বিষ-বীজটিকে আমরা আমাদের ক্রীড়া জীবন থেকে উৎখাত করায় প্রেরণা পেতাম নিশ্চয়ই।

নিজেকে ঠকাচ্ছি? তা ছাড়া আর কি! পয়েন্ট দেওয়া-নেওয়া করে ক্ষতি করছি কার? আমরা নিজের নয় কি? নিজের কাছে নিজেই চোর সাজছি। চক্ষুজ্ঞান দর্শকদের দৃষ্টিতেও আড়াল করতে পারছি না। সব মিলিয়ে চরিত্র-হননের এ এক রাজসূর্য বস্ত্র যেন। বড়রাই এই যজ্ঞের হোতা। আর বাড়ন্ত ছেলেরা সেই যজ্ঞের শিকার। অবস্থাটা সত্যিই ভাববার মতো! শব্দ ভাল না খেলতে পারলে আফশোস করতাম না। কিন্তু যে আয়োজনে খেলতে পারছি না এবং চরিত্র বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছি, সেই আয়োজনে নিজেদের বলি দিয়ে আমরা লাভ করছি কি!

মাঠে যাঁরা যান, ব্যাপারটা তাঁদের অগোচরে নেই। তবে আশ্চর্যবশত সম্পর্কে তাঁরা সবাই কিন্তু তেমন সচেতন নন। তাই তাঁরা এখনও বড় বড় কণ্ঠ দলের ভালমন্দের সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও জড়িয়ে রাখতে চাইছেন। 'সম্মতি' দল জিতলে আজও তাঁরা উচ্চৈশ্বরে আকাশ ফাটান, হারলে খেলোয়াড়-রেফারীর কপাল ফাটিয়ে দেবার জন্যে ইন্ট-পাথরের টুকরো হাতে তুলে নেন। দলের হার-জিতকে কেন্দ্র করে এতদিন বিনা উচ্ছ্বাসিত আনন্দে উদ্বোধন অর্থাৎ সেই তিনিই দৃষ্টিতে, ১৯৮০ পুণ্ডিয়া স্টুডেন্ট।



কলকাতা ফুটবল নিয়ে পাগলামি দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, আর ফুটবল খেলার মান নামতে নামতে শূন্যের কোঠায় পড়ে-পড়ে। কিন্তু এর মধ্যেও স্বপ্ন দেখার অন্ত নেই। রসিকতার ছলে কিংবা ফুটবল ধাঁধা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে হলেও ১৯৭৮ সালে ভারতকে ওয়ার্ল্ড কাপ প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানের অধিকারী বলে ঘাঁরা কল্পনা করতে পারেন তাঁদের আশা-বাদের প্রশংসা করি। কিন্তু যখন ১৯৭০ সালে ওয়ার্ল্ড কাপের খেলার বিবরণ পড়েছি আর দেখেছি কলকাতা মাঠের খেলা তখন উচ্চকণ্ঠে বৃন্দদেব বসুদেব বন্দীর বন্দনা কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করতে ইচ্ছা হয়েছে :

বিধাতা জানোনা তুমি কী অপার
বাসনা আমার অমর্তের তরে
হয়তো ডুবিয়া আছি কৃমিঘন
পাঁশকল সাগরে।

কলকাতা ফুটবল বর্তমানে সত্যিই কৃমিঘন পাঁশকল সাগর আর সেই সঙ্গে চারতীর ফুটবলও।

মোহনবাগান কোনমতে স্পোর্টিং ইউনিয়নকে এক গোলে হারিয়ে কিংবা ইস্টবেঙ্গল কেঁদে কঁকিয়ে খিনিরপুত্রের বিরুদ্ধে একগোলে জেতে, আর সমর্থক জনতা বিপুল আনন্দে পটকা ফাটিয়ে ও বিউগল বাজিয়ে ফেরে। শূদ্ধ এক গোলে জেতার বেলায়ই বা কেন। ইস্টবেঙ্গল হাওড়া ইউনিয়নকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে তাও কেঁদে কঁকিয়ে। প্রথমাধের শেষ ১৫ মিনিটে

তিন গোল ও বিবতীয়ার্থের শেষ দশ মিনিটে আরও তিন গোল দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। মোট খেলা ৭০ মিনিটের মধ্যে মাত্র ২৫ মিনিটকাল ইস্টবেঙ্গলের হাওড়া-জয়ন্ত দিয়ে গড়া টিম হাওড়া ইউনিয়নের রক্ষণবিভাগকে ভেদ করতে পেরেছে। আর বাকি ৪৫ মিনিটকাল হাওড়া দলের রক্ষণবাহুর কাজে ব্যর্থ হতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। তার পূর্ণকৃতিত্ব হাওড়া ইউনিয়ন রক্ষণ বিভাগের নয়, ইস্টবেঙ্গল দলের অকৃতিত্বই তা সম্ভব হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল আক্রমণই করে এসে যখন দেখেছে হাওড়া দলের গোল দুর্গ প্রায় অরক্ষিত, তখন কিন্তু গোল-কাঁপারকে একা পেয়ে দুর্গভেদ প্রয়াসে ভংগর হয় নি ওরা। বল নিয়ে পায়তারা কষে কষে ব্যাক, হাফব্যাকদের গোলের সামনে এসে জড়ো হবার প্রচুর সময় নিয়েছে। যখন গোলমুখী শট মেরেছে তাও টিপ করে মেরেছে বিপক্ষ কোন খেলোয়াড়ের গানে। জানি না, এর পিছনে বিপক্ষকে দুর্গ রক্ষার জন্য জমালত হতে দেবার ক্ষত্র মনোভাব কাজ করেছিল কি না। বল কাড়াকাড়ির বৈরথ সমরে হাওড়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে অধিকাংশ সময়ই এঁটে উঠতে পারে নি ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়েরা। বল পাস কে কখন কাকে করছে, আর কেইবা ধরছে, কে কোন্ দিকে শট মারছে, আর কাদা মাঠে আলতো গড়ানে পাস আধপথে বারে বারে আটকে যাচ্ছে দেখেও সেই রীতি চলছে—দেখতে দেখতে আমার ফুটবলের ধ্যান-ধারণা রিদ্রোহ করে উঠেছে। তবু ইস্টবেঙ্গল

জিতেছে ছ' ছটা গোল দিয়ে। দর্শকদের উল্লাসে ফেটে পড়া কি কিছু অন্যায়। বড়ো বেরসিকের দল ঘাই ভাবুক ও বলুক না কেন।

এই বছরে সদ্য প্রথম বিভাগে ওঠা টালিগঞ্জ অগ্রগামী যে চ্যাম্পিয়ান এবং দশটি খেলায় ৩৬টি গোল দেওয়া মোহনবাগানকে একটিও গোল দিতে দেয় নি, তাদের সর্বধ্বংসী জয়যাত্রা রুদ্ধ দিয়ে বছরের প্রথম পয়েন্ট হারাতে বাধ্য করেছে, তাতে অগ্রগামী দলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ওই খেলায় তার চেয়েও বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল মোহনবাগান দলের অকৃতিত্ব। দলের প্রতিটি খেলোয়াড় যেভাবে আগাগোড়া ভুল পাস করে গেল, সারাক্ষণ গোলে একটাও শটের মত শট মারতে পারলো না, তা দেখে মনে হয়েছে যে, তৃতীয় বিভাগের কোন দলকে মোহনবাগানের জামা পরিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওই দুর্দৃষ্টি খেলার স্মৃতি এই মূহুর্তে উজ্জ্বল বলেই তার উল্লেখ করলাম। কিন্তু মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহম্মদান স্পোর্টিং তিন প্রধানেরই অধিকাংশ বড় জয়ের মধ্যেও ওই ধরনের ফুটবলের ধ্যান-ধারণা ছািলয়ে ও ঘািলয়ে দেওয়া খেলাই দেখেছি।

আর প্রধানদের বিপক্ষ দলগুলি যেখানে একান্তই ফুটবল-নাবালক কিংবা ফুটবল নিঃস্ব সেখানে বড় দলগুলির বড় জয় সহজসাধ্য করে দিয়ে আই এফ এ বড় ক্লাবভক্তদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন নিঃসন্দেহ। শূদ্ধ চারটি দলকে বিবতীয় বিভাগ থেকে তোলাই নয়, মোট কুড়িটি দলের অসহ্য ভিড় প্রথম বিভাগ খেলায়। যেখানে কৃতী খেলোয়াড়ের সংখ্যা দিয়ে দশটি দল ভালো করে গড়া চলে না, সেখানে বিংশটি দলে খেলোয়াড় সরবরাহ আসবে কোথা থেকে? অতএব তিনিটি বিগ ক্যাপিটাল টিম, দুটি ভারত সরকারের টিম, একটি আধা-সরকারী বিরাট প্রতিষ্ঠানের টিম এবং একটি ভারতের প্রধান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টিম—এই সাতটি টিম বাদ দিয়ে বাকি তেরটি টিম একান্তই দুর্বল, কোনমতে ঠেকা দিয়ে চলছে।

তা বলে এই সব চ্যাং-ব্যাং টিম যদি বড় টিমকে হারাবার বা দ্বন্দ্ব খেলবার চেষ্টা করে, তবে ভক্ত সাধারণ তাদের মাথা ভেঙে দেবে তার প্রমাণ তারা দিয়েছে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে, সাময়িকভাবে সামান্য তিন মিনিটের জন্য হলেও, ২-১ গোলে এগিয়ে থাকার অপরাধে এরিয়ান্সকে ইস্টক বর্ষিতে নাজেহাল করে, তাদের অধিনায়কের

জাগাহিক বঙ্গমতী

মাথা ফাটিয়ে। আর যে রেফারি মোহনবাগানের বিরুদ্ধে পেনাল্টি দেয় তার গায়ে থুতু দিয়ে তার মুখে-মাথায়-ঘাড়ে কিল-চড় কষিয়ে। সবটুকু উচ্ছ্বলতা অসদস্য দর্শকদের উপর চাপালে তাতে সত্যের অপলাপ হবে।

এর পরও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, কেন ফুটবলের মান নেমে যাচ্ছে তাহলে কিছু বলার নেই।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহা-মেডান স্পোর্টিং-এর ফুটবল খরচ বার্ষিক দু' লাখ থেকে এক লাখ টাকা। সে-টাকা কিভাবে খরচ হয় ও কে পায়, সে প্রশ্ন করবেন না। সবাই সব কিছু জানে এবং বলাবলিটাও সব সময়ে কানে কানে হয় না। কিন্তু ছাপার হরফে স্পষ্ট করে বলা চলে না। কারণ তাতে প্রমাণের দায়িত্ব এসে যায়। আর স্বে-আইনি কাজ প্রমাণ রেখে করবে এমন বোকা খ্রীদগুরারের নেতৃত্বে চালিত কলকাতার ফুটবল নয়।

দু'টি ভারত সরকারের দল ইস্টার্ন রেল ও বি. এন. আর। যেখানে উচ্চ-শিক্ষিত ও সবগুণাবিত দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পন্ন কৃতি তরুণেরা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমপয়গেট এজেন্টে খনি দিয়ে দিয়ে বছরের পর বছর ঘুরছে, সেখানে ফুটবলে দু'টো লাখ মারার কৃতিত্ব যারা রেল চাকরি পাচ্ছে শব্দ খেলার জন্য, অন্য কাজের দায়িত্ব পালনের কোন বাধ্যবাধকতা না নিয়ে, তারা চাকরি পেয়ে যে খেলা খেলছে, তা দেখেও অনেক সময় আমাদের ফুটবলের ধ্যান-ধারণা জলাঞ্জলি দিতে হয়। যাই থেলুক ওরা, জনসাধারণের অর্থে লালিত-পালিত ওই টিম দু'টিরও আর্থিক সঙ্গতি অপরিসীম। পোর্ট দল ও বাটা দলেরও সঙ্গতি কম নয়। এদের সঙ্গে অন্য প্রথম বিভাগ ক্লাবগুলির তুলনা করুন, তাদের কারও ক্লাবের বার্ষিক সদস্য চাঁদা আদায় হাজার টাকা পেরোয় কি না সন্দেহ। এই সব দলের সঙ্গে আগের দলগুলির প্রতিযোগিতা যদি সমানে সমানে হয়, তবে টাটা-বিড়লার সঙ্গে আরবি-র ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও সমানে সমানে গণ্য হতে পারে।

এককালে মোহনবাগান যখন আমাদের প্রাণের ঠাকুর ছিল, তখন তাদের লড়াই ছিল সব বাঘ-সিংহ মার্কী দলের সঙ্গে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হার স্বীকার করতে হত মোহনবাগানকে। তবে বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করে দু'দশটা আঘাত না দিয়ে কাবু হত না-ওরা। সংগ্রামী মনোভাবের তাতেই ছিল সার্থকতা। আর আজ বীর

রথীরা আই. এফ. এ, রেফারী; দলীয় খেলোয়াড় ও সমর্থক দশক এই চতুরঙ্গ বাহিনীতে সজ্জিত হয়ে খরগোশ শিকারে বার হচ্ছে, ব্যাগ বোঝাই করে আনছেন, বীরত্বের সার্থকতার উল্লাসে ফেটে পড়ছে ভক্তরা। ওদের মধ্যে কেউ কার্ডকে জ্ঞান করছে পেলে, কার্ডকে বা জেয়ার, কার্ডকে মূল্য, কার্ডকে রিভা এবং সেই বাহুল স্বপ্নে উসকানি দেওয়ার লোকের অভাব হচ্ছে না।

কেন কোন্ উদ্দেশ্যে আই. এফ. এ দিনকে দিন প্রথম বিভাগ লীগে দল সংখ্যা বাড়ছে, তা নিয়ে দু'হুজনে যাই বলুক, প্রকৃত মতলবটা আমি ঠাউরে উঠতে আজও পারি নি। এবং যে আই. এফ. এ সভাপতি তাঁর অধীন আই. এফ. এ-র সার্থকতার স্বীকৃতি দাবি করেন সব সময়, তাঁর কাছ থেকেও এ সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি। আর সব কার্টের পুতুলের পিছনে যিনি দাঁড় টেনে নাচাচ্ছেন, তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগই মেলে না। তবু তাঁর কাছে একটি প্রস্তাব আছে আরবি-র। আজকের এই শ্রেণীহীন সমাজ দাবিমূলক প্রবল আন্দোলনের যুগে ফুটবল দলগুলির মধ্যে শ্রেণীবিশিষ্ট নিশ্চয়ই যুগচেতনাবিরোধী। তাই এখন যা কর্তব্য, তা হল কলকাতা ফুটবল লীগে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বিভাগ আর নয়। সবই প্রথম বিভাগ—তা আই. এফ. এ-র অন্তর্ভুক্ত ক্লাবসংখ্যা যতই হোক না কেন।

বর্তমানের কুড়িটি টিম নিয়ে গঠিত প্রথম বিভাগ লীগে আর একটি পুনর্গঠন প্রস্তাব আমার মনে ধরেছে। তা হল অর্থবলে বলীয়ান সাতটি টিম এক গ্রুপ বাকি সাতটি অপর গ্রুপ। প্রয়োজনমত ডাবল লেগ বা প্রতি দলের সঙ্গে প্রতি দলের দু'বার করে খেলা এবং তার পর প্লেজফ্য ব্যবস্থায় চূড়ান্ত চ্যাম্পিয়ান নির্ধারণ। আর যদি রুশ পদ্ধতিতে প্রতি জেলার লীগ চ্যাম্পিয়ান এবং কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ান নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলাও প্রবর্তন করা যেতে পারে, তবে বাংলা দেশের কলকাতা কেন্দ্রিক সভ্যতার মাথা কাটা যাবার মত ওই ব্যবস্থা আই. এফ. এ করবে না।

আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় যা গলদ, ফুটবলেরও তাই। ফুটবলের দল-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে খেলোয়াড়ের চাহিদা বেড়েছে তার সরবরাহ ব্যবস্থা কিছু নেই। খালিগায়ের ফুটবলের যুগে মাঠ-ঘাট, গাঁ-গাঁল থেকে স্বভাব-

নৈপুণ্যবৃত্ত খেলোয়াড় তবু খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু বৃটবলের স্বভাব-নৈপুণ্য দিয়ে কিছু হবে না, চাই সুশিক্ষণ ব্যবস্থা। সেটি কোথায়? এমন কি, মেওলালাল কর্তৃক স্কুল অব ফুটবলের ৭০।৮০টি ছেলের সবাই পূর্ণ শিক্ষা পেলেও চাহিদার সামান্য এক অংশও তাতে মিটেবে না। দেশে কোথাও বৃটবলের পাঠশালা-স্কুল নেই। একেবারে কলকাতা ফুটবলের কলেজ ও প্রথম বিভাগ লীগের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বিভাগ—সেখানকার উপযুক্ত খেলোয়াড় আসবে কোথা থেকে?

আসবে সারা ভারত সে'চে অজ্ঞান মদ্রা বায়ে। এককালে তাদের খুঁজেপেতে আনার পূর্ণ দায়িত্ব পালন করতো রাজস্থান। বাইরের খেলোয়াড়



উৎসবে,
মাসলিক অনুষ্ঠানে...

“পুষ্টিক মার্কা”

অগুরু

প্রাচীন কাল হইতে
গন্ধমাধুর্যে ও স্বাস্থ্যে
অতুলনীয় প্রসিদ্ধ
দ্রুগন্ধি অগুরু উৎসবে,
মাসলিক অনুষ্ঠানে ও
নিত্য ব্যবহারে
ভারতের ঘরে ঘরে
ব্যবহৃত হইত।
দ্রুগন্ধি হিসাবে আজও
ইহার সমাদর
অব্যাহত আছে।



বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা - বোম্বাই - কানপুর

এনে খেলাবার বদনামের অধিকারী হত তারা। আর পরের বছর মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ভালোমানুষের মত স্থানীয় খেলোয়াড়দের দলভুক্ত করতো তাদের ভাগিয়ে এনে। রাজস্থান ক্লাব পরিচালকের বৃদ্ধি খুলে গেছে। তারা এখন নেহাৎ কলকাতার ছেলেদেরই নিয়ে দল গড়ছে। খুজিয়ে পেতে আনছে সব চেয়ে বেশি মহম্মেদান স্পোর্টিং। আর আনবেই বা কোথা থেকে? কলকাতা ফুটবলের দৈন্যের প্রভাবে আজ সারা ভারতজোড়া দৈন্য। তাই মহাবীর প্রসাদ, চন্দন গুপ্ত, শ্যাম থাপাই কলকাতায় আমদানি করা রক্ত।

কলকাতা ফুটবলের অবনতির প্রধান কারণ, অবনতির জন্য কারো মনে গ্লানি নেই। যতদিন সরকারী বাতিকে টিঙ্কু আব্দুল রহমানের মারডেকা প্রতি-যোগিতায় দল পাঠানো চলবে, ততদিন ইন্ডিয়া কালার দিয়ে খেলোয়াড়দের গ্লামার পাওয়ার সুযোগ থাকবে, কর্তাব্যক্তিদের বিদেশ সফর এবং তার আনুষ্ঠানিক সুবিধাগুলি লাভের অন্তরায় ঘটবে না।

আর কলকাতা ও বহুর কলকাতার কয়েক লক্ষ ফুটবল পাগল তারা ফুটবলের ধারও ধারে না। শৃঙ্খল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল আর সম্প্রদায় বিশেষের স্পোর্টিং। এরা যদি লীগ, শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স প্রভৃতি জেতে ওদের এবং ওদের অগণিত আত-উৎসাহী সমর্থকদের মতে তাতেই ভারতীয় ফুটবল মহীয়ান। তাই মোহনবাগানের পূর্ব আত্মিকা সফরে দাবাদপট্টগুলি টেস্ট ম্যাচের উল্লেখ

করেছিল। দুর্বল বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে খেলে খেলে ভেঁতামেরে যাওয়া মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, সে খেলায় যে হঠাৎ চমক জেগে উঠতে পারে না, তা জেনে এবং বুঝেও সেই খেলা দেখার জন্য অগণ্য ভিড় বৃদ্ধিমান লোক—যারা এমনিতে ক্লাব-পাগল বা ফুটবল-পাগল নয়—তারাও ক্ষেপে যায়। আর এই দু'টি দলের সমর্থকবৃন্দের প্রেরণা যে পূর্ব-বঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ মনোভাব, আজকের দিনে সেই অস্বাভাবিক চেতনা অবলম্বিত গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত বস্ত্রিও এই উপলক্ষে সেই চেতনাকেই উদ্বেগ হন।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের স্থানীয় চেতনা এবং মহম্মেদান স্পোর্টিং-এর পিছনকার সাম্প্রদায়িক চেতনা কলকাতা ফুটবলের সবচেয়ে বড় দুটি। আর যেখানে সারা ভারতের সর্বক্ষেত্রে অস্তিত্ব-নাস্তি বৈষম্য বিদূরণের প্রয়োজন প্রবলভাবে অনুভূত, সেখানে কলকাতা ফুটবলে অস্তিত্ব-নাস্তি বিরোধ দিন দিন বাড়ছেই শৃঙ্খল নয়, বাড়বার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেওয়া হচ্ছে—চেতন, অচেতন ও অবচেতনভাবে।

আজকের বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজ যারা টাটা-বিড়লা ধংস হোক, সর্বহারার রাজ চাই, মজুতদারি চলবে না, বড়লোকের চামড়া দিয়ে গরীবলোকে জুতো পরবে প্রভৃতি স্লোগান দেয়, হয়তো মনে-প্রাণে সে দাবি সমর্থনও করে, তারাও কিন্তু মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল যে ফুটবলে সর্বগ্রাসী টাটা-বিড়লা তা উপলব্ধি করে না এবং ওই দু'দল যখন প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি খেলোয়াড় সংগ্রহ করে বসিয়ে রাখে, তাকেও মজুতদারি বলে খিঁকার না দিয়ে বরং মনের খুশি-ই প্রকাশ করে।

কলকাতা ফুটবলের আসল গলদ এই সামন্ততান্ত্রিক দল দুটিকে উচ্চতর ধরে রাখার একটা বিস্ময়কর হৃদয়বেগ। যায় কাছে কর্মসংস্থানমূলক দল, যথা দু'টি রেল দল, পোর্ট দল, বাটা পর্যন্ত মাথা তুলতে পারছে না। আর এখানকার ফুটবল পরিচালন সংস্থার এ্যাভারি ব্রান্ডেজী মনোভাব এবং অফিস স্পোর্টস ফেডারেশনকে তোয়াজ করার প্রয়াস। অর্থাৎ লীগে কর্মসংস্থানমূলক ক্লাব যারা খেলবে, তাদের বলতে হবে ওপেন ক্লাব। রেল, বাটা, পোর্ট সব ওপেন ক্লাব। এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার প্রয়াসে ফুটবল গাছের ফলও পাচ্ছে না, তলারটাও হারালছে।

সব দিকের যুগচেতনাবিরোধী ব্যবস্থায় কলকাতা ফুটবল মরছে, আর সেই সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলেরও নাভিশ্বাস উঠছে এবং এদের মৃত্যু ঘরান্বিত করছে সেবকদেরই নিজ নিজ স্বার্থে প্রণোদিত ফলসেবা, আর ফুটবল ভক্ত জনগণের চেতনা ও চিন্তাধারার গোঁজামিল।

তা মরছে মরুক। হু কেয়ার্স? দ্য শো ইজ্ গোয়িং অন অ্যান্ড এ্যাট, বিগ্ প্রফিট্‌স্। উত্তেজনাপাগল শহুরে মানুষও তার উত্তেজনার খোরাক পেয়ে বিচার-বৃদ্ধি হারিয়ে বসে আছে।

কিন্তু ফুটবলের সমস্যাকে যদি ফুটবলে সীমাবদ্ধ মনে করে নিশ্চিন্ত থাকি, ভাবি সাধারণ মানুষের মনের স্বাভাবিক উত্তাপ উৎস্রবণ করে আসার জায়গা ফুটবল মাঠ, যার ফলে আবাস পাড়াগুলি কিছুটা নিরাপদ, তাহলে মারাত্মক ভুল করবো।

বড় ফুটবল ম্যাচ সামলাতে যে পরিমাণ পলিশ মোতামেন করতে হয়, তাতে হয় পাড়াকে পাড়া অরক্ষিত পড়ে থাকে, নয়তো বা ফুটবলের প্রয়োজনে পলিশের ব্যয়-বরাদ্দ বাড়তে হয়। কোনটাই সমাজের পক্ষে উদাসীন থাকার প্রসঙ্গ নয়। ফুটবল নেশার প্রসার যেভাবে বাড়ছে, কিশোর ও বাল্যখল্য সমাজে প্রতিদিন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে যে সব মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের বড় খেলায় গতবার পর্যন্ত আসন সংখ্যা ভর্তি হয় নি, এবার তাতে টিকেট না পেয়ে লোক ফিরে যাচ্ছে। ক' বছরের মধ্যে ইডেন গার্ডেনস-এও স্থান সংকুলান না হবার আশংকা। মাঠের উত্তেজনা সামান্যই ফেটে পড়ে এবং অনেকদূরে পর্যন্ত সংক্রামিত হয়ে পড়ে। লাইনে মানুষ মরা টেস্ট ক্রিকেটেই সীমাবদ্ধ থাকবে, এমন মনে করারও কারণ নেই। এ যুগের পলিশ কঠোর হতে পারে না। রাজিও হয় না, পলিশী ডান্ডাকে ভয়ও করে না এ যুগে কেউ, পলিশই বরং জনতাকে ভয় করে।

সব মিলিয়ে নিত্য খারাপ হওয়া আইন ও শৃঙ্খলা ব্যবস্থায় ফুটবল অবস্থিত প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। ফুটবল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়েও কোন সমাজসচেতন ব্যক্তি ফুটবলের প্রভাবকে অবজ্ঞা করতে পারেন?





আজ একটা প্রশ্ন একই সঙ্গে অনেকের মনে ঘোরাফেরা করছে। চায়ের টেবিলে, খেলার মাঠে কিম্বা যে কোন আলোচনা সভায় এই প্রশ্নটা উঠেছে। বিষয়টা জটিল না হলেও এই বিষয়ে নানা মতের নানা মত। কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দেন সোজাসুজি, কেউ দেন ঘুরিয়ে, কেউ বা আবার নাক বেড় দিয়ে কান ধরেন।

মেক্সিকোর বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর এবারের মতো শেষ হয়ে গেল। সেই সঙ্গেই ফরোজ জুলে-রিমে কাপের আয়। বিশ্বকাপের আসরে জুলে-রিমেকে আর দেখা যাবে না। বিশ্বকাপের নিয়ম ছিল যদি কোন দেশ তিন বার বিশ্ব-বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারে, তাহলে জুলে-রিমে কাপটা তারা পেয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে।

এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে যখন ব্রাজিল আর ইটালী উঠলো তখনই বোঝা গিয়েছিল যে, জুলে-রিমের আয় এতোদিনে ফুরোল। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত—এই দীর্ঘ ৪০ বছরের শিরোনামার থাকা সোনার পরী এতোদিন পরে সত্যি সত্যিই উড়ে গেল।

উড়ে গিয়ে চিরদিনের মতো আশ্রয় গ্রহণ করলো ব্রাজিলে। সেই সঙ্গে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার জুলে-রিমে কাপটির কাহিনী প্যানলাভ করলো ইতিহাসের পাতায়।

জুলে-রিমে কাপ সম্বন্ধে আমরা যেমন জানতে চাই, তেমনি জানতে চাই খেলেন যারা তাঁদের সম্বন্ধেও। আর তারপরই সেই প্রশ্নটি মনে আসে। মনে হয়, ওদেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে কি এমন যাদু আছে, কি এমন মহা ঐশ্বর্য আছে যার জন্যে ওরা অমন আবিষ্কার ক্রীড়ানৈপুণ্যের অধি-

কারী? আর সব শেষে শ্রদ্ধা জানতে ইচ্ছে করে, কেন ওঁদের মতো বড় হতে, ওঁদের মতো নিপুণ হতে পারেন না আমাদের খেলোয়াড়রা? ওঁরাও মানুষ, আমরাও মানুষ—তাহলে কেন আমরা পারি না ওঁদের মতো হতে? আসল পার্থক্যটা কোথায়?

অত্যন্ত সহজ, সরল লাগলেও বিষয়টা কিম্বা প্রশ্নটা কিন্তু বেশ জটিল। এই জটিলতার জট ছাড়াতে আমাদের দেশের বিশেষজ্ঞরা এক একজনে এক এক কথা বলেন। কেউ বলেন, ঐ সব দেশের খেলোয়াড়দের মতো আমাদের শারীরিক পটুতা নেই, তাই। আবার কারো মতে, ওসব দেশের খেলোয়াড়রা যে সব সুযোগ-সুবিধে পান আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা তা কল্পনাও করতে পারেন না। সুতরাং...। আর একদলের মতে, বিদেশে উন্নত ধরনের প্রশিক্ষণ দেবার যে ব্যবস্থা আছে আমাদের দেশে তা নেই। এ ছাড়া কেউ তোলেন আবহাওয়ার প্রশ্ন, কেউ তোলেন খাদ্য এবং পার্শ্ব-অপার্টের বিষয়ে প্রশ্ন।

এর সবগুলো না হলেও বেশির ভাগই সত্যি। কিন্তু এগুলোই কি সব? চিন্তা-ভাবনার আব কি কিছু নেই? নাকি আমরা কোনদিন কোনদিক দিয়ে ওঁদের মতো হতে পারবো না এই সাক্ষ্য নিয়ে বসে থাকলেই চলবে? দিন-কাল বদলে গেছে, সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে আমরা ঠিকমতো চলতে পারছি কি?

কিন্তু এভাবেও তো আর বসে থাকা চলে না। আজ তাই সময় এসেছে চিন্তা করার। নতুনভাবে সব কিছু ভেবে দেখার সময় এসেছে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে

নব-আগিকে আজ যা করার—তাই করছে হবে।

ওঁদের মতো আমরা কোন দিন হতে পারবো না—এই ধারণা নিয়ে বসে থাকার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? হতে পারবো না তো পারবো না; কিন্তু চেষ্টা করতে দোষ কি?

কিন্তু মর্শকিল হয়েছে যে, সেই চেষ্টা করবে কে? নতুনভাবে, নতুন আগিকে চিন্তাই বা করবে কে?

অত্যন্ত দৃষ্ট আর পরিতাপের বিষয় হলো, যাঁদের ওপরে আমাদের দেশের খেলা-ধুলার ভার, যাঁরা আমাদের দেশের ক্রীড়া-জগতের হতা-কর্তা-বিধাতা তাঁদের এই সব বিষয় ভাববার, চিন্তা করা কিম্বা সত্যি সত্যিই নতুন কিছু করার মতো সময় কই। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে, এঁরা খেলাধুলাকে আদৌ ভালোবাসেন কিনা?

তা না হ'লে ভাবতে অবাক লাগে, যে সমস্ত দেশ ভারতের অনেকগুলি রাজ্যের চেয়ে ছোট, আর লোকসংখ্যাও ভারতের রাজ্যগুলোর চেয়ে কম—তাঁরাও কি করে ফুটবল খেলায় এতো উন্নতি করে বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং সেই দেশের খেলোয়াড়রা তাঁদের খেলার চকিত চমকে সকলকে চমৎকৃত করে দেন?

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। মাত্র ক'বছর আগে বার্মী, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশগুলোকে আমরা হেলায় হারাতাম। কিন্তু আজ তাদের হাতে আমাদের গো-হার হারতে হয়। অর্থাৎ ফুটবল খেলায় এবং খেলাধুলার অন্যান্য বিষয়ে যখন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ উন্নতি করছে তখন আমরা দিনের পর দিন শ্রদ্ধা পিছিয়েই পড়ছি।

সব থেকে দূরে বিষয় হলো, পিছিয়ে যে আমরা পড়ছি সে কথা জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা তার জন্যে এতোটুকুও সজ্জত নই। আমাদের ক্রীড়া-জগতের হতা-কর্তা-বিধাতারা কেমন বুক ফাটিয়ে হাঁটেন, খেলোয়াড়রা খেলা ভালোভাবে শেখার আগেই জামার কলার তুলে হিরো বনে যান।

ফলে আসলে যা দরকার সেই খেলা শেখাটা আর হয়ে ওঠে না। ভালো খেলোয়াড় হতে হলে যে আন্তরিকতা দরকার, যে পরিশ্রম প্রয়োজন, আজ কি তা আমাদের দেশের খেলোয়াড়দের মধ্যে আছে বা তার পরিচয় পাওয়া যায়?

একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, পেলে একদিনে পেলে হন নি, ইউসেবিও, রিভা, বাঁবি মুর, মুলার কিম্বা অনা কেউ আজকের এই শ্রেষ্ঠত্বের পর্যায়ে আসতে প্রচুর পরিশ্রমে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন দিনের পর দিন, ধরে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাঁরা পুরোদমে চালিয়েছেন

সাপ্তাহিক বসুমতী

অনুশীলন। প্রচণ্ড পরিপ্রসার সঙ্গে হাসি-মুখে মেনে নিয়েছেন সব দর্শক, সব কণ্ঠ—করেছেন প্রয়োজনীয় সমস্ত ত্যাগ স্বীকার।

আমাদের দেশের কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে কি এই পরিপ্রসার, কিম্বা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়? শব্দ তাই নয়—ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে আজ প্রত্যেককে ভালো জিমনাস্টিক হতে হবে। জিমনাস্টিক ছাড়া এ যুগে কিছত্তেই ভালো ফুটবল খেলা সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের খেলোয়াড়রা তাই এইদিকে নজর দেন। কিন্তু আমাদের দেশের খেলোয়াড়বা.....?

পরিশেষে আর একটা কথা বলার প্রয়োজন। ফুটবল খেলা কিম্বা খেলা-খেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে আজ সবার আগে এগিয়ে আসার দরকার সরকারের।

স্কুল থেকে বাছাই করে তাদের গড়ে-পিঠে তৈরি করতে হবে সরকারী দায়িত্বে। আমাদের মনে হয়, দেহদানের সৈনিক-স্কুলের মতো ক্রীড়াঙ্গণ খোলা দরকার আজ সব থেকে বেশি। তারপর সমস্ত ভারত থেকে ছেঁকে ছাত্র এনে সৈনিকস্কুলের মতো লেখাপড়ার সঙ্গে প্রত্যেকের আলোচনা-আলাদা বিভাগের খেলাধুলার কোচিং করতে হবে। ভালো খেলোয়াড় তাহলে সহজেই তৈরি হবে। তবে তাদের চাকরী-বাকরী থেকে সব কিছুর দায়িত্বই নিতে হবে সরকারকে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে খেলাধুলার উন্নতির জন্যে খেলাধুলাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হয় এবং খেলোয়াড়দের সব দায়িত্ব নেন সে দেশের সরকারই। তাই মনে হয়, আজ এই মর্হুর্তে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গণে ভারতের মান বাড়তে এবং ভারতকে মূর্তপ্রতিষ্ঠিত করতে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শব্দ স্পোর্টস কাউন্সিল আর প্যাঁতায়ালার কোচিং ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থা করে যে কিছুর হবে না, সে কথা আজ আমরা সকলেই বুঝে গেছি। তাই আমরা চাই, এখন এমন একটা কিছুর করা হোক যা সত্যি সত্যিই একটা কিছুর কাজের জিনিস হবে।

যদি সৈনিকস্কুলের মতো কড়া নির্দেশনায় ক্রীড়াঙ্গণ হয় তাহলে হয়তো বিশ্ববাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকাব্যী খেলোয়াড়দের সঙ্গে আমাদের খেলোয়াড়দের তুলনায় নানা মূর্নির নানা মতের প্রান্তি অচিরেই ঘটে যাবে।

তারপর বলা যায় না, হয় তো একদিন ভারত ও বিশ্ববাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ঐতিহাসিক লাক্ষ্যের নিজের ভারতীয় তথা বিশ্ব ফুট-

বলের-ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচনা করে বসবে।

কিন্তু সে দিন কি সত্যিই কোনদিন আসবে.....!!

হাতে নকল নাড়.....
[২৯৩ পৃষ্ঠার পর]

শোকে জীবনমৃতপ্রায়! কিন্তু তিনি কি ভেবে দেখেন কোন সাক্ষা বস্তুর প্রত্যাশায় তিনি মাঠে-মাঠে তাঁর বাড়তি জীবনশক্তিকে উজাড় করে দিচ্ছেন?

যে লীগের অনেকখানিই মেকি সেই লীগের জন্যেই তাঁদের দরদ উথলে পড়েছে। যে যে দলের জন্যে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গীকৃত, প্রায় সেই সেই দলের সঙ্গীত-বিরাজে। পরসা অটেল। অপেশাদারী ফুটবলেও সেই পরসা গোপনে ছড়িয়ে হীরা-দিল্লী থেকে খেলোয়াড় সংগ্রহ করে সেই সব দল শক্তি সঞ্চার করে। তারা হারায় কাদের? অথবা কাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তারা লীগ বা শীল্ড পায়? যারা অশক্ত, অক্ষম—ক্রীড়াগত দক্ষতা এবং আর্থিক মূলধন, কোনো কিছুর সঙ্গীতিই যাদের নেই খেলা তো তাদেরই সঙ্গে। এই অসম প্রতিযোগিতায় জয়ের মূল্যই বা কতটুকু? জয়ের যথার্থতা যে কি, সবাই যদি শব্দ সেইটুকুই উপলব্ধি করতে পারতো তাহলে সামান্যকে অসামান্য জান করার লক্ষ্য থেকে কলকাতার ফুটবলের মূর্ত্তি মিলতো অনেকদিন।

এক এক পক্ষ দল ভাঙিয়ে নিজদের দল গড়তে লক্ষ বা লক্ষাধিক টাকা খরচ করেছে। বাকীদের সে মরোদ নেই। তার ওপর এবার আবার বিপটি প্রতিযোগিতার মধ্যে সিনিয়র বিভাগের খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরোয়া মানের পরিপ্রেক্ষিতেই সিনিয়র বিভাগে খেলার যোগ্যতা দশটি দলের আছে কি না? নেই। কোনো সন্দেহই নেই। অথচ সেই অধিকার কুড়িটি দলের জন্যে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। মর্ডি ও মিছরিকে একনজরে দেখার এই যে আয়োজন, তাতে কি আর খেলার মান ওপরে ওঠে? ওঠে না, উঠতে যে পারে না তা সবাই জানে। তবে মাঝে মাঝে সভা-সমিতি, কর্মকর্তাদের বৈঠকে, প্রশিক্ষকদের আলোচনা সভায় মানের কল্পনা কাঁদা হয়। হায়! কাঁদা ছাড়া আমাদের আর পুঁজিই বা আছে কি?

বৈঠকী আড্ডায় স্টেডিয়ামের অভাবের জন্যে, আর্থিক অনটনের জন্যে গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া যাচ্ছে না বলে আক্ষেপ করা হয়। কিন্তু কেউ কি বলে যে প্রকৃত ঘাটতি কোথায়? ঘাটতি তো প্রশাসনিক

দৈন্যে। প্রশাসন আঁটোসাঁটো হলে, তাঁদের বিগলিতচিত্ত না হয়ে প্রশাসকেরা যদি লীগ-ফুটবলের অবলম্বিত ঘটতে এবং ওপরতলার প্রতিযোগিতা-সংখ্যা সীমিত করে দিতে পারেন, তাহলে সাক্ষা প্রতিযোগিতার কল্যাণে খেলার মানোন্নয়ন ঘটতে বাধ্য। উপরতলায় মানে সিনিয়র মহলে অযোগ্যদের ঠাই হবে না—এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার ফুটবলের প্রশাসকেরা যদি ওই মহলের প্রতিযোগিতার সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারেন, তাহলে সিনিয়রদের ক্রীড়া-কেন্দ্রে আগাছার উপাত্ত কমবে। এই তথ্যের নাড়ির খবর জানতে তাঁরা, শণিত বৃদ্ধির ও দরকার পড়ে না। চেনা প্রশাসকের ঘটে যেটুকু বৃদ্ধি রয়েছে, তাতেই কাজ হতে পারে। কিন্তু.....

হ্যাঁ, ওই কিছুই বাদ সেধেছে যে! অনেক প্রশাসকের নিজের দল রয়েছে। সেই সব দলের যোগ্যতা, দক্ষতা না থাকলেও তাঁরা হেন মর্দুখি থাকতে নেমে যাওয়া চলে কি করে! নামলে প্রশাসকদেরই 'প্রেসিডেন্ট' চলে হয়ে যায় না কি! অতএব প্রশাসকগোষ্ঠীতে ওরা থাকতে ওদের বা ওদেরই ভাই-বোনের দলগুলিকে নিজে মহলে নামিয়ে দেওয়া যায় না। যাচ্ছেও না। কাজেই সিনিয়র মহলের দলের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বিশেষ এসে দাঁড়িয়েছে। বছর কয়েকের মধ্যে বিশ চীজশে ছাড়িয়ে পড়তে চাইলেই বা রুখবে কে?

লীগ ফুটবল বন্ধ করার প্রস্তাব আগেই তুলেছি। শব্দ কেউ যদি বিশ্বাস-বিস্ফারিত চোখে প্রশ্নটির দিকে তাকান, তাহলেও বলি, ফাঁক-ফাঁকি রাস্তা আলু গা রাখলেই কি চিরদিন সকলকে বোকা বানানো যাবে? কলকাতার ফুটবল লীগ যে সাক্ষা প্রতিযোগিতা নয়, তা জেনেও একটি নকল অনন্তানের গায়ের সাক্ষা প্রতিযোগিতার নামাবলী চড়াবার দরকার কি? আবার বলি, নকল নাড় হাতে নিজে কে কাকে ঠকাচ্ছে? নিজেকে নয় তো!

তবে ঠকতেই যাদের আনন্দ, লোক ঠকানো যাদের নেশা ও পেশা, তাঁরাই আজ কলকাতার ফুটবল মাঠ ছেয়ে ফেলেছেন এবং তাঁদেরই অস্তিত্ব ক্রমে ক্রমে বাংলাদেশের অন্যান্য খেলার আসরেও প্রসারিত হচ্ছে। অতএব, যে কালের মধ্যে আমরা মাথা গুঁজে রইলাম এবং যে যুগকে আমরা গড়লাম নিজদের হাতে, সেই যুগ সম্পর্কে আমাদের গর্ব করার কিছুই নেই। উত্তরকালের জিজ্ঞাসাদের জবাব দেওয়ার কৈফিয়তও আমাদের হাতে নেই।

আমাদের ভাগ্যকে আমরা নিজেরাই হিংসা করতে পারি না! পারি কি?

এক নজরে বিশ্বকাপের ফলাফল • • •

গ্রুপ ১ (মেক্সিকো সিটি)

মে ৩১--মেক্সিকো (০) রাশিয়া (০)	
জুন ৩--বেলজিয়াম (৩) এল	
গ্যালভাড়ের (০)	
জানসোয়র ২, ল্যাঘার্ট (পেনাল্টি)	
জুন ৬--রাশিয়া (৪) বেলজিয়াম (১)	
বাইশোভেটস ২, —ল্যাঘার্ট	
আসটিয়ানি ও খেমলেনিটস্কি	
জুন ৭--মেক্সিকো (৪)	
এল গ্যালভাড়ের (০)	
ভ্যালভেডিয়া ২, ফ্রাগোসা	
ও বাস্তুগুয়েন	
জুন ১০--রাশিয়া (২)	
এল গ্যালভাড়ের (০)	
বাইশোভেটস ও মুনজিয়ান	
জুন ১১--মেক্সিকো (১) বেলজিয়াম (০)	
পেনা (পেনাল্টি)	
খে জ ডু প স্ব বি প	
রাশিয়া ৩ ২ ১ ০ ৬ ১ ৫	
মেক্সিকো ৩ ২ ১ ০ ৫ ০ ৫	
বেলজিয়াম ৩ ১ ০ ২ ৪ ৫ ২	
এল গ্যালভাড়ের ৩ ০ ০ ৩ ০ ৯ ০	
• টসে রাশিয়ার প্রথম স্থান লাভ	

গ্রুপ ২ (পুয়েব্লাও টোলোকা)

জুন ২--উরুগুয়ে (২) ইজরায়েল (০)	
ম্যানেরিও, মজিকা	
জুন ৩--ইতালী (১) সুইডেন (০)	
জোমিংঘিনি	
জুন ৬ উরুগুয়ে (০) ইতালী (০)	
ইজরায়েল (১) সুইডেন (১)	
স্মিগলার তারেসন	
জুন ১০--সুইডেন (১) উরুগুয়ে (০)	
গ্রান	
জুন ১১--ইতালী (০) ইজরায়েল (০)	
খে জ ডু প স্ব বি প	
ইতালী ৩ ১ ২ ০ ১ ০ ৪	
উরুগুয়ে ৩ ১ ১ ১ ২ ১ ০	
সুইডেন ৩ ১ ১ ১ ২ ২ ০	
ইজরায়েল ৩ ০ ২ ১ ১ ০ ২	

গ্রুপ ৩ (গুয়াদালাজারা)

জুন ২--ইংলণ্ড (১) রুম্যানিয়া (০)	
হার্ট	
জুন ৩--ব্রাজিল (৪) চেকোশ্লোভাকিয়া (১)	
রিভালিনো, পেনে, পেত্রাস	
জিয়ারজিনহো ২	
জুন ৬--রুম্যানিয়া (২) চেকোশ্লোভাকিয়া (১)	
নেস ডুমিত্রাসে পেত্রাস	
জুন ৭--ব্রাজিল (১) ইংলণ্ড (০)	
জিয়ারজিনহো	
জুন ১০--ব্রাজিল (৩) রুম্যানিয়া (২)	
পেনে ২, জিয়ারজিনহো ডুমিত্রাসে	
ও এমারিস	
জুন ১১--ইংলণ্ড (১) চেকোশ্লোভাকিয়া	
ক্লার্ক (পেনাল্টি)	
খে জ ডু প স্ব বি প	
ব্রাজিল ৩ ৩ ০ ০ ৮ ৩ ৬	
ইংলণ্ড ৩ ২ ০ ১ ২ ১ ৪	
রুম্যানিয়া ৩ ১ ০ ২ ৪ ৫ ২	
চেকোশ্লোভাকিয়া ৩ ০ ০ ৩ ২ ৭ ০	

গ্রুপ ৪ (লিওন)

জুন ২--পেরু (৩) বুলগেরিয়া (২)	
গ্যালভে, চুম্পিটেড ডারমেও	
ও কুবিলাস জিয়েত ও বনেউ	
জুন ৩--পশ্চিম জার্মানী (২) মরক্কো (১)	
সিলার, মুলার মহঃ হডিসন	
জুন ৬--পেরু (৩) মরক্কো (০)	
কুবিলাস ২, চালে	
জুন ৭--পশ্চিম জার্মানী (৫)	
বুলগেরিয়া (২)	
লিবুডা, মুলার ৩ ও নিকমত ও	
সিলার কোলেভ	
জুন ১০--পশ্চিম জার্মানী (৩) পেরু (১)	
মুলার ৩ কুবিলাস	
জুন ১১--মরক্কো (১) বুলগেরিয়া (১)	
খে জ ডু প স্ব বি প	
পঃ জার্মানী ৩ ৩ ০ ০ ১ ০ ৪ ৬	
পেরু ৩ ২ ০ ১ ৭ ৫ ৪	
বুলগেরিয়া ৩ ০ ১ ২ ৫ ৯ ১	
মরক্কো ৩ ০ ১ ২ ২ ৬ ১	

এই বছর বিশ্বকাপে গ্রন্থের বছকাল পরে বহু প্রত্যাশিত
পুনর্মুদ্রণ

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীর

ওমর খৈয়াম

গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, “যাঁহারা ‘ওমর’ বলিতে শব্দ বুলবুল ও গোলাপ, মদ্রা ও মাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার করবার জন্য আমরা লেখকের নিকট ঋণী।”

“জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আমাদের আলীর গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম’ এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরও সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পারের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গ ভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।”

মূল্য সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

কলিকাতা-১২

মাসিক ক্রীড়া

কোয়ার্টার ফাইনাল, জুন ১৪

(মেক্সিকো সিটি)	(টোলোকা)	(গুয়াদালাজারা)	(লিওন)
রাশিয়া (০) উরুগুয়ে (১)	ইতালী (৪) মেক্সিকো (১)	ব্রাজিল (৪) পেরু (২)	পশ্চিম জার্মানী (৩) ইংলণ্ড (২)
এসপারাগো	জেমিংঘিনি, গঞ্জালেস	রিভালিনো, গ্যালভের্ডো,	বেকেনবেরার, মুলারি,
অতিরিক্ত সময়ে	রিভা ২,	টোসটাও ২, কুবিলাস	সিলার, পিটার্স
	রিভেরা	জিয়ারজিনহো	মুলার
			অতিরিক্ত সময়ে

সেমি-ফাইনাল, জুন ১৭

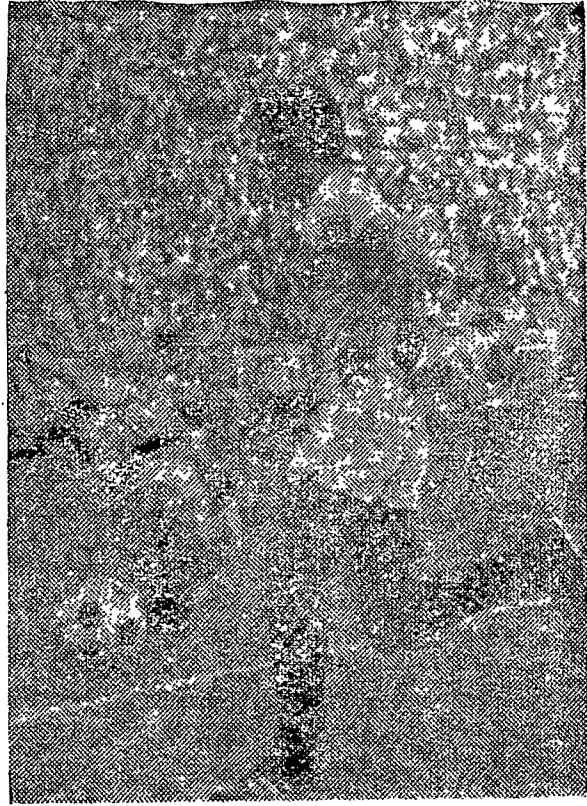
(গুয়াদালাজারা)	(মেক্সিকো সিটি)
ব্রাজিল (৪) উরুগুয়ে (১)	ব্রাজিল (৪) ইতালী (১)
ক্লোডিয়ানডো, কিউবিলা	পেলে; গ্যারসন, বেনিনসেগনা
জিয়ারজিনহো, রিভেলিনো	জিয়ারজিনহো, আলবার্টো
(মেক্সিকো সিটি)	তৃতীয় স্থান, জুন ২০
ইতালী (৪) পশ্চিম জার্মানী (৩)	(মেক্সিকো সিটি)
বলিনসেগনা, বর্গালিচ, শেলিঞ্জার, পশ্চিম জার্মানী (১)	উরুগুয়ে (০)
রিভা, রিভেরা	মুলার ২ ওভার

সেরা গোলদাতা

মুলার (পঃ জার্মানী)---	১০
জিয়ারজিনহো (ব্রাজিল)---	৭
কুবিলাস (পেরু)---	৫
বাইশোভেটস্ (রাশিয়া)---	৪
পেলে (ব্রাজিল)---	৪
রিভালিনো (ইতালী)---	৩
সিলার (পঃ জার্মানী)---	৩
রিভা (ইতালী) ---	৩



বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় বেলজিয়ামের গোলরক্ষকে রাশিয়ার জনৈক খেলোয়াড়ের মাথার উপর দিয়ে বলটিকে বিপদভ্রম্ করতে দেখা যাচ্ছে। এই ম্যাচে রাশিয়া ৪-১ গোলে জয়লাভ করে।



বিশ্ব ফুটবলের মহানায়ক ফুটবলের মহা অগ্নি থেকে সোনার মোড়া "জুদে রিমে" কাপ হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন—এ এক মস্ত সংবাদ। এডসন এয়ারেটসডু ন্যাসিমেটো বিশ্ব ফুটবল অগ্নিতে বিনী পেলো বা 'সানগড' অথবা ব্র্যাক পার্ল কিংবা ব্র্যাক সীজার নামে পরিচিত; তিনিই হলেন এই ভাগ্যবান মহানায়ক।

১৯৫৮, '৬২ এবং '৭০—এই তিনবার 'জুদে রিমে' জয়ের দৌলতে ব্রাজিস চিরকালের জন্য এই সোনার মোড়া বিশ্বকাপটি ঘরে নিয়ে গেল। সেই সাথে বিশ্বকাপের নামও গেল বদলে—"জুদে রিমে" থেকে "ফিফা কাপ"। এই ফিফাই হল বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিচালক এবং বিশ্বের প্রাচীনতম সংগঠন।

সেই ফিফার নেতৃত্বেই মেক্সিকোতে বসেছিল দীর্ঘ একশ দিনের বিশ্ব ফুটবল মেলা। গোটা বিশ্বের আগ্রহান্বিত, ক্রীড়ানুরাগী সম্মানী দাঁড়ি মেলো অপেক্ষা করছিল এবারের আসরে ফলাফলের জন্য। নিঃসন্দেহে এবারের হট্ট ফেভারিট ছিল; গতবারের বিজয়ী ব্রিসমের নেতৃত্বে গঠিত ইংল্যান্ড দল। কিন্তু বিশ্বকাপের মেলা; শুরুর সাথে সাথেই ইংল্যান্ড তার সমর্থকদের চিন্তায় ফেলোঁচল। বলতে বাধা নেই মেক্সিকোর ঘেরা আশ্চিন্য ইংল্যান্ড এমনকি জেন ভূমিকা নেয় নি; যাতে এদের

এবারের বিশ্বকাপের সম্ভাব্য বিজয়ী বলে এই মনোভেদ ধরা যেত। কোনক্রমে প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডী পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও এখান থেকেই বিদায় নিয়ে তাকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনালে পশ্চিম জার্মানী ২-০ গোলে পেছিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে ইয়া নামডাকওয়ালা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়ে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে, 'মেক্সিকো ওয়েম্বলী নয়'। অনেকে তো একথাও বলেছেন যে, ইংল্যান্ডের কোয়ার্টার

একটি ঘোষণা:

'ঢাকার চিঠি' ডাকবিব্রাটের দরদে মিলবে এসে পৌঁছায় এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না।

ফাইনালে ওঠাও উচিত হয় নি। ইংল্যান্ড হেরে যাওয়াতে ওদের বক্তব্য হল— "কলঙ্কিত নামকের বিলম্বিত লয়।" ইংল্যান্ড ছাড়া আর যারা মোটামুটি বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়েছিল বিশ্বকাপ জয়ের পক্ষে; তারা হল—পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বাশিয়া, উরুগুয়ে, পেরু, মেক্সিকো এবং ব্রাজিল। এদের মধ্যে 'মেক্সিকো' অভিজ্ঞদের আসরে তেমন জোন অঘটন

ঘটাতে পারে নি। পেরুর ধোণ্য দল ব্রাজিলের কাছে হেরে গিয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে, তবুও ওদের ক্রীড়াশৈলীর যে নিদর্শন মেক্সিকোর দর্শকরা দেখেছে, তা বহুদিন ওদের মনে থাকবে। রাশিয়ার দুর্ভাগ্য—এক বিতর্কিত গোলে হেরে গিয়ে হঠাৎ আসতে হয়েছে। হঠাৎ আসতে হয়েছে উরুগুয়েকেও ব্রাজিলের হাতে হেরে। তবে জার্মানীর পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর এবং দুর্ভাগ্যজনক। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় জার্মানী ৪-৩ গোলে হেরে গেছে ইতালীর কাছে। সেলিজার, শিলার, বেকেনব্যার এবং জার্ড মলারকে নিয়ে যে শক্ত বনেদ গড়েছিল জার্মানী, তা শেষ মনোভেদে ধরে রাখতে না পারার দরদে বিশ্বকাপ জয়ের আশা হারাতে হল। তবে এবারে বিশ্বকাপে এই ইতালী-পশ্চিম জার্মানীর খেলাই নাকি অভিজ্ঞ সমালোচকদের মধ্যে প্রশস্ত খেলা।

তবে পেলো ও তাঁর সতীর্থরা—জাইন-জিনহো; টোস্টাও, রিভারেনো এবং দলপতি এ্যালবার্টো; আজটেক স্টেডিয়ামের লাখো লোকের সামনে রিভা-ফেচেরীর ইতালীকে বিশ্বকাপ জয়ের মন থেকে ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্ব ফুটবলের যে এক নতুন হীড়হাস সৃষ্টি করেছেন—তা হল তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের দলোঁড় সম্মান।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

গত বিশ্বকাপে গায়ের জোরে খেলার দরুণ ব্রাজিল প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডী পেরোতে পারে নি। সাত রাজার ধন ছালো মাণিক 'পেলে'-কে মেরে অকেজো করে দিয়েছিল ও-আসরে। মেক্সিকোর নিষিদ্ধ ভূমে ব্রাজিলের ট্রেসকোরাকোম সন্তান—রোজে মেরীর স্বামী পেলে এবার

তার উপযুক্ত বদলা নিয়েছেন, সেই সাথে একথাও প্রমাণ করেছেন, যে, ফুটবল যতক্ষণ পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন থেকে সৌন্দর্যকে ধরে রাখবে, ততক্ষণ পেলে ও ব্রাজিল বিশ্বসেরা। বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবলে 'পাওয়ার' শব্দটার অপপ্রয়োগেই ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ ব্রাজিলের হাতছাড়া হয়েছিল। তিন-তিনটে জুড়ে রিমের আসর মাং

করে সেই সাথে হাজার গোলের মদুকুট চাড়িয়ে বিশ্ব-ফুটবলের কালো সন্ধ্যাটো বিশ্বকাপ আসর থেকে বিদায় নিচ্ছেন—মেক্সিকোর এটাই হ'ল সবচাইতে দুঃসংবাদ। তবে আনন্দ এইখানেই যে, বিশ্ব-ফুটবল সন্ধ্যাটো ১৪ বছর ফুটবল সৈনিক জীবনের শেষ অন্ত্যানে সোনার মোড়া জুড়ে রিমে হাতে নিয়ে বিদায় নিলেন—সাবাস পেলে!



সর্বোচ্চ সংখ্যক গোলদাতা জার্মানীর মল্লারকে কোয়ার্টার ফাইনালের খেলায় ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শেষ প্রবন্ধে জয়সূচক গোলাটি করতে দেখা যাচ্ছে। এই খেলায় জার্মানী ৩-২ গোলে জয়লাভ করে।

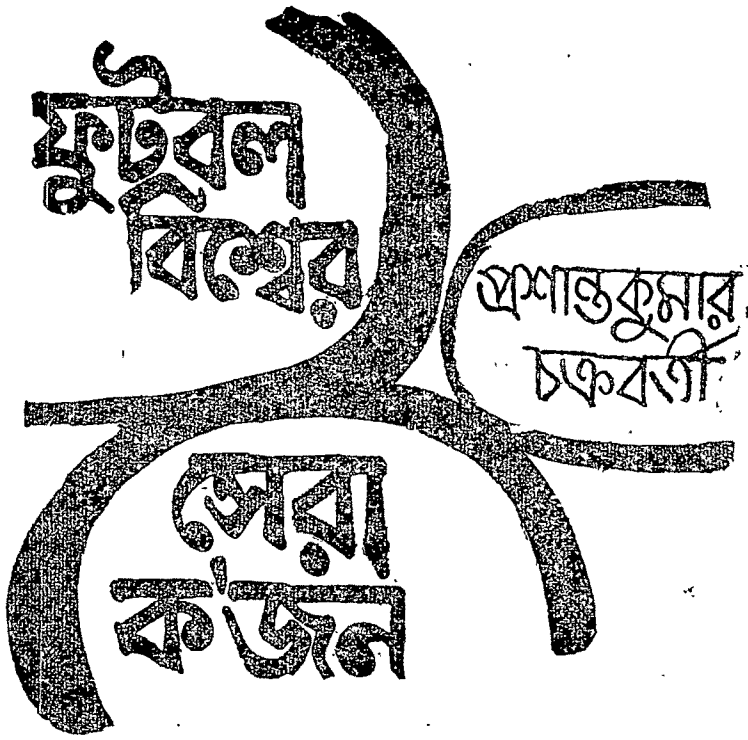
ঐতিহাসিক বসন্ত



বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করায় জর্লেরিমে কাপটি ব্রেজিল পেয়ে গেল।
যদিও জর্লেরিমে ফাইনাল খেলা শেষ হবার পর ব্রেজিলের অধিনায়ককে জর্লেরিমে কাপটি উঠা করে ধরে আনন্দ প্রকাশ
করতে দেখা যাচ্ছে।



বিশ্বকাপ জয়ের পরে ব্রেজিলের সন্থার্করা তাঁদের হিরো পেলেকে মাথায় তুলে নাচছেন। পেলের মাথায় মস্ত বড় মোমার
টুপি।



অর্জন করেছিল বিশ্বজয়ের সম্মান। আর তখন থেকেই পেলেকে ডাকা হতো 'ব্লাকপাল', 'সানগড' ইত্যাদি। পেলে খেলার মাঠে যেন আসন্ন ঝড়ের প্রতীক। অনেক শক্ত প্রাচীরও ভেঙে গিয়েছে এই ঝড়ের মূখে পড়ে। সাপুড়ের সাপ খেলানোর মত, পেলেও খেলতেন তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের। পেলের খেলার পদ্ধতি-গুলিও যেন নতুন আবিষ্কার। এক কথায় পেলের সাথে যেন বলের ঘনিষ্ঠ অস্বাভাবিক যেন ছবি। লেফট ইনের খেলোয়াড় হলেও তাঁর দৃষ্টি পায়ের স্টেই বুলেটের গতিবেগ। যে কোন অবস্থায়, যখন খুশি গোল করা পেলের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি সর্বপ্রথম বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করেছিলেন। এত কম বয়সে বিশ্বকাপের আসরে খেলার সুযোগ বোধ হয় আর কোন খেলোয়াড়েরই ভাগ্যে জোটে নি। প্রথম গ্রুপের ফুটবল খেলায় পেলে সর্বমোট ১০২৮টি গলের অধিকারী। গোলসংখ্যা

ব্রাজিল - ইতালিকে ৪-১ গোলে পরাজিত করার পর এবারকার অর্থাৎ ১৯৭০ সালের নবম বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। খেলার পরিসমাপ্তি ঘটলেও বিশ্বজয়ের আনন্দের রেশ এখনও মূছে যায় নি। হয়ত এখনও ব্রাজিলবাসী আনন্দে আত্মহারা। এককথায় সোনার পরী যেন আকাশের চাঁদ। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ব্রাজিল এবার বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল। আর সেই কারণেই তারা পেয়েছে বিশ্বজয়ের দুর্লভ সম্মান। ব্রাজিলের নাম বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। কেন না, নিয়মানুযায়ী তারা তিনবার বিশ্বকাপ জয়ের সূত্রে চিরতরে ঘরে ভুলেছে সুদৃশ্য জুড়ে রিমে কাপটি।

বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগুলির কথা ভাবলে আমাদের বিস্ময় বোধ হয়। মনে হয়, সেই সব দলের খেলোয়াড়েরা হয়ত দেবতা। কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, তাদের সাফল্যের মূলে আছে প্রবল নিষ্ঠা। বিশ্বকাপে যোগদানকারী দলগুলির মত বিশ্ব একাদশের প্রতিও আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। স্বভাবত আমরা অজানাকে জানতে আগ্রহী। তাই আমরা বিশ্ব একাদশের কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটু আলোচনা করে দেখি যে, তাঁরা আমাদেরই মত মানুষ, না দেবতা?

পেলে

(ব্রাজিল)

বিশ্ব একাদশ দলের সবচেয়ে উজ্জ্বল-যোগ্য নাম ব্রাজিল তথা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ফুটবল সম্রাট পেলে। পেলেকে আজ নতুনভাবে পরিচয় করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কেন না, পেলে আজ পূর্ণিমার চাঁদ। ফুটবলের রাজা পেলেকে হয়ত আমরা আর দেখতে পাবো না, বিশ্বকাপের আসরে। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে তিনবার বিশ্বকাপের আসরে যোগদান করে নিজের সুনাম অনুযায়ী খেলা এবং দলকে জয়ের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেমন ক্ষুদ্রকর, তেমনি অস্বাভাবিক। যে পেলেকে ফুটবল মাঠে আমরা চিৎকার করে বলতে

শুনছি, যাকে বিশ্বকাপের আসর থেকে অবৈধভাবে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল, সেই শিল্পী সেই ফুটবলের যাদুকর পেলেকে নিয়ে আজ সারা দেশ গর্বিত। তারা হয়ত ভুল বুঝতে পারে অনুশোচনার ব্যস্ত। কেন না, আগুন কখনও ছাই চাপা থাকে না। এর সত্যতা প্রমাণ করার জন্যই হয়ত গত বিশ্বকাপে আহত পেলেকে নিতে হয়েছিল হারানো রূপ।

১৯৪০ সালের ২৩শে অক্টোবর যে শিশু প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেছিল, সেই আজ বিশ্বপ্রিয় ফুটবলের রাজা পেলে। পুরো নামটা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। কেন না এডসন এয়ারাস্টেস দো ন্যাসিমেন্টো নামটার চেয়ে, পেলে নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৫৮ সালে বিশ্বকাপের আসরে পেলের দেওয়া গোলেই ব্রাজিল



॥ টোন্টাও ॥

(ব্রাজিল)

বা অর্থের বিনিময়ে পেলেকে বিচার করা যায় না, কেন না, পেলে অসাধারণ, অস্বভাবিক। পেলের খেলোয়াড়ী জীবনের ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, ফুটবলের এক নিপুণ শিল্পী পেলে চিরবিষ্ময়।

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

রিভা

(ইতালী)

এবারকার বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় নাম লুইজি রিভা। প্রতিভা যে কোনদিন চাপা থাকে না, এরই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলো ইতালীর রিভা। একদিন যে ছিল মোটর গ্যারেজের কর্মী, আজ সে সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রিয়। তার মূল্য আজ দুই কোটি টাকা। এ কথাটা যতটা অবিশ্বাস্য, ততটা অকল্পনীয়। কিন্তু রিভার দর্ভাগ্য যে, সে তার দলকে এনে দিতে পারে নি বিজয়ীর সম্মান। অবশ্য ফুটবল একার খেলা নয়। তবু রিভাকে এবার খেলতে দেওয়া হয় নি। তার ক্রীড়া-চাতুর্যের কাছে পরাজিত হয়ে, অন্যায়ভাবে তারা আটকে রেখেছে। যে কথা একদিন পেলেকেও আফশোস করে বলতে শোনা

ইতালী দলের ১০টি গোলের মধ্যে ৭টি গোলই রিভার অবদান। রিভা যে একজন সূচকুর এবং সুযোগসম্পন্ন খেলোয়াড়



॥ গর্ভাস ব্যাকস ও ববি চালটিন ॥ (ইংলন্ড)

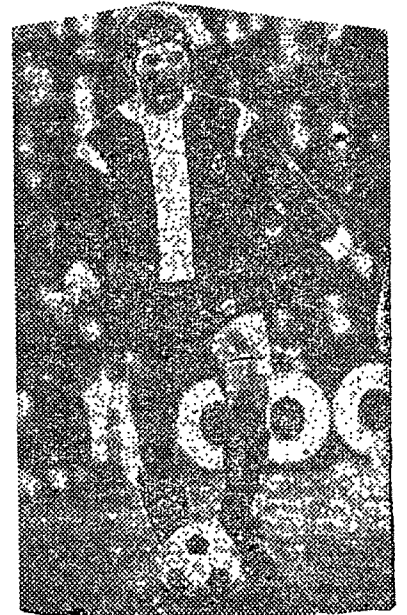
এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। পর পর তিনবার ইতালীয় লীগে তিনি সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেছিলেন। প্রায় ছয় ফুট দীর্ঘ রিভা এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বয়সে তরুণ বলেই তাকে এখনও বিশ্বকাপের আসরে নামতে হবে। দেখাতে হবে তাঁর আত্মরূপ। যা দেখে সারা বিশ্বের ফুটবল অনুরাগীদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে। এক কথায় ইতালীর লুইজি রিভা এখন বিশ্বের বিস্ময়। আগামী বিশ্বকাপের আসর বসবে ১৯৭৪ মিউনিকে। এই দীর্ঘ চার বৎসরের মধ্যে রিভা নিজের দোষ-ত্রুটি শোধরে নিতে পারবেন বলেই ক্রীড়া-মোদীদের বিশ্বাস। তাই সবার লক্ষ্য আজ মিউনিকে।



॥ শেস্টারনেড ॥ (রাশিয়া—অধিনায়ক)

গেছে, আজ সেই কথাই রিভার মনে ঝকঝক শোনা গেল। ১৯৪৫ সালে রিভার জন্ম। ফুটবল খেলোয়াড় হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পেয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। রিভা তখন উত্তর ইতালীর লেগনানো ক্লাবের নিয়মিত খেলোয়াড়। তারপর ২১ হাজার ৩৫০ পাউন্ড মূল্যে কাগলিয়ারী ক্লাবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন রিভা। ইতালীয় লীগে যে বছর কাগলিয়ারী ক্লাব প্রথম চ্যাম্পিয়ান, সে বছর রিভার দানই ছিল সর্বাধিক। মেক্সিকোতে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায়

কনটেনের দেওয়া ১৬টি গোলের রেকর্ডকে ভেঙে ফেলে গড়ে তুলবেন নতুন রেকর্ড। কিন্তু সেই আশা পূরণ করে তুলতে সক্ষম হন নি। মূল্যে, তবে প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ৯টি গোল সমেত ১৯টি গোলের অধিকারী মূল্যে। আর সেই কারণেই গোলদাতার তালিকার গুরু শীর্ষস্থান। সাইপ্রাস দলের সাথে প্রথম খেলায় মূল্যের দেওয়া গোলেই পশ্চিম জার্মানীর জয়। দ্বিতীয় খেলায় ১২টি গোলের মধ্যে মূল্যের দখলে ৪টি। স্কট-ল্যান্ডের সঙ্গে ফিরতি খেলায় জয়সূচক গোলটিও করেছিলেন মূল্যে। তাঁর খেলার পদ্ধতি দেখলে মনে হয়, তিনি তখন গোল করতে খুব ভালোবাসেন। গ্রুপ লীগের খেলায় মরক্কো দলের সাথে যখন অসমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ হতে চলেছে,



॥ মূল্যে ॥ (ওয়েস্ট জার্মানী)

মূল্যে (পশ্চিম জার্মানী)

১৯৭০ সালে বিশ্বকাপের আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতা কে? এ প্রশ্ন করলে প্রতিটি ক্রীড়ামোদীই কোনরকম চিন্তা না করেই চট করে উত্তর দেবে, পশ্চিম জার্মানীর সেন্টার ফরোয়ার্ড গের্ড মূল্যে। গোলের পরিসংখ্যান দিয়ে কোন খেলোয়াড়ের ক্রীড়ামানকে বিচার করা যায় না, বিচার করতে হলে সর্বপ্রথমে তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানা প্রয়োজন। গোল দিতে যে ভালোবাসে, তাকে গোলপিপাসুই বলা যেতে পারে। বিশ্বকাপের আসরে ৪টি খেলার মধ্যে ১০টি গোল করেছেন মূল্যে। প্রতিটি ক্রীড়ামোদীই হয়ত আশা করেছিল মূল্যের জুস্ট

ঠিক সেই মূল্যে জয়সূচক গোল করেছিলেন মূল্যে। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান দলের ৫-০ গোলে জয়লাভ করার পেছনেও মূল্যের দানই সর্বাধিক। বিশ্বকাপের আসরে পেরুর বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য। ভাবলেও আশ্চর্য বোধ হয়, যে খেলোয়াড় ৬৬-তে বিশ্বকাপে ৪০ জনের মধ্যে স্থান পান নি, সেই খেলোয়াড়ই গত তিন বছরে ১৫টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে গোল করেছেন ১৭টি। সেরি-ফাইনালে ইতালীর কাছে পরাজিত হওয়ায় ফাইনালে খেলার সৌভাগ্য হয় নি পশ্চিম জার্মানীর। মূল্যের তীর গতি-

দাপ্তরিক বঙ্গমতী

বেগের কাছে বার বার পরাজিত হয়েছে বিপক্ষ রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা। আমরা সেই দিনটির অপেক্ষায় আছি, যেদিন দেখব বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার নামের পাশে ম্লানের নাম।

গর্ভন ব্যাংকস্,

(ইংল্যান্ড)

সাধনায় সিংধিলাভ হয়। এ কথাটা যে ধ্রুব সত্য, তারই উদাহরণ হলো গর্ভন ব্যাংকস। ভোর হওয়ার সাথে সাথে মাঠে উপস্থিত হয়ে সারাদিন গোল পোস্টের সামনে বল আটকে, সূর্যদেব বিদায় নেবার সময় ঘরে ফিরতেন ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক গর্ভন ব্যাংকস। আজ ব্যাংকস নামে সারা বিশ্ববাসী গর্ভিত। কিন্তু এমন একদিন এসেছিল যেদিন তাঁকে খাদ্যের সম্ভানে যেতে হয়েছিল রাজমিস্ত্রীর কাছে। তবুও ফুটবলের প্রতি ছিল তাঁর প্রাণের সংযোগ। একদিকে চাকরি, আর একদিকে খেলা। লিস্টার সিটি দলে যোগ দেওয়ার পর তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল দিকে দিকে। সামরিক বাহিনীর ডাকেও সাড়া দিয়েছিলেন ব্যাংকস। সামরিক বাহিনীতে যোগদান করা সত্ত্বেও মাঠের কীচি কীচি ঘাসগুলির ডাকে তাঁর মনপ্রাণ কেঁদে উঠত। আর এই কারণেই ব্যাংকস আবার ফিরে এসেছিলেন ফুটবল জগতে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলেছিলেন ডেনমার্কের

বিরুদ্ধে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। ১৯৬২-তে বিশ্বকাপের আসরে প্রথম যোগদান করেছিলেন ব্যাংকস। আমরা সেই থেকেই শ্রদ্ধা যশ আর প্রতিপত্তি। ব্যাংকসকে যে কত তীর সটের মোকাবিলা করতে হয়েছে, তা হয়ত গুণে শেষ করা যাবে না। ব্যাংকসকে এখন বিশ্বের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক বলা যেতে পারে। হয়ত এমন একদিন আসবে যেদিন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিনের জাঁড়ান চাতুর্ভাষ হার মানবে ব্যাংকসের কাছে।

জেরারজিনহো

(ব্রাজিল)

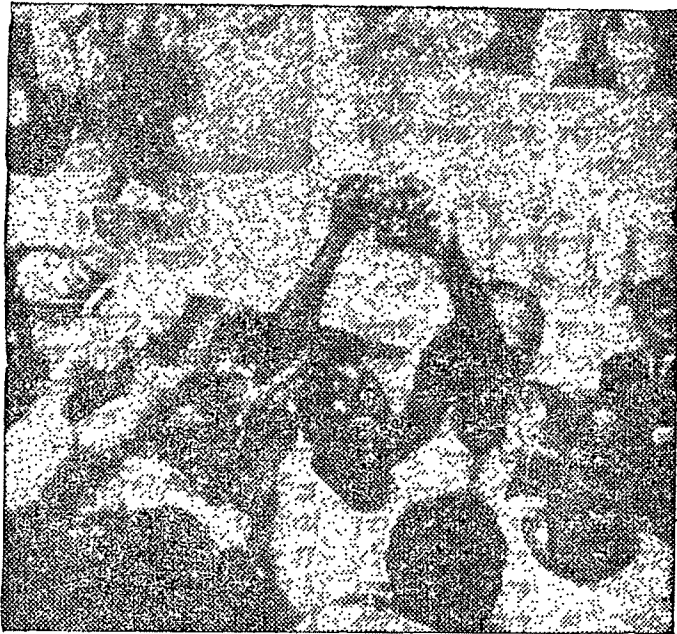
বিশ্ব একাদশের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষক ব্রাজিলের রাইট আউট জেরারজিনহো। জেরারজিনহোর পুরো নাম জেরারডেনচন্দ্রা ফিলহো। প্রতিটি ফুটবল অনুরাগীর ধারণা, জেরারজিনহো হলো গ্যারিগার দ্বিতীয় সংস্করণ। জেরারজিনহোর আছে অফুরন্ত দম, যে সব খেলোয়াড় একটি দলকে সন্তোষভাবে পরিচালনা করতে পারে, পারে তার সতীর্থদের সময়মত গোলের উপযোগী বল উপহার দিতে, সে যে নিঃসন্দেহে একজন ভালো খেলোয়াড় এটা বলা বাহুল্য। আমাদের প্রত্যেকেই অবগত যে, প্রাথমিক পর্যায়ে খেলায় জেরারজিনহো গোল করেছিলেন

মাত্র ৪টি। ব্রাজিলের বিশ্বজয়ের পেছনে জেরারজিনহোর অসদানও যথেষ্ট, নিঃসন্দেহে জেরারজিনহো একজন সদ্দক্ষ রাইট আউট। একজন ভালো রাইট আউটের যে সব গুণ থাকা উচিত, সেইসব যোগ্যতার অধিকারী জেরারজিনহো। দু'পায়ে প্রচণ্ড সট। অশ্রুত ড্রিবলিং এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর গতিবেগ। কোয়ার্টার ফাইনালে পেরুর বিরুদ্ধে, সেমিফাইনালে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে এবং ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর দেওয়া গোলেই ব্রাজিল বিজয়ী হয়। এ থেকেই সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, বিশ্বকাপের আসরে জেরারজিনহো একজন সদ্দক্ষ খেলোয়াড়। বিশ্বকাপ জয়ে জেরারজিনহোর অবদানও কম নয়। আর এই কারণেই জেরারজিনহোর উপর ব্রাজিল দল অনেকখানি নির্ভরশীল।

ববি মুর

(ইংল্যান্ড)

১৯৬৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল। প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দল ইংল্যান্ড ও পশ্চিম জার্মানী। ঠিক যেন সেখানে সেখানে লড়াই। গোল আর গোল শোধ। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ইংল্যান্ড দল পশ্চিম জার্মানীকে পরাজিত করেছিল ৪-২ গোলের ব্যবধানে। ১০৭ বছরের ফুটবল ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় ১৯৬৬-র আগস্ট মাস। সেদিন সোনার পরী জয়ের পরে ইংল্যান্ডের খেলোয়াড়েরা চীৎকার করে বলেছিল, জিতে আমরা সমর্থকদের ঋণ শোধ করলাম। সেই প্রথম ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ জয়। আর এই কারণেই ইংল্যান্ডের গৌরবে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলেন ববি মুর। কেন না, এই বিশ্বজয়ের সম্মান তাঁরই নেতৃত্বে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৫। ছোটবেলা থেকেই মুরের ফুটবলের প্রতি নেশা ছিল বেশি। আর তখন থেকেই দলনায়ক হবার সাধ ছিল প্রবল। স্কুল জীবনে মুর ছিলেন একজন দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড়। এমন কি, তিনি ইংল্যান্ড স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হবার সম্মানও অর্জন করেছিলেন—একদিকে ক্রিকেটের ডাক অন্যদিকে ফুটবলের আকর্ষণ। শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট হ্যাম দলের ডাকে ফুটবল খেলায় মুর নিজেকে প্রতিশ্রুত করেছিলেন। মাত্র ২৩ বছর বয়সে মুর ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলেন। মুর যে একজন সেরা হাফব্যাক, এর সত্যতা প্রমাণ করবে ইংল্যান্ড দলের ম্যানেজার আলফ লামসের নির্বাচন। পাঁচবার প্রায় সমস্ত



বিজয়ী ব্রাজিল দলের খেলোয়াড় পেলে জুড়ে রিয়ে কাপ হাতে আনন্দে নৃত্য করতেন।



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

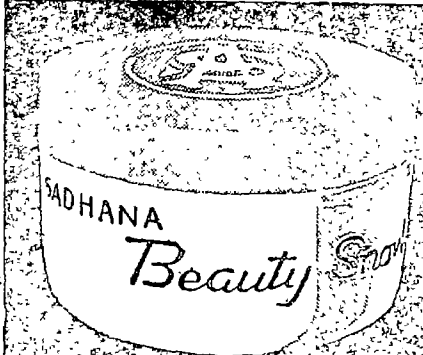
সাধনা বিউটি স্নো

• একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

অক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখজীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাধনা ওষধালয় কলিকাতা-৫



১৯৫২/৫৩

নাগ্রাহিক বসুমতী

বড় বড় জায়গাতেই মূরের বড়ের আঁচড় পড়েছে।

ওয়েস্ট হ্যামের ম্যানেজার রন গ্রীনউড বলেছেন—“বাবির সাফল্যের মূলে রয়েছে তার সারল্য। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তার মন নেই, তাই সে এত দ্রুত সাফল্যের সোপানে উঠতে পেরেছে।”

১৯৫০ সালে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডে দু' বছর কোচিং নেবার পর থেকেই মূর প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড় এবং পেশাদার। ১৯৭০-এ বিশ্বকাপের আসরে মূর পরাজিত হয়েছেন, পরাজিত হয়েছেন তাঁর দল। তবে এই পরাজয়ের মূলে ছিল, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস।

মূরের প্রতি সপ্তাহে আয় একশো পাউন্ড। মূরের বাড়িটিও যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দরী তাঁর স্ত্রী। ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি দীর্ঘ সুন্দর বাবির সুন্দরী স্ত্রী। বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে যারা খেলোয়াড় বলে স্বীকৃতি পেয়েছেন, দুহাতে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছেন, ফুটবল অনুরাগীদের তাঁদের ডগায় যাঁদের নাম, স্পর্শত তাঁদের আদর্শ-স্থানীয় হচ্ছেন বাবি মূর। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক।

গুস্তাভ পেনা

(মেক্সিকো)

১৯৬৬ সাল! খেলা চলেছে ইংল্যান্ড এবং মেক্সিকোর মধ্যে। ডুম্বেল লড়াই। বার বার বল নিয়ে ছুটে আসছে ইংল্যান্ডের দুর্বর্ষ খেলোয়াড় জিঁমি গ্রীভস। গ্রীভসকে কিভাবে বাধা দেওয়া যায়, সে সব পরিকল্পনা নিয়েই মাঠে নেমেছিল মেক্সিকো দল। আর সে গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করার ভার পড়েছিল মেক্সিকোর সেন্টার ব্যাক গুস্তাভ পেনার ওপর। ঠিক যেন পেনা আর গ্রীভসের শক্তি পরীক্ষা। পরীক্ষায় বিজয়ী হওয়ায় পেনা তখন থেকেই সংবাদ-শীর্ষে এসে হাজির হয়েছিলেন। ইংল্যান্ড দলের সমর্থকদের কাছে বাবি মূর যেমন একটি প্রিয় নাম, ঠিক তেমনি মেক্সিকো-বাসীদের কাছে পেনাও একজন বাবি মূর। মেক্সিকোর ‘বাবি মূর’ নামেই পেনা বেশি পরিচিত। মাত্র ২৬ বছর বয়সেই পেনা বিশ্ব একাদশের নির্বাচিত খেলোয়াড়। এবারের বিশ্বকাপে পেনার দলের প্রতি ছিল অগাধ আশা। দল সম্পর্কে আভ-মাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকো ইতালীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় পেনার সব আশাই ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এর জন্য এতটুকু মনো-

বল হারান নি পেনা। আবার দীর্ঘ চার বছরের মধ্যে নতুনভাবে দল গঠন করে বিশ্বকাপের আসরে চমক সৃষ্টি করতে পারবেন এই তাঁর বিশ্বাস। পেনাও যখন খেলার মাঠে, তখন মনে হয় কোন এক দম-দেওয়া যন্ত্র। অসম্ভব পরিগ্রহী পেনা। পুরো দলকে কিভাবে পরিচালনা করতে হবে, সেই সব কৌশলই জানা আছে পেনার। আর এই কারণেই পেনা একজন কৃতী খেলোয়াড়—মেক্সিকোর ভরসা।

টোস্টাও

(ব্রাজিল)

এ প্রার্থীতে কেউই চিরস্থায়ী নয়। একজন চলে যায়, আর একজন আসে। তারা উত্তরসূরী হিসাবে। টোস্টাও ঠিক তাই। প্রায় সব কিছু একই রকম। গোল করার ক্ষেত্রে দু'জনেই সিদ্ধপদ। আর্নিস্ট হার। সাথে তুলনা করছিলাম, সে হল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় এবং ফুটবল সম্রাট পেলো। এমন এক সময় এসেছিল যখন টোস্টাও-সমর্থকেরা পেলেকে সরিয়ে টোস্টাওকে সুযোগ দেবার জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। পেলেকে বাদ দিয়ে ব্রাজিল দল ঠিক যেন নুনহীন বাজন। বিশ্বকাপের প্রাথমিক পর্যায়ে খেলায় টোস্টাও খেলেছিলেন পেলের পাশে। মাত্র ২৩ বছর বয়সে টোস্টাও প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ১০টি গোল করেছিলেন। এক সময় ব্রাজিলের কোচ জাগালোকে ভীষণ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল টোস্টাওকে দলে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে। পেলেকে যেমন বলা হয় ‘রয়্যাল পার্ল’, তেমনি টোস্টাওকে বলা হয় ‘হোয়াইট পেলে’। চিলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক খেলায় জাগালো পেলেকে দলে রেখেছিলেন। আর বাদ পড়েছিলেন টোস্টাও। তবে বিশ্বকাপের আসরে টোস্টাও একদিন চমক সৃষ্টি করতে বলে সমর্থকদের আশা। আর আমরাও দেখব, হোয়াইট পেলে পেলের যোগ্য উত্তরসূরী কিনা?

ফ্যাচিতি

(ইতালী)

কথায় আছে, তরুণের জয় সর্বত্রই। আর এই কথাটার সত্যতা প্রমাণ করার

জনাই হয়ত ফ্যাচিতির জন্ম। সুযোগের অভাবে এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন, যারা আজ অবহেলিত। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিভা কোনদিন চাপা থাকে না। ১৯৬৪-তে যে ফ্যাচিতিকে একেবারে আমলা দেওয়া হয় নি, দেওয়া হয় নি খেলোয়াড় সুযোগ, আজ সে বিশ্ব একাদশের অন্যতম খেলোয়াড়। এমন কি ১৯৬৫-তে তিনি ইউরোপীয়ান ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছিলেন। আজ এমন অনেক খেলোয়াড় আছেন, যারা সুযোগের অভাবে সুপ্ত প্রতিভাকে বিক্রান্ত করতে পারছেন না। ফ্যাচিতি মূলত ফুল ব্যাক হলেও তাঁর খেলার পদ্ধতি ভিন্ন। ফুল ব্যাক হয়েও তিনি এগিয়ে গিয়ে গোল করেছেন। আর এই কারণেই তিনি বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের অন্যতম। যারা একদিন ফ্যাচিতিকে নিয়ে সমালোচনার ঝড় তুলেছিলেন, তাঁরাই আজ ফ্যাচিতির প্রশংসায় পঞ্চমুগ্ধ। ১৯৪২-এর ১৮ই জুলাই ইতালীর ট্রেন্ডিগলিওয়ে তাঁর জন্ম। ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলতে শুরু করেন স্থানীয় ক্লাবে। ইন্টার মিলান দলের হয়ে তিনি খেলেছেন কয়েক বছর। ইন্টার মিলান দল সেবার ইতালীর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই বছর ফ্যাচিতির দানই ছিল সর্বাধিক। অনেক আন্তর্জাতিক খেলায় ফ্যাচিতি গোল দিয়েছেন। ফ্যাচিতি ঠিক সময়সভ এগিয়ে যান, আবার পিছিয়ে আসেন নিজের জায়গায়। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। আজকাল যে জিনিসটি প্রায় অবলুপ্তির পথে, সেটি হলো হেডের সাহায্যে বল পাশ করা। হেডের সাহায্যে যে কত নিখুঁতভাবে বল দেওয়া যায়, তারই উদাহরণ হলো ফ্যাচিতির হেডিং, তাঁর হেডিং অতি নিখুঁত। সত্যিই ঠিকানা: অনস্বায়ী তিনি বল পাঠিয়ে দেন হেডের সাহায্যে। সেবার ইতালী স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেবার ফ্যাচিতির দেওয়া গোলাটি ছিল দর্শনীয়। আর সেই গোলের জন্য ইতালী অর্জন করেছিল বিশ্বকাপের চড়ান্ত পর্যায়ের খেলার যোগ্যতা। ফ্যাচিতিতে আউট-ডজ করে বল নিয়ে যাওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য। ইতালীর এবারের ফাইনালে ওঠার পেছনেও ফ্যাচিতির দান যথেষ্ট। আর এই কারণেই ফ্যাচিতির ওপর বিশ্বের সমস্ত ক্রীড়ামোদীর অনেক আশা। সবাই দেখতে চায় ফ্যাচিতির নবরূপ।



কলকাতার ফুটবলের এখন দৈন্যদশা। কলকাতার ফুটবল মানেই ভারতের ফুটবল। আজ তাই ফুটবলেও ভারতের দুর্দশা। মেলবোর্ণ অলিম্পিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী ও দুবারের এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান ভারতের স্থান এখন কোথায়? গতবার মারডেকায় ভারতের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। কাজেই এই ফলাফলের দিকে নজর রেখে নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ভারতীয় ফুটবলের মান অনেক নীচে নেমে গেছে। গত কয়েক বছর ধরেই প্রতিবেশী দেশগুলির কাছে আমরা ক্রমাগত হারাছি। অথচ এককালে বার্মা, ইন্দোনেশিয়া বা মালয়েশিয়াকে ভারত অনায়াসে হারিয়েছে। ব্যাপারটা ভাবলে সত্যিই কষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের এই অধঃপতন কেন? শুধু সরকারী ঔনসীনের অভ্যুত্থান বা বিদেশের তুলনায় অপৰ্যাপ্ত সদ্ব্যোগের অভাব—কারণ কি একটাই? এ সব অভিযোগ মেনে নিয়েও বলা যায় যে, ভারতের খেলোয়াড়দের উপযুক্ত ক্রীড়াদক্ষতার অভাবও এই অধঃপতনের অন্যতম কারণ। পি. কে. চন্দ্রী, বলরাম, জার্নাল, অরুণ ঘোষের পর তাঁদের অভাব পৃথিবীতে দেবার মতো তরুণ খেলোয়াড়রা কোথায়? গত পাঁচ বছরে একটিও চন্দ্রী, বলরাম বা পি কে তৈরি হয় নি। কিছুটা বিকল্প হিসাবে কাজল বা পি দেবের নাম করা গেলেও, তারা সম্পূর্ণ পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু তারপর আর কারো নাম চোখে পড়ে না। নঈম বা প্রসাদ কেউই জার্নাল-অরুণের সমকক্ষ নয়। অথচ ফুটবলে ভারতকে হৃতসম্মান পুনরুদ্ধার করতে গেলে পি কে, চন্দ্রী, বলরাম বা জার্নাল-অরুণের যোগ্য উত্তরসারক খুঁজে বার করতেই হবে। অথচ তেমন সম্ভাবনায় আশাও দেখা যাচ্ছে না। তা বলে কলকাতার ফুটবল থেমে নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও খেলা ঠিকই চলছে। ওরই মধ্যে কয়েকজনের খেলা বিক্ষিপ্তভাবে নজর কাড়ছে। সেই সব তরুণদের যদি একত্র করে দীর্ঘমেয়াদী কোচিং বা প্রশিক্ষণ চালু করা হয় তবে ভালো ফলাফল না হয়ে পারে না। তবে তার জন্য সরকারী তৎপরতার সাথে চাই খেলোয়াড়দেরও আন্তরিক আগ্রহ। সে যাই হোক, আজকের এই লেখায় কয়েকজন সম্ভাবনাময় উঠতি ও নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

সুধীর কর্মকার

(ইন্সট্বেগল)

ছোটখাটো শান্ত স্বভাবের সুধীরকে দেখলে চট করে বিশ্বাস করা শক্ত যে, ওই চেহারা নিয়ে সে মাঠে অত দাপটে খেলে, বিশেষত ব্যাকে। '৬৭ সালে বালী প্রতিভার হয়ে খেলা শুরুর পরে '৬৮-তে এরিয়ান ঘুরে মাত্র গত বছরই সুধীর ইন্সট্বেগলে এসেছে। ধীর, স্থির সুধীর অবিচলচিত্তে একের পর এক ভালো খেলে গতবারই সবার নজর কেড়েছে। প্রথম বছরেই ক্রীড়া সাংবাদিক সংঘের সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতিও তার ভাগ্যে জড়টেছে। বান্দু সাংবাদিকদের পাকা জহুরীর চোখ যে খাঁটি সোনা চিরন্তন ভুল করে নি, তার প্রমাণ—এবারও সুধীর ভালো খেলেছে। এবারের সুধীর আরও পরিমার্জিত। ব্যাক হিসাবে ইন্সট্বেগলের মত খুঁটি।



সুধীর কর্মকার

৩০৯

স্বমহিমায় উজ্জ্বল সুধীরের পাশে শান্ত, নঈমের মতো তারকারাও দৃতিহীন।

সুধীরের বড় গুণ ও কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না। ঠান্ডা মাথায় বিপক্ষের ক্রমাগত আক্রমণ রোখার সাথে সাথে সমানতালে উঠে গিয়ে স্বপক্ষের ফরোয়ার্ডদের পাশে বাড়তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে তাদের উজ্জীবিত করে ভুলতে সার্থক ভূমিকা নেয়। প্রয়োজনীয় মত্বতে সুধীরের এই বাড়তি প্রয়াস দলের অনেক কাজে লাগে সন্দেহ নেই। হেভি-ট্যাকলিং-পাসিং-এ সুধীরের জড়ি নেই।

সেই সংগে প্রশংসনীয় খেলার মত ও তার বাইরে সুধীরের আচরণ। মাঠের ভেতরে যেমন শারীরিক আক্ষফালনে ওর প্রবল অনীহা তেমনি মাঠের বাইরেও সুধীরের শান্ত, সংযত ব্যৱহার সবার মন কেড়েছে।

মাত্র বাইশ বছরের তরুণ, প্রীত্যক্ষ পদের সুধীর কর্মকার বড় হবার অসম্ভব

প্রেরণায় নিজের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গুণে আজ সবার প্রিয়পাত্র। সাম্প্রতিককালে খেলাধুলার নিরিখে একমাত্র সুধীরকেই শেরা বললে বোধহয় অত্যাঙ্ক করা হয় না। কারণ অধিকাংশ নামী ও দামীরা যখন নিঃপ্রাণ, আর উঠতি তরুণরা যখন হঠাৎ জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে তখন সুধীরই একমাত্র খেলার মান ধরে রেখেছে। ব্যাপারটা সুধীরের কাছে ভো বটেই, আমাদের কাছেও কম উৎসাহ-ব্যঞ্জক নয়।

হুগলী জেলার ছেলে সুধীর কর্ম-কার জোর কদমে এগিয়ে এসে আজ কলকাতার অন্যতম সেরা খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে। ইতি-মধ্যে ফুরিয়ে না গেলে সুধীর আমাদের অনেক কিছু দিতে পারে। ধাপে ধাপে সুধীর খ্যাতির চূড়ায় আরোহণ করুক আমাদেরও এই কামনা।

শ্যামসুন্দর মান্না

(মোহনবাগান)

চাঁগাডাঙ্গা গ্রামের সেই ছেলোটি কোনদিন কলকাতা ময়দানে খেলে নাম করবে, এ কথা কেউ ভাবতে পেরেছিল! আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতোই শ্যামসুন্দরের শৈশব কেটেছে নিতান্ত দুরবস্থার মধ্যে। একজোড়া বড় কেনার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। স্কুলের প্রধানশিক্ষক বড়ট কিনে দিলেন শ্যামসুন্দরকে। মরে গেলেও কোনদিন এ সব কথা ভুলতে পারবে কি শ্যামসুন্দর!

কালো, শক্ত-সামর্থ্য চেহারার শ্যাম-সুন্দর কলকাতা ময়দানে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছে '৬৭ সালে খিদিরপুরের হয়ে। '৬৭-৬৮ দু'বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। '৬৯-তে নগরীয় সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের খেলোয়াড় শ্যাম-সুন্দর মান্না এ বছর খিদিরপুর ছেড়ে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছে।

শ্যামসুন্দরের বড় গুণ, সে খাটতে জানে। ৪-২-৪ পদ্ধতিতে হাফে খেলার যে কঠিন দায়িত্ব তা অনেকাংশেই সুদৃষ্টভাবে সম্পাদন করতে পারে। বিপক্ষের আক্রমণ রোধের ফাঁকে এগিয়ে গিয়ে এ পর্যন্ত চার-চারটে গোলও দিয়েছে শ্যামসুন্দর।

অমায়িক, নিরীহ স্বভাবের শ্যাম-সুন্দর মাঠে কিন্তু লড়িয়ে মেজাজের ছেলে। অক্লান্ত মেহনতে নিজের সব-টুকু সামর্থ্য উজাড় করে শ্যামসুন্দর দলের জন্য জ্ঞান-প্রাণ দিয়ে লড়ে।

বয়স অল্প, শেখার আগ্রহ আছে এবং

খেলবার সামর্থ্য আছে; কাজেই সেরকম সুযোগ পেলে যে, শ্যামসুন্দর উন্নতি করবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

সদা হাস্যময় শ্যামসুন্দরও সুধীরের মতো খেলোয়াড়সুলভ আদর্শে বিশ্বাসী। ফলে, বল ছেড়ে মানুষ মারার দিকে ওর ঝোঁক একেবারেই নেই।

মোহনবাগানের মতো ভারতবিশ্বাত দলের নিয়মিত খেলোয়াড় হয়েও শ্যাম-সুন্দরের মনে এতটুকু অহংকার নেই। শ্যামসুন্দর এখনও সেই আগের মতো সহজ, সরল, অমায়িক। মনটা এখনও সেই চাঁগাডাঙ্গা গ্রামের শিশুর মতো।

ও যা কিছু শিখেছে তা একমাত্র কোচ অচ্যুৎ ব্যানার্জীর দৌলতে—এ কথা স্বীকার করতে ওর কুণ্ঠা নেই। শারীরিক দক্ষতা ও দম এই দু'টি গুণই শ্যামসুন্দরের পুরোদমে আছে। আর নিষ্ঠা বা অধ্যবসয়ে যে ঘাটতি নেই, তা না বললেও বোধ করি চলে। যা নেই, তা হচ্ছে ওর অভিজ্ঞতা। ফলে ভালো খেলেও শ্যামসুন্দর অনেক সময় ফিনি-সিং দিতে পারছে না। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে শ্যামসুন্দর এ সব দোষ-দুটি শূন্যে নেবে।

শ্যামসুন্দর যে শূন্য খেলাধুলায় ভালো তা নয়, পড়াশুনায় কর্মতি নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্রাজুয়েট কোর্সের সিস্কথ ইয়ারের ছাত্র শ্যামসুন্দর মান্নার সাবজেক্ট হচ্ছে পলিটি-ক্যাল সায়েন্স।

স্বপন সেনগুপ্ত

(ইস্টবেঙ্গল)

জোর খেলা হচ্ছে। প্রতিশব্দদ্বী-ইস্টবেঙ্গল আর বি এন আর। অশোক চ্যাটার্জীর দেওয়া গোলে যদিও ইস্ট-বেঙ্গল এক গোলে এগিয়ে আছে, তবু যে কোন মূহুর্তে গোল শোধ হয়ে যেতে পারে। দু'দিকের গোলের সামনেই বল ঘোরাক্ষেরা করছে। হঠাৎ ইস্ট-বেঙ্গলের তরুণ রাইট উইং বল নিয়ে তীব্রবেগে বি এন আরের তিনজন ব্যাক মায় অরুণ ঘোষ সহ গোলরক্ষককে কাটিয়ে গোলে বল ঠেলে দিলো। অকস্মাৎ খেলার মোড় ফিরে গেলো। শেষ মূহুর্তে আরও একটি গোল দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ঐ খেলায় তিন গোলে জিতে গেলো।

এর পর সবার নজরে পড়ে গেলো সেই তরুণ রাইট উইংটি। নাম স্বপন সেনগুপ্ত। খিদিরপুর ছেড়ে স্বপন এবারই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছে। স্বপন মস্তবড় খেলোয়াড় না হলেও

যথেষ্ট প্রতিভূতীবান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ইস্টবেঙ্গলের নামী দামী ফরো-য়ার্ডরা যখন গোলের কাছে মাথাখুঁড়ে দিশেহারা হয় তখন স্বপন লম্বা লম্বা সেণ্টার করে সতীর্থদের অনেক বল উপহার দিচ্ছে। কখনও বা একক প্রচেষ্টায় বিদ্রোহবেগে বল নিয়ে গোল দিয়েও আসছে।

হ্যাঁ, স্বপনের বড় ভরসা ওই বার কাঁপানো স্ট ও বিদ্রোহ বেগ।

কুড়ি বছরের তরুণ স্বপন কলকাতার প্রথম খেলেছে '৬৬ সালে বালী প্রতিভার হয়ে। '৬৭-তে খিদিরপুরে এসে পরের বছর জুনিয়র বাংলা দলে স্বপনের ঠাই মেলে।

মেদিনীপুরের ছেলে স্বপন সেন-গুপ্ত, শ্যামসুন্দরের মতো কোনদিন ভাবতে পারে নি সে ইস্টবেঙ্গল কিংবা মোহনবাগানে খেলবে। সে সুযোগ সে পেয়েছে। কিন্তু কলকাতার মাঠে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে গেলে তাকে এখনও অনেক বড় হতে হবে।

স্বপনের পায়ের কাজ আছে, দমেও ঘাটতি নেই। আশা করি, আন্তরিকতায় বা নিষ্ঠায় ফাঁকি থাকবে না। কাজেই স্বপন যদি ধাপে ধাপে আরও উন্নতি করে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে! তবে, কাগজের সাময়িক প্রশংসা বা অনুরক্ত ভক্তের প্রশংসাতে ভুলে স্বপন যদি নিজেকে একটা বিরাট কিছু ভাবে, তবে স্বপনের এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি—মোদ্দা কথাটা, স্বপনকে ভুললে চলবে না।

প্রবীর মজুমদার

(মোহনবাগান)

'৬৫ থেকে '৬৯ টানা ক'টি বছর ইংরেলে ইনসাইড ফরোয়ার্ড হিসেবে খেলে নাম করেছে প্রবীর। এ বছর মোহন-বাগানে এসে হাফে খেলছে। মাঝে ব্যাকেও খেলতে হয়েছে।

ব্যাক থেকে ফরোয়ার্ড যে কোন স্থানে খেলতে নেমে মানিয়ে নেওয়াটা যে কোন খেলোয়াড়ের কাছেই গর্বের কথা এবং এজন্য প্রবীর একটু-আধটু গর্বও করতে পারে।

বেশি দিন ধরে প্রবীর কলকাতা মাঠে খেলছে না। ওরই ফাঁকে '৬৫-তে জুনিয়র বাংলা ও '৬৬-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও জুনিয়র ভারতীয় ফুটবল দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছে প্রবীর।

ফর্সা, সুদর্শন প্রবীর মজুমদার

মোহনবাগানে আসার আগে বামাদাও প্রদীপদার পাশে থেকে নিজেকে তৈরি করে নেবার চেষ্টা করেছে। বলতে গেলে, যতটুকু শিখেছে, তা ঐ ঠাঁয়ের দৌলতেই।

খেলেতে নেমে প্রবীর ফাঁকি দেয় না। লিংকম্যানের কঠিন দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ও সারা মাঠ চষে বেড়ায়। অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হিসাবে প্রবীর সতীর্থ ফরোয়াডদের সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত-লয়ে ছুটে গাটিকয়েক গোলও করেছে এর মধ্যে। ব্যাপারটা প্রবীরের কাছে যে উদ্দীপক ঘটনা, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শান্ত ও সুদর্শন প্রবীর মজুমদার এখনও খ্যাতির তুঙ্গে আরোহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে নি, তবে ঠিকমতো খেললে আগামী দিনের উজ্জ্বল রঙ্গ হয়ে উঠতে পারাটা অসম্ভব নয়।

প্রবীরের দোষ লিংকম্যান হিসেবে ও একটু স্লেমা। অনেক সময় দেখা গেছে যে, ফরোয়াডদের বাড়তি সাহায্য দিতে গিয়েও সময়মত নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে নি। তা ছাড়া, প্রবীরের পায়ের কাজে তারিফ পাবার মতো বাহ্য-দুরী নেই। আর অভিজ্ঞতার অভাব তো আছেই।

প্রবীর যদি এ সব দোষ-দুর্দৃষ্টি শূন্যেরে নিয়ে নিজেকে ভালো খেলোয়াড় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তবে ও একদিন নিশ্চয়ই সফল হবে। ইং রেলের কক্ষী প্রবীর বাবা-মা ও দাদার কাছ থেকে সব সময় বড় হবার অনুপ্রেরণা পেয়েছে।

নিত্য নানা মাঠে হরেক রকম খেলোয়াড়ের খেলা দেখে বেড়ানো প্রবীরের নেশা। খেলা-দেখেও অনেক কিছু শেখা যায় বা শব্দ খেলা নয় খেলা দেখাও প্রতিটি খেলোয়াড়ের অবশ্য কর্তব্য—এ কথাটা প্রবীর মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে।

অমিয় ভট্টাচার্য

(রাজস্থান)

কোন বিগ টিমের প্লেয়ার না হয়েও অমিয় ভট্টাচার্য বারোটি গোল দেওয়ার সূত্রে এখন পর্যন্ত লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতা। রাজস্থানের দীর্ঘদেহী ফরোয়াড অমিয় ভট্টাচার্য এখন পর্যন্ত যে-কটি গোল করেছে তার মধ্যে সেরা কোনটি? নিঃসন্দেহে ইন্সটবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দেওয়া গোলটি। ইন্সটবেঙ্গলের শক্ত, সামর্থ্য ডিপার্ডফেন্সের ফোকর দিয়ে গোলে আসা সতীর্থের একটি গুঁপাশ পেয়ে অমিয় ঠান্ডা মাথায় খণ্ডরাজকে গোল ছেড়ে বাইরে আনিচ্ছে বলটি জালে

ঠেলে দেয়। প্রথম গোল দিয়েও রাজস্থান-ম্যাচ দখলে রাখতে পারে নি। দোষ অমিয়র নয়। যারা খেলা দেখেছেন তারা অমিয়র দেওয়া গোলার তারিফ করবেনই।

অমিয়র যেমন অফুরন্ত দম আছে, তেমনি আছে দৃঢ়পায়ের জোরালো স্ট। অমিয়র দূরপাল্লার স্ট দর্শনীয়। সেই সংগে ভীরু গতিবেগ ওর প্রধান সহায়। রাজস্থানের আক্রমণের প্রধান উৎস অমিয় এবার একাই একশো। অমিয় না থাকলে রাজস্থানের স্কোর করবে কে?

গতবার ইন্সটবেঙ্গে থেকে অমিয় সর্বাধিক করতে পারে নি। এবার তাই আবার ছোট ক্লাবে নাম লিখিয়েছে। ভুল সে করে নি; তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

নিরঙ্কর অমিয় ভট্টাচার্য কোন রকম ব্যাকিং না থাকা সত্ত্বেও এবার নিজ-গুণে মারডেকা ঝাঁপালে আমন্ত্রিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত অমিয় বড় দলের জার্সি না পরেও ভারতীয় দলে ঠাঁই পাবে কিনা জানি না; না পেলেও নিরাশ হবার কিছু নেই। অদূর ভবিষ্যতে অমিয় ভারতের সেরা ফরোয়াডের স্বীকৃতি পাবার আশা রাখে।

সত্যিকথা বলতে কি, অমিয়র পাশে এবার খ্যাত-অখ্যাত অনেক ফরোয়াডকেই নিতান্ত নিপ্রভ ঠেকেছে। আগার কথা সন্দেহ নেই। কারণ—নতুনরাই তো ভরসা। আর অমিয়কে বড় হতে দেখলে আশ্রয়ও কম খুঁশি হবে না। তবে, অমিয়কে মনে রাখতে হবে, বড় হবার পথ সহজ বা মসৃণ নয়। বন্ধুর পথে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তবে খ্যাতির চড়ায় আরোহণ করা যায়। তার জন্য অমিয়কেও অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।

গোবিন্দ গুহঠাকুরতা

(মোহনবাগান)

ড্রেস করে রোজ একটি ছেলে মাঠে নামে। কিন্তু খেলার সুযোগ পায় না। পাবে কি করে, সে যেখানে খেলে সেখানে যে ভারতের সেরা গোলরক্ষক বলাই দে খেলে। স্বভাবতই বলাই দেকে রোজ খেলানো হয়। খেলার শেষে ছেলোট হাঙ্গামা-আবার পরের দিনের প্রতীক্ষায় থাকে। পরের দিনও হয়তো একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ছেলোটের কিন্তু ক্লান্তি নেই। ক্ষোভ বা অভিযোগও নেই কারও বিরুদ্ধে। একদিন বড় হবেই—এ বিশ্বাস নিয়ে সে দিন কাটায়।

হ্যাঁ! এই ছেলোটই গোবিন্দ গুহ-

ঠাকুরতা। নিজগুণে সবার প্রিয় গোবিন্দ গুহঠাকুরতা বাল্যী প্রতিভার হয়ে '৬৬ সালে প্রথম ঘেরা মাঠে খেলার সুযোগ পায়। '৬৬-৬৭ সালে উয়াড়ীতে ও '৬৮-তে কালীঘাটে। শেষের দু'বছর জাতীয় চ্যাম্পিয়ন জুর্নিয়ার বাংলা দলের গোলরক্ষার দায়িত্ব বহন করেছে গোবিন্দ। '৬৮-তে ভালো খেলে সবাম নজর কাড়লো গোবিন্দ। আর তাই '৬৯-এ ডাক এলো মোহনবাগান থেকে। সেই থেকে মোহনবাগানে খেলেছে গোবিন্দ।

যে কটা খেলায় গোবিন্দ খেলেছে তাতে মোটের ওপর মন্দ খেলে নি। কিন্তু হলে কি হবে ভাগ্য সুপ্রসন্ন না থাকলে কোন কিছুই করা যায় না।

গোবিন্দর 'গ্রীপ' করা ভালো। সাহস করে ড্রাইভ দিতে পারে। তবু ওকে নিয়মিত খেলানো হয় না। আর না খেলে খেলা ভালো হবে কি করে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোবিন্দর নিষ্ঠা আছে। খেলা শেখার আন্তরিক আগ্রহ থাকলে কোন কিছুই প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কাজেই সাময়িক অসময়কে নিয়ে তার মন খারাপ না করাই উচিত।

তবে গোবিন্দকে বড় হতে গেলে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে।

আজই সংগ্রহ করুন

মনোরঞ্জন রায়ের

শিক্ষা বিজ্ঞানের রূপরেখা

দু'খন্ড একত্রে মূল্য—১০.০০

(বি, টি ও বি, এড-এর চারটি আবশ্যিক বিষয় একত্রে)

প্রথম ভাগ মূল্য—৬.০০

(শিক্ষার মূলনীতি, পদ্ধতির ইতিহাস, বিদ্যালয় সংগঠন, স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রভৃতি একত্রে)

দ্বিতীয় ভাগ— মূল্য—৮.০০

(শিক্ষাপ্রণালী মনোবিজ্ঞান, শিক্ষার ভাব-ধারার ইতিহাস, আধুনিক শিক্ষাবিদগণ, তাঁদের মতামত, শিক্ষার আধুনিক সমস্যা একত্রে)

প্রকাশক :

অমপূর্ণা প্রকাশনী

১/২ জ্যাকসন লেন, কলিকাতা-১

পরিবেশক :

জে, এন ঘোষ এন্ড কোং

ইউ এন ধর এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ

বিক্রম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২

সুযোগ-সুবিধা ও আন্তরিক চেষ্টা থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।

নম্র, বিনয়ী ও আত্মপ্রচারবিমুখ গোবিন্দ গুহঠাকুরতার মধ্যে আগামী দিনের অনেক সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সে সম্ভাবনা যেন অন্ধুরে বিনষ্ট না হয়, তাকে সাধক করে তোলা দরকার।

দিলীপ পাল

(মোহনবাগান)

ছেলেবেলা থেকে উত্তরপাড়ার দিলীপ পাল স্বপ্ন দেখে এসেছে কলকাতা ময়দানের নামকরা খেলোয়াড় হবে। খেলতো ফরোয়াড়ে। চোখের সামনে আদর্শ খেলোয়াড় ছিল চুনি-বলরাম।

'৬৩-তে বালী প্রতিভার জার্সি চাপিয়ে ঘেরা মাঠে প্রথম খেলার সুযোগ পেল দিলীপ। সেখানে তিন বছর কাটিয়ে '৬৬-তে এরিয়ানে যোগ দেয়। আস্তে আস্তে ভালো খেলে নাম করতে লাগলো। '৬৭-তে এরিয়ানে থাকতেই জুনিয়ার ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হয়ে ব্যাঙ্কক যাবার সুযোগ হয়েছিল। কোচ হোসেন দিলীপকে পরামর্শ দিলেন হাফে খেলতে। তখন থেকেই দিলীপ পাকা-পাকিভাবে হাফে খেলা শুরু করলো।

'৬৮-তে বিগ টিম ইস্টবেঙ্গেলে যোগ দিলেও তাকে তেমন খেলানো হলো না। ফলে পরের বছরেই দল পাঁচটে মোহনবাগানে আসে। কিন্তু আজও দিলীপ তথাকথিত বড় খেলোয়াড় হতে পারল না। দুঃখের কথা, এখনও দিলীপকে খেলবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

তেইশ বছরের তরুণ দিলীপের মনে ক্ষোভ থাকলেও কোন অভিযোগ নেই, তাই আজও হাসিমুখে ড্রেস করে দৈনিক মাঠের ধারে বসে থাকে।

চেক, রাশিয়া ও বর্মা দলের বিরুদ্ধে খেলায় অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা দিলীপের আছে। দিলীপের প্রিয় কোচ ল্যাংচা মিত্র।

খেলা দেখতে দিলীপ দারুণ ভালবাসে। ছেলেবেলা থেকে যার অনুপ্রেরণা পেয়ে দিলীপ বড় হতে চেয়েছে সেই অরুণাভ মজুমদারের অভাব দিলীপ প্রতিপদে অনুভব করে।

সুকুমার সেন

(মহমেদান)

ফর্সা, সুদর্শন মহমেদানের নিয়মিত নির্ভরশীল ব্যাক সুকুমার সেন

কলকাতা ময়দানে খেলা শুরু করে '৬৩ সাল থেকে। এক বছর স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলে পরের দু'বছর '৬১-৬২ হাওড়া ইউনিয়নে সুকুমার সেন যোগ দেয়। '৬৩ থেকে '৬৬ সে খেলে এরিয়ানে। তখন থেকেই নামডাক শুরু। '৬৭ থেকে মহমেদানের অপরিহার্য খেলোয়াড়। মাঝে '৬৮-ত চাকরির জন্য বি এন আরে খেলতে হয়েছিল।

সুকুমার সেন ভালো খেলেও জাতীয় দলে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায় নি। কোন বড় দলের হয়ে না খেললে অনেক সময় সে রকম সুযোগ আসে না।

ছাব্বিশ বছর বয়সী সুকুমার সেনের বড় হবার মূলে বাড়ির দাদা ও অন্যান্যদের প্রেরণাই বেশি। পরে ধলাই চ্যাটার্জীর নামও এর কাছে স্মরণীয়।

বলরাম আর অরুণ ঘোষ হচ্ছে সুকুমার সেনের প্রিয় খেলোয়াড়। এ ছাড়া শৈলেন মামার খেলা তো আছেই।

সুকুমার সেনের স্মরণীয় খেলা হচ্ছে, ১৯৬৭-র মহমেদান-ইস্টবেঙ্গেল দলের খেলাটি। এক গোলে পিছিয়ে থেকেও দশজনে খেলে ইস্টবেঙ্গেলকে হারিয়ে সেবার মহমেদান লীগ বিজয়ী হয়। ওই খেলার কথা সুকুমার সেন কোনদিনই ভুলবে না।

কলকাতার দর্শকদের দৃষ্টিশা সুকুমার সেনকে কষ্ট দেয়। এরা খেলা কত ভালোবাসে। অথচ খেলা দেখার অধিকার থেকেও তাদের বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। অথচ পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন নজর নেই।

সুকুমার সেন রাতে খেলার পক্ষপাতী। লাইটে খেললে স্ট্যামিনা বাড়ে বলে তার বিশ্বাস। রোভার্সে খেলে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। আর দর্শকদেরও অনেক সুবিধে। রোদে পুড়ে তাদের এখনকার মতো এত কষ্ট করতে হবে না। তা ছাড়া খেলোয়াড় ও দর্শক উভয়েই বাড়তি সুবিধা পায়।

সমরেশ চৌধুরী

(ইস্টবেঙ্গেল)

অশোক নগরের ছেলে সমরেশ চৌধুরী ওরফে পিপ্টু এখন ইস্টবেঙ্গেলে নিয়মিত হাফে খেলছে। বয়স অল্প, মাত্রই '৬৭-তে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতায় চলে আসে।

'৬৭-তে উয়াড়ীতে খেলার সুযোগ পায় সমরেশ। '৬৮-তে জুনিয়ার বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে নিজের স্থান

করে নেয়। '৬৯ অবধি উয়াড়ীতে খেলে এবছর অনেক আশা নিয়ে ইস্টবেঙ্গেলে যোগ দিয়েছে।

খাঁদও কাজল বা প্রশান্তর তুলনায় সমরেশ নিজস্বই আকর্ষণীয়, তবু ওর আন্তরিক নিষ্ঠা আছে। খেলা শেখার অদম্য প্রেরণাই সমরেশকে বড় হবার পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। পারদূক আর না পারদূক, সমরেশ সারা মাঠময় ছুটে বেড়ায়। ওর দূর থেকে নেওয়া সটও অনেক সময় দর্শনীয় হয়ে গোলে ঢাকে।

সমরেশ চৌধুরীর প্রিয় খেলোয়াড় কাজল মুখার্জি। ছেলেবেলা থেকে সমরেশ যাকে আদর্শ খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আজ সৌভাগ্যক্রমে সেই কাজল মুখার্জির পাশে পাশে খেলার সুযোগ পাচ্ছে।

অশোকনগরের ছেলে সমরেশ চৌধুরীর স্বপ্ন একটাই। বড় খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা।

বিমান লাহিড়ী

(মহমেদান)

নারডেকা ষ্ট্রায়েলে আর্মিস্তৃত মহমেদানের একমাত্র খেলোয়াড় বিমান লাহিড়ী কলকাতা ময়দানের একটি সুপরিচিত নাম। বিমান লাহিড়ী বড় খেলোয়াড় হবে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? অবিস্মরণীয় শিবদাস ভাদুড়ী ও বিজয়দাস ভাদুড়ী তার দিদিমার আপনাকা। কাজেই বিমানের রক্তে আছে জাত খেলোয়াড়ের রক্ত।

কলকাতা ময়দানে বিমান প্রথম খেলে '৬৩-তে হাওড়া ইউনিয়নের হয়ে। '৬৪- '৬৫ স্পোর্টিং ইউনিয়নে খেলে '৬৬-তে বিমান যোগ দেয় এরিয়ানে। '৬৭-তে অনেক আশা নিয়ে মোহনবাগানে আসে। সে বছরই সুনীল ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ব্যাঙ্ককগামী জুনিয়ার ভারতীয় দলের সদস্য। মোহনবাগানে গিয়ে আশানুরূপ ভালো খেলতে পারল না বিমান। '৬৮-তে আবার এরিয়ানে প্রত্যাবর্তন। '৬৯-এ মহমেদানে চলে আসে। সেই থেকে মহমেদান তো বটেই, বাংলা দলেরও নিয়মিত খেলোয়াড়। ১৯৬৬, ৬৮ ও ৬৯-এ বাংলা দলের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে বিমান খেলে। গতবার সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের অন্যতম খেলোয়াড় বিমান নওগাঁর মাঠে গোল দিয়েছে পাঁচটি।

কোচ রমণী সরকার, শচীন হালদার ও শৈলেন মামার কাছ থেকে তাগিদ পাওয়া বিমান যে কোন দলের আক্রমণের প্রধান উৎস। বিপক্ষের রক্ষণভাগকে তখনই করতে ওর ছুঁড়ি নেই। সুন্দর

প্রাণাধিক বসুমতী

জোরালো ভলি, নিখুঁত সেটের আর মনোমগ্ন ভঙ্গীতে বিমান যখন সতীর্থদের সাথে আক্রমণ হানে, তখন তা চেয়ে দেখার মতো।

হুগলী জেলার প্রাক্তন অধিনায়ক বিমান লাহিড়ী নিজগুণেই কলকাতা মাঠের সবার প্রিয়। ভালো খেলে বিমান আরও উন্নতি করবে, এমন আশা করা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

সুনীল ভট্টাচার্য

(ইস্টবেঙ্গল)

জাত খেলোয়াড় হয়েও সুনীল ভট্টাচার্য ভাগ্যের বিরূপতায় ঠিকমতো খেলতে পারছেন না। খালি আঘাত আর আঘাত। ১৯৬৭ সালে ভারতীয় যুব ফুটবলের অধিনায়ক হয়ে বিদেশে গিয়ে প্রথম পায়ে আঘাত পায় সুনীল। ফলে সে বছর লীগে খেলতে সক্ষম হয় নি। '৬৮-তে রাশিয়ার একটি দলের বিরুদ্ধে দিল্লীতে এক প্রদর্শনী ম্যাচে খেলতে গিয়ে আবার আহত হলো সুনীল। আঘাত গুরুতর। এক বছর খেলা স্থগিত থাকার পর '৬৯-এ কালীঘাটের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে একই জায়গায় আবার চোট। আবার বেশ কয়েক মাস মাঠে নামা বন্ধ। গতবার শেষের দিকে রোভাসে' অনবদ্য খেলা। ফলস্বরূপ তেহরানগামী বাংলা দলের খেলোয়াড় হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিটি খেলায় অংশগ্রহণ। '৭০-এর শুরুর দিকে অনেক আশা নিয়ে সুনীল মাঠে নামে। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গল-এরিয়ান প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে গিয়ে আবার আঘাত। ফলে লীগের শুরুর দিকে আর মাঠে নামা হলো না। পায়ে আঘাত একটু কমে যাওয়ায় সুনীল তার পরে মাঠে নামে। কিন্তু বড় খেলায় মহমেডানের বিপক্ষে আবার পায়ে চোট লাগে। তারপর বেশ ক'টি ম্যাচ বাদ দিয়ে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে আবার জখম ও মাঠত্যাগ।

অথচ সুনীলের মধ্যে কত সম্ভাবনা ছিল। সুনীল '৬৪-তে কালীঘাটের হয়ে লীগে প্রথম খেলতে নামে। '৬৬-তে ইস্টবেঙ্গলে শোগ দেয়। এর ফাঁকে বেশ কয়েকবার জুনিয়ার বাংলা ও জুনিয়ার ভারতীয় দলের নেতৃত্বভার নিয়ে ঘরে ও বাইরে অসংখ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। বার্মা, থাইল্যান্ড, জাপান সহ বহু দেশের বিরুদ্ধে খেলার অভিজ্ঞতা তার আছে।

শান্ত স্বভাবের সুনীল ধীরস্থিরভাবে এতো সুন্দর খেলে যে, তার তারিফ না করে পারা যায় না। ব্যাকে খেললেও

এতটুকু গায়ের জোর ফলায় না। সুদীর্ঘ মাঠে থাকলে যে কোন দলেরই রক্ষণভাগ বাড়তি শক্তি পায়।

সর্বজনপ্রিয় এই খেলোয়াড়টির খেলোয়াড়ী জীবন বড়ই দুঃখের। এত আঘাতের পরও কানও পক্ষে মাঠে নামা কম্পনার অতীত। তবু সুনীল খেলবার ইচ্ছা রাখে।

অশোক ব্যানার্জী

(খিদিরপুর)

অশোক ব্যানার্জী ফুটবল খেলোয়াড় না হয়ে ভালো ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়ও হতে পারতো। '৬২-তে পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতায় অশোক বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। কিন্তু বরাবরই ফুটবলের প্রতি অশোকের ঝোঁক। ফলে ব্যাকেট ছেড়ে বল নিয়েই মেতে রইলো।

তেইশ বছরের যুবক অশোক ব্যানার্জীর শ্যামনগরে বাড়ি। অগ্রজ পাট্টাল ব্যানার্জীর কাছেই ফুটবলের হাতে-খড়ি। পরে প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড় কৃষ্ণচন্দ্র পাল ওকে বড় হতে সাহায্য করেছেন।

প্রথমে গ্রীষ্মের পরে বালী প্রতিভায় খেলে বড় হবার প্রেরণায় অশোক '৬৮-তে ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য অশোকের সহায় হয় নি, তাই '৬৯-এ খিদিরপুরে নাম লিখিয়ে আবার ছোট ক্লাবে ফিরে আসে। '৬৪, '৬৫-তে আন্তঃজেলা প্রতিযোগিতা ও '৬৭, '৬৮ সালে জুনিয়ার বাংলা দলের হয়ে বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করেছে অশোক। '৬৯-এ সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের নিয়মিত খেলোয়াড় অশোক সে বছরই তেহরান সফরে গিয়েছে।

অশোক ব্যানার্জীর প্রিয় খেলোয়াড় অরুণ ঘোষ। অরুণ ঘোষের আদর্শ সামনে রেখে অরুণ ঘোষের শূন্যস্থান পূরণের জন্য যে ক'জন উঠতি তরুণ জোর কদমে এগিয়ে আসছে, অশোক ব্যানার্জী তাদের অন্যতম। মারডেকা ট্রায়ালে আদর্শিত অশোকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এস জোহা

(মহমেডান)

জাহাবাদের ছেলে জোহা খেলাধুলায় প্রথম নাম করে জামসেদপুর স্পোর্টিং দলে খেলে। জামসেদপুর ছেড়ে টিসকোয় এসে

নামডাক একটু বাড়ে। সেই সঙ্গে ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় খেলার ইচ্ছেটাও বাড়তে থাকে। '৬৭-৬৮ কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং থেকে ডাক আসামাত্রই একবারো জোহা টিসকো ছেড়ে কলকাতায় চলে এলো। কিন্তু মহমেডানে তখন মস্তাফা নির্ভরশীল গোলরক্ষক। ফলে সে বছর দু' নং গোলরক্ষক হয়েই জোহাকে খুশি থাকতে হলো।

মাঝে এমন দিন গেছে যে, মস্তাফার বদলে জোহা মাঠে নামলে দলের সমর্থকরা চটে যেতো। আর এখন জোহা না নামলেই তারা চটে যায়।

আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জোহা যাঁদের কাছ থেকে খেলা শিখেছে তাঁরা হচ্ছেন কোচ রহিম কুদরুস প্রমুখ।

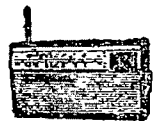
১৯৬৭ থেকে '৭০ পর্যন্ত মহমেডানে খেলার ফাঁকে জোহা রোভাস, ডুরান্ড ছাড়াও সন্তোষ ট্রফিতে খেলেছে। গতবার সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী বাংলা দলের নিয়মিত গোলরক্ষক জোহা একেবারে অস্বাভাবিক মাত্রায় যোগের সংবাদ শুনে নওগরি মাঠ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে ফাইনালে খেলার সুযোগ আর তার হয় নি।

জোহার প্রিয় খেলোয়াড়দের মধ্যে খগরাজের নাম সর্বাগ্রে। জোহা যদি খগরাজের আদর্শকে সামনে রেখে খেলে যায়, তার উন্নতি না হবার কোন কারণ নেই।

ফুটবলের মক্কানগরী কলকাতায় খেলার জন্য সারা ভারতের অনেক খেলোয়াড়েরই স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন নিয়েই জোহা কলকাতায় এসেছে। বলা বাহুল্য, জোহা সুনামও পেয়েছে। কিন্তু জোহার কাছে এসব কিছুই নয়। সে আরও ভালো খেলে আরও বড় খেলোয়াড় হতে চায়। মহমেডানের অধিনায়ক জোহা তাই নিয়মিত কোচ মমতাজ হোসেনের পরামর্শ অনুযায়ী গভীর নিষ্ঠা ও প্রত্যয় নিয়ে অনুশীলন করে চলেছে।

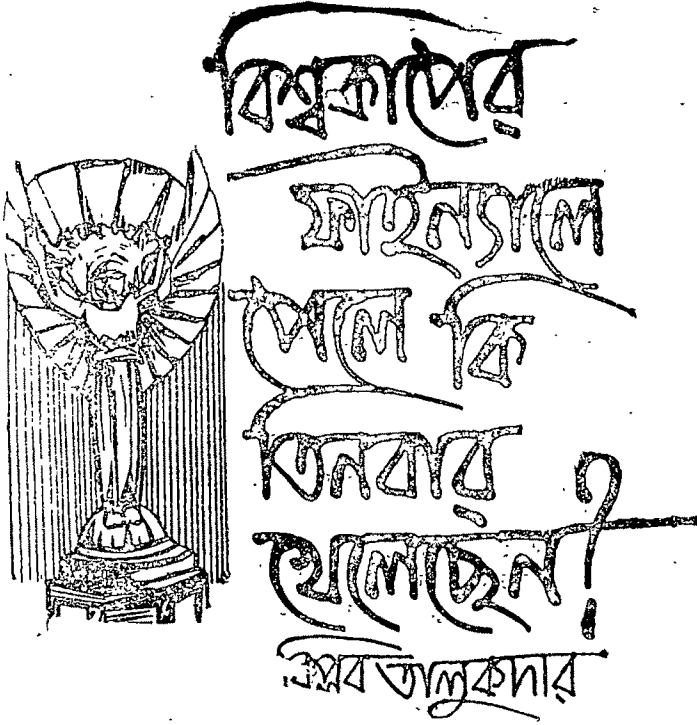
মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অ ল ও রা ল্ড
স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার
(জাপান মেক) জন-
প্রিয়।- দে শ ব্যা পী
খ্যাতি আছে। ডবল



স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7



অস্ট্রেলিয়া সিটির আজর্টেক স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের (জুড়ে রিমে ট্রফির) চূড়ান্ত খেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের রূপ-কথার রাজকুমার 'ব্র্যাকপাল' পেলো আবার শ্রদ্ধা অনন্যসুলভ ক্রীড়া-নৈপুণ্যের জন্যই নয়, একটা নতুন রেকর্ড স্থাপনের গৌরবের সূত্রে সংবাদের শিরোনামায় এসেছেন। আমাদের সংবাদপত্রগুলোতে খবর বেরিয়েছে যে, বিশ্বকাপের চার্লিশ বছরের ইতিহাসে 'পেলোই' নাকি একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি তিনটি ফাইনালে অংশ গ্রহণের সূত্রে তিনবার বিজয়ী পদক লাভ করেছেন। কিন্তু এই সংবাদের সূত্রে যে কি, তা সংবাদদাতারা উল্লেখ করেন নি। জানি না, বিদেশী কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এই সংবাদের সূত্র কিনা। তবে রেকর্ড বৃদ্ধির পাতা খোঁটে বিশ্ববাসিন্দা পেলের তিনবার বিশ্বকাপ ফাইনালে অংশ গ্রহণের কোন নজর পাওয়া যাচ্ছে না।

১৯৫৮ সালে মাত্র সতেরো বছর বয়সে ওয়াশিংটন বয়' পেলো ইনসাইড লেফট হিসেবে, ব্রেজিলের প্রথম বিশ্বজয়ী দলে খেলবার সুযোগ পান। ১৯৬৮ সালে সুইডেনে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের মূল পর্যায়ের খেলায় চতুর্থ পদের প্রতিযোগী ছিল ব্রেজিল। পল লীগের প্রথম খেলায় আন্ট্রয়ার বিরুদ্ধে এবং দ্বিতীয় খেলায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'দলের শিশু' পেলেকে সুযোগ দেওয়া হয় নি। পেলো প্রথম খেলবার সুযোগ পেলেন রাশিয়ায় বিরুদ্ধে পল লীগের শেষ খেলায়, সেই খেলায় কোচ ফিওলা ব্রেজিলের জ্যাকমণভাগে

শ্রদ্ধা নতুন তারকা পেপেই খেলবার সুযোগ দিলেন তাই নয়, দলের খেলোয়াড়দের অনুরোধে 'ক্ষুদে পাখী' গ্যারিগাও দলভুক্ত হলেন দক্ষিণ প্রান্তিক খেলোয়াড় হিসেবে। ফিওলা সেন্টার ফরোয়ার্ড 'ম্যাজোলাকে' বাসিয়ে দিয়ে ভাতাকে দিলেন সেন্টার ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব। পেলের বাদু, গ্যারিগার সমোহন, আর ভাতার লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতায় ব্রেজিল দলের পুনর্জন্ম হল। ১৯৬৮ সালে গোটেবর্গের আসরে পেলো গ্যারিগা বিশ্ব ফুটবলের আসরে পদক্ষেপ করলেন। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল এবং ফাইনালের 'ক্ষুদে পাখী' আর 'কালো মূর্ত্ত্তে' শ্রদ্ধা অংশ গ্রহণ করলেন-ই না, এই দুজনের শাণিত আক্রমণে এবং ক্রীড়াকুশলতার ব্রেজিল প্রথমবার বিশ্ব ফুটবলের শিরাসীন হল সোনার পরীওয়লা জুড়ে রিমে ব্যাপ জয় করে। পেলো কোয়ার্টার ফাইনালে ওয়েলশের বিরুদ্ধে করা একমাত্র গোলটি করে এবং সেমি-ফাইনালে ফ্রান্সের বিপক্ষে করা পাঁচটির মধ্যে দুটি গোল করে বিশ্ব ফুটবলের আঙিনায় তাঁর আবির্ভাবকে স্বর্ণলিপিতে চিহ্নিত করলেন।

১৯৬২ সালের বিশ্ব কাপের আসরে পেলের আবির্ভাব মধ্য গগনের ভাস্করের মতো ভাস্বর হতে পারলো না শ্রদ্ধা পায়ের মাংসপেশীর আঘাতের জন্যেই। চিলির রাজধানী স্যান্টিয়াগোতে অনুষ্ঠিত এই আসরে পেলো গ্রুপ-লীগের দুটি মাত্র খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম খেলায় ভিনা-ডেল-মারের সমুদ্র তীরবর্তী মনো-

রন মাঠে অস্ট্রিকোর বিরুদ্ধে দুটো গোলের মধ্যে একটি করলেও পরবর্তী খেলায় পেলো একেবারে বসে গেলেন। চেকোস্লোভাকিয়ার সাথে পল লীগের দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবার সময় প্রথমার্ধের ২৫ মিনিটের সময় গোলপোস্টের পাদদেশে বাঁ পায়ে প্রচণ্ড সট করে গুরুতর ভাবে মাংসপেশী সংকোচনে আক্রান্ত হলেন। আর চিলির বিশ্বকাপের আসরে এইটিই হল তাঁর সেবারের মতো শেষ খেলা।

আহত পেলের শুনাস্থান সেবারে পূরণ করলেন আমারিন্ডো। শ্রদ্ধা তাই নয়, গ্রুপ লীগে ১ গোলে পিছিয়ে থেকেও স্পেনের বিরুদ্ধে আমারিন্ডোব দু' গোলেই ব্রেজিল জয়লাভ করলো। পেলের পরিবর্ত খেলোয়াড় আমারিন্ডোর ক্রীড়া-দক্ষতা ব্রেজিলকে ঐ বছরের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় ৩-১ গোলে ইংল্যান্ডকে, সেমি-ফাইনালে ৪-২ গোলে চিলিকে এবং ফাইনালে ৩-১ গোলে চেকোস্লোভাকিয়াকে হারাবার ব্যাপারে মস্ত এক ভূমিকা নিয়েছিল। তা ছাড়া ফাইনালে আমারিন্ডোর গোলেই ০-১ গোলে পেছিয়ে থাকা ব্রেজিল খেলায় সমতা ফিরিয়ে এনে শেষ অবধি ৩-১ গোলে জয়ের সূত্রে পর পর দু' বার বিশ্ব-শ্রেষ্ঠের আখ্যা লাভ করেছিল।

চিলিতে পল লীগের শেষ খেলা থেকে ফাইনাল অবধি বিভিন্ন খেলায় যাঁরা ব্রেজিল দলে খেলেছেন, তাঁদের নামের তালিকা নিচে দেওয়া হলঃ—

ব্রেজিল-বনাম-স্পেন—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ১৬ স্যাপ্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যাপ্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিগা, ভাতা, অ্যামারিন্ডো, জাগালো।

কোয়ার্টার ফাইনালঃ—ব্রেজিল বনাম ইংল্যান্ডঃ—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ডি স্যাপ্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যাপ্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিগা, ভাতা, অ্যামারিন্ডো, জাগালো।

সেমি-ফাইনালঃ ব্রেজিল বনাম চিলি—

ব্রেজিলঃ—গিলমার, ডি স্যাপ্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যাপ্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিগা, ভাতা, অ্যামারিন্ডো, জাগালো।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ফাইনাল: ব্রজিল বনাম চেকো-শ্লোভাকিয়া—

ব্রজিল—গলমার, ডি স্যান্টোস, মউরো, জোজিমো, এল স্যান্টোস, জিটো, ডিডি, গ্যারিগা, ভাবা, অ্যামারিন্ডো, জাগালো।

দেখা যাচ্ছে যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সাথে পূর্ন লীগ ম্যাচ খেলবার পর থেকে ব্রজিল ফাইন্যাল অবধি একই টিম মাঠে নামিয়েছে। তা ছাড়া সে সময়ে বিশ্বকাপে, শূদ্ধ বিশ্বকাপে কেন, কোন খেলাতেই বদলী খেলোয়াড় নামাবার বিধান ছিল না। তাই ব্রজিলের ১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ফাইন্যাল সমেত শেষ খেলাতেও পেলো যে অংশ নেন নি, এটা একটা তথ্যানভর সত্য। ১৯৬৬ সালের লন্ডনের আসরে পেলের টিম

ব্রজিল কোয়ার্টার ফাইন্যালাই পৌঁছয় নি। তাই সে বছর পেলের ফাইন্যালাই খেলার প্রশ্নই ওঠে না। তবে এবারে (১৯৭০) পেলো ক্রীড়া-জীবনের অপরাহ্নবেলায় মধ্য-গগনের সূর্যের মতোই দীপ্ত তেজে খেলে শূদ্ধ দলকে ফাইন্যালাই তোলেন নি, ফাইন্যালাই তার উপস্থিতিতে জয়ের সাথে সাথে প্রথম গোল করার সূত্রে চিরন্তন করে রেখেছেন।

তা হলে? পেলো ফাইন্যালাই অংশ নিয়েছেন ১৯৫৮-তে গোটেবার্গে এবং ১৯৭০-এ মেক্সিকো সিটির আজটেক স্টেডিয়ামে। তবে ১৯৬২-তে বিজয়ী দলের খেলোয়াড় হিসেবে ফাইনালের বিজয়ীর পদক লাভ করে থাকবেন। কিন্তু এ থেকে কি প্রমাণিত হয় যে, পেলো তিনবার বিশ্বকাপ ফাইন্যালাই খেলেছেন? না, বিশ্বকাপের ইতিহাসও তা বলে না।



॥ পেলো ॥

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার তিনটি ফাইন্যালাই পেলো খেলেন নি

॥ চাষ-আবাদ-ফসল ॥ চাষ-আবাদ-ফসল ॥

আগামী বৈশাখ থেকে মাসিক বঙ্গমতীর বর্ষারস্ত্র বৈশাখ সংখ্যা থেকে প্রতি মাসে অনন্যসাধারণ ও অপূর্ব নতুন নিয়মিত বিভাগের প্রবর্তন হচ্ছে—

● চাষ-আবাদ-ফসল ●

কৃষি-জীব ও কৃষি-ব্যবসায়ীদের
সাহায্যকল্পে এই প্রথম



ফল-ফুল-
শাকশজী-চাল-
ডাল-পাট
ইত্যাদি ফসলের
বাস্তব দিক-নির্দেশ
হবে এই নতুন
বিভাগ

চাষ
আবাদ
ফসল

বিশেষজ্ঞদের লেখা। সেই সঙ্গে ছবি,
আলোকচিত্র এবং আরও অনেক কিছু

মাসিক বঙ্গমতী

প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত
হয়ে যায়! এখনই আপনার অর্ডার
পেশ করুন। স্থানীয় বিক্রেতার
কাছে, কিংবা সরাসরি আমাদের
কার্যালয়ে। প্রতি কপি দেড়
টাকা। ষাণ্মাসিক ন' টাকা। বার্ষিক
আঠারো টাকা।

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা - ১২

॥ চাষ-আবাদ-ফসল ॥ চাষ-আবাদ-ফসল ॥

রেকর্ডস এর পাতা থেকে • • •

অলিম্পিক ফুটবল বিজয়ীদের তালিকা

১৯০৮	গ্রেট ব্রিটেন	১৯৩৬	ইতালী
১২	ঐ	৪৮	সুইডেন
২০	বেলজিয়াম	৫২	হাঙ্গেরী
২৪ ও	উরুগুয়ে	৫৬	রাশিয়া
২৮		৬০	যুগোস্লাভিয়া
৩২	প্রতিযোগিতা হয় নি	৬৪	হাঙ্গেরী
		৬৮	হাঙ্গেরী

ভারতের অলিম্পিক ফুটবল অধিনায়কগণ

১৯৪৮	লণ্ডন	টি, আও
৫২	হেলসিংকি	শৈলেন বায়া
৫৬	মেলবোর্ণ	সমর ব্যানার্জী
৬০	রোম	প্রদীপ ব্যানার্জী
৬৪	প্রাথমিক পরেই ভারত ইরানের কাছে পরাজিত হয়, চুনি গোস্বামী অধিনায়ক ছিলেন।	

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফলাফল

বর্ষ	বিজয়ী	অনুষ্ঠান কেন্দ্র
১৯৪১	বাংলা	কলকাতা
৪২	খেলা হয় নি	
৪৪	দিল্লী	দিল্লী
৪৫	বাংলা	বোম্বাই
৪৬	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৪৭	বাংলা	কলকাতা
৪৮	খেলা হয় নি	
৭৯-৫০	বাংলা	কলকাতা
৫১	বাংলা	বোম্বাই
৫২	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৫৩	বাংলা	কলকাতা
৫৪	বোম্বাই	মাদ্রাজ
৫৫	বাংলা	এণ্ডিকুলাম
৫৬	হায়দ্রাবাদ	ত্রিবাঙ্গনা
৫৭	হায়দ্রাবাদ	হায়দ্রাবাদ
৫৮	বাংলা	মাদ্রাজ
৫৯	বাংলা	নগুগা
৬০	মাদ্রাজ	কোজিকোন্ড
৬১	রেলওয়ে	বোম্বাই
৬২	বাংলা	বাঙ্গালোর
৬৩	বোম্বাই	মাদ্রাজ
৬৪	রেলওয়ে	গোয়াটি
৬৫	অন্ধ	কুইলন
৬৬	রেলওয়ে	হায়দ্রাবাদ
৬৭	মহীশূর	কটক
৬৮	মহীশূর	বাঙ্গালোর
৬৯	বাংলা	গোয়াটি



॥ চুনি গোস্বামী ॥

শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে চুনি গোস্বামী নিজেই একটা আলো অন্ময়। চুনির মতো খেলোয়াড় আর কি আমরা কোনদিনই দেখতে পাবো না?



॥ পি. কে. ব্যানার্জী ॥

খেলোয়াড় পি. কে. ব্যানার্জীকে নতুন রূপে আমরা এখন পাচ্ছি বেতার ডায়াকার হিসেবে।

সাধারণ বঙ্গমতী

আই এফ এ শীল্ড বিজয়ীদের তালিকা

১৮৯৩-৯৪	রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস	১৯১১	মোহনবাগান
৯৫	রয়্যাল ওয়েলশ কবলিয়ার্স	১৯১২-১৩	রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস
৯৬	ক্যালকাটা	১৯১৪	কিংস ওন রেজিমেন্ট
৯৭	ডালহৌসী	১৯১৫	ক্যালকাটা
৯৮	গুসেটার রেজিমেন্ট	১৯১৬	সেকেন্ড নর্থ স্টার্টার্ডস
৯৯	মডিথ ল্যান্কাশায়ার রেজিমেন্ট	১৯১৭	১০ মিডিল গোল্ড
১৯০০	ক্যালকাটা	১৯১৮	টোনিং রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ন
১৯০১	রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস	১৯১৯	ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন ব্রুক নশায়ার
১৯০২	ইইল্যাণ্ডার্স	১৯২০	ব্র্যাক ওয়াচ
১৯০৩-৪	ক্যালকাটা	১৯২১	উরগেটারশায়ার রেজি:
১৯০৫	ডালহৌসী	১৯২২-২৪	ক্যালকাটা
১৯০৬	ক্যালকাটা	১৯২৫	সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ন রয়্যাল স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯০৭ থেকে ১০ এইচ এল আই গার্ডস		১৯২৬-২৮	শেরউড মরগেটার্স
২৯	রয়্যাল আর্নস্টার্স	৩০	সিফোর্থ ইইল্যাণ্ডার্স
৩১	এইচ এল আই	৩২	এলেক্স রেজি:
৩৩	ডি সি এল আই	৩৪	কে আর আর
৩৫	ইস্ট ইয়কস	৩৬	মহমেডান স্পোর্টিং
৩৭	গিল্ড ফিল্ড বিগেড	৩৮	ইস্ট ইয়কস
৩৯	পুলিশ	৪০	এরিয়ান্স
৪১-৪২	মহমেডান স্পোর্টিং	৪৩	ইস্ট বেঙ্গল
৪৪	বেঙ্গল এন্ড আসাম রেলওয়ে	৪৫	ট্রু
৪৬	খোলা হয় নাই	৪৭-৪৮	মোহনবাগান
৪৯-৫০	ইস্টবেঙ্গল	৫২	শীল্ড ফাইনাল পরিত্যক্ত ফাইন্যান্সিস্ট, মোহনবাগান-রাজস্থান
৫৩	ইণ্ডিয়ান কালচার লীগ, বোম্বাই	৫৪	মোহনবাগান
৫৫	রাজস্থান	৫৬	মোহনবাগান
৫৭	মহমেডান স্পোর্টিং	৫৮	ইস্টবেঙ্গল
৫৯	শীল্ড ফাইনাল পরিত্যক্ত, ফাইন্যান্সিস্ট, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল	৬০	মোহনবাগান
৬২	মোহনবাগান	৬১	মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল (যুগ্মবিজয়ী)
৬৪	শীল্ড ফাইনাল পরিত্যক্ত, ফাইন্যান্সিস্ট, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল	৬৩	বি এন আর
৬৮	পরিত্যক্ত	৬৫-৬৬	ইস্টবেঙ্গল
৬৯	মোহনবাগান	৬৭	ফাইন্যান্সিস্ট-মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল, শীল্ড ফাইনালের ভাগ্য অনির্ধারিত

প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগ বিজয়ীর তালিকা

বিজয়ী	বিজয়ী
১৮৯৮ ফার্স্ট গুয়ার্ডস	৯৯ ক্যালকাটা
১৯০০-০১ রয়্যাল আইরিশ	১০২ কিংস ওন স্কটিশ
০৩ ৯০ ইইল্যাণ্ডার্স	১০৪-০৫ কিংস ওন ল্যান্কাশায়ার
০৬ এইচ এল আই	০৭ ক্যালকাটা
০৮-০৯ গার্ডস ইইল্যাণ্ডার্স	১০ ডালহৌসী
১১ ৭০ কোম্পানী আর জি এ	১২-১৩ ব্র্যাক ওয়াচ
১৪ কিংস ওন রেজি:	১৫ ১০ মিডিল গোল্ড
১৬ ক্যালকাটা	১৭ লিনকোলনস
১৮ ক্যালকাটা	১৯ দ্বাদশ স্পেশাল গার্ডস
২০ ক্যালকাটা	ব্যাটেলিয়ন
২১ ডালহৌসী	২২-২৩ ক্যালকাটা
২৪ ক্যানেরনস	২৫ ক্যালকাটা
২৬-২৭ ফার্স্ট ব্যাটেলিয়ন নর্থ স্টার্টার্ডস	২৮-২৯ ডালহৌসী
৩০ ফুটবল লীগ বঙ্গ	৩১ ডারহাম এল আই
৩২-৩৩ ডারহাম এল আই	৩৪-৩৫ মহমেডান স্পোর্টিং
৩৬ মোহনবাগান	৪০-৪১ মহমেডান স্পোর্টিং



৥ বলরাম ৥

বলরামের মত খেলোয়াড় মেম্বারনে খেলেন থেকে খোঁজবের। কিন্তু দ্বিতীয় বলরামের দেখা ততো আমরা আজো পেলাম না?



৥ জর্নাল লিং ৥

জর্নাল লিং-এর খেলার কথা আমরা কোনদিনই ভুলতে পারবো না।



৥ কাজল মখাশী ৥

কাজলের মতো বলের কপ্টোল ভারতের খুব কম খেলোয়াড়ের মধ্যেই দেখা গেছে।

দাণ্ডাহিক বঙ্গমতী

বিজয়ী

- ৪২ ইস্টবেঙ্গল
৪৫-৪৬ ইস্টবেঙ্গল
৪৮ মহঃ স্পোর্টিং
৫১ মোহনবাগান
১৯৫০ ফুটবল লীগ মাঝপথে পরিত্যক্ত

- ৫৮ ইস্টার্ন রেল
৬১ ইস্টবেঙ্গল
৬৬ ইস্টবেঙ্গল
৬৮ পরিত্যক্ত

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের তালিকা

- ১৮৮৮ রয়্যাল স্কচ ফুজিলার্স
১১-১২ স্কটিশ বর্ডার্স
১৬ এস এল আই
১৯০০-০১ এস ডবলিউ বর্ডার্স
০৩ রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস
০৫ রয়্যাল ড্রাগনস
০৮-০৯ লেন ফুজিলার্স
১৩ লেন ফুজিলার্স
২০ ব্যাক ওয়াচ
২২ লেন ফুজিলার্স
২৪ ফার্স্ট উরশেষ্টার্স
২৬ ভারহাম এল আই
২৮ শেরউড ফরেস্টার্স
৩১ ডেভনশায়ার রেজিঃ
৩৪ বি, কোর, সিগন্যালস
৩৫ বর্ডার রেজিঃ
৩৭ বর্ডার রেজিঃ
৪০ মহম্মেডান স্পোর্টিং
৫০ হায়দ্রাবাদ সিটি পুলিশ
৫৩ মোহনবাগান
৫৫ মাদ্রাজ রেজিঃ সেন্টার
৫৭ হায়দ্রাবাদ পুলিশ
৫৯ মোহনবাগান
৬১ হায়দ্রাবাদ পুলিশ
৬২ প্রতিযোগিতা বন্ধ
৬৬ গুর্খা ব্রিগেড
৬৮ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স

রোভার্স কাপ বিজয়ীদের তালিকা

- ১৮ ১১-১২ উরশেষ্টার্স
১৪-১৫ রয়্যাল স্কচ ফুজিলার্স
১৭ মিডলসেক্স রেজিমেন্ট
১৯ রয়্যাল আইরিশ রেজিঃ
১৯০১ রয়্যাল আইরিশ রেজিঃ
০৫ সিকোর্থ হাইল্যান্ডার্স
০৭ ইস্ট ল্যাংকাশায়ার
০৯-১০ ল্যাংকাশায়ার রেজিঃ
১২ উরশেষ্টার্স রেজিমেন্ট
১৪-২০ প্রতিযোগিতা বন্ধ
২২-২৩ ভারহাম লাইট ইনফ্যান্ট্রি
২৭ চেশায়ার রেজিঃ
২৯ সেকেন্ড ব্যাটেলিয়ান ওয়ার্কশায়ার রেজিঃ
৩০ কে ও এস বি
৩২ রয়্যাল আইরিশ ফুজিলার্স
৩৪ শেরউড ফরেস্টার্স

বিজয়ী

- ৪৩-৪৪ মোহনবাগান
৪৭ ফুটবল লীগ বন্ধ
৪৯-৫০ ইস্টবেঙ্গল
৫২ ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৪-৫৬ মোহনবাগান
১৯৫৭ মহঃ স্পোর্টিং
৫৯-৬০ মোহনবাগান
৬২-৬৫ মোহনবাগান
৬৭ মহম্মেডান স্পোর্টিং
৬৯ মোহনবাগান
৮৯-৯০ এইচ এল আই
৯৩-৯৫ এইচ এল আই
৯৭-৯৯ ব্যাক ওয়াচ
০২ হ্যাম্পশায়ার রেজিঃ
০৪ নর্থ স্ট্যাফোর্ডশায়ার
০৬-০৭ ক্যামেরোনিয়ান্স
১০ রয়্যাল স্কটস
১৪-১৯ খেলা হয় নি
২১ থার্ড উরশেষ্টার্স
২৩ চেশায়ার রেজিমেন্ট
২৫ শেরউড ফরেস্টার্স
২৭ ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাশায়ার রেজিঃ
২৯-৩০ ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাশায়ার রেজিঃ
৩২-৩৩ কিংস শ্রুশায়ার এল আই
৩৬ এ এণ্ড এস হাইল্যান্ডার্স
৩৮ এস ডবলিউ বর্ডার্স
৪১-৪৯ প্রতিযোগিতা বন্ধ
৫১-৫২ ইস্টবেঙ্গল
৫৪ হায়দ্রাবাদ পুলিশ
৫৬ ইস্টবেঙ্গল
৫৮ মাদ্রাজ রেজিঃ সেন্টার
৬০ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল
(যুগ্ম বিজয়ী)
৬৩-৬৫ মোহনবাগান
৬৭ ইস্টবেঙ্গল
৬৯ গুর্খা ব্রিগেড



॥ অরুণ ঘোষ ॥

অরুণ ঘোষ আজো খেলছেন—ক্রীড়া
ভার সেই আগেকার মননাতান খেলা
আর আমরা দেখতে পাই না।



॥ শান্ত মিত্র ॥

শান্ত মিত্র যেন আর আগের মতো
খেলতে পারছেন না।



॥ ধগুরাজ ॥

ভারতের সেরা গোলরক্ষক ধগুরাজের
খেলা এখন শেষ প্রান্তে।

দাপ্তরিক বঙ্গমতী

৩৭-৩৮ বাক্সেলের মুসলিম

- ৪০ মহম্মেডান স্পোর্টিং
৪২ বাটা স্পোর্টিং ক্লাব
৪৪ ব্রিটিশ বেস রি-এনফোর্সমেন্ট ক্যাম্প
৪৬ ব্রিটিশ বেস রি-এনফোর্সমেন্ট ক্যাম্প
৪৮ বাক্সেলের মুসলিম

৫০-৫৪ ছায়দ্রাবাদ পুলিশ

- ৫৬ মহম্মেডান স্পোর্টিং
৫৮ ক্যান্টনমেন্ট
৬০ অন্ধ পুলিশ
৬২ ইস্টবেঙ্গল ও অন্ধ পুলিশ (যুগ্ম বিজয়ী)
৬৪ বি এন আর
৬৬ মোহনবাগান
৬৮ মোহনবাগান

৪৯ ফিল্ড ব্রিগেড

- ৪১ ওয়েলস রেজিঃ
৪৩ আর এ এফ
৪৫ মিলিটারী পুলিশ
৪৭ খেলা হয় নি
৪৯ ইস্টবেঙ্গল
৫১ মোহনবাগান
৫৩ ছায়দ্রাবাদ পুলিশ
৫৫ মহম্মেডান স্পোর্টিং
৫৭ ই এম ই সেন্টার
৬১ অন্ধ পুলিশ
৬৩ মকতলাল
৬৫ ইস্টবেঙ্গল
৬৭ ইস্টবেঙ্গল

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সাক্ষাৎকারের ফলাফল

১৯২৫	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
২৬	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	১
	ঐ	০	ঐ	০
২৭	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
২৮	মোহনবাগান	২	ঐ	১
	ঐ	০	ঐ	০
৩২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ঐ	৩	ঐ	২
৩৩	ইস্টবেঙ্গল	২	ঐ	২
	ঐ	১	ঐ	১
৩৪	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
	ঐ	১	ঐ	১
৩৫	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	ঐ	১	ঐ	১
৩৬	ঐ	৪	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
৩৭	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
৩৮	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	১
৩৯	মোহনবাগান	২	ঐ	১
৪০	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	"	০	"	০
৪১	"	২	মোহনবাগান	০
	"	২	"	০
৪২	"	২	মোহনবাগান	২
	"	১	"	০
৪৩	"	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৪	মোহনবাগান	১	"	০
	"	২	"	০
৪৫	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৬	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০



॥ অশোক চ্যাটার্জী ॥

অশোকের খেলার ভঙ্গী এখনো চকিত।
চমকে সকলকে চমৎকৃত করে।



॥ বিনয় মজুমদার ॥

ভাবতে অন্যাক আগে, বিনয় মজুমদারকে
এখনো খেলাতে দেখা যায়।



॥ পি সিংহ ॥

প্রশান্তর খেলা এখনো দর্শকদের অবাক
বিশ্বাসে হতবাক করে দেয়।

দ্ব্যস্তাহিক বঙ্গমতী

৭৮	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	০
৪৯	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
		২		১
৫০	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	২
৫১	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
৫২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
		১	মোহনবাগান	০
৫৩	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৫৪	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	১
৫৫	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৫৬	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
		০		০
৫৭	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৫৮	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	১
৫৯	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬০	মোহনবাগান	০	ইস্টবেঙ্গল	০
	মোহনবাগান	২	ইস্টবেঙ্গল	০
৬১	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬২	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
পে. অফ্‌ ম্যাচ মোহনবাগান		২	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৩	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	০
	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	০
৬৪	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	মোহনবাগান	৩	ইস্টবেঙ্গল	১
৬৫	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
৬৬	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	১
	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
৬৭	ইস্টবেঙ্গল	২	মোহনবাগান	১
	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
৬৮	মোহনবাগান	১	ইস্টবেঙ্গল	০
			(স্বপার লীগ)	
৬৯	ইস্টবেঙ্গল	১	মোহনবাগান	০
	ইস্টবেঙ্গল	০	মোহনবাগান	০
			(স্বপার লীগ)	



॥ সি প্রসাদ ॥

মোহনবাগানের রক্ষণভাগের প্রধান
শ্রদ্ধ এখনো সি প্রসাদই।



॥ মানস ব্যানার্জী ॥

কালীঘাটের অধিনায়ক মানস চিরকাল
মাকারি-আনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ
রইলেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) ১লঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিরহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

বেদান্তসার :

শ্রীমদ্ পরমহংস সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত; ধর্মশাস্ত্র প্রচার-বৃত্তী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত (স্ববোধিনী-টীকা সমং)। বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মবিদ্যার দিব্যজ্যোতিঃ বিবশিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

মাননোদ্যম :

বশিষ্ঠানন্দ পুরী (অনুবাদ)।

মূল্য—২-০০ টাকা।

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ :

ভারতীতীর্থ বিরচিত। সুপণ্ডিত শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত। চারি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ১ম—৪-০০ এবং ২য়, ৩য় ও ৪র্থ মূল্য—প্রতি খণ্ড—১-০০ টাকা।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিত্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত। মূল্য—১ম খণ্ড—৫-০০ টাকা ৩য় খণ্ড—৪-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরওসংহিতা, ব্রহ্মসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত, যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ দুস্তাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের সমাবেশ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত অমিয় নিস্যাঙ্গিনী বাণী ভক্তপ্রবর উমাপদ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মহামূল্য রত্নের সন্নিবেশ। বোর্ড বাঁধাই মূল্য—২-৫০ টাকা।

গবন-বিজয়-স্বরোদয় :

বায়ু জরই যোগের শ্রেষ্ঠ সাধনা। অলৌকিক সত্য নির্দেশক যোগক্রিয়ার গ্রন্থ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

ক্লিয়াকান্ড-বারিধি : (১ম খণ্ড)

(ত্রিবেদ, উপনিষদ, স্মৃতি ও সর্বতন্ত্র হইতে সঙ্কলিত। সংবধিত সংশোধিত ও সুসংস্কৃত সংস্করণ)।

বহু আয়াস ও অধ্যবসায় আহত এবং প্রচুর অর্থব্যয়ে মুদ্রিত আর্থ সংকরমানুষ্ঠান সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্যপূর্ণ এই বিরাট গ্রন্থশাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও স্বল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। দীক্ষা প্রকরণ, নিত্যকৃত্য প্রকরণ, পূজা প্রকরণ, ধ্যানাদি প্রকরণ, ন্যাস প্রকরণ, বৃত্ত প্রকরণ, যাত্রা প্রকরণ, আসন ও মুদ্রা প্রকরণ-সমন্বিত মূল বিষয়-সমূহে ৮৬৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ড। মূল্য—১০-০০ টাকা।

হিন্দুধর্ম পরিচয় :

ধর্মশাস্ত্রবিশারদ শ্রীসনৎকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

আত্মানুসন্ধান :

শ্রীসুশীলকুমার ঘোষাল প্রণীত। প্রতিটি ধর্মপ্রাণ নর-নারীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। মূল্য—২-৫০ পয়সা।

হিন্দু ও আত্মজান :

মূল্য—৪-০০ টাকা।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য :

যোগীপ্রবর মহর্ষি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য বিরচিতম্। মূল সংস্কৃত, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসমন্বিত। মূল্য—২-০০ টাকা।

গণতীর্থ সাহায্য :

শ্রীকাশীসাহায্য, শ্রীগয়াসাহায্য, শ্রীবৈদ্যনাথ সাহায্য, শ্রীপ্রয়াগসাহায্য, শ্রীবৃন্দাবনসাহায্য। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩-০০ টাকা।

কল মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু প্রচী-

কুকুমী

পুলতা হয় তা!

10 AUG 1970



কুকুমী
গুড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিভূগু করে।
কুকুমী পিড়র খাত্ত
ও রুগীর
পাখা নির্ভায়ে
ব্যবহৃত হয়।

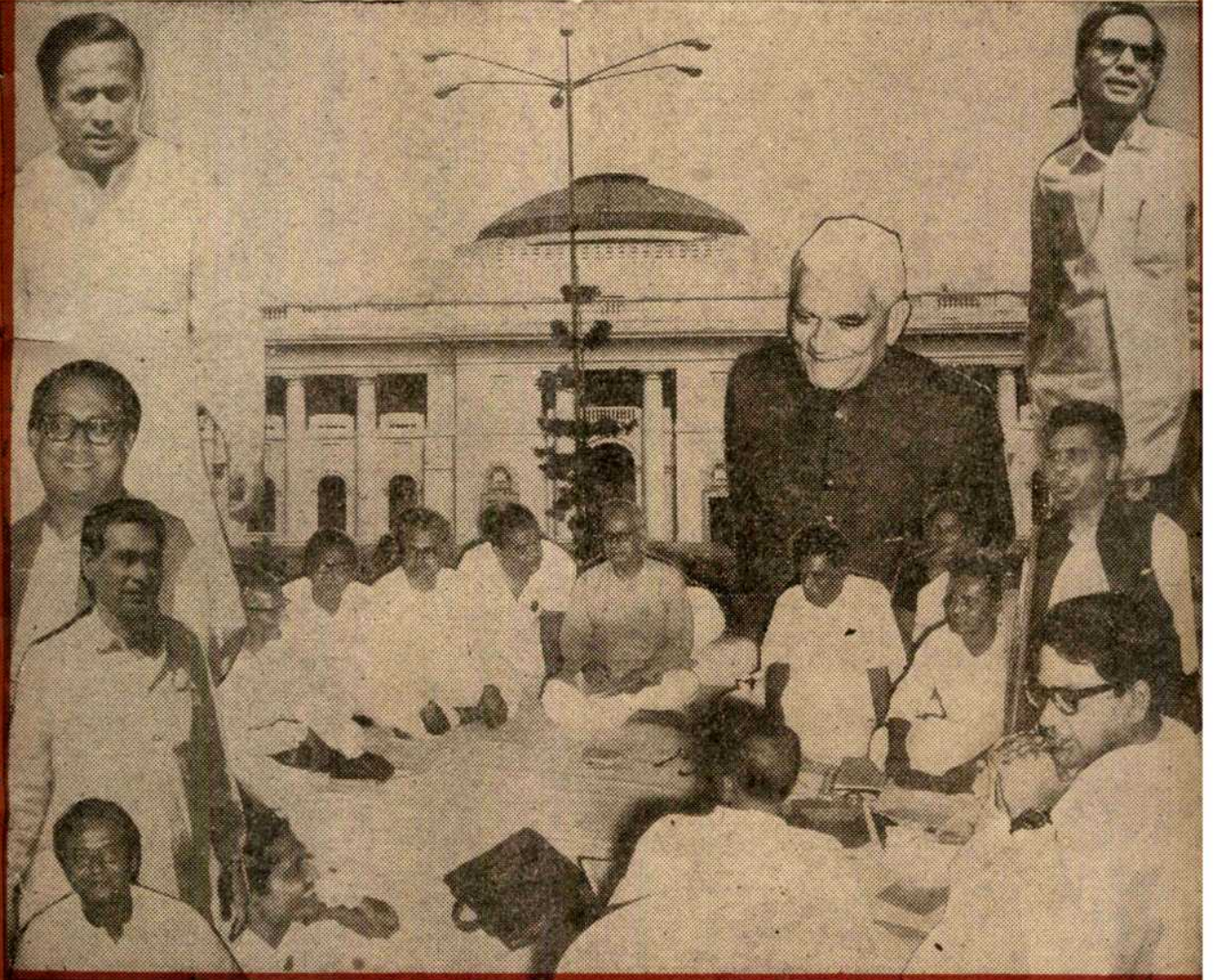
কুকুমী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রিত
গুড়ো মশলা।
এর পেছনে
দায়ছে ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

শ্রুতকারক
কুকুমী দত্ত (স্বাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কালীপুর



সাপ্তাহিক বসুমতী

“বিধানসভাকে এই ভয়েই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট
পার্টিতে যোগদান করছে না—এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পর
আট পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে কিছু দল আর বাংলা
কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে না থেকে সি পি এম-এর দিকে মন
ফেরাবে”। (‘সপ্তাহের বোঝা’ থেকে)



৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 6, 6th August, 1

বোম্বোলীন
হাউস



ফেমিলা প্রা
সব গুণবীর জন্ম

সূচী

বিষয়	উপখণ্ড	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০৫	৩২৩
আজকের মানুষ	১০৬	৩২৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করাপ্রসাদ বসু	৩২৫
স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী (কবিতা)	— মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত	৩২৭
বঙ্গদর্শন	১০৭	৩২৮
ভারতদর্শন	১০৮	৩৩২
আন্তর্জাতিক	১০৯	৩৩৪
সপ্তাহের বোঝা	— কুন্তিবাস ওঝা	৩৩৬
স্রোতের সঙ্গ (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৯
শহর কলকাতা	— গিগেন	৩৪২
চাকার চিঠি	১১০	৩৪৬
আগন্তু বিষয় (প্রবন্ধ)	— নির্মল বসু	৩৪৮
সুভাষা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনীতি (প্রবন্ধ)	— সুধাংশু দে	৩৫০
দাক্ষিণ্য-পরিভ্রম	— পদমকেশ দে সরকার	৩৫৩

যে কোন

গয়না

আর

আমল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড প্রাপ্তসমস্ত অব লেট
প্রম. বি. সরকার



সূচী

বিষয়

লেখক

পৃষ্ঠা

স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক
বিপ্লববাদ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী

— গোরাচাঁদ কুন্ডু

৪৫

১০৭

৩৫৭

আনন্দরূপম্ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)

— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

১০৫

১০৭

৩৬০

অপ্রাকৃত কবিতাশৃঙ্খ (কবিতা)

— উল্লাস

১০৫

১০৭

৩৬২

মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)

— বিশ্বনাথ ঘোষ

১০৫

১০৭

৩৬৩

বান্দা (গল্প)

— খায়রুল বাসার

১০৫

১০৭

৩৬৬

প্রশ্নমেলা

— ...

১০৫

১০৭

৩৭২

রত্নমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে

— শিলালি

১০৫

১০৭

৩৭৪

ব্রহ্মজগৎ

— ...

১০৫

১০৭

৩৭৬

খেলার রাজার রাজা

— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

১০৫

১০৭

৩৮০

খেলাঘড়া

— শান্তিপ্রিয়

১০৫

১০৭

৩৮২

বিভাদয়ের বই

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের বৈপ্লবিক

সংগ্রামের ইতিহাস :

প্রথম খণ্ড ২০'০০

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : ১ম ১৬'০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫'০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫'০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [সংকলন]

বিজ্ঞানী স্বামী

জগদীশচন্দ্র ৬'০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সন্ধানে ১০'০০

নেপাল মজুমদারের

ভারতে জাতীয়তা ও

আন্তর্জাতিকতা এবং

রবীন্দ্রনাথ : প্রথম খণ্ড ১০'০০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১০'০০

ডঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্যের

পথিকৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ৮'০০

নারায়ণ চৌধুরীর

সাহিত্য ও সমাজ মানস ৬'০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের

ময়ূরপঙ্খী ৬'০০

মকরমুখী

৬'০০ [মন্তব্য]

সাগরদাঁড়ী

শ্রীকথকঠাকুরের

কণ্ঠকাবতী ৩'৫০

শ্রীকথক ঠাকুরের

অথ ভারত কথকতা ৩'০০

মোহিতলাল মজুমদারের

সাহিত্য-বিচার ৮'৫০

কবি শ্রীমধুসূদন ১০'৫০

বিক্রম-বরণ ৬'৫০

সাহিত্য-বিতান ৯'৫০

বাংলার নবযুগ ৮'০০

শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র [মন্তব্য]

প্রের্ততম ও বৃহত্তম পূজা-বার্ষিকী

শারদীয়া ১৩৭৭

কিশোর ভারতী

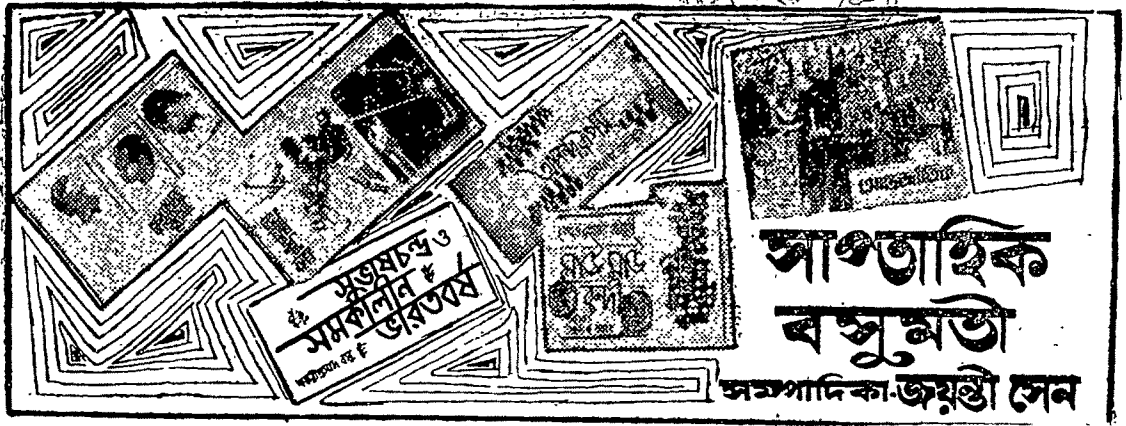
বিষয়বস্তুর সামান্য আভাস :

- বাংলা সাহিত্যের সর্বজনাগ্রন্থ চোদ্দটি চরিত্রের অভাবিত সমারোহ —যাদের দলপতি ঘনাদা, তৈনাদা, হরবর্ধনের মত মহাপুরুষেরা
- বহুকাল পরে সূদীর্ঘ রহস্যোপন্যাসে রহস্যভেদী কীরিটী রায়
- সাগরতলে অবতরণের অমর কাহিনী
- সমুদ্র-গর্ভে বাস্তবে সার্থক অভিযানের শিহরণজাগানো ইতিকথা
- অন্যান পনেরটি উপন্যাস ও উপন্যাসের মত গল্প
- চিত্রে সূদীর্ঘ গোয়েন্দা-কাহিনী
- চিত্রে হাস্যোজ্জ্বল কাহিনী
- প্রায় শতাধিক লেখক-সমাবেশ

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে ৬-০০

কার্যালয় : ৮/৩ চিত্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ ৥ ফোন : ৩৪-৩১৫৭

রিনোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড ৯ কলিকাতা ৯ ফোন : ৩৪-৩১৫৭



বৃহস্পতিবার, ২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
৭৫ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

Price : 30 Paise
Thursday, 6th August, 1970

বিধানসভা বাতিলের পর

গত ৩০শে জুলাই রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এক বিশেষ হুকুম-নামা বলে বাতিল করে দিয়েছেন। গত ১৬ই মার্চ শরিকী স্বদেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর চার মাসের ওপর বিধানসভাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। এভাবে বাঁচিয়ে রাখার পর নেপথ্যে চলছিল পুনর্নির্বাচন এড়িয়ে একটি জনপ্রিয় সরকার গঠনের প্রচেষ্টা। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে সেই নেপথ্য কাহিনী এখন আর অজানা নয়। আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের যুক্ত মোর্চায় এবং নব কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থনে পশ্চিমবঙ্গে আর একটি সরকার গঠন হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের সতর্ক দৃষ্টির জন্য শেষ পর্যন্ত সরকার গঠনে আগ্রহী দলগুলির সাধ মিটল না, আশাও মিটল না। কংগ্রেসের কোনো রকম সমর্থনে ফরওয়ার্ড ব্লক সরকার গঠনে অস্বীকৃত হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠনের আশা বিলুপ্ত হয়। হয়তো সেই কারণে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের পক্ষে রাজ্যপালকে না জানিয়ে উপায় ছিল না যে, পশ্চিমবঙ্গে আর একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে যে, ছয় পার্টির সঙ্গে অন্য একটি দলের গোপন শলা-পরামর্শের ফলে আর একটি সরকার গঠনের সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠছিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটলে নাটকীয় দ্রুততার মধ্যে যদি বিধানসভা বাতিল করা হয়, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই। এতো দ্রুত বিধানসভা বাতিল করার কথা কেন্দ্রীয় সরকারও ভাবেন নি। ৯ ঘণ্টার কটিকা সফরে কলকাতার এসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জানিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলা ও কলকাতার

উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি অধিকতর মনো-যোগী। বিধানসভা ভেঙে দেওয়া না-দেওয়ার প্রশ্নটা নির্ভর করছে রাজ্যপালের ওপর। বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল নয়াদিল্লী থেকে ফেরার পর দমদম বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কথা তিনি ভাবছেন না, যদি একটা জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই দিকেই তিনি চেষ্টা করছেন।

সেই চেষ্টা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পাল্পস্পর্শক অবিশ্বাস, শ্রেণীগত স্বার্থ ও বিক্ষুব্ধ জনগণের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেই সচেতন রাজনৈতিক দলগুলি জনপ্রিয় সরকার গঠনে আগ্রহী দলগুলিকে নিম্নাশ করেছে, ব্যর্থ হয়েছেন স্বয়ং রাজ্যপালও।

এদিকে গত ১৪ই জুলাই সারা পশ্চিমবঙ্গে ছ'পার্টি ও আট পার্টি কৃত্তক আহত সফল হরতাল দিল্লীর মন-বিগলিত করতে না পারলেও, ছ'পার্টির প্রথম দাবি ছিল বিধানসভা ভেঙে দিয়ে স্বতন্ত্র অন্তর্বর্তী পুনর্নির্বাচনের, আট পার্টিও দাবি করেছিল পুনর্নির্বাচনের।

বিধানসভা বাতিল হওয়ায় তা পশ্চিমবঙ্গের ছোট-বড় সব দলগুলি কৃত্তক সমর্থিত হয়েছে। কবে পুনর্নির্বাচন হবে, সেই প্রশ্নটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

ছ'পার্টি আগামী নভেম্বরেই অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে। সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে, আগামী নির্বাচনে তাঁদের পার্টি সংখ্যা-ধিকো জয়ী হবে, তাঁদের পার্টি ২৪০টি আসনেই প্রাধী দেবে, তবে বিচার-বিবেচনার পর কোনো কোনো আসনে প্রাধী না দিতেও পারে। ছ'পার্টির এভাবে এগিয়ে আসার পর আট পার্টির পক্ষে দঃসংবাদ এই যে, যে বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বিধানসভা বাতিল হয়, সেদিন রাতে বাংলা

কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় আট পার্টির দ্ব্যন্তে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য আট পার্টির অন্তর্ভুক্ত দলগুলির সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে বাংলা কংগ্রেসের যোগাযোগ কথা বলতে রাজী হয়েছেন। আট পার্টির অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছে যে, এ পার্টির কোনো কোনো নেতা বলতে সুরু করেছেন—বাংলা কংগ্রেস ও আশ-এস-পি তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা আগামী নির্বাচনে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করবেন। এ দুই পার্টি যোগ দা দিলে তাঁদের অবস্থা কি হবে সে ব্যাপারে তাঁরা কোনো মন্তব্য করেন নি। এইরূপ পরিস্থিতিতে আট পার্টির পক্ষে আশু নির্বাচনের দাবি করা সম্ভব নয়। সৌদিক থেকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়-কুমার মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তী পুনর্নির্বাচনের দাবি নস্যাক করেছিলেন। কিন্তু শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের দাবি, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হোক। যদিও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণ নিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে, তবু শ্রীমুখোপাধ্যায় বুঝেছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনপ্রতিনিধি-মূলক সরকার ছাড়া গতানুগতিক নেই। তাই মনে হয়, পুনর্নির্বাচন যতো তাড়াতাড়ি হয়, ততোই মঙ্গল। অনেক ঘটনার পর জনসাধারণই এবার বিচার করুন, কে তাদের মঙ্গল করবে, কেই বা করবে না।

সিদ্ধান্তকীর্তি

আজকের মানুষ

বোম্বাই সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা দিল্লী পদলিশের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতেন, তবে গান্ধীহত্যা হয়তো রোধ করা সম্ভব হতো। কাপদুর কমিশন গান্ধী হত্যা সম্পর্কে বেরি-রিপোর্ট দিয়েছেন তার 'নির্গলিতাথ' বোধ হয় এই। কমিশন আরো বলেছেন যে, বোম্বাইয়ের তদানীন্তন মধ্যমন্ত্রী শ্রী বি জি থেরকে গোপন খবর দেওয়া হয়েছিল যে, গান্ধী হত্যার গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। সে খবর শ্রীথের তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমোবারজী দেশাইকে দেন। খবরটি খবারীটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেলের কাছেও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বিড়লা ভবনে বা তাঁর প্রার্থনা সভায় পর্বাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় নি। এ-গাফিলতির জন্য কমিশন বোম্বাই সরকার, দিল্লী পদলিশ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করছেন। কিন্তু কাপদুর কমিশনের ১৩০০ পৃষ্ঠা-ব্যাপী সন্দেহী রিপোর্টে আজ গান্ধী-হত্যার ঘটনাই ময়না তদন্ত করা হোক না কেন, নিহত নেতাকে ফিরে পাওয়া যাবে না। কর্তব্যপালনে যাদের গাফিলতি ছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছে, তাদেরও এতদিন বাদে শাস্তি দেওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এমন কি সেদিন যে ভুল-ত্রুটির জন্য 'জাতির জনক'কে হারাতে হয়েছে তাও শোধরানো হবে কিনা বা তার আর কখনো পুনরাবৃত্তি হবে না—এ-প্রশ্না-দ্বন্দ্বী দেওয়া যাবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ সন্দেহ রয়েছে।

সন্দেহী রিপোর্ট, কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী জে এল কাপদুরকে একক হস্তেই সব কিছুর সারতে হয়েছে। কাদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে, কী কী নথিপত্র ঘাটা হবে, কোন্ কোন্ ঘটনা-স্থলে যেতে হবে—এ সমস্ত একা শ্রীকাপদুরকেই ঠিক করতে হয়েছে এবং রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে। কমিশনটাই তো ছিল একজন সদস্যবিশিষ্ট কমিশন। তা সে দায়িত্ব শ্রীকাপদুর কৃতিত্বের সঙ্গেশ



জে, এল, কাপদুর

পালন করেছেন বলতে হবে। অবশ্য তাঁর অতীত অভিজ্ঞতাই কাপদুর সাহেবকে এ-ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করেছে।

কারণ কমিশন পরিচালনার কাজ তিনি এ পর্যন্ত তো কম চালানেন না। ১৯৬৩ সালে গঠিত ডিলিমিটেশন কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীকাপদুর। তারও আগে খোদ ল কমিশনেরই চেয়ারম্যানের

পদ অলংকৃত করেছিলেন তিনি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্ভাস্তু আগমনের কারণ সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালাবার ভার তাঁর ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে। বর্তমানে ভারত সেবক সমাজের বিষয়ে তদন্তকার্য চালাচ্ছেন শ্রীকাপদুর।

১৮৯৭ সালে পশ্চিম পাজাবের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে শ্রী জে এল কাপদুরের জন্ম। ডেরা ইসমাইল খাঁর স্কুলে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে গ্র্যাজুয়েট হন লাহোর সরকারী কলেজ থেকে। কেম্ব্রিজ থেকে আইন পাশ করে আসার পর তিনি ১৯২০ সালে লাহোর হাইকোর্টে প্রাকটিস শুরু করেন। দেশ বিভাগ হবার সময় পর্যন্ত তিনি লাহোরেই ছিলেন, তারপর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতের মাটিতে। এখানে তিনি গোড়াতেই বড় দায়িত্ব পেয়ে গেলেন—ফেডারেল সার্ভিস কমিশনের সদস্যপদ—পরে যেটা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রূপান্তরিত হলো। ১৯৪৯ সালে তিনি পাজাব হাইকোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি সূপ্রীম কোর্টের বিচারক পদে উন্নীত হন।

রৌবনে শ্রীকাপদুর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। লাহোরে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তিনি ছিলেন একজন যশস্বী সমাজকর্মী ও নেতা। পরে তিনি কয়েকটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের সঙ্গেশ হতে হন। লবণ সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণের অপরাধে শ্রীকাপদুরকে কারাবরণও করতে হয়েছিল।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালিন ভারতবর্ষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে

সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আসামে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্রের জন্যই তা সম্ভবপর হয়েছিল। মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পরে আসামের কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রী বরদলৈ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেকথা স্বীকার করেছিলেন। একই কথা বলোঁছিলেন কিন্তু বিম্বেষের সঙ্গে আসামের ইউরোপীয় দল। কোনো সন্দেহ না রেখেই বলা যায়, আসামের জন্য সুভাষচন্দ্র যা করেছিলেন, খুব কম মানুষই তা করেছেন এবং মুসলিম লীগের কবল থেকে আসামকে বাঁচাবার সবল চেষ্টা যদি তিনি ঐকালে না করতেন, তাহলে আসামের ভাগ্য কোন পথে যেত বলা শক্ত।*

পূর্ব অধ্যায়ে বলে এসেছি, মুসলিম লীগের সাংপ্রদায়িক অভিসন্ধির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের লড়াইয়ের একটি রূপ আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের প্রচেষ্টার মধ্যে দেখা গেছে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সাফল্যের ফলে দেখা গেল—এগারোটি প্রদেশের চাটিতে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বর্তমান।

বাকী ষোল্লটি প্রদেশের মধ্যে সিন্ধুতে কংগ্রেসের সমর্থনে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। বাংলা ও পঞ্জাবেই কেবল কংগ্রেসের কোনো প্রভাব মন্ত্রিসভায় নেই। শেষোক্ত প্রদেশ দুটিতে ইউরোপীয় সমর্থন লীগ মন্ত্রিসভাকে টিকিয়ে রেখেছিল।

আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন করিলে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষে লীগের প্রভাবক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে পেয়েছিলেন এবং একথা বিনা সন্দেহে বলা যায়, তিনি কংগ্রেস সভাপতি না থাকলে আসামে ঐ কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হত্বে পারত না। সিন্ধুতেও ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে তিনি পদমর্যাদার ব্যবহার করেছিলেন। বাংলা দেশে কেরালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হতে না দিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণ-পশ্চিম নেতারা যে সর্বনাশ ঘটিয়েছিলেন, তার বেদনা সুভাষচন্দ্রকে আসামের ক্ষেত্রে ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধ করতে দৃঢ় করে তুলেছিল।

আসাম মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে একটা পুরো নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল যার মধ্যে ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন, রূপান্তর 'আবহাওয়া', তাঁর শিহরণ, উত্তেজনা, গোপন চক্রান্ত, প্রকাশ্য সংঘর্ষ—সব কিছু ছিল। এই নাটকে একপক্ষে নেপথ্য নায়ক গভর্নর, অন্য পক্ষে সুভাষচন্দ্র। সাক্ষাৎ অভিনেতা

* গত মার্চ মাসে গোঁহাটিতে আমি শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। ১৯৩৮ সালে শ্রীযুক্ত মেধী আসাম কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি আমার কাছে স্বীকার করেছিলেন, আসামে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের মূলে অবশ্যই সুভাষচন্দ্র। আমি তাঁকে এই কথাগুলি লিখে দিতে বললে তিনি কিন্তু অস্বীকার করেন।

শ্রীযুক্ত মেধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। ১৯৩৯ সালে কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে শ্রীযুক্ত মেধী সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছিলেন—একথা শুনিয়েছিলাম। “সুভাষবাবু, অহিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন না”—সুভাষচন্দ্রের পক্ষ ত্যাগের কারণ হিসেবে শ্রীযুক্ত মেধী জানিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র, যিনি আসামের জন্য অতীতকষ্ট করেছিলেন, তাঁকে অহিংসার জন্য ভাসিয়ে দেওয়া ব্যাপারটিকে অস্বস্তি মনে হয়েছিল। সবিমর্ষে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ‘আপনি অহিংসায় বিশ্বাস করেন?’ উত্তর হয়েছিল—‘হাঁ।’ ‘আপনার সে বিশ্বাস আদর্শ হিসাবে, না পার্লিস হিসাবে?’ উত্তর পেয়েছিলাম—‘আদর্শ হিসাবেই অহিংসায় তাঁর বিশ্বাস। আমি আর কথা বাড়াই নি। এবং আমি এই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা করেছিলাম—১৯৬২ সালে চীনা বাহিনী আসামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং দুর্ভাগ্য আসামবাসীর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু যখন তাঁর মহান হৃদয়ের বেদনাকে বেতারে কাঁপিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তখন নিশ্চয় তাতে অন্যান্য আসামবাসীর মত বিক্ষুব্ধ না হয়ে শ্রীযুক্ত মেধী অহিংস পন্থায় চীনাদের ঠেকাবার কথা চিন্তা করেছিলেন!!

শ্রীযুক্ত বসুর কাছে আসামের ঋণের বিষয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে অনেক কথা শ্রীযুক্ত মেধী বলেছিলেন।

গোপীনাথ বরদলৈ, মহম্মদ সাদুল্লা, বসন্তকুমার দাস প্রমুখ। সেই সঙ্গে কখনো মস্তে, কখনো সাজঘরে কিছু ইউরোপীয় ব্যক্তি। মৌলানা আজাদ রংগভূমিতে মাঝে মাঝে টীকবর্ধক দিয়েছিলেন।

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে সংবাদপত্রের প্রভাতী চাপ্তাঃ সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতন হয়েছে—নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করবেন গোপীনাথ বরদলৈ।

ASSAM CABINET RESIGN CONGRESS TO STEP IN

Premier Springs a Surprise

Announces Resignation on Eve of No-Confidence

Invitation to Opposition Leader

Mr. Bardoloi Agrees to form Ministry, but Wants a Day's Time

মহম্মদ সাদুল্লা মন্ত্রিসভা গঠন করেছিলেন ১লা এপ্রিল, ১৯৩৮। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের জীবন এই পর্যায়ের দশ মাস। এর মধ্যে এগারোবার নানা ছোটখাট ব্যাপারে মন্ত্রিসভার পরাজয় হয়েছে আইনসভায়। বহু ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে মন্ত্রিসভাকে বজায় রাখা হয়েছিল। স্যার সাদুল্লা একবার মন্ত্রিসভা ভেঙে পুনর্গঠনও করেছিলেন।

আসাম আইনসভায় ১০৮ জন সদস্যের ৩২ জন কংগ্রেসী। কংগ্রেসই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। পরবর্তী বড় দল ইউরোপীয়ানদের। আসাম ও বাংলায় ইউরোপীয় বাণিজ্যস্বার্থের প্রয়োজনে ইউরোপীয় সদস্যসংখ্যা ফাঁপিয়ে রাখা হয়েছিল। ইউরোপীয়রা সর্বদা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে মদত দিত। আসাম আইনসভায় মুসলিম লীগ সমৃদ্ধ আরও অনেকগুলি দল ছিল, যাদের সদস্যসংখ্যা পাঁচ থেকে পনের।

এক্ষেত্রে বোঝাই যায়, মন্ত্রিসভা গঠনে অন্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন কংগ্রেসেরই করার কথা। কিন্তু কংগ্রেসের বিচিত্র আত্মঘাতী নীতির জন্য তা করা সম্ভব হয় নি। অপর দিকে আসামে মুসলিম লীগের পক্ষেও স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব ছিল না। তা গঠিত হয়েছিল কিন্তু সর্বদাই টলমল করছিল। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি সূভাষচন্দ্র কংগ্রেসের উন্মত্ত নীতিকে কিছুটা বদলাতে পেরেছিলেন। ১৯৩৮-এর মার্চ মাসে কলকাতায়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি অপরাপর প্রগতিশীল দলের সঙ্গে কংগ্রেসের কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাবকে অনুমোদন করিয়ে নিতে পেরেছিলেন।*

যাই হোক, আইনসভায় পরাজয়ের জন্য কিন্তু সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পতন হয় নি—পরাজয় এড়াবার জন্যই তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। তিনজন উপজাতি সদস্য দলত্যাগ করেন; পদত্যাগ না করলে আইনসভায় অতি অবশ্য সাদুল্লার পরাজয় ঘটত।

পদত্যাগ করে, খুবই গণতান্ত্রিক মনোভাব দেখিয়ে স্যার সাদুল্লা বলেছিলেন—সরকার পক্ষে সমর্থন ক্রমক্ষয়মান, সুতরাং পদত্যাগই প্রের। তিনি স্বীকার করেছিলেন, তাঁর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

গোপীনাথ বরদলৈ স্যার সাদুল্লার গণতান্ত্রিক মনোভাবের প্রশংসা করলেন এবং গণতন্ত্রের রীতি রক্ষার জন্য গভর্নর যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে তাঁকে লাট-ভবনে আহ্বান করলেন, সেখানে গেলেন, গভর্নরকে বললেন, কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী আছি, তবে বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে চারদিন সময় চাই।

“গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে শ্রীযুক্ত বরদলৈ কংগ্রেস সভাপতি সূভাষচন্দ্র বসু এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা বলেন। কংগ্রেস সভাপতি এবং মৌলানা আজাদ উভয়েই আগামীকাল (১৫ই সেপ্টেম্বর) কলকাতা থেকে শিলং যাত্রা করবেন।”

শরীরে আসামে উপস্থিত হবার আগেই সূভাষচন্দ্রর অভিনন্দন গোপীনাথ বরদলৈ-এর কাছে পেঁচে গেল—‘Heartiest congratulations.’ অভিনন্দন জনাবার জন্য সূভাষচন্দ্র এতটুকু অপেক্ষা করতে রাজী ছিলেন না—আসামের কংগ্রেস মহল থেকে খবর আসার আগেই অ্যাসোসিয়েটে প্রেসের কাছে খবর জেনে সূভাষচন্দ্র অভিনন্দন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু হাত এবং মুখের মধ্যে অনেক ব্যর্থত। মন্ত্রিত্বের অমৃতফল বরদলৈ অবিলম্বে মুখে তুলতে পারলেন না। গভর্নর তখন সাদুল্লার পদত্যাগপত্র নিলেন না। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় যিনি ভরসা হারিয়েছিলেন তিনি পদত্যাগ করার পরে আশা ফিরে পেলেন! দেখলেন, আসাম বন্ধুতে পূর্ণ। কয়েকজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা আসামে এসে পড়লেন, তাঁরা আসামের উভয় উপত্যকার মুসলমান সদস্যদের মিলিয়ে দেবার প্রবল চেষ্টা চালালেন, যাতে নাকি সংখ্যা দাঁড়াল ৩৪।

সাদুল্লা এবং তাঁর বন্ধুগণ ভাবতে লাগলেন, তাহলে আবার সাদুল্লা মন্ত্রিসভা নয় কেন?

* “After the Calcutta session of the Congress Working Committee in March last... Mr. G. N. Bardoloi, leader of the Congress Assembly Party was authorised to form a Congress Ministry in coalition with other progressive parties.” (A.B.P., Sep. 14, 1938).

স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী

মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

কোনো কোনো বিকেলে স্টীমারের গন্ধ ভেসে আসে;

নদীর কথা মনে পড়লেই স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী
মধুমতী দুলিয়ে ভুলিয়ে সকাল বিকেল তার আশা যাওয়া,
দূরে বহুদূরে অন্য মানচিত্রে
হয়তো তার জল কেটে জল কেটে
চলা ফেরা;
এক এক বিকেলে বৃষ্টির প্রহরে কদম শাখা
দমকা হাওয়ায় দুলে উঠলে
বুকের মধ্যে যখন ছলাং ছলাং
ভেজা বিকেলে ফুল তুলতে গেলে
নদীর বুকে ভেঁ ভেঁ ধ্বনি,—রূপকথার মতো স্নলযাত্রা
প্রতিদিন অজস্র যাত্রী পাড়ি দেয়
কোথায় কোথায় কেন

সব কিছুর অর্থ এখন সুস্পষ্ট; জীবনের প্রেমের অপ্রেমের
বৃত্ত থেকে ঘুরে ঘুরে যাওয়া, ঘুরে ঘুরে যাওয়া;
তবু বৃষ্টি পড়লে মাঝে মাঝে স্মৃতির মধ্যে স্রোতস্বিনী;
কে যেন

স্মৃতির মধ্যে বিগত দিনের ধূসর পতাকা তুলে
নাম ধরে ডাকে

কেন জানি না ভিজ়ে বিকেলে মাঝে মাঝে
অন্যমনে স্মৃতির হাওয়ায় স্টীমারের গন্ধ ভেসে ভেসে
আসে

ওধারে কংগ্রেস পক্ষও চূপ করে বসে নেই। একটা
প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার ব্যাপারে ছুটে আসছেন কংগ্রেসের
সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক প্রভাব-
শালী সদস্য। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের কাছে গোপীনাথ
বরদলৈ বললেন, “কলকাতা থেকে শ্রীযুক্ত সদ্ভাষচন্দ্র বসু
এবং মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ আসছেন—তাদের
আসার প্রতীক্ষায় আমরা আছি। তাদের নির্দেশেই আমরা
চলব।”

তারা এলেন। তারা কিছু করলেন। তার ফলে একটি
শুভ সংবাদ ফেটে পড়ল সংবাদপত্রে:

ASSAM ANNEXED BY CONGRESS

Coalition Cabinet

5 Hindus and 3 Muslims to form Ministry;

Sj. Subhas Chandra Bose's Statement

Muslim Members Not Yet Selected

Response Awaited From Those Who Will
Accept Congress Policy

বোঝা গেল, আসাম লীগ-শাসন থেকে মুক্তি পাচ্ছে।
বোঝা গেল, ৪৭ বৎসর বয়স্ক গোপীনাথ বরদলৈ, যিনি
গৌহাটি আদালতের অ্যাডভোকেট এবং গৌহাটি মিউন-
সিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান—তিনি মহম্মদ সাদজ্জাব
পরবর্তী আসামের প্রধানমন্ত্রী।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত সদ্ভাষচন্দ্র বসু এবং নিখিল
ভারত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সদস্য মৌলানা আব্দুল
কালাম আজাদ সাম্প্রদেয় বিবৃতিযোগে জানানলেন:

“আসাম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতাদের সঙ্গে

পরামর্শ করার পরে স্থির হয়েছে—আটজন সদস্য নিয়ে
একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হবে, তার পাঁচজন হবেন হিন্দু এবং
তিনজন মুসলমান।

“আরও স্থির হয়েছে যে, অবিলম্বে হিন্দু সদস্যগণকে
মনোনীত করা হবে কিন্তু মুসলমান সদস্য-নির্বাচন স্থগিত
রাখা হবে। এমন করার হেতু, যেসব মুসলমান দল কংগ্রেস
কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দেয় নি, তারা যাতে কংগ্রেসের
নীতি, কর্মপন্থা এবং শৃঙ্খলাকে স্বীকার করে কংগ্রেস
কোয়ালিশন পার্টিতে যোগ দিতে পারে, তার সুযোগ করে
দেওয়া। এই সকল মুসলমান দল কিভাবে সাড়া দেয়, তা
দেখার পরেই মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যদের নাম নির্দিষ্ট-
ভাবে স্থিরীকৃত হবে।

“আসাম কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত
গোপীনাথ বরদলৈ আজ সন্ধ্যায়, সাড়ে পাঁচটার সময়ে
মাননীয় গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর মন্ত্রিসভার
পাঁচজন হিন্দু সদস্যের নাম দাখিল করেছেন। তারা হলেন:

(১) শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ, প্রধানমন্ত্রী

(২) “ কামিনীকুমার সেন

(৩) “ রূপনাথ ব্রহ্ম

(৪) “ অক্ষয়কুমার দাস

(৫) “ রামনাথ দাস

“আমাদের এই আশা এবং বিশ্বাস, এই নবগঠিত মন্ত্রি-
সভা আসাম আইনসভার সদস্যদের, সেই সঙ্গে আসামের
জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন পাবে এবং নবগঠিত মন্ত্রিসভার
সদস্যগণ তাঁদের জনসেবামূলক কার্যের দ্বারা তাঁদের মনো-
নয়নের সার্থকতা প্রমাণ করবেন, যার ফলে কংগ্রেসের নীতি
ও কার্যসূচীর সম্প্রসারণ ঘটবে এবং কংগ্রেসের গর্বাদ
বৃদ্ধি পাবে।”

কংগ্রেস সমর্থক জাতীয়তাবাদী মহলে বিশেষ আনন্দের
সঞ্চার হল। বাংলা কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা
শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তা গভীর উল্লাস জানানলেন।

সে উল্লাস মার কয়েক ঘণ্টার জন্য।

[১২শ]



গত সপ্তাহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সি-আর-পি'র তান্ডবের একটা সাদামাটা বিবরণমাত্র দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ ঘটে নি, কেন না, দ্বংসবাদটি এসেছিল বঙ্গদর্শন প্রেসে যাবার মূখে। বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে সেদিনের 'সি-আর-পি'দের নাটকীয় তান্ডবের ভয়াবহ কাহিনী নতুন করে শুনিয়ে কোন লাভ নেই। এ বিষয়ে আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জেগেছে, যেগুলি উত্থাপন করাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। মূল প্রশ্নটি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি আনা হয়েছে কেন? উদ্দেশ্য সমাজবিরোধীদের দমন। সেই দায়িত্ব তাদের ওপর, তারা যদি সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারে এবং তা না করে তারা যদি নিরীহ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করে, তবে তাদের কেন সমাজবিরোধিতার অপরাধে শাস্তি দেওয়া হবে না? শ্রদ্ধামোহ সি-আর-পি বলেই তারা অহেতুক নরহত্যার মত অপরাধ করেও পার পেয়ে যাবে? এই প্রশ্নটা একটা মৌলিক জিজ্ঞাসা। বিনা প্ররোচনায় তাদের লাঠিবাঁজির পরিচয় তো প্রধানমন্ত্রী স্বচক্ষেই পুর্নুলিয়ায় দেখেছেন। সুস্পষ্ট অভিযোগ আছে, সি-আর-পি বহু স্থানে ব্যাপক লুণ্ঠন চালিয়েছে। উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামে দলবন্ধভাবে তারা নারীদের ওপর পার্শ্বিক অত্যাচার করেছে। এগুলি কি অপরাধ নয়? এক অপরাধ দিয়ে সরকারের অপর এক অপরাধের প্রতিকার করার চেষ্টা করছেন, এর ফলাফলটা শেষ পর্যন্ত যে অনিবার্যভাবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই পুলিশবাহিনী শৃঙ্খলিত, ভারতেও গত কয়েক বছরে পুলিশবাহিনীগুলিতে শিক্ষিত মানুষেরা আসতে শুরু করেছেন, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ, অনেক দোষত্রুটি সত্ত্বেও, ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যের পুলিশের চেয়ে উন্নত এবং দক্ষ। এই কারণেই বোধ হয় শিক্ষিত পুলিশবাহিনীকে কেন্দ্রের এত ভয়, কেন না, শিক্ষা মানুষমাত্রকেই শৃঙ্খলীকৃত করে তোলে, নির্বিচারে নিপীড়ন করতে তাদের বিবেকে বাধে। মনে হয়, সম্পূর্ণ অশিক্ষিত লোক ভিন্ন সি-আর-পি'তে কোন ভদ্রঘরের ছেলেকে নেওয়া হয় না। তারপর দীর্ঘদিনের সূনিপুণ শিক্ষায় তাদের পরিপূর্ণ এক-একটি বর্ধন করে তোলা হয়, যাতে অকারণে রক্তগণ্য বহাতে তাদের হাত না কাঁপে। সূনিপুণ শিক্ষায় তাদের রচিককে বিকৃত করে তোলা হয়। তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য কাদের স্বার্থে এই ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সৃষ্টি।

যতই গণতন্ত্রের কথা বলা হোক না কেন, গত বাইশ বছরে নয়াদিল্লীতে শাসক-শ্রেণীর একটি প্রভাবশালী অংশের মধ্যে ফ্যাসীবাদী মনোভাব সযত্নে প্রতিপালিত হয়েছে এবং তদনুরূপ সংগঠন রপ্তে রপ্তে প্রস্তুত করে রাখা আছে। এটা জিজ্ঞাসাকার মত পরিষ্কার যে, পশ্চিম-বঙ্গে আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা সি-আর-পি'র নেই। এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-

বিরোধীদের দমন করার ক্ষমতা সি-আর-পি'র নেই। কেন না, একদল সমাজ-বিরোধী দিয়ে আর একদল সমাজ-বিরোধীকে উৎখাত করা যায় না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি রাখার অর্থ কি? যে কথাটা আপনার-আমার মত গোলা লোকের মাথায় ঢোকে তা কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্যপাল ও তাঁর উপদেষ্টাদের মাথায় যে ঢোকে না, সে আমরা বিশ্বাস করতে নারাজ। পশ্চিমবঙ্গে সি-আর-পি

রাখার অর্থ একটিই। তার সোজা উদ্দেশ্য, জনসাধারণকে টেরোরাইজ করা, আতঙ্কগ্রস্ত করা। যাদবপুরের ঘটনায় এটাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়। ওরা কেন সেদিন এই তান্ডব চালালো? ওদের পিকিটিং-এর ওপর হঠাৎ বোমা পড়ায় ওদের একজন গুরুতর আহত হয়েছে। এটা ঘটনা কি রটনা বলা যায় না। কেন না, ভিন্ন একটি সূত্র থেকে জানা গেছে যে, তাদের একটি দল আন্ডারওয়ার্যার পরিহিত অবস্থায় তাস খেলছিল, এমন সময় রটে যায় যে, বোমা পড়েছে। তর্কহীন ধরেই নেওয়া গেল যে, তাদের পিকিটের ওপর কেউ বোমা ফেলেছে। এরকম অবস্থার মোকাবিলা করার জন্যই তো তাদের পশ্চিমবঙ্গে আগমন। কে বা কারা বোমা ফেলেছে তাদের খুঁজে বার করা ও কোর্টে চালান দেওয়াই তো তাদের স্বাভাবিক কর্তব্য। কিন্তু বোমা পড়েছে এই অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে যাকেই সামনে পাব তাকেই লাঠিপেটা করব, বেশনেটের খোঁচা দেব, এ তো বিশ্বদুখ পাগলা কুকুরের প্রশাসন নীতি। এবং এই নীতি অবলম্বন করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার যে চেষ্টা হচ্ছে, যদি লজিক বলে শাস্ত থাকে তার অনিবার্য সিদ্ধান্তই যে, কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পূর্ণ কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে উন্মত্ততার নীতি গ্রহণ করেছেন।

বিধানসভা বাতিল

শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বাতিল হল ৩০শে জুলাই তারিখে। বিধানসভা বাতিল হওয়াই ছিল অবশ্য-ম্ভাবী, কিন্তু যে মূহুর্তে এই সংবাদটি ঘোষণা করা হল সেটি একেবারেই অপ্রত্যাশিত মূহুর্ত। কেন না, কয়েকদিন আগেই রাজ্যপাল নয়াদিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দমদম বিমানবন্দরে বর্লোছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেবার কথা তিনি ভাবছেন না, যদি একটা জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই দিকেই তিনি চেষ্টা করছেন। প্রধানমন্ত্রী কয়েক দিন আগে কলকাতা সফরে এসে বলেছিলেন যে, বিধানসভা ভেঙে দেওয়া না দেওয়ার প্রশ্নটা রাজ্যপালের ওপর নির্ভর করছে। দ-একটি দল ছাড়া অধিকাংশ দলই বিধানসভা ভেঙে দেবার পক্ষপাতী ছিল। গত মে মাস থেকে রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান অধুনালুপ্ত জলন্ডের প্রায় সকল দলের নেতার সঙ্গে নানা বৈঠকে মিলিত হয়ে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে রাজ্যপাল বুঝতে পেরেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে এ-

আর জনপ্রিয় সরকার গঠনের সম্ভাবনা নেই। একমাত্র বিকল্প হল বিধানসভা বাতিল করে দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলই বিধানসভা বাতিলের সংবাদে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, এটা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এবং মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিন ধায়ে'র দাবি জানিয়েছেন। এ ছাড়া ফরোয়াদ রকের শ্রীহেমন্ত বসু, শাসক-কংগ্রেসের শ্রীবিজয়সিং নাহার, সি-পি-আই-এর শ্রীবিম্বনাথ মুখার্জী, আর-এস-পি'র শ্রীদ্বাদিচ চৌধুরী প্রমুখ নেতা এই ঘটনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। নয়াদিল্লীর ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ওই রাজ্যে দীর্ঘস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন অনিবার্য হয়ে উঠল। মধ্যবর্তী নির্বাচন সংক্রান্ত কোন সংবাদ আপাতত নেই।

রাজ্য-রাজনীতি সংবাদ

গত ৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টি জোটে যোগ দেবে না এবং আট পার্টির সঙ্গে প্রস্তাবিত ২রা আগস্টের বৈঠকও হবে না। এই রকম যে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে সে কথা আমরা আগেই লিখেছিলাম, কেন না, বাংলা কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র সম্পর্কে যারা ওয়াকিবহাল তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, শুধুমাত্র সি-পি-এম বিশ্বেষকে মূলধন করে এই দুই শক্তির চিরস্থায়ী, এমন কি দীর্ঘস্থায়ী আঁতাতও সম্ভবপব নয়। শ্রীসুশীল ধাড়া সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, জমি দখল, গণ-আন্দোলন ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁরা নেই, আবার আট পার্টি শরিকদের ওই সব প্রোগ্রাম বাদ দিলেও চলে না। অথচ বাংলা কংগ্রেসকে সঙ্গে না পেলেও আট পার্টির পক্ষে নিজেদের শক্তিতে সি-পি-এম-এর মত একটি প্রবল শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে কিছু অসুবিধা হবে। কাজেই বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত রাজ্য-রাজনীতিতে গভীর তাৎপর্য ও দ্রুত ভৎসনতার সৃষ্টি করেছে। এছাড়া আট পার্টির কোন কোন নেতার কাছে এটা বিস্ময়ের কারণ হয়েছে যে, মাত্র কয়েকদিন আগে রাজ্যপাল বিধানসভা বাতিল করা হবে না বলা সত্ত্বেও অকস্মাৎ বাতিলের সংবাদ ঘোষিত হল কেন? তাঁদের মতে, নেপথ্যে নাকি গত দু'দিন রাজ্যভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে শ্রীঅজয়

মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সময় আলোচনা হয়েছে এবং এমন সম্ভাবনা নাকি এসে গিয়েছিল যে, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সরকার গঠন করতে না পারলে অন্য কেউ তা চেষ্টা করবে—এমন প্রচার জোর হয়ে উঠছিল। তাই শ্রীমুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে শেষ কথা বলেছিলেন, বিধানসভা বাতিল হওয়া শ্রেয়। এই সঙ্গে আরও একটা প্রচার আছে, যা হল, একজন প্রতিনিধি দিল্লী ও কলকাতায় ঘুরে বলে বেড়িয়েছেন। বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার হতে পারে ও হবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। একই-ভাবে বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তও বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। কারণ বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের একদিন আগেও যারা অজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছেন, তাঁরা জেনেছেন বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করেছে, কিন্তু শেষ সংবাদ হল বাংলা কংগ্রেস যোগদান করে নি। অনেকের মতে, এটা হল বাংলা কংগ্রেসের শেষ চাপ সৃষ্টি, যাতে বাংলা কংগ্রেসের সত্তা মেনে নিতে আট পার্টি কোন কিস্তি না করে। যাই হোক, বাংলা কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের ফলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে আর একটা কূটনৈতিক যোগাযোগের খেলার সম্ভাবনা খুলে গেল। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দলের মধ্যে সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

রাইটাস বিল্ডিংস, সমাচার

রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী এল পি সিং থেকে শত্রু করে প্রায় সকল উদ্ভটন। অফিসার কলকাতা ঘুরে গেলেন। জানা গেল, সিং সাহেব আরও চারজন অফিসার নিয়ে রাজ্য প্রশাসনে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য একটা মাস্টার প্ল্যান নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই আবার কলকাতায় আসছেন। এই পরিবর্তনের মধ্যে অনেক রাঘববোয়াল আছে। এরই সঙ্গে রাজ্য স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে জোরদার করার জন্য একটি অতিরিক্ত হোম সেক্রেটারীর পদ সৃষ্টির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে প্রকাশ। আগামী দিনে যে পরিবর্তন আসছে তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে ভিন্ন রকম ব্যাখ্যা চলছে। প্রশাসনকে সুদৃঢ় করার নামে এই পরিবর্তনের পিছনে অনেক প্ল্যান আছে বলে প্রকাশ। বর্তমান চীফ সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার মাল্লিককে যদি অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ এক নতুন নজীর সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ তিন মাসে তিনবার চীফ সেক্রেটারী

বদল। এই প্রস্তাবিত ট্রান্সফারে অফিসার মহলেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, বর্তমান চীফ সেক্রেটারী অবস্থার বলি হয়েছেন। রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর বিরোধ এমন স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে একজনকে ছাড়তেই হয়। এদিকে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর উপদেষ্টাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শত্রু হয়েছে বলে প্রকাশ। কয়েকজন উপদেষ্টা চান রাজ্যপাল সাংবিধানিক প্রধানই থাকুন, মন্ত্রীদের মত উপদেষ্টাদের হাতে নীতি-নির্ধারণের ব্যাপারে সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। গদ্য উপদেষ্টা শ্রী বি নি ঘোষ নাকি এই সব প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্যপাল যেভাবে ফাইলপর দেখছেন, তাতে প্রশাসনিক কার্যে ব্যাপক বাধার সৃষ্টি হচ্ছে বলে কোন কোন উপদেষ্টা মনে করছেন। এদিকে মহাকরণে উচ্চপদাধিকার একটা রদবদল আসিল। ময়াদিল্লী থেকে সবজ সংকেত পেলেই তা কার্যকর হবে বলে জানা গেল।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট

কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার (ন্যাশনাল লাইব্রেরী), যা সারা ভারতেরই গর্বস্বরূপ, গোলায় যেতে বসেছে। ১৯৪৮ সালে ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরী ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে রূপান্তরিত হয় এবং এটিকে প্রকৃতই একটি জাতীয় গ্রন্থাগাররূপে গড়ে তুলতে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন, তিনি হলেন তদানীন্তন লাইব্রেরীয়ান বি. এস. কেশবন। ১৯৬৩ সালে কেশবন অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর জায়গায় ওয়াই. এম. মুলে লাইব্রেরীয়ান হয়ে আসেন। অসুস্থতার কারণে এ'র প্রায়ই অনুপস্থিত থাকার দরুণ দু'জন অফিসার লাইব্রেরী পরিচালন ব্যবস্থায় সর্বসর্বা হয়ে ওঠেন এবং তখন থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরী সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যেতে থাকে। স্বজনপোষণ ও মূল্যবান গ্রন্থসমূহ এদিক-ওদিক চলে যাওয়ার অভিযোগ তখন থেকেই শত্রু হয়।

১৯৬৭ সালের ৩০শে নভেম্বর ডি. আর. কালিয়া লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান পদে তাঁর নিয়োগ নিয়ে দিল্লীতে লোক-সভায় বিতর্ক উঠেছিল। বিশেষ একটি মহলের ভাববিরোধ ফলে তাঁকে নাকি এই গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়, এমন অভিযোগও হয়েছিল।

সাপ্তাহিক বসুমতী

বিভিন্ন মহল থেকে লাইব্রেরী পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উঠতে থাকায় কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এক-সদনাবিধিগত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন এবং তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি শ্রীখোসলার উপর। তাঁকে এক মাসের মধ্যে তদন্তের রিপোর্ট দাখিল করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তদন্ত কমিটির তদন্তের বিষয় ছিল—

(১) সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ও তার কারণ অনুসন্ধান করা ও (২) যাতে ন্যাশনাল লাইব্রেরীর প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে চলে, সে সম্পর্কে কার্যকর প্রস্তাব রাখা।

তদন্তের হেড কোয়ার্টার হয় দিল্লী, যদিও ব্যাপারটি কলকাতায়। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর কর্মীসংখ্যা ৫২৯ জন, পুস্তকের সংখ্যা ১৩ (তেরো) লক্ষের বেশি। এত লোককে জেরা করা, বইপত্রের হিসাব নেওয়া, অসংখ্য অভিযোগ শ্রবণ করা—এগুলির জন্য বেশ সময় প্রয়োজন। কিন্তু কি আশ্চর্য, খোসলা সাহেব কলকাতায় রইলেন মাত্র চারদিন, এতেই তদন্তকার্য মিটে গেল?

লাইব্রেরীয়ান সম্পর্কেও তদন্ত করার কথা। কিন্তু তিনিই যেন কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। তিনিই কাগজপত্র ও রিপোর্ট সরবরাহ করেন কমিটিকে। যে সময়ে তদন্ত চলছিল, সেই সময়ে তাঁকে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কাজ করতে দেওয়া কি স্বাভাবিক হয়েছে? এই প্রশ্নে এ কথা ধরা যেতে পারে যে, যদিও তিনি রিভায়িং কমিটির সম্পাদক ছিলেন, তবুও তাঁকে ঐ কমিটির রিপোর্ট ড্রাফট করতে দেওয়া হয় নি।

অন্য কর্মচারীরা যখন তদন্ত কমিটির কাছে বিবৃতি দিচ্ছিলেন, তখন লাইব্রেরীয়ানকে সেখানে নাকি উপস্থিত থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতায় থাকাকালীন লাইব্রেরীয়ান সঙ্গেই ছিলেন। কাজেই এটা খোলাখুলি ও নিরপেক্ষ তদন্ত নয়, যা এখানকার এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন দাবি করেছিলেন এবং যা রিভায়িং কমিটিও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। লাইব্রেরীয়ান শ্রীখোসলার সঙ্গে দ্বার নাকি কলকাতা থেকে দিল্লীও গিয়েছিলেন। দৃষ্টিতেই অবশ্য সামান্য সরকারী কাজের ছুতো নিয়ে।

ইউ এন আই খোসলা কমিটির রিপোর্টের যে সারাংশ প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যায় যে, লাইব্রেরীয়ান যে সব তথ্য দিয়েছিলেন, তারই উপর ভিত্তি

করে এটা রচিত। সেগুলো যাদের সম্পর্কে, তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে যাচাই করা হয় নি। কর্মীদের মধ্যে প্রধান যে যে কারণে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে: বহু মূল্যবান বই চুরি গেছে, স্বজন-পোষণ করা হয়েছে এবং কোন কোন অফিসার অবৈধভাবে অর্থ আদান-প্রদান করেছেন—এসব ব্যাপারে রিপোর্টে কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নি, হলে রিপোর্টের সারাংশে কিছু উল্লেখ থাকতো।

সারাংশ থেকে দেখা যায় যে, কমিটি এক ব্যক্তির জন্যেই অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়েছেন, সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ভাল করার কথায় গুরুত্ব দেন নি। কমিটি লাইব্রেরীয়ানের কাজ-কর্মে সন্তুষ্ট—কেমন করে এই সিদ্ধান্তে এলেন? শ্রীখোসলা লাইব্রেরীর কাজ-কর্ম পরীক্ষা করেন নি, একমাত্র একজনকে ছাড়া নাকি অন্যান্য কর্মীদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। রিভায়িং কমিটি, (যার মধ্যে একজন ছিলেন গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ) লাইব্রেরীর কাজকর্ম পরীক্ষা করেছিলেন, সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন, আর দেখেছিলেন যে, বর্তমান লাইব্রেরীয়ানের আমলে কাজ-কর্ম মোটেই সন্তোষজনক নয়। তিনি লাইব্রেরীর এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রশাসনকে বহুভাঙ্গে ভাগ করেছেন—২০টি অর্ডার সেকশন, ২০টি কপিরাইট সেকশন ও ২০টি সাময়িক পত্রিকা সেকশন। পৃথিবীর আর কোনো লাইব্রেরীতে এই ধরনের বিভাগ নেই। এর ফলে গাউগোল বেড়েছে, সময় ও অর্থের অপচয় হয়েছে।

ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনগুলিতে যাঁরা ভাষা জানতেন তাঁরাই ইনচার্জ ছিলেন। তাঁদের বদলি করে ল্যাঙ্গুয়েজ সেকশনে এমন কিছু লোককে ইনচার্জ করেছেন, যাঁরা ঐ সব ভাষার বর্ণমালাও জানেন না। এর ফলে কোন কোন বিভাগে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাঁর ইংরাজী মনোগ্রাফ সেকশন পুনর্বিবিন্যাস করা এতই ভুল হয়েছিল যে, লাইব্রেরী এর জন্য এক বছরে প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত। বর্তমান পুনর্বিবিন্যাসের কুফলস্বরূপ প্রায় সব বিভাগেরই কাজকর্ম কমে আসছে। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীখোসলা কিভাবে বর্তমান কাজ-কর্মকে সমর্থন করেছেন, তা কারুরই বোধগম্য হবার নয়।

লাইব্রেরীয়ানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে রিপোর্টে অনুচিত আগ্রহ দেখান হয়েছে। তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতে পারলে তদন্তের

কি দরকার ছিল? লাইব্রেরীর ইতিহাসে তিনিই প্রথম পুঁলিশ ডেকে এনেছিলেন কি তাঁর সহকর্মীদের শিক্ষা দেবার জন্যে? তাঁরই সময়ে লাইব্রেরীর সবরকম কাজকর্মই নিদারুণভাবে ভাঁটা পড়েছে। তিনি তাঁর পদে এতই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে, শিক্ষামন্ত্রক তাঁর পদে তাঁকে ৩০ মাস চাকরি করার পরও স্থায়ী করে নি! ভারত সরকারের নিয়মানুযায়ী অস্থায়ী সরকারী চাকুরীদের কার্যকাল এক মাসের নোটিশে চলে যেতে পারে। (C.S.R., Vol. II, Appendix 30)

এটা আশ্চর্যের যে, এই স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কমিটি সুপারিশ করেছেন তাঁকে কলকাতার বাইরে তাঁর বর্তমান পদের সমতুল্য একটি পরিবর্তন চাকুরি দেওয়ার। কেউ কখনো শোনে নি যে, যদি এক ব্যক্তি একটি পদে ব্যর্থতার পরিচয় দেন, তাহলে তিনি সমতুল্য একটি চাকুরি পাবেন তার বিনিময়ে, এমন কি তাঁর চাকুরিকাল যখন অস্থায়ী, সেই সময়ে। কমিটি নিশ্চয়ই জানেন যে, এই রকম লাইব্রেরী ভারতে একটিই—আর ভারত সরকারের অধীনে সমবেতন ও সমান মর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন লাইব্রেরীয়ানের পদ নেই। কমিটি একজনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতই উৎসাহিত যে, এই জাতীয় প্রস্তাব দিতে এতদূর ইতস্তত করে নি, যার সদর্থ্য হচ্ছে এই যে, ভারত সরকারের উচিত—তাঁকে পদস্থ করতে নতুন পদ তাঁর করা। এইরকম সুপারিশ করা কমিটির বিচার্য বিষয় ছিল না।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে এক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে স্কেপ-গেট করা হয়েছে। তিনি হচ্ছেন ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান শ্রীচিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। চিন্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় এখানে নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই, ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে তাঁর যে মূল্য কত এবং তিনি যে কিভাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা করে আসছেন, সে কাহিনী সুধীসমাজ ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীর অগণিত পাঠক-পাঠিকাদের অজানা নয়।

আমরা এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানী, ভাষাতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, বাণিজ্যিকীদের দ্বারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিকট প্রেরিত একটি পত্রের অনুলিপি প্রকাশ করছি।

Calcutta, Dt. the 1st July, '70
Dear Dr. Rao,

We feel compelled to write to you on a matter of vital importance to the scholastic world.

ঐতিহাসিক বন্দন

Some of the signatories you know personally; some others, we hope, you know by reputation. All of us have one thing in common, namely our deep love for the National Library where most of us have been regular readers for a long time past for the purpose of study and research. Those whose visits to the Library have been less frequent are also equally deeply interested in, and in touch with its proper functioning as a unique centre of study and research and an invaluable instrument for the advancement of knowledge. It is in the interest of this National Library that we are addressing you.

We are dismayed to read in the papers a very brief summary of the findings of the one-man Khosla Commission, recommending, among other things, the compulsory and premature retirement of Sri Chittaranjan Banerjee, Deputy Librarian, apparently as a punishment for the tension between the present Librarian and the staff.

We have no desire to take sides in this controversy though we are far from convinced that Sri Banerjee is at all responsible for the tension. What we are concerned with is the fatal blow that will be struck to scholarship and research within the Library if Sri Banerjee is removed from here. The break with the great tradition set by such giants of old as Macfarlane, Harinath De and Chapman will then be complete.

Those of us who have regularly used the National Library and known Sri Banerjee for years have found in him a rare combination of scholarship and unrivalled knowledge of books and other materials within this Library,

which has been of very great help to scholars and investigators in a wide variety of subjects. He is, by all accounts, a sort of living bibliography whose wide knowledge is always at the service of every would be research-worker. We feel that the removal of Sri Banerjee, long before he reaches the normal age of retirement at fifty-eight, will be a great loss and we fervently hope that no action will be taken by you which will deprive us of his services. He should be allowed to carry on the good work he is doing and also train up a number of promising Assistants, able to take his place when his normal retirement falls due.

To

Dr. V. K. R. V. Rao,
Minister of Education &
Youth Services,
Govt. of India,
New Delhi.

Yours very sincerely,

Sd/-

Dr. Tarashankar Banerjee

Dr. S. N. Sen

Vice-Chancellor,
Calcutta University.

Mr. Justice B. K. Guha.

I.C.S. (Retd.)

Ex-Vice-Chancellor,
Burdwan University.

Dr. R. C. Majumder
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.

Dr. Sunity Kumar Chatterjee
National Professor and
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.

Prof. Satyen Bose
National Professor and
Ex-President, Asiatic
Society, Calcutta.

Sri P. B. Chakraborty
Ex-Chief Justice
Calcutta High Court.

Dr. Bhabatosh Dutta
Director of Public Instruc-

tion & Education Secretary,
(Retired) Govt. of West
Bengal.

Dr. Amallesh Tripathy
Professor of History,
Presidency College,
Calcutta.

Prof. Lotika Ghosh
Principal, Sarojini Naidu
College (Retired), Calcutta.
Prof. Nirmal Ch.

Bhattacharjee
Dr. Mahadev Shah
C/o. Asiatic Society,
Calcutta.

Sri Kalicharan Ghosh
Author & Journalist.

Sri Benoy Ghosh
Author & Journalist.

Prof. P. Lal
Department of English
Calcutta University.

Dr. Parimal Ray
Retired Director of Public
Instruction, West Bengal.

Dr. Roma Chaudhuri,
Vice-Chancellor, Rabindra
Bharati University,
Calcutta.

Sri Hiranmoy Banerjee
I.C.S. (Retired)

Ex-Vice-Chancellor, Rabindra
Bharati University, Calcutta.

Sri J. N. Talukdar,
I.C.S. (Retired)

Dr. N. K. Sinha
Professor and Head of the
Department of History,
Calcutta University.

Dr. Amalendu Bose
Professor and Head of the
Department of English &
Dean of the Faculty of
Library Science, Calcutta
University.

Dr. Pratul Gupta
Professor and Head of the
Department of History &
Acting Vice-Chancellor,
Jadavpur University,
Calcutta

তদন্ত কমিটি প্রীকালিয়ার কাজ সম্পর্কে
সন্তুষ্ট হয়েছেন।' তবু তাঁর বদলির
সুপারিশ করা হয়েছে কলকাতার
[৩৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]



অনাস্থা প্রস্তাব ধোপে টিকল না

পার্লামেন্টের বর্ষাকালীন অধিবেশন সূর্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলবার হিড়িক পড়ে যায়। দক্ষিণ-পন্থী "মহাজোট"-ই (স্বতন্ত্র-জনসংঘ-সিপিএম) এই অনাস্থা প্রস্তাবের প্রধান উদ্যোক্তা। তার সঙ্গে এবার যোগ দিয়েছিলেন "শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইন্দিরা গভর্নমেন্টকে ওল্টাবার" ধনুর্ভঙ্গ পণে আবশ্য এস-এস-পি এবং সি-পি-এম। তার মধ্যে মধু লিমায়ের (এস-এস-পি) অনাস্থা প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য লোকসভায় গৃহীত হয় এবং ২৮শে জুলাই সেই প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক সূর্য হয়ে ২৯শে জুলাই শেষ হয়। প্রস্তাবের ওপর ভোট গ্রহণের পর সের্টি ২৪৩-১৩৭ ভোটে বাতিল হয়ে যায়। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন সিপিএম-৪৬ (৬৩), স্বতন্ত্র-২৮ (৩৬), জনসংঘ-২৭ (৩৩), সি-পি-এম-১৮ (১৯), এস-এস-পি-১২ (১৭), নির্দলীয়-১ এবং দলবাহিত-৫। অনাস্থা প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন : কংগ্রেস-১৮৯ (২২২), ডি-এম-কে-৮ (২৫), সি-পি-আই-২১ (২৪), নির্দলীয়-১০, দলবাহিত-১৩ (২৮) এবং বি-কে-ডি-২ (৯)।

ভোটদানের সময় অনুপস্থিত ছিলেন পি-এস-পি-১১ (১৬), সিডি-কেট-১।

লিমায়ের অনাস্থা প্রস্তাবে সরকারের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগ করা হয়েছিল : (১) কেন্দ্রীয় সরকার কেরালার ভোটার তালিকায় কারচুপি করে সেখানে নির্বাচনে জালিয়াতির সুযোগ করে দিচ্ছেন এবং বিধানসভার আস্থা বিবর্জিত একটি সংখ্যালঘু গভর্নমেন্টকে জিইয়ে রেখে গণতন্ত্র-বিরোধী প্রবণতার উস্কানী দিচ্ছেন। (২) প্রধানমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ের হাতে অতিরিক্ত

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। (৩) শাসনমন্ত্রের ওপর মন্ত্রিসভার নিয়ন্ত্রণের নীতি বর্জন করে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

এই অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে চরম দক্ষিণপন্থী এবং চরম বামপন্থী দলের অপূর্ব মিলন দেখে ভারতের রাজনৈতিক পর্ববিক্ষকরা দস্তুরমত হকচাকিয়ে গেছেন। প্রস্তাবের আলোচনাকালে দেখা যায়, সি-পি-এম এবং এস-এস-পি দল কেরালার আসন্ন নির্বাচনকেই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থির করেছেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী দলগুলো প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিবেচ্য প্রচারে এবং সোভিয়েট-ভারত মৈত্রীর বিরুদ্ধে বিয়োগ্যারেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী অনাস্থা প্রস্তাবে বর্ণিত অভিযোগগুলো অস্বীকার করে বলেন যে, ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েটের সূত্রপাত স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমলে। তখন ওটাতে কারও আপত্তি হয় নি। এখন ওটাকে "ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত" করার একটা যন্ত্র বলে অভিযোগ করবার কি কারণ থাকতে পারে, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকার্য আগেও যেভাবে পরিচালিত হচ্ছিল, এখনও সেইভাবেই পরিচালিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত মধু লিমায়ের আর অশোক মেটা অভিযোগ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নীতির ফলে ভারত সোভিয়েটের তলপীবাহকে পরিণত হয়েছে। অপর দিকে সি-পি-এম অভিযোগ করেছেন যে, ভারত আমেরিকার তলপী বহন করে চলেছে। আমেরিকা এবং সোভিয়েটের তলপী একসঙ্গে বহন করা যে ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রধানমন্ত্রীও সেই কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে, স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধেও ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীর অভিযোগ তুলেছিলেন যে, তিনি সোভিয়েটের

ভাষা-বাক্য বোঝে না। কিন্তু ভারত বরাবরই গোষ্ঠীনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। তার কোন ব্যতিক্রম এখনও হয় নি। কেরালার ভোটার তালিকা কারচুপির অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভোটার তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনারের। তিনি সরাসরি রাষ্ট্রপতির অধীন। তাঁর এস্তিয়ারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার গভর্নমেন্টের নেই। কাজেই ভোটার তালিকার অভিযোগ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

কেরালায় ভোটার তালিকায় কারচুপির যে অভিযোগ লিমায়ের তুলেছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, তিন বছর আগে কেরালায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৮৬ লক্ষ। নতুন তালিকায় নাকি সেই পুরাতন তালিকার ১৭ লক্ষ ভোটারের নাম নেই, কিন্তু ৩০ লক্ষ নতুন ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। এটা লিমায়ের এবং গোপালনের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। এর জবাবে এস এস ডাঙ্গে (সি-পি-আই) বলেছেন কেরালার ভোটার সংখ্যা বেড়েছে ২.৭ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২.০৮ শতাংশ এবং তামিলনাড়ুতে ২.১২ শতাংশ। সুতরাং এর মধ্যে ডাঙ্গে কোন অস্বাভাবিকতা খুঁজে পান নি।

মহাজোট ভেঙে গেল

সি ডি কে টের মোরারজী-নিজ-লিঙ্গাপ্পা এন্ড কোং গ্রীষ্মতী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্টকে উল্টে দেবার জন্য স্বতন্ত্র, জনসংঘ এবং অন্যান্য দক্ষিণপন্থী দলগুলোকে নিয়ে তথাকথিত মহাজোট গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত শূন্যে সৌধ নির্মাণে দাঁড়িয়ে গেল। সিডি-কেটের মধ্যেই মহাজোটের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিল তাতে প্রস্তাবটা ধামাচাপা দেওয়া ছাড়া মোরারজী-নিজলিঙ্গাপ্পার আর কোন উপায় রইল না। লোকসভায় সিডি-কেটী নেতা ডঃ রামসুভগ সিংকে সারিয়ে সেই জায়গায় অশোক মেটাকে বসাবার একটা চেষ্টা হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছিল। মেটা মহাজোটের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। রামসুভগ সিং যখন সেটা টের পেয়ে গেলেন, তখন তিনি বুঝতে পারলেন, মহাজোট গঠিত হলে তিনি গদিচ্যুত হতে পারেন। তাই তিনি মহাজোটের বিরোধিতা ঘোষণা করেন এবং পদত্যাগের হুমকী দেন। অপরদিকে মানুভাই শা' ঘোষণা করেন যে, মহাজোট গঠিত হলে তিনি সদলবলে সিডি-কেট ত্যাগ করবেন। অভূতাব্য ঘোষ, কামরাজ, সঞ্জীব রোহিও নাকি মহাজোটের বিরুদ্ধে। মহাজোটের

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পক্ষে ছিলেন মোরারজী, অশোক মেটা, সূচেনা কৃপালনী, তারকেশ্বরী সিংহ প্রমুখ। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সিঁড়িকেটে মন্ত্রাজোটের বিরুদ্ধবাদীরাই দলে ভারী। তাই মোরারজী-নিজ-লিঙ্গাপ্পা এন্ড কোং হতাশায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, শ্রীমতী গান্ধীর গভর্নমেন্টকে ১৯৭২ সালের আগে উল্টে দেওয়া তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবার সিঁড়িকেটে ভাঙন সূর্য হলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

কেরালায় নির্বাচন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস পি সেনবর্মী ঘোষণা করেছেন যে, আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর কেরালায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। একই দিনে বিধানসভার ১৩৩ আসনের সঙ্গে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী গোবিন্দ মেননের (স্বর্গত) শূন্য পার্লামেন্টারী আসনেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ধার্য হয়েছে ২৪শে আগস্ট, মনোনয়নপত্র পরীক্ষা হবে ২৫শে আগস্ট, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের তারিখ ২৭শে আগস্ট এবং নির্বাচন ১৭ই সেপ্টেম্বর। ভোট গণনা ১৮ই সেপ্টেম্বর।

কেরালায় নান্দুদ্রিপাদের (সি-পি-এম) নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অচ্যুত মেননের (সি-পি-আই) নেতৃত্বাধীন মিনিফ্রন্ট সরকার কয়েম হবার পর থেকে সি-পি-এম সাধারণ নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। কিন্তু নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা আশু নির্বাচনের তীব্র বিরোধিতা করতে সুরু করেছে। এ ব্যাপারে এস-এস-পিও তাদের অংশীদার। তাদের অভিযোগ, ভোটের তালিকা সম্পূর্ণ নয়। কেরালায় খসড়া ভোটের তালিকা ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। সেই তালিকা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে এই বছর জানুয়ারী মাসে। তার ভিত্তিতে বেশ কয়েকটি উপনির্বাচনও হয়ে গেছে। তখন কেউ ভোটের তালিকা সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নি। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া মাত্র সেই ভোটের তালিকার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠে। সি-পি-এম এই ভোটের তালিকার বিরুদ্ধে দিল্লীর হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করে। নির্বাচন স্থগিত রাখার চেষ্টা করছেন। আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই মামলার শুনানী সুরু হবে।

ভোটের তালিকার অভিযোগ নিয়ে সি-পি-এমকে আদালতের স্মরণ হতে দেখে বামপন্থী রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে। বছর দেড়েক আগে কেরালার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নান্দুদ্রিপাদ (সি-পি-এম) এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, “মার্জ ও এঙ্গেলস্ বিচারশালাকে উৎপীড়নের যন্ত্র বলে মনে করতেন। বিচারকরা শ্রেণীস্বার্থ শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা এবং শ্রেণীবিশেষের দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত হন। যখন কোন দামী মাজপোষাক সরা মোটাসোটা গোলগাল চেহারার বড় লোকের সঙ্গে জরাজীর্ণ বসনে ভূষিত গরীব অশিক্ষিত লোকের মামলা হয় তখন সাক্ষ্যপ্রমাণ ঘাই থাক না কেন, অনিবার্যভাবে বড়লোকের অনুকূলেই রায় প্রদান করেন। তাঁর পার্টি (সি-পি-এম) বরাবরই মনে করেন যে, বিচারশালা শাসক শ্রেণীর শ্রেণী শাসনের একটি অঙ্গ। বিচারশালা শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এবং আইন ও বিচারশালা মূলত শোষক শ্রেণীরই সেবা করে থাকে। যেখানে বিচারশালাকে প্রশাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়েছে, সেখানেও প্রশাসকরা তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে চাপ সৃষ্টি করেন। বিচারকরা ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খেলালখুশমত রায় দেন। শ্রেণীস্বার্থ, শ্রেণীবিশেষ এবং শ্রেণীগত কুসংস্কারই তাদের প্রধান চালিকা শক্তি।”

কেরালার হাইকোর্ট নান্দুদ্রিপাদের এই বক্তব্যকে আদালত অবমাননার সাক্ষ্য মনে করে তাঁর ওপর হাজার টাকার জরিমানার আদেশ জারী করেছিলেন। নান্দুদ্রিপাদ সেই দণ্ডদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করেছিলেন। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত একটি বেঞ্চ গত ৩১শে জুলাই নান্দুদ্রিপাদের সেই আপীল অগ্রাহ্য করে দণ্ডদেশ বহাল রেখেছেন। তবে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে ৫০ টাকা ধার্য করেছেন।

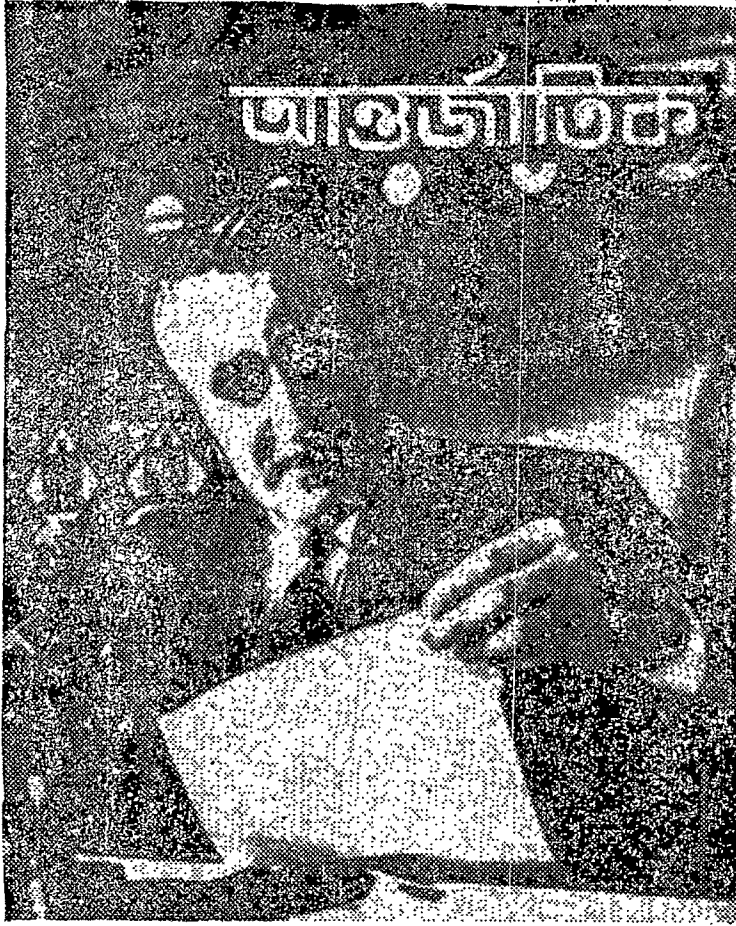
বিচারশালা সম্বন্ধে নান্দুদ্রিপাদ এবং তাঁর দল যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন, তাতে বিচারশালা সম্পর্কে তাঁদের বিন্দু-মাত্র আস্থা না থাকাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও ভোটের তালিকার অভিযোগ নিয়ে তাঁরা যে সেই বিচারশালায় বিচারপ্রার্থী হয়েছেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে বিচারশালায় ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে তাঁরা একেবারে আস্থাহীন নন।

ওড়িশা বন্ধ

গত ২৭শে জুলাই সর্বদলীয় ইম্পাত কারখানা সংগ্রাম সমিতির আহবানে ওড়িশায় দ্বিতীয় ইম্পাত কারখানার দাবীতে ওড়িশা বন্ধ প্রতিপালিত হয়। সেদিন সমগ্র ওড়িশার জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারী, নোকান-বাজার যান-বাহন সবই ছিল বন্ধ। এমন কি ওড়িশার মুখ্য দিয়ে গমনাগমনকারী ট্রেন-গুলোকেও ওড়িশার সীমানার বাইরে আটকে রাখা হয়েছিল। কটক বেতার কেন্দ্রেও সেদিন কোন প্রোগ্রাম চালু থাকে নি। এ কথা কারও অজানা নেই যে, ভারতবর্ষ আকরিক লৌহে অতিশয় সমৃদ্ধ দেশ। ওড়িশা সেই আকরিক সম্পদের একটা প্রধান উৎস। ইম্পাত উৎপাদনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেরও (কেয়লা, চুন, জল ইত্যাদি) কোন অভাব ওড়িশায় নেই। কাজেই সেখানে একটি দ্বিতীয় ইম্পাত কারখানার দাবী ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ইংরাজ আমলে ওড়িশা বরাবরই ছিল অবহেলিত রাজ্য। তাই সেখানকার শিল্প-বাণিজ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে নি। দেশ স্বাধীন হবার পর ওড়িশায় একটি ইম্পাত কারখানা সহ একাধিক বৃহৎ শিল্পের পত্তন হয়েছে এবং একটি সমুদ্রিক বন্দরও নির্মিত হয়েছে, কিন্তু তাতে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন কোন উন্নতি হয় নি। কারণ প্রয়োজনের তুলনায় সেটা একেবারেই নগণ্য। ওড়িশায় মাথাপিছু আয় অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখনও অনেক কম। একটি ইম্পাত কারখানা নির্মিত হলে তাকে কেন্দ্র করে আশপাশে আরও বহু শিল্প-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। তাই ওড়িশাবাসীর মনে হয়ত এই রকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, আর একটা ইম্পাত কারখানা তৈরি হলে তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারবেন।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইম্পাত কারখানা নির্মাণ করতে প্রচুর মূলধন এবং কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রচুর লোকের দরকার হয়। আর সেই মূলধনের মূল্য আসতে যথেষ্ট সময় লাগে। বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তিনটি ইম্পাত কারখানা ক্রমাগত লোকসান খাচ্ছে। ব্যবস্থাপনার ত্রুটিই তার জন্য মূলত দায়ী। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই দক্ষিণ ভারতে তিনটি ইম্পাত কারখানা স্থাপনের কথা ঘোষণা করেছেন। তার ওপর ওড়িশায় একটি

“৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।”



পশ্চিম এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার 'সুযোগ গ্রহণ করার জন্য' নাসের রজার্স-প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছেন।

পশ্চিম এশিয়া :

পশ্চিম এশিয়ায় শান্তিপ্রতিষ্ঠাকল্পে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইজরায়েল তা গ্রহণ করেছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ছাড়া জর্ডানও এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। কুয়েইত, সুদান, লেবানন ও লিবিয়াও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডানের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে।

১৯শে জুন উইলিয়াম রজার্স তাঁর প্রস্তাব সম্বলিত চিঠি ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রসংঘ নি রা প স্তা পরিষদের ১২ই নভেম্বর ১৯৬৭ তারিখের প্রস্তাবে (২৪২ নং প্রস্তাব) ভিত্তিতে রচিত রজার্স শান্তি পরিকল্পনার মূল কথা হল : (১) আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে লিপ্ত উভয়পক্ষ অবিলম্বে অতীতপক্ষে ৯০ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করবে; (২) যুদ্ধবিরতি কার্যকরী হবার সঙ্গে সঙ্গে

পশ্চিম এশিয়ায় রাষ্ট্রসংঘের শান্তিদূত ডঃ গানার জারিং উভয়পক্ষের সঙ্গে আলোচনা সূত্র করবেন; এবং (৩) আরব-ইজরায়েল বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে যে-কোন আলোচনার ভিত্তি হবে—অধিকৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলের অপসারণ, আরব রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক ইজরায়েলের সার্বভৌমত্ব স্বীকার এবং আরব উন্মুক্ত সমস্যার ন্যায্য সমাধান।

রজার্স শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রথম দিকে আরব মহলে বিশেষ কোন উৎসাহ দেখা যায় নি। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও আরব জগতের প্রধান নেতা আবদুল গামেল নাসের বলেছিলেন, "এই প্রস্তাবে নতুন কিছু নেই।" কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাসের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। ফারুক শাসন উচ্ছেদের অষ্টাদশ বার্ষিকীতে কায়রোর এক জনসমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে নাসের বলেছেন, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার "সুযোগ গ্রহণ করার জন্য" তিনি এই প্রস্তাবে সাড়া দিচ্ছেন। তবে, আরব জাতিকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে কোন পরিস্থিতির জন্য।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্র-

মন্ত্রী মুহাম্মদ রিয়াদ কায়রোর স্পেন দূতাবাসে "মার্কিন স্বার্থ সংক্রান্ত বিভাগের" প্রধান ও কায়রোর প্রধান মার্কিন কটেনীতিক ডোনাল্ড বারগাসের কাছে লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন।

নাসেরের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে সোভিয়েত যুনিয়নের প্রভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। শান্তি প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক আগে নাসের ১৯ দিন সোভিয়েত যুনিয়নে ছিলেন। এই সময় সর্বোচ্চ সোভিয়েত নেতাদের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। প্রাথমিক আপত্তি কাটিয়ে নাসের যে মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণে রাজী হয়েছেন, তার জন্য সোভিয়েত নেতাদের চাপ ছিল। অনর্থক দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সোভিয়েত নেতারা মোটেই ইচ্ছুক নন। তাই, যে-কোন আকস্মিক আরব রাষ্ট্র-গুলিকে সবপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া সত্ত্বেও সোভিয়েত যুনিয়ন আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের অবসান চায়। আর, এর জন্য, ইজরায়েল সম্পর্কে আরব নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন প্রয়োজন। কখনও কোন অবস্থাতেই ইজরায়েলকে স্বীকার করব না, এই নীতি পাট্টাতে হবে। ইজরায়েলকেও যেমন দখল করা আরব ছুঁমি ছাড়তে হবে, তেমনি আরবদেরও ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মেনে নিয়ে আলোচনা সূত্র করতে রাজী হবার অর্থ, নাসের মোটামুটি সোভিয়েত যুক্তি মেনে নিয়েছেন। ইজরায়েলের সঙ্গে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে তিনি প্রস্তুত। সোভিয়েত যুনিয়ন আরবদের প্রধান বন্ধু। সোভিয়েতের পরামর্শ, নাসেরের পক্ষে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

নাসের অবশ্য বলেছেন, কেবল দখল করা এলাকা ছেড়ে দিলেই চলবে না, ১৯৪৮ ও ১৯৬৭ সালে যে বিশ লক্ষ আরব ইজরায়েল থেকে উৎখাত হয়ে স্বতমানে উন্মুক্ত জীবনযাপন করছে, এদের সবাইকে ইজরায়েলে ফিরিয়ে নিতে হবে। এতে ইজরায়েলের ঘোরতর আপত্তি।

ইজরায়েলের পক্ষে রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করা আরও কঠিন মনে হয়েছিল। প্রথমত, তারা বরাবর বলে এসেছে যে-কোন মীমাংসার জন্য তারা সরাসরি আরবদের সঙ্গে কথা বলবে। গানার জারিং-এর মারফৎ পরোক্ষ আলোচনায় তাদের মত নেই। সরাসরি প্রত্যক্ষ আলোচনার স্বারা তারা বোঝাতে পারবে, আরবরা তাদের মেনে নিতে বাধ্য

সাংগাহিক বসুমতী

হয়েছে। আরবরাও ঠিক এই কারণে প্রত্যক্ষ আলোচনার বিরোধী। ত্বিভীয়ত, ইজরায়েলের ভয়, সামরিক যুদ্ধবিরতির সুযোগ নিয়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র নতুন করে সোভিয়েত সামরিক অস্ত্রসম্পদ আনবে ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার সুযোগ পাবে।

ইজরায়েলী মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টে রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে তীব্র মতভেদ হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম অংশীদার গহাল পার্টি হুমকী দিয়েছে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে তারা সরকার থেকে বেরিয়ে যাবে। তবু শেষ পর্যন্ত মার্কিন চাপে ইজরায়েল রজার্স প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ৩১শে জুলাই সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এখন রাষ্ট্রসংঘ পর্যায়ে শান্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থাট ইতিমধ্যেই প্রধান প্রধান শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। নিউ ইয়র্কে এই ব্যাপারে চতুর্ভুক্তি বৈঠক বসছে। গানার জারিং চিঠি লিখছেন বিবদমান সকল পক্ষকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গোলমাল আছে। অনেকগুলি আরব রাষ্ট্র রজার্স প্রস্তাবের ভিত্তিতে শান্তি প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হলেও সিরিয়া ও ইরাক এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। দামাস্কাস ও বাগদাদের পথে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। নাসের এই প্রস্তাব মেনে নেয়ার নাসেরের বিরুদ্ধেও তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বামপন্থী আরবদের সমর্থন নাসের হারাবেন, এমন আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। প্যালেস্টাইন গেরিলা বাহিনীর নেতারাও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বলেছেন, তাঁরা কোন যুদ্ধবিরতি মানবেন না।

আর, এই সুযোগে, ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে চীন। ৩০শে জুলাই পিকিং রেডিও থেকে রজার্স প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করে একে পশ্চিম এশিয়ার মিউনিক চক্রান্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এর দ্বারা আরব স্বার্থকে বালি দেয়া হচ্ছে। আরব-বিরোধী এই মার্কিন চক্রান্তে যোগ দিতে আরব রাষ্ট্রগুলিকে বাধ্য করার জন্য, নামোস্তেখ না করে পরোক্ষভাবে, সোভিয়েত য়ুনিয়নের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে পিকিং রেডিও থেকে।

সোভিয়েত য়ুনিয়ন :

২৭শে জুলাই থেকে মস্কোতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াল্টার শিল ও সোভিয়েত য়ুনিয়নের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আন্দ্রে গ্রেমিকোর মধ্যে।

সাধারণ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ক্রিস্টিয়ান-ডেমোক্রেটদের হা রি-য়ে সোস্যাল ডেমোক্রেট ও ফ্রি ডেমোক্রেটদের কোয়ালিশন সরকার গঠনের পর থেকেই পশ্চিম জার্মানীর নতুন চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে আসছেন। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে একটা মীমাংসার পৌঁছবার জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। চেষ্টা করছেন সোভিয়েত য়ুনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য।

মে মাসে উইলি ব্র্যান্ডের একান্ত বিশ্বাসভাজন ইগন বার মস্কো গিয়ে আন্দ্রে গ্রেমিকোর সঙ্গে প্রাথমিক কথা-বার্তা বলে এসেছেন। তারই ভিত্তিতে এবার শিল-গ্রেমিকো বৈঠক হচ্ছে।

সোভিয়েত য়ুনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার কথা আছে, তাতে উভয় পক্ষ 'বলপ্রয়োগ' পরিহারের কথা বলবেন, যে কোন বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলোচনার দ্বারা মীমাংসার ওপর জোর দেবেন এবং য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বর্তমান সীমানা মেনে নেবেন।

য়ুরোপের বর্তমান মানচিত্র মেনে নেবার অর্থ পূর্ব জার্মানীর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং দুই জার্মানীর এককের সম্ভাবনাকে নষ্ট করা, এই যুক্তিতে বিরোধী ক্রিস্টিয়ান-ডেমোক্রেটরা ব্র্যান্ড-শিল নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং অস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও মস্কো বৈঠকে দশকরূপে কাউকে পাঠান নি। এই সমালোচনা

সত্ত্বেও পশ্চিম জার্মানী সরকার সোভিয়েত য়ুনিয়নের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরে অগ্রসর হয়েছেন।

এই প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত সরকারিভাবে শিল-গ্রেমিকো আলোচনার ফলাফল জানা যায় নি। কয়েকটি প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে মতভেদের কথা প্রচারিত হয়েছে।

দক্ষিণ ভিয়েতনাম :

দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাদাম বিনকে ভারতে আমন্ত্রণ করায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার খুব চটেছে। তারা সরকারিভাবে ভারতের কাছে তাদের আপত্তি জানিয়েছে।

স্পর্শতই, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের উস্কানিতে গত ২৭শে জুলাই প্রায় একশ'র মত দক্ষিণ ভিয়েতনামী যুবক ও প্রাক্তন সৈনিক সায়গনে তু দো স্ট্রীটে ভারতের কনসাল-জেনারেলের অফিস আক্রমণ করে এবং ভারতের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ও তারপর তা পোড়ায়।

ভারতের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, ভারতের কনসাল-জেনারেল শ্রীশ্যামসুন্দর নাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে যে পত্র পাঠান, দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। যদিও পরে তারা ঘটনাকে দঃখজনক বলে ক্ষমা চেয়েছে।

৩১শে জুলাই আবার একদল প্রাক্তন সৈনিক সায়গনে ভারতের কনসাল-জেনারেলের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে।

সায়গনে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের দোকান ও অফিসে গিয়ে হুমকী দেখানো হচ্ছে এবং তাদের অবিলম্বে ভারতে ফিরে যেতে বলা হচ্ছে। ২৭-৭০

শারদীয়

সাংগাহিক বসুমতী

১০৭৭

বের হবার সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন

সৃষ্টি করবে

বেহুবে মহালয়ার আগাই

জাকস্মিক ও চমকপ্রদ কিছু ঘটলেই আমার মিজ। গালিব-এর কথা মনে পড়ে যায়। গালিবের উদ্দেশ্যে বয়াতটো মনে নেই। কিন্তু বাংলা ভজ্জমাটা মনে আছে। সেটা হল—প্রিয়তম, কাল তুমি বলছিলেন তোমার বিছানার ওপর উঠে বসবার শক্তি নেই, কিন্তু আজ তুমি এত শক্তি কোথায় পেলে যে, বিছানা নয়—ঘর নয়—বিশ্ব সংসার ছেড়ে চলে যেতে পারলে। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ঠিক একই চমক, একই বিস্ময়। কাল যে কথা সত্য ছিল, কাল যে কথা নিশ্চিত ছিল, কাল যে ঘটনা অবশ্যম্ভাবী ছিল, আজ দেখা যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে গেছে। তাই গালিবের প্রিয়তমের মত বিস্ময়ে বলতে হচ্ছে—কাল তুমি এত শক্তিহীন ছিলে, কিন্তু এক রাতি না যেতে এত শক্তি তোমার কোথা থেকে এল।

বৃহস্পতিবার ৩০শে জুলাই সন্ধ্যা-বেলায় দুটো চমক-লাগানো খবর রাজ্য-রাজনীতির সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে বড় খবর ছিল। একদিন আগে কলকাতায় ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ভূমিকম্প হঠাৎ ও আকস্মিকভাবে হয়ে সব কিছু লুপ্তভস্ম করে দেয়। যদিও ২৯শে জুলাই কলকাতায় যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা লুপ্তভস্ম করতে পারে নি। কিন্তু ৩০শে জুলাই রাতে সামান্য সময়ের ব্যবধানে রাজ্যপালের বিধানসভা বাতিলের সিদ্ধান্ত আর বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত



রাজ্য-রাজনীতিতে সব চিন্তা-ভাবনার ওলটপালট করে দিয়ে গেছে।

কদিন আগে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী কলকাতায় রাজভবনে এসে ন' ঘণ্টা ছিলেন। রাজভবন থেকে বেরিয়ে যাবার আগে কয়েক মিনিটের জন্য সাংবাদিকদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন শ্রীমতী গান্ধী। লেখক স্বয়ং প্রধান-মন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন—মহাশয়া, দয়া করে বলুন, পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার ভবিষ্যৎ কি এবং বিধানসভা বাতিল হবার কি হচ্ছে? শ্রীমতী গান্ধীর মুখখানা এখনো মনে পড়ছে—গ্রীষ্ম বৌকয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন—আমি জানি না। প্রশ্নের জবাবে আমি জানি না কথা এমনভাবে বলেছিলেন যে, আমার প্রশ্নটা বৃথা ছিল আহম্মক ও বাল-খিয়ার মত। সত্য কথা বলতে কি শ্রীমতী গান্ধীর 'আমি জানি না' বলবার পর বিতীয় কোন সার্মিমেণ্টারী প্রশ্ন তাঁকে আমি করতে পারি নি, বলতে পারি নি—আপনি জানেন না, তবে কে জানে, আপনি প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সেই প্রশ্ন তখন ওঠে নি। রাজ্যপাল শ্রীধাওয়ান মায় দুদিন আগে দিল্লী থেকে ফিরলেন কলকাতায়। বিমান-বন্দরে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলো বিধানসভা কি বাতিল হচ্ছে? প্রায় প্রধানমন্ত্রীর মত একই মেজাজে শ্রীধাওয়ান বলেছিলেন—না, বিধানসভা বাতিল হবে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালের এমন দৃঢ়তাপূর্ণ মনোভাব কোথায় গেল, ৩০শে জুলাই রাতে যখন ঘোষণা করা হল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা বাতিল হল!

একই বিস্ময় বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তে। জুলাই মাসেরই প্রথম দিকে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আট পার্টির বৈঠক হয়। এই বৈঠকের আগেও বাংলা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে আট পার্টির নেতাদের অনেক আলাপ-আলোচনা,

এ বৈঠক হয়েছে। সেই সব বৈঠকের পরিণতি ঘটেছিল বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টির বৈঠক। আট পার্টির সঙ্গে বাংলা কংগ্রেসের বৈঠকের পর শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী প্রশ্ন করে-ছিলেন—বৈঠক তো হল, এবার খবর কাগজকে কি বলা হবে? বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান নিশ্চিত ভেবে শ্রীবিশ্বনাথ মুখো-পাধ্যায় বলেছিলেন—কেন? বলা হবে যে, আমাদের কথা শুনেন বাংলা কংগ্রেস খুশি হয়েছে, পরে বাংলা কংগ্রেস বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। খুশি কথা-টায় আপত্তি করেছিলেন শ্রীসুশীল ধাড়া। বলেছিলেন—খুশি বলার দরকার কি? বলুন আমরা শুনছি! তার পর সাংবাদিকদের কাছে আট পার্টির নেতারা বারে বারে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুশীল ধাড়ার সঙ্গে আলোচনা করে বলেছেন, আট পার্টিতে বাংলা কংগ্রেসের যোগদানের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, বাংলা কংগ্রেস বলেছে আমরা মনের অনেক কাছাকাছি এসেছি।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সাম্প্রতিক-কালে অনেকবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন আর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের কথার মধ্যে যে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা হল পশ্চিমবঙ্গে সরকার হবে কি না সেটা ঠিক হবে বাংলা কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সভায় আলোচনার পর—আট পার্টিতে যোগদান ও আলোচনা



কলকাতায় ভূমিকম্প!



ওকি এলো, ওকি এলো না.....

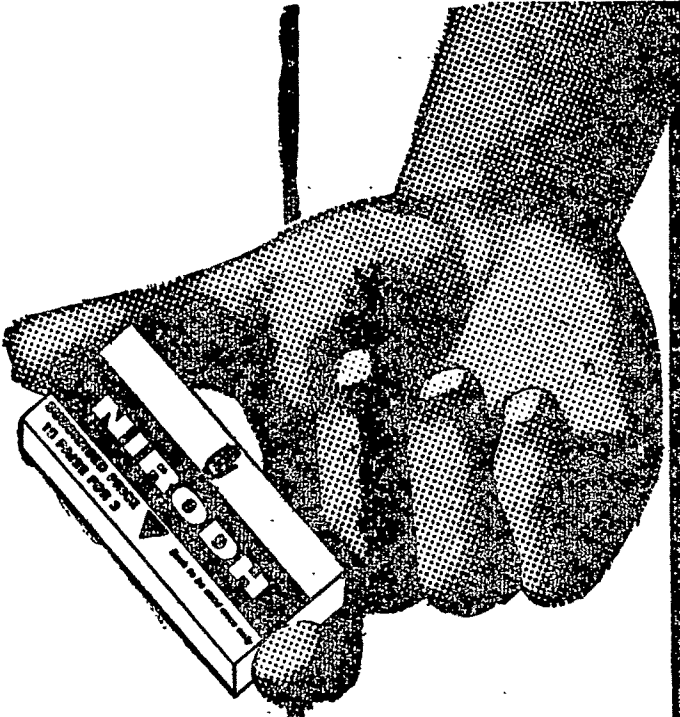
गाथादक. वनप्रती

হবে সেই একই কম'পরিষদের সভায়।
শ্রীমদ্বৈখোপাধ্যায় এমন কথাও বলেছিলেন
যে, হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে আট পার্টি ও বাংলা
কংগ্রেস এক হলে সরকারও করতে
পারে? তার পর ৩০শে বাংলা
কংগ্রেসের কম'পরিষদের সভার আগে
কয়েকদিন ধরে সি পি আই, পি এস
পি দলের নেতারা ধারে ধারে দেখা
করেছেন শ্রীঅজয় মদ্বৈখোপাধ্যায়ের সঙ্গে

আম্র খুশিমনে ফিরে এসেছেন ধরে নিয়ে
যে, বাংলা কংগ্রেস আর্ট পার্টিতে যোগদান
করছে। সি পি আই দলের যারা
শ্রীজয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ৩০শে
জুলাই-এর আগে দেখা করেছিলেন,
তার মধ্যে শ্রীসোমনাথ লাহিড়ী
ছিলেন।

শ্রীলাহিড়ীর চোখ দড়টো খুবই
 খারাপ হয়ে গেছে সন্দেহ নেই কিন্তু

শ্রীলাহিড়ী'র মত দুর্দান্ত সম্প্রদায় রাক্ষ-
সৈন্যিক নেত্রা পশ্চিমবঙ্গে আর
শ্রীলাহিড়ী নেই। এই কথা প্রায় সকলেই
স্বীকার করেন। শ্রীলাহিড়ী'র মূসা-
বিদা আর বিশ্লেষণ কখনও কারো
কাছে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় না। এই
শ্রীলাহিড়ীও শ্রীঅজয় মদুথোপাধ্যায়ের
সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং প্রায়
নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, বাংলা কংগ্রেস



মাত্র
5টি গয়সা
খরচ করলে
আগনি আগনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন !

নিষেধ



পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরনের
বন্ডারের জন্মনিগোধক
১৫ পয়সায় ৩টি

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଦେଖିବ ।

সময়ের ব্যবধানে সম্ভাবন
উৎপাদনের ক্ষেত্রে

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মাফিক
সময়ের ছেলেপিলের জন্ম দেওয়া
সম্ভব । হঠাৎ কিছু হয় না ।
আপনি যখন চাইবেন, তখনই
আপনি সন্তান উৎপাদন
করতে পারবেন । নিরোধ
আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের
মুযোগ দেয় ।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্তে
জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার
বছরের সময়ে শিশুর যত নেওয়া
উচিত—তাহলেই ওরা ভালো
ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তা-
রেরা মত দিয়ে থাকেন । সন্তান
প্রসবের পরে কৃতস্বাস্থ্য আবার
ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও
কিছু সমস্ত দরকার । বিরোধ
ব্যবহার করে আপনি খুব
সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম
দুর্গত রাখতে পারেন ।

নিরোধ (কণ্ঠায়) পুরুষদের
জন্মে উন্নত ধরণের রসারে তৈরী
জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র
নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ
এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ
পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে,
তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয়
না। নিরোধ সব জায়গায়
পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী
দোকান, ওষুধের দোকান,
সাধারণ বিপণী, পানের দোকান
আদিত্তে নিরোধ বিক্রী হয় ।

আট পার্টিতে যোগদান করছেই। কিন্তু কোথায় গেল বাংলা কংগ্রেস আট পার্টির মনের কাছাকাছি আসা? কোথায় গেল আট পার্টি ও বাংলা কংগ্রেসের এক হয়ে সরকার গঠনের সম্ভাবনা?

৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেস ঘোষণা করলো—না, তারা আট পার্টিতে যোগদান করছে না।

একটা প্রশ্ন তাই স্বভাবতই ওঠে। কেন এমন নিশ্চিত সম্ভাবনা, দৃঢ় ঘোষণা উল্টো হয়ে যায়। সেই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে—বাংলা কংগ্রেস যৌদিন রায়ে সিদ্ধান্ত নিল তারা আট পার্টিতে যোগদান করবে না, সেইদিন সেই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সামান্য আগেই রাজ্যপাল যে বিধানসভা রাতিল হয়ে না ঘোষণা করেন—তার মধ্যে কি কোন যোগসূত্র আছে? তা যদি না থাকবে—তবে রাজভবন আর বসন্ত বসু রোড থেকে দুটো ভূমিকম্প সৃষ্টিকারী সংবাদ একই দিনে একই সময়ে ঘোষণা হয় কি করে? এই সঙ্গে আরো একটা ঘটনা কিন্তু সবার অজ্ঞাতে এই দিন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই রায়ে ঘটে—যার সংবাদ একমাত্র বঙ্গবন্ধু পারিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংবাদ হল বাংলা কংগ্রেসের সভা যখন চলছে, তখন অর্থাৎ ৩০শে জুলাই রাত এটার সি পি আই দপ্তরে আট পার্টির চারজন নেতা এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। ৩০শে দুপুরবেলায় এস ইউ সি দলের শ্রীমতীহার মুখোপাধ্যায় জরুরীভাবে খবর দেন শ্রীবিষ্ণুনাথ মুখোপাধ্যায়কে এই বলে যে, জরুরী দরকার, সম্মুখী সাতটার বসতে হবে। ফরোয়ার্ড রকের কেউ কলকাতা ছিলেন না, তাই তাঁদের খবর দেওয়া হয় নি। বেলা পাঁচটা নাগাদ শ্রীঅশোক ঘোষ বিমানে করে কলকাতা আসেন এবং এসেই ছটা নাগাদ শ্রীবিষ্ণুনাথ মুখোপাধ্যায়কে ফোন করেন সর্বশেষ অবস্থা জানবার জন্য। শ্রীমুখোপাধ্যায় বলেন—জরুরী দরকার, সাতটায় সি পি আই অফিসে চলে এস। সেই সম্মুখী সাতটার সি পি আই অফিসে বসেছিলেন শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীবিষ্ণুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতীহার মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিদ্যুৎ বসু। প্রশ্ন করা যায়—কি জরুরী প্রয়োজনে তাঁরা বসেছিলেন, কি সংবাদ তাঁরা প্রত্যাশা করেছিলেন অথবা কোন ভবিষ্যৎ সংবাদের সম্ভাবনায় তাঁরা কর্মসূচী নিশ্চিহ্ন।

জানি ৩০শে জুলাই বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত কেন হল—এর জবাব গন্তব্যজনকভাবে পাওয়া যাবে না।

জানি, ৩০শে জুলাই রায়ে রাজ্যপাল কেন সব পূর্বমত বদল করে বিধানসভা বাতিলের সংবাদ ঘোষণা করলেন তার জবাব পাওয়া যাবে না—আবার ৩০শে জুলাই রায়ে সি পি আই দপ্তরে কোন জরুরী আলোচনায় চার দলের নেতারা বসেছিলেন তার জবাব পাওয়া যাবে না। জবাব পাওয়া না গেলেও জবাবের হাদিস করার চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে—সেই ক্ষেত্রে হয়ত কিছু আন্দাজ বা কিছু কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হতে পারে, হয়তো কিছু লোকমুখে শোনা কথা প্রভাব বিস্তার করতে পারে—কিন্তু তাই বলে গবেষণার অন্ত থাকে না। এমন কিছু গবেষণার সংবাদ এই একই সময়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গবেষণার সূত্র যদি বলতে হয়, তবে দুটো সংবাদ প্রথম রটে। সেটা হল ছয় পার্টির জনৈক নেতা সম্প্রতি বলেন যে, ইন্দিরা গান্ধী রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচন চাইছেন না—খুব ভাল কথা, আমরাও দেখি ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত যাতে নির্বাচন না হয়, তার ব্যবস্থা করতে পারি কি না? কিভাবে এই নির্বাচন বন্ধ হতে পারে, তার একমাত্র জবাব হল—সরকার গঠন করে। তবে ছয় পার্টি কি আন্দোলনের কর্মসূচীকে হুমকি হিসাবে সামনে রেখে সরকার গঠনের নতুন উদ্যোগ নিয়েছিলেন? সেই সঙ্গে আরো একটা খবর—সেটা হল ছয় পার্টির কোন এক বড় শরিক দলের কোন প্রতিনিধি কি প্রধানমন্ত্রীকে বোঝাতে গিয়েছিলেন যে, নকশালদার যদি শায়ের্তা করতে হয়, তবে সে কাজ সি আর পি দিয়ে আর বড়ো অথবা কয়েকটি আমলা দিয়ে হবে না, সেই কাজ হতে পারে একমাত্র কাঁটা দিয়ে যারা কাঁটা তুলতে পারে তাদের দ্বারা। আমরা সরকার করলেই নকশাল দমন হবে। এই উদ্যোগ আর আলোচনার সংবাদ কি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় জেনেছিলেন, তাই ১লা আগস্ট তাঁর রাজ্যপালের সঙ্গে রৈঠকের নির্দিষ্ট দিন থাকা সত্ত্বেও ৩০শে জুলাইয়ের আগে দুই দিন রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছিলেন? কোন একটা সংবাদপত্র এই সরকার গঠনের সংবাদ রেরিয়েও পড়েছিল। এই কথাও শোনা যায়, ৩০শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী নিজেই নাকি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে ফোন করে জেনে নিয়েছিলেন আট পার্টিতে বাংলা কংগ্রেস যোগদান করছে কি না? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার পর শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কি প্রায় নিশ্চিত হয়েছিলেন, তাঁকে বাদ দিয়ে রাজ্যে একটি সরকার করার চেষ্টা আবার

পেঁকে উঠছে। এই পরিস্থিতিতেই কি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে বলেছিলেন—না, পশ্চিমবঙ্গে সরকার হবার সম্ভাবনা নেই। অতএব বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। তার পরই রাজ্যপাল দিল্লীকে বললেন—না, রাজ্যে সরকার হবার সম্ভাবনা নেই, অতএব বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হোক। তাই বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণাও ৩০শে প্রকাশ করা হল। আর বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার দুই ঘণ্টা আগে বিধানসভা ভেঙে দেবার ঘোষণা কেন করা হল—এর সংযুক্তি পাওয়া যাবে না। বিধানসভাকে এই ভয়েই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না—এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার পূর্বে আট পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়ে কিছু দল আর বাংলা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ ফেরাবে। সি পি এম-এর দিকে মুখ ফেরাবার অর্থই হল বাংলা কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করা। আর এর জন্যই কি শ্রীমতীহার মুখোপাধ্যায় জরুরীভাবে ৩০শে জুলাই আট পার্টির চার পার্টিকে এক ঘরে এনে বসিয়েছিলেন?

এর পরের প্রশ্ন হল—এত বলার পর ও এত কথা হবার পরও বাংলা কংগ্রেস কেন আট পার্টিতে যোগদান করলো না? তার কি কারণ এই যে, বাংলা কংগ্রেস যখন বুদ্ধলো যে, আট পার্টিতে যোগদান করলেও ওরা সরকার করবে না, তখন কেন আট পার্টিতে যোগদান করবে? অথবা কারণ কি এই যে, আট পার্টিতে যোগদানের সিদ্ধান্ত না করে আট পার্টিকে একটা অনাথ অবস্থায় ফেলে তাদের ওপর আরো চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে ঘেরাও, আইন-শৃঙ্খলা, জমি দখল প্রভৃতি প্রশ্নে বাংলা কংগ্রেসের নীতির কাছে আট পার্টি বশ্যতা স্বীকার করে। অথবা আট পার্টিতে যোগদান না করে বাংলা কংগ্রেস কি নব কংগ্রেসকে প্রলুপ্ত করতে চায় এবং একই সঙ্গে আট পার্টিকে জানাতে চায়, তোমরা আমাদের নীতি ও পথ মেনে না নিলে আমরা নব কংগ্রেসের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধবো। এই সব কথাই হল তর্ক ও যুক্তির খাতিরের কথা। বাস্তবের সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটা সেটা এখনও কারো জানা নেই। তবে গালিবের প্রিয়তমার বিস্ময় যতক্ষণ আছে, প্রশ্নও ততক্ষণ থাকবে। সেই প্রশ্ন কারো মনোমত হবে, পছন্দমত হবে এমন কথা সব সময় বলা যায় না।

—৩১শে জুলাই, ১৯৭০

নারায়ণ সদৌদার্য্য স্রোতের সঙ্গে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ কুড়ি ॥

টানতে টানতে প্রায় নিয়ে চলল মৃকুল।
'ঘেরাওয়ার ফার্স—যুক্তফ্রন্ট! আর
কেন হে ব্যানার্জি! এবার চলো এখান
থেকে!'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার কী—রাস্তায়। এর
এখ্যেও অফিস করবার কথা ভাবছ নাকি?'

'না—অফিস আর কোথায়!'

'প্রায় লক্ষ্যহীনভাবে চলা ধানিকন্ধণ।
জালহার্ভিস পেরিয়ে, এস্প্যান্ডের দিকে।
রোদ জ্বলছে মাথার ওপর। কিন্তু ধার
নেই এখন। হালকা-হালকা মেঘ ছায়া
ফেলছে তার ওপর। মধ্যে মধ্যে যেন পথ
ভুলেই আসছে উত্তরের হাওয়া, শীতের
ছোঁয়াচ নেই তাতে—বাংলা দেশের
অনিশ্চিত রাজনীতির ওপর বিষণ্ণ বসন্ত
ছাড়িয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে মৃকুল বললে, 'ভাবছি,
চাকরি ছেড়ে দেব।'

'কোনো একটা স্টেট লটারীর টাকা
পেয়ে গেছ নাকি?'

মৃকুলের গলার স্বর গাঢ় হল: 'না,
ঠাট্টা নয়। চাকরী ছাড়ব।'

'ব্যবসা করবার ইচ্ছে হয়েছে?'

'ব্যানার্জি, বী সিরীসস। এখন আর
এভাবে বসে থাকবার সময় নেই। নাউ টু
অ্যাকশন। বিপ্লব এসে গেছে—আর দেরি
করা চলবে না।'

প্রবীর আবার নতুন করে সজাগ হল।

মৃকুল, তুমি তা হলে—'

'হাঁ, তোমরা যাকে বলো নকশা-
লাইট।'

ঈকান্ত দর্শন আগে পর্যন্ত সি-পি-'

মৃকুলের কথা কেড়ে নিয়ে মৃকুল, ঝললে,
'স্কাই-এম-এল এখন!'

'হঠাৎ এই দল-বদল কেন?'

মৃকুল বললে, 'সহ্য করা যাচ্ছে না
বলে। আসলে দেখতে পাচ্ছি সবটাই এক
চক্রাবর্ত—একটা ভিশন্স সার্কল। একটা
রুটিন পার্টি যাবে, আর একটা আসবে।
আসলে সব ব্যুরোক্র্যাশির এক চেহারা।
কোনোটা চড়া লাল, কোনোটা ফিকে
লাল। সব একসঙ্গে বাঁধা—রঙ যেমনই
হোক, চামড়ার তলায় সব সমান। নইলে
ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজ করেই প্রোগ্রেসিভ
হলেন তোমাদের প্রাইম মিনিস্টার আর
জগজীবন রাম? একেবারে বিপ্লবী?—
মৃকুলের ঠোঁট বিদ্রূপের হাসিতে ভরে
গেল: 'তোমাদের অভিনন্দনের ঘটা দেখে
মনে হচ্ছে সেন্ট্রাল ক্যাবিনেটে একেবারে
ডিক্টেটরশীপ অব প্রোলেটারিয়াট চালু
হয়ে গেল!'

তর্ক করা যেত, বলবার ছিল। কিন্তু
আজ তিন মাস ধরে তর্ক করে করে এখন
ক্লান্ত এসে গেছে। এখন সময়টাই
আলাদা। তর্ক করে, যুক্তি দিয়ে কাউকে
কিছুই আর বোঝাবার নেই। সহিষ্ণুতা
থাকলেই নিজের কথা অন্যকে বোঝানো
চলে, শোনবার উৎসাহ থাকলেই বলা যায়।
কিন্তু এখন কেউ কারো কথা শনতে চায়
না, অন্যের যুক্তি শোনবার মতো ধৈর্য
কারো নেই। এখন প্রত্যেক মানুষ নিজের
বিশ্বাসের একটা দর্ভেদ বস্ত্রে স্থির
হয়েছে—সব শোনা, সব বোঝা শেষ হয়ে
গেছে সকলের। এখন রাজনীতি ধর্মের
গোড়ামিকও ছাড়িয়ে গেছে, যে তর্ক কবে
সে অবাস্তব, শূন্য বিশ্বাসের পায় চোখ
বাজে বসে থাকা ছাড়া কিছুই আর করবার
নেই।

এই জন্যই প্রবীর তর্ক করল না। কিন্তু
একটা কোঁতুহল জাগল। এই পরম
বিশ্বাস, একান্ত আনুগত্যের যুগেও
মৃকুল হঠাৎ দল-বদল করল কেন?
কলেজের ছাত্রদের না হয় বোঝা যায়,
কিন্তু মৃকুল তো তা নয়—সেই ছাত্র
ফেডারেশনের সময় থেকে তো সে রাজ-
নীতি করে আসছে।

'খবর অবাক লাগছে তোমার এই
পরিবর্তন দেখে।'

মৃকুল পকেট থেকে রেড বুক বের
করল একটা।

'পড়েছ এইটে?'

'পড়েছি বই কি?'—প্রবীর হাসল:

'এই আন্দোলনটাকে আমি ঠিক মানতে
পারি না, তাই বলে পৃথিবীর একজন
শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর বাণী-সংগ্রহ পড়ব না?
তার কথাগুলো তো কোনো দলের এক-
একচেটে নয়। বরং যে-কোনো বিপ্লবীরই
এ থেকে অনেক কিছু নেবার আছে।
আমাদের আপত্তিটা প্রয়োগের প্রশ্ন।'

মৃকুল বইটা আবার পকেটে পুরে
ফেলল: 'ব্যানার্জি, ওই প্রয়োগের প্রশ্নটাই
আসল। ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাবার
রাস্তাই ওইটে। এখন সময় নয়, দেশকাল
অনুকূল নেই, আমাদের প্রোবলেমের
চেহারা আলাদা—এসব কথা বলবার
একটাই অর্থ আছে। আমাদের পেটি-
বুর্জোয়া লীডারশীপ আগুনের আঁচ
বাঁচিয়ে বিপ্লব করতেই জানে, তাই
তেলেগানা থেকে কোনো শিক্ষা নিতে
পারল না, নিতে পারল না হাজং বিদ্রোহী-
দের কাছ থেকে, কলকাতায় এতগুলো
আন্দোলনে এত রক্ত ঝরতে দেখে। মানে,
বিপ্লবের আঁচে আগুন পোয়াতে চাই,
কিন্তু নিজের ঘরের চালাটা ঠিক রাখতে

হবে। এখন তো গাঁদির সন্ধ্যা মিলাচ্ছে—
শোভনবাদ-নরা শোভনবাদ বিপ্লব অনববে
এ স্বপ্ন যারা দেখছে, তাদের স্বপ্ন ভাঙতে
আর বেশি দেরি হবে না। আমরা অপেক্ষা
করব না, কারণ লড়াই শুরুর না করলে
লড়াই শেষ করা যায় না।

প্রবীর একটু চুপ করে থাকল। তার
আনন্দকে মনে পড়ছিল। হঠাৎ অন্যান্যক
হয়ে গেল সে। কোথায় আছে এখন আনন্দ,
কিভাবে আছে? তার রিভলভারটা পড়ে
রয়েছে প্রবীরের ড্রয়ারের ভেতর। করে
আসবে ফিরিয়ে নিতে?

মুকুল বললে, 'ভাবছ কী?'

'না—বিশেষ কিছু না।'

'কাম্ উইথ আস।'

প্রবীর বিষণ্ণভাবে বললে, 'এখন থাক।
যদি সময় হয় দেখা যাবে।'

'সময়ের প্রশ্ন নেই। হয় আমাদের
সঙ্গে আসবে, নইলে ঝড়ের মধ্যে টুকরো
টুকরো হয়ে যাবে। শ্রীকাকুলামের কিছু
জানো?'

'কাগজে খবর পড়ি। আর সাউথ
ইস্টার্ন রেলের যেতে ওড়িশা পেরিয়েই
মারবারি একটা স্টেশন যেন দেখেছিলাম—
শ্রীকাকুলাম রোড।'

'ঠিক। শ্রীকাকুলাম রোড। সারা
ভারতবর্ষে ওই একটি রাস্তাই আছে।
বিপ্লবের পথ।'

'বুঝেছি। কিন্তু চাকরি ছাড়বে
কেন?'

'হোল টাইম ডিভোর্স করতে হবে।'

'এতই জরুরি?'

'নিশ্চয় জরুরি। নন কো-অপারে-
শ্যনের সেই ফার্স্ট মনে আছে? দেশের
লোকের মেরুদণ্ডটাকে দু-ভাজ করে
দেবার, অহিংসার আঁকিং খাওয়ানোর
সেই আশ্চর্য আন্দোলনটি? অথচ তাত্ত্বিক
দ্যাখো দেশ কিভাবে ত্যাগ স্বীকার করে-
ছিল, স্কুল-কলেজ ভেঙে বোরিয়ে গিয়ে-
ছিল ছাত্রেরা, হাজার হাজার মানুষ চাকরি
ছেড়েছিল, জেলে গিয়েছিল, লাঠি খেয়ে-
ছিল? আজ আমি চাকরি ছাড়তে চাইছি
শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছ কেন? নিছক
মক-ফাইটের জন্যে দেশ যদি এত বড়ো
দাম দিতে পেরে থাকে, সত্যিকারের
স্বাধীনতার জন্যে এটুকু আমি পারব না?'

অকাতা যুক্তি। কিছু বলবার নেই।

'কী করবে?'

'পার্ট থেকে যেমন নির্দেশ আসে।'

'যদি গ্রামে যেতে বলে?'

'তাই যেতে হবে। আর কাজ তো
এখন গ্রাম দিয়েই। বিপ্লবী কৃষকই শহর
দখল করবে। কলকাতা-বোম্বাই-দিল্লী-
মাদ্রাজ-কানপুর—ক্যাপিটালিস্টরা তাদের
শেষ দুর্গে ধবংস হয়ে যাবে।'

পারলে ভালোই, প্রবীর ভাবল। কিন্তু

ভারতবর্ষ কি কেবল অন্ধ, কেরল, বাংলা
দেশ?

চলতে চলতে দু'জনে কখন
এস্প্যান্ডেড ইস্ট পার হয়ে ধর্মতলার
মোড়ের দিকটায় এসে পড়েছিল। ট্রাফিক
সন্তুষ্ট। নিশ্চল ট্রাম-বাস-মোটরের সার।
একটা শোভাযাত্রা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ
পার হয়ে এস্প্যান্ডেড গম্বুজের দিকে
চলছিল। শহীদ মিনারের নিচে সভা
আছে একটা।

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ—'

'পার্ট জিন্দাবাদ—'

'যুক্তফ্রন্ট ভাঙছে কারা!'

'— — —'

ওদের ঠিক পাশ ঘেঁষেই যাচ্ছিল
দলটা। মুকুল প্রামাণিক হঠাৎ বলে
ফেলল: 'তোমরাই ভাঙছ, আবার কে?'

সঙ্গে সঙ্গে তিন-চারটি ছেলে ফিরে
দাঁড়াল।

'কী বললেন?'

পর্বতো বহিমান ধুমাং! সঙ্গে সঙ্গে
একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে মুকুলকে তিন হাত
সরিয়ে নিলে প্রবীর। বেশ কিছু দরকার
নেই, পাইকারী হারে কয়েকটি ঘুঁষি
পড়লেই যথেষ্ট; কিংবা কয়েকটি ফেস্টনের
লার্টি নেমো এলেই একেবারে ছাত্তু করে
দেবে। মুকুলকে আড়াল করে প্রবীর
সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কিছু না—কিছু না দাদারা, আপনারা
যান।'

'কিছুই বললেন না আপনারা?'

'না—না, আমরা নই।'

'কী হয়েছে—কী হয়েছে রে?—আরো
কয়েকজন এসে দাঁড়ালো।

মুকুল বোধ হয় এগিয়ে আসবার চেষ্টা
করছিল, কিন্তু প্রাণপণে প্রবীর তৈলে
রাখল তাকে। মুকুল না হয় এখন
অকুতোভয় সৈনিক; কিন্তু এ-ভাবে জনতার
হাতে শহীদ হতে বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল
না প্রবীরের।

'আপনারা এগিয়ে যান—ভুল শুনছেন।'

পেছন থেকে শোভাযাত্রার চাপ
পড়ছিল, ছেলেরা আর দাঁড়ালো না। তবু
যেতে যেতে একজন বলে গেল: 'মুখ
সামলে কথা কইবেন, নইলে মৃত্যু উড়িয়ে
দেব।'

'ব্যাটার—র দালাল—' আর একটি
মন্তব্য।

ফাঁড়া কাটল। স্বস্তির শ্বাস ফেলে,
মুকুলকে টানতে টানতে আরো খানিকটা
সরিয়ে আনল প্রবীর।

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? কাণ্ড-
জ্ঞান নেই একটা?'

'নির্ভাজ সত্যি কথা বলেছি।'

'সব সত্যিই সব সময়ে কিন্তু নিরাপদ
নয়।'

'ওটা শোভনবাদী-নরা শোভনবাদারা
বলে।'

'মানছি। কিন্তু দোহাই প্রামাণিক,
বীরঘটা দলবল জড়িয়ে কোরো। দেখতে
পাচ্ছ, তিনদিক থেকে প্রোসেশ্যন আসছে
এখন? গায়ে হাত তোলবারও দরকার
নেই, স্ট্রফ স্ট্যাম্পার্ড হলেই আমরা
ধুলোয় মিলিয়ে যাব।'

মুকুল দাঁতে দাঁতে ঘষল।

'একদিন ওদের সঙ্গেই আমাদের
ফয়সালা করে নিতে হবে।'

'তা নিরো। কিন্তু ময়দানে র্যালীটা
কি রকম হবে আশ্রয় করতে পারছ কি?
বরং চলো এখন থেকে।'

'চলো!—মেঘে-ঢাকা মুখে মুকুল
বললে, 'কিছু খাওয়া যাক।'

'সামনেই তো কে সি দাশ?'

'না—না, মির্চিফলিট নয়। মেঘের
গলির ওদিকে চেনা পাজাবী দোকান
আছে। ভালো তন্দুরী রুটি আর কাবাব
করে। খরচ কম, পেটও ভরবে।'

'বেশ, তাই যাওয়া যাক।'

তখনো রাস্তা বন্ধ—আর একটা
শোভাযাত্রা ঢুকছে ধর্মতলা স্ট্রীট দিয়ে।
রাস্তা পার হয়ে—শোভাযাত্রার দিকে
চোখ পড়তেই প্রবীর থমকে দাঁড়ালো।

প্রসেশ্যনের মধ্যে যে মেয়েরা রয়েছে,
তাদের সঙ্গে কে ও? চলার ভঙ্গি
ক্লান্ত, শেরালদা থেকে তো হেঁটেই
আসছে। ওই বিবর্ণ মুখ, ওই পাতলা
ফ্রেমের চশমা, সজ্জাতা বোঁদি! অথচ
ডাক্তার বলেছিল—

রবিবারে সাবিত্রী বারাসাত যাবে কথা
ছিল। গিয়েছিল কিনা সে জানে না,
দেখা করবার সময় পায় নি। এখন মনে
হল, যাওয়ার কোনো দরকার নেই, গেলেও
কোনো লাভ নেই।

এগিয়ে যাওয়া শোভাযাত্রা আর
উভয় স্লেগানের ভেতরে কোথায়
হারিয়ে গেল সজ্জাতা। স্বরাস ঠিকই
বুঝেছিল, পথ আলাদা হয়ে গেছে আর
মিলবে না কোনোদিন।

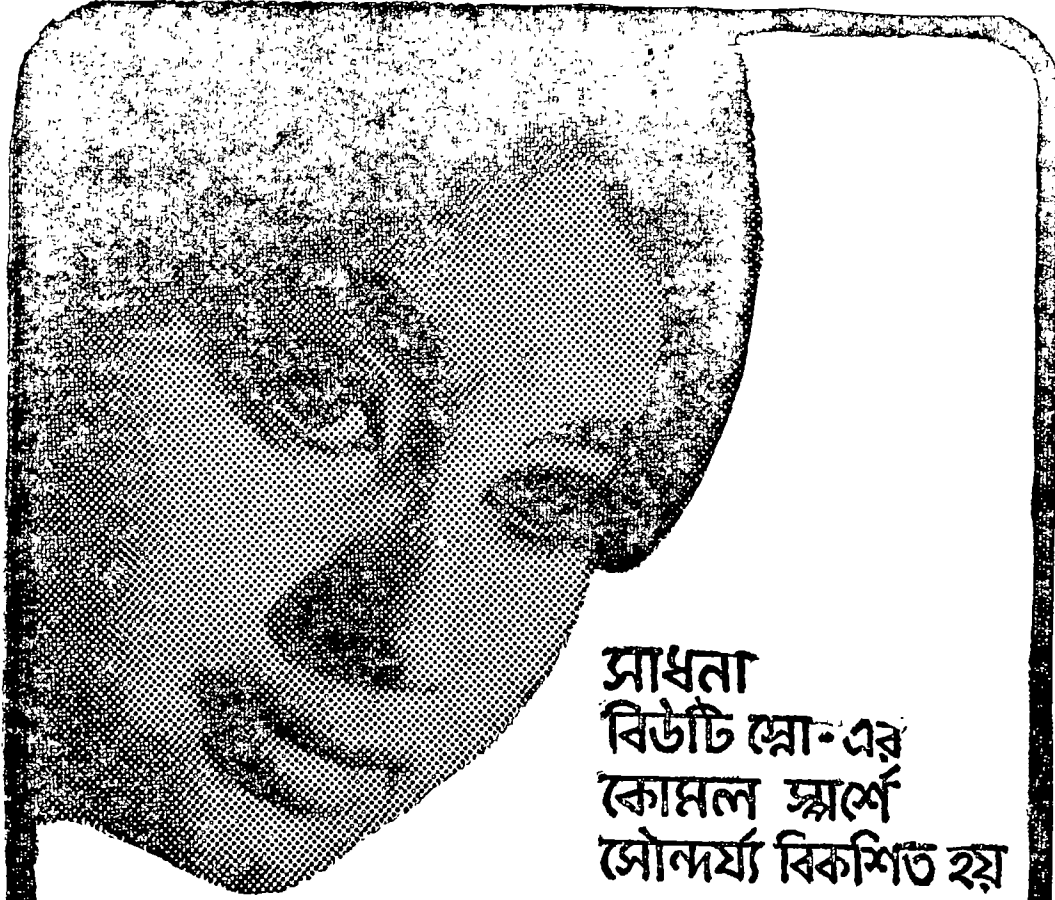
বিরক্ত মুকুল বললে, 'কী দাঁড়িয়ে
গেলে কেন?'

প্রবীরের নিশ্বাস পড়ল।

'না, দাঁড়িয়ে কোনো লাভ নেই। এই
সময় কাউকে দাঁড়াতে দেবে না।'

শহীদ মিনারের দিকটা পড়াকার
লালে লাল। সৌদীনও এই রঙ দেখলে
বুকের মধ্যে সমুদ্র দুলত। কিন্তু এখন
চোখ দুটো জ্বালা করছিল।

এই লালে এখন আর এক রঙ
মিশেছে। আত্মীয়-বিশ্বেষের রঙ।



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্মার্শ
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

হৃদয় মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।

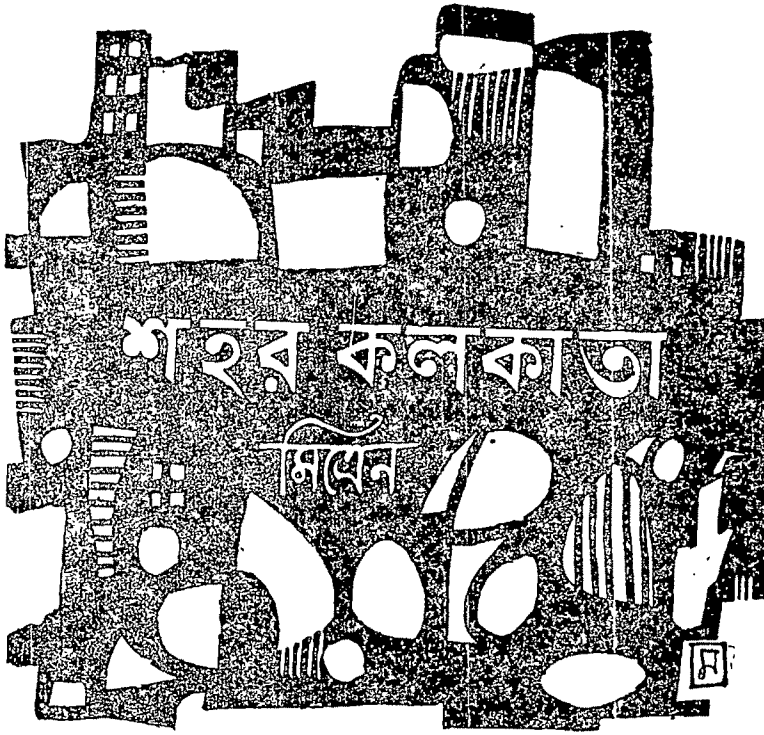
• একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫



585-2/58



পাড়ি কি ভূতলে শশী!

“পাড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি,
ধুলায়!”

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আপন মনে কোনও যুবক মধুসূদন আবৃত্তি করছেন শুনলে আপনিও চমকেই উঠবেন, আর আমি সঞ্জয়কে সেই অবস্থায় চাক্ষুষ করলাম। যতদূর জানি, সঞ্জয় কাব্য-প্রেমিক নয়। চিরকাল সায়াস ঘেঁটেছে। আজ জীবিকার জন্য ব্যাগ হাতে ওষুধ বেচে বেড়ায় কেমিস্ট-ড্রাগিস্ট শপে। সেলসম্যানের চাকরিটা জুটেছে এম-এসসি ডিগ্রীর সঙ্গে সদুপদ্রব চেহারা আর চটপটে স্মার্টনেস ফেরি করে।

সদুত্তরং দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমি তাকে ভালো করে এবং কিছুটা সশঙ্কভাবেই পরীক্ষা করে নিয়ে তখন ঘরে ঢুকলাম। বলা কি যায়, যা দিনকাল, যে-কোনো মানুষের মাথা যখন-তখন বিগড়োতে পারে। তার ওপর সঞ্জয় চাকরি করে অবাঙালী ফার্মে। শুনছি এমন ঢের ফার্ম নাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানীতে আর বাণিজ্য অফিস রাখতে চাইছেন না (কাগুজে সংবাদ)। দু’দুটো যুক্তফ্রন্ট নাকি এমনই সর্বশেষে সরকার গড়েছিল যে, কলকাতা থেকে বাণিজ্যপাতি গড়-গাড়িয়ে ভিনদেশে চালান হয়ে যাবে। তা আমাদের সঞ্জয়ের চাকরিটাও শেষকালে...

সঞ্জয় এই সময় মদ্য তুলে আমাকে দেখেই বললে: আরে মিত্তির? আয় আয়। বললাম: বাঁচালি। প্রিয়জন সম্পর্কে অসং চিন্তাই মনে আগে প্রথমে। ভেবে-

ছিলাম, তুই হয়ত হঠাৎ বেকার বনে মস্তিস্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিস।

সঞ্জয় গলা ছেড়ে হেসে বললে: আর আপনজনের অসং চিন্তাই তার মঙ্গল করে এবং শূন্যে খুঁশি হবি, আমার প্রমোশন হয়েছে।

: তাই নাকি? কিন্তু তার জন্য কাঠ-কয়লা-লাঞ্ছিতা শশিকলাকে ভূতলায়িত করার হঠাৎ আবেগ অনভূত হ’ল কেন এই কাঠফাটা রোদে?

: আঃ! তাই বল্। “পাড়ি কি ভূতলে শশী?” তা সে তো এক নয়, একাধিক গড়া গড়া গড়াগড়ি যাচ্ছেন। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ মায় রবি ঠাকুর। আজকের কাগজটা দেখেছিস?

: ও তো হামেশার ব্যাপার। কোনো নিউজই নয়। সার আশুতোষের স্ট্যাচু? স্মনিভাসিটিতে?

: হ্যাঁ, স্ট্যাচুটাকে গড়িয়ে ফেলে দেওয়ার সংবাদ পড়লাম। আবার কিছু শিষ্ট ছাত্র তাঁকে যথাস্থানস্থ করেছে। তাই হঠাৎ ছুটা মনে পড়ল, আবৃত্তি কর-ছিলাম। পূর্বাপর সবটুকু জানি না। ব্যাখ্যা আসত পরীক্ষায়। ছুটা মনে আছে তাই। সেদিন ব্যাখ্যা লিখতে পেরেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে মনে হচ্ছে, আজও ও’র ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না।

বসে পড়ে সিগারেট জ্বাললাম। বললাম: বেশ, বেশ। তাহলে তোর মতো ভদ্রলোক ফেরিওয়ালাও নোট মোকার হওয়ার বাসনা রাখে। বল্ তোর ব্যাখ্যা। শুন। সটীক ব্যাখ্যা থাকলেও, সঠিক ব্যাখ্যা কটাই বা পাওয়া যায়।

সঞ্জয় কেমন অনামনস্ক আর ভাবুক বনে গেল এই কথায়। বললে: একটা মানুষ বস্তুতই শশিকলার মতো বাড়ছিল সেদিন, আর বাড়তে চেয়েছিল কলকাতার সবচেয়ে বড় সম্পদ ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটিকে। হিন্দু কলেজ, অর্থাৎ আজকের প্রেসিডেন্সি কলেজ আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ দুটোই কি ব্রিটিশ ভারতে বাঙালীর পজিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রধান শক্তির যোগান দেয় নি? আজ আমরা কিন্তু ও দুটোকেই খতম করতে কোমর বেঁধেছি।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম সঞ্জয় হাত তুলে আমাকে থামিয়ে বললে: ওয়েট! আমি পলিটিস্স বন্ধ না। ও লাইনে কথাও বলছি না। নো পলিটিস্স মিত্তির। আমি শুধু সেই মানুষটির কথাই ভাবছিলাম, যিনি ঐ ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়’-কে ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা-সম্পন্ন জ্ঞানপীঠ বানাবার জন্য তরুণ বয়স থেকে এক ধ্যান, এক জ্ঞান ছিলেন। ঐ য়ুনিভার্সিটির জন্য তাঁর সেদিনের হিমালয়ান স্যাক্রিফাইস, একটু আগেই ভাবছিলাম, হয়ত তাঁর হিমালয়ান রান্ডার হয়ে গেছে। কিন্তু না মিত্তির, ঐতিহাস তো মছে ফেলা যায় না। তুমি যতই পোড়াও, যতই ঘোচাও। বরং ঐতিহাসকে স্বীকার করে সেই প্রদীপে আলো জ্বালিয়ে নাও। আজ তুমি এতো পথ হেঁটে এসেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস খুঁড়ে খুঁড়ে নিজের উৎপত্তি জানতে চাইছ। মায় এক শতকের ইতিহাস তুমি কোন মারটির তলায় চাপা দেবে? সিস্টেম অপছন্দ, নতুন সিস্টেম কর। সার আশুতোষ পরেনো সিস্টেম পাটে নতুন ধারা প্রবর্তনের প্রয়োজনেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ করেন। তারপর থেকে সেদিনের প্রয়োজনে, সেকালের আবহাওয়ায় তিনি নিত-নবীন সংস্কারের আর সিস্টেম প্রবর্তনের জন্য ভি-সি পদে আর্টসি স্বর্ণ-ময় বছর একান্ত পারিশ্রমের মধ্যে অতি-বাহিত করেছিলেন। আচ্ছা, মিত্তির, তিনি এগিয়েছিলেন, না পিছিয়েছিলেন?

সঞ্জয় একটু থেমে আপন আবেগে ফের আরম্ভ করল: ভেবে দেখো, মানুষটি শিক্ষা সমস্যা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন যৌবন সমাগমের সম্বন্ধেও থেকেই। ইচ্ছে করলে অন্যত্র অপেক্ষাকৃত ক্ষমতা-শালী পদে নিজেই তিনি অন্যায়সেই প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। সরকারী তরফে তৈমন আহ্বান এসেওছিল একাধিক-বার। তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছেন সেসব অফার। তাতে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, বিত্ত সব কিছুই হতে পারত। তাঁর স্মরণ্য তাঁর মত জুয়েল ভূভারতে ক’জন ছিলেন? কিন্তু তিনি সে লাইনেই গেলেন না। এমন

সাপ্তাহিক বসন্ত

কি যখন আইনজীবী হিসেবে তাঁর মাসিক আয় দশ হাজার (আর ভেবে দেখে সেটা ১৯০৪ সাল!) তখন শিক্ষা-সমস্যা এবং বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে চিন্তা করার সময় পাবেন এই লোভে ব্যবসা ছেড়ে তিনি নিলেন বাঁধা-মাইনের জিজ্ঞাসিত। ভাবতে পার, হোয়াট এ হিমালয়ান ম্যানিটারি স্যাক্রিফাইস! কতবড় একটা আর্থিক ত্যাগ? কেন না, অনেক কাঠ-খড়, কেরোসিন জ্বলে তিনি তখন শ্রদ্ধামায় সেনেটের একজন নির্বাচিত সভ্য। ক্যান মনোবাক্যে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার সময় পাবেন, এজন্য চাল-বাগজোর লাইন বিলকুল ত্যাগ করলেন। অর্থ নয়, প্রতিপত্তি নয়, মহৎ এক-বাসনা পূরণের জন্য কিছুটা অবসরমাত্র কামা ছিল তাঁর। সার আশুতোষের সেই মহান প্রান্তর খেসারত আজ তাঁর আবক্ষ মূর্তিকে গুণে দিতে হল। হোয়াট বেঙ্গল থিংকস টু-ডে, সার আশুতোষ কুড় নট থিংক ইয়েসটারডে। যদি অতটাই দূরদৃষ্টি থাকবে, তাহলে যৌদীন উপাচার্য ইলবার্ট সাহেব তাঁকে ডেকে জিজ্ঞেস করে- ছিলেনঃ মুখার্জী, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়? কী করতে পারি তোমার জন্য, মুখার্জী? তখন তিনি ব্রিটিশ প্রশাসনের একটা শীর্ষপদ চেয়ে নিতে পারতেন এবং সেই ১৮৮৬ খৃঃ ক্যালকাটা রুনিভার্সিটির সাহেব ভাইস চ্যান্সেলর সুপারিশ করলে হত না এমন কাজই বা ছিল কি। তাছাড়া আশুতোষ তখন অসাধারণ আলোকিত এক তরুণ। তাঁর জন্য সব পদই ছিল উপযুক্ত। কিন্তু আশুতোষের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত সর্বস্বতী ভর করেছিল। আশুতোষ চাইলেন, এক অতি ক্ষুদ্র 'বর'। বললেনঃ আমাকে তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের মেম্বর কর! ইলবার্ট বললেনঃ আমি তোমাকে 'ফেলো' বানাব। আশুতোষ মহা সন্তুষ্ট। হলই বা অবৈতনিক। রুনিভার্সিটির স্পর্শ লাগবে গায়ে। সেদিন তিনি কতবড় ভুল করেছিলেন? জ্ঞানের আলোটির স্ফীত টিপে নিজেই আজ সেই আলোকিত গৃহবাসীর দোরগোড়ায় প্রচণ্ড গলাধাক্কি খেয়ে প্রস্তুতরীভূত শরীব নিয়ে গাড়িয়ে পড়লেন তাঁরই হাতেগড়া রুনিভার্সিটির পাথুরে মেঝের ওপর। সেদিনের তরুণ আশুতোষ অবশ্য বিশ্বাস করতেন, জননী জন্মভূমির যেটুকু ভালো, তা অপরিহার্য। যেটুকু কালো অন্ধকার। সেখানে আলোর রোশনাই জ্বলে দেওয়াই হবে সবচেয়ে বড় মাতৃমুষ্টি পণ, সব বাড়ী মাতৃপূজা। সেদিন অবজোয়া প্যান-ধারণার এমন দাপট ছিল না। তিনি তৎকালের প্রয়োজনে বলিষ্ঠ কাজই করেছেন।

এজন্য তিলে তিলে নিজেকে তৈরিও করেছিলেন। ফাঁকি দিয়ে নাম কেনার বাসনা ছিল না। সেনেটের হাতেতোলা মেম্বর হয়ে সমাজে পজিশন বাড়তে চান নি। ফাঁকি দিয়ে বাজিমাং করার মানুষ সেদিন মানুষের প্রাধা কাড়তে পারতও না।

আমি সঞ্জয়কে থামাতে চাইলাম। কিন্তু সে থামবার লক্ষণ প্রকাশ করল না। চায়ের কাপে চা গেল জুড়িয়ে। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের মুখে জমে উঠল তামাকপোড়া, কাগজপোড়া ছাই। উত্তেজিতভাবে বলে চলল সঞ্জয়ঃ ঐ রুনিভার্সিটিতে প্রবেশের জন্য রাগিদিন তাঁর কী কঠোর তপশ্চর্যা! ভাবতে পারিস, কাকা রাধিকাপ্রসাদ যখন সেনেটের সভ্য, তখন, সেই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাছে সেনেটের নীলস মিনিটস আর ক্যালেন্ডারস আসত। এক-নিম্ন পাঠক আশুতোষই তখন সেগুলি আদ্যাপান্ত পড়তেন। সেই সেদিন থেকেই তাঁরই হিচ্ছিল। লক্ষ্য একটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় মহা জ্ঞানপীঠ-রূপে প্রতিষ্ঠা করা।

পড়াশুনোকে ভালবেসেই শুদ্রলোক আর সব ভুলেছিলেন। যে আমরা পাঠ্য-পুস্তকও চাপে পড়ে পাঠ করি না, পাঠ্য-বহির্ভূত কেতাব তো দূরের কথা, সেই আমাদের ভাবতে নিশ্চয় অবাক লাগবে যে, সার আশুতোষের নিজস্ব গ্রন্থ-সংগ্রহ-শালার তৎকালীন মূল্য ছিল পাঁচ লক্ষ টাকা। বাংলা দেশের অসীম সৌভাগ্য যে, এমন জ্ঞানান্বেষীই হয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদি অক্টাভিয়ান এবং আন্বিতীয় আর্যকটেক্ট।

তুই তো জানিস মিস্ত্রি? সঞ্জয় তাকাল আমার দিকেঃ প্রথম দাঙালী ভি-সি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করেন যে, সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন ভারতীয় ভাষামাত্রই আবশ্যিক বিষয় হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং আশুতোষই সে চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেন তাঁর অনস্বীকার্য ব্যক্তিৎ এবং পাণ্ডিত্যের জোরে। তাঁর পরিকল্পনা সাধক করার পথে কোনও সাম্রাজ্যবাদী বাধা পথ আগলে দাঁড়াতে পারে নি। আজ আমরা হিন্দী-সাম্রাজ্যবাদের তলায় সর্বৎ-সহ মহাদেবের মতো চিং হয়ে পড়ে আছি। আর সেদিন মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় করে নেওয়া কতবড় একটা কাজ ছিল। যাই বলিস, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে রেখে মানুষকে প্রাধা জ্ঞাপন করতে না পারলে নয়া ইতিহাস রচনার পথে শঙ্কলার অভাব হয় বলে আমার বিশ্বাস।

মানুষটা রুনিভার্সিটির মাধোই বাঁচতে চেয়েছিলেন, রুনিভার্সিটির মাধ্যমেই মৃত্যুতে চেয়েছিলেন একটা মেরুদণ্ডহীন

প্রাধানী অর্থ কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে। এ তোমার কোন্ জাতের বজোয়া অপরাধ, বৃদ্ধিতে পারি না মিস্ত্রি, সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

দেখ, অনেকে বলে, আশুতোষ? এক নম্বরের নেপোটিজমের রাজা। নিজে ছিলেন তোষামোদপ্রিয়, আর তাই নিশ্চয় ব্রিটিশের তাঁবেদারও ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ।—লক্ষ্য করলাম কথাগুলি উচ্চারণের সময় সঞ্জয়ের মুখটা কেমন করণ বেদনায় নীল হয়ে উঠছিল। সে বললেঃ সেদিন প্রদীপের সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক আমার। মিস্ত্রি, আমাদের অরাজ-নৈতিক ক্লাসশ্রেনের অন্যতম কারণ হয়ত এই যে, আমরা বড় সহজে অকৃতজ্ঞ হতে পারি। কৃতজ্ঞতা পাছে কোনো কতব্য করায়, এজন্য অকৃতজ্ঞতার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে চাই। গাল দেওয়া স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কাকে না গাল দিই আমরা। গাল দেওয়ার কিছু না পেলে রাব ঠাকুরকে নিয়ে বই লিখে প্রমাণ দেখাতে চাই যে, আসলে তিনি বিদেশী রোমাণ্টিক কবিদের ছর আর ভাণ চুরি করেছেন। তাঁর কবিতা কিছু না হোক, কালিদাস আর বৈষ্ণব মহাজনের কাব্য গায়েব করা নতুন বোতলে পুরনো মদ। আমাদের সমালোচকের মধ্যেও এক ধারণা, পাণ্ডিত্য সমালোচনা করতে হলে দুনিয়ার কাব্যসাহিত্য থেকে বাছাই করে লাইন ভুলে আনতে হবে। সাদৃশ্য দেখিয়ে বলতে হবে ওরুকের দ্বারা অম্লক প্রভাবিত ছিলেন এবং দেশী কবি-সাহিত্যিক অবশ্যই বিদেশী প্রভাবের আওতায় বিকশিত। অর্থাৎ তাঁবেদারি আমাদেরই মজাগত, তাই তাঁবেদার খুঁজে বেড়ানো মহা বাহাদুরী বলেই গণ্য করি আমরা।

কিন্তু আশুতোষ সম্পর্কে তাঁবেদারি অভিযোগটা কেমন করে চাল হ'ল, আশ্চর্য লাগে। যে লোকটি শিক্ষাজগতের

এজেন্ট আবশ্যক

EARN
Rs 50
PER MONTH

জাপান আট শাভী, টেরিলিন-প্যাটিং, রোজমেরি
পোষাক, মাইলনের মোস্টা, টাই, ট্রেন্সেস প্রিন্টের
বাসনপত্র প্রভৃতির অর্ডার বক কলিমা মাসিক
৬৫০ টাকা উপার্জন করিতে পারেন অথবা
আকর্ষণীয় কমিশনে কাজ করিতে পারেন।
তৎপর হউন। বিনামূল্যে মতামতী এবং পত্র
নাগের নম্বর জনা অদাই পত্র লিখিব।

HURRY WRITE BOMBAY AGENCIES
Kalyanpura, Delhi-6.

পাঠ্যবিকল্প

আবহাওয়ায় জীবন অতিবাহিত করবেন বলে স্থিরসঙ্কল্প, তিনি কত সহজেই তদানীন্তন শিক্ষা অধিকর্তা সার আলফ্রেড রুফট সাহেবের প্রস্তাব নিতান্ত অবহেলায় ত্যাগ করেছিলেন। আজ বিদেশী প্রেসার প্রসাদভোজী ও প্রসাদভোজী আমরা। সেদিন বিদেশী রাজ্য, বিদেশী প্রশাসক ডেকে বললেনঃ তুমি প্রেসিডেন্টের ছাত্র, এখানেই অধ্যাপনার কাজে সোগ দাও মশাই! কিন্তু আশুতোষ বললেন, ইংরেজ অধ্যাপকদের সমানানুপাতিক

প্রোড না পেলে তিনি প্রতিশ্রুতি পরাধীনতার প্লান অনুভব করে সরকারী চাকরি করতে পারবেন না। রুফটের স্পেকুলেশন হলেন রুফটের বিরাগভাজন। তা একেই কি তাবদারি বলবে না কি?

সঞ্জয় মৃদু ভুলে তাকাল।

অথচ মাত্র দু'শ' টাকা বেতনে সেই আশুতোষই যেতে গিয়ে চাকরি নিলেন বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটান কলেজে। স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বের বিকাশই আশুতোষের জীবনীতহাস।

শিক্ষাভ্যাসের সেই তেজী দুদান্দ পুরুষকে শশী বলব না? অবাক ব্যাখ্যাত হব না সেই শিশিগতের ভুল শয়ানে। আর এ শব্দ পেতে দিল্লী স্বহস্তে! অথচ তাঁর উত্তরাধিকার এমনই এক সম্পত্তি, যা দিল্লী করে দান প্রত্যাখ্যানও করা যায় না। তাই অকৃতজ্ঞ ১৯৭০ আমি, তাঁর কৃতিত্বকে লালিত করছি। প্রাসলে নিজেই নিজের কপালে জাঁকিছ লজ্জনার টীকা।

আমি বলতে চাইলাম, কিন্তু উত্তেজনার কালে মানুষ এমন অনেক কিছুই করে, যা হরত বস্তৃত তার অভিপ্রেত নয়। সেদিন উত্তেজিত ছাত্ররা হরত আসলে ঐ স্ট্যাচুটা তাদের বিক্ষোভ প্রকাশের 'লক্ষ্য' করেন নি। তুমি মিছে এতোটা বিচলিত হচ্ছ! এমনও তো হতে পারে.....

সঞ্জয় চাপা দীর্ঘশ্বাস মৃদু করে কলেঃ হবে হরত তাই। তবে তুমিই তো বললে ফুটবলের মতো শিশিকুল গড়াগড়ির ঘটনা আজ এমনি চান্যচুর যে, তার নিউজ হওয়ার মর্যাদাটুকুও গেছে। আমি কিছু বুঝি না মিস্টর, শুধু মনে হয়, আত্মবিস্মৃতি হয়ত সুস্থতার লক্ষ্য নয়। ইতিহাস-বিস্মৃতি এক অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কেউ স্বয়ম্ভু নই। আমার সামন্ত-তান্দিক ঠাকুরদার ছবিটা ভেঙে ফেললে যদি আমি আদর্শ এক কলকাতার নাগরিক হতে পারতাম, এক্ষণি ভেঙে দিতাম ওটা। উনি তো ও'র তৎকালীন বিশ্বাসমত কাজ করে গত হয়েছেন। আর কেন? কিন্তু মিস্টর, তাতে তো এই কলকাতার চেহারা পাল্টাবে না। কিছু লোকের পা কাটবে মাত্র।

আমি কোনো জবাব দিতে পারি নি সঞ্জয়কে। শুধু অনুভব করছি কলকাতার সাম্যারণ নাগরিকের মতো সঞ্জয়ও আজ সরল জিজ্ঞাসাঃ এবং তার সেই সরলতম প্রশ্নের উত্তর আমারও জানা নেই।

আমরা হয়ত অনেক পিছিয়ে আছি। অনেক। আমাদের চিন্তা হয়ত আমাদের পিতৃদেবের নিভন্ত চিতার পাশেই জ্বলছে। ইতিহাস এমনি করেই চিতা সাজায়, সন্দেহ নেই।

কিন্তু সঞ্জয়ের প্রশ্নঃ আমরা পুড়ছি, কিন্তু ইতিহাস কি পোড়ে? আমাদের ব্যক্তিগত ছাই হয়। কিন্তু কর্মদেহ, প্রতিষ্ঠার কর্মদেহের পিরামিডে তাঁর যুগ-ইতিহাস, তা যে অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয়। যুগপুরুষরা তাঁদের কর্মের মধ্যেই সঞ্জীবিত। কি জানি, কেমন করে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত পুড়িয়ে তুমি সে ইতিহাস মছে মেরে। আমরা কোথাও ভুল করছি না তো, মিস্টর?

আমি নিরন্তর। জবাব জানা নেই।

★ ★ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে !

স্বনামধন্য গািহিক
ও লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার

নারদবজ্র দাশগুপ্ত
প্রবাবলী



প্রবাবলী

আছে দৈখ্য

দ্বন্দ্ব

দগদী

উপন্যাস

মুশান্ত সা
ও
নীল শাড়ী

পূর্তা নংখ্য
সর্বসমুদ
৩৩৩

দাওলা সাহিত্যে
জীবন সংযোজন

মূল্য মাত্র ১১ টাকা

পদ্মতী (প্রঃ) প্রি
কলিকাতা-১২



২ তের ২

বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকের রবিন্দ্র-মার্কাস নেতৃত্ব গণ-আন্দোলনের যে ক্ষতি করে, তা প্রতিরোধার্থে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষেও অকল্পনীয়। কেন না, শাসক-গোষ্ঠীর বিরোধিতা মূলত বহিরাগত আঘাতকে প্রতিহত করা যায়, কিন্তু গণ-আন্দোলনের ভিতরেই যদি অন্তর্ঘাতী কাজকর্ম চলে, আঘাত যদি কেউ ভিতরে বসেই হানে, তাহলে সেই আঘাত হয় মারাত্মক, তার মোকাবিলা করা যায় না। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যতবার যত বিপ্লবের অপ-মৃত্যু ঘটেছে, তার জন্য দায়ী এই বুর্জোয়া নেতৃত্ব। বুর্জোয়া বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্তর্ঘাতের আধুনিকতম দৃষ্টান্ত হোল মহান চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

খবরদার লিউ-শাও-চি এবং তার শিষ্য-সেবকরা সভাপতি মাওয়ের স্বপ্নকে চরমায় করে দিতে চেয়েছিল। তারা যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, সে পথের শেষে আছে এক গভীর গাভা, এই গাভায় পড়ে রাখা আর উঠতে পারছে না। তার সর্বশেষ লেটে গেছে শোভনবাদের বিপ্লব। চীনের পরিণতিও তাই হোক। কিন্তু সভাপতি মাও সময়মত শক্ত হাতে বুর্জোয়া কৃষ্ণাত্মগুলির কান পাকড়ে ধরায় চীন তথা সারা দুনিয়ার মেহনতী আওয়াম এক অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের হাত থেকে বেঁচে গেল।

পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন সম্পর্কে এই একই কথা বলা যেতে পারে। উনিশ শ' চুয়াশ সাল থেকে প্রতিরোধার্থে শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের শোষিত, মেহনতী আওয়াম যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেছে, তা বার বার প্রতি-হত হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে। লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়েও পিছদ হঠে এসেছে মূলত বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য। বুর্জোয়া নেতারা তাদের স্বার্থবিভক্ত মানসিকতা নিয়ে, তাদের আস্থা, মজ্জা ও গোপনতের মধ্যে নিহিত চাকর মনোবৃত্তি নিয়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানেও একই কাজ বার বার করে

সেছে এবং যাচ্ছে। শাসকগোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়ে চুপি চুপি সংগ্রামের আওয়ামের পিঠে ছুরি বসিয়ে, তার রক্তে তারা হোল খেলছে। অবশ্য একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত কম্যুনিষ্ট জন্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। আমার আগের চিঠিতে আমি লিখেছিলাম যে, চেয়ারম্যান মাও বিশ্বাস করেন, প্রকৃত বিপ্লবীর পরিচয় তার চিন্তা ও কর্ম, তার বংশ বা শ্রেণী নয়। কাজেই বুর্জোয়া শ্রেণীতে জন্মেও যদি কেউ নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রামী আওয়ামের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, তবে সে আর বুর্জোয়া থাকে না, সে তখন বিপ্লবী হিসাবেই চিহ্নিত হয়। কাজেই আমার পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ করব তাঁরা যেন লিউ-শাও-চির সাথে মাও সে-তুং-এর কিংবা নূরুল আমিন, মিয়া দৌলতানা, মৌলানা ভাসানী, মুজিবুর রহমান, মোজাফ্ফর আহমেদ প্রমুখ অপদার্থ, কটর বুর্জোয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের বিপ্লবী জনতা ও তাদের মূখ-পার “পাকিস্তান কম্যুনিষ্ট পার্টি—মার্ক্সবাদী, লেনিনবাদী”র তুলনা না করেন। যাই হোক, আবার মূল বক্তব্য ফিরে আসছি। পাকিস্তানে প্রকৃত জনতার রাজ্য কয়েম হাতে পারত যদি নেতৃত্ব শ্রমিক, কৃষক এবং বুর্জোয়া শ্রেণী আভিজাত্যের প্রতি মোহশূন্য দেশসেবকের হাতে থাকত, কিন্তু কার্যত তা হয় নি! যখন মৌলানা ভাসানী পাপাত্মা নূরুল আমিনের ডাকে মাড়া না দিয়ে পিছিয়ে আসেন এবং আমিন সাহাবের সাথে “ন্যাশনাল ডেমো-ক্রেটিক পার্টি”—র আঁতুড়েই দাফন হয়, তখন আমরা মৌলানাকে আন্তরিক সাধ-বাদ জানিয়েছিলাম। আমাদের মহান নেতা কমরেড মোহাম্মদ তোয়ানহা সৌদীন মৌলানা সাহাবকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে ছিলেন। নূরুল আমিনের ফাঁদে পা দিলে ন্যাপের অপমৃত্যু ঘটত। কেন না, তার লক্ষ্য ছিল “রাজনীতি” করে টু পাইস এবং হাততালি অর্জন করা। প্রকৃত আন্দোলন করা তার উদ্দেশ্য হোলে সে কখনও নতুন দল গঠন করার আয়োজনে মেতে উঠত না, সরাসরি আমাদের সাথেই হাত মেলাতে পারত।

ন্যাশনাল ডেমোক্রটিক পার্টি গড়ে
৩৪৬

পাকিস্তানীদের মাথায় কাঠাল ভেজে খাওয়ার সুযোগ নষ্ট হওয়ার নূরুল ও তার বংশব্দ অনুচররা সামরিকভাবে মুষড়ে পড়লেও একেবারে হাল ছাড়ল না। তারা অপেক্ষায় রইল, কবে জাবার নতুন সুযোগ আসে। সুযোগ এল বছর কয়েক বাদে, সাতবাঁট সালে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানে একটি মস্তবড় ঠাট্টার ব্যাপার ঘটে গিয়েছে, তা হোল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন। মিলিটারী প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ তাঁর দুনিয়াদী গণতন্ত্র এবং সংবিধান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সালে যে নির্বাচনের “আজান” ডেকেছিল, তাতে নূরুল আমিনের সাথে হাত মিলিয়ে ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ইত্যাদি চারটি দল হাজির হয়েছিল। এই পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মিলিত নাম হয় “সম্মিলিত বিরোধী দল” বা “কম-বাইন্ড অপজিশন পার্টিস”। এই ধরনের নির্বাচনে যে জয়লাভ করা যায় না, তা সবাই জানত। “সম্মিলিত” দলের নেতারাও জানতেন। কেন না, ধরম্মর আয়ুব খাঁ সমস্ত দুনিয়াদী গণতন্ত্রীকে টাকা দিয়ে কিনে রেখেছিল, যে কারণে পাকিস্তানীরা দুনিয়াদী গণতন্ত্রীদের “আয়ুবের খাটালের গরু” বলে উপহাস করত। কাজেই আয়ুবের একান্ত অনুগত বিডিরা আয়ুবের বিপক্ষে “বিরোধী-পক্ষের নেত্রী ফতিমা জিন্নাকে ভোট দেবে কিংবা “কনভেনশনাল মুসলিম লীগের” প্রার্থীদের হতাশ করে “বিরোধী”দের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে নির্বাচিত করবে, এমন অলীক কল্পনা কেউ করত না। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও মৌলানা ভাসানীর মত নেতা, যিনি “শ্রমিক, কৃষক ও খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি” হিসাবে নিজেকে জাহির করেন, তিনিও বুর্জোয়া আন্দোলনের গতানুগতিকতার গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। আয়ুবের চেয়ারের তলায় বসে তার উচ্ছ্বস্তের জন্য কৌদল করা নূরুল আমিনকে মানায়, কিন্তু ভাসানীকে নয়। ভাসানীর বোকা উচিত ছিল যে, প্রতি-রোধার্থে শোষিত, মেহনতী আওয়াম যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করেছে, তা বার বার প্রতি-হত হয়েছে, বিপথগামী হয়েছে। লক্ষ্যের কাছাকাছি গিয়েও পিছদ হঠে এসেছে মূলত বুর্জোয়া নেতৃত্বের ব্যর্থতার জন্য। বুর্জোয়া নেতারা তাদের স্বার্থবিভক্ত মানসিকতা নিয়ে, তাদের আস্থা, মজ্জা ও গোপনতের মধ্যে নিহিত চাকর মনোবৃত্তি নিয়ে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাকিস্তানেও একই কাজ বার বার করে

তিনি ফাঁদে পা দিয়েছিলেন, ফাঁদে ফাঁদে পেতেছিল আরব খাঁ তার দালাল নরুল আমিন প্রমুখের সাহায্যে। ধরতর অভিরোভা আরব খাঁ সারা দানিয়াহ গাল ফুর্কানে প্রচার করেছিল যে, “নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তানে গণতন্ত্র কার্যকর করা হয়েছে এবং গণতন্ত্রের স্বার্থেই আবার নির্বাচন হচ্ছে। বিরোধী রাজনৈতিক দল-গদাগকে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারার্দপারেভো জরী হয়ে সরকার গঠন করুক।” আরব খাঁ এই নির্বাচনী গাজনে পাকিস্তানের মানুষকে মাত্তরে তোলার জন্য এন-ডি-এফ নেতানরুল নিশ্চয় বেশ মোটা-রকমের বকশিস পেয়েছিল এবং এই দালালির কাজে সে যে কত পারদর্শী, তা প্রমাণ করে দিয়েছিল ভাসানীকে টেনে এনে। নির্বাচনের প্রতিটি পর্যায় “সম্মিলিত বিরোধী দল” পরাজিত হোল, ভাসানী সাহাবেরও সাময়িক মোহমুগ্ধি ঘটল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যখন নরুল চাচা তার দুই নম্বর ভেক্টরীবাঞ্জী অর্থাৎ পি-ডি-এম দেখাতে চাইলেন, তখন ভাসানী মৃদু ফিরিয়ে নিলেন এবং উনসত্তরের প্রস্তাবিত নির্বাচনে যে ন্যাপ কোনও অংশ নেবে না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। কিন্তু আজ আবার ভাসানী সাহাব তাঁর ঘুশেকাটা, পোকায়-খাওয়া ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে নির্বাচনের ভায়া-ডোলে নামিয়ে দিয়েছেন। যেখানে নরুলের পি-ডি-পি নির্বাচন করছে, সেখানে ন্যাপ থাকবে তা ভাবাই যায় না। কিন্তু তাই তো হয়েছে। যে বজ্রোয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে নরুল আমিনকে বিচার করা যায়, তা দিয়ে ভাসানীকেও চেনা যাচ্ছে। প্রকৃত গণ-আন্দোলনের অংশীদার তিনি আর কোনও দিনও হতে পারলেন না।

যাই হোক, উনিশ শ পঁয়ষট্টির মারাত্মক জুলের জন্য কেবলমাত্র নরুল আমিন ও তার এন-ডি-এফকে দায়ী করা চলে না। কেন না, সেদিন আরববিরোধী গণ-আন্দোলনের দুর্বীর প্রোতকে নির্বাচনের বাঁধ দিয়ে প্রতিহত করার ভাসানী, মুজিবর রহমান প্রমুখেরও একটা অপত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। নরুল আমিন আরবের পক্ষে দালালি করেছিল, আর ভাসানী সাহাব এবং আজকের পূর্ব বাংলার “চ্যাম্পিয়ন-বায়” মুজিবর হাবাছেলের মত এই দালালির শিকার হয়েছিলেন। এই কারণে উনিশ শ পঁয়ষট্টির নির্বাচনকে সরাসরি নরুল আমিনের একক এ্যাড-জেষ্টার বলা যায় না, এটা হোল তার মৌখিক এ্যাডজেষ্টার।

যে দ্বিতীয় মৌলিক সৃষ্টির জন আমরা নরুল মিয়াকে সাধুবাদ জানাই তা “পি,

ডি, এম” বা “পাকিস্তান ডেমক্রেটিক মুভমেন্ট”। তালগোল পাকানো, অস্ত্রসার-শূন্য কতকগুলি বকুন, লম্বাচওড়া শঙ্কার খদান সহ কয়েকটি সঁজা ও ম্লাছল এবং কাছাখোলা উদ্বাহু নির্ধারাম সন্ন্যাসের মত কিছু অর্থহান, পোরদুহীন, লোক-দেখানো আশ্ফালন-বাস। এই নিয়ে “পি, ডি, এম”র জন্ম এবং এই নিয়েই তার প্রস্থান। “মৃত্যু” শব্দটি ব্যবহার করলাম না, কেন না নরুল যখন দেখল, তার হাত্তরারটি ডেমন কোনও কাজে লাগছে না, তখন সে শোখনবাদী মাস্টার মোজাকফের আমোদের ন্যাপ, বাঙলার খাটাস-বায় শেখ মুজিবরের অগ্রয়ামী লীগ এবং গান্ধী-মার্কাস ইসলামী পার্টি জমিয়াত-উল-উলমায়ে-এই তিন দলকে পটিয়ে-পটিয়ে “পি, ডি, এম”র সাথে মিশিয়ে নিল। ফলে জন্ম নিল “ডাক” বা “ডেমক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি”। “পি, ডি, এম” ছিল পাঁচ দল; তাই সেটা পাঁচ ফোড়ন, আর “ডাকে” চুড়ু আট পার্টি, সুতরাং এটাকে বলা যেতে পারে আট ফোড়ন। যাই হোক, খানদানী বাবুর্চি নরুলের আট ফোড়ন তৈরির কাহিনীটা পড়ে জানাব; আপাতত তার পাঁচফোড়নের কথায় ফিরে আসছি।

ন্যাশনাল ডেমোক্রটিক পার্টি বা “এন, ডি, পি” গঠন করতে ব্যর্থ হয়ে নরুল আমিন বসে বসে তার হাত-পা কামড়িয়েছিল এবং আমাদের পুরোন দল ন্যাপ ও তার নেতা ভাসানী সাহাব সম্পর্কে কুৎসা ছড়াচ্ছিল। আমাদের অপরাধ, আমরা তার ফাঁদে পা দেই নি এবং ভাসানী সাহাবকে সময়মত সামলে দিয়েছি। কিন্তু পঁয়ষট্টির নির্বাচনে অন্যান্য বড় দলগুলির মত ন্যাপ নিজেও যখন আরব খাঁর টোপ গিলল অর্থাৎ “বুনিয়াদী গণতন্ত্র”র নির্বাচনে অংশ নিল; তখন নরুলের চপসে-খাওয়া বকের ছাতিতে খানিকটা বাতাস ঢুকল। সে বুঝল যে, কায়দা করে টোপ ফেললে রাখববোয়ালরা সেটা গিলবেই। সুতরাং নতুন উৎসাহে খসে-খাওয়া লুঙ্গীটিকে কোমরে জড়িয়ে আমিন ও তার দলবল পি, ডি, এমের টোপ নিয়ে পাকিস্তানের বজ্রোয়া রাজনীতির এদোঁ ডোবার পারে গিয়ে বসল। ছেষটি সালের উনিশে জুলাই ঢাকায় বসে নরুল এক বিবৃতি দিয়েছিল। তার মতে, “পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হলো একটি দলহীন বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা। কারণ, দেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেবল অশান্তই নয়, অশুভও বটে। এই পরিস্থিতিতে একা চলার মনোভাব পরি-ভাগ করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।” যে

সুরাবদীর নাম শোনাযাত্র একদিন তার দেহে অ্যালাজী দেখা দিত এবং মুসালিম লীগের গদি মাওয়ার পর যে সুরাবদী তার ক্লাছে ধীরে ধীরে মিত্তর মোহাম্মদে রূপান্তরিত হচ্ছিল, তাকেই সাক্ষী রেখে নরুল বলেছিল—“জনাব সুরাবদী নিজেও রাজনৈতিক দলগুলির পুনরুদ্ধারের বিরোধিতা করেছেন। কেন না, তা বিপজ্জনক।”

নরুলের ঐ বিবৃতির মধ্যে যথেষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল। কেন না, মুখে দলহীন আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলা সত্ত্বেও নয়া দল গঠন করে লীগের বনার ইচ্ছে তার বরাবরই ছিল এবং এখনও আছে। “ন্যাশনাল ডেমোক্রটিক ফ্রন্ট” বা সুরাবদী একটা দলহীন রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে শুরু করেছিল, তাকে ন্যাশনাল ডেমোক্রটিক পার্টিতে রূপান্তরিত করার জন্য নরুলের চেষ্টার অন্ত ছিল না। আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়ছে যে, নরুল ভাসানীকে মামদ আলী মারফৎ নিজের দিকে টেনে আনতে চেয়েছিল কিন্তু ভাসানী বা আমরা ন্যাপকে তার ফাঁদে পড়তে না দেওয়ায় তার সব পরিকল্পনা তখনকার মত বানচাল হয়ে যায়। তা হলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে নরুল দলহীন রাজনৈতিক আন্দোলন গঠনের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও আসলে তার লক্ষ্য ছিল একটি নয়া দল গঠন করা। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে সে এই মতলব ফেঁদেছিল? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন দলগুলিকে একত্র করে তাদের শিং, মোখ, দাঁত উপড়ে ফেলে পুরোপুরি নিজের অধীন করা। ফলে ভবিষ্যতে বজ্রোয়া রাজনীতির এঁদো ডোবার পচা কাদায় সে একেশ্বর হয়ে যত খুশি গড়াগড়ি দিতে পারবে। তার এই মহৎ পরিকল্পনা কিছুটা বাস্তবায়িত হয়েছে। ন্যাপের যে ক্ষুদ্র অংশটা মামদ আলীর লাজ ধরে বেরিয়ে গেছে বা আওয়ামী লীগের যারা নবাব-জাদা নহরুল্লার হুঁকা কাঁধে নিয়ে তার সাথে সরে পড়েছে, আজ তাদের নিজস্ব বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু আজ মার্কামারা “পি, ডি, পি-ওয়াল” নরুল আমিনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত রেখে তারা আজ নির্বাচনের মাধ্যমে সাংঘাতিক এক বিপ্লব ঘটতে ব্যস্ত এবং এই ব্যাপারে তাদের নিকটমত। প্রতিশ্রুতী আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের পশ্চাদ্বেশে শিঙের গুতো দেওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সদাই যাবমান।

সাতষট্টির শুরতেই নরুল আমিন একটা বিশেষ মওকা পেয়ে গেল। ষাট

সামগ্রিক বঙ্গবন্ধু

সালে মার্শাল ল' বা সামরিক শাসনের অমলে আরব খাঁ তার রাজনৈতিক প্রতি-
শ্বস্বীদের ঘায়েল করার জন্য "ইলেকটিভ
বিভাজ" ডিসকোয়ালিফিকেশন "অডার"
নামে এক চোখা ব্রহ্মাশ্র ছেড়েছিল। এই
আইন অনুযায়ী বেশ কিছু সংখ্যক বান্দু
বুজোয়া নেতাকে ছয় বছরের জন্য রাজ-
নীতি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে
হয়। এদের মধ্যে একজন ছিল প্রাক্তন
প্রাদেশিক শাসনকর্তা, পাঁচজন কেন্দ্রীয়
মন্ত্রী, আঠারজন প্রাদেশিক মন্ত্রী, দুইজন
রাষ্ট্রদূত এবং দুইজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী
(সুদ্রাবদী সহ)। বঙ্গবন্ধু ভাজলে কি হবে,
আরব খাঁর মাথায় জমিদার বাড়ির নায়েব
গোমস্তার মত বদবাস্থি যথেষ্টই ছিল।
কেন না, তার বাপ নিজেও গোমস্তা-
গিরি এবং জমিদারি, দুইরকম কাজে করে
গেছে। গদীতে এসেই আরব খাঁকে যথেষ্ট
তার প্রতিশ্বস্বীরা অধিকাংশই বুড়ো হয়ে
গেছে, কয়েক বছরের মধ্যেই তাবা হয়
মরবে, নয় পঙ্গু হয়ে যাবে। কাজেই
গদীটা পোস্ত না হওয়া পর্যন্ত কটা বছর
যদি ওদের আটকে রাখা যায়, তা হলেই
"রাস্তা পারিষ্কার"। আরবের পাঁচ
সার্থক! কেন না ছয় বছরের মধ্যে সাত
বুড়ো মরল, এরা ছিল—সুদ্রাবদী, আব্দুল
লাতিক বিশ্বাস, ফজলুর রহমান, মিয়া
ইফতেখার উদ্দিন, মমতাজ হাসান
কিজিলবাস, আজ্ঞা নাওয়াজ খাঁ এবং সি,
ই, গিবন। আরও বারজন রাজনীতি
ছেড়েই দিল, বোধ হয় আরবের পাকানো
গোফ আর ডাবডাবের চোখ দেখেই তারা
ভড়কে গিয়েছিল। মালিক ফিরোজ খাঁ
নুন, মিয়া জাফর শাহ এবং সদার আবদুল
রসিদও এদের মধ্যে ছিল।

যাই হোক, বাদ বাকী যারা গাভরাটি
সালের পয়লা জানুয়ারী "এবডো রাহু"র
কাটা গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, তারা যাতে
হাতছাড়া না হয়ে যায়, এই ভয়ে নরুল
আমিন তাড়িঘড়ি করে তাদের কাছ চর
পাঠাতে লাগল। আমরা ঢাকায় বসেই এই
সব লক্ষ্যবস্তুর খবর পাচ্ছিলাম।

বঙ্গদর্শন

[৩০১ পৃষ্ঠার পর]

বাইরে। কমিটি এই বদলির ব্যাখ্যা
করতে কষ্ট স্বীকার করেছেন,
বলেছেন, এই বদলি শাস্তিস্বরূপ নয়,
কলকাতাই (কলকাতার অবস্থা?) এই
বদলির জন্যে দায়ী। কলকাতার আব-
হাওয়ায় তাঁর প্রাতিভাপূর্ণ প্রস্তুতি
হয়ে উঠতে পারছে না, এই দৃষ্টি
শব্দের (?) বাইরে তিনি তাঁর যোগ্যতা
প্রমাণ করবেন। কিন্তু লাইব্রেরীর
ইতিহাসে (৭০ বছর) লাইব্রেরীয়ানের
পক্ষে একজন মাত্র বাঙালী কাজ করেছেন
১৯০৭-১১ সালে—তিনি হরিনাথ দে।

বর্তমান লাইব্রেরীয়ানের আগে যেসব
অবাঙালী লাইব্রেরীয়ান এসেছেন, তারা
কখনও অভিযোগ করেন নি যে, স্থানীয়
লোকেরা তাঁদের কতকো বাধাদান
করছে। কমিটি লাইব্রেরীয়ানকে স্বাস্থ্য
দেবার জন্যে কলকাতা থেকে লাইব্রেরী
অপসারণের কথা সুপারিশ করেছেন
কি না, রিপোর্টের সারাংশ থেকে তা
অনুমান করা যাচ্ছে না।

খোসলা কমিটির রিপোর্ট বাতিল
করা উচিত এবং নতুন করে খোলাখুলি
নিরপেক্ষ তদন্ত করা উচিত। এই
প্রসঙ্গে আমরা লাইব্রেরীর স্বার্থ-
সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রসঙ্গ জনসাধারণের
সামনে তুলে ধরতে চাই—

১। কোন অফিসার নাকি তাঁর ডাক্তার
বন্ধুর নিজস্ব লাইব্রেরীর বই
ক্যাটালগ করার জন্য দিনের পর
দিন জাতীয় গ্রন্থাগারের কয়েক-
জন কর্মীকে আপিস টাইমে
বন্ধুর বাড়ি কাজ করতে বাধ্য
করেছেন?

২। কোন কোন অফিসার নাকি ভাই,
শালা, শালী, সহপাঠী, প্রতি-
বেশী, কন্যা, গ্রামবাসী প্রভৃতিকে
চাকরি দিয়ে স্বার্থচক্রের সৃষ্টি
করে জাতীয় গ্রন্থাগারের পরি-
বেশ পীড়িত করেছেন?

৩। সরকারী অফিসে নাকি নাবালকের
চাকরি হয় না। কোন অফিসার
নাকি নিজের ভাইকে সাড়ে ষোল
বছর বয়সেই চাকরি দিয়েছেন?
শুদ্ধ তাই নয়, কিছুদিনের
মধ্যেই অনেক পুরনো কর্মীকে
ডিঙিয়ে নাকি তাকে প্রমোশন
দেওয়া হয়েছে? বহু সিনিয়র
কর্মীর দাবি উপেক্ষা করে—
জাতিকে নাকি কোয়ার্টার দেওয়া
হয়েছে—এখন দু'ভাই পাশাপাশি
দু'টি কোয়ার্টার দখল করে
বেলভেডিয়ায় নাকি সাম্রাজ্য
স্থাপন করেছেন?

৪। বেলভেডিয়ার কোয়ার্টারে অবস্থান-
কারী কোন অসহায় উদ্ভাসচু
তরুণী কর্মী নাকি অস্বহ্যতার
চেষ্টা করেছিলেন। সুখলাল
কারণানি হাসপাতালে নাকি
এর প্রমাণ আছে। অন্যায়ভাবে
তাঁকে কোয়ার্টার ছেড়ে দেবার
আদেশই কি এর কারণ? আর
একটা কারণ নাকি উপরোক্ত
অফিসারের ভ্রাতার দুর্য্যবহার?

৫। এই অফিসার নাকি খিদিরপুরের
একটি স্কুলের এডার্মিনিস্ট্রেটর
থাকাকালে যাতায়াত ভাড়া হিসাবে
প্রতি মাসে টাকা নিতেন। এর
জন্য সরকারী অনুমতি এবং

ইনকাম ট্যাক্স কর্তৃপক্ষের অনু-
মোদন ছিল কি?

৬। কলকাতা এলাকায় বাড়ি থাকা
সত্ত্বেও কোন কোন অফিসার
বেলভেডিয়ায় কোয়ার্টার পেয়ে-
ছেন কি?

৭। কোন কোন অফিসার অফিসের
মধ্যে টাকা-পয়সার অবৈধ লেন-
দেন করেন কি? চতুর্থ
শ্রেণীর কর্মীদের ভর দেখিয়ে
কো-অপারেটিভ থেকে ঋণ করিয়ে
সেই টাকা নিজেদের কাছে
লাগান কি?

৮। স্টাফ কার কি নিউ সেক্রেটারিয়েটে
বা এঞ্জির আপিসে আড্ডা দিতে
যাবার জন্যে? মেয়ের বিয়ের
বাজার বা তত্ত্ব পাঠাবার জন্য
গাড়ি ব্যবহার বেআইনী নয় কি?

৯। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
যাতায়াতের ভাড়া এবং প্র্যাকটি-
ক্যাল পরীক্ষা নেবার জন্য টাকা
পেয়েও কোন অফিসার নাকি
একে অফিসের কাজ বলে দেখান
এবং ছুটি নেন না?

১০। লেনডিং ও রীডিং সেকশনের
সঙ্গেই পাঠকদের যোগাযোগ।
জাতীয় গ্রন্থাগারের যা কিছু
সুযোগ, এই দু'টি সেকশনের
মাধ্যমেই পাওয়া যায়। অথচ
১৯৬৮ সাল থেকে এ দু'টি
সেকশনে কোনও অফিসার নেই।
একজন অফিসার কিছুক্ষণের জন্য
ঘুরে যান মাত্র। পাঠকরা এমন
কাউকে পান না, যাকে কিছু
জিজ্ঞাসা করা যায় কিংবা অভি-
যোগ জানানো যায়। পাঠকদের
কথা উপেক্ষা করে এই পদগুলি
কেন খালি রাখা হয়েছে?

১১। লোকসভায় প্রশ্নোত্তরে কেন্দ্রীয়
শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছেন, কোন
দুঃপ্রাপ্য বই হারায় নি। বহু
হারিয়ে যাওয়া দুঃপ্রাপ্য বইয়ের
নাম জানানো কি দরকার?
তা ছাড়া বই চুরি গেলে যথার্থ-
ভাবে কে দায়ী তা নাকি সাব্যস্ত
করা যায় না? এটাও কি
বিশ্বাস্য? বই রক্ষার ভার
লাইব্রেরীর কোনো অফিসারের
ওপর নেই—এ কি কল্পনা করা
যায়?

জনসাধারণ চান লাইব্রেরীর সুষ্ঠু
পরিচালনা। কিন্তু বাঘের ঘরে
ঘোগের বাসা হলে লাইব্রেরীর কাজ
ভাল হতে পারে না। সেই বাসা ভেঙে
ফেলার জন্য খোসলা কমিটি বোধ হয়
তার ধারে-পাশেই যান নি। এরকম
হাস্যকর তদন্ত সমর্থনের অযোগ্য।

আগস্ট বিপ্লব

নিম্নলিখিত

৯ই আগস্ট।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে রক্তাক্ত লেখা এই দিনটি আজও লক্ষ লক্ষ মানুষেরা প্রাণে শিহরণ জাগায়। ১৯৪২-এর ৯ই আগস্ট শত্রু হযোঁছিল দেশব্যাপী আগস্ট বিপ্লব। আসমুদ্র হিমাচল কর্মপত হযোঁছিল একটি ধর্নিতঃ ইংরেজ, ভারত ছাড়ো। লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা-সৈনিক উচ্চারণ করোঁছিল একটি মন্ত্রঃ 'করব; না হয় মরব' (করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে)।

বোম্বাই শহরে গোয়ালিয়া পাকের্ নিখিল ভারত কংগ্রেস কর্মিটির অধিবেশন ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ অধিক রাত্রিতে প্রস্তাব গৃহীত হলঃ ইংরেজকে ভারত ত্যাগ করতে হবে। না হলে সমগ্র দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরুর হবে। গান্ধীজীর নির্দেশে সেদিন এ-আই-সি-সি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ শেষ হতে না হতেই, রাত্রি শেষ হবার পূর্বেই, গান্ধীজী থেকে শুরুর করে কংগ্রেস ও কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য বামপন্থী দলের (কমিউনিস্ট পার্টি বাদে) ছোট বড় সকল নেতাকে ইংরেজ সরকার গ্রেপ্তার করে। ৯ই আগস্ট সকালে এই সংবাদ জানার পর সমগ্র দেশ ক্রোমে ফেটে পড়ে এবং ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতার সংগ্রামের কোন সম্পর্ক নির্দেশ দিয়ে যান নি। সময় পান নি। বোধ হয় সে সম্পর্কে ভাবেনও নি। কারণ, দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতাদের অনেকেরই ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের প্রয়োজন হবে না। এ-আই-সি-সি'র প্রস্তাব নিয়ে বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা শুরুর করলেই একটা মীমাংসা হয়ে যাবে। অনিচ্ছুক নেতারা অনেকটা বাধ্য হয়েই এই প্রস্তাব নিয়েছিলেন। কারণ, তখন দেশবাসীর মনে আপোষহীন সংগ্রামের প্রবণতা তীব্র হয়েছিল। নেতৃবৃন্দের পক্ষে এই চাপ অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। তবে, জওহরলাল নেহরু থেকে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার আপত্তি ছিল, তখন যখন বিরত, ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যখন রক্ত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বড় বক্রায় কোন সংগ্রাম শুরুর করার ব্যাপারে। কিন্তু সব হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল নেতাদের গ্রেপ্তারের ফলে। নেতৃবৃন্দের নির্দেশ ও কর্মপন্থা ছাড়াই, সামারণ কর্মীরা নিজেরা কর্মসূচী প্রস্তুত করে আন্দোলনে এগিয়ে গেলেন।

সারা দেশে শুরুর হল সে এক বিরাত গংগ্রাম। ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবের পর ভারতে এত বড় গণঅভ্যুত্থান, এত বড় বিদ্রোহ আর হয় নি। চিরাচরিত সত্য-

গ্রহের পথে এই আন্দোলন পরিচালিত হয় নি। সংগ্রামী জনতা ইংরেজ শাসন উচ্ছেদকল্পে রেল লাইন উপড়ে ফেলেছে, পোস্ট অফিস ও থানা জ্বালিয়ে দিয়েছে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটেছে। আন্দোলনের এ এক নতুন পথ। বহু জায়গায় ইংরেজ শাসনকর্তৃপক্ষের অবসান ঘটিয়ে বিদ্রোহী জনতা পাঠা স্বাধীন সরকার গঠন করেছে। সাতারা, বালিয়া, তমলুক প্রভৃতি স্থানে এইরূপ স্বাধীন সরকার দীর্ঘদিন কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। এই সব স্বাধীন সরকার নিজেদের আদালত, পদ্রলিশ এমন কি কোথাও কোথাও মদ্রার প্রচলন পর্যন্ত করেছে।

আগস্ট বিপ্লবে ভারতের সকল প্রান্তের মানুষ অংশ গ্রহণ করেছে। আবাপবৃন্দ-বিনিতা এই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন। ইংরেজ সরকারের চরম নিষাঁতন, পদ্রলিশ ও সৈন্যের জুলুম এদের পিছর হঠাতে পারে নি। তমলুকে ৭০ বৎসরের বৃন্দা বীরাগনা মার্ভাগনী হাজরার বীরত্ব কাহিনী আজ ইতিহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পদ্রলিশের গুলীতে এই বৃন্দার দুই হাত রক্তে ভেসে গেছে, তবু তিনি হাত থেকে জাতীয় পতাকা ফেলে দেন নি, অসীম সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে পতাকা উচ্ছে তুলে ধরে এগিয়ে গিয়েছেন, মৃত্যু বরণ করেছেন। আগস্ট বিপ্লবের প্রথম শহীদ সিদ্ধ প্রদেশের ছাত্র হিমু কালানির আত্মত্যাগই কি কম গৌরবের? এ রকম কতজন প্রাণ দিয়েছেন। তদানীন্তন ভারত সরকার এক হিসাবে বলোঁছিলেন, প্রথম তিন মাসে আগস্ট বিপ্লবে এক হাজার জন মারা গিয়েছেন। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের হিসাবমত পঞ্চাশ হাজারের ওপর শহীদের মৃত্যু বরণ করেছেন আগস্ট বিপ্লবে।

আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শহরের ছাত্র ও যুবকদের পাশাপাশি এই আন্দোলনে গ্রামের চাষী ও কারখানার মজদুররা ব্যাপকভাবে এতে অংশ গ্রহণ করেন। বোম্বাই, সেলাপদ্র, আহমেদাবাদ, মাদ্রাজ, কানপদ্র, কলকাতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিল্পনগরীতে শ্রমিকরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির উল্লেখযোগ্য প্রভাব থাকা সত্ত্বেও (কমিউনিস্ট পার্টি আগস্ট বিপ্লবের বিরোধিতা করেছিল) এই সব ধর্মঘট হয়েছিল।

সেদিন আগস্ট বিপ্লব, দমনের জন্য হিংস্র ইংরেজ সরকার যে বর্বর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, ইতিহাসে তার তুলনা-থক কমই পাওয়া যাবে। গ্রামের

পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিয়েছে। শ্রমী-পদ্রব নির্বিশেষে অত্যাচার চালিয়েছে, চমেরদের সতীষ নষ্ট করেছে, এমন কি আন্দোলন দমনের জন্য বিমান থেকে গুলীবর্ষণ পর্যন্ত করেছে। এত নিষাঁতন সত্ত্বেও তারা বিপ্লবীদের মনোরল ভাঙতে পারে নি।

শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের পদ্রলিশ ও সৈন্য আগস্ট বিপ্লব 'দমনে' সক্ষম হয়। স্বাধীন পাঠা সরকারের অবসান ঘটে।

কিন্তু আগস্ট বিপ্লব ব্যর্থ হয় নি। আগস্ট বিপ্লবের ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান দেখে ইংরেজ আঁতকে উঠেছিল। তারপর যখন নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের যুদ্ধ শুরুর হল, তখন ইংরেজ বৃন্দ, এবার তাদের ভারত ছাড়তে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ভারতের সর্বত্র যে ব্যাপক গণবিক্ষোভ শুরুর হয়েছিল, তার মূলে ছিল আগস্ট বিপ্লব ও আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব। বোম্বাই ও করাচীর নৌ-বিদ্রোহ, জম্বলপদ্রের পদ্রলিশ বিদ্রোহ, ব্যাংক কর্মচারীদের ঐতিহাসিক ধর্মঘট, শ্রমিকদের আন্দোলন, কৃষকের সংগ্রাম এবং ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন, এসবে বিচলিত হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়েছে। বিপ্লবী অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীত কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃ ইংরেজের সঙ্গে আপোষ করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান হলেও, এখনও আগস্ট বিপ্লবের আদর্শ সফল হয় নি। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "চাষীর হাতে জমি দিতে হবে, শ্রমিকের হাতে কারখানা দিতে হবে।" এই প্রস্তাব আজও কার্যকরী হয় নি। আগস্ট বিপ্লবের অসম্পূর্ণ কাজ তাই আজ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতার অপেক্ষায় আছে। দেশের সকল মানুষের জন্য জন-বন্দের লাবস্থা না করা পর্যন্ত, ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আগস্ট বিপ্লবের অর্থ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন সফল হবে না।

আগস্ট বিপ্লবের জয়ন্তী দিবসে আজ এই প্রশ্ন উঠবেঃ ইংরেজ কি সত্যি ভারত ছেড়েছে? আজও ভারত কমনওয়েলথের মধ্যে রয়েছে, যে কমনওয়েলথের প্রধান বৃটেন এবং যে বৃটেন চরম শ্বেত বর্ণ-বিশেষে পরিচালিত হয়ে বৃটেন থেকে তাবৎ কৃষ্ণাঙ্গ বিতাড়নে বন্ধপারকর এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দেশ অমান্য করে ঘৃণিত দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয়ের স্পর্ধা রাখে। আজও ভারতে ইংরেজ পদ্রলিশ অবাধে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। তাই 'ভারত ছাড়ো' তখনই সম্পূর্ণ হবে, যখন ভারত কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে এবং ভারত থেকে ইংরেজ পদ্রলিশ শোষণ সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। 'ভারত ছাড়ো' ধর্ন কেবল ভারতের ইংরেজ শাসন অবসানের জন্যই ছিল না।

ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন সমগ্র বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদের অবসান কামনা করেছে। আজ তাই আগস্ট বিপ্লবের ঐতিহ্য আমাদের নতুন করে বিশ্বের সর্বত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই-এ প্রেরণা যোগাবে।

সোভিয়েত আগস্ট বিপ্লবীরা যে সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আজ দেশের ছাত্র ও যুবকদের সেইভাবে সকল অন্যায্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে।

আগস্ট বিপ্লব আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছে, জাতীয় পরিপ্রেক্ষিত অগ্রাহ্য করে কোন সংগ্রামের কর্মসূচী হতে পারে না। সোভিয়েত যারা 'জনযুদ্ধের' কথা বলেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ভ্রান্ত ছিল, ভারতের অবস্থার যথার্থ মূল্যায়ন না করে তাঁরা অন্য দেশের প্রশ্নকে বড় করে তুলেছিলেন। আজ তাই মনে রাখতে হবে, ভারতের যে-কোন সংগ্রামের কর্মসূচী প্রণয়নে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাবে জাতীয় পরিস্থিতি।

ভারতবর্ষ

[৩০৩ পৃষ্ঠার পর]

বিত্তীয় ইস্পাত কারখানা খোলা একটু কতিন হওয়াই স্বাভাবিক। তাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব করেছেন যে, ওড়িশায় বিত্তীয় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিবর্তে তাঁরা রুচকেয়া ইস্পাত কারখানার উৎপাদনী ক্ষমতা তিন গুণ বাড়ানোর কথা চিন্তা করছেন। কারণ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তাতে অনেক কম মূলধন ব্যয় করে, বেশি ইস্পাত উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রের এই প্রস্তাবটি অর্থনৈতিক বলে মনে হয় না।

ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্ব এখন ইস্পাতের চাহিদা ক্রমবর্ধমান। আর ভারতবর্ষ ইস্পাত উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদে যে রকম সম্পদশালী তাতে আরও ১০।২০টি ইস্পাত কারখানা এদেশে অনায়াসেই নির্মিত হতে পারে। বর্তমানে আমরা লক্ষ লক্ষ টন আকরিক লৌহ অত্যন্ত সস্তা দরে জাপান এবং অন্যান্য দেশের কাছে বিক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছি। তাই দিয়ে আমরা যদি ইস্পাত উৎপাদন করতে পারতাম, তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যেতে পারত। কিন্তু নানা বাস্তব অসুবিধা আমাদের সেই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই অসুবিধা দূরীকরণের পথে বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেন নি। সেটা তাঁদের মস্ত অক্ষমতা।

ওড়িশায় অবিলম্বে একটি বিত্তীয় ইস্পাত কারখানা গঠন করা সম্ভব হোক বা না হোক, সেই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অবিলম্বে নজর দেওয়া দরকার। ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের অর্থনৈতিক মান যতদিন না সমান সমান হচ্ছে, ততদিন দেশের বিভিন্ন অংশে অশান্তি ও অসন্তোষ বিরাজ করা অস্বাভাবিক নয়। সেটা দেশের সঠিক অগ্রগতি ব্যাহত না করে পারে না।

পাঞ্জাবের একটি কলেজের কাহিনী

কয়েকদিন আগে রাত ১০টার সময় পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (চেন্ডী-গড়) এক হোস্টেল থেকে গান-বাজনা, হৈ-হুগুড়োর আওয়াজ উঠতে থাকে। সেই আমোদ-ফর্তির কণ্ঠবিদ্যার চিংকারে পাড়াপড়শী সচকিত হয়ে ওঠেন। প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য অফিসাররা ভাবলেন, হোস্টেলে র্যাগিং হচ্ছে। সেটা প্রতিরোধ করবার জন্য তিনি ছুটেতে ছুটেতে হোস্টেলের দিকে এগিয়ে গেলেন। খবরটা হোস্টেলে পেঁগে যেতেই ছাত্ররা তাড়াহুড়ো করে গা ঢাকা দিল। প্রিন্সিপাল সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, সেখানে ১৫টি শূন্য মনের বোতল আর একটা রেকর্ড প্লেয়ার পড়ে আছে। তিনি শুনলেন বাইরের কয়েকজন লোক নিয়ে হোস্টেলের ২০ জন পানেশ্বর ছাত্র অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় টাইট আর ভাঙড়া নাচ নাচছিলেন।

প্রিন্সিপাল সংশ্লিষ্ট ৪জন ছাত্রকে এক বছরের জন্য সাস্টিক্ট করেছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট নাকি প্রিন্সিপালকে আরও নরম মনোভাব অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রিন্সিপাল সরকারের সেই নির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন।

দেশের ছাত্রসমাজের একাংশ কোন পথে চলেছে, এই ঘটনাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

—১।৮।৭০





॥ এক ॥

“নয়া দিল্লী, ২৬ মে (ইউ এন আই): পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে শেয়ারের মূল্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। টোকিওর স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ারের মূল্য দারুণ হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু আজ কিছুটা তেজীভাব দেখা দেয়। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের শেয়ারের বাজারে দারুণ মন্দাভাব দেখা দিয়েছে।.....লন্ডন, প্যারিস, মিলান এবং অন্যান্য শেয়ার বাজারে ব্যাপক মন্দা দেখা দিয়েছে।... নিউ ইয়র্কের শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ার জনোই বিশ্বের অন্যান্য শেয়ার বাজারে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বলে বি-বি-সি জানিয়েছে।”

—বঙ্গমতী ২৭-৫-৭০

“নিউ ইয়র্ক, ২৭ মে (পি টি আই): গতকাল নিউ ইয়র্কের শেয়ারের বাজার আবার হোট্ট থেয়েছে এবং মাঝখানে দর কিছুটা আশ্বস্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দিলেও তার পরেই সমস্তরকম শেয়ারের দর আবার নেমে যায়।.....১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শেয়ারের বাজারে মূল্যের নিম্নগতি সুরু হয়। এই সময় থেকে কাগজে-কলমে শেয়ারের দর ৩৫ শতাংশ হারে নেমে গেছে।”

—যুগান্তর ২৮-৫-৭০

“ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (এ-পি ও এ-এফ-পি): প্রেসিডেন্ট নিক্সন আজ ঘোষণা করেছেন যে, মূদ্রাস্ফীতি ও ঋতি উত্তপ্ত অর্থনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে তিনি তাঁর উপদেষ্টাদের দ্বারা ‘মূদ্রাস্ফীতি সতর্কীকরণ’ ব্যবস্থা প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছেন। মজুরী ও ব্যবসায়ের উৎসর্গিত রোধের ব্যাপারে সাহায্যের জন্যে তিনি ব্যবসায়ী ও

শ্রমিক মহলের নিকট সাহায্যের আবেদন জানান।”

—বঙ্গমতী ১৯-৬-৭০

লন্ডনের অবস্থা—

“Unemployment went down this month...there were 561,000 people out of work, excluding school teachers.... last month. The fact remains that this is the highest May figure since 1940.... Stocks which were run down last year...etc. etc.”

—The Economist, 23-29 May, 1970

বিশ্বের শেয়ার বাজারে এই ধরনের সংকট প্রাক-দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবস্থার কথা কি স্মরণ করিয়ে দেয় না? বেকারী, মূল্যবৃদ্ধি, মূদ্রাস্ফীতি, সর্বোপরি সারা ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় বাজার মন্দা এবং তার পরিণতিস্বরূপ শেয়ার বাজারে দারুণ হোট্ট—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে গ্রিগ দশকে এই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল ১৯২৯ সালে। এ-বিষয়ে সর্বিস্তার আলোচনা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। এ থেকে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে: তা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কি আসন্ন?

॥ দুই ॥

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির উনবিংশতিতম কংগ্রেস উপলক্ষে প্রকাশিত ‘রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যাবলী’ পুস্তিকায় স্তালিন দুটি মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে বিরোধ, তার চাইতে ধনতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ

অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং তা থেকেই বিশ্বযুদ্ধের উৎপত্তি।

কিন্তু বর্তমান পরি-স্থিতিতে—যে বারংবারই হোক—অবস্থাটা ঠিক উল্টো। অর্থাৎ সমাজ-তান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক শিবিরের মধ্যে যে বিরোধ, তার চাইতে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ অনেক বেশি প্রকট: এবং এটাই হচ্ছে সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি।

কম্যুনিষ্ট শিওরিভে অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের মূল ভিত্তি, রাজনীতি তার বাহ্যিকাকাঠামো। এই বাহ্যিকাকাঠামো মূল ভিত্তির ওপর নির্ভরশীল ও তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু অবস্থা—

বিশেষ এই মূল ভিত্তি আবার বাহ্যিকাকাঠামোকে নিয়ন্ত্রিত করে পাশ্চাত্যে দিতে পারে।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি প্রথমোক্ত পর্যায়ভুক্ত। আর সম্ভাব্য তৃতীয় মহাযুদ্ধের স্বরূপপ্রকৃতি দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। তার মানে হচ্ছে বাজার নিয়ে (মূল ভিত্তি, অর্থনৈতিক) ধনতান্ত্রিক শিবিরের অভ্যন্তরে যে বিরোধ হওয়ার কথা, সে-বিরোধের চেয়ে রাজনীতি (বাহ্যিকাকাঠামো) নিয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্বিরোধ অধিকতর প্রকট।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়া ধনতান্ত্রিক শিবিরের এই অন্তর্বিরোধকে কাজে লাগিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে ব্লটেন ও আমেরিকাকে নিয়ে ফ্যাসি-বিরোধী ফ্রন্ট করেছিল। আর সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধনতান্ত্রিক শিবির, তেমনিভাবে, কম্যুনিষ্ট শিবিরের অন্তর্বিরোধকে কাজে লাগাবে, তার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এবং এইটাই সম্ভবত কম্যুনিষ্ট দুনিয়ার চরম প্রজেক্ট হবে।

॥ তিন ॥

গত ২৪ এপ্রিল চীন সাফল্যের সঙ্গে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপ করেছে। চীনের আর আলাদাভাবে প্রমাণ করতে হবে না যে, তার বহু-পর্যায় রকেট আছে (বহু-পর্যায় রকেট ছাড়া এই ধরনের স্পর্টনিক উৎক্ষেপ অসম্ভব, আর বহু-পর্যায় রকেট মানেই হচ্ছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র বা আই-সি-বি-এম)। পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপের ব্যাপারে বহু-পর্যায় রকেট অপেক্ষাও কৃত্রিম উপগ্রহ অনেক বেশি মারাত্মক। স্পর্টনিকে বসান পারমাণবিক বোমাকে ভূপৃষ্ঠস্থিত নিয়ন্ত্রণাগার থেকে বোতাম টিপে যে-কোন স্থানে

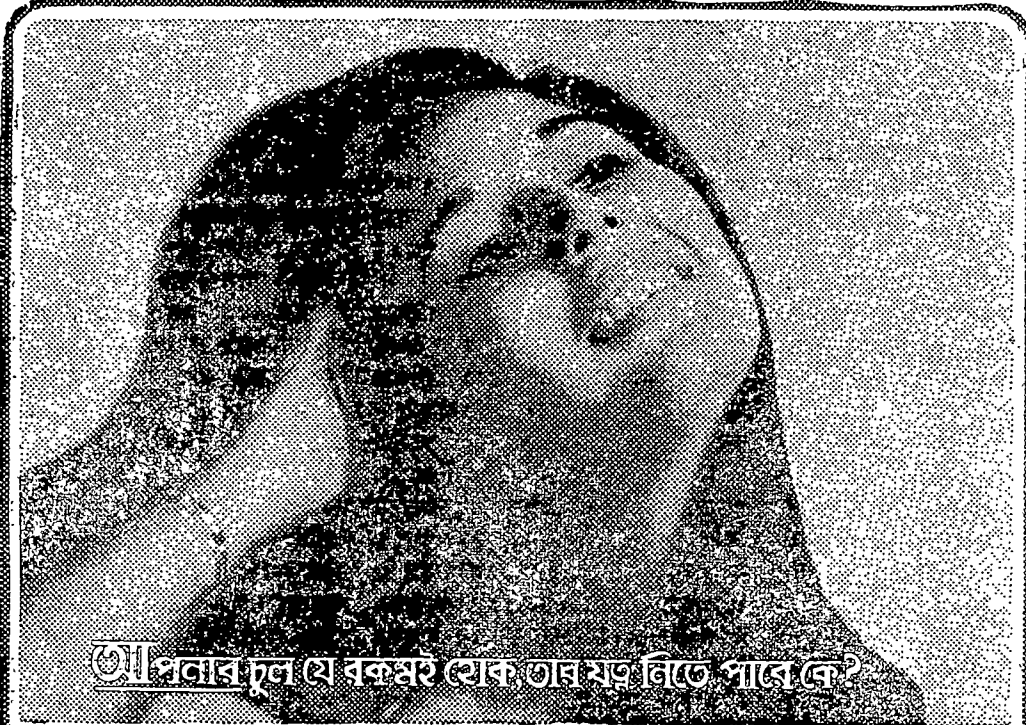
সাম্প্রতিক বঙ্গভাষা

নির্ভুলভাবে ফেলা চলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই সম্ভাব্য বিপদের রক্ষাকবচ হিসেবে বেশ কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছে যে, তারা কেউ কারোর বিরুদ্ধে মহাকাশকে ব্যবহার করবে না। সৌররশ্মি বা মহাজাগতিক রশ্মি দ্বারা পৃথিবীকে পুড়িয়ে ছাই করার ব্যবস্থা

উদ্ভাবনের যে চেষ্টা চলছে, বলা বাহুল্য তা আবিষ্কৃত হলে, তাও একচুটির আওতাধীন আসবে।

গত ২০ মে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি প্রচারিত এক সংবাদে বলা হয়—মার্কিন আক্রমণকারী ও তার তাবৎ দারদের পরাস্ত করার জন্যে চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং বিশ্বের জন-

গণকে একাবাক্ষ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। পিকিং বেতারে মাও সে-তুং-এর বিবৃতি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, আজ আবার বিশ্বযুদ্ধের নিগম এসেছে। তিনি (মাও) সারা দুনিয়াকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। (এখানে 'মার্কিন আক্রমণকারীদের তাবৎদার' বলতে মাও সে-তুং রাশিয়ার প্রতি



আপনার চুল যে বকসহ থেকে তার মত মিতে পারে কে?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যেসকলটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্মেঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার, বরফের, মেঘের মত উদাস, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্মেঃ- এতে আছে আলানট্রিয়েন যা আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, ফিরিয়ে আনে রেশমী-গোভা, চুল এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

স্বাভাবিক চুলের জন্মেঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় হৃদয় পরিপাটি থাকে, প্রতিটি চুল থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ণ প্রসাধনী



লিটল-SS. 11-1408G

হিন্দুস্থান লিটারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ঐতিহাসিক মনমতা

অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন, তা বুদ্ধকে বোধ হয় অসুবিধা হবে না।)

[এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। এ-সব ঘটনার ঠিক পূর্বে ফ্রান্সিসে স্তালিনপন্থীদের একটি 'কুপ'-এর চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এক প্রণীর রাজনৈতিক ভাষ্যকারের মতে, সে 'কুপ' সফল হলে সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্বরূপ-প্রকৃতি সম্পর্কে পাল্টে যেত। এমন কি, আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস পেত।]

পরের দিন ২১ মে রুশ সরকারের মন্ত্রণালয় 'প্রাভদা' মাও'র এই বিবৃতিতে তীব্রভাবে আক্রমণ করে বলে : "মাও সে-তুং চীনের পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র শক্তি বৃদ্ধির বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। চীন রপোন-নাদনার চরম শিখরে উঠে বসে আছে। বুদ্ধ এবং পেটের ক্ষিধে মৌনীর প্রস্তুতির ডাক ছাড়া মাও'র অন্য কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ নেই। সমস্ত বৈদেশিক মদ্রাকে এবং সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত শিল্প বিনিয়োগকে চীন সামরিক মাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে লাগাচ্ছে।"

তারপর ২৬ মে'তে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (বলা বাহুল্য, রাশিয়া এখন পর্যন্ত 'বুজোয়া' প্রেসের এ-সংবাদের কোন প্রতিবাদ করেনি)।—

"নিউ ইয়র্ক, ২৫ মে (এ পি) : চীনের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের মড়াই বাধলে রুম্যানিয়াকে রুশপক্ষে নেবার জন্যে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ এক চরমপন্থ দিয়েছেন। গত সপ্তাহে রুম্যানিয়ার নেতা নিকোলাই সিংয়েজুর কাছে এ পত্র দেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট এ পত্র যে-ক'টি কথা বলেছে, তার মধ্যে অন্যরোধের কোন বলাই নেই—সবই অবশ্যপালনীয় বলে নির্দেশ রয়েছে।"

৥ চার ৥

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের প্রস্তুতিকাল থেকে "চীন আক্রান্ত হতে পারে", একাধিকবার চীন এ-কথা বলে থাকলেও বিশ্বযুদ্ধের কথা ইতিপূর্বে (স্পোর্টনিক ছাড়ার আগে) সে এত জোর দিয়ে কোন দিন বলে নি। স্বভাবতই তার দিক থেকে এখন চেষ্টা চলবে কাকে কাকে সে দলে নিতে পারে এবং যাদের দলে নিতে পারছে না, তাদের কাকে কাকে অন্তত নিরপেক্ষ করে রাখতে পারে। সেদিক থেকে তার কূটনৈতিক চালচলনের ভেতর এবং সীমান্তবর্তী

দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সম্ভব।

সম্রাতি চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির নবম কংগ্রেসের পর চীনা কূটনীতিতে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত কংগ্রেসের পর পিকিংস্থ ভারতীয় দূতাবাসের কয়েকটি অনুষ্ঠানে চীনারা যোগ দিয়েছেন এবং ভারতীয়দের সঙ্গে ভদ্রতা বিনিময় করেছেন। নেপালের যুবরাজের বিয়ের সময় সেখানে উপস্থিত চীনের ভাইস-চেম্বারম্যান খ্যাভ-নাঘা সাহিত্যিক কু মো জো যে ভারত-তীয়দের সঙ্গে হৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন, তা সবাই লক্ষ্য করে থাকবেন। এর চাইতে আরো চমকপ্রদ ঘটনা : পিকিং-এ মে-দিবসের অনুষ্ঠানে স্বয়ং মাও সে-তুং ভারতীয় চার্জ-দ'অ্যাফেয়ার্স শ্রী বি সি মিশ্রের করমর্দন করার সময় বলেছেন, "ভারত মহান দেশ, এ দু'টি দেশের মধ্যে পুরাতন বন্ধুত্বের সম্পর্কই থাকা উচিত।"

ইন্দুরাজীর তরফ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের সঙ্গে একটা আপস-রফার ইচ্ছাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না (এবং সিংহলে সিরিমাভো বন্দরনায়ক আবার ক্ষমতায় আসায় তাঁর দৌত্যে দু'পক্ষের এই সিদ্ধি যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহের সম্ভাবনায় সিংহিত, তা বলাই বাহুল্য)। কারণ, সি'ডকেট কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী দল ও প্রতিরক্ষাশীল শক্তিগুলোকে রোধ করার জন্যে ইন্দুরাজীর কম্যুনিষ্টদের সমর্থন প্রয়োজন। রুশপন্থী কম্যুনিষ্টরা ইতিমধ্যেই তাঁর হাতে রয়েছেন। এখন চীনের সঙ্গে একটা আপস-রফা হলে চীনপন্থী বা চীনবেশা কম্যুনিষ্টরা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ না-এলেও বর্তমানের তুলনায় তাঁদের কাছ থেকে অনেক বেশি সমর্থন পাওয়া যাবে—ইন্দুরাজীর পক্ষে এটা চিন্তা করা অবাস্তব বা অযৌক্তিক কিছুর নয়।

ঘটনার এই গতিপ্রকৃতিতে সি পি এম ও নকশালপন্থীদের এক গুরুত্বপূর্ণ ও সূচত্বর ভূমিকা যে নিতে হবে—এটা বোধ হয় সবাইর চাইতে তাঁরাই ভাল বুঝবেন।

সি পি আই-এর এদিক থেকে কোন সমস্যাই নেই—রুশ নীতির অনুসরণ তার পরিষ্কার লাইন। সবচাইতে বেশি সমস্যার সম্মুখীন সি পি এম। কারণ, সি পি এম প্রথম চীনপন্থী থেকে পরে নিরপেক্ষ থাকার নীতি নিলেও তার সদস্য ও সমর্থকদের সহানুভূতি চীনের প্রতি। সি পি আই ভেঙে সি পি এম'এর জন্মলাভের মধ্যে চীনপ্রীতি রয়েছে, এটা স্বীকার না-করাটা সত্যের অপলাপ

৩৫২

ছাড়া আর কিছই নয়। সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সি পি এম'এর তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' সত্তা বিপর্যয় সি পি এম নেতারা এ-জিনিষটি বুঝতে পেরেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন বলেই এ-সমস্যার হাত থেকে 'আপাতত' রেহাই পাওয়ার জন্যে উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েতনাম ও কিউবার ন্যায় নিরপেক্ষ কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। শ্রীনাথদ্বিপাল, শ্রীসুন্দরারাম ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক উঃ কোরিয়া সফর যে এই অবস্থারই পটভূমিকার, তা বোধ হয় পরিষ্কার করে বলাই অপেক্ষা রাখে না।

উঃ কোরিয়া, উঃ ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি কম্যুনিষ্ট দেশগুলো মিলে আপাতত একটা তৃতীয় নিরপেক্ষ কম্যুনিষ্ট ব্লক হলেও বিশ্বযুদ্ধ এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই নিরপেক্ষ জোট আর নিরপেক্ষ থাকবে না কিংবা থাকতে পারবে না। হয় এই জোটকে চীন কিংবা রাশিয়া, কোন একটি জোটভূষ হতে হবে, নয়ত এই প্রশ্নই নিরপেক্ষ জোট ভেঙে যাবে এবং এই জোটভূষ দেশগুলোকে স্বাধীনভাবে রুশ কিংবা চীন কোন-না-কোন পক্ষে যোগ দিতে হবে।

উঃ ভিয়েতনাম, উঃ কোরিয়ার পরিস্থিতি আর ভারতের পরিস্থিতি এক নয়। কাজেই সি পি এম'এর পক্ষে এ-পথ অবলম্বন গোঁজামিলের পথ ছাড়া আর কী হতে পারে!

সি পি এম'এর দ্বিতীয় সমস্যা : ভারত ও চীনের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়ে গেলে তখন ইন্দুরা সরকার সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী হবে?

নকশালপন্থীদের সমস্যাও কম নয়। তাঁরা যদি সত্যি চীনপন্থী হন, তা হলে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মাও'র যে সত্যকথা, সে-সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁদের মনে কোন দ্বিধা নেই। স্বভাবতই সেই অবস্থায় প্রথম পর্যায়ে অন্যান্য চীনপন্থী ও চীনের প্রতি সহানুভূতি-শীল দলগুলোকে নিয়ে একটা ফ্রন্ট করার এক গুরুদায়িত্ব কি তাঁদের ওপর এসে বতায় না? দ্বিতীয় সমস্যা : ভারত ও চীনের মধ্যে একটা আপস-রফা হয়ে গেলে ইন্দুরা সরকার সম্পর্কে তাঁদের নীতি কী হবে, তা স্থির করা (এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে সি পি এম অপেক্ষা তাঁরা অধিক সংকটের সম্মুখীন)।

আরো অনেক বিষয়, অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে—যা নিয়ে এই স্বল্পপারিসরে আলোচনা সম্ভব নয়। তাই এখানেই ইতি করার ইচ্ছে নেই। সে-সব প্রশ্নের আলোচনা পরবর্তী লেখার অপেক্ষায়।

দুষ্টি পরিক্রমা

সুজনকম দে মরকস

বিতর্কের আরও খানিকটা

যাঁকে কেন্দ্র করে কোন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান অথবা পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে, বিতর্ক তো তাঁকে নিয়ে এবং তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়েই হবে। মানুষের ভেতরে যেমন আনুগত্যের, তেমনি জিজ্ঞাসার বিপরীত সমাবেশ থাকে। এই ডায়ালেকটিক্যাল ভাবধারাই মানুষকে রাস্যশালা করে রাখে। সুতরাং, যাঁকে নিয়ে, যার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক সোটা তাঁর গোঁরব, একই সঙ্গে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতি, তাই থেকেই সম্ভব।

কৈ, বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে তো বিতর্ক ওঠে না। উঠেছিল যখন তাঁর অন্যান্য যোনাঙ্ক সাহিত্যকাণ্ডের মধ্যে প্রথম 'এরা ওরা অনেকে' বাজারে এসেছিল। কিন্তু সে তো সুনীতি সংঘের একপেশে তাত্‌কালিক বিবাদ মাত্র এবং পরিণামও কীতিমান লেখকের পরিজ্ঞাত। আবার বার্ষিকাকালের 'রাতভরে বৃষ্টির ফল' দালা হচ্ছে আদালতে। তেমনি বিতর্ক ঘটেছে সমরেশ বসুর গঙ্গার বিবর প্রবেশ নিয়েও। এবং এও তাত্‌ক্ষণিক মাত্র। এ সব বিতর্কের জাতই আলাদা। এগুলো বারে বারে বিতর্ক ওঠবার কিছু নয়। বহু সময় আয়োজনের নৈমন্তিকবাড়ির আবজনা যেমন পরদিনই ধাপার মাঠে বাহিত ও বুল-ডজারিত হয়, এ বিতর্কের জাতও তেমনি। নতুবা মানদার আকর্ষণিতও বিতর্কে অক্ষয় হয়ে থাকতে পারত এবং অবধূতও চিরঞ্জীব হয়ে থাকতেন।

কিন্তু রামমোহনকে, বিদ্যাসাগরকে, বাঁশ্‌ককে, শরৎচন্দ্রকে এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে বিতর্ক হয় তা অভিজাত; চিরন্তন। কালপ্রবাহে সংঘটিত। সাহিত্যের ভেতরে ও বাইরে বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, মেঘনাদ, সত্যেন বসুকে নিয়ে যদি বিতর্ক ওঠে, তার আভি-

জাত্যও ভিন্ন। যার পরিমণ্ডল যত বেশি ব্যাপ্ত তাঁকে নিয়ে বিতর্কের অবকাশও তত বেশি।

রামমোহন যেমন একটি ব্যক্তিমাত্র নন, বিদ্যাসাগর, বাঁশ্‌কমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র যেমন এক-একটি ব্যক্তিমাত্র নন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ব্যক্তিগত সীমায়িত নন, যেমন নন বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ প্রমুখেরা। যে ছাত্রনামধেয় গুণ্ডারা আশুতোষের মর্মরমূর্তিকে সিঁড়িতে গড়িয়ে দিয়ে হাততালি দেয় অথবা বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে যে বিদেশী রাষ্ট্রের বৈতনিক চরেরা আলকাতারার প্রলেপ দেয় তাদের কোন আত্মপরিচয়ই নেই। এরা যদি কোন বিতর্ক তোলার সাহস দেখাত, বাহাদুর বলতাম। চোরের মত গোপন অভিসারে মূর্তিতে কলঙ্ক-লেপন যে করে, চৌরবাঁধিই তার সর্বস্ব, আর সর্ববিষয়ে সে নিঃস্ব, দুই থেকে বোমা মেরে যে পালিয়ে যায় সে শৌর্যের দাবীদার হতে পারে না, তার মতো ভীরু দুনিয়ার স্বতীয়টি নেই। যাদের নিঃপ্রাণ মর্মরমূর্তিকে ওরা ভাঙে বা কলঙ্কিত করে তাঁদের সজীব প্রাণের লেশমাত্র খবর রাখবার এক কণা বিদ্যে বা জ্ঞানও তাদের নেই; রাজনৈতিক বুদ্ধিতে যতই কেন না তারা প্রাচীর মসলিপ্ত করুক, ওরা বিদেশী রাষ্ট্রস্বার্থের বিভীষণ কুইসলিংয়ের নির্বোধ উত্তরাধিকার মাত্র। আমি যিশুখৃষ্ট নই, আমি আন্তরিকতার সঙ্গে বলতে পারব না, হে পিতা, ওরা জানে না ওরা কি করছে, ওদের ক্ষমা কর। ওরা ক্ষমার অযোগ্য। বন্দকের নলের ভাষা ছাড়া এই নব বন্য হেড হাটাররা অন্য কোন ভাষা বোঝে না, এরা স্বভাবতই বিতর্ককে ভয় পায়।

অতএব থাক এসব ক্ষণকালীন মণিরোগীর বিক্ষিপ। আজ কৈ খবর রাখেন একদা এক অস্বাচারণ গুপ্ত

ছোটগল্প লিখেছিলেন? গজপাণ্ড রায় নামে একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন? চামেলীবালা মজুমদার লিখেছিলেন 'শুকতারা', কে খোঁজ করেন আজ 'দলিত কুসুম', 'দামিনীলতা'র? প্রসন্নময়ী দেবীর 'অশোকা'? 'কনক-নলিনী'র রজন্য ভট্টাচার্য, 'মডেল ভগিনী' ও 'মডেল কাকার' যথাক্রমে মথুরানাথ তর্করহ, মধুসূদন মৃধো-পাধ্যায়, 'সুখচক্রে'র যদুনাথ ভট্টাচার্য, 'সুতপার' রামনারায়ণ করকে নিয়ে কে তর্ক করেন? 'ভীষণ' লিখেছেন শরচ্চন্দ্র বিদ্যারথ, 'সর্বনাশী' শ্যামলাল মজুমদার, 'তচনচ' অবিনাশ ঘোষাল, 'বিজলী' অবিনাশ দত্ত, 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক' অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী, 'ভণ্ড পাদরী' উপেন্দ্রনাথ মৃধো-পাধ্যায়। অথবা উমেশচন্দ্র গুপ্তের 'মুখ', উমাচরণ চক্রবর্তীর 'বসন্ত-কুমারী', উপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুকের বোঝা', উর্মিলা দেবীর 'পদ্পহার', এস সি মজুমদারের 'সুলো-চনা', ওসমান আলির 'হাফেজ সাহেব', কমলাকান্ত ঘোষের 'সিরিফুমার', কালীময় ঘটকের 'শর্বানী', কালী-কিস্কর চক্রবর্তীর 'অপূর্ব সহবাস' খুঁজে কে বা কারা পড়েন? কৈ এ সব লেখকের ব্যক্তি ও সাহিত্যকাণ্ড নিয়ে অথবা অন্য কোন কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক? কালীকৃষ্ণ চক্রবর্তীর 'নীরা', কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'ভবানী-ঠাকুর', কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুর্গমের সিংগিনী', কান্তিচন্দ্র বিদ্যারথের 'সুশীলা চন্দ্রকেতু', কালীমোহন ভট্টাচার্যের 'ধনু রায়', কালীচরণ মিত্রের 'যুথিকা', কৃষ্ণচন্দ্র কুন্ডুর 'পাষণী', কৃষ্ণকালী গুহের 'শৈলকণ্ঠ', কৃষ্ণবিহারী গুপ্তের 'অনিদ্যা', কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিচিতা', কৃষ্ণপ্রসাদ বসুর 'মেহের আকজন হরণ' নিঃসন্দেহে একদা কোন লাইব্রেরীর সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেছে।

পাদ্যাহিক বসুমতী

কিন্তু আজ? হ্যাঁ আজও আছে এই সংগ্রহে কক্ষধন চক্রবর্তীর 'কৌরবগণী', কৃষ্ণানন্দ শর্মার 'হীরাবাদী', কৈদারেশ্বর সেনের 'স্মৃতিসন্দির', কৈলাশচন্দ্র ঘায়ের 'ভাইভাণ্ডার', ক্ষেত্রমোহন ঘোষের 'দ্বীপালি', ক্ষেত্রগোপাল চক্রবর্তীর 'মধুযাগিনী', ক্ষেত্রগোপাল রায়ের 'ইন্দ্রকুমারী', গোবিন্দ ঘোষের 'চিন্ত-বিনোদিনী', গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হেমোৎসব', গোলাম মোস্তাফার 'ভাঙা বৃক্ক'। আলমারীতে বিন্যস্ত আছে 'অনাথ বালক', 'অযোধ্যার বেগম', 'আদর্শনা', 'সুতর', 'মা', 'শোভা', 'মায়ী', 'তারাসুন্দরী', 'ফোকলা', 'দিগম্বর', 'পিশাচ', 'অসতী সন্ন্যাসিনী', 'পদ্মরাগী', 'শীলাদেবী', 'উন্মাদিনী', 'অপরিচিতা', 'চিরস্মৃতিগলী', 'মধুমতী', 'আরতি', 'নবীমা', 'জননী', 'প্রতিমা', 'সুন্দরী', 'অভয়া', 'পদ্মপরাগী', 'কাকীমা', 'সরলা', 'রংগোন্মাদিনী', 'অনুস্মিণী', 'এলোকেশী', 'নিগহীতা', 'শান্তা', 'চারুশীলা', 'অপরিণীতা', 'লক্ষ্মী বো', 'পতিপ্রাণী'।

তর্ক নেই, বিতর্ক নেই, কিন্তু এরাই তিলোত্তমা বঙ্গসাহিত্যকে গড়ে তুলেছে। সঠিক সমালোচনার দ্বারা নেই আমাদের সাহিত্যে, তাই অসংখ্য বইয়ের পাঠ্য থেকেছে অজ্ঞাত। কেন না, আমাদের সাহিত্যের দুর্ভাগ্য, ভাল-মন্দ বইয়ের সার্টিফিকেট দেন অধিকাংশ অর্থ, স্বল্প অথবা অ-শিক্ষিত প্রকাশকেরা। কোন বই-সুখপাঠ্য, পাঠ্য অথবা অপাঠ্য, স্বল্পায়ু, গোলিওগ্রস্ট অথবা রসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ তার সার্টিফিকেট নিতে হয় যাঁরা বই ছেপে লেখককে ধনা করবেন তাঁদের কাছ থেকে।

প্রভাবতী সুরস্বতী অনেক বই লিখেছেন, সম্ভবতঃ কম-সংকম অর্ধশত; সৌরীন্দ্র মদ্যোপাধ্যায়ের বইয়ের সংখ্যা এর চাইতে কিছু কম হবে না। এরা সাহিত্যে ক্রমশ বিলীন হয়ে আসছেন, কিন্তু আজও কিছু স্থান আছে—যেমন আছে বহু গণ্যকার প্রভাত মদ্যোপাধ্যায়ের স্থান। সেকালে অনেকে বহুসংখ্যায় বই লিখেছেন খামকটা লেখার তাগিদে, রেশিরভাগ জীবিকা নির্বাহের তাগিদে। কি অসামান্য নামমাত্র নামে তাঁরা বই বেচেছেন একেবারে বা সংস্করণপিছদে (যার বিবর্তী সংস্করণ কখনো হয় নি) তা উল্লেখ করতেও লজ্জা পাই। আজও এই শ্রেণীর দরিদ্র লেখক কিছু আছেন যাঁদের প্রকাশকের ডিউটেন শূন্যে হয়; কিন্তু আজকের লেখক লেখেন পয়সার তর্পিত, যদি লেখবার কিছু সন্ধ্যা থাকে, তবে পোয়াবারো একখানা

বই বাজারে ধরলে পাঁচ থেকে পনেরো পনেরো থেকে পঞ্চাশ হতে পারে এবং সংগে সংগে কক্ষকালে মৌ ও স্থিতিতে বাড়ি, চলনে গাড়ি ও সপ্তয়ে ব্যাঙ্ক হতে পারে।

তবু সেকালে এক-একখানা বই নিয়ে হুলস্থূল হয়েছিল, কিন্তু আজ প্রকাশকদের কাছে, কে জানে, হয়তো বা পাঠকদের কাছে তা অচল হয়ে গেছে। চন্দ্রশেখর মদ্যোপাধ্যায়ের 'উল্লেখ্য প্রেম', 'সেই মৃৎখান', এখানে আসিলে সরাই সন্ন্যাস, হয়! ইত্যাদি কথা লোকের মুখে মুখে ফিরত। আমাদের আমলে ম্যাট্রিকে (১৯২৬) বঁধারীধি কোন সিলেকসান ছিল না, সেটা স্কুলের ইচ্ছাধীন ছিল, তাই, আমরা যেমন শরৎচন্দ্রের অনুরাগীরা পড়েছি, চন্দ্রশেখরের শ্মশান পড়েছি। আজ যেমন প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথ' ঘুরে বেড়াবার পর সুবোধ চক্রবর্তী 'রম্যানি বীক্ষ্য' করে চলেছেন, সেকালে নাটিকা ছাড়াই জলধর সেনের 'হিমাদ্রি' বা 'হিমালয়ও তেমনি এক চমকের সৃষ্টি করেছিল। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতাও এমনি একখানি বই। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের আরও বই আছে, কিন্তু পালার কাছে সব পরাস্ত। এবং এ থেকেও আমাদের পাঠ্য নির্বাচন হয়েছে। অনুরূপা দেবীর মা এমনি একখানি বই, গার্লের মা, গ্রাফিনা দেলেদার মা আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেছে নামা কারণে, অনুরূপার মা কিছু সামান্য নয়। দিলীপ রায় আজ সাহিত্যক্ষেত্রে অনুপস্থিতপ্রায়, কিন্তু তাঁর কিছু বই কিছু চমক সৃষ্টি করেছিল অম্বদাশঙ্কর রায়ের দেশ-বিদেশে এবং নবগোপাল দাসের সাগর দোলায় চেউয়ের মত। নিরুপমা দেবীর অরুণার, মন্দিরেও পাঠক বৃক্ক পড়েছিল। ক্রেতাবন্দু গুপ্তের বইয়ের সংখ্যাও কিছু কম নয়। এককালে কৈদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখার পাঠকদের রেশ মাতিয়েছেন। মানিক ভট্টাচার্য অনেক গল্প লিখেছেন, ভাল গল্পও, কিন্তু কজন তাঁর নাম করেন? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্বকীয়ভাবে আজও বেঁচে আছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরও স্থান স্থির হয়ে গেছে গ্রন্থাবলীতে। তাঁর কবিতা নিয়ে তাঁর পূর্ণ জীবন সম্প্রদায় চেষ্টা হলেও অত্যন্ত দ্রুত অন্তরালায়িত হতে চলেছেন। অথচ তিনি গ্রন্থী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একজন অবিস্মরণীয় লেখক।

কিন্তু সব চাইতে বিস্ময়কর ডঃ নরেশ-চন্দ্র সেনগুপ্তা স্মরণ যো! একটি রাজ্য গড়েছিলেন তার বিস্মৃতি। অত্যন্ত সচেতন লেখক, ফাইন রাজ্যে তাঁর

বইগুলো রসোত্তীর্ণ নয় এমন অভ্যোগও শোনা যায় নি, তাঁকে নিয়ে কিছু বিতর্কও হয়েছে; আজ হয় না। আজ পাঠকেরা অন্য জাতীয় ক্রাইম দেখছেন বা তাই তাঁদের কাছে পরিবেশন করা হচ্ছে। দামোদর মদ্যোপাধ্যায়ের কথা ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা ঐতিহাসিক দাগ কেটেছিলেন বাংলাসাহিত্যে। আজ রমেশ গ্রন্থাবলী হয়েছে প্রকাশকের সৌজন্যে। রাখালদাস, অক্ষয় মৈত্রেয় ওঁদের কে চেনেন?

নবনাট্য আলোচনায় মধ্যও হঠাৎ যদি কখনো শূনি স্বজেন্দ্রলালের নাটক হচ্ছে, চমকে যাই। অনেক নাটক লিখেছেন তিনি এবং আজও লোকে তাঁর—'সত্যি সেলকাস', 'কি. বিচিত্র এই দেশ', অথবা 'বাহবা নন্দলালের' কথা প্রবাদ বাক্যের মতো বলে শুনে শুনে, কিন্তু স্বজেন্দ্রলাল আজ অতীত; যেমন অতীত মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, শচীন সেন, অপারেশন মদ্যোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়। মন্থন রায় বেঁচে আছেন বলেই তিনি এখনও কিং! নাটক গবেষণায় ডক্টরেট প্রার্থীরা অবশ্যই পড়তে বাধ্য হন, কিন্তু সাধারণ পাঠক-দর্শকের কাছে তাঁরা বিস্মৃতি বা অজ্ঞতারাজ্যে বিলীনমান।

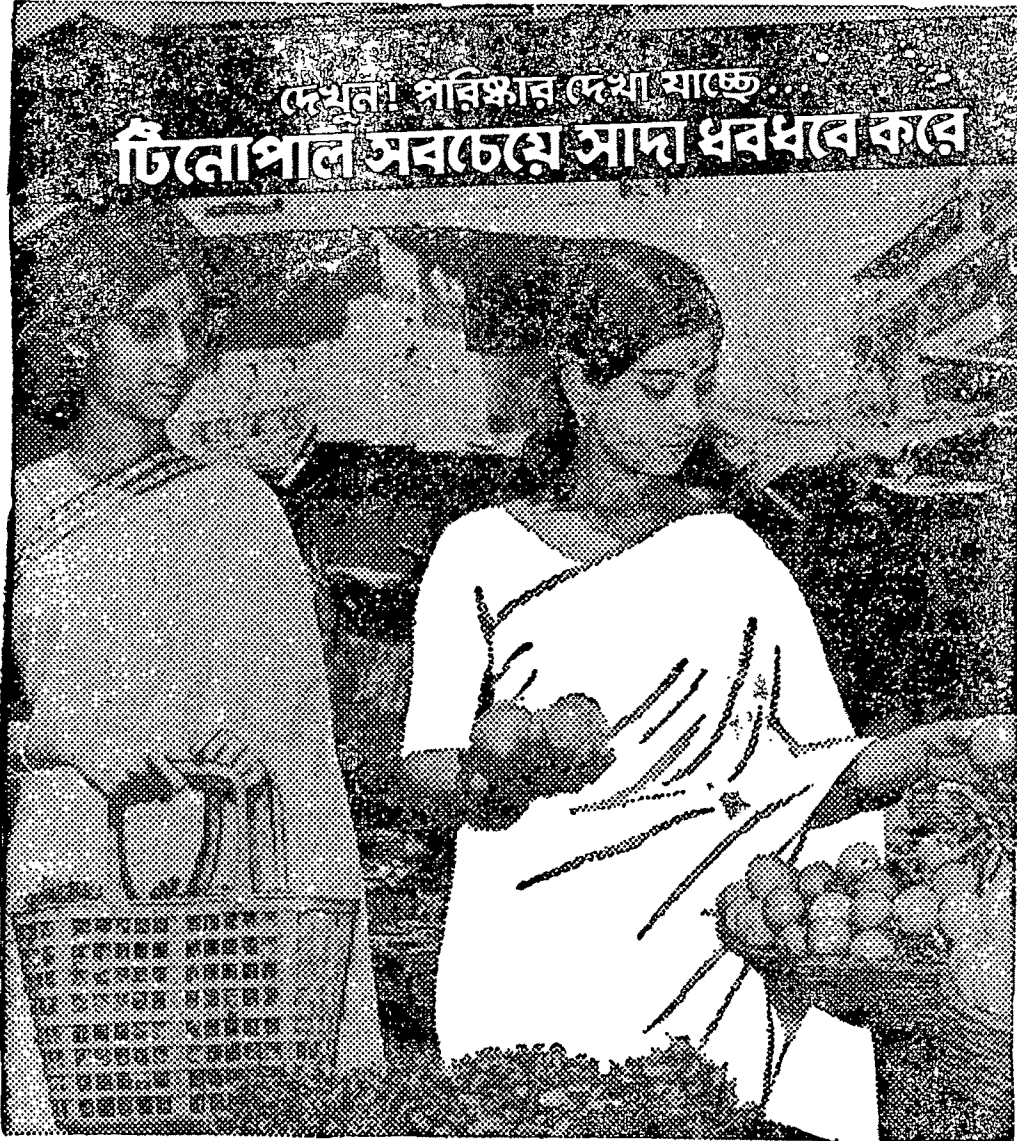
একটা কালে বাংলা সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছিল। বিশেষ করে কথা-সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায়ই মানিক-বিভূতি-তারানাথের অভ্যুদয়ই যে ঘটেছে, তাই নয়, শৈলজানন্দ মদ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, প্রমোদকুমার আতর্ষী, বনফুল বা বলাইচাঁদ মদ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মদ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নব নব সৃষ্টির আনন্দ দিয়েছেন বাঙালী পাঠককে। মোটামুটি তাঁদেরই অনুসরণ করে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্র মিত্র, আশাপুর্ণি দেবী, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, জ্যোতির্বিহারী নন্দী, সত্যীনাথ ভাদুড়ী, আশুতোষ মদ্যোপাধ্যায়, বিমল গিই, প্রণতোষ ঘটক, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শরীফন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সার্থক লেখকরা বাংলাসাহিত্যকে নিঃসন্দেহে ফসলে ভরে দিয়েছেন। তবে তালিকা করতে যাওয়ার বিপদ এই যে, ঠিক লেখবার মূহুর্তে অমাজনীয় বিস্মরণ ঘটতে পারে। উল্লেখযোগ্য নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা প্রতি মূহুর্তে। তা ছাড়া, যিনি তালিকা করেন তাঁর ওপর ক্রেতাকি ব্রহ্ম প্রভাব বিস্তার করবে

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পেরেছেন, সেটিও নগণ্য নয়। সংস্কার-বাক্য আমি মানুষ্টা যেখানে শরীরে শব্দ নয়, মনেও সীমাবদ্ধ, সেখানে তালিকা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আর সত্য করে আমি এখানে তালিকা-রচনাও করছি নে। আমি বলতে চেয়েছি, এককালে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে, কথা-সাহিত্যে সোনার ফসল ফলেছে। কিন্তু সবারই সব বই সমান চমক দিতে

পেরেছে বা নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে এ-কথা ঠিক নয়। সুন্দর ডেউ খেলানো সবুজ ধানক্ষেতেও অনেক গাছ থাকে সতেজ, কোনটা পোকায় বিনষ্ট, কোনটায় চিটে ধরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মাঝিতে যে চমক, চোর বা প্রাগৈতিহাসিক গল্পে যে বিস্ময়, শতুল-নাচের ইতিকথা বা সেরতলী শ্বিতীয় খণ্ডে যা বিস্তারিত, তা সবটাকে নেই।

এখন্য খেদের কোন কারণ নেই। মানিকবাবুকে নিয়ে বেশ কিছুকাল কথা উঠবে, ওর সচেতন লেখার সঙ্গে অন্যান্য অচেতন অথচ রসোত্তীর্ণ লেখার নিশ্চয়ই আলোচনা হবে। বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী বিশ্বজয়ী চলচ্চিত্র হয়েছে বলে নয়, অপরাধিতের উপসংহারে এমন মৌলিক ইংগিত আছে যা বিভূতিভূষণের মনটাকে দর্পণের মতো



পরীক্ষা করে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেখবার ধোয়ার সময় দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়—জমল সাদা শুধু টিনোপালেই সম্ভব। আপনার শাট, শাড়ী, বিছানার চাদর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা “এক মালতির জন্যে এক প্যাকেট”!



© টিনোপাল—যে আর পাচনী এস এ. বাল, হাইদারাবাদ-এর বেলিগার্ড টেক্সটাইল।

মুদ্রণ: গায়দী লি., পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi HPMA-13/78 C&S

সাহিত্যিক বস্তুত্ব

শব্দ বয়ে ফেলে। জানি, তারাশঙ্করের দীর্ঘ 'মত' কিছু পৃথক, কিন্তু ঐতিহাসিক এস্টেমেট ও রিয়াল এস্টেমেটে তাঁর ফাল্গুনী-গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম তাঁর অন্যান্য সাহিত্যকীর্তির মধ্যে অভুলনীয়। এঁদের তিনজনই সাহিত্যশিল্পকর্মের একটা মানরক্ষা করেছেন বলে তাঁদের গ্রন্থাবলীর খোঁজ হবে দীর্ঘকাল। শৈলজানন্দেরও একটা বলিষ্ঠ মান আছে, কিন্তু তাঁর প্রথম আবিষ্কার ঘটল ক্ষয়লাভের—কথা-সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তারে আজ তিনি স্রান্ত। ভাষা ও দার্শনিকতায় প্রবোধ সান্যালের ওপর আলোকছটা পড়েছিল এবং প্রত্যশাও জেগেছিল পাঠকদের মনে। এঁদের অধিকাংশই আমাদেরই মত নিম্ন-মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও পারিপার্শ্বে পরিবর্তিত, আজ হয়তো তাঁরা অর্থবিশেষে তা উত্তীর্ণ হয়েছেন। কিন্তু সংস্কার বাল্যজীবন থেকেই দৃঢ়মূল হয়ে যায়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমেন গিহ, বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন চন্দ্র, বৈষ্ণবীভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর যার বস্তুর স্বকীয়তা রক্ষা করে এসেছেন। সম্প্রতি পরামর্শের আরম্ভ জানা গেল, এঁরা নাকি অনেকেই লেখার বৈষয়িক সম্পর্কে পড়েছেন, নীচ বৈষয় নিয়ে লিখবেন, সহসা বিশ্বাস করতে পারছেন না। অথবা একথাই বা তাঁরা স্বীকার করছেন না কেন, তাঁদের শিল্প-সৃষ্টির যে দৃষ্টি ও কর্মক্ষমতা ছিল তা ক্ষীণতর হয়েছে? চারচন্দ্র মেলে দেখবার, বোকাবার, আমস্বপ্ন বা আত্মমাংস করবার ক্ষমতা গেছে কমে বা শেষ হয়েছে স্বর্ণকমল পরেলোকগত, কিন্তু তাঁর 'অন্তোষ্ঠি' বইটিও বিস্ময়িতকর। সত্যি নাথ হয়তো বোঝা হয় বোঁচ ৷ ছেন জাগরীতে এবং তাঁর 'দুঃ-এক-৭' বা বই আজও প্রকাশকেরা বেচতে রাজী আছেন। সুবোধ ঘোষের 'হিসল' নিয়ে হুন্দুস্থলে পড়েছিল, পাড়বার কারণও ছিল, অর্থাৎ প্রকাশকের সঙ্গে কথা-সাহিত্যের ভার্জিন সয়েল 'আগটান'ও হয়েছিল। তাঁরও একটা মান আছে, কিন্তু পুস্তকের তাগিদে বেশী লেখার দোষ চুকতে বাধ্য। তবু তিনি বলাই-চাঁদ, প্রেমেনের মতই সাবধানী সতর্ক লেখক।

শুদ্ধমাত্র চিত্তবিনোদন নয়, এঁরা মানুষ্যের অনাবিস্কৃত বহু ক্রিয়া-প্রতিফলিত অতলান্ত মহাসাগর থেকে কিছু কিছু রস আহরণ করেছেন, অথবা তার নমন্য উপস্থাপন করেছেন, হয়তো কিছু কিছু অব্যক্ত বস্তুও ঘূলিয়ে উঠেছে। সন্দেহ নেই ওঁরা পাঠকের চিত্তকে আলোড়িত-উজ্জ্বলিত করেছেন। তবু একথা জোর করে বলা 'অদ্বৈত' ওঁরা চিরপ্রসীদিত থাকবেন। এঁদের অনেকেই অশ্বিকা গুপ্ত প্রমুখের মতই

বিস্মৃতির গহবরে প্রক্ষিপ্ত করেন—খাঁদ না, প্রকাশকেরা নতুন বইয়ের অভাবে এঁদেরকেই নব নব সাজে বা কোণাল করে বাজারে আনেন। এর কারণ এই নয় যে, তাঁরা হয়তো এমন কিছু দেন নি, যা বারে বারে মানুষ্যের মনে প্রশ্ন তুলতে পারে; তাঁরা স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, কিন্তু সে উজ্জ্বলতার পরিমণ্ডল দীর্ঘায়ত নয় অথবা তাঁদের কেন্দ্র করে কোন ইনস্টিটিউশন, একটা ঐতিহ্য, একটা স্কুল, একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা, পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষের বিতর্ক বিষয় হতে পারেন নি। সবাই হন না। খাঁরা হন, তাঁদের অমরত্ব এখানেই।

লক্ষ্য করার বিষয়, স্বল্পায়ু কথা-সাহিত্য বা কথা-সাহিত্যিক অথবা নাটক বা নাট্যকারের জীবনায় প্রবন্ধকার, গবেষক বা ইতিহাসীরদেখা অনেক বেশি দীর্ঘায়ু। একটা সময় ছিল যখন দীনেন্দ্র সায়ের গোয়েন্দা 'কাঁহিনী', দ্বিজেন্দ্র জ্যোতীর নাটক বা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্প জাইয়েরী বা বইয়ের দোকানে টানাটানি। প্রবন্ধের বই, গবেষণার বই, জঙ্কের বই, (টেকসাঁট না হলে) সামান্য ইতিহাস। এমন নীচ, সন্দেহের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস বা সমালোচনার বইয়ের পাঠক কম, খুবই কম; তবু এই স্বল্প পাঠকের মধ্যে তাঁরা দীর্ঘজীবী এই কারণে যে, মানুষ্যের মনে যে যে প্রশ্ন জাগে, জেগেছে বা জাগতে পারে, তার কিছু কিছু সত্তাও সব বইয়ের মধ্যেই আছে। ইতিহাস-প্রণেতাদের কাছে যেমন পূর্বসূরীদের উল্লেখ অবিহার্য হয়ে ওঠে (খাঁদ আমস্বপ্নাতের 'মতলব না থাকে), তেমন বিষয়ে বিতর্ক তুলতে গেলেও তেমন পূর্বসূরী প্রবন্ধকারদের স্মরণ করতেই হয়। অতুল গুপ্ত কথ্যিত একথানা বই—কথা 'জিজ্ঞাসা' লিখেই জীবদ্দশায় সাহিত্য সভা-সমিতিতে সমাদৃত হয়েছেন, মরণোত্তরকালেও স্রোত-না-কোন সত্তা, খুব ব্যবধানে হলেও স্মরণযোগ্য হতে পারেন। লোকে এখনও যেমন বীরবল-সবুজপত্রের কথা বলে। পিঁড়িচেরীতে আড়াল না হয়ে গেলে নীলিনী 'গুপ্ত জীবদ্দশায়' সমাদর পেতেন। বিদ্যাসাগর, বীকমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতা-সত্তাও তাঁদের প্রবন্ধ তাঁদের বেশি করে জাগিয়ে রাখবে। ডঃ অরবিন্দ পোন্দার বা নারায়ণ চৌধুরী প্রবন্ধকার বলে তাঁদের নিয়ে হেঁচ-টে নেই, কিন্তু আলোচনা-সমালোচনাকালে তাঁদের নাম ওঁঠার সম্ভাবনা আছে—হয়মন আছে পরলোকগত ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ সায়ের এবং জীবিত ডঃ অজিত ঘোষের নামোচ্চারণ। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন হবে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস লিখে গেছেন, 'ময়মনসিংহ' গীতিকার ইত্যাদি লিখেছেন। আরণ্যক ডঃ সত্ৰুয়ার সেন,

ডঃ জুদের চৌধুরী, ডঃ আসিত সন্দেহ-পাধ্যায় এসেছেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য এসেছেন, কিন্তু দীনেশ সেন বোঁচ এসেছেন এঁদের মধ্যে বা এঁদের বাইরেও।

কিন্তু যিনি শিশুসাহিত্যে, কাব্যে, গল্পে, নাটকে, প্রবন্ধে এবং সর্বোপরি রসচর্চাপ্রম শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় পরিব্যপ্ত, তিনি বিতর্কের এখনও (আজি হতে শতবর্ষ পরে—বস্তুত ১০১ বছর পড়েও) বিষয় ও দীর্ঘায়ু (বা চিরায়ু) হবেন না কেন? কথা-সাহিত্যে যেমন, প্রবন্ধ-সাহিত্যেও তেমন। কারণ মূল্যায়নে তাঁর খাঁদ একাধিক শিল্পকর্ম থাকে তবে তা থেকে মাত্র একটি বা ত্রিশের বেছে নিলে তাঁর মূল্যায়ন কখনো সার্থক বা নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা; তাতে হয় সমালোচকের প্রামাণ্যিকতা নতুবা সৎকীর্তি জানেরই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। কোন লেখকেরই সব বই ভাল হয় না, কোন লেখকেরই সব বই স্মরণীয় হয় না; আবার এমনও দেখা যায়, কোন লেখকের একটি মাত্র বই বিস্ময়কর, আর সব না লিখলেই ভাল হতো; কোন লেখকের একাধিক বই ভাল, অনেক অপাত্য। তবু বলতে হবে, কোন লেখক সম্পর্কে ব্যক্তিগত জীবনমুখ, সম্পর্ক না জেনে, তাঁর ভালসম্পদ সব বই না পড়ে কোন স্রায় দেওয়া বাচালোচার পর্মিত্যেও পড়তে পারেন। বিশেষ খাঁরা বেঁচে আছেন। অচিন্ত্যবাবুর প্রাচীর ও প্রান্তর খসে পড়ের কিছু শ্রীমতীমত-রামকৃষ্ণ কথা-মুত্তের ঐতিহাসিকদায়ী 'পরমপদ' বই দীর্ঘায়ু হবেই।

এই দ্বৈত অক্ষয়কুমার সেনের দেড়শ বছর পূর্তিপালন করা হল এবং উঁচল তাঁর সমগ্র জীবনের সঙ্গে চার-পাঠের কথা। তাঁর যিনি তাঁর চাইতেও পরিব্যপ্ত তাঁর কথা কয়েক শতাব্দী ধরে চলবে অবধারিত। অজবুলের কাব্য ও মরণোত্তর উপন্যাস নিঃসন্দেহে দীর্ঘকালব্যাপী, কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন পরিব্যপ্ত নন বলে তাঁরা কোন স্থায়ী ইনস্টিটিউশন বা (সিঁকিউলার অর্থে) 'আশ্রম', নীচ কেউবিন্দু হয়ে ওঠেন নি, তাঁদের নিয়ে বিতর্কও তাই কালে ও বিষয়ে সীমাবদ্ধ হয়। কিন্তু যাদের পরিমণ্ডল বহুস্তর, সৌরভগতের মত, তাঁদের নিয়ে বিতর্ক উঁচবে বারে বারে, মূল্যায়ন হবে বারে বারে—হয়তো এইভাবেই, এই এক-পাণ্ডিৎ ইউনিভার্সের মতো আরও নৌরমণ্ডল মানুষ্যের, পাঠকের, বাংলা-সাহিত্যের দৃষ্টিগোচর ও আয়ত্তে আসবে। আজ এখনও বিজ্ঞানে এবং বাংলাসাহিত্যে বীরের নৌরভগতেই কক্ষ-পারিত্য করে 'চলোঁচ' কয়েকটা গু চাঁদে ফেলেও।

স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক বিলম্ববাদ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গোরাচাঁদ কুন্দু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৯ তমঃ

স্বামীবিজ্ঞানবাদী বিবেকানন্দের দিকে
চাকিয়ে অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন—

“তার বিচারবুদ্ধি ছিল বিজ্ঞানধর্মী
ও মানবধর্মী। সমাজবাস্তবের বিশ্লেষণে
তাই তিনি আধুনিক সত্য দৃষ্টির পথে
অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিলেন কিন্তু
হৃদয়টি ছিল স্থিতিশীল।...বিবেকানন্দের
মানবধর্মও তাই অধ্যাপকবাদের কুশাশা থেকে
মুক্ত হতে পারে নি।”

বিবেকানন্দের হৃদয় স্থিতিশীল হয়ে-
ছিল, একথা আমরাও স্বীকার করি। সেই
সঙ্গে আমরা একথাও বলতে চাই
যে সত্যদৃষ্টির পথে তিনি অনেক দূর
অগ্রসর হয়েছিলেন বলেই তার হৃদয়
স্থিতিশীল হয়েছিল এবং হৃদয়কে
স্থিতিশীল করে বস্তুবাদের সত্য এবং
অধ্যাপকবাদের সত্য—এই দুই সত্যকে এক
করে মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন তিনি এক
দম্পনের মধ্যে। সত্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ
তার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল দানা
বর্ণে। আর অধ্যাপকবাদের কুশাশা? কুশাশা
কোথায় নেই? বিজ্ঞান অনুসন্ধান যতই
মানুষ এগুচ্ছে, আমাদের চারপাশের
ইন্দ্রিয়জগৎ ততই কুশাশা ভরে উঠছে।
ইন্দ্রিয়জগতে বসে আমরা সকলেই খাঁজ-
লাছি, অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য বা
পলিটিস্ক করছি, বাহাজগতের হাজার রকম
ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি—এই পরম-
বিশ্বাসে যে, নিত্যকার দেখা আমাদের এই
জগৎ, আমাদের চারিদিকের এই বহির্বিশ্ব
সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতায় কোথায়ও
কোনো ভুল নেই। আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-
ভঙ্গীর গর্ব কে না করে? আমাদের

অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-
ভঙ্গীর দ্বারা পরিশুদ্ধ এই দাবি-ই বা
কে ছাড়তে চায়? আমাদের মত ও পথ
সবই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে
নির্ধারিত—এ বিশ্বাস আমাদের কতই না
দৃঢ়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ
বখন তার লেবোরেটরীতে বসেন তখন
তাকে জিজ্ঞেস করেন—

“কি ব্যাপার? এই বিশ্বজগৎ বাইরে
যেমনটা দেখছি, শুনছি, বুঝছি—সব ঠিক
ত? পরীক্ষা করে কি বুঝছেন?”

“তাই তো, হে—আগেকার সেই
Materialism যেন একেবারে শেষ কথা
নয়।”

“কেন?”

“এই তো দেখো, Matter, photon,
light quanta সব পরীক্ষা করে
দেখলুম। Particles আর Wave
নিয়ে নানা অবস্থার বিচার হলো। কিন্তু
কি জানো—কণিকাগুলোর সঠিক অবস্থান
জানাই আর সম্ভব হচ্ছে না।
Elements of radiationগুলোও
কেমন যেন—কোনো জায়গায় ঠিক থাকছে
না। আবার এই দ্যাখো না—এদের
অবস্থান যদি ঠিক ঠিক জানা যেতও, তবু
পরে কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু
বলা একেবারেই অসম্ভব।

“চেতনাহীন এই জগৎটার কথা যদি
বলো, তবে দেশ আর কালের তলায় ফুটে
উঠছে তার Substratum-এর ছবি।
ওর মধ্যেই ত জাগতিক ঘটনার সব উৎস
লুকিয়ে আছে। হয়ত অনাগত ভবিষ্য
ওর মধ্যে সূত্র—অনিবার্য পরিণাম প্রকাশের
জন্য সে অপেক্ষমাণ।”

“ওটা আপনার Hypothesis.”

“কি বলছো? ওটা Hypothesis
মাত্র? —তা বলা। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানের
সত্য যা কিছু জানা গেছে, এখন দেখা
যাচ্ছে তার মিল শব্দ Hypothesis-
এরই সঙ্গে। যতই দেশ-কালে আবশ্য
এই ওপরকার জগৎ থেকে Substratum-
এর জগতে প্রবেশ করতে বাই, মনে হয়
যেন কেমন তরো—যেন বস্তুর জগৎ থেকে
মনের জগতে ঢুকছি।”

কিছুদিন আগে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে
আমাদের চারিদিকে Space বা দেশ ছিল
কঠিন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিরেট কণিকাপুঞ্জ
দ্বারা পরিপূর্ণ—যেগুলি পরস্পর
পরস্পরের ওপর বৈদ্যুৎ চুম্বক বা
মধ্যাকর্ষণীয় শক্তি প্রয়োগ করতো। এই
শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বারা নির্ধারিত
হোতো কণিকাপুঞ্জের গতি আর এর ফলেই
ছোটতো জগৎজোড়া কর্মপ্রবাহ! কিন্তু
আজ বিংশ শতাব্দীতে Physical
theory of relativity বলছে বৈদ্যুৎ
এবং চৌম্বক শক্তিক্রিয়া আসলে আমাদেরই
“Mental constructs” বা “মনের
ছাঁচ”। জড় কণিকার গতি বদলবার
চেষ্টা থেকেই এই “ছাঁচ”গুলির উদ্ভব।
আবার Energy বা শক্তি, Momentum
বা ভরবেগ বা অন্যান্য যেসব ‘Concepts’
বা ধারণা গঠিত হয়েছে এই বিশেষ ক্রিয়া-
কলাপকে বদলবার জন্য সেগুলি সবই
“মনের ছাঁচ”।

Dialectics-এর ব্যাখ্যায় মার্ক্স বলে-
ছিলেন—“With me, on the con-
trary, the ideal is nothing else
than the material world reflect-
ed by the human mind and
translated into forms of

গাথাহিক বস্তুবাদ

"Thought"—ঠিক কথা, কিন্তু যে জোরটা
জানি বাইরের Material World-এর
ওপর দিয়েছেন, আধুনিক বিজ্ঞান ততখানি
জোর আর দিতে পারছে না। একটা
যেহেতু উদাহরণ দেওয়া যাক। কানাই-এর
শব্দ—ধরুন তার নাম বলাই। বলাই
কানাই-এর কাছে মনোবেদনা জানিয়ে
খবর বলে, জানিস, ভাই কানাই,

"স্বপ্ন প্রিয়া বলেন তোমার গলা
বড়ই রুদ্ধ
এই মোর বড় দুঃখ—কানাই রে
এই মোর বড় দুঃখ—"

[রবীন্দ্রনাথ]

তখন প্রাত্যহিক জীবনের বস্তুবাদী
অভিজ্ঞতা কানাইকে যতদূর নিয়ে যেতে
পারে তার ওপর ভিত্তি করে সে বলে,
"ভাই ভো ভাই, তোমার গলার সুর ত'
আমিও কত শুনছি। সে কি এতই রুদ্ধ?
কই, আমার ত' তেমনটা মনে হয় না।
কি জানি বাপু, নারীর মন!"

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বলছে
রুদ্ধতা বা কোমলতা ত' দুয়ের কথা,
আসলে বন্ধুর গলা থেকে সুর বা বেসুর
কিছুই বেরোয় না।—যা বেরোয় তা নিছক
জড় বা শক্তি-কণিকার কম্পন-জনিত কিছু
ভরঙ্গ। প্রিয়ার মনের উপর প্রতিফলিত
সেই ভরঙ্গ যে ভরঙ্গ-বোধে রূপান্তরিত
না হয়ে বেসুর রূপে জেগে ওঠে এবং
বিরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, ওটা
প্রিয়ার মনের সৃষ্টি। প্রিয়ার মনট যদি
একটু অন্য ধরনের হত, তবে বিরস বদনার
বিরূপতায় নিপতিত হয়ে বলাইকে আর
অমন কষ্ট পেতে হত না।

শব্দ ধ্বনি নয়, বর্ণ স্পর্শ স্বাদ গন্ধ
যা নিয়ে আমাদের এত কারবার, এত হাসি-
কান্না, দুঃখ বেদনা, এত আকর্ষণ বিকর্ষণ,
বন্ধুত্ব এবং রেবারেব বহির্জগতে তার
কোনো অস্তিত্ব নেই। মনঃসাহচর্য বা
মননিঃস্পর্শ বস্তু জগৎ—সে শব্দস্পর্শ-
স্বাদগন্ধবহীন এক কিস্তৃত্বিকম্বাকর সত্তা
মাত্র। একজন প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের
ভাষায়—“অণু পরমাণু ও আদিম জড়-
কণিকাসমূহের সূক্ষ্মতম রাজ্য জরীপ
করে বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের স্বরূপ
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন তার সঙ্গে
আমাদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতের
স্রোটে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়
না। আধুনিক বিজ্ঞানের মতে বিশ্ব-
জগতের সর্বত্র জড়—জড়ে জীব উদ্ভিদে
গ্রহ নক্ষত্র নীহারিকায় ও মহাশূন্যে প্রচণ্ড-
বেগে অনবরত ছুটোছুটি করে নেড়েছে
শব্দ অগণিত আদিম জড় কণিকা
ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন ও ফোটনের
দল। শক্তিকণিকারূপী ফোটন হিসাবে
গণ্য করা হল এখানে। কোথাও এরা
দলে ভারী, কোথাও হালকা। কোথাও

এদের বিদ্যুৎচুম্বক, কোথাও বা ৬০ হেজ
অল্প বেশী কম। এই ছুটোছুটি-ফলে
এরা সব সময়ে আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায়
এসে আঘাত করে। এ সব আঘাতের
ধাক্কা বহন করে নিয়ে যায় আমাদের
দেহের বহুসংখ্যক স্নায়ুসূত্র আমাদের
মস্তিস্কের কেন্দ্রস্থলে। এখন মস্তিস্ক
কেন্দ্রের আদিম জড়কণিকার মধ্যে যে কি
আন্দোলন ঘটে তা জানবার উপায় নেই,
যা থেকে আমাদের মানসপটে ফুটে ওঠে
বর্ণে গন্ধে রসে ছন্দে স্পর্শে ভরপুর
বিচিত্র এ বিশ্বজগৎ। বহির্জগতের
পদার্থ হতে আসে আমাদের ইন্দ্রিয়ের
দ্বারা শব্দ আদিম জড়কণিকা বা শক্তি-
কণিকার নৃত্যতরঙ্গের ধাক্কা। জাদুকরের
দণ্ডের মত এরা আমাদের সূপ্ত চেতনার
জাগিয়ে তোলে বিচিত্র রকমের অনুভূতি।
অগত্যা মানতে হয় এ হল শব্দ আমাদের
মনেরই কারসাজি। আমাদের মায়াবী
মনই তার আপন মাদুরী মিশামে বিচিত্র
বিশ্বজগৎ রচনা করে সূক্ষ্ম দৃষ্টির
সংমিশ্রণে আপন উপভোগের জন্য।
পাখীর গানে, ফুলের গন্ধে, চাঁদের
আলোয় বা সূর্যাস্তের শোভায় কোনো
বাস্তব ছন্দ গন্ধ রূপের অস্তিত্বের প্রমাণ
নেই। আসলে আধুনিক বিজ্ঞানের মতে
বহির্জগৎ হচ্ছে অরূপমরসগন্ধস্পর্শম-
শব্দম। সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয়ানু-
ভূতির প্রত্যক্ষ জগৎ—যাকে বলা যায় নাম-
রূপের জগৎ—তা হচ্ছে আমাদের মনের
গড়া জগৎ। স্বপ্নের মতই অনিত্য এবং
অলীক। একে বলা যায় বিজ্ঞানের
মায়াবাদ। বেদান্তের মায়াবাদের সঙ্গে
এর বিশেষ প্রভেদ নেই।”

অতএব মায়ী বা অতীন্দ্রিয় কথাটি
শূন্য আর আঁধারে উঠলে চলবে না।
আমাদের মত সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক
অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যাকে একান্ত
অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়, যারা তলিয়ে
দেখতে চায় তাদের অভিজ্ঞতায় সেই
অবাস্তবই একান্ত বাস্তব হয়ে ওঠে।
ইন্দ্রিয়জ্ঞান আহরণ করতে গিয়ে আমরা
আমাদেরই অজ্ঞাতসারে অহরহ অতীন্দ্রিয়
ভূমিকায় আরোহণ করি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্ধেক—
তখনও Quantum theory অথবা
Physical theory of relativity
জগতে প্রচারিত হয় নি—সেই সময় জড়-
বিজ্ঞান এবং অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সীমারেখার
মধ্যে কাপোনিক ভেদকে ধুঁচিয়ে দেওয়ার
আহ্বান জানিয়ে স্বামীজী লিখেছিলেন—

“জড়বিজ্ঞানের বিপরীত আধ্যাত্মিক
বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে আজ সারা বিশ্বে এক
মহা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের
ঐহিক জীবন ও পারিবাশ্রম্যমান জগৎকে
দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য

আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমার বাহুত
সকল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা আত-
ম্মত একটি ফ্যাসানে পার্ণগত হইতেছে।...
আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান যতক্ষণ স্বাভাবিক
শক্তিসম্পন্ন, ততক্ষণ আমাদের সর্বাপেক্ষা
বিশ্বাসযোগ্য পথপ্রদর্শক এবং সেগুলাই যে
সব তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেয়, সে সব যে
মানবীয় জ্ঞানসৌধের ভিত্তি—এ কথা কেহ
অস্বীকার করে না। কিন্তু কেহ যদি
মনে করে মানুষের সমগ্র জ্ঞান শব্দ
ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি—আর কিছুই নয়, তবে
আমরা উহা অস্বীকার করিব। যদি
প্রাকৃতিক জ্ঞান বলিতে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানই
বুঝায়—তার বেশি আর কিছুই নয়। তবে
আমরা বলিব এরূপ বিজ্ঞান কোনোদিন
ছিল না, কোনোদিন হইবেও না। উপরন্তু
ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো জ্ঞান
কখনো বিজ্ঞান বলিয়া গৃহীত হইতে
পারিবে না।

অবশ্য ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানের উপাদান
সংগ্রহ করে এবং তাদের সাদৃশ্য ও বৈষম্য
অনুসন্ধান করে কিন্তু এখানে উহাদের
প্রামাণ্যে হয়।

প্রথমতঃ বাইরের তথ্য সংগ্রহ ব্যাপারও
অন্তরের কতকগুলি ভাব ও ধারণা যথা
দেশ, কাল-এর উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ মানসপটভূমিকার কিছুটা
বিমূর্ত ভাব ব্যতীত তথ্যগুলির বর্ণীকরণ
বা সামান্যীকরণ অসম্ভব। সামান্যীকরণ
যত উচ্চ ধরনের হইবে বিমূর্ত পট-
ভূমিকাও তত ইন্দ্রিয়ানুভূতির বাইরে
থাকিবে। সেইখানেই অসংলগ্ন তথ্যগুলি
সাজানো হয়। এখন জড়, শক্তি, মন, নিয়ম,
কারণ, দেশ, কাল প্রভৃতি ভাবগুলি অতি
উচ্চ বিমূর্তনের ফল—কেহই কোনোদিন
এগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করে নাই—
অথবা বলা যায় এগুলি অতি প্রাকৃতিক বা
অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। অথচ এগুলি ছাড়া
কোনো প্রাকৃতিক তথ্য বোঝা যায় না।”

[পৃঃ ৩০৬, ৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

বেদান্তের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বামীজী
বলোছিলেন—

“আমাদের বাইরে এমন একটা কিছু
আছে যাহার যথার্থ স্বরূপ আমাদের
নিকট অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। ইহাকে বলা
যাক ‘ক’। আমাদের ভিতরে আরও এমন
একটা কিছু আছে যাহা আমাদের নিকট
অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়,—ইহাকে বলা যাক
‘খ’। জেয়বস্তুমাট্রেই এই ‘ক’ এবং ‘খ’-
এর সমষ্টি। আমরা যে সকল বস্তু জানি
তার প্রত্যেকটিরই দুইটি অংশ অবশ্যই
থাকিবে। ‘ক’ বহির্ভাগ এবং ‘খ’
অন্তর্ভাগ এবং ক ও খ-এর সমষ্টিটলক্ষ
বস্তুকেই আমরা জানিতে সমর্থ হই।
অতএব জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তু

সাম্প্রদায়িকভাবে আমাদের সৃষ্টি এবং উহার অপর অংশটি বাহ্য। এখন বেদান্ত বলেন এই 'ক' ও 'খ' এক অখণ্ড সত্তা।"

[পৃঃ ৩৩১—৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

তাই স্বামী বিবেকানন্দের অধ্যাত্মবাদ বা অতীন্দ্রিয় অন্তর্ভূতি কুরাশমন্ডিত কোনো অলৌকিক মিথ্যা জগতের কাহিনী নয়। অলৌকিক ঘটনা বলে তিনি কিছু মানতেন না। ইন্দ্রিয়ের জগতে অনুসৃত হয়ে এবং তাকে অতিক্রম করে রয়েছে যে অতীন্দ্রিয়ের জগৎ সেও মানুষের অধিগম্য এক স্বতন্ত্র জগৎ। সেই জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান না করে আমাদের থাকবার জো নেই। এই বর্তমান ব্যস্ত জগৎ সেই অব্যক্তের এক অংশ মাত্র। এই পণ্ডিতের গ্রন্থ জগৎ যেন সেই অনন্ত অধ্যাত্ম-লোকের একটি ক্ষুদ্র অংশ—আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্তরে এসে পড়েছে। অতীন্দ্রিয় বোধ আধুনিক বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতেও কুরাশাবৃত প্রহেলিকা-জগতের ধুম্রমায়ায় অচ্ছন্ন কোন অলৌকিক মিথ্যা ব্যাপার নয়। স্বামীজী তাই বলেছিলেন—

"সকল মানুষের ভিতরেই এই তিনটি শক্তির বীজ [সহজাত জ্ঞান, বিচারশক্তি, অতীন্দ্রিয়বোধ] অল্প-বিস্তর পরিষ্কৃষ্ট দোঁখতে পাওয়া যায়। এই সকল মানসিক শক্তির বিকাশ হইতে হইলে উহাদের বীজগুলিও অবশ্যই মানবমনে থাকা চাই। ইহাও স্মরণযোগ্য যে, একটি শক্তি অপরাটর বিকশিত অবস্থা মাত্র। সুতরাং তাহারা পরস্পর বিরোধী নয়। বিচারশক্তিই পরিষ্কৃষ্ট হইয়া অতীন্দ্রিয়বোধে পরিণত হয়। সুতরাং অতীন্দ্রিয়বোধ বিচারশক্তির পরিপন্থী নহে—পরন্তু তাহার পরিপূরক। যে সকল স্থলে বিচারশক্তি পোঁছিতে পারে না, অতীন্দ্রিয় বোধ তাহাদিগকে উন্মোচিত করে। তাহারা বুদ্ধির বিরোধী হয় না। বারংক বালকজের বিরোধী নয়, পরন্তু তাহার পরিণতি।"

[পৃঃ ১৬৫-১৬৬—৩য় খণ্ড, বাণী ও রচনা]

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা পাঠক-বর্গকে স্মরণ করতে অনুরোধ করি। শ্রুতি বিচারের সীমায় রেখে যার ব্যাখ্যা হয় না, ইন্দ্রিয়ভূমির চৌহদ্দিতে সাধারণ বোধের মাঝে যা খাপ খায় না

এমন এক নিত্য অন্তর্ভূতির সাক্ষ্য রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে।

"এক মৃহর্তে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পদা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটা অপরাপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দ-এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে যে একটা বিবাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষে ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।.....বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হাসিতেছে, শিশুকে লইয়া মাতা লালন করিতেছে, একটা গরু আর একটা গরুর পাশে দাঁড়াইয়া তাহার গা চাটিতেছে—ইহাদের মধ্যে যে একটা অন্তহীন অপরিমেয়তা আছে তাহাই আমার মনকে বিশ্বয়ের আঘাতে যেন বেদনা দিতে লাগিল।"

কবির সেই সর্বাবগাহী পদলক-বিস্ময়-বেদনাসিঞ্চিত ভাবরাশি কবিতায় নিঃসারিত হইল—

"হৃদয় আজিকে মোর কেমনে

গেল খালি

জগৎ আসি দেখা করিছে

কোলাহুলি।"

জানি না কবির এই ইন্দ্রিয়াতীত অন্তর্ভূতিকে কেউ কবিকল্পনা বলে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবেন কি না। কিন্তু কবি লিখেছেন—"ইহা কবিকল্পনার অত্যাতি নহে। বস্তুতঃ যাহা অনুভব করিয়াছিলাম তাহা প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।"

[পৃঃ ১০০-১০১, জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী—১০ম খণ্ড]

[চলবে]

উগাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উগাসক-সম্প্রদায়

বহুকাল পরে সদ্য প্রকাশিত হইল!

ভারতবর্ষীয় উগাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও ধর্ম-সাহিত্যের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭। মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বসুধাতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সাত্ত্বাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯

উগাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উগাসক-সম্প্রদায়

খানকাটাসমুদ্র

দ্রুমথানাত্মা সিনঘুস্তা

১ পূর্ব-প্রকাশিতের পর।

(৯)

তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইনস্টিটিউট অফ কলেজেন্স' ছিলেন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি (পরে স্বাধীন ভারতে যিনি পশ্চিমবঙ্গের গভর্নর ছিলেন)। প্রফেসর নিবারণচন্দ্র রায়কে সঙ্গে নিয়ে উনি এলেন শান্তি-নিকেতন শিক্ষাভবন পরিদর্শনে। ওঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল গেস্ট হাউসে, দেখাশোনার ভার ছিল আমাদের উপর। বিজ্ঞানে আই-এসসি মান পর্যন্ত 'প্রভিশনাল এ্যাফিলিয়েশন' এসেছে, ইনস্টিটিউট মহাশয়ের ভালো রিপোর্ট পেলে বরাবরের জন্য প্যাকা এ্যাফিলিয়েশন পাওয়া যাবে। বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরীগুলি (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বটানি), বিশেষ করে ফিজিক্স ল্যাবরেটরীটা দেখবেন প্রফেসর রায় (তিনি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে ফিজিক্সের অধ্যাপক)। ডঃ মুখার্জি পরিহাস করে বললেন, "আমি আপনাদের আদর-ময়ে, বিশেষ করে গড়গড়ান্ন সংগ্ধ ভাস্কর্য পরিবেশন করার ব্যবস্থায়, অত্যন্ত পরিতুষ্ট। এদিককার রিপোর্ট আমার প্রায় তৈরি হয়ে আছে, ইংরেজীর অধ্যাপক, বিজ্ঞানে দখল নেই, তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিবারণবাবুর রিপোর্ট পেলেই তা সই করে একেবারে কবিগদ্যর হাতে দিয়ে আসব। নিবারণবাবু হলেন আধুনিক

যুগের বিশ্বামিত্র, ওঁর ভয়ে সবাই তটস্থ, একটু তফাৎ এই যে, খোসামুদে উনি তুষ্ট হন না। ওঁর পরীক্ষা করার কিছ্র নিজস্ব পদ্ধতি আছে, সেগুলি যিনি ধরতে পারেন, তিনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তা তিনি ছাত্রই হোন বা অধ্যাপকই হোন।" ডঃ মুখার্জি ও প্রফেসর রায় এলেন ল্যাবরেটরীতে, প্রথম দেখলেন কেমিস্ট্রি, তারপর বটানি ও সব শেষে এলেন ফিজিক্স ল্যাবরেটরীতে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন যন্ত্রপাতি সব আছে কিনা, হঠাৎ নজর পড়লো ছোট ট্রান্সমিটার একটা যন্ত্রের উপর, বললেন, "এটা কি?" বলা হলো—'ডিরেক্ট ডিসন স্পেকট্রোস্কোপ', রাজশেখর বসু মহাশয় দিয়েছেন। "দেখি, দেখি" বলে প্রফেসর রায় হাত বাড়িয়ে যন্ত্রটা নিলেন, তার এক প্রান্তে চোখ ঠেকিয়ে সূর্যের আলোর বর্ণালিতে কালো-রেখা দেখার চেষ্টা করে বললেন, "এসব 'ডামি' যন্ত্র রেখে কী হবে?" আশ্চর্য হলাম, ওটা তো ডামি নয়, ভাকিয়ে দেখি তাড়াতাড়ি ভুলে প্রফেসর রায় 'আই-পিস'-এ চোখ না রেখে 'স্পট'-এর দিকে চোখ ঠেকিয়েছেন। কথাটা বলতেই তিনি প্রকৃটি করে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। চোখের ইঙ্গিতে ডঃ মুখার্জি আমাকে চুপ থাকতে বললেন, বখলাম দেবতা বেশ রুষ্ট। তার পরেই ঘটলো এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। সেদিন দ্বিতীয় বার্ষিক প্রণয়ীর ছেলেমেয়েদের প্রাকটিকাল পরীক্ষা হচ্ছিল। সেখানে গিয়েই একটি ছেলের

খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন, সে তখন 'ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার' নিয়ে কাজ করছিল। তাকে প্রফেসর রায় ইজেক্সট করলেন "দেখি কি 'রিডিং' নিয়েছে।" 'রিডিং'টা দেখেই ছেলোটিকে আবার 'রিডিং' নিয়ে দেখাতে বললেন। ছেলোটি আবার 'রিডিং' নিতে গিয়ে দেখে 'গ্যালভানোমিটার'-এর কাঁটা পূর্বস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে। প্রফেসর রায় সেই ঝুঁকে পড়ে 'রিডিং'টা দেখতে গেলেন কাঁটাটি আরো খানকাটা সরে গেল। ছেলোটি ছিল বেশ বুদ্ধিমান, কাঁটার এই আকস্মিক স্থান পরিবর্তনে সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "স্যার, এখন আর কোনো নির্দিষ্ট 'রিডিং' পাওয়া যাবে না, তার কারণ হঠাৎ এখানে একটা নতুন চৌম্বক ক্ষেত্রের আবির্ভাব হয়েছে।" প্রফেসর রায়ের মূখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেল, খুশি হয়ে বললেন, "তা কি করে হবে, হঠাৎ কোনো চৌম্বক ঝড়ের সৃষ্টি হলো নাকি।" ছেলোটি বললো, "হ্যাঁ স্যার, আপনি একটু নড়লেই কাঁটাটা নড়ে যায়, আপনার দেহটাই হয়তো একটা চৌম্বক, না হয় তো আপনার সঙ্গে চৌম্বক রয়েছে।" প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরে উঠল, পকেট থেকে চৌম্বকটি বের করে ছেলোটির হাতে দিয়ে প্রফেসর রায় তাকে দহহাতে কাছে টেনে এনে বললেন, "ঠিক ধরছে বাবা, তোমার পর্ববেক্ষণ শক্তি ও বুদ্ধি দেখে আমি খুশি হলাম।" ডঃ মুখার্জি বললেন,

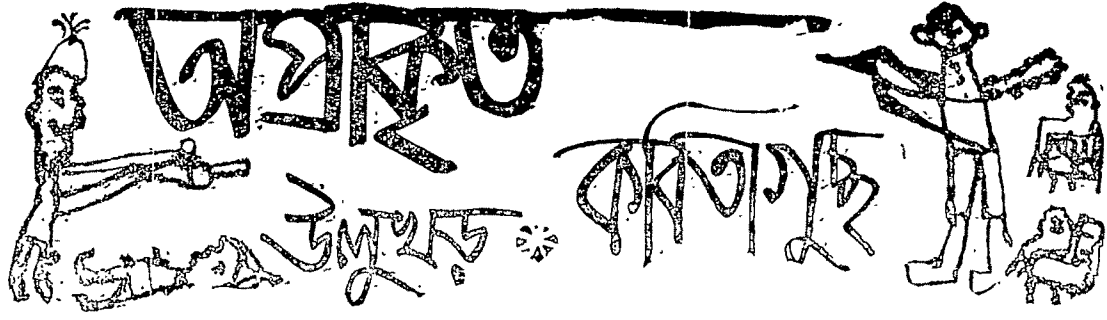
শনিবারগণবাদ্ এতোকাল কলিকাতার ছেলে-দের চোখে ধুলো দিয়ে আজ এখানে ধরা পড়ে গেলেন।" প্রফেসর রায় বললেন, "হরেন্দ্র, এই ধরা পড়ার জন্যেই যে শিক্ষক আমি উন্মত্ত হয়ে থাকি, অধ্যাপনার এই দীর্ঘ জীবনে এর আগে আর দ্বার মাত্র ধরা পড়েছি।" ডঃ মৃধার্জি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মাইডে রুট খাবি এবার তুচ্ছ।" তারপর ওরা দুজনে উত্তর সেনের সঙ্গে গেলেন গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে। ডঃ মৃধার্জি শান্তিনিকেতন ও প্রীতনিকেতন দেখে এতো আনন্দ পেয়েছেন যে, গুরুদেবকে বললেন, "ইচ্ছে হয় আপনার এখানে শিক্ষার্থী হয়ে আসি।" প্রসন্ন-মুখে গুরুদেব বললেন, "আসুন না এখানে, আপনার কাছে থেকে ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্যসম্ভার সিংহিত হয়ে উঠুক এখানকার চিত্তক্ষেত্র।" তারপর ঘণ্টাখানেক দুজনের আলোচনা চললো ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র নিয়ে। এই দুটি ক্ষেত্রে আমি অব্যবসায়ী, তাই এই আলোচনার কোনো কিছু লিপিবদ্ধ করা হবে অধিকার চর্চা। বিদায় নেবার আগে ডঃ মৃধার্জি বললেন, "এমন উদার-উন্মত্ত আকাশ এখানে, অর্থের সংগতি হলে একটা দূরবীনের ব্যবস্থা করবেন ছেলে-মেয়েরা যাতে গ্রহ-উপগ্রহ চোখে দেখতে পায় ও বিশ্বপ্রকৃতির দৃষ্টিতে বহুসংখ্য খানিকটা আভাস পায়। আকাশ যেখানে উদার, মনের প্রসারতাও সেখানে বাড়বে।" গুরুদেব বললেন, "অনেকদিন থেকে আমারও ইচ্ছে একটা ভালো দূরবীন এখানে নিয়ে আসি, ছেলেমেয়েরা উপরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখুক।"

কিছুদিন পরেই একটা দূরবীন কেনা হলো। বেশ শক্তিশালী, সৌরমণ্ডলের শনিগ্রহ ও তার বেষ্টনী সহ বেশির ভাগ উপগ্রহই চোখে ধরা পড়ে। চাঁদের গায়ে পাহাড়-পর্বত, গহ্বর, এমন কি সূর্যের আলোতে চাঁদের পাহাড়ের যে-ছায়া তার উপরে পড়েছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছেলেমেয়েদের চাঁদ ও গ্রহ-উপগ্রহ দেখিয়ে তাদের আয়তন, দূরত্ব, গতিবেগ, সূর্য প্রদক্ষিণের সময় ও অবস্থা সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য পরিবেশন করতাম। কী অসীম আগ্রহ, উৎসাহ ও মনোযোগ দিয়ে তারা দূরবীনে এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে দেখতো! একদিন সন্ধ্যার পর ল্যাবরেটরীর পূর্বদিকের মাঠে দূরবীন এনে ছেলেমেয়েদের গ্রহ-উপগ্রহ দেখিয়ে দূরবীনটা 'স্ট্যান্ড' থেকে খোলার ব্যবস্থা করছি, এমন সময় পিছন দিক থেকে ভেসে এলো গুরুদেবের কণ্ঠস্বর, "আমিও দেখব

বলে বসে আছি যে।" দূরবীনে তখন শনিগ্রহ তার বেষ্টনী সহ ধরা রয়েছে, গুরুদেব আগে শনির দশাটা দেখতে চাইলেন। একটা চেয়ার এনে গুরুদেবের বসবার ব্যবস্থা করা হোল, তারপর শনিকে দূরবীনের দৃষ্টিক্ষেপে এনে গুরুদেবের হাতে 'কণ্ট্রোল'টা দেওয়া হলো। তিনি দূরবীনটাকে নানা রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখাটা সহজ করে শনি, তার বেষ্টনী ও উপগ্রহমণ্ডলী দেখে যাচ্ছেন আর প্রশ্ন করে যাচ্ছেন, 'সূর্য তো পৃথিবী থেকে ন' কোটি মাইল দূরে, শনির ব্যবধান কতো? সূর্য-প্রদক্ষিণের এর সময় লাগে কতো? কক্ষপথে গতিবেগ কতো, আয়তন কতো, মেরুদণ্ডে আবর্তনের গতিবেগ কতো, এর উপগ্রহ কয়টি? এর বেষ্টনী একটা অপূর্ব জিনিস, গ্রহলোকে এর তুলনা নেই, এটা কী, আর সৃষ্টি হলোই বা কী করে? যতটা জানা ছিল এক এক করে প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেলাম: 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থের গ্রহলোক অধ্যায় লেখা কয়েকদিন আগেই শেষ হয়েছে, তাই অধিকাংশ খবরই দেওয়া সম্ভব হলো—সূর্য থেকে এর ব্যবধান প্রায় ৮৮ কোটি মাইল, সূর্য-প্রদক্ষিণের সময় ২৯ বছরের বেশি, কক্ষপথে গতিবেগ ঠিক মান নেই, হয়তো সেকেন্ডে ৮।১০ মাইল, তবে পৃথিবীর চেয়ে কম, পৃথিবীর হলো সেকেন্ডে প্রায় ১১ মাইল; আয়তন—ব্যাস পৃথিবীর প্রায় ন'গুণ, ৭০,০০০ মাইলেরও বেশি, আর আবর্তনের বেগ ১১ ঘণ্টা। উপগ্রহের সংখ্যা হলো ৯; তবে এই দূরবীনে ৪।৫টির বেশি খুঁজে পাওয়া যায়নি, সবচেয়ে বড়ো বলে যাকে দেখায় সে আয়তনে বৃহস্পতির চেয়েও বড়ো, আর শনি থেকে প্রায় আট লক্ষ মাইল দূরে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বেষ্টনীটা কী এবং সৃষ্টি হলো কী করে? বেষ্টনী নিরেট চাকা নয়, পরীক্ষায় জানা গেছে বেষ্টনীর যে অংশ শনির কাছাকাছি, তাদের গতিবেগ বাইরের দূরবর্তী অংশের চেয়ে বেশি। বেষ্টনী যদি অখণ্ড চাকার মতো হতো তাহলে ঘূর্ণিচাকার নিক্ষেপ-সারে বেগটা বেশি হোত বাইরের দিকে। লক্ষ লক্ষ খণ্ড টুকরো দল বেগে প্রচণ্ড বেগে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে বলে অখণ্ড চাকার মতো দূর থেকে মনে হয়। বিচ্ছিন্ন টুকরো বলেই, যারা শনির কাছে, টানের জোরে তাদের উপরই বেশি এবং ভারাই ঘুরবে বেশি বেগে। কী করে এই বেষ্টনীর সৃষ্টি হলো, সে সম্বন্ধে মতের মিল নেই, তবে যেটা বেশি প্রচলিত তা হলো—গ্রহের প্রবল টানে কোনো উপগ্রহই একেবারে গোলাকার থাকতে পারে না, অনেকটা ভিমের মতো চেতলা হয়। তারপর এমন এক সহজ-আসে যখন এই

টানের বেগ সহ্য করতে না পারে উপগ্রহ ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়। এই টুকরো দুটি আবার ভাঙতে থাকে, এমন করেই পর্যায়ক্রমে ভাঙতে ভাঙতে একটি উপগ্রহ ভেঙে লক্ষ লক্ষ টুকরো বের হওয়া অসম্ভব নয়। অনেকের মতে, প্রত্যেক উপগ্রহকে ঘিরে আছে এক অদৃশ্যমণ্ডলী, যাকে বলা যায় 'বিপদের গণ্ডী'। কোনো উপগ্রহ ঘুরতে ঘুরতে এই গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়লেই তার দেহটা ভিমের আকারের মতো হয়ে যায়, তারপরই ভাঙতে শুরু করে। আমাদের চাঁদেরও একদিন এই দশা হবে বলে আশংকা, তবে তার এখনও দেরী আছে; কারণ পৃথিবীর 'বিপদ-গণ্ডীর' অনেকটা বাইরে আছে সে। বৃহস্পতির নিকটতম উপগ্রহ এই বিপদ-গণ্ডীর খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে, কিছুদিন পরে সেখানে টুকরোই হয়তো খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে। শনির মতো বৃহস্পতিকে ঘিরে তখন শোভা পাবে একটি উজ্জ্বল বেষ্টনী। অনেকে মনে করেন, বহুকাল আগে শনির একটি উপগ্রহ তার বিপদ-গণ্ডীর ভিতরে গিয়ে পড়েছিল, তাতেই ঘটলো এক অপঘাত, উপগ্রহটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে শনির চারদিকেই চক্রপথে অবিরাম ঘুরছে, তাতেই সৃষ্টি হয়েছে এই বেষ্টনীর। আবার কেউ কেউ বলেন, চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে, কাজেই এভাবে বেষ্টনী সৃষ্টির ব্যাখ্যা চলবে না।

গুরুদেব বললেন, "চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পৃথিবীর যখন শনির দশা হবে, তখন তো অমাবস্যা, পূর্ণিমা বলে কিছুই থাকবে না। দিনরাত একটানা আলো আসবে তার বেষ্টনী থেকে, কবি-দের জগতে হাহাকার পড়ে যাবে যে! সমুদ্রে জোয়ার-ভাটাও বন্ধ। শুনোছ মানুষের জ্বরজ্বর, বাতের বাত এই চাঁদের টানেই জেগে ওঠে, বাতের রোগী ভয় করে অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশীকে; তারা তখন স্বাস্থ্যের নিশ্বাস ফেলে বাঁচবে। ভেবেছিলাম চাঁদকেও আজ দূরবীনের নতুন চোখ দিয়ে দেখব, কিন্তু চাঁদ তো দেখাছি পলাতক। যাক আর এক সন্ধ্যায় ওকে ধরব।" ছেলেমেয়েদের বললেন, "জানো, আমাদের পূর্ব-পূর্বেরা মনে করতেন বিশ্বমণ্ডলের কেন্দ্রে পৃথিবীর আসন অবিস্থিত, সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষের দল দিনে রাতে তাকে প্রদক্ষিণ করে মানুষের পরিচর্যায় নিযুক্ত। মনে যে করেছিলেন সে জন্য তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। সহজ-দেখা চোখে তারা দেখেছিলেন পৃথিবী স্থির, আর তাকেই পরিবেষ্টন করে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পূর্ব থেকে পশ্চিমে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী



সি: আর: পি:

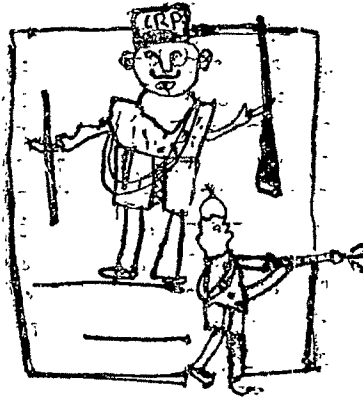
এখন ঠাণ্ডারদের রাজত্ব;
মানুষ বলতে কেউ নেই যে রুদ্ধে দাঁড়াবে।
রাজনীতির জুয়াড়রা এখন
অনেক রকম-পাশা খেলায় ব্যস্ত;
সময় কই যে বর্বরদের বোঁটিয়ে তাড়াবে।

.....ঠাকুরাণী

তিনি কোপ বৃক্ষে কোপ মারতে: ওস্তাদ;
তাতে মোষ অথবা মানুষ যে-ই জবাই হোক।
এবং তাঁকে আরো বাহবা দিতে হয়,
জবাই করার আগে পশু আর মানুষ
একই সঙ্গে তাঁর পা চেটে দেয়।

দিল্লীশ্বরোরা: একটি ঘরোয়া সভা

আজ সব কিছু দিল্লীর হুকুম চলেবে
খোদ রাজ্যপাল থেকে আক্রো-বঙ্গীয় কন্ফারেন্স।
আর যিনিই এর প্রতিবাদ করবেন,
তিনি এই মহতের সভা ছেড়ে চলে যেতে পারেন।



যে স্থির নয়, তারই পশ্চিম থেকে পূবে
আবতনের ফলেই যে জ্যোতিষ্কের: চলা-
সম্বন্ধে এই বিভ্রম জন্মাচ্ছে, একথা তাঁরা
বুঝতেই পারেন: নিঃ দূরবীন তাঁরির
সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টির সীমানাও বেড়ে
গেছে, আজ তাঁরা বিশ্ব-দেখা চোখ
বানিয়েছেন। জানতে পেরেছেন: বিশ্ব
পৃথিবীর আসন অবিচলিত নয়, তাকে
দৌড়াতে হয় সূর্যের চারদিকে এক
চক্রাকার পথে, পথটা সদৃশ, সময় ক্রম
মাগে না। ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি। যে-
ছায়াপথকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে স্বর্গ-
লোকের কতো বিচিত্র কাহিনী রচিত
হয়েছে, দূরবীনের চোখে মহতের তার
অবসান ঘটলো। জানা গেল: পৃথিবী
দেখা চোখে যাকে আলোকপথ বলে মনে
হয়েছে তার ভিতর রয়েছে অসংখ্য নক্ষত্র

মহাশূন্যে দুঃস্মরণীয় বিপুল দৃশ্যমাত্রা
নিয়ন্ত্রিত এদের অবস্থিতি। বিরাট দূরত্ব
এদের আলোকে করেছে স্লান; সন্নিবেশকে
করেছে নির্বিড়, তাই একটা দূরবীনের
আলোকপথ বলেই আমাদের সহজবোধ্য
ধরা দেয়। দূরবীনের শক্তি বাড়তে বাড়তে
বিশ্বলোকে বেড়ে চলেছে মানুষের দৃষ্টির
পরিধি, আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে
বিশ্বের রূপ। একটা জিনিস দেখতে পাই,
বিশ্বপ্রকৃতি তার চেহারাটাকে এমন
নিপুণভাবে সাজিয়ে রেখেছে যাতে তাকে
আমাদের সহজবোধের কাঠামোর মধ্যেই
ধরতে পারি। অতি বড়োকে দূরে সরিয়ে
তাকে করেছে ছোটো, আর অতি ছোটকে
করেছে অদৃশ্য। যা চিন্তা কর্তৃক মন
অভিভূত হয়ে যায়, এতো বড়ো বড়ো
জ্যোতিষ্ককে দিক-সীমানায় বদ্ধ আমাদের

মাথার উপরকার আকাশের মধ্যে ধরা
হয়েছে। দেখ-দেখি, আমাদের কীরকম
ভুলিয়ে রাখা হয়েছে; আর না ভেঙালেই
বা বাঁচতুম কী করে! এই সূর্য আপন
বিরাট দেহ ও প্রচণ্ড উত্তাপ নিয়ে যদি
আমাদের অনুভূতির-আরো কাছে আসতো
তাহলে মহতের পৃথিবীশুদ্ধ আমরা
লোপ-পেয়ে যেতুম।" দূরবীনে জ্যোতিষ্ক
মন্ডলী দেখাবার সময় এই কথাটা মনে
রেখো, আর বিশেষ করে ছেলোমেয়েদের
মনে করিয়ে দিও—“এই বিশ্বসংস্থিতির
অগম্য স্থানে মানুষের অবস্থিতি, বিশ্ব-
ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে
বর্তমান, অথচ এই বিরাট বিশ্বের অতি-
বড়ো ও অতিছোটদের হিসেব সে রাখছে,
এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা জগতে আর
কিছুই নেই।”

জৈময়ী মেয়াদী কারিকু মুন্ড মুন্ড বন্দী অনুবাদ : বিশ্বনাথ ঘোষ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সৈদন আমার কথামতই বন্দীরা সবাই কাজ করেছিল এবং তার ফলও আমার আশানুরূপই হয়েছিল। লড্-ওয়ার খুবই গরম জায়গা এবং যদিচ মাথায় পাথর নিয়ে হাসপাতালের দিকে যাবার সময় আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল তাড়াতাড়ি চলতে, কিন্তু ফেরবার সময় খালি হাতে আমরা দৌড়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। বেচারী প্রহরীরা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। নিয়মকানুন ভুলে গিয়ে রাইফেল কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। গায়ের ঘামে পায়ের ফেটি ভিজ়ে ফুলে ওঠাতে তাদের চলতে আরও কষ্ট হচ্ছিল এবং প্রায় সকলকারই পায়ে ফোস্কা দেখা দিয়েছিল অস্পষ্ট পরেই। বেচারারা হাঁপিয়ে প্রথমে জামার বোতাম খুলে ফেলে, তারপর আমাদের অনুরোধ করে আরও আস্তে চলতে। উত্তরে আমরা গর্হে বলেছিলাম, কি করবো ভাই, জেলা শাসকের হুকুম তাড়াতাড়ি কাজ করার, তাই মানতেই হবে। সৈদন সন্ধ্যায় শিবিরের হাসপাতালের সামনে ক্ষতিবিক্ষত প্রহরীদের ভিড় জমে গিয়েছিল। পরদিন সকালে তাদের অধিনায়ক শিবিরের অধিনায়ককে সোজা

জানিয়ে দেয় যে, এভাবে তারা কেউই কাজ করতে পারবে না; সে নিজে আমাদের আগেকার গতিতে চলতে নির্দেশ দেয় এবং আরও বলে যে, প্রয়োজন হলে জেলা শাসকের কাছেও সে আমাদের পক্ষই সমর্থন করবে। কিছুমাত্র ভাষায় আমাদের একটি প্রবাদ আছে : “নুগেন্তা থি নুভিয়াগাগা মুটেগি”, অর্থাৎ মাটির ভেতর গর্ত খুঁড়ে যে সব জন্তু-জানোয়ার চলাফেরা করে, তাদেরও ফাঁদ পেতে ধরা যায়। মহাশক্তিমান জেলা শাসককেও বন্দির লড়াই-এ হারিয়ে দেওয়া সম্ভব।

লড্-ওয়ারে দিনের কাজ শেষ হতো বেলা একটার সময় এবং তারপর খাওয়ার দায়ার কাজ সেরে প্রথর রৌদ্রের তেজ এড়াতে আমরা সবাই যে-যার নিজের কুঁড়েঘরের ছায়ায় আশ্রয় নিতাম লেখাপড়া করার জন্য। বিকেল পাঁচটার পর অতি উৎসাহীরা ফুটবল বা এরকম কোন খেলা খেলতো, বাদবাকি সবাই দাবা বা পাশার টেবিলে এসে জমা হত। আমি ফুটবল খেলায় সেন্টার ফরোয়ার্ড খেলতাম এবং আমাদের দলের নামকের কাজ করতাম। প্রহরীদের নির্বাচিত দলকে হারাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নি কোনদিনই।

একজন প্রহরীর হাতে আমরা

লুকিয়ে জোমো কৈনিয়াটোকে এবং লোকিটাউং বন্দিশিবিরের অন্যান্য বন্দীদের কিছু উপহার পাঠিয়েছিলাম। সে যখন ফিরে এসে খবর দিলো যে, কৈনিয়াটা পায়ের কণ্ঠে ভীষণ দুগছেন, তখন আমরা সবাই খুব বিমস্ হয়ে পড়ি। পরিচালক সমিতি প্রত্যেক বন্দীকে তাঁর দ্রুত আরোগ্যলাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করে এবং এর কিছুদিন পরেই তিনি ভাল হয়ে গেছেন জানতে পেরে আমরা অত্যন্ত সুখানুভব করি। আমরা আরও জানতে পারি যে, তিনি সেখানকার সমস্ত নিরক্ষর বন্দীদের লেখাপড়া শেখাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ওয়ারু-হিউ ইটোটে, যাকে আমরা “সেনাপতি চায়না” বলে ডাকতাম, কৈনিয়াটার কাছে ঐ সময় লেখাপড়া শেখে এবং বহুদিন পরে তার সঙ্গে কথোপকথনের সময় শিক্ষক হিসেবে কৈনিয়াটার ধৈর্য ও চেষ্টার সে যথেষ্ট গুরুগান করে।

একদিন সকালে আমরা যখন সবাই সৈদনের জন্য জন খাটেতে বেরুচ্ছিলাম, সে সময় শিবিরের অধিনায়ক আমাদের সকলকে ডেকে পাঠান। খুব হাসি-খুশিভাবে তিনি প্রচার করলেন : “তোমাদের বিখ্যাত বোম্বা, ফিল্ড মার্শাল স্যার (বিদ্রোপোজিত : ব্রিটিশ সরকারের প্রদত্ত সম্মানের নকলে) দিদান কিমাথি গতকাল নেয়েরী শহরের কাছে উপজাতীয় আরক্ষ বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে ও প্রচার চোটও খেয়েছে। ঠিক এইভাবেই তোমাদের আর সমস্ত তথাকথিত জেনারেলদের এক এক করে ধরা হবে পিষে মারবার জন্য। আশা করি, তোমরা এখন বুঝতে পারছ যে, কৈনিয়া সরকারেরই শেষ অবধি জয়লাভ হবে। আচ্ছা, তোমরা এবার যে-যার কাজে যেতে পার।” (এখানে বলা যেতে পারে যে, ১৯৫৭ সালে কৈনিয়া সরকার তাঁকে, ফাঁস দেন এবং ১৯৬৩ সালে স্বাধীনতা লাভের পর রাজধানী নাইরোবির এক বিখ্যাত রাজপথ তাঁর নাম বহন করছে সগৌরবে।)

এই দৃঃসংবাদ শোনবার পর আমরা সবাই অধীর হয়ে উঠেছিলাম। প্রথমে আমরা অধিনায়কের কথা বিশ্বাস করতে চাই নি, কিন্তু শানিক পরেই রেডিওতেও আমি ঐ খবরই শুনি। সৈদন আর আমাদের কাজ করতে ভাল লাগছিল না এবং প্রহরীরাও এ বিষয়ে কোন জোরজুলুম করে নি। তাদের চোখের নীরব ভাষা কেবল দৃঃ ও সমবেদনাই প্রকাশ করেছিল। সৈদন আমরা কোন লেখাপড়ার ক্লাস বসাই নি, ফুটবল খেলা স্থগিত ছিল এবং কেউই কোনরকম ভাল খাবারদাবার খায় নি। বিকেলে আমাদের বিচার-

জয়ের কাজও মূলতঃ রাখা হয়েছিল। সমস্ত বন্দীই নিঃশব্দে শোক প্রকাশ করছিল এবং যারা যারা কালো কাপড়ের খোঁজ পেয়েছিল, তারা শোকের চিহ্নস্বরূপ তা হাতে বেঁধে রেখেছিল। সম্মুখেবোলা আমরা সবাই আমাদের কণ্ঠেবেরে বসে প্রার্থনা করি এবং কিমাথির উদ্দেশ্যে তৈরি করা গানটি গাই। এই গান কেনিয়ার জঙ্গলে লুক্কায়িত কোন স্বাধীনতা সংগ্রামী রচনা করে এবং সব বন্দীই এর কথাগুলি জানতো। কথাগুলির তজ্জমা নিচে দেওয়া হল :

কিমাথির গান

- ১। আমাদের কিমাথি যখন একা পাহাড়ের শীর্ষদেশে পৌঁছায় তখন সে ভগবানের কাছে সাদা মানুষদের পরাস্ত করবার জন্য শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করে।
- ২। সে আমাদের সবাইকে তার পথ অনুসরণ করতে, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে পা ফেলে চলতে এবং তাব মতো একনিষ্ঠ হতে উপদেশ দেয়।
- ৩। সে বলে যে: “এসো, শক্তির অমৃত পান কর, যা আমি করেছি এবং যে অমৃতে আছে শত্রু দেশসেবার দ্বন্দ্ব, অশ্রু ও মৃত্যু।
- ৪। “মনে রেখ যে আমরা শত্রু কালো বলেই আজ সাদাদের কাছ থেকে পেয়েছি অবমাননা ও দাব্যবহার; কিন্তু ভগবানই আমাদের শক্তি দেবেন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জন্মো।
- ৫। “যদি তোমাদের নির্বাসন হয় বা বন্দিশিবিরে কালতিপাত করতে হয় বা সর্বস্ব খোয়া যায় তাহলেও মনে রেখো যে ভগবান আমাদের সহায়।
- ৬। “অতি বড় দুর্দিনেও আমাদের নেতা জোমো কেনিয়াটা সাহায্য করবেন আমাদের; যখন কাপেন গারিয়ার তাঁর বিচারের প্রহসন হয়েছিল সে-দিনও ভগবান তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন।
- ৭। “তোমরা সবাই তাঁর মতো ঠোঁটশীল হও, সাহসী হও; মৃত্যুকে, কণ্ঠকে হাসিমুখে বরণ করে নাও, শত্রু মনে রেখো যে, তোমরা সবাই আমাদের পূর্বপুরুষ গিকুয়ু ও মুম্বির সন্তান।
- ৮। “ভগবান, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে, সাদা লোকেরা যেন তাদের দেশে ফিরে গিয়ে শত্রু-শান্তিতে থাকে; যেমন বাগানেই ফুল ও ফল শোভা পায় নিজ নিজ গাছে, তেমনি তারাও যেন নিজ নিজ স্বস্থানে ফিরে যায়।”

দিদান কিমাথি সাহসী পুরুষ ছিলেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন দিতেও কুণ্ঠা করেন নি তিনি। জঙ্গলে লুক্কায়িত সংগ্রামীদের নেতা-রূপে অসীম ধৈর্য ও বীর্ষের পরিচয় দিয়েছেন তিনি। যুদ্ধবিপ্লব শেখবার সুযোগ তিনি দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসম্মেলনের সময় পান মিত্রশক্তির পক্ষে থেকে। যুদ্ধের পর কিছুদিন তিনি নেয়েরী শহরের ‘টেটু’ দৃশ্য সরবরাহ সমিতিতে ও পরে টমসনস্ ফলস্ শহরে ‘শেল’ তেল কোম্পানীর কাছে চাকরি করেন। তাঁর এক ছাত্রের মৃত্যু আমি শুনেছি যে, সে সময় কিমাথি খুব ভদ্র, নম্র ও দয়ালু প্রকৃতির লোক বলে ‘সুদানাম’ অঙ্গন করেন। পরবর্তীকালে জঙ্গলে লুক্কায়িত থেকে সংগ্রাম করবার সময় তাঁর সাহস ও বীর্ষের কথা পৌরাণিক কাহিনীর মতো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, লোকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করে যে, তিনি অলৌকিক গুণের অধিকারী। কিকুয়ু সম্প্রদায়ের লোকেরা স্থিতি-চিহ্নস্বরূপ নাইরোবি শহরে তাঁর এক প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করার প্রস্তাব করেছে। তাদের অনেকেই এখনো বিশ্বাস করে না যে, তৎকালীন কেনিয়া সরকার সত্য-সত্যই দিদান কিমাথিকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছিলেন। তারা মনে করে যে, তিনি অজর, অমর, কাজেই এখনো বেঁচে আছেন। কিমাথি ধরা পড়ে মারা যাবার পর তাঁর স্ত্রী, মৃকামি এবং তাঁর বাচ্চারা নেয়েরীতে অত্যন্ত কষ্টভোগ করেছিল। বন্দিজীবন থেকে জন্মা পাবার পর আমি যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করেছি। আমাদের নতুন কেনিয়া সরকারের উচিত ঐরকম নিঃসহায় লোকদের যথাসম্ভব সাহায্য করা।

১৯৫৭ সালের ৩রা জুন ঘানা (পশ্চিম আফ্রিকার পূর্ববর্তী গোল্ড-কোস্ট) স্বাধীনতা লাভ করার আমাদের সবাই খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। আমরা বন্দিশিবিরেই বিশেষ উৎসবের আয়োজন করেছিলাম, তার ভেতর ছিল কিকুয়ুদের ঐতিহ্যগত নাচগান এবং কাম্বা সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ‘ওয়াথি’ নাচ (এই নাচে তারা অনেক উচ্চ অবধি লাফালাফি করে)। আমাদের উৎসবে যোগদান করতে অনেক প্রহরীও এসেছিল তাদের স্ত্রী ও প্রেমিকাদের নিয়ে। তারা সবাই যখন জানতে বা বুঝতে পারে যে কি জন্য আমরা এই উৎসব করছি, তখন তারাও মহানন্দে নাচ ও গানে যোগ দেন। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের

উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করি সে-রাত্রে যে আমাদের পশ্চিম আফ্রিকার কালো ভাইবোনেরা সুখে-শান্তিতে থাকুক, তাদের গ্রীবাধি হউক, তারা আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলিকেও স্বাধীন করে তুলতে সাহায্য করুক। পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ কিমানা ওয়াচুকু সৌদীন আমাদের প্রার্থনায় আচার্যের কাজ করেছিল, লন্ডনে সে সময় সেই ছিল সব থেকে প্রাচীন বন্দী। সে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে বহুদিন আগে থেকেই এবং আমরা, যুবকেরা, যেন সাময়িক ক্ষয়-ক্ষতির ভারে নড়ে না পড়ি বা আমাদের মহান আদর্শ থেকে দ্রষ্ট না হই। কিমানা আরও বলে যে, খুব শীঘ্রই তাদের সময়কার লোকেরা দেশের সমস্ত ভার যুবকদের হাতে তুলে দেবে এবং হয়তো তাদের জীবদ্দশায় আর কেনিয়া স্বাধীন হয়ে উঠবে না। তাদের অবর্তমানে কার্ভার তুলে নেবার আগে আমরা যেন নিজেদের যথাসম্ভব শিক্ষিত করে নিতে সচেষ্ট হই, কারণ অশিক্ষিত, অজ্ঞান, বুদ্ধিহীন লোকদের দ্বারা রাষ্ট্রের সুপরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। জোসেফ কিরিররা এবং আমি ঐদিনের স্মরণে একটি গান রচনা করি, তার নাম দিয়েছিলাম আমরা ‘আফ্রিকার গান’ :-

- ১। ভগবান আফ্রিকার কালো লোকদের এই বিরাট স্থলভূমি দিয়েছেন থাকবার জন্য, তাঁর এই দানের জন্যে আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিই।
- ২। সকলে এককণ্ঠে : আমরা সবাই চিরকাল ভগবানকে তাঁর এই দানের জন্য ধন্যবাদ দেব, পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে।
- ৩। অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করার পর আফ্রিকার উত্তরে মিশর দেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং পদানত জীবনের দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচোয়া পায়।
- ৪। সকলে এককণ্ঠে : আবির্দানিয়ার লোকেরাও তাদের উত্তরাক্ষেপে স্বাধীনতার বিদ্রোহ দেখতে পায় এবং বহু দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে নিজেদের পুনর্জীবিত করে তোলে স্বাধীনতার মস্তবাস্তুতে।
- ৫। এখন আমরা ঘানার স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা চিরকালের জন্য সেখান থেকে নেমে এসেছে বলে।

আরও দক্ষিণে চেয়ে দেখ: আমাদের
কালো ভাইদের দিকে দক্ষিণ:
আফ্রিকায়, সেখানে ইউরোপের।
“বোর” সম্প্রদায়ের! লোকেরা, তাদের
উপর অকথ্য অত্যাচার করছে।

সমস্ত আফ্রিকার সব কালো লোকেরা যেদিন একসঙ্গে স্বাধীনতার হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারবে; সেদিনই হবে আমাদের সংগ্রামের শেষ; সেদিন আমরা সবাই মিলে, গড়ব এক বিরাট শক্তিশালী সংস্কৃত আফ্রিকা।

সমগ্র আমরাও অনেক প্রশ্ন তাদের করে-
ছিলাম, যার কোন সদত্তরই তারা দিতে
পারে নি। ফলে আমাদের তরফ থেকে
আমরা তাদের দৃষ্টজনেই বিশ্বাস-
ঘাতকের পর্যায়ে ফেলি।

লড়-ওয়ারে প্রহরীদের ভেতর আমরা
দেব বেশ কয়েকটি বৃন্দ থাকার আমরা
নিয়মমত সংবাদপত্রাদি পেতাম, আর
বন্দিশালার বাইরের জগতের হাল-সমা-
চার পেতাম। নারায়ণা জেলা থেকে
নির্বাচিত সদস্য ওগিংগা ওডিংগা যখন
বিধানসভায় প্রথমবার বলেন যে, জ্যোমো
কেনিয়াটা আমাদের জাতীয় নেতা তখন
আমরা তাঁকে প্রশংসা না করে থাকতে
পারি নি; অবশ্য এ খবরও আমরা
পেয়েছিলাম যে, অন্য কয়েকজন রাজ-
নীতিবিদ সেখানে এই কথা শুনে নাক
সিঁটকেছিলেন। ১৯৬১ সালের মার্চ
মাসে এক বিবৃতিতে কেনিয়াটা লড়-
ওয়ারের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেন :
‘উহুরু না ভুম্বি’ অর্থাৎ ধূলিধূসর
স্বাধীনতা। তাঁর এই বক্তব্যের অনেক
রকম অর্থ অনেকে করেছেন, কিন্তু
‘তিনি’ সাধারণভাবেই বলেছিলেন কথাটা।
লড়ওয়ারে আপাতদৃষ্টিতে মানদ্রের
স্বাধীনতা; কোন বাধা নেই এবং চার-
দিকই সব সময় ধূলিসামান্য। বছরের
কোন কোন সময় সেখানে এতো ধূলার
ঝড় ওঠে যে, সমস্ত জিনিষপত্র, মানদ্র,
সব কিছুই ধূলোয় ঢাকা পড়ে যায়। তার
ওপর আবার সেখানকার প্রখর রৌদ্রতাপ
জীবনকে সত্যই দ্রুতগতি করে তোলে।
রেন গাচাচি এবং আরও একজন বন্দী
তো পাগল হলে গিয়েছিল। লড়ওয়ারের
রোদ আর ধূলো সহ্য করতে না পারে।
সৌভাগ্যক্রমে সময়মতো তাদের সেখান
থেকে সরিয়ে অন্য বন্দিশিবিরে নিয়ে
যাওয়ায় ও রীতিমত চিকিৎসা করানো
তারা আবার সুস্থ ও সুস্থ হয়ে উঠে।

লভঃওয়ায়ে। থাকাকালীন আমরা
স্থানীয়। তুর্কান। উপজাতীয় লোকদের
সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপন করতে
পেরেছিলাম এবং তারা আমাদের মাথার
পরিবর্তে কঠোর খাবার পদব্র্যস্বরূপ
পাওয়া যেতে পারে ঠিক সে কথা আর
ভাবতো না। তারা যে দরবস্তার
জেতর। সেখানে জীবনপাত করতো আ
নেক। আমরা খুবই খারাপ নৈর্গেহ
এবং এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হতে
পেরেছিলাম যে, রেনিয়া সরকারের
উচিত তাদের অস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য
তৎপর হওয়া, যদি তাকে আমাদের
কিছুদূর বা নায়াগা ইত্যাদি জেলার
উন্নতির হ্রদ কমে যায় তা সম্ভব।
আমরা তাদের আমার কয়েকটি কথা
বলতে শিখেছিলাম এবং প্রায়ই তাদের

খাবার-দাবার দিতাম। আমরা শিবির থেকে যে র্যাশন পেতাম তা অনুপাতে ছিল যথেষ্ট, যদিচ তার গুণাগুণের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা যায়। সেই একঘষে ভুট্টার লার্সি (পরিষ্কার) আর কতো খেতে পারে মানুষ দিনের পর দিন, তাই প্রায়ই আমাদের কিছু খাবার উদ্ভুক্ত হতো। শিবিরের পরিচালক সমিতি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কোন বাড়তি খাবারই ফেলা হবে না এবং সুযোগ-সুবিধা মতো তার সবটাই তুর্কানাদের ভেতর বিলিয়ে দেওয়া হবে।

১৯৫৭ সালের ২৫শে অক্টোবর আমরা জানতে পারি যে, লন্ডনের থেকে যাটজন বন্দীকে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কেনিয়া সরকার নাইরোবর কাছে 'আখ-রিভার' নামক শিবিরে বন্দী করবেন। সেখানকার আসল অবস্থা ও পরিচালকদের ব্যবহার সম্পর্কে এর ভেতর অনেক কথাই আমরা জানতে পেরেছিলাম। জেমস ওয়ালটার অনেকবার বলেছিল যে, বন্দীরা সেখানে সত্যি-মিথ্যে যা হোক কতগুলো "স্বীকারোক্তি" দিলেই কেনিয়া সরকার বন্দীজীবনের অনেক দঃখকষ্ট দূর করে দিচ্ছিলেন, কারণ তাঁরাও এতো হাজার হাজার "বন্দী"কে আর পৃথকে চাই-ছিলেন না অনির্দিষ্টকালের জন্য। যাট জনের ভেতর আমার নামও ছিল এবং একদিন ভোরবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সরকারী লরীতে চেপে বসি, যারা পেছনে পড়ে রইল। তাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় সম্ভাষণ করি এবং দক্ষিণমুখে হয়ে প্রথমত কিটালে শহরের দিকে রওনা হয়ে পড়ি। আমরা দেরা পেছনে পড়ে রইল। কিছু হতভাগ্য বন্দী, খুলা, গরম এবং একটি নবনির্মিত হাসপাতাল, আর প্রত্যেকটি পাথর আমরা দু'মাইল দূরের খাদ থেকে ভেঙে মাথায় করে নিয়ে গিয়েছিলাম। [ক্লেশ]

कलिकात्र-५२

ফুয়াশার মধ্যেও বাড়িটাকে চিনতে
 .ধান অসুবিধে হয় নি হানিফের। দূর
 থেকে প্রথমে নজরে পড়তে বৃকের
 ভেতরে ধব্ব করে উঠেছিল। কাছে এসে
 দেখল তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি।
 বাড়ি মুরগি একটি গুডাকয়েক বাচ্চাকে
 সঙ্গে নিয়ে পিটলিতলার সার গাদায়
 কোঁক কোঁক আওয়াজ করে করে মাটি



খোঁটাখুঁটি করছে। মনে হল মুরগিটা
 তার বিলক্ষণ চেনা এবং তারও কোন
 পরিবর্তন হয় নি।

একটু দমে গেল হানিফ। কিন্তু
 আপাতত সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা—
 কাকে ডাকবে এবং কী বলে? ডাকা
 চলে সামাদকেই, এ বাড়িতে পুরন্ব
 মলতে সে-ই। তবে সামাদের নাম ধরে
 ডাকাটা কি ঠিক হবে? কেমন যেন
 শব্দেছে। দলিফের লাগোয়া সদর দরজা

বন্ধ। এক উপায়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
 কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা। একটু-আধটু
 গলা খাঁকারি দেওয়া। সেটুকুরই
 উদ্যোগ-আয়োজন করতে গিয়ে হঠাৎ সে
 ডেকে উঠল, সামাদভাই আছ বাড়িতে?
 আশ্চর্য! ডাকাডাকি সমস্যার এমন
 নিখুঁত সমাধান কোথায় লুকিয়ে ছিল
 তার গলার ভিতরপানে? আরও
 পরিষ্কার গলায় সে ডাকল, সামাদভাই!

—কে?

এ-গলা তার একেবারে চেনা, যেন
 গতকাল পর্যন্ত শুনিয়েছে। তবুও
 হানিফ চেনা লোকের মত চট্-
 পট্ প্রত্যুত্তর দিতে পারল না। মনে
 হল, কিছু বলতে গেলে এ-সময় গলা
 দিয়ে বড়জোড় মুরগিটার অর্থহীন
 কোঁক-কোঁকানির মত বিতর্কিত্রী একটা
 আওয়াজ বেরিয়ে আসবে। ভারি লজ্জার
 ব্যাপার! দরজা খুলে গেল। ফাঁক
 দিয়ে বেরিয়ে এল জয়নাবের মৃদু

সামান্যিক বস্তুমতী

—কে রে? ও বাবা, হানিফ! বিস্ময়ে এবং দারুণ খুশিতে জয়-নাবের স্বর কলকলিয়ে উঠল। এক কদম সে এগিয়ে আসতেই যেন পিছনের কোন থাকায় হানিফ খুবড়ে বসে পড়ল। বসে সালাম করল। মনে হচ্ছে যেন সে এখন শূন্যে ভাসছে। শরীরের ভার বলতে নেই। কিংবা সে বদমাশ গাড়ির কামরায় বা তার কলিন স্ট্রীটের বিড়ির দোকানে বা কলকাতার কোন একটা পাকের ঘাসের ওপরে শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে! কিছ্র যেন বলছে জয়নাব, কানে ঢুকছে না। তবে হ্যাঁ, মাটি থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তার যা মনে হল, জয়নাবের অবয়বে বা আচরণে দারিদ্র্যের চিহ্নমাত্র নেই। সে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

জয়নাব আগ্রত স্বরে বলল, আর বাপ। দাঁড়িয়ে রইল কেন?

হানিফ দেখছিল মদুরগিটা আর তার বাস্তুগলো খুশিতে তুড়ুক তুড়ুক লাফালাফি করছে। কুয়াশা রোধ হয় এবারে কেটে যাবে।

চৌকাঠ ডিঙিতে গিয়ে তার মনে হল বৃকের খুন বদমাশ চলকে পড়ে যাবে। পড়ে গিয়ে পায়ের মাটিকে পিছল করে দেবে। খতম চোখ যায়, বিবর্তী প্রাণী কেউ নেই। অথচ তার বস্তুগলে ধারণা, আকালিমা আছেই আশেপাশে কোথাও-না-কোথাও, একটুও চিড় খেল না। এগ্নে ও উসারা সত্য ঝাঁটানো-পাটানো। দুটো ঘরেরই দরজা খোলা। কুয়াশার জন্যে ভেতরের সর্বত্র আবছা আবছা। হয়তো আকালিমা ওখানেই কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চোখ সে জ্বলতে পারল না।

—কই গো আকালি, আগে দ্যাখ এসে, কে এসেছে। আমাদের হানিফ। জয়নাবের স্বর এক্ষেত্রে নিষাদ প্রসঙ্গ। চোখ তুলে তাকালো হানিফ। চোখ নামিয়ে নিল। এত বড় হয়ে গেছে আকালিমা, এত সুন্দরী! ধীর-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উসারার খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ালো আকালিমা। দৃষ্টি পায়ের কাছে মাটিতে বিছিয়ে রেখে হানিফ মনে করার চেষ্টা করল, দৃশ্যটা যেন পরিচিত, কোথায় যেন দেখেছে কতবার। খুব হালাহালি নয়—গাড়ির কামরায় বা কলিন স্ট্রীটের ভিড়ে জয়জমাত বিড়ির দোকানের চাটে বা কলকাতার কোন ঘেয়ো কুকুরের চামড়ার মত খাপছাড়া ঘাসে-চাক্ষু পাকেরটিকে নয়। অবশ্য এভাবে

তার বৈষ্ণবের মত দাঁড়িয়ে থাকাটা যাক্ষেতাই। একটু হাসার চেষ্টা করে আকালিমার ওপরে দিয়ে চোখের দৃষ্টিকে

ঘুরিয়ে নিয়ে হানিফ জিজ্ঞেস করল, সামাদভাই কোথায়? ঘরে নেই?

মনে পড়ে গেছে! খায়েরের বাগানের এক কোণের সেই ঝাঁকড়া মেওয়া ফলের গাছটা, একটা হাড়িসার তালগাছের বৃকতল 'দু'-এক প্যাঁচ জড়িয়ে ধরে সুমুখপানে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকত। ভারি অশুভ। সামাদ আর আকালিমা দু'জনেই ছিল মেওয়া ফলের ভক্ত। চোত-বোশেখের ঝিম-মারা দু'পুঁরে কতদিন যে গাছটায় চড়েছে মেওয়া ফল পাড়তে। আকালিমা যেরকম সপ্রতিভ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, জবাবটা তারই কাছে আশা করেছিল হানিফ। কিন্তু জয়নাব বলল, সামাদ? তুমি তাকে ইন্সটিশানে দেখতে পাও নি? ইন্সটিশান বাজারেই তো তার দোকান।

দোকান? হানিফ কপাল কুঁচকালো।

—কাপড়ের দোকান! এই তুমি আসবার একটুখানি আগে বেরিয়ে গেছে বাপ। বলি, হ্যাঁ-করে দাঁড়িয়ে রইল কেন? কদ্দিন পরে এল ছেলোটা। বসতে দিবি তো।

জয়নাব তেমনই আছে। তেমনই সহজ স্নেহ-সৌজন্যময়ী। গভীর অস্বস্তিতে নিজের সহজ ভাবটাকে ফিরে পেতে-চাইল হানিফ। আপাতত এটাই বাঞ্ছনীয়।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। এত ব্যস্ত হবার কি আছে! সে বলতে যাচ্ছিল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, যেভাবে সে আগে বলত। কিন্তু পাকা আঁট বছর পরে 'হুচ্'-র বদলে 'হুচ্ছেন' বলাই ঠিক হবে কি না তা ঠিক করতে তার অসুবিধে হল। সামাদ তাহলে একটা কাপড়ের দোকান করেছে! আস-বার সময় স্টেশন রোডের কোনদিকে সে অবশ্য ভাল করে তাকায় নি। এমন কি কোথাও বসে এক কাপ চাও খায় নি। কোন মানে হয় এত দৌড়োদৌড়ি করার! একটু হাসি পেল তার।

—কই না, লক্ষ্য করে দেখি নি তো, অনামনস্কভাবে সে জয়নাবের কথার জবাব দিল।

—হ্যাঁ বাপ, ঐ সামান্য একটুখানি দোকান, ওকেই নেড়েচেড়ে যাচ্ছে। বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে থেকো নি।

আকালিমা একটা চাটাই এনে বিছিয়ে দিয়েছে। খুব আস্ত করে যেন একবার বলল, বোস। ধাঁধার মত লাগল হানিফের। আকালিমা ঠিক বলল কি-কথটা! যেন পাতায়-লাুকোনো একথোকা মেওয়া ফল, নিচ থেকে তাক করে তাক করে গাছের ডালে চড়ে যার আর হৃদিশ পাচ্ছে না। খায়েরের মেওয়া ফলের গাছে এমন কাণ্ড কত-বার ঘটেছে। একটা ভারী নিশ্বাস

ফেলতে ফেলতে সে চাটাই-এ বসে পড়ল।

জয়নাব কুশল প্রশ্নের কিছ্র ব্যক্তি রাখে নি। কোথা থেকে কী যে একটা রোধ চড়ে গেল হানিফের, উত্তরগুলো নির্ভেজাল সত্য করে দিতে পারল না। আকালিমা জয়নাবের নির্দেশে এক গ্লাস সরবৎ করে এনে দিতে সেই রোধেরই জের টেনে বলল, সরবৎ? থাক থাক, আমি তো এইমাত্র চা খেয়ে এসেছি।

কথটা আকালিমা মিসে। তবু জয়নাব বোধ হয় এটাকেই মেনে নিতে যাচ্ছিল। আকালিমা মৃদু খলল।

—চা? চা তো কখন খেয়েছো। এবার সরবৎ খেতে পার।

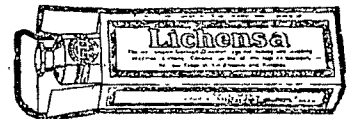
ভারি আশ্চর্য! চা সে খেয়েছে বাড়ি স্টেশনে, অন্তত ঘণ্টা দেড়েক আগে। এটা জানার কথা নয় আকালি-মার। সে চোখ নিচু করে হাত বাড়িয়ে সরবতের গ্লাসটাকে ধরে নিল। আকালিমা কি মনের ভেতরটা দেখতে পায়!

সরবৎ যেন তার গলায় আটকে আটকে যাচ্ছিল। গ্লাস নামিয়ে রেখে একবার সে গলা ঝাড়ল। পকেটে হাত ঢাকালো রুমালের সন্ধানে। কিন্তু হাত বের করতে স্বেধা হল। রুমাল তো বটেই, আরও যেটা অস্বস্তিকর—আসবার সময় চৌপাট করা রুমালে একটু সেন্ট ছড়িয়ে নিয়েছিল। রুমালের ভাঁজে হাতের আঙুল কটা নাড়াচাড়া করতে করতে তার বৃকটা টনটনিয়ে উঠল। শকনো একটু হেসে তাকালো আকালিমান মতের

ব্রণ

দুর্ কবিতা জন্ম

লিভেনসা



● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।

● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1676-R-BEN

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

দিকে। আকলিমা মদুখ নামিয়ে প্লাসটা হাতে করে আস্তে আস্তে উঠে গেল ঘরের দিকে।

সব কিছই তার কাছে অবাক লাগছে। যে মেয়ের অনাহারে শূন্যকিয়ে শূন্যকিয়ে মরে যাওয়ার কথা, কেমন আশ্চর্য! এক রূপসী হয়ে সে বেঁচে আছে! যে জন্মনাবের শূন্যকিনো লাউমাচার মত স্মৃতি-সর্বস্ব সবহারা হয়ে টিকে থাকার কথা বড়জোর, সে এবং তার সংসার দিব্য জীবন্ত, লাভণ্যময়, পরিপাটি হয়ে সকালের কুয়াশাকাটা রোদে ঝলমল করছে! এবং সামাদ একটা কাপড়ের দোকানের মালিক, যে সামাদ বছর আটেক আগে তাকে ভারি একটা গোপন কথা বলেছিল, আল্লার কসম থাইয়ে।

- এই, একটা কাজ করবি?
- কী?
- কাউকে বলবি নি বল?
- না।
- কসম!
- কসম!
- আল্লার কসম!
- আল্লার কসম!
- চালের কারবার করবি?
- চালের কারবার!

—হুঁ। দু'জনে মিলে দু'খোপ করে কোলাঘাটে যাব। চাল আনব।

—ধন্য! তা-ও আবার হয়! পলিশ আছে না! ঘোয় সংশয়ে শঙ্কর হানিফ জবাব দিয়েছিল।

—আছে তো কি হবে? কত লোকে করছে না? বেশ মজবুত ভগ্নীতে বলেছিল সামাদ।

—তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে আমরা পারব কেন? ভারি ঝামেলার কাজ।

—তবে কী করতে পারব বলতে পারিস? কাম্বার মত হিলহিলিয়ে উঠেছিল সামাদের কথা। আবদুস সাত্তার কেরানী সাহেবের ভয়ংকর আদরের দুলাল, কিন্তু পরক্ষণেই দাঁত কড়মড় করে গর্জন

ছেড়েছিল, ঠিক আছে। যা পারিস কর গে তোরা। আমি পালিয়ে যাব, যেদিকে দাঁচো যায়, চলে যাব। আমার আর সহ্য হয় না।

কারই বা সহ্য হয়? অতি দুঃখেরও না। তবে অনেক করে বোঝাতে হয়েছিল সামাদকে। বাপের কথা বলতে হয়েছিল, বংশের কথা বলতে হয়েছিল। বিপদে ধৈর্য ধরার কথা বলতে হয়েছিল। এবং আপনমনে একটা শপথ নিতে হয়েছিল। আবদুস সাত্তারের মহা ঋণ শোধ করার শপথ। শপথমাত্র সেই শপথটাকে পুঁজি করেই তাকে একদিন এ সংসার ছেড়ে দিকলের অগোচরে সরে পড়তে হয়েছিল।

আশ্চর্য! কবে তার বাপ মরল, কবে তার মা মরল, কিছই তার আর মনে নেই। নিজেকে পুরোদস্তুর ছ্যাঁওড় বলেই তার মনে পড়ে। মনে পড়ে, সে তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। লোকের কাছে পরসা চাইত। দাঁত খিঁছনি শুনত। গালাগালি শুনত। পরসা চাইত, খাঁ-খাঁ রোদ নিয়ে গ্রীষ্ম নামত। ঝাম ঝাম শূন্য নিয়ে বর্ষা নামত। পরসা চাইত। যা জড়ত তাতেই গেট ভরিয়ে ইস্টিশানের প্রাটফর্মে শরীর কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়ত। সূর্যোদয়ে সে ছ্যাঁওড়। সূর্যাস্তে সে ছ্যাঁওড়। দিন দুপুরে ছ্যাঁওড়। রাত দুপুরে ছ্যাঁওড়। অনুগ্রহ-প্রার্থী, কিম্বদন্তি, লাজুত, নিগাহীত, জীবনের কোন এক অন্ধকার হিমমন্ডলে নির্বাসিত। ভীত, ক্রিষ্ট, বিষম, একাকী।

প্রাটফর্মেই কনকনে শীতের রাতে সে সাত্তারকে পাকড়াও করেছিল। মাথায় মাফলার, গায়ে চাদর, হাতে বাজারভর্তি ব্যাগ। কেন যে সেটুকুও পরিষ্কার মনে আছে। অভ্যেসমত হাত বাড়িয়েছিল পরসার জন্যে। আপাদমস্তক পরিভ্রুণ মানুসিটি প্রথমে আমল দেয় নি। ঘ্যান্ করত দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল, থাকবি আমাদের বাড়িতে, এ্যা? এক ঝলক উজ্জ্বল যেন কোথা থেকে তাকে জড়িয়ে ধরল। মদুখে কিছই না বলে জানাল থাকবে। কথার কথা নয়। খুশি খুশি মানুসটা হেসে জানতে চাইল, পারবি বইতে এই ব্যাগটা? পরক্ষণেই আবার ভুরু কুঁচকে বলেছিল, না থাক, তোরা দ্বারা হবে না। এমনি চ'। রাস্তায় শূন্যকিয়েছিল, কে আছে তোরা? কেউ নেই! তা থাকবি তো, না পালাবি? আবার একমুঠো উজ্জ্বল। আঁধারে মাথা নাড়ার মানে হয় না। মদুখে বলতে হয়েছিল, হ্যাঁ, থাকব। মনে মনে বলেছিল, আপনারা তাড়িয়ে না দিলে চিরকাল থাকব বাবু।

—থাকিস। আমাদের কাজকাম তেমন একটা নেই। ঘরের ছেলের মত

থাকবি, এটা-সেটা টুকটাকি ফায় ফরমাশ খাটাব, বদখাল? পথের কথা শেব।

ভেবোছিল হিন্দু। বাড়িতে এসে ভুল ভাঙলো। কেন যেন জন্মনাবের কথার একটু আপাত্তর সূর ছিল। সেটা ধোপে টিকল না। সকালে জন্মনাব তাকে ভাল করে লক্ষ্য করে নিয়ে বলল, আহা রে, কার ছ্যাঁওড় বাছর! ঠিক আছে। কি কাজ আর করবি তুই বাপ। ঘরের ছেলের মতন থাকবি। নিজেকে মনে করে যা পারবি করবি। আল্লা মালিক। জন্মনাবের দীর্ঘবাস এখনও যেন কানে বাজে। অগাধ উজ্জ্বল, যার মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণ ঢেকে নিয়েছিল। সে উজ্জ্বল আজও সত্যি হয়ে নেই না কি!

আড়চোখে তাকিয়ে দেখল হানিফ। আকলিমা কাছাকাছি নেই। জন্মনাব ঘরের ভেতর থেকে ঘুরে এসে পিঁড়ে পেতে বসল তার কাছে।

এবারে আর কুশল প্রশ্ন নয়, আশ্ব-কথন। ভূমিকা সুপরিজ্ঞাত। একেই বলে বদখি আল্লার গজব। মানুসটা অফিস থেকে ফিরল। ছেলেকে, মেয়েকে নিয়ে মাতামাতি করল। স্বভাবগত উদারতায় কবুল করল, কচি, তুই ম্যাট্রিক পাশ করলে হানিফকে পড়াব। কীরে ব্যাটা, তুই পড়বি তো? কচি ডাকে পড়াবে। আর কলি? তোরা, তোরা ততদিনে বিয়ে দিয়ে দোব। না কি বল? কি বল কলি? উঃ মাথাটা কেন ঘুরছে বল দিকি? ভাত তৈরি কর। খেয়ে নিই সবর-সবর। শূয়ে পড়ব।

খেয়েদেয়ে শূয়েই পড়ল লোকটা। ঐ যে পড়ল আর উঠল না। ভয়ংকর জন্মের ঘরে আওয়াজ বলতে শূন্য বিকার। তিনদিন পরে সেটুকুও বন্ধ হয়ে যেতে, সব ফুরিয়ে গেল। সেও শীতকাল। সে শীত যেন আর নড়তে চায় না এ সংসার থেকে। ফল ঝরে পড়ল, ফুল ঝরে পড়ল, পাতা ঝরে পড়ল, লতা শূন্যকিয়ে গেল। যেন একটা শূন্যকিনো কাণ্ডসার লাউমাচা। সামাদের বয়স তখন চোন্দ। আকলিমার নয়। বছর না ঘুরতেই সাত্তারের আদরের কলি শূন্যকিয়ে গেল, কচি হয়ে দাঁড়ালো পোড়া কাঠ যেন।

নিজের জীবনে উজ্জ্বল কবে ছেড়ে এসেছে তা আর মনে পড়ে না হানিফের। এদের এখানে সেটুকু ফিরে পোয়েছিল সাকুলো বছর পাঁচকের মত। কনকনে ঠান্ডায় এদের সঙ্গেই ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে কখনও তার আপনা থেকে মনে হয় নি জীবনে উজ্জ্বলদের তার একার আর কোন প্রয়োজন আছে। ক'র জন্যে কার বুক ফাটে, কেন ফাটে, এও সে খতিয়ে দেখতে চায় নি। শেষের দিকে কেবলই মনে হত, কিছই একটা তাঁর করা উচিত। কেন না, তাঁর মত আর কেউ তো

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

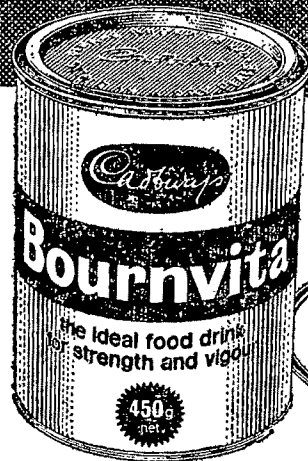
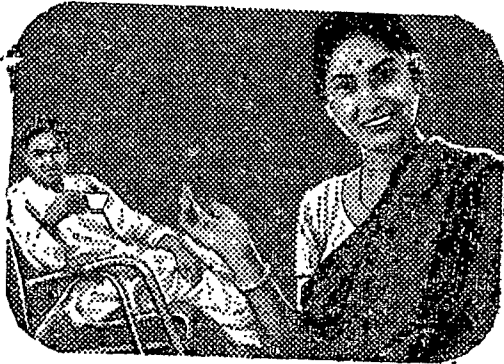
অ ল ও য়া ল্ড
স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার
(জাপান মেক) জন-
প্রিয়। দেশ ব্যাপী
খ্যাতি আছে। ডবল
স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-
ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা
হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7



সেদিন কথায় কথায় অজ্ঞানবাবু মনহিঁসে—

“আজকাল প্রাণ
রাখতেই প্রাণান্ত ।”



Business 102 B-Bos

“সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয়
ওঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দাক্ষন ভিড়, তার ধকলতো
আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ
কর্মকর্ম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। ভাগ্যিস
বোর্নিভিটা ছিল, তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে।
এক কাপ বোর্নিভিটায় সব ক্রান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা
চান্না হয়ে ওঠে, প্রাণের দোষ্টি বলমল করে ওদের চোখে
মুখে। বোর্নিভিটার চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব
ভালে লাগে, বাচ্চাদেদরতো কথাই নেই। শরীর সুস্থ-সবল
রাখতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও স্যামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নিভিটার
তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।”

বোর্নিভিতা। পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। পুষ্টম পানিমাণে কোটকা, গুগু, চিনি ও মণ্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি-
প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ বলে খাঁদের খ্যাতি
একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ
ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ !

শ্রীজবরির বোর্নভিটা খাবেন -
শক্তি, উদ্যম - এবং স্বাদের জন্যে

ধনী নয় এই পরিবারের কাছে। সে ধন শোধ করার দায় তো তার একারই।

জয়নাব বলে চলে, ভুই চলে গেলি বাপ, কাঁচ আমার কত জায়গায় যে তোর তাল্লাস করলে! কী করে ভুলে থাকলি, হ্যাঁ রা। কি পাষণ রে তুই।

তা বটে! হানিফের হাসি পেল জয়নাবের কথার ধরনে। কাঁচ ওরফে সামাদ যে তাকে খুঁজে খুঁজে হুন্ড হুন্ডে গেছে এ কথা অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য। সে আর সামাদ দু'জনে দু'জনের সাথী, সান্তার স্কুলের পড়ুয়া ছেলেকে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিত না। পাড়ার সামাদের কোন সহপাঠী ছিল না, যেহেতু স্কুলে ছেলে পাঠানোর আর কারও মাথা ব্যথা 'ছিল না। লোকে উষ্টে সান্তার উদ্দেশ্যে বলত, রহমত ওস্তাগরের ব্যাটা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে আর আপসে কেরানীর চাকরি করে ধরাকে যেন সরা স্তান করছে। কেউ এমন ট্যারাবাকা টিপ্পনী কাটত, কেউ কেউ সান্তার কেরানীকে একটু সমীহও করত। সান্তার মাথা ঘামাতো না। জয়নাবকে শোনাত, দর্জির ব্যাটা কেরানী হয়েছে, কেরানীর ব্যাটা হাকিম হবে। রং-এর ডিবে হাতে ঝুলিয়ে তো মাচার মাচার ঘুরবে না। সান্তারের বিচারে ছেলের সঙ্গী হিসাবে বাড়ির চাকর বং ঢের ভাল! মাথা বিগড়ে দেবে না অন্তত। সামাদের গর্দলি খেলার সাথী হানিফ, গুলতি নিয়ে পাখি শিকার করার সাথী হানিফ, চোত-বোশেখের বনঝনে দুপুরে মেওয়া ফল পাড়তে যাওয়ার সাথী হানিফ। পুকুরে ঝাঁপাই ঝড়তে ঝড়তে পাড়ের গাবগাছ থেকে হলদবরণ পাকা গাব পাড়ার সাথী হানিফ, ক্রিমকালো থোকা থোকা রাখল-ফল পাড়ার সাথী হানিফ।

সামাদ তাকে ভুলে যাবে বা তার খোঁজ-খবর না করে চপচাপ বসে থাকবে, এ হতেই পারে না। কিন্তু এ বাড়িতে আসা অবধি এখনও সামাদের সঙ্গে দেখা হয় নি। দেখা হয়েছে জয়নাবের সঙ্গে, আকলিমার সঙ্গে। এরা কতখানি মনে বোকা ছিল তাকে, তার পরিমাপ ক্রেশকর মনে হচ্ছে। এতই ক্রেশকর যে, তার এখানে বসে থাকতেও তেমন ভাল লাগছে না। বাঠের গিয়ে একটা বিড়ি খেয়ে এসে হত, কিংবা নিরিবিলিতে শুয়েই একাকী ভেবে দেখলে হত। জয়নাব আপনমনে তার মনোযোগের সন্ধান না করে আত্ম-কথনে গল্প। বেশ খাশি খাশি পরিতৃপ্ত। সন্দেশের অরকশ নেই, আট বছর পরে সে ফিরে আসার ভারি আনন্দিত: কথার পর কথা, অনেক কথা এ সময়ে তার মনে পড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। অথচ মাসিকল, কেন যেন হানিফের এসব একেবারে অসহ্য

লাগছে। উঠে গিয়ে বং মাথাটাকে সাফ করে আসাই ভাল, সে সাব্যস্ত করল।

—তা, বিয়ে সাদী করেইস বাপ? জয়নাব হঠাৎ তার আত্মকথনে মোড় ঘুরিয়ে প্রশ্ন করে।

ওঠা হল না। শরীরের রক্তস্রোত যেন একবার থেমে গেল, কী উদ্দেশ্য জয়নাবের? শব্দমাত্র কৌতূহল, না আর কিছ? খোঁচা-খাওয়া জন্তুর মত মাথা তুলল হানিফ। ঘরের চৌকাঠে ভর রেখে আকলিমা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কী আশ্চর্য, পরিপূর্ণ রূপসী! যা সে এতকাল ভেবে এসেছে তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। মৃদু বেদনায় সে ঘাড় হেঁট করল।

—ছেলেপুলে হয়েছে? কীটা? জয়নাব নিরীহভাবে শুধায়।

এই ভালমানুষির কোন মানে হয়, সে হাত মট্টো করল। জয়নাবের কলকলানি কি কোনমতে বন্ধ করা যায় না।

গেঁড়ি-গুর্গলি সাঁটানো হাসির মত পরিতৃপ্ত ভঙ্গীতে জয়নাব বলল, এই মাসেই কাঁচর বে। বলেই খাপছাড়াভাবে ফেস করে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, ইচ্ছে ছিল, কালির বেঁটাই আগে দোব। দেখছ তো কত ডাগর হয়ে গেছে। কিন্তু কাঁচর বে' না দিলেই নয় কিনা।

আরও অসহ্য হয়ে ওঠে হানিফ। কী বলতে চায় জয়নাব?

—মইনানের গহর কাজীর নাম শুনেন? আর মনে নেই হয় তো। মোড় পুকুরের হাটে বড় মৃদখানার দোকান। খুব মানী পয়সাওয়ালা লোক। নিজে এসে সম্বন্ধ করে গেছে। কাঁচকে ভারি পছন্দ। তোর কাছে লুকিয়ে কি লাভ বাপ। হাজার দরয়েক টাকা নগদ দেবে আর মেয়েকে গা-সাজানো গয়না। দৌখি, তারপর যদি কালির ব্যবস্থাটা করতে পারি। আল্লা মালিক।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল জয়নাব। আপনমনে বলে চলল, এ তো সামান্য কাপড়ের দোকান। আল্লার দোয়ায় চালু আছে, তাই সংসার চলে যাচ্ছে কোনরকমে। ও থেকে কি আর মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায়, না কি বল?

প্রশ্নটা তারই উদ্দেশ্যে। হানিফ একটু চমকে উঠে সাই দিল, তা তো বটেই।

—তমি আপনার লোক, তমি চট করে বয়ে ফেলবে। বারো শরিগর মি খো বলে মেয়েকে ঘরে ফেলে রেখে ভাপাচ্ছে। বলে তো খুব সহজে? কই, কোন শরিগর মি তো ছাতা দিয়ে মাথা রাখার বেলায় নেই! কই তো পালালি, মানে চলে গেলি বাপ—কি মাসিখবত যে নাবল আমার দুধের বাচ্চা দুটোর ওপরে। তাই বলি মালিকাক, কি গণাহ করেছি তোমার দরবারে। তা জামা নান্ন বোসের ভাল করক। চন্দর ছেলে,

তো মানুষ বলতে হয় ওকেই। লেখা-পড়ার এমন গুণ, বুঝলি বাপ? কবে বুঝি একটা ইনিসওর করে রেখে গেছল ওরই হাত দিয়ে। গা-গতর ঘামিয়ে ঘামিয়ে সেই টাকা কাটা বের করে আনতে তবে হিলে দেনেওলার রহমতে হিলে হল। সেই টাকাতেই কাঁচর দোকান, আর সেই দোকানেই আমাদের ভাত-ভিত।

কথা শেষ করে জয়নাব হাঁপাতে থাকে, এবারে জিজ্ঞেস করা উচিত আকলিমার বিয়ের সম্বন্ধ-উস্বন্ধ হয়েছে কিনা। কিন্তু সে জন্যে যে সাহসটুকুর দরকার কিছ, সে তার হৃদয় পেল না। কুয়াশা কেটে গিয়ে প্রায় গোটা এগনেটা টাটকা রোদে ঝলমল করছে। সে দিকেই সে আনমনে তাকিয়ে থাকল। এ বাড়ির কোন কিছতেই সে যেন কোন আগ্রহ বোধ করছে না। অথচ ভোরে হাওড়া স্টেশনে গাড়িতে চেপে বসার সময়, তাই বা কেন, সারা পথটুকুতে, এমন কি এ বাড়ির দলিঙ্গ-গোড়ায় এসে পেঁছনো পর্যন্ত সে ছিল যেন অন্য এক মানুস বা মানুসই নয়, কোন ফেরেস্তা। যেন কিছ, একটা গুরুত্বার বস্তু সে বয়ে নিয়ে এসেছে হাওয়ার উড়ে উড়ে। এ বাড়ির মাটিতে পা রেখেই আবার সে মানুষ হয়ে গেছে। ক্রিষ্ট, বিষয়, উদাসীন, অভাগা।

জয়নাব দু-একটা ঢেকুর তুলল। বোধ হয় এর পর কোন যুগেই প্রসঙ্গ ধুঁজছে। আকলিমা ধীর পদক্ষেপে তাদের সম্মুখ দিয়ে খিড়িকির দিকে বেরিয়ে গেল। হানিফ লক্ষ্য না করে পারল না, আকলিমার চলনে কি সুন্দর একটা ছন্দ এসেছে মনে হয়, যৌবনের কলস এমনই ভরা কানায় যে, প্রতি পদক্ষেপে বুঝি চলকে গড়ে যাবে। এটা কোন কথাই নয় যে, এ বাড়িতে পা দিয়েই সে মানুষ হয়ে গেছে। মানুষই সে ছিল, মানুষই সে আছে। গত আট বছরে অবস্থাটা একই রকমের।

নিজেকে তার বেশ মজবুত লাগল এতক্ষণে। এ বাড়ির জন্য কোন এক উষ্ণ-মন্ডলের খোঁজে সে বেরিয়ে গেছল একদিন সকলের অগোচরে। তারপর কিছ করতে আর বাকি রাখে নি এই আট বছরে। তার নিজের জন্যে যেখানে শব্দ ফাইফরমাস খাটলে বা মোট বইলেই চলত, সেখানে সে ফাইফরমাস খেটেও রাত্রি বিড়ি শিখেছে। বাড়ির কারিগর হলেই তার কুলিয়ে যেত, অথচ তিল তিল করে সঙ্গতি সঞ্চয় করে বাড়ির দোকান ফেঁদেছে। সেই দোকানকে মাথা ঘামিয়ে মাথা ঘামিয়ে শতকের এক কণ দাঁড় করিয়েছে। ফেরেসতার এমনটি পোষায় না। ন্যাকামির পরাকাস্তা, গাঁজাখরি।

এবং এই সম্বাদে, যদিও ঘটনাক্রমে

উদয়া যাচ্ছে এ বাড়িতে ইতিমধ্যে শীত ঋতুর অবসানে বসন্ত এসে গেছে, সে সাহসের সঙ্গে কেনই বা বলবে না, সরাসরি কথাটা পাড়া আপাতত যদিও কঠিন, আকলিমাকে, আপনাদের কলিকে, আমার তিল তিল স্বপ্নে গড়া স্বপ্নাতীত তিলোত্তমাকে আপনারা আমার হাতেই তুলে দিতে পারেন। সামাদ, তুমিও কথাটা ভেবে দ্যাখ—আমার কেউ নেই, কেউ ছিল না, তোমরাই আমার, আমি তোমাদের। ভীষণ ঝড় আমরা একসাথে সরেছি, দারুণ জ্বালায় আমরা একভাবে জ্বলছি। আমি পালিয়ে গিয়ে যা কিছু করেছি তা এই সংসারটারই জন্যে, তুমি ঘরে থেকে যা করেছ, তুমি সংসারের জন্যেই। হ্যাঁ, এটাও তুমি বুঝি দেখতে পার, তোমার দোকান-টার মাসিক আয় কত আমার জানা নেই, আমার দোকানের পাঁচজন কারিগরের মজুরি মিটিয়ে, সবরকম খরচ-খরচা বাদটান দিয়ে মাসিক আয় এখনই শ' পাঁচেক টাকা, যা আরও বাড়বে ভবিষ্যতে, কেন না, আমি বাড়িতে চাই। সুতরাং তুমি, তোমার মা, তোমরা সকলে বিচার করে বল আমি কি আকলিমার অনুপস্থিত? অকলিমা কি আমার কাছে কষ্ট পাবে? যে আকলিমা—

—যাই বল হানিফ, তুমি একটু বদলে গিছিস বাবা! জয়নাবের কথাই শুন যেন তার ভাবনাকে ধাক্কা মেরে রাখা দিল।

—তুমি আগের চেয়ে অনেক গেরাম-ও হয়ে গিছিস। কচির চেয়েও। আমার সেই বোকা বোকা ভাগিন্দারি ভাবটা তাকে যেন পেয়ে বসছে। হানিফ অধৈর্য বোধ করল। জয়নাবের দিকে না তাকিয়ে মাথা হেঁট করে বলল, কচির বিয়ের সম্বন্ধ-টস্বন্ধ হয়েছে না কি?

—কথায় বলে না, বিয়ের গাছ থাকলে চেনা দূর-চারটে পড়েই। ঐ রকমের আর কি। এসেছে তো কত জায়গা খিকেনই। তবে হ্যাঁ, একটা যেন, সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ বলে মনে লাগছে। সামাদের তো এক-রকম মতই হয়ে গেছে ওখেনটায়। ছেলে বি-এ পড়ছে, এবারে পাশ দিবে। বাপের মত হল এখনই হয়ে যাক! ছেলে গরবান্ধী। বলে, পাশ না করলে বে করবে নি।

বেশ গাছিয়ে গাছিয়ে কথাগুলো বলে গেল জয়নাব। শুনতে শুনতে হানিফের মনে হতে লাগল, বক যেন তার যন্ত্রণার 'বান্ধন' করছে—হাওড়া পোলের ওপর দিয়ে ছুটন্ত ট্রাম গাড়ির শব্দের মত। কপালের দুই পাশে, কানের গোড়ায় আগুন ছুটছে। তেমন সহজে নিশ্বাস ফেলতে পারছে না।

—নাস্তাটা স্তা করবে নি হানিফ-ভায়ের জন্যে? আকলিমা জানতে চাইল জয়নাবের কাছে। কখন এসে দাঁড়িয়েছে

এক পাশে আগের মত খুঁটিতে ভর দিয়ে। জয়নাব তার কথায় কান দিল না। নিজের কথার জের টেনে বলল, ঘর-ঘর আমারও পছন্দ। তবে হাজার হলেও শিক্ষিত ছেলে, টাকার খাই একটু হবেই। তাই বলি, কচির বেটা আগে হয়ে যাক, তারপর ইনসাফা—। উপসংহারে জয়নাব এক দফা আবিষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

ভয়ংকর ক্রান্ত দৃষ্টিতে হানিফ একবার তাকালো আকলিমার দিকে। আকলিমা ছোট করে হেসে চোখ নামিয়ে নিল। বলল, বড় ভাই-এর বিয়েতে আসবে তো হানিফ ভাই?

—উ!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে বৈকি! ও কি আমাদের পর গা? আপনার জনই এক-রকম। দ্যাখ না, এখনও কি ভুলতে পেরেছে আমাদেরকে? এ্যান্ডিন পরেও ছুটে এসেছে বেচারী, জয়নাব গদগদ-স্বরে বলল।

কে জানে আকলিমা কি ভাবছে। আবার ওর মুখের দিকে তাকালো হানিফ। তেমন কোন গদগদ ভাব নেই। তবে হাসিটুকুও মিলিয়ে গেছে। কি এখন ভাবছে ও! এমন কিছু কি, যা এই মুহূর্তে সকল কান্না, সকল হতাশাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে কুয়াশা-কাটা রোদ হয়ে তাকে আলোয় আলোয় আলোময় করে তুলবে?

—মা, দাদা বলছিল না, আকলিমা তার মাথার ওপর দিয়ে জয়নাবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর দোকানে একটা লোক রাখবে এবারে?

তার মানে? কী বলতে চায় আকলিমা? সোজা হয়ে বসল হানিফ। ভয়ংকর শব্দ হয়ে।

জয়নাব ভাবিত ভঙ্গীতে বলল, বলছিল তো। তো কী করে এখন।

—না, বলছিলুম কি, একটু থামল আকলিমা, যেন চোখ গিলল। বলল, হানিফ ভাইকেই তো রাখলে পারে। চেনা-জানা লোক, সেটাই ভাল হবে না কি?

উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল হানিফ। এক মুহূর্তেও আর দেরি করা যায় না। একটা কান্না প্রবল বেগে তাকে গ্রাস করবে বলে ছুটে আসছে। যত শক্ত হয়েই দাঁড়াক সে, হয়তো তার রেহাই নেই।

ব্যাপারটা আকস্মিক। জয়নাব খুব অবাক হয়ে গিয়ে বলল, সে কি, উঠে পড়লে কেন বাপ?

আমার গাড়ির সময় হয়ে গেছে, হাতবাড়ির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সে জবাব দিল এবং তরতর করে বাইরে বেরিয়ে এল। আনমনে কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রচণ্ড শক্তিতে সে মাটিতে দু-একবার খেঁচ ফেলল।

বঙ্গমতীর বই মানেই

রাঙলা দেবীর জাতীয় সম্পদ

সদ্য প্রকাশিত! নতুন সংস্করণ।
বেদব্যাস বিবীচিত

মহাভারত

কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সরল গদ্যে
অনুবাদঃ ১ম ১৬ টাকা ২য় ১০ টাকা
৩য় ১০ টাকা ৪র্থ ৮ টাকা ৫ম ৮ টাকা।
বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপা।

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশের

বৃহৎ তন্ত্রসার

১ম খণ্ড পনেরো টাকা

২য় খণ্ড পনেরো টাকা

(বহু চক্র ও যন্ত্রের চিত্র সহ)

স্ববকবচমাল্য

প্রতিটি দেবদেবীর স্তোত্র, মন্ত্র
ও কবচের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
পৃষ্ঠা ৯৩৯ ॥ আট টাকা

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা মূল, ব্যাখ্যা
ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত ॥ দুই টাকা
গীতা গ্রন্থাবলী পঞ্চবিংশতি
গীতার সমাহার। মূল সংস্কৃত ও
সরল বঙ্গানুবাদ। পাঁচ টাকা
ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা
যোগেশ্বর / পাঁচ টাকা
পবন-বিজয়-স্বরোদয় / তিন টাকা
শ্রীশ্রীগুরু শাস্ত্র / তিন টাকা
হঠযোগ প্রদীপিকা / তিন টাকা
পদুমচরণ রসোদয় / তিন টাকা
যোগী যাজ্ঞবল্ক্য / দুই টাকা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত / আট টাকা
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ / ছয় টাকা
শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত / ছয় টাকা
দোঁহাবলী / তিন টাকা

মহার্কি কালিদাসের গ্রন্থাবলী
১ম ৬ টাকা ২য় ৬ টাকা ৩য় ৮ টাকা
বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থাবলী/পাঁচ টাকা
ক্যাটালগের জন্য লিখুন। মফস্বল ও
অন্যান্য সহরের পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য
কমিশন শতকরা পনের টাকা

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ

১৬৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

ভবিষ্যৎ

লেনিন, রুশ মহাবিপ্লব ও বাংলা
সংবাদ-সাহিত্য—অবিনাশ দাশগুপ্ত। ক্যাল-
কাটা বুক হাউস। মূল্যঃ চার টাকা।

লেনিন শতবার্ষিকী বছরে বাঙালী
পাঠকদের হাতে বর্তমান গ্রন্থটি তুলে
দেবার জন্য লেখক অবিনাশ দাশগুপ্তকে
ধন্যবাদ। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে রুশ-বিপ্লবের
সাফল্য পূর্ণবীজোড়া চাম্পল্যেব সৃষ্টি
করেছিল এবং ভারতবর্ষে, বিশেষ করে
বাংলাদেশেও সেই চাম্পল্যেব কম্পন রীতি-
মত অনুভূত হয়েছিল। রুশ-বিপ্লবের নায়ক
হিসাবেই লেনিনের নাম প্রথমে বাংলাদেশে
পরিচিতি লাভ করে, যদিও ইংরাজ সরকার
লেনিন ও রুশ বিপ্লবের সম্পর্কে কোন
সত্য সংবাদ যাতে আমাদের দেশে প্রচারিত
না হতে পারে; তার জন্য চেষ্টা করত
করেন নি। শব্দে ব্রিটিশ সরকারই নয়; পুঁজি-
বাদী দেশগুলিতে লেনিন সম্পর্কে অপ-
প্রচারের অন্ত ছিল না। তাঁকে রক্তলোভী
দানব, শয়তান, ঘাতক, দস্যু, তস্কর এমন
কোন বিশেষণ নেই; যা বলে অভিহিত
করা হয় নি। দিনের পর দিন, লেনিন ও
সোভিয়েট, রুগ্নায়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার
করা হয়েছে। লেনিন জার্মান স্পাই, বল-
শেভিকরা ডাকাত, সে দেশে ধর্ম লঙ্ঘিত;
সমাজে ঘোঁন দৈরাজ্য চলেছে, এমন কোন
অপপ্রচার নেই; যা করা হয় নি। লেনিনের
মৃত্যু সংবাদ নিয়েও অনেক গল্পের ছড়ানো
হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে লেখক বাংলা সংবাদ-
সাহিত্যে রুশ মহাবিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে
যে সব সংবাদ ও রচনাদি প্রকাশিত হয়েছে;
তার একটি বর্ণনামূলক ক্যাটাগরি তৈরি
করার প্রয়াস পেয়েছেন এবং তাঁর এই
প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অনুরূপ
একটি প্রয়াস সর্বভারতীয় পারসরে
করেছেন পুরগাঁদ ঘোষী, গৌতম চট্টো-
পাধ্যায় ও দেবেন্দ্র কৌশিক। তিনজনে
মিলে, তবে সদ্যপ্রকাশিত ইংরাজীভারতীয়
গ্রন্থটি এখনো হাতে পাবার সুযোগ হয়
নি। পুরাতন বঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা

থেকে তথ্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য।
ব্যাপার এবং অবিনাশবাবুকে ধন্যবাদ,
তিনি সাফল্যের সঙ্গেই একক প্রচেষ্টায় তা
সম্ভবপর করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থটি পাঠ
করে পাঠক-পাঠিকার যে অনুভূতিটি
সর্বপ্রথম উদ্ভূত হবে, তা হচ্ছে এই যে,
বাংলা সংবাদপত্রসমূহ কোনদিনই রুশ
মহাবিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী
অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয় নি। বিদেশের
প্রেস ও সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান-
সমূহ সংবাদের নামে অজ্ঞান গৃহব ও
মিথ্যা গালগল্প প্রচার করেছে, কিন্তু
বাংলা দেশের পত্র-পত্রিকাগুলি প্রথম চোটেই
তাঁদের মতলব বুঝে ফেলতে সমর্থ হয়।

বাংলা পত্র-পত্রিকায় লেনিনচর্চার প্রকৃত
সূত্রপাত ১৯২১ সাল থেকে। রুশ বিপ্লবের
সাফল্যের মাত্র অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই
দৈনিক বসুমতীতে এ সম্পর্কে বহু
গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হয়। তারপর
থেকে বাংলা পত্র-পত্রিকাসমূহ দীর্ঘকাল
ধরে লেনিন ও রুশ বিপ্লবের সমর্থনে নানা
ধরনের রচনা প্রকাশ করেছে। বাংলা পত্র-
পত্রিকাসমূহ লেনিন ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে
কি ধরনের সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রচার করে-
ছিল, এই প্রশ্নটিই লেখককে বর্তমান গ্রন্থে
উল্লিখিত তথ্যাদি সংগ্রহে আগ্রহী করেছে।
ভূমিকায় লেখক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়
বিস্তৃত উল্লেখ করেছেন। যোগ্যলিতে রুশ
বিপ্লব ও লেনিন সম্পর্কে সহানুভূতিশীল
বক্তা রাখা হয়েছিল। এই তালিকায়
তিনি শব্দে বাংলা পত্র-পত্রিকাগুলিরই
উল্লেখ করেন নি, ইংরাজী, আর্য্যী এবং
হিন্দী পত্র-পত্রিকার কথাও উল্লিখিত
হয়েছে। বাংলা হিতবাদী, আত্মশক্তি,
দৈনিক বাংলা প্রভৃতি পত্রিকা থেকে
তিনি অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন
যে, সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া
দুরূহ থাক, তারা নির্ভর্যে সত্যকে প্রকাশ
করতে সক্ষম হয়ে নি। যেমন ২রা জুন,
১৯২২-এ হিতবাদী লিখেছিলেন, "বল-
শেভিক বিপ্লবে আতঙ্কগ্রস্ত ইংল্যান্ড

মিথ্যা প্রচারে নেমেছে, ভারতে বলশেভিক-
দের চিহ্নিত করেছে নরদানবরূপে; কিন্তু
রাশিয়া সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেই মনে-
প্রাণে খুঁশি যে, এতদিনে স্বেচ্ছাচারী
শাসনের অবসান হল।"

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিষয়ভিত্তিক-
ভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বক্তব্য-
গুলিকে সাজানো হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে
স্থান পেয়েছে লেনিন-জীবনী, যেখানে
সংসঙ্গী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত
লেনিন-জীবনের অংশবিশেষ, ফণিভূষণ
ঘোষের লেনিন নাম পুস্তিকার অংশ-
বিশেষ, এ ছাড়া বিজলী, শব্দ, আত্মশক্তি,
আনন্দবাজার, সংহতি, প্রবাসী, গণবাণী,
লাঙল, দেশ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত
রচনাসমূহের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম 'চিরন্তন প্রতিভুলনা'।
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শব্দে লেনিনের জীবনী
বা কীর্তিকলাপের কথাই প্রকাশ করেন
নি, জীবনীমূলক রচনায় লেনিনের
লেনিনের চিরন্তন বিশেষণেরও চেষ্টা হয়েছে-
এবং তাঁর সঙ্গে অপরাপর নেতাদের তুলনা
করেছে এবং সেগুলির অংশবিশেষ লেখক
উদ্ধৃত করেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে লেনিনের
রাজনৈতিক মতবাদ ও জীবনাদর্শ স্থান
পেয়েছে। সে যুগের বাংলা পত্র-পত্রিকায়
লেনিনের রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্তৃত কোন রচনার
সন্ধান পাওয়া যায় না, যা দৃষ্টিচ্যুত।
পাওয়া গেছে, লেখক সেগুলির অংশ-
বিশেষ উদ্ধৃত করেছেন। পঞ্চম অধ্যায়ের
শিরোনাম 'উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে লেনিনের
মৃত্যুর পর রাশিয়ায় স্ট্যালিন ও ট্রটস্কির
মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলল, সে বিষয়ে
বাংলা পত্র-পত্রিকায় বহু মন্তব্য প্রকাশিত
হয়েছে; লেখক যোগ্যলিকে প্রয়োজনীয় অংশ
সংকলন করেছেন। শব্দে রাজনৈতিক
সংবাদ বা প্রবন্ধই নয়, লেনিন সম্পর্কে
বাংলা পত্র-পত্রিকায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য
কবিতাও প্রকাশিত হয়েছিল, যোগ্যলি যষ্ঠ
অধ্যায়ে সংকলিত হয়েছে। অরুণ পত্রিকায়
১৩৪৯ সনের বৈশাখ সংখ্যায় একটি
অনুবাদ-নাটিকা প্রকাশিত হয়েছিল, যার
অংশবিশেষ পঞ্চম অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে।
অষ্টম অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে
লেনিনের অসংস্থতা ও মৃত্যুসংবাদ স্থান
পেয়েছে। লেনিনের অসংস্থতা ও মৃত্যু-
বিষয়ক সংবাদাদি বাংলা পত্র-পত্রিকায়
সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হয়েছে। এ বিষয়-
লেখক সবচেয়ে বেশি তথ্য সংগ্রহ করেছেন-
আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে। এ ছাড়া
আত্মশক্তি, বিজলী, হংগামতর, শব্দ, অরুণ;
বাঙলার কথা প্রভৃতি পত্রিকা থেকেও
লেখক উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই আটটি
অধ্যায় ছাড়া দুটি পরিশিষ্ট আছে। একটির
নাম 'রুশ মহাবিপ্লব ও সাম্রাজ্যিক আতঙ্ক-
শক্তি'। লেনিন ও রুশ বিপ্লবকে বাংলাদেশে

জনপ্রিয় করার জন্য এই পত্রিকাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয় পরিশোধের বিষয় হচ্ছে 'লেনিন সম্পর্কে' প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থপঞ্জী।

তবে, বর্তমান গ্রন্থটির কয়েকটি অভাবের দিকও আছে। প্রথমত, লেখক উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলি ছাড়াও লেনিন ও রুশ বিপ্লব আরও কোন কোন পত্রিকায় উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে, অবশ্য এ জাতীয় 'ওমিশন' থাকবেই। দ্বিতীয় দ্রুটি, লেখক কোন সন্নিদর্শিত কালানুক্রম অনুসরণ করেন নি, ঠিক কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত পত্র-পত্রিকা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন সেটা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন ছিল, কেন না গ্রন্থটির যা নাম তাতে ১৯৭০ সাল পর্যন্তই বোঝায়। তৃতীয়ত, একটি নিবন্ধের প্রয়োজন ছিল এই জাতীয় গ্রন্থের জন্য, হয় লেখক সৈদিকে উদাসীন, অথবা প্রকাশক। বাংলা-দেশের প্রকাশকেরা সচরাচর যা হয়ে থাকেন, চার-পাঁচটি বেশি পৃষ্ঠার দায় বহন করতে অনিচ্ছুক হয়েছেন। 'রাশিআ' বানানটি অতিশয় দৃষ্টিকটু। ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই রচনার বিষয়বস্তুর উপযোগী হয় নি। আশা করি, পরবর্তী সংস্করণে লেখক এই সকল বিষয়ে আর একটু সচেতন হবেন।

—ডঃ নরেন ডাট্টাচার্য

রবীন্দ্র-স্মৃতি বিজিমা : শ্রীপ্রদ্যোত সেনগুপ্ত : আলফা পাবলিশিং কনসার্ন, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১। মূল্য : ৭ টাকা।

লেখক রবীন্দ্রনাথের মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, কল্পনা, খেয়া, শ্যামলী, আকাশপ্রদীপ, আরোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির এবং নৌকাডুবি উপন্যাসটি সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন—“রবীন্দ্রনাথের এই সব গ্রন্থ সম্পর্কে যে সব সত্য মৌলিকভাবে স্বীকৃত এবং কবির যেসব নিজস্ব উক্তি এবং পত্রাবলী এই সব সত্যের অনুকূল, তাদেরই তিনি নিষ্ঠাভরে তাঁর বইতে আহরণ করে দিয়েছেন। সাধারণভাবে যারা আলোচিত গ্রন্থগুলির বিষয়ে একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে চান, প্রদ্যোতের বইটি থেকে তাঁরা উপকৃত হবেন। প্রধানভাবে বইখানি ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ সহায়ক হবে মনে হয়।”

কড়ি ও কোমলের পার্থক্য স্তর থেকে মানসীর আধ্যাত্মিক স্তরে উত্তরণের সম্পর্কে লেখকের সমীক্ষা

প্রশংসনীয়। সোনার তরী - সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তিনি দেখিয়েছেন সে কাব্যটি রচনার যুগে প্রকৃতি এবং মানবজীবনের নিবিড় সামিধ্য কবিকে কেমন করে এক সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছিল। চিত্রা কাব্যের জীবনসেবতা শীর্ষক কবিতাগুলির মূল্যায়ন এবং কল্পনায় কবির সৌন্দর্য চেতনার সম্পর্কিত বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। লেখক বলেছেন 'খেয়া' কাব্যের দৃষ্টান্তে অবিমিশ্র দৃষ্টির গান নয়, এই দৃষ্টান্ত আনন্দময় এবং পুরাতন জীবন থেকে বিদায় গ্রহণ করে কবির নব-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠা হবার আভাস এ কাব্যে সূচিত হয়েছে। কবির শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলির সমালোচনায় যে আন্তরিকতার ভাবটি রয়েছে তা আমাদের ভাল লেগেছে। নৌকাডুবির সম্পর্কে লেখকের বক্তব্যের ভিতর দিয়ে তার ইতিহাস সচেতন মনের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

স্বপ্নদীপ : নীরদবরণ। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পাঁড়েরী, পৃঃ ১৮। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীঅরবিন্দ পাঠশালার, ১৫, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা। মূল্য : চার টাকা।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা নীরদবরণ কেবল কবিই নন, তিনি যোগীও। সাধারণত মনোময় পুরুষের ধৃতি-বৃদ্ধির আলোকে কাব্য রচিত হয়। কিন্তু মানুষের পরমবৃদ্ধি মন নয়, শেষ ধাপও নয়। মনের ওপরে আছে অন্য সমর্থ চেতনার স্তরাবলী। মানুষ সেখানে পৌঁছতে পারে, বসবাস করতে পারে, তাদের নামিয়ে আনতে পারে এই মর্ত্য জীবনাধারে। তাদের স্বরূপেই একে গড়ে তুলতে পারে। এই স্তরাবলীর শীর্ষে যা তাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেন স্বর্গাচল বা অতিমানস। এই জ্যোতির্ময়ী পরাশক্তির দিকেই স্মৃতি-প্রবাহ চলেছে। কবি নীরদবরণ এই পথেরই পথিক।

এ জনাই শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের কবির যে কাব্য রচনা করেছেন, মনে হয়, এ এক নতুন ধরনের কাব্যের নবদিক্‌শের ইসারা। এই পুস্তকের ভূমিকায় কবি লিখেছেন : “তখন আশ্রমের শিক্ষণ্য.....খ্যাত ও অখ্যাতনামা অনেকে যোগের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্যের, গানের, শিল্পের আরাধনায় তৎপর।” তাই যোগ সাধনার ফসল বলে এই সকল কবিতা কেবল মানস কুসুম নয়, অতি মানস কুসুম। এদের বাকধারাও পৃথক। সৃষ্টিকরণের মতই এই সকল কাব্য অপেক্ষা অন্তর্ভুক্তি, সত্যের চার-তম শিবতম প্রভায় সমৃদ্ধ।

এজন্য প্রথম পাঠে দর্বোধ্য ও অস্পষ্ট

বলে প্রাতিভাত হলেও যে বাঞ্ছনাময় চিত্র-কল্পের সাহায্যে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতির আলোকে কবি প্রতিটি কবিতার বক্তব্যকে পরিষ্কৃত করে তুলেছেন, তা বার বার আবৃত্তিতে পাঠকের চিত্তকে দেলা দেয়, মনে আনন্দ সঞ্চার করে।

শ্রীঅরবিন্দ এ সকল কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, “নীরদের কবিতা আসছে স্বপ্ন-চেতনা থেকে—আমি তাকে সূর-রিয়ালিস্ট নাম দিয়েছি.....। স্বপ্ন কবিতা সাধারণত ছবি, ভাবদৃষ্টি, প্রতীকে ঠাসাঠাসি, কেন না তাদের লক্ষ্য হল এমন এক গভীর সত্যকে প্রকাশ করা, যা সাধারণ ভাষায় পক্ষে সম্ভব নয়। এতে পারস্পর্য, লজ্জা, পারিকল্পনা আছে। কিন্তু ধৃতি-বৃদ্ধির কঠোর নিয়মসম্মত নয় বলে মন সন্তুষ্ট হয় না। বুদ্ধিগত ব্যাখ্যায় অর্থ খর্ব হয়। অর্থ হল দেখার ও অনুভবের জিনিস, মননের নয়। চিন্তাপ্রসূত যে ব্যাখ্যা, তাতে একটা হৃদয় ও মানসিক যৌক্তিকতার ভান থাকে। কিন্তু গভীর অর্থ ও সংগীত ভিতরের অন্তর্ভুক্তি-সাপেক্ষ।”

প্রত্যক্ষ বাস্তবের পেছনে যে গভীরতর সত্য রয়েছে, তারই সন্ধান দেয় এই সকল কবিতা। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গ্রন্থ অভিনব। কাব্যমোদীরা এই কাব্য পাঠে তা বিশেষ রসাস্বাদন করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েকটি কবিতা হীরার টুকরার মত কঠিন, কিন্তু তাদের দীপ্ত ও আলোকচ্ছটা চিত্তহরণ করে।

—স-র-ত

চলার পথে (বিশেষ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭০)। সম্পাদিকা কমলা মথোপাধ্যায়। ১৪৪, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। দাম এক টাকা পঞ্চাশ পঃ।

পত্রিকাটির এই বিশেষ সংখ্যায় কয়েকটি রচনা তথ্যসমৃদ্ধ। মাদাম কামার কথা লিখেছেন মঞ্জুলা সেন। মাদাম কুরীর অপ্রকাশিত ডায়েরীর অনুবাদ করেছেন বেলা দত্তগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ ও আদিবাসী মেয়েরা (মুন্ডি মিত্র) লেনিনের দেশের মেয়েরা (অরুণা হালদার) পূর্ব পাকিস্তানের মেয়েরা (জাহানারা বেগম) প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য। ‘পর্বতারোহণে ভারতীয় মেয়েদের ভূমিকা’ (ভক্তি বিশ্বাস) একটি মূল্যবান রচনা। লেখিকাগোষ্ঠীতে আরো আছেন পারুল ঘোষ, উমা দেবী, মালবিকা চট্টোপাধ্যায়, গীতা মহাশয়ী, ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার, মৃদুলাকুমারী চৌহান, বীণা গুহ, গাগণী রায়, অঞ্জলি রায়, উমা সেহানবীশ, রাণী দাশগুপ্তা ও বেলা সাহিত্যী।



জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৮ বিকেলে গ্যায়টের গার্ডন হাউস দেখতে গেলাম। তারপর গেলাম গ্যায়টে এবং শিলারের বোরিয়াল প্লেস দেখতে—কফিন দুটি একটি ঘরে পাশাপাশি রাখা হয়েছে—জার্মানীতে দেখলাম ঘরের ওপরেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের কফিন সাজানো থাকে—অবশ্য সাধারণ লোকদের কফিন মাটির তলাতেই রাখা হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারী গ্যায়টে হাউসে গেলাম—কালীহিলের, স্যার ওয়াল্টার স্কট এবং লর্ড বায়ারগের স্বহস্তে গ্যায়টকে লেখা চিঠি দেখলাম। তাছাড়া গ্যায়টের বহু কাব্য-নাটকের পাণ্ডুলিপি অংশও এখানে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

গ্যায়টের বেডরুমে তাঁর শেষ শয্যা এখনও অতি সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লর্ড বায়ারগ এবং নেপোলিয়নের দুটি অতি সুন্দর ছবি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আছে। তাছাড়া গ্যায়টের নিজের আঁকা বহু ছবিও এই বাড়িতে দেখলাম।

ভাইমারে একদিন সকালে রোলান্ড বিয়ার এসে হাজির হল। এই যুবকটির সঙ্গে কয়েকদিন আগে বার্লনে ব্রেস্ট-ডায়লগের সময় আলাপ হয়েছিল ‘মান ইস্ট মান’ নাটকটি দেখতে গিয়ে। প্রথম বিরতির সময় থিয়েটারের রেস্টোরাঁতে খাবার খাচ্ছি—আমার হাতে বিয়ারের গ্লাস। হঠাৎ ছোটখাট চেহারার একটি যুবক এসে আমাকে ইংরাজীতে প্রশ্ন করলো—আপনার নাম কি মিস্টার অশোক সেন?

বললাম—হ্যাঁ।

সে নিজের পরিচয় দিল—নাম রোলান্ড বিয়ার, হেসে বললো—আমার নাম মনে রাখতে আপনার কষ্ট হবে না—আপনার হাতের পানীয়ের সঙ্গে আমার নামের মিল রয়েছে।

রোলান্ড বিয়ার জেনাতে ক্রাইডারশ শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করে—সংস্কৃত নাটক এবং ব্রেস্টের নাটকের উপর তুলনা-মূলক আলোচনা করে থিসিস লিখে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য। আমার নাম এবং পরিচয় পেয়েছে কাগজে—বাক্য শুনছে ব্রেস্ট-ডায়লগে। বিয়ার জেনা বিশ্ববিদ্যালয়

থেকে ব্রেস্ট-ডায়লগে যোগ দিতে এসেছে। যদি আমার অসুবিধা না হয়, তাহলে আমার সঙ্গে তার ডক্টরেটের থিসিস সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চায়। সেদিন রাতে থিয়েটারের পর সে আমার সঙ্গে আমার হোটেল এসেছিল এবং অনেকক্ষণ গল্প করে গেল। পরের দিন সকালে ব্রেস্ট-ডায়লগ ডায়লগের পর বিয়ার আমাকে বার্লিনের আসেম্বলের কাছে একটি রেস্টোরাঁতে খেতে নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে বললে, আপনার ভাল লাগবে এমন খাবার সার্ভ করতে বলছি। খাবার এলে দেখলাম মাংসের ঝোল ও ভাত—নাম হ্যাগেলরিয়ান গুলাস ও রাইস। বহুদিন বাদে ভাতটা সত্যিই খুব মধুরোচক লেগেছিল। এর পরদিন সকালে বিয়ার এসে জানালো—আজ কিছুক্ষণ বসে সে চলে যাবে জেনাতে—তার কর্মস্থল থেকে তাগিদ এসেছে ফিরে যাবার জন্য। আমি স্বখন ভাইমারে যাব, তখন যেন তাকে চিঠি দিই—চিঠি পেলেই সে জেনা থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। ও-দুটি জায়গার ভেতর তেমন দূরত্ব নেই।

বিয়ারের সঙ্গে আলাপের সময় বলেছিলাম যে, ব্রেস্ট নতুন ফর্মের ইউরোপীয়ান ড্রামার স্রষ্টা। কিন্তু এই ফর্মের নাটকের সঙ্গে আমাদের বাংলাদেশের যাত্রার অনেক মিল দেখা যায়। যাত্রা হচ্ছে বাংলাদেশের নিজস্ব জিনিস—প্রায় সাতো ছ’শো বছর ধরে যাত্রা বাংলাদেশে প্রচলিত। পিকচার ড্রামা স্টেজটা আমরা ব্রিটিশদের থেকে ধার করেছি। ব্রেস্ট-ড্রামার মতন যাত্রাতেও ন্যারেটিভ ফর্মের প্রাধান্য। যাত্রার অডিটোরিয়ামের সঙ্গে বর্তমান ইউরোপের থিয়েটার ইন দি রাউন্ড এবং ‘এরিনা থিয়েটারের’ যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যাত্রাভিনয়ে দর্শকদের মনে কোন সম্মোহন সৃষ্টির প্রয়াস করা হয় না।

সাধারণত পৌরাণিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই যাত্রার নাটকের দিকটা রচিত হোত। নীতিগত শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, নানা ধরনের আদর্শের প্রচার—এই সব উদ্দেশ্য নিয়েই যাত্রার প্রচলন হয়েছিল। সমাজের সব শ্রেণীর লোকেরাই যাত্রা দেখে আনন্দ উপভোগ করতো। বিদেশীদের কাছ থেকে ধার করা থিয়েটারকে আমাদের দেশের কৃষক, মজদুর, শ্রমিক শ্রেণীর

লোকেরা নানা কারণে কখনও গ্রহণ করতে পারে নি। প্রথমত থিয়েটারের দর্শনী দেবার মত পয়সা দেবার সামর্থ্য তাদের ছিল না এবং নেই—বিশ্বায়িত থিয়েটারে যে একটা সফিস্টিকেশনের চাকচিক্য আছে সেহনতী মানুষ তার থেকে দূরে সরে থাকতে চায়। তৃতীয়ত, ব্রিটিশ আমলে আমাদের দেশের শতকরা ৫/৬ জন লোককে শিক্ষিত বলা হোত—বাকী লোকদের পক্ষে থিয়েটারের তুলনায় যাত্রাকে অনেক সহজবোধ্য বলে মনে হোত।

যাত্রায় একটা ব্যাপারে কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি ছিল। কোনরকম দৃশ্য-সজ্জার ব্যবহার হোত না। সেটসিনের ব্যাপারে সবটাই দর্শক এবং শ্রোতাদের ভেবে নিতে হোত। এর ফলে তাদের কম্পনাশক্তির ওপর একটু বেশি চাপ পড়তো বলেই আমার মনে হয়। এদিক থেকে তুলনা করলে ব্রেস্ট-থিয়েটার উন্নত ভঙ্গীর প্রয়োগরীতির প্রবর্তন করবার কৃতিত্ব দাবি করতে পারে।

ব্রেস্টিয়ান প্রডাকশনে দৃশ্যসজ্জার বাহুল্যে নাটকের গতি ব্যাহত হয় না—আবার যাত্রার মত দৃশ্যসজ্জাহীন রং-ভূমিতে অভিনয় করে দর্শকের কম্পনা-শক্তিকে পীড়িত করার দরকার করে না। ব্রেস্টের প্রয়োগপদ্ধতি হল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের—সাম্প্রতিক এবং রিয়ালিস্টিক এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নাটকের এক অভিনব ভঙ্গীর প্রকাশরীতি। ফলে দর্শক বৃদ্ধি এবং অন্তরকক সজাগ রেখে ধীরে ধীরে নাটকের প্রস্ফুটন সজাগ মনে এবং বিচারকের সচিব্যেতে দেখতে পারে।

সেদিন কিছু বাদেই বিয়ারকে তার কর্মস্থলে চলে যেতে হয়েছিল। ভাইমারে গিয়ে হঠাৎ তার কথা মনে হোল। আমার দোভাষী মিসেস মায়ারামকে অনুরোধ করলাম জাইডারশ শিলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোন করে রোলান্ড বিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ফোনে তাকে না পাওয়াতে মেসেজ দিয়ে আমার ফোন নাম্বার রেখে দেওয়া হল। ঘণ্টাখানেক বাদেই বিয়ারের ফোন পেলাম—ঠিক হল, পরের দিন সকালে সে ভাইমারে আসবে এবং বেলা তিনটে নাগাদ জেনাতে ফিরে যাবে।

পরিদর্শন যথাসময়ে এসে বিয়ার আমাকে শিলারের বাড়ি, গ্যায়টের বাগানবাড়ি প্রভৃতি দেখিয়ে আনলো—তার সঙ্গে সময়টা ভারি ভাল কেটেছিল। যাবার আগে বিয়ার তার থিসিসের অংশবিশেষের ইংরাজী অনবাদের টাইপ করা একটি কপি আমাকে দিয়ে গেল। সেদিন রাতে তার এই প্রবন্ধটি পড়ে মনোহর হয়ে গিয়েছিলাম। এই লেখাটির কিছু অংশ এখানে অনবাদ সহ তুলে দিচ্ছি:

সাপ্তাহিক বসুমতী

“একশো সত্তর বছর আগে ইংরাজ প্রাচ্যভাষাবিদ উইলিয়াম জোনস মহাকাব্য কালিদাসের বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় ঘটিয়ে দেন।

[এম্. উইনটারনিটজ্ তাঁর ‘ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস’ বইতে যেভাবে উইলিয়াম জোনসের পরিচয় দিয়েছেন, তা এখানে তুলে দেওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—লেখক। William Jones (born 1746, died 1794) went to India in the year 1783 in order to take up the post of Chief Justice at Fort William... In the year 1789 he published his English translation of the celebrated drama ‘Sakuntala’ by Kalidasa. This English translation was translated into German in the year 1791 by George Forster, and awakened in the highest degree the enthusiasm of men like Herder and Goethe.]

“তারপর থেকেই ইউরোপীয়ান সায়েন্টিস্টের দল (জার্মানরা শিল্পের ক্ষেত্রের রিসার্চারদেরও সায়েন্টিস্ট নামেই সম্বোধন করেন!), অনুবাদকেরা এবং থিয়েটার বিশেষজ্ঞরা ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছেন

দর্শকদের কাছে শকুন্তলার এবং অন্যান্য সংস্কৃত নাটকের মাহাত্ম্য তুলে ধরতে এবং সুদৃষ্টভাবে এগুলিকে মণ্ডন করতে।

ভাষাতত্ত্ববিদ এবং অনুবাদকদের আপ্রাণ চেষ্টায় সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছু অনুবাদ বেশ ভালই হয়েছে বলতে হবে—কিন্তু মণ্ডনপায়ণের বেলায় উল্টো ফল দেখা গেছে—ইউরোপীয়ান থিয়েটারে সংস্কৃত নাটক সাফল্যজনকভাবে প্রডিউসড হতে পারে নি।

এর কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, আমাদের ইউরোপীয়ান থিয়েটারের ট্র্যাডিশন এবং অভিনয়-পদ্ধতি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল তার মাধ্যমে সংস্কৃত নাটকের স্পেশিয়ালিটি অফ দি পোয়েটিক্ স্ট্রাকচার ফুটিয়ে তোলা ছিল অসম্ভব।

পূরনো ভারতীয় নাট্যশিল্প এক বিশেষ ভঙ্গীর রচনা, বিশেষ ধরনের কাব্যিক এবং নাট্যিক নিয়মের ওপর নির্ভর করেই এর সৃষ্টি—এর সম্বন্ধে মণ্ডনপায়ণের জন্য প্রাচীন প্রচলিত ভারতীয় নৃত্য এবং মুকাভিনয়কে এর সঙ্গে প্রকৃতভাবে যুক্ত করতে হয়। যেসব পূরনো ভারতীয় নাটকের পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়েছি, তার সংলাপের অংশবিশেষ সংস্কৃতে লেখা এবং বাকী অংশ প্রাকৃততে রচিত। নাটকের মাঝে মাঝে দৃশ্যের বিশ্লেষণ এবং অভিনয়

সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া আছে। নাটকে গদ্যের সঙ্গে মিলিতভাবে পদ্যের ব্যবহার করা হয়েছে—পদ্য অংশে নানা ধরনের ছন্দ দেখা যায়। নাটকের পদ্য অংশটাই প্রধান এবং অনেক উন্নত স্তরের।

এই গাঠনিক দিকটাই পূরনো ভারতীয় নাটক এবং পূরনো গ্রীক ও শেক্সপীরিয়ান নাটকের মধ্যে বিরাট প্রভেদের সৃষ্টি করেছে।

ইউরোপীয় ইন্ডলজিস্টরা পূরনো ভারতীয় নাটকের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন সাহিত্যের ঐতিহাসিক দিক থেকে। এর ছিট এবং সাদৃশ্য খুঁজেছেন ভারতীয় কাব্যে। কিন্তু পদ্য-স্তবকগুলোর নাটকীয় কার্যকারিতার ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন নি। মাত্র কয়েকজন বিদ্বৎ সংস্কৃতজ্ঞ (যেমন ফ্রায়েড-রিশ রুকার্ট) এই সব স্তবকে সংস্কৃত নাটকের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছেন।

ক্র্যাসিক সংস্কৃত কাব্য অত্যন্ত সুক্ষ্মভাবে পঠিত। গদ্য থেকে কঠিন ছন্দাবলম্ব কাব্যের আশ্রয় নেওয়াটা নিশ্চয়ই নাটকীয় উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সুতরাং কার্যকারিতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করাটা খুবই দরকার।

[কমশ]

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

বন্ধনশিল্পে আভিজ্ঞা

পাকুল সেনগুপ্তের

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তার মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙালয়

ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শ্রদ্ধা নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভাগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। প্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে ‘জলখাবার শিল্পের’ বহুবিচিত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগুলি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে বাকিয়ে দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।”

সদা প্রকাশিত হয়েছে !! মূল্য : ছয় টাকা

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

৥ ১১৮১১৮১১ ১১৮১১৮১১ ৥ ১১৮১১৮১১ ১১৮১১৮১১ ৥ ১১৮১১৮১১ ১১৮১১৮১১ ৥ ১১৮১১৮১১ ১১৮১১৮১১ ৥

সেন্সার বোর্ডের আর এক কীর্তি

ফিল্ম সেন্সার বোর্ডের বিরুদ্ধে এমন অনেক কথা শোনা যায়, যা বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও সত্য। খোসলা কমিটির তদন্তের সময় এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই সভায় খ্রীখোসলা এবং তাঁর কমিটির সদস্যদের কাছে কয়েকজন বক্তা এমন তথ্য উপস্থিত করেছিলেন যা শুনে আমাদের পেটে খিল ধরার উপক্রম হয়েছিল। অথচ সেন্সার বোর্ডে যাঁরা আছেন, তাঁরাও সবাই সমাজের উচ্চশিক্ষিত এবং বুদ্ধিজীবী বলেই জানি। একজন বক্তা বলেছিলেন—এক কালোবাজারীর মাথায় গান্ধীচিহ্ন থাকার জন্য নাকি সেন্সার বোর্ড আপত্তি করেছিল; আর একজন বললেন, একটা ছবিতে গৃহভৃত্যদের সমিতির অফিসে ‘স্বাধীনতা’ দৈনিক পত্রিকা দেখানোর নাকি আপত্তি উঠেছিল; জাল পতাকা নিয়ে মিছিল দেখে নাকি জনৈক সদস্যর রাড প্রেসার বেড়ে গিয়েছিল—এমন আরো কত কথা শুনেছিলাম। অথচ যে সেন্সার বোর্ডের এমন শৃচিবাই, সেই সেন্সার বোর্ডের মস্তিষ্কপেতে সেক্স ছবি ও মার্কিন গোয়েন্দা এসেন্সজীর প্রচারমূলক ছবির পক্ষে কোন অসুবিধে হয় না। এসব ক্ষেত্রে সেন্সার বোর্ডের নীতির অভিব্যক্তির নীতিজ্ঞান কোথায় থাকে?

সম্প্রতি সেন্সার বোর্ডের একটা নতুন কীর্তির কথা শুনলাম। লেনিন জন্ম-শতবর্ষ উপলক্ষে ঋষিক ঘটক দূ-রীলের একটি ছবি করেছেন। ছবির নাম ‘আমার লেনিন’। ছবিটিতে নাকি একজন কৃষকের চোখে লেনিন শতবর্ষ উদ্‌যাপন উৎসব দেখিয়ে লেনিনের শিক্ষায় সেই কৃষকের জমির সংগ্রামে অংশগ্রহণের দৃশ্য দেখান হয়েছে। এই ছবিটি নাকি সেন্সার বোর্ডের সভায় যে সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা অনুমোদন করেছেন। এই অনুমোদনে প্রযোজক ছবিটি দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী এবং

আরো অনেককে দেখিয়েছেন। কিন্তু তার পরে কয়েক মাসের মধ্যেও এই ছবির ছাড়পত্র বোম্বাই থেকে আসছে না। স্বভাবতই এতে প্রযোজক অস্থির হয়ে উঠেছেন এবং খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সেন্সার বোর্ডের সদস্যরাও কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছেন, তাঁদের অনুমোদনের পরেও ছবিটি ছাড়পত্র পাবে না কেন?

প্রকাশ যে, সেন্সার বোর্ডের সদস্যরা অনুমোদন করলেও কলকাতায় ভারপ্রাপ্ত সেন্সার অফিসার নাকি জানিয়েছেন তাঁর আপত্তির কারণ—ছবিতে জোরপূর্বক জমিদখলের দৃশ্য আছে। প্রকাশ যে, তিনি নাকি খোলাখুলি বলেছেন, জমিতে কৃষি-বিপ্লবের প্রেরণা যোগান হয়েছে। চমৎকার! এ না হলে তিনি আর আমলা-তন্ত্রের একজন হলেন কি করে! একদিকে সরকার বামপন্থীদের ওপর টেকা দেবার জন্য জমির ব্যাপারে কত কথাই বলেছেন, আর একদিকে সেই সরকারের আমলা কৃষি-বিপ্লবের গম্ভীর ভিত্তি খাচ্ছে! একদিকে সরকার লেনিনের জন্ম-শতবর্ষ ডাক টিকেট বার করেছেন, রাজ্যপাল লেনিনের প্রতিমূর্তির আবরণ উন্মোচন করেছেন, আর একদিকে লেনিনের শিক্ষা গ্রহণ করছে, তা দেখাতে আপত্তি জানাচ্ছে। শ্যাম ও কুল রাখার চমৎকার নজর!

অথচ ফিল্ম ডিভিশনের একটি সংবাদ-চিত্রে দেখান হয়েছে জমিদখলের অভিশানের ঘটনা। কেন্দ্রীয় সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের পক্ষে তা যদি আপত্তিকর না হয়, কলকাতার ফিল্ম সেন্সার অফিসারের কাছে আপত্তিকর হবে কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে কয়েকটি তথ্য ও সংবাদচিত্র তৈরি এবং প্রদর্শিত হয়েছে—যাতে বেনামী জমিদখলের ব্যাপার দেখান হয়েছে। গ্রামের জীবনে এটা যখন একটা বড় ঘটনা, তখন তাকে অস্বীকার করা যাবে কি করে!

কিন্তু সরকারী আমলের অতি উৎসাহে ‘আমার লেনিন’ ছবিটি আজ সেন্সার সার্টিফিকেট পাচ্ছে না। এই ঘটনা গণ-তন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। —সুজন।



‘পথ উপকথা’ ছবিতে আরতি ভট্টাচার্য

চি আলোচনা

গুড বাই, মিঃ চিপস্

‘গুড বাই, মিঃ চিপস্’ আবার চলচ্চিত্র রূপ লাভ করেছে। এই ছবিটি মেট্রো সিনেমায় মস্তিষ্ক লাভ করেছে।

ইংল্যান্ডের জেমস হিলটন রচিত বড় গল্প ‘গুড বাই, মিঃ চিপস্’ জনপ্রিয় প্রণয় উপাখ্যান। যে গল্পের ২২টি সংস্করণ আজ পর্যন্ত বার হয়েছে এবং ২০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই গল্পটি সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে লন্ডনে নাট্যরূপ লাভ করেছিল। দু বছর পরে মেট্রো গোল্ডউইন মায়ার কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছিল। সেই ছবিতে মিঃ চিপসের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন রবার্ট ডোনাট এবং ক্যাথারিনের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গ্রীয়ার গার্সন। ত্রিশ বছর পরে আবার এই কাহিনী রঙিন চিত্ররূপ লাভ করেছে। এই চিত্ররূপ ১২টি গানে উপভোগ্য।

আজকাল আমরা সিনেমায় যে ধরনের প্রেমকাহিনীচিহ্ন দেখি, তার সঙ্গে ‘মিঃ চিপস্’ কাহিনী এক নয়। সমাজবোধের সঙ্গে প্রেমের মাধুর্য এবং সেই প্রেমের সৌরভ বিকশিত হয়েছে। সত্যিকার প্রেম কেবল যৌন-নির্ভর হয় না, সকল মানুষের প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যবোধে তা প্রদীপ্ত। মিঃ চিপস্ একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক, শিক্ষকতাকে তিনি রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মিউজিক হলের সুন্দরী গায়িকা ক্যাথারিন নিজের বিলাসের জীবন ছেড়ে দিল এই স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী হবার জন্য। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পম্পেই দেখতে গিয়ে মিঃ চিপসের সঙ্গে ক্যাথারিনের প্রণয় গড়ে উঠেছিল। সেই অব্যক্ত প্রেম মধুর



হয়ে উঠলো দক্ষিণ ইতালীর মৎসাজীবীদের সুন্দর গ্রামে। বিয়ের পর নানা প্রতিবন্ধকতা দেখা দিল। প্রতিহিংসা, হতাশা, শোকের মতোও মিঃ চিপস্‌ নিজের কর্তব্যকর্মে অটল, স্থায়ী মৃত্যু-সংবাদ তাঁকে বিচলিত করে না, জীবনকে তিনি বিকশিত করে তুলেছেন শিক্ষারতী হিসাবে, ছাত্রদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্কে। একদিনের মণ্ড-গায়িকা ক্যাথারিনের জীবনেও ঘটেছে বিস্ময়কর পরিবর্তন।

এই কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক মিঃ চিপসের চরিত্রে পিটার ও'টল যে অভিনয় করেছেন চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে তা পরম সার্থকতা লাভ করেছে। এক প্রবীণ শিক্ষক চরিত্রের রূপদানে পিটার ও'টল বিস্ময়কর অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সম্ভবত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে 'মিঃ চিপস্‌' শ্রেষ্ঠ। ক্যাথারিনের চরিত্রে পেট্রুলা ক্লার্ক সমান দক্ষতার গ্ল্যামার গার্ল থেকে জাদাসিধে শিক্ষক-পত্নীতে পরিণত হবার চমৎকার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি জুগায়িকা, গায়িকা হিসাবে সারা ইউরোপ-আমেরিকায় তাঁর নাম আছে। এই ছবিতে তাঁর কণ্ঠের গানগুলি ভাল লাগবে।

পম্পেই, দক্ষিণ ইতালীর গ্রাম এবং ইংল্যান্ডের ডোরসেটে সেরবোন স্কুলে দৃশ্যগুলি তোলা হয়েছে। কাহিনীর মাধুর্য, অভিনয়, গান ও দৃশ্য-সৌন্দর্যে ছবিটি উপভোগ্য। এই ছবিটির চিত্রনাট্য



‘প্রথম কদম ফুল’ ছবিতে শ্বাভেন্দু ও সৌমিত্র

লিখেছেন টেরেন্স রেটিগান; পরিচালনা করেছেন হার্বার্ট রস।

নাটকের কথা

শর্মিলা'র চার' শ' রজনী স্মারক উৎসব

গত ২৫শে জুলাই স্টার থিয়েটারের নাটক 'শর্মিলা' চার' শ' রজনী অভিনয়ের স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন সাহিত্যিক বিমল মিত্র এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক শ্রীঅজিত ঘোষ। স্মারক রজনী উপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসঞ্জিল মিত্র শিল্পী ও কর্মীদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পুরস্কারগুলি শিল্পীদের হাতে দিলেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। এই অনুষ্ঠান শেষে 'শর্মিলা' নাটক অভিনয় হয়। শর্মিলা'র নাট্যকার ও পরিচালক শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

স্টুডিও খবর

রাজকুমারী

লোকনাথ চিত্রশিল্পীদের 'রাজকুমারী' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। শেষ চিত্রগ্রহণ ছিল হেলেনের নৃত্য দৃশ্য। ছবিটি আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গদ্রী, বীণা, মিঠা চিত্রগ্রহণে মন্ডিলাভের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার, তনুজা, দীপ্তি রায়, চাষা দেবী, পাহাড়ী সাম্যাল, অসিতবরণ,

তরুণকুমার, জহর রায়, ভানু বানার্জী, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ। রাহুল দেববর্মণ ছবিতে সুরারোপ করেছেন। বাংলা ছবিতে এই তিনি প্রথম কাজ করলেন। সঞ্জিল সেন ছবিটি পরিচালনা করেছেন। শ্রীবিষ্ণু পিকচার্সের পরিবেশনায় ছবিটি মুক্তি পাবে।

মুক্তিও কথা

শান্তিনিকেতন আশ্রামক সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘে ৪ঠা জুলাই থেকে সাতদিনের জন্য রবীন্দ্র-সদনে মায়ার খেলা, ভানুসিংহের পদ্মলী, তাসের দেশ, বাল্মীকি-প্রতিভা, চিত্রাঙ্গদা ও শ্যামা মণ্ডস্থ করলেন। প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগম দেখেই বোঝা যায় এদের জনপ্রিয়তা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। মায়ার খেলার মত পিওর ওপেরাকে এমন সাফল্যের সঙ্গে মণ্ডস্থ করা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।

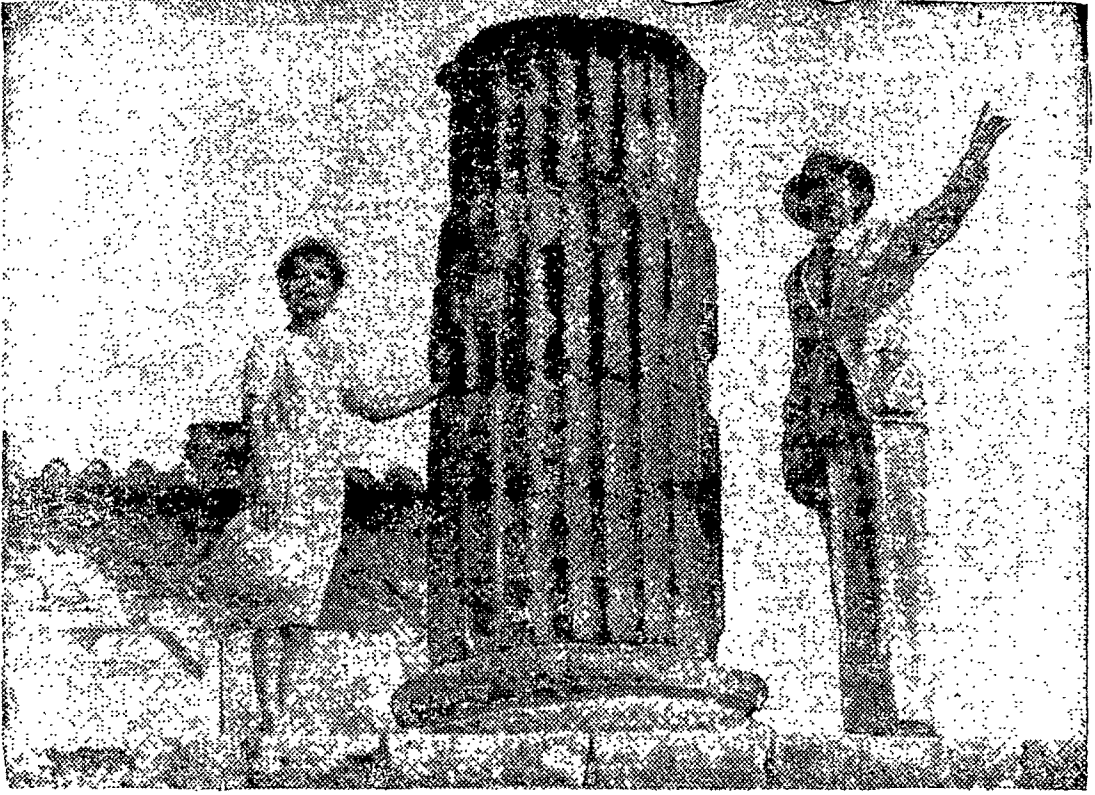
গানে সূচিমা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেন মৃদ্ধ করে রেখেছিলেন বিভিন্ন নাটকে। সঙ্ঘের ব্যালেরিনা পূর্ণিমা ঘোষ প্রতিটি শোভে বেন ইন্স-পায়ারড হয়ে নেচেছেন। চন্দ্রোদয় ঘোষের তাসের দেশের রাজপুত্র এবং শ্যামার উত্তীর্ণরূপী নৃত্য প্রশংসনীয়। শ্যামল বোসের কোটাল এক কথায় অনবদ্য।

স্টেজ ডেকর এবং সাজসজ্জাও অত্যন্ত সুদৃষ্টিপূর্ণ—তবে আলোকসম্পাত সব সময় আশাপ্রদ হয় নি।

আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আশ্রমিক সঙ্ঘ চণ্ডালিকা এবং নটীর পুজারও মণ্ডস্থপায়ণের ব্যবস্থা করবেন।



শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘের 'শ্যামা'র কোটালেক ভূমিকায় শ্যামল বসু।



গাউনবাই, মিঃ চিপস্‌ ছবিতে পেট্রোলা ক্লার্ক ও পিটার ওটল

প্রাবণ-সন্ধ্যা

গত ২৬শে জুলাই রবীন্দ্র সদনে শহরের সঙ্গীতরসিকরা এক নবোন্নত সঙ্গীত-সন্ধ্যা উপভোগ করেছেন। রবীন্দ্র সদন কমিটি এই প্রশংসনীয় অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা। 'প্রাবণ-সন্ধ্যা' অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিল্পীরা বরষার সঙ্গীত পরিবেশন করলেন তাঁদের দরদী কণ্ঠে। নীলাকাশে মেঘভরা বর্ষার প্রতীকময় সুন্দর মঞ্চে একে একে শিল্পীরা এসে তাঁদের কণ্ঠের সেরা গানগুলি শোনালেন। প্রথমেই এসেছিলেন বাণী ঠাকুর। তাঁর কণ্ঠে 'আজ ঝড়ের রাতে তোমার অভি-সার' এবং 'আজ প্রাবণের পূর্ণিমাত্রে' শ্রোতাদের মনে সুরের মাদকতা জাগিয়ে দিয়ে যায়। সাগর সেনের ভারী গলায় 'হে নিরুপমা' আর 'আমার প্রিয়র ছায়া আকাশে ভাসে' বর্ষার ভারী হাওয়ায় যেন ভেসে আসে সুদের থেকে। অশোকতরু স্বনোপাধ্যায় গাইলেন—'মাটির বুকের মাঝে', 'প্রাবণ মেঘে', 'ঝরে যায় উড়ে যায়' অপূর্ব এক সুরের মায়ায়। সুদের সে মায়ালোককে ভরিয়ে তুললেন চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা সেন এবং আরো শিল্পীরা। রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত এই সুরভার্য শ্রোতারা মুগ্ধ-বিস্ময়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত উপভোগ করলেন।

রবীন্দ্র সদনের এই উদ্যোগ সার্থক

হয়েছে। ইতিপূর্বে তারা এক নজরুল সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন, ভবিষ্যতে তাঁদের কাছে এরকম আরো সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সংবাদ কলা

সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ডাবিং

সম্প্রতি ভারতীয় ছবি "অনুপমা"র ডাবিং-এর কাজ চলেছে মস্কোর অন্যতম বৃহৎ স্টুডিও—গর্কি ফিল্ম স্টুডিওতে। বিদেশী ছবির ডাবিং-এর কাজ খুব বেশি এখানে হয়।

বিগত কিছুকালের মধ্যে সোভিয়েত দর্শকরা যেসব ভারতীয় ছবি দেখেছেন তার মধ্যে আছে "জাগতে রহো", "শেহর ঐর স্বপ্না", "ধূল কা ফুল" ও "অনু-রাধা"।

সোভিয়েত দর্শকরা ভারতীয় ছবির বিশেষ কদর করেন। চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে

তারা ভারতীয় ঐতিহ্য-আচরণ ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হন।

গর্কি ফিল্ম স্টুডিও, এখন যেখানে "অনুপমা" ছবিটির ডাবিং হচ্ছে সেটি একটি বহুতলা বাড়ি, বিখ্যাত সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক সেগেই আইজেন-স্টাইনের নামাঙ্কিত রাস্তায় এই স্টুডিও অবস্থিত। বছরে প্রায় ৮০টি ছবি এখানে তোলা হয়।

"অনুপমা" ছবির ডাবিং-এর কাজ এখন এখানে দ্রুত হচ্ছে। এই কাজ বেশ কঠিন। মূল ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিব্যক্তির উপযোগী কণ্ঠস্বর খুঁজে বার করা বেশি জটিল ব্যাপার। "অনুপমা"র ক্ষেত্রে অভিনেত্রী শ্রীমতী শর্মিলা ঠাকুরের ডাবিং-এর উপযোগী কণ্ঠ খুঁজে নেওয়া সমস্যা হয়। অভিনেত্রী শ্রীমতী শশিকলার ক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়। বিশিষ্টা সোভিয়েত অভিনেত্রী শ্রীমতী নাদেজদা রুদমিয়ানৎসেভা পরে এই ডাবিং-এ কণ্ঠ দেন।

ভারতে প্রদর্শনের জন্য

নতুন সোভিয়েত চলচ্চিত্র

সোভিয়েত চলচ্চিত্র বাণিজ্যসংস্থা "সোভেন্সপোর্টফিল্ম"-এর প্রধানী

সাপ্তাহিক বসন্ত

প্রতিনিধি ভারত সহ বিশ্বের ১০০-এরও বেশি দেশে রয়েছে।

সংস্কার এশীয় বিভাগের অধিকর্তা লেড পোলিয়াকভ জানান যে, ভারতে প্রদর্শনের জন্য সম্প্রতি ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার ছবি মস্কো থেকে প্রেরিত হয়েছে। দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, জয়পুর ও ভারতের অন্যান্য শহরে ছবি-গ্যালি দেখান হবে।

এই নতুন ফিল্মগুলির মধ্যে রয়েছে "ডেড সিজন" ছবিটি। মিনস্কি অনুষ্ঠিত চতুর্থ সারা সোভিয়েত চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পুরস্কার লাভ করে। ১৪ মাস আগে ছবিটির মুক্তির পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ৯ কোটি দর্শক ছবিটি দেখেছে। নয়া-ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের এক কাহিনীর ভিত্তিতে ছবিটি তোলা।

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় তোলা দু'খানি ছবি ভারতীয় দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে। একটি হল তাসখন্দের উজ্জবেক ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা "ফার-হাদ'স ফীট" এবং তাজিক ফিল্ম স্টুডিওতে তোলা "হোয়াইট গ্র্যান্ড পিয়ানো"। ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধের বীরত্ব ও দেশপ্রেমের কাহিনী নিয়ে ছবি দু'টি তোলা।

আরও দু'টি ছবি "ফার ইন দি ওয়েস্ট" এবং "ওয়ান চান্স আউট অব এ থাউ-সেন্ড"-এর কাহিনীও ফ্যাসিবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের।

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিগত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখান হয় লিও তলস্তয়ের "আনা কারেনিনা"র চিত্ররূপ। এখন সেটি সাধারণ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হবে।



‘প্রতিবাদ’ ছবিতে বিশ্ববিজয় ও মৌসু

দিল্লী চলচ্চিত্র উৎসবের আন্তর্জাতিক জুরিতে ছিলেন সোভিয়েত চলচ্চিত্র পরিচালক আলেকজান্ডার বার্ক। ইনিই "কারেনিনা" ছবির পরিচালক।

বর্তমানে প্রেরিত নতুন সোভিয়েত ছবির মধ্যে রয়েছে তলস্তয়ের "ওয়ার গ্র্যান্ড পীস"-এর তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড। ভারতীয় দর্শকরা এবারে তা প্রথম দেখতে পাবেন। ফিওদোর দস্তয়েভস্কির "ব্লাদাস" কারামাজোভ"-এর চিত্ররূপও

দেখান হবে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন খ্যাতিনামা পরিচালক আইভান পীরিয়েভ।

রবিতীর্থের "বিদায়-অভিশাপ"

আগামী ৯ই ও ১৬ই আগস্ট রবীন্দ্র সদনে রবিতীর্থের শিল্পিবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের "বিদায়-অভিশাপ" নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করবেন। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুচিরা মিত্র ও স্ববর্জেন চৌধুরী। নৃত্য পরিকল্পনায় আছেন রামগোপাল ভট্টাচার্য। আবহ সঙ্গীতে ও আলোকসম্পাতে আছেন যথাক্রমে দীনেশ চন্দ ও তাপস সেন।

ইউথ্ প্যপেট্ থিয়েটার, ইন্ডিয়া

অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও ছোটদের বাৎসরিক অঙ্কন, আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত ও রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন 'ইউথ্ প্যপেট্ থিয়েটার' আগামী ২২শে ও ২৩শে আগস্ট সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন বয়স্ক্রে তিনটি বিভাগে যথাক্রমে আট, বারো, ষোল বছর অনূর্ধ্ব ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও সংস্কৃতিতে সমানভাবে উৎসাহিত করার জন্যে গত কয়েক বৎসর ধরে এই প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত। এ সম্পর্কে খবরা-খবর পাওয়া যাবে ১৩৮, শরৎ বোস রোডস্থিত (কলিকাতা-২৯) ট্রেনিং সেন্টারে সন্ধ্যা ৬টা ও ৯টার মধ্যে।



‘পারি পাশী’ হিন্দী ছবিতে তনুজা

খেলা রাজারাজা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বা-প্রকাশিতের পর]

১৯০২ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড সফরের সময় যে স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতের ক্রিকেট উৎসাহীরা, যে আশার আলোর সম্মান তাঁরা পেয়েছিলেন, এ সময়ে—১৯০৪ সালে ইংল্যান্ড দলের ভারত ভ্রমণের সময় তা খেল ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল।

মিটলা না আমাদের কোন আশা। ম্যাচে-বলের লড়াই-এ বড়াই করার মতো আমাদের কিছুই থাকলো না। বম্বে, কলকাতা আর মাদ্রাজ—এই তিনটি টেস্টের মধ্যে দু'টিতে হেরে গেল ভারত, আর শূন্য সময়ের অভাবেই কলকাতা টেস্টে নিশ্চিত পরাজয়ের হাত থেকে রেহাই পেল ভারত।

ভারত ভালো খেলতে পারে নি ঠিকই, কিন্তু একটি শিশু দলের কাছে আমাদের প্রত্যাশাও ছিল একটু যেন বেশিই।

তবু ১৯০৪ সালে ইংল্যান্ড দলের ভারত ভ্রমণকে কেন্দ্র করে পাই নি-পাই নি করেও আমরা পেয়েছিলাম যা, তাও খুব একটা কম নয়। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সেবারের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার লালু অমরনাথ আর বিজয় মারচেন্ট। স্টো বোলার হিসেবে মদুস্তাক আলী কিম্বা সি. এস. নাইডু কোন অংশেই কম ছিলেন না।

লাভ-ক্ষতির হিসেবের দিকে তাকালে লাভের অঙ্ক শূন্য হলেও অমরনাথ, মারচেন্ট, মদুস্তাক কিম্বা সি. এস. নাইডু যে রাস্তা বড় পাওয়া, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন।

বম্বের প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে সেগুরী করার পর অমরনাথ

তখনো খুব একটা সাফল্য লাভ করতে পারেনা নি। তবু অমরনাথের খেলার ধারা, ব্যাটিং-এর নৈপুণ্য তাঁরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলের মনে এনে দিয়েছিল আশ্বাস ভাব।

খুব একটা বেশি রান না করলেও মারচেন্ট প্রত্যেকটি খেলায় শতধারায় সুসঙ্গভাবে ব্যাটিং-ই করেন নি—দশক এবং কতৃপক্ষকেও পেয়েছিলেন সন্তুষ্ট করতে। বিজয় মারচেন্ট যে যখন ক্রিকেটজগতে ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিদর্শন তা তখন তাঁর খেলা দেখেই বোঝা গিয়েছিল।

মদুস্তাক আলী সেই সময় ভারতের অন্যতম সেরা স্টো বোলার হিসেবে মদুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে মদুস্তাকের পরিচয় তখনো পাওয়া যায় নি। সি. এস. নাইডু কোন দিক দিয়ে সি. কে'র সমকক্ষ না হলেও ব্যাটিং এবং বোলিং-এ তিনি তখনই দেখিয়েছিলেন অভাবনীয় নৈপুণ্য।

এই ছিল ভারতের লাভের অঙ্কের সবচেয়ে বড় পাওনা। কিন্তু এ ছিল প্রত্যক্ষ পাওয়া, পরোক্ষ আরো বড় পাওয়া যে আমরা তখনই পেয়ে গেছি, তার পরিচয় ঠিক তখনই পাওয়া যায় নি। ১৯০৪ সালে ইংল্যান্ড দলের ভারত সফরে সেইটাই ছিল ভারতের কাছে সবচেয়ে বেশি লাভের বিষয়।

সেবার ইংল্যান্ড তিনটি টেস্ট ম্যাচ সহ অংশগ্রহণ করেছিল মোট ০৪টি খেলায়। আর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ায় রাজ্যরাতি ক্রিকেট খেলা ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে

বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

রাজা-রাজরাদের খেলা তখন খীয়ে খীয়ে প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছে, নিজের কাছে চানতে শুরু করেছে সাধারণ মানুষকে। মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা তখন আরম্ভ করেছেন ক্রিকেট খেলতে। তবে এ ব্যাপারে সব থেকে বেশি সাহায্য করেছিল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলি।

এর মধ্যে জামনগরের জামসাহেব, পার্ভোদর নবাব, পাতিয়ালা, বরোদার মহারাজা, ভিজয়ানাগ্রামের রাজকুমার, পোরবন্দরের মহারাজা প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা নিজেরা যেমন খেলেছেন, তেমনি খেলার জন্যে ব্যয় করেছেন অল্প অর্থ, তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দিয়েছেন, দিয়েছেন তাঁদের খেলার সব রকম সুযোগ-সুবিধে। আর অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা এঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন তাঁদের প্রাপ্য সম্মান।

ভারতীয় ক্রিকেটের অগ্রগতিতে তাই সেকালের রাজা-রাজরাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় ক্রিকেটকে তাঁরাই নিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্ব-ক্রিকেটের দরবারে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, ১৯০২ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড ভ্রমণের কথা ধরলেই বোঝা যাবে যে, ভারতীয় রাজস্ব্যবগ শতধারায় ক্রিকেট খেলাকেই ভালোবাসতেন না—তাঁরা জানতেন

শাখাধিক বসুমতী

গুণীর আদর করতেও ১৯০২ সালের ইংলন্ড সফরকারী ভারতীয় দলের অধিনায়ক ছিলেন পোরবন্দরের মহারাজা। তিনি জানতেন সি. কে. নাইডু তাঁর চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য খেলোয়াড়। তাই ভারত যখন লর্ডস মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করলো, তখন তিনি নিজে না খেলে সি. কে. নাইডুর ওপরই দিলেন ভারতীয় দল পরিচালনার ভার। শব্দে তাই নয়, পোরবন্দরের মহারাজার জন্যেই ভারতের প্রথম টেস্ট খেলায় অধিনায়কের সম্মান লাভ করার সুযোগ পেলেন সি. কে. নাইডু। অথচ পোরবন্দরের মহারাজা ইচ্ছে করলেই এ ঐতিহাসিক সম্মানের অধিকারী হতে পারতেন।

মাই হোক, ১৯০৪ সালে ইংলন্ড দলের ভারত ভ্রমণের পর ইংলন্ড মে ২-১ টেস্টে জিতে আবার নিজে গেল, তার জন্যে কারো এতোটুকুও দুঃখ নেই। কারণ আর্ডিনের শক্তিশালী দলের খেলা দেখে এবং ভারতীয় খেলোয়াড়দের লড়াই করার শক্তির পরিচয় পেয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের আবাল-বৃন্দ-বনিতার কাছে ক্রিকেট খেলা নিজের স্থানটি তখন পাকা করে নিয়েছে।

কিন্তু তখনো ছিল আসল কাজ-টুকুই বাকী। ক্রিকেট খেলাকে সর্ব-ভারতীয় একো একটি সম্ভার-মাধ্যমে তখনো কাছাকাছি টেনে আনা হয় নি। কিন্তু তার প্রয়োজন যে কতো তা বুঝতে তখন আর কারো বাকী ছিল না। ভারতের শিশু-ক্রিকেটকে যৌবনের স্বাবপ্রাপ্তে নিয়ে যাবার চিন্তায় তাই তখন মেতে উঠলেন ক'জন সত্যিকারের ক্রিকেট-উৎসাহী। তাঁদের উৎসাহ আর উদ্দীপনায় সে কাজও একদিন সারা হলো। কিন্তু তার আগে ঘটে গেছে অনেক ঘটনা। সেই ঘটনাগুলো ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে গেল আরো অনেকখানি। সেই কথাই বলতে হবে এবার আগে।

[চলবে]

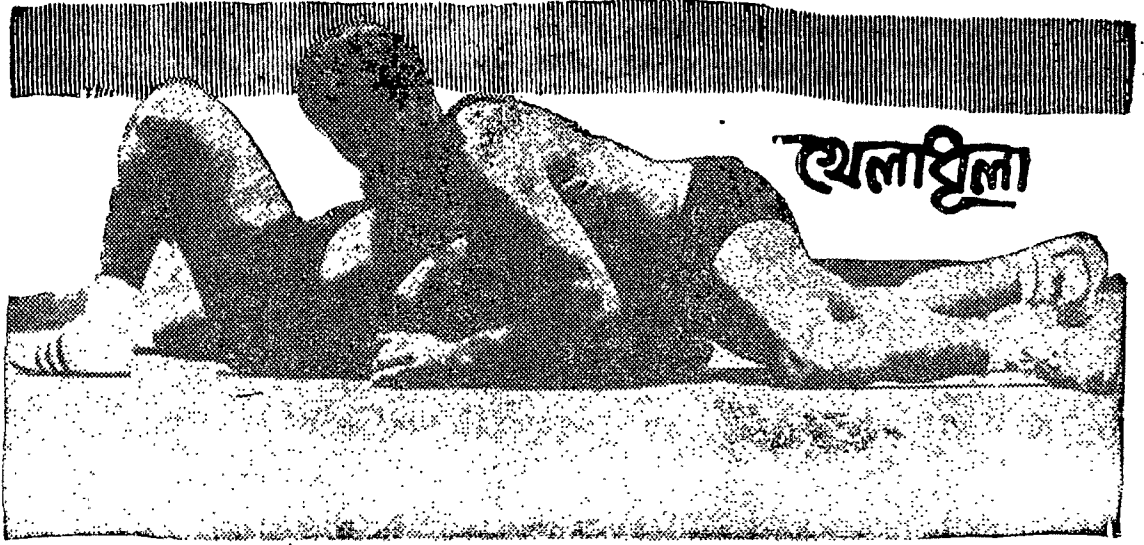
মাদ্রাজের জাতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচের স্কোর-বোর্ড নিম্নে দেওয়া হল :-

ইংলন্ড	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
এ. এইচ. বেক ওয়েন: কাসি-এস-নাইডু-ব-অমরনাথ---	৮৫	ক পাতিয়ালার মহারাজা ৪ ব অমর সিং ৪
ওয়ালটারস এল বি. ডি. বিউ-ব অমর সিং---	৫৯	ক সাবট্রিউট ১০২ ব অমরনাথ ২৮
মিচেল এল বি. ডি. বিউ-ব অমরনাথ---	২৫	ক ও ব অমরনাথ ২৮
ল্যাঙ্গরিজ এল বি. ডি. বিউ-ব অমর সিং---	১	ক দিলওয়ার হাসান ৪৬ ব নাজির আলী ৩৫
জাভিন ক ওয়াজির আলী ব অমর সিং---	৬৫	অপরাজিত ৩৫
বারনেট ক পাতিয়ালার মহারাজা ব অমর সিং---	৪	ক মুস্তাক আলী ২৬ ব নাজির আলী ৮
নিকলস ব অমর সিং---	১	ক দিলওয়ার হাসান ৮ ব নাজির আলী ৮
টাইনসেও ব অমর সিং---	১০	ক সি. কে. নাইডু ৮ ব নাজির আলী ৮
ভেরিটি এল বি. ডি. বিউ-ব মুস্তাক আলী---	৪২	
ইলিয়ট ক মুস্তাক আলী ব অমর সিং---	১৪	
ক্লার্ক অপরাজিত---	৪	
অতিরিক্ত (বা ২২, লে বা ২, নো ১)	২৫	(বা ১, লে বা ১) ৪
	৩৩৫	(৭ উইকেটে) ২৬১

বোলিং	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
অমর সিং	৪৪.৪-১৩-৪৬-৩	২৩-৬-৫৫-১
সি. কে. নাইডু	১১-১-৩২-৩	৯-০-৩৮-০
অমরনাথ	৩১-১৪-৬৯-২	১১.৫-৩-৩২-২
মুস্তাক আলী	২৫-৩-৬৪-১	৪-০-১৬-০
সি. এস. নাইডু	১৩-১-৪৩-০	২-০-১৭-০
জিওমল	৬-০-১৬-০	
ওয়াজির আলী	১-১-০-০	৩-০-৩৬-০
নাজির আলী		২৩-০-৮৩-৪

ভারত	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
দিলওয়ার হাসান ক বারনেট ব ভেরিটি	১৩	ব ল্যাঙ্গরিজ ৬০
নিওমল জিওমল আহত হয়ে অপস্থত	৫	ব্যাট করেন নি ৩
ওয়াজির আলী ব নিকলস	২	ই. ক মিচেল ব ভেরিটি ২১
সি. কে. নাইডু ব ভেরিটি	২০	ইলিয়ট ব ভেরিটি ২
অমরনাথ ক ইলিয়ট ব ল্যাঙ্গরিজ	১২	নট আউট ২৬
মারচেন্ট ব ভেরিটি	২৬	ক ও ব ভেরিটি ২৮
পতিয়ালার মহারাজা ব ভেরিটি	২৪	ক ইলিয়ট ব ল্যাঙ্গরিজ ৬০
নাজির আলী ক মিচেল ব ভেরিটি	৩	ক নিকলস ব ল্যাঙ্গরিজ ৮
সি. এস. নাইডু ক নিকলস ব ভেরিটি	১১	ইলিয়ট ব ভেরিটি ০
মুস্তাক আলী নট আউট	৭	ক মিচেল ব ভেরিটি ৮
অমর সিং ক বারনেট ব ভেরিটি	১৬	ক বারনেট ব ল্যাঙ্গরিজ ৪৮
অতিরিক্ত (বা ১, লে বা ৩, নো ২)	৬	(বা ১০, লে বা ১, নো ১) ১২
	১৪৫	২৪৯

বোলিং	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস
ক্লার্ক	১৫-৪-৩৭-০	৮-২-২৭-০
নিকলস	১২-৩-৩০-১	৬-১-২৩-০
ভেরিটি	২৩.৫-১০-৪৯-৭	২৭.২-৬-১০৪-৪
ল্যাঙ্গরিজ	৬-১-৯-১	২৫-৫-৬৩-৫
টাইনসেও	৩-০-১৪-০	৩-০-১৯-০
বারনেট		১১-০-১-০



অন্তিম মুহূর্ত কলকাতার ফুটবল

দিন দিন যে পরিস্থিতির মুখোমুখি কলকাতার ফুটবলকে হতে হচ্ছে তা শুধুমাত্র হতাশাবাঞ্জকই নয়, অত্যন্ত গম্ভীরও বটে। সত্য কথা বলতে কি, কলকাতার ফুটবল আজ সেই অসহনীয় অবস্থার মধ্যেই এসে পড়েছে। খেলা আজ খেলা নয়, ফুটবল খেলার উৎকর্ষ কিম্বা খেলা দেখার নিম্নলিখিত আনন্দলাভ করার আশা নিয়ে আজ বোধ হয় আর কেউই মাঠে যান না। খেলা যেমনই হোক না কেন, বড় দলদের সব সময় জিততেই হবে। প্রতিপক্ষ দল যদি ভালোও খেলে, তা হলেও কোন কথা নেই—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহম্মদান স্পোর্টিং পয়েন্ট নষ্ট করবে—আর তাই কিনা মেনে নেবেন দর্শকরা! আর তাঁরা তা' সত্যিই নিচ্ছেন না—তাই খেলাও আজ আর খেলা নেই। ফুটবল খেলার নামে চলেছে অশ্রুত একটা জেনারেলের লড়াই। এই লড়াই-এর হাওয়ায় গা মিলিয়ে কলকাতা ময়দানের মেজো, সেজো, ছোট কয়েকটি দল যখনই নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেন না, তখনই বাধে গোলমাল। শেষ পর্যন্ত হয়তো তার ফলে খেলা বন্ধ হয়ে যায়, পদলিখের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস কিছই বাদ যায় না। এই বছর যেন এই সব ব্যাপার-সাপার অন্য বছরের তুলনায় বেশ বেশিই হচ্ছে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহম্মদান স্পোর্টিং—কেউই এর আওতার বাইরে নয়। সত্যি কথা বলতে কি—এই তিনটি দলের সমর্থকরা খেলা দেখতে যান না—তাঁরা মাঠে যান যে-করে হোক নিজের-নিজের দলের জন্যে দুটি করে পয়েন্ট সংগ্রহ করতে। এই পয়েন্ট সংগ্রহে একটু বাধা পড়লেই খেলার মাঠে বেধে যায় তুলকালাম কাণ্ড।

যা সেদিন বাধলো ইস্টবেঙ্গল বনাম পোর্ট কমিশনারস দলের খেলার সময়। খেলা শেষ হবার বারো মিনিট আগে পর্যন্ত গোল দিতে পারে নি ইস্টবেঙ্গল—এই অপরাধে মাঠে পড়তে লাগলো ঢিলের পর ঢিল। সে ঢিলের লক্ষ্য ছিল খেলোয়াড় আর লাইনসম্মানরা। শেষ পর্যন্ত খেলা তো বন্ধ হলোই, আর মধ্যে পড়ে পদলিখের হাতে নাকাল হলেন নিরীহ দর্শকরা। সেদিন খেলার মাঠে পদলিখ যে ভূমিকা নিয়েছিল তার জন্যে শুধু জবাবদিহিই নয়, পদলিখের উচিত আহতদের ক্ষতিপূরণ করা। এরিয়াস ক্লাবের সভ্যদের আসনে আর এক টাকার দৈনিক টিকিটের স্ট্যান্ডে পদলিখ কেন অমন নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করলো? কে হুকুম দিয়েছিলেন ঐ জঘন্য কাজের? মেম্বাররা খেলা দেখতে গিয়ে মার খেলেন, দর্শকরা টিকিট কেটে মার খেয়ে এলেন। আর তারা সত্যিকারের গোলমাল করেছিল, তারা বিনা বাধায় সরে পড়লো—ভাবতেও খারাপ লাগে। আর ঠিক তখনই এই একটা কথাই মনে হয় যে, এই যদি পরিস্থিতি হয়, এই যদি অবস্থা পাঁড়ায়, তাহলে অন্তত এক বছরের জন্যে কলকাতার ফুটবল খেলা বন্ধ করে দেওয়া হোক। আর বাই হোক, খেলার নামে ছেলেখেলা বছরের পর বছর আর বৃদ্ধি সহ্য করা যায় না। বড় ক্লাব আর দর্শকরা যদি এর প্রতিকারে এগিয়ে না আসেন, তাহলে আজ না হোক, কাল কলকাতার ফুটবল খেলা বন্ধ হবেই হবে। কারণ কলকাতার ফুটবল এখন অন্তিম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে।

কমনওয়েলথ গেমস্

এবারের কমনওয়েলথ গেমস্-এর আসর শেষ হয়ে গেল। সবচেয়ে বেশি পদক পেয়ে অস্ট্রেলিয়া লাভ করেছে প্রথম স্থানটি। দ্বিতীয় স্থান গ্রেট ব্রিটেনের। ভারতের স্থান পঞ্চম। ভারতীয় ক্রিস্টগীরদের কল্যাণে ভারতের ভাগ্যে জুটতেছে পাঁচটি স্বর্ণপদক। সত্যি কথা বলতে কি, কমনওয়েলথ গেমস্-এ ওরাই ভারতের মান রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে হয় যে, ভারোত্তোলন বিভাগে প্রতিযোগী নির্বাচন যদি আরো সদ্ভূতভাবে ও আন্তরিকতার সংগে করা হতো তাহলে ভারতের ভাগ্যে আরো কয়েকটি পদক হয়তো বা জুটলেও জুটতে পারতো।

ও কথা থাক। ভারতের ১৪ বছর বয়স্ক ক্রিস্টগীর বেদপ্রকাশ প্রথম স্বর্ণপদকটি পেয়ে ভারতের কনিষ্ঠতম প্রতিযোগী হিসাবে আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। অল্প বয়সের জন্যে এবারকার প্রতিযোগিতায় দিল্লীর একটি স্কুলের ছাত্র বেদপ্রকাশের যোগদানের বিষয়টি

গেমস্‌হলেও প্রতি

ওয়েস্ট ইন্ডিজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক যাদুকর ক্রিকেটার যার নাম লিয়ানি কনস্ট্যান্টাইন। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর ব্যাটিং এবং বোলিং-এর পরি-সংখ্যান হলো ১৮টি টেস্টে ৬৪১ রান এবং ৫৮টি উইকেট। পরিসংখ্যান দেখে ফেলনা মনে হলো লিয়ানির খেলা দেখে তাঁকে যাদুকর বলতে একটুও বাধে না। ১৯২৮ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ইংল্যান্ড সফরে আসে। মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে খেলার আগে হাতেয় পেশীর টান ধরার জন্য ডাক্তার লিয়ানিকে খেলতে নিষেধ করেন। কিন্তু ডাক্তারের মান্য অমান্য করেই খেলতে নামেন। কাগজ তখন দলের রান ছিল ৫ উইকেটে ৭৯। এমন অবস্থায় ব্যাট করে এক ঘণ্টায় সংগ্রহ করেছিলেন ৮৬ রান।

মিডলসেক্সের দ্বিতীয় ইনিংসে ধল করে ১১ রানের বিনিময়ে লাভ করেন ৬টি উইকেট। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার তাদের বিপর্যয়। কিন্তু লিয়ানি একাই যেম একটি দল। আবার ব্যাট করে কম্বলেন শতরান সময় ছাত্র এক ঘণ্টা। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩ উইকেটে জিতে গেলো।

—পরিচয় নাথ
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। ভারতের অগ্নি ভালো যে শেষ পর্যন্ত তা বাতিল হয় নি।

যাই হোক, এবারকার প্রতিযোগিতায় পদকলাভকারী ভারতীয় দলের প্রতি-নিধিদের নাম নেওয়া হলো—

ক্রিস্ট—

লাইট ফাই ওয়েট : বেদপ্রকাশ (প্রথম)

ফাই ওয়েট : সুদেশকুমার (প্রথম),

মিডল ওয়েট : হরিশ্চন্দ্র (প্রথম),

ওয়েল্টার ওয়েট : মদুখতিয়ার সিং,

(প্রথম)

লাইট ওয়েট : উদয়চাঁদ (প্রথম)

ফেদার ওয়েট : রণধাওয়া সিং (দ্বিতীয়)

সুপার হেভি ওয়েট : মারুতি মানে

(দ্বিতীয়)

লাইট হেভি ওয়েট : সঞ্জয় সিং

(দ্বিতীয়)

হেভি ওয়েট : বিশ্বনাথ সিং (দ্বিতীয়)

ভারোত্তোলন—

ফেদার ওয়েট : এ্যান্টনি নেলিস

(দ্বিতীয়)

ট্রিপল জাম্প—

: মহীন্দার সিং (দ্বিতীয়)

বক্সিং—

ওয়েল্টার ওয়েট : শিবাজী ভৌসলে

(সোমি-ফাইন্যাল)



III: বিজয়:সম্বর্ধনা: II

পাঁচটি স্বর্ণপদক বিজয়ী ভারতীয় ক্রিস্ট দল দিল্লীতে ফিরে এসে অগ্নিভক্ত কীড়া উৎসাহীর সম্বর্ধনায় তাঁরা সম্বর্ধিত হন। ছবিতে ১৪ বছরের বালকবীর বেদপ্রকাশ ও সুদেশকুমারকে কাঁধে চাপিয়ে জনগণ আনন্দে মেতে উঠেছেন।

প্রশ্ন-উত্তর

বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায় (চাকুরিয়া, ফালিকাতা-৩১)

প্রশ্ন : ৯ই জুলাই সংখ্যায় যে লিখেছেন, মোহনবাগান বনাম মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলাটা অসুস্থিত হতে না পারার পরূপ যে টাকা রসে গেছে সে টাকাগুলো দিয়ে দক্ষ খেলোয়াড়দের সাহায্য ভান্ডার খোলা হোক—এই প্রস্তাব আমি মনে-প্রাণে সমর্থন করি। আমাদের পাড়া থেকে যাঁরা খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও ঐ একই কথা।

উত্তর : ধন্যবাদ! এবার আপনারা এগিয়ে এসে দলগতভাবে এই সাহায্য ভান্ডার খেলার জন্যে চাপ দিন। কারণ আমরা মতোই লিখি না কেন, আপনারা এগিয়ে না এলে কিছুর হবে না।

শুকদেব সরকার (ক্যানিং টাউন, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : এ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহামেডান স্পোর্টিং দলের কে কোন দলের বিরুদ্ধে কত পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে?

উত্তর : আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুদ্ধিতে পারলাম না।

অশোককুমার ঝালিক (বেলদা, মেদিনীপুর)

উত্তর : তোমার চিঠি পেলাম। তুমি ভাই এভাবে অনুশীলন করে যাও। আন্তরিকতা আর ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ করবে।

সুরজ দে (ফকিরচাঁদ ঘোষ লেন, হাওড়া-৫)

উত্তর : এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর আমরা তো সাধারণত দিই না। আপনি যদি খেলাধুলার ওপর প্রশ্ন পাঠান তাহলে ভালো হয়।

ভারতীয় ফুটবল দল আবার গেছে কুয়ালালামপুর—মারডেকা টুর্নামেন্টে খেলতে। একজন ভারতীয় হিসেবে খেপেট আশা করা উচিত ভারতীয় দলের সাফল্য সম্পর্কে? কিন্তু তা কি সত্যিই করা সম্ভব? সত্যিই কি আশা করবার কিছু আছে? ১৯৬৪ সালের পর থেকে আশা করবার মত কিছু কি ভারতীয় ফুটবল দল দেখাতে পেরেছে দেশে কিম্বা বিদেশের মাটিতে? না, পারে নি। কিন্তু কেন পারে নি তা নিয়ে বোধ হয় আমাদের কর্মকর্তাদের কেউ কোনোদিন অনুসন্ধানও করেন নি। আর সেইজন্যই



বোধ হয় ভারতীয় ফুটবলের হতা-কর্তা-বিধাতারা অন্যারের মত এবারও দায়সারাগোছের মত করে একটি টিম ওখানে পাঠিয়েই খালাস। আশ্চর্য! প্রতিবাদ করবার মত একটি লোকও কি নেই ওই কমিটিতে?

প্রদীপ, চন্দ্রনী, বলরাম, অরুণ, জার্নেল, থঙ্গরাজ প্রমুখের পর সত্যিকারের স্কিলড ফুটবলার আমরা আর পাই নি। কিন্তু যাঁরা আছেন, তাঁদের প্রতিই কি সুবিচার করা হয় সব সময়ে! এবারের কথাই ধরা যাক। বোম্বাইতে ট্রেনিং ক্যাম্পে বাংলা থেকে

যাঁরা চান্স পেয়েছেন, তাঁদের অনেকের থেকেই যোগ্যতর খেলোয়াড় সুযোগ পান নি। এঁরা যে কোন অযোগ্যতার বিচারে সুযোগ পেলেন না, বুদ্ধিতে পারলাম না।

প্রশিক্ষক হিসেবে মহঃ বাসা এবং প্রদীপ ব্যানার্জীর নির্বাচনকে এতটুকুও হয় না করেও বলতে চাই যে, বাংলা তথা ভারতের আরেক স্বনামধন্য কোচ—গ্রীস্মজ দত্ত দারুণভাবে উপেক্ষিত হচ্ছেন। কারণ কি জানি না। ভালো ফলাফল দেখাতে গেলে টিম-স্পোর্টিং সব থেকে আগে দরকার। এক্ষেত্রে তমল দত্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে চাই। যে টিমই তৈরি হোক, আর যিনিই

রজত চ্যাটার্জী

প্রশিক্ষকরূপে যান, ম্যানেজারের গুরুদায়িত্বটা কিন্তু প্রধান প্রশিক্ষকের ওপরই দেওয়া উচিত। আই. এফ. এ একাদেশের বিগত তেহরান সফরের তিন্ত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলতে হচ্ছে। ব্রাজিল, ইংল্যান্ড, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দলের যিনি প্রধান প্রশিক্ষক, তিনিই ম্যানেজার। ভিন্ন ব্যক্তি হলে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ খেলোয়াড়দেরই করে বিভ্রান্ত।

এ. আই. এফ. এফ কর্মকর্তাদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন একটু ভেবে-চিন্তে যা করার তাই করেন। আর যাই হোক, দেশের মান-সম্মান নিয়ে খেলেখেলার অধিকার তাঁদের কেউ নেয় নি।

অরুণকুমার কীর্তন্যা (রঘুনাথপুর, চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং—এই তিনটি দল কে কতবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন?

উত্তর : এ প্রশ্নের উত্তর এর আগে বেশ কয়েকবার দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আমাদের ফুটবল বিশেষ সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

কিশু সেনগুপ্ত (জামসেদপুর)

উত্তর : আশা করি—কেন আমরা ঐ বিশেষ প্রশ্নের উত্তরটি এভাবে দিয়েছিলাম তা নিশ্চয়ই বুদ্ধিতে পেরেছেন।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতীর 'খেলাধুলা' বিভাগটা আপনার কেমন লাগছে এবং আর কি কি হলে বিভাগটা আরো ভালো হয়—সেই সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে পারলে খুশি হবো।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ ফালিকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে ব্রীহদাক্ষর গুরুদাসদাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

“শ্রীঅজয় মৃথোপাধ্যায় মাইনাস হয়ে গেলে খুবই বিপদ হবে আট পার্টির শরিক দলগুলির। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবার পর বিগত কয়েক মাস শ্রীমৃথোপাধ্যায়কেই কল্পনায় সম্ভাব্য ফ্রন্টের নেতা ভেবে যত দূর এগিয়ে গেছে আট পার্টি, সেখান থেকে ফিরে আসা খুবই মস্কিন। তাই আট পার্টির এত ধর্না, এত আনাগোনা, এত সতর্কবাণী।” (‘সপ্তাহের বোঝা’ থেকে)



৪ ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ]

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 7, 13th August, 19



ফেমিলা প্রো
যদি গাঢ়রঙের চুল

—সূচীপত্র—

বিবরণ	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৩৮৭
আজকের মানুষ	...	৩৮৮
স্বাভাষ্যচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩৮৯
বঙ্গদর্শন	...	৩৯৩
ভারতদর্শন	...	৩৯৬
আন্তর্জাতিক	...	৩৯৮
বামপন্থী আন্দোলন ও বাংলার		
মধ্যবিত্ত সমাজ (প্রবন্ধ)	— সাগর বিশ্বাস	৪০০
সপ্তাহের বোঝা	— কুন্তিবাস ওঝা	৪০৬
চব্বিশ বছরে পা দিয়ে (প্রবন্ধ)	— নরেন ভট্টাচার্য	৪০৮
তিন ভূবন জুড়ে এখন (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪০৯
গরিলা যুদ্ধের হের-ফের (প্রবন্ধ)	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৪১০
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	৪১৪
পাঠকমন	...	৪১৭
ঢাকার চিঠি	...	৪১৮
আনন্দরূপম্ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	৪২১
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	৪২৭
স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক		
বিপ্লববাদ ও ন্যাক'সীয় দৃষ্টিভঙ্গী	— গোরাচাঁদ কুন্ডু	৪৩১
ফেস্টুনে (কবিতা)	— রুদ্রেন্দ্র সরকার	৪৩৩
দর্পণে সংগ্রামের মুখ (প্রবন্ধ)	— জীবন সরকার	৪৩৪
গ্রন্থমেলা	...	৪৩৭
রুগ্মমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	— শিলালি	৪৩৮
রুগ্মজগৎ	...	৪৪০
খেলার রাজার রাজা	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৪৪
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	৪৪৬

যে কোন

গয়না

আর

আমল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসমস অব লেডি

এম. বি. সরকার



এ.এ. সরকার
বর্তমান
১৯১৭ রামবিহারীজিৎ চন্দ্রসহ

২রা অক্টোবর থেকে দেখান হবে



ভৈরবী

সাহসী

দ্বন্দ্ব

বদলে

কালো

ইন্সট্যান্সকলার-ভৈরবী

গতকাল, আজ এবং আগামীকালের ভাবনা সম্বলিত কাহিনী



বৃহস্পতিবার, ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
৭৫ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 13th August, 1970

অমরলোকে মহারাজ

শ্রীর বিপ্লবী, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহানায়ক, ভারতের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মহাপুরুষ মহারাজ দ্রৌলোক্যনাথ চক্রবর্তী শহীদ-দিবসের স্মরণ মহাহর্তের প্রাক্কালে ৮২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইহা ঠিকই যে, তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন, কিন্তু লোকচিত্তে মহারাজের সিংহাসন যুগ যুগ ধরে সুগভীর শ্রদ্ধা ও পরম সন্মানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যে বিস্ময়কর কর্মোন্মাদনা, অতুলনীয় ত্যাগ, আশ্চর্য দেশপ্রেম, সুদৃঢ় সবল চরিত্র, নির্বিড় মানবপ্রেম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানব মৈত্রীর জীবন্ত প্রতীকরূপে অশীতিপর বয়সেও তিনি আমাদের ঘুম ভাঙাবার প্রয়াসী হয়েছিলেন, সেই মহাহর্তে তাঁর জীবনের আকস্মিক ছেদ ঘটায় দেশ ও দেশের পক্ষে তা কতোটা বেদনাদায়ক—সে কথা বলা নিঃপ্রয়োজন। দূর্ভাগ্য এই বিরাট উপমহাদেশের, দূর্ভাগ্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যাবিবিক্ষদ মানুষের। আমরা যে সময় নেতাদের শূন্যগর্ভ বহুতায় নিস্পৃহ হয়ে উঠছিলাম এবং দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্রমশ শঙ্কিত হচ্ছিলাম, ঠিক সেই মহাহর্তে আমাদের আশার আলো দেখাতে সমর্থ হয়েছিলেন একালের একমাত্র একজনই—আর তিনি স্বয়ং মহারাজ চক্রবর্তী। এবং তা বহুতার ঝড়ে নয়, শৃঙ্খল অপরিমেয় ভালোবাসার আড়ানায়। আশা করা গিয়েছিল, দেশের যুবশক্তিকে আবার তিনি পথ দেখাবেন, তাদের চরিত্র

গঠনের তিনি হবেন পূজ্য সহায়ক। সেই আশা অপূর্ণই থেকে গেল। তবু মহারাজের প্রতি সাধারণ মানুষের, মতনির্বিশেষে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে আদর্শবোধ আজো সঞ্চারিত হয় বলেই তাঁর মহাযাত্রায় হাজার হাজার অগণিত মানুষ জানিয়েছে তাদের অকপট শ্রদ্ধা।

মহারাজ দ্রৌলোক্যনাথ ভারতে আসেন গত ২৪শে জুন চিকিৎসা উপলক্ষে। একালের মানুষ যে মহারাজকে একেবারে ভুলে যায় নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায়, মহারাজকে নিকটে লাভ করে তাদের চিত্ত কিভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে! এই আলোড়নের আগেকার ইতিহাসটুকুও আজ আমাদের ব্যাখ্যার স্মৃতিতে বার বার জেগে উঠছে।

বছর দুয়েক আগে মহারাজ যখন ময়মনসিংহের স্বগ্রামে থেকে পূর্ব বাংলার সমগ্র হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাজ করে চলেছেন এবং ভারতের কাগজগুলিতে তাঁর সম্পর্কিত সংবাদ যখন কদাচিৎ প্রকাশিত হয়, তখন আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে জানলাম যে, মহারাজ আমাদের পরিচয় শুধু গুণগ্রাহীই নয়, পরম হিতৈষী। ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর একটি সংখ্যা শুধু তাঁর সগর্ব অভিনন্দনই লাভ করে নি, তিনি পূর্ব বাংলার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেককেই ডেকে দেখিয়ে বলেছিলেন,

তিনি যে আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চান, তা গ্রহণ এবং প্রচার করার মতো পরিণীলিত মনের অভাব আজো নেই। সেদিন ঐ কথা শুনে আমাদের গর্বও বাঁধনহারা হলে, আমরা তাঁকে তাঁর স্বলিখিত জীবনকাহিনী ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার জন্য 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে দিতে অনুরোধ জানাই। তিনি আমাদের অত বড় প্রার্থনা রাখবেন—তা ভাবাও ছিল অসম্ভব। কিন্তু তিনি আমাদের নিরাশ করা তো দূরের কথা, তাঁর জীবন-কথা বরং আশাতীতভাবে দ্রুততার সঙ্গেই আমাদের দিয়েছিলেন। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র পাঠকদের কাছে সেই অমূল্য জীবন-কথা অজানা নয়—যা শতবার পড়লেও প্রতিবারই রোমাঞ্চে জাগে। তবু ঘটনাটি নিবেদন করলাম এই কারণে যে, মহারাজের বিরাটের মধ্যেও ছিল কী গভীর সৌজন্যবোধ। আর ঘটনার পূর্বাগর প্রসঙ্গ স্মরণ করে আমরা আমাদের স্বপ্ন স্বীকার করছি মহারাজের কাছে—যে স্বপ্ন সমস্ত দেশ ও জাতি চিরকাল ধরে বহন করে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতের পথে।

সম্মাদকীয়

আজকের মানুষ

ওড়িশার রাজনীতি বলতে একাদিন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবকে বোঝাতো। সারা রাজ্যের রাজনীতি যেন তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, আজও তাঁর একটি ঘোষণায় ওড়িশার রাজনীতি উন্মেল হয়ে উঠেছে। ডঃ মহতাব জন কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছেন। ওড়িশা বিধানসভার সদস্যপদ ত্যাগের সংকল্পও তিনি ঘোষণা করেছেন। জন কংগ্রেস থেকে মধ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছেন বিধানসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচন করতে। মজার কথা এই যে, জন কংগ্রেস ওড়িশা বিধানসভার সরকার-বিরোধী দল নয়; কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরিক জন কংগ্রেস। তার অপর সহযোগী হলো স্বতন্ত্র দল এবং মধ্যমন্ত্রী গীরাজেন্দ্রনাথ সিংহের স্বতন্ত্র দলেরই নেতা। কিন্তু প্রবীণ রাজনীতিকের এ-হুমকি অপেক্ষাকৃত তরুণ মধ্যমন্ত্রী গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। বিধানসভা তো ভাঙছেনই না, মধ্যবর্তী নির্বাচনেরও কোনো আশা নেই এখানে। এমন কি, জন কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যেও বিধানসভা বাতিল করার প্রশ্নে গুরুতর মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ যে প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তিনি একাদিন ছিলেন, তাঁর সৈন্য যেন আজ খানিকটা ভেঁতা হয়ে গিয়েছে।

ওড়িশায় জন কংগ্রেসের অন্যতম প্রাতিষ্ঠাতার কৃতিত্ব ডঃ মহতাব অবশ্যই দাবি করতে পারেন। কিন্তু আজ কেন তিনি তাঁর হাতে গড়া সংসার সংগে সম্পর্ক ছেদ করতে চাইছেন? জন কংগ্রেস-স্বতন্ত্র বিরোধ অবশ্য মাস

কয়েক আগেও একবার দেখা দিয়েছিল এবং তখনও জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগের হুমকি দিয়েছিল বলে সরকারের সামনে সংকট উপস্থিত হয়েছিল এবং সেবার যেমন সিংহের মাথার ওপর দিয়ে উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ বয়ে গিয়েছিল, এবারও তার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের জীবনে



ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব

দলত্যাগের অতীত নজীরও রয়েছে অবশ্য। ১৯৬৫ সালে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছিলেন, যে-কংগ্রেসের সংগে তাঁর সম্পর্ক প্রায় তিন দশকের। শুধু ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসেরই তিনি প্রধান ছিলেন না, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বেরও তিনি ছিলেন অন্যতম

সুসজ্জিত। দেশ স্বাধীন হবার আগে তিনি একাদিক্রমে আট বছর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন—যে গৌরব খুব কম নেতার কপালেই জুটেছে।

১৯২৪ সাল থেকেই ডঃ মহতাব ওড়িশা প্রদেশ কংগ্রেসের একজন প্রথম দায়িত্বশীল পদে তাঁকে দেখা দিয়েছে। দলের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে যেমন তাঁর কর্মতৎপরতা দেখা গিয়েছে, তেমন প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। স্বাধীনোত্তর ভারতে ওড়িশার প্রথম মধ্যমন্ত্রীর পদ ডঃ মহতাব অলঙ্কৃত করেছিলেন। বন্দুত ১৯৪৭-৫০ পর্যন্ত একবার মধ্যমন্ত্রিত্ব করার পর ১৯৫৭ সালে তার তাঁরই ডাক পড়ে সরকার গঠনের দায়িত্ব নেবার। এ-পদে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাজ করেছিলেন দ্বিতীয় ক্ষেপে। এর পর তিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে কিছুকাল বোম্বাই রাজ্যের গভর্নরের দায়িত্বও ডঃ মহতাবকে পালন করতে হয়েছিল।

ওড়িশায় কংগ্রেস দলকে যেমন তিনি সংগঠিত করেছিলেন, তেমন তার ভাঙনের দায়ও কি তিনি সরাসরি অস্বীকার করতে পারবেন? নতুন চিন্তাধারা ও কর্মোদ্যোগ নিয়ে যখন ওড়িশা রাজনীতিতে তথা কংগ্রেসে তরুণ নায়ক বিজু পট্টনায়কের আবির্ভাব ঘটেছিল, তখন সে-তারুণ্যকে কি তিনি স্বাগত জানাতে পেরেছিলেন? বাস্তবপক্ষে বিজু পট্টনায়কের সঙ্গে মতবৈধতার কারণেই ডঃ মহতাব ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে জন কংগ্রেসের পত্তন করেন। চিন্তাধারার দিক থেকে তিনি সেকেলে, পূরনো রক্ষণশীল চিন্তাধারারই বাহক।

৭১ বছরের বৃদ্ধ রাজনীতিক আজ আবার জন কংগ্রেস ত্যাগ করতে বৃদ্ধ-পরিবর্তন হলেন কেন? বিজু পট্টনায়ক এখন শাসক কংগ্রেসের সংগে নেই। সে-সুযোগে কি ডঃ মহতাব শাসক কংগ্রেসে ফিরে যেতে চাইছেন? তাঁর সম্পর্কে নাকি মদ্যলোকের রিপোর্ট দর্শনীর তদন্তের সুপারিশ করেছে। তাই তিনি শাসক কংগ্রেসে ভিড়ে গিয়ে আত্মরক্ষায় প্রয়াসী হন নি তো? কে জানে, রাজনীতিতে অসম্ভব কিছুই নয়।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালীন সঙ্কল্পসাদ বসু ৫ ভারতবর্ষ

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(২)

১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, বিশেষ গেজেটে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে, দুপুর সাড়ে বারটার সময়ে শপথ গ্রহণ করবে মন্ত্রিসভা, এমন সময়ে সরকারী ভবন থেকে সংবাদ এল—গভর্নর মহোদয় শ্রীযুক্ত বরদলৈ-র সঙ্গে বিশেষভাবে সাক্ষাৎ করতে চান।

“গভর্নরের নাটকীয় আহ্বান বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। পরবর্তী ঘটনাবলীর জন্য সকলে উৎসুকভাবে প্রতীক্ষারত রইল।

“গভর্নরের সঙ্গে শ্রীযুক্ত বরদলৈর কী কথাবার্তা হল তা জানা যায় নি, কারণ সেগুলির বিষয়ে খুবই গোপনীয়তা রাখা হয়েছে।

“ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত বরদলৈর অনুরোধে আসাম আইন-সভার অধিবেশন বসেছিল, যেখানে তিনি কোয়ালিশন সরকার গঠনের সংবাদ ঘোষণা করেছেন। তারপরে স্পীকার (বসন্তকুমার দাস) ১২-১৫ মিনিটে অধিবেশন অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ করে দেন।

“তার আগে বিরোধীপক্ষ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করতে চেয়েছিল (মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করবার আগেই), কিন্তু স্পীকার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন।

“আসাম আইনসভার মাননীয় স্পীকার আজ (১৯ সেপ্টেম্বর) রাতি ৯টার সময়ে গভর্নর বাহাদুরের অনুরোধে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এক ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে একান্তে আলোচনা করেন।

“সাক্ষাৎকারের ফল গোপন রাখা হয়েছে।

“শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে রাষ্ট্রপতি বসুর কাছে ঘটনার রূপ ব্যাখ্যা করেন। রাষ্ট্রপতি বসুর গ্রীহু হয়ে কলিকাতা যাত্রার কথা ছিল। বরদলৈ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুরোধকে সহসা খামিয়ে দিয়ে যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই গুরুতর পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে রাষ্ট্রপতি

বসু তার যাত্রা স্থগিত রেখেছেন। তিনি মৌলানা আজাদের সঙ্গে টেলিফোনে পরামর্শ করেছেন।

“আসামের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত। জোর গুজবঃ আইনসভাকে বাতিল করে দেওয়া হবে। অবশ্য গুজবটি সমর্থিত হয় নি।

“গভর্নর সিমলার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন।...

“রাষ্ট্রপতি বসু টেলিফোনে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের সঙ্গেও কথা বলেছেন।

“শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতায় ফিরবার জন্য স্বীয় বাসস্থান থেকে গৌহাটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন—অল্প দূর গিয়েই মন্ত্রিসভার গন্ডগোলের সংবাদ শুন এবং অবিলম্বে শিলঙে ফিরে আসেন।...

“কংগ্রেস সভাপতি টেলিফোনে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলেছেন।...জান: গেছে, শ্রীযুক্ত দেশাই কংগ্রেস সভাপতিকে বলেছেন যে, স্পীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে সংগত কাজই করেছেন।১

কংগ্রেস-পক্ষে এবং সুভাষচন্দ্রের পক্ষে গোটা ব্যাপারটা তীরে এসে তরী ডোবার মত। অপরপক্ষে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা হওয়া মানে ইউরোপীয়দের স্বার্থনাশ সংঘবনা। সুতরাং ইউরোপীয় দল যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, ঠিকভাবে বলতে গেলে চক্রান্ত করেছিল কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের বিরুদ্ধে। ১৯ সেপ্টেম্বরের এক বিবৃতিতে সুভাষচন্দ্র ইউরোপীয় দল ও মুসলিম দলগুলির মধ্যে গোপন সূত্টির কথা বললেন, কিভাবে তারা অবিরত গভর্নরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে সমস্ত ব্যাপারটা পাকিয়ে তুলেছিল সে কথাও জানানেন। গভর্নরের বিরুদ্ধে সরাসরি না হলেও পরোক্ষ অভিযোগ তুললেন। সবশেষে, গভর্নরের বিচিত্র আচরণ কী ধরনের শাসনতান্ত্রিক সংকট ঘনিয়ে তুলেছে তা পরিষ্কার করে দিলেনঃ “বিশেষ গেজেটের ঘোষণা অনুযায়ী সাদুল্লা মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গভর্নর গ্রহণ করেছেন এবং সেই জায়গায় পাঁচজন নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করেছেন। শেবোক্ত মন্ত্রীরা যেহেতু এখনো শপথ নেন নি, সেই কারণে বিশেষ গেজেটের প্রকাশের পরে সরকার ছাড়াই আসাম চলেছে বলতে হবে। আমি তাই বলতে চাই, আসামে বর্তমানে আমরা যে নৈরাজ্যের মধ্যে বাস করছি, তার জন্য দায়ী মাননীয় গভর্নর মহোদয়।২

গাণ্ধ্যদিক বসন্ততী

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কিন্তু শেষ পর্যন্ত গঠিত হয়েছিল। ২১ সেপ্টেম্বর, দুপুর আড়াইটের সময়ে যখন উক্ত মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হল—সুভাষচন্দ্র মন্ত্রিসভার নিশ্বাস ফেলোছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিজয়ের মত ব্যাপারটি। ঐদিন সন্ধ্যায় জেল রোড ময়দানে এক সভায় সুভাষচন্দ্র মন্ত্রীদের সঙ্গে জনগণের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাঁচজন মন্ত্রীই সভায় বক্তৃতা করেছিলেন। পরদিন সকালে তিনি শিলঙ ত্যাগ করলেন। ১৩ থেকে ২১ সেপ্টেম্বর—এই সাত দিনের নাটক শেষ হল।

২১ সেপ্টেম্বর, যেদিন মন্ত্রিসভা শপথ নিয়েছিল, সেদিনই সুভাষচন্দ্র এক বিবৃতিতে কঠোর ভাষায় ইউরোপীয়দের আচরণের সমালোচনা করেছিলেন। সেই বিবৃতি নিম্নের শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিলঃ

AN UNPROVOKED ATTACK WAR ON CONGRESS

President Bose's Stern Warning to
European Planters

Assam Ministerial Affairs

Congress Prepared to Take Up Challenge
and 'Give a right Royal Battle.'

সুভাষচন্দ্র অন্যান্য কথার সঙ্গে বলেছিলেনঃ

“সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছি এবং সবচেয়ে বেদনা পেয়েছি ইউরোপীয়দের আচরণে। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার গঠন গোড়াতেই বানচাল করে দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খোলাখুলি যুদ্ধঘোষণা ভিন্ন আর কিছু নয়। ভারতবর্ষের আর কোথাও ইউরোপীয় দল এমন অস্বাভাবিক ব্যবহার করে নি। আসাম আইনসভার ইউরোপীয় দল তাঁদের এই আচরণের অর্থ কী, তা কি ভেবে দেখেছেন? কংগ্রেস দল এখন আসামে শাসনাধিকার পেয়েছে। সকল সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ইউরোপীয় চা-বাগানের মালিকদের সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কংগ্রেস দল আইনসভায় সকল দলের উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করেছে। এই রকম মনোভাব দেখানোর পরেও যদি আসামের ইউরোপীয়গণ বিনা প্ররোচনায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমে পড়ে—তার ফলাফলের দায়িত্ব তাদেরই। কংগ্রেসের পক্ষে বলতে পারি, বন্ধুত্বের আহ্বান যদি এমন অশালীনভাবে প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কংগ্রেস জানে কি করে উপযুক্ত উত্তর দিতে হয়। কংগ্রেস সেক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে এবং দেখিয়ে দেবে লড়াই কাকে বলে। আসামের চা-বাগান সমিতি কী চায়? তাদের একটু ধীরসংস্থ ভাবে দেখতে বলছি। সারা ভারতের ইউরোপীয়দেরও একই কথা ভেবে দেখতে বলি।”

আসাম-সংকটে জড়িয়ে পড়ে সুভাষচন্দ্রের দিল্লী যাত্রার দৌর হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ছিল। কলকাতায় বৃহস্পতিবার রাতে ফিরেই পরদিন দিল্লী ছুটলেন। ঠিকভাবে বলতে গেলে দিল্লী জন্ম উড়লেন। শিলঙে দৌর হওয়ার জন্য পেনে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের

সর্বশেষ সংযোজন ‘জিপসি মেজর’ স্থান বিশেষভাবে ভাড়া করা হয়েছিল; বিমানটি চালাবেন ফ্লাইং ক্লাবের পাইলট-ইনস্ট্রাক্টর মিঃ চিদাম্বরম। দমদম থেকে বিকেল ৫টায় ছেড়ে পরদিন বিকেল ৩টে-৪টের মধ্যে বিমানটির দিল্লী পৌঁছবার কথা। দিল্লী যাবার আগে সুভাষচন্দ্র সাংবাদিকদের কাছে নিজের আশার কথা জানিয়ে গেলেন—চক্রান্ত সত্ত্বেও বরদলৈ মন্ত্রিসভা স্থায়ী হবে এবং ভাল কাজ দেখাবে।

সুভাষচন্দ্রের শ্রুভেচ্ছা সত্ত্বেও গোটা ব্যাপারটি সাধারণের কাছে খুবই জটিল হয়ে দেখা দিয়েছিল। একথা সত্য, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছেন মনে করে সাদুল্লা পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু সুদূর উপত্যকার যে ১১ জন মুসলমান সদস্য লিখিতভাবে সাদুল্লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেবার কথা জানিয়েছিলেন, তাঁরা পরে মত বদলান, যার জন্য গভর্নর যখন পোগনভাবে বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন, বরদলৈ তাঁকে বলেছিলেন—সেই মর্হুতে তিনি কংগ্রেস পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারবেন না। গভর্নর তা হলেও বরদলৈকে সেই পর্যায়ে মন্ত্রিসভা তৈরী করতে বলেছিলেন, কারণ ইউরোপীয় সদস্যেরা নিরপেক্ষ থাকবে, এই ছিল তাঁর ধারণা।

এর পরেই কিন্তু গভর্নর নিজ ভূমিকা বদল করেন, ইউরোপীয়দের নিরপেক্ষতার মত্বাশ খসে পড়ে, নানা জোর-জবরদস্তি ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সাদুল্লার পক্ষে ১০৭ জনের আইনসভায় ৫৬ জনের সমর্থন জোগাড় করা হয়, কিন্তু বরদলৈ, না সাদুল্লা কোন পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে তা নির্ধারিত হবার সুযোগ থাকে নি, যেহেতু স্পীকার আইনসভা অনির্দিষ্টকালের জন্য মূলত্ব বি করে দিয়েছিলেন। স্পীকারের কাজ কতখানি নীতিসঙ্গত হয়েছিল, তাও বহুভাবে আলোচনার বস্তু হয়। সুভাষচন্দ্র দিল্লীতে পৌঁছে ২৭ ডিসেম্বর তারিখের এক বিবৃতিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছিলেন। তার আগে শিলঙে ২০ সেপ্টেম্বর এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তিনি ভিতরের সকল কথা খুলে বলেছিলেন, সেটি পড়লেই পাঠক ঠিক কী হয়েছিল, তা বঝতে পারবেনঃ

“সাদুল্লা মন্ত্রিসভা ১৩ তারিখে পদত্যাগ করে। সেই দিন সন্ধ্যাতেই কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা গোপীনাথ বরদলৈ মাননীয় গভর্নর বাহাদুরের আমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। গভর্নর শ্রীযুক্ত বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে বলেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ রাজি হন কিন্তু কিছু সময় চান, বিশেষত কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সাব-কমিটির সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতে চাইলেন। ১৭ তারিখে বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে শ্রীযুক্ত বরদলৈ গভর্নর বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে মন্ত্রিসভায় ৫ জন সদস্যের নাম পেশ করেন। গভর্নর নামগদলি গ্রহণ করেন—এবং জানান যে, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে সোমবার, ১৯ তারিখে, সকালে কিংবা বিকালে।

“১৭ তারিখে সন্ধ্যায় মোলানা আজাদ ও আমার একটি যৌথ বিবৃতিতে সেই অবধি সময়ের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

ওদের ভবিষ্যৎ
গায়ে তুলতে

স্বাধীনতা
সেখানে!

আমি ওদের কোন ভাবনাচিন্তা নেই।
কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে তো?
ওদের স্বাধীনতা ভবিষ্যতের কথা ভাবতে
শেখান। ভবিষ্যতের জন্য গল্প করতে শেখান।
সেই ব্যাংক টাকা জমাতে শেখান।

স্বাধীনতা সেখানে
সেই ব্যাংক



সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

করা হয়। এই যৌথ বিবৃতিটি এবং সেই সঙ্গে আমার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি মর্দিত করে পরদিন অর্থাৎ ১৮ তারিখ রবিবারে শিলঙে বিতরণ করা হয়। আমার উক্ত বিবৃতিতে আমি বলেছিলাম, শ্রীযুক্ত বরদলৈ বেসব মন্ত্রীর নাম দাখিল করেছেন সেগুন্দি গভর্নর বাহাদুর গ্রহণ করেছেন এবং সোমবার ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে। আমি এই ঘোষণা করেছিলাম, কারণ শহরে প্রবল গুজব ছড়িয়েছিল—শ্রীযুক্ত বরদলৈর দেওয়া মন্ত্রীদের নামের তালিকা গভর্নর গ্রহণ করেন নি এবং শপথ অনুষ্ঠান হবে না। বস্তুতপক্ষে শিলঙে পৌঁছবার পর থেকেই শনৈঃ, কংগ্রেসের বিপক্ষদল ক্রমাগত গুজব ছড়িয়ে যাচ্ছিল—কংগ্রেস দল মন্ত্রিত্ব পাবে না, সাদুল্লা মন্ত্রিসভাকেই আবার এনে বসানো হবে।

“কংগ্রেস-কোয়ালিশনে যোগদান করতে ইচ্ছাক্ত এমন বেশ কিছু এম এল এ-কে কড়া পাহারায় আটকে রাখা হয়েছিল এবং তাঁদের ভয় দেখানোও হয়েছিল। গত কয়েকদিনে দেখা গেছে, শিলঙে বহুসংখ্যক বাইরের লোক আমদানী করা হয়েছে কংগ্রেস-কোয়ালিশনে যোগদানে। এম এল এ-দের ভয় দেখাবার জন্য। এই সব বহিরাগতদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্পীকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

“গতকাল বিকালে কিছু মূসলমান এম এল এ-র স্বাক্ষরিত একটি পুস্তিকা শিলঙে বিতরণ করা হয়েছে। শ্রীযুক্ত বরদলৈ কর্তৃক দাখিল-করা মন্ত্রীদের নামগুন্দি গভর্নর গ্রহণ করেছেন এবং সোমবার ১৯ তারিখে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হবে—এই সংবাদগুন্দিকে উক্ত পুস্তিকায় চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এই মর্দিত পুস্তিকাটি দেখে শ্রীযুক্ত বরদলৈ তার একটি কপি গভর্নরের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সঙ্গে এক পত্রে জানান—গত ১৭ তারিখে গভর্নর বাহাদুর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম গ্রহণ করেছেন এবং ১৯ তারিখে সোমবারে শপথ অনুষ্ঠান হবে বলেছেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ এ ব্যাপারে গভর্নরের স্বীকৃতিমূলক সমর্থন চেয়ে পাঠান।

“গভর্নরের কাছ থেকে কোনো উত্তর কিন্তু আসে নি। আজ (২০ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রায় সাড়ে দশটার সময়ে গভর্নর বাহাদুর শ্রীযুক্ত বরদলৈকে ডেকে পাঠান। গভর্নর বাহাদুর জানান, মন্ত্রীদের প্রদত্ত নামগুন্দি তিনি মেনে নিয়েছেন এবং দুপুর সাড়ে বারটার সময়ে শপথ অনুষ্ঠান হবে।

“আজ এগারোটার সময়ে স্পীকার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার শাসের সভাপতিত্বে অ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসে। অধিবেশন বসার আগে ৩৯৮৯ জি এস সংখ্যক একটি এক্সট্রা-অর্ডিনারী গেজেট বেরোয় যার মধ্যে মাননীয় গভর্নর বাহাদুর পুরাতন মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং নতুন মন্ত্রিসভার গঠনের কথা জানান। সেইসঙ্গে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিতভাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ অনুষ্ঠানের রীতির বিষয়ে বলা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনেক চতুলোককে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

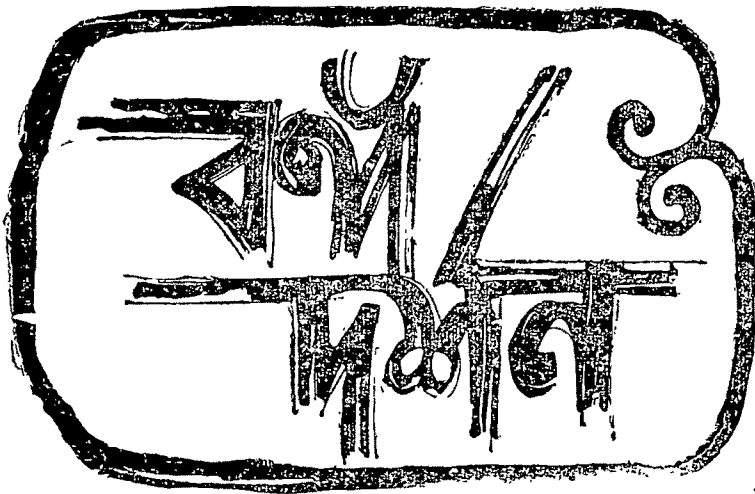
“আজ এগারোটার সময়ে অ্যাসেমব্লির অধিবেশন বসলে মাননীয় স্পীকার মহোদয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতা শ্রীযুক্ত বরদলৈর কাছ থেকে পরিস্থিতির বিষয়ে

জানতে চান। শ্রীযুক্ত বরদলৈ অবস্থার বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন, নতুন সরকার পুরাতন সরকারের নানা নীতির সমর্থন করে না; নিজেদের নীতি নির্ধারণ করে আইনসভার সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে কিছ্ সম্মত লাগবে; তাই তিনি চান, আইনসভা অনির্দিষ্টকাল স্থগিত থাক। তারপরে আলোচনা চলে। আলোচনার শেষে স্পীকার বলেন, তিনি আইনসভার অধিকারের রক্ষক। তাঁর পক্ষে এখন প্রের্ত পথ হচ্ছে অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখা। ছুটির পরে তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কার্যপরিচালনার ব্যবস্থা করবেন। অবশ্য গভর্নর মহোদয় যদি আইনসভা বাতিল করে দিতে চান তাহলে বর্তমান কার্যাবলী বন্ধ হয়ে যাবে। কী করবেন, গভর্নরই স্থির করবেন।

“সভা মূলতঃ বিহবার পরেই নতুন মন্ত্রীরা শপথ নেবার জন্য কনস্টিটিউশন হলের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা শুনলেন, গভর্নরের আসতে মিনিট কুড়ি দেরি হবে। কয়েক মিনিট কাটবার পরে চীফ সেক্রেটারী জানানলেন, গভর্নর শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত রেখেছেন এবং তিনি শ্রীযুক্ত বরদলৈকে সাক্ষাতের জন্য ডেকেছেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ তদনুযায়ী গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসভা বন্ধ করে দিয়ে স্পীকার যে-কাজ করেছেন তার বিষয়ে গভর্নর কথাবার্তার মধ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত বরদলৈ তাঁকে জানান, ও-ব্যাপারটা স্পীকারেরই সিদ্ধান্তের বিষয়। গভর্নর বাহাদুর আরও জানান, স্পীকারের সিদ্ধান্তের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে তিনি শপথ অনুষ্ঠানের সময় স্থির করার আগে শাসনতান্ত্রিক অবস্থাটা পর্যালোচনা করে নিতে চান। মন্ত্রীদের সঙ্গে এই প্রকার ব্যবহারের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত বরদলৈ প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, সব কিছ্ বিবেচনা করার পরেই গভর্নর বাহাদুরের শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আইনসভা মূলতঃ বিহবার সঙ্গে শপথ অনুষ্ঠানের কোনো সম্পর্কই নেই।

“এর মধ্যে খুবই চিত্তাকর্ষক ব্যাপার হচ্ছে, শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত হওয়া মাত্র সরকারী আমলাদের মধ্যে এক্সট্রাঅর্ডিনারী গেজেটের সকল সংখ্যা, যার মধ্যে পূর্ব মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ এবং পাঁচজন নতুন মন্ত্রীর নিয়োগের কথা ছিল—হস্তগত করবার জন্য আঁকুপাঁকু চেণ্টার অন্ত থাকে না। সেই সঙ্গে যে নোটসে মন্ত্রীদের কর্মভার গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিবৃতি ছিল তারও কপি সংগ্রহের তাড়াহুড়া পড়ে যায়।

“এই সকল চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলীর ভিতর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার গঠন বানচাল করবার জন্য ইউরোপীয় দল ও মুসলিম দলের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। গতকাল এই দলগুন্দি একটি সভা করে। আজ মুসলিম ও ইউরোপীয় এম এল এ-রা মিলিত হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব পাঠান, যাকে স্পীকার বিধিবাহিত বলে বাতিল করে দেন, কারণ মন্ত্রীরা তখনো শপথ নেন নি। ইউরোপীয় ও মুসলিম এম এল এ-রা গত কয়েকদিন অবিরত গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই যাচ্ছেন। [ক্রমশ]



স্বাধীনতা দিবসের প্রাকালে

এই সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতী পনেরই আগস্টের দুর্দিন পূর্বেই প্রকাশিত হচ্ছে। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার চতুর্বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করতে চলেছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের সঠিক অবস্থাটি এই সূর্যোদয়ে একটু পর্যালোচনা করাই প্রয়োজন। এখানে হাতাশার একটা বছর শেষ হয়ে আর একটা বছরের সূত্রপাত হল, এর

চেয়ে বেশি আর কিছুর বলা যায় না। স্বাধীনতা দিবসের কোন মূল্যই পশ্চিমবঙ্গে নেই, কেন না, জনসাধারণের বৃহত্তম অংশ এখানে স্বাধীনতার স্বাদ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। গত তেইশ বছরে, ধীরগতিতে হলেও, ভারতের অপরাপর রাজ্যগুলি অনেকটা এগিয়েছে, পঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর তো রীতিমত উন্নতি হয়েছে, বাকি রাজ্যগুলির উন্নতির গতি এত দ্রুত না হলেও সেগুলি উন্নতির দিকে চলেছে। সে সকল স্থানেও দারিদ্র্য আছে, জীবিকার সংস্থানের ক্ষেত্রে অসুবিধাও

আছে, কিন্তু তা হলেও পশ্চিমবঙ্গের মস্ত সামাজিক অবস্থা কোথাও নেই। এই সকল রাজ্যের উন্নতি এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অবনতির পিছনে ফয়েকটি বাস্তব কারণ রয়েছে, তার প্রথমটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং এই নীতি সুস্পষ্টই বৈষম্যমূলক নয় কি? প্রশাসন মোটামুটিভাবে পঞ্জাবী, মাদ্রাজী ও মহারাষ্ট্রীয়দের করতলগত, আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় চিরদিন উত্তরপ্রদেশীয়দের প্রাধান্য। কাজেই এই রাজ্যগুলি স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের দক্ষিণা পেয়েছে। আর দিল্লীর প্রশাসন পৃথক হলেও ভৌগোলিকভাবে তা পঞ্জাবেরই অন্তর্ভুক্ত এবং সেই কারণেই সরকারী দপ্তরগুলিতে পঞ্জাবীদেরই প্রাধান্য। এটাই ব্যাখ্যা করে যে, কেন পঞ্জাবের উদ্ভাস্ত সমস্যা সমাধানে কেন্দ্র এত তৎপর ছিল এবং কেন পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এক যাত্রায় পৃথক ফল হল। অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের যা নীতি, পশ্চিমবঙ্গ তার শিকার—নীতিটা কি? যে সকল রাজ্য অনন্নত, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ বেশি হবে, এই আপাতনির্দোষ নীতির ধাক্কায় পশ্চিমবঙ্গ মার খাচ্ছে এবং উত্তরপ্রদেশের উন্নতি হচ্ছে—কেন না, কাগজে-কলমে

মহাপ্রয়াণে ত্রৈলোক্য মহারাজ

বিপ্লবী মহানায়ক মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী আর নেই। মহারাজ অবিস্তৃত ভারতে বৃটিশ শাসকদের মহাশত্রু। খণ্ডিত এই মহাদেশে পাকিস্তানের নাগরিক — ভারত-পাকিস্তানের আর হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীতে বিশ্বাসী। মহানায়কের শেষ ইচ্ছা ছিল ভারতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে পাকিস্তানে শেষ নিবাস ত্যাগ করবেন। সে আশা পূরণ হোল না।

‘মহারাজ’ জনতার মহারাজ। দিল্লী আর কলকাতা—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এক দিকের দুই শক্ত ঘাঁটি আজ বিদেশী শাসন-মুক্ত। এই দুই মহানগরীর জনতা এদিন উদ্বেল। শোকস্নান দিল্লীর পথে হাজার হাজার মানুষ আর কলকাতার রাজপথে লক্ষ লক্ষ। লোকচক্ষুর আড়ালে প্রচারের চক্কানিনাদকে এড়িয়ে যে বিপ্লবীরা নিজেদের লক্ষ্যের জন্য সাধনা করে গেছেন, তাঁদের কারো শোকযাত্রায় স্বাধীনতা-উত্তর কলকাতায় আর এ দৃশ্য দেখা যায় নি। জনতার মহারাজ—প্রকৃত মহারাজের প্রম্ধা পেলেন কলকাতার মানুষের কাছে।

বহু মিছিলের সাক্ষী মহানগরী কলকাতা। সাম্প্রতিককালের কলকাতায় এক নতুন দৃশ্য। শৃংখলাহীনতার অভিযোগে দৃষ্ট কলকাতায় এদিন নতুন রূপ। দমদম বিমানবন্দরে এত সূক্ষ্মখল



জনতার দৃশ্য পুরনো দিনের কলকাতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের

মিছিল দমদম থেকে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে পৌঁছতে রাত্রি গভীর থেকে গভীরতর হয়ে যায়।

বৃটিশ শাসকের দাস, অনুশীলন সমিতির অন্যতম নায়ক, বিপ্লবী সমাজ-তন্ত্রী দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দলের প্রেরিত নেতা, পাকিস্তানকে ধর্মানিরপেক্ষ রাষ্ট্র পরিণত করার অক্লান্ত যোদ্ধা, বার্মকোও চিরনবীন মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী অশ্রুত দেহে কিন্তু শক্ত মনে ২৪শে জুন তারিখে ভারতে পা দিলেন। সেদিন থেকে তিনি অভিনন্দন পেয়ে এসেছেন ভারতবাসীর। অভিনন্দন পেয়েছেন মহানগরী দিল্লীতে। রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী থেকে সুর করে মহানগরীর দীনতম মানুষের প্রম্ধা পেয়েছেন। ১ই আগস্ট তাঁর কলকাতায় ফিরে আসার কথা ছিল। জীবিত মহারাজ আর কলকাতায় ফিরে এলেন না। ফিরে এল তাঁর নম্বর মরদেহ সামরিক বিমানে বীবের মর্যাদায়। ১ই আগস্টের প্রভাতে দিল্লীতে ডঃ ত্রিগুণা সেনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সাক্ষাৎকারের কথা ছিল। ডঃ সেন আর মহারাজের বিপ্লবী জীবনের কনিষ্ঠ জনজন্মের অন্যতম ত্রিদিবকুমার চৌধুরী আর ভূপেশ গুপ্ত বয়ে নিয়ে এলেন তাঁর মরদেহ কলকাতায়।

—(দৈনিক বসুমতী থেকে।)

সাম্প্রতিক বঙ্গদেশ

এবং বাস্তবিক পশ্চিমবঙ্গ শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য, উত্তরপ্রদেশ তা নয়। প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে এক অভিনব সামান্যীত গ্রহণ করা হয়েছে, যার ফলে মার খাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। সে নীতিটা কি? প্রাকৃতিক সম্পদের কোটা সকল রাজ্যেই সমান। অর্থাৎ আকরিক লৌহ পশ্চিমবঙ্গ যা পাবে, উত্তরপ্রদেশও তাই পাবে। পশ্চিমবঙ্গে উত্তরপ্রদেশের চেয়ে বেশি গুণ বেশি কারখানা থাকলেও কাঁচামালের ক্ষেত্রে ভাগ উভয় রাজ্যেরই সমান, অর্থাৎ উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে কারখানার তুলনায় কাঁচামাল বেশি বলে উৎপাদনের বাড়াবাড়ন্ত, আর কাঁচামালের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি কারখানার উৎপাদন বন্ধ। অর্ডার দেবার ক্ষেত্রেও ঐ আজব সামান্যীতি। উত্তরপ্রদেশের দশটি ইঞ্জিনয়ারিং শিল্প যে অর্ডার পাবে, পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোটি কারখানা ঐ একই অর্ডার পাবে, যার ফল ওদের বাড়াবাড়ন্ত, আর আমাদের কারখানাগুলির অর্ডার প্রাপ্তির অভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া।

ইঞ্জিনয়ারিং শিল্পে আজ ভারতব্যাপী জৈয়ারের লক্ষণ দেখা গেছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনয়ারিং কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কারণটা উপরেই উল্লেখ করেছি। কাঁচামাল নেই, অর্ডার নেই। উত্তরপ্রদেশের কলকারখানা বাড়ুক তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তাদের কলকারখানার সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের সমান হোক এটাও কাম্য। কিন্তু এই সমান করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পাঁচশোটি কারখানাকে লাটে তুলে দশটিতে নামিয়ে এনে উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে সমান করার আজব সামান্যীতির খাঁর উদ্যোক্তা, তাদের বৃদ্ধির জরিফ করতে হয়।

ষেটা সবচেয়ে দৃষ্টান্তের বিষয় পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ সমস্যাবলী, যা শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই নিজস্ব এবং ষেগুলির অনুরূপ সমস্যা অন্য কোন রাজ্যে নেই, সেগুলির প্রতি দিল্লীর চরম ওদাসীনা। অথচ দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি বিশেষ সমস্যা আছে। ষেগুলি কেন্দ্র বিশেষভাবে দেখবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কোনদিনই হয় নি। সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে নাকি হ্রাসের রাজত্ব, আর বাঙালীমাত্রেই কমিউনিস্ট। নয়াদিল্লীতে কলেজে বাঙালী ছেলেমেয়ে ভীত করা নিষিদ্ধ হয়েছে। দিনের পর দিন সংবাদপত্রে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে নিরবচ্ছিন্ন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিদেশী অপসংস্কৃতির ভাবধারায় পুষ্ট নয়াদিল্লীর প্রভাব-প্রতিপত্তিসম্পন্ন অধিবাসীদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ তার সংস্কৃতি,

তার গণ-আন্দোলন, তার বামপন্থী ভাবধারা—সমস্ত কিছুই তাজিলোর বিষয়। তাদের কথাবার্তা জাতিবৈষ্যেবের গন্ধকে তারা আজ চেপে রাখার প্রয়োজনবোধ করে না। হেন কোন অপবাদ নেই, যা এই অপসংস্কৃতির বাহকরা পশ্চিমবঙ্গ ও তার অধিবাসীদের ওপর চাপায় নি। স্বাধীনতার চতুর্বিংশতি বৎসরে পশ্চিমবঙ্গের এই হাল হয়েছে। অতঃপর আমরা বিষয় ধরে আলোচনা করব।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি,

আইন ও শৃঙ্খলা

একটি স্থায়ী প্রগতিশীল সরকার এবং পরিচ্ছন্ন প্রশাসনব্যবস্থা যা পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় অবস্থার কিছুটা প্রতিকার করতে পারে, তা বর্তমান বর্ষে এখান্ডই অনুপস্থিত। প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার অকর্মণ্য ছিল না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেশ সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকাই অবলম্বন করেছিল, কিন্তু সকলেই জানেন, বিভিন্ন শরিক দলের পারস্পরিক কলহ, দলীয় প্রাধান্য বিস্তারের উদগ্র প্রবণতা এবং এর জন্য দলীয় নেতাদের প্রচণ্ড নেপথ্য প্রয়াস, সব কিছু মিলে সে সরকার টেকে নি। প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরেও যুক্তফ্রন্টের চাঙ্গা করে তোলা যেত, কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি পারস্পরিক আপোষে নারাজ হবার ফলে তা হল না। রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এ তো নিছক যান্ত্রিক শাসন, কোনগতিকে প্রশাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে দেওয়া। দীর্ঘমেয়াদী কোন আর্থিক পরিকল্পনা নেবার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসনে করা সম্ভবপর নয়, উন্নয়নমূলক বিচিত্র কাজে প্রয়োজনীয় ব্যয়বরাস্তার পথেও বাধা আছে। ফলে অপরাপর রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা শোচনীয় থেকে শোচনীয়তর হয়েছে, নয়াদিল্লীর যান্ত্রিক নির্দেশ ও সি-আর-পি দিয়ে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয় নি, হতেও পারে না। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের কথাই চিন্তা করছে, কিন্তু সেটা কবে হবে তা জানা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, উগ্রপন্থীদের ক্রিয়া-কলাপ, এগুলি একটি গভীরতর সামাজিক চাহিদা থেকে গড়ে উঠেছে, এবং সেই চাহিদাকে পূরণ না করলে, রোগের আসল কারণটি দূর না করলে রোগের শাসনে অধিকতর দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু দুর্যোগের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকার সি-আর-পি পাঠাতে যত আগ্রহী, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাবলীর গভীরে যেতে ঠিক ততটা আগ্রহী।

বেকার সমস্যা, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও উগ্রপন্থী

ক্রিয়াকলাপ

পশ্চিমবঙ্গের আসল সমস্যা বেকার সমস্যা এবং যাবতীয় সামাজিক অশান্তির এটাই মূল কারণ। পশ্চিমবঙ্গের আয়তনের তুলনায় লোকসংখ্যা অত্যন্ত বেশী। পূর্ব-পাকিস্তানের এক-তৃতীয়াংশ লোক তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ীভাবে বাস করছেন, এ ছাড়া অপরাপর রাজ্য থেকেও বহু লোক পশ্চিমবঙ্গে এসে রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য অব্যাহত কবলিত, এখানে বাঙালী ছেলেদের চাকরি পাবার কোন উপায় নেই। এ ছাড়া সরকারী চাকরির ক্ষেত্রেও খুব সীমাবদ্ধ। আর কোন ক্ষেত্রেই খুঁটির জোর না থাকলে কিছুই হয় না। গৃহগুলি বসবাসের অনুপযোগী। শান্তিতে দু'দশ-শ্রম্য হয়ে বসে চিন্তা করাবও কোন স্থান নেই। শিক্ষা পদ্ধতি শূন্য অবৈজ্ঞানিক নিকই নয়, এক কথায় অপরাধমূলক। সর্বোচ্চ ডিগ্রি পেয়েও চাকরি মেলে না। আমরা বিগত একটি সংখ্যায় ব্যাখ্যা করেছিলাম যে, কেন উগ্রপন্থীরা এই বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিনাশ চায়। সমাজের উপরতলা দুর্নীতি ও ব্যভিচারে পরিপূর্ণ। কাজেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার প্রত্যেকটি মূল্যবোধের প্রতিই মানুষের বিতৃষ্ণা এসে গেছে। প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলি ও তাদের নেতারা পথ দেখাবে অক্ষম। তাঁরা প্রত্যেকেই গদীর লড়াই-এ মত্ত। এ হেন পরিবেশে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপ খুবই স্বাভাবিক, এবং সৈন্যকে পুর্লিখ, সি-আর-পি দিয়ে ঠেকানো কোন-ক্রমেই সম্ভবপর নয়। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিদ্যায়তন কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। আর হবে নাই বা কেন? লেখাপড়া শিখে কি লাভ? কেন না তা যখন করে খেতে সাহায্য করবে না, বরং বেকার জীবনের যন্ত্রণায় সকল অধীত বিদ্যাই ভুলে যেতে হবে, তখন এমন কি মাথাবাথা পড়েছে যে, এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে হবে? এই মূল জিজ্ঞাসাটাকে এড়িয়ে গালভরা বীল আর সি-আর-পি দিয়ে, আর প্রশাসনশীর্ষে কিছু জরদগব আমলাকে বসিয়ে রেখে কার্যত উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে অধিকতর স্বাগত জানানো হচ্ছে। কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানের উপরই পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

শিল্প-বাণিজ্য, ক্রটিপূর্ণ

পরিকল্পনা

কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপক শিল্পোদ্যোগ দরকার।

এম. ডি পরীক্ষা সম্পর্কে

এম. ডি পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্ব, আত্মীয় পোষণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অবাধ প্রয়োগের অভিযোগ করে কয়েকজন এম. ডি পরীক্ষার্থী এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের নিকট এক স্মারকলিপি পেশ করেছেন এবং ফ্যাকাল্টি অফ মোর্ডিসিনের উচ্চপদস্থ কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিয়ে তাঁদের অভিযোগসমূহ তদন্ত করার দাবী জানিয়েছেন।

পরীক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এম. ডি পরীক্ষার বিষয়ে তদন্তের দাবী আজ নতুন নয়। অতীতে এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বহু পরীক্ষার্থীর বহু সূনির্দিষ্ট অভিযোগ মাসের পর মাস আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বহুবার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবীও জানানো হয়েছিল। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তদন্তের দাবী জানিয়েছিলাম। কিন্তু কোন ফল হয় নি। গতবারের সঙ্গে এবারের দাবীর পার্থক্য এই যে, গতবার পরীক্ষার্থীরা উপাচার্যের কাছে লিখিত দাবী পেশ করেন নি, এবার করেছেন।

কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছেন যে, এবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের জটীক ক্ষমতাবান ব্যক্তি পরীক্ষক হতে না পারলেও তাঁর চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী পুত্র মারফৎ নাকি প্রিয়জনদের রোল নম্বরের তালিকা পাঠান কোন কোন পরীক্ষকের কাছে এবং তাঁদের পাশ করাবার সুপারিশ করেন। কিন্তু পরীক্ষকেরা সেই সুপারিশ অগ্রাহ্য করে যোগ্যতা অনুযায়ী পাশ করান।

শোনা যাচ্ছে গত ৭ই আগস্ট কর্তৃপক্ষ নাকি পরীক্ষার্থীদের স্মারকলিপি বিবেচনা করেন এবং এবারের পরীক্ষার ব্যাপার অনুসন্ধানের জন্য তিন জনকে নিয়ে একটা কমিটি নিযুক্ত করেছেন। যে কর্তৃপক্ষ এত লেখালেখিতেও অতীতে নীরব ছিলেন, এবার তাঁরা এত তৎপর কেন? ছাত্রদের দাবী অনুযায়ী ফ্যাকাল্টি অফ মোর্ডিসিনের সেই “উচ্চপদস্থ দায়িত্বশীল ব্যক্তিও” কি অনুসন্ধানের জন্য মনোনীত হয়েছেন?

কিছু পরীক্ষার্থী মনে করেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই সাজান এবং এটা জটীক ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিজেকে পরীক্ষক হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অথবা নিজের অনুরূপদের পরীক্ষক করে নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখার প্রচেষ্টা? পরীক্ষকেরা প্রশ্ন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি এই প্রচেষ্টার সহায়ক হবেন?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের নিবেদন—তাঁরা যদি সত্যি এম. ডি পরীক্ষার দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে চান, তবে তাঁরা যেন কোন যথার্থ নিরপেক্ষ জনসাধারণ ও ছাত্রদের আস্থাভাজন কোন তদন্ত কমিটির দ্বারা গত দশ বছরের এম. ডি পরীক্ষার ব্যাপার ভালভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ভবিষ্যতে এই পরীক্ষায় দুর্নীতিবোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গত দশ বছরে যারা পরীক্ষক হয়েছেন, তাঁদের দ্বারা বা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা তদন্ত করে জনসাধারণ বা ছাত্রদের আশ্বস্ত করা যায় না।

পাশে দাঁড়িয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু ভারত জুড়েই তাৎকথ্য করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার যে নীতি নিয়ে ছিলেন সে ক্ষেত্রেও অপপ্রচার চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে খেলো করা হচ্ছে। ভূমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা মত স্বীকার করলেও কার্যক্ষেত্রে তাকে রূপায়িত করার যে সাহস যুক্তফ্রন্ট সরকার দেখিয়েছিলেন তা বর্তমান শাসকদের দ্বারা

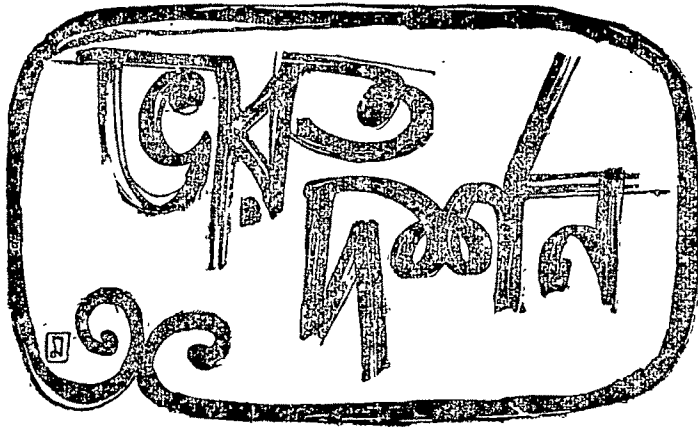
হবে না। ও কাজটা অহিংস উপায়ে হয় না। বলাই বাহুল্য, এই নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একটা দুর্ভোগ আসন্ন এবং ভারতবর্ষের অপরাপর রাজ্যেও তার প্রভাব পড়বে। উগ্রপন্থী আন্দোলনের এটাও একটা মস্ত বড় কারণ, এবং এ ক্ষেত্রেও ভূমি সংস্কার ব্যতিরেকে উগ্রপন্থা দমন করা যাবে না। ভূমির ক্ষেত্রে অনাচারের অবসান বিগত তেইশ বছরে হয় নি, যেটা সর্বাগ্রে হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

৮ই আগস্ট, ১৯৭০

আমরা আগেই বলেছি যে, অব্যাহত শিল্পপতিরা বাংলার ছেলেদের কাজকর্ম নেবে না, এবং তারা এখানে নতুন আরও কল-কারখানা খুললেও সেখানে স্থানীয় লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব কমই থাকবে। কাজেই বেকার বাঙালী ছেলেরা যাতে নিজের থেকে উদ্যোগী হয়ে ওঠে, সরকারের সেই চেষ্টা করা উচিত। গত তেইশ বছরে সত্যি কিন্তু এই জাতীয় প্রচেষ্টা হয় নি। এতদিনেও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি, অথচ এই বিদ্যুৎই পাঞ্জাব ও তামিলনাড়ুর ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য, গ্রামের থেকে শহরে লোক আসা বন্ধ করার জন্য কোন পরিকল্পনামাফিক শিল্পোদ্যোগ ঘটে নি। প্রতিটি গ্রামেরই কিছু না কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, যোগ্যলিকে অবলম্বন করে প্রচুর ছোটখাট শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রায় প্রতিটি গ্রামের আছে। এ ছাড়া গ্রামে পরিকল্পনামাফিক স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি খোলারও প্রয়োজন ছিল, সেগুলিতেও বহু লোকের কর্মসংস্থান হত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে আরও দু’একটি শহর সুপারকম্পিউতভাবে গড়ে তোলা উচিত ছিল। উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে একাধিক বড় শহর থাকায় চাপটা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত কিছুই কলকাতা-মুখী হওয়ায় বিপদ আরও বেড়েছে।

শ্রমবিরোধ, ভূমিসংস্কার

পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের পক্ষে আরও একটি বড় বাধা হল শিল্পপতিদের একটি অশুভ যুক্তি যে, এখানে শ্রমবিরোধ অত্যন্ত বেশি। শ্রমিকেরা কথায় কথায় ধর্মঘট করে, আন্দোলন করে, আর যুক্তফ্রন্টের আমল থেকে ঘেরাও বলে একটা ব্যাপার তাঁদের বড়ই পীড়িত করছে। এই কারণেই তাঁরা বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পের প্রসারের পরিবর্তে তাঁরা তা গুটিয়ে নিতে পারলে বাঁচেন। এই নগ্ন মিথ্যাটির প্রতিবাদ দায়িত্বশীল মহল থেকে ওঠে নি। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকের মজুরি ভারতের অন্যান্য যে কোন রাজ্যের চেয়ে কম। বিগত দশ বছরে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বেড়েছে, মজুরী সে হারে বাড়ে নি, কোন কোন ক্ষেত্রে আদৌ বাড়ে নি। যেখানে শিল্প আছে সেখানেই শ্রমবিরোধ আছে, ইংল্যান্ড-আমেরিকাও ব্যতিক্রম নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনদিন মালিকদের প্রতি দৃঢ় হয় নি। শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে মালিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আরও শক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল, এবং তা কার্যকরী করারও দরকার ছিল। দর্ডগঞ্জের এ সমস্ত কিছুই হয় নি। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রমিকদের



ভারত-পূর্ব জার্মানী সম্পর্ক

ভারত এবং পূর্ব জার্মানি গভর্ন-মেন্ট স্থির করেছেন যে, অতঃপর দুই দেশের (ভারত-পূর্ব জার্মানী) মধ্যে কনসাল্টে-জেনারেল পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। অর্থাৎ ভারত বালিনে একজন ভারতীয় কনসাল-জেনারেল নিয়োগ করবে এবং পূর্ব জার্মানী দিল্লীতে একজন কনসাল-জেনারেল নিয়োগ করবে। এতদিন দুই দেশের মধ্যে ট্রেড কমিশনার পর্যায়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল গত ৩রা আগস্ট পার্লামেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীস্বরণ সিং এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

বিত্তীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই জার্মানী দেশটা দু' ভাগ হয়ে আছে। পশ্চিম অংশের নাম ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানী, আর পূর্ব অংশের নাম জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির নায়করা পটসডামে বসে জার্মানীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যুদ্ধের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের তাগিদে ইং-মার্কিন-রুসসী জোট সেই চুক্তি কার্যত বাতিল করে দেন এবং তাঁদের অধিকৃত পশ্চিম জার্মানীতে একটি গভর্নমেন্ট গঠন করে সেটাকেই সমগ্র জার্মানীর গভর্নমেন্ট বলে চালাতে চেষ্টা করেন। তখন সোভিয়েট অধিকৃত পূর্ব জার্মানীতেও একটা আলাদা গভর্নমেন্ট গড়ে ওঠে। ফলে গোটা জার্মানী দু'টি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভারতের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকদিন আগেই। কিন্তু পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্কটা ছিল ট্রেড কমিশনার বিনিময়ের পর্যায়ে। এতদিনে সেটা কনসাল্টে-জেনারেল বিনিময়ের পর্যায়ে উন্নীত হতে চলেছে। এতদিন পশ্চিম জার্মানী জিদ ধরে বসেছিল যে, যে সব দেশ পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে, তাদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর কূটনৈতিক সম্পর্ক

ছিদ্র হয়ে যাবে। কিছুকাল আগে পশ্চিম জার্মানীর নতুন গভর্নমেন্ট সেই সত্য প্রত্যাহার করেছেন। তারা নিজেরাই এখন পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছেন। এ অবস্থায় ভারত যে পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের সম্পর্ক গড়ে তোলতে ইচ্ছুক, তা বোঝা যাচ্ছে না। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কনসাল্টে-জেনারেল বিনিময়ের পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে যে, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের বার্ষিক, অর্থনৈতিক এবং সংস্কৃতি বিনিময় ক্রমবর্ধমান। কাজেই দুই দেশের মধ্যে কনসালার সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

পার্লামেন্টে সব দলের সদস্যরাই সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, তবে স্বতন্ত্র এবং এস-এস-পি দলের সদস্যরা এই সঙ্গে ইসরায়েল এবং তাইওয়ানকেও স্বীকৃতি দেবার দাবী তোলেন। স্বরণ সিং বলেন যে, তাইওয়ান নিজেকে চীন বলে পরিচয় দিতে চাইছে। ভারতের পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। আর ইসরায়েলকে ভারত স্বাধীন দেশ হিসাবে স্বীকার করলেও সেই দেশের সঙ্গে কনসালার বা রাষ্ট্রদূতীয় সম্পর্ক স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে না।

মানচিত্রে গলদ

সোভিয়েট রাশিয়ার গ্রেট এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রকাশিত (দিশ্বকোষ) বিশ্বের মানচিত্রে ভারতের নেফা অঞ্চল এবং আকসাই চীনকে চীন দেশের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ বছর ধরে নাকি মানচিত্রটা এইভাবেই চালু আছে। বিষয়টা নিয়ে গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে তুমুল হটগোল হয়ে গেছে এবং প্রতিবারে স্বতন্ত্র, জনসম্মত, পি-

এস-পি, সিন্ডিকেট এবং এস-এস-পি'র সদস্যরা দু-দুবার সভাকক্ষ ত্যাগ করেছেন। এ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বলেন যে, সংশ্লিষ্ট মানচিত্রটি ভারতের পক্ষে দৃষ্টান্তগত। সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমাগত এই ভুল মানচিত্র প্রকাশ করে যাচ্ছে দেখে ভারত অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। অতীতে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই মর্মে প্রতীতি দি়েছিল যে, এই মানচিত্রের কোন রাজনৈতিক তাৎপৰ্য নেই এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণ করে না। সত্যিই যদি তাই হয়, তাহলে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের মানচিত্রে ক্রমাগত একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যাচ্ছে কেন, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। নেফা এবং আকসাই চীনকে তারা কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে, সেটা তাদের স্পষ্ট করে ঘোষণা করা উচিত।

শুদ্ধ সোভিয়েট ইউনিয়ন নয়, আমেরিকা এবং রাষ্ট্রসংঘের মানচিত্রেও ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বহু গলদ ধরা পড়েছে। পররাষ্ট্র দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্রপাল সিং জানিয়েছেন যে, মার্কিন তথ্যকেন্দ্র "ইউনাইটেড নেশন্স এ্যাট টেলেগ্ৰাফ" নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেছে, তাতে ভারতের এলাকা ৩০ লক্ষ ৪৬ হাজার ২০২ বর্গমাইল বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতীয় এলাকা থেকে একেবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৬ সালের ১লা জানুয়ারী ভারতের সাভেয়ার জেনারেলের হিসাব অনুযায়ী ভারতীয় এলাকার পরিমাণ ছিল ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯০ বর্গমাইল। রাষ্ট্রসংঘের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইয়ারবুকেও নাকি ভারতীয় এলাকা সম্পর্কে এই ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে। ভারত সম্পর্কে এই ধরনের ভুল তথ্য পরিবেশিত হওয়া যে দেশের পক্ষে অতান্ত বিপজ্জনক, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই সমস্ত ভুল সংশোধনের জন্য ভারত সরকারের অবিলম্বে তৎপর হওয়া উচিত।

ওড়িশার রাজনীতি

১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে গত সাড়ে তিন বছর যাবৎ ওড়িশায় স্বতন্ত্র-জন কংগ্রেস কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট চালু আছে। জন কংগ্রেস পুরোনো কংগ্রেসেরই একটা ভাঙা দল। বিজু গুণারায়ের সঙ্গে বিনিবনা হয় নি বলে পিওগমোহন প্রধানের নেতৃত্বে একদল পুরোনো কংগ্রেস কর্মী জন কংগ্রেস গঠন করেন এবং হরেকৃষ্ণ গহতাব তাঁদের ফ্রেন্ড, ফিল-

সাপ্তাহিক বঙ্গব্রতী

ছফার এবং গাইড হয়ে যান। আর ওড়িশার স্বতন্ত্র পার্টি প্রাঙ্গন দেশীয় নৃপতিদের নিয়ে গঠিত। স্বতন্ত্র-জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ওড়িশায় বেশ নির্বিবাদেই শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ বিরোধী দলের অবস্থা মোটেই তেজী নয়। কিন্তু গত বছর কংগ্রেস দল দু'ভাগে ভাগ হবার পর জন কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের (হিন্দু-পন্থী) মিটিংয়ের কথা হিঁস্লে। তাতে জন কংগ্রেসের ভিতরে দলদলি হয় এবং কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করে আলাদা দল গঠন করেন। কিন্তু তাতে মন্ত্রিসভা বিপর্যয় হয় নি এবং দলত্যাগী সদস্যরা কেউ কেউ আবার স্বদলে ফিরে গিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে জন কংগ্রেসের রাজ্য কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে ওড়িশায় অবিলম্বে নতুন নির্বাচনের দাবী তুলেছেন। জন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্ত সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করেন গ্রীহরেক্ষ মহতাব। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও জন কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেছেন। জন কংগ্রেসের এই নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের তার দেওয়া হয়েছে পবিত্রমোহন প্রধান, সুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক এবং রবীন্দ্রনাথ পট্টনায়ককে নিয়ে গঠিত এক কমিটির উপর। কোয়ালিশনের মধ্য-মন্ত্রী আর এন সিংদেও জন কংগ্রেসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেছেন যে, স্বতন্ত্র পার্টি মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষপাতী নয়। অপরাধকে জন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জন কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেই যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। দলের প্রেসিডেন্ট পবিত্রমোহন প্রধান বলেছেন যে, তাঁদের প্রস্তাব বাধ্যতামূলক (ম্যান্ডেটরী) নয়। ওঁদিকে হরেক্ষ মহতাব শুধু পার্টি থেকেই পদত্যাগ করেন নি, রাজ্য আইনসভা থেকেও পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর পদত্যাগের সঙ্গে জন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কোন সম্পর্ক নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "ভারতের তথা ওড়িশার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ঐতিহাসিক পন্থার বিবর্তনই তাঁকে পদত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছে"। তার আসল মর্মটা যে কি, তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে জন কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের পর ওড়িশার বর্তমান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পরমায়ু যে কমে এসেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে ওড়িশার সকল দলের নেতাদের মধ্যে জোর শলাপারামর্শ চলছে। মধ্য-মন্ত্রী সিংদেও বিষয়টা নিয়ে বিজু পট্টনায়কের স্বাধীন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট গঙ্গাধর মহাপাত্র এবং হরেক্ষ

মহতাবের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে, জন কংগ্রেস কোয়ালিশন ত্যাগ করলে বিজু পট্টনায়কের দল কোয়ালিশনে ঢুকে মন্ত্রিসভাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন। ওড়িশা আইনসভায় সদস্যের সংখ্যা ১৪০ জন। তার মধ্যে বিজুর দলের সদস্য আছেন ১৫ জন। ওড়িশার রাজনীতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে আরও দুই-একদিন না গেলে পারিস্কার কোন চিহ্ন ফুটে উঠবে না। তবে এটুকু বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বর্তমান কোয়ালিশনের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

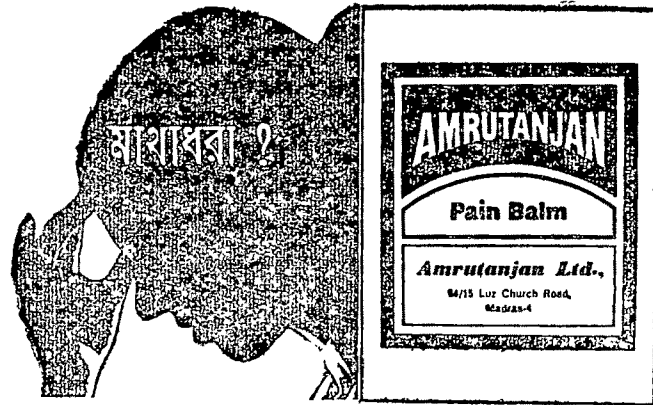
ব্যাঘ্র বিনাশ

ভারতবর্ষ বাঘের দেশ হিসাবে বিশ্ব-বিখ্যাত। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখতেও যেমন অপূর্ব, বল-বিক্রমেও তেমনি অপূর্ব। মানুষ খেতেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। তবে সুন্দরবনের অসংখ্য মানুষ সেই বাঘের সঙ্গেই সহ-অবস্থান করছেন। বাঘ তাঁরা ভালবাসেন এবং ব্যাঘ্র দেবতার পূজা করেন। তবে নিতান্ত দূরে না পড়লে বাঘের ধারে-কাছে তাঁরা বড় একটা ঘেঁষতে চান না।

বাঘ হচ্ছে ভারতের একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা—ব্যাঘ্র-শিকারীদের বাঘ বিনাশের তৈলায় বাঘের

সংখ্যা দেশে ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৩০ সালে ভারতের বিভিন্ন জঙ্গলে প্রায় ৪০ হাজার বাঘ বসবাস করত। সেই বাঘের সংখ্যা বর্তমানে আড়াই হাজারে নেমে এসেছে। শিকার এবং জঙ্গলচ্ছেদই তার প্রধান কারণ। ভারতীয় ব্যাঘ্র বংশকে অবলুপ্ত হাত থেকে বাঁচাবার জন্য হিমাচল, অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, কেরল, তামিলনাড়ু, মহীশূর এবং রাজস্থানে ব্যাঘ্র শিকার নিষিদ্ধ হয়েছে। পশ্চিম-বঙ্গ সরকার এ সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত কেন যে নেন নি, তা বোঝা যাচ্ছে না। সুন্দরবনের বাঘ এখনও দুই বাঙলার আত্মিক একের প্রতীক। সেখানকার বাঘ নাকি রাজনৈতিক সীমানা অগ্রাহ্য করে অবাধে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যাতায়াত করে। পাসপোর্ট, ভিসার ধার কখনও ধারে না। বাইরের পৃথিবীতেও তার বেঙ্গল টাইগার নামেই (ওয়েস্ট বেঙ্গল অথবা ইস্ট-বেঙ্গল টাইগার নয়) পরিচিতি। সুন্দরবনের বাঘ একাবাক্ষি বাঙালী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। তাদের বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের বংশবৃদ্ধির সুব্যবস্থা করা উভয় দেশের রাজ্য সরকারেরই দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনে তাঁদের কোন বিধা থাকা উচিত নয়।

—৮-৮-৭০



আমৃতাজনি চটপট যন্ত্রণা কমায়ে!

আমৃতাজনি, ফিক বাথা, সর্দিকাশি, কি পেশীর যন্ত্রণায় আমৃতাজনি লাগান—সঙ্গে সঙ্গে আরাম। ৭৫ বছরের ওপর ঘরে ঘরে নির্ভাবনা সবাই ব্যবহার করছেন। এক শিশি সব সময় হাতের কাছে রাখুন। 'জ্বর' ও 'কমদামী ছোট্ট কোটোতেও পাওয়া যায়। আমৃতাজনি ৪ সর্দিকাশি ও ব্যাথা-বোঝা উপশমে দশ ওষুধের এক ওষুধ।

আমৃতাজনি লিমিটেড

AM 598B

আন্তর্জাতিক

পশ্চিম এশিয়াঃ

এই আগস্ট থেকে পশ্চিম এশিয়ায় আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে যুদ্ধবিরাতি কার্য-করী হয়েছে। দু'পক্ষ থেকেই কোন প্রকার গুলীবর্ষণ, বোমাবর্ষণ বা আক্রমণ করা হয় নি।

পশ্চিম এশিয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘের শান্তিদূত ডঃ গানার জারিংকে তাঁর সুইডেনের বাড়ি থেকে রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট ডেকে এনেছেন। গানার জারিং এখন রাষ্ট্র-সংঘে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করছেন, কিভাবে তিনি এখন দু'পক্ষের মধ্যে আপোষ-আলোচনা চালাবেন। নিউ ইয়র্ক বা নিকোসিয়ার নাম শোনা যাচ্ছে আলোচনার স্থান হিসাবে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও ইজরায়েল 'রজাস' শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এই সংবাদে খুশি হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন উইলিয়াম রজাসকে সঙ্গে নিয়ে যে সাংবাদিক সম্মেলন করেন, সেখানে তিনি বলেন, "এটা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এখনও অনেক অসুবিধা আছে।"

সত্যি, অসুবিধা এখনও অনেক। এই আগস্ট যে যুদ্ধবিরাতি হয়েছে, তার ফলে ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র,

জর্ডানের পক্ষ থেকে গুলীবর্ষণ হয় নি এমন কি, যে সিরিয়া ও ইরাক যুদ্ধবিরাতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাও কোন-রূপ আক্রমণ করে নি। কিন্তু, প্যালে-স্টাইন গেরিলারা যুদ্ধবিরাতিকে মানেনি। যুদ্ধবিরাতির পরেও জর্ডানের ভেতর থেকে তারা ইজরায়েলীদের লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছে।

প্যালেস্টাইন গেরিলাদের নেতারা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, তাঁরা যুদ্ধ-বিরাতি মানবেন না। আশ্মানে তিন হাজার গেরিলা বিক্ষোভ মিছিল পরিচালনা করেছে রজাস' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এই মিছিল থেকে "বিশ্বাসঘাতক নাসেরের" বিরুদ্ধে নানা প্রকার ধর্নি দেওয়া হয়েছে। রজাস' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানা-বার জন্য আশ্মানে পঁচিশ হাজার মানুষের এক বিরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে প্রধান গেরিলা সংস্থা 'আল্ ফাভার' নেতা ইব্রাহিমের আরাফাত ঘোষণা করেন, তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন। নাসেরের নাম উল্লেখ না করে তিনি বলেন, বিপ্লব কোন একজনের হুকুমত চলবে না। প্যালে-স্টাইন থেকে শত্রুদের সম্মুখে উৎখাত না করা পর্যন্ত তাঁদের সংগ্রাম থামবে না, এই কথা বলেন আরাফাত। আর এই সংগ্রামে কোন আপোষ নেই।

জর্ডানের রাজা হুসেন 'রজাস' প্রস্তাবের একজন উৎসাহী সমর্থক। তবে তিনি আগেভাগেই বলে রেখেছেন, প্যালে-স্টাইন গেরিলারা যদি কিছু করে বসে, তবে তার দায়িত্ব তিনি নিতে পারবেন না। তাদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতাও তাঁর নেই।

সুতরাং, গেরিলাদের আক্রমণ চলবে—এটা মেনে নিয়েই যুদ্ধবিরাতিকে গ্রহণ করতে হবে এবং পরবর্তী আলোচনা ইত্যাদি চালিয়ে যেতে হবে। মনে হয়, ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র তো বটেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নও এই অবস্থা বোধে এবং সেই-মত তারা অগ্রসর হচ্ছে।

রজাস' প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রশ্নে আরব জগৎ স্পষ্টতই আজ শ্বিখাবিভক্ত। ৩রা আগস্ট থেকে লিবিয়ার রাজধানী

ত্রিপলিতে আরব রাষ্ট্রনায়কদের যে শান্তি-বৈঠক হবার কথা ছিল, এই বিরোধের জন্য তা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। লিবিয়ার রাষ্ট্রপতি কণেল মদুয়াম্মর গাদাফি চেষ্টা করেছিলেন বিরোধ মেটাবার জন্য, কিন্তু তিনি পারেন নি।

ইরাক ও সিরিয়া রজাস' প্রস্তাবের ঘোরতর বিরোধী। আলজিরিয়াও প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। তবে ইরাক ও সিরিয়াতেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বেশি। নাসেরের বিরুদ্ধে রাগও তাদেরই বেশি। বাগদাদ ও দামাস্কাসে নাসের-বিরোধী অনেকগুলি মিছিল হয়েছে।

ইরাকের রাষ্ট্রপতি আহমেদ হাসান আল্ বকর নাসেরের কাছে যে চিঠি দিয়ে-ছেন, তাতে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, জুন মাসে ত্রিপলিতে ৭টি আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, রজাস' পরিকল্পনা অনুসারে যুদ্ধবিরাতির প্রস্তাব মেনে নিয়ে নাসের তার বিরুদ্ধে গিয়েছেন।

নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের বিরো-ধিতায় নাসের খুবই ক্ষুব্ধ। আহমেদ হাসান আল্ বকরের চিঠির যে জবাব তিনি দিয়েছেন, তা সরকারীভাবে কয়েকটি প্রকাশ করা হয়েছে। উত্তরের প্রতি ছদ্রে নাসেরের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

নাসেরও স্পষ্ট অভিযোগ করেছেন, ইরাকী সরকারের সমর্থন ছাড়া সে দেশে নাসের ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ সম্ভব নয়।

নাসের দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন তিনি ত্রিপলি সিদ্ধান্তের বিরোধী কোন কাজ করেন নি। সংগ্রাম তাঁরা অবশ্যই করবেন। তবে ন্যায় শান্তির সুযোগও গ্রহণ করবেন। তিনি ব্যাংকভরে ইরাকের রাষ্ট্রপ্রধানকে জিজ্ঞাসা করেন : কেন সীমান্তে ইরাকী সৈন্য ইজরায়েলী শত্রুর বিরুদ্ধে গুলীবর্ষণ করে না? ইরাকী বিমান থেকে কেন শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো হয় না? ইজরায়েলী সৈন্যরাই বা কেন ইরাকের ওপর আক্রমণ করে না? ইজরায়েলী বিমান ইরাকের অভ্যন্তরে কেন বোমাবর্ষণ করে না?

ইজরায়েলী আক্রমণের প্রায় সবটাই পড়ে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ওপর। আর তার জন্য তাঁরা 'গর্বিত'।

বিরোধ কেবল আরবদের ভেতর নয়, রজাস' প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ইজরায়েলী-দের মধ্যেও তাঁর মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। দক্ষিণপন্থী গাহান পার্টির ৬ জন মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ারের কৌশলগত মন্ত্রিসভা ত্যাগ করেছেন এই প্রস্তাব গ্রহণের প্রতিবাদে। ইজরায়েলী

মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার-সার্ভিসেস

কম্যান্ডার ওয়াকার্স ইঞ্জিনীয়ার (পি), ক্রিমাগুডি (পঃ বঃ) কর্তৃক ক্রিমাগুডিতে আর্মি ইউনিটসমূহের ম্যারেড গ্র্যাকমা-ডেশনের জন্য আসবাবপত্রের ব্যবস্থার নির্মিত টেন্ডার ফর্ম বিতরণের জন্য ২০.১১৭০ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত আহত হইতেছে। বরাদ্দীকৃত ব্যয়ঃ টাঃ ৫ লক্ষ। আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১২.৮.১১৭০ তারিখের ইন্ডিয়ান ট্রেড জার্নাল দেখুন।

ডি এ ডি পি-৬৮০(৪১৪)/৭০

শাস্ত্রাত্মিক বসুমতী

পার্লামেন্ট 'নেসেটে'ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব এসেছিল, তবে তা ভোটে পাশ হয় নি।

আসল কথা, আপত্তি দ' দিকেই। আর দ' দিকেই যাঁরা রাজি হয়েছেন, তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে রাজি হয়েছেন।

ইজরায়েল শেষ মুহূর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে 'রজার্স' প্রস্তাব' সম্পর্কে কয়েকটি ব্যাখ্যা চায়। ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়েই তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। আসলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কিছু প্রতিশ্রুতি চেয়েছিল। তা তারা পেয়েছে। নাসেরও মস্কো থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করে এনেছেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই এখন পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের অবসান চায়। অবশ্য উভয়ের ক্ষেত্রে কারণ ভিন্ন। তাই আশা হচ্ছে, শেষ পর্বন্ত একটা মীমাংসা হবে। অনেক অসুবিধা থাকলেও কিছু আশা আছেই।

আর যদি পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে কোন মীমাংসা সম্ভব হয়, তবে তা ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামাতেও নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। পশ্চিম এশিয়ার পশ্চিম যদি মস্কো-ওয়ারশিংটন বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তবে ভিয়েতনামের ব্যাপারেই বা হবে না কেন?

মাসকাট ও ওমান

মাসকাট ও ওমানের ষাট বৎসর

বয়সের সুলতান সৈয়দ বিন তৈমুর ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন।

ক্ষমতাচ্যুত সুলতান আহত অবস্থায় এখন বৃটেনে। তিনি সেখানে চিকিৎসা ও আশ্রয়প্রার্থী। প্রাসাদরক্ষীরা যখন সুলতানকে জোর করে ক্ষমতাচ্যুত করে, তখন সংঘর্ষে সুলতানের গায়ে পাঁচ জায়গায় বন্দুকের গুলী লেগেছে। আঘাত খুব গুরুতর নয়। তিনি বেঁচে যাবেন।

সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পেছনে হাত ছিল সুলতানেরই নিজের ছেলে শেখ কাবাস বিন সৈয়দের। আটশ বৎসর বয়স্ক কাবাস মাসকাট ও ওমানের নতুন সুলতান হয়েছেন।

আরব বন্দীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত মাসকাট ও ওমানের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত লক্ষের মত। একেবারে মধ্য-যুগীয় বলা যায় এই দেশকে। সৈয়দ বিন তৈমুরের হুকুমে এখানকার লোকেরা মোটর গাড়ি চড়তে পারে না, সিনেমা দেখতে পারে না, প্রকাশ্যে খুঁমপান করতে পারে না, ফুটবল খেলতে পারে না, জুতা, ট্রাউজার, চশমা ব্যবহার করতে পারে না, বিদেশের ওষুধ খেতে পারে না। সমগ্র দেশে মাত্র দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুলতানের বস্ত্র, লেখাপড়া শেখার কোন শ্রয়োজন নেই।

১৯৬৪ সালে এখানে প্রচুর তেলের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৬৭ থেকে তেল

তোলা হচ্ছে। বছরে ৭৫ মিলিয়ন ডলার বাজস্ব পান সুলতান তেল থেকে। তেল তোলার জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী বিশেষজ্ঞদের ওপর নির্ভর করে আছেন। দেশের কোন লোককে এ কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেন নি। তেলের টাকা দেশের উন্নয়নের জন্যও ব্যবহার করেন নি।

এহেন সুলতান কেন তাঁর ছেলেকে বৃটেনে স্যান্ডহাস্ট মিলিটারী অ্যাকাডেমীতে পড়াতে পাঠালেন, তা সত্যি বিস্ময়ের বিষয়। আর তাঁর কালও হয় তিনি এর জন্যই।

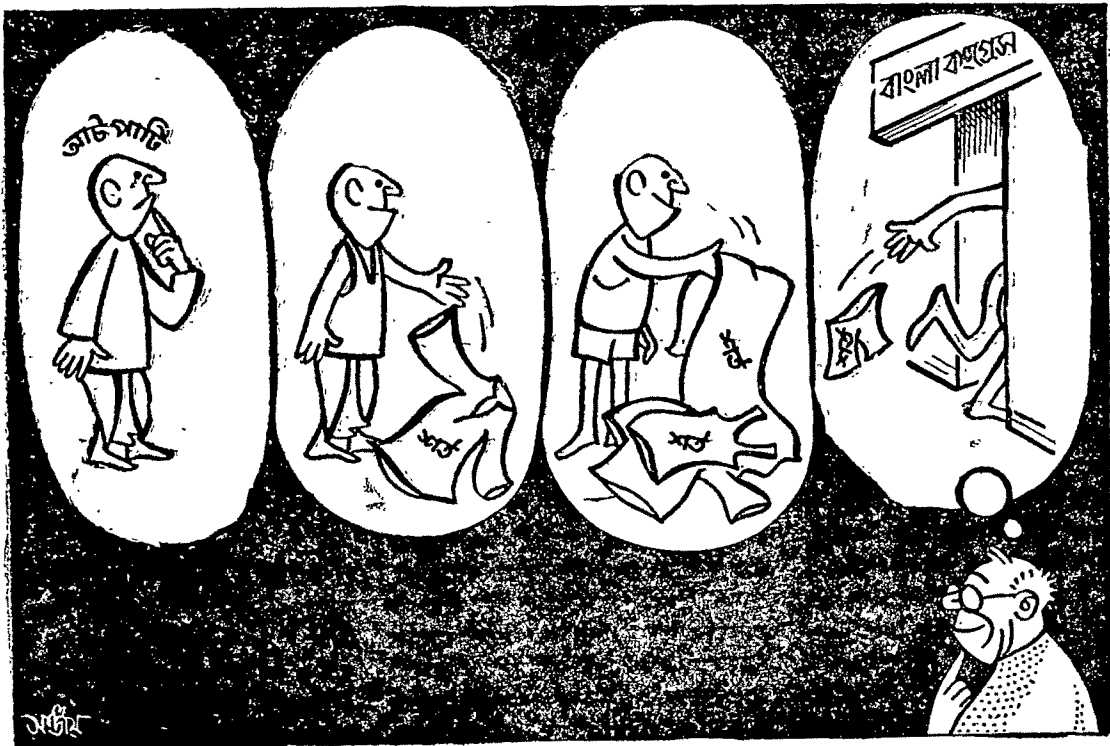
সুলতান পুত্র কাবাস পিতার আচরণ আচরণ একেবারেই পছন্দ করেন না। সুলতানও বুঝেছেন সে কথা। তাই স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর পুত্রকে সালালা প্রাসাদে নজরবন্দী করে রাখা হল। পিতার অনুমতি ছাড়া কারও সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও নিষিদ্ধ।

কিন্তু বেশি দিন এভাবে কাবাসকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হল না। গোপনে ক্ষমতা দখলের সব ব্যবস্থা হল।

কাবাস সুলতান হয়েই ঘোষণা করেছেন, তেলের অর্থ তিনি দেশের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করবেন। মাসকাট ও ওমানকে তিনি আধুনিক করে গড়ে তুলবেন।

মাসকাটে এসেই তিনি ১৯ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দিয়েছেন।

(১৯-৮-৭০)



বামসঙ্গী আন্দোলন ও বাঙালীর মধ্যবিত্ত সমাজ



সাগর বিস্তার

বাংলার সেই চিত্র আজ আর নেই। এখন বাঙালীর জীবনে আর যা-ই থাক না কেন—জীবন-মন্টগা ছিলো না। অমৃতত আজকের মতো এমন উৎকট হয়ে দেখা দেয় নি। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় রচনায় সেই কালের বাংলার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে প্রত্যেক বাঙালীরই সেই অতীত বাংলার প্রতি একটা তাঁর মোহ জেগে ওঠে। শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে সেকালে খুবই অসুবিধা ছিলো মত, তথাপি এ কথাও সত্য জীবনে তখন অস্বাচ্ছন্দ্য ছিলো না, অশিক্ষা এবং সংযোগহীনতা বা বিচ্ছিন্নতা ব্যবহারিক জীবন এবং আদর্শগত জীবনের মধ্যে কোনো দূরত্ব ব্যবধানের সৃষ্টি করে নি। অগতঃ অক্ষয়কুমার মৈত্রী যে যুগের বাংলা-দেশের চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার অনেক আগে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের উপর বার বার বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে গেছে। তুর্কী আক্রমণের ফলে বাঙালীর অর্থনীতি প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে; সমাজের উপর পড়েছে তারই নিদারুণ প্রতিফল। এই কারণেই বিশ্ববিখ্যাত জার্মান-দর্শনিক কার্ল মার্ক্সের একটি চিঠিতে দেখতে পাইঃ

“Hindustan is an Italy of Asiatic dimensions, the Himalayas for the Alps, the plains of Bengal for the Plains of Lombardy, the Deccan for the Appenines, and the Isle of Ceylon for the Isle of Sicily... Just as Italy has from time to time been compressed by the conqueror's sword into different national masses, so do we find Hindustan, ... Yet from a social point of view, Hindustan is not Italy, but the Ireland of the East. And this strange combination of Italy and Ireland, of a world of voluptuousness and a world of woes, is anticipated in the ancient traditions of Hindustan. That

religion is at once a religion of sensualist exuberance and a religion of self-torturing ascetism....”

এঙ্গেলসকে লেখা চিঠি থেকে ১০ই জুন, ১৮৫০)

ইতালীর সঙ্গে ভারতের বহিঃসঙ্গ সাদৃশ্য, আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে সামাজিক সাদৃশ্য এবং ইতালী ও আয়ারল্যান্ডের পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য সম্পর্কে কার্ল মার্ক্স যা বলেছেন তা শুধুমাত্র বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। অক্ষয়কুমারের বাংলার চিত্র দেখে অবাক হতে হয় এই ভেবে যে, বার বার বৈদেশিক আক্রমণের পরেও বাঙালী তার সেই স্বাচ্ছন্দ্যটুকু বজায় রেখেছিলো কিভাবে? এর উত্তর সম্ভবত এই যে, তখন মানুষের জীবন বাহিমর্দখী উন্মত্ততার শিকার হয় নি। তাহলে কি তখন ওই sensualist exuberance এবং self-torturing ascetism-ই এর পেছনে কাজ করেছে? হয়তো তাই। একদিকে যেমন এই exuberance এবং অন্যদিকে ascetism-এর অস্তিত্ব ছিল, সেই সঙ্গে আর একটি বস্তু ছিলো—যাকে বলা যায়, জীবন সম্পর্কে একটি নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি।

ব্রিটিশ যুগের আগে

ব্রিটিশপূর্ব যুগে বাংলার সমাজ-ব্যবস্থা ছিলো গ্রামাভিত্তিক। অধিকাংশ মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল ছিলো কৃষির উপর। এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ unit-এর মতো করে গঠিত গ্রামাঞ্চলে অশান্তি এবং অনটনের বিভীষিকা ছিলো না। খাদ্য-সংস্থানের জন্য তখন অন্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হতো না। খেলাধুলা, শরীরচর্চা, লোকগীতি ও শাস্ত্রালোচনা নিয়ে স্বেচ্ছন্দে মানুষের জীবন নির্বাহ হতো। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সাধারণত জমিদারী প্রচেষ্টায় হতো। কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ ছিলেন—যারা সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রে একটু প্রগতিবাদী, অন্তত প্রচলিত বন্ধনে

বন্দী ছিলেন না—পূরনোকেই ধ্রুব এবং অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতেন না—ভারী সাধারণত সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অচলায়তন ভাঙতে সচেষ্ট থাকতেন। এরা সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। বিভিন্ন অব্যবস্থা এবং অত্যাচারের প্রতি এরাই জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন, গ্লোয়াজন হলে প্রতিবাদও জানাতেন। এই নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন ছিলো না, একথা বলা যায় না। তবে একথা বলা যায়, সেই সব আন্দোলন প্রায়শ রাজনীতি-নির্ভর ছিলো না—প্রধানত সেগদাল ছিলো সমাজ ও সাংস্কৃতিকনির্ভর। হাজার বছরের বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলন অথবা বলা যেতে পারে ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কারের উত্থান ঘটেছে বার বার। ভুললে চলবে না যে, সে যুগে ধর্ম ছিলো মানুষের সকল সামাজিক স্তম্ভগুলির মধ্যে বৃহত্তম স্তম্ভ। পাল বংশীয় শাসনকালের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক জাগরণ, তাও যেমন ধর্ম-বাহিত ছিলো না, তেমনই মোগল যুগের নবজাগরণ, এবং প্রীতৈতন্যের প্রেমধর্মের জোয়ারও ধর্মবাহিত ছিলো না। এ ব্যাপারে ব্রিটিশযুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় বাধাকে অতিক্রম করে গড়ে উঠেছিলো। সে কথা পরে বলছি। তার আগে যে কথা স্পষ্ট করে বলা দরকার, তা হলো—(১) ব্রিটিশপূর্ব বাংলাদেশের নিস্তরঙ্গ সমাজেও আন্দোলন হতো, (২) সে আন্দোলন প্রধানত সাংস্কৃতিক হলেও ধর্মবাহিত ছিলো না, (৩) সমাজের প্রগতিশীল অংশ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই সকল আন্দোলনে মধ্য অংশ গ্রহণ করতেন।

ব্রিটিশ যুগে

বলোছি, ব্রিটিশ যুগের আন্দোলনই সর্বপ্রথম ধর্মীয় প্রভাব অতিক্রম করেছিলো। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার সংস্পর্শে আসার ফলে আমাদের সামাজিক জীবন তরঙ্গিত হতে থাকলো। ইউরোপীয়

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

Humanism এসে আঘাত করতে লাগলো আমাদের Devinism-এর উপর। একদিকে যেমন সমাজে নবীন চিন্তা পুরাতন সংস্কারকে পর্য্যুদস্ত করতে লাগলো—অন্যদিকে বণিকের নিষ্ঠা নতুন রাজস্বনীতি পঞ্জীসমাজের অভিজাতশ্রেণীর বিপর্য্য ডেকে আনতে লাগলো। তাদের বিপর্য্য করে ইংরেজ এক শ্রেণীর পেটোয়া ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি করলো, যাদের সঙ্গে গ্রামবাংলার প্রত্যক্ষ কোনো পরিচয় ছিলো না। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমাজবিদ শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষের একটি বক্তব্য উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরো স্পষ্ট হবে। শ্রীযোষ বলছেন, “ইংরেজের নতুন নতুন পরীক্ষা-মূলক রাজস্বনীতি বা revenue policy-র ফলে সেকালের গ্রাম্যসমাজের যে অভিজাতশ্রেণী ছিল, তারা দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল, কারণ তারা নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের চিবিদিনের অভ্যাস ও ধারণাগুলিকে খাপ খাইয়ে নিতে পারল না। তাদের ধীরে ধীরে উচ্ছেদ করে, চিরস্থায়ী রাজস্বব্যবস্থা প্রবর্তন করে নতুন এক শ্রেণীর অভিজাত জমিদার গ্রাম্যসমাজে সৃষ্টি করা হল—যাদের সঙ্গে গ্রামের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক নয়—যারা টাকার জোরে জমিদারী নিলেম্ব কিনে ঠিক ব্যবসায়ীর মতো নতুন জমিদার হয়ে উঠলেন। সুতরাং, যেমন নতুন নগরকেন্দ্রে, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও যে new rural aristocracy গড়ে উঠল তারা হলেন নতুন শাসক ইংরেজদের অনুগ্রহজীবী এক শ্রেণীর হঠাৎ অভিজাত বা upstart. এরপর যখন মধ্যবিত্ত-ভোগীদের উদ্ভব হল—তখন পত্তনদার, দর-পত্তনদার প্রভৃতিদের নিয়ে বেশ বড় একটা মধ্যবিত্তশ্রেণীর উৎপত্তি হল গ্রাম্য-সমাজে—যা পূর্বে কখনো কোনদিন ছিল না। নতুন rural aristocracy এবং নতুন rural middle-class-দুইটি গ্রাম্যসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটা উদাসীন বিত্তলোভী শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠলো।... এঁরা অধিকাংশই গ্রামে বসবাস করা পর্যন্ত ত্যাগ করলেন—absentee জমিদার পত্তনদার হয়ে উঠলেন। নগরের aristocracy-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে এঁরা নতুন নাগরিক সমাজে প্রতিষ্ঠালোভী হলেন। ফলে হতাদরে ও নিষ্ঠুর উদাস্যে গ্রাম্য-সমাজ দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করলো একে-বারে ধ্বংস হয়ে গেল।” একদিকে ইউরোপীয় সমাজের মূল্য প্রাণের আবেগ এসে পড়তে লাগলো সমাজের উপর, অন্যদিকে ইংরেজের বিচিত্র অর্থনীতি এবং সামন্ত-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় গ্রামবাংলা ভাঙতে লাগলো ধীরে ধীরে। একই সঙ্গে এই দুই বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলেতে লাগলো। এরই ফলে হয়তো গোটা অষ্টা-

দশ শতাব্দী জুড়ে কেবল ভাঙনেরই প্যালে চললো; পরনো গ্রাম্যসমাজ ধ্বংস হলো, কিন্তু সেই ধ্বংসস্থাপে কোনো নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠলো না।

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে দেখা গেলো পরিবর্তনের সূচনা। ইউরোপের মূল্য জীবনবাদ সজোর আঘাত হানলো এতকালের সংস্কারের রুদ্ধস্বারে, ধর্ম, সাহিত্যে, সমাজে, বাস্তবে। তারই সূত্রপট প্রকাশ ঘটলো রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ আন্দোলনে, ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজ-সংস্কারে ও বাস্তবে, মধুসূদনের জীবনে ও সাহিত্যে, ডি রোজিও এবং তাঁর আদর্শবাহী ইয়ং বেঙ্গলদের আচারে-আচরণে, বিভিন্ন সাময়িকপত্রে। এক কথায় গোটা রেনেসাঁসের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। সে কথা

বিস্তারিত বলতে গেলে একটা বিরাট গ্রন্থ হয়ে যাবে। আমি কেবল বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে শব্দ-মাত্র ধারাবাহিকতাত্ত্বিক সম্পর্কে পাঠককে সজাগ রাখবার জন্য এগুলির উল্লেখ করে যাব মাত্র। রামমোহন সম্পর্কে ইতিপূর্বে অনেক বিতর্ক হয়ে গেছে। সৌন্দর্য্য থেকে রামমোহন এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি। তিনি কতটা বজ্রোরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং কতটা সমাজ-তান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও আমরা একথা বলতে পারি, শ্রেণীগত বিন্যাসের দিক থেকে রামমোহন ছিলেন বজ্রোরা শ্রেণীরই মানুষ। তথাপি তখনকার বাংলার সেই revolutionary

আন্দামান হারবার ওয়াকস্

পোঃ চাথাম
পোর্ট ব্লেয়ার

প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার (মেরিন), আন্দামান হারবার ওয়াকস্, পোঃ চাথাম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে নিম্নলিখিতের জন্য ২১-৮-১৯৭০ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করিতেছেনঃ—

১। টেন্ডার নং এএইচডব্লু/টি-২/৭০-৭১। “পোর্ট ব্লেয়ারের ফোনিঞ্জ বে-তে চৌলুঙ্গা জেটের সুপারস্ট্রাকচারের ফ্যানলিকেশন, কাস্টিং, আর, সি, সি পাইলস-এর কন্ডেইং এবং ড্রাইভিং এবং নির্মাণ করা”। বরাদ্দীকৃত ব্যয় টাঃ ৬,৯১,২০০/ সিমেন্ট ও স্টীলের মূল্য বাদে। জমা দেয় বায়নার টাকাঃ টাঃ ১৭,২৮০। সম্পাদনের কালঃ ১৮ মাস।

২। টেন্ডার নং এএইচডব্লু/টি-১/৭০-৭১। “পোর্ট ব্লেয়ারে ফোনিঞ্জ বে-তে ফিশারীজ হারবারের জন্য এ্যাপ্রোচ জেটের নির্মাণ।” বরাদ্দীকৃত ব্যয়ঃ টাঃ ৯,৩৪,০০০/ সিমেন্ট, স্টীল এবং স্টোন মেটালের মূল্য বাদে। জমা দেয় বায়নার টাকাঃ টাঃ ২৩,৩৫০। সম্পাদনের কালঃ ১৮ মাস।

ঐ একই দিনে বেলা ৩-৩০ মিঃ যোগদানকারী টেন্ডারদাতাগণের বা তাঁহাদের অননুমোদিত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে টেন্ডারগুলি খোলা হইবে। চূড়ান্ত সত্যাবলী, স্পেসিফিকেশনস এবং ড্রাইংস সহ টেন্ডার ফর্ম প্রতিটি দফার জন্য ২০/ টাকা (অফেরৎযোগ্য) নগদ, মনি অর্ডার বা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মেরিন), নর্থ ও সাউথ ডিভিশন, পোঃ চাথাম-এর অনুকূলে আনক্সড পোস্টাল অর্ডার মারফৎ আদায় দিয়া আবেদন করিলে ১৪-৮-১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার (মেরিন), আন্দামান হারবার ওয়াকস্, পোঃ চাথাম-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। টেন্ডার-দাতাগণকে বায়নার টাকা প্রেক্ষারী/স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় জমা দিতে হইবে এবং রিসিটেড চালান টেন্ডারের সঙ্গে পাঠাইতে হইবে, উহা ব্যতীত কোন টেন্ডার বৈধ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। উক্ত অর্থ “রেভিনিউ ডিপোজিট” শীর্ষে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (মেরিন), নর্থ ও সাউথ ডিভিশন, আন্দামান হারবার ওয়াকস্, পোঃ চাথাম-এর অনুকূলে জমা দিতে হইবে। প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ার (মেরিন), আন্দামান হারবার ওয়াকস্, পোঃ চাথাম কর্তৃক কোন কারণ না দর্শাইয়া টেন্ডারের কোন নিয়ম না মানিবার বা গৃহীত সকল টেন্ডার বা কোন টেন্ডার বাতিল করিবার অধিকার সংরক্ষিত এবং নিম্নতম টেন্ডার গ্রহণ করিতেও তিনি বাধ্য নহেন।

ডিএভিপি ৬২৫(১১)/৭০

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

আন্দোলনের মধ্যে তিনি অমন করে কপিপয়ে পড়লেন কেন? ১৮৯৫ সালে প্রকৃষ্ণই তিনি কলকাতার প্রতিষ্ঠিত। সম- সামাজিক ধর্মাত্মদের মতো অটল সম্পদ না থাকলেও আভিজাত্য দেখাবার মতো সম্পদ তাঁর যথেষ্টই ছিলো। তথাপি বুদ্ধোন্নতদের মতো তিনি আরো বেশি ধর্মোপার্জনের দিকে ঝুঁকিয়েছিলেন কেন? এর উত্তর খ্রীষ্ত বিনয় ঘোষের ভাষ্যেই দেওয়া যায়—“তিনি বুঝে- ছিলেন যে নতুন বিত্তের মানদণ্ড সামাজিক আচরণের ভিতর দিয়ে যে সচলতা সৃষ্টি করেছে—সেই সচলতা মেবলী সচলতা— সমাজবিজ্ঞানীরা যাকে spurious mobility বলে, সেও তাই। এই ক্ষুদ্র সচলতা সামাজিক—এর ফলে কোনো মানসিক ও আদর্শগত সচলতা দেশবাসীর জীবনে আসবে না এবং তা না এলে সমাজ আবার অচল অনড় হয়ে বিষয়ে উঠবে। নতুন বিদ্যা, জ্ঞান ও বুদ্ধির আলোকস্পর্শেই এই মানসিক সচলতা আসতে পারে। তাই তিনি পাশ্চাত্য দর্শন ও প্রাচ্য দর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধর্মের গভীর অনুশীলনে মনোনিবেশ করলেন। এমন একটি নতুন আলোকের সম্মানে, যে আলোক জ্বালিয়ে দিতে পারলে আমাদের দীর্ঘকালের প্রাণহীন অচল আচরণ অভ্যাস অনুষ্ঠান, অজ্ঞানপ্রসূত ধ্যানধারণা ইত্যাদি পরিবর্তিত হতে পারে। তাহলে দেখতে পাই। বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনা হলো নতুন বিদ্যা ও বুদ্ধির অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। এই অনুশীলনের পথ ধরেই এদেশে পাশ্চাত্য ভাব-ধারা, জীবনদর্শন, রীতিনীতি সব একে একে প্রবেশ করেছে এবং ক্রমে দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার সংঘাতও আরম্ভ হয়েছে। নতুন agents of westernisation এবং পুরাতন forces of tradition—এই দু'য়ের সংঘাতের ভিতর দিয়ে উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সূচনা হয়েছে এবং সেই জাগরণের প্রবাহেরও উত্থান-পতন হয়েছে। নতুন রিভরানপ্রণীত নয় শব্দ, তার সঙ্গে নব্য শিক্ষার প্রসারের ফলে নতুন বিদ্যাজীবী ও বুদ্ধিজীবী প্রণীত ও বিকাশ ও বিস্তারিত হয়েছে ধীরে ধীরে। এই নতুন বিদ্যা-বুদ্ধিজীবী প্রণীত নবজাগরণের আদর্শের ধারক ও বাহক হয়েছেন। এই নতুন বিদ্যা-বুদ্ধিজীবী প্রণীত অধিকাংশই সেকালের মধ্যবিত্ত প্রণীত, যাঁরা গোটা উনিশ শতাব্দীকে এক বাঁধনছেঁড়া বিপ্লবের মধ্যে উজ্জীবিত করে রেখেছিলেন। এই বাঁধনছেঁড়া উত্তাল প্রাণচালার গর্ভ থেকেই একদিন জন্ম নিলো নবীন ভারত—সত্য

হলো রামমোহনরই কথা—“Enemies of liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful.”

চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও সে-তুং মধ্যবিত্ত প্রণীত ‘ধনতান্ত্রিক’ উপাদান সম্পর্কের প্রতিনিধি এবং ‘জাতীয় বুদ্ধোন্নতা’ বলে চিহ্নিত করে বলেছেন যে, দেশ যখন বিদেশী পুঁজি-কিংবা বুদ্ধিবাজ নেতাদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়, তখন এই প্রণীত বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং সাম্রাজ্যবাদ বা বুদ্ধিবাজ নেতাদের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামে সহায়তা করে। বৃটিশ ভারতে এই সত্যকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পেরেছি। বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সর্ব-হারার আন্দোলন ছিলো না। নেতৃত্ব হাদের হাতেই থাকে—এ আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিলো প্রধানত শিক্ষিত বিনয়ান মধ্যবিত্ত এবং বুদ্ধিজীবী প্রণীত। লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানবকে সংঘবদ্ধ ও সংগঠিত করার দায়িত্ব ছিল এদের হাতে।

পেটি বুদ্ধোন্নতা বলতে মাও সে-তুং মালিকপ্রণীত, কৃষক, দক্ষ-কারিগর, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রসমাজ, শিক্ষকসমাজ, কেরাণী, ছোট আইনজীবী ও ছোট ব্যবসায়ীদের নির্দেশ করেছেন। দেশের মধ্যে যখন বিপ্লবী আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ-ধারণ করে, তখন এরাও সেই সর্বহারার বিপ্লবে সামিল হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় বুদ্ধোন্নতা এবং পেটি বুদ্ধোন্নতা প্রণীত ভূমিকা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। (অবশ্য এই বিপ্লব সর্বহারার প্রণীত ছিল না বলেই আন্দোলন সংসংঘবদ্ধ ও সংগঠিত হতে পারে নি)।

প্রাক-স্বাধীনতাকালে ১৯০৮-০৯ সালেই সত্যচন্দ্রের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম একটি বামপন্থী শক্তি সংহত হয়েছিল। বাংলাদেশে ছিলো সেই শক্তির হৃদপিণ্ড। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর হাতে, অন্যটি সত্যচন্দ্রের হাতে—একটি প্রতিপক্ষের সঙ্গে আপোষধর্মী, অন্যটি আপোষহীন। ১৯২১ সালে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মত্যাগ করবার অদম্য উৎসাহ নিয়ে সত্যচন্দ্র বিলাত থেকে আই-সি-এস-এর লোভনীয় চাকরি ছেড়ে ভারতে এসে সর্বপ্রথম ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের নেতা গান্ধীজীর সঙ্গে বোম্বাইতে দেখা করেছিলেন, দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের জন্য সেই সত্যচন্দ্রই পরবর্তীকালে গান্ধীজী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, “Gandhiji should now be regarded as an old, useless piece of furniture.” যে মহতে

জাতীয় কংগ্রেস নেতারা বিপ্লব এবং রক্তপাতের আশঙ্কায় বৃটিশ সরকারের সঙ্গে একঘেয়ে আলোচনা-আলোচনা চালিয়ে চলেছেন, তখনই সত্যচন্দ্রের কাছে শোনা গেছে: “No real change in history has ever been achieved by discussion.” “India can well afford to bring a blood sacrifice for her liberation.” দীর্ঘকাল কংগ্রেসের মধ্যে থেকে গান্ধী-নেতৃত্বের গতি-প্রতি-দেখে সেই সত্যচন্দ্রই দৃষ্ট করেছেন, “The entire intellect of the Congress has been mortgaged to one man.”

১৯০৮-০৯ সালে হরিপুরা এবং হরিপুরী কংগ্রেসের ঘটনাবলীতে স্পষ্টই দেখা গেল সত্যচন্দ্রকে কেন্দ্র করে একটি বামপন্থী শক্তি সংহত হয়েছে। গান্ধীজী প্রমুখ রক্ষণশীল নেতারা সত্যচন্দ্রের তৎকালীন জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হয়ে উঠেছিলেন। জওহরলাল নেহরু স্বয়ং সত্যচন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করে একটি চিঠিতে লিখলেন “আমি জানি না, তুমি কাকে বামপন্থী এবং কাকেই বা দক্ষপন্থী বলে বিবেচনা কর। তবে তোমার নির্বাচনী লিপিসমূহ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গান্ধীজী ও ওয়াকিং কমিটিতে তাঁর অনুগামীদের তুমি দক্ষপন্থী বলে মনে কর এবং তাঁদেরই যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের তুমি বল বামপন্থী। আমার বিবেচনায় তোমার এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কঠিন ভাষা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্বের সমালোচনা করা এবং তাকে আক্রমণ করাই কি রাজনীতিতে Leftism-এর পরিচায়ক?” এর পরের ঘটনা দ্রুত এগিয়ে গেল। এবং দেখা গেল ১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় নির্ধারিত জরুরি কংগ্রেস কর্মসূচির যে বৈঠক বসলো, সত্যচন্দ্র সেখানে রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত সভাপতি অপসারণের জন্য গান্ধীজী সৌদীন বো অসহযোগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ছিলেন, কংগ্রেসের ইতিহাসে সে ছিল এক অভূতপূর্ব কলংকিত ঘটনা। চম্পা বহর পরে বাঙ্গালার অধিবেশনের পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপা এবং কংগ্রেস-সিডকেটের ঘনীভূত আত্মকলং সৌদিনের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনো কখনো সত্যই ঘটে।

সত্যচন্দ্র সৌদীন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে চুপ করে থাকেন নি।

বামপন্থী শক্তি সমন্বয়ে গঠন করেছিলেন নতুন রাজনৈতিক দল—ফরোয়ার্ড ব্লক—দলের মুখপত্র হলো ‘ফরোয়ার্ড’। সেদিন ভারতবর্ষের সমস্ত বামপন্থী শক্তি যদি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন জানাতো তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে রচিত হতো। তার অনেক আগেই (১৯২১ সালে) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয়েছে। তখনো কমিউনিস্টদের শক্তি কোন উল্লেখযোগ্য আকৃতি নেয় নি। তবু ভারতবর্ষের সেই রাজনৈতিক সংকটমুহুর্তে কমিউনিস্টরা ফ্যানিজমের ভয়ে এই বিপ্লবী শক্তির পেছনে দাঁড়াতে চাইলেন না। তবু হরিপদ্রা এবং দ্বিপদ্রারী কংগ্রেসের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী দেশের অগণিত মানুষের সামনে বামপন্থী শক্তি সম্পর্কে তাঁদের ধারণা স্পষ্ট করে তুলেছিল। আমি বলছি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি রূপ গঠিত হয়েছিল গান্ধীজীর হাতে, অন্যটি সুভাষচন্দ্রের হাতে—একটি নরমপন্থী, অন্যটি চরমপন্থী। দুটি পথেই সর্বস্বত্বের মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিল—দুটি পথেই ছাত্র, শিক্ষক, বাদ্ধিক জীবীদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। এক সময় রাশিয়া থেকে জার সাম্রাজ্যের অবলুপ্তি ঘটানোর অদম্য সাহসে উন্মত্ত বন্দকের সামনে প্রসারিত বুক নিয়ে নির্ভয়ে দাঁড়াতে সমাজের শিক্ষিত বাদ্ধিকজীবীরা। হাজার হাজার মৃত্যুর বিনিময়ে একদিন রাশিয়া জার-শাসনমুগ্ধ হয়েছিল। ভারতবর্ষেও আমরা দেখেছি শিক্ষিত তরুণ বা শিক্ষকের এতটুকু ভয় নেই ফাঁসির দাঁড়ি গলায় পরতে কিংবা অগ্নিগোলার সামনে বুদ্ধের আবরণ উন্মুক্ত করে দিতে। আজকে নুয়েন ভ্যান গ্রায়ীর কাহিনী পড়তে পড়তে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। কিন্তু ভারতের মাটিতে এমন কত গ্রায়ীর তাল্লা রক্তে বৃটিশ বন্দকের তুফা মিটেছে, ইতিহাস কি তার নির্ভুল হিসাব দেবে কোনদিন? শিক্ষিত যুবক কিংবা বাদ্ধিকজীবী শিক্ষকের কাছে সেই মরণখেলা ছিল যেন একটা প্লেজার, যাতে মৃত্যুর হাসি বিনষ্ট হয় না (স্বদেশী যুবকদের কথা স্মরণীয়)। যাই হোক, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া এবং বৃটিশ সরকারের সকল চক্রান্ত ভেদ করে সুভাষচন্দ্রকে একদিন বিদেশে পাড়ি দিতে হলো। কিন্তু যে বিপ্লবাত্মক শক্তির (Spirit) মূর্তি ঘটিয়ে গেলেন, কোনমতেই আর তার মাত্রাগত হ্রাস হলো না।

একদিন ভারত স্বাধীনতা পেলো। সে স্বাধীনতালাভের দ্রুততার সুভাষচন্দ্রের বামপন্থী নেতৃত্বের অবদান আজ কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। ঔপনিবেশিক সরকারের হাত থেকে স্বাধীন ভারত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো। তাঁরই হলো নতুন সংবিধান। কিন্তু শাসন ক্ষমতায় যাঁরা এলেন তাঁরা শঙ্কু ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য এত ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে, আসল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হতে দেরী হলো না। এবং এই বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে দেশের বামপন্থী শক্তি দ্রুত সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলো।

স্বাধীনতার পরে

স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসের প্রশাসনিক দুর্বলতা, ধনতান্ত্রিক দুর্ভাগ্য, তবু ও কর্মের মধ্যে বৈষম্যের সুযোগে বামপন্থী শক্তি দ্রুত সংহত হয়ে উঠতে লাগলো। কমিউনিস্ট পার্টি হলো এই শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি বয়সের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগুতে পারে নি। এর কতকগুলি বড় কারণও ছিল। প্রথমত ভারতের উপর অ্যাংলো-আমেরিকান প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় পড়ে আছে। দ্বিতীয়ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব এখনো কমিউনিস্টদের ভাষায় বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণীর হাতে এবং এরই সম্ভাব্য ফল হল দলের মধ্যে অন্তর্কলহ। যে কলহের চরম রূপ দেখা গেল গত ১৯৬৪ সালে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের বহিঃজন সদস্য সেদিন দল থেকে বেরিয়ে এলেন। দীর্ঘকাল ধরেই পার্টির অভ্যন্তরে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে চীন ও সোভিয়েটের নীতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট উত্তাপের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই উত্তাপেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটলো ওই বছরেই ওই মার্চ তারিখের ‘কারেন্ট’ পত্রিকার একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ উঠলো চেয়ারম্যান শ্রী এস, এ, ড্যাগের বিরুদ্ধে—যার পরিণতি দাঁড়ালো দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে অন্ধ্র, কেরল, পশ্চিমবঙ্গ, তামিল-নাড়ু, পাজাব, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং জম্মু ও কাশ্মীরের যে ৩২ জন সদস্য বেরিয়ে এসেছিলেন—তার মধ্যে আজকের নাগি রেড্ডিও ছিলেন, যিনি চতুর্থ কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে খবরে প্রকাশ।

যা হোক, কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দুই টুকরো হলো ১৯৬৪ সালে। পার্টির

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবার অবকাশ আর রইলো না। অথচ এটাই ছিল স্বাভাবিকভাবে কামা। কোন রাজনৈতিক দল বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দৃঢ়নীতি কিংবা পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কোন নজর নিয়ে কোনক্রমেই কাউকে বরদাস্ত করা হয় না। এই সেদিনও আমরা রাশিয়ার রাষ্ট্রনীতি থেকে ব্রুশেভকে সরে যেতে দেখেছি—চেকোস্লোভাকিয়া থেকে ডবচেচকে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষেত্রে হলো নতুন ঘটনা। পার্টির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, সে অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগে পার্টিটাই গেল ভেঙে। জাতীয় পরিষদের সদস্যরা কার্যত পিছিয়ে নিয়ে গেলেন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে। দুই নম্বর কমিউনিস্ট পার্টির নাম হলো কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্স বাদী)। যদিও অ-মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। এই দলের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব নিলেন কেরলের এ, কে, গোপালন, অন্ধ্রের পি, সুন্দরায়ীয়া ও তামিল-নাড়ুর পি, রামমূর্তি প্রমুখ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক হলেন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। কলকাতায় ত্যাগরাজ হলো চীনের চেয়ারম্যান মাও সে-তুং-এর ছবি স্থাপন করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশন বসলো—আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম হলো ভারতের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টির।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হলো ১৯৬৯ সালে। আর একটি কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হলো। নকশালবাদী বলে কথিত অতিবাম কমিউনিস্টরা কলকাতায় মনমোহন ময়দানে অধিবেশন বাসয়ে তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক জন্ম ঘোষণা করলেন। এখানেও ছবি ছিল মাও সে-তুং-এর; বরং কিছু বেশি ছিল যা, তা হলো মাও সে-তুং-এর প্রতি প্রকাশ্য আনুগত্য। এঁরা পার্টির নাম দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী)। আবার সংকট সৃষ্টি হলো পরিমল দাশগুপ্ত এবং নাগি রেড্ডিকে নিয়ে। শ্রীরেড্ডী নতুন আর একটি কমিউনিস্ট দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন। জানি না এ দলের চরিত্রগত বন্ধনীর মধ্যে ‘মাওবাদী’ কিংবা ‘চে-গুয়েভারাবাদী’ থাকবে কি না! কিছুই বিচিৎ নয়। অন্তত ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনীতিতে বোধহয় সবই সম্ভব। কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙনের অর্থ বোঝা যায়—কেন সে ভাঙন তাও বোঝা যায়। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান ভ্রষ্টাংশের ব্যাখ্যা যুক্তিতে হয় না। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বিরোধের তাৎপর্য সম্ভবত এ-খণ্ডের শ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট নেতা

ও উত্তর ভিয়েতনামের সম্প্রতি প্রয়াত কমরেড হো চি মিনও অনুধাবন করতে পারেন নি। মৃত্যুর পরে তাঁর যে উইলের কথা প্রকাশিত হয়েছে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর এক জায়গার তিনি লিখেছেন, “ব্রাহ্মপ্রতিম সমাজতান্ত্রিক পার্টিগুলিতে মতানৈক্য দেখে আমি ব্যথিত। আমি কামন; করি, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও প্রগতিবাদ আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মপ্রতিম পার্টিগুলির মধ্যে একা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের পার্টি বৃদ্ধি ও বৃদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। আমি নিশ্চিত যে ব্রাহ্মপ্রতিম পার্টিগুলি পুনরায় একবাক্য হবে।” উইলের সর্বশেষ অনুচ্ছেদে প্রেসিডেন্ট হো চি মিন সারা বিশ্বের কমিউনিস্ট, তরুণ সম্প্রদায় এবং শিশুর প্রতি তাঁর ‘সৌভ্রাতৃমূলক’ অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন।

কমরেড হো-র অন্তিম বাসনা হয়তো একদিন সার্থক হবে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কেন এই আত্মকলহ? প্রতিবিপ্লব যদি এই আত্মকলহেরই প্রতিবিপ্লব বলে ধরে নেওয়া যায়, তবে কি তা নিছক একটি কপনাবিলাস বলে পরিগণিত হবে? ভারতের কথাই ধরা যাক। এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন কি অনিবার্য ছিল? অত্যন্ত নিবারণ করার কতটা চেষ্টা হয়েছিল? আর হলোই যদি তবে সে কিসের ভিত্তিতে? কোন নীতিগত পার্থক্য? কি সে পার্থক্য? পার্থক্যই যদি থাকবে তবে ভূতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টি হলো কেন? সারা ভারতের রাজনীতিতে কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের (মাঃ) কর্মসূচীর পার্থক্য কোথায়? সে কি শত্রু জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যেই নয়? কিন্তু এই পার্থক্য কণ্টকীকৃত নয় কি? জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠন করে রাজ্যে রাজ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ) তো কম সচেষ্ট বলে মনে হয় না। ১৯৬৮ সালের ২০শে ডিসেম্বর থেকে ২৯শে ডিসেম্বর কোচিনে অনুষ্ঠিত পার্টির ৮ম কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রস্তাবেও মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছেন—“The Communist Party of India (Marxist) which is vitally interested in building the united front of different democratic parties and groups including the S.S.P., P.S.P. and others, cannot but take this development into serious account. Prompted by the desire to consolidate

the existing UF with them in states where it has materialised, and eager to extend it to other states and areas.—”

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পাটনা কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের অংশবিশেষ আমি সামনে রাখছিঃ “কমিউনিস্ট পার্টি আবারও জোরের সহিত ঘোষণা করিতেছে যে, এই সংকটমুহুর্তে বামপন্থী পার্টিগুলির দায়িত্ব হইতেছে অপরিসীম এবং চূড়ান্ত। অবিলম্বে তাহাদের এমন সব জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের একা এবং ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলনের একতা সংগ্রামক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়। সংসদীয় গণতন্ত্র এবং শ্রম-জীবী মানুষের জীবনধারণের মান রক্ষার জন্য তাহাদের ভারতব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন গণ-আন্দোলন শুরুর করিতে হইবে। নতুন এলাকাতেও তাহাদের প্রবেশ করিতে হইবে এবং একটি সাধারণ গণ-তান্ত্রিক মণ্ডলের উপর এমন এক নূনতম রাজনৈতিক একা প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে ঐ গণ-আন্দোলনকে নতুন নীতিসমূহের স্বপক্ষে দেশব্যাপী এক জাতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামে উন্নীত করা যায়। অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও মধ্যপন্থায় অবস্থিত পার্টি ও গ্রুপগুলিকে এবং কংগ্রেসের মধ্যকার ও কংগ্রেস অনুসরণকারী জনগণের গণ-তান্ত্রিক অংশকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করিয়া জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের পথ প্রস্তুত করিতে রাজনৈতিক কর্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এরূপ বামপন্থী একাই সমর্থ। কমিউনিস্টদের ভিতরকার ভেদাভেদ দূর করিয়া আন্দোলনে ও গণ-সংগঠনে একা প্রতিষ্ঠা করাই হইতেছে অন্য দেশের মত ভারতেও পাকিস্তানী শক্তি ও শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে আরও সংগ্রাম পরিচালনার অন্যতম প্রধান উপাদান।”

অনুরূপভাবে আরো অনেক বামপন্থী সোস্যালিস্ট দলের রাজনৈতিক প্রস্তাব উদ্ধার করে দেখানো যায় যে, প্রত্যেকেই একটি সংযুক্ত বামপন্থী আন্দোলন ও একটি বামপন্থী শক্তি একত্রের কথা বলেছেন। গত বছর লন্ডন টাইমস্ পত্রিকার জন্য একটি ইংরেজী প্রবন্ধে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু লিখেছিলেন, “বিশেষ বিশেষ স্থানিক ঘটনার বিচার করে এক সাধারণ শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শক্তিসমাবেশে যদি আমরা দোঁখের দিতে পারি যে, এই স্থানিক ভেদগুলির ভূমিকা গৌণ, তাহলে ভারতবর্ষে এক অখণ্ড কমিউনিস্ট

আন্দোলন গড়ে তোলা কঠিন বলে আমার মনে হয় না।”.....

“.....কংগ্রেসকে এমন সংকটের সম্মুখীন দেখা যাচ্ছে, যা কালে কালে আরো তীব্র হবে; তার সঙ্গে বাড়বে কংগ্রেসের ভিতরকার উপদলীয় রেবারেয। নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আদর্শগত ও কার্যক্রমগত মতবৈধ প্রকট হয়ে উঠছে, যার সম্পর্কে জনগণ পূর্বের যে-কোন সময়ের চেয়ে আজ বেশি সচেতন। বামপন্থী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রসার ও শক্তি সৃষ্টির পক্ষে এ যে কতবড়ো সুযোগ দেবে, তা বলাই বাহুল্য। কমিউনিস্ট পার্টি দরতোর তত্ত্বগত প্রভেদ এবং কার্যক্রমগত বিস্তার পার্থক্য বর্তমানে যা আছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এদের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা দেখছি না। কিন্তু এমন সুযোগ আছে, যেখানে শত্রু এই দুটো পার্টিই নয়, বরং বামপন্থী ও গণতন্ত্রী সবগুলি দলই যুক্তভাবে কাজ করতে পারে। আমার বিশ্বাসে সন্দেহ নেই যে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট পন্থার নির্ভুলতা এবং কমিউনিস্ট পন্থার প্রতিযোগিতামূলক আরো সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হবে।”

তত্ত্বের ক্ষেত্রে যা-ই থাক না কেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা কিন্তু আমাদের অন্য কথা বলে। ভাঙনের পর্বটা যত দ্রুত সম্পন্ন হয়, মিলনের বা পারস্পরিক বোঝাপড়ার পর্ব তত দ্রুত কোনদিনই হয় না। বামপন্থী রাজনৈতিক দল যতই শক্তিসম্মেলনের কথা বলুন না কেন, কমিউনিস্টরা যতই তাঁদের প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কে সচেতন থাকুন না কেন, বস্তুত অনেকক্ষেত্রেই তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয়। যার জন্য ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি তাদের প্রধান শত্রু (যে কথা তাঁরা নিজেরা প্রায়শই বলে থাকেন) কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একজোট হতে পারেন নি। যে সি-পি-এম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এস-এস-পি, পি-এস-পি প্রভৃতি দল নিয়ে যুক্ত মোর্চা গঠন করতে সচেষ্ট বলে রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন, সেই সি-পি-এম বালা কংগ্রেসকে সহ্য করতে পারেন নি। শত্রু তাই নয়, বাংলা কংগ্রেস নিয়ে গঠিত পাঁচ পার্টির বামপন্থী ফ্রন্টের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাক এক সাত পার্টির ফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে কার্যত বামপন্থীরা পারস্পরিক বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যে সি-পি-এম কংগ্রেসের উপদলীয় কলহকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে চান, যারা রাজনৈতিক পোলারাই-জেশনে বিশ্বাস করেন, তাঁরাই আবার কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিশীল শক্তি দেখতে পান নি। তাঁরাই কিন্তু আবার কংগ্রেস

পাণ্ডাহিক বঙ্গমতী

থেকে ভেঙে-আসা বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন (১৯৬৯, মধ্যবর্তী নিবারণ), তাঁরাই পাল্টামতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বপক্ষে ভোট দেন, আবার তাঁরাই জনসংঘ-স্বতন্ত্র এবং সিন্ডিকেট কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে হয়ে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোট দেন। বাংলা দেশে তাঁরাই আবার বাংলা কংগ্রেসকে সহ্য করতে না পেরে চরম ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেন—কার্যত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভাঙনের মুখে নিক্ষেপ করেন এবং বামপন্থী শক্তিসমূহের জোট যুক্তফ্রন্টের মধ্যে একটা অস্বস্তিকর আত্মকলহ এবং শরিকী সংঘর্ষের ফলেই মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে গেল। সরকার ভেঙে যাবার পর বাংলাদেশে বামপন্থীরা আবার বিশ্বাবিক্ত হয়ে গেলেন।

যে বাংলা কংগ্রেস সি-পি-এম-এর মহাভারত অশুদ্ধ করেছে, বারবার সেই বাংলা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে-যাওয়া আর এক ক্ষুদ্র পার্টি বিদ্রোহী বাংলা কংগ্রেসকে নিয়ে সি-পি-এম একটি ছয়-পার্টির ফ্রন্ট গঠন করলো। কমিউনিস্টদের ছাত্র-সংগঠন আগেই ভেঙেছিলো। সম্প্রতি তাদের শিক্ষক সংগঠন, মহিলা সংগঠন এবং সর্বোপরি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও ভেঙে গেল। এইসব ভাঙাচোরা আন্দোলন এবং বৈপারিত্যের মধ্যেই বর্তমান বামপন্থী আন্দোলনের ধারারটির অনুসন্ধান করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সারা দেশে বামপন্থী এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এ এক সংকটময় কাল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপের এ এক কলঙ্কজনক সময়। কিন্তু সে-কথা থাক। আমি আগেই বলেছি, প্রগতিশীল আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিন্দু সমাজ চিরকাল একটি গৌরবজনক ভূমিকা পালন করেছে। তবুও মার্ক্সীয় তত্ত্বের ক্ষেত্রে এই মধ্যবিন্দু সমাজকে সাম্যবাদের এক বিরাট অন্তরায় হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সে তত্ত্বের কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। যদিও কমিউনিস্টরা বলেন, “উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টনের প্রধান উপকরণগুলির মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ভার সমগ্র সমাজের দখলে আনা এবং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্তের রাষ্ট্র গঠন—এই হলো সমাজতন্ত্রের মূল শর্ত।”

বর্তমান সময়ে বাংলার মধ্যবিন্দু সমাজ ভাঙছে। একদিকে ক্রমবর্ধমান অর্থ-নৈতিক সংকট এবং অসাম্য, অন্যদিকে জটিল রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে মধ্যবিন্দু সমাজ তার নিজস্ব অক্ষরেখার উপর আর তাকে ধরে রাখতে পারছে না। এই ভাঙনের মধ্যে দাঁড়িয়ে একদিকে যেমন নতুন কিছু গঠন করার অদম্য

উৎসাহ, অন্যদিকে প্রচলিতের বন্ধন থেকে বিদায় গ্রহণের সূক্ষ্ম বেদনাবোধ এদেরকে নাড়া দিচ্ছে—বিচলিত করছে। কেন না, সমাজের এই অংশটি যেমন চিরকাল একটা শান্তিপূর্ণ, সং এবং সুস্থ নাগরিকবোধ-সম্পন্ন, তেমনি আবার সামাজিক অচলায়তনের বেড়া ভাঙবার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণকারী সৈনিক। এই বৈত-চরিত্র্যই মধ্যবিন্দু সমাজকে সমাজের অন্যান্য স্তর থেকে পৃথক করার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়ই হোক, আর পুঞ্জিবাদী সমাজব্যবস্থায়ই হোক, সমাজের যারা উচ্চতলার মানুষ তারা বরাবরই শোষকের ভূমিকা পালন করেছে। শোষণ করেছে নিচতলার শ্রমজীবী মানুষকে। শোষণের বিরুদ্ধে যদিও ওই সর্বহারা শোষিতশ্রেণীর প্রতিবাদে ফেটে পড়ার কথা—তবুও বহু শতাব্দী ধরে অজ্ঞানতার অন্ধকারে প্রতিপালিত এবং নানাপ্রকার অশ্ব কুসংস্কারাজ্যের সর্বহারা শ্রেণী তা পারে নি। এক্ষেত্রে পথনির্দেশক শক্তি হিসেবে মধ্যবিন্দুশ্রেণীই বরাবর এগিয়ে এসেছে সামাজিক অচলায়তনের বেড়া ভাঙবার আন্দোলনের পুরোভাগে, সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থে। তাঁরাই শ্রমিক-শ্রেণীকে সহত করেছে—তাদের বণ্টনার দিকগুলি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেছে। বণ্টনার পুঞ্জীভূত অভিমানই সংগ্রামের হাতিয়ার হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রমিক ও সর্বহারাশ্রেণীর এই ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য তথা বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিসম্পন্ন করার জন্য বহু ছাত্রকে রক্ত দিতে হয়েছে, এমন কি জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়েছে, বহু শিক্ষক ও বান্ধিজীবীকে বরাবর শাসকশ্রেণীর অন্ধকার কারাগারে দিন কাটাতে হয়েছে। এই ছাত্র, শিক্ষক, বান্ধিজীবীরা প্রধানত বাংলার মধ্যবিন্দু সমাজের মানুষ। আজকের বামপন্থী আন্দোলনের দিকে তাকালেও দেখা যাবে, তার নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে এই মধ্যবিন্দু সমাজ। সুক্ষ্ম শ্রেণী-বিভাগের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটিভাবে মাও সে-তুং এদেরই বলেছেন পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী। কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকেরা এদেরই বলেছেন opportunist বা সুবিধাবাদী। এরা বিপ্লবের অক্ষশক্তির মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু যে-কোন মহত্বের বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিমন্ডলে এই তত্ত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে মেনে নেওয়া যায় কি না, সেটা একটা বিতর্কের ব্যাপার। মেনে নিলে একথা অনস্বীকার্য হয়ে দাঁড়াতে পারে যে, ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলন আজও পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের কুক্ষিগত। কেন

না, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব কয়েম হয়ে গেছে একথা কেউই বলবেন না। অন্যদিকে নেতৃত্বের মধ্যে বিভেদমূলক বুর্জোয়া, পেটি-বুর্জোয়া সেক্টরগুলির ব্যাপক আন্তর্গত লক্ষ্য করার মতো। তথাকথিত সাক্ষা কমিউনিস্টরাই এই রোগে প্রবণভাবে আক্রান্ত। যার ফলে বামপন্থী রাজ-নৈতিক শিবিরে একা প্রতিষ্ঠার আশা কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে মার্ক্সীয় তত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাসে এদেশের মধ্যবিন্দু সমাজকে ফেলবার সাহস সম্ভবত কারোই নেই। তাই কমিউনিস্ট ও অতি-অ-কমিউনিস্ট সকলের রাজনৈতিক প্রস্তাবে ‘শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের’ সামাজিক-রাজ-নৈতিক ব্যবস্থা কয়েম করার কথা বলা হয়ে থাকে। বস্তুত একথা সত্য যে, আজকের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে মধ্যবিন্দু সমাজের অবদানের কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। অবমূল্যায়ন করারও প্রশ্ন ওঠে না এই কারণে যে, তাঁদের বাদ দিয়ে বর্তমান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা কেউ ভাবতেও পারেন না।

তবু বলবো, পূর্বোক্তিত বৈত-চরিত্র্য এবং নেতৃত্বের মোহাবিষ্টতাই বাম-পন্থী শক্তিসমূহের সমন্বয়সাধনের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেইজন্য দুটো কাজ অবশ্য করণীয় বলে মনে হয়ঃ

(১) বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বরাবরকার অভিস্রুত অভিমানী মধ্যবিন্দু সমাজের অবদান ও ত্যাগের সূচনা মূল্যায়ন।

(২) পুঞ্জিবাদী সমাজব্যবস্থার দ্রুত ধ্বংসসাধনের জন্য বামপন্থী শক্তি সমন্বয়।

আমি আগেই বলেছি, সারা দেশে বামপন্থী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এ এক সংকটময় কাল। দ্বিতীয় কর্তব্যটিতে ব্যর্থ হলে দেশের বামপন্থী আন্দোলন দারুণভাবে জখম হবে বলে অনেক বিশেষজ্ঞই মত পোষণ করেন এবং এর ফলে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনাও হতে পারে বলে আশংকা। ১৯৬৯ সালে বাংলা দেশে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে শরিকী সংঘর্ষের মধ্যে এই ধারণার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রীজ্যোতি বঙ্গ কমিউনিস্টদের যে প্রতিযোগ ক্ষমতার কথা লন্ডন টাইমসে বলেছিলেন—এর মধ্যে আর যাই থাক, সেই প্রতিযোগ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিউনিস্ট পন্থিত ছিল না। সকল প্রকার স্পর্শ-কাতরতা থেকে মুক্ত হয়ে আদর্শভিত্তিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঞ্জিবাদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শক্তি সমাবেশ করতে না পারলে এই প্রতিযোগ ক্ষমতাই কেবল অসার বলে প্রতিপন্ন হবে না—সারা দেশে বামপন্থী রাজনীতি এক চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন হবে।

যে আশায় বসে জামাই মেয়ের গায়ে জ্বর—এই গ্রাম্য কথাটা আমার গত সপ্তাহে বারে বারে মনে পড়ছে। বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্তের পর বাংলা কংগ্রেস নেতাদের কাছে 'আট পার্টির নেতাদের বিরূপিত-হীন ধরনার চিত্র দেখে যেমন মনে পড়ছে আট পার্টির নাছোড়বান্দা রূপ, তেমন বাংলা কংগ্রেস নেতাদের চালচলন দেখে মনে পড়ছে জামাইয়ের বসে থাকা বৃথা, কারণ মেয়ের গায়ে জ্বর, এই কথা সত্য। বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আট পার্টির শরিক দল যে বৃদ্ধবান্না করেছেন, সেখান থেকে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় মাইনাস হয়ে গেলে খুবই বিপদ হবে আট পার্টির শরিক দলগুলির। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে যাবার পর বিগত কয়েক মাস শ্রীমুখোপাধ্যায়কেই কম্পনায় সম্ভাব্য ফ্রন্টের নেতা ভেবে যত দূর এগিয়ে গেছে আট পার্টি, সেখান থেকে ফিরে আসা খুবই মূসকিল। তাই আট পার্টির এত ধরনা, এত আনাগোনা, এত সতর্কবাণী।

কত বিরোগান্ত দৃশ্যের অবতারণা ঘটলো বিগত কয়েক দিনে তার ইয়ত্তা নেই। ভাবতেও অবাক লাগে রাজ্যের সি-পি-আই দলের রাজ্য সম্পাদক-মণ্ডলীর প্রায় সব সদস্যই দু'বার হাজিরা দিলেন বাংলা কংগ্রেসের দরজায়। একবার শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি—একবার বাংলা কংগ্রেসের দপ্তরে। দু'বারই সঙ্গে ছিলেন শ্রীজ্যোতি দাশগুপ্ত, যার কলম দিয়ে কয়েকদিন আগেও শ্রীসদৃশীল ধাড়ার রাজনীতির পোস্টমর্টেম করে দেখানো হয়েছে—শ্রীধাড়ার রাজনীতি কত খারাপ। অনেক মজার দৃশ্যই চোখে পড়লো, কানে এল, গত সপ্তাহের রাজনীতির লেপখা চিত্র।

পয়লা আগস্ট শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, বেরিয়ে এসে কয়েকটা কথা বললেন অতি স্পষ্ট ভাষায়। শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন—আট পার্টিতে যোগদানের প্রস্নে বাংলা কংগ্রেসের “না” শেষ কথা নয়। শেষ কথা যদি হবে, তবে আবার অন্য দলের সঙ্গে আলোচনার অবকাশ রাখা হয়েছে কেন? নির্বাচন সম্পর্কে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের বর্তমান অশান্ত অবস্থার যদি দেখা যায় কোন উন্নতি হচ্ছে না, বরং আরো অবনতি হচ্ছে, তখন নির্বাচন চাইতে হবে—কারণ তাহলে বোঝা যাবে বর্তমান সরকার শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারবে না, তার জন্য নির্বাচিত সরকার চাই। আর যদি দেখা যায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে, তখন ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনের কোন সম্মতি থাকবে না। এই আগস্ট বাংলা



কংগ্রেস সম্পাদকমণ্ডলীর সভার পর শ্রীসদৃশীল ধাড়া যে কথাগুলি বললেন, তাতে বোঝা গেল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কেও সম্পাদকমণ্ডলী জানিয়ে দিয়েছেন, “মেয়ের গায়ে জ্বর”। শ্রীসদৃশীল ধাড়া বললেন, আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত ও বহাল আছে, সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাংলা কংগ্রেসের কর্ম-পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের অধিকার থাকলে একমাত্র কর্ম-পরিষদের আছে। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সংবাদপত্রে অজয়দার নামে ‘বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নয়’ বলে যা বেরিয়েছে, অজয়দা তা অস্বীকার করেছেন। এর পর শ্রীধাড়া বললেন—নির্বাচন সম্পর্কেও অজয়দার নামে যা বেরিয়েছে, সেটাও সত্য নয়। আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় অজয়দাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বলেছেন—না, ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন হতে পারে বলে যা বেরিয়েছে, সেই কথা সত্য নয়। শ্রীধাড়া যখন কথা বলছিলেন, তখন রুম্বুয়ার কক্ষে বসে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সি-পি-আই দলের নেতাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা করছিলেন।

যে বন্ধ দরজার দিকে দেখে মনে পড়ছিল সেই অনেকদিন আগে একদিন কংগ্রেস ভবনে একটা রুম্বুয়ার বৈঠকের কথা, সেই রুম্বুয়ার বৈঠক দেখে আমার সাংবাদিক বন্ধু ডঃ মুখার্জী বলেছিলেন—
 “রুম্বুয়ার বৈঠক মিথ্যায় রুখি
 সত্য বলে তবে আমি দোষা

দিয়ে ঢুকি।
 সত্য কথা বলতে কি, সেটাই ছিল রাজ্য কংগ্রেস ভাগ হবার আগে শেষ যুক্ত সভা, তার পর রাজ্য কংগ্রেস দুই ভাগ হয়—আরো পরে আদি ও নব কংগ্রেসে রূপান্তরিত হয়। এইখানেও সেই কথা—
 “রুম্বুয়ার বৈঠক মিথ্যায় রুখি
 সত্য বলে তবে আমি দোষা

আসা রোধ করতে পারবেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সত্যেরও যে প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে সে কথা কি কেউ ভেবে দেখেছেন? অজয় ব্যাংক ভাঙিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে অনেকেই পার হবার বাসনা রাখেন—সেখানে ঘরের লোক যদি সেই কাজটা একটু বেশি করে, তবে বাইরের কারো আপত্তি থাকবার কথা নয়। কিন্তু শ্রীধাড়া সেইদিন সাংবাদিকদের কাছে যখন একটার পর একটা বলছিলেন—অজয়দা এই কথা বলেন নি, অজয়দা এ কথা বলেন নি, আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করে এই কথা জেনেছি। এই কথা শুনে সাংবাদিকরা শব্দ বুদ্ধে ছিলেন সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় পরি-স্থিতিটা কেমন বিরোগান্ত হয়েছিল, যখন শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের বিশ্বাসমত বলা কথাগুলি সভায় বসে ফেরত নিয়ে-ছিলেন।

বাংলা কংগ্রেস ভবনে ভিতরের ঘরে বসে যখন সি-পি-আই নেতাদের সঙ্গে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের আপোষ-আলোচনা চলছিল, তখন বাইরের ঘরে বসে শ্রীসদৃশীল ধাড়া সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একটা বিবৃতি সাংবাদিকদের হাতে দিলেন শ্রীধাড়া। যে বিবৃতির মূল কথা হল সি-পি-আই জমি দখল আন্দোলনের মাধ্যমে পার্টি ফাণ্ডে টাকা সংগ্রহ করছে। সেই সঙ্গে শ্রীধাড়া বললেন, বাংলা কংগ্রেসের আট পার্টিতে যোগদান সম্পর্কে “না” হল পাকা কথা—সেই কথা ফেরত হতে পারে এমন সম্ভাবনা বা প্রশ্ন নেই। কারণ এই সিদ্ধান্ত হল বাংলা কংগ্রেস কর্ম-পরিষদের। অর্থাৎ শ্রীধাড়া প্রায় এক কথায় বলে দিলেন—আট পার্টি অথবা সি-পি-আই জামাই যে আশায় বসে থাকুক, মেয়ের গায়ে জ্বর, অর্থাৎ বধু নিয়ে জামাতাব ফেরত যাবার সম্ভাবনা নেই, জামাতাকে খালি হাতে ফিরতে হবে। অবশ্য মেয়ের গায়ে জ্বর শব্দ সি-পি-আই আর আট পার্টির ক্ষেত্রে নয়, শ্রীধাড়ার ক্ষেত্রেও কি তা প্রযোজ্য হয় নি? সি-পি-আই আর বাংলা কংগ্রেস বৈঠকে বসে একটা শান্তি প্রস্তাব রচনা করা হল—যে শান্তি প্রস্তাব রচনা করলেন স্বয়ং শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, নিজে হাতে কাগজে শান্তি প্রস্তাব লিখে কাগজখানি দিলেন শ্রীবিম্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। শ্রীবিম্বনাথ মুখোপাধ্যায় ছোড়দার হাতের লেখা কাগজখানি সময়ে নিজের নোট-বকের মধ্যে রেখেছিলেন। অর্থাৎ শ্রীসদৃশীল ধাড়াকেও মেয়ের গায়ে জ্বর দেখতে হল শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের লেখা শান্তি চুক্তিতে। মেয়ের গায়ে জ্বর দেখিয়ে দিয়েছেন শ্রীঅশোক ঘোষ অতি সংক্ষিপ্ত কথার মধ্য দিয়ে গত সপ্তাহে। অবশ্য শ্রীঘোষের বলা কথাটা

সংবাদিক বসুমতী

ঠিকমত কাগজে না বেরুনোতে পরদিন সকালে শ্রীঅশোক ঘোষই ফোন করে শ্রীঅজয় মদুখোপাধ্যায়কে বলেছিলেন—দেখুন, কাগজে কিন্তু ভুল খবর বেরিয়েছে। শ্রীমদুখোপাধ্যায় বলেছিলেন—ও নিজে চিন্তার কিছু নেই, ভুল খবর তোমার নামে বের হয়েছে, আমার নামেও বের হয়। শ্রীঘোষ আট পাটির শরিক দলের সঙ্গে আলোপ-আলোচনা করে যখন নিশ্চিত হলেন যে, বাংলা কংগ্রেস আট পাটিতে না এলেও কোন পাটি বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে যাবে না, তখন একদিন বললেন—বাংলা কংগ্রেসের সামনে দুটো পথ খোলা—আমাদের সঙ্গে থাকলে সে মাথায় মুকুট পরবে আর কংগ্রেসের সঙ্গে গেলে তাকে কবরের পথে যেতে হবে। কারণ শ্রীঅজয় মদুখোপাধ্যায়ের ঐতিহ্য গড়ে উঠছে কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্য দিয়ে—সেই ঐতিহ্য নষ্ট হলে অজয় মদুখোপাধ্যায়ের কি থাকবে?

এই যে সব কথাবার্তা, এই যে সব আলোচনা—এর মধ্যে প্রকৃত অবস্থাটা কি? প্রকৃত অবস্থা হল আমি অনেক আগেই ধরেছি, বাংলা কংগ্রেস আট পাটিতে আগবার আগে এবার অনেক কিছু সত্য কবুল করিয়ে নেবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলা কংগ্রেসের একটা অংশের কাছে সি-পি-আই ও এস-ইউ-সি, ফরোয়ার্ড ব্লকের কিছু কিছু কাজ সি-পি-এম-এর কাজের সঙ্গে কোন তফাৎ বলে মনে হয় না।

মেদিনীপুরে সি-পি-আই জমি দখল নিয়ে যা করছে বা এস-ইউ-সি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় যা করছে—তার সঙ্গে সি-পি-এম-এর কাজের তফাৎ বাংলা কংগ্রেস খুঁজে পায় না। তাই বাংলা কংগ্রেস মনে করে আবার ফ্রন্ট করে, আবার সরকার করে যদি সি-পি-আই, এস-ইউ-সি, ফরোয়ার্ড ব্লকের আচরণে সরকার ভাঙতে হয়, তাহলে কি হবে? অজয়বাবু কি বাকী জীবনে শুধু ফ্রন্ট গড়বেন, সরকার গড়বেন আর ভাঙবেন? এই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্নও আছে, সেটা হল বাংলা কংগ্রেসের একটা অংশ কি ইতিমধ্যে শাসক কংগ্রেসের সঙ্গে কোন পাকা কথায় বন্ধ হয়ে গেছে? আট পাটি এই ভাবনা থেকেও মুক্ত নয়।

বাংলা কংগ্রেস যে আট পাটিকে ঘেঁষিয়ে রেখেছে, তার তিনটে কারণ হতে পারে। এক কারণ হল—দলের মধ্যে আট পাটি আর নব কংগ্রেসে যাওয়া নিয়ে নিশ্চয়ই দুটো মত আছে, কাজেই দুই মত এক না হওয়া পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আর এক কারণ হতে পারে—বাংলা কংগ্রেসের নব কংগ্রেসে যাওয়া পাকা হয়ে গেছে, এখন শুধু চেষ্টা করা আট পাটি থেকে কোন কোন দলকে নিজেদের দিকে টেনে আনা

যায় কিনা।

তৃতীয় কারণ হতে পারে বাংলা কংগ্রেস আট পাটিতেই যোগদান করবে, তবে এবার বিয়ের পয়লা রাতে বিড়াল মারতে চায়। অর্থাৎ আগামী নির্বাচনের পর বাংলা কংগ্রেস আসন সংখ্যা যাই পাক না কেন, মদুখোপাধ্যায় সহ গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পাবে, মদুখোপাধ্যায় থাকবে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার, মদুখোপাধ্যায়ই হবেন মন্ত্রিসভার যে কোন আদেশ জারি ও বাতিলের মালিক—সেই সঙ্গে ঘেরাও, জোর করে জমি দখল চলাকে না, হিংসার পথ ত্যাগ করতে হবে, সব রকম জোর-জবরদস্তিমূলক পথ পরিহার করতে হবে।—এই সত্যগুলি কবুল করিয়ে নিতে চায়।

একটা চলতি কথা আছে—চ্যাঁচ যতদিনে লায়ক হবে, চাচা ততদিন গোরে যাবে। প্রকৃত পক্ষে বাংলা কংগ্রেস-আট পাটির অবস্থা হল তাই—এই দুই পক্ষ যতদিনে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পৌঁছবেন, ততদিনে দেখবেন চাচার গোরে যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। শ্রীঅজয় মদুখোপাধ্যায় ও আট পাটি রাজ্যে যে বিকল্প একটা রাজনৈতিক লাইন দিতে

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রাজনৈতিক উপন্যাস 'স্রোতের' সংগে প্রকাশ করা গেল না।

—সম্পাদিকা

যাচ্ছে, সেই লাইন ভোঁতা হয়ে যাবে। আট পাটি ও বাংলা কংগ্রেসের লাইন ছিল—কংগ্রেস নয়, আবার মার-দাঙ্গার পাটি সি-পি-এম নয়, মাঝের পথই হল বাঁচার পথ। এই লাইনটা দুইপক্ষের কচলাকচলিতে ক্রমেই তেতো হয়ে যাচ্ছে ও গেছে। ফলে আট পাটি ও বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যতে যদি জোটও হয়, তাহলে সেই জোট একটা সুবিধাবাদী জোটের বেশি মর্যাদা পাবে না। অবশ্য এর মধ্যে যদি কোন পক্ষের এমন মতলব না থাকে যে—ভিতরে থেকে এই জোটের মর্যাদা নষ্ট করে নিজের অভীষ্ট স্থানে চলে যাবার, সেটাও খুব অসম্ভব ঘটনা নয়।

আট পাটি জোটের মধ্যেও এমন কেউ থাকতে পারেন, যাদের লক্ষ্য হল—এই দিকে জট পাকিয়ে যথাসময়ে সি-পি-এম-এর সঙ্গে হাত মেলানো অথবা ডামাডোল লাগিয়ে নব কংগ্রেসের সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া। কিন্তু সত্যি কি আজ

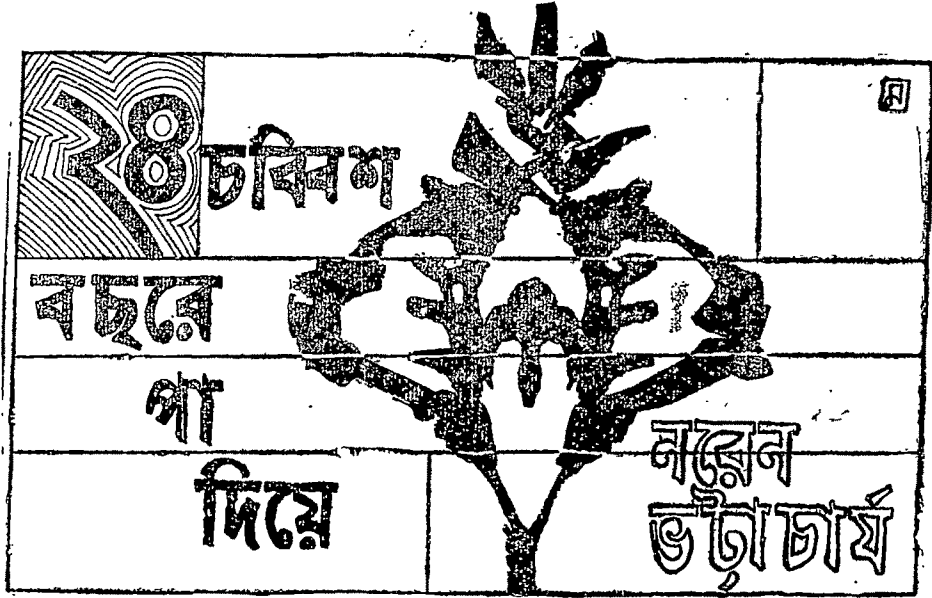
বাংলা কংগ্রেস ও আট পাটি ছাড়াছাড়ি হতে পারবে? সত্যিই কি এই দুই-পক্ষ একে অপরকে ছেড়ে চলতে পারবে? এই প্রশ্নের জবাব সহজ নয়, তবে একটা নমুনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত অবস্থাটা বোঝা যেতে পারে। এই অবস্থা হল এইদিকম। যথা এক অন্ধ আর এক খোঁড়া মিতালি করে রাস্তা চলে আর উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। অন্ধের কাঁধে বসে থাকে খোঁড়া। অন্ধ তার সবল পায়ে পথ চলে। খোঁড়া তার চোখ দিয়ে অন্ধকে পথের নিশানা বলে দেয়। কিন্তু একদিন অন্ধের মনে সন্দেহ এল আমার কাঁধে চেপে খোঁড়া ক্রমেই ভারী হয়ে উঠছে, নিশ্চয়ই ও আমার অন্ধের সন্যোগ নিয়ে বেশি খাচ্ছে, অতএব ওকে আর বইব না। এইভাবে একদিন অন্ধ খোঁড়াকে পথে নামিয়ে বলল, আমি আর তোমাকে বইতে পারবো না—তুমি তোমার পথ দেখ। খোঁড়া বলল—সে কি, আমার পা নেই, আমি যাবো কিভাবে, বারা অন্ধ তুমি সত্য দাও, আমি মেনে নিচ্ছি, আমার কাঁধ থেকে নামিও না। অন্ধ অনেক দর কষাকষি করে বলে—হ্যাঁ একটা সত্য আছে, তোমার শরীরের ওজন কমাতে হবে, তবে আমি তোমায় বইবো। খোঁড়া বলে, এ কি সত্য বারা, শরীরের মাংস কেটে, তো ওজন কমানো যায় না, এই সত্য মানবো, কি করে? অন্ধ বলে, না, মানো, ভাল কথা, পড়ে থাকো এই মারপথে। আমি চললাম। খোঁড়া কাকিয়ে ওঠে, অন্ধ তোমার সত্য মানবো কিভাবে বল, কি করে আমার ওজন কমাই বলে দাও।

অন্ধ বলে, কেন, তুমি খাওয়া ছেড়ে দাও। একেবারে ছাড়তে হবে না, তবে কমিয়ে দাও, ওজন কমে যাবে। খোঁড়া বলে, তাই হবে বারা, কাল থেকে আমি খাওয়া ছেড়ে দেব, ওজন কমাতে, তুমি আমার কাঁধে তোলা।

কিন্তু খোঁড়া নিজের পরামর্শ হারিয়ে একবারও ভারলো না—আচ্ছা, আমার ফেলে অন্ধ যাবে কোথায়? ও তে একটু এগুলেই খানা-খন্দ-গর্তে, কাঁটারে পড়বে।

হ্যাঁ, বাংলা কংগ্রেস আজ আট পাটিতে যে সত্য দিতে চায়, সে হল ঐ ওজন কমানোর সত্য—না খেয়ে থাকার সত্য। শ্রীঅশোক ঘোষ শ্রীসদুশীল ধাড়া কে শেষ কথা বলে এসেছেন—আপনি বলুন, কি কি সত্য বাংলা কংগ্রেস আট পাটিতে যোগদান করতে পারে। শ্রীঘোষ আগামী ১৬ই আগস্টের মধ্যে এই সত্যের তালিকা পেতে চেয়েছেন। এবং সেই জন্য অপেক্ষা করছেন।

—১০ই আগস্ট '৫০



॥ এক ॥

॥ দ্বই ॥

প্রতি বছরেই সাম্প্রতিক বন্দুতীর পাতায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি করে প্রবন্ধ আমাদের লিখতেই হয় এবং ধলাই বাহাদুর, এই বাৎসরিক কর্মে আমি ধরে প্রতিবোধ করি না। সমগ্র ব্যাপারটাই আমার কাছে নিছক আনুষ্ঠানিক বলে মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে পনেরই আগস্টের মত স্মরণীয় দিনটি তার সমস্ত গুরুত্বই হারিয়ে ফেলেছে। মানুষের কাছে এই দিনটি কোন আশার বাণী বহন করে আনে না। সকল উন্নত দেশেই স্বাধীনতা দিবস জনগণের নিকট একটি উৎসবের দিন। এখানে সে সবার বিন্দুমাত্র নেই। গৃহশীর্ষে এই দিনে পতাকা উত্তোলিত হয় না, সম্মান গৃহে গৃহে আলোকসজ্জার কথা কল্পনা করা যায় না। সরকারী ভবনগুলিতে অবশ্য পতাকা ওঠে, সেও তো আনুষ্ঠানিক, সেখানেও কোন প্রাণের স্পর্শ নেই। রুটিনমাসিক কুচকাওয়াজ হয়, রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সাধারণ মানুষ ঐ একদিনের ছুটিকেই যথা লাভ বলে মনে করে। এ অবস্থা কেন ঘটল, সেটা নিশ্চয়ই বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। জনসাধারণের সর্বাধিক অংশ সংগতভাবেই বিশ্বাস করেন যে, সত্যাকারের স্বাধীনতা তাঁরা পান নি। মর্দুটিমেয় কিছু লোক গত তেইশ বছরে অবৈধ উপায়ে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে এবং সরকার ও সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা তাদেরই সেবার নিয়োজিত। জনসাধারণের কোন মণ্ডল বিগত তেইশ বছরে হয় নি। গাল-ভরা বুলি ভিন্ন জনসাধারণ শাসকদের কাছ থেকে আর কিছুই পায় নি। সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক শাসক-শাসিতের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে।

একজন ঐতিহাসিক হিসাবে এর জন্য আমি নিশ্চয়ই আজকের ও বিগত দিনের নেতা ও শাসকদের দায়ী করব। একটা কথাই অনেকেই অস্বীকার্য করবেন, কিন্তু তাহলেও কথাটি মোটামুটিভাবে সত্য যে, এদেশে যে-কোন আয়তনীয় মানবের পক্ষে নেতা হওয়া সম্ভব ছিল এবং তা আজও সম্ভব এবং তার জন্য কোনদিনই খুব বেশি মূল্য দেবার প্রয়োজন হয় না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে কোন ব্যক্তি যদি তাঁর ব্যক্তিগত পেশায় সফল্য লাভ করতে পারতেন, যদি তিনি রাজনীতি করতে চাইতেন, তাহলে তাঁর জন্য নেতার আসন আপনিই তাঁর হয়ে যেত। অতীত আমলের যারা খুব বিখ্যাত নেতা বলে পরিচিত, তাঁরা এইভাবে নেতৃত্ব এসেছেন। কিন্তু জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্কই ছিল না। বড় ব্যারিস্টার বা বড় ডাক্তার বা বড়দের চাকুরে নাম-ধাম-প্রতিপত্তির জন্যই রাজনীতিতে নামতেন, সহজেই নেতা বনতেন। সে আমলের কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের ব্যবহার ছিল অননুগ্রহণীয় ভ্রমতর। পৃথিবীর আর কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী নেতারা বড়লাটের সঙ্গে ডিনার খেতে খেতে সংগ্রাম করেন নি। উৎপীড়ন বলতে কিছুই ছিল না, শব্দ মাঝে মাঝে জেলে যাওয়া, সেটায় লাভ বৈ লোকসান ছিল না, সে আমলে জেলে যাওয়া মানেই বিরাট পাবলিসিটি পাওয়া। অনেকেই মনে মনে জেলে যাওয়াটাকে স্বাগত জানাতেন। অবশ্য সাধারণ কর্মীর উৎপীড়িত হতেন, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? মোন্দা কথা সাদা শাসকেরা তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে বাদামী শাসকের মত ব্যবহার করতেন, পদবীর সঙ্গে আলেকজান্ডারের ব্যবহারের মত।

মোহটা আজকে ভাঙিয়ে দেবার সত্যই বড় প্রয়োজন দেখা গেছে। দু'একটি ব্যক্তিগত বাদ দিয়ে, মানুষ হিসাবে এঁরা সকলেই ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর। দেশপ্রেম ও সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী কারোর ছিল না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফলস্বরূপ কংগ্রেস তৎকালীন ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশেই ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল এবং এই ক্ষমতার লোভকে ব্রিটিশ সরকার ক্রমাগত খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছিল, লিওনার্ড মোজলের ভাষায়, যেমন লোকে গরুর সামনে গাজর খুলিয়ে দেয়। দুর্দৃষ্টিহীন, ক্ষমতালোভী এই তৃতীয় শ্রেণীর আদর্শহীন, নীতিভ্রষ্ট মানবগুলি অতি সহজেই ভারত বিভাগে রাজী হয়েছিল, জিন্মা আর মুসলিম লীগকে দোষ দিয়ে কি হবে! ভারত বিভাগ করে ক্ষমতালোভের স্বপ্ন কংগ্রেস বহুকাল ধরেই দেখে এসেছে। রাজাগোপালাচারী কর্মলার কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?

দেশ স্বাধীন হবার পর নেতৃত্বের চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটল না। বরং তৃতীয় শ্রেণীর মানুষদের নেতৃত্বের পরিবর্তে চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের হাতেই নেতৃত্ব এল। আগেকার দিনে নেতৃত্ব পেতে হলে নিজের ব্যক্তিগত পেশায় সফলতার প্রয়োজন ছিল এবং পরবর্তীকালে নিছক টাকাই নেতৃত্ব লাভের একমাত্র যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হল। রাজ্যের চোর-বদমায়েস, গুন্ডা, লম্পট, কালোবাজারীরা স্রেফ টাকার জোরে নেতা বনে গেল। স্বাধীনতার পরবর্তী বাইশ বছরের রাজনীতি ইলেকশান-নির্ভর। ভোটে জিততে গেলে টাকা লাগে, হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা। সং কর্মীদের টাকার অবস্থা এমন নয় যে, নির্বাচনের ওই বিপুল ব্যয়ভার বহন করবেন। কাজেই দল কেন, তাঁদের মনোনয়ন দেবে? সব টাকাওয়ালারা ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে ঢুকে পড়েছিল, আর

তিন ভুবন জুড়ে এখন

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পেছনে হাটের সময় এখন নয়। এখন মানুষের মূর্খের ওপর ভিত্তি তৈরী করার আলো, বুদ্ধির মধ্যে প্যারির তোলপাড় আর কালো আগুনের গর্জন—যে আগুন পুড়িয়ে নিতে চায় হালোমের সমস্ত অপমান আর শ্রম, যে আগুন ধিকি ধিকি ছড়ালে দক্ষিণ আফ্রিকায় আর রোডেশিয়ায়, কঙ্গোয়, এমন কি এই লাথো লাথো বেকারের ভিক্ষকের উলঙ্গের পিছনভিত্তি ভরতবর্ষে। পেছনে হাটের সময় এখন নয়।

এখন দেয়ালে দেয়ালে ইস্তহার আর কবিতা লেখার সময়; এখন তিন ভুবন জুড়ে রক্তে ভাসা মানুষগুলোর মাথা তুলে দাঁড়ানোর সময়। এখন প্রতিটি মানুষের হাতের মূঠোয় একটি করে লাল নিশান; কোনোটি ছোট কোনোটি বড় তাতে কিছু আসে যায় না—কাঁধে রাইফেল; গাদা বন্দুক হলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু পেছনে হাট এখন অসম্ভব।

এখন একাকার জেলখানায় সারা রাত ঘুমুতে না পারা হো চি মিনের আর বাইরে ভেজা ঘাসের ওপর সারারাত জেমে থাকা চে গেভারার কণ্ঠস্বর। এখন হালোমের দেয়ালে আর প্যারির রাস্তায় একাটাই কবিতা, শিকল ভাঙার শব্দ, কেবল শিকল ভাঙার শব্দ, আর রাইফেলের শব্দ.....

এমন কি এই লাথো লাথো কাপড়বুকের, ভিক্ষকের, ক্রীতদাসের ভারতবর্ষ; শতাব্দীর পর শতাব্দী যে শুধু পুড়িয়েই হাটতে শিখেছে; যার কবিতা বোবা, শ্রমিক আর কৃষকেরা বধির—সে-ও এগিয়ে চলেছে। বুদ্ধগদলি সরু সরু; কঙ্কালের মত চেহারা; একটি দৃষ্টি তিনটি, বড়জোর চারটি কি পাঁচটি মানুষ এখানে, ওখানে—হাতের নিশানগুলি এত ছোট যে ভাল করে দেখা যায় না! কিন্তু কিছু আসে যায় না। একটা গাদা বন্দুক দিয়েও অসাধ্য সাধন করা যায়, যদি কেউ আগুন ছুঁয়ে শপথ করে।

টাকার জোরে তারা সহজেই মনোনিয়ন ব্যাগিয়ে নিতে পেরেছিল। ভারতের এত-গদলি বিধানসভা, লোকসভা, শব্দ তাই নয়, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যেখানে গণতান্ত্রিক নির্বাচনের প্রয়োজন থাকে, সবাই এই টাকার কুমীরদের আধিপত্য। কালো টাকাকে সাদা টাকায় পরিণত করার একটা ভাল ক্ষেত্র নির্বাচন, হিসাববাহিত্ব অর্থ প্রাণ খুলে ব্যয় করার এমন মওকা বড় একটা মেলে না। পুঞ্জপতিরাও তাদের ইয়েস-ম্যানদের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে লাগল। তাদের কালো টাকা সাদা হবার এটা একটা ভাল ক্ষেত্র, আর যেসব লোক এদের টাকার জোরে ক্ষমতায় বাবে, তারা এদেরই স্বার্থ দেখবে, এটাই স্বাভাবিক। কাজেই স্বাধীনতা লাভের পর এতগুলি বছরে এইসব ব্যক্তিদের কপালেই স্বর্গসুখ জুটেছে, জনসাধারণের কিছু হয় নি।

॥ তিন ॥

এরপর বামপন্থী নেতৃত্বের কথায় আসা যাক। বামপন্থী নেতৃত্ব বলতে আমি মাক্স-বাদে বিশ্বাসী দলগুলির কথাই বলছি। পি-এস-পি, এস-এস-পি এবং অপরাপর কংগ্রেস-বিরোধী দলের কথা বলছি না, কারণ আমার বিশ্বাস, এগুলি কংগ্রেসেরই চারা, কংগ্রেসে পাশা না পেয়ে কিছু নেতা এইসব দল খুলেছেন। আর রাম-শ্যাম-বদ-মদ এদেশে ইচ্ছা করলেই দল গঠন করতে পারে।

এদেশে কমিউনিস্ট পার্টির বয়স বড় কম নয়, প্রায় অর্ধশতাব্দী। এবং সেই তুলনায় তার অ্যাটিভিস্ট এমন একটা কিছু নয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব অন্যান্য রাজ্যে মগণ্য। অল্পে একদা প্রভাব ছিল, কিন্তু

এখন তা নেই। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, এত বছরের জীবনে কমিউনিস্টদের প্রভাব এত কম কেন? বিশেষ করে এমন একটা সময় ছিল, যখন সবচেয়ে ডিসিপ্লিনড এবং রাজ-নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত কমিউনিস্ট গর্ব অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারত। কিন্তু সে দলের একটি জোরালো রাজ-নৈতিক তত্ত্ব ছিল এবং সে দলের কমিউনিস্ট এফিসিয়েন্ট ছিল, সে দলের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এত পুয়ের শো কেন? এখানেও সেই নেতৃত্বের প্রশ্ন। কমিউনিস্ট পার্টি কৃষক-শ্রমিকদের পার্টি হলেও সেখানে কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এই পার্টির নেতৃত্ব সর্বতোভাবেই মধ্যবিত্ত-নির্ভর, মূলত এর প্রভাব শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যারা মূলত বিদগ্ধবান্ধির উপর নির্ভর করেই পেট চালায়। সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে কৃষকদের উপর কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব নামমাত্র, শ্রমিক ইউনিয়ন-গুলির অধিকতর কমিউনিস্ট পার্টির আওতায় নেই, পুলিশ ও সামরিক বিভাগে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ যৎসামান্য। একমাত্র ছাত্র-শিক্ষক-কর্মীক এবং নিম্ন আয়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেই এর প্রভাব। তাও সর্বভারতীয় পরিসরে নয়, উত্তর ভারতের ছাত্ররা মূলত দক্ষিণপন্থী সাম্প্রদায়িক শিবিরভুক্ত, দক্ষিণ ভারতেও এমন কিছু অনুকূল অবস্থা নয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস যত্ন করে অনুশীলন করলে দেখা যায় যে, বরাবরই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। আজকের কমিউনিস্ট পার্টি যে তিনভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, তা ওই বহুকালসঞ্চিত নেপথ্য দ্বন্দ্বের ফল। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন তেমন যে সাফল্যলাভ করতে পারে নি, তার কারণ কমিউনিস্ট পার্টির ধর্ম কম সমর্থকই নিজেদের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। বেশির ভাগ কমিউনিস্টেরই সৃষ্টি বই পড়ে এবং প্রচারে।

আমার নিজের হিসাব অনুযায়ী, কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে একেবারে গোড়ার দিকের কমিউনিস্ট, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যারা বিলেতে পড়াশোনা করতে গিয়ে কমিউনিস্ট বনেছিলেন, তৃতীয়টি হচ্ছে যারা আগে সন্থাসবাদী ছিলেন পরে কমিউনিস্ট হয়েছেন এবং চতুর্থটি হচ্ছে যারা আগে কংগ্রেস কর্মী ছিলেন, কৃষক-সভা ইত্যাদি করতেন, পরে তিরিশের দশকে নিজ কমক্ষেত্রের অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট হয়েছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীটিই নির্ভরশীল, কেন না বই পড়ার চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এদের বেশি কাজ দিয়েছে এবং জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কটা প্রকৃতপক্ষে এরাই রেখেছেন। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত শ্রেণীটি পর্যাপ্ত প্রতি-নিধি পায় নি বলেই আমাদের দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন অভিজ্ঞতা-নির্ভর হয়ে ওঠে নি এবং তারই ফলে এদেশে গেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং বা হো চি মিনের মত প্রকৃত কোন পীপুলস-ম্যান কমিউনিস্টদের মধ্য থেকে গড়ে ওঠেন নি। গান্ধীজীর রাজনীতির আদর্শ এবং রাজ-নীতিতে আমার আস্থা নেই, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বকে কোনােদিন অস্বীকার করা যাবে না যে একটি অনুমত, অশিক্ষিত, অচেতন, অন্ধ এবং বহুধা-বিশিষ্ট জাতির সর্বস্তরে তিনি স্বাধীনতালাভের আবেগটিকে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ঠিক এই রকম একজন জনতার মানুষ সৃষ্টি হয় নি, যিনি সারা দেশে কমিউনিজমের প্রতি আগ্রহ সার্বিক-ভাবে জাগিয়ে তুলতে সমর্থ। মাক্সবাদে বিশ্বাসী অপরাপর ছোটখাট পার্টি-গুলিকে আমরা বর্তমান আলোচনার টানাছি না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

গরিলা যুদ্ধের হের-যোঁর

সত্যেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বর্তমানে গরিলাযুদ্ধ সম্বন্ধে প্রচুর পরিচয় নানা কথা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। কিন্তু এই পন্থাতি ইতিহাসের পাতায় নতুন নয়। শিবাজীর বীরত্ব কাহিনী এই যুদ্ধ-পন্থাতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমেরিকার রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় বিপ্লবী-বীর ফ্রানসিস মেরিয়নের বীরত্ব কাহিনী, তাও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। (ক) ১৮০৮-১৮১৩ সালে নেপোলিয়ানের প্রচণ্ড আক্রমণের বিরুদ্ধে সামান্যসামান্য প্রতিরোধ-শক্তি স্বাধীনভাবে সশস্ত্র করিতে অসমর্থ হয়ে স্পেনবাসীরা যে যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেটিও ছিল এই গরিলা-পন্থাতিরই সমতুল্য। এরূপক বহুর পরে রুশের কসাক সৈন্য ও চাষীরা নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, সেটিরও এক গরিলা-ধরনের যুদ্ধ-কৌশলই বলা চলে। আরার অল্প-বিস্তর এক শতাব্দী অতীত হওয়ার আগেই ইটলীর সাহেবের প্রবল শক্তি-রুশের কাছে যখন বিপর্যস্ত হয়, তখনানেও অবলম্বিত হয়েছিল এই গরিলা-কৌশলই। সবশেষে মাও সে-তুং-এর দিরেছিলেন এই

(ক) দক্ষিণ-কারোলিনাতে লালিতপালিত হয়ে সামান্য বিদ্যাশিক্ষার পরে মেরিয়ন কিছুকাল কৃষিকারে নিযুক্ত ছিলেন। ১২ বছর বয়সে, ১৭৫৯ সালে তিনি চেরোকিদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে সংগঠিত এক সৈন্যদলে যোগ দেন। অতঃপর রাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে, বিশজন্যে ক্রোকার সাহায্যে একটি সামান্য সৈন্যদল তথা কোম্পানি গঠন করে, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশদের ওপর উপযুক্ত গরিলায়তে হানেন, বিশেষত কনফেডারেলদের চক্রান্ত রহস্যময় গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) অধ্য চীনের হুনান প্রদেশে এক প্রাচীনত্বপূর্ণ গরিলাদের মাও রুশের

পন্থাটিকে একটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। অবশ্য এই সম্পর্কে একথা ভুলে চলবে না যে, পূর্বোক্ত গরিলাযুদ্ধের কৌশল সকল ক্ষেত্রেই অবগম্য হইয়াছিল বাহ্য-শত্রুর বিরুদ্ধে আর মাও-কে তাঁর গরিলা কৌশল প্রয়োগ করিতে হইয়াছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহ-শত্রুর বিরুদ্ধে। সেখানে একদিকে ছিল ধনী, পুঞ্জিপতি ইত্যাদির

করেন ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে। সাধারণভাবে বিদ্যালয়ের পাঠ সেকেন্ডারী স্কুলে শেষ করে ১৯১৭ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। ইতিমধ্যে চীন ও অন্যান্য দেশের দর্শনশাস্ত্র, কবিতা, ইতিহাস ইত্যাদি পড়া কিছুই তাঁর বাকি ছিল না। অতঃপর গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। এই স্থানে তিনি লি তা চো (Li Ta-Chao) এবং চেন-তু-সিনের (Chen-Tu-Hsin) স্মারা প্রতিষ্ঠিত মার্ক্সিজম-পাঠ্যক্রমে যোগ দেন এবং মার্ক্স ও এঙ্গেলসের লেখা পড়িতে শুরু করেন। এইভাবে তিনি ক্রমে কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন হয়ে নিজের জীবন-রত নির্ধারণ করে নেন এবং মার্ক্স ও লেনিনের ভাবাদর্শে নব-চীন প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প নেন। তবে চীনের জাতীয়তাবাদ ধ্বংস করার কথা তিনি কখনও ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। কৃষি ও সংস্কৃতির দিক থেকে চীন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকে চীন কিন্তু তখন বিশৃঙ্খলার চরমে অবস্থান করছিল। আর কৃষিজীবীদের অবস্থা ছিল অতি হীন। ফ্রান্স, বৃটিশ, জারমান, রুশ প্রভৃতি দেশ সেই সুযোগে চীনে প্রবেশ করে নিজেদের প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্যে শত্রু করেছিল একটা বিদেশ প্রত্যাগস্ত। তাই মাও চে-তুং-এর সেই দুর্য্যতিসম্বন্ধে সমাপ্তি ঘটিয়ে সাধারণ চীনাবাসীর বাঁচর হত-বাঁচার ব্যবস্থা করিতে।

প্রভাবে সংগঠিত, আধুনিক অস্ত্র সজ্জিত প্রতিরোধশীল রাষ্ট্রশক্তি আর অপর পক্ষে ছিল নানাভাবে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত অন্তর্বেদনায় জর্জরিত গরীবের অত্যাচার।

যখন কোন দেশে রাষ্ট্র তার অধিকাংশ নাগরিকের জীবনধারণের সন্তোষজনক মান বজায় রাখার কাজে সাহায্য করতে অসমর্থ হয়, তখন সেখানে স্বভাবতই একটা প্রচ্ছন্ন বৈপ্লবিক াব বিরাজ করে। আবার সেই বৈপ্লবিক ভাবধারাকে সুদৃঢ় করার জন্যে তারই ভিতরে যদি কোন সুবিদ্যাস্ত সংগঠন গড়ে ওঠে, তা হলে আর কথাই নেই। তখন বাকি উপাদানের যা অভাব থাকে, সেটি হচ্ছে একটি প্রচণ্ড বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা। (গ) স্যামুয়েল বি গ্রিফিথ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন ১৯৬১ সালে—মাও সে-তুং-এর গরিলা যুদ্ধ-কৌশল পর্ববেক্ষণ করে।

কিন্তু এই পন্থাটিকে কোন একটা সাময়িক বিস্ফোরণের ব্যাপার বলে মনে করলে সত্যই ভুল করা হবে। চীনে এই

(গ) "A potential revolutionary situation exists in any country where Government consistently fails in its obligation to ensure at least a minimally decent standard of life for the great majority of its citizens. If there also exists even the nucleus of a revolutionary party able to supply doctrine and organisation, only one ingredient is needed: the instrument of violent revolutionary action." (* Guerrilla Warfare by Mao Tse-Tung & Che Guevara with a Foreword by Capt. B. H. Liddell Hart, P.—8).

শাস্তাহিক বঙ্গমতী

কৌশলের প্রথম ব্যাপক প্রকাশ পেয়েছিল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে, জাপানীদের দ্বারা চীন আক্রান্ত হওয়ার সময়ে— ১৯২৭ সাল হবে। চীন ছিল নোদন গৃহযুদ্ধের তীর্থক্ষেত্র, আর বিংশদশকের আক্রমণের পক্ষে একটি উর্বর ভূখণ্ড। কৃষকদের দুরবস্থা পেঁছেছিল সেখানে চরম শিখরে। জেনারেল চিয়াং কাই-সেক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে বাঁহঃশত্রুর আক্রমণ খানিকটা প্রতিহত করার পরে, তাঁর ন্যাশানাল রেভলিউশনারী আর্মিকে কমিউনিস্টদের প্রভাবমুক্ত করার জন্যে যখন উদ্যোগী হন, সেই সময় চীনে আবার অশান্তির ঝড় প্রবাহিত হয়। কিন্তু ১৯৩৭ সালে চীনে যখন তাদের জাতীয় মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে আবার প্রশ্ন ওঠে, তখন কিন্তু ন্যাশানালিস্ট ও কমিউনিস্ট শক্তি পুনরায় এক হয়ে জাপানীদের প্রতিরোধ করেন সাফল্যের সঙ্গে। (ঘ) চীনের কমিউনিস্ট দল অবশ্য এই সুযোগে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের দলীয় প্রচার চালাতে ভুল করেন নি। এইভাবে চীনের ন্যাশানালিস্ট ও কমিউনিস্ট দল একত্রে জাপানীদের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করার পরে মাও সে-তুং-এর দল ও তাঁর আদর্শ অল্প কয়েক বছরের ভিতরে চীনের মধ্যে যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। আর সেই সুযোগে চিয়াং-এর সাহায্যার্থে প্রেরিত আমেরিকার অস্ত্রশস্ত্রের অধিকাংশই তাঁদের হস্তগত হয়।

যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা বিপর্যস্ত চিয়াং-সরকার সৈন্য নিজেদের দেশের জনসাধারণকে তাঁদের জীবনের হার বজায় রাখার জন্যে (standard of living) নিত্য-

(ঘ) প্রসংগত, আলোচ্য সময়ে জাপানীদের আক্রমণ পদ্ধতি এবং চিয়াং-এর তা প্রতিহত করার কৌশল একটু জানা প্রয়োজন। জাপানী আক্রমণের মধ্যে প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল, চীনের শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস করা।

“One of the earliest and most malicious atrocities committed by the Japanese War machine since the out-break of the Lubonchiao maident in July, 1937, was the complete destruction of the costly & beautiful Nanki University, one of the leading institutions of higher Learning.” *

(* ‘Chinese Education in the War’ by Hurbert Treyn: pp. 14-15) এটি হচ্ছে এইরূপ বছরে মধ্যে একটি উদ্ভূতি মাত্র।

প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহে বার বার অসমর্থ হতে থাকেন। স্বভাবতই দেশের চতুর্দিকে নানারূপ বিশৃঙ্খলার হাওয়া প্রবাহমান হয়ে ওঠে। মাও সে-তুং পরিচালিত চীনের কমিউনিস্ট পার্টি সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করেন পূর্ণমাত্রায়, নিজেদের সংগঠনকে সবল করে তোলার কাজে। অপরদিকে পুঁজিপতি রাষ্ট্রের মত চীনের অধিবাসীরাও সৈন্য স্পষ্ট দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এক-ধনী, অপর-অতি দরিদ্র। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—যথা ব্যবসায়ী, ডাক্তার, আইনজীবী, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদির মধ্যে সবল নেতৃত্বের অভাব ছিল। পরিবর্তে ছিল—হিংসা, শ্বেষ, সাম্প্রদায়িক দলাদলি, আর বাস্তব রাজনৈতিক অকর্মণ্যতা। স্বভাবতই তাঁদের মধ্যে যে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী সম্প্রদায় বা উদার পার্লামেন্টারি ডিমক্রে-

সির ভাবযুক্ত দল ছিল, সেগুলি এক-একটি অভিশপ্ত গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ে।

অতঃপর চীনে সৈন্য ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ঐ উৎকট বৈষম্য দূর করার প্রকল্পে যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছিল, তার একদিকে ছিল বিপুল অস্ত্র সজ্জিত চিয়াং কাই-সেকের সৈন্যশ্রেণী, আর অপর দিকে ছিল বৈপ্লবিকভাবে প্রভাবিত সুসংগঠিত গণশক্তি। আর সেই গণশক্তির যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে অবলম্বিত কৌশল হয়েছিল গরিলা পদ্ধতি। সেই আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে এই গরিলা কায়দার যুদ্ধ-পদ্ধতিই কেবল একটা রাজনৈতিক শক্তি দখল করার পক্ষে যে সকল কিছু, এই কথা মনে করা মোটেই সমীচীন নয়। কারণ, অপরাপর গরিলা কায়দার যুদ্ধ পরি-

মাইনস অ্যাক্ট, ১৯৫২

ফাস্ট ক্লাস কোল মাইন ম্যানেজারস সার্টিফিকেট

অফ কম্পিউটিং পরীক্ষা (কোল মাইনস

রেগুলেসনস ১৯৫৭ অনুযায়ী)

উপরোক্ত সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা ১০ই, ১১ই এবং ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে ধানবাদ ও নাগপুরে (অনুমোদিত প্রার্থীদেরকে প্রদত্ত অধিকারপত্রে সঠিক স্থান যথাযথ জ্ঞাত করা হইবে) অনুষ্ঠিত হইবে।

ফী ৫০ টাকা (পঞ্চাশ টাকা) মাত্র। পরীক্ষা বিষয়ক বিবরণ এবং দরখাস্তের নির্ধারিত ফর্ম বোর্ড অফ (কোল) মাইনিং এগজামিনেশনসের চেয়ারম্যান এবং ডিরেক্টর অফ মাইনস সেফটি, ধানবাদ, ই. রেলওয়ের অফিসে পাওয়া যাইবে।

২। যাঁহাদের কোল মাইনস রেগুলেসনস ১৯৫৭-এর রেগুলেসন ১৬ অনুযায়ী মাইনস-এর ব্যবহারিক ট্রেনিং নাই অথবা যাঁহাদের বৈধ ফাস্ট-এড সার্টিফিকেট, সর্দার এবং গ্যাসটেষ্টিং সার্টিফিকেট নাই তাঁহাদের দরখাস্ত করিবার প্রয়োজন নাই। গ্যাসটেষ্টিং এবং ফাস্ট-এড সার্টিফিকেটের বৈধতার তারিখ পরীক্ষা শুরুর হইবার তারিখের পূর্বের কোন তারিখ হইলে চলিবে না। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা কেবল ১০ই নভেম্বর, ১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত অনুমোদন করা হইবে।

৩। পরীক্ষার কেন্দ্রও অর্থাৎ ধানবাদ বা নাগপুর প্রার্থীকে দরখাস্তে উল্লেখ করিয়া দিতে হইবে।

৪। নির্ধারিত ফর্মে সকল দিক দিয়া সুসম্পূর্ণ দরখাস্ত ১০ই অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে বা উহার পূর্বে চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ (কোল) মাইনিং এগজামিনেশনস এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ মাইনস সেফটি, ধানবাদ, ই. রেলওয়ের অফিসে অবশ্যই পৌঁছান চাই। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত এবং নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত দরখাস্ত প্রার্থীকে না জানাইয়াই অগ্রাহ্য করা হইবে।

ডি এ ডি পি ৫১২ (১)/৭০

সাপ্তাহিক বসুমতী

জালকদের পক্ষে তাঁদের পারিপার্শ্বিক সম-
কালীন অবস্থার কথা বাদ দিয়েও স্বনাম-
খ্য মাও সে-তুং এই কথা কখনই
অস্বীকার করেন নি। মাও-এর মতেই
এই জাতীয় যুদ্ধকৌশল একটি রাগনৈতিক
ক্ষমতা দখল করার পক্ষে চেষ্টার শেষ
পরিণতি মাত্র। আর এই পরিণত অবস্থায়
পৌছাবার আগে আরো কতকগুলি
অপরিহার্য ধাপ থাকে, যে ধাপগুলি যথা-
যোগ্যভাবে অতিক্রম করার ব্যবস্থা না
থাকলে উক্ত কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত
হওয়াই স্বাভাবিক।

যথা—(১) নির্দোষ সংগঠন প্রচেষ্টা—যে
কাজ যথেষ্ট ধৈর্য ও সময়-
সাপেক্ষ।

(২) সর্বদল একত্রীকরণের কাজ
(Consolidation)—মত ও
পথ এক হলেও প্রকৃতভাবে
চলার ধাপ যদি না মেলে,
সংগঠনের কাজ বাস্তবে
রূপান্তরিত করার পক্ষে বহু
বাধার উদ্ভেদ স্বাভাবিক। (৩)

(৩) বিচ্ছিন্ন-দুর্গম ও গুপ্ত অঞ্চলের
সংরক্ষণ—যে সকল স্থানে
স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষার মাধ্যমে
বিশিষ্ট ভাবধারায় উদ্ভুদ্ধ
করার ব্যবস্থা করা হয় এবং যে
সকল স্থান হতে আন্দোলন-
কারী ও প্রচারকদের গ্রামান্তরে
পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়,
গ্রামবাসীদের দেশে প্রচলিত
পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন করে
দলীয় সভ্যতালিকাভুক্ত করার
জন্মে। (৪) এই সকল কাজে
ধৈর্য ও কর্মনিষ্ঠার যথেষ্ট
প্রয়োজন থাকে। কারণ এই-
ভাবে এমন এক-একটি সর্বাঙ্গিত
বেষ্টনী গড়ে তোলবার প্রয়োজন
হয়, যে সকল স্থান হতে সক্রিয়
কর্মীদের জন্যে খাদ্য সরবরাহ
ইত্যাদি চলতে পারে সুস্থ-থলে,
স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্তির কাজ
চলে ধীর ও স্থির গতিতে এবং

খবরাখবরের আদান-প্রদান হয়
সহজ ভাঙতে। তাইতো রিগে-
ডিয়ার-জেনারেল স্যামুয়েল বি
গ্রিফিথের উক্তি—“গরিলা পন্থা-
তিতে কাজ করার জন্যে প্ল্যান
তথা মতলব স্থির করার জন্যে
প্রয়োজনীয় বুদ্ধিই হচ্ছে
চূড়ান্ত উপাদান।”

—“Intelligence is the deci-
sive factor in planning
guerrilla operation.” *
[* Mao Tse-Tung & Che-
Guevara, p.—19)—1.

গরিলা যুদ্ধকৌশলের আধুনিক কর্ম-
পন্থার কথা ভাবলে সমস্ত ষাঁচ ও ধাপ-
গুলিকে একত্রে একটি চক্রান্তমূলক ব্যাপার
বলা চলতে পারে। এই পন্থার যাবতীয়
ক্রিয়াকলাপ বাহ্যিক রহস্যময় বলে মনে হয়,
কিন্তু আসলে সেগুলির সমস্তই সুনির্দিষ্ট
এবং ক্রমবর্ধমান। তবে শেষ পরিণতি
তথা যুদ্ধপন্থার কৌশল হয় বিক্ষিপ্ত
ধাঁচের। কিন্তু যাবতীয় কায়দা-কৌশলের
অন্তরালে ধৈর্য, বুদ্ধি, কর্মনিষ্ঠা ইত্যাদির
সংমিশ্রণ না থাকলে সাফল্যের পথ হয়
সন্দেহপরাহত। (৬) এই কৌশল অবলম্বন
করার পূর্বে বৃদ্ধ-যুবক, স্ত্রী-পুরুষ,
বালক-বালিকা, মেঘপালক-গাড়োয়ান-চারী-
শ্রমিক, বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক, গৃহের
পুরুষোত্তর, নৌকার মাঝি ইত্যাদি সকল
স্তরের মানুষের মধ্যে প্রচার, সংগঠন ও
প্রত্যেকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সহানু-
ভূতি লাভের ব্যবস্থা করা চাই ধীরস্থির
বুদ্ধির মাধ্যমে। (৭) তাই সকল ক্ষেত্রেই

(৬) মাও সে-তুং-এর উক্তি—“these
leaders must be models for the
people”—এই সকল অধিনায়কদের গণ-
সমাজে আদর্শস্থানীয় হওয়া চাই। *
[* পূর্বে উল্লিখিত পুস্তক Guerrilla
Warfare—পৃঃ ৩৩)।

(৭) মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের
ইংগিত—“ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ,
দরিদ্র, অজ্ঞ, মর্চি, মেথর, তোমার রক্ত,
তোমার ভাই!.....বল—মূর্খ ভাবতবাসী,
চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও
কটিমার বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া
বল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী
আমার প্রাণ.....।” এই সকল উক্তি নিছক
ধর্মসংক্রান্ত বলে ভাবলে হয়তো ভুল করা
হবে। তার কারণ অন্যর আলোচিত
রাওলাট সাহেবের কর্মফিডেনশ্যাল রিপোর্টে
বাংলার বৈপ্লবিক সংগঠনের কাজে

মূলে থাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান, সব স্ব-
পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সকলকে সচেতন
করার ব্যবস্থা, আর দৃঢ় নিয়মানুবর্তিতা।
এখানে ডাকতি, রাহাজানি, হিনতাই,
ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দলীয় চাঁদা আদায়
ইত্যাদির স্থান বোধ হয় অল্প। যাবতীয়
অন্যায়ের সম্ভাব্য প্রতিরোধ করে সমগ্র
দেশের অত্যাচারিত মানুষের হৃদয় জয়-
করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে কর্মের মূল সূত্র।
তাই একটি বৈপ্লবিক গরিলা আন্দোলন
গড়ে তোলা যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। —“A revolutionary guerrilla
movement is organised and
then begins.”

প্রকাশ, আমাদের দেশে বর্তমানে কিছু
কিছু বৈপ্লবিক কাজকর্ম নাকি গরিলা
পন্থাতিতে সংঘটিত হয় বা হয়ে থাকে।
সত্য-মিথ্যা বোঝা কঠিন। তবে বৈপ্লবিক
আখ্যায়িক্ত যে সকল কর্মতৎপরতা প্রত্যক্ষ
লক্ষ্য হয়, সেইগুলিকে যদি মহামানব মাও
সে-তুং-এর সর্বশেষ সংশোধিত নৈজ্ঞানিক
গরিলা পন্থার আখ্যা দেওয়া হয়, তা হলে
হয়তো একটা বিশেষ ভুল করা হতে পারে।
এর প্রত্যাশিত ফলাফল বিচারের স্থান
এখানে অল্প।

অবশ্য এটা স্মরণীয় যে, স্বাধীনতা
লাভের পরে আজ পর্যন্ত দুই দশক
অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের দেশে
শিক্ষার কোন বৈপ্লবিক পরিরূপনা এখনও
সুদৃষ্টভাবে গ্রহণ করা হয় নি। তথাপি
বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরে উগ্রপন্থার মাধ্যমে
আক্রমণ ইত্যাদি কতখানি যুক্তিসংগত, সে
কথা বোঝা কঠিন। মাও সে-তুং-এর মতেও
—“It is necessary to have uni-
versities”—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়ো-
জনীয়তা আছে। (* Peking Review,
2nd August, 1968)। তবে শিক্ষা
পন্থাতি ইত্যাদির মধ্যেও যে একটা বৈপ্লবিক
হাওয়া প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন, সেটা

স্বামীজীর পরোক্ষ অবদানের উল্লেখের
কথা ছাড়াও ছয়/সাত বছর আগে কলি-
কাতায় অনুষ্ঠিত সোভিয়েট দেশ অফিসে
ডঃ এ এল লেভকোভেস্কি ও এ আই
চিচেরোভের ম্বারায় এক কনফারেন্সে
প্রকাশিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা
বলেছিলেন—“পাশ্চাত্যে ভ্রমণের সময়,
বর্তমান শতকের প্রারম্ভে, প্যারিস এক-
জিভিশন কনফারেন্সে, বিখ্যাত রুশ বিপ্লবী
ও রাজনীতিক চিন্তানায়ক প্রিন্স ক্রপোট-
কিনের সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ মিলিত
হয়েছিলেন।” এই মিলনের উদ্দেশ্য বা
কারণ নিশ্চয়ই কোন তথাকথিত ধর্মতত্ত্ব
আলোচনার জন্য ছিল না।

(৪) উদাহরণস্বরূপ এদেশে সাপ্তাহিক
ইউনাইটেড ফ্রন্টের ভাঙনের কথা মনে
পড়ে।

(৫) উল্লেখ্য—অন্যর আলোচিত স্বামী
বিবেকানন্দের ইংগিত—“তোমরা কিছু
অর্থ সংগ্রহ করিয়া.....সর্বাপেক্ষা
দরিদ্রগণের যেখানে বাস” ইত্যাদি। *
(* সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৬ই এপ্রিল,
১৯৭০, পৃঃ ২৬৬৫ দ্রষ্টব্য)।

সাপ্তাহিক বসমতী

অনস্বীকার। যেমন, সেখানে কেবল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার পরিচয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে অনুচিত—বিশেষত মনোবিদ্যা সংক্রান্ত শিল্পশিক্ষা ইত্যাদিতে, যেখানে হাতে-কলমে পারদর্শিতার স্থান অগ্রগণ্য। অনুরূপভাবে, অফিস-স্কুল, কল-কারখানা, ক্ষেত-খামার ইত্যাদি সর্বস্তরেই ঐ একই তথ্য রহস্যময় অবস্থায় বিদ্যমান। (ঝ)

তাই আমাদের ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা না বাড়িয়ে, দেশের বর্তমান বৈপ্লবিক কার্যতালিকায় যদি প্রথম স্থান দেওয়া যায়—দেশের মধ্যে অন্যায়-আঁচর, কালোবাজার, খাদ্য ও ঔষধপত্র উজ্জ্বল, কোর্ট-কাছারি—পৌরপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে নানা স্তরে, নানাভাবে ঘূষের লেন-দেন থেকে আরম্ভ করে, উপকৌশল গ্রহণ, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত অফিসারদের স্বজন-পোষণ নীতি ইত্যাদির মূল উৎপাতনের প্রচেষ্টা, তা হলে বোধ হয় 'পাবলিক ওপিনিয়ন' তথা সাধারণের মন জয় করার কাজ সহজসাধ্য হতে পারে। আর এই জাতীয় কাজে অধিক সংখ্যক স্বেচ্ছা-সেবকেরও প্রয়োজন হবে বলে মনে হয় না। মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক শক্তি দখলের আগে একটি নির্দিষ্ট সংগঠনের কর্ম-পন্থার ওপর সর্বসাধারণের সহানুভূতি লাভেরও বিশেষ প্রয়োজন থাকে। (ঞ)

(ঝ) নিছক বিশ্ববিদ্যালয়ের কতকগুলি ডিগ্রী থাকার জন্যে অথবা অনুরূপ কারণে এক শ্রেণীর মানুষকে যদি উচ্চ বেতনে নিয়োগ করা হয় অপর এক শ্রেণীর ওপরে কেবল রক্তচক্ষু দেখিয়ে অথবা অপব কোন উপায়ে কাজ আদায় করে তাতে স্বাক্ষর করা অথবা প্রয়োজন বোধে তাদের শাস্তি দেবার জন্যে—অপরদিকে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কর্মপটভূতা ইত্যাদি গুণসম্পন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীর মানুষকে যদি অফিস-স্কুল, মাইঘাট, কল-কারখানা ইত্যাদি সকল স্থানেই স্বল্প বেতন বা প্রতিদানে কেবল খেটেই খেতে হয় কবিগুরু বর্ণিত সর্দারদের সন্তুষ্ট করার জন্যে, তা হলে চতুর্দিকে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে মনে পড়ে কবিগুরুর ইংগিত—“মানুষের অপমানে ওদের মাথা হেঁট হয় না, ভিতরকার জানোয়ারটার ল্যাজ ফুলাতে থাকে, দুলতে থাকে।” (* রক্তকরবী, পৃঃ-৭৬)। প্রতিকার? প্রতিকার হচ্ছে, সকল স্তরেই নন্দিনীর আবাহন। তাই তো সর্দারের প্রতি নন্দিনীর সতর্কবাণী—“আমি নারী বলে আমাকে ভয় করো না? বিদ্যাবিশিষ্ট হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন। আমি সেই বজ্র বয়ে এনোছি, ভাঙবে তোমার সর্দারের সোনার চুড়া।” (পূর্বোক্ত পুস্তক, পৃঃ-৭৪)।

এই জাতীয় কাজে প্রয়োজন কবিগুরুর বর্ণিত কয়েকটি ‘রক্তকরবী’ চরিত্র, মৃত্যুর

(ঞ) “To overthrow a political power, it is always necessary first of all to create public opinion, to do work in the ideological sphere.” * (* Comrade Mao Tse-Tung at the Tenth

মধ্যেও যার অপরাজিত কণ্ঠস্বর ‘নন্দিনী’ শব্দে পাবেন। (* রক্তকরবী, পৃঃ ৯৮)।

Plenary Session of the Eighth Central Committee of the Party.)- অবশ্য এই সভা কোন বৈপ্লবিক দল ও তার বিরুদ্ধে গোষ্ঠী-উভয়ের পক্ষেই সম প্রযোজ্য।

COLLEGE BOOKS

(Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani & Viswa Bharati University)

P. U. Course

অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত প্রণীত

1. তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ — ৫ম সংস্করণ (Recommended by C. U. & N. B. U. as Text Book) 6:50
2. P. U. Logic Made Easy—S. Banerjee 2:25

Degree Philosophy Course

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

3. দর্শনের মূলতত্ত্ব (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন একত্রে)—৬ষ্ঠ সংস্করণ 15:00
4. ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy)—(৫ম সংস্করণ) 8:00
5. ভারতীয় দর্শন (দ্বিতীয় পর্যায়) for B. U. 2:00
6. পাশ্চাত্য দর্শন (Western Philosophy) — ৭ম সংস্করণ 8:00
7. পাশ্চাত্য দর্শন (for B. U. Part II) — ২য় সংস্করণ 10:00
8. নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন — ৭ম সংস্করণ 15:00
9. নীতিবিজ্ঞান (Ethics) — ৭ম সংস্করণ 8:00
10. সমাজ দর্শন (Social Philosophy) — ৬ষ্ঠ সংস্করণ 8:00
11. মনোবিজ্ঞা (Psychology) ৪র্থ সংস্করণ 15:00
12. Handbook of Social Philosophy— Second Edition 12:00
13. পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আধুনিক যুগ : বেকন—হিউম 6:00

Education Course

অধ্যাপক স্বতন্ত্রকুমার রায় প্রণীত

14. শিক্ষা-তত্ত্ব (Principles & Practice of Edu.)—২য় সংস্করণ 9:00
15. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (Indian Edu. Problems)—৩য় সংস্করণ 12:00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক রায় প্রণীত

16. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—(Edu. Psy. with Statistics)—২য় সং 16:00

B. T. B. ed. & Basic Course

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

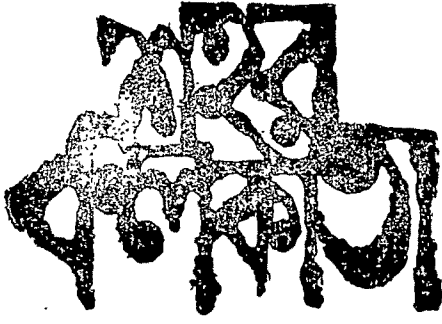
17. শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজ বিজ্ঞা (Social Studies) 8:00
18. শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থ নীতি ও পৌরবিজ্ঞান—(Eco & Civics) 10:00
19. শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— (History) 12:00
20. শিক্ষা-তত্ত্ব (Educational Theory)—২য় সংস্করণ—অধ্যাপক রায় 9:00
21. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (Indian Edu. Problem)—৩য় সংস্করণ—অধ্যাপক হালদার ও রায় 12:00
22. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Edu. Psy. with Statistics)—২য় সংস্করণ—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় 16:00



ব্যানার্জী পাবলিশার্স

৫১/এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ফোন : ৬৪-৭২৩৪



পনেরই আগস্টের স্মৃতি-বিস্মৃতি

সেই প্রথম গ্রামে-বাসে ঝুলন্ত ভিড় দেখেছিলাম। ঘরঘরে দোতলা বাসের না-ঢাকা অর্ধচন্দ্র সিঁড়ি পর্বন্ত স্বাধীন সিটিজেনস্ বোঝাই। কন্ডাক্টরের স্থান হয়েছে এঞ্জিনের সামনে মার্ভ-গার্ডে। তখন তো প্রাইভেট বই স্টেট ট্রান্সপোর্টের অস্তিত্ব নেই। গাড়ি মানেই দাঁড়ি। জাইভার মানেই শিখ, যারা গলায় গামছা দিয়ে এক পয়সা-দু' পয়সার আদায় নিত যাত্রীদের কাছ থেকে। কিন্তু সেদিন তারাও উৎসবমণ্ডন। কলকাতার লোককে প্রাণ খুলে গাড়ি চড়িয়েছে। জোর-জ্বলম্ব নেই।

মহানগরী সাজবে, তাই মক্ষবল গড়ের মাঠ ক'রে গড়ের মাঠেও লোক জমায়েত। যার যেমন খুশি চল। যার মত কথা আছে কলকালিয়ে বল। কিছুদিন আগেই হিন্দু-মোছলমান কলকাতার পথে পথে ছুরি খেয়ে পড়ে ছিল ব্রিজ, সাঁকোর আঙুঠায় মৃত মানবুয়ের শব ঘুলেছিল। ভাসমান মড়ার ভেলায় মহানন্দ কাক আর শকুনের দখলবারি নিয়ে স্বন্দর হয়েছিল। সেদিন কিন্তু সে বিভীষিকা ভুলে গেছে শহর কলকাতা। দিকে দিকে একটি মাত্র মলোচ্ছারণ 'বন্দে মাতরম'। ছেলেবেলার স্মৃতি জড়ানো কত রোমাঞ্চিত দিবস-রজনী প্রকম্পিত একটি মাত্র মহান অর্থবহ শব্দ 'বন্দে মাতরম'। আজ যে শব্দের সঙ্গে স্বাধীন ভারতের মানবুয়ের কোনও মানসিক আবেগও বিজড়িত নেই। আমাদের জীবনে সে শব্দই কিন্তু একই সূত্রে বেঁধে রেখেছিল আসমুদ্র-হিমাচল। অমন যে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি, যার সঙ্গে আমাদের ছিল নাড়ীর যোগ। আজ সে ধ্বনি আর উচ্চারিত হয় না। উচ্চারিত হলেও তার মধ্যে সেদিনের সে স্পিরিটের উত্তেজক রোম-হর্ষক গন্ধ নেই। রাজনৈতিক ফাটকা-বাজির শৈয়ার বাজারের 'কিতনা ভাও' ডাক বলে মনে হয়।

সেদিন সেই এক ধ্বনিতেই কলকাতা ফেটে পড়ছিল। মাছুবন্দনার ঐ মন্যও ছেড়েছি, মাকেও ভুলে বসেছি—এ কথা

কেন জানি না বার বার মনে হয় আমার। কী কর্ত ছিল বন্দে মাতরমের স্তোত্র-টুকু ধরে রাখলে। ঐ একই মনের ঘাটের মড়াও যুদ্ধ চিতিয়ে চিতার ওপর উঠে বসত। আজ জনগণমনের কী বাহার। দাঁত ছরকুটে আছে চতুর্দিক। এ ফোঁস করে তো ও ঘোঁস করে লাফিয়ে আসে নেকড়ের মতো। পথ চলতে সব সময় যুদ্ধ দুরদুর। মনে হয় ঠ্যাঙাড়ে কলকাতা ওং পেতে আছে গিল-হুজি, বড় রাস্তায়। যে কোনো মুহুর্তে অজ্ঞাত আততায়ী কবলস্থ হওয়ার আশংকা।

কিন্তু সেদিন, সেই প্রথম ১৫ই আগস্ট? ভারতের ইতিহাসে তার অক্ষয়প্রাণ মঙ্গলচন্দ্রীর বরংপ্নত। আগুনে পোড়ে না, জলে ভেজে না, ছিঁড়লে হারায় না, 'পেটোয় ফেটে শিমুল ফুলের মতো ফুস করে উড়ে যায় না। যা একবারই এসেছিল, আর-বার একইভাবে আসতে পারে না। কারণ তার পরও ভাগীরথীতে অনেক ঘোলাজল গড়িয়ে গেছে।

তবু মূছে যাওয়া সেদিনের স্মৃতি রয়েছে অক্ষয় হয়ে। আমাদের এজ গ্রুপের জেনারেশনটা খতম হ'লে তাও আর থাকবে না। পরের যুগের ছেলেরা স্বাধীন যুগের ছেলে। পত্র-পত্রিকার পাতা ঘেঁটে হয়ত কেউ কেউ ধ্যানে চিত্র সাজাতে চেষ্টা করবে, যদি কেউ তা আদৌ করতে চেষ্টিত হয়।

সেদিন মনে হয় নি, ইয়ে আজাদী ঝুটা হয়। আংরেজ পল্টন মুরদাবাদ তো সি আর পি খাড়া হয়। আংরেজ সাব গার্দ ছোড়া তো ইন্ডিয়ান সাব কা নেকটাই লটপটাতা হয়। আংরেজকা লাশ, ডীনার, গান-বাজনা, ওয়াইন, ওম্যান—বিলকুল হট গিয়া তো ইন্ডিয়ান বলড্যান্স আউর ক্লসমাস ইভ হয়। রান্নাঘরকো 'কিচেন' আউর 'দালান'কো ডাইনিং প্রেস বোলা যাতা হয়। মাইজী হো গয়ী মেমসাব আউর মাতা-পিতা, ডাডি-মামি।

অর্থাৎ ১৫ই আগস্টকে যদি একটি প্রাণময় সত্তা বলে কম্পনা করি তো বর্তমানকে বলব, ১৫ই আগস্টের 'মিম'।

মায়ের 'মিম' হয়েছেন নয় ভারতের শবড হোয়ার মামনিজুল।

এই পরিবর্তমান কলকাতার বুদ্ধে দাঁড়িয়ে ছেলেবেলার ছবিয় এ্যালবাম-টিকে খুলে ধরলে অস্পষ্ট সেদিন চোখ জড়িয়ে দেয়।

যা বলছিলাম। ইংরেজের ভাঙা গ্রামে, যে গ্রাম দু'পাশে টাল খেয়ে চলত, সেই প্রথম সে গ্রামে বাদুড়ঝোলা মানব দেখেছিলাম। দিল্লী দু'র অস্ত। কিন্তু ডালহৌসীর লাট ভবনের গেট খোলা। বহুকালের শোষণে সাজানো সে প্রাসাদ কেমনতর? কলকাতা উপচে পড়ে দেখতে গেছে সেই জু-প্যালেস। আমি সাংঘাতিক বীরত্ব করেছিলাম, মনে আছে, গ্রামের চাকায় যে বাড়তি অংশে পা রেখে আজকের দুধের খোকা থেকে ঘাটের বৃন্দ পর্বন্ত আকহার আসা-যাওয়া করছে, কয়েকটি বৃন্দুর পাল্লায় পড়ে সেই সাংঘাতিক এ্যাড-জুজিরের স্থান গ্রহণ করেছিলাম সেদিন। মস্তবড় এক পরীক্ষা প্লামের আনন্দে শহর কলকাতার ধমনীতে তীব্র রক্তপ্রোত টগবগিয়ে ফুটেছে সেদিন। যান্ন যাবে যাক প্রাণ, কৈ পরোয়া নেই। স্বাধীনতা নামক অজ্ঞাত চীজ যে শহরের হাতের মটোয়, সে জানে না বিতায়ী কোনো এ্যাক্সিডেন্ট।

সবাই হর্ষাৎফুল্ল। গ্রাম কন্ডাক্টররা সেকালে স্বল্পবয়সী দেখলেই মাকড়সার মতো বড় পাল্লো এগিয়ে আসত, যেন জালে পড়া মাছি মারবে। ইংরেজ কোম্পানীর পয়সা মেরে কঁচো কলকাতা গ্রামে চাপবে, এই ভয়ঙ্কর অন্যান্যের মোকাবিলায় বিহারী কন্ডাক্টররা ভারি তৎপর ছিল। তখনও 'তোম' 'তুমি'-কারির যুগ। ছোটরাও বয়স্ক কন্ডাক্টর, দোকানদারদের সম্মিহ করে কথা বলত না। সুতরাং 'খাপচুরিয়াস' অশ্লীলতা হ'লে থাকত তারাও। বাগে পেলেই শাস্তি। সেদিন কিন্তু ওরা শূন্য ব্যাগই বিনের শেষে ডিপোয় গিয়ে জমা দিয়েছিল। আমাদের মধ্যে রটে গেছিল, চল বেড়িয়ে আসি। আজ গ্রাম ফ্রি।

আমাদের স্বাধীনতা কি ছিল ঐটুকুই? এক পয়সার স্বাধীনতা। কে জানে, আর তো কিছু মনে পড়ে না। ভারি একটা উৎসব! যেন শহর জুড়ে মস্ত ফ্যান্সতা বা ফিয়েস্তা।

গান্ধী টুপী আর অশোক চক্র-শোভিত তেরুগা পতাকার হট কেব সেল। পথে পথে ব্যাজ পরিয়ে টাকায় টাকা লাভ। বাড়ি বাড়ি ফাগ তোলায় প্রতিযোগিতা। প্রভাতে প্রভাতফেরী, রাতে বাজী মাঠে-ময়দানে।

শুনলাম, সব নাকি পাল্টে যাবে? স্কুলে-কলেজে পাঠ্যবিষয় পাল্টাবে?

সাধারণ বসন্ত

গ্ল্যাক্সো মিল্ক ফুড শিশুদের
সুস্থকর করে গড়ে তোলে



আপনার শিশু কি গ্ল্যাক্সো বেবী?

সুখ থেকেই আপনার শিশুকে গ্ল্যাক্সো মিল্ক ফুড দিন। কারণ, গ্ল্যাক্সো মিল্ক ফুড—শিশুর প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টির বাতুলগুণে ভরপুর সম্পূর্ণ বেবী ফুড—সবল করে গড়ে তোলে শিশুর হাড়, মাংসপেশী আর মস্তিষ্ক। ভারতের শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম যারা মিল্ক ফুড ভৈরী করেছিলেন, তাঁরাই ভৈরী করছেন—গ্ল্যাক্সো মিল্ক ফুড। এখন সব লোকানাই গ্ল্যাক্সো।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

মাতৃভাষায় মৃদু উচ্চ করে কথা বলবে মানুসজন। শুনলাম, মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় পাতলা হবে। বাপের দেওয়া মোটা চাল খালায় খালায় ছাসবে। ঘরের ছেলে আর পরের চাকরি করবে না। দেশের ছেলের কাজ জুটবে, দেশের মায়ের দুগ্ধ ঘুচবে। আর পদলিখ? সেদিন লাল-মৃদু অবশিষ্ট সার্জেন্টরাও বাপের সুপুতুরের মতো কত ছেলেকে যে রাস্তা পার করে দিয়েছিল!

তা সে রাত কাটল কি কাটল না, পরে আর বুঝতেও পারি নি। শৃঙ্গু বুঝলাম, একটা মস্ত কাণ্ড ঘটে গেছে। লর্ড কার্জন বাংলা ভাগ করতে গিয়েই মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলেন, এ স্বাধীনতা গোটা ভারতের ম্যাপটাকেই রেড দিয়ে চিহ্নিত করে। রেডের ধার বুঝি 'সিলেক্ট', প্রথম টান তুলির টানের মতো, কাটে তবু লাগে না। এ-ও সেই দশা। লাগল যখন, জ্বালায় জ্বলানিতে কলকাতার সমাজজীবন পুরোপুরি লাট খেলো, তখন আর উপায় নেই। শিয়ালদা স্টেশন লোকে লোকারণ্য। স্বাধীনতার জন্য মূল্য গুণে দিয়ে এসেছে এক দল মানুস। চালানি ছাগের মতো তাদের এনে ফেলা হচ্ছে শিয়ালদহে। লরি লরি সেই সব জীবন্ত মাল চালান হয়ে যাচ্ছে স্বতন্ত্র। অনেক পরিবার ক্যাম্পের কনসেন্ট্রেশন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দিগ্বিদিকে নিজের রিস্ক ছাড়িয়ে পড়েছেন। ওঁদের নিয়ে লেখা হচ্ছে নাটক, গল্প, সূর্য হচ্ছে নতুন নতুন ব্যবসা। আমার পাড়ায় একজন ফেমাস হয়ে গেলেন বাস্তুহারার ওপর নাটক লিখে। কয়েকটি পরিবার মুরব্বীর জোরে গ্রাণ দণ্ডের পদনবাসনে উমেদারি করে কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ি হাঁকিয়ে বসলেন। কেউই বাস্তুহারার নন। জঙ্গো অবধি বাবা, দাদার সঙ্গে আস্তা দিতে দেখেছিলাম। তাঁরা কোন যাদুবেলে গব্বারা দলে নাম লিখিয়ে বাড়ি, জমি হাঁকিয়ে বসলেন। কত লোকের যে সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে বলে ডিক্লারেশন পড়ল এবং কত মানুস যে বিদেশ থেকে বাইশ বছর গ্যাপিয়ে নিলেন, কত পোদ্দার উপাধায় হলেন, কত দাসের দস্ত 'স' তালব্য 'শ' হয়ে গেল, তার আর লেখাজোখা রইল না। যে কলকাতা ছিল উত্তরে শ্যাম-বাজার, দক্ষিণে ঢালীগঞ্জ, বালীগঞ্জ ট্রাম ডিপো, পূর্বে সার্কুলার রোড এবং পশ্চিমে হুগলী নদীর ঘাটা আঘাটা; জনবসতি ঘনবসতি এবং বন কেটে বসতকারীর কল্যাণে তা বেড়ে বেড়ে হ'ল বিরাট। জমি দখল, বাড়ি দখলের

বাহাদুরি আজ যে পাটিই নিক, পাইওনীর হলে এই পথে ঐ নতুন ইহুদীরাই। তাঁদের পরিগ্রমে তৈরি হ'ল গ্রেটার ক্যালকাটা। গ্রেটার — ১৫ই আগস্টের দৃঃস্বপ্নময়ী বন্য রাত্রির শিহরিত দীর্ঘস্বাস। কিন্তু তার চেয়ে 'বেটার' কিছু আর হ'ল না। আমি সেই গ্রেটার ক্যালকাটার কাসন্দরী-ফেরীওয়ালা; আজও ১৫ই আগস্টের নিয়ম রক্ষা করে দু'পাতা লেখার আকাঙ্ক্ষাজীবী।

১৫ই আগস্টের পরে প্রাপ্ত কলকাতা অবশ্যই পূর্ববর্তিনীর চাইতে মেদে-বিলাসে বর্ধিত, তবে ১৫ই আগস্টের পর তার স্নায়ুকেন্দ্রের ওপর ধ্বং-উৎপীড়নও কম হয় নি।

কী পিটুনি বাপস-রে বাপস, তার পর থেকেই। '৪২-এর কলকাতাকে মনে আছে। মানুসে-পদলিখে সম্মুখ সমর, সম্মুখ বুরুষ গেরিলা ফাইট। কিন্তু তার পরও মনে আছে ট্রাম আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, কর্মচারী আন্দোলন আর ছাত্র আন্দোলন তো আছেই।

প্যারেড গ্রাউন্ডটা, পণ্ডিত জুওহর-লালজীর বক্তৃত্যুর্মি থেকে ক্রমেই আন্দোলনের ময়দানে পরিণত হ'ল। সেই অবধি ক্রমেই ১৫ই আগস্টের দ্যুতি স্মান থেকে স্মানতর। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারায় ক্ষাপা কলকাতার গর্ভস্থ জলনিষ্কাশনী ব্যবস্থা মজে যেতে লাগল। সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মেরে রাজপথ জনপথে একচ্ছত্র আধিপত্য আর টিকিয়ে রাখা গেল না। ১৫ই আগস্টের আশীর্বাদে তৈরি 'বারলো হাউজের পেছনের বাড়িটা' আজ গায়ে আলোক-সজ্জা পরতেও 'কিন্তু' 'কিন্তু' করে। তেরঙা পতাকাশোভিত সে বাড়ির সে ইজ্ঞার আর নেই।

কেন না ১৫ই আগস্টের পর কলকাতা যেন স্বতীয়বার এক স্বাধীনতার মানসিকতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করেছিল পথে পথে। আবার বাজি, আবার উৎসব, আবার আলোকসজ্জা। সেই সঙ্গে কাঁদি কাঁদি কাঁচকলা।

রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বতীয়-বার স্বাধীন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েছে কলকাতা লাল আলোয় নগর সাজিয়ে। ফের হতাশ হয়েছে।

তবু এবারও ময়দানেই ১৫ই আগস্টের আয়োজন। ভাঙা কংগ্রেসের এক পক্ষ সভা ডাকছেন। অন্য পক্ষ ডাক ছাড়বেন শহীদ মিনারের পাদদেশে।

কলকাতা ভেঙে ভেঙে তছনছ। মুরব্বীরানার সার্টিফিকেট-দাবিদাররা তাকে নিয়ে নেট প্র্যাকটিশ করছেন।

শহরবাসীর একমাত্র সাংখ্যনা—

রেতে মশা, দিনে মাছি,

বোমায় 'পেটো'তে আছি।

মারিছে টহল সি আর পি,

কলিকাতা শহরে নাই কী?

ফিফটিনথ আগস্ট ঘুরে আসে,

কলিকাতা বেঁচে আছে

দিখি হাড়ে মাসে।

তা বেঁচে আছে ঠিক কথা। শহর তো আর নশ্বর নয়। জন্মিলেই মরিতে হবে এমন মুচলেকা দেওয়া নেই কোথাও, তবে এ বাচন একরকম মরণ-সমান প্রায়।

বুড়ো হাড়ের মরণ, খুব আশার মরণ, তরুণ কাঁটা মনের মরণ, ফুটপাথে হাজার হাজার শিশু কলকাতার মরণ। তা ছাড়া কোঁদলে কিকিয়ে আছে কলকাতা।

প্রফুল্ল সেন, বিজয়সিং, অজয় মুখার্জী, প্রফুল্ল ঘোষ বাংলা দেশের ছকে চার কোণায় বাঘবন্দী খেলেছেন। জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জী, আর আর 'এবং-সেবং-রা' হারে রে রে রে রব তুলে তেলো বাঁশের লাঠি বনবন ঘোরাচ্ছেন। এখন আমলার কলকাতা এক নয়া বস্তু।

কলকাতা?

জব চানকের আমলে এ শহরের একটি কম্পাচিট তৈরি হয়েছিল বিদেশীর মনে। ১৫ই আগস্টের ফ্যাগ দিঙ্গীতে উড়লে কলকাতার ঘাড়ে চাপল আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বি বি ডি বাগে ছায়া ফেলে যে লালবাড়ি, সেটি আত্মস্বাধীনতা ঠুটো জগন্নাথ। পথের মিছিলে বসুধৈব কুটুম্বালিগনের আওয়াজ। ১৫ই আগস্ট তাই কার বাড়ি কেঁক কাটা হল, শহর কলকাতার তাই নিয়ে বড় একটা মাথাব্যথা নেই। মিস্ট্রীর যেমন কোঠাবাড়ি বানিয়ে ছুটি। এর পর সে গৃহে তার প্রবেশাধিকার পর্যন্ত নেই; কলকাতার তেমনি প্রথম ১৫ই আগস্টের ফ্যাগ তুলেই ছুটি, স্বাধীন মেওয়ার অংশভাগে তার শেয়ার নেই। ভারতের যেখানে যাও, সাজানো শহর গড়ে উঠছে, চোখে পড়বে। কলকাতা এসো, মহান অবনতির চিহ্ন চতুর্দিশী।

কিন্তু পনেরই আগস্ট বার বার ফিরে আসেই। কলকাতার কাছে ফিরে আসে এক বিশেষ দিনের স্মৃতি হয়ে। কিন্তু তাও আর কদিন? আমরা যারা চঞ্জিশের চৌকাটে পা পাততে যাচ্ছি, তারাও চোখ বুজলেই টটকা স্মৃতি ইতিহাসের পাতা। গল্প করার লোক পর্যন্ত থাকবে না।

—মিরেল

বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গ

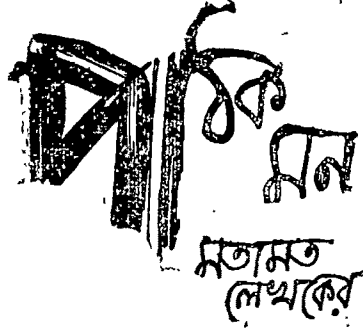
গত ১৪ই মের সংখ্যায় সাপ্তাহিক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্গদর্শনে “বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ” স্তম্ভে বঙ্গদর্শন-কার সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সহজ সরল ভাষায় যে সূচীভিত্তিক বক্তব্য রেখেছেন, পাঠকার একজন নিয়মিত পাঠক এবং ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রতি এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতি অভিনন্দন ও সমর্থনে আমি পাঠকার পাঠকমণে দু’চার কথা বলতে চাই।

অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা—জীবনধারণের প্রতিটি অঙ্গিতে-গলিতে আজ শোষণ-অবিচার, সুবিধাবাদ, অন্ধ অনুকরণ-বেলেপ্পাণা, ধর্ম নিয়ে, জাতি নিয়ে নোংরা হানাহানি, দুর্নীতি-বিজ্ঞানবিমুখতা বেনোজলের মত হু হু করে ঢুকে সাধারণ মানুষকে কোন্ সর্বনাশের অতল বিবরে নিয়ে চলেছে—তার খবর কে রাখে?

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ এই ভারতবর্ষে যখন তথাকথিত অভিজাত, শান্তিপ্রিয় ও ভদ্রলোকেরা দেশব্যাপী এই অশান্তিকে তরুণদের ফ্রাণ্টেশন সমাজ-বিরোধীদের অ্যাণ্টিসোশ্যাল ক্লাইম প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে আসল কারণকে নেপথ্যে রাখার জন্য শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন, তখন বহু অভিজ্ঞ, বহু সংগ্রামে পোড় খাওয়া রাজনৈতিক নেতারাও তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলার কৃষকে-কৃষকে, শ্রমিকে-শ্রমিকে দাঙা লাগিয়ে প্রকৃত শত্রুর ‘চাল’ তৈরিতে রসদ জোগাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে কয়েকটা গ্রাম উজাড় করে খেটে-খাওয়া মানুষদের শহরের আলোফলমলে, পিচবাঁধানো রাস্তা দিয়ে ময়দানী সংগ্রামে নিয়ে গিয়ে মশালের লাল আলোর নিচে দাঁড়িয়ে, তাদের রুটি-গুড়ে তুষ্ট করে হাত-পা ছুড়ে আগামী ভোটবৃক্ষের মহাভারত শোনাচ্ছেন।

এ অবস্থায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে ছাত্রদের। অধ্যয়ন তপস্যা—কিন্তু খালি পেটে? সব ছাত্রেরই পিতৃ-পুরুষের শতাব্দী-সঞ্চিত কোষাগার ভেঙে পড়ায় চালানোর ক্ষমতা নেই। সংখ্যায় তারা মার্শিস্টমের এবং কেবল ব্যক্তিগতভাবেই অসল স্বাভাবিক ঘটনা হল অধিকাংশ ছাত্রই দৈনন্দিন অর্থনৈতিক দৈন্যদশায় প্রপীড়িত পিতা বা অভিভাবকের মাসান্তিক কষ্টার্জিত উপার্জনের একাংশ দিয়েই শিক্ষার অর্থভার বহন করেন। সেই সব ছাত্র যখন শিক্ষান্তে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা পেয়ে নিত্যবর্ধমান সাংসারিক দায়িত্ব আংশিক লাঘবের সিদ্ধিলাভ উপার্জনের ফটক খোঁজেন, তখন দেখেন সব ফটকেই তালা-বন্ধ। কোনোটা ভিতর, কোনোটা বাইরে থেকে।

ইঞ্জিনিয়াররা আজ ওভার প্রোডাকশনের বলি (শিক্ষায়তনগুলি যেখানে



নিছকই বিদ্যান তৈরির কারখানা হয়ে দাঁড়িয়েছে।) কথায় কথায় ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্রোজার, ডিসচার্জ-নোটিশ।

চাকুরী বা জীবনের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে শিক্ষার কানাকাড়িও মূল্য নেই, সেই শিক্ষার প্রতি ছাত্রদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা উৎসুক্য আসবে কোথা থেকে? আর এর প্রতি প্রচণ্ড ক্রোধে, ধিক্বারে, নৈরাশ্যে, ঘৃণায় যখন তাঁরা ক্ষিপ্ত হন, জবাব চান, প্রতিকার চান, পথ চান—তখনই তার গালভরা সরস নামকরণ হয় রাজনীতির নোংরামী, হঠকারিতা, বিশৃঙ্খলা, হেলে-মানুষী ইত্যাদি আরো কত কি। আর টোটকা হিসাবে আসে ধর্ম্মজীবী-মস্তিষ্কজাত উপদেশামৃত সহ কিশিৎ শান্তিবারি সেচন, শান্তিরক্ষক পুর্লিঙ্গ; সমস্যার সাধারণ উৎসমুখে আবিস্কারে লেগে যায় কর্মিটির শোভাবাদ্য।

সীতালী ভূমিহীন কৃষক যখন তার ছ’ মাসের শিশুসন্তানকে খেতে দেওয়ার অক্ষমতায় তাকে ঘুম পাড়িয়ে ভোলানোর জন্য তার মুখে “হাড়িয়া”র প্রলেপ দিচ্ছে, সুবিধাবাদী রাজনীতির নোংরা খেলায় নিঃস্ব শ্রমিক যখন বাঁচার একমাত্র পথ হিসাবে চোখের সামনে দেখছে কাঁড়কাঠ আর কয়েকগাছি দড়ি, তখন ছাত্রবা যদি বলে—যে শিক্ষার আমার বাঁচার রাস্তা নেই, সে ব্যবস্থাকে ধ্বংস করলে আমি বিবেকের কাছে অপরাধী হব না; তখন ছাত্রদের প্রতি দরদে অহরহ আঁখি বর্ষণকারী মানবতাবাদীরা তাকে কি বলবেন?

আত্মহননের রাস্তা ওটা? বেশ, তবে অনুগ্রহ করে সেই সব মানবতাবাদীরা যদি পথপ্রদর্শক ছাত্রদের সামনে গুঁজলো ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ দেখাতে পারেন, বলুন।

ঈশ্বরালকুমার শীল
রামচন্দ্র মৈত্র লেন, কলিকাতা

দ্রম সংশোধন

১৬-৭-৭০ তারিখের সাপ্তাহিক ধর্ম্মতীর “আন্তর্জাতিক” বিভাগে পাকিস্তান সম্পর্কে যে খবর বোঝিয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলার আছে।

(১) লেখক মোহাম্মদ “তোয়াহা”র পরিবর্তে “তোফা” লিখেছেন। প্রকৃত

পদবী হোল তোয়াহা। তোয়াহা বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে কম্যুনিষ্ট পার্টি অব পাকিস্তান (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট) গঠন করেছেন।

(২) লেখক লিখেছেন যে, তোয়াহার মত মর্জিবরের দলের কিছু কিছু নেতৃ-স্থানীয় লোকও নির্বাচনকে প্রহসন মনে করেন এবং মর্জিবর নির্বাচনে অংশ নেবেন জেনে কিছু লোক “ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগে” যোগ দিয়েছেন।

এই বক্তব্য সঠিক নয়, কারণ, (ক) এন-পি-এল বা ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ লীগ আতাউর রহমান মূলত ব্যক্তিগত বিরোধের জন্যই আওয়ামী লীগ ছেড়েছেন। সম্ভবত লেখক জানেন না যে, কম করেও ১৯৫৭ সাল থেকেই মর্জিবর ও আতাউরের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে একটা ঠান্ডা লড়াই চলছিল। আওয়ামী লীগ থেকেও মর্জিবরের তুলনায় নিজের ইমেজ মণ্ট হয়ে যাবে। প্রধানত এই দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঈর্ষায় আতাউর রহমান আওয়ামী লীগ ছেড়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য আওয়ামী লীগ-নেতা, যেমন নওয়াবজাদা নসরুল্লা, আবদুস সালাম ইত্যাদির পার্থক্য এই যে, তাঁদের মত তিনি সরাসরি সুবিধাবাদের রাজনীতিতে গা ভাসান নি।

(খ) এন-পি-এলও নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে। তাদের নির্বাচনী প্রচার বেশ ভালরকমই চলছে। লেখকের লেখা পড়ে মনে হচ্ছিল ধর্ম্ম নির্বাচন-বিরোধী আঃ লীগ-নেতারা এন-পি-এল-এ যোগ দিয়েছেন নির্বাচন বয়কট করার জন্য! তা মোটেই নয়, এন-পি-এলও নির্বাচনে নেমেছে।

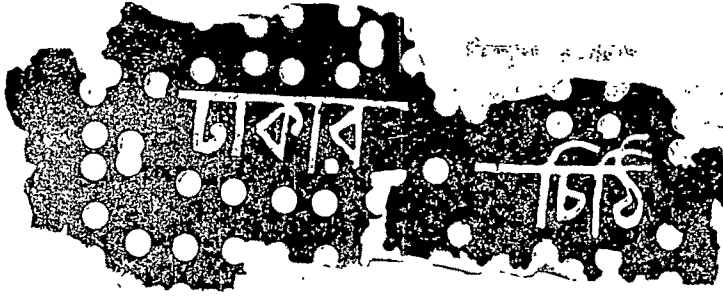
(৩) জামাতের নেতৃত্বে যে প্রতিক্রিয়া-শীল মোর্চা গড়ে উঠেছে, তার নাম “ইসলাম পসন্দ পার্টি”। নামেও যেমনি পিলে চমকানো, কামেও তাই। “ইসলাম নসনদিরা” কোরান, আল্লা, মোহাদ আর কায়ের—এই ছাড়া আর কোনও শব্দের অর্থ সম্ভবত জানে না।

—আবদুল খালেক,
রমনা, ঢাকা

পরবাস প্রসঙ্গে

জীবন সরকারের গল্প “পরবাস” প্রকাশের জন্যে ধন্যবাদ জানবেন। নিরীক্ষার নামে বাংলা গল্প থেকে যখন গল্পকেই বাদ দেবার চেষ্টা চলেছে, সে সময়ে “পরবাসের” মত গল্প নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। ধরলার শব্দ, হিরিলালের নৌকা বাওয়া, নতুন ধানের গন্ধ এবং নিপুণভাবে পূর্ববঙ্গের ভাষার ব্যবহার—সব মিলিয়ে নন্দীলাজির বাতাবরণ বার বার একদা জন্মভূমির স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। লেখককে ধন্যবাদ।

অনুরাধা গুহ
মালিগাঁ, গোঁহাটি-১১।



॥ চোদ্দ ॥

সাতষটি সালের পনেরই এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে বসে নূরুল আমিন সাংবাদিকদের জানাল যে, “অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঢাকাতে মিলিত হবে। একটি প্রকল্প নিখিল পাকিস্তানী রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠতে আর দেরী নেই। তা’ ছাড়া ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, কার্ভিন্সল মুসলিম লীগ, নছরুদ্দোপন্থী আওয়ামী লীগ এবং জামাতে ইসলাম একটা বোঝাপড়ার আসার জন্য জোর চেষ্টা শুরু করে দিয়েছে। আসন্ন একাধিক বৈশিষ্ট্যে তারা নিশ্চয়ই ‘সাক্ষ্য’ অর্জন করবে”, ইত্যাদি। - পেশাদার খবর ও শৃঙ্খল ব্যবসায়ীরা নূরুলের এই “সাংবাদিক বৈঠক” সম্পর্কে কি মন্তব্য করেছিল তা ঠিক মনে পড়ছে না, তবে এটা ঠিকই বোঝা গিয়েছিল যে, আয়ুব খাঁর দসেলের ভূমিকায় নূরুলের অভিনয়ে মন্থ হোয়ে তারা বার বার “শোভনালা” বলে লাফিয়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের বুদ্ধোন্নত সংবাদপত্রগুলির প্রতিবাদি এত বিচিৎ যে, সাধারণ মানুষের চোখে তাদের নীতি সেরেফ গোলাকধার মতই জটিল মনে হয়। প্রতিক্রিয়াশীল বুদ্ধোন্নত শিক্ষাপতি, সামন্তপ্রভু এবং অত্যাচারী শাসকদের বৃদ্ধ অনুরূপ বুদ্ধোন্নত প্রণী উদ্ভূত এই সব মার্কসিয়ারা কাগজওয়ালারা ছাদের পোঁথরা কিছু সংখ্যক হুমাসাহেবকে রাতারাতি “অপার্জন লীডার” বানিয়ে জনতার মধ্যে ছেড়ে দেয় এবং এমনভাবে এসব লীডারদের স্থানিত করতে থাকে যে, ভালমানুষ দেশবাসীর চোখে তারা খুব তাড়াতাড়ি ‘হিরো’ হয়ে যায়। অতঃপর এই হিরোর দল জনতার মারমুখী মনোভাবকে নানা কায়দায় দমিয়ে দিয়ে বুদ্ধোন্নতদের বস্তাপচা সাংবিধানিক আন্দোলন আমদানী করে। ফলে আওয়ামের আজাদীর স্বপ্ন প্রতিবারই ব্যর্থ হয়ে যায় আর কাসেমী স্বার্থের বিষয়ক অব্যবহিততে বাড়তে থাকে। নূরুল আমিনের বোঝা এই একই সত্যতানীর পুনরাবৃত্তি ঘটল। তার প্রথম নিম্নত বিপ্লববাদের অনুদগার জন সূকৌশলে বুদ্ধোন্নত কাগজগুলির

সম্পাদকীয় কলমে পরিবেশিত হোল যে, সাধারণ মানুষের কাছে জনাব আমিন বিপ্লবের পয়গম্বর হিসাবে প্রতিভাত হোলেন। প্রমাদ গুণলায় আমরা, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকরা। কেন না আমাদের পুরোন অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বুঝতে পারিলাম যে, গণআন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য শাসকচক্র আর একটা নতুন ফন্দি এঁটেছে। প্রকৃতপক্ষে তাই ঘটতে যাচ্ছিল। যতবার পাকিস্তানে প্রতি-ক্রিয়াশীল ও কাসেমী স্বার্থ শোষণকারী শাসকদের বিরুদ্ধে মেহনতী জনতা একই কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে; ততবার তাদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করার জন্য ঐ শাসকচক্র একদল টাউটকে নেতা বানিয়ে মাঠে-ঘাটে, রাস্তায় রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে এবং এসব টাউট জনতাকে সশস্ত্র সংগ্রামের পথ থেকে সূকৌশলে টেনে এনে নিরস্ত্র করে শাসকচক্রের পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর মেসিনগানের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়ে সব পড়েছে। যদিও আমরা নির্বাচন-বিরোধী এবং সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী তা’ হোলোও চুয়াট সালের লীগ-বিরোধী নির্বাচন ও আন্দোলনকে আমরা আজও অভিনন্দন জানাই। চুয়াটর ঐ দুর্বীর আন্দোলনকে যারা পথে বসিয়েছিল, তারা এই সময়ে নতুন ফন্দি এঁটে নতুন শয়তানী চাল দিতে চেষ্টা করছে। বাষটি, তেষটি সালে অস্ত্রের গদি পোস্ত হতে না হতেই আবার যখন আগুন জ্বলে উঠল তখনই সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভাব হোল নূরুল আমিনের। সে তার এন, ডি, এফ-এর ছাই দিয়ে ঐ আগুন চাপা দিতে চাইল, কাজও হোল কিছুটা, কেন না সংগ্রামী জনতা,—যারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সঠিক শিক্ষা পায় নি তাদের কিছু অংশ নূরুলের বক্তৃতার মারপ্যাটে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। সাতষটিতেও দালালবাহিনী সমান সক্রিয় ছিল। আয়ুব তার সেপাই-সামন্ত নিয়ে অত্যাচারের চড়াবত করলেও আমরা পূর্বে বাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক অপ্রতিরোধ্য গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলাম। ঠিক সেই সময়ই নতুন করে রিভেদের বীজ নিয়ে হাজির হল “বঙ্গোবসর” মজিবর, রহমান, যে ইউসুফ হারুনের কাছ থেকে মাসোহারা

পায়ে বাংলাকে শাসনমুক্ত করার স্বপ্ন দেখে। এল নূরুল আমিনও। তবে এবার আর এন, ডি, এফ নয়, পি, ডি, এম বা পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভ-মেন্ট নিয়ে। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরী হোয়ে গিয়েছিল। তিল তিল করে বিক্ষোভের যে সমুদ্র তৈরি হয়ে-ছিল এবং অপন্যর্থ আয়ুব নিজের হাতে, নিজের অজান্তে যার বাঁধ কেটে দিয়েছিল (মার্কস ঠিকই বলেছেন যে, অত্যাচারী নিজেই প্রতি-শোধ নেওয়ার অস্ত্র অত্যাচারিতের হাতে তুলে দেয়), সেই আন্দোলনের, সেই বিক্ষোভের মহাসমুদ্রকে প্রত্যাহাত করার ক্ষমতা মজিবর বা নূরুলের ছিল না। তারা তাই আরও বড় এক আয়োজন করল, যার নাম-ডাক বা ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি। শোষণ-বাদী মৌজাফর, ওয়ালী খান ও মাহমুদুল হকের ন্যাপও এই আয়ো-জনের অংশীদার হোল। ভাসানী বাইরেই থাকলেন। আর এইবার এই সময়ে, যে সময়ে মজিবর দশক সেই সময়ের প্রথম বছরেই আমরা দেখছি আরও অনেক, অনেক বড় এক বিপ্লব-বিরোধী আয়োজন। শৃঙ্খ তাই নয়, একই সাথে এ কথাও বুঝতে পারছি যে, বিপ্লব বত আসন্ন হচ্ছে, মানুষ যত মারমুখী হচ্ছে, ততই তথাকথিত বিপ্লবীদের মরখাশ খুলে যাচ্ছে। তাই আজ মৌলানা ভাসানীও সংসদীয় গণতন্ত্রের ছেঁড়া ছাতার নিচে দাঁড়িয়ে মজিবর, মৌজাফর, নূরুল, কাইয়ুম ফকা, চৌধুরী প্রমুখ দালালের সাথে গলা মিলিয়ে তারস্বরে চিৎকার করছে।

যাই হোক, আমরা যখন নূরুলের নতুন চক্রান্তের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি তখন খবর পাওয়া গেল যে, এপ্রিলের শেষে বা মের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় নূরুল ও তার সহচরবৃন্দ একটা বৈঠকে বসবে। যথাসময়ে, অর্থাৎ সাতষটির পয়লা মে ঢাকায় নূরুলের মহায়জ্ঞ শুরু হয়ে গেলে। এন, ডি, এফ-এর পক্ষ থেকে এল নূরুল স্বয়ং, তা’ ছাড়া হামিদুল হক চৌধুরী এবং আতায়ুর রহমান খান। কার্ভিন্সল মুসলিম লীগ থেকে এল মিয়া মমতাজ দৌলতানা, খাজা খয়েরুদ্দিন এবং তোফাজ্জল আলী, জামাতে পক্ষ থেকে যোগ দিল তুফাইল মোহাম্মদ, মহম্মদ আবদুর রহিম এবং গুলাম আজম। আওয়ামী লীগের যে অংশটা ইতিমধ্যেই দল ছেড়েছিল তারাও এদা তাদের মধ্যে ছিল নওয়াবজাং নছরুজা, আবদুস সালাম খান এবং গুলাম মোহাম্মদ খান—লুন্ড খাওয়ার। নিজামে ইসলামের পক্ষে যোগ দিল চৌধুরী

সাংগাহিক বদনতী

মোহাম্মদ আলী, ফরিদ আমেদ এবং
এম আর খান। পি, ডি, এম-এর এই
বৈঠকে একটা আটদফা কর্মসূচী তৈরি
করা হোল। দফাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়
দিচ্ছি : (১) পাকিস্তান হবে একটি
ফেডারেশন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বা-
চিত সংসদীয় সদস্যরা দেশের ব্যবতীয়
নীতি নির্ধারণ করবে। স্বাধীন
বিচারবিভাগ, স্বাধীন সংবাদপত্র এবং

সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার—এই তিন
অবশ্য প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
(২) প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, ফেডা-
রেল অর্থনীতি, মুদ্রা এবং আন্তঃ-
আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়
সরকার পরিচালনা করবে। (৩) পূর্ণ
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই। (৪) আগামী
দশ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম
পাকিস্তানের আর্থিক বৈষম্য দূর

করতে হবে। এই ক'বছর পূর্ব
পাকিস্তানের নিজস্ব বৈদেশিক মুদ্রা
তার প্রতিরক্ষা এবং উন্নতির জন্য ব্য-
করা হবে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান এই
মুদ্রার অংশ দাবী করতে পারবে না।
(৫) উভয় অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে
গঠিত কোনও একটি সংস্থা বৈদেশিক
মুদ্রা, দেশীয় মুদ্রা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক,
বৈদেশিক বাণিজ্য এবং আন্তঃ-



লাইফবয়

যেখানে
স্বাস্থ্য
সেখানে

লাইফবয় সাবান মেখে স্বাস্থ্য রক্ষা করলে আপনি
অপূর্ণ নির্মল ও স্বাস্থ্যের বোধ করবেন।
লাইফবয় এনে মেবে - স্বাস্থ্যের এক সন্তোষ
অনুভূতি। লাইফবয় নির্মল ও স্বাস্থ্য
জীবনের পরম সহায়। মনে রাখবেন...

লাইফবয়
ধূলো ময়লায়
রোগজীবাণু ধ্বংস করে দেয়

সাংবাদিক বসুমতী

আংশলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিচালনা করবে। (৬) দশ বছরের মধ্যে চাকুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে। (৭) প্রতি-রক্ষার ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সব বিষয়েই সমতা সৃষ্টি করতে হবে। নৌ-বাহিনীর প্রধান কমান্ড স্থল হবে পূর্ব পাকিস্তান। উভয় অঞ্চলের সমসংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে একটি প্রতিরক্ষা পরিষদ। (৮) নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ উনিশ শ' ছাপ্পান সালের সংবিধানের দুই থেকে সাত নম্বর পর্যন্ত যাবতীয় সূত্রগুলি গ্রহণ করবে এবং নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময় তাদের ব্যবহার করবে। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান সমস্ত দেশের সাথেই প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখবে। ইসলামী ও আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলির প্রতি বোশ মনোযোগ দিতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে পি, ডি, এম-এর এই আটদফা কর্মসূচীকে বেশ প্রগতিশীল বলে মনে হতে পারে, অন্তত সৈনিক অনেক পূর্ব পাকিস্তানীর তাই মনে হয়েছিল। কেন না, স্বায়ত্ত-শাসন, আর্থিক সাম্য, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বড় বড় দাবী-দাওয়ার কোনটাই পি, ডি, এম তার দফার লিস্টে ঢুকিয়ে দিতে ভোলেনি। গুল্লা মের বৈঠকে যাঁরা যাঁরা তাঁদের পূর্বপুরুষের কণ্ঠার্জিত পুণ্যের বলে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন এবং “মহাশয় ঘাতি”দের ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনে-ছিলেন তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে, দফাগুলির মৌলিক সম্পর্কে শ্রোতাদের সন্দেহান করার জন্য সান্দ্রচর নূরুল কি পরিমাণ বক-বক করেছিলেন! নূরুলের এই “জনদরদী” সাজার প্রকৃত উদ্দেশ্য আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে, আশা করছি, আপনারাও তা মনে রেখেছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই দফাগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার সম্পর্কে আমার বক্তব্যের সত্যাসত্য যাচাই করতে পারবেন। আয়তুর গাঁদিতে কসার পর থেকেই আংশলিক বৈষম্য লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে,—সেই সঙ্গে বৈষম্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক প্রতি-ক্রিয়া হিসাবে স্বায়ত্তশাসনের দাবীও দ্রুতগতিতে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ঠেলে গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে শুরুর করে। নূরুল সুকৌশলে স্বায়ত্ত-শাসনের বিভিন্ন স্লোগানগুলি চুরি করে নিজের আট-দফায় ঢুকিয়ে দিল। সম্ভবতাজ করতে তার জুড়ি মেলা ভার। সে বৃত্তান্তে পারল যে, গণ-আন্দোলনকে ভিতর থেকে নষ্ট করতে হবে। কাজেই আন্দোলনকারীর ছদ্মবেশ ধরে আন্দোলনে নেমে

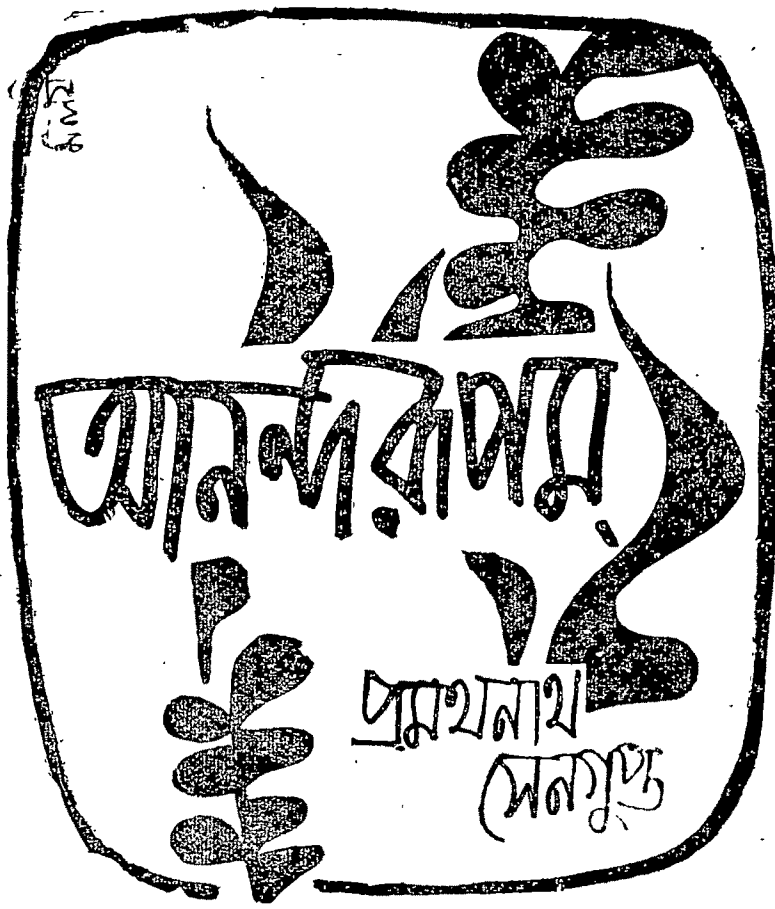
পড়তে পারলে “তাকে কে আর পায়”। এই কারণেই তার তথাকথিত আট দফায়, ছপ্পে ছপ্পে বিপ্লবের ফুলকি ছুটিছিল! কিন্তু শেষরক্ষা আর হোল না। দালালের ডুমিকায় আগাগোড়া চমৎকার অভিনয় করে গেলেও মাঝে মাঝে নূরুল বেশ কচি খোকার মত কাজ করে বসে। আট দফার ক্ষেত্রেও সে এই রকম কাঁচা কাজ করেছিল। দুই নম্বর দফায় কেন্দ্রের হাতে মদ্রা, অর্থনীতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে, তিন নম্বর দফায় পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করা হয়েছে! এট কেবল অসম্ভবই নয়, ভণ্ডামীও বটে। পাঞ্জাবী আমলা দিয়ে ঠাসা কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরগুলির পূর্ব পাকিস্তান বিরোধী চক্রান্তের কথা আজ আর অজানা নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যোগাযোগ, বৈদেশিক মদ্রা এবং অর্থ-নীতি থাকলে পশ্চিমী তথা পাঞ্জাবী শিল্পপতিরা পাঞ্জাবী আমলাদের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়মিত বড়ো আঙুল দেখাতে পারবে। আর্থিক ক্ষেত্রে পরাধীন থেকে আমরা কিভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করব? ঠিক একই কারণে চার নম্বর ও ছয় নম্বর দফা দুটিও অর্থহীন হয়ে পড়েছে। আংশলিক বৈষম্য দূর হবে কি করে, কোন ক্ষমতায় পূর্ব পাকিস্তান তার নিজস্ব বৈদেশিক মদ্রা নিজের স্বার্থে ব্যয় করতে পারবে, কি করেই বা পূর্ব পাকিস্তানীরা চাকুরির ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের সাথে সমান সুযোগ পাবে, যদি অর্থনীতি পুরোপুরি কেন্দ্রের অধীনে থাকে? আট নম্বর দফাটিতে নূরুল তার প্রচণ্ড বোকামির পরিচয় দিল। সে বলল যে, পাকিস্তান গাছেরও খাবে, তলারও কুড়াবে, কেন না “যে কোনও দেশের সাথেই সম্ভাব রাখা হবে পাকিস্তানের মূল বৈদেশিক নীতি”। চমৎকার! তা হলে মার্কিন, রুশ, চীন সবাই পাকিস্তানকে নিয়ে একপাতে বসে গোস্ত খাবে নাকি?

বলা বাহুল্য যে, নূরুল আমিনের এই নয়া দালালির মোকাবিলা করার জন্য আমরা যাবতীয় বন্দোবস্ত, সবই করেছিলাম। কেবল ঢাকা বা পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলা কেন, সুদূর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানেও ন্যাপের পক্ষ থেকে নিয়মিত সভা, শোভাযাত্রা, আলোচনা এবং গ্রাম প্রদক্ষিণের মাধ্যমে আমরা জন-সাধারণকে পি, ডি, এম-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করছি। মজার ব্যাপার এই যে, পি, ডি, এম-ওয়ালারা নিজেরাই মাঝে মাঝে এক-একটা আহাম্মুকী করে আমাদের রাস্তা

পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। যেমন, পি, ডি, এম হবার তিনদিন বাদেই অর্থাৎ চৌঠা মে আবদুস সালাম খান সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করল যে, পি, ডি, এম কোনও দল নয়, একটা সংগঠন মাত্র। তার কোনও নির্দিষ্ট এবং নিজস্ব গঠনতন্ত্র নেই, অংশীদার দলগুলির নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতাও তার নেই। এই দলগুলি নিজস্ব কর্মসূচী ও অর্থনীতি সহ স্বাধীনভাবে নির্বাচনে নামবে। কেবল একটি বিষয়ে তারা একমত যে, দেশের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; অতএব জনসাধারণের স্বার্থে গণতন্ত্র কার্যকর করার জন্য তারা মিলিতভাবে চেষ্টা করে যাবে। আতবড় মর্শ্বও বোধ হয় এই ধরনের বিবৃতি দিতে লজ্জাবোধ করত! আপনারা যাঁরা নিয়মিত আমার চিঠি পড়ছেন এবং ভারতে বসেই পাকিস্তানের আগামী নির্বাচনের টুকটাকি খবর পাচ্ছেন তাঁরা জানেন যে, আজও পাকিস্তানের তথাকথিত প্রগতিশীল দলগুলি জনতার স্বার্থে এক কাতারে আসতে পারে নি। যেখানেই একটা বোঝাপড়া হয়েছে, সেখানেই কিছু না কিছু ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা পাকা হয়ে গেছে এবং এই ধরনের বোঝাপড়া অত্যন্ত সাময়িক, কেন না এরা প্রত্যেকেই দালালি করছে এবং নিজের ব্যবসাতাকে একচেটিয়া করতে চাইছে। সৈদিনও তাই হয়েছিল। জামাতের এক মত, নিজামের আর এক মত, এন, ডি, এফ-এর এক পথ, কার্ডিনাল মুসলিম লীগের আর এক পথ। এই সব মত এবং সব পথ একই আঁস্তাকুড়ের দিকে গেছে, হয়ত সেই-খানে গিয়ে হাঁটু আর কনুই ঠোকা-ঠুকি করে ওরা ময়লা খুঁটে খেত, কিন্তু জনতার জন্য জনতার স্বার্থে কখনও এক হতে পারত না। কাজেই নূরুল বা আবদুস সালামের আশ্বাস সম্পূর্ণ ধাপ্পা!

স্বতীয়ত এটা অর্থাৎ পি, ডি, এম কি ধরনের সংগঠন—যেখানে প্রত্যেকেই স্বাধীন! যেখানে প্রতি দলই তার নিজস্ব নীতি নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার রাখে! আট দফায় যে সব দাবীদাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, তার সামান্যতম সাফল্যের জন্যও একটা সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। আবদুস সালামের কথা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে, সেই বোঝাপড়ার লেশমাত্র পি, ডি, এম-এ নেই।

কাজেই আমাদের সর্বাধা হোল। পি, ডি, এম-এর গোড়ার গলদ জন-সাধারণকে বুঝিয়ে দিতে আমরা তেমন কোনও বেগ পেলাম না।



পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১০)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেবছর গুরুদেবকে আমন্ত্রণ জানানেন তাঁদের সমাবর্তন উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ দেবার জন্য। গুরুদেব সানন্দে সম্মতি জানানেন, আর একথাও লিখে দিলেন যে, বাংলার এই প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ তিনি বাংলাতেই দেবেন। প্রতি বছর সমাবর্তন-ভাষণ দেওয়া হয় ইংরেজি ভাষায়; আর তখন আচার্য ছিলেন বাংলার গভর্নর এক বিদেশী ভদ্রলোক, তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যতিক্রমের প্রস্তাবটা গ্রহণ করতে স্বিধা করলেন। গুরুদেবকে তাঁরা লিখে দিলেন ইংরেজিতেই তিনি যেন তাঁর ভাষণ দেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবও বিশ্ববিদ্যালয়কে জবাব দিলেন তাঁর ভাষণ তিনি বাংলা ভাষাতেই দেবেন বলে স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন, এ বিষয়ে ষ্টুডেন্টসিটির কোনো অসুবিধা থাকলে তাঁরা যেন তাকে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেন। গুরুদেবের এই অসম্মিত জ্ঞাপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ খুব বিচলিত হলেন, বিশেষ করে আচার্য। ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করে তাঁরা স্থির করলেন বাংলার বৃক্কে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি যখন বাংলা ভাষায় সমাবর্তন-ভাষণ

দেবার প্রস্তাব করেছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া। শুনিয়ে চ্যান্সেলার নিজে গুরুদেবকে অনুরোধ করেছিলেন বাংলা ভাষাতেই সমাবর্তন-ভাষণ দেবার জন্য। গুরুদেব সম্মত হন—এই উপলক্ষে যে ভাষণ তিনি দিয়েছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে তা অমর হয়ে আছে। এই ভাষণের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করলাম—“কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদবী-সম্মান-বিতরণের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আজ আমি আহত। ...আজ বাংলাদেশের প্রথমতম বিশ্ববিদ্যালয় আপন ছাত্রদের মাগল্যবিধানের শ্রদ্ধাকর্মে বাংলার বাণীকে বিদ্যামন্দিরের উচ্চ বেদীতে বরণ করেছেন। বহুদিনের শূন্য আসনের অকল্যাণ আজ দূর হলো। দূর্ভাগ্যবাদের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে, সেই দিনে স্বতঃস্বেকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেককাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে, পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণী পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা

যায় না। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় আপন স্বাভাবিক ভাষায় স্বদেশে স্বজনের আত্মীয়তালভের গৌরবান্বিত হবে, সেই আশার সংকেত আজকের দিনের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার সুযোগ আমি পেয়েছি। তাই সমস্ত বাংলাদেশের গর্ব ও আনন্দ বহন করে এই সভায় আজ আমার উপস্থিতি। নতুবা এখানে স্থান পাবার মতো প্রবেশাধিকার মূল্য দেওয়া আমার স্বারা সাধ্য হয় নি। আমার জীবনে প্রথম বয়সে স্বল্পপক্ষণস্থায়ী ছাত্রদশা কেটেছে অপ্রভেদী শিক্ষাসৌধের অধস্তন তলায়। তারপর কিশোর বয়সে অভিভাবকদের নির্দেশমতো একদিন সংস্কৃতিতে প্রবেশ করেছিলাম বাহিরগঙ্গা ছাত্রদপে প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক প্রোগ্রামে। সেই একদিন আর দ্বিতীয় দিনে পৌঁছল না। আকারে-প্রকারে সমস্ত ক্লাশের সঙ্গে আমার এমন কিছ্র ছন্দের ব্যত্যয় ছিল, যাতে আমাকে দেখবামাত্র পরিহাস উঠল উচ্ছ্বাসিত হয়ে। বহুদিন মন্ডলীর বাহির থেকে অসামঞ্জস্য নিয়ে এসেছি। পরের দিন থেকেই অধিকার প্রবেশের দুঃসাহসিকতা থেকে বিরত হয়েছিলাম এবং আর যে কোনোদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পার হয়ে অধিকারী-বর্গের একপাশে স্থান পাব, এমন দুরাশা আমার মনে ছিল না। অবশেষে একদিন মাতৃভাষার সাধনাপ্রণোই সেই দলভ অধিকার আমার মিলবে, সেদিন তা স্বপ্নের অতীত ছিল।.....

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পর-ভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুশীল হলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গমগ্ধচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষার ধারাকে অবতারণা করলেন, সাবধানে তার স্রোতপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দেহ সেই পথকে আজ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বর্ণিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি (ডক্টর) দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলাভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দৃঢ়তা গ্রন্থি একসঙ্গে মৃদু করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ধাতুপারিতন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে-আড়ন্ত শাখায় আজ এলো নবপল্লবের উৎসব।”.....

তরুণ ছাত্রসমাজকে ডাক দিয়ে তিনি বললেন, “তোমরা যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জীবনের জয়যাত্রার পথে

নাগাধিক বন্দন

অগ্রসর হতে প্রস্তুত, তোমাদের প্রতি আমার অভিনন্দন জানাই। তোমরাই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন গৌরবদানের প্রভূত সফলতার প্রত্যাশা আগামীকালের পথে বহন করতে যাত্রা করছ।..... সমস্যার পর দঃসাধ্য সমস্যা এসে অভিব্যক্ত করছে দেশকে। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে পরস্পর বিচ্ছেদ ও বিরোধ নানা কদম্ব মূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে উঠলো; বিকৃতি আনলে আমাদের আত্মকল্যাণবোধে। এই সমস্যার সমাধান সহজে হবার নয়, সমাধান না হলেও নিরবচ্ছিন্ন দৃগতি।.....অনশন ও দঃখ-দারিদ্র্যের সহচর মজাগত মারী সমস্ত জাতির জীবনশক্তিকে জীর্ণ-জর্জর করে দিয়েছে। এর প্রতিকার কোথায় সেকথা ভাবতে হবে আমাদের নিজেকে— অশিক্ষিত কল্পনা দ্বারা নয়, ভাবিবহুল দৃষ্টির বাস্তবকুলতা দিয়ে নয়। এই পথ করে চলতে হবে যে, পরাস্ত যদি হতেও হয়, তবে সে যেন প্রতিকূল অবস্থার কাছে ভীরুর মতো হাল ছেড়ে দিয়ে নয়; যেন নির্বোধের মতো নির্বিচারে আত্ম-হত্যার মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে পড়াকেই গর্বের বিষয় না মনে করি।.....

অবাস্তবের মোহাবেশ কাটিয়ে পুরুষের মতো উজ্জ্বল বুদ্ধির আলোকে দেশের সমস্ত অসম্পূর্ণতা, মূঢ়তা, কদম্বতা সব-কিছুকে অত্যাধিকারিত করে জেনে দৃঢ়-সঙ্কল্পের সঙ্গে দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করা। যেখানে বাস্তবের ক্ষেত্রে ভাগ্য আমাদের প্রতিদিন বশীভূত করে, অবমানিত করে, সেখানে ঘর-গড়া অহঙ্কারে নিজেকে ভোলাবার চেষ্টা দৃঢ় চিত্তের দলক্ষণ। সত্যকার কাজ আরম্ভ করার মধ্যে একথা মানাই চাই যে, আমাদের সমাজে, আমাদের স্বভাবে, আমাদের অভ্যাসে, আমাদের বুদ্ধিবিকারে গভীরভাবে নিহিত হয়ে আছে আমাদের সর্বনাশ। যখনই আমাদের দৃগতির সকল দায়িত্ব একমাত্র বাহিরের অবস্থার অথবা অপর কোনো পক্ষের প্রতিকূলতার উপর আরোপ করে বাহির শূন্যের অভিমুখে তারম্বরে অভিযোগ ঘোষণা করি, তখনই হতাশাস ধাতবাণ্টের মতো মন বলে ওঠে: “তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়”।

আজ আমাদের অভিযান নিজের অন্তর্নিহিত আত্মশত্রুতার বিরুদ্ধে। প্রাণ-পন আঘাত হানতে হবে বহুজ্ঞানস্বা-নির্মিত মূঢ়তার দৃগীভিত্তি-মূলে। আগে নিজের শক্তিকে তামাসিকতার জড়িমা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে তারপরে পরের শক্তির সঙ্গে আমাদের সম্মানিত সন্ধি হতে পারবে। নইলে আমাদের সন্ধি হবে ক্ষণের জালে, ভিক্ষুকতার জালে আটে-

পৃষ্ঠে আড়ম্বল্য পাকে জড়িত। নিজের প্রেরণতার স্ফারাই অন্যের প্রেরণতাকে আমরা জাগাতে পারি, তাতেই মঙ্গল আমাদের ও তাদের। দৃঢ়তার প্রার্থনা যে কুণ্ঠাগ্রস্ত দান সপ্তয় করে, সে দান শতাহ্ন ঘণ্টের জল, যে-আশ্রয় পায় চোরা-ঝালিতে সে-আশ্রয়ের ভিত্তি।

“হে বিধাতা,.....

.....

দূর কর চিত্তের দাসত্ব বন্ধন,

ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,

দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে

মানবমর্যাদা বিসর্জন.

চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তম্ভপীকৃত

লক্ষ্যরাশি

নিষ্ঠুর আঘাতে।

নিঃসংকোচে

মস্তক ভুলিতে দাও

অনন্ত আকাশে

উদাত্ত আলোকে

মুষ্টির বাতাসে”।*

গুরুদেবের এই দীক্ষান্ত-ভাষণ আকাশ-বাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে ‘রীলে’ (relay) করার ব্যবস্থা হয়। বিশ্ব-ভারতীর অধ্যাপকমণ্ডলী, ছাত্রমণ্ডলী, কর্মিমণ্ডলী সবাই সেদিন একেলে উত্তরায়ণে সমবেত হয়ে অসীম আগ্রহে রেডিওতে গুরুদেবের কণ্ঠে তাঁর এই প্রাণীভাষণ শুনছিলেন। এই ভাষণ দেবার কিছুদিন আগে তিনি শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ সংবন্ধে New Education Society-এর জন্য বে-উদ্বেোধনী ভাষণ রচনা করেছিলেন, তা অধ্যাপকমণ্ডলীকে আহ্বান করে শুনিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন—“বাঙালীর ছেলে ইংরেজি-বিদ্যায় যতই পাকা হোক, তবু শিক্ষা পুরো করার জন্য তাকে বাংলা শিখতেই হবে, ঠেলা দিয়ে মধুসূদনমশায় (আশু-তোষ) বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়কে এতটা দূর পর্যন্ত বিচলিত করেছিলেন। হয়তো এ পথটার তার চলাছটির সূত্রপাত করে দিয়েছেন, হয়তো তিনি বেঁচে থাকলে চাকা আরো এগোত।..... বাংলা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একটি সজীব সমগ্র শিশু-মূর্তি দেখতে চাই, সে-মূর্তি কারখানাঘরে-ঠাঁঠির খন্ড খন্ড বিভাগের ক্রমশ যোজনা নয়। বয়স্ক বিদ্যালয়ের পাশে এসেই সে দাঁড়াক বালক বিদ্যালয় হয়ে। তার বালক-মূর্তির মধ্যেই দেখি তার বিজয়ী মূর্তি, দেখি ললাটে তার রাজ্যাসন অধিকারের প্রথম চিহ্ন।.....মনের চিন্তা এবং ভাব কথায় প্রকাশ করার সাধনা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। অন্তরে-বাহিরে দেওয়া-নেওয়ার এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্যসাধনই সুস্থপ্রাণের

লক্ষণ। বিদেশী ভাষাই প্রকাশচর্চা প্রধান অবলম্বন হলে সেটাতে যেন মধুসূদনের ভিতর দিয়ে ভাব প্রকাশের অভ্যাস দাঁড়ায়। মধুসূদন-পরা অভিনয় দেখেছি, তাতে ছাচে-গড়া ভাবকে অবিচল করে দেখানো যায় একটা বাঁধা সীমানার মধ্যে, তার বাইরে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। রচনার সাধনা অর্মান্তেই সহজ নয়। সেই সাধনাকে পরভাষা দ্বারা ভারাক্রান্ত করলে চির-কালের মতো তাকে পঙ্গু করার ভাষণকা থাকে।.....আমার নিবেদন এই যে, আজ কোনো ভগ্নীয় বাংলাভাষায় শিক্ষা-প্রোতকে বিশ্ববিদ্যার সমুদ্র পর্যন্ত নিয়ে চলন; দেশের সহস্র সহস্র মন মূঢ়তার অভিশাপে প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে, এই সজীবনীধারার স্পর্শে বেঁচে উঠুক; পৃথিবীর কাছে আমাদের উপেক্ষিত মাতৃ-ভাষার লজ্জা দূর হোক; বিদ্যা বিতরণের অগ্রসর স্বদেশের নিতাসম্পদ হয়ে আমাদের আতিথ্যের গৌরব রক্ষা করুক।”

তিনি একাধিকবার একথা বলেছেন যে, পাশ্চাত্য-ছাচে গড়া আমাদের দেশের শিক্ষাবিধান পরভাষায় ভারাক্রান্ত হয়ে এমনি অস্বাভাবিক হয়েছে ও তার আয়োজন এতো অকিঞ্চিৎকর যে, দেশের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে শিক্ষার ক্ষীণ আলোক পড়েছে, তার বহুভাগ অংশ শিক্ষা-বিহীন হয়ে মূঢ়তা ও অপরিবাসের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। বহুদিন ধরে এদেশে শিক্ষার চর্চা হয়ে আসছে একান্ত-ভাবে বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়ে, অনভ্যন্ত এই ভাষায় সে-শিক্ষা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে নি, দেশের মস্তিকে সে দান করেছে অতি সামান্য। তাই দেশের শিক্ষা ও তার বহু মন আজ পরস্পর বিচ্ছিন্ন, দেশের প্রাণের ধারার সঙ্গে এই শিক্ষার যোগ খুব সঙ্কীর্ণ। অনেকদিন ধরে এই অসংগতির অভ্যাস মজাগত হয়ে জাতির চিন্তাশক্তি এনেছে এক সর্বনেশে জড়তা। এই জড়তার সাংঘাতিক নাগ-পাশ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে ব্যাপকভাবে জন-সাধারণের মধ্যে বর্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করে দেওয়া একান্ত আবশ্যিক। তাই গুরুদেব সেই ভগ্নীয়কে আহ্বান জানিয়েছেন—যিনি বাংলাভাষায় দেশের শিক্ষাপ্রোতকে বিশ্ববিদ্যার মহাসাগর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে তার সজীবনী ধারায় অভিশাপমুক্ত করুন সহস্র সহস্র প্রাণহীন মনকে।

এই New Education Society-র উদ্বেোধন দিবসে একটা ঘটনা ঘটে গেল। উদ্বেোধনী ভাষণ দেবেন গুরুদেব, বাংলার তদানীন্তন শিক্ষা-অধিকর্তা ছিলেন সভাপতি (যতদূর মনে পড়ে), এক বিদেশী ভদ্রলোক। বাংলাদেশের ও বাইরের অনেক



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

ত্বক শালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। সুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

১৯৫২/৫৯

অধ্যাপক ও শিক্ষারতী এই সভায় সেদিন উপস্থিত। শিক্ষা-অধিকর্তা তাঁর ভাষণে শিক্ষার মানের যে কী অবনতি ঘটেছে, তাঁর তদাহরণস্বরূপ বললেন যে, ষোল্লদিন আগে একটি শূন্যপদে যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগের জন্য যেসব স্নাতক প্রার্থীকে মোখক পরীক্ষার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল, তাঁদের সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে যে কয়টি সহজ প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাদের কোনো সদন্তর গান নি বলে বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন। তিনি মন্তব্য করলেন—ছেলেদের লেখাপড়ার আর তেমন মন নেই, নানা বাজে কাজে তাঁদের মন বিক্ষিপ্ত। তিনি বললেন, তাঁর একটি খুব সহজ প্রশ্ন ছিল “What is the exact height of the Mount Everest?” (মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গের নির্ভুল উচ্চতা কত?)। একজন স্নাতক যদি এই সহজ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারেন তাহলে স্নাতক হওয়ার যোগ্যতা তাঁর নেই, আর যে-বিশ্ববিদ্যালয় বা বিদ্যালয়তনের ছাত্র তিনি তার শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষতা সম্বন্ধে মনে গভীর মন্দেহের উদ্বেগ হয়। একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বললেন—কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের জবাব না দিতে পারাটা স্নাতকের সামগ্রিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা নির্ণয় করে না, আর কোনো শিক্ষায়তনের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কটাক্ষ করাও সাজে না তার কোনো এক স্নাতকের কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের দ্রুতিপূর্ণ জবাবকে ভিত্তি করে। তারপর শিক্ষা-অধিকর্তাকে উদ্দেশ্য করে অধ্যাপক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—“Sir, may I know what is the exact height of the Mount Everest! Frankly speaking, I myself do not know the answer.” (মহাশয়, মাউন্ট এভারেস্টের নির্ভুল উচ্চতা কত তা একটু বলে দেবেন! সত্য কথা বলতে কি আমি নিজেই এই প্রশ্নের জবাব জানি না)। শিক্ষা-অধিকর্তা সঙ্গে সঙ্গে বললেন—“It's so simple!—29002 ft. (খুবই সহজ—২৯০০২ ফুট)। অধ্যাপক তখন তাঁকে চেপে ধরলেন, “How do you know? How do you measure the exact height? What you can measure is only the approximate height and that also is subject to so many corrections” (কী করে জানলেন? কী করে নির্ভুল উচ্চতা পরিমাপ করা হলো? যা নির্ণয় করা সম্ভব তা হলো মূল উচ্চতা, তাও আবার অনেক শৃঙ্খল

প্রক্রিয়া আরোপ করার পর)। শিক্ষা-অধিকর্তা ভাবতেই পারেন নি এভাবে বিরত হবেন ছেলেদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য করতে গিয়ে, তবে বুদ্ধিমানের তাঁর নিজের প্রশ্ন করার ভুলটা ও তাঁর অসঙ্গত সিদ্ধান্তের। আর এটুকুও বুদ্ধিমানের যে, স্নাতকের পক্ষ নিয়ে যিনি দাঁড়িয়েছেন তাঁকে বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আর বেশিদূর ঘাটানো খুব নিরাপদ নয়। কারণ, বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে তিনি স্বনামধন্য। গুরুদেব অবস্থাটা উপলব্ধি করে আলোচনার ধারাটা অন্যপথে চালিত করে ব্যাপারটা এখানেই চাপা দিলেন। না হলে শ্রাস্থ কতদূর গড়াত বলা যায় না! এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়ে গেল—এই অধ্যাপক ছাত্রদের সম্বন্ধে কোনো নিন্দা বা লেশম সহিতে পারতেন না, বিশেষ করে তাদের বস্তুবস্তুর উপর কোনো কটাক্ষ করলে। সেবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন মাদ্রাজে হচ্ছে। সদ্য এম-এসসি পাশ-করা এক তরুণ গবেষক তাঁর গবেষণালব্ধ ফল রচনার আকারে বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাঁকে প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে এমন জর্জরিত করে ফেললেন যে, সেই বেচারার কণ্ঠস্বরে হলো; সঙ্গে সঙ্গে এই বিশিষ্ট স্বনামধন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সেই তরুণ যুবকের কাছে গিয়ে তাঁকে এক হাতে বেঁটন করে অপর হাতে তাঁর রচনাটি নিয়ে সেই সপ্তরথীর প্রশ্নাবলীর যথাযথ জবাব দিয়ে বললেন, তিনি যেসব কথা আলোচনা করলেন, এই তরুণ বিজ্ঞানসাধকও ঠিক সেই কথাই বলতে চেয়েছেন। কিন্তু বিশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর বক্তব্য সম্যক উপলব্ধি না করে সপ্তরথীর দল অন্যায়াভাবে তাঁকে আক্রমণ করেছেন। এই মনোভাবের তিনি প্রশংসা করতে পারেন না; তরুণ যারা, তাঁদের কাছে উৎসাহ দিতে হবে, উপদেশ দিয়ে তাঁদের কাছে অনুপ্রেরণা দিতে হবে, থাক না তাঁদের কাজের কিছু দ্রুতি। তা না করে, সবাই মিলে কঠোর ও নিষ্ঠুর সমালোচনা করলে তাঁর প্রতিভার বিকাশের যোরতর অন্তরায় হবে।

এই বিশিষ্ট অধ্যাপক যে কী রকম ছাত্রদরদী তা বোঝাতে আর দু-একটি ঘটনার উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বি-এসসি পাশকোর্সের প্রায়-টিকাল পরীক্ষার সময় ৮।১০টি ছাত্রের বর্ণালীবীক্ষণ (Spectroscope) যন্ত্র নিয়ে বর্ণালি বিশ্লেষণের কাজ পড়েছে। অনেকক্ষণ ধূস্রতাদৃষ্টি করে বিফল হওয়ার পর তারা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ল্যাবরেটরী থেকে বেরিয়ে স্থানীয় পরীক্ষকের কাছে একযোগে জানালো যে,

একটা যন্ত্রও ঠিক নেই, কোনো কাজই এদের দিয়ে করা যাচ্ছে না। পরীক্ষক তাদের ধমকে বিদায় করে দিলেন, বললেন—যন্ত্র সব ঠিক আছে, adjustment যা দরকার তা নিজেদেরই করে নিতে হবে, অন্যথায় ফেল করবে। তারা অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে যাচ্ছিল ল্যাবরেটরীতে, বারান্দায় এই অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা। হতে তিনি তাদের চোখে-মুখে একটা উদ্বেজিত ও অস্বাভাবিক ভাব দেখে জিজ্ঞেস করলেন তাদের কী হয়েছে। তারা সব কথা ওঁকে খুলে বললো। তিনি ছেলেদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে তাদের ল্যাবরেটরীতে ফিরে যেতে বললেন, আশ্বাস দিলেন, অপেক্ষাকৃতক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অধ্যাপক পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যে-দু'জন গবেষক কাজ করছিলেন, তাঁদের বললেন—মনে হচ্ছে.....স্পেকট্রোমিটার-এর সব adjustments গোলমাল করে রেখেছে, তোমরা একদুটি যন্ত্রদ্বারা ঠিকমতো set করে দু-একটা করে reading ছেলেদের নিতে দেখিয়ে চলে এসো, ততক্ষণ আমি.....কে আমার ঘরে নিয়ে কথাবার্তা বলে আটকে রাখি। অধ্যাপকের নির্দেশমত তাঁর গবেষক ছাত্র-দ্বয় আধ ঘণ্টার মধ্যেই আদেশ পালন করে চলে এলো। ছেলেরাও তাদের পরীক্ষায় বেশ ভালোভাবেই অগ্রসর হয়ে চললো। কিছুক্ষণ পর স্থানীয় পরীক্ষক অধ্যাপকের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ল্যাবরেটরীতে ছেলেদের কাজ দেখতে এলেন। এসেই তাঁর চক্ষুস্থির, দেখেন সব স্পেকট্রোমিটারই প্রায় নিখুঁতভাবে set করা, আর প্রত্যেকটি ছেলেই তার পরীক্ষা প্রায় শেষ করে ফেলেছে, results যা পেয়েছে তা চমৎকার। “আচ্ছা দেখাচ্ছি” বলে অগ্নিমূর্তি হয়ে তিনি সবগে ঢুকলেন গবেষকদ্বয়ের ঘরে। বললেন—তোমরা নিশ্চয়ই ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ছেলেদের স্পেকট্রোমিটার set করে দিয়েছ, এমন কি কিছু reading নিয়ে তাদের দেখিয়ে এসেছ। আমি জানতে চাই এই অন্যায়া কাজ তোমরা কেন করেছ? এই অসদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট ছেলেদের এবং এই কাজে তাদের সাহায্য করার জন্য তোমাদের শাস্তি নিতে হবে। ঠিক সেই মূহুর্তে অধ্যাপক ঘরে ঢুকেই বললেন—“আমিই এই কাজ করার ব্যবস্থা করেছি। প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে স্পেকট্রোমিটারের সাহায্যে এই পরীক্ষা সম্পাদন কর; এর অর্থ এই যে, এমন যন্ত্র ছেলেদের দিতে হবে যার মধ্যে খুঁজ নেই, আর arrangements আগাগোড়া ওলট-পালট করার তো কোনো কথা ছিল না। ছেলেদের শেখাবার জন্যই শিক্ষক, ঠাকার জন্য নয়; তোমার এই মনোবৃত্তি

দাপ্তরিক বসুমতী

ভাগ্য করতে হবে। তা না হলে ভবিষ্যতে আমাকেও কঠোর হতে হবে।”

কিন্তু এতদিন অনুশীলনের ফলে এটা যার স্বভাবে মজাগত হয়ে গেছে তাঁকে সংশোধন করা এতো সহজ নয়। কেন নয় তাই বলছি, তার পরের বছরই এম-এসসি প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষায় এই স্থানীয় পরীক্ষককে নিয়ে এক অপঘাত ঘটলো। একটি ভালো ছেলে, যার প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা স্বল্পে অধ্যাপক নিশ্চিত, প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষায় তার “এক্সপেরিমেন্ট” নির্ধারিত হলে ‘কনস্টেট’ ডিভিশন স্পেকট্রোগ্রাফ দিয়ে অজানা একটি পদার্থের বর্ণালি পরীক্ষা করে তার পরিচয় নির্ণয় করা। এই পরীক্ষার বহির্পরীক্ষক (External Examiner) হিসেবে এসেছিলেন বাংলা-

দেশের বাইরের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক। তত্ত্ব-বিষয়ক (Theoretical) পরীক্ষায় ছেলোট সব প্রশ্নপত্রই (Paper) প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেয়েছে, এখন এই প্র্যাক্টিকাল পরীক্ষার ভালো নম্বর পেলেই তার এম-এসসি প্রথম শ্রেণীতে পাশ করা সূনিশ্চিত। বহির্পরীক্ষক এই অধ্যাপকের সঙ্গে এলেন ল্যাবরেটরীতে ঐ ছেলোট ‘এক্সপেরিমেন্ট’ কী রকম করছে তা দেখতে ও তাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে। ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখলেন ছেলোট ঘর্মান্তকলবের প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্পেকট্রোগ্রাফ যন্ত্রটাকে ঠিকমতো set করার জন্য, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে আলো কিছুতেই ক্যামেরার ঘষা কাঁচে এসে পড়ছে না। ছেলোটের এই দুরবস্থা দেখে বহিরাগত পরীক্ষক একটু শেলষ করেই বললেন—“এই তোমাদের ‘রিলিয়ান্ট’ ছাত্র, যে ‘কনস্টেট’ ডিভিশন স্পেকট্রোগ্রাফের ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চেষ্টার আলোর সন্ধান পেল না!!” অধ্যাপক ছেলোটের দিকে তাকিয়ে তার দুরবস্থা উপলব্ধি করে কোমল কণ্ঠে বললেন—“কী হে....., ব্যাপার কী বলতো?” ছেলোট প্রায় কেঁদে ফেললো, “স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না, মনে হয় যন্ত্রটাই খারাপ।” বলতেই বহির্পরীক্ষক ধমকে উঠলেন—“যন্ত্রের দোষ দিও না, ওটা set করতে জানো না বলেই আলো আসছে না, যন্ত্রের উপর দোষারোপ করাটা আজকাল ছেলেদের স্বভাবে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।” ছেলোট অবিরাম বললো—“স্যার, এই ধরনের যন্ত্রের কাষপাশিত এতো সহজ যে না-জানার প্রশ্নই ওঠে না। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এই যন্ত্রটার ভিতরে নিশ্চিত কোথাও কিছু গোলযোগ রয়েছে।” বহির্পরীক্ষক দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, “না, যন্ত্র ঠিকই আছে।” ছেলোটের এবার খৈয়চ্যুতি ঘটলো, “বেশ তো স্যার, তবে তাই; এই

যন্ত্র দিয়ে তাহলে আপনিই আলো এনে দিন।” তিনি সহাস্যে বললেন, “দাঁড়ি, কিন্তু তাহলে এই পরীক্ষার তোমার অর্ধেক নম্বর কাটা যাবে।” ছেলোট বললো, “তাই হোক স্যার, এবার আমি পরীক্ষা দেব না।” বহির্পরীক্ষক তখন একটু স্মিতহাস্যে যন্ত্রটার কলকজা নেড়েচেড়ে দেখলেন আলো আসছে না, তিনিও ঘর্মান্তকলবের হয়ে উঠলেন। তাঁর এই অবস্থা দেখে অধ্যাপক তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—“বন্ধু হেরে গেলে, মনে হয় বাজো বন্ধ ‘কনস্টেট’ ডিভিশন প্রিজম-এর ব্যবস্থানটা কোনো রকমে পাণ্টে গিয়েছে। কিন্তু এই প্রিজমে হাত দেওয়া নিষেধ, বাজটা খুলে দেখা যাক।” দুজনে মিলে তখনই দ্রুতহাতিয়ার আনিয়ে বাজ খুলেই দেখেন যে প্রিজমটা কেউ উলটে রেখেছে। একে স্বস্থানে বসিয়ে বাজটা আবার বন্ধ করে দিতেই ক্যামেরার স্পেটে আলো এসে পড়লো। বহির্পরীক্ষক তখন ছেলোটের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, “আমি খুবই দৃষ্টিমত, আমাদের দৃষ্টিতেই তোমার এই অসুবিধা ঘটলো, তুমি এখন কাজ করে যাও, যে-সময়টা তোমার নষ্ট হয়েছে তা তোমাকে পুঁজিয়ে দেব।” দুই অধ্যাপক বন্ধু তখনই ডেকে পাঠালেন সেই অন্ত-

পরীক্ষককে—যিনি এই পরীক্ষাটি সাজিয়ে রেখেছেন। তিনি আসতেই অধ্যাপক তাঁকে বললেন, “এই ‘প্রিজম বাজটা’ খুলে প্রিজমের ব্যবস্থানটা কেন তুমি পরিবর্তন করে রেখেছ। ছেলেদের ‘প্রিজম বজ’ খোলা নিষেধ তা জেনেও তাদের এভাবে হয়রান করতে তোমার বিবেক-বোধিতে একটুও বাধলো না। আজ থেকে কোনো পরীক্ষাতেই তোমাকে যাতে পরীক্ষক নিষেধ করা না হয় তার ব্যবস্থা আমি করব। এর আগেই তোমাকে একবার সাবধান করেছি, দেখছি তুমি তা উপেক্ষা করেছ, তোমার হাতে ছেলেদের শিক্ষার ভার দেওয়া দেখছি বিপজ্জনক।”

গুরুদেবও ছেলেমেয়েদের স্ববন্দে কোনো অভিযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন না, তবে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়তনের শৃংখলা ভগ্ন করার প্রশ্নে তিনি খুব কঠিন ব্যবস্থাই গ্রহণ করতেন। একবার মহাত্মা গান্ধী আশ্রমে এসে কয়েকদিন থেকে বান, সেই সময় অধ্যাপক-মণ্ডলীর সঙ্গে তিনি মিলিত হলেন উত্তরায়ণে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কিছু আলোচনা-আলোচনা করবেন বলে। গুরুদেবও সেখানে উপস্থিত। প্রথমেই মহাত্মাজী জানতে চাইলেন শিক্ষকতার

প্রকাশিত হল

উ দ্বা স্ত

সাহিত্য বাণ্যোপাধ্যায়

(আই. সি. এস. অবসরপ্রাপ্ত)

পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্ভাস্তুরা আজও এদেশে কাতারে কাতারে আসছে। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির প্রথম বছরগুলিতেও আগত উদ্ভাস্তুর প্রবাহে পশ্চিমবঙ্গের জীবনে এক তীব্র সংকটের উদ্ভব হয়েছিল। এই মানদুষ্ট পিতৃপুরুষের ভিটে ছেড়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের সরকার তাদের সমস্যা কিভাবে সমাধানের চেষ্টা করেছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা কি ছিল, সমস্যার ব্যাপকতা ছিল কতটা, উদ্ভাস্তুরা নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধানের জন্যে কি-পথ নিয়োজিত, উদ্ভাস্তুর নেতারা বা কি চেয়েছিলেন, কেনই-বা ২২-২৩ বছর পরেও উদ্ভাস্তুর সমস্যার স্বেচ্ছা সমাধান হল না—এ সব কথা সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক উদ্ভাস্তুর পুনর্বাসন বিভাগের ম্যুনিচিভ ও মহাধ্যক্ষ ছিলেন বহুদিন—এ সমস্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় প্রত্যক্ষ। উদ্ভাস্তুর সমস্যা সমাধানের ইতিহাস আজও রচিত হয় নি—বহুলাংশে অভাব মেটাবে এই বই। প্রতিটি সচেতন পাঠকের পক্ষে অপরিহার্য বই। [দশ টাকা মাত্র]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা-৯ (৩৫-৭৬৬৯)

লাগাতিক বসুদত্তী

কাজে কার কী ধরনের অসুবিধা ও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একজন তরুণ অধ্যাপক বললেন, “আজকাল ছেলেমেয়েরা খুব অমনোযোগী, লেখাপড়ায় মন নেই, দৃষ্টিমি করে বেড়ায়, আর ক্লাশে গন্ডগোল করে।” গম্ভীরজী তাঁকে বললেন, “ক্ষেত্র-নির্বাচনে আপনার ভুল হয়েছে। ছেলেরা অমনোযোগী, পড়াশুনো করে না, গোলমাল করে বলে যে-শিক্ষক অভিযোগ করেন তিনি যতশীঘ্র সম্ভব শিক্ষাক্ষেত্র থেকে বিদায় নেন ততই তাঁর পক্ষে মঙ্গল, শিক্ষার্থীদের পক্ষে তো বটেই।” এর পর তিনি এক নতুন শিক্ষাপরিকল্পনার কথা বিশদভাবে আলোচনা করলেন, পরবর্তীকালে এই পরিকল্পনাই ‘বেসিক এডুকেশন’ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়লো—একবার ‘কর্মসিচিব রথীন্দ্রনাথ, শ্রীভবনের প্রণেত্রী ও নেপালচন্দ্র রায় মহাশয় মিলে শ্রীভবনের মেয়েদের উপর প্রযোজ্য হবে এমন কতকগুলি কঠোর নিয়ম রচনা করে গুরুদেবের সামনে উপস্থাপিত করলেন তাঁর অনুমোদনের জন্য। গুরুদেব অধ্যক্ষদের সব ডেকে পাঠিয়ে ঐ নিয়মাবলী তাঁদের পড়ে শুনালেন। তারপর বললেন, “কর্মসিচিব, প্রণেত্রী ও নেপালবাবু, এই ত্রিশটি মিলে এই নিয়মাবলী রচনা করেছেন, আপনাদের অভিমত জানতে চাই।” গুরুদেব রথীন্দ্রনাথকে ‘রথি’ বলেই ডাকতেন, কিন্তু প্রশাসনিক কোনো ব্যাপারে ক্ষুণ্ণ হলে ‘কর্মসিচিব’ বলেই সম্বোধন করতেন। সবাই নির্বাক, গুরুদেব তখন বলতে শুরুর করলেন, “শুদ্ধ সরল অন্তঃকরণে আমদের মধ্য দিয়ে ছেলেমেয়েরা মেলায়েশ্য করে, সেটাই হলো তাদের সদ্ধ জীবনযাত্রার লক্ষণ। প্রতিপদে সন্দেহ করে এই নিয়মাবলীর কদর নাগপাশে তাদের বেঁধে দিলে শান্তিনিকেতনের উদার উন্মুক্ত আকাশ সন্দেহের বিষবাপে কলুষিত হয়ে উঠবে। এই শান্তিনিকেতনে আমি গড়তে চাই নি, চাইও না। অন্তঃকরণের শূন্যতাই যেখানে নষ্ট হয়েছে বলে আশংকা সেখানে শূন্য কতকগুলি শুদ্ধ কঠোর নিয়ম প্রতিনিয়ত বাধ্যনিয়মের গম্ভীর টেনে দিয়ে তাকে রক্ষা করতে পারে না। বসুদেবের নাজিয়ের কাছে আমরা ভুচ্ছ—‘আনন্দ’ যখন মঠে ভিক্ষুপীদের গৃহণ করেছিলেন তখন এ দুঃ-বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল; যে-কঠোর ও অবশ্যপালনীয় নিয়মাবলী তিনি বেঁধে দিয়েছেন তাদের অতিক্রম করে কোনো বিপদ বা অপঘাতের আশংকা নেই। বোধধর্ম একদিন মুক্তির পথ ছিল অত্যন্ত দুর্গম, সংঘম ও ভাগ্যের কঠোরতা ছিল অপরিহার্য। ঐ ধর্ম করণাকে আদর করেছে কিন্তু ভক্তিকে স্বীকার করে নি। সেই ভক্তিই একদিন এসে তার অবমাননার প্রতিশোধ নিয়েছে, সাধনার সমস্ত কঠোরতা সে অপহরণ করেছে। কিন্তু, যেখানে

অন্তরের শূন্যতার প্রশ্ন, হৃদয়বেগের ও নিষ্ঠার প্রশ্ন, অনুরাগ ও আকর্ষণের মূল্যের প্রশ্ন, যেখানে মানবপ্রকৃতির অন্তঃনিহিত সত্ত্বের অরজ্য করার প্রশ্ন সেখানেই জ্ঞানকে হতমার করলে ভক্তিকে অপমান করলে ব্যর্থ হয়। অন্তঃশাসনের লৌহী কঠিন অবলম্বন তখন তাদের অনিবার্য পতনের পথ রোধ করতে পারে না। এই ধরনের শূন্য অনুশাসনের বদলি আমি কখনও অনুমোদন করতে পারি না।”

কে কী ধরনের কাজের যোগ্য, তা নিয়ে একদিন গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন কয়েকজন। গুরুদেব বললেন, “এই ধরা যাক, ‘অমর’ তাঁর ঐ বিশাল বহুলকার্য নৃত্যের ছন্দের পরিপন্থী বপু-খ্যনি নিয়ে নৃত্যের অনুশীলন করতে গেলে আনন্দের বদলে বিভ্রমবনাই সার হবে, তাঁর তাগড়বে ও অস্বাভাবিক ওজনের ভারে পদস্থলন হয়ে বা টেটজ ভেঙে অপয্যক্ত ঘটও বিচিত্র নয়। ‘সরেন’ (সুরেন্দ্রনাথ) কর, কল্যাণবনের সহ-অধ্যক্ষ) নেপথ্যে এই ইঙ্গিত করছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে তিনি ব্যাক্যলাপ বন্ধ করে দিয়েছেন। আর কঠোর নেই তার সংগীত চর্চার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্ববাসিত হবে, না পাবে নিজের আনন্দ, না দিতে পারবে অন্যকে আনন্দ। যার মধ্যে ছন্দ নেই, মিল নেই তার কবিতা লেখার প্রয়াসে পদে পদে ঘটবে বিভ্রমবন।” এসব আলোচনা হচ্ছে তখন একটা ব্যাপারে গুরুদেবের আদেশের জন্য সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখেই তিনি বলে উঠলেন, “এই যে কাঠখোটা বৈজ্ঞানিক, আমি ওকে যতদূর বঞ্চিত ওর মধ্যে সর নেই ছন্দ নেই রাজনীতি নেই, তাই সংগীত কবিতা ও প্রকাশ্য বহুতা এই তিনটি কাজের কোনোটিই ওকে দিয়ে হবে না। অনুশীলনের চেষ্টা করলে অপঘাত অনিবার্য।” কেউ কেউ বললেন, “আপনার কবিতা-রচনার খেলায় যোগ দিলে হয়তো ব্যক্তিগত কিছু সাফল্য আসতে পারে।” গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “অসম্ভব”। —এই খেলাটা কি জানো; কয়েকজন মিলে বাসে এই খেলা—একজন কবিতার একটি লাইন বলবেন, তাঁর পাশের লোকটি পদ-পূরণ করবেন। একবার এরকম খেলায় একজন বললেন, “কৃষ্ণপ্রেমে সবাই হাবুডুব, রাই শূন্য কলংকিনী।” আমি ছিল, স তাঁর পাশে তাঁই পদপূরণের দায়িত্ব এসে পড়লো আমার উপর। সঙ্গে সঙ্গে বললাম, “সবট কলম ধার নিয়ে যায় আমি খালি কলম কিনি।” এবার ওঁদের বললেন, “ওকে দেখলেই কেন জানি না আমার অক্ষয় চৌধুরী মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। তিনি ছিলেন জ্যোতিষদার, সহপাঠী বন্ধু, ইংরেজি সাহিত্যে এম-এ। বাংলা অনেক উল্লেখ্য গান তাঁর মনোস্থ ছিল, সে-গান

সুরে-বেসুরে যেমন করেই হোক একেবারে মরিয়া হয়ে গাইতেন। তাঁর গলায় যে সুর ছিল না একথা তিনিও জানতেন, প্রোভারা আরও বেশি জানতো। প্রোভারার আপত্তিতেও তাঁর উৎসাহে তাঁটা পড়ত না, গাইবার জেদ কিছুতেই থামত না। বিশেষ করে বেহাগ রাগিনী ছিল তাঁর খুব প্রিয়; চোখ বুজে গাইতেন, যারা শুনত তাদের মস্তকের ছািব দেখতে পেতেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজারার ব্যাপারেও কোনো বাধা তাঁর ছিল না; টোবিল, বই, বৈধ অর্ধে আওয়াজওয়ালা যাকিছু হাতের কাছে পেতেন তাকেই অজ্ঞান পটপট শব্দে ধ্বনিত করে বাঁসা-ভলার বদলি করে নিয়ে আসার সরগরম করে ভুলতেন। ভাবে ভোর মানদ্য, আনন্দ উপভোগ করার শক্তি ছিল খুবই উদার।” আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি হে, তোমার গল্পগল্পা সম্বন্ধে যা-বিশেষণ করলাম—ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে তো!” বললাম—কখনও কখনও গানের দৃষ্টি একটি কালিতে চান দিলে সঙ্গে সঙ্গে জোরালো প্রতিবাদ ওঠে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ মহল থেকে; সব গানই ‘একসুরে’ গাইতে আমি নাকি অপ্রতিবন্ধী, সেই গান শুনলে প্রোভারার মাথায় খুন চেপে যাওয়া অসম্ভব নয়। শ্রীভবনদ্বারীরা বলেন, আত্মা কঠোর-নিঃসৃত বেসুরে মানদ্য ক্ষিপ্ত হলে আমার নাকি অব্যাহতি নেই, অপঘাত অনিবার্য। গুরুদেব বললেন—“সত্যিই গান বিকৃত করে গাইলে বা গানের তাল কেটে দিলে রাগও হয়, দুঃখও হয়। সৌন্দর্য দেখলে তো সিংহ-সদনে মাইহারের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তাঁর ছেলে আলী আকবর তাল কেটেছিল বলে প্রকাশ্য আসরে কীভাবে তাকে শাস্তি দিলেন। ঠোঁট গুণীর জাত, সংগীতের নিখুঁত গতিপথ থেকে বিচ্যুতি বা এতটুকু স্থলন সহ্য করতে পারেন না। ধীরে যখন ছোট্টা ছিল একদিন অত্যন্ত নির্বিষ্ট মনে গান গেয়ে চলেছে, ওত তমস্র যে আমার আসাটা টেরই পায় নি। আমি পিছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরলাম, ও ভাবলো কোনো সতীর্থের কাজ, বললো, ‘ছেড়ে দে বলছি’। চোখ ছেড়ে দিতেই আমাকে দেখতে পোয় খুব লজ্জা পেল। বললাম, ‘গানই যদি গাইবি তবে বেসুরো কেন, আর সুর ঠিক করে দিচ্ছি।’ বেসুরো গান উনি একেবারেই সঠিক পারতেন না। মনে ভাজে একবার বলা মহলানবীশ মশায় কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে গুরুদেবের অনুমোদনের জন্য এলেন। সুর ঠিক হয় নি বলে গুরুদেব সবকিছু রেকর্ডই বাতিল করে দিলেন, বলাবাবু ও গ্রামোফোন কোম্পানির তো অবস্থা শোচনীয়। সুর ঠিক করে আবার রেকর্ড করতে হলো সেবার।

[কলম]



[পূর্বে-প্রকাশিতের পর]

৯ অষ্টম অধ্যায়

পাইপ লাইন, "গুনবর্গিন" এবং বাঁড়

নিভিন্ন জায়গায় বেড়াতে ও নতুন নতুন দৃশ্য দেখতে আমার খুব ভাল লাগে, কাজেই লডওয়ার থেকে কিটালে যাওয়ার পথে বিস্তীর্ণ বালুভূমি, মাঝে মাঝে ছড়িয়ে থাকা বাবলা কাটার খোপ এবং জমির ওপর হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কালো পাথরের চিবিগুঁড়ি দেখে আমার মন খুঁশি হয়ে উঠেছিল। "রয়েল" নামে এক পাহাড়ের শ্রেণীকে পার করতে রাস্তা তার গা বেয়ে একে-বেঁকে ওপরে উঠে গেছে, সেখান থেকে নিচের বিকে তাকালে বৃক কেঁপে ওঠে। এই বিপদসঙ্কুল রাস্তা নিরাপদে পার না হওয়া অবধি কেউই কোন কথা বলে নি। সেদিন রাতে আমরা কিটালের বন্দিশালায় ঘুমাই এবং পরের দিন সকালে টেনে চেপে নাইরোবি থেকে আঠারো মাইল দূরে "আর্থি-রিভার" বন্দিশিবির অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করি। মোট দুইশত সত্তর মাইল পথ টেনে যেতে আমাদের লেগে-ছিল দু'দিন এবং আমার প্রথমবার গ্রেফতার হবার ঠিক চার বছর পর ১৯৫৭ সালের ২৮শে অক্টোবর আমরা মন্তব্যস্থলে পৌঁছাই।

আর্থিবিভারে অনেকদিন পরে আবার আমাদের কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এর মধ্যে ছিল লডওয়ার ক্যাম্পের বাকস্টেন ও ম্যানস্‌ফিল্ড, যাকে আমরা "টিনের মগ" নাম দিয়েছিলাম। বাকস্টেন লডওয়ারে আমাদের সঙ্গে মোটামুটি বেশ ভালই ব্যবহার করেছিল। কিন্তু ম্যানস্‌ফিল্ডের সঙ্গে আমাদের যে মোকাবিলা হয়েছিল কিছুদিন আগে তা সে এখনও পর্যন্ত ভুলতে পারে নি। আর্থিবিভার ক্যাম্পকে ছয় ভাগে ভাগ

করা হয়েছিল এবং প্রত্যেক ভাগে তিন-শত বন্দির থাকবার বন্দোবস্ত ছিল, কিন্তু আমরা যখন পৌঁছেছিলাম সেখানে তখন এক-একটি ভাগে মোটে ১৫০ থেকে ২০০ জন করেই থাকত। লডওয়ার থেকে আগত আমাদের ষাট জনকে ছয় ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগেই ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাকে ষষ্ঠ বিভাগে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে মানিয়ানির কয়েকজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুঁশি হয়েছিলাম। রবিনসন মোয়ানগি, গাদ্‌ কামাউ, জোসেফ কিবিরা এবং ডেভিড

ওলু অচ ওকেলো ইত্যাদি বন্ধুরা অবশ্য লডওয়ারেই রয়ে গিয়েছিল এবং ওদের সঙ্গে আবার আমার দেখা হয় ১৯৬০ সালে ছাড়া পাবার পর।

কেনিয়ার 'সম্ভট অবস্থা' জারি হবার সময় আর্থিবিভার বন্দিশিবির সম্পূর্ণ তৈরি হয় নি, কিন্তু এখানকার নির্মাণকার্য শেষ হবার আগে আগেই মাসাই অঞ্চলের কাজিয়াভো শিবির থেকে অন্তরীণদের এখানে চালান করেন সরকার। এই সমস্ত লোককে রাজ-প্রধানের আদেশানুযায়ী 'আটক' করা হয়েছিল এবং এর সরকারী নাম ছিল "জক্‌ স্কট অপারেশান"। এই দলের ভেতর অনেক উচ্চশিক্ষিত লোকও ছিল। প্রথমদিকে প্রত্যেকটি লোককে আটক করার জন্য রাজ্যপ্রধানের নিজস্ব স্বাক্ষর ও সম্মতির প্রয়োজন হত, কিন্তু সম্ভট বন্দির সঙ্গে আগেই ধর-পাকড়ের বহরও বাড়তে থাকে এবং স্বাক্ষর করার ক্ষমতা রাজ্যপ্রধান থেকে নেমে প্রথমে প্রাদেশিক ও পরে জেলা মহাধ্যক্ষের হাতে বর্তায়। আমাদের ভেতর বেশির ভাগ অন্তরীণকেই এই-ভাবে অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ কর্ম-চারীদের হুকুমে ও খেয়াল-খুঁশিতে বন্দিজীবন যাপন করতে হয়েছিল। সরকারী প্রচারে বলা হয়েছিল যে, সম্ভট বন্দি পাওয়ার ফলে রাজ্য-প্রধানের পক্ষে আর প্রত্যেকটি 'পরিঃস্থিতি'



জোমো কৌন্যাট

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

বিচার করা সম্ভবপর ছিল না, তাছাড়া এক ও জেলা মহাধক্ষকের এ বিষয় আরও বেশি ওরাকবহাল হবার সুযোগ-সুবিধাও ছিল। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য 'পরিস্থিতিগুলি তৈরি হচ্ছিল আরও নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ইচ্ছানুযায়ী এবং মহাধক্ষকরাও বেপরোয়াভাবে হুকুমনামার সই করে যাচ্ছিলেন আফ্রিকানদের "শংসেস্তা" করার জন্য : কারণ রাজ্যপ্রধানের চেয়েও জেলা মহাধক্ষকের সই পাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

কেনিয়া সরকার যখন এই সব অন্তরীণের পুনর্বাসনের কথা ভাবতে আরম্ভ করেন, তখন গোড়ার দিকেই আর্থিকভার ক্যাম্পটিকে তুলে দেন মর্যাদা রিআরমামেন্ট (M.R.A.) সংস্থার হাতে। জোসেফ কিরিয়া এই সময় আর্থিকভার বন্দির্শাবিরে ছিল; সে আমাকে বলে যে, প্রথমে দিকে এদের বন্দোবস্ত ছিল খুবই ভাল, জীবনযাত্রাও যথেষ্ট পরিমাণে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখা দিল "স্বীকারোক্তি" ভুল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য মারধোরের দিক দিয়েই যায় নি। তাঁদের কর্মপন্থা ছিল আরও জটিল। প্রথমত খাবারের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয় : ফলে যারা অপেক্ষাকৃত কমজোর তারা সহজেই আত্মসমর্পণ করে। তার পর আসে একদল বেশ্যা, যারা অন্তরীণদের সামনে জামা-কাপড় খুলে বা অনাবৃত পায়ের খেলা দেখিয়ে ও হাসি-ঠাট্টার ভেতরেই অনেককে বন্ধিয়ে দেয় যে, "স্বীকারোক্তি" না করে তারা নিজেদের জীবনকে কত মধুরস থেকে বঞ্চিত করছে। অন্তরীণদের কেউই বেশ্যাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারে নি, শুধু তাদের লীলাখেলা দেখেই নিজেদের অন্তরে ঝড়ের বেগ অনুভব করেছিল এবং তা মেটেতে কয়েকজন 'স্বীকারোক্তি'র জন্যও বন্দপরিকর হয়ে উঠেছিল। অবশ্য আমাদের ভেতর যারা খাঁটি জাতীয়তাবাদী আদর্শে দীক্ষিত ছিল তারা কেউই এই ফাঁদে পা দেয় নি। আমরা প্রায়ই বলতাম যে, দেশ-মাতৃকার ভালবাসার চেয়ে মোহিনী নারীর রূপজ ভালবাসা কখনই বড় হতে পারে না : যারা এই মহান দেশ-প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তাদের সামান্য বেশ্যা মজাবে কি করে? এই সব উপায় অবলম্বন করেও যখন কেনিয়া সরকার বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারে নি তখন চরমপন্থীদের বেছে বেছে তারা পাচার করেন মা'ন্ডা নামক এক অস্বাস্থ্যকর স্থানে এবং ভয়াবহ

ম্যাকিলন রোডের বন্দির্শাবিরে। আর আর্থিকভারের কাষভার আবার সরকার নিজের হাতে তুলে নেন। মা'ন্ডা স্থানীয় কন্ট্রোল জীবন সহ্য করতে না পেরে আরও কয়েকজন বন্দি স্বীকারোক্তি করে এবং তাদের সরকার ফেরৎ পাঠান আবার আর্থিকভারে "বাছাইকার" হিসাবে। কেনিয়া সরকারও বৃদ্ধিতে পেরেছিলেন যে, মা'ন্ডা স্থানীয় স্বীকারোক্তি করা অন্তরীণরা নেহাৎ দায়ে পড়ে সরকার পক্ষে যোগদান করেছে, তাই তাদের বলা হয় "তোমরা এবার আর্থিকভারে ফিরে যাও এবং সেখানে তোমাদের সাধু উদ্দেশ্যের প্রমাণ দাও সেখানকার অন্তরীণদের স্বীকারোক্তি যোগাড় করে। যে যতো বেশি স্বীকারোক্তি যোগাড় করতে পারবে তার পুনর্বাসন ততই তড়াতাড়ি হবে। যারা অন্যদের নিজের দলে টানতে সরকারী হিসেবে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিতে পারে নি, তাদের আবার ফেরৎ পাঠান হয় কেনিয়ার পূর্ব উপকূলে সমুদ্রের তীরে জমিজমা চাষাবাস করার জন্য। সেখানে তারা থাকবার বাড়িও পায় এবং ধীরে ধীরে প্রায় সবাই ঘরে ফিরে আসে।

১৯৫৭ সালে রচেস্টার নামক একজন ইউরোপীয়ান সৈনিক সেনা-বিভাগ থেকে অবসরগ্রহণ করার পর বন্দিদের পুনর্বাসন কাজের দায়িত্ব নিয়োজিতেন আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী। কেনিয়া সরকার এই কথাটাই মেনে নিয়োজিতেন কালে সবাই স্বীকারোক্তি দেবে, কেউ আগে আর কেউ পরে। কাজেই যারা এ বিষয়ে যথেষ্ট তৎপরতা দেখাচ্ছিল না তারা শুধুমাত্র সরকারী পয়সা ধুস করছিল। 'স্বীকারোক্তি' 'আদায়' করার জন্য দৈহিক বলপ্রয়োগের প্রয়োজনীয়তাও সরকার মেনে নিয়োজিতেন, যদিও বুদ্ধিমানের মত কাগজে-কলমে এ বিষয় কিছু লেখা হয় নি। আর্থিকভারে পেঁছাবার পরদিনই জন্ম গিয়াথিও আমাকে ডেকে পাঠায় তার দপ্তরে। সেখানে সে সোজাসুজি আমাদের জানায় যে, যদি আমরা এখানেও চরমপন্থা অবলম্বন করি তাহলে শুধু শুধু নিজেদের কণ্ঠই বাড়াবো, কিন্তু সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলে যথাসম্ভব তড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হবে আমাদের। পুনর্বাসনের কাজকে সরকার একটি পাইপ-লাইনের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন এবং বাকস্টন বলে যে, এই পাইপের ভেতর দিয়ে বেয়ে যেতে হলে আমাদের নরম হতে হবে, আর তা না হলে শুধু শুধু আমাদের

হাড়-গোড়েই চোট লাগবে বেশি। পাইপের ভেতর দিয়ে যে আমাদের যেতেই হবে এ বিষয় বাকস্টনের কোন সন্দেহই ছিল না এবং আমরা অপরাধার দিয়ে না বেরোলে বাকি সব লোকদের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে, কাজেই যেভাবেই হোক না কেন টেনে বারও করা হবে আমাদের। এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেবার পর বাকস্টন জিজ্ঞাসা করল, "কি বল, রাজী তোমরা সহযোগিতা করতে?" আমরা উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ।" এর পর বাকস্টন জনকে পাঠায় তার দপ্তরে বসে বন্দিদের জনমজুরী খাটার পারিশ্রমিকের হিসাব-নিকাশ দেখতে এবং আমার ওপর যুবক দলকে ফুটবল খেলা শেখাবার ও ব্যায়ামচর্চা করাবার ভার পড়ে। এই রকম কাজ করতে আমাদের কোন আপত্তি হয় নি, কারণ লন্ডনগারে তাঁর আমাদের নিয়মে ছিল যে, ন্যায়সঙ্গত কোন নির্দেশই আমরা অমান্য করবো না।

দুর্দিন পরে রচেস্টার আমাকে ডেকে ক্যাম্পের "অতিরিক্ত" নামক সংবাদপত্রের ভার নিতে বলেন। এর সম্পাদক তখন ছিল বেঞ্জামিন নামে এক বন্দি, সে ছাড়া পাবার পর তার নিজের সংবাদপত্র ও ছাপাখানার ব্যবসায় ফিরে যায় আবার। আমার প্রথম কাজ ছিল অতিরিক্তকে কিছু থেকে ইংরাজীতে তর্জমা করা। এ ভার নেবার আগে আমি রচেস্টারকে পরিশ্কার বন্ধিয়ে দিই যে, শুধুমাত্র তার নির্দেশেই আমি এ কাজ করছি, স্ব-ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে আমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বলেই। আমি আরও বলি যে, কোন রকম অদলবদল আমি করব না কিছুতেই—এমন কি যদি পাঁচ আর পাঁচ-এ দশের জায়গায় থাকে কুড়ি, কিছুমাত্র তাহলে আমিও ঠিক তাই লিখব। রচেস্টার আমার কথা মেনে নেন। এই কাজে আমাকে সাহায্য করে লিনাস্ মর্গি, জাকারিয়া কিনজা কিবাচিয়া এবং ম্যালদ কিমানি নামক তিনজন বন্দি।

বেঞ্জামিন খুব চালাক ও চটপটে লোক ছিল এবং কিছুমাত্র ভাবায় খুব হৃদয়গ্রাহী করে লিখতে পারতো। সে সরকার পক্ষে কাজ করছিল আর্থিকভারে, কিন্তু তার কর্মপন্থা ছিল অতি সূক্ষ্ম। আর সে কোনদিন কাউকে মারধোরও করে নি বরং প্রত্যেক অন্তরীণ ও বন্দির সঙ্গে সে খুব ভাল ব্যবহার করত। "স্বীকারোক্তি"র ওপর সে কিছুমাত্র ভাষায় একটি চটি বই লিখেছিল, যার একটি করে কপি আমরা প্রত্যেকে পেয়েছিলাম আর্থিকভারে

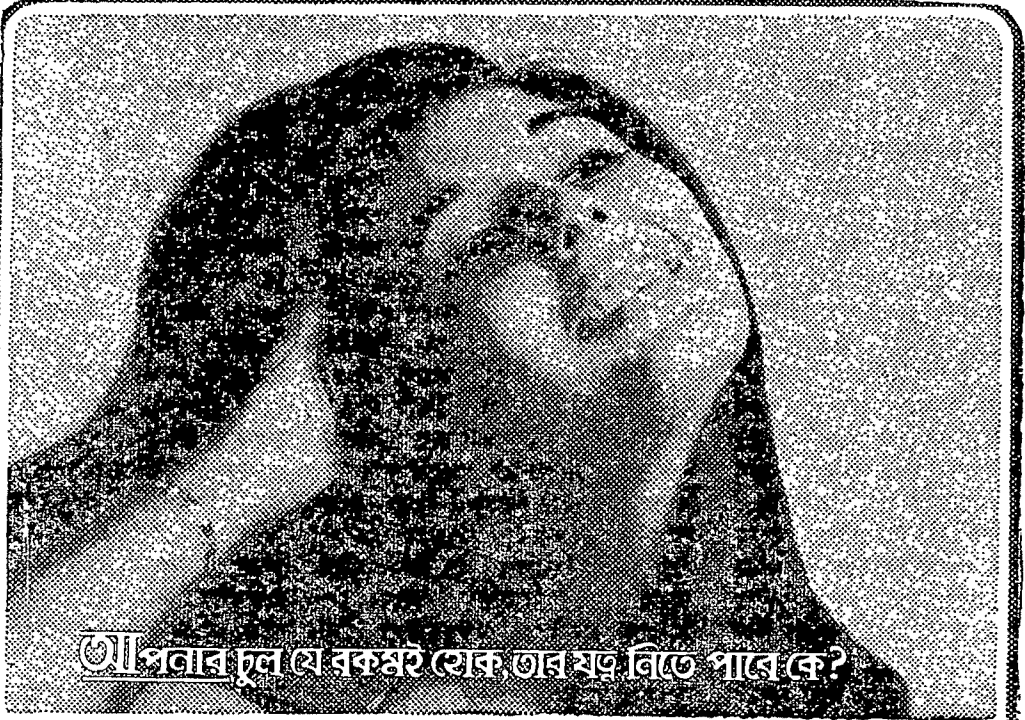
দাণ্ডাহিক বসুধাতী

আমার পরই। এ ছাড়া সে ফয়েকটি ছোট ছোট একাঙ্গ নাটিকাও তৈরি করেছিল এবং তার প্রত্যেকটিতে যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছে তারা অন্যদের (অর্থাৎ যারা দেয় নি) থেকে ভাল অবস্থায় আছে বা জীবনে বেশি উন্নতি করতে পেরেছে সেই ভাবই ফুটিয়ে তুলেছিল। ক্যাম্পের প্রহরীরা

এবং আমাদের ভেতর নরমপৃথ্বীরা সবাই এই লেখাগুলি খুবই পছন্দ করত। আমরা এগুলিকে "ওয়ামারের নাটক" বলে উপেক্ষা করতাম অর্থাৎ গভর্নমেন্ট বাক্যসমষ্টি।

অল্প কয়েকদিনের ভেতরই রচেষ্টার ও বাকস্টন নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠে যে, আমি স্ব-ইচ্ছায় স্বীকারোক্তি

দেব না; তা ছাড়া তারা আরও বুঝে-ছিল যে, আমি ক্যাম্পের ভেতর আরও অনেক অন্তরীণকে এ বিষয় একমত করতে সক্ষম হয়েছি যা নাকি তাদের কাছে আরও ভয়াবহ। কাজেই তারা আমার ওপর তাদের শেষ অস্ত্র ব্যবহার করতে মনস্থ করে যা হচ্ছে জোর-জুলুম। একদিন তারা আমাকে ডেকে



আপনার চুল যে বকসই থেকে তার যত্ন নিতে পারেন?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যে রকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্যে- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার স্বরস্বরে, যেখান মত উদ্ভাস, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্যে- এতে আছে অ্যালানটয়েন যা আপনার চুলে পুষ্টি যোগায়, কিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, চুলে এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

স্বাভাবিক চুলের জন্যে- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় হৃদয় পরিপাটি থাকে, প্রতিটি চুলে থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী



লিনটাস-SS. 11-140 BQ

হিন্দুস্থান লিটারের একটি উৎকৃষ্ট উৎসাহ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

বলে যে, আমার স্বীকারোক্তি তারা চায়। আমি সোজাসুজি তাতে অস্বীকৃত হই এবং এও বলি যে, তারা শব্দ এমন লোকদের কাছেই স্বীকারোক্তি পাবে যারা যে কোনভাবেই হোক না কেন পুনর্বাসনের জন্য ব্যস্ত। আর জোর করে স্বীকারোক্তি আদায় করলে তার কোন ফলই হবে না। সপ্তে সপ্তে রচেস্টারের একটি সবল ঘৃসি আমার মূখের ওপর এসে পড়ে এবং আমি কিছুক্ষণের জন্য চোখে অন্ধকার দেখি।

ধীরে ধীরে আমার জ্ঞান ফিরে এলে আমি আবার উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হই। তখন আমাকে ঐ দপ্তর থেকে ভাড়ারের কাছে আর একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে আমার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবার জন্য আরও তিনজনের ডাক পড়ে। তারা ছিল নেয়েরী অণ্ডল থেকে আগত জো নাহ ও ইলাইজ নামে দু'জন কর্মচারী এবং কিসাম্বু অণ্ডল থেকে আগত একজন কেরানী। এ ছাড়া সেখানে আরও চারজন ইউরোপীয়ান কর্মচারীর সপ্তে ছিল রচেস্টার, বাকস্টন এবং দু'জন প্রহরী। তারা আমাকে জানায় যে, স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দেবার এই আমার শেষ সুযোগ। আমি আগেকার মতই তা দিতে অস্বীকার করলে তাদের দৈহিক অত্যাচার আরম্ভ হয় আমার ওপর মাপজোখ করে। শব্দ ইউরোপীয়ানরাই এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে আর আফ্রিকানরা ছিল দর্শক মাত্র। পরে আমি জানতে পারি যে, ইউরোপীয়ানদের মতে শব্দ তারাই ঠিকমত শাস্যেস্তা করতে পারতো আমাকে মারধোরের দ্বারা, কারণ আফ্রিকানরা হয়তো নিজেদের সামলাতে না পেরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শক্তি ব্যবহার করে ফেলতো যার ফলে আমার প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। নিকটস্থ অনেক বন্দীই তাদের কাজের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছিল আমার ওপর অত্যাচারের বহর। বেশ কয়েক ঘা মার খাবার পর, জ্ঞান হারিয়ে এই পাশবিক যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ঠিক আগেই আমি দেখতে পাই যে, আমার লজ্জায় পূর্ণ পুরনো বন্ধু কিসাম্বু ওয়ালগুগুরে নিপলকনেনে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আর তার দুই চোখ দিয়ে বেয়ে পড়ছে সমবেদনার অশ্রু। আমার মূখ উঠেছিল ফুলে আর কয়েক জায়গা কেটে রক্তও ঝরছিল। আমার ডান পায়ের হাঁটুর ঠিক নিচেই এক অদ্ভুত ধরনের ছঁচাল অস্ত্র দিয়ে এতো জোরে ঘা দেওয়া হয়েছিল যে, সেখানকার হাড় ফেটে গিয়েছিল। আমি প্রাণ হারাই নি এইটুকুই যা রক্ষা, কিন্তু

আমার হাঁটুর ও বকের ক্ষত রয়েছে চিরজীবনের সাথী হয়ে এবং আজও এতো বছর পরে আমি মাঝে মাঝে পেটে ও গলায় ভীষণ কষ্ট পাই তাই থেকে। আমাকে অপমান করার জন্য আমার সমস্ত চুল কামিয়ে ফেলা হয় এবং তাও ঠিক করে না করার আমার মাথা থেকেও রক্ত ঝরছিল। প্রহরীরা আমার রক্তাক্ত, অধর্ম্মত, অজ্ঞান দেহ তুলে নিয়ে গিয়ে সমস্ত বন্দীকে দেখায় তাদের সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পরে শুনোছিলাম আর তাদের সবাইকে ডেকে প্রহরীরা এ কথাও বলে : এসো দেখ তোমাদের নেতার কি হাল হয়েছে গোঁয়াতুঁমি করার ফলে।" একটি ছোট অন্ধকার ঘরটি ঘরে আমাকে ফেলে রেখে দরজা বন্ধ করে চলে যায় প্রহরীরা, পুরা দু'দিন সে দরজা কেউ খোলেনি বা কোনরকম খাবার দেয়নি আমাকে। অবশ্য আমার শরীরের এবং বিশেষ করে মূখের যা অবস্থা হয়েছিল তাতে খাবার পেলেও মূখ খুলে খেতে পারতাম কি না সন্দেহ আছে। যেদিন আমার ওপর মারধোর করা হয় সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় চার নম্বর এলাকায় একজন অন্তরীণ মনঃকষ্ট সৃষ্টি করতে না পেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। তার শব্দাসঙ্গী, এম্বু, অণ্ডলের জিমি পরে আমায় বলেছিল যে, গলায় দড়ি দেবার অল্প কিছুক্ষণ আগেই সে জিমিকে বলেছিল "কারিয়াকির কি হাল করেছে সরকার তা আজ স্বচক্ষে দেখলাম, এরকম জীবন্ত নরকে আর বেঁচে থাকা যায় না—তার থেকে মরাই বোধহয় ভাল।" কারাগার থেকেই প্রদত্ত দড়ি, যা আমাদের হাফ প্যান্টকে কোমরে বেঁধে রাখবার জন্য দেওয়া হয়েছিল, তা দিয়েই বেচারার তার ইহজীবনের জ্বালা-মল্লগার অবসান করে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তার আত্মার শান্তির জন্য।

তৃতীয় দিনে কয়েকজন বন্দী আমার কাছে কিছু খাবার আনবার অনুমতি পায়। তারা আমাকে বলে যে, শিবিরের সমস্ত বন্দীই আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে খুব উদ্বেগ্ন হয়ে উঠেছে, তাদের মতে কতৃপক্ষ আমাকে এভাবে মেরে ফেলতেই চান এবং সেজন্য আমার উচিত যা হোক একটা কিছু স্বীকারোক্তি দিয়ে দেওয়া। সবাই জানবে যে, এই স্বীকারোক্তি জোর-জুলুম করে আদায় করা হয়েছে, কাজেই পরে তাকে আবার ফেরত নেওয়া চলবে। এভাবে নিজেকে এমন প্রাণে বাঁচিয়ে নিতে পারলেই আমি পরে আবার চিঠি লিখে ওপরওয়ালার কাছে

যথাযথ নালিশ করতে পারবো এখনকার নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে। তারা সবাই আরও চায় যে-কোনভাবেই হোক না কেন, আমি যেন প্রাণে বেঁচে যাই এ যাত্রা।

উপরোক্ত কথাবার্তার ফলে আমি কতৃপক্ষের কাছে একগাদা মিথ্যা স্বীকারোক্তি দিই এবং আমার নির্জন কারাবাস থেকে আবার আমাকে অন্যান্য বন্দীদের কাছে ফেরত নিয়ে আসা হয়। পরের দিনই আমি এক বিরাট লম্বা-চওড়া নালিশভরা চিঠি লিখি এবং যে কটা নাম মনে আসে তাদের প্রত্যেককে এর একটা অনুলিপি পাঠিয়ে দিই : ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশিক মহাধ্যক্ষ শ্রীমতী বারবারা ক্যাসেল (ব্রিটিশ বিধানসভার সভ্য), জন স্টোনহাউস (ব্রিটিশ বিধানসভার সভ্য), টম ম্বায়া ও আর গুইংস কোডেথ (কেনিয়ার অন্যতম রাজনৈতিক নেতাস্বয়), জেল বিভাগের মহাধ্যক্ষ এবং কেনিয়া বিচারালয়ের সর্বপ্রধান সরকারী উকিল। চিঠিগুলি আমি কাগদ্রোয়ানগো এবং নাইরোটা গিথেনগিকে দিয়ে বলি যে, কোন প্রহরীকে বশ করে সেগুলো ডাকে দেবার বন্দোবস্ত করতে। এরা দু'জন এ সময় জেলের এলাকার বাইরে কুয়া খোঁড়ার কাজে নিযুক্ত ছিল। চিঠি ডাকে দেবার জন্য আমার পয়সারও অভাব ছিল না এ সময়, কারণ লজ্জায় থাকাকালীন আমি অনেকগুলি মুকোমা (হাতে বোনা ঝড়ি বা মাদুর) তৈরি করে বেচেছিলাম এবং সব সময়ে আমার কাছে তখন প্রায় ১৪০০ শিলিং-এর মত ছিল। আমার নালিশের ফলে কয়েকদিনের ভেতরই নাইরোবি থেকে সরকারী অনুসন্ধান বিভাগের মুখপাত্র আসেন আমাদের শিবিরে। আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয় যে, চিঠির লেখক আমি কি না? আমি স্বীকার করে নিই এ কথা এবং সপ্তে সপ্তে এও বলি যে, ভবিষ্যতে আর আমি চিঠি লিখবো না। অবশ্য এ আশ্বাস দেওয়ার কোন অর্থই ছিল না আর আমার মনে, কারণ যেভাবে আমার ওপর মারধোর করা হয়েছিল তার পর সত্য কথা বলার আর কোন দায়িত্ব ছিল না বলেই মনে হচ্ছিল আমার।

আর্থারভার বান্দিশবির ছিল স্বীকারোক্তির আড্ডা যদিচ আরও কিছু কিছু কাজ হচ্ছিল সেখানে। এই শিবিরের সর্বপ্রধান কর্মসূচী ছিল বন্দীদের বাছাই করা এবং আমাদের পক্ষে সেখানে যাওয়ার মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাছাই হওয়া ইচ্ছা বা অর্নিচ্ছা যেভাবেই হোক না কেন।

১৪মশ ১

স্বামী বিবেকানন্দের বৈদান্তিক বিশ্ববাব্দ ও মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গী গোরাচাঁদ বুদ্ধ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চার ॥

অতএব বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার আছে, আবার অতীন্দ্রিয় অধ্যবসায়ও আছে। প্রাচীন ভারত বৈজ্ঞানিক এষণা এবং আধ্যাত্মিক এষণা একই জ্ঞানানুশীলনের দুইটি শাখা হিসাবে পরিগণিত হত। ভারতের মনীষীরা ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানকে এক সামগ্রিক সাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল প্রকৃত সত্য নির্ধারণের জন্য চাই যুগপৎ বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে জ্ঞানের অনুশীলন। এ কারণে দেখা যায় ভারতের প্রাচীন দর্শন ও ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে ওতঃপ্রোত জড়িয়ে। উপনিষদ, কপিলের সাখ্য-দর্শন ও পতঞ্জলির যোগদর্শন এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের খাওয়া-পারার সমস্যা মিটুক, অভাব-অনটন, নিষ্পেষণ থেকে মানুষ পরিণাম লাভ করুক, শোষণহীন সুখী সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রিপূরণের মাধ্যমে গোষ্ঠীবদ্ধ স্বার্থের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে পৃথিবীর সুখ এবং ধনসম্পদের পুনর্বিந্যাস ঘটুক—এ সব সমস্যার সমাধান হলে ভূম্বা আধ্যাত্মিক বুদ্ধবুদ্ধির অবসান ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাতে মানুষের প্রকৃত আধ্যাত্মিক এষণার অবসান ঘটবে বলে যে তত্ত্ব প্রচার করা হয় তা যদি বাস্তবে সত্য হত, তবে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে বা ইতিহাসের উত্তালনে সহজ সরল সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে যখন খাওয়া-পারার সমস্যা ছিল না বা শোষণ ছিল না তখন এই আধ্যাত্মিক এষণার উদয় হল কি করে?

ভয় এবং বিস্ময় থেকে? তা হলে ত' এই সত্যকেই স্বীকার করা হয় যে, বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা বাইরের দিক থেকে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' হলেও ভিতরের দিক থেকে তা 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' হতে পারে না। Expanding Universe-এর মত মানুষের মনের জগৎও সত্যত সম্প্রসারণশীল।

মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজ-জীবনের প্রতিটি বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা, মতামত ও বিশ্বাস, এক কথায় মানুষের চেতনা বদলে যায়—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু এও সত্য যে, মানুষের বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা ঘন ঘন বদলায় না। বদলায় যুগ-যুগান্তরে—যখন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। অথচ একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার একদিনেই মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা বা বিশ্বাসের রূপান্তর ঘটিয়ে দিতে পারে—তার উৎপাদনভিত্তিক বৈষয়িক অস্তিত্বের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও। ব্যক্তিগত বা সমাজগত জীবনে একটি তুচ্ছ বা বৃহৎ ঘটনা এক নিমেষে মানুষের প্রচলিত ধারণা, মতামত বা বিশ্বাসের ভিত্তিকে চূর্ণ করে নতুনের অভ্রাঘাত ঘটিয়েছে—বাস্তব অভিজ্ঞতায় এর সাক্ষ্য এতই প্রবল যে, এর বিরোধিতা করতে হলে সত্যকে খাটো না করে পারা যায় না।

এই তো সৈদিন একমাত্র শিশুসন্তান নিয়ে মাসিক দ' হাজার টাকার আয়ে যে অধ্যাপক দম্পতি সুখের নীড় বেঁধেছিলেন, তাঁদের মধ্যে [বিজ্ঞানে ডক্টরেটপ্রাপ্ত] অধ্যাপক স্বামী যখন সহসা অতি তুচ্ছ

কারণে আত্মহত্যা করে বসলেন—অধ্যাপিকা স্বামীর চোখেরই সামনে—তখন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থায় যদিও কোনো পরিবর্তন হয় নি, কিন্তু মহিলার আজন্মপোষিত ধারণা, মতামত ও বিশ্বাসে যে সদূদ্-প্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেল—উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে তার কোনো ব্যুৎ-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা নেই। তারপর যখন একই বা অনুরূপ বৈষয়িক অস্তিত্বের মধ্যে বাস করে একই সমাজদর্শনে বিশ্বাসী দু'দল ব্যক্তি বা দুইটি জনসমাজের মধ্যে তাত্ত্বিক বা প্রয়োগ বিধিগত মতাদর্শের দ্বন্দ্ব ঘনায়-মান হয়ে ওঠে এবং নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তখন এই ধারণাই অপরিবর্তিত হয়ে ওঠে যে, মানুষে মানুষে মনের কাঠামোতে ফারাক আছে, আর সেই ফারাক উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ওপরেই সর্বথা নির্ভরশীল নয়। এমনি অজস্র বাস্তব উদাহরণের দ্বারা দেখানো যেতে পারে যে যেসব শক্তি বা অবস্থা মানুষের মনকে প্রভাবিত বা পরিবর্তিত করে, বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থা তার মধ্যে একটি মাত্র, কিন্তু একমাত্র নয়। কথটা অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, মানুষের মনের জগৎ বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে গঠিত এবং মানুষের মনের পরিবর্তন বৈষয়িক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনকে কড়ায়-গন্ডায় মান্য করে, চলে—এ তত্ত্ব ধোপে ঢেকে না।

মানুষের মন কি দিয়ে তাঁর জ্ঞানবার উপায় নেই। জড়বাদীরা তাদের নিজস্ব যুক্তিধারাকে অনুসরণ করে কল্পনা করেছেন যে, মানুষের মন বা চেতনা বিশ্বের রূপবিকাশধারায় জড়ানো—

সামাজিক বসুমতী

এক জটিল বিকাশমাত্র, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত মানব তার দেহ-মন নিয়ে একটি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে মানবমনের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে তারা একথা স্বীকার করেছেন যে, মন যা থেকে উদ্ভূত, উদ্ভবের পর উল্টে সে তার উপরেই প্রভাব ফাটায়—স্বয়ংকারী করে। অধ্যাত্মবাদীরা প্রশ্ন করেন, এই স্বয়ংকারী করার শক্তি সে পেল কোথা থেকে? এই শক্তির উৎস কোথায়? এখানে কোনো সুস্পষ্ট উত্তর নেই। বিংশ শতাব্দীর অতি আধুনিক বিজ্ঞান কতকগুলি পুরনো বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়েব ভিত্তি এমনভাবে শিথিল করে দিয়েছে যে, মানুষের মনের জগৎ নিয়ে বিজ্ঞানজগৎও এক নতুন কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। জড়াদ্ব বা শক্তিকণিকার সমবায় গঠিত এই বিশ্বজগতের স্বরূপ যেমনটি হোক না কেন, যে জগৎ নিয়ে আমাদের কারবার, আমাদের মায়ারী মনই তাকে রচনা করে, নিজের রং-এ রঞ্জিত করে, নিজের মাধুরী মিশিয়ে আপন উপভোগের উপকরণ সাজিয়ে নেয়। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যেমন তার নিজস্ব সৃষ্টি, মান-অভিমান, অনুরাগ-বিরাগ, দুঃখ-বেদনা, আনন্দ, হাসি-কান্নার আলো-আঁধারি তেমনি তার রহস্যভরা মায়ারী চরিত্রের বৈচিত্র্য। মানব-মনের এই অলতহীন অতল রহস্য ভারতীয় মনীষী এবং সাধকবৃন্দকে এমন গভীর-ভাবে স্পর্শ করেছিল যে, তাঁরা অন্তর্জগতের অনুসন্ধানকে জ্ঞানসাধনার গুপ্ত স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা অনানিরপেক্ষ হয়ে অতন্দ্র শ্রমসাধনায় আপন মনের গভীরে ডুব দিয়ে সেখানকার বৈচিত্র্য অনুধাবন করতেন। তাঁরা অন্তর্জগতের মানা তথ্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শেষে ঘোষণা করেছেন, বহির্জগৎ জয় করা যেমন মহৎ, অন্তর্জগৎ জয় করাও তেমনি মহৎ—এমন কি মহত্তর। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—“আমি যেন এ বিজ্ঞানের বহির্বাসের প্রান্তটুকু স্পর্শ করিযাছি। কিন্তু আমি ধারণা করিতে পারি যে, এ বিজ্ঞানটি সত্য, সুবিশাল ও আশ্চর্য।”

[পৃঃ ৪১৪—৩য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

প্রসঙ্গত এখানে বলা যেতে পারে, এই অভ্যাসের জগতের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়ে ভারতীয় ঋষিরা যেসব দার্শনিক প্রত্যয় জগতে প্রচার করেছেন, তার মধ্যে একটা আদর্শিক প্রত্যয় হল মুক্তিতত্ত্ব। ভারতীয় ঋষিগণ কর্তৃক কথিত এই মুক্তিতত্ত্ব একটি সর্বাবগাহী প্রত্যয়। মুক্তি বলতে সাধারণত যা আমরা বুঝি তা হল আমাদের দুঃখ-কষ্টের নিবৃত্তি—সংসার বন্ধন থেকে অব্যাহতি। কোনো কোনো ধর্মে মুক্তি অর্থে বোঝানো হয়—“ঈশ্বরের দেওয়া পরিগ্রহ।” কিন্তু ভারতীয় ঋষিদের এই দার্শনিক প্রত্যয়টি অতটুকু সংকীর্ণ

অর্থের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ—অস্তিত্বের সমগ্র অংশ জুড়ে সকল পর্ষায়ে সকল স্তরে এর পরিব্যাপ্তি। বিশ্বজগৎ মূর্তির ছন্দে দোলায়িত—মূর্তির দ্যোতনায় চিরসমুন্নয়ন, চিরচঞ্চল। স্বামীজী বলেছিলেন—

“এই [মূর্তির] আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রতি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করে, আমাদের গতিবিধি সম্ভব করে, পরস্পরের সাহিত আমাদের সম্পর্ক নির্ধারণ করে। শূন্য তাই নয়, ইহা যেন মানবজীবনরূপ বস্তুর টানা ও পোড়েন। বুদ্ধিমত্তা জ্ঞান ইহাকে তিল তিল করিয়া নিজ ক্ষেত্র হইতে হঠায়া দিতে চায়, ইহার রাজ্য হইতে একটির এর একটি দূর্য্য অধিকার করিতে চায় এবং প্রতিটি পদক্ষেপ কার্যকারণের লৌহ পথের বন্ধনে আবদ্ধ করে। কিন্তু আমাদের এসব প্রচেষ্টায় মূর্তি হাসিয়া ওঠে। আর কি আশ্চর্য! মূর্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্যকারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনো নিজেকে এগুনের উদ্বেগ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ইহার অন্যথা কিরূপে হইতে পারে? সসীমকে যদি নিজের অর্থ পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে সর্বদাই তাহাকে অসীমের উচ্চতর ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতে তাহা করিতে হইবে।”

[পৃঃ ৩৩৭—৩৩৮—২য় খণ্ড—বাণী ও রচনা]

একটু ভেবে দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, মানুষের অন্তর্জগৎ এই মূর্তির দ্যোতনায় সর্বদাই ক্রিয়শীল। বাস্তব সত্য এই যে, মানুষের কাছে নতুন অতি শীঘ্রই পুরাতন হয়ে ওঠে। বর্তমান অবস্থা যেন বন্ধন হয়ে তাকে আবদ্ধ করতে চায়। সে বর্তমানের বন্ধন কাটিয়ে ভবিষ্যতের মুক্তিপথে অগ্রসরমান। সে অপূর্ণতার, অসন্তোষে ভরা এবং পূর্ণ সন্তোষের রাজ্য সর্বদাই তাকে দূর থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সে ছুটে চলেছে, কিন্তু যাত্রাপথের শেষ নেই। যেসব ধারণা, বিশ্বাস, যুক্তি বা আবেগ মানুষ এবং তার সমাজকে নানা কাজের মধ্যে টানছে, জগৎসত্তার অন্তরে মূর্তির এই সর্বানুসৃত নিগূঢ় দ্যোতনাই তার উৎস। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে অতি আধুনিক পদার্থ-তত্ত্বে যেন এই মুক্তিতত্ত্বের এক প্রতিধ্বনি বেজে উঠছে। কথাটি একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। বিজ্ঞানের একটি সনাতন প্রত্যয় এই যে, অঘটন কিছুই ঘটবার উপায় নেই। সৃষ্টিবান্দন পরে সবই কার্যকারণের নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা। যা ঘটছে, যা ঘটবে সবই অনতিক্রমণীয় নিয়মসূত্রে গ্রথিত। এই প্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করে

গঠিত হয়েছে বিজ্ঞানের Law of Determinism. কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে বিজ্ঞানের নব নব পরীক্ষায় যেসব তথ্য জানা গেল—যথা আলোকরশ্মি, অণু-পরমাণু এবং আদিম জড়কণিকার অবস্থাবিশেষে তরঙ্গধর্ম, অবস্থাবিশেষে কণিকধর্ম—তাতে Law of Determinism গেল শিথিল হয়ে। কিন্তু এটাও শেষ কথা নয়। এর থেকে আরও গভীরে নেমে এলেন বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ। উদ্ভার করলেন এক নতুনতর তথ্য—যার নাম হল Principle of Uncertainty or Law of Indeterminism. এতে অণু-পরমাণুর রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের একানুবর্তিতা বা Law of Uniformity of Nature যাচ্ছে বদল হয়ে। [পূর্বোক্তাধিত স্বামীজীর উক্তি—“মূর্তিকে যদিও আমরা অশেষ বিপুলভার বিধি ও কার্যকারণের নিয়মের চাপে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে চাহিয়াছিলাম, তথাপি সে এখনো নিজেকে এগুনের উদ্বেগ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে”—এখানে স্মরণীয়] আপন অবস্থায় কেউ-ই যেন স্থির হয়ে থাকতে চায় না। আপন অবস্থার আবরণ উন্মোচন করে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সর্বদাই সে নতুনের মধ্যে কাঁপিয়ে পড়তে চায়। স্থির-নিয়মের বন্ধন হতে সে মুক্তি চায়। এ যেন সেই “হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।” প্রাকৃতিক নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ গ্রহ-উপগ্রহগুলি সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে অনন্তকাল। তারা নিয়মের দাস, কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের এই আবর্তনের নিয়মের মধ্যেও রয়েছে আর একটা নিয়ম—যে নিয়মে তারা আবর্তনের নিয়মকে ফাঁকি দিয়ে সততই স্বতন্ত্র যাত্রাপথে ছিটকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য নিরন্তর সচেষ্ট।

সমাজ-ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে এই মূর্তির দ্যোতনা বিকাশ লাভ করে সমাজের পরিবর্তনে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবে। আমরা আগেই দেখেছি মাস্ত্র, হেগেল এবং স্বামী বিবেকানন্দ সকলের মতেই সামাজিক বা অর্থনৈতিক বিপ্লবের মূলে শ্রেণীবৈষম্য। এই শ্রেণীবৈষম্যের মূলে আবার দ্বন্দ্বতত্ত্ব। স্বামীজীর চিন্তা-সূত্র অনুসরণ করলে দেখা যায় হেগেলের দ্বন্দ্বতত্ত্ব মূর্তিতত্ত্বের একধাপ পরের কথা। অর্থাৎ অস্তিত্বের সঙ্গে যে অনাস্তিত্বের ভাব জেগে ওঠে, তার কারণ দ্বন্দ্বের ভিত্তিমূল মূর্তিতে প্রোথিত। পদার্থজগৎ এবং প্রাণজগৎ—সমগ্র অস্তিত্বে এই সর্বানুসৃত মূর্তির ভাব থেকে গঠিত, এর থেকেই দ্বন্দ্ব, এর ফলে বৈষম্য, এর ফলেই পরিবর্তন, বিপ্লব ও বিকাশ। এর ফলে মানুষের বক্ষে এক চিরন্তন রুদ্ধন চলেছে যুগ যুগ

ফেস্ট নে

রুমেন্দ্র সরকার

বাদামী রঙের চিন্তাগুলো এখন আর আসছে না।
প্রেম, আমাকে ক্ষমা করো।
পূরনো জুই ফুলের গল্প খাবার পাতে মনে হলে
আকবর শা সামনে এসে দাঁড়ায়, দু'হাত জোড়ে
বলে—
এক টুকরো রুটি দাও।

পিসি তো মরে গেছে কবেই
তার শাড়ির স্মৃতি এখনকার কাঁথাগুলো বহন করে।
জ্বলতে জ্বলতে জোনাকিরও তেল ফুরিয়েছে রাজা।
সানডায়ালটা এখনো বিনা দমেই চলে।

চাগামী মঙ্গলবার অন্ধের দগলে তুমি আসবে
আলতো পায়ে লাল সূর্যকি বিছানো পথ দিবে।
তোমাকে ফুলের অভ্যর্থনা জানাবার কেউ নেই বে।
মাই ফেয়ার লেডির ফুলওয়ালি
কচুর শাক ফোর করে বাড়ি রান্ধে এখন।
তাই তোমার বন্দ্য নয়নে দুটি গাঁথবার জন্যে
ইতিহাসের কালা আর সব ফুলের বসন্ত
এঁকে রেখেছি এ ফেস্টনে।

ধরে। অতীপ্তর অপূর্ণতাই এই ক্রন্দন।
স্বামীজী বলেছিলেন—

“আমরা দারিদ্র্য দ্বারা প্রবণিত হই,
তাই ধন অর্জন করি। আবার ধনের দ্বারা
প্রবণিত হই। আমরা হয়ত মূর্খ, তাই
বিদ্যা অর্জন করিয়া পণ্ডিত হই। মানুষ
কখনো সম্পূর্ণ পরিপুষ্ট হয় না। তাহাই
দুঃখের কারণ, আবার তাহাই আশীর্বাদের
মূল। ইহাই জগতের প্রকৃত লক্ষণ। তুমি
কিরূপে এই জগতের মধ্যে তৃপ্ত পাইবে?
যদি আগামীকাল এই পৃথিবী স্বর্গে
পরিণত হয়, তখনো আমরা বলিব ইহা
সরাইয়া লও,—অপর কিছু দাও। এই
অসীম মানবাত্মা স্বয়ং অসীমকে না
পাইলে কখনো তৃপ্ত হইতে পারে না।”

[পৃঃ ২৫৯—২৬০, ৩য় খণ্ড—বাণী
ও রচনা]

মানুষের সুখ এবং পরিতৃপ্তির জন্য
কি কি প্রয়োজন, তা নির্ধারণ করে তার
নিজের মন—যার তৃপ্তি ক্ষণিক মাত্র। বাস্তব
সত্য এই যে, তৃপ্তির পিছনে অতৃপ্তি
সর্বদাই ওং পেতে বসে রয়েছে। সে
অচিরেই তৃপ্তিকে পিছনে ঠেলে দিবে নিজে
এগিয়ে আসে তার সন্তোষ বিধানের দাবি
নিয়ে। দাবি পূর্ণ হয়। আসে নতুন
অতৃপ্তি। তাই প্রয়োজনের কোনো শেষ
নেই। পৃথিবীর বকে লভ্য ভোগসুখের
সকল প্রয়োজনীয় উপকরণ লাভ করার
পর সে অন্য গ্রহ-উপগ্রহে লভ্য ভোগ-
সুখের জন্য কাতর হয়ে উঠবে—এই হল
মুক্তিকামী মানবমনের বাস্তব প্রকৃতি।

মানুষের সমাজ-বিন্যাসে একদিন
আমূল পরিবর্তন ঘটবেই। সেদিন
উৎপাদনশক্তি ও পদ্ধতি সর্বসাধারণের
যৌথ সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে সমাজ-
জীবনে জীবিকার উপায় ও উপকরণ নতুন-
ভাবে বিন্যস্ত হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই

আশা করা যায়, এই পৃথিবীর ভোগ-
সুখের জন্য সকল মানুষের সমষ্টিগত
প্রয়োজন মেটাবার কোনো উপকরণের
অভাব সেদিন থাকবে না। কিন্তু সেদিন
পরিপুষ্ট প্রয়োজন কি অতৃপ্ত প্রয়োজনের
জন্ম দেবে না? অগ্রসরমান ইতিহাসের
নির্দেশ এবং মানুষের বাস্তব চরিত্রকে
স্বীকার করে নিলে একথা মানতে হবে যে,
নিশ্চয়ই দেবে। অতএব সংগতভাবেই
একথা বলা চলে যে, দূর বা অদূর-
ভবিষ্যতে অগ্রগামী মানবসমাজের বৈশ্বিক
পরিবর্তনের ফলে উন্নত সুপরিণত শ্রেণী-
হীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেও মানুষকে
“সাধ্যমত কাজ করার পরিবর্তে প্রয়োজন-
মত উপকরণ” দেওয়া সম্ভব হবে না,
যদি না মানুষ পূর্বশর্ত হিসাবে পরিপুষ্ট
হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে।

এখন প্রশ্ন ওঠে, মানুষের পরিপুষ্ট
হওয়ার যোগ্যতা অর্জনের প্রচেষ্টা কেমন
করে সাধক হয়ে উঠবে? বস্তুবাদী মার্জ
এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন নি
যা তার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।
ভারতব্যোম হাতে এর সমাধান ছেড়ে দিয়ে
তিনি নিজে নিরন্তর রয়েছেন। ব্রহ্মবিজ্ঞান-
বাদী স্বামী বিবেকানন্দ কিন্তু এর উত্তরেই
ঘলিয়েছেন, সমাজের মানুষকে সেদিন
বৈদান্তিক অর্থে ব্রাহ্মণ হতে হবে। শ্রেণী-
হীন সমাজপ্রতিষ্ঠার দিন যেদিন সমাগত
হবে, সেদিন মানব-ইতিহাসে মূর্তি অভি-
যানের শেষলগ্ন। বিপ্লবের এই শেষ
অঙ্ক সম্পূর্ণ করার জন্য মানুষের জীবন
থেকে সেদিন ইন্দ্রিয়ের একাধিপত্যেরও
অবসান ঘটবে। মানুষ সেদিন সামন্ততন্ত্র
বা রাজতন্ত্রের দাস নয়, শ্রমচার্যতন্ত্রের
সেবক নয়, শোষণমূলক উৎপাদন ব্যবস্থার
শিকার নয়, আবার ইন্দ্রিয়েরও অনগত
ভূতা নয়। অন্তরে-বাইরে সে স্বাধীন,

মুক্ত। তার স্বাধীন, মুক্ত আত্মায় সেদিন
পরমেশ্বর জেগে উঠবেন।

কিন্তু সেই মুক্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজে,
সামাজিক দিক দিয়ে আবার পরমেশ্বরের
কি প্রয়োজন? পরমেশ্বরের স্থান
কোথায়? কে এই পরমেশ্বর? স্বামীজী
বলেছেন—

“বেদান্তের ঈশ্বর সম্পূর্ণ পৃথক এক
জগতে সিংহাসনে সমাসীন সন্ন্যাসী নন।
.....স্বর্গস্থ রাজা আজ কোথায়? মতের
রাজারা যেখানে—সেইখানে। গণতান্ত্রিক
দেশে রাজা প্রত্যেক প্রজার তন্তরে।
বেদান্তধর্মে তাই ঈশ্বর প্রত্যেকের
ভিতরে। বেদান্ত বলে জীব ব্রহ্মই। এই
জন্য বেদান্ত খুব কঠিন। বেদান্ত ঈশ্বর
সম্বন্ধে পুরাতন ধারণা আদৌ শিক্ষা দেয়
না। মেঘের ওপারে অবস্থিত স্বেচ্ছাচারী,
শূন্য হইতে খুশিমত সৃষ্টিকারী মানুষের
দুঃখ-যন্ত্রণাদায়ক এক ঈশ্বরের পরিবর্তে
বেদান্ত শিক্ষা দেয়—ঈশ্বর প্রত্যেকের
অন্তরে অন্তর্ভাবী, ঈশ্বর সর্বরূপে সর্ব-
ভূতে। দেশ হইতে মহিমাম্বিত রাজা
বিদায় লইয়াছেন, স্বর্গস্থ রাজ্যপাট
বেদান্ত হইতে শত শত বৎসর পূর্বেই
লোপ পাইয়াছে। ...এই জন্য বেদান্তের
সিদ্ধান্ত বিম্বিত্রাভূত নয়—বিশ্বব্যাপক।
আমি অপরাপর মানুষ, জন্তু—ভাগমন্দ
—যে-কোনো জিনিসের মতই একজন।
সর্বত্র এক শরীর, এক মন, একটি আত্মা
বিরাজিত। সকল মনই আমার। সকল
পায়ে আমি ভ্রমণ করি—সকল মুখে
আমি-ই কথা বলি—সর্বশরীরে আমি
অধিষ্ঠিত।”

[“বেদান্তই কি ভবিষ্যতের ধর্ম?”
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

[পৃঃ ৩৭০—৩৯১—৩য় খণ্ড, বাণী
ও রচনা]

[সমাপ্ত]



কারখানায় ধর্মঘট চলছিল।

সরমা নিজেই জানে না কি করে সংসার চলবে। কেন না পরিমল একে গোঁয়ার, তার ওপর মজদুর ইউনিয়নের পান্ডা। সে সহজে কাজে যোগ দেবে না। হাতে যে কটা টাকা ছিল তা প্রায় শেষ। এখন একমাত্র ভরসা সেলাই-কল ও দাঁজের কাজ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে সবমাত্রা সার্ভার সংগ্রহ করে। মেয়েদের স্কুল, রাউজ ইত্যাদি ভালই করে এবং সবয়্যে ঠিক সময়ে দেয়। সেইজন্য অর্ডারের অভাব হয় না। ভাগ্যিস বিয়ের আগে এই কাজটা সখ করে শিখছিল। বর্তমানে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, না হলে যে কি হত তা ভাবতে পারে না। আত্মবিশ্বাস আর মিষ্টি

স্বভাব তাকে শুধু বাঁচিয়ে রাখে নি— চারজনের ভ্রাতৃও যোগাচ্ছে। অবিশ্য ব্রাতদিন পরিগ্রহ করে সরমা। বস্তুত এই কষ্টের জন্য আশ্রয় নেই।

পরিমল অলস, বোকা লোক নয়— চলনে-বলনে রীতিমত স্মার্ট। শ্রমিক-দের প্রতিনিধি। আর এ হচ্ছে সর্বনাশের কারণ। এখন শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ মা'লি ক প ক্ষ কে জানাতেই হবে। দায়িত্বটা তো কম নয়। লেখাপড়া জানা শ্রমিক-সরদারী পরিমল ব্যতীত আর কে আছে। জামিতির উপপাদ্যের মত কথাটা সহজ না হলেও, এক্ষেত্রে সহজ। শ্রমিকদের কিসে ভাল হবে, এই চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকে। নিজের জন্য, সংসারের

জন্য কোন ভাবনা নেই। কারখানা-শ্রমিক ওর কাছে বড়। অবিশ্য এই নিশ্চিন্তে থাকার জন্য কতকটা সরমা নিজেই দায়ী। নিজের কাঁধে সম্পূর্ণ ভারটা নিয়েই ভুল করেছে। বিপদ-আপদ, ঝড়-ঝাপটা সব সরমার ওপর।

এত দ্রুত যে একটা সংসারে ওলট-পালট হবে, এ ধারণা পরিমলের ছিল না। আলিকপক্ষ দীর্ঘদিন ধর্মস্বত জ্বিয়ে রাখতে বিস্মিত হল। সময় চলে যাওয়ার ফলে দিন-দিন সরমার মূখ্যে গম্ভীর হতে থাকে। কারো সঙ্গেই তেমনভাবে কথা বলে না। চুপচাপ নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

বাড়িতে বসে পরিমল সরমার মূখের দিকে তাকিয়ে ভাবে সেই ফেলে

দায়িত্ব বহন

আসা গ্রামের কথা। প্রাইমারি স্কুলে একটা সামান্য মাস্টার ছিল। নদীর কিনারে গাছ-গাছালিতে ঘেরা একটা ছোট বাড়ি ছিল। চারিদিকে উপচে পড়ছিল সুখ-আনন্দ। কিন্তু অত সুখ কপালে সইল না। হঠাৎ সর্বকিছু যেন চলে গেল। বাড়িঘর, মানুষজন চিরদিনের মত চলে গেল। সকলের মত তাকেও স্রোতের টানে ভেসে এসে কাম্প-জীবন নিতে হল।

সংগ্রামের সিঁড়ি অতিক্রম করার পর একটা কলোনীতে একটু জমি পেল। মাথা গোঁজবার মত বাড়িও হল। এর পর কারখানায় এই চাকরি। ক্রমে ক্রমে নতুন কর্মক্ষেত্রে সে প্রতিষ্ঠিত হল। পরিমলের চেষ্ঠায় কলোনীতে সমবায় সমিতি গড়ে উঠল। লোকের সুখ-সুবিধা সে করে দিয়েছে বলে না, তবে তাদের সঙ্গে নিজেও অক্লান্ত খেটেছে। কলোনীটাকে সুন্দর সুশ্রী করার জন্য, এখানকার লোকের সুখ-সুবিধা আনার জন্য চেষ্ঠার কোন ঘুটি ছিল না। ব্যাপারটা ছিল আন্তরিক।

ওদের ঘরে ইতিমধ্যে দু'টি সন্তান এসেছে। ছেলে পদ্মা, মেয়ে রীতু। সরমা এদের নিয়ে কত আনন্দে ছিল। রাগে ছেলে-মেয়েদের রূপকথা শোনাতে। পরিমলও সেই গল্প শুনে ভাবত, একদিন এই সংসারে এক অভাবনীয় পরিবর্তন আনবে। ছেলে-মেয়েদের মনের মত করে মানুষ করবে। এই কঠিন সংসার প্রাঙ্গণে দুঃখ-দৈন্যের দৈত্য-বানবকে পরাজিত করে নিজে বাঁচবে, এদের বাঁচাবে। কিন্তু আজ সে ক্ষত-বিক্ষত। তবে মনের জোর হারায় নি। সে যুগ্ম করবে শেষ পর্যন্ত। সংগ্রামই ত' জীবন।

সরমা ভাবে ধর্মঘট কতদিন চলবে। কেনই বা ধর্মঘট। মালিকের সঙ্গে ক্ষুদ্র শক্তি শ্রমিকেরা কতদিন যুগ্ম করবে। কে বোঝাবে কাকে। দু'পক্ষের ব্যাপার। সরমা পরিমলকে বোঝায়, জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া কি আমাদের মত চুনোপুটির চলে? কে শোনে কার কথা। এক পক্ষকে একটু নরম হতেই হবে। অবিশিষ্ট বিচার যেন নীতিসঙ্গত হয়। এখানেই ত' প্রশ্ন। সর্বদাই জোর যার মাটি তার। আগে ছিল রাজার জোর—এখন হয়েছে সরকারের। খনী লোকদের জনাই যেন সরকার। মালিক যদি একেবারে কারখানা বন্ধ করে দেয় ত' কি হবে? সেলাই করে কোনরকমে ছেলে-মেয়েদের বাঁচিয়ে রেখেছে। আর যাদের কোন কিছু অর্থকরী কাজ জানা নেই,

তাদের কি হবে। পরিমলের ওপর রাগ হয়। গজগজ করে সরমা।

আবার ভাবে, পরিমলের কি সব দোষ? হয়তো এই ধর্মঘট করতে বাধ্য করা হয়েছে। অশান্তি যাতে না হয়—আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিলেই ভাল হত। আজ আসুক বাড়ি। কোথা থেকে রোজ ভাত আসে, তা জিজ্ঞেস করবে। মনে মনে ভীষণ জ্বলতে থাকে। কে তাকে পরামর্শ দিয়েছে এই দুঃখ-দুঃশা আনতে। সকল অলঙ্কার এক এক করে কেন বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। আর নয়, পরিমলের অনেক লম্বা লম্বা বুলি সে শুনেছে। সকলের দুঃখ দেখলে চলে না। নিজে মরে যাচ্ছে তা কে দেখছে। ইউনিয়ন! পোস্টার মারবেন। মিছিল করবেন। বস্ত্রা দেবেন। এই যদি করার ইচ্ছে ছিল, বিয়ে না করলেই হত। দেশের কাজ করেই বেড়াকগে। কারোও কিছু বলার থাকবে না। এদিকে হাঁড়িতে চাল নেই—দেশের সেবা। লেখাপড়া শিখে বুদ্ধিসুদ্ধ লোপ পেয়েছে। গোড়াকপাল!

প্রান্ত পায়ে দু'পদে বাড়ি এল। ইতিমধ্যে সরমা কোনরকমে চাল যোগাড় করে উনুনে চড়িয়েছে। আজ শুধু ভাতে ভাত ছাড়া আর কিছু হবে না। পরিমলকে দেখে সরমা চেঁচিয়ে বললে : এতক্ষণে বাবুর সময় হল। বলি কি করে সংসারটা চলে—খোঁজ-খবর রাখ!

পরিমল খতমত খেয়ে গেল। সরমার তো অত রাগ হয় না কোনদিন। আজ আবার কি অঘটন ঘটল! বন্ধুতে পারল আজ নানা প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ভাঙা চেনারটা টেনে এনে শক্ত করে বসল এবং সহজভাবেই উত্তর দিল : জানি তুমি এই সংসার আর বহন করতে পারছ না। কিন্তু কি করবো বল। আমি কি ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি। এ সময় অধৈর্য হলে চলবে না।

সরমা কথার উত্তর দিতে গিয়ে চোখটা মুছে নিল। অজান্তেই চোখে জল এসে পড়ছিল। নিজেকে সংযত করে বললে : কেন এই বন্ধুটি নিতে গেলে। কতবড় দায়িত্ব তুমি নিয়েছ জান? কারখানা আর না চললে, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। আবার শুনছি কোম্পানির দালালরা সবাইকে ঘুষ দিয়ে কাজ করতে প্রলোভন দেখাচ্ছে।

ঃ বাজে কথায় কান দিও না। পরিমল ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

পরিমল বন্ধুতে পারছে সরমা সব কিছু বোঝার চেষ্টা করছে। যদিও অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহারা হয়েছে, সহানুভূতি আছে। কেন না এর আগে বহুবার বন্ধু হয়েছে। দিন দিন বাজার বাড়ছে। সংসার চালানো কষ্টকর ব্যাপার। এর পরে আছে চিকিৎসা, স্কুল। এই সব অভাব-অভিযোগ সরমারও অজানা নয়। সেই জন্যই রেগে গেলেও তেমনভাবে কিছু বলে না।

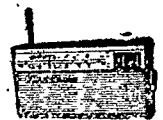
কলোনীর পাশে শুল্ক কারখানাটা নয়। পাশে রয়েছে একটা বস্তি। এই বস্তিতে থাকে অবাঙালী অনেক মজুর। এই ধর্মঘটের জন্য কেউ কেউ দেশে চলে গেছে। কেউ অন্য স্থানে ঠিকা কাজ করছে। কিন্তু যারা কোন কিছুই জোটেতে পারে নি, তারাই পড়েছে বিপদে। এখন এই অকর্মণ্য লোকেরা পেটের দায়ে চুরিচামারি করবে। এ আর অসম্ভব কি? আবার ধৈর্যহারা হয়ে কোম্পানীর দালাল হবে, এও অসম্ভব নয়।

কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে নির্ধারিত কিছু সংখ্যক কর্মীকে নিয়ে প্রথমে কারখানা খোলার সর্তে ইউনিয়ন রাজী হল। এ ছাড়া উপায় ছিল না। শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমেই অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছিল। অবিশিষ্ট মালিকপক্ষ দাবীদাওয়ার ব্যাপারে সন্তোষজনকভাবে সুরাহা করবে কথা দিয়েছে। পরিমল দেখল মান থাকতে এই প্রস্তাবে রাজী না হলে ভাঙন ধরবে। দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া মৃত্যুর কথা নয়। আবার কারখানা খুললে অবস্থা বন্ধে বাস্তব নেওয়া যাবে। নিজেকে একাও অটুট থাকবে। পরিমলের কাছে দু'নিয়টা শুধু লড়াই আর কিভাবে নিজেরা ঠিকমত একতাবদ্ধ থাকবে এই নিয়ে ঘুরছিল। এখন তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে ভেবে যেন শান্তি পেল। সরমাও বিরক্ত করছিল।

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অ ল ও য়া ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার (জাপান মেক) জনপ্রিয়। দেশ ব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies (B.C.) P.B. 2123, Delhi-7



স্বাভাবিক বসন্ত

প্রফুল্লমনে বাড়ির উঠানে পা রাখতেই সরমা টিপ্পাপাখির মত চোখ ঘুরিয়ে এক পলক পরিমলের দিকে তাকিয়ে মৃদুতা নিচু করল। সেলাই মেশিনটা জোরে চালান। চোখে-মুখে হাজার বিতৃষ্ণা। অবহেলার ভাব। সে যেন এ বাড়ির কেউ নয়। সে যেন ফালতু লোক। খেল না খেল কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। এই বৃষ্টি সংসারের নিয়ম। টাকার সংগে সকলের সম্পর্ক।

হাত-পা ধুয়ে খেতে বসল পরিমল। সরমা কল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল : আসার সময় হল। গলার স্বরটা বিকৃতি শোনা।

পরিমল এ সব কিছু গ্রাহ্য না করে সহজভাবে কথাটা পড়ল : কাল কারখানা খুলবে।

কি বললে। তা আমি বুঝেছি। আগার হাড়-মাস না খেয়ে তোমার শান্ত নেই। কারখানা খুলবে কতবারই তো বললে।

খুলবে, খুলবে এবার দেখে নিও। কথার ফিকেই বাড়ি ভাত টেনে নিয়ে পরিমল গোত্রাসে গিলতে লাগল। কথাটা সরমা এখনও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। কেন না পরিমল এমন কথা বলে আগে বহুবার সাক্ষ্য দিয়েছে। হাতের কাজটা বন্ধ করে পরিমলকে উদ্দেশ্য করে বলল : গোবিন্দদের বাড়ি থেকে কাপড়টা নিয়ে এস। বলেই নিজের কাছে মন দিল। যাকে বলল সে একমনে ভাত খাচ্ছে। মৃদু তুলে মায়া হল সরমার। কি বিস্তী চেহারা হয়েছে। হবেই বা না কেন? সময়মত খাওয়া নেই, স্নান নেই, ঘুম নেই।

তাড়াতাড়ি উঠে সরমা আরো দু'মুঠো ভাত দিল। পরিমল সংগে সংগে বলল : না-না-না আর নয়। তুমি খাবে কি? সরমা কোন কথা শুনল না। পরিমল কিছুটা খেয়ে উঠে পড়ল। কোনরকমে হাত ধুয়ে পরিমল চলে যাচ্ছিল দেখে সরমা ডাকল, বলল : আঁচলে টাকা রয়েছে নিয়ে যাও। ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে এস।

পরিমলের ফেলে-যাওয়া ভাতগুলি দেখে সরমার চোখে জল এল। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। মানুষটা যেন কেমন হয়ে গেল। অথচ এরকম ছিল না। সাধ-আশ্রয় ছিল। রং-তামাসা ছিল। কিন্তু আজ আর যেন কিছু নেই। সংসারের খামেলায় এবং কারখানার পরিবেশে মানুষটা মেশিন হয়ে গেছে। আর এই ধর্মঘটের জন্য সংসারের প্রতি নিষ্পৃহ হয়েছে আরো বেশ। রাতদিন ভাবে। সভা-

মিছিল নিয়ে মেতে আছে। আগে কারখানার কত গল্প করতো। ক্যান্টিনে কি রান্না হত। কার প্রশ্রয় হল ইত্যাদি কত বিষয় নিয়ে কত কথা বলতো। ছুটির দিন ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গড়ের মাঠে, কখনো চাঁড়িয়াখানায় বেড়াতে যেত। মাঝেমধ্যে সিনেমায় যেত। এখন যেন সব পাশে গেল। কেন? সে কথার জবাব খুঁজতে গিয়ে আকাশের দিকে চোখ পড়তেই উঠে পড়ল। সম্মার আর বেশি নেরী নেই।

পরিমল বেশ একটু রাতে বাড়ি ফিরে দেখল—সরমা হ্যারিকেন জালিয়ে মেশিনটা চালিয়ে যাচ্ছে। অল্প আলোয় সরমার মৃদুতা করুণ দেখাচ্ছে। পরিমল স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল : জান, কাল কারখানা খুলবে। পাকাপাকি কথা হয়ে গেল।

সত্যি। সরমার চোখ দুটো উজ্জ্বল দেখাল।

হ্যাঁ, কয়েকটি সতের। কিস্তিতে কিস্তিতে লোক নেবে। বলেছিলার না আমরা জিতবো। কি জানো—এক-তাই শক্তি।

তোমাকে নেবে তো?
কেন এ কথা বলছো?
তুমি যে লিডার।
মেশিনটা বন্ধ কর। কোথাকার যমদুত।

এটা ছিল বলেই বেঁচে ছিলে—অবহেলা করো না।

রাখ দিকিনি।
তুমি খাবে না।
না, একগাদা খেয়ে এসেছি।
কে খাওয়ালে।
প্রমিক ভাইয়া।

অনেকদিন পর প্রাণ খুলে দু'জনে কথা বলল। কথা বলতে বলতে রাগি গভীর হয়ে গেল। কি মনে করে পরিমল হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিল। অশ্বকর গ্রাস করে নিল এক মৃদু হৃৎ। পরেই জ্যোৎস্নার আলো চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। পূর্ণিমা কাছেই হবে। আকাশে তারারা ঝলমল করছে। দূরের গাছ-গাছালিতে জোনাকিরা জ্বলছে-নিভছে। দূরে কোথাও বিস্তিতে গানের জলসা বসেছে। তার সুরের মূর্ছনা এখানেও ভেসে আসছে। দীর্ঘদিন পর সংগ্রামী মৃদুগলো আবার খুঁশিতে গশগল হুচ্ছে। পরিমলের ভাল লাগল। গুনগুন করে একটা গান ধরল। সরমা চুপ করে বসে রয়েছে।

চাঁদের আলোয় সরমার মৃদুতা যেন আগের মত মিষ্টি লাগছে। টানা টানা

চোখ আজ আবার পরিমলকে আকর্ষণ করছে। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সরমা বললে : কারখানা খুললে যে টাকা পাবে—আমায় দেবে।

কি করবে।
রেডিও কিনবো।
আছা।

কথায় কথায় চাঁদ গাছের মাথায় নেমে এসেছে। পরিমল সরমাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল।

ধর্মঘটের পর কারখানা খুলেছিল। বিরাট লোহার গেট দিয়ে কর্মীরা ঢুকছে। অদূরে একটা পল্লিশতান দাঁড়িয়ে রয়েছে। একদল শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আজ যারা ঢুকছে তাদের মধ্যে শ্রম কার্যকরী সমিতির সদস্য বাতীত সকলেই রয়েছে। পরিমলের কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু সহসা কিছু করতে মন চাইছিল না। সকল শ্রমিক ঢুকে গেলে দারোয়ান একটা লিস্ট গেটে মেরে দিল এবং সংগে সংগে গেট বন্ধ করে দিল।

পরিমল ও ইউনিয়নের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখে কোম্পানী কার্যকরী সমিতির সবাইকে বাদ দিয়ে কারখানা চালাবার জন্য সমস্ত ঘোষণা করেছে—অনির্দিষ্টকালের মত নিষ্পত্তি। শ্রমিকদের কর্তৃপক্ষ পুনর্বহাল দিতে অক্ষম। নোটিশটা পড়ার সংগে সংগে সুবোধ লোহার গেটে সজোরে ঘর্ষি মারল। কয়েকজন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। শোকের ছায়া নেমে এল। পরিমল হতভম্ব হয়ে গেছে। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। শরীর কাঁপছে। কারখানাটা চোখের সামনে ঘুরছে। কিছুই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। কারখানার হুটোর পড়ল। আর সংগে সংগে পরিমল হাত মুঠো করে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। আর তক্ষুণি মন্থবলের মত সকলে পরিমলের পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল—সকলে শ্লোগান দিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। এ লাড়াই বাঁচার লাড়াই, এ লাড়াই জিততে হবে। ধাম্পাবাজি চলাবে না—চলাবে না। বিশ্বাসঘাতক, বেইমান—জবাব দেবে—জবাব দেবে।

চিমনির ধোঁয়া—বন্ধ লোহার গেটের সামনে তারা এই বেইমানীর জবাব দেবার শপথ নিল।

কবিতা

Burglars of Hearts (Soviet 'Land' Nehru Award Winner) :
Oles Benyukh and Darshan Singh: Jaico Publishing House,
125 Mahatma Gandhi Road,
Bombay 1 ; Price in India only
Rs. 4/-.

ইউক্রেন এবং পাজাবের দুই সাহিত্যিকের এই যৌথ প্রয়াস প্রশংসনীয়। পশ্চিম নদের দেশ এবং ইউক্রেন অঞ্চলে ভ্রমণ করে তাঁরা যা কিছু দেখেছেন, তার বিবরণ যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ। হাস্যরসের মাধ্যমে দুই দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বেসব চিত্র এঁটতে অঙ্কিত হয়েছে, তা সত্যনিষ্ঠ এবং শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতায় অবিস্মরণীয়। সাধারণত রুরোপীয়দের সাথে আমাদের দেশের লোকেরা একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেই অভ্যস্ত। কিন্তু রুশ দেশের মানুষের সাথে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে আমাদের কোন সংকোচ হয় না। কারণ তাদের সাথে কোথায় যেন আমাদের একটা মিল আছে। তাছাড়া পশ্চিম রুরোপের মানুষ এদেশের মানুষকে যেমন অগ্রাধা করতে অভ্যস্ত, তাতে তাদের সাথে আমরা স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করতে কোনমতেই পারি না। কিন্তু রুশ দেশের মানুষ আন্তরিকভাবে আমাদের সাথে কেবল মেলামেশাই করে না, আমাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু জানাতেও তারা নারাজ নয়। দুজন লেখকই গতানুগতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে দুটি বিরাট দেশের সম্পর্কে যে সমীক্ষা করেছেন, তা অন্তরকর্ষক স্পর্শ করে। গ্রন্থটি 'সোভিয়েত দেশ' নেহরু পুরস্কার লাভ করেছে।

গীতিমালশু—ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ।
প্রকাশক : শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ,
প্লট নং ৩৯, শাহীদনগর, ভুবনেশ্বর,
উড়িষ্যা। মূল্য : তিন টাকা।
প্রাচীনকাল থেকেই সংগীতের সঙ্গে
ধর্মের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

যখন পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশের লোকেরা অজ্ঞানের অন্ধকারের মধ্যে নিমগ্ন ছিল, তখন সনাতন ভারতের মূনি-ঋষিরা বেদগানের মধুর সুরে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। সংগীতের মনোমোহিনী সুরে নাদব্রহ্মের উদ্দেশ্যে নাদোপাসনা করতেন। তখন থেকেই আজ পর্যন্ত সংগীতের নানা শাখার মধ্যে ভক্তিমূলক গানের স্থান সন্দেহ হয়ে আছে।

ডাঃ কিরণচন্দ্র ঘোষ রচিত 'গীতি-মালশু' বইখানি কয়েকটি ভক্তিমূলক বাংলা খেয়াল গানের সঞ্চয়ন। উড়িষ্যার সিভিল সার্জেন থাকাকালীন গ্রন্থকার এই গানগুলি রচনা করেন এবং নিজেই সুরসংযোজনা করেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সংগীতালঙ্কার সুনন্দা পট্টনায়ক ও শ্রীমতী শিশিরকণা ধরচৌধুরী প্রমুখ সংগীতবিদ ও শিল্পী এই বইটির উৎকর্ষতা সম্বন্ধে সূচনিত অভিমত দিয়েছেন—যা বইয়ের মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে।

এখানি উত্তর ভারতীয় এবং ১৩খানি দক্ষিণ ভারতীয় রাগের বাংলা গানের সংকলন আছে এই বইটিতে। এর মধ্যেই আছে প্রত্যেকটি রাগের পরিচয়, বিস্তার, তান, বোলতান, সরগম, তারানা প্রভৃতির সহজবোধ্য স্বরলিপি। উত্তর ভারতীয় রাগের মধ্যে আছে ভৈরব, জয়জয়ন্তী, মালকোষ, আড়ানা, বাগেশ্রী, বাহার, মিঞাটোড়ী এবং দক্ষিণ ভারতীয় রাগের মধ্যে আছে জগনমোহিনী, কিরবাণী, কলাভরণ, মলয়-মারুতম, সরস্বতী, চারুকেশী, শিবরঞ্জনী, সাবেরী, বসন্ত-মুখারি, বাচস্পতি, মারুতকম্বু, সুধাকম্বোজী ও কম্বু পঞ্চম। প্রচলিত ও দুঃপ্রাপ্য দুঃরকম রাগের সংকলন থাকায় বইটি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষাবিদ উভয়েরই সহায়িকা হিসেবে বিশেষ উপযোগী।

বইটির ছাপা পরিষ্কার এবং বাঁধাই সুদৃশ্য, প্রচ্ছদটিও সুন্দর।

অম্বিতীয় ছোটকাঁকা—কিশোরবন্দে
উপযোগী হাসির একাধিক নাটক।
লেখক—সুদাম্পল চট্টোপাধ্যায়। জুপিটার
পাবলিশিং হাউস, ৫৭/১ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২। দাম দেড় টাকা।
এদেশে এখনও কিশোর-সাহিত্যের
খুব অভাব। তাদের উপযোগী
হাসির নাটকও বেশী নেই।
'অম্বিতীয় ছোটকাঁকা' তাদের
অফুরন্ত হাসির খোরাক খোগাবে।
নাট্যকারের নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি
প্রশংসার যোগ্য। প্রতিটি চরিত্র
সু-অঙ্কিত এবং প্লটটিও চমৎকার।
নাটকটি কিশোর মহলে শুধু নয়,
সকলের কাছেই সমাদর পাবার যোগ্য।
শিল্পী রেবতীভূষণ অঙ্কিত প্রচ্ছদটি
আকর্ষণীয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।
তরুণ নাট্যকার সুদাম্পল চট্টোপাধ্যায়কে
সাধুবাদ জানাই।

উত্তরণ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৭)—সম্পাদকঃ
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। ৩১১, গঙ্গুলী
বাগান, কলিকাতা-৪৭। এক টাকা।
'উত্তরণ'-এর বর্তমান সংখ্যাটি মূলত
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক সংকলন।
অবশ্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিবেদিত
কবিতাগুচ্ছ ব্যতিরেকে যথারীতি অন্যান্য
রচনা অর্থাৎ কবিতা, আলোচনা এবং প্রবন্ধ
ইত্যাদিও 'উত্তরণের' বর্তমান সংখ্যায় স্থান
লাভ করেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে
নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ নানা কারণেই অত্যন্ত
সময়োচিত এবং মানিক যে বাংলা
সাহিত্যের সত্যিকারের মানিক—বাংলার
কবিদের তাঁর প্রতি নিবেদিত নানা ব্যক্তির
অকণ্ট কথামালায় মধ্যেই সেকথার সত্য-
সত্য প্রতিষ্ঠিত। এই পর্যায়ে বিধু দে,
বিমলচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক,
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেন-
গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়,
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও আরো অনেকের কবিতা
'উত্তরণ'-এর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক
সংকলনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। নিবেদিত
কবিতাগুচ্ছের প্রারম্ভ কবিদের চোখে
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র
চট্টোপাধ্যায় লিখিত ন্যাতনীয় ভূমিকাটি
উল্লেখযোগ্য। তবে বর্তমান অংশের
সম্পাদনায় কিঞ্চিৎ এলোমেলো ভান লক্ষ্য
করা গেল। নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ
কবিদের নাম এবং কবিতার শীর্ষনাম একই
ধারায় রাখা হয় নি, ফলে কোনো কোনো
ক্ষেত্রে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কেই (একাদিক
ক্ষেত্র) রচয়িতা বলে মনে হতে পারে
(পৃঃ ১১। ১২। ১৩)। প্রতিষ্ঠিত কবিতা
পত্রিকা হিসেবে 'উত্তরণ'কে আরো আধ-
নিকভাবে সজ্জিত এবং মদ্রণপ্রমাদহীন
হিসেবে দেখতে আমরা আগ্রহী।



জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রোলান্ড বিয়ার তার খ্রিস্টসে আরও লিখেছে : “যে-কোন দেশের নাটকের গাঠনিক দিকটায় অনেকটাই নির্ভর করে সেই দেশের তৎকালীন নাট্যিক পরিস্থিতির উপর। সুতরাং আমাদের প্রথমেই পুরাকালের ভারতীয়দের সম্বন্ধে এবং তাদের নাট্যিক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা দরকার। আমাদের খুঁজে বের করা দরকার যে-আকারে নাটক-গুলো আমরা পেয়েছি কিভাবে অভিনীত হবার জন্য সেগুলো রচিত হয়েছিল।

পুরনো ভারতীয় রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে চিরায়ত ইওরোপীয়ান স্টেজের অনেক পার্থক্য ছিল। ভারতীয় অভিনেতার খোলা জায়গায় অভিনয় করতেন—কোন উইংস বা সেট থাকতো না—সামান্য ছোট-খাট প্রপার্টিজের ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

অভিনেতাকে যদি গিয়ে দৃশ্যের প্রথম দিকে সিংহাসনে বসতে হতো, যদি তাকে কোন ছাঁচ দেখতে হতো, অথবা প্রেমোভিনয়ের দৃশ্য করতে হতো, সে স্বাভাবিকভাবে রঙ্গমঞ্চে ঢুকতো, নিজের আসনে গিয়ে বসতো এবং তারপরে যে ভূমিকায় অভিনয় করছে তার ধরনধারণ নিজের ভেতর ফুটিয়ে তুলতো।

ইওরোপীয়দের মত পিকচার ড্রাম স্টেজে ভারতীয় অভিনয় হতো না—কার্টেনের ব্যবহারও তাঁরা করতেন না। ভারতীয় রঙ্গালয়ে পিকচার ড্রাম স্টেজের মত ম্যাজিক এফেক্ট সৃষ্টি করার বা দর্শকদের স্থান, কাল ভুলিয়ে দেবার কোন প্রচেষ্টা করা হতো না—

No attempt was made to create the illusion of a non-existent reality by means of a manyfold stage technique.

ভারতীয় অভিনয়ে নৃত্য ছিল একটি প্রধান অঙ্গ। ধর্মনিষ্ঠান সম্পর্কীয় মৃদাভিনয় এবং নৃত্যের উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল। এই সব দিকগুলো সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান না থাকলে অর্থাৎ ভারতীয় অভিনেতাদের অঙ্গভঙ্গী থেকে শব্দ করে হাভের

আঙুলের কাজ ইত্যাদির বাজনা না বন্ধ হতে পারলে ইওরোপীয়দের পক্ষে পুরনো ভারতীয় নাটকের মণ্ডরূপায়ণ সম্বন্ধে ধারণা করা একটা অসম্ভব ব্যাপার।

সংলাপকে বাদ দিয়েও ভারতীয় অভিনেতার আয়ত্তে থাকতো বহুবিধ শিল্প-সম্মত দেহভঙ্গী করবার অধিকার। চিরায়ত প্রচলিত রীতি অনুসারে দেহের প্রত্যেক অঙ্গকে নানা ভঙ্গিমায় কার্যকরীভাবে অভিনয়ের সময় ব্যবহার করা যেত। এই সব ভঙ্গিমার দ্বারা যে চরিত্রে অভিনয় করা হতো তার অন্তরের অন্তস্তলের ভাবানুভূতিগুলিকে প্রকাশ করা হতো। ভাবাভিব্যক্তির জন্য হাত এবং চোখের যথেষ্ট ব্যবহার করতো ভারতীয় নটনটীরা।

In Shakuntala we find many scenic annotations referring to such a play in gestures for instance!

—Shakuntala expresses shy love—

—He wants to hold her back but controls himself—

—(The King) indicates being tired of the throne—

একদিকে দৃশ্যপটহীন রঙ্গমঞ্চে ভাবাভিব্যক্তিকে ঘনীভূত এবং রসঘন করবার জন্য যেমন নৃত্যের সাহায্যের দরকার হতো, তেমনি দরকার হতো অতিরিক্ত স্টাইলাইজড মৃদাভিনয়ের। সংস্কৃত নাটকে অষ্টমেন্তারা সাতার কাটে, ঘোড়ায় চড়ে এবং উড়ে বেড়ায়—এ সবই সম্পন্ন হতো মৃদাভিনয়ের সাহায্যে। অন্ধকার বোঝাতে হলে স্টেজের আলো নেভাতে হতো না—পূর্ণাঙ্গলোকিত রঙ্গমঞ্চে হাতের ভঙ্গীর সাহায্যেই অন্ধকারের সংকেত দেওয়া হতো। কালিদাসের শকুন্তলায় রাজা দৃশ্যমন্ত অদৃশ্য রথে চড়ে স্টেজে আসতেন। শকুন্তলা যে ফুল তুলতো তাও চোখে দেখা যেত না, তার সখীরাও অদৃশ্য গাছগুলিতে জল সেচন করতো।

নাটকের চেষ্টাতে পরিচালকের প্রতি যে সব নির্দেশ আছে তার ঠিকমত অনুবাদ করলেই এসব কথা পরিষ্কার হয়ে যায়।

—Indicating the impetuous dispatch of the chariot—

—Indicating the watering of trees—

—Indicating that a bee swarms round-irritatingly—

এ ছাড়া আরো অনেক উদাহরণ আছে।

দৃশ্য বদলের ব্যাপারেও অভিনেতাকেই দর্শকদের বুদ্ধি দিয়ে দিতে হয় সাংকেতিক ভঙ্গীর দ্বারা। শকুন্তলা নাটকে কবি এইভাবে কাজ করেছেন:

Doorkeeper: “Here is the staircase...will the gentleman please step up?”

Or:

King: (Walking about and looking around) “This is the entrance to the grove of penitence; I want to enter it now.” (He makes a movement to this effect).

কালিদাসের শকুন্তলা নাটক সামান্য রাজসভায় ধনী দর্শকদের সামনে অভিনীত হবার জন্য রচিত। তাঁর কাব্য যে ভাষায় রচিত তা ভখনকার সময়ের কথিত ভাষা ছিল না। শব্দমালা ঐতিহাস্যম্পন্ন সুদৃশ্যিক দর্শকরাই তাঁর নাটকের অভিনয়ে সুস্কৃতিসুন্দর দিকগুলো উপভোগ করতে পারতো। দর্শকসংখ্যা স্বভাবতই ছিল সীমিত। থিয়েটারের জন্য বিশেষভাবে কোন রঙ্গগৃহ তৈরি করা হোতো না। বোধ হয় মন্দিরের কোন অংশে বা রাজপ্রাসাদের বড় আকারের হল জাতীয় ঘরে অভিনয় হতো।

সুন্দর গাঠনিক আকারের দ্বারা সংস্কৃত নাটকের কাব্যাংশকে গদ্য সংলাপের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এবং এইভাবেই কাব্যাংশ নাট্যিক বিশেষ পরিস্থিতির থেকেও আলগাভাবে অবস্থান করে। সংস্কৃত নাটকের মণ্ডরূপায়ণ এবং অভিনয়ের ব্যাপারে সচেতন দৃষ্টি থাকে নাটকের কাব্যময় দিকটাকে ঘটনার অগ্রগতির দিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। অভিনেতার কাব্যাংশ বলবার বাচনভঙ্গী এবং গদ্য সংলাপ বলবার ভঙ্গীও হতো বিভিন্ন ধরনের—এভাবেও বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করা হতো। একথাও আমাদের অজানা নয় যে, পুরনো ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে সঙ্গীতের একটা বড় অংশ ছিল। সংস্কৃতের পদ্য স্তবকে অসংখ্য নকশের ছন্দবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়—সুতরাং অনুমানে বোঝা যায় এই কাব্যাংশ যখন গানে রূপান্তরিত হতো, সে গানেও প্রচুর বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য নিশ্চয় থাকতো এই সব সঙ্গীতের মাধ্যমেও অভিনেতার নাটকে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করতেন।

তাহলেই দেখা যাচ্ছে, পুরনো সংস্কৃত নাটকে পদ্যাংশের একটা নির্দিষ্ট নাট্যিক

দায়িত্ব বহন

কার্যকারিতা ছিল। নাটকের দৃশ্যভিত্তিক নৈকট্যবোধের পদার্থ্য্য এসে বাধা সৃষ্টি করতো।

প্রাচীন গ্রীক থিয়েটারে কোরাস এসে ঠিক এই কাজই করতো। এই একই এক্ষেপে ক্রিয়েট করবার জন্য শেক্সপীরের সলিলক বা স্বগতোক্তি ব্যবহার করতেন। দৃশ্যের অবাধ গতিতে দীর্ঘ মনোনিবেশ বাধার সৃষ্টি করে—নাটকের অব্যাহত গতিকের স্থানান্তর করে দেয় স্বকীয় সৌন্দর্যের দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এর দ্বারাই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। জাপানী নো-প্রেজেন্ডো বা ঘটছে তার পাশে পাশেই থাকে একদল কোরাস—তারা স্বকীয় ধরনে গান গায়। নাটকের দৃশ্যভিত্তিক দৃশ্যের বর্ণনা করে, মতামত দেয়, নায়কের ভাবাবেগের ভাষা করে এবং সময় সময় অল্প কথায় “সংলাপে” অংশ গ্রহণ করে। আজকাল অনেক ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান নাটকে ভাষাকার এসে নাটক সম্বন্ধে মত প্রকাশ করেন।

In Brecht's “The Caucasian Chalk Circle” e.g. a singer or several musicians give lyric and epic explanations to the dramatic actions on the stage.

জার্মান কবি, শব্দতত্ত্ববিদ এবং অনুবাদক ফ্রাইডরিখ রুকার্ট সব প্রথম ইউরোপে সংস্কৃত নাটকের বিভিন্ন ঘটনামাত্রা সংক্রান্ত গাঠনিক দিকটা (multi-dimensional structure) আবিষ্কার করেন। কিন্তু দর্ভাগ্যবশত তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণগুলো তাঁর সমসাময়িকেরা গ্রহণ করেন নি। আসলে সে সময়ের জার্মান রঙ্গমঞ্চ এমন একটা পরিণতিতে পৌঁছয় নি যে, সংস্কৃত নাটকের যথাযথ মণ্ডরূপায়ণ করবে। ১৮৩৪ সালে রুকার্ট এইচ এইচ উইলসন কৃত কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তাঁর সমালোচনা করেন। তিনি বলেছিলেন এই সব অনুবাদে সংস্কৃত নাটকে শেক্সপীরের জ্ঞানময় গঠনাকর্মে দেওয়া হয়েছে। ফলে মূল নাটকের সঙ্গে অনুবাদের বৈষম্য দেখা দিয়েছে। রুকার্টের মতে:

The dialogue in them is certainly prose—even the emotions and the affects can only be expressed in prose. The verses are only outstanding flowers of phantasy, a collection of reflections on situations and emotions, but not the

bursts of emotions and therefore they are many pictures full of art, many little drawings forming an entity...The artistic composition of these verses bestows beauty and meaning on them; they stand for a chorus disintegrated so to speak embodied in each of the characters representing general features in particular circumstances.

রুকার্ট সংস্কৃত নাটকের অপভাষার কথা প্রমাণ করে দিলেন তাঁর সমালোচনায়। আর ঐ সব অপভাষার ওপর নির্ভর করেই এক সময় ফ্রাইডরিখ শিলার জার্মানীতে কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের মণ্ডরূপায়ণ

সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি এই ধারণায় এসেছিলেন (শকুন্তলায় ডারউইজেনস এবং জি ফরস্টার কৃত অনুবাদের ওপরই শিলারকে নির্ভর করতে হয়েছিল) ভারতীয় নাটকটির মণ্ডপ্রয়োগের অনুপযোগিতার কারণ হচ্ছে গতির অভাব—কারণ কবি কালিদাস গতিকে ব্যাহত করে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েছেন তাঁর নাটক শকুন্তলায়। শিলারের এই ভুল ধারণার জন্য দায়ী হচ্ছেন ইংরাজ অনুবাদক। ইংরাজী অনুবাদে নাটকে ছোট করতে গিয়ে কাব্যিক স্তরের বিভিন্ন ভাগকে এক করে ফেলা হয়েছিল এবং সংলাপে এপিক ও লিরিক বিস্তৃতির কোন প্রণয়ী বিভাগ করা হয় নি।

[কম্প]



চুল হবে দীর্ঘ, ঘন,
চিকন, চিকনিতর বশ।
চুলের গোড়া ঐ সুস্থ
সবল এবং মজিক
মিষ্ট রাখবে—

বেজল কেমিক্যাল-এর
পারফিউমড
তিল অয়েল

কসমেটিক ডিভিসন

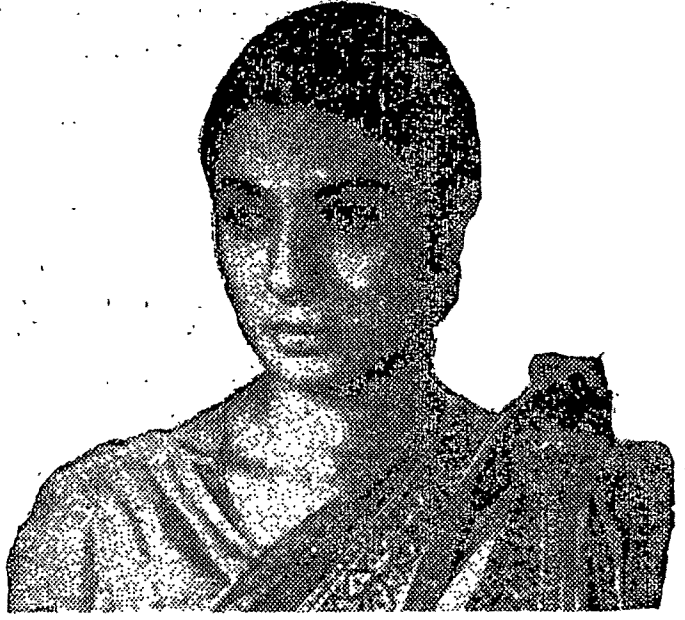
বেজল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী • মাদ্রাস

লোভের টাকা পিঁপড়েয় থায়

দুঃখিত কলকাতার একটি নামকরা থিয়েটারে নাটক দেখতে গিয়ে আসনের দুরবস্থার জন্য বড় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। যার জন্য নাটক উপভোগ করতে আসনটি অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। আসনটি ছিল ছেঁড়া, ভেতরের ফ্রেম বেরিয়ে এসেছে, ফলে ঘাড়ে যেমন লাগছে, তেমনি নারকেলের ছোবড়ার খোঁচায় বেশিক্ষণ একভাবে বসে থাকা দুঃসাধ্য ছিল। বেশি নড়াচড়া করলে পেছনের দর্শকের বিরক্ত হবার কথা, অথচ এক ঠাই বসে থাকারও উপায় নেই, কারণ নারকেল ছোবড়ার খোঁচা। অথচ আসনটি ছিল 'এফ' সারির, অর্থাৎ সামনের দিকে ছয় সারির। এই আসনগুলির টিকেটের দাম বেশি, সুতরাং দর্শকরা আরামে বসবার অধিকারী। সামনের দিকের সারিতে বসুন আসনের এই অবস্থা, তখন পেছনের সারির দর্শকদের কি হাল!

অথচ থিয়েটারগুলির আর্থিক অবস্থা এখন বেশ ভাল। প্রতিটি থিয়েটারে দর্শকের ভীড়। এ ছাড়া প্রতিদিন হলগুলি ভাড়া খাটে মোটা টাকায়। যে টাকা দেওয়া এখন অফিস ক্লাব ছাড়া ছোট দলের পক্ষে সাধারণত সম্ভব হয় না। প্রমোদকরের দিক থেকেও পেশাদার থিয়েটারগুলি কিছুটা সুবিধা ভোগ করে থাকে। আমি যে থিয়েটারের কথা বলছি এই থিয়েটারের যেমন নিজেদের নাটক, তেমনি হল ভাড়া দেবার ব্যাপারে এখন বেশ তেজী অবস্থা চলছে। থিয়েটারের মালিকও ধনী ব্যবসায়ী। তা হলে এই থিয়েটারের এত দৈন্য কেন? আসন ছেঁড়া, মাঝখানটায় পাখার হাওয়া তেমন পৌঁছয় না। কীট ও দুর্গন্ধনাশক পদার্থ দেওয়া হয় কি না—এ সব কথা না হয় তুললাম না।



লোকনাথ চিত্রশিল্পের 'রাজকুমারী' ছবিতে ভনুজা

সাধারণত সিনেমার তুলনায় থিয়েটারে টিকেটের দাম বেশি। নাটক-রসিকরা বেশি দাম দিয়ে টিকেট কেনেন। সুতরাং সিনেমার তুলনায় তাঁরা বেশি আরাম পাবার অধিকারী। বিশেষত যেক্ষেত্রে এখন থিয়েটার ব্যবসাটা বেশ তেজী চলেছে। অথচ একমাত্র স্টার থিয়েটার ছাড়া আর কোন থিয়েটারে তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই, আসনের ব্যবস্থাও তাচ্ছিল্যপূর্ণ। বিদেশী দর্শক এলে একমাত্র স্টার থিয়েটারেই থিয়েটার দেখানো চলে, সুযোগ থাকলে নিউ এম্পায়ারে। অথচ সারা ভারতে কলকাতার থিয়েটারের নামডাক এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু দর্শক আসেন কলকাতার থিয়েটার দেখতে। কিন্তু কলকাতার পেশাদার থিয়েটার মালিকদের ব্যবসাবুদ্ধি এত বেশি হয়েছে যে, দর্শকদের জন্য ভাল আসনের ব্যবস্থা করতেও

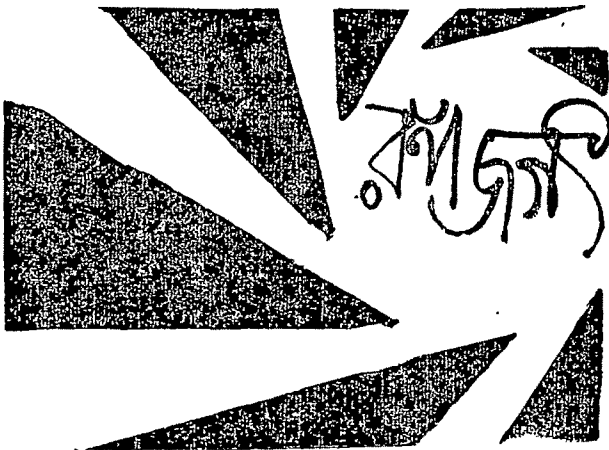
তাদের মন সরছে না। যে থিয়েটারের ব্যবসা-বুদ্ধির জন্য আমি নাটকটি ভাল করে উপভোগ করতে পারলাম না, সেই থিয়েটার সম্পর্কে কয়েকটি অফিস ক্লাবের বন্ধুরাও একই অভিযোগ ইতিপূর্বে করেছেন। অথচ এক সময় এই থিয়েটার হাতে নিয়ে মালিকরা দর্শকদের কত আরাম দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন; কয়েক বছর পরে দেখা যাচ্ছে—বড় লোকদের গাড়ি রাখার ব্যবস্থাটাই কেবল বেশিষ্টের পরিচয় দিচ্ছে। ...সুজন।

চিত্র আলোচনা

ইচ্ছাপুরণ

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'ইচ্ছাপুরণ'-এর চলচ্চিত্র রূপদান করেছেন পরিচালক মৃণাল সেন। এই ছবিটির প্রযোজনা করেছেন চিত্রশিল্প ফিল্ম সোসাইটি। সাত রীলের এই ছবিটি গত ২রা আগস্ট প্রাচী সিনেমায় ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিটি কিশোর ও তরুণদের ভাল লাগবে, বড়রাও বেশ আনন্দ পাবে। এক কথায় বলতে গেলে ছবিটি ভাল হয়েছে।

'ইচ্ছাপুরণ' গল্পের মূল চরিত্র এক দুরন্ত কিশোর, নাম তার গুদুশীল।



নামে স্দুশীল হলেও, ব্যবহারে সে একে-
বারে নামের উল্টো। শুল্ক পালানো,
রাত জেগে যাত্রা শোনা, বাবার পকেট
মেরে ছেলেদের লজেন্স খাওয়ানো
ইত্যাদি নিয়ে সে মেতে থাকে। বেতো
রোগী বাবা তাকে সামলাতে পারে না।
বাড়িতেও তা নিয়ে অশান্তি। অবশেষে
স্দুশীলের বাবার মনে এল ছোট-
কালের কথা। হায়, সে যদি স্দুশীলের
মত হত তা হলে এই অচল দেহ নিয়ে
টানাচ্যাঁচড়া করে চলতে হতো না।
আর একদিকে স্দুশীল ভাবছিল সে যদি
বাবার মত বড় হতো তা হলে তাকে
শাসন করার কেউ থাকতো না। ইচ্ছা-
পূরণ দেবী দ্ব'জনার মনের কথা
জানতে পেরে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ
করে দিলেন। ফলে বাবা হলো
স্দুশীল, আর স্দুশীল হলো বাবা।
বুড়ো লোকটা ছেলের মত আচরণ
করতে থাকলো, তা দেখে পাড়ার লোক
নিন্দে করতে শুরু করলো। আর ছোট
ছেলে স্দুশীল হুকো হাতে রাস্তায়
এলে পাড়ার লোক ছিঃ ছিঃ করতে
লাগলো। আর একদিকে স্দুশীলের
শাসনে বাবা অস্থির হয়ে উঠলো।
তখন দ্ব'জনারই মনে এল আগে যা
হিলাম তাই ভাল ছিল, যদি আগের মত
হতে পারতাম। ইচ্ছাপূরণ দেবী এই
প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন। ছেলেরা
ছেলেদেরই মতন আচরণ করবে,
বড়রা বড়দের মত। কোন ক্ষেত্রেই
বাড়াবাড়ি ভাল নয়; ছেলেদের মনকেও
বুঝে শাসন করা উচিত।

ছোট গল্পকে রূপমান করা কঠিন।
বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত লেখকের।
গল্পের পরিধি ও চরিত্রগুলি সীমা-
বদ্ধতার মধ্যে যদি রাখা সম্ভব না হয়,
তা হলে পরিচালককে কিছুটা
স্বাধীনতা নিতে হয়, কিন্তু সেই
স্বাধীনতা মূল গল্পকারের রসবোধ,
মেজাজ ও রচনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ
কি না সেই প্রশ্ন ওঠে। এখানে
পরিচালক কয়েকটি চরিত্র ও পরিবেশ
সৃষ্টি করেছেন গল্পের বিস্তৃতির জন্য।
গল্পের বিস্তৃতি সে কারণে উপভোগ্য
হয়েছে।

ছবিতে বাবার চরিত্রে অভিনয়
করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, এক বেতো
রোগী বয়স্ক লোকের চরিত্রে তিনি
চমৎকার অভিনয় করেছেন, তবে কোন
কোন ক্ষেত্রে একটু মাত্রাধিক মনে
হয়েছে। স্দুশীলের চরিত্রে কিশোরীটির
অভিনয় প্রশংসনীয়। মায়ের ভূমিকা
নিয়েছেন শোভা সেন। ছবিটির চরিত্র
ও গ্রামের পরিবেশ রূপায়ণে পরিচালক
বাস্তববোধ সর্বত্র রক্ষা করেছেন।
চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির ছবি-



হিন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে 'আলো ও ছায়া' ছবির নেপথ্য গায়িকা মীন্য
মুখোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিচ্ছেন বিজয় পাল।

গুলির মধ্যে 'ইচ্ছাপূরণ' ছেলে-
মেয়েদের কাছে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি
করাব।

তিন অঙ্কের নতুনভাবে সাজানো
এই নাটকটি পরিচালনা করেছেন
তরুণ রায়।

মণ্ডাভিনয়ে উত্তমকুমার

জনমলজয়ী শিল্পী উত্তমকুমার
বহু বছর পরে আবার মঞ্চে অভিনয়
করবেন বলে জানা গেল। নাটকটির নাম
"আলিবাবা"। শিল্পী সংসদের
প্রবোজনায় নাটকটি আগামী
২১শে আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায়
রবীন্দ্র সদনে অভিনীত হবে।
"আলিবাবা" নাটকে উত্তমকুমারের সঙ্গে
আর ষাঁরা অভিনয় করবেন তাঁদের মধ্যে
আছেন—মালিনা দেবী, দীপক মুখার্জী,
গুরুদাস ব্যানার্জী, রূপক মজুমদার,
অমর মুখার্জী, প্রভাত ঘোষ ও
জয়ন্তী সেন।

শিল্প ও শিল্পীর তিনটি একাঙ্ক

আগামী ১০ই আগস্ট মৃত্ত অঙ্গনে
কলকাতার সুপরিচিত নাট্যসংস্থা শিল্প
ও শিল্পী তিনটি একাঙ্ক নাটকের
চতুর্থ অভিনয় মণ্ডস্থ করছেন।
নাটক তিনটি যথাক্রমে মোহিত চট্টো-
পাধ্যায়ের "বাজপাখী", মনোজ মিত্রের
"কালবিহঙ্গ" এবং ক্রিফোর্ড ওডেতের
"ওয়েটিং ফর লেফটিং" অনুপ্রাণিত
"বিজয়ের অপেক্ষায়"; নির্দেশনার
দায়িত্বে আছেন শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভদ্র।

কৌশিকী

আগামী ১৮ই আগস্ট কৌশিকী
সংস্থা মিনার্ভা মঞ্চে দুটি একাঙ্ক নাটক
মণ্ডস্থ করবে। নাটক দুটি হল সমর

নাটকের কথা

অনুশীলন সম্প্রদায়ের এক একা

অনুশীলন সম্প্রদায় আগামী
উনিশে আগস্ট বুধবার সন্ধ্যা সাতটায়
মৃত্ত অঙ্গনে সর্বত্র নন্দীর নির্দেশনায়
আবার তাঁদের বহু প্রশংসিত নাটক
জাঁ পল সায়েঁর একদা সারা বিশেষ
আলোড়ন সৃষ্টিকারী "ক্রাইম-
প্যাসনেল"-এর ছায়া অবলম্বনে রচিত
"একা একা" মণ্ডস্থ করছেন।

ঘোড়শী

কাশী বিশ্বনাথ মণ্ডঃ—স্বাধীনতা
দিবসে ১৫ই আগস্ট দুটি বিশেষ
অভিনয় রজনীর ব্যবস্থা করেছেন।
শরৎচন্দ্রের "ঘোড়শী" প্রায় এক যুগ
পরে মণ্ডস্থ হবে। জীবানন্দ চৌধুরীর
ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন তরুণ রায়।
এককড়ি—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঘোড়শী—
দীপান্বিতা রায়। এছাড়া রবীন
মজুমদার, পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, অজিত
মিত্র, সমরেশ চক্রবর্তী, রিটা পলিন
প্রমুখ শিল্পীরা বিভিন্ন চরিত্রে রূপ
দেবেন।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমের ছক্সা-পাজার ছায়া। অবলম্বনে রচিত বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের “প্রেমতত্ত্ববোধিনী সংঘ” ও সিরাজ চৌধুরী রচিত “বিস্ফোরিত বিবর”। দুটি নাটকই পরিচালনা করবেন বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবারের বিকেল
অনুভব নাট্যসংস্থার প্রখ্যাত প্রযোজক “শনিবারের বিকেল”-এর দ্বাদশ অভিনয় অনুষ্ঠিত হবে ১৬ই আগস্ট, রবিবার, মৃত্ত অঙ্গনে, সকাল সাড়ে দশটায়। নির্দেশনায় শ্রীদীপেন্দ্র সেনগুপ্ত।

স্টুডিও খবর

মহাকবি কৃত্তবাস

রামায়ণ চিত্রমের প্রথম নিবেদন বাংলার আদিকবি, কৃত্তবাসের পুণ্যময় জীবনকাহিনী। কৃত্তবাসই রামায়ণ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিদ্যমান সৃষ্টি, কৃত্তবাস লোকপ্রিয়, জনগণের কবি। তাঁর সহজ সরল কাব্যগাথা বাঙালীর ঘরে ঘরে যে আনন্দ-সুখা ভরে দিয়ে গেছে, তা মহাকালের স্পর্শ বাঁচিয়ে আজও আমাদের জাতীয় জীবনকে বেঁধে রেখেছে ভাব, ভাষা ও প্রেমের বন্ধনে। আদিকবির রসমধুর জীবনকাহিনীকে চিত্রে রূপ দিয়েছেন “লবকুশ” খ্যাত চিত্র পরিচালক অশোক চ্যাটার্জী।

এই সংগীতবহুল ছবিটিতে মুরারোপ করেছেন—শ্রীমতী: বিজন ঘোষদত্তদার, নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—মাল্লা দে, হেমন্ত মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, প্রসূন ব্যানার্জী, আরতি মুখার্জী, চন্দ্রাণী মুখার্জী, পিণ্ডু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, মাধবী রক্ষ, অধীর চ্যাটার্জী, অমর পাল, শিবানী পাল।

কৃত্তবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া, রাজা গণেশের রাজধানী গোড় এবং অযোধ্যায় “মহাকবি কৃত্তবাস” ছবিটির বহু বাহিদৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন—অসীমকুমার, অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন—লিলি চক্রবর্তী, সুমন মুখার্জী, তরুণকুমার, পদ্মা দেবী, সুখা সরকার, কল্যাণী মন্ডল, গীতা প্রধান, রবীন ব্যানার্জী, সুমিত্রা মিত্র, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ভোলানাথ ব্যানার্জী, পশু-শক্তি কুন্ডু, ভবরূপা ভট্টাচার্য, অশোক সেন, চিত্রাণী মুখার্জী, মঞ্জুলা মুখার্জী,

গাথাবক বসন্ত

বেচু সিংহ, পটানন ব্যানার্জী, কল্ল রায় প্রভৃতি।

অধেন্দু চ্যাটার্জী ছবিটির প্রধান সম্পাদক, নৃত্যাংশে আছেন—“গোপী-কৃষ্ণ” ও “সুদমিত্রা মিত্র”।

শ্রীরঞ্জণ পিকচার্স-এর পরিবেশনায় ছবিটি শহর ও শহরতলীর বিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

নলদময়ন্তী

গোপালকৃষ্ণ রায় পরিচালিত জে এস ফিল্ম প্রোডাকসন্সের “নলদময়ন্তী” ছবিটি সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহে বীণা, বসুধী, মিত্রা ও শহরতলীর অন্যান্য চিত্রগ্রহণসমূহে মুক্তিলাভ করবে।

বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত মহা-ভারতের অমর প্রেমকথা—“নলদময়ন্তী”র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন—মণি বর্ম। সংগীতাংশ ছবিটির অন্যান্য অনেক আকর্ষণের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। কালীপদ সেনের সুদূর ছবিটিতে কণ্ঠদান করেছেন—মাল্লা দে, সতীনাথ মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিত্র, গীতা দাস ও গঙ্গা দে। বিশ্বনাথ নায়ক ছবিটির প্রধান সম্পাদক।

প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—রবীন ব্যানার্জী, জহর রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, গঙ্গাপদ বসু, দীপিকা দাস, রৈগুদা রায়, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মুখার্জী, গীতা দে, লীলাবতী দেবী, পদ্মা দেবী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, ইন্দিরা দে, লীনা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দে, সীমা ভৌমিক, ধীরাজ দাস, গোপী চক্রবর্তী, রঞ্জা ঘোষাল, নবাগতা জয়ন্তী, সুদীনেশ ভট্টাচার্য, অজিত ব্যানার্জী, তপন চ্যাটার্জী, সুমন মুখার্জী, জীবনকুমার, স্বর্ষি ব্যানার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, অধেন্দু ভট্টাচার্য, কম্পনা দাস, ঋতা চক্রবর্তী ও শতাধিক শিল্পী।

পারফেক্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর প্রাঃ লিঃ ছবিটির পরিবেশক।

আজব শহর

রবীন বোস প্রডাকসন্সের প্রথম নিবেদন “আজব শহর”। এই ছবির কাহিনীকার গৌর শী। ছবির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সংগীত পরিচালক—ব্রজেন মুখোপাধ্যায়, কথা—বীরেন ভট্টাচার্য, কণ্ঠসংগীতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ব্রজেন মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত। শিল্প নির্দেশনায়—সুধীর খান। সম্পাদনায়—রমেশ ঘোষা। চিত্রগ্রহণে—শক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন—সবিত্রী উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, মঞ্জু দে, অনুপকুমার, গীতা



‘রাজপুত্র’

মুকুভিনেতা যোগেশ দত্ত

দে, সুব্রতা চ্যাটার্জী, তানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, সুশীলা চক্রবর্তী, শ্যাম লাহা, অজিত চ্যাটার্জী, নূপতি চ্যাটার্জী, মুকুভিনেতা তপন দত্ত, অনু দত্ত, শীতল ব্যানার্জী, বেণু সেনগুপ্ত, কান্দু মুখোপাধ্যায়, অমর বিশ্বাস এবং এই ছবির বিশিষ্ট ভূমিকায় বোসের একজন অভিনেত্রীকে দেখা যাবে। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন রবীন বোস।

আলো ও ছায়া

গুরু বাগচীর পরিচালনায় শরৎ চন্দ্রের “আলো ও ছায়া” ছবিটির কাজ ক্যালিফোর্নিয়া স্টুডিওতে চলছে। গত ২৫শে জুলাই ইন্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে সংগীত রেকর্ড করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সংগীত পরিচালক বিজন পালের আরোজিত সুদূর গান গিয়েছেন সুধীর সরকার, বেলা পাল, হেমন্ত মুখার্জী, মঞ্জুশ্রী কুন্ডু, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও মীনা মুখার্জী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন নান্দিনী মালিয়া, দিলীপ রায়, জুই ব্যানার্জী, পদ্মাদেবী, আনন্দ মুখার্জী, আশা দেবী, প্রমুখ।

মর্শিদাবাদ

মর্শিদাবাদ মিউজিক কলেজের সমাবর্তন উৎসব

গত ২৭শে জুন ৭০ মর্শিদাবাদ মিউজিক কলেজের বাৎসরিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পোরো-হিতা করেন—লালবাগ মহকুমার শাসক কুমারী আর মিত্র, আই. এ. এস. প্রধান আতিথ্য গ্রহণ করেন—মর্শিদাবাদ জেলা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক শ্রী বি. আর.

শ্রীমতী এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী কে. ক্যানার্জী কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ডিপ্লোমা, ডিগ্রি ও অভিজ্ঞানপত্র দান করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ লক্ষ্ণৌ-এর পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই মহাবিদ্যালয় থেকে সঙ্গীত প্রথমায় ১ জন, সঙ্গীত মধ্যমায় ৬ জন, সঙ্গীত বিশারদ-এ ২ জন এবং নৃত্য মধ্যমায় ৩ জন ছাত্র-ছাত্রী সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে এবং নৃত্য মধ্যমায় সর্ব-ভারতীয় পরীক্ষায় এই মহাবিদ্যালয় থেকে কুমারী কৃষ্ণা আচার্য, কুমারী চন্দ্র আচার্য এবং মধুমিতা নন্দী যথাক্রমে প্রথম বিভাগে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

হরিন্দাস শ্রীমতী সঙ্গীত সংসদের
দ্বিতীয় সঙ্গীতানুষ্ঠান

৬৭-ই বিডন স্ট্রীটস্থ রামদুলাল সরকার মঞ্জিল-এ গত ২রা আগস্ট হরিন্দাস শ্রীমতী সঙ্গীত সংসদ-এর দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গেলো। ঐ অনুষ্ঠানে সংসদের সম্পাদক শ্রীমতীকুমার মধুপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণের পর সভাপতি শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল স্বর্গত সঙ্গীত্যাচার্য হরিন্দাস মধুপাধ্যায়ের স্মৃতিস্মরণ সঙ্গীতজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

ঐ আসরের প্রথম শিল্পী শ্রীবৃন্দ-দেব দাশগুপ্ত সরোদ বাজিয়ে শোনান। তিনি রাগ ইমন ও কাফি ও পরে ঠুংরী পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় শিল্পী ছিলেন আশ্রা ঘরানার প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী শ্রীকুমার মদ্যাজী। তিনি প্রথমে জয়জয়ন্তী রাগে খেয়াল ও পরে কতকগুলি ঠুংরী শোনান। শ্রীমহেশ-প্রসাদ মিশ্র সারোঙ্গীতে তাঁর সুনাম শঙ্কর রাখেন। তরুণ তবলীয়া শ্রীগোবিন্দ বসু উভয় শিল্পীর সাথে তবলা সহযোগিতায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বাক্ষর রাখেন।

সংবাদ
কলা

সোভিয়েত শিল্পার কণ্ঠে ভারতীয় কাব্যের আবৃত্তি

মস্কোর স্টেট ফিলহারমোনিক সোসাইটির শিল্পী শ্রীমতী ইরিনা চিজোভা ভারতীয় কাব্য আবৃত্তিতে খ্যাতি অর্জন করেছেন, এ খবর দিয়েছে এ. পি. এন।

শ্রীমতী চিজোভার অনুষ্ঠানের নাম



‘রূপসী’ ছবিতে সন্ধ্যা রায়

হল “ভারত—প্রাচীন থেকে আধুনিক-কাল”। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি আবৃত্তি করে শোনান “মহাভারত” থেকে “নল-দময়ন্তী”র উপাখ্যান, তা পৃথক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় শতাধিক বছর আগে রুশ অনুবাদে। অনুবাদ করেন তৎকালীন বিশিষ্ট কবি ভ্যাসিলি বুকোভস্কি। কালিদাসের “শকুন্তলা”র রুশ অনুবাদ করেছিলেন বিশিষ্ট কবি ব্যালমন্ড। রবীন্দ্র-রচনাবলীও বিভিন্ন খণ্ডে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শ্রীমতী চিজোভা তাঁর প্রকাশভঙ্গী ও অভিব্যক্তিতে ভারতীয় কাব্যের ব্যঞ্জনা এমনভাবে ফুটিয়ে তোলেন যে, শ্রোতাদের কাছে সেগুলির আবেদন সজীব হয়ে ওঠে।

শ্রীমতী চিজোভা আজ প্রায় ১৫ বছর ধরে আবৃত্তি-শিল্পী হিসেবে সোভিয়েত শ্রোতাদের চিত্ত জয় করে আসছেন। স্টেট ইনস্টিটিউট অব থিয়েট্রিক্যাল আর্টের ছাত্রী অবস্থাতেই তিনি মস্কো আর্ট থিয়েটার কোম্পানীর শিল্পী হিসেবে কাজ করেন।

কলাম্বিনেরে মোগেশ দত্তের মৃকাদিনয়

গত ১লা আগস্ট কলাম্বিনেরে ভারতীয় মৃকাদিনয়ের পথিকৃৎ শ্রীমোগেশ দত্তের একক মৃকাদিনয় অনুষ্ঠিত হলো। শ্রীদত্তের এবারের মৃকাদিনয়ের মান উন্নততর। তিনি কয়েকটি নতুন মৃকাদিনয় পরিবেশন করেন। বহু দর্শক স্থানাভাবে ফিরে যান। শিল্পীর এই একক প্রচেষ্টা আমাদের দেশের মৃকাদিনয় মানকে অনেক

উন্নত করেছে। আলো ও মঞ্চ তাপস সেন ও সুব্রহ্ম দত্ত, আবহসঙ্গীতে হিমাংশু বিশ্বাস, পোশাকে খালেদ চৌধুরী ও রূপায়ণে অনন্ত দাশ—এরা সকলেই নিজ নিজ সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

“ফিল্ম সোসাইটি সংবাদ”

মিনে সেন্ড্রাল, ক্যালকাটা এ মাসের ৯ তারিখে ম্যাজেস্টিক প্রেক্ষাগৃহে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের “স্টস্ আন্ডার দি গ্যালোজ” ছবিটির এবং ১৩, ১৪ এবং ১৬ তারিখে সরলা রায় মেমোরিয়াল কমিউনিটি হলে “ট্রেন উইদাউট টাইম টেবল” (মৃগোসলাভিয়া) এবং “এ বম্ব ওয়াজ স্টেলেন” (রুম্যানিয়া) ছবি দুটির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

বলাকার মিলনোৎসব

গত ৫ই আগস্ট মহাজ্ঞাত সদনে ‘বলাকার’ বার্ষিক মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসবে এ বছর যাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের কয়েকজনকে সম্বর্ধনা জানান হয়েছে। অভিনন্দিত হয়েছেন দেবাশিস গুহ, দেবাশিস বসু, আশিস রায় ও গোতম রায়। এই মিলনোৎসব উদ্বেগধন করেন ডঃ রমা চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেছেন বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিশ্র, আর বক্তৃতা দিয়েছেন ডঃ দিলীপ মালেকার।

সংস্থার পক্ষ থেকে বার্ষিক ক্রীড়া, সঙ্গীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। তার পরে রবীন্দ্র, নজরুল ও অতুল-প্রসাদের গানের আসর হয়।

ফ্রেন্সের রাজার রাজা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩৪ সালে ভারত ভ্রমণ শেষ করে ইংল্যান্ড দল ফিরে গেল। ফিরে গেল রাবার জয় করেই। জার্ডিনের নেতৃত্বে শক্তিশালী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত তীর প্রতিপত্তি গড়ে তুলতে পারে নি বটে—কিন্তু ঐ সময়ের ফলে ভারত যা পেয়েছে তাও খুব একটা কম নয়। ১৯৩২ সালে টেস্ট ক্রিকেটের আসরে যাত্রা শুরুর করলেও ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভারত বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসরে ভারত তখন নিজের আসনটা পাকা করে নিয়ে চলেছে।

অবশ্য এর পেছনে ছিল ইংল্যান্ডের অনেক নামকরা খেলোয়াড়দের অবিস্মরণীয় অবদান। এঁদের মধ্যে সি. বি. হুই, হ্যারল্ড লারউড, উইলফ্রেড রোজস, জর্জ হার্ট প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ভিজয়ানা গ্রামের মহারাজকুমারের চেষ্টায় জ্যাক হবস, সার্ভিক প্রভৃতিরও বারবার ভারতে এসেছেন খেলতে।

ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির পেছনে যাঁদের অবদান ছিল, সব থেকে বেশি তাঁদের মধ্যে ফ্রান্স টেস্টের নামই করতে হবে সবার আগে। টেস্ট ছিলেন সে-যুগের নাম করা খেলোয়াড় আর কোচ। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে বসবাস শুরুর করে তিনি খেলোয়াড়েন মিডল-স্ট্রোকের পক্ষে। তারপর ভারতে এসে যাঁধলেন ঘর আর সেই সংগে ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে মন-প্রাণ ঢেলে আরম্ভ করলেন কাজ করতে। আর তাঁরই হাতে তালিম নেওয়া দল ১৯৩২ সালে ইংল্যান্ডে গিয়ে সকলকে চমকে দিয়ে এলো।

আর তারপরই ভারতীয় ক্রিকেটের আগ্রহে নেমে এলো সেই চরম

দিনটি। এ শব্দ ভারতীয় ক্রিকেটই নয়—বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে সেই দিনটির কথা চিরকাল কালো অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ক্রিকেটের রাজপুত্র, বিশ্বক্রিকেটের প্রাণ-পুরুষ রণজিৎ সিংজী মারা গেলেন।

প্রিন্সেস প্রোটেকশ্যান বিল পাশ করিয়ে রণজিৎ ফিরে এলেন জামনগরে। দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২৭শে মার্চ। ক্রান্ত রণজিৎ। প্রচণ্ড পরিগ্রামের ফলে বিপর্যস্ত। রণজিৎ যেন বদ্বতে গেরে-ছিলেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে।



দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল। ঠিক রাত তিনটের সময় সকলকে কার্দিয়ো যেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময়, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ রণজিৎ সিংজী।

স্টেশনে দিগ্বিজয় সিংজীকে সংগে নিয়ে রণজিৎ সমস্ত রাজধানীটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। যেন আর ফোনদিন দেখতে পাবেন না—যেন এই তাঁর শেষ দেখা—দিগ্বিজয় সিংজী কিন্তু রণজিৎ মনোভাবের কিছুই বদ্বতে পারলেন না। কথা ছিল ওখান থেকে খুব শীঘ্রই রণজিৎ ইংল্যান্ডে যাবেন। তাই দিগ্বিজয় জানালেন যে, স্টেনসের বাড়ি গুঁছিয়ে রাখার জন্যে দেওয়ান সাহেব ইংল্যান্ডে চলে গেছেন আর তাঁর যাত্রার সব কিছুই গুঁছিয়ে রাখা হয়েছে।

দিগ্বিজয়ের কথার কোন উত্তর দিলেন না রণজিৎ। কি উত্তরই বা দেবেন। তিনি যেন তাঁর ভবিষ্যৎ, দিন-খন সব কিছু জেনে বসে আছেন—তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যেন অজানা আর কিছুই নেই। তাই দিগ্বিজয় সিংজীর কথা শুনে রণজিৎ মূগে খেলে গেল স্নান হাসি। কিন্তু সেই হাসির অর্থের ছিটেফোঁটাও ধরতে পারলেন না দিগ্বিজয়।

পথে দিগ্বিজয়কে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে শুরুর করলেন রণজিৎ। কোথায় বাজার হবে, কোথায় ব্যাংক হবে, কোথা দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি করতে হবে সব কিছু বলে দিলেন।

দিগ্বিজয় ভাবলেন, রণজিৎ তো বেশ কিছুদিনের জন্যে ইংল্যান্ডে চলে যাচ্ছেন। তাই সব কিছু তার ভার তিনি তাঁরই উপর দিয়ে যাচ্ছেন। দিগ্বিজয়ের মনের ভাব বদ্বতে এতোটুকুও দেরী হলো না রণজিৎ। কিন্তু তিনি একটা কথাও বললেন না। শব্দ তাঁর মুখে লেগে থাকলো স্নান সেই হাসির ছিটে.....।

রাতিরে শোবার আগে আত্মীয়-স্বজন সকলকে ডাকলেন রণজিৎ। সকলের

সাম্প্রতিক বঙ্গমতী

সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা বললেন। এক-একজনকে নিয়ে গেলেন এক-এক রকমের উপদেশ। কার কি করতে হবে, না হবে তাও জানাতে ভুললেন না।

আসল কথাটা কেউ কিন্তু বুঝতে পারলেন না। দীর্ঘবয়সের মতো সকলেই ভাবলেন যে, রণজি ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন, হয়তো অনেকদিন থাকবেন। তাই তাঁদের বলে যাচ্ছেন এই সব কথা। তাই তাঁদের দিয়ে যাচ্ছেন এমন সব উপদেশ।

সে ভুল ভাঙতে কিন্তু খুব একটা বেশি দেরী হলো না। রাত না গোহাতেই জামনগরের বড় বড় ডাক্তাররা ছুটে এলেন রাজপ্রাসাদে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে—রণজি অসুস্থ। রোগ উপশমের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বেড়েই চলেছে ধীরে ধীরে। শব্দ ভারত নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রণজির অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে বেন মরিয়্যা হয়ে উঠলেন সকলে।

ওদিকে তখন যমের সংগে চিকিৎসকদের চলেছে তাঁর লড়াই। যে মানদুর্ঘট চিরজীবন সোজা ব্যাটে খেলে গেছেন, যে মানদুর্ঘট কোনদিন কাউকে পরোয়া করেন নি—মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু সৈবিনও ছিলেন নির্বিকার। তাঁর মুখে লেগেছিল শ্লান হাসির ছটা।

নাকি এও ছিল রণজির কাছে খেলাই.....!

ব্যাট হাতে নিয়ে যিনি চিরজীবন লড়াই করে গেছেন ক্রিকেটকে সামনে রেখে, তিনি যেন শব্দে শব্দে দেখছিলেন তাঁকে সামনে রেখে যমের সংগে মানদুর্ঘের লড়াই-এর দৃশ্যগুলো।

দীর্ঘ পাঁচদিন ধরে চললো এই লড়াই। তারপর.....তারপর এসে গেল সেই মুহূর্ত।

দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল।

ঠিক রাত তিনটের সময় সকলকে কাঁদিয়ে যেন হাসতে হাসতে চলে গেলেন বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় আর ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাণপুরুষ রণজিৎ সিংজী...!

রণজির মৃত্যুর ক্ষতি নিরূপণ করতে যাওয়া বাতুলতা। যা গেল তা আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু তিনি যা দিয়ে গেলেন, আমাদের জন্যে তিনি যা রেখে গেলেন—ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে যে কতো বড় পাওয়া, তা জানতে আজ আর বোধ হয় কারোরই থাকী নেই।

রণজির মৃত্যু সংবাদে সমস্ত বিশ্ব নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। চোখের

জলে ভেসেছিল জামনগরের জনগণ। ভারতীয় কাগজগুলোর কথা ছেড়ে দিলাম, বিদেশী সংবাদপত্রে রণজির মৃত্যু সংবাদের প্রচারিত খবরের সামান্য অংশ তুলে দিলেই বোঝা যাবে তাঁদের চোখে রণজি ছিলেন কতো ওপরে। সমস্ত বিশ্ববাসীর ভালোবাসা, শ্রদ্ধা লাভ করে রণজি বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে যে কতো বড় করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তার কথা ভাবলেও অবাক হতে হয়!

রণজির মৃত্যু সংবাদ দিয়ে দি মর্নিং পোস্ট যে সংবাদ পরিবেশন করেছিল, তার থেকে সামান্য অংশ তুলে দেওয়া হলো—

“...East and West met in him ; what a glorious innings his life has been! In the present crisis in the fortunes of India the loss of his statesmanship first of all will be lamented....”

‘ম্যাগেস্টার গার্ডিয়ান’-এ প্রকাশিত বিস্তারিত বিবরণ ও রণজি সম্বন্ধে প্রকাশিত লেখার কিছু অংশ—

“...Modern lovers of the game, jealous of their own heroes will no doubt tell us that Ranji, like all other masters, was a creation of our fancy in a world old fashioned and young. We who saw him will keep silence as the sceptics commit their blasphemy. We have seen what we

have seen. We can feel the spell yet....”

রণজি আর নেই। ভারতীয় তথা বিশ্ব ক্রিকেট রণজিহারা—এ কথা ভাবতেও কেমন লাগে। ঠিক যেন বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু তাই বলে চূপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। রণজির স্মৃতিরক্ষার জন্যে যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

এমন একটা কিছু করতে হবে—যার মাধ্যমে রণজি চিরকাল আমাদের মধ্যে বাস করবেন। ক্রিকেটের রণজির স্মৃতিরক্ষার সব থেকে ভালো উপায় হলো ক্রিকেট খেলার সংগেই রণজির নাম যুক্ত করে রাখার ব্যবস্থা করা। আর সেই ব্যবস্থা করারই ভার পড়লো ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওপর।

অনেক আলাপ, অনেক আলোচনার পর ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ করলেন রণজির নামে একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। রণজির স্মৃতিরক্ষার জন্যে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে রণজিৎ সিংজী চিরকাল ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনের মণিকোঠায় বাস করবেন। কেউ কোনদিনই তাঁকে ভুলে যাবেন না। সকলের মনের মন্দিরে চিরকাল থাকবে রণজির নাম।

তারই জের টেনে ১৯৩৪ সালে শুরুর হলো সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—সেই প্রতিযোগিতার পুরস্কার রণজি ট্রফি। আর খেলাগুলোর নাম হলো রণজি ট্রফির খেলা।

[চলবে]

শ্রীঅচৈতন্য-এর অনন্ত রচনা—

দুই খণ্ড **ছিন্ন চিন্তা** প্রতি খণ্ড ২-২৫ টাঃ

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—“...এই লেখাগুলো কখনো ডায়েরীর ধরনে, কখনো পত্রের আকারে, কখনো বা কোনো ভাবনার অভিব্যক্তিতে। পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের ‘ছিন্নপত্র’ মনে আসে, পাস্‌কালের ‘পাসে’র রচনার উপলব্ধি আসে।...পড়তে পড়তে বার বার পাঠক লেখকের প্রাণের স্পর্শ পাবেন, পরিতৃপ্তির একটা মৃদু স্বাদ মনকে ভরে দেবে।...”

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—“গ্রন্থখানির চিন্তার স্বচ্ছতা বিশেষ প্রশংসার। পড়তে পড়তে মনে হয় যেন বই পড়ছি না, কারো সঙ্গে আলাপ করছি।...”

‘দেশ’, ‘অমৃত’ প্রভৃতি পত্রিকা এবং বহু প্রখ্যাত সাহিত্যিক কর্তৃক প্রশংসিত।

পরিবেশকঃ (১) জ্ঞানতীর্থ, ১, বিধান সরণী, কলি-১২, (২) প্যারাদাইস বুক কোম্পানী, ১৯, কলেজ স্ট্রীট, কলি-১২।



মরছে—মরবে

কলকাতা ময়দানের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠছে। খেলা আজ আর খেলা নেই। ফুটবল খেলার মান দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। আর তারই সংগে পালা দিয়ে বেড়ে চলেছে অসন্তোষ, অরাজকতা আর সৃষ্টি হচ্ছে অভাবনীয় সব পরিস্থিতি। সবগুলো এক করে খোলা চোখে একটু দেখলেই বোঝা যাবে যে, আজ আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, একটা চক্রাবর্তের মধ্যে কলকাতার ফুটবল শব্দ ঘুরছে আর ঘুরছে। কিছুতেই আর বেরুতে পারছে না সেই আবর্তের মধ্যে থেকে। কিন্তু এই আবর্ত যে ফুটবলের মৃত্যু, আর কলকাতা ফুটবল যে মরছে, এ কথা কেউই আজ আর ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করেন না। আই. এফ. এ কতৃপক্ষের দুর্বলতা আর কলকাতার বড় বড় দলগুলোর কর্মকর্তাদের খামখেয়ালীপনা এবং একগুয়েমীই কলকাতা ফুটবলের অন্তিম অবস্থার জন্যে দায়ী। আই. এফ. এ কতৃপক্ষ সব সময় তাকিয়ে থাকেন কলকাতার প্রধান তিনটি দলের দিকে। আর তারই সুযোগ তারা নেন পুরোদমে। তারা জানে যে, তাদের বাদ দিলে কলকাতার ফুটবল কাগা, তাদের না হলে কলকাতার ফুটবল অজল, তাই আই. এফ. এ চায় তাদের হাতে রাখতে। কিন্তু হাতে রাখতে গিয়ে আই. এফ. এ-ই আজ হয়ে গেছে ওদের হাতের পুতুল।

পুতুল তো! তা না হলে একটি বিশেষ দল কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলা নিয়ে বার বার কেন ছেলেমানুষী করছেন? রেফারীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন কিম্বা খেলার মাঠেই খেলা ছেড়ে রেফারীকে ঘেরাও করছেন—কই তাদের বিরুদ্ধে তো কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি! ছোট কিম্বা মাঝারি দলগুলোর বিরুদ্ধে বড় দলগুলো গোল করতে না পারলে মাঠে ঢিল ছুড়ে হোক কিম্বা যে-কোন ভাবেই হোক, খেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। যারা বন্ধ করে দিচ্ছে তারা ভাবছে আজ পারে নি তাতে কি—আবার খেলা তো হবেই, তখনই না হয় গোল দেওয়া যাবে। তাই যেভাবেই হোক খেলা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা অনেক পুরোন, তাই আই. এফ. এ কতৃপক্ষেরও অজানা নয়। কিন্তু আই. এফ. এ কতৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে কিছু করার বা বলার প্রয়োজন তো অনুভব করছেন না। অথচ অনেক আগেই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরকার ছিল। শব্দ তাই নয়—কলকাতার ফুটবলকে বর্তমানের এই অরাজক অবস্থার হাত থেকে বাঁচাতে হলে এর প্রতিবিধানের একটা ব্যবস্থা এখনই করা উচিত। কিন্তু তা যে হবে না, সে কথা সকলেরই জানা। কারণ, যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, আই. এফ. এ যে তাদেরই হাতের পুতুল। সুতরাং কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই—একমাত্র জীড়া উৎসাহীদের প্রত্যক্ষ আন্দোলন ছাড়া। শেষ পর্যন্ত কি সেই পথেই নামতে হবে আমাদের? নাকি কলকাতার ফুটবল মরছে, কলকাতার ফুটবল মরবে—আর সেই দৃশ্যগুলো আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো.....!! —শান্তিপ্রিয়।

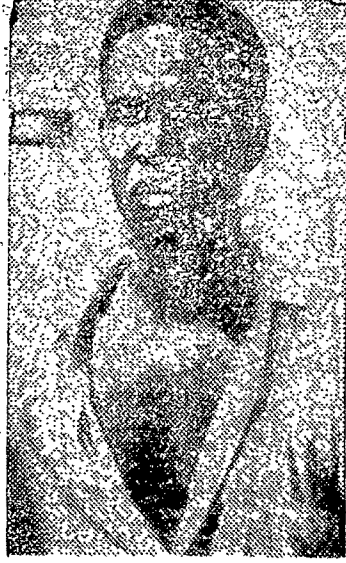
ফুটবল

কলকাতার ফুটবল মরশুমের ওপর এখন চলেছে ভাটার ঢাল। ভারত এখন খেলছে কুয়ালালামপুরের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায়। কলকাতার কয়েকটি দল গেছে গৌহাটিতে, বড়দলো জঁফতে আর নওগাঁয় ইন্ডিপেনডেন্স জে কাপে খেলতে। এ ছাড়া কলকাতা, ময়াদানার মেজো, সেজো, আর ছোট-অনেকগুলো দলের লীগের খেলার পালা হয় শেষ হয়ে গেছে, না হয় তো শেষ হতে চলেছে। কিন্তু টুর্নামেন্ট করে খেলা চললে কি হবে; মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং দল মাঠে না নামলে খেলা যেন ঠিক জমতেই চায় না।

ওঁদকে একা সম্মিলনকে দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যেতে হবে। স্নাত সংঘ, কুমারটুলী, টালিগঞ্জ অগ্রগামী, আর একা সম্মিলনী এই বছর দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠে প্রথম বিভাগে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। স্নাত সংঘ ছাড়া অন্য কোন দল আশানুরূপ ভাবে খেলতে না পারলেও একা সম্মিলনী ছাড়া বাকী দু'টি দল এবারের মতো প্রথম বিভাগে থেকে যাবার সুযোগ পেল। যাই হোক, একা সম্মিলনীর জায়গায় প্রথম বিভাগে আসছে কলকাতা স্কিম্বানা ক্লাব।

কুয়ালালামপুরে গিয়ে ভারতীয় দল প্রথম খেলাতেই হেরেছে তাইওয়ানের কাছে। বামার কাছেও হার স্বীকার করতে হয়েছে ভারতকে। তবে মালয়েশিয়া আর পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পেরে ভারত এখন একটু সুরিধাজনক অবস্থায় আছে। শেষ খেলায় ভারত যদি দক্ষিণ ভিয়েতনামকে হারাতে পারে, তাহলে ভারত হয়তো ফাইনাল রাউন্ডে খেলার সুযোগ পেলোও পেতে পারে। দেখা যাক, শেষ পরিস্থিতি কি হয়।

গত বছর মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ৮টি দেশের মধ্যে ভারত ৮ম স্থান অধিকার করেছিল। এবারের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে ৮টি দল। ভারত এবার কোন স্থানটি লাভ করে, তাই দেখার জন্যে আমরা এখন গভীর উৎসাহে অপেক্ষা করে আছি।



II. সোবার II

সোবারের নেতৃত্বে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রাবার জয় করেছে।

ক্রিকেট

নোভানথ গণগোপাধ্যায়

উইকেটের পিছনে, সতর্কপ্রহরী হিসাবে ইংল্যান্ডের লেসলী এমিসের একসময়ে ছিল জগৎজোড়া খ্যাতি। আর এই এমিসই উইকেটরক্ষকদের মধ্যে একটি মরশুমে সর্বাধিক পরিমাণে সফল লাভ করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ক্রিকেট মরশুমে উইকেটের পিছনে থেকে তিনি ১২৭ জন ব্যাটসম্যানকে বিমুখ করেছিলেন। এর মধ্যে ৭৯ জন তাঁর হাতে ধরা পড়ে আর বাকী ৪৮ জন তাঁর হাতে স্টাম্পাউট হয়ে ফিরে গিয়েছিলেন প্যাভেলিয়ানে।

মাত্র ৪৮ রানের রানমানে একদিনের মধ্যেই এই বোলারটি লাভ করেছিলেন সতেরটি উইকেট—তাও আরার প্রথম শ্রেণীর এক ক্রিকেট খেলায়। ১৯০৭ সালে নর্দাম্পটনে নর্দাম্পটনশায়ারের বিরুদ্ধে কেপ্টেন সি. রাইথ এই অবি-স্মরণীয় কীর্তি অর্জন করেন। প্রথম ইনিংসে ৩০ রান দিয়ে ১০টি উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৮ রান দিয়ে সাতটি উইকেট দখল করে রাইথ সে খেলায় একদিনের মধ্যেই সতেরজন খেলোয়াড়কে ফিরিয়ে দেন।

সোবার দর্শন

লীডসের চতুর্থ স্টেট মাঠে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ নাটকীয়ভাবে জিতে গেছে। খেলাটি শেষের দিকে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যখন সকলেই ভেবেছিলেন যে, ইংল্যান্ড হয়তো শেষ মুহুর্তে জিতে যাবে। কিন্তু শেষের দিকে সোবার আর রিচার্ডস খেলার হাল ধরায় বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ২ উইকেটে জিতে যায়। ফলে, ওটি স্টেটের মধ্যে ৩-১ খেলায় জেতার বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ রাবার লাভ করলো। চতুর্থ স্টেট মাঠে জেতার জন্যে বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ ২,০০০ গাউন্ড পুরস্কার পেল। আর সিরিজ জেতার জন্যে পেল ৩,০০০ গাউন্ড।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

ইংল্যান্ড—১ম ইনিংসে ২২২ ও ২য় ইনিংসে ৩৭৬ রান। বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশ—১ম ইনিংসে ৯ উইঃ ৩৭৬ ডিক্রে ও ২য় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২২৬ রান।

অনেক আশা আর উৎসাহ নিয়ে ভারতীয় দল ডেভিস কাপের খেলায় খেলতে নেমেছিল পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়াকে হারাবার পর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে যে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের ভার জেগেছিল, সেই ভারের প্রতিফলিত বোধ হয় ভারত শেষ পর্যন্ত ৫-০ খেলায় হেরে গেলো। চারটি সিঙ্গেলস আর একটি ডাবলস-এর রোনটিতেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা জিততে পারেন নি।

কেন পারেন নি—সে প্রশ্ন এখন তোলা থাক। কিন্তু ভারত যে জিততে পারে, নি, সেই বাস্তব সত্যটাই আমাদের মনে এখন ধীরে ধীরে জ্বলছে জ্বলছে।

II. ১২ থেকে ১৪ II

(৪৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আসবেন। শ্রদ্ধ হাতে ফিরে এসে অভিযোগ করলে যে আমাদের দেশে তা খোপে ঢেকে না—তা কর্মকর্তারা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু ভারতীয় মন্ত্রবীররা এ রিভাঙ্গে শ্রদ্ধ পাঁচটা স্বর্ণপদকই পান নি, প্রথম স্থানটিও অধিকার করেছেন। সত্যরং... সত্যরং ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মন্ত্রবীররা যে অভিযোগ করেছেন, তার তদন্ত হবেই।



প্রদীপ, প্রকাশ ও শেখর (বঙ্গবন্ধু, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : রেজিল যে বিশ্ব কাপ জয় করেছে, তার মূল্য ভারতে কতো?

উত্তর : অমূল্য নিশ্চয়ই...! পঞ্চাশ হাজার টাকার কাছাকাছি।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য (কলেজ রোড, হাইলাকাশি, কাছাড়)

উত্তর : জয়দীপ মদ্যাজীকে আপনি C/o. সাউথ ক্লাব, এলগিন রোড, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভালো লাগছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

এম. জি. সেন (গড় জয়পুর)

প্রশ্ন : ভারতের পি উমরিগড় ছাড়া আর কারো ক্রিকেট খেলার দশটির বেশি সেঞ্চুরী আছে কি?

উত্তর : আপনি একটু ভুল করেছেন, পলি উমরিগড়ের সেঞ্চুরীর সংখ্যা ৮টি।

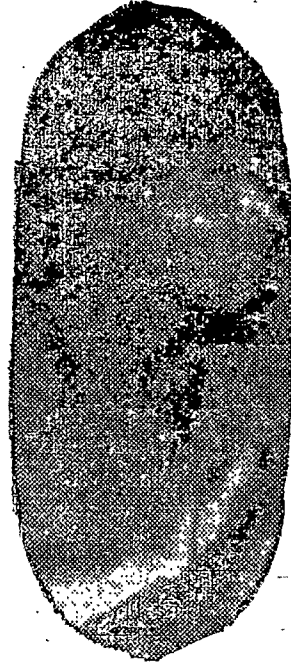
এ ছাড়া মঞ্জুরেকার ও বোরদে যথাক্রমে ১০টি ও ১১টি করে সেঞ্চুরী করেছেন।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভালো লাগছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি।

কপোত চট্টোপাধ্যায় (সিউড়ী, বীর-চূড়)

উত্তর : সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা কোথায় আবিষ্কৃত হয়, এই নিয়ে নানা মতামত। কেউ বলেন ইংল্যান্ড, কেউ বলেন চীন, আবার কেউ বলেন গ্রীসের কথা। সুতরাং... এ বছর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ভারতীয় দল যাবে। ভারতের অধিনায়ক পাতৌদিকে এবারও অধিনায়ক মনোনীত করা হবে কিনা এখনও ঠিক হয় নি।

স্ট্যাম্প পাঠালে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়।



৪২ থেকে ৪৪

কমনওয়েল্‌থ গেমস শুরুর হবার আগেই পর-পারকায় ভারতের শিশু মল্লবীর ভেদ প্রকাশের বয়েস নিয়ে খবরের ছড়াছড়ি ছিল। একবার খবর বেরুলো, ভেদ প্রকাশের বয়েস ১২, তাই তাকে প্রতিবন্ধিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ, কমনওয়েল্‌থ গেমস-এর নিয়ম হলো, যে প্রতিযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের দৈহিক সংযোগ বা সংঘর্ষ হবে, তাদের সর্বনিম্ন বয়েস হবে ১৫। কিন্তু পাসপোর্টে ভেদ প্রকাশের বয়েস লেখা ছিল ১২। সুতরাং.....।

ভারতীয় কর্মকর্তারা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তারা তখন কমনওয়েল্‌থ গেমস-এর কর্মকর্তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এডমন্টনের বিশ্ব কুস্তি প্রতিযোগিতায় ভেদ প্রকাশকে যখন অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে তখন এডিনবার্গেই বা দেওয়া হবে না কেন? কিন্তু কমনওয়েল্‌থ গেমস-এর কর্তৃপক্ষ ভারতীয় কর্মকর্তাদের এই যুক্তিতে কানই দিলেন না। তারা তাই সাফ জানিয়ে দিলেন যে, ভেদ প্রকাশকে প্রতিবন্ধিতায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

এর পর ভারতীয় কর্মকর্তারা সকলকে চমকে দিয়ে প্রমাণ দেখালেন যে, পাসপোর্টে যাই লেখা থাকুক না কেন, ভেদের বয়েস ১৪ বছরই। কিন্তু এই বয়েস নিয়ে যেভাবে ন্যাকারজনক প্রচার হয়েছে—অপব্যবস্ক ভেদ কেন, যে কোন প্রতিযোগীর কাছেই তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

এই প্রসঙ্গে ভারতের চীফ ডি মিশন অশ্বিনীকুমারও ন্যাকারজনক সংবাদ

প্রকাশনের চাকে একইভাবে ঢিল ছুড়েছেন। তাঁকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন ভেদের বয়েসের বিষয়ে, তখন তিনি বললেন যে, ভেদের বয়েস নিয়ে নানারকম প্রচার হচ্ছে ঠিকই—কিন্তু সেই মহত্বের তিনি জানেন না ভেদ প্রকাশের বয়েস কতো!

এই শেষ নয়, এর পরেও আছে। আর সেই আছেটাকে নিয়ে বাজার এবার গরম হবে। কারণ গোষাক-পরিচ্ছদ এবং খাবারদাবার নিয়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ভারতীয় মল্লবীররা। তারা তো শূন্য হাতে ফিরে আসেন নি! তাঁদের জন্যেই কমনওয়েল্‌থ গেমস-এ অংশগ্রহণকারী ৪২টি দেশের মধ্যে ভারত ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তাই তাঁদের অভিযোগের মূল্য আজ অনেক।

ভুল অবশ্য কর্মকর্তারা বোধ হয় করেন নি। কারণ তারা ভেবেছিলেন যে, অন্য প্রতিযোগীদের মত ভারতের মল্লবীররা প্রায় শূন্য হাতে ফিরে (শেষাংশ ৪৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে প্রীতকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়।
বিশুদ্ধ সংস্করণ। সুন্দর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন মহাতারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাংশসার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবন্মুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মঙ্কি, গীতাসাড়, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশ্লোকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ত, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐত্তরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আকর্ণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটজ্ঞ, ভৃগু, শিকা, বৃদ্ধবিদ্যাবাদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাজ্রদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশু, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যমুণ্ড তৈত্তিরীয়, পাণ্ডপত-ব্রহ্ম, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কোষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তান্ত্রাশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। শঙ্করাচার্যের মহাভাষ্য, শঙ্কর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তান্ত্র্যপূর্ব-জ্ঞানগর্ত ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহর্ষি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনাদিত। সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈশেষিক দর্শন :

মহর্ষি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ :

পরমভক্ত শ্রীমৎনাভাজী হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীমৎ প্রিয়দাস তাহার টীকা রচয়িতা। লগ্রন্থ ও টীকা অবলম্বনপূর্বক শ্রীমান কৃষ্ণদাস বাবাজী বঙ্গভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবদ্ভক্তিরসে অন্তঃকরণ আপ্নত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভক্তমাল অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য—৬-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্য-কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরশ্চরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরুংসংহিতা, বুদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ঘটজ্ঞনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুস্তাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

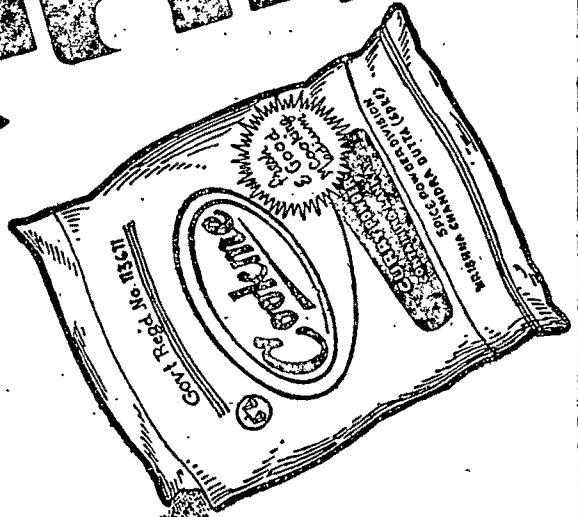
(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

কণ মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সলি-

সাপ্তাহিক

18 AUG 1970

পুলতা হয় না!



কুক্কী
গুড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিচু করে।
কুক্কী শিশুর খাওয়া
ও রুগীর
পাখা নির্ভয়ে
ব্যবহৃত হয়।

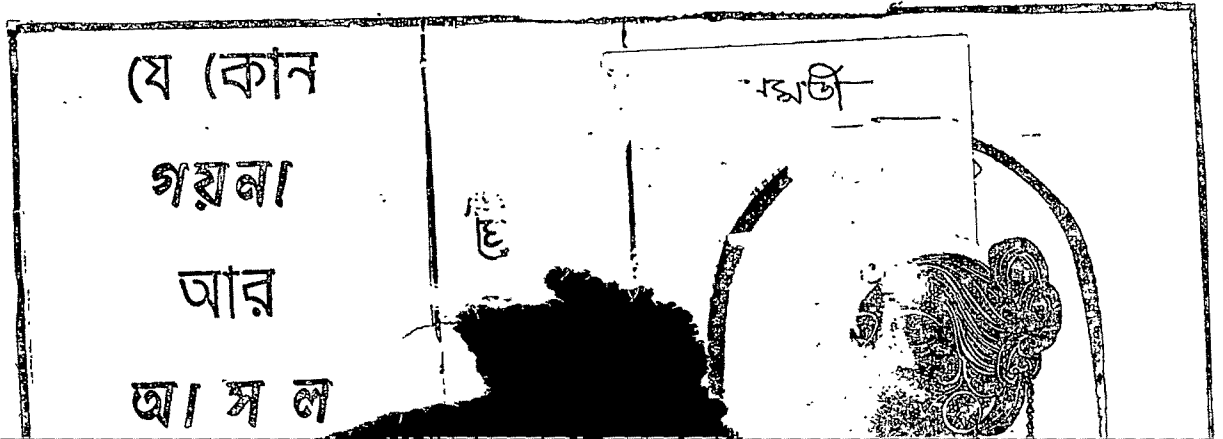
কুক্কী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
গুড়ো মশলা।
এর পেছার
মার্ক ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক
কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কাসীপুর



সূচী

বিষয়							পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১০৬	১০৬	১০০	০০	১০৬	০০০	৪৫১
আজকের মানদণ্ড	১০৬	১০৬	১০০	১০৬	১০০	০০০	৪৫২
বঙ্গদর্শন	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০৬	১০০	৪৫৩
ভারতদর্শন	১০৬	১০৬	০০০	১০৬	১০৬	০০৬	৪৫৭
আন্তর্জাতিক	১০৬	১০০	০০০	১০৬	১০৬	১০৬	৪৫৯
সংগ্রহের বোঝা	১০৬	—	কৃত্তিবাস ওঝা	১০৬	১০৬	০০৬	৪৬১
চব্বিশ বছরে পা দিয়ে (প্রবন্ধ)	০০৬	—	নরেন ভট্টাচার্য	১০৬	০০৬	০০৬	৪৬৩
মহারাজ (কবিতা)	১০৬	—	সুকুমার রায়	১০৬	১০০	০০০	৪৬৬
সূর্য নিভলেও (কবিতা)	১০৬	—	শচীন দত্ত	১০৬	০০০	০০০	৪৬৬
তৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর একটি							
অপ্রকাশিত চিঠি	১০৬	—	০০০	১০৬	০০৬	০০৬	৪৬৭
স্নেহের সঙ্গ (ধারাবাহিক উপন্যাস)		—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	১০৬	০০৬	০০৬	৪৬৮
যদি আসো (কবিতা)	০০৬	—	কায়দুল হক	১০৬	০০৬	০০৬	৪৭১
মৃত্যুতীর্ণ	১০৬	—	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০৬	০০৬	০০৬	৪৭২
মহারাজের সঙ্গ	০০৬	—	অসিতা ভৌমিক	১০৬	০০০	০০০	৪৭৪
তৈলোক্য মহারাজের সঙ্গ কল্লেকদন		—	গোপালচন্দ্র সেন	১০৬	০০৬	০০৬	৪৭৫
শহর কলকাতা	১০০০০	—	মিশ্রেন	১০৬	০০০	০০০	৪৭৬
পাঠকমন	০০৬	০০০	০০৬	১০০	১০০	১০০	৪৭৮
ঢাকার চিঠি	১০০	১০০	১০৬	১০৬	১০০	১০০	৪৮০



সূচীপত্র

বিষয়

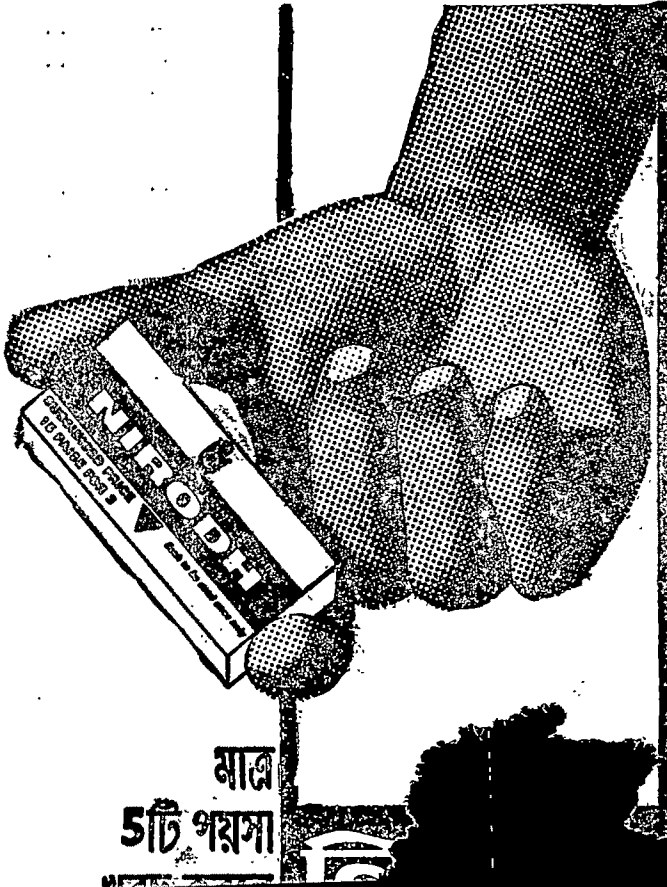
মাউ-গাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	...
দীর্ঘ-পরিব্রাজা	...
আনন্দর পদ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	...
হাওয়া বদল (গল্প)	...
স্বপ্নমণ্ড—ওদেশে এবং এদেশে	...
স্বপ্নজগৎ	...
খেলার রাজার রাজা	...
খেলাধুলা	...

লেখক

— বিশ্বনাথ ঘোষ	...
— পলকেশ দে সরকার	...
— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	...
— দিব্যেন্দ্র নাথ	...
— শিলালি	...
— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	...
— শান্তিপ্রিয়	...

পৃষ্ঠা

৪৮৩
৪৮৭
৪৯০
৪৯৬
৫০১
৫০৩
৫০৮
৫১০



সময়ের ব্যবধানে সন্তান-উৎপাদনের জ্ঞান

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মারফিৎ সময়ে ছেলপিলের জন্ম দেওয়া সম্ভব। ইঠাৎ কিছু হয় না। আপনি যখন চাইবেন, তখনই আপনি সন্তান উৎপাদন করতে পারবেন। বিরোধ আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জ্ঞান জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার বছরের সময়ে শিশুর মৃত নেওয়া উচিত—তাহলেই ওরা ভালো ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তারেরা মত দিয়ে থাকেন। সন্তান প্রসবের পরে ক্ষতস্থান আবার ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও কিছু সময় দরকার। বিরোধ ব্যবহার করে আপনি খুব সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম দ্রুত রাখতে পারেন।



বৃহস্পতিবার, ৩রা ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৮ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 20th August, 1970

স্বাধীনতা দিবস ও রাষ্ট্রপতির ভাষণ

চতুর্দশতম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল। এই দিবসটি সমস্ত ভারতবাসীর কাছে অত্যন্ত পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৈদেশিক শৃঙ্খলমুক্ত হবার পর সোঁদন থেকেই আমাদের ওপর আঁপিত হয়েছে স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব, দেশগঠনের কর্তব্য।

স্বাধীনতা লাভের পর কর্তব্য সমাপন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছিল, এ-দেশের জনসম্পদ ইতিপূর্বে সাগরপারে চলে গিয়েছিল, উপরন্তু স্বাধীনতা দিবসের প্রথম সেই আনন্দ মুহূর্তে দেশবিভাগের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল বহুরকম নতুন সমস্যা। তবু আশা ছিল, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের সূত্র পদক্ষেপে সমস্যাগুলির সমাধান হবে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ শৃঙ্খলমুক্তির সূত্রে স্বাধীনতার নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করবে। আর্থিক সুরাহার জন্য গৃহীত হয়েছিল পাঁচশালা পরিকল্পনা। একটির পর আরেকটি সেই পরিকল্পনা বাস্তবভাবে কার্যকর হলেও, সেগুলিও গ্রুটি-মুক্তি ছিল না এবং সেই ভুল যখন ভাঙলো তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। গ্রামে গ্রামে নেমে এসেছে হতাশা, শিক্ষিত যুবকরা বেকার জীবন নিবাহ করে হয়ে উঠেছে নিরুদ্যম—যা দেশের পক্ষে কখনোই কল্যাণকর নয়। অথচ দায়িত্বশীল নেতৃত্ব যথাসময়ে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ ও সতর্ক হতে পারেন নি।

স্বাধীনতা লাভের পূর্ণ তেইশ বছরে এই বিরাট ভারতের হৃদয়ের নিশ্বাস ভালো-বাসা হারিয়েছে জাতীয় কংগ্রেস। সেই কংগ্রেসও আজ শ্বিধাবিভক্ত। অন্যান্য রাজ-নৈতিক দলগুলির কণ্ঠস্বর যতোই উদাত্ত হোক না কেন, একক শক্তিতে কোনো দলই বিশাল জনশক্তির কর্তব্য পালনে সমর্থ নয়। রাজ্যে রাজ্যে এখন গণতন্ত্রের নামে চলছে

দল-বদলের গালা, ভাঙা-গড়ার মহড়া। তাছাড়া স্বাধীন ভারতে আজো ভাষা সমস্যার সূত্র সমাধান হয় নি, অঞ্চল নিয়ে বেধে ওঠে বিরোধ, আর যে কোনো মুহূর্তে প্রতিক্রিয়াশীলদের প্ররোচনায় জেগে ওঠে সাম্প্রদায়িক বিষেষ।

স্বাধীনতার প্রতি সাধারণ ভারতবাসীর মর্শ্বাবোধ নেই, এটাও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। তবু স্বাধীন ভারতে স্বাধীন ভারতবাসীরা যা করবে বলে আশা করা গিয়েছিল, তা করতে কি তারা সতাই পরাম্ভ্য?

আমরা মনে করি, ভারতের জনসাধারণের এক বিরাট অংশ অশিক্ষার নিমজ্জিত থেকে, স্থায়ী দৈন্যে নিভা-নিয়মিত ভুগতে ভুগতে এখন বঝতে শিখেছে যে, ভারত স্বাধীন হলেও, বোধ হয়, তারা স্বাধীন হতে পারে নি। আর এই রকম বোধের মূল— কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। অধিকন্তু সরকারী প্রচেষ্টা ও ব্যবস্থাপনায় জনকল্যাণ-মূলক যে সব কাজ হয়েছে, আমলাতান্ত্রিক নির্ভরতার জন্য তা সর্বত্রই সমান সফল্য-লাভ করে নি। তাছাড়া পুরো তেইশ বছরে, যে কাজে সর্বাগ্রে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল সেই চারি গঠনের কাজ কিছুই হয় নি। প্রতিটি দেশে যুব-চারিত্রে যে আদর্শ, চেতনা ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করা যায় এবং প্রাক-স্বাধীনতার দিনগুলিতে আমাদের এই দেশে যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যুবকদের তুলনায় ছিল ঢের বেশি বিষয়কর ও সূহান, বর্ত-মানে তার লেশমাত্র আছে বলে অনেকেই মনে করেন না। বলা বাহুল্য, স্বাধীন দেশের পক্ষে ঐ অবস্থা অত্যন্ত বেদনাদায়ক।

২৪তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি শ্রী ডি ডি গিরি বর্তমান অবস্থা থেকে মন্ত্রির পথনির্দেশ করে বলেছেন, “কালক্ষেপের সময় নেই। স্বাধীনতা লাভের ২৩ বছর পরেও আমরা আমাদের জনগণকে

সভা জীবনযাপনের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও দিতে পারি নি। পূর্ণতর ও সমৃদ্ধতর সামাজিক পরিবর্তনই শৃঙ্খলমাত্র সংবধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকারকে সূচনামিত করতে পারে।

“আমার স্থির বিশ্বাস, বেকার সমস্যার সমাধান হলে তা অন্যান্য গুরুতর সমস্যার সমাধানেও সাহায্য করবে। দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্যজনিত হতাশা থেকেই বিভেদকামী শক্তির প্রকাশ ঘটে। আন্তরিকতার সঙ্গে দারিদ্রের সমস্যা মোকাবিলায় প্রয়াসী হলে আমাদের জনজীবন থেকে সমাজবি-রাধী শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র অথচ সংগঠিত হিংসাত্মক দলগুলির বিরুদ্ধে সমাজের বিবেককে সচেতন করে তুলতে হবে।”

বলা বাহুল্য, আন্তরিকতার সঙ্গে সেই কাজ করার লোকের সংখ্যা অধুনা নগণ্য বলা চলে। রাষ্ট্রপতি আত্মসমালোচনার দ্বারা তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন, “আমাদের বৃত্তি ও আচরণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আজ সারা দেশে আত্মা ও চারিত্রের একটা গুরুতর সংকট সৃষ্টি করেছে।”

রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি তাঁর বক্তৃতার উপসংহার করেছেন সুগভীর আশাবাদতার মধ্যে। নৈরাশ্যপীড়িত এই দেশে ভবিষ্যতের শেষ সম্ভব আশাটুকুর পুনরুজ্জীবন ঘটুক এই আমাদের কামনা। প্রগতিশীলতা যদি “গণতান্ত্রিক” রাজনৈতিক দলগুলির মুখের বুলি না হয় এবং তা বাস্তবোচিত ক্রমের দ্বারা প্রসারিত হতে থাকে, তাহলে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাময়িক নৈরাশ্যের অবসান হবেই হবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ব্যারোক্রাটরা কি দেশ-শাসন করেন না? অবশ্যই করেন এবং রাজনীতিকদের চেয়ে কিছু যে খারাপ করেন না তার প্রমাণও আমরা এদেশে পেয়েছি। অন্য পাল্টা-মোটারী দেশের মত আমাদের দেশ এ-দৃষ্টান্তও দিয়েছে যে, রাজনীতিক তথা মন্ত্রীদের আসলে পরিচালনা করেন দু'দে ও জ্বরদস্ত আমলারাই। জারিং অবশ্য সে-অর্থে তাঁর দেশের মন্ত্রীদের নাকে দাঁড় দিয়ে ঘোরান নি, যদিও আমলা হিসেবে সুইডিশ সরকারী মহলে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন নেগোশিয়েশন বা কথা-বার্তা চালাতে গিয়ে। বিবদমান দু'পক্ষ সরাসরি তাদের মধ্যে কথা বলতে গিয়ে কাজিয়া বাধায়, একের অকাটা যুক্তি অপরের কাছে ছেঁদো অজুহাত বলে মনে হয়। কাজেই সেক্ষেত্রে মধ্যস্থ রেখে আলোচনা চালানোই সভ্য দুনিয়ার রীতি বা ঠাণ্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর সেই মধ্যস্থের ভূমিকায় ডঃ গানার জারিং যেন তুলনাহীন। পশ্চিম এশিয়া প্রসঙ্গে মার্কিন শান্তি প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য ডঃ জারিং-এর ডাক পড়েছে আবার। শান্তি প্রস্তাবে ১০ দিনের সাময়িক যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে। সেই সময়ে দু'পক্ষ—আরব ও ইস্রায়েলের মধ্যে আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করার গুরুদায়িত্ব পড়েছে ডঃ জারিং-এর ওপর।

ডঃ গানার ওয়ালফ্রিড জারিং কিন্তু পেশায় রাজনীতিক নন, তিনি সুইডেনের একজন দক্ষ ব্যারোক্রাট। কিন্তু অধুনা তাঁকে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশে। পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টায় তাঁকে ইতিপূর্বেও একবার আত্মনিয়োগ করতে হয়েছিল। ১৯৬৭

সালে আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধ রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের ফলে বন্ধ হয়েছিল। তখন সেক্রেটারি-জেনারেল উ থাণ্ট সুইডিশ রাষ্ট্রদূত ডঃ গানার জারিংকে পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ব্যক্তিগত দূত করে পাঠান দু'পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য। রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব যে তিন



গানার জারিং

পক্ষ মেনে নিয়েছিল সেই তিনটি দেশের রাজধানী—কায়রো, আম্মান এবং তেল আভিভে তিনি ক্রমাগত চরকবাজি করেছেন। প্রায় ২৮ বার তিনিই রাজধানীতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পশ্চিম এশিয়া সমস্যার সমাধানের সন্ধান করেছেন। তাঁর স্ট্রেশন

বাহি ব্যর্থ হয়ে থাকে, যদি পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপিত হবার বদলে আবার অঘোষিত লড়াই বেধে গিয়ে থাকে তবে তার দায়িত্ব কি ডঃ জারিং-এর ঘাড় ফেলা যাবে? কখনই না। তিনি ধৈর্যের সঙ্গে দু'পক্ষের কথা শুনেছেন, এ-অঞ্চলে যুদ্ধের বিপদ এবং শান্তির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেছেন। কিন্তু ডঃ জারিং কখনই—হাজার প্রয়োচনা সত্ত্বেও—কোনো বিবৃতি দিয়ে সমস্যাকে ছাঁটলতর করে তোলেন নি। ঘটনা যেমন গড়িয়েছে তেমন কতটা উ থাণ্টের কাছে তিনি রিপোর্ট পেশ করেছেন।

কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাক বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্যেও ১৯৬৭ সালে ডঃ জারিংকে রাষ্ট্রসংঘের পক্ষ থেকে তলব করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সে ব্যর্থতার জন্যেও বেউ তাঁকে দোষী করেন নি।

তার আগে ডঃ জারিং ছিলেন রাষ্ট্রসংঘে সুইডেনের স্থায়ী প্রতিনিধি, তাঁর আসন ছিল রাষ্ট্রদূত মর্যাদার। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে তাঁর স্বল্পকালীন উপস্থিতিতেই তিন বৃদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। তার আগে ডঃ জারিং ছিলেন তাঁর দেশের ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূত। বর্তমান কার্যভার গ্রহণের আগে ডঃ জারিং ছিলেন মস্কোস্থ সুইডেনের রাষ্ট্রদূত, যদিও শান্তি মিশনের কাজে তাঁকে অধিকাংশ সময় কাটাতে হয়েছে নিকোসিয়ায়।

এত বড় আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ভূমিকা আজ যাকে পালন করতে হচ্ছে তিনি কর্মজীবন শুরুর করেছিলেন অধ্যাপনা দিয়ে। সুইডেনের মালমোহাস প্রদেশের ব্রানবির এক সাধারণ কৃষক পরিবারে গানার জারিং-এর জন্ম আজ থেকে ৬৩ বছর আগে। লান্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ২৬ বছর বয়সে ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পর তিনি তুর্কী ভাষার অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে এই ভাষায় বংশোদ্ভূত দৌলতে তিনি ১৯৪০ সনে ফরেন সার্ভিসে যোগ দেন। পরে বৈদেশিক দপ্তরের রাজনীতিক শাখার প্রধানের পদ পেয়েছিলেন। তিনি পার্সি এবং আরবী ভাষাও জানেন। কূটনীতিক হিসেবে ডঃ জারিং ইতিমধ্যেই আত্মকারা, বাগদাদ, তেহরান, কলম্বো, করাচী, নয়াদিল্লী ইত্যাদি রাজধানীতে উপনীত হয়েছেন। কর্তব্যের আহবানে ডঃ জারিং এই পৃথিবী গ্রহ ছেড়ে গ্রহান্তরে যেতেও বোধ হয় আপত্তি করবেন না।



কলকাতার বস্তি

কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ও নগর উন্নয়ন বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ লোকসভায় আভাস দিয়েছেন যে, কয়েকটি পর্যায়ে কলকাতার বস্তি উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে, তিন বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ করা হবে, ব্যয় হবে ২৫ কোটি টাকার মত, এবং এই বছরের বাজেটে ৬৮ লক্ষ টাকা প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সত্যই কতটা কি করা হবে তা আমরা জানি না, কেন্দ্রীয় সরকারের মতিগতি সম্পর্কে আমাদের কোন আস্থা নেই, কেন না ইতিপূর্বেও এই বিষয়ে লম্বা-চওড়া কথা অনেক হয়েছে, কিন্তু কাজ কিছু হয় নি। কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে বস্তি রিক্রমেশন স্কীম চালু করা হয়েছিল এবং সেই অনুসারে কলকাতার কিছু বস্তি তুলে দিয়ে কম ভাড়ায় হাউসিং এস্টেট করা হয়েছিল বস্তির লোকেদের বসবাসের জন্য, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় এত নগণ্য যে তার দ্বারা আসল সমস্যার বিশেষ কোন সুরাহা হয় নি, এমন কি প্রকৃত বস্তি-বাসীও সেখানে স্থান পায় নি। যেখানে লবণ হ্রদের মত পরিকল্পিত উপনগরী তৈরি হচ্ছে, যেখানে শহরের নানা প্রান্তে নিত্য নতুন গগনচুম্বী অট্টালিকা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, সেখানে খাস কলকাতার বৃদ্ধের ওপর ঘিঞ্জি বস্তিতে আলো-বাতাসহীন কক্ষে, কাঁচা নদমা, পাক ও কাদার মধ্যে ছেঁড়া চট টাঙিয়ে যেভাবে মানুষ বাস করে সেভাবে গোয়ালঘরে গরু-ছাগলও বাস করে না। কলকাতার বস্তিগুলাতে দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করেন, অথচ মানুষের বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য এই বস্তিগুলির উন্নয়ন আজও হল না। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার বস্তির ট্যাক্স হ্রাস করেছিলেন এবং বস্তি থেকে জোরপূর্বক উচ্ছেদের পথ অনেকখানি রুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু এটা হচ্ছে ছেঁড়া কাঁথা সেলাই করার মতন। আসল সমস্যার সমাধানের জন্য চাই বস্তির বর্তমান মানচিত্র নতুন করে অঙ্কন করা, আধুনিক শহরের উপ-যুক্ত ছকে বস্তির জনপদকে গড়ে তোলা। কিন্তু যে কয়েকটি স্বার্থ আজও পর্যন্ত এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে তাকে আঘাত না করে এই কর্মটি সম্পন্ন হবে তো? কেন্দ্রীয় সরকার কি ততদূরে যেতে রাজী আছেন?

মাছের বাজারে আগুন

মাছের দর বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে

স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোধা, প্রবীণ বিপ্লবী জননায়ক, অনুশীলন পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ৮২ বছর বয়সে অকস্মাৎ নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করেছেন। দেশের এমন এক পরিস্থিতিতে আমরা তাঁকে হারালাম, যখন তাঁর মত সং, ত্যাগব্রতী, নির্ভীক অথচ অমায়িক বিপ্লবীর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করার ছিল। চিৎসার জন্য ও সহকর্মী, সত্যীর্থ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে তিনি কিছুকালের জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ঠিক ছিল, যথাসীল জন্মভূমি পূর্ব বাংলায় ফিরে যাবেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পূর্ব বাংলায় কাটাবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প।

পূর্ববঙ্গের প্রগতিশীল মানুষদের, বিশেষভাবে সংখ্যালঘুদের পক্ষে মহারাজের এই আকস্মিক মৃত্যু যে ক্ষতি করল, তা অপূরণীয়। কারণ পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন আসন্ন এবং এই নির্বাচনে মহারাজ ছিলেন প্রগতিশীল শক্তির স্বপক্ষে। মহারাজের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, পাকিস্তানের নির্বাচনে প্রগতিশীলরা জয়ী হবে। পূর্ব বাংলায় স্বায়ত্তশাসন হবে—ওখানে বইবে মুক্তির হাওয়া।

মহারাজ ইংরেজ আমলে এবং ডিক্টেটর আমলের আমলে জীবনের প্রায় ৩২ বৎসর জেলে কাটিয়েছেন, কিন্তু ক্ষমতার পিছনে কোনদিন ছোটেন নি, বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশের কল্যাণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনের শেষ বাণী ছিল পাক-ভারত মৈত্রী। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল গণ-জাগরণের প্রতি পশ্চিম বাংলার মানুষের দৃষ্টি তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিলেন এবং দুই দেশের শত্রুবন্ধুসম্পন্ন জনগণকে দুই দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য আরও সক্রিয় ও তৎপর হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর জীবনের এই শেষ ইচ্ছা বা সংকল্পকে দুই বাংলার মানুষ সফল করে তুলুন—এটাই আমাদের কাম্য।



খাসন্তী দেবীর সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ

শ্রমিক বসন্ত

যেতে পরীক্ষা ও নিশ্চয়তাভিত্তিক আহরণ-
তালিকা থেকে মাছ বসন্তটি বাদ হয়ে
শেয়েছে। কিন্তু ব্যবসায়ীর অত্যধিক
জাতির প্রদত্ততার ফলেই হয়েছে, যদিও
মাছের পাইকারী কারবারীরা, যাদের
কারসাজিতে এই অবস্থা হয়েছে, মূল্য-
বৃদ্ধির জন্য। মাছের সরবরাহ হ্রাসকে
দায়ী করছে, বলাই বাহুল্য, যা একটি
ছোট্ট কথা। তবুও যদি মেনেও
নেওয়া যায় যে, সরবরাহ কিছু হ্রাস
পেয়েছে, তাহলেও মাছের দর দশ-বারো
টাকা কিলো হবে কেন, এটা অনেকেরই
বোধগম্য হচ্ছে না। অসহায় দশকের
ভূমিকায় অধিষ্ঠিত গভর্নমেন্ট বলছেন
যে, মাছ ধরা থেকে মাছ বিক্রি পর্যন্ত
সমস্ত ব্যাপারটাই মনিটরমেন্ট একচেটিয়া
মৎস্য কারবারীর হাতের মুঠোয়। মাছ
ধরা বন্ধ রেখে অথবা মাছ অনাধু চালায়
দিয়ে তারা যে কোন মুহূর্তেই কৃত্রিম
মৎস্য সংকট সৃষ্টি করতে পারে।
সরকারের ভাবগতিক দেখে মনে হয়,
মাছের এই মনিটরমেন্ট একচেটিয়া
কারবারীদের বশে রাখবার কোন ক্ষমতা
তাদের নেই। শতকরা নব্বই জন
বাঙালী মাছ খাওয়া বন্ধ করতে বাধ্য
হয়েছেন, কেন না কালো টাকার মালিক
ভিন্ন দশ-বারো টাকা কিলো দরে মাছ
কেনার ক্ষমতা কার্যকর নেই। মাছ না
হলেও পেটের জ্বালায় ভাত ঠিকই
খাওয়া যায়, কিন্তু একটা মানুষকে
সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার জন্য কিছুটা

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ না করলে
চলে না। মাছের সঙ্গে ভাল রকমে
স্বাভাবিক নিয়মেই মাংস ও ডিমের দর
বেড়েছে, আর তা ছাড়া একটু সামান্য
মাছের কোল রেখে একসঙ্গে বহু লোক
খেতে পারে, যা মাংস ও ডিমে সম্ভব
নয়। দুধ অগ্নিমূল্য ও ভেজালে
পরিপূর্ণ, সর্বোপরি তা সাধারণ
মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। বি-
মাখনের অবস্থাও তদুপ। কাজেই
শাক-সবুজ ও ডাল ছাড়া গরীব মানুষের
আর কিছু খাবার নেই। কিন্তু এই
রকম প্রোটিনবিহীন খাদ্যগ্রহণ যদি
বরাবর চলতে থাকে, তাহলে তা কি
জাতিকে পঙ্গু করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট
নয়? এ অবস্থায় সরকারের কিছুই কি
করণীয় নেই? আমাদের মনে হয়
আছে। কেন না কয়েক বছর পূর্বে
মাছের বাজারের ঘৃণ্য আকর্ষক দর
চাড়িয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জনমতের
চাপে তদানীন্তন প্রফুল্ল সেন সরকার
মাছের বাজারের কয়েকজন ঘৃণ্যকে
গ্রেপ্তার করেছিলেন পি ডি অ্যাঙ্কে।
বর্তমান সরকার এমন ধরনের কোন
ব্যবস্থা কি গ্রহণ করতে পারেন না?

শিল্প প্রসারের সুযোগ- সুবিধা

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশ
স্বাধীন করার জন্য রাজ্য সরকার

সম্প্রতি শিল্পপতি ও হস্ত শিল্পপতি-
দের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা
প্রদান করবেন বলে ঘোষণা করেছেন।
যে-সব শিল্প-সংস্থার মূলধন এক কোটি
বা তদপেক্ষা কম সেই সব শিল্প সংস্থাই
এইসব সুযোগ-সুবিধার অধিকারী
হবে। দশ লক্ষ হতে এক কোটি টাকা
মূলধনওয়ালারা কোম্পানীকে এই সব
সুযোগ-সুবিধা পেতে হলে, তাঁদের
শিল্প-সংস্থায় অন্তত ৫০ জন কর্মচারী
থাকা চাই এবং সেই কর্মচারীদের
মধ্যে অন্তত পাঁচ শতাংশের ডিগ্রী অথবা
ডিপ্লোমা থাকা চাই। তা ছাড়া সরকার
যে বিশেষজ্ঞের তালিকা প্রণয়ন করবেন,
তা থেকেও একজনকে সংশ্লিষ্ট
কোম্পানীতে নিয়োগ করতে হবে।
নতুন নতুন শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে
সমীক্ষা করার ব্যয় সরকার অর্থায়ন
বহন করবেন। সরকারী মালপত্র ক্রয়ের
সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার
দেওয়া হবে। এ ছাড়া রাজ্য সরকার
তাঁদের মূলধন, জমি, ভূমি-বিক্রয় ও কর
ছাড় ইত্যাদি সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা
দিতে রাজী আছেন। এই উদ্যম
নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। মহারাষ্ট্র, গুজ-
রাট, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ
প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য সরকার শিল্প-
পতিদের এই ধরনের বিশেষ বিশেষ
সুযোগ দিয়ে আসছেন, যার ফলে
শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সেই সব রাজ্যের
যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে
ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প-বাণিজ্য
কেন্দ্র হওয়া সত্ত্বেও সরকারী ওদাসীন্যের
ফলে বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যের
শিল্প-বাণিজ্যের বিশেষ কোন সম্প্রসারণ
হয় নি। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি
নিবারণ বেকার সমস্যা ও নানা ধরনের
জটিল সামাজিক ব্যাধি। কিন্তু আমাদের
মনে হয়, শ্রম সুযোগ-সুবিধার লোভ
দেখিয়ে মানুষকে শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত
করা সহজ হবে না। অবশ্যলী শিল্প-
পতিরা চারিদিক থেকে ফটকাবাজ,
যে কোনভাবেই হোক অতি মন্থাকার
দিকে তাদের আগ্রহ, এবং যেহেতু দশ
লক্ষ থেকে এক কোটি টাকা মূলধন
তরাই একমাত্র বার করতে পারে, তরাই
এর সুযোগ নেবে, কিন্তু তাতে অন্য
রাজ্যের ছেলেদের বেকার সমস্যার সমা-
ধান হলেও বাংলার ছেলেদের কাজ
জুটবে না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গে সর-
কারী উদ্যোগেই শিল্প-সংস্থা খোলা
উচিত এবং সুপরিচালিত হলে তাতে
লাভ নেহাৎ কম হবে না। এ-ছাড়া
আরও অনেক কম মূলধনে বাঙালী
ছেলেদের ছোটখাট শিল্প গড়ে তুলতে
উৎসাহ দেওয়া উচিত। এখানে বেকার
ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই। তারা কাজ

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার
সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মৃগী উৎপাদন বা পোলট্রি
ফার্মিং অথবা অন্যান্য লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক
পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার
বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসন্ত থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রায়েজ পিডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়ে

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিব

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসন্ত (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

স্বক মালিন্যযুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করোমুখগ্রীতে লালিতোর ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

১০৫-২/৬৯

জানেন, কিন্তু বাজার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। এদের প্রত্যক্ষভাবে যদি সরকার গাইড করেন, তবেই সমস্যা মেটে। তাদের মূলধন ও যন্ত্রপাতি নিয়ে সাহায্য করতে হবে, এবং কিসের কারখানা করতে হবে, কোথায় মাল বেচতে হবে, এইগুলি বুঝিয়ে দেওয়া সরকার। বিভিন্ন সংস্থার তদারকির জন্য সরকারী উপ-দেষ্টা থাকা সরকার। এ ছাড়া ছোট ছোট শিল্পকে বিকেন্দ্রিত করতে হবে, সেগুলিকে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজন পশ্চিম-বাংলার প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া এবং বিদ্যুতের দাম কম করা। মতে সরকারী প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হওয়াও অসম্ভব নয়।

দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ

দুর্গাপুরে ইম্পাত কারখানার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে, কেন না এই কারখানায় যে পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে এখন তার মাত্র তিরিশ শতাংশ উৎপাদিত হচ্ছে। গত সাত মাসে এই কারখানায় ৯৮ হাজার মেট্রিক টন ইম্পাত তৈরি হবার কথা ছিল, কিন্তু সে জায়গায় তৈরি হয়েছে ৫২ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৬৮-৬৯ সালে এই কারখানাকে লোকসান দিতে হয়েছে ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এভাবে চলতে থাকলে প্রায় তিন শ' কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি এই কারখানার সমগ্র সর্বনাশ হতে আর দৌর নেই। কারখানার বর্তমান দুর্দশার কারণ নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। কেউ কেউ উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিক-কর্মচারীদেরই দায়ী করছেন, আবার কেউ বলছেন পরিচালনা ও কর্তৃপক্ষের দোষেই এই অবস্থা হয়েছে। আমাদের মনে হয় দু' তরফের কোন তরফই দায়ী এড়িয়ে যেতে পারেন না। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার সংকটের মধ্যে পতিত হবার একটি প্রধান কারণ সেখানকার শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, একই ইউনিয়নের ভিতর উগ্র-পন্থীদের চাপের সামনে অন্যদের নতি স্বীকার এবং সাধারণভাবে কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খলতা। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষও দুর্নীতি ও ব্যভিচারে ভরপুর, অপদার্থ আমলাতান্ত্রিকতার চাপে বিপর্যস্ত এবং তাদের দায়িত্ব এই অধঃপতনের মূলে বড় কম নয়। শ্রমিক ইম্পাত কারখানা নয়, সমগ্র দুর্গাপুর উপনগরীই আজ একটা বিস্ফোরক অবস্থায় উপনীত

হয়েছে, এবং এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারও যে তাদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছেন তা বলা যায় না। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্পবিবোধী একটি লবী পার্লামেন্টে আছে এবং দুর্গাপুরের অবনতির এই সুযোগ নিয়ে তারা দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানা বন্ধ করে দেবার দাবি তুলছে। এদিকে দুর্গাপুর উপনগরীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, ইম্পাত কারখানা সহ লাগাতার ধর্মঘটের সূত্রপাত হয়েছে, এবং কার্যত সেখানে যে কি হচ্ছে এখান থেকে তার স্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যাচ্ছে না। আজকের পশ্চিমবঙ্গের সংকটময় জীবনে দুর্গাপুর বৃহত্তম সংকটরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং এখন যত শীঘ্র পারা যায় কেন্দ্রীয় সরকার যদি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে না পারেন, পরিচালনার গলদ এবং শ্রমিকদের শৃঙ্খলাহীনতার কারণগুলি দূর করতে না পারেন, তা হলে শ্রমিক দুর্গাপুর কেন, এদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব যে কোন শিল্পের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হতে বাধ্য।

ঔষধের মূল্যবৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় সরকারের রসায়ন ও পেট্রোলিয়াম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবিগ্গা সেন কিছুকাল ধরেই ঔষধের দাম কমানোর জন্য চেষ্টা করছেন এবং সেই মর্মে একটি আইনও পাশ হয়েছে যার ফলে কয়েকটি বিশেষ ধরনের ঔষধের দাম প্রস্তুতকারকেরা কমাতে বাধ্য হয়েছে। দেখানো হয়েছিল যে, ওই সব ঔষধের উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় অর্থোজিকভাবে ঔষধ নির্মাণের দাম বেশি ধার্য করে এতাবৎকাল অকল্পনীয় মূল্যফা ভোগ করে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, টেরামাইসিন - সিরাপের খুচরো দাম ইউনিট পিছ সাড়ে ছ' টাকা হলেও খুব বেশি দাম নেওয়া হয়, কিন্তু আগে তা সাড়ে দশ টাকা দামে বিক্রি হত। সরকারী নির্দেশনামার ফলে বাধ্য হয়ে ঔষধ নির্মাতারা নির্দিষ্ট ঔষধগুলির দাম কমিয়েছে। কিন্তু অত সহজে এ দেশের উৎপাদকেরা হৃদয় পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধী হয়ে যাবে সেটা আশা করাই ভুল হয়েছিল। ফলে দেখা গেল, সরকার যে ঔষধগুলির দাম কমানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলির দাম কমানো হল ঠিকই, কিন্তু বাকি-গুলির দাম ওই একই সঙ্গে বিগ্গা করে দেওয়া হল। পৃথিবীর কোন দেশে ঔষধের দাম ভারতের মত এত বেশি নয়, এটা বুঝেই এবং দেশবাসীর

দারিদ্র্য ও রোগক্ষমতার কথা চিন্তা করেই দাম কমানোর জন্য চাপ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এখন ফল হল উল্টো। কার্যত সমস্ত ঔষধেরই দাম বেড়ে গেল, বরং বিগ্গা হয়ে গেল, সরকার কর্তৃক ঘোষিত কয়েকটি স্পেসিফিকেড ড্রাগ ছাড়া। আমাদের জিজ্ঞাস্য, সরকার কেন এখনো এই ঔষধ প্রস্তুতকারকদের সমাজবিবোধী হিসাবে গ্রেপ্তার করছেন না? কেন সরকার তাদের এই আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটানোর জন্য কৈফিয়ৎ তলব করছেন না? এরা পয়সাওয়ালা ও সমাজের ওপরতলার লোক বলেই কি পার পেয়ে যাবে? আর দেশের গরীব মানুষদের সন্তায় ঔষধ দেবার নামে কি এইভাবে প্রবঞ্চিত করা হবে?

আফ্রো-এশীয় লেখক প্রস্তুতি সম্মেলন

আফ্রো-এশীয় লেখক আন্দোলনের চতুর্থ সম্মেলন নভেম্বর ১৯৭০-এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার কবি-সাহিত্যিকরা আগামী ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে দুই দিনব্যাপী এক প্রস্তুতি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

এর মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের লেখকদের মধ্যে এই সম্মেলনকে নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। বিশিষ্ট কবি-লেখক-সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সমিতিও গঠিত হয়েছে। ১২ই সেপ্টেম্বর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। আফ্রো-এশীয় লেখকদের বিভিন্ন সমস্যা, সমসাময়িক বিশ্ব বিষয়ে কয়েকটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়াও একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত প্রস্তুতি কমিটি গ্রহণ করেছেন।

প্রস্তুতি কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, সম্পাদক শ্রীচিন্মোহন সোহানবিশ, শ্রীগোলাম কুন্দাস ও শ্রীমণীন্দ্র রায় এই সম্মেলনকে সফল করে তোলার জন্যে সাহিত্যিক জনসাধারণের কাছে এই সম্মেলনের সদস্য বা অধ্যর্থনা সমিতির সদস্য হয়ে সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলবার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। সম্মেলনের সদস্য চাঁদা দু' টাকা ও অধ্যর্থনা সমিতির সদস্য চাঁদা পাঁচ টাকা ধার্য করা হয়েছে। সকলকে ১৪৪, লেনিন সরণী, কলকাতা-১০ এই ঠিকানায় সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে যোগাযোগের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।



স্বাধীনতার ২০ বছর পূর্ত

গত ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতার তেইশ বছর পূর্ণ হল। দেশের সর্বত্র সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে এই তিথি উদ্‌যাপিত হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি এক বেতার ভাষণে বলেছেন যে, জাতি আজ বেকারী ও দারিদ্র্যের দুষ্টগ্রহের দ্বারা আচ্ছন্ন। বিগত ২০ বছরে ভারতের বিপ্লবের অগ্রগতি সত্ত্বেও বেকারী আর দারিদ্র্য এখনও শিকারী কুকুরের মত জাতিকে অনুসরণ করছে। এই দুষ্টচক্র ভাঙতে হলে এমন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে সকলের জন্য কাজের সংস্থান এবং দ্রুত বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতিনাশক শক্তিগুলো দারিদ্র্য এবং সামাজিক অবিচার থেকেই জন্মলাভ করছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য এবং ক্রেশের উপর স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায় না। তার ফলে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় পারস্পরিক ঘৃণার। ঘৃণাই হিংসার জনক।

তিনি আশা করেন যে, বাস্তব-ভিত্তিক এবং গঠনমূলক পদ্ধতিতে বেকারী সমস্যার সমাধানের পথ পাওয়া যাবে। আন্তরিকতার সঙ্গে দারিদ্র্য মোচনের চেষ্টা হলে রাজনৈতিক জীবনে সমাজবিরোধী শক্তিগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হবে।

কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ডঃ গিরি বলেছেন যে, আদর্শগত মতপার্থক্য থাকলেও কঠোর পরিশ্রম ছাড়া জাতির অগ্রগতি সম্ভব নয়। একমাত্র কঠোর পরিশ্রমই সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সাম্য আনতে পারে।

রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক কাঠামোর পংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের

মোকাবিলা করবার মত সাহস প্রশাসন কর্তৃপক্ষের থাকা উচিত। তাদের যেমন বিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তি বিজ্ঞানের শক্তিগুলিকে কাজে লাগাতে হবে, তেমনি ক্ষেত-খামার আর কারখানায় কর্মরত মানুষগুলির কল্যাণের জন্যও কাজ করতে হবে।

জনগণকে সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ডঃ গিরি তাঁর ভাষণ শেষ করেন।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে কয়েকটি তথ্য

স্বাধীনতার ২০ বছর বাদে ভারতের চেহারাটা কি দাঁড়িয়েছে, তার কয়েকটি তথ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে : —

(১) ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে যে মন্দা দেখা দিয়েছিল, সেটা আমরা এখন কাটিয়ে উঠেছি। ১৯৬৮ সালে ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৪.৯ শতাংশ এবং ১৯৬৯ সালে ৬.৯ শতাংশ। কিন্তু তার সঙ্গে পাছা দিয়ে পণ্যমূল্যও ক্রম-বর্ধমান। ১৯৬৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৭০ সালের মে মাসের মধ্যে পণ্যমূল্য বেড়েছে ৭ শতাংশ। বাজারে পণ্যের তুলনায় মদ্যার সরবরাহ বৃদ্ধিই তার কারণ। উল্লিখিত সময়ে বাজারে মদ্যার সরবরাহ বেড়েছিল ১৪ শতাংশ হারে।

(২) “ইকনমিক টাইমস্” পত্রিকার হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৬১-৬২ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে পণ্যের পাইকারী মূল্য ৭১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬১ সালের এক টাকার দাম কমে এখন ৫৮ পয়সায় এসে ঠেকেছে। অর্থাৎ ১৯৬১ সালে ৫৮ পয়সা দিয়ে যে পণ্য কিনতে পাওয়া যেতো, সেটা এখন এক টাকা দিয়ে কিনতে হয়।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের সামগ্রিক ও অসামগ্রিক কর্মচারীর সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৩০ হাজার। রাজ্য সরকারগুলোর কর্মচারীর সংখ্যা ৩৯ লক্ষ, আধা সরকারী এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলোর কর্মচারীর সংখ্যা ১ কোটি ১০ লক্ষ। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য তাদের যদি মাথাপিছু এক টাকা করেও মাইনে বাড়ানো হয়, তাহলে বছরে ১০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

(৪) এক বছর আগে রিজার্ভ ব্যাংকের সমীক্ষায় ধরা পড়েছিল যে দেশে বেকার বেকারের সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষ। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ। এই ৫০ লক্ষের মধ্যে বেকার ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন ৬০ হাজার। ৪র্থ পরিকল্পনার শেষে বেকার ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ১ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বছরে আরও ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক চাকরির স্থানে বাজারে আবির্ভূত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ২৪,৮৮২ কোটি টাকার পরিকল্পনা যদি পুরোপুরি কার্যকর হয়, তাহলে পাঁচ বছরে বড় জোর ১ কোটি ৪০ লক্ষ নতুন চাকরির পদ সৃষ্টি হতে পারে। তার অর্থ ১৯৭৪ সালের শেষে দেশে বেকার বেকারের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি ৭০ লক্ষ। রাষ্ট্রপতি ডঃ গিরি সম্প্রতি “জবস্ ফর দি মিলিয়ন্স্” (লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য চাকরি) বইতে লিখেছেন, বর্তমানে দেশে বেকারের সংখ্যা ৫ কোটি এবং আধা বেকারের সংখ্যা ১০ কোটি।

(৫) ৩রা আগস্ট লোকসভায় পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ৩০শে এপ্রিল ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৬৮৩ কোটি টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালে ঋণ পরিশোধ বাবদ আসল খাতে আমরা ৯৭.০৬ কোটি টাকা খরচ করেছি আর সুদ খাতে করেছি ৯৮.৫ কোটি টাকা। এই সব ঋণ বৈদেশিক মদ্যার শোধ করতে হয়েছে। এ ছাড়া পণ্য রপ্তানি করেও গভর্নমেন্ট আসল খাতে ৬০.৭ কোটি এবং সুদ খাতে ১২.৩ কোটি টাকার ঋণ শোধ করেছেন। এ বছর ঋণ শোধ বাবদ আসল খাতে ১৮৫.৭৭ কোটি ও সুদ খাতে ১৬৫.৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করতে হবে। গত তিন বছর আমরা গড়ে ১০ কোটি ডলার করে বৈদেশিক ঋণ লাভ করেছি। অর্থাৎ এখন আমরা বৈদেশিক ঋণ বাবদ যে টাকাটা পাচ্ছি, তার চেয়ে ঋণ পরিশোধের জন্য আমাদের অনেক বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।



একটি ভিন্ন স্বাদের বই
মহৎ অনুপ্রেরণায় দিব্য অনুভূতিতে লেখা
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বহু
-অনুদযাটিত তথ্য সমৃদ্ধ

"Out of a handful of dust lacs of Vivekananda can
be made by him—This Ramkrishna"

—Swami Vivekananda.

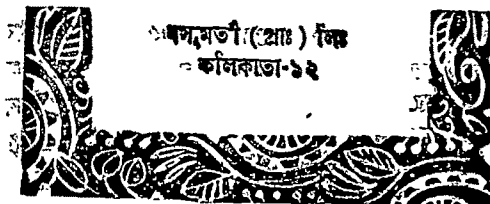
ঠাকুর পরমহংসদেবের

আবির্ভাবের গূর্বাভাষ



যে দরে রাখবার, প্রভোকে পড়বার মত বই
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি রচিত

মূল্য আত্র দুই টাকা



বঙ্গমতী (প্রাচীন) লি.
কলিকাতা-১২

(৬) উপরের চিত্র দেখে মনে হতে পারে দেশের অবস্থা খুবই কর্মহীন। কিন্তু সত্যি কি তাই? গত ৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের মহালক্ষ্মীর ঘোড়দৌড় মাঠে জ্যাকপট পদে মোট ৬৯ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। (নির্দিষ্ট পুঁচিটি রেসের ফলাফল নির্দিষ্ট করার জুয়া খেলা)। এই টাকার ট্যাক্স ও কমিশন আদায়ের পর জুয়াড়ীদের প্রাপ্য দাঁড়ায় ৪৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। ৪ জন জুয়াড়ী সেই টাকাটা পেয়ে গেছেন। জ্যাকপটের খেলা ভারতের সবাই হচ্ছে এবং তাতে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি সপ্তাহে উড়ে যাচ্ছে। এ টাকাটা আসছে কোথেকে?

বিভিন্ন রাজ্য সরকার যে লটারী চালু করেছেন তাতে গত ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত মোট ৪৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। তার মধ্যে ২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে প্রাইজ এবং অন্যান্য খরচে। আর রাজ্য সরকারগুলো পেয়েছেন বাকী টাকাটা। তার মধ্যে একমাত্র তামিলনাড়ুই পেয়েছে ১১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, মহারাষ্ট্র ১০ কোটি টাকা।

(৭) সম্প্রতি রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী চাবন ঘোষণা করেছেন যে, ভারতের বছরে একশ' থেকে দেড়শ' কোটি টাকার চোরাই চালানোর কারবার হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা ধারণা চোরাই চালানোর পরিমাণ হাজার কোটি টাকার কম নয়। গত ১২ই জুলাই অল ইন্ডিয়া রেডিওর বলা হয় যে, ১৯৭০ সালের মে মাস পর্যন্ত এক বছরে ২৪ কোটি টাকার চোরাই মাল বিদেশ থেকে চোরাপথে আমদানী) রাজস্বোপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত চোরাই মালের মধ্যে আছে সোনা, ঘড়ি, সিলেক্টিক সূতো এবং কাপড়। বাজেয়াপ্ত চোরাই সোনার দামই সাড়ে ৫ কোটি টাকা। চোরাই চালানোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ১০০০ লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারা এই চোরাই মাল কিনছে, তাদের হাতে নিশ্চয়ই অটল পয়সা আছে।

(৮) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী গ্রামের ৫২ শতাংশ মানুষ এবং শহরের ৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্রের সর্বনিম্ন স্তরে বাস করেন। অর্থাৎ তাঁদের ভোগের স্তর শূন্য থেকে ১৫-১৮ টাকা (মাসিক) মাত্র। দৈনিক পঞ্চাশ পয়সায় যে একটা পেট ভরবার মত টকান খাদ্যই কিনতে পায় তারা, সে কথা বলাই বাহ্যিক।



ওয়ালটার শিল্ আন্দ্রে গ্রোমিককে (ডান দিকে) শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন :

— ১২ই আগস্ট মস্কোতে ঐতিহাসিক রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন এবং পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতারা চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই চুক্তিতে একটি প্রস্তাবনা সহ পাঁচটি ধারা রয়েছে। চুক্তিতে উভয় পক্ষ মেনে নিয়েছেন, পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেবে না। কেউ কাউকে আক্রমণ করবে না। সকল প্রকার বিরোধ আপস-আলোচনার দ্বারা মেটানো হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া উভয় পক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে, য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বর্তমান সীমানা তারা মেনে চলবে।

অনাক্রমণ চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়েছে, পশ্চিম জার্মানী একটি পৃথক বিবৃতি দিয়ে দুই জার্মানীর একীকরণের প্রস্তাবে তাদের সমর্থন পুনরায় ঘোষণা করবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন এতে আপত্তি করবে না। তাছাড়া এই চুক্তিকে শান্তি চুক্তিরূপে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসা হল, এমন মনে করা হবে না। পশ্চিম জার্মানী পৃথকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও বৃটেনকে চিঠি দিয়ে জ্ঞানিয়ে দিয়েছে, পশ্চিম জার্মানীতে তাদের যেসব অধিকার রয়েছে তা অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিম জার্মানীর বিগত সাধারণ

নির্বাচনে খ্রিস্টীয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'কে পরাজিত করে উইলি ব্র্যান্ডের সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ও ওয়ালটার শিলের ফ্রি ডেমোক্র্যাটিক পার্টি জয়লাভ করে সরকার গঠনের পর থেকে পশ্চিম জার্মানীর রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড সোভিয়েট য়ুনিয়ন সহ পূর্ব জার্মানী ও অন্যান্য পূর্ব য়ুরোপীয় কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। তাঁর মনোমালিন্য সত্ত্বেও ব্র্যান্ড নিজে পূর্ব জার্মানী গিয়ে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য সেখানকার নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মস্কোতে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হয়েছে।

গত মাসে এই আলোচনা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে। একটি চুক্তির খসড়া পাকা করার জন্য পশ্চিম জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়ালটার শিল্ মস্কো যান এবং সেখানে সোভিয়েট য়ুনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন। শেষ পর্যন্ত কিছু পরিবর্তনের পর চুক্তির খসড়া উভয় পক্ষ গ্রহণ করে।

অনাক্রমণ চুক্তি পশ্চিম জার্মানীর মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে এবং স্থির হয়, চ্যান্সেলার উইলি ব্র্যান্ড মস্কো যাবেন আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য। ওয়ালটার শিল্ এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, “আমাদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল।” আন্দ্রে গ্রোমিকো বলেন, “আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোড় ঘুরল।”

সত্যি, রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পঁচিশ বৎসর পর

বিশ্বযুদ্ধের এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

মহাযুদ্ধ শেষে জার্মানীর বিভক্তি-করণ ও বার্লিন সমস্যাকে কেন্দ্র করে য়ুরোপে প্রথম উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে তার যুদ্ধকালীন মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের তীব্র মতবিরোধ হয়। জার্মানী থেকে য়ুরোপ এবং য়ুরোপ থেকে সমগ্র বিশ্ব ঠান্ডা বা ‘কোল্ড ওয়ার’ ছড়িয়ে পড়ে।

দুই জার্মানীর মধ্যে পূর্ব জার্মানী কমিউনিস্ট শাসনে পরিচালিত হয় এবং জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানী বা জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পশ্চিমীদের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবে যুদ্ধ-নীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ‘ন্যাটো’ সামরিকচক্রের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। এখানে প্রাক্তন নাৎসীরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ভয় হয়, আবার হয়তো জার্মানীকে কেন্দ্র করে নতুন বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবে। কনার্ড আদেনার ও জর্জ কিসিংগার পশ্চিম জার্মানীকে এই দিকেই ঠেলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উইলি ব্র্যান্ড চ্যান্সেলার হয়ে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন।

আজ যদি দুই জার্মানীর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়, পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তা হলে য়ুরোপের উত্তেজনার বারো আনা কারণ দূর হবে।

বার্লিন সমস্যার সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই আলোচনা সুরু হয়েছে। মস্কোতে ওয়ালটার শিল্ ও আন্দ্রে গ্রোমিকের মধ্যে এই ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। উইলি ব্র্যান্ড বার্লিন প্রসেন সোভিয়েট য়ুনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে চতুঃশক্তি আলোচনার প্রস্তাব করেছেন। সম্ভবত সেপ্টেম্বর মাসে এই আলোচনা সুরু হবে।

য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের প্রস্তাবও হয়েছে। গত বৎসর প্রথমে সোভিয়েট য়ুনিয়ন এই প্রস্তাব করে। য়ুরোপের সকল রাষ্ট্র এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে য়ুরোপের নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করুক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি এই সম্মেলনে যোগদান করে, তাহলেও সোভিয়েট য়ুনিয়নের আপত্তি নেই। রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এই য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

‘ন্যাটো’ ও ওয়ারশ গোট্টী, উভয় পক্ষের মধ্যে অস্ত্র ও সৈন্য হ্রাসের আলোচনাও নিশ্চয়ই সুরু হবে। বর্তমানে জার্মানীর দুই দিকে ‘ন্যাটো’ ও ওয়ারশ গোট্টীর সৈন্যরা প্রায় মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে আছে। অনাক্রমণ চুক্তির ফলে এই দুই পক্ষের যুদ্ধের মনোভাব যদি কমে, তবে তা সব দিক দিয়েই লাভজনক হবে।

সুতরাং, সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে স্বাক্ষরিত মস্কো চুক্তি য়ুরোপ তথা বিশ্ব রাজনীতিতে উত্তেজনা প্রশমনের বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে যদি একটা বোঝাপড়া সম্ভব হয়, তা হলে য়ুরোপের রাজনীতি আবার প্রাধান্য পাবে এবং বিশ্ব রাজনীতিতে য়ুরোপ নতুন করে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। য়ুরোপের রাজনীতিতে মার্কিন প্রভাবও এর ফলে বিশেষভাবে হ্রাস পাবে। দুই জার্মানীর পক্ষেই রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করা সহজ হবে।

পশ্চিম জার্মানীর পরবর্তী প্রচেষ্টা হবে পোল্যান্ড ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা। ওডার-নিসে সীমান্তের প্রশ্নে পশ্চিম

জার্মানী ও পোল্যান্ডের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, পশ্চিম জার্মানী তা মিটিয়ে নেবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করবে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কের প্রসারের জন্য পশ্চিম জার্মানী বিশেষ উৎসাহী। কমিউনিস্ট দেশগুলির উৎসাহও এ ব্যাপারে কম নয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিশেষ অবদান রয়েছে।

অবশ্য এখনও সমস্যা অনেক। পশ্চিম জার্মানীর আইনসভা বাঙে-স্টাগের দ্বারা চুক্তি অনুমোদন করাতে হবে। বাঙে-স্টাগে উইলি ব্র্যান্ডের কোয়ালিশন সরকারের মাত্র ১২ জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। বিরোধী ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এই চুক্তির ঘোরতর বিরোধী। জার্মান প্রথা অনুসারে খসড়া চুক্তি আলোচনার সময় জার্মান প্রতিনিধিদলে বিরোধী দলের সদস্য থাকার কথা। কিন্তু, এই চুক্তি আলোচনার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না বলে ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি প্রতিনিধিদলে যোগ দেয় নি। তারা প্রস্তুত হচ্ছে সর্বশক্তি দিয়ে একে বাধা দেবার জন্য।

জার্মান ঐক্য ও পূর্ব জার্মানীর

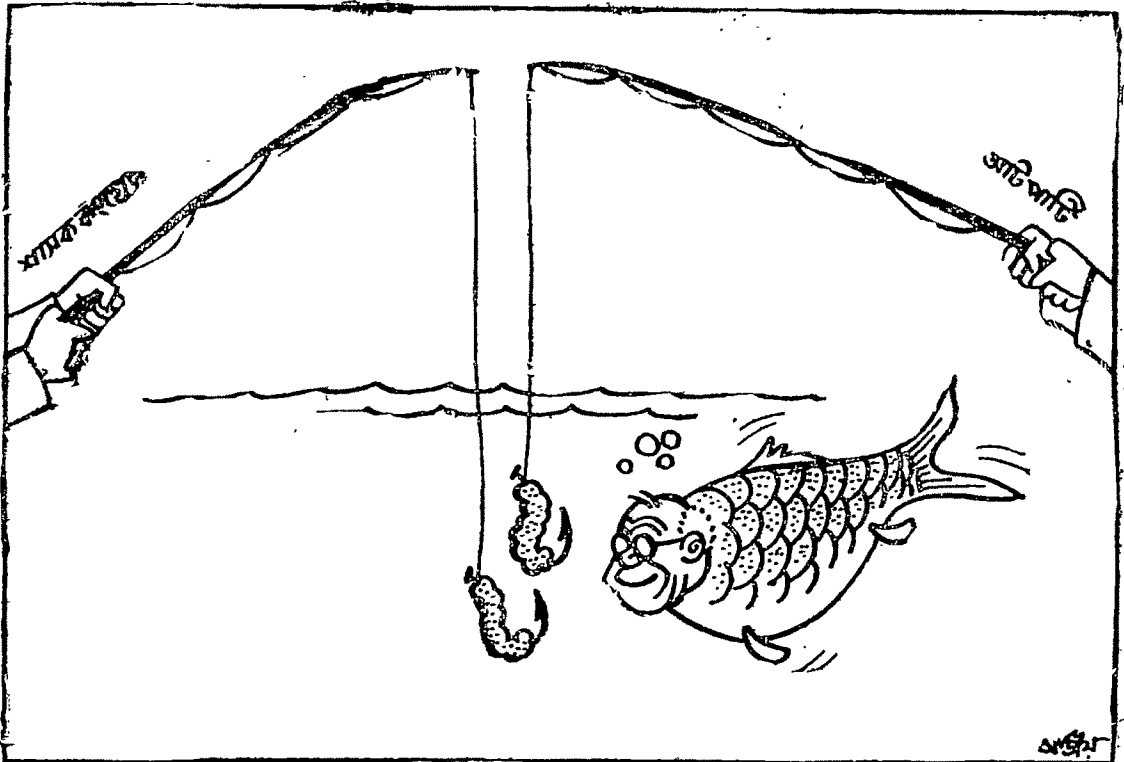
স্বীকৃতির প্রশ্নও সমস্যা আছে। পশ্চিম জার্মানী এখনও একীকরণের প্রস্তাব ছাড়ে নি। পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে, কিন্তু কূটনৈতিক স্বীকৃতি সহজে তাকে দিতে চাইবে না, এই হল পশ্চিম জার্মানীর মনোভাব।

কিন্তু, এদিকে আবার রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব জার্মানীর কমিউনিস্ট প্রধান ওয়ালটার উল্ট্রিখট্ ‘ন্যাটো’ভুক্ত সকল রাষ্ট্র-প্রধানের কাছে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁরা পূর্ব জার্মানী অর্থাৎ জার্মান গণ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দিন।

কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করলেও, পশ্চিম জার্মানী এখনও পশ্চিমী গোট্টীর সঙ্গে তার পূর্ব সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ সামরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করবে। চুক্তি স্বাক্ষর করার পূর্বে তাই উইলি ব্র্যান্ড মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও ফরাসী রাষ্ট্রপতি জর্জ পাম্পিদুকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর সম্পর্ক ঠিকই থাকবে।

(১৬-৮-৭০)

কার ছিপি উঠবে ?



কিন্তু তার পর কি হবে? এই প্রশ্নের জবাব—এক কথায় সামরিক শাসন। তবে সামরিক শাসন বাস্তব-সম্মত না হলে সমগ্র রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে দেওয়া। আমার তার পর কি হবে এই প্রশ্নের জবাবে পশ্চিম-বঙ্গে আগামী দিনে জরুরী অবস্থা ঘোষণা বা সামরিক শাসনের কথা যিনি বললেন, তিনি কোন হেলাফেলার লোক ন'ন বা কোন বে-হিসাবে বে-ওজনের কথা বলার মানুষ ন'ন। কথাটা শুনবার পর বারে বারে রাজ্যের পরিস্থিতি ও আগামীদিনের সম্ভাব্য রাজ-নৈতিক চিত্রটি চোখের উপর মেলে ধরছি এবং এক সময় নিজের মনেই প্রশ্ন এসেছে—তাহলে এর পর কি আমাদের জন্য একমাত্র সামরিকবাহিনীর হাতকড়া অপেক্ষা করছে? কিন্তু দেখা গেল সপ্তাহখানেক আগে থাকতে যে প্রশ্ন ও চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমি বিভ্রান্ত রাজ্যের প্রভাবশালী রাজ-নৈতিক নেতা শ্রীসুশীল ধাড়া সেই কথাটা খোলাখুলি বলে দিয়েছেন। শ্রীধাড়া বলেছেন—রাজ্যের পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তে আনতে রাজ্যের পুলিশ যথেষ্ট নয়। তাই পরিস্থিতি মোকাবেলার দরকার হলে মিলিটারী ডাকতে হবে। শ্রীধাড়া কে ধনবাদ—যে কথাটা উচ্চারণেও মন ভয় পাচ্ছিল, সেই কথাটা তিনি স্বচ্ছন্দে বলে দিতে পেরেছেন। কিন্তু শ্রীধাড়া মশায়কে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, তার পর কি হবে? অর্থাৎ মিলিটারী ডাকা হল, মিলিটারী রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নিল, রাইটস-লালবাজার-এন্ডারসন হাউস, লর্ড সিংহ রোড—সব কিছুর ওপরে বসলেন জেনারেল আরোরা বা জেনারেল পাড্ডা, কিন্তু তার পরও তো প্রশ্ন থাকে। তার তো জবাব চাই, সেই প্রশ্ন হল—মিলিটারীর পরে কি?

যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনকালে শ্রীধাড়া মনে করেছিলেন দলের মধ্যমন্ত্রী না হলে মন্ত্রিসভা গঠন করা অর্থহীন, মন্ত্রিসভা চালানো অসার। সি-পি-এম'কে মধ্যমন্ত্রী না দিয়ে সেটা বাংলা কংগ্রেসকে দেওয়া উচিত ও দরকার। অবশ্য এই কথা সত্য গত যুক্তফ্রন্টের যে কর্মবিশেষ ছিল এবং গত যুক্তফ্রন্টের যে সব পরিস্থিতি ছিল, তাতে বাংলা কংগ্রেসের মধ্যমন্ত্রী চাইবার



সমস্যা মোকাবিলা সহজ হবে। তাই ৮৩ জন এম-এল-এর পার্টি সি-পি-এম মধ্যমন্ত্রী দাবী করার কোন অবকাশ পেল না, মধ্যমন্ত্রী পেল ৩৩ জনের পার্টি বাংলা কংগ্রেস। স্বরাষ্ট্র দপ্তরটিও সি-পি-এম'কে পেতে হল অনেক কাকূতি-মিনতি, ধর্না ও সংকট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। মন্ত্রিসভা গঠিত হল, চলতে লাগলো, কিন্তু এই সময় প্রশ্ন উঠলো,—না; সব কিছুর গোলমাল হচ্ছে এটা কারণে যে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর রয়েছে সি-পি-এম'এর হাতে। সি-পি-এম স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সদ্ব্যবহার নিয়ে সব কিছুর তছনছ করে

দেচ্ছে। তাই মদ্র গৃহমন্ত্রী, পরে দাবী উঠলো সি-পি-এম তথা শ্রীজ্যোতি বসুকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে হটালেই সব সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু যখন দেখা গেল সেইখানে অনেক বাধা, তখন বাংলা কংগ্রেস মনে করলো মধ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়াই হল একমাত্র সমাধান। অর্থাৎ বাংলা কংগ্রেস সি-পি-এম'কে শাসনোত্তর করতে মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে গেল। মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল। কেউ কেউ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন—বাঁচা গেল, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম'এর হাতে আর নেই, রাজ্য-পালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসন চলবে। এইবার শান্তি আসবে, সি-পি-এম শাসনোত্তর হবে। কিছুদিন পরে আবিষ্কার হল—না, শান্তি তো আসছে না, তাহলে কি হবে? এইখানেও বাংলা কংগ্রেস দ্রুত দাষয়ই আবিষ্কার করলো। সম্পাদকমণ্ডলীর এক সভার পর বলা হল—সি-পি-এম'এর তাবৈদ্যার কিছু আমলা রয়ে গেছেন অর্থাৎ শ্রীজ্যোতি বসু গেছেন, কিন্তু শ্রীবসু যাঁদের দিয়ে কাজ করাতেন, তাঁরা রয়ে গেছেন—অতএব হঠাৎ আমলা! বাংলা কংগ্রেস থেকে বেশ কিছু আমলার নাম দিল্লী গেল। এর পর একদিন মহাকরণ থেকে শ্রীমদ্রস্তাক মর্শেদ, শ্রীএস বি রায় বিদায় নিলেন। এইবার আর একবার

এই বছর বিখ্যাত গ্রন্থের বহুকাল পরে বহু প্রত্যাশিত পুনর্মুদ্রণ প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক সুরেশচন্দ্র নন্দীর ওমর খৈয়াম

গ্রন্থের ভূমিকায় ইতিহাসাচার্য স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন, “যাঁহারা ‘ওমর’ বলিতে শব্দ বুলবুল ও গোলাপ, মরিয়া ও সাকীর কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে, লোকটা কবি ও ভোগী মাত্র ছিলেন না, কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের প্রতিভার প্রতি ন্যায় বিচার করিবার জন্য আমরা লেখকের নিকট ঋণী।”

“জগতের জন্য ইসলাম কি করিয়াছে, তাহা জানিতে হইলে আমীর আলীর গ্রন্থের বাঙলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর ‘ওমর খৈয়াম’ এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের স্নিগ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পারের কি সম্বন্ধ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত উদ্ধৃত করিয়া লেখক বঙ্গ ভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মধ্যযুগের পশ্চিম এশিয়ার সভ্যতার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। ইহাখানি বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।”

সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

প্রাঃ লিঃ

দাপ্তরিক বসুমতী

স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো। হ্যাঁ, এতদিনে দাওয়াই পাওয়া গেছে—শ্রী এস বি রায়, শ্রীমুর্শেদ চলে গেছে, অতএব এইবার শান্তি।

কিন্তু হায়, কিছুদিন পর দেখা গেল যে তিমিরে সেই তিমিরে। তখন বলা হল, বোলাও সি-আর-পি। পদলিখ পারছে না, ভিন রাজ্যের পদলিখ আর সি-আর-পি এসে সব ঠান্ডা করে দেবে। এল সি-আর-পি, এল আরো কতরকমের পদলিখ। রাজ্যের পদলিখকে কতরকমে কতভাবে সাজানো হ'ল—শক্তিশালী করা হ'ল, কত চটকদার নামের সেল তৈরি হ'ল, কত ওলট-পালট বদলী হ'ল। রাজ্যের মানুষের প্রতি পাঁচজনের মাথাপিছ একজন করে পদলিখ বা তার সম্বন্ধী নিয়োগ করা হ'ল। কিন্তু সকলি গরল ডেল। এখন দেখা যাচ্ছে সেই পদলিখ আর সি-আর-পি দিয়েও কাজ হচ্ছে না।

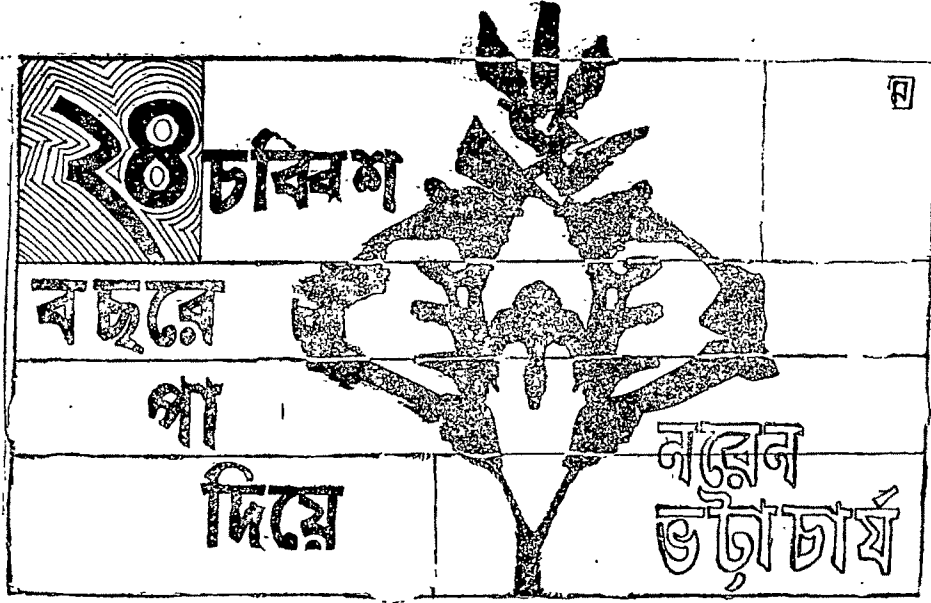
তাই শ্রীমুর্শাল ধাড়ার প্রস্তাব—পদলিখ যথেষ্ট নয়, দরকার হলে মিলিটারী নিয়োগ করতে হবে। আমার প্রশ্ন এই—

খানে—মিলিটারীও না হয় এল, তারপর কি হবে? মিলিটারীর বেয়নেট-বন্দুকও যদি অভীপ্সিত শান্তি না আনতে পারে, তাহলে কি হবে? এমন কথা তো সত্য নয় যে, রাজ্যের পদলিখ ও সি-আর-পির বন্দুকের নল দিয়ে রসগোল্লা বের হয়, আর মিলিটারীর বন্দুক দিয়ে গুলী, ছরু বের হবে! এখন না হয় প্রতি পাঁচজনে পদলিখ আছে, তখন না হয় প্রতি তিনজনে পদলিখ ও মিলিটারী হবে—কিন্তু তাতেও শান্তি না আসলে কি হবে? কই শান্তি তো আসে নি মিলি-সভা ভেঙে বা শ্রীঅজয় মুরখোপাধ্যায়ের পদত্যাগে, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সি-পি-এম'এর হাতছাড়া করে, শান্তি তো আসে নি মুর্তাক মুরশেদ আর এস বি রায়কে সরিয়ে বা শ্রী পি কে সেনের অবসরে, শান্তি তো আসে নি সি-আর-পি আমদানী করে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স আমদানী করে, তবে? কোথায় ভরসা শান্তি আসবে মিলিটারী এনে—মিলিটারী বসিয়ে? এই আমার প্রথম প্রশ্ন—বাংলা

কংগ্রেস তথা তার নেতা শ্রীমুর্শাল ধাড়ার কাছে।

আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন সি-পি-এম দল তথা তার নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের কাছে। সেই প্রশ্নও এই একই প্রশ্ন—সেই হল সমগ্র রাজ্য আজ কয়েকজন বৃদ্ধ সৃজনী ও জীবনশক্তিহীন মানুষের হাতে, রাজ্য আজ কেন্দ্রীয় সরকারের একটা কলোনীতে পরিণত হয়েছে এবং আগামী দিনে সামরিক আইন ও শাসনের তাওতার যাবার পথে চলেছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তির দায়িত্ব কে নেবে? রাজ্যের সর্ববৃহৎ দল, সর্ববৃহৎ সংগঠিত রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সি-পি-এম তার অগণিত সংগঠনশক্তি যে পথে পরিচালিত করছে, সেই পথে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, না অপহরণের সহায়ক হচ্ছে? সি-পি-এম দলের কাজে বাংলা দেশের মানুষের হাতের শিকল ভাঙছে, না আরও জোরদার করে শিকল পরাবার ছল সৃষ্টি হচ্ছে?





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর।]

৥ চার ৥

তাইলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের শাসক পার্টি বর্তমানে যে ঐতিহ্যের অধিকারী, সেটা কিছু গৌরবময় নয় এবং সাম্প্রতিক-কালেও কোন গৌরবময় নজীর সৃষ্ট হয় নি। পক্ষান্তরে, বামপন্থী আন্দোলন, আমরা যা দেখলাম, এখনো সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সাবালক অর্জন করে নি। আর এর মাধ্যমাবি বিশেষ করে উত্তর ভারতে, একটি চরম দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট শিবিরের অভ্যুদয় ঘটছে। অথচ এদিকে হিমালয়-প্রমাণ সমস্যা এবং তা সমাধানের মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব। এ বিষয়টা ঠিক একটা সরকারের বদলে আর একটা সরকার হলেই মিটছে না, অথচ নেতৃত্ব এমনই বন্দ্য যা, মিটবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। সর্বরোগহর দাওয়াই হিসাবে সমাজতন্ত্রের কথা মনে আওড়ানো হয় বটে, কিন্তু শব্দে তো কথাতেই চিড়ে ভেজে না। যে জিনিসটা কার্যে পরিণত করার শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, আসলে নেতৃত্বের সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই, বা ধারণা থাকলেও সত্যাকারের কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শকে রূপ দেবার কোন মতলবই শাসকবর্গের নেই।

আসলে এই গোঁজামিলটা দীর্ঘকাল ধরে দিয়ে আসা হচ্ছে বলেই জীবনের সর্বস্তরে উন্নতির লক্ষণ তো দূরের কথা, হতাশা ও দুর্ভোগকেই দিনের পর দিন আহ্বান করা হচ্ছে। যেখানে দেশ সম্পর্কে নেতাদের কোন সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী নেই, সেখানে ভাঙন যে অবধারিত, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যেখানে নেতৃত্ব দরদাউতীন, যেখানে কোন কাজের কোন ফল হতে পারে, সেটুকু

বোঝার ক্ষমতা পর্বন্ত নেতাদের নেই, সেখানে যে দেশ এখনো খণ্ড খণ্ড হয় নি, এটাই আশ্চর্য। নেতৃত্বকে বজায় রাখতে গিয়ে কিছু অলপবান্ধি ক্ষমতা-লোভী মানুষ ন্যাকারজনকভাবে বিচ্ছিন্নতা-কামী মনোভাবসমূহকে প্ররয় দিচ্ছেন। সম্পূর্ণ প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মাদ্রাজে সরকার চলছে, পাঞ্জাবের রাজনীতি এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, অশ্বের অগচ্ছদের ব্যবস্থা হচ্ছে। যতদূর মনে পড়ে একদা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বহু অশ্বের ডাক দিয়েছিল। সেই শ্লোগান উগ্র স্বাভাব্যবোধের ধাক্কায় আত্মগোপন করেছে। স্বাধীনতার চাবিশ বছরে ঘর শব্দে ভাঙছে, গড়ছে না।

৥ পাঁচ ৥

নিছক নিন্দা করাই আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি শব্দে এইটুকু বলতে চাইছি যে, একটি ঘৃণধরা নেতৃত্বের কবলে এ দেশটা গোজায় যেতে বসেছে, অন্ধকার ও হতাশার গাঢ় মেঘ সকল দিক আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। কিন্তু প্রতিটি কার্যেরই সমান ফল আছে। দেশজোড়া যে হতাশা, তা ঠিক বিরুদ্ধে ফল প্রসব করে চলেছে উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপে। একে ঠেকানোর কোন ক্ষমতা বর্তমান সরকারের থাকতে পারে না, কেন না, যে পরিস্থিতি উগ্রপন্থার সৃষ্টি করেছে বা অনিবার্য নিয়মে করে যাবে, তাকে বদলানোর ক্ষমতা বর্তমান সরকারের নেই, বদলে ভিন্ন সরকার এলেও সম্ভবপর নয়, ডিক্টেটর-শিপও অচল, মিলিটারী শাসনও নিষ্ফল, কেন না, সর্বস্তরে ঘৃণা ধরেছে।

অথচ এও সত্য কথা যে, এমন কোন

সমস্যা নেই যা সমাধানের অতীত। কিন্তু চোখের সামনে যা দেখছি, সমাধানের কোন প্রচেষ্টা নেই, আজও সেখানে ক্ষমতার স্বার্থে শিবসেনাদের মত শক্তিদেয় প্ররয় দেওয়া হয়, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতাকে উস্কাবী দেওয়া হয়, সেখানে দেশের সমস্যা সমাধানের কোন সং মতলব শাসকদের মধ্যে আছে, তা বিশ্বাস করার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই।

৥ ছয় ৥

পক্ষান্তরে বামপন্থী শক্তিগুলির কিছু করণীয় ছিল, অল্লেখ্য পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে, যা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পটপরিবর্তন করতে পারত বলে আমার ধারণা। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শরিক বামপন্থী দলগুলি গাছে ওঠার আগেই এককর্দি পেতে চাইলেন এবং তার চূড়ান্ত ফল বামপন্থী শক্তিগুলির বিধাবিভক্তি। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচন এবং পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচন তাঁদের সামনে অনেক সুযোগ এনে দিয়েছিল। প্রত্যেকটি বামপন্থী দলই যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়ে কিছুটা চাইবেন, সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু তারও একটা নিয়ম আছে। প্রত্যেকেই অতি বাড়ি বাড়িতে চেয়েছিলেন এবং তাঁদের পতনের মূলও সেখানে। এঁরা শব্দে যুক্তফ্রন্টকেই ধরেন নি, বামপন্থী আন্দোলনকেও কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছেন।

১৯৭০ পর্যন্ত এই হচ্ছে সর্বভারতীয় চিত্র এবং এ চিত্র নিছক হতাশার। ভারতে বর্তমানে একমাত্র প্রয়োজন আমূল অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং সেটা দূর হলেও কিছু দঃসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে এ দায়িত্ব কে নেবে, কারা নেবে?

২ সাত

একটা সংগত প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারেন : অতীত দিনের তিন্ত বিষয়গুলির পুনরাবৃত্তি করে লাভ কি? তদানীন্তন নেতৃবৃন্দের আদ্যপ্রাণ্ড করলেই কি আর সমস্যার সমাধান হবে? কোন যাদুমন্ত্র বলে এই বিরাট দেশের পৰ্বতপ্রমাণ সমস্যাসমূহের সমাধান হবে তা আমার জানা নেই, থাকতেও পারে না। তাঁদের প্রতি আমার দোষারোপের কারণ তাঁরা যে দেশের সমস্যা সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন তা নয়, আসলে তার পরিবর্তে তাঁরা সমস্যার সৃষ্টি করেছেন অসংখ্য। সর্বভারতীয়বোধ যা ব্রিটিশ ভারতে ভারত-বাসীর মধ্যে বর্তমান ছিল তার মূলে তাঁরা কুঠারাবাত করেছেন। ক্ষমতালভের জন্য বা ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাঁরা যে কোন ধরনের সুবিধাবাদের আশ্রয় নিতে স্তুষ্টিত হন নি, যার ফলে বিভেদের শক্তিই বেড়েছে, যার পরিণামে ভারতের অখণ্ড অঙ্গর ভবিষ্যতে বজায় যে থাকবে সে কথা হালফ করে বলা যায় না।

বিগত তেইশ বছরের প্রধান ব্যর্থতা, এতকাল সংসদীয় গণতন্ত্র এদেশে চলেও, আমাদের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী কোন গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করতে পারেন নি, যার একমাত্র কারণ তাঁদের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, যেন-তেন-প্রকারে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার নীতি। শাসকদলের অগণতান্ত্রিক আচরণসমূহ বিরোধী দলগুলিতেও সংক্রমিত হয়েছে। যে অবিভক্ত কংগ্রেস সর্বদা মূখে গণতন্ত্রের কথা আউড়েছে সেই দল কখনও দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র প্রবর্তন করে নি, কেন না তা করলে অকর্মণ্য স্থাবির নেতৃত্ব কখনই দলের শীর্ষে অথবা গদীতে শোভা পেত না। কংগ্রেসের কথা এই কারণে বিশেষভাবে বলছি যে, এতাবৎকাল কেন্দ্রে কংগ্রেসই একমাত্র শাসকদল এবং চতুর্থ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সর্বভারতীয় পর্যায়ে তার চেয়ে প্রভাবশালী কোন দল ছিল না এবং সর্বভারতীয় পর্যায়ে আজও কোন দলের অতটা জোর নেই। যেসব দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র চালু আছে, সেখানে দলীয় নেতৃত্ব সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়। কাজেই সেই সকল নেতৃত্বে একটা গতিশীলতা থাকে। এখানে কংগ্রেস সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটি মূলে মনোনয়ন-নির্ভর, আপস ক্ষমতা ভাগ করার ব্যাপার, ফলে তেইশ বছরে নেতৃত্বের চরিত্র একেবারেই বদলায় নি। সেই স্থাবির ও পঙ্গু নেতৃত্ব, বর্তমানে কিছুটা পরিবর্তনমূল্যই হলেও, কার্যত এখনও বর্তমান।

ঠিক এই কারণে কোন গণতান্ত্রিক

মূল্যবোধেরও সৃষ্টি হয় নি। নেতাদের অধিকাংশই অধীর্শিক্ষিত, সামন্ততান্ত্রিক যুগ ও মনোভাবের ঐতিহ্যবাহী এবং সকল রকম কুসংস্কারেই পূর্ণ। আধুনিক যুগের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা তাঁদের মাথায় আছে, গতানুগতিকভাবে তাঁরা সেগুলি আবৃত্তিও করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের বেলায় যত গন্ডগোল, কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁকি দ্রুততর। বেশিদের যাবার দরকার নেই, মাত্র কিছুকাল আগে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি জগজীবন রাম, আমার যতদূর স্মরণে আছে, ঘোষণা করেছিলেন যে, যদি ভূমি-সংস্কার কার্যকর করা না হয়, ভূমিহীনদের অবশ্যই অধিকার আছে বলপূর্বক জমি দখল করার এবং তা তাদের করা উচিত। তখন তিনি একথা ভাবেন নি যে, তাঁর নিজের জমিই এর ফলে দখল হবে এবং এখন যখন সত্যি তা হতে যাচ্ছে, তখন তিনি অন্য কথা বলছেন। গত তেইশ বছরে ঠিক এইভাবে কথার ফুলঝুরি ছড়ানো হয়েছে, কিন্তু কারো কারো মী স্বার্থে খোঁচা দেওয়া হয় নি, এবং এখন যদি জনসাধারণ তাঁদের ওইসব বাণীকে অনুসরণ করে নিজেদের হাতে আইন তুলে নেয়, সেক্ষেত্রে কিভাবে তাদের দোষ দেওয়া যাবে? কথা ও কাজের মধ্যে এই যে বিরাট ফাঁকি, এর ফলে মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, আর বিশ্বাসই হচ্ছে সকল মূল্যবোধের ভিত্তি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধেরও। আইন যখন হয়েছে, তখন সেই আইন কার্যকর হবে, আমার পক্ষে ধৈর্য ধারণপূর্বক অপেক্ষা করা এবং সুস্থস্থলে সব কিছু হতে দিতে সাহায্য করাই কর্তব্য, এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের গোড়া ঘেঁষে নেতারা কেপ দিয়েছেন। এখন আমি আর রীতিনীতি মানব না, আইন-কানুন মানব না, যেন-তেন-প্রকারে আমার প্রাপ্য আদায় করব, আইনের শাসন আমি মানব না, কেন না ওটা আমার কল্যাণে কোনদিনই প্রযুক্ত হবে না, যদিও তেইশ বছর ধবে আমাকে স্তোত্রবাক্য দেওয়া হয়েছে।

২ আট

আসলে যে আদর্শগদীস্বর কথা এতাবৎকাল অনর্গল প্রচার করে আসা হয়েছে, তা আমাদের এই চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থা দিয়ে কার্যকর করা যায় না। যে দেশের মানুষের পেটে অঙ্গ নেই, পরিধানে কাপড় নেই, রোগে চিকিৎসা নেই, শিক্ষার সুযোগ নেই, লেখাপড়া শিখে চাকরি নেই এবং যেখানে একটি স্বাধীন দেশ, যার বয়স তেইশ বছর, সেগুলি সাধারণ মানুষকে দিতে

অপারগ হয়েছে, সেখানে তথাকথিত গণতন্ত্র যে একটি প্রহসনে পরিণত হবে, তাতে সন্দেহের কি আছে এবং পরিণামস্বরূপ যদি সেখানে উগ্রপন্থী (বাম ও দক্ষিণ) মতবাদসমূহ ও ক্রিয়াকলাপের বিকাশ ঘটে তাহলে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই।

সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা কোন মৌলিক পরিবর্তন সম্ভবপর কি না, সে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও বলা যায় যে, যতটুকু এর দ্বারা করা সম্ভব ছিল, ততটুকুও করা হয় নি, ফলে এদেশে ধনী ও দারিদ্রের ব্যবধান গত তেইশ বছরে দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। জনকল্যাণমূলক অনেক কাজই সংসদীয় গণতন্ত্রের দ্বারা করা চলতে পারত। বিনা ক্ষতিপূরণে সম্পত্তির জাতীয়করণ হয়ত সংবিধান অনুমোদন করে না, কিন্তু সম্পত্তির উপর চড়া হারে ট্যাক্স বসাতে নিশ্চয়ই সংবিধান বাধা দেয় না। ধনী ও সুবিধাভোগীর স্বার্থে নানাভাবে আঘাত করা যায় এবং সেগুলির মধ্যে প্রগতিমূলক প্রত্যক্ষ করনীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ, দর্ভাগ্যক্রমে যা কোনদিনই এদেশে অনুসৃত হয় নি। অথচ একটি বলিষ্ঠ করনীতি দ্বারা সরকারের পক্ষে ধনীদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা আদায় করা সম্ভব পর ছিল। কিন্তু সরকার কোনদিনই ধনীদের স্বার্থে বিন্দুমাত্র আঘাত করার চেষ্টা করে নি। এর পরিণামে দুটি অশুভ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

২ নয়

প্রথমটি হচ্ছে একটি সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণীর অভ্যুদয়। শাসকশ্রেণী কথাটা আমি একটু অন্যভাবে ব্যবহার করছি। গত তেইশ বছরে সমাজের একাংশ রীতিমত টাকা করতে সক্ষম হয়েছে। স্বদেশ ও বিদেশের ব্যাংক তাদের টাকার অন্ত নেই, এ ছাড়া হাতে আছে অফুরন্ত কালো টাকা, যা খরচ করে শেষ করা যায় না, হোটেল, নাইট-ক্লাবে, ঘোড়ার মাঠে হাজার হাজার টাকা প্রত্যহ ব্যয় করেও যাদের টাকা ফুরায় না। এরা নিজেদের মধ্যে ইংরাজীতে কথাবার্তা বলে এবং ইউরোপীয় সভ্যতার যোগুলি কলঙ্ক ও পানকার বিবেচক মানুষের কাছে যোগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলার সামগ্রী, সেগুলিই এদের সংস্কৃতি। এদের ছেলেমেয়েরা পড়ে ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে এবং কলেজে এবং পরবর্তী স্তরে ইউরোপে বা আমেরিকায় (এরা আবার আমেরিকা বলে না, স্টেটস বলে)। ওপরওয়ালার মানুষ—মোটো মাইনের চাকরি জীবনের শুরুর থেকে বাঁধা। সূচনাতেই পিতা বা মাতুল বা পিতৃবৃন্দ

গাণ্ঠাহিক বসুমতী

ফামের পাঁচ-হাজারী মনসাবদার। শূদ্র-তাই নয়, সরকারী বড় বড় পদগুলিও এদের একচেটে হতে চলেছে। এরাই সারা দেশকে কার্যত শাসন করে। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলি প্রারম্ভিক সূখ-সুবিধার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়গুলিও এরা দখল করে ফেলেছে। শাক-চর্কাড়ি খাওয়া গরীবের ছেলে যতই মেধাবী হোক, এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়, কারণ এদের প্রত্যেকের শিক্ষার পিছনে মাসে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়। একেবারে অপদার্থ হলেও ক্ষান্ত নেই, সেক্ষেত্রেও ডিগ্রী কেনাও যায়। আর এদের লেজুড় যে শ্রেণী, তারাও মোটামুটি দুর্ভে-ভাতে আছে, ভবিষ্যতের ভাবনা বড় নেই, গাড়ি-বাড়ি আছে, আর কোনো টাকার ভাগও কিছু হাতে আসে।

— কিন্তু সমাজের অবশিষ্টাংশ? সে দুরবস্থার বর্ণনা দেবার ভাষা নেই, আর তা দেবারও প্রয়োজন নেই। বলাই বাহুল্য, এখানে বিক্ষোভ আছে, প্রতিমুহূর্তে বিক্ষোভ ধুমায়িত হচ্ছে, আর এই বিক্ষোভই হচ্ছে একশ্রেণীর পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের মূলধন। বাংলাদেশ ছাড়া সর্বত্রই এই বিক্ষোভকে রূপ দেওয়া হচ্ছে জাতিবিশেষে। বলা হচ্ছে তোমাদের দুরবস্থার জন্য দায়ী অমুক প্রদেশের লোকেরা, তারাই এখানে সব কিছু জুটে-পুটে খাচ্ছে, তাদের ঠেঙাও। এইভাবে জাতিবিশেষ, প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এই জাতিবিশেষই ফ্যাসীবাদের জন্ম দিচ্ছে এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি তার সুযোগ নিয়ে পাকাপাকি ফ্যাসিস্ট রাজ্য কায়েম করার চেষ্টা করছে। তাই আমরা দেখি, এই প্রাদেশিকতা ও জাতিবিশেষের বিষ সারা দেশের সর্বাত্মক এমনভাবে সঞ্চার করে দেওয়া হয়েছে যে, তামিল-নাড়ুতে একটি জাতিবিশেষী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। অনেকে বলবেন, ডি-এম-কে তো মাঝে মাঝে প্রগতিশীল শক্তিগুলির স্বপক্ষে আসে। সেটা কৌশল-গত ব্যাপার। প্রাদেশিকতা ও জাতিবিশেষ ছাড়া ডি-এম-কের আর কি ভিত্তি আছে? ঠিক একইভাবে মহারাষ্ট্রে শিবসেনার উদ্ভব হয়েছে। এই জগীবাহিনীর পরিচয় নতুন করে দেবার বেই এবং বলাই বাহুল্য, এর পিছনে মহারাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের, বিশেষ করে চোঁহান সাহেবের সন্দেশ প্রশ্রয় আছে। শিবসেনার তাম্রবে মহারাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয় না, অথচ নকশালী উপদ্রব নাকি পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা নেই! নকশালীরা তো লোক বেছে বেছে মারে, কিন্তু এরা যা করে, তা গণহত্যা, জেনো-সাইড। অথচ এই দলকে ক্ষমতার স্বার্থে

নিষিদ্ধ করা হয় না, এদের কুখ্যাত নেতাদের সমাজবিরোধী বলে গ্রেপ্তার করা হয় না! খুঁচিয়ে গেলা জাতিবিশেষের ধাক্কা আসাম বহুধা বিভক্ত হয়ে গেল, দ্বিখণ্ডিত পাঞ্জাব আবার বিভক্ত হল, আর পাঞ্জাবের রাজনীতির যারা সবচেয়ে বড় শরিক, তারা একটি সাম্প্রদায়িক জাতিবিশেষী দল। উত্তরপ্রদেশে জাতিবিশেষী শক্তিগুলিকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগানো হচ্ছে, কোন্ যুক্তিতে আর-এস-এস'এর মত একটি সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক জাতিবিশেষী গান্ধাবাহিনীকে পুনরায় বৈধ সংগঠন বলে ঘোষণা করা হল, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। অবশ্য বুদ্ধির অগম্য বলে মতের অপলাপ করা হবে, উদ্দেশ্য একটিই, ক্ষমতার স্বার্থ, যে স্বার্থ এমন কি মুসলিম লীগের সর্বভারতীয় পুনর্জাগরণ ঘটতে চলেছে। অর্থাৎ কায়মী স্বার্থের টিকে ধাক্কা পক্ষে বণ্ণিত নিরস্ত্র মানবের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়োজন এবং সেই বিভেদের সৃষ্টি করে কিছু চতুর্থ শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা রাজনৈতিক মুনোফা লুঠছেন, তাদের ন্যায় বিক্ষোভকে বিপক্ষে চালনা করে ফ্যাসীবাদকে সাদরে আহ্বান করে আনা হচ্ছে।

॥ দশ ॥

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সৌভাগ্যক্রমে এই বিক্ষোভ জাতিবিশেষ এবং প্রাদেশিকতায় রূপ নেয় নি, তার কারণ এখানকার বামপন্থী ঐতিহ্য। কাজেই দিল্লীর শাসকদের পক্ষে বাংলাকে নিয়েই ভয়ের কারণ সবচেয়ে বেশি, কায়মী স্বার্থ ভীত এই কারণেই যে, বাংলাদেশের গরীব মানবেরা তাদের মূল শত্রু চিনতে ভুল করেন নি। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিশেষ ও প্রাদেশিকতার ধূয়া ভুলে এখানকার খেটে-খাওয়া মানবদের বিচ্ছিন্ন করা যায় নি, যদিও সেই অপচেষ্টা যে বার বার করা হয় নি তা নয়। কাজেই ভারতজোড়া অপপ্রচার বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হচ্ছে। বাঙালী মানেই কমিউনিস্ট, তারা বিপজ্জনক। খোদ রাজধানী দিল্লীর ইস্কুল-কলেজগুলি তো বাঙালী ছাত্র ভর্তি করা বন্ধ করে দিয়েছে।

বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে বাংলাদেশ গৌরব বোধ করতে পারে বটে, কিন্তু তাতেই তো আর সমস্যার সমাধান নেই। বামপন্থী আন্দোলনের অসংখ্য দুর্বলতা ও টাটি-বিচুটির ইতিহাসও বাংলাদেশ বহন করছে এবং সেগুলিকে মিথ্যা মায়্যা ভ্রম বলে উড়িয়ে দিলে সত্যের অপলাপ করা হবে। গত সংখ্যায় লিখেছি, এদেশে বামপন্থী আন্দোলন কেতাবী নেতার সৃষ্টি করলেও

কোন জননেতাকে গড়ে তুলতে পারে নি। ফলে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা ও পরিবর্তনের আগ্রহ দেখা গেলেও, নেতৃত্বের ব্যর্থতায় সব ডুন্ডুল হয়ে গেছে এবং এই কারণেই উগ্রপন্থী রাজনীতি বাংলাদেশে পা রাখার মাটি পেয়ে গেছে। আসলে বামপন্থী নেতৃত্ব যে কতটা অকর্মণ্য, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ১৯৬৬-র খাদ্য-আন্দোলনের সময় থেকে। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে বামপন্থী নেতারা ব্যর্থ হয়েছিলেন। জনসাধারণ আসলে নেতাদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে যেতে রাজী ছিলেন, কিন্তু নেতারাই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ব্যর্থতাকে তো অস্বীকার করা যায় না। বামপন্থী নেতারা বিশ্বাস করতেনই রাজী ছিলেন না যে, ১৯৬৭-র নির্বাচনে বাংলা-দেশ কংগ্রেসকে নির্মূল করে দেবে! কিন্তু কার্যত তাই ঘটল। বামপন্থী নেতারা ঐক্যবন্ধ না হতে পারার দরুন কংগ্রেসের যতগুলি আসনে হারা উচিত ছিল, তার চেয়ে কম আসনে তারা হারল। ১৯৬৭-র যুক্তফ্রন্ট তো বামপন্থী নেতারা করেন নি, জনসাধারণই তাদের যুক্তফ্রন্ট গড়ে বাধ্য করেছিলেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর অবশ্য তাঁরা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, ১৯৬৯-এর উপনির্বাচনে তাঁদের সাফল্যই যার প্রমাণ। কিন্তু এই সাফল্যকে তাঁরা ধরে রাখতে পারেন নি এবং সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক কারণে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন

সাপ্তাহিক বসুমতী

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

তিন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

চাঁদার হার

ভারতে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৮.০০ পং
ষান্মাসিক—	৯.০০ পং
ত্রৈমাসিক—	৪.৫০ পং

বিদেশে জাহাজে (সডাক)

বাৎসরিক—	৪০.০০ পং
ষান্মাসিক—	২০.০০ পং
ত্রৈমাসিক—	১০.০০ পং

বিদেশে বিনানে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৭০.০০ পং
ষান্মাসিক—	৮৫.০০ পং
ত্রৈমাসিক—	৪২.০০ পং

প্রতি সংখ্যা (নগদ মূল্য) ৩০ পয়সা

মহারাজ

শুক্লমাসের রাত্রি

সূর্য নিভলেও

শচীন দত্ত

মহা আতিথির বেশ
চির যৌবনের বিপ্লব-দিশারী
আরো নিবিড় কর্ম-শব্দে, প্রশান্তিমগ্ন।

তাপস কাদের নাম?
দৌখিনি সে যুগ।
আশ্রয় নেই এ যৌবন সাধনার
ত্রিশতি বর্ষের কারাগার-ভ্রমরয় চিরন্তন।
অগ্নিধৌত বজ্রাঙ্কিতে লৌহ সংযোজন
অত্যাচারের উৎসাদনে প্রবুদ্ধ—
দুর্বীর বিদেশী-দেশী কলুষ
উৎপাতনের চিত্তচর্য—সেই এক নাম তপস্যা।
কর্ম-প্রেমে মূর্ত্তি-মন্ত্রে—আর এক তপস্যা।
চির যৌবন দিশারী
কালান্তকে নির্জিত করে যৌবনের
আর এক নাম রাখেন চরিত্র-চরিত্র-চরিত্র-শব্দে।
বহু বিপ্লবীর রক্তধারা নিষিক্ত,
কোটি কোটি হীরকদন্ডিত গলিত,
বিপ্লব-মানসীর অন্তরাল—ফল্গুধারা বসন্তে যায়
সেই পারাবারে জনতার স্নান।
এ যে অর্ঘ্য নয়, বিড়ম্বনা-নয়, জ্বালা-নয়
অজ্ঞতার সংকার অশ্রুতীর্থে
নির্বাক মহাতাপসের পদ্য বেদীমূলে।

মাটির প্রদীপ ফুট দিয়ে নেভাও : ঘর অন্ধকার,
আগনের সূর্য ফুট দিয়ে নেভাও : পৃথিবী অন্ধকার।

এমনি-এক অন্ধকারের বিছানা থেকে জ্বলে চোখের
পিচুটি জলে ধুয়ে উধাও-মুখ আমাকে কে বলেছিল
—ওই দ্যাখ সূর্য। নতমুখ আমাকে কে বলেছিল
—চিনে রাখ তোর জননী।

জননী জন্মভূমি

আমি চিনেছিলাম। জেনেছিলাম সূর্য পিতা এবং
পিতা সূর্যের ঔরসে মাতা জন্মভূমির গর্ভে আমার
‘মা’ কিছ্র অস্তিত্বের অহংকার।

আর শুনছিলাম

দস্যুর হাতে-বন্দী সেই জননীর মূর্ত্তির সত
ভেসে-আসা অগ্নিমগ্নের সূর আমার কানে
: মৃত্যুই জীবন, জীবনই মৃত্যু।

প্রদীপ ফুট দিয়ে নেভাও : ঘর অন্ধকার,
সূর্য ফুট দিয়ে নেভাও : পৃথিবী অন্ধকার।

তবু থাকে

চেতনার-রাজ্যে থাকে জীবন-মৃত্যুর মহান শিল্পী
অক্ষয় অশ্লান স্বাধীন-গৈলোক্য-মহারাজ।

ঘটল। এই পতন ঘটায় কোন ন্যায়সঙ্গত
কারণ ছিল না এবং জনসাধারণকে অধিক-
তর হতাশা ও প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের
দিকে ঠেলে দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করা
হয় নি। এখন এ কথাটা কোন দল বা
নেতাকে বলতে গেলে তাঁরা পত্রপাঠ
দোষটা অপর কোন দল ও তার নেতাদের
ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন, যা তাঁরা দিয়ে
থাকেন, কিন্তু সেটা কোন কাজের কথা
নয়। যেটুকু প্রত্যাশা যুক্তফ্রন্টকে কেন্দ্র
করে পশ্চিমবঙ্গের জনমনসে গড়ে উঠে-
ছিল, তার অপমৃত্যু ঘটানোর দায়িত্ব কোন
বামপন্থী দলই—তা ঘোর লাল, লাল,
ফিকে লাল, গোলাপী যে দলই হোক না
কেন—অস্বীকার করতে পারেন না।

॥ এগার ॥

এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে যে
হতাশা নেমে এসেছে, তা যুবসমাজের
একাংশকে অনিবার্যভাবে উগ্রপন্থী করে
ভুলছে এবং বলাই বাহুল্য, এই ক্রিয়া-
কলাপকে রোধ করার ক্ষমতা সরকারের
নেই। আইন করে, পুলিশ-মিলিটারী,
সি-অ্যান্ড-পি দিয়ে এই সমস্যার সমাধান
হবে না, সমাধান হবার পথ একটাই। তা
হচ্ছে বর্তমান সমাজ থেকে হতাশা ও
হতাশার কারণগুলিকে দূর করা, যা

আবার বর্তমান সমাজ-কাঠামো, বর্তমান
প্রশাসনকে টিকিয়ে রেখে সম্ভবপর নয়।
এমন একটা সময়ে উপনীত হওয়া গেছে,
যখন আমূল পরিবর্তন দরকার, প্রয়োজন
ব্যাপক সার্জারির, হোমিওপ্যাথি ওষুধে
কাজ হবে না, অথচ বর্তমান শাসনব্যবস্থা
এর চেয়ে বেশি দিতে অপারগ। স্বাধীনতার
চাবিশ বছরে পা দিয়ে আমরা একটা এমন
পর্ষায়ে উপনীত হয়েছি, যেখানে রাজ-
নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট
তীব্রতম হয়েছে, তা বিস্ফোরণের আকার
নেবার পথ খুঁজছে অথচ পাচ্ছে না,
বিপ্লবের মুহূর্ত প্রস্তুত, অথচ তার
প্রস্তুতি নেই, এদিকে শাসকশক্তিরও
অবস্থাকে সামাল দেবার মত কোমরের
জোর নেই। সোজা বাংলায়, যা হচ্ছে,
হতে দাও, এই নীতি অবলম্বন করে সকল
তরফই চলছেন। কিন্তু এভাবে চলে
দেওয়াটা কতদূর সঙ্গত হবে? সময়
হিসাবে তেইশ বছর বড় কম নয়। রুশ-
বিপ্লবের তেইশ বছর পরে সোভিয়েট
রাশিয়া হিটলারের জার্মানীকে হারিয়ে
দেবার মত শক্তি অর্জন করেছিল এবং
স্বতীয় মহাযুদ্ধের ঐ প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি
সহ্য করেও যুদ্ধান্তের কিছুকালের মধ্যেই
নিজে প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত
করতে পেরেছিল। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা

কতটা জোরাল ভিত্তির উপর স্থাপিত
হলে এটা সম্ভবপর হয়? বিপ্লবের তেইশ
বছরের মধ্যে তারা যদি নিজেদের অর্থ-
নীতিকে এতটা জোরাল ভিত্তির উপর দাঁড়
করাতে সক্ষম হয়ে থাকে, সৌদিক থেকে
বিচার করলে স্বাধীন ভারতের তেইশ
বছরের ইতিহাসকে নিছক অকৃত্বের
ও অক্ষমতার ইতিহাস বললে কিছ্র ভুল
হবে কি? বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট
রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমাদের
চেয়ে কিছু ভাল ছিল না, বরং অধিকতর
খারাপ ছিল। গৃহযুদ্ধ, প্রতিবিপ্লব,
বিদেশী আক্রমণ—সমস্ত কিছুকে মোকা-
বিলা করে তাদের অগ্রসর হতে হয়েছে,
অথচ জাতি হিসাবে ভারতবাসী, বাস্তব
হিসাবে ভারতীয়রা, পৃথিবীর কোন
দেশের লোকের চেয়ে কম পরিগ্ৰহী নয়,
বরং অত্যন্ত নিম্নমানের জীবনযাত্রা,
অনাহার-অধাহার, অপদৃষ্টিজনিত বাগ,
এতকিছ্র সত্ত্বেও তারা যে আন্দাজ পরিগ্ৰহ
করে, ব্যাক-ডেটেড যন্ত্রপাতি নিয়ে একান্ত
প্রতিকূল পরিবেশে তারা যে পন্থা তৈরি
করে, তা মোটেই নিম্নমানের নয়। অথচ
গত তেইশ বছরে অতুলনীয় এই মানব-
শক্তির প্রচণ্ড অপচয় ঘটা ভিন্ন আর
কিছুই হয় নি।

[চলবে]

ਭੀਮ

নারায়ণ গান্ধীসাহিত্য সঙ্গে

[পূর্বনিবেদিত]

॥ একুশ ॥

মনীশদা এসেছিল ঘোষ সাহেবের কাছে। কী জরুরি, আলোচনা চাচ্ছিল দৃ'জনের। বিকেল পাঁচটা নাগাদ হাতের কাজ নামিয়ে টুল্‌ বেরতে যাচ্ছিল, মনীশদা বললে, 'একটু বোসো টুল্‌, তোমায় লিফ্ট দেব।'

মন্দ কী—বারো আনা রাস্তার বাসের ঝাঁকুনি বেঁচে যায়, কটা পয়সাও। পাটি-শনের ওপার থেকে ওঁদের কথা কানে আসছিল, কোন এক কারখানা, ফ্যাক্টরী আইন, লক-আউট, কোম্পানীর লিফ্ট-ডেশনে যাওয়া—এইসব নিয়ে খুব বিব্রত আর উত্তেজিত ছিলেন দৃ'জন।

'ওদের ইউনিয়নের অন্ততঃ জনতিনেক পার্চেজ্‌বল্‌—' ঘোষ সাহেব বলছিলেন।

'কিন্তু সাহসে কুলোবে না—' মনীশদা বলছিল: 'যে-রকম আগুন হয়ে আছে লেবার! একটু আঁচ পেলে একেবারে জ্বালতে কবর দিয়ে দেবে।'

'ওরা আজকাল কবর দেওয়াটা খুব পছন্দ করছে।'—ঘোষ সাহেব ঠাট্টা করছিলেন: 'সব সময় বলছে, এই মাটিতে কবর দিন। কিন্তু হিন্দুরা তো কবরে যেতে আপত্তি করতে পারে।'

'সে ব্যবস্থাও আছে। পড়িয়ে মারো, পড়িয়ে মারো—এটাও খুব ফেবারিট শ্লোগান।'

এসব টুল্‌ শুনছিল, শুনছিল না। বাইরের রাস্তায় গাড়ির আওয়াজ বাড়ছিল ক্রমশ, এখন সব ঘরে ফেরবার তাড়া। আর ঘণ্টা দেড়-দুই বাদে এমন ব্যতিক্রম হাইকোর্ট পাড়া একেবারে ঝিমিয়ে যাবে। তার এদিকের জানলা দিয়ে বিশাল লাল বাড়িটার থেটুকু দেখা যায়, তার ওপর এখন ছায়া ঘন হচ্ছে। এ ঘরে আলো-সারা

দিন জ্বলেই—দৃ'পুঁরে তার অস্তিত্ব ভালো করে টের পাওয়া যায় না, কিন্তু সেই আলোটা টেবিলের ভল্লায়, আলমারীর কোণায়, র্যাকের আশেপাশে ছায়ার ছক কাটছে এখন। বেলা একটু একটু করে পড়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে ধুলো, কাগজ আর ক্রান্তির গন্ধে ভরে উঠছে ঘরটা।

মনীশদার কথা চলছে—চলছেই। টুল্‌র হাই উঠতে লাগল অবসাদে। বোরিয়ে বাস ধরলে এতক্ষণে ভবানীপুঁরে পৌঁছে যেত সে। কিন্তু মনীশদা বসতে বলেছে। বসাই যাক।

উঠে টাইপরাইটারটার সামনে গিয়ে বসল। অল্প অল্প শিখছে, সামান্য স্পীডও আসছে। উৎসাহটা এ-সময়ে একটু বেশিই থাকে। হাতের আঙুলগুলো এখনো সেট হয় নি, প্রায়ই দেখে দেখে টেপার্টীপ করতে হয়।

বাঁকা চোখে তাকিয়ে হেড ক্লার্ক মধ্যে মধ্যে বলেন, 'মেশিনটার বারোটা তো তুমিই বাজাবে দেখাছি। দয়া করে ভেঙো না—এখন আবার রোমিংটন কোম্পানীতে গন্ডগোল যাচ্ছে।'

হেড ক্লার্ক বোরিয়ে গেছেন, এই সুযোগ। টুল্‌ মেশিনে কাগজ চাপিয়ে যা খুঁশি টাইপ করতে লাগল।

এস-ডাবল্‌-এ-পি-এন-এ, এস-ডাবল্‌-এ—

স্বপ্না!

টুল্‌র আঙুল থেমে গেল। ঘুরে-ফিরে ওই নামটা। এই পাঁচ-সাতটা বছর তো বেশ ছিল, আড্ডা মেরে, ইয়াকি' দিয়ে, বখামো করে চমৎকার কেটেছে। তখন কিছই মনে পড়ত না। বাড়ি ফিরলে দাদা চ্যাটামোচ করত এক-একদিন, মা কাদিত—কিছই আসত-যেত না। স্বপ্না কোথাও ছিল না, কোনো স্বপ্নের মাঝেও

না। কিন্তু তারপরে দাদার পান্সার পড়-বার আগে সেই হাজত—একজন কনস্টেবল কয়েকটা থাপড় মেরেছিল, দারোগা দুটো লাথি বসিয়েছিলেন—আর হাজতের সেই দৃ'গন্ধ। মার খেয়ে ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসেছিল কার্তিক, ফণী গোঁ-গোঁ করে বলেছিল, 'সালাদের একবার রাস্তায় জুং-মতো পেলে—' আর লম্ভায়, দুঃখে, অপমানে টুল্‌ সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। যত কামড়েছে মশায়, মনের ভেতরটা জ্বলেছে তার চাইতেও বেশি।

দাদা ছাড়িয়ে আনল মুরারি হালদারকে ধরে। এমন সময় দাদি। নিজের মধ্যে একটা কিছ ঘটে গিয়েছিল নিশ্চয়। না হলে হঠাৎ এমন ভালো ছেলে হওয়ার সুবুদ্ধি জাগল কেন তার। আর তখন স্বপ্না ফিরল।

স্বপ্না ফিরল।

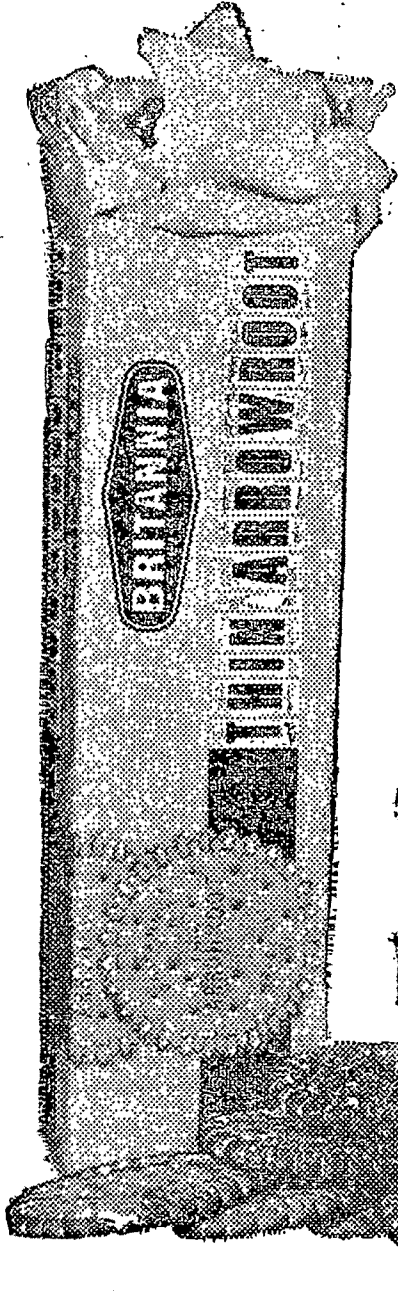
এই মেয়েটা তাকে ভালোবেসে ফেলে-ছিল। সেই ছেলেবেলার ভালোবাসার যদি মানে থাকে কোনো। কবে কথাটা প্রথম জানা গিয়েছিল—কবে?

[—ইস, তুমি কী ভালো অন্ধ কবচে পারো টুল্‌দা! কত তাড়াতাড়ি!]

'অন্ধ তো ভালো করেই শিখতে হবে। নিখুঁত চুলচেরা হিসেব জানা চাই। যন্ত্র-পাতি চেনা চাই। না হলে তো একেবারে সোজা ক্র্যাশ—দারুণ অ্যাকসিডেন্ট!'

'সে কি! কিসের ক্র্যাশ! কিসের অ্যাকসিডেন্ট?'

'বা-রে, আই-এসসি পাশ করে আমি পাইলট হবো যে। জানিস স্বপ্না, দমদমে একটা একজিবিশন করেছিল একবার, আমি দেখতে গিয়েছিলুম। এরোপ্লেনের একজিবিশন। মানে—ঠিক এরোপ্লেন নয়—নানা রকম প্লেনের এজিন, তার মন্ত্র-টন্ত্র সব দেখিয়েছিল। কত যে সব সুন্দর



৫০ বছরের ওপর
জনপ্রিয়তায়
আদ্বিতীয়

ভারতে সবচেয়ে
বেশী বিক্রী—



থিন এরাবুট বিস্কুট



মানেই সেরা বিস্কুট

BBC 1009

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

ব্যাপার না—দেখলে তোর মাথা একেবারে ঘুরে যেত। সেই দেখেই তো আমার মনে হল যে, আমাকে পাইলট হতে হবে। আর অঙ্কে মাথা না থাকলে, সব হিসেব করে, বুঝে প্লেন না চালাতে পারলে, ব্যাস্—হয়ে গেল।’

‘না টুন্ডুদা, না। তোমার পাইলট হয়ে কাজ নেই।’

‘কেন রে, কত সম্মানের কাজ। তা ছাড়া ভেবে দ্যাখ—কিরকম প্রিলিং! মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি—পায়ের তলায় পড়ে থাকছে নদী-পাহাড়-সমুদ্র—যৌ করে দেখতে দেখতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে একে-বারে লন্ডনে পৌঁছে গেলুম।’

‘যেতে হবে না তোমায় লন্ডনে। প্লেন চালিয়ে।’

‘তবে কী করব?’

‘কেন, ডাক্তার হবে, এন্জিনিয়ার হবে, আরো কত কী হতে পারো।’

‘আরে, ঠিকমতো চালাতে পারলে অ্যাক্সিডেন্ট হবে কেন! আর কত লোকই তো পাইলট হয়।’

‘হোক গে। তুমি চালাতে যাও না প্লেন, তার আগে আমি মরে যাব।’

‘তুই মরে যাবি কেন?’

‘আমি—আমি যে—’

বাকীটা চোখের জলে মিলিয়ে গেল তারপর।]

টুন্ডু টাইপ-করা কাগজটার দিকে চেয়ে রইল। এস-ডবলু-এ—স্বপ্না। না, এখনো যে সব সময় ভাবছে স্বপ্নার কথা, তা নয়। কিন্তু কোথায় জড়িয়ে গেছে মনের ভেতর, একটা সুরের মতন ঝিনঝিন করে বৃকের মাঝখানে কাঁপতে থাকে কখনো কখনো। আর বিশেষ করে সোঁদন, সেই কার্তিক আর তার দলবলের হাতে পড়বার সময়—

মনীশদা ডাকলঃ ‘টুন্ডু, চলো।’

‘আসছি মনীশদা।’

মেশিনটা বন্ধ করে টুন্ডু উঠল। টাইপ-করা, কাগজটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কী ভেবে ভাঁজ কবে নিলে নিজের পকেটে।

ঘোষ সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই মনীশদা নামল, টুন্ডু মনীশদার ফোলিও-ব্যাগটা হাতে টেনে নিয়ে পিছে পিছে চলল। এখানে আর মনীশদা তার ভ্রম্মপীতি নয়—তার মনিবের বন্ধু। এখানে মনীশদাকে আলাদা সম্মান করা উচিত, সে সঙ্গে থাকতে ভারী ব্যাগটা তাকে বইতে দেওয়া যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোষ সাহেব নিজের গাড়ির দিকে এগোলেন, মনীশদার সঙ্গে টুন্ডু উঠল তার গাড়িতে। কিছুক্ষণ ব্যাজার মধ্যে চুপ করে মনীশদা স্নগতোক্তি করলঃ আ—দিস্ লেবার-ট্রাবল! বাংলা দেশে একটা ইন্ডাস্ট্রিও আর থাকবে না।’

টুন্ডু চুপ করে থাকল। তার কিছু বলবার নেই। এসব ভাবনার ভার সে বইতে পারে না—ওগুলো দাদার এজিয়ারে। লেবারের জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই তার।

‘লেবার মডেমন্ট নয়—প্রেক্ষ ইউনিয়ন-বাজী। চমৎকার হয়েছে এই বক্তৃষ্ট সরকার! বক্তৃষ্ট মানেই চৌদ্দ দলের লাঠিবাজী। যেমন করে হোক নিজের পাটি বাড়াতে হবে। ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা বোঝবার দরকার নেই, ডিম্যান্ড কতটা রিজনেবল—শেষ পর্যন্ত কোম্পানীই উঠে যাবে কি না সে-সব ভাবনাও নেই—স্ট্রাইক কল দিতে পারলেই পপুলারিটি! ইম্প্রসিবল! দিস প্রভিন্স অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ইজ ডম্ভ!।’

টুন্ডু তেমনি চুপ করে রইল।

মনীশদা—একটা সিগারেট ধরিয়ে—‘ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকল বাইরের দিকে। ময়দানে—শহীদ মিনারের নিচে বিরাট জনসভা। চৌরঙ্গীর ট্র্যাফিক চলছে, তার আওয়াজ ছাপিয়েও মাইকের গর্জন কানে আসে।

‘সেই বিশ্বাসঘাতকদের চিনে নিন কমরেডরা—যারা প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—’

মনীশদা বিষ-ছড়ানো গলায় বললে, ‘হুঁ, তোমরাই কেবল সিজার্স ওয়াইফ—বাকী সবাই বিশ্বাসঘাতক!’

গাড়ি চলল। পার্ক স্ট্রীট ছাড়াতে ট্র্যাফিক হাল্কা হয়ে আসছে। বাতাসে দক্ষিণের অজস্রতা। ঘরা পাতা উড়ে উড়ে আসছে পথের ওপর।

একটু চুপ করে থেকে মনীশদা বললে, ‘কাজকর্ম কেমন চলছে?’

‘ভালোই।’

‘শিখে নিচ্ছ তো?’

‘যতটা পারি।’

‘যদি এক-আধটা পরীক্ষাও দিত, তা হলে অনেক বেটোর জায়গায় দেওয়া যেত তোমাকে। আজকাল এসব কোয়ালি-ফিকেশনে বেয়ারার কাজও জোটে না। নেহাৎ ঘোষ আমার বন্ধু বলেই—’

অপমানের একটা কটি টের পেলে টুন্ডু। ঠিক কথা, মনীশদার অনুগ্রহের সীমা নেই। কিন্তু অনুগ্রহ ঝিনি করেন বার বার সেটা তিনি মনে করিয়ে দিলে ভালো লাগে না, কেমন বিদ্বাদ হয়ে যায় সব। তখন বলতে হচ্ছে করে—দরকার নেই আপনার দয়ায়, ওটা বরং ফিরিয়েই নিন আপনি।

কিন্তু বলা যায় না সে কথা। মনীশদা এ নিয়ে বোব হয় বার-সাতক তাকে মনে করিয়ে দিল, তবুও বলা যায় না। টুন্ডু

এখন জীবনকে বদলাতে চাইছে; এখন সাত বছরের সমস্ত অপচয়গুলোকে তার মূছে ফেলা দরকার; এখন আবার রক্তের ভেতরে সদর তুলেছে স্বপ্না, অল্প বয়সে, বয়ে-যাওয়ার আগে যে সদরটা তার মনকে খানিক নেশার মধ্যে তুলিয়ে রাখত।

টুন্ডু একবার চোঁট চাটল।

‘আমি প্রাইভেটে পাশ করবার কথা ভাবছি মনীশদা।’

‘তাই নাকি?’

‘ইচ্ছে আছে শীগুঁগুরই পড়াশোনাটা আরম্ভ করে দেব।’

‘ইচ্ছে নিশ্চয়ই আছে, তবু এখনো কোটিং ক্লাসে ভর্তি হওয়া গেল না। অথচ যাওয়া-আসার রাস্তার ধারেই তো কটা টিউটোরিয়াল হোম পড়ে। কী যে হচ্ছে, কোনোমতেই আর সময় পাওয়া যাচ্ছে না!’

মনীশ সামান্য একটু হাসল। অবিশ্বাসের হাসি।

‘সে তো খুব ভালো কথা। কিন্তু পড়াশুনোর এনার্জি আছে এখনো? যে দলে মিশেছিলে।’

‘এনার্জি আমার আছে মনীশদা। তবে অফিসে কাজের যা চাপ—’

মনীশ টুন্ডুর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল মুখটা।

‘পরিশ্রম না করলে মাইনে দেবে কেন তোমাকে? আর পরিশ্রম না কবা ছাড়া কোন বোগ্যতা তোমার আছে?’

আবার সেই অপমানের আঘাত।

খিদের ক্রান্তিতে শরীর যেন ভেঙে আসতে চাইছিল, একরাশ ভীক্ষা বিরজি মনের ভেতর দিয়ে বয়ে গেল টুন্ডুর। বলতে ইচ্ছে করলঃ ‘বার বার শোনাচ্ছেন কেন ওভাবে, গাধার মতো খাটুনি আর হেড্ ক্রাকের সারা দিন দাঁত খিঁচুনির পরে ওই মাইনের মুষ্টিভিক্ষা আমি চাই না। কাল থেকেই দেব ঘোষ সাহেবের চাকরি ছেড়ে।’

কিন্তু, এখনো, এত অসহ্য হলেও বলা যায় না। জীবনটা বদলাতে হবে তাকে। স্বপ্না এখনো তাকে মনে রেখেছে। স্বপ্নার জন্যেই তৈরি হতে হবে তাকে।

নেবা গলায় টুন্ডু বললে, ‘তা ঠিক।’

মনীশদা তেমনি শক্ত ভাঁগতে বললে, ‘কাজ করো, কাজ। খাটো। এসব কমপ্লেন কখনো তুলো না। আর মনে রেখো, ঘোষ নেহাৎ মার্সি গ্রাউন্ডেই তোমায় চাকরি দিয়েছে, আমার রিফোর্টিং না হলে—’

যদি আসো

কায়সার হক

(শ্রীশীতলদাস জোয়ারদার-কে)

১...যদি আসো, পথ চিন্তে নিতে হলে না কিছুই দেয়।
কেন না, তেমনি আছে স্বপ্ন
মরা নদী,
শুকনো খাল, ভাঙা সেতু—
সব তুমি পাবে পথে।

২...লাউয়ের সীমের জাংলা,
দুঃখবতী গাভী,
(আগের মতন দুঃখ দেয় না যদিও)
ছাড় বের-করা গোটা দুই হালের বলব
দেখবে রয়েছে মাঠে বাঁধা।

৩...অতিবৃষ্টিতে, অনাবৃষ্টিতে মাঠের ফসল মারা যায়
ফি রছর।
চড়া সূর্যে
অথবা বকেয়া খাজনায়
অনেকের জমিজমেরেত
নেই আর।

৪...তোমার সেই পালোয়ান ফজর শেষ,
দিনের পর দিন
একবেলা আধবেলা খেয়ে না খেয়ে
হারিয়েছে পেশির উদ্ভাসতা ;
এখন সে
ঘায় না কোথাও
বাজি রেখে আর লড়তে।

৫...তবু দেখতে পাবে তুমি (যদি আসো)
হাট-ফেরত মানুষজন
হাট্টি অবাধ ধুলোয়
ডুবিয়ে, দুর্ভাবনাকে ক্ষণিকের জন্যে ভুজে
মর্শ মনে সওদা কিনে ফিরছে—
সব তুমি দেখতে পাবে।

৬...যদি আসো
পথ চিনে নিতে
কষ্ট হবে না তোমার।

টুলু আর কথা বলল না, কেবল
একটা হাতের মূঠো তার শক্ত করে
সীটটাকে আঁকড়ে রাখল। মনশীদার
গাড়িতে ইহজীবনে আর কখনো লিফট
নেবে না সে। এর চাইতে বোকাই বাসের
পা-দানীতে প্রাণ হাতে করে ঝুলতে
ঝুলতে যাওয়া অনেক ভালো।

আর—অ্যাটর্নি অফিসের এই চাকরি
ছাড়া ভদ্র জীবিকার আর কি পথ নেই
কোনো? এর চাইতে রাস্তার মোড়ে
মোড়ে খবরের কাগজ বিক্রি করলে কেমন
হয়!

মনশী বলছিল: 'গোটা বাঙালী
জাতটাই যা হয়েছে—পরিগ্রহ করতে
হলেই—'

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল
টুলু। গলার ভেতরটা যেন কেমন পাকিয়ে
শ্যাকিয়ে উঠছে, তার কান্না পাচ্ছিল।

গাড়িটা বাড়ির সামনে পেঁছানোর
অপেক্ষামাত্র। প্রায় ছুটেতে ছুটেতে নেমে
এল দিদি। একেবারে পাগলের মতো
চেহারা।

অশ্রুত স্বরে দিদি বললে, 'তুমি ছিলে

কোথায়? তোমার অফিসে তিনবার ফোন
করোঁছি, কোথায় গিয়েছিলে তুমি?'

টুলু আগেই নেমে যেতে চেয়েছিল,
মনশীদা বলেছিল, 'তোমার দিদির ওখান
থেকে চা খেয়ে যাবে।' কিন্তু এখন আর
চা খাওয়ার প্রশ্ন নয়—ভয়ে থমকে গেল
দুঃজনে।

মনশীদা কাঁপা গলায় বললে, 'আমি
ঘোষের অফিসে গিয়েছিলুম, কাজ ছিল।
কিন্তু ব্যাপার কী? অমন করছ কেন
উমা?'

দিদি এবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল।
'টিনটিনকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

অন্য ফ্ল্যাটগুলো থেকে অনেকগুলো
মুখ উঁকি মেরেছে তখন।

মনশী আর টুলু পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে
থাকল কিছৃক্ষণ। শাদা হয়ে গেল মনশীর
মুখ, থর থর করে কাঁপতে লাগল চোঁট।

'কী বলছ তুমি? পাওয়া যাচ্ছে না
মানে?'

'পাওয়া যাচ্ছে না—স্কুল থেকে সে
ফেরে নি। স্কুলে নেই, তার বন্ধুদের বাড়ি
কোথাও যায় নি।'—উমা কাঁদতে কাঁদতে
বসে পড়ল মাটির ওপর : 'ওগো, কোথায়
গেল আমার মেয়ে—ফিরিয়ে আনো—যেখান
থেকে পারো নিয়ে এসো তাকে—'

দিদি এখন সম্পূর্ণ অন্যরকম।
অবিকল আরো দশজন বাঙালী মেয়ের
মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগল :
'ফিরিয়ে আনো, আমার টিনটিনকে ফিরিয়ে
আনো—'

[ক্লেশ]



মৃত্যু

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

“আমার প্রশংসায় কাজ নেই—
ধর্ম-অধর্মের অতীত
কার্য-কারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন
যা ভূমি জানে
আমাকে বলো!”

—যমের প্রতি নচিকেতা
(কঠোপনিষদ: অনুবাদ সুভাষ
মুদ্রোপাধ্যায়)

●

দুর্কান্তকে নিবেদিত ‘উল্জীবন’
কবিতায় সুভাষ কঠোপনিষদ থেকে যে
উদ্ধৃতির ব্যবহার করেছেন, উপনিষদের
পৃষ্ঠায় তা একজন কিশোর মানুষের
জ্ঞানপিপাসাতেই চিরদিনের জন্য
নিবেদিত। অবশ্যই ঐ কিশোরের স্বপ্নভঙ্গ
হয়েছিল, কেন না তাঁর পিতা যজ্ঞের জন্য
যে গাভী দান করেছিলেন, সেখানে চাতুরী
এবং ফাঁকি ছিল। স্বপ্ন ভেঙে গেলেও
নচিকেতা কিন্তু তাঁর বিশ্বাসকে ত্যাগ
করেন নি। সম্মুখের তমসাকে, যা তাঁর
পিতার অজ্ঞানতা, সম্পূর্ণই অতিক্রম করে
তিনি আরো বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন;
কেন না, তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল।

আমার মনে হয়, ঐ প্রশ্নকে যমের
সম্মুখে উপস্থিত করার অধিকার শুধু
সেই মানুষেরই থাকে, যিনি জ্ঞাত সত্যকে
প্রতিষ্ঠিত করার চেয়ে অজ্ঞাত সত্যকে
জানবার পিপাসায় অধিকতর আত্ম: এবং
যাঁর জীবনে অন্তত একবার স্বপ্নভঙ্গ
হয়েছে, এমন স্বপ্ন, যা তাঁর নিজস্ব
অস্তিত্বের তুলনায় অধিক মূল্যবান।

বিশেষ করে আমি ‘স্বপ্নভঙ্গ’ কথাটির
ওপর জোর দিচ্ছি এই কারণেই যে, অতীত
প্রিয় কোন স্বপ্ন ভেঙে চোঁচির না হলে

কোন মানুষ জীবিত অবস্থায় মৃত্যুর
মুখোমুখি হতে পারে না। অবশ্যই,
অনুরূপ অস্থির, প্রায় উন্মাদ হয়ে
যাওয়ার মুহূর্তেও যিনি বিচলিত হন না,
এবং অত্যন্ত ধৈর্য ধরে যমকেই বারবার
জিজ্ঞাসা করেন, ‘এই মৃত্যুর পর কোন
জীবন?’—তিনি আমাদের নমস্কা এবং এই
কারণেই, আমাদের কাছে প্রশ্নকর্তার যে
চেহারাটি ভেসে ওঠে, তা একজন অভিজ্ঞ
মানুষের, যদিও জ্ঞানলাভের পিপাসায়
তিনি শিশুর মতই সরল হতে পারেন।

॥ দুই ॥

এমন কয়েকজন মানুষকেই আমি
কল্পনা করতে পারি, যাদের সঙ্গে নচি-
কেতার তুলনা করা যায়। অবশ্যই কিশোর
দুর্কান্তর চেহারা আমার কাছে অন্য
রকম, কেন না, সত্যকে জানবার জন্য নয়,
জ্ঞাত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই
তিনি নিজের জীবন বাজি রেখেছিলেন।
হয়তো নচিকেতাও তাঁর জ্ঞাত সত্যকে
মর্ষাদা দেবার জন্য নিজের অস্তিত্বকে
বিপন্ন করেছিলেন, কিন্তু আমরা জানি
তাঁর মনে অন্য গভীর প্রশ্ন ছিল। আমার
বিশ্বাস, এই প্রশ্ন, যা অজ্ঞাত সত্যকে
জানবার পিপাসা, দুর্কান্তর তুলনায়
সুভাষের চিরদিনেই অধিকতর নিশ্চিত ছিল,
এবং এই জিজ্ঞাসা ক্রমেই তাঁকে জ্ঞাত
সত্য থেকে দূরে অন্য কোথাও নিয়ে
যাচ্ছে। আমি জানি না, ইতিমধ্যেই
সুভাষের সবচেয়ে প্রিয় স্বপ্নটিতে কোন-
রূপ চিহ্ন ধরেছে কি না। তিনি কখনো
এমন কোনো দৃশ্য দেখেছেন কি না,
পিতার সমান প্রাণের ব্যক্তির যজ্ঞ করছেন
এবং যজ্ঞের দানস্বরূপ তাঁরা যা দিচ্ছেন,
তা নিজেদের হৃৎপিণ্ড নয়, মৃত পশু-
দের অস্থি আর পঙ্কর, যাদের মূল্য কানা-
কড়িও না?

এই ভয়ংকর দৃশ্য দুর্কান্তকে চাক্ষুষ
দেখতে হয় নি; তার আগেই তিনি এই
পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু
তাঁর জীবিতকালেই দেশকে দূর টুকরো
করার চাঁৎকার ও হুজুড়, যা এক বিরাট
যজ্ঞশালার হৈ-হল্লাকেও ছাড়িয়ে যায়,
নানা দিক থেকে শব্দ হয়ে গিয়েছিল।
সেখানে যাঁদের কণ্ঠস্বর সবচেয়ে উচ্চুত
উঠেছিল, তাঁরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির
নেতৃবৃন্দ। দুর্কান্তর মনে এই নেতৃবৃন্দের
বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ বা প্রশ্ন ছিল না,
বরং তাঁর পার্টির ওপর অগাধ বিশ্বাস
ছিল। আগস্ট বিপ্লবের প্রতি পার্টির
অস্বাভাবিক অনীহাতেও তিনি বিচলিত
হন নি। যদিও সেদিনকার স্বাধীনতা
যজ্ঞে তাঁর কমিউনিস্ট পার্টি উল্লেখ
বুদ্ধিগত স্বদেশবাসীদের, অর্থাৎ
যারা স্বদেশের সর্বস্বত্ব, তাদের কি কি
মূল্যবান দ্রব্য-সামগ্রী দান করেছিল, তা
একমাত্র চিন্মোহন সোহানবীশের মত বিজ্ঞ
লোকদেরই আজ গাবষণাব বিষয়।

॥ তিন ॥

আমি তাই নচিকেতার মত মৃত্যুর
সন্ধান করি অন্য অভিজ্ঞ মানুষদের মধ্যে
যাঁরা স্বার্থান্বেষিত জন্মভূমির যন্ত্রণায়
জীবিত অবস্থাতেই মৃত্যুর মুখোমুখি
হয়েছেন; অথবা বিপ্লবকে স্বাধীনতা
জন্য, স্বদেশের মাটিতে বিপ্লবের বীজ
তখনই অঙ্কুরিত হবে না এই-কঠিন সত্য
জেনে নিয়ে যাঁরা দেশের বাইরে স্বাধীন
সেনাবাহিনী গড়তে চেয়েছেন এবং সেই
চেষ্টায় প্রাণ পর্যন্ত আহুতি দিয়েছেন।
আমার অভীষ্ট মানুষ খণ্ডিত ভিয়েত-
নামের পাহাড়ে-জঙ্গলে মাইলের পর মাইল
হেঁটেছেন। একবার তাঁর স্বপ্নের মৃত্যু
হয়েছে; কিন্তু ঐ মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর
বিশ্বাসেরও পুনর্জন্ম হয়েছে, যে বিশ্বাস

শাণ্ধ্যাহিক বঙ্গভাষা

মানুষ এবং মনুষ্যকে সম্পূর্ণ সমীপিত। হয়তো তিনি দেশ বিধিভিত্তিক হবার আগেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, অন্য এক স্বাধীন দেশের মাটিতে, ভিয়েতনামের মানুসার চোখে অনেক বেশি তিত্ততা বৃদ্ধি নিয়ে, কিন্তু তাঁরই মত নিজের প্রত্যয়ে অটল থেকে। আবার, এমনও তো হতে পারে, স্বাধীনতা বাঙালি তিনি যেখানে পায়ের নিচে মাটি সেখানেই স্থির ছিলেন। স্বাধীন, নাকি স্বাধীন স্বদেশের জেলখানায় পিঞ্জরাবদ্ধ, সে চিন্তা পরে করা যাবে। আমরা বরং এই মনেতে একটি মানুসের অতীতের দিকে চোখ তুলে তাকাতে চাই। হো চি মিন অথবা সুভাষচন্দ্রের মত ততটা ভাগ্যবান ছিলেন না তিনি। একথা ঠিক, তাঁর সমস্ত জীবন স্বদেশের এবং মানবসমাজের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত। পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী যুবশক্তিকে হয়তো তিনিই একদিন একত্রিত করেছিলেন। অথবা তিনি একা নন, তাঁর মত কয়েকজন নির্ভীক মানুস। তারপর একদিন কিন্তু তাঁর এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি হিমালয়ের সম্মান ব্যর্থ, তাঁর স্বদেশ এখন অন্য রকম মানুসদের নেতৃত্ব কামনা করে। পরাজয়ের এখানেই শেষ নয়। তাঁর চোখের সামনে নিকৃষ্ট মানুসদের নেতৃত্বে ভারতবর্ষ নিজেকে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হতে দিয়েছে; অর্জন করেছে এক অশুভ বিকৃত স্বাধীনতা, যার ফলে দেশের অর্ধ-উলঙ্গ মানুসগুলি গম্পণেই উলঙ্গ হয়েছে, আর যেখানে যতটুকু শস্য-শ্যামলা মাটি ছিল, তাও ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাদের পায়ের নিচের মাটিতেও যেন আগুনের তাপ লেগেছে। এক বাংলা থেকে অন্য বাংলায় ভ্রূ-স্বাধীনতার তাড়া-খাওয়া মানুসগুলো আগ্রের জন্য, দু' মৃত্যু অশ্রুর জন্য নির্লজ্জ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। একদিন যিনি সমস্ত ভারতবর্ষের 'মহারাজ' ছিলেন, স্বাধীন জন্মভূমির এই সর্বশাসা চেহারাটাই তিনি দীর্ঘকাল ধরে দেখে এসেছেন। এবং আরো বীভৎস কিছু দৃশ্য-সাম্প্রদায়িকতা, বিনা অপরাধে নরহত্যা, দাঙ্গার চেয়েও যা বেশি খারাপ; যখন লড়াই করার মত প্রতিগম্য নেই।

কিন্তু যাঁদেরই নাম আমরা উপনিষদের কিশোর নায়কের সঙ্গে এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করি, তাঁরা সকলেই অতান্ত কাঁঠন মানুস। বারবার স্বপ্নভগ্নের বেদনা-গুলিকে তাঁরা সহ্য করেন এবং মনে করেন, এ-ও একরকমের অভিজ্ঞতা, যা পেকে ভবিষ্যতের পথ চলার ইঞ্জিত পাওয়া যায়।

তাঁরা একথাও জানেন, মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হলে তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের প্রয়োজন আছে এবং মানুসের প্রতি বিশ্বাস

হারানো পাপ। তাই যখন মহারাজের মত মানুসকেও তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মীরা একে একে ছেড়ে চলে যান, সকলেই অনাদ্র, অন্য এক স্বাধীন দেশে তাঁদের জন্য নিরাপদ ঘর আছে মনে করেন, যে যার জীবনের শপথ ও রতকে বিসর্জন দিয়ে এবার পুরস্কৃত হবার সময় এসেছে মনে করেন, তখনো মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর বিশ্বাসে অটল থাকেন, পায়ের নিচে যেখানে তাঁর জন্মভূমির মাটি স্থির রয়ে গেছে, সেখানেই অপেক্ষা করেন পালা বদলের দিনটির জন্য। পুরাতন বন্ধুদের তিনি এই বলে ক্ষমা করেন যে, হয়তো সবাই কাপুরুষ বা পুরুষকারলোভী নন; তাঁদের মধ্যে এমন মানুসই বেশি, যারা উপলব্ধি করেছেন, এখন খণ্ডিত পাকিস্তানের চেয়ে খণ্ডিত ভারতেই তাঁদের স্বপ্নকে সফল করার সময় ও সুযোগ বেশি। হয়তো পশ্চিম বাংলাতেই বিপ্লবকে দ্রাবিড় করার কাজ নিয়েছেন তাঁরা। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তাঁর নিজস্ব কাজটিও ইতিমধ্যে

শ্রীগোপালচন্দ্র সেন নির্মাতৃত্ব প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী। এখনো পর্যন্ত তিনি অন্তর্জাতীয় সন্ধিত্ব সক্রিয় সদস্য। স্বগত মহারাজের তিনি অন্তরঙ্গ অন্তর্জাতীয় সহকর্মী। মহারাজ যখন পাকিস্তানে অবস্থান করছিলেন, তখনো শ্রীসেন তাঁর সঙ্গী নিয়মিত যোগসূত্র বজায় রেখেছিলেন।

মহারাজের সঙ্গে কয়েকদিন লেখাটিতে ভারত সফরে মহারাজের কয়েকটি কর্মব্যাপ্তি দিনের ছবিই শ্রীসেন ফুটে ওঠে নি, এতে পুরাতন দিনগুলিও যেন মনে পড়ে উঠেছে।

শ্রী সেন

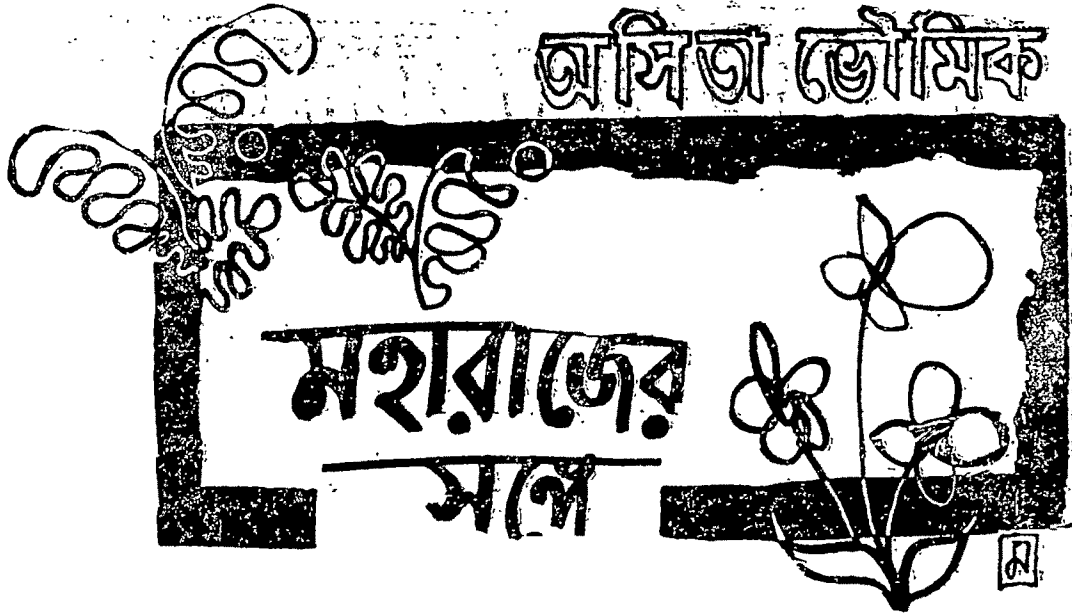
বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর মাতৃভূমিতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন মৃত্যুর মতই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাগুলোর জন্য এবং সময় হলেই যমকে প্রশ্ন করবেন, 'এইসব গত্যুর পর আর কি আছে, আমাকে জানাও!' তিনি স্থির জানতেন, একদিন না একদিন যমকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; কেন না, মৃত্যুর পর মানুসের জন্য যা রয়েছে, তা তো নবজন্ম।

এই নবজন্ম, হো চি মিন জেনেছিলেন, ভিয়েতনামের স্বাধীনতা যা আমাদের চোখের সামনেই আজ দ্রুত স্পষ্ট হচ্ছে। সুভাষচন্দ্র কি একই স্বপ্ন দেখেন নি? সৌদনকার সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরাই বা আজ কোথায়? ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীও তাঁর

প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। তিনি জেনেছেন, দুই বাংলার যুবশক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে অসাম্যের, শোষণের, সাম্প্রদায়িকতার মরণবাণ। তাঁর এই পুনর্জন্ম কি আমাদের চোখে কিছুটা বিবর্ণ মনে হচ্ছে? তিনি আমাদের জন্য কোন বহুকণ্ঠ শপথের উচ্চারণ করেন নি; বরং দুই বাংলার গদ্যটিক, অথবা কয়েক হাজার, অথবা কয়েক লক্ষ যুবক-যুবতীই যে তাঁর মত প্রবীণ লোকদের সঠিক নেতৃত্ব দেবে এরকম শিশুসুলভ (?) কথা কত সহজেই কলকাতার আর ভারতের রাজধানী দিল্লী শহরে বিনা বিশ্বাস এবং বিনা অভিমানে উচ্চারণ করে গেলেন! তিনি কি আমাদের অভিমানে আর অহঙ্কারেও কিছুটা ঘা দেন নি?

আমাদের এখনও বুঝতে কষ্ট হয়, নচিকেতার আসল চরিত্র কী ছিল। 'আমার প্রশংসায় কাজ নেই'—নচিকেতার প্রশংসার জন্য, নেতৃত্বের জন্য, ভবিষ্যৎ এবং অহঙ্কারকে বুকের মধ্যে পুঁতে রাখার জন্য স্বেচ্ছায় আগুন বাঁপ দেন না। তাঁর সমস্ত জীবন ধরে সত্য কি, তাই জানতে চান। কিন্তু তাঁদের এই জ্ঞানপিপাসার পিছনেও গভীরতর মূল্যবোধ নিহিত আছে, যার স্পষ্ট উচ্চারণ 'মানুস' এবং 'মনুষ্য'।

আমি নচিকেতা নই। কোন বোমল-হৃদয় কবিই (আর, কবিমায়ই নিজেকে সামান্য ভালবাসেন) নচিকেতা হতে পারেন না, যদি না তিনি কলম ছুঁতে দিয়ে অন্য কিছু তাঁর হাতের মৃত্যুর গ্রহণ করেন। কিন্তু কবিতা লিখি থলেই আমার কাছে লৌনিন, বিদ্যাসাগর, হো চি মিন অথবা সুভাষচন্দ্রের, যতীন দাসের, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর, অথবা নকশাবাণ্ডির কোন এক অজ্ঞাতনামা ছাত্রের মত এক সময় একাকার হয়ে যায়। কার কতটুকু সাফল্য, কার কতখানি ব্যর্থতা, এই ধরনের হিসাব কষে আমি নিজেকে ছোট করবো না। এসময়ে যদি নজরুল বা সুবাস্তর মত কবি-সোম্বাদের মতগুলিও আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়, তাঁদের থেকে চোখ ঘুরিয়ে নেবো, এমন স্পর্ধাও আমার নেই। আমরা সেই মৃত্যুতীর্ণ মানুসদের মিছিলকেই বুকের মধ্যে অনুভব করতে চাই, যারা অশ্রুকার দিনগুলিকে এবং অশ্রুকারের চেয়েও ভীষণতর পশু-মানুসদের হীনতা, গৌণ, পার্শ্বিক উদ্বেজনাতে নিজের রক্ত ধোয়ে দিয়ে আমাদের জন্য, আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও মানবিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আমাদের মধ্যে তাঁরাই প্রকৃত মানুস এবং একমাত্র তাঁরাই মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন।



মহারাজ চলে গেলেন। ভারত-পাক উপমহাদেশের একজন খ্যাতি, নির্ভেজাল, নির্ভীক, সর্বজনপ্রিয় মানুষ চলে গেলেন। তাঁর স্মৃতিচয়ন করতে গিয়ে আমার অনেক কথাই মনে আসছে। মহারাজ গত ২৪শে জুন চিকিৎসার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর যোদ্ধা দ্রৌপদী মহারাজকে দেখার বাসনা আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। সেই বাসনা আমার পূর্ণ হল মহাজাতি সদনে সম্বর্ধনা সভায় গিয়ে। মহাজাতি সদনেই আমি সহজ সরল এই লোকপ্রিয় মানুষটিকে প্রথম দেখি। আমরা কয়েকজন ছাত্রী মিলে মহারাজকে দেখবার জন্য মহাজাতি সদনে গিয়েছিলাম। দেখলাম মণ্ডের ওপর মহারাজ বসে আছেন। স্থির-শান্ত মূর্তি, মৃদু সুরলতাপূর্ণ মৃদু হাসি। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে লাইন দিয়ে মহারাজকে প্রণাম করছে। তিনি সকলেরই মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। আমি মহারাজের কাছাকাছি যাবার জন্য এগিয়ে গেলে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক এসে আমাকে বাধা দিল। আমি তখন পেছনের গেট দিয়ে গিয়ে মণ্ডে উঠলাম। লাইনে দাঁড়িলাম। আস্তে আস্তে লাইন অগ্রসর হতে লাগল। কেউ কেউ শুদ্ধ প্রণাম করছিল। আবার অনেকে প্রণামের সঙ্গে তাঁর অটোগ্রাফ নিচ্ছিল। একজন কর্মী এসে মহারাজকে বললেন, “মহারাজ আপনার কণ্ঠ হচ্ছে, এভাবে অটোগ্রাফ লিখতে লিখতে আপনি যে ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।” মহারাজ তৎক্ষণাৎ এর উত্তরে বললেন, “আমি তো শুদ্ধ এক লাইন সই করিয়া দিতেছি, লিখে দিতেছি—এতেই আমার কষ্ট হবে, আর ওরা যে দূর দূরান্ত থেকে কত কষ্ট করিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।”

তার পর আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তটি এল। আমি মহারাজের সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম। আমি বিস্ময়ে এত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম যে, ভাবতেই পারছিলাম না আমি সত্যিই মহারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পেছনের একটি মেয়ের ধাক্কায় আমি কম্পলোক থেকে বাস্তব জগতে ফিরে এলাম। মহারাজকে প্রণাম করতে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং অতি পরিচিতের হাসি হেসে বললেন—পাশে বসো। আমার মনে হল আমাকে দেখে তাঁর বোধ হয় অতীতের কথা মনে হল। তারপর আস্তে আস্তে প্রণাম শেষ হয়ে এল।

তিনি আমাদের উদ্দেশে বলতে আরম্ভ করলেন, “আমি পূর্ববঙ্গে শূন্যিয়াছি পশ্চিমবঙ্গের ছেলেরা দর্শনীয় হইয়া গিয়াছে, তাহারা গুরু-জনদের মর্যাদা দিতে জানে না। আজ আমার সেই ভুল ভাঙিয়া গেল। এই ছেলেমেয়েদের দেখিয়া আমার অতীতের কথা মনে হইতেছে। এরা গুরুজনের মর্যাদা ঠিকই দিতে জানে। এখানে ছাত্রদের মধ্যে যদি কিছু অন্যায় ঢুকিয়া থাকে, তবে তার জন্য দায়ী তাহারা নয়, দায়ী আমাদের দেশের কর্ণধারেরা।

“স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের বা জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টাই হয় নাই। বৃটিশ ভারত-পাকিস্তান পরিভ্রমণ করিয়া যাওয়ার সময় তাহাদের সমস্ত আবর্জনা-দর্শনীয় আমাদের ঘাড় চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে। আমরা তাহার জের টানিতেছি। জাতির সম্মুখে ত্যাগের কোন আদর্শ না থাকিলে জাতি কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে? আমাদের যুবকদের সম্মুখে ত্যাগের

কোন আদর্শ আছে কি? তাহারা কি দেখিতে পায়?

“শৈশব হইতে দেখিতে পায়, দর্শনীয় আশ্রয় গ্রহণ না করিতে পারিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। যুব না দিলে কোন কাজ হয় না, দর্শনীয় আশ্রয় গ্রহণ না করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় না, যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক, তিনিই দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা। যাহারা সংলোক সাধারণত তাহারা গরীব, কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না।

“বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ সংস্কার। বর্তমানে দরকার দৃষ্টিত আবহাওয়া পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ইহার মূল হইবে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি; তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে।”

এই কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজের মৃদুশব্দে অশ্রুত দৃঢ়তা ও উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলাম। জীবনে ত্যাগ ও আদর্শের প্রেরণায় স্বেচ্ছায় জাতিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন, অশীতিপর বয়সে তাঁর পক্ষেই শুদ্ধ যুব-ছাত্র সমাজের প্রতি এই আহ্বান দেওয়া সাজে।

সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিভিন্ন স্তরে আজ যে দারুণ ক্রিয়মত্তা, অধৈর্য, লক্ষ্যহীন উত্তেজনা, সময়ে সময়ে উচ্ছৃঙ্খলতার বেপরোয়া প্রকাশ ঘটছে, তার মূল কারণ অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দেশপ্রেমের অভাবই আজ সমাজজীবনকে পঙ্কজ করে তুলেছে। দ্রৌপদী মহারাজের মতন সর্বত্যাগী আদর্শবাদী নেতাই আজ এই রিপূর্ণ সমাজজীবনে নতুন আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারবেন!

শ্রীলোক মহারাজের সঙ্গে গোপালবন্দ কয়েকদিন

অনেক দিন যাবৎ মহারাজের ভারত ইউনিয়নে আসার ব্যাপারে প্রচলিত হইতেছিল। তিনি প্রায়ই জানাইয়াছেন, পাকিস্তান তাঁহাকে পাশপোর্ট দিবে না। তাই তাঁহার ভারতে আসা সম্ভবপর হইতেছে না, যদিও তাঁহার সহকর্মী ও ভাস্কর্য-স্বজনের সহিত দেখা ফিরবার জন্য প্রাণের খুবই আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। হঠাৎ জুন মাসে একদিন অনুশীলন ভবন হইতে টেলিফোনে জানিতে পারিলাম মহারাজ পাশপোর্ট পাইয়াছেন এবং ২৭শে জুন সকালে বনগাঁ সীমান্ত পার হইয়া ভারতে আসিবেন। সংবাদটা পাইয়া মন আনন্দে ভরিয়া গেল। কিন্তু ভাবিতে লাগলাম কেমন করিয়া এত সকালে বনগাঁ পেরিছিব! অনুশীলন ভবনের শ্রীসত্য ঘটক আমাকে বলিলেন যে, সুলেখা কোং-এর মালিক শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ও তাঁহাকে প্রত্যোদগমন করিতে বনগাঁ যাইবেন। শঙ্করবাবু আমার প্রতিবেশী, যাদবপুরে থাকেন। রাত্রি ৯টার শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সহিত বনগাঁ যাওয়া স্থির করিয়া নিলাম। পর্বদিন সকাল ৫টার আমরা বনগাঁ চেকপোস্টে পেরিছলাম। আমরা সেখানে পেরিছবার পূর্বেই মহারাজ তথায় আসিয়া পড়িয়াছেন। লোকের লোক-গণ্য, চেকপোস্টের বাঁশটা উঠাইয়া দিতেই মহারাজ ভারতে পদার্পণ করিলেন। আমি তখনও অনেক দূরে। হঠাৎ একটা মনুষ্যের ভীড় আমাকে মহারাজের নিকটে টেলিয়া লইয়া গেল। আমাকে দেখিয়া তিনি ঘাড় হাত দিয়া বলিলেন “আসিয়াছেন?” এবং আমাকে লইয়া একখানা বেগের নিকট গেলেন। এক মিনিট পরেই তিনি দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আমি পাকিস্তানের নাগরিক এবং এখানে এক মাস থাকিয়াই পাকিস্তানে ফিরিয়া যাইব।” একটু পরেই বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলাম। তিনি শ্রীযুক্ত পরেশ চ্যাটার্জি মহাশয়ের গাড়ি চাড়লেন আর আমি শ্রীশঙ্কর মৈত্র মহাশয়ের গাড়িতে চড়িয়া আমরা তাঁহার পিছ পিছ যাদব-

পুরে তাঁহার ভাষপো শ্রীজিতেন চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে পেরিছলাম। তখন হইতেই মহারাজের সঙ্গে অনেক সময় কাটাইয়াছি। সন্ধ্যাবেলায় রোজই তাঁহার নিকট বাইতাম, দেখিতাম ঘর ভর্তি লোক। বাহার যেমন ইচ্ছা প্রশ্ন করিতেছেন আর তিনি উত্তর দিতেছেন। তাঁহাকে ডাক্তাররা বিশ্রাম নিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু রাত্রি ১১টার পূর্বে তাঁহাকে বিশ্রাম লইতে দেখি নাই। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও তাঁহার নিকট আসিত এবং বসবার জায়গার অভাবে মাটিতে বসিয়া যাইত। তাহাদের তিনি উপদেশ দিতেন, তোমরা পরীক্ষায় নকল করবে না, চরিত্রবান হইবে, কখনও মিথ্যা কথা বলিবে না। অধিক কথা বললে শরীর খারাপ হইতে পারে ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বেশি কথা বলিতে নিষেধ করিলে ক্রুদ্ধ হইতেন এবং বলিতেন, “আমি এখানে সকলের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি; আমি কি মদ্য বন্দ করিয়া থাকিব? ডাক্তাররা ত অনেক কিছই বলে, তাহাদের কথা শুনিলে কোন কাণ্ডই হইতে পারে না। সুতরাং আমি তাহাদের কথা মানিয়া চলিতে পারি না।” তিনি আরও বলিতেন, আমি ভারতে আমার যে সব সহকর্মী ও আত্মীয় আছেন তাহাদের সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব। তাঁহার ইচ্ছা হইল তিনি অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিবেন। চন্দননগরে তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। চন্দননগরে মহারাজ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয়কে কত প্রীতি ও ভালবাসার সঙ্গে আলিঙ্গন করিলেন তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত। বুদ্ধিলাস সহকর্মীদের জন্য তাঁহার কত প্রেম ও ভালবাসা।

তারপর আমরা মহারাজের সঙ্গে বহরমপুরে শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। প্রভাসদা শয্যাগত, মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভাসবাবু কেন ঘরে

থাকেন। শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের ছেলে শ্রীদেবশ লাহিড়ী তাঁহাকে প্রভাসদার ঘরে লইয়া গেলেন। মহারাজ তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। প্রভাসদা কাঁদতে লাগিলেন। বুদ্ধিলাস সহকর্মীর জন্য কত প্রেম কত ভালবাসা। সেখান হইতে কাঁল-কাতা ফিরবার সময় তিনি বলিলেন, “আমি ফুলিয়া যাইব। সেখানে আমাদের গ্রামের একটি বিধবা দৃশ্য মেয়ে থাকে তাহাকে দেখিয়া যাইতেই হইবে। তাহার ঠিকানা তিনি জানেন না। আমরা যে বাড়িতে উঠিলাম সেই বাড়ির একটি মহিলাকে নাম বলয় তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি তাহাকে লইয়া আসিলেন। উক্ত মহিলাটিকে দেখিয়া তাঁহার বৃন্দবাতা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দিনান্তে খাওয়া জোটে কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। কত স্নেহ কত মমতামাখা তাঁহার কথাগুলি তাহা আর কি বলিব। বলিলেন, আমি দেশে ফিরিয়া তোমার বাবাকে (যিনি কাপাসাটিয়া গ্রামের পোস্ট মাস্টার) তোমার কথা সব বলিব।

মহারাজ ফিরবার সময় দাদপুর্নামে একটা গ্রামে নামিলেন। ঐ গ্রামটা বহরমপুর জেলায়। প্রায় সবই মুসলমান বাসিন্দা। তাহাদের নিকট বলিলেন, পাকিস্তানে এখন হিন্দু-মুসলমান বাঁগিয়া পার্থক্য কেহ রাখে না, তাহা সবাকলেই বলে, “আমরা বাঙ্গালী, বাংলা আমার দেশ।” স্বিজাতীয় ভাব এখন মোটেই নাই।

আমার প্রতি স্নেহ-মমতার কথা কত বলিব। সবদাই তাঁর সঙ্গে রাখিবার কেমন যেন একটা আগ্রহ। তিনি যখন দিল্লী যান তখন আমাকে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। যখন গাড়ি ছাড়ে তখনও বলিলেন, “গোপালবাবু ফার্স্ট ক্লাসে একটা সিট রিজার্ভ করা আছে, তাহাতেই উঠিয়া পড়ুন।” আমি বলিলাম, কাপড় আমি নাই বা বাসায়ও বলিয়া আসি নাই, সুতরাং কেমন করিয়া যাই!” যাওয়া হইল না, গাড়ি ছাড়িয়া দিল।



মিন্টেন

মিনি' অবসানকালে

মিনি, মিনি, মিনি! যা নিয়ে এতো চাকচাক্য, মাত্র ক'টা দিন তাই নিয়ে কলকাতা যেন ছিনিমিনি খেলল। কত টেলর যে কত দামি কাপড় বাড়তি লাভের সুযোগ পেলেন। কত স্ট্রী-অঙ্গ পোষাক স্বল্পতার দরুণ রোদে তাপে পুড়ে ঝলসে কুশী হয়ে গেল। কত-কাল পরে বাঙলা ভাষায় একটি জন্মব স্মার্ট শব্দের আমদানি হ'ল। এবং কয়েকজন রাজনীতিক 'মিনি' খেলিয়ে পার্টি অভিযোগের হুজুত বাধিয়ে দিলেন তর্কাতর্কির আসরে। ঘন ঘন ঘরোয়া বৈঠক বসল নেতাদের। মিনিফ্রন্ট, মিনি মিনিফ্রন্টের মাথা ব্যথা। তবু অবশ্য, এই মিনিফ্রন্টে জোয়ার-ভাটার ধাক্কায় একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি শূন্য একটি চিহ্ন, মিনিবন্ধ। সব যখন ডুবু ডুবু, মিনিবন্ধ পেপার স্টলের তত্ত্বা আঁকড়ে ভরে গেছে সবার অলঙ্ঘ্য। কিন্তু মিনি স্কার্ট চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীটে পা পাততে না পাততেই অবসোলেট।

পয়সাওয়ালা ঘরে ফ্যাশন আসে যায়, গায়ে লাগে না। কিন্তু যে সব মধ্যবিত্ত ঘরে স্কার্টের বদল 'রাউজ' ওয়ারড্রোব আধিকার করেছিল, গাংকল হয়েছে সেই সব হতভাগ্য সাংসারিক-দেরই। মিনি রাউজ এখন ফেলে দেওয়াও যায় না, আবার গায়ে চাপালে শূন্য পুরাতনী নয়, ঝঞ্ঝাট আর সাম্প্রতিক সব বিপদের সামনে পড়তে হচ্ছে। শূন্য, মিনি রাউজের বিরুদ্ধে জেহাদ শূন্য হয়েছে পথে-ঘাটে। অপারেশন মিনি'র ধ্বংসধারীরা নাকি দাড়িকামানো রেড সহযোগে সার্জিক্যাল অপারেশনে নেমেছেন। সাদা-কালো দুষ-আলতা খোলা-পেট, খোলা-পিঠ, খোলা হাত কখন অজ্ঞাতসারে চিরে দিচ্ছে তারা জনবহুল রাজপথে। অথচ ফ্যাশনের টেড যে-সব মধ্যবিত্ত সংসারে আছাড় খেয়েছিল, রাতারাতি বোনের, বোয়ের আর একপ্রস্থ জামা বানাবার সংস্থান নেই সেই সব সংসারের। হত-ভাগ্য তাদেরই, ভয়ঙ্কর মহানগরীয় পথে

বিকায়গ্রস্ত শারভাটেও রেডের আক্রমণ থেকে এখন আত্মরক্ষাই এক সমস্যা। শহর কলকাতার অ-ভূত-পূর্ব সমস্যা। অথচ এই অমানবিক মোকাবেলার কোনো বাস্তবিক প্রয়োজনই ছিল না। মিনি রাউজের মিনিসুখ যেহেতু ফ্যাশন, অত-এব তার দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উপায় নেই। শারদীয় মেঘের মতই ফ্যাশনের আবির্ভাব। হাল্কা পক্ষে ভর দিয়ে যেমন আসে, হাল্কা পাখায় ভর করেই তেমনি অদৃশ্য হয়ে যায় আপনা থেকে।

বল-বটম ট্রাউজার এখন ফ্যাশন-চট্টল লা, লালোলা মেয়েদের গোড়ালি ছুঁয়েছে। অতএব মিনি যে ইলেকট্রিক চুল্লীতে চড়ল অথবা গোরস্থ হ'ল এতে আর সন্দেহ কি? কলকাতার হৃৎকেন্দ্রে এখন বম্মী লুপী, ফিতে বাঁধা প্যান্ট, নিন্মাঙ্গ চওড়া পাজামা, যা লক্সা পয়রার পায়ের মতো অধিকাংশ গ্রীচরণেযু। তবু আটপৌরে কলকাতায় মরা সাহেবের কোটের মতো মোম-অঙ্গে মিনি জামা এখনো দিনকয় চলবেই, কেন না পাড়ারিশেষে যত সাধ তত সাধ্য নেই মানবজনের। তবু কুস্কমবও চিৎ হয়ে শোওয়ার বাসনা হয়েছিল সৈনিক। ফ্যাশানের সঙ্গে পাজা দেওয়ার এই সব মিনি সূখ। এটুকুর ওপর আর আক্রমণ কেন? যে মহৎ ক্ষেত্রে সংস্কারকের দল চোরের মতো রেড পকেটে স্ট্রী-অঙ্গ চৌচির করে বেড়াচ্ছেন বলে খবর, তাঁরা রেডে টান দিয়ে আক্রান্তার মূখ দেখলেই হয়ত টের পাবেন, ও-মূখ বুদ্ধোন্মাদুখ নয়; ঘিয়ে-দুধে ও শরীর নবনীতা নয়। ওসব মূখ আক্রমণকারীরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, চাই কি জায়া-জননী ভাগিনী-ভাগিনেরীও হতে পারে। সুতরাং কেন এই মিছে মাতব্বরী! ও জামা এমনই খরচের খাতায় উঠবে। জমার খাতায় পুজোবোনাস পড়লেই মধ্যবিত্ত কলকাতাকে দেখা যাবে ম্যাক্সিমুমে সাজ পরে পথে নামতে। মিনি অবসানকালে, সুতরাং, মড়া ঝুঁচিয়ে কাঁধকাটের দায়িত্ব না পাললেও চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট অঙ্গলের ফ্যাশন-ঘাতে ও বালাই অপানি চড় চড় করে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শূন্য কলকাতার বরং তের স্বতন্ত্র কাজ জমা হয়ে আছে। নরসুন্দর সংস্কারকগণ নারী ছেড়ে অতঃপর নরায়ন মনঃসংযোগ করতে পারেন। তোবড়া চুমড়ানো গালে যে রেটে লম্বা জুলাফি-বাড়ছে তাতে দেশটার অষ্টাদশ শতকে প্রত্যাবর্তনে আর বিলম্ব নেই। গ্র্যাক-শনের যুগে এই মহতী রিয়াকশনের বিপত্তি অবিলম্বে বন্ধ না হলে জুলাফির প্রতিজ্ঞায় সামন্ততান্ত্রিক ফ্যাশিন্ত মনোভাব গিজিয়ে উঠতে পারে।

পুং মুখে লম্বা জুলাফি পুরুষ-কারের লক্ষণ বলে ভুল করার কারণ নেই। বরং ওটা বীভৎস, বিশেষ বাঙালী লালিমা পাল পুং মূখাবয়বে। নরসুন্দর সমাজ সংস্কারকের রেড অতঃপর গালে গালে কৌরকর্ম করলে বোধ হয় একটা কাজের কাজ হবে।

কারণ লম্বা জুলাফির স্টাটিস্টিকস বড় দৃষ্টান্তজাগরুক। অশুতোষ মূখজো রোডের ওপর সৌদীন স্টাটিস-টিকস সংগ্রহ করছিলাম। তখন বেলা পড়ে এলেও, যে বয়সে জুলাফি মানায় তাঁদের সাধ্য আছাড় ডাক পাশ্চিম দিগগন থেকে তখনও ভরাট গলার ঝুঁকে পড়ে নি। তাতেই পনের মিনিটে পঞ্চাশটি লম্বা জুলাফি পাশ করে যেতে দেখলাম। সরু প্যান্ট, ছুঁচো জুতো, লম্বা জুলাফি রাস্তার একদিকের ফুট-পাতে মিনিটে তিন পূর্ণ একের তিন। ঐ সময় তা ছাড়াও আবার পুরুষের চেয়ে মেয়ের সংখ্যাই ছিল সমর্থক। ছিলেন বৃন্দ দিশদু কিশোর নাগরিক এবং না হোক কিছু টাকমাথা লোক তে বটেই। তা ছাড়া জুলাফি নিয়ে চিন্তা করার যাঁদের অবসর কম, এমন মুটে-মজুর-মন্ডোফরাসও ছিলেন পলিতর। সর্বোপরি নির্বাচিত স্থানটি লোকবনছে মোটেই নামকরা জায়গা নয়। তাতেই এতো। না জানি অফিস টাইমে চৌরঙ্গী বি বি ডি বাগ, শিয়ালদা হ্যারিসন, বৌবাজার, হাওড়া স্টেশনের অবস্থা কী। সবচেয়ে মজার ব্যাপার বিনা নোটিশে এতো জুলাফি গজগজিয়ে উঠল কী করে। এখনো অসংখ্য মুখে জুলাফি-লক্ষ্য দাড়ির চাষ চলছে। তামাম বলকাতা দু'দিন পরে জুলাফিময় হয়ে উঠবে। এখন শূন্য বিজ্ঞাপনের অপেক্ষাও আমরা দায়িত্ব নিয়ে লেটেস্ট ডিজাইন জুলাফি বানাইয়া থাকি। জুলাফি কাটিং-এ বিশেষ অভিজ্ঞ হোয়ার কাটার একমাত্র এখানেই পাবেন। ভবদীর নফরচন্দ্র পরামণিক, প্রোঃ 'স্টাইলো জুলাফি' অথবা 'স্টাইল ন্য জুলাফি'। চাই কি এমন হ্যাণ্ডবিল হাতে আসাও অসম্ভব নয়, উত্তম জুলাফি ছাঁটাই-এর জন্য যেখানে অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উন-বিংশ শতকের প্রথম দিকের মনীষীদের

সাংসাহিক বঙ্গমত

স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট মন্দিরিত আছে।
বিদেশী তো বটেই, এদেশী-ও। জুলাফির
জনা বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন আছে। কারণ
জুলাফি শুধু কর্ণমূল-প্রদানিত রোম-
রাজি হলেই চলছে না। লম্বা জুলাফির
চের রকম ফেরও চোখে পড়ল। বারও
মেয়ে-হাতের ঘড়ি-ব্যাণ্ডের মতো সমান
এক পাতলা (আধুনিক তাগা-টাইপ

নয়)। টাইপ রিবনের মতো আধ ইঞ্চি
চওড়া কারো বা। কারো আবার নিচ
দিকে ঠোঁটের কম পশন্ত গ্রিকোণিক।

এসব জুলাফি ছেলেবেলায় বারো-
য়ারী থিয়েটারের স্টেজে কারভালোর
ভূমিকায় কাল সাহেবের গালে
দেখোঁছ। কসাই এবং নিষাধ পাড়ার
দালালদের চওড়া চোয়ালে জুলাফি-বাহার

কম্বিনকালে স্টাইল বলে মনে হয় নি।
অথচ ও বস্তু আজন্ম দেখে আসছি
আমরা। ঐ গাল থেকেই লম্বা জুলাফি
নিষ্ঠুরতা ও নারকীয় বীভৎসতার
প্রতীক হয়ে আছে মনে মনে। উল্লো
গা রঘু ডাকাতদেরও মনোমত জুলাফি ঐ
[৪৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

“কোন মানুষ বা কোন দেশ

অপরকে ঘৃণা করে বাঁচতে পারেনা”

স্বামী বিবেকানন্দ



মহারাজের আকাশমক অন্তরানে ভারতবাসী যে কি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু অতীত দুঃখের মধ্যে লক্ষ্য করলুম যে, পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে এই দুঃসংবাদে তেমন কোন শোক প্রকাশের চিহ্ন নেই। আজ এই মুহূর্তে লক্ষ্য করছি, ভারতীয় বেতার-কেন্দ্রগুলি থেকে যখন এক শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি বেরিয়ে আসছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে, তখন পাকিস্তান বেতার এ বিষয়ে এমনই নীরব ও উদাসীন যা অত্যন্ত মর্মান্তিক। পাকিস্তান সরকারের এই হীনমন্য আচরণ থেকে এটাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মহারাজের ভারত সফর পাক সরকারের কতখানি অবিভ্রান্ত ছিল—যিনি দীর্ঘ চেষ্টা চরিত্রের পরই মাত্র ভারতে আসার অনুমতি লাভ করেছিলেন। আমরা মনে-প্রাণে আশা করেছিলাম যে, মহারাজের মরদেহ তাঁর স্বপ্নে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাক সরকার নিশ্চয় বিশেষ আগ্রহী হবে; কিন্তু পাক সরকারের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, মহারাজের মৃত্যুতে তারা যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে।

অথচ পাক সরকার হয়ত যা ভেবেছিল, মহারাজের আচার-আচরণে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নি। অর্থাৎ মহারাজ এদেশে এসে পাকিস্তানের কোন কুৎসা প্রচার করেন নি। বরং তিনি সে দেশের সাধারণ মানুষের সংস্কারমূলক মনের কথাই এদেশের মানুষের কাছে ব্যক্ত করে দ্ব' দেশের মৈত্রীর বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে চেষ্টা করেছেন। এবং এদেশের মানুষেরাও আশা করেছিল যে, এদের মনের কথাও ওদেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদের ভাব-ভালবাসার সম্পর্কে তিনি আরও সুদৃঢ় করে তুলবেন। এটা ছিল মহারাজেরও অন্তরের একমাত্র কামনা। কিন্তু আমাদের দর্ভাগ্য যে, মহারাজ আর ফিরে গেলেন না।

এমন একদিন ছিল যখন মহারাজের অন্তরে একটিমাত্র বাসনাই জাগ্রত ছিল স্বপ্না—মাতৃভূমিকে বিদেশী শাসনমূলক করা। সৌদীনই তাঁর অন্তরে নিঃসন্দেহে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল সেই ঈশ্বর-স্বাধীন ভারতবর্ষের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় রূপরেখা—একটা আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো। আর তারই মোহে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর অমানুষিক লাঞ্ছনা-অত্যাচার সহ্য করেও অমিততেজ বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বীরদর্পে অগ্রসর হয়েছেন তাঁর সেই লক্ষ্য-পথের শেষ প্রান্ত অবধি। কিন্তু মহারাজের সে বাসনা ঠিক পূর্ণ হয় নি। গলতবস্থলে হাজির হয়েও সেই বহুল ঈশ্বর-স্বাধীনতার রূপটি চোখে পড়ে

সাক্ষিক মন মতামত লেখকের

নি। সৌদীন তিনি এক নিদারুণ আঘাত সহ্য করেছিলেন নীরবে। সৌদীন তাঁর মত দেশপ্রেমিকদের অন্তরের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় নি। রাজনীতির দাবা-খেলায় স্বার্থ-সংক্ষুব্ধ মানসিকতার চাপে পড়ে সৌদীনকার ভূঁইফোড় নেতারা এমনই উন্মত্ত হয়েছিল যে, তাদের সেই স্বার্থ-স্বপ্নের নগ্ন দৃশ্য তাঁকে যেন বিমূঢ় নির্বাক করে দিয়েছিল।

এবং আজও মহারাজ ওপার থেকে ছুটে এসেছিলেন তাঁর মনের কোণে আর একটি গোপন বাসনা লুকিয়ে রেখে। সে বাসনা হচ্ছে দ্ব' দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধন গড়ে তোলার বাসনা, তাদের ভালবাসার সেই পূর্বতন অভিন্ন রূপটি ফিরিয়ে আনার বাসনা। প্রতিটি সভাসমিতি ও সাক্ষাৎকারে মহারাজ তাঁর সেই বাসনার কথাই ব্যক্ত করেছেন সবাইয়ের কাছে। সংসদ সদস্যদের প্রতিও তিনি সেই একই আবেদন জানিয়েছেন। মহারাজ বলেছিলেন, মৃত্যুর আগে তিনি শৃঙ্খল দেখে যেতে চান—এই দ্ব' দেশের মানুষের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতির আদান-প্রদান এবং পাকিস্তানের আসন্ন নির্বাচনে সেখানকার গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার বিশ্বাসী প্রগতিশীল জনসাধারণের বিজয়োল্লাসের দৃশ্য। মহারাজ ছিলেন গণতন্ত্র ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার এক মূর্ত প্রতীক।

বন্দিত মহারাজ ছিলেন এমনই এক বিরাট ব্যক্তিত্ব ও উজ্জ্বল আদর্শ যে, আজকের দিনের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতাদের তাঁর কাছে নতুন করে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যে-মানুষটা কৈশোরেই আত্মদান করলেন দেশের কাজে, যার সুদীর্ঘ জীবনের অধিক সময় কেটে গেল কারার অন্ধকারে, সহ্য করলেন অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট ও অত্যাচার, গদির মোহ বাঁকে টেনে আনতে পারল না ওপার থেকে এপারে, অন্ধকার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে পড়ে থাকলেন নির্বাসিত, নিপেষিত হয়ে—শৃঙ্খল অনায়েব বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে। তিনি যে জাতির অন্তরে চিরদিন

অমর হয়ে থাকবেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দেশ বিভাগের তিনি যে কতখানি বিরোধী ছিলেন, মহারাজ সেটাই প্রমাণ করে গেছেন সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ জেনেও পাকিস্তানের নাগরিক গ্রহণ করে এবং অন্তর দিয়ে পাকিস্তানেরই শৃঙ্খল কামনা করে। অথচ পাকিস্তান সরকার তার কর্তব্য পালন করে নি।

—সেখ ওয়ারিশ আলি
হাওড়া

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

ফারজান পাকের অনশন ম'ডপে শঙ্খধ্বনির মধ্যে যে চক্রান্তের জন্ম, গত ৩০শে জুলাই রাজ্যপাল আকাশমকভাবে বিধানসভা ভেঙে দিয়ে তার মৃত্যু ঘটালেন। বাস্তবে রাজ্যপালের ভূমিকা সামান্যই। এই চক্রান্ত বা চেষ্টার আসল নায়ক-নায়িকা যুক্তফ্রন্টের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। রাজ্যপাল এঁদের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের সেতুমাত্র। বাস্তব ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই চক্রান্ত ঘাঁরা শৃঙ্খল থেকেই আঁচ করেছিলেন, ঘাঁরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করেছিলেন বিভিন্ন বক্তৃতায় কিংবা পত্র-পত্রিকায় (আপনাদের পত্রিকাতেও), তাঁদের একটি নির্দিষ্ট বামপন্থী দলের অনুগামী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিলো। এবারের (ষষ্ঠ সংখ্যা) সম্পাদকীয়তে এই সুনিপুণ চক্রান্তের কথা পরোক্ষভাবে স্বীকার করা সত্ত্বেও এর জন্য কারোকে দোষারোপ করা হল না।

গত দশ মাসের বিভিন্ন সংখ্যা পড়ে মনে হোত আমরা বুদ্ধি শ্রীঅজয় মুখার্জীকে পশ্চিম বাংলা নামক দেশটা ইজারা দিয়েছি। কেউ এ ব্যাপারে বিরোধিতা করলে তাকে বরদাস্ত করা হবে না। গত জুলাই মাসে ৯।১০ বার তিনি (যখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী নন এবং কোনও গণ-আন্দোলনের নেতা হিসাবেও নন) রাজ্যপালের সাথে দেখা করেছেন। আপনারা তো কোনও লেখায় তার জন্য সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। এমন কি ২৯ তারিখেও অনেকক্ষণ তিনি রাজ্যপালের সাথে ছিলেন। দু'দিন আগে রাজ্যপাল দমদম এয়ার পোর্টে ঘোষণা করলেন—বিধানসভা ভেঙে দেবার কথা তিনি চিন্তা করছেন না, হঠাৎ কোনও নিগূঢ় কারণে তিনি তাঁর মত পাটালেন? এর থেকে এটাই কি প্রমাণ হয় না যে, শ্রীঅজয় মুখার্জী এবং রাজ্যপালের মধ্যে জুলাই মাসের সাক্ষাৎকারগুলো ছিলো ওই চক্রান্তের অংশ। আপনারা সপ্তাহের বোকাতেও সন্দেহ করা হয়েছে “বিধানসভাকে এই ভেবেই ভাঙা হল যে, বাংলা কংগ্রেস আট পার্টিতে যোগদান করছে না—এই

গাণ্ঠীক বসন্ত

সিমান্ত, যোগিত, হবার, পর, আট
পার্টিতে বিরূপ প্রতিফ্রিয়া হয়ে। কিছু
দল আর বাংলা কংগ্রেসের দিকে তাকিয়ে
না থেকে সি পি এম-এর দিকে মুখ
ফেরাবে।" তবে কি বাংলা কংগ্রেসের
আট পার্টিতে যোগ না দেওয়ার সিমান্ত
গৃহীত হবার পূর্বেই রাজ্যপালকে
বাংলা কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী
জানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এবং তা
হলে শ্রীঅজয় মুখার্জী বাংলা দেশের
জনগণ এবং আট পার্টির প্রায় সকলকেই
সন্দেহের চোখে দেখেন, এটা প্রমাণ
হয় নাকি? তকের খাতিরে যদি ধরা
যায় বাংলা কংগ্রেসের এই সিমান্তে
সি পি এম-কে সরকার গঠনে তৎপর
হতে আট পার্টির কিছু দল সাহায্য
করত, তাহলে বাধা কোথায়? তাহলে
আসল উদ্দেশ্য ছিলো সি পি এম-কে
কিছুতেই সরকার গঠন করতে দেওয়া
যাবে না এবং এই উদ্দেশ্য ছিলো,
সি পি এম-বিরোধী এখানকার বাম-
পন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সমস্ত দল সহ
ক্ষেত্রীয় সরকারের। কারণ যুগস্লবের
রাজত্বকালে "চূড়ান্ত আইন-শৃঙ্খলার
অবনতির" জন্য নাকি সি পি এম পার্টি
এবং সেই দলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতি
বসু দায়ী। এই প্রসঙ্গে আপনার ৯ই
জুলাইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য আমি
পুনরাবৃত্তি করতে চাই। রাষ্ট্রপতির
শাসনকালে জ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
না থাকা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার এই
অবস্থা কেন? পর-পত্রিকায় গুডামি,
ছিনতাই, রাহাজানিকে নকশালী
আন্দোলনের নাম করে প্রচারের চেষ্টা
কেন? এই সমস্তকে রাজনৈতিক
আন্দোলনের অংশ বলে প্রচার করতে
পারলে সি আর পি-কে পশ্চিম-বাংলায়
বহাল তবিয়তে রাখা চলে, তাই না?
এই সম্পর্কে সমস্ত পর-পত্রিকা,
বুদ্ধিজীবী অংশ এবং আইন-শৃঙ্খলার
ঐতিহাসিক অংশ অনশনকারী শ্রীঅজয়
মুখার্জী নীরব কেন? বিবর্তীয় যুক্ত-
ফ্রন্ট সরকার গঠনের শুরুর থেকে ৩০শে
জুলাই পর্যন্ত বাংলা দেশের রাজনীতি
পর্যালোচনা করলে এইটুকুই বোঝা
যায় যে, বাংলার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
এবং সামাজিক উন্নতির গালভরা বদলির
আড়ালে সি পি এম-বিরোধী দলগুলো
নিজেদের নাক কেটে সি পি এম-এর
খাদ্যভোগকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে।
তাই নয় কি? মাত্র চার মাস আগে
আপনারা লিখেছিলেন "রাষ্ট্রপতির
শাসন দীর্ঘজীবী হউক", কিন্তু আজ
শ্রীঅজয় মুখার্জীর মত আপনারাও
বুঝতে পেরেছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার
ন্যে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার ছাড়া
গভ্যন্তর নেই। তাই এবারের (৬ষ্ঠ)

সংখ্যায় লিখেছেন পুনর্নির্বাচন যতো
তাড়াতাড়ি হয় ততোই মঙ্গল। কিন্তু
এই বিষয়ে বাংলার প্রধান বামপন্থী
একটি দল যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার বহু
আগে থেকেই সাবধান করে দিয়েছিল,
সরকার ভাঙার পর মূহুর্তেই নির্বাচনের
জন্য সোচ্চার হয়েছিলো। তখন
আপনার মত প্রগতিশীল পত্রিকাও
জ্বর এই চিন্তার বিরূপ সমালোচনা
করেছিলেন। আর আজ বাস্তব ঘটনা
উপলব্ধি করে সেই পার্টির স্লোগানে
গলা মেলতে বাধ্য হচ্ছেন।

—শ্রীকণ্ঠ সেনগুপ্ত
নাগের বাজার, দমদম

শহর কলকাতা

[৪৭৭ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রকারই। তাই বলে কিন্তু জুলফিই
বদ মেজাজের লক্ষণ। এমন বলতে পারি
না। আমেরিকার মন্ত্রদাতা ওয়াশিংটন
থেকে বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ জেফারসন
এবং জ্যাকসনদেরও ছিল আকর্ষণ
জুলফি। আমাদের মাইকেল মধুসূদন,
ডিরোজিওর হাবিতেও জুলফির ইঙ্গিত।
জুলফি ছিল অনেক ব্রিটিশ গভর্নরের।
কিন্তু সেসব জুলফি বাবার চুলের
সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখত। পোষাকের
দৌলতে, গলাবন্ধের চমৎকারিছে
জুলফির একক উৎকট চেহারা অনেকটা
মিনিমাইজড হয়ে যেত। আমার
হাতের কাছে ফোটো এ্যালবামের অভাব,
নয়ত বলতে পারতাম, ইংলন্ডের কোন্
কোন্ রোমান্টিক কবির জুলফি ছিল
আকর্ষণীয়। কিন্তু এ ফুলো-ফাঁপা
ফুল স্নিগ্ধ জামা, ঘাড় ঝুঁকা কোট-কলার,
গলাবন্ধ রুমালী 'কো' জুলফিকে 'মাস্ট'
করে তুলত। যেমন জঙ্গ সাহেবের
'উইগ' যদি পঞ্চাননতলার পাঁচুর মাথায়
চাপান দেওয়া যায় তাহলে যেমন বিস-
দৃশ দেখায়, বাঙালী পুরুষের হাড়ভালা
পাংশুটে মূখে লম্বা জুলফি তেমনি
বেমানান, যা অষ্টাদশ শতকে হ্রাস ছিল
দেহ-পোষাকে মানদলসই মর্যাদার লক্ষণ।
ম্যার আশুতোষের বিখ্যাত গোঁফজোড়া
শরৎচন্দ্রের মূখে চাপিয়ে দিলে কেমন
লাগে?

সৌন্দর্য অসৌন্দর্যের জন্য নয়।
ফ্যাশনের হাওয়ায়ই জুলফি চলছে,
চলবে। নরসুন্দর সংস্কারকের ব্রেড
শাণিয়ে না উঠলে হস্ত রেশ কিছুকালই
চলবে। শব্দ চমৎকারিছে হেরফের
হতে পারে। লম্বমান জুলফি এরই
মধ্যে কনস্ট্রাক্শন চন্দনরথার মত দুই
গালে পাক মেরে উবু-মুখে শব্দ
তুলছে। সম্প্রতি এক ভদ্রলোককে পার্ক
স্ট্রীট অঞ্চলে গাড়ি হাঁকতে দেখছি, যিনি
জুলফি, গালপাটা এবং দাড়ির সমন্বয়

সাধন করে দু'গালে দু'চারটা গোলাকার
রোম গাজিয়ে তুলেছেন। টকটকে ফর্সা
মুখে রোমশ আইল্যান্ড দুটি বড় বড়
একজোড়া আঁচলের মতো মনে হয়।
তা এই ভদ্রলোক কয়েকবার চৌবঙ্গীতে
পায়ে পায়ে পাক খেলে নয়া ফ্যাশন চালু
হতে পারে। কিছু তো বড়া ভাঙা গাল
রোমপালনের ফলে ঢাকা পড়বে হয়ত।

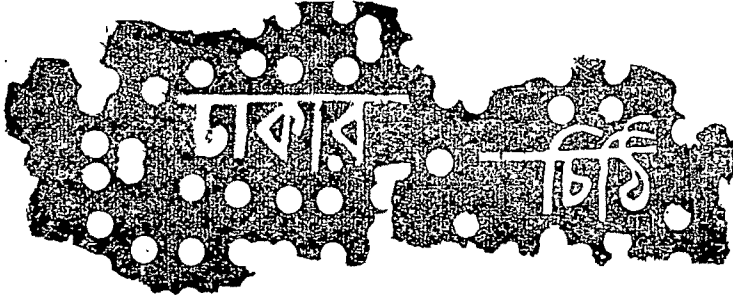
তবে হ্যাঁ, মিনিমুগে লম্বা জুলফি
একটা পারদর্শিক বিষয়ে বটে। তবে
বসু দেরি হয়ে গেছে, না? মিনি অব-
সানে ম্যাক্সিমুগের মাথা উঁকি মারছে।
মায় দেশের রাজনীতিতেও মিনি মিনি-
স্ট্রির গয়া গঙ্গা ঘটে ম্যাক্সিমাম সুবিধে-
ভোগী আই এ এস আমলাদের রাজত্ব
কালো হয়ে গেছে। এখন নিউ ওয়েভ
চালাতে হলে লম্বা জুলফি কুপিয়ে
কাটাই বাঞ্ছনীয়। গালে গালে রোমশ
আইল্যান্ডই বা মন্দ কি? তা ছাড়া
ফ্যাশন তো ভিসাস সার্কেলের মতো
চক্রবৎ পরিবর্তিত। তাহলে আজ
থেকে কয়েক বছর আগে হঠাৎ যে চশমা-
কাট জুলফিহীনতা চালু ছিল তাতেই
বা প্রত্যাবর্তনে আপাত্তি কোথায়।
কয়েকটি মাথা তো রংগের চুল, মাথার
তেলো রূপ করে মূড়িয়ে ফেলেছিল।
সম্মুখভাগে থোকাটাক শোভিত হোতো
মাত্র।

যে সব কচিমুখে এখন দাড়ি চাষ
হচ্ছে জুলফি-বাহারে মুণ্ড ভাসানোর
জন্য সেগুলি যথার্থ থাক। সেলুন
খরচা, যা বাপেরই গুণতে হবে
পুজোর আগে কিছু বেঁচে যাক।
বারোয়ারীর জলুম-চাঁদার কিছু মিটেবে
এ এ্যাকাউন্টে।

তবে মিয়নের এই ভবিষ্যৎবাণী
জেনে রাখুন, মিনি অবসানে জুলফির
কোরমতি বিশেষ টেকসই হবে না।
আপনার পার্শ্ববর্তী নীচ খুব শীঘ্র ধমক
দিয়ে বলবেন, 'ম্যাগো; এ উৎকট লোম-
গুলো কামিয়ে ফেল না! একা একা
তোমার মুখ আর মনে করতে পারি না।
চোখ বুজলেই দু'দুটো জুলফি পদা
সব কিছু ঢেকে দেয়। বাঙালী পাঁঠার
দোকনটা মনে পড়ে!'

আশুতোষের গোঁফ, ববীন্দ্রনাথের
দাড়ি, হিটলারের বাটারফ্লাই, চার্লির
চামাচকে, এরোল স্কিনের গুম্ফ-ডানা
(ফিন)-ই টিকল না, জুলফির ওপর
ফুর না বদলিরে যাবেন কোথায়।

একজোড়া জুলফির জন্য খুব মমতা
বোধ করে থাকেন ভো শ্রীমুখের খান দুই
করে ফোটো তুলে রেখে কামিয়ে ফেলুন।
খামকা নিজেই কুণ্ঠিত করার বোকামি
থেকে রেহাই পাওয়ার চার্মাকট
আপনারই প্রথম প্রাপ্য হবে।



॥ পনের ॥

যদ্যপি বর্ষাচবে নূরুল

দালালি করিবে।

দালালির কমিশনে

কৌমী লীডার সাজিবে ॥

ছড়াটা বেঁধেছিল আমাদেরই এক কৃষক কর্মী। তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তার দূরদৃষ্টি ছিল বলতে হবে। আজ নির্বাচনের প্রাক্কালে আমিন সাহাবের নয়া, নয়া দালালি দেখে বার বার ছড়াটা মনে পড়ে যাচ্ছে। ক্ষণজন্মা দালাল বটে নূরুল আমিন! পি, ডি, এস-এর চালিয়াতী বার্থ হয়ে যাওয়ায় তাকে কেউ এতটুকুও মুষড়ে পড়তে দেখে নি, সে তখন নতুন ফন্দী আঁটতে ব্যস্ত, ঘন ঘন সাকরেদদের সাথে “গোপন বৈঠক” করছে আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পেটোয়া সাংবাদিকদের বিবৃতি দিচ্ছে। আমরা বরুলাম যে, গণ-আন্দোলনকে বিপথগামী করার জন্য নূরুল, নছরুলারা বন্দপরিকর। সূত্রাং সজ্ঞাপ থাকলাম।

ইতিমধ্যে ন্যাপ বা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মধ্যে ভাঙন এসেছে। কেন ন্যাপ ভাঙল, তার পুরো ইতিহাস এই চিঠির আলোচনার বিষয় নয়, বারান্তরে তা নিয়ে লিখব, কেবল এইটুকু জানিয়ে দি যে, মাস্টার মোজাফ্ফর আমেদ ন্যাপ ভাঙার অজুহাত হিসাবে নীতিগত বিভেদের কথা তুললেও আসলে সে ও তার বন্ধুরা নূরুলের খপ্পরে পড়েছিল এবং কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের মারমুখী আন্দোলনের উৎসবকেন্দ্র পুরোন ন্যাপকে ধ্বংস করার জন্য নূরুলের চক্রান্তের অংশীদার হয়েছিল। মৌলানা ভাসানী সম্পর্কে আমাদের অনেক অভিযোগ আছে। তিনি আজ নয়া শোধানবাদী এবং দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়াশীলদের মত তাঁর কণ্ঠেও আজ অহোরাত্র কোরান আর ইসলামী সমাজ-তন্ত্রের অর্থহীন চিংকার উঠছে। আজ আমরা ঠিক যে অর্থে চীনের পথকে আমাদের পথ বলছি, যে অর্থে মহান চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙকে আমাদের তথ্য সারা দুনিয়ার বিপ্লবী সেনা

বাহিনীর পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করেছি, ভাসানী তা করেন নি। আরতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শাসককে মদত দেবার জন্য তিনি চীনকে আহ্বান করেছেন। কিন্তু এই কথা তাঁর কখনও মনে আসেনি যে, আমাদের লড়াই দুনিয়ার সকল শাসকের বিরুদ্ধেই। ভারত, পাকিস্তান—উভয় দেশের শোষিত মানুষ সবাই আমাদের বন্ধু, উভয় দেশেরই প্রতিক্রিয়াশীলরা আমাদের শত্রু। আর তাই যদি হয়, তা হোলে এক দেশের শাসককে মেরে আর এক দেশের শাসককে কোলে নেব, এটা কোন বিপ্লবী নীতি, কোন বিপ্লবী আদর্শ? যাই হোক, এই সব বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও সেদিন মৌলানা ভাসানী আমাদের কাজে বাধা দেন নি। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক এবং জীবনের বিভিন্ন পথের আরও অনেক মেহনতী আওয়ামকে পাশে নিয়ে সেদিন আমরা বৈশাখের ঝড়ের মত, ভাঙের উত্তাল সাগরের কোটালের মত আয়ুবশাহীর পাথরে দেওয়ালে বা দিয়ে দিয়ে শাহেনশার বৃকের কলজে আর তার শাহী তখত, দুটোকেই নাড়িয়ে দিয়েছি। সেদিন কোথায় ছিল “বাংলার বাঘ” মজিবর। সে তখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের খাঁচার মধ্যে বসে হাত-পায়ের নখ খাচ্ছিল, আর তার সাকরেদরা করিছিল “আন্ডার গ্রাউন্ড” “আন্ডার হ্যান্ড” বিপ্লব। অপরদিকে, খচ্চর মাস্টার মোজাফ্ফর আহমেদ, যে একেবারে নাম করে জনতার চোখে ধুলো দিয়ে মাই ডিয়ার হওয়ার চেষ্টায় আজও তৎপর, সে সেদিন আমাদের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অশ্রাব্য গালি দিচ্ছিল এবং সভা-সমিতি-মিছিল করে আর বিবৃতি দিয়ে আঘাতের নামে আয়ুব খাঁকে সূরসূরি দিচ্ছিল। ঐ অবস্থায় আমরা, পুরোন ন্যাপের সদস্য, কর্মী এবং সমর্থকরা গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। সত্যি কথা বলতে, পূর্বে পাকিস্তানের মানুষ নিজেরাই এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা কেবল তাদের পাশে ছিলাম।

শয়তান দালাল নূরুল আমিন

৪৮০

যখন দেখল যে, তার শ্বিতীয় অভিযান গাডায় পস্তাতে বসেছে, গণ-আন্দোলনকে সে রুখতে পারে নি, মনিব আয়ুব এক্ষণি তাকে কমিশন থেকে বঞ্চিত করবে এবং অন্য কাউকে চাকরিতে বহাল করবে, তখন সে তার উপস্থিত দুঃখ আর অনুশোচনাকে দাফনের দিনের জন্য জমা রেখে নতুন কিছু করা যায় কি না ভাবতে বসল। সৃষ্টিকর্তা (অর্থাৎ নূরুলের বাপ, আমরা ভগবান নিয়ে মাথা ঘামাই না) তার মাথায় যথেষ্ট মারপ্যাঁচ দিয়েই জগতে পাঠিয়েছিলেন। তাই তাকে আর বেশি ভাবতে হোল না। ভাবতে বসামাত্রই নয়া ফন্দী তার সামনে হাজির হোল, সে ঠিক করল শোধানবাদী মাস্টার মোজাফ্ফর আহমেদকে কাজে লাগাবে। ঐ সময় অর্থাৎ সাতষটির শরৎকাল থেকেই মোজাফ্ফর দল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। নূরুল এসে গোপনে গোপনে তাকে উৎসাহ দিল। ন্যাপ ভেঙে যাওয়ার পেছনে এই ভয়ানক ধরিবাজ খচ্চরটির যে একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল, তা সহজেই বোঝা গেল। কারণ আটঘটি সালের বারই ফেব্রুয়ারী ঢাকায় মোজাফ্ফর আহমেদ, মাহ-মুদুল হক ওসমানী প্রমুখরা এক দলীয় সভা ডেকেছিল। ঐ সভায় ওসমানী এমন সব গন্তব্য করল যে, বৃদ্ধিতে বাকী রইল না সে নূরুলের পি, ডি, এস-এ যোগ দিয়ে নতুন কোনও ষড়যন্ত্রের অংশীদার হোতে চায়। ‘নির্লজ্জতা আর কাকে বলে? আমার একটি চিঠি নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। আমি লিখেছিলাম যে—“নির্লজ্জতাই বৃজ্জোয়া রাজনীতির প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য”। ঐ চিঠিতে আমার উক্তির প্রমাণ দিয়েছিলাম। ওসমানী-মোজাফ্ফর সম্পর্কেও প্রমাণ দিচ্ছি। ন্যাপ ভেঙে নূরুলের গলায় মালা দিলেও মাত্র কয়েক মাস আগে মোজাফ্ফররা অন্য কথা বলত। আমরা-দের বেশ মনে আছে যে, সাতষটিরই দশই মে পশ্চিম পাকিস্তানের হায়দ্রাবাদে ওসমানী পি, ডি, এস-কে খ্রিস্ট করেছিল, বলেছিল “পি, ডি, এস-এর প্রোগ্রাম আদর্শেই কোন কাজের নয়, ওদের ভরাডুবি হবেই। “তা ওসমানী তুমি ঠিক কথাই বলে ফেলেছ। গণ-বিপ্লবের দুর্বীর তরঙ্গের ওপর দিয়ে তুমি আর নূরুল আমিনের দল যে সুবিধাবাদের নৌকা বাইছ, তা’ আমরা ডুবিয়ে দেবই, কোনও চিন্তা কোর না, তোমাদের রুহের সদগতি আমরাই করব।”

ঐ বছরেরই বারই মে ঢাকায় এক জনসমাবেশে মোজাফ্ফর আমেদ এবং তার স্থানীয় সাকরেদ মহীউদ্দিন আমেদ, নূরুল আমিন, মিয়া মুমতাজ

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

দৌলতনা, চৌধুরী মহাম্মদ আলী প্রমুখ পি, ডি, এম-ওয়ালাকে প্রচুর গালি দিয়েছিল। মোজাফ্ফর হাত-পা নেড়ে বলাছিল, "আজ পি, ডি, এম করে বড় দেশসেবা দেখাচ্ছ, তা' গত্ত আট বছর কোথায় ছিলে? এই আট বছর ধরে তোমরা কোন গহং কাজ করেছ শুনিন?" শেষ পর্যন্ত এই "আট বছর বেপাড়া হয়ে থাকা পি, ডি, এম-ওয়ালার"দের সাথেই কিন্তু মোজাফ্ফরকে গাটিছড়া বাঁধতে হোল! বঙ্গোয়াল রাজ-নীতির রূপ আর রঙ্গ, কোনটাই কম নয়!

ন্যাপ থেকে মোজাফ্ফরকে বার করে আনার পর নূরুল আমিনের নজর গেল আওয়ামী লীগের দিকে। এখানে তার রাসতারা আগে থেকেই কিছুটা পীরকার হয়েছিল। কারণ, এন, ডি, এফ বা "ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট" করার সময় আবদুস সালাম, আতাউর রহমান প্রমুখ বড় দলের আওয়ামী লীগার সহ আরও অনেক সদস্য ও কর্মী মর্জিবরকে ছেড়ে নূরুলের দলে ঢাকোছিল। এবার তাদেরই কাছে লাগল আমিন সাহাব। হয় দফা প্রচার করার পর থেকেই মর্জিবর রহমানের আওয়ামী লীগ কোণঠাসা হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের হয় দফা প্রণয়নের পিছনে পাকিস্তানের কয়েকটি পুঁজিপতির বিশেষ করে ইউসুফ হারুনের অদৃশ্য হাত আছে। ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের ভেড়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের মোটা মূনাফার ব্যবসাসটা উঠে যাবে, এই ভরে হারুনের দল এক মোক্ষম দাঁও প্যাঁচি বাড়ল। তারা মর্জিবরের ঘাড়ে চেপে সোজা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বরাবরের মত পূর্ব পাকিস্তানে "ডোমিনাইন্ড" হতে চাইল।

এর দরুণ সুবিধে হবে অনেক বেশি। পশ্চিমে নিয়মিত পুঁজি বা মূনাফা পাচারের ঝঙ্ক থাকবে না। এ দেশে বসেই এ দেশের মানুষকে শোষণ করা যাবে। স্বতীয়ত্ব, প্রতিবন্দনী পশ্চিমা পুঁজিপতিদের হাটিয়ে দিয়ে মাত্র কয়েকজন মিলে পূর্ব পাকিস্তানে চুটিয়ে ব্যবসা করা যাবে। তৃতীয়ত্ব, পূর্ব বাংলা কোনদিন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও অসুবিধা হবে না, কেন না মর্জিবর বলে, "আমি ডানও নই বামও নই; আমি "সেন্টিস্ট"। কাজেই কোনও দুর্দৃষ্টিতা নেই। কেন না মাঝামাঝি যে থাকে সে হাফগেরস্থ মেয়েছেলে।

তাকে দিয়ে যা খুঁশি করান যায়। তা ছাড়া ইউসুফ হারুণ তো তাকে টাকা দিয়ে কিনেই রেখেছে। সোরাবদী মারা যাওয়ার পর থেকে তার বিবস্ত বন্ধ ইউসুফ হারুণ নিয়মিত মর্জিবরকে

টাকা দিয়ে আসছে। বেশ কয়েক বছর মর্জিবর ইউসুফের বেঞ্চল ওরিয়েন্টাল ইনসিউরেন্স কোম্পানী থেকে নামমাত্র চাকরির বিনিময়ে প্রতি মাসে তিন-চার হাজার টাকা বকশিস পয়েছে। আর সে যখন ছেষটি মাল থেকে জেলে পচাছিল, তখন এই ইউসুফই তার পরিবারকে নিয়মিত দানাপান দিয়ে জিইয়ে রেখেছিল। মর্জিবর যৌন আগরতলা মামলা থেকে "রিলিজড" হোল, সেদিন ইউসুফ হোলকুটারে চড়ে তার গোপালগঞ্জের বাড়িতে গুড্ডর-পাখীর মত উড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এদেরই টাকায় মর্জিবর ধানমন্ডীতে বাড়ি, গাড়ি হাকিয়ে গোটকয়েক জীপ, ডজনখানেক লাউডস্পীকার, গাদা গুচ্ছের বন্দুক, বোমা আর শত শত গুড্ডা কিনে দেশোদ্ধার করছে।

কিন্তু কি কারণে হারুণ-মর্জিবর সৃষ্ট হয় দফা আমদুবকে ক্ষেপিয়ে দিল? কারণটি খুব পীরকার। জমিদারের নায়ের + হাবিদার + ছোট জোত-দারের সন্তান, আমদুব খাঁ নিজের তার সুপুত্রদের সাহায্যে পুঁজিপতি হয়ে উঠেছিল এবং বেশ কিছু পশ্চিমা পুঁজিপতির সেই ছিল বড় দালাল। এই পুঁজিপতিরা যখন দেখল যে, হারুনের দল হয় দফার খেল দেখিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের দফা রফা করছে, তখন তারা আমদুবের শরণাপন্ন হোল, এ ছাড়া ইউসুফের সঙ্গে আমদুবের বহুদিন ধরে কোদল চলছিল। আমদুব ভাবল হারুণকে সে এতদিনে বাগে পেয়েছে, সুতরাং "আর ছাড়ব কেন" এমন মনোভাব নিয়ে সে হঠাৎ একটা অর্ডিন্যান্স খেড়ে বসল।

"জিমিনাল ল' অ্যা মে ন ড় মে ন্ট (স্পেশাল ট্রাইবুনাল) হয় নং অর্ডিন্যান্স" অনুযায়ী সাতটি সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ কয়েকটি লোক গ্রেপ্তার হোল। কিন্তু ব্যাপারটা জনসাধারণকে জানান হোল কিছু দেরীতে, আটটি পয়লা জানুয়ারী এক সরকারী প্রেস নোটে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার কথা প্রকাশিত হোল। ছয়ই জানুয়ারী নাগাদ সবদুধ আঠাশ জন গ্রেপ্তার হোল আর অঠার তারিখে মর্জিবরকে মামলার প্রধান আসামী সাব্যস্ত করা হোল। শূরু হোল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মর্জিবর রহমান মামলা"। মর্জিবরের বিরুদ্ধে আমদুবের অভিযোগ যে, "মর্জিবর ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্তে নেমেছে। কিন্তু আমাদের মতে, এই মামলার নাম দেওয়া উচিত ছিল আমদুবগোষ্ঠী পুঁজিপতি বনাম হারুণ-

গোষ্ঠী পুঁজিপতি মামলা। কিন্তু আমদুব নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। তার ইচ্ছা হোল যে, সে একই সঙ্গে হারুণকেও ভোবাবে, আবার ভারতকেও জড়াবে। কাজেই ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আনা হোল। ভারতের ষোগসাজস কতটা ছিল তার আলোচনা এখানে অবাস্তব, কেবল এইটুকু জেনে রাখা দরকার যে, হারুনের দল পূর্ব পাকিস্তানের উপনিবেশটা একচেটিয়া করে নেবে এটা আমদুব ও তার দলের অন্যান্য পুঁজিপতির কোনও মতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না।

যাই হোক, একদিকে আমদুবের ঠাণ্ডানি, অপরদিকে প্রতিবন্দনী আওয়ামীদের অর্থাৎ আবদুস সালাম, নহরুল্লাহের আক্রমণ—এই ভয়ানক জ্বালা কলে পড়ে মর্জিবরের হয় দফা আওয়ামী লীগের ন্যাভিবাস উঠে গেল, প্রাণ যায় আর কি! ঠিক সেই মহুতে হাত বাড়িয়ে দিল ধুরন্ধর আমিন। বলা বাহুল্য যে, মর্জিবরপন্থীরা তার হাত দু'খানিকে বেহেস্তের হুরারী ডানা মনে করে সাগ্রহে ও সজোরে চেপে ধরল।

আটটি পুঁজিপতির অষ্টোবর মাসের শূরু থেকেই নূরুল আমিন, মামদ আলী, নহরুল্লাহ এবং তাদের নবদীক্ষিত শিষ্য-বৃন্দ অর্থাৎ মোজাফ্ফর আমেদ, মাহমুদুল হক ওসমানী, ওয়ালী খাঁ (ন্যাপ-দক্ষিণ) এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মাণিক মিয়া (তোফাজ্জুল হোসেন), কামরুজ্জামান (আওয়ামী লীগ-হয় দফা) ইত্যাদিরা "আওয়ামের মর্জির জন্য নব যুক্তফ্রন্ট" গঠনে তৎপর হয়ে উঠল। পি, ডি, এম-এরই এক অংশীদারের কাগজ "আজাদ" প্রতিদিন কলামের পর কলাম জুড়ে এই নতুন দালালির গালভরা বিজ্ঞপ্তি দিতে লাগল এবং ন্যাপ ও আওয়ামী লীগকে একই গোয়ালে, একই গামলায় জাবনা খাওয়াতে পেরেছে জন্যে নূরুলকে বিস্তর বাহবা দিল।

অষ্টোবরের আট তারিখে আজাদ তার চালিয়াতীর একটি বিশেষ নমুনা দেখাল। সে লিখল, "জনমতের চাপে আর রক্ত বাস্তবের আঘাতে ভাসানী-পন্থী ন্যাপের একলা চলা মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে", অর্থাৎ যে এই খবরটা পড়বে, সেই ভাবে ভাসানীও বুদ্ধি নূরুলের সাথে হাত মিলিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে আমরা, পুরোন ন্যাপের প্রাণ্ড কর্মী ও সমর্থকরা সেদিন আমাদের দলকে একটা নিশ্চয় প্রাচীর করে রেখেছিলাম, এক ফোঁটা বেনো জল ভিতরে ঢোকার রাস্তা সেদিন ছিল না।

সামগ্রিক বন্দনমতী

ইতিমধ্যে আমানী টাঙ্গাইলে এক সম্মেলন আহবান করেন। বলাই বাহুল্য যে, অপর্যাপ্ত গাঙ্গীর মোজাফ্ফর বা ওমানীদেব আমরা আমন্ত্রণ জানাই নি। এই ব্যাপারটিকেই যথেষ্ট কাজে লাগাল নুরুল। আমাদের বিরুদ্ধে মোজাফ্ফরের বিদ্রোহী ন্যাপ ও ছয় দফা-আওয়ামীদের উদ্দেশ্য দেওয়ার চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেল সে। নয় তারিখ মগবাজারে ছয় দফাওয়ালাদের কার্যকরী সভার এক অধিবেশনে ভাসানীর সম্মেলনকে বরকট করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হোল, আওয়ামীদের মতে, মোজাফ্ফরকে আমন্ত্রণ না জানিয়ে আমরা ঘোরতর অন্যায় করেছি। সুতরাং তারাও আমাদের আমন্ত্রণ নিল না। যেচে সেধে এই অপমান নেওয়ার জন্য আমরা ভাসানীকেই দায়ী করি। টাঙ্গাইলের সম্মেলনে এই সব কনফারেন্স দালালকে ডাকার কি দরকার ছিল? রুড়ি তারিখ ঢাকার হোটেল ইডেনে আওয়ামীদের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বেগধন হোল। সেখানে মোজাফ্ফরের দুই চেলা মাইউদ্দিন আহমদ আর পীর হাবিবুর রহমান অতিথি হিসেবে হাজির হয়েছিল। ভরতে অনেক লাগে যে, মাত্র দুই-এক বছর আগেও মজিবুর রহমান মোজাফ্ফরকে তার দুষমন মনে করত আর দুই-এক বছর পর তারা একই জেয়াল কাঁধে নিয়ে জোড়াবলদ সেজেছিল।

মজিবুর আর মোজাফ্ফরদের দলে পাওয়ার পর নুরুল আমিন যে কথা সময় নষ্ট করবে না, তা আমরা আন্দাজ করেছিলাম। সত্যিই তাই হোল। ডিসেম্বরের অষ্টাশ তারিখ নছরুল্লা চাকর ডিউ এল। ঢাকা শহর দালালদের দৌলতে জম-জমাট হোয়ে উঠল। তেসরা জানুয়ারী থেকে (উনসত্তর-সাল) এক নিকে বসল “পি, ডি, এম-এর” “ন্যাশ-নাল একসেকিউটিভের” বৈঠক, অপর দিকে চলল মজিবুর, মোজাফ্ফরদের গোপন পরামর্শ। এই দুই শকুনীমার্কা বড়স্প্রে ফলস্বরূপ জানুয়ারীর আট তারিখ “ডাক” বা “ডেমোক্রেটিক অ্যাকসন কমিটির” আমদানী হোল। অর্থাৎ শয়তান পার্টি এই নয়া গণ-বিরোধী শয়তানীর অংশীদার হোল—ন্যাপ (বিদ্রোহী), জামাতুল উলমায়ে ইসলাম, এন, ডি, এফ, আওয়ামী লীগ (নছরুল্লা গোষ্ঠী), কাউন্সিল লীগ, জামাতে ইসলাম, নিজামে ইসলাম এবং ছয় দফা আওয়ামী লীগ।

ডাকের আট দফা দাবীর মধ্যে সার পদার্থ কিছুই ছিল না, দফাগুলি গড়লেই তা বন্ধতে পারবেন।

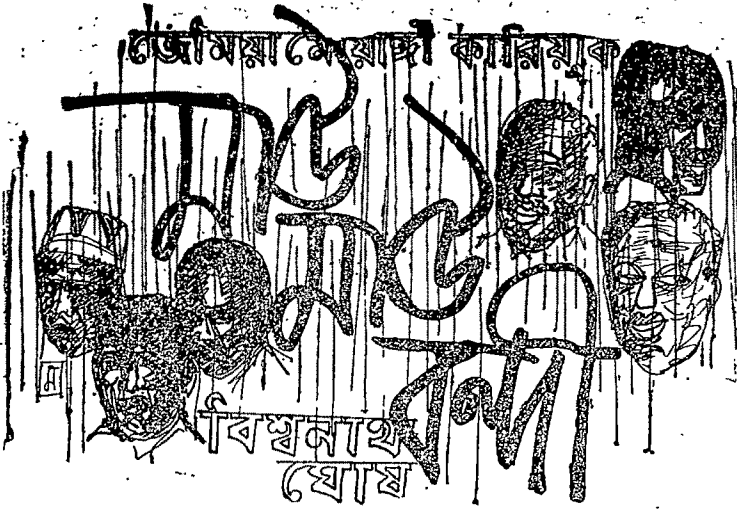
- ১। ফেডারেল পাল্লামেন্টারী ব্যবস্থা (অর্থ বি শুরোরের খোঁজাড)
 - ২। প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার (পুঁজিবাদ, সামন্তবাদকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা)
 - ৩। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার
 - ৪। নাগরিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা
 - ৫। রাজবন্দীদের মুক্তি
 - ৬। একশ’ চরমাজিগ ধারার অধীন সকল আদেশ প্রত্যাহার
 - ৭। ধর্মঘট করার অধিকার
 - ৮। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
- প্রতিটি দফাই কতকগুলি আশু সুবিধা আদায়ের কথা বলেছে। দফা-গুলি পড়ে আমরা তখনই বলেছিলাম যে, ‘ডাক’-এর আয়ত্বে কল্লিকের, কয়েক মাস মাত্র। আমাদের কথাই ঠিক হোয়েছিল, তের মাস পরেই ডাক ভেঙে গেল।

মজিবুর বা হারদুণ যদি ধান্মমান হোত, তবে তারা কখনই “ডাকে” যেত না, কেন না “ডাকে”র মূল উদ্যোক্তা ছিল দালাল নুরুল এবং নুরুলের পিছনে ছিল আয়ুব খাঁ। আয়ুব খাঁ পশ্চিমা পুঁজিপতিদের সবচেয়ে বড় দালাল আর ধর্মবাপ ছিল। “ডাকে”র আয়োজন করে আয়ুব খাঁ নুরুলের সাহায্যে মজিবুরকে ফাঁদ পেতে ধরেছিল এবং গোলটেবিল বৈঠকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছিল, কেন না সেখানে মজিবুরের ছয় দফা আদায় হোল না। সে রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাড়ি ফিরে এসে তার ছেলে আর ছোট শালাকে পাঠিয়ে দিল আয়ুবের চাকর মামদ আলীকে ছোরা মারার জন্য। আমি এই ঘটনার আগেই উল্লেখ করেছি। “ডাক” যে একটা মস্তবড় কুটনৈতিক চাল তা মজিবুরের বোকা উচিত ছিল। উনসত্তরের বারই ফেব্রুয়ারী আয়ুব খাঁ রাওয়ালপিণ্ডিতে ঘোষণা করল যে, “নছরুল্লা একজন আদর্শ রাজনীতিক, কেন না সে শ্রুতি মেনে চলে”। মজিবুরের মাথা মোটা না হোলে সে বন্ধত যে, ডাকের সঙ্গে আয়ুবের ভিতরে ভিতরে যোগসাজস আছে। তা না হোলে সে কেন হঠাৎ বিরোধীপক্ষীয় “ডাকে”র নেতা নছরুল্লাকে সমর্থন জানায়?

মৌলানা ভাসানী সৌদীন সঠিক পথ নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, “সুবিধাবাদী, স্বার্থপর কতকগুলি রাজনীতি ব্যবসায়ীর জোটে ন্যাপ কোনদিনই যোগ দেবে না।” বাস্তবিক, মূল ন্যাপ “ডাক”-এর সাথে হাত মেলায় নি। ডাক সৃষ্টির পর নুরুল, নছরুল্লা আর আয়ুবের পরামর্শে গোলটেবিল বৈঠক ডাকল। বোচ্চন্দ

মোজাফ্ফর, গোঁরাড মজিবুর পবে বাংলার সংগ্রামী শাসনের নিষেধ অমান্য করে এই বৈঠকে যোগ দিল। আজও মনে আছে, বৈঠকের প্রাক্কালে কুমিল্লার চিরাড়ার বিশাল জনসমাবেশে মৌলানা ভাসানীর সেই ভাষণ—“আমি পিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিয়ে কেন সুন্দর গ্রাম বাংলার চিরাড়ায় আপনাদের কাছে এলাম তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। আমার সুদীর্ঘ রাজ-নৈতিক জীবনে বহু গোলটেবিল বৈঠক দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কোন বৈঠকের মাধ্যমেই হৃদয়, শ্রমিক ও মেহনতী জনতার মুক্তি বা পরাধীন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা আসে নি। তাই স্বাধীনতার বাঁশ বছর পরেও এই দেশের মেহনতী মানুষ এক সর্বগ্রাসী সংকটে জর্জরিত হয়ে পড়ে পড়ে মরছে। এই জন্যই পেটে ক্ষুধার আগুন নিয়ে ক্ষেতমজুর, শ্রমিক ইত্যাদি শোষিত মানুষ বাঁধাঙা স্রোতের মত দুর্বার গতিতে কারাফিউ, জেল, গুলী ও বেয়নেটকে তুচ্ছ করে লড়াই করে চলেছে। আমি বিশ্বাস করি কোনও নেতা বৈঠকের মাধ্যমে এদের মুক্তি আনতে পারে না।” ভাসানীর প্রতিটি কথাই অক্ষরে অক্ষরে সত্য হোয়েছিল। আমাদের মহান নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা তাঁর পদত্যাগ-পরে স্বীকার করেছেন যে, “যদিও বিগত গণ-অভ্যুত্থানে ন্যাপ সকল ক্ষেত্রে যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারে নি, তবুও আয়ুবের নির্বাচন বর্জন, গোলটেবিল বৈঠক বর্জন সম্পর্কে ন্যাপ সঠিক নেতৃত্ব দেয়” (তোয়াহার মূল চিঠি থেকে উদ্ধৃত)। ন্যাপের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ অন্য এক অধ্যায় এবং এই ক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক। আমরা কেবল বলতে চাই যে, সৌদীন আজকের “বঙ্গোবসর” মজিবুর এবং “নিভেজাল, সাচ্চা কম্যুনিষ্ট” মোজাফ্ফর গণ-আন্দোলনকে প্রতিহত করার চক্রান্তে আয়ুব-নুরুল-নছরুল্লা সৃষ্ট “ডাকে” যোগ দিয়েছিল। মজিবুর শিখেছে ঠেকে এবং অনেক দেবীতে। তাই আজ পি, ডি, পি’র প্রতিটি সমাবেশে নুরুল তাকে “মিরজাফর” বলেছে আর মজিবুর নুরুলের দলকে দালাল বলে ব্যাণ্ড করছে। বর্তমানে পি, ডি, পি আর আওয়ামী লীগ এই পারস্পরিক খোয়ান খোয়ি করে নির্বাচনের ময়দান জমিয়ে রেখেছে।

পুঃ—সবুদ খাঁ বেশ কিছুদিন হোল কায়ুমের জিমা মদসলিম লীগে যোগ দিয়েছে। কনভেনশন লীগের ফাউ বাজেয়াপ্ত হওয়ায় সুবিধাবাদী সবুদ কায়ুমের সাথে হাত মিলিয়েছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

স্বীকারোক্তি পাওয়াটাই সব থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু ছিল সরকারী পক্ষে, ইচ্ছায় দিলে তো ভালই, না হলে জোর-জুলুম করেও। যারা বাছাইব কাজে সাহায্য করত কতৃপক্ষকে, তারা বেশির ভাগই ছিল আফ্রিকান রিজার্ভ গুলি থেকে আগত বয়োবৃদ্ধরা। তাই তারা নিজ নিজ এলাকার ছেলেছোকরাদের চিনতো। এখানেই আবার অনেকদিন পরে আমি 'নোয়া' দেখা পাই, যে এক সময় লুকুচুর কোয়া নোয়ান্‌গুয়েথ বাছাই শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিল। আমি নোয়াকে জিজ্ঞাসা করি যে কোয়া নোয়ান্‌গুয়েথ অনেক অন্তরীণদের জোর করে কেন খোজা করা হয়েছিল। নোয়া স্থূল হেসে উত্তর দেয় যে, এর দুটো কারণ ছিল। প্রথম তারা চরমপন্থীদের শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ধরে ধরে খোজা করে দিরাছিল এবং আমার খুব সৌভাগ্য যে, আমাকেও তখনি সেই পর্যায় ফেলা হয় নি। আর দ্বিতীয়ত দেখতে চেয়েছিল যে, যৌন-লিপগহীন বাঁড়ের মতো খোজা কথার পর মানুসগুলোও ফুলেফেঁপে উঠবে কিনা। নোয়া এক স্থূলবুদ্ধি অপদার্থ গবেট মূর্খের জীবন্ত প্রতীকবিশেষ।

আর্থ-রিভারের সকালবেলায় আমাদের বাছাই করা হত, কিম্বা আমরা দিন-মজুরের কাজে যেতাম। বিকেলবেলায় কতৃপক্ষ আমাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন সব প্রচেষ্টায় ব্যস্ত থাকতেন ও আমাদের ব্যস্ত রাখতেন যে, আমরা নিজেদের সংয-বন্দ্য করার বা নিজে থেকে কিছু করার জন্য এক মহত্ব ও সময় পেতাম না। এ বিষয় কতৃপক্ষ সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন তাঁদের প্রচেষ্টায়। কারণ আমরা সেখানে কোনরকম কার্যনির্বাহক সমিতি গড়তে সক্ষম হই নি। নিম্নলিখিত কার্যসূচী

যে কোন দিনের বৈজ্ঞানিক সমগ্রসাপনের একটি নমুনা :-

এক নম্বর এলাকা : শিক্ষাদীক্ষার ক্লাস : পড়ানার বিষয়বস্তু ছিল ফোর্নিয়ার ইতিহাস, যাতে সাদা মানুষের ওদেশে আগমনের ঠিক পূর্বেই বিভিন্ন উপজাতি-সমূহ কিরকম অন্তর্কলহে ব্যস্ত ছিল তার বিশদ বিবরণ দেওয়া হত। তারপর থাকত সাদা মানুষেরা এসে কি করে আমাদের এই বর্বরতার হাত থেকে বাঁচায় এবং সর্বশেষে আমাদের বলা হত যে, সাদারা কতো কষ্ট সহ্য করে শুধুমাত্র আমাদের উন্নতির জন্যই এদেশে কতো রকমের সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করেছে। (এখানে বলা বোধ হয় নিঃপ্রয়োজন যে, শিক্ষক এবং ছাত্র দল এই দু'পক্ষ পাঠ্যের বিষয়বস্তুর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ বা একমত কোনদিনই হতে পারে নি।)

দুই নম্বর এলাকা : বাছাই করে বয়োবৃদ্ধদের ভাষণ শোনবার জন্য একত্রিত হওয়া। আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল কি করে স্বীকারোক্তি দিতে হয়, কি বলতে হয় এবং বাদবাকি সন্তাসবাদীদের ধরতে সরকারকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

তিন নম্বর ও চার নম্বর এলাকা : ঐতিহ্যগত নাচগানসমূহ, যাতে ফোর্নিয়ার বিভিন্ন উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতো, যেমন : মুকুনগোয়া, মগইয়ো, মথুও, কুমুন্ডাম্বুরি, মুকুওগো এবং কামানো। বয়োবৃদ্ধরা বসে বসে মারোবা নাচের কথা-গুলি গেয়ে যেত একটানা সুরে। আমরা চেষ্টা করতাম গানগুলির ভেতর নানারকম সরকারী প্রতিকূল কথার প্রবর্তন করতে। কিন্তু বাছাইকার বয়োবৃদ্ধরা কড়া পাহাড়া রাখতেন আমাদের উপর এর বিরুদ্ধে।

ছয় নম্বর এলাকা : চলচ্চিত্র দেখা।

উপরোক্ত কার্যসূচী অবশ্য সপ্তাহের

বিভিন্ন দিনে শিবিরের বিভিন্ন এলাকায় হত।

প্রত্যেক তাঁবুতে বা কুঁড়ে ঘরে একটি করে শব্দ-বিবর্ধক যন্ত্র লাগান ছিল, হয়তো বা দুটো। এর দ্বারায় সারাদিন অন্তরীণদের কানে বর্ষিত হত সরকার পক্ষের প্রচারকার্য : বৃটিশায়া ফোর্নিয়ার 'ভাল'র জন্য কি কি করছেন, সরকার পক্ষে কার্যরত ফোর্নিয়ার কালো আফ্রিকানরা কতো মহান চরিত্র, পুঁজিবাদি দেশগুলি আফ্রিকার কল্যাণে কি কি কল্পন্য জল্পনা করছেন ইত্যাদি।

মাঝে মাঝে এই অনাহৃত প্রচারকার্য এতো অসহ্য হয়ে উঠতো যে, আমরা কয়েকটি কবল দিয়ে যন্ত্রটিকে চেপে দিতাম, ফলে তার ভেতর থেকে শুধুমাত্র এক হাস্যকর ঘড়ুঘড়ু শব্দমাত্র বার হত। অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ভেতরের কোন সরকারী অনুকম্পানুরাগী বন্দী এ খবরটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতো এবং প্রহরীদের কেউ এসে কবলের তলা থেকে টেনে বার করতো যন্ত্রদানবক আবার আমাদের কানে মধুবর্ষণের উদ্দেশ্যে। যাই হোক, এভাবে কবল চাপা দিয়ে যেটুকু সময়ের জন্য শাসিত পেতাম আমরা, তাই মুহালাত বন্দ মনে করতাম। এ ছাড়া যন্ত্রের দ্বারা আর একটি কার্য সাধিত হত নিঃস্মৃত : আমাদের ভেতর যার যার পালা গড়তো তার পরিদর্শন বাছাইকারের সামনে উপস্থিত হবার জন্য, তাদেরও ডাক পড়তো এই যন্ত্রের দ্বারা। যন্ত্রের ভেতর থেকে নামের বর্ষণ আরম্ভ হওয়ামাত্র আমরা চুপ করে যেতাম এবং ফিস্‌ফিসিয়ে বলতাম, "শোন, শোন, কার গলায় দাঁড়ি পড়বে এবার"। আর্থ-রিভারের বাছাই নির্ধন ছিল বড় শব্দ, এখানে যেদিন যার নাম ডাকা হত, সে রাতে আর বেচারার ঘুম হত না। বাছাইকারেরা, বিশেষ করে বয়োবৃদ্ধ বন্দীদের উপর খেরকম দর্ব্যবহার করতো তাতে আমার খুবই খারাপ লাগতো। এর ভেতর ছিল কিরোরি মটোকু, ওয়ামবুগু, কামুইরু (উপস্থিত কানুর নেয়েরী শাখার কোষাধ্যক্ষ) এবং আমাদের লড়ু ওয়ার শিবিরের গ্রন্থাগারিক ওয়াচিরা কারিগে। কিরোরি খেরকম বর্বরতা, অন্যায় ও দর্ব্যবহার সংক্রান্ত হাতিসমুদ্রে ও ক্ষমাশীলতার সংগে সব কিছু সহ্য করে গিয়েছিল তা আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সে কোনদিনই ভেঙে পড়ে নি এবং সব সময় এতো মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করা সত্ত্বেও আমাদের সদৃশদেশ দিত এবং ধৈর্য ও সংযমের আশ্বাস দিত। এই সময় আমরা খবর পাই যে, নেয়েরীর সরকার নিম্নোক্ত আফ্রিকান জেলা পরিষদ তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার আটশ একর চার-জাতি

নাট্যিক বন্দনতা

অন্যসাথে করেছে এবং ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রায় একরাপছ মাত্র তিনশো শিলিং বরাদ্দ করেছে। খোলা বাজারে ঐরকম ক্ষতির দাম তার দশ গুণেরও বেশি।

রচেষ্টার একদিন হঠাৎ আর্থ-রিভার থেকে অন্য কোথাও বদল হয়ে যায় এবং তার জায়গায় ডেনিস লৌকিন বলে আর একজন ইউরোপীয়ান আসে। লৌকিন আমাকে কোনদিন মারধোর করে নি। বরঞ্চ সে আমার সঙ্গে খুব ভালভাবেই কথাবার্তা বলতো। তার অভিজ্ঞ ছিল প্রত্যেক অন্তরীণকে নিজ নিজ গ্রামীণ এলাকায় বা রিজার্ভে ফেরৎ পাঠান এবং সেখানকার স্থানীয় চীফের হাতে তার পুনর্বাসনের পরবর্তী কর্মসূচী তুলে দেওয়া। আমরা চরমপন্থীরা সে সময় সংখ্যা খুব বেশি ছিলাম না আর্থ-রিভারে এবং আমাদের একটা গতি না হওয়া পর্যন্ত লৌকিন অন্য কোন শিবির থেকে আরও অন্তরীণ সেখানে আনারও বিরুদ্ধে ছিল। তার মতে, আমরা নবাগতদেরও হয়তো বিষয়ে তুলবো চরমপন্থী প্রণালী। এই সব সাতপাট ভেবে লৌকিন ওপরওয়ালার কাছে এই মর্মে সুপারিশ করে যে, আমাকে ওথাইয়া জেলার শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হোক পুনর্বাসনের পূর্ব-বর্তী ধাপ হিসাবে।

১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে, কয়েকদিন কাবাটিনার শিবিরে কাটিয়ে আমি ওথাইয়া পেঁছাই। আমার ভাগ্যে হয়তো আরও দুর্ভোগ লেখা আছে, তা না-হলে এখানকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কেন সেই হবে, যে লডু ওয়ারে বাকস্টনের পরে এসেছিল? ওথাইয়া পেঁছার সঙ্গে সঙ্গেই আমি দেখলাম যে, আবার শত্রুর সামনে পড়েছি; সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। প্রাথমিক পরীক্ষা, নামডাকা ইত্যাদির পরই কর্মচারীরা আমাদের সকলকার দাড়িগোঁফ জোর করে কামিয়ে দেওয়া হয় এবং এত খলা হয় যে প্রত্যেক সপ্তায়ই তার পুনরাবৃত্তি হবে। পরনের জন্য এক প্রস্থ পুরান জামাকাপড় আমরা পাই এবং আমাদের নিজস্ব বলতে যা কিছু ছিল—চটিজুতা, হাতঘড়ি, টাকাপয়সা ইত্যাদি সবই শিবিরের ভাঁড়ারে জমা করে দিতে হয়। ওথাইয়াতে নিজস্ব একটা রুমাল বা পিন্কারো আছে রাখারও অধিকার ছিল না কোন অন্তরীণের। কাপড়জামা বদলানোর পর আমাদের তাঁবুর চারিদিকে জোর কদমে সৈন্য দলের মত নিয়মিত পদক্ষেপে চলতে আদেশ দেওয়া হয়, আর সেই সময় একজন প্রহরী যথেষ্ট মারতে থাকে আমাদের বেতের বাড়ি। সবশেষে আমাদের ছয় নম্বর তাঁবুতে যেতে বলা হয়। এ একটি করে কামিজ ও হাফ-প্যান্ট ছাড়া

আর অন্য কোন কাপড়-জামা দেওয়া হয় নি আমাদের, এমন কি গোঞ্জি বা জাঁগিয়া পর্যন্ত নয়। ওথাইয়া শিবিরটি ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক ভাগে আমাদের একমাস করে থাকার কথা, অর্থাৎ ভাগ্য ভাল হলে ছয় মাস পর ছাড়া পাওয়া যেতে পারে। সে রাতে এই শিবিরের পার্শ্ব-পার্শ্বিক অবস্থার কথা ভেবে, বিশেষ করে আমাদের মনুষ্যত্বের উপর যে অত্যাচার করা হচ্ছে তার কথা চিন্তা করে, আমার মোটেই ঘুম হয় নি।

আমাদের তাঁবুতে এম্বু জেলায় অবস্থিত 'মেওয়া' নামক বিশেষ বন্দি-শিবির থেকে আগত কয়েকজন অন্তরীণও ছিল, তাদের কাছে আমি সেখানকার দুর্বার্ভার ও দুর্ভোগের কথা জানতে পারি। বিশেষ করে নবাগত অন্তরীণদের উপর খুবই খারাপ ব্যবহার করা হত সেখানে, যার ফলে "হোলা"-র শোকাবহ ঘটনা ঘটে কিছদিন পরে। নবাগত চরমপন্থীদের মেওয়ায় আসবার পরই কয়েকটি সরকারী আদেশের সম্মুখীন হতে হত, যাকে নাকি চুলচেরা বিচার করলে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে হবে, কিন্তু অন্তরীণরা এ আদেশগুলি অমান্যই করতো। এক নতুন সরকারী আদেশে বলা হয়েছিল যে, যদি অন্তরীণরা ন্যায়সঙ্গত নিয়মাবলী মেনে চলতে অস্বীকার করে, তবে তাদের উপর "জোর" করা যেতে পারে সেগুলি মানতে বাধ্য করার জন্য। এই 'বাধ্য' করার জন্য একদল ইউরোপীয়ান কর্মচারী ও প্রচুর সংখ্যক আফ্রিকান প্রহরী রাখা হয়েছিল মেওয়া শিবিরে। তারা নবাগত অন্তরীণকে বেশ ভালভাবেই স্বাগত জানাত। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, বাধ্য করার নামে যে সমস্ত দরদার ও ক্রিয়াকলাপের সাহায্য নিত ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, তা ছাপার অক্ষরে লেখা সম্ভব নয়। মনের সমস্ত জোর এইভাবে নষ্ট করার পর অন্তরীণদের "স্বীকারোক্তি" লিখিয়ে নেওয়া হত আরও প্রয়োজনীয় চাপ দিয়ে। তথাকথিত অভিজ্ঞ কর্মচারীরা নাকি মত দিয়েছিলেন যে, চরমপন্থীদের এভাবে পিটিয়ে শাস্তস্তা করা ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না! এই স্বীকারোক্তির মূল্য যে কি, আশা করি অভিজ্ঞ কর্মচারীরা তা জানেন! কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধাচরণের উদ্দেশ্যে যে কি ছিল আমাদের, তার খবর কর্মচারীরা রাখতেন না, সে বিষয় কোন সন্দেহই নেই। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, আমরা সবাই এক-একটি নীতিভ্রষ্ট লম্পট, অমানুষবিশেষ, কিন্তু আসলে আমরা ছিলাম শুধুমাত্র চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং একমাত্র মনুষ্য ছাড়া কতৃপক্ষের জোর করে নেওয়া শত শত স্বীকারোক্তিও আমাদের এই মনো আদর্শ

থেকে টলাতে পারতো না একেবারেই।

এইভাবে নবাগতদের একপ্রস্থ পিটিয়ে 'ঠান্ডা' করার পর মেওয়া শিবিরে তাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা আরম্ভ হত এবং এই কার্যে রত "শিক্ষকরা" একজন-কিছু জেলা-সহায়কের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। তাদের শিক্ষা প্রশালীর ধারা ছিল অদ্ভুত: যেমন অন্তরীণের মাথায় এক বালতি পাথর চাঁপিয়ে তাকে জোর-কদমে হাঁটানো বা এক বিশেষভাবে পাথর ছড়ান পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে হাঁটতে গেড়ে চালানো। আকুলিনো নামে একজন অন্তরীণ এই কষ্ট সহ্য করতে না পেয়ে একদিন থিবা নদীতে বাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রহরীরা তাকে জল থেকে টেনে তোলে। কয়েকদিন পরেই কিন্তু যেচারা তার কুঁড়ঘরে গলায় দাঁড় দিয়ে আত্ম-হত্যা করে এই পাশবিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়।

ওথাইয়া শিবিরে আমরা যে কাজ করতাম, তাতে পরিশ্রম করতে হতো প্রচুর। খুব ভোরেই মাথা গোঁগা শেষ হবার পরই, আমরা শিবির থেকে বেরিয়ে পড়তাম শাবল; গাঁহিত বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে। কখনো আমরা চাষজমি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ঢালু জমি কেটে তাকে থাক থাক করে সাজাতাম এবং নিচের দিকে বঁধি দিতাম জলের প্রবাহের বেগ কমানোর জন্য, আবার কখনও বা স্থানীয় চাষাদের টুকরো টুকরো জমি সরকারী ব্যবস্থায় একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে নতুনভাবে বন্টিত এলাকায় নতুন করে বেড়া দিতাম। এইসব কাজের জন্য আমাদের ক্যাম্প থেকে প্রায় ছয় মাইল দূর অবধি হেঁটে যেতে ও ফিরে আসতে হয়েছে—সারাদিন খাটবার পরও। কাজ যাই হোক না কেন, বেলা চারটের আগে কোন দিনই ছুটি হত না এবং দুপুরে খাওয়া বা বিশ্রামের কোন বন্দোবস্তই ছিল না। একথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে যতগুলি বন্দি-শিবিরে আমি থেকেছি, তার ভেতর এখানকার কাজেই শারীরিক পরিশ্রম ছিল সব থেকে বেশি এবং তার ফলস্বরূপ এখানকার অন্তরীণদের শারীরিক অবস্থাও ছিল সব থেকে খারাপ।

সরকারী ব্যবস্থায় ভূমি একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে ছিল খুবই ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে গলদ দেখা গিয়েছিল। আমাদের প্রাচীন ও ধারাবাহিক নিয়মকানুনের ফলে বেশির ভাগ চাষীর জমিই গ্রামের নানা জায়গায় ছড়িয়েছিল। টুকরো টুকরোভাবে সরকারী প্রয়োজনায় এই সমস্ত টুকরোগুলির মাপ করে প্রত্যেক চাষীর মোট জমির পরিমাপ করা হয়েছিল তারপর, এর এক অংশ স্কুল, হাসপাতাল, যুব-

লাভাধিক স্বত্বস্বত্ব

সমিতি, চা-বাগান বা কৃষির কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ইত্যাদি স্বত্বজনীন কাজের জন্য রেখে দিয়ে বাকি সমস্ত অংশই সেই গ্রামের মানচিত্রে একসঙ্গে আঁকা হয়েছিল এবং আমাদের কাজ ছিল মানচিত্রে দাগ দেওয়া এই সীমারেখাকে মাটিতে কেটে দেওয়া। জমির মালিক লিখিতভাবে এই নতুন বন্দোবস্ত স্বীকার করে নিত এবং একরপিছ দশ শিলিং অন্ডাজ পয়সা দিলে পর তাকে নতুন জমির মালিকানা স্বত্ব স্বীকার করা কাগজ-

পত্র দেওয়া হ'ত। এই দলিলের সাহায্যে তখন চাষী মহাজনের কাছে জমি বাঁধা রেখে খার বা আগাম নিতে পারতো চাষ-বাসের জন্য। কাগজে-কলমে এই সমস্ত ব্যাপার খুব সোজা বা মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর ব্যবহারে ছিল অনেক রকম গলদ ও গোঁজামিল। কার্য-নির্বাহক সমিতির সভ্যরা ছিল সবাই সরকারী পক্ষের লোক, কর্মচারীরা কেনে-দিনই উৎকোচ নিতে স্বেচ্ছা করে নি এবং যেসব অন্তরীণের জমি নিয়ে একতীকরণ

হাচ্ছিল, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় নি। শব্দে তাদের বলে দেওয়া হয়েছিল যে, তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা এ বিষয় দেখাশোনা করবে। তাছাড়া, নব-বিভাজিত উর্বর জমি ভাগের সময় যথেষ্ট প্রিয়-তোষণের নীতি নিয়ে-ছিলেন সরকার। কেনিয়া সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে দেশের এই সংকটকালে জমি একতীকরণের কাজ বিনা স্বেচ্ছায় চালিয়ে দেওয়া যাবে এই-ভাবে জমি একতীকরণের ফলে দেশের

বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বরে কষ্ট পাবেন কেন ?



বিনাকা ফ্লোরাইড ব্যবহার করুন

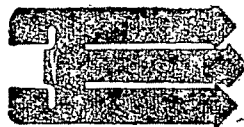
ইহা দন্তক্লয় ও কষ্টদারক ক্ষয়গহ্বরের যত্ননা থেকে বাঁচায়। বিনাকা ফ্লোরাইড আপনার দাঁত সুদৃঢ় করে এবং সুস্থ রাখে। ক্ষয়ের প্রারম্ভেই ইহা দাঁতের এনামেলকে মারিবে তুলতে সাহায্য করে।

ভারতের মধ্যে একমাত্র ফ্লোরাইড টুথপেস্ট হোল-এই বিনাকা ফ্লোরাইড, যাতে সোডিয়াম-মোবো-ক্লোরো-ফসফেট (এস-এম-এফ-পি) আছে এবং ঘার বৈশিষ্ট্য :

১। মুখে ক্ষতিকর এসিড পণ্ডন রোধ করে;

২। দাঁতের এনামেলকে সুদৃঢ় করে

৩। বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বরের প্রতিরোধ করে।



বিনাকা ফ্লোরাইড

দন্তক্লয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয়গহ্বরের প্রতিরোধের

ত্রিবিধ উপায়

UKA-CP-27 BEN

C I B A Cosmetics

খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং একটিও জমির দালদাদি দেখিয়ে চাষীরা মহাজনের কাজ থেকে অপেক্ষাকৃত সুবিধায় টাকা ধার করতে পারবে চাষবাসের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনবার জন্য। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বহু সংখ্যক অন্তরীণই এই জমি একত্রীকরণের ব্যাপারে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তাদের অনেকেই এ ব্যাপারে সরকারী জোরজুলুমের ফলে সরকারের ওপর বিরূপ হয়েছিল।

ওথাইয়াতে তৃতীয় দিনের দিনই আমি অন্য সমস্ত অন্তরীণকে বলে দিচ্ছি যে, আমি একজন শিক্ষিত অন্তরীণ একথা যেন তারা কোন প্রহরী বা কর্মচারীর কাছে প্রকাশ না করে। আমার মতলব ছিল একজন নির্বদ্বিধ লোকের মত ব্যবহার করে তাদের কাছ থেকে কৌশলে ভেতরের খবর বার করে নেওয়া। স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নাম ছিল সলস্বেরী, কিন্তু তার অহেতুক তর্জন-গর্জন করার স্বভাবের জন্য আমরা তাকে 'কারু আলু' নাম দিয়েছিলাম; তার আচার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম গল্পব আমায় কানে এসেছিল ইতিমধ্যেই। আমি সেখানে 'ভাঁড়ের' মত ব্যবহার করতাম ও প্রহরীদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর মত করে সম্বোধন করতাম; যেমন নিম্নতম সামরিক কর্মচারীকে (কর্পোরালকে) আমি সার্জেন্ট বলতাম, সার্জেন্টকে বলতাম ক্যাপ্টেন বা ঐ জাতীয় কিছু। স্বাভাবিক চেষ্টা করার ফলে আমি যে সমস্ত অন্তরীণ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর দপ্তর বাট দেবার কাজ করত, সেই দলে মিশে গিয়েছিলাম ও আস্তে আস্তে সেখানকার হাঁড়ির খবর পেতে আরম্ভ করেছিলাম। ব্যাপার-সাপার দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, কৈনয়ার সপ্তকাকালের প্রথম দিকে সরকার প্রচুর পরিমাণে কাঁটা তার কিনে জমা করেছিলেন ওথাইয়া শিবিরের চারিদিকে ভাল করে ঘেরবার জন্য এবং তার অনেকাংশ সলস্বেরীর বিক্রি করে দিয়েছিল গোপনে; বলা বাহুল্য বিক্রির পয়সা কিছু সরকারী তহবিলে জমা হচ্ছিল না। এ ছাড়া ওথাইয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এবং অন্তরীণদের উপার্জিত পয়সা-কাড়ি নিয়েও কিছু গোলমাল হচ্ছিল বলে আমার সন্দেহ হয়। আর একবার নালিশভরা চিঠি লেখার দরকার হয়ে পড়েছিল এবং জার্মানিকো কিহোরো নামক আমার মানিয়ানির বন্ধু তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বন্দোবস্ত করে দেয়। রবিবার দিন শিবিরের একাধিক আমরা গায়ে দেবার কম্বল ইত্যাদি দিয়ে একটি ছোট তাঁবুর মতো তৈরি কর এবং আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন অন্তরীণকে পাহারায় রেখে আমি চিঠি লেখা শেষ

করি। এক সামান্য চিঠির ক্ষমতা বিশেষ করে যদি তার প্রতিটিটি বিলেতের কয়েকজন রাজনৈতিক গণ্যমান্যকে পাঠান হয়, আমাকে চিরদিনই অবাক করেছে এবং এই চিঠির ফলও খুবই আশাপ্রদ হয়েছিল।

নাইরোবি থেকে এক সরকারী সমিতি চিঠিতে অভিব্যক্তি ঘটনাসমূহের খোঁজ-খবর করতে আসে। ফৌজদারী খোঁজ-খবর দপ্তরের লোকেরা কয়েক মাস ধরে ওয়াইয়ার লোকদের জবানবন্দী গ্রহণ করে এবং যদিচ এক পাকাপোণ্ড মোকদ্দমার সম্ভাবনা ছিল খুবই, তবু দর্যাব্যবহৃত ভারপ্রাপ্ত প্রশাসন কর্মচারীরা শেষ অবধি ব্যাপারটাকে কোঁচিয়ে দিতে সক্ষম হন। ফলে মোকদ্দমা আদালত অবধি নলে পৌঁছয়-ই নি; ১৯৫৫ সালে কৈনয়ার আরক্ষাবাহিনীর মহাধ্যক্ষ কর্নেল ইয়ং কেন হঠাৎ তাঁর চাকরিতে ইস্তাফা দিয়েছিলেন তার একটা কারণ হিসেবে উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করা যেতে পারে। সে সময় কৈনয়ার প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভরে উঠেছিল একদল স্বার্থান্বেষী ও নীচ রাজপুরুষ। যাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে-কোন উপায়েই হোক না কেন, নিজের পকেট ভারী করা এবং তারা যে চোরে চোরে মাসতুত ভাইয়ের মত প্রয়োজনে একে অন্যকে রক্ষা করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! যাই হোক, এ ঘটনার কয়েকদিন পরেই সলস্বেরীকে ওয়াইয়া থেকে বদলি করে নেয়েরী অঞ্চলের দক্ষিণ টেট শিবিরে পাঠাতে মনস্থ করেন সরকার। কিন্তু শেষ অবধি সলস্বেরীর সেখানে কার্যভার গ্রহণ করতেই পারে নি, কারণ তার আগেই তাকে মেওয়া পুনর্বাসন শিবিরের ভার দিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেওয়াতে যে কর্মচারীর যাবার কথা ছিল, সে সেখানকার হালচাল দেখে কার্যভার গ্রহণ করতে অস্বীকার করার তাকে সলস্বেরীর জালগায় দক্ষিণ টেটতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সলস্বেরীর ছিল আকারে ছোট, চটপটে ও তীক্ষ্ণধার, কিন্তু তার সঙ্গে কোন বিষয় "আলোচনা" করা যেত না বা সে কারও অভিমত গ্রহণ করতো না। অন্যান্য কয়েকজন আঞ্চলিক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর মত তার হাতেও দেশের সপ্তকালীন অবস্থার প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, যার সে 'স্বাধীনতার' করতে পেছপা হন নি। কিন্তু তার মনে দয়া-দাক্ষিণ্য বা কোন সদগুণের বড়ই অভাব ছিল। সে এও বুঝতে পারতো না যে, তার অধীনস্থ অন্তরীণরা এই জন্যই তার কর্মতৎপরতার উৎসাহ দেখাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতো সব সময়ই।

কাজ ছেড়ে যাবার কয়েকদিন আগে সে শিবিরের সবাইকে, এমন কি প্রহরীদেরও একত্রিত করে এক গালিগলাজ-পূর্ণ ভাষণ দিয়ে আমাদের মনের জ্বালা কিছুটা আরও বাড়িয়ে দিয়ে যায়। তার ভাষণে সে ঐ চিঠির উল্লেখ করে এবং তারপর আমাকে ডেকে সবার মাঝে দাঁড় করায়। আমাকে উদ্দেশ্য করে সমবেত লোকদের সে বলে, "দেখ এই যে লোকটি, এ হচ্ছে আমাদের কৈনয়া সরকারের পক্ষে এক ভীষণ বিপজ্জনক লোক। আর তোমরা যে যার কুঁড়েঘরে ফিরে যাও, কিন্তু আগামীকাল তোমাদের সকলকার কি হাল হয় দেখতে পাবে।" আমরা দেখতে ঠিকই পেয়েছিলাম, কারণ তার পরদিন আমাদের সবাইকে মহাধ্যক্ষ নডুই নামক স্থানে একটি রাস্তা খোঁড়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সারাদিন কেউ এক মনুষ্যের জন্য দাঁড়িয়ে নিবাস ফেলবার সময় পায় নি; সারাদিন ধরে আমরা মাটি কেটেছিলাম, গাঁহিত্তির হাতল বেয়ে আমাদের গায়ের ঘাম লাল মাটির সঙ্গে গিয়ে মিশেছিল। প্রহরীরাও সেদিন খুব দর্যাবহার করেছিল আমাদের সঙ্গে। অন্তরীণদের কেউ একটা দাঁড়ালি বেরের ঘা এসে পড়ছিল তার গায়ের উপর সপাং করে। তারা কিন্তু আমার গায়ে হাত দেয় নি; আমাকে প্রথমে সবাই গাধা বন্ধি-হীন, ভাঁড় বলে মনে করেছিল এবং আমি যে এরকম একটা নালিশভরা চিঠি উপর-ওয়ালার কাছে লিখতে পারি, তা দেখে তারা বেশ চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল। তাদের ভেতর খুব কম লোকই আসলে সলস্বেরীর ব্যবহারের সমর্থন করতো এবং কয়েকজন আমাকে একথাও বলেছিল যে, সলস্বেরীর বিরুদ্ধে আমার নালিশ তাদেরও সমর্থন আছে, কারণ এই নালিশ-গদাল ছিল যুক্তিসঙ্গত। ঐ রাস্তা খোঁড়ার কাজ এক সপ্তাহ ধরে করতে হয়েছিল, তারপর আমাকে আগুদখীর জেলা-শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমার চলে যাবার পরই রাস্তা তৈরির কাজও বন্ধ হয়ে যায়। সলস্বেরীর আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাকে আর সমস্ত অন্তরীণের কাছে হাস্যকর প্রতিপন্ন করা এবং যদি এরা সরকারী রিপোর্টে যে রকম বলা হয়েছিল, সেই রকমভাবে সত্য-মতাই পুনর্বাসিত হয়ে সরকারের পক্ষে যোগ দিতো, তাহলে আমাকে তারা ঘৃণা করত নিশ্চয়ই। কিন্তু আসলে তারা সবাই আমাকে ভালবাসতো এবং অনুরোধও করেছিল আমাকে তাদের হয়ে নালিশ করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে।

দৃষ্টি পরিকল্পনা

মুন্সিফম দে মরকর

মহারাজের মাতৃবন্দনা

ত্রৈলোক্য মহারাজ জীবনে মহৎ ছিলেন, মৃত্যুতে মহত্তর হলেন। তাঁর মৃত্যু বাংলাদেশের হৃদয় থেকে উৎসারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি বাঙালী কণ্ঠ পরিপূর্ণ করল, কলকাতার আকাশে উদ্ভূত তরঙ্গক্ষেপ ছড়িয়ে পড়ল। ব্যোমপথে একবার কোন ধ্বনি উঠলে তার তরঙ্গ চলতেই থাকে, এই নাক প্রকৃতির নিয়ম। বিদেশী খেমটাভাঙের লাল লেগামে যারা অভ্যস্ত তাদের কানে এ কেমন লেগেছে জানিনে, আমাদের কানে এর স্বাদ নতুনতর হয়ে এসেছে।

এই ধ্বনি যে রক্ত-রাঙা, এ খবর আজকের নেতৃত্বহীন স্ব-সম্প্রদায়ের রাধবার কথা নয়, কেন না, এ তাদের দোষ নয়। বাংলায়ই কি, ভারতেই কি, কোন ইতিহাস নেই; ইতিহাস সম্পর্কে অনীহা নয়, উপেক্ষা আমাদের ঐতিহ্যগত; তারপর অপকর্ম-দুর্কর্ম ঢাকবার জন্য উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিরা যদি রাজদণ্ড পায়, তবে তো কণ্ঠাই নেই।

২৩টি বছর পার হয়ে গেল নাকি আমাদের স্বাধীনতালাভের; যার আর এক নাম ক্ষমতা হস্তান্তর। এতদিনেও আমরা ইতিহাস লিখতে পারলাম না। লিখতে পারলে এবার 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে কি ছিল জানতে পারত, 'বন্দে মাতরম্' পারত আকৈশোর ও আমরণ বিপ্লবী 'মহারাজ' ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে উপলক্ষ্য করে হঠাৎ কুলপ্রবী জনস্রোতে পূর্ণকণ্ঠ এই ধ্বনি উঠল কেন।

একালের দোষ নেই, যে অজ্ঞান তার অপরাধ নেই। ত্রৈলোক্য মহারাজকে উপলক্ষ্য করে সব ধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠল কেন 'বন্দে মাতরম্', বিজাতীয় চিন্তায় লক্ষ্যহীন আমরা তাদেরকে সশ্রদ্ধ ভৎসনায় ব্যাধিয়ে দেবে কে? বিপথ-

চালিত রিজার্ভের চারদিকে এলোপাখাড়ি আঘাত করতে থাকায় আজ এতদিন পর মনোবী ক্ষতিপূজার উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে। পারিস্কার বোমা বাম, ফড়দের উপেক্ষায়ই এসব অপকণ্ড ঘটছে। নইলে প্রতিদিন ভোরবেলা র‍্যোডও খুলেই এই ধ্বনিটি উচ্চারিত হয়; কিন্তু প্রতিদিনকার র‍্যুটিন কাজে এ যেন তার অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। ওতে কোন প্রাণ নেই। হঠাৎ তাতে প্রাণোৎসারিত করে দিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজ; তাঁর নিঃপ্রাণ দেহের প্রাণ যেন ছড়িয়ে পড়ল তাঁর নম্বরদেহ-বাহকদের মধ্যে, তারই বিদ্যুৎ স্পর্শ জাগল প্রাণে প্রাণে।

কিন্তু অসুখ নয়। ত্রৈলোক্য মহারাজ পাকিস্থানের নাগরিক। বন্দে মাতরম্ সেখানে জাতীয় সঙ্গীত নয়। হতেও পারে না। যে সম্প্রদায় আলারা রাজ্য গড়বার জন্য লাড়ল, তাদের এ সঙ্গীতে ছিল ঘোর আপাত্তি, মতবিরোধ ধ্বনিতেও। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জোড়াতালিতে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের মত এই ধ্বনি আল্লাহ্ আকবরের সঙ্গে চলেছে বটে, কিন্তু সখ্য হয় নি কখনো। শব্দ যে অপৌজলিক একেশ্বরবাদীরাই আপত্তি করেছেন, সংঘাত ঘটিয়েছেন তাই নয়, নিরীশ্বরবাদী ভাববাদীরাও তাঁদের সঙ্গ দিয়েছেন। এককালের একটা সভাকারের মাতৃভূমির বন্দনার ধ্বনি, বিপ্লবী জেদের ধ্বনি, রণধ্বনি, কলঙ্কে বিচিত্র অর্থহীন ধ্বনিতে ধ্বনিতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। রেন্ডেও অনেক ভবিষ্য-ভদারকের পব এ সঙ্গীত ও ধ্বনি অর্থাৎ পেয়েছে।

যাঁরা আনন্দমঠের সঙ্গে জড়িয়ে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে পর্বত বজ্র করেন তাঁরা যেমন ইতিহাস জানেন না, তাঁদের উপলক্ষ্যের গভীরতাও তেমনী আকর্ষণশক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতটি লিখেছিলেন আনন্দমঠ লেখার অনেক

আগে। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায় লেখা এ গানটি আনন্দমঠে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সেখানে নিশ্চয়ই তার একটি বিশেষ অর্থ বা পারিপার্শ্ব বা পটভূমিকা সংযোজিত হয়েছে। এ গান বা সঙ্গীত বঙ্কিমের জীবদ্দশায় কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে রণহুৎকার হিসেবে উচ্চারিত হয় নি, ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলনের সময় নয়, ১৮৮৮ পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মামলাকালেও নয়। বণভাঙ প্রতিরোধের আন্দোলন যখন দানা বেঁধে ওঠে তখন এই সঙ্গীত ও ধ্বনি বহুজনের মধ্যে প্রসার লাভ করে।

যাঁরা বলেন আনন্দমঠই সেকালের বিপ্লববাদীদের (তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদের) অনুপ্রাণিত করেছে, তাঁরা পুরো কথা বলেন না বা জানেন না। বহু গ্রন্থের মধ্যে আনন্দমঠও গীতার মতই বিপ্লবীদের সমাদরবস্তু ছিল বটে, কিন্তু সে তাঁদের ভাষা মত। নতুবা আনন্দমঠের কাহিনীতে যাই থাক অথবা কোন কোন ধর্ম্মধ একে সাম্প্রদায়িক বলগেও, আসল কথা আসল উদ্দেশ্য তাঁদের দৃষ্টি এঁড়িয়ে গেছে।

প্রাণ তুচ্ছ, সবাই দিতে পারে, চাই ভক্তি-দেশভক্তি, এই হচ্ছে আনন্দমঠের প্রথম কথা। ১৯০৫-৮ এবং তার পরবর্তী 'বিপ্লবীরা' (১৯০৪ অবধি) এই দেশভক্তির পাঠই নিয়েছিলেন, ওকত কতখানি সাম্প্রদায়িকতা, কতখানি রাজানুগত্য আছে তা বিচার করেন নি। ঐ থেকে আর আহরণ করেছেন সন্তান-জীবন। দারাপত্র পরিবার ছেড়ে দেশের জন্য অকুতোভয়ে আত্মনিবেদন।

ত্রৈলোক্য মহারাজের জীবনে এইটি সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল বলেই তো তাঁর মরদেহবাহকদের মধ্যে সেই সত্যটি স্বকপ-কালের জন্য হলেও বিদ্যুৎ প্রবাহের মত সঞ্চারিত হয়েছিল। ত্রৈলোক্য মহারাজের

জীবন কৃষ্ণসাধনে অভ্যস্ত ঐ সন্তানেরই জীবন, গাটার নিন্দাপন্থ, নির্লিপ্ত জীবন।

ত্রৈলোক্য মহারাজের যখন স্বদেশী স্বীকৃতি হয়, তখন সন্তানের কাছে মায়ের দাঁবি ছিল। মন্ত্রগদ্যগুণিত তো সামান্য কথা, জীবনকে আদর্শোপযোগী করে গড়ে তুলতে হয়। কবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে তখন আমি সাম্যবাদী হব, আজ বুদ্ধোন্মাদজীবনের সকল স্বাচ্ছন্দ্য ভারতম্য ভোগ করব, এমন আদর্শনিষ্ঠ তিনি ছিলেন না, যখন মায়ের কাছে মায়ের নামে দিয়েছেন তখন সব দিয়েছেন। কিন্তু রাখেন নি নিজের জন্য, নিজের বলে। আজই এই মন্তব্যে এই হৃৎসর্বস্বা মায়ের হৃৎসর্বস্ব সন্তান হতে হবে, একমাত্র থাকবে ভক্তি। হ্যাঁ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আন্তর্জাতিকতায় আত্মবিস্তার।

সংপ্রদায় বিশেষ মনে করেছিল বন্দে মাতরম্ সংগীত বা ধ্বনি ঠুনকো পেয়ালার মতো তাঁর একেশ্বরবাদী বিশ্বাসকে ভেঙে দিয়ে পৌত্তলিকতার ভঙ্গভঙ্গতার পরিণত করবে। কিন্তু ইংরেজরা বুঝেছিল ঠিকই। প্রথমে হাস্যকর এই ধারণা হয়েছিল, বন্দে মাতরম্ অর্থ বৈধে মারো—এবং ইংরাজকে। পরে, তরুণদের বৈজ্ঞানিকভিত্তি করে বুদ্ধল, ওটা ওদের জেদ, রণহংসকার, কিছুতেই মানব না, মানব না। দেশের মাটির কাছে ওরা মাথা নোয়াবে আর কারও কাছে নয়। বরিশালে মনোরঞ্জন গৃহঠাকুরতার মাথা ফাটিয়ে বা সূর্যশীলকে বেত মেরে অথবা ক্ষুদ্রিরামকে ফাঁসী দিয়ে বুদ্ধল, আনন্দমঠ-বিচ্ছিন্ন, উপন্যাস-বিচ্ছিন্ন, সংগীত-বিচ্ছিন্ন এই মাতৃবন্দনার ধ্বনি তাদের রণধ্বনিও বটে। তাই তারা ছুটল চারদিকে এই শব্দটাকে স্তব্ধ করে দিতে।

বাংলাদেশের সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় একদিকে অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা, অপরদিকে নির্মম-নিষ্ঠুর পীড়নের, লোভাতুর স্বার্থান্ধদের শাসকপক্ষ-সখ্যতার সংবাদ রয়েছে বিস্তারিত। ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য উৎসুক কিশোরেরাও তা খুঁজে পাবে। পরিণত বয়স্কেরা তার তাৎপর্যও খুঁজে পাবেন। দেখবেন, বিপ্লবীরা এই ধ্বনিটির কনোটেশন—তাৎপর্যই দিয়েছেন বদলে। তাঁদের আত্মত্যাগে স্বার্থত্যাগে এর অর্থ হয়েছে বিকশিত প্রস্ফুটিত—যা কুণ্ডিতে ছিল আবৃত।

ত্রৈলোক্য মহারাজ তাঁদেরই অন্যতম। এবং আদর্শ নিষ্ঠা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বল্পায়ু, অনেক ক্ষেত্রে মহত্বের চড়োয় উঠেও পড়ে যেতে দেখা গেছে কাউকে কাউকে, দর্দান্ত দঃসাহসী কাজের পর

পরবর্তী জীবনে আপন প্রাণ বাটার রীতি অনুসরণ করতেও দেখা গেছে, নয় তো আকস্মিক কোন লোভে পতন ঘটেছে। বিপ্লবীদের সকলেরই ক্ষুদ্রিরামের মত ১৮ বছর বয়সে ফাঁসীর রজ্জু চূষনের সৌভাগ্য থাকলে ভাল হত, তাহলে দীর্ঘকাল বেঁচে পতনের বিড়ম্বনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন সকলেই; একটা মন্ত্রিস্ব কি পদাধিকারের জন্য রসলোলুপ হয়ে ওঠবার দরভাগ্য ঘটত না। কিন্তু দীর্ঘকাল বেঁচেও রইলাম, আদর্শ থেকে বিদূষিত মাত্র স্থলিত হলাম না, আকৈশোর আমরণ মাতৃচরণ বন্দনার অচঞ্চল রইলাম, এ দৃষ্টান্ত বিরল এবং সে অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত ত্রৈলোক্য মহারাজ।

কেমন মানবমিতি? আমি তাঁকে অতি কাছে থেকে দেখবার অবকাশ পেয়েছি। আমার তারুণ্যে যে অনুসন্ধানবাস ছিল সাহিত্যের তপোবনে তার খোঁজ চলছিল, তখন আনন্দমঠই শৃঙ্খল নয়, বহু হারাকাহিনী বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছিল। গোয়ালি যখন গিলে চলোঁছ, তখন কলেজেরই এক ছাত্রের শ্যোনদৃষ্টি পড়ল এই শুল্ক ছাত্রটির ওপর। সে-ই কোন এক অবসরে আমার হাতে চালান দিয়েছিল সিঁড়িশান কমিটি রিপোর্ট। নতুন শেলটের মত নতুন আখরে চিহ্নিত হবার মত এরও দাগ পড়ল মোটা রকমের। আমার অজ্ঞাতেই আমি যখন বেশ জড়িয়ে গেছি এবং যখন হার পরতে গেলে লাগে এবং ছিঁড়তে গেলে বাজে, তখন জানলাম ছেলোট অনুশীলন সমিতির, গদ্য বিপ্লববাদী দলের, সতরাং, ন্যায়শাস্ত্রমত আমিও ঐ সমিতির, ঐ দলেরই।

আমার জন্মস্থান কোচবিহার ছিল দেশীয় রাজ্য, করদ রাজ্য, আমরা বলতাম স্বাধীন রাজ্য। স্বাধীন রাজ্যের দেশ। সে রাজ্যের সঙ্গে আমার বিরোধ ছিল না; আমার বিরোধ ঘটিছিল ওর সীমানা ডিঙিয়ে ব্রিটিশ রাজ্যের সঙ্গে, ইংরেজ—ইংরেজ বিদেশী শাসক। এই শাসনের উচ্ছেদ এবং এজন্য গদ্য সমিতির সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অলক্ষ্য ষড়যন্ত্র। সব চূপে চূপে নির্বাক হয়ে। সম্ভবত, দেশীয় রাজ্যের সন্দেহভাজন হিসেবে অথবা অন্য কোন কারণে ঐ কলেজের ছেলোট শহর ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু সে যোগসূত্র রেখে গেছে। তাই ধরে ছিলাম।

ঐ রোমাঞ্চে একদিন আমাকেও ধরতে হল সন্ন্যাসের পথ এবং নিঃসম্বল কপর্দক-হীন, কিন্তু অজ্ঞাত প্রেরণাতাড়িত আমি ঘূর্ণাবর্তে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় আসি। এর নাম কি কৃষ্ণসাধন? বিপ্লবী হবার প্রস্তুতি? সাটল ককের মতো নানা ঘটনাক্রম বিক্ষিপ্ত

হুতে হুতে একদিন দেখা পাই মহারাজেরও! আমাদের বরসের পার্থক্য ২০।২১ বছরের কম নয়।

বঙ্গমতী সাহিত্য মন্দিরের পেছনে আছে এক বাড়ি। ১৬৪ নং। দোতলায় মস্ত বড় ঘর। আজ সব টোপোগ্রাফ মনের দৃষ্টিতে আবছা হয়ে গেছে, কয়েকটি মানুষ অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। বড় ঘরটায় অনেক সময় থাকত একটা মস্ত বড় সতরঞ্জি বিছানো, হয়তো বা তারই ওপর বা তার বাইরে কারও কারও ব্যক্তিগত বিছানো গুটোনো। এটা ছিল অনুশীলন সমিতির তখনকার বড় দাদাদের আনাগোনার কেন্দ্র, আড্ডা, কিন্তু সবই চূপিসারে। গম্ভীর প্রকৃতির প্রতুল গাঙ্গুলী, ভারী চালের রাব সেন, কথা না কইলে কথা বলতাম না। কোন-কিছু সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ করা ছিল রীতি বিরুদ্ধ। ভয়ে সেকোচে যথাসম্ভব চূপ-চাপই থাকতাম।

অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল না আমার, বলতে গেলে এক বস্ত্রই; আর ওটি ছিল কেদারেশ্বর সেনগুপ্তের ঢালাও হোটেল, অমৃত-স্বাদে দু'বেলা ভাত খেতাম পেট পূরে। অসাধারণ মানুষ ছিলেন এই কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত। কি একটা তুলোর দালালি ছিল বোসের সঙ্গে। সর্বস্ব ঢেলে দিতেন পার্টি হিতায়। মহারাজের মত ও'রও নিজের বলে কিছু ছিল না। বেশির ভাগ সময় ও'কে পেতাম। রূপ-তায়ও তিনি ছিলেন অসাধারণ, কঙ্কাল, কিন্তু এমন মেধা দীর্ঘ নি খুব বেশি। লেখাপড়া চিঠি চাপাটির রেওয়াজ ছিল না গদ্য সমিতিতে; কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত ছিলেন জীবন্ত কম্পিউটার; যার যা আছে সব বলে যেতেন কেদারদাকে, আশ্চর্য, যথাস্থানে যথা সময়ে নিবেদন করে দিতেন সে কথা। আমার সঙ্গে কথা হত অনেক, তর্কের সময় ধমকে ধমকে কথা বলতেন, কিন্তু স্নেহসিক্ত; পরবর্তীকালে সিউড়ী জেলেও ছিলাম এক ঘরে রাজবন্দী হিসেবে, রিকুইজিসান নিজের জন্য করতেন না। করতেন আমার জন্য। কি চাই তোমার? এমন মানুষের তদারকে ছিল ঐ মেস, সমিতির কেন্দ্রীয় আড্ডা। এমনি একটি সর্বভাগী মানুষের দিকে যখন অপলক চেয়ে চলোঁছ, তখন এরই জোড়া যে থাকতে পারে, কিন্তু দেহে বলিষ্ঠতর ও কাজে বেপরোয়া, জানলাম মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে যখন এখানেই দেখা হল, প্রথম বার, তারপর বার বার। সেকালে বাজেয়াপ্ত, আজ নিশ্চিহ্ন, আমার জীবনের প্রথম ছাপা বই “বিপ্লব পক্ষে ভারত” তখন বেরিয়েছে, কেদারদাই তা শাখায় শাখায় বিলি-বন্দোবস্ত করেছেন, ধমক দিয়ে দাম আদায় করেছেন। সবাই

গাথাবিক বসুমতী

খুব খুশি; মহারাজ যেনা করুক তাতেই খুশি। আমি হাওয়ায় উড়ছি আর "ফাসীর আশীর্বাদ" পান্ডুলিপি তৈরি করছি। রবিদা (রবি সেন) কৈদারদার প্রামাণ্যক্রমে ঠিক করেছিলেন বইটা ও'রাই ছাপবেন, 'জবাব বদলে ছিল শির' নামে তিনরঙা রকটাও করিয়েছেন বৌবাজারে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীদের ওখান থেকে; তারপর অবশ্য ওটা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে রজবিহারী বর্মণ ছেপে বের করে। ওঁদের কাছে আমার আদর বেড়ে গেছিল, মহারাজের অপরিমেয় স্নেহের স্পর্শ পেতাম, হাসি ছাড়া খুশি ছাড়া কথা বলতেই যেন পারতেন না, কেমন শিশু-মুগ্ধ। এমন সময় "ফাসীর আশীর্বাদ" বাজ্যোপ্তির এবং প্রকাশক রজবিহারী বর্মণের গ্রেপ্তারের খবর প্রসঙ্গে বেরোলো গ্রন্থকার পলাতক। আমি তখন এই ১৬৪ নং-এ; রবিদা বললেন, পচা শামুকে পা কাটলে বদ্বি। অর্থাৎ আরও বড় কাজের আগেই ধরা পড়লাম বদ্বি। নাঃ, আমি চালান হয়ে গেলাম আসামে।

সময়ের কিছু হেরফের হতে পারে। শ্রেষ্ঠরাজ্যের বোমা সম্পর্কে ধরা পড়া ব্যাপারটাও সমসাময়িক। অনুশীলন সীমিতের মেজদারা নাকি কেউ কেউ বিদ্রোহ করেছেন, বিনা অনুমোদনে অনুমতিতে অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছেন। যারা করেন নি, তাঁরা এসে আনুগত্য জানাতে লাগলেন! আমি মেজদা নই ছোড়দাও নই, একেবারে রংরুট, কিন্তু "লেখক" তো বাঁচি, তাই আমাকেও জেরায় পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য লেগেছিল যখন "মহারাজের" কথাটাও উঠেছিল। সম্ভবত এই কারণে যে, তিনি বড়দের চাইতে ছোটদের সঙ্গেই মিশতে পছন্দ করতেন বেশি এবং ছোটরাও তাঁকে গেলে তাঁকে ঘিরে বসত। বাইরের চামড়া কংকাল সব কিছু ভেদ করে গুঁর হৃদয়টাকে স্পষ্ট দেখতে পেতাম। মাঝে কদিন ছিলেনও না মহারাজ ওই হট্ট-গোলের সময়; একদিন যখন এলেন, তখন বড়দাদাদের চাপা কথা চলেছিল তাঁদের সঙ্গে, সম্ভবত তাইতেই সংশয় নিরসন হয়েছিল। মহারাজ সর্বদাই ছিলেন এ্যাকসানের পক্ষপাতী। তাইতেই সন্দেহ। কেউ কিছু করতে চাইলে খুশি হতেন, তাই গুঁকে নিয়ে ছিল বড়দের ভাবনা।

তারপর কোথায় নানা ঘটনাচক্রে সঙ্গ হারিয়ে ফেলিছ; দলও কেমন বিলীন হয়ে গেছে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে গেল; দুর্লভ্য প্রাচীর উঠল মাঝখানে। তবু শুনলাম, মহারাজের পথ-চলা শেষ হয় নি; আত্মনিবেদিতপ্রাণ চলেছেন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে এবং ইংরাজের জেলেও যেমন, আয়ুর্বের জেলেও তেমন জীবন কাটছে। একবার কৈদারেশ্বর সেনগুপ্ত

এসেছিলেন পাকিস্থান ছেড়ে; তিনি আজ নেই। আবার হঠাৎ এলেন মহারাজ গোলোক চক্রবর্তী। আমি তখন স্নরকমে ছোট হয়ে গছি তাঁর জীবনের মাঝে। তবু—

আসছেন শুনাই আমার বৈয়াক সাংসারিক মন, রাজনীতি-বিচ্ছিন্ন কোটি কোটির মত সাধারণ আমার এই মনেও একটা অব্যক্ত ব্যঞ্জনা জাগল। ছুটে যাই নি অবশ্য সীমান্তে, ইচ্ছে থাকলেও সাধ্য ছিল না; কিন্তু প্রথম সন্মোগেই দেখা করলাম।

আশ্চর্য! ঐ ভীড় কোলাহলের মধ্যেও এই সন্মুখের বিচ্ছিন্ন অতীতকে চিনলেন। বিপ্লবী নেত্রী লীলা রায়ের শোকসভায় মহাজাতি সদনে গুটি গুটি লাঠি আর সঙ্গী ভর করে যখন মগে উঠছেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম, নাম বললাম। সগে সগে আনন্দে আমার নামটা বার দুই পুনরাবৃত্তি করলেন। মুগ্ধরা হাসি।

তারপর গেলাম শাদবপুর্ন, যেখানে তাঁর অস্থায়ী শিবির পড়েছিল। লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। খেতে খেতে দুটো বেজে গেছিল; বিশ্রাম করতে না-করতেই আমরা হাজির ছিলাম; আমার এককালের এক বন্ধুও হাজির ছিল। একটা এনগেজমেন্ট আগেই করা ছিল কয়েকজনের সঙ্গে। তার ওপর এসে দাঁড়াল গাড়ি, জ্ঞান মজুমদার অসুস্থ, তাঁকে দেখতে যানেন। নিজের অসুস্থতার কথা মনেও নেই; সবাইকে দেখে বেড়াচ্ছেন।

ওরই মধ্যে বললেন, বল। বললাম। বললেন, নিশ্চয়ই। দিল্লী থেকে ফিরে এসে বসব তোমার সঙ্গে।

কথা হয়েছিল, তিনি তাঁর দেখা-শুনার অভিজ্ঞতা ধারণা বলে যাবেন, আমি লিখে যাব। পাকা কথা।

তারপর আবার দেখা এন্ডরুজ স্কুল ভবনে তাঁর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে। প্রাণের আবেগে যা বলবার বললেন। যখন ফিরছেন গাড়িতে, মুখ ব্যাডিয়েছিল। বললেন, মনে আছে, দিল্লী থেকে ফিরে।

সকালবেলা বস্ত্রপাত। রেডিও সংবাদ, ছোট মেয়ে এসে বলল। কম্পনাও করি নি। যে-মানুষ এই বয়সে হার্টের রোগ নিয়ে অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠানে যাচ্ছে, সে এমন অকস্মাৎ নিভে যেতে পারে? মনে হয়েছিল অপরিমেয় শক্তির। নিঃসন্দেহ, কিন্তু দেহ আর বইতে পারাছিল না অত বড় হৃদয়কে। শারীরিক হার্টফেল কবেছে, কিন্তু হৃদয় ছিল অপরািজিত। তাই তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সকলের গৃহকোণে, সঙ্কীর্ণাদারী ছাড়া সকলের প্রাণে প্রাণে। তিনি কি, তাঁর প্রমাণ দিয়ে গেলেন যেন মৃত্যুতে।

হয়তো পাকিস্থানের শাসকশ্রেণী নিম্নবাস ফেলে বেঁচেছেন এই অমর বিপ্লবীর শেষ নিম্নবাস ত্যাগে, কিন্তু বাংলার সৌভাগ্য তিনি প্রাণ দিয়ে গেলেন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে এবং পুতাস্থি দিলেন পশ্চিমবংগকে। তাই তো সেই বহুদিন বিস্মৃত 'বন্দে মাতরম্' কলকাতার আকাশকে প্রতিধ্বনিত করে তুলল। বন্দনা করি দেশকে। রুশিয়াকে যদি ভালবাসি তো সে রুশদের দেশাত্মবোধের জন্যই, চীনকে যদি ভালবাসি সে তাদের স্বাদেশিকতার জন্য, ইংলন্ডকে যদি ভালবাসি সে তাদের দেশপ্রেমের জন্য, আমার দেশকেও লোকে ভালবাসবে আমরা যদি নিজেরা দেশকে ভালবাসি। আন্তর্জাতিকতা ফাঁকা শব্দ মাত্র, যেখানে জাতি, জাতীয়তা, দেশপ্রেম নেই। মহারাজ মৃত্যুতে পশ্চিমবংগবাসীকে এই মৌলিক সত্যকে উপহার দিয়ে গেলেন; তাই না অকস্মাৎ বন্দে মাতরম্ ধ্বনিত আকাশ পরিপূরিত হয়েছে। মহারাজের মহৎ জীবন তাই মহত্তর হয়ে উঠেছে মৃত্যুতে। ভারতকে পশ্চিমবাংলাকে এই তাঁর উপহার। তিনি মরণে আমাদের দেশ-মাতৃকার বন্দনাকে অবশ্য-কর্তব্য বলে স্মরণ করিয়ে দিলেন—তা ভারতই কি, পাকিস্থানই কি, দেশপ্রেম আজও মানুষের নিম্নবাস-প্রবাস, আজও ভৌগোলিক সীমানাগুলো অতন্দ্র প্রহরীরক্ষিত এবং দেশপ্রেমই দিতে পারে আত্মস্বার্থমুগ্ধ দেশসেবা লোকসেবার অধিকার।

মহারাজের জীবনে এ ছাড়া দ্বিতীয় কথা নেই। কারাপ্রাচীর তাঁকে আবদ্ধ করতে পারে নি, সীমানা তাঁর পথ আগলে দাঁড়াতে পারে নি; দেশপ্রেমই আত্মবিচ্ছিন্ন অথচ আত্মগত সকল মানুষকে ভালবাসতে শেখাতে পারে, বিন্দুমানবিকতার মূলে শেকড়টা ঐ দেশপ্রেমের চেতনায়। আন্তর্জাতিকতার সীমাহীনতা ওরই ভেতর বিস্তারিত।

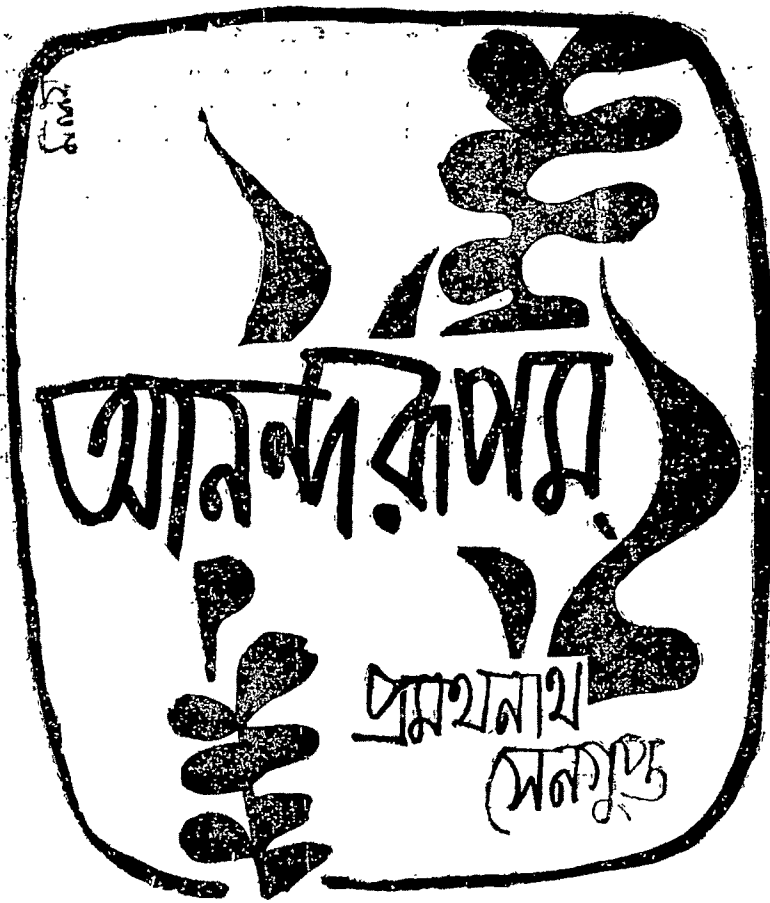
পাকিস্থানের নাগরিক মহাধাজের ভারতে দেহরক্ষা এই সত্যটাকেই দাগিয়ে দিয়ে গেছে। বন্দে মাতরম্ হচ্ছে সেই মৌল সত্য।

কুন্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র গুরুকাণ্ড। কবিব জীবনী-সম্বলিত)
আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অরব্য। পদানুসারে। বাঙ্গলসংস্করণ। সচিত্র। রেকসিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১১)

শান্তিনিকেতনের গোড়ার কথা নিয়ে গুরুদেব একদিন আলোচনা করছিলেন। অনেকদিন থেকেই মনে একটা বিশেষ আকাংক্ষা ছিল ঠিক মত থেকে শুনেন নব বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার মূল ভাব ও সংকল্পটি কখন কী করে ঠিক মনে উদয় হয়েছিল, অর্থাৎ এর আরম্ভ কী করেছিলো, আর ধীরে ধীরে এর পরিণতি কীভাবে হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সেই পরম সন্যোগ সৌন্দর্য উপস্থিত—কথাটা ঠিক কাছের নিবেদন করলাম। বললেন,—“এতো একদিনে বলার কথা নয়, আর শুধু শোনার কথাও নয়। এর প্রাপের স্পন্দন যে অনুভব করে তারই কাছে এর মূল্য। কোনো জিনিসের শূন্য কী করে হয় বলা যায় না; বিশ্বভারতী সম্বন্ধেও এই কথাটা খাটে। এর আরম্ভকালটি রহস্যে আবৃত। এর সংকল্পটি কোনো একটি বিশেষ সময়ে আমার মনে ভেবেচিন্তে উদয় হয়েছে তা নয়। এই সংকল্পের বীজ আমার মন-চৈতন্যের মধ্যে নিহিত ছিল, ধীরে ধীরে তা অগোচরে অঙ্কুরিত হয়ে জেগে উঠেছে। বাল্যকাল থেকে যে-জীবন আমি

অভিভাবিত করে এসেছি তার ভিতর থেকেই বিশ্বভারতীর আদর্শটি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষার প্রকৃত ক্ষেত্র সেখানে, যেখানে বিদ্যার উদ্ভাবন চলছে; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত্যা কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাদান করা। বিদ্যার বিস্তৃত ক্ষেত্রে সে সব মনুষ্যকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে, যাঁরা নিজের শক্তি ও সাধনায় অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কাজে নিবিষ্ট রয়েছেন। তাঁরা যেখানেই মিলিত হবেন সেখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হবে, সেই উৎস-ধারার নিষ্করণীতেই দেশের সত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হবে। বিদেশী বিদ্যালয়ের নকল করে হবে না। দেশের শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবন-যাত্রার যোগ স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশের মাটিকে আশ্রয় করে নেই, তারা পরগাজার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় লম্বমান। ভারতবর্ষে যদি আদর্শ বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহলে গোড়া থেকেই সে তার অর্থবিদ্যা, তার কৃষিকৃত্ত, তার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠানের নিষ্করণী পঞ্জীর মধ্যে প্রয়োগ করে দেশের জীবন-

ব্যায়র কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াবে। এই আদর্শ বিদ্যালয়তনকে আমি বিশ্বভারতী নাম দেবার সংকল্প করেছিলাম। এর আরম্ভকালের অবস্থাটা তোমরা অনেকেই দেখে নি। তখন আর যাই হোক, এর মধ্যে ইস্কুলের গন্ধ ছিল না বললেই চলে। এখানে যে-আহবানটি সবচেয়ে বড়ো ছিল সে হচ্ছে বিশ্বপ্রকৃতির আহবান, ইস্কুল-মাস্টারের আহবান নয়। ছাত্রদের সঙ্গে তখন বেতনের কোনো সম্বন্ধ ছিল না, এমন কি বিছানা তৈজসপত্র সমস্ত আমাদের জোগাতে হতো। কিন্তু বর্তমানে এতো উজান-পথে চলা সম্ভব নয়, তাই এই শিক্ষায়তনের অন্তর্গত-প্রকৃতি তখনকার চেয়ে এখন অনেক বদলেছে। কিন্তু তা হলেও সেই মূল জিনিসটা আছে। এই আগ্রহে ছেলেমেয়েরা যত দূর সম্ভব মস্তিষ্ক স্বাধীন পায়, বাহ্য মস্তিষ্ক লীলাক্ষেত্র হচ্ছে। বিশ্বপ্রকৃতি, সেই ক্ষেত্র এখানে প্রশস্ত।

পরিণত বিদ্যুৎশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটি সংকল্পের উদয় হয়েছিল—টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয়, অন্য সকল শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল-আশ্রয় স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপর অন্য সকল শিক্ষার প্রচলন করলে তবেই শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটিকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এই সংকল্পটিকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নানা বাধার তখন তিনি তা পারেন নি। এই অধাবসায়ের টানে কিছুদিন তিনি আগ্রহ ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে আবার আগ্রহে আহবান করে আনা গেল, তাঁকে এবার ক্লাস পড়ানো থেকে নিষ্কৃতি দিলুম। তিনি ভাষা-তত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হলো, এইরকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্য। যাঁরা সত্য-কারের শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এইরকম বিদ্যার সাধকদের চারদিকে সমবেত হন তা হলে তো ভালোই, আর যদি না হন তাহলেও এই যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না। কথার মানে ও বিদেশের বাঁধা বুলি গুরুদেব করিয়ে ছেলেদের তোতাপাখি কবে তোলার চেয়ে এ অনেক ভালো। এমন করেই কাজ শুরুর হলো, এই আমাদের “বিশ্বভারতীর” প্রথম বীজ বপন। তখন সহায়ক হিসেবে পাই কয়েকজন কর্মীকে—ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, কর্ণি সত্যশচন্দ্র, লগদানন্দ রায়, কার্ল মোহন ঘোষ। এঁরা তখন একটি ভাবের ঐক্যে মিলিত ছিলেন, তখন হাওয়া ছিল অন্যরকম।

৪০/৫০ লক্ষ টাকা ফাঁড়িরে নিচে

বিশ্ববিদ্যালয় পুস্তক করার সাধ্য আমাদের ছিল না, সেজন্য হতাশও হই নি। আমাদের সাধনায় সত্যবস্তু ছিল বলে উপকরণের অভাবে কিছু ক্ষতি হয় নি। আমাদের শিশু বিদ্যালয়ের আসনগুলি কিছুদিনের মধ্যেই ভরে উঠল। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃতভাষা ও শাস্ত্র অধ্যাপনার জন্য বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী মহাশয় একটিতে বসেছেন, আর একটিতে ছিলেন সিংহলের মহাশয়, ক্ষতিমোহনবাবু আর একটিতে, আর ছিলেন ভীমশাস্ত্রী মহাশয়। অন্যদিকে এংলোজের চারিদিকে ইংরেজি-সাহিত্যপাঠসূত্র সমবেত হলেন। ভীমশাস্ত্রী ও দিনেন্দ্রনাথ ভার নিলেন সংগীত অধ্যাপনার, আর বিষ্ণুপুরের নকুলেশ্বর গোস্বামী তাঁর সুবাহার নিয়ে যোগ দিলেন। তারপর এলেন নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর চিরাবিদ্যা শিক্ষা দিতে। তারপর ধীরে ধীরে এসেছেন আরো অনেক কৃতাভিযা অধ্যাপক ও কর্মী। আমার সঙ্গে যারা এখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেছিলেন, এখানকার আদর্শের মধ্যে যারা ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ পরলোকে। পরবর্তী যারা এসেছেন, তাঁদের শিক্ষকতার আদর্শ, দূর থেকে ছাত্রদের পরিচালনা করা, এটা আমার সময় ছিল না। এরকম করে দূরত্ব রেখে অন্তঃকরণকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব নয়। এতে হয়তো দক্ষ পরিচালনা হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে। একটা কথা মনে পড়ে গেল—পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে আমি প্রথম কাজ শুরু করেছিলাম, আমার নিজের বেশি বিদ্যা ছিল না, কিন্তু যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের মানব করার চেষ্টা করছি। এক সময়ে অনাভিজ্ঞতার খেদে মনে হলো যে একজন হেডমাস্টারের নেহাৎ দরকার। একজন বললেন, 'অমুক ভদ্রলোক একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাসের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাস হয়ে গেছে।' তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখে-শুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চোঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়ায়, এতো ভালো না।' আমি বললাম, 'দেখুন, আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না, এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে, তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা।' আমার মতিগতি দেখে তিনি বিরক্ত হলেন। তিনি কিংডারগার্টেন-প্রণালীতে পড়বার চেষ্টা করতেন। ভাল গোল, বেল গোল, মানুষের মাথা গোল—ইত্যাদি সব পাঠ শেখাতেন। তিনি ছিলেন পাসের ধুরন্ধর পাণ্ডিত, ম্যাট্রিকের কণ্ঠধার। কিন্তু এখানে তাঁর

বল না, তিনি বিদায় নিলেন; তারপর থেকে আর 'হেডমাস্টার' রাখি নি। এখন অনেক ছাত্র, অনেক বিভাগ হয়েছে, চলছে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কর্মীরা সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিকে চিন্তার ক্ষেত্রে সেবার ক্ষেত্রে এক করে দেখতে পাচ্ছেন না—বিচ্ছেদ জন্মাচ্ছে। সকল বিভাগই যদি এক প্রাণক্রিয়ার অন্তর্গত না হয়, তবে এ ভার বহন করা কঠিন। তোমাদের কাছে আমার বক্তব্য এই দৃঢ়নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই একত্র হয়ে বিশ্বভারতীর আদর্শের বিশদীকৃত অক্ষয় রাখতে হবে, বিদ্যায়তনের মূল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হলে চলবে না। অতি ছোট বিদ্যালয় ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে, এর আরম্ভ অতি ক্ষীণ ও দুর্বল। ছাত্রদের কাছ থেকে বেতন নিতুম না, তাদের অল্পবস্ত্র প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেমন করেই হোক আমাকেই জোগাতে হতো, অধ্যাপকদের সাংসারিক অভাব মোচন করতে হতো। বিদ্যালয় বাড়তে লাগলো, দেখা গেল বেতন না নিলে বিদ্যালয় বাঁচানো যাবে না। বেতনের প্রবর্তন হলো, কিন্তু অভাব দূর হলো না। নিজের সংসারকে প্রায় রিক্ত করে বিদ্যালয়ের কাজ চালাতে হলো। ক্রমে এভাবেই ছোটো বিদ্যালয় বড়ো হয়েছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে অনেকে এখানে এসেছেন, ছাত্ররাও এসেছে। ধীরে ধীরে এর সীমা আরো দূরে প্রসারিত হলো, বিদেশ থেকে বন্ধুরা এসে এই

কাজে যোগ দিলেন। যা ছিল প্রচ্ছন্ন ভাষাপকভাবে প্রকাশমান হলো। সকলের জন্য ভারতের যে বাণী তাকেই আমরা বলি বিশ্বভারতী, এই আশ্রমে সে এসেছিল দীন ছন্দবেশে ছোটো বিদ্যালয়রূপে, সেই তার শব্দ; কিন্তু সেখানেই তার চরম সত্য নয়। সেখানে সে প্রার্থী গ্রহণ করতো, আহরণ করতো, আজ সে দাতা, দানের ভান্ডার খুলেছে, সে ভান্ডার ভারতের। বিশ্বপৃথিবী আজ প্রার্থী হয়ে তার অগ্নানে দাঁড়িয়ে, তাকে তো ফিরিয়ে দিতে পারি না। কারণ দিতে না পারলেই হারাতে হয়, বিস্ময়সংসার আমাদের স্বার রুদ্ধ দেখে যদি অভূত হয়ে ফিরে যায় তাহলে কী আমাদের কোনো কল্যাণ হতে পারে? বিশ্বভারতীর কাজের ভিতর তারই পূর্ণ অভিযুক্তি হতে থাকে, এই আমাদের একাগ্র সাধনা। যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্ এই বেদমন্ত্রের মধ্য দিয়েই সে তার পরিচয় দিক। ষে-আত্মীয়তা বিশ্ব বিস্তৃত হবার যোগ্য সেই আত্মীয়তার আসন এখানে পেতে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করব। সেই আসনে জীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই, সংকীর্ণতা নেই। বিশ্বভারতী আপন নিয়মে আপনি গড়ে উঠছে। গঙ্গা যখন গঙ্গেগাত্রীর মূণ্ড তখন একটিমাত্র তার ধারা। তারপর তার চলার পথে বহু নদনদীর সঙ্গে যতই সে সংগত হলো, সমুদ্রের যতই নিকটবর্তী হলো, কতো তার রূপান্তর ঘটেছে। সেই আদিম

ভারতের
আদিতন
রুসানুন



চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত



চ্যবনপ্রাশ নুতন ও পুরাতন সর্দি কাশি, শ্বস্বভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী। টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্বল্য ও ক্লান্তি দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যাত্মীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

স্বচ্ছতা তার আর নেই, কত অবিলম্বে প্রবেশ করেছে তার মধ্যে; তবু তো কেউ বলে না গঙ্গার উঁচত ফিরে যাওয়া। সব নিজে যে পরিপূর্ণতা সেইটেই বড়ো। বিশ্বভারতীও আগুন অন্তর্নিহিত বেগে ধাবিত হয়ে চলেছে, বহু মানবের চিত্ত-সম্মিলনে আপনি গড়ে উঠছে। এর মধ্যে একটা ঐক্য এনে দেয় একটা মূলতম গীতবেগ, কিন্তু এর গীত প্রবলতর হয় সবার সম্মিলনে। নিত্যকালের মতো কিছু থাকে না, তবে এর মূলগত একটি গভীর তত্ত্ব বরাবর থাকবে, সে হলো এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যাশিক্ষার একটা খাঁচা হবে না, এখানে সবাই মিলে একটি প্রাণলোক সৃষ্টি করবে। যারা একদা এখানে ছিলেন ও যারা এখানে রয়েছেন, তাঁরা সম্মিলিত হয়ে এই বিদ্যালয়কে পূর্ণ করে রাখুন, এ যেন কলের জিনিস না হয়। যন্ত্রের অংশ এখানেও এসে পড়েছে, কিন্তু সবার উপরে প্রাণ যেন সত্য হয়।

তোমরা তো তখন এখানে আস নি, বিদ্যালয়ের নিদারুণ অভাবের কথা জানো না, তখন আমার ঘাড়ে মতো একটা দেনা ছিল। পরিমাণ লক্ষ টাকারও বেশি। আমার গ্রন্থের স্বত্ব প্রভৃতি আমার সাধারণত জিনিসের কিছু কিছু করে বিক্রয় করে অভাব মেটাবার অসাধ্যসাধনে লেগে গেলুম, কিন্তু অভাব সম্পূর্ণ দূর হলো না। এদিকে-ওদিকে দু-একটা যা সম্পত্তি ছিল তা গেল। স্ত্রীর অলংকার পর্যন্ত বিক্রয় করলাম। নিজের সংসারকে বাঁপ্ত করে কাজ চালাতে হলো। খণ করে প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাতে সর্বস্বান্ত হয়ে দিন কাটিয়েছি, কিন্তু পরিতাপ ছিল না। অসংখ্য অভাব, দৈন্য, বিরোধ ও ব্যাঘাতের মধ্য দিয়ে দুর্গম পথে এই বিদ্যায়তনকে বহন করে এসেছি। তখন প্রদেশবাসীর সহায়তা পাই নি, তাদের অহেতুক বিরুদ্ধতা ও অকারণে বিবেক একে আঘাত করেছে, কিন্তু তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নি। মনে আছে বন্ধুবর মোহিত সেন এই বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট হন, তিনি বললেন, 'এখানে এসে কাজ করতে পারলে ধনা হতাম, কিন্তু তা সম্ভব হলো না। এবার পরীক্ষায় কিছু অর্জন করছি, তার থেকে এই বিদ্যালয়ের জন্য কিছু দেব এই ইচ্ছা'। তিনি এক তাজার টাকা সঙ্গে আমার হাতে তুলে দিলেন, বোধ হয় আমার প্রদেশবাসীর এই প্রথম ও শেষ সহানুভূতি। অবশ্য এই সঙ্গে রিপূরার মহারাজার আনুকূল্যের কথাও উল্লেখ করছি। আজও তাঁর বংশে এটা প্রবাহিত হয়ে আসছে। অকারণ পীড়া দেয় যে দুর্বলতা তা গড়া জিনিসকে ভাঙে, সংকল্পকে আঘাত করে, সাধার সঙ্গে কিছুই গ্রহণ করে না। বিশ-

ভারতীর এই যে প্রচেষ্টা, তা এই অহেতুক বিরুদ্ধতাকে প্রাণহত করেছে বোঝে আছে। অর্থবর্ষণের আনুকূল্য হলে হয়তো এর আত্মসত্য রক্ষা করা কঠিন হতো, অনেক কিছু আসত খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে যা বাঞ্ছনীয় নয়। ভবিষ্যতে দেশের স্বাধীনতা এলে হয়তো বিশ্বভারতীর অর্থাভাব দূর হবে, আমি হয়তো তখন থাকব না, তখন এ কথাটা কখনও ভুলে যেও না অর্থের আনুকূল্যে এই শিক্ষায়তন যেন আত্মসত্য-হ্রস্ট না হয়। যারা এখানে আরম্ভের দিকে এসেছিলেন, অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন তাঁরা। কী কষ্টই না তাঁরা এখানে পেয়েছেন, সাংসারিক কতো দীনতাই না তাদের সহিতে হয়েছে। প্রলোভনের জিনিস আশ্রমে কিছুই ছিল না, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য তো নয়ই, এমন কি খ্যাতিরও না। লোকচক্ষুর অন্তরালে অনেক দুঃখের ভিতর দিয়ে তখন ছিল আমাদের সাঁত-কারের সাধনা। অর্থের এতো অভাব ছিল যে, আজ তা কল্পনাও করতে পারব না। যারা তখন এখানে আমার কর্মসংগী ছিলেন তাঁরা অন্তরে দান করেছেন, শাইরে কিছু নেন নি। কিন্তু স্বপ্নায়তনের মধ্যে সহজ জীবনযাত্রাই শ্রেষ্ঠ আদর্শ। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়; শিশু অবস্থার সহজ-তাকে চিরকাল আঁকড়ে থাকার ইচ্ছা ও চেষ্টার মতো বিভ্রম্বনা খুব কমই আছে। কর্ম বহুবিস্তৃত হয়ে যখন বন্ধুর পথে চলতে থাকে, তখন তার নানা দ্রুতিবিচ্যতির মধ্যেও যদি তার প্রাণের ধারা অব্যাহত থাকে, তবে তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। ক্রমে এই আশ্রম বড়ো হয়ে উঠল; অনেকে এখানে এসেছেন, বিচিত্র তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সবাইকে নিয়েই কাজ করতে হচ্ছে। নানা ভুল-দ্রুতি নানা বিক্ষোভ বিরোধের ভিতর দিয়েই জীবনের যে প্রকাশ ঘাত-প্রতিঘাতে সর্বদা আন্দোলিত, তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার কাছে যা শ্রেয়, শ্রেষ্ঠ বলে যা আমি বরণ করছি, অর্থাৎ শূদ্ধ আমারই আদর্শ সবাই মিলে অন্ধ-ভাবে অনুসরণ করবেন, এমন ব্যবস্থাকে আমি নিজেই শ্রদ্ধা করিনে। পরিবর্তমান পরিবর্তমান সৃষ্টির কাজ সকলে মিলেই হয়, একনারকত্বের ব্যবস্থাটা সহজ হয় না, তার প্রভাবে আসে কৃত্রিমতা। শূদ্ধ এই কথাটি ধ্রুব হয়ে থাক, এই প্রতিষ্ঠানে যেন হৃদয়-প্রাণ-কল্পনার সঞ্চারের পথ সদা উন্মুক্ত থাকে, অখণ্ড পরিপূর্ণ জীবন যেন আশ্রমে ধ্রুব সত্য হয়ে বিরাজ করে। নিজেকে নেপথ্যে সরিয়ে নিতে পারলেই অপরায়ে মানবতার সম্বন্ধ মিলে, এই সাধারণ শিক্ষকতার মধ্যেও। এতে খ্যাতি নেই, স্বার্থ নেই, সেই জন্যই এতে বৃহৎ মানবের স্পর্শ আছে। আজ বার্ষিক্যের টানে আশ্রমের সক্রিয় জীবন থেকে দূরে

থাকতে হয়েছে। একটা কথা আমার মনে রেখো, বৈশ্বিক প্রাচুর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ে ওঠা খুবই কঠিন, এর অভিশাপই হলো সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, আর মানব-সভ্যতার চিরদিনের আরাধ্য সামগ্রীকে বিদূষ করা।"

শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডু ওয়ার্ধা থেকে কয়েক দিনের জন্য এলেন শান্তি-নিকেতনে। সেদিন সকালে যথার্থীত পাঠভবনের (যতদূর মনে পড়ে সপ্তম শ্রেণীর) ছেলেমেয়েদের বিজ্ঞানের ক্লাশ চলছে; বিভিন্ন চুম্বকন প্রণালীতে কৃত্রিম চুম্বক তৈরির পরীক্ষা দেখানো হচ্ছিল। বৈদ্যুতিক চুম্বক কী শক্তিশালী হয় তা বোঝাবার জন্য একটা পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। ছোটো একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক কাঁচা লোহার একটা টুকরোকে এতো জোরে টেনে ধরে রেখেছে যে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও কোনো ছেলেমেয়ে লোহার টুকরোটিকে চুম্বকের গা থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না—এই পরীক্ষা যখন দেখানো হচ্ছে, গুরুদেব শ্রীযুক্ত নাইডুকে সঙ্গে নিয়ে এলেন ল্যাবরেটরীতে, যেখানে ছোটো বৈদ্যুতিক চুম্বকটি দেয়ালের গায়ে প্রত্যেকে আটকানো আর লোহার টুকরোটি তার গায়ে লেগে আছে চৌম্বকশক্তির টানে। এই লোহার টুকরোর বিপরীত দিকে একটা আঙটা লাগানো; ছেলেমেয়েরা একে একে এসে আটা ধরে টেনে লোহার টুকরোকে চুম্বকের গা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে বিফল হচ্ছিল। শ্রীমতী নাইডুকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই হলো আমাদের বিজ্ঞানের মান্টার, এরই কথা তোমাকে বলছি।' (প্রশ্ন ও তার জবাব সবই ইংরেজীতে হলো, তার যথার্থ বাংলা তজ্জমা করে দিলাম)। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী নাইডু বললেন, 'এই ছোট্ট চেহারার মানুষটি তুমি, ছেলেমেয়েরা তোমাকে ভয়-ভক্তিমাত্রা করে তো! বললুম, 'দেহের আয়তনটাই কি মূল্য? ওয়ার্ধার যার আশ্রম থেকে আপনি এলেন, তাঁর দেহের আয়তন বোধ হয় আমার চেয়ে বেশি নয়, কিন্তু সারা পৃথিবী তাঁকে মহামানব বলে মান্য করছে, আব তাঁরই দুর্দম প্রতাপে প্রবল পরাক্রান্ত বংশীস্বর পৃথিবী ভরে সদা সন্ত্রস্ত।' তাঁর উত্তরে, 'তোমার স্পর্শ দেখে অবাক হচ্ছি, দুঃসাহস তো তোমার কম নয়—গান্ধিজীর সঙ্গে নিজের তুলনা করছ? গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'এটা ঠিক তুলনা নয় সরোজিনী, মহাত্মজীকে ওরা আদর্শ মানব বলে শ্রদ্ধা করে। তাঁরই আদর্শে উন্মুগ্ন হয়ে তাঁরই মহান জীবনকে যদি সাধনার সামগ্রী বলে গ্রহণ করে থাকে, তাহলে একে ওর এমন একটা স্পর্শ বলে বলব, যার মধ্যে আত্মপ্রচার বা

অহমিকার ক্ষুদ্রা নেই! শ্রীযুক্তা নাইডু এবার খুঁশি হলেন, বললেন, 'আমি একবার টেনে দেখব ঐ খুঁদে চন্দ্রকটার টান থেকে লোহাটাকে মুক্ত করতে পারি কিনা, দেহের আয়তন তো আমার কম নয়, হাত দুটোতে শান্তিও বেশ আছে বলেই তো মনে হয়, কী বলেন Poet?' গুরুদেব সহাস্যে বললেন, 'মেয়েদের দেহের বিপদলতা নিয়ে উপহাস করে কিছু বললেও গুঁরা ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হন, কাজেই তোমার কথায় সায় দিয়ে আমি ঠকতে রাজী নই। শক্তি-সামর্থ্য তোমার যথেষ্ট আছে, একবার চেষ্টা করেই দেখ না। পঁচাত্তর বছরের 'খুবক' আমি, এই শক্তিপরীক্ষার স্বল্পে আমাকে কিন্তু আহ্বান করো না, তোমার বয়সের সীমায় থাকলে হয়তো আসরে নেমে পড়তুম—তার জড়ানো অতটুকু একটা লোহার দণ্ড আমাদের দৈহিক শক্তিকে পরাভূত করে এভাবে দণ্ড দেবে এ যেন ভাবতেই পারছি না।' শ্রীযুক্তা নাইডু সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও ব্যর্থ হলেন, টানটানির স্বল্পে চন্দ্রকেরই হলো জয়। ক্রমে একটি মেয়ে ছিল, খুবই রোগা, দেখলেই বোঝা যায় বেশ দুর্বল, তাকে বললুম, 'সবাই দেখলো, তুমি এসে একবার টেনে দেখ না। সবাই হেসে উঠল, মেয়েটি বললে 'ওরে বাবা, আমি গায়ব না।' বললুম 'ভয় কি, এসো না একবার।' মেয়েটি এসে টান দিতেই লোহার টুকরোটা চন্দ্রকের গা থেকে খসে ওর হাতে চলে এলো। দেখেই শ্রীযুক্তা নাইডু বললেন 'এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো কারসাজি আছে।' গুরুদেব সহাস্যে বললেন, 'নিঃসন্দেহে, সরোজিনী তুমি তো ওর ছোটো চেহারা দেখে ওর শক্তিসামর্থ্য সম্পর্কে একটু কটাক্ষ করেছিলে, ও দেখা ছোটো খুঁদে চন্দ্রকের প্রচণ্ড শক্তি দেখে পাণ্টা জবাব দেবার চেষ্টা করেছে। আমাদের দুজির আড়ালে বৈদ্যুতিক চন্দ্রকের বেগুনীতে রিদুং চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত করে চন্দ্রকের অবসান ঘটিয়ে দেখালো বড়ো দেহ নিয়ে তোমরা যা পারো নি, এই ছোট্ট মেয়েটি অবলীলাক্রমে তা করলো—এই হলো কারসাজি।' শ্রীযুক্তা নাইডু সহাস্যে বললেন, 'ভারি দুশ্ট, একে-বারে ছেলেমানুষ।' শ্রীযুক্তা নাইডু সহাস্যে বললেন, 'ভারি দুশ্ট, একে-বারে ছেলেমানুষ।'

গ্রীষ্মাবকাশের সময় গুরুদেব আল-মোড়া যাবেন, আদেশ হলো 'বিশ্ব-পরিচয়ের' সমগ্র পান্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে খবর শীঘ্র গুরু হাতে পেয়ে দিতে। আলমোড়ায় নিভুতে 'বিশ্বপ্রকৃতির' সান্নিধ্যে বসে 'বিশ্বপরিচয়' গ্রন্থের পরি-রচন-পরিবর্ধনের কাজটা সমাধা করবেন। ওখান থেকে ফিরে এসে বইখানা ছাপাবার ব্যবস্থা করবেন বিশ্বভারতী প্রেসে। এমনি সময় 'বীরেনদা' (বীরেন্দ্রমোহন সেন,

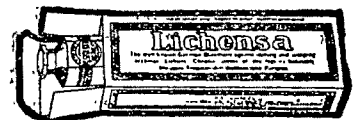
শান্তিনিকেতনে প্রায় সবারই বীরেনদা, গুরুদেবের অত্যন্ত স্নেহভাজন) তাঁর তিন-চার বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করে বললেন, 'গুরুদেব', সৌদীন দাদামশায় (নেপালচন্দ্র রায় মহাশয়) ভারি মুস্কিলে পড়েছিলেন—শ্রীভবনের মেয়েদের নিয়ে 'বাসে' করে হেমবালা দেবী (শ্রীভবনের প্রপ্রেয়ী শ্রীযুক্তা হেমবালা সেন) যাবেন কেন্দুলী মেলায়, দাদামশায় যাবেন গুঁদের সঙ্গে। বাস এসে দাঁড়িয়েছে হেমবালা দেবী, সুহাসিনী দেবী ও আর কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে; দাদামশায় বাসে উঠে হেমবালা দেবীর পাশে বসলেন। কিছুক্ষণ পর উনি একটু চঞ্চল হয়ে বললেন, 'বাস ছাড়বে কখন? হেমবালা দেবী বললেন, 'কয়েকটি বড়ো মেয়ে এখনো আসে নি, এলেই রওনা হবে।' আর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে 'দাদা-মশায়' গুঁকে বললেন, 'দেখুন মিস সেন, বেশি বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা থাকলে মেয়েদের কত ব্যক্তানে 'শিথিলতা আসে।' মিস সেন এই কথা শুনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন; গুঁর অকস্মাৎ এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে দাদামশায় বুদ্ধলেন এভাবে কথাটা বলা তাঁর ঠিক হয় নি, কারণ হেমবালা দেবীর বয়স তখন চাঁদ্রশের বেশি, আর তিনি নিজেই তখনও অবিবাহিতা), সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বললেন, 'মিস সেন, তাই তো বড়ো অনায়াস হয়ে গেল, আপনাকে কোনো কটাক্ষ করি নি, ক্ষমা করুন।' গুরুদেব শুনেই হেসে উঠলেন, নেপালবাবুর মুস্কিল তো লেগেই আছে, এই জনাই বোম্ব হয় কয়েক-দিন এদিকে আসেন নি। তারপর বীরেন তোর খবর কী?' বীরেনদা বললেন, 'আমার ছেলের নামকরণের জন্য এলাম।' গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'ও, 'বরেন্দ্রমোহন' নামটা বাকি তোদের পছন্দ হয় নি, বেশ একটা আধুনিক নামই দেব এখন।' বীরেনদার অবস্থাটা অবগতীয়া। প্রায় দু-তিন বছর আগে গুরুদেব এই ছেলের নাম রেখেছিলেন 'বরেন্দ্রমোহন',—এই নামটা গুঁদের বাড়ির কারও পছন্দ হয় নি। তাই ভাবলেন যে, ঐ তিন বছরে কতো ছেলেমেয়ের গুরুদেব নামকরণ করেছেন, তিনি কী আর মনে করে রেখেছেন, কার ছেলেমেয়ের কী নাম দিয়েছেন! গুরুদেবের স্মৃতিশক্তি যে অনন্যসাধারণ, সে খোয়ালই বীরেনদার হয় নি। বীরেনদার চারপাশে কতকগুলি বিশেষ গুরু—উনি খুব পরোপকারী আপদে-

বিপদে এমন বৃদ্ধ দিয়ে সাহায্য করতে খুব কম লোককেই দেখেছি, অন্তঃকরণ উদার ও মহৎ। কারও বিপদের খবর পেলেই হলো—তিনি সাহায্য প্রার্থনা করুন আর না-ই করুন—উপযাচক হয়ে নিজেই তাঁর বিপদ মুক্তির জন্য অগ্রণী হতেন। অনেককে গোপনে অর্থ সাহায্য করতেন, অতিমায়ায় অতিথিবৎসল, বাইরে থেকে যাঁরা শান্তিনিকেতন দেখতে আসতেন, তাঁরা বীরেনদার এই বিরাট 'জাতিশালায়' আশ্রয়িত হতেন—তা সে বেলা দুপুরেই হোক বা রাত দুপুরেই হোক! একটা অপূর্ব মেজাজ, সদাপ্রফুল্ল মুখ, কথায় কথায় রসিকতা ও গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি—এসব করিতার যে-কোনো একটা লাইন বললেই গোটা কবিতাটা মধুস্বপ্ন বলে-যাওয়া! সংগঠিত সবসং দেহ, অসাধারণ পরিপ্রণয়ী, একজন দক্ষ ক্রীড়া-বিদ—বিশেষ করে ফুটবল খেলায় 'ব্যাঙ্কে' খেলতেন, যেন একটি দুর্ভেদ্য দেয়াল। এমন একজন 'বন্ধু' সত্যিই দুর্লভ—মনে হয় এই ধরনের মানুষ দেখেই বোধ হয় জ্ঞানী ব্যক্তির বন্ধুর সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন 'উৎসবে ব্যসনে চৈর দর্শিত্বৈ রাস্তাবিবপবে, রাজস্বারে সম্মানে চ যস্তিস্ততি স বান্ধবঃ।' অনেক সময় বলাবলি করোছি—এই রকম কয়েকজন বীরেনদা যদি বাংলাদেশে থাকতো তাহলে এর চেহারাটা হয়তো বদলে যেত।

ব্রণ

দুর্ কবিতা জন্ম

লিচেনসা



● ১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন করেছেন।

● যে কোন নামকরা ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1674 R-REM

বীরেনদার রসিকতা ও পরোপকারের দৃষ্ট-একটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করছি। একবার গ্রীষ্মের ছুটির সময় কলকাতা এসেছি; বীরেনদা খুব ভোরে গাড়ি নিয়ে এসে হাজির। অনুরোধ করলেন, তখনই ওর সঙ্গে বের হতে, দমদম ছাড়িয়ে ২০।২৫ মাইল, কি একটা বিশেষ কাজ আছে, যাঁর সংগী হওয়ার কথা তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ওর সঙ্গে বের হওয়া মানে কখন বাড়ি ফিরব তা অনিশ্চিত, আর এতো বেশ দূরের পাড়ি; প্রতিবাদ নিষ্ফল, সঙ্গে যেতেই হলো। গাড়িটা নতুন কিনেছেন, নিজেই চালান, চাকায় পাম্প বোঁশ বলে রাস্তায় বেশ 'বাম্প' করছিল, লোক রোড়ে এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে গাড়িটা থামিয়ে পিছনের দরজা খুলে দিয়ে কাঁকে জানি ডাকলেন। তাকিয়ে দেখি, এক দশাসই চেহারার ভদ্রলোক, ওজন কমপক্ষে সাড়ে তিন মণ, খরিলে গরুর গাড়ি ছাড়া গাঁত নেই' অবস্থা। হাত-পা দ্রুত সম্বালন করে হেঁটে চলেছেন অতিকণ্ঠে ভারসাম্য রক্ষা করে অত্যন্ত অসহায়ভাবে, কিন্তু শাস্ত্র-প্রয়োগের তুলনায় দেহের গতিবেগ খুবই মন্দ। যেন শক্তি ও ওজনের পার্থক্যে একটি দৃষ্টান্ত চলেছে। দেহের বিপুল ওজনের উপর ভারাক্ষরিত শক্তি ও তাতে গতি-সম্পাদনের প্রযুক্ত শক্তির মধ্যে প্রধান লাভ করেছে ভারাক্ষরিত শক্তিটা, তাই প্রয়াসের অনুপাতে গতিবেগ হয়েছে অনেক মন্দ। বীরেনদা তাঁকে বললেন, 'এই যে, লেকে বেড়াতে যাচ্ছেন তো, আসুন গাড়িতে, আমরাও লেকের কাছ দিয়ে যাচ্ছি, আপনাকে সেখানে নামিয়ে দিই যাব।' বহুকণ্ঠে ভদ্রলোক তাঁর ঐ বিশাল বপু নিয়ে গাড়িতে উঠে একটা আবামের নিশ্বাস ফেললেন। লেকের কাছাকাছি গাড়িটা থামলে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে বীরেনদাকে জোড়হাতে নমস্কার করে বললেন, 'ধন্যবাদ, আমার খুব উপকার হলো, আপনাদের পরিচয় জানতে পারলে খুব খুশি হব।' বীরেনদা নির্বিকারচিত্তে বললেন, 'ল্যান্সডাউন রোড এন্ট্রেনশনে বি এম সেন, ইঞ্জিনিয়ার, কন্সট্রাক্টর ও আর্কিটেক্ট প্রতিনিধির কর্মচারী আমরা।' ভদ্রলোক একটু সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে অঙ্গানবদনে বললেন, 'তাই বুদ্ধি, বি এম সেন আমার বিশেষ বন্ধু, তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আপনাদের এই অবাচিত সাহায্যের কথাটা আমি নিশ্চয় তাঁকে বলব; আচ্ছা, নমস্কার।' ভদ্রলোক চলে যাবার পর বীরেনদাকে বললাম, 'এটা কী হলো, যে-ভদ্রলোককে সত্যি আপনি চান না, তাঁকে ডেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এই রসিকতা করার অর্থ কী?' উনি বললেন, 'দেখছেন না, চাকায় পাম্প বোঁশ, গাড়িটা

কিরকম 'বাম্প' করছিল, ঐ বিপুল ওজন পিছনের সীটে চাপিয়ে 'ব্যালান্স'-এর কাজ হলো, রাস্তাটা খুব খারাপ, তাই গাড়ির স্প্রিংকে একটু বাঁচবার চেষ্টা। আর ভদ্রলোকেরও উপকার হলো, এতোটা পথ ঐ বপুখানি নিয়ে যত্ন করতে করতে আসা এক বিষম ব্যাপার হোও, সেই স্থান থেকে তো ভদ্রলোক আজ অন্তত রেহাই পেলেন।' বললাম, 'তা তো পেলেন, কিন্তু দেহ স্থূল হলে হবে কি, ভদ্রলোক বি এম সেনকে না-চেনার ভাণ করে যে-ভাবে ধন্যবাদ দিয়ে গেলেন, তাতে মনে হচ্ছে তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। আপনার পরিচয় গোপন করাটা ঠিক ধরে ফেলে যেন ব্যঙ্গ করেছে চলে গেলেন।'

তারপর শান্তিনিকেতনের আলো দৃ-জন অধ্যাপককে তাঁদের বাড়ি থেকে তুলে নিলেন। তাঁরা যেতে রাজী হলেন এই শর্তে যে, বেলা এগারটার মধ্যে তাঁদের ফের পেঁছে দিতে হবে। এদের মধ্যে একজনের মেজাজ অত্যন্ত চড়া, তিনি এমনি'ত বেশ ভালো, তবে মেজাজ বিগড়ে গেলে একে-বারে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠতেন; তখন স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গিয়ে যে-আচরণ করতেন, তা মোটেই অধ্যাপকজনাচিত নয়, যদি কেউ একে মস্তিস্কের সাময়িক অসুস্থতার লক্ষণ বলে বলেন, তাহলে তাঁকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। যারা হলো শূর, এখানে-ওখানে-সেখানে থামতে থামতে বীরেনদা আমাদের নিয়ে চললেন। কলকাতার রাস্তাঘাটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব কম, হঠাৎ একসময় যেন মনে হলো দমদম যাওয়ার বদলে গাড়ি নিয়ে উনি দক্ষিণ দিকে চলেছেন, তখন বেলা সাড়ে এগারটা বেজে গেছে। এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বললেন, 'আজ আর দমদমের দিকে যাবার সূচিব্যাপার হলো না, দেরি হয়ে গেছে, ছোটোখাটো দৃ-একটা কাজ সেরে নিয়ে আপনাদের বাড়ি পেঁছে দেব।' তারপর ঘণ্টাখানেক যে কোন রাস্তায় কোথায় ঘুরলাম জানি না। লক্ষ্য করলাম চড়া মেজাজের অধ্যাপকের নাসিকা ঘন ঘন স্ফূর্তিত হচ্ছে, অর্থাৎ ঝড়ের পূর্বাভাস, ধৈর্যচ্যুতি আসন্ন। কিছুক্ষণ পর গাড়ি গিয়ে ঢুকলো মস্ত গেটওয়ালা প্রকান্ড এক বাড়ির ভিতর; গাড়িটাকে লনের পাশে একটা গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে বীরেনদা বললেন, 'আপনারা যিনিট দশেক বসুন, আমি জাস্টিস..... এর সঙ্গে একটা কাজের কথা বলে আসছি।' বোঝা গেল, সারা কলকাতা শহর সকাল থেকে টহল দিয়ে কোনো এক জজসাহেবের বাড়ির আঙিনায় প্রবেশ করোঁছ, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। গাড়ির মধ্যে এই প্রচণ্ড গরমে বসে থাকা অসম্ভব, তাই অস্বাভাবিকভাবে গাড়ি থেকে নেমে

গাছের ছায়ায় ঘাসের উপর বসলাম, ক্ষুধার-ক্ষুধার তখন আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আরো আধ ঘণ্টা কেটে গেল, বীরেনদার 'মিনিট দশেক' শেষ হলো না, 'চড়া মেজাজের' এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো, সোজা দাঁড়িয়ে উঠে দু'হাতে সজোরে নিজের কান দু'টি মলতে শুরুর করলেন, ঘন ঘন কণ্ঠ-মর্দনের সঙ্গে বলে চললেন, 'এই কান মলছি, আর কোনোদিন যদি বীরেনদার সঙ্গে বের হই তাহলে আমার নাম..... নয়।' ঠিক তখনই দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এক সৌম্যশান্ত মূর্তি, তাঁর পিছনে বীরেনদা। ভদ্রলোক অগ্নিদল-নির্দেশে কণ্ঠমর্দনের অধ্যাপককে দেখিয়ে মনে হলো বীরেনদাকে কিছু বললেন, তারপর ফিরে গেলেন ঘরের মধ্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বীরেনদার আবির্ভাব, এসেই ঐ অধ্যাপককে বললেন, 'জাস্টিস..... আপনার নিজের কান নিজহাতে মলতে দেখে ধরে নিয়েছেন আপনার মস্তিস্ক-বিকৃতির লক্ষণ সব পরিস্ফুট। আমাকে জিজ্ঞেস করতই বললাম, 'ঠিক ধরেছেন, আর এই গরমে এতক্ষণ মাঠে বসে থাকার ফলে এই বিকৃতির মাত্রাটা এতো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিজের হাতে নিজের কান মলে যাচ্ছেন।' এরপর সারা গাড়ির সবাই চুপ; এই ব্যাপারের পর ঐ অধ্যাপক বেশ কিছুদিন বীরেনদার সঙ্গে বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

আর একদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিকেলের দিকে গাড়ি নিয়ে বের হলেন হাবড়ায় ও অধুনা বাগীপুর নামে খ্যাত এক জায়গায় এরোড্রোম নির্মাণের কাজে। সেদিন আমাকে ছাড়া আর কাউকেই সংগী পেলেন না! ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল, বারাসাতের কাছাকাছি এসে দেখা গেল এক বিশালদেহী ভদ্রলোক এসে দেখা গেল এক বিশালদেহী ভদ্রলোক সপরিবারে একটা গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোক দু'হাতে তুলে আমাদের গাড়ি ধামাতে সজেকত করলেন, রাত তখন প্রায় আটটা। বীরেনদা বললেন, 'মনে হচ্ছে, গাড়ি 'ব্রেক-ডাউন' হয়ে ভদ্রলোক এই নির্জন জায়গায় সপরিবারে খুবই বিপদে পড়েছেন, দেখি কিছু ব্যবস্থা করা যায় কি না।' বাধা দিয়ে বললাম, 'আপনি এভাবে পরোপকারে লেগে গেলে কলকাতা পেঁছাতে অনেক রাত হয়ে যাবে, আমার নটার সময় একটা জরুরী 'এমপেজমেন্ট' রয়েছে, সময় মতো না পেঁছাতে পারলে বেশ মর্শিকিলে পড়ব।' কার কথা কে শোনে! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়লেন, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস কাব জা... গেল ওর গাড়ির 'এ্যাক্সেল' (axle) ভেঙে গেছে একটা লরীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে, ওরা সবাই অসুস্থতর কিছু আঘাত পেয়েছেন। সম্ভার অন্ধকারে

লরীচালক সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গে লরী নিয়ে উধাও, এমন কি এ লরীর নশ্বরতা নেওয়াও সম্ভব হয় নি। এ পথে চলতে অনেক গাড়ি থামিয়ে তিনি সাহায্যের আবেদন করেছেন, কিন্তু এ্যাক্সেল-ভাঙা গাড়িকে উদ্ধার করে কলকাতা নিয়ে যেতে কেউ কিছু করতে পারেন নি, আর তা ছাড়া গোটা পরিবারের ৫-৬ জন লোককে এক-সঙ্গে 'লিফ্ট' দেওয়ার দুঃসাহস কারও হয় নি। তবে এক ভদ্রলোক বলে গেছেন তিনি কলকাতা গিয়ে 'ব্রেক-ডাউন সার্ভিসে' ফোন করে একটা 'ভ্যান' পাঠিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন, আর তা না হয় তো 'ফায়ার ব্রিগেডে' খবর দেবেন। এই অনিশ্চিত ভরসার উপর নির্ভর কবে ভদ্রলোক প্রায় দু' ঘণ্টা অপরিবারে এই জনহীন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছেন। বীরেনদা হঠাৎ এক বিষম কান্ড করলেন—অজানা-অচেনা এই ভদ্রলোককে বললেন, 'আপনি আমার গাড়িতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কলকাতা চলে যান, আপনার ড্রাইভার আমার গাড়িটা নিশ্চয় চালাতে পারবে। আপনি কলকাতা পৌঁছে হয় একটা 'রেস-কিউ-ভ্যান' পাঠিয়ে দেবেন, আর না হয় তো আপনার গাড়ি মেরামত করে নিয়ে যাবার জন্য নতুন এ্যাক্সেল সহ কোনো দক্ষ 'মেকানিক' আমার গাড়ির সঙ্গে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিন।' প্রস্তাবটা ভদ্রলোকের খুব মনঃপূত হলো না, বললেন, 'তা কী করে হয়! চলুন সবাই মিলে আপনার গাড়িতেই কলকাতা ফিরে যাই, সেখানে গিয়ে আমার গাড়িটা ফিরিয়ে নেবার একটা ব্যবস্থা আজ রাতেই করতে পারব।' বীরেনদা সহাস্যে বললেন, 'হলে ভালোই হতো; তবে কিনা আপনার ও আমার মতো দু'জন 'শীর্ষকায়' লোক একসঙ্গে এক গাড়িতে বসার পর আরো ৫-৬ জনের বসার স্থান একমাত্র বাস বা লরীতে হতে পারে, কোনো প্রাইভেট গাড়িতে নয়। যদিও বা ঠাসাঠাসি করে আমার গাড়িতে এই ৭-৮ জন উঠে বসি, তাহলে আরো একটা অপঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে।' ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে অপরিবারে বীরেনদার গাড়িতেই কলকাতা রওনা হয়ে গেলেন। যাবার সময় বীরেনদার ঠিকানা নিয়ে গেলেন আর ও'র ঠিকানাও বীরেনদাকে দিয়ে গেলেন। বিশাল হাত দু'টি যুক্ত করে বীরেনদাকে নমস্কার করে বললেন, 'অজানা-অচেনা একজন লোককে আপনার এই অযাচিত সাহায্যের জন্য চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম, গরীবের কুটিরে একদিন পদধূলি দিতে হবে কিন্তু।' বীরেনদার গাড়ি বোঝাই করে অপরিবারে ভদ্রলোক সক্রান্ত দৃষ্টিতে বিদায় নিলেন। এই নির্জন অন্ধকার প্রান্তরে এ্যাক্সেল-ভাঙা একটা গাড়ি নিয়ে পড়ে রইলাম।

আমি ও বীরেনদা অনিশ্চিত ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে। মামনে-পিছনে যতদূর দৃষ্টি যায়, শব্দ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার, কিছুদূরে একটা পরিত্যক্ত ভাঙা-বাড়িতে শেরালের একতান ছাড়া প্রাণের আর কোনো সাড়া নেই, অপ্রাকৃত কোনো অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না জানি না, অন্তত তাদের উপস্থিতির কোনো স্পষ্ট নিদর্শন নেই। কবিত্ত করার উপযুক্ত সময় ও পরিবেশ বটে। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে গাড়ির পা-দানে বসে বীরেনদা তখন গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন, হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তার তখন দশটা বেজে গেছে। একটার পর একটা কবিতা আবৃত্তি চললো, মাঝে মাঝে আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করছেন জেগে আছি কি না। ঘুম চোখ থেকে অনেকক্ষণ বিদায় নিয়েছে, আর গাড়ির পা-দানীতে বসে বসে ঘুমাবার কৌশলটা আয়ত্ত্ব করা নেই। তবে রক্ষে এই যে, আধুনিক কবিতা বীরেনদার জানা ছিল না, থাকলে আমার অবস্থা হয়তো 'ব্রহ্মদৈত্যের' মতোই হতো! এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মদৈত্যের গল্পটা মনে পড়ে গেল— "একটা পরিত্যক্ত ভাঙাবাড়িতে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করতো, রাতে মানুষকে ভয় দেখিয়ে বেড়ানোই তার পেশা। একথা শুন্যে একদল কলেজের ছাত্র অপদেবতা সম্বন্ধে মানুষের এই অবিশ্বাসকে দূর করার জন্য স্থির করলো তারা দলবেঁধে এই পরিত্যক্ত হানাবাড়িতে এক রাত্রি কাটিয়ে প্রমাণ করে দেবে যে, এসব মিথ্যে বা কোনো দৃষ্ট লোকের কারসাজি। একদিন রাত দশটার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়েকটা টর্চলাইট ও সতরঞ্চি নিয়ে তারা এই পড়ে ভিটেতে জমিয়ে বসে তাস খেলতে শুরু করলো; রাত বারটা পর্যন্ত ব্রহ্মদৈত্য দূরে থাক, একটা শেরাল-কুকুরেরও সাড়া পাওয়া গেল না। তাস খেলা ছেড়ে তারা তখন কবিতা আবৃত্তি শুরু করলো: রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত থেকে শুরু করে লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ কবিদের কবিতা অনেকক্ষণ আবৃত্তির পর একটি ছেলে-স্বরচিত আধুনিক কবিতার আবৃত্তি শুরু করলো। এই কবিতার ক্যাকট লাইন আবৃত্তির পর এই ভিটের উঠোনে অন্ধকারের মধ্যে একটা পচন্দ, "খটখট", শব্দ হলো ও একটা মর্মান্তিক গোঙানির আওয়াজ কানে এলো ছেলেদের। কৈ-কৈ করে ওরা টর্চ জ্বালিয়ে উঠোনে নেমে এসে এক নিদারণ দৃশ্য দেখলো—পায়ে খড়ম, গলায় পৈতে জড়ানো এক ব্রহ্মদৈত্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। আধুনিক কবিতার মাত্র গোটাকয়েক পঙ্ক্তির আঘাতই এতো বড়ো দর্দান্ত ব্রহ্মদৈত্যের পতন ঘটালো!" এভাবে রক্ত প্রায় সাড়ে

বারটা পর্যন্ত বসে থেকে অন্ধকারে শশার প্রচণ্ড আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি, হঠাৎ চোখে পড়লো একজোড়া হেডলাইটের তীর আলো। একটা গাড়ি এসে থামলো, চেয়ে দেখি বীরেনদার গাড়ি নিয়েই এ ভদ্রলোকের ড্রাইভার ফিরে এসেছে। সঙ্গে আরো দু'জন লোক। এদের একনে নাকি দক্ষ মেকানিক, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই এ্যাক্সেল বদলে গাড়িটাকে সচল করার ভরসা দিল; এদের সঙ্গে এনেছে খুব জোরালো তিন-চারটে টর্চলাইট আর ব্যাটারীতে জ্বলে তেমন দুটো বাত্ব ও অনেক যন্ত্রপাতি। ড্রাইভার বীরেনদাকে নমস্কার করে বললো, 'সাহেব, অনেক রাত হয়ে গেছে, আপনি এবার কলকাতা ফিরে যান, বাড়িতে নিশ্চয় সবাই খুব ভাবছেন। আপনার গাড়ি করে আমার সাহেবকে যদি আজ কলকাতা ফিরে না পাঠান, তাহলে খোদা জানেন কী সর্বনাশ হতো! দেখতেই এ চেহারা, সাহেব কিন্তু হাটের রুগী, একটুও ধকল সহিতে পারেন না। খোদা মেহেরবান যে, রাস্তায় ব্যাপারটা ঘটে নি, বাড়িতে গিয়ে দোতলায় উঠেই হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, সবাই মিলে ধরাধরি করে বসবার ঘরের সোফায় ও'কে শুয়ে দিয়ে আপনার গাড়ি নিয়েই ডাক্তারবাংকে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তারবাবুর কড়া দাওয়াই খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে তাকালেন, তারপর বললেন, "আবদুল, তুমি এখনও গাড়ি নিয়ে ফিরে যাসনি; আমার যা হয় হবে, তুমি এক্ষণি বেরিয়ে পড়। ডাক্তারবাবু যখন এসে পড়েছেন, তখন আমার জন্য ভাবনা আর কোনো কারণ নেই। তুমি 'মেকানিক' ও যন্ত্রপাতি নিয়ে এক্ষণি রওনা হয়ে যা। এই বিপদে যিনি সাহায্য করলেন, তাঁকেই তোরা ভুলে বসে রইলি!" তারপরেই এই দু'জন মেকানিক আর এসব যন্ত্রপাতি, আলো যোগাড় করে একটানা গাড়ি চালিয়ে এই এলাম।' ওরা এসেই গাড়ি মেরামতের কাজে লেগে গেল, আমরা যাত্রা শুরু করলাম কলকাতার দিকে। কিছুক্ষণ পরে বীরেনদা গান ধরলেন, হাতজোড় করে বললাম, 'দোহাই আপনার, থামুন, এই গভীর রাতে বেসরো গান শুন্যে ব্রহ্মদৈত্য না হোক, কুকুরে তাড়া করতে পারে, না হয় দ্রব্যগুণে অপ্রকৃতিস্থ মনে করে পুলিশে ধরাও খুব অসম্ভব নয়।' বীরেনদা নিরন্তর হলেন, রাত প্রায় দুটোর সময় কলকাতা ফিরলাম। বলা বাহুল্য, এতো রাতে বাড়ি ফিরলে পরিবারবর্গের, বিশেষ করে স্ত্রীর কাছে যে অভ্যর্থনা মেলে ও যে সম্বন্ধ-বিরোধী সম্ভাষণ আর বাকসমূহা বিধিত হয়, তা লিপিবদ্ধ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ভুক্তভোগী মাত্রই আমার অবস্থাটা সম্যক উপলব্ধি করবেন। [কম]



আর কতক্ষণ জেগে থাকবে মল্লিকা? কিছুতেই স্থির হয়ে বসে থাকা যাচ্ছে না। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে হাতের পাখাটাও তার অজান্তে খেঁষে যাচ্ছে। এখন রাত ক'টা কে জানে। প্যাশের বাড়ির রেডিওর গান অনেকক্ষণ হল বন্ধ হয়ে গেছে। চারপাশটা মোটামুটি নিস্তব্ধ।

মল্লিকার ঘুম পেয়েছে। তবুও সে ঘুমোতে পারছে না। বাবার রুদ্র দেহটার দিকে ভাল করে চোখ পড়ামাত্রই তার জন্মের ঘোর কেটে যাচ্ছে। আর তখনই পাখাটা নিয়ে জোরে জোরে বাতাস করছে।

একটা ছোট হাই তুলে পা টিপে টিপে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। সাবধানে আঁত সন্তর্পণে দরজা খুলে বারান্দায় এসে চোখে জলের ঝাপটা দিল সে। চোখ দুটো একটু একটু জ্বলছে। অঁচিল দিয়ে চোখ মুছে আবার ঘরে এসে দাঁড়াল সে। স্থিরদৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকিয়ে বইল বাবার দিকে। এবণ্ড ভাবল এবারে খোয়া যেতে পারে। শোয়ামাত্রই সে

ঘুমিয়ে পড়বে না। শরয়ে শরয়ে চোখ বন্ধে বন্ধের ওপরে হাত দুটি রেখে কিছুক্ষণ চিন্তা করবে। তারপরে একটু একটু করে ঘুম ঘুম আমেজ আসতেই উপড় হয়ে বালিশ জড়িয়ে ধরে শোবে। আরো চিন্তা করবে। আরো ভাববে। ভাবতে ভাবতে চোখের জলে বালিশ ভিজাবে। কিংবা সুখ-স্বপ্নে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হবে।

বেণীমাধব একটু বোধ হয় কাশলেন। মল্লিকা ভয় পেল। তাড়াতাড়ি পাখাটা তুলে নিয়ে পাশে বসে জোরে জোরে বাতাস করতে লাগল।—কি জানি, যদি আবার টান ওঠে! তাহলে হয়ত সারা রাত আর ঘুমই হবে না।—আজ বছর তিনেক হল এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়েছে। প্রতিবার এই গ্রীষ্মকালেই রোগটা যেন গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে। শীতকালে অতটা নয়। এবারে বাড়াবাড়িটা যেন আরো বেশী।—মাথার কাছে একগাদা ওষুধের শিশি। এফিড্রিনের ফাইলটা সামনেই।

ঘুমিয়ে আছেন বেণীমাধব।

নিশ্বাসের তালে তালে শাই-শুই আওয়াজ। মাঝে মাঝে গলার কাছে কেমন যেন ঘর্ষের শব্দ হয়। আর মল্লিকা তখনই ভয় পায়। জোরে জোরে বাতাস করে। আজ সারাদিন বেণীমাধব কেশেছেন। গলার শিরা ফুলিয়ে চোখ বড় বড় করে দম নেবার চেষ্টা করেছেন। আর হাপরের মত হাঁপিয়েছেন। বড় কষ্ট। রোগের জন্মলায় চেহারাটাও আধ-খানা হয়ে গেছে। সেই সাথে মেজাজ-টাও। সর্বদাই খিটখিটে, নইলে সদৃশীতকে কি কখনও মূখের ওপরে ঐরকম কথা বলতে পারেন!

সদৃশীত মল্লিকার বন্ধু। মল্লিকা তাকে ভালবাসে। অন্য পৃথিবীর স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সব স্বপ্নই সেদিন চুরমার হয়ে গেছে। সদৃশীত তাদের বাসায় আসত। অনেক সাহায্য করত। ডাক্তারখানা, বাজার, বিনি-মিনিকে অংক আর ট্রান্সলেশন করে দেওয়া, বেণীমাধবের সাথে পলিটিজ আলোচনা ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা, সব দিক থেকেই বাড়ির ছেলের মতই হয়ে গিয়েছিল। মল্লিকা তাই মাঝে মাঝে

ঠাট্টা করত, আগে থেকেই যে কতটা হয়ে গেলে দেখাচ্ছিল!

—কেন, হিংসে হয় নাকি?

—উহু! দুঃখ হয়।

—আহা-হা! দুঃখের চোটে গালে যে আরো রং ধরেছে।

—যাঃ! —মল্লিকা পালাত। কিন্তু শ্যালিয়ে খাবে কোথায়?

পায়রার খুপারীর মত ছোট দড়টো ঘর তো তার দুনিয়া। এ-ঘরে বাবা। ও-ঘরে রিনি-মিনিরা। সামনের এক চিলতে বারান্দায় তোলা-উননে রান্না হয়। উননে আঁচ দেওয়াসাই ধোঁয়ায় সব ঘোলাটে হয়ে যায়। দম বন্ধ হয়ে আসে। তবুও মল্লিকা তার মধ্যে খুশির নিশ্বাস টানবার চেষ্টা করে। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এই ঘিজি এলাকার রূপ দেখে। এ-বাড়ির ছাদ টপকে, সে-বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে, ও-বাড়ির চিলে-কোঠার পাশ কাটিয়ে আকাশকে দেখবার চেষ্টা করে। এক টুকরো আকাশ। তার আশা আর আনন্দের আকাশ। পাড়টা বড় নোংরা। ঠিক বস্তুও নয়, আবার ভদ্রপল্লীও নয়। দড়টোরই এক বিস্তীর্ণ মিশ্রণ। দেখে মনে হয়, সব ক’টি বাড়িই পুরনো। বিবর্ণ, রং-চটা আর সায়তসেতে। তারই মাঝে মাঝে খেলার ঘর। এখানে-ওখানে আবর্জনার স্তুপ। সবদাই দুঃগন্ধ। মাসে একবারও পরিষ্কার হয় কি না সন্দেহ। সমস্ত এলাকাটা জুড়ে সরু সরু রাস্তা লেনের গোলাকর্ধা। এক ফোঁটা বৃষ্টিতেই জলে-কাদায় এক-কোমর।

তবু ভাগ্য। অন্ততপক্ষে মাথা গোঁজ-বার ঠাইটুকু পাওয়া গেছে। বহর ঘোরা-ঘুরির পর সদৃশীতই এই আস্তানাটুকুর সম্ভান এনে দিয়েছিল। আর সেই সদৃশীতকেই কিনা বাবা—সে কথা ভারলেই যেন একটা চাপা বেদনা চোখের জলে মূর্ত্তি পেতে চায়। মনের মণিকোঠায় যেন একটা ফ্লাভ ভটফটিয়ে মাথা ঠুকবার চেষ্টা করে। আর যত অভিমান, রাগ এসে জমা হয় একজনের ওপর। কিন্তু বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। কেন না বেণীমাধব অসুস্থ। আর এই অসুস্থতাটা ক্রমে ক্রমেই যেন তার জীবনকে পংগু করে তুলছে—এই ভাবনায় মাঝে মাঝেই সে শক্তিক্ত হয়। তবুও স্বপ্ন দেখে মল্লিকা।

যদিও সদৃশীত আজকাল আসা-যাওয়াটা একটু কমিয়ে দিয়েছে, তবুও তাদের ভালবাসার মধ্যে কোন ছলচাতুরী ফাঁকি নেই। ওরা স্থির বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত। সদৃশীতই সেদিন বলেছিল,—এর পরেও কি তোমাদের বাসাতে আসাটা ঠিক হবে?

অসুস্থতাবরে মল্লিকা বলেছিল,—অমিও জাই ভারিচ্ছ।

—তোমার বাবা আর আমাকে পছন্দ করছেন না। তুমিও তো শুনলেই উনি কি বলেছেন। বিয়ে যখন দেবেনই না, তখন আর মৈথ্যে মায়া বাড়িয়ে লাভ কি বল?

—তুমি কিছ্ মনে কোর না লক্ষ্মীটি। রোগের জ্বালায় বাবার মাথার ঠিক নেই। আমাকেও তো চম্ভিশ ঘণ্টা বকেন।

—মন করবার মত যথেষ্ট কারণ ঘটেছে মল্লিকা। আমার যাতায়াতটাও উনি যখন পছন্দ করছেন না, তখন না হয়—

মল্লিকা কোন কথা বলতে পারে না। তার সজল চোখে করুণ মিনতি ফুটে ওঠে। একটু পরেই ধরা-গলায় বলে,—প্রীজ, ভুল বক্ব না।

এবারে সদৃশীত জোরে-হেসে ওঠে,—তুমি কি সত্যি সত্যিই ধরে নিলে নাকি যে, আমি এসব সিরিয়াসলি বলছি।

মল্লিকা কিছ্ বলে না। তার সজল চোখের কালো তারায় নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের স্থির ছায়া প্রতিফলিত হয়।

—অসুস্থের চোটেই মেজাজটা ভিরিস্কে হয়ে গেছে। খুবই স্বাভাবিক। হাঁপানির মত এত বদ রোগ আর নেই। ভয় কি, সেরে গেলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। —সাম্বনা দেবার চেষ্টা করে সদৃশীত।

—তুমি না এলে.....

—জানি, তোমার খুব কষ্ট হবে। তোমাদের অসুবিধা হবে। কিন্তু এরকম অবস্থায় ও’র অব্যাহা হওয়াটাও ঠিক নয়। —ভাবনা কি? মাঝে মাঝে চুপিসারে ঠিক চলে আসব। তুমি দেখে নিও।

মল্লিকা হেসেছে। গভীর তৃপ্তির চোখ মূছে ফিস্ ফিস্ করে বলেছে—কথার নড়চড় যেন না হয়। —তুমি এক্ষুণি যেও না। একটু বস, চা খেয়ে যাবে।

—একবারে শেষবারের মত!

—সদৃশীতের কণ্ঠে কৌতুক উপচে পড়ে।

—না মশাই, আজকের মত।

—এর পরে তো ছ’ মাসে ন’ মাসে একবার আসব। তখনও কি শূদ্র এক-কাপ চা জুটবে?

—তা নয় তো কি, অন্য কিছ্ আশা কর নাকি?

—তা একটু করি বৈ কি!

—কি — মল্লিকা হাসিমুখে বড় বড় করে তাকায়।

—একটু বেশি আদর, বেশি যত্ন ইত্যাদি ইত্যাদি।

—ইস্!—তখন শূদ্র এই জুটবে!

—বড়ো আঙুল দড়টো দেখিসে চলে গেছে মল্লিকা।

সদৃশীত কথা রেখেছে। দু’দিন অন্তর্পস্থিত হতে-না-হতেই সম্ভার অন্ধকারে যখন পাশের বাড়ির রেঁডওটা ফুল ভল্লামে ছাড়া থাকে, ওপরতলার আয়েটা বিয়ের কোয়ার্টারফিকশন বাড়ানোর

জন্যে বিস্তীর্ণ সুরে গলা-সাধে, এপাশের ঘরের ছোঁড়া দড়টো তাদের দৃষ্টি মায়ের ভয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে, কানাগলির ভাঙা রকে লণ্ঠন জেলে কয়েকটা বড়ো হাল্লা করে পাশা খেলে, তখন পা টিপে টিপে এসে উপস্থিত হয়েছে। রিনি-মিনি কিছ্ বলার আগেই ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে চোখ বড় বড় করে চুপ করতে ইসারা করেছে। তাই দেখে মল্লিকা হেসেছে। শক্তিক্তও হয়েছে।

দু’চার দিন এরকম লুকোচড়ার খেলা চলতে-না-চলতেই একদিন পাশের ঘর থেকে বেণীমাধব কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করেছেন,—কে এসেছে, কার সাথে কথা বলছিলেন রে মল্লিকা?

—কেউ না বাবা, গয়লা। দূখে আজ-কাল বড় বেশি জল দিচ্ছে।

—ও! —অবিশ্বাসের কাশি কৌশলে বেণীমাধব।

—সখী, শুনছি কেঁচটাকুর গরু চরাতেন। তা আমি না হয়.....

—আঃ, কি হচ্ছে কি? বাবা শুনতে পাবেন। —চাপা গলায় ধমক দিয়েছে মল্লিকা।

ঘরের ঘোরে দু’বার কেশে উঠলেন বেণীমাধব। আর তখনই মল্লিকার ভাবনার ভেলা ধমক দাঁড়াল। জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল সে। —রাত নিশ্চয়ই অনেক হয়েছে। জানলার বাইরে আঁধার। সবাই এখন ঘুমিয়ে। কিন্তু আর কতক্ষণ জেগে থাকবে সে? আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল মল্লিকা। আর নয়। এবারে শূদ্রে হবে। এতক্ষণে রিনি-মিনি বোধ হয় তার জায়গাটা দখল করে নিয়েছে।

* * * *

ভয় পেয়েছে মল্লিকা।

বড় কষ্ট পাচ্ছেন বেণীমাধব। ভূগে ভূগে চেহারাটা আধখানা হয়ে গেছে। হাতের, গলার, মূখের চামড়া অতিরিক্ত ক’চকে যেন অকালে বার্ধক্য ঘোষণা করছে। টানের ঠেলায় প্রতিটি কাশির ঝাঁক দেখে মনে হয়, এই বৃদ্ধি প্রাপ্তি বেরিয়ে গেল। বেণীমাধবের অবস্থা দেখে ভয় পেয়েছে মল্লিকা। কেন না, তিনি এখন মারাত্মক রকম অসুস্থ এবং ওষুধের শাসনের বাইরে। তাঁর কাশি দেখলে প্রায় পতিবারই মল্লিকার সদ্য জল থেকে ডাঙায় তোলা মাছের কথা মনে হয়। পর পর বেশ কয়েকটা রাত জেগেছে মল্লিকা। চিন্তায় চিন্তায় তার চোখের কোণে দর্ভাবনার কালি গভীর হয়েছে। প্রাণপণে বেণীমাধবের পরিচর্যা করেছে কিন্তু তাতেও রোগের এতটুকু উপশম হয় নি। বরং আরো বেড়েছে যেন।

মল্লিকা ভয় পায়।

সদৃশীত আশ্বাস দেয়,—তুমি মিছি মিছি

ভয় পাইছে। উনি কষ্ট পাচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু তা বলে হাঁপানিতে কেউ কখনও মরে না।—কথা শেষ করেই লজ্জা পেয়েছে সূদীপ্তি। এভাবে বলাটা ঠিক হল না।

—কিন্তু দিনের পর দিন চোখের ওপর ঐ কষ্ট যে দেখাও যায় না। কি করব বল তো?

—ওষুধ-টষুধে কোন ফল হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।

—সে হলে তো কোন কথাই ছিল না। ডাক্তার চৌধুরী বলছিলেন চোখে যেতে। লী-সাইডে গেলে নাকি অনেকটা রিলিফ পাওয়া যায়।

—আমিও কিন্তু ঐরকম শুনিয়েছি।

—ডাক্তারবাবু বলছিলেন বায়ু পরিষ্কৃত করে অনেকেরই নাকি এ রোগ একদম সেরে গেছে।—ভাবছি বাবাকে নিয়ে গেলে কেন হয়।

—ভালই হয়। চেষ্টা করতে দোষ কি?

—কিন্তু অনেক টাকা লাগবে যে। অন্তত মাসখানেক সেখানে থাকতেই হবে। তারপরে রিনি-মিনিকেও সেখানে নিয়ে যেতে হবে।

—ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।—সূদীপ্তির আশ্বাসে অনেকটা ভরসা পায় মল্লিকা।

শেষ পর্যন্ত পুরী যাওয়াই সাক্ষ্য হল। সবাই বললে, সমুদ্রের হাওয়া খেলে দুদিনেই এ রোগ অনেক কমে যাবে। আর পুরীর আবহাওয়া এই সময়েই চমৎকার। বেণীমাধব প্রথমে আপত্তি করেন।—কিন্তু কন্যার যুক্তি-তর্কের দ্বারা তঁার ওজর-আপত্তির বাঁধ ভাঙতে সক্ষম হয় নি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি রাজী হয়েছেন।

যাওয়ার ব্যবস্থা করতে করতে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলে। তারপর একদিন রাত্রে তারা রওনা হল। সূদীপ্তি স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল এবং মিষ্টি হেসে বেণীমাধবের সাথেও কথা বলেছিল।—এবারে আপনি ঠিক সেরে উঠবেন।

—কি জানি।—গম্ভীর মুখে অস্পষ্ট ভাবে বিড়বিড় করে বলেছেন বেণীমাধব।

—মেয়েটার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমাকে নিয়ে খুব ফ্যাসাদে পড়ছে। সবই আমার কপাল।

টেন লাভার একটা আগে প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়েই বেণীমাধবের সম্মানী মজর বাঁচিয়ে সূদীপ্তি মল্লিকাকে বলেছে,—শুধু বাবাব স্বাস্থ্যগোপন করলেই হবে না, সেই সঙ্গে তোমারও করা চাই।

—কেন, আমার আবার কি হল। অবাক হবার ভাগ করেছে মল্লিকা।

—কি হয় নি? ইদানীং আয়নার নিজের রূপটা কি দেখছে?

—নিশ্চয়ই।—বাড়ি থেকে বের হবার

আগেই তো আয়নার সামনে আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে চুল বেঁধেছি, সেজেছি, নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেছি। কই কিছু তো চোখে পড়ে নি!

—তা পড়বে কেন? সে দৃষ্টি কি আছে?

মল্লিকা আর এ প্রসঙ্গে কথা বলে নি। শুধু হেসেছে। সূদীপ্তিও হেসেছে। আর তাদের হাসি দেখে যেন টেনটাও হাসতে হাসতে চলতে শুরু করেছে, মল্লিকা জানলা দিয়ে মুখ বের করে হাত নেড়েছে আর সূদীপ্তিও প্ল্যাটফর্মে হাঁটতে হাঁটতে রুমাল উড়িয়েছে।

বেশ কয়েকদিন পরেই সূদীপ্তি চিঠি পেল। পুরী থেকে মল্লিকা লিখেছে—.....অবাক! কান্ড! এখানে পা দেবার সাথে সাথেই অশ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। সামান্য এই কয়েকদিনের মধ্যেই বাবা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। শুধু স্বাস্থ্যেই নয়, মনেও। আশা করছি আর কয়েকদিনের মধ্যে প্রায় সেরে উঠবেন। হাঁপের টান অনেক কমে গেছে। রাতের জল ঘুম হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়াতেও দিনে দিনে আগ্রহ বাড়ছে।—প্রতিদিন দুবেলাই সমুদ্রের ধারে আমরা সবাই মিলে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দুদিন স্নানও করছি। খুবই জয়ে ভরে। টেউগলো বিরাট বিরাট আর অসভ্যও বটে।.....এখন আমরা স্বর্গে

স্বারের কাছে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছি। প্রথম দুদিন ভেতরে মন্দিরের কাছে একটা মস্তবড় ধর্মশালায় ছিলাম।.....সমুদ্র শব্দই দেখছি, ততই তোমার কথা মনে হচ্ছে। আর প্রশ্ন জাগছে মনে—সমুদ্রের সবটুকু নীলই কি আকাশের কাছ থেকে ধার করা, না নিজের গভীরতার জন্যে নীল? সেদিন বাবা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। গতকালও করছিলেন। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না এর কারণ কি। মানুষের মন বড় অশ্রুত—তাই না?..... চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ গভীর চিন্তা করল সূদীপ্তি। ঘরময় ইতস্তত পায়চারি করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে কয়েক টান মেরেই ফেলে দিল। তারপরে ঠিক করল কয়েকদিন ছুটি নেবে এবং—

বিকলে সমুদ্রের ধারেই ওদের সঙ্গে দেখা হল। রিনি-মিনি কলকল করে ছেকে ধরল সূদীপ্তিকে। মল্লিকা অবাক হল। খুশির ভাব গোপন করল। সেই সঙ্গে সূদীপ্তিও। এমন ভাব দেখাল যেন তার আসাটা খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক। বেণীমাধব হাসিমুখে বললেন—আরে, তুমিও এসে গেছ দেখছি! কখন এলে? কোথায় উঠেছ?

—আজ সকালেই। হঠাৎ কয়েকদিন ছুটি পেয়ে গেলাম। তাই চলে এলাম।

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

বেশ করেছ। বড় ভাল জায়গা এটা। এই নীল আকাশ আর এই বিশাল সমুদ্র দেখলে সত্যিই রোগ পালিয়ে যায় বাপুও—বেণীমাধব হাসতে লাগলেন।

—এখানে এসে আমি কিন্তু অনেকটা ভাল বোধ করছি।

প্রদিন ভোরে ওদের সাথে খালি পায়ে বালুবেলায় হাঁটতে হাঁটতে সূর্যোদয় দেখল সূদীপ্তি। সূর্যের প্রথম আভাস মল্লিকার ফর্সা নিটোল কুমারী গাল লাল হয়ে উঠল। তাই দেখে সূদীপ্তি হাসল। মল্লিকা সে হাসি লক্ষ্য করে লজ্জা পেয়ে রিনি-মিনির সঙ্গে বিন্দুক কুড়াতে দূরে চলে গেল। নরম রোদে ঐকমিকি টেউয়ের মিষ্টি গান শুনতে শুনতে হাঁটতে লাগল সূদীপ্তি। বারবারেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে চাইল সাগরের তেউয়ে পা-ভিজানো মল্লিকার উজ্জল অবয়ব।

বেণীমাধব চশমাটা পকেটে পুরে স্বললেন,—মুহুর্তে মুহুর্তে সমুদ্রের রং পাটে যাচ্ছে। কী সুন্দর বল তো। বিধাতার এ এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই সমুদ্রের সামনে দাঁড়ালে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মানুষ কত ক্ষুদ্র।

সূদীপ্তি কিছু বলল না। সে রোদের আপ-অনুভব করল। মল্লিকাকে দেখবার চেষ্টা করল এবং ভাবল, এবারে ফেরা উচিত।

—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যেই মানুষের দেখবার ও শেখবার অনেক কিছু রয়েছে।—তা তো বটেই।—সূদীপ্তি অন্যমনস্কভাবে সায় দিল।

—বুঝলে সূদীপ্তি, গত দু বছর আমি কথায় কষ্ট পেয়েছি। এমনকি হাওয়ার যে এত গুণ, আগে তা জানলে হাঁপানির শুরুর্তেই এখানে চলে আসতাম। ভাবছি—আসছে বছর গ্রীষ্মকালে যদি আবার টান ওঠে তাহলে আবার আমি এখানে আসব।

সূদীপ্তি দূর সমুদ্রের জেলে-ভিগ্ন গুলো দেখতে দেখতে বলল,—চলুন, এবারে ফিরে যাই।

তখন বিকেল। বাতিঘর ছাড়িয়ে নিজের সৈকতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মল্লিকা আর সূদীপ্তি গল্প করছিল। দুজনার ঠোঁটেই হাজার কথার চেউ আর চোখে দিগন্ত-প্রসারী সমুদ্র-নীল ছবি।

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

—সময় হলেই ঠিক পাবে। অত ব্যস্ত কেন?—মল্লিকা মৃদু হাসে।

—কবে সময় হবে? আর মাত্র দুদিন তো রয়েছে।

—সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সূদীপ্তি উসখুস করে।—তোমার বাবা কি মনে নেবেন?

—এত দূরে এসেও তোমাকে ঠিক একা পাচ্ছি না কেন বল তো?

পাঠ্যবস্তু

—সেইটিই তো সমস্যা। —মালিক
জন্মের হল।

দুজনেই গভীর ভাবনায় ডুব দিল।

—এই যে তোমরা এখানে?

বেণীমাধবের কণ্ঠস্বরে ওরা দুজনে
অপ্রস্তুত হল। ভয়ও পেল। রিনি-মিনি
আভিযোগ করে বলল,—তোমাদের সেই
কখন থেকে খুঁজছি। তোমরা পালিয়ে

এলে কেন? মেলা সন্দের সন্দের কিন্দুক
কুড়িয়েছি।

—ইয়ংম্যান বসে থাকলে চলবে কেন?

চল বোড়িয়ে আসি।

সুশীত উঠে দাঁড়াল এবং অনিচ্ছা-
সঙ্কেত মালিকাদের পিছনে ফেলে বেণী-
মাধবের সঙ্গে বালি ভেঙে হাঁটতে লাগল।
বেণীমাধব নানান বিষয়ে অহেলাচনা

করতে লাগলেন। অনেক খোঁজ-খবর
নিলেন। সুশীত কিছু শুনল। কিছু
শুনল না, টুকরো টুকরো জবাব দিল।
এক সময়ে বেণীমাধব বললেন,—মেয়েট
আমার জন্যে বড়ই কষ্ট। মালিকের মত মেয়ে
হয় না। সেবাসঙ্গে, কথাবার্তায় ওর মায়ের
সব গুণগুলোই পেয়েছে। ভাবছি, এবারে
ওর বিয়ে দেব।

যা ব
যে ব
দ
ক
ব

আমরা রাজনীতির কথা বলছি না, বলছি সফল
আর বিনিয়োগের কথা। আপনি যখন আপনার সফল
৭-বছরের জাতীয় সফল সার্টিফিকেটে খাটাবেন, বাজারে
ছাড়া হয়েছে এমন তিনটি ইস্যুর যে কোনটি আপনি বেছে
নিতে পারবেন বৈকি। এগুলি থেকে মোটরকার লাভ ছাড়াও
আয়কর রেয়াত আর সুস্পদ করের সুবিধে পাওয়া যায়।

২য় ইস্যু
মেসাদ ফুরোলে করমুক্ত
প্রায় ৫% চক্রবৃদ্ধি সুদ।

৩য় ইস্যু
বার্ষিক ৫% করমুক্ত সুদ।

৪র্থ ইস্যু
বার্ষিক ৭.৫% করমুক্ত সুদ
আসনের ওপর কর
চাপান হয় না।

৫য় ইস্যু
ব্যক্তিগত কোম্পানিতে জমা
টাকা শুধু বছরে ৩,০০০
পর্যন্ত—সার্টিফিকেটে
খাটান—টাকার কর
হিসেব হয় না।

বিশদ বিবরণের জন্যে
যেকোন ডাকঘর অথবা
আপনার জেলার জাতীয়
সফল সংগঠকের সাথে
যোগাযোগ করুন।



জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

সুশীত শীতকাল হইল। তেউ দেখতে।
মাগল সে এবং ভাবল সমুদ্রে অনেক
মাগল, অনেক হিংস্র জীবজন্তু আছে।

—প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কটা
গেলেই খুব শিগগির তোমাদের বিয়েটা
দিয়ে দেব।

চমকে উঠল সুশীত এবং কথাটা
অবিশ্বাস্য বলে মনে হল তার।

—সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যেই পেয়ে
যাব মনে হয়। ততদিনে তুমিও একটু
দাঁড়িয়ে নাও।

জুবন্ত সূর্যের শেষ আভাষ সমস্ত
আকাশটা লাল হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কে
যেন মূঠো মূঠো সিঁদুর ছিড়িয়ে দিয়েছে।
সমুদ্রের প্রতিটি তেউ যেন আনন্দে নাচছে।
আর শেষ আলোয় ক্ষণে ক্ষণে রং বদল
করছে। তেউ ভেঙে জেলে-নৌকাগুলো
নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ফিরে আসবার চেষ্টা
করছে।

সুশীত মুগ্ধ হল! বেণীমাধবের প্রতি
পূর্বে মনোভাবের জন্য অনুশোচনার ভরে
উঠল তার মন। এক অপত্যাশিত আনন্দে
তার দেহ-মন অচ্ছন্ন হয়ে রইল। সে ভেবে
পেল না ঠিক এই মনোভব তার কিছ-
বলা উচিত কি না। ভাল করে তাকিয়ে
দেখল মানুষটিকে। দৃষ্টি মেল দিল
বিশাল উদার সমুদ্রে।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল। দূরে
আলোগুলো দেখা যাচ্ছে। মাথায় ওপর
দিয়ে এক বাকি পাখী উড়ে গেল। সমুদ্রের
গর্জনও যেন অনেক কম মনে হল। এক
সময়ে বেণীমাধবই বললেন,—এবারে ফেরা
যাক।

লোকালয়ের পথে হাঁটতে হাঁটতে
সুশীত ভাবল, আগামীকাল সে শব্দ
মঞ্জিকাকে নিয়ে কোণারকের সুখনিদের
দেখতে যাবে।

* * * *

কলকাতায় ফেরার পর আরো মাস
দেড়েক কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে
সুশীত নানান কাজের চাপে অত্যন্ত
ব্যস্ত ছিল। তাই সে মঞ্জিকাদের বাসায়
বেশিদিন যেতে পারে নি। তবুও তার
দিনগুলি একটা মিষ্টি আমেজের মধ্যে
দিয়ে কাটছিল।

সেদিন সন্ধ্যায় অনেকটা সময় হাতে
নিয়ে সে মঞ্জিকাদের বাসার পথে একটা
খুশির সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রওনা হল।
—রাস্তায়, দোকানে, পার্কে সব আলো-
গুলো জ্বলে উঠেছে। চতুর্দিকে হাজার
মানুষের মিছিল। সবাই যেন হাসছে,
ছুটেছে, আনন্দের জোয়ারে ভেসে চলেছে।
কোথাও যেন কোন দঃখ নেই। কোন
সমস্যা নেই। খান্দের ঘাটটি নেই, লাল

ত্রিকোণের প্রয়োজন নেই, রাজনৈতিক
অরাজকতা নেই। সব রাতারাতি মিটে
গেছে। প্রত্যেকের মন্থ থেকেই সুখ চুয়ে
চুয়ে পড়ছে। —একটা সিগারেট ধরিয়ে
সুশীত এগিয়ে চলল।

মঞ্জিকাদের বাসায় দরজার কাছে এসে
সুশীত দেখল এদিককার রকে কয়েকটা
বড়ো লস্টন জেলে মহা উল্লাসে পাশা
খেলেছে। হাসি পেল তার। বাসার ভিতরে
এল সে। —দরজা খোলা। কিন্তু কারো
কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? রিনি-
মিনিকেও তো দেখা যাচ্ছে না! তবে কি
ওরা বেড়াতে কিংবা সিনেমায় গেছে?
রিনি-মিনির নাম ধরে দু'বার ডাকল সে।
তারপর পাশের ঘরে উঁকি দিতেই বেণী-
মাধবের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।
কাশতে কাশতে বেণীমাধব তাকে কাছে
বসতে বললেন। একটু ধাতস্থ হতেই
সুশীত জিজ্ঞাসা করল,—কেমন আছেন?

—ভালই। তবে হাঁপের একটু টান
আবার দেখা দিয়েছে। —গম্ভীর গলায়
উত্তর দিলেন বেণীমাধব।

সুশীত কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।
কি বলবে চট করে ভেবে পেল না। তারপর
পাশের ঘরের দিকে চোখ রেখে বলল,—
রিনি-মিনিদের দেখছি না যে।

—মঞ্জির সাথে বাজারে গেছে। ফিরতে
দেরি হবে। —বেণীমাধবের কণ্ঠস্বর আরো
গম্ভীর শোনাল।

সুশীত অস্বস্তিবোধ করতে লাগল।
ঘরের মধ্যে কেমন যেন গুমোট গরম
অনুভব করল সে।

—তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই
সুশীত।

একটু যেন শীতকাল হইল সুশীত।
রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে ভাল করে
তাকাল সে। —ঘর ঈষৎ অন্ধকার। একটা
ছায়ামূর্তি হয়ে বেণীমাধব বসে আছেন।
যথাসাধ্য গলাটাকে পরিষ্কার করে সে
বলল,—বলুন।

—তুমি বান্ধবমান ছেলে, আমাকে
নিশ্চয়ই ভুল বদবে না। তোমার এখানে
আসা-যাওয়াটা হয়ত অনেকেরই মনঃপূত
নয়।

সুশীত ঘামতে লাগল।

—যদিও মঞ্জিকার বিয়ের ব্যয় হলে,
তবুও এখন আমি ওর বিয়ে দেব না।
আমি অসুস্থ। রিনি-মিনি ছোট।

সুশীত তার মাথার মধ্যে কেমন যেন
মন্ত্রণা অনুভব করতে লাগল। কপালের
দু'পাশের রংগুলো যেন টনটন করে উঠল।

—তাছাড়া তোমাদের মত শিক্ষিত
ছেলের মেয়ের অভাব হবে না বাংলাদেশে।
—বেণীমাধব চুপ করে রইলেন।

কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ঘর
থেকে বেরিয়ে এল সুশীত। রাগে, দঃখে,
অপমানে তার চিন্তাশক্তি লোপ পেল।
সারা শরীর জ্বলতে লাগল।

গলিতে পা দিতেই নোংরা আবজনার
গন্ধে তার মনটা যেন আরো বিষিয়ে
উঠল। —না, মঞ্জিকার সঙ্গে আর কোন
সম্পর্ক নয়। সমস্ত কিছুরই ইতি এই
খানে। বিষ্টেরার! মানুষকে বিশ্বাস
করাও পাপ। এত ছলনার তো কোন
প্রয়োজন ছিল না।

উৎকট হাসিতে সচকিত হল সুশীত।
দেখল ভাঙা রকে ভুতুড়ে আলোয় শকুনিরা
পাশা খেলছে। —কি বিস্তী এই গলিটা।
এর ক্ষয়ে-যাওয়া গায়ে লাগলাগি বাড়ি-
গুলো। আর এখানকার মানুষগুলো।
এই বিস্তি পট্টর কোন কিছই স্বাভাবিক
নয়। কোন কিছই সহজ-সরল-ভদ্র নয়।
এ এলাকার সমস্ত ব্যতাসই দঃষিত। সমস্ত
পাড়াটাই যেন কুষ্ঠরোগীর মত দগদগে
ঘায়ে পড়ে।

বড় রাস্তায় এসে কিছুটা যেন সুস্থ
হল সুশীত। অবস্থা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে
রইল। চতুর্দিকে বার কয়েক চাইল। তার-
পরে হাঁটতে লাগল। ভাবল মঞ্জিকার
সঙ্গে দেখা হলে আচ্ছা করে দু'কথা
শুনিয়ে দেওয়া যেত। হাঁটতে হাঁটতে
একটা পার্কের সামনে এসে পড়ল সে।
চুকে পড়ল ভেতরে। খুঁজে খুঁজে একটা
ফাঁকা বেঞ্চে গিয়ে বসল।

তার সুন্দর ফরফুরে হাওয়া বইছে।
এখানকার ব্যতাস কত হাসকা, কত মিষ্টি।
সুশীত চারদিকে চাইল। —পার্কের বাইরে
নতুন ডিজাইনের বাড়িগুলো কি সুন্দর।
পার্কের ভেতরে ছোট ছোট বাড়িগাছ-
গুলোকেও চমৎকার লাগছে দেখতে।
আকাশে অজস্র তারা। আর একটু পরে
হয়ত চাঁদ উঠবে। দূরে কোথায় যেন
মাইকে সানাই বাজছে। —বেচারী মঞ্জিকা!
ওর তো কোন দঃখ নেই। ও হয়ত এসবের
কিছই জানে না। জানতেও পারে না।

মঞ্জিকার ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট পেল
সুশীত। আর সমস্ত রাগ গিয়ে জমা হল
বেণীমাধবের ওপর। সমস্ত নষ্টের মূলে
ঐ একটি লোক। কিন্তু বেণীমাধবের ওপর
প্রকৃতপক্ষে যতটা রাগ করা উচিত, ততটা
সে যেন রাগতে পারল না। তার বদলে
যেন হঠাৎ একটা নিশ্চিন্ত হাসকা হাসি
ফটে উঠল তার মুখে। আর ঠিক সেই
মনোভব সুশীত ভাবল, তাকে অপেক্ষা
করতে হবে। আগামী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত।

বঙ্গবন্ধু

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিহার তাঁর প্রবন্ধে আরও লিখেছেন: "রুকারের পরবর্তী আমলে ভারতীয় নাটকের অনেক মূল্যবান অনুবাদ করা হয়েছে—ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে এসব অনুবাদ সার্থক সৃষ্টি। এই অনুবাদ-গুলিতে প্রচেষ্টা করা হয়েছে মূল নাটকের গাঠনিক দিকটা বজায় রাখতে। তবে বেশির ভাগ জনপ্রিয় সংস্করণগুলিতে বাঙ্গালমণ্ডের জন্য তাঁর অনুবাদ-পান্ডুলিপিতে ভারতীয় নাটকের গাঠনিক দিকটার ওপর দৃষ্টি দেওয়া হয় নি। Considering the usual way of acting in German stages the realisation of such dramatic forms was not possible

একমাত্র এই শতাব্দীতেই বেরটল্ট ব্রেশটের প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে ভারতীয় নাটক অভিনয় করবার সত্যিকার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একথা সত্য যে, এমন কোন প্রমাণ নেই যে, ব্রেশটের কাজে প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় নাটকের সামান্য প্রভাব পড়েছে। তবে একথাও অজানা নয় যে, ব্রেশট চায়না, জাপান প্রভৃতি দেশের অর্থাৎ ইস্ট এশিয়ান রংগমণ্ডের থেকে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। এপিক থিয়েটার সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি চরম সাফল্য অর্জন করেছেন 'দ্য ককেশিয়ান চক্ সার্কল' নাটকে। এটি তাঁরই রচিত এবং এর পরিচালনাও করেছিলেন তিনিই। মাল্টি ডিমেনশনাল সিন-ইক্ এক্সপ্রেসনের সার্থক রূপায়ণ দেখা যায় 'চক্ সার্কল' নাটকে।

এই নাটকটিতে আমরা নানা ধরনের কাব্যিক বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখতে পাই—এই বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করবার জন্যই দরকার হয়েছে নানা স্তরে দৃশ্যের অব-তারণা করবার—ঠিক এমনিভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি করা হোত পুরনো সংস্কৃত নাটকে।

অর্থাৎ সহজ কথায় রোনাল্ড বিয়ারের মত হচ্ছে এই: ব্রেশটের আগে জার্মান ট্র্যাডিশনাল থিয়েটারে যেভাবে নাটকের

অভিনয় হোত, সেইভাবে সংস্কৃত নাটকের মণ্ডরূপায়ণ করতে গিয়ে নাটকগুলোও অভিনয়ে দাঁড়াতে পারে নি। যেহেতু ব্রেশট-পূর্ব জার্মান নাটকগুলো ছিল ড্রামাটিক নাটক, সেই কারণেই এপিক শ্রেণীর সংস্কৃত নাটক ঐ এবই পদ্ধতিতে মণ্ডস্থ করলে তা সাফল্যলাভ করতে পারে না। ব্রেশট এসে জার্মান স্টেজে এপিক নাটকের প্রবর্তন করলেন—এপিক বলতে এখানে বর্ণনাত্মক ভাষার নাট্য রচনাকেই বোঝাচ্ছে। এপিক থিয়েটারের অভিনয় পদ্ধতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদকে গ্রহণ করতেই হবে—আর এই বিচ্ছিন্নতাবাদ থাকার ফলে দর্শককে সচেতন মন নিয়ে অভিনয় দেখতে হবে—নাটকের বস্তুকে বৃদ্ধি দিয়ে বৃদ্ধিতে হবে—দর্শকমনের ওপর কোন সম্মোহনের ভাব প্রসিদ্ধ হবে না। কালিদাস প্রমুখ পুরনো ভারতবর্ষের সংস্কৃত নাট্যকারদের নাটকেও বিচ্ছিন্নতাবাদের একটা বিরাট প্রভাব ছিল। সুতরাং ব্রেশটীয় ধারায় ভাষ্যকের দিনে যদি ইউরোপে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করানো যায়, তবে সে অভিনয় সাফল্যলাভ করবেই করবে।

বার্লিনে ব্রেশটের যেসব প্লে দেখবার সুযোগ হয়েছিল, সেগুলোর নাম হচ্ছে: "কোরিওলান"—এটি শেল্পপীরারের "কোরিওলেনাসের" ওপর ভিত্তি করে লেখা। ভলান্টায়ার ভূমিকায় অদ্ভুত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন হেলেনা ভাইগেল। 'দ্য ব্রেডশপ'—একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ট্রাজিক নাটক। বৃন্দ-বর জন উইলেটের 'দ্য থিয়েটার অফ বেরটল্ট ব্রেশট' বইটি সংগে থাকতে ব্রেশটের নাটকগুলোর বিষয়বস্তু মোটা-মুটি বুঝতে পারতাম—কারণ বইটিতে ব্রেশটের সমস্ত নাটকেরই সারাংশ ইংরাজীতে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া আমার সংগে একই হোটেল ছিলেন—হোটেল উইল্টার ডেন লিগেন্ডেন—জন উইলেট। তিনি বৃটিশ ব্রেশট-বিশেষজ্ঞ, প্রতিউসার এবং নাট্যকার। উইলেটের সংগে অবসর সময়ে ব্রেশটের নাটক নিয়ে আমার কিস্তিত আলোচনা হোত। অবশ্য সব সময়েই যে আমাদের মতৈক্য হোত, তা নয়—যেমন "কোরিওলান" ব্রেশট পরিশোধিত কোরিওলেনাস) নাটকের উজ্জ্বলিত-প্রশংসা

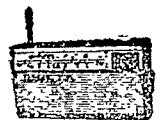
করাছিলেন উইলেট—আর্ম বললাম, শেল্প-পীরারের নাটকের এটি একটি বিকৃত রূপায়ণ। অভিনয়ের ব্যাপারেও আমরা একমত হতে পারি নি। জার্মানদের অভিনয় উইলেটের ভাল লেগেছিল—আমার মনে হয়েছিল, গিলগড বা অ'ল-ভিয়ারের মত শক্তিশালী অভিনেতা ছাড়া কোরিওলেনাস চরিত্রের রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তবে হেলেনা ভাইগেলের কথা আলাদা—তাঁর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী যে ভূমিকাতেই অভিনয় করুন তা সব সময়েই হবে প্রথম শ্রেণীর। ১৯৫৬ সালে প্রথম হেলেনা ভাইগেলের অভিনয় দৈর্ঘ্য প্যালেস থিয়েটারে প্রদর্শিত 'মাদার কারেজে' এবং 'ককেশিয়ান চক্ সার্কল' তখনই বুঝতে পেরেছিলাম এমন অভিনেত্রী সারা ইউরোপে আর দ্বিতীয়টি নেই। টি-ভিতে হেলেনা ভাইগেল 'দ্য ভিসন অফ সেমোন মাচার্ড'—এ ডাবল রোলে অভিনয় করেছিলেন—দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বার্লিনে দুটি ব্রেশট বচিত ওপেরা দৈর্ঘ্য—'রাইজ এ্যান্ড ফল' অ'ল-দ্য টাউন অফ মেহাগনী' ও 'দ্য কন্-ডেমনেশন অফ লুকাস'। গার্লের 'মাদার' উপন্যাসের ওপর রচিত ব্রেশটের 'দ্য মাদার' নাটকটি দেখবারও সুযোগ হয়েছিল—ভ্যাসোভার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন হেলেনা ভাইগেল—শেষ দিকে তিনি যখন লাল পতাকা হাতে যুদ্ধ-বিরোধী মিছিলের পরিচালনা করছেন, সে দৃশ্যের মাহাত্ম্য ঠিক ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ব্রেশটের 'দ্য ডেইজ অফ দ্য কামিউন'—এর নাট্যরূপায়ণ করেছিলেন অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে বার্লিনার আসেসবল্। প্যারিস কমিউনের কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে কিছ্ ঐতি-হাসিক এবং কিছ্ কাব্যিক পথচারীদের দ্বারা—এরা সবাই এসে জড় হ'লেন মোমাটের একটি ক্যাফেতে। 'মান ইস্ট-মান' নাটকটিও খুব ভাল লেগেছিল—নাটকটিব বহিঃসংগে হাস্যরস—ভেতরে রয়েছে চিন্তা করবার যথেষ্ট মালমশলা।

এ ছাড়া বার্লিনে বিখ্যাত রাশিয়ান নাটক 'দ্য ড্রাগন'—এর জার্মান ভাষায়

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অ ল ও য়া হুট স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টার (জাপান মেক) জন-প্রিয়। দে শ ব্যা পী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টার। নাইট-জ্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7



সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

মণ্ডাভিনয় দেখেছিলাম। এ নাটকটি ইওরোপে খুব জনপ্রিয় হয়েছে—আমার নিজের কিন্তু এ নাটক ভাল লাগে নি—এর সাংকেতিকতার দিকটা আমার বস্তু জুড় লেগেছে। আসলে এটি প্রচারধর্মী নাটক—কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হয়েছে। বরং এটিকে শিশুনাট্য সংজ্ঞা দিলে এর প্রতি সন্নিবিচার করা হবে। মেতারলিঙ্কের 'ব্লু বার্ড'ও শিশুনাট্য—তবে এর সঙ্গে নাট্যকার যে দার্শনিক তত্ত্ব জুড়ে দিয়েছেন, তার ভেতর যথেষ্ট শিকপ-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়—'ড্রাগনের' তত্ত্বের দিকটা অত্যন্ত স্থূল—অত্যন্ত বেশি প্রকট। জার্মানীতে—ঠিক কোন জায়গায় মনে নেই—গীথ মাস্কেটিয়াস—এর জার্মান ভাষান দেখেছিলাম মণ্ডের ওপর। টেকনিকের দিক থেকে এ প্রডাকসনটি হয়েছিল অতুলনীয়—ঘোড়সওয়ারদের ঘোড়ার কাজ করছিল লম্বা লাঠির মাথায় ঘোড়ার মাথা আঁটা এবং তলার দিকে বর্শার ফলা লাগানো এক-একটি দণ্ড। লাঠির ওপর বসে ঘোড়সওয়ার যখন গ্যালপ করছিলেন, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে চমৎকার ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল—ঘোড়া থামিয়েই দণ্ডটির বর্শার দিকটা সওয়ার গেঁথে দিচ্ছিলেন স্টেজের ওপর। অথচ এর দ্বারা মোটেই হাস্যরসের সৃষ্টি হচ্ছিল না।

বার্লিনে ডয়েচে থিয়েটারে সোস-এর বিখ্যাত নাটক 'নাথান দি ওয়াইজ' দেখেছিলাম—এখানকার স্টার এ্যাক্টর ছিলেন ভোলফ্‌গ্যাংগ হাইনজ—ইনিই নাথানের পরিচালনা এবং নামভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। এ থিয়েটারের অভিনয়রীতি বাস্তবধর্মী—মস্কা আর্ট থিয়েটারের মত।

এবার ভাইমার, ট্রুসডেন, লাইপজিগ এবং রস্টকে যে সব শো দেখেছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিচ্ছি : ভাইমারে দেখেছিলাম পাঁচ অঙ্কের বিখ্যাত ব্যালে 'গাজানে'। ডয়েচে ন্যাশনাল থিয়েটারে এটি প্রডিয়ুস করেছিলেন। এর লিরেটো ছিলেন আর এন ডেরশাউইন, মিউজিক ডিরেক্টর রুডলফ ব্রানের এবং কোরিওগ্রাফার রুথ ভোলফ্‌। ওপেরা হাউসে হেদবারের 'ডেমার ভাইস্‌টস্‌'—এর মণ্ডরূপায়ণ দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

লাইপজিগের ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গৈভাল্ড হাউস অর্কেস্ট্রা মণ্ডস্থ করেছিলেন পিটার চায়কোভস্কির সোয়ানলেক—চায় অঙ্কের ব্যালে। এক হিসাবে এই থিয়েটার হাউসটি সংগীতরাসিকদের কাছে খুবই স্মরণীয়। ফেলিক্স মেন্ডেলসন এইখানেই তাঁর জীবনের শেষ এবং ট্রুসডেন পর্বটি কাটিয়েছিলেন ডিরেক্টর হিসাবে। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি খার্স্টনদের সেরা ধর্মসংগীত ইয়োহান সেবাস্টিয়ান

বাইথের 'সেইন্ট ম্যাথুজ প্যাসন' রিভাইভ করেছিলেন।

রস্টকে এসে পৌঁছেছিলাম এক বিকেল বেলায়। ওখানকার সমস্ত থিয়েটারের পরিচালনার ভার একজন ডিরেক্টরের উপর—ম্যানেজারও একজন। এই ম্যানেজার আমি পৌঁছনোর আধ ঘণ্টার ভেতর আমার হোটেল এসে হাজির—সঙ্গে কোন থিয়েটারে কি প্রোগ্রাম হচ্ছে তার চার্ট। অন্যকে অনুরোধ করলেন কোথায় কি শো দেখবো তা তাঁকে বলতে। সব দেখে শুনে বললাম—“এখানকার লিটল থিয়েটার দেখবো। দেখেওছিলাম—সাতাই এটি একটি পরীক্ষানিরীক্ষামূলক থিয়েটার। ঐ ম্যানেজার ভদ্রলোককে বলছিলাম, পিটার ভাইসের কোন একটি নাটক দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় কিনা। তিনি বললেন, ওঁদের একটি স্টেজে ভাইসের ভিয়েটনাম বিষয়ক নাটকটির মহড়া চলছে—উনি আমার রিহাসাল দেখবার ব্যবস্থা করবেন। ভাইসের এই বিখ্যাত নাটকটির মহড়া দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম এইভাবেই। রস্টকে 'সুদরেল' নামে একটি তিন অঙ্কের ব্যালেও দেখেছিলাম। এর কোরিওগ্রাফার ছিলেন ভেরা ব্রয়ার এবং সংগীত পরিচালক কার্ল হাইনজ্‌ রিখটার।

ট্রুসডেনেও আবার হেদবারের 'ডেমার ভাইস্‌টস্‌' দেখেছিলাম।

[কমশ]

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

বন্ধন শিল্পে অভিজ্ঞা
পাকুল সেনগুপ্ত

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তায়
মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর
এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙলায়

ছিল না বললেই হয়। বাঙলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণা ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুদেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শূদ্ধ নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পরম উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে 'জলখাবার শিপের' বহুবিচিত্র পদ্ধতি সংগ্রহ করে সেগুদলি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে বুদ্ধির দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।”

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !! মূল্য : ছয় টাকা

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

১। ১১৮১১১১ ১২২২২২২ ২। ১১৮১১১১ ১২২২২২২ ৩। ১১৮১১১১ ১২২২২২২ ৪। ১১৮১১১১ ১২২২২২২ ৫। ১১৮১১১১ ১২২২২২২ ৬। ১১৮১১১১ ১২২২২২২

মুক্তি সংগ্রামের ছবি

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটিতে মনে পড়ে দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক শহীদের অঙ্গদানে, অনেক বীরত্বপূর্ণ ঘটনার এবং অনেক মানুষের ত্যাগে মহৎ অমর কাহিনী রচিত হয়েছে। এই অমর কাহিনীর কিছু কিছু অংশ গল্পে, উপন্যাসে যেমন, তেমন চলচ্চিত্রে রূপ লাভ করেছে। বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে অনেকগুলি ছবি নির্মিত হয়েছে। চলচ্চিত্র মানের দিক থেকে সবগুলি উন্নত না হলেও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস যদি কেবলমাত্র মুক্তি সংগ্রামের ছবি দেখাবার জন্য নির্দিষ্ট থাকে, তবে এই দিনটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ হয়। কেবলমাত্র ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র নয়, সেই সঙ্গে পৃথিবীর সানা দেশের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা করা উচিত। অতীত দিনের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী-চিত্র থেকে আজকের দিনের কিছুটা ভিত্তিতে নাম পর্যন্ত। তা হলে এই দিনটি সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া শোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন এ বিষয়ে ভাবতে পারেন — দুজন।

নাটকের কথা

লালন ফকির

রূপকার নাট্য সংস্থার প্রীতিকা-রত দত্তের পরিচালনায় নতুন নাটক 'লালন ফকির'। একদিকে সবিতারত



এভারলিং পিকচার্স 'গান, রাত, উন্মাদন'

দত্তের গানের খ্যাতি আর একদিকে লালন ফকিরের ইতিকথা জানবার আগ্রহ; দুয়ে মিলে এই নাটকটি সম্প্রতি নাট্যজগতে গভীর ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছে। রূপকারের এই নাটকটিতে তৃপ্তি মিষ্টের অংশ গ্রহণে দর্শকদের মধ্যে আরো আকর্ষণ বেড়েছে।

বাংলার সাহিত্য, সংগীত ও জাতীয় জীবনে 'লালন ফকির' একাট আগ্রহ সৃষ্টিকারী নাম। তিনি একজন সহজিয়া-ধর্মী সাধক ছিলেন। তাঁর বাউল গানের কাব্য-সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথকেও আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রসংগীতের মধ্যে লালন ফকিরের গানের প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাবের কথা তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন। লালন ফকির সম্পর্কে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন ডাঃ মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন।

তিনি লিখেছেন : "লালন ফকির অসাধারণ প্রতিভাবান কবি ও সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী পাঠে স্বতই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়।..... হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মরমিয়া-বাদ তাঁহার চিন্তা-প্রয়াগ সংগমের সৃষ্টি করিয়াছে। এই লোককবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির পূর্ণ মূল্য অবধারণে ইহাই বিশেষ প্রয়োজন....."।

ডাঃ মনসুর উদ্দিন এ কথা লিখেছেন বহু বৎসর আগে। বাংলা তখন অবিভক্ত। তখন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিভেদের জন্য আমরা সাম্রাজ্যবাদের উপর দোষ চাপাতাম। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ যদিও নেই কিন্তু তার সাম্রাজ্যবাদী শাসন-কারীরা রয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ভেদ-বিভেদে এখনো প্রতি বছর আমাদের জাতির জীবন কলুষিত হয়। এখনো সাম্প্রদায়িকতার লজ্জা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। এই পরিস্থিতিতে লালন ফকিরের সাধনা ও কাব্য-সংগীতকে যদি দেশবাসীর সামনে আর একবার তুলে ধরা যায় তা হলে অন্তত আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করা যাবে। এ কারণে রূপকারের এই নাট্য প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানাই। যেকালে নাট্য সম্প্রদায়ের একাংশ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার আবর্তে পড়েছে, কিন্তু বিমূর্ত নাটকের প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে জাতীয় নাট্য ঐতিহ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। বিদেশীয়ানার নকল, বিশারদ

বিশারদ

সাহিত্যিক বঙ্গমতী

হয়ে উঠেছে, সে কালে রূপকারগোষ্ঠী একটি সমন্বয়যোগী নাটক উপস্থাপন করেছেন।

হিন্দু-মুসলমানের আত্মীয়তা যে ধর্মের উর্ধ্বে, এক দেশ এক জলবায়ুর মানুষ, জাতীয়তায় তার পরিচয়। লালন ফকিরের বাণীতে এ কথা স্পষ্ট-তর হয়ে উঠেছে। আলোচ্য নাট্যরূপে মোটামুটি এই বাণীকে প্রকাশ করার চেষ্টা হয়েছে। লালন ফকিরের জীবন বৃত্তান্ত বড় কৌতূহলজনক। তিনি ছিলেন হিন্দুর ঘরের মানুষ। বিয়ের পরে তীর্থ ভ্রমণে যাবার পথে বসন্ত রোগাক্রান্ত হয়ে পথে পরিত্যক্ত হন। এক মুসলমান দম্পতি তাকে সেবাযত্নে বাঁচিয়ে তোলেন। কিন্তু মুসলমানের ঘরে অন্ন গ্রহণের জন্য সেকালের হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান হয় না। সিরাজ ফকিরের সংস্পর্শে এসে সহজিয়া মতবাদে তাঁর জীবনের গতি ভিন্ন পথে অগ্রসর হয়। সমাজে জাতি ও ধর্মভেদ এবং ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই বিদ্রোহের পূর্ণ প্রকাশ—লালন ফকিরে।

নাট্যকার এই কাহিনীর মূল অংশকে যথাযথভাবে প্রকাশ করেছেন। তবে সব কিছুর মিলিয়ে দেখলে লালন ফকির সম্পর্কে আমাদের মনে যে ইমেজ তৈরি হয়ে আছে তাকে যেন অনুভব করতে পারি না। সিরাজ ফকির এখানে বেশ সহজ ও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাটকটি কিহুটা কিংবদন্তী আশ্রিত। অন্তত লালনের হিন্দু স্ত্রীর ভূমিকা দেখে তাই মনে হয়েছে। স্ত্রী ও মা লালনকে ত্যাগ করতে পারেন না, কিন্তু সমাজের কত বড় চাপ থাকলে এবং তার সঙ্গে সংস্কার যোগ হলে তা সম্ভব হয় এই পরিস্থিতি পরিষ্কার হয়ে না উঠলে মনে হতে পারে লালন যেন একদিকে হিন্দু স্ত্রী আর একদিকে মুসলমান স্ত্রী নিয়ে মানসিকভাবে টানাপোড়েনে ভুগছেন। যে মহন্তর প্রেম প্রজ্জ্বলিত শিখা বিস্তার করে ব্যক্তিগত প্রেমের মোহ ও ক্ষুদ্রতাকে পুড়িয়ে দিল, স্ত্রীর প্রতি প্রেম বিকশিত হয়ে উঠলো মানুষ ও সমাজের প্রতি ভালবাসায়, তার অনুভূতিতেই ত' নাটকের সার্থকতা, লালন ফকিরের বৈশিষ্ট্য হয়ে ফুটে ওঠা উচিত। লালন ফকির সাধারণ মানুষের কবি ও দার্শনিক, তিনি সাধারণ মানুষের ভাষায় তাদের মনের কথা বলতে পেরেছিলেন বলে এত জনস্বীকৃতি ও গুরুত্ব আসন লাভ করেছিলেন। কিন্তু নবস্বীপে তাকে স্বীকৃতির পরিবেশ কি উনিবংশ শতাব্দীর কল্পমণ্ডুকতার মধ্যে ছিল? নবস্বীপের দৃশ্যটি দেখে



অহাংকি কৃষ্ণবাস ছবিতে অসীমকুমার রবীন্দ্রনাথের একটা কথা আমার মনে হয়েছে : “আমাদের দেশে যারা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন, অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুল তাঁদের শিক্ষা।” হিন্দুয়ানীটা আসলে আমাদের মজায় মিশে আছে। আজকের কালচেতনা নিয়ে অনুভব করলে সময় সময় সংলাপ আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন দেখা গেছে। তাতে নাটক প্রযোজনার উদ্দেশ্য আরো সার্থক হবার অবকাশ ছিল। নাটকে একটি চরিত্র ভূবন ডাকহরকরা (ভুল শুনছি কি না জানি না)। লালন ফকিরের শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন গগন হরকরা। তিনি কুষ্ঠিয়ার ঠাকুরদের জমিদারী এলাকায় ডাক পিয়ন ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। লালন ফকিরের গান ও দার্শনিকতার প্রচারে গগন হরকরার একটি ভূমিকা ছিল।

লালন ফকির নাটকে নামভূমিকাতে রূপদান করেছেন সবিতারত দত্ত। গায়ক অভিনেতা হিসাবে বাংলার নাট্যজগতে তাঁর স্থান অস্বিতীয় বলা যায়। এই নাটকে যুবক লালনের প্রাণচঞ্চল প্রথম জীবন, স্মৃতিশক্তিহীন অসহায় মধ্যবর্তী জীবন এবং এক সহজিয়া কবি ও জীবনবর্শনের নায়ক—জনগণের আপনজন লালন ফকিরের চরিত্রকে সবিতারত

সেবাল
একাল
টিকালের
আদর্শ

একাল
টিকালের
আদর্শ

পরিচালনা—গোপাল কৃষ্ণ রায়
সাবিত্রী



সাত্ত্বিক শুভমুক্তি
২৮শে আগস্ট !
বসুন্ধী ০ বীণা ০ সিন্ধু
এবং অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে।

শ্রীশ্রীমহারাজের আশীর্বাদপুত

সব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলী

জুয়েলস

৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতিষী

ও হস্তরেখাবিদ শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত

শ্রীহরিশ্চন্দ্র শাস্ত্রী

মহাশয় বলেন—

“আমার কয়েকজন বিশিষ্ট গ্রাহক জুয়েলস-এর সম্মুখ ধারণা করিয়া অল্প দিনেই বেশ শুভফল লাভ করিয়াছে। ইহা সকাশে আমি এই নব প্রতিষ্ঠানটির দীর্ঘজীবন কামনা করি।”

রাজ-জ্যোতিষী

—ব্রিটিশজনের শাস্তিই আমাদের কাম্য—

শ্রদ্ধেয় ডঃ শাস্ত্রী মহোদয়ের—

- (১) সামুদ্রিক ব্রহ্ম (বাংলা ২য় সংস্করণ) দাম ৬ টাকা
- (২) JUEL OF PALMISTRY (2nd ed.) Price Rs. 10/-
- (৩) A GUIDE TO ASTROLOGY (1st ed.) Price Rs. 11/-

হস্তরেখা ও জ্যোতিষের উপর ৫০ বৎসরের অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই তিনটি বই-এর দক্ষিণ কলিকাতার খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র—

জুয়েলস

৬, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫

সকাল ৮-১২। বৈকাল ৪-৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২টা হইতে শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত বন্ধ।



দায়িত্ব বহন ছবিতে দায়িত্ব চট্টোপাধ্যায়

দুঃস্থ নিষ্ঠার সঙ্গো রূপদান করেছেন। ফকিরের অংশে অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা অভিনেতা অপেক্ষা নাটকের দুর্বলতা জন্য। সেকথা আগে বলেছি। লালনের হিন্দু স্ত্রীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন গীতা দত্ত। এক সরল বালিকা বধুর অন্তরিকতা ও প্রেমের অভিব্যক্তিতে গীতা দত্তের অভিনয়ে চরিত্রটি দর্শকদের মনে রোখপাত করে; কিন্তু চরিত্রটিকে নাট্যকার কিছুটা প্রয়োজনের বাইরে টেনে এনেছেন মনে হয়েছে। লালন ফকিরের মুসলমান স্ত্রী ও সাধন সহযোগিনীর চরিত্রে তৃপ্তি মিত্রের অভিনয় গভীর ভাবোদ্যোতক। প্রলোভন ও স্বার্থবুদ্ধিবিমুক্ত একটি গ্রাম্য নারী চরিত্রকে শ্রীমতী মিত্র ব্যক্তিগত পরিপূর্ণ করে প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার অন্তঃসলিলা প্রেমের ধারায় দর্শক-মন মুগ্ধ হয়। সিরাজ ফকিরের চরিত্রে অভিনেতার এক সার্থক সৃষ্টি। চেহারা ও সংলাপে দর্শকরা তাঁকে সহজভাবে গ্রহণ করেছে।

এই নাটকের অন্যতম প্রগতিশীল অসংখ্য বাড়ল গান। সবিভারত দত্ত ও সিরাজ ফকিরের কণ্ঠে গীত গানগুলি দর্শকদের পরম তৃপ্তি দান করেছে। তবে দুঃস্থ একটি গানের সুরের ব্যাপারে মনে হল একটু সাবধানতার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের একটা উক্তি উদ্ধৃত করলে সতর্কতার কারণ বোঝা যাবে। “কবির প্রতিভা থেকে যে রস-ধারা বয় মন্দাকিনীর মত অলঙ্কারকে থেকে সে নেমে আসে; তারপরে এক-দল লোক আসে যারা ঝাল কেটে সেই ঝল চাষের ক্ষেতে আনতে লেগে যায়। তারা মজুরী করে, তাদের হাতে এই ধারার গভীরতা, এর রিশুদ্ধতা চলে যায়, ফলিতময় নানা প্রকারে বিকৃত

হতে থাকে।” আজকাল চলতি হাটে রাউল গানের দশা দেখে এই সতর্কতার কথা মনে এল।

নিউ প্রভাস অপেরার তিনটি নতুন পালা। নিউ প্রভাস অপেরা ছবি ব্যানাজীর “সিরাজের কাহিনা”, দেবেন নাথের “বিপ্লবী ভিয়েতনাম” এবং ভৈরব গাঙ্গুলীর “নিহত গোলাপ” এই তিনখানি ভিন্নধর্মী নতুন পালা নিয়ে এ বছরে বিভিন্ন যাত্রার আসরে উপস্থিত হবেন। “সিরাজের কাহিনা” পালায় দীর্ঘদিন পরে যাত্রামোদীরা পূর্ণেন্দু-শেখর ব্যানাজীকে “সিরাজ” চরিত্রে দেখতে পাবেন। “বিপ্লবী ভিয়েতনাম” পালায় পূর্ণেন্দুবাবু “হো-চি-মিন” চরিত্রে রূপ দেবেন। এ ছাড়া অন্যান্য চরিত্র চিত্রণে থাকবেন অভয় হালদার, অনাবি চক্রবর্তী, জয়ন্ত কুমার, রবীন্দ্র চ্যাটার্জী, জম্মেলা ভট্টাচার্য, মণি চ্যাটার্জী, নিমাই দত্ত, মহেন্দ্র ব্যানাজী, প্রফুল্ল ব্যানাজী, রীতি দত্ত, বীণা চক্রবর্তী, অনিলা ভট্টাচার্য, মঞ্জু ব্যানাজী, অরুণা গোস্বামী। “বিপ্লবী ভিয়েতনাম” পরিচালনা করবেন নাট্যকার ও নির্দেশক রমেন লাহিড়ী। “সিরাজের কাহিনা” ও “নিহত গোলাপ” পরিচালনা করবেন পূর্ণেন্দু-শেখর ব্যানাজী। দল পরিচালনায় আছেন বমেন বসুমতীক।

নিহত গোলাপ

নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা

গত ১২ই আগস্ট ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিশন ক্লাবের উদ্যোগে ৫০৬

১৮, রবীন্দ্র সরণিতে নজরুল-সুকান্ত সন্ধ্যা অনুষ্ঠান হয়েছে। ছুটির পরে আয়কর কর্মচারীরা সমবেত হয়ে এই অনুষ্ঠানটিকে সার্থক করে তোলেন। কর্মচারীদের মধ্যে থেকে শ্রীবিমল ভট্টাচার্য ও শ্রীরবীন্দ্র বড়াল রাগাধারী নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিখ্যাত নজরুলসঙ্গীতশিল্পী শ্রী সত্যেন্দ্র র মৃত্যুপাধ্যায় উদাত্তকণ্ঠে নজরুলের নৈশাবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ভারতীয় গণনাট্য সংস্থার মহা কলিকাতা শাখার শিল্পীরা সূর্য্যকান্তের “বিদ্রোহ আজ”, “অবাক পৃথিবী” প্রভৃতি গণসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকম্পতর সেনগুপ্ত। তিনি সমাজ বিপ্লবে নজরুল ও সূর্য্যকান্তের কাব্য ও সঙ্গীতের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন।

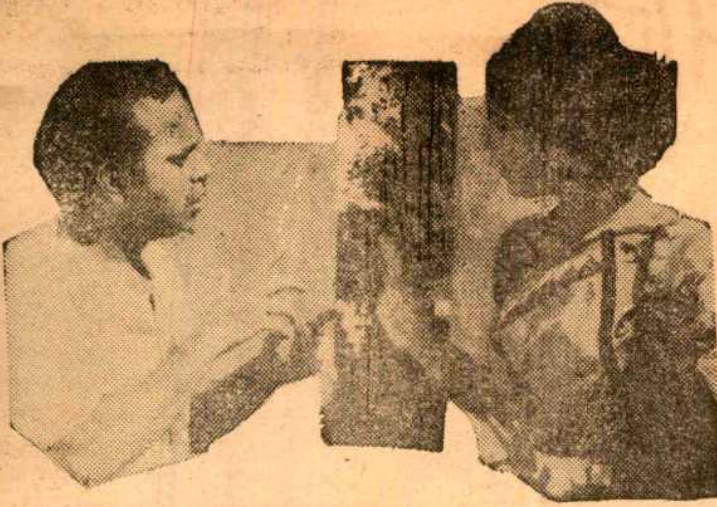
সংবাদ

হরিপদ চ্যাটার্জী স্থানান্তরিত

গত ১০ই আগস্ট মেমো সিনেমায় সকাল দশটায় হরিপদ চ্যাটার্জী মেমোরিয়াল কমিটির উদ্যোগে এক সভা হয়। মেমোরিয়াল কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমোনো রঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীশিবনাথ চ্যাটার্জী অভিনেতা সত্যেন্দ্র পক্ষ থেকে শ্রীঅনুপকুমার দাস, সিনেটেকনিসিয়ান এন্ড ওয়াকার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীউজ্জলকুমার ব্যানাজী, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকটোর পক্ষ থেকে শ্রীবিমান বসু, স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রীসুজিতকুমার দাস, শ্রীসুধী প্রধান, শ্রীপশুপতি চ্যাটার্জী এবং বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি এম এ সয়ীদ ভাষণ দেন।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়েছে—“কমিটি প্রথমত স্বাস্থ্যনিবাস প্রকল্পের জন্য এক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন ইতিমধ্যে প্রায় ৯,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন এবং সিনে সেন্ট্রাল, কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ৮,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছেন।

এ ছাড়া কমিটি সরকারের কাছে ২০,০০০ টাকা এককালীন অর্থ



‘এই করেছে ভাল’ ছবিতে রাবি ঘোষ ও লাল চক্রবর্তী

সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। চলচ্চিত্র পরামর্শদাতা কমিটি সরকারের কাছে এই অর্থ মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করা সত্ত্বেও সরকারী সাহায্য এখনও পাওয়া যায় নি। এ ছাড়া কমিটির পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র মালিকদের প্রতিষ্ঠান ই আই এম পি-এর কাছে একাদিনের বিকল্পলব্ধ অর্থের শতকরা তিনভাগ এককালীন সাহায্য হিসাবে চাওয়া হয়েছে। শ্রমিক-কর্মচারীর পক্ষে কল্যাণকর এই প্রস্তাব মালিকপক্ষ প্রত্যাখ্যান করেছে।

মালিকপক্ষ এবং সরকারের উপর নির্ভর না করে কমিটি অর্থ সংগ্রহের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে অভিনেতা সংঘের নাট্যদলগণ এবং সিনে সেন্দ্রোল, ক্যালকাটার উদ্যোগে চলচ্চিত্র উৎসব ইত্যাদি এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বাংলার যাতুশ্রেয়সীর নেপাল সফর

যাদুজগতের অন্যতম মহিলা যাদু-কর যাদুশ্রেয়সী ডি পূর্ণা সম্প্রতি নেপাল সফর করে ফিরে এলেন। নেপাল মহারাজার ৫১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বীরগঞ্জ পনের দিনের এক আনন্দ উৎসব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রদর্শনীতে দেশ-বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী, গুণী এবং শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন।

যাদুকরী ডি পূর্ণা সদলবলে আমন্ত্রিত হন। একের পর এক ক্রমাগত সুপ্রদর্শন পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনীতে সুদক্ষ যাদুর কলাকৌশল দেখিয়ে তিনি দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

প্রতিটি থেলাই উপভোগ্য, বিশেষত ভৌতিক বাজ, বেনারসের মন্দির, নারী-দেহ বিশ্বখণ্ডন, শূন্যে ভাসমান বালিকা,

ডলস্‌ স্পোর্টনিক, মাদার অব নেপাল খেলাগুলি দেখে দর্শকরা বিম্মিত হন।

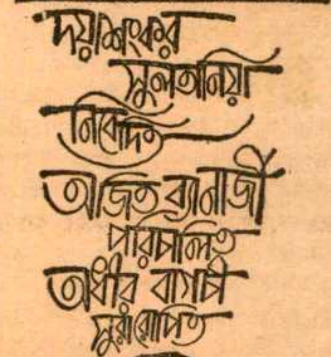
বড়দ্বার ছবি

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট প্রমথেশ বড়দ্বার ছবি দেখাবার প্রশংসনীয় আয়োজন করেছিল। গত ১০ই, ১১ই ও ১২ই আগস্ট সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে প্রমথেশ বড়দ্বার স্মৃতি হিন্দী “মুষ্টি” ও “দেবদাস” এবং বাংলা “অধিকার” ছবি দেখানো হয়েছে। প্রমথেশ বড়দ্বার ছবি দেখার জন্য দর্শকরা আজও কৌতূহলী এবং ছবিগুলি দেখে বড়দ্বার প্রতিভা অনন্দভব করা যায়।

“শপথ নিলাম” ছবির মামলা

রূপ ও বাণী প্রযোজিত ইস্টার্ন ফিল্ম এন্ড চেঞ্জ পরিবেশিত উনিশশো তিরিশ সালের বাংলার বিপ্লবী অধ্যায় নিয়ে লেখা “শপথ নিলাম” ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির পরিচালক শ্রীশচীন অধিকারী। ছবিটির নাম, কাহিনী এবং চিত্রনাট্য নিয়ে সিটি সিভিল কোর্টে একটি মামলা শুরু হয়েছে। শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম কোর্টে এই মর্মে অভিযোগ করেছেন যে, প্রযোজক এবং পরিচালক তাঁকে দিয়ে কাহিনী এবং চিত্রনাট্য লিখিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পরিচালকের নামে সেটি চালাবার চেষ্টা করছেন। এমন কি তাঁকে প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ছবিটির নামও (পূর্বনাম “এক অধ্যায়”) আকস্মিকভাবে পরিবর্তন করেছেন তাঁরা।

প্রথমে ছবিটির সন্নিবিষ্ট গ্যাড-ইন্টেরম ইনজাংশনে দীর্ঘকাল বন্ধ ছিল। বর্তমানে সিটি সিভিল কোর্টের চীফ জজের ঘরে মূল কেস শুনানীর জন্য মুলতুবি আছে। মামলার নম্বর টি. এস ৭১৩/৬১। (প্রাপ্ত)



মিনার • বিজলী • ছবিবর ও অন্যান্য চিত্রগ্রহণে * ফিল্মল্যান্ড কর্পোরেশন রিলিজ

খেলা রাজারাজ



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ব্রহ্মাণ্ড ট্রফি খেলা শব্দ হবার সংগে সংগেই ভারতীয় ক্রিকেটের দিন বদলে গেল, মোড় ঘুরে গেল ভারতের ক্রিকেট খেলার। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ক্রিকেট খেলা দেখতে দেখতে সকলের মন জয় করে নিল। এতোদিন যা সম্ভব হয় নি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে দেশের আবাল-বৃন্দ-বনিতা মেতে উঠলেন ক্রিকেটনগ্নে। ক্রিকেট খেলার মেলা বসলো উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত। একটা অদ্ভুত আনন্দ, অদ্ভুত একটা উন্মাদনার জোয়ারে যেন ভেসে গেল সমস্ত দেশ। রাজা-রাজারা, জমিদার আর বিদ্বানদের খেলা ক্রিকেট ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষের মন দখল করে বসলো।

আর তারই জের টেনে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা শুরু করলেন ক্রিকেট খেলতে। আর তাঁদেরই মধ্যে থেকে ভারত একে একে গেল তার প্রেমে ক্রিকেট-রহস্যের।

সত্যি কথা বলতে কি, জার্ডিনের এম. সি. সি দলের ভারত ভ্রমণের সময় থেকে ক্রিকেট খেলা এ দেশের জনগণের মনে পাকা আসন লাভ করছিল। ভারত ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে যাবার সময় জার্ডিন বলে গেলেন :

"I fully believe that in the next ten years India will be on top of the Cricket-world"....

এ শব্দ কথার কথা নয়, বিশ্ব ক্রিকেটের স্বনামধন্য পুরুষ ডি. আর. জার্ডিন এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতেন। আর তাঁর সেই বিশ্বাস-উদ্দীপ্তবাণী ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে, ভারতীয় ক্রিকেটের কর্মকর্তাদের মনে আগালো পরম উৎসাহ। তাঁরা যেন

দেখতে গেলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনায় ভরা আশার আলোর সম্মান।

নতুন উৎসাহে মেতে উঠলেন তাঁরা। এবার তাঁদের চোখ পড়লো অস্ট্রেলিয়ার ওপরে। অস্ট্রেলিয়াকে কিম্বা অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা শক্তিশালী দল আনার জন্যে তাঁরা উঠে-পড়ে লাগলেন। এই বিষয়ে সব থেকে বেশি উৎসাহ ছিল পাতিয়ালার মহারাজার।

তিনি আর ফ্রাঙ্ক ট্যারেন্ট-দু'জনে মিলে ব্যবস্থা করে অস্ট্রেলিয়া থেকে একটা বেসরকারী দল ভারতে আনার ব্যবস্থা করলেন। জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া দলের ভারত ভ্রমণের বিষয়টি পাকা হয়ে গেলো। সে দলে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সব নামী খেলোয়াড়। কিন্তু ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল চার্লস ম্যাকারটিনই ছিলেন সেই দলের প্রধান পুরুষ। তাঁর আকর্ষণই ছিল আলাদা।

পৃথিবীর সব কালের সর্বপ্রমুখ খেলোয়াড়দের তালিকা বানালে সেই তালিকায় যেমন ডরিউ. জি. গ্রেস, ভিক্টর ট্রাম্পার, জ্যাক হবস, জন ব্রাড-ম্যান প্রমুখ খেলোয়াড়রা স্থান পাবেন—তেমনি বাদ যাবে না চার্লস ম্যাকারটিনের নামও।

নিজস্ব ক্রীড়াভোগীতে ম্যাকারটিন ছিলেন স্বতন্ত্র। তাঁর খেলা, খেলা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা সবই ছিল অন্য রকম। আর তাঁর মেজাজ...সেই মেজাজের জন্যেই তাঁর অনুরাগীরা দিয়েছিলেন তাঁর গভর্নর জেনারেল নাম। সত্যিই তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল—ছিলেন যেমন উদ্ভট তেমনি বিনয়ী, ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি কোমল, ছিলেন যেমন সতর্ক তেমনি উদাসীন। ব্যাট হাতে মাঠে নেমে তিনি যেমন যে কোন মুহুর্তে অঘটন ঘটতে

পারতেন, তেমনি এক এক সময় সব ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে খেলার মাথায় ফিরে আসতেন প্যাডেলিয়নে। এক কথায় বলা যায় ম্যাকারটিন ছিলেন প্রতিভা অন্ন্য—বিশ্ব ক্রিকেটের বিস্ময় এক মহান পুরুষ।

তিনি কোনদিন মানেন নি কারো প্রভুত্ব। চিরকাল প্রভুত্ব বিস্তার করে গেছেন অপরের ওপর। তা তিনি যতো বড় বোলারই হোন না কেন—তাঁর নিস্তার ছিল না ম্যাকারটিনের হাত থেকে। কোনদিন তিনি কোন কিছকেই পরোয়া করেন নি। নিজের ইচ্ছামত খেলে গেছেন—করে গেছেন যা খুশি তাই। জীবনে কারো সংগে কোনদিন আপোষ করেন নি তিনি। চিরকাল শব্দ লড়েই গেছেন। তাই তিনি গভর্নর জেনারেল।

১৯২৬ সালে লীডস্ মাঠের সেই ঘটনার কথা তখনো সকলের মুখে মুখে ঘুরতো। লীডস্ মাঠে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট খেলছে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ। টেসে জিতে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক এ ডরিউ কার অস্ট্রেলিয়াকে পাঠালেন ব্যাট করতে।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারেন বার্ডস্লেয়ার বিরুদ্ধে বল করতে এলেন সেকালের অন্যতম সেরা ফাস্ট বোলার মরিস টেট। প্রথম ওভারের প্রথম বলেই স্লিপে হার্বার্ট সার্টিফিকের হাতে ক্যাচ তুলে দিয়ে প্যাডেলিয়নে ফিরে গেলেন বার্ডস্লে। কোন রান করার আগেই বার্ডস্লেয়ার উইকেটটি হারালো অস্ট্রেলিয়া। প্রথম উইকেট পড়ার সংগে সংগেই মাঠে নামলেন ম্যাকারটিন। কিন্তু সেই ওভারের পঞ্চম বলে স্লিপে ক্যাচ তুললেন তিনি। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক কার পারলেন না সেই ক্যাচটা লুফতে।

নির্ঘাণ আউটের মুখ থেকে ফিরে এসে মুহূর্তের জন্যে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ম্যাকারটন। না, আপোষ নয়—আক্রমণ। সিংহাসন নিতে তাঁর সময় লাগলো না এতোটুকুও। হাতের শ্লাভস্ দৃষ্টো ঠিক করে নিয়ে আর চূড়িটা একটু টেনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর.....?

তার পর মুহূর্তের মধ্যে মাঠের চেহারা গেল বদলে। ব্যাট-বলের লড়াইকে কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক সব কান্ড ঘটতে লাগলো সমস্ত মাঠ জুড়ে। ম্যাকারটনের হাতের ব্যাট যেন এরোপ্লেনের প্রপেলারের মতো ঘুরতে লাগলো। আর তারই আঘাতে বলগুলো ছুটে ছুটে যেতে লাগলো বাউন্ডারীর দিকে।

রানের পর রান—বাউন্ডারীর পর বাউন্ডারী। মাঠের চেহারা তখন গেছে বদলে। মাঠের মধ্যে তখন যেন ঝড় বইছে। সেই ঝড়ের ঝাপটায় ইংল্যান্ডের আক্রমণের সমস্ত ধার তছনছ হয়ে গেলো। দেখতে দেখতে এক সময় পঞ্চাশ রান আর তারপরে একশ' রান করে ফেললেন ম্যাকারটন। মধ্যাহ্ন ভোজের তখনো অনেক দেরী।

এর আগে একমাত্র ভিটর ট্রান্সপারই ল্যান্ডের আগে করতে পেরেছিলেন সৈফুরী। দ্বিতীয় ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে সেই সম্মান লাভ করলেন চার্লস্ ম্যাকারটন।

সেই ম্যাকারটন আসছেন ভারতে। সময়টা ছিল ১৯৩৫-৩৬ সাল।

আর ম্যাকারটনের বয়স তখন ৪২-৫০ বছর।

তবু ম্যাকারটনই ছিলেন বেসরকারী সেই অস্ট্রেলিয়া দলের প্রধান পুরুষ। তিনিই ছিলেন প্রধান আকর্ষণ, তিনি ছিলেন সব।

কারণ তিনি তখন বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল.....!

ম্যাকারটন ভারতে এলেন, জ্যাক রাইডারের নেতৃত্বে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ অস্ট্রেলিয়া দল ভারত সফরে এলো বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে ভারতকে আরো উঁচুতে স্থান দেবার জন্য।

রাইডারের নেতৃত্বে বেসরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের বয়েসের গড় ছিল প্রায় চল্লিশ। কিন্তু অভিজ্ঞতা আর নৈপুণ্য যেখানে প্রধান, বয়স সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

পারেও নি। ভারত সফরের প্রথম দিকটায় ভারতীয় দলগুলোকে নাস্তানা-বদ করে ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বয়স্ক ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা। তাঁদের খেলার ধারার সংগে ভারতীয় খেলো-



॥ চার্লস্ ম্যাকারটন ॥
বিশ্ব ক্রিকেটের গভর্নর জেনারেল

য়াড়রা কোন সময়ই তাল দিতে পারেন নি। পরে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত টেস্ট ম্যাচে এবং অন্য খেলাগুলোতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পেরেছিল। শব্দ তাই নয়—জয়-লাভের মুখও দেখেছিল ভারত। সে পরের কথা পরে আলোচনা করা হবে।

এখন শব্দ এই কথাটাই বলা যায় যে, ভারতের পক্ষে ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে বেসরকারীভাবে অস্ট্রেলিয়া দল এসেছিল ভারতে।

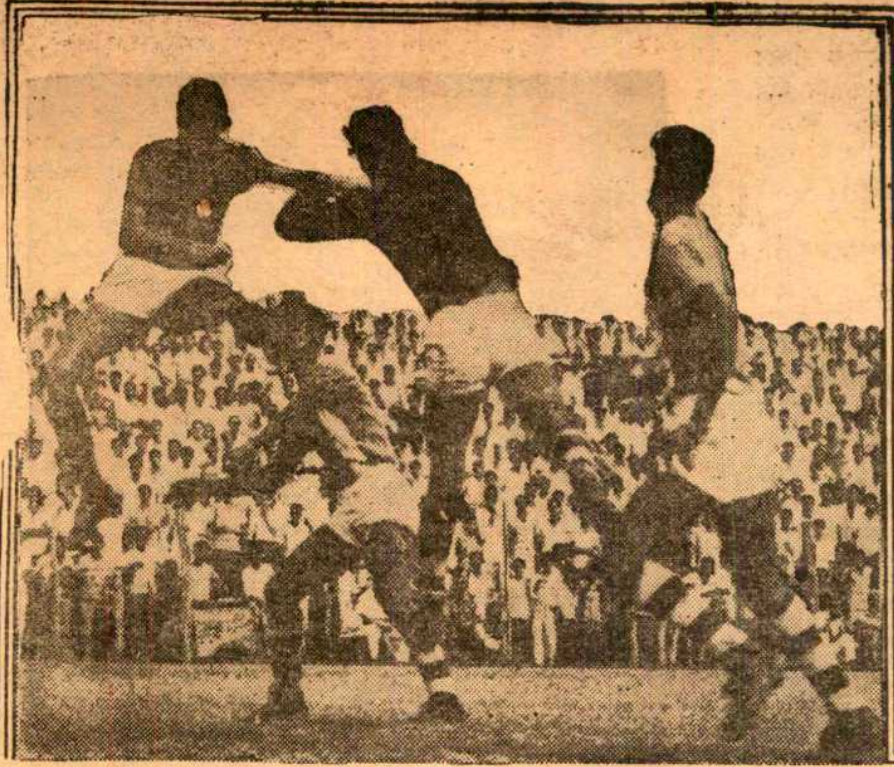
আর অস্ট্রেলিয়া দলকে ভারতে আনার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি করে যিনি দাবী করতে পারেন তিনি হলেন ক্রম্বক ট্যারাণ্ট। ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে তিনি যা করে গেছেন তার তুলনা মেলা ভার। অস্ট্রেলিয়ার নামকরা খেলোয়াড় ট্যারাণ্ট ইংল্যান্ডের কার্টিস্ট লীগে কিছুদিন খেলার পর ভারতে এসে শব্দ করছিলেন বসবাস

করতে। আর তিনি একাই ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে দিয়েছিলেন অনেকখানি।

ভারতীয় খেলোয়াড়দের কোচিং থেকে শব্দ করে প্রায় সব কিছুই দায়িহই তিনি স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। আর তাঁরই চেষ্টায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা পেয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল চার্লস্ ম্যাকারটনের মতো খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ।

আর সেই সুযোগ যে ভারতীয় খেলোয়াড়দের কাছে কতো বড় আশীর্বাদ ছিল তা বুঝতে কারো দেরী হয় নি। সেই দিক দিয়ে এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সভ্যতারের হিতৈষী হিসেবে ক্রম্বক ট্যারাণ্টের নাম চিরকাল ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

(চলবে)



৬৩৬

খেলাধুলা ও রাজনীতি

খেলাধুলায় সংগে রাজনীতির সম্পর্ক থাকা ডাচত নয়, সাধারণত থাকেও না। কিন্তু তাতে কি হবে—খেলাধুলায় নৈজেরই যে একটা আলাদা 'রাজনীতি' আছে। আর সেই নীতির আবর্তের মধ্যেই খেলাধুলায় বিভিন্ন দিকগুলো শুধু ঘুরছে আর ঘুরছে। এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার যেন আর কোন উপায় নেই। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে আরম্ভ করে খেলাধুলায় সমস্ত বিভাগগুলি ময়দান-নীতির মজায় মজে আছে। আর এই নীতির নিয়মে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের খেলাধুলা আজ ছেলেখেলায় পরিণত হয়েছে। ভারতবর্ষের খেলাধুলায় ওপর মহলে যারা আছেন, তাঁরা খেলাধুলাকে নিজেদের স্বার্থসিঁদ্বির উদ্দেশ্যেই এতোকাল লাগিয়ে এসেছেন। লাগিয়ে এসেছেনই বা কেন বলা হবে—এখনো লাগাচ্ছেন। আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে খেলাধুলায় মান দিনের পর দিন নেমেই চলেছে। কেউ কেউ তো আবার খেলাধুলাকে ব্যবসার স্বার্থেই কাজে লাগিয়েছেন। অর্থাৎ খেলাধুলাকে সামনে রেখে তাঁরা যে যার কাজ হাসিল করেছেন, করছেন এবং হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতেও করবেন। আর এই সব কান্ডের জন্যে কি হতে যে কি হয়েছে আর কি হচ্ছে, সেই সব কেলেশকারীর কিছু কিছু এখন জানা যাচ্ছে। বাংলাদেশেই বোধহয় এই নাটকটা সব থেকে ভালো জমেছে। ঘাদ-প্রতিবাদের ডেউ-এ সংবাদপত্রের খেলার পাতাগুলো এখন রীতিমত উপাদেয়। বেচু দত্তরায় মহাশয়, অমর ঘোষ, নন্দু জালান কিম্বা ও প্রান্তের নাগরওয়াল সাহেব—যে যাই বলুক না কেন, আমরা বেশ ভালোভাবেই জানি যে, এই সব বলা-ঘলির পেছনে আছে স্বার্থে ঘা লাগার জ্বালা। জে জ্বালায় আজ নন্দুবাবু জ্বলছেন, কিম্বা যে জ্বালা সয়ে সয়ে বেচুবাবু, কিম্বা অমরবাবু মদু খুলেছেন অথবা এঁদের চেয়ে অনেক ওপরের বানু ক্রীড়া-রাজনীতিবিদ নাগরওয়াল সাহেব পদত্যাগ করেছেন এবং তারপর নিজের রাজ্যের সংস্থা থেকে বিতাড়িত হয়েছেন—সেই একই জ্বালা এবার বোধহয় আমাদের সকলেরই সইবার সময় এসেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতবর্ষের খেলাধুলায় জগতে একটা অদ্ভুত সময় এসেছে—এই পরিবর্তনকে কাজে লাগিয়ে যদি আজ আমরা খেলাধুলায় জগৎ থেকে ক্রীড়া-রাজনীতি দূর করতে পারি তাহলেই শুধুমাত্র ভারতবর্ষের খেলাধুলায় মান উন্নত হবে। আর এই উন্নতির জন্যে আজ চাই সরকারী তত্ত্বাবধান। আমরা চাই অন্য দেশ-গুলোর মতো আমাদের দেশেও কর্মকর্তাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য করা হোক এবং তাঁদের সমস্ত দায়িত্ব সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আর তার আগে ক্রীড়াঙ্গণের সংগে জড়িত বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের মানে মানে বিদায় দিতে হবে। কিন্তু একাজ করবেন কে? কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, 'বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার' সময় আজ এসেছে। যদি দরকার হয়, আমরা যারা খেলাধুলাকে ভালোবাসি তারাই এগিয়ে যাবো সেই ঘণ্টা বাঁধতে.....।

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল মাঠ

শেষ পর্যন্ত ভারত হেরেই গেল।
মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠে নিজেদের জুলের জন্যে ভারত হারানো ফাইনালে ওঠার সুযোগ।

বিরতির সময় পর্যন্ত যে দল দু' গোলে এগিয়ে থাকে—বিরতির পর সেই দল যে কি করে পর পর তিনটি গোল খায় তা তো ভেবেও পাওয়া যায় না। দক্ষিণ কোরিয়া যে তিনটি গোল দিয়েছে সেই তিনটিই হয়েছে ভারতের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের ভুল বোকা-বুদ্ধির জন্যে।

প্রথম গোলটির জন্যে দায়ী নট-রাজন আর সেনগুপ্ত। বল ধরতে যাওয়ায় তাঁদের ইতস্তত করার সুযোগ নিয়েই কোরিয়া গোলটি করে। দ্বিতীয় গোলটির জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী অশোক ব্যানার্জী, গোলের মধ্যে তিনি শুধু বল অস্ত্রে রাখতেই পারেন নি—দাঁড়িয়েও ছিলেন গোলরক্ষককে একদম আড়াল করে। ফলে জেতার খেলায় শেষ পর্যন্ত ভারতকে ৩-২ গোলে হেরে যেতে হলো দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে।

মারদেকা ফুটবলের এ গ্রুপের দ্বিতীয় সেরা দল হিসেবে ভারত বার্মার সংগে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল। বার্মা সহজেই হংকংকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। আর এদিক থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ফাইনালে উঠলো ভারতকে পরাজিত করে। আর এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে ততোবিনে ফাইনাল খেলাও শেষ হয়ে যাবে।

যাই হোক ভারত এবার মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ স্থানটি পাবে! সাংখ্যিক কথা

গল্প হচ্ছে ও প্রতি

খেলার মাঠে দর্শকেরা যান অনাবিল আনন্দ লাভের প্রত্যাশায়। এদিক দিয়ে কিন্তু ক্রিকেটের জুড়ি মেলা ভার। কারণ খেলার রাজা ক্রিকেট। আবার তার রাজ্য হলেন, যাঁরা ক্রিকেটের বিশ্ববাসিন্দা ব্যাটস-ম্যান এবং পৃথিবীর দুর্ধর্ষ বোলার। আজ এখানে এমন একজন ব্যাটসম্যান ও একজন বোলারের কথা উল্লেখ করছি, যাঁদের কৃতিত্ব পৃথিবীর ক্রিকেট ইতিহাসে আজও অম্লান।

ইংল্যান্ডের জুবনবিজয়ী ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনের নাম কে না জানে। ইনি ক্রিকেট ও ফুটবলে সমান পারদর্শী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ক্রিকেট মরশুমে তিনি ১৮ বার শতরান সহ মোট রান করেছিলেন ৩৮১৬ এবং সেই মরশুমে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেই করেছিলেন মোট ৬ বার শতরান, যার গড় হিসাব দাঁড়ায় ৮৪.৭৮ কিন্তু টেস্টে তাঁর সংগৃহীত রান সংখ্যা হল ৫৮০৭।

আর একটি ঘটনা : ১৯৫৭ সালে ইংল্যান্ডের বার্মিংহাম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৎকালীন দুরন্ত বোলার সনি রামাধীন মোট ১২৯ ওভার বল করেছিলেন এবং এক ইনিংসে ৯৮ ওভার বল করে-ছিলেন। এটি আজও একটি বিশ্ব রেকর্ড।

—শেখর বানার্জী,
কলিকাতা-৪।

নিঃসন্দেহে। কারণ, গত বছর এই প্রতি-যোগিতায় যোগদানকারী ৮টি দেশের মধ্যে ভারত লাভ করেছিল প্রথম স্থান।

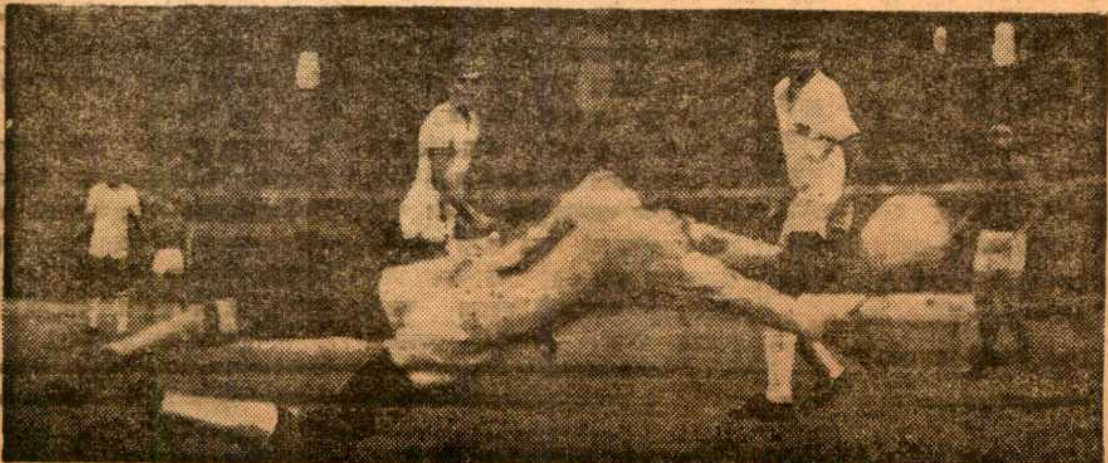
তবে এবার ভারত প্রায় সব কটা খেলাতেই ভালো খেলেছে। তাইওয়ানের কাছে ভারত হেরেছিল, প্রয়োজনীয় বিশ্রাম না পেয়ে রাষ্ট্রের ক্ষাভ লাইটে খেলার জন্যে। আর বার্মার সংগে ভালো খেলেও হেরে গেছে। বার্মা যোগ্য দল হিসেবেই ভিত্তি। তবে ভারতের পক্ষ মালয়েশিয়াকে হারানো রাষ্ট্রীয় প্রশংসার ব্যাপার। এ ছাড়া পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েত-নামকে পরাজিত করার জন্যেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা যথেষ্ট প্রশংসা জুড়িয়েছেন।

তাই মনে হয় ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটু নজর দিলে হয়তো বা খেলার ফলাফল অন্য রকম হলেও হতে পারতো। কারণ যাঁরা গেছেন দলের সংগে তাঁদের চেয়ে যাঁরা যান নি তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা কোন অংশে কম তো নয়ই, বরং বেশিই.....।



॥ নদীন ॥

মঙ্গলের নেতৃত্বে ভারতীয় দল এবার মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত উঠেছিল।



মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার এ গ্রুপে বার্মার বিরুদ্ধে খেলায় ভারতের গোলরক্ষক মৃদুতাকাকে বাঁপিয়ে পড়ে একটা বল ধরতে দেখা যাচ্ছে। বলটা মেরেছেন কালো জার্সি গায়ে বার্মার খেলোয়াড়। তাঁর সামনে সচরীর কর্মকার।



॥ সূভাষ ভৌমিক ॥
স্কোরার হিসেবে সূভাষ কুমারলানপুড়ে
নাম কিনেছেন।

[তৃতীয় কলমের শেষাংশ]

ভাল সেন্টার ফরোয়ার্ড আমাদের দেশে
আর হয় নি।

লেফট ইন হিসাবে আমেদ খানই
যোগ্য। চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে খেলায়
ভারত ১০টি গোল খেয়েছিল কিন্তু
ভারতের পক্ষে আমেদ খান ১টি গোল
দিয়েছিলেন। আমেদ খানই সত্যিকারের
একজন ভাল লেফট ইন। প্রদীপ-
চন্দ্রের সঙ্গে বলরামকে রাখতেই হবে।
প্রদীপ-চন্দ্রের সঙ্গে বলরামের কোন
পার্থক্য নেই। এই তিনজনের জন্যই
ভারত ১৯৬২তে জাকার্তায় এশিয়ান
গেমস-এ জয়ী হয়েছিল। তাই
লেফট আউট হিসাবে বলরামকে দলে
 রাখাই যুক্তিযুক্ত। যে দল গঠন করা
হবে সেটা তিন ব্যাক প্রথার। কারণ—
এই প্রথায় খেলেই ভারত ফুটবলে
নাম করোঁছিল। যে দলটি গঠন করা
হলো সেটা নিম্নরূপ :-

গোল—জে ডি ভরম্বাজ, রাইট
ব্যাক—শৈলেন মাস্তা, স্টপার—জার্নেল
সিং, লেফট ব্যাক—অরুণ ঘোষ, রাইট
হাফ কেম্পিয়া, লেফট হাফ—মহাবীর
প্রসাদ, রাইট আউট—প্রদীপ ব্যানার্জী,
রাইট ইন—চন্দ্রী গোম্বামী, সেন্টার
ফরোয়ার্ড—কানন, লেফট ইন—আমেদ
খান, লেফট আউট—বলরাম।

কেউ যদি ভারতীয় ফুটবলের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ গঠন করেন তাহলে
সেই দলটি কেমন হবে। এই বিষয়টি নিয়ে নানা মতের নানা মত। সেই নানা মতের
একটি এবার প্রকাশ করা হল। সকলের মতের সংগে লেখকের মত মিলবে না
ঠিকই। তাই আমরা এই বিষয়ে পার্থক্য-পাঠিকাদের মতামত আহ্বান করছি

—ক্রীড়া সম্পাদক

ভারতীয় ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ

কিছুদিন আগে বিশ্বের ৮০টি
দেশের ফুটবল বিশেষজ্ঞদের ভোটে
বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ একাদশ দল
গঠিত হয়েছে। তাই দেখে আমাদেরও
ইচ্ছে হয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে
একটা সর্বশ্রেষ্ঠ দল গঠন করার। আজ
পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবলে যারা প্রতি-
নিধ্ব করে আসছেন তাঁদের মধ্যে থেকে
১১ জনকে বেছে নিতে হবে এই দলটির
জন্য।

এই দল গঠন করতে গেলে প্রথমেই
বেছে নিতে হবে একজন সুদক্ষ গোল-
রক্ষকে। অনেকে খংগরাজের কথা
বলবেন, উ'চু স্ট-প্রতিরোধ করার ক্ষমতা
খংগরাজের অপূর্ব। কিন্তু নীচু
গড়ানো স্টে তিনি প্রায়ই অসহায় বোধ
করেছেন। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে
পেরুর বিরুদ্ধে খেলার সময়
তিনি গড়ানো স্টে যে তিনি গোল
তিনি খেয়েছিলেন, সে কথা তো আমরা

খেলা বুদ্ধিদীপ্ত, নিজ দলের
ফরোয়ার্ডদের অফুরন্ত বল জোগাতে
পারেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।
তবুও বলবো আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ়তা
অরুণের থেকে জার্নেলের অনেক বেশি।
বরং জার্নেলের পাশে লেফট ব্যাক
হিসাবে অরুণ ঘোষকে রাখা যেতে
পারে। ওভাবে ওঁরা একসাথে অনেক
দিন খেলেছেন। এর পর আসে দু'টি
হাফ-এর কথা। রাইট হাফ হিসেবে
কেম্পিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ, লেফট হাফ
হিসেবে মহাবীর প্রসাদ। কেম্পিয়া
১৯৫৬ ও '৬০ সালের অলিম্পিকে
মহাবীর ১৯৪৮ সালের অলিম্পিকে
খেলেছিলেন। ওঁদের দু'জনেরই ছিল
অফুরন্ত দম, উঠে ও নেমে খেলার
যোগ্যতা—এক কথায় বলতে গেলে ওঁরা
ছিলেন সঠিক গোলক-মান।

এর পরেই আসে রাইট উইংগার-
এর কথা। ডেককটেশ ও প্রদীপ ব্যানার্জী
দু'জনেরই খেলা দেখার সৌভাগ্য আমার
হয়েছে। ডেককটেশ দ্বিপ্রগতি ছিল
কিন্তু প্রদীপের মতো সময় সময় জায়গা

আমার মতে

কোনদিনই ভুলতে পারবো না। এদিক
দিয়ে ১৯৪৮ এবং '৫২ সালের অলিম্পিকে
ভারতীয় গোলরক্ষক মহাশয়ের
জে ডি ভরম্বাজকে আমার শ্রেষ্ঠ মনে
হয়েছে। রাইট ব্যাক হিসাবে শৈলেন
মাস্তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ওঁর
ক্রীড়াকৈর কোন তুলনা তখনকার দিনে
ছিল না, বর্তমানেও নেই। তা ছাড়া
একজন ব্যাকের পক্ষে যা দরকার তার
সব কিছুই ওঁর মধ্যে ছিল। এর পরেই
আশে স্টপারের কথা। স্টপার হিসাবে
সব থেকে আগে যে নামটি মনে আসে,
তিনি হলেন জার্নেল সিং। ওঁর পরি-
গ্রহ করার ক্ষমতা, পায়ে প্রচণ্ড স্ট, সব
থেকে বড় কথা ওঁর আত্মবিশ্বাস ছিল
প্রচণ্ড। অনেকে হয়তো অরুণ
ঘোষের নাম করবেন। অরুণের

লক্ষীকান্ত ঘোষ

বদলিয়ে লেফট-ইনের জায়গায় চলে
যাওয়া বা কোন কোন ক্ষেত্রে ইনসাইড
ডজ করে ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা ছিল
না। তা ছাড়া বলে কন্ট্রোল ছিল
প্রদীপের অপূর্ব। এই সব বিচারে
প্রদীপকেই আমার শ্রেষ্ঠ মনে হয়েছে।

রাইট ইন হিসেবে চন্দ্রী গোম্বামীর
নাম সর্বপ্রথমে আসে। শূদ্ধ রাইট ইন
কেন, লেফট ইনেও চন্দ্রীর সমান দক্ষতা
ছিল। শৈলেন মাস্তার যেমন কোন
প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, ইন হিসেবে চন্দ্রীরও
কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

সেন্টার ফরোয়ার্ড হিসেবে ধনরাজ,
মেওয়ালাল ও কাননের মধ্যে কাননকেই
শ্রেষ্ঠ মনে হয়। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ একা-
দশের অন্যান্য খেলোয়াড়দের চেয়ে
কাননের যোগ্যতা অনেক কিছু কি
করবেন, দঃখের কথা কাননের চেয়ে
[প্রথম কলমে দ্রষ্টব্য]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) ১মঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বঙ্গমতী প্রেস হইতে গ্রীসকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

। গ্রন্থনসৌষ্ঠবে নয়নাভিরাম ॥

বৃহৎ তন্ত্রসার—১ম ও ২য়		Essential of Commercial		গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
প্রতি খণ্ড	১৫-০০	Law	৬-০০	ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	
কালিদাস গ্রন্থাবলী— ১ম	৬-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-৫০	—২য় ভাগ ৫-০০	
কালিদাস গ্রন্থাবলী— ২য়	৬-০০	প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—	৩-৫০	নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থঃ— ১ম	১০-০০
কালিদাস গ্রন্থাবলী— ৩য়	৮-০০	বিভূতিভূষণ মখোঃ গ্রন্থাবলী—	৪-৫০	অরুণবাহি—	৪-০০
মাইকেল গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-৫০	রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—	৩-৫০	কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	৪-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-৫০	ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি ১ম	১০-০০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—		" " ২য়	৩-৫০	পরলোক—	৪-৫০
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড	৩-০০	মণিলাল বন্দ্যোঃ গ্রন্থঃ—১ম	৩-৫০	পরলোক রহস্য—	২-২৫
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—		" " " ২য়	৩-৫০	পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	৪-৫০
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড	৩-০০	অসমঞ্জ গ্রন্থাবলী—	৪-০০	দৃশ্যকাব্য পরিচয়—	১০-০০
দ্বিজেন্দ্রলাল গ্রন্থাবলী— ১ম	৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী— ৩য়	৪-০০	নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	৩-০০
" " ২য়	৬-০০	" " ৪র্থ	৩-০০	ভারত প্রতিভা—	৫-০০
" " ৩য়	৮-০০	রামপদ মথাজী গ্রন্থাবলী—১ম	৪-০০	প্রতাপাদিত্য—	৩-০০
ত্রৈলোক্যা গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-০০	" " " ২য়	৩-০০	সাধক কনলাকান্ত—	২-৫০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী— ১ম	৪-০০	হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	৬-০০	মহারাজ নন্দকুমার—	৩-০০
" " ২য়	৪-০০	মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—	৩-০০	নানার মা—	৩-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—	৩-৫০	জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—	৩-৫০	জালিয়াৎ কুটিল—	৩-০০
মানিক গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-০০	বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—	৪-০০	বিক্রমাদিত্য—	৩-০০
" " ২য়	৩-০০	শচীশ চট্টোঃ গ্রন্থঃ—২য় ভাগ	৩-০০	বিসমার্ক—	২-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ গ্রন্থঃ—৩য়	৩-০০	স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	৩-০০
" " ২য়	৪-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মখোঃ গ্রন্থঃ—৫ম	৩-০০	মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	২-০০
" " ৪র্থ	৪-০০	বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—	৫-০০	মাধবীকঙ্কণ—	২-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-০০	কথাসরিৎসাগর—১ম ভাগ	৪-০০	শিবরাম গ্রন্থাবলী—	৪-০০
" " ২য়	৪-০০	" —২য় ভাগ	৪-০০	বিবরণ প্রণেয় সংগ্রহ— ১ম	৪-০০
" " ৩য়	৪-০০	অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—	৩-০০	২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রতি খণ্ড	৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী— ১ম	৩-০০	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—		বৌদ-মনোদর্শন	
যোগেশ গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-০০	২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৪-০০	৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	৪-০০
রত্নলাল গ্রন্থাবলী—	৩-০০	ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী ২য় ও ৪র্থ হইতে		৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	৪-০০
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলা—	৩-০০	৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০	৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-	
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—	৫-০০	ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী— ২য়	৪-০০	কালিকন্দের ব্যাপারসমূহ	৪-৫০
জট গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-০০	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—	৪-০০	আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—১ম	৬-৫০
" " ৩য়	৩-০০	বিনাতী গুপ্তকথা—২য় ভাগ	৫-০০	আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—২য়	৫-০০
মুণেন্দ্রকঙ্ক চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থঃ—	৪-০০	অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী— ২য়	৩-০০	হেমচন্দ্র বন্দ্যোঃ গ্রন্থাবলী—	৮-০০
হাঁসের সংস্পর্শে এসেছি—	২-০০	" " " ৩য়	৩-০০	ANANDAMATH	৪-০০
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের		রস-গ্রন্থাবলী—	৩-০০	(শ্রীঅরবিন্দ কত ক ইংরেজী অনবাদ)	
পূর্বাভাষ—	২-০০	নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—	৭-০০	DAVID HARE	৪-০০
A Hand Book of				রাজভাষা	৪-০০
Commercial Law ২০-০০					

Thursday, 20th August, 1970

SAPTAHIK BASUMATI

Regd. No. C. 71

Price : 30 Paise

GRAM : "BASUMATI"

PHONE : 35-9461, 62, 63, 64

কুঁড়ো মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সঠিক -

কুকুম্বী

তুলতা হয় তা!

25 AUG 1970

334
206
534
100
634
100



কুকুম্বী
কুঁড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিতৃপ্ত করে।
কুকুম্বী শিশুর খাওয়া
ও রুগীর
পাখা নির্ভয়ে
ব্যবহৃত হয়।

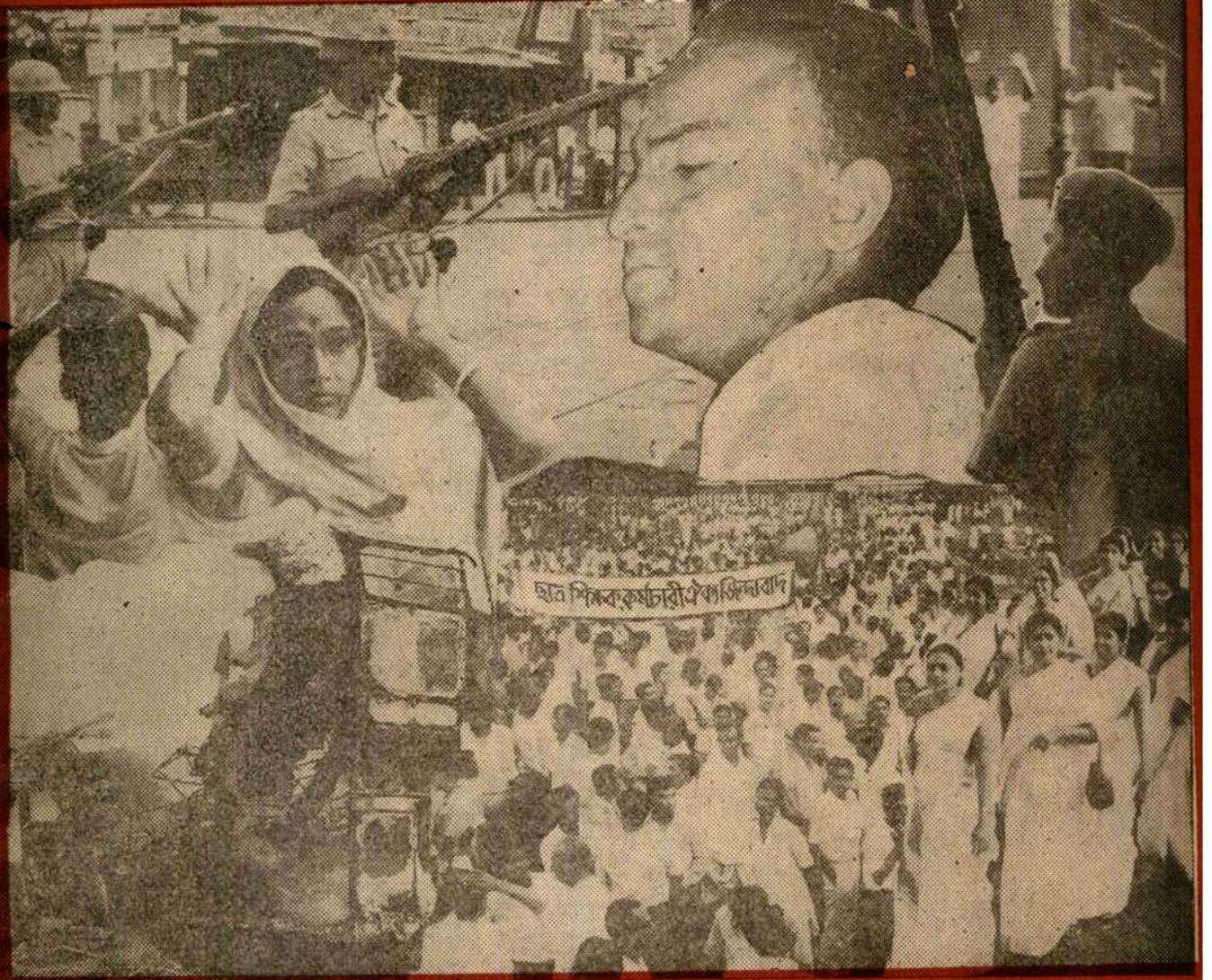
কুকুম্বী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
কুঁড়ো মশলা।
এর পেছার
ব্র্যান্ড ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

শ্রদ্ধাভাজন
কুকুম্বী লব (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কানীপুর



সাপ্তাহিক বসুমতী

“এই রক্তক্ষয়ের পিছনে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই, মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কোন সুচিন্তিত আদর্শ নেই—আছে শুধু অন্ধ বিশ্বাস, যুক্তিহীন ঘৃণা আর অর্থহীন আত্মপীড়ন। আর এই ব্যক্তিগত সন্ত্রাস ও খুনোখুনি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা বম্ব চোরাগলির ভিতর দিয়ে বিপর্যয়ের অতল গহবরে টেনে নিয়ে চলেছে, যার পরিণামে ফ্যাসীবাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বললে অতুক্তি হয় না। (‘বঙ্গদর্শন’ থেকে)



ঃ ৯ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ]

OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 9, 27th August, 1970]



বোরোলীন
হাউস



ফার্মাসোয়া
সব শক্তির জন্য

সূচী

বিষয়	লেখক	পাতা
সম্পাদকীয়		৫১৫
আজকের মানব		৫১৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫১৭
বঙ্গদর্শন		৫২০
ভারতদর্শন		৫২৫
আন্তর্জাতিক		৫২৭
সপ্তাহের বোঝা	— কৃষ্ণবাস ওকা	৫২৮
চব্বিশ বছরে খা দিয়ে (প্রবন্ধ)	— নরেন্দ্র ভট্টাচার্য	৫৩০
অপ্রতিহত (কবিতা)	— মহেন্দ্র সাহা	৫৩২
স্রোতের সঙ্গে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৩৩
ঢাকার চিঠি		৫৩৬
পাঠকসন		৫৩৯
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	৫৪০

যে (কান)

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ত

(কনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড প্রাপ্তসম অব লেট

প্র. বি. সরকার





বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
পূর্ববাংলার উদ্ভাস ও আশ্রয় (প্রবন্ধ)	— সাগর বিশ্বাস	৫৪০
স্মৃতির কুঠার (কবিতা)	— মানস রায়চৌধুরী	৫৪৬
অনন্দর, গম্ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	৫৪৭
মোট-মোট বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	৫৫২
অপ্রাকৃত কবিতাগুচ্ছ (কবিতা)	— উল্লাস	৫৫৬
গ্রন্থমেলা	—	৫৫৭
ভ্রমর (গল্প)	— প্রিয়দর্শিনী সেনগুপ্ত	৫৫৮
বোনিন ও নাটক (প্রবন্ধ)	— সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৬২
ব্রহ্মসংস্কৃতি—ওদেশে এবং এদেশে	— শিল্পাঙ্গি	৫৬৪
ব্রহ্মজগৎ	—	৫৬৭
খেলার রাজার রাজ্য	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৭২
খেলাবন্দ্য	— শান্তিপ্রিয়	৫৭৪

বিজ্ঞানদায়ের বই

সুপ্রকাশ রায়ের

ভারতের বৈপ্লবিক

সংগ্রামের ইতিহাস :

প্রথম খণ্ড ২০'০০

ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম : ১ম ১৬'০০

কানাই সামন্তের

চিত্রদর্শন ২৫'০০

শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্তের

অলিম্পিকের ইতিকথা ২৫'০০

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বিপ্লবের সঙ্কলনে ১০'০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের [সংকলন]

বিজ্ঞানী স্বামী জগদীশচন্দ্র ৬'০০

মুক্তিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

বক্তব্য ৫'০০

অনন্ত সিংহের

অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম

প্রথম খণ্ড ১১'০০

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্যের

নাট্যতত্ত্বমীমাংসা ১০'০০

ডঃ বদ্বন্দ্যেব ভট্টাচার্যের

পাখিকুৎ রামেন্দুসুন্দর ৮'০০

প্রমোদ মিত্রের

ময়ূরপঙ্খী ৬'০০

মকরমুখী ৬'০০

সাগরদাড়ী [যন্ত্রস্থ]

শিবরাম চক্রবর্তীর

চোরের পাল্লায় চকরবর্তী ৩'০০

আমার ভালুক শিকার ৩'০০

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

ভয়ঙ্করের জীবন-কথা ২'২৫

মোহিতলাল মজুমদারের

সাহিত্য-বিচার ৮'৫০

কবি শ্রীমধুসূদন ১০'৫০

বীতিকম-বরণ ৬'৫০

সাহিত্য-বিতান ৯'৫০

বাংলার নবযুগ ৮'০০

শ্রীকান্তের শরণচন্দ্র [যন্ত্রস্থ]

শ্রেষ্ঠতম ও বৃহত্তম পুজা-বার্ষিকী

শারদীয়া ১৩৭৭

কিশোর ভারতী

বিষয়বস্তুর সামান্য আভাস :

- রহস্যপূর্ণভাবে কীরীটী রায়
- সাগরতলে পর্যটনের অমর কাহিনী
- সমুদ্র-গর্ভে বাস্তব অভিযানের পরমাশ্চর্য ইতিকথা
- বাংলা সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় চোদ্দটি চরিত্রের অভাবিত সমারোহ—যাদের দলপতি ঘনাদা, তৈনিন্দা, হর্ষবর্ধন, বঙ্কোবাবু প্রমুখরা
- অন্যান্য পাঁচটি উপন্যাস ও গল্পের উপন্যাসের মত গল্প
- চিত্রে তিনটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী
- নটসূত্রের সরস স্মৃতিকথা
- পূর্ব বাংলার কবিতা
- চিত্তরঞ্জন থেকে দেশবন্ধু
- প্রায় শতাধিক লেখক-সমাবেশ

মহালয়ার আগেই বেরুচ্ছে ৬'০০

৮/৩ চিত্তামণি হাস লেন, কলি : ৯

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড II কলিকাতা ৯ ফোন : ৩৪-৩১৫৭



বৃহস্পতিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 27th August, 1970

মূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারী প্রহসন

যেখান-সেখানের খবর নয়, খোদ ষোয়াইয়ের খবর : গত ১৫ই মে ঔষধের যে দাম ছিল, সেই দামে বর্তমানে ঔষধ বিক্রি করার জন্য কয়েকটি ভারতীয় সংস্থা পাইকারী বিক্রেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত স্মরণীয় : আমাদের দেশে প্রস্তুত ঔষদের ২০% ঔষধ ভারতীয় সংস্থাগুলি উৎপাদন করে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত গত একুশ আগস্ট তারিখের ষোয়াইয়ের খবরে দাঁড় ক্রেতাসাধারণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলোছিল এই ভেবে যে, ঔষধের মূল্যের পুনর্মীক্ষণ ঘটলেও তা মন্দের ভালো। যাক, আমাদের দেশের ঔষধ উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা দেশের দূস্থ রোগীদের কথা ভোলেন নি।

কিন্তু সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সত্য কিনা, এখনো পর্যন্ত তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। কারণ ক্রেতারা উদ্ভূত মূল্যে ঔষধ ক্রয় করতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বহু রকম ঔষধ বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছে।

পেট্রোলিয়াম ও রসায়নমন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন প্রায় কড়া সুরেই গত ২০শে আগস্ট বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা-গুলিকে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন যে, যদি তারা ঔষধের মূল্য হ্রাসে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করেন, তাহলে সরকার তাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার নিয়ে নিতে কোন রকম ইতস্তত করবেন না।

সরকারের এই হুমকির পর ঔষধ উৎপাদক-ব্যবসায়ীরা মাথা নত করবেন, একথা যায়্য ভাবে তারা মুখের স্বর্গে বাস করছে। ইতিমধ্যে ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে জয়-পরাজয়ের যে খেলার সূচনা হয়েছিল, প্রথম রাউন্ডেই কেন্দ্রীয় সরকার তাতে পরাজয় বরণ করে-ছেন। মূল্য হ্রাস করানো তো দূরের কথা, সরকারের চোখের সামনে উৎপাদকরা

ঔষধের মূল্য বাড়িয়েছেন এবং পূর্বা-বস্থায় ফিরে যাবার জন্য আবেদন-নিবেদনের পথ বেছে নিয়েছেন। দেশের একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের এই জল্প-ই প্রমাণ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই মান-ইজ্জৎ কিভাবে বৃহৎ মূল্যফাভোগী ব্যবসায়ীদের কাছে বন্ধক রেখেছেন। এর পরও কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ধমক দিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার সেবার কথা বললে তাতে সরকারের মুখের জোলের প্রমাণ পাওয়া গেলেও বৃকের পাটোর জোলের প্রমাণ মেলে না।

বলা বাহুল্য, নিত্য-নিয়মিত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতোই ঔষধও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার এমন কতকগুলি ঔষধ আছে, যোগুলির ব্যবহার হয় সর্বাধিক। এই সব ঔষধের দাম কি রকম বেড়েছে, নীচের তালিকাটি দেখলেই আন্দাজ করা যাবে।

ঔষধের নাম পূর্ব মূল্য বর্তমান মূল্য ট্যানাডিরল	
(প্রতি বড়ি) ২৫ প. ৩৬ বা ৩৭ প	
নোভালজিন	
(প্রতি বড়ি) ২০ প ২৫ প	
নোভালজিন কুইনাইন	
(প্রতি বড়ি) ২২ প ৩০ প	
কোডোপাইরিন	
(প্রতি বড়ি) ৮ প ১০ প	
সারিডন	
(প্রতি বড়ি) ১৩ প ১৮ প	
সালফাডাইজিন	
(প্রতি বড়ি) ৬ বা ৭ প ১০ বা ১২ প	
লেডারপ্রেস	
৭-৭৫ ১০-৭৫	
(বড় ফাইল)	

এ জাতীয় বহুল ব্যবহৃত ঔষধের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। মূল্য নিয়ন্ত্রণের চেয়ে সরকারের বেশি মজর নাকি জন্ম-নিয়ন্ত্রণের দিকে। এসব ঔষধের দাম হ্রাস

পাওয়া তো দূরের কথা, তাদের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন—	
ঔষধের নাম পূর্ব দাম বর্তমান দাম	
লিনিডিয়ল	৪-৮০ ৫-২৫
নোরসাইক্লিন	৫-২০ ৫-৬৩
ভর্নাদিস	৫-৫০ ৭-০০

মোটের উপর এটা আর একবার হাতে-নাতে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, সরকার কতক কোনো বস্তুর মূল্য নিয়ন্ত্রণ বা মূল্য হ্রাস করার হেঁচ-এর অর্থ যেন মূল্য বৃদ্ধি ঘটানো!

এর পর আমরা শুধু এই কথা বলতে পারি যে, জনগণের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দরদ যদি যথার্থ হয়, তা হলে সরকার ইচ্ছে করলে ঔষধ ব্যবসায়ীদের এখনো সঠিক পথে আনতে পারেন। সেই সঠিক পথে আনার প্রথম উপায় হচ্ছে, পেটেন্ট আইনের আমূল সংস্কারসাধন করা। তারপর সরকারী ঔষধ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বেসরকারী কাম্বানার প্রস্তুত ঔষধের উৎপাদন-ব্যয় নির্ধারণ করে বাজারদর বেঁধে দেওয়া। ঔষধের দাম বৃদ্ধি করে দিয়ে ঔষধ প্রস্তুতকারীরা সরকারের বিরুদ্ধে এখন যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন, আমরা মনে করি, উপরি উক্ত ব্যবস্থাই হবে তার একমাত্র সঠিক জবাব। তবে তার আগে দরকার সরকারের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা। সরকারী দৃঢ়তা যে শুধু বক্তাবাজী ও হুমকীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা বোঝা যায়, ১৫ই মে ঔষধের যে দাম ছিল সেই দামে ফিরে যাওয়ার জন্য ঔষধ প্রস্তুতকারীদের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আকুল আবেদনে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ভারতে একজন দুর্লভ অতিথি এসেছেন। মাত্র তিন দিনের সফরে নয়াদিল্লী উপস্থিত হয়েছেন জাপানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিঈচি আইচি। গত দশ বছরের মধ্যে জাপানের কোনো সামনের সারির রাজনৈতিক নেতা এই ভারত-পাক উপমহাদেশে পদার্পণ করেন নি। আইচির শ্রুত আগমন তাই সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

জাপান পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রুত ভারত সফরই করেন নি, এর পরে তিনি পাকিস্তানেও গিয়েছেন। কিন্তু বলা নিঃপ্রয়োজন, তাঁর ভারত সফরের তাৎপর্য অনেকখানি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পারমাণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হবার পরেও এক আশ্চর্য আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তাকে অবলম্বন করে জাপান মাথা উঠু করে দাঁড়িয়েছে। তার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আজ রূপকথার মত চিত্তাকর্ষক। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও জাপানে এ পর্যন্ত স্থিতিবস্থা চলে আসছে। সরকারের পরিবর্তন হয় নি। প্রধানত শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে তার আশ্বাস্য অগ্রগতির কারণে জাপান নিজেকে এশীয় রাষ্ট্রগুলির ওপর নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা পোষণ করে এসেছে। কিন্তু জাপান সম্পর্কে ভারত সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে একটা মোটামুটি স্কেভ রয়েছে যে, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, তার স্বাধীন সত্তা নেই। জাপান সম্পর্কে প্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলিতে এ ইমেজ বা ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে যে, সেই এশিয়াতে আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির প্রধান সমর্থক এবং চীন বা কমিউনিজম বিরোধী রক্ষণশীল দেশ। কিঈচি আইচির ভারত সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য—জাপান সম্পর্কে এ-

সমস্ত ধারণার অবসান ঘটানো। তাঁর সে-কাজে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কতটা সাফল্য অর্জন করতে পারেন, তা অবশ্য সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, কিঈচি আইচি একজন প্রবীণ রাজনীতিক এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য আজ পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার নিলেও আইচি প্রধানত অর্থনীতি এবং বিষয় বাণিজ্যের লোক। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ল ম্যাকালিট



কিঈচি আইচি

থেকে ১৯৩১ সালে গ্যাজেট হবার পর তিনি জাপান সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। প্রথমেই তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। পরের বছরেই তাঁকে পাঠানো হয় লন্ডনে। বৃটেনের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে সেদিন আইচি এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁকে পরে

প্যারিস পাঠানো হয়। এখানে বসেই ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে জাপানের বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। তারপরে তাঁকে দেখা গেল লন্ডনে অনর্দীক্ষিত আন্তর্জাতিক বৈষায়িক সম্মেলনে বিরাট এক পোর্টফোলিও ব্যাগ হাতে। জাপানী প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারীর দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আইচি অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ব্যুরোর ডিরেক্টর হন।

রাজনীতিতে আইচির আবির্ভাব দীর্ঘদিনের নয়। তিনি ১৯৫০ সালে নির্বাচনে জিতে হাউস অফ কমন্স-লর্স-এ প্রবেশাধিকার লাভ করেন। অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতার কারণে তিনি দু'বছর বাদে উপ-অর্থমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে জাপানের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও ব্যবসায় দপ্তরের পূর্ণ মন্ত্রীর পদে বৃত্ত হন। আর প্রতিনিধি সভায় নির্বাচিত হলেন তিনি ১৯৫৫ সালে এবং বছর দু'য়েকের মধ্যে ক্যাবিনেট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। বাস্তবিক সেই থেকে তাঁর দ্রুত পদোন্নতি ঘটেছে থাকে। কখনও তাঁকে দেখা গিয়েছে বিচার-মন্ত্রীর পদে, কখনও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রয়োগবিদ্যা দপ্তরের মন্ত্রিপদে।

মাত্র দু'বছর আগে কিঈচি আইচি পররাষ্ট্র দপ্তর পেয়েছেন। অর্থাৎ যে আমেরিকা-বৈষা পররাষ্ট্র নীতির কারণে জাপান সরকার সমালোচিত ও নিন্দিত হয়েছেন তার পুরো দায়িত্ব আইচির ঘাড়ে ফেলা বোধ হয় উচিত হবে না। বরং ওকিনাওয়া দ্বীপ থেকে মার্কিন ঘাঁটি অপসারণ এবং মার্কিন নিভরতামুক্ত পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তাতে মনে হয় আইচির প্রগতিশীল মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে। জাপান এশিয়ার একটা সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত দেশ হয়েও খানিকটা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে তার মার্কিনমুখী পররাষ্ট্র নীতির কারণে। আজ ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে তাই নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার তাগিদে কিঈচি আইচির শ্রুত পদার্পণ ঘটেছে এই উপমহাদেশে। বলা বাহুল্য তাঁর এ-সফর একেবারে বিফলে যাবে না, এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়।

সুভাষচন্দ্র ও মমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীন্দ্রসাদ কসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা

সাময়িক সাফল্যের অন্তে সুভাষচন্দ্র যখন শিলং ছেড়ে চলে গেলেন, তখন পিছনে আনন্দ ও আশ্রয় যোগপৎ আছড়াতে লাগল। ক্ষুদ্র আসামের মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপার সর্বভারতীয় মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠল এবং সুভাষচন্দ্র ব্যাপারটাকে সর্বভারতীয় সমস্যায় পরিণত করতে চেয়েছিলেনও বটে। এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধি দেখিয়েছিলেন। আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা যেভাবে গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে সবটাই সরল ব্যাপার ছিল না এবং থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ, অধিকতর অসরলভাবে সাদুল্লা মন্ত্রিসভাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। গভর্নর প্রথম দিকে গোপীনাথ বরদলৈকে মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করে এবং বিশেষ গেষ্টে সাদুল্লা পদত্যাগপত্র গ্রহণ ও বরদলৈ মন্ত্রিসভা গঠনের সংবাদ প্রকাশ করে কংগ্রেসের যে প্রাথমিক সন্নিবিধা করে দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর সে ভূমিকা বদল করতে তিনি যতই চেষ্টা করে থাকুন, তাতে সফল হন নি সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক বুদ্ধির জন্য। এইকালে আমরা দেখেছি, কয়েক দিনের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বিবৃতির বাড়ি বইয়ে দিয়েছেন যার মধ্যে গভর্নরের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতির কথা ব্যবহার করা হয়েছিল এবং ইউরোপীয় ও মুসলিম দলগুলির আঁতাতের কথাও। এই সব বিবৃতির দ্বারা সুভাষচন্দ্র গভর্নরকে কোণঠাসা করতে চেয়েছিলেন, সেই সঙ্গে ইউরোপীয় চক্রান্তের পথে বাধা সৃষ্টিও করছিলেন। কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতিগুলি সর্বভারতীয় প্রচার পাচ্ছিল। তার ফলে একদিকে ইউরোপীয়দের তথাকথিত নিরপেক্ষতার মত্বোপদে খুঁলে যাচ্ছিল, অন্য দিকে অপরাপর স্থানের ইউরোপীয় মহলের চাপ আসামের ইউরোপীয়দের উপর পড়বার সম্ভাবনা বাড়ছিল।

আসামের কংগ্রেসী রাজনীতি যথার্থ কূটনীতি হয়ে উঠেছিল একটি ক্ষেত্রে। বরদলৈ মন্ত্রিসভার নাম ঘোষিত হওয়ার পরেই স্পীকার অনির্দিষ্টকালের জন্য আইনসভা মূলতুর্বা করে দেন এবং দেওয়ার পক্ষে উপযুক্ত যুক্তিও

দেখান। বুদ্ধিগতির মূল্য কম নয়, একথা মেনে নিয়েও বলতে হবে, স্পীকারের ঐ কাজের ফলে বরদলৈ মন্ত্রিসভা আশু পতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

স্পীকারের কাজের পিছনে সুভাষচন্দ্রের হাত ছিল না বললেও চলে।

সুভাষচন্দ্র এক্ষেত্রে ইউরোপীয় এবং সাদুল্লাপন্থীদের কাছে সাধারণ শত্রু বলে গৃহীত হলেন। বিবৃতির পর বিবৃতিতে তাঁকে আক্রমণ করা হল। সাদুল্লা-সমর্থকেরা এক যৌথ বিবৃতিতে বললেন (২২ সেপ্টেম্বরের স্টেটসমানে প্রকাশিত): বরদলৈ মন্ত্রিসভা সংখ্যালঘু মন্ত্রিসভা। সাদুল্লা সমর্থক মুসলমান সদস্যদের ভাঙিয়ে নিয়ে যাবার সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও সাদুল্লার দলে ৫৬ জন সদস্যের সমর্থন থেকে গেছে। সুভাষচন্দ্রের আত্মকালীন সত্ত্বেও মন্ত্রিসভার মুসলমান সদস্যদের নাম ঘোষণা করা যাবে না। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার যে পাঁচজন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র গোপীনাথ বরদলৈ খাঁ কংগ্রেসী; বাকি কামিনীকুমার সেনা স্বতন্ত্র হিন্দু, রূপনাথ ব্রহ্ম উপজাতি, অক্ষয়কুমার দাস ও রাগনাথ দাস অন্তর্ভুক্ত।

সুভাষচন্দ্র এবং মোলানা আজাদ কিভাবে সাদুল্লার দল ভাঙিয়েছিলেন, সে বিষয়ে ঐ বিবৃতিতে বলা হয়েছিল:

“ইতিমধ্যে দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন মোলানা আবদুল কালাম আজাদ এবং মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু। প্রথম জন একজন মুসলমান সদস্য ভাঙাতে সমর্থ হলেন এবং শেষোক্ত জন বাবু অক্ষয়কুমার দাস ও তাঁর দু'জন অনুগামীকে কংগ্রেস-প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করাতে পারলেন—মন্ত্রিসভার অক্ষয়কুমার দাসকে স্থান দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।”

আসাম ইউনাইটেড পার্টির নেতা আবদুল মতিন চৌধুরী সুভাষচন্দ্রের কঠোর সমালোচনা করলেন দীর্ঘ বিবৃতিতে। মুসলমান ও ইউরোপীয়দের মধ্যে গোপন চুক্তির কথা মতিন চৌধুরী অস্বীকার করলেন: বললেন, তাঁরা মোটেই বাইরে থেকে গদুজা আমদানী করেন নি; তবে আসামের চাকল্যকর পরিস্থিতিতে অনেক বাইরের লোক এসে জুটেছে, যেমন স্বয়ং কংগ্রেস-সভাপতিই ছুটে এসেছেন। রাজার সরকারকে বজায় রাখার জন্য কংগ্রেসের ব্যাকুলতার প্রতি মতিন চৌধুরী বিদ্রূপ বর্ষণ করলেন এবং অতীত

সাপ্তাহিক বঙ্গভাষী

ক্রোধের সঙ্গে স্ভাষচন্দ্রের হৃদয়িক উত্তর দিলেন। (স্টেটস-ম্যান, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

আসামের ঘটনা নিয়ে লীগ-মহলে রোষ-বিস্ফোরণ সীমা ছিল না। বাংলার প্রধানমন্ত্রী মৌলবী ফজলুল হক ওয়েলসলি স্কোয়ারের মোসলেম ইনস্টিটিউটে এক ভাষণে কংগ্রেসের জঙ্গী মনোভাবের সমূহ প্রতিবাদ জানালেন, সেই সঙ্গে আপত্তি জানালেন স্ভাষচন্দ্রের মন্তব্যের বিরুদ্ধে।

আর, আসাম মন্ডিসভার ব্যাপারটি যার কাছে সবচেয়ে অশুভ সংবাদ বহন করে এনেছিল, সেই মহম্মদ আলি জিন্না তাঁর ক্ষোভ ও নৈরাশ্য উজাড় করে দিলেন এক ভাষণে। করাচীতে অনুষ্ঠিত সিন্ধুর প্রথম মুসলিম সম্মেলনে জিন্না যে দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, তার মধ্যে হিন্দু কংগ্রেসের অনেক কুকাঁতির কথা ছিল। আসামে কংগ্রেসী মন্ডিসভা গঠন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেনঃ সাদুল্লা পদত্যাগ করা মাত্র কংগ্রেস-সভাপতি সেখানে পড়ি-মারি করে ছুটে গিয়ে তথাকথিত মন্ডিসভা গঠন করিয়েছেন এবং সেই কাজ করার সময়ে 'কোয়ালিশনের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনো সম্পর্ক থাকবে না'—কংগ্রেসের এই পূর্বতন ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতির কথা একেবারে ভুলে গেছেন। বরদলৈ অনেক চেষ্টা করেও একজনের বেশি মুসলমান মন্ত্রী যোগাড় করতে পারেন নি,

অথচ বলেছেন, তিনি তিনজন মুসলমান মন্ত্রী রাখবেন। অ্যাসেমব্লির অধিবেশন মূলত্ববী করায় স্পীকারের কাজও প্রশংসনীয় নয়। কংগ্রেসের মত বিরূপ দলের পক্ষে আইন-মতায় পরাজয়ের ভয়ে অব্যাহত উপায় অবলম্বন করা কাণ্ডরূপতা ভিন্ন আর কিছু নয়। কংগ্রেস হাই কমান্ডের এখন একটিমাত্র ভাবনা, কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে পারে, বিশেষত মুসলিম লীগের মধ্যে কিভাবে ফাটল ধরতে পারে। তার জন্য যে-কোনো পথই কংগ্রেস নিতে পারে, ইত্যাদি।

অনেক বেশি আশাভঙ্গ ও নৈরাশ্যের ক্ষেত্র ছিল অন্যর ইউরোপীয় মহলে। ইউরোপে প্রবল সংকট চলেছে, চেকো-শ্লেভাকিয়ার সর্বনাশ সম্ভব, এই পরিস্থিতিতে পূর্ব ভারতের শাসনকর্তৃপক্ষ কখনই ইউরোপীয়দের পক্ষে হাতছাড়া করা সম্ভব ছিল না। ফজলুল হক মন্ডিসভাকে ইউরোপীয় দল পুরো সমর্থন জানিয়ে টিকিয়ে রেখেছিল, বৃদ্ধি ছিল, প্রতিষ্ঠিত সরকারের পক্ষে ইউরোপীয়রা রয়েছেন। একই বৃদ্ধিতে পূর্বে তারা সাদুল্লা-মন্ডিসভাকে সমর্থন জানিয়েছে; এবং তা জানানো উচিত ছিল বরদলৈ মন্ডিসভাকেও। সে কাজ তো তারা করলই না, বরং গোপনে চক্রান্ত করতে লাগল, যাতে বরদলৈ মন্ডিসভা গঠন করতে না পারেন। গভর্নরের প্রারম্ভিক 'ব্রান্ডি' জন্য

১ ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, স্টেটসমানে ফজলুল হকের বক্তার রিপোর্টের শিরোনামঃ
CONGRESS 'GAME' IN ASSAM

CABINET CHANGE

BENGAL PREMIER'S SPEECH

২ জিন্না বলেছিলেনঃ

"In Assam the Saadulla Ministry resigned. Immediately the Congress President went posthaste with others to help the formation of so-called Congress Ministry in utter disregard of all previous professions and declarations and contrary to the avowed Congress determination to have nothing to do with coalitions. But when forming a Ministry Mr. Bardolai was not able to announce the name of even one of the three Moslem ministers who were to be included in the Ministry. The move to get the President to adjourn the Assembly *sine die* was hardly creditable. For a great party, not to face the legislature, knowing full well that they had not the majority at their back was sheer cowardice. It is under the threat of suspension of the oath-taking ceremony that the President of the Congress party agreed to a session of the Assembly being called at an early date.

"Upto the present moment Mr. Bardolai has not been able to get more than one of the three Moslem ministers. He is still hunting for the remaining two Moslem ministers. Fifty-six members of the Assembly out of 107 are not only against the so-called Congress Ministry but have tabled a vote of no-confidence.

"The Congress High Command is obsessed with one idea and is determined to 'divide the Moslems, and particularly to break the solidarity of the Moslem League, no matter what the method may be.' (Statesman, Oct. 9, 1938)

সিদ্ধান্তিক বঙ্গমতী

নিরপেক্ষতা অবশ্যই প্রাপ্তি!) যখন বরদলৈ মন্ত্রিসভার গঠন ঘোষিত হয়ে গেল, তখন শপথ গ্রহণের আগেই ইউরোপীয় দলের নেতা এফ ডবলিউ হকেনহাল অনাস্থা প্রস্তাব হাজির করলেন। ইউরোপীয় দলনেতা বললেন, কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতির বিরুদ্ধে তাঁদের আপত্তি আছে বলে এই অনাস্থা প্রস্তাব তুলছেন না—কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বলেই তাঁদের বিরোধিতা।

চা-বাগানের মালিক ইংরেজদের ন্যায়পরায়ণতা! হাসির কথা বটে। কয়েকদিনের মধ্যে তা প্রমাণিত হয়ে গেল। কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মনীতির বিরুদ্ধে আপত্তি আছে বলেই কংগ্রেসের বিরোধিতা করছি—একথা পবিত্রকার বিবৃতিযোগে জানানো কেন্দ্রীয় আইনসভার ইউরোপীয় দলের গ্রিফিথস সাহেব। কথাবার্তার এই অসংলগ্নতা দেখিয়ে দেয়, স্ভাষচন্দ্র ইউরোপীয়দের খুঁচিয়ে কতখানি অস্থির করে তুলেছিলেন। ইউরোপীয়দের রাগের আরও কারণ, স্ভাষচন্দ্র হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, ইউরোপীয়রা যদি আসামে কোনো শাসন-সংকট বাধায়, তাহলে কংগ্রেস

সর্বভারতীয় স্কেলে ইউরোপীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে তার নীতির পুনর্বিবেচনা করবে; কংগ্রেস একটা অখণ্ড প্রতিষ্ঠান—তাকে যেখানেই আঘাত করা হোক না কেন, সে আঘাত সর্বত্র বাজে।

স্ভাষচন্দ্র সম্পর্কে ইউরোপীয়রা কতখানি রুষ্ট ছিল তার প্রমাণ তাদের সাকুলার, যাতে বলা হয়েছিল, আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা স্ভাষচন্দ্রই জোর করে তৈরি করে দিয়েছেন, গোপীনাথ বরদলৈর মন্ত্রিসভা গঠনে ইচ্ছা ছিল না। কংগ্রেস ওয়ার্ল্ড কমিটিও গরুরাজি ছিল। এই সাকুলারের প্রতি স্ভাষচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি খুব নিরীহভাবে বলেছিলেন, “এই প্রদেশের কংগ্রেসীরা এবং তার পশ্চাত্তাত্ত্বী জনগণ যদি মন্ত্রিসভা গঠনে সর্বসম্মতি প্রকাশ না করতেন, তাহলে আমি কদাপি এক্ষেত্রে কিছু করতাম না। বস্তুতপক্ষে আমরা যদি বর্তমান মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়টি অননুমোদন না করতাম, তাহলে আসামের কংগ্রেস মহলে বিস্মৃত অসন্তোষ দেখা দিত। ওয়ার্ল্ড কমিটির বিষয়ে বলতে পারি, বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি তার সম্পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।”

০ “When the Assembly met to-day Mr. F. W. Hockenull, the European leader wanted to move a motion of non-confidence against the new Ministry but the Speaker ruled that he could not do so at present.

“The no-confidence motion tabled by the European group is based entirely on the fact that the group does not believe that a Congress-guided Ministry enjoys the support of a majority of the House. It has nothing to do with any programme which the Congress Ministry may or may not introduce.” (বক্তৃতি লেখক-নিদেশে)

(Statesman, Sep. 20, 1938)

৪ স্ভাষচন্দ্র বলেছিলেন:

“To my mind this attitude of the Assam European Assembly Party amounts to an open war on the Congress, for which there is not the slightest justification. The attitude of the European Group in Assam will, I am afraid, have repercussions all over the country, and it is but natural that it will influence our own attitude towards the European community all over India. It would be fatal mistake to regard the events of Assam as an isolated phenomenon. Congress is a unitary organisation and whatever happens to the Congress in one part of the country, naturally has repercussions all over India.”

(Statesman, Oct. 7, 1938)

৫ এই সাকুলারটি আমরা পাই নি। সংবাদপত্রে এর উল্লেখ দেখছি। এই সাকুলারটি সম্পর্কিতভাবে প্রমাণ করে দিচ্ছে, আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনে মধ্য ভূমিকা স্ভাষচন্দ্রেরই ছিল। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে বেরিয়েছিল:

“On his (Bose's) attention being drawn to a circular by the European Group in Assam that Mr. Bose forced the formation of the Bardoloi Ministry in Assam against the desire of Mr. Bardoloi and the Working Committee, Mr. Bose said, ‘I would have been the last man to do anything with the formation of the present Ministry, if it had not been the unanimous desire of Congressmen in that province and the public behind the Congress. As a matter of fact if we had not sanctioned the formation of the present Ministry, there would have been wide spread discontent in the ranks of the Congress in Assam. So far as the Working Committee is concerned it is a matter of common knowledge that the present Ministry has the fullest support of that body.’”

(Amrita Bazar, Nov. 24, 1938)

সুভাষচন্দ্রের এই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল অনেক কথাই। আসাম মন্ত্রিসভার গঠনে সুভাষচন্দ্রকে কেবল বাইরেই নয়, ভিতরেও লড়তে হয়েছিল। কংগ্রেস কোয়ালিশনে যোগদান করবে না—এত বড় প্রতিজ্ঞাকে সুভাষচন্দ্র টালিয়েছিলেন, সে কি বিনা সংগ্রামে? তিনি কি কংগ্রেস-সভাপতি হিসাবে নিজ সিংধান্ত চাপিয়ে দেন নি? ওয়াকিং কমিটি যখন সেই সিংধান্ত গলধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তখন বাইরে অবশ্য সুভাষচন্দ্র খুবই সরল মনস্কর কন্ঠে জানিয়েছিলেন, মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে আমরা সবাই একমত। কিন্তু উল্টোদিকে আর একটা গুহ্য ইঙ্গিতও ছিল—এক্ষেত্রে হাই কমান্ড গররাজি হলে গোটা আসামের কংগ্রেস-মহলে অসন্তোষের ঢেউ উঠত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উপরের কথাগুলির মধ্যে তিনি কংগ্রেস-বিরোধীদের যেমন উত্তর দিয়েছেন, একই সঙ্গে কোয়ালিশন-বিরোধী কংগ্রেসীদেরও কিছ্র সমঝে দিয়েছেন।

অনেকগুলি বিবৃতিতে ক্রমান্বয়ে সুভাষচন্দ্র ইউরোপীয়দের আক্রমণ করেছেন, সুতরাং কংগ্রেস-বিরোধী চক্রান্তের নায়ক এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার ইউরোপীয় নেতা পি জে গ্রিফিথসের পক্ষে উত্তর না দিয়ে উপায় ছিল না। খুব অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি উঁচিয়ে আছে আক্রমণের জন্য। ১০ অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত বিবৃতির গোড়ায় তিনি বললেন, “মিঃ বসু, সকল ভুল বিবৃতি এবং মিথ্যা সিংধান্তের আলোচনা করতে গেলে যে জারগার দরকার, ততখানি গুরুত্ব তাঁর বিবৃতিগুলি পেতে পারে না, কিন্তু ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিষয়ে তাঁর মনোভাবের বিষয়ে কিছ্র বলতেই হবে।”

মিঃ বসুর বিবৃতিগুলি দীর্ঘ উত্তরের যোগ্য না হলেও গ্রিফিথ সাহেব কিছ্র দীর্ঘ বিবৃতিই দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে তিনি মিঃ বসুকে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কাকে বলে সে বিষয়ে কিছ্র সং শিক্ষা দান করেন। প্রতিটি সদস্য কিভাবে নিজ বিবেক অনুযায়ী কাজ করবে, কিভাবে বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপন্থাতি অনুযায়ী সদস্যদের বিবেক নিয়ন্ত্রিত হবে—সেসব কথা প্রাঞ্জল ভাষায় জানিয়েছিলেন, কেবল একটি কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন—যেসব ইউরোপীয় সদস্যের পক্ষে এসব অধিকার তিনি দাবি করছেন, তাঁরা কেউই যথার্থভাবে নির্বাচিত হন নি। গ্রিফিথ সাহেব বলেছিলেনঃ

“মিঃ বসু, তাঁর বিবৃতির আরম্ভে আক্রমণ করে বলে-

ছেন, আসামের ইউরোপীয় দল ‘রাজার সরকার’ চালু রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েও পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে নতুন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। রাজার সরকার চালু রাখা বলতে যদি মিঃ বসু বোঝাতে চান—যে-দলেই সরকারে আসুক তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বা কার্যনীতি বিবেচনা না করে তাদের সমর্থন করে যাওয়া—তাহলে জোরেব সঙ্গে বলাই, এমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি বা হতে পারে না। এ ধরনের প্রতিশ্রুতি পার্লামেন্টারী গভর্নমেন্টের মূল ভাবের বিরোধী। পার্লামেন্টারী রীতিতে বিরোধী দল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে—একথা না বুঝলেই এ ধরনের প্রতিশ্রুতির কথা কেউ ভাবতে পারে। মিঃ বসুকে আমি কি স্মরণ করিয়ে দিতে পারি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিরোধী দল ‘ইজ ম্যাজেসটিজ্ অপোজিশন্’ বলে পরিচিত এবং বিরোধী দলের গুরুত্বের স্বীকৃতিরূপে বিরোধী দল নেতা সরকারের কাছ থেকে গাহিনা পান?”

অতঃপর গ্রিফিথস সাহেব শিক্ষাদানজ্বলে জানিয়েছিলেন, পার্লামেন্টারী পন্থাতিতে সদস্যরা বিভিন্ন দলের নীতি ও কর্মপন্থাটিকে খুঁচিয়ে-খাঁচিয়ে দেখেন। তারপর তিনি সরকার পক্ষ বা বিরোধী দল কোনো একটা দলে যোগ দেন; কিন্তু তিনি তখন যে-দলেই থাকুন, ‘রাজার সরকার’ চালু রাখার ব্যাপারে অংশ নিচ্ছেন।

গ্রিফিথসের বিবৃতি একটি সুন্দর স্বপ্ন এনে দিয়েছিল—ভারতবর্ষ একেবারে ইংলন্ড হয়ে গেছে, সেখানে ইংলন্ডের অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত রয়েছে। এই স্বপ্নের অংশীদার হতে অসমর্থ ভ্রান্তবুদ্ধি সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে গ্রিফিথসের আরও কিছ্র সহাস্য শিক্ষাঃ “ইউরোপীয় দল যদি সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভূমিকা গ্রহণ করে বলত, ‘যতক্ষণ আমাদের স্বার্থ বজায় থাকছে ততক্ষণ কে এই প্রদেশ শাসন করছে তা আমরা গ্রাহ্য করি না, আমাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এমন যে-কোনো দলকে আমরা সমর্থন করতে রাজি আছি’—তাহলে মিঃ বসু কী বলতেন? সে ক্ষেত্রে মিঃ বসুর এই অভিযোগ কি সত্য হয়ে উঠত না—আইনসভার ইউরোপীয় দল যথাযোগ্য অংশ নিচ্ছে না!” গ্রিফিথস জানালেন, আসামের ইউরোপীয় দল অন্য সকল দল অপেক্ষা আসামের স্বার্থ সম্বন্ধে অধিক সচেতন। সুতরাং এদেশের শ্রেষ্ঠ স্বার্থসাধক দলের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আসামের ইউরোপীয় দল চলবে। গ্রিফিথসের ঝুলি থেকে অতঃপর বিড়াল বেরিয়ে পড়ল—তিনি পরিস্কারভাবেই জানালেন—কংগ্রেস দল নয়, সাদেক্সার দলই আসামের শ্রেষ্ঠ স্বার্থ সংরক্ষণ করবে এবং সেজন্য তাঁরা সাদেক্সার সমর্থক।

৬ গ্রিফিথসের বক্তব্যের অংশঃ

“The European Group in Assam is probably in closer contact with the needs of the province as a whole than any other party and its consequent interest in the welfare of the province compels it to consider the policies and programmes of the different parties which appear to it to be working in the best interests of the country. It may be that the Congress Party in power would have a very different policy from

আফগান মোশন পিকচার

৫০,০০০ টাকা
জিতে নিন

আফগান মো-এর 'আমার ছপ' আবার পছন্দ প্রতিযোগিতায় যোগ দিন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে আশ্চর্যের পরিণত দিন।
আপনার নিপুণতার যাচাই করার এত অর্থের সুযোগ হারাবেন না।
পারব করুন... যোগ দিন 'আমার-ছপ-আবার পছন্দ'
প্রতিযোগিতায়... সঙ্গে নিম্ন শব্দের নির্দেশ সব প্রসঙ্গ।

প্রথম পুরস্কার	২০,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার	৫,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার	২,০০০ টাকা

এছাড়া রয়েছে অনেকগুলি মনোমোহিত সাফল্য পুরস্কার।
এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া খুব সহজ, আর কোন ব্যয় নেই।
কৃষি ভো নেই-ই। এর নিয়মগুলি স্পষ্ট ও সরল। প্রবেশ পত্র
আফগান মো-এর স্ট্যান্ডার্ড স্টিকার আঁকনের মধ্যে পাবেন। তাতে
আফগান মো-এর ১৮টি ছপ-প্রমাণের ছবি আছে। সারাদিনে তার
পর যেটি আপনি ব্যবহার করেন সেই প্রমাণসহ মো-এর মতো
মাত্র ৮টির মাত্র লিখে দিন। কত সৌন্দর্য! কত মজা! জীবনের দুটি
প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার আগে আফগান মো-এর নিয়মগুলি
সৌন্দর্য প্রমাণ ব্যবহার করলে পুরস্কার জিতে নেওয়া হবে।



আফগান মো

সৌন্দর্য প্রমাণ আবার ছপ আবার পছন্দ প্রতিযোগিতা

১. এফ. পাইলটসন, ২. এফ. পাইলটসন, ৩. এফ. পাইলটসন, ৪. এফ. পাইলটসন, ৫. এফ. পাইলটসন

বিবৃতির শেষে প্রবল ঘৃণা ও প্রবলতর বীরব্রতের প্রকাশ
মিঃ গ্রিফিথস মিঃ বসুর হুমকির বিরোধিতা করলেন। এর
মধ্যে সবচেয়ে উপাদেয় অংশ সেইটুকু যেখানে তিনি জানিয়ে-
ছিলেন—বসুর বিরুদ্ধে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতর থেকেই
সমর্থন পাবেন। গ্রিফিথস বললেনঃ

“পরিশেষে আমি মিঃ বসুর সম্পূর্ণ আনপারল্যামেন্টারী
মনের চেহারার জন্য ক্ষোভ বোধ করছি, যে-মনের বশে
তিনি ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হুমকি জানিয়েছেন
এবং ইঙ্গিত করেছেন যে, আসামে ইউরোপীয়রা যদি কংগ্রেস
দলের বিরোধিতা করে, তাহলে তারা সারা দেশে ঝঞ্ঝাট
পড়বে।

১ “পারল্যামেন্টারী সংস্থাসমূহ তার প্রত্যেক সদস্যের
বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করবার স্বাধীনতার উপর এবং সেই
বিশ্বাস মনঃপূত না হলেও অপর সদস্যগণ কর্তৃক তাকে
সম্মান করে চলবার মনোভাবের উপর নির্ভরশীল। মিঃ
বসুর হুমকিতে ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভীত নয়, কারণ
কংগ্রেস দলের সম্বন্ধে আমাদের অনেক বেশি জ্ঞান আছে,
যার জন্য বিশ্বাস করতে পারি, পারল্যামেন্টারী ভাবের রস-
গ্রহণে মিঃ বসুর অসামর্থ্যের তুলনায় অনেক বেশি রস-
গ্রহণের সামর্থ্য এই দলের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে রয়েছে।

“আমরা অধিকন্তু একথা স্মরণ করতে পারি, হুমকিই
মিঃ বসুর রাজনৈতিক অসম্মানার প্রধান অঙ্গ। এবং
ফেডারেশন-প্রশ্নে মিঃ বসু নিজ দলের বিরুদ্ধে যে হুমকি
জানিয়েছেন, তার জন্য তাঁর দল যতখানি বিচলিত, আমরা

নিশ্চয় আমাদের বিরুদ্ধে তাঁর হুমকিতে তার বেশি বিচলিত
নই।” (স্টেটসম্যান, ১১ অক্টোবর, ১৯৩৮)

গ্রিফিথসের এই বিবৃতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে
সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “এক্ষেত্রে তিনি বাংলার আইনসভায়
অন্যথা প্রস্তাব ওঠার পরে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল সৌজন্যবৃত্তি
দেন তার প্রতি মিঃ গ্রিফিথসের মনোযোগ আকর্ষণ করাতে
চান। প্রাদেশিক আইনসভাসমূহে ইউরোপীয় দলের
মনোভাব সম্বন্ধে স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের বক্তৃতায় ব্যাপকতর
দৃষ্টিভঙ্গি ও তার প্রযুক্তি ছিল। হুমকির কোনো প্রশ্নই
এখানে ওঠে না। কিন্তু আসামের ইউরোপীয়দের নীতি
অন্যান্য স্থানের ইউরোপীয় দলের নীতির সঙ্গে সমরূপ
নয়। এক্ষেত্রে মিঃ গ্রিফিথস যদি হুমকির কথা বলেন
তাহলে তা তাঁর ‘অপরোধী বিবেকের’ রূপই দেখিয়ে দিচ্ছে।
মিঃ গ্রিফিথস ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হলে সেখানকার
ইউরোপীয় দল ভিন্ন নীতি গ্রহণ করত।”

সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেনঃ “আইনসভা এড়িয়ে
চলার ইচ্ছা আসাম মন্ত্রিসভার নেই। পূজা ও রমজানের
ছুটির জন্যই স্পীকার আইনসভা আহ্বান করতে পারছেন
না। অবশ্য একথা সত্য যে, গত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে
যেখানে কাজকর্ম ফেলে রেখে গেছে, সেখান থেকে নিজেদের
নীতি অনুযায়ী কাজ গড়িয়ে তুলতে বর্তমান মন্ত্রিসভার
কিছু সময় লাগবে।”

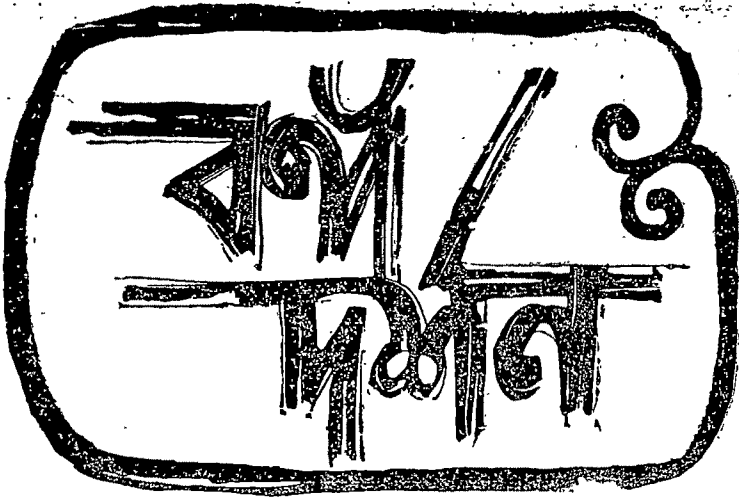
সুভাষচন্দ্র, ১৫ অক্টোবর, ১৯৩৮)

[কম্প]

that which it has advocated in Assam during the past 18 months. Political align-
ments, however, must be based on known facts about the past and not on specula-
tions as to future changes of mentality, and in the light of what has been the avowed
policy of the Congress Party in the province of Assam since the inauguration of
provincial autonomy the European Group had no choice but to support the Saadullah
Ministry.” (Statesman, Oct. 11, 1938)

৭ ইউরোপীয় সংকটে মানসিকভাবে ভারতের ইউরোপীয় সম্প্রদায় এতই উদ্ভিষ্ট ছিল যে, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান
সংবাদপত্রগুলি এই ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে বেশি ঘাঁটাতে চায় নি। তবে পায়োনীর ১৪ অক্টোবর, ১৯৩৮-এ
Mr. Basu Rebuked নামে সম্পাদকীয় না লিখে পারে নি। তার শেষাংশ ছিলঃ

“What was the meaning of his recent outburst against the Europeans in Bengal
for having stood by Mr. Huq on the motion of no-confidence in his ministry. In refus-
ing to be cowed by his threats; veiled or naked, the European Group in Assam
Assembly has acted constitutionally, correctly, and with courage. Incidentally, it is
amusing to find Mr. Bose now playing the role of the Defender of the Parliamentary
Faith, and now what of the champion wrecker of Constitutions!”



পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর অশান্তি, হাঙ্গামা ও অরাজকতা বন্ধ হবে বলে যাঁরা আশা করেছিলেন, তাঁরা অবাক হয়ে দেখছেন যে, হাঙ্গামা ও অরাজকতা বন্ধ হওয়া দূরে থাক—তা যেন বহুদুখী হয়ে সারা বাংলাদেশকেই গ্রাস করতে বসেছে। এমন দিন একটিও পওয়া যাবে না যেদিন কোথাও-না-কোথাও সংঘর্ষ, হানাহানি, প্রকাশ্য বা গুপ্ত হত্যাকাণ্ড, বোমাবাজি, লাঠালাঠি, ছুরি চালাচালি ইত্যাদি না ঘটছে। প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পাঁচ-সাতটি খুন এবং কুড়ি-পঁচিশটি সশস্ত্র সংঘর্ষের সংবাদ পাঠ করতে করতে মানুষ এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে যে, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করাই এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কলকাতা শহর শূন্য কলকাতাবাসীদের নিয়ে নয়, মফস্বল অঞ্চলসমূহ থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যহ রোজগারের খন্দায় কলকাতায় যাওয়া-আসা করেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের উদ্বেগের অন্ত নেই, মানুষটা জ্যান্ত ফিরতে পারবে কিনা তাই নিয়েই উৎকণ্ঠা। সংঘর্ষ ঘটছে প্রকাশ্য রাজপথে। কোথাও দুই রাজনৈতিক দলের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে আবার কোথাও পুলিশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষ হচ্ছে। এক দলের লোক অপর দলের কর্মীকে বাড়ি থেকে টেনে এনে প্রকাশ্যে পিটিয়ে মারছে। আবার সেই দলের লোক প্রতিপক্ষ দলের নিরীহ কর্মীকে রাস্তাঘাটে চোরগোপ্তা মেরে তার প্রতিশোধ নিচ্ছে। প্রত্যেকটি খুনোখুনির পর এক-একটি দলের আহবানে এক-একটি এলাকা 'বন্ধ' হচ্ছে।

পুলিশের ওপরে কোন ভরসা নেই। এক-একটি পাড়া ঘেরাও করে অপরাধী সম্প্রদায়ের নামে পুলিশ শত শত নিরীহ যুবককে ধরে অমানুষিক অত্যাচার করছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সেই অত্যাচারের ফলে কেউ কেউ পৃথিবী থেকে চিরকালের মত বিদায় নিচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, সমীর ভট্টাচার্য নামে আঠারো বছর বয়সের একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ থানায় এনে তাকে এমন প্রহার দেয় যে, সে প্রাণত্যাগ করে। পুলিশের তরফ থেকে এই ধরনের রিয়াকলাপ প্ররোচনামূলক এবং এরই ফলে কলকাতায় আবার আগুন জ্বলছে। পুলিশের তরফ থেকে এ-সংবাদ অস্বীকার করা হলেও, এই রকম প্রায়ই ঘটে, তার নিজস্ব আছে। আমরা পূর্বে থানার অভ্যন্তরে ধৃত বিচারাধীন বন্দীদের ওপর পুলিশের অমানুষিক পীড়নের কথা লিখেছিলাম। যদি কারো বিরুদ্ধে কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, কোর্টে তার বিচার হওয়া উচিত এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদের পীড়ন করার অধিকার পুলিশকে কে দিয়েছে, বিশেষ করে সে পীড়ন যদি নরহত্যা পর্ব্বাসিত হয়, তাহলে সে ঘটনা আরও অশান্তির প্ররোচনা যে যোগাবে, তাতে আর সন্দেহের কি আছে?

গোটা কলকাতা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে আজ এক প্রচণ্ড সন্ত্রাসের রাজত্ব শূন্য হয়েছে। কখন কোথায় বোমা ফাটবে, তার আঘাতে কার হাত-পা উড়ে যাবে কেউ জানে না। সাধারণ মানুষ যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন তাঁদেরও নিস্তার নেই। কারণ আকস্মিক বোমার আঘাতে আহত বা নিহত হবার ভয় যেমন আছে, তেমনি ভয় আছে সি

আর পি-র হাতে ঠাণ্ডনি খাবার। এই বিপজ্জনক ও সন্ত্রাসবাদী আবহাওয়ায় সমাজবিরোধী দাণ্ডাবাজ, পেশাদার গুন্ডা-বদমায়েশেরাই সবচেয়ে বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। অরাজকতা ও গুন্ডাদের দৌরাভা যে কি সাংঘাতিক আকার ধারণ করেছে, তা মাণিকতলা অঞ্চলে কয়েকদিন আগে একটি কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের কাহিনী চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে

দেবে। দৃষ্টকারীরা যেভাবে একটি বাড়ির দরজা ভেঙে ঢুকে একজন ছাত্রীকে ধর্ষণ করেছে, সঙ্গে বোমা ও অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে, তাতেই বৃদ্ধিতে পারা যায় এরা আজ কত বেপরোয়া, কত দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে। কলকাতার মত শহরে বোমা নিয়ে নারী ধর্ষণকারী যদি বাড়ির ওপর চড়াও হবার সাহস পায়, তবে দেশের আইন-শৃঙ্খলা যে কোন অধঃপাতে গেছে, তা কারুরই বৃদ্ধিতে বাকি নেই।

অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ কোথাও কারো জীবন নিরাপদ নয়। এই ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তারা কিন্তু একেবারেই উদাসীন। গত কয়েক মাসে কয়েকশো লোক খুন হয়েছে, অথচ একটি ক্ষেত্রেও অপরাধীদের ধরবার অথবা খুনের কিনারা করার চেষ্টা হয়েছে বলে মনে হয় না। এমন কি, থানায় থানায় খুনের ডায়েরি নিতেও পুলিশ অফিসারদের মধ্যে অনীহা দেখা যাচ্ছে। অথচ সরকারী কর্তারা বলে বেড়াচ্ছেন আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা নাকি ভালোর দিকে যাচ্ছে। একমাত্র গণজিকা-সেবী ছাড়া আর কেউ এ-ধরনের আত্ম-সন্তুষ্টি প্রকাশ করে দায়িত্বস্থলনের চেষ্টা আগে করেছেন বলে শোনা যায় নি। অবস্থা আজ কত ভয়াবহ ও মর্মান্তিক তা স্বাধীনতা দিবস ও তার পরের দিনের কলকাতা ও দমদমের ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। স্বাধীনতা দিবসেই কলকাতা শহরের ২১টি জায়গায় সংঘর্ষ হয়েছে এবং মারমুখী জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশকে তিরিশ রাউন্ড গুলী ছুড়তে হয়েছে। এই সব ঘটনায় একজন নিহত ও তিরিশজন আহত হয়েছে। ঐ দিনই দমদমে নকশালপন্থী শিক্ষক কনক অধিকারীকে খুন করা হয়। পরের দিন সকালে গ্রামোফোন কোম্পানীর শ্রমিক ইউনিয়নের সেক্রেটারী সি পি এম নেতা শ্রীঅনন্ত দত্তকে একা পেয়ে ভলোয়ারের আঘাতে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলা হয়েছে। ওই দিন বিকেলে মানস মিষ নামক একজন নকশালপন্থী যুবককে দমদমের নল-পাড়া অঞ্চলে বোমার আঘাতে হত্যা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক প্রতিবন্ধিতা আজ যে কোন নোংরা স্তরে গিয়ে পৌঁচেছে, তা এই সব ঘটনার পর আর ব্যাখ্যা করে বলতে হয় না। রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু সে ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা মোটেই গৌরবজনক নয়। উগ্র-পন্থীদের সঙ্গে সি পি এম-এর সংঘর্ষ

দাণ্ডাহিক বঙ্গমতী

এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তারা একে অপরকে নেকড়ে বাঘ বলে মনে করছে। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলি সমাজজীবনে সুস্থ অবস্থাওয়া ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন তৎপরতাই দেখাচ্ছেন না। এই সব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের দ্বারা কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে, তা কেউই চিন্তা করার প্রয়োজন বোধ করছে না। যে রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের কর্মী ও সমর্থকদের এই রকম জঘন্য নরহত্যা ও বাঙালি সন্তানদের পথে প্ররোচিত করছেন, তাঁরা আজকের যুবসমাজকে কোন নরকের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তা তাঁরা ভেবে দেখছেন না। পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচারের দ্বারা হানাহানির উস্কানি দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যে পথে চলেছে তা গৃহযুদ্ধের পথ, কিন্তু এই গৃহযুদ্ধের শিকার জনসাধারণের শত্রুরা নয়—জনসাধারণ নিজেরাই। এই রক্তক্ষয়ের পিছনে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই, মহৎ উদ্দেশ্য নেই, কোন সুচিন্তিত আদর্শ নেই, আছে শুধু অন্ধ বিদ্বেষ, যুক্তিহীন ঘৃণা আর অর্থহীন আত্মপীড়ন। আর এই ব্যক্তিগত সন্তোষ ও খুনোখুনি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনকে একটা বন্ধ চোরাগিলির ভেতর দিয়ে বিপর্যয়ের অভয় গহবরে ঠেলে নিয়ে চলেছে, যার পরিণামে ক্যাপিভাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বললে অত্যুত্তী হয় না।

কলকাতায় হাঙ্গামা

বৃহস্পতিবার ২০শে আগস্ট তারিখ থেকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে প্রচণ্ড হাঙ্গামা শুরু হয়, তার জের কলকাতার অপরাপর অংশেও ছড়িয়ে পড়ে। নকশালপন্থী নেতাদের প্রেরণার প্রতিবাদে সৈনিক সকাল থেকেই সারাদিন ধরে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যুবকদের সংঘর্ষ ঘটে। হাঙ্গামার কতকগুলি বাস ও ট্রাম ভস্মীভূত হয়েছে। পুলিশ প্রথম দিনে বিভিন্নস্থানে দশ রাউন্ড গুলী ছোঁড়ে এবং বহুবার কাঁদানে গ্যাস ফাটায়। জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে প্রথম দিন বারজন নিহত ও পনেরজন আহত হয়।

হাঙ্গামার প্রচণ্ডতা আর তার মোকাবিলায় পুলিশ ও সি আর পি-র ভূমিকায় ওই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটা ঘাসের রাজত্ব চলে। ট্রাম আর স্টেট বাস রাজপথ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে এই বিস্তীর্ণ এলাকা মহনগরীর অন্যান্য এলাকা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্কুল-কলেজগুলি সব বন্ধ হয়ে যায় এবং দোকানপাটও বন্ধ থাকে। ক্ষুধা যুবকেরা যেমন বাসে ট্রামে অগুন লাগায় তেমনি তারা পুলিশের মোকা-

বিলায় অনেক ক্ষেত্রেই সোড়ার বোতল আর বোমা ব্যবহার করে। পুলিশ আর সি আর পি সমগ্র এলাকা ছেয়ে রাখার ফলে ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষকে মাথার ওপর হাত তুলে চলতে হয়। শ্যামপুকুর অঞ্চলে এই বিক্ষোভের সঙ্গে সমীর ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রতিবাদেও বিক্ষোভ যুক্ত হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনসাধারণ এই মৃত্যুকে হত্যা আখ্যা দেয়। এ দিন সকালে সমীরের মৃতদেহ তার বাড়িতে দেখার পর এ এলাকা সহ আশ-পাশের এলাকার মানুষ প্রচণ্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে।

পরদিনও এই হাঙ্গামার বিরাম ছিল না। এবং তা কলকাতার আরও নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বঙ্গদর্শন এই অবস্থারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হচ্ছে, হাঙ্গামার গতি শেষ পর্যন্ত কোনদিকে যাবে তা আমরা পূর্বাঙ্কে বলতে পারছি না, তবে এটুকু প্রতিমুহূর্তে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, রাজ্যপাল প্রশাসনে পশ্চিমবঙ্গের নতিবাস উঠেছে। এ এক আজব অবস্থার শুরু হয়েছে, যেখানে রক্তক্ষয়ের ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানা যাবে না।

ওদিকে দুর্গাপুর

একাদিকে সি আর পি-র লাঠি, কাঁদানে গ্যাস ও গুলীচালনা এবং অন্যদিকে বিক্ষোভকারী জনতা কতৃক অগ্নি-সংযোগ ও দোকানপাট লুণ্ঠিতরাজের কয়েকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের চলতি ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি ঘটে এবং দুর্গাপুর স্টীল টাউনশীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় অনির্দিষ্টকালের জন্য সাম্মা আইন জারি করা হয়। অবস্থা মোকাবিলায় জন্য আরও প্রচুর সি আর পি পাঠানো হয়েছে। স্টীল টাউনশীপ ছাড়াও বেনাচিতি, এ ভি বি টাউনশীপ ও এম এ এস সি টাউনশীপ কান্দুর কবলে পড়েছে। গত ২০শে আগস্ট প্রায় সাড়ে নটায় স্টীল টাউনশীপের 'এ' জোনে স্থানীয় হাসপাতাল স্টাফের সঙ্গে সি আর পি-র সংঘর্ষ বাধে। হাসপাতালের জানলা-দরজা ভেঙে সি আর পি ভেতরে প্রবেশ করে এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রহার করে। বেলা ১১টায় 'এ' জোনের অশোক এডভিনউতে ব্যারিকেড সরাতে একদল মহিলা সি আর পি-কে বাধা দেয়। ওই সময় কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনী মহিলাদের ওপর লাঠি-চার্জ করে ও ১৫ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। কিন্তু তাতেও নারীবাহিনীকে হটানো যায় না। 'এ' জোনে সি আর পি ব্যারিকেড সরাতে গেলে প্রবল বাধার

সামনে পড়ে। প্রতিরোধকারীদের ওপর পুলিশ প্রথমে টিয়ার গ্যাস ছোঁড়ে ও পরে গুলী চালায়। ফলে দুজন আহত হয়। পুলিশ মোট বারো রাউন্ড গুলী ছোঁড়ে।

দুর্গাপুরে অশান্তির সুত্রপাত বেশ কিছুকাল আগে থেকেই শুরু হয় এবং বর্তমানে এই স্থানটি একটি শক্তিপরীক্ষার লড়াই-এর আসরে পরিণত হয়েছে। এই লড়াই-এর একাদিকে রয়েছে সি পি এম পরিচালিত ছয় পার্টি জেট আর অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং সি পি এম বিরোধী প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দল-গুলি। এই লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল অনেকদিন আগেই—অর্থাৎ যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর থেকেই। তার পর থেকেই হয়েছে দুই তরফের মজবুতের সুত্রপাত। দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার গুরুত্ব শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের দিক দিয়েই যে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, শ্রমিক আন্দোলনের দিক দিয়ে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব অসাধারণ। এই মহৎ ও সরল সত্যটা সকলেই বুঝেছেন এবং তার ফলে ইম্পাত কারখানাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে এসপার-ওসপার লড়াই। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্গাপুরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স পাঠাবার পর থেকেই প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। দুর্গাপুরের সি পি এম নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক ইউনিয়ন কতৃক ধৃত দিলীপ মজুমদার প্রমুখ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এবং সি আর পি ও সিকিউরিটি ফোর্স তুলে নেবার দাবিতে আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটল, তারপর থেকেই ধাপে ধাপে অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে শুরু করেছে। গভর্নমেন্ট নতি স্বীকার করতে রাজী হন নি, সি পি এম বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল, কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস ও আট পার্টি জেট এই ধর্মঘটের প্রকাশ্য বিরোধিতা করেছেন, সরকারী মনোভাবের প্রতিবাদে বর্ধমান বন্ধ হয়েছে, দুর্গাপুরে গুলী চলেছে, কান্দুর জারি হয়েছে, কিন্তু ধর্মঘট শুরুর হবার পর অনেকদিন কেটে গেলেও সমস্যার অবনতি ছাড়া উন্নতি ঘটে নি। ধর্মঘটের সমর্থক ও বিরোধী দুই পক্ষই এই লড়াইকে ঋণাদার লড়াই-এ পরিণত করেছেন এবং দুই পক্ষই ধরে নিয়েছেন যে, এই লড়াই-এ জয়-পরাজয়ের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করবে বাংলাদেশের রাজনীতিক্ষেত্রের ভবিষ্যতে কোন তরফের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

—২২শে আগস্ট, ১৯



উন্মত্ত জমি দখলের আন্দোলন

গত ১লা জুলাই থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি আই) ভারতব্যাপী উন্মত্ত জমি দখলের আন্দোলন শুরু করেন। তাঁদের কার্যক্রম অনুযায়ী তাঁরা জোতদারদের উন্মত্ত জমি (জোতের সর্বোচ্চ-সীমার বাইরের জমি) এবং খাস জমি দখল করতে গিয়ে কোথাও কোথাও জোতদারের লোক, আবার কোথাও কোথাও পুলিশের প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। কোন কোন ক্ষেত্রে জমি দখল করতে গিয়ে তাঁরা কোন বাধার সম্মুখীন হন নি। জমি দখলের সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কিছু লোক হতাহত হন। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বায় শুরু হয় ৯ই আগস্ট। ১৬ই আগস্ট সি-পি-আই-এর তরফ থেকে সেই আন্দোলনের যে বিবরণী প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্বায়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কমী সেই আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং ১৬ই আগস্ট পর্যন্ত মোট ১৬ হাজার কমী তাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ছুপেশ গুপ্ত এবং এস এ ডাঙ্গে সহ ১২ জন এম-পি এবং বহু সংখ্যক এম-এল-এ আছেন।

সি-পি-আই-এর হিসাব অনুযায়ী আন্দোলনের প্রথম পর্বায়ে ন্যাক ৩ হাজার কমী গ্রেপ্তার হয় এবং ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমি দখল করা হয়। তবে সরকারী হিসাব অনুযায়ী দখলের পরিমাণ ন্যাক ১০ হাজার একরের বেশী নয়। দ্বিতীয় পর্বারের জমি দখল আন্দোলনে সি-এস-পি এবং এস-এস-পিও যোগ দিয়েছেন, তবে তাঁদের জমি দখল আন্দোলনের সঙ্গে সি-পি-আই-এর জমি দখল আন্দোলনের কোন সাংগঠনিক যোগসূত্র নেই।

ভূমি দখলের আন্দোলনে ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই ব্যাপক ধরপাকড় হয়েছে

এবং এখনও হচ্ছে। শাসক কংগ্রেসের একাংশও ভূমি দখল আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি-শীল। কংগ্রেসী এম-পি মোহন ধারিয়ার বলেছেন যে, সরকার ভূমি সংস্কারের কোন ব্যবস্থা চালু করতে না পারার ফলেই বাম-পন্থী দলগুলি আজ উন্মত্ত জমি দখলের আন্দোলন শুরু করার সুযোগ পেয়েছে। সুবিচার আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ সত্যায়ন করা অন্যান্য বলে তিনি মনে করেন না। পার্লামেন্ট এবং অন্যান্য সংস্থা যদি ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না করেন, তাহলে কৃষকদের পক্ষে জমি দখলের আন্দোলনে নেমে পড়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

মোহন ধারিয়ার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট সারবস্তু আছে। কংগ্রেস দল ভূমি সংস্কারে অগ্নীকায়বশ্ব হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর ২০ বছরে সেই পথে তাঁরা বেশিদূর এগোতে পারেন নি। মনে রাখা দরকার যে, ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের মধ্যেও একটি ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম ছিল। মহাত্মা গান্ধী মার্কিন সাংবাদিক লুই ফিসারকে বলেছিলেন যে, 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরাও জমি দখল করতে শুরু করবে এবং জোতদার ও ভূস্বামীরা গ্রাম ত্যাগ করে সেই আন্দোলনে কৃষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে বলে তিনি আশা করেন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর জমিদারী উচ্ছেদ এবং জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণক আইন পাশ হয়েছে বটে, কিন্তু প্রাক্তন ভূস্বামীরা কংগ্রেসী সরকারের যোগ-সাজসে সেই আইনকে ব্যাধাৎসূর্য দৌঁখিয়ে স্বনামে-বেনামে নিজেদের জমিজমা পূর্ববৎ ভোগ করে যাচ্ছেন। অনেক জায়গায় কুকুর-বেড়ালের নামেও জমিজমা বেনামা করা হয়েছে। উপরন্তু কৃষিপণ্যের অস্বা-ভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে প্রলুপ্ত হয়ে সত্যদর

বহু দনীও গ্রামাঞ্চলে জমিজমা কিনে খামার বসিয়েছেন। অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র এবং পুঞ্জিবাদের অবৈধ প্রণয় ঘটতে শুরু করেছে। তার ফলে গ্রামের কৃষিজীবীরা ক্রমশই নিঃস্ব হতে বসেছেন। তার ফলে গ্রামের অসন্তুষ্ট কৃষিজীবীরা অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেসী সরকার-গুলো যদি সরকারী আইন যথারীতি প্রয়োগ করতেন, তাহলে শান্তিপূর্ণভাবেই গ্রামাঞ্চলে সামন্ততন্ত্র শেষ চিহ্ন বিলোপ করা যেতো। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেসী গভর্ণ-মেন্টগুলো মূলত গ্রামের এই সম্পদ ভূস্বামী প্রণয়ী ভোটের জোরে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই হেতু তাঁরা তাঁদের বে-আইনী ক্রিয়াকলাপের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস বহু রাজ্যে কুণ্ডলিকাৎ হয় এবং কোন কোন রাজ্যে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হন। তাঁরা ভূমি সংস্কার প্রয়োগের চেষ্টা করেন এবং তাতে গ্রামাঞ্চলে নতুন আলোড়নের ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউ আজ সারা ভারতব্যবধি ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রামের কৃষকদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন থামবে বলে মনে হয় না। দেশের শাসনভার যাঁদের উপর নাস্ত, তাঁরা এ-সম্পর্কে যত ভাড়াভাড়ি সজ্ঞতন হন ততই মৃগল। নইলে অর্থহীন চাবনের ভাষাতেই বলা যায়, ফসল বিপ্লব শেষ পর্যন্ত লাল বিপ্লবে পরিণত হবে এবং তাতে শৃঙ্খলিত গ্রামের ভূস্বামী প্রণয়ী নয়, সহজে ধনিক প্রণয়ী প্রাধান্যও অটুট থাকবে কি না কে বলতে পারে?

কেরালার আসন অন্তর্ভুক্তি নির্বাচন

কেরালায় নির্বাচন স্থগিত রাখবার জন্য স্থায়ী বিদ্রোহী কংগ্রেস কেরালা হাই কোর্টে এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দিল্লী হাইকোর্টে যে দুটি মামলা দায়ের করেছিলেন, তা ধারিজ হয়ে গেছে। কাজেই সেপ্টেম্বরেই কেরালার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

কেরালার বড় বড় পার্টিগুলো ইতি-মধ্যেই তাঁদের প্রার্থী বাছাই শেষ করে ফেলেছেন। সি-পি-আইয়ের নেতৃত্বাধীন মিনিফ্রন্ট ৭৬ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছেন। তাঁরা এই ৭৬টি আসন ছাড়া অন্য কোন্ কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। আসন ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবে: সি-পি-আই—৩২, মুসলিম লীগ—২১, আব-এস-পি—১৪ এবং পি-এস-পি—৯। মিনিফ্রন্ট ডি-এম-কে দলের সঙ্গে কোন সমঝোতা করেন নি। কংগ্রেস (ইন্দিরাপন্থী) দলের সঙ্গে এঁদের যে বোঝাপড়া হয়েছে, তদনুযায়ী এঁরা কংগ্রেসকে ৫৭টি আসন ছেড়ে দিয়েছেন। সি-পি-এম দলের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট

নিজদের মধ্যে আসন। ভাগাভাগি করেছে। এইভাবে: সি-পি-এম-৪৬, এস-এস-পি-১২, কে-টি-পি-৪, কে-এস-পি-৪। এছাড়া আই-এস-পি দলের সংগও এমএম ১০টি আসনে নির্বাচনী সমঝোতা হয়েছে। আই-এস-পি দলের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীকুরুপ বলেছেন যে, তাঁর দল সি-পি-এম জোটের সঙ্গে নির্বাচনী সমঝোতা করেছে বটে, তবে সেই জোটের অঙ্গীভূত হয় নি। তবে যে আসনে আই-এস-পির প্রার্থী থাকবে না, সেই আসনে তাঁরা উপরোক্ত জোটের প্রার্থীকে সমর্থন জানাবেন।

কেরালা কংগ্রেস (থুস্টান প্রধান) সি-পি-এমের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে। স্থানীয় সি-পি-এমের প্রেসিডেন্ট টি-ও-বাতা এবং কেরালা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কে-এম-জর্জ এক যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরা একটি অ-কমিউনিস্ট গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠন করে তৃতীয় জোট হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হচ্ছেন।

কেরালায় নায়ার সার্ভিস সোসাইটি নামে একটি শক্তিশালী সংস্থা আছে। এখানকারী বলেছেন যে, কেরালার ১ কোটি ভোটারের এক-পঞ্চমাংশের ওপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব রয়েছে। নায়ার সার্ভিস সোসাইটি আসলে অস্বাভাবিক উচ্চবর্ণের হিন্দুদের একটি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। কেরালায় প্রথম কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা (নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বাধীন) উচ্ছেদের ব্যাপারে এই সোসাইটির বৃদ্ধি নায়ক পশ্চাত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কাজেই ভোটারদের ওপর সোসাইটির প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। এরা ঠিক করেছেন যে, নির্দিষ্ট ২৭টি আসনে “গণতান্ত্রিক পার্টি”গুলো তাঁদের অনামত প্রার্থী না দিলে তাঁরা সেখানে নির্দলীয় প্রার্থীদের সমর্থন করবেন। গণ-তান্ত্রিক পার্টি বলতে তাঁরা কাদের বোঝাতে চাইছেন, তা স্পষ্ট করে বলেন নি। তবে

সাপ্তাহিক বসুমতী

সি-পি-এম, সি-পি-আই এবং আর-এস-পি কে তাঁরা গণতান্ত্রিক পার্টি বলে গণ্য করেন না বল জানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাঁরা হয় সি-পি-এম জোট, না হয় ইন্দিরা কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছাড়া আর কাউকে সমর্থন করবেন বল মনে হয় না।

কেরালায় সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ধার্য হয়েছে ১৭ই সেপ্টেম্বর। আর কেরালা বিধানসভায় আসনের সংখ্যা হচ্ছে ১৩০টি।

একই দিনে প্রাক্তন আইনমন্ত্রী স্বর্গত গোবিন্দ মেননের শ্রদ্ধা আসনেও (লোকসভা) উপনির্বাচন হবে। মিনিফ্রন্টের সঙ্গে সমঝোতা অনুযায়ী কংগ্রেস (ইন্দিরা) সেই আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবেন।

কেরালায় বিভিন্ন দল যেভাবে প্রার্থী দাঁড় করছেন, তাতে বেশ বোকা যাচ্ছে, নির্বাচনের পর সেখানে কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠিত হবার সম্ভাবনা নেই। কাজেই নির্বাচনের পরই সেখানে যে ব্যাপকভাবে ফ্রন্ট ভাঙাভাঙি এবং দল ভাঙাভাঙির ব্যাপার ঘটবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজ্যের একটা পরিষ্কার চিত্র ফুটে ওঠার সম্ভাবনা খুবই কম বলে মনে হয়।

সরকারী তালিকায় বেকারের সংখ্যা

গত সপ্তাহে লোকসভায় জ্যোতির্ময় বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রমমন্ত্রী ডি সঞ্জীবারা বলেছেন যে, সরকারী তালিকায় (এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের খাতায়) গত ৩০শে জানুয়ারী বেকারের সংখ্যা ছিল ৩৬ লক্ষ ২১ হাজার ৩ শত। তার মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৬ লক্ষ ২১ হাজার ৬৭৭ জন। এ তারিখে পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৩২ হাজার। ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে সংগঠিত সেক্টরে চাকুরীজীবীর সংখ্যা ২২ লক্ষ ১০ হাজার।

গম সংগ্রহ

এ বছর ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া ৩০ লক্ষাধিক টন গম সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৭০-৭১ সালের জন্য সংগ্রহের লক্ষ্য ধার্য ছিল ৩২ লক্ষ টন। কাজেই লক্ষ্য শতকরা ৯৫ ভাগের বেশিই পূরণ হয়েছে।

এ বছর (১৯৬৯-৭০) চাল সংগ্রহের লক্ষ্য ছিল ২৩ লক্ষ টন। তার মধ্যে ২০ লক্ষ টন চাল ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ লক্ষ্যের ৯০ শতাংশ পূর্ণ হয়ে গেছে।

গত সপ্তাহে পার্লামেন্টে খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী ফকরুদ্দীন আলী আমেদ বলেছেন যে, এ বছর যে রকম ফসলের পক্ষে অনুকূল বারিষাৎ হয়েছে, তেমন বহুকাল হয় নি।

মহীশূর, অম্ব, বিহার এবং কাশ্মীরের কোন কোন অঞ্চলে বারিষাতের অবস্থা ভাল না হলেও সাধারণভাবে যে বারিষাত হয়েছে, তাতে ফসলের ফলন ভাল হবে বলেই আশা করা যায়।

নিজের জালে শেখ আব্দুল্লাহ

কাশ্মীরের শেখ আব্দুল্লাহ নিজেকে সব সময়ই ধর্মীয় গোড়ামীর উদ্ভেদ বলে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু আত্মপ্রচারের জন্য এবং ভারত বিপক্ষে জিগির তোলবার জন্য তিনি সব সময়ই ধর্মীয় সংস্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন। প্রতি শতাব্দীর জন্মের নামাজ পড়বার জন্য ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে সমবেত হয়ে থাকেন। শেখ আব্দুল্লাহ এতকাল সেই সব ধর্মীয় সমাবেশে গিয়ে নিজের “স্বাধীন কাশ্মীরের” তত্ত্ব প্রচার করতেন এবং এখনও করেন। সেই সব সমাবেশে ভারতের বিরুদ্ধে বিমোহনকারী তার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে। নিছক ধর্মীয় সমাবেশে এই ধরনের মোহরা রাজনীতি যে খুবই নিলদলীয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা এতদিন সম্ভব হাছিল না। সম্প্রতি কাশ্মীরের ছাত্র সমাজই শেখের এই বিধি-বহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে ধুখে দাঁড়িয়েছেন। গত ২১শে আগস্ট গ্রীনগরের হজরতবাল্লী মসজিদে নামাজের পর শেখ আব্দুল্লাহ যখন বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করেন, সেই সময় ক্রুদ্ধ মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তার প্রতিবাদ করে। শেখ সাহেব তাদের ধমকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর ধমকে কণপাত করে নি। তারা মুসলমান সমাজের ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানাদির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য শুরু করে দেয়। শেখ সাহেব তখন তাদের বলেন যে, ধর্মীয় সভায় ধর্ম ছাড়া আর কিছু প্রচার করা চলে না। তখন ছাত্র-ছাত্রীরা বলে, “তাই যদি হয়, তাহলে আপনি রোজ এই ধর্মীয় সভায় এসে রাজনীতি প্রচার করেন কেন?” জবাব শুনে শেখ সাহেবের চক্ষু চড়কগাছ। তিনি আর সেখানে রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে সাহস পান নি। কাশ্মীরের মুসলিম ছাত্রদের এই গণতন্ত্র বোধ নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। শব্দ কাশ্মীরে নয়, ভারতের বহু এলাকাতেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রচারকার্য হয়ে থাকে। তার বিরুদ্ধে দেশের শ্রব সমাজ যে ক্রমেই সজাগ হয়ে উঠছে, সেটা আশার কথা।

২৩।৮।৭০

বসুমতীর

যাবতায়

গ্রন্থ ও

গ্রন্থাবলীর

প্রাপ্তিস্থান

বসুমতী (গ্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা-১২

এবং

সান্যাল এন্ড কোং

১/১৫ বর্ধমান চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

আন্তর্জাতিক

রাষ্ট্রসংঘঃ

ঔপনিবেশিক শাসন অবসানকল্পে গঠিত রাষ্ট্রসংঘ কমিটি ১৮ই আগস্ট পতঙ্গালের অধীন সকল দেশের স্বাধীনতার জন্য অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি জানিয়েছে।

কমিটির প্রস্তাবে 'ন্যাটো' জোটের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে কোন প্রকার সামরিক অস্ত্র কিংবা ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হতে পারে, এমন কোন জিনিস পতঙ্গালকে দেবেন না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, পতঙ্গাল 'ন্যাটো'র সদস্য।

কেবল 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর প্রতিই নয়, রাষ্ট্রসংঘ কমিটির প্রস্তাবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে, পতঙ্গালের অস্তিত্বস্থির কাজে সহায়তা করা হয়, এমন কোন কাজ যাতে কোন ব্যক্তি বা কোম্পানী না করেন। তার জন্য প্রতি রাষ্ট্র উদ্যোগী হোন, নিজের নিজের দেশের নাগরিক ও কোম্পানীকে পতঙ্গালের সঙ্গে সহযোগিতা থেকে নিবৃত্ত করুক। বিশেষ করে প্রস্তাবে মোজাম্বিকে পতঙ্গাজ শাসন বজায় রাখার চেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এখানে পতঙ্গাজ সরকার কারোয়ো ঘাসা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের যে কাজ শুরু করেছে, তার সঙ্গে যেন কেউ সহযোগিতা না করে।

প্রস্তাবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করা হয়েছে, পতঙ্গাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান ঘটিয়ে মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, ম্যাকাও প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির জন্য তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

প্রস্তাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলঃ পতঙ্গাজ ঔপনিবেশসমূহে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থ ও অন্যান্য জিনিস দিয়ে সবতোভাবে সাহায্য করার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অনুরোধ করা হয়েছে।

অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে পতঙ্গাজ সরকারের বর্বর জুলুম বর্তমানে দ্বারা

ছাড়িয়ে গেছে। তাই রাষ্ট্রসংঘ কমিটিকে এইরূপ একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে হয়েছে।

ভারত, আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, ইরাক, মালাগাসি, মালি, তানজানিয়া, নিয়েরা লিওন, তিউনিসিয়া ও যুগোস্লাভিয়া এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। কমিটির সভায় ১৪-২ ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। ইতালী ও নরওয়ে ভোটদানে বিরত ছিল।

ন্যাটো'জোটের অন্যতম অংশীদার পতঙ্গালের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাবে কি করে সায়-দেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা বৃটেন? তা-লে প্রস্তাব যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন।

আর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি না চায়, তবে নিরাপত্তা পরিষদকে দিয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণও সম্ভব নয়। তবে, এই প্রস্তাবের গুরুত্ব রয়েছে। পতঙ্গাজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমতের চাপ এর ফলে আরও বাড়বে।

ইতালীঃ

রুমের মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর ইতালীতে যে মন্ত্রিসংকট সূত্র হয়েছিল, তার অবসান ঘটেছে। রাষ্ট্রপতি সারাগাত এমিলিও কলোস্বোকে নতুন প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছে।

কলোস্বো ইতালীর প্রজাতন্ত্রের ৩২তম মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। এমিলিও কলোস্বো রুমের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। কলোস্বোর কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি পরোনো কোয়ালিশন সরকারের চারটি দলকেই আবার একত্র করে নতুন কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছেন। এই চারটি দল হলঃ ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি, সোসিয়াল ডেমোক্রেটিক পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি ও সোসিয়ালিস্ট পার্টি। সরকারের বিরোধী পক্ষ ক্রীমউনিট পার্টির সঙ্গে সোসিয়ালিস্ট পার্টি, অস্ট্রিয়া, টাসকানি ও এমিলিয়া রোয়োগানায় একত্র আঞ্চলিক সরকার গঠন করার রুমের মন্ত্রিসভা ভেঙে গিয়েছিল। অবশ্য অর্থনৈতিক প্রশ্নেও সরকারের অংশীদার দলগুলির

মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। তাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ঠিক মতো মন্ত্রিসভা ভেঙে যায়।

চারটি দলকে একত্র করে তাদের মিলিত বক্তব্য নিয়ে 'প্রধানমন্ত্রী এমিলিয়া কলোস্বো' তাঁর সরকারের নতুন কর্মসূচী স্থির করেছেন। এই কর্মসূচী তিনি ইতালীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে, চেম্বার অব ডেপুটিজ ও সেনেটে পেশ করেছেন। কলোস্বো পার্লামেন্টের আস্থাসূচক ভোটে জয়লাভ করেছেন।

কলোস্বো রুমের মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। তাই ইতালীর বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে তাঁর এই 'মধ্যম' মন্ত্রিসভা কি নতুন নীতি গ্রহণ করেন, তা দেখার জন্য সবাই অপেক্ষা করে আছেন। তবে, ইতালীর অর্থনৈতিক সংকট যে রূপ ধারণ করেছে, তাতে বৈপ্লবিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে সমস্যার সমাধান করা যাবে বলে মনে হয় না। দক্ষিণে যে 'মধ্যপন্থীরা' যে সরকারে প্রধান অংশীদার, তাঁদের নিয়ে এমন কোন কাজ ইচ্ছা থাকলেও কলোস্বো করতে পারবেন না।

বৃটেনঃ

বৃটেনের নতুন রক্ষণশীল সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লর্ড ক্যারিংটন সংপ্রতি সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড ঘুরে লন্ডন ফিরেছেন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ায় বৃটিশ প্রভাবের দায়িত্বের বিষয়ে এই সব দেশের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ক্যারিংটনের এই সফর।

সূর্যেজের পূর্বে কোন বৃটিশ সৈন্য থাকবে না। সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে বলে হ্যারল্ড উইলসনের প্রাথমিক সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, নির্বাচনে জয়লাভ করেই রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম তা ব্যাভল করে দিয়েছেন। রক্ষণশীল সরকার এশিয়ায় তাঁদের সামরিক ঘাঁটি রাখতে চান।

মালয়েশিয়া, বিশেষ করে সিঙ্গাপুর এই সিদ্ধান্তে খুশি।

তবে বৃটেন একক প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করতে চায় না। তারা অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডকেও এর সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চায়। অবশ্য অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডেরও নিজস্ব নিরাপত্তার সমস্যা আছে।

আগামী মাসে এই চারটি দেশ ও বৃটেনের মধ্যে এক যুক্ত প্রতিরক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে আমার প্রতিবেদন পেশ করার আগে একটা কথা পরিষ্কার বলে নেওয়া দরকার। সেই কথা হ'ল এই—প্রতিবেদন যদিও পেশ করা হচ্ছে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের সমীপে, কিন্তু লক্ষ্য শ্রীদাশগুপ্ত একা নন বা তিনি যে দলের নেতা সেই দল নয়। এই প্রতিবেদনের বক্তব্য সব দলেরই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল সকলেই আছেন শ্রীদাশগুপ্ত মহাশয়ের নামের আড়ালে। আমি শ্রীসুশীল ধাড়া বলতে যেমন একটি ব্যক্তির নাম ব'ঝি না, ব'ঝি পারি ব'জুজেরা সোস্যাল ডেমোক্রেট রাজনীতির প্রতীকরূপে, তেমনি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলতে ব'ঝি বামপন্থী, উগ্র রাজনীতির প্রতীকরূপে। এছাড়া আরো একটা কারণও আছে শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের নাম দু'টি ব্যবহারের মধ্যে। এই কারণ হ'ল রাজ্যের রাজনীতির বর্তমান সময়ে নিয়ামক শক্তি হ'ল দুইটি প্রধান ধারা—একটি ধারার ফাঁসিয়ারিং ধরে আছেন শ্রীদাশগুপ্ত—অন্যটির ধরে আছেন শ্রীধাড়া। মাঝে অন্য যারা আছেন—তারা মূলত দাদা ধরে আছেন অথবা মিশনারী মিশনে রয়েছেন।

মিশনারী মিশন হ'ল—যথা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় বা শ্রীঅশোক ঘোষের রাজনীতির বর্তমান লক্ষ্য হ'ল সি পি এম-কে সঠিক রাস্তায় আনতে বাধ্য করা। সি পি এম তার আগ্রাসী মনোভাব ত্যাগ করবে, ভাল ছেলে হবে, তারপর সেই গুড় বয় সি পি এম-কে নিয়ে তারা ফ্রন্ট করবেন। আবার এঁদের একই মনোভাব বাংলা কংগ্রেস সম্পর্কে। বাংলা কংগ্রেসও ভাল ছেলে হয়ে তাঁদের হাত ধরবে, সঙ্গে চলবে, কংগ্রেসের দিকে ফিরে তাকাবে না। অর্থাৎ এই মধ্যমার্গের দলগুলির মূল লক্ষ্য হল—তারা এক হাতে ধরবেন সি পি এম-কে, অন্য হাতে বাংলা কংগ্রেসকে—তারপর দুই পক্ষকে নিয়ে ওঁরা এগিয়ে যাবেন। এই পরিস্থিতি ও মূল্যায়নের ভিত্তিতেই আমার প্রতিবেদন শ্রীসুশীল ধাড়ার উদ্দেশ্যে—শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে।

একদা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একান্ত আশা-ভরসার প্রতীক যুক্তফ্রন্ট ভেঙেছিল শরিকী সংঘর্ষ ও ভাইয়ে ভাইয়ে ধুনোখুনির সূচনায়। আজ সেই ধুনোখুনি, মারামারি সমাজের সব স্তরে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র রাজ্য জুগলের রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এই জুগলের রাজ্য সম্পর্কে—নিতাদিনের গল্প বীভৎস হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত আর শ্রীসুশীল ধাড়া দুই রকমের লাওয়াই বাতলাচ্ছেন। শ্রীসুশীল ধাড়া বলেছেন—মিলিটারী ডেকে সব ঠান্ডা কর, মিলি-



টারী ছাড়া পথ নেই। শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন—হরতাল-ধর্মঘট-বাংলা বন্ধ ও প্রশাসন অচল করেই পরিস্থিতিব মোকাবিলা করতে হবে। শ্রীধাড়ার মিলিটারী ডাকার প্রসঙ্গ নিয়েই গত সপ্তাহে আমার প্রতিবেদন রেখেছি, তাই প্রতিবেদন শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের উদ্দেশ্যে।

রাজ্য রাজনীতি আজ চলছে জোর-জুলুম, খুন-খারাপি, ভীতি পদশব্দের পথে। একটা বোমা, একটা বন্দুক, একটা ছোরা যে কোন সময়ে যে কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিতে পারে। মানুষকে আজ সম্পূর্ণ এক অনিশ্চিত ভাবিব্যবহার হাতে নিজেদের ছেড়ে দিতে হয়েছে। মানুষের মৃত্যু আজ আর কোন ঘটনা নয়—দুর্ঘটনা মাত্র। সম্প্রতিকালে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড-গুলি ঘটেছে, সেইগুলিকে সঠিক ধরনে ছাপালে সেই বিবরণ কোন মানুষ নার্ভ ঠিক রেখে পড়তে পারবে না। আজ সমাজে নিরাপদ মাত্র দুই শ্রেণী—এক শ্রেণী, যারা হাতে বোমা, পিস্তল, পাইপ গান, ছোরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আর নিরাপদ হল সে সব ব্যক্তি, যাদের পিছনে ছায়ার মত সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর মানুষ পাহারা দেয়। যারা পাহারা দেয় তাদের হাতেও অস্ত্র থাকে। অতএব আজ বেঁচে থাকবার অধিকারী একমাত্র তারা—যাদের হাতে অস্ত্র আছে অথবা যাদের পিছনে সন্ত্রাসের পাহারা আছে।

এইবার প্রশ্ন করি শ্রীঅজয় মথাজী, শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক ঘোষ ও সর্বোপরি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে—কোন রাজনীতি আপনানা করছেন, যে রাজনীতির ফল হ'ল মানুষের জীবনের মূল্য কানাকাড়ি নয় এই স্তরে পৌঁছানো, জীবনের নিরাপত্তা যেখানে থাকে না, সেখানে কোন বিচারের প্রশ্নও থাকে না! তাহলে জীবনের মূল্য থাকবে না, বিচারের আশা

থাকবে না, অপরাধীর সাজা থাকবে না—এই সমাজই কি আপনাদের কাম্য? রাজ্যে সংগঠিত কেতাদুরস্ত দপ্তর, লক্ষ-অর্ধ লক্ষ সদস্যে গর্বিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা এক ডজন। এই দলগুলির কাছে বর্তমান অবস্থা যদি অসহনীয় হয়, তবে কেন প্রতিরোধ হয় না? প্রতিরোধ দূরে থাক, যদি প্রশ্ন করা যায় ওই সব ঘটনার পিছনে কারা আছে—তারা কি সবাই সমাজবিরোধী? সমাজ-বিরোধীমুক্ত সমাজ কোনদিন ছিল না, কিন্তু সমাজবিরোধীরা কোনদিন তো এইভাবে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হতে পারে নি, সমাজবিরোধীদের হাতে এত পরিমাণ রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু ঘটে নি।

রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রূপ নিয়েছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা পূরণে যখন থেকে জোর-জুলুম, খুন-খারাপিকে পথ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে রাজ্য-নীতির তত্ত্বের সঙ্গে ছোরা-পিস্তল-বোমা-বন্দুক এসেছে। প্রমোদবাবু আপনি কি এই বিশ্লেষণে একমত হবেন? আপনার দলের প্রায় একশত সভ্য, সমর্থক, কর্মী এইভাবে গুলুহতায় বা রাজনৈতিক হত্যায় নিহত হবার পরও কি আপনার মনে এই প্রশ্নে কোনপ্রকার দ্বিমত দেখা দেবে? এই একই কথা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅশোক ঘোষও মেনে নেবেন নিশ্চয়ই, কারণ ১৯৬৭ সালের পর এই জাতীয় হত্যায় সব দলেরই কর্মী রয়েছে। এই জোর-জুলুমের রাজনীতি কিন্তু শুরু হয় বেশ অহিংস পথে। একদা শান্তিপূর্ণভাবে কোন ব্যক্তিকে দৈহিকভাবে আটক রেখে এই রাজনীতি শুরু হয়—তারপর দৈহিক আটক অত্যাচারে রূপ নেয়। যেমন প্রথমে দাবী আদায়ের জন্য কাউকে ঘেরাও করা হ'ল। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘেরাও চলবে; এই ঘেরাও-এর ব্যক্তি-স্কুলের হেডমাষ্টার হতে পারেন, মিলের ম্যানেজার হতে পারেন, রেলের গার্ডও হতে পারেন। তারপর এই ঘেরাও ধীরে ধীরে নির্যাতনের রূপ নিল, ঘেরাও কর, জল খেতে দেওয়া হবে না, মলমত্র ত্যাগ করতে দেওয়া হবে না। এইভাবে শুরু হল জোর-জুলুমের রাজনীতি, যা রাজ্যকে আজ এখানে এনেছে। এই কথা তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠিত না হলেও নিতাদিনের অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপরীত যুক্তি অনেক আছে নিশ্চয়ই। শোষণ বণ্টন, আবিচার মানুষকে নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত করেছে, কিন্তু বিক্ষোভকে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দেওয়াই হল রাজনৈতিক দলের কর্তব্য। মানুষের বিক্ষোভ যাতে রিপথে চালিত না হয়, বিক্ষোভ যাতে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে বিপ্লবের পূর্ণ প্রশস্ত করে—সেই নেতৃত্ব দেওয়াই তো

সাপ্তাহিক বসুমতী

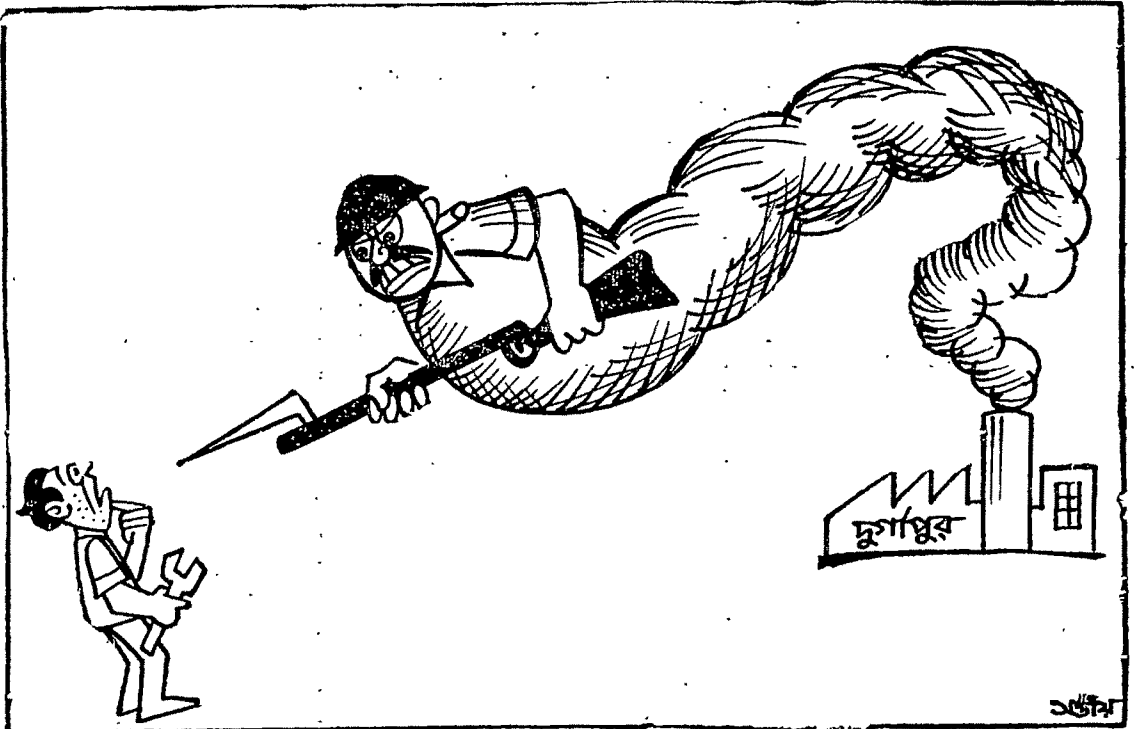
বিপ্লবী আদর্শের রাজনৈতিক দলের কতব্য।

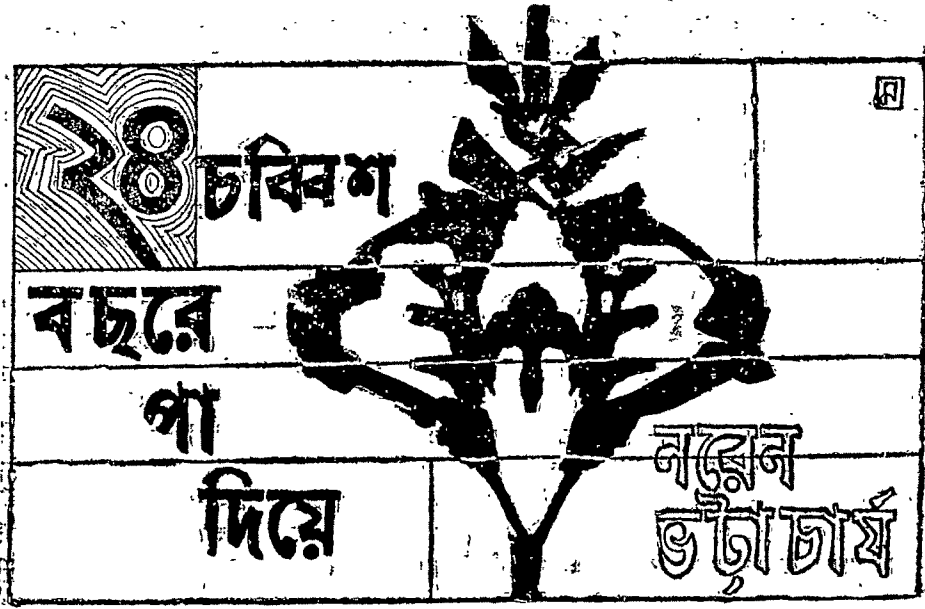
আমার প্রশ্ন—সেই কতব্য কি পালন করা হচ্ছে? বেলগাছিয়া দুধের কেন্দ্রের উপর কলকাতার হাজার হাজার শিশু-রোগী-প্রসূতির জীবন নির্ভর করে। সেই দুধের কেন্দ্রের শ্রমিকদের যে কোন মামলি দাবিকে কেন্দ্র করে আকহার দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ব্যক্তিবিশেষ কয়েকজন কর্মীর প্রতি অন্যায়-অত্যাচার হ'ল, কিন্তু তার জন্য সমগ্র উত্তর-পূর্ব রেলের বিরাট অংশ সাতদিন বন্ধ থাকলো: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উত্তরবঙ্গ আসাম বন্ধ থেকে যাত্রীদের দুর্গতির এবং অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও ৭০ টাকা মণের পাট কুঁকরা ৩০ টাকা মণ দরে বিক্রি করলো। আদ্রায় রেল কর্মচারীর অতি ভুল কারণ উপলক্ষ করে দক্ষিণ-পূর্ব রেল কদিন বন্ধ রইল। সেই বন্ধের ক্ষতির কি কোন হিসাব করে দেখা হয়েছে? একজন বা কয়েকজন রেল কর্মচারীর দাবি বা নিগ্রহের সঙ্গে এই রেল বন্ধের ক্ষতির কি কোন তুলনা হতে পারে? বহু আলোচিত দুর্গাপুরের কথাই ধরা যাক। কয়েকজন কর্মী, সেই সঙ্গে খ্রীদিলীপ মজুমদারকে ধরা হলো। খুব অন্যায়ভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার ও

আটক রাখা হয়েছে, কিন্তু সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে যেসব ঘটনা ঘটছে অর্থাৎ দুর্গাপুরের হাজার হাজার কর্মী ধর্মঘট করে যে মূল্য দিল, তার চেয়ে কয়েকজন কর্মীর আটক থাকায় মূল্য কি বেশি? আমি জানি মূল্যের হিসাব সেইভাবে হয় না। জানি প্রতিবাদ নির্মিতর বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তবু দেশে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার-আটক খ্রীদিলীপ মজুমদার কি প্রথম হয়েছেন এবং এই কথা বলতে পারবেন কেউ যে, দুর্গাপুরের এই আন্দোলন শেষ হলে আর কোন অন্যায়-ভাবে গ্রেপ্তার করা বা আটক করা হবে না, এই আন্দোলনের পর অত্যাচারী বা অন্যায় প্রশাসনের শেষ হয়ে যাবে? জানি সেই কথা সত্য নয়। খন্ড খন্ড আন্দোলনে শিশুদের-বোগীদের দুধ বন্ধ হতে পারে, হতে পারে দিনের পর দিন রেল বন্ধ—যার ফলে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কষ্ট হবে, ৭০ টাকার পাট ৩০ টাকায় বিক্রি হবে। দুর্গাপুর বন্ধ হবে, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হবে, মানুষের কাজের দিন নষ্ট হবে—তার বেশী কতটা হবে।

আজ প্রশ্ন—এই পথেই কি রাজ্যে শান্তি আসবে? এই পথেই কি বিপ্লব আসবে? এই পথেই কি সাম্যবাদ বা

সমাজতন্ত্র আসবে? খ্রীসদৃশীল ধাক্কা মিলিটারী এনে সব সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যের সেই মিলিটারী আসা বন্ধ কববেন কি এই পথে? এই পথেই কি সবচেয়ে প্রশস্ত ও শান্তিপূর্ণ পথ? পথ প্রশস্ত ক'না তার কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। পরন্তু যা দেখা যাচ্ছে, সে হ'ল রাজ্যে সি আর পি আমদানী ও অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। সি আর পি আজ শব্দ মানুষ মারা নয়, শহীদ বেদী ভাঙছে—শহীদ বেদীর উপর প্রশ্রাব করতে আদিষ্ট হচ্ছে। সি আর পি অত্যাচার করে, পার না পেলেই মিলিটারী ডাকা হবে—পশ্চিমবঙ্গ সেই মিলিটারী আগমনের প্রান্ত সীমার দাঁড়িয়ে আছে। তাই প্রশ্ন খ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের মাধ্যমে রাজ্যের বামপন্থী দলের উদ্দেশ্যে। যে পথে রাজ্য চলেছে, এই পথেই কি সঠিক পথ? আজ কি সময় আসে নি, সকলকে ডেকে বসে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এবং বলবার—দেশ আমাদের, রাজ্য আমাদের, আমরাই দায়িত্ব নেব শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার, সমস্ত সমস্যা মোকাবিলা করার। মিলিটারী আসতে দেব না, সি আর পিকে রাজ্য থেকে বিদায় দেব।





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ছাত্র সমস্যা

১১

“অবস্থা অতি শোচনীয়” এই একটি-
মার ব্যাক্যেই বিগত দুঃসংখ্যায় যা লিখেছি
তার সারমর্ম করা যায়। কিন্তু এ লেখার
সার্থকতা কি আছে, যদি অন্ধকারের
মধ্যে আলোর বিন্দু খোঁজার চেষ্টা না
করা হয়? আর তা ছাড়া পূর্বে যা
বলেছি, তা ত’ নিছক আমার ধারণা-
প্রসূত এবং লিখতে লিখতে আমার মনে
হয়েছে যে, আলোচনার ধারাকে যদি
বিষয়ভিত্তিক না করা হয়, তাহলে তার
কোন মূল্য থাকে না। আর সমস্যা-
গুলিকে ভাল করে উপলব্ধি করতে না
পারলে, সমস্যার পথও খুঁজে পাওয়া
যাবে না। কাজেই ‘আগামীবারে সমাপ্য’
লিখে দিল্লিও সমাপ্তি শেষ পর্যন্ত ঘটানো
গেল না।

উগ্রপন্থী রাজনীতির সাম্প্রতিক
অভ্যুত্থান সকলেরই টনক নড়িয়ে দিয়েছে
এবং সবচেয়ে বেশি তা ঘা দিয়েছে বাম-
পন্থী নেতাদের, যাঁরা মুখে বিপ্লবের
কথা বললেও কার্যত কর্মধারার দিক
দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায়
থাকাটাকেই আপাতত শ্রেয় বোধ করছেন।
কারা ঠিক, কারা ভুল সে আলোচনা
নিঃপ্রয়োজন, এ বিষয়ে আমার নিজস্ব
কিছু বক্তব্য আছে—যা ‘পরবর্তী’ একটি
রচনায় পেশ করব। এ ক্ষেত্রে যা বক্তব্য
তা হচ্ছে এই যে, উগ্রপন্থী রাজনীতি
আজ ভারতবর্ষের সমগ্র রাজনৈতিক ধ্যান-
ধারণার সামনে চ্যালেঞ্জস্বরূপ উপস্থিত
হয়েছে। বিগত তেইশ বছরে জীবনের
সর্বক্ষেত্রে যে অসাম্য, অবিচার ও শোষণ

দিনের পর দিন বর্ধিত হয়েছে এবং যে
সব রাজনৈতিক মতবাদ, বিশ্বাস ও
আচরণসমূহ এই দুঃবস্থাকে লালন-
পালন করেছে, সেগুলির সম্মুখে নক-
শালপন্থী রাজনীতি একটি চ্যালেঞ্জ-
স্বরূপ। বর্তমানে দুটি ক্ষেত্রে এই
রাজনীতির ক্রিয়াকলাপ অনেকেরই
চোখের ঘূমি কেড়ে নিয়েছে। একটি
হচ্ছে ভূমি, অপরটি হচ্ছে শিক্ষা। বর্ত-
মান নিবন্ধে ভূমি প্রসঙ্গই আলোচিত
হবে।

২২

১৯৪২ সালে মার্কিন সাংবাদিক
লুই ফিসারের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের
সময় মহাত্মা গান্ধী তাঁকে বলেছিলেন
যে, ভূমিহীন চাষীর পক্ষে জমিদারের
জমি দখল করাতে কোন অন্তর্য নেই এবং
সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ওই ভূমিহীন চাষীদের
পক্ষেই যেতে হবে, জমিদারকে ক্ষতিপূরণ
দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। বলা
বাহুল্য, তথাকথিত গান্ধীশিষ্যেরা এই
গুরুবাক্যটিকে সময়ে আড়াল করে রেখে-
ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির
বৈঠকগুলিতে ভূমিসংস্কারের কথা মাঝে
মাঝে উঠত, এ বিষয়ে গালভরা প্রস্তাবও
নেওয়া হত। কিন্তু কার্যত কিছুই করা
হত না। কারণ কংগ্রেস নেতাদের
অধিকাংশই ছিলেন প্রচুর ভূমির মালিক।
সবচেয়ে মজার কথা, স্বাধীন ভারতে
যখন একটা লোক-দেখানো ভূমিসংস্কার
আইন পাশ হল, যখন জমির উদ্ভবতন
সীমা বেঁধে দেওয়া হল, যাঁরা যে রাজ্যে
এই আইন পাশ করলেন, তাঁরা নিজেরাই
সর্বপ্রথম আইনভঙ্গ করে প্রচুর উদ্ভব

জমি দখলে রাখলেন, যারা মহারাষ্ট্রের
বর্তমান মধ্যমণ্ডলী শ্রী ভি পি নাসের,
রাজস্থানের মধ্যমণ্ডলী শ্রী এম আর
সুখাডিয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ ভূমিসংস্কার
আইন নিছক লোক-দেখানো ছিল, তা
যে কোনদিন কার্যকর করা হবে, একথা
কেউ স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি। জমির
সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু
ইচ্ছা করেই তার পূর্বে ভূমি হস্তান্তর
নিরোধ আইন পাশ করা হল না। তার
ফলে সিলিং-বহির্ভূত সকল জমিকেই
বেনামা করার সুযোগ দেওয়া হল।
আর সেই সুযোগে যে ছেলে জন্মায় নি
তার নামেও জমি বরাদ্দ হয়ে গেল।
ভূমিসংস্কারের নাম করে ভূমিহীন
কৃষকের নাকের ডগায় অপর কদলী
জোড়ায় জোড়ায় প্রদর্শন করা হল।

নকশালবাড়িতে জমি দখল ও জোত-
দার খুনের আগে ক’ কাঠা জমি ক’জন
কৃষক পেয়েছে? সাতচল্লিশে দেশ
স্বাধীন হয়েছে, আর সাতষট্টিতে যে
আগুন নকশালবাড়িতে জ্বলল, আর তার
স্বপ্নলিঙ্গ যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে
লাগল তখনই শূন্য হল রীতিমত সোর-
গেল। বোঝা গেল যে, নকশালপন্থীদের
আন্দোলন যতই হিংস্রপন্থী হোক না
কেন, এই আন্দোলনের মূলে রয়েছে
একটি ন্যায় দাবি—বেনামী জমি রাখা
চলবে না, উদ্ভব জমির মালিকানা ভূমি-
হীনদের দিতে হবে। কেন্দ্র তখনো
বর্ধিত, কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার বিভিন্ন
রাজ্যের অকংগ্রেসী সরকারগুলির শরিক-
দলসমূহের মধ্যে সংহতির অভাব দেখে
দলভাঙানি রাজনীতির মহড়া দিচ্ছে।
কিন্তু বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এ

বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকা আর সম্ভবপর হল না, কেন না ক্ষমতা পাবার আগে, তারাও এ ধরনের কথা বলে এসেছে এবং এ বিষয়ে সক্রিয় না হলে বামপন্থী দল হিসাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব হয়ে উঠবে। ফলে দ্বিতীয় যুদ্ধশ্রুতি সরকারের আমলে সরকারের সমর্থনে বেনামী জমি দখলের কাজ শুরু হল। বলাই বাহুল্য, জোতদার পক্ষ এক্ষেত্রে নতি স্বীকার করল না, স্থানে স্থানে সংঘর্ষ দেখা দিল, জমি দখলকে কার্যকর করতে গেলে যা অনিবার্যভাবেই দেখা দেবে। কেন না এমন বাপের সূপদত্তর খুব কমই আছে যে, এতদিনের ভোগ করা সম্পত্তিকে বিনা বাধায় ছেড়ে দেবে। সপ্তে সপ্তে রব উঠল আইন গেল, শংখলা গেল, অথচ গত বিশ বছরে আইন-শংখলা ভক্তদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। জমিদারী বিলোপ আইনকে ফাঁকি দিয়ে যখন গ্রামাঞ্চলের জোতদারেরা লাখ লাখ একর পরিমাণ জমি বেনামী করে চাষীদের ফাঁকি দিয়েছিল, তখন আইন-শংখলাওয়াদের খুঁজে পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় যুদ্ধশ্রুতি সরকারের আমলে এই একটি সংকাজ শুরু হচ্ছিল, বহু একর বেনামী জমি উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার কোন সফল পাওয়া যায় নি। একটি হচ্ছে শরিকী সংঘর্ষ যা ভূমি দখল আন্দোলনকে বহুলাংশে ব্যাহত করেছিল, যেটাকে এড়াতে পারলে এতদিনে নিশ্চয়ই সকল বেনামা জমি উদ্ধার হয়ে যেত। যৌথ প্রচেষ্টা যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারত, শরিকী সংঘর্ষ তাতে বাদ সাধল এবং তা ভারতের সমস্ত সংবাদপত্র মালিকদের হাতে যুদ্ধশ্রুতি বিরোধী প্রচার চালাবার একটি শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিল। দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে যুদ্ধশ্রুতি ভেঙে যাওয়া। যে সব বেনামী জমি দখল করা হয়েছিল এবং যে সব ভূমিহীন কৃষকেরা সেই সব জমিতে চাষাবাস শুরু করেছিল, তাদের সেই সব জমির ওপর আইনসম্মত অধিকার দেবার জন্য যুদ্ধশ্রুতি সরকারের ক্ষমতায় থাকা প্রয়োজন ছিল। এবং সেটা না হবার ফলে, যার জন্য প্রত্যেকটি শরিকী দলই অরুণবস্ত্রের দায়ী, বর্তমানে আবার সেই উদ্ধার করা বেনামী জমিগুলিকে পূর্ব-তন অধিকারীদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে আশংকাটা অনেক আগেই করা হয়েছিল।

১০৪

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন প্রথম ইউরোপ থেকে মানুষ গিয়ে বাসা বাঁধতে শুরু করে, সেই সময় যাতে বহু মানুষ আমেরিকা

রিকায় যেতে এবং স্থায়ীভাবে বাস করতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্য দরাজ হাতে জমি দেওয়া হয়েছিল, আমার ঠিক পরিমাণটা মনে নেই, মাথাপিছু ২৫০ একরের মত। সেই হিসাবে আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহু লোকেরই জমির মালিক থাকা উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জমি আজ মন্টিমেয় কয়েকজনেরই করতলগত। এর কারণ একটাই। ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঞ্জির প্রবেশ। বৃহৎ পুঞ্জির এই অনুপ্রবেশের স্বপক্ষে পুঞ্জিপতিরা কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছিল। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল 'সবুজ বিপ্লবের' যুক্তি। বলা হয়েছিল যে, উৎপাদনবৃদ্ধি ও শস্যের উৎকর্ষের জন্য কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি প্রয়োজন এবং এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন বিস্তৃততর কৃষিক্ষেত্র। এই উদ্দেশ্যে কয়েকজন পুঞ্জিপতি প্রথমে কয়েকটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর পত্তন করে এবং হাজার হাজার একর জমি নিয়ে তাদের ফার্ম গড়ে ওঠে। এদের সপ্তে প্রতিযোগিতায় ছোট জমির মালিকেরা অবলুপ্ত হয়ে যায় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র জমি মন্টিমেয় কয়েকজন পুঞ্জিপতির হাতে চলে আসে। মার্কিনী ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটাই নাকি আসল ভূমিসংস্কার! আর এর সাথকতা প্রমাণে তারা ফলন বৃদ্ধির যুক্তি দেখায়! ইউরোপের ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতেও ঠিক এইভাবে মন্টিমেয় কয়েকজন পুঞ্জিপতি সমগ্র জমির মালিক হয়ে বসে আছে।

ভারতবর্ষেও ভূমিসংস্কারের নামে ওই একই মার্কিনী নীতির আমদানী করা হয়েছে এবং উৎপাদনবৃদ্ধির অজুহাতে দেশের সমগ্র জমির মালিকানা পুঞ্জিপতিদের হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত দীর্ঘকাল আগে থেকেই শুরু হয়েছে। যেখানে ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি রাজ্যেই মাথাপিছু জমির উদ্ভবসীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, সেখানে বিড়লারা পঞ্চাশ হাজার একর জমি রাখতে পারে কোন অধিকার? বিড়লাদের খবরটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, কিন্তু এরকম কত পুঞ্জিপতি কত লক্ষ একর জমি হাতিয়ে নিয়ে বর্ণচোরা আমটির মত ভারত সরকারের সাধের 'সবুজ বিপ্লবের' নীট ফল পকেটস্থ করছে, তার খবর কে রাখে? পাঞ্জাবের রূপার গ্রামটি যখন বিড়লারা নিল, সে তো বর্শাদিন পূর্বের ব্যাপার নয় (সেই বিষয় নিয়ে আমি বোধ হয় এই সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতেই লিখেছিলাম), তখন তাদের সেই দখল করার ব্যাপারে সরকারের

সহযোগিতা ছিল লক্ষ্য করার মত। সেই গ্রামের কয়েক সহস্র বাসিন্দাকে জোর করে উচ্ছেদ করা হল (তারা আজ ভারতের জনারণ্যে হারিয়ে গেছে। আমাদের 'পবিত্র সংবিধান' ধনীদেব সম্পত্তি রক্ষার মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছে, কিন্তু দরিদ্রকে তার দুর্বিধা জমি আর কুঁড়েঘর থেকে উচ্ছেদ করলে মৌলিক অধিকারে হাত দেওয়া হয় না!), সমগ্র গ্রামটিকেই খুলায় মিশিয়ে দেওয়া হল, বিড়লাদের ষ্ট্রাক্টর আর বুলডোজার কয়েক মূহুর্তেই সেই কর্ম নিষ্পন্ন করল। উদ্দেশ্য মহৎ। উৎপাদন তো বাড়বে! তার জন্য হাজার হাজার মানুষ যদি উৎসাহিত হয়ে যায় ক্ষতি কি! "গেছে গুটিকতক জীর্ণ কুটির, কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর, কত ধন যায় রাজমহিষীর এক প্রহরের প্রমোদে?"

১১৪

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভূমির ক্ষেত্রে এই বিপজ্জনক সম্ভাবনাটির দিকে যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তিনি অজস্র লিখেছেন, যদিও তাঁর নামকরা ভক্তরা এই সব বিষয় নিয়ে মাতামাতি করতে চান না, তারা কবিগুরুকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসুরূপে দেখতে পেলেই খুঁশি। আমি এখানে ভূমি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করছি, পরিসরের অভাবে উদ্ধৃতি দেব না, তবে যদি কেউ চান তো মূল থেকে তাঁর রচনাংশ উদ্ধৃত করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ নিজে একজন জমিদার ছিলেন এবং জমিদার-জোতদারেরা কিভাবে চাষীকে ঠিকিয়ে তার জমি অপহরণ করে তা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাঁর 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটিই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আজকের জোতদারেরা যে হাজার হাজার বিঘা জমির বেনামী দখলদার হয়ে বসে আছে, তারা সেই জমি পেলে কোথা থেকে? পরের জমি আত্মসাৎ করার প্রচেষ্টা তো আজ থেকেই নয়। মুখ্যত তিনি দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে কৃষকের ঋণগ্রস্ততা। সে যা উৎপন্ন করে তা বেচে তার পেট চলে না, আরও নানা রকম দায়-অদায় আছে, কাজেই সে ঋণ করতে বাধ্য। সকল ক্ষেত্রেই জমি বন্ধক পডত এবং চক্রবৃদ্ধি হারে চড়া সুদ মিটিয়ে সেই জমি পুনরায় ফিরিয়ে নেবার কোন উপায় থাকত না। অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতা জমিদার বা জোতদার জমি বিক্রির বন্ডই লিখিয়ে নিত, অমূলক সময়ের

অপ্রতিহত

মহেন্দ্র নাথ

কোনো এক, রিক্ত সন্ধ্যাসীম, উনাত আহবানে—
প্রতিজ্ঞা হোক বজ্রসদৃশির হত।
তার অপ্রতিহত দুর্বীর প্রোভ—
সজীবতার নেশা যেন ধীরে দিলো
চাঙা বাংসার তারুণ্যের গানে।

যে মাটির অর্থে ভালোবাসা অগাধ
সেই মাটির, একটি মানুষকেও
চিনতে বিলম্ব হয় আজ।

মহারাজ সেই-ই,
একই ভারতবর্ষের, একই বাংলার রূপ সৌন্দর্যে
যে বার বার মন স্বকীয় স্বপ্নে।

স্বার্থবাদের কামায় খোঁজেন যে একক স্বর্গসুখ
বরং মৃত্তির কাঠামোর উদ্দীপ্ত আলো জ্বালার
প্রয়াস যার বার বার।

ছাড়পত্রের বেড়া তুলতে যে অক্লান্ত ঘোষা,—
উদ্যোগের বাণী ছড়ায়,
সে রিক্ত, এক, সন্ধ্যাসী মহারাজ—
নিঃসঙ্গ নয়।

তবু যদি কালের হাওয়ায় নিঃস্বার্থবাদ—
না আসে, না আসে, আশ্রয় পরিশুদ্ধি....
তবে এ গান, আমার অপরাধের নয় বন্ধু
এই আমি শেষ মানবিক;—জানবো।

মধ্যে সুদ সমেত ঋণ মেটাতে না পারলে
জমির উপর অধিকার থাকবে না—এই
রকম চিন্তা। অনেকে আবার সোজাসুজি
কৃষকের নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার সুযোগ
নিিয়ে তাকে প্রবাসিত করত। আর
স্বত্বীয় পদ্ধতিটি ছিল গায়ের জোরে
দখল, কারণ জমিদার-জোতদারেরা
জানত যে তা একবার করতে পারলে
আদালতে মামলা করে নিজের অধিকার
ফিরে পেতে তার সাতপুরুষ কেটে
যাবে, আর তার ব্যয় যোগাতেই তার
ভিটেমাটি উজ্জ্বল হবে।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য রবীন্দ্র-
নাথ একটি অতি বাস্তব পদ্ধতির কথা
বলেছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন
যে, কৃষকের জমি হস্তান্তর করার
ক্ষমতা আইনের দ্বারা বেশ কিছুকালের
জনা নিষিদ্ধ করা হোক এবং পূর্বে যে
জমিদার কৃষকেরা অভাবে পড়ে হস্তা-
ন্তর করতে বাধ্য হয়েছে, সেগুলি ফেরৎ
দেওয়া হোক। তাঁর বক্তব্য, রাজপথে
হাটীর অধিকার সকলের আছে, কিন্তু
যানবাহনবহুল রাজপথে শিশুর একা
হাটীর অধিকারকে স্বীকার করে নিলে
তার গাড়ি চাপা পড়াটা রোধ করা যায়
না। স্বত্বীয়ত, কৃষি যাতে লাভজনক
বস্তু হয়ে ওঠে এবং সরকারী প্রচেষ্টা
যাতে সেই দিকে চালিত হয়, এটাও
তাঁর দাবি ছিল। কেন না, তাঁর মতে,
আমাদের উত্তরাধিকার প্রথা এবং আরও
নানা কারণে জোতের পরিমাণ ক্ষুদ্র
থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। বন্ধক
দিয়ে, বিক্রি করে চাষীর জমির পরিমাণ
আরও কমে যায়, যার ফলে চাষী আর
শাভের ব্যাপার থাকে না, খরচ ওঠে না,
সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ হয় না, এমন কি

বছরের খাদ্যটাও ঘরে আসে না।
এমতাবস্থায় চাষী জলের দরে জমি
বিক্রয় করে দিতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র-
নাথের সময়ে, আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট
বছর আগে কৃষকদের ওই জলের দরে
বোচা জমি কেনার প্রবণতা শহুরে মধ্য-
বিত্তদের মধ্যে প্রচুরভাবে দেখা
দিয়েছিল। যারা শহরে চাকরি-বাকরি
করত এবং বসবাস করত, তাদের মধ্যে
এই জমি কেনার হিড়িক ব্যাপকভাবে
দেখা দি়েছিল। এটা রবীন্দ্রনাথের
মনঃপূত হয় নি। কেন না, তাঁর মতে,
এতে উৎপাদন ব্যবস্থার কোন হেরফের
হয় না। কারণ এখানে জমি কেনার
উদ্দেশ্য কৃষিকাজ নয়, কৃষিতে মূলধন
বিনিয়োগ নয়, কৃষিকে লাভজনক করে
তোলা নয়, যে ব্যবস্থা আছে সেটাকে
বজায় রেখে খোদ শহরে বসেই চাষীর
পরিশ্রমে উৎপন্ন ফসলের কিছুটা ভাগ
নেওয়া। এই দেখে তিনি খুব সঙ্গত-
ভাবেই অনুমান করেছিলেন যে, যে সব
শহুরে ভদ্রলোকেরা গ্রামে জমি কিনছেন
এবং যে উদ্দেশ্যে তাঁরা তা কিনছেন,
তা স্থায়ী হবে না, তাঁরা শেষ পর্যন্ত
গ্রামে নিজেদের জমিকে ধরে রাখতে
পারবেন না, বিক্রি করে দিতে বাধ্য
হবেন। কারা সেই জমি কিনবে? গ্রাম-
বাসীদের তো আর কৃষিক্ষমতা নেই, আর
শহরবাসী ভদ্রলোকদের স্বপ্নেণী তো
ততদিনে গ্রামের জমি সম্পর্কে মোহ-
মুগ্ধ। ফলে এবারের যারা জোতা তারা
হচ্ছে মাড়োয়ারী।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, এই যে
শহুরে বোনো জল গ্রামে ঢুকছে, তার
উপর নৌকা বেয়ে গ্রামে ঢুকবে
মাড়োয়ারী অর্থাৎ পুঁজিপতিরা এবং

তারা জানে কিভাবে মনুফা তুলতে
হয়। কালক্রমে দেখা যাবে, সারা দেশের
কৃষিক্ষেত্রে মাড়োয়ারীদেরই জয়েন্ট স্টক
কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হবে, সমগ্র জমি
কয়েকটি মাল্টিমেয় লোকের সম্পত্তিতে
পরিণত হবে। তাতে হয়ত উৎপাদন
বাড়বে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের
একমাত্র প্রকৃত সম্পদ, অর্থাৎ ভূমি, তা
এক বিঘা, দু' বিঘা যেটুকুই হোক না
কেন, তা থেকে বঞ্চিত হবে। সর্ব-
ভারতীয় দৃষ্টিতে দেখলে সেই লক্ষণই
কি চোখে পড়ে না?

II & II

কাজেই ভূমির ক্ষেত্রে বৃহৎ পুঁজির
অনুপ্রবেশ রোধ করাই সেই সরকারের
একমাত্র কর্তব্য—যে সরকার আদর্শ
হিসাবে সমাজতন্ত্রের নাম উচ্চারণ করে।
দুটি উপায়ে তা করা সম্ভব। প্রথমটি
হচ্ছে, সমস্ত জমির রাষ্ট্রীয়করণ—যা
সোভিয়েট রাশিয়ায় হয়েছে। কিন্তু তা
করতে গেলে কেন্দ্রে একটি অতি শক্ত-
শালী, সর্ববিষয়ে চড়াপত্তি ক্ষমতার
অধিকারী একটি কমিউনিস্ট সরকারের
প্রয়োজন। কিন্তু সে বহুত দুরস্থান।
পশ্চিমবঙ্গে বাম-শক্তির প্রভাব দেশে
বিচার করলে তো আমাদের চলবে না।
খোদ রাজধানী দিল্লীতেই দেখোঁছ
কম বয়সী যুবক-যুবতীরা, যে বয়সে
মানুষ সবচেয়ে বেশি বৈপ্লবিক মনোভাব-
সম্পন্ন হয়, 'গো হামারা মাতা হ্যাম'—
এই স্লোগান সহ বিরাট মিছিল বার

[৫০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নারায়ণ সম্পাদিত স্বাভাৱ সন্দেশ

[পূৰ্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বাইশ ॥

সাবিত্রী বললে, 'কী হল, মন্দের চেহারা ও-রকম কেন?'

'এক পাশ জল দাও, তারপরে বলছি।'

'তা বাবে?'

'না—দরকার নেই। যত্নের পান্নায় গড়ে বড়ো এক পেয়লা গ্ৰীণ টী খেয়েছি। চায়ে উৎসাহ নেই আর। জলই আনো।' জল নিয়ে এল সাবিত্রী। এক চুমুকে শেষ করল 'লাশটা।

'কী হয়েছে তোমার?'—একটা স্নিগ্ধ উৎকণ্ঠা নিয়ে সাবিত্রী প্রবীরের দিকে চাইল।

'বলছি। তুমি কখন ফিরেছ কলেজ থেকে?'

'আজ ক্লাস হয় নি। স্টাইক করেছে মেয়েরা।'

'কিসের স্টাইক?'

'ওদের ইউনিয়নের দুজন লিডারকে কলেজ থেকে টি-সি নিতে বলা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে।'—সাবিত্রী একটু হাসল। 'বুঝেছি। কিন্তু এই দুটি মেয়েকে কলেজ থেকে সরিয়ে দেওয়া কি এতই জরুরি?'

'গভর্নিং বডি মনে কবে এরাই ট্রাবল-মেকার। আমি অবশ্য স্টাফ রিপ্ৰেজেন্টেভ হিসেবে আছি গভর্নিং বডিতে। আমি বলেছিলাম, এখনি এসব স্টাফটিক অ্যাকশন নিয়ে লাভ নেই, বরং অন্যভাবে—কিন্তু ওঁরা রাজী হলেন না। বললেন, মেয়ে দুটো অত্যন্ত উদ্ভত—ওদের কিছুতেই রাখা চলবে না।'

'তা হলে স্টাইক এখন চলতে থাকবে?'

'খবে সম্ভব।'

'সময়টাই ওদের উদ্ভত করে তুলছে—ওদের দোষ নেই। সেই সপ্নে যদি তোমরাও অসহিষ্ণু হও, তা হলে ছটটা আরো পাকাবে, খুলবে না।'

সাবিত্রী বললে, 'কী করা যাবে, বলো। ত্রিশ-চালিশ বছর আগে যাঁরা স্কুল-কলেজ থেকে পাশ করে গেছেন, তাঁদের চোখে সেই সময়ের ইমেজটাই ভাসছে। টীচার আর স্টুডেন্টের ভেতরে তাঁরা সেই ভয় আর শ্রদ্ধার সম্পর্কটুকুই আশা করছেন এখনো।'

'ভয়ের কথা জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধাটা এখনো থাকতে বাধ্য নেই। মৃশকিঙ্ক হল, দু'পক্ষ দুটো মৃগের মধ্যে দাঁড়িয়ে। তোমরা যারা পড়াও—তারা একটু বেশি করে যদি ওদের চিনতে চাও—'

'খুব বেশি সরল করে ফেললে প্রবীর। সব কিছুর মূলটা যে কোথায় সে তুমিও জানো, আমিও জানি। দেশ-সমাজ-জীবন—সব কিছু যে হতাশা আর অনিশ্চয়তার পাক খাচ্ছে, তাকে একটা উজ্জ্বল লক্ষ্যে যদি তুলে ধরতে না পারি, তা হলে এর শেষ কোথাও নেই।'—সাবিত্রী একটা নিশ্বাস ফেলল : 'জানো—এক সময় আমি ভেবেছি, এখনো ভাবি—ছাত্র-রাজনীতি কেন তার নিজস্ব পথ ধরে এগোয় না—কেন সব সময় পার্টি-পলিটিকসে জড়িয়ে যায়। কিন্তু তারপরেই দেখি—আজ পার্টি-পলিটিকস্ ছাড়া আর কী আছে বাঙলা দেশে? সব লেফট-পার্টীগলোর ইডিয়োলজীর দিকে তাকাও—নিছক কত-গুলো থিয়েরীর পার্থক্য ছাড়া—আর সেগুলো এখন শেল্ফে তুলে রাখলেও দেশের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই—প্রত্যেকে যা চাইছে, তার মধ্যে তফাৎ কোথায়? অথচ পার্টি বাঁচাতে কিংবা বাড়াতে হয়,

'নেতারা তাঁদের মহিমায় ডিস্টিংগিশ থাকতে চান, অতএব যেখানে সাধারণ একো এক বছরে দশ বছর এগিয়ে মাওয়া যেত—সেখানে তাঁরা ক্যাডারদের খেঁপিয়ে দেন—পঁচিশ বছরের চেণ্টা পঞ্চাশ বছর পেঁছিয়ে যায়, লেবার-কৃষক-ছাত্র-সিভিল-ওয়ারের আবহাওয়া তৈরি করে।'—সাবিত্রী একটু চুপ করল : 'প্রবীর, একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, সবচেয়ে বড়ো সুযোগ যখন এল, তখন সেই সুযোগটাকে আমরা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলছি। ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে কী করব—ওরা তো সময়ের বাইরে নয়।'

একটু চুপ। তাবপর সাবিত্রী অপ্রস্তুতের মতো হাসল।

'যাক গে, এ সব থাকুক এখন। আমি তো একেবারে চুপ করেই থাকব ভাবি, তবু মধ্যে মধ্যে এমন অস্বস্তি লাগে, যে—কিন্তু তোমার কথা বলো। মৃশ দেখে মনে হচ্ছে, মেজাজ ভালো নেই।'

সাবিত্রীর কথাগুলো প্রবীরের ভাবনাটাকে আবার একটা বিবস দিকে সরিয়ে নিয়েছিল, কাগজে অজয় মতোপাধ্যায়

মাসিক ১০ টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়াল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জন-প্রিয়। দেশ ব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার, ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7

সাপ্তাহিক বসুমতী

এবং জ্যোতি বসুর বিবৃতি-গল্ফটা বিবৃতির বিস্বাদ অনুভূতিটা জাগিয়ে তুলেছিল। মৃত্যু এবং উপমৃত্যুমন্ত্রী প্রকাশ্য কোন্‌দলে গলা চড়াচ্ছেন—কী বমণীয় যন্ত্র-ফ্রণ্টের চেহারা। ওদিকে আর এক নেতা দিনক্ষণ গুণে ঘোষণা করছেন কবে এই মন্ত্রিস্বের বারোটা বাজবে। খাসা চলছে। আর প্রামিক ঝরাচ্ছে প্রমিকের রক্ত, কৃষক কৃষকের ঘরে আগুন দিচ্ছে। আমরা দায়ী নই—ওরা। ওরা কারা? প্রতি-বিপ্লবী? তা ছাড়া আর কী—আলাদা পার্টি থখন!

সাবিহরী কথায় প্রবীর জোর করে নিজেকে ছিনিয়ে আনল মানসিক অবসাদ থেকে।

তুমি বারাসতে গিয়েছিলে?

একটা ছায়া পড়ল সাবিহরীর মুখে।

গিয়েছিলুম। কিছু বরা যায় নি।

ভেবেছিলুম, অফিসে ফোন করে তোমার খবর দেব, কিন্তু কেমন লজ্জা করল। সজ্জাতা আর ফিরতে চায় না। স্বরাজদার নাম শুনলেই জ্বলে ওঠে: বলে, এবার ভালো দেখে স্বরাজদা আর একটা বিয়ে করুক, এতটুকুও আর্পান্ত নেই তার।

‘এত অভিমান?’

‘অভিমান?’—সাবিহরী কপাল কুঁচকে অনমনস্কভাবে চেয়ে রইল: ঠিক বন্ধুতে পারাছি না।

‘দশ বছরের সম্পর্ক মূছে যায় এত সহজে? স্বামী-স্ত্রীর?’

‘ভাঙনটা খুব আস্তে আস্তে শব্দ হয়, প্রবীর। তখন বন্ধুতে পারা যায় না, কিন্তু তারপর একদিন এক সপ্তে নেমে আসে। তা ছাড়া—’ সাবিহরী যেন নিজের সপ্তে কথা বলে চলল: ‘তা ছাড়া সজ্জাতা যে স্বরাজদাকে ভালোবেসেছিল, সেখানে স্বরাজদার আর একটা ইমেজ ছিল। আজকের রাজনীতিতে স্বরাজদা এমন করে ফ্রান্সেটেড হয়ে গেছে বলেই এমন বিপ্লী হয়ে এসেছে ভাঙনটা।’

‘স্বরাজ যদি যে-কোনো একজন মানুষ হত—’

‘আর সজ্জাতার যদি কোনো পলিটি-ক্যান্‌ কন্‌ভিকশ্যন না থাকত। কোথাও বাধত না ভুল—ওদের জীবনটা চমৎকার এগিয়ে যেত।’

হয়তো তাই, হয়তো তা নয়। একালে আমাদের মনগুলো অতি মন্থায় আত্ম-সচেতন। আসলে আগেকার মতো স্ত্রী, বন্ধু, আত্মীয়—কাউকেই আমরা সবটুকু দিয়ে ফেলতে পারি না—অনেকখানিই নিজেরদের জন্যে রেখে দিতে হয়। সেই বাড়তি জায়গাটুকুতেই কখনো-কখনো কাঁটা বন জন্ম নেয়। যাদের আমরা খুব স্বাভাবিক বলে জানি, তারা কি সত্যিই স্বাভাবিক? সবটা?

প্রবীর সাবিহরীর দিকে তাকালো। চোখ

দুটো ফ্রান্ত। সজ্জাতার কথাই ভাবছে বোধ হয়।

সাবিহরী বললে, ‘কিন্তু তোমার কথা তো বললে না।’

‘আজ ময়দানে ওদের পার্টির ম্যামথ গ্যাদারিং ছিল একটা। সেখানে সজ্জাতা বৌদিকে দেখলুম।’

‘তাই নাকি?’

‘একটা মিছিলের সপ্তে আসছিল।’

‘দেখা হল তোমার সপ্তে?’—একটু উত্তোজিত হল সাবিহরী: ‘কিন্তু বললে?’

‘দূর থেকে দেখেছি। তা ছাড়া সপ্তে ছিল মুকুল—সে নকশালাইট—এমন একটা কমেন্ট করে বলল যে আর একটু হলে মার খেয়ে হাসপাতালে যেতে হত। তাড়া-তাড়ি সরিয়ে নিতে হল ওকে।’

‘তা হলে আবার পুরো পলিটিকসে নামল সজ্জাতা।’

‘হাঁ, ফেরবার পথটা বন্ধ করে দিলে চিরকালের মতো।’

‘কিংবা এইটেই ওর দরকার ছিল। এখন নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে না দিলে নীলুকে ও ভুলতে পারবে না।’

‘নীলুর জন্যে টান ওর আছে নাকি?’

‘সেইটে ছিল বলেই হয়তো এতদিন ওখানে থাকতে পেরেছে। কিন্তু আর সইল না।’

প্রবীর আবার চুপ করে গেল। দাম দিতে হয়—নিশ্চয়। কিছু না দিয়ে বিপ্লবের সৈনিক হওয়া যায় না—নিজের নাড়ী পর্যন্ত ছিঁড়ে দিতে হয় কখনো-কখনো। আজ সজ্জাতাকেও এইভাবেই ছেড়ে যেতে হয়েছে নীলুকে। কিন্তু এই মূল্য কোথায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে শেষ পর্যন্ত? ময়দানে যাঁরা বিপ্লবের ডাক দিচ্ছিলেন, তাঁরা কতটা সংগ্রামের কথা বলছিলেন, কতখানিই বা বিদ্বৎশেব?

‘সাবিহরী।’

‘কী।’

‘ভাবছি, ভাগ্য ভালো যে সাহস করে কখনো বলি নি যে, আমার মতো একজন সাধারণ কেরাণীকে তুমি বিয়ে করে ফেলো।’ সাবিহরীর গাল লাল হয়ে উঠল।

‘এতই ভয় আমাকে?’

‘ভয় তোমাকে নয়—সময়কে।—সাবিহরীর হাতটা আবার মূঠোর মাধ্য টেনে আনল প্রবীর: ‘এই যা, তোমার আগুনে আবার ব্যথা দিলুম নাকি?’

‘না—ওটা সেরে গেছে।’—সাবিহরীর চোখের দৃষ্টি ঘন হয়ে এল: ‘কিন্তু কাকে ভয় করো বললে।’

‘সময়কে। জানো—প্রবীরের মূঠোটা আরো শক্ত হতে লাগল: ‘সময়টাকে আমরা যতই বেশি আশা-আনন্দ-ভবিষ্যৎ—ভালো-বাসা দিয়ে গড়ে তুলতে চাইছি ততই সে ভেঙে যাচ্ছে—হাত থেকে ছাড়িয়ে পড়ে

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মলখনের ব্যবসা হিসাবে মৃগী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অথবা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের জুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রায়েজ পিডিথ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রাহা

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

যাচ্ছে। একটা প্রোভের চাঁদে; আগর।
জসাই—যেটাকে মনে হয়েছিল; অন্যকুল,
ঠিক এইবারে একটা নিশ্চিত আর শক্ত
ডাঙায় পৌঁছে যাব, তখন দেখছি; আমরা
মেহনানায় হারানো নৌকোর মতো চলে
যাচ্ছি—সমুদ্রের দিকে। আমরা পরস্পরকে
পাশে চাইছি আর ক্রমাগত আলাদা হয়ে
যাচ্ছি। জানি, তোমার হৃদয় ধরে আমি
রওনা হবে—তারপর দেখব—স্বপ্নদায় আর
সুজাতা বোদির মতো আমরাও কখন—

‘কিন্তু ভুল—’ সাবিত্রী প্রায় নিঃশব্দ
গলায় বললে, ‘আমি তো তোমাকে কখনো
কোনো আলাদা চোখ দিয়ে দেখব না।’
আমি তো কোনোদিন কখনো করব না
যে, সমুদ্রের মতো তুমি মাথা ছাড়িয়ে
উঠবে সকলের। তুমিও সাধারণ, আমিও
সাধারণ। যদি প্রোভে ডুবতেই হয়
গাটছড়া বেঁধেই ডুবব। সুজাতার মতো
আমার স্বপ্ন নেই—স্বপ্ন কোনোদিন।
ভাঙবেও না।

‘কী জানি।’

‘আমাকে বিশ্বাস হয় না?’

‘তোমাকে নয়—সময়কে।’ কিন্তু একটা
ভুল বললে সাবিত্রী। আমি সাধারণ সমুদ্র
নেই কিন্তু তুমি সাধারণ নও। তুমি
এম-এসসি পাশ করেছ, কলেজে পড়াও।
আমি পাশকোর্সের বি-এ, বিদ্যে তোমার
কাছে কিছুর নেই। কাজেই তোমাকে বিয়ে
করব—এরকম ধৃষ্টতা আমি ভাবতেই পারি
না। তবু হয়তো তোমার দয়া হত—

‘এই চূপ।’

‘না—না, কথাটা বলতে দাও।’ তবু
হয়তো তুমি—

‘আবার।’

আর বলতে দিল না সাবিত্রী। প্রবীরের
মুঠো থেকে ছাড়িয়ে ওনে হাতটাকে
জড়িয়ে দিল প্রবীরের গলায়। একবারে
টেনে আনল; নিজের কাছে।

‘ভীরা—ভীরা কোথাকার! সময়ের
কাছে হার মানবে কেন, সময়ের কাছ থেকে
নিজের পাওনা ছিনিয়ে নিতে হয়।’

সাবিত্রী একটা আগে স্নান করে
এসেছে, তার হালকা সুগন্ধ; সারা শরীরে

ঠান্ডা দীর্ঘের জলের শীতলা শান্তি;
প্রবীরের মূখের ওপর নিশ্বাস পড়তে
লাগল; ঘন ঘন।

‘ভীরা—ভীরা কোথাকার! এরকম
কাপুরুষকে কে ভালোবাসে!’

ভালো যে বাসে না, তার প্রমাণ দিল
তৎক্ষণাৎ। আর এক হাতে কাপুরুষের
মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরে গভীর
গলায় বললে, ‘চূপ।’

তারপর প্রবীরের ঠোঁটে শক্ত করে চেপে
ধরল নিজের ঠোঁট দুটো।

সময়ের কাছ থেকে নিজের পাওনা
অদায় করে নিতে হয়। ঠিক কথা। কিন্তু
কিন্তুবে? আমরা তো ভেবেছিলাম—
অনেক দুঃখের পাড়ি শেষ হয়ে গেছে;
এইবার আমরা ঘাটে পৌঁছব। অনেক
রক্ত, অনেক ভুল শেষ হল, অনেক শত্রুর
সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা আমরা করে
নির্গোঁছ। এর পরে আরো অনেক পরীক্ষা
দিতে হবে—আরো অনেক নিষ্ঠুর কঠোর
দায় মেটাতে হবে—কিন্তু তখন আমরা
প্রস্তুত। প্রাচীর যখন একবার ভেঙেছি,
লক্ষ্য যখন একবার নিশ্চিত—

কিন্তু ঘাটে আমরা পৌঁছতে পারি
নি। প্রোভ আমাদের কলে উঠতে দিল
না। আমরা কি—

বাস ক’ডাক্তার এনে দাঁড়ালো? দায়
—আপনার টিকিটটা—

চিন্তাটা কেটে গেল।

ডবল-ডেকারের দোতায় হাওয়ার
চেউ। বাতাসে বসন্ত। এক-একটা ভালো
লাগার দিনকে মনে পড়ে এইরকম হাওয়ার।
একদিন সে আর সাবিত্রী—একদিন কেন
—কতদিন এইভাবে হাওয়ার ভেতরে নিজে
দের ভাসিয়ে দিয়ে পাশাপাশি বসেছে
বাসে-ট্রামে, গাছের তলা দিয়ে—পাতার
শব্দ আর ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটেছে
কতক্ষণ। আশ্চর্য—আজ সাবিত্রী সঙ্গে
মাসে একবার দেখা করবার সময় পর্যন্ত
হয় না। নিজের কাজ বেড়েছে, সাবিত্রী
সম্মা পর্যন্ত ল্যাবরেটরীতে কাজ করে
ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে।

তবু—তবু—এখনো এই বিশ্বাস দিন-
গুলোতে—যখন মনে হয়, জীবনটার কাছে
অনেক কিছু চাওয়ার ছিল, নেবার ছিল,
যখন কিছুই নেওয়া যাচ্ছে না—কেবল
মুঠো থেকে ছিটিয়ে-ছিড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে
তখনো কিছুক্ষণের জন্যে সাবিত্রীর কথা
মনে পড়ে। হঠাৎ মনে হয়—এখনো আশা
আছে; আমরা হারব না, আমরা হারাবো না।
এতক্ষণে একটা মাদুরের স্বাদ-স্বপ্নের
মতো তাকে ঘিরতে লাগল।

বাড়ির সামনে পৌঁছে আশ্চর্য লাগল
তার। একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। কে এল? রাত
ভো এখন সাড়ে দশটার কাছাকাছি। কে
বাড়িতে এসেছে এই অসময়ে?

চিনতে দেবী হল না। দিদির গাড়ি।

[ক্লমশ]

শ্রীরামচরিত-খানস

ভক্তবিঃ তুলসীদাসঃ

অধ্যাপকঃ শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের
বহু গণ ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া
আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর
লোকনীর প্রতিভা-নিবন্ধে ভারতবর্ষের
মহাকাব্য পুথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য
সমৃদ্ধ করে। ভক্তবিঃ গোস্বামী তুলসীদাস
তৎসম্মুখ্য অন্যতম—যিনি সহস্র সরস ভাষায়
পতিতপাবনা সীতারামের চরিত্র বর্ণনা
মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

করিয়ছেন সুমধুর সঙ্গীতের মাধ্যমে।
তুলসীদাসের জীবনসংস্রব মহামানব শ্রীরাম-
চন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাণী
অনুবাদ এই প্রথম-বসুমতী সাহিত্য
মন্দিরের অপর্যবী কীর্তির নতুন এক পরিচয়।
এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে
সুসজ্জিত।

বঙ্গব্রতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২



॥ ঘোল ৫ ॥

প্রবল বর্বা আর বন্য়ার দরুণ নির্বাচন দুই মাস পিছিয়ে যাওয়ায় পাকিস্তানের মানুষ বুজোয়া বিপ্লবীদের মূলমন্ত্রের রঙ-তামাসা উপভোগ করার আরও কিছু সময় পেয়েছে। আশা করা যায় যে, এই অপ্রত্যাশিত সংযোগ পেয়ে ভোটের কাণ্ডাল বুজোয়া দলগুলি শিঙের মাথায় দফা আর প্রতিশ্রুতির চোখা কুলিয়ে নতুন উৎসাহে পানি এবং কাপাভরা পূর্ব পাকিস্তানের মাঠে-মাঠে দাপাদাপি করে বেড়াবে। আওয়ামী পার্টি ইত্যাদি দুই-একটি দল—যারা এতদিন পর্যন্ত পাঁচই অক্টোবরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষপাতী ছিল, তারা ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে। কারণ নির্বাচনটা তাড়াতাড়ি চুক গেলে তাদের অনেক সুবিধে হতো। “বংশেশ্বর” মজিবর রহমান বা “একেশ্বর” ভূট্টো অনেক যত্নে ও কৌশলে তাদের নিজের নিজের প্রদেশের বেশ কিছু ভোট প্রায় বাগিয়ে এনেছিল। এখন বন্য়ার তোড়ে সেইসব আঁত কটের ভোটগুলি ভেসে যাচ্ছে দেখে তারা “ইয়া আল্লা” বলে মাথায় হাত দিয়ে মাজাভাড়া ‘দ’-এর মত বসে পড়েছে এবং তাদের কোমর থেকে তমকালো সিকের লুপি খসে গেছে! পাল্লোমেণ্টারী খাটালে বছরের পর বছর বাস করে মজিবর বা ভূট্টো বেশ বখতে পেরেছে যে, এখানে যে কোনও সময় যে কোনও নেতা বা দল তার যে কোন বোসরের সাথে জীবনার গামলায় মিতালী করতে পারে আর এইখানেই হচ্ছে তাদের ভয়! বাস্তবিক, পাকিস্তানের বুজোয়া রাজনৈতিক দলগুলির প্রত্যেকটিই চরম সুবিধাবাদী। আজ যদি কেউ কোনও একটি জোটে থাকে কাল তার নাম অপর জোটে দেখা থাকে, কাল তার নাম অপর জোটে দেখা কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট। পিছনের উদাহরণ দিলাম না, কেন না তা পর্বত-প্রমাণ। জনাব নুরুল যখন প্রবল উৎসাহ নিয়ে তার চতুর্থ ভেক্টর অর্থাৎ

পি, ডি, পির আমদানী করল, তখন জাস্টিস্ পার্টিওয়ালা “উড়ুর্কু” খান অর্থাৎ এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ তার দলে ছিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উড়ুর্কু খাঁ তার অনুচরদের নিয়ে পি, ডি, পির তাঁবু ছেড়ে এল। কিন্তু ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হোল না। উড়ুর্কু খাঁ “তেরিক ই-ইস্টিক্‌লাল” বা “গণ-এক্য আন্দোলনে”র শব্দ সূচনা করে আমাদের পিালে চমকে দিল। কাইয়ুম খাঁর মুসলিম লীগ আর মিয়া দৌলতানার মুসলিম লীগ মাত্র দিন পনের আগেও “কনফারন্স” সতীনের মত চমোচমুল করছিল। সম্প্রতি কাইয়ুম প্রস্তাব করেছে যে, কার্ভিসল মুসলিম লীগ এবং জামাতিদের সঙ্গে সে নির্বাচনী জোট বাঁধবে। হয়ত কোন-দিন শুনব যে, ফকা চৌধুরীর কনভেনশন লীগের সঙ্গেও দৌলতানা বা কাইয়ুমের দোস্তালী হয়েছে। ভাণ্ডারী নিশ্চয় জানেন, কাইয়ুম আর দৌলতানা বর্তমানে ফকা চৌধুরীদের বিরুদ্ধে তহবিল তছরপের কেছা ছড়াচ্ছে? কিন্তু এই সব বিরোধ সৃষ্টি করতেও তাদের যেমন দেরী হয় না, তেমনি মেটোতেও না! কৃষক সমিতিতে কেন্দ্র করে শোধানবাদীদের গুরু মজাফ্ফর আমেদের ন্যাপ এবং মিয়া শোধানবাদী মৌলানা ভাসানী ও মশিউর রহমানদের একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা হাঁজল, কিন্তু তা আবার ভেঙে গেছে। গত চম্বিশে জুন লাহোরে পি, ডি, পি, জামাতে ইসলামী, মরকজাই—জমিহাতুল-উলমায়-ইসলাম, জমিয়াতুল-উলমাই-ই-পাকিস্তান, কেন্দ্রীয় জমিয়াত ই-আহ-লে-হাদিস ইত্যাদিরা “ইসলামী মুতাহিন্দা মহাজ” বা “সংঘস্ত ইসলামী ফ্রন্ট” গঠন করেছিল। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, জামাতীরা এই ফ্রন্টের বিরোধিতা করছে। তারা বলছে যে, প্রতিটি ব্যাপারেই ফ্রন্টের কথা মেনে নিতে হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি নাকি তারা অস্তত দেয় নি! দল ভাঙা আর দল গড়ার এই কেছার মধ্যেই লুকিয়ে আছে নির্বাচন আগ-পিছ

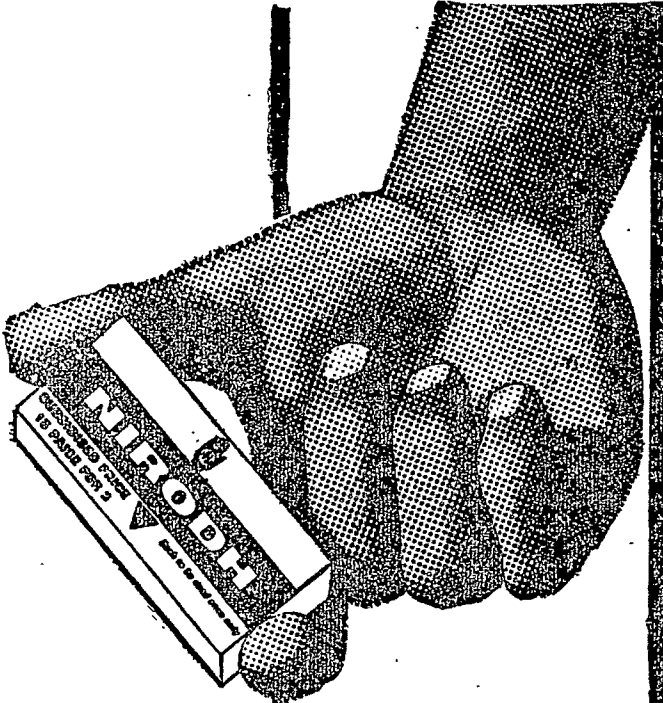
করার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তড়পানির রহস্য। যারা গদ্বিয়ে নিতে পেরেছিল, তারা পাঁচই অক্টোবরে মজিব মারার আনন্দে নাংগা বাবা হয়ে নাচাছিল আর যারা গদ্বিয়ে নিতে পারে নি, তারা “বন্য়ার জলে গোটা দেশ ভেসে যাচ্ছে, আগে ওদের বাঁচাও” বলে “হঠাৎ সতী”র মত ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। বংশেশ্বর মজিবর রহমান হারুণের টাকায়, আদমজীর টাকায় ভোট কিনে “নিশ্চিত মেয়ের বাপের” মত মের্জাজ নিয়ে বসে ছিল, সিন্ধুতে সে জি, এম সৈয়দের মত একজন বড়গোছের মাতম্বর দোস্তও পেয়েছিল। এখন নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ায় সে খুবই মুষড়ে পড়বে। বলা যায় না, জি, এম, সৈয়দ যে রাজনীতি বলতে কেবল সিন্ধুর উন্নতি বোঝে, সে হয়ত কিছু সুবিধের বিনিময়ে আর কারও সঙ্গে গটিছড়া বাঁধতে পারে। তখন মজিবরের উপায় কি হবে? জুলফিকর ভূট্টা দক্ষিণপন্থী অর্থাৎ মজাফ্ফর আমেদের ন্যাপের পশ্চিমা শাখার লোক ভাঙিয়ে এনে নিজের দল ভারী করছে। মামুদ আলী কাসুরী সহ কুড়ি-পঁচিশজন দক্ষিণ-পন্থী ন্যাপ নেতা ভূট্টোর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বলা বাহুল্য, তারা পিপলস পার্টির টিকিটেই নিজের নিজের জায়গা থেকে ভোটে দাঁড়াবে এবং তারা জিতলে জনাব ভূট্টোরই পোয়া বার। কিন্তু নির্বাচন দুই মাস পিছিয়ে যাওয়ায় ভূট্টো সাহেবের মাথার টাক দিনে দিনে বেড়ে যাচ্ছে! পাকিস্তানে দল পালটাতে কয়েক ঘণ্টাই যথেষ্ট, সেখানে দুই মাস অর্থাৎ ষাট দিন! ষাট দিনে কি না হোতে পারে এবং কি না হবে? মামুদ আলী কাসুরী যদি অন্য কোনও দিকে হাত বাড়ায়, সিন্ধুতে জি, এম সৈয়দ যদি আরও বেড়ে ওঠে, তবে? তবে কি হবে। নির্বাচন এগিয়ে বা পিছিয়ে দেওয়ার বাদ-প্রতিবাদের সঙ্গে রাজ-নৈতিক দলগুলির যে কেবল কায়মী স্বার্থই জড়িয়ে আছে, তা ভূট্টো নিজেই বেমজা বেকাস করে ফেলেছে। এই মাসের আট তারিখে লাহোরের এক জন-সভায় সে বলেছে যে, “নির্বাচনে যারা হেরে যেতে পারে, তারাই নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী।” “তা হোলে বদখির কাঠাল ভূট্টো, আমরাও বলতে পারি যে, যারা নির্বাচনে জিতে যাবে তারাই নির্বাচনের তারিখ ঠিক রাখার পক্ষপাতী অর্থাৎ হারার সম্ভাবনা থাকলে তারাও নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করত, তাই না কি?” জনাব ভূট্টো মনে করে যে, মাকাল ফলের মত রাঙা চেহারাটি নিয়ে কিছু গরম কুলি ছাড়লেই মেহনতী অগ্রগামি ব্যাকুল গোপিনী হোয়ে ছুটে

আসবে—এমন আহাম্মকী বৃষ্টি নিয়ে রাজনীতিকরা চলে না! যাই হোক, মুজিবর রহমান বা জলফিকর ছোট্টোকে আমরা অভ্যর্থনা দিচ্ছি—“আপলোক মত যাবড়াইয়ে। দল থেকে দোস্তরা বেরিয়ে গেলেও নয়া দোস্ত নিশ্চয়ই ছুটে যাবে, কেন না বর্জোয়া রাজনীতির প্রকৃতিই তাই। এই দুই মাসে অনেক সাদী,

অনেক-তালুক, অনেক নিকে হবে। সুতরাং সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত একে-বারে কৃষ্ণপক্ষ নয়, মেঘাচ্ছন্ন চতুর্দশীর চাঁদ দেখতে পাবে।”

এইবার আমিন সাহেবের অভিনয়ের কেচ্ছাকাহিনীর চতুর্থ অধ্যায়ে ফিরে আসি। আপনারাও এই পুণ্যস্মা

ঘোরতর বিপ্লবীর স্বকীর্তির ইতিহাস পাঠ করে রাজনৈতিক দালালির রকমফের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন। ডাক বা ডেমক্রেটিক অ্যাকশন কমিটির মাধ্যমে রথ দেখা এবং কলা বেচা শেষ করে অর্থাৎ একদিকে হারুণ মুজিবরের ছয়দফা প্ল্যানকে স্যাবতাজ করে এবং অপরাধকে দেশজোড়া ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনকে



মাত্র
৫টি গয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

নিরোধ



পরিবার পরিকল্পনার জন্যে
উন্নত ধরনের
স্বাব্যবহারে উদ্ভাবনিক
১৫ পয়সায় ৩টি

সরকারী সাহায্যে ৩০০ এর মাত্র খরচে।

সময়ের ব্যবধানে সম্ভাবন
উৎপাদনের ক্ষেত্রে

আজকাল, বিজ্ঞের ইচ্ছে মাসিক
সময়ে ছেলোপিলের জন্ম দেওয়া
সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না।
আপনি যখন চাইবেন, তখনই
আপনি সম্ভাবন উৎপাদন
করতে পারবেন। বিরোধ
আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের
সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে
জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার
বছরের সময়ে শিশুর মৃত্যু বেওয়া
উচিত—তাহলেই ওরা ভালো।
তবে বেড়ে উঠবে বলে ভাঙা-
রেয়া মত দ্বিধে থাকেন। সম্ভাবন
প্রসবের পরে ক্ষতস্থান্য আবার
ফিরে পাওয়ার জন্যে মায়েরও
কিছু সময় দরকার। বিরোধ
ব্যবহার করে আপনি খুব
সহজেই পুনর্বর্তী সন্তানের জন্ম
স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কন্ডোম) পুরুষদের
জন্যে উন্নত ধরনের রবারে তৈরী
জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র
নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ
এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ
পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে,
তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয়
না। নিরোধ সব জায়গায়
পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী
দোকান, ওষুধের দোকান,
সাধারণ বিপণী, পানের দোকান
আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

আনুষ্ঠানিক বৈঠক

প্রাথমিক স্তরে 'মুদ্রণ' খবর তার দাঁড়িতে পাক বিতে দিতে চাকর এসে নামল, শুখন তার ওপরওয়ালাদের হেড আপিসে অর্থাৎ ইসলামাবাদে বড় দালালের আসনটা খালি হয়ে গেছে। আয়তুর খাঁর বদলে ইয়াহিয়া খাঁ এসেছেন এবং পশ্চিমা পুঞ্জপতিদের লিমিটেড কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছেন। নব্বুলের অবশ্য চাকরি গেল না। বরং তার মনিবরা তাকে নতুন উৎসাহে নতুন কিছু করার জন্য মদত দিতে লাগল। কারণ, ইয়াহিয়া পাকিস্তানের সর্বত্র জঙ্গী আইন জারী করলেও এবং মোলানা ভাসানীর মত নেতা তাকে "সং মৈনিক", "আদর্শ দেশসেবী" ইত্যাদি বলে ভেল দিলেও মারমুখী কৃষক-গ্রামিক এবং অন্যান্য মেহনতী আওয়াম থেমে ছিল না। তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল, যেমন আজও চালিয়ে যাচ্ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোষ্টার পড়ছিল—“নির্বীচনের মাধ্যমে মন্ত্রী বদল করা যায়, জনতার শোষণ বন্ধ করা যায় না, গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে, কৃষিবিপ্লব সম্ভব কর”। যাতে যাতে ঘুরছিল সভাপতি আওয়ার লাল বই, যা কি না জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মন্ত্র এবং অসংখ্য কৃষ্টি উঠছিল হুদন—“রেড বুক, রেড ফ্লাগ, রাইফেল”। কপে কপে উঠছিল “গোল টেবিলের দালালরা, যাদের যত্নেরে উনসওয়ারে মেই এতিহাসিক আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। ফলে পশ্চিমা ভ্রমা নিখিল পাকিস্তানের পুঞ্জপতিদের নির্দেশে নব্বুল আমিন ভর নয়া অভিযানে নামল। জন্ম নিল “পাকিস্তান ডেমো-ক্রটিক পার্টি”। মাত্র কয়েকদিন আগে মার্কামারা পি, ডি, পি ওয়াল—অবদূস মালাম খাঁ “পাকিস্তান অবজারভারের পাতায় কলামের পর কলাম জুড়ে শাসিয়েছে যে, ক্ষমতায় এলে তাদের দল আমাদের দেখে নেবে (অক্টোবর, পাঁচ)। মাঝে মাঝেই পি ডি পি'র এডে গরু-গাউল আমাদের উদ্দেশ্যে এই সব গরম বাক্য ছাড়ছে। গত একত্রিশে মে “শও-কতে ইসলাম দিবস” পালন করতে গিয়ে তাদের নয়া জোট “ইসলামী মৃত্তা-হিন্দ”র অংশীদার জগাতারী দৈনিক “সংগ্রামের” পাতা ভরে আমাদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার আশ্বালন করেছিল। কিন্তু তাদের এই সব কাণ্ড দেখে আমরা কেবল হাসতেই পারি এবং খতমের লিখে তাদের নামের নিচে-যন্ত্র করে লাল-রঙে গাড়া দিতে পারি। নির্বাচন যারা ঠাঁয়ে দিতে চেয়েছিল, পি ডি পি'র তাদের একদল। ওভাবে সময় বেশি পোলেই বা কি হবে? বড় জোর কয়েকটা

আসনের হেরফের হতে পারে। বরং ক্ষতিই হবে বেশি। কেননা বর্তমান যাবে ততই এই সব দালালদের রক্তচোটে মৃত্তাসগুলো খসে পড়বে। আগামী চিঠিতে পি ডি পি সম্পর্কে অনেক খবর দেব।

৬ চাঁদ্র বহুরে পা দিয়ে
[৫০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করেছে। এই গোপনীয়দের মানবপত্রে হতে অনেক দেরী।

নির্বর্তী পক্ষীটি হচ্ছে, বর্তমান অবস্থাকে বজায় রেখেই ভূমির ক্ষেত্রে যাতে কুহং পুঞ্জি নাক গলাতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা এবং এটুকু না করলে ওই অনুপ্রবেশকে রোধ করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন সিলিং-বাহিত জমি সারা ধরে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি উদ্ধার এবং তা ভূমি-হীনদের মধ্যে বন্টন। এই কাজের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে শত্রু হয়েছিল, কিন্তু শেষ আর করা হল না। ভারতবর্ষের অন্য রাজ্যগুলিতে বিপ্লবের হয় নি।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এবং কেন্দ্রের বর্তমান শাসকদল মধ্যে অবশ্য খুব বড় গলায় বলছেন যে, ভূমিসংস্কার আইন কার্যকর করতে হবে, ভূমিহীনদের অধিকার আছে বেনামা জমি দখল করার, কিন্তু এই গালভরা বুলিসমূহ ছাড়া কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কিছু করতে যে ইচ্ছুক, তার ন্যূনতম পরিচয়ও এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। সম্প্রতি কয়েকটি দল সারা ভারতব্যাপী ভূমি দখল আন্দোলন শুরু করেছিল। সেই আন্দোলনের মূখ্যমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আচরণ, তাদের কথা ও কাজের মধ্যে ফাঁকিটাকেই অত্যন্ত কুণীসতভাবে প্রকাশ করেছে। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন যে, ভূমি দখল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে। যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে ন্যায়-শাস্ত্র অনুযায়ী আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য, যাঁরা মূখ্য ভূমিসংস্কারের কথা বলেন, যদি তাঁরা ভূমি দখল আন্দোলনের ব্যর্থতায় আনন্দিত হন, তাহলে বুঝতে হবে তাঁরা ভূমিসংস্কার চান না, যা বলেন, তা নিছক স্তোকবাক্য, নিছক ভাঁওতা।

৬ ৬ ৬

কাজেই যে সকল দল ভূমি দখলের আন্দোলন সমর্থন করেন তাঁদের কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই দাবি

জ্ঞানানো যে, তাঁরা সোজাঙ্গী বলছেন যে, তাঁরা ভূমিসংস্কার চান কি না, তাঁদের ভূমিসংস্কারের নীতিকে তাঁরা কবে এবং কিসে কার্যকরী করবেন।

আমার নিজের ধারণা, যদি আন্তর্-নিরকতা থাকে, তাহলে মাত্র কয়েক-দিনের প্রচেষ্টাতেই বেনামা জমি উদ্ধার এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা যায়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য এখনই নতুন সেটলমেন্টের আদেশ দেওয়া। গভ্যারের সেটলমেন্টে কাজ করেছিলেন এমন লোক অনেকে আছেন এবং আরও কিছু লোক নেওয়া যেতে পারে। প্রতিটি গ্রামেই এই উদ্দেশ্যে একটি করে কোর্ট বসানো হোক এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও রাজনৈতিক দলগুলিকে এই বিষয়ে সহযোগিতার জন্য আহ্বান করা হোক। করার কত বেনামা জমি আছে তা গ্রাম-বাসীদের অজানা থাকার কথা নয়। এখানে তাদের দলিলপত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখা হোক এবং সেক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য, ভূমিসংস্কার বিল পাশ হবার পর যে সকল জমি হস্তান্তরিত হয়েছে, সেগুলি অবৈধ ঘোষণা করার জন্য একটি আইন পূর্ববাহে পাশ করিয়ে রাখা দরকার। তাহলে সিলিং-বাহিত সকল জমিই বেরিয়ে যাবে এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে অতিদ্রুত বন্টন করে দেওয়া হোক একেবারে দলিল-পত্রাদি করে দিয়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন আন্তরিকতার ও তৎপরতার।

এই কাজ যদি এই মর্মেতে শুরু করা না যায়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, তাহলে সরকারকে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে—যার মোকাবিলা করা শিগেরও অসম্ভব। বস্তুত সরকার কি এই পরিস্থিতির সম্মুখীন ইতিমধ্যে হন নি? কেন্দ্রীয় সরকার কি পারছেন পশ্চিমবঙ্গে রুল অফ ল বজায় রাখতে? পুর্নলিঙ্গ, সি-আর-পি, মিলিটারী—কোন কিছুতেই অবস্থার সামাল দেওয়া কি আছে?

ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা গ্রামীণ অর্থনীতির সমস্যা, যা ভূমি-সংস্কারের দ্বারা আংশিক মিটলেও সম্পূর্ণ মিটেবে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে এই দিকটাই সর্বাধিক উপেক্ষিত, যা বারান্তরে আলোচনা করব। আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে জনৈক মনীষী বলেছিলেন, ইউ কাণ্ট বিল্ড এ রুম ফাই বিগিনিং টু বিল্ড ইট ফ্রম দি ব্লক। আর তা করতে গিয়েই যত গড়গোল।

[চলবে]

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

গত ২০শে জুলাইয়ের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র 'পাঠক-মন' স্তম্ভে আমার সম্পূর্ণ ঠিকানা সহ একটি চিঠি প্রকাশিত হওয়ার পর সূদূর কেরালা থেকে 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র জনৈক পাঠক (মনে হয় উদ্‌ভাষী) এক পত্রে আমাকে ২১শের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি কপি সংগ্রহ করে পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। 'বসুমতী' কার্যালয়ে খোঁজ করেও নাকি তিনি এই সংখ্যাটি পান নি। বলা বাহুল্য, পত্রলেখকের সংগে পূর্বে আমার কোনরূপ যোগাযোগ ছিল না। যা হোক, দুঃখের সংগে স্বীকার করছি—আমি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত পাঠক নই, কিন্তু এর গ্রাহক বা নিয়মিত ক্রেতা নই। তাই এ সংখ্যাটি আমার কাছে নেই। সমস্যাভাবে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে যারা নিয়মিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' কেনেন, তাঁদের সংগে যোগাযোগ করতে পারি নি। যা হোক, যদি কারো পক্ষে সম্ভব হয় ২১শে মের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র একটি কপি দয়া করে নীচের ঠিকানায় পাঠালে সূদূর কেরালার এ পত্রলেখক বিশেষ উপকৃত হবেন। প্রয়োজনবোধে পত্রলেখক প্রেরককে পত্রিকাটি পাঠ করার পর ফেরত (পত্রলেখকের ভাষায় 'আপস') দিতেও রাজি আছেন।

—অজিতকুমার দাস

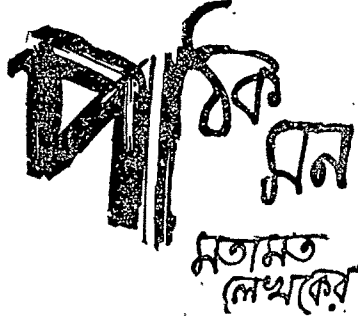
পত্রিকা প্রেরণের ঠিকানা :

M. N. Satyardhy,
P.O. Marikunnu,
Calicut-12,
Kerala.

মিনি স্কাট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে

গত ২৪শে আষাঢ় তারিখের পত্রিকায় 'রাজস্বগণ' বিভাগে 'সূজনের' মিনি স্কাট নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব শীঘ্রক লেখাটি খুব মূল্যবান হয়েছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দর-নারক মিনি স্কাটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশেষ আগ্রহী হয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এ ব্যাপারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরকারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণী আবেদন জানিয়ে সমাজের রুচিশীল জনসাধারণের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতাভার অধিকারী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সিনেমা-সংস্কৃতির আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "এই বিকৃত মানসিকতা বিজাতীয় ফ্যাসনের প্রধান প্রচারক সিনেমা।"

শুধু সিনেমা নয়, সাহিত্যের প্রভাবও এক্ষেত্রে কম নয়। আজকাল একটি বহু বিতর্কিত শব্দ প্রায়ই কানে আসে। শব্দটি হচ্ছে "শিল্প"। এই মহামান্য শব্দটির দোহাই দিয়ে আজ



সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে যৌনতার যে অবাধ ব্যাপ্তি ঘটছে তা জনমানস ও সমাজজীবনে এক বিপর্যয়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। অথচ এ বিষয়ে যখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বলতে শুন, ন্যাক শিল্পের খাতিরেই এ সবার আমদানি। এবং শিল্প এমনই এক বস্তু, যা যে-কোন প্রকার সমালোচনা ও বিধিনিষেধের আওতার বাইরে। এই "শিল্প" বস্তুটির কোন পরিষ্কার সংজ্ঞা আদ্য পর্যন্ত পাওয়া যায় নি এবং সমাজ ও সভ্যতার প্রতি এই শিল্পের অবদান কতখানি সে প্রশ্নেরও উত্তর মেলে নি। এ নিয়ে যখনই কেউ প্রশ্ন তুলেছে তাকে গোঁড়া বা অনুদার বা বেরনিক বলে হাঁকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলেছে। কোন এক সমালোচক সখেদে মন্তব্য করেছিলেন, 'শিল্প হচ্ছে যেন এক ফুলের বাগান যা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। কিন্তু পেট ভরাতে হলে আলু-পটলেরই চাব করা'। অপর এক সমালোচককে শিল্পের প্রশস্তি গাইতে শুনিয়ে, 'আট ফর আর্টস সেক'। তাই শিল্প সমাজের পক্ষে অকল্যাণকরও হতে পারে, কিন্তু সেটা কোন আলোচনার বিষয় নয়।' কি অশ্রুত যুক্তি!

বস্তুত এই তথ্যাক্ষিত শিল্পের খাতিরেই আজকাল সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে বেপরোয়া মনোভাব গড়ে উঠছে এবং এর প্রতিরোধের চেষ্টা করলে তা শিল্পীর পক্ষে আরও সুবিধার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

শিল্পপরিসরকে বলে থাকেন, সাহিত্য ও সিনেমার মধ্যে বাস্তবের নিখুঁত প্রতিফলনই শিল্প সৃষ্টির চাবিকাঠি এবং বাস্তবে যা ঘটছে সাহিত্য ও সিনেমায় তা রূপায়ণের অধিকার অবশ্যই দিতে হবে। এই কারণে উচ্চমানের শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে খোশলা কর্মিটি সিনেমায় চর্চন ও নৃত্যের সুপারিশ করেছেন এবং এই নিয়ে তুমুল বিতর্কও বাড়ুও বায়ে গেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সাহিত্য ও সিনেমা যথার্থই বাস্তবের ফটোগ্রাফি হচ্ছে কি? বরং বাস্তবই হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই সব সাহিত্য ও সিনেমার

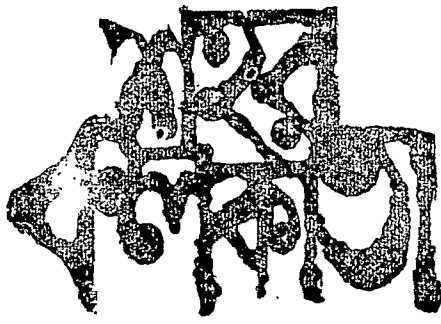
ফটোগ্রাফি। বিশেষত সিনেমার নায়ক-নায়িকারাই আজ সমাজের প্রকৃত নায়ক-নায়িকা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পরিণত ও অপরিণত মনের তরুণ-তরুণীবা এদেরকেই অনুকরণ করার মধ্যে যথার্থ আভিজাত্য ও আনন্দ আহরণ করে বেড়াচ্ছে। বস্তুত সিনেমাই আজ সমাজজীবনের মানসিকতাকে ওলটপালট করে দিচ্ছে বা দিতে চলেছে। সিনেমাতে যখনই কোন নতুন বই চালু হয়, অমনি তার গানগুলো সবার মুখে মুখে এবং নায়ক-নায়িকাদের শব্দ বৈশবাসই নয়, তাদের চুল কাটা থেকে সূর্য করে চলনভঙ্গিটি পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় নতুন নতুন ফ্যাসনের আদর্শ।

অবশ্য এই ফ্যাসনের আমদানি আজই নতুন নয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এ দেশের নারীরা নিজেদের অপরের দৃষ্টিতে লোভনীয় করে তোলার বিদ্যাটি রপ্ত করে নিয়েছে।

যাই হোক, সরকারকে এ বিষয়ে অবিলম্বে দৃষ্টি দিতে হবে এবং এই বহু বিতর্কিত শিল্পের মোহ ছেড়ে সুস্থ সমাজ রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য তথ্যাক্ষিত শিল্পপরিসরকে হয়ত অনেক চেষ্টামোচন করবে, কিন্তু সোঁদিকে কর্পাত করলে চলবে না। কারণ, শিল্প যদি বিপণ্য-দ্রব্যের মতই ক্রয়-বিক্রয় হয়, তবে শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে বিষ পরিবেশন করছেন কিনা, তাও পরীক্ষা করতে হবে। তা ছাড়া শুধু শিল্পেরই দোহাই নয়, সমাজে যাই কিছু ঘটুক, আমরা সেই অপকর্মের সবটুকু দোষ নির্বিবাদে যুগধর্মের ওপর চাপিয়ে দিয়ে রেহাই পেতে চেষ্টা করি। অথচ এ কথা ভুললে চলবে না যে, যুগ আপনাকে হতে সৃষ্টি হয় না, মানুষই যুগ সৃষ্টি করে এবং সমাজজীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রে সুস্থ মানসিকতার এই ক্রম অবক্ষয়েই বিকৃত-রুচি যুগের জন্মলাভ ঘটে। সাহিত্যে যৌনতার স্বপক্ষে গেয়ে যারা বলেন যে, যৌনতা জীবনের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ, তাঁদের বোঝা উচিত যে, জিহবাও মদুগহবরের অপরিহার্য অংশ কিন্তু তা যদি মদুগহবরের বাইরে এসে ঝুলতে থাকে, তবে বলতে হবে—নিশ্চয় তার বিকৃতি ঘটেছে।

বাংলা দেশের খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে সাপ্তাহিক বসুমতীই একমাত্র পত্রিকা, যে সংবাদ পরিবেশন ও সাহিত্য সম্পাদনার সত্যতা ও রুচিশীলতার পরিচয় রাখছে। আশা করি, সাপ্তাহিক বসুমতী এ বিষয়ে আরও মনোযোগ দেবে।

—সেখ ওয়াল্মিশি আলি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



এবার গাড়ি দখল ?

অশোভনভাবে বাস স্টপে ডিগবাজি খেয়ে বোদন অপলক অধিকারীর হাতে ফ্যাণ্ডেজ উঠল তার পর দিন থেকেই চোকাঠের বাইরে পা বাড়ানোর সময় ঠাণ্ডা বারে এসে দাঁড়ায়। তার ডাঙা রেকর্ডের একই জায়গায় পিন বিঁধিয়ে সবম-মলজ্ঞ কণ্ঠে রোজ একই অনুরোধ করে, 'দেখে শুনো ট্রামে-বাসে উঠো!' আর আমার তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি স্মরণীয় পাবলিসিটি মনে পড়ে যায়। সেই স্বামীর চোখে চোখ পেতে যুবতী বধুর করুণ মিনতি, 'কথা রেখো!' অর্থাৎ ভিড় সামলে চালাও। কিন্তু ঘরের স্ত্রী, ঘরের স্ত্রীর মাথা-বাথা তো আফিসের হামলা অফিসের-আমলা-দের থাকার কথা নয়। নয় বলেই অপলক অধিকারীকে হাতে পিটি বাঁধতে হল। করুণাময়ের অন্তঃস্বভা স্ত্রীর মতো ঘটল। আর ওঁদের অফিস শত্রু জমানো প্রভেদে ফাণ্ডের টাকা বছর চারেক ঘুরিয়ে করুণাময়ের হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'আমরা যে কী গভীর শোক পেয়েছি কী বলব মশায়। অমন পাণ্ডুরাল কর্মী সচরাচর মেলে না। আমরা দুর্দিনে শোকসন্তপ্তভাবে দাঁড়িয়ে তার আত্মার শান্তি কামনা করেছি। এবং বলাই বাহুলা, সেই শোক সভায় হামলা অফিসের-আমলাও বোধহয় গলাব দাঁড়ি (নেকটাই) আঙুলে পাকাতে পাকাতে ঘড়ি করে দুর্দিনে আপন মর্বাদা রক্ষা করেছিলেন।

তবে আমি জানি, লাল চিকের লেট এ্যাটেন্ড্যান্স বাঁচাতেই শহরের রাস্তায় আন্তিমশয়া ঝিয়েছিলেন ভদ্রমহিলা।

অপলক অধিকারীর এ্যাটেন্ড্যান্স অফিসকে রুমগত লাল সেলাম জানাচ্ছিল। ক্ষাপা ঘাড়ের মতো ক্ষেপে গিয়ে চিকে মারা হামলা অফিসের একদিন খবর করে হেঁকে দিয়েছিলেন ওকে। ফলত লেট বাঁচাতে বেচারীর ঐ দুর্ভোগ। না হ'ক কিছ্র মেডিক্যাল এক্সপেন্স হয়ে গেল। জমা ছুটি শেষ হয়ে এ্যাভারেস্ট পেতে দাঁড়াল।

অপলক এসব কথা বলতে বলতে একদিন উজ্জবুকের মতো কোঁড়ে ফেলোঁছিল, যদিও জানত, 'কুন্দসী' শহরে তার কাছা উপযুক্ত কানে কোনোদিনই পৌঁছবে না। বলেছিল, 'লেট বাঁচাতে কম করি নি মিস্তুরদা।' যৌদন পড়লাম সৌদনই ঠিক সময় ধরে বাস স্টপে হাজির হয়েছিল। রুটে গন্ডগোল। বাসের দেখা নেই। শেষে যেটা এলো, একেবারে ভরা-পেটে পক্ষীরাজ। গোটা দুই শিশু (ওরা স্কুলে যাচ্ছিল) আর এক লাইন মেয়ে যাত্রী ঠেলে বীর-পুরুষের মতো কোনো রকমে ঐ বাসটাতেই একটা পা সোঁদিয়ে দিয়েছিল। আর আপনি যদি কোনোক্রমে একটা পা তুলে দিতে পারেন, দেহটা পাঁচজনের সাহায্যে কখন গাপ করে ভেতরে ঢুকে যায় জানতেও পারবেন না। আমিও পারি নি। বাস, আমাকে নিয়ে বেশ জোরেই ছুটছিল। আমিও হামলা সাহেবের তেরা কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হব ভেবে আরামে ঘামছিলাম। এমন সময় বিকট একটা ব্র্যাঙ্ক ফায়ার করে গাড়ি গেল দাঁড়িয়ে। হুড়হুড় করে যাত্রীরা নামলেন, স্ট্রোতের তোড়ে আমি। অনেক 'কাটা টিকেট ফেলা না যায়' এজন্য কন্ডাক্টরের সাহায্যে অন্য কোনো বাসে স্থানান্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমার সে অবসর নেই। ছুটোছুটি গলদ-ঘর্ম। শেষে একটা ট্রামেই চাপলাম মাঝ পথে। হাতে বা সময় তাতে হাজিরা খাতা টানার আগেই হয়ত পৌঁছে যাব। কিন্তু কপাল সঙ্গ ছাড়ে না। ট্রামও মাঝ পথে ঘড়াং করে থেমে গেল। ড্রাইভার-কন্ডাক্টর নেমে পড়ে ঘাসরুটে উদ্দ হয়ে বাসে ঢাকা পরীক্ষা শুরুর করল। আমি অক্লান্ত নিশি ডাকের মতো সরকারী ডাকে আমি ফের ছুটে গেলাম বাসতলায়। উর্বর মগজ ব্যবস্থাপকদের কল্যাণে এখন তো বাসতলা থেকে ট্রামতলা বড় কাছাকাছি নেই। দূরে একটা বাসে একপেয়ে জায়গার সম্ভাবনায় ছুটছিলাম, মাঝে বিপত্তি। হাতটা গেল। ইনজেকশন, ব্যান্ডেজ, প্রেসক্রিপশন।

অপলকের ইতিহাস নেহাৎ মামুলী। এ তো হামেশার এ্যাফেয়ার। এবং কে আর

হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে। আমি বলেছিলাম, 'আমলার রাজত্বে গামলা ভরে রক্ত দাও তবে না চাকরির উঁপাত! এতেই অমন মুষড়োলে চলে! চাঁয়ার আপ-কাল থেকে ফের বাসকুস্তি শুরুর করে দাও!' কিছ্রমাত্র সহানুভূতি দেখাই নি। কিন্তু উপদেশ যাই দিই ন। কেন অপরকে; বাস্তব সমস্যা বিচলিত করবেই। আমলারা হামলা করেন কারণ তাঁদের গাড়ি আছে। নিদেন অফিসের লিফট ভ্যান তো আছেই। তা ছাড়া মোটা মাহিনা। ঘরে বৌ ছাড়াও দাস-দাসী। বাজার, দুধের লাইন, রেশন, টাইশন, নিজের ছেলে পড়ানো, গৃহিণীর অল্পপাক ঘটিত বিলম্ব, বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, কলের জল নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিবাদ ইত্যাকার সমস্যা ওঁদের নেই। কিন্তু আমি, আমার তো ঐ সব কটি সমস্যাই বর্তমান। সূত্রের অপলকের অবমাননা আমার গায়েরে বিঁধেছে বৌক। করুণাময়ের স্ত্রী তো আমাদেরই ঘরের মেয়ে। তা ছাড়া আমারও স্কুটার, বাইক, মোটর বা ভ্যান নেই। এই ভাইটাল ইস্যু নিয়ে অফিসার নম্মা করার ব্যামো আমার তাই থাকার কথা নয়। তবে যানবাহন সমস্যা একটা ক্রোজড ফাইলের মতই পুরনো সাবজেক্ট। একে নতুন করে ওপেন করায় পৌনপুনিকতা দোষ লাগে। প্রসঙ্গটা সূত্রের শহর কলকাতার আওতার বাইরেই রেখেছিলাম। ধরে নিয়েছিলাম, লাল চিকের বিজ্ঞাপন প্রচারের প্রভাবে জনসংখ্যা হ্রাস পেলে বছর কুড়ি পর হয়ত এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মাঝে পড়ে যদি আবার সাকুলার রেল ফেল হয়ে যায় তবে তো কথাই নেই। তাই আর কেন ও প্রসঙ্গে।

কিন্তু জীবনের ধন কিছ্রই যায় না ফেলা। ইতিমধ্যে আর একটি ইন্সিডেন্ট সেই পুরনো সমস্যাকেই গোঁব খাইয়ে উদ্ভীন করেছে। আমিও দোয়াত-কলম বাগিয়ে বসেছি, কর্তব্যবোধে সমস্যাটা রীতিমত সিরিয়স এবং পাকিয়ে উঠলে যে ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে, তাতে ওপর তলার গ্রাহি রাজ্যপালম্ রবে হয় আমলা-দের হামলানো বন্ধ করতে হবে, নয় বি বি ঘোষ মহাশয়কে দিল্লী গিয়ে তুরন্ত কয়েক বস্তা টাকা এনে সাকুলার রেল চালু করে দিতে হবে। না হলে অন্তত অফিসে অফিসে কর্মীদের জন্য লিফট ভ্যানের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

সমস্যাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজের মনেই একটা ভবিষ্য সম্ভাবনায় চমকে উঠেছিলাম। শুরুর থেকেই আরম্ভ করি:

সি-পি-আই জমি দখল করছে, সি-পি-এম করেছে ফ্রন্ট আমলে, অন্যান্য পার্টিও যে-যার বংশদণ্ড সুবিধেমত যথাস্থানে পুঁতেছে। কেন? না অন্যের জমি নেই। এস-এস-পি দেখলো, এ বড় ল্যাঠা, কিছ্র

শাপ্তাহিক বঙ্গমতী

তো করতেই হয়। শুধু সম্পত্তির ওপর আর আরের ওপর শিলিং কর' শ্লোগানে তো বর্তমান হিড়িকে পার্টি জিইয়ে রাখা যায় না। অতএব ও'রা বললেন, লাগাও লাগাতার বাড়ি দখল। সম্প্রতি দেখলাম, এ-গুড়ে মধুর সন্ধান পেয়ে ফরোয়ার্ড ব্লকও বাড়ি দখলে ফরোয়ার্ড হচ্ছেন।

নির্বাচনের আগে অন্তত পার্লামেন্টটিও ক্ষম জরুরী নয়। শ্লোগান তুলে বুলে পড়লেই হল। বিপদ হয়েছে বাংলা কংগ্রেসের। সেই যে বলে, 'খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুন', তা এঁদেরও তাই। চলছিল দিন চরকা কেটে, কাল হল বামপন্থা ঘেঁটে! এখন সামাল সামাল হাঁকছেন সুশীল ধাড়া।

জমি-বাড়িতে হাত লাগানোর সম্বন্ধে ব্যাপারে জড়িয়ে থাকলে পার্টি ধায়। তাই লাও সি-আর-পি, লাও মিলিটারী পরিচাহী চীৎকার ওয়াদের। কিন্তু অমন কাটখোটা পলিটব্লক যাঁদের চলে না তাঁরা কি করবেন! বাড়ি-জমির চাইতে চটকদার আর কোনো শ্লোগান পেলে এখন বাদ-বাকি বামপন্থীরা



আপনার চুল যে বকসহ এক তার মত নিতে পারে কেন?

সানসিল্ক

তার ৩ টি স্পেশাল শ্যাম্পু দিয়ে

আপনার ঠিক যে রকমটি দরকার বেছে নিন

সানসিল্ক লেমন শ্যাম্পু

চটচটে চুলের জন্মঃ- বাড়তি তেল ধুয়ে দেয়, তার ফলে আপনার চুল হবে পরিষ্কার স্বরস্বত, ঘোষের মত উজ্জ্বল, রেশমের মত কোমল।

সানসিল্ক টনিক শ্যাম্পু

খসখসে চুলের জন্মঃ- এতে আছে অ্যালার্জিনেন যা আপনার চুল পুষ্টি যোগায়, কিরিয়ে আনে রেশমী শোভা, চুল এনে দেয় উজ্জ্বল আভা

সানসিল্ক বিউটি শ্যাম্পু

আভাষিক চুলের জন্মঃ- এটি এমন ভাবে তৈরী যাতে আপনার চুল সবসময় মৃদুর পরিপাটি থাকে, প্রতিটি চুল থাকে রেশমের মধুর বাহার

সানসিল্ক - শুধু শ্যাম্পুই নয় আপনার চুলের এক অপূর্ব প্রসাধনী



সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

পরে পড়েন। (সম্প্রতি আবার চাকরি খুলেও হয়ে গেল।)

আর শ্লেগান জিনিসটা মানুষের অভাববোধ থেকেই সৃষ্টি। শহরের পিচ তপ্ত পথে নীত একশ' শ্লেগান জন্ম নিতে পারে। তারই এক ভণ্ডাঙ্কুর সেদিন হঠাৎ আমাকে উচ্চকিত করল। স্পষ্ট স্বকর্ণে শুনলাম। বাস স্টপে শুনলাম নতুন শ্লেগান জন্ম নিচ্ছে। ভাগ্যস এখনি তা কোনো পার্টির কানে ওঠে নি। কিন্তু উঠতেই বা কতক্ষণ।

বাস্তবিক যদি বা শুনলাম তাই-ই শুরুর হয়, আর তা হওয়াই বা বিচিত্র কি, তাহলে সে হবে সাংঘাতিক আর একটি ব্যাপার। ব্যাপারটা বলি তবে:

সাপ্তাহিক ফীচারের সাবজেক্ট সংগ্রহের জন্য আমাকে সদা উৎকর্ণ থাকতে এবং উচ্চকিত দৃষ্টি রাখতেই হয়। বর্তমানে ওটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। এই স্বভাববশতই সেদিন ওভারহিয়ার করে ফেললাম কিছু উঠতি বয়সীর আলাপ।

তখন ঝেড়ে বৃষ্টি হচ্ছিল। বাদুড়-ঝোলা ট্রাম-বাসের কোলে-পিঠে কাক-ভেড়া অফিসঘাত্রীর করুণ দৃশ্যে ছোকরা তিনটি অকস্মাৎ উত্তেজিতভাবে বলছিল, 'নিজের মূখ দেখ শালা, নিজের মূখ দেখ। অদৃশ্য কাছিতে-বাঁধা জানওয়ারের মতো আমরা ছুঁচি। গড়োগড়ুতি, খেওখেরি, ঘামাঘামি, এমন কি গরম বাড়লে মাথা গরম জ্বিনত মারপিট, আমাদের শিক্ষা দীক্ষা, স্বভাব-চার দ'বেলার শহুরে অবাবস্থার এক কোমর কাদায় ডুবে আছে। দেখো, গাড়ি-গুলোর অবস্থা।'

'এই শহুরে অবস্থায় ঠুটো সরকার যদি নাই-ই কিছু করতে পারে তো দূটো সার্কুলার ছাপুক না। অফিসের সময় ভাগ করে দিক। আটটা থেকে সাড়ে এগারটার ভেঙে ভেঙে অফিস টাইম করুক। ৮টার, ৯টার, সাড়ে ৯টার, দশে, সাড়ে দশে, এগারোয়, সাড়ে এগারোয়। চাপ চের কমে যাবে। এক-এক টাইপের অফিস শব হোক এক-এক টাইমে।'

'কে শালা তোমার সুখ-সুবিধে ভাবছে!' ক্রমে আলোচনার উত্তাপ বাড়ছিল।

'বরং কত বেশি করে অত্যাচারের বোঝা চাপানো যায়, আমলাভারী শাসনযন্ত্রের ফলি-ফিকির তাই-ই।'

'আরে ওরাই তো কংগ্রেসের বারোটা রাজাল। নিজের কোলে অনবরত ঝোল টেনে মূর্খিমেরের পার্টি বানিয়ে ছাড়ল একটা জাতীয় দলকে।'

'তা তোমার সেই জাতীয় দলের চেতনা তো আজও জাগে নি। আজকের শহরটার দিকে তাকিয়ে দেখো, রাজ্যপালের আমলা মিনিস্টারদের বরোক্র্যাটিক শাসন পদ্ধতি-

ফের সেই রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে গেছে। মানুষজনের কী দৃশ্য।'

'আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিস? দুর্ভোগের মধ্যে থাকতে থাকতে ওটা গা-সওয়া ব্যাপার হয়ে যায়। না হ'লে মানুষ কখনো যুগ যুগ ক্রীতদাস থাকতে পারে! অথচ তাই সম্ভব হয়েছে। দুর্ভোগটা বৃষ্টিতে পারে না মানুষে।'

'বাস্তবিক আজকের এই দুর্ভোগ লোকে যখন ইতিহাসের পাতায় পড়বে একদিন, যেদিন দুর্ভোগের অবসান হয়েছে, সেদিন তারা ভাববে, উরে বাস রে, লোকগুলো বেঁচেছিল কী করে।'

'যানবাহনের ব্যবস্থা যদি নাই করতে পার তো হাজিরার কড়াকড়ি কি করে কর হে? চাকুরে মানুষ কি সেকলে গৃহবধু? সব বজাট ভূমি পোয়াও, বার্থ হলে শুকিয়ে মর! আর আমরা গৃহস্বামীর মতো সুখের অংশ আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে চেটে খাই।'

'ঠিক। মোটা মাইনের ওপরও ওদের জন্য আছে অফিসের গাড়ি। কি কর বাপু তোমরা? সব দায়িত্ব তো নিচ তলার, তোমরা শূন্য গোছানো ফাইলে সই কর, আর মালিকের শাসকের দালালি কর, সদারদের মতো অত্যাচার কর। জমিদারের নায়েবের মতো, ইংরেজের পেয়াদার মতো ঘুরঘের সুখের চাকরি। অথচ এক তক্কে আমলা-কতিপয়ের চারশ' থেকে নশ' টাকা ভাতা বাড়ে।'

'দূর শালা, আর বাঁচতেই ইচ্ছে করে না। ওদের মগজে কি সাধারণের চাইতে বেশি ফিলু আছে?'

'তাই থাকলে কি ওদের ঠ্যাঙাড়ে নিজে রাজত্ব করতে হয়। আসলে ওরা একটা ছাঁচে ফেলা জাত। অসুবিধে ছাড়া কোথাও কখনো সুবিধে সৃষ্টি করার প্ল্যান ওদের মগজে আসে না। এই ছাঁচে এক জাতের অত্যাচারী সৃষ্টি হয় মাত্র।'

'দেখো না, বাস-ট্রামের জন্য মানুষ যখন খামচা-খামচি করছে আর একদল প্রকান্ড প্রকান্ড গাড়িতে একা ফোলে-ছাড়িয়ে মৌজ করে চলেছে। চোখে কী লাটসাহেবী দৃষ্টি!'

'এ-ও আর বেশি দিন নয় হে। জমি দখল, বাড়ি দখল অবধি পের্পেজেছে, গাড়ি দখলই কি বাদ থাকবে!'

'গাড়ি দখল?'

'করলেই হয়। কতগুলো পার্টি এখনো ভেবে পাচ্ছে না নতুন শ্লেগান কি দেবে। জমি দখল চলছে, বাড়ি দখলের আওয়াজ দিয়েছে। এবার গাড়ি দখলের আওয়াজও উঠবে। পার্টিতে না দেয়, শালা, আমরাই একদিন নেমে পড়ব।'

'সাংঘাতিক কথা।'

'কিন্তু কথাটা ঠিক। যদি একবার খালি গাড়ি চাপতে শুরুর কর, বাপ বাপ করে

যানবাহন সমস্যা সমাধানের জন্য তখন বড় লোকরা আমলাদের নেকটাই ধরে টান দেবে। আর ওদের বকলেস তো ওখানেই বাঁধা। দেখবে আই এ এসের মাইনে বাড়ানোর মতো তড়িঘড়ি ভখন শহরের যান সমস্যার ফাইল ক্লিয়ার করা হচ্ছে।' এই হল কথোপকথন।

কীর থেকে কী! স্বকর্ণে শোনা! এই উত্তেজিত আলোচনায় চমকে উঠেছিলাম। কথাগুলো যে ঠিক ঐ ভাষাতেই বলা হয়েছিল এমন নয়, তবে বক্তব্যের ধারাবিবরণী যথার্থ রাখবার চেষ্টাই করেছি।

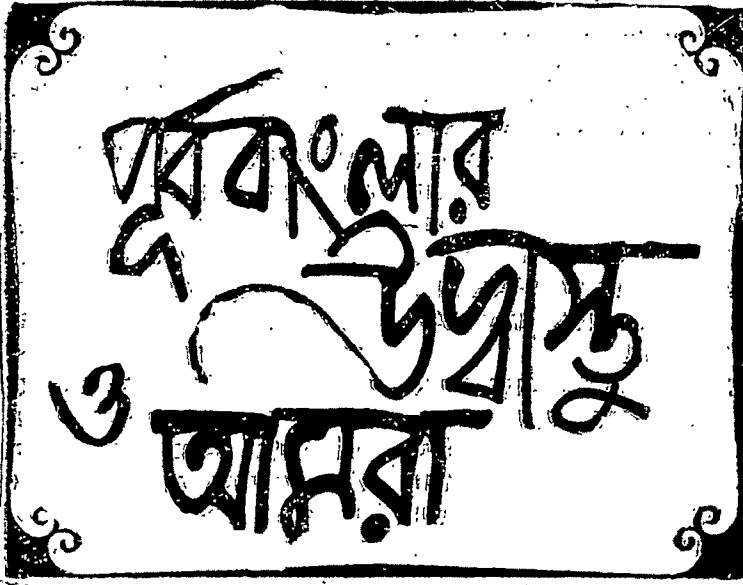
ইচ্ছার অঙ্কুর এই করেই তো পাক ধরায়। আর অসম্ভবই বা কি! যদি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর জমি দখলের চিন্তা বাংলার বাইরে জাগতে পারে, তো খোদ বাংলার খালি গাড়িতে চেপে বসা এমন কিছু দিবাস্বপ্ন নয়।

আর চাপতে শুরুর করলে, ছোকরা কটি ঠিকই বলেছে, আমলাদের ওপর চাপ আসবে একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য। চাপ না এলে ওদের মগজ খেলে না। সরকারী খরচের খাতায় আমলারা রাজবাড়ির হাতীর মতো। প্রভু পিঠে ঘণ্টা বাজিয়ে নধর বান্ধিত দুলিয়ে ঘুরতে পারে শূন্য। প্রভুর অসুবিধা দেখলে ক্ষ্যাপা মাতঙ্গ দলে পিষে মারতে পারে নির্দয় আক্রোশে। কিন্তু কাজের কাজ ওদের দিয়ে হয় না।

আন্দোলনের ধাক্কায় আমরা সাধারণ মানুষেরাই কিন্তু মারা পড়ি। তাই আন্দোলনকে ভয় আমাদেরই। আমরাই আনপ্রটেক্টেড। ওরা না হয় কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকবে। রাইটার্সে ঘেরাও হলে ভোজ-সভায় সাধারণের আরও শাস্তির ব্যবস্থা করবে। কিন্তু আমরা? এই পদাতিক দরিদ্র নগরবাসী? কাছে-পিঠে আন্দোলনের পেটো ফাটলে সি-আর-পি'র ডান্ডা নেমে আসবে। যদিও পুলিশে, সেন্ট্রাল পুলিশে সংখ্যা এখন পাঁচজন নাগরিকে একজন, তবু হামলার মোকাবিলায় ওরা নির্দোষের ওপর অত্যাচার করে লোক ক্ষ্যাপানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।

এই, যে দেশের অবস্থা, সেখানে নতুন-ভর আন্দোলন মানেই গৃহস্থের যন্ত্রণা।

'গাড়ি দখলের' আওয়াজটা স্তরায় একেবারে অবাস্তব মনে হচ্ছে না। এ শহরে-কিছুই অসম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত তাই পেয়ে বসেছে। যানবাহন সমস্যার আশু সমাধান চাইছি অনেকদিন থেকে। এবার সেটা সিরিয়াসলি চাই।



সামগ্রিক বিশ্বাস

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জ্যাডকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা থেকে সরাবার জন্য যে দীর্ঘ-মেয়াদী মনোনিবেশ ভারতবর্ষে শত্রু হলেছিলো, তাতে পূর্ব বাংলার দান ছিল অপারিসীম। মনোনিবেশে পূর্ব বাংলার অসংখ্য তরুণের রক্তের ঋণ কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করা যায় না। ইংরেজের ভেদ-নীতি এবং মুসলিম লীগের শিষ্টিজাতিকের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ভারতের ক্ষমতালোভী 'ক্লান্ত' হিন্দু-নেতৃত্ব স্বাধীনতার জন্মলগ্নে পার্টিশনকে মেনে নিয়েও এই ঋণ অস্বীকার করতে পারেন নি। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার কলভাই প্যাটেলের একটি উক্তি প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে: 'উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে একত্ব ভোগ করতে না পারলে আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা আমরা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি না। বিদেশীর দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে আমাদের দেশ-জননীকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা হাসিমুখে যে যন্ত্রণা সহ্য করেছিলেন এবং যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন- তা আমরা কেমন করে ভুলব? তাঁদের চরিত্র্য মণ্ডলের প্রতি, সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণকে অতি সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।'

বস্তুত সর্দার প্যাটেলের এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালের ২রা আগস্ট তারিখে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু নেতারা দেশবিভাগের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন।

পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘু মানুষের প্রতি সর্দার প্যাটেল যদিও ভারত সরকার এবং ভারতীয় জনসাধারণকে 'অতি সতর্ক দৃষ্টি' রাখতে আবেদন জানিয়েছিলেন, তথাপি গত ২০ বছরের মর্মান্তক ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, স্বাধীন ভারত সরকার প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্ভাস্তু জীবন নিয়ে রাজনৈতিক ছিন্মিনি খেলেছেন। আজ যে মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের সামরিক পাহারাকে উপেক্ষা করে হাজার হাজার সর্বহারা উদ্ভাস্তু তাদের ভারতীয় ভাই-বোনদের সামনে শীর্ণ হাত বাড়িয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই মুহূর্তে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত একটি প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখলে এই কথাই মনে হবে যে মানবিক মূল্যবোধ বলতে বোধহয় আজ আর কিছুই আমাদের অবশিষ্ট নেই। সংবাদপত্রটির সম্পাদক একজন বাঙালী, যদিও প্রধান সম্পাদক বাঙালী নন। আমি ওই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের অংশ-বিশেষের বাংলা ভাষা সামনে রাখছি: পূর্ব পাকিস্তান থেকে ভারতে নিরনাজি হিন্দু উদ্ভাস্তু-প্রবাহ একটি অস্বাস্তকর ব্যাপার। বর্তমান বছরের জানুয়ারী মাস থেকে এই উদ্ভাস্তু সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১,২৫,০০০-এর ওপরে পৌঁছেছে এবং এই উদ্ভাস্তু-প্রবাহ হাঙ্গামার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।.....

পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলবদ্ধভাবে হিন্দুদের এই প্রস্থানের কারণ যা-ই হোক না কেন; ভারত সরকার একথা ব্যাখ্যা করেন নি যে, কেন তাঁরা এভাবে একটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কোন বৈধ ছাড়পত্র ছাড়া ভারতে ঢুকতে দিচ্ছেন। এই বে-আইনী প্রবেশের জন্য আজ পর্যন্ত কোন উদ্ভাস্তুকেই শাস্তি দেওয়া হয় নি। উপরন্তু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রীয় সরকার তাদের হাঙ্গামা ও পুনর্বাসনের ব্যয় বহন করেছেন...। এই উদ্ভাস্তুরা প্রকাশ্যেই আসক্ত আর অপরাধেই আসক্ত, ভারত সরকারের অবশ্যই এ ব্যাপারে কঠোর নীতি নির্ধারণ করতে হবে যে, কোন অবস্থাতেই ভারতে আর উদ্ভাস্তু গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বে-আইনীভাবে প্ররিক্ত প্রত্যেক উদ্ভাস্তুকে অবশ্যই সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত।

এই প্রবন্ধের বক্তব্যের মধ্যে কেউ যদি ভারতের ভূতপূর্ব পুনর্বাসনমন্ত্রী মেহেরচাঁদ খান্নার প্রত্যাখ্যান কণ্ঠস্বর শ্রবণে পান, তবে সম্ভবত তিনি ভুল করবেন না। আজ যে বৈধ ছাড়পত্রের কথা বলা হচ্ছে, পূর্ব বাংলা থেকে আগমনেচ্ছ, সংখ্যালঘুদের, তা পাবার ক্ষেত্রে ভারত সরকার কতটা ব্যবস্থা করেছেন? ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত যদিও বৈধ ছাড়পত্র দেবার একটা মোটামুটি ব্যবস্থা ছিল, ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রী: মেহেরচাঁদ খান্নার চক্রান্তে কিভাবে কার্যত একে-বারেই বন্ধ হয়ে গেল, সে কথা গত ১৬ই জুলাই-এর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ বলে-ছিলাম। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করবো না। শ্রদ্ধা বলতে চাই আজও বৈধ ছাড়পত্র পাবার ক্ষেত্রে সেই নৈরাজ্য চলছে এবং পূর্ব বাংলার উদ্ভাস্তুরা নিরপায় হয়েই সব কিছু সীমান্তের ওপারে ফেলে রেখে শ্রদ্ধা হাতে ভারতের করুণাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভাবতে অস্বাভাবিক লাগে যে দেশের ওপর তাদের নৈতিক এবং জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত, সেখানে আজ তারা করুণার প্রত্যাশী। ইতিহাসের এ এক নিম্নম পরিহাস! আজ তাদের বিদেশী বলে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপ-প্রয়াস চলছে। যাঁরা এই অপপ্রয়াসে অংশগ্রহণ করেন তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান; স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নে তাঁদের প্রতি ভারতীয় নেতাদের প্রতিশ্রুতির কথা—ভুলে যান ভারতের সংবিধানের কথা; যার ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: পশ্চিম অনুচ্ছেদে যা-ই বলা হয়েছে; তাকুক, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত কোন অঞ্চল থেকে ভারতীয় এলাকায় চলে এলে তাঁকে এই সংবিধানের সূচনাকাল থেকেই ভারতের নাগরিক বলে গণ্য করা হবে—যদি, (ক) তিনি বা তাঁর পিতা বা মাতা কিংবা পিতামহ, মাতামহ, পিতামহী বা মাতামহীদের কেউ ১৯৪৭ সালের ভারত

গাণ্ঠাধিক বঙ্গমতী

হাসন আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ভারতীয় এলাকার মধ্যে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, এবং—

(খ) (১) যদি তিনি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর আগে পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতীয় এলাকায় বাস করে থাকেন, তবে—

(২) যদি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পরে এসে এই সংবিধান চালু হবার আগে ভারত সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী নাগরিকত্ব লাভের জন্য আবেদন করে থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট অফিসার তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত করে থাকেন।

তবে আবেদন করার আগে অবশ্যই অন্তত ছয় মাসকাল তাঁকে ভারতীয় এলাকায় বসবাস করতে হবে।

আজ যাঁরা এই জটিলমূল উদ্ভাস্তুদের সম্পর্কে ভারত রাষ্ট্রের দায়িত্ব অস্বীকার করতে চান তাঁরা শ্রদ্ধা আত্মবিস্মৃত হন না, সংবিধানের এই বিশেষ ধারাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকেও উপেক্ষা করেন।

উক্ত প্রবন্ধে আরো বলা হয়েছে: ভারত সরকার কি এই অশুভ 'মস্তব্যার-নীতি' অনুসরণ করে চলবেন? সরকার যদি পাকিস্তানের এই তথাকথিত 'ভারতীয়'দের দায়িত্ব নির্দিষ্টকাল স্বীকার করেন তাহলে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের আগমন রোধ করা কষ্টকর হবে।

কিন্তু কেন? আজ যে সব ভারতীয় বংশোদ্ভূত মানুষ সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা তাঁদের ওপর কি কেউ ওইসব দেশের নাগরিকত্ব জোর করে চাপিয়ে দিয়েছিল? কিন্তু আজ যাঁরা পাকিস্তানের বাসিন্দা, একথা কি কেউ অস্বীকার করতে পারেন যে, দেশবিভাগের দ্রুত সিদ্ধান্তই তাঁদের ওপর পাকিস্তানের নাগরিকত্ব চাপিয়ে দেয় নি? এক কোটি পঁচিশ লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষ নিশ্চয়ই স্বেচ্ছায় সেদিন পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন নি? তা যদি করতেন তাহলে আজ স্বাধীনতাব ২৩ বছর পূরও তাঁদের নিশ্চয়ই সীমান্ত অতিক্রম করার প্রয়োজন হতো না। ভারতের সংবিধান তাঁদের যে নাগরিক অধিকার দান করেছে, এ কথা ইচ্ছে করে ভুলে যাবার প্রবণতার মধ্যে এই সত্যকে-ই এড়িয়ে যাওয়া হয় না কি? সিংহল, ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি দেশের ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে এদের অসংগত তুলনা করার অর্থ কি আত্মপ্রতারণা নয়?

প্রবন্ধটিতে প্রশ্ন করা হয়েছে: যে সকল 'উদ্ভাস্তু' আসছে এবং ভবিষ্যতেও

আসবে, ভারত সরকার তাদের নিয়ে কি করবেন? তাদের জন্য কি কর্মসংস্থান করা যাবে? তারা কি জমি পাবে?—ঘর পাবে? কোথায়? কে তাদের পুনর্বাসনের টাকা দেবে এবং ভারতবর্ষের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে আছেন, তাঁদের তুলনায় এই উদ্ভাস্তুদের জন্য অধিকতর সুখস্বচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হবে কেন?... পশ্চিমবঙ্গে নিশ্চয়ই তাদের স্থান দিতে পারবে না। আর অন্যান্য রাজ্যে প্রকৃতপক্ষে তার অব্যাহত।

ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে জাগানো যায়। কিন্তু জেগে-ঘুমোনা মানুষকে জাগানো সম্ভব নয়। প্রবন্ধের এই সমস্ত প্রশ্ন মনকে চোখ ঠারার অপূর্ব নিদর্শন। দায়িত্ব স্বীকার করার থেকে দায়িত্ব পালন করাটাই বড় কথা। ভারত সরকার এই উদ্ভাস্তুদের দায়িত্ব যদিও অস্বীকার করেননি, তথাপি এদের প্রতি স্বেচ্ছা দায়িত্ব পালন কখনোই করা হয় নি। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারই এদের সামনে সীমান্ত বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অম্ব, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার ৮০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য যে দণ্ডকারণ্য পরি-কল্পনা রচিত হয়েছিল তা প্রহসনে পরিণত হয়েছিল কার অভিধানে? দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের জনপ্রিয় চীফ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মিঃ এ এল ফ্লেচারকে সিরিয়ে মিঃ এল. জে জনসনকে নিয়োগ করে এই প্রকল্পের বারোটা বাজাতে এগিয়ে এসেছিল কারা? ১৯৬১ সালে পুনর্বাসন বিভাগ তুলে দেবার সাকুলার জারী করে অসহায় উদ্ভাস্তুদের মধ্যে 'পানিক' সৃষ্টি করা হয়েছিল কার চক্রান্তে? পুনর্বাসনের টাকার প্রশ্ন ত' পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্ভাস্তুদের বেলায় ওঠে নি? (পুনর্বাসনমন্ত্রী খানজাহী একজন পশ্চিম পাকিস্তানী উদ্ভাস্তু ছিলেন)। তবে পূর্ব পাকিস্তানের উদ্ভাস্তুদের বেলায় এ প্রশ্ন কেন উঠবে? খাস পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভাস্তুদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে কয়েকটি প্রকল্প (যেমন—রাজ্য পরিবহন সংস্থা) রচিত হয়েছিল সেখানে ক্রমবর্ধমান অসংখ্য অফিসার-কর্মচারীর অন্ত্রপ্রবেশ ঘটিয়ে উদ্ভাস্তুদের স্বার্থহানি ঘটানো কারা? আজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের স্বারই বা তাদের সামনে রুদ্ধ হচ্ছে কেন?

১৯৬১ সালের আদম সমারী অনুযায়ী পূর্ব বাংলার হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ৯২ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি হিসাবে দেখা যায়, '৬১ সাল থেকে '৬৩ সাল পর্যন্ত বৈধ ছাড়পত্র নিয়ে মোট ৩৬,৪৬৯ জন এবং '৬২-৬৩ সালে অবিধভাবে ২৪,৮০৬ জন উদ্ভাস্তু পূর্ববঙ্গে থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। '৬৩ সালে এসেছে ৬ লক্ষ উদ্ভাস্তু এবং এবছর দেড়

লক্ষ। স্বেচ্ছা পরিসংখ্যান না পাওয়া গেলেও আমরা অনুমান করতে পারি, ১৯৬১ সাল থেকে এ পর্যন্ত দশ লক্ষাধিক উদ্ভাস্তু ভারতে এসেছে এবং এখনো ৮০ লক্ষাধিক উদ্ভাস্তু পূর্ব বাংলায় অপেক্ষমাণ! এদের পুনর্বাসনের টাকা কে দেবে এ প্রশ্ন করার আগে আমরা ত' কখনো ভাবতে চাই না ৫৮ কোটি মানুষের মধ্যে এক কোটি মানুষের সংস্থান করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে কেন? অন্যান্য রাজ্যের কাছে হয়তো তারা অব্যাহত কিন্তু সে সকল রাজ্য এদের পুনর্বাসনের জন্য জমি দিতে প্রতিশ্রুত, সেই সব জমিকে ভারত সরকার কতটা ব্যবহার করতে পেরেছেন? খাস পশ্চিমবঙ্গে স্বাধীনতার প্রাক্কালে আবাদযোগ্য পতিত জমির পরিমাণ ছিল ১৮ লক্ষ ২৮ হাজার একর। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হিসাবে দেখা যায় ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত সরকার ৬২,১৩৪ একর জমি উদ্ধার করেছেন এবং ৩২ লক্ষ উদ্ভাস্তুর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু বাকী ১৬ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমির কি হলো? ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ১০ লক্ষ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে। অবশ্যই এই দশ লক্ষ একর জমি সবই অনাবাদী পতিত জমি নয়, এর মধ্যে বহু পরিমাণে আবাদী বেনাম জমি আছে। ধরা যাক, ৫ লক্ষ একর অনাবাদী জমি এর মধ্যে আছে। তাহলেও প্রশ্ন থাকে বাকী ১১ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমির খবর কি? আসল কথা হলো, আন্তরিক সদিচ্ছা না থাকলে কোন কিছই স্বেচ্ছাভাবে সম্পন্ন হতে পারে না।

উক্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উদ্ভাস্তুর রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে বলে মন্তব্য করে লেখা হয়েছে: On the other hand, failure to rehabilitate them and provide them with jobs will through them into the arms of the Naxalities and other extremists; and in another six to eighteen months from now the very authorities that are unmindfully holding the door open for every East Pakistan Hindu to migrate to India will be shooting down the same people as a 'law and order problem....'

যুক্তির দিক থেকে এটা নিঃসন্দেহে খুবই দুর্বল যুক্তি। ধরা যাক, পূর্ব বাংলার উদ্ভাস্তু আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাহলে ভারতের রাজনৈতিক উগ্রতা ও অস্থিরতা কমে যাবে বলে কি কেউ



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্মার্মে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

• একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

স্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

585-2/67

স্মৃতির কুঠার

শানস:রামচৌধুরী

তোমার যাওয়ার পর চার বছর কেটে গেল
চার বছর মানে কত দিনরাত্রি ঘণ্টা ও মিনিট সমবায়
আমার রক্তের মধ্যে ওঠাপড়া
উত্তীন বাজপাখি আর মরুভূমি ক্যারাবান অথবা বোয়িং

আমার রুমালে কতো অশ্রুপাতের মতো তোমার রক্তের
তিস্ত রেখা
বিদ্যুৎ চুড়িলির সাদা হাড় আর গগোদকে বিচ্ছিন্ন নভির
স্নেহভার ধুয়ে যায়, ধুয়ে যায় দীর্ঘনিবাসের ঘণ্টা বড়ে।

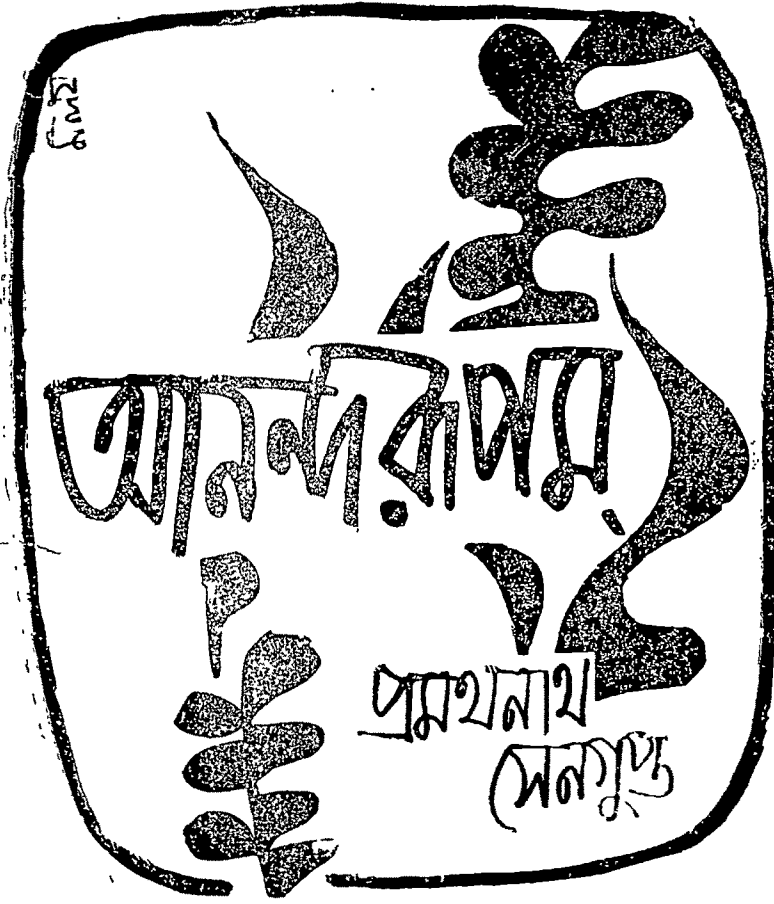
তবু কি গিয়েছে সব ঝড়ে উড়ে? ওই যে দীর্ঘল দৃষ্টিশিশু
আমার বৃকের পাশে হেসে খেলে জীবনকে সত্য বলে।
অথবা আগুন রঙ হাতে করে ওই মাতা তোমার
শিশুর স্বপ্নে মেশায় দিগন্ত
চার বছর কেটে যায় বয়ে যায় আমার আয়ুর ক্ষণিঃস্রোত
অনন্ত অরণ্য দেখি চোতমোঃ এখন শূন্য ওঠে পড়ে স্মৃতির কুঠার।

গ্যারান্টি দিতে পারেন? তা পারা সম্ভব নয়। কারণ এই অস্থিরতার উৎস অন্যত্র, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্ত নয়। পশ্চিম-বঙ্গের অনেক রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অঙ্গুহাতে পূর্ব বাংলা থেকে আগত উদ্ভাস্তদের গারে অস্বা কলঙ্কলেপন করা হয়েছে বহুবার—আজও হচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক উগ্রতা বা অস্থিরতা কি কেবল পশ্চিমবঙ্গেই আছে? অল্প প্রদেশের যে এলাকা উগ্র রাজনীতির পীঠস্থান—সেখানে ক'জন উদ্ভাস্ত আছে? মহারাজের শিবসেনা কি পূর্ব বাংলার উদ্ভাস্ত নিয়ে গঠিত? গুজরাটের সাম্প্র-দায়িক হাঙ্গামা কি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ব বাংলার উদ্ভাস্তরা গিয়ে বাধিয়েছিল? দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। চিন্তার সংশ্লিষ্টতার জন্য অনেকে দোষারোপ করে লাভ কী? অপরের দায়িত্বহীনতার প্রতি-কটাক্ষ করে নিজের দায়িত্ব স্থানান করা নির্বাসিতার পরিচায়ক। জুই উদ্ভাস্ত সমস্যার সকল দায়িত্ব যাঁরা পাকিস্তানের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান তাঁরা চিন্তার ক্ষেত্রে একটি গৌজামিল-প্রশ্ন দিতে চান। উপরোক্ত দৈনিক পত্রিকাটির ওই সম্পাদকীয় প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে কলকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তেও একই সররে লেখা হলোঃ কোনও দেশ, তা যত শক্তিশালী হোক, কখনও রাতারাতি লক্ষ-লক্ষ মানুষের জীবিকা এবং অগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারে না। নিঃশব্দ সে হাবা বহন সম্ভব নয়, বহনের প্রশ্নও ওঠে না। বিশেষত, তাহাদের সংস্কার যখন অজ্ঞাত। আজিকার দেড় লক্ষ যে আগামী-কাল দশ লক্ষ পেঁছাইবে না, সে নিশ্চয়তা কোথায়? তা ছাড়া মনে রাখা চাই, এই আগন্তুক দল অন্য আর একটি রাষ্ট্রের নাগরিক। নৈতিক দায়িত্ব ভারতের বটে,

কিন্তু উদ্ভাস্তদের ব্যাপারে পাকিস্তানের দায়িত্ব আরও অনেক বেশি।
হ্যাঁ, পাকিস্তানের দায়িত্ব কেউই অস্বীকার করতে পারে না। পাকিস্তানও আলোচনায় বসে কোনদিনই এই দায়িত্ব অস্বীকার করে নি। তাই 'নেহরু-লিয়ারকত' চুক্তিতে পাকিস্তান সই করেছিল; সই করেছিল তাসখন্দ চুক্তিতেও। কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করা আর তা পূরণ করা দুটি আলাদা জিনিস। তাই পাকিস্তান নীতি-গত দিক থেকে যদিও সংখ্যালঘদের দায়িত্ব অস্বীকার করে নি, কিন্তু কার্যত এই দায়িত্ব সে কখনোই পালন করে নি। তা যদি করতে তাহলে আজ ২৩ বছর পরেও এমন করে সংখ্যালঘু মানুষের দল ভারতবর্ষে পাড়ি জমাতো না। এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে উদ্ভাস্ত সমস্যার বিচার-বিশ্লেষণ না হলে আমাদের ভুল হবে। দুটো জিনিস আমাদের ভাবতে হবে; তা হলো সংখ্যালঘুরা পাকিস্তানে বাস করতে পারবে, কি পারবে না। প্রথমটির উত্তরে একটি দশ বছরের শিশুও বলবে, না পারবে না, কারণ পাকিস্তান ইসলামিক-রিপাবলিকে সে দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তারা সেখানে বাস করুক, এটা সে দেশের সরকার কখনো চায় না। তা যদি চাইতো তাহলে এই নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাস্ত-স্রোত অনেক কাল আগেই বন্ধ হয়ে যেতো। এ ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের সনদটুকু পর্যন্ত লঙ্ঘন করেছে। অতএব, পাকিস্তানের কাছ থেকে এ ব্যাপারে সহ-যোগিতা আশা করা বৃথা।

তাহলে আমাদের ধরে নিতে হচ্ছে, তাদের পক্ষে সে দেশে বাস করা সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্বাধীনতা-বঞ্চিত ওই কয়েক লক্ষ মানুষের দায়িত্ব

নৈতিক, রাজনৈতিক ও মানবিক মূল্য-মোখের দিক থেকে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণের ওপর কতাবে। এখন প্রশ্ন হলো—ভারত এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করবে? এ সম্পর্কে দুটি পথের কথা ভাবা যায়—(১) রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তার ওপর সহযোগিতার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং (২) নিজের দায়িত্ব ভারতের ৫৮ কোটি মানুষের মধ্যে এবে মানবিক মর্বাদা স্থাপন করা। প্রথমটি কতটা সার্থক হবে বলা শক্ত। কারণ চাপ সৃষ্টি করে সহযোগিতা আদায় করা যায় না। তা ছাড়া চুক্তিগত স্বাক্ষর করলে সেই চুক্তিকে কার্যে রূপান্তরিত করতে হবে—পাকিস্তানের রাজনৈতিক মতাদর্শ এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। এ প্রচেষ্টা সার্থক কিংবা আংশিক সার্থক হলে ভাল কথা, না হলে সমস্ত দায়িত্বই ভারতকে মাথা পেতে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেবল নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে চাপ ক'র বসে থাকা চলে না। দায়িত্ব যদি পালন করাই না যায় তাহলে কেবল মূল্য নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করা-না-করা সমান কথা। তাতে সমস্যার কোন হেরফের হয় না। এ এক ধরনের আত্মপ্রবণতা ও পলারনাই মনো-বৃত্তি। এ বোঝা বহনের প্রশ্ন ওঠে না বললে এই সত্যকে কি গোপন করা হয় যে, ভারত তার স্বাধীনতার জন্মলক্ষণ এই কয়েক লক্ষ সংখ্যালঘু মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভারতের সংবিধানের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ সেই প্রতিশ্রুতিরই তাৎপর্য বহন করে? জার্মানি, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ যদি কয়েক লক্ষ উদ্ভাস্তের সন্ধান পূরণের ব্যবস্থা করতে পারে, তবে ৫৮ কোটি মানুষের দেশ এই বিশাল ভারতবর্ষে কয়েক লক্ষ মানুষের স্থান হবে না কেন?



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

(১২)

এই প্রসঙ্গে তখন যাঁরা শান্তি-
নিকেতনে ছিলেন তাদের কয়েকজনের
কথা না বললে এই রচনা অসম্পূর্ণ
থেকে যাবে। প্রথমেই মনে পড়ে
ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র ও ইঞ্জিনিয়ার
কেশবচন্দ্র সেনকে, 'সেবক' নামেই
যিনি ওখানে সুপরিচিত। আশ্রমে
ইঞ্জিনিয়ারের কাজ ছাড়া তিনি পাঠ-
ভবনের কিছু ক্লাশও নিতেন। আমি
কাজে যোগ দেবার কয়েকদিন পরেই
তিনি এলেন, থাকতেন শিশুবিভাগের
পূর্বাঙ্গের একখানা ঘরে। বলিষ্ঠ,
দীর্ঘদেহী, খুব বুদ্ধিমান ও অক্লান্ত
পরিশ্রমী—খন্দর পরতেন সর্বদা, মনটাও
খন্দরের মতোই শক্ত, পরোপকার
করতে পারলে সदा প্রফুল্ল। এরূপ
দরদী বন্ধু বিরল। তবে মাঝে মাঝে
ওঁর দেশের খাঁটি মেজাজটি প্রকাশ
পেত, একবার 'না' বললে 'হাঁ' বলান
কার সাধ্য! পাঠভবনের ছেলে-মেয়েরা
ওঁকে খুব ভালোবাসতো, যখন যেখানে
'আউটিং'-এ যেত 'সেবকদা' ছাড়া তাদের

চলতো না। কী তাঁর উৎসাহ,
কী অসামান্য উদ্দীপনা! যাঁরা
দেখেন নি তাঁদের পক্ষে তা কল্পনা
করাও দৃঃসাধ্য। তখনকার দিনের
ইঞ্জিনিয়ার, অনেক জায়গা থেকে ভালো
ভালো চাকরির ডাক এসেছে, কিন্তু
শান্তিনিকেতনের আদর্শের সঙ্গে
নিজেকে এমনভাবে মিশিয়ে দিয়ে-
ছিলেন যে বাইরের বোঁশ মাইনের
চাকরির বা আর্থিক স্বচ্ছলতা বা পদ-
মর্যাদার কোনো মোহই তাঁকে শান্তি-
নিকেতনের কর্মকেন্দ্র থেকে বিচ্যুত
করতে পারে নি। একটা সেবায়
উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি শান্তিনিকেতনে
এসেছিলেন, ৩৫।৩৬ বছর পরেও তিনি
সেখানেই রয়ে গেছেন, 'সেবক' নামটা
তাঁর সত্যি সার্থক।

এর কিছুদিনের মধ্যেই শিক্ষাভবনে
বোতানীর অধ্যাপক হিসেবে যোগ
দিলেন পদ্মায় সেন, 'কিষ্টদা' নামেই
তিনি অধিক পরিচিত। তাঁকেও পাঠ-
ভবনে অনেক ক্লাশ নিতে হতো।
থাকতেন প্রথমে এক আশ্রমের সঙ্গে,
তারপর এলেন শিশুবিভাগে। অত্যন্ত

গোছালো স্বভাবের, একজন উদ্বল
কর্মী, সপ্তাহে কখনো কখনো চারশ
পিরিরড্ ক্লাশও নিয়েছেন। এ কথা
শুনে এখন অনেক অধ্যাপকই হয়তো
আবশ্বাসের হাসি হাসবেন, অতি-
শয়োক্তি অপরাধে আমাকে অভিযুক্ত
করতে স্বেচ্ছা করবেন না। ছেলে-
মেয়েদের এমন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে
ও আপন করে নিতে খুব কম
অধ্যাপককেই দেখেছি: 'কিষ্টদা'-
'সেবকদা' বলতে তখনকার ছেলে মেয়েরা
পাগল। শিশুবিভাগে যে সব ছেলে
চিঠি লিখতে পারত না তাদের অভি-
ভাবকের কাছে নিয়মিত চিঠি লেখার
কাজটা কিষ্টদাকেই করতে হতো।
ওঁদের অসুখ-বিসুখ করলে হাসপাতালে
নিয়মিত দেখাশোনাও ওঁর নিয়মিত
কাজ ছিল। পরম নিষ্ঠার সঙ্গে
অধ্যাপনাকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন
বলেই তিনি ছিলেন শিক্ষার্থীদের
অতিপ্রিয়, তার উপর অন্তরের উদারতায়
ও পরিপূর্ণতার সহজেই তিনি
শিক্ষার্থী সহ সকলেরই মন জয় করে-
ছিলেন। সदा প্রফুল্ল মুখ, কর্তব্যে
দৃঢ় এই নির্বিরোধী ও নিরহংকার
ভদ্রলোকটিকে ওখানে সবাই খুব
ভালোবাসতেন।

এর পর এলেন ক্ষিতীশ রায়,
সুধীর রায়, তারপর সুধীর গুপ্ত।
ক্ষিতীশ রায় ছিলেন বয়োজ্ঞানী,
সবাই ডাকতো 'বাণী' বলে। ইংরেজিতে
সদ্য এম-এ পাশ করা, শিক্ষাভবনে
ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ
দিলেন; ওঁকেও পাঠভবনে অনেক
ক্লাশ নিতে হতো। শ্রুত বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র নন, এক-
জন প্রতিভাশালী লেখক, যেমন
সুন্দর ইংরেজি লিখতেন তেমন
লিখতেন বাংলা; বিশেষ করে
তাঁর ছোট কবিতা ও গল্প
ছেলে-মেয়েদের খুবই প্রিয় ছিল।
সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা, বুদ্ধিমান
উজ্জ্বল মুখ, স্বভাবে একেবারে
ছেলেমানুষ, তাই সবারই প্রিয় এই
প্রিয়দর্শন যুবকটি। কোথাও কোনো
'পক্‌নিক্' বা 'আউটিং' হলে ছেলে-
মেয়েদের ক্ষিতীশদাকে চাই-নানা
রকমের নানা ছন্দের ইংরেজি, বাংলা
গান-কবিতা ও খেলার প্রবর্তন করে
সহজ সরল আনন্দে আসর সজ্জায়
করে রাখতেন। তাঁর 'London
Burning' গানের খেলাটা আজও কানে
লেগে রয়েছে। অফুরন্ত প্রাণশক্তির
প্রাচুর্যে তিনি ছিলেন ভরপূর; হয়তো
ছেলেমানুষি স্বভাবের জন্যই বা অন্য
কী কারণে ঠিক জানি না ওঁর সংস্পর্শে
যাঁরা এসেছেন তাঁরা ওঁর প্রতি আকৃষ্ট
হয়েছেন, ওঁকে ভালোবেসেছেন।

সুধীর রায় ও সুধীর গুপ্ত জুজুনেই ইতিহাসের অধ্যাপক। সুধীর রায় অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির, ছোটখাটো মানুষ্যটি। পড়াশুনো নিয়ে সদা মগ্ন, তবে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ‘আউটিং’-এ যাওয়া চাই-ই। একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ্য, কিন্তু সুরাসিক, লোকচরিত্র অনুধাবন করার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, আর প্রত্যেকের জড়িমার নকল করতে পারতেন অনায়াসে। আপনভোলা মানুষ্য, কখন কোন ক্লাশ, কবে কখন কোথায় কোন মিটিং যেমালুম ভুলে যেতেন। প্রায়ই চশমা টেবিলে ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়তেন, পথ চলতে চলতে হোঁচট খেলেই বলতেন, “আজ রাস্তাটা এতো খারাপ কেন? এতো গতই বা এলো কী করে?” তারপরই হঠাৎ আবিষ্কার করতেন চোখে চশমা নেই, বলতেন ‘দেখেছো, চশমাটা ভুল করে ফেলে এসেছি, তাই চলাফেরার একটু অসুবিধা হচ্ছে।’ ঘন লোমশ শরীর, তাই সর্বদা জামা পরে থাকতেন; শুনোছি ঢাকায় যখন ছিলেন একদিন কার অর্জিত ডাকে অসতর্ক মুহুর্তে খালি গায়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এক ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ানের সামনে পড়লেন। গাড়োয়ান গুর দিকে তাকিয়েই নাকি বলে উঠল, “এইটা কী করছেন কর্তা! আর জামা কিনোনের দরকার তইব না, হামনে (সামনে) কয়টা বড়াম লাগাইয়া দইলেই অইব।” একবার অধ্যাপক-মণ্ডলীর জরুরী মিটিং-এ উনি এলেন মিটিং যখন শেষ হয়ে গেছে তখন, দরবিনয়ে বললেন, “মিটিং-এর সময়টা ও খানটা ভুলে গিয়েছিলাম।” অধ্যাপক মহাশয় গুকে একটি ডায়েরী উপহার দিয়ে বললেন, “এতে সব এন-গেজমেন্টের সময় ও স্থান লিখে রাখলে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।” এর কিছুদিন পরেই আর এক মিটিং-এ আবার বিপর্যয়; বললেন, “ডায়েরীটা দেখতেই ভুলে গিয়েছিলাম, এক অধ্যাপকের কাছে খবর পেয়ে মিটিং-এ এলাম।”

সুধীর গুপ্তের দীর্ঘদেহী ব্যায়ামপুষ্ঠ সুগঠিত শরীর। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ক্রীড়া ছাত্র, প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণী, সম্ভবত প্রথম স্থানই অধিকার করে এসেছেন। শুনোছি বেঙ্গল মিডিল সার্ভিসেস-এর প্রাতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন খুব উচ্চস্থান অধিকার করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ক্রীড়ার জন্য চাকরিতে নিযুক্ত হতে

পারেন নি। যেমন ছিলেন লেখাপড়ার ভালো খেলাধুলাতেও তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা খেলোয়াড়, অর্থাৎ সেখানেও প্রথম শ্রেণী। লেখাপড়া ও খেলাধুলা এই দুটি গুণের এমন একটা অপূর্ব সমন্বয় ছিল গুর মধ্যে যা বড়ো একটা দেখা যায় না। কঠিন মানুষ্য, নিয়ম ও শৃংখলা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা সে ক্লাশের মধ্যেই হোক বা খেলার মাঠেই হোক। এর জন্যে অনেকে এই ভুল্লোককে অনেক সময় ভুল বুঝেছেন।

নিতাইবিনোদ গোস্বামী, ‘গোসাইজী’ নামেই ওখানে সবাই জানেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। পণ্ডিত-মশাই বলতে তখনকার দিনে ছাত্রমহলে শিখাধারী, রত্নরোষে প্রদীপ্ত, ছাত্র-প্রপীড়ক বলে যিনি সদা শিশুমনে ভীতির সঞ্চার করতেন গোসাইজী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও ‘ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিপরীত। এমন অমায়িক সদাপ্রফুল্ল, মধুরস্বভাব, প্রতিভাধর মানুষ্য অত্যন্ত বিরল। নিজ চরিত্রের গুণেই তিনি সবাইকে আপন করে নিয়েছিলেন: কী শিক্ষার্থী, কী অধ্যাপক, কী কর্মী, তা তাঁরা যে কোনো স্তরেরই হোন, গুকে ভালোবাসতেন। ধীর, স্থির, স্বল্পভাষী, বিপদে অবিচলিত এই নিরীভমান মানুষ্যটিকে সবাই অপরিচীত প্রশ্রা করতেন। যোদিন তাঁর একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর তরুণ বয়সে মেরিনজাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলো সোবিনের কথা ভুলবার নয়—মৃত ছেলের শয্যাপার্শ্বে বসে আছেন সুমিহীন বেদনায় পাষাণে রূপান্তরিত গোসাইজী, চোখে জল নেই। হঠাৎ সেই পাষাণের বুক ফেটে বেরিয়ে এলো এই কথা, “মহাভারতে লেখা আছে এক পুত্রঃ অপুত্রকঃ, আমার জীবনে যে এই ধর্মবাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যে আমি অকরুণ অভিঘাত এসে পড়বে তা কোনোদিন ভাবি নি।”

তেজেশচন্দ্র সেন ছিলেন পাঠভবনের অধ্যাপক—প্রকৃতি-পরিচয়, গাছ পালা, পশু-পাখী, পোকা-মাকড় এ সব বিষয়েই তিনি শিশুদের শিক্ষা দিতেন। ছোটখাটো গোলগাল চেহারা, সবাই বলতেন ‘গোলবাবু’, থাকতেন মন্দিরের পূর্বদিকে একটি উঁচু তালগাছকে কেন্দ্র করে তৈরি করা একটি গোলাকার খড়ের ঘরে। পরীক্ষার-পরীক্ষার রাসিক মানুষ্যটি, অবিবাহিত, নিজের রান্না করে খেতেন; কেউ গুর বাড়িতে এলে নিজের হাতে চা করে খাওয়াতেন। তিনি ছিলেন চায়ের একজন পন্থ

উপাসক, শান্তিনিকেতন ‘চা-চক্রে’ নিয়মিত উপস্থিতশীল সদস্যের মধ্যে ছিলেন তিনি ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। ‘গোলবাবু’ আগ্রমে আছেন অথচ চা-চক্রে অনুপস্থিত এমন দুর্ঘটনা কোনোদিন ঘটেছে বলে তো শুনিনি। এতো বয়েস অবধি অবিবাহিত, কেউ যদি বলতেন ‘তেজেশবাবু, এবার একটা বিয়ে করুন, কতকাল আর স্বপাক খেয়ে একা একা কাটাবেন?’ সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মগাম্ভীর্যের আড়ালে পরিহাস-তরল কণ্ঠে বলে উঠতেন, “মশায়, চেষ্টার মর্দুটি করি নি, কিন্তু পাত্রী জুটলো না, আমি যাকে পছন্দ করি তিনি করেন আমাকে অপছন্দ, এভাবেই তো এতদিন চলেছে। দিন না একটি মনোমত সুস্থ চাকুরে-পাত্রী জুটুক—যিনি বয়সের অসমতায় ক্ষুধ না হয়ে হাসিমুখে স্বামীসেবা করবেন। তা হলে তো শেষের দিনগুলি পরমানন্দে স্ত্রীর রোজগারে বসে বসে খেতে পারি। সত্যি বলছি, দিন না একটি সুপাত্রী জুটুক!”

প্রভাতকুমার মদুখোপাধ্যায় ছিলেন বিশ্বভারতীর ‘গ্রন্থাগারিক’, আর সহ-গ্রন্থাগারিক ছিলেন সত্যচরণ মদুখোপাধ্যায়। প্রভাতবাবু বেশ ফসারিঙের সুন্দর চেহারার মানুষ্য, দীর্ঘদেহী, দাঁড়ি গুরুদেবের দাড়ির মতো করে রাখার প্রচেষ্টায় যত্নবান। অধ্যাপনাও করতেন, সুনাম ছিল বেশ। গ্রন্থাগারিক হিসেবে ভারতের সর্বত্র তাঁর খ্যাতি। দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল প্রভূত। নতুন বই এলে সমস্ত পড়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অননুক্রমণীয় পদ্ধতিতে এ বইয়ের ‘রিভিউ’ করে লাইব্রেরীর বারান্দায় টাঙিয়ে দিতেন, উদ্দেশ্য সহজেই তা অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি যাতে আকর্ষণ করে। বিশ্বভারতীর সব গ্রন্থের মদ্রণ ও প্রকাশনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, ‘বুক অব নলেজ’ বা ‘শিশু-ভারতীর মতো ‘জ্ঞান-ভারতী’ নামে একখানা বড়ো গ্রন্থ লিখেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমী, সদা কাজে ব্যস্ত মানুষ্যটি, কিন্তু সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত।

সত্যচরণবাবু ছিলেন অতি অমায়িক মানুষ্য; দীর্ঘদেহী, মূখে হাসি লেগেই আছে। অধ্যাপকই হোন আর ছাত্রই হোন, গুর কাছে ব্যবহারের এতটুকু পার্থক্য নেই। কোন বই কোন ‘সেলফে’ আছে তা ছিল গুর নখদর্পণে, বইয়ের নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বলে দিতেন ‘অত নং ব্ল্যাক্’ ও ‘অত নং স্বেল্ফ্’

সাপ্তাহিক বসুমতী

ধা অত নং আলমারি দেখুন।' কোনো-দিন ভুল হতে দেখিনি।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, 'হাইদ্র' মদ্রুজেন্দ' বলেই সুপরিচিত, পাঠ-ভবনের গণিতের অধ্যাপক। সুন্দর ফুটবল খেলতেন, শান্তিনিকেতন ফুটবল টিমের একটি স্তম্ভ বললেও অত্যুষ্টি হবে না। উনি ছিলেন 'ছাত্রপরিচালক', পাঠভবনের আবাসিক ছেলেদের সম্পর্ক ভার ছিল ঠুর উপর। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তিনি প্রাক্তন ছাত্র, পরবর্তীকালে উচ্চতর শিক্ষা শেষ করে সেখানেই অধ্যাপনার কাজে যোগ দিলেন। 'শ্রীমন্ত্র কুটির', যেখানে তখন ছিল পাঠভবনের 'ডিমটরী', তারই সংলগ্ন একটি ঘরে থাকতেন, সব সময় ছেলেদের চোখে-চোখে রাখতেন, ওদের ভালোবাসতেন খুব, ছেলেরাও ঠুকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু কেউ 'ডিসিপ্লিন' ভাঙলেই মনে করতেন ঠুরই পীরদর্শনের কোনো হুটিতে তা ঘটেছে, অর্থাৎ ছাত্রপরিচালক হওয়ার যোগ্যতা ঠুর নেই! কতদিন 'তনয়দা' ও ডঃ সেনকে বলেছেন এ কঠিন কাজের তিনি অনুপযুক্ত, তাঁকে এ দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে। কিন্তু যিনি ছাত্রের অশালীন ব্যবহারের জন্য 'নিজেকে দায়ী' মনে করেন তাঁর মতো একজন আদর্শ শিক্ষককে তো এই গুরুভার থেকে মুক্তি দেওয়া যায় না। তাই ছাত্রপরিচালকের নির্দিষ্ট কার্যকাল অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি এ কাজ থেকে মুক্তি পান নি। ছেলেরা সবাই ডাকতো 'বিশ্বনাথদা', ঠুর চার-পাঁচ বছরের ছেলে 'শিশির' একবার এলো ওখানে, এসে দু-একদিনের মধ্যেই 'বিশ্বনাথদা বাবা' বলতে শুরু করলো। শান্তিনিকেতনকে খুবই ভালোবাসতেন, তাই অবসর গ্রহণ করেও তিনি ওখানেই আছেন।

সরোজরঞ্জন চৌধুরী ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র, 'স্বচ্ছন্দ্যপ্রম' সময়কার, যতদূর জানি সুপ্রসিদ্ধ কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও 'বিশ্বভারতী'র প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুধীররঞ্জন দাশ মহাশয়ের সমসাময়িক। 'সরোজদার' মতো বৃন্দ-বৎসল, 'ধীর-স্থির-শান্ত' ও অমায়িক মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। 'ছাত্র-জীবনে নামজাদা ক্রীড়ারিদ ছিলেন, আলমারি ভরতি সযত্নে রক্ষিত 'কাপ, মেডেল' তার সাক্ষী। 'শান্তিনিকেতন ফুটবল টিমের' তিনি ও বীরেন্দ্রা ছিলেন নামকরা 'ব্যাক', অনেক বলতেন 'দুর্ভেদ্য' 'চীনের দেয়াল'। বীরেন্দ্রা পীরহাস করতেন 'জীবনে অনেক পীঠ-মহারপীঠ দেখেছি কিন্তু সরোজদাপীঠের মতো এতো বড়ো পীঠ-

স্থান' আর দেখিনি, কতো অব্যর্থ গোল যে এই পিঠে প্রতিহত হয়ে ফিরে এসেছে তা বলা কঠিন।' সরোজদা ছিলেন উদার ও মহৎচরিত্রের মানুষ, কারো সঙ্গেই তাঁর কোনো বিরোধ ছিল না। কতো ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে ঠুর জীবনে, বিশেষ করে জীবনসীমার শেষের দিকে, কিন্তু একদিনের জন্যও মূখের স্নিগ্ধ হাসিটি মলিন হতে দেখে নি। কোনো অবস্থা, তা সে যতো প্রতিকূলই হোক না কেন, এই সহজ সরল মানুষটির ভারসাম্য কখনো ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। তখনকার দিনে শান্তিনিকেতনে যারা ছিলেন সরোজদার চীনেভাষায় বক্তৃতার কথা আঞ্জ ও ভোলেন নি। চমৎকার অভিনয়প্রতিভা ছিল ঠুর, পরশুরাম বিরচিত 'বিরিগুণাবা' নাটকে ঠুর-নিবারণের ভূমিকায় ও 'শচীন' ডাক্তারের স্রেদম খাঁর ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় শান্তিনিকেতনে অমর হয়ে আছে। একবার 'বর্ষামঙ্গল' অভিনয়ের পর অধ্যাপক ও কর্মসূচী 'ভরসামঙ্গল' নামে একটি নতুন নাটক মণ্ডস্থ করেন সিংহসদনে। স্বয়ং গুরুদেব এলেন সেই নাটক দেখতে। সরোজদা চীনেভাষার রূপসজ্জা করে 'চীনেভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করে গেলেন, চীনাভবনের প্রফেসার 'তান্ য়ন্ সান্' এ বক্তৃতা শ্রবণে শ্রবণে অনুধাবন করার ভাঙতে ঘন ঘন মাথা নাড়তে শুরু করলেন। সবাই বলাবলি করছেন, সরোজদা এতো অস্পষ্টদিনের মধ্যে এমন সুন্দর চীনেভাষা কার কাছে শিখলেন! শাস্ত্রী মশায় চীনেভাষায় সুপরিচিত, বললেন 'সরোজের বক্তৃতার কিছুই বন্ধুতে পারলাম না।' প্রফেসার 'তান্ য়ন্ সান্' ও স্বীকার করলেন এই বক্তৃতার কিছুই অনুধাবন না করতে পেরে তিনি ঘন ঘন মাথা নাড়ছিলেন। এমন কি গুরুদেবও সরোজদাকে ডেকে বললেন, 'হারে সরোজ, তুই চীনেভাষা

শিখলি কার কাছে?' তখন সরোজদা বললেন, ওটা মোটেই চীনেভাষা নয়, তবে কিছুদিন আগে চীনের রাষ্ট্রনায়ক মার্শাল 'চিয়াং কাইশেক' আম্রকুঞ্জে অভ্যর্থনা সভায় চীনেভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে উদ্ভূত হয়ে তারই অনুকরণে চীনেভাষায় চীনে দোকানের নামগদলি তিনি পর পর বলে গেছেন।

শচীনন্দনাথ মুখোপাধ্যায় এলেন শান্তিনিকেতনের ডাক্তার হয়ে, সবাই বলতো 'ডাক্তারবাবু'। ডাক্তারের মধ্যে যে এমন একটি কোমল হৃদয়ের মানুষ অধিষ্ঠিত থাকতে পারে তা এই শচীন ডাক্তারকে দেখার আগে জানা ছিল না। উচ্চতম ডাক্তারী খেতাব না থাকলেও চিকিৎসক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই দক্ষ, আর এমন একটা অন্তর্দৃষ্টি ঠুর ছিল যে মামুলী নাড়িপরীক্ষা ও স্টেথোস্কোপ দিয়ে বন্ধ-পিঠ পরীক্ষার পরই ঠিক রোগটিকে আবিষ্কার করে ফেলতেন। তাই বিধিমতো ঔষধ প্রয়োগে রোগ সারতে বেরী হতো না। রোগের প্রকোপ বেশি হলে রোগীর পাশে সারা রাত বসে থেকে নিজ হাতে তার শূদ্রাশ্রাও করতেন। শান্তিনিকেতনে কারো বাড়িতে অসুস্থের খবর পেলে গিয়ে যাকে সর্বপ্রথমে দেখা যেত তিনি হলেন 'শচীন ডাক্তার'। রোগের যত্নগায় রোগী ছটফট করছে, তার কণ্ঠে ঠুরই চোখ দিয়ে জল পড়তে দেখেছি। গোসাইজীর একমাত্র ছেলে বীরু যেদিন শেরানিবাস ত্যাগ করলো, গোসাইজী গভীর শোকে স্তম্ভ, কিন্তু শচীন ডাক্তারের মে কী কামা! মনে হলো যেন ঠুরই পুত্রবিরোগ ঘটেছে। আরো একটা দিনের কথা মনে পড়ছে। উত্তরায়ণের বাগানে মালী ছিল নলিন, তার ছেলে 'গোবিন্দ' আমার কাছে কাজ করতো। গোবিন্দকে আমার স্ত্রী ছেলের মতো স্নেহ করতেন, গোবিন্দও ঠুকে 'মা' বলে ডাকতো; সুন্দর পাগোছল

অষ্টম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

প্রাথমিক-আশ্রিত, ১৩৭৭

রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা

সম্পাদক

রমেশচন্দ্রনাথ তালুক

লেখকসমূহ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (টিটিপত্র), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (উর্নিবংশ ও 'বংশ শতাব্দীর' যুক্তিবাদ), রমা চৌধুরী (ভাস্করের 'উপাধিক-ভেদভেদবাদ'), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা), ক্ষেত্র গুপ্ত (বৈষ্ণব-উপদ্যাসের শিল্পরীতি ও 'দুর্গেশনন্দিনী'), শিবপদ চক্রবর্তী (রোসেলের নৈতিকচিন্তা), লুৎফুল হক (বাংলা 'গদ্যের' আদিকথা এবং 'অক্ষয়-ঈশ্বর'), শ্রীকৃষ্ণলাল দাশ (সাহিত্য স্টাইল), অজিতকুমার ঘোষ, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, উমা সায় ও রমেশচন্দ্রনাথ তালুক (গ্রন্থসমালোচনা)।

চিহ্নসূচী: 'গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (আশ্রিত-প্রদীপ)। প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।

ঐতিমাসিক সাহিত্যপত্র :

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৪

৬৯৪ স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর জেন, কলিকাতা-৭

মাধ্যমিক বসন্ত

ছেলোটি, এসে ১৫/১৬ বছর। হঠাৎ একদিন গোবিন্দ নিদারুণ নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হলো; খবর পেয়ে বিকেলে ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি শচীন ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করছেন। গোবিন্দ তখন প্রলাপ বকেছে ‘আমার মার কাছে নিয়ে চলো, আমি এখন থাকব না’। ওর মা বললেন, “কাল থেকে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে—মা, মা তুমি কোথায়? আমি কাছে গিয়ে বলি—এই যে বাবা আমি।” সঙ্গে সঙ্গে ধমকে ওঠে, “তুমি আমার মা নও, আমার মাকে নিয়ে এসো।” বললাম, ‘কাল সকালে নিয়ে আসব।’ ভোরেই খবর এলো, শেষরাতের দিকে গোবিন্দ মারা গেছে। গিয়ে দেখি মৃত ছেলেকে সামনে রেখে স্তম্ভ হয়ে বসে আছে নলিন ও তার স্ত্রী। আমাদের দেখেই গোবিন্দের মা বললেন, “মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও প্রলাপ বকেছে—আমার মা এখনও এলো না? ও আমাদের কেউ নয়, আপনাদেরই ছেলে, ওর শেষ কাজ আপনাদেরই করতে হবে, আমরা করলে ওর আত্মার শান্তি হবে না।” শচীন ডাক্তার এলেন ‘ডেথ সার্টিফিকেট’ লিখে দিতে; শূন্যলিঙ্গ দরপূর রাত থেকে শেষরাত পর্যন্ত গোবিন্দের পাশেই তিনি ছিলেন, আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এই তরুণ জীবনটিকে রক্ষা করতে। কিন্তু তাঁর একান্তিক চেষ্টাকে ব্যর্থ করে একটি নিষ্পাপ প্রাণ চলে গেল। ‘ডেথ সার্টিফিকেট’ লিখে দিতে ডাক্তার একেবারে ভেঙে পড়লেন, সে কী কান্না, মনে হলো যেন ওঁরই পুত্রবিরোগ ঘটেছে।

ডাক্তারী ছাড়া গান-বাজনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও শচীন ডাক্তার ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। একবার একটা গানের আসরে উপস্থিত ছিলাম, সমঝদার হিসেবে নয়, কারণ সুর ও তালের সঙ্গে আমার চির-বিরোধের কথা ওখানে সুবিদিত; তাই এই রস পরিবেশনের আসরে একজন ‘অসুরের’ অনধিকার উপস্থিতি সঙ্গীতরস-সুধা পান করার জন্য নয়। জলসা শেষে দক্ষিণহস্তের ব্যাপারে যে-বিপুল আয়োজনের ব্যবস্থা হয়েছিল তাতে ভোজনব্যয়ের সঙ্গীত করার জন্যই এই অরসিকের আমন্ত্রণ, কারণ সুর-রসিক না হলেও খাদ্য-রসিক হিসেবে বেশ একটু খ্যাতি ছিল। দেহের আয়তনের তুলনায় খাদ্যসম্ভার যে-পরিমাণে জঠরস্থ করতাম তার বিপুল অসংগতি দেখে অনেকেই বিস্মিত হতেন। ‘সেবক’ তো একদিন বলেই ফেললেন যে, আমার দেহটা নাকি ‘বালিশের খোলস’ মতো আগাগোড়া ফাঁপা, এমন কি হাড়-গুলিও, তা না হলে এতো দ্রব্য এই ক্ষুদ্র জঠরে স্থান পায় কী করে! যাক, যা বলছিলাম, সঙ্গীতের জলসায় বসে আছি অন্তবাসী হয়ে, হয়তো বা সঙ্গীতসাধনার ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ বর্জিত হওয়ার জন্য

মনে মনে অদৃষ্টকেই দিকার দিচ্ছি, হঠাৎ শচীন ডাক্তার পাশে এসে বসলেন। হেমেন্দা (হেমেন্দ্রলাল রায়, সঙ্গীতভবনের তদানীন্তন অধ্যক্ষ) একটি সুন্দর সুর বাজিয়ে তারের যন্ত্রটি রেখে দিলেন, চারদিক থেকে “সাধু, সাধু” ধবনি উঠলো। হঠাৎ সর্বস্বময়ে আবিস্কার করলাম শচীন ডাক্তার ঐ যন্ত্রটাকে কাছে টেনে আনছেন। বলে উঠলাম, ‘এই ডাক্তার! কী ছেলেমানুষী হচ্ছে!’ হেমেন্দার অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ডাক্তার এমনি আভূত সে, আমার কথা হয় ওঁর কানে গেল না, আর না হয়তো আমার নিবেদনবাণী সম্পূর্ণ অগ্ৰাহ্য করলেন। যন্ত্রটা এনেই এমন একটি সুন্দর সুর তাতে বাজালেন যে, উপস্থিত সবাই স্তম্ভ বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইলেন। হেমেন্দা বললেন, “এ যে দেখছি ‘বর্ণচোরা আঁব’, এতদিন নিজেকে প্রকাশ করেন নি কেন? গলায়ও নিশ্চয় সুর আছে, একখানা গান এবার নিবেদন করুন এই সুধী-সমাজে।” পর পর কয়েকখানা গান গাইলেন ডাক্তার, চারদিক থেকে ‘সাধু, সাধু’ ধবনি। বললেন, ছেলেবেলায় শচীনকর্তার (প্রখ্যাত সঙ্গীত-চার্য শচীন দেববর্মণ) শিষ্য ছিলেন, অনেক সুরই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া। ‘ভরসা-মঙ্গল’ স্লেদম খাঁর রূপসম্ভার লুপ্তি পরে হাতে থালাভর্তি ফুল নিয়ে অপরূপ জীলায়িত ছন্দে নৃত্য করতে করতে গুরুদেবের সামনেই পরিবেশন করলেন তাঁরই রচিত গান “বাকি আমি রাখব না কিছুই.....।” গুরুদেব মুগ্ধবিস্ময়ে ওঁর এই নৃত্যগীত দেখে বললেন, “ওহে ডাক্তার, বাকি তো কিছুই রাখলে না দেখছি। এখন আবার এই সুরে আমাকে আর একটা গান লিখতে হবে। এটা স্লেদম খাঁর সঙ্গেই যুক্ত হয়ে থাক, বীরশিবাবা থাকলে হয়তো বলতেন, ‘স্লেদম খাঁর জন্যই এই গানটা আমি ‘রবিক’ দিয়ে রচনা করিয়েছিলাম, ‘রবির’ কবিতা ও গান লেখার হাতেখড়ি তো আমারই কাছে কিনা।” এই ‘ভরসা-মঙ্গল’ অভিনয় দেখে গুরুদেব এতো খুশি হয়েছিলেন যে, ‘তারক ধর-সুরেন করের’ মঞ্চে বেসরো গান শুনলে একটা গান লিখে উপহার দিলেন। এতদিন পরে গানের সবটা মনে নেই, তার শব্দ হলো “ওরে ও ভাই গাইয়ে, মোদের পাড়ার খোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে.....ইত্যাদি”, পুরো গান ও তার স্বরলিপি শৈলজাবাবুর কাছে ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব, শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অনেক বছর যুক্ত ছিলেন। মনে আছে আশ্রমের যখন ঘোর দুর্দিন, নিদারুণ অর্থসংকট, তখন তিনি দিল্লীতে ভারত সরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি অর্থমন্ত্রকের কাছ থেকে

বিশ্বভারতীর জন্য পঁচিশ হাজার টাকার সত্ৰহীন বাৎসরিক অনুদান মঞ্জুর করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর ও তাঁর সুযোগ্য পত্নী রেণুকা রায়ের যোগসূত্র ছিল অন্তত গভীর। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এঁদের সম্মিলিত দান অপারিসম, লোক-চক্ষুর অন্তরালে কাজ করেছেন নিজেদের প্রচ্ছন্ন রেখে, তাই তাদের এই অপারামিত মহান দানের ইতিহাস অনেকেই অজ্ঞাত। তাঁরা দুজনেই ছিলেন বিশ্বভারতীর সংসদ সদস্য, শব্দ যে জরুরী কাজের জন্যই শান্তিনিকেতন আসতেন তা নয়, প্রায় প্রতিটি উৎসবেই উপস্থিত হতেন বাইরের সব কাজ বন্ধ রেখে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কৃতী ছাত্র ও আই-সি-এস; ভারতবর্ষের যেখানেই তিনি কাজ করেছেন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে এসেছেন। অত্যন্ত সুরাসিক ছিলেন, সবলের সঙ্গে সমানভাবে মিশতেন, আই-সি-এসী মেজাজ বা আভিজাত্য বলতে যা আমাদের ধারণা কখনো তাঁর মধ্যে তা দেখি নি। যখনই দেখা হতো নানা বিষয়ে গল্প করতেন, তাঁর শিকারের গল্প, নানা ধরনের যে সব লোকের সংস্পর্শে এসেছেন তাদের কথা, এক অপরূপ ও অনন্যকরণীয় টীকা-টিপ্পনী সহযোগে পরিবেশন করতেন।

ডঃ সুধীরজ্ঞান দাশ, শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র। ‘গোটা মানুষ’ বলতে গুরুদেব যা বোঝাতে চেয়েছেন ‘সুধীদার’ মধ্যে তার অনেকখানি খুঁজে পাওয়া যায়। একজন প্রখ্যাত আইনবিদ, ব্যারিস্টার ও জজ হিসেবে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম-কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেছেন। শান্তিনিকেতনেব আদর্শে উদ্ভূত শান্ত, ধীর, স্থির, অমায়িক মানুষটি। প্রথম পরিচয় হয়েছিল সরোজদার বাড়িতে ৭ই পৌষের উৎসব উপলক্ষে ১৯৩৩ সনে। প্রথম দিনের পরিচয়েই মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন এই সৌম্য স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, ধাজ্জ দীর্ঘদেহী মানুষটি তাঁর শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল ব্যবহারে। প্রায় প্রতিটি পৌষ উৎসবেই সুধীদা শান্তিনিকেতন আসতেন। একটা কথা মনে পড়ে গেল, একদিন হাওড়া স্টেশনে গিয়েছিলাম একদল শিক্ষাবিদকে অভ্যর্থনার জন্য, দিল্লী থেকে আসবেন ওঁরা, ট্রেন ঘণ্টাখানেক ‘লেট’। অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই, হঠাৎ দেখি আর একটা গাড়ি প্রাটফরমে দাঁড়ানো, তারই একটি প্রথম শ্রেণীর কামরাকে ফিৎ বেস ভিড়, পদলিঙ্গ জনতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যস্ত। ভিড়, জনতা ও পদলিঙ্গ এই গ্রাহস্পর্শকে চিরদিন এড়িয়ে গেছি, সোঁদনও তাই কোন ব্যতিক্রম হয় নি। ভিড় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতেই একজন পদলিঙ্গ অফিসার

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

আমার পথরোধ করে দাঁড়ালেন, বললেন, "You are under arrest, please follow me." অপরিচিত এই

আফসারটি আমার পরমাত্মীয় নন যে ঠাট্টা করবেন, ভাবলাম কোথাও একটু ভুল হয়েছে। তাকে অনুসরণ করে এসে পৌঁছলাম সেই পল্লিশ-জনতা-ঘেবা প্রথম গ্রেপারি কামরার দরজায়। ভিতর থেকে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে ডাক এলো "আয়, আমার কাছে।" তাকিয়ে দেখি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ও বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বসে আছেন সুধীদা, হাত ধরে টেনে ঠাঁই পাগে বাসিয়ে সহাস্যে বললেন, "তোকে দরজার ডাকলাম, এলি না দেখে আমার এক বন্ধুকে পদ্মঠায়ে ধরে আনলাম।" পরিহাস করে বললেন, "জানিস, ভারতের শাসনতন্ত্রে মর্বাদার তালিকায় যার স্থান বেশ উচ্চ, তাকেই অগ্রাহ্য করে চলে যাবি এ তো হতে পারে না, তাই গ্রেপ্তার করে আনতে হলো। এবার বোস, অনেকদিন দেখা হয় না, কিছু গল্প করি, সময়টা কাটবে ভালো।" ঠাঁই সংসর্গে যাঁরা এসেছেন তাঁরা জানেন উনি কী রকম রসিক মানদ্য—কথায় কথায় ঠাঁই এক বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা সুধী, ডিফেন্স সার্ভিসে তোমার যে ছেলটি কাজ করে তার নাম কী?" সুধীদা জবাব দিলেন, "আমারই নাম, শুধু 'ধীটু' বাদ দিয়ে।" সবাই হেসে উঠলেন, বললাম, "তোমার নামের 'ধী' শব্দটি বাদ দিয়ে, না তোমার 'ধীটু' বাদ দিয়ে।" বললেন, "দেখ, জেরা করার অধিকার আমার তোর নহ, যা তোদের ইচ্ছে ধরে নে। দেখাছিস না তোদের বোর্ড রয়েছেন, কিছু একটা বলে মন্স্ট্রকে গড়ি আর কি!" সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর সুধীদা বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদ গ্রহণ করেন, বিনা বেতনে। খুব দক্ষতর সঙ্গে ছয় বছর এই মহৎ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

এই প্রসঙ্গে শান্তিনিকেতনের কয়েকজন মহিলার কথাও বলে রাখি। প্রথমেই মনে পড়বে বীরেন্দ্রার মার, কথা—এমন রহস্যশীলা, নিরহরকার, অতিথিসেবাপরায়ণ ও গুরুকর্মনিপুণা মহিলা খুবই বিরল। প্রতিটি বাড়ি গিয়ে তাদের কুশল সংবাদ নেওয়া ও আপদে-বিপদে সাহায্য করা ছিল ঠাঁই চারতর একটি মহান বৈশিষ্ট্য। শান্তিনিকেতন যেন এক বৃহৎ যৌথপরিবার, এক প্রোগ্রেশিভ নৈসর্গিক, এখানে সবাই একই উদ্দেশ্যনিষ্ঠে সমবেত হয়ে এক সংগঠিত—এই সত্তা ঠাঁইর কাজের গম্বিদিয়েই প্রথম সঙ্গপট্ট হয়। ঠাঁইর সঙ্গেই মনে পড়ে আমসীতার কথা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথিতযশা নীলিমাসেনের মত, বাদিও, তিনি ওখানে গিয়েছিলেন অনেক পরে। বিদ্যুৎ মহিলা, শ্রমোপকারী, লেখশীলা; কীভাবে কার কী

সাহায্য করবেন তাই ছিল ঠাঁইর মস্ত সমস্যা। এই সঙ্গে আরো দুজন মহিলার কথা মনে পড়ে—বীরেন্দ্রার স্ত্রী কমলা সেন ও ডঃ সেনের স্ত্রী পারুল সেন, এককম শান্ত, ধীর, স্থির, নিরাভমান, সেবাপরায়ণা ও নিবিরোধী মহিলা খুবই বিরল।

ঠানদি, ক্ষতিমোহনবাবুর স্ত্রী—কিরণবালা সেন। শান্তিনিকেতনে মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছিলেন; এই সমিতির উদ্দেশ্য হলো ওখানকার ও আশেপাশের পরিবারের অভাব-অভিযোগের সম্মান করা ও তাদের প্রতিবন্ধন করা। কী করে অসচ্ছল পরিবারের আয়ের ক্ষেত্র প্রসারিত করা যায়, সুস্থভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুব্যবস্থা করা যায় ও তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে পারে, এই ছিল সমিতির প্রধান লক্ষ্য। এই মহান কাজের অনেক ভার নিয়েছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। স্ত্রী সুধীরা বসু, একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এই আশ্রমেরই কাজে। শান্তিনিকেতনের সর্বোচ্চ মঙ্গল কী করে সাধন করা যায় এই পণ্যরত্নই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিমা দেবী, রবীন্দ্রনাথের সহ-ধর্মিণী, গুরুদেবের পূর্ববধূ যাকে তিনি 'আশ্রম-লক্ষ্মী' বলতেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের তিনি ভাস্করী, প্রায় ৬০ বছর আগে গুরুদেবের পূর্ববধূরূপে তাঁর পরিবারে এসেছিলেন। তখন থেকেই গুরুদেবের ও আশ্রমজীবনের সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন গুরুদেবের আদরের 'মা-মি' ও আশ্রমের 'বৌঠান', এঁদেরই পরিচর্যা নিজে করে উৎসর্গ করেছিলেন। যে সাধনার ক্ষেত্র গুরুদেব শান্তিনিকেতনে স্থাপন করেছিলেন তাতেও বৌঠানের ভূমিকা ছিল অবিচ্ছেদ্য। গুরুদেবের নাটকে নৃত্য সংযোজন করে তাকে 'নৃত্য-নাট্য' রূপান্তরের পরিকল্পনার কৃতিত্ব বৌঠানের, এই জন্মান্তরের নেপথ্য ইতিহাস অনেকেরই অজ্ঞাত। এদেশে সঙ্গীতের নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত হলো তাঁরই সাহায্যে প্রবর্তিত এই নৃত্যলীলার ছন্দে। আশ্রমের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মণ্ডলসজ্জা ও পান্ডপাঠী সজ্জায় নন্দলাল বসু যে অভিনব সৌন্দর্যের প্রবাহ এনেছিলেন সেই প্রবাহের ধারাকে বৌঠান রক্ষা করেছেন, অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শান্তিনিকেতনে, শান্তিনিকেতনে কারুশিল্পের চর্চা এবং পার্শ্ববর্তী পল্লীতে মেয়েদের মধ্যে তার প্রচলনের প্রচেষ্টার মূলে তাঁর যে কী অবদান তা অনেকের কাছে আজও অজ্ঞাত। যে কালে শান্তিনিকেতন ছিল জনবিরল সেকালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসে গুরুদেবের কাছে আত্মনিয়োগ করেন। সেকাজে ছিল সুষ্ঠির কাজ, তাতে বৌঠানের দল ছিল অপরিসীম, রূপে-রসে-সৌন্দর্যে

ভরা। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেই, সেই সৌন্দর্যের লিখন তিনি রেখে গেছেন, নিজের স্বাক্ষর কোথাও রাখেন নি। আশ্রমের যাকিছু শিল্প সুন্দর, যাকিছু শূচি বৌঠান ছিলেন তারই প্রতীক। দীর্ঘকাল ধরে শান্তিনিকেতনে 'শ্রী'র উপাসনায় তিনি রেখে গেছেন অনন্ত মাধুর্যের এক অস্মান অক্ষয় অর্থ। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে বহু জ্ঞানী-গুণীজন এসেছেন গুরুদেবের কাছে, তাঁদের আতিথেয়তার পূর্ণ দায়িত্ব ছিল বৌঠানের হাতে। এই দায়িত্ব সহজ নয়, কিন্তু তিনি আনন্দের সঙ্গে, অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করেছেন। প্রায়ই বলতেন, "এই এতটুকু মেয়ে যখন ছিলাম বাবামশাই আমাকে এই বাড়িতে এনে আপন মেয়ের মতো স্নেহে আদরে আমাকে পালন করেছেন, তাঁরই জয়গান করে যেন শেষনিঃশ্বাস ফেলতে পারি, এব চেয়ে বড়ো আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।" ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৯ খৃস্টাব্দে বৌঠানের জীবনদীপ নির্বাপিত হলো শান্তিনিকেতনে। তাঁরই তিরোধানে বিশ্বভারতীর সঙ্গে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ-সূত্রের অবসান ঘটলো। এই বছরই ১৫ই মার্চ গুরুদেবের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীর ৭৫ বছর বয়সে তিরোধান ঘটলো, ধাবমান কাল একটা গাড়ি যবনিকা টেনে দিল গুরুদেবের জীবনপথের শেষ বেখাটির উপর, পরিসমাপ্তি ঘটলো রবীন্দ্রনাথের বংশধারার।

[ভ্রমশ]

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

তিন মাসের কম গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা হয় না। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

চাঁদার হার

ভারতে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৮.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৯.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪.৫০ পঃ

বিদেশে জাহাজে (সডাক)

বাৎসরিক—	৪০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	২০.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	১০.০০ পঃ

বিদেশে রিমান্নে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৭০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৮৫.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪২.০০ পঃ

প্রতি সংখ্যা (নবঙ্গবঙ্গ) ৩০ পয়সা



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ওথাইয়া বন্দিশিবির ভাল ছিল না। কোন অন্তরীণের কাছে নীসা পাওয়া গেলে বেচারাকে প্রচুর পরিমাণে মার খেতে হতো। সেখানকার বেশির ভাগ প্রহরীই পূর্বতন রক্ষাবাহিনীর লোক ছিল। এবং তারা আমাদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করত, কিন্তু পরগতী জীবনে ছাড়া পাবার পর আমরা তাদের উপর কোনরকম প্রতিশোধ নিই নি। আমরা তাদের সবাইকে ক্ষমার চোখেই দেখেছি বরাবর, কারণ তারা ছিল আসলে নিরক্ষর, অবদুশ এবং তাদের নির্দেশ দেওয়া ছিল যে, যা তাদের আদেশ দেওয়া হবে, তা নিবিচারে পালন করা। প্রতি-হিংসাপরায়ণ হয়ে পূর্বতন সরকার পক্ষের লোকেদের শাস্তি দিলে আজ আর স্বাধীন কেনিয়ার কোন লাভ তো হবে না, বরং ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট।

প্রতি শনিবার আমরা নিবটবতী খুঁটি নদীতে স্নান করতে যেতাম এবং সেই সময়ই আমাদের পরনের একমাত্র কাপড়-জামা কেচে পরিস্কার করতাম। খুঁটি ছিল পাহাড়ী নদী, তার পরিস্কার ঝকঝকে জল এক পাথর থেকে অন্য পাথরে নেচে-কুঁদে বেড়াত, আর তার প্রাণবন্ত ধাবমান গতির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমি কল্পনা করতাম আমাদের দেশের অদূরভবিষ্যৎ, যা নাকি প্রাণবন্ত, স্বাধীন, স্বাভাবিক ও আশায় ভরা থাকবে। বন্দিশিবিরের ধারে-কাছেই সমস্ত মাঠেই স্থানীয় কিকুয়ু, চাষীরা ফসল ফলাত খুব উৎসাহের সঙ্গে এবং তাদের কণ্ঠোৎপাদিত আম, ভুট্টা বা কলাবাগানের মাঝে মাঝে শাগান এরাদুটের গাছগুলি দেখতে ভারি ভাল লাগত আমার। এই কচি সবুজের মাঝে প্রত্যেক টিলার উপর নির্মিত গ্রামের কুঁড়েঘরগুলি শব্দে কেমন যেন বিসদৃশ

লাগতো আমার চোখে। কোঁনয়ার শঙ্কটের প্রথম দিকেই সরকার গ্রামবাসীদের একত্রিত করে টিলাগুলির উপর নতুন কুঁড়েঘর নির্মাণ করতে বাধ্য করেছিলেন, যাতে তারা সবাই একজোট হয়ে মাউ-মাউ সন্তাসবাদীদের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে! আমরা—কিকুয়ুরা কোনদিনই এইভাবে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে ভালবাসি না, এতে আমাদের মন হাঁপরে ওঠে এবং আমরা চাই না যে, আমাদের উঠানের বা ঘরের কোন দৃশ্যই পৃথিবীর অন্য কারুর চোখে পড়ুক। পাহাড়ী নদীতে চান করে পরনের কাপড়-গুলি কেচে দিয়ে তাদের শব্দবাহর অপেক্ষায় আমি জেলখানার মোটা ভারী ও অস্বস্তিকর কবলে গা ঢেকে বসে বসে এইসব কথা ভাবতাম এবং স্বাধীনতার পর আমাদের কত কি কাজ করবার আছে তার তালিকা তৈরি করতাম মনে মনে।

প্রতি রবিবার দিন আমাদের কাঁটাডারে ঘেরা শিবিরের বাইরে এক খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে প্রহরী-বেষ্টিত এক বিরাট মনুষ্যচক্রের ভিতর আমরা আমাদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কিছৃক্ষণের জন্য নির্বিঘ্নে আলাপ-আলোচনা করতে পারতাম। প্রথম ববিবারে আমার অনেক আত্মীয়রাই আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, যাতে ছিলেন আমার 'মাসী' ওয়ানগুয়ী 'বার' কাছে আমি উগাণ্ডা থেকে ফেরবার সময় বাকুনীতে কিছৃদিন ছিলাম: মাসীর মেয়ে নায়াকিন্ উয়া, আমার বোন নজোকি এবং তার স্বামী জন কিমোন্ডো: আমার আর এক বোন ওয়ানগুয়ী, যে গাটিয়ু ওয়ানবুরাকে বিয়ে করেছিল (তার সঙ্গে আমি দক্ষিণ য়াটা শিবিরে একসঙ্গে ছিলাম কিছৃদিন); আমার দুই খুড়তুত ভাই সাইমন্ গাচিয়েনগু এবং গুড্বে মৃগ-

ওয়ানগারী, যে নাইরোবীর একজন বর্ধিত লোকের স্ত্রী। ওয়ানগারী কিকুয়ু প্রধানদায়ী আমার মেয়ে, আদলে সে আমার মাসী ওয়ানগুয়ীর মেয়ে নায়াকিন্ উয়্যার মেয়ে। তারা সবাই আমাদের দেখে প্রচুর পরিমাণে কাশ্যাকাটি করে, কিন্তু ততদিনে আমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি শব্দে তাদের বলছিলাম যে, আমার জন্য তাদের দুঃখ করা উচিত নয়, কারণ দেশকে স্বাধীন করতে হলে এরকম কষ্ট স্বীকার আমাদের কর্তেই হবে। তারা আমার জন্য বাগানের কলা এনেছিল আর এনেছিল নজাহী এরাদুট এবং দুধ। সেদিন সেখানে বসেই আমরা সবাই মিলে এসব সদৃশ্য খাবার খেয়েছিলাম।

আর সকলের ভেতর কিন্তু আমার মাকে আমি দেখতে পাই নি সেদিন এবং মাসী ওয়ানগুয়ীকে আমি মার শব্দীর খারাপ হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করি। মাসী গভীর সমবেদনার সঙ্গে আমাদের ভখন বলে যে, আমি আত্মীয়তার শিবিরে থাকাকালীনই আমার মা মেরী ওয়ানজিকু ইহকাল ত্যাগ করে চলে যান। প্রথমটায় আমি কি রকম হতবাক হয়ে যাই এবং মাসীকে আর একবার মার কথা জিজ্ঞাসা করি। তার কথা মথার্থ বোধ-গম্য হবার পর আমি মিনিট পাঁচেক চুপ করে বসে থাকি, তারপর আমার হঠাৎ ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু সমবেত আরও সাতশো অন্তরীণ এবং তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সামনে আমি প্রাণ খুলে কাঁদতেও পারি নি। আমার মুখ গিয়েছিল শূন্যের, আর জিহবার স্বাদ তেতো লাগছিল, মাথা ঘুরছিল এবং চোখের দৃষ্টি এতো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল যে, কিছৃই দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে আমি তাদের হেসে বলি, "তোমরা ভাবনা করো না, এরকম দাম আমাদের সবাইকেই দিতে হবে। আমার মা তাঁর কাজ করে গেছেন, আমাদের সবাইকেই একদিন জীবনের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হবে আর প্রত্যেকটি দিনই সেই মহাজনকে টেনে আনছে আমাদের কাছে।" এর পর আমরা আবার খাওয়া-দাওয়ায় মগ্ন হয়ে যাই, যদিও আমার বৃকের উপর এক নতুন বোঝা চেপে বসেছিল।

কিকুয়ু পদব্রূণের জীবনে মার চেয়ে বড় আর কোন নারীই নেই। মা-ই হলেন তার সবচেয়ে আদরের, সবচেয়ে নিকটের। মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে নয়মাস তার কষ্ট ভোগ করেন, তারপর গভীর বস্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাকে পৃথিবীর আলো-বাতাসের মধ্যে আনেন—আর সেই সময় থেকে চলে মার একটানা কর্মজীবন, সন্তানের লালনপালন, তাঁর জীবনের এক-

শাণ্ঠাহিক বসুমতী

মার লক্ষ্য—মহান উদ্দেশ্য। আমার মা
আবার তার উপর খুবই অর্থকষ্ট ভোগ
করেছিলেন ছেলেবেলায় আমাকে লেখা-
পড়া শেখাবার জন্য। আমার কাছে
তার একটা ছবিও ছিল না, যা দেখে আমি
অন্তত একটুও তাঁর মৃত্যুর ভাব চোখে
দেখতে পাই—যার সবটাই ছিল আমার

মনে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন
যে, তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা আমি যাকে
বিয়ে করে সংসারধর্ম করব তাকে যেন
তিনি দেখে যেতে পারেন, কিন্তু হাস্য; তাঁর
সে ইচ্ছা আর কোনদিনই পূরণ হবে না।
মাকে এভাবে হারানই আমার সংগ্রামী
জীবনের সর্বশেষ কঠিন মূল্য, যা আমাকে

দেশের স্বাধীনতার বেদীমূলে দিতে হয়ে-
ছিল। স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয়ানদের
কাছে এ বিষয়ে আমার মনের ভাব বুঝিয়ে
বলা কঠিন। তারা তাদের সভ্যতা অনুযায়ী
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা-মার আগ্রহ
ছেড়ে স্বাবলম্বী হয়, বিয়ে করার সময়
অনেকেই মা-বাবার কথা ভাবেও না।

আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য একটি আলোচিত সৃষ্টিকারী কর্মসূচী

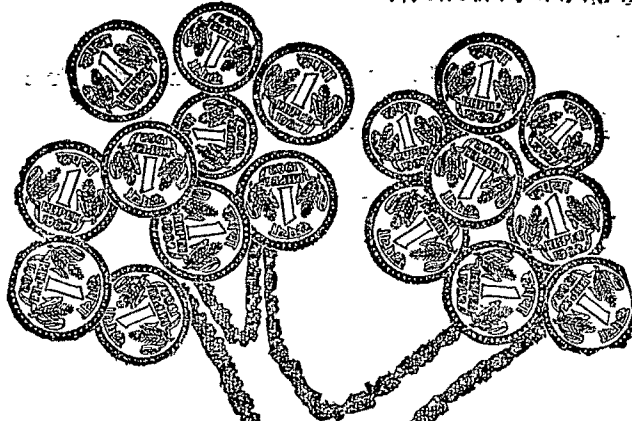
নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকদের সহজ শর্তে ঋণ দানের জন্ত
আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে :

- পরিবহন চালক ● যন্ত্রশিল্পী এবং মেরামতকারী
- খুচরো বিক্রেতা ● ডাক্তার ● কৃষক ● রপ্তানীকারী
- ছাত্র ● ছোটখাটো শিল্পপতি ● চাকুরে

আপনি যদি এঁদের মধ্যে একজন নাও
হন অথচ আপনার আর্থিক সমস্যা রয়েছে
তাহলে আমাদের কাছে আসুন। আপনাদের
সেবার জন্ত সারা ভারতে আমাদের ৬৪০ টিরও
অধিক শাখা আছে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত
কার্যকোডিয়ান : এস, সি, ডিগ্গা



১৮৯৫-১৯৭০
৭৫ বছরেরও
বেশী আমাদের
ব্যাঙ্কিং এর অভিজ্ঞতা

মা ও সন্তানের মধ্যে যে অচ্ছেদ্য বন্ধন তা তাদের বোঝান 'মহিষ্কল'। আমরা মনে করি যে, পদ্রুঘ এবং তার স্ত্রীর সম্বন্ধ হল পারস্পরিক বন্ধুত্বের ও প্রস্থার, যার মূল উদ্দেশ্য হল সন্তান সন্ততির জন্ম ও তাদের পালন। এই বন্ধুত্ব ও প্রস্থার ভেতর দিয়েই পদ্রুঘ ও তার স্ত্রীর ভেতর কালে গড়ে ওঠে গভীর আত্মিক অনুরাগ ও একতা। কিন্তু অনেক সময় এই আত্মিক অনুরাগ ব্যতিরেকেও স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন ও একত্র বাস সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রেই আত্মিক একতা কোনদিনই আসে না। কিন্তু কিছু কিছু ভাষায় একটি প্রবাদ আছে, "বইনা ম্যা মন্ডু, নিটা উই নগায়ী ম্যা করি", অর্থাৎ আত্মার সন্তানের কাছে দ্বিতীয় ভগবানেরই স্বরূপ। তাছাড়া মা এবং সন্তানের বন্ধনের যে গভীরতা তা আর কোন সামাজিক বা সাংসারিক বন্ধনেই নেই। আমাদের সমাজে মাকে হেলাফেলা করা বা আঘাত করার মত দুষ্কার্য আর নেই এবং নিজের স্ত্রীর উপর মারধোর বা জবরদস্তি করার সঙ্গে এর কোন তুলনাই হয় না। মার মৃত্যু সংবাদে আমি যত বেদনা ও আঘাত পেয়েছিলাম, অন্তরীণ জীবনের সমস্ত মারধোর, লাঞ্ছনা, অবমাননা ততর তুলনায় কিছুই নয়।

পরে আমি আমার আত্মীয়দের কাছে জানতে পারি যে, সে সময় তারা আমাকে মা কিভাবে মারা যান তা বলতে চায় নি আসলে। কারণ তাদের ভয় ছিল আমি হয়ত ভয়ানক কিছু একটা করে ফেলব। পরে তারা আমায় বলেন যে, কেনিয়ার সঙ্কটের সে সময় দিনের চক্ৰবর্তী ঘণ্টার তেইশ ঘণ্টাই সাম্ভ্য আইন জারী থাকত—সে সময় মা আমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্যাথলিক মিশনারী 'চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তিনি অল্প ভাল হয়ে ওঠেন। কিন্তু পরে আবার রোগাক্রান্ত হয়ে তাঁর শরীর এত ফুলে ওঠে যে চোখের পাতাও খুলতে অসুবিধা হত তাঁর। এইভাবে কয়েক মাস অসুস্থ যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি ইহকাল ত্যাগ করে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন হন।

সৈনিকার সাফাৎকারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে ফরার পর আমি গভীর বস্মাহত হৃদয়ে শিবিরে আমার খাটে ফিরে আসি এবং জেগের রুদ্ধ কঠিন কবলে আমার চোখের জল উজাড় করে দি। পর পর কদিন রাত্রিই কাটে আমার এইভাবে এবং সর্বক্ষণ আমি মার আমার শান্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি।

১৯৫৮ সালের চক্ৰবর্তী জুন আমি নেয়েরী জঙ্গলের অগাধ শিবিরে এসে পৌঁছই। এটা হল আমার অন্তরীণ বন্দী জীবনের এগার নম্বর বন্দীশালা। এর ভিতরটা আট ভাগে ভাগ করা ছিল এবং প্রত্যেক অংশে একশো দুইজন করে

অন্তরীণ থাকতো। শিবিরের চারিদিকে বিদ্যুতের বেড়া দেওয়া ছিল এবং এক হতভাগ্য প্রহরীর প্রেমিকা এই খবর না জানায় এক রাতে অভিসারে আমার পথে এই বিদ্যুতের বেড়ার ছোঁয়ায় প্রাণ হারায়। নেয়েরী জঙ্গলের যে সমস্ত অন্তরীণরা মেওয়া, মানিয়ানি এবং আথিরিভার বন্দী শিবিরে ছিল, তাদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যেই আগুনি শিবির তৈরি করা হয়েছিল, যাতে এখানে কিছুকাল কাটাবার পর অন্তরীণরা ধীরে ধীরে নিজের নিজের এলাকায় ফিরে যেতে পারে। ১৯৫৮ সালের শেষের দিকে কেনিয়ার রাজ্যপাল এক বিশেষ আইন জারী করেন, যাবৎ ফলে যে সমস্ত বিদ্রোহীরা ছোটখাট 'মাউ-মাউ' কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল তাদের বাদ বাকি সাজা মাপ করে দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গেই তাদের অন্তরীণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়, যাতে তারাও আমাদের মত পুনর্বাসনের ক্রিয়াকলাপের আওতায় আসতে পারে। এইরকম অনেক লোককেই প্রথমে বারো থেকে চৌদ্দ বছরের মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং কারাগারে সাধারণ ছিঁচকে চোর-বদমাসদের থেকে এরা আলাদা থাকতো। এই চোর-বদমাসদের নাম ছিল 'মানরু কানগা'। মানরু শব্দের অর্থ হল শকুনি, তাদের এই নামের কারণ ছিল যে, তারা নিজেদের ভেতরেই ঝগড়া-মারামারি করতো, চুরি করতো পরস্পরের জিনিসপত্র এবং পদ্রুঘরা নিজেদের ভেতরও ঘোঁরাফোঁরা করতো ও পিছপা হত না। এরা সংঘম কির্জিনিস তা জানতো না এবং শকুনির মত ময়লা অর্পিত, মত জিনিসপত্র ঘাঁটতে বা খেতে তাদের কোন অসুখি ছিল না। 'মাউ মাউ' কার্যকলাপে লিপ্ত লোকেরা ছিল সংঘবদ্ধ এবং তাদের আচার-ব্যবহারের মাপকাঠি ছিল খুব কড়া। এবং তার থেকে সামান্যতম ভুলটুকুই হলে পরেই তারা সংঘের কামড় থেকে পেত কঠিন সাজা। মানরুীদের ভেতর যারা নেয়েরীর কারাগারে ছিল, তাদের থেকে প্রাপ্ত সংগ্রহে প্রায় তিরিশজন করে আগুনিতে বর্দীল হয়ে আসতো। মেওয়া শিবিরে নবগত বন্দীদের জন্য পূর্ববর্ণিত যে অভ্যর্থনার নিষ্ঠার ব্যবস্থা চলছিল ছিল, আগুনিতে তার অন্যথা হয় নি। শিবিরে পৌঁছলে পর তাদের সবাইকে দেখান হত এক বিরাট বড় নিদ্রাশয্যা "মাউরিটিয়া নিয়াটিখাগিও", অর্থাৎ যে নিজেকে সাহায্য করে অনায়াসে তাকে সাহায্য করবে। তারপর তাদের এ বিষয় মনস্তত্ত্ব করাব জ্ঞান মাত্র পনের মিনিট সময় দেওয়া হত। যারা এ নির্দেশ স্বীকার করে নিনত তাদের শিবিরের ভেতর পাঠান হত, আর যারা স্বীকার করত না (এরাই দলে ভার্যহত অধিকাংশ

সময়) তাদের পাঠান হত শাস্তি-গহনরে। এই গহনগহনীর একমাত্র কাজ ছিল অন্তরীণদের উপর কোন রকম শাস্তির কাজ জোরজব্দ না করে তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করে নেওয়া। গহনগহনীর আয়তনে বার ফিট লম্বা ও ছয় ফিট চওড়া এবং দশ ফিট গভীর। লাল মাটিতে কাটা এই গহনগহনীর ভেতর বোয়াড়া অন্তরীণদের নামতে হত এবং নিচে রাখা একটি বুদ্ধিতে মাটি কেটে ভরে বুদ্ধি শব্দ মাথায় বকরে উপরে উঠে আসতে হত। মাথায় বুদ্ধি ভর্তি মাটি নিয়ে উপরে উঠবার সময় দুই হাতই জোড়া থাকতো, কাজেই ঠাল সামলান ছিল খুবই দুরূহ কাজ। অর্থাৎ একদিকে এক হতভাগ্য অন্তরীণকে ঠাল সামলানতে না পেরে পড়ে যেতে দেখেছিলাম, ফলে বুদ্ধি ভর্তি মাটি তার কব্জের উপর গিয়ে পড়েছিল; বলা বাহুল্য, রেচনার খুবই চোট লেগেছিল। শাস্তি গ্রহণের পর অন্তরীণরা যখন আবার উপরে উঠে আসত তখন তাদের সারাগারে লাল মাটি লেগে গেছারা হত অকুত, আর মাটির সঙ্গে মিশে মনের অবস্থাও হয়ে যেত তদুপ।

যখন একসঙ্গে অনেক অন্তরীণ জমা হওয়ার ফলে গহনগহনীর জায়গার অকুলান হত, তখন বাড়তিদের মাথায় এক পাথর ভর্তি বোম্বাতি নিয়ে খেলার মাঠে দৌড়তে বলা হত। আমি তর্পীথিতে যখন এসে পৌঁছই, সে সময় এই সমস্ত কার্যকলাপের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিল 'মিথা' নামক এক আফ্রিকান; তাকে সবাই বস্তা বলে ডাকতো। 'মিথা' খুব আহসানী ও বীর ছিল, আমার খুব ভাল লেগেছিল তাকে। সে কোন কিছুকেই ভয় করত না বা কোন কাজেই পেছপা হত না। কেনিয়ার সঙ্কটের আগে সে একজন ব্যবসায়ী ছিল, যদিও তার সে সময়কার ক্রিয়াকলাপ থেকে তার সবকারী মনোভাবাপন্ন হবার কোন চিহ্নই কেউ পায় নি। সে যদি মন্তব্যবাদের যোগ দিত তাহলে নিঃসন্দেহে সে খুব উচ্চ দরের সংগ্রাসবাদী হতে পারতো, কিন্তু আমার অজ্ঞাত কোন কারণবশত সে বরাবরই সারকার পক্ষেই কাজ করেছিল সঙ্কটের দিন-গুলিতে। এই সময় তার বয়স ছিল প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি এবং বর্ণশিবিরে কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সে তার ফোর্ট হলের ব্যবসাও চালু রেখেছিল। সে আমাদের এই বলে ভয় দেখাত যে 'মিজের হাতেই সে দুশোর বেশি সন্তানসম্রাটকে খতম করেছে এবং তার কথা অশ্রদ্ধাস করার কোন কারণই ছিল না। সে এবং আরও কয়েকজন সারকার পক্ষের আফ্রিকানরা মিলে পূর্বোক্ত "কল টেনিক" পারিকম্পানী প্রস্তুত করে এবং তাকে

কর্ম করী করে তোলে। এই নকল সৈনিক দলের লোকেরা আসলে ছিল সরকারী গুপ্তচর, কিন্তু তারা সন্যাসবাদী সঙ্গে অন্যান্য সংগ্রামীদের সঙ্গে থাকতো, তাদের মতোই কাজ করতে লোক-চক্ষে খোঁকা দেওয়ার জন্য। মিথ্যা এখন সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজের শাস চালনার ব্যবসা আরম্ভ করেছে। সরকারী কাজে সে জেলা সহকারীর পদ পর্যন্ত উঠতে পেরেছিল। বাস চালনার কাজ আরম্ভ করার প্রথম দিকে অনেকেই তার বাসে চড়তো না, তারা বলতো, "মিথার বাসে চপ না, তাহলে মারা পড়বে।"

একদিন নেয়েরী জেলা কারাগার থেকে একদল অন্তরীণ এসে পৌঁছয় মিথার কাছে, সে সময় আমি নিকটবর্তী এক জায়গায় কাজ করছিলাম, কাজেই তাদের সম্বন্ধ না কি রকমভাবে হয়েছিল, তা স্বচক্ষে দেখতে পেরেছিলাম। মিথার তত্ত্বাবধানে তাদের সবাইকে প্রথমেই এক-প্রস্থ মারধোর করা হয় এবং কাবুগি নুজুমা ও গাচি কারানজা নামক দু'জন অন্তরীণের ভাগ্যেই এর প্রকোপ পড়ে সব থেকে বেশি। কাবুগি সেইদিনই মারা যায় এবং গাচি যদিও প্রাণে বেঁচে যায়, তবু অনেকদিন অর্ধি তাকে হাসপাতালে পড়ে থাকতে হয়েছিল, বোচা: আজও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। তার পরদিন সকালে আমি ও আরও কয়েকজন অন্তরীণ নেয়েরী রেড ক্রস শিক্ষা কেন্দ্রের বাড়ি তাঁর সাহায্যের জন্য গিয়েছিলাম, সেখান থেকে আমি চিঠি লেখবার কাগজ বোগাড় করে নিয়ে আসি এবং পরের রবিবার দিন পায়খানায় বসে বসে সেই অমানুষিক মারধোরের বিবরণ লিখি। এই কাজ করার সময় অন্য কয়েকজন অন্তরীণ কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার উপর পাহারা রেখেছিল; যাতে আমি কোন অনুসন্ধানরত কর্মচারী কাছে ধরা না পড়ে যাই। শিবিরের সবাই খুব চুপচাপ ছিল এবং ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সকলকেই খুব উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছিল এইভাবে একজন অন্তরীণ মারা যাওয়ার ফল চিন্তা করে। চিঠিখানার দুইটি নকল করে আমি ইরুংগু নামক একজন গাড়ির চালককে দিই বিলেতে এবং কৈনয়া সরকারের কাছে পাঠবার জন্য। এক সময় ইরুংগুও আমার মতো বন্দিজীবন কাটিয়েছিল মানিয়ানি শিবিরে এবং তার বিশ্বাস ছিল যে, যাই হোক না কেন, আমি তাকে কোনদিনই বিপদে ফেলব না। চিঠি তাকে দেওয়ার জন্য।

সরকারী খোঁজ-খবরের পর মিথার নামে অভিযোগ আনা হয়, ফলে তার দু' বছর কারাদণ্ড হয়। বিলেতে চিঠি

পাঠানোর ফলে মিসেস বারবারা ক্যাসেল সেখানকার বিধানসভায় তুমুল কড় তোলেন এ বিষয়ে। এর পর ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন কৈনয়া সরকার সাধারণভাবে সব কয়েদীদের সাজা মকুদ করেন, তখন মিথার মৃত্যুলাভ করে। মিথার দু' বছরের সাজা হবার পরও অবশ্য আমাদের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে,

তাকে শিখা-ডিম্বরূপ ব্যবহার করতো অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং 'মখ' যে মারধোর করতো তাতে তার নিজেও উৎসাহের চোটে উপরওয়ালার আদেশটি ছিল বেশি। হোলার শোকাবজ ঘটনায় মতো এ ব্যাপারটাও ঘটনোচিত সেই সরকারী কর্মচারীরা, যাদের মধ্যে মারা ক অন্যায়ের কোল প্রভেদ ছিল না।

COLLEGE BOOKS

(Calcutta, Burdwan, North Bengal, Kalyani & Viswa Bharati University)

P. U. Course

অধ্যাপক চৌধুরী ও সেনগুপ্ত প্রণীত

1. তর্কবিজ্ঞান প্রবেশ — ৫ম সংস্করণ (Recommended by C. U. & N. B. U. as Text Book) 6:50
2. P. U. Logic Made Easy—S. Banerjee 2:25

Degree Philosophy Course

অধ্যাপক প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত প্রণীত

3. দর্শনের মূলভঙ্গ (ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দর্শন একত্রে)—৬ষ্ঠ সংস্করণ 15:00
- ভারতীয় দর্শন (Indian Philosophy)—(৫ম সংস্করণ) 8:00
5. ভারতীয় দর্শন (দ্বিতীয় পর্যায়) for B. U. 2:00
6. পাশ্চাত্য দর্শন (Western Philosophy) — ৭ম সংস্করণ 8:00
7. পাশ্চাত্য দর্শন (for B. U. Part II) — ২য় সংস্করণ 10:00
8. নীতিবিজ্ঞান ও সমাজদর্শন — ৭ম সংস্করণ 15:00
9. নীতিবিজ্ঞান (Ethics) — ৭ম সংস্করণ 8:00
10. সমাজদর্শন (Social Philosophy) — ৬ষ্ঠ সংস্করণ 8:00
11. মনোবিজ্ঞা (Psychology) ৪র্থ সংস্করণ 15:00
12. Handbook of Social Philosophy— Second Edition 12:00
13. পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 6:00

আধুনিক যুগ : বেকন—হিউম

Education Course

অধ্যাপক ঋতেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত

14. শিক্ষা-তত্ত্ব (Principles & Practice of Edu.)—২য় সংস্করণ 9:00
15. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (Indian Edu. Problems)—৩য় সংস্করণ 12:00

অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও অধ্যাপক রায় প্রণীত

16. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান—(Edu. Psy. with Statistics)—২য় সংস্করণ 16:00

B. T. B. ed. & Basic Course

অধ্যাপক গৌরদাস হালদার প্রণীত

17. শিক্ষণ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞা (Social Studies) 8:00
18. শিক্ষণ প্রসঙ্গে অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান—(Eco & Civics) 10:00
19. শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস— (History) 12:00
20. শিক্ষা-তত্ত্ব (Educational Theory)—২য় সংস্করণ—অধ্যাপক রায় 9:00
21. ভারতের শিক্ষা সমস্যা (Indian Edu. Problem)—৩য় সংস্করণ—অধ্যাপক হালদার ও রায় 12:00
22. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Edu. Psy. with Statistics)—২য় সংস্করণ—অধ্যাপক সেনগুপ্ত ও রায় 16:00



ব্যানার্জী সাবলিয়ার্ম

৫১৯এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৪-৭২৩৪

অপ্রাকৃত কবিতাগুলি

উল্লেখ্য

যাঙ্গিন দেশে

আহাম্মক, কি গাছে ফলে?
আহাম্মক, আগাছায় ফলে!
কিন্তু, বুদ্ধিহীন: রেইমান,
গাছেই ফলে, মাচায় ফলে।

গোলামদা

গোলামী করিয়া মনে নাই সুখ
আই সে এবার হ'য়েছে দালাল;
এবং তেনারো আছে মোসাহেব
চেটে দিতে জুতো সকাল-বিকাল।

পদোন্নতি

রামছাগলের ছা,
বেশ মানিয়েছে
সিংহের চামড়া
খেল, দেখাতে চাস
দিল্লী চলে যা

হাততালি দেবে

আফ্রো-এশিয়া

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে আমাকে নৈরবী শহরের কাছেই এক কাষশিবিরে বদলী করা হয়। যদিও এখানকার বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল না, তবু এখানে কোন মারধোর করা হয় নি আমাদের উপর এবং এই শিবিরটি আমাদের গ্রাম্য লোকদের খেলার ছাদের বাড়ির খুব কাছে থাকায় সেখানকার ধোঁয়া আমাদের নাকে এসে লাগতো। তার থেকে আমরা পেতাম সেই পুরনো পরিচিত, সাধারণ নিরহংকার ও শান্তিময় জীবনের অবশেষ-মাখা স্বাদ। আমার আসার কয়েকদিন পরই এই শিবিরে জন স্টাইন নামক ওথাইয়া জেলার এক ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সেখানে আসেন এবং বলেন যে, তাঁর জেলার লোকেরা কাঁটাতারের বেড়ার পেছনে বন্দি-জীবন যাপন করছে; তা তিনি চান না, কাজেই আমাদের সকলকে শীঘ্রই ছেড়ে দেওয়া হবে। ডিসেম্বরের নয় তারিখে আমাদের সকলকে ওথাইয়া পুলিশ দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার করিখ নামক ভারপ্রাপ্ত প্রহরী আমাদের সম্বোধন করে বলে, “তোমরা এখন ইচ্ছে করছে যে-যার বাড়ি চলে যেতে পারো। অবশ্য সব-প্রথম তোমরা নিজ নিজ এলাকায় চীফের কাছে হাজিরা দেবে। তারপর তোমাদের গ্রামের প্রধানের কাছে গিয়েও হাজিরা দেবে। সে যখনই তোমাদের বিনা পয়সায় জন খাটতে বলবে (গিটটি), তখন আর পাঁচজনের সুখ-সুবিধার জন্য তা তোমরা করবে। প্রত্যেক বুধবার দিন তোমরা চীফের দপ্তরে গিয়ে একবার করে হাজিরা দেবে। যদি কোন সময় কোন সরকারী সান্দ্য আইন জারি হয়, তবে তা নিশ্চয়ই

মানবে তোমরা, কারণ তাই হল নিয়ম। তোমাদের এইসব বন্ধিয়ে বলে দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অবশেষে মন্তিলাভ করে বন্দিশিবিরের ফাটকের বাইরে এসে দাঁড়িলাম। নিজেকে বললাম—“আমি মুক্ত, আমি এখন নাচতে পারি, গান করতে পারি, দ্রৌড়তে পারি বা আস্তে হাঁটতে পারি, যা ইচ্ছা তাই করতে পারি!” চারিদিকে চেয়ে দেখলাম যে, মানবের মধুগন্ধো বদলে যায় নি, পাহাড়, রাস্তা, গাছপালা কিছুই বদলে যায় নি, নিবাস নিয়ে দেখলাম যে, হাওয়াও বদলে যায় নি, নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, আমিও খুব বেশি বদলে যাই নি; হয়তো বা একটু রোগা হয়ে গেছি। কিন্তু নিজের গনের দিকে তাকিয়েই আমি সেদিন সব থেকে বেশি অরাক হয়ে গিয়েছিলাম যে, সেখানেও আমি বদলে যাই নি; দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে সংগ্রামে ব্যাপিয়ে পড়বার স্পৃহা তখনও প্রতিটি স্নায়ুতে স্নায়ুতে। আমি একটু দৌড়লাম, একটু হেঁটেও ছিলাম, কিন্তু কেউ কিছু আপত্তি করে নি বা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে নি বা অন্য কিছু করার জন্য হুকুম দেয় নি। তখন আমি আস্তে-খীরে রাস্তা ধরে নিজের গ্রামের দিকে এগিয়ে চললাম। রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হল তাকেই অভিবাদন করলাম—প্রত্যেককেই আমার অন্তরংগ বন্ধ বলে মনে হল। কারিকো গ্রামে আমার মাসী ওয়ানগুই-র বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে আমার সঙ্গে বেশ একটা দল জমা হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ দশ বছর পর আবার আমি তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িলাম।

অন্তরীণ হিসেবে থাকাকালীন আমরা প্রায়ই ছাড়া পাবার পর প্রথমে কি করব তা নিয়ে প্রায়ই জল্পনা-কল্পনা করতাম। হিতৈষীরা সাবধান করে দিয়েছিলেন: “জোসেফ, যেন তুলেও শৃঙ্খল একটা মুরগী মেরে তোমার ছাড়া পাবার উৎসব সম্পন্ন করে না, তাহলে আবার ফিরে আসতে হবে। একটা বড় ভাল মন্দা ছাগল কাটবে, আর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাইকে ডেকে খাওয়াবে।” একটু পরেই ওয়ানগুই ফিরে এসে আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়। নানান কথাবার্তার পর সে একটা বড় মোরগ দেখিয়ে বলে যে, আমার মা মরবার আগে তাকে বলে-ছিলেন, “জোসেফ ফিরে এলে এটাকে কেটে খাওয়াস তাকে।” তার কথা শুনে আমার মনটা অল্পক্ষণের জন্য দমে যায়, কিন্তু তারপরই আমি স্থির করলাম যে, ঐ মোরগটাই কাটা হবে, কারণ, এইটাই আমার মা-র শেষ ইচ্ছা এবং আমি তা পূরণ করব নিশ্চয়ই। তাছাড়া, আমাকে যে কেউ আর জেলে পড়বে না, সে বিষয়ে আমার মনে এক বন্ধমূল ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কাজেই ছাগল কাটার সংকল্প আর একদিনের জন্য স্থগিত রেখেছিলাম। সেদিন আমার দরকার ছিল শৃঙ্খল ছাড়ার আনন্দ উপভোগ করার, আর আগামীকাল থেকেই আবার দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুতি করার। [ক্লমশ]

* Parliamentary debates, 24 Feb. 1959, V. 600. 1081-39 and 28 April, 1959, V. 604. 1081-2

বাহুবলী

ভারতীয় দর্শন : অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামী। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা-নতুন দিল্লী। দাম—আট টাকা মাত্র।

দর্শন সম্পর্কে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মনে এখনও একটি জ্ঞানিত আছে। এ সম্পর্কিত ব্যাপক চর্চার অভাব থেকেই এই জ্ঞানিত। কেউ কেউ দর্শনের সঙ্গে ধর্মের অলঙ্কার পরিণয়ে সে সম্পর্কে কিছু আত্মসমীহিতাব বোধ করেন, কেউ বা দর্শনকে জীবনযাত্রার বহির্ভূত বিশেষ কোনো মনীষার আধাররূপে গ্রহণ করে নিশ্চিত থাকেন। আসলে দর্শন কি, বিশেষত ভারতীয় দর্শন বলতে কি বোঝায়, এ সম্পর্কে আমাদের দেশের পণ্ডিত-সমাজও পূর্ণমাত্রায় আলোকিত নন। তাঁরা যেটুকুও বা জানেন, তাও খণ্ড ও বিধাবিভক্তভাবে জানেন। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে যত বেশি অজ্ঞতা, পণ্ডিত-সমাজে তত বেশি তর্কবৃষ্টি। মূল দর্শনের জগতে কোনো পক্ষই এসে পৌঁছাতে পারছেন না।

এই অবস্থার মধ্যে অধ্যাপক নৃপেন্দ্র গোস্বামীর ‘ভারতীয় দর্শন’ গ্রন্থখানি এদেশের বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ এক আলোকপাত করেছে। যদিও তিনি স্নাতকপ্রার্থীর দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়সমূহকে সংক্ষিপ্তাকারে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে রচনারবহির্ভূত রাখার প্রয়াস পেয়েছেন, তবু ‘ভারতীয় দর্শন’-এর বিভিন্ন পর্যায়কে নানাভাঙ্গে বিভক্ত করে এক-একটি বিষয়কে ধরে ধরে যেভাবে তাকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তা এদেশের অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠকের জ্ঞানভাণ্ডার নিবারণে যেমন সহায়ক হবে, তেমন অনেক দ্রাব্ধি অশনোদনেও কার্যকরী হবে। ওও পৃষ্ঠাব্যাপী বিরাট ‘ছবিকা’ অংশে অধ্যাপক গোস্বামী অনেকাংশে নিজস্ব মত আরোপ করে ভারতীয় দর্শনে দৃষ্টবাদ, কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ,

মুর্তি, আত্মা, ব্রহ্ম, চৈতন্য, নীতিবাদ, সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে চর্চাক, জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, মীমাংসা, অদ্বৈত বেদান্ত ও রামানুজের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদের সম্পর্কে আলোচনা যেমন ব্যাপ্তিলাভ করেছে, তেমন ‘পরিশিষ্ট’ অংশে প্রমাণ-অপ্রমাণ, ভ্রম, যোগাচার, স্মৃতি-অস্মৃতি ও অসংখ্যাতবাদ এবং বৈতরন্যবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করে অধ্যাপক গোস্বামী ছাত্রসমাজের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের বহুকালের কণ্ঠ সন্তোষ, দ্রাব্ধি বিশ্বাস ও অনীহার উপর এক বিশেষ আলোক-সম্পাত করেছেন। এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করতে হলে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি যতখানি গ্রন্থাধীন হওয়া দরকার, তা অধিকমাত্রায় অধ্যাপক গোস্বামীর মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি। ধর্ম, দর্শন ও সমাজতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে প্রকাশিত তাঁর বৈদিক সমাজ ও সংস্কৃতি’ একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসেবে আমরা পেয়েছি। তিনি শ্রুত দর্শনেরই অধ্যাপক নন, মাত্রাতিরিক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ। অতএব ‘ভারতীয় দর্শন’ তার অনেক অপ্রাসঙ্গিকতা থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁর হাতে যে পরিশুদ্ধ রূপ পাবে, তা স্বাভাবিক। শ্রীবিদ্যারামের সেন-শাস্ত্রী রচিত ‘প্রাক-কখন’ সংযোজিত হওয়ার আলোচ্য গ্রন্থটির মর্মান্বী বান্ধি পেয়েছে। গ্রন্থশেষে প্রশ্নমালা সংযোজিত হওয়ার ছাত্রসমাজের প্রচুর উপকার হবে, সন্দেহ নেই। যারা দর্শনজগতের অভিব্যক্তি, আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁদের প্রথম সোপান হিসেবে একান্ত অপরিহার্য।

মনীষীদের কৌতুককথা : শৌরীন্দ্র-কুমার ঘোষ। ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বাল্মীকি চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

“এত ভগ্ন বগদেখ, তবু রপে

ভরা।” কিন্তু এখন এই কবিবাহাণী মিথ্যা হতে বসেছে। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দুঃখজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করে স্বনামধন্য বাঙালী মনীষীদের কয়েকজনের ছোট ছোট গুটিকতক কথার ভিতর দিয়ে তাঁদের গরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় দিয়েছেন যাতে আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্যেও সব কিছু ভুলে গিয়ে হেসে উঠে মনটো লঘু করতে পারি। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বাল্মীকিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দাশরথি রায়, ইন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ভুবন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎ পণ্ডিত প্রমুখ মনীষীদের কৌতুককথা পরিবেশিত হয়েছে। এই সব কৌতুককথার মধ্যে মনীষীদের জীবনের যে লঘু দিকটি উন্মোচিত হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রে রীতিমতো কৌতুহলোদ্দীপক এবং তাঁদের গণ্যগণ্যভাবে বোধবার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। এই গ্রন্থের কিছু কিছু কৌতুককথা পরিচিত হলেও অনেকগুলিই বিশেষ জানা নয়া এবং সবগুলি একসঙ্গে গ্রথিত হওয়ায় সত্যিই হাসির সুখকর আয়োজন হয়েছে বলা যায়।

বসন্তরাস : অবিনাশ মজা। পরিবেশক—ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বাল্মীকি চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—আড়াই টাকা।

‘প্রাণগল্লা’, ‘জীবনদেবতা’, ‘ঢাকাই গল্প’ প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের লেখক অবিনাশ সাহার ‘বসন্তরাস’ প্রেমের আকর্ষণীয় ছোট উপন্যাস। উত্তমপূরুষ লেখা ‘আমি’ এই এক সাংবাদিক (নিউজ ক্লন্টের বাতী সম্পাদক)-এর জীবনে পুরীষাঘ্রার মূর্ত্তে কি করে ব্যক্তিগত প্রেমের উদয় ও প্রতিষ্ঠা হল তাই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সাংবাদিক চলেছেন রেলপথে পুরী ভ্রমণে। রেলের কামরায় তাঁর সহযাত্রী হলেন একজন মহিলা। এই মহিলার উদাসীনী সাংবাদিককে দুর্বীরভাবে আকর্ষণ করলো যা ক্রমেই রূপান্তরিত হতে লাগল অনুরাগে। শেষ পর্যন্ত পুরীতে সাংবাদিকের পুরনো স্নেহপাত্রী শোভার দৌতো এই উদাসীনীই হলেন তাঁর কোণারক যাত্রার সঙ্গিনী এবং পরিশেষে জীবনসঙ্গিনী। মিলনান্তক কাহিনীটি হাস্যকর চলে বেশ দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হওয়ায় একঘেয়েমির আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা হয় নি এবং এক কথায় বেশ সুস্বাদু হয়েছে। কলা ও শোভার চরিত্র অঙ্কনে লেখকের স্বাভাবিক নৈপুণ্য দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না।



সুজনের মেজাজটা ভাল নেই।
মাসের ছাব্বিশ তারিখে কোন লোয়ার
ভিভিশন ক্রাকেরই বা মেজাজ ভাল
থাকে? অভাব-অনটন-খণ-এ্যাডভান্স—
এ সবই ত' তাদের জীবনে স্বাভাবিক।
প্রথম প্রথম অসহ্য লাগলেও
এক সময় এ সব গা-সওয়া
হয়ে যায়। সুজনেরও হয়ে
গেছে। কিন্তু আজ বুঝি তার সহ্যের
সেই পুরানো বাঁধটার কোথাও একটা
চিঁড় খেয়েছে। তার ভেতরকার মানুষটার
কোন একটা নরম জায়গার চোরা
ফাটলের ফাঁক দিয়ে সমস্ত বাঁধটা
বুঝি ভেংগে পড়তে চাইছে।

পিওনটা ঘন ঘন এসে তাগিদ দেয়,
সুজনবাবু! বড়বাবু এই ফাইলগুলো
তাড়াতাড়ি চাইছেন।

সুজন জানে সওদাগরী অফিসের
প্রত্যেকটি মূহুর্তের দাম আছে—প্রতিটি

কাজেরই লাভ-ক্ষতির অংক কষা আছে।
এনড্রু বার্ন কোম্পানীটা সত্যি যখন
বুটিশ সাহেবদের ছিল, তখনো হিসেব
কষা ছিল, কিন্তু যৌদিন থেকে দেশী
সাহেবদের হাতে কোম্পানী গেছে, সেদিন
থেকে কেবল লাভ-ক্ষতির হিসেবই
হয়েছে চুলচেরা, মানবিকতার হিসেবটা
গেছে হারিয়ে। বুকের মধ্যে কিসের
একটা যন্ত্রণা পাক খেয়ে ওঠে।

ফাইলের মধ্যে মন ডোবাতে চেষ্টা
করে সুজন। কিন্তু প্রতিক্ষণেই মার
করুণ মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে
ওঠে। মাই বা কেন মুখটা অমন কাতর
করতে গেলেন! লোয়ার ভিভিশন
ক্রাকের মা হয়ে অত সাধ কেন নাটিকে
নিয়ে? যত সব এঁদোপচা পাতি-
বুজোঁরা মানসিকতা! মা অবশ্য অত-
শত বোঝেন না! বুঝবেনই বা কি
করে—চাকা থাকতে কখনো ত' দারিদ্র্যের

সংগে পরিচয় হয় নি! দেশ ভাগ না
হলে কি সুজনও আজ কলম ঘা ?
অনামনস্ক হয়ে পড়ে সুজন। সু-
মাখা সেই দিনগুলো দেখতে চেষ্টা
করে, কিন্তু দৃষ্টি আপ্সা হয়ে আসে।
সে সব যেন অনেক দিনের পুরানো
ইতিহাস! আজকের বাস্তব সম্পূর্ণ
অন্য রকম। আজ তার টাকা চাই-
বোঁশ নয়, গোটা কুড়ি হলেই হবে।
কুড়িটা টাকাই বা কম কিসে? কে আজ
সুজনকে টাকা খার দেবে? খার
করার ত' কোন রাস্তাই বাকি রাখে নি!
খার না করাই বা কি করে সুজন? সেই
যে একদিন বাবা প্রমোবিসের ধাক্কায়
হঠাৎ মারা গেছেন, সেই থেকে ত' মার
শরীরে নিত্য নতুন ব্যাধি লেগেই আছে।
মার পুরো চিকিৎসাটাই কি সুজন
করতে পারছে? মার কথা মনে হতেই
চোখ ফেটে জল আসতে চায় সুজনের।
মা যেন কেমন সম্পূর্ণ বদলে ভিন্ন
একটা মানুষ হয়ে গেছেন। টাকা থাকতে
কি হাসিখুশিই না ছিলেন! আজ কি
তার শূকনো মুখটার দিকে তাকিয়ে
সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে? ভেংগে-
চুরে একেবারে দুমড়ে গেছে চেহারাটা।
সারাদিন বহু রোগের যন্ত্রণায় কষ্ট
পাচ্ছেন আর নানা রত্নের তছিলায়
উপোস করেই কাটিয়ে দিচ্ছেন মাসের
অর্ধেক দিন। একটা মানুষ যে কয়েকটা
ঘুরের মধ্যে এত বদলে যেতে পারে,

মাকে নিজের চোখে না দেখলে সুজন বিশ্বাসই করতে পারত না। মার দিকে চোখ তুলে তাকাতো পারে না সুজন। নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়। দূর থেকে মাকে দেখে ওর মনে হয় মার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন বাকি সৌমিত্র—সুজনের ছেলে।

আজকের সমস্যাটা সৌমিত্রকে নিয়েই। কোন এক আচার্য মশায় মাকে বলেছেন, সৌমিত্রকে হাতেমতি দেবার জন্য কালকের দিনটাই নাকি প্রশস্ত। অফিসে আমার ঠিক আগে অপরাধীর মত কাতর মুখ করে এই দঃসংবাদটা জানিয়েছেন মা।

সুজনের চোখের সামনে আবার তার মার সেই অসহায় ছবিটা ভেসে ওঠে—মিলন ঘুমে মা দাঁড়ানো আর কোলে সৌমিত্র, সুজনের একমাত্র সন্তান।

ভারতেও ভাল লাগে সুজনের, সৌমিত্র লেখাপড়া শিখবে—বড় হবে—আলোহাসিতে ঝলমল করবে! কাজে জুল হয়ে যায় সুজনের।

কই সুজনবাবু, আবার আসে পিওনটা, বড়বাবু ভীষণ রাগ করছেন যে!

দিচ্ছি—দিচ্ছি! ফাইলগুলোর মধ্যে অনোনবিশ করতে চেষ্টা করে সুজন।

কিন্তু মনটা আজ যেন কিছুতেই বশে আসতে চায় না। থেকে থেকে মনে পড়ে, মা বলছিলেন, সৌমিত্রই ত' আমার স্বপ্নপুরের বংশের একমাত্র প্রতীক—তাই ওর লেখাপড়ার শুরুর্তে বিধিযুক্ত হাতেখড়িটা দিতে চাই। ওর দাদু, মাকলে—কথাটা শেষ করতে পারেন নি মা। সুজনও সাহস করে তাকায় নি মার দিকে।

হঠাৎ বড়বাবুর দিকে চোখ পড়ে সুজনের। এ লোকটার নাকি অনেক টাকা! কিছ' ধার চাইলে হয় না ওর কাছে? কিন্তু কি খিলী কুতকুতে চোখ লোকটার! যেমন বিদ্যুৎটে মোটা শরীর তেমনি ভরাবহ জুসিসত এ চোখ দুটো! ছোট হলে কি হবে, চোখ দুটো কিন্তু অনবরতই চতুর্দিকে ঘুর-পাক খাচ্ছে। সতর্ক নজর রাখতে হবে না সব কেরানীদের উপর! এই ফাইল-গুলো জরুরী না ছাই! এই যে সুজন একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছে সেটা দূর থেকেই ধরতে পেরেছে ব্যাটা, আর ঠিক সে কারণেই এত ঘন ঘন তাগাদা। আজ এতদিন ধরে চাকরি করছে, লোকটাকে চেনে না সুজন? পাকীর হুকু এ লোকটা! ও বেবে টাকা? টাকা চাইলেই উদাস চোখ করে একটা জ্ঞান-কর্তৃকৃত্য দেখে—কেরানীর মত দাঁড়

কেন? কুজোর আমার চিং হয়ে শোওয়া? আর নয়ত কুতকুতে চোখ দুটো স্থির করে সোজা জিজ্ঞেস করবে, ধার যে চাইছ, শোখ দেবে কি করে? সারা মাস ধরে এ্যাডভান্স নিয়ে নিয়ে মাসকাবারে আমার মত মাইনের কি আর অবশিষ্ট কিছ' আছে? দূর ছাই! ও লোকটার কাছে টাকা চাওয়ার কোন মানে হয় না।

পিওনটা আবার এসে দাঁড়ায়। দুটো ফাইল ওর সামনে এঁগিয়ে দেয় সুজন।

: না সুজনবাবু, বড়বাবু ফাইল চান নিন, ছোট সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

: ছোট সাহেব? বলগে বা হাতের এই ফাইলটা সেরেই আসছি।

: না সুজনবাবু, বড়বাবু বলে দিয়েছেন আপনাকে এখুনি যেতে।

: ষাচ্ছি ফাইলটা ওলটাতে ওলটাতে বলে সুজন।

কী বদ লোক এ বড়বাবুটা—ছোট সাহেবের কানে ইতিমধ্যে লাগিয়ে দিয়েছে! জঘন্য! আরেকটা অপদার্থ লোক এ ছোট সাহেব। আমার জোরে চাকরি করে, তবু ডাট কত! এক পাতা ইংরেজী লিখতে পারে না কিন্তু বুক'নির চোটে ভুত পালায়। কোন কেরানীর সংগে ভদ্রভাবে কথা গব্যন্ত কর না।

সুজন ধরে ঢুকতেই ভূব, ক'চকে চিৎকার করে ওঠে ছোট সাহেব, কই হে, আমার সেই রিবেনট্রপ ইন্ডয়ার ফাইলটা তো আজও এসে পৌঁছয় নি আমার হাতে!

: আজ যে বড়বাবু অন্য কতক-গুলো ফাইল দিয়েছেন!

: হোয়াট? রাগে ফেটে পড়ে এন্ড্রু বার্ন কোম্পানীর ছোট সাহেব, আমার কাজ ফেলে তুমি বড়বাবুর কাজ করছ? আবার আমারই মুখের সামনে সেই কথা জাহির করে বলছ? শেমলেস! আই ওয়ান ইউ সুজন, এসব বেরাদবী সহ্য করার মত লোক আমি নই। কুড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড! ষাও, সব কাজ ফেলে দিয়ে এ ফাইলটা কম্প্লিট করে বিকেল চারটের মধ্যে আমার কাছে তুমি নিজে নিয়ে আসবে।

একবার বেল্লালঘড়িটার দিকে তাকায় সুজন।

: ঘড়ি দেখছ কি? ইট ইজ টুয়েল্ভ ও ক্লক মাউ। আই হ্যাভ গিভেন ইউ কোর আওয়ার টাইম।

মাথাটা নিচু করেই নিজের চেয়ারে এসে বসে সুজন।

সব কটা ফাইল ঠেলে সারিয়ে রিবেনট্রপ ইন্ডয়ার ফাইলগুলো নিয়ে বসে। এতগুলো চিঠি পড়ে তার ঘ্রীফ লিখে টাইপ করা কি চাটখানি কাজ! চার ঘণ্টা কেন, পুরো দু'দিনেও সম্ভব নয়। তবু করতে হবে—ছোট সাহেবের হুকুম।

ছোট সাহেবের চরিত্র জানতে বাকি নেই সুজনের। সুজন কেন, গোটা অফিসটাই জানে। নিজের পেটোয়া একটা জরঙ্গাবকে আঁককে ঢোকাবার জন্য কীভাবে অপমান করে লাহুয়ার মধ্য দিয়ে আশাবরঙ্গী ঐশ্বর মশায়ের চাকরিটা খেয়েছে ছোট সাহেব! বড়বাবু, কিন্তু এ ছোট সাহেবেরই অনুগত। বড়বাবুর মেজাজে ছেলের চাইতেও ছোট এই ছোট সাহেব। তবু ছোট সাহেবের সংগে এমন ব্যবহার করে বড়বাবু যে, দেখলেও গা ঘিন ঘিন করে। মানুষ যে কত বড় ইত্তর হতে পারে এদের দেখলেই তা বোঝা যায়। এই ত সৌদিন ছোট সাহেবের সংগে অফিসে এসেছিল তার বাম্ববী আর বাম্ববীর কুকুরটা। সেই কুকুরটাকে নিয়ে কি কাশুটাই করেছিল বড়বাবু—বিঃ বিঃ! শেষে শেষ ত আবেগের আতিশয্যে বড়বাবু বলেই ফেললে, স্যার—হে' হে' স্যার, সত্যি বলছি স্যার, আপনি স্যার, আপনি কুকুরটাকে এত ভালবাসেন দেখে আমার না স্যার, বড় ইচ্ছে হয় আপনার কুকুর হতে।

গাটা ঘালিয়ে ওঠে সুজনের।

রিবেনট্রপ ইন্ডয়ার ফাইলগুলো থেকে গ্রীফ তৈরি করতে থাকে। যে কাজ করতে পুরো দু'দিন সময়ের প্রয়োজন সে কাজ চার ঘণ্টার শেষ করতে না পারলে সুজনকেও যে ঐশ্বর মশায়ের মত লাহুনা ভোগ করে চাকরিটা খোয়াতে হবে, সুজন সে কথাটা ভাল করেই জানে।

টিফিন টাইমে সবাই যখন একে একে ক্যান্টিনে চলে গেল, সুজন তখনও বড়ের বেগে সমানে টাইপ করে চলে।

হাত-পাঠ কনকন করে। ঘড়ির দিকে সোজা চাইতে ভরসা পায় না। তবু আড়চোখে একবার দেখে সুজন। তখন সময় আড়ে তিনটা। সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম করতে থাকে সুজনের।

হঠাৎ একটা দৃষ্টান্ত সেটের আদকতামাখা গম্ব নাকে যেতেই চোখ তুলে তাকাল সুজন। ছোট সাহেবের সেই কুকুরীপ্রস বাম্ববীটি শীলারিত ভঙ্গীতে ছোট সাহেবের চেয়ারের দিকে তখন এঁগিয়ে বাঁছিল। সত্যি সুন্দরী

গাঙ্গাহিক বসুমতী

মেয়েটা! কিন্তু তাই বলে আপন দেহের যৌবনটুকু অমনভাবে অনাবৃত রেখে এতগুলো লোকের সামনে দিয়ে যেতে লজ্জা করে না ওর! নিজের মনকে চোখ রাঙায় সৃজন, ওসব সেকেন্দ্রে নীতিজ্ঞান তোমার হেঁসেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, সে সব এদের জন্য নয়! তবু কে যেন সৃজনের মনের মধ্যে ফিস ফিস করে ওঠে, মেয়েটার দেহ যত সুন্দর, ঠিক ততটাই কুৎসিত তার চরিত্র। আজকে এ সময়ে মেয়েটার এসে পড়াটা কিন্তু ভাল লাগে সৃজনের। একটা ক্ষীণ আশা মনের মধ্যে উর্ধ্বাধিক মারে—হয়তো এখন সব ভুলে যাবে ছোট সাহেব; আজ আর ডাক পড়বে না তার। একটু পিঠটা সোজা করে নিতে চায় সৃজন।

ছোট সাহেবের খাস আদালী এসে বলে, বাবুজী! সাব আপকো সেলাম দিয়া।

মুখ তুলে দেখে সৃজন ঘাড়িতে তখন চারটে।

ছোট সাহেবের সেলামের অর্থ সে বোঝে। একগাদা ফাইল বগলদাবা করে চোকে ছোট সাহেবের ঘরে। ব্রীফটা এগিয়ে দেয়।

ব্রীফটা হাতে পেয়ে একটু যে চমকে উঠেছিল ছোট সাহেব, সেটা নজর এড়ায় নি সৃজনের।

একগাল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ছোট সাহেব, দ্যাট্‌স্‌ লাইক এ গুড্‌ বয়! দেখলে ত ইয়ম্যান, উইল থাকলেই সব কাজ হয়!

বয়সের দিক থেকে ছোট সাহেবের সংগে সৃজনের ব্যবধান কয়েকটা মাসের বেশ নয়। একই বছর ওরা দু'জন ম্যাট্রিক পাশ করেছে—ছোট সাহেব কিশোরীলাল জুবিলী হাই স্কুল থেকে আর সৃজন সেন্ট থেরেসী'স স্কুল থেকে। দু'জন দু'জনকে তখন থেকেই চেনে। সৃজন যে তখন ঢাকার একটি উজ্জ্বল ব্রহ্ম! আজ অবশ্য সে সব কথা ছোট সাহেব ভুলে গেছে; সৃজনও মনে করাতে চায় না।

ব্রীফটা দেখতে দেখতে মুখের রেখা কঠিন হয়ে ওঠে ছোট সাহেবের, হোয়াট্‌স্‌ দীজ্‌? পিকউনিয়ারি সিঁজনজেন্স ডিউ টু রিসেস ইন দ্য ন্যাশনাল প্র্যানিং! আমি ত এ সব লিখিনি!

: না স্যার, আপনি লিখেছিলেন, কিনাশিয়াল ডিফিকাল্টিজ ডিউ টু ব্যাড বিজনেস!

: বেন—হু, হ্যাভ ডান ইউ?

মাথাটা নিচু করে বলে সৃজন, কোম্পানীর প্রেসিডেন্টের জন্য—

: দিস ইজ অডারিসিট—হাউ ইউ ডেয়ার টু কারেক্ট্‌ মাই রাইটিং—ইন্টেলারেন্স! তুমি যদি এতই ভাল ইংরেজি জান ত যাও না কেন স্কুলে বা কলেজে মাস্টারি করত—সে বিদ্যোৎ ত নেই! লুকু হিয়ার সৃজন, এ সমস্ত বেয়াদবী আমার সংগে করতে এসো না। ডোন্ট ফরগেট দ্যাট ইউ আর জাস্ট এ ক্লার্ক!

কানটা গরম হয়ে ওঠে সৃজনের! মুখটা একটু তুলতেই দেখে ছোট সাহেবের বান্ধবীটি একটা সিগারেট দাঁতে চেপে ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসছে। মাথাটা আবার নিচু হয়ে যায় তার। সৃজনের মনে হয় পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা আগুনের হস্কা যেন উঠছে।

কিন্তু সেখানেই শেষ নয়।

ব্রীফটা পড়তে পড়তে আবার ফিস্‌ হয়ে ওঠে ছোট সাহেব, হোয়াট্‌স্‌ দীজ্‌? ইউ হ্যাভ্‌ নট্‌ কপিড্‌ দীজ্‌ টু লেটার্‌স্‌?

: আগের চিঠিগুলোতেও একই বক্তব্য ছিল বলে শূদ্র রেফারেন্স দিয়ে গেছি।

: শাট আপ! কাজে ফাঁকি দিয়ে আবার সাফাই গাওয়া হচ্ছে! লিসেন্‌—শূদ্র টাকা চারিকেই চারি বলে না, কাজ চারিও চারি—এবং যে তা করে সেও চোর।

মাথাটা তুলে সোজা ছোট সাহেবের দিকে তাকায় সৃজন। কিন্তু মৈত্র মশায়ের কথাটা মনে হতেই নিজেকে সামলে নেয়।

: হোয়াট্‌ ফর ইউ আর লুকিং য়াট্‌ মী? ডু ইউ থিংক্‌ মি এ ফুল?

আপ্রাণ প্রয়াসে নিজেকে সংযত রাখে সৃজন। চাকরিটা খোয়া গেলে তার চলবে না।

সৃজনের নিঃশব্দতা কিন্তু ছোট সাহেবকে চূপ করাতে পারে না। ছোট সাহেব চিৎকার করে সেই একই কথা বলতে থাকে, ডু ইউ থিংক্‌ মি এ ফুল?

সহ্যার আগলটাকে শক্ত করে বেঁধে রাখতে চেয়েছিল সৃজন; কিন্তু হঠাৎ সেটা এক সময় ভেঙে গেল। সৃজন বলে, এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব? যদি আমার আপনার মধ্যে চেয়ার দুটো পাণ্টে নেওয়া সম্ভব হত, তা হলে অবশ্য বলতে পারতাম!

: হোয়াট্‌ ডু ইউ মীন? তোমার বেয়াদবী দেখছি সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আই সে ইউ গেট্‌ আউট—এন্ড্‌

রিমেম্বার—আই উইল সী ইউ!

ছোট সাহেবের চেম্বার থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে সৃজন। তৃষ্ণার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। অপমানের জ্বালাটা তীব্র হয়ে তার হৃদয়কে পুড়িয়ে থাক্‌ করে দিতে থাকলেও সান্ত্বনা পায় এই ভেবে যে বান্ধবীর সামনেই বেশ দু' কথা শুনিয়ে দিয়ে এসেছে ছোট সাহেবকে। কিন্তু তবু শান্তি পায় না সৃজন, মৈত্র মশায়ের মুখটাই বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

অফিস শূদ্র লোক ঘিরে ধরে তাকে ব্যাপারটা জানানো জন্য—ছোট সাহেব কি কি ভাষায় সৃজনকে গাল দিয়েছে শোনার জন্য।

সবাই খুব বাহবা দেয় সৃজনকে। সৃজন তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে—স্বার্থপরের দল! আমার চাকরিটা গেলে এক বেলাও ত তোমরা খাওয়াবে না, যেমন পারনি মৈত্র মশায়কে এক দানা সাহায্য করতে। কিন্তু মূখ ফুটে কিছ্‌ বলে না। এ সব কথা বলা চলে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে বাসায় ফিরতে পারে না সৃজন। সেই দুঃশ্চিন্তাটা পেয়ে বসে—টাকা চাই! সামান্য কটা টাকা আজ তার না হলেই চলবে না।

ঘুরতে ঘুরতে কলেজ স্কোয়ারে আদিনাথের দোকানের দিকে পা বাড়ায় সে। আদিনাথ তার বাল্যবন্ধু—কলকাতার বাবসা করে ভাল টাকা করেছে। যদি আজ সে কিছ্‌ ধার দেয় সৃজনকে!

আদিনাথের দোকানে ঢুকতেই কয়েকজন হৈ-হৈ করে উঠে—সবাই সৃজনের বাল্যবন্ধু, শূদ্র একজনকে সে চেনে না। সবাই যায় কমলা কোবনে। পথে ঐ অচেনা ভদ্রলোকটিকে দেখিয়ে বলে বন্ধুরা, জার্নিস সৃজন, আজ তুই খুব ভাল দিনে এসে পড়েছিস। এই যে দেখাছিস এই ভদ্রলোককে, এঁর নাম ওমপ্রকাশ। আদিনাথের ব্যবসা-জগতের বন্ধু। এই ভদ্রলোকের সংগে তুই যদি পাঞ্জা লড়ে জিততে পারিস ত তিরিশ টাকার বাজী জিতবি!

কে একজন বলে, শূদ্র তিরিশ কেন, ও-পিকে হারাতে পারলে সৃজনকে আমিই বেব পঞ্চাশ টাকা। বংশিল সৃজন, এটা আমাদের প্রেস্‌-টিসের ফাইট—আমরা কেউ ওর সংগে পারি নি।

লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখে সৃজন—এমন কিছ্‌, পালোয়ান ত নয়, বরং রোগাই বলা চলে। বাজী রেখে

দাণ্ডাহিক বসন্ত

পাঞ্জায় অনেক লোককে হারিয়েছে সৃজন। তখন অবশ্য সে বালক সংঘের আখ্যায় নিয়মিত ব্যায়াম করত। আজও নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে ভরসা পায় সৃজন। মনে মনে ভাবে ভালই হল, ধার-দেনা চাইতে হবে না, বজার টাকা বন্ধুদের খাইয়েও প্রয়োজন-ম ঘরে নিয়ে যাওয়া চলবে। মার সেই অপরাধী-অপরাধী মৃখটা আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সৌমিত্রর উজ্জ্বল মৃখটাও। ওদের সবাইকে আজ খুশি করতে পারবে সে—একটা তৃপ্তির স্বাদ পায় সৃজন।

কমলা কৈবিনের একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল সৃজন আর ওমপ্রকাশ। চারদিকে দাঁড়িয়ে রইল বন্ধুরা। প্রত্যেকের চোখেই দারুণ উত্তেজনা।

সৃজনের মনে হল ওমপ্রকাশ রোগা হলেও হাতে জোর রাখে। সৃজন আর ওমপ্রকাশের মর্দুর্ভব হাত দুটো কে'পে কে'পে উঠতে লাগল। বন্ধুদের উত্তেজনাও বেড়ে গেল। প্রায় মিনিট দুই পর ধীরে ধীরে সৃজনের হাতটা টেবিলের ওপর চিৎ করে ফেলল ওমপ্রকাশ। মাথার রগটা দপ্ দপ্ করতে থাকে সৃজনের। হাতে পাওয়া টাকার ফস্কে যাওয়ার বেদনাটা তার বুকে একটু বেশি করেই লাগে।

বন্ধুরাও ইতাসায় ঢুপ হয়ে যায়। এক গ্লাস জল খায় সৃজন।

তারপর ধীরে ধীরে বলে, বহুদিনের অভ্যাস নেই ত। ঠিক আছে ওমপ্রকাশবাব, আরেকবার টাই করা হোক—কি বলেন?

বিজয়ের আনন্দে সাগ্রহে হাতটা বাড়িয়ে দেয় ওমপ্রকাশ।

হাতটা কাত করে আনে সৃজন। ঐকান্তিক মানসিক আবেগে হাতের শিকারকে ছিঁড়ে ফেলার জন্তব আনন্দে সমস্ত দেহের শক্তি দিয়ে ওমপ্রকাশের হাতে চাপ দেয় সৃজন। দাঁত কামড়ে নিজের হাত সামলায় ওমপ্রকাশ। প্রায় মিনিট তিনেক বাদে সৃজনের কাঁপা কাঁপা হাতটাকে আবার চিৎ করে ফেলে টেবিলে।

পরাজয়ের গ্লানিতে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে সৃজনের হাতটা।

পাঞ্জার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে বন্ধুদের কাছে আর টাকা চাইতে পারেনি সৃজন। বুকের মধ্যে সেই বিকল বোঝাটা আবার চেপে বসে—হৃদয় ঠেলে কি যেন একটা বোরিয়ে আসতে চায়। পেটটার মধ্যেও যেন একটা আনোয়ার খ্যাপার মত ঘুরতে থাকে। ক্ষুধার্ত সে। অসহ্য।

অসহ্য এই টালিগজের ট্রামগুলো। কোন সময়ে একটু নিশ্চিন্তমনে দাঁড়ানো পর্যন্ত যায় না। দুটো লোক বিনা স্বিচায় সৃজনের পা মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। একবার ইচ্ছে হল সৃজনের ঠাস করে লোক দুটোর গালে চড় কাষিয়ে দেয়। কিন্তু পাঞ্জায় হেরে গিয়ে হাতে যেন আর জোর পায় না সে।

প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডের মোড় আসতেই বৃপ বৃপ করে নেমে পড়ে একগাদা লোক। নামে সৃজনও। তারপর কলাবাগানের দিকে ক্রান্ত দেহটাকে টেনে নিয়ে চলতে থাকে। মার কাতর মৃখটা মনে পড়ে তার—সৌমিত্রর উজ্জ্বল মৃখটাও। কোন অর্থ খুঁজে পায় না সৃজন এই সব পাতি-বুজোয়া সোঁটিমেণ্টের। এ সমস্তই পুঁজিহীন মধ্যবিত্তের বুজোয়া অনু-করণের নিলঞ্জ মনোবিলাস! নির্মম কঠিন হস্তে এ সব অর্থহীন বিলাস-বাসনা গুঁড়িয়ে দেবে সে। সংকল্পে দৃঢ় হয়ে ঘরে ফেরে।

সৃজনকে ফিরতে দেখেই ছুটে আসে সৌমিত্র, বাবা, ছেলেট এনেছ—খাবার বই?

সৃজন দেখতে পায় পাশের ঘর থেকে তৃষিত দৃষ্টিতে মা তাকিয়ে আছেন তার মূখের দিকে। কোন কিছুকেই গ্রাহ্য না করে পদব্রজে

বলে সৃজন, তোর মা কোথায়? আমায় খেতে দিতে বল।

পাশের ঘর থেকেই যন্ত্রণায় কোঁ কোঁ করতে করতে বলেন মা, বোঁমা এতক্ষণ তোর আশায় বসে থেকে এখন গেছে রায়েনের বাড়ি—যদি কিছু ধার পায়! তোর ঘরেই খাবার টাকা দেওয়া আছে।

সারাদিন মস্ত বড় হবার অনেক স্বপ্ন সৌমিত্রকে দেখিয়েছে ঠাকুমা। অনেক আশায় সৌমিত্র অস্থির। সে সৃজনের শার্টটা ধরে টানে, বাবা, আমার ছেলেট আননি কেন? আমি লিখব না! ছেলেটার আদেখলেপনায় সৃজনের সারা শরীর জ্বলে যায়, ঠাস ঠাস করে দুটো চড় বসিয়ে দেয় সৌমিত্র নরম পিঠে।

আচমকা বাবার এই অশ্রুত শাসনে কেঁদে ফেলে সৌমিত্র, বাবা, আমাকে মারলে!

সৌমিত্র চোখে জল! সমস্ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সৃজন। বেনোজলের টানে তলিয়ে যায় তার সকল সংকল্প—নিঃশেষ হয়ে যায় সমস্ত প্রত্যয়। আবার হেরে যায় সৃজন; আজ শুধু তার হারারই পালা। ছেলেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে, না বাবা, না—তোমায় মারি নি তো।

অশ্রুর বাষ্প সৃজনের শেষ কথা কয়টা মূখের মধ্যেই আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ভারতের শ্রেষ্ঠ...বেঙ্গল কেমিক্যালের সুচ্ছ গ্লিসারিন সাবান ব্যবহারে

আপনার ত্বক হবে
ফুলের মত কোমল...
আলোর মত উজ্জ্বল



বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী

Progressive/BC

লেনিন ও নাটক

সুমনজল চট্টোপাধ্যায়

‘বিপ্লবী’, ‘সাজা’, ‘কমিউনিস্ট’, ‘মাস্কবাদী পলিডট’ এবং ‘বিশ্ব শ্রমিক ও মূর্তি’ আন্দোলনের ‘মহান নেতা’ ছিলেই যে রসকষবিজ্ঞিত আবেগহীন তত্ত্ববাগীশ হতে হবে, মহামতি লেনিন এই ধারণার এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি ছিলেন সাধারণভাবে আবেগপ্রবণ, পরিহাসপ্রিয়, হাসিখুশি মানুষ। সাহিত্য-শিল্প-সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল দূর্বর্ষ। শিল্পাচার্য নিরবাক্ষর সুযোগ তিনি কোনদিন পান নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেবেলা থেকেই এই বরেন্দ্র মনীষীর ছিল এক অশ্চর্য শিল্পীমন, যে-মন নিসর্গ-প্রকৃতির সৌন্দর্যে ‘পাগল’ হইত, সংগীত আর বহুসংগীত শ্রুত্রে মগ্ন না হয়ে পারত না, শিল্প-সাহিত্যের অনাবিল রাজ্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াত।

শিল্পী-মনীষী লেনিন কিন্তু যে-কোন শিল্পকেই তারিফ করতেন না। জীবনরসবিজ্ঞিত, আবাস্তব, দূর্বোধ্য, মধ্যবিত্ত ভাবানুভূতি-আচ্ছন্ন এবং যুগোন্মী নৈতিকতাভরা সাহিত্য-নাটক-শিল্পের তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক। থিয়েটার দেখাকে তিনি

কোনদিন ‘যুগোন্মী-বিলাস’ বলে মনে করেন নি। আর্ট থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল খুব উচ্চ। তাঁর চর্যায় বছরের জীবনে অবসর প্রায় ছিলই না। তবু কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে থিয়েটারে যেতেন। কিন্তু শিল্পের নামে যা-ইচ্ছে-তাই পরিবেশিত হলে তিনি উঠে আসতে বাধ্য হতেন। তাঁর অসহ্য লাগত অভিনেতাদের অতি-অভিনয় দেখে। যে ম্যাকসিম গোর্কির তিনি ভক্ত ছিলেন, তাঁর ‘নিচের মহল’-এর অভিনয় দেখে লেনিন বেশ কিছুদিন থিয়েটারে যাওয়া বন্ধ রেখেছিলেন। চেকভের ‘চুস্তীতে বি’ বি’ নাটক ছিল রীতিমত জনপ্রিয়। এ-হেন নাটকও লেনিনের মনে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তিনি রীতিমত বিরক্ত হতেন নাটকের ভাব-স্বত্বতায়, সংগ্রামী জীবনের প্রতি উদাসীনতায় এবং পলায়নমুখীনতায়। আশ্চর্য-স্বত্ব সাহিত্য-শিল্পও তাঁর পছন্দ হইত না। আবার, ‘তলস্তয়ের জীবিত শব’, চেকভের ‘ভানিয়া কাফু’ তাঁকে মগ্ন করেছিল। তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন আরো কয়েকটি নাটক দেখে

যার মধ্যে ‘প্রলয়’ এবং ‘গাডোয়ান হেনশেল’ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্প সম্বন্ধে লেনিনের সূচিস্তত অভিমত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন রচনায় এবং বৈঠকী আলোচনা-আলোচনায়। কথা প্রসঙ্গে এবার তিনি প্রখ্যাত জার্মান সাম্যবাদিনী রারা সৎকিনকে বলেছিলেন— ‘Art belongs to the people. Its roots should be deeply im- planted in the very thick of the labouring masses. It should be understood and loved by these masses. It must unite and elevate their feelings, thoughts and will.’ অর্থাৎ শিল্প মানুষেরই সম্পদ। ব্যাপকতম মেহনতী জনতার গভীরে তার শিকড় যাওয়া দরকার। তাকে হতে হবে জনগণের বোধগম্য ও প্রিয়। তাদের অনুভূতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে সন্নিবিষ্ট ও উত্তীর্ণ করতে হবে তাকে।

আবার বিখ্যাত সোভিয়েত রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা আনাতলি ভাসিলিয়েভিচ লুনানচরস্কিকে ১৯০৫ সালে লেনিন বলেছিলেন, ‘শিল্প-ইতিহাস কী অপূর্ণ ক্ষেত্র! মাস্কবাদীদের পক্ষে এখানে কত কী-ই না করবার রয়েছে।’ কিন্তু প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ায় শিল্প-সংস্কৃতির উদার রাজ্যে খেটে-খাওয়া সম্রাট প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র পায় নি। জনগণ এবং সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে এক দূরত্বর ব্যবধান ছিল। যুগোন্মী সরকারের নির্মম অত্যাচারের ভয়ে শিল্পী-সাহিত্যিক শিল্প-সাহিত্য সর্পিষ্ট করত বাজারের জন্যে, জনতার জন্যে নয়। সাহিত্য-শিল্প-নাটক ছিল ঘরীর গৃহে-টাকার শেকলে বন্ধ। যে-শেকল মেহনতী মানুষের সুখ-দুঃখের ভাষা-কার এবং উন্মেষকার, তার পেছনে ছিল পুলিশের চশমানদৃষ্টি। সত্যেরা শিল্পের আনন্দ-যজ্ঞে শোষিত মানুষের নিমন্ত্রণ হত না।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে বিপ্লবী-প্রেরণ লেনিনের নেতৃত্বে সম্ভল হল মহত্তম বিপ্লব। শুরুর হল লেনিনের নেতৃত্বে পৃথিবী-রূপানো সর্বহারার মানুষের বিজয় অভিযান। বৈরাচার, শোষণ আর জমিদার-পুঁজিবাদ



লেনিন

সাহিত্যিক মনোমত

নির্মম অত্যাচার থেকে মুক্তি পেল খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষ। কোটি কোটি অজ্ঞ, নিরক্ষর মানুষ ভীড় জমালো বিদ্যাগানে। ঘুচে গেল শিল্প ও জনগণের বিরাট ব্যবধান। বিপ্লবের পীঠস্থান থেকে জন্ম নিল সত্যকারের প্রলোভনীয় কবি, শিল্পী, নাট্যকার।

নতুন এবং যথার্থ বস্তুবাদী গণ-শিল্পীকে লেনিন সাবর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বার বার বলেছেন—‘খনতন্য যে সংস্কৃতি রেখে গেছে, তার সবটাই আমাদের নিতে হবে এবং তাই দিয়েই গড়তে হবে সমাজতন্ত্র।...এ ছাড়া আমরা কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তুলতে পারব না।’ অষ্টোত্তর বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই লেনিন বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, যাতে দেশের পুরাতন সাংস্কৃতিক সম্পদ রক্ষা পায়। ‘একদিন ভ্লাদিমির ইলিচের আপিসে এসে বললাম’, স্মৃতিচারণ করেছেন লেনিন-চার্লসক, ‘বৈশেষ সেরা থিয়েটারগুলো খাঁচিয়ে রাখার জন্য সবশক্তি নিয়োগ করতে চাই।...ভ্লাদিমির ইলিচ মন দিয়ে আমার কথা শুনে বললেন যেন আমি ঠিক ওই নীতিটাই অনুসরণ করি, তবে বিপ্লবের প্রভাবে যে নতুন জন্ম হচ্ছে তাকে সমর্থনের কথা যেন না ভুলি।’

লেনিন চাইতেন নাটক এবং থিয়েটারগুলি মেহনতী মানুষের আনন্দের উৎস হয়ে উঠুক। কিন্তু যার প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক বিজয়লাভের পক্ষে অপরিহার্য তা বাদ দিয়ে শব্দমাত্র থিয়েটারের জন্যে অর্থ ব্যয় করতে তিনি সম্মত হতেন না। দেশ গঠনের প্রথমেই এই মহান কর্মযোগীকে বিশেষভাবে নজর দিতে হয়েছিল নিরক্ষরতা দূরীকরণের দিকে। তাই এ কঠোর সময়ে বলশয় থিয়েটারের জন্য বরাদ্দের অঙ্ক তিনি হ্রাস করে দিয়েছিলেন। শব্দ যে তা ‘একখণ্ড বিশুদ্ধ জমিদারী’ ছিল তা নয়, এর পেছনে ছিল এক গভীর তাৎপর্ষ্য, যা লেনিনচার্লসকে লেনিন সন্দেহভাবে ব্যাখ্যা করে দেন—‘পায়ের মামুলী সব স্কুল চালাবার মতো সম্পত্তি যেখানে জুটছে না, সেক্ষেত্রে প্রচুর টাকা দিয়ে অমন সাদৃশ্যের একটি থিয়েটার পোষা সাজে না।’ লেনিনের বিপ্লবী মন প্রথমেই চেয়েছিল নির্বাহিত, শোষিত, অজ্ঞ মানুষ সর্বপ্রথমে আলোকপ্রাপ্ত হয়ে উঠুক। না হলে ব্যর্থ হবে সমাজতন্ত্র, ধসে পড়বে গণতন্ত্রের বনিয়াদ। ফ্রাংস সের্গিনকেও তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন—‘একদিকে ম স্কোতে

আল দশ হাজার, কাল আরো দশ হাজার লোক যখন আমাদের থিয়েটারগুলির চমৎকার অভিনয় দেখে আনন্দে আত্ম-হারা হচ্ছে, কোটি কোটি লোক তখন শিখতে চেষ্টা করছে নিজের নামের বানান আর এক-দুই গুণতে; পৃথিবী যে সমতল নয়, গোল এবং ডাইনি, যাদুকের আর এক ‘স্বর্গীয় পিতা’ দ্বারা তা শাসিত হয় না, শাসিত হয় প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা, চেষ্টা করছে সেইটুকু জানার মতো সংস্কৃতি অর্জন করতে।’

লেনিন দেখে যেতে পারেন নি তাঁর অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়েছে। অতি দ্রুত অপসারিত হয়েছে রাশিয়ার নিরক্ষরতা, আর গড়ে উঠেছে শিল্প-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর রাজ্য।

‘আমাদের সংবাদপত্রগুলির চরিত্র’ প্রবন্ধের একস্থানে লেনিন যে উপদেশ

আর পঞ্চদশে দিয়েছেন, তা শব্দমাত্র সাংবাদিকদেরই নয়, সব দেশের কবি-শিল্পী-নাট্যকারের আদর্শ হওয়া উচিত—‘আরো ঘনিষ্ঠ হও জীবনের সঙ্গে। প্রমিক ও কৃষকেরা তাদের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়ে, বাস্তবক্ষেত্রে যে নতুনকে গড়ে তুলেছে, তার প্রতি আরো নজর দাও...।’ তবেই রচিত হবে যথার্থ গণ-সাহিত্য। তবে সৃষ্টি হবে বিদেশ থেকে ধার করা কৃত্রিম উপাদানের পরিবর্তে, দেশের খুলো-কাদা-মাথা, ঘাম-ঝরা মেহনতী মানুষের আশ্চর্য জীবনবেদ, তাদের জীবনের চিরন্তন পৌষ-ফাগুনের পালা।*

* [সুদৃশ্যগল চট্টোপাধ্যায় এ-বছর মস্কো রেডিও থেকে লেনিনের জীবন ও কার্যাবলী সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতায় পুরস্কার লাভ করেছেন।]

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

বহুকাল পরে সদ্য প্রকাশিত হইল।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত

বাঙলা ও বঙ্গ-সাহিত্যের এই অধিতীয় গ্রন্থখানি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন ছিল। অনুসন্ধানীরা দীর্ঘকাল এর অভাব বোধ করছিলেন। সেই অভাব পূরণ করার জন্য অক্ষয়কুমারের বিভিন্ন উপাসক-সম্প্রদায়ের বিবরণ সম্পূর্ণ এক খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৭ ॥ মূল্য কুড়ি টাকা। মূল্যবান কাগজে লাইনো টাইপে ছাপা। প্রচুর চিত্র সম্বলিত। বোর্ড বাঁধাই।

বিনয় ঘোষ সম্পাদিত

বসুধাতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সাগ্রাল এণ্ড কোং ॥ কলিকাতা-৯

উপাসক-সম্প্রদায়। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়

বঙ্গমুকুট

মিলি নি ৪ দিলে

জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গ্রীসের সেরা নাট্যকারেরা তাঁদের বিবাদান্তক নাটকগুলিতে কাব্য, সংগীত এবং নৃত্যের অশ্রুত সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। অভিনয়ের সময় নটেরা কখনো কখনো একটি বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁদের সংলাপ আবৃত্তি করতেন। এই সংলাপের সঙ্গে ধীরে ধীরে লাগার অথবা বাঁশী বাজানো হত। প্রাচীন গ্রীসের এই নাট্যীয় রীতি যুরোপের মানুষ এক সময় ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু রেনেসাঁসের সময় থেকে গ্রীক সভ্যতা সম্পর্কে যুরোপীয়দের তাঁর অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং সংগীতজ্ঞ ফ্রেন্সেস কাউন্ট বার্নার্ড নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে মিলিত হয়েছিলেন। ইতিহাসে এই সম্প্রদায় 'ক্যামেরেটা' নামে পরিচিত। অগামী যুগের সংগীতে এঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

ক্যামেরেটা সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, দর্শকেরা যতক্ষণ না একটি নাটকের গান ভাল করে শুনতে পান ততক্ষণ তাঁদের পক্ষে নাটকটির রস সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই গোড়াতে কি করে দর্শকদের সন্তোষভাবে নাটকের গান শোনাতে যায় সে চেষ্টা তারা করেছিলেন। রিগিচিনির 'ইউরিডিস' কাব্যটিতে সুরাধিপ করে জ্যাকোপে পেরী নামে 'ক্যামেরেটা'র এক সভ্য যে গানগুলি রচনা করেছিলেন, সৃষ্টিমূলক কাজ হিসাবে তা হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে রাসোত্তীর্ণ। বিভিন্ন চরিত্র গানের মাধ্যমে স্বেমন করে এ কাব্যকাহিনীতে বর্ণনা করেছিলেন তা ছিল সত্যিই অশ্রুতপূর্ব। পেরীর রচিত এই সংগীত ১৬০০ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্থ হেনরী এবং মারিয়া দ্য মেদিচির বিবাহ উপলক্ষে ফ্রেন্সেস অনীত হতে হয়েছিল। গ্রীক নাটকের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা হিসাবে এটি ব্যর্থ হলেও এর মধ্য দিয়েই মলিতকলার ওপেরা নামে এক নতুন শাখার জন্ম হয়।

ওপেরার একটি নিজস্ব ইতিবৃত্ত আছে। সেখানে আমরা দেখি যে, বহু বিখ্যাত সরকার সংগীতের এই শাখার সম্মান্যতম সাফল্য স্বর্জন করতে পারেন

নি। যুরোপের সেরা সুরকারদের মধ্যে অনেকে একটিও ওপেরা রচনা করতে পারেন নি। বাষ একটিও ওপেরা লেখেন নি। বিটোফেনের একমাত্র রচনা হল 'ফিডেলিও'। ফিডেলিওর প্রথম অনাটন হয়েছিল ভিয়েনা, ১৮০৫ খৃস্টাব্দে। The Oxford Companion To Music-এ আছে—The composer made four attempts at the overture, in the following order, employing the accepted but incorrect enumerations: Leonora No. 2 (1805), Leonora No. 3 (1806), Leonara No. 1 (1807), Fidelio (1814): The last is the one now always used with the opera, but Leonora No. 3 (The most developed and finest) is sometimes interpolated between the acts. The libretto is by Sonnleithner, alter the French play by Bonilly, Leonore, on l' amour conjugal.

The Spanish nobleman Florestan, having incurred the hatred of Pizarro, has been secretly lodged in the prison of which his enemy is the Governor. Pizarro has given it out that Florestan is dead, but the nobleman's devoted wife, Leonora, suspects the truth, and, disguising herself as a boy and calling herself 'Fidelio', she gets employment in the prison as assistant to the chief jailor, Rocco.

The only other solo characters during the greater part of the opera are Rocco's daughter, Marcellina; and her assistant-jailor lover, Jaquino. বিটোফেন মূলত বিশুদ্ধ সংগীতের দ্রষ্টা ছিলেন। তাই তাঁর প্রতিভার যে পূর্ণতা তাঁর রচিত সিমফনি বা কনচাটোনিতে অনুভব করা যায় এটিতে তার অভাব কিছুটা পরিলক্ষিত হয়।

মোটমুঠ বিটোফেনের পূর্বসূরী।

তিনি একাধিক ওপেরা রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর ওপেরাগুলির মধ্যে 'ম্যাজিক ফ্লট সর্বশ্রেষ্ঠ। মিশরের রাজপুত্র টামিনো এবং 'রাব্রের রাশী' পামিনার কন্যা প্রেমকাহিনী এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভা ওপেরা বলতে মোটসার্ট বুদ্ধতেন—an opera is sure of success when the plot is well worked out, the words written solely for the music and not shoved in here and there to suit some miserable rhyme... Verses are indeed the most indispensable element for music—but rhymes—solely for the sake of rhyming—the most detrimental. এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছিলেন—The best thing of all is when a good composer, who understands the stage and is talented enough to make sound suggestion, meets an able poet, that true phoenix; in that case no fears need be entertained as to the applause even of the ignorant. স্বর্গাচল ওপেরা-গুলিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলার জন্য তাঁর চেষ্টার দ্রুতি ছিল না। মোটসার্ট যদিও খুব বেশি ওপেরা রচনা করেন নি, কিন্তু 'দি ম্যারেজ অফ ফিগারো' অথবা 'ডন গিয়োভানি' তাঁকে চিরস্মরণীয় সুরকাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ১৮৯১ খৃস্টাব্দে মোটসার্ট সেন্টিনারী উপলক্ষে জর্জ বার্নার্ড শ একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন: There are operas... on which you can put your finger and say, 'Here is final perfection in this manner; and nobody, whatever his genius may be, will ever get a step further on there lines.' এই প্রবন্ধটির উপসংহারে বার্নার্ড শ লিখেছিলেন—In my small boyhood I by good luck had an opportunity of learning the Don thoroughly, and if it were only for the sense of the value of fine workmanship which I gained from it, I should still esteem that lesson the most important part of my education. Indeed it educated me artistically in all sorts of ways, and disqualified me only in one—that of criticizing Mozart fairly. Everyone appears a sentimental, hysterical bungler in comparison when anything

সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধু

brings his finest work vividly back to me. মাদ্র তের বছর বয়স থেকে মোটিনাট ওপেরা রচনা শুরু করেছিলেন। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তার অকালমৃত্যুর সঙ্গে সংগীতের অন্যান্য শাখাগুলির সাথে ওপেরারও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

মোটিনাটের আগে যেসব জার্মান

সুরকার ওপেরা রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে হাণ্ডেল এবং হাইডেলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এরা কেউই সার্থক ওপেরা রচয়িতা ছিলেন না, তাই এঁদের রচনাগুলির কথা সবাই আজ ভুলে গিয়েছে। হাণ্ডেল জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেও জীবনের দীর্ঘতম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সময় ইংল্যান্ডেই

কটিরেছিলেন এবং সেজন্য ইংরাজরা তাঁকে ইংরাজ সুরকার বলেই দাবি করে থাকেন। পারসেলের মৃত্যুর পর প্রথমবার ইংল্যান্ড ভ্রমণে গিয়ে মাদ্র পনেরো দিনের মধ্যে রিনাল্ডো নামে যে ওপেরাটি তিনি রচনা করেছিলেন, তা ইংরাজ জাতিকে বিমোহিত করেছিল। এমন ওপেরা ইংল্যান্ডে কখনো অনুষ্ঠিত হয় নি। এটি প্রকাশ

“যে অন্যদের ঘৃণা করে
ঘৃণা তাকেই আঘাত দেয়
ঘৃণিতকে নয়”

মহাত্মা গান্ধী



দ্বয়ে এক ইংরাজ ভদ্রলোক এত অর্থ উপার্জন করেছিলেন যে, হাৎডেল তাঁকে নারিক বলােছিলেন—‘এর পরের বার আপনি ওপেরা রচনা করবেন আর প্রকাশনার ভার গ্রহণ করব আমি।’ লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর The Royal Academy of Music নামে একটি বড় ওপেরা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন হাৎডেল। এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি ওপেরাও তিনি লিখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হন নি। এর জন্য দু’বার সর্বস্ব হারিয়ে দেউলিয়া হতেও হয়েছিল। বিখ্যাত যন্ত্রসঙ্গীত রচয়িতাদের মধ্যে সন্মানের ‘গেনোভেভা’ নামে একটি ওপেরা আছে। কিন্তু এটিকেও সন্মানের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির পাশে স্থান দেওয়া যায় না। ওপেরা রচয়িতাদের মাঝে সবাব সেরা আসনটি নির্দিষ্ট দখল করে আছেন, তাঁর নাম রিখার্ড ভাগনার। ভাগনারের জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করার আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর ওপেরা সম্পর্কে দু’একটি কথা বলা প্রয়োজন। ঊনিশ শতকের জার্মান ওপেরার মজাজ ছিল পুরোপুরি রোমান্টিক। গ্রান্ড ওপেরার ঈশতির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রণীর হালকা গীতিনাট্যও সে যুগে লোকপ্রিয়তা লাভ করে। হেববার, স্কেফার এবং মারসনার এ যুগের শ্রেষ্ঠ রচয়িতার স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রাচীন কমেডি থেকে Opera buffa (হাসির ওপেরা) রচিত হবার পরিবর্তিকালের মধ্যে গ্রান্ড ওপেরার নির্ভিন্ন অঙ্কের মাঝে কিছু কমিক চরিত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হ’ত। ক্লাসিকাল ওপেরার সর্বপ্রকার আটাইটিকে বাদ দিয়ে এ সময় থেকেই ওপেরার সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নিবিড়তর যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল।

ভাল ওপেরার অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র কিছু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করলেই চলে না। সুন্দর কাব্যের সাহায্যে তার আখ্যানভাগটিও বর্ণনা করতে হয়। তাই ওপেরার মূলত দু’টি ভাগ থাকে—(১) বর্ণনাত্মক অংশ এবং (২) লিরিক অংশ। বর্ণনাত্মক অংশটির নাম Recitative. তার মাধ্যমেই ওপেরার কাহিনী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা যায়। আর লিরিক অংশটির নাম Aria. ওপেরার সাঙ্গীতিক সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলার জন্য সুরচিত Aria অপরিহার্য। ঊনিশ শতকের ওপেরা রচয়িতারা অশ্রুভাবে প্রাচীন রীতি অনুসারে recitative এবং aria রচনা না করে স্বাভাবিকভাবে সংলাপ লিখতে শুরু করেন। জার্মানীর হাসির ওপেরার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল মোটসার্টের ‘দি ম্যারেজ অফ ফিগারো’ এবং গিঁ ম্যাজিক ফ্লিউট।

হাসির ওপেরার সাথে Opera

Comique-এর একটা পার্থক্য আছে। Opera Comique সব সময় হাস্য-রসাত্মক হয় না। গ্রান্ড ওপেরার সঙ্গে তার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে গেলে একথাই বলা উচিত যে, গ্রান্ড ওপেরার মত Opera Comique-এর সব সংলাপ গীত না হয়ে কিছু কিছু অংশ সাধারণভাবে কথা বলার ভঙ্গিতেও বক্তৃতা হয়ে থাকে। জার্মান ‘সিগলস্পিল’ (নাট্য-গীতি)-এর মধ্যে এর দু’টি ভাল উদাহরণ হল বিটোফেনের ‘ফিডেলিও’ এবং হেববারের ‘ডেয়ার ফ্রাইস্টেজ’।

তারিখ-সালের হিসাবে ভাগনারকে জার্মানীর সর্বপ্রথম ওপেরা রচয়িতা বলা চলে না। তবে স্থায়ী প্রতিভার বলে জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ ওপেরা রচয়িতার স্থানটি তিনি অনায়াসেই দখল করে নিয়েছিলেন। ভাগনারের জীবন ও কর্মের মাঝে এমন এক বিচিত্র যোগাযোগ রয়েছে যে, তাঁর শিল্প-কর্মের অনুধাবন করতে গেলে তাঁর জীবনীচর্চার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। ভাগনার সম্পর্কে দীপঙ্কর সেন তাঁর ‘য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কাহিনী’ গ্রন্থে লিখেছেন:

রুশন ক্ষীণদেহী মানুষটির সারা শরীরের মধ্যে প্রকাণ্ড মাথাটিই প্রথম চোখে পড়ত। মানাবিধ অসুস্থতার মাঝে স্নায়বিক ব্যাধি এবং চর্মরোগে তিনি সবচেয়ে বেশি ভুগেছেন। চর্মরোগের ফলস্বরূপ সিন্ধু ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে তাঁর অস্তবাস পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করতে পারতেন না। তাঁর আত্মশ্রুতি ছিল অতি প্রবল। নিজেকে বাদ দিয়ে অন্য কোন বিষয়ে চিন্তা করতেও তিনি পারতেন না। মনে করতেন তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, সুরকার এবং দার্শনিক। তাঁর কথা শুনে মনে হ’ত একই দেহে যেন সেন্সপারার, বিটোফেন এবং প্রেটো বিরাজ করছেন, আর কথা শুনবার জন্য কারুর অপেক্ষা করে থাকতে হ’ত না। কারণ, তাঁর মত বাক্যবাণীশ সচরাচর চমকতে পাওয়া যায় না। কথাটা তিনি ভালই বলতেন, তাই আলাপ-আলোচনা করতে এসে সবারই প্রোতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হ’ত। এসব আলোচনা যেখান থেকেই শুরু হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাঁকে ঘিরে এবং নানা বিষয়ে তাঁর ধ্যান-ধারণার পর্যালোচনায় গিয়ে পরিসমাপ্তি লাভ করত।

ভাগনারের বাবা ছিলেন লাইপজিগের একজন পুলিশ অফিসার। ভাগনারের জন্মের কয়েক মাস পরেই তিনি মারা যান। এ ঘটনার কিছুদিন বাদে তাঁর বিধবা পত্নী লুডভিক গেরার নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। গেরার শক্তির অভিনেতা ছিলেন। তাঁর ছবি আঁকার হাত ভাল ছিল এবং তিনি কবিতাও লিখতেন।

কেউ কেউ ভাগনারকে ‘গেরারের অর্ধসন্তান’ বলেছেন, কিন্তু একবার কোন প্রমাণ নেই। তবে গেরার ভাগনারকে অত্যধিক স্নেহ করতেন এবং নানাভাবে তাঁকে ভুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। শৈশবে ভাগনারের প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি, তবে নিতান্ত শিশুকাল থেকেই পড়াশুনায় তাঁর খুব ‘ঝোঁক’ ছিল। গ্রীক ভাষা ভাল লাগত বলে বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের বাইরে অনেক কিছুই তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন। সেন্সপারারের মূল রচনার অসাধারণ আগ্রহ ছিল বলে খুব বয়স সহকারে ইংরাজী শিখেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে রোমিও এ্যান্ড জুলিয়েটের কিছু অংশ জার্মান ভাষায় তর্জমাও করেছিলেন। জার্মান কাব্য, ইতিহাস এবং ভূগোল পড়তেও তাঁর ভাল লাগত। স্কুলে থাকতে থাকতেই কয়েকখানি নাটক তিনি রচনা করেছিলেন এবং স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সঙ্গীতশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তখনও শিল্প-কর্মে তেমন মন দেন নি।

উদ্দেশ্যহীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল টমাস স্কুলের সঙ্গীত-শিক্ষক ভাইর্নালিগের শিক্ষায় গ্রহণ করার পর। তিনিই ভাগনারকে প্রথম পথের সন্ধান দেন। কাউন্টার পয়েন্ট নিয়ে গবেষণা শুরু হল। একটি মোনাটা, একটি পলনেইজ এবং ফ্যান্টাসিয়া রচনা করার পর একখানা সিমফনি লিখে ফেললেন ভাগনার। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গেভার্ড হাউস ওপেরাতে এটি অনাতিষ্ঠিত হয়েছিল। উরটজবুর্গ থিয়েটারে তাঁর বড় ভাই অভিনয় করতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ভাগনার সেখানকার কোরাস মাস্টারের পদটি লাভ করেন। চাকরির জন্য নানা শহরে সফর করতে হ’ত। মাগডেবুর্গ শহরে মিনা প্রানার নামে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কিছুদিন পরে তিনি এই মহিলাকে বিবাহ করেন। প্যারিসে মেয়ার বিয়ারের লোকপ্রিয়তার কথা শুনে রিয়েনটজি ওপেরাখানি নিয়ে তিনি সেখানে গেলেন। আশা ছিল ফরাসী প্রোতারার তাঁকেও সমাদর করবেন। কিন্তু সেদিক থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে হতাশ হন। স্বয়ং মেয়ার বিয়ার সর্বপ্রকারে সাহায্য করা সত্ত্বেও প্যারিস সফরে তিনি একটুও সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। ভাগনারের মধ্যে কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল না বলেও চলে। কারণ, এ ঘটনার ১৩ বছর পরে তাঁর ‘ওপার উনট্র ড্রামা’ গ্রন্থে তিনি মেয়ার বিয়ারকে কৃতিত্ব ভাষায় সমালোচনা করেন। প্যারিসে বহু সংগ্রামের পরও আশার আলো দেখতে না পেয়ে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন।

[কম্প]

সিনেমাগুলির অবস্থা

টিকেট কিনে দর্শকরা সিনেমা দেখেন। দর্শকরা যেমন আরাম কামনা করেন, তেমনি তাঁদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার বিষয়ে হাউসের কর্তৃপক্ষ সচেতন আছেন মনে করে নিশ্চিন্ত থাকেন। যদি কিছুর অসুবিধা মনে হয়, অল্প সময়ের মধ্যে প্রতিবাদ জানাবার মত সুযোগ থাকে না। অনেক প্রেক্ষাগৃহের কর্তৃপক্ষ কিন্তু দর্শকদের বিশ্বাস রাখা করেন না। দর্শকদের স্বাস্থ্যের নিরাপত্তার জন্য যে সব বিধি আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট নজর দেন না। কর্মচারীদের ব্যাপারেও তাঁরা আরো বেশি উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি নিয়োজিত এক সাব-কমিটি শহরের বিভিন্ন সিনেমা পরিদর্শন করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেল।

এই সব কর্মিটির সদস্যরা শহরের কয়েকটি সিনেমায় গিয়ে দেখেছেন—যে ঘর থেকে ছবি দেখান হয় অর্থাৎ প্রজেকশন-রুম, তার অবস্থা ভয়াবহ। হাওয়ার চলাচলের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়, কার্বন জ্বলার জন্য যে গ্যাস সৃষ্টি হয় তা বেরিয়ে যাবার ভলা ব্যবস্থা নেই এবং প্রজেকশনের ব্যবস্থা ঠিক বিধি অনুসারে হয় না। বাঁরা প্রজেকশন-রুমে কাজ করেন তাঁদের নড়াচড়ার জায়গা পর্যন্ত নেই। ফলে প্রজেকশন-রুমের কর্মীদের বস্ত্র ঘরে-দমে আটকানো অবস্থায়, গরমের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই প্রজেকশন কর্মীদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। এইভাবেই অপারেটর এবং প্রজেকশন-রুমের কর্মীরা দর্শকদের চিড়িবিদোদনের জন্য কাজ করে যান। এই অব্যবস্থার কথা জানা বা ভাববার সুযোগও কারো থাকে না। সারা কলকাতায় এই অব্যবস্থা থেকে মুক্ত এমন সিনেমার সংখ্যা কয়েকটির বেশি নেই।

এই অবস্থা কর্মচারীদের জন্য ভয়াবহ। কিন্তু দর্শকদের ব্যাপারেও কম বিপদের নয়। এই অব্যবস্থার মধ্যে ভাল প্রজেকশন হয় না, ফলে অনেক সময় দর্শকদের চোখের ওপর আঘাত পড়ে। অবৈজ্ঞানিক প্রজেকশন-রুম থেকে যে কোন সময় বিপদও হতে পারে। যে সব সিনেমায় তাপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে তা কেবলমাত্র প্রেক্ষাগৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। লবী তাপনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মধ্যে যুক্ত নয়। ফলে কর্মচারীদের ঘর্মাক্ত হয়ে কাজ করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। আর দর্শকরা যখন লবীতে অপেক্ষা করেন তাঁদেরও কষ্ট হয়। এখনো কলকাতা শহরে এমন সিনেমার সংখ্যা কম নয়, যেগুলিতে তাপনিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। এমন কি বহু লোক সমাগমে যে গ্যাস সৃষ্টি হয় তা নিগমনের ব্যবস্থাও যথোপযুক্ত নেই। অধিবেশিত এবং শহরের গরীব সমাজের লোকেরা এসব সিনেমার দর্শক। এই অবস্থার ফলে মেহনতি মানুষের পরিবারগুলির স্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকারক চাপ পড়ে। কয়েকঘণ্টার আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে স্বাস্থ্যের হানিকর পরিবেশে থাকতে বাধ্য হন। মফস্বলের সিনেমাগুলির অবস্থা বলার নয়। সেগুলির অবস্থা আরো খারাপ। প্রেক্ষাগৃহের ভেতরকার পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও কোন কোন সিনেমা কর্তৃপক্ষ নজর দেন না। বীজাণুনাশক ওষুধ দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে পরিশোধন করার নিয়ম। কিন্তু সব সিনেমায় এই নিয়ম যে প্রতিদিন মানা হয় তা মনে হয় না।

চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটির সাব-কমিটি নাকি আরো লক্ষ্য করেছেন যে, অধিকাংশ সিনেমায় কর্মচারীদের ইউনি-ফর্ম নেই, তাঁদের বিগ্রামের জন্য ঘর নেই এবং ওয়েলফেয়ারের ব্যবস্থা নেই। তার জন্য যত নিয়মকানুন থাকুক সিনেমা মালিকরা ব্যাপ্য়গুস্ত দেখিয়ে চলেছেন।



লিলা চক্রবর্তী 'ভানু গোয়েন্দা' জহর গ্র্যান্ডস্ট্যান্ডে ছবিতে।

এই অবস্থার বিরুদ্ধে দর্শকদের কিছু বলার আছে। কারণ পয়সা দিয়ে সিনেমায় গিয়ে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের শিকার তাঁরা হতে পারেন না। চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটির সাব-কমিটির রিপোর্টের ওপর সরকার গুরুত্ব দিয়ে নজর দেবেন আশা করি। এতে কর্মচারী এবং দর্শক—উভয়ের প্রশ্ন জড়িত।

—সুজন।

লাইপৎসিক অপেরাগোষ্ঠী

লাইপৎসিক অপেরা সব সময়েই মানুষকে সাদরে গ্রহণ করেছে। আবার লগ্নে লগ্নে ঐতিহ্যের চর্চা করে এসেছে। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে লাইপৎসিক অপেরার এই খ্যাতি বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। আজকের দিনে জার্মানি বিশ্ব বাস্তববাদী সম্প্রীতি-নাট্যের কথা বলতে হলে একই নিম্বাসে দুটি প্রতিষ্ঠানের নাম করতে হয় : লাইপৎসিক অপেরা ও বার্লিনের কোমিশি অপেরা।

১৯৬০ সালের শরৎকালে লাইপৎসিক অপেরাগোষ্ঠী শহরের কেন্দ্রস্থলে নতুন জাঁকজমকপূর্ণ ভবনে উঠে আসে। ১৭০০টি আসনবিশিষ্ট শব্দবিজ্ঞানসম্মত প্রেক্ষাগৃহ, মহলার মঞ্চ, কারখানা ও কর্মীদের জন্য সমাজ-কল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধা সব মিলিয়ে নতুন ভবনে কাজের অবস্থা ছিল অপেরার পক্ষে আদর্শস্থানীয়।

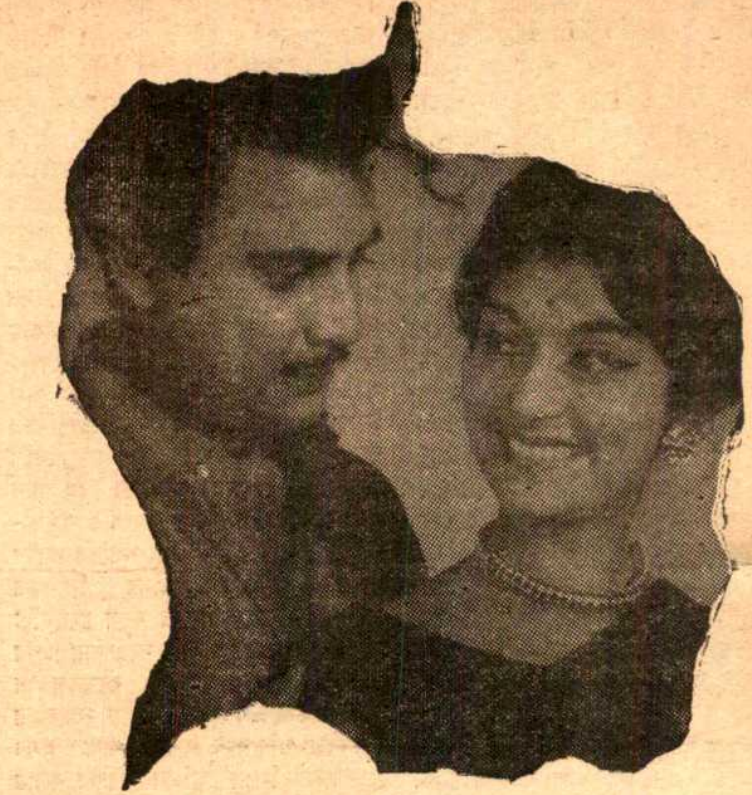


সাপ্তাহিক বঙ্গবতী

একই সময়ে এলেন একজন নতুন 'কর্তা' অপেরা পরিচালক ইওয়ার্থম হার্ৎস। তিনি এসে লাইপৎসিকের অপেরাগোষ্ঠীতে ও অপেরা ঐতিহ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করলেন।

হার্ৎস হচ্ছেন প্রফেসর ফেলাঙ্গন-স্টাইনের শিষ্য। বার্লিনের কোমিশ্যে অপেরা এখনো পর্যন্ত তাঁকে মঞ্চ-পরিচালনার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকে। লাইপৎসিকের অপেরাগোষ্ঠীকে তিনি এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যে, এই গোষ্ঠীর অনুষ্ঠান বারে বারেই হয়ে উঠেছে নিখুঁত প্রশংসনীয়। তরুণ প্রতিভাকে তিনি সুযোগ দিয়েছেন ও বড়ো করে তুলেছেন। যেমন, একটি দুর্ভাগ্য, উচ্চকণ্ঠ গায়ক জিগরিত কেল। ইউরোপের ও সমুদ্রপারের মঞ্চগুলিতে এই একক গায়কদের এখন খুবই চাহিদা। স্থায়ী নাটকের ভাণ্ডার-বিশিষ্ট একটি রুগ্যালয়ের জটিল অবস্থার মধ্যেও তিনি প্রবর্তন করেছেন হাস্যবাদের সঙ্গীত-নাট্যের নীতি-সমূহ। বিশ্ব এ কৃতিত্বের কোন তুলনা নেই। তাঁর নিখুঁত প্রযোজনায় দর্শকরা বারে বারেই স্তম্ভিত হয়েছেন।

গত কয়েক বছরে ইওয়ার্থম হার্ৎস-এর পরিচালনায় চোখে পড়ার মত বহু অনুষ্ঠান বহুবার হয়েছে। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা চলে : প্রকো-ফিয়েন্ডের 'যুদ্ধ ও শান্তি', শোস্টো-



এই করেছে ভালো' ছবিতে অনুপকুমার ও জুই বন্দ্যোপাধ্যায়

কোম্পিচের 'কার্টেরিনা ইসমাইলোভা', ব্রেকট। ভাইল-এর 'মহাগানী নগরের উত্থান ও পতন', ভোর্দির 'ডন কার্লোস', ভাগনারের 'লোহেনগ্রিন', বোরগোদিনের

'প্রিন্স ইগোর' ও রিটন-এর 'আলবার্ট হেরিং'।

অপেরা পরিচালনার জন্যে হার্ৎস বছরে একবার কি দু'বার বিদেশেও



বোরগোদিনের 'প্রিন্স ইগোর' অনুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী

গিয়ে থাকেন। যেমন, তিনি গিয়েছেন বয়েনোস এয়ারেসের ডিয়েগো কোলোন-এ, ডিয়েনার ফেলক্স-সুওপেন-এ, মস্কোর বলশয় থিয়েটারে। বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে অপেরা পরিচালনা করে ফিরে আসার পরে প্রতিবারেই লাইপৎসিকে তিনি আরো চিত্তাকর্ষক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তেন। তাঁকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার আরো একটি উৎস এই একই ভবনে রয়েছে—বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতগোষ্ঠী লাইপৎসিক গেভার্ট হাউস অর্কেস্ট্রা। প্রতিদিন সম্ভ্যার এই সঙ্গীত গোষ্ঠীর অর্কেস্ট্রা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

বর্তমানে লাইপৎসিক অপেরার ভাণ্ডারে আছে মণ্ডে উপস্থাপনার উপযোগী ৪০টি অপেরা। রচয়িতাদের নামের তালিকায় রয়েছেন মোৎসার্ট, ভেবের, ভাগনার, ওফেনবাখ, ভের্দি থেকে শব্দ করে ব্রিটেন, বৃশ, শোসটাকোভিচ, চাইকোভস্কি, প্রোকোফিয়েভ ও মাখাস পেরন্ত। এই তালিকা থেকেও বোঝা যায় লাইপৎসিক অপেরায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্লাসিকের চর্চা যেমন হয়ে থাকে, তেমন প্রখ্যাত আধুনিক সঙ্গীতকারদের রচনাও উপস্থাপিত হয়।

স্বদেশে লাইপৎসিক অপেরার খ্যাতি বর্ষি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ও আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানও বর্ষি পেয়েছে। গত কয়েক বছরে লাইপৎসিক অপেরাগোষ্ঠীর কাছে আমন্ত্রণ এসেছে কিউবা, জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক ও যুগোস্লাভিয়া থেকে আর লাইপৎসিক অপেরা মণ্ডে অনুষ্ঠান করে গিয়েছে বেলগ্রেড, লদৎস, মস্কা, মিউনিক জুপেরটাল ও স্টুটগার্টের অপরাগোষ্ঠী। লাইপৎসিক অপেরার একক গায়করা ইউরোপের ও সমুদ্রপারের দেশগুলিতে এত বেশি জায়গায় গিয়েছেন যে, তার তালিকা উপস্থিত করা প্রায় অসম্ভব। গত কয়েক বছর ধরে মস্কোর বলশয় থিয়েটারের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে লাইপৎসিক অপেরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মস্কোর বলশয় থিয়েটারে ইওরাখিম হাৎস ছিলেন প্রথম জার্মান পরিচালক। তিনি উপস্থিত করেছিলেন ভাগনার-এর 'ফ্লাইং ডাচ ম্যান'। তারপর থেকেই এই দুই নাট্যভবনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মৃত্যু প্রযোজক প্রফেসর প্রোকোভস্কি ও মৃত্যু পরিচালক বোরিস খাইকিন ১৯৬৯ সালের অক্টোবরে লাইপৎসিকে যন্ত্রণ

করেছেন চাইকোভস্কির 'পীক ডেম', রিমস্কি কোরসাকভের 'গোলডেন কক', স্পার্টাকাস, 'নাট্যকার' ও 'কারমেন সুইট'।

নাট্যের কথা

বিশ বছর আগে

গত ৬ই আগস্ট তমলুক থানা ও সরবরাহ কর্মচারী রিক্রিয়েশন ক্লাবের

সদস্যবৃন্দ শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের "বিশ বছর আগে" অভিনয় করলেন স্থানীয় রূপশ্রী সিনেমা হলে। পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন শ্রীরাজেন দাস। নাটকটি দর্শকদের কাছে বেশ রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন সমর মন্সী (দেবদহন), সুভাষ রায় (প্রদীপ), অরবিন্দ দত্ত (দীপক), নন্দলাল দে (যদুপতি), অসিত সেনগুপ্ত (সনাতন), ছবি পাত্র (মনীষা), প্রতিমা ব্যানার্জী (তমসা), কানন ঘোষ (বনলাতা)। এ ছাড়া অন্যান্য চরিকায় ছিলেন—রণজিৎ কর, রতন সাহু, পরিতোষ

২১শে আগস্ট থেকে সগোঁরবে চলিতছে



● 'সাগোঁরবে'র মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত

রূপবাণী - অরুণা - ভারতী

মুচিঙ্গা - মৃণালিনী - নিউ ভবন - গার্বতী - অজকা - মারা - দীপক
শব্দা - শ্রীরামপুর টেকী - অমরেশ্বরী - কল্যাণী - রমা (বিরাটী)

শুক্লাবর ২৮শে
আগস্ট থেকে

লাইট হাউস !

ইন্টার সার্কিট
পরিবেশনা



গান্ধবীর অষ্টম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সম্বন্ধিত শিল্পী শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে উপহার দিচ্ছেন শ্রীহরিশ্রয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তাষণ দিচ্ছেন শ্রীরঞ্জিতকুমার সেন।

চুপা, নিয়জন গুহাইত, রঞ্জিত ব্যানার্জী, প্রভাত মহাপাত্র, সুখেন্দু পাল, নলিনী মায়া, রমা চক্রবর্তী, হুজুনা আচার্য ও নমিতা চক্রবর্তী।

নবীন মাস্টার

কাশী বিশ্বনাথ মণ্ডে অবকাশ-এর শিল্পীরা ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত “নবীন মাস্টার” নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন। পূর্নবিহারী চক্রবর্তী নির্দেশিত মাস্টারভূমির দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখ্য অভিনয় করলেন : অরুণ আচার্য, হিমাংশু ব্যানার্জী, লালন বসাক, চন্দন সেন, দীপকর মুখার্জী, স্বপন নিকদার, দীপক নাথ, অসীম নাগ, গোপীনাথ সাহা ও দীপক ব্যানার্জী।

সুউড়ি
খবর

শবরীর মহর

গত ১৯শে আগস্ট নিউ থিয়েটার্স ২ নম্বর স্ট্রিটতে ইউনাইটেড আর্টিস্ট এন্ড টেকনিসিয়ানস্-এর “শবরী” ছবির শব্দ মহর অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবিটি প্রযোজনা করছেন শিব গোম্বারী। কাহিনী, চিত্রনাট্য,

পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণ সব কাজের দায়িত্ব একাই পালন করছেন অশোককুমার দাস। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন অনিল বাগচী। বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ণে থাকবেন অনুপকুমার, বিদ্যুৎ রাও, শিবানী ও গীতা দে।

“ব্রিনয়নী মা”

হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত রূপকথি চিত্রমের “ব্রিনয়নী মা” ছবির চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ছবিটির চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সংগীতাংশ ছবিটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। অনিল বাগচীর সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মায়া দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও অলক বাগচী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন মথাক্রমে রামানন্দ সেনগুপ্ত, অমিয়া মুখার্জী ও সুবোধ দাস।

চরিত্র চিত্রণে আছেন কমল মিত্র, অসিতবরণ, গুরুদাস ব্যানার্জী, অজিত ব্যানার্জী, পদ্মা দেবী, মণি শ্রীমানী, শমিতা বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জী, শচীন মল্লিক, সীমা দেবী, অমরেশ দাস, কালীপদ চক্রবর্তী, অলক বাগচী, বিজয় ভাওয়াল, মত্যা দে, তাপস চ্যাটার্জী, মধুমিতা এবং নবাগতা রূপা।

সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে ছবিটির বহু দৃশ্য গৃহীত হয়েছে।

সংবাদ
কল্যাণ

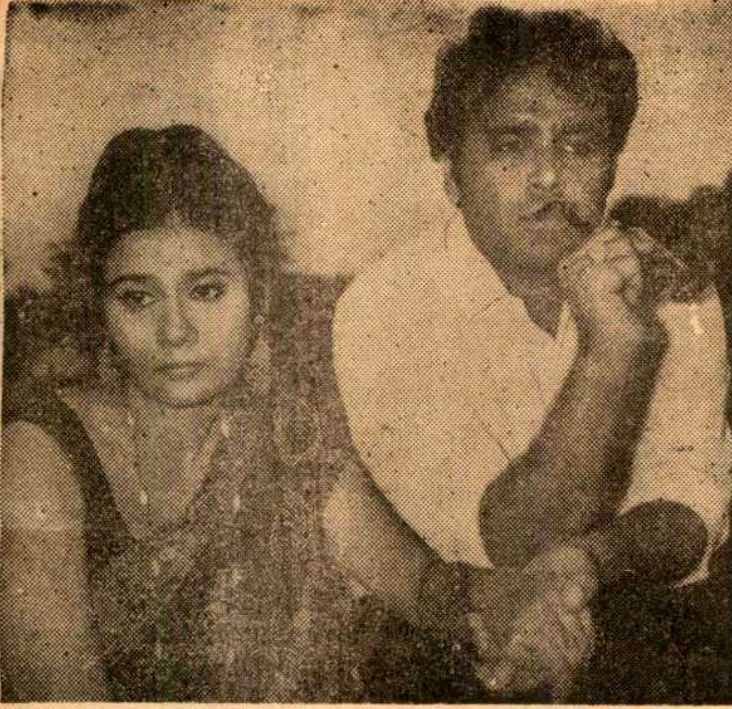
অনুষ্ঠান

“জন্মদায়কী উপলক্ষে মহারার সারা-রাত্রব্যাপী নাট্যানুষ্ঠান। নবীন সেন রচিত “বর্বর বাঁশী” ও চন্দ্রনাথ সুর রচিত ও পরিচালিত “সব পেলাম শব”। স্থান :—শালিমার রেলওয়ে ইন্স-টিটিউট। সময় রাত ১০টা। অভিনয়ে :—জয়দেব রায়, চন্দ্রনাথ সুর, সমীর মজুমদার, কুমার রায়, শচীন বারিক, জগন্নাথ নারায়ণ, প্রভাত, জগবন্ধু, আনন্দ, কার্তিক এবং মেয়ী দেবী ও রুদ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়।”

বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা দিবস

গত শনিবার ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় সুপরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠান বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সাধারণত রবীন্দ্র সদনে মণ্ডে নাটকের অভিনয় ও নাট্য-নাট্যানুষ্ঠান দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন কদাচিৎ হয়, তাও প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সেদিক দিয়ে রবীন্দ্র সদনে মণ্ডে বৈজ্ঞানিক ভাবের প্রাক্তন এবং বর্তমান শিল্পীদের নিয়ে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের প্রয়াস।

অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারা সঙ্গীত সহযোগে আলোচনা। আলো-নায় শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রসবোধ ও সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতমানসের ক্রম-বিবর্তনের ধারাটির সূচ্যর বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ভানু সিংহের পরাবলী থেকে শুরুর করে কাব্য সঙ্গীত পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের গানে সুর সংযোজনার দক্ষতা যে রবীন্দ্রনাথের সচেতন প্রয়াসের ফল না হয়ে মহৎ প্রতীকস্বভাবের জীবিত আনন্দের সাধা হয়েছে তা দৃষ্টান্ত সহ-যোগে প্রমাণ করেছিলেন। বিভিন্ন



সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী গন' ছবির একটি দৃশ্যে সর্বেশ্বর ও মিত্র চৌধুরী।

রাগ মিশ্রণ পদ্ধতির মধ্যেও সুদুরকারের অনারাস পটুইই প্রকাশিত। তাঁর ভাষণ সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুপরিবেশিত দৃষ্টান্তে মূর্তি গ্রহণ করেছে। এককথায় আলোচনা এবং গানের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশের ধারাটি যেভাবে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠেছিল তাতে রবীন্দ্র সদনের উপস্থিত সকল শ্রোতাই মগ্ন এবং অভিভূত হয়েছিলেন।

বৈতানিকের রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশনা সেদিন 'স্বর্গাসুন্দর' হয়েছিল। সমবেত সঙ্গীতে তাঁদের খ্যাতি বহুদিনের। কিন্তু একক সঙ্গীতেও এবার বৈতানিকের কোন কোন শিল্পী যথেষ্ট প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে শ্রীমতী সুমিত্রা সেন, শ্রীমতী রাধারাণী দেবী ও শ্রীশৈলেন দাসের গান খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। তবে শ্রীশৈলেন দাসের কৃষ্ণকলির গানটি যন্ত্র-সঙ্গীতের মূর্ছনায় ব্যাহত হয়েছে। কিশোর শিল্পী শ্রীসুবিদ ঠাকুর সম্বন্ধেও অনেকেই আশান্বিত। একটি নাম এক্ষেত্রে সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য—যাঁর কণ্ঠের 'নীলাঙ্গন ছায়া...' এবং 'কখন দিলে পরায়ে ব্যথার মালা'।

গান দুটির অপূর্ব সুস্বরকার শ্রোতাদের মগ্ন করেছে। তিনি হলেন শ্রীসুধীর চট্টোপাধ্যায়। বৈতানিক ঐ দিন রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মস্তম্বল করেন।

গান্ধবীর অষ্টম বার্ষিকী ও সমাবর্তন উৎসব

সম্প্রতি এক সম্মান্য রবীন্দ্র সরোবর প্রেক্ষাগৃহ আলোকোজ্জ্বল

হয়ে উঠলো। গান্ধবীর অষ্টম বার্ষিকী ও সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সভাপতি—শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আচার্য—শ্রীতারাপ্রণব ব্রহ্মচারী। সম্মিলিত বেদগানের দ্বারা অনুষ্ঠান শুরু হয়। গান্ধবীর আট বছরের ইতিহাস বর্ণনা করে সকলকে স্বাগত জানান গান্ধবীর স্থায়ী সভাপতি শ্রীরণজৎ-কুমার সেন। অধ্যক্ষ ও কর্মসচিব শ্রীসন্তোষ ঠাকুর অন্ত্যপরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ছাত্রীবৃন্দকে আচার্যের নিকট উপস্থিত করলে তাঁরা তাঁর কাছ থেকে অভিজ্ঞানপত্র ও পদক উপহার পান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ হিসেবে এ বছর গান্ধবী থেকে সম্বর্ধনা জানিয়ে মানপত্র ও উপহার দেওয়া হয় ঠাকুর পরিবারের বর্ষীয়সী রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী অমিয়া ঠাকুরকে। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীমতী ঠাকুর দু'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে সকলকে মগ্ন করেন। পাশ্চাত্য সুর প্রভাবিত ছ'খানি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের এক বিশেষ অঙ্গ হিসেবে সকলকে আনন্দ দেয়। এতদ্ব্যতীত একক সঙ্গীতে ও নৃত্যে সর্বশ্রী সন্তোষ ঠাকুর, সমীর মজুমদার, মনোজ সেনগুপ্ত, জয়ন্তী চক্রবর্তী, সঞ্জিত চক্রবর্তী, নবঘনশ্যাম সিং, খেলেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। সভাপতি এবং আচার্যের আনুষ্ঠানিক ও সমাবর্তন ভাষণ বিশেষ হৃদয়গ্রাহী।

সদ্য প্রকাশিত হইল!

সদ্য প্রকাশিত হইল!!

সদ্য প্রকাশিত হইল!!!

দণ্ডপাণি রচিত

অন্তরালের শব্দবৃত্ত

একালের সমাজের নানা অজানা দিকের এই সম্যক চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখকের গভীর সমাজচিন্তার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

এই গ্রন্থটি সম্পর্ক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ কবি জসীম উদ্দীন বলেছেন—
আপনার পুস্তকে জাতির কল্যাণকর বহু কথা আছে।

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১২

খেলাবি বাজার বাজা



শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বয়স্ক খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দল হলে কি হবে—প্রথম দিকে তাঁরা যা খেললেন তার তুলনা মেলা ভার। প্রথম দু'টি টেস্টে আর তৃতীয় টেস্টের আগের প্রথম শ্রেণীর খেলাগুলোয় ভারতীয় খেলোয়াড়রা মোটে সর্বাধিকই করতে পারলেন না।

বোম্বাই-এর প্রথম টেস্টে ভারতীয় দল পারচালনা করেছিলেন পাতিয়ালায় যুবরাজ। কিন্তু কলকাতার দ্বিতীয় টেস্টে ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনো-নীত হলেন কর্নেল সি কে নাইডু।

সেলিম ডরানীর বাবা আব্দুল আজিজ আর তরুণ খেলোয়াড় মদুস্তাক আলীও ছিলেন ভারতীয় দলে।

খেলার আগের দিন রাতিয়ে নামল বর্ষিক। তাই টেসে জিতে জ্যাক রাইডার ভারতকেই পাঠালেন ব্যাট করতে। ওয়াজির আলীর সংগে মদুস্তাক ভারতীয় দলের গোড়াপত্তন করতে এলেন। পিচের অবস্থা ভালো না। দৃষ্টিতেই তাই খুব সতর্ক হয়ে খেলছেন।

দেখতে দেখতে এক সময় রোদ উঠলো। শুকোতে আরম্ভ করলো পিচ। আর তার সুযোগ নিতে রাইডার স্লেয়া বোলারদের ওপর দিলেন আক্রমণ-ভার। ২০ রান করে আউট হয়ে গেলেন ওয়াজির আলী। অমরনাথ এলেন আর ফিরে গেলেন কোন রান করার আগেই। স্ট্যান্টিনর বোলানো বলে এগিয়ে মারতে গিয়ে স্টম্পড হলেন মদুস্তাক। সি কে নাইডুও আউট হলেন একইভাবে।

পিচের অবস্থা তখন সাম্প্রতিক। ব্যাটসম্যানরা মোটে দাঁড়াতেই পারছেন না। পারলেনও না কেউ রুখে দাঁড়াতে। মাত্র ৪৮ রানের মাধ্যম শেষ হয়ে গেল ভারতের প্রথম ইনিংস।

প্রথম দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়াও দু'টি

উইকেট হারিয়ে করলো ২৮ রান। ভারতের ফাস্ট বোলার নিসারই নিয়েছেন উইকেট দু'টি।

কিন্তু স্লেয়া বোলারের প্রয়োজন যখন সব থেকে বেশি, ঠিক সেই সময়ই জবরে পড়লেন মদুস্তাক। ভীষণ জ্বর। মাঠে নামতেই পারলেন না। মদুস্তাক মাঠে নামতে পারলে খেলার ধারা হয়তো অন্যরকম হতো। তবু খুব একটা সর্বাধিক করতে পারলো না অস্ট্রেলিয়া। ৯৯ রানের মাধ্যম শেষ হয়ে গেল তাদের প্রথম ইনিংস। মহম্মদ নিসারের ফাস্ট বল আর বাকী জালানীর লেগ ব্রেক বলের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা অসহায় হয়ে পড়লেন।



॥ কার্তিক বন্দু ॥

কার্তিক বন্দু সেবার প্রথম পেলেন টেস্ট খেলার সুযোগ।

কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও ভারত আবার বিপর্যয় সম্মুখীন হলো। এই বিপর্যয় শোচনীয়। একমাত্র অমরনাথ ছাড়া ভারতের আর কোন ব্যাটসম্যানই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন না। একের পর এক আউট হয়ে ফিরে এলেন।

একা অমরনাথ আর কি করতে পারেন। তবু তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে ভারতকে কিছুটা এগিয়ে দিলেন। কিন্তু অতো অল্প রানে এগিয়ে থাকারই কি বা মূল্য থাকতে পারে।

থাকলোও না। মাত্র দু'টি উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া তুলে নীল জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় রান। ফলে কলকাতার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে ভারত হেরে গেল ৮ উইকেটে।

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিল ভারত তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়ে। ভারতের এই জয়লাভের পেছনে ছিল ওয়াজির আলীর সব চেয়ে বেশি অবদান। তাঁরা ব্যাটিনৈপুণ্যের কথা চিরকাল যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তেমনটি সেই সময় ওয়াজির আলীর খেলার ধারা ভারতীয়দের মনে জাগিয়েছিল বিশ্বাস, এনে দিয়েছিল আশ্বাসের ভাব—ওয়াজির আলীর খেলা দেখে তাঁরা অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে-ছিলেন। তাই খেলেওছিলেন জান লাড়িয়ে।

আর তারই জের টেনে জান লাড়িয়ে খেললেন মেনুদৌলা একাদেশের খেলোয়াড়রা। সৈকেন্দ্রাবাদের লেই খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে হলো। অস্ট্রেলিয়া হেরে গেল এক ইনিংস ও ১১৫ রানে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ডাবাও যায় না! অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দল

ইনিংসে হেরে গেল মৈনুদ্দৌলী একা-
দশের কাছে।

আর চতুর্থ টেস্টের প্রাক্কালে অস্ট্রেলিয়ার এই পরাজয় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মনে এনে দিলো উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ভরা নতুন আশার আলোর সন্ধান।

কিন্তু কর্নেল নাইডু বাদ গেলেন দল থেকে। লাহোরের ম্যাচে তিনি খেলেন নি আর না খেলার জন্যে দেখান নি কোন কারণও। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাঁকে বাদ দেওয়া হলো মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট দল থেকে। তবে বাংলার কার্তিক বসুকে সেবার দেওয়া হলো প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ।

কার্তিক বসু কিন্তু একদম সুবিধে করতে পারলেন না। মদুস্তাক আলীর সংগে খেলতে নামার একটু পরেই আউট হয়ে গেলেন। মদুস্তাক তখন খেলছেন তাঁর স্বাভাবিক ভঙ্গীতে। লালু অমরনাথ এসে যোগ দিয়েছেন মদুস্তাকের সংগে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ৪০ রান সংগ্রহ করার পর মদুস্তাক আলী রান আউট হয়ে গেলেন। ভারতের প্রথম ইনিংসে ফাস্ট বোলার অমর সিং দর্শনীয়ভাবে ব্যাটিং করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

যাই হোক, ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে গেল ১৮৯ রানের মাথায়। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরাও কিন্তু সুবিধে করতে পারলেন না। পারবেনই বা কি করে। একাদিক থেকে অমর সিং আর অপর দিক থেকে মহম্মদ নিসার যেভাবে বোলিং শুরুর করেছিলেন, তার ভুলনা মেলাই ছিল ভার। ফলে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও করতে পারলো না ১৬২-র বেশি রান।

দ্বিতীয় ইনিংসও ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা আবার বিলেন শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। ইনিংস সূচনা করতে এসে মাত্র এক রান করে বিদায় নিলেন কার্তিক বসু। ৭ রানের মাথায় আউট হলেন মদুস্তাক আলী।

গ্রামন একটা সময় এলো যখন দেখা

গেল যে, ৮টা উইকেট হারিয়ে ভারত করেছে মাত্র ৮২ রান। শেষ মুহূর্তে নিসারের 'মার মার' খেলায় ভারতের রান সংখ্যা কোন রকমে পার হলো শয়ের কোঠা।

অস্ট্রেলিয়ার সামনে তখন জয়-লাভের সুযোগ। জেতার জন্যে দরকার মাত্র ১৪১টি রান। হাতে আছে অফব্রিস্ত সময় আর দশ-দশটি উইকেট। জয়-লাভের আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা ব্যাট করতে নামলেন।

ভারতের বোলাররাও কিন্তু বসে নেই। তাঁরাও তখন অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের জয়লাভের স্বপ্ন ভেঙে দিতে বশ্বপারিকর।

আরম্ভ হলো অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। আর সংগে সংগেই সংহার মর্তি ধরলেন অমর সিং আর মহম্মদ নিসার। নিসারের বোলিং-এর সামনে অস্ট্রেলিয়ার বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের সমস্ত চাতুর্ষ্য যেন মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

একটার পর একটা পড়তে লাগলো উইকেট। দাপটে বল করতে লাগলেন মহম্মদ নিসার। অমর সিং সেই আক্রমণে যোগালেন ইন্দ্রন। অস্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটসম্যান যখন আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন তখন স্কোর বোর্ডে হয়েছে মাত্র ১০৭ রান। জয়লাভের জন্যে তখনো দরকার ৩০ রানের।

সেই ৩০ রানের ব্যবধানেই ভারত হারালো অস্ট্রেলিয়াকে। আর মাত্র ৩৬ রান দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের ছজন ব্যাটসম্যানকে প্যাভেলিয়নে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন মহম্মদ নিসার।

সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর পেছনে ছিল যেমন মহম্মদ নিসারের বোলিং সাফল্য, তেমনি ছিল ওয়াজির আলীর ব্যাটিনৈপুণ্য।

সত্য কথা বলতে কি, নিসার আর ওয়াজির আলীর জন্যেই সেই টেস্টে ভারত জিতেছিল...!

ডন ভালো আছেন

ডন ভালো আছেন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি এখন নিচ্ছেন সম্পূর্ণ বিশ্রাম। নিজের বাড়িতে একটু-আধটু পায়চারি ছাড়া প্রায় সব সময়েই ক'দিন ধরে শুধু ঘুমিয়েছেন তিনি।

মাত্র ক'দিন আগে স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যানের হঠাৎ অসুস্থতার সংবাদে সমস্ত বিশ্ব চমকে উঠেছিল। একটা হোটেলে দুপুরের লাঞ্চার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন ডন। প্রায় দশ মিনিট

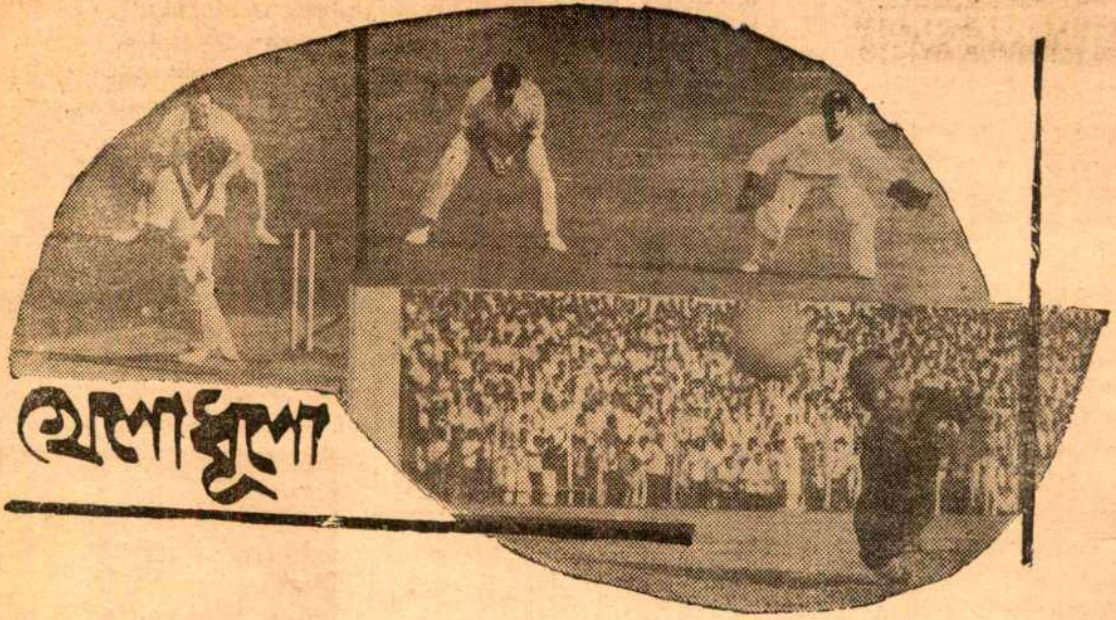


ছিলেন সঙ্গাহীন অবস্থায়। ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন সকলে।

পরে ডাক্তারবাবুরা দেখে বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই, ডাইরাস ইনফেকশনের জন্যেই ব্রাডম্যান অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ক'দিন বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

পৃথিবীর সর্বকালের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এই সপ্তাহেই ৬২টি বছরের ঘরে পা দিয়েছেন। এখনো তিনি মনে-প্রাণে পাকা ক্রিকেটার, তাজা পুরুষ। তাই তাঁর হঠাৎ অসুস্থতার খবরে চমকে গিয়েছিলেন সকলে।

ডন ব্রাডম্যান মোট ৫২টি টেস্ট



ভুল

কলকাতা ময়দানে এখন একটা নতুন জিনিষ দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটার গুরুত্ব যে কতোখানি তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। তবে কলকাতা ময়দানের কয়েকটি ছোট ছোট দল এরই মধ্যে সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছেন। আর এ ব্যাপারে তাঁদের বিশেষ কিছু করার নেই দেখে আরো বেশি হতাশ হয়েছেন। বড় ক্লাবগুলোর অর্থ সমর্থকরা তাতে খুশি। কিন্তু যারা ফুটবল খেলাকে সত্যিই ভালোবাসেন আর যারা দলবাজী পছন্দ করেন না—তাঁরা ঠিক খেলা মনে ব্যাপারটাকে শুদ্ধ মেনেই নিতে পারছেন না, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও করেছেন। অবশ্য তাঁদের প্রতিবাদের যে বিশেষ কোন মূল্য নেই—একথা তাঁরা ভালোভাবেই জানেন। তবে ফুটবল খেলার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা চুপ করে থাকা যে সম্ভবও নয়—একথাও বোধহয় ফুটবলরসিক মাগ্রেই স্বীকার করবেন। স্বীকার করবেন যে, এই সংক্রামক রোগটাকে বাড়তে দিলে একদিন এই রোগই সব কিছু অর্থাৎ ফুটবল খেলার ভূত-ভবিষ্যৎ, এমন কি বর্তমানকেও বিনাশ করে ফেলবে। ফেলবে কেন—ফেলছে বলাই মোহ হয় উচিত।

কারণ, আজকাল প্রায়ই বড় দলের খেলায় দেখা যাচ্ছে যে, বড় দলগুলো গোল দিতে না পারলে সেই দলের এক শ্রেণীর উগ্র সমর্থক মাঠে ইট-পাটকেল প্রভৃতি ছুড়ে খেলা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেন রেফারীকে। তাঁরা ভাবেন যে, তাঁদের দল সেদিন গোল দিতে পারে নি তাতে কি হয়েছে। খেলা শেষ হবার আগেই হামলা করে খেলা বন্ধ করে দিতে পারলে আর একদিন খেলা হবেই—আর সেদিন নিশ্চয়ই তাঁদের দল গোল করতে পারবে। ফলে শুদ্ধমাত্র এই কারণেই এ বছরের কয়েকটি খেলা সম্ভবত ভাঙল হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটি কি সত্যিই তাই? ক্লাবগুলোরও কি এই ব্যাপারে সম্মতি আছে? বোধ হয় আছে—তা না হলে এই বিদ্রোহী ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়ে ভাঙল খেলার ফলাফল বজায় রাখার জন্যে আই এফ এ-র কাছে আবেদন জানাতো বড় দলগুলো। তারা কিন্তু তা করে নি। বরঞ্চ নিয়েছে ভাঙল খেলাগুলোর পুনরনুষ্ঠানের সুযোগ। আজ তাই এই ব্যাপারটি বন্ধ করার জন্যে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর দৃষ্টি দেবার জন্যে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় এবং দর্শকদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি। আমরা চাই, এই আবেদনে সাড়া দিয়ে আপনারা সকলে এগিয়ে আসুন এবং বন্ধ করে দিন এই অস্বাভাবিক অবস্থা.....!

—শান্তিপ্রিয়

ফুটবল মাঠ

ভারতের বার্ষিক এয়ার ভালেই বলতে হবে। তা নাহলে কি আর মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করতে পারতো? গত বছর এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী আটটি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ছিল অষ্টম। আর এ বছর বারোটি দেশের মধ্যে ভারত পেরিয়ে তৃতীয় স্থান।

তাও দুর্ভাগ্যের জন্যই। তা না হলে হয় প্রথম না হয় তো দ্বিতীয় স্থানটি ভারতের কাছে একরকম বাধাই ছিল। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়াকে দু'গোল-দেওয়া সঙ্গেও আর বিরাতি পর্যন্ত দু'গোলে এগিয়ে থেকেও ভারত যে শেষ পর্যন্ত ০-২ গোলে হেরে যাবে তা বোঝা ভারতের পক্ষে না।



সোবান

ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচটি গোলটিই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের নেতৃত্ব করবেন সোবান। সোবানের অধিনায়কত্বে সম্প্রতি বিশ্বের অবাঞ্ছিত একাদশ ইংল্যান্ডকে ৪-১ টেস্টে হারিয়ে দিয়েছে।

কংকে। আর দ্বিতীয়টিতে দক্ষিণ কোরিয়া হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত জিতে গেলো। ভারতের বিরুদ্ধে খেলায়। ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়া বামাকে হারিয়ে দিয়ে ১৯৫৭ সালের এই প্রতিযোগিতা শুরুর হবার পর এইবারই সর্বপ্রথম এককভাবে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার পুরস্কার ট্রফি আব্দুল রহমান ট্রফি লাভ করলো। এর আগে তারা অল্প তিনবার যুগ্মভাবে এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল।

তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভের জন্যে ভারত ও হংকং তারপর সম্মুখসমরে অন্তর্লিপ হয়। সেই খেলায় ভারত সহজেই হংকংকে হারিয়ে দিয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করে।

প্রতিযোগিতার প্রথম ওটি দল—
দক্ষিণ কোরিয়া—প্রথম
বামা—দ্বিতীয়
ভারত—তৃতীয়
হংকং—চতুর্থ
মালয়েশিয়া—পঞ্চম



হারিষ

এরছক ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের তৃতীয় স্থান লাভের পেছনে ছিল হারিষের প্রশংসনীয় কীড়াশৈল্য।

কিন্তু হলোও শেষ পর্যন্ত তাই। অবশ্য তার আগে অর্থাৎ সেমি-ফাইনালেই ভারতের ওঠার সম্ভাবনা ছিল কম। কিন্তু ঠিক সময়ে তাইওয়ান আর মালয়েশিয়া হেরে যাওয়ায় ভারত বামার সংগে একযোগে এ গ্রুপ থেকে উঠলো সেমি-ফাইনালে। বি গ্রুপ থেকে সেমি-ফাইনালে উঠেছিল দক্ষিণ কোরিয়া আর হংকং।

প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলাটিতে বামা সহজেই হারিয়ে দিয়েছিল হং-

এলি হলেও প্রতি

বেলার রাজা ক্রিকেটের অনেক রকম মজার ঘটনার মধ্যে এই ঘটনাটি সত্যিই কিন্তু আশ্চর্যজনক।

এ সেই ১৮৯৩ সালের কথা। ইংল্যান্ডের সেন্টেনহামে প্রথম প্রণীর একটি খেলা চলছিল সমারসেট ও গ্লাসেস্টারের মধ্যে। আর সেই খেলায় তখন ব্যাট করছিল সমারসেট। ওদিকে তখন বিপক্ষ দলের বোলার সি এল টাউনশেডের হাতে ছিল বল। টাউনশেডের হাত থেকে বল গেলো ছাড়া পায়ের আগেই যেন ওং পেতে বসেছিলেন উইকেটরক্ষক ডরিউ এইচ রেন। হঠাৎ টাউনশেডের পর পর তিনটি বলেই বিপক্ষের তিনজন ব্যাটসম্যান যখন পরাস্ত হলেন তখন দেখা গেল এ তিনজনই আউট হয়েছেন রেনের হাতে স্ট্যাম্পড হয়ে। আর তাই সোদিনের খেলায় সৃষ্টি হলো এক অভাবনীয় নজর! বোলারদের সঙ্গেই হ্যাটট্রিক করলেন উইকেটরক্ষক। হলো 'হ্যাটট্রিক অব স্ট্যাম্পিং'!

—রোমানা গণেশপাধ্যায়
হ্যাটট্রিক ২৪ পরগনা।



কাউড্রে

ইংল্যান্ডের বর্ষীয়ান ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণে যাচ্ছেন দলের সংগে। তার ওপর দলের সাক্ষ্যের অনেকটাই নির্ভর করছে।

কলকাতা ফুটবলে এখন ভাটার টান। একক লীগ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বসবে সুপার লীগের আসর। আর তারপর শুরুর হবে আই এফ এ শীল্ডের খেলা।

বিদেশী ইরানের প্যাস ক্লাব এ বছর সর্বপ্রথম আই এফ এ শীল্ড খেলতে আসছে। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়েকটি দল ও স্থানীয় দলগুলো আই এফ এ শীল্ডকে সামনে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবে।

প্রশ্ন-উত্তর

স্বপনকুমার নন্দী (কৃষ্ণনগর, নবীয়া)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে যে ক'জন ব্যাটস-
মান ১,৫০০-এর ওপর রান করেছেন
তাদের এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : নাম	টে:	ই:	ন:	আ:	রান	সর্বোচ্চ	সেঞ্চুরী	গড়
পলি উমরিগড়	৫৯	৯৪	৮	৩৬৩১	২২১	১২	৪২'২২	
মঞ্জুরেকার	৫৫	৯২	১০	৩২০৯	১৮৯*	৭	৩৯'১৩	
বোরদে	৫৪	৯৫	১১	৩০৪২	১৭৭*	৫	৩৬'২১	
পঙ্কজ রায়	৪৩	৭৯	৪	২৪৪১	১৭০	৫	৩২'৫৪	
পাতোদি (ছোট)	৩১	৫৬	২	২২০৩	২০৩*	৬	৪০'৭৯	
বিজয় হাজারে	৩০	৫২	৬	২১৯২	১৬৪*	৭	৪৭'৬৫	
ভিনু মানকাদ	৪৪	৭২	৫	২১০৯	২৩১	৫	৩১'৪৭	
জয়সীমা	৩৫	৬৪	৪	২০১৭	১২৯	৩	৩৩'৬১	
কনট্রিবি	৩১	৫২	১	১৬১১	১০৮	১	৩১'৫৯	

* নট অউটি (ভারত-অস্ট্রেলিয়ার এই মরশুমের খেলাগুলো ধরা হয় নি)

প্রদীপ বিশ্বাস (মোহরগু টি
এস্টেট, গুলামা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : হ্যাসেট, মিলার, পনসফোর্ড-এর
ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট ইনিংস -	ন:	আ:	রান -	সর্বোচ্চ -	শতরান -	গড়
হ্যাসেট	৪৩	৬৯	৩	৩০৭৩	১৯৮*	১০	৪৬'৫৬
মিলার	৫৫	৮৭	৭	২৯৫৮	১৪৭	৭	৩৬'৯৭
পনসফোর্ড	২৯	৪৮	৪	২১২২	২৬৬	৭	৪৮'২২

বীরেন্দ্রনাথ পাল (বংশীহারী,
পশ্চিম দিনাজপুর)

প্রশ্ন : পাণ্ডু সম্পর্কে জানতে চাই!

উত্তর : কিসের পাণ্ডু জানাবেন।

ব্যাসচাঁ ডট্টাচার্য (শঙ্কর বসু
রোড, কলকাতা-২৭)

উত্তর : চন্দ্রক বিভাগের জন্যে আপনি
আর একটা লেখা পাঠান।

হাবুল, রতন ও বাসুদেব
(শ্রীকলোনী, কলকাতা-৪৭)

উত্তর : আপনারা যখন কলকাতাতেই
থাকেন তখন যে-কোন বিন দপুদে
তিনটে নাগাদ মঙ্গল থেকে শুক্র-
বারের মধ্যে আমাদের অফিসে এসে

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ম্যাচ-
গুলোর স্কোর দেখে যান না।
পাঠ্যাহিক বসুমতীতে ঐ প্রশ্নের
উত্তর দেওয়া কেন সম্ভব নয়—তা
নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

গম্প হলেও সত্য, চন্দ্রক এবং

‘আমার মতে’ বিভাগে আপনারা
নিশ্চয়ই লেখা পাঠাতে পারেন।

সুখেন্দু, ন্যাকোমল ও কল্যাণ রায়-

চৌধুরী (বাঁকড়া, বিষ্ণুপুর)

প্রশ্ন : জীবনের প্রথম টেস্টে নেমেই

সেঞ্চুরী করেছেন, কিন্তু আর কোন
সময় সেঞ্চুরী করতে পারেন নি—
এমন কোন খেলোয়াড় আছেন কি?

উত্তর : বেশি দূরে যাবার দরকার নেই,
আমাদের ভারতের ক'জনই তো
রয়েছেন। সব ক'জনই—লালা
অমরনাথ, দীপক সোমন, আব্বাস
আলী বেগ, কৃপাল সিং, হনুমন্ত
সিং আর নতুন খেলোয়াড় বিশ্বনাথ।
এঁরা কেউই দ্বিতীয়বার সেঞ্চুরী
করতে পারেন নি।

সিম্ভার, সোমদত্তা ও পদ্মকে
(পূর্বদিল্লী)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমা-
দের বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় পাবেন।

সম্মানবর্জন

শেষ টেস্টেও শেষ পর্যন্ত ইংল্যান্ড
হারলো। অভিনব এই বেসরকারী
টেস্ট মরশুমের রাবার আগেই বিশ্বের
অর্বাংশ একাদশ জয় করেছিল।

এই টেস্ট ম্যাচ সম্বন্ধে বিস্তারিত-
ভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে
বলে মনে হয় না। কারণ এই খেলা-
গুলো ইংল্যান্ড দলের আগামী অস্ট্রেলিয়া
সফরের প্রস্তুতিপর্ব ছাড়া আর কিছুই
নয়।

যাই হোক, শেষ টেস্টে ইংল্যান্ড খুঁজে
পেয়েছে একজন সার্থক বোলারকে।
লোভার তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টেই এক
ইনিংসে ৭টি উইকেট দখল করে সকলকে
তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। শেষ টেস্টে
লোভারের উন্নত বোলিং আর বয়কটের
ব্যাটিং-এর জন্যেই ইংল্যান্ড ইনিংস পরা-
জয়ের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

এই মরশুমের সেরা ব্যাটসম্যান
হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সোবার্স আর
সেরা বোলার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার
বারলো ১০০০ টাকা পুরস্কার
পেয়েছেন। ফিল্ডিং-এ শ্রেষ্ঠের জন্যে
১০০০ টাকা করে পেয়েছেন
ওয়েস্ট ইন্ডিজের লয়েড আর ইংল্যান্ডের
উইকেটরক্ষক এ্যালান নট। দ্বিতীয়
সেরা ব্যাটসম্যান ও বোলার মনোনীত
হয়েছেন দুই দেশের দুই অধিনায়ক—
ইলিংওয়ার্থ আর সোবার্স।

হকির যাদুকের ধ্যানচাঁদের জীবন
নির্মে ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন
একটা তথ্যচিত্র শীঘ্রই তৈরি করবেন।
৬৫ বছরের ধ্যানচাঁদ এখন কটকে
আছেন। তিনি ১৯৩২ সালে এল
এঞ্জেল ও ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলি-
ম্পিক ভারতীয় হকি দলের প্রতিনিধিত্ব
করেন। ভারত সেই দু'বারই স্বর্ণ
পদক লাভ করেছিল।

[৫৭৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

খেলায় অংশগ্রহণ করে সংগ্রহ করে-
ছেন ৬,১১৬ রান। তাঁর সর্বোচ্চ
রান সংখ্যা হলো ৩৩৪। টেস্ট
খেলায় তিনি ২৯ বার বেখেছেন
শতরানের মূখ। টেস্ট ক্রিকেটে
ইনিংস প্রতি তাঁর রান সংখ্যা
হলো ৯৯.৯৪।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিনিনবহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর শাস্ত্র-প্রচার গ্রন্থরাজি

শ্রীমদ্ভগবদগীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

প্রামাণ্য অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়। - বিজ্ঞান সংস্করণ। স্থলর বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদগীতা যেমন মহাভারতের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের সারাংশ। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত, জীবনমুক্তি, ষড়্‌জ, হংস, মক্তি, গীতাসাধু, পিতৃ, পৃথিবী, সপ্তশৌকী, রাম, পরাশর, শান্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য, গর্ত, পাণ্ডব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি গীতার সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্র, চুলকা, আরুণ্যেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ঘটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, বৃদ্ধবিদ্যাবাদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যমুণ্ড তৈত্তিরীয়, পাণ্ডপত-ব্রহ্ম, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, পঞ্চভূত, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরাধোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগুরুত্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কোষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি খণ্ড—৪-০০ টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

সামবেদের তান্ত্রাশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ। ঈশ্বরচার্যের মহাভাষ্য, শাস্ত্রর ভাষ্যের সরল অনুবাদ। তত্ত্বাপূর্ণ-জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহাশি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনাদিত।

সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈবেশিক দর্শন :

মহাশি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ :

পরমভক্ত শ্রীমৎনাভাজী হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীঃ প্রিয়দাস তাহার টীকা রচয়িতা। লগ্রন্থ ও টীকা অবলম্বনপূর্বক শ্রীমান কৃষ্ণদাস বাবাজী বঙ্গভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবন্তজিরসে অন্তঃকরণ আপ্লুত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভক্তমাল অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য—৬-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্য-কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরাণচরণ প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, জীওরু, মন্ত্রমালা প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, যেরঙসংহিতা, বৃদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্, পরাশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুস্তাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ বল ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বামীরাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীঃ জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

কুঁড়ো মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিছু সত্যি—

কুকুম্বী

তুলতা হয় তা!

9 SEP 1970



কুকুম্বী
কুঁড়ো মশলা

সবার কুঁচিকেই
পরিচূপ্ত করে।
কুকুম্বী শিতর ঘাত
ও কুম্বীর
গাথা মিউরে
বাবলুত হয়।

কুকুম্বী ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
কুঁড়ো মশলা।
এর পেছা
রায়েছ ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

প্রস্তুতকারক
কুকুম্বী দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
বিল-কানীপুর



সাপ্তাহিক বসুমতী

রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তিন দিনব্যাপী
ধর্মঘাটে অচল রাইটার্স বিন্ডিংস্-এর
কায়েকটি চিত্র



বর্ষ : ১০ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

] OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

| 75 year, No. 10, 3rd Sept., 19

বোরোলীন
হাউস

ভালিকাতা-৩



ফেমিলা প্রা

সব যুগ্মবীর জন্ম

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫৭৯
আজকের মানুষ		৫৮০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫৮১
জীবন যা নিয়ে বেঁচে আছে (কবিতা)	— সুশীল আচার্য	৫৮০
বঙ্গদর্শন		৫৮৪
ভারতদর্শন		৫৮৬
আন্তর্জাতিক		৫৮৮
সপ্তাহের বোঝা	— ফুজিবাস ওয়া	৫৯০
চল্লিশ বছরে পা দিয়ে (প্রবন্ধ)	— নরেন ভট্টাচার্য	৫৯২
প্রোভের সঙ্গে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৯৫
কবিতার হৃদয়ের কাছে (কবিতা)	— অমিয়কুমার হাট	৫৯৮
নীলকণ্ঠ কবিতার মানুষ (প্রবন্ধ)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫৯৯
ঢাকার চিঠি		৬০০

যে কোন

গয়না

আর

আমল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসম অর লেট

প্রম. বি. সরকার



১৯১৭ রাসবিহারী অজিত্য চৌধুরী

সূচী

বিষয়	লেখক	দাম
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	— প্রণবেশ চক্রবর্তী	৬০৩
মধুমতী (কবিতা)	— দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়	৬০৪
দর্শিত-পরিভ্রম	— পদমকেশ দে সরকার	৬০৫
স্কুল অব ট্রাণিক্যাল অডিসিনের কুস্ত গবেষণা বিভাগের ছমিকা ও অবদান	— সরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ	৬০৬
শহর কলকাতা	— মিত্রেন	৬১১
আনন্দর পদ্ম (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	৬১৩
মাউ-মাউ বন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ)	— বিশ্বনাথ ঘোষ	৬২০
সেলস্ গার্ল (গল্প)	— কণা বসু	৬২৪
গ্রন্থমেলা	— শিলালি	৬২৭
রংগমণ্ড—ওদেশ এবং এদেশ	— শান্তিপ্ৰিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৬২৮
রংগজগৎ	— শান্তিপ্ৰিয়	৬৩১
খেলার রাজার রাজা	— শান্তিপ্ৰিয়	৬৩৬
খেলাধুলা	— শান্তিপ্ৰিয়	৬৩৮

—সমগ্র প্রকাশিত হইয়াছে!!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

“নবীনবাবু বর্ণনা এবং স্ফুটিত্তে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।.....এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্ৰণালীর সঙ্গে বাইরের লিপির
প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।.....বায়রনের ছায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।.....নবীনবাবুর যখন স্বদেশ
পাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।” —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

ন বী ন চ চ্চ সেনের গ্রন্থাবলী

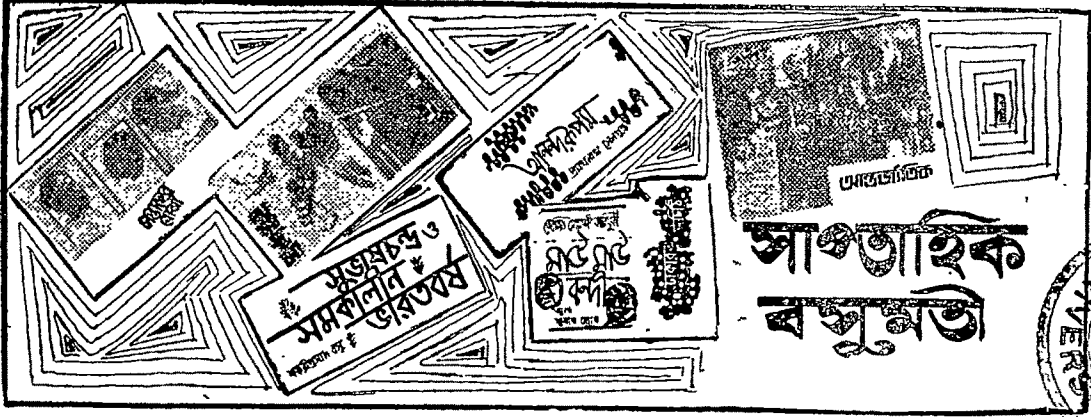
রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস



গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৮।

মূল্য মাত্র মাত্র টাকা।

মধুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



বৃহস্পতিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ
৭৫ বর্ষ : ১০ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা

বাংলা ভাষায় বিত্তীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 3rd September, 1970

সরকারী কর্মচারী ও বে-সরকারী শিক্ষক ধর্মঘট

রাজ্য সরকারী কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহবানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের তিন দিনব্যাপী ধর্মঘট এবং নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আহত এই রাজ্যের বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির শিক্ষকদের সাত দিনব্যাপী কর্ম-বিরতি ও রাজ্যভবনের সম্মুখে অবস্থান শেষ হয়েছে।

বে-সরকারী শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন ও মহাঘণ্টা পান বা না পান কিংবা তাঁদের সম্পর্কিত পে-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ ও তা কার্যকর করা হোক বা না হোক, সে ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কোনরকম মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ছাত্রদের কল্যাণের প্রশ্ন যে শিক্ষকদের ক্ষুধার সঙ্গেও জড়িত—এই মূল কথাটি বুঝতে সরকার অপারগ হয়েছেন।

বর্তমান রাজ্য সরকারের রীতি-নীতি ও প্রচার-কৌশল দেখে মনে হয়, এই সরকারের বড়কর্তারা কর্মীদের ন্যায্য পাওনার চেয়ে নিজেদের প্রেসিটজের মূল্য দেন সর্বাধিক। পরলোকগত মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আমলেও শিক্ষক এবং কর্মীরা তাঁদের ন্যায্য দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছেন; কিন্তু ডঃ রায়ের মতো ব্যক্তিগত সম্পন্ন ব্যক্তিও সেই আন্দোলনকে তীব্রতর করার সুযোগ না দিয়ে শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকার করে নিতে সন্দিগ্ধ করেন নি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিধি-মূলক সরকার নেই। ঘটনাপ্রবাহে মনে হয়, রাজ্য সরকারের মুখ্য উপদেষ্টাই এখন সর্বোচ্চ, অর্থাৎ তিনি দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা। রাজ্য সরকারী কর্ম-চারীদের তিন দিনব্যাপী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে তাঁর নম্রাবিধানে সরকারের

সঙ্গে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের যে সম্পর্কের সৃষ্টি হ'ল তা মোটেই সুখ-কর নয়।

যে কেউ একথা স্বীকার করবেন যে, রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক দাবিগুলি ন্যায্য এবং সরকারের নিয়ো-জিত পে-কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি চালু করা এই মহত্বের সম্ভব না হলেও অন্তত অন্তর্বর্তীকালীন সাহায্য হিসেবে সরকার কর্মচারীদের কিছু আর্থিক সাহায্য দিতে পারতেন এবং বে-সরকারী সূত্রের খবরে জানা যায় যে, স্বয়ং রাজ্যপালও ঐ সাহায্য মঞ্জুর করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু রাজ্য-প্রশাসনের বড়-কর্তাদের কর্মীদের সঙ্গে পাঞ্জা কষার মনোভাবের দরুণ কর্মীরা কলকাতা-হাওড়ার সফল ধর্মঘট করেছেন এবং জেলাভিত্তিক ধর্মঘটও যে অসফল নয়—সরকার, আকাশবাণীর উল্টোপাল্টা প্রচারেই তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রচারমাধ্যমে এমন সংবাদও প্রকাশ পেয়েছে যে, যেখানে মোট কর্মীর সংখ্যা যত নয়, উপস্থিতির সংখ্যা বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশি; অথবা যেখানে প্রথম বা দ্বিতীয় দিনে সবাই উপস্থিত বলা হয়, সেখানে পরের দিন আরও বেশি সংখ্যায় উপস্থিত হয় কিভাবে? বোধ হয় সবই সম্ভব হয় ভৌতিক কায়দায়! কিন্তু বাস্তবের যে-চেহারা, সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ধর্মঘটের পর অফিস খোলার দিন বে-সামাল সরকারী বড়কর্তারা হাজার হাজার ধর্মঘটী কর্মীদের সামনে লক্ষ্যবস্তু দেখিয়েও আর ছাঁটাই নোটিশ ধরিয়ে দেবার সাহস পায় নি। অথচ ধর্মঘট ভাঙার জন্য রাজ্য পুলিশ ও সি-আর-পি-র বরণপণ চেক্টা, মুখ্য উপদেষ্টার কড়া সতর্কবাণী ও বেতার-ভাষণ এবং আট পার্টির তৎপরতা—কিন্তুই ব্যর্থ ছিল না।

সরকারী কর্তাদের এই জাতীয় অনমনীয় মনোভাবের দরুণ কণ্ঠভোগ করতে হয়েছে এই রাজ্যের জনসাধারণকে। প্রসঙ্গত আমরা প্রশ্ন করি কলকাতায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির তীব্র বিরোধী সরকারী কর্মীদের সেই সংস্থাগুলিকে—যাঁরা বনোছিলেন, ধর্মঘট ভেঙে যাবে। আমরা না হয় জেলার খবর মূলতঃ রাখলাম, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁদের চোখের সামনেই ধর্মঘট হল। এমন ঘটনা অসম্ভব নয় যে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ওপর অনেক কর্মীর আস্থা নেই। তবু ঐ কমিটি বিরূপ কর্মীদের ধর্মঘটের সামিল করতে পেরে-ছেন তাঁদের দাবির ন্যায্যতায়।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও বে-সরকারী শিক্ষকদের ধর্মঘটের পর বর্তমান সরকারের আমলাতান্ত্রিক জীবনের অবসান হওয়া প্রয়োজন। আমরা আগেও যেমন বলেছি, তেমনি এখনও বলছি যে, কর্মচারীরা সরকারের আপন জন, তাঁদের সঙ্গে বিরোধ বৃদ্ধি করা শুধু অনর্থকই নয়—তা বৃদ্ধিমানের কাজ নয়। যাদের নিয়ে প্রতি মহত্ব চলতে হয়, তাঁদের সঙ্গে সাময়িক বিরোধ যদি ঘটেও থাকে, এখনও পারস্পরিক হার্দ্য বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে তার অবসান ঘটানো প্রয়োজন। আশা করি, রাজ্য সরকার সেই মনোভাবেই এগিয়ে যাবেন এবং সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি সেই মনোভাবের প্রতি যথোচিত মর্যাদা আরোপ করবেন।

সম্মাদকীয়

আজকের মানুষ

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরণানিধির এক ঘোষণায় সারা দেশে তোলপাড় হচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে তাঁর দাবির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ তো হাজির করা হচ্ছেই, পাল্লামেটে পর্যন্ত প্রচণ্ড হৈ চৈ হয়ে গিয়েছে। তবে শ্রীকরণানিধির দৃড়ভাষা দাবির বিরুদ্ধে দলের পাল্লাটাই ভারি দেখা যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি তাঁর রাজ্য তামিলনাড়ুর জন্য আলাদা স্ট্যাণ্ডার্ড (পতাকা) দাবি করেছেন। তার জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে যে, তাঁদের ইচ্ছে এই যে, রাজ্য পতাকার মধ্যে জাতীয় পতাকাও স্থান পাবে; আর যদি কেন্দ্রীয় সরকার তা না চান, তবে রাষ্ট্রীয় পতাকা বাদ দিয়েই তামিলনাড়ুর স্বতন্ত্র পতাকা করা হবে।

স্বভাবতই এ-অভিনব দাবি মেনে নিতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকৃত হয়েছেন। কারণ তাঁরা মনে করেন রাজ্যের আলাদা পতাকা আজ মেনে নেবার অর্থ ভারতের সংহতিতে ফাটল ধরানো, ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিচ্ছিন্নতার দাবিকে স্বীকার করা। এর পরিণাম গৃহযুদ্ধ বলেও রাজনৈতিক নেতারা আশংকা প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও তামিলনাড়ুকে আলাদা পতাকার অনুমোদন দিতে রাজি হন নি। তবে শ্রীকরণানিধির যুক্তি হলো গৃহযুদ্ধের ঝড়ের ২৫টি অঙ্গরাজ্যেরই আলাদা আলাদা পতাকা রয়েছে। পৃথক পতাকা পেলে তামিলনাড়ু, কালিই ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁদ করবে—একথা মা বললেও এ-সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রাজ্যবাসী অচিরে স্বাভাবিকসিদ্ধে হয়ে উঠলে এবং তার প্রতিক্রিয়া অন্যত্র রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়বে।

এ-ধরনের 'স্টাণ্ট' দিতে অবশ্য শ্রীকরণানিধির জুড়ি মেলা ভার। কিছুদিন আগে তিনি রাজ্যগুলির জন্য অধিকতর ক্ষমতা চেয়ে এক মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। বিভিন্ন

রাজনৈতিক নেতাদেরও তিনি এ-প্রস্তাবিত সম্মেলনে ডেকেছেন। আগামী মাসে তামিলনাড়ুতেই সে-সম্মেলন হবার কথা রয়েছে। আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসেবে ডি-এম-কে একটা বিশেষ গুরুত্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত, সে-আসন যাতে স্থায়িত্ব লাভ করে, তারই ক্ষেত্র রচনার জন্যে যে করুণানিধির এই সমস্ত প্রচেষ্টা তা বুঝতে কষ্ট হয় না। তবে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ছাড়া কোনো সর্বভারতীয় দল করুণা-



মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধি

নিধির ডাকে সাড়া দেবেন বলে মনে হয় না।

আরো চমকদার স্টাণ্ট হচ্ছে তামিলনাড়ুতে কামরাজ প্ল্যান। পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী নেহরু যেমন কামরাজ প্ল্যানের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্ট থেকে মন্ত্রী ছাঁটাই করেছিলেন তেমনি শ্রীকরণানিধিও তাই করছেন তাঁর রাজ্যে। তবে যে ক'জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দলীয় পতনের অভিযোগে রাজ্যের আবহাওয়া পর্যন্ত বিঘিয়ে উঠেছে কেবল তাঁদেরই ওপর ছাঁটাইয়ের খজ নেমে

আসছে দেখে সন্দেহ হচ্ছে সত্যি দলের সংগঠনের স্বার্থে না, নিজের মন্ত্রিসভার ইচ্ছাত বাঁচাবার জন্যে এ-ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যদিও প্রস্তাবটি এসেছে সংগঠনের পক্ষ থেকে তবেও একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আম্মাদুরাইয়ের জীবদ্দশাতেই শ্রীকরণানিধি একবার এ-প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু নেতার আপত্তিতে সেবার সফল হন নি।

শ্রীমদ্ভেল করুণানিধি ডি-এম-কে দলের একজন শক্ত মানুষ হিসেবে পরিচিত। সে শক্তির পরিচয় তিনি গোড়াতেই দিয়েছেন, যখন আম্মাদুরাইয়ের মৃত্যুর পর নেতৃত্বের পদ থেকে কৌশলে কেদন চেকিয়ান এবং মাথিয়াজাগানকে অপসারণ করেন। আম্মাদুরাইয়ের মত শ্রীকরণানিধিও আগে দ্রাবিড় ও কাজাঘাম দলের সদস্য ছিলেন, কিন্তু আম্মার সঙ্গে তিনিও দলভাগ করে ডি-এম-কে গঠন করেন। তিনি ছিলেন আম্মার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, তবে আম্মার যে উদারতা আছে করুণানিধির তা নেই, সংগঠনের মধ্যে তাঁকে কঠোর ব্যক্তি বলেই সকলে জানে।

মাদ্রাজের তাজাবার জেলার তিরুকুবলাই শহরের এক অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারে ৪৫ বছর আগে শ্রীকরণানিধির জন্ম। তিনি ১৯৫৭ সাল থেকে রাজ্য বিধানসভার সদস্য এবং আম্মাদুরাই মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন পূর্ত বিভাগের মন্ত্রী। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খ্যাতি নাট্যকার হিসেবে। শ্রীকরণানিধি বহু নাটক লিখেছেন এবং ৩৫টি ফিল্মের জন্য চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। এমন কি চিত্রপ্রযোজকের ভূমিকায়ও তাঁকে দেখা গিয়েছে। বক্তা হিসেবেও তাঁর সুনাম রয়েছে। তবে যতই বক্তৃতা করুন, করুণানিধি তামিলনাড়ুর জন্য পৃথক পতাকার দাবি আদায় করতে পারবেন কি?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা—(৪)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শান্তব প্রয়োজনে সুভাষচন্দ্র রাজনীতির ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না, কিন্তু তাঁর জীবনে সেটা অবশ্যই গোপনিক। বন্ধুচর্চা তিনি করেছেন—কিন্তু আদর্শ ও ভাবাবেগ ছাড়া জাতির উত্থান হয় না তিনি জানতেন। তবে সেই আবেগ অবৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যের চোরা-বাঁলিতে ঘেঁষে ভাবে না যায়, সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। আসামে মন্ত্রিসভার ভাঙা-গড়ার খেলায় এ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা আমরা দেখে এসেছি। এবার সুভাষ-চন্দ্র কিভাবে দেশপ্রেমের প্রবল তরঙ্গের মত আসামের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কিছু সংবাদ দেব। এখানে একটি কথা বলে নিতে চাই। আসামের রাজনীতির সঙ্গে পূর্বাধি পরিচিত ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি—আমাদের আলোচ্যকালেই আসামে সংগঠিত কংগ্রেস-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়—এবং সেই সংগঠনের পিছনে সুভাষচন্দ্রের প্রেরণা ছিল অসামান্য। আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের মধ্য দিয়ে নানা গোষ্ঠী ও স্বার্থে বিভক্ত আসামে প্রথম একবাক্য জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্ম হয়। সুতরাং আসামে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠন কঠিন দিয়ে সুভাষচন্দ্র আসামকে মন্ত্রিসভার আর্তিস্ট কিছু দিয়েছিলেন।

১৯৩৮-১৯৪০ সালের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বেশ কয়েকবার আসাম সফর করেছেন। এখানে আমরা ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর-নভেম্বর মাসের দুটি সফরের কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি।

সেপ্টেম্বর মাসে গ্রীষ্ম হয়ে সুভাষচন্দ্র শিলং এ যান। শিলং-এর পথে নানা স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সব বক্তৃতায় মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদানে আহ্বান জানান। কয়েকজন মুসলমান ছাত্র তাঁকে কালো পতাকা দেখায়, আবার অনেক মুসলমান সম্বর্ধনাও জানিয়েছিল। ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর দেড়টায় তিনি শিলং পৌঁছান। শিলং শহরের সমস্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—সবাই ছুটে এসেছিল তাঁর দর্শনের জন্য। বিরাট শোভাযাত্রা হয়েছিল তাঁকে নিয়ে।

শিলং-এর ২৪ মাইল দূর থেকে শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। সেখানে থেকে শোভাযাত্রা নানা পথ অতিক্রম করে এগিয়েছিল—সকল পথের ধারে সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের উৎসাহ জমতা তাঁর দর্শনের জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রতিটি পথের বাঁক আক্ষরিকভাবে মানুষের মাথার সমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। নারীদের শঙ্খধ্বনি এবং পুরুষদের শ্লোগানে পরিবেশ সঘন মদ্যুরিত ছিল।” (অমৃতবাজার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)

এ দিনই শিলং-এর পোলো গ্রাউন্ডে সুভাষচন্দ্রের জন্য বিরাট সম্বর্ধনা সভা হয়। সভাপতিত্ব করেছিলেন আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী, এম-এল-এ। ১৫ হাজার লোক সমবেত হয়েছিল। শিলং-এর জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সুভাষ-চন্দ্রকে মানপত্র দেওয়া হয়।

সম্বর্ধনার উত্তরে ভাষণ দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র পটভূতাবে বলেছিলেন, “ফেডারেশনকে যে-কোনো উপায়ে রুদ্ধ হবে” এবং আশ্রমস্বাধী শুনিয়েছিলেন—“আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন যে, যদি আমরা সুযোগের সম্ভাবহার করতে পারি, তাহলে হয়ত আর লড়াই ছাড়াই অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পেয়ে যেতে পারি।”

সুভাষচন্দ্র শিলং-এর সঙ্গে তাঁর সংযোগের স্মৃতিচারণা এই সভায় করেছিলেন। এগারো বছর আগে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পাবার পরেই একেবারে ভাঙা স্নাত্বের ঊধারের জন্য তিনি অল্প কিছুদিন শিলং-এ ছিলেন। “সেদিন কেউ কল্পনাই করতে পারে নি”, সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “শিলং-এর প্রকাশ্য স্থানে এমন একটা বিরাট রাজনৈতিক জনসভা অনুষ্ঠিত হতে পারবে। কিন্তু পরিস্থিতি বহুলাংশে বদলে গেছে। কেবল আসামে বা ভারতবর্ষে পরিস্থিতি বদলায় নি—সমস্ত পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটেছে। সারা জগতে বিপুল রাজনৈতিক চেতনার প্রাবল্য বয়ে গেছে—জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।”

বৃটেনের প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্র বলেনঃ “দশ-বার বৎসর আগে বৃটেন যা ছিল, তার সঙ্গে আজকের বৃটেনের অনেক পার্থক্য। বৃটেনের জনমতের বেশ খানিক পরিবর্তন হয়েছে। সেখানে এমন কিছু মানুষ আছেন, যারা ভারত সহ পৃথিবীর অন্যান্য শৃঙ্খলিত দেশগুলির স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন। তাঁরা বলেন, বৃটেনের সাক্ষাৎ অধীন কিংবা প্রভাবাধীন অঞ্চলগুলিকে স্বাধীনতা দিতে হবে—তার বার কেবল এই দশগুলি স্বাধীনতা পাবে না, বৃটেনও স্বাধীন হবে।”

স্বাধীন বন্দু

ভারতে প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে উচ্চাশ্রয় বিরুদ্ধে সূত্রবাণী উচ্চারণ করে সূভাষচন্দ্র বলেছিলেনঃ “শেষ লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজের জুলনায় তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কিছই নয়। এর দ্বারা ভারতের সমুদ্র্যত সমস্যাগুলির—দারিদ্র্য, ব্যাধি, বেকার সমস্যা, নিরক্ষরতা, কৃষি-ঋণ প্রভৃতি কোনোটিরই সমাধান করা যাবে না। আমার আশঙ্কা হয়, ১৯৩৫-এর আর্ট অনুষায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের নামে যে সামান্য ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছে, তার দ্বারা বৃদ্ধি মূল লক্ষ্য পূর্ণ স্বরাজের প্রশ্নটি আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে! পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেই তবে আমাদের সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব।”

“স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে” যোগ দেবার আহ্বান জানিয়ে সূভাষচন্দ্র বলেছিলেন— “আরও সংগ্রাম, আরও ত্যাগের জন্য উঠে-পড়ে লাগতে হবে। সংগঠন-শৃঙ্খলা-ত্যাগ—এখন এরই প্রয়োজন। সুযোগ এসেছে, বসে থাকলে চলবে না।”

১৭ সেপ্টেম্বর সূভাষচন্দ্র শিলং-এর বিখ্যাত মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেন্ট এডমন্ডস কলেজ দর্শনে যান। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সম্মিলিত হয়ে তাঁকে মানপত্র দেন। সভায় ‘বন্দে মাতরম্’ গান হয়েছিল, গেরোছিল লে’ড কিন কলেজের ছাত্রীরাই। সভায় পৌরোহিত্য করেন ঐ কলেজের বিদ্যালয় বিভাগের অধ্যক্ষ রেভারেন্ড ব্রাদার ও’লিয়ারী।

রেভারেন্ড ও’লিয়ারীর পক্ষে ‘সুন্দর এক বক্তৃতায়’ সূভাষচন্দ্রকে অভ্যর্থনা জানানো সম্ভব হয়েছিল, কারণ তিনি ডি’ ভ্যালেরার বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাহলেও ডি’ ভ্যালেরার বন্ধু হয়েও, ভারতবর্ষে মিশনারীরূপে অবস্থান করার জন্য রেভারেন্ড ও’লিয়ারীর পক্ষে এসবের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি প্রকাশ্যে সহানুভূতি জানানো সম্ভব ছিল না। সুতরাং স্বাধীনতাযোদ্ধা সূভাষচন্দ্রকে প্রশংসা করার জন্য অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশ তিনি বেছে নিয়েছিলেন—ন্যাশন্যাল প্র্যানিং প্রবর্তনে সূভাষচন্দ্রের ভূমিকার বিষয়টিকে—ঐ বিশেষ অংশে তিনি সূভাষচন্দ্রের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন। চিন্তাশীল এক বিদেশীর মূখ্য থেকে ঐ কালের পরিপ্রেক্ষিতে সূভাষচন্দ্রের সংগঠনী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির এই প্রশংসা খুবই মূল্যবান।

রেভারেন্ড ও’লিয়ারী বলেছিলেনঃ

“শ্রীযুক্ত বসু এই দেশের কোটি কোটি দানবের প্রতি-নিধি।” তাঁর প্রকাশ্যে উচ্চারিত বক্তব্য থেকে তাঁর মন ও হৃদয়ের অসাধারণ গুণাবলী সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনে সম্প্রতি প্রদত্ত ভাষণে শ্রীযুক্ত বসু জাতীয় পন্থাগঠন সম্বন্ধে তাঁর পারিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যায়, তিনি কেবল রাজনৈতিক নেতা নন, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নেতাও। এই বিশাল দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান আশ্রয় প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বসুর সংগঠনশীল মন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে পন্থাগঠনের পারিকল্পনার প্রণয়ন করেছে।

“আমি জেনেছি যে, শ্রীযুক্ত বসু আগারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি’ ভ্যালেরার বন্ধু। ডি’ ভ্যালেরার বন্ধুত্ব অর্জনের সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। আমাদের আইরিশ স্কুল-গুলির একটির তিনি প্রাক্তন ছাত্র। কয়েক বৎসর আগে যখন আমি আগারল্যান্ড ছেড়ে আসি, তখন তিনি শেষ এই কথা আমাকে বলেছিলেন, ‘ব্রাদার, আপনারা যদি ভারতের নৈতিক, মানসিক এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির কাজে অংশ নিতে পারেন—যে-কাজ আপনারা শতাধিক বৎসর ধরে আগারল্যান্ডের জন্য করে আসছেন—তাহলে আপনারা সত্যি ভারতের জন্য অনেক কিছু করবেন।’ আমরা এখানে সেই কাজ করার চেষ্টা করছি। শ্রীযুক্ত বসুকে আশ্বাস দিয়ে বলতে পারি, জাতি গঠনের ব্যাপারে আমরা নিজস্ব ক্ষেত্রে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। দৃঢ়-সুস্থ সমাজতন্ত্রের ভাবধারা—যার মধ্যে মানুষের নিজ সম্পত্তি বজায় রাখার মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত—সকল খৃষ্টান ও অখৃষ্টান দেশে প্রচারিত হয়। সামাজিক সুবিচারের অর্থ—ব্যস্তির যুক্তিসম্মত স্বাধীনতা, শ্রমিকের ন্যায্যমূল্য মজুরি এবং যেসব গোষ্ঠী কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উদ্যমের দ্বারা জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত, তাদের জন্য সরকারের উৎসাহ ও সংরক্ষণের মনোভাব। ভারতীয় জনগণ স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য ও অসামান্য ধৈর্যের অধিকারী—তাঁরা সেজন্য বিশ্ব-ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। আন্তরিক ও গভীরভাবে আশা করি, শ্রীযুক্ত বসু ও তাঁর স্থলাভিষিক্তদের নেক্ষ্রে ভারতীয় জনগণ শান্তি, পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্মানের প্রেরণার পৃথিবী সৃষ্টির কাজে সাহায্য করবেন। তেমন পৃথিবীতে আমাদের সকলের প্রয়োজন।”

রেভারেন্ড ব্রাদার ও’লিয়ারীর সমাজতন্ত্র সূভাষচন্দ্রের সবটা পছন্দসই হবার কথা নয়। কিন্তু সম্বর্ধনা সভায় তিনি ভাষিক বিভক্তির মধ্যে প্রবেশ করতে চান নি। ভাষণের প্রথম দিকে সাধারণভাবে আগারল্যান্ডের সঙ্গে

১ অমৃতবাজারের ১৯ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় সূভাষচন্দ্রের এই ভাষণের শিরোনামঃ

SJ. BOSE AT ST. EDMUNDS

Irish Missionary's Tribute to Congress President

A Friend of De Valera

“The Representative of Millions of People in this Country”

জীবন যা নিয়ে বেঁচে আছে

সুশীল আনন্দ

জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলেছে—এখনও

শুলা শক্ত কে বাঁচবে

তবু চেষ্টা ডাক্তারের

মানুষের হৃৎপিণ্ড নিয়ে

জীবন যা নিয়ে বেঁচে আছে।

ড্রাপ স্ট্রীটে তখন লাল আলোর

সিগন্যাল;

সুশীলার চোখে মুখে বিরক্তি,

জাইভারকে অনুরোধ—

অমিত বোধ হয় চলে যাবে

অনেক দেবী হয়ে গেছে।

সে নিরুপায়—

এখনও লাল আলো জ্বলছে।

তার সংযোগের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। 'গুরুতর নানা ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও আইরিশ ক্রীস্চান ব্রাদারদের স্বাধীনতা পরিচালিত কলেজের আমন্ত্রণ' তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেনঃ "আয়ারল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে বহু ব্যাপারে এক্য আছে। এই সভার সভাপতি রৈভারেন্ড মহোদয় আয়ারের প্রধানমন্ত্রী মিঃ ডি' ভ্যালেরার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের উল্লেখ করেছেন। গত বৎসর লন্ডনে মিঃ ডি' ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাতের সুস্বপ্নের কথাগুলি মনে পড়ছে। তার আগেও আয়ারল্যান্ডে গিয়েছি, সেখানকার জনগণের সৌজন্য ও আতিথেয়তায় আমি মুগ্ধ।"

আসামের কথা এই বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন। "বিদেশীর কাছে আসাম বহু বিভিন্ন বিচিত্র জিনিসের সমাহার বলে মনে হয়। এখানে নানা মানুষ, তাদের চেহারা, ভাষা, ধর্ম পৃথক। কিন্তু একদিক দিয়ে এই সকল বিভিন্নতা বিহরণ, কারণ, এখানে জনগণের মধ্যে সুগভীর একাচেতনাও রয়েছে, তারা একই উদ্দেশ্যে সম্মিলিত—একই মাতৃভূমির সন্তান—সকলেই বিরাট, কিন্তু অনুন্নত এক দেশের নাগরিক। এতখান সত্য, সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ যথেষ্ট ফুটে উঠেছে, কিন্তু কংগ্রেস নানা প্রশংসার মানদণ্ডকে একাবদ্ধ করতে দ্বিতীয়—সকলকে সে সাধারণ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত করতে চায়—সে উদ্দেশ্য, শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতার—তারই স্বর্গাতির জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম করছে।

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রথম প্রয়োজন। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। অর্থনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্নও আছে। আমাদের সামনে সমস্যা বিপুল। বন্যার বিধ্বংসী রূপের কথাই ধরা যাক। কংগ্রেসের লক্ষ্য নদী-পরিষ্কারণের দ্বারা বন্যার ভয়াবহ সর্বনাশ একেবারে দূর করা, বা তা অসম্ভব হলে তাকে কমানিয়ে আনা। আমাদের উদ্দেশ্য জনগণের উন্নতি। এর জন্য সকলের উচিত কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাকে শক্তিশালী করা।"

মিশনারী কলেজে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করছিলেন—যেখানে বহু মিশ্র রক্তের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তিনি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, তাঁরা যেন সকলের সঙ্গে নিজস্বের ভাগ্য মিলিয়ে দেন। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের অনেকেই এখন তা করছেন। তাঁরা অনুভব করছেন, ভারতবর্ষ তাঁদের মাতৃভূমি। প্রিয় বন্ধু বন্ধু তাঁদের আম্বাস দিয়ে বলেন, কংগ্রেস যখন তাঁদের স্বার্থের প্রতি সম্মান মনোভাব বজায় রেখে

তার পৃষ্ঠার চেষ্টা করবে। কংগ্রেসের একটিই উদ্দেশ্যঃ ভারতকে একাবদ্ধ করা এবং প্রতিটি সম্প্রদায়কে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাবোধ, সাধারণ ঐতিহ্যবোধ এবং এই বিরাট দেশের সম্পদসমূহের পূর্ণ ব্যবহারের উপযোগী প্রশাসন দান করা।"

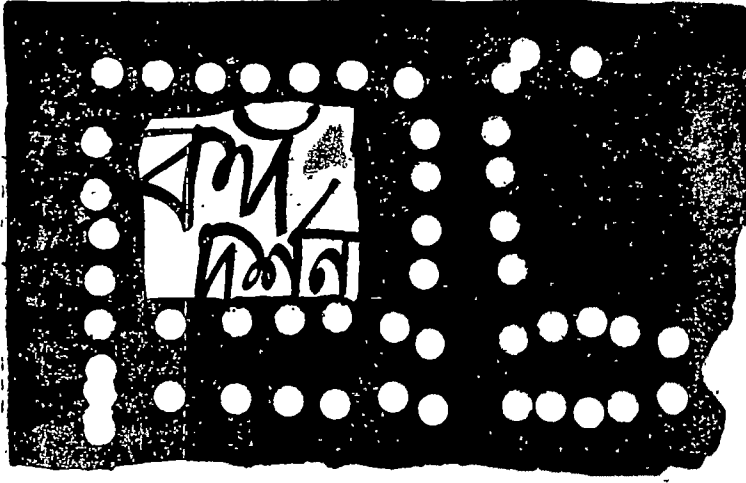
সুভাষচন্দ্র আরও বলেছিলেনঃ "ব্যক্তির স্বাধীনতার সঙ্গে রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মন্দির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে অনুভূত রীতিনীতি প্রচলিত। সেগুলি দূর করা দরকার। স্কুলের জন্য অবৈতনিক সাধারণ শিক্ষার বিস্তার এ ব্যাপারে সর্বাধিক সহায়ক এবং কংগ্রেস-পরিষ্কারণের মধ্যে এই অবৈতনিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। কোটি কোটি মুক মানবকে নিশ্চয় মুক্ত করে তুলতে হবে। সং পরিপ্রমের উপযুক্ত পাণ্ডা তাদের পেতেই হবে এবং তাদের জন্য সকলপ্রকার সাংস্কৃতিক ও আনন্দপ্রসাদমূলক ব্যবস্থা করতে হবে।

"রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অংশ নিতে পারবে। স্বাধীনতার নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অনেক বিষয়ে এক্য রয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সকলে পৃথিবীর স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সমাবেশে যোগ্য স্থান গ্রহণ করবে—বিরাট মানব পরিবারের মঙ্গলসাধনে উপযুক্ত অংশ নেবে।"

সভায় অনেক মহিলা ও ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেস নারী-জাগরণে কি করছে সে সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ সুভাষচন্দ্র করেছিলেনঃ "আমাদের নারীরা যখন সামাজিকভাবে সচেতন এবং সুশিক্ষিত হয়ে উঠবেন, তখন তাঁরা জীবনের সৌন্দর্যবৃদ্ধির কাজে উপযুক্ত অংশ নেন। নারীমন্দির ক্ষেত্রে কংগ্রেস অনেক কিছু করেছে। একজন মহিলা মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন, অন্য একজন এক প্রাদেশিক আইনসভায় ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয়েছেন। অন্যান্য পদেও অনেক নারীকে নিয়োগ করা হয়েছে। কংগ্রেস নারীর অধিকার বৃদ্ধি করতে চায়।"

পরদিন অর্থাৎ ১৮ সেপ্টেম্বর সুভাষচন্দ্র গুনরায় ছাত্র-সভায় বক্তৃতা কবলেন। লেডী কিন কলেজ ও স্কুল সহ শিলং-এর অন্যান্য স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। সভায় 'খাসি ন্যাশনালিস্ট ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক মিঃ ডি.এন.এস ওয়ালাং তাঁকে খাসি পুস্তক উপহার দেন।

[ক্রমশ]



পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে যত কম কথা বলা যায়, ততই ভাল। একটির পর একটি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কোন ঘটনার সঙ্গে যে কোন ঘটনা কিভাবে সংযুক্ত, সেগুলি ঘটে যাবার পর ফলাফল কি হচ্ছে, সেটুকু উপলব্ধি করার মতও সময় পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত ব্যতীতই যেন ভারী হয়ে উঠেছে এবং একটা অশুভ শ্বাসরোধকারী অবস্থার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পড়ে রয়েছে। কতকগুলি ঘটনার প্রকৃতি অবশ্য রাজনৈতিক, কতকগুলি আবার রাজনীতি ও সমাজবিরোধিতার মিশ্রণ, আবার কতকগুলি নিতান্তই সমাজবিরোধী ঘটনা। একদিকে দেখা যায় নিছক রক্তক্ষয় চলছে, অপরদিকের ঘটনাগুলিতে কিছুটা আন্দোলন, কিছুটা সংগ্রামের আদল ফুটে উঠছে, কিন্তু এগুলি কিসের জন্য, এগুলি কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে, সমস্তই একটা কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। কি ঠিক, কি ভুল, সেটা বোঝার উপায়টুকুও নেই।

উপর-উক্ত আবহা বা কাসমর্শি যে মূল ঘটনাসমূহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, সেগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে কার্ণত একটা অহসনীয় পরিস্থিতির চিত্রই ফুটে ওঠে, যে অহসনীয়তায় আমরা প্রত্যেকেই উত্তেজিত ও বিব্রান্ত, অথচ যা থেকে ফলদায়ক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন হবার সঙ্গে সঙ্গেই রাতারাতি যেন দেশটাক সর্বনাশের অতল গহবরে ঠেলে দেওয়া হল, আইন-শৃঙ্খলা শিকের উঠল, আর শত্রু হল ব্যাপক রক্তক্ষয়ের পালা এবং সে রক্তক্ষয়ের অজুহাত কোথাও রাজনৈতিক, কোথাও অন্য কিছু। রাজনীতির নামে যে রক্তপাত সে সম্পর্কে গত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে, এর পিছনে কোন মহৎ লক্ষ্য নেই, কোন সুচিন্তিত আদর্শ নেই, আছে শুধু অন্ধ বিশ্বাস, যুক্তিহীন ঘৃণা আর অর্থহীন আত্মপীড়ন।

এ তো গেল এক দিক। এবার বাকি দিকের বিষয়ে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় পরিস্থিতিতে বিগত যুক্তফ্রন্টের বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা কি? আট পার্টি, ছয় পার্টি উভয় তরফ এখন নিজেদের শক্তির পরিসরটার পরিমাপ করছে, একে অন্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। আর সেই অবসরে বাংলা দেশে যে ফ্যাসিস্ট রাজত্ব কয়েক হতে চলেছে, তার হিসাব কে রাখে? আজ কারোর জীবন নিরাপদ নয়। রাতে ঘুমিয়েও শান্তি নেই, পাড়ার কোথায় কি ঘটেছে, সি, আর, পি এসে ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছে। এই নব বর্গীর দল বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছে। একে যদি ফ্যাসিবাদ না বলে তো ফ্যাসিবাদ কাকে বলে?

অথচ পশ্চিমবঙ্গের বন্ধু যারা এই ফ্যাসিবাদকে ডেকে এনেছে, তারা এখন মর্ষাদার লড়াই-এ লিপ্ত। আর এই মর্ষাদার লড়াই-এর ভিত্তিম তারাই, যাদের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পার্টিবাজি গড়ে উঠেছে। দুর্গাপুরে ধর্মঘট করাই বলুন, সরকারী কর্মচারী বা শিক্ষক ধর্মঘটের ক্ষেত্রেই বলুন, একটি গ্রুপের ভূমিকা খুব প্রশংসনীয় নয়। এই সমস্ত আন্দোলনে সফলতা বা বিফলতা কতটা ঘটেছে সেটা বড় কথা নয়, এক তরফ জানে যে তারা ধর্মঘটের আহ্বান দিলে অন্য তরফ প্রচণ্ড বাধা দেবে, অন্য তরফও জানে যে তাদের কাজও অনুন্নতভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে। সব জেনেশুনই দৃষ্টি তরফ দৃষ্টাবে এগিয়েছে, যেখানে উদ্দেশ্য একটাই, নিজেদের শক্তির ক্ষেত্রটা কতখানি তা পরিমাপ করা এবং এই উদ্দেশ্য উভয় তরফেরই সিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন, এই এক্সপেরিমেন্টের জন্য সাধারণ মানুষকে এই রকম পরিস্থিতিতে গিনিপিগের মত কেন ব্যবহার করা হল? অথচ এর ফলাফলস্বরূপ যে উৎপীড়নের বোঝাটা নেমে আসবে, তা থেকে জনসাধারণকে, তাদের সমর্থকদেরও মুক্ত করার ক্ষমতা কি সংশ্লিষ্ট দলগুলির আছে?

আজ প্রয়োজন পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা স্বাভাবিক আবেগের সৃষ্টি করা, আর বাংলার বন্ধু যে ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছে তার বিনাশ ঘটানো। কিন্তু একাধা করা করতে পারে সেই রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর বিভক্ত হয়ে ফ্যাসিস্ট শক্তির হাতকেই শক্ত করেছে। অথচ মার এক বছর আগেও পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কত স্বপ্ন দেখেছিল। তারা ভেবেছিল তারা একটি প্রগতিশীল সরকার পেয়েছে, তারা ভেবেছিল দোষ-ত্রুটি থাকলেও এই সরকার তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে, তারা ভেবেছিল যে শরিকী সম্পর্ক সাময়িক, একদিন সব মিটে যাবে। সে প্রত্যাশার অপমৃত্যু ঘটানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে বাঘের খাঁচার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যারা তা করেছে, তারা আজ দৃষ্টি তরফে ভাগ হয়ে বলছে, 'আমরা নম্র ওরা, ওরাই তোমাদের খাঁচার মধ্যে পুড়েছে, আগে ওদের নিকেশ করি, তারপর তোমাদের খাঁচার থেকে বার করব।'

পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ

সংসদে ১৯৭০-৭১ সালের সংশোধিত বাজেট পাশ হয়েছে আর সেই সঙ্গে ১লা অক্টোবর থেকে ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদও বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচন যে কবে হবে সে সম্পর্কে কেউই ভবিষ্যদ্বাণী করতে সাহস করছেন না। কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য : বাংলাদেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে না আসা পর্যন্ত নির্বাচনের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার পতনের ফলে সাধারণ মানুষের আন্দোলনে যে কি সাম্প্রতিক আঘাত এসেছে তা আজ জনসাধারণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছেন। বাম-পন্থী নামে কথিত নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কাদা ছোঁড়াছাড়ির প্রতিযোগিতা সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় বাংলাদেশের অন্ধকারময় পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে কোন আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতেও নেতৃস্থানীয় কান্ডারীহীন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কোন মাথাব্যথার লক্ষণ দেখা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের জন্য সত্যি কিছু করা হচ্ছে এ বিশ্বাস লোকসভার অনেক সদস্যই রাখতে পারছেন না! অনেকেই লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে বৈষম্যের কথা তুলেছিলেন। অনেকে দেখিয়েছেন যে, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তাঁর আবিচার করা হয়েছে। বৈষম্যকৃতভাবেই

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

হোক, আর অন্য যে কোন কারণেই হোক বাংলাদেশ দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত রয়েছে। কলকাতা ভারতের প্রধানতম নগর হওয়া সত্ত্বেও তার সমস্যা

উপেক্ষিত হয়েছে এবং দীর্ঘকালের এই বঞ্চনা ও উপেক্ষার ফলে আজ পশ্চিম-বঙ্গের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে রাজ্যের শাসনভার (৫৮৭ পৃষ্ঠায় চম্ভাব্য)





মেয়ে চালানের ফলাও কারবার

গত সপ্তাহে লন্ডন টাইমস্‌ পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইউরোপের ক্যাথলিক গীর্জাগুলোয় 'নান' অথবা সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেতে সুরু করেছে। অর্থাৎ ইউরোপীয় মেয়েরা আর সন্ন্যাসিনী সাজতে রাজী হচ্ছেন না। কিন্তু সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী না পাওয়া গেলে ইউরোপের হাজার হাজার ক্যাথলিক গীর্জাগুলো চলবে কি করে? তাই ক্যাথলিক গীর্জার বর্তনভুক্ত দালালরা ভারতবর্ষ থেকে ইউরোপে সন্ন্যাসিনী চালান দেবার ফলাও কারবার ফেঁদে বসেছেন। গত চার বছরে কেরালা থেকে প্রায় দেড় হাজার মেয়েকে (১৭ থেকে ২১ বৎসর বয়সকা) তাদের দরিদ্র পিতামাতাব কাছ থেকে 'ক্ৰয়' করে ইউরোপে চালান দেওয়া হয়েছে। কেরালায় খৃষ্টধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বেশি বলে সেই রাজ্যটিই হয়েছে 'নান' রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র। এনাকুলমের উপকণ্ঠস্থিত চেরু-ভান্ডুরের গীর্জার পুরোহিত ফাদার সিরিয়াক পুথেনপুড়া এই কারবারের একমাত্র রপ্তানীকারক এবং এর সিনান্স-য়ার হচ্ছে ইউরোপের ক্যাথলিক গীর্জার কর্মকর্তারা। এমন কি স্বয়ং পোপও এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত এবং তিনি এই চালানী কারবারের নায়ক পুথেনপুড়াকে তাঁর কাজের জন্য আশীর্বাদ করেছেন। পুথেনপুড়া 'নান' চালানের কারবার করবার জন্য নির্মাণ ভবন সেকুলাব ইনস্টিটিউট নামে একটি ট্রানজিট হাউস খুলেছেন। গরীব পরিবারের ১৬/১৭ বছর বয়সকা মেয়ে সংগ্রহ করে প্রথমে এই ইনস্টিটিউটে এনে রাখা হয়। সেখান থেকে বিমানে করে চালান দেওয়া হয় ইউরোপের নানা দেশে।

লন্ডন টাইমস্‌-এর হিসাব অনুযায়ী 'নান' চালানের কারবারে ইতিমধ্যেই ৫৪

লক্ষ টাকার লেনদেন হয়েছে। ফাদার পুথেনপুড়া 'নান' চালানের কারবারে 'নান' পিছ ৩ হাজার থেকে ৬ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকেন। 'ডেলী মিরর' পত্রিকা বলেছেন যে, এই 'নান' চালানের কারবারে ভারতের গীর্জা কর্তৃপক্ষ প্রচুর মনোফা লুটেছেন। ফাদার পুথেনপুড়া স্বীকার করেছেন যে, 'নান' চালান দেবার জন্য তাঁরা ইউরোপের গীর্জা থেকে যে টাকা পান, তার চেয়ে অনেক কম টাকায় 'নান' চালান দেওয়া হয়। ফলে তাঁদের হাতে প্রচুর টাকা উদ্ভূত থাকে। অর্থাৎ কারবারে মনোফার মার্জিনটা বেশ লোভনীয়।

পাপ ব্যবসায়ের পণ্য হিসাবে মেয়ে চালানের কারবার পৃথিবীতে নতুন নয়। সেটা "ইম্মোরাল ট্রাফিক" বলেই পরিচিত। কিন্তু ধর্মীয় ব্যবসায় এই ধরনের ব্যাপক মেয়ে চালানের কাহিনী কখনও শোনা যায় নি।

ক্যাথলিক ধর্মসংস্থার কর্মকর্তারা বলতে চেয়েছেন যে, গীর্জার জন্য 'নান' সংগ্রহ করা কোন নীতিবিরূদ্ধ কাজ নয় এবং হব্দ নানদের আসা-যাওয়ার ব্যয় নির্বাহী করাও গীর্জার পক্ষে অন্যায় কাজ হতে পারে না। কাজেই 'নান' চালান নিয়ে এত হৈ-চৈ করবার কি আছে?

যদি কেউ স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসী অথবা সন্ন্যাসিনী হবার বাসনায় গীর্জায় গিয়ে হাজির হন, তাহলে নিশ্চয়ই কারও আপত্তির কোন কারণ থাকে না। কিন্তু যে সমস্ত তথ্য আমরা জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, দরিদ্র পরিবারের সদ্য-যৌবনা মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং উন্নততর জীবনের লোভ দেখিয়ে ইউরোপে চালান দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের দিয়ে সেখানে বিয়ের, কাজ করানো হচ্ছে। মেয়েদের আগে লোভ দেখিয়ে নির্মাণ ভবনে ঢোকানো হয়। সেখানে তাদের দিনের পর দিন ধর্মীয় বোঁড়ামিতে দীক্ষা দিয়ে এই বলে ভর দেখানো হয় যে, যদি তারা

ধর্মীয় সংস্থা ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চায়, তাহলে তাদের পাপের অন্তর্থাৎ নান আর সেই পাপের একমাত্র শাস্তি অনন্ত নরক ভোগ। পাপের ভয়ে ভীত মেয়েরা ইউরোপে নতুন "অভিভাবকদের" খুঁপরে গিয়ে পড়ে এবং তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

কেরালা থেকে রোমের নিকটবর্তী গাইডোনিয়ায় সিস্টার অফ ডিভাইন প্রোভিডেন্স কনভেন্টে সন্ন্যাসিনী হিসাবে প্রেরিত আনা টমাস এলাক্সাট্‌র সম্প্রতি কনভেন্ট ত্যাগ করে ভারতে ফিরে এসেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁকে রোমের কাছে এক মানসিক হাসপাতালে ওয়াড এবং রোগীদের ধোয়া-মোছার কাজ করতে দিয়ে ক্রীতদাসের মত খাটানো হ'ত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবিরাম তাঁর কাজ ছিল ওয়াড সাফ করা আর রোগীদের ধোয়া-মোছা করা।

গত বছর ১৫ই অক্টোবর আনা ইটালীতে প্রেরিত হন। তার আগে তাঁকে ২২ দিন নির্মাণ ভবনে থাকতে হয়েছিল। সেখানে ফাদার পুথেনপুড়া তাঁকে কয়েকটি ইটালীয় শব্দ শিখিয়েছিলেন। ফাদার পুথেনপুড়া তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, ইটালীতে গেলে তিনি নার্সিং এমন কি ডাক্তারী পড়বারও সুযোগ পাবেন। কিন্তু যে ৯ মাস তিনি সেখানে ছিলেন, সেই ৯ মাসে তাঁকে কিছুই শেখানো হয় নি। একমাত্র কাজ ছিল দিব্যারাত্রি মানসিক হাসপাতালের ঘর-দরবার এবং রোগীদের পবিত্রকার-পরিচ্ছন্ন করা। এই ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে যখনই তিনি প্রতিবাদ করতেন, তখনই পুরোহিতরা তাঁকে শ্রমণ করিয়ে দিতেন যে, তাঁকে ৬ হাজার টাকা দিলে কিনে আনা হয়েছে। কাজেই তাঁর কোন প্রতিবাদ করা উচিত নয়। সেই প্রথম আনা জানতে পারেন যে, তাঁর নামে ৬ হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু মজুর কথা হচ্ছে, নিজের শাড়ি কেনবার জন্য ৯৫ এবং ৫০ টাকা ছাড়া তিনি আর কিছুই পান নি। আনা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে কনভেন্টে ত্যাগ করার মতলব আটেন এবং খবরটা ভারতীয় দূতরাসে পৌঁছে দেবার ভয় দেখিয়ে ভারতে ফিরে আসার টাকা আদায় করেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন, কনভেন্টে খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না।

খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে এদেশের মানুষ পরিপূর্ণ প্রাধান্যশীল হলেও খৃষ্টান মিশনারীদের সম্বন্ধে এ দেশের মানুষ মোটেই উচ্চ ধারণা পোষণ করেন না। অধিকাংশ খৃষ্টান মিশনারীই ধর্মের নামা-বলী গায়ে দিয়ে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের পাইওনিয়ার বাহিনীর কাজ করে থাকেন।

ভারতের মত অতি দরিদ্র দেশে স্বচ্ছল জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোককে ধর্মাস্তর-করণ ছাড়াও অনেক ক্ষেত্রেই মিশনারীরা ইংরাজ সরকারের গুপ্তচরের কাজ করতেন এবং এখনও করেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। উপজাতি অঞ্চলে এদের উৎপাত সবচেয়ে বেশি। ভারতের উত্তর-পূর্বাংশে এরা অনেকেই ভারতবিরোধী গুপ্ত ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত বলে অভিযোগ শোনা যায়। সেই কারণে প্রাক্তন ঔপনিবেশিক দেশ-গুলোয় খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট অসন্তোষ বিদ্যমান। কিন্তু মিশনারীদের হাতে প্রচুর টাকা। সাম্রাজ্যবাদী দেশের ধনীরা কোটি কোটি টাকা দিয়ে এই মিশনারীগুলোকে সাহায্য করে থাকেন এবং এটাকে তাঁরা তাদের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নী বলেই মনে করেন। কারণ, মিশনারীরা তাঁদের কারবার এবং প্রভুত্ব সম্প্রসারণে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন।

পার্লমেন্টে পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরণ সিং বলেছেন যে, নান চালান সম্পর্কে কোন অভিযোগ সরকার পান নি। তবে সংবাদটি প্রকাশ হবার পর বিষয়টি সম্পর্কে উদন্ত করা হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপে হঠাৎ সন্ন্যাসিনীর অভাব দেখা দিল কেন? কারণ, বিজ্ঞান ও কারিগরির অগ্রগতি পৃথিবীর মানুষকে আজ এমন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে, যার সঙ্গে প্রাচীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা আদৌ তাল রাখতে পারছে না। তাই সারা দুনিয়ায় যে-কোন ধর্ম সম্পর্কেই মানুষ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে। ধর্মবিশ্বাস তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। বহু পুরুষের অভ্যাস-বশত মানুষ এখনও ধর্ম অঁকড়ে আছেন বটে, তবে ধর্মের বন্ধন একেবারেই শিথিল হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় আদর্শ আর মানুষকে আগের মত উদ্বেগ করতে পারছে না। সেই কারণেই সম্ভবত খৃস্টান মিশনারীদের পক্ষে ইউরোপে সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ছে। কিন্তু সন্ন্যাসী পুরোহিত ছাড়া ঠাট বজায় রাখা শক্ত বলে দারিদ্র্যপ্রপীড়িত এশিয়ায় তাঁরা ভোগ-বিলাসের লোভ দেখিয়ে ত্যাগ-হৃত্যু সন্ধান করছেন। এটাকে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস বলাই কি সঙ্গত নয়?

ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার

পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মূল্যবোধ আন্দোলনের চাপে বিত্তীয় মহাবুদ্ধির পর প্রাচ্যের বহু দেশ থেকে বিবায় নিতে বাধ্য হয়েছে বটে, তবে প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা এখনও তাদের মেটে নি এবং সম্ভবত সাম্রাজ্য বিস্তারের আশাও তাদের এখনও ঘোচে নি। ইন্দোচীনের

ঘটনাই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার প্রধান লক্ষণ কুৎসা-বিস্তার। এশিয়া এবং আফ্রিকার স্থানীয় অধিবাসীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে তাঁরা প্রমাণ করতে চান, এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকেরা এখনও অসভ্য এবং বর্বর রয়ে গেছে।

বৃটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন গ্রেট ব্রিটেন বৈতার এবং টেলিভিশনের প্রায় একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে থাকেন। এটা একটা স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ সংস্থা হলেও বি বি সি বৃটিশ গভর্নমেন্টের সরকারী মন্ত্রণালয় বলেই পরিচিত। সম্প্রতি বি বি সি ফরাসী চিত্র পরিচালক লুই ম্যালের তোলা পাঁচখানি ছবি তাঁদের টেলিভিশন মারফৎ দর্শকদের কাছে পরিবেশন করছেন। প্রথম তিনখানি ছবি ইতিমধ্যে দেখানো হয়ে গেছে এবং (৫৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বঙ্গদর্শন

(৫৮৫ পৃষ্ঠায় শ্রমোৎসব)

আসবার আপাতত কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। কোন বিশেষ দল বা জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় আসতে না পারলে ভবিষ্যতেও কোন স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হবে না। এদিকে আন্তর্জাতিক অবস্থাও অতীব শোচনীয়, আমলাতান্ত্রিক শাসনে মানুষের নাভিস্বাস উঠেছে। পশ্চিম-বঙ্গের ভবিষ্যৎ সত্যি অন্ধকার।

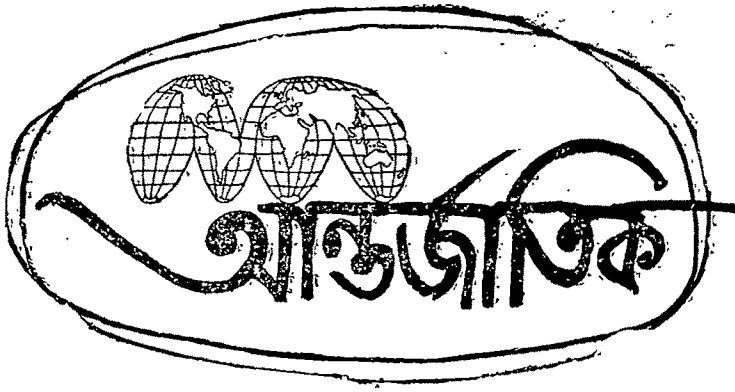
ভবিষ্যৎ সত্যি অন্ধকার, কেন না এই সৌদীনও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য টাকার অভাব হবে না, কিন্তু কার্যত পশ্চিমবঙ্গের জন্য টাকা বরাদ্দ করতে কেন্দ্রীয় সরকার কার্পণ্যই করছেন। কেন্দ্রীয় রাজস্ব ও ব্যয় দপ্তরের মন্ত্রী লোকসভায় জানিয়েছেন যে, কলকাতা উন্নয়নের জন্য ২০ কোটি ও হাওড়া কর্পোরেশনের ঘাটতি পূরণের জন্য ৭ কোটি টাকা এবং কলকাতা শহরাঞ্চলে পরিবহণের উন্নতির জন্য ৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য, প্রধান-মন্ত্রী গত জুন মাসে খরাদর্গত বাকুড়া ও পুরুলিয়া পরিদর্শন করে একটি দীর্ঘস্থায়ী সেচ প্রকল্পের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমান বাজেটে এ বিষয়ে কিছুর নেই কেন?

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট আলোচনার সময় ডেপুটি অর্থমন্ত্রী শ্রী আর কে গণেশ কয়েকটি মারাত্মক কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নতি রাজনৈতিক স্থায়িত্বের ওপর নির্ভর করে। এখন তো পাকাপাকি কেন্দ্রীয় শাসনই চলছে, কাজেই তাঁর যুক্তি অনু-

সরণ করলে এই কথাটাই প্রমাণিত হয় যে, এখনই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রকৃত সময়। অথচ উত্তরবঙ্গ ও রাজ্যের অন্যত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ সম্পর্ক প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, এগুলা রাজ্য সরকারের নিজস্ব ব্যাপার। রাজ্যের শাসনভার যে সময় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, সে সময় রাজ্য সরকারের নিজস্ব এস্তিয়ার বলে কোন প্রকল্পকে বাধ্যত্ব করার অর্থই হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে রাজ্যের সমস্যাদুলিকে গুরুত্ব না দেওয়া। আর এরই ফলে পশ্চিমবঙ্গকে সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

উদ্ভাস্ত কথা

গত জানুয়ারী মাস থেকে এ পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন। কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীভগৎ ঝা আঙ্গাদের মতে এই উদ্ভাস্তদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নাকি ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এবারের নতুন উদ্ভাস্তদের প্রায় সকলেই কৃষিজীবী বা কৃষি পরিবারভূক্ত, কাজেই পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এই কথাটি যেন কতৃপক্ষ ভুলে না যান। বসিরহাট এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আগমনের পরেই দৃষ্টকারণ্যে দশ হাজার উদ্ভাস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আপাতত এদের অবশ্য জমি দেওয়া হবে না, তবে পরিবারের সঙ্কষ্ট ব্যক্তিদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা হবে। ট্রানজিট ক্যাম্পে বা রেল স্টেশনে জীবন-যাপনে বাধ্য না করে সরকার যে এতদিন পরে তাদের কায়িক শ্রমের ব্যবস্থা করছেন সেটা আনন্দের কথা। আমরা পূর্বে লিখেছিলাম যে, উদ্ভাস্তদের সোজাসজি পুনর্বাসন কেন্দ্র না পাঠিয়ে যদি আগেকার মত ক্যাম্প-জীবনে থাকতে এবং ক্যাশ ডোল পেতে বাধ্য করা হয়, তার চেয়ে বড় ভুল আর কিছই হবে না। সুত্বের বিষয়, সরকারের মাথায় এটা চুকুচ্ছে। কিন্তু ভারতের আমলাতন্ত্রের ওপর আমাদের ভরসা কম, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা কার্যকরী করার মধ্যে ফারাক অনেক। সরকারকে অনুরোধ যেটুকু ব্যবস্থা তাঁরা করবেন তা যেন পাকাপাকি করেন। এমন ঘটনাও তো ঘটেছে যে পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে উদ্ভাস্তরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, তার কারণ ব্যবস্থাপনার অভাব। আন্দামান ও দন্ডকারণ্য এই দুটি স্থান উদ্ভাস্ত পুনর্বাসনের খুব ভাল ক্ষেত্র। এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও মহীশূরেও অনেক অনেক অনাবাদী ও বনভূমি পড়ে আছে, সেখানে যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকলে উদ্ভাস্তরা সোনা ফলাতে পারেন।



পশ্চিম এশিয়া

পশ্চিম এশিয়ার সংকট সমাধানকল্পে বহুপ্রত্যাশিত শান্তি আলোচনা শুরু হয়েছে। ২৫শে আগস্ট নিউ ইয়র্কে এই আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। পরে প্রয়োজন হলে পশ্চিম এশিয়ার কোথাও এই আলোচনা চলবে। রাষ্ট্রসংঘের শান্তিদূত ডঃ গানার জারিং পৃথক পৃথকভাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, জর্ডান ও ইজরায়েলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন।

শান্তি আলোচনার জন্য একদিকে ইজরায়েল এবং অপর দিকে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডান নব্বই দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছে। ইরাক, সিরিয়া, আলজিরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি আরব রাষ্ট্র ও প্যালেস্টাইন গেরিলারা যুদ্ধবিরতির বিরোধিতা করলেও অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র এই যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। প্রথমে যুদ্ধবিরতি ও পরে আলোচনার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রজার্সের প্রস্তাবকে ভিত্তি করেই এই ব্যাপার সম্ভব হয়েছে। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যাতে এই প্রস্তাব মেনে নেয়, তার জন্য সোভিয়েত যুনিয়ন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

ইজরায়েলের প্রস্তাব ছিল আরব ও ইজরায়েল; উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতায় আলোচনাব্যবস্থা করতে হবে। আরবরা এতে রাজি নয়। তারা ইজরায়েলকে এখনও রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করে না। ইজরায়েলের কোন প্রতিনিধির সঙ্গে এক বৈঠকে তারা বসবে না। তারা গানার জারিং-এর মাধ্যমে পরোক্ষভাবে আলোচনা চালাতে চায়। সেই মতই ব্যবস্থা হয়েছে। জারিং পৃথক পৃথকভাবে তিনটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনা করছেন।

ইজরায়েলের আর একটি প্রস্তাব ছিল, এই আলোচনার সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের যোগ দেবেন। সেইমত ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবানকে মনোনীতও করা হয়েছে। কিন্তু আরবরা রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা চালাবার

পক্ষপাতী। রাষ্ট্রসংঘে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও জর্ডানের শীরা প্রতিনিধি আছেন, তারা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। ঠিক হয়েছে; আপাতত রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে আলোচনা হবে। পরে প্রয়োজন হলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের যোগ দেবেন।

ইজরায়েলের তৃতীয় প্রস্তাবও গৃহীত হয় নি। ইজরায়েলের ইচ্ছা ছিল, সাই-প্রাসের নিকোসিয়ায় এই আলোচনা হোক। কিন্তু তা হয় নি। নিউ ইয়র্কেই আলোচনা শুরু হয়েছে।

প্রথম দিনের আলোচনার পর ইজরায়েলের প্রতিনিধি রাষ্ট্রসংঘে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত জোশেফ তেকোয়া বলেছেন, আরবরা যদি সত্যি শান্তি চায়, তবে অবশ্যই শান্তি স্থাপন সম্ভব হবে।

২৫শে আগস্টের আলোচনার পর জোশেফ তেকোয়া আর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন নি। কারণ, ইজরায়েল সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তিনি দেশে গিয়েছেন। তবে গানার জারিং অন্য দুই দেশের প্রতিনিধির সঙ্গে আরও কয়েক দফা আলোচনা করেছেন।

ভেল আর্ভডে ২৪শে আগস্ট ঘোষণা করা হয়েছে। গানার জারিং-এর সঙ্গে পরবর্তী আলোচনায় জোশেফ তেকোয়া সোজাসুজি জানতে চাইবেন, ইজরায়েলের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কি আরবরা মানবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা প্রথমে হওয়া প্রয়োজন।

গানার জারিং-এর সঙ্গে প্রথম দিন আলোচনার পর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধি মহম্মদ হাসান আল জায়াত বলেছেন, যে ইজরায়েলীরা ছয় দিন ধরে যুদ্ধ করতে পারে, তারা নিশ্চয়ই চাইলে নব্বই দিনের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাও করতে পারে। আল জায়াতের বক্তব্য হল; নিরাপত্তা পরিষদের ২২শে নভেম্বর, ১৯৬৭ তারিখের প্রস্তাবকে মীমাংসার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে হবে। দখল করা সকল আরব অঞ্চল থেকে ইজরায়েলী সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া, আরবদের

দাবী, প্যালেস্টাইনের উন্মাদত্বের সমস্যা একটা ন্যায্য সমাধান চাই।

জর্ডানের রাজা হুসেনও প্রায় একই কথা বলেছেন সাংবাদিকদের কাছে। তার মতে, ১৯৬৭-এর জুন যুদ্ধে ইজরায়েলীরা যেসব এলাকা দখল করেছে তা যদি তারা ছেড়ে দেয় এবং প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তারা মেনে নেয়, তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। জেরুজালেম সম্পর্কে রাজা হুসেন বলেন, এই পবিত্র নগরীর আন্তর্জাতিকীকরণে তাঁদের আপত্তি নেই। তবে কেবল জেরুজালেমের আরব অংশের আন্তর্জাতিকীকরণ করা চলবে না, করলে সমগ্র শহরের জন্যই তা করতে হবে।

আলেকজান্দ্রিয়ায় সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের ও জর্ডানের রাজা হুসেন তিন দিনের জন্য এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন ২১, ২২ ও ২৩শে আগস্ট। শান্তি আলোচনায় যাতে দুই আরব রাষ্ট্র একই সুরে কথা বলতে পারে, তা স্থির করার জন্যই প্রধানত দুই রাষ্ট্রনায়ক মিলিত হয়েছিলেন। তবে ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, শান্তি আলোচনা যদি হঠাৎ ভেঙে যায়, বা ব্যর্থ হয়, তবে আরবদের পক্ষ থেকে কি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সে সম্পর্কেও নাসের ও হুসেন আলোচনা করেছেন। তাছাড়া, প্যালেস্টাইন গেরিলাদের বিষয়েও উভয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজি হলেও প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনকে বন্ধ করতে চান না কেউই। রাজা হুসেন এই আলোচনার জন্য জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী সুলেমান নাবুজিসকে সঙ্গে এনেছিলেন। নাবুজিসের সঙ্গে প্যালেস্টাইন গেরিলা নেতাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। অনেকের ধারণা, প্যালেস্টাইন উন্মাদত্বের দিকে প্যালেস্টাইনের জন্য বাইরে থেকে একটা পাল্টা সরকার স্থাপন করা যাবে কি না, আলেকজান্দ্রিয়া বৈঠকে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

অনেক অসুবিধা থাকলেও আরব ও ইজরায়েল, উভয় পক্ষই যে একটা মীমাংসায় পৌঁছতে আগ্রহী, তার প্রমাণ, আলোচনা শুরু হয়েছে। আরবরা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে বোমারু বিমানবহনসহ সোভিয়েত ক্ষেপণাস্রব নিক্ষেপ ঘাঁটি স্থাপন করেছে, ইজরায়েল এই অভিযোগ তুললেও এই নিয়ে তারা জিদ করে নি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও খুব একটা পাল্টা দেয় নি।

আই মনে হচ্ছে, আশাবাদের রিসেব কারণ না থাকলেও, কিছুটা আশা অবশ্যই আছে।

এদিকে মার্কিন সেনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ব কর্মিটির চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ার

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী



ফুল রাইট

গ্যাপারে মার্কিন নীতির কঠোরতম সমালোচক উইলিয়াম ফুলরাইট পশ্চিম এশিয়ার জন্য এক শান্তি প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৪শে আগস্ট তিনি তাঁর প্রস্তাবের কথা বলেন, ৩১শে আগস্ট সেনেটে তাঁর সম্পর্কে বক্তৃতা করার কথা।

ফুলরাইটের প্রস্তাব হল : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের মধ্যে একটা স্বিপারিক চুক্তি হোক। এই চুক্তি অনুসারে জুন, ১৯৬৭-এর পূর্বে ইজরায়েলের যে সীমানা ছিল, কখনও তা লাঞ্ছিত হলে ইজরায়েলকে রক্ষা করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্যে অবতরণ হবে। তবে ইজরায়েল নিজে কখনও অপর আরব রাষ্ট্রের সীমানা লঙ্ঘন কবে না, এবং ১৯৬৭-এর যুদ্ধে ও তারপর যে সব আরব এলাকা ইজরায়েল দখল করেছে, তা সে ফিরিয়ে দেবে। স্বাভাবিক, ইজরায়েলের সীমান্তে ও সারম আল শেখ রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য থাকবে। ইজরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলির সম্মতি ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না। তৃতীয়ত, ফুলরাইট বলেছেন, আরব ও ইজরায়েল উভয় পক্ষ একমত হয়ে যদি কোন মীমাংসায় উপনীত হতে না পারে তবে রাষ্ট্রসংঘের উচিত তাদের ওপর জোর করে একটি সিদ্ধান্ত, একটি শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া। উভয়কেই এটা মানতে হবে।

ফুলরাইট ভরসা দিয়েছেন, তাঁর প্রস্তাবমত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল যদি কোন নিরাপত্তা চুক্তি করে, তবে সেনেট যাতে তা অনুমোদন করে তার জন্য তিনি চেষ্টা করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সেনেটে রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের রিপাবলিকান পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। ফুলরাইটের ডেমোক্রাটিক পার্টিই সেখানে

সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর যে-কোন বৈদেশিক চুক্তির জন্য সেনেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক।

ফুলরাইট প্রস্তাব সম্পর্কে মার্কিন সরকারের কোন স্পষ্ট বক্তব্য জানা যায় নি। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র বা জর্ডানের প্রতি-ক্রিয়াও পাওয়া যায় নি। তবে ইজরায়েল অত্যন্ত ঘৃণাভরে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার বলেছেন, এই প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ ইজরায়েলকে একটি 'প্রোটেক্টরেট' পরিণত করা।

লেবানন:

লেবাননে একটি অলিখিত প্রথা দীর্ঘদিন ধরে মেনে আসা হচ্ছে। এটি হল: লেবাননের রাষ্ট্রপতি হবেন একজন খ্রিস্টিয়ান, আর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন হবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে ধর্ম খ্রিস্টিয়ান হলেও লেবাননের খ্রিস্টিয়ানরা জাতিতে আরব। এই প্রথা অনুসারে, বর্তমানে লেবাননের রাষ্ট্রপতি হলেন চার্লস হেলু, আর প্রধানমন্ত্রী রাসিদ কারামি।

চার্লস হেলুর কার্যকাল ২২শে সেপ্টেম্বর শেষ হচ্ছে। নতুন আর একজন রাষ্ট্রপতি ২৩শে সেপ্টেম্বর কার্যভার গ্রহণ করবেন।

নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য লেবানন পার্লামেন্টের বৈঠক বসেছিল গত সপ্তাহে রাজধানী বৈয়রুটে। লেবাননের সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্ট সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের মোট ৯৯ জন সদস্যের সকলেই উপস্থিত ছিলেন ভোটদানের সময়। ভোটের ফলে দেখা গেল, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সুলেমান ফ্রানজিয়ে পেয়েছেন ৫০টি ভোট, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ইলিয়াস সারাকিস পেয়েছেন ৪৯টি ভোট। অর্থাৎ, মাত্র এক ভোটে ফ্রানজিয়ে জয়লাভ করেছেন। কিন্তু পার্লামেন্টের স্পীকার সার্বীর হামাদা, যিনি প্রকাশ্যে সারাকিসের প্রার্থীপদ সমর্থন করেছেন, ইচ্ছা ঘোষণা করলেন, ফ্রানজিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পান নি!

স্পীকার হামাদা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ হয়ে গেল দক্ষিণে কান্ড। সদস্যরা বোধ হয় আগে থাকতেই গোলমাল আশংকা করেছিলেন, তাই তাঁরাও প্রস্তুত ছিলেন। বেপরোয়া কিল ঘুরি লাগি চালাতে লাগলেন 'মাননীয়' সদস্যরা। শেষ পর্যন্ত কেউ কেউ বন্দুক তুলে ধরলেন। আর, পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন দলের বেসরকারী সৈন্যদের মধ্যে শব্দ হয়ে গেল হুম্মা।

অবস্থা বেগতিক দেখে সার্বীর হামাদা সুলেমান ফ্রানজিয়েকে যথাবিধি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করলেন। গোলমালও থেমে গেল। বিজয়ী প্রার্থীকে নিয়ে সমর্থকদের মিছিল বের হল।

লেবাননের রাজনীতির খবর যারা রাখেন, তাঁরা বলছেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিশেষ কোন রাজনৈতিক প্রশ্ন প্রাধান্য পায় নি। এ ছিল নিতান্তই বাক্ত্বের ব্যাপার। দুজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কামিলে সামুন ও ফয়াদ সেহাবের এবার আবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়াবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যখন তাঁরা বুঝলেন, তাঁদের কারও জয়লাভের আশা নেই, তখন তাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এঁদের মধ্যে সামুন একটু পশ্চিমঘেষা। তিনি ফ্রানজিয়েকে সমর্থন করেছেন। তাই বলে ফ্রানজিয়ে নিজের পশ্চিম-ঘেষা হয়ে পড়বেন, এমন মন করার কোন কারণ নেই। কারণ, লেবাননের বামপন্থী নেতা বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল জামরাটেরও সমর্থন লাভ করেছেন ফ্রানজিয়ে।

লেবাননের অন্যতম প্রধান সমস্যা প্যালেস্তাইন গেরিলাদের প্রশ্নে ফ্রানজিয়ে কামাল জামরাটের সহযোগিতা পাবেন। জামরাটের সঙ্গে গেরিলাদের যোগাযোগ রয়েছে।

(৩০।৮।৭০)

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

২য় খণ্ড : শ্রুতিশাস্ত্র, পরমহংস, দর্শন, নীলরক্তচুলিক, আকর্ণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জীবন, পিণ্ড, আত্ম, ঘটক্র, ভণ্ড, শিক্ষা, বুদ্ধবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াভীত, বাসুদেব, শান্তিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশু, মণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাণ্ডপত-বঙ্গ, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গুরুভ, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চবঙ্গ, কালাগুরুভ, যজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কোষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অন্তরাদ। কাপড় ও বোড়ে বঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

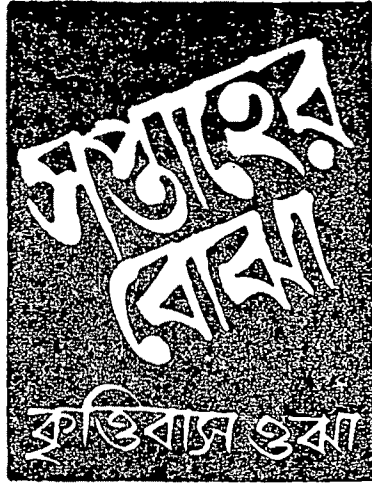
বঙ্গমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬. বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কলঙ্কভঞ্জন নামের কীর্তনবারা
আজকাল আর হয় না। তবে রাজ-
নীতিতে কলঙ্কভঞ্জন আন্দোলন আগেও
ছিল, এখনও আছে। সেই কলঙ্কভঞ্জনের
অনেক অভিনয় সম্প্রতি দেখলাম। কিন্তু
অভিনয়ের কথা পরে—আগে সংগ্রামের
কথা বালি। ফল অফ দুর্গাপুর।
কথাটা বলেছিলেন রাজ্যের একজন প্রথম
শ্রেণীর নেতা। পতন কথাটা কোন
মামুলি অর্থে ব্যবহার হয় না—এই
ক্ষেত্রেও তাই। দুর্গাপুরের পতন ঘোষিত
হল এমন একটা সময়ে, যখন রাজ্যের
সি পি এম নেতৃস্থানীয় শক্তিতে সর-
কারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার ময়দানে নেমে
পড়েছেন। দুর্গাপুরের পতনটা হল
এমনভাবে—যেন সেন্টার ফরওয়ার্ড বল
নিয়ে অনেক শক্তিকে পাশ কাটিয়ে এক-
মাত্র গোলাকপারকে কিংকর্তব্যবিমূঢ়
করে গোলে কিক করে জয়লাভ করবে,
ঠিক সেই সময় রেফারী বাঁশ বাজিয়ে
অফসাইড ডিক্লেয়ার করে নিশ্চিত গোল
ও জয়ের সম্ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করলো।

দুর্গাপুরের পতনের মধ্য দিয়ে যে
রাজনৈতিক চিত্র ধরা পড়ে, সেটা নানা
কারণেই ভাষ্যপূর্ণ নয়। কারণ দুর্গা-
পুরে যে ঘটনা ঘটে গেছে, সেটা রাজ্য
রাজনীতির কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।
দুর্গাপুর দিয়ে যে রাজনীতির সূত্র
তার শেষ এখনও হয় নি, তাই দুর্গা-
পুরের পরবর্তী ঘটনাবলি বুঝতে হলে
দুর্গাপুরকে আগে ভালভাবে বোঝা
দরকার—দুর্গাপুর সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির
মীমাংসা দরকার।

রাজ্যের রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের
একাধিপত্য প্রভাব ও শক্তির পরিচয়
দিতে সি পি এম ধাপে ধাপে সংগ্রামের
একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল—যে
কর্মসূচীর প্রথমে ছিল দুর্গাপুরের
সংগ্রাম, দুর্গাপুরের সংগ্রাম চলতে
চলতেই সূত্র হবে সরকারী কর্মচারীদের
সংগ্রাম—তার মধ্যে যুক্ত হবে শিক্ষকদের
সংগ্রাম ও পরিবহণ কর্মচারীদের
সংগ্রাম। এই সংগ্রামগুলির একটা
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটবে ৩১শে
আগস্ট, যে দিন বহু লক্ষ মানব এসে
কলকাতা ঘেরাও করবে, অচল হয়ে যাবে
কলকাতা, অচল হয়ে যাবে প্রশাসন।
রাজ্যের জনগণ বুঝবে দেশের মূল নিয়ামক
শক্তি হল সি পি এম আর সরকারের
প্রশাসনবল্লভ বুঝবে সি পি এমকে
কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করা নয়, কারণ
আগামী দিনে আবার ক্ষমতায় সি পি
এম দলই আসবে—অতএব ভাবী প্রভুদের
এখন থেকে প্রভুর মত চোখেই দেখতে
হবে।

এই রণকৌশল সামনে রেখেই সি পি
এম তার সবচেয়ে জ্ঞানী ও শক্তিশালী
সেনাবাহিনী দিয়ে প্রথম লড়াই সূত্র



করলো। প্রথম লড়াইয়ের ক্ষেত্রে বেছে
নেওয়া হল দুর্গাপুর। দুর্গাপুর বেছে
নেবার মূলে যে মানসিকতা কাজ করলো,
সেটা হল—রাজ্যে দুর্গাপুরের মত শক্তি-
শালী ঘাঁটী সি পি এম-এর খুব কমই
আছে। এ ছাড়া দুর্গাপুরকে কেন্দ্র করে
সরকারকে শিক্ষা দেবার অন্য প্রয়োজনও
ছিল। কারণ সরকারও খুবই দুঃসাহসের
সঙ্গে বর্ধমানে অনেক দিন ধরে সি পি
এম দলের শক্তিকে খর্ব ও ছোট করার
চেষ্টা করছে। সরকার বর্ধমানে সি পি
এমকে “কাট টু সাইজ” করতে চায়
বলেই শ্রীবিনয় কোঙার ও গোকুলানন্দ
রায়কে জামিন না দিয়ে আটক রাখবার
দুঃসাহস দেখাতে পারছে। কাজেই
সরকার যে সাহসে ভিত্তি করে শ্রীবিনয়
কোঙারকে আটক রাখতে পেরেছে, সেই
সাহসে আঘাত দেওয়া দরকার। নইলে
দুর্গাপুরের সংগ্রামের পিছনে অন্য যুক্তি
যথেষ্ট সবল নয় বলা যায়। প্রথম কথা
দুর্গাপুরে অশান্তি করা সমগ্রভাবে
রাজ্যের স্বার্থের পরিপন্থী—এই কথাটাও
কারো অজ্ঞাত নয়।

পশ্চিমবঙ্গের যদি কোন ভবিষ্যৎ
থাকে, তবে সেই ভবিষ্যৎ হল দুর্গাপুর।
সরকারী ও বেসরকারী যে সব শিল্প
কারখানা দুর্গাপুরে আছে ও যে সকল
কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবনা রয়েছে—
দুটোর ক্ষেত্রেই দুর্গাপুর সম্পর্কে কিছ-
স্বতন্ত্র ভাবনার অবকাশ আছে। কেন্দ্রীয়
সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাবের মধ্যে
দুর্গাপুরকে বাঁচাতে হবে, বড় করতে
হবে—এটা হল জাতীয় কর্তব্য।

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানাকে
আরো সম্প্রসারিত করার কথা কেন্দ্রীয়
সরকার ভাবছেন না এবং অস্ত্র, উড়িষ্যা
প্রভৃতি রাজ্যে আরো ইস্পাত কারখানা
স্থাপন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক
বেশী মাথা ঘামাচ্ছেন। সেইখানে
দুর্গাপুর নিয়ে কোন জুয়া খেলা
উচিত ছিল না। কিন্তু সেই জুয়া

খেলাই হল। যদি প্রশ্ন করা যায়—
শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিসাবে রাষ্ট্রীয়
প্রকল্প দুর্গাপুরকে বেছে নেওয়া হল
কেন? শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে হিসাবে
বিড়লা, সিংঘানিয়া, বাজোঁরিয়া প্রমুখ
বৃহৎ পঞ্জিপতিদের শিল্প কারখানা
এলাকা বেছে নেওয়া হতে তো পারতো।
ঐ বর্ধমানে জে, কে, ইন্ডাস্ট্রিজ রয়েছে—
মার্টিন বার্ন রয়েছে, এঞ্জুল রয়েছে,
বিলাতি মালিকানার কত কলকারখানা
রয়েছে—সব ছেড়ে দুর্গাপুর বেছে
নেওয়া হল কেন? সম্ভবত তার প্রধান
কারণ হল অন্য কোথাও লড়াই করলে
সেই লড়াইতে দিল্লীকে বিচলিত করা
যেত না; দিল্লীকে ইন্ডলব করা যেত
না। সর্বোপরি দুর্গাপুরের মত এত
শিক্ষিত ট্রেন্ড পার্টিমুখী এত বেশি
ক্যাডার কোথাও নেই। তাই ইন্ডা-
স্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স নিয়োগ
করাতেই ইস্যু করে লড়াই শূন্য করা
হল।

সরকারও সম্ভবত সুযোগের
অপেক্ষায় ছিলেন—কারণ বর্ধমানে
শ্রীবিনয় কোঙার ও শ্রীগোকুলানন্দ
রায়কে আটক রাখতে পেরে বর্ধমান
শহরে সি পি এম-এর যে মনোবলে
আঘাত দিতে পেরেছেন, দুর্গাপুরের
শ্রীদিলীপ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে সেই
আঘাতের সুযোগ নিলেন। প্রকৃতপক্ষে
সি পি এম মহলের কাছে শ্রীদিলীপ
মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা
ছিল একটা অভাবনীয় চিন্তা।
সি পি এম দ্রুত পাঁচটা আঘাত দেবার
জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলো অর্থাৎ
সারা দুর্গাপুর বন্ধ করে শ্রীদিলীপ
মজুমদারকে মুক্ত করতে চাইলো।
সূত্র হল দুর্গাপুর ধর্মঘট। চললো
এগারো দিন। দুর্গাপুরের এগারো
দিনের ইতিহাস হল সরকার ও সি পি
এম দলের শক্তি পরীক্ষার এক অভূত-
পূর্ব ইতিহাস। এগার দিন পরে
সি পি এম যুদ্ধবিরতি করে আত্ম-
সমর্পণ করলো ধর্মঘট নিঃসর্তে
প্রত্যাহার করে।

একদা শ্রী বি টি রণদিত্তে সি পি আই
দলের রাজনীতিক ১৯৪৮-৪৯ সালে
সরকারের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার পথে
নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই দিন পার্টির
প্রধান হিসেবে শ্রীরণদিত্তে খেসব হর-
তাল ও ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন
সেই আহ্বান কিন্তু কোনটাই নিঃসর্তে
প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় নি। বলতে
গেলে শ্রীরণদিত্তের হরতাল, ধর্ম-
ঘটের আহ্বান এখনও বহাল রয়েছে।
কিন্তু অনেক বৎসর পর সেই শ্রীরণদিত্তে
সি পি এম দলের ট্রেন্ড ইউনিয়ন শাখার
প্রধান। এ, আই, টি, ইউ, সি ভাণ্ডার
পন্নও সি, টু, গঠিত হয়ে এই প্রথম

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমে একটা অনিদিষ্ট-কালের ধর্মঘট আহ্বান হ'ল। কিন্তু বিশ বৎসর আগে গ্রীষ্মকালে কোন অবস্থায় এমন একটা আহ্বানও ফেরৎ নেন নি, আজ কিন্তু তাঁরই মৌসুমে ধর্মঘটীদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হ'ল—নিঃসতর্ক ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়া হ'ল। ধর্মঘট নিঃসতর্ক প্রত্যাহারের যুক্তি ছিল পুলিশ, সি, আর, পি'র অত্যাচার। দুর্গাপুরে ধর্মঘট হবে, দুর্গাপুর অচল হবে—সরকারের কোটি কোটি টাকা নষ্ট হবে—আর সরকার ধর্মঘটীদের লাভ্য মোয়া খেতে বেবেন—এই কথা ভেবে যারা ধর্মঘট আহ্বান করেছিলেন, তাঁদের বৃদ্ধি খুব পরিণত বলে মনে করা যায় না। তবে গ্রীষ্মকালীন চৌধুরী যে এই লাভ্য প্রাপ্তির দলে ছিলেন না, এ কথা সত্য। ধর্মঘট আহ্বান করার সিদ্ধান্তের সময় তিনি ছিলেন না বলে শোনা যায়, আবার ধর্মঘট প্রত্যাহারের দিন সভায় উপস্থিত থেকে কোন মিথ্যা অহমিকার প্রশ্ন না দিয়ে ধর্মঘট প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন। যাদের কেশাঙ্গ স্পর্শ করবার ক্ষমতা সরকারের হবে না—এই সাহসে বুক বেঁধে যারা এতদিন দুর্গাপুরকে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ বলে মনে করতেন, সেই দুর্গের শোচনীয় পতন হ'ল।

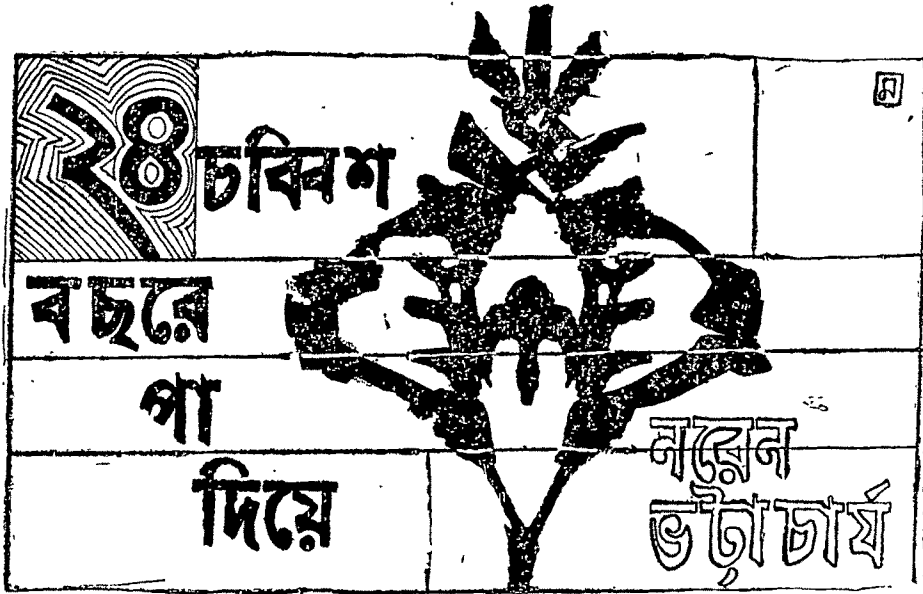
বর্ধমান শহরে গ্রীষ্মকালীন কোঙার ও দুর্গাপুরে গ্রীষ্মকালীন মজুমদারকে জামিন না দিয়ে সরকার সি, পি, এম দলের একটা দুর্গাসহসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পথ গ্রহণ করলো।

কথা ছিল দুর্গাপুরের ধর্মঘট লিঙ্ক সাংগ হবে সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক ধর্মঘটের সংগে। সেই সংগে হবে একদিনের বাংলা বন্ধ, তার পর আসবে ৩১শে আগস্ট। কিন্তু দুর্গাপুর জুগের পতনের পর বাংলা বন্ধের ডাক তুলে নেওয়া হ'ল, কিন্তু ঠিক সময়মত সূর্য হ'ল সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের কর্মরিত ও ধর্মঘট। শিক্ষকদের কর্মরিত চলছে—সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট শেষ হয়ে গেছে। পতন হয়েছে দুর্গাপুরের, কিন্তু সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের দুর্গ মহাকরণের কি হয়েছে? সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সফল-ব্যর্থ—এই কথা নিয়ে দুই পক্ষের সোচ্চার বক্তব্য রয়েছে। আমি কোন তথ্যের হিসাবে যেতে চাই না—তবে এই কথা হল বাস্তব সত্য যে, ১৯৫৬ সাল থেকে সরকারী কর্মচারী আন্দোলন ও ধর্মঘট বলতে যা দেখা গেছে, এবার তা দেখা যায় নি। কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ধর্মঘট ছিল সব যুক্তিতর্কের বাইরে। ধর্মঘটের সাফল্য সম্পর্কে কোন প্রশ্নের

অবকাশ কখনও হয় নি। কিন্তু এইবার সফল হয়েছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুধু প্রশ্ন উঠেছে, পৌণে দু'লক্ষ কর্মচারীর মধ্যে একটা বিরাট সংখ্যক কর্মচারী কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বান অগ্রাহ্য করে কাজে যোগদান করেছে। এই কাজে যোগদানকারীর সংখ্যা অধিকের বেশী কি কম—এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে, কিন্তু কাজে যোগদানকারীর সংখ্যা নগণ্য বা অগ্রাহ্য করার মত নয়, সেটা যে কোন পাগলও স্বীকার করবে। এই সরকারী কর্মচারীরা অতীতে বিধান-চন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, অজয় মুখার্জী, ধর্মবীর—সকলের হুমকি, ধমক, দমন-পীড়ন সব কিছু দেখেছে, মোকাবিলা করেছে—কোন দিন আত্মসমর্পণ করে নি। কিন্তু এইবার যা হল সেটা দেখে আর যাই বলা যাক, সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট সফল হয়েছে বলা যায় না। এখন প্রশ্ন : এই হরতাল, ধর্মঘটে কার কতটা লাভ ও কার কতটা লোকসান হ'ল। দুর্গাপুরের পতনে দুর্গাপুরের হাজার হাজার কর্মচারী আজ যুদ্ধবন্দী, সরকারের অনগ্রহ-নির্ভর। একই অবস্থা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে। এই সব লাভ-লোকসান অপেক্ষা অনেক বড় লোকসান হ'ল এক একটা আন্দোলন হচ্ছে আর পর্বতের মত দৃঢ় মজবুত সংগঠনগুলি ভেঙে যাচ্ছে। দুর্গাপুরে এই ভাঙনের চিহ্ন প্রকটভাবে ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে, ধরা পড়েছে শিক্ষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে। অথচ সি পি এম দলের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ যদি বলতে হয়, তবে সেটা হল বর্ধমান আর সেই দুর্গের মণিকোটা ছিল দুর্গাপুর। আর সি পি এম দলের প্রভাবে ও নেতৃত্ব পরিচালিত গণসংগঠনের মধ্যে এ, বি, টি, এ ও সরকারী কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী ও মজবুত। এই সব শক্তিশালী দুর্গেই ভাঙন ধরে গেছে এবং এই শক্তিশালী দুর্গ সম্পর্কে সরকারেরও ভয় ভেঙে গেছে। এই ভাঙনে কোন পাগলও উজিসিত হতে পারে না। সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস ইউ সির যারা দুর্গাপুর, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক আন্দোলনে সি পি এম নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনটি আন্দোলন ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কিন্তু কোন জয়ই হয় নি দুর্গাপুর, সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক আন্দোলনের ব্যর্থতায়। প্রকৃতপক্ষে সি পি এম দলের আন্দোলনকে হঠকারী মনে করে বা প্রকৃতপক্ষেই

হঠকারী জেনে-বে বিরোধিতা করেছেন, তাতে লাভ হয়েছে শ্রী বি বি ঘোষের, শ্রীওয়াদেশীর আর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির। লাভ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের, যারা পশ্চিমবঙ্গকে একটা মধ্যযুগের উপনিবেশ বিবেচনায় শাসন ও শাস্যতা করতে চায়। লাভ হয়েছে তাদের, যারা রাজ্যে আরো মিলিটারী, আরো সি আর পি আনতে চায়। অতি-বিপ্লবী আর হঠকারী আন্দোলন এবং নিজেকে সর্বশক্তিমান ভেবে, বন্ধু-শত্রুকে শত্রু মনে করে, শ্রমিক-কর্মচারীদের দলীয় স্বার্থে আন্দোলনে নামালে বামপন্থী শক্তি স্বার্থবিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে আর সেই লড়াইয়ের মধ্যে দক্ষিণপন্থী প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদের পেয়া বারো হয়। হয়েছেও তাই—বর্ধমানে সাঁই বাড়ির ঘটনার পর ছাত্র পরিষদ এমন শক্তিশালী হয়েছে যে, তারা পুলিশ গাড়ীতে বন্দী গ্রীষ্মকালীন কোঙারের মত নেতার গায়ে থুথু দিতে পারে, ধর্মঘট-রত সরকারী কর্মচারীদের পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে দুপুরে বাঁসিলে দিতে পারে। এ শুধু বর্ধমানের কথা নয়—যেখানে সি পি এম বেশি গায়ের জোর দেখিয়েছে, সেইখানে হয় ছাত্র পরিষদ, না হয় নরশাল শক্তিশালী হয়েছে। সেই সঙ্গে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই কথা বলা যায় গত দু'বৎসরে সবচেয়ে বেশি যুবক ছাত্র প্রথমে গেছে নরশাল পথে—স্বিতীয়ে এসেছে ছাত্র পরিষদ।

কিন্তু সি পি এম দলের কি কোন লাভ হয় নি এই সাংপ্রতিক পরাজয় বরণকারী আন্দোলনগুলির মধ্যে? নিশ্চয়ই হয়েছে এবং সেই লাভ হল ভয়ানক লাভ। এই সব আন্দোলন পরিবেশে এমন একটা পরিমিত সৃষ্টি হল, যাতে গত যুক্তফ্রন্টের ইতিহাসটা মানুষের মন থেকে মুছে গেল। সি পি এম দলের জোর-জুলুম প্রভৃতির যে সব ঘটনা ও অভিযোগ তুলে গত যুক্তফ্রন্ট সরকার শ্রীঅজয় মুখার্জী ভেঙে দিয়েছিলেন ও যুক্তফ্রন্ট ভেঙে আট পার্টির আলাদা ফ্রন্ট হয়েছিল, সেই সব ঘটনা আজ তালিয়ে গেল। সি আর পি ও পুলিশকে আজ এমনভাবে ইনভলভ করা হয়েছে যে, তাদের জোর-জুলুম অত্যাচারের নতুন ইতিহাস সি পি এম-এর জোর-জুলুমের ইতিহাসকে বস্তাপচা কুসো হিসাবে বলার সুযোগ করে দেবে। সি আর পি, পুলিশ, শ্রী বি বি ঘোষ আর গ্রীষ্মকালীন ধড়া সকলে মিলে যে কাজগুলি করেছেন, তাতে সবচেয়ে উপকৃত হচ্ছে সি পি এম। কারণ এদের অনেক কাজে সি পি এম-এর অনেক কলঙ্কভঞ্জন হয়ে গেছে ও যাচ্ছে।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা

১১

কত সংখ্যায় লিখেছিলাম যে, ভূমি ও শ্রমি সংস্কারের সমস্যা আমাদের দেশের একটি প্রধান সমস্যা হলেও এর বাইরের সমস্যাগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং একটি সমস্যা আর একটি সমস্যার সংগে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। ভূমির পরে যে সমস্যাটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা। কিন্তু এ বিষয়ে কোন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি এ পর্যন্ত অবলম্বন করা হয় নি। ভারতের জনমত আজও শিক্ষিত শ্রেণী আশ্রয়ী, যেখানে নিম্ন-বর্গের মানুষদের অবস্থা ও চিন্তা-ভাবনার কোন প্রতিফলন নেই। তার ফলে ভারতের শ্রমিক শ্রেণী, তাঁদের সংগ্রাম ও আন্দোলন, সমস্ত কিছু সম্পর্কেই কয়েকটি অতি সরলীকৃত ধারণার বশবর্তী হয়েই সকলে চলেন। প্রত্যেকেরই স্মরণে আছে পশ্চিম-বঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে সারা ভারতে, এমন কি ভারতের বাইরেও, যে সব অপপ্রচার চালানো হয়েছে সেগুলির প্রধানতম বক্তব্য ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমনীতি সম্পর্কে। বলা হয়েছিল, আজও বলা হচ্ছে যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে ধর্মঘট ও ঘেরাও-এর তৈলায় শিল্প-বাণিজ্য, ভেঙে পড়েছে, শিল্পপতিরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে পালাতে চাইছেন, নতুন কোন শিল্পপতি এখানে পুঁজি বিনিয়োগ করতে ভয় পাচ্ছেন এবং সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী বদমাইস শ্রমিকেরা, যুক্তফ্রন্ট সরকার যাদের পিছনে থেকে নষ্টামি করতে উৎসাহ

দিচ্ছে। এই প্রচারে অনেকে বিভ্রান্ত হয়েছেন, এমন কি অনেক শ্রমিকদেরদী, প্রগতিশীল ব্যক্তিও।

কিন্তু যুক্তফ্রন্টের শ্রমনীতি কি ছিল? যুক্তফ্রন্ট সরকারের বক্তব্য ছিল শ্রমিক ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, কারখানা বন্ধ বা ট্রাইবুনালের রায় অকার্যকর হলে শ্রমিক বিক্ষোভ হতে বাধ্য। আর মালিকপক্ষের প্রত্যক্ষ প্ররোচনার ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হলে যদি বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সংশ্লিষ্ট শিল্পে ঘেরাও করে, তাহলে তা কোন কোন ক্ষেত্রে সংগত। জনগণের ড্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত বা ক্ষুণ্ণ করার জন্য পুঁজিশ্রের সাহায্য দেওয়া হবে না। তবে ধনপ্রাণ বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য জরুরী প্রয়োজনবোধে পুঁজিশ্রের সাহায্য দেওয়া যেতে পারে।

এমন কিছু বৈশ্ববিক শ্রমনীতি নয়। অথচ এরই ফলে গ্রাহি-গ্রাহি রব পড়ে গিয়েছিল, আর সেটাই প্রমাণ করেছিল শ্রমশিল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সমাজের অপরাপর অংশ কতটা অজ্ঞ।

১২

গত ২২রা মে ১৯৭০-এর ইকনমিক এন্ড পলিটিকাল উইকলি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে যে, ১৯৬০ থেকে ১৯৬৭-র মধ্যে ভারতের সব রাজ্যেই টাকার অঙ্কে কিছু মজদুরী বাড়লেও প্রকৃত মজদুরী সর্বক্ষেত্রেই কমে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত মজদুরি কমে শূন্য করেছে ১৯৬৫ থেকে। এদিকে দ্রব্য-মূল্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক

দাবিদাওয়ার সংগ্রামসমূহ স্তব্ধ করে দেবার প্রচেষ্টা চলছে বরাবরই, সেই স্বাধীনতার জন্মলগ্ন থেকে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের পক্ষে রাষ্ট্রের যোগ্য প্রাথমিক করণীয় কতব্য, সেটাও কোনদিন করা হয় নি, বরং বলা যায় ভারত সরকার এ বিষয়ে পুঁজিপতিদের কাছে দাসখত লিখে দিয়েছে।

ব্রিটিশ রাজত্বের অবসানের পর শ্রমিক শ্রেণী সংগতভাবেই আশা করে- ছিলেন যে, কংগ্রেস সরকার একটা বলিষ্ঠ শ্রমনীতি গ্রহণ করে শ্রমিক শ্রেণীকে জাতীয় অগ্রগতির কিছুটা ভাগ দেবে। কার্যত কিন্তু উল্টোটাই ঘটল, প্রথম আঘাত এল শ্রমিক শ্রেণীর উপর। নিখিল ভারত ড্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে ভাগ করা হল, হোতা হলেন বঙ্গভাই প্যাটেল। ১৯৪৭ সালের ৩রা মে আই-এন-টি-ইউ-সির জন্ম হল, যার উদ্দেশ্য ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর উপর কংগ্রেসের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করা, আর যার কর্মপন্থা হল শ্রমিক আন্দোলন নয়, কংগ্রেসের শাসনভুক্ত থাকার সুযোগে যত্নাঞ্চল সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শ্রমিকদের বিপথগামী করা, আর কমিউনিস্ট প্রভাব থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে দূরে রাখা। তারপর দ্রুত অন্যান্য কমিউনিস্ট-বিরোধী পার্টির পালা ট্রেড ইউনিয়ন গড়তে আরম্ভ করলেন। ১৯৪৮-এ জন্মালো হিন্দ-মজদুর-সভা। ১৯৪৭-এর সেই আঘাত আজও শ্রমিক শ্রেণী কাটিয়ে উঠতে পারে নি। এখন কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের সংখ্যা চারটিরও বেশি, যার ফলে প্রত্যেক কারখানায় একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের অবস্থান, যার সুযোগ

মালিকপক্ষ নিচ্ছে। অর্থাৎ প্রথম চোটেই প্রতিদ্বন্দ্বীশীলো নানা অস্থিলায় শ্রমিক সংহতি ভেঙে দিয়ে মালিকের মনোনাফা লোটার রাস্তা বহুমুখী রেখেছে।

এবার সরকারের ভূমিকার কথা আসা যাক। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ১৯৪৭ সালেই প্রথম মজুরী-নীতি ঘোষিত হয়। তাতে শ্রমিকদের জন্য ন্যায় মজুরীর কথা থাকলেও, একই সঙ্গে মালিকের ন্যায্য মনোনাফা ও মজুত তহবিল গঠনের দৃষ্টি ধারা বুদ্ধি ফুল আর শেখের দৃষ্টির দিকেই গুরুত্ব দেবার ফলে ন্যায্য মজুরী একটি ছেঁদো কথায় রূপান্তরিত হয়েছিল। পর বৎসর ১৯৪৮-এ শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে অসংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণে আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরীর পক্ষে বলা হয়। কিন্তু পুঁজিপতিদের সামনে শ্রমিকদের ফাঁকি দেবার একটি বেশ চওড়া রাস্তাও খুলে দেওয়া হয়। ঐ প্রস্তাবে অনেক গালভরা কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু আসল কাজটি করা হয় নি। ন্যায্য মজুরী টাকার অঙ্কে হিসাব করার পদ্ধতিটিকেই খুঁজে পাওয়া যায় নি! আর তা পাওয়া না যাবার ফলে ষোল আনা সুবিধাটা মালিকপক্ষের, তাদের পকেট থেকে একটা পয়সাও খসানো গেল না। শ্রমিকদের প্রতি সরকারী দরদের এই হচ্ছে নমুনা!

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুযোগে শ্রমিকদের ওপর আরও একটি কোপ মারা হল। বলা হল যে, 'জাতীয় প্রয়োজনে' (অস্বার্থ) কয়েকজন পুঁজিপতির প্রয়োজনে মজুরী বৃদ্ধির বিপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপিত করা হল, এবং মজুরীকে বাড়তে না দেওয়াই সরকারী নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হল।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হবার অব্যবহিত পরেই ১৯৫৭ সালের জুলাইয়ে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলন। সর্বপ্রথম প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী টাকার অঙ্কে নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি স্থির করে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পে ত্রিদলীয় বেতন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। কিন্তু সদাশয় ভারত সরকার পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগুলির প্রতি খোলাখুলি বৃদ্ধাঙ্গুর প্রদর্শন করে। ভারত সরকার যে সুস্পষ্টভাবে শ্রমিক-বিরোধী নীতির সমর্থক তা আরও একবার প্রমাণিত হয়ে যায় প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণে সরকারের দায়িত্বের খোলাখুলি অব্যবহিত।

কাজেই কাগজে-কলমে একটি কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর এবং শ্রমমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও, শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি অপরাধমূলক একটি শ্রমনীতির ধারক ও বাহক ছিলেন ভারত সরকার, যদিও মুখে শ্রমিকদের সম্পর্কে বড় বড় কথার বিরাম ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্রমিক-দের প্রকৃত মজুরী যে পরিমাণ কমে যায়, তা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শুরুরতেও পূরণ হয় নি। জাতীয় শ্রম কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ১৯৫০ সালের প্রকৃত মজুরী ১৯৪৯ সালের তুলনায় দশ শতাংশ কম ছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়ে জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৯ শতাংশ এবং প্রকৃত মজুরী হ্রাস পায় ১৯৫৫ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বার্থ হয়েছে এবং সেই বার্থতার দায় শ্রমিক শ্রেণীকে পোহাতে হচ্ছে। দ্ব্যমূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, টাকার অঙ্কে মজুরীর কিছুটা বৃদ্ধি হলেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রকৃত মজুরী সেই হিসাবে কমে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির পুরো ক্ষতি-পূরণের দাবি এখনও স্বীকৃত হয় নি। স্বাধীনতার চব্বিশ বছরে একই শিল্প ও বৃত্তির জন্য কোন সাধারণ মজুরী-মান নির্ধারিত হয় নি।

বাড়তি সম্পদ উৎপাদনের মাপ-কাঠিতে মাথাপিছু শ্রমিক উৎপাদকতা ১৯৪৬ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে প্রায় ৪২ শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু উৎপাদকতা বৃদ্ধির অনুপাতে মজুরী বাড়েনি। জাতীয় শ্রম কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে মজুরী বাবদ খরচ বাড়ছে, এই চলতি ধারণার কোন ভিত্তি নেই। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেও জাতীয় শ্রম কমিশন একটি সুদৃঢ় মজুরী-নীতি নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে এবং এ সম্পর্কে তাদের সুপারিশ দৃশ্যতই শ্রমিক-বিরোধী। তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফলে যে বর্ধিত সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে তার সিংহভাগ কৃষ্ণগত করেছে একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠী এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীরা।

শ্রমিকমুণ্ডে ফলাহারের এই নীতির বিশদ পরিচয় দিতে হলে একটি মহা-ভারত রচনা করতে হবে, তবে এ পর্যন্ত যা লেখা হল তা থেকে একটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে গেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে

আজ পর্যন্ত সরকারী শ্রমনীতি নিঃসন্দেহে শ্রমিকবিরোধী, এমন কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহে শ্রমিকেরা যেটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকে, এখানে সেটুকুও হয় নি। যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড সব শিল্পে প্রযুক্ত হয় নি, গ্র্যাচুইটি চালু হয় নি। শ্রমিকদের বাসস্থান বিষয়ে, বিশেষ করে বেসরকারী ক্ষেত্রে এখনও কোন পরিবর্তন হয় নি, এমন কি সরকারী অর্থানুকূল্যেও মালিকরা শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী নয়। শিল্পে দৃষ্টিভঙ্গির সংখ্যা বহু পরিমাণে বেড়ে গেছে, কিন্তু এর জন্য মালিকপক্ষকে সরকার কার্যত সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। গুরুতর খনি-দৃষ্টিভঙ্গি কয়েকটি শ্রমিকের মৃত্যুজনিত একটি মামলার রায়ে ডিরেক্টরদের মাথা-পিছু মাত্র দু'হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেবার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, সরকারের মমতা কোনদিকে। তদুপরি বিপুল পরিমাণ বেকারবাহিনী এবং বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান তীব্রতা কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের কাজের সর্বাবলী, মজুরী প্রভৃতির উপর অনিবার্যভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং মালিক শ্রেণীও এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেছে। কিছু মালিক পদলেহী রাজনীতিক এই সুযোগে অত্যন্ত আপাতকর ও চটকদার শ্লোগান দিচ্ছে। শ্রমিক শ্রেণী অর্থ-



দাপ্তরিক বসুমতঃ

নৈতিক দাবি-দাওয়ার জন্য আন্দোলনে নামক্কে প্রচার করছে শ্রমিকেরা। ছোঁষা হোক মাইনে পাচ্ছেই, কাজেই খামকা ধর্মঘট করে যদি কিছু বেশি টাকা পায়, সে টাকায় অভাব মিলবে না, অথচ এ টাকা মালিকের থাকলে তা দিয়ে সে কারখানা বাড়িয়ে আরও কিছু বেকারকে কাজ দিতে পারবে। যেন বেকারকে কাজ দেবার মহৎ কর্তব্য নিয়েই মালিকেরা কারখানা খুলেছে। এই জাতীয় কোন কোন ধাঁড়বাজ নেতা তো ইতিমধ্যেই লম্বা-চওড়া বিবৃতি দিচ্ছে, কোন জল্পনা ধর্মঘট হলেই যেন বেকাররা তাদের সেখানে কাজ দেবার দাবি জানায়।

II পাঠ II

১৯৫৭ সালের শ্রমবিরোধ আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক মালিকশ্রী ব্যবস্থা কংগ্রেস সরকার শ্রমিকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এর আসল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীকে আরও এক দফা প্রবঞ্চিত করা। ট্রাইবুনালের বিচারকেরা যখন কিছু কিছু শ্রমিক স্বার্থান্বেষী রায় প্রদান করতে শুরু করলেন, তখন সেই রায় বিলম্বিত করার জন্য আপীল ট্রাইবুনাল কোর্টের পত্তন করা হল। শ্রমিক তাই নয়, এ কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্ট যাবার সব রাস্তাই খুলে রাখা হল যাতে বছরের পর বছর ধরে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াগুলি এক কোর্ট থেকে আর এক কোর্টে ঘোরাদুরি করতে পারে এবং মালিক তার মনোমত পূরণের ভোগ করতে পারে। মালিকপক্ষের বেআইনী কাজসমূহ বন্ধ করা বা তার জন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থার কথা ভারত সরকার গত ২০ বছরে কল্পনাতেও আনতে পারেন নি।

সুতরাং সিদ্ধান্ত দাঁড়াচ্ছে এই যে, শ্রমিকের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব শ্রমিক

শ্রেণীকেই নিতে হবে; সরকার এখানে একটা অব্যবহৃত প্রশ্ন, কেন না মালিক শ্রেণীর বশব্দদ একটি প্রতিষ্ঠান, যার একমাত্র লক্ষ্য হিংস্রতার সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনসমূহকে লাঠি-গুলীর জোরে দমন করা। কাজেই শ্রমিক আন্দোলন সর্বক্ষেত্রেই এক্যবদ্ধ ও যুক্ত থাকা প্রয়োজন, কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পরস্পরের নিকটবর্তী হওয়া। আমরা দেখছি বাংলাদেশে ইদানীংকালে সকল কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি একজোট হয়ে পাট শিপ্পে, চা-বাগিচায়, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাগুলিতে ও সড়কপথে যুক্ত ধর্মঘট সংগঠিত করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এবং এই ঘটনাটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, শ্রমিক শ্রেণীক বাঁচতে হলে যে পথ নেওয়া দরকার তা বিভেদের নয়, একের। দর্ভাগ্যক্রমে বিচ্ছিন্নতাকামী প্রবণতা ইদানীং আবার বাড়তে শুরু করেছে এবং তা বলাই বাহুল্য কোন শ্রুত ফল প্রসব করবে না।

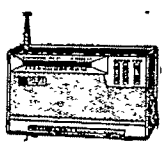
আমাদের দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির বয়স বড় কম নয়। কংগ্রেসের জন্মের বহু আগে থেকেই এর উদ্ভব; আর ভারতে প্রথম শ্রমিক ধর্মঘট ঘটেছিল ১৮৭৭ সালে। কাজেই এতখানি ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও আজও শ্রমিক শ্রেণী এত দুর্বল কেন? এর একমাত্র উত্তর বিচ্ছিন্নতা। আর তা গড়ে উঠেছে একান্ত দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, আর তা দেখতে চাওয়া বোধ হয় সঙ্গতও নয়। প্রতিটি দলই চায় যে, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর তার প্রাধান্য থাকুক। এবং সেই কারণেই তারা ভাঙাভাঙির খেলায় এত মত্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, ভাঙাভাঙির মধ্যে না গিয়েও কেন্দ্রীয় সংগঠনের ওপর দলীয় প্রাধান্য স্থাপন করা যায়, যদি সেই রাজনৈতিক দলের ব্যাপক সংগঠনের জোর ও গণভর্তি থাকে। আমি এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেব।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস যখন গড়ে উঠেছিল তখন সেখানে কমিউনিস্ট প্রভাব এমন কিছু ছিল না। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এখানে কংগ্রেসেরই প্রভাব ছিল এবং ১৯৩১ নাগাদ সে প্রভাবটা আবার রীতিমত চাগিয়ে ওঠে সুভাষচন্দ্রের আমলে, যার ফলে কমিউনিস্ট পার্টি বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নামে পৃথক একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংস্থা গড়ে তোলে। কিন্তু চার বছর পরে ১৯৩৫ সালে তারা ফিরে আসে এবং পুরাতন সংগঠনের

সঙ্গে মিশে যায়। এবং তার পর থেকেই দেখা যায় যে, সেখানে তাদের প্রভাব হ্রাস করে বেড়ে চলেছে। এই প্রভাব বৃদ্ধির মূলে ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যাপকতা। এটা কংগ্রেসের ছিল, না বলেই কংগ্রেস না-পাতা হয়ে যায় এবং ১৯৪৭-এ তারা যে পৃথক সংগঠন খুলতে পেরেছিল এবং এ আই টি ইউ সি থেকে যে কিছু লোক ভাঙিয়ে নিতে পেরেছিল, তা তাদের সংগঠন শক্তির গুণে নয়, শাসন-কর্তৃত্ব থাকার সুযোগে। কাজেই ভাঙাভাঙি কোন কাজের কথা নয়। এর দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট দলগুলিরও যে খুব লাভ হয় তা-ও নয়।

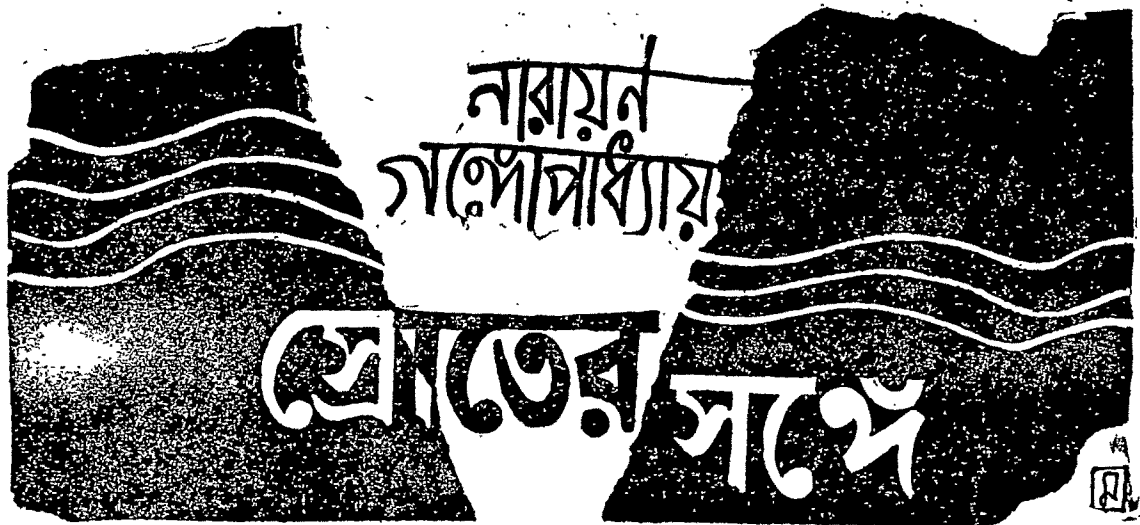
II ছয় II

সর্বশেষে বলা যায়, আমাদের দেশের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে বামপন্থী রাজনীতির একটি স্বচ্ছ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি, যেগুলি বাম দলসমূহের করায়ত্ত, পরস্পর-বিরোধী দুটি ধারণার ব্যবহারিক সাধন; ঘটতে আজও সক্ষম হয় নি। প্রথমাটি তথাকথিত ধনাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী, মূলত যে আদর্শ ট্রেড ইউনিয়নের উদ্ভব, যার মূল কথা হচ্ছে বর্তমান সমাজব্যবস্থা ও তার শক্তি-বিন্যাস আজকে যা আছে তাকে বজায় রেখে সামাজিক ন্যায়ের দিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীকে কিছু পাইয়ে দেওয়া। কাজেই অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার আন্দোলন না করে উপায় নেই, কিন্তু কার্যত ওটাই হয়ে পড়ে এন্ড ইন ইট-সেল্ফ, যা আসলে কিন্তু মূল বামপন্থী আদর্শের বিরোধী, কেন না সে আদর্শের মূল লক্ষ্য শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখল। আবার নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেও তা করতে গেলে সেক্ষেত্রে পরীপ্ত সাড়া পাওয়া যাবে না। এটা কোন নতুন কথা নয়। কিন্তু আগার বস্ত্য, এর জন্য প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু এত বছরের শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে সে চেষ্টা কি কোনদিনই বামপন্থী দলগুলি আন্তরিকভাবে করেছেন? আজও কেন প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতেই সর্বাধিক অনুষ্ঠিত হয়? শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি বলে একটি কথাটির সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সে বিষয়ে বামপন্থী দলগুলি কতটুকু করেছেন? (চলবে)



কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
ন্যাশনাল জেম
ও ব্যান্ড অলওয়াল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর
মূল্য ১৬৫ টাকা। মাত্র
১০ টাকা মাসিক কিস্তিতে প্রত্যেক
শহরে এবং গ্রামে পাঠান যায়। যোগাযোগ
করুনঃ

A. E. CORPORATION
(B.W.) Post Box No. 2117,
Delhi-7



[পূর্ব-প্রকাশনের পর]

॥ তেইশ ॥

এখন ঘন ঘন বজ্রতা—এখন নিয়মিত মীটিং এখানে-ওখানে। কিন্তু মীটিঙের চেহারাই বদলে গেছে। সেই একতা নেই, সেই শপথ নেই—একই মঞ্চে সব দলের নেতার সেই উজ্জ্বল সমাবেশ নেই। সেদিন সব শ্রোতার মন এক উৎসাহ—এক প্রত্যয়ে ঝকঝক করত : সময় বদলেছে, অনেক যুদ্ধ—অনেক দুরূহের পর আমাদের এই জয় : আগের ভুল আর করব না—এবার সব নতুন করে গড়বার পালা।

দলের প্রশ্ন আর নয়—সব নেতাই জনমন অধিনায়ক। জ্যোতি বসু? আনন্দিত করতালি। সোমনাথ? জয়-ধ্বনি। হেমন্ত বসু—বরদা মুকুটমণি—সুধীন কুমার—সুশীল খাড়া—উল্লাসের পর উল্লাসের চেউ। এক দল—এক মন—এক পথ।

কিন্তু মিলিয়ে গেল মরীচিকার মতো।

‘যুদ্ধক্ষেত্র ভাঙছে কারা?’

এক এক পক্ষের এক এক জবাব।

বেনামদার জমি কে দখল করবে? আমরা—আমরা। যে সব লাঠি-সর্ভিক-তীর-খন্দুক একলক্ষ্যে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, তারা ঘরে গেল নিজেদের ভেতর : এর মাথায়, তার ঘকে। কে কাটবে জমির ধান? আমরা—মা, তোমরা নয় আমরা—একোর লাল পতাকায় আঁকা কপোত ধানে পড়ল মা—রাঙা হ'ল নিজেদের রঙে। কারা করবে ভেড়ী দখল? ছটল বঙ্গম—মাছ গাঁথল না, মানুষের বুকে বিঁধল। তোমার ইউনিয়ন? মানব না—আমি খল করব, আমাকে বাড়াতে হবে পার্টির স্ট্রিং—অতএব লাল পতাকার হাতুড়ি শ্রমিকের হাতেই শ্রমিকের মাথায় পড়ল।

সেদিনও স্ট্রাইকে যারা একতাল জমাট লোহার মতো সামিল হয়েছিল, আজ অফিসে পাশাপাশি বসেও তারা কেউ কাউকে চিনতে পারছে না—আমরা আমরা, তোমরা তোমরা। ‘হ্যাঁ একা জিন্দাবাদ!’ নিঃসন্দেহ! কলেজ, ইউ-নিভার্সিটিগুলোর দিকে তাকাও—সব মোহ মূহুর্তে মিলিয়ে যাবে।

আমি জানতুম—এ যে হবেই আমি জানতুম। যেদিন কতগুলো অস্পষ্ট ইন্ডিয়ালজীর সড়তো ধরে, কিছু দলীয় নেতার জেদ আর অহংকারের কোঁদলে তোমরা ভেঙে গেলে, আমি সেদিনই জানতুম। জনতা তোমাদের বিশ্বাস করেছিল, তাকিয়েছিল তোমাদের মূখের দিকে, কিন্তু তাদের দিকে

সংস্কৃতি-বিষয়ক গ্রন্থমালা

উদ্ভাস্ত

শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। উদ্ভাস্ত সমস্যা ও সমাধানের তথ্যচিত্র।

[১০-০০]

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি

ডঃ সদ্ধাংশুবিমল বড়ুয়ার গবেষণা গ্রন্থ। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেনের ভূমিকা।

[১০-০০]

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্যে অভিযান কাহিনী। ১০টি বিরল মানচিত্র।

[৬-৫০]

বাঁকুড়ার মন্দির

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঁকুড়া তথা বাঙলার মন্দিরগুলির সচিত্র পরিচয় ও ইতিহাস। ৬৭টি আর্ট প্রেট।

[১৫-০০]

ঠাকুরবাড়ীর কথা

শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষের সন্দর্ভ আলোচনা।

[১২-০০]

উপনিষদের দর্শন

শ্রীহরিশ্রম বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপনিষদ-সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

[৭-০০]

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাস্ত্র-সাহিত্য

ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত এই বইটি রচনার জন্য সাহিত্য-আকাদেমী পুরস্কারে ভূষিত।

[১৫-০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলিকাতা ৯

পাদ্যাহিক বসুধাতী

তাকাও নি। এক চক্ষু হরিণের মতো চেয়ে থেকেছে দলের দিকে, প্রজো দিয়েছে নিজেদের অহমিকার পায়ে। এখন তার দামশোধ করতে হবে—কড়ায়-গড়ায়। তোমাদের সেই ভুলের ঋণ মেটাতে গিয়েই আনন্দরা অন্ধের মতো ঝাঁপ দিয়েছে স্রোতে।

‘বীরের এ রক্তশ্রোত, মাতার এ অশ্রু-ধারা।’ বাংলা দেশে জন্মে ভুল করেছেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর কথাগুলোকে অসংলগ্ন প্রলাপের মতো মনে হয় এ-দেশে। কোনো বিশেষর ভাঙারীর ঘরে এত অতিরিক্ত সঞ্চয় নেই যে নিবন্ধিত্ত্বের দেনা শূন্যে দেবেন তোমাদের।

রাত দশটা বাজে—তবু বক্তৃতা চলছিল সমান তেজে। খানিক দূরের মাঠ থেকে, অ্যাম্প্লিফায়ারে ভেসে-আসা সেই আওয়াজ ছাড়া-ছাড়া হয়ে কানে আসছিল স্বরাজের। মধু বাকী হয়ে উঠছিল সিনিকের হাসিতে। ‘যুক্ত-ফ্রন্ট ভাঙছে কারা?’ কেউ ভাঙছে না—ফতকগুলো ভাঙা কাচের টুকরোকে কাগজের পিট নিয়ে তোমরা জুড়ে নিয়েছিলে, একটা-বর্ষারও ভর সইল না, কাগজ গলে গেল।

হঠাৎ দুমদম করে বোমার আওয়াজ। তারপরে দারণ কলরব।

যক-জমে উঠল তাহলে! এক ধরনের তৃপ্তিতে স্বরাজের মুখ ভরে উঠল : এইটাই দরকার ছিল, এরই জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। এতক্ষণ এক-তরফা নিদে-মন্দ চলছিল, এবার ও পক্ষ থেকেও তার জবাব এল। বক্তৃতার চাইতে ঢের জোরালো—লাউডেস্ট প্রোটেস্ট।

আবার বোমার শব্দ।

কিন্তু বোমার শব্দ নয়। একটা ছবি মনে এল। কোন এক হতভাগা মানুষকে ডোমেরা পোড়ানো কেরাউলার শ্মশানে। একজন ধিকৃ হয়ে লাঠির ঘা বসিয়ে ফাটিয়ে দিলে মাথাটা—ছিটকে-ছিড়িয়ে পড়ল হলদে রঙের গলিত মগজ—মড়াপোড়া গন্ধের সঙ্গে আর বাড়তি দুর্গন্ধ পাক খেয়ে উঠল শ্মশানের গরম বাতাসে।

যুক্তফ্রন্টের চিতা তো জ্বলছিলই। এবার খুলি ভাঙবার আওয়াজ আসছে। লোকজনের দৌড়োদৌড়ির শব্দ পাওয়া যায়। ওদিকের বড়ো রাস্তাটা দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা বাস পালিয়ে গেল। পদলিখ ভান ছুটে গেল মনে হয়।

অতঃপর শান্তি।

এবং কবরের শান্তি।

দেওয়ালের দিকে চোখ পড়ল স্বরাজের। সূজাতার ছবি একখানা। বিয়ের পর ছবিটা ভুলে দিয়েছিল সূজাতার বন্ধু সানিট্রী, তার দামী

ক্যামেরা ছিল একটা, ছবিটা ভালো তুলেছিল। সূজাতার মোটামুটি সূত্রী চেহারা—কিন্তু ছবিতে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। তার চেয়েও আশ্চর্য—

তার চেয়েও আশ্চর্য—এবং ঠিক এই মূহুর্তে আবিষ্কার করল নাকি স্বরাজ, এই ছবিতে ভারী কোমল, ভারী শান্ত মনে হচ্ছে সূজাতাকে! আর—এমনও মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, কোনো পাড়াগাঁয়ের একটা কিশোরী মেয়ে—দু’ চোখে লজ্জা জড়ানো, জীবনকে এখনো সে জানে না, ভীরুর মতো একটা আঁশচয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে!

কী ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে ফোটোগ্রাফ! এই সূজাতা?

নীলু হওয়ার পরে কিছদিন কেনন নিবে গিয়েছিল, ভেঙে গিয়েছিল শরীর, তারপর একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। তখন স্বরাজই বলত—সেই ময়দান-মিছিলের দিনগুলোকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে বলত : ‘সূজাতা, এত সহজে মরলে চলবে কেন? আমাদের সব পথ তো পড়ে রয়েছে সামনে। আমাদের কবি সূভাষ-দার কথা ভুলে গেল : “কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?”’

স্বরাজ, আমি বোধ হয় চিরদিনের মতো ফুরিয়ে যাচ্ছি।

‘কে বলে? “This is our day, so turn my Comrade, turn/like infant's eyes”—

তারপর।

তারপর তার নিজের চোখেই নিবে গেল সুস্বপ্ন। ধরতে চাইল মাটি আঁকড়ে, মৃত্যু ভরে উঠল ভাঙা কাচের ধারালো টুকরো, হাত রক্তাক্ত হয়ে গেল। দেখল তার নিজের চারদিকে লোহার বাসরের মতো প্রাচীর উঠছে, সেখানে মাথা ঠেকে কপাল ফাটে—কিন্তু প্রাচীর নড়ে না।

এবং তখন সূজাতা জেগে উঠল।

‘তুমি কী করবে?’

‘কিছুই করবার নেই, কিছুই করব না।’

‘মানে?’

‘আই হেট পলিটিক্স—আই হেট পলিটিশিয়ানস্, আই হেট এড্রিথিং!’

‘স্বরাজ, শেষে তুমি—’

‘আই ওয়াজ এ ফুল। এসব না করে আমি কালোবাজার করতে পারতুম। বিরাট বাড়ি হত, লাইমুজিন হত, প্রায়ই পৃথিবী ঘুরে আসতুম। আর কালোবাজারীদের স্ট্রীট ল্যাম্পের পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁস দেওয়া হবে—জওহরলালের এই স্ল্যাগস্টিক নিয়ে আমার মন্দের আসর খুব ভালো জমে

উঠত।’

‘তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।’

‘আমার নয়—বাংলা দেশের।’

প্রথমে কানিল সূজাতা। তারপরে ক্ষেপে উঠল আস্তে আস্তে।

এখন সময়টা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল। আমাদের প্রত্যেককে নামতে হবে এখন। এতদিন বাইরে ছিল শত্রু, এবার ভেতর থেকে ঘা দিয়েছে তার।

‘কারা শত্রু?’

‘ওরা।’

‘সত্যটা আবিষ্কার হ’ল বছর বিশেক একসঙ্গে থাকবার পরে? একসঙ্গে জেল খেটে, দুঃখ সয়ে, লাঠি খেয়ে, রাইফেলের মূখে দাঁড়িয়ে?’

‘ওদের পতন হয়েছে।’

‘আর তোমরা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছ। একেবারে দেবলোকের দিকে।’

‘গায়ে পড়ে ঝগড়া করছ কেন?—তুমিও ওদের দলে।’

‘আমি ঈশ্বর মানি না। But Oh, God, if here be any God, please save me from all these political parties!’

এর পরে দিনগুলো বিশ্বাস থেকে কটু, কটু থেকে বিষাক্ত। প্রত্যেকদিন চারপাশে তাকিয়ে—দেশের চেহারা দেখে, মাথা ঠিক থাকে না, রক্ত ঢেড়ে যায়, এক-এক সময় বাড়িতে ফেরে পৃথিবীর সমস্ত জিহাংসা মাথার ভেতরে জড়ো করে। আর তখনই হয়তো—

‘আমি এভাবে থাকতে পারছি না। তুমি কি এটা মিডল ইস্ট পেয়েছো যে আমাকে একেবারে হারামে বন্দী করে রাখবে—বাইরের আলোও দেখতে দেবে না?’

‘আলো নেই সূজাতা! অন্ধকারে পাঁচা উড়ছে।’

‘তুমি চূড়ান্ত ফ্রান্টেজনে ভুবে গেছ।’

‘ফ্রান্টেশন নয়—এতদিনে আমার চোখ খুলেছে।’

‘না স্বরাজ—এভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ইয়ু মাস্ট ওয়েক-আপ।’

‘কিসের জন্যে? রাতের অন্ধকারে প্যাঁচার ঝগড়াটা আরো জমিয়ে তুলব বলে?’

বিস্বাসিত, ক্রমেই বাড়ছিল। তারপরে বন্দনা আর কারোই সইল না।

‘আমি চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না।’

‘তোমার অভিরুচি।’

‘তুমি আর একবার বিয়ে করতে পারো। ডিভোর্সের সার্ট ফাইল কোরো, এক্সপার্ট ডিগ্রী পাবে, আমি কন্সটেন্ট করব না—অভয় দিচ্ছি তোমাকে।’

‘অনুগ্রহের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

একবার ফিরে তাকিয়েছিল সূজাতা, মনে হচ্ছিল তার শত্রু মূখখানা লোহার

**ওদের ভবিষ্যৎ
গাড়ে ডুলাতে**

**সম্পন্ন করতে
শেখান!**

আজ, ওদের কোন ভাবনাটি নেই।
কিন্তু ভবিষ্যতের কথা আর কেমন জানে!
ওদের, অসুখ, ভবিষ্যতের, কল্যাণ, ভবিষ্যতের
শেখান। ভবিষ্যতের জন্য গুরু করতে শেখান।
সেই ব্যক্তিগত ও মাতে শেখান।

**সফলের সেবার
স্টেট ব্যাংক**



APF-Airun 5.22.818

কবিতার হৃদয়ের কাছে

অনিয়মিত হাট

কবিতা, এসেছি আজ প্রশ্ন নিয়ে তোমার সম্মুখে,
শ্রম ও ভক্তির ভারে নতজানু হব না এখন;
স্বপ্নের কুহেলী নিয়ে স্বপ্নগড়া, বিমূর্ত বিস্ময়,
ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদা, দূর্বোধতা, পড়ে থাক সব।

শিল্পের জন্যেই শিল্প? এতবড় ধাম্পা বয়ে বকে
তোমার উল্লেখ করে যারা নাচে অশ্বিন নাচন;
অশ্লীল পঙ্কল পথে গুপ্তঘাত সর্বনাশা ভর,

বিশ্ব ও বিজ্ঞান আনে, অন্ধকার সৃষ্টির উৎসব
সদর্পে চালিয়ে যায়, কাদা ছোঁড়ে সভ্যতার মুখে,
তুমি কি তাদের পক্ষে? সদৃশের বড় প্রয়োজন।—
অথবা বিশুদ্ধ বস্তু, সংগ্রামের শপথ অব্যয়,
জীবন গভীরে মূল, পরপদে প্রাণ কলরব?

সৃষ্টির পেলব পুষ্প কবিতার হৃদয়ের কাছে
অতান্ত গভীর, তীর, তীক্ষ্ণ এই প্রশ্ন পড়ে আছে।

ছাঁচে ঢালাই করে তৈরি করেছে কেউ,
কোটরের ভেতর চোখ দুটো ধিক্ ধিক্
করে জ্বলছিল। হয়তো ব্রুট্ কিংবা
রাসকেল বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে
সামলে নিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়ে-
ছিল ঘর থেকে।

একটা আদিম ফোঁসে পেছন থেকে
স্বরাজ ডাক দিয়ে বলেছিল: 'পার্টির
স্পেশ্যাল ট্রেনে ইনক্লিনাটো যখন নিয়ে
আসবে, তখন খবর দিয়ো, আমি স্টেশনে
রিসিভ করতে যাব।'

আনন্দ—ওরাই বিপ্লব আনন্দ। স্বরাজ
আর সূজাতার কথা ভাববে না। কিন্তু
দেওয়ালের ওই ফোঁটোটা! কী ডিসেপ্টিভ
ছবিই তুলেছিল সাবিরী—সেন পাড়াগাঁয়ের
একটি শান্ত কিশোরী মেয়ের মতো
লজ্জাভরা চোখে চেয়ে আছে সূজাতা,
জীবনটাকে এখনো চেনে না, এখনো
পৃথিবী তার কাছে স্বপ্নে আর কিস্ময়ে
ভরে আছে।

না—সূজাতার কথা তাববার কোনো
মানে হয় না আর। ইট্‌স্ এ সীল্ড্
চ্যাপটার।

বাইরে বহুতা নেই, বোমার অগ্ন্যুজ্জ
নেই, কোলাহল নেই, হঠাৎ যেন একটা
সত্যতার মধ্যে ডুব মেরেছে সব। কবরের
শান্তি। এর পরে আরো বোমার দিন
আসছে, কালের চিতায় আরো অনেক-
গুলো মাথা ভাঙবার আওয়াজ জেগে
উঠবে। তারপরে—তারপরে সারা বাংলা
দেশ জুড়ে শ্মশানের ছাই উড়ে চলবে
কেবল।

গুন গুন করে একবার কান্নার
আওয়াজ এল যেন। স্বরাজের শরীরটা
শক্ত হয়ে উঠল একবারের জন্যে। নীল
বোম হয় ঘুমিয়ে পড়েছিল, মা-কে স্বপ্ন
দেখে কেঁদে উঠল।

স্বপ্নার গলার আওয়াজ—মা যেন
কান্নাভরা সুরে কিছ্ বললেন, বাবা
রাজকার অভ্যাসে নিজের ঘরে লুই
ফিশার বা ওইরকম কিছ্ একটু পড়-
ছিলেন। তিনি কয়েকবার কেশে উঠলেন।

নীল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মা-র স্বপ্ন
দেখছে। সূজাতা জেগে বসে দেখছে

বিপ্লবের স্বপ্ন। আবার একটা সিনিক
হাসিতে মুখ ভরে উঠল স্বরাজের।

টোবল থেকে সিগ্রেট, দেশলাই তুলে
নিয়ে সিগ্রেট ধরালো একটা। দ্বিধীতে
ট্রান্সফারের ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে সামনের
মাসেই। নীলকে নিয়ে যাবে সঙ্গে করে।
সেখানে যে-কোনো একটা রেসিডেন্সিয়াল
স্কুলে ভর্তি করে দেবে তাকে। তারপর
মা-কে ভুলতে, এমন কি, এই পরিবারটাকে
ভুলে যেতেও তার সময় লাগবে না।

বাইরে পায়ের শব্দ। দরজার ও-পাশে
কে দাঁড়িয়ে।

কে?

‘আমি, বড়দা।’

‘স্বপ্না? ভিতরে আর।’

স্বপ্না ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল,
তারপর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খাটের
পার্শ্বটিতে।

‘কিছু কবি?’

‘নীলুডা খুব কষ্ট পাইতাছে বড়দা।’

এতক্ষণের জ্বালা স্বপ্নার দিকে
তাকিয়ে যেন মমতায় জুড়িয়ে এল।
বাড়িতে এই একটি মেয়ে। এত স্নিদ্ধ,
এত করুণ। কোনোদিন রাগ করল না
কারুর ওপর, অভিমান করল না এত-
টুকুও, যেন নিজের ছায়ার ভেতরে তলিয়ে
রইল চিরকাল। ওকে এতটুকুও দৃষ্টি
দিতোও কী যে খারাপ লাগে!

শান্ত গলায় স্বরাজ বললে, ‘দুই-চাই-
দিন। ভুলিয়া যাইবো তারপরেই।’

‘না—ভুলবো না। ছোট পোলাপান
মায়েরে ভুলতে পারে?’

স্বরাজ চুপ করে রইল। জবাব
পাচ্ছে না।

ভিজ্জ গলায় স্বপ্না ডাকল: ‘দাদা।’

‘কী?’

‘তুমি একবার যাইবা বৌদির ধারে?’

আর কেউ কথাটা বললে অগ্নির
মতো জ্বলে উঠত। বলত: চুপ করো,
আমার সামনে উচ্চারণ কোরো না
সূজাতার নাম। কিন্তু স্বপ্নার সামনে
সমস্ত মনটা মমতায় স্নিদ্ধ হয়ে গিয়ে-
ছিল। ক্রান্তভাবে হাসল স্বরাজ।

‘ক্যান এইসব ভাবতাছস্। সে আর

আইবো না। আমি গ্যালে হয় তো
দ্যাখাও কোরবো না।’

স্বপ্নার চোখে জল ছিলছিল করতে
লাগল।

‘বৌদি নীলুর কথাডাও ভাববো না
বড়দা?’

‘সকলের আগে দ্যাশ। সেইডাই
ভাবতাছে।’

‘আমি অ্যাক্‌বার গিয়া বৌদিরে
বুঝাম্‌ বড়দা?’

‘না, যাইতে হইবো না। খামাখা
অপমান হইয়া লাভ নাই।’

‘বৌদির কাছে আবার অপমান
কিসের? কাইল আমি বরং—’

ইচ্ছে ছিল না, তবু স্বরাজের স্বর
শক্ত হয়ে উঠল: ‘না, সে আর বৌদি না।
সমস্ত সম্পর্ক শেষ কইয়াই চইল্যা গ্যাছে
এইখান থিকা—তবে আর কণ্ডালের
মতন গিয়া তারে সাধতে হইবো না।
তরা যদি অপমান না ভাবস্, আমার
সম্মানে লাগে।’

টোট কাঁপতে লাগল স্বপ্নার। খাটের
একটা কোণা ধরে রাখল এক হাতে।

স্বপ্না আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে
এল তার। একখানা হাত রাখল কাঁধের
ওপর। স্বপ্না চোখ তুলল, দু’ চোখে
জল ছিলছিল করছে তার।

‘বুইন!’

বড়দার এমন গলা অনেকদিন শোনে
নি স্বপ্না। চোখ দিয়ে টপ করে এক-
ফোঁটা জল গাড়িয়ে পড়ল তার।

‘উ?’

‘তর এ্যাক্‌টা বিয়া দিম্‌ ভালো
দেইখ্যা। যেইখানে পলিটিক্‌স্ নাই—
ইন্ডিয়ালজীর তর্ক নাই—যে তরে সুখী
করতে পারবো, তর সত্যিকারের দাম
দিতে পারবো—’

এবার কান্নাটা আর বাধা মানল না।
‘না বড়দা, বিয়ায় কাম নাই আমার।
আমি বেশ আছি।’

সেই সময় একটা শব্দ হ’ল জানলার
বাইরে। চমকে দু’জনে তাকালো সেনিকে
জানলার রেলিং ধরে অস্পষ্ট চাঁদের
আলোয় একটা মূর্তি।

আনন্দ।

—কমল

নামকর্ষ কবিতার মানুষ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বয়েস বাড়ছে, আর একটি মানুষের মত ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। মতই তাকিয়ে থাকি, বিস্ময় বাড়ি; কেন না ঐ মতের আদল একেবারেই সেকলে। কথা ছিল, একদিন ঐ মত সম্পর্কেই চোখের আড়াল হয়ে যাবে; কেন না, আমাদের সামনে তো এই বিংশ শতাব্দীতে অনেক মতের আলো, অনেক ভাষাগাড়ার স্বপ্ন, মিছিল, সভা, ঐকতান, আরও কত আশা, কত না সমারোহ!

তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সব কিছু থেকে দূরে, একাকী, শ্লান মনুষ্যত্বের প্রতীক, তিষ্ঠ এবং করুণাময়। তাঁর মতের ওপর যে আলো কাঁপতে কাঁপতে স্থির হচ্ছে, তাও যেন একই রকম বিবর্ণ। সেখানে যুদ্ধজয়ের কোনো সমারোহ নেই, কিন্তু সঙ্কল্পের অবিনাশী দৃঢ়তা আছে। মহাভারতের কর্ণের মতই তিনি হয়তো ধ্রুব পরাজয়কে চোখের সামনে দেখতে পান, কিন্তু পিছনে হটেন না। তাঁর সেনাবাহিনী নেই, দল নেই, সঙ্গী নেই; পায়ে নীচে মাটি স্থির নেই; এমন কি সময় পর্যন্ত তাঁর প্রতিকূল।

তবু, চারদিকের প্রচণ্ড মার, লাঞ্ছনা, অপমান, সব কিছুকে তুচ্ছ করে, অতীতের বন্ধ উন্মাদ ডন কুইকস্মোরে মতই যেন পরিশুদ্ধ মানবসমাজের পত্তন কবতে চান তিনি এমন এক পৃথিবীতে যা গভীর কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যেখানে হ্যামলেটের পিতার প্রেতচ্ছায়া এবং জননীর ব্যভিচার! যেখানে লিয়র, ওথেলো, ম্যাকবেথেরা তাঁদের লোভ, সন্দেহ, উচ্চাশা এবং হত্যা দিয়ে অন্য সমস্ত মানবচৈতন্যকে ঢেকে দেয়। কুইকস্মোরে সপ্তে তবু, সূর্য-দেবতার ভাগ নেবার একজন মানুষ ছিল। এই কবচকুন্ডলহীন, বিষয়, করুণাময় মানুষটি রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণই একা; যদিও তাঁর চারদিকে হাজার শত্রু। কুইকস্মোরে দানবেরা ছিল তাঁর উত্তম মিত্রের মধ্যে। উনিবিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে যে মানুষটি জন্মগ্রহণ কর-

লেন, তাঁর লড়াই সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষদের সঙ্গে; তাঁদের মানসিক ব্যাধি, স্বার্থ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সুতরাং কী প্রচণ্ড মার তাঁকে দিনের পর দিন সহ্য করতে হয়, তা আমি কল্পনা করে নিতে পারি তাঁর তাঁটের এক কোণের রক্তিম তিষ্ঠতা থেকে।

এই মানুষটিকেই দেখি, বার বার দেখি, আর আমার বৃদ্ধের ভেতরটা



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

কেন যেন পাল্টাতে থাকে। আমি অনুভব করি, কোথাও আমাদের ভিতর আরোগ্যের মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে যেন। আমি অনেক মতের আলোয় মূগ্ধ। উপনিষদের নীচেকতা অথবা সত্যকাম থেকে শ্রদ্ধা করে শতাব্দীর পর শতাব্দী অমল মানুষেরা আমাদের সমস্ত রাত ঘুমুতে না পারার ক্রান্তিকে নিরাময় করেছেন তাঁদের আলো আর উত্তাপ দিয়ে। শ্রেষ্ঠ মানুষদের এই পথ চলার আজও বিরাম নেই; তাই তো আমাদের বৈতে থাকা এখনও গভীর অর্থময়। প্রতি শতাব্দীর নারকীয় অভিজ্ঞতা-গুলিকে অন্যায়সে অতিক্রম করে 'মানুষ', এই নাম, তাই আজও মস্তের মত আমাদের রক্তে তোলপাড় আনে।

আমার কাছে তথাপি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত এক আশ্চর্য নীলকণ্ঠ কবিতার মত, যে কবিতা আগুন এবং চোখের জলে পরিশুদ্ধ এবং যা আমার স্বদেশ, আমার মনুষ্যত্ব, আমার শপথকেই বারবার গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়।

ভারত দর্শন

(১৮৭ পৃষ্ঠার শেখাংশ)

বাকী দু'খানা দেখানো হবে। কলকাতার জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে ছবি ইতিমধ্যেই দেখানো হয়েছে, তা কলকাতার মানুষ এবং জীবনযাত্রা সম্পর্কে কুৎসা প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ছবিগুলো বিস্তারিত বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নি। তবে ছবির 'টাইটেল' দেখালেই বোঝা যায় ছবিগুলো কতখানি কুরূচিপূর্ণ হতে পারে। একটি ছবির নাম "এ ভিজিটারিয়ান ট্রাইব ইন হুইচ মেন ইনিসিয়েট গাল'স সেক্সুয়ালি এট থার্টিন এন্ড এনকারেজ দেম টু এনজয় দেমসেল্ভস্ দেয়ারআফটার" (একটি নিরামিষাশী জাতির কাহিনী— যেখানে পুরুষেরা ১৩ বছরের মেয়েদের বৌনকীড়ায় দীক্ষা দেয় এবং তখন থেকে মেয়েদের বৌনলীলায় মত্ত হবার জন্য উৎসাহ দেয়)। ভারতবর্ষে এখনও কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে কুরূচি এবং বৌনবিহারে কোন স্থান আছে বলে কখনও শোনা যায় নি। কাজেই ম্যালে সাহেব ভারতবর্ষের কি চিত্র এঁকেছেন, তা বৃদ্ধকে কোন কষ্ট নেই।

লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার বি বি সি'র এই ভারত-বিরোধী কুৎসা প্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। স্বভাবতই ভারত সরকার দিল্লীস্থিত বি বি সি দপ্তরটি বন্ধ করে দিয়েছেন এবং বি বি সি'র প্রতিনিধিকে ভারত ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। —৩০-৪-৭০



ঢাকার চিঠি

৥সংকল্পে৥

উনিশ শো ঊনসত্তরের চব্বিশে জুন নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় দিন, কেন না ঐদিন আওয়াম-দরদী নূরুল আমিন পাকিস্তানের কোটি কোটি আওয়ামের উদ্ধারকপে এবং পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রদেশে “আল্লাতালাহে”র বেহস্ত পত্তনের দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় সাতোপাশ্বেদের নিয়ে ঢাক, ঢোল, ক্যানাস্তারা পিটিয়ে এবং তারস্বরে ইসলামী প্রেমের মন্ত আওড়াতে আওড়াতে পি-ডি-পি আন্দোলনের সূচনা করল। এন-ডি-এফ. এর পক্ষে প্রতিনিধিত্ব সেই করেছিল। সাথে যোগ দিচ্ছেন নওরাব-জাদা নছরুল্লা। নিজামি ইসলামের ফরিদ আমেদ এবং জাস্টিস পার্টির উদ্ভুদ্ধ খাঁ অর্থাৎ প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর মাহাব।

জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে মাঝে মাঝে পি-ডি-পির ঘরোয়া বৈঠক ইত্যাদি হয়েছে, কিন্তু সরকারী আদেশ বলবৎ থাকায় প্রকাশ্য জনসভায় স্বদেশপ্রেমের নাচ দেখানোর সুযোগ পি-ডি-পিওয়ালাদের হয় নি। তারা কেবল কখনও ঢাকা, কখনও লাহোর আর কখনও বা করাচীতে ঘসে তাদের দালাল কোম্পানীর নিরুপায়ী অংশীদার বৃজোয়া কাগজওয়ালাদের মারফৎ জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী চেড়েছে। সন্তরের জানুয়ারী থেকে সরকারী নিষেধ উঠিয়ে নেওয়ার অন্যান্য রাজনৈতিক দল-গুলির মত পি-ডি-পিও সভা, মিছিল ইত্যাদি করার সুযোগ পেয়েছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে তার সদ-ব্যবহার করছে। প্রায় প্রতিটি জন-সভায়ই পি-ডি-পি নেতারা তাঁদের প্রতি-দ্বন্দ্বী দলগুলির কেছা কীর্তনে অধিকাংশ সময় ব্যয় করে থাকেন। থাকী দুই-পাঁচ মিনিটে আল্লাহের মহিমা কীর্তন আর “ইসলামের পথই মুক্তির পথ” ইত্যাদি বাণী প্রচার করা হয়। নূরুল আমিন, নওরাবজাদা নছরুল্লা, আমদ আলী, আবদুস সালাম ইত্যাদিরা বলে যে, “ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা পাকিস্তানীদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে, ঐসলামিক সমাজ-

ব্যবস্থাই আদর্শ সমাজব্যবস্থা, ঐসলামিক অর্থনীতিই আদর্শ অর্থনীতি এবং ঐসলামিক সামাই হোল একমাত্র আদর্শ সাম্য।” ইসলাম কি আর কোরাণ কি ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আমরা কখনও মাথা ঘামাই না, কারণ ধর্ম আর ধর্মগুরু এই দুটি হোল সামন্ততন্ত্রের গলিতকুষ্ঠ এবং পুঞ্জিতন্ত্রের মারফৎ তা আজও সমাজদেহে বহাল ভবিষ্যতে বিরাজ কবছে। আমাদের মোন্দা : কথা হোল এই যে, ঈশ্বরই জগতের প্রথম সামন্ততন্ত্র, প্রথম পুঞ্জিবাদী, সুতরাং ঈশ্বরকে মানা বা ঈশ্বরের বাণী ইত্যাদিতে বিশ্বাস করার অর্থই হোল সামন্তবাদ, পুঞ্জিবাদের নোংরা গাছের পড়ে থাকা। আমরা সোজাসুজি এই কথাটাই বলতে চাই যে উৎপাদনের উপকরণে এবং উৎপাদনের উপর পুরোপুরি অধিকার একমাত্র সর্বহারা কৃষক আর শ্রমিকেরই আছে। এই অধিকার তারা শস্তু সংগ্রামের দ্বারা আদায় করে নিচ্ছে এবং নেবে। “মার্কস সাহেব একশ বছর আগে জন্ম-ছেন। তাই তাঁর কথা পুরোন হোয়ে গেছে” কিংবা “মাও সে-তুং এর দেশের লোক কম্যুনিজম করে খেতে পাচ্ছে না” এই ধরনের ফালতু কথা যারা বলে তাদের আমরা কেবল এইটাই জ্ঞানিয়ে দিতে চাই যে মার্কস বা এঙ্গেলস যা শত্রু করেছিলেন, লেনিন যার গতি বাড়িয়ে ছিলেন এবং মাও যাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা হোল “শোষিত মানুষের বাঁচার অধিকারের জন্য লড়াই”। মার্কসের কোন নীতি আজ অচল, মাওয়ের কোন বক্তব্য আজ ভারতের ক্ষেত্রে অপ্রাসংগিক—এই সব প্রশ্ন কোনও সমস্যাই সৃষ্টি করতে পারবে না। বাঁচার অধিকারের লড়াই তার নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নেবে। কম্যুনিজম কেবল বাঁচার মন্ত্র নয়, কম্যুনিজমের একটা নিজস্ব গতিবেগও আছে। সে তার রাস্তায় ঠিক এগিয়ে যাবে। তাই বলে শোখনবাদী আর নয়—শোখনবাদী ভদ্র-লোকেরা যেন মনে না করে যে তারা সামন্তবাদী আর পুঞ্জিবাদীদের বিচিত্র শয্যাসজ্জা হলে তাদের সেই নোংরা দর্শনাত্মক মেননতী আওয়াম কম্যুনিজম বলে অনুসরণ করবে। সেই দিন চলে

গেছে। কাজেই, পি-ডি-পি এবং অন্যান্য বৃজোয়া দলগুলির ইসলামপ্রীতি বা কম্যুনিজম-নিষ্ঠা কোনটাতেই আমরা বিভ্রান্ত হব না এবং তাদের বৃদ্ধি বৃদ্ধন করার জন্য কোরাণের বা মার্কস তত্ত্বের আলোচনা—কোনটাই করব না। এই সব কাজ শোখনবাদী নয়—শোখনবাদীরা করবে। আমরা আওয়ামের হাতে ধারাল অস্ত্র তুলে দিচ্ছি, হাজার বছরের দাসত্বের প্তানি, শোষণের জ্বালা মেটানোর পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এইটাই আমাদের কাজ।

নূরুল আমিনের পি-ডি-পিই কেবল নয়, পাকিস্তানের প্রতিটি বৃজোয়া রাজ-নৈতিক দলই আসন্ন নির্বাচনে ভোট বাগাবার জন্তে বড় বড় গালভরা কথা বলে যাচ্ছে। এরা কেউ ইসলামী, কেউ ইসলামী সমাজতন্ত্রী, কেউ সমাজতন্ত্রী-ইসলামী (যেমন মোজাফফর, ওয়ালী খাঁদের ন্যাপ, এরা সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সম্পর্কে বিরাট বিরাট স্লোগান বেড়ে তারপর “অশ্বখামা হত, ইতি গজঃ” বলার মত বক্তৃতা শেষে “আমরা ইসলামের আদর্শে বিশ্বাসী” এই কথাটি জুড়ে দেয়। না দিলে তো বড় বিপদ, কেন না আমাদের এই বিচিত্র দেশে “কম্যুনিজম” বে-আইনী। সাহস করে “আমি কম্যুনিষ্ট”, এই কথা বলার সাহস এই সব নপুংসক বৃজোয়াগুলির কারোই নেই)।

নিজের নিজের দল সম্পর্কে নানারকম বিশেষণ প্রয়োগ করা ছাড়াও এইসব রাজ-নৈতিক দল একে অন্যের উদ্দেশ্যে কুৎসা রটানোয় তন্ময় হোয়ে আছে। এদের বাকজাল এবং প্রতিশ্রুতির সামনে পড়ে সাধারণ মানুষের অবস্থা সদা গাঁ থেকে শহরে ধান বেচতে আসা কৃষকের মত হোয়েছে। পকেটে কাঁচা টাকা নিয়ে গাঁয়ের কৃষক শহরের এ’দোগলিতে পথ হারিয়ে গণিকাদের পাক্সায় পড়লে তাকে নিয়ে যেমন মেয়েছেলেগুলি কাডাকাড়ি করে, আসন্ন নির্বাচনে ভোটারদের অবস্থাও ঠিক তাই হোয়েছে। এ বলে আমরা দেখ, ও বলে আমরা দেখ! বাস্তবিক পাকিস্তানের বৃজোয়া রাজনৈতিক দলগুলির স্বভাব আর ঘাট-গল্পের গণিকার স্বভাব অবিকল এক। উভয়েই সমান সুবিধাবাদী, স্বার্থপর এবং নোংরা। পেশাদার গণিকা-দের মতই এরা বৃজোয়া রাজনীতির অন্ধকার, নোংরা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে একে অন্যের সাথে চুলোচালি করে এবং সাধারণ মানুষকে ঠকায়। এদের এই পারস্পরিক, চুলোচালির কয়েকটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিলাম।

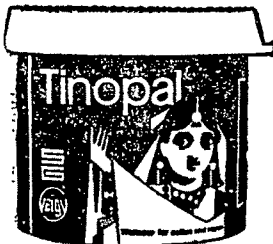
এই বছরের গোড়া থেকে এই পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনই মিয়া মমতাজ দৌলতানা এবং কাইয়াম খাঁ-ফকা চৌধুরীর কনভেন-শন লীগারদের বিরুদ্ধে ডুবিল তছরপের কেছা ছড়িয়েছে। আপনাদের হয়ত মনে

দাণ্ডাহক বন্দুগতী

আছে যে, এই বছর এগারই জুন ইরানিয়ার
খাঁ কনভেনশন লীগের চান্ড বাজেয়াপ্ত
করেছেন। ঐ ফাশে একশ' প'রিশ
কোটি টাকা আছে! টাকার অঙ্কটা পড়ে
বন্ধুতে পারছেন- নিশ্চয়ই যে, আয়বের
আমলে তার স্বহস্তের সৃষ্টি কনভেনশন
লীগ কি রকম দুই হাতে টাকা লাটোঁছিল!
মজার ব্যাপার এই যে, খান সর্বদা খান,
যে কিনা আয়বের একরকম ডান হাত

ছিল, সে আর বর্তমানে কনভেনশন লীগে
নেই! আয়বের "খেল খতম" হওয়ায়
তার "পরসা হজম" করে সর্বদা এখন
কাইয়ুমের "কারেমে আজম মুসলিম লীগে"
যোগ দিয়ে নতুন উৎসাহে দেশোদ্ধার
করছে এবং পিছন থেকে ফকা চৌধুরীর
বিরুদ্ধে কাইয়ুমকে লেলিয়ে দিচ্ছে।
পাকিস্তানের রাজনীতি যে কত নোংরা,
তা একমাত্র সর্বদাকে দেখলেই বোঝ যায়।

গদা, হত্যাকারী, নারীধর্ষণে বিশেষজ্ঞ
এবং সাধারণ মানুষের শত্রু সর্বদা বা
পাকিস্তানের জনগণের জীবনে একটি
অন্যতম দুষ্টগ্রহ! বাই হোক, সর্বদা,
কাইয়ুম এবং দৌলতানার আন্তরিক
উৎসাহ এবং আগ্রহে শেষ পর্যন্ত ফকা
চৌধুরীদের বিরুদ্ধে তহবিল তহরুরের
মামলা দায়ের করা হয়েছে। এইবার
অন্যদিক!



পরিক্ষা ক'রে দেখা গেছে! সামান্য একটু টিনোপাল শেষবার ধোয়ার সময়
দিলেই কি চমৎকার ধবধবে সাদা হয়—এমন সাদা শুধু টিনোপালেই
সম্ভব। আপনার শাট, শাড়ী, বিছানার চান্দর, তোয়ালে—সব ধবধবে!

আর, তার খরচ? কাপড়পিছু এক পয়সারও কম! টিনোপাল কিনুন
—রেগুলার প্যাক, ইকনমি প্যাক, কিম্বা "এক বারতির জন্যে এক
প্যাকেট"।



© টিনোপাল—সে আর গার্সী এল এ, বায়,
সুইডারগ্যাণ্ড-এর রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

সুন্দর গারগী লি., পোঃ আঃ বক্স ১১০৫০, বোম্বাই ২০ বি. আর.

Shilpi HPMA-13/70 Ben

গাভাইর কনসেট

এক সাথে কনসেট আর মাথা জড়াজড়ি করে কনভেনশন লীগকে নাজহাল করলেও দৌলতাবাদী কনভেনশন লীগ এবং কাইয়ুমের কয়েদে আজম লীগ, এই দুই-এর মধ্যে কোনও সম্ভাব্যই নেই। যেমন, এই মাসেরই প্রথম সপ্তাহে—লাহোরে কনভেনশন লীগের এক বিশেষ “লীগ” জনাব ইউসুফ খটক কাইয়ুমের বাপান্ত করেছে। সে বলেছে যে, “কাইয়ুম যদিও আজ গণতন্ত্রের খাদেম সেজেছে, একদিন কিন্তু সে মুসলিম লীগ তথা পাকিস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি ছিল এবং উনিশশ’ একাত্তর সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে গন্ডা দিয়ে ব্যালট বাগ্ন ভেঙেছিল।”

ইউসুফ খটক কাইয়ুমকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে যে, “বাড়াবাড়ি করলে সে কাইয়ুমের অনেক কেছা ফাঁস করে দেবে।”

এইবার কাইয়ুম খাঁ কি বলল তা লিখছি। বড়ো কাইয়ুম তার পাকা দাড়ি আর লোলচর্ম নিয়ে এখনও সোজা হয়ে দাঁড়াতে চায়, হার মানতে সে মোটেই রাজী নয়। দু’ হাতে তলোয়ার নিয়ে সবাস্যচীর মত সে তার সব প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করছে। গত সতের তারিখ, হরিপদুরে এক জনসভায় সে দৌলতানাকে দেশদ্রোহী বলে গালি দিয়েছে। তার মতে “মিয়া দৌলতানা, ওয়ালী খাঁর ন্যাপ এবং মজিবরের ছয়-দফাপন্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে জনতার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে চাইছে।” বহুতার তোড়ে ও উৎসাহের আতিশয্যে কাইয়ুম খেয়ালই করে নি যে, জনতার হাতে ক্ষমতা না এলে তা কেড়ে নেওয়ার প্রশ্ন কি কর ওঠে? যাই হোক, বড়ো বজ্রাত কাইয়ুম খাঁ এই জনসভায় এমন আরও কিছু কথা বলে ফেলেছে, যা তার দল সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করে দেবে এবং তাকেও পথে বসাবে। কাইয়ুম বলেছে যে, “যদিও তার দলে কিছু পুঁজিপতি এবং জমিদার আছে, সে জানে কেমন করে এদের কাজে লাগাতে হয়।” সে বলেছে যে, তার দলের “নবাব এবং খান”-রা দেশের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য এই কথা সে প্রমাণ করে দেবে। তাদের দিয়ে সে জন-কল্যাণকর কাজ করাবে। চনৎকার! আমরা আবারও বলছি—চনৎকার! এমন মহৎ উদ্দেশ্যের তুলনা হয় না। সাধু! সাধু! তোবা! তোবা! তাহলে খান এবং নবাবের দল জনগণের হাণের জন্য এগিয়ে এল। অন্য কাইয়ুম, অসম্ভবকে সম্ভব করলে তুমি! গাধা, গরু, বাঘ, সিংহী সবাই তোমার মহিমায় একঘাটে ঘেঁষাঘেঁষি করে পানি চাটছে। ধন্য তুমি! প্রতিক্রিয়া-শীল, রক্তচোষা সামন্ত-প্রভু আর ব্যবসায়ীদের তুমি রাতারাতি সর্বত্যাগী ফকির

বানিয়ে দিলে। এত ক্ষমতা কি পি, ডি, পি প্রধান এবং পাক-সরকারের স্থায়ী দালাল নুরুলেরও আছে? মনে ভে হয় না! ভূমি তারও একবার উপরে!

এইবার আর এক ইসলামী নেতার কথা আসা যাক। ইনি উজ্জ্বল ওরফে আসগর খাঁ। প্রাক্তন এয়ার মার্শাল। পিণ্ডির রাজপ্রাসাদ থেকে খান বাহাদুর আয়ুব খানের প্রচণ্ড পদাঘাতে গড়াতে গড়াতে এই পর্যন্ত তিনিই মাকাল ফল বুজোঁয়া রাজনীতির আস্তাকুড় এসে ছিটকে পড়েছে! এরা হেলি, জলফকর ভুট্টো, প্রাক্তন এয়ার মার্শাল নুর খাঁ এবং আসগর খাঁ। ভুট্টো “পাকিস্তান পিপলস পার্টি” করেছে। নুর খাঁ কনভেনশন লীগে যোগ দিয়েছে এবং আমগর প্রথমে গোফুলের হাড়ি, তারপর স্ট্যান্ডি পার্টি, তারপর পি, ডি, পি, অবশেষে “তেহরিক ই ইস্তিকলাল” বা “গণ-এক্স আন্দোলন”-র সৃষ্টি করে উজ্জ্বল আর আগুন পোহাচ্ছে। হালে নুর খাঁ যেমন তার উপরওয়াল্য ইয়াহিয়াকে ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়ে প্রচণ্ড চাঁট খেয়ে খেতাব এবং ক্ষমতা দুই হারিয়েছে, তেমনি আয়ুবের আমলে আসগর খাঁও অতিরিক্ত তৎপরতা দেখাবার দরুণ আয়ুব সাহাবের জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে নিচে এসে ভুট্টোর পাশে টান টান হয়ে শয়ন পড়েছিল। এক জায়গায় ভুট্টোর সঙ্গে আসগরের বেশ মিল আছে। উভয়েই নিজেকে মাতঙ্গর এবং একেশ্বর মনে করে এবং সেই জন্যই তাদের কেউই নুরুলের গোলটেবিলে পাস্তা পায় নি। ঠিক এই একই কারণে আসগর পি, ডি, পি-তে ঢুকেও টিকতে পারে নি। “জাস্টিস পার্টি” ছাড়ার পিছনেও এই একই কারণ আছে। সম্প্রতি সে তার “তেহরিক”-র মাধ্যমে “রাজনৈতিক অধমদের মধ্যে সে-ই উত্তম”, এই কথাটি প্রচার করতে ব্যস্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কাইয়ুম, দৌলতানা, ফকা চৌধুরী, মওদুদী এবং নুরুলের মত সেও ইসলাম, কোরান, সূরার আদর্শে বিশ্বাসী, তবে তাদের মত “কনজারভেটিভ ইসলামী” নয়! এই মাসের পয়লা তারিখে পশ্চিম পাকিস্তানের সরাই আলমগীরে এক জনসভায় আসগর খাঁ, নুরুল, দৌলতানা, ওয়ালী খাঁ প্রমুখ নেতাদের “বড়ো এবং বাড়তি” বলে গালি দিয়েছে। তার মতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এরা প্রত্যেকেই অপ্রয়োজনীয় বোঝা। ভুট্টো সম্পর্কে সে বলেছে যে, “তার দ্বারা কিছুই করা সম্ভব হবে না, কারণ, সে একদা আয়ুবের সেবক ছিল।”

এইখানেই আসগর খাঁ একটা মন্ত বড় ভুল করে বসল। কেন না, বাণী দিতে দিতে সে ভুলেই গিয়েছিল যে,

ভুট্টোর মত সে নিজের একদা আয়ুবের সেবা করে এসেছে এবং সেবার প্রতি হওয়ার দরুণই তাদের প্রভু তাদের দু’জনকে দুটো লাথিতে অধঃপতিত করে-ছিলেন! নুর খাঁ সম্পর্কেও এই এক কথা বলা চলে। আজ কনভেনশন লীগে ঢুকে রাতারাতি দেশপ্রেমিক এবং জন-দরদী বলে গেলেও মাত্র কিছুদিন আগেও এই বদমায়েসটি পশ্চিম-পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা হিসাবে শহরে-গ্রামে সর্বত্র শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং অন্যান্য সংগ্রামী জনতার উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে! যাই হোক, আসগরের কথায় ফিরে আসা যাক। এই নির্ধারিত সফারটি বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটা গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। তার মতে পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তানের মত কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করতে হবে। এতে নাকি শাসনকার্যের ব্যয় কমবে এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দাবি-দায়ার জন্য লড়াতে বাঙালীদের সুবিধা হবে। কুচক্রী আর কাকে বলে? একেই বাংলা দেশের মানুষ গন্ডা গন্ডা রাজনীতি-ব্যবসায়ীর বাকছটায় বিভ্রান্ত, তারপরও যদি এই ছোট প্রদেশটি আরও চার ভাগে ভাগ হয়, তাহলে তো পোয়া-বারো! জনগণের দশমন, এসব দলগুলি দুর্দর্দনেই অগণিত মানুষের দাফন সেয়ে দেবে! সত্যি কথা বলতে কি, যারা সংগ্রাম করে না, যারা রক্ত দিতে সাহস পায় না, যারা রাজনীতি বলতে কেবল-মাত্র সভা-সমিতি, মিছিল আর বকুনি ছাড়া কিছু ভাবতেই পারে না, তারা অর্থাৎ বুজোঁয়া, তথা পাতিবুজোঁয়ারা নানারকম অলীক কল্পনা করে সুখ পায় এবং এইসব কল্পনাই তাদের একমাত্র আশ্রয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান সম্প্রতি “ন্যাশনাল প্রোগ্রেসিভ লীগ” গঠন করেছে। কয়েকদিন আগে “প্রোগ্রেসিভ” কথাটি ছোট্ট দিয়ে তার দলের নতুন নামকরণ হোল “ন্যাশনাল লীগ”। জনাব আতাউর সর্বত্রই “তার দল শ্রেষ্ঠ” এই কথা প্রচার করে বেড়িয়েছে এবং তার দলের মধ্যে কোনও অন্তর্বির্বাদ নেই বলে বড়াই করেছে। কিন্তু মাত্র কয়েকদিন আগে দলের এক সভায় সম্পাদকের পদ নিয়ে ওলি আহাদ এবং আমিনা বেগমের মধ্যে প্রচণ্ড চুলো-চুলি হয়ে গেছে এবং উভয়েই উভয়ের অতীত ইতিহাস প্রকাশ করে দেবে বলে শাসাচ্ছে!

ওয়ালী খাঁ, ভুট্টোর পিপলস পার্টি বা মজিবরের আওয়ামী লীগও ঠিক একইভাবে একে অন্যের লেজ ধরে টানাটানি করছে, পরে সেসব কথা আসবে। ইতিমধ্যে পি, ডি, পি প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

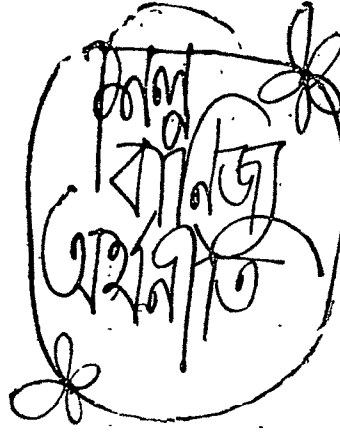
আমাদের দেশের অর্থবিশেষ যদি

অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশ পরিমাণে ক্ষতি হলেও, তবে তা নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয় এবং নীরোগ দেহও নয়। বরং সেটা সুস্পষ্ট অসুস্থতারই বাহ্যিক প্রকাশ। ব্যক্তিগত এবং জাতীয় দেহের এই রোগটা আজ বড় বেশি প্রকট। তাই রাষ্ট্রদেহে অসুস্থতার যন্ত্রণা দেখা দিয়েছে। গত বিশ-বাইশ বছর ধরে আমাদের অর্থনীতিতে অনেক উত্থাল-পাতাল হয়েছে। তিনটি পারিকল্পনার রক্ত জাতীয় দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে সত্যি, কিন্তু সে রক্ত সমানানুপাতে সমগ্র দেশের শিরা-ধমনীতে প্রবাহিত হয় নি। পরিবর্তে অর্থবিশেষে তা জমাট বেঁধে গেছে। ফলে, শরীর অঙ্গ হয়েছে শীর্ণতর, আর অর্থবিশেষ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে অসন্তোষ মাঝে মাঝে দম্কা হাওয়ার মত আমাদের কাঁপিয়ে দিচ্ছে, সেই অসন্তোষের মূল রয়েছে অর্থনৈতিক হতাশার গভীরে। আঞ্চলিক বৈষম্যের যে প্রশ্ন আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠছে, তার পেছনে আছে ব্রিটিশ শোষণের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি এবং গত বাইশ বছরের দ্রাব্য পদক্ষেপ। দেশের মানচিত্রের দিকে তাকালেই উদ্ভাসিত উন্নয়ন এবং গ্লান্যময় অনগ্র-সরতার ছবি পাশাপাশি ভেসে উঠবে। বেশিদের বেতে হবে না। আমাদের ঘরের কাছেই এমন উদাহরণ অসংখ্য। উত্তর-বঙ্গের কয়েকটি জেলা, বাঁকুড়া এবং পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা তাকালেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের সভায় এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। যদিও এই বিতর্ক ছিল নিছকই শূন্যগর্ভ। তবে আশার কথা, আঞ্চলিক উন্নয়নের ত্রাসমাহীনতা আজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, এই ঐক্যব্যাধি দূর করার কোন 'শর্টকাট' নেই, সামগ্রিকভাবে বিষয়টির প্রতি সন্নিবেশ করা প্রয়োজন। দেরিতে হলেও কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের হাতে তৈরি এই ফ্র্যাকশনালাইজেশনকে দেখে আজ আঁতকে উঠেছেন।

তিনটি পারিকল্পনা শেখ করে আমরা তিন বছর বিগ্রাম করেছি, তারপর চতুর্থ পারিকল্পনার কাগজপত্র নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত হয়েছে। এরই মধ্যে চীন-পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, ভয়ানক খরা এবং বন্যা ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে সত্যি। তবুও বলা চলে, আঞ্চলিক উন্নয়নের যে বৈষম্য আজ চর্মসর্শ্ব ধরা পড়েছে, তার দায়িত্ব পারিকল্পনা বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তলতা নয়, যতটা কেন্দ্রীয় সরকারের অবাস্তব পন্থা



এবং উদাসীনতার। গত বাইশ বছরের অভিজ্ঞতা দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার চাপের কাছে যত তাড়াতাড়ি নীতি স্বীকার করেন, তার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশও অনুভূত প্রয়োজনের কাছে করেন না। তা যদি করতেন, তবে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন সমস্যা, অশ্বের তেলগুণানার দাবি, উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার প্রশ্ন এবং নেকার উন্নয়ন নিয়ে এত বেশি গাঁড়মসি চলত না।

এক্ষেত্রে একটি মৌলিক নীতির প্রশ্ন জড়িত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপকতা কতটা হবে? যে সকল অঞ্চলে উন্নয়নের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য, সেখানেই প্রথম কার্যসূচীকে কেন্দ্রীভূত করা হবে, না এক বিস্তারিত অঞ্চল জুড়ে কার্যসূচী গ্রহণ করা হবে? যদি প্রথম পন্থাকে অনুসরণ করা হয়, তবে স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চল, যেখানে সুযোগ-সুবিধা সহজলভ্য, সেখানেই উন্নয়ন ব্যাপক এবং দ্রুত হবে। আর যে সকল অঞ্চলে সুযোগ-সুবিধা কম, সেসব অঞ্চল স্বাভাবিকভাবেই পেছিয়ে পড়বে। অন্য দিকে, যদি বিস্তারিত অঞ্চলকে কেন্দ্র করে উন্নয়নের কর্মসূচী পরিচালিত হয়, তবে সামগ্রিকভাবে সেই অঞ্চলের উন্নয়নে যেমন অনেক বাধা দেখা দেবে, তেমনি উন্নয়নও ব্যাপক হবে না। ফলে, প্রথমেই স্থির করা প্রয়োজন, উন্নয়নের নীতি কি হবে? আমাদের দেশে সুযোগ-সুবিধার 'প্রায়োরিটি' অনুসারে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া স্বাধীনতার আগে শিল্পসমৃদ্ধি বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পরে সেইসব অঞ্চলই অধিক-তর সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আর অবশিষ্ট অঞ্চলের কপালে সামান্যই জুটেছে।

সব মিলিয়ে বর্তমানে যে অবস্থা, তাতে এই বৈষম্য দূর করার জন্য বিশেষ প্রয়াস প্রয়োজন। আর এর জন্য কোন ছকবাধা পারিকল্পনা কোন ক্ষেত্রেই কার্যকরী হবে না। যে সকল অঞ্চল এখনো

অনগ্রসর, সে সকল স্থানের নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। এই চরিত্রকে অবিকৃত রেখে উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা ভাবতে হবে নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রকৃত অভাববোধ কোথায়, তাও যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করা আবশ্যিক, তেমনি সেই অভাববোধকে দূর করে স্থানীয় উন্নয়নের জন্য কি ধরনের পারিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, তাও বিশেষভাবে সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করা উচিত। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে কাজ করতে গেলে এসব ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা দেয়। তবু দেখতে হবে স্থানীয়ভাবে লভ্য সুযোগ-সুবিধা এবং উৎপাদনের প্রাপ্য উপকরণের ভিত্তিতে কোন পারিকল্পনা দ্রুত রূপায়িত হওয়া সম্ভব।

যদিও বাস্তবে এই মৌলিক প্রশ্নটি উপেক্ষিত, কিন্তু পারিকল্পনা কর্মশনের নথিপত্রে এ ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। চতুর্থ পারিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবে বলা হয়, "Balanced regional development and dispersal of economic activities are closely inter-related." অনুন্নত অর্থনীতিতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী অনেকাংশে লভ্য সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল—একথা যেমন সত্যি; তেমনি সত্যি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এর জন্য কিছুর কিছু প্রতিকূল পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রয়াস প্রয়োজন।

এই বহু বিতর্কিত প্রশ্ন নিয়ে পারিকল্পনা কর্মশনও আজ চিন্তিত। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে দু'টি স্টাডি গ্রুপ করা হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল, (১) অনুন্নত এলাকাগুলি চিহ্নিত করা, (২) বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কি পরিমাণ বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে, তা নির্ধারণ করা এবং (৩) জাতীয় গড় উন্নয়নের তুলনায় অনুন্নত অঞ্চলের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়, পারিকল্পনা কর্মশনের প্রাক্তন সচিব শ্রী বি. ডি. পান্ডের নেতৃত্বে প্রথম স্টাডি গ্রুপটি গঠিত হয়েছিল। শ্রীপান্ডের মূল বক্তব্য যদিও পরিশীলিত ছিল, কিন্তু তা ছিল সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি বর্ণোচ্চলেন, অনুন্নত রাজ্যের বিশেষ বিশেষ জেলায় শিল্পস্থাপন করতে। অবশ্য এটা প্রযোজ্য হবে শিল্পে অনগ্রসর রাজ্যের ক্ষেত্রে। তিনি অনগ্রসর অঞ্চলের কয়েকটি দৈনিকের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন, (১) মোট মাথাপিছু আয়, (২) খনি ও শিল্প থেকে মাথাপিছু আয়, (৩) রেজিস্ট্রার্ড কারখানায় মোট শ্রমিকের সংখ্যা, (৪) মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ এবং (৫) জনসংখ্যার অনুপাতে মোট পাকা রাস্তা ও রেলপথের দৈর্ঘ্য।

মধুমতী

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

আর কিছ্ তো এমন করে ভুলায় না আমার মন
যেমন ক্রুরে ভুলায় আত্মা
তোমার এই লাগণ-লজ্জিত তনু-দেহ!
অমৃত যদি কোথাও থাকে
তা আছে তোমার বদকে,
তোমার হৃদয়-কোরকের নিবিড় নিভৃত মধুপকে,
যার ভ্রমর আমি,
যে পদ্ম-বুকেটি আমি একান্ত করে পেয়েছি,
প্রত্যহর নর্ম-স্নানে যেখানে শুষ্ক হয়েছি আমার মন
নির্মল হয়েছে আমার কামনা
ভ্রুপ্ত হয়েছে আমার জীবন—
যার আনন্দস্পর্শে মায়াময় হয়েছে মরু-পৃথিবী
সংসার-সংগ্রামের ক্ষতচিহ্নেরা হয়েছে রক্তগোলাপ,
যে না থাকলে জীবনটা মনে হতো নিরর্থক
মৃত্যুটা বশ্য্য ঃ

তুমি ছিলে, তাই
বন্যায় ডুবে, মড়কে মরে, দর্ভিক্ষে উজাড় হয়েও
কালের সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েছি ভাঙা নৌকায়,
ছেঁড়া পাল উড়িয়েছি বুক ফুলিয়ে বিদ্রোহী রাতাসে,
ভাঙা হাল ধরেছি শক্ত মৃত্তিগে, তাল ঠুকে
যদি মরেও থাকি,
পেয়েছি অমৃতের আশীর্বাদ—

ভাগ্যের সর্বোত্তম সান্দ্রনা,
তুমি ছিলে পাশে,
ছিলে সহযোগিনী সেই দুর্লভ সহমরণে!
সব নিয়মে তাই সর্বস্বহরণ করতে পারে নি মৃত্যু

তুমি যেদিন থাকবে না,
বিষণ্ন ইতিহাসের অস্তরাগে
তোমার স্নেহছায়াটি যেদিন যাবে মিলিয়ে,
সেদিন বেঁচে থাকবে না জীবনের কোনো আনন্দ
অন্তিমের কোনো সান্দ্রনা,
স্বর্গের কোনো সম্ভাবনা।
সৃষ্টির অমৃত-কুম্ভ চিরকালের মত শুদ্য হয়ে যাবে।
লুপ্ত হয়ে যাবে
ফুল
পাখি
আর করিতা

বল তো তুমি কে?
তুমি কি বাংলাদেশের ছায়া-মালিনী মধুমতী?
তরঙ্গ-উৎপলা পদ্মা?
গৈরিক-মেখলা গঙ্গা?
ক্ষীণ-অধামা কালিন্দী?
না, তার মাটির মত নরম
শান্ত কোমল শ্যামাবধূ?

শ্রীপাণ্ডে প্রদত্ত বৈশিষ্ট্য অনুসারে
সাত ছটি রাজ্য অনগ্রসর বলে চিহ্নিত—
অঙ্গপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা
এবং রাজস্থান। অবশ্য এর সঙ্গে জম্মু
এবং কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড, গোয়া এবং
হিমালয় প্রদেশের নামও নুত্ন। যেহেতু
আর্থিক এসজ্ঞতির জন্য এর কটি রাজ্যের
সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, তাই তিনি
প্রস্তাব করেছেন প্রতিটি রাজ্য থেকে দুটি
করে জেলা এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে
একটি জেলা নির্দিষ্ট করা হোক। জেলা
নির্দিষ্টকরণের জন্যও তিনি কয়েকটি
মানদণ্ড উল্লেখ করেছেন। যেমন, (১) বড়
শহর বা বড় শিল্পাঞ্চল থেকে দূরে,
(২) উৎপাদনের উপকরণের তুলনায় জন-
সংখ্যার ঘনত্ব, (৩) কর্মসংস্থানের সুযোগ-
সুবিধা, (৪) স্বাধীপিত্ব আয় অনুযায়ী
দারিদ্র্য, (৫) বিদ্যুৎ বা জলবানী পাওয়ার
সুযোগ এবং (৬) যোগাযোগ ব্যবস্থার
বর্তমান পরিস্থিতি ইত্যাদি আগামী
দু'এক বছরে এর সম্ভাবনা। শ্রীপাণ্ডে
সরকারী উদ্যোগে শিল্প স্থাপনের ওপর
জোর দিয়েছেন। যদিও তিনি উদারহস্তে
নাইসেন্স দেওয়ার নীতিকেও অগ্রাহ্য
করেন নি।

শ্রীপাণ্ডের বক্তব্য এবং প্রস্তাব সম্পর্কে

যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। সরকারী
উদ্যোগে শিল্প স্থাপন করা যে সমস্যা
সমাধানের চাবিকাঠি নয়, তা আমরা
বিহার, মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গের
অভিজ্ঞতা থেকেই দেখেছি। শিল্পীমত,
বড় শহর বা শিল্পাঞ্চল যে সর্বাঙ্গীত
এলাকার সমীপস্থিত সহায়ক হয় না জাম-
সেদপুত্রই তার প্রমাণ। উড়িষ্যার কথাও
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও
মহারাষ্ট্রকে উন্নত রাজ্য বলে বলা হয়,
কিন্তু সে উন্নয়নের মধ্যভাগটি বৃহত্তর
বোম্বাইতেই সমীপস্থ, বাকী অঞ্চলের
অবস্থা বিহার বা উড়িষ্যার তুলনায় কিছু-
মাত্র ভাল নয়। আসল কথা, শ্রীপাণ্ডে
শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে আর্থনিক চিন্তাধারা
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই প্রাচীন উৎকরণ
ও সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে আর্থিক-
তার গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিল্পীমত 'স্ট্যাটি' গ্রুপটি গঠিত হয়ে-
ছিল প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীওয়াংচন্দ্র নেতৃত্বে।
তিনি সমস্যাটিকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে
বিশ্লেষণ করে কয়েকটি 'রাস্তারসম্মত'
পন্থা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে অনগ্রসর
রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট
রাজ্যই গ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার

প্রয়োজনীয় অর্থ ও অন্যান্য সহায়তা
দেবেন, যাতে রাজ্যগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ
ও অন্যান্য বর্তমান সুযোগ-সুবিধাকে
কাজে লাগাতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার
প্রথম শর্ত হবে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে
ভারসাম্য-রজার রাখা। যদি দেখা যায়,
কোন রাজ্যে সহজেই কৃষির উন্নয়ন সম্ভব,
তবে অথবা শিল্পের কথা না ভেবে কৃষির
উন্নয়নকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। গত
কুড়ি বছরে এই নীতি অনুসৃত হলে
বিহার, উড়িষ্যা বা অন্যান্য কৃষিপ্রধান
অঞ্চলকে নিয়ে এমন বিপন্ন অবস্থার সৃষ্টি
হত না। সেই সঙ্গে কৃষিভিত্তিক ক্ষেত্র
ও কুটিরশিল্প অনায়াসেই গড়ে উঠতে
পারত। কেবলমাত্র ভারী শিল্পের মোহ
আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে।

খোলা মান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সমগ্র
প্রশ্নটি বিবেচিত হওয়া উচিত। কারণ,
কোন একটা ওষুধেই যেমন সকল রোগের
চিকিৎসা হয় না, তেমন কোন একটা
অর্থনৈতিক উদ্বেগে সকল সমস্যার সমাধান
হতে পারে না।

—প্রবোধ চক্রবর্তী

দৃষ্টি পরিক্রমা

তুলকম দে মরকর

অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-সাধনা

মাশরা আজ একমাত্র বিজ্ঞানাচার্য নতেন বসু'র মূখ্য চেয়েই আছি। আজকে এই একটি মানুষ—যিনি বিরল বাঙালীর ঐতিহ্যানুসারী, যিনি সর্ব-স্তরে বাংলা ভাষাকে সঞ্চারিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে অন্তরকে উৎসর্গ করেছেন। বিজ্ঞানী মানুষ, বয়সের ভারে অবনত; অধিকাংশেরই শ্রম্ভাজন। কিন্তু তিনি তথাকথিত এজিটের নন, অগ্নিগর্ভ কৃত্তার যুবসমাজকে নাচিয়ে, মাতিয়ে তুলতে পারেন না; ঠিক কথা শুনে তক্ষণ একদল ইয়ংম্যান পোস্টার হাতে বোঁরিয়ে পড়বে, বাংলা ভাষার দাবীতে আকাশ কাঁপাবে ফাটবে—এমন জোরালো কৃত্তা তিনি দিতে পারেন না; কোন দলও গড়েন নি। ফলে, নিরলস, সচরাচর নীরব, এই বিজ্ঞানী কজের মানুষটি নিঃসঙ্গপ্রায়। আমরা যারা বাংলা ভাষার পক্ষে কেউ বললে বটে' যাই' তারা তবু ঠিকই দিকে তাকিয়ে আছি। কেন না, বাংলা ভাষার পক্ষে জোর করে বলবার মতো লোক আর স্বেতীয় নেই। মাতৃহীন লোঙর-হীন রাজনৈতিক দলগুলো তোষণবাদ ও সুবিধাবাদের ফলে দিশেহারা। ওদের ক্ষেমন বিকৃত ধারণা—পাকিস্তান বা আরব দেশের বিরুদ্ধে বললেও তা সাম্প্রদায়িকতা। তেমন নিবোধ ভাবনা যে, বাংলা, বাংলা ভাষার পক্ষে কিছু বলা মানেই প্রাদেশিকতা। অতিসংকীর্ণমণা পার্টিবাজেরা দলস্বার্থে (দেশ বা প্রদেশ স্বার্থে নয়) খুন-খারাবি অনৈতিক মনে করে না, আত্মসেবা অক্ষুর রেখে জনস্বার্থবিরোধী জনতার সৃষ্টি করে, মানুষের খাদ্যপ্রাণের

মতো যে-মাতৃভাষা, তার জন্য কোন দরদ তাদের নেই; তাদের অতীত কার্যক্রম তার অকাট্য প্রমাণ। শত দফার মধ্যে মাতৃভাষার দাবী একটানা-করবার দফা লোক-ঠকানো চাতুর্য মাত্র। এ সকল কিছুর উদ্দেশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন আচার্য বসু আমাদের একমাত্র অবলম্বন! তিনিই সাহস করে আমাদের ভরসা দিয়েছেন, সর্বস্তর বলতে বিজ্ঞানেও বাংলার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও বাংলা ভাষায় ব্যক্ত করা চলে এবং করাই উচিত, কেন না, মাতৃভাষার চাইতে উৎকৃষ্টতম শিক্ষার মাধ্যম আর কিছু হতে পারে না। কজের মানুষ—তাই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের মধ্য দিয়ে তিনি তা প্রমাণ করে চলেছেন। বিজ্ঞানী শব্দ তত্ত্ব সন্তুষ্ট হন না, তার ব্যবহারিক কার্য-কারিতায় তা প্রতিপন্ন করে থাকেন! আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলায় বিজ্ঞান আগাতত তাঁরই অনুপ্রাণিত।

প্রসঙ্গত তাঁর পূর্বসূরীদের মনে পড়ে! তাঁরাও একক ও নিঃসঙ্গ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অবিস্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এ চেষ্টা করেছেন, রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদী করেছেন, জগদানন্দ রায় করেছেন। আরও অতীতে বস্কিমচন্দ্র করেছেন। কিন্তু দেড়শ বছর আগে যে-মানুষটি এক আকস্মিক আবির্ভাবের মতো বাংলার বিজ্ঞানপ্রকাশে সচেতন হয়ে-ছিলেন, তাঁর নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। ইংরাজী গ্রন্থের সাহায্যে করেছেন এ কথা স্বীকৃত; কেন না, আমাদের ইংরাজী আমলে আধুনিক জাগরণে ইংরাজী ভাষা-সাহিত্যের দান অনস্বীকার্য; তার ভেতর দিয়েই আমরা পশ্চিমের স্কার

খোলা পেয়েছি। আমাদের সব রকমের শিক্ষাই এই খোলা স্কার দিয়ে এসেছে। এমন কি, আমাদের নিজস্ব যে সম্পদ, খাঁটি ভারতীয় দর্শন, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির নাগাল আমরা যে সবাই পেয়েছি, তাও এই স্কার উন্মুক্ত হওয়ায়। হয় পাশ্চাত্যের পশ্চিমতেরা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়েছেন, নতুবা তাঁদেরই আঘাতে আমরা ঘরের পানে তাকিয়েছি। নতুবা এ সম্পদ যক্ষরাজ-প্রকৃতির মৃষ্টিমেয় অন্ধ গৃহা-বাসী সমাজকর্তাদের কৃষ্ণিগত হয়ে থাকত এবং ক্রমে বিনষ্ট হয়ে যেত। যে আচার্য রজেন্দ্রনাথ শীল উত্তরকালে পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে তা জীর্ণ করে প্রাচ্য দর্শন-বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোকশিখা জ্বেলোঁছিলেন, তাঁর উদ্ভ-বও সম্ভব হত না; বশিষ্ঠের আদেশে বারে বারে রামচন্দ্রেরা শঙ্কুবধের গৌরব অর্জন করতেন।

সুতরাং, আমাদের নবাবিস্কৃত দর্শন-বিজ্ঞানের পাশাপাশি যারা সাহস করে পাশ্চাত্যবিজ্ঞানকে একেবারে বণ্ণ-ভাষায় উপস্থিত করতে উদ্যোগী হয়ে-ছিলেন, তাঁদের বাহাদুরি বলে শেষ করা যায় না! তাঁরা ছিলেন ঋষি, সত্য ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। আজও তাঁদের আরম্ভ রত উদ্‌যাপিত হয় নি, সে অপরাধ তাঁদের নয়, উত্তরপুরুষের—যে উত্তর-পুরুষের মানসিকতার বর্ণসাক্ষর্য এত প্রবল যে, কদাচিত্ত একটা খাঁটি বাঙালীর দেখা মেলে। মাইকেল-ডিরেজিও'র আমলেও এমন অবাঙালী বাঙালীর প্রাধান্য দেখা যায় নি।

তবু এই এক সন্মুখণ যে, চার-দিকে কালাপাহাড়ী আঘাতাতী কাম

শাণ্ডাহিক বঙ্গমতী

কলাপের মধ্যেও আমরা রামমোহনের বিশ্বশতবর্ষ ও বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের দেউশত জন্মবর্ষপূর্তি চিহ্নিত করার কথা ভাবছি। বিজাতীয় প্রবণতার মধ্যেও অন্তরালে বাঙালীর কোথায় যেন একটা অমর মহৎ প্রাণ আছে, যেটি কালে-ক্ষেণে উন্মোচিত হয়ে আমাদের বিস্মিত করে দেয়! অক্ষয় দত্তের স্মরণ্যোজ্ঞন এমনি এক বিস্ময়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম। বাংলা ভাষার প্রতি অপারিমেষ ভালবাসা আমরা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের প্রতি পদে উপলব্ধি করি। রামমোহনের কাছে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা বা কার্যকারিতার দিকটা প্রবলতর ছিল বলে সাহিত্য-সৌকর্য তেমন প্রকাশ পায় নি; কিন্তু কাজের ভাষা বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের ভাষার মধ্যে শিল্পকর্ম, রসোত্তীর্ণ সাহিত্যের অবলম্বন পাওয়া গেছে। কিন্তু এর ব্যবহারিক দিকটা অক্ষয়কুমার দত্তকে যেভাবে গ্রাস করেছিল, বোধ হয় আর কাউকে তেমনভাবে করতে পারে নি। অক্ষয়কুমার বাংলা সাহিত্যপাঠকে সরাসরি বৈজ্ঞানিক যুগে উপনীত করে দিয়েছেন। এবং এখানেই তাঁর স্বকীয়তা। সংস্কৃত শব্দের নিগড়কে তিনি বহু আশ্রয়ে বাংলা ভাষায় শিথিল করেছেন। এই ব্যাপারে অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর যেন পাল্লা দিয়ে চলেছেন! সহজবোধ্যতার দিক থেকে নিঃসন্দেহে জিত হয়েছে বিদ্যাসাগরেরই, কিন্তু অক্ষয়কুমার বিষয় নির্বাচনও করেছিলেন একান্ত অপরিজ্ঞাত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় শব্দসম্পদ অশেষ, কিন্তু তাকে বঙ্গজ করা সহজ ছিল না। সুতরাং “বিদেশী” বিষয় সংস্কৃতমুগ্ধ বঙ্গভাষায় প্রকাশ করার কাজ স্বভাবতই ছিল দুরূহ; তাই অক্ষয়কুমার দত্তের ভাষায় এত কাঠিন্য। পরবর্তীকালীন জগদানন্দ-রামেন্দুসুন্দরের স্বচ্ছলগতি ভাষা তিনি পান নি, বঙ্কিমী ভাষাও অন্যতর ছিল। এই কারণেই বা এই কারণেও অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক প্রয়াস চিরস্মরণীয় ঘটনা!

আজ থেকে ১২৯ বছর আগে তাঁর বাংলা “ভূগোল” বেরোয়।

তার ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন : “ইদানীং দেশহিতৈষি বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্বেগে স্থানে ২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পশ্চিভ্রমে বঙ্গ-ভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এ দেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যা-বৃদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এ ভাষায় এ

প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে, তদনুরূপে বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে এ অকণ্ঠন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে, এই মানস করিয়া চন্দ্রসুখালোভী উম্মাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহু ক্রেশে বহু ইংরাজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষা-যোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।”

অক্ষয়কুমার তখন ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত “তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষক।” বইটি—

“তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষদিগের অনুমোদনসারে তৎসভা শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্তৃক প্রস্তুত হইয়া তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে মন্ত্রাঙ্কিত হইল। কলিকাতা। শকাব্দা : ১৭৬৩।”

দুটি উদ্ধৃতিতেই লক্ষণীয় যে, লেখক সম্পূর্ণ ইংরাজীমুগ্ধ বাংলায় প্রকাশের জন্য যথেষ্ট আয়াস করেছেন। বলা বাহুল্য, এইরকম দৃঢ় প্রচেষ্টার ফলেই রা তারই গভীর আধুনিক বাংলা ভাষার জন্ম সম্ভব হয়েছে। যদি কেউ বলেন যে, সেকালের এই আয়াস ইংরাজী ভাষা ও ভাবমুগ্ধ ছিল না, তবে বলব, আধুনিক ভাষার অনেক ক্ষেত্রে তা বোশ করে প্রয়োজ্য। ইংরাজী চর্চা সৌদীনও ছিল, অভজও আছে; পার্থক্যের মধ্যে সেকালে সংস্কৃত ও ইংরাজীর সমন্বিত প্রভাব ছিল, এখন তা সংস্কৃতমুগ্ধ, কিন্তু ইংরাজী ভাষা দ্বারা বোশ প্রভাবিত। তখন বরং এ থেকে মুক্তি পাবার এবং বাংলাকে স্বকীয়তার প্রতিষ্ঠা করবার একটা সাধনা ছিল, এখন তা বহুলাংশে নিঃপ্রয়োজনও বটে, গ্রাহ্যও বিশেষ নেই। অনেক আধুনিক লেখকেরই লেখায় ইংরাজী গন্ধ ছাড়ে, বিশেষ যারা সংস্কৃত বা পূর্বসূরী বাংলা লেখকের বদলে ইংরাজী-ফরাসী-জার্মান লেখকদের উল্লেখই আত্মপ্রসাদ লাভ করে থাকেন। বাংলাভাষা-সাহিত্যের পরোক্ষামীর অন্তত এই অপরাধে অপরাধী নন। তবে অনবোধ যেখানে স্বীকৃত, সেখানে সর্বত্র বিমুগ্ধ স্বকীয়তা সম্ভব নয়। নির্ভরযোগ্য অনুবাদ, পরিভাষা-অভাবগ্রস্ত ভাষায় রূপান্তর কাঠিন্য ব্যাপার; কিন্তু সেখানে বিষয় ও পারিপার্শ্বিকতা সর্বভাষায় না হোক, প্রধানত অপরিচিত বা অপরিজ্ঞাত।

এ সাধনা মাতৃভাষার প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা না থাকলে হয় না। অক্ষয়কুমার দত্তের মধ্যে তার প্রাচুর্য পক্ষ্য না করে উপায় নেই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবোড়িয়া গ্রামে

স্থানান্তরিত হয়ে, সেই উপলক্ষে সেখানে যে সভা হয়, তাতে অক্ষয়কুমার বলেন :

“বঙ্গভাষা বিস্তার দ্বারা স্বজাতীয় ধর্ম রক্ষার নিমিত্ত যে এইরূপ পাঠশালা স্থাপন করা কিরূপ প্রয়োজনীয় এবং কি অসংখ্যক মঙ্গলদায়ক, তাহা কাহার না বিদিত হইতেছে? এইক্ষেণে যদিও কলিকাতা নগরস্থ এবং তাহার নিকটস্থ কতিপয় গ্রামবাসী অনেক যুবক ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তথাপি ইহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, যেহেতু ইংরাজি বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হইলেন, তবে কোন ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেন? এবং স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাব সত্ত্বে কোন ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক? আমরা আর কোন বিষয়ে আপনাদিগের প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। আমরা পরের শাসনের অধীন রহিতেছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অভ্যাসের সহ্য করিতেছি এবং খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের মেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তাহাতে শঙ্কা হয়, কি জানি পরের ধর্ম বা এদেশের জাতীয় ধর্ম হয়। অতএব এইক্ষেণে আমাদের সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, নতুবা আর কিংকাল গোণে ইংরাজদিগের সহিত আমাদের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেন না—তাহারদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাহারদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং ব্যস্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, হিন্দুনামে ঘাঁচিয়া আমাদের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই গুলল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষার বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ বৈশাখ রবিবারে এতৎ পাঠশালারূপে নব-কুমার প্রসব করিলেন।”—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১, আশ্বিন ১৭৬৫ শক, পৃষ্ঠা ১১-১২।

অক্ষয়কুমার দত্তের সকল রচনার মধ্যে এই প্রেরণাটিই সপ্টিমারিত। “রাজমোহনস ওয়াইফ”—এর লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, খৃষ্টধর্মাবলম্বী বিদ্রোহী কবি মাইকেল মধুসূদনের কথা মনে পড়ে।

তাদের প্রত্যাবর্তন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে তাদের সাধনালব্ধ ফল। অন্য সবই জন্মায়, মাতৃভাষাই কালজয়ী।

“হে বঙ্গ, ভাষাত্রে তব বিবধ রতন”
তখনো কিন্তু হয় নি। সবে রক্ত সংগ্রহ চলেছে এবং মধুসূদনও মাতৃকণ্ঠে রক্তহার দুলিয়ে দিয়েছিলেন। রক্ত আহরণে অক্ষয়কুমার এক বাঁশপট ভূমিকায় অবতারণা করেন না, তিনি মূল এই কথাটি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মাতৃভাষাই কেবল স্থায়ী কল্যাণ আনতে পারে, অন্য কোন ভাষা শিক্ষা ও চর্চা জল-রেখার মতো নিতান্তই ব্যবহারিক, প্রমুখ কাজের। আজ ইংরাজ শাসক, তাই রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী, তাদের খসী করতে, তাদের তাব্দেদারী চাকরী করতে, স্কুল-কলেজে পাশ করতে তা “প্রয়োজনের” জিনিস মাত্র; মনের নয়, অন্তরের যোগস্পর্শ তাতে নেই, মাতৃগৃহ ও স্কুলভবনে অথবা চাকুরী বাড়িতে যে ব্যবধান, এখানেও সেই ব্যবধান। মাতৃগৃহে মানুষ নিজেই ফিরে পায়। এবং এই ভাষাই যদি সর্বত্র সম্ভারিত থাকে, মাতৃগৃহ ও কর্মভবন ভাষায় একাকার হয়, মানুষ পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে; তার সমগ্র সত্তার পূর্ণ বিকাশ হয়।

তাই অক্ষয়কুমার দত্ত বলেছিলেন :
“তাহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হইলেন, তবে কোন্ ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেন?” ৯৯ বছর পর এদেশে ধর্মান্ত হইয়াছিল ভারত ছাড়ো, “কুইট ইন্ডিয়া”। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গেছে তারও পাঁচ বছর পর, ১৯৪৭-এ। বিকৃতবৃদ্ধি হিন্দী সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যাখ্যা করেছে—ইংরাজ ভারত ছাড়ো অর্থ ইংরাজী ভারত ছাড়ো এবং সেই শূন্য সিংহাসনে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সামন্ত-বিদ্রোহী কুনওয়ার সিং প্রমুখের বংশধরদের সিংহাসনে বসাত—ইংরাজী হঠাৎ, হিন্দী চাপাও। বাংলাদেশের মৌরজাফরী বংশধরেরা এতে অন্যায়সেই সামিল হয়ে বাংলা-বাঙালীর মূন্ডপাত করেছে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালী স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা বাংলা না পড়ে পাশ করার নম্বর টেনে নামাওয়ার জন্য বাংলার চাকা বন্ধ করেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড় কতৃপক্ষ এই সব বালখিলোড় ভয়ে মাথা নত করে; একদিকে ইংরাজী শিক্ষায় অরাজকতা এনেছেন, অপরদিকে বাংলাকে পক্ষাঘাত করে চলেছেন। চারিত্রিক দৃষ্টান্ত সর্বস্তরে বাংলাও চালাতে পারছেন না। অনমনীয় সংকল্পে ইংরাজীও বরবাদ করতে পারছেন না। অথচ মানুষকে বলীয়ান হলে তাঁরা জন্ডি-গাড়ি চালাতে পারতেন—যেমন তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) চালাচ্ছে। মাতৃভাষা ও ইংরাজী দুটোরই

বল্যা ধরতে পারলে, দুটোই টগবগিয়ে চলতে পারত এবং হিন্দীর রথ এসে থমকে দাঁড়াতে বঙ্গ-সীমানায়। এখন সে সীমানার চিহ্ন নেই, এখন বাংলারই পাট-চার টাকায় হিন্দীর হাইওয়ে প্রস্তুত হয়ে চলেছে—সম্মুখে ঝুলছে প্রলোভনের ক্যারট। কোটি কোটি টাকার ঘর। এই সব অব্যর্থচীন সেরদুন্দহীন শিক্ষা-কতৃপট উপলব্ধি করবে কি করে বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের তিল তিল সাধনার তিলোত্তমা-সৌন্দর্য? আজও এই ন্যাবারোগারী বখাই অধ্যাপক বিজ্ঞানী বসুকে লাঞ্চিত করে গোবর্ধের আনন্দলাভ করছে।

“ইংরাজ যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হইলেন, তবে...স্বদেশীয় ভাষায় গ্রন্থ এবং উপদেশকের অভাব সত্ত্বে কোন্ ব্যক্তি আর জ্ঞান অভ্যাস করিতে শক্ত হইবেক?” এই ভাবনায় অক্ষয়কুমারের অস্থির চিন্তা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চায় সমাহিত হয়েছিল; হাতে হেতেড়ে অবশ্য নয়, কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে যে বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে তা আত্মস্থ করার একমাত্র বৈজ্ঞানিক রূপান্তরিত সহজ উপায় যে মাতৃভাষা সেই মর্মাণলব্ধি। অক্ষয়কুমার সেই রত গ্রহণ করেছিলেন বলেই আজ দেড়শত বছর পরও তাঁর নাম ও দান অক্ষয় হয়ে আছে। আশা নিশ্চয়ই করব, ক্রমান্বয়ে তাঁর চেয়ে জ্ঞানীগুণী বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধতর করতে থাকবেন। কিন্তু পথিকৃৎ

হিসেবে তার যে স্থান তার ভূমিকায় কে করতে পারবে? দেড়শ বছর পরেও যিনি স্মরণীয়, তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন না, এমন অকৃতজ্ঞ পৃথিবী আমি কল্পনা করতে পারিনে।

অভিজাত বংশে যার জন্ম এবং মা যার দয়াময়ী, তাঁকে মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী ভাষাও শিখতে হয়েছে কলিগুণে। সংস্কৃত ও ইংরাজীও তাঁকে পড়তে হয়েছে। কিন্তু যেখানে যত দূরেই যান, যা আনবার্য, তাকে যতই আয়ত্ত করুন না, মায়ের নাড়ীর যোগটি (আমবাহীলিকাল বড়) কখনো বিচ্ছিন্ন হয় নি। মাতৃ-আজ্ঞাতেই ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই স্কুল-পড়া ছেড়ে দিয়ে অর্থোপার্জনে মন দিতে হয়। তাঁর উনিশ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হওয়ায় গতানুগত্য ছিল না।

কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা অভাব মানে না। মায়ের বেলায় যেমন, মাতৃভাষার বেলায়ও তেমন সম্পর্ক কখনো ছিন্ন হয় নি। পিতৃ-সুত্রেই ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং “বাংলা ভাষানুশীলনী সভা”য় উপস্থিত থাকতে থাকতে ঈশ্বর গুপ্তের স্নেহাকর্ষণ লাভ করেন। তাঁরা “নীতি-তরঙ্গিণী” সভারও সভ্য ছিলেন।

জনশ্রুতি এবং বহুলাংশে তথ্য-সমর্থিতও বটে যে, সাহিত্যিকদেরই অঙ্কুরোদ্গম হয় কবিতা-রচনায় যে

বেকার সমস্যার সমাধান ?

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে গৃহীত উৎপাদন বা পোলিট্রি ফ্যাক্টরি অথবা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলিট্রি ফ্যাক্টরি ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রায়েজ পোড়িগ্রী পোলিট্রি ফ্যাক্টরীর অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এক, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিব

আধুনিক পোলিট্রি ফ্যাক্টরি

মূল্য মাত্র চার টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

স্বাতন্ত্র্য-হেতু আমি সাহিত্যিক হতে পারি নি), অক্ষয়কুমারের সাহিত্যজীবনেও তা সত্য। সৈদিক থেকে নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখিত “অক্ষয়-চরিত”-এর নিচের উদ্ভূতিটি চারী কৌতুক ও কৌতুহলোদ্দীপক।

“ইনি মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন পদ! না গদ্যে কিসে লোকের বেশি উপকার দান্যবনা? একদা এবশ্বিধ চিন্তাক্রমে প্রবৃত্ত দিবসের পর ইনি পড়াকর যন্ত্রালায়ে গদ্য মহাশয়ের নিকট গমন করেন। কি অনুরক্ত বটনা! তাঁহার লক্ষ্যকারী সৈদিক উপস্থিত না থাকতে তিনি উত্থানে সন্নিবিষ্ট ইংলিশম্যান পত্রিকা হইতে কয়েকখণ্ড অনুবাদ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। অক্ষয়বাবু বলিলেন, ‘আমি লিখিতে পারি না, যেহেতু আমি কখনও গদ্য লিখি নাই।’ এই কথা শুনিয়া সম্পাদক মহাশয় উত্তর করিলেন, ‘আমার বিশ্বাস তুমি পারিবে, নচেৎ বলিতাম না।’ কি করেন, লিখিলেন। লেখাটি এরূপ উত্তম হইল যে, তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, ‘যে ব্যক্তি বহু দিবসাবধি এই কার্য করিয়া আসিতেছেন, তিনি এমত সুন্দর লিখিতে পারেন না।’

অনুরক্ত বটনাই বটে! “যে ওজস্বিনী গদ্য রচনার দত্ত মহোদয় অখিল বঙ্গদেশকে বিমোহিত করেন, এই সেই গদ্য রচনার সুত্রপাত।”

কেবল তাই তো নয়। এ লক্ষ্য পদ্য-গদ্যের প্রশ্ন নয়। অক্ষয়কুমার যে বিষয় নির্বাচন করিয়াছিলেন, তা আজও বাংলা সাহিত্যের দ্বন্দ্ব বিবল সাধন হয়ে আছে। বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় চর্চা অতি প্রয়োজন; কিন্তু অতি দুর্গম। উপরন্তু পরিভাষার অভাবে সত্ত্বেও অক্ষয়কুমার এই দুর্গম পথই বেছে নির্বাচিত ছিলেন।

তিনি অন্য বিষয়ে লেখেন নি তা নয়, কিন্তু মধ্য কীর্তি বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ১ম ভাগ ১৮৫১; ২য় ভাগ, ১৮৫৩; চারুপাঠ (১৮৫৩-৫৯), পদার্থবিদ্যা (১৮৫৬)।

প্রকৃতির মধ্যে মানুষ, প্রকৃতির আবিষ্কার অংশ মানুষ; আবার প্রকৃতির ঘাইরে, প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ। সব জীবের মধ্যেই এই আন্তর্জাল্যের বিবর্তন চলছে; মানুষের সঙ্গে অপর জীবের পার্থক্য—যোধির অতিরিক্ত বুদ্ধি ইন্সটিংক্টের অতিরিক্ত রিফ্লেক্স এবং তাৎ

বড় স্মৃতির অতিরিক্ত লিপি। এই লিপিই জীব হিসেবে মানুষের বিবর্তনে বিপ্লব ঘটিয়েছে, যে লিপিবদ্ধ বস্তুই বর্জিত সাহায্যে কারিগরি উন্নতি এমন পথ দিয়ে পৌঁছেছে, যেখানে শত্রু-বীজাণু থেকে ম্যামথ সংহার করে আত্মরক্ষা করা গেছে, একদিকে ধ্বংসের বোমা আর একদিকে চাঁদে পা দেবার সৃষ্টিশীল মেধা পেয়েছে।

অক্ষয়কুমার দত্তের বইখানি নিঃসন্দেহে অত্যাধুনিক অগ্রসর নয়। ও’ট “শ্রীমত জর্জ কুম্ব সাহেব-প্রণীত ‘কান্টারিটিউশন অব ম্যান’ বইয়ের সার সংকলন। কিন্তু “ইংরেজি পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসংগত ও উপকারজনক, কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে, তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সংগত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে।”

এ বড় সামান্য কথা নয়, সহজ কথা নয়। লক্ষ্য করোঁ, পাঠ্যপুস্তক হবার প্রত্যাশায় যাঁরা বিজ্ঞানের নীতি (যথা মনস্তত্ত্ব কি রাষ্ট্র নীতি কি পদার্থ-রসায়ন শাস্ত্র) লেখেন, তাঁরা বিষয়টি জীর্ণ বা আত্মস্থ না করে অজীর্ণাবস্থায় বিদেশী উদাহরণ উগরে দেন; ভাবেন না, উদ্ভিষ্ট শিক্ষার্থীর চিত্ত এগুলো কতটা স্পর্শ করবে। ১৯ বছর আগে অক্ষয়কুমার যে কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং প্রয়োগ করে-ছিলেন, একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের তা পারেন না। এ যে লজ্জার কথা, এ তাঁরা মানবেন না, তর্ক করে দেখিছি, কিন্তু এ যে বাংলা ভাষার প্রতি গমতার অভাবের কথা, তাঁদের অযোগ্যতা-কথা, তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ হলেও, তা তো না বলে পারেন। শতবর্ষ আগে কোন মাতৃভাষায় প্রমাণশীল বাঙালী লেখকের পক্ষে যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, আজ তা অনেক সহজ। “ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে” তিনি এ বই লিখেছেন। এর পেছনে অর্থকরী তাগিদ নয়, একটা অশ্রদ্ধ প্রেরণাও রয়েছে, মধনাও রয়েছে। সে-সাধনার ফল দিয়েছেন কয়েকটি পরিভাষার উদ্ভাবনে : মেসমর-তত্ত্ব (Mesmerism); রসায়ন (Chemistry); শারীরবিদ্যা (Physio-

logy); শারীরস্থান (Anatomy); ক্ষিপ্তনিবাস (Lunatic Asylum); পদার্থবিদ্যা (Natural Philosophy); মনোবিজ্ঞান (Mental Philosophy); রূপ পদার্থ (Elements); লোকসামান্য-বিদ্যা (Political Economy); হস্তবিবেক (Phrenology)।

তার “চারুপাঠ”-এর তিনভাগ, ১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯-এ প্রকাশিত এবং নানা ইংরেজি-হইতে সংকলিত, ইহা বলা যায় না। আশ্চর্য যে, বইগুলো দেখলেও “সচিত্র”। চারুপাঠ, প্রথমভাগের ৩১শ সংস্করণের প্রচ্ছদপটটি এইভাবে ওপর-নীচে সাজানো: Entertaining Lessons in Science and Literature Part I By Ukkhoy—Coomar Dutt Thirty-first Edition. চারুপাঠ, প্রথমভাগ শ্রীঅক্ষয়-কুমার দত্ত প্রণীত একাংক বার সন্নিবৃত Calcutta The New Sanskrit Press 1876 Printed by G. C. Day 14, Goabagan Street, Calcutta.

চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করা এই বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আছে—আন্তঃকর্মে, সিন্ধুঘোটক, বীবর, জলপ্রপাত, পৃথিবীর আকার, পদার্থভূজ, পৃথিবীর পরিমাণ, বৃক্ষতাদি উৎপত্তির নিয়ম, উষ্ণ প্রস্রবণ, দীপমাক্ষিকা, পৃথিবীর গতি, বন্যমন্দ্র, শারীরিক স্বাস্থ্যবিদ্যা, জলস্রোত, পরিমাণ ইত্যাদি।

“বাস্পীয় রথারোহীদিগের প্রতি উপদেশ” (১৮৫৫) এবং “পদার্থবিদ্যা” (১৮৫৬) দুটি বইও লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। “পদার্থবিদ্যা” যে অনুবাদ, তা বইটিতেই মস্তকণ্ঠে স্বীকৃত। এতে লজ্জা নেই।

লজ্জা আমাদের — উত্তরপুরুষের। অক্ষয়কুমার দত্তের প্রারম্ভিক কর্ম বিলুপ্ত হতে চলেছে; অনাদৃত তো বটেই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ যে ক’খানি বই আছে তা “দুঃপ্রাপ্য” বলে চিহ্নিত এবং হস্ত করা হয় না। বসে পড়বার মত অবস্থাও ওদের নেই। এগুলো আবার ছেপে প্রচার ও সম্বল সংরক্ষণের ব্যবস্থা আমরা করি নি এবং ১২৯।৩০ বছর আগে তিনি যা রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, আমরা তাঁর উত্তরপুরুষেরা তার কতটুকু বা কতখানি উদ্‌যাপন করেছি? তাই তো সত্যেন বসুর চিরায়ত কামনা করেছি।

স্কুল অফ ট্রিগিক্যাল মেডিসিনের কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগের ভূমিকা ও অবদান

পরোজেন্দ্রমোহন ঘোষ

দেহকে ব্যাধিমানদের সঙ্গে যে মনীষী তুলনা করেছেন, তাঁর উক্তিঃ মধ্যে আতি-শয়া নিশ্চয়ই নেই। নীরোগ শরীর নিয়ে ক'জন লোকান্তরিত হয়েছেন, সে তথ্য কেউ জানেন বলে মনে হয় না। অতএব নিঃসংকেচে বলা চলে শরীরের আস্তিত্ব থাকলেই রোগের অস্তিত্ব থাকাও খুবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ব্যাধি আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা আজ আমরা চোখের সামনে অহরহ দেখতে পাচ্ছি। এদের মধ্যে প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ করে কয়েকটি ব্যাধি আবার বেশ খানিকটা মারাত্মক, যদিও নিরাময়যোগ্য। যেমন ফক্ষ্মা, ভি-ডি, কুষ্ঠ ইত্যাদি। এই ব্যাধি-গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশত আমাদের জন্ম-সাধারণের একটি বৃহৎ অংশ ব্যাধি আক্রান্ত অবস্থায় আত্মগোপন করে থাকতে চান। পরিণতিতে তাই তাঁরা নিজের এবং সমাজের প্রভূত অকল্যাণের সূত্র হন। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে—জগৎ যখন প্রগতির চরম শিখরে উপনীত, সেই মুহূর্তে আমরা ভারতবাসীরা আজও স্বাস্থ্য-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে পারছি না, এটা মোটেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। আলোচনা প্রসঙ্গে কুষ্ঠ ব্যাধি সম্বন্ধে স্কুল অফ ট্রিগিক্যাল মেডিসিনের কুষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্রের ভূমিকা ও অবদানের কথা উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না। প্রারম্ভে কুষ্ঠ ব্যাধি সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক পর্যায়ে চর্মরোগ সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা অতিমাত্রায় সীমিত। চুলকানি, দাদ, ঘা ইত্যাদি বিষয়ে অবশ্য অনেকেই ওয়াকিববহাল এবং এই ধরনের অসুখের চিকিৎসা পদ্ধতিও অনেকের জানা আছে। তাই সাধারণত চর্ম-রোগ সম্বন্ধে প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণ বিশেষ বাস্তব হন না। ফলে অনেক সময় তাঁদেরকে ভুলের মশগুল যোগাতে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হতে হয়।

সেইজন্য প্রথমেই মনে রাখা কৰ্তব্য যে, চর্মের কোনো অস্বাভাবিক শরীরে দেখা দিলেই, কোনো চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। আজকাল হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। একটু কষ্ট স্বীকার করে যে-কোনো চর্ম-রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ

গ্রহণ করতে পারেন এবং সেইমতো চিকিৎসার ব্যবস্থা করলে, সে চর্মরোগ যদি কুষ্ঠও হয়, তবে অনায়াসে নিরাময় করা সম্ভব হয়।

কুষ্ঠ ব্যাধিকে সাধারণত দু'টি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়—(ক) সংক্রামক, (খ) অসংক্রামক। সংক্রামক কুষ্ঠ ব্যাধি প্রাথমিক অবস্থায় সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য। সাধারণত চামড়ার উপর যে দাগ প্রকাশ পায়, সেগুলি কিছুটা উজ্জ্বল ও তৈলাক্ত, কিন্তু সুদূরালোকে দাগগুলিকে তামাটে মনে হয়।

সংক্রামক কুষ্ঠ প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসাধীনে না আনলে, বেশ কয়েক বছর পর তার ঝক পড়বে ও উজ্জ্বল হয়। কান ফুলে উঠে ও নাকের ভগা বসে যায়। আশ্বাসের কথা এই যে, এই ধরনের সংক্রামক কুষ্ঠ মাত্র ২০ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই পর্যায়ের রোগীরাই সাধারণত রোগ সংক্রমণের হাতিয়ার হয়। খাবার বা জল বা দূষিত হওয়া এই ব্যাধি বিস্তারের সহায়ক হয় না। এই রোগের সূচীকাল [Incubation period] দীর্ঘদিন হওয়ায় [প্রায় ৩০ দিন থেকে ৩০ বৎসর গড় ২/৫ বছর] অনেকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথে এদের সংস্পর্শে আসে এবং রোগাক্রান্ত হয়।

অসংক্রামক কুষ্ঠ ব্যাধির ক্ষেত্রে ঝকের উপর হালকা, মসৃণ বা রক্তিম দাগ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হস্ত-পদের স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্পর্শানুভূতি লোপ পায়। এটা খুবই সান্দ্রনার বিষয় যে, প্রায় আশী ভাগ ক্ষেত্রে কুষ্ঠ ব্যাধি অসংক্রামক পর্যায়ের অর্থাৎ ছোঁয়াচে নয়। এদের সংস্পর্শে রোগ সংক্রমণ হয় না, সেইজন্য এদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশাও নিষিদ্ধ নয়।

সমাজে এখনো একটা ভুল ধারণা আছে যে, কুষ্ঠ ব্যাধি পাপেরই ফল, তাই নিরাময় হওয়াও সম্ভব নয় এবং কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সমাজে অপাংক্তেয়। এই সব বাজে ধারণা বন্ধমূল থাকায়, অনেক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিজের ব্যাধি গোপন রাখেন। এইজন্য ভাবী জীবনে তাঁদেরকে অশেষ দুর্গতির মধ্যে কালটিপাত করতে হয়। শত্রু তাই-ই নয়, রোগ ছোঁয়াচে হয়ে সমাজের ক্ষতি সাধন করে থাকে। আজকাল এই ব্যাধি নিরাময়কল্পে

দেশব্যাপী চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অজ্ঞতাবশত আজও জনসাধারণের অনেকে রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসাকেন্দ্রের সুযোগ গ্রহণে বাণ্ডত। তাই নব্বায়ে প্রয়োজন সামাজিক জীবনের অহেতুক ভীতি দূরীকরণের দ্বারা বলিষ্ঠ মনোভাব গ্রহণ করা। প্রত্যেকের জানা উচিত—কুষ্ঠ ব্যাধি অভিশাপ বা পাপের ফল নয়, অন্যান্য সব ব্যাধির মতো এই ব্যাধিও জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং যথা-রীতি চিকিৎসার সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরাময়ও হয়ে থাকে।

কুষ্ঠ ব্যাধি গবেষণা ও নিরাময়ের ভূমিকাতে স্কুল অফ ট্রিগিক্যাল মেডিসিনের "কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগের" অবদান উল্লেখ-যোগ্য। বিভিন্ন ব্যাধি বিষয়ক নিরলস গবেষণা যেখানে চালিত হয়, সেই স্কুল অফ ট্রিগিক্যাল মেডিসিনের হাততাস গৌরবান্বিত করতে যারা সহায়ক হয়ে-ছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধে কিছুটা বিবর্তিত নিশ্চয়ই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। এই প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য পুরোপুরি চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে মেডিকেল রিসার্চ ও পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচিং-এর উপর নির্ভরশীল একথা অনস্বীকার্য। তৎকালীন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল ১৯১৪ খৃঃ যে প্রাতি-ষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, সেই প্রতিষ্ঠান ছিল প্রাচ্যের একমাত্র গবেষণা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে যে মনীষীর অবদান আবিষ্কারগণ্য, যার অক্লান্ত পরিশ্রম সাধকতায় রূপান্তরিত হয়েছিলো, সেই স্যার লিওনার্ড রোজার্স-এর কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। প্রথম ডিরেক্টর হিসাবে মেজর জেনারেল জন মেগাও কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন সে ১৯২২ খৃঃ।

বর্তমানে ডিরেক্টর পদে ডাঃ জে. বি. চ্যাটার্জী যোগ্য মর্যাদায় অর্পিত রয়েছেন। ষোলটি বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও অন্যান্য কার্যাদি এখানে হয়ে থাকে। তার মধ্যে কুষ্ঠ গবেষণাকেন্দ্রের ভূমিকা অন্যতম। স্যার লিওনার্ড রোজার্স-এর দূরদর্শিতা ও উৎসাহে এবং ইন্ডিয়ান কার্ডিসিয়াল অফ ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রোসিস বিলিফ এ্যাসোসিয়েশন—BELRA-এর অধিনা ইন্ডিয়ান লেপ্রোসিস এ্যাসোসিয়েশন। কর্তৃক ১৯২১ খৃঃ পৃথিবীর প্রথম কুষ্ঠ

দায়াবিক বঙ্গমতী

গবেষণা বিভাগটি এই প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ সমর্থন জন্য আর্থপ্রকাশ করছে। ডাঃ মুর তখন ছিলেন বিভাগটির ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এই বিভাগটির আর্থিক সাহায্যকল্পে তখন অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন Indian Leprosy Assn., Hind Kusth Nivaran Sangha—H. K. N. S., School এর Endowment Fund, Indian Research Fund Assn.—[অধুনা I.C.M.F.R.]। বর্তমানে অবশ্য ১৯৬২ খৃঃ থেকে শুধুমাত্র Endowment Fund ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে পরিচালিত হয়।

কুষ্ঠ সম্বন্ধে বিভিন্ন পর্ষায়ে এবং বিভিন্নভাবে বিভাগটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে। শিক্ষণ কর্মসূচীতে শুধুমাত্র ভারতীয় শিক্ষার্থীই নয়, পাঠ্যবীর অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরাও অংশ গ্রহণ করেন এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত স্কুলের অন্যান্য পাঠ্য বিষয়েও এই বিভাগটি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

কুষ্ঠ ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণার এই বিভাগ চিকিৎসা জগতে অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশনের দ্বারা তার যথাযথ কৌলীনা বড়ায় রাখছে। সংক্ষেপে কার্যবিবরণী বিস্তৃত করা অপসংগত হবে না বলেই মনে হয়।

(ক) জীবাণু সম্বন্ধীয়ঃ—

(১) সন্দেহজনক কুষ্ঠ ব্যাধি সনাক্তকরণের ব্যাপারে এই বিভাগই ঘনীভূত পদ্ধতি [Method of Concentration] প্রয়োগ করার উপায় উদ্ভাবনে কৃতকার্য হতে পেরেছে। (২) ইলেকট্রন এবং পর্যায়ক্রমিক আণবীয়ক্ষণিক বিশ্লেষণে এই জীবাণুর [Mycology] গঠন-তত্ত্ব, ক্রমবৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধির বিবরণ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়েছে। (৩) সালফোন চিকিৎসায় কোষসমন্বয়ের কিঞ্জার উপর কুষ্ঠজীবাণুর সাইটোপ্রাক্সমের রূপান্তর ও কুষ্ঠের সাইটো-রাসায়নিক জীবাণুর বিশ্লেষণ সম্পর্কে তথ্য জানা গেছে। (৪) বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কুষ্ঠ-জীবাণুর বংশ বিস্তারকল্পে অবিচ্ছিন্ন চেষ্টা চালানো হচ্ছে। যেমন ব্যাঙ অথবা উক-শোণিতবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর পরীক্ষা ফলপ্রসূ না হলেও মানুষের কুষ্ঠ-জীবাণু পরীক্ষামূলকভাবে নিরিয়ান হ্যাসমটার [রোডেনশিয়া বর্গের উক-শোণিত তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী] অথবা সংকর জাতীয় কালো ইন্দুরের উপর প্রয়োগে কার্যকরী ফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কটিজন দ্বারা চিকিৎসাধীন বানরদেহে এই জীবাণু অন্তর্প্রবেশ করানোর পর উক্ত প্রাণীর ললাটে কুষ্ঠ ব্যাধির লক্ষণ সনাক্ত করা

সম্ভব হয়েছে। (৫) বিশেষজ্ঞগণ পরেব্যাক-গারে নিরলসভাবে নানান প্রকার রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লিষ্টজনিত পরিবেশে এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই জীবাণুর বংশবৃদ্ধির অন্তর্কালে এখন পর্যন্ত কোনো গুরুবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় নি। ফলে এই ব্যাধির জন্য আশংক্যপূর্ণ ঔষধ আবিষ্কার করা এখনো সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।

(খ) প্রতিরোধকল্পঃ—

এই কেন্দ্র থেকেই ক্রোরোফর্ম ও ইথারের সহযোগে কুষ্ঠজীবাণুর রাসায়নিক ভগ্নাংশীকরণের ফলে “পারিশুদ্ধ লেপ্রোসিন” প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। ফলে কুষ্ঠ ব্যাধির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎসাহরাজক ফলও দৃষ্ট হয়েছে।

কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত গ্রামাঞ্চলে, রোগের সূচনার বা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির স্পর্শাক্রান্ত মানবদেহের উপর লেপ্রোসিন প্রয়োগে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে সহজে পোষণযোগ্য মাইকোব্যাকটেরিয়ার এন্টিজেন থেকে “লেপ্রোসিন” অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এটি পারিশুদ্ধ লেপ্রোসিনের ন্যায় কার্যকরী হবে বলে অনুমান করা যায়।

(গ) চিকিৎসা ও ব্যাধিনিদান তত্ত্বঃ—

দীর্ঘকালীন গবেষণার এই ব্যাধির প্রকারভেদ ও প্রাণীবিশেষ স্পেকট্রামের বিশেষ করে ম্যাকিউলো এনেস্বেটিক ও পলি-নিউরটিকের অবস্থান সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। কুষ্ঠ ব্যাধি নির্ধারণে স্ফীত-স্নায়ুর উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রকার কুষ্ঠ রোগের গঠনতত্ত্ব ও রাসায়নিক লক্ষণসমূহ পুরোপুরিভাবে পর্যবেক্ষণ করাও সম্ভব হয়েছে। সংস্পর্শের দ্বারা কুষ্ঠ ব্যাধির সূচনা কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

(ঘ) নিরাময়েঃ—

কুষ্ঠ ব্যাধি চিকিৎসার চালমগেরা তৈল ব্যবহারের আমল থেকেই উক্ত তৈলের রাসায়নিক গুণ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা এখানেই হয়। উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই তৈল দ্বারা কিভাবে এর মূল উপাদানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে হাইড্রোকোর্টিসনিক এ্যান্টিসিড থেকে সোডিয়াম লবণ নিষ্কাশিত করার পর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরায় ব্যবহারোপযোগী করা যায়, তার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সালফোন ঔষধসমন্বয়ের ব্যবহারিক মাত্রা নির্ধারণ এই বিভাগই গবেষণার সাহায্য করতে পেরেছে। বর্তমানে প্রচলিত নিম্নমাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগবিধি নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়েছে এই বিভাগটির কল্যাণেই। ডি, ডি, এস, রজনরশ্মি এস-

এন্ড সমিপ্রণে রোগগ্রস্ত টিমাডে শোষণ, নিঃসরণ ও ঘনীভূতকরণ বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে। অনুসন্ধান জানা গেছে Hb এবং RBC-এর মানের অবনতি ঘটানোর জন্য চিকিৎসার প্রাথমিক পর্ষায় থেকে লোহা ও ইস্ট [Yeast] ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘকাল যাবৎ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিম্নবর্ণিত এই ঔষধগুলি ব্যবহারেও কার্যকরী ফল পাওয়া গেছেঃ—Dihydrocarpyl—D.D.S., Thiosemicarbazone, D.P.T., Hydroxy D.D.S., Diaminodiphenyl—Sulphide, Long acting Sulphonamids [Lederkyn-Orisul Fanacil, Madibon] Avlosulphone ইত্যাদি।

পায়ের পুরনো ক্ষত চিকিৎসার ব্যাপারেও গবেষণা এই বিভাগ থেকে করা হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত স্নায়ুর সংকোচন ও স্থানচ্যুতির অস্ত্রোপচার এবং চক্ষুর উপরেও বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রোপচার অব্যাহত আছে।

(ঙ) আঞ্চলিক সংক্রমণ সম্পর্কেঃ—

কুষ্ঠ ব্যাধির আঞ্চলিক সংক্রমণ সম্বন্ধেও সমীক্ষা এবং গবেষণা চালানো হচ্ছে। সংক্রামক কুষ্ঠের তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ১৯৩৫ খৃঃ পশ্চিম বাংলার বাকুড়ায় একটি গ্রাম্য অনুসন্ধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ-কয় বৎসর যাবৎ নানান ধরনের মূল্যবান তথ্যও সংগৃহীত হয়েছে। সম্প্রতি আঞ্চলিক কুষ্ঠ সংক্রমণ রোগকল্পে বি. সি. জি. টীকার মান নির্ণয়ের জন্য বিস্তৃত গবেষণা চলছে। কুষ্ঠ প্রতিরোধে সালফোনের ভূমিকা নির্ণয়ের জন্যও বর্তমানে চেষ্টা চলছে। এই দুটির যেকোনটির প্রচেষ্টা সফল হলে অদূর ভবিষ্যতে অল্প সময়ে কুষ্ঠ ব্যাধি নিমূল করা কষ্টসাধ্য হবে না।

এই কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগটির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক একজন দীর্ঘদিনের কুশলী বিশেষজ্ঞ। তাঁর সঙ্গে আছেন সহযোগী হিসারে, রীডার, ভেকচারার, ডেমনস্ট্রেটর, প্যাথলজিস্ট এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের ফর্মি-বন্দ। এঁরা প্রত্যেকেই কুষ্ঠ ব্যাধি চিকিৎসা গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপককে সাহায্য করে থাকেন।

উক্ত চিকিৎসকগণ ব্যতীত দুজন সমাজ কল্যাণ সংগঠক [একজন পুরুষ ও একজন মহিলা] আছেন। এঁরা রোগীর এবং অন্যান্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকেন। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে রোগীর চিকিৎসা গ্রহণ রিখি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শ [শেষাংশ ৬১২ পৃষ্ঠায়]



হরিণঘাটার দূধে কয়লায় ফোক

নেহা সরকারী প্রকল্প। গয়লার ঘরের দূধ হলে পেমেন্ট নিয়ে কবেই হাঙ্গামা শুরুর হয়ে যেত। গয়লার গলায় গামছা দিয়ে চোখের অপবাদে শাস্তির ব্যবস্থা করলেও সেটা হতে পারত ক্রেতা-বিক্রেতার নিজস্ব বচসা। কিন্তু হরিণঘাটার দূধ নিয়ে এসব করার ফলশ্রুতি সকলেই জানেন সাম্প্রতিক। সেটা হবে সরাসরি সরকারী যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অথচ ব্যাপারটার মধ্যে চারিত্রিক তফাৎ এইটুকুই যে, এখানেও সম্পর্ক ক্রেতা ও বিক্রেতারই, তবে বিক্রেতা স্বয়ং সরকার এবং ক্রেতা দূর্বল জনসাধারণ। যাদের সরকারী যথেষ্টাচারের বিরুদ্ধে কোনও কোর্ট অব আপীল নেই।

গয়লার দূধের টাকা চেপে দিয়ে গয়লাকে শাসানো যায়; হরিণঘাটা দূধের বদলে সাধা জল সরবরাহ করলে, দ্বাদশ দূধ সরবরাহ বন্ধ রাখলে অথবা এখন যা নিত্যই চালু বিজনেস হয়ে দাঁড়িয়েছে সেইমত দ্বাদশ অন্তর প্রতি হাপ লিটার দূধে এক পঞ্চমাংশ কম দূধ দিলেও বলবার কিছু নেই। এবং কেউ কিছু প্রকৃতপক্ষে বলছেনও না। কেনই বা বলবেন, আর কী করাই বা বলবেন। দূধের টাকা হরিণঘাটা দূধ প্রকল্প মাসের প্রথম আগাম গুণে নেয়। আগাম নেয় বলেই এমন কোনো গ্যারান্টি সে সাধারণ ক্রেতাকে দেয় না যে, দূধ আসল ও খাঁটি হবে এবং মাপেও তা সঠিক পরিমাণে ক্রেতার পাবে। যদি ক্রেতা সাধারণের মনে এমন ধারণাই বৃদ্ধিমান থাকত যে, দাম দিয়ে দূধ কেনার দরুন তিনি রোজদিন সঠিক মাপই পাবেন, তবে টের আগেই হুজুং হয়ে যেত পাড়ায় পাড়ায়।

সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে হরিণঘাটা দূধ প্রকল্পের ওপর তাঁরা এতোটা বিশ্বাস কোনোদিনই ন্যস্ত করে রাখেন নি। তাই দেখা যায়, একই ক্রেতা চার বোতল (সিল্ড বোতল) দূধ নিলে তিনি সে দূধ চার রকম মাপে পান। কোনো বোতল কাগা পর্যন্ত। কোনোটা গলায়

প্রথম গাট অবাধ। কোনোটা তারও নিচে। কোনোটার বা শিশির ছিঁপতে ছিদ্র থাকায় সে দূধ চলকানো ওপছানো অবস্থায়। শহর কলকাতার শিল্প ক্রেতাদের এ নিয়ে কেউ অবশ্য কখনো অভিযোগ করতে শোনেন নি। হরিণঘাটা দূধ প্রকল্পও তাই যথেষ্টভাবে দূধের বোতল কম বেশি ভর্তি করে জিজ্ঞাস্যানে তুলে দিয়েছে। জানি না, শর্ট সাপ্লাইজনিত দূধের ফালতু নাফা সরকারী খাতায় জমা পড়েছে, নাকি কারো কারো বিশেষ পকেটের ক্ষীতির কারণ ঘটিয়েছে। এবং যেহেতু দেশে এইভাবে বিশিষ্ট পকেট পূর্তির অলিখিত ব্যবস্থা বহুক্ষেত্রেই চালু আছে ও সেজন্য সাধারণের মনঃপীড়া থাকলেও ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা নেই, সেজন্য পরিমাপে কারচুপির এই চালু প্রথাটি নিয়ে কখনো কারও প্রশ্ন উদ্ভূত হয়ে ওঠে নি। দিনের পর দিন মানুষ হরিণঘাটার যথেষ্টাচারী মাপ অস্বাভাবিক বদলে খোলাবন্দী করে বাড়ি ফিরছে।

কিন্তু দ্বাদশ বোতলে, একদিন 'ক্যানে', (সেব 'ক্যান' সীল্ড থাকে কিনা তা-ও পরীক্ষা করা কোনো ডিপোতেই কারও পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না), এই প্রথা চালু হওয়ার পর মানুষের মনে কম পরিমাণ দূধের জন্যই শব্দ বিক্ষোভ নয়, খোলা দূধের জন্যও রীতিমত দাঁড়চলতার সৃষ্টি হয়েছে।

একথা বললে অন্যায় হবে না যে, আমরা যেদেশে বাস করি সেদেশ অস্বাভাবিক বদলে শিশুখাদ্য চুরি তো বটেই, সে খাদ্যে বিষও মেশাতে পিছপাও নয়। খোলা দূধ নিয়ে তাই সাধারণ মানুষের মনে আশঙ্কা জেগেছে। খোলা দূধ 'সমাজ সচেতন সমাজসেবী' ভেজাল-কারীদের হাতে যে চর্ব-চর্ব ভেজাল হয়ে এক-একদিন শহরের এক এক প্রান্তে ভরাবহ অবস্থার সৃষ্টি করবে না, এমন গ্যারান্টিই বা কোন্ সরকারী বেসরকারী প্রকল্প দিতে পারে আজ? আগে যখন সীল্ড বোতলই পশ্চিমবঙ্গে পাটাপাটের অভিজোগে ধরা পড়েছে; তখন ক্যানের দূধ রাস্তায় হোক, ডিপোয় হোক কিম্বা আসল দূধ পূর্তির জায়গায় হোক, ভেজাল মিশ্রিত হয়ে কি

পারগাম ভরাবহ হয়ে উঠতেই পারে না? হরিণঘাটা দূধ প্রকল্পের কোন্ দায়িত্বশীল অফিসার জোর গলায় বলবেন, না, তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই!

যদি মেনেও নেই, না, এমন সাধু দেশে কি এমন বদ কাজ কেউ করতে পারেন। ওসব হলে তো একদিনেই পঞ্জীকে পঞ্জী অ্যান্ডুলেন্সে চড়ে বসবে। যাঃ, তাও কি হয়! (কিন্তু কথাটা ভাববার বটে!)

বেশ তো, সাধু দেশে তা না-ই হল। কিন্তু খোলা দূধ যে নিয়মিতভাবে পরিমাপে কম হচ্ছে তার কোন্ জবাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দেন?

ডিপোয় অভিযোগ করলে বিক্রেতা বোনেরা হতাশভাবে বলেন, কী করব বলুন, এই তো মাপ। দেখুন, এই মাপে বোতল ভরে না।

বাস্তবিক, বোতল ভরে না।

আবার এক আধাদিন ডিপোয় পাটাতনে উপছানো দূধ দেখিয়ে বলা হল, কতটা দূধ আজ পড়ে গেছে। বস্তৃত এমনভাবে দূধ পড়ে গেলে সে দূধ ক্রেতার হাড়া আর কে দেবেন?

আমার এলাকার ডিপোয় দ্বাদশে একদিন খোলা দূধের সঙ্গে কিছু পরিমাণ বন্ধ বোতলও আসে। বোনেরা কিন্তু সে বোতল খাঁশিমত বিশেষ কয়েকজন ক্রেতার মধ্যেই নিয়মিতভাবে বিলি করে বলেন, ওঁদের তো ক্যাসের দূধ দেওয়া হল।

কে তর্ক করে মশায়! অথচ দেখতে পাচ্ছি, 'ক্যাসের দূধ' চোখের ওপর কার্ডে টিক মেরে বিলি হচ্ছে। কিন্তু এই মিথ্যাচারের কথা বলতেও লজ্জা করে। ভাবি, দোষটা ওঁদের, না আমাদেরই? হরিণঘাটার ক্রেতার যে ব্যবস্থা শুরুর করেছেন তাতে ওঁদেরও এই উনিশ-বিশের হিসেবের পাপচক্রে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ওঁরাও ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ পেয়ে দ্বাদশ মনোবাহ্য প্ররণ করে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন এতে ছেলেমেয়ে আর তফাৎ কি। অসাধু ব্যবস্থার আওতায় আমরা প্রত্যেকেই অসাধু হতে বাধ্য। ওঁদের অসাধুতা এই যে, ওঁরা বিশেষ ব্যক্তি তোষণ করছেন, যদিও জনসাধারণ প্রত্যেকেই হরিণঘাটার 'ন্যায্য' মূল্যের সমান অধিকারী খন্দে। কিন্তু ক্রেতাদের, (ইচ্ছাকৃত অথবা অনিচ্ছাকৃত, জানি না) প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ক্রেতাদের ক্ষেত্রে অসমান ব্যবহার প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করছেন এই স্বল্প বয়সী মেয়েরা। যাঁরা জাতির ভবিষ্যৎ জন্মদাত্রী, তাঁরা অসত্যতার চক্রবর্তনে নষ্ট হচ্ছেন।

এলাকার ইন্সপেক্টরকে প্রশ্ন করে জানলাম, বোতলের কাগা পর্যন্তই (শিশির ঢাকা পর্যন্ত) নাকি আসল

দাণ্ডাহিক কস্মতী

মেজার'। যদি তাই হয়, তবে প্রতিদিন হাজার হাজার বোতলে ঢের কম পরিমাণ দুধের সাপ্লাই দেওয়ার দরুণ যে পরিমাণ দুধ উৎপত্ত হচ্ছে তার হিসেব কি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন? এই উৎপত্ত কোন খাতে কার ঘরে জমা পড়ছে? ঐ উৎপত্ত জমা করার জন্য সাধারণ মানুষ পুরো দাগ মাসের প্রথমে ডিপোয় ডিপোয় জমাই বা দেবেন কেন? এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজর দেওয়ার নিজস্ব দায়িত্ব কি নেই?

সাধারণের তরফে আওয়াজ না উঠলে এদেশে সরকারী ব্যবস্থার গরমিলগুলি নজর করার জন্য কি কেউ থাকেন না?

মোটাইনৈর প্রশাসকরা কি স্বেচ্ছামাত্র চালানে চোখ রেখেই যথাকর্তব্য পালন করেছেন বলে মনে করেন এবং সগর্বে সরকারী আমলার ইজ্জৎ দাবি করেন?

হরিণঘাটার দুধে কমতির বোঁক, খোলা দুধের সর্বনাশা পরিণতির আশংকা এবং দুধ নিয়ে এই প্রহসনই আজ শহরের সবচেয়ে জ্বলন্ত প্রশ্ন।

এ প্রশ্ন (আশ্চর্যের বিষয়) কেউ উত্থাপন করেন নি বলেই কি কর্তারা এই অবস্থায় নির্বিকার?

পশ্চিমবঙ্গে আজ সর্বশক্তিমান পুরুষ শ্রীযুত বি বি ঘোষ মহোদয়। তিনি কঠোর হাতে অস্বচ্ছলিত করলেই নাকি সব গরমিল যথার্থ হয়ে যায়। হরিণঘাটা দুধের প্রহসনটা হরিণঘাটার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বন্ধ করবেন বলে আদৌ মনে হয় না। কারণ সে সিদ্ধি তাঁদের থাকলে আজ বহুকাল অপেক্ষার পর, তাঁদের সন্নিবিষ্ট এবং সচেতনতার পথ চেয়ে বসে থাকার পর, এমন একটি প্রবন্ধ ফাঁদে হত না আমাদের। তাই পশ্চিমবঙ্গের সর্বশক্তিমান বি বি ঘোষ মহোদয়ের দৃষ্টিতেই দুধ নিয়ে গোঁজামিলের ব্যাপারটা উত্থাপিত করছি।

তিনি ব্যস্ত মানুষ হলেও, জনগণের সুবিধা অসুবিধা কষ্ট ইত্যাদির প্রতি তাঁর যে প্রখর দৃষ্টি আছে তা তাঁর প্রশাসনিক তৎপরতার দ্বারা বেশ মালুম হচ্ছে।

আশ্ব করতে পারি কি যে, যে খাদ্য শিশুর প্রধান খাদ্য, সেই দুধ নিয়ে গয়লাপুলড গোঁজামিলের ব্যাপারটা যাতে সঠে সঠেই বন্ধ হয়, সেদিকে তিনি সহস্র দৃষ্টি দেবেন। কারণ জনস্বার্থের সঠে সংশ্লিষ্ট এমন একটি ব্যাপার যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ জব-হেলার যোগ্য নয়, নিশ্চয়ই সেকথা বি বি ঘোষের মতো যোগ্য প্রশাসককে দুঃখিয়ে বলতে হয় না।

তিনিই তো রাজ্যপালের প্রধান

উপদেষ্টা। এবং আজ রাজ্যপালেরই শাসনের আওতায় দুর্বল জনসাধারণ সন্নিবিষ্ট প্রত্যক্ষ। তা তিনিই শহরের এই দুধ সমস্যার একটা তাত্ক্ষণিক (ইমিডিয়েট) বিচার করে দেন না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, বোঝাই যাচ্ছে, জেগে ঘুমুচ্ছেন। তাঁদের ঘুমের ব্যাঘাত করতে চাই না। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সজাগ মানুষটির কাছেই তাই আশ্রয় আবেদন, একটা অঘটন ঘটান আগে তিনি দৃঢ় হস্তে দুধ নিয়ে নিত্যদিনের এই অসুচার প্রতিকার করুন, অনেক দৃষ্টিচ্যুত হা (ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে) নিশ্চিন্ত হতে পারেন তাহলে।

—মিট্রেন

স্কুল অফ ট্রীপক্যাল মেডিসিন

[৬.১০ পন্টার শেখাংশ]

দেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমেও ব্যাধি সম্পর্কিত বিষয়ে রোগীদের পালনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ সমাজকল্যাণ সংগঠকরা দিচ্ছে থাকেন।

এ ছাড়া এই বিভাগে আভিজ্ঞ ল্যাবরেটরি এ্যাসিস্ট্যান্টরা রয়েছেন, যাঁরা চিকিৎসা ও গবেষণার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য চিকিৎসকদের করে থাকেন। কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যক্ষমতা প্রদানের জন্য অঙ্গ-সম্ভারণ ব্যায়ামের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ফিজিওথেরাপিস্ট। অণ্ডল থেকে কুষ্ঠ রোগীদের সনাক্তকরণ এবং বহির্বিভাগে তাঁদের উপস্থিত করানোর দায়িত্ব একজন ফিল্ড ওয়াকারের—সমাজকল্যাণ সংগঠকরাও এতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

নতুন রোগীদের চিকিৎসাকল্প এই বিভাগটি প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার খোলা থাকে। বাইরের কোনো চিকিৎসক কর্তৃক প্রেরিত হয়ে অথবা রোগী নিজে উক্ত দিনগুলিতে সকাল ৮টার মধ্যে নিজেদের নাম-ধাম পরীক্ষা করানোর জন্য লেখাতে পারেন। রোগীদের পরীক্ষার ব্যাপারে ভিডিও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। উপস্থিত চিকিৎসা প্রাথমিক পর্যায়ে একবার পরীক্ষা করার পর তাঁদের অভিমত নির্দিষ্ট কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। তারপর রোগীদের দেহ থেকে নিঃসৃত পদার্থ যেটা রোগীদের স্বক থেকে নেওয়া হয়, সেটা গবেষণা কেন্দ্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে উদ্ভিন্নরূপে পরীক্ষার মাধ্যমে রোগজীবাণু আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। এইসব ব্যবস্থা শেষে অধ্যাপক নিজে সহযোগীদের সঙ্গে শেষবার পরীক্ষা করে রোগ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বভাবতই এই কারণে রোগীদের বেশ খানিকটা সময় প্রায় ৩/৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করার

প্রয়োজন হয়। অবশ্য উপস্থিত রোগীদের অবসর সময়ে সমাজকল্যাণ সংগঠকরা ব্যাধিবিষয়ক বক্তৃতা বহির্বিভাগে দিচ্ছে থাকেন।

রোগীদের ব্যাধি সনাক্তকরণের পর তাঁদের নিজস্ব বাসস্থানের নিকটবর্তী কোনো নির্দিষ্ট কুষ্ঠ চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়ে থাকে এবং অনেকে এই কেন্দ্রেও রাখা হয়। রোগীরা সেই সেই কেন্দ্র থেকে ঔষধ সংগ্রহ করেন এবং বাড়িতে অবস্থান করেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারেন। উক্ত দুই দিবস ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য ৪ দিন গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের নিজস্ব পুরনো গোণীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।

এ ছাড়া বিভিন্ন চিকিৎসা-শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত ক্লাসও নিয়ে থাকেন।

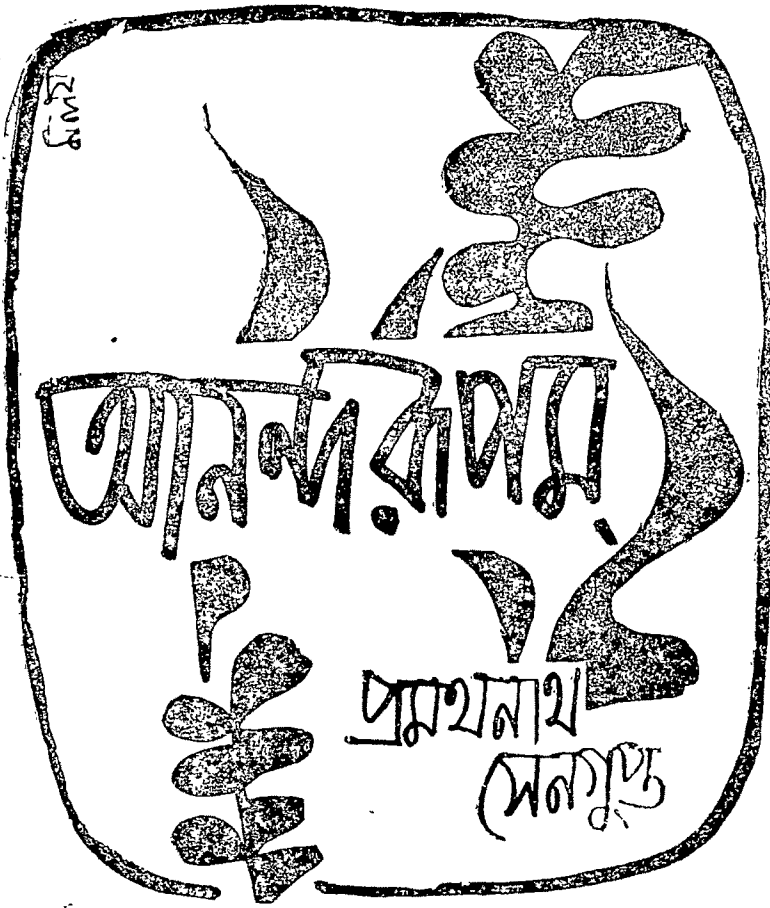
সেইজন্য কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগের অবদান নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য।

এখানে যন্ত্রসহকারে রোগীর পরীক্ষা-পত্র দেওয়া, পরীক্ষা করা এবং রোগীর ব্যক্তিগত সুবিধে-অসুবিধে দেখা হয়ে থাকে। যেসব ব্যক্তি আজো লক্ষণজন্মিত কারণে অথবা মিথ্যা লোকভয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করতে বিরত আছেন, তাঁদের এ সব অকারণ ভীতি মন থেকে দূর করে অবশ্যই চিকিৎসাধীনে আসা উচিত।

এই ব্যাধি নিরাময়ের জন্য কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয়। প্রায় ২ থেকে ৫ বছর নিরাময়ের জন্য সময় নেয়। রোগীরা অনেক সময় ভুল করে চিকিৎসার অমধ্য সাময়িক বিবর্তি দিয়ে থাকেন। এটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কিছুদিন ঔষধ ব্যবহারের পর স্বকের দাগ অস্পষ্ট হলে অনেকে মনে করেন ঔষধ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। এই ধারণা যে কতখানি মারাত্মক, সেটা পরেই বোঝা যায়। এ সব রোগী পরবর্তী সময়ে যখন চিকিৎসাকেন্দ্রে আসেন, তখন তাঁদের অবস্থা আরো ভয়াবহ আকার নেয়।

এই বিভাগে রোগীর সংখ্যা ক্রম-বৃদ্ধির পথে। ধারণা হয়, আধুনিক চিকিৎসা সম্বন্ধে জনমনে একটা ব্যাধির ভাব এসেছে। কারণ, গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কুষ্ঠ ব্যাধি জীবাণু দ্বারাই অন্যান্য অনেক ব্যাধির মতো সৃষ্ট হয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় করাও সম্ভব—এটা কোনো অভিশাপ বা কুস্ত-পাপের ফল নয়।

স্কুল অফ ট্রীপক্যাল মেডিসিনের কুষ্ঠ গবেষণা বিভাগ যে সেবা নবোব্ধি নিয়ে রোগীদের পরিচর্যা ব্যাপ্ত রয়েছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যাধি সম্পর্কে আরো অনেক সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবে বলে ধারণা করা যায়।



১ পূর্ব-প্রকাশিতের পর।

(১০)

‘বিশ্ব-পরিচয়ের’ শেষ অধ্যায় লিখে দিয়ে এলাম গুরুদেবের হাতে। এটা সংশোধিত হয়ে ফিরে এলে তৈরি করতে হবে নতুন করে সমগ্র পাণ্ডুলিপি সন্দর নির্ভুলভাবে লিখে, তারপর তা তুলে দিতে হবে গুরুর হাতে, আলমোড়া যাবার আগে,— এই হলো গুরুদেবের নির্দেশ। গুরুর দিনই শেষ অধ্যায় সংশোধিত হয়ে ফিরে এলো,— এর শেষাংশ এখানে তুলে দিলাম এই জন্য যে, কোনো বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এরূপ অপূর্ব সন্দর উপসংহার আর কোথাও আছে বলে তো জানি না—

গুরুদেবের লেখা

তথ্য সংগ্রহ ও যুক্তি প্রয়োগ করে বিশ্ব-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও স্থিতি সম্বন্ধে মানুষ্য এ পর্যন্ত যা অনুমান করেছে একরকম করে বলা শেষ হলো।

আকাশব্যাপী জ্বলন্ত বাষ্প সংহত হয়েছে নীহারিকায়, নীহারিকা আবও সংহত হয়েছে নক্ষত্রে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে ধাক্কা লেগে ভেঙে-চুরে গিয়ে উৎপন্ন হয়েছে সূর্য ও পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ। অনেক কোটি বছর লেগেছে পৃথিবীর ভৌতিক পদার্থের

নিরন্তর ও প্রচণ্ড সংঘাতে সংঘর্ষে জনে মনে বিভক্ত তার বর্তমান কালের গড়ে উঠতে। পৃথিবীর এই বিপুল জড়বস্তু রাজ্যে কখন অতি ক্ষুদ্র আকার নিয়ে দেখা দিল প্রাণ ও মন। পৃথিবীর সৃষ্টি-ইতিহাসে এদের আবির্ভাব তড়ানবীর, কেন না জড়প্রকৃতির সঙ্গে এর কোনো এক্ষণে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সকল কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন একান্ত আকস্মিক কিছুর অভ্যুত্থাতকে আমাদের মন মানতে চায় না। আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনো-বিশ্বের মূলগত এক্য অনুমান করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা ভ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেককাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে যে সকল প্রচ্ছন্ন আকারে নিভাই জ্যোতির ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আকারে নিভাই জ্যোতি ক্রিয়া চলছে। সেই জ্যোতিরই নানা ছন্দ ভেদে নানা কঠিন, তরল ও বাষ্পীয় বস্তু নানা রূপ ধরতে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরো সূক্ষ্মতর বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে, চৈতন্য তারই মূর্তপ্রকাশ। সম্পূর্ণ মূর্তি এখনো কোথাও হয় নি। জড় থেকে জীব

একে একে তার পদা উঠে মানুষের মধ্যে এখনো তার আবির্ভাব নোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মূর্তির অভিব্যক্তিই সৃষ্টির শেষ লক্ষ্য।

আমার লেখা

আমার যা বলার ছিল তা প্রায় শেষ হয়েছে; জ্বলন্ত এক বাষ্প নিয়ে আরম্ভ হয়েছিল সৃষ্টি, তা থেকে এসেছিল নীহারিকা, নীহারিকা আবার তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ভেঙে পড়েছিল নক্ষত্রের আকারে। কোটি কোটি বছর আগে এক দৃশ্যসম্ভব ঘটনা ঘটেছিল—প্রচণ্ড এক নক্ষত্রের খুব কাছে ভেসে এসেছিল আমাদের সূর্য; এই নক্ষত্রের প্রবল টানে সূর্যের কিছু ভেঙে সৃষ্টি হয়েছিল এই গ্রহ ও অন্যের গ্রহের দল, আমাদের পৃথিবী তাদের মধ্যে একটি। প্রথমে ছিল পৃথিবী জ্বলন্ত বাষ্পের আকারে, তারপর আস্তে আস্তে তেজ ছড়িয়ে দিয়ে জন্মে হলো তরল, তারপর হলো কঠিন; জলীয় বাষ্প জন্মে তখন সমুদ্র ও নদীর করল সৃষ্টি। তারপর এল সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস, পৃথিবীতে প্রাণের প্রকাশ। এই প্রাণের তিনটি ধারা সৃষ্টির প্রথম থেকে চলে এসেছে—গাছপালা, পাখী ও জন্তুজানোয়ার; এত কালের এত পরি-বর্তনের ভিতর দিয়েও এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য রেখে এসেছে। সৃষ্টির মূলে রয়েছে তেজ, বিশ্ব সৃষ্টির কাল থেকে তেজে পূর্ণ জ্যোতিষক ছাড়া আর কোথাও কিছু ছিল না। বাইরে থেকে কোনো শক্তি এসে এ প্রাণের সৃষ্টি করে নি, এ তেজেরই কোন রূপ। তেজের কত যে বিভিন্ন রূপ আছে তা আজও সম্পূর্ণ জানা যায় নি, আমরা যা দেখতে পাই বা অনুভব করি, তা হচ্ছে আলো, উত্তাপ ও বিদ্যুৎ এসব। মানুষের দেখা ও অনুভব করার বাইরে তেজের অনেক সূক্ষ্ম রূপান্তর থাকতে পারে, যাকে বলতে পারি চৈতন্য। তেজ থেকেই প্রথম সৃষ্টি জড় পদার্থের, যাদের প্রাণ বা চৈতন্য কোনোটাই নেই, তারপর গাছপালা, যাদের প্রাণ আছে চৈতন্য নেই, সব শেষে সৃষ্টি হয়েছে জীব, যাদের প্রাণ ও চৈতন্য দুই-ই আছে। বাইরে থেকে যাদের ভিতর তেজের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না, সেসব জড় পদার্থ তেজেরই রূপান্তর, একথা আগে কেউ জানতে চাইতেন না। এই জড় পদার্থের ভিতরই আছে বিদ্যুৎ কাণিকা, যাদের নাম Proton, Electron ও Positron—এ সত্য আজ পণ্ডিতদের পরীক্ষার স্থির হয়ে গেছে। গ্রহের দল যেমন সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, electronও তেমনি proton-এর চারদিকে ঘুরছে; জড় পদার্থের ভিতর সঞ্চিত আছে অসীম তেজ, একথাই আজ বিজ্ঞান প্রচার করছে। যে electronকে একদিন বিদ্যুৎ কাণিকা বলে সবাই বলেছেন, তাকেই আবার

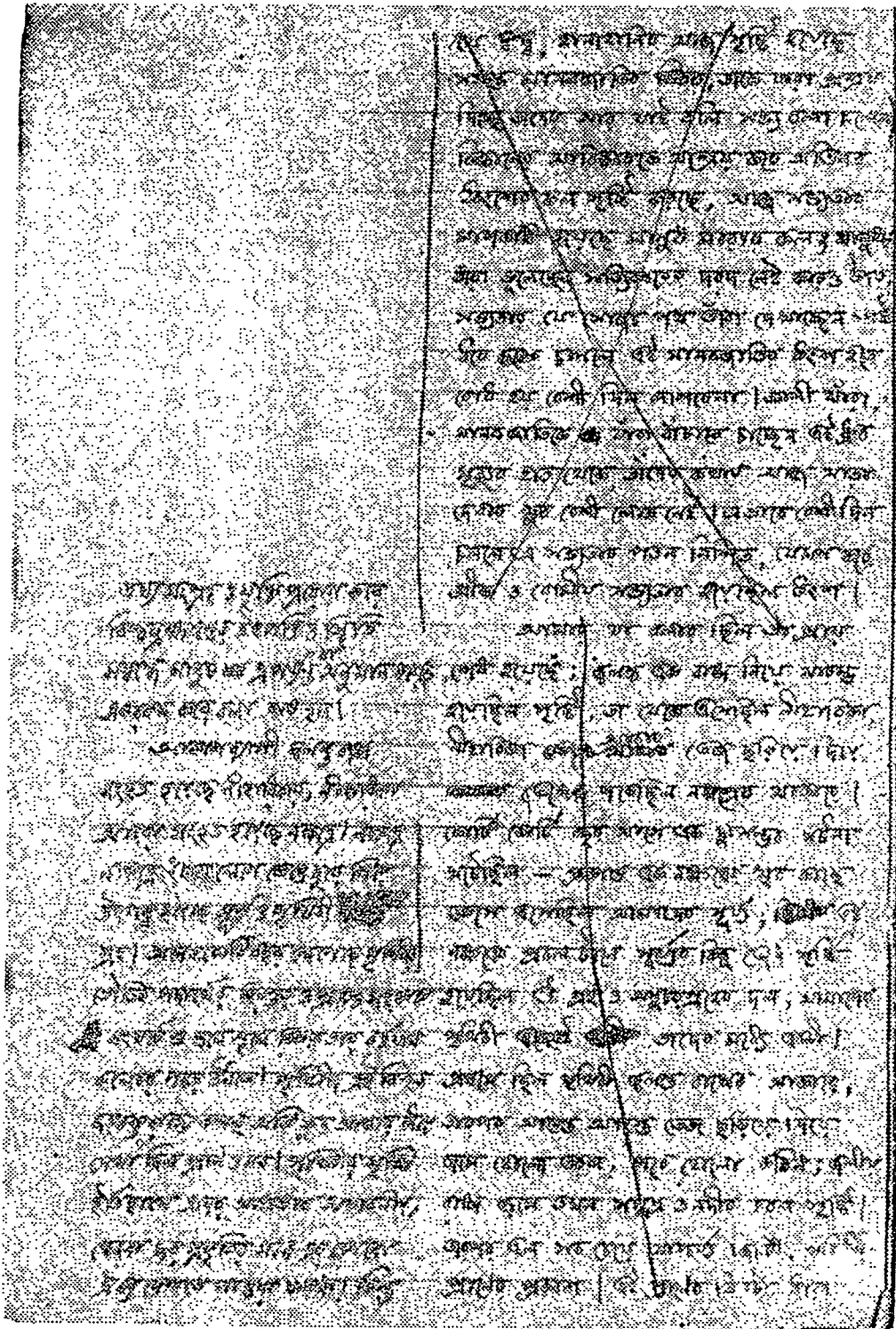
সাম্প্রতিক বসুমতী

ডায়ের সমাবেশ যলে প্রমাণ করেছেন
পাণ্ডিতরা। Proton থেকে আরও ছোট
বিদ্যুৎকণা বের করা হয়েছে, নাম তার
Positron, হয়তো এরাও ডায়েরই
সমাবেশ। যা বলছি একেই শেষ কথা
বলে মেনে নিও না; বিশ্ব সৃষ্টির গভীর

রহস্য খুঁজে বের করার পথে এরা
আমাদের সামান্য পাথের, মানুষ যতই
চলবে এগিয়ে, নতনের সঙ্গে হবে তার
পরিচয়, জানার শেষ নেই, তাই শেষ কথা
বলা চলে না।

গুরুদেবের আলমোড়া যাবার আগের

দিন অপরাহ্নে বিশ্ব-পাণ্ডিতের সম্মেলন
পাণ্ডালিপি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে
এই ছিল তাঁর নির্দেশ। পাণ্ডালিপি তৈরি
করে গুরুদেবকে দিয়ে আসব বলে বাড়ি
থেকে বের হতেই দীর্ঘ উষ্টর সেন দরজার
সামনে। বললেন, "আপনার মইয়ের



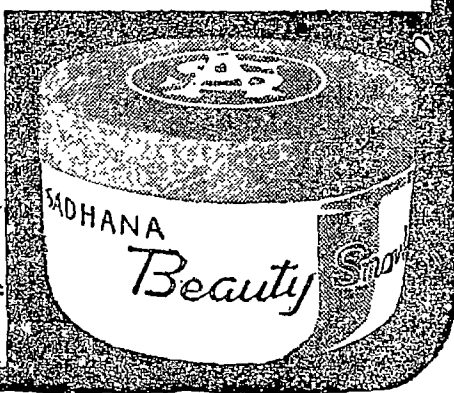


সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্নর্শে
সৌন্দর্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

স্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যমুক্ত
করো। মুখত্রে লালিত্যের ও
তারুণ্যের ল্লাভ ফুটে ওঠে।



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

১৯৬২/৬৩

খ্যানাস্ক্রিপ্ট' নিয়ে গুরুদেবের কাছে
আছেন ধর্ম, আমাকে ডেকেছেন, চলুন
আমি একসঙ্গেই হাই।" খবরই আগ্রহের
সঙ্গে গুরুদেব পাণ্ডুলিপিটা গ্রহণ
করলেন, বললেন যে, আলমোড়ায় নিভূতে
যে সে ভাষার দিকটা আরো মাজাঘষা করার
লময় পাবেন। ডক্টর সেন হঠাৎ ও'কে
বললেন, "বিশ্ব-পরিচয়" নিয়ে আপনি যে
পরিচয় করেছেন, তাতে বইটার যুক্ত-
গ্রন্থকার হওয়া উচিত—রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ-
নাথ।" গুরুদেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন,
"সে কীবে, বইটার বিষয়বস্তু রচনার কাজ
তো প্রমথই করেছে, আমি শব্দ ভাষার
দিকটা দেখে দিয়েছি। গ্রন্থকার তো প্রমথ-
নাথ হওয়াই উচিত, তবে আমার নাম
এর সঙ্গে যদি প্রমথ যুক্ত করতে
চায় তাহলে প্রমথনাথ-রবীন্দ্রনাথ হওয়াই
ঠিক হবে।" তারপর পাণ্ডুলিপি নিয়ে
কিছুক্ষণ আলোচনা করলেন, শিক্ষায়তনের
ব্যাপারে কিছু নির্দেশও দিলেন ডক্টর
সেনকে। ওখান থেকে বাইরে বেরিয়ে
এসে ডক্টর সেন বললেন যে, সম্ভব হলে
ঐ গ্রন্থের ছুটির মধ্যেই যেন 'পৃথ্বী-
পরিচয়' বইটা আমি শেষ করি। ও'র
কথা বলার ধরন থেকে মনে হলো 'বিশ্ব-
পরিচয়' বইটার লেখকের নাম নিয়ে
কোথায় যেন একটা সংশয় জেগেছে, অবশ্য
এই ব্যাপারে ও'কে খোলাখুলি কিছু
জিজ্ঞেস করাও সংগত নয়।

এর কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনে
গ্রীষ্মাবকাশের ছুটি হলো। চলে এলাম
আমতলায় আমার সেই অগ্রদূতের ওখানে।
পৃথ্বী-পরিচয় যাতে খুব জড়াজড়ি
শেষ করতে পারি, তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট
হলাম। জন মাসে (যতদূর মনে পড়ে)
আলমোড়া থেকে গুরুদেবের লেখা এক-
খানা কার্ড পেলাম, "বিশ্ব-পরিচয়" থেকে
আমার কলম এখনও ছুটি পায় নি। তুমি
পৃথ্বী-পরিচয় লেখা গুরুদেব করে দাও,
এছাড়া সর্ব গণের মতো সব কিছু বলে
যেও—পৃথিবীর সৃষ্টি ইতিহাস, ভূপৃষ্ঠের
ক্রমপরিবর্তন, গাছপালা, জীবজন্তু ও
মানুষের আবির্ভাব।" এর কয়েকদিন
পরেই শুনলাম খবরের কাগজে নাকি বের
হয়েছে — আলমোড়ার সংবাদদাতা
জানাচ্ছেন, রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব-পরিচয়' নামে
একখানা বিজ্ঞানের বই লিখেছেন, বিশ্ব-
কবি হাত দিয়ে এখানাই প্রথম বিজ্ঞানের
গ্রন্থ রচনা। শুনাই মনে পড়লো ডক্টর
সেনের কথাগুলি, তিনি কেন বইটার যুক্ত-
গ্রন্থকার হওয়ার কথা বলেছিলেন।

গ্রীষ্মের ছুটির পর গুরুদেব আল-
মোড়া থেকে ফিরে একদিন সন্ধ্যার সময়
ডেকে পাঠালেন। উত্তরায়ণে গিয়ে দেখি-
ক্ষতিমোহনবাবু ও শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে
তিনি কথা বলছেন, আমাকে ডেকে সেনেছে

পাশে বসালেন, কুশল প্রশ্ন করলেন।
তারপর বললেন, "দেখো, 'বিশ্ব-পরিচয়'
লিখতে লিখতে দেখলুম এর ভাষাটা
আমারই হয়ে গেছে, তাই এর মধ্যে
তোমাকে কোথাও স্থান দিতে পারলুম
না।" একটু থেমে বললেন, "অবশ্য তুমি
শব্দ না করলে আমি সমাধা করতে
পারতুম না, আর তা ছাড়া বিজ্ঞানের
অনভ্যন্ত পথে চলতে শেষ পর্যন্ত এই
অব্যবসায়ীর সাহসে কুলোতো না। তুমি
ক্ষম হয়ো না।" গুরুদেব থামলেন, আমার
দিকে তাকাতেই সহাস্যে বললাম, "বইখানা
লেখার ভার আমার উপর দিয়েছিলেন,
কাজ সম্পূর্ণ করে আপনার হাতে তুলে
দিয়েছি, পরবর্তী ব্যবস্থার ভার আপনার,
আপনি যে-ব্যবস্থা করবেন তাতেই আমি
তুষ্ট, ক্ষম হবো কেন।" এই তো গেল
'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থ রচনার ইতিবৃত্ত।

এর কিছুদিন পর গুরুদেব তথ্যাপক
সতেন বোসকে শান্তিনিকেতনে ফাবার
আমন্ত্রণ জানালেন। প্রফেসর বোস এলেন,
বিশ্বকবি ও দার্শনিকের সঙ্গে দেখা হলো
বিশ্ববিদ্রুত বিজ্ঞানীর, অন্তরের ত্রিপুরা
সম্পদের অধিকারী দুই বিরাট মনুষ্যের
মিলন ঘটল উত্তরায়ণে। প্রায় দু' ঘণ্টা
ধরে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে এই দুই
বিরাট প্রতিভার মনস্বীর নানা বিষয়
নিয়ে আলোচনা হলো। আলোচনা শেষে
গুরুদেব বললেন, "তোমার এই বিরাট
প্রতিভা নিয়ে অন্তরালে আত্মভোলা হয়ে
আত্মগোপন করে থাকলে তো চলবে না,
সামনের সারিতে তোমাকে আসতেই হবে,
তোমার বলিষ্ঠ হাতের অপরিমিত দান
থেকে দেশকে বঞ্চিত করার কোনো
অধিকার তোমার নেই।" প্রফেসর বোসকে
কলাভবন দেখালেন স্বয়ং শিম্পচাধ নন্দ-
লাল বসু, আর্ট সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরে
দু'জনের মধ্যে গভীর আলোচনা হলো।
নন্দলাল বসু বলেছেন, "সতেন বোস
বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তাই জানতুম, কিন্তু আর্ট
সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান যে এতো বিস্তৃত ও
গভীর তা জানতুম না। আর্টের ক্ষেত্রে
ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, আলো-
চনার ধারাও আলাদা। মনে হয় উনি যেন
এক নিখুঁত আর্টিস্ট।"

গায়ে পাঞ্জাবি, পরনে ধূতি, পায়ে
স্যান্ডেল, আর মাথায় কাঁচাপাকা জঁবিনাস্ত
চল, এমনি কোনো মানুষকে দেখলে তাঁকে
সাধারণ বাঙালী বলেই মনে হবে। কিন্তু
এই অতি সাধারণ বেশভূষার তন্তরালে
যে একজন অনন্যসাধারণ প্রতিভার
মনস্বী বিরাজ করতে পারেন তা জানা
যায় যখন জ্ঞানতপস্বী প্রফেসর সতেন
বোসকে দেখি। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা
জানুয়ারী কলকাতায় ২২ নং ব্রহ্ম মিল
লেনের বাড়িতে ঠিক জন্ম, ২৪ পরগণার

বড় জাগলিয়া গ্রামে (হাঁরঘাটার কাছে)
আদি নিবাস। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এন্ট্রান্স
পাশ করেন, পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার
করে প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পেলেন। ১৯১১
সনে আই-এসসি পরীক্ষায় প্রথম স্থান
অধিকার করলেন, 'ডাক-বৃত্তি' পেলেন।
১৯১৩ সনে বি-এসসি অনার্স পরীক্ষায়
গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন।
১৯১৫ সনে মিস্র গণিতে প্রথম শ্রেণীতে
এম-এসসি পাশ করলেন, এখানেও
সত্যেন্দ্রনাথের স্থান হলো প্রথম। অসাধারণ
মেধাবী ও প্রতিভাধর অল্প কিছুদিনের
মধ্যেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিমিত কৃতিত্ব
অর্জন করলেন, বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর
বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত
হলো; অধ্যাপনা শব্দ করলেন কলকাতা
বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে পদার্থবিজ্ঞানের
'রীডার' হয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ছাত্রদের তিন
সম্পূর্ণ আপন করে নিলেন। সবাই যেন
তাঁর বন্ধু, কেউ তরুণ শিক্ষার্থী, কেউ
অধ্যাপক, কেউ প্রতিবেশী, কেউ বা সম্পূর্ণ
অজেনা—সবাই আসেন তাঁর কাছে অনারিত
স্বাভাব। জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা হয়; ইতিহাস,
অর্থনীতি, প্রকৃতি, সংগীত, কবিতা, আর্ট
নিয়ে আলোচনা হয়। অসাধারণ স্মৃতি-
শক্তি, অনন্যসাধারণ প্রতিভা, অন্তরের
উদারতা ও সত্য সন্ধানের নিবন্তর
আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণায় সदा সজ্জ্বল
তিনি। ১৯২৪ সনে পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স
নিয়ে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, এর
কিছুদিন পরেই প্রফেসর বোস বিদেশে
চলে গেলেন। সেখানে তাঁর আনন্দকার
'Zeitschrift für Physik' নামে
প্রখ্যাত জার্মান জার্নালে প্রকাশিত হলো,
আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথ-আবিষ্কৃত তত্ত্বের
বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেন। এই তত্ত্বই
'বোস-আইনস্টাইন' তত্ত্ব নামে বিজ্ঞানী-
মহলে সুপরিচিত।

দেশে ফিরলেন ১৯২৬ সনে, তখনকার
একটা ব্যাপার আজও মনে পড়ে। তথ্যাপক
ভবানীচরণ গুহ X-ray নিয়ে গবেষণা
করতেন, প্রফেসর বোস সেদিন ঠিক ঘরে
বসেছিলেন, এমন সময় একটা বিষয়
বুঝবার জন্য গেলাম ভবানীবাবুর কাছে।
তিনি বললেন, প্রফেসর বোসের সঙ্গে তাঁর
অনেক কাজ রয়েছে, সেদিন তাঁর সময়
হবে না। একটু ক্ষম হয়েই ফিরে
যাচ্ছিলাম। অত্যন্ত স্নেহের সুরে ডাক
এলো "শোনো", ফিরে তাকিয়ে দেখি
প্রফেসর বোস ডাকছেন 'এসো আমার
কাছে, দেখি কী বুঝতে চাও।' হাতে
ছিল আমার Drude-এর Optics-এর
বই; নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা খুলে 'Dispersion
Formula'টা দেখিয়ে বললাম ওটা

কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বইটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, “বই পরে দেখা যাবে, এখন এসো তো দেখি এই Dispersion ব্যাপারটা কী আর কী করে ঘটে তা একবার আলোচনা করি দৃষ্টিতে।” বলেই আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন এক চেয়ারে বসালেন, একখানা কাগজ নিয়ে সমস্ত জিনিসটা পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে বললেন, “বুঝেছ এবার, তাহলে লিখে যাচ্ছ এদের গাণিতিক সংজ্ঞা।” বোধ হয় এক পৃষ্ঠার মধ্যেই জটিল Dispersion Formula-টা প্রমাণ হয়ে গেল, এটা প্রমাণ করতে Drude-এর অন্তত ২১৩ পৃষ্ঠা ছাপানো কাগজ লেগেছিল। মৃদু বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম গুঁর দিকে। কী অসামান্য প্রতিভা, কী পরিষ্কার বোধগম্যতা! এর আগে এইরকম একজন মনীষীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য ঘটে নি। তারপর শব্দ করলেন পদার্থবিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন, সাধ্যমতো জবাব দিলাম, কিন্তু খুব প্রসন্ন হলেন না। বললেন, “শব্দ পাঠ্য কেতাব পড়লেই চলবে না, যাঁরা এসব বিষয়ে গবেষণা করেছেন তাঁদের মূল রচনা পড়তে হবে, জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিখতে হবে, ঐ সব ভাষায় লেখা ধ্যানার্জ পড়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।” সত্যিকারের বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হলো প্রফেসর বোসের অপূর্ব শিক্ষণধারায়, এমন সহজ সরল করে জটিলতম বিষয় শিক্ষার্থীর আয়ত্তগম্য দীমানায় পেঁচে দিতেন যে বিস্ময়ে ও প্রশংসায় হতবাক হয়ে যেতাম আমরা।

অবাচিত সাহায্য করার একটা প্রবল প্রেরণা ছিল প্রফেসর বোসের মহান চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কতো গরীব ছেলে যে তাঁর কাছে থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে তা খুব কম লোকেই জানে। এতো সংগোপনে তাঁর দান প্রবাহিত যে দাতা ও গ্রহীতা ছাড়া আর কেউ বৈ পেরে না। মনে আছে, একবার টাইপান ফি জমা দিতে তিন মাস দেরী হয়ে গেল, তারপর টাকা জোগাড় হলে ফি জমা দিতে গেলে ক্যাশিয়ার ললিত গোসাঁই বললেন, ‘কতো বার মাইনে দেবে হে, ডিফল্টার’ হিসেবে তোমার নাম কেটে দেবার চিঠি পাঠানোর পরের দিনই তো তোমার সব টাকা জমা হয়ে গেছে, এই দেখ তার রসিদের কপি।’ বললাম, ‘আমি তো কোনো টাকা জমা দেই নি।’ গোসাঁই বললেন, ‘তাহলে আর কেউ ঐ টাকা জমা দিয়েছে।’ সংগে সংগে মনে হলো, এ নিশ্চয় প্রফেসর বোসের কাজ। সোজা চলে গেলাম গুঁর ঘরে, দেখি চেয়ারে পা তুলে বসে এক সহকর্মী অধ্যাপকের পিঠে বাঁ-হাত রেখে বলছেন, “এই সোজা আঁকটা হাল্কা না কীরে!” আমাকে দেখেই

বললেন, ‘কিরে তুই আবার কোনো আঁক নিয়ে এলি নাকি।’ বললাম, ‘আঁক নয় স্যার, তবে সমস্যা—আপনি আমার তিন মাসের মাইনেটা জমা দিয়েছেন নাকি।’ প্রশান্ত হাসিতে মৃদু উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, বললেন “আমি! কই মনে পড়ছে না তো, জ্ঞানকে (ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ) একবার জিজ্ঞেস কর, ও তোদের ‘প্রভোস্ট’, হয়তো জ্ঞানই টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে।” গেলাম ডক্টর ঘোষের কাছে। শব্দেই বললেন, “সত্যেন বললে আমি টাকাটা দিয়েছি! না বাপু আমি দেই নি, তুমি শুঁকেই আবার জিজ্ঞেস কর।” আবার গেলাম প্রফেসর বোসের কাছে, বললাম, “ডক্টর ঘোষ টাকাটা দেন নি, আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করতে বললেন।” শব্দে হেসে বললেন, “দেখ, টাকাটা যখন দেওয়া হয়ে গেছে তখন আর এ নিয়ে গোলমাল করছিস কেন, ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে ‘ফণীর’ দোকান থেকে চপ্টপ্ এনে খাইয়ে দিস।”

আর একদিনের ঘটনা—ডেকে পাঠালেন সব ছাত্রকে, বললেন, “লেখা-পড়া তো কেউ কিছু করছ না, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তার জবাব পাওয়া যায় না। যাও, প্রত্যেকে তার Andrade-এর Structure of the Atom বইখানা নিয়ে এসো, কী কী পড়তে হবে বলে দিচ্ছি।” এই বইখানা তখনকার দিনে Modern Physics-এর একখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ, দাম ছিল উনিশ টাকা, সবাই এই বই কিনতে পারত না; অবস্থাপন্ন ছেলে ছাড়া বেশির ভাগ ছাত্রেরই ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। যে-কয়জন ভাগ্যবানের বইখানা ছিল তারা বই নিয়ে এলো, তাদেরই একজনের পাশে বসে খাতায় টুকে নিচ্ছিলাম প্রফেসর বোসের দেওয়া ‘রেফারেন্স গালি’। হঠাৎ দৃষ্টি গড়লো আমার উপর, বললেন, ‘তোমার বুকি বই নেই।’ এর কয়েকদিন পর উনি কলকাতা গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নেবার জন্য। ফিরে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন গুঁর বাড়িতে, সেখানে গুঁর লাইব্রেরীতে বসিয়ে ৩১৩ খানা বই আলমারি থেকে বের করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, “এ বইগুলি ভালো করে পড়বি, দরকারী তথ্য সব নোট করে রেখে আবার এগুলি ফিরিয়ে দিবি কিন্তু, তোদের হাতে বই গেলে ভেঁ! আর শীগগির ফিরে আসে না।” তারপর হঠাৎ যেন একখানা বইয়ের দিক নজর পড়লো, বললেন “আরে, এখানে যে দেখছি একখানা Andrade-এর বই রয়েছে। তোমার তো বই নেই, এখানা নিয়ে যা, পরীক্ষার পর আবার মনে হবে ফিরিয়ে—স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী—পরিচয় করিয়ে দিস।” বইখানা খুলতেই দেখি কল-

কাতার এক কোম্পানির লেবেল মারা, পাশে দাম লেখা উনিশ টাকা, একেবারে আনকোরা সদ্য কেনা কলকাতা থেকে। আমার বই কেনার আর্থিক সঙ্গতি নেই, তাই সোজাসুজি উনি বই কিনে আমার দিলে পাছে মনে আঘাত পাই, সেই জন্য এ সব ভূমিকা করে হঠাৎ যেন আলমারি থেকে বইটা আবিষ্কার করলেন। এই মহাপ্রাণ মানুষটির অন্তরের উদারতায় চোখে জল এসে পড়লো। বোধ হয় এটা টের পেয়েই বললেন, “এবার পাল, আমার চের কাজ বাকি, তোর সংগে গল্প করলে তো চলবে না বাপু।” প্রফেসর বোসের সংস্পর্শে যিনি একবার এসেছেন, শব্দ যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, অপূর্ব মেধা ও বহুমুখী পাণ্ডিত্যেই মৃদু হয়েছেন তা নয়, তাঁর অন্তরের উদারতা, প্রশারতা, নিরহংকারিতা আর শিশুর মতো সরল ব্যবহারে ও কোমল চিত্তমাধুর্যে প্রশংসায় অভিভূত হয়েছেন।

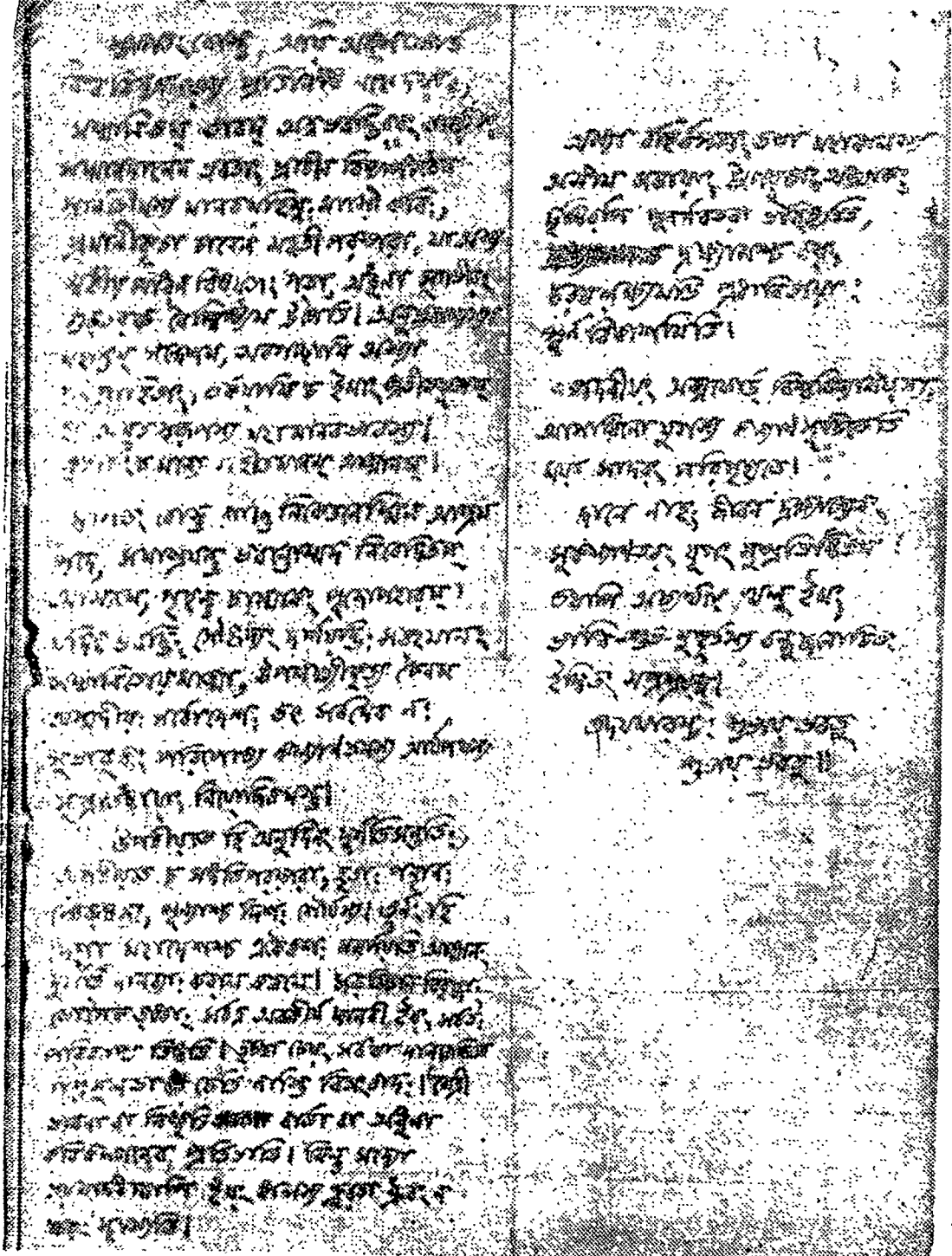
আরো একটা ঘটনা আঙ্গু স্পষ্ট মনে পড়ে—তখন ছিলাম খজাপুর আই-আই-টিতে। প্রফেসর বোসকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে এক সভার ভাষণ দেবার জন্য। ওখানকার পদার্থবিজ্ঞানের তদানীন্তন সহকারী অধ্যাপক হর্ষনারায়ণ বসু গুঁর ছাত্র। এখন সমস্যা হলো উনি কার কাছে থাকবেন। হর্ষবাবু ও আমি দুজনেই গেলাম স্টেশনে, ট্রেন থেকে নেমে গাড়িতে বসতেই বললাম, “স্যার, আপনি কিন্তু আমার কাছেই থাকবেন।” সংগে সংগে হর্ষ বললেন, “তা কী করে হয়? রেবা (হর্ষবাবুর স্ত্রী) গুঁর সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখেছে, উনি আমার ওখানেই থাকবেন।” প্রফেসর বোস বললেন, “দেখ, আমি খুব ক্লান্ত, এখন দরকার একটা খাটিয়ার উপর চিৎপাত হয়ে শব্দে পড়া, তা তোর ওখানেই হোক বা হর্ষর ওখানেই হোক। তবে বাপু, টানা-পোড়েন করতে পারব না, কিন্তু রেবা যেন ক্ষুদ্র না হয় আর হর্ষ যেন বিমর্ষ না হয়।” পেঁচে দিয়ে এলাম হর্ষবাবুর ওখানেই, বললেন, “তোমার ওখানেও একবার ঘুরে আসব, একটু কিগ্রাম করে নেই তাবপর তুই এসে নিয়ে যাস আমাকে।” রাত প্রায় ৮টা নাগাদ গুঁকে নিয়ে এলাম আমার বাড়িতে, বললেন, “ডাক তোমার ছেলেমেয়েদের, ওদের সংগে একটু কথাবার্তা বলি।” আমার বড় ছেলে কল্যাণ (ডল নামেই বেশ পরিচিত ছিল) তখন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দ্বিতীয় ছেলে সত্যেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, আর মেয়ে কন্যা দিলাম। উনি সন্মানে ওদের অশীর্বাদ

সাপ্তাহিক বসুমতী

করলেন, তারপর মেয়েকে ডেকে বললেন, "তুই ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস, আমি আমার মাথার পাক্সা চুল তুলে দে তো।" মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললো, "দাদা, তোমার সব চুলই তো প্রায় সাদা, বলতো খাঁজে কাণো চুল তুলে দিতে পারি।" প্রফেসার বোস

হেসে উঠলেন, "মেয়েটার তো দেখাছ বেশ বৃদ্ধি আছে রে, এরকম জবাব তো এর আগে কেউ দেয় নি।" তারপর ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবাতা বলে বললেন, "এখানে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব, হেঁটে যেতে পারব না বাপ, একটা গাড়ির ব্যবস্থা কর দেখি।" কল্যাণ সঙ্গে

সঙ্গে বললো, "আমি আপনাকে নিয়ে যাব আমাদের গাড়ি করে।" ঠিকে নিয়ে কল্যাণ চলে গেল, রাত এগারোটোর পর হঠাৎ বাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময় উনি বললেন, "অনেক রাত হয়ে গেছে, এবার বাড়ি গিয়ে ঘুমো।" কল্যাণ বললো, কাল ওর ফাইনাল প্র্যাকটিকেল পরীক্ষা,



অনেক পড়শুনো বাকি। শুনাই প্রফেসর বোস বলে উঠলেন, 'একথা আগে বলিস্ নি কেন রে, যাক্ কী আর কথা যাবে, দেখাবি আমার আশীর্বাদে কাল বেশ ভালো পরীক্ষা দিবি।' হলোও ঠিক তাই, তারপর দিন পরীক্ষা শেষে শোনা গেল, এই পরীক্ষায় কল্যাণ নাক খুব ভালো করেছে, সব চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। ফল বের হলে দেখা গেল কল্যাণ প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে। তারপর ১৯৫৯ সনের ৮ই জানুয়ারী দুর্গাপুরের ডাইভারসব রোডের কাছে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় কল্যাণের মৃত্যু ঘটলো। তখন আমি কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে কাজ করি; এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ পেয়েই প্রফেসর বোস এলেন আমার কাছে, নির্বাক স্তম্ভ হয়ে বসে বসে বসে আমার মাথার উপর হাত রেখে দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাবপর ধীর পদে সিঁড়ি বেয়ে নিচে চলে গেলেন। মৌন মধ্যে সান্ত্বনার কোনো ভাষা নেই। কিন্তু গভীর বেদনায় অভিভূত দুটি বাষ্পাকুল চোখে আমার মাথায় সন্মোহ হাত বুলিয়ে যে-সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানিয়ে গেলেন তার তুলনা নেই! ঠাণ্ডা সম্বন্ধে অজ্ঞ ও শূদ্ধ একটি কথাই বার বার মনে হয়— নিঃসন্দেহে উনি বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, মনীষী ও জ্ঞানতপস্বী। কিন্তু ঠাণ্ডা অস্তরে মানবতার গণিসংগ বর্ণ নিয়ে যে-মানুষটি বিরাজ করছে তা ঠাণ্ডা অসামান্য পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা চেয়েও অনেক বড়ো। মনীষী ও মনুষ্যত্বের এরকম অপূর্ব সমন্বয় সত্যিই বিরল!

এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক—

এর কিছুদিন পর গুরুদেব ডেকে পাঠালেন, বললেন, 'বিশ্ব-পরিচয় তো ছাপা হলো, এবার 'পৃথবী-পরিচয়' তাত্ত্বিক শেষ কর, এর ভূমিকাটা আমি লিখে দেব স্থির করেছি। 'পৃথবী-পরিচয়' লেখা সম্পূর্ণ হলে তার পাণ্ডুলিপি দিয়ে এলাম ঠাণ্ডা হাতে, বললেন, 'এটা পড়ে দেখছি, পরিবর্তন ও পরিবর্তন যা দরকার তা করে ভূমিকা লিখে সোজা প্রেসে পাঠিয়ে দেব, অনেক দৌর হয়ে গেছে, আর নয়।' কয়েকদিন পর ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমার বইটার 'ভূমিকা' লিখে লোক-শিক্ষা গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করে প্রেসে পাঠিয়ে দিয়েছি, কি ভূমিকা লিখো দেখ।' একখণ্ড তুলট কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন, বললেন 'আমার লেখা

তোমার বইয়ের ভূমিকা, তোমার কাছেই রেখে দাও।' ভূমিকাটি পড়ে অভিভূত হলাম, কাগজটা উটে দেখি সেখানে রয়েছে গুরুদেবের স্বহস্তে লিখিত সংস্কৃতে একটি অভিভাষণ। এই অভিভাষণ তিনি উদ্দেশ্য করেছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের প্রতি, যাঁরা কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনে এসে গুরুদেবকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে ডক্টরেট (ডি-লিট) ডিগ্রি অর্পণ করে গিয়েছেন জ্যাটিন ভাষায় তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করে। বললাম, 'গুরুদেব, আমার বইয়ের ভূমিকা লেখা কাগজের অন্যদিকে রয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে আপনার নিজ হাতে লেখা সংস্কৃত এক অভিভাষণ।' বললেন, 'দুটোকে তো আর আলাদা করা যাবে না, রেখে দাও তোমার কাছে, এ তোমার সম্পত্তি।' গুরুদেবের হাতে লেখা এই সংস্কৃত অভিভাষণটির কপি এখানে তুলে দিলাম—

“স্বাগতং বোম্বে, অয়ি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্য প্রতিনিধি মহোদয়াং, সম্মানিতম্। তাবদ্ অত্রভবিস্তব্ধং ভারতীয় সম্মানদানে ভবতাং প্রাচীন বিদ্যাপীঠেন সার্বভৌমস্য মানবমহিম্নঃ মাসৌ কবিঃ, প্রমাণীকৃত্য চানেন, মহতী পরম্পরা, যা অস্মৈ স্বকীয় সাধন বিষয়তাং গত, অধুনা সুগভীরং গুরুতরং বৈশিষ্ট্যম্ উপৈতি। অনুভবাম্যস্যা মহান্তম্ সূক্ষ্মম্, অবগচ্ছামি অস্মৈ গুরুগ্রাহিতাং, তর্ক্যামি চ ইমাং প্রতীকভূতাম্। ইব অমৃত স্বরূপস্য মহামানবভাবস্য। কৃতার্থং চ মন্যে গৃহীতমানম্ আত্মনাম্।

স্বাগতং বোম্বে শান্তিনিকেতনেন্সিন আশ্রম পদে, সমাপ্রয়ন্তু ভবতোস্মদ নিবেদিতম্ আসনম্, গৃহন্ত্যাস্মাকং পূজোপহারম্। যাদিহ ভবন্নিঃ সৌহৃদ্যং দর্শয়ন্নিঃ সবহমানং সম্মানিতোঃসাম্রাট, উপলক্ষ্যীকৃত্য চৈনম্ অস্মদীযঃ সর্বাদেশঃ তং সর্বদৈব নঃ সূভাবকং পরিপোষ্য কল্যাণতমস্য আর্থপথস্য সুপ্রতিষ্ঠায়াং নিয়োজিতমস্তু।

উপচারিতে হি অনুদিনং দুর্গতি-সম্ভাতিঃ, অপচারিতে চ সর্গাতিপরাং, হুতাঃ পশ্চানঃ পৌরুষস্য, শূন্যচ দিশঃ শৌর্যস্য। তদং হি দেশঃ মহাদেশচ একৈকশঃ সমপর্যায়িত আত্মনং দুর্গতি দানব্যাঃ করাল কবলে। জড়বিজ্ঞান বিবন্ধাং ভোগৈক কৃষ্ণং সর্বত্র অবকীয়

দানবী ইয়ং সর্বত্র পরিব্যাপ্য তিষ্ঠতি। কৃষ্ণা চেয়ং সর্বত্র দানবোচিত্য পশ্যন্তেভা চৈতি নাস্তি বিসংবাদঃ। মৈত্রী ভাবনা বা নিকৃতি বাতা বা অধুনা কবিকল্পনেব প্রতিষ্ঠাতি। কিন্তু সদ্যঃ ভয়বাদধানাপি ইয়ং কালস্য ক্রুরতা ধুবং ন চিরং স্থাস্যতি।

অস্মৈ বহিবসতাং তথা মহাকালস্য অস্মৈ সম্ভায়াং উপেক্ষাং অস্মাকং দৃষ্টিপি পননবতরা ভবিষ্যতি, চক্ষ্যামশ্চ বয়ং চরমলক্ষ্যমভি প্রধাবিতায়াং পূর্ণ-বিকাশমতি।

পদবীযং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্য, আগামিনো যুগস্য কল্যাণসুচিকোতি ময়া সাদরং পরিগৃহ্যতে।

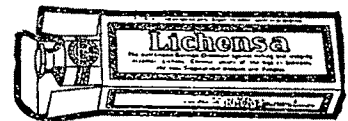
জ্ঞানে নাহং জীবনদ্রক্ষ্যমোনং সুকল্যাণতরং যুগং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। তথাপি অভ্যর্থয়ে খলু ইয়ং ভবিষ্যদ-মহতস্য বন্ধুজ্ঞানোচিতং ইংগিতং সমপ্রয়ম্।

তদযমারম্ভং শূভায় ভবতু
শূভায় ভবতু॥”

সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ আমি, এর তর্জমা করা আমার সাধ্যাতীত। যাঁরা সংস্কৃত জ্ঞানে সহজেই তাঁরা এর রস গ্রহণ করতে পারবেন, যাঁদের অবস্থা আমার মতো তাঁরা অবশ্যই পণ্ডিতের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

[ক্রমশ]

ব্রণ
দুই কব্জার জন্য
লিচেনসা



১০৮ টি দেশে ডাক্তাররা
প্রেসক্রিপশন করেছেন।

যে কোন নামকরা ওষুধের
দোকানেই পাওয়া যায়।

DZ-1476 R-BEN



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ নবম অধ্যায় ॥

“একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম”

ছাড়া পাবার ঠিক তৃতীয় দিন পর ভোর রাতে এক বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল, মনে হল যেন একটা সিংহ কাছেই কোথাও রাগে গর্গর্ করছে। আমি ওয়ান গদ্বইকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলল যে, ওটা মানুষের গলার আওয়াজ। মাইকের ভেতর দিয়ে বেরোচ্ছে; গ্রামের লোকের দিনমজুরী খাটতে যাবার আহ্বান। তাড়াতাড়ি করে চা খেয়ে নিয়ে আমিও কোদাল হাতে বেরিয়ে পড়লাম—ওয়ান গদ্বইর সঙ্গে গ্রামের প্রান্তে দেউটির কাছে গ্রামরক্ষীর সামনে হাজির হবার জন্য। আরও অনেক নরনারী ইতিমধ্যেই সেখানে জমা হয়েছিল এবং সমবেত সবাইকে ছোট ছোট কয়েকটা দলে ভাগ করার পর নিকটবর্তী এক ভাগ্যবান চাষীর মাঠে মাটি কাটতে পাঠিয়ে দেয় আমাদের গ্রামরক্ষী। অনুদ্রুত অথচ প্রগতিশীল দেশগুলিতে এভাবে গ্রামের লোকদের জনসাধারণের কল্যাণার্থে কাজ করানোতে কোন দোষ দেখি না। কিন্তু এ বিষয় কিছু নিয়মকানুন আছে। প্রথমত কাজটা এমন হওয়া চাই যা সকলকার পক্ষেই উপকারী, যেমন ছেলে-মেয়েদের স্কুলবাড়ি বা হাসপাতাল, আর দ্বিতীয়ত এ রকম কাজ আরম্ভ হওয়ার আগে জনসাধারণের সম্মতিও প্রয়োজন। জনহিতকর কাজের অজুহাতে বিনা পয়সায় বিনা মম্বতিতে, সাধারণ লোকদের দিয়ে জোর করে কোন একজন সরকারী তাবদারের জমির উন্নতিসাধন করিয়ে নেওয়া খুবই অন্যায়।

খন্দিও এতদিন পরে ছাড়া পাবার

পরই এভাবে মজদুর খাটতে আমার আপত্তি ছিল খুবই, তবু সেখানকার ব্যাপার-সাপার জানবার জন্যই আমি গিয়েছিলাম। প্রত্যেক পুরুষকে এক টুকরা জমি দেওয়া হয়েছিল মাটি কোপাবার জন্য এবং তাদের সাথে একজন করে স্থ্রীলোক ছিল সেই মাটি বড়িতে ভরে মাথায় করে নিয়ে ফেলে আসার জন্য। আমি আমার খুড়তুত ভাই-এর বউ কামদুউর সঙ্গে কাজ করছিলাম এবং অন্তরীণ জীবনে কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করার ফলে আমার বিশেষ কোন অসুবিধাও হয় নি; কিন্তু কার্যরত অনেকেই অল্প সময়ের ভেতর হাঁপিয়ে উঠেছিল। আমি আরও লক্ষ্য করে দেখেছিলাম যে, গ্রামরক্ষী কয়েকজন স্থ্রীলোককে তার নিজের বাড়িতে জল তোলা ও জ্বালানি কাঠ কাটার কাজে নিযুক্ত করে। ঘরে তার নিজের স্থ্রী ছিল এবং সে সরকারী মাহিনা পেত, কাজেই এভাবে গ্রামের লোকদের দিয়ে নিজের বাড়ির কাজ করিয়ে নেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই ছিল না তার। আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখলাম যে, শ্রদ্ধু আমাদের গ্রামেই নয়, আশেপাশের সব গ্রামেই এই ব্যবস্থা চালু হয়েছে। দিন তিন-চার এইভাবে বেগার খাটবার পর আমার অন্তর বিদ্রোহ ঘোষণা করে উঠল—মন চাইল হয় আমি পুরোপুরি স্বাধীন, না হয় আমি বন্দী। আমার উপস্থিত অবস্থার তুলনা করে দেখতে গিয়ে মনে হল, আমি যেন একটি গলার দড়িবাঁধা গাধা, শ্রদ্ধু প্রভেদ এই যে, সাধারণ ছোট বড়ির বদলে আমার গলার দড়ি অনেক লম্বা। আমার মনে হল সারা দেশটাই একটা বিরাট বন্দীশালা, আর প্রত্যেকটি গ্রাম তার

একটি অংশবিশেষ। আমরা কোন কিছু থেকেই ছাড়া পাই নি। কাজেই আমি রক্ষীকে গিয়ে সরাসরি মিথ্যা কথা বললাম যে, আমার ডান পা এত ব্যথা করছে যে, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। সে আমাকে এক হস্তার ছুটি দিল বটে, কিন্তু সদ্বী হল বলে মোটেই মনে হল না।

ছাড়া পাবার কয়েকদিনের ভেতরেই যে সমস্ত অন্তরীণ প্রথমেই দিকে আমার সঙ্গে জেলে ছিল, তাদের অনেকেই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং আমি বেঁচে আছি দেখে খুবই আনন্দিত হয়, কারণ তাদের অনেকেই শুনিয়েছিল যে, আর্থিরভারে থাকাকালীন আমার মৃত্যু হয়। এক-একদিন আমার সঙ্গে গ্রিশজন অর্ধি লোক দেখা করতে আসতো এবং একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই মিলে বন্দীথাকাকালীন রচিত আঙ্গিকার গান এবং কাপেনগদ্বরিয়ায় কৈনিয়াটার গান গিয়েছিলাম। এর প্রথমটি আগেই উল্লেখ করেছি, দ্বিতীয়টির সারাংশ নিচে দেওয়া হল :

কাপেনগদ্বরিয়ায় জোমো কৈনিয়াটার গান (*) (এটি একটি গান এবং আমরা সেইভাবেই তাকে গিয়েছিলাম; এর প্রত্যেকটি কথা সত্যি কি না তা নিয়ে আমাদের কেউ মাথা ঘামায় নি এবং তাতে কিছু আসে যায় না)।

১। কৈনিয়াটা তাঁর নিজস্ব চরিত্রবলে লোকদের রাজনীতি শেখান ফলে সত্যকার সংগ্রামীরা তাঁর কথায় বন্দীজীবনের দৃষ্টি-কণ্ট স্বীকার করে নেয় আর যারা ভীরু কাপদুর তার বিভীষণ বাহিনীতে যোগ দেয় (সকলে একসঙ্গে) হেঁইয়ো ভাই! অদ্রভবিষ্যতে দেশ স্বাধীন হলে পরে, আমরা আনন্দে নাচব কৈনিয়াটা আমাদের নেতা আর এটা আমাদের মতো কালো আফ্রিকানদের দেশ।

(*) জোমো কৈনিয়াটার বিচার কাপেনগদ্বরিয়ায় শ্রী আর. এস. থ্যাকারের কোর্টে হয়েছিল। কৈনিয়াটার পক্ষের উকিল ছিলেন শ্রী ডি. এন. প্রিট। কৈনিয়াটা তার সঙ্গে আরও পাঁচজন দেশী সাব্যস্ত হবার পর নাইরোবিতে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা হয়েছিল, কিন্তু আপীল নামজদুর হয়। দ্বিতীয়বার আপীল করার জন্য অবৈদন বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকদের কাছে পেশ করা হয়, কিন্তু তাও নামজদুর হয়ে যায়।

২। শূন্যমাত্র জোমোই আমাদের সবাইকে একত্রিত করেছেন তিনি কাপেনগার্ডিয়ান আমাদের সকলের সব ঝগড়া নিজের মাথায় হুলে নিয়েছেন তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন দয়াময় ভগবান তাঁকে জয়যুক্ত করলেন এবং দেশশুদ্ধ লোক তাঁর জয়গান করলো।
হেইয়ো ভাই!
তিনি আমাদের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন দয়াময় ভগবান তাঁকে জয়যুক্ত করলেন এবং দেশশুদ্ধ লোকে তাঁর জয়গান করল
হেইয়ো ভাই!

৩। কাপেনগার্ডিয়ান চাঁপলজান লোক সাক্ষী দিতে আসে কিন্তু তারা কেউই তাদের কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারেনি প্রিটের প্রশ্নবাদের সম্মুখে তারা দাঁড়াতেই পারেনি থ্যাকারও বলেন সেই পরিহাসের সমাপ্তি করতে এই দেশটা আমাদের মতো কালো আফ্রিকানদের দেশ।
হেইয়ো ভাই!

৪। কাপেনগার্ডিয়া থেকে মকদ্দমা গেল ফিটালেতে প্রিট তাকে স্থগিত রেখে বিলেতে গেলেন সেখান থেকে তিনজন আরও বুদ্ধিমান আইনজীবী আনতে যাতে নাকি তারা সবাই মিলে সাদা-কালোর বিভেদ না করে মানুষের বিচার করতে পারেন।
হেইয়ো ভাই!

৫। তাঁরা সবাই একমত হয়ে বললেন : জোমোকে ছেড়ে দাও কিন্তু যারা সাদা-কালোর বিভেদ চায় তারা রাজী হ'ল না, বলল : আমরা মকদ্দমা নাইরোবিতে সাদাদের বিচারালয়ে নিয়ে যাব
হেইয়ো ভাই!

৬। নাইরোবিতে সাদাদের বিচারালয়ে কাপেনগার্ডিয়ান কথাই মেনে নিল প্রিট আপত্তি করে বললেন : মকদ্দমা বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে নিয়ে যাওয়া হোক সেখানে সাদা-কালোর বিভেদ না করে বিচার হবে
হেইয়ো ভাই!

৭। কিন্তু প্রিভি কাউন্সিলের বিচারক ভয় পেয়ে মকদ্দমা হাতেই নিলেন না

প্রিট সখেদে বললেন : (হায় ভগবান) কেনিয়াটা আমাদের নেতা আর এটা আমাদের মতো কালো আফ্রিকানদের দেশ।
হেইয়ো ভাই!

এই গান গাওয়ার পরের দিন সকালেই গ্রামরক্ষী আমার বিরুদ্ধে চিংগার আফ্রিকান প্রধানের কাছে নালিশ করে। প্রধান গাচিচিও ওয়াম্বিত খুব কড়া মেজাজের লোক ছিল, সে আগে উপজাতীয় আরক্ষাবাহিনীতে বেশ উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিল। সে আমাকে আদেশ দেয় যে, আমার কাছে যারা আসে-যায় তাদের প্রত্যেকের নাম এবং তারা কেন আসে, তার সবিশেষ বৃত্তান্ত আমি যেন গ্রামরক্ষীকে জানাই। যদিচ এরকম হুকুম মেনে নিতে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল, তবু আমি হিলাম নিরুপায়, কারণ কেনিয়ার দেশীয় কতৃৎ দপ্তর গ্রাম-কানুনে (৯৭ নং) এ বিষয়ক কিছু ক্ষমতা দেওয়া ছিল সরকারী এবং তার ব্যবহার করতে পারতেন। অবশ্য এ নিয়ে মকদ্দমা করলে কেনিয়ার সর্বোচ্চ আদালত এর যথার্থতা স্বীকার করে নিতেন কি না আমার সন্দেহ আছে।

একদিন সম্মুখাবলো যখন কোন বাইরের লোক ঘরে ছিল না, আমি ওয়ান গুইকে আমার মার কিভাবে মৃত্যু হ'ল সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এর মধ্যে মাকে হারানোর ভয়ানক দুঃখ ও শোক আমি কিছুটা দমন করতে পেরেছিলাম—কাজেই ঘটনার সবিশেষ বৃত্তান্ত জানার মত মনের অবস্থা ও আগ্রহ আমার হয়েছিল।

ওয়ান গুই উত্তরে চোখের জলে ভেসে যা বলে তার থেকে আমি জানতে পারি যে, সে সময় গ্রামে দিনে মাত্র একবার-দু'বার করে ঘণ্টা বাজতো এবং শূন্য তখন বাছা বাছা কয়েকজন লোক গ্রাম-রক্ষীর নিজস্ব তত্ত্বাবধানে এক ঘণ্টার জন্য মাত্র ঘরের বাইরে বেরতে পারতো খাবারদাবার জোগাড় করবার জন্য। সাধারণ চাষবাসের কাজ করা ছিল প্রায় অসম্ভব এবং যথেষ্ট পরিমাণে ফলন্ত ভূমি ইত্যাদির গাছ সরকারী আদেশে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল, কারণ তাদের মতে সম্প্রদায়বাদী নাকি এই সব মাঠে লুকোতে পারতো।

গ্রামের নিকটবর্তী জঙ্গলের ধারের জমি অনেকদূর অবাধ একদম কেটেকুটে সাফ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সেখানে কাউকে দেখতে পেলেই তৎক্ষণাৎ তাদের গুলী করে মারা হত। প্রত্যেক বাসিন্দার চলাফেরার উপরও কড়া বাধানিষেধ

থাকার ফলে দেশের উর্বর অঞ্চল থেকে বা আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকেও খাবার-দাবার আনার কোন উপায় ছিল না। দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ও বৃদ্ধশা দেশে মহা আকালের সৃষ্টি করেছিল এবং প্রচুর সংখ্যক অসহায় বৃদ্ধা-কাচ্চা, নারী ও অসমর্থেরা প্রাণ দিরেছিল ক্ষুধার তাড়নায়। এই সময়ই আমার মা প্রথম অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আমার বাবার দ্বিতীয় স্ত্রী গাথোনি এবং তাঁর কন্যা নেয়াকিও সেই সময় মারা যান। হাজারে হাজারে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে অভাবের তাড়না সহ্য করতে না পেরে বাড়ি-ঘর ছেড়ে নাইরোবিতে গালিয়ে যায় সেখানকার আন্তর্জাতিক থেকে একটুকরো খাবার সংগ্রহ করার দুরাশায়। এইভাবে সংসারগুলি ছারখার হয়ে যাওয়ায় আমাদের সমাজে যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিক্রিয়া এখনও চলছে আমাদের ভেতর।

আমি গ্রামে যে কয়েকদিন হিলাম তার ভেতরই 'ভূমি একত্রীকরণ' কার্য-কলাপের জন্য আমার ভাগের জমিতে ফলের গাছ ও পাইরিঞ্চাম ফসলের বীজ লাগিয়েছিলাম। জমির অনুপাত দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, যতটা জমি আমার পাওয়া উচিত ছিল, আসলে তা থেকে প্রায় পাঁচ একর কম জমি আমি পেয়েছিলাম। এখন সেই সব ফসল বিক্রি করে আমি যা উপার্জন করি তা আমার সংসারের খুব কাজে লাগে। আমার মাসীমা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা আমাকে সে সময় বিবাহ করে সংসারধর্মে মন দিতে উপদেশ দেন, বিশেষ করে তাঁরা কারণ দেখান যে, আমি তখন সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ ছিল তখন আমার কাছে পুরোপুরি অন্ধকার ও অনিশ্চিত এবং আবার ধরা পড়ে জেলে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিল খুবই বেশি, কাজেই আমি তাদের বলেছিলাম যে, সে সময় আমার সংসারধর্মের কথা ভাবা উচিত নয়।

কয়েকদিন ধরে জেলার আর পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমার মনে হয়েছিল যে, আমাদের সংঘবদ্ধ করার জন্য একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে আমার কিছু করা উচিত। খুব তাড়াতাড়ি কিছু না করতে পারলে সরকারপক্ষের লোকেদের এবং আমাদের মতো স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের ভেতর অন্তর্ভুক্তি বেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং এর ফলে আমাদের একতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাই ছিল সব থেকে বেশি। এই

একতা ব্যতিরেকে আমাদের ঈশ্বাসিত স্বাধীনতা লাভ ক্রমশই দূর হইতে উঠতে। স্থানীয় আফ্রিকান প্রধান ও জেলা কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, তারা সে সময় কিছুতেই নেয়েরা জেলায় কোন রাজনৈতিক দল প্রাতিষ্ঠান অনুমোদন দেন না। অবশ্যই তাদের এই মনোভাব খুবই অদূরদর্শতার পরিচয় দাড়াইল এবং তাদের মনোভাব বদল করারও যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। এই সময় আমি আরও জানতে পারি যে, সরকার আমার পিছনে গুপ্তচর লাগিয়েছেন—আমার কাজকর্মের ও মাতৃগতির খবর রাখবার জন্য। এ কথা জেনে আমি অবশ্য ভয় পাওয়ার চেয়ে গর্ব বেশি অনুভব করি। আমি নাইরোবিতে একটি নালিশভরা চিঠি লিখি গ্রামে বেগার খাটার কাজে নারীদেরও বাধ্য করার বিরুদ্ধে এবং তারপর থেকেই আমার পিছনে ফেটে লাগান কেনিয়া সরকার! এ ছাড়া কেনিয়া বন্দীশালার মহাধ্যক্ষকেও আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, তাতে কয়েকজন অন্তরীণের ছাড়া পাবার পর তাদের যে সমস্ত নিষ্পত্তি সম্পত্তি সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখা ছিল, তা উদ্ধারের আবেদন জানিয়ে। এ কাজে আমি যথেষ্ট সফলতা লাভ করি এবং আরও অন্যান্যদের সঙ্গে আমার বহু পরোচন বন্ধু জেমস থুঙ্ক মানগোথকে সাহায্য করতে সক্ষম হই।

আমি অল্পদিনের ভেতরেই জানতে পারি যে, সরকার আমার আমাকে আটক করার কথা ভাবছেন, কাজেই রাজনৈতিক দল গঠন সম্পর্কে যা কিছু করার তা খুব তাড়াতাড়ি করে ফেলবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। আমি চটপট নেয়েরা জেলার অন্য তিনটি বিভাগ, দক্ষিণ টেট, উত্তর টেট ও মাথিরা পরিদর্শন করি এবং সেখানকার সংগ্রামীদের সঙ্গে এ বিষয় কথাবার্তা চালাই। এদের প্রত্যেকের কাছে আমি অপরিমিত উৎসাহ পাওয়ায় অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করতে মনস্থ করি। একদিন সকালে উত্তর টেট থেকে কিগাংগো নামক একজন লোক আমার কাছে এসে বলে যে, নেয়েরা শহরের মুখাই চিউক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়; সে তখন নেয়েরাতেই একটি ছোটখাট হোটেলের ব্যবসা করতো। মুখাই-এর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হবার পর সে আমাকে ওয়ানজোহি মুনগাউ নামক তার এক ব্যক্তির কাছে নিয়ে যায়। ওয়ানজোহি "হাবারি য়া কেনিয়া" বা "কেনিয়ার সংবাদ" নামে একটি কাগজ বের করতো মাঝে মাঝে (আর্থিক সংগতি মতো), তাতে থাকতো কেনিয়া সরকারের বিরুদ্ধে নানারকম নালিশ। ওয়ানজোহিকে

আমার একজন বৃদ্ধমান রাজনীতিজ্ঞ বলে মনে হয়েছিল এবং সেও নেয়েরা জেলায় একটি রাজনৈতিক দল সংগঠনের জন্য প্রচুর উৎসাহ দেখায়। তার সঙ্গে বসে কথা বলার সময় প্রায় মারও দশ-বার-জন লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছিল সেদিন, যাদের সকলকার কাছ থেকে প্রায় তিনশ' শিলিং চাঁদা ওঠে তখনই। সর্বসম্মতিক্রমে ওয়ানজোহি এবং আমার উপর ভার পড়ে নতুন দলের নিয়মকানুনের খসড়া তৈরি করার এবং এও ঠিক হয় যে, সেই খসড়া নিয়ে আমরা নাইরোবিতে এমন কয়েকজন লোকের কাছে যাব, যারা এ বিষয় আমাদের সাহায্য করতে সক্ষম হবে।

সে সময় সরকারী নিয়মানুসারে কোন আফ্রিকানকে তার জেলা থেকে নাইরোবিতে যেতে হলে তার ভারপ্রাপ্ত জেলা কর্মচারীর কাছ থেকে 'ছাড়পত্র' নিতে হত তাকে। এই ছাড়পত্র পাবার কোন আশাই ছিল না আমার, কাজেই আমরা ঠিক করেছিলাম যে, ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন বিলেতের রাণীমাতা নেয়েরা শহর পরিদর্শনে আসবেন সে সময় আমরা নাইরোবির দিকে রওনা দেব, কারণ সে সময় শহরের সমস্ত অরক্ষণাহীনরাই রাণীমাতার রক্ষণাবেক্ষণে বাস্তব থাকবে। নাইরোবি পৌঁছে আমরা সোজা হেনরী ক্রিমেন্ট ওয়ারিথ নামক একজন কিকুয়ু আইনজীবীর দপ্তরে যাই। হেনরীর বাবা আমার সঙ্গে আগুথি কার্ব শিবিরে অন্তরীণ ছিলেন, কাজেই তাকে আমি অস্পষ্টভাবে জানতাম। তার দপ্তরে কাবুরুর সঙ্গে আলাপ হয়, সে ছিল দক্ষিণ টেটের লোক, সে তখন নাইরোবির বয়্যাল টেকনিক্যাল কলেজে (অধুনা নাইরোবি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) কাজ করতো। হেনরী পরে জোমো কেনিয়াটার পক্ষে আইনজ্ঞের কাজ করে বহু সুনাম অর্জন করে। সেদিন সে আমাদের যথেষ্ট সমর্থনা করে এবং আমাদের রাজনৈতিক মনোভাব ও ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সে যে একমত তা প্রকাশ করে।

তার পরদিন আমরা নাইরোবিতে পিপলস কনভেনশন নামক রাজনৈতিক দলের দুজন মতপাত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এদের নাম হল এলিজা ওমোলো আগার, কর্মনির্বাহক সম্পাদক এবং জোসেফ পি মাথেনগে, সাধারণ সম্পাদক। মাথেনগের বাবা ওথাইয়া গামের একজন প্রাথমিক বয়স্ক ব্যক্তি ছিলেন এবং তা নিজে উগান্ডার বিখ্যাত ম্যাকারারি কলেজে (অধুনা পূর্ব আফ্রিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত তিনটি কলেজের একটির) লেখাপড়া করেছিল। সে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব আনন্দ প্রকাশ করে এবং

একথাও বলে যে, আরও অনেক অন্তরীণ বা বন্দীর কাছ থেকে সে আমার বন্দী-জীবনের অনেক দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনা এবং নেতৃত্বের কথা আগেই শুনেছে। এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন পরেই কেনিয়া সরকার ওমোলো আগারকে কমিউনিস্ট সন্দেহে গ্রেপ্তার করেন এবং ১৯৬১ সালের শেষ অবধি তাঁকে হাজতে রাখেন। তৃতীয় দিনে আমরা টম ম্বায়া'র অধুনা স্বাধীন কেনিয়ার একজন বিখ্যাত মন্ত্রী ও দলনেতা)* সঙ্গে দেখা করি। তিনি আমাকে বলেন যে, আমার সবকিছু চিঠিই তিনি পেয়েছেন এবং যত দূর সম্ভব তার যথাকর্তব্য তিনি করতে চেষ্টা করেছেন।

আমরা তাঁকে আমাদের রাজনৈতিক দল সংগঠনের ইচ্ছার কথা বলি এবং তিনি আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ দেন এ বিষয়ে। আমরা সমস্ত দেশব্যাপী একটি রাজনৈতিক দলের বদলে কয়েকটি ছোট ছোট দলের সৃষ্টি হলে যে উপজাতীয় ঝগড়াঝাঁটির সৃষ্টি সম্ভব, সে বিষয় আলোচনা করি সেদিন। টম ও চাই-ছিলেন উপরোক্ত নাইরোবির দলটির বৃদ্ধিসাধন করতে। কিন্তু তখনকার সরকারী নিয়মকানুন মেনে তা করা ছিল দুষ্কর। আমরা নাইরোবিতে টম ম্বায়া'র জিয়ানির বাড়িটি নিজেদের বাড়ির মত ব্যবহার করেছিলাম। আমাদের নাইরোবি থাকাকালীন চতুর্থ দিনের দিন এন-পি-সি-পির কর্মকর্তারা নাইরোবির কাছেই কালোলোনি নামক স্থানে একটা পল্লী-সংগীত ও নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন এবং তাতে আমরাও দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে নিমন্ত্রিত হই। তাদের সমবেত রাজনৈতিক অর্থপূর্ণ সংগীতগুলি আমার খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু সব থেকে মন্থ হয়েছিলাম আমি এইচ আমবু, প্যাটেল নামক একজন ভারতীয় সংগীতকারের স্বরচিত গানে। গানটিতে আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাগুলি ভারি সুন্দর করে গেয়েছিলেন গায়ক এবং তাতে জোমো কেনিয়াটা এবং অন্যান্য আফ্রিকান নেতাদের নামেরও উল্লেখ ছিল। সেখানেই আমার বিলেতের বিধানসভার লেবার পার্টির সদস্য ব্রীজেন স্টোন হাউসের সঙ্গে আলাপ হয়। তিনি আমার বন্দীজীবনের বৃত্তান্ত খুব আগ্রহ সহকারে শোনেন এবং আর্থারভার শিবিরে মার খাওয়ার ফলে আমার ডান পায়ে হাঁটতে যে কাটা দাগ এখনও আছে, তা দেখে দঃ প্রকাশ

* যখন আসল বইটি লেখা হয়েছিল, তখন তিনি তাই ছিলেন। তারপর ১৯৬৯ সালে আভতায়ার গুলীতে তিনি প্রাণ দেন।

স্বাধীনতা

যদিও... ইচ্ছাকৃত।
...তারা মৃত্যু থাকতে চায়।
...এম-এটা পাশ না করা পর্যন্ত
শমিতা। কিন্তু এই মৃত্যুতে যেন মা
হবার জন্যে একটা অশ্রুত হাহাকার, যা
এতদিন চাপা ছিল, তার টের পেল
শমিতা।...কাস্টমারদের ওপরে তো
কোন প্রতিশোধ নিতে পারে না
সেলস্ গার্লরা।...মীরা থাকলে ঠিক
হেসে উঠত। বলত, এ আবার দুঃখ
নাকি?...ম্যানেজার বলত, লোকসান
হচ্ছে এই, একজন শাসালো মক্কেল
হাতছাড়া হল।...মনোজ খুব হাসবে
রাগিত্রে। বলবে, অমনি একটা ডল
পড়ল, তুমি তো ইচ্ছে করলেই...।
না। এখন নয়, এখন নয়। এ সব কি
ভাবছে শমিতা? ওর চিন্তার সূত্র
ছিঁড়ে গেল। ও তাকাল বইয়ের
পাতায়। সামনেই এম-এ পরীক্ষা।
কিছু পড়া হয় নি। অথচ পাশ করতে
না পারলে এ দোকান থেকে মৃত্যু নেই
তার। এম-এ পাশ করে যদি যেমন-তম
কোন একটা স্কুলের কাজ পেল। যদিও
মনোজ এ ব্যাপারে তাকে খুব হতাশ
করে। বলে, কিসা লাভ হবে না।
এম-এ পাশ বেকারের সংখ্যা কত তা
জান? তোমার মতন ওই সেলস্
গার্লের চাকরির জন্য কত এম-এ
ঘুর ঘুর করছে। শমিতা আশাবাদী।
খুব হতাশ সে হয় না।

ম্যানেজার এতক্ষণ ছিল না
দোকানে। এখন এল, সঙ্গে আরেকটি
লোক, এ লোকটিকে প্রায়ই এখানে
আসতে দেখে শমিতা, ম্যানেজারের কাছে।
লোকটা এমন বিদ্রোহী তাকায়। ওর
আর দোষ কি, ম্যানেজার নিজেরই
যখন...নেহাং শমিতা পাতা দেয় না, তাই।
মীরার সঙ্গে তো ওর বেশ ঠাট্টা-তামাসা
চলে। এমন কি ওর বাড়িতেও ম্যানে-
জারের যাতায়াত আছে। রীতিমত
সন্দেহজনক সম্পর্ক ওদের। এ ছাড়া
অবশ্য মীরার উপায় নেই। নইলে
কবেই তো ওর চাকরি চলে যেত।
শমিতার বেলায় সে প্রশ্ন ওঠে না।
কেন না ম্যানেজার খুব ভাল করেই
জানে, এ দোকানে অনেক কাস্টমারই
আসে শমিতার জন্যে। তার চেহারায়
চটক আছে, হাসিতে মেজাজ আছে,
আর কথা যেন চুসক। কাস্টমারকে
আপন করে নিতে এক মিনিটও সময়
লাগে না শমিতার। মৃত্যু এ কথা
স্বীকার না করলেও মনে মনে হয়ত
অস্বীকার করে না ম্যানেজার।

ম্যানেজারকে ঘরে ঢুকতে দেখেই
শমিতা লুকিয়ে ফেরেছিল হাতের বই।
উনি আবার পছন্দ করেন না, বইটাই পড়া

ডিউটির সময়। কাস্টমার না থাকলেও,
বরং সুইং ডোর ঠেলে বাইরে গিয়ে
দাঁড়াও। অন্তত তোমার চেহারার
দেখানো যদি ভুলিয়ে আনতে পার
রাস্তার কোন কাস্টমারকে। ওর
মনের ভাবটা যেন তাই, শমিতা বন্ধুতে
পারে। নইলে প্রায়ই কেন বলে লোকটা,
কি ব্যাপার আজ একজনকেও জোটেতে
পারলে না?

এ কথা বলারও অবশ্য কারণ আছে।
শমিতা জানে, এ দোকানে অনেকেই
টোকে শব্দ তারই জন্যে। দরজার
বাইরে গিয়ে দাঁড়ানোর দরকার পড়ে
না। সুইং ডোরের কাঁচের মধ্যে দিয়েই
কোন কোন লোক তাকে ঠিক দেখতে
পায়। ঢুকে পড়ে যখন-তখন। এটা-
ওটা জিনিস দেখে, তারপর চোখ টিপে
একটু হেসে চলে যায়। ও তবু কিছু
বলতে পারে না। ও যে সেলস্ গার্ল।
কাস্টমারের সামনে অনর্গল বকে যাও-
য়াই যে তার কাজ, তার দোকানের মাল
সে নিক বা না নিক।

নিজের কাউন্টারে বসে হিসেব
লিখছিলেন ম্যানেজার। আর সিগারেট
খেতে খেতে মৃদু কথাবার্তা বলছিল
লোকটা। শমিতা স্পষ্ট কিছু শুনতে
না পেলেও বন্ধুতে পারছিল, লোকটা
ব্যবসা সংক্রান্ত কিছু ব্যাপার নিয়েই
কথা বলছে। যদিও ম্যানেজার নীরব।
এখন হিসেবের খাতা থেকে চোখ তুলে
শমিতার দিকে তাকাল ম্যানেজার।

বলল, এর মধ্যে কোন কাস্টমার
এসেছিল?

শমিতা প্রেফ অস্বীকার করে গেল।
বলল, না।

দূর, হোপ্লেস। ম্যানেজারের
গলায় বিরক্তি ফুটে উঠল।

লোকটা বলল, হয়ত এই ওয়ে-
দারের জন্যে।

রেখে দিন মশাই ওয়েদার,
ম্যানেজার বলল। বলল, কলকাতার
লেডীদের আবার ওয়েদার, জলে শহর
ভেসে গেলেও তারা বেরোয় মার্কেটিং-এ।

ম্যানেজারের মৃত্যুর শব্দগুলো
কানে যেন বাজল। শমিতার। ও বাসি
খবরের কাগজটা টেনে নিল মৃত্যুর
সামনে। সকালবেলার সেই একঘেয়ে
পূরনো খবর, রাজ্যের বিপ্লব জয়-
ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টের জীবনাব-
সান—আততায়ীর আক্রমণে কলকাতার
ছাত্রাবাসে নিহত এক : আহত এক
ইত্যাদি ইত্যাদি। ও চোখ বুলিয়ে
গেল মাত্র। কিছু মাথায় ঢুকল না।
এত অস্বস্তি হচ্ছিল ওর। শমিতা বেশ
বন্ধুতে পারছিল। ম্যানেজারের লোকটা
তাকে গিলছে যেন। বহুদিন মালফাল
খাই নিচ্ছে। ম্যানেজার হিসেবের খাতা

বন্ধ করে বলল। লোকটা খুক খুক
করে হাসল। বলল, আজ অবশ্য
মালটানারই দিন।

ম্যানেজার বলল, চলবে নাকি?
লোকটা বলল, যদি চালাও।

ম্যানেজার শমিতাকে বলল, আমি
একটু বেরোচ্ছি, এর মধ্যে যদি কিছু
বিক্রিষ্টি হয় তো হিসেবটা তুমিই
রেখ? দেখবে যেন কোন গণ্ডগোল না
হয়। তোমার হিসেবে আবার ভুল-
টুল থাকে।

লাল টকটকে হয়ে উঠল
শমিতার কান। মধ্যবয়স্ক ম্যানেজারের
ধমক আর যাই হোক স্নেহের নয়।
ম্যানেজার উঠে দাঁড়াল। প্যান্টের
কোমরটা একটু টেনে তুলতে তুলতে
তাকিয়ে দেখে নিল একবার দেওয়ালের
আয়নার তার তামাটে চোয়াড়ে মৃদুখানা।
ওর সঙ্গের রোগা লম্বাটে কালো
লোকটা দেখল নিজের ধতি—কাদা-
জলের ছিটে লেগে ধতির একেবারে
বারোটা বেজে গেছে।—লোকটা বিড়-
বিড় করে বলল। ওর সারা মধ্যে বিদ্রোহী
একটা অস্বস্তিকর ছাপ। ব্যাক্ ব্রাশ-
করা পাকা চুল ভরা মাথা, তোবড়ানো
গালটা নেড়ে বলল, মাইব ট্যান্ডলোটা
না এখন.....।

ওর কথা শেষ করতে দিল না
ম্যানেজার। বলল, আরে ঠিক আছে,
ঠিক আছে। বলতে বলতে ওর ঘাড়
থরে প্রায় ঠেলেই বার করে নিল।
যাবার সময় শমিতাকে বলে গেল
ম্যানেজার, আমি আটটার আগেই
ফিরব। শমিতা যন্ত্রের মতন মাথা
নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

ওদের টুকরো কথা, যা ওরা বলতে
বলতে গেল, শমিতার কানে এসেছিল
কিছু। ক্যালকাটা বার...জেল্লা কাটা
মাইরি...।

কাউকে সস্তা বলে মন্তব্য করতে
চায় না শমিতা। তবু তার মনে হয়ে-
ছিল, বর্ষার দিনে ঘরে বসে কবিতা
পড়ে কেউ, গান-টান গায়, কেউ বা
দাওয়াই নিতে ছোট্ট সরাব ভাটিখানায়।
শমিতা ভাবছিল, তার যদি কোন ওষুধ
থাকত...

পশ্চিম আকাশে এখন প্রচুর মেঘ।
সুইং ডোরের কাঁচের মধ্যে দিয়ে শমিতা
তাকিয়ে থাকল দূরে। কাছাকাছি
কোথাও বোধহয় বৃষ্টি নেমেছে, এদিকেও
জল নামল বলে। আকাশময় ছড়িয়ে
আছে কালো মেঘ। শেষ বিকেলের
মরা আলোর রেখাটুকু মূছে গেল ফিকে
অন্ধকারে। বিদ্যুৎ চমকালো। প্রচণ্ড
জোরে মেঘ ডেকে উঠল। বাইরের
বিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ও ভুলে
গেল। কিছু সময় আগের এক রুচিহীন

মানুষের অগমান। ওর মনে হল, ঈশ্বর নামের কেউ যদি থেকে থাকেন, তবে তিনি একবারে বৈরাসিক নন। মন খারাপের দিনে সন্ধ্যা ভাটির দাওয়াই যাদের না জোটে, তাদের প্রকৃতি সহায় থাকে। নইলে এমন ঘটা করে বাড় আর জল নামে! ভিজ্জে কাকের মতন ছোটখাটুটি করছিল রাস্তার মানুষগুলো, জ্বলেও যারা ছাতা নেয় না কোনদিন। শমিতা দেখছিল সাবধানী মানুষগুলোর কান্ড, নিন্ট-মোনিয়ার ভয়ে তারা ঠাসঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে ছোট চায়ের দোকানের টিনের শেডের তলায়। বেশ লাগছিল ওর, হঠাৎই যেন মনে পড়ে গেল স্বামী মনোজকে। কি করছে এখন ও? নিন্দায় দরজাখানলাগুলো পটাপট বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় শুয়ে নভেল পড়ছে। হুঁস! এ সময় যদি থাকত ও! ওই হিসেবী লোকটাকে জের করে তুলে দিয়ে...। সত্যি বৃষ্টিতে ওর এত ভয়! মনটা হৃদয় হয়ে উঠল শমিতার। ওর প্রাণ খুলে গইতে ইচ্ছে করলো। কেউ দেখছে না, কেউ শুনছে না, একা ঘরে এক লাইন রবীন্দ্রসংগীত গাইলেই বা ক্ষতি কি? যদি বাইরে গিয়ে বৃষ্টিতে একবার ভিজ্জে আসে! আকাশে কি দরুণ মেঘ! শমিতা অনেকদিনের মতনই আজ আবার অনুভব করল বয়েসটা তার বয়স পেরোলেও মনের রং তার এখনও কাঁচা। ওর মনে হল, শব্দ আমি কেন, স্তব্ধ এমন অনেকেই আছেন, যাদের বয়েস হয়েছে, কিন্তু মনটা আজও ছেলেমানুষই থেকে গেছে। আমরা বাইরের ঢালচলনে সংকত, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একবারে একেকটি শিশু। ও একা ঘরে চেসে উঠল, খুব জোরে হাসল, ওরপর থেকেও গেল।

বাইরে বাড়, জল, শব্দ বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সূইং ডোরের কাঁচের মধ্যে দিয়ে ও আকাশ দেখছিল। এখন ভীষণ অন্যানসক শমিতা।

ঠিক কতক্ষণ হবে খেয়াল নেই। ও মোহাচ্ছন্ন মতন চেয়েই ছিল বাইরের আকাশে। সূইং ডোর তেলে ঘরে ঢুকল এক দীর্ঘ দেহের সাহেব যুবক। লালচে ধরনের ফর্সা চেহারায় ফ্রেমকাট দাড়ি। একমাথা সোনালী চুল, চোখের মণি দুটো নীল। একেবারে যেন স্নান করে ঢুকল ঘরে। গায়ের মেরুন রঙের সিলেক্স ভিজ্জে গেঞ্জীটা লেগটে আছে তার লোমশ চওড়া বুক। পরনে একটা সাদা প্যান্ট। মাথার চুল বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছে। শমিতা সরে এসে দাঁড়াল নিজের কাউটারে। আবার সেই দারুণ প্রিয়ালিটি, ও মনে মনে

ভাবল। ভাবল, আমি উড়িয়া কনারের সেলস্ গার্ল শমিতা মর, হেসে অভিযর্থনা জানাতে হবে কাস্টমারকে।

ভুরু বাঁকিয়ে সারা শরীরে হাসির ঢেউ তুলে ও বলল, ইয়েস্ কাম ইন্। কিন্তু সাহেবকে উত্তেজিত করল ন্যু ওর সেস চাউনি। শমিতা জানে না তার চেহারায় মাদকতার চেয়ে পবিত্রতা বেশি। ওর ক্রীমমাথা নরম ফর্সা মুখটা সুন্দর, বড় নিপাপ, আর চোখ দুটো! কয়েক মুহূর্ত সাহেব তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। মনে হল, কি যেন আবছা। শমিতা হাসিমুখে আবার প্রসন্ন করল, কি চায় সে!

সাহেব কোন জবাব না দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মরের চারদিকের শো-কেসে। চোখ দুটো তার হঠাৎই খেঁমে গেল যেন সিলভারের গয়নাগুলোর দিকে। শমিতাকে বলল, হামার একটো মালা দেও। বাংলা ভাল না বলতে পারলেও তার এই অনেক কষ্টের চেষ্টা-কটকট অন্য খুশি হল শমিতা, উপভোগ করল। ও সিলভারের তৈরি গলার কতগুলো তার শো-কেস খুলে এনে দিল সাহেবকে। একটাও পছন্দ হল না তার। বড় খুঁতখুঁতে মন সাহেবের। খুঁদিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে দেখল সেগুলো। তারপর শমিতাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল আবার সময় কি মনে করে যেন ঘুরে দাঁড়াল। বলল, হামি জার্মান কন্সট্রাক্টে ঠাকে, এখানে ল্যান্ডস্কেপ টিচিং ডিটে এসেছে।—নিজের পরিচয় দিয়ে তারপর বলল, হামার একটো গার্ল ফ্রেন্ড জার্মানীতে, সে একটো মালা চায়, ইন্ডিয়ান মালা, টোমি পছন্দ করি ডিবে?

সাহেব তার প্রিয়জনের বর্ণনা দিতে লাগল, তার বলার কায়দা আর চোখের জঙ্গলীয় মধ্যে দিয়ে বার বার ফুটে উঠছিল তার মনের গভীরতার পরিচয়। সে যেন কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না, তার প্রিয়জন কত সুন্দর, কত পবিত্র তার চেহারা, সে আর পাঁচজন কমন লেডীর মতন নয়। তার রুচি মার্জিত, চোখ দুটো তার স্বপ্নালু, এমন লেডীর জন্য কি মালা নিতে পারে সে? একটু মচকি হেসে, শমিতা নিজে পছন্দ করে যখন এগিয়ে দিল একটা হার, তখন জার্মান যুবকটি খুশি হয়ে তাকে একটি অশ্রুত অনুরোধ করে বসল। যদিও শমিতার জীবনে এ নতুন কিছু নয়। অনেক কাস্টমারই তো করে থাকে এ ধরনের আবার কিংবা অনুরোধ। শমিতার কাস্টমারিট বলল, টোমি মালাটা পিঁড়িয়া লও, হামি ডেখবে, সেই লেডীকে

প্রটো বেসে। শমিতা প্রথমে তার পরে দেখানোর প্রয়োজন। এ ভালই মানাবে। সিলভারের এ গয়না গুলো তো সবাইকেই আনায়। কিন্তু জার্মান যুবক নাছোড়বান্দা। শমিতা পরল হারটা। কত সময়ই তো তাকে শুনতে হয়, কাস্টমারদের এসব আব্দার, যখন তারা শাড়ীর রঙ ঠিক করে উঠতে পারে না কিছুতেই, তখন তাদের মন জোগানোর জন্য নিজের গায়ের সঙ্গে শাড়ী জড়িয়ে দেখাতে হয়, রঙবেরঙের শাড়ী। এও তো তৈরী এক ব্যাপার। যুবকের দিকে চেয়ে শমিতা হাসল। কিন্তু আশ্চর্য, জার্মান সাহেব অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে তাকে। শমিতা বেশ বুদ্ধিতে পারছে, মালা দেখার ছল করে সাহেব তাকেই দেখছে। কিন্তু এ চোখ যেন আর্টিস্টের চোখ, এ দেখা যেন আর্টিস্টের দেখা। ও প্রথমে কৌতুকবোধ করছিল। তারপর ক্রমেই অস্বস্তিতে মরে যাচ্ছিল শমিতা।—হ্যাড্ ইউ স্যাটিসফায়েড? বলে ও খুলতে যাচ্ছিল হারটা, কিন্তু নীল চোখের মণি ঘুরিয়ে সাহেব যেন নিষেধ করল। কতক্ষণ, আর কতক্ষণ ভাল লাগে তার এ পাগলামী? কি দেখছে ও অমন করে! শমিতার বুক কাঁপতে লাগল। এখন দোকানে কেউ নেই। বাইরে বৃষ্টি রাত, আঘাতের কালো মেঘ, নির্জন হয়ে আসছে কেয়া-তলার ওই রাস্তাঘাট। কি উদ্দেশ্য জার্মান সাহেবের! তোমার দেখা শেষ হল? ও বেশ রুদ্ধ করেই বলতে চাইল। কিন্তু পারল না। সেই আশ্চর্য চাউনির কাছে ওর যেন দারুণ পরাজয়। ভেতরে ভেতরে তাকেও যে অস্থির করে তুলছে অচেনা ওই মানুষটার চোখের ভাষা।

বেশ কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে যুবক বলল, জাস্ট লাইক ইউ, জাস্ট লাইক, সেই লেডী তোমার মতন আছে।

ওর থর করে কেঁপে উঠল শমিতা। মুহূর্তে ভেঙে গেল যেন তার সর মোহ। ওই আশ্চর্য চোখ দুটো তাকে দেখছিল না তবে! উড়িয়া কনারের সেলস্ গার্লের মতো কাস্টমার খুঁজছিল তার আরেকজনকে। মালা পছন্দ হল। দাম ফেলে দিয়ে চলে গেল জার্মান যুবক। বকের মধ্যেটা যেন মোড়ল দিয়ে উঠল শমিতার। ওর মনে হল, এর চেয়ে যদি শো-কেসের ওই সাজান পড়ল হতাম!

উন্মাস্তু

উন্মাস্তু—গ্রীহিরণ্যায় শব্দোপাখ্যায়।
সাহিত্য সংসদ, ৩২এ আচার্য প্রফুল্ল-
চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য : দশ
টাকা।

“উন্মাস্তু” বাংলা সাহিত্যের একটি
মূল্যবান দলিল। দেশ বিভাগের পর
স্বাধীনতা অর্জন করে আমাদের দেশের
লক্ষ লক্ষ নরনারীকে—কি অপারিসীম
দুঃখ, অবমাননা এবং নির্যাতন সহ্যে
হয়েছে, সে কথা আজ আর কারোর
অজানা নয়। বিড়ম্বিত, ছিন্নমূল এই
মানুষগুলি “উন্মাস্তু” নামে আখ্যাত
হয়েছেন। পিতৃপুরুষের ভিটা ছেড়ে
পূর্ব পাকিস্তান থেকে কেন এরা
পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন, পশ্চিমবঙ্গের
সরকার কিভাবে এদের সমস্যা সমা-
ধানের চেষ্টা করেছেন, এই সমস্যার
ব্যাপকতা কতদূর, এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয়
সরকারের ভূমিকা কি, এই সব বিষয়ে
লেখকের সমীক্ষা পাঠকের গভীরতর
চিন্তা জাগিয়ে তোলে। গ্রীহিরণ্যাবাদ
সুলেখক এবং উন্মাস্তু পুনর্বাসন বিভা-
গের মহাধ্যক্ষ হিসাবে উন্মাস্তু সমস্যার
সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তাই
ইতিহাসকে তিনি বিকৃত করেন নি,
নিরপেক্ষভাবে বিবৃত করেছেন।

এই গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য
নিক হল এটির রচনা পদ্ধতি। গল্প
বলার ভাষাতে লেখক যে কত তথ্য পরি-
বেশন করেছেন এবং কত ঘটনা বিবৃত
করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। “লীলা
রায়ের প্রস্তাব সমর্থন করে জয়তারা
উন্মাস্তু কলোনির কৃষিজীবী অধিবাসী-
দের আবাদযোগ্য চাষের জমি দেওয়ায়
বিখ্যাত রাজনৈতিক কর্মী” স্ত্রীনাথন
নিয়োগীর ক্ষোভ, উন্মাস্তু পুন-
র্বাসন বোর্ড থেকে গ্রীসতীশচন্দ্র দাশ-
গুপ্তের পদত্যাগ, উন্মাস্তু দরদী
বিজ্ঞান সাধক ডঃ মেঘনাদ সাহার
ক্লান্তিহীন প্রয়াস এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ
মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলনের কথা

এক নতুন ইতিহাসের ভিত্তিভূমি রচনা
করেছে। আগ্রহাশিবরবাসী নর-
নারীর দৈনন্দিন জীবনের যে সত্যনিষ্ঠ
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তার থেকে
বোঝা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জন করবার
জন্য কি অপারিসীম মূল্য এ দেশের
মানুষকে দিতে হয়েছে। কুপার্স
ক্যাম্পের শিশুখাদক শূকরের কাহিনীটি
যেমন অভাবনীয় তেমনই বীভৎস।
দূরদর্শিতার অভাবে এবং নতুন
জিনিষের আকর্ষণ বিবেচনা না করে
খাঁপ দিতে গিয়ে আমাদের দেশে কেমন
করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় তার
একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে আমাদের
একজন অডিটর জেনারেলের একটি
অভিনব প্রস্তাবের ইতিবৃত্ত অতি
সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন গ্রীহিরণ্য-
বাদ। এই ঘটনার শোচনীয় পরিণতি
এবং সে সম্পর্কে তদন্তের ভারপ্রাপ্ত
ব্যক্তিদের ঘটনাস্থলে না গিয়েই তদন্ত
করে আসার কাহিনীর ভিতর দিয়ে
আমাদের জাতীয় চরিত্রের দুর্বল দিক-
গুলি অতি স্বচ্ছভাবে চোখের সামনে
ধরা দেয়। নেহরু-লিয়াকৎ চক্টির
পরিপ্রেক্ষিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখো-
পাধ্যায়ের তীব্র প্রতিবাদ ও মন্ত্রিসভা
থেকে পদত্যাগের ফলে ভারত সরকারের
উন্মাস্তু নীতি পরিবর্তনের ঘটনাবলী
মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সমাজ
এবং ইতিহাস-সচেতন পাঠকেরা এই
গ্রন্থটি পাঠ করে বিশেষ আনন্দলাভ
করবেন।

সময় ভাঙার শব্দ—প্রণব চট্টো-
পাখ্যায়। নবজাতক প্রকাশন, ৬ এণ্টনী
বাগান লেন, কলিকাতা-৯। মূল্য :
দুঃ টাকা।

একালের বাংলা কাব্যেও শিকল
ভাঙার জয়গান সোচ্চারে ঘোষিত হচ্ছে।
তবুও সমস্ত মূর্ত্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে
চলেছে সুগভীর ষড়যন্ত্র। একালের
এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিকও তন্দরাসা

বিভ্রান্ত হচ্ছেন। তবু তার মধ্যে যে
কাজন তরুণ কবি আজ সর্বহারাদের
জয়গানে সময় ভাঙার শব্দে সাহিত্যাকাশ
মুখর করে তুলেছেন—তাঁদের অন্যতম
হচ্ছেন প্রণব চট্টোপাধ্যায়। স্বতঃস্ফূর্ত
ভাবে, স্বচ্ছ চিন্তাধারা এবং ঋজু বক্তব্য
প্রকাশের সারল্য প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের
কবিতাসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর
কবিতা পাণ্ডিত্যের জটিলতা থেকে মুক্ত
বলেই তা অকপটে চট করে সাধারণ
মানুষের চিত্তকে উচাটন করে তোলে।
সঙ্গে সঙ্গে সত্যকও। প্রণবাব্দ
বলেছেন—

“ভদ্রমহোদয়গণ!

আপনাদের জানা থাকা ভাল

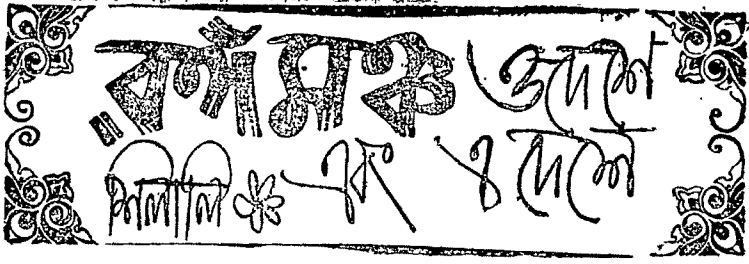
চকচকে ষড়যন্ত্র এগিয়ে আসছে

কটেবন্ধুর মতো পা ফেলে পা ফেলে”

(তদন্তকারীর প্রস্তাব)

শুধু বাংলা দেশের বন্ধুর মধ্যেই
নয়, যেদিকে তাকাই সাধারণ মানুষের
বিরুদ্ধে চলছে গোপন ষড়যন্ত্র। আর
সময় ভাঙার শব্দে হুঁশিয়ার করে দিয়ে-
ছেন প্রণবাব্দ। তিনি বলেছেন—
“সময় নেই কমরেড; আমাদের রক্ত-
বীজে জন্ম নিক হাজার লেনিন!”
প্রসঙ্গত তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে-
ছেন মুখোষের সমস্ত চতুর শিল্পের
(‘আগুন উত্তাপে’) কথা; তিনি
জানেন ‘আমারই একান্ত পাশে বসে
থাকে/গৃহস্থ মে মাস।’ ‘মধ্যাহ্ন এখন’
কবিতায় ‘ডাকাতিয়া রোদের’ কাহিনী,—
স্বভাবতই বর্তমান সামাজিক অবস্থার
পরিপ্রেক্ষিতে এই কবিতায় মানুষ এবং
প্রকৃতির মূল্যায়ন করা হয়েছে।

সংগ্রাম-চেতন কবি পূর্ববাংলায়
ভাষাসংগ্রামী কোনো বন্ধুকে দৃঢ় প্রত্যয়-
বোধে অভিনন্দন জানিয়েছেন, ‘প’চিগে
বৈশাখ’ হাতে তুলে নিয়েছেন ভেরী,
আবার কোনো কিশোরের মুখ মনে হলে
মনে পড়ে তার বাংলাদেশে নদ্রুলের
মুখ। কবি বিজ্ঞানসচেতন, প্রকৃতির
আহবানে উন্মুখ এবং সহসা রণক্ষেত্রে
তিনি আজ উপস্থিত। বলা বাহুল্য,
কবির কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠক-
দের রাষ্ট্র ও সমাজের গলদ সম্পর্কে
সচেতন করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য
করে। আমরা মনে করি, এখানেই
কবির সাধকতা। কারণ কবি এক
বিশেষ সময়ে সময় ভাঙার শব্দ তুলে
নির্ধাতিত, শোষিত মানুষদের আহবান
জানিয়ে বলিষ্ঠ প্রগতিশীল ভূমিকার
স্বাক্ষর রাখতে পেরেছেন। কাব্য
গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুপরিষ্কার।



জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মানুষ হিসাবে ভাগনার ছিলেন অত্যন্ত একরোখা প্রকৃতির। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সব ব্যাপারে তাঁর মতামতগুলিই সব সময় নিখুঁত। কারুর সাথে মতান্তর দেখা দিলে তিনি এমনই তর্ক শুরুর করে দিতেন যে, সে বেচারী শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করতে বাধ্য হত। আর পাঁচজনের তাঁর মতামত সম্পর্কে আগ্রহ না-ও থাকতে পারে, এ সহজ কথাটি তিনি বুঝতেন না। নাটকলা, সংগীত, দর্শন, এমন কি নিরামিষ ভোজন সম্পর্কেও নানাবিধ প্রবল মতামত প্রকাশ করে তিনি অসংখ্য চিঠিপত্র, পুস্তিকা এবং গ্রন্থাবলী রচনা করে গিয়েছেন। নিজের লেখা অপরের পয়সায় ছাপিয়ে নিয়েই তিনি ক্ষান্ত হতেন না। পরিবারের পাঁচজনের সাথে বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে সেগলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে শোনাতেন।

তাঁর গীতিনাট্য রচনার পদ্ধতিও ছিল বিচিত্র। যেই একটি গীতিনাট্যের গল্পের কাঠামোটুকু খাড়া হল, সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধুদের ওপর সমন জারি হল তাঁর বাড়িতে এসে সেটুকু শুনে যাবার জন্য। এখানে একটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব শ্রোতাদের ডাকা হত স্তুতির জন্য, সমালোচনার জন্য নয়। গীতিনাট্যটি লেখা শেষ হলে বন্ধুদের আবার ডাকা হত সেটি শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়িয়েছে তা পরখ করে দেখতে। এর পর আসত প্রকাশনার পর্ব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাব্যংশ প্রকাশিত হবার দীর্ঘদিন পরে তার ওপর সমালোচনা করা হত। বড় বড় সরকারেরা যেমন বিদ্রোহীভাবে পিয়ানো বাজিয়ে থাকেন তাঁর পিয়ানোর হাতটিও ছিল ঠিক তেমনি। কিন্তু কোন উৎসব উপলক্ষে দশজনের সাথে একত্রিত হলেই নামকরা পিয়ানিস্টদের সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই পিয়ানো বাজাতে বসে যেতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেবল নিজের রচনাবলীই বাজাতেন তিনি। ভাগনার সাক্ষাৎ ছিলেন না। কিন্তু সে যুগের সেরা গায়কদের বাড়িতে ডেকে এনে নিজের গীতিনাট্যের অংশবিশেষ

গেয়ে শোনাতে একটুও কুণ্ঠিত বোধ করতেন না।

তাঁর মান-অভিমানের পালা চলত ছ' বছরের শিশুর মত। মেজাজ ভাল না থাকলে হাত-পা ছুড়ে ফুরুক্ষেত্র কাণ্ড করে তুলতেন। কিস্বা একেবারে স্তব্ধ হয়ে বলতেন, প্রাচ্যের কোন বৌদ্ধ মন্বদরে গিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দেবেন। কখনো এর দশ মিনিটের ভেতরেই আন্দুত পরিবর্তন দেখা দিত। তখন শিশুর মত ছোটোছোটো মতামতি করে বাড়িটিকে আনন্দে মগ্ন করে তুলতেন। গোমা কুকুরের মৃত্যুতে যে মানুষ শোকে বিহবল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর হৃদয়হীনতার কাছে কখনো কখনো নিষ্ঠুরতম রোমান সল্লাটরাও পরাভূত হত।

কোনরকম দায়িত্ববোধ তাঁর ছিল না। ঠিকমত সংসারের ভরণপোষণের ক্ষমতা তাঁর ছিল-ই না, এমন কি সে ব্যাপারে সামান্যতম দায়িত্বটুকুও অস্বীকার করতেন। তিনি বলতেন যে, তাঁর মত মহান ব্যক্তির অভাব-অভিযোগ দূর করে অপরাপর সকলের নিজেদের ধন্য মনে করা উচিত। তকাতরে সবার কাছে টাকা ধার করতেন তিনি। পরিচিত এবং অপরিচিত কত নরনারীর কাছে যে ধার চেয়ে চিঠি লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। ঋণদাতারা আইনের সাহায্য গ্রহণ না করলে তিনি নিজের ধার কখনো শোধ করতেন না।

হাতে টাকা এলে দরহাতে উড়িয়ে দিতেন। অথচ কত টাকা যে ধার করে শোধ দেন নি, সে কথা একবারও মনে আসত না। বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী এক হুদলোক কোন এক শহরে আটচালিশ হাজার টাকার ঋণ শোধ করে দেবার পরের বছরই অপর এক শহরে তাঁকে জেল থেকে বাঁচাতে এক লক্ষ আঠাশ হাজার টাকার দেনা মেটাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ভাগনার নৈতিক চরিত্রও ভাল ছিল না। কত নারীর সাথে যে তিনি প্রেমের অভিনয় করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর প্রথমা পত্নী মিনা কুড়ি বছর অকথ্য অত্যাচার সহ্য করে শেষ পর্যন্ত বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হন। মিত্রায়া পত্নী কসিমা ছিলেন বিখ্যাত হাগোয়িয়ান সুরকার লিস্টের কন্যা এবং ভাগনার বিশেষ অনুরাগত এক বন্ধুর সহধর্মিণী।

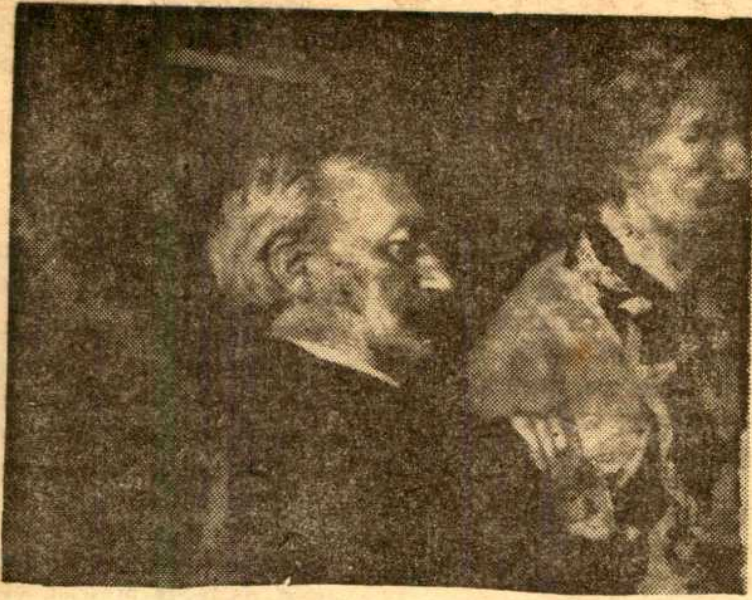
কসিমাকে তাঁর প্রথম স্বামীর ঘব থেকে বের করে এনেছিলেন তিনি। সবচেয়ে মজার কথা হল এই যে, কসিমাকে যখন তাঁর স্বামীর ঘর থেকে তাঁর কাছে চলে আসবার কথা বলেছেন, ঠিক সেই সময়েই এক বন্ধুকে লিখেছেন তাঁর জন্য এক ধনী বিবাহযোগ্য মহিলার খবরাখবর নিতে।

তাঁর মত স্বার্থপর মানুষ চোখে বড় একটা পড়ে না। কে তাঁকে ক'দিনে পারবে, অথবা কতটা ভিত্তি-প্রস্থা নিবেদন করবে, তার ওপর ভিত্তি করেই অন্যদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতেন তিনি। যে মন্বর্তে ক'রুর প্রতি বিরূপ হতেন, তখনই তার সাথে সব সম্পর্ক চাঁকিয়ে ফেলতেন। হিতাকাঙ্ক্ষীদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে গেলেও বিনা শ্রদ্ধায় তিনি তাদের পরিত্যাগ করতেন।

মানুষের সাথে শত্রুতা সাধনের একটা বিশেষ ক্ষমতা তাঁর ছিল। সামান্য মতান্তর অনেক ক্ষেত্রেই ক্রোধীতম মনান্তরে পরিণত হত। একবার এক সংগীত সমালোচকের ওপর চটে গিয়ে তাঁকে এক গীতিনাট্যের একটি হাস্যকর চরিত্র হিসাবে চিত্রিত করেই ক্ষান্ত হন নি। হুদলোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে তাঁর উপস্থিতিতে আর পাঁচজনকে সেই গীতিনাট্যটি পড়ে শোনালেন। সারা জীবন লোকজনের সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে যা হয়ে থাকে তাঁরও তাই হয়েছিল। মৃত্যুর সময় ভাগনারের একজন মাত্র বন্ধু অবশিষ্ট ছিলেন।

এসব কথার একটিও বানানো নয়। সংবাদপত্র, পুলিশ রিপোর্ট, সমকালীন বিভিন্ন মানুষের বক্তব্য এবং ভাগনারের আত্মজীবনীতেও এগুলির প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি বিচিত্র চরিত্রের এই শিল্পীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আজ আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই। নিজের সম্পর্কে যেসব ধারণা তাঁর ছিল, সেগুলি আজ নিভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি সত্যিই পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, দার্শনিক এবং সুরকার। জীবনের প্রতিটি দিন চাম্বেশ ঘণ্টা করে নিজের কথা বললেও তাঁর সব কথা ফুরোতো না। তাঁর যুগে নানা দিক থেকে তিনি এত অগ্রসর ছিলেন যে, সমকালীন জনসাধারণের পক্ষে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় নি।

রিয়েনটজির সাফল্যের পর ভাগনার ফ্রায় ডাচম্যান মণ্ডস্থ করেন। ড্রেসডেনের শ্রোতারা কাব্য এবং সংগীতের অভিনবত্বের জন্য এটিকে গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু ভাগনার তাতে একটুও দম্বা ঘান নি। প্রথমে টান হাউসার ও তারপর লহেনাগ্নন রচনা করলেন। মাই স্টার সিগ্গার, পার্সিফাল এবং ডেথ অভ সিয়েগফ্রিড আরো পরের রচনা। এগুলির থেকেই এসেছিল দি রিও অভ দি নিবেলুং রচনার অনুপ্রেরণা। এতগুলি



ভাগনার ও তাঁর স্ত্রী

গ্র্যান্ড ওপেরা রচনা করার সময় তাঁর কোরাস মাস্টারের কাজ সূচন্যভাবে করে এবং ড্রেসডেন ওপেরা হাউসের মাধ্যমে প্রোতাদের রচনার পরিবর্তন করেও তিনি নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেন। টান হাউসার অনুষ্ঠিত হবার পরও তিনি হতাশ হয়েছিলেন। প্রোতাদের ভাল লাগল না, সমালোচকেরা অতি বিরূপ মন্তব্য করলেন। আট রাত্রি চলার পর এটি তুলে নিতে হয়।

ড্রেসডেনেও ভাগনার আর্থিক অবস্থা ভাল হয় নি। কোরাস মাস্টারের পদটি পাওয়া মাত্রই পুরনো পাওনাদারেরা চার-দিক থেকে ছেকে ধরল এবং তাঁদের দাবি মেটাতে আরও ঋণ গ্রহণ করে তিনি অর্ধে জলে পড়লেন। একটির পর একটি গীতিনাট্য মণ্ডপ করে বিফল হবার পর তিনি কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এর থেকেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর মনে একটা বিদ্রোহী মনোভাব দেখা দেয়। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ড্রেসডেনে এক রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার তাকে শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে পালাতে হয়। প্রথম ভাইমারে গেলেন লিস্টের কাছে। সেখান থেকে জুরিখে গিয়ে আন্তঃগোপন করতে হল। দশ বছর দেশে ফিরতে পারেন নি তিনি। জুরিখের দশটি বছর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন:

I have passed from the unconscious to the conscious.... The new form of dramatic music must show the unity of

a symphonic movement, if it is to be a work of art. And this is obtained only when the new form permeates, and is in close accord with, the whole drama and not few arbitrarily selected parts of it. This unity must express itself in a work women together by basic themes which, as in symphonic movements, both oppose and complement one another, form anew, separate and link one another. The dramatic action itself provides the rules for separation and union, this has its origin in the movements of the dance. জুরিখে থাকবার সময় তিনি Die kunst und die Revolution (শিল্প ও বিপ্লব), Das kunstwerk der Zukurft (ভবিষ্যতের শিল্পকর্ম), Das Junden thum in der Musik (সঙ্গীতে ইহুদীবৃত্তি) এবং Oper und Drama গ্রন্থগুলি লিখেছেন। সুইটজারল্যান্ডের এই সম্ভ্রম শহরে একাধিক নারীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। কিন্তু ম্যাটিল্ডে মেডসেনডক নামে এক ধনী বণিকের পুত্রী তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিলেন। ট্রিসটান উনট ইসোলটে লেখবার প্রেরণা এসেছিল একে দেখে। ম্যাটিল্ডে নিজের কবিতা লিখতেন এবং ভাগনার তাঁর পাঁচটি গানে সব দিয়েছিলেন। ম্যাটিল্ডেকে একটি চিঠিতে

ভাগনার লিখেছিলেন:

শিল্পী হিসাবে আমি যেসব স্বপ্ন দেখি প্রায়ই সেগুলি সত্যে পরিণত হয়। ট্রিসটান এবং ইসোলটের ভাবনা যেন তোমার মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কেবল তোমারই জন্য এ গীতিনাট্য আমি লিখতে পেরেছি। তাই সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জীবিত অবস্থায় অন্তঃগামী শত্রুদের থেকে ভাগনারের মত সাহায্য আর কোন শিল্পীই পান নি। তাঁর যতই বয়স বাড়ছিল, তাঁর গীতিনাট্যগুলি ততই তিনি মণ্ডপ্রয়োগের দিক থেকে কঠিন করে তুলেছিলেন। 'দি রিং' গীতিনাট্যটি রচনা করার পর তিনি বলেন যে, কোন রাজপুত্র ছাড়া এটিকে মণ্ডপ করে আর কেউ পারবে না। তেমন কোন রাজপুত্রকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি? স্বথাসময়ে তেমনই এক রাজপুত্র এগিয়ে এসেছিলেন। ইনি ন্যাভেরিয়ার তরুণ রাজা স্টিভান লুডোইক। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি ভাগনারের সম্মানে লোক পাঠিয়েছিলেন। রাজা লুডোইককে যতদিন তাঁর সরকার বাধা দেন নি, ততদিন পর্যন্ত তিনি ভাগনারকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ভাগনারকে তাঁর কাছে নিয়ে আসবার সময় যে চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন—'আপনার জন্যই আমি সিংহাসনে বসেছি। আপনি কি চান বলুন, আমি সাধ্যমত আপনার সমস্ত সাধনের চেষ্টা করব।' বেরগেট ভাগনারের নির্দেশমত বিশেষ ধরনে তাঁর রংগশালা তাঁর সাহায্য ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হ'ত না। এ ব্যাপারে নিঃশেষে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

জর্জ বার্নার্ড শ'র মতে, গান পাওয়ার সাথে ছবি আঁকার অন্তর্ভুক্ত সামগ্র্যসা আছে। কারণ, ছবি এবং গান দু'রকমভাবে ফটে উঠতে পারে। কোন কোন শ্রম্ভার হাতে এগুলি অলঙ্কারময় হয়ে ফটে ওঠে। আবার এক-একজন সুরকার অথবা চিত্রকরের সৃষ্টির সবটুকু জুড়েই শব্দবৈচিত্র্যের অন্তরের গভীরতম ভাব সুপায়িত হয়। এগুলি নাট্যীয় সৃষ্টি।

পৃথিবীর সব দেশেই সুরপ্রধান গান আছে। শব্দমাধ্যমে এবং সুরের উৎকর্ষে সেগুলি অবিস্মরণীয়। কিন্তু সুরের প্রধানতম গানের সুরের বহু দিক কিনা, সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কবোধ বোধ। অনেক বলেন, গানে কেবলমাত্র সুরকে প্রধান্য দিলে তার আলাপে আত্মা মস্ত হুট বটে, কিন্তু আমাদের মনের নিভৃততম কোণের দুঃখগুলিতে নাজ দিতে তা পারে না। তাই সুরমাধ্যমে অতলনীর বহু গানেও আমাদের সখ-দুঃখ, হাসি-কান্না এবং বিরহ-মিলনের ধারি আমরা শুনতে পাই না। হৃদয়বেগ তার ভিতর

চলচ্চিত্র পরিবেশক অফিসের কর্মচারী

গত সপ্তাহে সিনেমা হাউসগুলির কর্মীদের অবস্থা, কি অবস্থাকর অবস্থায় তাঁদের কাজ করতে হয় এবং দর্শকদের স্বাস্থ্য ও প্রজেকশনের ব্যাপারে সিনেমা মালিকরা কত উদাসীন সে কথা গত সংখ্যায় বলা হয়েছিল। সিনেমা মালিকরা নিজেদের লাভের কথাটা যত বোঝেন কর্মচারীদের কথা তেমন বোঝেন না, এমন কি স্বাদের জন্যে তাঁদের এই লাভের ব্যবসা সেই দর্শকদের আরাম ও স্বাস্থ্যের দিকটাও লক্ষ্য রাখতে চান না। চলচ্চিত্র উপদেষ্টা বোর্ডের যে সাব কমিটি গঠিত হয়েছিল এবং যে কমিটি তদন্ত শেষ করেছে, সেই কমিটি চলচ্চিত্র শিল্পের আর এক দিক পরিবেশন সংস্থার কর্মচারীদের বিষয়েও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

চলচ্চিত্র শিল্পে পরিবেশন সংস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পরিবেশন সংস্থার মারফৎ ছবিগুলি বিভিন্ন সিনেমায় দেখান হয়, তার জন্য পরিবেশন সংস্থা কমিশন লাভ করে থাকে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, অনেকক্ষেত্রে পরিবেশকরা প্রযোজককে অগ্রিম দান করে লাভের অংশেও ভাগ নেন, ছবি বন্ধক নিয়ে টাকা দেন; এমনও পরিবেশক সংস্থা আছে যাঁরা প্রযোজনা এবং পরিবেশনা একই সঙ্গে করেন; কখনো স্বনামে, কখনো বেনামে। কোন কোন পরিবেশক সংস্থা একাধারে প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শক, অর্থাৎ তাঁদের নিজেদের সিনেমা আছে। ফ্রেমবিশেষে তাঁদের দাপট এমন যে, গুঁরা প্রযোজককে হুকুম করেন ছবিতে কিরকম শিল্পী থাকবে, কোন তারকাকে নিতে হবে। তাই বলছিলাম,



‘মেঘকালো’ ছবির প্রধান ভূমিকায় সন্নিবিষ্টা সেন

চলচ্চিত্র শিল্পে পরিবেশক সংস্থাগুলির গুরুত্ব আছে।

কিন্তু এই পরিবেশক সংস্থাগুলির কর্মচারীদের কি অবস্থা সে কথাই বলছি। মোটা লাভের অংশটা ত’ পরিবেশক মশাইয়েরে দেন, কয়েকটি ছবি হিট হলে তাঁর গাড়ি-বাড়ি হয়, অন্যান্য দিকে তাঁর অপ্রয়োজনীয় খরচ বেড়ে যায়। কিন্তু কর্মচারী বোচারায় সেই

দশটা থেকে খাটছেন, পাঁচটার জায়গায় ৭-৮টা পর্যন্ত কাজ করেও মালিককে সন্তুষ্ট করতে পারেন না। অনেক পরিবেশক অফিসে যত কর্মচারী দরকার তার চেয়ে কম লোক দিয়ে কাজ করানো হয়, ফলে এত কাজের চাপ পড়ে যে, তাঁরা মাথা তুলতে পারেন না। তার উপর আছে খেলাল-খুশিমত ছাঁটাই। নিজের লোককে বসাতে হবে তার জন্য কর্মচারী ছাঁটাই, ওভারটাইম চাইলে তার জন্য ছাঁটাই ইত্যাদির অভিযোগ লেগেই আছে। অনেকগুলি ডিস্ট্রিবিউটর্স অফিস আছে এমন ছোট ঘরে বা ছাদের চিলেকোঠায় যে, নড়াচড়া দরের কথা বসে থাকাই প্রাণান্তকর ব্যাপার। এই দুঃসহ আলো-বাতাসহীন অবস্থার মধ্যেই কর্মচারীদের কাজ করতে হচ্ছে। বড় অফিসগুলি ছাড়া ছোট অফিসগুলিতে বেতন দেবার নির্দিষ্ট দিন নেই। কেরাণী বা টাইপিস্ট বোচারী সারা মাস খাটার পরও বাড়িতে বলে আসতে পারেন না, কোনদিন বেতন পাবেন। তাও অনেক অফিসে কিস্তি করে দেওয়া হয়। প্রজিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি, চীকৎসার ব্যবস্থা বা ওয়েলফেয়ার ব্যবস্থা? ও সব



কথা ত' কল্পনারও বাইরে। এমনিতে সময়মত এবং পরিগ্রহের উপযুক্ত বেতন জোটে না, কোন কোন অফিসে একজন কর্তৃপক্ষকে ৭৫—১০০ টাকা পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়; এই অবস্থায় প্রভিডেন্ট ফান্ডের কথা ভাববে কে!

অথচ বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত মানুষ পরিবেশক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করেন। তাঁদের আয়ের উপর এক একটা সংসার নির্ভরশীল। এই সরকারের শ্রমিক কল্যাণমূলক কিছু আইন-কানুন আছে। বিভিন্ন কল-কারখানার শ্রমিকরা সংগ্রাম করে বেশ কিছু আইন আদায় করেছেন। কিন্তু সেই আইনগুলি এখনো চলচ্চিত্র পরিবেশক অফিসে পৌঁছয় নি। সেখানে এখনো মধ্যযুগীয় দাস ব্যবস্থার মত কাজ চলছে। অথচ সরকারী প্রচারে ধলা হয়—এই সরকার নাকি জনকল্যাণমূলক। স্বাধীনতার তেইশ বছর পরেও এই অবস্থা চলছে। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

সাগিনা মাহাতো

অবশেষে তপন সিংহের 'সাগিনা মাহাতো' মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটির

প্রস্তুতিকালে অনেক বিতর্ক উঠেছিল, বিরোধিতা দেখা দিয়েছিল। বিরোধিতার কারণ এই ছবির চিত্রনাট্যের অবলম্বন রূপদর্শী লিখিত উপন্যাস। এই উপন্যাসটি মূলত ছিল বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন ও কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী। যে উপন্যাসকে শ্রম-জীবী মানুষ প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করেছিল।

ছবিতে দেখা গেল, পরিচালক তপন সিংহ মূল কাহিনীর আপাতকর অনেক অংশ বাদ দিতে চেষ্টা করেছেন। এত সতর্কতার ফলে যদিও কোন বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, একটি ব্যক্তিগত জীবনকে ঘিরে তিন দশক আগের শ্রমিক জীবনের কিছু টুকরো টুকরো কথা, আর শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে স্বেচ্ছাবাদীর একটা ছমিকা দেখা গেছে। বক্তব্যের চেয়েও ব্যক্তির বীর্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে তা ভাল লাগে, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর দিক থেকে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের চেয়েও সম্মিলিত গ্যাকশনই প্রধান কথা হওয়া উচিত। সেখানেই ছবি অথবা গল্পের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। 'সাগিনা মাহাতো' এদিক থেকে আজকের সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর জীবনের সহায়ক নয় বা মূল্য লাভ করবে না। সম-সাময়িক ঘটনার ওপর ছবি করার ব্যাপারে তপন সিংহ বিশেষ একটি ছমিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর সকল বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হয়েও সেই প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করি। এক্ষেত্রে যদি রূপদর্শীর বহুনির্দিষ্ট উপন্যাসকে

অবলম্বন না করে তিনি দার্জিলিঙের চা-বাগানের পটভূমিতে নিজের স্বাধীন চিত্রনাট্য নিয়ে অগ্রসর হতেন, তাহলে বোধ হয় আরো বেশি সার্থক হতেন। ছবিটি দেখে সে কথাই বার বার মনে হয়েছে।

বাংলাদেশের পাহাড় অঞ্চলের কোন এক ব্রিটিশ কারখানার শ্রমিকদের জীবন-কথা। রেলগাড়ি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে মনে করা যায় দার্জিলিঙ অঞ্চল। এখানে এক জংগী শ্রমিক সাগিনা মাহাতো রুখে দাঁড়ালো শ্রমিকদের প্রতি অবমাননার বিরুদ্ধে। সে নেতার মর্ষাদা লাভ করলো। তার পৌরুষ ও শৌর্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে স্বামীর ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে ঘর করতে এল ললিতা। কিন্তু একদিন এই সাগিনাকে গণ-আদালতে বিচারের নাম করে হত্যা করার জন্য জোর করে উপস্থিত করা হলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাত্রের এই ভয়ঙ্কর বিচার-সভায় শ্রমিকদের সামনে সাগিনা মাহাতো পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করলো শ্রমিক নেতা অনিরুদ্ধের বিরুদ্ধে। যে অনিরুদ্ধ সাগিনা মাহাতোর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাকাতর হয়ে তাকে অপ্রিয় করার চক্রান্ত করেছিল। তার স্পষ্ট বক্তব্য এই বিচার প্রহসনে পরিণত হলো, অনিরুদ্ধের সাক্ষীরা একে একে সরে দাঁড়ালো; প্রথমে বিশাখা, তার-পরে অমল। অনিরুদ্ধের পিস্তলের গুলীতে অমলকে প্রাণ দিতে হলো। এতে সত্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সাগিনা মাহাতোর পরিবর্তে অনিরুদ্ধের বিচার করলো শ্রমিক জনতা।

প্রারম্ভে বলা হয়েছে ১৯৪২-৪৩ সালের সাম্রাজ্যবাদ শাসিত ভারতের দুঃসহ দিনগুলি ছবির ঘটনাকাল। এই বিশেষ ঘোষণার প্রয়োজন ছিল না, কারণ দেশ স্বাধীন হলেও তিন দশক পরে আজো অঞ্চলবিশেষে সেই একই অবস্থা রয়ে গেছে। ইংরেজ মালিক অনেকক্ষেত্রে না থাকলেও দেশী মালিকরা ইংরেজের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না। কিন্তু সাধারণভাবে বর্তমানে শ্রমিকরা সংগঠিত এবং সংগ্রামমুখী। সাগিনা মাহাতোর জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেবার জন্যে অনিরুদ্ধের যে চক্রান্ত, সে রকম স্বেচ্ছাবাদী মানব শ্রমিক আন্দোলনে আজো আছে। বর্তমানে সেখানে এক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডাকলে আর এক ইউনিয়নের নেতা সেই ধর্মঘট ডাকার ডাক দেয়, সেক্ষেত্রে অনিরুদ্ধের মত যতলববাজ শ্রমিক নেতা থাকবেই।



অজয় কর পরিচালিত 'সাগিনা' ছবিতে সানিহী চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিনী মালিয়া।

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী



মুকোভিনেতা শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী

কিন্তু সেই অনিরুদ্ধ হঠাৎ কিভাবে থাকি ইউনিফর্ম পরে বন্দুকধারী বলে পরিণত হলো? কি তাদের পরিচয়? হঠকারী, না ডাকাত? শ্রমিক আন্দোলনে যারা সংস্কারবাদী, ঘটনাক্রমে তারা হঠকারী হয়। কিন্তু অনিরুদ্ধ ত' অতলববাক্য-ক্যারিয়ারিস্ট, সে এই ঝুঁকি নিতে যাবে কেন? যুদ্ধের দিক থেকে তা পরিষ্কার হলো না। রাত্রির অন্ধকারে গা ছম্-ছম্ পরিবেশে এখানে কিছটা ক্রাইম ড্রামার মত মনে হয়েছে।

প্রথমেই বলোছি ছবিটি ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। অন্যরা সবাই কমবেশি পার্শ্বচরিত্র। সাগিনা মাহাতো একটি রোমান্টিক-মানবিক চরিত্র, মানুষের প্রতি তার বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস আছে। এই জগৎ চরিত্রে দিলীপকুমার একেবারে মিশে গেছেন বললে অত্যাতি হবে না। চলায়-বলায়; কখনো ঘৃণা, কখনো প্রেমের অভি-বাজিতে, তার ছোট ছোট ধারালো কথায়, গানে এমন একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলে-ছেন যা দর্শকদের ভাল লাগবে। হিন্দী ছবির নায়ক দিলীপকুমার এখানে সত্যিই একটি চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছেন। বলা চলে, তিনি একাই ছবিটিকে ধরে রেখেছেন। তার সঙ্গে সায়রা বানুকে ভাল লাগে একটি সাধারণ পাহাড়ী মেয়ের ভূমিকায়, তাঁর নাচের ছন্দে চলা, লাস্যময় ভঙ্গি, প্রাকৃতিক পরিবেশে নাচ ছবির রিলিফ। অনিরুদ্ধের চরিত্রে অনিল চ্যাটার্জী এবং অমলরূপে স্বরূপ

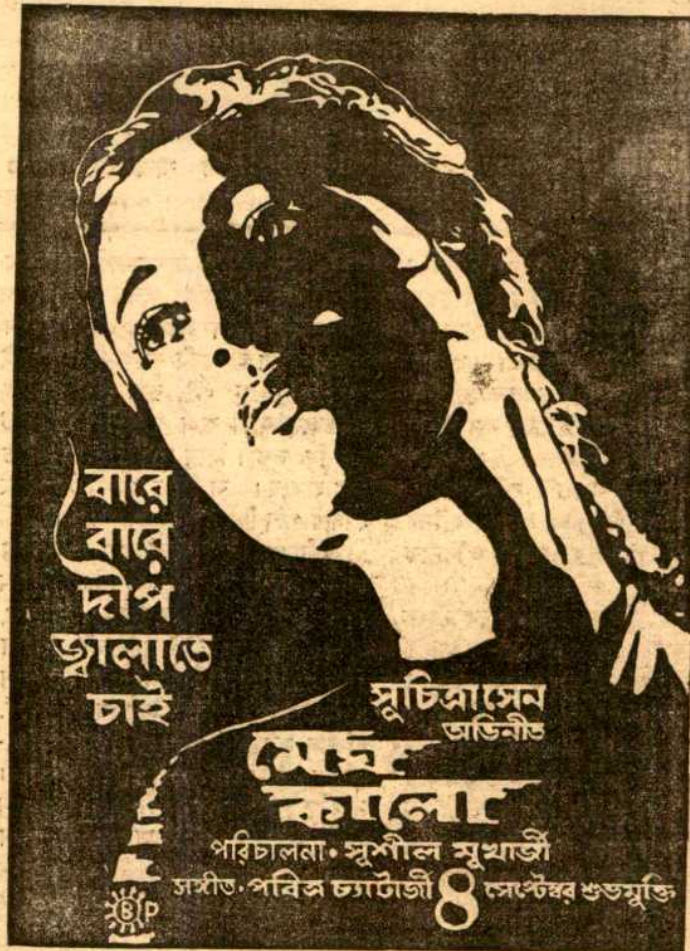
দত্ত আর বিশাখার ভূমিকায় সোমতা সাম্যায় প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্র-গুলিতে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রোমী চৌধুরী, কুমার রায়, রুদ্রপ্রসাদ, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, জে এ লিডল, এ বি কোহেন প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

তপন সিংহ সংলাপ রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পরিবেশ সৃষ্টি এবং সাগিনা মাহাতোর চরিত্র প্রকাশে তাঁর পরিচালিত সঙ্গীত সহায়ক হয়েছে। সঙ্গীতের ব্যাপারে তিনি প্রশংসনীয় সংযম দেখিয়েছেন। একই-ভাবে প্রশংসনীয় রোশনকুমারী পরি-কল্পিত নাচ। পরিচালক ফ্র্যাশ ব্যাক পশ্চাতিতে গল্প প্রকাশ করে দর্শকদের কৌতুহল বজায় রেখেছেন। চিত্রগ্রহণ,

সম্পাদনা, শিল্প নির্দেশনা ইত্যাদির সম্বন্ধিত সার্থকতা ছবিতে রয়েছে।

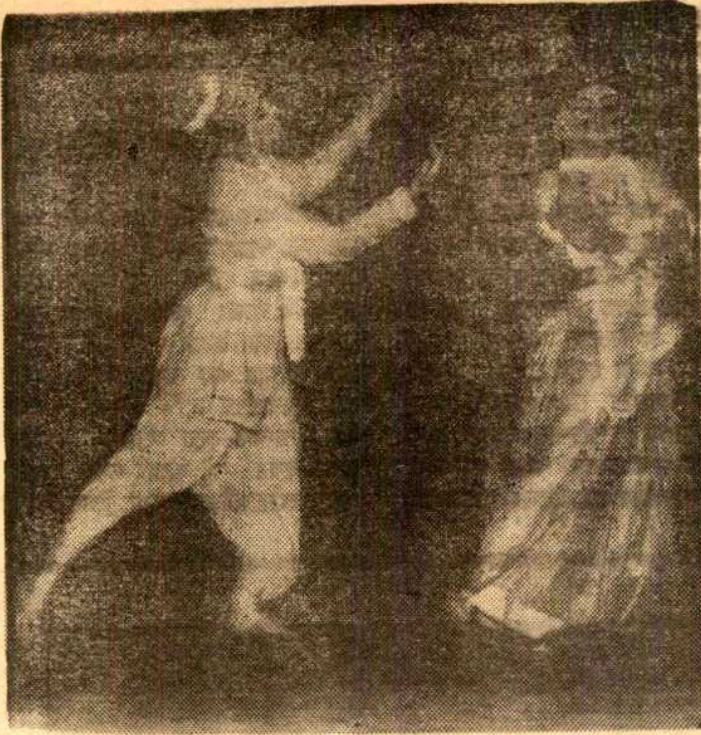
এই কোরেছে ভালো

লাইট এন্ড শেড-এর প্রথম ছবি "এই কোরেছে ভালো" একটি হাসির ছবি। ছবির জগতে হাসির ছবি নির্মাণ বোধ হয় কঠিন কাজ। এক রকম ছবি আছে যাতে যে কোন রকমে দর্শকদের হাসানো হয়। আর এক রকমের ছবি আছে যাতে লোকচরিত্র সৃষ্টি ও শ্লেষ যোগ্য-ভাবে উপস্থিত করে হাসির উপাদান যোগান হয়। এই দুয়ের তফাৎ আছে। প্রথম শ্রেণীর ছবিকে শ্বেল, শিল্পরসহীন



রাধা ০ গুণ ০ আলোছায়া ০ পদ্মশ্রী - অশোকা - লীলা পারিজাত -- মায়াপুরী -- জয়শ্রী -- গৌরী -- রূপালী -- জ্যোতি -- মানসী বীনা -- বাটা -- নৈশাটি -- শ্যামলী ॥

আগামী বুধ (২রা) অগ্রিম টিকিট ০ চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত



স্বাভাবিক বসুধার 'বিদায়' অভিনায় নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্যে শান্তা বসুধার ও রাইতা সেনগুপ্ত।

বলে চিহ্নিত করা হয়। স্বাভাবিক শ্রেণীর ছবি রসোত্তীর্ণ, শিল্পরসের স্বীকৃতি পায়। সত্যিকার হাসির ছবি কখনো সমগ্র চেতনাহীন, বাস্তবতা বর্জিত হতে পারে না। বরং সমগ্র চেতনার তীব্রতা থাকে বলেই হাসির মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করে। দর্শকেরা বাস্তবজীবনের অথবা ব্যক্তিগত জীবনের নান্দ সত্যকে উপলব্ধি করে হাসির আনন্দ উপভোগ করে, আর জীবনকে চিনে নেয়।

"এই কোরেছো ভালো" এদিক থেকে প্রথমোক্ত ধরনের ছবি। ছবির কাহিনী নিছক খেলালী, বাস্তব সম্পর্কহীন কল্পনা। কাহিনীকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক লিখিয়ে হিসাবে নাম আছে। কিন্তু যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিন্তাজগতের যে পরিবর্তন হয়েছে সেকথা তিনি খেলালে রাখেন নি। তাই তাঁর এই কাহিনী সত্যিকার হাসির ছবির দাবি মেটাতে পারে নি। বড় বেশি খেলালী মনে হয়েছে।

যদু গাঙ্গুলী নামক লোকটা মৃত্যুর সমগ্র উইল করে যায় যে, তার সাত লাখ টাকার সম্পত্তি পাবে তার দুই ভাই, যারা বর্তমানে দুঃস্থ অবস্থায় আছে। তবে সম্পত্তি পাবে একটি সতে—দুজনকে এমন দুটি মেয়ে বিয়ে করতে হবে যাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে এবং

নিঃসন্তান। উইল রচনাকারী উকিলের ও তাঁর স্বরী চক্রান্তে দুটি অবিবাহিতা মেয়েকে ডিভোর্স সাজিয়ে তাদের সঙ্গে যে রূপ করা হয় সেই কাহিনী নিয়ে এই ছবি। কিন্তু এই রূপ প্রথম থেকে বাস্তববোধহীন বলে তেমন রসসৃষ্টি ঘটে নি, ভগ্নী দিয়ে লোক হাসাবার মত মনে হয়েছে। যা কিছু রসসৃষ্টি হয়েছে দীঘার পটভূমিতে কাহিনী অংশে।

ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জহর রায়, অন্নপূর্ণা, রবি ঘোষ, কান্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরজিৎ, ললিত চক্রবর্তী, যাই বানার্জী, শমিতা বিশ্বাস, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, নিরঞ্জন রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জ্ঞানেশ মুখার্জী, হরিধন মুখার্জী প্রমুখ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় অধীর বাগচী তেমন কিছু বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে পারেন নি।

দি স্ট্রেঞ্জার

এলিট সিনেমায় প্রখ্যাত পরিচালক লুসিনো ভিসকাসিটির ছবি "দি স্ট্রেঞ্জার" মুক্তিলাভ করেছে। বিষয়বস্তু এবং পরিচালনা নৈপুণ্যে বর্তমানে এটি শহরের সিনেমায় সর্বাধিক আকর্ষণীয় ছবি। ছবির কাহিনীকার এ যুগের

বিতর্কিত মানব আলবার্টো কামু। কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার' বহু অমলাচিত্র সাহিত্য। ছবির বিষয় হিসাবে এই কাহিনী গতানুগতিকতার বাইরে, চিন্তাশক্তি নিয়ে উপভোগ্য। কামুর অস্তিত্ববাদের দার্শনিক বস্তু এতে প্রতিফলিত।

ছবির পরিচালক লুসিনো ভিসকাসিটি; যিনি চলচ্চিত্রে নিও-রিয়ালিজম-এর পথে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

ভিসকাসিটির ২৫ বছর চলচ্চিত্র জীবনে এটি অষ্টম ছবি। বর্তমানকালে ভিসকাসিটি তাঁর প্রথম জীবনের প্রগতি-শিমিরে নেই। কিন্তু কারিগরি দক্ষতায় তাঁর জুড়ি নেই। তাঁর এই ছবিটি সৌন্দর্য থেকেও আকর্ষণীয়।

কামুর 'দি স্ট্রেঞ্জার'-এর নায়ক এক সওয়াগরি অফিসের কেরানি, আলজেরিয়া প্রবাসী। এক আলজেরীয় যুবককে খুনের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল। আদালত তাকে গিলোটিনে প্রাণদণ্ডদেশ দেয়। অপরাধের তার কাছে কোন গুরুত্ব ছিল না, কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে সে হত্যা করে নি। তার বক্তব্য ছিল, প্রথমে সর্ব্বতাপে উত্তপ্ত এবং দিশাহারা হয়ে পিস্তল থেকে গুলী বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সমাজের সকলের চোখে সে নিষিদ্ধ; এমন কি তার উকিলও তাকে জোরালোভাবে সমর্থন করতে পারে নি। কারণ, মায়ের শব্দধারের সামনে বসে সে সিগারেট ও ক্যাফি খেয়েছে, মাকে কবর দেবার পর সে সিনেমা দেখেছে, আলজেরিয়ায় ফিরে এসে তার সহকর্মীগণের সঙ্গে প্রেম করেছে, তার চেয়েও বড় কথা সে জগবানে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ লোকটি অস্তিত্ববাদী। সমাজের গতানুগতিক বিশ্বাস, সংস্কার এবং নীতিতে বিশ্বাস না করা ভয়ানক অপরাধ বলে গণ্য হলো।

ভিসকাসিটি এই কাহিনীকে চিত্ররূপে উপস্থিত করেছেন দুই জেনারেশনের মানুষকে নিয়ে, তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে। একদিকে ক্ষয় যাওয়া বিবর্ণ মানুষ, সমাজের স্বেচ্ছাবিরহ, আর একদিকে ভোগময় জীবন। জীবনটায় অস্তিত্ব উপলব্ধি করে নাও। যৌবনের পরে আসছে জরা, যৌবনই পৃথিবীর সব সৌন্দর্য। ব্যক্তিগতভাবে এই জীবন জিজ্ঞাসার বাইরে আরও একটি বস্তুবাদী চিন্তা আছে। কিন্তু কামু শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী শোষণ অবসান করার সংগ্রাম এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে জীবন জিজ্ঞাসার পথের পথিক নন। সুতরাং ভিসকাসিটি

স্টুডিও ছবির

মৌসুমী বন



‘নল-দময়ন্তী’ ছবিতে অসীমকুমার ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী

বিশ্বস্তভাবে কামর দার্শনিক তত্ত্বকে ছবিতে উপস্থাপন করেছেন।

অভিনয়ে খেমত মাস্ট্রিয়ানি, তেমন আনা কারিনা সমান দক্ষতায় চরিত্র দুটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যে অভিনয় আশ্চর্যসুন্দর, অভিজ্ঞ করে। ইতালীয় অভিনেতা মাস্ট্রিয়ানি লা দোলচা ভিটায় প্রথম অভিনয় চমক সৃষ্টি করেছিলেন। ডাচ অভিনেত্রী আনা কারিনা ফরাসী নিউ ওয়েভধর্মী ছবির পরিচালক জাঁ লুক গডার্ডের সৃষ্টি। তাঁর নিউ ওয়েভ ছবিগুলিতে এই অভিনেত্রীকে দেখা গেছে। কামর কল্পনার চরিত্রটিকে মাস্ট্রিয়ানি জীবন্ত করে তুলেছেন।

ছবিতে বর্জোয়া বিচারালয়ের দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। বিচারপক্ষিত, বিচারক এবং বিচারালয়ের স্থলতার বিষয়ে ভিসকটি চমৎকার শ্লেষ শব্দের পরিচয় দিয়েছেন। এই সঙ্গে আলজেরিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি, রঙিন পরিবেশকে টেকনিকলারে চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ছবিটি দেখবার মত।

নাটকের কথা

বিবিন পয়সার ভোজ

গত ১৮ই আগস্ট রবীন্দ্রভারতী

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দশন বিভাগের পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্র ভারতী মঞ্চে ‘বিনি পয়সার ভোজ’ নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। মূল কাহিনীর নাট্য রূপ দিয়েছেন দিলীপ দে এবং পরিচালনা করেছেন তিনি। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন কিরণশঙ্কর জানা, চিত্তরঞ্জন দাস, জগবন্ধু নাথ, সুভাষ মুখার্জী, সুনির্মল বাইন, রতন পাল, দিলীপ দে। অনুরোধে সভাপতিত্ব করেন ডঃ রামচন্দ্র পাল।

জুলিয়াস সীজার

মুদ্রধারাগোষ্ঠী, রবিবার, ৬ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টিয় মুদ্রাঙ্গনে সেক্সপীয়রের ‘জুলিয়াস সীজার’ অভিনয় করবেন। অংশগ্রহণকারী—পরিতোষ শী, নিমাই দাস, নিহার দাঁ, অসিত ঘোষ, ভবেশ কুন্ড, জ্যোৎস্না শীল, কমল রায়, শ্রীপদ রায়, দিলীপ সাহা, অনিল দে, সহদেব শ্রীমানী, দেবকুমার নন্দী ও সুপর্ণা সেন। রূপান্তর ও প্রয়োগে—সুশ্যামল শর্মা।

নর্থ হাওড়া ফিল্ম সার্কেল

চতুর্থ বর্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৫ই সেপ্টেম্বর প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘শেষ উত্তর’ এবং ৬ই সেপ্টেম্বর তপন সিংহের ‘হাসিনী বাকের উপকথা’ ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হবে। স্থান—রবীন্দ্র সদন, হাওড়া।

সদ্য প্রকাশিত হইল!

সদ্য প্রকাশিত হইল!!

সদ্য প্রকাশিত হইল!!!

দণ্ডপাণি রচিত

অন্তরালের শব্দবৃত্ত

একালের সমাজের নানা অজানা দিকের এই সম্যক চিত্র উদ্ঘাটন করা হয়েছে এই গ্রন্থের মাধ্যমে। প্রতিটি প্রবন্ধ লেখকের গভীর সমাজচিন্তার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

এই গ্রন্থটি সম্পর্ক বাঙলার সুপ্রসিদ্ধ কবি জসীম উদ্দীন বলেছেন—
আপনার পুস্তকে জাতির কল্যাণকর বহু কথা আছে।

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১২

খেলায় রাজার রাজার রাজা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

খেলায় রাজনীতি নতুন নয়।
প্রথম অবস্থাতেই ভারতীয় ক্রিকেটের
মধ্যে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

১৯৩২ সালে ভারতীয় দলের ইংল্যান্ড
ভ্রমণের সময় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের
প্রথম টেস্ট খেলায় ভারতের অধিনায়ক কে
হবেন—এই নিয়ে জল যথেষ্ট ঘোলা হয়ে-
ছিল। পত্র-পত্রিকায় সেই বিষয় নিয়ে কিছু
লেখার স্থান এখনো পাওয়া যায়।

ভারতের একটি নামকরা দৈনিক
পত্রিকা তো সব কিছু ফাঁস করে দিয়ে
খোলাখনিভাবে লিখেই দিল যে, ১৯৩২
সালের ২৫শে জুন থেকে লর্ডস
ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের
অধিনায়ক হিসেবে সি কে নাইডুর মনো-
নয়ন অনেকেই পছন্দ করেন নি।

খেলোয়াড়দের মধ্যেও মোটামুটিভাবে
দু'টো দল হয়ে গিয়েছিল। একদল সি কে
নাইডুর চান—আর একদল চান না। যারা
চান না তাঁরা তো সি কে নাইডুর নেতৃত্বে
খেলেতেই চান নি প্রথম টেস্ট মাঠে।
তাঁদের খেলতে রাজী করানোর জন্যে
অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল।

এই ঘটনার জন্যেই হঠাৎ অস্ট্রেলিয়া
একাদশের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে সি কে
নাইডুর জায়গায় ভারতীয় দলের অধিনায়ক
হিসেবে মনোনীত হলেন প্যাতিয়ালায়
যুবরাজ।

যুবরাজের বয়স তখন কুড়ি বছরেরও
কম। আর অধিনায়ক মনোনীত হওয়া
তো দু'রের কথা, ভারতীয় দলের একজন
খেলোয়াড় হিসেবে দলে স্থান পাবার
যোগ্যতা তাঁর ছিল কিনা সন্দেহ। দলে
তাকে স্থান দিলে হয়তো প্রশ্ন উঠতো না।
কিন্তু তাকে সরাসরি অধিনায়ক নির্বাচিত
করায় প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।

যুবরাজের অধিনায়ক মনোনীত হবার
প্রতিবাদে ডাঃ এইচ ডি কংগা খেলোয়াড়
নির্বাচক মণ্ডলীর সভ্য পদ থেকে ইস্তফা

দিলেন। এই প্রসঙ্গে ডাঃ কংগা হবে
কড়া বিবর্ত দেন। তিনি বলেন—

“...The Chief function of
the selection Committee was
to try out promising youngmen
all over the country from
amongst whom the candidates
could be selected to represent



ক্রিকেট খেলায় রাজনীতি সে যুগেও
ছিল। আর সেই রাজনীতির কবলে
পড়তে হয়েছিল সি. কে. নাইডুরকেও।
তবে নাইডুর নিয়ে যা হয়েছিল, তাকে
রাজনীতি না বলে ষড়যন্ত্র বলাই বোধহয়
যুক্তিসংগত।

India during the forthcoming
visit to England next summer.

“We have at least three
men who are candidates for
the team to visit England and
who have the required qualifi-
cations for the responsible
position of captaincy. Why
then was the Yuvaraj of
Patiala, who had not yet esta-
blished his claim to be even a
member of the team, selected
captain of the Indian side
against the Australians at
Bombay?”

“...This is not the first
time that a deliberate attempt
has been made to foist upon
India a captain whose only
qualification is his birth. In
the highest interest of the
game, I could not subscribe to
this view...”

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো
না। জল তখন সবে ঘোলা হতে শুরু
হয়েছে। বোম্বাই ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন
ডাঃ কংগার এই প্রতিবাদের সপক্ষে গলা
মেলানো। শব্দে তাই নয়, ভারতীয়
খেলোয়াড় নির্বাচক মণ্ডলীর খেলোয়াড়
নির্বাচনের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ
করলো তাঁদের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ
তুলে।

পাতোঁদর নবাব (বড়) তখন অসুস্থ।
ভারতীয় দলের অধিনায়ক হয়ে তাঁর
ইংল্যান্ড ভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু

সাপ্তাহিক বসুমতী

পার্ভোদির পক্ষে দলের সঙ্গে যাওয়া তখন আর সম্ভব নয়। তাই বোম্বাই-এর ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন দু'জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে দলের সহ-অধিনায়ক হিসেবে মনোনীত করার জন্যে অনুরোধ করলেন।

হয়তো বা এই বাদ-প্রতিবাদের জন্যেই কলকাতার স্থিতীয় টেস্টে সি কে নাইডুর ওপর পড়ল দল পরিচালনার ভাব। কিন্তু কলকাতা টেস্টের আগেই রান্নিরে কি ঘটলো? ঐ টেস্টেরই খেলোয়াড় মস্তাক আলীর লেখার সেই ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছ জানা যায়।

মস্তাক লিখছেন—

...“But while in the city before the match, I sensed attempts to let C. K. Nayudu down. In fact another young player and I, biletted together with Nayudu in the house of the same host, had been invited to a party on the eve of the match. I do not know if Nayudu himself was invited, but he did not attend, permitting us at the same time to accept the hospitality. The programme at the party included items, which were likely to rob us of our efficiency on the field next day. Whether such a programme was deliberately planned to sabotage the team I can not say, but my later experience about certain personalities and the authority they were wielding at the party, created the impression that some persons were out to undermine C. K. Nayudu's position as India's cricket captain. Subsequent events, however, should the perpetrators of the anti-Nayudu conspiracy themselves falling out, when it came to the division of the spoils.

Next day Amar Sing reported sick, and even though certi-

fied fit by the medical men, refused to take the field...”

এবং সেই সঙ্গেই ব্যাপারটা আরো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নাইডুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয়টিও কারো কারো কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তবু গোপাল কিশু মিটলো না।

বল শু সেই সময়ই ক্রিকেট জগতে প্রাদেশিকতার প্রশ্নটাও মাথা তুলে দাঁড়ালো। এস জি রাম সিং, এম জে গোপালিন ও তিরুভেনকটচরীকে ভারতীয় টেস্ট দলে নেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে মাদ্রাজ ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশন। শব্দ চাপ সৃষ্টিই নয়—তাদের দাবি পূরণের জন্য তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মাদ্রাজ টেস্টে মাদ্রাজের ঐ তিনজনকে দলে নিতেই হবে। অস্ত্রুত আন্দার, অস্ত্রুত দাবি। ভালো খেলোয়াড়রা চান্স পাচ্ছেন না, তাঁদের হয়ে আবেদন জানানো চলে। কিন্তু খেলোয়াড়দের খেলার মান যেমনই হোক না কেন—একমাত্র নিজদেশের প্রদেশের খেলোয়াড় বলে তাঁকে দলে নেবার জন্যে জেদাজেদি করতে—এ আবার কেমন কথা?

বিশেষ করে রাম সিং-এর তখন আর আগের ফর্ম ছিল না। তিরুভেনকটচরীর টেস্ট দলভুক্ত হবার মত যোগ্যতা ছিল না। তবু তাঁদের মাদ্রাজ টেস্টে খেলার সুযোগ দেওয়া হলো। আর গোপালিনকে রেখে দেওয়া হলো ইংলন্ড সফরে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে যাবার জন্যে।

ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের, তাকে কোন সন্দেহ নেই। নোংরামি বললে কিংবা অন্য যা কিছুই বললে না কেন—ভারতীয় ক্রিকেটে সেই সবেই সেই শব্দ। তবে শব্দভেই যেভাবে সি কে নাইডুর ওপর আকিয়ার করা হলো, যেভাবে মাদ্রাজ সি-এর হুমকীর কাছে মাথা নত করে তাঁদের খেলোয়াড়কে দলে নেওয়া হলো, সে যুগে তার তুলনা মেলা ছিল ভার।

তবে এক দিকে রাজা-মহারাজা আর রাজকুমারদের ভারতীয় ক্রিকেটে একাধিপত্য কিস্তারের প্রচেষ্টা আর অপর দিকে সাধারণ ঘরের কুশলী খেলোয়াড়দের প্রত্যাব নিজে এর পরে ভারতীয় ক্রিকেটে যে দৃশ্যগুলো অভিনীত হলো তার সব

বৈবরণ ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কারণ আর যাই হোক, নিজের কলঙ্কে কে আর জাহির করার জন্যে ছাপার হরফে প্রকাশ করে? কিন্তু তার কিছু কিছু খোঁজ তবু আজো পাওয়া যায়। ভারতীয় ক্রিকেটকে জানতে হলে, ভারতীয় ক্রিকেট জগতের রাজাদের পরিচয় পেতে হলে সেই সব ঘটনার কথা যে সবার আগে জানার দরকার।

কুড়িয়ে-বাড়িয়ে তার কিছু কিছু প্রকাশ করে ভারতীয় ক্রিকেটের অতীতের দিনগুলির সত্য পরিচয় আমরা পাঠকদের দিতে চেষ্টা করবো।

তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখার আছে। অতীতের ঘটনার কথা বলতে গেলেই উদ্ভৃতির প্রয়োজন হয় সব থেকে বেশি। এ ছাড়া লেখা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে না। সে যুগের নামী খেলোয়াড় কিংবা ককতাদাদের মন্তব্য থেকে আরম্ভ করে খবরের কাগজের কাটিংও সম্ভব হলে আমরা প্রকাশ করবো। আর সেই উদ্ভৃতিগুলি ইংরেজীতেই হবে। ভাষান্তর করে তার মূল্য আমরা কমাতে চাই না।

এই সংখ্যাতেও তাই ইংরেজী উদ্ভৃতির সংখ্যা একটু বেশিই আছে। আশা করি, পাঠক-পাঠিকারা সে-যুগের বিবরণ সে-যুগের মানুুষের লেখার মধ্যে দিয়ে পেয়ে খুশিই হবেন।

ভারতীয় ক্রিকেট রাজনীতি যে নতুন নয়, ভারতীয় ক্রিকেটের প্রথমাবস্থা থেকেই যে রাজনীতির সূত্রপাত হয়েছিল, সে কথা আজ আর আমাদের মনে না থাকলেও ইতিহাসের পাতা থেকে মছে যায় নি সেই নিম্নম সত্য।

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে লেখা আছে, পার্ভোদির নবাবের (বড়) অসম্ভ-তার সুযোগ নিয়ে সি কে নাইডুকে ডিঙিয়ে ভিজি (ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ-কুমার) কিভাবে ইংলন্ডগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন।

[চলবে]



বিহেলী দল

আই-এফ-এ শীল্ডের জেতা কমছে। এ কথা আজ সবার মুখে শোনা যায়। বাংলার বাইরের সেরা দলগুলোও আজকাল আর আই-এফ-এ শীল্ড যোগদানের জন্যে কলকাতায় খেলতে আসতে চায় না। অর্থাৎ কলকাতার আই-এফ-এ শীল্ডের আকর্ষণ এখন কমে যাচ্ছে। অথচ আই-এফ-এ শীল্ডই হলো ভারতের চ্যাম্পিয়ন ফুটবল প্রতিযোগিতা। ঐতিহ্য থেকে আরম্ভ করে সব দিক দিয়েই আই-এফ-এ শীল্ডের ধারে-কাছেও অন্য কোন প্রতিযোগিতা আসে না। অথচ রোভার্স আর ডুরান্ড কাপের খেলায় আজকাল যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা দেখা যায়, কলকাতার আই-এফ-এ শীল্ডের ক্ষেত্রে তার অভাব বড় বেশি করে চোখে পড়ে। আজকের এই গতির স্বরূপে আই-এফ-এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা রণীতমত ব্যতিক্রম! যেন চিমে তে-তালে চলছে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আর এইভাবে চললে আই-এফ-এ শীল্ডের ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার, এ কথা বৃদ্ধিতেও আজ আর কারো বাকী নেই। কিন্তু যাদের বোঝার দরকার তাঁরা যেন ঠিক বুঝেও বুঝছেন না। তাই আই-এফ-এর উৎসব-বছর বলে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভারতের বাইরে থেকে ফুটবল দল আনার জন্যে তাঁরা উঠে পড়ে লেগেছিলেন। এই নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে তাঁদের চিঠি-পত্রেরও আদান-প্রদান চলছে। কিন্তু আমরা ভেবে পাই না, আই-এফ-এ শীল্ড খেলার জন্যে বাইরে থেকে দল এনে আমাদের ফুটবল খেলার মান কিভাবে উন্নত করা সম্ভব? তার জায়গায় বরঞ্চ ঐ টাকা দিয়ে ভারতের বাইরে থেকে ভালো কোচ এনে কোচিং-এর ব্যবস্থা করলে অনেক ভালো হয়। খেলাধুলার উন্নতিই যদি তাঁদের আসল লক্ষ্য হতো তাহলে আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ বাইরের দল আনার দিকে বেশি নজর না দিয়ে ভারতের সেরা দলগুলোকে আনার চেষ্টাই করতেন বেশি করে।

—পার্বতীপ্রিয়

ফুটবল মাত্ৰ

একক লীগের বেশ কয়েকটা খেলা এখনো বাকী। খেলাগুলো বেশ বড়-সড়ি। আর প্রতিটি খেলার মূল্য ক্লাব সমর্থকদের কাছে অপরিসীম। বিশেষ করে এবার যখন একক লীগের পয়েন্ট যোগ করা হবে সুপার লীগের পয়েন্টের সঙ্গে।

কিন্তু একক লীগের খেলাগুলো শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলেন না আই-এফ-এ কর্তৃপক্ষ। আগেভাগেই তাঁরা তৈরি করে বসলেন সুপার লীগের নিয়ম।

স্বাভাবিকই বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মধুর হয়েছে রাজস্থান। সুপার লীগের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজস্থান জানিয়েছে যে, মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহম্মেদান স্পোর্টিং-এর একক লীগের খেলা শেষ না হলে তারা সুপার লীগে খেলবে না।

কলকাতার লীগ ফুটবল নিয়ে এ বছর যেভাবে টানা-হ্যাঁচড়া চলছে, তাতে

ভয় হয়, পাছে না লীগ ফুটবলের আসর শেষ পর্যন্ত ভেঙে যায়। কলকাতার ফুটবলের ভাগ্যে এ বছর যে কি আছে তা এই মুহূর্তে কেউই বলতে পারবেন না।

লীগ ফুটবল এখনো শেষ হল না। শব্দ হলো না সুপার লীগের খেলা। তবু আই-এফ-এ শীল্ডের খেলাকে ঘিরে এরই মধ্যে বাজার বেশ গরম।

ইরানের প্যাজ ক্লাব কিম্বা পশ্চিম জার্মানীর একটি দল কলকাতায় খেলতে আসবে কি আসবে না। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত ভারতের বাইরের দল এবার আই-এফ-এ শীল্ড খেলবে কিনা তা মোটামুটি ভাবে ঠিক হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো নেওয়া হয় নি।

ওদিকে আবার এই বিষয়টি নিয়ে জল ঘোলা হতে শুরু করেছে। রাজস্থানের সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ের পরে পশ্চিম জার্মানীকে আই-এফ-এ শীল্ড যোগদানের বিষয়টি তুলে বৈধতার প্রশ্ন তুলেছেন।

অর্থাৎ জল বেশ ভালোভাৱেই ঘোলা হতে শুরু করলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত সব কিছ্, কি সামল যাবে

না? এবারের ফুটবল মনসুমে অসমাপ্ত থেকে যাবে?

এই ভয় কিন্তু অমূলক নয় এবং অনেকেই অনেকেদিন থেকে এহ ভয়ই করছেন। ভয় মনে মনেই। সহযোগিতার প্রশ্ন তুললে সেখানে দেখা যাবে নানা মনির নানা মত। আই-এফ-এ রাজ্য সরকার, ক্লাবগুলির কর্তৃপক্ষরা, এমন কি দর্শকদের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করার মতো মন আজ আর নেই।

তাই আজ খেলার মাঠে পূর্ণিমশ না থাকলে খেলা হয় না। খেলার রেফারীর সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ হলে অবস্থা চূড়ান্ত রূপ ধরে। খেলার মাঠে বড় দলগুলো গোল দিতে না পারলে এক প্রণীর দর্শক খেলা বন্ধ করে দেন—আর একদিন খেলা হবে এবং সেই খেলায় তাঁর দল জিতবেই এই ভাবনায়।

সুতরাং এ দেশের আর কি হবে? আর কি বাকী আছে? খেলাধুলার, বিশেষ করে ফুটবল খেলার মান এদেশে কি কখনো উন্নত হবে, না উন্নত হওয়া সম্ভব...?



॥ গিনেস বুক হাতে সোবার্স ॥

ইংল্যান্ডকে ৪-১ টেস্টে হারাবার পর বিজয়ীর পুরস্কার হাতে তুলে সকলকে দেখাচ্ছেন বিশ্বের অবশিষ্ট একাদশের অধিনায়ক সোবার্স।

প্রশ্ন-উত্তর

অসীম চট্টোপাধ্যায় (মগরা হাঙ্গলী)

প্রশ্ন—কোন সাল থেকে মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়?

উত্তর—১৯৫৭ সাল থেকে।

আপনার চিঠি পেয়ে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। আপনাকে ধন্যবাদ।

বর্ষ, চপ্পল, সজল বাগচী নিতাই দে সরকার ও মহাশয় দত্ত (বানারহাট বাজার, জলপাইগড়ি)

প্রশ্ন—ভারতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছ'জন ব্যাটসম্যান, দু'জন ফাস্ট বোলার ও তিনজন স্পিনারের নাম জানতে চাই। তাঁদের মধ্যে থেকে যোগা অধিনায়কের নাম জানান।

উত্তর : ব্যাটসম্যান—সি কে নাইডু, বিজয় মারচেন্ট, বিজয় হাজারে, পলি উমরিগড় ওয়াজির আলী ও মৃত্যুতাক আলী।

দু'জন ফাস্ট বোলার—মহম্মদ নিসার ও অমর সিং।

তিনজন স্পিনার—ভিনু গানকাদ, গোলাম আমেদ ও সুভাষ গঙ্গৈ।

অধিনায়ক—সি কে নাইডু।

সকলের মতের সঙ্গে নাও মিলতে পারে। এ আমার ব্যক্তিগত অভিমত।

সুখময় কুন্ডু (টোংলা, দারং, আসাম)

উত্তর—আপনার চিঠি থেকে কিছুটা অংশ ভুলে দিলাম—

আপনাদের বিশেষ ফুটবল সংখ্যায় একটি ভুল আমার চোখে পড়েছে। ভুলটি হলো জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানের কেন্দ্রটি লিখেছেন গোহাটি। কিন্তু কেন্দ্রটি গোহাটি না হয়ে হবে লগাও। ওখানেই বাংলা সন্তোষ ট্রফি ফিরে পায়।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভালো লাগছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। আপনি ঠিকই ধরেছেন, ওটি ছাপার ভুল।

মাসিক বসুমতী

ক্রীড়া সম্পাদক সমীপে,

আপনার বহুল প্রচারিত মাসিক বসুমতীর আমি একজন নিয়মিত পাঠক। আপনার নিকট বিনীত অনুরোধ যে, আপনার মাসিক বসুমতীর ৭ম সংখ্যায় (১৩ই আগস্ট, ১৯৭০) ৪৪৮ পৃষ্ঠায় “প্রশ্ন-উত্তর” বিভাগে একটি ভুল চোখে পড়ল।

যাই হোক, পলি উমরিগড়ের সেঞ্চুরিসংখ্যা ১২টি, মাজরেকার ও বোরদে যথাক্রমে ৭টি ও ৫টি করে সেঞ্চুরি করেছেন।

নিম্নে কে, কখন, কোথায়, কার বিরুদ্ধে কত সেঞ্চুরি করেছিলেন, তার তালিকা দিলামঃ—

খেলোয়াড়ের নাম	দেশের বিরুদ্ধে	স্থান	মাল	রাণ-সংখ্যা
১। পলি উমরিগড়	পাকিস্তান	বোম্বাই	১৯৫২-৫৩	১০২
২। ”	”	পেশোয়ার	১৯৫৫-৫৬	১০৮
৩। ”	”	কাণপুর	১৯৬০-৬১	১১৫
৪। ”	”	মাদ্রাজ	১৯৬০-৬১	১১৭
৫। ”	”	দিল্লী	১৯৬০-৬১	১১২
৬। ”	ইংলণ্ড	মাদ্রাজ	১৯৫১-৫২	১১৩
৭। ”	”	কাণপুর	১৯৬১	১৪৭
৮। ”	”	ম্যানচেস্টার	১৯৫৭	১১৮
৯। ”	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	পোর্টস্মেন	১৯৫২-৫৩	১৩০
১০। ”	”	কিংস্টন	১৯৫২-৫৩	১১৭
১১। ”	”	ত্রিনিদাদ	১৯৬২	১৭২
১২। ”	নিউজিল্যান্ড	হায়দ্রাবাদ	১৯৫৫-৫৬	২২০
১। চাঁদু বোরদে	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	দিল্লী	১৯৫৮-৫৯	১০৯
২। ”	”	বোম্বাই	১৯৬৭	১১২
৩। ”	”	মাদ্রাজ	১৯৬৭	১২১
৪। ”	পাকিস্তান	”	১৯৬০-৬১	১৭৭
৫। ”	নিউজিল্যান্ড	বোম্বাই	১৯৬৫	১০৯
১। মঞ্জুরেকার	ইংলণ্ড	লীডস	১৯৫২	১৩৩
২। ”	”	দিল্লী	১৯৬১-৬২	১৮৯
৩। ”	”	মাদ্রাজ	১৯৬৪	১০৮
৪। ”	নিউজিল্যান্ড	দিল্লী	১৯৫৫-৫৬	১৭৭
৫। ”	”	হায়দ্রাবাদ	১৯৫৫-৫৬	১১৮
৬। ”	”	মাদ্রাজ	১৯৬৫	১০২
৭। ”	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	কিংস্টন	১৯৫২-৫৩	১১৮

—সুশীলকুমার দাস, রামচন্দ্রপুর, পোঃ পূজালী, থানা—বজবজ, জেলা—২৪ পরগণা

ক্রীড়া সম্পাদক সমীপে,

৩রা ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, ৮ম সংখ্যায় ভারতীয় ফুটবলের সংকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একাদশ গঠনের জন্য আহবান জানিয়েছেন। এই সংখ্যায় লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের দল গঠন দেখে মনে হলো উনি ১৯৪৮ সালের পর থেকে খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করেছেন। কিন্তু আপনার আহবান জানিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল দল গঠনের জন্য, লক্ষ্মী-বাবুর কতকগুলি খেলোয়াড় নির্বাচনের সঙ্গে আমি একমত। তবে গোলে কে, দত্তের

কথা ভুলে গেলে চলবে না। ব্যাকে গোষ্ঠী পাল, তাজ মহম্মদ এবং জুমা খাকে কোনদিন ভুলতে পারবো কি? রাইট আউটে ভেনকটেশ অথবা পি কের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলা মুশ্কিল। তবে ভেনকটেশ আপ্পারাওয়ার জুটি কোনকালে হবে কিনা সন্দেহ আছে। সেন্টার ফরওয়ার্ড-এ সৌলম অথবা পাগুসলের থেকে কানন কোনদিন ভাল, এ কথা কিছতেই বলা যায় না। সবাইকে ভুলে যেতে পারি, কিন্তু লেফট আউট হিসেবে সামাদকে কোনদিন স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারবো কি?

—সমীর চৌধুরী

অস্থায়ী সম্পাদক—বিজনকুমার পেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপনিবহারী গান্ধুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতীর কালজয়ী গ্রন্থরাজি

। গ্রন্থনমোষ্ঠাবে নয়নাভিরাম ।

বৃহৎ তত্ত্বসার—১ম ও ২য়		Essential of Commercial		গোপেন্দ্রবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
প্রতি খণ্ড		Law		ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	
		১৫-০০	৬-০০	—২য় ভাগ ৫-০০	
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০	দীনেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—	২য়	৮-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	২য়	৬-০০	প্রভাবতী দেবী গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
কালিদাস গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০	বিভূতিভূষণ মথো: গ্রন্থাবলী—		৮-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-৫০	রামনাথ বিশ্বাস গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মাইকেল গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-৫০	শৈলজা গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (উপন্যাস)—			" "	২য়	৩-৫০
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড		৩-০০	মণিলাল বন্দ্যো: গ্রন্থা:—	১ম	৩-৫০
বঙ্কিম গ্রন্থাবলী (সাহিত্য)—			" " "	২য়	৩-৫০
১ম, ২য়, ৩য়, প্রতি খণ্ড		৩-০০	অসমঙ্গ গ্রন্থাবলী—		৮-০০
বিজ্ঞানেন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী—	১ম	৬-০০	সংসাহিত্য গ্রন্থাবলী—	৩য়	৮-০০
" "	২য়	৬-০০	" "	৪র্থ	৩-০০
" "	৩য়	৮-০০	রামপদ মথাজী গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-০০
ত্রৈলোক্য গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০	" " "	২য়	৩-০০
দীনবন্ধু মিত্র গ্রন্থাবলী—	১ম	৮-০০	হেমেন্দ্র রায় গ্রন্থাবলী—		৬-০০
" "	২য়	৮-০০	মতিলাল দাশের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
প্রেমেন্দ্র গ্রন্থাবলী—		৩-৫০	জগদীশ গুপ্তের গ্রন্থাবলী—		৩-৫০
মানিক গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০	বিভূতিভূষণ ভট্টের গ্রন্থাবলী—		৮-০০
" "	২য়	৩-০০	শচীশ চট্টো: গ্রন্থা:—	২য় ভাগ	৩-০০
দামোদর গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-৩০	সৌরীন্দ্রমোহন মুখো: গ্রন্থা:—	৩য়	৩-০০
" "	২য়	৮-০০	সৌরীন্দ্রমোহন মথো: গ্রন্থা:—	৫ম	৩-০০
" "	৪র্থ	৮-০০	বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী—		৫-০০
অমৃতলাল গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০	কথাসরিৎসাগর—	১ম ভাগ	৮-০০
" "	২য়	৮-০০	"	—২য় ভাগ	৮-০০
" "	৩য়	৮-০০	অরবিন্দ দত্তের গ্রন্থাবলী—		৩-০০
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	১ম	৩-০০	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী—		
যোগেশ গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০	২য়, ৩য়—প্রতি খণ্ড	৮-০০	
রত্নলাল গ্রন্থাবলী—		৩-০০	ক্ষীরোদ গ্রন্থাবলী	২য় ও ৪র্থ হইতে	
উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী—	৩-০০		৮ম খণ্ড—প্রতি খণ্ড—	৩-৫০	
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাবলী—	৫-০০		ডিকেন্সের গ্রন্থাবলী—	২য়	৮-০০
স্টুট গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০	চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী—		৮-০০
" "	৩য়	৩-০০	বিলাতী গুপ্তকথা—	২য় ভাগ	৫-০০
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থা:—	৮-০০		অতুল মিত্র গ্রন্থাবলী—	২য়	৩-০০
বাদের সংস্পর্শে এসেছি—	২-০০		" " "	৩য়	৩-০০
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের			রস-গ্রন্থাবলী—		৩-০০
পূর্বাভাস—	২-০০		নবীন সেনের গ্রন্থাবলী—		৭-০৭
Hand Book of					
Commercial Law	২০-০০				
				গোপেন্দ্রবর বন্দ্যোপাধ্যায়ের	
				ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস	
				—২য় ভাগ ৫-০০	
				নীরদ দাশগুপ্তের গ্রন্থা:—	
				১ম	
				১০-০০	
				অরুণবাহি—	
				৮-০০	
				কবিকঙ্কণ চণ্ডী—	
				৮-৫০	
				ক্রীড়াকাণ্ড বারিষি	
				১ম	
				১০-০০	
				পরলোক—	
				৮-৫০	
				পরলোক রহস্য—	
				২-২৫	
				পরলোক ও প্রেততত্ত্ব—	
				৮-৫০	
				দশ্যাকাব্য পরিচয়—	
				১০-০০	
				নাড়ীজ্ঞান প্রদীপিকা—	
				৩-০০	
				ভারত প্রতিভা—	
				৫-০০	
				প্রতাপাদিত্য—	
				৩-০০	
				সাধক কমলাকান্ত—	
				২-৫০	
				মহারাজ নন্দকুমার—	
				৩-০০	
				নানার মা—	
				৩-০০	
				জালিয়াৎ কুইড—	
				৩-০০	
				বিক্রমাদিত্য—	
				৩-০০	
				বিসমার্ক—	
				২-০০	
				স্বরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর আত্মজীবনী	
				৩-০০	
				মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত—	
				২-০০	
				মাধবীকঙ্কণ—	
				২-০০	
				শিবরাম গ্রন্থাবলী—	
				৮-০০	
				বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ—	
				১ম	
				৮-০০	
				২য়, ৩য়, ৪র্থ প্রতি খণ্ড	
				৩-০০	
				মৌল-অনোদর্শন	
				৩য় ভাগ : কামাবেগের বিশ্লেষণ	
				৮-০০	
				৪র্থ ভাগ : প্রেম ও পীড়া	
				৮-০০	
				৫ম ভাগ : কামাবেগের নিয়ত-	
				কালিকঙ্কণের ব্যাপারসমূহ	
				৮-৫০	
				আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—	
				১ম	
				৬-৫০	
				আশাপূর্ণা দেবীর গ্রন্থাবলী—	
				২য়	
				৫-০০	
				হেমচন্দ্র বন্দ্যো: গ্রন্থাবলী—	
				৮-০০	
				ANANDAMATH	
				৮-০০	
				(শ্রীঅরবিন্দ কত ক ইংরেজী অনবাদ)	
				DAVID HARE	
				৮-০০	
				রাজভাষা	
				৮-০০	

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড । ১৬৬, বিপিনবিহারী নাথুলী স্ট্রীট, কলি-১২

Thursday, 3rd September, 1970

Price : 30 Paise

SAPTAHIL BASUMATI

GRAM : "BASUMATI"

Regd. No. C. 71

PHONE : 35-9461, 62, 63, 64

কুখ্য মশলা'ই তো
স্বাস্থ্য কল্লুস
কিন্তু সখি—

কুখ্য

খুলতা হয় তা!

9 SEP 1970



কুখ্য
খুঁড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিচাল করে।
কুখ্য পিত্তর ব্যাধ
ও রুখের
পাথা নির্ভর
চাবকত হয়।

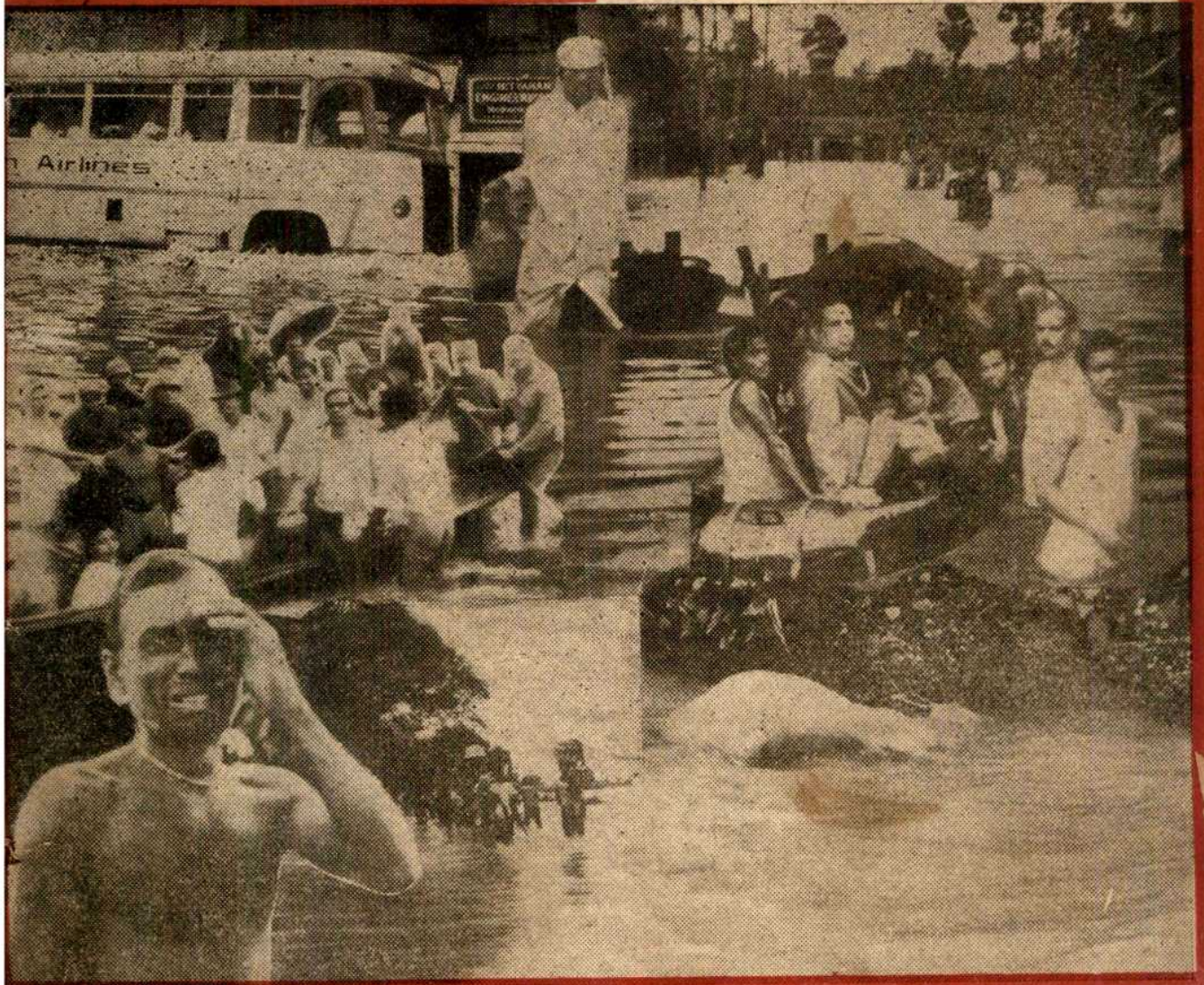
কুখ্য ভারতের
সর্বাধিক বিক্রীত
খুঁড়ো মশলা।
এর পেছনে
মর্যাদা ১২৩
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

শ্রবতকার
কুখ্যচন্দ্র দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কান্দীপুর



সাপ্তাহিক বসুমতী

১৬৭৭ ৫৭৭-
অবিশ্রান্ত বর্ষে বৃহত্তর কলকাতা ও
গ্রামবাংলায় দারুণ দুর্যোগ



১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

] OLDEST WEEKLY OF
NORTH INDIA

[75 year, No. 11, 10th Sept., 19



বোরোলীন
হাউস
কলিকাতা-৩



ফেমিলা প্রা
সব শিশুর জন্য

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	...	৬৪৩
আজকের মানব	...	৬৪৪
স্বাধীনতা ও সমকালীন	...	...
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— লক্ষ্মীপ্রসাদ বসু	৬৪৫
একটি পরিবার (কবিতা)	— সুভাষ ঘোষাল	৬৪৭
বঙ্গদর্শন	...	৬৪৮
ভারতদর্শন	...	৬৫১
আন্তর্জাতিক	...	৬৫৩
সপ্তাহের বোকা	— কুন্ডবাস গুপ্তা	৬৫৪
চব্বিশ বছরে পা দিয়ে (প্রবন্ধ)	— নরেন ভট্টাচার্য	৬৫৬
শহর কলকাতা	— মিশ্রেন	৬৬০
পাঠকমন	—	৬৬২
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	— সন্তোষ দত্ত	৬৬৪
পতাকা (কবিতা)	— শক্তিরত ঘোষ	৬৬৫

যে কোন

গয়না

আর

আমল

গ্রহরত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সব অ্যাণ্ড প্র্যাণ্ডসমঙ্গ অব লেটি

এম. বি. সরকার



এম. বি. সরকার
১৯৭৫ রামবিহারী বসু স্মৃতি

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
রাজনৈতিক বিশ্লেষণ (বিশেষ প্রবন্ধ) ...	— রামেন্দু মৎসঙ্গ	৬৬৬
বর্ধমান বিদ্যাসাগর (প্রবন্ধ) ...	— ললিত হাজারা	৬৬৯
রাজনৈতিক তত্ত্বসাধনা ও স্বাধীন বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ) ...	— সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৭১
আনন্দরূপ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ...	— প্রমথনাথ সেনগুপ্ত	৬৭৬
মাউ-মাউ নন্দী (ধারাবাহিক অনুবাদ-প্রবন্ধ) ...	— বিশ্বনাথ ঘোষ	৬৭৮
রূপকুণ্ড ও কুমারী গিরিপথ ...	— সুজয়া গুহ	৬৮১
পাহাড়ের যাবার প্রহর ...	— প্রদীপ চক্রবর্তী	৬৮৪
গ্রন্থমেলা ...	—	৬৮৬
কবিত্বের বাঙ্গা (গল্প) ...	— সৈয়দ আলতার আহম্মদ	৬৮৭
লোকসংগীতের একাল না আকাল ...	— মুরশিদ	৬৯০
রংগমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে ...	— শিলালি	৬৯৪
রংগজগৎ ...	—	৬৯৬
খেলার রাজার রাজা ...	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৭০০
খেলাধুলা ...	— শান্তিপ্রিয়	৭০২

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে :

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রাক্কল, অ্যাক্কেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিসরাজউদ্দোলা ; ব্যায়াসা কা ত্যায়সা ; জন্ম ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, মাস্তি, মলিনাবিকাশ, হীরর ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-গিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন,
—“অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈকি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর ভোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।”

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

আবলম্বে অর্ডার পেশ করুন।





বৃহস্পতিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
৭৫ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 10th September, 1970

জল-বন্দী মানুষদের সাহায্য করুন

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি প্রকৃতিও বোধ হয় এবার প্রসন্ন নন! অবিশ্রান্ত অতি-বর্ষণের ফলে নেমে এসেছে এই রাজ্যে দারুণ দুর্দিন।

কলকাতা, কলকাতার চারপাশের প্রায় সমস্ত অঞ্চল এবং উত্তরবঙ্গ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই পথে-ঘাটে, ঘরে-দোরে বন্যাবস্থা! এরপর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো নতুন বিপদ দেখা নিয়েছে বহু অঞ্চলেই। কারণ অজয়, দামোদর, মুন্ডেশ্বরী, কাঁসাই তাদের খাপা মার্তি নিয়ে কল ছাপিয়ে জনজীবনে নিদারুণ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। লেখার সময় পর্যন্ত যেটুকু সংবাদ পৌঁছেছে, তা থেকে জানা যায় সমগ্র আরামবাগ মহকুমা সহ হুগলী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা আর বর্মান জেলার কালনা মহকুমা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা ভীষণ ভয়াবহ। বীরভূম, চব্বিশ পরগনা ও হাওড়ার সংবাদও রীতিমতো উদ্বেগজনক। গ্রাম বাংলার জল-বন্দী মানুষ আজ শুধু দুঃসহ দুরবস্থার হাত থেকে উদ্ধারের জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছে। তাদের জন্য চাই এই মুহূর্তেই আশ্রয়, খাদ্য ও বস্ত্র। এবং এই খাদ্য-বস্ত্র যুদ্ধকালীন জরুরী ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের কাছে অবিলম্বে পাঠানো প্রয়োজন।

বৃষ্টির অভিশাপে এমনিতেই সভ্যতার লেবেল-আঁটা শহর কলকাতা অভিশপ্ত। অবিশ্রান্ত অতি-বর্ষণের ফলে শহর কলকাতার সমস্ত রাজপথ, অলিগলি এবার তলিয়ে গেছিল। বাজার ছিল শূন্য, আফিস-কারখানায় নামমাত্র কর্মীদের উপস্থিতি, গ্রাম-বাস-ট্যান্সি চলার মতো অবস্থা ছিল না। বিমানপথে বিমান আসা-যাওয়া

করেই নি। এমন কি শিয়ালদহ, হাওড়া স্টেশনে ট্রেন পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতে পারে নি। বহু অঞ্চলে বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। যে সব অঞ্চলে টিউবওয়েল ছাড়া গতানুগতিক নেই, সেখানে সেগুলি ছিল জলমগ্ন। বস্তুি অঞ্চলগুলিতে সাধারণ দরিদ্র মানুষ-গুলির দুর্দশা অবর্ণনীয়। এবার বহুর কলকাতার অন্তর্গত বাঙ্গদুর্, লেক টাউন, গ্রীণ পার্ক, দমদম পার্ক, খাপা, ট্যাংরা, হালতু, কসবা, যাদবপুর, টালীগঞ্জ, বেলেঘাটা, পূরারিপুকুর প্রভৃতি অঞ্চলে বহু ঘরের ভেতরে পর্যন্ত এক কোমর, এক বুক জল।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এই দুর্দশার জন্য কপালে হাত দিয়ে প্রকৃতির ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বসে থাকলেই অবস্থার পরিবর্তন হবে না। এই সহজ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রকৃতি যেহেতু ছিল এবং ভবিষ্যতে থাকবে—সেই কারণে বন্যা, বৃষ্টি, খরাও আক্রমণ করবে। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে যদি প্রকৃতির প্রকোপ থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে বের করা সম্ভব না হয়, তাহলে বৃথাই আধুনিকতার গর্ব করা।

যা হোক, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুর্ভোগ মুহূর্তে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি সেবাপ্রতিষ্ঠান বৃষ্টি-কবলিত মানুষগুলিকে উদ্ধারের কাজে লেগেছে। তাছাড়া এখনো যে আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায় নি, তার প্রমাণ মেলে পাড়ায় পাড়ায় যুবকদল কতৃক অসহায় ও নিঃসহায়দের সাহায্যদানের মধ্য দিয়ে।

কলকাতা কর্পোরেশনের সঙ্গতি

খুবই কম। তবে এবার কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অন্তত সাহায্য-দানের জন্য কার্ণা করা হয় নি। স্বয়ং মেয়র জল-বন্দী দিন-গুলিতে ময়লা ফেলার গাড়িতে করে আফিসে গিয়ে সম্ভব মতো সাহায্য-দানের সব ব্যবস্থাই করেছেন। তবে সে সাহায্য তো সমুদ্রে গোম্পদের তুল্য। তাই আশা করা গিয়েছিল রাজ্য সরকার জরুরীভিত্তিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সে-ব্যবস্থা যে কতটা অপ্রতুল—তার নিদর্শন মেলে এখনো পর্যন্ত এই কলকাতা শহরেই। এও আশা করা গিয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের বর্তমান দুরবস্থায় তৎপরতার সঙ্গে অতিরিক্ত সাহায্য পাঠাবেন। কেন্দ্রীয় সরকার কোনো রকম সাহায্য পাঠাবেন কিনা, তাও এখনো অজ্ঞাত। তবে প্রয়োজনের তুলনায় পরিমাণে অতি সামান্য হলেও এই রাজ্যের রাজ্যপাল সাড়ে নয় হাজার টাকা দান করে দুর্গত-দের সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টি অকর্ষণ করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।

অতি-বৃষ্টির দরুণ বর্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমশ সে অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। কারণ বিবাক্ত মূর্ষের ভয়ে ইতিমধ্যে সকলেই শঙ্কিত এবং নানা রকম রোগের উপসর্গ ইতিমধ্যে নানাস্থানে দেখা গেছে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের দাবি, তাঁরা অকৃপণ হস্তে এই রাজ্যের দুর্গতদের সাহায্যদানে এগিয়ে আসুন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বাংলা দেশ আজ যা চিন্তা করে, গোটা ভারত আগামী কাল তা চিন্তা করে। নিরবিচ্ছিন্ন অতিবৃষ্টির দিনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বখন দিশাহারা তখনও ঐ কথার আবার প্রমাণ মিলল। বাংলা দেশ ভাগ হবার পর থেকে পোড় খেতে খেতে আজো বেঁচে আছে, আর ভাঙা বাংলায় অটুট ও উদ্দীপ্ত আছে বাঙালীর প্রতিভা। কিন্তু সেই প্রতিভা কেবলমাত্র বাংলা দেশকেই বরণ করে বড় হয় নি, সারা ভারতে বিস্ময় সৃষ্টি করে সেই প্রতিভাকে সম্মান জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে। আর সম্মান যিনি লাভ করেছেন, তিনি হচ্ছেন বাংলা-চলচ্চিত্র জগতের প্রিয় পরিচালক শ্রীমৃগাল সেন।

কিন্তু মৃগাল সেনকে এবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও নগদ বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে যে চলচ্চিত্রের পরিচালনার জন্য, তার নাম ভুবন সোম এবং ভুবন সোম মৃগাল সেনের প্রথম হিন্দী ছবি। ভুবন সোম চলচ্চিত্র জগতে নতুন নিশানা তুলেছে তো বটেই, তা হিন্দী চলচ্চিত্র জগতেরও এক বিস্ময়। কারণ হিন্দী চলচ্চিত্র বলতে দর্শকেরা বোঝেন ছকে বাঁধা কাহিনীর মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ নাচ-গান-রসস্তরী-হোটেল-মারামারি-হৈ-হুজোড়। মৃগাল সেনের ভুবন সোম উত্তেজনাপূর্ণ। কিন্তু হিন্দী চলচ্চিত্র জগতের প্রথাগত অর্থ নয়। সেই উত্তেজনা জন-জীবনে তরঙ্গ মলে স্বাধিকারে বেঁচে থাকার উত্তেজনা। ধীরে ধীরে জয় সেখানে উদারচেত্রে চ্যারিত।

ইতিমধ্যে মৃগাল সেনের অনুসরণে/অনুকরণে নাকি হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে বাকি সৃষ্টি হয়েছে।

মৃগাল সেন পরিচালক হিসেবে প্রথম আলোড়ন সৃষ্টি করেন, 'নীল আকাশের নীচে' চলচ্চিত্রের জন্য। ঐ বাংলা চলচ্চিত্র সারা ভারতে অভিনন্দিত হয় এবং তার আবেদন দেশ-কালের উদ্দেশে।

মৃগাল সেন এমন জাতের পরিচালক যিনি যেটোতেই হাত দেন সেটাই সার্থক হয়ে ওঠে। এই অভিজাত পরিচালকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর বা মধ্যবিত্তের জীবন অবলম্বনে যে ছবি

করেন তা প্রথম শ্রেণীরই মর্যাদা লাভ করে।

এই তো সেদিন, তাঁর পরিচালিত আর একটি চলচ্চিত্র নতুন বার্তা ঘোষণা করেছিল। সেই চলচ্চিত্রটি ছিল একটি ওড়িয়া কাহিনীকে অবলম্বন করে। মাটির মানুষদের, যাঁদের দেখেও আমরা দর্শি না বা বুঝতে পারি না তাঁদের কেন্দ্রীভূত করেছিলেন তাঁর ছবির কাহিনীতে। এখনো হঠাৎ কানে বেজে ওঠে অজ পল্লীর মাথার ওপর উড়ে যাওয়া এরোপ্লেনের শব্দ। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার স্বাদে বঞ্চিত গ্রাম্য মানুষগুলির সে কি শিহরণ। সেই লোকগুলির ঈর্ষা-দ্বন্দ্ব-ভালোবাসা কোনটাই মিথ্যা



মৃগাল সেন

নয়। তবু গোটা সংসার কিভাবে ভেঙে যায় মাটির মানুষের আছে সে এক করুণ কাহিনী। তবু কাহিনী রূপায়িত করা একমাত্র উদ্দেশ্য নয় মৃগাল সেনের। একটা সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ বস্তুকে শেষ ইংগিতের মাধ্যমে প্রকাশ করেন মৃগাল সেন। চলচ্চিত্র জগতে এই জাতের পরিচালক অঙ্গুলিমেষ। নিজের অনুভূতি ও প্রাণসর চিন্তার সঙ্গে অন্য কোনো পরিচালকের এবং তিনি যেতোই বড় হোক না কেন, মিল না হলেও হয়তো বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু মৃগাল সেনের মতো শিল্পী কখনো স্বস্থান

পরিত্যাগ করেন না। কারণ তিনি জানেন স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে ভয়াবহ। তাই যাঁরা মৃগাল সেনের ছবি দেখে ভাবেন যে, রায় বা ঘটকের চলচ্চিত্রের কোনো নিদর্শন এখানে কেন পাওয়া গেল না, তখনই ধরে নিতে হবে সেখানেই মৃগাল সেনের অসাধারণ গৌরব।

মৃগাল সেনের জন্ম ১৪ই মে, ১৯২০, ফরিদপুর শহরে। শিক্ষা ফরিদপুরে, পরে কলকাতায়। ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ফেডারেশনের সক্রিয় সভ্য। পারিবারিক জীবনে তিনি স্বদেশীয়ানার আমেজে পরিপুষ্ট এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাপটে রাজনীতিতে অস্থায়ী। সাউন্ড রেকর্ডিং-এ শিক্ষা নিয়েছেন, অভাবের চাপে যত্ন-তত প্রফরিডারের কাজ করেছেন, মায় মৌডিক্যাল রিপ্রেসেন্টেটিভের চাকরি পর্যন্ত করেছেন, তবু আর্থিক অবস্থা ফেরে নি। আর সব রকম বাধা অস্বীকার করেই তিনি আজ প্রথম শ্রেণীর পরিচালক।

রাজ্যগত জীবনে মৃগাল সেন ভাব-গম্ভীর, মেলামেশায় নয় স্বভাবের। কিন্তু চলচ্চিত্র-আন্দোলনে কিংবা আত্ম সেবার আহবানে তিনি থাকেন প্রথম সারিতে।

মোটোও নন রোগাও নন, হয়তো একটু কালোবরণ, কিন্তু প্রায়-কোঁকড়ানো চুল আর তাঁর নাক-মুখ-চোখের সুসম গড়ন যেন গ্রীক ভাস্কর্যকেও হার মানিয়ে দেয়।

এখনো পর্যন্ত 'অহংকার' কি তা বোধ হয় মৃগাল সেন জানেন না, কারণ একেবারে অপরিচিতজনও তাঁর আলাপ বা সাক্ষাৎকার থেকে বঞ্চিত হন না। তবে পড়াশুনোতেও রীতিমতো মশগুল থাকেন তিনি। কবিক্রোচিৎ মেট্রিকু ওদাসীনা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা বোধ হয় জগৎ ও জীবনকে আরো ভালো করে জানার জন্যেই। তবু মৃগাল সেন একজন বাস্তববাদে বিশ্বাসী শিল্পী। এই বাস্তববাদী শিল্পীর পরিচালিত চলচ্চিত্রে পরিচালকের নব নব উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় পেয়ে দেশের দর্শকেরা হয় আনন্দিত ও মুগ্ধ।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আসামে প্রথম মন্ত্রিসভা গঠনে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা—(৫)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুভাষচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই সবচেয়ে আনন্দিত ও উদ্দীপিত। তাঁর বক্তৃতায় এইসব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর নতুনত্ব না থাকলেও আবেগের প্রাবল্য থাকত। ছাত্রদের স্বাধীনতায় তিনি বিশ্বাস করতেন, কিন্তু কদাপি উচ্ছৃঙ্খলতায় নয়। উচ্ছৃঙ্খলতায় বিপ্লব আসে না। একমাত্র সংগঠনের মধ্য দিয়েই ছাত্রদের হৃদয়ের ফটেন্ট রক্তধারাকে স্ফুটনভাবে প্রবাহিত করা সম্ভব। “প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখি, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সংঘাত বাধছে। আমি তোমাদের বলি, তোমরা ত্যাগ ও সেবার আদর্শে সংগঠিত হও, নিজদের স্ফুটন করে তোল এবং নিজদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করো।” সুভাষচন্দ্র বলেছিলেনঃ “আমি নিজে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তারা আমাকে নিজের লোক মনে করে।” ছাত্ররা স্বপ্নে সন্তুষ্ট নয়, তাদের আদর্শ বিরাট, সুতরাং তাদের কাছে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ব্যাখ্যা করেছিলেন। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশ উন্নতির পথে এগোতে পারে না। “পড়াশোনার বাইরেও ছাত্ররা যেন নিজদের এমনভাবে প্রস্তুত করে, যাতে তারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করতে পারে। দৈহিক, নৈতিক এবং মানসিকভাবে তাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন।” সুভাষচন্দ্র বিশেষ জোর দিয়েছিলেন চরিত্র গঠনের উপর। চরিত্রভিত্তি না থাকলে ছাত্ররা হয় উত্তেজনার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, না হয় বিপথগামী হবে প্রথম প্রতিঘাতেই। “সুদৃঢ় চরিত্রগঠন চাই। তেমন চরিত্র থাকলেই তবে ছাত্ররা আত্মত্যাগ ও দৃঢ়বহন করতে পারবে।” ছাত্রীরা সুন্দরভাবে সভায় বন্দে মাতরম গেরোছিল—সেজন্য সুভাষচন্দ্র তাদের ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ “অনেক দায়িত্ব তোমাদেরও নিতে হবে। স্বাধীনতার জন্য তোমরাও দেহে, মনে, বুদ্ধিতে তৈরি হয়ে ওঠো। কংগ্রেস আন্দোলনের পাশাপাশি তোমরা

নারী আন্দোলন গড়ে তোলো, যার উদ্দেশ্য হবে নানাপ্রকার সামাজিক পাপের বিনাশ। আধুনিক জগতে কমক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্যের বোধ কমে যাচ্ছে। নারীর অধিকারের ব্যাপারে ভারত কতকগুলি প্রগতিশীল ইউরোপীয় দেশের থেকেও এগিয়ে রয়েছে। এখানে নারীরা বিশেষ চেষ্টা ভিন্নই ভোটাধিকার পেয়ে গেছে। তার সম্ভাবহার যেন নারীরা করে।”

সেপ্টেম্বর মাসের এই আসাম-সফরের দেড় মাসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র আবার আসামের নানাস্থানে সফর করেন। এই পর্যায়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ—আসামে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার গঠন—সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করেছি। এখানে ঐকালে প্রদত্ত তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় শিলঙ পোলো গ্রাউন্ডে বিরাট জনসভায় সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা করেছিলেন। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত বিষ্ণুরাম মেধী। ফেডারেশন-পরিচালনার দৃষ্ট রূপ তখন তিনি প্রতি জনসভায় উন্মোচন করছিলেন। এই সভাতেও সে প্রসঙ্গে বলেন, “ফেডারেশন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে যে-কোনো উপায়ে তাকে রুখতে হবে। বিদেশীর তৈরি এই বস্ত্রটি আমাদের কাছে এতখানেকই গ্রহণযোগ্য নয়। এর থেকে বর্ণাশ্রম কিছড়ও আমরা পাব না।” “ভারতের দরিদ্র মানুষদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস”, তা “জাতীয় প্রতিষ্ঠান”, “স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত”, “সর্বসম্প্রদায়ের ম্বার এই প্রতিষ্ঠানের জন্য উন্মুক্ত”, “নিজ স্বার্থে প্রত্যেকের উচিত এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া এবং এর মঞ্চে বিস্তৃত করে তোলা।”

“গত অর্ধশতাব্দী ধরে যে প্রতিষ্ঠান স্বাধীনতা সংগ্রাম করে আসছে” তার বিরুদ্ধে অনেক প্রচারকার্য চলেছে—সুভাষচন্দ্র জানালেন সে বিষয়ে তিনি সচেতন, কিন্তু সে চক্রান্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুসলমানেরা যদি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে, তাদের উচিত কংগ্রেসে যোগ দেওয়া—যোগ দিলেই দেখবে কংগ্রেসের বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট হেতু নেই। “সুতরাং জনগণের কর্তব্য, কংগ্রেসের বার্তা সকলের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং অধিকতর আত্মত্যাগের জন্য সংগঠিত হওয়া। ‘সেবা, ত্যাগ ও বলিদান’—এই হোক

আমাদের মন্ত। আমরা এখনো ক্রীতদাস, কারণ আমরা স্বাধীনতার মূল্য দিই না।”

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, “আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এখন এমনই অনুকূল যে, ভারত যদি লড়াই আরম্ভ করে তাহলে ইংরেজের পক্ষে আর ভারতকে অস্ত্রের দ্বারা দমনোপায় সম্ভব হবে না।

কংগ্রেসের পরিকল্পনা সম্বন্ধেও সুভাষচন্দ্র সভায় বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। “কংগ্রেস পরিকল্পনার দুটি দিক আছে, একটি গঠনমূলক, যথা—পার্লামেন্টারী, দ্বিতীয়টি সংগ্রামমূলক। একদিকে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া যায়, অপর দিকে যেটুকু ক্ষমতা করায়ত্ত হয়েছে, তা খুব আংশিক হলেও তাকে ব্যবহার করতে হবে স্বাধীনতারই প্রয়োজনে। আইনসভায়, মন্ত্রিসভায় বা নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এই গঠনমূলক কাজ চলবে। নিখিল ভারত কাউন্সিল সংঘ বা ঐ জাতীয় সহযোগী প্রতিষ্ঠানও একই কাজ করবে। কংগ্রেসের এই গঠনাত্মক কার্যাবলী দেশবাসীর কিছু কষ্ট লাঘবের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, সেই সঙ্গে তা বাহির্বিশ্বের কাছে এই বিশাল উপমহাদেশের শাসন ব্যাপারে ভারতীয় জনগণের সামর্থ্যের চেহারাও দেখিয়ে দেবে।” “প্রয়োজন হল”, সুভাষচন্দ্র আবার বলেছিলেন, “স্বাধীনতার বার্তা জনগণের কাছে বহন করা নিয়ে যাওয়া এবং জনগণকে কংগ্রেসের অধীনে সুশৃঙ্খল সৈন্যরূপে তৈরি করা, সেই সঙ্গে অধিকতর ত্যাগের জন্য তাদের উৎসাহ করা।

শিলঙে কংগ্রেস অফিসের উদ্বেগধন সুভাষচন্দ্রই করেন। শিলঙের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে সেটি একটি মাহেন্দ্রক্ষণ। উদ্বেগধনকালে উদ্দীপ্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, “স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতা না থাকলে মানুষের মত আমরা বাঁচতে পারব না। দারিদ্র্য, বেকারী ও ব্যাধির জাতীয় সমস্যা জাতীয় সরকার ভিন্ন কেউ সমাধান করতে পারবে না। সেই সরকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমরা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নরনারীর সহযোগিতা চাই। খাসিয়া জনগণ দলে দলে কংগ্রেসে যোগ দেন—আমি এই বিশ্বাসই করি।”

৩০ অক্টোবর শিলঙে ‘আসাম ফাঁজকাল কালচার অ্যাসোসিয়েশন’ এবং ‘অনাথ আশ্রম’ সুভাষচন্দ্রকে সংবর্ধনা দেয় জনাকীর্ণ সভায়। ছাত্ররা বিরাট সংখ্যায় সভায় উপস্থিত ছিল। সুভাষচন্দ্রের প্রেরণায় সভাস্থলে স্থানীয় ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়।

শরীর সংগঠনের প্রতিষ্ঠান অভিনন্দন জানাচ্ছে এবং ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় সেখানে উপস্থিত। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ভাষণে দেহগঠন ও দেশগঠন—উভয়ই যুগপৎ প্রমথান্য পেরিয়েছিল। “কোনো জাতি তখনই শক্তিশালী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে, যখন জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিমানুষগুলি সেই প্রকার হয়।”—সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন। “ছাত্রগণ! তোমরা অনুভব করো—ভাবী স্বাধীন ভারতের নাগরিক হিসাবে কী প্রচণ্ড দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত।”

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় বহুবিধ রূপের উল্লেখও তখন করেছিলেন। “শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক—সব দিক দিয়ে এই শিক্ষাব্যবস্থা দেউলিয়া। জীবনধারণের ব্যবস্থার দিক দিয়েও তাই। ছাত্র ফেডারেশনের লক্ষ্য হবে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার রূপটি আংশিকভাবে নিজেদের চেষ্টায় দূর করা। ছাত্ররা এজন্য ফেডারেশনের নেতৃত্ব শরীরচর্চার নানা প্রতিষ্ঠান এবং পাঠ্যক্রম বা বিতর্কসভা প্রভৃতি গঠন করতে পারে। সেই সঙ্গে ছাত্রদের শৃঙ্খলাপরায়ণ হতে হবে, যা পরিণতিতে জাতীয় ঐক্য সম্ভবপর করবে। এইভাবেই জাতির পুনর্গঠন সম্ভবপর। এই যে ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হল, একে সুসংগঠিত, শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে এর মধ্য দিয়ে নিজেদের কর্মশক্তি বজায় রাখা উচিত।”

শিলঙ থেকে সুভাষচন্দ্র ৩১ অক্টোবর গোহাটিতে নেমেছিলেন। তাঁর সম্মানে পথে পথে তোরণ নির্মিত হয়েছিল। হাজার হাজার লোক তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানায়। গোহাটির কটন কলেজ ইউনিয়ন সোসাইটিতে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হয়। সভাপতি রায় বাহাদুর বি বি সেনগুপ্ত বলেছিলেন, “শ্রীযুক্ত বঙ্গ জাতির বিশ্বাস অর্জন করেছেন, ভারতের ভাগ্যকে তিনি চালনা করছেন।”

এই সভায় সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা-যুদ্ধোত্তর সমস্যার উপরে বেশি জোর দিয়েছিলেন। “আমরা পরিত্যক্ত কালের মধ্য দিয়ে চলেছি। এর সমাপ্তিতে নতুন স্বাধীন ভারতবর্ষ অধিকতর সমস্যার সম্মুখীন হবে, যার সমাধান করতে দেশের প্রাণশক্তি, কর্মশক্তি ও নবজাগ্রিত সম্পদের ব্যবহারের প্রয়োজন ঘটবে। স্মরণ রাখবেন, রাজনৈতিক মুক্তি কাজ শেষ হয় না—তা শুরু হয়। আপনারা জানেন, আমাদের দেশ দারিদ্র্যের-ব্যাধির-বেকারীর-অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতার এবং কৃষক ও শ্রমিক সমস্যার দেশ।” এই সব সমস্যার সমাধানে শিক্ষায়নের অনিবার্যতার কথা তিনি উত্থাপন করেছিলেন : “শিক্ষায়নকে খতাই পুঁপ বলা হোক, ভারতের অর্থনৈতিক উত্থানের জন্য তাকে বরণ করতেই হবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এখন আর বহু সমস্যা নয়। আধুনিক পদ্ধতিতে ভারতের পুনর্গঠনই মূল সমস্যা। এই কঠিন সমস্যার সমাধানে আপনাদের অগ্রসর হতে হবে বুদ্ধি, প্রাণশক্তি এবং প্রজ্ঞা নিয়ে। রাশিয়া ও তুরস্কের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ছিল, স্পেনের তা ছিল না। সেজন্য স্পেন শোচনীয় দুর্গতির মধ্যে পড়ল।”

ছাত্রদের কাছে সুভাষচন্দ্র বিশেষভাবে আবেদন জানিয়ে বলেছিলেন : “তোমরা বিশ্বরাষ্ট্র শক্তিগুলির বিষয়ে চর্চা কর এবং নিকট ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতবর্ষ এক জাতি, এক

একটি পরিবার

সুভাষ বোষ

দেবতোর বারায় মৃত্যু বজ্রপাত
দেবতোর বাদ দিলে বাকী তিনজন
হাড়হাভাতে।

বোবার মতোই ছোটটি অজাতশত্রু
অন্য দুটি নারী
প্রতিবেশীর ভাঁড়ারে ঘুরে তারাও

আর দেবতোর পেঁপে গাছের নীচে
অসংবৃত খদ্যোতের সন্ধ্যা রেখেছিলো

সংসারী। বর্তমানে অন্ধ সে আলোরই নির্দেশে।

ভাগ্য নিয়ে কিতারে বেঁচে থাকবে—সেই বিষয়ে মনোযোগ
দাও।”

কংগ্রেস-সভাপতি হলে সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব পালন
করতে হয়। সুতরাং গোহাট্টির গোস্টাষ্টমী মেলায় ৩১
অক্টোবর বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তিনি হাজির হয়েছিলেন,
সেখানে বিরাট সভা হয়েছিল, যাতে মাড়োয়ারী ও উত্তর
ভারতীয়রা বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব
করেছিলেন বিষ্ণুদ্রাম মেধী।

বক্তৃতা দিতে উঠে সুভাষচন্দ্র অসমীয়া ভাষায় অধিকার
না থাকার জন্য দৃষ্টিপ্রকাশ করেছিলেন। যে সম্মান তাঁকে
দেওয়া হয়েছে, তা যে আসলে কংগ্রেসকে জানানো হয়েছে
সেই কথা বলতে গিয়ে পদনুচ. কংগ্রেসের প্রশংসা করলেন :
“কয়েক দশক আগে ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে লোকে
স্বপ্নজ্ঞান করত। কংগ্রেস গত পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামের
স্বারা দেখিয়ে দিয়েছে, তা স্বপ্ন নয়, বাস্তবে সম্ভব।
ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা পেতেই হবে, কারণ জনগণ
বুঝেছে যে, বিদেশীর অধীনে থাকা পাপ—সে পাপ দূর
করতেই হবে যে-কোনো মূল্যে।”

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন,
“য়েটুকু ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তাকে ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা
করা হয়েছে ফেডারেশন চাপাবার ব্যবস্থা রেখে। ফেডারেশন
সম্মত অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। কংগ্রেস কোনামতে
ফেডারেশনকে মানবে না। তার সংগে লড়াই করতে
কংগ্রেস বশ্পরিকর। আপনারা সংগঠিত হোন—একাত্ম
হোন—আন্দোলন করুন।”

এই সভায় প্রধানত ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বক্তৃতা
করেছিলেন। সদা সতর্ক এবং রাজভক্ত ব্যবসায়ীদের তিনি
একদিকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামের পক্ষে কথা
শুনিয়েছিলেন (এ সমাবেশে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা হাস্যকর
হত), অন্যদিকে ইংরেজের ফাঁপানো মহিমার পালে কিছু
শরক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন : “গত পাঁচ বছরে আন্তর্জাতিক
ক্ষেত্রে বৃটিশের মর্যাদা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গেছে। প্যালে-

স্টাইন, আয়ারল্যান্ড, মিশর প্রভৃতি দেশের ঘটনা থেকে দেখা
যায় বৃটিশ-শক্তি সেনাবাহিনী এবং নৌবাহিনীর উপর
নির্ভরশীল। কিন্তু তাদের বিমানশক্তি ইটালি, জার্মানী
ব্যবসায়ের সমতুল নয়। বৃটেন সম্প্রতি বিটলারের কাছে
নাতি স্বীকার করেছে; কারণ সে প্রস্তুত নয়। আমি তাই
আপনাদের বাকি, বর্তমান অবস্থার সুযোগ আপনারা নিন।”

গোহাট্ট থেকে সুভাষচন্দ্র খুবড়ি যান। সেখানে বহু
লোকের উপস্থিতিতে ২ নভেম্বর প্রভাতে পতাকা উত্তোলন
করেন। তারপরে তাঁকে মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা কংগ্রেস
কমিটি, সোস্যালিস্ট পার্টি, ছাত্র ও শ্রমিকদল, হোমিও-
প্যাথিক কলেজ প্রভৃতির পক্ষ থেকে মানপত্র দেওয়া হয়।

বাংলা ও হিন্দীতে সুভাষচন্দ্র ঘণ্টাখানেক ভাষণ দেন।
বক্তৃতার মধ্যে বিশ্বরাজনীতির কথা বলেছিলেন, কংগ্রেস-
মন্ত্রিসভার সাফল্য ও সীমাবদ্ধতার কথাও, কিন্তু কংগ্রেসের
পক্ষে প্রচারকাৰ্যই বেশী করেছিলেন। তার কারণ আমি
আগেই বলেছি—সুভাষচন্দ্র এই প্রদেশে কংগ্রেস-আন্দোলনকে
প্রথম ব্যাপকভাবে সংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র
বলেছিলেন : “গত দেড়শো বছরে যা করা যায় নি, কংগ্রেস
গত আঠার বছরে তা করেছে। নিপীড়নমূলক আইন পাস
করে কংগ্রেসকে মারা যায়নি। কংগ্রেস জেগে উঠেছে
সমান্তরাল সরকাররূপে। কংগ্রেস বলতে আমরা বুঝি
গণসংগ্রাম এবং জনগণের সরকার। অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ
কংগ্রেস সরকার স্থাপিত হবে। এখন আমাদের তাই চিন্তা
করতে হবে, আমরা একের পথে যাব, না ভেদের পথে যাব।
কংগ্রেসে যদি কোনো দোষ থাকে সমালোচনাকারীরা কংগ্রেসে
প্রবেশ করে সে দোষ সংশোধন করুন। কংগ্রেস জাতি-ধর্ম-
বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য। অন্য অনেক প্রতিষ্ঠানই
দেশে রয়েছে, কিন্তু সেগুলিকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলা যায়
না। যদি স্বাধীনতা চাই, কংগ্রেসে যোগ দিতেই হবে।
কংগ্রেসের বাণী ছাড়িয়ে দিন দেশময়।”

[ক্লেশ]

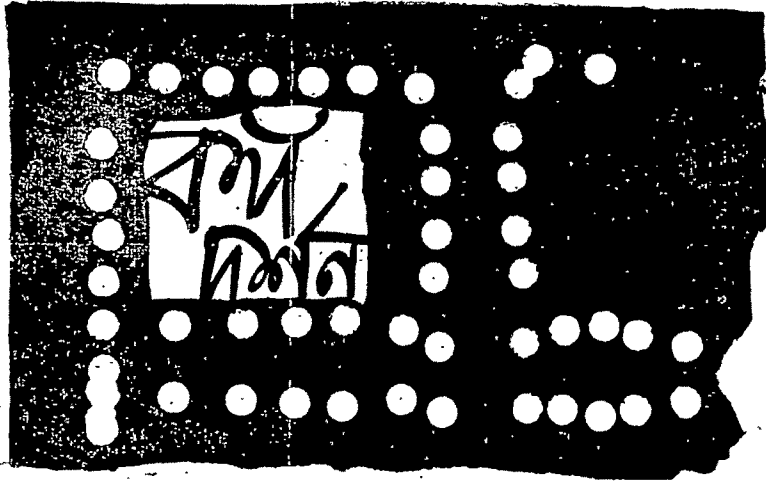
১। ১ নভেম্বর, ১৯৩৮-এর অমৃতবাজারে উদ্ভূত সংবাদে শিরোনাম :

INDIA AND WORLD FORCES

President Bose's Address to Gauhati People

“Study the Need of Free India”

Reference to Federation Issue : “Congress is Out to Fight it.”



গত ৩১শে আগস্ট শহীদ দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার ঘটনা ঘটে, যার ফলে বহুক্ষেত্রে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কলকাতা শহরেই এই উপলক্ষে সাতজন নিহত ও কমপক্ষে শতাধিক আহত হয়। সি পি এম সহ ছয় পার্টির শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে কলকাতা অভিযান ও অবরোধের কর্মসূচী সফল না হলেও কলকাতা অচল করার অঘোষিত কর্মসূচী সফল হয়েছে। কলকাতা অচল করার পারিকল্পনায় কলকাতার চার ধার ঘিরে অন্যান্য দশটি এলাকায় বন্ধ আহবান করা হয়েছিল, যেগুলি সর্বাংশে সাফল্যলাভ করেছে। অপর দিকে সরকার শহীদ দিবস পালন উপলক্ষে সি পি এম-এর প্রচেষ্টা বানচাল করার জন্য চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু এই মর্ষাদার লড়াইয়ে কলকাতার জন-জমায়েত ও শোভাযাত্রা সংগঠনের প্রচেষ্টা প্রতিরোধে সফল হলেও, কলকাতার জনজীবন স্বাভাবিক ও সচল রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন বলা যায়।

এগারো বছর আগে ১৯৫৯ সালের আগস্ট মাসে কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে খাদ্য আন্দোলন হয়েছিল। সেই আন্দোলনে ৮০।৯০ জন মানুষ পুলিশের গুলীতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। সেই থেকে ৩১শে আগস্ট তারিখটি শহীদ দিবসরূপে চিহ্নিত হয়েছে এবং বামপন্থী আন্দোলনের একটি প্রকান্ড নিশানাস্বরূপ এই দিনটি গণ্য হয়েছে। কিন্তু তার পরের এগারো বছরে গঙ্গা বয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। সেদিনের বামপন্থী দলগুলির মধ্যে মতভেদ থাকলেও সম্পর্কের তীব্রতা এত তীব্র ছিল না। আজ পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী শক্তি ত্রিধাবিভক্ত এবং এর সুযোগ সরকার পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করেছে। নতুবা শহীদ দিবসের মত একটি ব্যাপারকে একটি রণক্ষেত্রে দাঁড় করানোর সাহস সরকার কোথা থেকে পেলেন? সরকারী তরফের প্ররোচনা বড় কম ছিল না। পুলিশ, মিলিটারী, সি-আর-পি দিয়ে বাংলা দেশ ছেয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর কি প্রয়োজন ছিল?

সি. পি. এম-এর যা প্রোগ্রাম ছিল, তা হচ্ছে মূলত কলকাতা শহরে একটি বড় ধরনের সমাবেশ প্রদর্শন করা। এরকম তো অতীতে বহুবার হয়েছে, সব দলই করেছে। সরকার এটিকে মর্ষাদার লড়াইরূপে গণ্য না করলে অনাবশ্যক এতগুলি প্রাণহানি ঘটত না এবং বলাই বাহুল্য সরকারের এই ভ্রান্ত রণনীতি সি. পি. এম-কে হিরো হতে সাহায্য করেছে। কেন না লোকের দেখেছে যে, পুলিশ ও মিলিটারীর জমজমাট ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সারা শহরে ১৪৪ ধারা এবং যানবাহনহীনভাবে বহিরাগতদের কলকাতা প্রবেশে বাধা দানের ব্যাপক ব্যবস্থা সত্ত্বেও সি. পি. এম-এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছে। উত্তরে দমদম, বেলঘরিয়া,

খড়দহ, পশ্চিমে শ্রীরামপুর, হুগলী, চুড়ুড়া পর্যন্ত হরতালের ডাকে অচল হয়ে গিয়েছিল এবং কলকাতা শহরে হরতাল ডাকা না হলেও নাগরিক জীবন অবশ্য হয়ে পড়েছিল।

দুর্গাপুরের ঘটনাবলী থেকে শুরু করে সরকারী কর্মচারীদের কর্মবিরতি, শিক্ষক ধর্মঘট এবং সবশেষে ৩১শে আগস্টের ঘটনাবলী চোখে আঙুল দিয়ে একটি জিনিসই দেখিয়ে দিচ্ছে, তা হচ্ছে এই যে, যে-কোন ধরনের আন্দোলন তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যেমনই হোক এবং যে-কোন ধরনের আন্দোলন তা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক যেমনই হোক না কেন, অত্যন্ত নিম্নমতীর সংগে মোকাবিলায় চেষ্টা করা হচ্ছে, সেই চেষ্টাটা আর যাই হোক গণতন্ত্রসম্মত নয়।

এখন কথা হচ্ছে, সরকার এই বে-চুড়-অগণভান্টিক পন্থের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার পিছনে কেন্দ্রের সম্মত প্রণয় রয়েছে, তার কারণ কি? কি সেই শক্তি যা সরকারের হাতকে প্রতিনিয়ত বলিষ্ঠ করে যাচ্ছে?

এর উত্তর খুবই সহজ। বামপন্থী অনৈক্য। বামপন্থী দলগুলির অনৈক্য ও পারস্পরিক কলহ সরকারকে এই কায়দা গ্রহণে উৎসাহিত করেছে। এর ফলে যারা যারা জনসাধারণের স্বাভাবিক শত্রু, তারা বহাল ভবিষ্যতে বাস করছে, আর জনসাধারণ একে অপরের বিরুদ্ধে খুনোখুনির নেশায় মত্ত হয়েছে। আর সরকার দু'হাতে তার মুনাম্বা কুড়েছে। কৃষ্ণনগরের ঘটনাটিই দেখা যাক। কোন একজন দৃষ্টিভ্রষ্টকারী একজন পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু তার প্রতিকারের জন্য পুলিশ বাড়ি বাড়ি তুকে ছেলে-বুড়ো যাকে যেখানে পেয়েছে বেদম প্রহার করেছে এবং সারা শহরে তা'জবের সৃষ্টি করেছে। আসলে এই সব করার জন্য পিছন থেকে উৎসাহ না পেলে হয় না। সরকার পিছন থেকে মনও দিচ্ছে, তোমরা যা খুঁশি করে যাও, কেন না যারা আমাদের বাধা দেবে, তারা নিজেরাই পরস্পরের মাথা ফাটানোর খেলায় মত্ত।

বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান হিসাবে বাংলা দেশের একটা বিশেষ স্থান ছিল, আজ সেই মর্ষাদা ধুলোয় লুটিয়েছে। অপ্রয়োজনীয় বিভেদের এক আত্মঘাতী খেলায় বামপন্থী দলগুলি মেতে উঠেছে, আর পরিণামে বাংলা দেশে পুরোদস্তুর ফ্যাসিস্টরাজ কায়ম হতে বসেছে। সি. পি. এম সহ ছয় পার্টি ভাবছে যে, আসন্ন নির্বাচনে তারা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে খুটো বিপ্লবীদের হাট্টিয়ে দেবে, ওদিকে আট পার্টি ভাবছে হঠকারী সি. পি. এম-কে আগামী নির্বাচনে একহাত দেখে নেওয়া যাবে। গণ-সংগঠনের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে তারা এখন থেকেই লড়াই শুরু করেছে, যার পরিণামে বাংলা দেশ গ্রাহি গ্রাহি ডাক ছাড়েছে, আর ফ্যাসিবাদের কালো ছায়া আকাশ আচ্ছন্ন করেছে। সকলেই জানেন হতাশা থেকেই ফ্যাসিবাদের জন্ম। ইতি-মধ্যেই এই হতাশা থেকেই কিছু কিছু লোক বলতে শুরু করেছে মিলিটারী শাসনই ভাল, অথবা বামপন্থীদের থেরোসেমির চেয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন শ্রেয়। অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের গণভীতিও ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। বামপন্থী দলগুলি কি এগুলি দেখেও দেখবে না?

বর্গাদার সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃঢ় গদক্ষেপ

০

পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংস্কার সমস্যাবলার মধ্যে বর্গাদার সমস্যা অন্যতম—এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অনেক চিন্তা ও পর্যালোচনার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে ‘পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (সংশোধনী) আইন, ১৯৭০’ পাশ করে গত ১৩ই জুলাই থেকে কার্যকর করা হয়েছে। সবলেই জানেন বর্গাদারকে ভাগচাষ কোর্টের আদেশ ছাড়া উচ্ছেদ করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

নূতন আইন অনুসারে—

- ১। বর্গাদারের উচ্ছেদের খারাপগুলি আরো সীমিত হয়েছে।
- ২। নিজ চাষে ৭৫ একর পর্যন্ত জমি / আনতে / যতটুকু জমির প্রয়োজন তার বেশী জমি থেকে বর্গাদার উচ্ছেদ করা চলবে না এবং দেখতে হবে যেন বর্গাদারের অন্ততপক্ষে দুই একর জমি থাকে।
- ৩। বর্গাদারের মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে একজন বর্গাচাষ চালিয়ে যাবেন।
- ৪। জমির মালিক হাল, বলদ, বীজ ও সার সরবরাহ না করলে বর্গাদার উৎপন্ন ফসলের শতকরা ৬০ ভাগের পরিবর্তে ৭৫ ভাগ পাবেন।
- ৫। জমির মালিক ভাগ নিতে কিম্বা রসিদ দিতে রাজি না হলে বর্গাদার মালিকের প্রাপ্য ফসল নির্দিষ্ট আধিবাসিকের কাছে জমা দেবেন।
- ৬। কোথায় ধান তোলা হবে বা মাড়াই হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বর্গাদার।
- ৭। মুনসেফ আদালতের পরিবর্তে ভাগচাষ কেসের আপীল শুনবেন মহকুমা শাসক।

পরিবর্তিত ধারাবাহিকতার বিস্তৃত বিবরণ ‘পশ্চিমবঙ্গ’ সাপ্তাহিকপত্রে (১৭ই জুলাই, ১৯৭০) সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়েছে। কিছু কিছু দৈনিকেও উক্ত ধারাবাহিকতার সারসংক্ষেপ সংবাদ পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিস্তৃত বিবরণের প্রচার ব্যাপকভাবে ছাপিয়েও বিলি করা হচ্ছে। পঃ বঙ্গের সমস্ত জেলার সদর ও মহকুমাস্থিত তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরে যে কেউ বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। সরকার আশা করেন যে, বর্গাদার, জমির মালিক ও সর্বশ্রেণীর লোকের দায়িত্বপূর্ণ সহযোগিতায় নতুন বিধান ভূমি সংস্কার নীতির সুস্ফুট রূপায়ণের পথে আমাদের এগিয়ে দেবে।

(পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত)

তথ্য ও জনসংযোগ ২৫৭৯/৭০

বর্ষ ও প্রাবন

পশ্চিমবঙ্গের সকল জায়গার রিপোর্ট এখনো আসেনি, যেটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে যে, সাম্প্রতিককালের বৃষ্টিপাতের সমস্ত রেকর্ড অতিক্রম করে পর পর কদিন ধরে অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে কলকাতা, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হবার ফলে কম করে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে। কলকাতা পৌর এলাকার প্রায় ৬০ হাজার লোক গৃহহীন হয়েছেন এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন। টাংরা, তপসিয়া, টালিগঞ্জ, কাশীপুর, বেলগাছিয়া প্রভৃতি কলকাতা পৌর অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা জলবন্দী হয়ে রয়েছে। টাংরার বিরাট এলাকা জুড়ে জল থেঁথে করছে, রাস্তাঘাট কোমর-জলের নীচে, কয়েক শো পরিবার জলবন্দী হয়ে রয়েছেন। টালিগঞ্জ পৌর এলাকা এককোমর জলের নীচে। সিংখি অঞ্চলের রাস্তাঘাট সব জলে জলমগ্ন হয়ে গেছে, বসতিবাসীদের দুর্দশা চরমে উঠেছে, প্রতি বাড়ির ভিতরে জল ঢুকেছে। দমদম ও রাজারহাট এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে রয়েছে। দমদম-পাতিপুত্র থেকে সুন্দর উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত, বাগুর এভিনিউ, বরাট কলোনি, দমদম পাক, শ্যামনগর এবং অধিকাংশ উদ্ভাস্তু কলোনি জলের তলায়।

রেল লাইনের দু'ধারে থেঁথে করা জলের মধ্যে কাঁচা বাড়িগুলো হারিয়ে গেছে, পাকা বাড়িগুলো কোনক্রমে দাঁড়িয়ে আছে। জলের নীচে সব কিছু ফেলে রেখে ওই সব মানুষ অস্বস্তিহীন হয়ে সাময়িক আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে বেড়াচ্ছে। কোথাও টালির ঘরে চৌকির উপর চৌকি রেখে শিশুদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। কলকাতা মহানগরী এবং শিয়ালদহ ও হাওড়া স্টেশন থেকে রেল লাইনের দু'পাশের হাজার হাজার গ্রাম জলমগ্ন। উপরে অকাশের অবিশ্রান্ত বর্ষণধারা, নীচে স্রোতোধারা দরিদ্র মানুষের কাছে অভিশাপের মত নেমে এসেছে। কৃষ্ণপুত্র খালের বাঁধ ভেঙে জল ক্রমশ ভিতর দিকে চাপ সৃষ্টি করছে। লবণ হ্রদ ও কৃষ্ণপুত্র খালের বাঁধভাঙা জলের চাপে বহু এলাকা প্রাণিত হয়েছে। লবণ হ্রদ এলাকার পান্সবতী বহু বাসিন্দা জলপ্রাবনে ভিটেমাটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বিরাট অঞ্চলের ৭০।৮০ ভাগ বাড়ি প্রায় ডুবে রয়েছে। স্থানীয় বিদ্যালয় গৃহগুলিতে এবং উচ্চ অঞ্চলের

বাড়িতে ফেলাকোপা আশ্রয় নিচ্ছে। বেলগাছিরার যতীন দাশ নগর জলে ভেসে গেছে, সেখানে তিন শতাধিক পরিবার গৃহচ্যুত হয়েছে। বেলগাছিয়া নন্দননগর সরকারী কলোনিটিও প্রাণিত হয়েছে। চব্বিশ পরগণার হাবড়া অঞ্চল জলমগ্ন হবার ফলে লক্ষাধিক লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিয়ালদহ থেকে নৈহাটির রেল লাইনের দু'ধারের সমস্ত উদ্ভাস্তু উপনিবেশগুলি জলমগ্ন হয়েছে। টিটাগড় পৌর এলাকার বিবেক-নগর, শান্তিনগর, খড়বহর আনন্দপল্লী ও সূর্য সেন নগরের প্রায় প্রতিটি ঘরে জল উঠেছে।

এদিকে হাওড়া স্টেশন জলবন্দী এবং স্টেশনের রুট রীলে ইন্টারলকিং ব্যবস্থা পুরোপুরি বানচাল হবার ফলে হাওড়া স্টেশন থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে ট্রেন চলেনি। হাওড়া-খলপুত্র শাখার সমস্ত ট্রেন বানচাল হয়। প্রবল বর্ষণে হাওড়ার দমকল অফিস জলে ডুবে যায়, গ্র্যান্ড ট্রান্স রোড কাষত একটি নদীতে পরিণত হয়। হাওড়া সদরে ধারসা, বালটিপুরী, শিবপুর, জগাছা, পেটরা, বালি, দাতোর এবং উলুবেড়িয়া মহাকুমার শ্যামপুর, উদয়নারায়ণপুর, শিসবোড়িয়া, নাকোল প্রভৃতি এলাকা জলমগ্ন হয়। হুগলী জেলার নানাস্থানও প্রাবনের কবলে পড়ে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে রেহুলা ও গঙ্গানদীর জল বেড়ে যাওয়ায় কালনা মহাকুমার দেড়শতাধিক গ্রাম জলমগ্ন হয়েছে। জলমগ্ন গ্রামগুলি থেকে দলে দলে নারী-পুরুষ কালনা শহরে এসে জমা হচ্ছে। মস্তেবর রকের ৫৩টি গ্রাম, পূর্বস্থলী রকের চারটি অঞ্চল কালনার ১ ও ২নং রকের ১০টি অঞ্চল প্রাণিত হয়েছে। কালনা মহাকুমার বিভিন্ন স্থান থেকে সংবাদ এসে পৌঁছেছে যে, প্রাণিত অঞ্চলের অধিবাসীরা দিনের পর দিন অনাহারে রয়েছে। হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানা এলাকার হরিপুর, আইয়া, ভগবতীপুর, হারানন্দবাটি এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে। মেদিনীপুর ও পাঁশকুড়ায় কাঁসাই নদীর জল বিপদ-সীমা অতিক্রম করেছে। বন্যার ফলে ঘাটাল, কাঁথ ও পাঁশকুড়ার নীচু এলাকাগুলি প্রাণিত হয়েছে। কংসাবতী ও ফেলেঘাই নদীর জলক্ষীতি ও প্রবল বর্ষণের ফলে মেদিনীপুর জেলার দাশপুরা, কেশপুর, নন্দীগ্রাম, পটীশ-পুর, ভগবানপুর, ঘাটাল, সবং এবং পিলা থানার বিরাট এলাকা জলমগ্ন হয়েছে।

প্রবল বর্ষণে পাঞ্চে জলধারার

জল বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। জলের চাপ ক্রমবর্ধমান। কতৃপক্ষ ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে ব্যারেজ থেকে পঞ্চাশ হাজার ক্রিউসেক জল ছেড়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। আরও ষাট হাজার ক্রিউসেক জল ছাড়া হতে পারে বলে খবর পাওয়া গেছে। বলাই বাহুল্য, এর ফলে নতুন করে আবার ক্রিয়ম প্রাবনের সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বর্ধমানের একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলপ্রাণিত হয়েছে। এমন কি বীরভূম জেলাতেও জলপ্রাবন ঘটেছে। অজয় ও কোপাই নদীতে জলক্ষীতি ঘটায় অবস্থা আরও ঘোরালো হয়েছে। জেলা কতৃপক্ষ ইতিমধ্যে অজয় নদ প্রারিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সিউড়ি, বোলপুর, সড়কপথে একটি ব্রিজ ডুবে যাওয়ায় ওই পথের সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ৭২ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণের ফলে বীরভূম জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে শত শত মাটির বাড়ি ধসে পড়ে গেছে। অজয় নদের তীরে ইলামবাজার, দুবরাজপুর, বোলপুর, নামদুর, স্বরাসোল প্রভৃতি নানা অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের মধ্যে রেল লাইন ডুবে যাওয়ায় আদ্রা-খলপুত্র বিভাগের ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়েছে। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর স্টেশনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত দু'দূর অঞ্চলের সকল সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছোয় নি। সব মিলিয়ে উত্তর বাংলা ছাড়া (সেখানে কি হবে জানি না) পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভোগে পতিত হয়েছে। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আশ্রয় নেই, পানীয় জল নেই। অথচ কোন উদ্ধারের ব্যবস্থা নেই, গ্রাণের ব্যবস্থা নেই। সরকার নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। এই ভরাবহু দুর্ভাবপেকের মোকাবিলার জন্য রাজ্যপালের ভাষ্যর শ্বেক সাড়ে বারো হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে মাত্র। কত লোক মারা গেছে তার এখনো হিসেব সরকার দেনা। কত বাড়ি জলের নিচে তন্নই বা হিসাব কোথায়? সরকারী কতৃপক্ষরা বৈঠক করছেন, কিন্তু তাঁদের কোন মৌলিক কর্মসূচীর পরিচয় পাওয়া যায় নি। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ তাঁদের অভিজ্ঞতার জ্ঞানের যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে আমলাতান্ত্রিক সরকারের কোন চিহ্ন থাকেনা। '৬৮ সালের জলপাইগুড়ি বন্যার সময়ে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে।

কলকাতা শহরবাসীর এই চরম দুর্দশার মধ্যে সরকার ও পৌর সংস্থার ব্যবস্থার সকলেই নিরাশ হয়েছেন। জল



রাজন্যভাতা বিলোপ বিল

গত ২রা সেপ্টেম্বর লোকসভায় প্রাক্তন দেশীয় নৃপতিদের ভাতা এবং বিশেষ সন্মোহন-সুবিধা বাতিল বিল পাশ হয়ে গেছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন ৩৩৯ জন এবং বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন ১৫৪ জন। রাজন্যভাতা বিলোপ করবার জন্য সংবিধানের কয়েকটি ধারা সংশোধন করতে হয়েছে। সংবিধানের ধারা সংশোধন করতে হলে লোকসভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোট দরকার হয়। কংগ্রেস দল দু'ভাগে ভাগ হবার পর লোকসভায় শক্তিবিন্যাসের চেহারা দেখে অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে, বিলের পক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ ভোট সংগ্রহ করা হয়ত সহজ হবে না। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল সে সন্দেহ অমূলক। বিলের উপর কিভাবে ভোটাভুটি হয়েছে তার হিসাবটা নীচে দেওয়া হল।

বিলের পক্ষে : কংগ্রেস (ইন্দিরা-পন্থী)—২১৫, স্বতন্ত্র—১, ডি-এম-কে—২৪, সি-পি-আই—২০, সি-পি-এম—১৮, এস-এস-পি—১২, পি-এস-পি—১৫, বি-কে-ডি—৩ এবং নির্দলীয়—২৮। মোট ৩৩৯।

বিলের বিপক্ষে : কংগ্রেস ইন্দিরা-পন্থী দেশীয় নৃপতি—৮, কংগ্রেস (নিজলিঙ্গাপা-পন্থী)—৫৮, স্বতন্ত্র—৩০, জনসংঘ—৩২, বি-কে-ডি—৮, আকালী—৩ এবং নির্দলীয়—১২। মোট—১৫৪।

বিলটি এইবার রাজ্যসভায় যাবে। সেখানে বিল পাশ হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনলাভের পর সেটা আইনে পরিণত হবে।

এই বিল আইনে পরিণত হলে ভারত ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় বিলটি উত্থাপন করে বলেন যে, এই বিল ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যপূর্ণ। তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে ভারতবাসীর শ্রমজীবীর কোন অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

ভারতের দেশীয় নৃপতিদের ইতিহাস দেশদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র এবং লান্পটের কলঙ্ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে সুরু করে, তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন স্বাধীন নৃপতির অধীনে ছিল। প্রজাদের উপর নির্যম শোষণ এবং পীড়ন চালিয়ে নিজেদের আরাম-আয়েস সন্নিবিষ্ট করা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন কাজ ছিল না। কয়েকজন স্বাধীন নৃপতি ও নবাব অবশ্য দেশভ্রাবোধে উদ্ভূত হয়ে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ লড়াই চালিয়ে বিশেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা ভারতবাসীর হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বাকী সকলে ইংরাজ সরকারের অধীনতা স্বীকার করে তাদের বশব্দ ভুতো পরিণত হয়েছিল। ইংরেজের কাজে নিজেদের সার্বভৌমত্ব নৈবেদ্য দিয়ে তারা স্ব স্ব এলাকার প্রজা শোষণ এবং পীড়নের অধিকার লাভ করেছিল। তাদের একমাত্র কাজ ছিল বৃটিশ রাজপুত্রদের তোষণ করে বিলাস-ব্যসনের প্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া। তারা ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত অনুচর। ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম মুক্তিযুদ্ধে (সিপাহী বিদ্রোহ) দেশীয় নৃপতিরা প্রায় সকলেই ইংরেজের পক্ষে যোগ দিয়ে নির্যম হস্তে ভারতের মুক্তিযুদ্ধে দমন করেছিল। তাই ভারতবাসী কোন দিনই এই তথ্যকথিত দেশীয় নৃপতি-

দের ক্ষমা করতে পারেন না। ইংরাজ রাজত্বকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মূলে লক্ষ্য ছিল বিশ্বদৃশী—(১) বৃটিশ শাসনের উচ্ছেদ এবং (২) দেশীয় নৃপতি উচ্ছেদ। ভারতের মুক্তিবিপ্লব যখন ইংরাজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করে তখন মেরুদণ্ডহীন এই দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে অনেকেই বিদায়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে চক্রান্ত করে 'স্বাধীন' হবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভারতবাসীর রক্তচক্ষু তাদের সেই অপচেষ্টা থেকে বিরত করে। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় নৃপতিদের উচ্ছেদের আয়োজন ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতারা কিছুটা ব্যাহত করে দেন। দেশীয় রাজগৃহলো ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অঙ্গীভূত হয় বটে, তবে তার পরিবর্তে দেশীয় নৃপতিদের ঢালাও ভাতা এবং সন্মোহন-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। দেশদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতকদের অকর্ম্য বংশধরদের পোষবার জন্য ভারতের রাজকোষ থেকে প্রতি বছর প্রায় পোনে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। যে দেশের অধিকাংশ মানুষের আয় দৈনিক চালিশ পয়সা, সেই দেশে মুষ্টিমেয় নিষ্কর্ম্য লোকের জন্য বছর বছর পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা একেবারেই নীতিবিপর্যিত নয় কি? প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর গভর্নমেন্ট এতদিনে সেই অন্যায় এবং অবিচারের অবসানের পথ প্রশস্ত করে দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, গৃহীত বিলে নৃপতিদের ভাতা লোপের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই ক্ষতিপূরণের কোন যুক্তি ছিল কি? কিন্তু আমাদের সংবিধান এমনভাবে রচিত যে, ক্ষতিপূরণ ছাড়া কারও কোন কায়মী স্বার্থ কেড়ে নেওয়া সম্ভব নয়। যতদিন না সংবিধানের সেই ধারাটি সংশোধিত হচ্ছে ততদিন এই অসংগতি মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায় কি?

মণিপুর ও ত্রিপুরা

ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য মণিপুর এবং ত্রিপুরা বর্তমানে কেন্দ্র শাসিত এলাকা। স্থানীয় অধিবাসীরা বহুকাল ধরেই দাবি করে আসছিলেন যে, ঐ দু'টি এলাকাকে ভারতের দু'টি পৃথক রাজ্য বলে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। গত সপ্তাহে সেই দাবি পাল্লামেটে 'নীতি-গত'ভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং এবং রাজ্যসভায় স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে. সি. পণ্থ প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন যে, অল্প কিছুকালের মধ্যেই

বঙ্গমতীর বই দান

সদ্য প্রকাশিত! নতুন সংস্করণ।
বেদব্যাস বিরচিত

মহাভারত

কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক সরল গদ্যে
অনুবাদঃ ১ম ১৬ টাকা ২য় ১০ টাকা
৩য় ১০ টাকা ৪র্থ ৮ টাকা ৫ম ৮ টাকা।
বড় টাইপে মূল্যবান কাগজে ছাপা।

শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাণীশের

বৃহৎ তত্ত্বসার

১ম খণ্ড পনেরো টাকা
২য় খণ্ড পনেরো টাকা
(বহু চক্র ও যন্ত্রের চিত্র সহ)

সুবকবচমাল

প্রতিটি দেবদেবীর স্তোত্র, মন্ত্র
ও কবচের একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ।
পৃষ্ঠা ৯৩৯ ॥ আট টাকা

শ্রীমদ্ভাগবতগীতা মূল, ব্যাখ্যা
ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত ॥ দুই টাকা
গীতা গ্রন্থাবলী পঞ্চবিংশতি
গীতার সমাহার। মূল সংস্কৃত ও
সরল বঙ্গানুবাদ। পাঁচ টাকা
ছান্দোগ্য উপনিষদ / ছয় টাকা
যোগেশ্বর / পাঁচ টাকা
পবন-বিজয়-স্বরোদয় / তিন টাকা
শ্রীশ্রীগুরু শাস্ত্রঙ্গ / তিন টাকা
হঠযোগ প্রদীপিকা / তিন টাকা
পদ্মসুন্দর রসোন্মাদ / তিন টাকা
যোগী রাজ্যবন্ধন / দুই টাকা
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত / আট টাকা
শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ / ছয় টাকা
শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত / ছয় টাকা
দোঁহাবলী / তিন টাকা

মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী
১ম ৬ টাকা ২য় ৬ টাকা ৩য় ৮ টাকা
বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থাবলী/পাঁচ টাকা
ক্যাটালগের জন্য লিখুন। মফস্বল ও
অন্যান্য সহরের পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য
কমিশন শতকরা পনের টাকা

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ

১৬৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

কেন্দ্রীয় সরকার এ সম্বন্ধে তাঁদের
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে,
ত্রিপুরা এবং মণিপুরের পূর্ণাঙ্গ
রাজ্যের দাবি সরকার নীতিগতভাবে
মেনে নিয়েছেন। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের
উন্নয়ন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্যার
গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে খুঁটিনাটি
বিষয় স্থির করা হবে।

ত্রিপুরার আয়তন ১০,৪৫১ বর্গ-
কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৪ লক্ষ ২৪
হাজার। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর
এই প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যটি ভারতের
অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্যের জন্য একটি
আইনসভাও গঠিত হয়েছে। প্রথম
মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১৯৬৩ সালের ১লা
জুলাই। ত্রিপুরায় জেলা মাত্র একটি,
সেই জেলার অধীনে ১০টি মহকুমা
এবং ৪৪টি তহশীল আছে। আসামের
লাগোয়া এই রাজ্যটি তিন দিকই
পূর্ব পাকিস্তানের দ্বারা পরিবেষ্টিত।

মণিপুরের আয়তন ২২,৩৪৬ বর্গ-
কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৭ লক্ষ
৮০ হাজার। রাজস্ব ২ কোটি টাকা।
গত বছরের আগে পর্বন্ত মণিপুরে
জেলা ছিল মাত্র একটি। তার অধীনে
ছিল ১০টি মহকুমা, ৪টি সমতলভূমিতে
এবং ৬টি পার্বত্য এলাকায়। গত বছর
এই রাজ্য ইক্ষল, কারং, ইখরদুল,
তামেংলং এবং চিরাচাঁদপুরকে সদর
দপ্তর করে পাঁচটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে।

মণিপুরের সমতলভূমিতে বাস করেন
পাঁচ লক্ষ লোক। বাকী লোক বাস
করেন পার্বত্য এলাকায়।

কাছাড় বিমান দুর্ঘটনা

গত ২৯শে আগস্ট অপরাহ্নে এক-
খানি যাত্রীবাহী ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান
শিলচর থেকে কলকাতায় আসবার পথে
শিলচর বিমানঘাটি ত্যাগ করার কয়েক
মিনিটের মধ্যেই এক দুর্ঘটনায় পতিত
হয়ে উত্তর কাছাড়ের ঘন জঙ্গলের
মধ্যে ভেঙে পড়ে। তাতে বিমানের
৩৯ জন আরোহীই মারা গেছেন।

বিমানখানি শিলচর ত্যাগ করার
অল্পকাল বাদেই বিমানঘাটির সঙ্গে তার
বেতার যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়।
তারপর বিমানখানির আর কোন হদিশ
পাওয়া যাচ্ছিল না। বহু অনুসন্ধানের
পর গত পয়লা সেপ্টেম্বর বেলা
আড়াইটার সময় অনুসন্ধানকারী দল
বিমানের ভস্মাবশেষের কাছে গিয়ে
পৌঁছতে সক্ষম হন। প্রাথমিক তদন্তে
মনে হচ্ছে হতভাগ্য বিমানখানি সম্ভবত
কনখস পাহাড়ের ৫৫৯৫ ফুট উচ্চ
চুড়ায় ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়েছিল।

বিমানখানি পাহাড় অতিক্রম করার মত
উর্ধ্বে উঠতে পারে নি কেন, সেটা ঠিক
বুঝতে পারা যাচ্ছে না। যাই হোক,
দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের জন্য
তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়।

লোকসভায় উপমন্ত্রী সরোজিনী
মহিষী বলেছেন যে, হতভাগ্য বিমানের
পাইলট ছিলেন ডি সি দত্ত। তিনি
অত্যন্ত সুদক্ষ পাইলট ছিলেন। তিনি
ইতিমধ্যেই বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সাড়ে
১০ হাজার ঘণ্টা বিমান চালিয়েছেন।
বিমানের অন্যান্য কর্মচারীরাও খুব
সুদক্ষ ছিলেন। এইরকম দুর্ঘটনা
বৈমানিকদের দ্বারা পরিচালিত বিমান
একটি অতি পরিচিত পাহাড়ের চুড়ায়
ধাক্কা খেয়ে ভেঙে পড়ল কি করে,
সেটাই আশ্চর্য। সাধারণ মানুষের
মধ্যে এইরকম সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে,
বিমানে নিশ্চরই কোন যান্ত্রিক ত্রুটি
ছিল। গত বছর এইভাবে একই রাস্তায়
আর একখানি যাত্রীবাহী ফকার
ফ্রেন্ডশিপ বিমান অতি রহস্যজনকভাবে
খুলনার বাদা অঞ্চলে ভেঙে পড়েছিল।
তাতেও বহু লোক মারা যান। বর্ষা-
কালের অপরাহ্নে পূর্বাঞ্চলের আবহাওয়া
সাধারণত উষ্ণ থাকে। তাতেও
এই দুর্ঘটনায় আবহাওয়ার কোন
অবদান আছে কি না, তাও পরীক্ষা করে
দেখা দরকার।

(৪।৯।৭০)

বঙ্গদর্শন

[৬৫০ পৃষ্ঠার পর]

নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই, সেরকম
কোন প্রচেষ্টারও নমুনা দেখতে পাওয়া
যাচ্ছে না। নিজেদের অপদার্থতা ঢাকার
জন্য কেবল পরস্পরের প্রতি অভিযোগ,
পাল্টা অভিযোগ চলছে। রাজ্যের সেচ-
দপ্তরের কাছে উত্তর কলকাতার ডেপুটি
পুলিশ কমিশনার লবণ হ্রদ এলাকার জল
পাম্প করে অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্য
অনুরোধ জানান, কিন্তু ৪৮ ঘণ্টা পার
হবার পরও সেচ দপ্তর এখনো নীরব। শব্দ
সেচদপ্তর নয়, কলকাতা পৌর সংস্থার
বিরুদ্ধেও ওই একই অভিযোগ। শহরে
সাবেকী জলনিকাশী ব্যবস্থায় দু' ঘণ্টায়ও
সিকি ইঞ্চি বা আট ঘণ্টায় এক ইঞ্চি জল
সরানো এখনো সম্ভব হয় নি, অথচ
শহরে এখনো এলাকাবিশেষে আট-দশ
ইঞ্চি পরিমাণ জল দাঁড়িয়ে আছে। খোদ
কলকাতা শহরেই যদি এই অবস্থা হয়,
দুরবর্তী জেলাগুলিতে যে কি ঘটছে
সেটা সহজেই অনুমেয়।

—৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭০



জাম্বিয়া :

৮ই সেপ্টেম্বর থেকে জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন শুরু হচ্ছে। ৫১টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারের প্রধানরা এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন। তার পূর্বে দু'দিন ধরে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন হবে।

লুসাকা সম্মেলন হচ্ছে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রপ্রধানদের তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলন। প্রথম শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬১ সালে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে। দ্বিতীয় সম্মেলন হয়েছিল ১৯৬৪ সালে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের রাজধানী কায়রোয়।

এক বিশেষ আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে জোটনিরপেক্ষতার উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে শুরু হয় ঠান্ডা লড়াই। বিশ্বের অনেকগুলি রাষ্ট্র হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নয় তো সোভিয়েত ইউনিয়নের তাব্দেদার বা প্রায়-তাব্দেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'দুই মেরু নীতি' বা 'বাইপোলারিজম' তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করে। নেন, একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের শিবির (বিরোধীপক্ষের বিচারমত পুঁজিবাদী শিবির), আর অপরদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রী শিবির (বিরোধীপক্ষের কথায়, এক-নায়কত্বের শিবির)—প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই এ দু'টির একটির সঙ্গে থাকতে হবে। এর বাইরে কারও থাকবার উপায় নেই। এবং এই দুই শিবিরের মধ্যে চলছে একটানা দ্বন্দ্ব। চলছে অস্ত্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতা, সামরিক সংস্থা গঠন। যে-কোন সময় ঠান্ডা লড়াই প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এই হল দুই মেরু নীতি।

কিন্তু যে-সব রাষ্ট্র এই দুই শিবিরের কোনটির সঙ্গেই পরোপরি একমত নয়, তাদের অবস্থা খুবই অস্বস্তিকর। বৃহৎ

শক্তি নয় বলে নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন একজনের সঙ্গে ভিড়ে যেতে হবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দুই মেরু নীতি ও ঠান্ডা লড়াই-এর ফলে তাদের স্বাধীনতা নতুন করে বিপন্ন হবার উপক্রম হয়। তাই, দুই শিবির বা জোট-বাহির্ভূত রাষ্ট্রগুলি দুই জোটনিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করে।

১৯৫৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে



টুন আবদুর রেজাক

জোটনিরপেক্ষতা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বান্দুং সম্মেলন থেকে বিখ্যাত পঞ্চাশীল নীতি ঘোষণা করা হয়।

পরবর্তীকালে জোটনিরপেক্ষ রাজনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল জোশেফ ব্রজ টিটো। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে বিশ্বের প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। টিটো ছাড়া আর যে দু'জন বেলগ্রেড সম্মেলনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা হলেন সংযুক্ত আরব প্রজা-

তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি আবদুল গামেল নাসের ও ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। টিটো, নাসের, নেহরু—এই তিনজনকেই জোটনিরপেক্ষতার জনক বলা হয়।

জোটনিরপেক্ষতার প্রধান প্রধান বক্তব্য হল : দুই জোট রাজনীতি বা দুই মেরু নীতির অবসান ঘটতে হবে, ঠান্ডা লড়াই বন্ধ করতে হবে, সর্বপ্রকার সামরিক জোট ভেঙে দিতে হবে, নিরস্ত্রীকরণকে কার্যকরী করতে হবে, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যের বিলোপ ঘটতে হবে এবং অন্তর্ভুক্ত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ পরিহার করে আলাপ-আলোচনার দ্বারা শান্তিপূর্ণ পন্থায় সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে, এই সাধারণ নীতি হল জোটনিরপেক্ষতার ভিত্তি।

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মিলনের ফলে আজ প্রকৃতপক্ষে আর একটি নতুন বা তৃতীয় জোটের সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন ও সোভিয়েত জোটের এমন কি পৃথক চীনের ওপরেও এই নতুন জোটের উগ্রব্য-যোগ্য প্রভাব পড়ে।

লুসাকা সম্মেলন এমন একটি সময়ে হচ্ছে, যখন পশ্চিম এশিয়ার বহু-আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধবিরতি (সামরিক হলেও) হয়েছে এবং ঐতিহাসিক রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাই জোটনিরপেক্ষ নেতারা আশা করছেন, ঠান্ডা লড়াই-এর যুগ বোধ হয় শেষ হল। কিন্তু সংকট এখনও কাটে নি। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। ইজরায়েলের পক্ষ থেকে আক্রমণ শুরু হয়েছে। ইজরায়েলও পাল্টা অভিযোগ করেছে, আরবরা যুদ্ধবিরতির চুক্তি ভেঙেছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ করেছে, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র যুদ্ধবিরতির সত্য মানছে না।

ভিয়েতনামেও শান্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। প্যারিস শান্তি আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। কম্বোডিয়ায় নতুন করে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে।

লুসাকা সম্মেলনে পশ্চিম এশিয়া, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, নিরস্ত্রীকরণ এ সব প্রশ্নে অবশ্যই উগ্রব্যযোগ্য আলোচনা হবে। তবে লুসাকায় সবচেয়ে প্রাধান্য পাবে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বটেনের অস্ত্রবিক্রয়, রোডেশিয়ায় বে-আইনী ইয়ান স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম এবং এঙ্গেলা ও মোজাম্বিকের পর্ভগঞ্জ উপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আফ্রিকীদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম।

[শেষাংশ ৬৬০ পৃষ্ঠায়]

এখন শব্দ পথ চাওয়া আর কাল গোণা। সতেরোই সেপ্টেম্বর দিনাটর জন্য নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সি-পি-আই-এম, সি-পি-আই, বাংলা কংগ্রেস, আর-এস-পি। এই দলগুলির নাম করলাম এই কারণে যে, এদের সকলেরই জীবনমরণ যুদ্ধ চলছে কেরলে। আর একটি দলও আছে এস-এস-পি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এস-এস-পি কোন নিয়ামক শক্তি নয়—সেই কারণে তার উল্লেখ করলাম না। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস, যার কেরলের রাজনীতির সঙ্গে কোন রাজনীতিক সম্পর্ক থাকবার কথা নয়, তার পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্পর্কে নির্ভরশীল কেরলের নির্বাচন যুদ্ধের ফলাফলে। শব্দ পশ্চিমবঙ্গ কেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—যিনি দিল্লীতে সারা ভারতের দেশীয় রাজাদের পাগড়ী-উজ্জীষ কেড়ে নিয়েছেন, মোরারজী দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মিন্দ্রাশাসনিকে কৌপীন পরিয়ে ছেড়েছেন, তিনিও তাকিয়ে আছেন কেরলের দিকে। কেরল শব্দ আজ কেরল নয়—কেরল শব্দ পশ্চিমবঙ্গের আগামী দিনের রাজনীতির ভবিষ্যৎ নয়, সারা ভারতের রাজনীতির দিগদর্শন।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন কবে হবে এ সম্পর্কে যদি কারকে প্রশ্ন করা হয়, তবে তিনি নিশ্চিতভাবে বলবেন—কি জানি মশায়, কিছই বোঝা যাচ্ছে না। ১৯৭১ সালেও হতে পারে, ১৯৭২ সালেও হতে পারে। যাঁরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে নানা চিন্তায় বিভ্রান্ত, তাঁরা বলবেন, আগে দেশের অবস্থা সুস্থ-স্বাভাবিক হোক, তারপর নির্বাচন হবে। আর যাঁরা মনে করেন নির্বাচন ও নির্বাচনের পর সরকার



হলেই দেশের আইন-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক হবে, তাঁরা বলবেন নির্বাচন এক্ষুণি চাই। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে না হলেও ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চাই-ই চাই। কিন্তু আমি বলি—এই দুইপক্ষের কারো কথাই খুব জোরদার ও যুক্তি-নির্ভর নয়। কিন্তু এদের সকলের কথাই উল্টে দিতে পারে কেরল। যেমন কেরলে যদি ইন্দিরা গান্ধীর দল ও সি পি আই বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তা হলে দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ১৯৭১ সাল কেন, '৭০ সালেই হয়ে যেতে পারে। 'দরজে গয়লা ঢেলা বয়'—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে বাঁকের একপাশে যদি দইয়ের ভাণ্ড জুড়ে যায়, তবে আর এক পাশে তিনি ঢেলা বইতেও রাজী হবেন। কেরলে যদি নব কংগ্রেস সি পি আইকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল সাফল্যলাভ করে,

তখন সেই সাফল্যের উত্তাপ থাকতে থাকতেই নব কংগ্রেস, সি পি আই দুই পক্ষই চাইবেন পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি পারে হয়ে যাক। আজকে যাঁরা এই মর্মেতে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোন যুক্তি-সম্ভাবনা খুঁজে পাচ্ছেন না, দেখা যাবে তাঁরাই কিন্তু বিপুল উৎসাহে ও অনেক যুক্তিতে জীবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের পক্ষপাতী হয়ে উঠবেন। জয়লাভ করে শব্দ নব কংগ্রেস, সি পি আই নয়—একই আশার পথ চেয়ে ও কাল গুণে চলছে সি পি এম। সি পি এম মনে করে, কেরলে যদি তারা জয়লাভ করে, তাহলে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণায় কেউ বাধা দিতে পারবে না, আর বাধা দিলেও বাধা দেবার পেছনে কোন সবল যুক্তি থাকবে না। কাজেই ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হবে। আর কেরলে যদি নির্বাচনে জয়লাভ হয়ে যায়, তবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে তাঁরা ওয়ান-সাইডেড গেম খেলতে পারবেন। এ ছাড়া অজয় মুখার্জী বা অন্যান্য যাঁরা এখন পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন সম্ভব নয় বলছেন, তাঁরা যদি দেখেন কেরলে সি পি এম-এর ভরাডুবি হয়েছে, তবে পঃ বঙ্গে তাঁরা সি পি এম-কে একই পথে পাঠাতে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী কেন, তার আগেই নির্বাচন চাইবেন।

শব্দ নির্বাচনের দিন ঠিক করার কথাই নয়, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে রাজনৈতিক জোট বাঁধা সম্পর্কে কি হবে, সেটাও নির্ভর করছে কেরলের নির্বাচনের ফলাফলের ওপর। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলি এখনও জোট বাঁধার ক্ষেত্রে খুব



গাণ্ধীজী বঙ্গমতী

একটা বেশি গরজ! অনুভব করছে না, কারণ সকলেই ভারতের কবে নির্বাচন হবে তার ঠিক নেই, এত আগে জোট-বন্দী হবার গরজ কেন?

ভাদ্র মাস সামনে রেখে কখনও বিয়ের কথা পাকা হয় না বা এগোয় না—কারণ পাত্র পক্ষ ও পাত্রী পক্ষ দু'জনেই ভাবে এখন সামনে ভাদ্র মাস, কোন বিয়ে-থা হবে না, তারপর আশ্বিন মাস, তারপর কার্তিক মাস অর্থাৎ বিয়ে-থা হলে হবে সেই অগ্রহায়ণে। কাজেই এত আগে কথা পাকা করে লাভ নেই। বরং এখন ঝুলিয়ে রেখে ভাল করে পাত্র বা পাত্রী পক্ষের খোঁজ নাও—সেই সঙ্গে আরো ভাল পাত্রের খোঁজ কর। যদি বর্তমান পাত্রী অথবা পাত্র অপেক্ষা ভাল যোগাযোগ না ঘটে, তবে এটা তো হাতের পাঁচ রইলই—অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে গরজ করলেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির জোটবন্দীর অবস্থা ঠিক এই। ভাদ্র মাস সামনে নিয়ে কেউ কোন পাকা কথার দিকে যাচ্ছেন না, শব্দ সময়ক্ষেপ করে যাচ্ছেন। তবে হ্যাঁ, কেরলে নির্বাচন হয়ে গেলে একটা আলো দেখা যাবে। সেই আলোতে সকলেই পথ দেখে এগুতে চেষ্টা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গে ফ্রন্টগতভাবে আট পার্টি ও ছয় পার্টি দুইটি জোট রূপ পেয়েছে, তবে এর মধ্যে আট পার্টি জোট এখনও নিজেদের ফ্রন্ট বলে ঘোষণা করেন নি, ছয় পার্টি নিজেদের ফ্রন্ট হিসাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন। আট পার্টি জোটের ফ্রন্ট হিসাবে ঘোষণায় অনেকগুলি ঝিকলু দেখা গেছে। যেমন আট পার্টি এখনও আশা করছে বাংলা কংগ্রেস তাদের জোটে আসবে, আর এস পি ও লোকসেবক সম্বন্ধে তাদের দিকে আসবে, অভাব ওরা সকলে এলেই পাকা ফ্রন্ট করা হবে। এই দিকে বাংলা কংগ্রেস ও আর এস পি দুই পক্ষই পড়ে আছেন এক অল্পভূত আবর্তের মধ্যে এবং দু'দলই এখন শব্দ সময়ের অপেক্ষা করে চলেছেন। বাংলা কংগ্রেসের দুই চোখ রয়েছে দুই দিকে—এক চোখে তারা দেখছেন আট পার্টি জোটকে, আর অন্য চোখে দেখছেন নব কংগ্রেসকে। তাই কাউকে পাকা কথা না দিয়ে উভয়কেই বলছেন দেখা যাক কি হয়। আসলে মূল নজর রয়েছে কিন্তু কেরলের দিকে। বাংলা কংগ্রেস চায় আট পার্টিতে যোগ দিতে, কিন্তু সঙ্গে নব কংগ্রেসকে নিয়ে। কিন্তু আট পার্টির কিছু শরিক—যেমন, এস ইউ সি, ফরোয়ার্ড ব্লক কোনরকমে নব কংগ্রেসকে জলচল করে নিজেদের পঙ্ক্তিতে বসাতে রাজী নয়। সি পি আই দল—যারা সারা ভারতের রাজনীতিতে নব কংগ্রেসের সঙ্গে গটিছড়া বাঁধতে কোন-

প্রকার সংকোচবোধ করে না, রং আরঙ্গ: গর্ব অনুভব করে, তারা কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে নব কংগ্রেসকে অচ্ছন্ন বলে দূরে ঠেলে রেখেছে।

কেরলে যেখানে শ্রীঅচ্যুত মেনন সব ছুঁমার্গ ত্যাগ করে নব কংগ্রেসের সঙ্গে গটিছড়া বেঁধেছেন এবং বলে দিয়েছেন—শব্দ আজ নয়, '৭২ সালের নির্বাচনেও নব কংগ্রেস তার সখা-সাথী সহযাত্রী হবে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই বলছে শ্রীবিক্রম সিং নাহার, শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কর, শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ অচ্ছন্ন। বাংলা কংগ্রেসের আপত্তি এইখানে। তোমরা কেরলে যদি নব কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সি-পি-এম-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে পশ্চিমবঙ্গে কেন তাদের সঙ্গে নেবে না?

কেরলে ইন্দিরা কংগ্রেজ ভাল



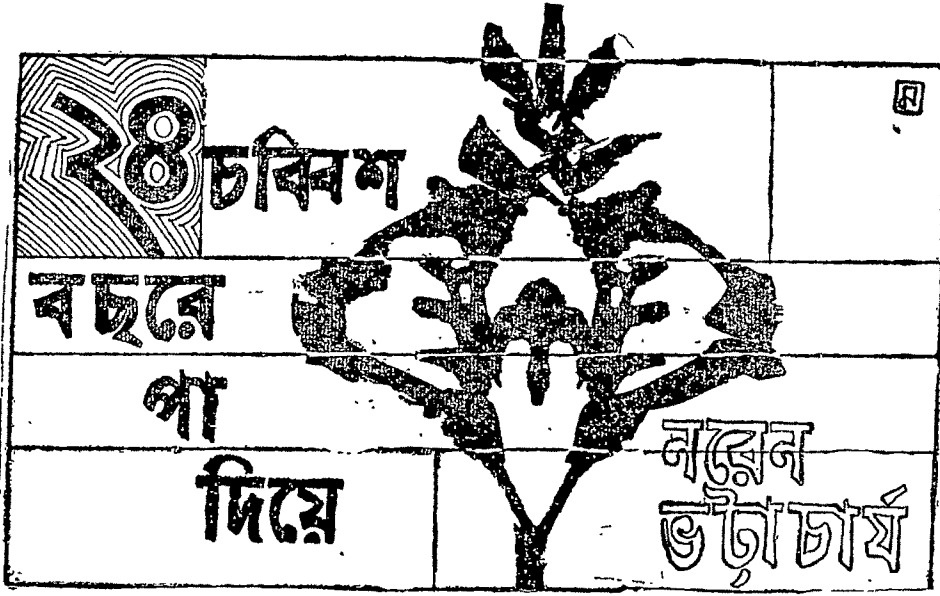
কেরলে সি-পি-এম ভোম্বাদের শত্রু, এখানেও সি-পি-এম ভোম্বাদের। শত্রু, আমায়ও শত্রু, তবে 'কমল' শত্রুকে নিধনে কেন? একজন বধু শক্তি সঙ্গে নেবে না? এই অবস্থায় বাংলা কংগ্রেস কেরলের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ কেরলে যদি নব কংগ্রেস ও সি-পি-আই জোট জয়লাভ করে, তবে সেখানকার একটা চাপ পশ্চিম-বঙ্গে পড়বে। কেরলে যদি সি-পি-আই-নব কংগ্রেস সরকার গড়ে, তখন নীতিগতভাবে পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই আর নব কংগ্রেসের বিপক্ষে থাকতে পারবে না। দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী ভাল, তাঁর কংগ্রেস ভাল, কেরলে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস ভাল আর পশ্চিমবঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস খারাপ—এই মত অনেক জোলো ও ছেলেমানুষী হয়ে যাবে। অতএব কেরল নির্বাচনের পর সি-পি-আই ও নব কংগ্রেসকে এক সঙ্গে নিয়েই জোট বাঁধা

যাবে—তাই অপেক্ষা করতে হবে কেরল নির্বাচনের।

বাংলা কংগ্রেস ও আর এস পি দলের আরো একটা কমন ঝঞ্জাট আছে, দলের ক্যাডারদের নিয়ে। যেমন বাংলা কংগ্রেস দলীয় নেতৃত্বের অনেক প্রধান চান আট পার্টি-মুখো মনোভাব রাখতে, কিন্তু ক্যাডাররা সি-পি-আই-এস-ইউ-সি-এর নাম শুনতে রাজী নয়। বাংলা কংগ্রেসের অনেক জেলার ক্যাডারদের কাছে সি-পি-এম অপেক্ষা সি-পি-আই, এস-ইউ-সি অনেক খারাপ—তাই ক্যাডারদের চাপে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে আট পার্টির দিকে বেশি তাকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। একই বিপদ আর-এস-পি-এর। সম্প্রতি আর-এস-পি-এর অনেকগুলি রাজ্য কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়ে গেছে। কোন কোন সভার শেষে প্রেসকে কিছু বলা হয় নি। আবার কোন কোন সভার পর শব্দ বলা হয়েছে, আমরা এখনও কোন পক্ষে নেই। 'এই কোন পক্ষে নেই'—এর মূল রহস্য হল নেতৃত্বের একটা মোটা অংশ চান সি-পি-এম-এর সঙ্গে ছয় পার্টি জোটে যোগদান করতে, কিন্তু বহু জেলার ক্যাডাররা সি-পি-এম-এর নাম শুনতে নারাজ। যে সব জেলায় সি-পি-এম-আর-এস-পি-সংঘর্ষ হয়েছে বা আর-এস-পি-কে সি-পি-এম-এর সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয়েছে, তারা কোন প্রকারেই সি-পি-এম-এর সঙ্গে যেতে নারাজ। এই অবস্থায় পড়ে আর-এস-পি-কে দুই ফ্রন্ট থেকেই নিজেদের দূরে রাখতে হয়েছে। আবার এই আর-এস-পি কিন্তু কেরলে সি-পি-আই দলের বন্ধু ও সহযাত্রী। কেরলে যে সি-পি-আই নব কংগ্রেসকে নববধুর মত আগলে চলছে, সেখানে আর-এস-পি অনুগত দেবর। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সি-পি-আই ভাস্কর হয়ে রয়েছে আর নব কংগ্রেস তো সত্যিনের ছেলে, তার তো কথাই নেই। কিন্তু সি-পি-আই ভাবছে এই অবস্থার বেশ কিছু সুদূরাহা হয়ে যাবে কেরল নির্বাচনের পর। কেরলে জয়লাভ করে আর-এস-পি নব কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে সরকার করলে পশ্চিমবঙ্গে কি আর-এস-পি সি-পি-এম-এর দিকে নজর ফেরাতে সাহস পাবে? কখনই নয়। কেরলে সি-পি-আই ভাল আর পশ্চিম-বঙ্গে খারাপ—কেরলে সি-পি-এম শব্দ আর পশ্চিমবঙ্গে সে জামাই। এ হতে পারবে না। কাজেই আট পার্টি জোটে আর-এস-পি-কে জোটাতে হলেও কেরল নির্বাচনই ভরসা।

অতএব কি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে আর কি

[শেষাংশ ৬৬৩ পৃষ্ঠায়]



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শিক্ষা ও শিক্ষিতের সমস্যা

॥ ১ ॥

আমাদের দেশে শিক্ষার সমস্যাকে শিক্ষিতের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না। শিক্ষিতের সমস্যা বলতে বোঝায় শিক্ষিত ব্যক্তির কর্ম-সংস্থানের সমস্যা।

প্রবেশিকা থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা পেয়েছেন, এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ মর্মান্তিকভাবেই কর্মহীনতার শিকার। এই বিপুল বেকার বাহিনী, যা প্রতিনিয়তই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্তাব্যক্তিদের মৌখিক দৃষ্টিচলিত প্রকাশের উপাদান হলেও, এঁদের কর্মপ্রাপ্তির সমস্যাকে কোনদিন প্রকৃত গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা হয় নি। বলা হয়েছে, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যাধিক্যই তাঁদের কর্মপ্রাপ্তির অন্তরায়; বলা হয়েছে, ইস্কুল স্তর থেকে অল্পমেধাবী ছাত্রদের কারিগরী বা অপরাপর ধরনের শিক্ষাদ দিকে চ্যালেঞ্জাই না করার দরুন, কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সব অব্যাহতীয় উপাদানগুলি চুকে পড়ে এবং কোন-ক্রমে স্নাতকের ডিগ্রীটা আদায় করে নিয়ে বেকারের দল ভারী করে। এগুলি বলাই বাহুল্য, অধঃসত্য, উদ্দেশ্যমূলক ও অতিসরলকৃত ধারণা, যার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না।

বরং এ কথা বলব যে, আমাদের দেশে বিভিন্ন বিষয়ে গাজুয়েট, এমন কি তবিন্দন ছাপওয়ালা ব্যক্তির সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। যত

আছে তার একশো গুণ গাজুয়েট হলেও ভারতবর্ষের চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল হবে। আমাদের দেশের পণ্ডিত কোটি জনসংখ্যার শতকরা সত্তর ভাগই নিরক্ষর। বাকি তিরিশ ভাগের মধ্যে, এবারে ভেবে দেখুন, শতকরা ক'ভাগ নিছক সাক্ষর, ক'ভাগ প্রাথমিক শিক্ষা পেয়েছে, ক'ভাগ স্কুল ফাইনাল টপকেছে, ক'ভাগ স্নাতক হয়েছে, আর ক'ভাগ স্নাতকোত্তর? অক্ষর পরিচয়-হীন উনচল্লিশ কোটি লোককে শিক্ষার আলোকে নিয়ে আসার জন্য যত শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন, তত লোক কি ভারতবর্ষে আছে?

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তুলনায় মর্দাটেমের, অথচ তাঁদের কর্ম-সংস্থানের উপায় নেই এ কথা বলা হাস্যকর। শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান যে হচ্ছে না তার একমাত্র কারণ বিষয়-টিকে কোনদিনই সঠিক গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয় নি।

॥ ২ ॥

কর্তব্যাক্ষিরা, রাজনৈতিক দলের নেতারা, শিক্ষার সমস্যাটাকে অন্যভাবে বোঝেন। তাঁরা মনে করেন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন বাড়ালে আর দূ-চারটে বেশি স্কুল-কলেজ খুললেই শিক্ষার প্রতি তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল। এগুলির প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থাটাকে তাঁরা

সামগ্রিকভাবে অপরাপর বিভাগসমূহের কর্মধারা ও সমস্যার গরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন না। আরও খোলাখুলি বলতে গেলে, দেশের সমস্ত সমস্যা আসলে একটিই সমস্যা, এ উপলব্ধির পরিচয় কোথাও নেই। ছাত্রকে শব্দ ডিগ্রী পাইয়ে দিলেই রাষ্ট্রের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, সে যে বিদ্যা অর্জন করল তার প্রয়োগক্ষেত্র যদি না থাকে, তাহলে তার ডিগ্রী পাবার সার্থকতা কি?

একজন গাজুয়েট, সে মানববিদ্যা বিজ্ঞান যে-কোন বিষয়েরই হোক না কেন, পেশা হিসাবে যা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সেটা তার পেশা হওয়া উচিত নয়। সে পকেটমার হতে পারে, করণিক হতে পারে, খুঁটির ঘোর থাকলে সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বড় পদও পেতে পারে, আসলে সে যে পেশায় নিযুক্ত হয়, সেখানে তার অধীত বিদ্যা বাহুল্যমাত্র, তা তার কোন কাজেই লাগে না, অফিসের সমস্ত কাজই তো স্কুল ফাইনালদের দিয়ে চলতে পারে। এর জন্য পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা দর্শন-শাস্ত্রের জ্ঞান লাগে না। কাজেই বাঁরা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষা ছাড়া অপরাপর বিভাগে নিযুক্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে একটি শ্রেণী হতাশাগ্রস্ত, তাঁদের বিন্যাসবুদ্ধি কোন মূল্য বা প্রয়োগক্ষেত্র সেখানে নেই বলে, যার ফলে যে কাজে তাঁরা নিযুক্ত আছেন সেই কাজের প্রতিও তাঁরা ন্যায়বিচার করতে পারেন না। অপর একটি শ্রেণী, বাঁরা একটা বেশি বস্তুবাদী, বাঁরা টাকার



সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়

সাধনা বিউটি স্নো

• একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

স্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করো। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
হার্যের আভা ফুটে ওঠে।



সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

১৪৫-২/৬৯

সাংগাহিক বসুমতী

অঙ্ক সমস্ত কিছু বিচার করতে অভ্যস্ত, তাঁদের বিশেষ ও ঘণ্টা লেখাপড়ার প্রতিই এসে যায়। এম-এ পাশ করে হবে কি? সেই তো মাস্টারী করতে হবে। কটা পয়সাই বা পাওয়া যায়?

পক্ষান্তরে, যারা শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত আছেন, যারা স্কুল-কলেজে পড়ান, তাঁরাও আর এক ধরনের হতাশায় ভোগেন। এখানে বেতনের পরিমাণ সামান্য। দু'শো টাকা মাইনেওয়াল। এম-এ পাশ স্কুল মাস্টার যখন দেখেন যে, তাঁর চেয়ে কম বিদ্যার লোক অন্য পেশায় অনেক বেশি রোজগার করছেন, তখন তিনি নিজের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিও বাতগ্রস্ত হয়ে ওঠেন, হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং বলাই বাহুল্য নিজের পেশার প্রতিও সন্নিবিষ্ট করতে পারেন না। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁরই হতাশার শিকার হয়। মোটের উপর বর্তমান সমাজব্যবস্থা অর্থকৌলীন্যনির্ভর। টাকা না থাকলে কেউই সম্মান-প্রশংসা করে না।

তাহলে সমস্যাটা শুধু শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থানেরই নয়, তার মানসিক পুনর্বাসনেরও।

১৩১

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটি বিষয় উপলব্ধি করা প্রয়োজন; যা না করলে শিক্ষার 'শেচরানী' সমস্যার মূলে পৌঁছানো যাবে না। 'আমার' একটি দৃঢ় কনভিক্শন, যা প্রাচীন ও সম-সাময়িক ভারতের ইতিহাস পাঠ করে গড়ে উঠেছে, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশের সমস্যা যতটা না রাজনৈতিক, ততটা নয়। অনেক বেশি টেকনিক্যাল। আজকে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে একটা বিপ্লব ঘটে গেছে, তারা আমাদের চেয়ে কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর এগিয়ে আছে। তারা যে আজ উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থায় পৌঁছেছে, পারমাণবিক যুগে প্রবেশ করেছে, তার একমাত্র কারণ তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ গোড়া থেকে শূন্য করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত সর্বাধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত। জাতি হিসাবে আমাদের টিকতে হলে, অর্থাৎ উন্নততর দেশ-গুলির শ্রেণীগত হিসেবে থাকতে না হলে, টেকনিক্যাল আমাদেরও তাদের সমকক্ষ হতে হবে, আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈশ্বিক পরিবর্তন আনতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সৃষ্টি করতে হবে যা বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আমদানী করে

হয় না। কাজেই সর্বাপ্রায়ে প্রয়োজন পাঠক্রম ও সিলেবাসের আমলে পরিবর্তন। একটা কঠিন সত্য হচ্ছে এই যে, আমাদের দেশে গোড়া থেকে শূন্য করে স্নাত-কোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্ররা যা শেখে তার চোন্দ আনাই ব্যাক-ডেটেড, অপ্রয়োজনীয়, বাকি দু'আনা বিয়ে বর্তমান জগতের সঙ্গে তাল রাখা যায় না।

কাজেই অনেক পুরানো জিনিসের মায়্যা ত্যাগ করতে হবে, যেমন স্কুলের অঙ্কের সিলেবাস থেকে সর্বাপ্রায়ে পাঠগণিত ও জ্যামিতিকে বাদ দিতে হবে, আর তার জায়গায় উচ্চতর গণিতের প্রারম্ভিক বিষয়গুলির প্রবর্তন করতে হবে। একটি বানর তৈলাক্ত বাঁশ পেয়ে তিন ফুট উঠে দু'ফুট নেমে কতক্ষণে তার মাথায় উঠবে, এ বিদ্যার কোন প্রয়োজন আজকের জগতে নেই। হায়ার সেকেন্ডারীর ছাত্রকে যদি পৃথিবীর গোলকের প্রমাণস্বরূপ সাতটা পয়েন্ট মুখস্থ করতে হয় তাহলে তার চেয়ে বিড়ম্বনার বিষয় আর কি আছে? আর ইতিহাসের সিলেবাসের কথা না বলাই ভাল। যারা এর প্রণেতা তাঁদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করা উচিত তা এখানে করলে মানহানির মোকদ্দমায় পড়তে হবে।

বেশ কিছুকাল ধরেই আমি বিভিন্ন দেশের স্কুল-কলেজের পাঠক্রমের সঙ্গে আমাদের দেশের পাঠক্রমের একটা তুলনামূলক সমীক্ষার কাজ করছি। তার ফলাফলের সারাংশ শীঘ্রই আমি সাংগাহিক বসুমতীর পাতাতেই প্রকাশ করব। এ বিষয়ে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা অপর দেশের তুলনায় পড়ে বেশি, কিন্তু শেখে কম, আর যা শেখে তা কাজে লাগে না। কেন না সবই ব্যাক-ডেটেড। স্কুল স্তরে এখানে সবচেয়ে বেশি সময় ও শক্তির অপচয় হয় ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও হিন্দী এই তিনের ঠেলায় প্রাণান্ত। ওইগুলিকে সম্মলে বর্জন করা দরকার। সকল শিক্ষা হবে মাতৃ-ভাষায় এবং প্রতিটি বিষয়ের সর্বাধুনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্যাকারের পণ্ডিত ব্যক্তিদের দিয়ে স্টেপট বই লেখানো দরকার, পণ্ডিতদের নামে লেখা অগাঠ্য পুস্তক নয়, যা এখানে চলে বেশি। ইংরাজী বর্জন করে উত্তরপ্রদেশ আমাদের পথ দেখিয়েছে।

এর মানে এই নয় যে, ভাষা শিক্ষা একেবারে তুলে দিতে হবে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষাসমূহ শিক্ষার জন্য পৃথক সংস্থা রাখলেই হল, যার দরকার সে শিখবে। নিজের গরজে

শিখলে শেখাটাও ভাল হয়, আর পরিণত মনে শেখার সুবিধাও অনেক বেশি। কলকাতায় বিভিন্ন বিদেশী ভাষা শেখাবার প্রতিষ্ঠান আছে, যারা তিন বছরে ডাইরেক্ট স্নেথডে সংশ্লিষ্ট ভাষাটিকে রীতিমত ভালভাবে শিখিয়ে দেয়। ইংরাজী শিক্ষার জন্য এই রকম কিছু প্রতিষ্ঠান খুলে রাখলেই হল, যার দরকার সে শিখবে এবং আমার স্থির বিশ্বাস, স্কুল-কলেজে চোন্দ বছরে যা শেখে তার চেয়ে ভাল শিখবে। অনুরূপভাবে সংস্কৃত ভাষার দায়িত্ব টোলগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। এতে সময় ও শক্তির অপচয় দূর হবে এবং ফলত্ব বোঝাসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের ঘাড় থেকে নেমে গেলে তারা নিজেদের সাবজেক্টগুলি আরও ভালভাবে পড়ার ও বোঝার সুযোগ পাবে।

১৪১

এর পরে আসল কথায় ফিরে আসি। শিক্ষিত ব্যক্তিদের যে বেকার সমস্যা তার একমাত্র কারণ স্কুল-কলেজগুলিতে সাবজেক্টের ব্যস্তি ঘটে নি। কবে কোন মাধ্যমের আমলে কলেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্টস বিভাগে ইতিহাস, লজিক, সিভিল, ইকনমিক্স ও সংস্কৃত আর সায়েন্স বিভাগে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি আর অঙ্ক বরাদ্দ হয়েছিল, তা আজও বদলায় নি। বায়ো-সায়েন্সের সূত্রপাত বিভিন্ন কলেজে হয়েছে তো এই সৌদিন। ইতিমধ্যে বিজ্ঞান কত এগিয়ে গেছে, তার কত শাখা-প্রশাখা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সাবজেক্টে পরিণত হয়েছে তার হিসাব নেই। কিন্তু আমাদের কলেজগুলির কৌলীন্য ভাঙে নি। হিসাব করা ওই কটি বিষয় ছাড়া অন্য সাবজেক্ট পড়ানোর কথা চিন্তা করা পর্যন্ত হয় নি।

এবার আমার নিজের লাইনের প্রসঙ্গে আসি। আমি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে কতমানে সংশ্লিষ্ট আছি। আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, যারা স্নাতকোত্তর প্রণীতে ভর্তি হয়, তারা এখানে এসে এমন সব নতুন বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হয় যেগুলি তাদের স্কুল ও কলেজ জীবনে অজ্ঞাত ছিল। এখানে পড়ানো হয় প্রত্নতত্ত্ব, লালতকলা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ধর্ম, নৃত্য এবং প্রাচীন গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা। এই বিষয়-গুলির একটিও কি কেউ ডিগ্রী কোর্সে পড়েছে? ফলে, বলাই বাহুল্য, এখানে এসে তারা ওই বিষয়ের

সাপ্তাহিক বসুমতী

অ-আ-ক-খ শিখতে শুরুর করে এবং এও সত্য যে, মাত্র দু' বছরের কোর্সে ওই বিষয়গুলির অ-আ-ক-খই মাত্র শেখা যায়, মাস্টার হওয়া যায় না। অথচ যদি ডিগ্রী কোর্সে ভারততত্ত্ব পড়ানোর ব্যবস্থা থাকত, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা আজ যা শিখছে তার অর্ধেকেরও বেশি আগে থেকেই শিখে আসতে পারত, আর এখান থেকে যারা পাশ করে বেরুচ্ছে তারাও বিভিন্ন কলেজে কাজ পেতে পারত, তাদের বেকার হয়ে ঘুরতে হত না। একথা ঐশলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

তাহলে সর্বাপেক্ষে প্রয়োজন কলেজে (এবং স্কুলেও) সাবজেক্ট বাড়ানো। এখানে একটি কলেজে খুব বেশি করে ধরলে গড়পড়তা দশটির বেশি সাবজেক্ট পড়ানো হয় না, যেখানে উন্নততর দেশগুলিতে ওই সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ। ফলে ওখানে ওরা লোককে চাকরি দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, আর এখানে উচ্চশিক্ষিত লোকেরা বেকার হয়ে রাস্তায় ঘোরে। বিজ্ঞানের বিষয়-সংখ্যা গত পঞ্চাশ বছরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, এখানে অতিদ্রুত প্রতিটি সাবজেক্ট শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অসংখ্য স্বতন্ত্র সাবজেক্টে রূপান্তরিত হচ্ছে, কিন্তু কলেজ ও তালিম্ন স্তরে সেগুলির প্রতিফলন ঘটছে না। হিউম্যানিটিজে এই পরিবর্তনের গতি খুব দ্রুত নয়, এখন যেগুলি কলেজে পড়ানো হয় সেগুলির অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে ভাগ তে মাত্র সোঁদিন ঘটল। বাকি-গুলির ভাগ হয়ে পৃথক পৃথক সাবজেক্টের সৃষ্টি হওয়া দরকার। সাবজেক্ট বাড়লে যে কর্মসংস্থান বাড়ে, তার প্রমাণ বর্তমান হায়ার সেকেন্ডারী। স্কুল স্তরে কিছু সাবজেক্টের বৃদ্ধি হয়েছে বলেই ওই ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র আগের তুলনায় অনেক প্রসারিত হয়েছে, এ সত্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। শূধু তাই নয় হায়ার সেকেন্ডারী হবার দরুণ স্কুল মাস্টারীর পেশাও জাতে উঠেছে, কেন না অনাস' বা এম-এদের স্কুলে আকৃষ্ট করার জন্য বেতনের হারটা একটু ভাল না করলে চলে না।

॥ ৫ ॥

এতক্ষণ যা বললাম তা তো উচ্চ-শিক্ষিতের কর্মসংস্থানের কথা। যারা গ্রাজুয়েট তাদের কি হবে? তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে কাজ

দিতে হবে। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এখানে যোগ্য শিক্ষকের অভাব বেশি। কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি এবং স্কুলবোর্ড পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার কারণ অবশ্য বহুবিধ—ব্যস্ত করতে গেলে আমরা বর্তমান আলোচ্য বিষয় থেকে দূরে সরে যাব। আমার নিজের বক্তব্য প্রাইমারী শিক্ষককে অবশ্যই গ্রাজুয়েট এবং ট্রেনিং-প্রাপ্ত হতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা যদি শিক্ষানীতি চালিত হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে যদি একটি করে প্রাথমিক স্কুলের ব্যবস্থা করা যায়, যদি প্রত্যেকটি স্কুলে পাঁচজন করে গ্রাজুয়েট লাগে, তাহলে মোট যত গ্রাজুয়েট লাগবে, তাতে গ্রাজুয়েটের ঘাটতি পড়বে, অত গ্রাজুয়েট পশ্চিম-বঙ্গে নেই। সেক্ষেত্রে অপরাপর কর্মক্ষেত্রে যে সব গ্রাজুয়েট নিযুক্ত আছেন তাঁদের থেকে কিছু লোককে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে হবে এবং যে সব নন-গ্রাজুয়েট শিক্ষাক্ষেত্রে আছেন তাঁদের ওই সব কর্মক্ষেত্রে বদলি করতে হবে।

এটা অবশ্য তখনই সম্ভব যখন বিভিন্ন পেশার বৈতনিক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যাবে। তৃতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা যে মাহিয়ানা ও সুযোগ-সুবিধা পান তাই প্রাথমিক শিক্ষকদের দিতে হবে। শূধু তাই নয় সরকারী, বেসরকারী সকল ক্ষেত্রেই একটা বিজ্ঞানসম্মত বৈতন নীতির প্রবর্তন হওয়ার দরকার। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই চারটি সাধারণ শ্রেণীতে, কেন্দ্রে ও রাজ্যে, সরকারী, আধা-সরকারী ও বেসরকারী সকল কর্মীদের ভাগ করে, প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য একই ধরনের বৈতনের হার প্রবর্তন করা উচিত। তাহলে মনোমত পেশায় স্থানান্তরিত হতে কারোরই আপত্তি হবে না, অথবা ব্যাপ্তের বাবু মাস্টার গশাইকে দেখে নাক কুঁচকোবেন না।

॥ ৬ ॥

এখন এ প্রশ্ন অনেকেই সংগতভাবে তুলবেন, সবই তো বুদ্ধলাম দাদা, কলেজগুলোতে গোটা পঞ্চাশ করে সাবজেক্ট পড়ানো হবে, হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলগুলিতেও কম-সে-কম গোটা তিরিশ সাবজেক্ট। আর সেগুলিতে ছেলে আর মাস্টার যোগানোর জন্য বিস্তৃত মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে আবার মাস্টারগশাইদের

প্রত্যেককে কম-সে-কম গ্রাজুয়েট হতে হবে, এতে না হয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বেকার সমস্যা দূর হল এবং আপনার কথামত শিক্ষার আধুনিকীকরণও হল, কিন্তু এত টাকা আসবে কোথা থেকে? উত্তরটা খুব সহজ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেটা কোন দিন দেওয়া হয় নি। আমাদের কতারা উল্টো রাস্তা নিয়েছেন, শিক্ষা খাড়েই ব্যয়-বরাদ্দ সবচেয়ে কম, এঁরা মনে করেন অন্য সকল ক্ষেত্রের দাবি মিটিয়ে তারপর শিক্ষার ব্যাপার ভাবা যাবে। এই মনোভাবের ফলে অন্য সকল ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হয়েছি, শিক্ষার ক্ষেত্রেও কিছু করে উঠতে পারিনি, কেন না দ্বিতীয়টি না হলে প্রথমটি সম্ভবপর নয়। বৃহৎ বৃহৎ প্রোজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়েছি, তারা দু'হাতে টাকা লাটেছে, তাদের ফরমাশমত তাদের দেশ থেকে আমরা প্রোজেক্টের জন্য মালপত্র আনিয়েছি, এখন দেখা যাচ্ছে সেখানেও ফাঁকি রয়েছে বিস্তর। অথচ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলে, দেশের ভিতর থেকেই অনেক বিশেষজ্ঞ গড়ে উঠত, প্রোজেক্ট-সমূহের ক্ষেত্রে অনেক অপচয়ের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতাম। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের তুলনায় ভারতীয়রা যে নিম্নমানের সেটা এখনও প্রমাণিত হয় নি। যদি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় থেকেই শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত এবং বর্তমান নিবন্ধ যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে, যদি এই রকম একটা মনোভাব সেখানে কাজ করত, তাহলে শূধু নিরক্ষরতা ও অশিক্ষাই দূরীকৃত হত না, আমরা টেকনোলজির দিক থেকেও উন্নততর দেশগুলির সমকক্ষ হতে পারতাম এবং উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসত। চীনদেশ যে হাইড্রোজেন বোমার ক্রমাগত পরীক্ষা করে যাচ্ছে, মহাকাশ অভিযানেও পদক্ষেপ করেছে, তা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, টেকনোলজির দিক থেকে তারা বেশ অগ্রগামী, তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাও রীতিমত উন্নত এবং এই অগ্রগতিমিতা নিশ্চয়ই রুশ-বিশেষজ্ঞরা করে দিয়ে যায় নি, আর হাইড্রোজেন বোমার মত ব্যাপারে নিশ্চয়ই বিদেশ থেকে এজপার্ট আনিয়ে চলে না। তাদের এই অগ্রগতির মূলে নিশ্চয়ই তাদের শিক্ষাব্যবস্থার অবদান সর্বাধিক। আমাদের অসুবিধাটা হচ্ছে আমরা গোড়া কেটে আগায় জল ঢালাছি।

【চলবে】

কথায় কথায়

কলকাতার ওপর আকাশটা পর্যন্ত নিষ্ঠুর বিরক্ত। সেই একপ্রশ্নে আগস্ট থেকেই টানা ক্যালকাটা বৃষ্টি। অফিস-ইস্কুল হচ্ছে না বললেই হয়। প্রাক-পূজা বাজার তো হা হা খাঁ খাঁ করছে। তবু কিছু কিছু মানুষ সর্বত্রই দেখা যায়, যাঁদের বখশকার যা শত প্রতিরোধও তা করে ফেলাই স্বভাব। এঁদের সম্ভবত বাল্যকালে তো নয়ই, বৃষ্টি বয়সেও আলস্য ধবাব কোনো চান্সই নেই। এঁরা মথারীতি পূজা বাজার কঁখে নিয়ে সাঁতরে বাড়ি আসছেন। অথচ আমার মতো কুঁড়ে লোক পাড়া-প্রতিবেশীরা জলে ডুবে আছে দেখে প্রায় আধ-পেট খেয়ে এবং একরকম চা না খেয়েই কাটিয়ে দিচ্ছে। চায়ের দোকানটা অনেক দূর, মানে এক ট্রাম স্টপের ফারাক। জলে ডুবে আছে। তাই ধারেকাছের প্যাকেট চা আনিতে না পারছি। গিমাতে, না-পারছি উগরাতে। এই যখন আমার অবস্থা, তখন এসপ্ল্যান্ড থেকে শেরার ট্যান্ডি ধরাব জন্য আমি ছিলাম আনমনা।

ধার-কাছ থেকে শুনলাম আমারই নাম ধরে কেউ ডাকছেন। তাকিয়ে দেখলাম, একহাতে ছেলে, একপাশে তরুণী কন্যা ও অন্যপাশে বৌদিকে নিয়ে একটা চলন্ত গোটা সংসার সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রণেশদা। মুখে সম্পন্ন হেড অব দি ফ্যামিলির পরি-তৃপ্ত হাসি।

আমি জোড়হাতে চার পা এগিয়ে গেলাম, কি বৌদি, পূজোর বাজার বন্ধি?

রত্না বৌদি এই বয়সেও চৌটে পাতলা রঙ দেন। মুখে এমনভাবে টয়লেট করেন, মনে হয় নাকের পাটা-দাঁটি পর্যন্ত সযত্নে মাজা হয়েছে। এহেন মহিলার যে নাস্পেসদুখমিত তা রত্না বৌদির ওটানো চৌটে না দেখলেও বুঝতেই পারতাম। তিনি এক নিশ্বাসে কত কী কিনেছেন তার একটা তালিকা উগরে দিয়ে আর কত কী-ই-যে কেনা হল না তা গুঁছিয়ে বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

রণেশদা স্ত্রীর এইসব জাগতিক উৎসাহে বেশ স্পষ্ট তৃপ্তি বোধ করছিলেন। তাই প্রস্তাব করে বসলেন, ট্যান্ডির আশা কিছুক্ষণ ছাড়তে হবে, চল বরং একটু গরম চা—কি গো?

আমি পিছলাবার চেষ্টা করছি, রণেশদা ছাড়বার পাত্র নন। টেনে নিলেন সঙ্গে। মনে মনে শঙ্কিত হলাম। উদ্ভতার খাতারে বিল পেইন্ট করতে হলে লজ্জায় পড়তে হবে। রণেশদা সম্ভবত কিছু একটা আঁচ করলেন।

মহিলা কলকাতা

মিথেন

রতনে রতন চেনে। বৃষ্টিপঞ্জীর সঙ্গে এমন অকোয়ার্ড পজিশনে তিনিও হস্ত আমারই মতো প্রমাদ গণে থাকেন।

অভয় দিয়ে বললেন, আরে চলই না। আজ তোমার বৌদি যা 'বারগেন' করেছেন তার খানিকটা ভাগ করে খেয়ে আসি সকলের সঙ্গে ভোজন।

বুঝলাম, লোকটি আমাকে অভয় দিচ্ছেন। এর পরও দমে যাওয়া অনুচিত। কিছু বরং সপ্রতিভ হতে হয়। ব্যাপারটা যেন ভারি মজার, এইভাবে তাই আমাকে বলতে হল, ইজ ইট! তবে তো বৌদি লাভের কড়ি ঘরে ঘুরিয়ে নেওয়া চলবে না!

রত্না বৌদি স্বামীর প্রতি কটাক্ষ করে মৃদু ধমক দিলেন, লাভ আবার কই! ঠকলাম না বলতে পার।

বা!! সেটাই তো মস্ত লাভ! না ঠকে বাজার করা এক আশ্চর্য কৃতিত্ব। আমি ওটাকে শব্দ লাভ নয়, লাভসহ আত্মতৃপ্তি হিসেবে গণ্য করি। সুতরাং ফসকে সরে যাওয়াটি চলবে না। (ভেরি গুড ম্যানেজার হয়ে উঠছি নিষ্ঠুর—নিজের মনে মনে নিজেকে ভারিফ করলাম)।

চায়ের কাপে প্রথম সিপ করে প্যান্টের পেটে আধাআধি কামড় বাসিয়ে আর্থিক আপ্যায়নের বিনিময়ে মৌখিকটুকু টেঁবলে সাজিয়ে দিলাম, শব্দ থাকেটিং নয়, এর ওপর বারগেনিং, সত্যি বৌদি, আপনি সাক্ষাৎ ক্ষণজন্মা মহিলা! কলকাতায় ভয় করার অনেক কিছুই আছে, তবে আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ভয় করি দোকানদারদেরই!

ওগা, কেন? রত্না বৌদি সর্কোতুকে জ্বা নাচালেন।

বললাম, সে কি, আপনি ভয় পান না ওঁদের। বাপস্কে, এক-একজন সেলসম্যান যেন এক একটি ও-সি, ডি-সি, ডি-এস-পি, এস-পি, পদলিঙ্গ অফিসার: যেমনি মেজাজ। তেমনি ডোন্টকেয়ার সব মন্তব্য। অথচ এই কিছুদিন আগে আমি বিহার, ইউ-পি ঘুরে এলাম। দোকান যেন আপনারই সম্পত্তি। সেলসম্যানরা খদ্দেরের মুখের কথাটি খসানোর অপেক্ষায়। পছন্দ হল নিলেন, পছন্দ না-হলে পেছন ফিরলেন। দোকানীর ব্যবহার একই রকম। বরং আপনার পছন্দসই জিনিসটি অন্যত্র কোথায় পেতে পারেন তাও বাথলে দেবেন। হাসিমুখে বিদায় নমস্কার

জানিয়ে বলবে, আবার কিছু নিতে হলে আসবেন। এমন দোকানে একবার কেন্দ্র আপনি নিশ্চয় একশোবার যাবেন। আর আমাদের এই কলকাতায়? হা পিতৃশ্রী দাঁড়িয়ে এক ডজন তোষামোদী কথা ছুটিয়ে সেলসম্যানের দৃষ্টি যদি বা আকর্ষণ করতে পারেন, তো তিনি যে ক'টি নামিয়ে দেবেন তার মধ্যে থেকেই আপনাকে একটি নিতেই হবে। না নিলে যে সুমধুর মন্তব্য আপনাকে বিধতে থাকবে তা সহ্য করার চেয়ে সেলসম্যান-রদ্রিচ একটি দ্রব্য নিয়ে কিছু গাটগজা দেওয়া ঢের সম্মান ও লাভজনক মনে হবে আপনার। তবে দ্বিতীয় দিন সেখানে আর আপনি যাবেন না। মনের মতোটি বেছে নেওয়ার খদ্দের হিসেবে সুযোগ বা অধিকার কোনোটাই এ শহরে নেই।

রণেশদা মাথা নেড়ে সায় দিলেন— ঠিক এই কারণেই আমি তোমার বৌদিকে কাউন্টারের কাছে এগিয়ে নিজে দূর থেকে কেনাকাটা লক্ষ্য করি। আর পূজোর বাজার ভিড় হওয়ার আগেই খতম করি। মেয়েদের দেখলে ওরা তবু একটু.....

মোটো না! মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করলেন বৌদি, বরং আজকাল ওরা ছেলেদের তবু একটু ভয় করে। মেয়েদের কেয়ারই করে না। তা ছাড়া রোজ এতো মেয়ে দেখছে, খদ্দের বলতে মেয়েই চেনে। ওরা এখন মেয়েতে 'ইমিউনড' হয়ে গেছে।

রণেশদা বললেন, তাছাড়া ওদের ওপর কথা বলবে, স্বয়ং মালিকেরই সে মুরোদ নেই। পান থেকে চুন খসলেই দোকানের সামনে তাঁবু খাটিয়ে গণ-অবস্থান।

রত্না বৌদি সমর্থন করলেন, সত্যি কী আনন্দলি হয়ে গেছে কানিষ্টি!

সমস্যাটা অনগ্রও দেখতে পারি আমরা!—আমি ইকনমিকস পড়লাম, সেই ডিম্যান্ড আর সাপ্লাই, চাহিদা আর যোগানের ব্যাপার। যত খদ্দের তার চেয়ে দোকান কম। তাই দৈমিক বেশি দোকানীর। পথের পাশে, ফুটের ওপর দোকান, কোথাও দাঁড়াতে পারবেন? তবু হৈ হৈ করে কেনাকাটা করছে সবাই।

ঠাট্টা করলেন রণেশদা, তার ওপর ফের সাড়ে পাঁচ পারসেন্ট জাতীয় আয় বাড়ছে। মার্কেট পড়তে পারে না।

টুকু রণেশদার মেয়ে। বাঙালীর মেয়ে, তাই শালোয়ার পাঞ্জাবী ওডনা চাপিয়ে শর্মিলা ঠাকুর হয়েছে। হঠাৎ সে বললে, জাতীয় আয় তো আমাদের কি? ওটা তো কয়েকটা প্রতিভস আর দু-চারটে পরিবারের ভাগ্যে জুটবে।

ঠিক বলেছ টুকু। সমর্থন করলাম

সাপ্তাহিক বঙ্গমতী

আমি, ওতে কলকাতার ট্যাকশাল এতো-টুকুও ফাঁপবে না। জাতীয় আয়টো অঙ্কের নিয়ম মাথাপিছু ভাগ হয় বটে, তবে সেটা বিশেষ বিশেষ সুযোগ-ভোগীদেরই সেফ ডিপোজিট ভল্ট ভরায়।

আমরা কিন্তু পলিটিস্ক আর বাংলার প্রতি আ-স্বাধীনতা আবিচারের প্রসঙ্গে অরণ্যে রোদন করতে যাচ্ছি মিস্ত্রি। কিন্তু তুমি ঐ ভুল্লোককে লক্ষ্য করেছ? লোকটার মতো আরো অনেককেই বিভিন্ন রেস্টোরাঁয় দেখবে। ম্যানে-জারের সঙ্গে দুটো কথা বলবার জন্য কেমন নুয়ে পড়ে তোষামোদী করছে। এরাই খন্দেরদের ইজ্ঞাটা ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। কেন, দোকানী তোর দিকে না তাকিয়ে দু-একটা লাটসাহেবী চালে জবাব দিচ্ছে, তাতে তোর অমন গলে পড়ে মনযোগানী বাক্যালাপ করার কী দরকার বাপু। ও কি তোর পাতে দুটো মোটা ফিস জ্বাই মাগনা হরির লুঠ দেবে!

আমরা প্রত্যেকেই তাকালাম। বাস্তবিক, মোসাহেবের মতো লোকটা ম্যানেজারের মন রেখে আলাপ জমাবার জন্য আশ্রয় করছে। ম্যানেজার যেন নিদেন দয়া-পরবণ দু-একটা জবাব দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এমন অকারণ চাটুকার অনেক দোকানেই নজরে আসে। এরা দোকানদারদের মাথায় তোলে। বিনিময়ে দু-পয়সা খরচাই হয়। তবে দোকানী হেসে কথা বললে নিজেকে এরা হয়ত কেউকেটা ভেবে আনন্দ পায়। অপর খন্দেরদের চেয়ে নিজেকে ইমপর্টেন্ট পারসন ভাবে ইজ্ঞা। নচেৎ এই চাটুকারিতা অর্থহীন। এরা নিজের ইজ্ঞা তো রাখেই না, অন্যান্যদেরও দোকানীর চোখে কুপার পাগ্ন করে তোলে। দোকানী ভাবে, সে মাল বেচে খন্দেরকে কৃতার্থ করছে।

বললাম, ব্যাপারটা সত্যিই প্রায় দোকানেই নজরে আসে। কিন্তু এর কারণটা কখনই ভেবে উঠতে পারি নি। আমার মনে হয়, এ জাতীয় মানুষ হয় এতো একা যে সঙ্গীর অভাবে দু'দণ্ড কথা বলার জন্য মানুষ খোঁজে; নয় এদের নিজের প্রতি অত্যধিক হীন-মন্যতাই এদের মধ্যে অকারণ চাটুকারের জন্ম দেয়।

রজ্জা বৌদি বললেন, আমি কিন্তু ঐ জাতের খন্দের আরো ঢের দোকানে দেখেছি। এরাই দোকানীর দেমাক বাড়ায়। তুমি যদি দোকানীর কোনো অন্যায আচরণের প্রতিবাদ কর, ওরা দোকানীর 'সাইড' (পক্ষ) নেয় আর তোমার দিকে এমনভাবে তাকায় যে

তুমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সুযোগই পাও না।

গত পরশু হরিশ মন্ডুজ্যে-হাজরা মোড়ের সেই জ্বাই ক্লিনিং দোকানটায় এমনি অপমান। আমার দুটো দামী শাড়ির একটার রঙ ওরা এমনি জঘন্য-ভাবে চটিয়ে দিয়েছে যে, আমার কাঁসা পেয়ে যাচ্ছিল। বলতে বলল, আপনার কাপড়টাই অমনি ছিল। আপনি এখন আমাদের পয়সায় জ্বাই করিয়ে নিতে চান। কী অসভ্য উক্তি! এতোটুকু সম্মান দিয়ে কথা পর্যন্ত বলে না। প্রতিবাদ করতে রিসিটটা দেখিয়ে দিল। দুটো শাড়িই পুরনো বলে লেখা আছে। অথচ ওটা আমার রঙ-চটা শাড়ি ছিলই না। বাড়ির কাজের লোকটা দিয়ে এসেছে। সে কি রিসিট দেখে নিতে জানে। এখন আমি কী বলব? বললাম, যেটা ঠিক আছে সেইটা দিন, অন্যটা নেব না। জবাব বিল, একসঙ্গে দুটো না নেন দুটোর কাচাই খরচা

সবিনয় নিবেদন

ডাক-বিজ্ঞাটের জন্য ঢাকার চিঠি নির্দিষ্ট সময়ে হাতে এসে না পৌঁছায় ঐ চিঠি এবার প্রকাশ করা সম্ভব হোল না।

—সঃ সাঃ বঃ

দিয়ে যেতে হবে। কী জ্বলম! 'অথচ আর যাঁরা ছিলেন কেউ একটা কথাও বললেন না।

টুকু যোগ করল, আমি একদিন, জানেন, কী ফলস্ পঞ্জিশনেই না পড়ে-ছিলাম ঐ দোকানে। ওরা কাস্টমারকে না জানিয়ে বিলে তিন নয়া পাঁচ নয়া বেশি লিখে দেয়। ওদের কী একটা নাকি চ্যারিটি ট্রাস্ট আছে, তার চাঁদা। আমি বললাম, কৈ, এটা লেখার আগে আমাদের চাঁদা দেওয়ার ইচ্ছে আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন নি তো! ওরা বললেন, সামান্য পয়সা তাই। সবাই তো দেন, কেউ কখনো আপনার মতো আপত্তি করেন না তো! অন্যজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, অত কথা বলছ কেন, দিয়ে দাও না পয়সা। সব লোক সমান হয় না। বুঝুন। আমারই পয়সা আমাকে না জানিয়ে বিলে এ্যাড করে নেবে। বললে উপরন্তু অপমান। অন্য যে সব খন্দের ছিলেন তাঁরা তখন এমন বাঁকা হাসি হাসলেন যেন আমি দোকানের ন্যায্য কোনো পাওনা পয়সা না দিয়ে পার পেতে চাইছি।

এই সময় বিল নিয়ে এলো বেয়ারা।

রণেশদা টিপস্ হিসেবে একটি পয়সাও ছাড়লেন না। আমি এবং টুকু আড় চোখে দেখলাম, লোকটা 'পারে তো গিলে খায়' এই চোখে তাকিয়ে টান মেরে মসলার প্লেটটা তুলে নিয় গেল।

রণেশদা মৃদু হেসে আমায় বললেন, দেখলে? দোকানদার রাখবে তার যোগানদার। এজন্য পঁচিশ পয়সার জিনিসটা নেবে পঁচাত্তর পয়সা আর তুমি বেচারী দু-টাকার খেয়ে এক সিকে বখ-শিস দিয়ে যাবে বেয়ারার স্বপ্ন মাইনে পুঁষিয়ে দিতে।

বৌদি এবার বেশ চটে গেলেন, তা দিলেই তো হত। তোমার সঙ্গে ঢুকলে এইভাবে অপমানিত হ'তে হয়। দেখলে, লোকটা কিভাবে মশলার প্লেট টেনে নিয়ে গেল!

রণেশদা বললেন, দেখলাম বৈকি। কিন্তু ওকে কি জন্যে বখশিস দেওয়া হবে? বখশিস লোকে দেয় কেন? ও কি তোমায় একটু বেশি খাতির দেখিয়েছে? ডিসে ওপছানো চায়ের কাপ নবাবচন্দ্রের মতো ঠকাঠক বসিয়ে নিয়ে গেছে গম্ভীরভাবে। চারবার ডাকতে পশ্চমবারে এসে এঁটো টেবিল সাফ করেছে। তবে ওর বখশিসের 'ক্রেম' কোথায়?

রজ্জা বৌদি বললেন, কিন্তু মান-সম্মান বলেও একটা কথা আছে তো!

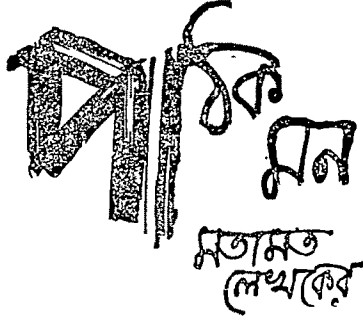
রণেশদা নিরুদ্বেশভাবে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, সেইটা যবে থেকে আমরা ঘৃণ দিয়ে আদায় করব ভেবেছি, ঠিক সেইদিন থেকেই শহর কলকাতার ও বস্তুটি উবে গেছে। আর সমস্ত দোকান বাজারে নিজের খাতির নিজেরাই আমরা মুড়িয়ে আসছি। এতোক্ষণ এতো অভিযোগ অনুযোগ করলে, কিন্তু নিজেকে যে রুত দুর্বল তা ভেবে দেখলে না। খন্দের শত্রু দোকানীকেই নয়, তার বেয়ারাকেও ভয় করতে শত্রু করেছে। নিজের সম্মানটুকু আদায় করতে হলে সব জায়গায় অন্যের অন্যায আদায় আর ফালতু ক্রেমগুলো অস্বীকার করতে শেখো। বখশিসটাই ইদানীং তুচ্ছ করে পেতে হয় না, চোখ রাঙিয়ে আদায় হয়। ওটা বন্ধ করতে হবে।

রজ্জা বৌদি উত্তর খুঁজে পেয়ে না। তবে অস্বস্তি অনুভব করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন শক্তিকভাবে। বললেন, চল চলে মাই। বেয়ারাগুলো চোখে চোখে কথা বলছে।

আমারও কিন্তু কেমন ভয় ভয়ই কর-ছিল। রাগী বেয়ারা এইবার ফ্যান বন্ধ করে কিম্বা টেবিলে গ্লাস উল্টে দিয়ে দলশত্রু আধাঘের খেঁদিয়ে না দেয়!

৯ম সংখ্যার “সপ্তাহের বোঝা” এবং “বঙ্গদর্শন”-এ সমস্যাভিত্তিক পশ্চিম বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি আলোচিত হয়েছে প্রায় একই দৃষ্টিকোণ থেকে। আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতির কারণ সঠিকভাবে উল্লেখ না রেখেই এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা এবং উপায় সম্পর্কে মতামত রেখেছে। সাংবাদিকদের উপরিউক্ত দুই লেখায়। যদিও “বঙ্গদর্শন” আগের দু’একটি লেখায় অনুধাবন করা হয়েছিল যে, বাংলার বর্তমান অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় সমস্যার গভীরে প্রবেশ। গালভরা সদুপদেশ, প্রলোভন এবং ঘৃণ্য রাজনীতি পশ্চিম বাংলার সমস্যাকে আরো জটিল করবে। কিন্তু এবারের আলোচনায় তিনি এবং কুন্তিবাস ওঝা মহাশয় এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে পশ্চিম বাংলার মুক্তি না হওয়ার কারণ এবং চূড়ান্ত আইন-শৃঙ্খলার অবনতির প্রশ্নে বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন দলের বর্তমান কার্যকলাপকে প্রধানত দায়ী করেছেন।

বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন পার্টির মধ্যে মতান্তর ঘটেছে আজ থেকে ৯।১০ মাস পূর্বে। মতাদর্শ ভিন্ন হলেও মিলন ঘটেছিল নির্দিষ্ট কতকগুলো কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে। সেই কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে গিয়ে দেখা দিলো মত ও পথের পার্থক্য। পরিণামে বিভিন্ন দলের মধ্যে ঘটলো মতান্তর এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন। আমার প্রশ্নঃ গতপার্থক্য থেকে মতান্তর এবং সবশেষের এই হানাহানি রোধকল্পে সাংবাদিকেরা তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে সোঁদন পালন করেছিলেন কি না? ভারতবর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং এই গণতন্ত্র সঠিকভাবে রক্ষা করা হচ্ছে কিনা তার বিচার করতে পারে স্বাধীন সাংবাদিকেরা। আজকের দিনের প্রধান প্রশ্ন দলীয় মতবাদে প্রভাবিত হয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে সাংবাদিকেরা কুণ্ঠাবোধ করছেন কি না? বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সংবাদপত্রে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের এবং মন্ত্রী-দের কার্যকলাপ নিরপেক্ষভাবে পরিবেশিত হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অপেক্ষা রাখে। সাংবাদিকদের সেই সময়কার সংবাদ পরিবেশনের ধারাও বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কিছুটা দায়ী নয় কি? তার জড়ন্ত দৃষ্টান্ত নকশাল-পন্থীদের বর্তমান কার্যকলাপ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এবং সেই সরকারের পতনের পরে কোনও একটি বৃহত্তম বাম-পন্থী পার্টিতে অপদস্থ করার বাসনা



নিয়ে কোনও কোনও সংবাদপত্রে নকশাল-পন্থীদের কার্যকলাপ ফুটিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। আজ তারই পরিণাম ওই দলের আদর্শচ্যুত গণ্ডামির দরুণ স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রায়ই বন্ধ করে রাখতে হচ্ছে। বঙ্গদর্শনে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধিতা আজ নোংরা স্তরে গিয়ে পৌঁছানোর ফ্যাসী-বাদের উত্থান ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে বলে যে আশঙ্কা করা হয়েছে, তা ঠিক। তবে প্রশ্নঃ এর সমস্ত দায়িত্ব কি শুধুমাত্র বামপন্থী পার্টিগুলোর উপর বর্তাবে? অপরের ওপর দোষ চাপিয়ে নিজের দায়িত্বকে অস্বীকার করার মধ্যে আর যাই থাক, সাহসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিগত দুই যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পশ্চিম বাংলা তথা ভারতের সাংবাদিকদের ভূমিকা আজকের এই পরিস্থিতির জন্য অনেকটা দায়ী।

কুন্তিবাস ওঝা মহাশয় শুরুর দিকে নিজের নিরপেক্ষতার প্রমাণস্বরূপ অনেক কিছু লিখে শেষে লিখছেন, “বিপরীত যুক্তি অনেক আছে নিশ্চয়ই। শোষণ, বণ্টনা, অবিচার মানুষকে নিঃসন্দেহে ক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু বিক্ষোভকে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দেওয়াই তো রাজনৈতিক দলের কর্তব্য। মানুষের বিক্ষোভ যাতে বিদ্রোহের রূপ নিয়ে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে সেই নেতৃত্ব দেওয়াই তো বিপ্লবী আদর্শ রাজনৈতিক দলের কর্তব্য।” ঠিক তার পরেই তিনি প্রশ্ন রাখছেন, “কয়েকজন কর্মী, সেই সঙ্গে খ্রীদলীপ মজুমদারকে ধরা হলো। খুব অন্যায়াভাবে (যাক্ তবু স্বীকার করেছেন) তাঁকে গ্রেপ্তার ও আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই ঘটনাকে উপলক্ষ করে যে সব ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ দুর্গাপুরের হাজার হাজার কর্মী ধর্মঘট করে যে মল্য দিল, তার চেয়ে কয়েকজন কর্মীর আটক থাকার মল্য কি বেশি? আমি জানি গাল্যের হিসাব সেইভাবে হয় না। জানি প্রতিবাদ নীতির বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। তবু দেশে অন্যায়াভাবে গ্রেপ্তার-আটক খ্রীদলীপ মজুমদার কি প্রথম হয়েছেন এখানে বলে রাখি ১৯০৮

সালে জাতীয় নেতা ভিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বোম্বাই-এর শ্রমিকেরা প্রথম একদিনের রাজনৈতিক ধর্মঘট পালন করে) এবং এই কথা বলতে পারেন কেউ যে, দুর্গাপুরের এই আন্দোলন শেষ হলে আর কোন অন্যায়াভাবে গ্রেপ্তার করা বা আটক করা হবে না? এই আন্দোলনের পর অত্যাচারী বা অন্যায়া প্রশাসনের শেষ হয়ে যাবে? কুন্তিবাস ওঝা মহাশয়ের এই দুই বক্তব্য পরস্পর বিরোধী নয় কি? প্রথমে তিনি ওকালতি করলেন মানুষের বিক্ষোভকে সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করার পক্ষে, কিন্তু পরে মনে পড়েই সেই রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সরিয়ে নিয়ে যাবার সূচিপূর্ণ চক্রান্ত ফাঁদলেন। একেবারে বুর্জোয়াদের সুরে লিখলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হবে রেল শ্রমিকদের এবং দুর্গাপুর-বন্দনের দরুণ। তার পরেই তিনি প্রশ্ন তুললেন, “এই পথেই কি রাজ্যে শান্তি আসবে? এই পথেই কি বিপ্লব আসবে?” আমার প্রশ্ন রাজ্যে শান্তি থাকলে (কারণ সমাজের সকল স্তরের মানুষ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেলেই রাজ্যে শান্তি বিরাজ করতে পারে) আর বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? চরম অশান্ত, তৈরি করা নয় নিশ্চয়ই) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অস্থিরতাই তো বিপ্লবের লক্ষণ। তারই পদধ্বনিতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পশ্চিম বাংলার কয়েকটি বামপন্থী, প্রধানত সি-পি-এম দল। যখন সি-পি-এম সমাজের প্রত্যেক স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের অর্থনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে একত্রিত করে একটি চূড়ান্ত রাজনৈতিক সংগ্রামের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন তারই বিরুদ্ধে সমস্ত বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শক্তিকে সংহত করতে বাস্তব। ঠিক সেই সময় ঐতিহাসিক নিয়মে সংগ্রামে অনিচ্ছুক তথাকথিত বামপন্থী দলগুলো বুর্জোয়া শ্রেণীকে সাহায্য করছে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি রুটাসের ভূমিকা পালন করে। ওঝা মহাশয়ের সঙ্গে একটা বিষয়ে আমি একমত যে, বিশ্বনাথ মজুমদার এবং অশোক ঘোষের দল বাংলা কংগ্রেসকে নিজেদের পক্ষে রাখতে আগ্রহী। প্রমাণ—বাংলা কংগ্রেসের হুমকীর ভয়ে প্রথমজন জমি দখল আন্দোলন এবং দ্বিতীয়জন বাড়ি দখল আন্দোলন স্থগিত রেখেছেন। কিন্তু এটা কি ঠিক তাঁরা সি-পি-এম-কেও দলে পেতে চান? তাই যদি হয়, তবে সি-পি-এম বা সেই দলের প্রভাবিত সংগঠনের সমস্ত আন্দোলনের ভাব্য সক্রিয় বিরোধিতা করছেন কেন? এই সমস্ত আন্দোলনের বিপর্যয়ে কার হাত শক্ত হবে? শ্রমিক শ্রেণীর না আমলাদের?

সাম্প্রতিক বসুমতী

আমলাদের জন্মে এবং সি-পি-এম-এর বিপর্যয়ে বিশ্বনাথ মুখার্জী এবং অশোক ঘোষ মহাশয় প্রমিত প্রণয়ী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন কি?

বাংলার সাংবাদিক তথা বঙ্গদর্শনের সাংবাদিক এবং কুস্তিভাস ওয়া মহাশয়ের কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, মানবতার দোহাই দিয়ে প্রথম যুক্তফ্রন্ট আমলে রবীন্দ্র সরোবরের ঘটনা (যেটা নিয়ে সমস্ত ভারতের সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীগণ বাংলার সমাজজীবনের ওপর কলংক লেপন করতে চেরেছিলেন) এবং ১৭ই মার্চ বর্ধমানের সেই পরিবর্তনের ঘটনার সচিত্র সংবাদ পরিবেশনে এখন কুষ্ঠাবোধ করেন নি, তখন কি করে দুর্গাপুরের সমস্ত ঘটনাকে আড়াল করে রাখলেন ভারতের সমস্ত গণতান্ত্রিক মানদ্বয়ের কাছে থেকে? প্রথম থেকে ভারতের সমস্ত সংবাদপত্রে প্রচার হতে লাগলো যে, দুর্গাপুরে সরকারপক্ষ এবং সি-পি-এম-এর শক্তিপরিষ্কা হচ্ছে। এ যেন পাঞ্জাব লড়াই। কি বাহাদুরী সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনে! কোন্ পরিস্থিতিতে এবং কি কি কারণে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল তার একটা আবছা খবর বাংলার সংবাদপত্রগুলোয় (সাম্প্রতিক বসুমতী সমেত) প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু কোন্ পরিস্থিতিতে এই ধর্মঘট বিনা সতর্কতায় নেওয়া হয়েছিল তার গভীরে না গিয়ে সি-পি-এম-এর (অর্থাৎ দুর্গাপুরের প্রমিত প্রণয়ী) পরাজয়ে তাঁরা আহ্বাদিত। ভারতের গণতান্ত্রিক মানদ্বয় জননে পারলো না এই ঐতিহাসিক ২১ দিনের রাজনৈতিক সংগ্রামকে পৃথকভাবে করতে ভারত সরকারের অ্যাপয়েন্টেড চার হাজারী ফুর্দে ডিকটের কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দুর্গাপুর নামক শিল্পনগরীকে ১৫ হাজার সি-আর-পি-এর অত্যাচারে জর্জরিত করে তুলেছিল। শেষে ওখানকার মা-বোনেরা এই আন্দোলনে অংশ নিলে অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফু ঘোষণা করা হয়। এতে করে দুর্গাপুরের সমস্ত মানব বন্দী হয়ে পড়ে তাদের নিজ নিজ গৃহে। শব্দমাত্র কাজে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের কার্ফু পাশ ইস্যু করা হয়। তারই ফলে সংগ্রামী দুর্গাপুরের নাগরিকেরা অনাহারে, নির্মম পুলিশী অত্যাচার এবং রোগীর চিকিৎসার অভাবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এটা সি-পি-এম-এর পরাজয়, না মানবতার পরাজয়? দুর্গাপুর তথা সমস্ত পশ্চিম বাংলার গণতন্ত্র আজ শঙ্কিত। সমস্ত ভারতকে একথা জানানোর আজ কেউ নেই। আশা করে-

জিগ্মা ডিক্টরদের এই অটুহাসিতে গজে উঠে অন্তত সাম্প্রতিক বসুমতীর প্রগতি-
শীল সাংবাদিকেরা। তাতেই পাওয়া যেত সাংবাদিকের স্বাধীনতার স্বাদ। অন্যথায় গণতন্ত্র রক্ষা পাবে না, তাকে ধ্বংস করে গৃহযুদ্ধ ছরান্বিত হয়ে ফ্যাসিবাদের চরম প্রকাশ পাবে এই ভারতবর্ষে।
—সমর সেন
ক্লাইভ হাউস, কলিকাতা-২৮

আন্তর্জাতিক
[৬৫৩ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র-নেতারা এই সব বিষয়ে জোরালো বক্তব্য রাখতে পারবেন, এই ভরসা আছে।

তবে, এবার রাজনৈতিক বিষয় অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপার জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে বেশি গুরুত্ব পাবে। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশ, যারা জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রধান অংশ, এখনও অনুন্নত। তাই এদের উন্নয়নের দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে।

সম্মেলনের প্রারম্ভে একটু অশ্রুত লক্ষণ দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার ও প্রিন্স নরোদম সিহানুকের নির্বাসিত কম্বোডিয়া সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। অনেকগুলি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এই দুই সরকারকে স্বীকার করে নিলেও অনেকে আবার এদের বিরুদ্ধে। এখন প্রশ্ন হল, লাসাকা সম্মেলনে এদের যোগ দিতে দেওয়া হবে কি না। মালয়েশিয়ার সহকারী প্রধান-মন্ত্রী টুন আবদুল রেজাক (২১শে সেপ্টেম্বর তিনি টাংকু আবদুল রহমানের কাছ থেকে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করবেন) হুমকী দিয়ে রেখেছেন, সিহানুকের সরকারকে নেবার চেষ্টা করলে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন ভেঙে যাবে। তাঁরা লন নলের সরকারকেই কম্বোডিয়ার একমাত্র বৈধ সরকার বলে মনে করেন। শেষ পর্বন্ত এই বিরোধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা আগে থেকে বলা শক্ত। তবে একটা মীমাংসার চেষ্টা অবশ্যই হবে।

জোটনিরপেক্ষ জগতের অন্যতম প্রধান নেতা নাসের এবার লাসাকা সম্মেলনে যাচ্ছেন না। কায়রো থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। নাসেরের পরিবর্তে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ রিয়াদ তাঁর দেশের প্রতিনিধিত্ব করে নেতৃত্ব করবেন। পশ্চিম এশিয়ার ঘনীভূত সংকটের জন্যই নাসেরের পক্ষে এক দিনের জন্যও কায়রো ত্যাগ করা সম্ভব হচ্ছে না। যে কোন সময় বড়

রকমের ঘটনা ঘটতে পারে।

ভারতের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার স্বরণ সিং সহ ১৬ জনের এক প্রতিনিধিদল লাসাকা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য রওনা হয়ে গিয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রীরূপে এই প্রথম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। বেলগ্রেডে ছিলেন নেহরু, আর ১৯৬৪ সালে কায়রোয় দ্বিতীয় সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী।
(৬-৯-৭০)

পশ্চিমের বোঝা
[৬৫৫ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নির্বাচনী জোট বাঁধার ক্ষেত্রে—আজ পশ্চিমবঙ্গের সি-পি-এম-বিরোধী দল সকলেই তাকিয়ে আছে কেরলের দিকে। কিন্তু সি-পি-এম বোধ হয় আরো বেশি করে তাকিয়ে আছে কেরলের দিকে। সি-পি-এম প্রকৃতপক্ষে আজ অল ইন্ডিয়া কেরল-পশ্চিমবঙ্গ পার্টি। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যে সি-পি-এম-এর শক্তি কোন হিসাবে গোনার মত নয়। কিন্তু কেরল আর পশ্চিমবঙ্গ দিয়েই সি-পি-এম সারা ভারতের রাজনীতিতে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হতে পারে। জনসংস্কৃতি দল, এমন কি সি-পি-আই দল সি-পি-এম থেকে অনেক বেশি বাজ্যে বেশি প্রভাবশালী হলেও কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্য হাতে থাকলে সি-পি-এম অনেক শক্তিশালী হতে পারে। সেইজন্য কেরলের নির্বাচন সি-পি-এম-এর জীবনমরণ সমস্যা। কেরল যদি আজ কোনরকমে হাতছাড়া হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গকে হাতে রাখা অসম্ভব হবে। সি-পি-এম-এর জীবনতরী বাঁধা আছে দুটো খুঁটোয়—একটা কেরল, একটা পশ্চিমবঙ্গ। তাই একটা খুঁটো যদি ছুঁতে যায়, তখন অপর একটা খুঁটো দিয়ে সি-পি-এম-বিরোধী উগ্র নকশালপন্থী স্রোতে দলের নৌকাকে ঠিক রাখা সহজ হবে না। তাই কেরল নির্বাচন অন্য দলের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, সি-পি-এম-এর কাছে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সি-পি-এমও তাকিয়ে আছে কেরলের দিকে। কেরলের নির্বাচন শূন্য কেরল নয়, সারা ভারতের রাজনীতির পথ রচনা করবে, যে পথ দেখে পশ্চিমবঙ্গের অজরবাব, রণেন সেন, মাখন পাল যাবেন, আবার প্রমোদবাব, জ্যোতিবাবও যাবেন।

অক্ট্রয়

অক্ট্রয়—কেউ বলেন প্রবেশ-শুল্ক। নগর প্রবেশ-শুল্ক অথবা শুল্ক নগর-শুল্কও বলা চলে। যে নামই বলুন, শুল্ক শুল্কই—অক্টোপাশের মত আট দিক থেকে এ শুল্ক শহরাঞ্চলের ক্রেতাদের আঁকড়ে ধরবে। হ্যাঁ, শীঘ্রই এ শুল্ক চালু হচ্ছে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে।

কিন্তু প্রশ্ন হল গত এক শতাব্দী ধরে পূর্বাঞ্চলে এ ধরনের শুল্ক বসানোর প্রস্তাব বাতিল হয়ে এসেছে—বহু কমিটি এ শুল্ক সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে; তবু কলকাতায় এ শুল্ক চালু হচ্ছে কেন? পূর্বাঞ্চলের কোনও শহরে নগর-শুল্ক এই প্রথম। অবশ্য ১৮২৮ সালের পরে সাময়িকভাবে একবার বসানো হলেও পরে তুলে নেওয়া হয়েছিল। সেও প্রায় দেড়শ বছরের কথা। আর এ শুল্ক দক্ষিণাঞ্চলেও নেই। পশ্চিমাঞ্চলে এবং মধ্যাঞ্চলের কোনো কোনো শহরে এ শুল্ক চালু আছে। তাদের কথা আলাদা। নদী, পাহাড়-পর্বত দ্বারা শহরগুলি এমনভাবে বেষ্টিত অথবা রাস্তাঘাট এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত যে, সে সব স্থানে এ শুল্ক আদায়ের তেমন কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু সমতল অঞ্চলের শহর-গুলিতে ছোট-বড় রাস্তা, নদীপথ, খাল-পথ, রেলপথ প্রভৃতি যোগে মালপত্র আসা-যাওয়া করে থাকে। সেক্ষেত্রে চেকপোস্ট বসিয়ে নগর-শুল্ক আদায় করা সোজা কথা নয়।

পূর্বাঞ্চলে তাই অক্ট্রয় শুল্ক আরোপের বিষয়টি নিয়ে প্রায় দেড়শ বছর ধরে টালবাহানা হয়েছে। বিকল্প হিসাবে পৌর এলাকাগুলিতে সম্পত্তি করের হার রদবদল করা হয়েছে—তবুও ইতিপূর্বে কখনও পণ্য প্রবেশের উপর শুল্ক বসিয়ে উন্নয়ন কার্যের অর্থ যোগানোর কথা কেউ চিন্তা করেন নি। কিন্তু এতদিনে তা করা হল। তাও আবার কলকাতার মত মহানগরীতে।

১৮২৫ সালেই হোষ্ট ম্যাককঞ্জী বলেছিলেন, এ শুল্ক প্রবর্তন বার বার পণ্য আটক হয় এবং প্রতিবেশী অঞ্চলগুলির মধ্যে মূল্য পার্থক্য ঘটে। তাছাড়া সাধারণ ব্যবসারীদের উপর ভীষণ ঝামেলা চাপায়।

১৮৩৫ সালে লর্ড এলেনবরো বলেন, এ শুল্ক জাতীয় নীতিবোধের উপর ভীষণ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বহু স্থানেই এ শুল্ক তুলে নেওয়া হয়েছিল। ১৮৫০ সালে পৌর শাসন চালু হলে এ কর আবার নতুন করে বহু রাজ্যে চালু হয়ে যায়। শুল্ক পূর্ব ভারতেই বাতিল ছিল। ট্রেভেগিন ১৮৬৪ সালে বলেন, যদি এ কর একান্ত রাখতেই হয়, তাহলে মাত্র স্থানীয়ভাবে ব্যবহার্য কয়েকটি মাত্র ভোগ্যপণ্যের উপরেই আরোপ করা



উচিত। নতুবা ব্যবসারীদের উপর এ করের চাপ খুব বেশি পড়ে।

১৯২৪-২৫ সালের কর তদন্ত কমিটিও বলেছিলেন, অক্ট্রয়ের বিকল্প হিসাবে বিক্রয়কর বরং ভালো। বহু শুল্কবিদ বলেছেন, অক্ট্রয় প্রগতিশীল অর্থনীতির পরিপন্থী।

সকল আপত্তি উপেক্ষা করে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে অক্ট্রয় চালু করা হচ্ছে। কারণ গরজ বড় বালাই। বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য বহু কোটি টাকা দরকার। অক্ট্রয় থেকে অন্তত কোটি দশেক টাকা নাকি পাওয়া যাবে। তাছাড়া বর্তমান বেকার দশায়ও কিছুটা স্বস্তি হবে। কারণ, বৃহত্তর কলকাতার আশেপাশে (অর্ডারকে) গোটা আঠাশ

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাস 'স্রোতের সংগে' প্রকাশ করা গেল না। এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যা থেকে রচনাটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সঃ সাঃ বঃ

চেকপোস্ট বসানো হবে। সেখানে বহু লোক কাজ করবে। অফিসেও কিছু লোক চাকরি পাবে। কাজেই আপত্তির কারণ কি? ভারতের বহু শহরেই তো অক্ট্রয় রয়েছে। কলকাতা ও আশেপাশের উজন তিনেক শহর জুড়ে একটি বৃহৎ অঞ্চলে এ শুল্ক চালু হলে ক্ষতি কি?

কিন্তু ব্যাপারটা অত সোজা নয়। লাভের গুড়ু পিঁপড়ের খেতে পারে। কলকাতাবাসী এখনও অক্ট্রয়ের খোঁচা খান নি। তবে বিক্রয়করের ক্ষেত্রে তাঁরা জানেন, সরকার যতটা কর আরোপ করে, তার বেশি হারে মূল্য বেড়ে যায় পণ্যাদির। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হবে না। বহু পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি অপরিহার্য হবে বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে।

ব্যবসারীদেরও হুমকিত কম হবে না।

যেসব পণ্য কলকাতায় আনা হবে, তা বিক্রি করা যাক বা না যাক, আগেভাগে শুল্ক মিটিয়ে দিতেই হবে। এতে ব্যবসায়ের সাবলীল গতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। বিক্রির সময় এ কর উশুল করতে তাদের বেগ পেতে হবে খুব।

আর বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে যেসব পণ্য ব্যবহার হবে তার উপরেই তো শুল্ক বসার কথা। কিন্তু কলকাতা থেকে আবার এসব পণ্যের যে অংশ বাইরে পাঠানো হবে সে অংশ বাবদ "রিফান্ড" বা শুল্ক ফেরত পাওয়ার কি ব্যবস্থা হবে? একেই তো গুদামঘরের খুব অভাব আছে, তার উপরে এ উদ্দেশ্যে নতুন করে গুদামঘর পাওয়া কি সোজা কথা? আর তৈরি করতে গেলেও কি কম টাকা দরকার?

বিভিন্ন চেকপোস্টে যানবাহন চেকিং-এর জন্যও কলকাতাগামী জনসাধারণের হয়রানি বাড়বে, সময়ও নষ্ট হবে।

এই শুল্ক আদায় করার ব্যাপারে যে ব্যয় অনুমিত হয়েছে, তা ছাড়িয়ে যেতে পারে। হয়তো শতকরা ১৫ শতাংশ ব্যয় হয়ে যাবে আদায় বাবদ। তাহলে কত আর বাঁচবে এ শুল্ক? আর বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য কতই বা পাওয়া যাবে?

ব্যবসার কেন্দ্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে শহর কলকাতার গুরুত্ব বরাবরই ছিল। দেশ ভাগের পরে এই গুরুত্ব কমেছে কিছুটা। পরে রাজনৈতিক গোষ্ঠিগোষ্ঠি ও অন্যান্য কারণেও কলকাতা তার মর্যাদা কিছুটা হারিয়েছে। সওদাগরি বহু অফিস এখন স্থানান্তরে গেছে। বন্দর হিসাবেও গুরুত্ব কমে আসছে হলদিয়া তৈরি হওয়ায়। অক্ট্রয় চালু হলে বর্ধমান, আসানসোল, মেদিনীপুর, রাণাঘাট এসব স্থানের ব্যবসার কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব বাড়বে। কলকাতার বহু ব্যবসারী এসব নতুন কেন্দ্রে চলে যাবে। চাকরির সুযোগ এ শহরে সঙ্কুচিত হবে। এমন কি ধানবাদ, কটক এ সমস্ত অনা রাজ্যের কেন্দ্রেও ব্যবসার স্থানান্তরিত হতে পারে। তাহলে নিয়োগ সম্ভাবনার নীট বৃদ্ধি হবে না।

আর একটা দিকও বিশেষভাবে বিবেচ্য। অক্ট্রয় চালু হলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি হবেই। তখন বহু পণ্যের ব্যবহার আগের মত হবে না। স্থিতিস্থাপকশীল (ইলাস্টিক) পণ্যের ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কাজেই যে পণ্য পরিমাণের (ভলিউম) ভিত্তিতে অক্ট্রয় থেকে আয় হিসাব করা, সে পরিমাণ পণ্য বৃহত্তর কলকাতা অঞ্চলে প্রবেশ নাও করতে পারে। তখন অক্ট্রয় চালু করার কোনও বৌদ্ধিকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে কলকাতা তথা

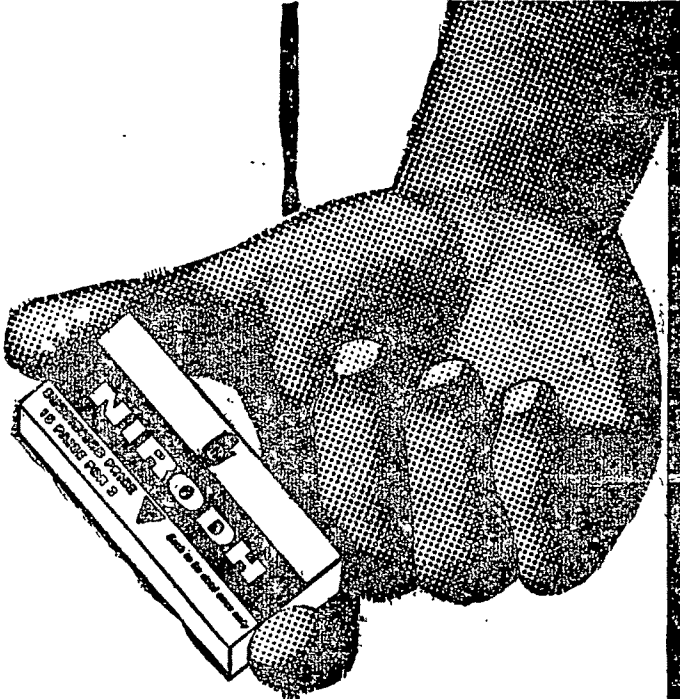
সামাজিক বন্দনতা

পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ অবস্থাটা বিবেচনা করা-দরকার অন্য রাজ্যের অন্য শহরের সঙ্গে তুলনা করার আগে। পশ্চিমবঙ্গকে নিত্যব্যবহার্য বহু পণ্যের জন্যই অপর রাজ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন মাছ, মশলা, তেল, কাপড়, ডাল, গুড়,

চিনি, বনস্পতি প্রভৃতি। আর এসব পণ্য কলকাতার সরাসরি এলে তবেই অন্য কেন্দ্রে বিস্তৃত হয়। এসব নিত্যব্যবহার্য পণ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় জীবনধারণ ব্যস্ত বাড়ে। তার ফলে শ্রমিক অশালিত আরও তীব্র হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটা

বিবেচনা না করার খেসারত হয়তো দিতে হবে। সমস্যা-জঙ্কিত জনসাধারণকে অকুট্রয়ের অঙ্কোপাশ দিয়ে আশেপাশে না আটকালেই বোধ হয় সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হ'ত।

—সত্যেন্দ্র দত্ত



মাত্র
5টি গয়সা
খরচ করলে
আপনি আপনার
পরিবার সীমিত
রাখতে
পারবেন!

নিরোধ



পরিবার পরিবেশের জন্যে
উন্নত ধরনের
বস্ত্রের জন্মনিরোধক
15 পরসায় 3টি

শ্রমিকরা সাধারণত ১৫ জন করে থাকে।

সময়ের ব্যবধানে সন্তান
উৎপাদনের জন্মে

আজকাল, নিজের ইচ্ছে মার্কিন
সময়ে ছেলের জন্ম দেওয়া
সম্ভব। হঠাৎ কিছু হয় না।
আপনি মখন চাইবেন, তখনই
আপনি সন্তান উৎপাদন
করতে পারবেন। বিরোধ
আপনাকে সেই ইচ্ছাপূরণের
সুযোগ দেয়।

মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের জন্মে
জন্মের পরে প্রথম তিন বা চার
বছরের সময়ে শিশুর মৃত নেওয়া
উচিত—তাহলেই ওরা ভালো
ভাবে বেড়ে উঠবে বলে ডাক্তার-
দের মত দিয়ে থাকেন। সন্তান
প্রসবের পরে হস্তস্বাস্থ্য আবার
ফিরে পাওয়ার জন্যে মাসেরও
কিছু সময় দরকার। বিরোধ
ব্যবহার করে আপনি খুব
সহজেই পরবর্তী সন্তানের জন্ম
স্থগিত রাখতে পারেন।

নিরোধ (কন্ডোম) পুরুষদের
জন্মে উন্নত ধরনের রবারে তৈরী
জন্মনিরোধক। পৃথিবীর সর্বত্র
নিরোধ ব্যবহার করা হয় কারণ
এটি খুবই সহজ ও নিরাপদ
পদ্ধতি। যারা ব্যবহার করে,
তাদের আদৌ স্বাস্থ্যহানি হয়
না। নিরোধ সব জায়গায়
পাওয়া যায়।

মুদীর দোকান, মণিহারী
দোকান, ওষুধের দোকান,
সাধারণ বিপণী, পারের দোকান
আদিতে নিরোধ বিক্রী হয়।

70/61

রাজন্যভাতা বিলোপ

রামেন্দু ষুংস্কান্দি

এক ঐতিহাসিক বিল পাশের জন্য ইরা সেপ্টেম্বরের লোকসভার অধি-বেশন ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজন্যবর্গের ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা বিলোপের উদ্দেশ্যে আনীত সংবিধান সংশোধন বিলটি এদিন ৩৩৯-১৫৪ ভোটের ব্যবধানে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে। আগামী ১৫ই অক্টোবর থেকে আইনটি কার্যকর হবে বলে স্থির হয়েছে।

আজকের ভারত যে আদর্শ ও ভাব-ধারা গ্রহণ করেছে এবং মেনে চলেছে, তার সঙ্গে প্রাক্তন নৃপতিদের ভাতা ও সুবিধাদি যে পরস্পরবিরোধী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এ-সুবিধা বিলোপের চেষ্টাও চলে আসছে গত প্রায় ১৫ বছর ধরে। কিন্তু প্রাক্তন রাজা-মহারাজারা এ-মুক্তি হাজির করেছিলেন যে, তাঁদের ভাতা, মর্যাদা ও অন্যান্য সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে তা একতরফাভাবে অগ্রাহ্য করা চলবে না। সংবিধানে যেহেতু তাঁদের ভাতা ইত্যাদির বিষয়ে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, সেহেতু সংবিধান সংশোধন না করে অবস্থার কোনো পরিবর্তন করাও চলবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

ভারত স্বাধীন হবার আগে এখানে প্রায় সাতশ'রও বেশি দেশীয় রাজ্য ছিল, ব্রিটিশ সরকার যাদের ব্রিটিশ ভারতীয় রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। সেই শাসকদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার চুক্তি করেছিলেন নিজেদেরই সুবিধার জন্যে। ইংরেজ সরকার তাঁদের কাছে মোটা কর আদায় করতেন, বিনিময়ে বহিরাঙ্গমণ থেকে তাঁদের রক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছিল। দেশীয় রাজ্যের শাসকদের খুশি রাখার জন্য চতুর বিদেশী সরকার তাঁদের রাজা-মহারাজা, নিজাম, নবাববাহাদুর ইত্যাদি নানা খেতাব দিয়েছিলেন। এবং স্ব-স্ব রাজ্যে এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কতকগুলি বিশেষ সুবিধা বা মর্যাদা ভোগ করতেন। দেশ স্বাধীন হবার পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লৌহমানব সর্দার কলভভাই প্যাটেলের তৎপরতায় দেশীয় রাজ্যগুলো ভারতের সঙ্গে যোগদান করল। কিন্তু পরিবর্তে রাজা-মহারাজাদের ভাতার ব্যবস্থা করা হল—সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা, খেতাব যা তাঁরা এতদিন ভোগ করে আসছিলেন তাও প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখা হল। সেদিন

দেশীয় নৃপতিরা যা যা চেয়েছিলেন ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের জন্য, ইন্সট্রুমেন্ট-এ্যাক্সেসশন-এ স্বাক্ষর দেবার শর্ত হিসাবে ভারত সরকার প্রায় বিনাবাক্যে সবই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন পরিস্থিতির চাপে। কারণ যে সুযোগ-সুবিধা এতদিন রাজন্যবর্গ ভোগ করে আসছিলেন, চট করে তা ত্যাগ করতে তাঁরা রাজি হলেন না। ভারত সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছিল কয়েকজন নৃপতির গতি-বিধি এবং পাকিস্তানের লোভী মনো-ভাব। ভূপালের নবাব ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে একটা তৃতীয় শক্তি গঠনের পায়তারা করছিলেন এবং এ ব্যাপারে তিনি সঙ্গী পেয়েছিলেন হায়দ্রাবাদের প্রবল প্রতাপান্বিত নিজাম এবং দ্রিবাঙ্গুরের মহারাজাকে।

যোধপুরের মহারাজা তো আরো চমৎকার মতলব এঁটেছিলেন! জয়-শলমীরের মহারাজকুমারকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কায়েদে আজম জিন্নার কাছে। সুচতুর ও ধূর্ত জিন্মা সাহেব এ-সুযোগ হাড়তে চাইলেন না। তিনি বলেছিলেন যে, দেশীয় নৃপতিদের মধ্যে যদি ভাঙন ধরানো যায় এবং তাঁদের একাংশকেও পাকিস্তানে যোগদানে রাজি করাতে পারেন তবেই কেজা ফতে। তাই জিন্মা সাহেব কালবিলম্ব না করে যোধপুরের মহারাজার কাছে একটি সাদা কাগজ ধরে দিলেন, বললেন : শর্ত যা দেবার তা আপনিই দিয়ে সহী করে দিন। আপনাদের কোন শর্তই অপূর্ণ থাকবে না। কিন্তু জয়শলমীরের রাজকুমার একটু ইতস্তত করলেন। তিনি কায়েদে আজমকে প্রশ্ন করলেন, যদি তাঁর রাজ্যে কখনো হিন্দু-মুসলমান সাংপ্রদায়িক দাঙ্গা বাধে, তবে তিনি মুসলমানদের পক্ষ নিতে না পারেন, তবে পাকিস্তান সরকার তাঁকে কী চোখে দেখবেন? এ-ধরনের মৌলিক প্রশ্ন যোধপুরের হিন্দু রাজার মনেও উঁকি দিয়ে থাকবে, যার কোনো সদুত্তর পাকিস্তানের জনকের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজন্যবর্গের মতিগতি যে মোটেই সুবিধের নয়, এটুকু বদ্ব্যভাতে ভারত সরকারের মোটেই অসুবিধে হয় নি। তাই প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য আবদার মিটিয়ে

দেশীয় নৃপতিদের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান-চুক্তিতে স্বাক্ষর করানো হয়।

সেদিন যেমন প্রয়োজনের ত্যাগদে রাজন্যবর্গের সব দাবি মোটামো হলে-ছিল, আজও জেমিন জরদুরা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে রাজন্যবর্গকে প্রদত্ত সমস্ত সুবিধা প্রত্যাহার করে নেওয়া। কারণ এগুলি আজকের ভারতের গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিরোধী। বাস্তবিক, রাজন্যবর্গের ভাতা ও সুবিধাদি বিলোপ করার দাবি কংগ্রেস ১৯৫৩ সালে থেকে জার্নিয়ে এলেও এ-পথে কার্যকর পদক্ষেপ বিশেষ নেওয়া হয় নি। ১৯৫৫ সালের অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে যখন সমাজতান্ত্রিক দাঁটে সমাজগঠনের প্রস্তাবের সঙ্গে রাজন্যবর্গের ভাতা ও সুবিধা বিলোপের প্রস্তাবও উঠেছিল, কিন্তু ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ-বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার আগে প্রকৃত কাজে অগ্রসর হওয়া যায় নি।

এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন নৃপতিরা কী ভাতা বা সুবিধা ভোগ করেন তার একটা সফিস্ট হিসেব এখানে দিয়ে রাখি। ভাতার পরিমাপ অনুযায়ী প্রাক্তন রাজন্যবর্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। এদের মধ্যে বার্ষিক ভাতা ২৬ লাখ টাকা থেকে দু'শে টাকা পর্যন্ত ভাতাজোগী প্রাক্তন নৃপতি রয়েছেন।

একনজরে রাজন্যভাতার খতিয়ান

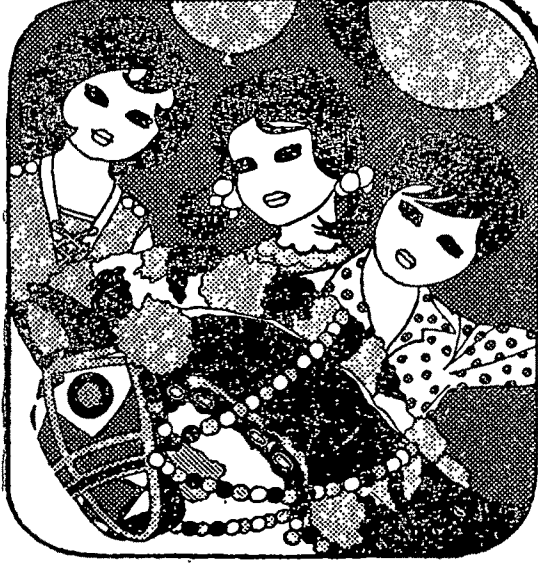
যে পাঁচজন সর্বাধিক রাজন্যভাতা পান

মহাশূদ্র	২৬ লক্ষ টাকা
হায়দ্রাবাদ	২০ " "
দ্রিবাঙ্গুর	১৮ " "
পাতিয়ালা	১৭ " "
বরোদা	১০ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা

যে ১৯ জন ১০ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পান

জয়পুর্	১০ লক্ষ টাকা
বিকানীর	১০ " "
ভবনগর	১০ " "
জম্মু ও কাশ্মীর	১০ " "
যোধপুর্	১০ " "
গোয়ালিয়র	১০ " "
কোলাপুর্	১০ " "
নবনগর	১০ " "
রেওয়া	১০ " "
উদয়পুর্	১০ " "
কোচাবহার	৮ লক্ষ ৫ হাজার টাকা
মোরভি	৮ লক্ষ টাকা
গোন্ডাল	৮ " "
কচ্ছ	৮ " "
ক্রোটা	৭ " "

বাড়ন্তু ছেলেমেয়েদের
জন্য কে না জানে
বাটার জুতোর
বিশিষ্টতা

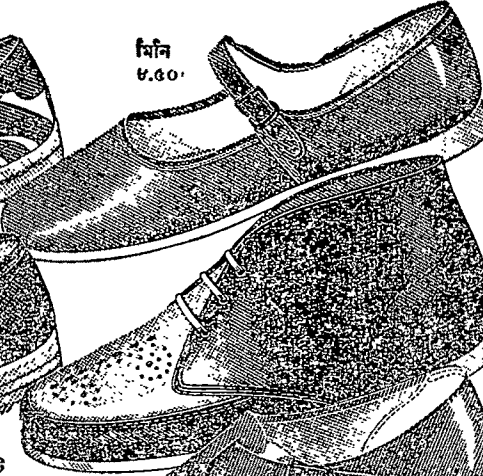


বাটার ছোটোদের জুতো এমনই বিশেষ প্রযুক্তি প্রস্তুত, যাতে ছেলেমেয়েদের ফুটফুটে কোমল বাড়ন্ত পাগড়াল থাকে সুগঠিত ও সুরক্ষিত। এই জুতোগুলোয় চলাফেরা যে এমন অবাধসহজ ও স্বচ্ছন্দ-সাবলীল, তার কারণ সামনে আছে পা মেলার বাড়তি জায়গা, আছে আঁটশাট গোড়ালি আর নমনীয় তালি। আজই নিয়ে আসুন আপনার ছেলেমেয়েদের আপনার প্রিয় বাটার দোকানে। আমন্ত্রণ পরিবেশ দেবো আরামভরা ও টেকসই, বাহারে ও মানানসই জুতায়।

বাহার লেসিং
০.২৫—০.৫০

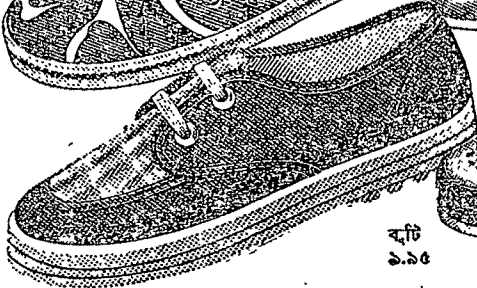


মিনি
৪.৫০

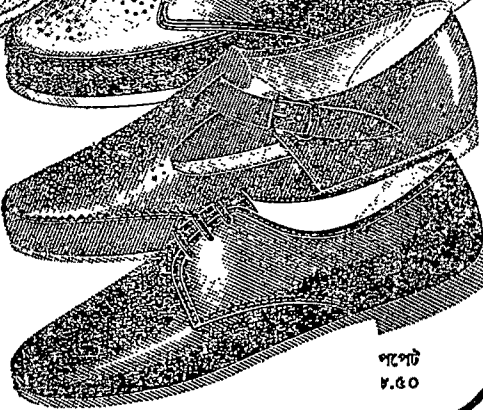


বুটি
২.৯৫

মোকাসিন
৪.৭৫—৫.৫০



হেফা
২.৫০



পপেট
৪.৫০

Bata

সাংগঠনিক বস্তুতত্ত্ব

গানপদুর	৬ লক্ষ ৬০ হাজার
চুপাল	৬ লক্ষ ২০ হাজার
আলওয়ার	৫ লক্ষ ২ হাজার
ভরতপুর	৫ লক্ষ ২০ হাজার

৩০ জন প্রাক্তন নৃপতি ২ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ টাকা বছরে ভাতা পান এবং এ বাদেও আরও ৪৫ জন প্রাক্তন নৃপতি ১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকা বছরে ভাতা পান।

২৪ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ১ লক্ষ থেকে ৭০ হাজার টাকা ভাতা পান।

২৮ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ৫০ হাজার থেকে ৭০ হাজার টাকা ভাতা পান।

৩৪ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ৩০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা ভাতা পান।

১১ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ২৫ হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা ভাতা পান।

৮৩ জন প্রাক্তন নৃপতি বছরে ২৫ হাজার এবং তার কিছু কম ভাতা পান।

গুজরাটের ছোট্ট কাতোদিয়ার প্রাক্তন শাসকই হলেন ক্ষুদ্র ভাতাভোগী। তাঁর বার্ষিক ভাতার পরিমাণ ১৯২ টাকা মাত্র।

ভাতা ব্যবদ গত ২৩ বছরে ভারত সরকারকে প্রায় ৯৮ কোটি টাকা দিতে হয়েছে।

প্রাক্তন নৃপতির সংখ্যা

গুজরাট	৮৩ জন
মধ্যপ্রদেশ	৫৯ জন
হিমাচল প্রদেশ	২৯ জন
ওড়িশা	২৩ জন
রাজস্থান	২২ জন

জনৈক প্রাক্তন নৃপতির আত্মীয়-স্বজন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বছরে ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ভাতা পান।

রাজ্য সরকারগুলিও পৃথকভাবে ৪৭ লক্ষ টাকা রাজকুমারদের আত্মীয়-স্বজনদের দিচ্ছে থাকেন।

রাজন্যভাতা আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স মুক্ত।

অবশ্য একথা সত্য যে, গত ২০ বছরে ভাতার পরিমাণ কিছু (৮১.৮ লাখ টাকা) কমানো হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকারী তহবিল থেকে রাজন্যভাতার দরদর বছরে পাঁচ কোটি টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এ তো গেল নগদ টাকার ভাতা। তাছাড়া অন্যান্য সুবিধা ভাড়া ক্ষ ভোগ করছেন তাতে মনে হবে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসন অক্ষুণ্ণ

রয়েছে, জনতার গণতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি! ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে যে স্মারকলিপি কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারগুলিকে পাঠিয়েছেন তাতে রাজা-মহারাজাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অনুযায়ী মর্যাদাগুলির অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। প্রথম সারির রাজা-মহারাজারা যেমন ২১টি পর্যন্ত তোপধ্বনি দিয়ে সম্বর্ধিত হবার অধিকারী, তেমনি তাঁদের বা তাঁদের পরিবারের লোকজনদের বিদেশ থেকে বিনামূল্যে জিনিষপত্র আনারও ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যারা ১০টি তোপধ্বনির সম্মানে ভূষিত হন, তাঁরাও দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশ থেকে আসার সময় বিনামূল্যে জিনিষপত্র আনতে পারবেন অর্থাৎ তাঁদের ব্যক্তিগত ভ্রমাসী করা হবে না।

ব্রিটিশ রাজত্বের সময় দেশীয় রাজারা ভারতের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের এজিয়ারমুস্ত ছিলেন। সে অধিকার অনেকের ক্ষেত্রেই এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

রাজা-মহারাজা বলে কথা, কাজেই রাজপ্রাসাদও তাঁদের একাধিক। অনেকের সাতমহলা, পাঁচমহলা ও তিনমহলা ভবন, বাগানবাড়ি, রেস্ট হাউস, গেস্ট হাউসের হুড়াহুড়ি। মণিষ্মুক্তা সোনা-গয়নার পরিমাণও প্রাক্তন নৃপতিদের কারো কম নেই। আর মজা এই, বেশিরভাগ বাড়িই করমুক্ত। খামার, চাষের জমিরই কি কোনো হিসেব আছে? কয়েকজন ভাগ্যবান রাজার নিজস্ব বিমান রয়েছে এবং নিজের পূর্বতন রাজ্যের মধ্যে বিমান অবতরণের জন্যে কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না। ভারতে যে দামী দামী বিদেশী মোটর-গাড়িগুলি আসে সে তো রাজা-মহারাজাদেরই কল্যাণে। কিন্তু সেগুলির রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স-ফি তাঁদের গুণতে হয় না। এমন কি, তাঁদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গাড়িতে লাল রঙের নম্বর-প্লেট ব্যবহার করার অধিকারও তাঁদের দেওয়া হয়েছে। তাঁদের গৃহশীর্ষ, বিমান এবং গাড়িতে নিজের পতাকা ব্যবহারের অনুমতিও রয়েছে।

হাতী, ঘোড়া কিম্বা কুকুরের সংখ্যাও রাজপরিবাবে নিতান্ত কম নয়। এগুলির চিকিৎসার ও ওষুধের ব্যবস্থা করতে কিন্তু কেন্দ্রীয় বা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার

দায়বদ্ধ। অস্ত্র আইনের বিধিনিষেধ-গুলিও প্রাক্তন নৃপতিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

কোনো কোনো প্রাক্তন রাজা তাঁর প্রাক্তন রাজ্যে মন্দির, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনার জন্য মোটা খরচ পেয়ে থাকেন। এমন কি লোক্যাল টোলফোনের জন্য কয়েকজন প্রাক্তন নৃপতিকে কোনো চার্জই দিতে হয় না।

মোটামুটি এই হলো প্রাক্তন রাজন্যবর্গের ভাতা ও বিশেষ সুবিধার ফিরিস্তি। স্বভাবতই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারতের মূল সূত্র ও মর্মবাণীর সঙ্গে এই ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা মোটেই খাপ খায় না। যেখানে কোটি কোটি লোক নিরম, মাথা গোঁজার ঠাই নেই, সেখানে এই মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র একেবারেই অচল নয় কি? কিন্তু

যেহেতু সংবিধানে এঁদের সুবিধাভোগের কথা স্বীকৃত হয়েছে, সেহেতু সংবিধানের ২৪তম সংশোধনের মাধ্যমে এই পূর্বনো গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র-বিরোধী ব্যবস্থার বিলোপ করা হল। প্রাক্তন রাজন্যবর্গের এ অধিকারগুলিকে পবিত্র আখ্যা দেবার কোন প্রয়োজন নেই, এগুলি যুগ ও কালের ঘোর বিরোধী। প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঠিকই বলেছেন যে, রাজন্যভাতা ও সুবিধা বিলোপ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে দেশের দারিদ্র্য হ্রাসবে বা বেকার সমস্যার সমাধান হবে, তা নয়, তবে সমাজে আজ যে গুরুতর ধনবৈষম্য রয়েছে, তার অবসান ঘটানো হবে এবং সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা বেড়ে যাবে।

ব্যাপক রাষ্ট্রীয়করণের পর ইন্দিরা সরকার আর একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন রাজন্যভাতা বিলোপ সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করে। সেই সঙ্গে বেশের প্রতিষ্ঠাপ্রদায়ী অংশ-জনস্বত্ব, স্বতন্ত্র এবং সিভিকিট কংগ্রেস আর একটা প্রচণ্ড ঘা খেল। বি কে ডি প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেবার গভীর প্রতিক্রিয়া উত্তরপ্রদেশ কোয়ালিশন সরকারের ওপর পড়তে বাধ্য। যাই হোক, মূল কাজে যখন এগোনো গিয়েছে, তখন প্রাক্তন নৃপতিদের ক্ষতিপূরণ দানের প্রশ্নটির নীমাংসা করা পার্লামেন্টের পক্ষে মোটেই শক্ত হবে না।

বর্ধমান বিদ্যাসাগর

ললিত হাজরা

মৃগপুরুষ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-
সাগর মহাশয়ের বর্ধমান জেলায়
অবিস্মরণীয় কীর্তিকলাপ স্মরণ করি-
বার আজ শত দিন উপস্থিত হইয়াছে।
এই কথা বলিবার কারণ ঘটিয়াছে এই
জন্য যে, এই মহান কর্মযোগীর বিশাল
কর্মক্ষেত্রে বর্ধমান জেলার স্থান নগণ্য
হইলেও, আমাদের কাছে নতুন করিয়া
মুগ্ধতা স্বীকার করিতে হইবে যে,
আমরা বর্ধমান জেলাবাসিগণ তাঁহার
নিকট যুগের সীমানা ছাড়িয়াও
চিরঞ্চণী থাকিব।

১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগর
মহাশয় সর্বপ্রথম বর্ধমান শহরে পদার্পণ
করেন এবং “প্যারীচাঁদ মিত্রের (স্বনাম-
ধন্য টেকচাঁদ ঠাকুর নহেন) বাড়িতে
উঠিলেন। তাঁহার বর্ধমান আগমনের
বার্তা রটিয়া যাইবার পর, বর্ধমানের
বহু বিশিষ্ট ও দরিদ্র ব্যক্তি
মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে আসিতে
লাগিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—বিদ্যা-
সাগর মহাশয়ের দর্শনলাভ। বর্ধমানের
মহারাজা মহাতাপচাঁদ বাহাদুর
বার বার বিশিষ্ট কর্মচারী
মারফত তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে পদধূলি
দিবার জন্য অনুরোধপত্র পাঠাইতে
লাগিলেন, কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদে
যাইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।
অবশেষে মহারাজা স্বয়ং করুণ ভাষায়
অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিলে
বিদ্যাসাগর মহাশয় রাজপ্রাসাদে যাইতে
সম্মত হইলেন। অবশেষে এক নির্দিষ্ট
দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে রাজপ্রাসাদে
বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত হইলেন।
তাঁহার উপস্থিতিতে মহারাজা কৃতার্থ
হইলেন। তাঁহার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ
করিয়া আসিবার প্রাক্কালে, মহারাজা
স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরণতলে
তাঁহার সম্মানার্থে একজোড়া বহু
মূল্যবান শাল এবং নগদ পাঁচশত টাকা
বিদায়স্বরূপ রাখিয়া দিলেন। গ্রহণ
করা ত দ্বয়ের কথা, বিদ্যাসাগর মহাশয়
তাহা স্পর্শ করিলেন না। বলিয়াছিলেন,

“পাঁচশত টাকা দানের আমর শীত
কাটে। বর্ধমানে একটি বালিকা
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে পাঁচশত টাকা
সাহায্য করিবেন।” তাঁহার এই তেজো-
দ্দীপ্ত ভাষণে মহারাজ সহ সকলেই প্রীত
হইলেন। এই সময়েই বর্ধমানের সহিত
তাঁহার স্থায়ী প্রীতির বন্ধন হইল।
ইহার পর স্কুল-পরিদর্শক নিযুক্ত
হইয়া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ও
বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য কয়েকবারই
বর্ধমান শহরে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে স্বাস্থ্যান্নতির
জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ধমানে
আসেন। এই সময়ে তিনি একটানা
চারিমাস বর্ধমান শহরে অবস্থান
করেন। এই চারিমাস কমলসায়ার
নিকেতনে তিনি বাস করিয়াছিলেন।
“...এই উপবনের সন্নিকটে অনেকগুলি
দরিদ্র মুসলমানের বাস। অতি অল্প-
দিনের মধ্যেই সেই সকল দরিদ্র লোক
তাঁহার আত্মীয়-স্বজন মধ্যে পোষ্যবর্গের
মত পরিগণিত হইয়া উঠিল। ঐ গল্পীর
ছোট ছোট বালক-বালিকা তাঁহার বিশেষ
স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিল। তাহাদিগকে
প্রতিদিন খাবার কিনিয়া দেন, তাহাদের
স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের
পিতা-মাতা প্রভৃতিরও নানা অভাব
মোচন করিতে প্রবৃত্ত হন। অনেকের
প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুরূপ ব্যবসায়াদি
চালাইবার মত মূলধন দিয়া সর্বদা
স্থায়ী অঙ্গসংস্থান করিয়া দেন; এইরূপে
এই গল্পীর দরিদ্র লোক তাঁহাকে
পরমাত্মীয়—আপনার জন করিয়া
লইল।” (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—
“বিদ্যাসাগর” (ষষ্ঠ সংস্করণ) পৃঃ
৪৯৪-৯৫)। ঠিক এই সময়েই সর্বনাশা
“বর্ধমান জ্বর” (Burdwan Fever)
বর্ধমান শহরে মহামারীরূপে দেখা
দিয়াছে। বর্ধমান শহরের উপর মৃত্যুর
করালছায়া নামিয়া আসিয়াছে।
চিকিৎসার ও ঔষধের অভাবে শহরের
দরিদ্র অধিবাসিগণ ঢলিয়া পড়িতেছে।
গরীব পাড়ার ক্রন্দনরোল ও সরকারী

অব্যবস্থা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অতি-
মাত্রায় ব্যথিত করিয়া তুলিল। সরকারের
দাতব্য চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার নামে
প্রহসন চলিতেছে দেখিয়া তিনি
কলিকাতায় সরকারের উচ্চমহলে পত্র
লিখিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না
দেখিয়া নিজ অর্থে গরীবদের চিকিৎসার
জন্য একটি অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয়
খুলিয়া দিলেন এবং বর্ধমান শহরের
তদানীন্তন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও সমাজ-
সেবক ডঃ গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের
উপর ইহার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।
প্রতিদিন স্বয়ং দাতব্য চিকিৎসালয়ে
উপস্থিত থাকিয়া রোগীদের সংবাদ
লইতেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন : “বিদ্যা-
সাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী
ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্য-
সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু
তিনিই সর্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলা-
নৈপুণ্যের অবতারণা করেন।...বিদ্যা-
সাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল
জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত,
সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে
সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান
করিয়াছেন।” (“বিদ্যাসাগর চরিত”,
পৃঃ ৮)। বর্ধমান শহরে অবস্থিতির
সময়ে তিনি গদ্য-সাহিত্যের রচনা-
শৈলীর চিরভাবের স্বাক্ষর রাখিয়া
গিয়াছেন। বর্ধমানে বাসিয়া মহাকাব্য
শেক্সপীরের “দি কমেডি অব
এরাস” নাটক অবলম্বনে “দ্যান্তিবিলাস”
উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছিলেন। এই
উপন্যাসখানি বঙ্গসাহিত্যে ভাষায়
প্রাঞ্জলতায় ও স্বকীয়তায় অমর্য লাভ
করিয়াছে।

চক্ৰদীঘর জমিদার পরিবারের
সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যথেষ্ট
সৌহার্দ্য ছিল। কয়েকবার এই পরি-
বারের অনুরোধে চক্ৰদীঘর গ্রামে তাঁহাকে
যাইতে হয়। তাঁহারই পরামর্শে এই
জমিদার পরিবার গ্রামে একটি ইংরাজী
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই গ্রামের

পতাকা

শক্তিরত ঘোষ

সংবাদে সব খবর থাকে না ; তাই তুমি শোনো নি যে এক
মন্ত মাঠে টানা রেলপথ ধরে হেঁটে যেতে, বায়হীন পরিমণ্ডলের
নিঃস্ব নিঃস্বাসে যেতে যেতে
দেখোছি যে রক্ত ঝরে কালপুরুষের তরোয়ালে

দূর গ্রামান্তের আলোরোখা সংসার,
সংসারে অসংখ্য হিংসার সিংহান্ত হয়ে যায়,
হঠাৎ ভয়-পাওয়া বৃক শান্ত হয়,
ফোটে প্রাণে মাধবী।

দূরে আলোময় পটরেখা জংশন,
জংশনে অনন্ত পারাপারের সিংহান্ত হয়ে যায়,
হঠাৎ-বিদ্রান্ত বৃক স্থির হয়,
ফোটে জানালায় ছবি।

সংবাদে সব খবর থাকে না ; তাই তুমি শোনো নি যে সব
প্রাকৃতিক জন্ম, মৃত্যু, প্রকৃত থাকে না ; কতগুলি
ছোঁড়া প্রতাগে ভরা আকাশ,
একটা প্রকাণ্ড জিভ আকাশ
(ফ্যাকাশে, নিলোভ, ঠান্ডা) মাথার ওপরে
প্রকৃত পতাকা যেন প্রাকৃতিক শব্দের পরিধি
টেনে নিচ্ছে নিজের ভিতর ;
আর আমি সৃষ্টির বিষয় প্রতিনিধি
মহত্তম হিংসার রিপোর্ট লেখার ঠিক আগে
শুনলাম : পিছনে আগত কোন দূরন্ত এগ্রেসে
বেজে যাচ্ছে অসহায় বাঁশ।

দাতব্য ঔষধালয়টির পরিচালনার দায়িত্ব
যাঁহাদের উপর ন্যস্ত ছিল, বিদ্যাসাগর
মহাশয় তাঁহাদের প্রধান ছিলেন।

সিয়ারসোলের রাণী হরসুন্দরী
দেবীর পিতার সহিত বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের যথেষ্ট সখ্যতা ছিল। স্বামীর
মৃত্যুর পর হরসুন্দরী সম্পত্তি রক্ষণে
বিপন্ন হইলে, কোন আত্মীয়-স্বজনকে
বিপন্ন করিতে আহ্বান না করিয়া
পিছুবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে
সিয়ারসোল আসিয়া ব্যবস্থা করিয়া
দিবার জন্য পত্র প্রেরণ করিলেন।
বন্ধুকন্যার করুণ আবেদনে তিনি
সিয়ারসোল গমন করিয়া হরসুন্দরীকে
সম্পত্তি রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় উপদেশ
দিলেন। যখনই প্রয়োজন হইয়াছে,
তখন তিনি সুপরামর্শদানে হর-
সুন্দরীকে কতব্যের পথ প্রদর্শন
করিতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম
কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে আসীন
থাকিবার সময়ে, সংস্কৃত কলেজের
ব্যাকরণের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর
অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের মাসিক বেতন ছিল পঞ্চাশ
টাকা, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের শূন্য
পদের মাসিক বেতন ছিল নব্বই টাকা।
শিক্ষা সমিতি (Council of Edu-
cation) সভাপতি ডাঃ ময়েট্ উক্তপদে
একজন যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ করিবার

জন্য মার্শেল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ
করিতে যান। উভয়ে আলোচনা করিয়া
সিংহান্ত গ্রহণ করিলেন যে, উক্তপদে
একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি হইলেন পণ্ডিত
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর
মহাশয়কে জানান হইলে তিনি উক্তপদ
গ্রহণে অস্বীকৃত হইলেন। ইতিপূর্বে
তিনি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি
মহাশয়কে একটি চাকুরি সংগ্রহ করিয়া
দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। প্রতি-
শ্রুতি রক্ষার্থে তিনি ঐ পদে
তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে নিয়োগ
করিবার পরামর্শ দিলেন। ডাঃ ময়েট্
ও মার্শেল সাহেব তাঁহার পরামর্শ
অনুযায়ী সোমবারেই তর্কবাচস্পতি
মহাশয়ের আবেদনপত্র ও প্রশংসাপত্রগুলি
পেশ করিবার জন্য বলিলেন। যেদিন
সিংহান্ত গৃহীত হয় সেদিন ছিল
শনিবার। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তখন
কালনায়ে থাকিতেন। সোমবারে
আবেদনপত্র ও প্রশংসাপত্রগুলি দাখিল
করিতে হইবে। তাঁহাকে সংবাদ দিয়া
সোমবার কলিকাতায় আনয়ন করা
অসম্ভব হইবে। এই অবস্থায় কি করা
যায় চিন্তা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়
একজন বিশ্বস্ত সংগী সহ শনিবার
সন্ধ্যায় কলিকাতা হইতে কালনায়ে
পদরজে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা
হইতে কালনা পৰ্যন্ত কোন রেলপথ
ছিল না। হাঁটপথে দূরত্ব ছিল দ্বিশ

ক্রোশ। পরদিন রবিবার বেলা ১০।১১
ঘটিকায় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের গৃহে
উপস্থিত হইয়া সমগ্র বৃত্তান্ত বলিলেন।
তাঁহার গৃহে আহ্বার করিয়া তাঁহার
প্রশংসাপত্রগুলি সহ আবেদনপত্রখানি
লইয়া কলিকাতার পথে পুনরায় যাত্রা
করিলেন। স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে
তিনি যে কি পরিশ্রম করিতে পারতেন
ইহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রকৃত
মিত্র না হইলে এই ধরনের অক্লান্ত
পরিশ্রম কেহ করিতে পারিতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত
বিধবা বিবাহের প্রথম বিধবা কন্যা
বর্ধমান জেলার পলাশডাঙ্গার অধিবাসী
ব্রহ্মানন্দ মূখোপাধ্যায়ের দশম বর্ষীয়
বিধবা কন্যা কালীমতী দেবী। বলা
বাহুল্য পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এই
বিবাহের পাত্র। কলিকাতায় এই বিবাহ-
কার্য অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ সাহায্যে
অনুষ্ঠিত হইতে না পারে, তত্ক্ষণ
বিরাট চক্রান্ত হইয়াছিল। এমন কি
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রাণ সংহারেরও
যড়যন্ত্র হইয়াছিল।

বাংলার নবজাগৃতির শোভন লগ্নে
জাতীয় নবজীবন সাধনায় দ্বিতীয়
মহান ঋষিক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
মহাশয়ের সাধর্শতাব্দী জন্মদিবসে
আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়া নিজেদের
ভাগ্যবান মনে করিতেছি।

রাজনৈতিক তত্ত্বমার্চনা ৩

স্বামী বিবেকানন্দ

সতেন্দ্রনাথ
গঙ্গোপাধ্যায়



স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বদ্রোহ ঘোষণার চিরন্তন রণচাতুৰ্য হ'চ্ছে নিরর্থক প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট হতে না দিয়ে তার ভাবপ্রবণতার সমযোগ গ্রহণ।*

(* It has always been the strategy of the revolt against freedom 'to take advantage of sentiments, not wasting one's energies in futile efforts to destroy them'—Parato.).

এই ইঙ্গিত হৃদয়ে ধরে মানবহিতৈষী একাদিকে যেমন অগ্রসর হন মানুষ সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের সংকল্প নিয়ে, অপরদিকে অনুন্নতপভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধ-গোষ্ঠী মিত্রের হৃদবেশে সেই প্রচেষ্টার মধ্যেই প্রবেশ করার সমযোগ করে নেন, নির্দিষ্ট পবিত্রপনাতে ভাঙন ধরাবার উদ্দেশ্যে। এই কট রণচাতুৰ্য দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দ্বারা একাদিকে যেমন নির্ব্বাদে অনুসৃত হয়ে চলে, বিদেশীয় রাজনৈতিক-রাও এই পদ্ধতি একইভাবে অবলম্বন করে থাকেন সদা সর্বদা, অপর রাজ্যের রাজ-নীতির মধ্যে ছলে ও কৌশলে প্রবেশ করে সেই রাজ্যে নানাভাবে অনর্থ ঘটনার উদ্দেশ্যে, নির্দিষ্ট রাজশক্তিকে দুর্বল করে রাখার প্রকল্পে। (ক) ইতি-

(ক) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত জানুয়ারী মাস থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্ভাস্ত আগমন ক্রমে বেড়ে এখন লক্ষের কোঠায় পৌঁছেছে। এই অতিথিদের মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের মানুষও বেশ কিছু মিশে আছেন বলে প্রতীয়মান। কিন্তু কোন দৃষ্টে তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে এই সমাগমে যোগ দিয়েছেন, সেই বিষয় বাচাই

হাসের পাতায় এটিকে একটি বহুল অবলম্বিত সুপ্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কৌশল বলা চলে। সেই কারণে প্যারেটোর মতেই রাষ্ট্রিক নীতিও নিবন্ধ হওয়া উচিত এই জাতীয় ভাবপ্রবণতাকে সর্ববিন্যস্ত করার জন্যে নিপুণ পথ নির্ধারণে, তুচ্ছ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষের কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে নয়।*

(* The art of government lies in finding ways to take advantage of such sentiments, not wasting one's energy in futile efforts to destroy them.—Mind & Society, Vol. III, P.—1281.).

কিন্তু বর্তমানে প্রতিনিয়ত লক্ষ্য হয়, মানুষের এই ভাবপ্রবণতা বিনষ্ট হতে দেওয়ারই ব্যবস্থা চলে, দল-উপদলের দ্বারা, তাঁদের বিক্ষিপ্ত চেষ্টার মাধ্যমে। ভাবপ্রণোদিত ব্যক্তির স্বভাবতই চান, জন-কল্যাণে একটা কিছু করার জন্যে চেষ্টা করতে। কিন্তু এই স্বভাবসুলভ পরিণত আকাঙ্ক্ষা ক্ষমতার মোহে বিঘ্নিত হলেই বহু অনর্থের সূত্রপাত ঘটে, এটাও স্বাভাবিক। তখন চেষ্টা চলে দল গঠনের, অতঃপর মিছিল-মিটিং-স্ট্রাইক ইত্যাদির মাধ্যমে দাবি আদায়ের। অপর পক্ষের দ্বারা সেই সকল বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত সংঘটিত হয় 'লক-আউট' ইত্যাদি

করে তাঁদের আপাতত সতর্ক দৃষ্টির আওতায় রাখার ব্যবস্থা হলে হয়তো দেশের পক্ষে মঙ্গলই হতো; কিন্তু সেই-রূপ কোন ব্যবস্থা হয়েছে বলে জানা যায় না।

ব্যাপার। (খ) তাই আমাদের বিশ্বাস এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন আন্দোলন বোধ হয় এই দেশের বর্তমান অবস্থায় সুফলপ্রসূ হবে না। সাধারণের সহানু-ভূতি থেকেও এই আন্দোলনকারীরা ক্রমে বঞ্চিত হয়ে পড়েন বলে মনে হয়। (গ) প্রসঙ্গত মনে পড়ে স্বামীজীর সতর্কবাণী —“শ্রমী-সংগ্রাম যাতে না ব্যর্থ সেই বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।” (*সাপ্তাহিক বসুমতী—১৬-৪-৭০, পৃঃ ২৬৬৬ দ্রষ্টব্য)। এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার

(খ) প্রকাশ—বর্তমানে বেকার সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা ইত্যাদির মধ্যে যখন গরীব মধ্যবিত্তের কেউ কেউ সংসামান্য অর্থ সংগ্রহ করে নিজের প্রচেষ্টায় কুঁটিলিঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমে পক্ষীর গরীব বেকার যুবকদের সাহায্যে কাজ চালিয়ে, উভয়পক্ষেই অল্প-বিস্তর অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থা করার নিমন্ত্রণ হন, ঠিক সেই সময় কোন অদৃশ্য ইঞ্জিতে দশ/বিশ জনা ঠিকা কর্মীর দ্বারা ইউনিয়ন গঠিত হয়ে, আরো দাবি আদায়ের আওয়াজ উঠে, শেষ পর্যন্ত সেই সকল শিল্প ধ্বংসের পথে চলে, আর বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন সেই অদৃশ্য কল্যাণপ্রবণতার কথা ভেবে সবই গুলিয়ে যায়। মনে হয় এইভাবে সমাধান সম্ভবপর হতে।

(গ) দলান্তস্বরূপ, বর্তমানে একাধিক লক-আউট ইত্যাদির ফলে, সংশ্লিষ্ট বেকার গোষ্ঠী, সর্বশেষ যখন সাহায্যের কোঁটা হাতে নিয়ে স্টেশন ট্রেন, ট্রাম ইত্যাদিতে সাধারণের সামনে হাজির হন, তখন এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্রুত-দশ বছর আগের তুলনায় বর্তমানে তাঁরা আর সাধারণের সহানুভূতি তেমন পান বলে মনে হয় না।

পাদ্যাহিক বস্তুমতী

মান এখানে অল্প। তবে ভবিষ্যতের যুগের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে এদেশের সংগঠন গড়ে তোলার নীতি ও কৌশল কোন বাঁকের হওয়া উচিত, সকল দিকে বজর রেখে তা উপযুক্তভাবে নির্ধারণ করার এখনও সম্ভবত সময় আছে। মহা-মানব কাল মার্জের প্রযোজনীয় মতবাদ থেকে এই সম্পর্কে দু'একটি মূল সূত্রের উল্লেখ করা গেল।

(১) একটি ঐতিহাসিক যুগে যে নীতি অবধারণত হয়েছিল, অপর ঐতিহাসিক যুগে সেই নীতি উপযুক্ত নাও হতে পারে।*

(* What is a law in one historical period need not be a law in another historical period).

(২) ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের একটি সহজাত ধারা আছে।*

(* There is an inherent law of progress in historical development).

(৩) স্বতঃ পরিচালিত ক্রমবিকাশের মধ্যে শ্রেণীচেতনা একটি মূলবিশেষ।*

(* Class consciousness is one of the instruments by which the development propels itself)—ইত্যাদি।

এই সকল পটভূমিকা পর্বেক্ষণ করেই সম্ভবত, মহামানব ভ্যাডিমির ইলিচ উইলিয়ামভের দ্বারা যখন প্রথম মার্ক্সবাদ পরীক্ষিত হয়েছিল 'লেনিন' ছদ্মনামের মাধ্যমে, তিনি বলেছিলেন—“আসল প্রয়োজন, সকলকার কাজ করা চাই সমান-ভাবে, প্রত্যেকের স্বকীয় স্বত্ব সম্পাদন করা উচিত নিষ্ঠার সঙ্গে, আর তাদের প্রতিদান তথা বেতনের হার হওয়া চাই সমহারে।” (ঘ)*

(* “All that is required”, he writes, “is that they should work equally, should regularly do their share of work & should receive equal pay.” শেষ পর্বন্ত দেখা যায়—

“He abandoned Marxism in practice although not in theory.”

(ঘ) কিন্তু প্রকাশ—আমাদের দেশে, বিশেষ করে এক শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীর মধ্যে প্রায় সকল স্তরেই প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ হলেও, কর্ম-নিষ্ঠা ইত্যাদির অভাব হয়ে পড়েছে, যদিও লেনিন প্রকৃতির নাম তাঁদের কাছেও যথেষ্ট শোনা যায়। আমাদের ধারণা, নিয়মানুবর্তিতা বোধ ও কর্মনিষ্ঠার

অর্থাৎ মার্জের মতবাদ তিনি তাঁর নিজের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনমত পরিমার্জিত করে নিয়েছিলেন, নিজের দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় উপযুক্ত কর্ম-পদ্ধতির মাধ্যমে।* (*স্টেট এ্যান্ড রিভলিউশন, এল এল এল, ভল্যুমে—১৪, পৃঃ ৭৭—৭৯)। পরবর্তী অপরাপর সমাজতান্ত্রিক দেশনায়কেরাও, যারা এভাবে উক্ত পথে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছেন, তারা সকলেই ঐ একই পথের পথিক হয়েছিলেন বলে মনে হয়। (ঙ)

অভাব হলে মানুষের পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছান বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। আর তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হন উভয়পক্ষই।

অনুরূপভাবেই দলগত কর্মীদের মধ্যেও দেখা যায়, নিজেরা ছোট ছোট প্রম-শিল্পের মালিক হয়েও, নিজস্ব শ্রমিকদের তাঁরা উপযুক্ত শিক্ষাদানে বিরত থাকেন। সেখানেও দেখা যায়, শ্রমিকের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ শ্রমিক ও মালিক হিসেবে। ফলে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ইত্যাদি আবার পর্ষদস্ত বলে প্রতিভাত হয়। প্রকারণতঃ মালিক-কর্মীর পক্ষে সেই আদর্শ নিষ্ঠার প্রশ্ন।

(ঙ) “In Pekin there was a current story, said to come from Communist sources, that after the war in Europe was over, Stalin sent Mao Tse-tung a Russian book on partisan warfare, the fruit of Russian experience during German invasion. Mao read it and showed it to Lin Piao, his best military commandar and the greatest expert on guerrilla warfare in China. Lin remarked : ‘If we had had this as our text book we should have been annihilated ten years ago’.”

—অর্থাৎ কমিউনিস্ট উৎস হতে প্রচারিত পেকিং-এ একটি গল্প শোনা যায় যে, ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হলে, জার্মানি কর্তৃক রুশ আক্রমণের সময় তাঁদের যুদ্ধের কলা-কৌশলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধীয় একটি পুস্তক স্ট্যালিন, মাওসে-তুংকে পাঠিয়ে দেন। মাও সেই বইখানি চীনের গেরিলা-যুদ্ধে পারদর্শী এবং শ্রেষ্ঠ মিলিটারি কমান্ডার লিন পিয়াওকে দেখতে দেন। লিন বইটি সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন এই বলে যে, ঐ বইটি যদি পূর্বে তাঁর হস্তগত হত, তা হলে তাঁরা হয়তো নিমূল হয়ে যেতেন।* (* দি বার্ল অফ কমিউনিস্ট চায়না, বাই সি পি ফিটস-জেরাল্ড, পৃঃ ১০০)। এই সমস্ত হতে

উনিশ শতকের শেষের দিক। মার্ক্স-জমকে তখন রুশে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছিল মাত্র। এই সময় লিখিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি তারিখবিহীন পত্রের সারমর্ম এখানে উদ্ধৃত করা গেল।

“প্রিয়—

মনুষ্য সমাজ চারটি সামাজিক শ্রেণীর দ্বারা পৃথকভাবে শাসিত হয়ে আসছে। যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শ্রমিক শ্রেণী। প্রত্যেক শাসন পদ্ধতিতেই একদিকে যেমন আছে গোরবের বস্তু, তপরিদিকে আছে তার দুটি-বিচ্যুতি প্রকট হয়ে। ব্রাহ্মণের শাসনকালে জ্ঞানদানের অধিকার ছিল সীমাবদ্ধ। এটা দুটি-বিচ্যুতির পর্যায়-ভুক্ত, অন্যায়। তবে গোরবের দিকে ছিল, একটি শ্রেণীর বিশেষভাবে মানসিক উৎকর্ষসাধনের সুযোগ, যার ফলে হয়েছিল বিজ্ঞানের সুপ্রতিষ্ঠা। (চ)

অতঃপর ক্ষত্রিয় শাসন বা মিলিটারি রুল। এখানে পাওয়া যায় ক্ষমতার নিষ্ঠুর প্রয়োগ। কিন্তু এই চাতুর্য শাসনের সময় শিল্প ও সামাজিক সংস্কৃতির উৎকর্ষসাধন পৌঁছোয় উন্নতির চরম শিখরে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস তার যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে আছে।

তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বৈশ্যের শাসন বা ব্যবসা-বিষয়-বৃদ্ধি প্রণোদিত শাসন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে নিঃশব্দে রক্ত-শোষণের ব্যবস্থা অতি ওয়ানক। তবে সুবিধা হচ্ছে দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের

প্রতিপক্ষ হয় যে, এক দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কলা-কৌশল অপর দেশের পক্ষে একই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত নাও হতে পারে।

(চ) প্রসঙ্গত ঋষি কণাদের নাম উল্লেখ করা গেল। আজ যে আণবিক-শক্তি নিয়ে দেশ-বিদেশে গবেষণা চলছে, আমাদের দেশে প্রকৃত ব্রাহ্মণ শাসনের সময় ঋষি কণাদ সম্ভবত ছিলেন ঐ বিষয়ে প্রথম প্রস্তাবক। এই সম্পর্কে তাঁর দু'একটি সূত্রের উল্লেখ করি।

নিত্যম্ পরিমণ্ডলম্ ॥ ২০।১৭ ॥—
অর্থাৎ পরিমণ্ডল তথা দেহাঙ্গকার যন্তু মাত্রই নিত্য, তথা অবিনাশী। মনে পড়ে পাশ্চাত্যের অণু-শাস্ত্রের কথাঃ জিরো—ইনার্ফিনিটম্।

সদ্কারণবান্ধবম্ ॥ ১।১।৪ ॥—

সৎ-কারণের মতই নিত্য, যার কোন অবস্থাতেই বিনাশ হয় না।

অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ

॥ ৪।১।৪ ॥

বৈচিত্র্য আণবিক পদার্থের অভিন্ন প্রতিভিন্ন হতে আণবিক-শক্তি পরিবর্তনশীল বলে ধরা যাবে না কেন। ইত্যাদি।

হিংসায় নয়, প্রেমে

আজ কি ঘটছে?

বাংলাদেশ আজ আঁতাক সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। এ সংকট দেশজোড়া সংকটের একটি গংশী
মানব-আত্মার সংকট, বাস্তবিকই, বিশ্বজোড়া সংকট।

প্রশ্ন হচ্ছে : হিংসা দিয়ে কি এ কাজ করা সম্ভব ?

বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও, যদি কিছু অধৈর্য লোক, বাড়ীঘর ও অফিস-আদালত বোমা মেরে উড়িয়ে
দেয়, শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে যদি হিংসা কেন্দ্রে পরিণত করে, এবং আমাদের যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির স্মৃতি-
স্তম্ভ বিকৃত করে, তাহলে কি একটি সমাজগঠন সম্ভব?

মনে হয়, কিছু তরুণের মনে প্রেমের তুলনায় হিংসায় অনেক দাঁড়ি আবির্ভাব ঘটে।

আমরা এমন একটি গণতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চাই, : প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান স্থান
থাকবে, দেখানে কাজ ও সমৃদ্ধির পূর্ণ সুযোগ থাকবে, এবং বে-আন আমাদের সচেতন প্রেরণা সৃজনশীল
ও যৌথ প্রয়াসের প্রতি উদ্দীপ্ত।

নিরাপত্তাহীনতা ও হিংসার আবহাওয়ার মধ্যে এই সমস্ত মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। বাংলা-
দেশ ও ভারতবর্ষ যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেছিল, সে বিপ্লব ছিল চিন্তার বিপ্লব, উৎকর্ষ, দক্ষতা ও কর্মকুশলতার
বিপ্লব।

অনুকরণের ভেতর দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করা যায় না। আমাদের নিজস্ব সৃজন ক্ষমতা দিয়েই আমাদের
দেশের পরিবর্তন আনতে হবে। হিংসা বা বিশৃংখলার ভেতর দিয়ে নয়, কেবল শৃংখলা, শৃভবুদ্ধি এবং
শান্তির ভেতর দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে।

সব সময়ই আমাদের গনে রাখতে হবে যে জনগণ সমস্ত দলের উর্ধ্ব। মাঠে, কারখানায় এবং অফিসে
খেটে খাওয়া মানুষ, সন্দর্ভী তরুণী, দীপ্তচক্ষু শিশু, প্রাণোচ্ছল তরুণ, সদাসতর্ক বুদ্ধিজীবী, এবং সমস্ত
আন্দোলনের মেরুদণ্ড গণ্যবিস্ত শ্রেণী—এঁরাই সকলে বাংলাদেশের জনগণ।

নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করতে গিয়ে আমরা যেন তাঁদের স্বার্থকে বিপদগ্রস্ত না করি।

আমার মনে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা সঞ্চিত রয়েছে। তাঁদের কর্মক্ষমতা এবং তাঁদের
শক্তি ও সৃজনপ্রতিভার ওপর আমার আস্থা আছে। বর্তমান সংকটের মোকাবিলা করার জন্য তাঁদের এই সমস্ত
গুণের ওপরই নির্ভর করতে হবে। তাঁরা যেন ফাঁকা শ্লোগান সর্বস্ব না হন, যে সমস্ত গুণের ফলে
বাংলাদেশ মহান ও আমাদের জাতীয়তাবাদের উৎসে পরিণত হয়েছে সেগুলিকে যে মর্দুটিমেয় ব্যক্তি ধ্বংস করতে
চায়, তারা যেন তাঁদের বিপক্ষে পরিচালিত করতে না পারে। তাঁরা যেন ভীতিপ্রদর্শন বা বলপ্রয়োগের সম্মুখে
নতিস্বীকার না করেন বরং সাহসের সংগে এগুলিকে প্রতিরোধ করেন। পথ বিপদসংকুল। কিন্তু আমরা
যদি একবন্দ্য হই, এবং যদি বাংলাদেশের অমর ঐতিহ্যের দ্বারা পরিচালিত হই, তবে সফল আমরা হবই।

ইন্দিরা গান্ধী
প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১৭ই জুলাই, ১৯৭০
বাংলাদেশের জনগণের উদ্দেশ্যে তাঁর
বেতার ভাষণ থেকে : আকাশবাণী
কলকাতা।

একথা হয় শুদ্ধপ্রসারী। ফলে স্থাপিত হয় অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বিন্যাস। কিন্তু ক্রান্ত ও সংস্কৃতি চলে ফরের পথে।

স্বদেশ প্রেমিক বা শূদ্রের শাসন। এর ক্ষুদ্র হচ্ছে শারীরিক সুখভোগ ব্যবস্থার অমাবৃত্ত। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য শাসনের অর্থ ফল হচ্ছে ক্রান্ত ও সংস্কৃতির অযোগ্যতা বা নৈতিক অবনতি। এই স্বাতন্ত্র্য শাসনের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার প্রসার হয় বিশেষভাবে, কিন্তু অসাধারণ প্রভাব উল্লেখ্য ক্রমেই কমতে থাকে।

সেই কারণে ব্রাহ্মণ শাসনের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় শাসনের তথ্য মিলিটারি রুলের কাছ থেকে সংস্কৃতি, বৈশ্যের শাসন হতে বণ্টনকারী চেতনা এবং শ্রমিক তথা শূদ্র শাসন পদ্ধতির মূল দিকগুলি বাদে, তার মানদণ্ডকে সমদর্শনের আদর্শ গ্রহণ করে যদি কোন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করা যায়, তা' হলে সেটি হতে পারে সত্যিই এক আদর্শ শাসন পদ্ধতি। কিন্তু, তা' কি সম্ভব?

তবে প্রশ্নোত্তর তিনটি শাসন পদ্ধতির দিন ঘনিষ্ঠে এসেছে। শেষোক্ত পদ্ধতিটি এবার সূর্য হব। কেউই তাকে প্রতিহত করতে পারবে না। সোনা-রূপার নীতি-বাদের মধ্যে কোথায় কি অসুবিধা আছে আমার জানা নেই, অপরেও এই বিষয়ে সঠিক কিছু অনুধাবন করেন বলে আমার মনে হয় না, তবে এইমাত্র আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সোনার আদর্শ দূরত্বকে আরো দূরিত করে তুলছে এবং ধর্মী প্রচলন কেবলই বাড়িয়ে যাচ্ছে। (ছ) তবে রূপার নির্ধারিত বিধি, এই অসমান পন্থে দারিদ্র্যকে একটা অপেক্ষাকৃত ভাল সুযোগ দিতে পারে। একটি গোষ্ঠীর সর্বদাই যন্ত্রণাভোগ আর অপর গোষ্ঠীর নিয়ত সুখভোগ করে যাওয়া অপেক্ষা সুখ-দুঃখের পুনর্বন্টন অপেক্ষাকৃত ভাল মনে হয়।* (* স্বামী বিবেকানন্দের ওয়াক'স,

(ছ) -মনে পড়ে আমাদের দেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা, আর তার ক্রম-পরিণতি। সেই সঙ্গে উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির মত—“...আমরা এমন একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছি যেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রা পদ্ধতির মধ্যে বিরাট বৈষম্য... অনেকের অতি দরিদ্র ও অচ্ছ অল্প কয়েকজন লোক অতিরিক্ত ধনী...।” এই মতামত তাঁর বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে হলেও, আমাদের দেশের পক্ষে অধিক প্রযোজ্য বলে মনে হয়। (জেনেভা, ১০ই জুন, '৭০—আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থার বার্ষিক সম্মেলন)।*—(আনন্দ-বাজার পত্রিকা, ১১/৪/৭০)

ভল্লম ছয়, মায়াবতী এডিসন, পৃঃ ৩৪২—৩৪৪)।

এই বিষয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আভ্যন্তরীণ (জ) সারাংশের কিছু উদ্ধৃত করা গেল। অন্তর্ধানের পরে জাপানে অবস্থানের সময় তিনি রুশে যাবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে পড়েছিলেন। জাপানীদের তখনকার প্রতিরোধ শক্তির বিষয় তাদের আন্তরিক স্পন্দন অনুধাবন করে, জুন মাসে রাষ্ট্রীয়র মধ্যে নিরাপদে গাছিত একটি সরকার (ভারতীয়) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তারা যদি সেই প্রভাবে সম্মত হতেন, তিনি ভেঙেছিলেন, জাপানীদের প্রতিরোধ শক্তির সীমা অনুধাবনী নিজের কার্যকলাপ চালিয়ে যাবেন এবং পরে অধিক কিছু সম্ভব না হলে রুশ রাজ্যে সরে যেতে পারবেন। জাপানীরা এই প্রস্তাবে আবার অসম্মত হন। ইতিমধ্যে ১৯৪৫ সালের ২১শে মে ব্যাংককে বক্তৃতা করার সময় তিনি মস্কোর উদ্দেশ্যে আবার একটি গুপ্ত অনুরোধের ইঙ্গিত করেন। কিন্তু সেটিও বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় নি।

অপরদিকে ভারত স্বাধীন হলে সেখানকার শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—আমেরিকা আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পার থেকে ইউরোপের ওপর কঠোর চালাতে কিছুতেই পারবে না। ব্রিটেন বা আমেরিকা সমাজের পুনর্গঠন সম্বন্ধীয় এমন কোন প্ল্যান তথা পার-কল্পনাও রচনা করতে সক্ষম হবে না, যে পরিকল্পনা ইউরোপের সকল জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারবে। কাজেই শেষ পর্যন্ত কমিউনিজম্ তথা সাম্যবাদের জয় নিঃসন্দেহ।* (* স্প্রিং টাইগার, হিউ টয়, পৃঃ ১৫৪—১৫৬ দ্রষ্টব্য)।

আবার অন্তর্ধানের সময় কাবুলে অবস্থানকালে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তরে নেতাজীর অভিমত—দেশের মধ্যে তাত্ত্বিক শক্তি তথা বৃটিশেরা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ অন্তর্ধানের শেষ থাকবে না। (খ)

(জ) নেতাজীর জীবন যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের বাস্তব অভিব্যক্তি—এই মত সম্পূর্ণ অনুধাবন করা যেতে পারে উক্ত দৃষ্টি জীবনকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করলে। এই বিষয়ে নেতাজীর স্মরণীয় উক্তি অন্যর উদ্ধৃত করা হয়েছে।

(ঝ) কিন্তু আজ ভাবতেও লজ্জা হয় যে, স্বাধীনতা অর্জনের বিশ বছর পরেও ঐ বিকল্প ভেদ নীতির এখনও সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা চলে দলগত স্বার্থে, ভোটের লোভে।* (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯-৪-১৯৭০, সম্পাদকীয় আলোচনা এই সম্পর্কে—প্রাধান্যযোগ্য)। অপরদিকে প্রকাশ,

অতঃপর দেশ স্বাধীন হলে অন্তত বিশ বছরের জন্যে লৌহপদাশ একনায়কত্বের শাসনের মাধ্যমে সেই সমস্ত ব্যাপার অদৃশ্য হবে। ভারতের মঙ্গলের জন্যেই এইরূপ একনায়কত্বের প্রয়োজন হবে।* (* পূর্বোক্ত পুস্তক—পৃঃ ৬০)।

বর্তমানে আমাদের দেশে রাজনৈতিক তন্ত্রাংসবের মধ্যে স্বামীজী ও নেতাজীর ঐ সকল মত ও পথ কতখানি প্রাধান্য-যোগ্য সেই বিষয়ে আলোচনার স্থান এখানে অল্প। তবে স্বামীজীর ইংগিত—“আমাদের চাই অসীম কর্মশক্তি, অসুরন্ত আগ্রহ, সাহস ও ধৈর্য, তবেই মহৎ কাজ সম্ভব হবে।” (* স্বামী বিবেকানন্দের ওয়াক'স, ভল্লম ছয়, মায়াবতী এডিসন, পৃঃ ৩৪৬) এই নির্দেশগুলি নেতাজীর পরে আর কোন দলীয় নেতার দ্বারা নিষ্ঠার সঙ্গে অবলম্বন করা হচ্ছে বলে মনে হয় না। আজ দেশের চতুর্দিকে তাকালে কেবলই মনে হয়, এই সকল ইংগিত ও নির্দেশ আমাদের বর্তমান দেশ-সেবকরা হয় ভুলে গেছেন, আর না হয় যে কোন কারণেই হোক এড়িয়ে চলেতে চেষ্টা করেন। ফলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্মীর অভাব হয়ে পড়ে। কোথাও কেউ বা শেষ পর্যন্ত আত্মত্যাগ করতেও কৃত-সংকল্প হন। (ঞ) অপরদিকে যে দারিদ্র্য মোচনের জন্যে স্বামীজীর প্রাণ একদিন উত্তোলিত হয়েছিল, সে গণ-শিক্ষা বিস্তারের জন্যে তিনি একদিন ব্যাকুল হয়েছিলেন, সেই সকল কাজে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মিশনগুলিও আজ পর্যন্ত কতখানি অগ্রসর হয়েছেন, সেই বিষয় প্রাধান্য-যোগ্য। নেতাজীর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনার স্থান অল্প। তবে আমাদের ধারণা, স্বামীজীর কর্মময় স্বপ্ন জীবনের মধ্যেও, তাঁর বিভিন্ন পত্রাবলী ও নির্দেশগুলি পরবর্তীকালে নেতাজীর বিভিন্ন নির্দেশের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করে পর্যায়ক্রমে যদি সাজান যায়, তা' হলে ভাবতবর্ষের জন্যেও

বৃটিশ প্রমুখ পাশ্চাত্যের কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল জাতি এখনও ছলে ও কৌশলে ভারতীয় রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাবার সুযোগ পায়, যে কাজ নেতাজীর উপস্থিতিতে কিছুতেই সম্ভব হোত বলে মনে হয় না।

(ঞ) দৃষ্টান্তস্বরূপ ডোমিনিয়ন রবার কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রীসমরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী ও তদীয় পত্নী অগ্নিমা চ্যাটার্জীর সাম্প্রতিক জীবন অবসানের কাহিনী উল্লেখযোগ্য।* (*আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬-৪-৭০, পৃঃ ৪)।

দাপ্তরিক বঙ্গবন্ধু

এখনও একটি উপযুক্ত 'ইজম' স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। আর সেই ইজমটি হবে ভারতের নিজস্ব বস্তু, যার সঙ্গে অপরাপর দেশের মহামানবদের স্বাধীনতার নিজ নিজ দেশের জন্যে নির্ধারিত কার্যক্রমের মূল তথ্যের বিশেষ পার্থক্য নিশ্চয়ই থাকবে না। (৫) মনে রাখতে হবে রাজনৈতিক দল গঠন এবং তারই মাধ্যমে দলীয় শক্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস, দরিদ্র ও নির্যাতিত গণ-সমাজের বিশেষ সাহায্য আসে না। এই বিষয়ে কে, আর, পপারের আলোচনা উদ্বোধনযোগ্য।

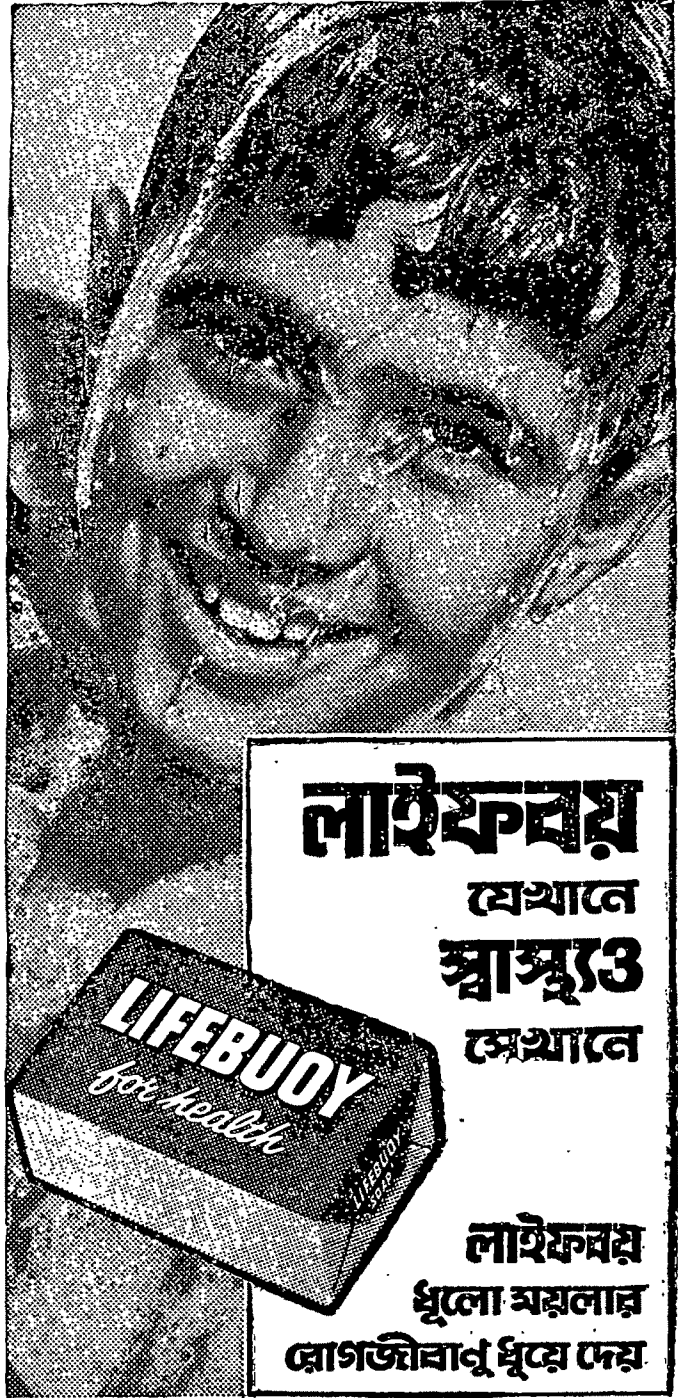
"...political developments are either superficial, unconditioned by the deeper reality of the social system...and can never be of real help to the suppressed & exploited."

অর্থাৎ রাজনৈতিক ক্রমবিকাশ হয় ভাষাভাষা, অগভীর ব্যাপার, সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে নিবন্ধ গড় বাস্তবতার দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত.....কাজেই শোষিত ও নির্যাতিতের কোন সাহায্যই তা আসতে পারে না।* (সিডি ওপেন সোসাইটি গ্র্যান্ড

(৫) লেনিন কিভাবে মার্ক্সিজম গ্রহণ করেছিলেন, সেই আভাষ অন্যত্র পাওয়া গেছে। অনুরূপভাবে চীন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯২১ সালে। তার প্রথম নেতা চেন তু সিউ। তিনি ছিলেন পেরিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং একজন জানী ও গদ্যী ব্যক্তি। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে মাওসে-তুং ছিলেন একজন। মাও তখন চেন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে অধিষ্ঠিত। আর প্যারিস গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন চৌ-এন্-লাই। এখানেও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যা লক্ষ্য হয় সেটি হচ্ছে মূল প্রতিষ্ঠাতা এবং পরে নেতাদের কেউই রুশের কমিউনিজম নিছক গলাধঃকরণ করেন নি। প্রয়োজনবোধে নিজেদের কর্মসূচী সাজিয়ে নিয়েছিলেন।

ইটস্ এনিমিজ, পৃঃ ১১৯)। এর একমাত্র সমাধান নির্ধারণের মত অফুরন্ত জ্ঞানদান। রক্তকরবীতে কবিগুরু-বর্ণিত নন্দিনীর সঙ্গে কয়েটি রক্তের আবি-

র্ভাব। ভোটলাভের জন্যে প্রচার, একাধিকবার নির্বাচনের ব্যবস্থা—ইত্যাদি গরীবের দৃষ্টি বাড়িয়েই চলে, সুফল বিশেষ ফলে বলে মনে হয় না।



লাইফবুয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও
সেখানে

লাইফবুয়
ধুলো ময়লার
রোগজীবাণু ধুয়ে দেয়

বিশ্বস্থান নিভারের একটি উৎকৃষ্ট উপাদান

সিটিস - ১.৬০-৪০ ৪০



(১৪)

১৯৪১ সনের মাঝামাঝি, ঘনিয়নে এলো শান্তিনিকেতনের চরম দুঃখের দিন। গুরুদেব হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কলকাতা তথা ভারতের প্রেক্ষিত চিকিৎসক দল এলেন শান্তিনিকেতনে, স্যার নীলরতন সরকারও এলেন। পরীক্ষার পর স্থির হলো ঠেকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে অবিলম্বে অপারেশন করা দরকার। যাবার আগের দিন সন্ধ্যার পর বনমালী এসে জানালো গুরুদেব ডেকে পাঠিয়েছেন: তখনই ছুটে গেলাম উত্তরায়ণে। গিয়ে

দেখি বারান্দায় বসে আছেন স্যার নীল-রতন গম্ভীর মুখে, বনমালী আমাকে ঠুর কাছে নিয়ে গিয়ে বললো, 'বাবুদশাই এনাকেই ডেকে পাঠিয়েছেন।' স্যার নীলরতন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন, বললেন "কবি খুব অসুস্থ, তাই বাইরের কারও সঙ্গে দেখা করা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি, আপনার কি ঠুর সঙ্গে কোনো বিশেষ প্রয়োজন আছে?" বললাম, "আমার কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজন নেই। দেখা করলে ঠুর অবস্থার যখন অবনতি ঘটবে আশংকা, তখন আমি না হয় ফিরে যাই, তবে গুরুদেবকে বলবেন আমি এসেছিলাম ঠুর ডাক শুনে, দেখা

করার অনুমতি পাই নি বলে ফিরে গিয়েছি।" স্যার নীলরতন বললেন, "দাঁড়ান, এইটাই তো সমস্যা, জেন ধরেছেন আপনাকে কিছু গুরুদেবী কথা বলতে হবে, দেখা করতে না দিলে নাকি অনর্থ ঘটবেন। তার চেয়ে বরং চলে যান ঠুর ঘরে, কিন্তু দু-চার মিনিটের বেশি থাকবেন না, যা বলার ঠেকেই বলতে দিন আপনি কিছু বলবেন না।" ঘরে ঢুকে দেখি ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন, চোখ দুটি বন্ধ, প্রণাম করতেই চোখ খুললেন, বললেন, "এই যে এসেছো, বসো, ডাক্তাররা দেখা দিচ্ছে তোমার উপর সদয়। দেখ, কাল কলকাতা যাচ্ছি, যাবার আগে বলে যাই—শান্তিনিকেতন ছেড়ে যেও না, এখানে তোমার প্রয়োজন আছে, বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তবে যেদিন দেখবে এখানে তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, শিক্ষার চেয়ে শাসনব্যবস্থা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, সেদিন তুমি চলে যেও, কিন্তু মনে কোনো গ্লানি নিয়ে যেও না। মানবতার দাবীকে অগ্রাহ্য করে যে শাসনব্যবস্থা, তা মানুষকে ঠেলে দেয় এক দুঃসহ পিঙ্কল আবর্তে, এক অশুভ নাগপাশের বাঁধনের মধ্যে। আর একটা কথা—তোমাকে ভাবার যে ট্রেনিং দিয়েছি, তার ব্যবহার করো, বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনসাধারণের আয়ত্তগম্য সীমার উপযোগী করে বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করে যেও। যেখানে যে-অবস্থায়ই থাকো এর যেন ব্যতিক্রম না হয়, এই পণ্যকাজে আমার আশীর্বাদ রইল।" এই সমস্ত বাইরে থেকে ঘটার আওয়াজ শোনা গেল, গুরুদেব বললেন, "তোমার চলে যাবার ইঙ্গিত, ঠুরা বোঝেন না যে মনের কথা কিছুটা বলতে পারলে ভার অনেকটা লাঘব হয়, ব্যাধির অনেক উপশম হয়।" মহাপুরুষকে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। তার পরদিন সকালে উঠে চলে গেলেন, সারা আশ্রমের কর্মীবৃন্দ উত্তরায়ণে সমবেত হয়ে ঠেকে প্রণাম জানালেন, আর এই প্রার্থনা জানালাম যে, গুরুদেব যেন রোগ-মুক্ত হয়ে তাঁর এই প্রাণপ্রিয় আশ্রমে সফর ফিরে আসেন।

কয়েকদিন অপরিচীত উদ্বেগ ও গভীর উৎকণ্ঠায় কাটলো সমগ্র দেশবাসীর ও আশ্রমের অধিবাসীর। তারপর নিদারুণ মর্মান্তিক খবর এলো ৭ই আগস্ট, ২২শে প্রাণ এই মহামানবের মহাপ্রাণ ঘটেছে। ভারতের শাস্বত শান্তি ও মন্দির বাণী বহন করে যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক 'রবি' ভারতের ভাগ্যাকাশে প্রদীপ্ত ছিলেন তাঁর তিরোধান ঘটলো। 'সত্যম-শিবম-সুন্দরম'-এর একনিষ্ঠ উপাসক, জনগণ-মনের অধিনায়ক, সাধনা ও বিশ্বমানবতার মূর্ত প্রতীক চিরবিদায় নিলেন। সারা

কবির ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী ॥

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

বসুমতী প্রাঃ লিঃ

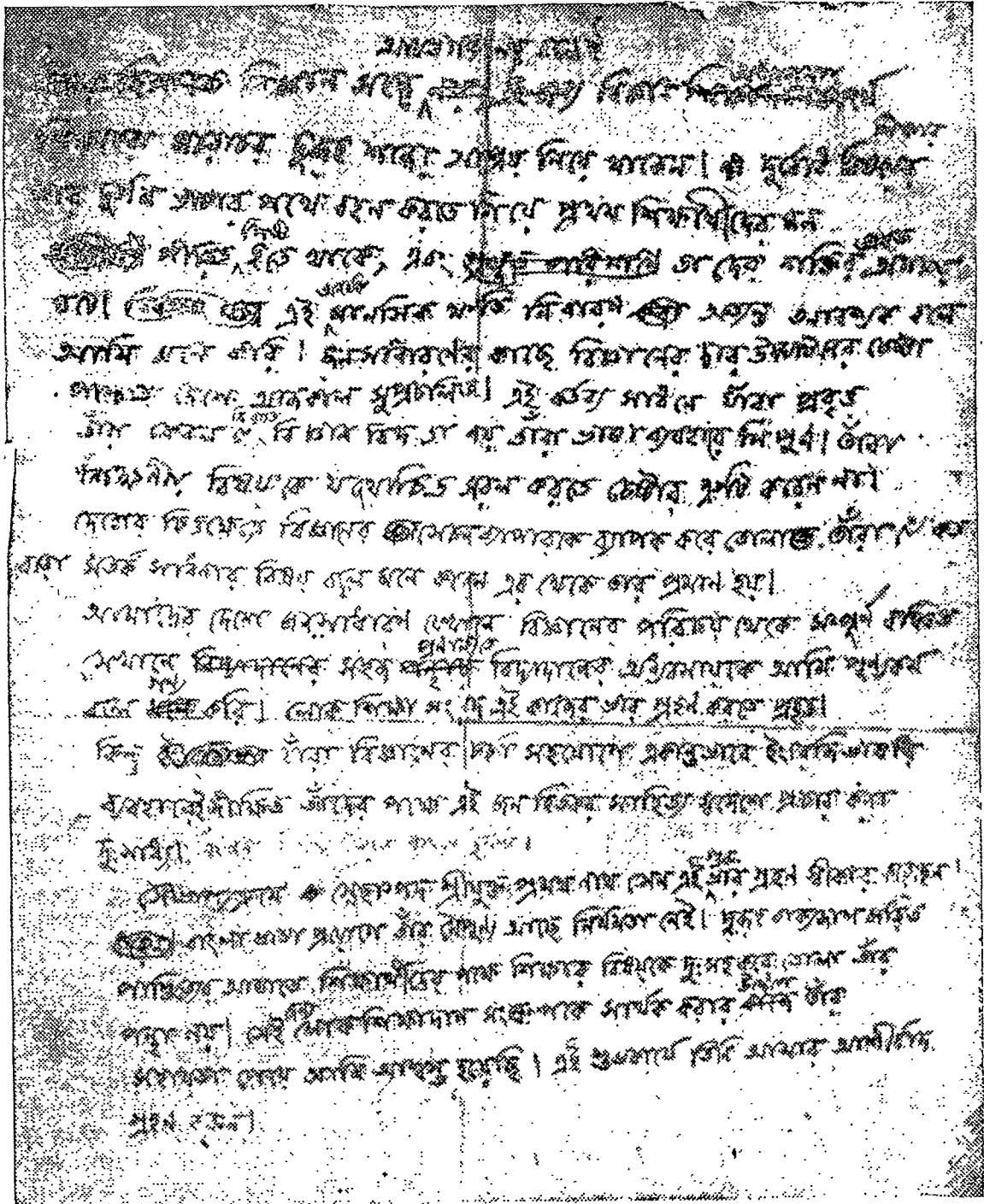
কলিকাতা-১২

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

বিশ্ব সন্মিলিত কণ্ঠে এই মহামানবের
জয়গানে মৃদু হয়ে উঠলো। সেদিন
শান্তিনিকেতনে মন্দিরে উপাসনা হলো
ভূঁর অমর আত্মার মন্দির জন্য, উপাসনার
শেষ হলো সেই গানটি দিয়ে, যা তিনি
রচনা করেছিলেন 'ডাকঘর' নাটকের
অমলের জন্য; এই গান তিনি গাচ্ছত
রেখেছিলেন শৈলজারঞ্জন দত্তমজুমদারের

কাছে এই নির্দেশ দিয়ে যে, গুরু মৃত্যুর
পর যেন মন্দিরে গানটি গাওয়া হয়—
"সমুখে শান্তি পারাবার, ভাসাও
তরণী হে কর্ণধার
তুমি হবে মম সাথী, লও লও হে
ছোড় পাতি
অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি
ধ্রুবতারকার।

মন্দিরাত্মা তোমার দর্য তোমার
কথা
হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার
হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন নষ্ট
বিরাত বিশ্ব বহু মৌলি লস
পায় অন্তরে নিভন্ন পরিচয়
মহা অজানার!!"
[সমাপ্ত]





[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বিনা অনুমতিতে নাইরোবি গিয়ে আমি সরকারী নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলাম। তা ছাড়া আমাদের এও বৃথা হয়েছিল যে, ছাড়া পাবার ছয় মাসের ভেতর আমরা যেন স্থানীয় আফ্রিকান প্রধানকে না জানিয়ে তার এলাকার বাইরে কোথাও না যাই, সে নিয়মেরও লঙ্ঘন করেছিলাম আমি। সরকার তাদের বিভীষণ বাহিনীর সাহায্যে আমার কার্যকলাপের সব কিছুই জানতে পেরেছিলেন এবং আরক্ষাবাহিনীর লোকেরা ইতিমধ্যে আমার খোঁজ করতে আরম্ভ করেছিল। এ সব খবরই আমি আমার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম; কাজেই যে-কোন সময়ই আমি আশা করছিলাম আরক্ষাবাহিনীর আগমনের। যাই হোক, এন-ডি-পি'র নিয়মকানুনের খসড়া তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেলে আমার আর কোন ক্ষোভ থাকতো না আবার ধরা পড়ার জন্য। কারণ এই দল গঠনের কাজে যে স্থানীয় বহু লোকের উৎসাহ ছিল সে বিষয় আমি এতদিনে নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিলাম। একমাত্র এই রাজনৈতিক দলের সহায্যেই আমরা খোলাখুলিভাবে সরকারপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে সক্ষম হতাম এবং আমাদের প্রাপ্য সূখ-সুবিধা-গুলি আদায় করতে পারতাম।

সেদিন মধ্যরাতে আমি 'হাবারি স্যা কেনিয়ার' এক আশু সংস্কারের সংশোধন করছিলাম, এমন সময় সেখানে দুজন ইউরোপীয়ান কর্মচারী উপস্থিত হন এবং আমারই নাম জোঁসিয়া মোয়াদ্দি কি না জিজ্ঞাসা করেন। আমি নিজের পরিচয় স্বীকার করলে পর তারা আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিকটবর্তী নেয়েরীর আরক্ষাদপ্তরে যাবার জন্য বলেন। বাকি রাত আমাকে সেখানকার একটি খুপরী গরে কোনরকম আচ্ছাদনহীন অবস্থায় কাটতে হয়—সই দারুণ শীতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছিল। নেয়েরীর আরক্ষাদপ্তর ছিল অতি প্রভাবশালী

এবং সেখানকার খুপরীগুলি তৈরি করার সময় যে সব হতভাগ্যদের সেখানে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হবে তাদের সুখ-সুবিধার কথা কতৃপক্ষ মোটেই চিন্তা করেন নি। তার পরদিন গথারীতি হাবারি স্যা কেনিয়ার বৈরয়েছিল এবং তাতে আমার লেখা সম্পাদকীয় মন্তব্যে নবপরিচালিত এন-ডি-পি'র বিষয় সব খবরই পাঠকেরা পেরেছিলেন।

আমাকে পরদিন সকালে ওখ্যাইয়া আরক্ষাদপ্তরে হাজির করা হয়, সেখানে ওখ্যাইয়া জেলার নতুন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী হেনলী নামক একজন ইউরোপীয়ান আমাকে প্রশ্নাদি করেন। এই প্রথম তাঁকে দেখি আমি এবং আমাদের দুজনের কেউই অন্যকে ভালবাসতে পারিনি। সে আমাকে জানায় যে, ছাড়া পাবার পর আমি এমন অনেক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছি যে, কতৃপক্ষ শূন্য আশ্চর্যই হন নি, ভীষণ হৃদয়বিহীন হয়েছেন। তাঁদের মতে আমি এমনতর ব্যবহার আরম্ভ করেছি যেন আমিই একজন ভারপ্রাপ্ত জেলা কর্মচারী। কাজেই কতৃপক্ষ স্থির করেছেন যে, আমাকে আবার বন্দী করে রাখা হবে। হায়! কেন তখন ছাড়া পাবার পর মৃত্যু মার কথা রেখে মরগী কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় পাঠাও কাটি নি আমি!) তিনি আরও বলেন যে, যদি আবার আটক করা সম্ভব নাও হয়, তবে নিশ্চিত পক্ষে আমাকে নেয়েরী জেল থেকে সরান হবে। তার মতে এক খাঁচায় দুজন সিংহ থাকতে পারে না এবং সে যখন সরকারী সিংহ তখন আমাকেই সরে যেতে হবে তার স্থান অটুট রাখার জন্য। আমি উত্তরে তাকে বলছিলাম যে, আমাকে যদি আবার আটক করা হয় তা আমার কোন অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য হবে না, শুধু এই জন্যই হবে যে, আমি সত্যের প্রয়াসী এবং হক কথাই বলছি রলে। কিছুকাল ভাবায় একটি প্রচলিত প্রবচন আছে—যাই যা

বুড় মাটিমাট গাগা, অবশ্য যার সেখানে জন পান করা উচিত সে সেখানেই করবে এবং বাদবাকি জায়গা অন্যদের জন্য ছেড়ে দেবে। যাদ আমার ভাগ্যে আরও বন্দী-জীবনের জল পান করা লেখা থাকে, তবে তো যেতেই হবে আমাকে। আমার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই, এমন কি হেনলী চেষ্টা করলেও তা রোধ করতে পারবে না। হেনলী আমার কথাবাতায় মোটেই খুশি হয় নি এবং পরদিন সে জেলাধ্যক্ষ বারটনকে ডেকে পাঠায়। বারটনকে সঙ্গে আমার আগেই দেখা হয়েছিল এবং সে বিষয় পাঠকও অবগত আছেন। সে ছিল সত্যভাষী এবং দয়ালু মনুষ্য, রাজনীতি সে একবারেই বুঝতো না বা বুঝতে চাইতো না। সে আমাকে, সরাসরি জিজ্ঞাসা করে যে, আমি কেন এক নতুন রাজনৈতিক দল সংগঠনের চেষ্টা করছি এবং কেন অনুমতি না নিয়েই নাইরোবি গিয়েছিলাম। উত্তরে আমি তাকে সব কথা পরিষ্কার-ভাবে জানাই এবং বারটন ও হেনলী এ বিষয় নিজেদের ভেতর আলোচনা করতে করতে দপ্তরের দিকে চলে যায়।

আরক্ষাদপ্তরের খুপরী থেকে সরিয়ে সরিয়ে আমাকে ছোটখাট অপ-রাধের জন্য নির্দিষ্ট খুপরী ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে থাকাকালীন বহু সংখ্যক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ও আমাকে উৎসাহ দেয় সংসাহসের সঙ্গে কাজ করে যাবার জন্য। নেয়েরী শহর থেকে ওয়ানজোহি মুনগাউও এসেছিল এবং বেড়ার ফাঁক থেকে আমি তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছিলাম। আমি তাকে আমাদের এন-ডি-পি'র কাগজপত্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নাইরোবিতে সরকারী রেজিস্ট্রিকরণের জন্য পাঠিয়ে দেবার কথাও বলেছিলাম। কিছুকাল মধু আহরণের জন্য একটা কাঠের গুড়ি নিয়ে তার ভেতরটা ফোঁপরা করে তার দু'দিকের মুখেই খড়কুটা দিয়ে দেয়, তারপর পছন্দমত গাছে ঝুলিয়ে বেশ কয়েক মৌচাকের কাছে। মধুর দরকার হলে পর তারা একটা ছোট কাঠের টুকরায় আগুন দিয়ে গুড়ির একটা মুখের কাছে ধরে এবং যতক্ষণ অবধি আগুন জ্বলতে থাকে ততক্ষণ অবধি নির্বিশ্রামে মধু আহরণ করে। আমিও তাই ওয়ানজোহিকে সেদিন কিছুকাল ভাবায় সংকত করে বলেছিলাম : নেডুকানারুটে গিসিন্গা মু ওয়াটু) অর্থাৎ আগুন নিবতে দিও না মধু সংগ্রহের সময়। সে ঠিকই বুঝেছিল যে, আমাদের রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রিকরণের জন্য যথাকর্তব্য তার করা উচিত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য লোকের ভিড় এতো বেড়ে গিয়েছিল

সাপ্তাহিক বসমতী

সে, হেন্সলী ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠেছিল। কাজেই আমাদের পূর্বকোর, নিজস্ব খুপরীতে, ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে কোন দর্শকের প্রবেশাধিকার ছিল না। তারপর ২৭শে ফেব্রুয়ারী আমাকে কানডেনগুদর কার্যশিবিরে চালান করা হয়, এটা হল এম্বু অঙ্গলের এক কুখ্যাত পুনর্বাসন শিবির। আমার সামনে বন্দিজীবন আবার ঘানিয়ে এলো : ছুটি ফ্লুরিয়ে গিয়েছিল আমার।

কানডেনগুদে আমার পরনের জামা-কাপড় ও নিজস্ব জিনিসপত্র সব জমা দিতে হয়েছিল এবং তার বদলে আবার সেই অন্তরীণ জীবনের সাদা হাফ প্যাণ্ট ও সাদা হাফ সাট পেয়েছিলাম পরবার জন্য। আমার থাকবার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল একটি ছোট খুপরী। হায় ভগবান, আর কতদিন চলবে এইভাবে। অবশ্য এখানকার খুপরীগুলো মানিয়ানার মতো ছিল না। এখানে আমরা যথেষ্ট খুপরীর বাইরে বেরদেতে পারতাম এবং হাত-মুখ ধোবারও স্বাধীনতা ছিল আমাদের। কিছুই ভাষায় এক প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়েছে : "মরিমু ওয়া মুকোকা নিগুও উন্নগাগা মুন্ড", অর্থাৎ একই রোগে যখন বিবর্তীয়বার হয় তাতেই মারা পড়ে লোকে। মায় কয়েকদিন আগেও বন্দিজীবনে আমার ভাগ্যে যা যা ঘটেছিল সেই সব মনে করে আমি আমার ভাগ্য সম্বন্ধে আবার একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কানডেনগুদে সে সময় আরও কয়েকজন অন্তরীণ ছিল আমার মতো; তারা আগে আগুদাথ শিবিরে ছিল এবং সেখানে তারা কাজ করতে রা "স্বীকারোক্তি" দিতে অস্বীকার করেছিল। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী এই সব লোকদের সায়েস্তা করবার জন্য "কিবোকো" নামক গন্ডারের চামড়ার তৈরি বেত দিয়ে মারবার হুকুম দিয়েছিলেন, যদিচ এরকম বেত ব্যবহার করা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। ঐ বিষয় নালিশ করার ফলে এক সরকারী সমিতি গঠন করা হয়েছিল। খোঁজ-খবর জন্ম, কিন্তু সমিতি নাকি সরঞ্জামিনে কোন প্রমাণ পান নি। সেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি তার কিছুদিন পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল হল! কানডেনগুদে সে সময় আমার কয়েকজন বন্ধু অন্তরীণ জীবনযাপন করছিল, এর ভেতর ছিল কি অঙ্গো কিবুরু, মারুনগো নগুগি, ওয়াহোসে কি হারা এবং কে নগুদু। নগুদুরুকে আমরা "কাপালা" বলেও ডাকতাম, কারণ শ্রী এ. আর. কাপালা নামে একজন কনিয়ার বিখ্যাত আইনজ্ঞ ছোয়ো

কোনগুটার কাপেনগুদার বিচারে তাঁর পক্ষে আইনজীবী শ্রী প্রটের সঙ্গে কাজ করছিলেন। আর নগুদুও প্রায়ই বন্দিশিবিরে আমাদের গঠিত বিচারালয়ে অভিব্যক্তি বর্ণিত পক্ষে আইনজ্ঞের কাজ করতেন। কানডেনগুদে আমাদের আরও কাজ ছিল প্রত্যেক অন্তরীণের কাজ থেকে তাদের বিভিন্ন বন্দিশিবিরে থাকাকালীন সেখানকার অভিজ্ঞতা শোনা। এইভাবে আমি "লাংগাটার লড়াইর" বিষয় জানতে পারি, যখন সেখানকার অন্তরীণরা আরক্ষ-বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। লড়াইয়ে অন্তরীণরা ব্যবহার করেছিল পথর, আর আরক্ষ-বাহিনী তার উত্তর দিয়েছিল গেনেঙ্ক দিয়ে। তাতেও অন্তরীণদের বাণে আনতে না পেরে আরক্ষবাহিনী ব্যবহার করে কাঁদুনে গ্যাস ও ফায়ার রিগেডের ঠান্ডা জলের জেট এবং এদের সাহায্যে সোদিন তারা জয়ী হয় শেষ অবধি।

এ ছাড়া এম্বাকাসির ঘটনার কথাও আমি সেখানে জেনেছিলাম। যখন সরকারপক্ষ আমাদের কারুর বিরুদ্ধে যথেষ্ট "প্রমাণ" জোগাড় করতে পারতেন না, তখন আমাদের ধরে রেখে দিতেন শব্দ "অন্তরীণ" হিসাবে। অবশ্য পারতপক্ষে তখনকার সব জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই ছিলেন, আসলে সরকারী কর্মচারী, যাঁদের কাজ ছিল শাসন করা, কাজেই খুব বেশি সাম্রাজ্য-সাবুদের দরকার হত না সরকারের আমাদের কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ "প্রমাণ" করতে। ফলে সংকটের প্রথমেই দিকে বহুসংখ্যক লোককে সরকার জেলে পুরতে পেরেছিলেন। "আসামী" হিসাবে রাজনৈতিক বন্দী বা অন্তরীণ হিসাবে আটক করার বদলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অপরাধ ছিল যে, তারা একঘাঁকরণের "শপথ" নিয়েছে। এই একই অপরাধের ফলে কারুর হত দ' বছর আবার কারুর হত পাঁচ বছরের কারাদণ্ড—তথাকথিত বিচারকের মজির ওপর নির্ভর করে। আমরা যেমন অন্তরীণ হিসাবে বন্দী হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কিভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া যায় তার কল্পনা-জল্পনা করছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের "আসামী" ভাইরাও কনিয়ার কারাগারে বসে কল্পনা-জল্পনা করতেন। এদের জন্য খুব কুখ্যাত এক কারাগার বিশেষভাবে তৈরি হয়েছিল নাইরোবি শহরের প্রায় আট মাইল দূরে এম্বাকাসি নামক জায়গায়, যার পাশেই শহরের অতি হালফ্যাসানের বিমানবন্দর তৈরি হবার কথা ছিল। বন্দীদের এই বিমানবন্দর নির্মাণ করার কাজে লগান

হয়েছিল, কিন্তু আমাদের মতো তারাও এম্বাকাসি মজুর খাটে ইচ্ছুক ছিল না মোটেই। ফলে কঠোরপক্ষ তাদের উপর যথেষ্ট জোরজুলুম করেছিলেন। কিশুনগো এবং মারুনগো আমাকে বলে যে, সেখানকার অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়, বন্দীদের ভেতর অনেকেই বিমানবন্দরে মজুরী খাটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নিজেদের আঙুল কেটে পাকিয়ে বসে থাকতো; অন্যরা নিজেদের মূত্থের ভেতর পিন ফুটিয়ে রক্ত বার করত, যাতে যক্ষ্মারোগী সন্দেহে তাদের হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়। নাইরোবি শহরের এম্বাকাসি বিমানবন্দর আর সুন্দর দেখতে, তার চারিদিকে বক-বকে, তরুজ্বক কিন্তু আমাদের এ কথা তোলা উচিত নয় যে, তার নির্মাণের পেছনে লুকিয়ে আছে অসংখ্য আফ্রিকান যুবক-যুবতীর রক্ত ও কঠিন পরিশ্রম, যা কি না তখনকার বিদেশী সরকার তাদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নিয়েছিলেন। তাদের একমাত্র "অপরাধ" ছিল যে, তারা নিজের দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

বিবর্তীয়বার অন্তরীণ জীবন-যাপন করবার ছয়দিন পর আমি সংবাদপত্রে "হোলা"র ভয়াবহ কাহিনী পড়ি, যাতে এগারজন অন্তরীণ প্রাণ দেয়। সংবাদপত্রটি আমরা মেয়াই নামক একজন কিকুয়ু গ্রহরীর মারফৎ যোগাড় করি, সে গ্রহরী হলেও আমাদের প্রচেষ্টার প্রতি তর-সহনুভূতি এবং সমবেদনাও ছিল যথেষ্ট। সরকারী বিবৃতিতে বলা হয়েছিল যে, অন্তরীণরা বিষাক্ত জল পান করে প্রাণ হারায়। আমি এই সমস্ত কারাগারের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালভাবেই জানতাম বলে এ বিবৃতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহান হতে পেরেছিলাম। আমার বরাবরই অশর্চ লেগেছে এই ভেবে, এইসব ঘটনায় কোনদিনই একজনও গ্রহরীর জীবন বিপন্ন করা হয় নি, কেবল বন্দীরাই হয়েছে ভুক্তভোগী? হোলা শিবিরের কোন গ্রহরীর হঠাৎ জল-তেঙা পেত না তাকে বিষাক্ত জল পান করতে বাধ্য করার জন্য বা মানিয়ানি শিবিরে যে সমস্ত বন্দী হঠাৎ "টাইফয়েড" রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়, সেই রোগে একজন গ্রহরীকেও ঘায়েল করতে পারে নি? এ বিষয় খোঁজখবর করার জন্য আমি বন্ধুদের জন্ স্টোনহাউসকে বিলেতে চিঠি লিখতে মনস্থ করি এবং মেয়াইর সাহায্যে প্রয়োজনীয় কাগজ-কলমের জোগাড় করি। কাগোলেনিতে নৃত্যোৎসবের সময় তাঁর সঙ্গে দেখা

পাণ্ডাহক বঙ্গমতী

ছবার পর থেকে যা যা ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ দিই আমি চিঠিতে এবং হোলার বিষয় খোঁজখবর করার বিশেষভাবে অনুরোধ করি আমি তাঁকে। চিঠিখানি ডাকে দেবার জন্য শিবিরের ক্যান্টিনের ভারতীয় ম্যানেজার শ্রীভরাজীকে অনুরোধ করি আমি এবং তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন। স্টেটহাউস আমার চিঠি পেয়ে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক মহাধ্যক্ষকে প্রশ্ন করেন আমাকে শ্বিতীয়বার বন্দী করার বিষয় এবং কতৃপক্ষ শব্দ বুলেন যে, দেশের প্রতিরক্ষার জন্যই এর প্রয়োজন হয়েছিল।*

হোলার দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীর কাছে কৈনিয়ার বিভিন্ন বন্দিশিবিরগুলির শোচনীয় দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করে, ফলে কৈনিয়া সরকার ফেয়ারন নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের তত্ত্বাবধানে এক তদন্ত সমিতি গঠন করেন, যার কাজ ছিল এ বিষয়ে যতদূর সম্ভব খোঁজখবর করা এবং অবস্থার উন্নতি কিভাবে করা যেতে পারে তার সুপারিশ করা। সমিতির কানডোনগোতে এসে পৌঁছাবার আগেই শিবিরের কর্মধ্যক্ষ লুইস আমাকে নিঃসঙ্গ কারা-খুদারী থেকে বার করে আনতে সক্ষম হয়েছিল। লুইসের মতো ধর্মভীরু ভদ্র ও স্বাধীনচেতা কর্মচারী আমি আর দেখিনি এবং তিনি যে কোনদিন কারুর কোন ক্ষতি করতে পারেন না, সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। আমরা তাঁকে শোষণশিলিতে “বাবা” বলে ডাকতাম এবং তিনিও আমাদের সকলকেই ঐভাবে

সম্বোধন করতেন। তিনি আমাদের সুস্থ-সুবিধার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন সবসময় এবং তাঁর মতে, আমরা ছিলাম এমন একদল লোক যারা দৈবের দুর্বিপাকে বিপদে পড়েছি, আর তিনি আমাদের সাহায্য করছেন মাত্র। লুইসের সঙ্গে আমার পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং তিনি এখনও প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসা-যাওয়া করেন।

ফেয়ারন আমাদের শিবিরে তদন্ত করতে এলে পর আমি তাঁর কাছে আমার সমস্ত অভিজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিই এবং অন্যান্য অন্তরীণ বা বন্দীর কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছিলাম সে বিষয়ও বলি। ফেয়ারন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও ধৈর্যশীল লোক। তিনি আমার সমস্ত অভিযোগ অভিজ্ঞতাই মনোযোগ সহকারে শুনিয়েছিলেন।

আমার কানডোনগোতে আসার কিছুদিন পরই ওখাইয়া জিলার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, আমার পুরান “বন্ধু” সলিস্-বেরী আমাকে দেখতে আসে। আমাকে আবার বন্দী অবস্থায় দেখে সে নিজের উল্লাস গোপন করতে পারে নি। বিদ্রূপ করে সে বলে যে, তার আন্তরিক কামনা যে, আমার দুর্বিবহারের যেন শেষ এইখানেই হয়। সে বলে যে আমি তার বিরুদ্ধে নালিশ করছি সরকারের কাছে তার দুর্বিবহারের জন্য, যদিচ আসলে সে সব সময়ই তার অধীনস্থ লোকদের সাহায্য করার চেষ্টাই করেছে! আমার শ্বিতীয়বারের কারাজীবন যে কেবল কতৃপক্ষের কাছে নালিশ-ভরা চিঠি লেখারই ফল, এ বিষয় সে একেবারে নিঃসন্দেহ। সে আমাকে বলে, “তুমি কি শব্দমাত্র এক মাসের জন্যও নালিশ করা থেকে ক্ষান্ত থাকতে পার

না? তুমি যদি এভাবে নালিশ করা বন্ধ না কর, তবে তোমার জীবনের এইখানেই সমাপ্তি হতে বাধ্য।” আমি উত্তরে তাকে বলি, “তুমি আমার সঙ্গে এক কঠিন প্রতিযোগিতায় নেমেছ। কখনো তুমি জিতেছো, আবার কখনও বা আমি তোমাকে পরাস্ত করে ধূলিলুপ্তিত করেছি তোমার রাজকীয় সম্মানকে। তুমি তোমার লোকদের, কৈনিয়ার ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়ানদের স্বার্থের জন্য আমাকে পরাস্ত করার চেষ্টা করেছে, আর আমি আমার দেশের লোকদের স্বাধীন করার জন্য, তাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য, তাদের “মানুষ” হিসাবে বেঁচে থাকবার অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছি তোমার মতো লোকের বিরুদ্ধে। তুমি আর আমি চিরকাল শত্রুই থাকবো।”

কানডোনগোতে আমার কয়েক হস্তা থাকবার পর ফোর্ট হল জেলার মারিরা কার্শিবিবির থেকে কয়েকজন অন্তরীণ সেখানে বদলি হয়ে আসে। এদেরও কতৃপক্ষ পুনর্বাসনের পাইপ লাইনে ঢোকাতে সক্ষম হন নি। এদের ভেতর ছিল টাঙ্কেও মোয়াউরা ইচাহারিয়া নামক একজন বয়ো-বৃদ্ধ লোক, তার ইংরাজী ভাষার উপর দখল ছিল অশুভ। সে প্রায় সারা জীবন ধরে দেশের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং খুব উচ্চদরের শিক্ষকও বটে। তার ভাই, গড্ডাউ মবরু, দক্ষিণ আফ্রিকার ফোর্ট হেয়ার কলেজে শিক্ষালাভ করে এবং বর্তমানে সে কৈনিয়ার প্রাদেশিক প্রশাসন বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। টাঙ্কেওকে আমি নিজের বাবার মতো ভক্তি-প্রাধা করতাম এবং ফেয়ারনের কাছে আমার বক্তব্য ঠিকমত পেশ করতে সে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। টাঙ্কেও এখন ফোর্ট হল এলাকায় কে. আ. ন্যা. হউর সভাপতি। তার সঙ্গে আরও যারা এসেছিল মারিরা থেকে, তার ভেতর ছিল বিলডাড কপিগয়ার ভাই নুগুগি মোয়ানান্দু, যার বিচার জোমো কৈনিয়াটোর সঙ্গেই কাপেন-গুরিয়াতে হয়েছিল। কিন্ডুথিয়া, যে এখন কৈনিয়ার হোটেল এবং গৃহস্থ বাড়ির চাকরদের সংস্থার সম্পাদক এবং মোয়ানগি নামক একজন যুবক, সে সংগ্রামীদের সঙ্গে জঙ্গলে প্রচুর উৎসাহ ও বিক্রমের সঙ্গে লড়াই করেছিল। নেয়েরীর কারাগার থেকেও কয়েকজন এসেছিল, তার ভেতর ছিল জেরোমিয়া কিরুমওয়া কিয়েরু, যে পরবর্তী কালে আমার এক ব্যবসার অংশীদার হয় এবং জন মাইকেল মুনগাই, ফ্রেড কুবাইর এক বিশিষ্ট বন্ধু এবং স্বাধীনচেতা জাতীয়তাবাদী। জনের বিচারও কাপেনগুরিয়াতে জোমো কৈনিয়াটোর সঙ্গেই হয়।

* Parliamentary debates, 2nd June, 1959. V. 606.6.

সামগানং সন্ধ্যাপ্রয়োগঃ

বঙ্গদেশে বহুদিন অবধি যে নামবন্দী সন্ধ্যাপ্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে, উহা গোভিল-প্রণীত সন্ধ্যাসূত্রের সম্পূর্ণ অনুযায়ী নহে। সেই জন্য সন্ধ্যাসূত্রোক্ত অনেকগুলি পরিভাষা মন্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্মার্তরঘুনন্দনের সন্ধ্যাপান বিচারের প্রাপ্ত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মন্তগুলির গুণ, বিষ্ণুপ্রণীত টীকা ও তদনুযায়ী বঙ্গানুবাদ এবং টীকাতে উদ্ধৃত পাণিনির সূত্রগুলির অষ্টাধ্যায়ী সূত্রগঠানুসারে অধ্যায়, পাদ ও সূত্রাক্ষ এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ।

হারাণচন্দ্র বক্ত্যাগাধ্যায়-কৃত বঙ্গানুবাদ

মূল্য মাত্র এক টাকা

বঙ্গমতী (প্রা) লিঃ

কলিকাতা-১২

রূপকণ্ড ৩

কয়ারী গিরিপথ সুজয়া গুহ

[সুজয়া গুহ আর নেই।
পশ্চিমবঙ্গ-এর পরিচালনায় গত ২৪শে
জুলাই ৬ জন মহিলা পর্বত অভিযাত্রীর
একটি দল কলকাতা ত্যাগ করেন
লাহুল অঞ্চলের একটি অনাম্য
পর্বতশৃঙ্গ জয়ের বাসনা নিয়ে। সুজয়া
গুহ ছিলেন এই অভিযানের নেত্রী।
২০শে আগস্ট ছ'জন সদস্যই ২০,১৩০
ফুট এই শৃঙ্গের আরোহণ করেন এবং
বিজিত শৃঙ্গটির নামকরণ করেন
'জলনা'। মূল ঘাঁটিতে ফিরে আসার

পথে একটি হিমবাহ পার হবার সময়
হিমাচল প্রদেশে শিগরী গ্রামের কাছে
করাচানালা নদীর জলে পড়ে নিহত হন
সুজয়া গুহ। অপর একজন সদস্য
শ্রীমতী কমলা সাহাও এই দুর্ঘটনার
কবলে পড়েন। এ পর্বত তাঁর খোঁজ
পাওয়া যায় নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে,
শ্রীমতী কমলা সাহাও মৃত। অপর
চারজন সদস্য নিরাপদ।

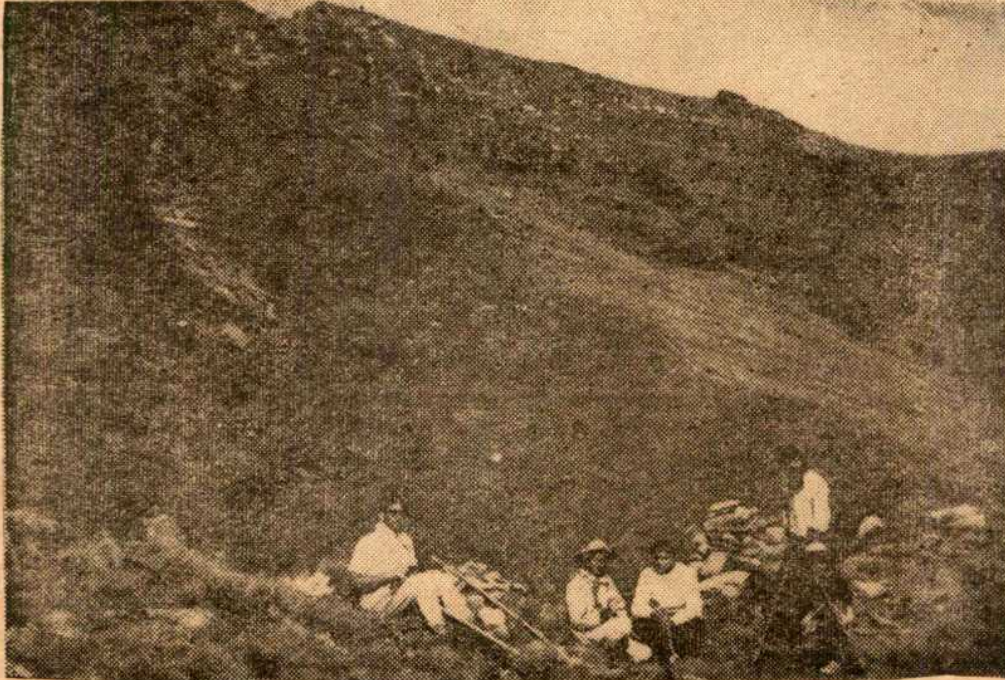
পর্বত অভিযাত্রণী হিসাবে শ্রীমতী
সুজয়া গুহের নাম ভারতজোড়া। তিনি

১৯৬৫ সালে দার্জিলিং-এ পর্বত অভি-
যানে বৈদিক ষ্টোন নেন। ১৯৬৬
সালে দুর্গম রোটার-পাশ ঘুরে আসেন।
১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মহিলা
পর্বত অভিযাত্রীদের সাফল্যমণ্ডিত
রোন্ট অভিযানের তিনি ছিলেন
ম্যানেজার। ১৯৬৮ সালে আবার
পর্বতারোহণে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করেন
উত্তর কাশ্মীরে। ১৯৬৯ সালে গিয়ে-
ছিলেন দুর্গম রূপকণ্ড ও কয়ারী
গিরিবর্জ।

হিমালয়কে অন্তর থেকে তিনি
ভালবেসেছিলেন। রচনাটির মাধ্যমে তার
পরিচয় মিলবে। এই রচনাটি প্রকাশ
করে আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন
করিছি।

এাই ওটা কি! পাথরের গায়ে
হুমড়ি খেয়ে পড়ি আর কি! পথের
ওপর পড়ে রয়েছে একটি কালো রোমশ
হাত, দীর্ঘ খারালো নোখ। বড়
পাথরটার গা ঘেঁষে একটি কঙ্কাল, প্রায়
ছ' ফুট লম্বা। কঙ্কালটির এখানে-
ওখানে মাংসখণ্ড বুলছে, অন্তঃসারশূন্য
সবল বক্ষপঞ্জর আর উন্মুক্ত দন্তপাটি।
সে এক বীভৎস দৃশ্য।

গাইড হুকুম সিং বলে, ভালু। এ
এলাকায় ভালুকের বড় অত্যাচার। ওরা
রাতের অধারে দল বেঁধে আসে। ফসল-
গরু-ভেড়া-মানুষ যা পায় তুলে নিয়ে
যায়। আশে-পাশের গাঁয়ের শিকারীরা
কদিন চেষ্টার পর কালই মাত্র তিনটি
ভালুক মেরেছে। তারই একটি এটি!



কয়ারী গিরিবর্জ ১২,৪০০ ফিট

মাস্তাহিক বঙ্গমতী

শ্রমজীবী শ্রমীণ আলো কখন বৈশিষ্ট্য হইয়া গেল। আধারে ঘেরা নিবিড় রাত। সারাদিনের পথপ্রদেহে আমরা প্রসন্ন, শিখা। তবু চোখে ঘুম নেই। গাড়েয়ালের এক অখ্যাত পাহাড়ী গ্রাম—পানি গ্রাম, প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে। বসতি মন্দ নয়। একটি স্কুলও আছে। একমাত্র মাস্টারমশাই—অত্যন্ত অতিথিবৎসল। রাতের আশ্রয় নিলাম ঐ স্কুল ঘরেই। মাটির ঘর। চারটি জানালা—দুটির আবাস কপাট নেই।

পাশাপাশি বিহানায় শূন্যে আছি চন্দনগরের রবীন্দ্রনাথ শূন্য, বিশ্বজিৎ শূন্য, আজ ঘোষ, বিজয়গড়ের পঙ্কজ চক্রবর্তী, আমার স্বামী কমল গুহ (মহারাজ) ও আমি। লাঠির মাথায় প্রাসটিকের রেনকোট চাপিয়ে খোলা জানালায় আবু টানার চেঁচা করেছিল। ব্যর্থ চেঁচা! বাতাসের ছোঁয়ায় খচমচ করে হেলে-দুলে রেনকোটগুলি লাঠি পরিত্যাগ করে ভূমিশায়া গ্রহণ করল। অব্যবহৃত জানলা দিয়ে ভেসে আসছে অপরিচিত বুনো গন্ধ, শোনা যাচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ, শূন্যে পাতার কঁকিয়ে ওঠা কান্না। আমরা নীরবে প্রতীক্ষা করি, কখন খোলা জানালা গলিয়ে ঘরের মধ্যে এগিয়ে আসবে একটি কালো লোমশ হাত, অন্ধকারের বুক চিড়ে

বলসে উঠবে অতিকার হিংস্র দাঁতের পাটি।

রাতের শেষে কক্ষের অন্তঃপুর থেকে সন্তস্রস্ত চোখ দুটি মৌল, সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ি—সবাই হাজির! পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠি।

এমনিভাবে নিত্য নতুন উদ্বেগ আর আনন্দের মধ্য দিয়ে আমাদের দীর্ঘ সফর শেষ হতে চলেছে। হ্যাঁ, পাহাড়ে একাদিক্রমে হাঁটার পক্ষে একটি উল্লম্ব-বোধ্য সফরই বটে। কলকাতা ছেড়েছি তরা সেন্টেম্বর। গোয়ালদাম থেকে কুলী ও গাইড নিয়ে পথচলা শুরু করেছিলাম ৬ই সেপ্টেম্বর। আর আজ আঠারোই। রূপকুন্ডের পথেই কেটে গেল সাতদিন। পথের দুর্গমতায় আর আবহাওয়ার অসহযোগিতায় রূপকুন্ড পদযাত্রা শেষ করেই দেহ মন নাগরিক জীবনের আয়াস-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উন্মুখ হতে চায়। 'রূপকুন্ড অভিযান' শেষ করেই যাত্রীরা মাধারগত ঘরে ফেরেন।

কিন্তু আমরা পাঁচজন অনমনীয় মনো-বল নিয়ে এগিয়ে চলছি আরও দূরে। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-বর্ণিত সেই কুয়ারী গিরিপথের দিকে। রূপকুন্ড (১৬,৩০০') থেকে সাড়ে তিন হাজার ফুট নেনে শিবির পেতেছিলাম জিমতোলাতে। কুয়ারীর পথ বেশ

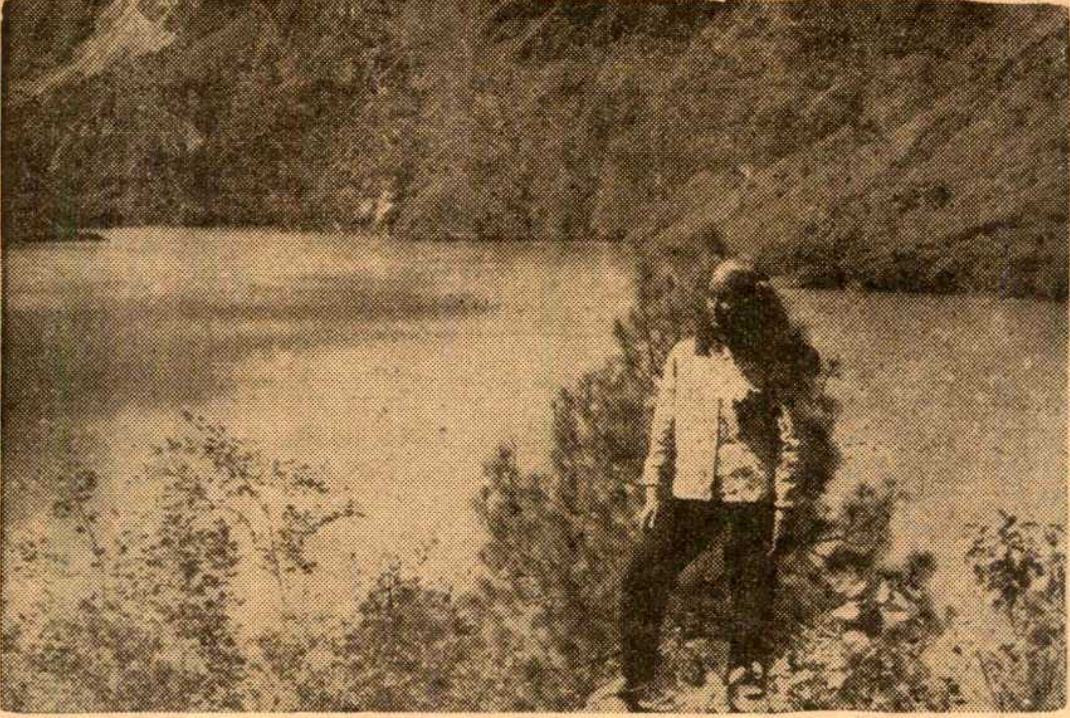
কষ্টদায়ক। অত্যন্ত ঘন ঘন খাড়া চড়াই-উৎরাই। আর তেমনি বিহুটির ঘন জঙ্গল। আর পথের সৌন্দর্যও এমন নয় যে সব পথকষ্ট ভুলে যাওয়া যায়।

মনে পড়ে যায়, রূপকুন্ডের পথের সৌন্দর্যের আর বৈচিত্র্যের কথা। দীর্ঘ পেলব তৃণে ঢাকা উজ্জ্বল সবুজ চারণ-ভূমি—আলি বৃগিয়াল, বৈদেনী বৃগিয়াল। বৈদেনী বৃগিয়ালের প্রবেশ-পথে বিচিত্র বর্ণের কি বিপুল সমারোহ—লাল, সাদা, হলুদ, নীল, বেগুনী কত রং-এর ফুলে ছেয়ে আছে সমস্ত প্রান্তর। আরও ওপরে উঠে কৈল্যবিনায়কের (১৪,০০০') পর থেকে হুনিয়াথর পর্বত স্থলপঙ্খের মেলা। উপল সন্মাকীর্ণ বন্য প্রান্তরে ফুটে রয়েছে অজস্র কমল—হালকা হলুদ রং-এর ব্রহ্ম কমল, বেগুনী রং-এর ফেন কমল ও হৈর কমল। তারই আশে-পাশে ফুটে রয়েছে বড় বড় লাল পাতা।

ত্রিশল (২৩,৩৬০') পর্বতের হিমবাহ-স্রোত রূপকুন্ডের বৈচিত্র্য আজও কত পদ-যাত্রী, অভিযাত্রী, বিজ্ঞানীকে এখানে টেনে আনছে। রূপকুন্ডের আকর্ষণের কেন্দ্র-বিন্দু হল কুন্ডের তীরবর্তী ছয় শত বছরের পুরাতন মৃতদেহ। নারী, পুরুষ ও শিশুর মৃতদেহ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অপহৃত হয়ত বা কোন তীর্থ-যাত্রীর দল।



রূপকুন্ডের তীরবর্তী ৬০০ বছরের প্রাচীন একটি মৃতদেহ



গোনা হ্রদের তীরে লেখিকা

তবে কুয়ারীর পথে গ্রামগুলির পরিবেশ কিন্তু ভারী সুন্দর—প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। আমরাই বরং উপভোগ করার অবকাশ পাচ্ছি না। প্রতিদিন শিবির পাততে সন্ধ্যা ছটা বেজে যায়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে আমরা অতি অবসর দেহে রাতের আগ্রয় নিই। তখন আর গ্রাম পর্যটনের সময় থাকে না। এইভাবে অতিক্রম করলাম—লাল রাম-দানায় ঘেরা সুতোলা গ্রাম, সাদা সবুজ পাথরে ছাওয়া রামনী গ্রাম, শস্যশ্যামল গোনা গ্রাম। থামলাম এসে গোনা হ্রদের তীরে।

সবুজ পাহাড়ের বেটনীর মধ্যে একটি সুবৃহৎ জলাশয়, সেও সিন্ধু সবুজ। হ্রদের কিনারায় দোল খাচ্ছে দু'টি হলুদ রং-এর ছোট্ট নৌকো। হ্রদের দক্ষিণ চালে টুকটুকে লাল টালিতে ছাওয়া বনবিগ্রাম-গহ। এমন পরিবেশে একটি দিন অতিবাহিত করার লোভ সংবরণ করা গেল না। যদিও আমাদের চাল, আটা, নুন, চিনি সব ফুরিয়ে গেছে। মনমতো পরিবেশ পেয়ে অধিক্ত অবস্থায়ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠি। সারাদিন সাতার কেটে আর অপটু হাতে নৌকোর দাঁড় বেয়ে উদ্বেল করে তুললাম প্রশান্ত গোমাতালকে। নৌকোয় ভাসতে ভাসতে দেখলাম, নন্দাঘাটের (২০,৭০০') শব্দ শিখর ছুঁয়ে নব অরুণোদয়, দেখলাম রুদ্ধ মৈথানার বৃকে রক্তিম সূর্যাস্ত, গভীর রাতে ঝলঝল বারান্দা থেকে তাকিয়ে দেখি—

হ্রদের শ্যামল কোমলতার রূপোলী চাঁদের অবগাহন।

গোনায় ষাওয়ার একটি সহজতর পথ জ্যোশীমঠগামী বাসে বিরহীতে নামতে হবে। সেখান থেকে বিরহী গঙ্গার প্রবাহ ধরে আট মাইল চড়াই পথের শেষে গোনা হ্রদ। প্রয়োজনীয় রসদ বিরহী গ্রাম থেকে কিনতে হবে, গোনায় দোকান-হাট নেই।

গোনা থেকে পানায় আসার সংক্ষিপ্ত পথটি বর্ষার দাপটে অবলম্ব্য। তাই কাল ঝিঝি গ্রাম ও কালিয়াঘাট হয়ে সেই সন্ধ্যার মধ্যে পানায় পৌঁছেছিলাম। আজকে ষাব ডাকওয়ানি (১১,৮০০')। ডাকওয়ানি থেকে সামান্য উঁচুতে কুয়ারী গিরিপথ।

ডাকওয়ানিতে পৌঁছে দেখি, বিধি এখানেও বিরূপ। আমাদের অভীষ্ট গিরি-গুহাটি বিছড়টির ঘন জঙ্গলে আবৃত, পাথরের দেয়াল বেয়ে অঝোরে জল গড়াচ্ছে, আর মেঝেতে শেওলার পুরু আস্তরণ। আমাদের জরাজীর্ণ তাঁবু টাঙিয়ে কোনমতে সেই বর্ষণমুখর রাতি অতিবাহিত করলাম। ভোরে উঠে দ্রুত শিবির ভাঙার পাট সাগু করে বিধবস্ত চড়াই ভাঙা সড়ক করলাম। আভাদি আর আমি দ্রুতগতিতে গিরিপথের দিকে এগিয়ে চলি। প্রকৃতিদেবী সুপ্রসন্ন। আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষা, আয়োজন বৃদ্ধি বাধ্য হয়। মাত্র পঞ্চাশ মিনিটে খাড়া ৪০০ ফুট চড়াই বেয়ে এসে দাঁড়লাম গিরিপথের ওপরে।

পশ্চাত্তাত্তাদের দ্রুত আগ্রহ ইঞ্জিত করি।

এই বৃদ্ধি হারিয়ে যায়। রোদ্দুর আর মেঘের সহঅবস্থানের দুর্বল প্রয়াস। ভোরের আকাশ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে উবার আলোক—শিখরে শিখরে সোনা রং—বর্ণালী করে তুলেছে শব্দ ক্রীড়াটিবিভূষিত উন্মত হিমশৃঙ্গ : আবার এদিকে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ঘন বনানী বেয়ে উঠে আসছে মেঘের শব্দ প্রবাহ—অবিমুক্ত আবেগে আগ্রয় করছে ধূসর গিরিকন্দর। ফেনিল আবর্তে ঘিরে ফেলে শিখরগুলিকে। রোদ আর মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে এক সুউচ্চ সুবিস্তৃত পর্বতমালা। সংখ্যাতীত শিখরের মেলা। সেই সুপরিচিত গঙ্গোত্রী থেকে স্বপ্নবিদিত নন্দাদেবী পর্বতগোষ্ঠী পর্বন্ত প্রতিটি শিখরকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে উন্মত ভাঙতে দেখা গেল। হিমালয়ের সেই সুবিশাল প্যানোরমার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে রইলাম।

ক'টি মহাত্ম! পৃথিবীভূত উর্মি-মালার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস হারিয়ে গেল শব্দ পর্বতশীর্ষ, মিলিয়ে গেল সুদীর্ঘ আকাশ। হিমালয়ের অস্তিত্ব মুছে গেল, পরাভূত সূর্য বিদায় নিল। অমাত্রার আকাঙ্ক্ষার ধন, আমাদের উৎস নিঃশেষিত হতে, বেদনাত হ্রদয়ে অন্তরীক্ষে বিরাজিত গিরিরাজের পদ-প্রান্তে প্রণতি জানিয়ে নেমে চললাম পাহাড়ের পথে।



গড়ের মাঠে ফুটবল লীগের আসর যখন বিমসে এসেছে, আই-এফ-এ শীল্ডের খেলার তালিকা নিয়ে আলোচনায় মশগুল ক্রীড়ামোদীরা, গিলির মোড়ে মোড়ে লাল শালুতে আর সার্ময়কীর বিজ্ঞাপনে শারদীয়ার আগমন ঘোষণা করা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয় বাংলা দেশের কিছুর উৎসাহী মনে। পাহাড়ের যারার দিন আগত!

ভারতবর্ষের ক্রীড়াঙ্গণে পর্বতারোহণ নিজের ঠাই করে নিয়েছে খুবই অল্পদিনে। ১৯৫০ সালে তেনজিং-হিলারীর সাফল্যমণ্ডিত এভারেস্ট অভিযানের উনিশ দিন পরে মেজর নন্দু জয়াল অপর দু'জন সাথীর সঙ্গে আরোহণ করেন গাড়োয়ালের ২৪,১০০ ফুট উচ্চ আবিগামিম শৃঙ্গে। ভারতীয় পর্বতারোহণের সূর্য ও বলা যায় এই ১৯৫০ সালে। দুর্ঘটনা এ্যাডভেঞ্চার এই পর্বতারোহণের শিক্ষা দেবার জন্য স্থাপনা করা হয় দার্জিলিং-এ হিমালয়ান মাউন্টেনয়ারিং ইনস্টিটিউট এবং পরে উত্তর কালীতে নেহরু ইনস্টিটিউট অফ মাউন্টেনয়ারিং। দেশের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে অনেকগুলি পর্বতারোহণ সংস্থা এবং দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উত্তর সীমান্তে চলাচলের কিছটা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায় এবং বিভিন্ন অভিযানকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা তথা প্রয়োজনে সংঘত করার জন্য গঠিত হয় ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থা। বর্তমানে হিমালয়ে কোন প্রকার অভিযান সংগঠিত করতে গেলে প্রতিরক্ষা দপ্তরের এই সংস্থার পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। বলা যেতে পারে এ আই-এফ-এফ কিম্বা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মতই আই-এম-এফ পর্বতারোহী সংস্থাগুলির একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন।

বাংলা দেশে পর্বতারোহণের ইতিহাস আরও অল্পদিনের। ১৯৬০ সালে নন্দাঘাট অভিযানে তার জন্ম। কিন্তু এই দশ বছরে এর অগ্রগতি খুবই তাল।

আজ পর্যন্ত প্রায় তিরিশটি অভিযান এখান থেকে সংগঠিত হয়েছে এবং অন্যান্য প্রদেশ কিংবা সরকারীভাবে আয়োজিত অভিযানগুলিতে বাঙালী অভিযাত্রীদের সংখ্যাও খুব কম নয়। এবং সবচেয়ে বড় কথা বাংলা দেশে বিভিন্ন সংস্থাগুলির একটি মিলিত কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা হয়েছে 'হিমালয় ফেডারেশন'—যদিও সব কটি সংস্থা এখনও এতে সামিল হয় নি। আশা করা যায় অল্পদিনেই নিজের তুচ্ছ ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের কথা ভুলে তরিগ ও এই কেন্দ্রীয় সংস্থাতিকে আরও শক্তিশালী করতে এগিয়ে আসবেন।

পর্বতাভিযান অভিযাত্রীদের প্রাত্যহিকতার প্লানিমুস্ত্র এক বৈচিত্র্যময় জগতে নিয়ে যায়। যেখানে জীবন-মৃত্যু, আশা-নিরাশা এক সূতায় দোল খায়। এই প্রতিযোগিতায় নেই কোন দর্শক, নেই বিচারক। প্রতিপক্ষ হচ্ছে দেবাদিদেব হিমালয়। জয়ের নেশায় নয়, ভীতিতে আন্দুলত হয়ে বিস্ময়াবিষ্ট অভিযাত্রী সেখানে পথ চলে। অসম্ভব মনের জোর আর দলগত কার্যধারা এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি যদি সপক্ষে থাকেন, তবেই ফিরে আসা সম্ভব সাফল্যমণ্ডিত হয়ে। এ পথে ইতকারিতার কোন ক্ষমা নেই। সে ক্ষেত্রে বিধান-মলিন ক্রিষ্ট মূর্খের হবি আমাদের দেখতে হয় সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়।

১৯৭০ সালকে ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে একটা দুর্ঘটনার বলে চিহ্নিত করা যায়। এই দুর্ভাগ্যের সূর্য এ বছর এপ্রিল মাসে—ভূটানের চোমোলহরী শৃঙ্গের দ্বিতীয় অভিযাত্রী দল আর ফিরে আসেন নি। তাঁরা ছিলেন তিনজন। শৃঙ্গের পথে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন, নিচের ক্যাম্প থেকে দেখা যাচ্ছিল। তাঁরা বিগ্রাম নিতে বসলেন—একটা মেঘ এলো। তাঁরা ঢাকা পড়লেন। মেঘ চলে গেল—তাঁদের আর দেখা গেল না। তিনটি অমূল্য প্রাণকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। এবং এর পর ঘটে গেছে আরও

দুটি বৃহৎ দুর্ঘটনা। প্রাণ হারিয়েছেন আরও তিনজন। দুটি অভিযানই সংগঠিত হয়েছিল মোম্বাই থেকে। এই দুর্ঘটনাতেই হারিয়েছি আমরা এভারেস্ট বিজয়ী আটপা বছরের ধুবক আংকামিকে। আরো বেনদার কথা, সম্প্রতি মহিলা পর্বতারোহী দল 'লাহুলা' অঞ্চলে অভিযানে সাফল্যের পর ফেরার পথে এক নিদারুণ দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন। তাতে তাঁদের দলনেত্রী সুজয়া গুহ পাহাড়ী নদীর প্রাণ হারান এবং অপর আর একজন সদস্য কমলা সাহা নিখোজ হন।

তবু অভিযান হয় এবং হচ্ছে। দেখা যায় সাময়িক অসহিষ্ণুতা এবং দুর্ভাগ্যের অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ছাড়াও দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু অভিযাত্রী ভুলে যান পৃথিবীতে এমন কোন পর্বতশৃঙ্গ নেই যা মানুষের জীবনের থেকে দামী।

এ বছরেও বাংলা দেশ থেকে তিনটি পর্বতাভিযান হচ্ছে। অমূল্য সেনের নেতৃত্বে 'যোগীন' এবং মাউন্টেনারীয়ার্স ক্লাবের 'যুগল মানা' অভিযাত্রী দলও খুব শীঘ্রই গঙ্গোত্রী অঞ্চল অভিযাত্রী যাত্রা করবেন। এবং শোনা যাচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে নাকি প্রায় লাখ টাকা ব্যয়ে এক পর্বতাভিযানের আয়োজন করা হচ্ছে নন্দা দেবী অঞ্চলে। নানা বিষয়ের বৈজ্ঞানিকরা থাকবেন এই দলে। অনেক নতুন গবেষণা হবে এই অভিযানে। দলনেত্রী নাকি ১৯৬৬-র চতুর্থশ্রী দুর্ঘটনাখ্যাত শ্রীসুজিত বোস। যে অভিযানে মারা গিয়েছিলেন শ্রীঅমর রায়, শেরপা গিয়ালবা এবং করমা। যে দুর্ঘটনার তেইশ ঘণ্টার মধ্যেও কোন উদ্ধারকারী দল প্রেরণ করা সম্ভব হয় নি। সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে তিন বছর দূর নেবার পর শ্রীবাসের পর্বতারোহণ জগতে পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্যের বিষয়।

শ্রীবাসের প্রায় লাখ টাকার অভিযানের কথা বাদ দিলেও কোন একটি সাধারণ অভিযান সংগঠন করতে গেলেও কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ হাজার টাকা লাগে। সৌদিক থেকে পর্বতাভিযান এক বায়বহুল ক্রীড়া। সব সংস্থার পক্ষে এই অর্থ জোগাড় করা সাধ্যাতীত। অথচ হিমালয়ের আকর্ষণ দুর্নিরার। এবং হিমালয়-প্রেমীরা তাই অভিযান ছাড়াও নিজেরা নিজেরে সাধারণ সম্ভব নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন। বাঁধা রাস্তা ছেড়ে রক্ষ প্রকৃতির কোলে কাটিয়ে আসেন শরৎকালের দিনকটি। বছরের বাকী

শাত্তাহক বঙ্গমতী

দিনকণ্ঠি এই স্মৃতি রোমন্থন করে তাঁদের মন্দ কাটে না।

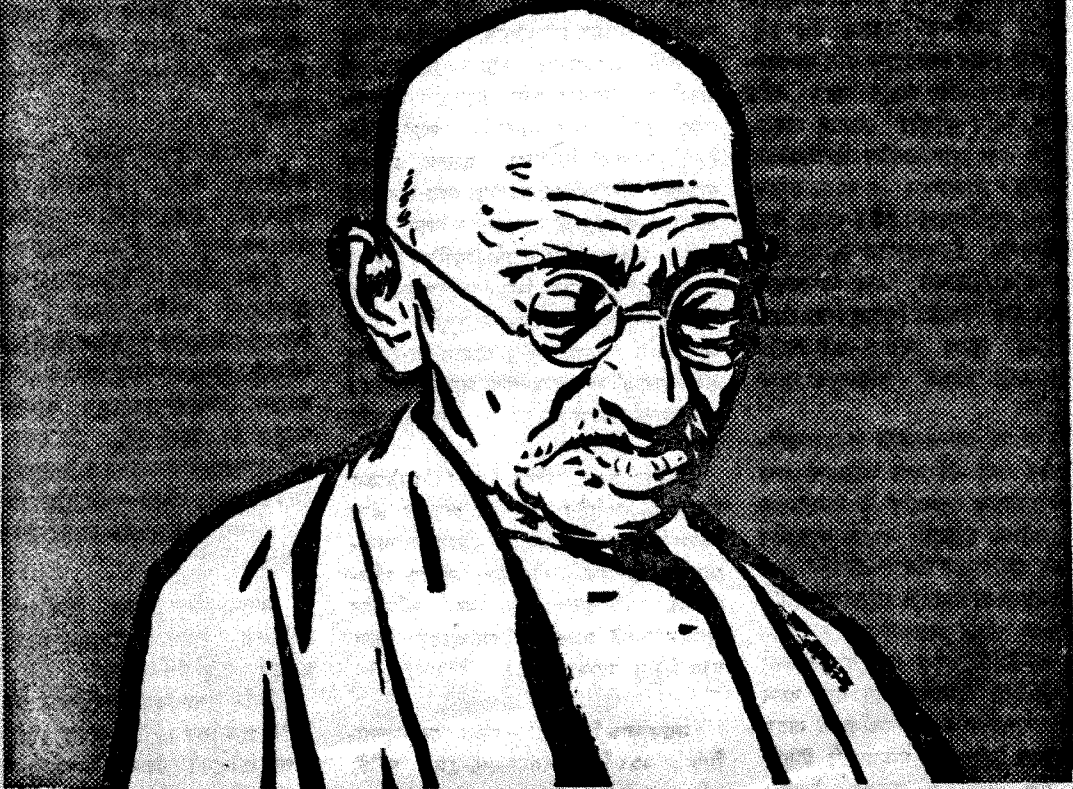
কোলকাতার এই ধরনের হিমালয়-পাখিকদের নিয়ে সংগঠিত একটি অগ্রণী সংস্থা 'হিমালয় লাভার্স' অ্যাসোসিয়েশন' এ বছর ভারতীয় পর্বতারোহণ সংস্থার অনুমোদনক্রমে সংগঠিত করেছেন তাঁদের 'গাডোয়াল হিমালয় ট্রেকিং এক্স-

পিডিশন'। শ্রীআশিস দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সাতজন অভিজ্ঞ যাত্রী আগামী ৬ই সেপ্টেম্বর ডুন এক্সপ্রেসে যাত্রা করে বদ্রীনাথ হয়ে সত্যোপস্থ হিমাবাহের ১৭,০০০ ফুটে ক্যাম্প করে কয়েক-দিন কাটাবেন। ফেরার পথে দলের দু'জন অভিজ্ঞ যাত্রী, যাদের পর্বতারোহণ শিক্ষাক্রম নেওয়া আছে, চেষ্টা করবেন,

লোকপাল হৃদের ওপর সপ্তশতগ শিখর আরোহণের এবং ফেরার পথে কুয়ারী গিরিপথের অপূর্ণ সৌন্দর্য নিকটনে তাঁরা কয়েকটা দিন কটাবার ইচ্ছা রাখেন। শ্রীদাশগুপ্ত ছাড়া দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন—বেবরত সরকার (সহ নেতা), দিলীপ ভট্টাচার্য, প্রভাত রায়, নিমাই সাহা, প্রবীণ চক্রবর্তী এবং জ্ঞান ঘোষ।

**“যে অন্যদের ঘৃণা করে
ঘৃণা তাকেই আঘাত দেয়
স্বাধীনতাকে নয়”**

মহাত্মা গান্ধী



কবিতা

কবি ও কবিতা বিষয়ক অভিনন্দনপত্র

কবি ও কবিতা নিয়ে সূর্যচন্দ্র প্রকাশন আজকের দিনে সহসা মেলে না বললেই হয়। আমাদের শিল্পসেবীদের সৌন্দর্যবোধের ভাগ্য নিতান্তই বিরুদ্ধাচারী। তবুও বাংলা দেশের শৈল্পিক প্রোতোধারার ঐতিহ্যিক সংস্পর্শে আসা নিভৃত অবকাশের কিছু কম। তাঁদের শিল্পস্নিগ্ধ আকাঙ্ক্ষার নির্বিরোধ প্রমাণ আমাদের সামনে প্রায়শই রাখেন। এ প্রমাণ আমরা পেয়েছি মলয়শঙ্কর দাশগুপ্তের রূপপরিকল্পিত সম্প্রতি প্রকাশিত তিনটি অভিনন্দনপত্রের চেহারায়। এই অভিনন্দনপত্র তিনটি নির্বোধিত হয়েছে বাংলা দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় ছজন কবির উদ্দেশে। প্রথম পত্রটি প্রকাশিত হয়েছে গত ৬ই জুন। এতে স্থান পেয়েছেন কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং অরুণ মিত্র। কবি মঙ্গলাচরণ, যিনি কবিতা রচনায় মানব-ধর্মে অটল এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারায় উদ্ভূত অখণ্ড স্বপ্নবাক। এ বছরে কবির পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হোল। কবি অরুণ মিত্র, যিনি কবিতাকে ইস্তেহারের চওড়া লাল কালিতে রাঙিয়েছিলেন এবং কবিতাকে করেছিলেন মন্তঃ 'আমি বিশ্বের পাঠ ঠেলে দিয়েছি/তুমি প্রসন্ন হও।'—এই পত্রটি প্রকাশ করেছেন কবিতা পরিষদের পক্ষে মণীন্দ্র মিত্র।

দ্বিতীয় অভিনন্দনপত্রটি প্রকাশ করেছেন উত্তর ও কবিকণ্ঠ পত্রিকার পক্ষ থেকে ক্রিয়শঙ্কর সেনগুপ্ত ও অসীমকুমার দত্ত। প্রকাশিত হয়েছে ২২শে জুলাই। এতে স্থান পেয়েছেন অরুণ ভট্টাচার্য এবং অশোকবিজয় রাহা। অরুণ ভট্টাচার্য সার্থক কবি হয়েছে এমন একজন মানব, যিনি কবিতার জন্যই নিজেকে সম্পূর্ণ নিবেদন করার ঐতিহ্য সারাজীবন ধরে বহন করছেন। অপরদিকে অশোকবিজয় রাহা, যার কবিতার বৈশিষ্ট্য: মনুষ্যের লড়াই, প্রবল সর্বনাশ অনিবার্য ভেনেও নিজের জীবনকে বিপন্ন করে মানুষের শিরে

রাত্রি জাগরণ, যদিও তার চারিদিকেই পর পর অনেকগুলি চিতা জ্বলছে।

অবশেষে তৃতীয় পত্রটি নির্বোধিত হয়েছে কবি সুভাষ মুনোপাধ্যায় এবং চিত্ত ঘোষের উদ্দেশে। প্রকাশ করেছেন কবিতা গ্রন্থাগারের পক্ষে স্বদেশরঞ্জন দত্ত এবং সামসুল হক। প্রকাশের তারিখ ১৮ই আগস্ট। যিনি মাথার উপর দ্বিপ্রহরের সূর্যকে এবং পায়ের নীচে গভীর অন্ধকারের মাটিকে চেতনার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করতে পেরেছেন এবং যার জটায় বেদনার আকাশগঙ্গা তিনিই সুভাষ মুনোপাধ্যায়। অপর দিকে কবি চিত্ত ঘোষ মধ্যবয়স্ক, দীর্ঘকাল ধরে তিনি কবিতা লিখছেন, তাঁর কবিকৃতি বৈশিষ্ট্য, স্বাবলম্বী, প্রাপ্তবয়স্ক। এই অভিনন্দনপত্রটিতে সুভাষ মুনোপাধ্যায়ের অভিনন্দন লিপিটি রচনা করেছেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং চিত্ত ঘোষের জন্য লিখেছেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তিনটি পত্র হাতে-তৈরী আশ্চর্য তিনকণ্ঠা কাগজে মুদ্রিত হয়েছে। শিল্পী-কবি মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত এই তিনটি পত্রেরই রূপ পরিকল্পনা করেছেন। সার্থক কবি হয়েছে সার্থক শিল্পী বাংলা দেশে খুবই বিরল। পত্রের রং, লিপিসংস্থাপন, অক্ষর-সংস্থাপিত এবং সর্বোপরি পত্রের উপরিভাগে রং-রেখার এক আশ্চর্য সম্পন্ন-সম্পক সৃষ্টি করেছে। এই অভিনন্দনপত্রের অর্থেক প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য।

কবির সঙ্গে কবির তথা পাঠকের অনুবন্ধন সৃষ্টির এরকম প্রচেষ্টা এবং শিল্প-স্নিগ্ধ আরাগতির মধ্য দিয়ে সৌন্দর্যবোধের ভাগ্যকে দীর্ঘতর করার পরিকল্পনা বতাই গ্রহণ করা হবে, কবিতার আসরে ততই মাঙ্গলিক আবহাওয়া সচল হয়ে উঠবে, সন্দেহ নেই।

নজরুলস্মৃতি—শ্রীবিষ্ণুনাথ দে সম্পাদিত। ১৮বি শ্যামাচরণ দে খণ্ডী, কলিকাতা-১২। মূল্য-ছয় টাকা।

আগের কথা কিছু সেরাতে হলেও

সুধিজন নজরুলের প্রতিভার নব মূল্যায়ন শুরু করেছেন। নজরুল সাহিত্যের চর্চা আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। আমরা পেয়েছি সর্বজনগ্রন্থেয় মজাফর আহমেদ রচিত নজরুল-জীবনীর মত একখানি মহামূল্য কবিতা-জীবন কথা।

আলোচ্য গ্রন্থ 'নজরুলস্মৃতি' সেই দিকেরই একটি প্রচেষ্টা। সম্পাদক শ্রী দে কবির আত্মীয়-অন্তরঙ্গ, সত্যর্থ বন্ধু-বান্ধব এবং দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারকবৃন্দের মধ্যে অনেকের নজরুল সম্পৃক্ত টুকরো টুকরো স্মৃতিকণা সংকলন করেছেন এই গ্রন্থে। আর তাতে সক্ষম হয়েছেন সামগ্রিকভাবে নজরুলের একখানি পূর্ণাবয়ব আলেখ্য আঁকতে। কবির সক্ষিপ্ত জীবনী, কবিকৃতির মোটামুটি পরিচয়, কবির প্রকৃতির অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ সবই এই গ্রন্থে অভিনব পদ্ধতিতে বিধৃত হয়েছে। ছোট ছোট স্মৃতির কুসুম কুড়িয়ে বিশ্বনাথবাবু একটি সুন্দরিত মালিকা গুঞ্জেছেন—যার প্রতিটি কুসুম যেমন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল, সমগ্র মালিকাটিও তেমনি বর্ণভাবীর হাতে একটি যোগ্য উপহার। গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেন, 'লেখাগুলি মূলত কিশোর-বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার কথা মনে রেখে গ্রন্থিত হলেও প্রতিটি বাঙালী পাঠক-পাঠিকাই যাতে এই গ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্ত হন, সে চেষ্টা আমি করেছি।' আমাদের বিশ্বাস সে চেষ্টা তাঁর বহুলাংশে সফল হয়েছে। গ্রন্থখানি সাধারণ পাঠকসমাজেও সমাদর লাভ করবে।

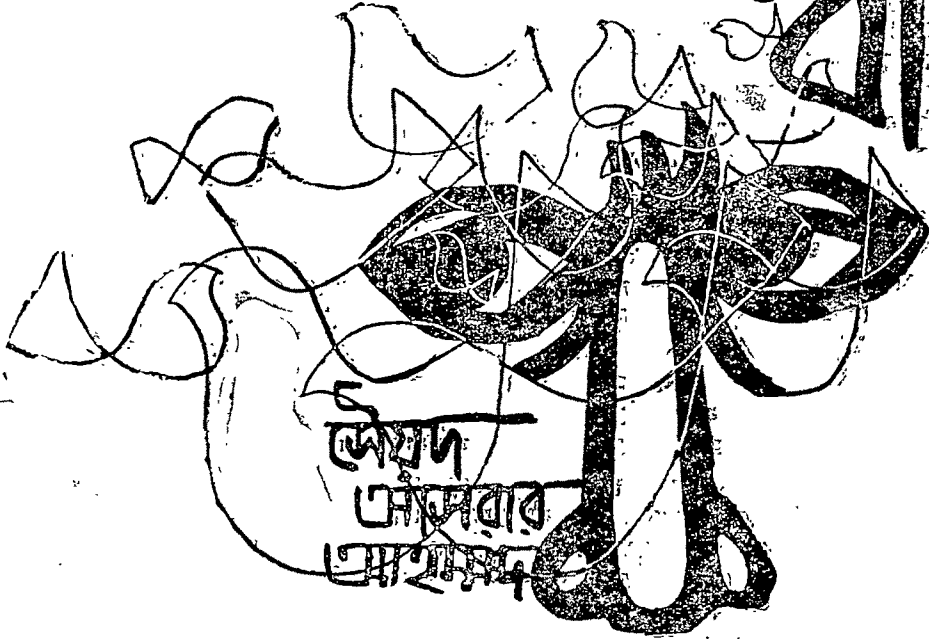
এ্যাপোলো—সম্পাদক নির্মল রায়, কালিদাস দাস, বিষ্ণুনাথ সেনগুপ্ত। পোস্টাল কোয়ার্টার্স, ডায়মন্ডহারবার, ২৪ পরগণা। দাম ২০ পয়সা।

মিনি মাসিক। প্রকাশ করেছেন ডায়মন্ডহারবারের ছাত্র-ছাত্রীরা। আশীর্বাণী দিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন বোস। কবিতা, গল্প, রসরচনা, প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা স্থান পেয়েছে। সুনীল জানা, পুতুল দে, মারা বসু, প্রমথের কবিতা, শ্রীবিষ্ণুনাথের রসরচনা, হরেন্দ্র বসু মাল্লিক সৈকত সেন, অঞ্জন চৌধুরীর গল্প, ডাঃ অরুণ বসু ও মন্য হালদারের প্রবন্ধ ভাল হয়েছে।

মহানন্দ—সম্পাদনায় দিলীপ ধর ও রূপবিজয় ঘোষ। মহানন্দপাড়া, শিলিগুড়ি। দাম দশ পয়সা।

মিনি পোস্টকার্ড পত্রিকা। উত্তরবঙ্গ থেকে প্রকাশিত। লিখেছেন স্বর্গী বাগচী, সুপা চৌধুরী, রজন বিশ্বাস, শবিলক শর্মা। এতেও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় স্থান পেয়েছে।

বসন্তের বাস



ওদিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে রজব আলী হিজিবিজি কি সব ভাবতে থাকলেন। ইদানীং তাঁর মনেরও তেমন ঠিক থাকে না। পড়তি বয়স। হাতে-পায়ে জোর কমে আসছে। একটা বিষয় ভাবতে গেলে হাজার রকমের স্মৃতি-কথারা ভিড় জমায়। সংসার চিন্তা থেকে কেমন যেন দূরে দূরে থাকতেই তাঁর দেহ-মন চায়। অথচ উপায় নেই। উপায় থাকবেই বা কেমন করে? এই তো সংসারের ধর্ম। এ ধর্ম পালন করা একান্ত উচিতকর্তব্য। সুতরাং সে কথা ভেবে নীতির তাড়নায় রজব আলী সরেও থাকতে পারেন না। সেই হাজার রকমের ঝগড়া; ঝামেলার মধ্যে নিজে থেকে জড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হন উনি। না হলে অচল হয়ে পড়বে জীবনযাত্রা। জমিজমা, গরুবাছুর, মৃনিষ-মাইনদার কোন কিছুই ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। সব তাল-বেতাল হয়ে পড়বে। লড়াইপড়াই থাকবে দশ জনে। তাই তো বড়ো বয়সেও বেচারার রজব আলীকে সাত কাজে ছোটোছোটো না করলেও দেখাশোনা করতেই হয়।

চোখ জোড়া আবার এদিকেই গিয়ে পড়ল। সেই ভাঙ্গা দালানের গোপটায়। এই আবার মাদী পায়রাটি মূখে তেমনি শব্দ করছে। আস্তে আস্তে গোপটায় মধ্যে গলাটাকে লম্বা করে ভরে দিচ্ছে।

মায়ের উপস্থিতি উপলব্ধি করে ছোট ছোট বাচ্চা দুটো; মূখে এক ধরনের কিস্তিত চিক-চিক শব্দ তুলে ঠোট দুটো ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। মা আহাঃ এনেছে বেশ বড়তে পেরেছে ওরা। হ্যাঁ, আহাঃ সংগ্রহ করেই তো এনেছে মাদী পায়রাটি। এই তো রজব আলী নিজেই দেখলেন একটু আগে। মিনিট দুয়েক আগে পায়রাটি ডানা ঝাপটে নেমে এলো একতল। দালানের খোপ থেকে একবারে আঙুনায়। খান, চাল, ছোলা; জাতীয় কিছুই এখন আর আঙুনায় পড়ে নেই। এখন হেমন্ত; সুতরাং কার্করই সম্বর। এবং চাল বা ছোলা জাতীয় কোন-কিছু না পেলে কার্করই সংগ্রহ করে পায়রা গুলো দিন কাটায়। এই খোপগুলোয় এরা অনেক কাল থেকে বাস করে আসছে। গোলা পায়রা। অনেক আবার বলে সুখ পায়রা। কিন্তু তেমন সুখ তো আর এখন নেই। গোলাভরা খান! কোঠাভর্তি ছোলা, মূগ, মসুর, এসবের দিন গত। এসব এখন স্বপ্ন। দিব্যস্বপ্নের মত। অথচ হতভাগারা কেন যে এখনো রজব আলীর ঘর ছেড়ে যাচ্ছে না, সেকথা ভাবতে তাঁর আশ্চর্য লাগে। তবে কি, সুন্দর আস্তানা পেয়েছে বলে আর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন ওরা? এই অটলিকার সুখ? পক্ষা দালানের আনন্দ? এটাই

কি মহাসুখ? বাবুই পাখিরা কি ঠাট্টা-তামাসা করে না ওদেরকে? কি জানে কি? ভারতে পারেন না রজব আলী, এতসব কি আর ভাবা যায়? সংসারের কথা ভাবতেই সুখ পশ্চিমে চলে যায়। অন্ধকার হয়ে আসে চারদিক। এর মধ্যে আবার প্রধান দায়িত্ব যে তাঁর আঙ্গার এবাদত। এতেও তো বেশ খানিকক্ষণ সময় দিতে হয়, তাঁকে। তাছাড়া তাঁর এ বয়সটা তো এবাদতেরই বয়স। এখন আর সংসার-ফংসার ও সব মোটেই ভালো লাগে না। সেজন্যই তো মাঝে মাঝে কাজে-কাজে টিলে পড়ে যায়। মৃনিষ-মাইনদাররা সুযোগ পেলেই লড়াইরাজ্য শুরু করে দেবে, এ তো জানা কথা, সুতরাং সে সময়ে এরাও এক হাত গুটিয়ে নেয়। এবং তখনই তাঁর সহধর্মিণী সরিতুন বেগম চিৎকার শুরু করে দিতে ছুঁলে খান না। রজব আলী কান করেন না সে কথা, কিন্তু মাঝে ছাড়িয়ে গেলে ধমক দিতে ইচ্ছে যায় তাঁর, তরুণ পারেন না মাদী সরিতুনকে একটা প্রচণ্ড রকমের বদ আওয়াজ করে স্তব্ধ করে দিতে। এবং না পারার কারণেই আছে অনেক। প্রথম ও প্রধান দুর্বলতা, হচ্ছে বড়ো বয়স। মাদী সেবায়তুটাই এখন তাঁর জীবনের একমাত্র পথ। এ ছাড়া গতানুগত্য নেই। পথ থাকত, কিন্তু সে পথ যে থেকেও নেই। সে রাস্তায় কাঁটা পড়েছে।

ঐতিহাসিক বঙ্গমতী

দু' দুটো ছেলে খেই বড়ো হলো অমনি রাস্তা মাপল। যাবে তো যাক দু'জনেই পালাল পাকিস্তান। এখানে পাশটাস করে কিছদিন চাকরির তালাশ করে না পেয়ে, দু'জনেই বড়ার পার হয়ে গেল। সেবার যাবার সময় তাঁর কাছে অনুমতি চাইতে এসেছিল দু' ভায়ে এক সংগে। কিন্তু অনুমতি দেন নি তিনি। বলেছিলেন, চাকরি না পাচ্ছে তো একজন ব্যবসা করো, আর একজন ছিমজমা দেখাশোনা করো। এ কথা তো বেশ মনে আছে তাঁর। কিন্তু সাহেব-বাচ্চা বেটারা, তা কি আর খাতে পোশায়? বড়ো বাপের কথা মনঃপূত হল না। বাপের অনুমতি না পেয়েও কেটে পড়ল। তখন ভীষণ রাগ হয়েছিল ছেলে দু'টোর উপর। একমাত্র মেয়ে শেফালী, তার বিয়ে দিলেন পাশের গ্রামে। ভেবেছিলেন কাছেই মেয়ে থাকবে সময়ে-অসময়ে দেখে আসবেন। কিন্তু জামাই ডাক্তারী পাশ করে কানপুতরের হাসপাতালে চাকরি পেয়ে চলে গেল। শেফালী বছর-দু'বছরে আসে। তবে প্রায়ই চিঠিপত্র লেখে, তাতে ওরা দু'জনেই অনুরোধ করে আশ্বা, আশ্বা আপনারা দু'জনেই চলে আসুন। চলে আসুন আমাদের এখানে। রজব আলীর মন নেচে ওঠে তখন। মেয়ের কাছে যাবার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন উনি। সারিতুনকে ডেকে চিঠিটা পড়ে শোনান এবং একবার মেয়ে-জামায়ের কাছে হাজির হবার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু স্ত্রী একেবারে নিষ্ঠুর পাথরের মতো নাকচ করে দেন স্বামীর ঐ ধরনের নিলঞ্জ আবদারভরা প্রস্তাবকে। তিনি ঝাঁঝ করে ঝড়ের মতো বলে ওঠেন, 'এ কি বলছ তুমি? বড়ো বয়স লক্ষ্যসরমের মাথা খেলে নাকি? মেয়ে-জামাই আদার করে চিঠি লিখলো, আর তুমি অমনি বায়না ধরলে!'

স্ত্রীর এ ধরনের কথাগুলো নির্মমভাবে রজব আলীর মনে লাগে, উনি নিরন্তরভাবে গুম ধরে বসে থাকেন। প্রচণ্ড রকমের একটা প্রতিবাদ-বিস্ফোরণ করেই বসতেন তিনি, কিন্তু তাঁর দুর্বলতা তাঁকে বিমুগ্ধ করেই রাখে; সেজন্য নির্বাক, নিশ্চল ভাষাহীন হয়ে পড়েন উনি, যেন হাজার বছরের ঝড়-জল-সহ্য পুরানো পাথরখণ্ড, যার মধ্যে একটুকুও প্রাণের স্পন্দন নেই বলে মনে হয়। অথচ এই রজব আলী এক সময়ে জীবন্ত দুর্বীর, দুর্বীরনীতি প্রাণচঞ্চল মানুষ ছিলেন। খালে-বিলে-জংগলে ডাঙলে-ভাঙলে বন্দুকধারী সেই শিকারী মানুষটির কথা ভাবতে গেলে কিম্বদন্তি লাগে। সেদিন আর এখন! অনেক পার্থক্য। আশমান-জমিনের

দূরত্ব। তবু তো দিগন্তে ঐ আশমানের নীল মেঘ নেমে আসে, কিন্তু ছুটে গেলে আরো দূরে চলে যায়—হারিয়ে যায় আরো দূরে। তেমনি ফেলে আসা স্মৃতিকথা ভেবে নিজের স্মরণে জোর পেতে চান উনি, কিন্তু ঐ নীল মেঘের মতো তারাও হারিয়ে যায় এই পাকা হাড়ের অলস মসজায়।

বার্ধক্য নেমে এসেছে দেহে মনে, এখন যে একটু সহায়তা চাই, একটু সেবাযত্ন। আর সেই সেবার সৌধিকা তো ঐ সারিতুনটাই। যতই বদরাগী, বদমেজাজী খেঁকি হোক, তবু সে ছাড়া তো কোন গতি নেই রজব আলীর। এবং নেই বলেই তো স্ত্রীর ঐরকম গোস্যা তাঁকে নীরবে সহ্য করতেই হয়। নৈলে কি আর তিনি ছেড়ে কথা বলতেন? সেই নামডাকঅলা পুরানো শিকারীর রূপটা কি বেরিয়ে আসত না?

আবার ডানা ঝাপটে উড়ে গেল মাদী পায়রাটি। সামনের চালে গিয়ে বসল। পশের খোপে আর দু'টো বাচ্চার ডানা গজিয়েছে। ফুরফুরে ডানা। কদিন থেকে ওড়ার পায়তারা ভাঁজছে। মা-বাপ দু'জনে মিলে ওদের উড়ন শেখাচ্ছে। ডানা শক্ত হলে ব্যস। আর দ্যাখে কে? তখন ছুট! ঐ বড়ো-বুড়ি-গুলোই থাকবে। কোথায় যে উড়ে যাবে ওরা! কে জানে, কোথায়?

একদৃষ্টিতে এই সব দেখছিলেন রজব আলী। মাঝে আবার হারিয়ে গেছিলেন জীবনের কথায়। সেই জংলা মাঠ, কাশ বন, ব্যানার ঝোপ, বিলের উলো ঘাস, হিজলের সরবনে দাঁতালের পিছু ধাওয়া করার অনেক কটা জীবন্ত স্মৃতি। সবচেয়ে বোঁশ করে আজো মনে পড়ে, জাঁদরেল সেই চিতাটিকে কেমন করে উনি ঘায়ের করোছিলেন। সেই সব দিনের কথা ভাসছিল তাঁর মনে। 'কি গো কি ভাবছ অমন করে বসে? তা বলছি কি না, গরু-মোষগুলোকে রাখাল-বাগালরা খেতে-ফেতে দিলে কি না দেখলে?'

চমকে ওঠার মতো দেখাল রজব আলীকে। হ্যাঁ, চমকেই উঠেছিলেন রজব আলী। অকস্মাৎ এ রকম ডাক দিলে কে না চমকায়? সে যতো বীরই হোক আর বাহাদুর। তা ছাড়া বয়সও পড়ন্ত। নার্সগুলো স্বভাবতই দুর্বল। শক্তি ক্রমশ শিথিল হচ্ছে। কিছুই উত্তর করতে পারলেন না উনি। শৃঙ্খল রাগে শক্ত করে নড়ে বসলেন।

ক'পা এগিয়ে এসে তাঁর পাশেই সারিতুন বসে পড়লেন। পরক্ষণেই একটা খাম ব্যাডিয়ে বসলেন, 'এই দ্যাখো বুকুনের চিঠি এসেছে। কি লিখেছে পড় তো!'

রজব আলী চশমার কথাটা বলার আগেই সারিতুন চশমাটা তাঁর হাতে গুঁজে দিলেন।

রজব আলী বেশ লক্ষ্য করেন ছেলেদের চিঠি আসলে তাঁর স্ত্রী বস্তো লাফালাফি শব্দ করে দেন। অথচ মেয়ের চিঠি আসলে অত কেন? অল্প একটুও যেন আন্দোলন অনুভূত হয় না। কিন্তু কেন? এর যথার্থ সদুত্তর হাজার-পাঁচাত্তর ভেবেও উনি পান না। তাই তো উনি বলতেই যাচ্ছিলেন, 'কি ব্যাপার বল তো শেফালীর মা, টুকুন, বুকুনের চিঠি আসলে তুমি আনন্দে আত্মহারা হও, অথচ সেখানে শেফালীর চিঠি পেয়ে অত খুশির বান তো তোমার বুককে ডাকে না?—কিন্তু কেন?'

সেই একই রকমের দুর্বল স্মরণ-গুলো যেন না-না করে ওঠে; কোন বাক্যই উচ্চারণ করেন না রজব আলী।

খামটা ছিঁড়তে কষ্ট করতে হয় না তাঁকে, তার পূর্বে স্ত্রী সাহেবা সব কর্ম সমাধা করেই রেখেছেন। নাকের ডগায় চশমা লাগিয়ে ধীরে ধীরে চিঠিটা পড়তে থাকেন উনি। অধীর আগ্রহে চুপ করে শুনতে থাকেন তাঁর স্ত্রী সারিতুন বেগম।

ছেলেদের নাম উচ্চারণ করতেও রজব আলীর বডো খরাপ লাগে। যতো সব অকেজো ছেলে ওরা। বাপ-মা কতো কষ্ট করে মানুষ করল, আর শেষে কি না বাপ-মাকে ফেলে নিজের সুখ দেখতেই ব্যস্ত। ছেলেদের চিঠি পড়তে কেমন যেন ছিঃ ছিঃ জাতীয় তাচ্ছিল্যবোধ নেমে আসে তাঁর মনে-প্রাণে, তবুও তাঁর স্ত্রীর তাড়নায় কাগজের উপরে কলম চালাতে হয় এবং ওদের চিঠি আসলে তাতে চোখও বোলাতে হয়।

চিঠিটা পড়তে পড়তে হঠাৎ করে থেমে যান উনি। আর পড়তে মন চায় না তাঁর। এ কি লিখেছে বুকুন? না, এ জায়গা তো পড়াই যায় না। অসম্ভব। এর উপরে চোখ বোলানো কিছুতেই সম্ভব হবে না তাঁর স্বারা। মরে গেলেও না।

—কি হল থেমে গেলে যে? পড়ো পড়ো।

স্ত্রীর কথায় নড়ে চড়ে বসেন রজব আলী। টু শব্দটি বের হয় না তাঁর ঠোঁট দু'টোর ফাঁক থেকে, যেন মোটা সুতো দিয়ে শেলাই করে বন্ধ করে দিয়েছে কেউ। আর যেন দারুণ রকমের রক্তপ্রাব হয়েছে তাঁর চোখ জোড়ার, যার দরণ সারা দু'নিরাটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন মনে হল এবং মোটা কাঁচের অসম্ভব পাওয়ারঅলা চশমাটা নিতান্ত অনর্থক

গাথাহক বসুমতী

তবেজো হয়ে গেল তাঁর কাছে। একটা বিদ্রোহী অস্বাভাবিকতার চাপে নাকের ডগা থেকে চশমাটা নামিয়ে নিলেন।

—কি হল তোমার? বিদ্রোহী জেঁন করে প্রশ্ন করলেন তাঁর স্ত্রী!

রজব আলী সোদিকে অক্ষিপাত না করে দূরত্বের চেটে দিয়ে চোখ কচলাতে থাকলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পর ধাতুস্থ হয়ে চশমাটা নিজের থেকেই কানে গুঁজলেন তিনি। কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সমর্থন কেন হেন পাচ্ছিলেন না উনি।

বসুমতী লিখেছে আশ্বা আপনারা চলে আসুন এদেশে। বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবেন। অহেতুক আপনারা ওখানে পড়ে আছেন। কি দরকার আপনারা ওখানে পড়ে থাকার? আমরা দুই ভায়ে এখানে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। তবুও আপনারা জন্ম মন-প্রাণ সব সময়ে কাঁদে। মনের মথার্থ সুখ যেন সেই দারুণ অসুখের কাছে বার বার পরাজিত হয়ে যায়।

বাঃ বেশ আশ্চর্য। না, না। এ অসম্ভব। এ কিছুতেই হতে পারে না। ছেলেরা এই ধরনের চিঠি লিখবে আর উনি কি না সেটা জোরগলায় পড়ে শোনাবেন স্ত্রীকে? এ অসম্ভব। এ হতেই পারে না। বাপের কথা রাখতে পারলে না তোমরা! ছেড়ে ফেলে পালালে, আর এখন কি না তোমাদের অনুরোধ রাখতে হবে আমাকে? এ কিছুতেই সম্ভব হতে পারে না। অসম্ভব। অসম্ভব। নিজের মনে বিড় বিড় করে উচ্চারণ করতে থাকলেন উনি।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কখন নিজেরই অজান্তে দুমড়ে, গুচড়ে ফেলোছিলেন রজব আলী। সোদিকে তাঁর স্ত্রীর চোখ পড়তে ঝাঁঝে উঠলেন উনি। 'এ কি করছ তুমি? খেপে গেলে নাকি?'

—ও হ্যাঁ, তাই তো। কিন্তু—

—কিন্তু আবার কি?

ভাবলেন, এক্ষণি যদি চিঠি পড়ে সরিতুনকে শোনাই তো নাকিসুঁরে কানো শুড়বে। বলাবে চলো একবার ছেলোদের কাছ থেকে ঘুরে আসি। অত আশ্চর্য কেনের? ওরা আমার ছেলে নয়। ওরা কি ছেলে? ওরা আমার রক্তের? যদি রক্তেরই হবে তো ছেড়ে পালাল কেন? আমাদের শেষ দিনের কথা ভাবা উচিত ছিল না কি ওদের? অথচ সরিতুন ওদেরই জন্য কান্না শুড়বে। না, কিছুতেই পড়বেন না উনি। মধ্যে ক'বার তো পড়োছিলেন, তাতে বড়ো জ্বালাতন করেছিল তাঁর স্ত্রী। কোন রকমে টালবাহানা করে কাটিয়ে দিয়েছেন উনি। না এবার আর

নয়। চিঠিটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতেই ইচ্ছে যাচ্ছিল তাঁর। ছেলে দুটোর উপর কেমন যেন এক গভীর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। এমনিতে জন্মায় নি, ওরাই তৈরি করে দিয়েছে।

—কি হল? তলদি চিঠি পড়ে শেষ করো।

সরিতুনের সুঁরে কড়া আদেশের স্পষ্ট প্রলেপ। রক্ষ বংকার। রজব আলী বেশ বুদ্ধিতেই পাংছেন, এবার তাঁর স্ত্রী রাগে ছেটে পড়বেন, অহেতুক গোলযোগ সৃষ্টি হবে। অতএব হুয়া বাঁচবার ভয়ে অত্যাগ অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ অবধি চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দিলেন উনি। এবং ক্ষিপ্তভাবে পকেটে হাত দিয়ে একটা বিড়ি বের করে জ্বালালেন।

টুকুন, বুকুন দু'জনে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়াতে রজব আলী কেমন যেন আধক্ষাপা, আধপাগলাগোছের হয়ে পড়েছেন। ইদানীং ছেলেদের নাম শুনতেও তাঁর খারাপ লাগে। মেজাজ বিগড়ে যায়। এই একই কারণে তাঁর থলে-ঝাড়া খোকনটাকেও সেনের চোখে দেখতে ইচ্ছে যায় না তাঁর।

বিড়িটা অর্ধেক টানা হয়েছে এমন সময় কোথা থেকে ছুটেতে ছুটেতে খোকন এসে হাজির হল। রজব আলীর সামনে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আশ্বা টাকা দেন। কুড়ি টাকা। স্কুলের বেতন লাগবে।'

খোকনের কথাটা শুনতেও যেন শুনলেন না রজব আলী। উনি যেন আর এ সব আশ্চর্য কিংবা আবেদন কিছুই শুনতে চান না। এ প্রকার আবেদন যে তাঁর মোটেই ভাল লাগে না। ছেলের দিকে চোখ তুলে চাইতেই তাঁর কেমন যেন বিদ্রোহী একটা স্মৃতি মনে পড়ে, মনটা বিষাক্ত দুর্গন্ধময় হয়ে পড়ে তখন। সেজন্য খোকনের দিকে বেশীক্ষণ চোখ রাখতে পারলেন না তিনি। চোখজোড়া আবার ওদিকেই গিয়ে পড়ল। মাদারী পায়রাটা নিজের মূখের আহার বাচ্চা দুটোকে দিচ্ছে।

সেই একই রকম শব্দ তার কণ্ঠনালীতে ধ্বনিত হচ্ছে। ওদিকে পাশের খোপ থেকে বেরিয়ে দুটো বাচ্চা কাঁচ ডানায় ভর করে আস্তে আস্তে বাতাসে ভেসে এ-চাল, ও-চাল করে উড়ন শিখছে। এ দু'রকমের দৃশ্য আজ নতুন দেখছেন না রজব আলী, অনেক বছর থেকে দেখে আসছেন। অমনি মূখের আহার খাইয়ে, অমনি উড়ন শিখিয়ে বাস। তার পর? কে কার? যেমনি ওড়া শিখলো, অমনি চলে গেল অন্য জায়গায়, যেখানে সুখ পাবে, সেখানে বাস করবে ওরা। এই মা-বাপদের কেউই খোঁজ করবে না। এমনি দৃশ্য উনি অগুরুত্বের সাথে দেখেছেন।

খোকন আবার বলল, 'আশ্বা বেতন লাগবে টাকা দিন।'

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে অনেক গভীরে তলিয়ে গেছিলেন রজব আলী, খোকনের ডাকে সম্বৎ ফিরে এলো তাঁর। তবুও কোন উত্তর করতে পারলেন না উনি। কিসব কথা ভাবতে ভাবতে আবার আনমনা হয়ে যাচ্ছিলেন। এক সময়ে চোখ তুললেন খোকনের দিকে এবং পরক্ষণেই দৃষ্টিকে ছুড়ে দিলেন ভাঙা দালানের কবুতরের বাচ্চাগুলোর দিকে। ক্রমান্বয়ে বার কয় এমনি করার পর, একটা প্রচণ্ড রকমের বিস্ময়ে উনি হারিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে কি এক ভীষণ রকমের পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন উনি। সে এক কিস্তিত, আর বীভৎস রকমের পরিবর্তন। খোকন যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে আর খোকন নেই, সেখানে এককাক কবুতরের বাচ্চা উপস্থিত, আর ঐ ভাঙা দালানের খোপগুলোয় যেন খোকনের মূখের আদল ভাসছে। এ জাতীয় পরিবর্তনে রজব আলী আঁতকে উঠছিলেন। বার বার চোখ কচলাতে থাকলেন উনি। তবু যেন সেই একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকল।

সায়ন গাধবাচার্য বা বিদ্যারণ্য মুনীর বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

১ম খণ্ড মূল্য চার টাকা

২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড—প্রতি খণ্ড মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ৥ কলিকাতা-১২

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল ?

মুকশি

আজকাল মুরশিদপুর লেখায় আকাশ-বাণীর গায়কদের বিষয়ে কোনো আলোচনা পাই না কেন? প্রশ্ন করেছেন একজন পাঠক। লোকসঙ্গীত গায়কদের সবচেয়ে বড়ো 'এমপ্লয়ার' হলেন: আকাশবাণী। সেখানে নিত্য নতুন শিল্পীর আমদানী। তথাপি নাকি এতো অডিশন পাশ করা শিল্পী প্রোগ্রাম একাজিকিউটিভের দরজায় কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যে; গল্প শেষ করা যায় না। কাজেই শিল্পীবিশেষের বিশেষ দিনের প্রোগ্রাম ধরে ভালমন্দ বিচার করা ছাড়া উপায় নেই। তত্বগত বিমূর্ত আলোচনা না করে বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা প্রোতাদের সাহায্য করে বেশি। কিন্তু মস্তিষ্ক হলো, সামান্য-তম বিরূপ সমালোচনাও কেউ সহ্য করতে চান না। আকাশবাণী অডিশনের স্কারো-ম্যানের গোঁফে কিঞ্চিৎ তেল মালিশ করে যে সব বেসুদ্রো, বেতালার দল সেখানে ঢুকে পড়েছেন, তাঁদের রেডিও-শিল্পী হওয়ার যশ এবং কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জনের পথে বাধা হতে চাই না। তাছাড়া আমার সমালোচনা তাঁদের গায়ে আঁচড়াটুকু কাটতে পারবে না, কারণ এরা নিশ্চয়ই খাঁতির লোক। আবার প্রশংসা করারও বিপদ আছে। অতীতে অনেক শিল্পীর প্রশংসা করে-ঠকেছি। একদিনের প্রোগ্রাম শুনে যাকে প্রশংসা করেছি, পরের একটা প্রোগ্রামে তিনি হয়ত একবারে হতাশ করেছেন। শহুরে শিল্পীদের অধিকাংশের মধ্যেই এরকম বৈষম্য ও বৈপরিত্য দেখা যায়। যাদের মধ্যে প্রথম দিকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলাম, ক্রমশঃ তাদের অনেকেরই অবনতি ঘটতে দেখেছি। এজন্য সাধারণভাবে কাউকে প্রশংসা করতেও ভরসা পাই না। অনেকদিন ভেবেছি কেন এমন হয়? পাঠক এবং প্রোতাদের সঙ্গে আমার চিন্তার সামান্য বিনিময়: আজকের আলোচনার প্রথমাই করতে চাই।

যাঁরা জাত-গ্রামগায়ক, অর্থাৎ শহুরে

থাকলেও শহুরে হয়ে যান নি কিংবা গ্রামের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ যাঁদের আছে, তাঁদের গলা শুনেই বোঝা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের সম্বন্ধে হতাশ হতে হয় না। কারণ এঁদের কণ্ঠ ও বাক্যবিন্যাস ভূমিজ। কিন্তু যাঁরা শহুরে আধুনিক পরিবেশে আধা-গ্রাম্য আধা-শহুরে হয়ে আছেন, কিংবা পুরাপুর শহুরে বসেই কারও কাছে গান শিখেছেন, সমস্যাটা তাঁদের নিয়েই। তাঁদের সমস্যার কয়েকটি দিক তুলে ধরতে চাই।

(ক) কোলকাতার কিছু লোকসঙ্গীত গায়ক বা গায়িকাকে জানি, যাঁরা লোকসঙ্গীতকে অন্তর দিয়ে ভালবাসতে পারেন নি। তাঁদের খাতায় দেখেছি লোকসঙ্গীতের চেয়ে আধুনিক গানের সংখ্যাই বেশি। বাড়িতে তাঁরা গুন-গুন করে লোকসঙ্গীত ততটা করেন না—যতটা করেন জনপ্রিয় আধুনিক চলচ্চিত্র বা রেকর্ডের গান। আজকালকার আধুনিক গানের রচনা, কথা, সুর ও চম্ভে দেশজ বর্ণ বা গন্ধ কিছুই থাকে না, যেমন আগে থাকতো। আজকালকার আধুনিক গান হলো বারোবাজারী পণ্য। এই রুচি নিয়ে কি করে একজন লোকসঙ্গীতকে ভালবাসতে পারে? যে গরীব শ্রমজীবী জনসাধারণ লোকসঙ্গীতের প্রস্তুতি, তাঁদের জীবনের সংগ্রাম ও আকৃতি-যাঁদের মনের তন্দ্রাতে কম্পন তোলে না, তাঁদের গলায় সুর থাকলেও তাঁদের গান হৃদয় স্পর্শ করতে পারে না। অর্থকরী দিক বিবেচনা করে অনেকেই লোকসঙ্গীত ও আধুনিক সমানভাবেই গেয়ে থাকেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্যাম-কুল দড়ী রাখতে পারেন না।

(খ) দ্বিতীয়ত: সঙ্গীত সম্বন্ধে attitude-এর প্রশ্ন আছে। সামগ্রিক সম্মান-হিসাবে খেয়াল, ঠুরী, ভজন, কীর্তন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, এমন কি আধুনিক গীতের যে মর্যাদা এবং সেই সব সঙ্গীত-শিল্পীর যে কদর, লোকসঙ্গীতশিল্পীর

তা নেহ। তারা নিজেরাও অনেক সময় নিজের মনে করেন অন্তত। সঙ্গীত-শিল্পীদের মধ্যে সাধারণভাবে এ মনোভাব লক্ষ্য করেছি। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে কোনো শিক্ষিত লোকসঙ্গীতশিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত কিছু বুঝি না বা জানি না বলতে নিশ্চয়ই লজ্জাবোধ করবেন এবং আমি মনে করি করা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক এমন অনেক আছেন, লোকসঙ্গীত কিছুই জানি না বা বুঝি না বলতে যাঁদের গলায় আটকার না। এ তাঁরা লজ্জার বিষয় মনে করেন না। সেখানে আমাদের শিক্ষিতের আভিজাত্য হলো—'আমি ইংরাজী ভাল জানি তবে বাংলাটা তেমন আসে না', সেখানে এ মনোবৃত্তি স্বাভাবিক। কোলকাতার সঙ্গীত সমাজেও এ ধারণা আছে যে, লোকসঙ্গীত তো কেবল দাদরা, কাহারবার কারবার এবং তা সহজেই আয়ত্ত করা যায়।—কিন্তু লোকসঙ্গীতশিল্পী নিজে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে অন্য সঙ্গীতের লাইনে অকৃতকার্য হয়ে লোকসঙ্গীতের 'লাইনে' আসতে চান। এজন্যই একবার আমি লিখেছিলাম 'যার নাই কোনো গতি, সে গায় পঙ্গুগীতি'।

(গ) অনেক লোকসঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠ ভাল, কিন্তু তাঁরা তাঁদের 'ভালস্বের' সীমানাটা জানেন না। যেই সামান্য প্রশংসা পেলেন, অর্মান ভেবে নিলেন, তিনি যে কোন অঞ্চলের, যে কোন স্টাইলের লোকগীতি গাইতে পারবেন। তাঁরা জানেন না, লোকসঙ্গীতের অত্যন্ত স্বাভাবিক চরিত্র হলো—সুরে, কথায়, উচ্চারণে ও ভঙ্গীতে তার আঞ্চলিকতা। অতীতে প্রশংসা করেছি এরকম কয়েকজন গায়ক বা গায়িকা নিজেদের সীমা না বুঝে পথভ্রান্ত হয়েছেন। পূর্ববঙ্গের স্টাইলে হয় তো তিনি ভালই গান অর্থাৎ তিনি উত্তরবঙ্গের স্টাইলে গাইতে গিয়ে নিজেকে হান্যাস্পদ করে তুলেছেন। তবন আর তাঁকে ভাল

সাংগাহিক বসুমতী

গাইয়ে বলি কি করে? খুব কম গায়কই এই আঞ্চলিকতার সীমানা পার হস্বে যেতে পারেন। তাতে লজ্জার কিছুই নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক। এমন যে শচীনদেব বর্মণ, যার নাম বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের সঙ্গে চিরদিন উচ্চারিত হবে, তিনি আব্বাসউদ্দীনের কাছে ভাওয়াইয়া শিখতে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তিনি সত্যিকারের গুণী শিল্পী, তাই তাঁর বুদ্ধিতে সময় লাগলো না যে, ভাওয়াইয়া তাঁর হবে না। তিনিও আর গাইবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু এই মাত্রাজ্ঞান আকাশবাণীর বর্তমানে নামকরা গায়কদেরও অধিকাংশের নেই।

(ঘ) শহরের লোকসঙ্গীতশিল্পীদের অধিকাংশই লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে কোনো পড়াশুনা করেন না। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বাংলায় ইদানীং বাংলার লোকসঙ্গীতের ওপর অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে—যা পড়লে লোকসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারার—সামাজিক, সাহিত্যিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মান্তরিত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। এই মূখে মূখে রচা সাহিত্য (Oral literature) এবং মূখে মূখে রচা সূত্র (Oral Composition) এর প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত জানা শুদ্ধ গবেষক নয়, প্রত্যেক গায়কের অবশ্যকর্তব্য। নিরক্ষর পল্লীশিল্পী নিজ পরিবেশ ও শ্রমজীবন থেকে যা সহজাতভাবে পান—অন্যরা তা পেতে পারেন না।

এই অজ্ঞতার জন্য অনেক শহরে গায়ক গানের নির্বাচন করতে পারেন না এবং উপস্থাপনায় দারুণ ভুল করেন। গান করেন অথচ বাউল বা সুফী দর্শন সম্বন্ধে এবং বাংলাদেশে তার সমন্বয় ঐতিহাসিক দিক থেকে যে সামাজিক ভূমিকা পালন করেছে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায়ই তিনি বাউল গান করেন। বাউলের যে মরমী মানবতা যা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছিলেন, তা ছিল সমাজের বর্ণহিন্দু এবং শরিয়াতী শাসনের আচার-বিচার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই বাউলের মধ্যে বিকৃতি এসেছে—কতকগুলি গড় গড়াতড়ের কচকচানিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং অনেক বাজে ব্যর্থ গানেরও জন্ম দিয়েছে। তা বিচার না করে অনেকে কাব্য, অভিব্যক্তি ও মরমী জীবনবাদী গান না গেয়ে বাউলের নামে হরেক্ষু, হররাম জাতীয় বাউল গান গেয়ে থাকেন। বাউলের সহজ ভাব ভ্রম গায়কের গানে যত কম, তত বেশী ভগ্নী ও তালের বাহুল্য—যাতে গলার চমক ও খমকের গমক থাকে, কিন্তু অন্তর্ভূত কর্তব্য আবেদন কিছুই থাকে না।

(ঙ) পশ্চিমত শুদ্ধ লোকসঙ্গীতে নয়,

শিল্প-সাহিত্যে, জীবনে সর্বত্র আজ নিষ্ঠা-হীনতা। সমর্পিত প্রাণ কেউ নন। কাজেই সন্তায় কিস্তিমাত করার প্রবৃত্তি সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও প্রবল। লোকসঙ্গীতের সাগরে কেউ নামতে রাজী নন—পার থেকে ঝিনুক কয়েকটি কুড়িয়েই সাগরের গান গাইতে চান। পুঁজিপাটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, কেউ বা ঘরে বসে গান রচনা করছেন, কেউ বা “রাই জাগো গো” কিংবা “জাগিয়ে লহ কৃষ্ণনাম” গেয়ে নিজেকে জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন। অবশ্য শিল্পীদের দিক থেকেও বলবার আছে। নিষ্ঠার দাম কে দেয়? রেকর্ড কোম্পানী চায় কমার্শিয়াল লোকসঙ্গীত, জলসায়ও তাই। রেডিওতে ভাল গাইলেও ৬ মাসে ৯ মাসে প্রোগ্রাম। খারাপ গাইলেও প্রোগ্রাম পাওয়া যায় ভাল গাইয়ের চেয়ে বেশি যদি “ব্যাকিং” থাকে। পয়সার কথা বাদই দিলাম।

শিল্পীর আত্মপ্রকাশের জায়গা কোথায়? উপরের এই বিশ্লেষণের আলোকে আমি কিছু শিল্পীর সম্বন্ধে আলোচনা করবো—যাদের কণ্ঠে খাঁটি জিনিস আছে কিংবা তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছি। মায় কয়েকজন শিল্পীর নাম করবো—তাঁদের গত এক বৎসরের প্রোগ্রামের বিশ্লেষণের ভিত্তিতে। আরো শিল্পী নিশ্চয়ই আছেন, যাদের নাম আজ উল্লেখ করবো না, অথচ যারা মোটামুটি ভাল গাইছেন। আমি কেবল আলোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবেই নাম-গুলি উল্লেখ করছি।

প্রথমেই কয়েকজন মেয়ে-শিল্পীর নাম করবো, কারণ সামাজিক রীতি অনুসারে মেয়েদের স্থান সর্বোপরে।

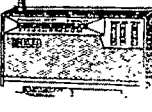
আকাশবাণীর লোকসঙ্গীতের আসরে একটি আকর্ষণীয় কণ্ঠ কৃষ্ণা সাহা। তাঁর সুদেহা, উদাত্ত গলায় এমন একটা দেশজ ভাব আছে, যা শহরে গায়কদের মধ্যে বিরল—কিন্তু তিনি হয়ত নিজেরই ভা জানেন না। তাই তিনি এখন আধুনিক অর্থাৎ লহুসঙ্গীতে ঝুঁকছেন। এটা কি শুদ্ধ অর্থের মোহে? আধুনিক সমাজে আধুনিক হতে গেলে আধুনিক গান গাইতে হয়, সেজন্যও হতে পারে। তাহলে তা দুঃখের। তিনি যদি চেষ্টা-চরিত্র করে কলকাতার বর্তমান প্রেক্ষা আধুনিক শিল্পীদের পর্যায়ের উঠতেও পারেন, তবে লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকে বিসর্জন দিয়েই তা সম্ভব হবে। তিনি যদি মনে করে থাকেন যে, দুটোতেই সমান দক্ষতা তাঁর আছে, তবে ভুল করবেন। এক বৎসর আগে ১২রা জুন, ১৯৬৯ একই দিনে তাঁর আধুনিক ও লোকসঙ্গীতের প্রোগ্রাম দুটাই শুনছিলাম। এ ধরনের আধুনিক গায়িকা আকাশবাণীতে অসংখ্য আছেন কিন্তু তাঁর মতো লোকসঙ্গীত গায়িকা সর্পি নেই। এক বৎসর পরে আবার কয়েকটি প্রোগ্রাম

যেমন গত ৫ই ফেব্রুয়ারীতে শুনে এই মতে আমি আরো দৃঢ় হয়েছি। তাঁকে শুদ্ধ একটা কথাই স্মরণ করিয়ে দেব, “স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ।”

ললিতা রায়চৌধুরী একটি জোরালো সুদেহা গলা—যদিও একটু বেশি মার্জিত। তিনি আধুনিক গানের রেকর্ড করেছেন এবং পাবলিসিটিও যথেষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু লোকসঙ্গীতের কাদামাটির পথ ছেড়ে পাকা সড়কে যেতোই হাঁটছেন, ততই কণ্ঠের কাদামাটী যতটুকু ছিল তা ধরে গিয়ে সিমেন্টের পালিশ লাগছে। গত ৪ঠা আগস্টে তিনি আবার প্রোগ্রাম করেছেন। সকালের প্রোগ্রামে তাঁর ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন, কিন্তু রাতে বিশেষত লালনের গানটি ব্যর্থ হয়েছে। বাউলশ্রেষ্ঠ লালনের গানের বৈশিষ্ট্য, তার সহজ কাব্যের মাধুর্যের সঙ্গে গভীর ভাবাবেগ-আশ্রিত বক্তব্য। অত্যন্ত সহজভাবেই তা গাইতে হয়। সুমার্জিত ভাগিসর্বস্বতায় তার মৃত্যু। সুমার্জিত গলার অলঙ্করণ থাকলেই যদি ভালো লোকসঙ্গীত গায়িকা হওয়া যেতো তবে প্রতিমা বন্দোপাধ্যায় কিংবা বনশ্রী সেনগুপ্তই হতেন শ্রেষ্ঠা লোকসঙ্গীত গায়িকা।

লোকসঙ্গীতের রক্ষা-মাধুর্যে ভরা একটি কণ্ঠ কল্যাণী বিশ্বাস। অতীতের অনন্তবালা বৈষ্ণবী বা ললিতা দেবীর মতো তাঁর গলায় আছে একটা পূর্বযুগলী ভারি কী চণ্ড। তিনি লোকসঙ্গীত ছাড়া অন্য সঙ্গীত করেন না। অনেকদিন যাবৎ তিনি আকাশবাণীতে গাইছেন পূর্ববঙ্গের চণ্ড এবং স্ট্যান্ডার্ড বজায় রেখে। কিন্তু তিনিও মাঝে মাঝে সুরে পাট কষতে গিয়ে পথ থেকে বিচ্যুত হন। গত বৎসর ২২শে ডিসেম্বরের প্রোগ্রামে তাই করেছেন। তিনি গোষ্ঠের এবং বিলম্বিত লয়ের ভাটিয়ালী গাইতে পারেন ভাল। কিন্তু তিনিও সীমারেখা মাঝে মাঝে লঙ্ঘন করেন। একক মেয়েলী গলায় সারিগান গাইতে যান। সারিগানের ছন্দপ্রাধান্যে সমবেত বলিষ্ঠতা তাঁর গলায় আসবে কেন।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার



ন্যাশনাল জেম
ও ব্যান্ড অলওয়ান্স
পোর্টেবল ট্রানজিস্টার
মূল্য ১৬৫ টাকা। মাত্র
১০ টাকা মাসিক কিস্তিতে প্রত্যেক
শহরে এবং গ্রামে পাঠান যায়। যোগাযোগ
করুনঃ

A. E. CORPORATION
(B.W.) Post Box No. 2117,
Delhi-7

সাহিত্যিক বঙ্গমতী

তার সঙ্গে 'হে', 'হেয়া' বলে টান মারলে ফল হয় 'এ্যাণ্ট-ক্রাইমেন্স'। তার আরেকটা দুটি, গানের কথা বোঝা কঠিন, উচ্চারণ অস্পষ্ট, তাতে কব্যরস হয় ক্ষুদ্র।

আকাশবাণীর লোকসঙ্গীতে প্রাচীন-তমাদের একজন হলেন সিদ্ধুরাণী ধর। পূর্ববঙ্গের ষাটি ওগুটি দীর্ঘদিন ধরে তিনি গলায় অটুট রেখেছেন। তিনিও লোক-সঙ্গীতই কেবল করেন। তার জনাই বোধ-হয় এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু ইদানীং তাঁর কণ্ঠও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে। অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে গেয়ে যান—আবেগের স্পর্শ তাতে থাকে কম। নাগরিক, যান্ত্রিক, আত্মকেন্দ্রিক জীবনে আমরা প্রত্যেকেই কর্মবোধি বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত। বিশেষ করে মেয়েদের পক্ষে গলার সজীবতা রক্ষা করা কঠিন। তবু শ্রীমতী ধর বৈচিত্র্য আনবার জন্য সুরকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করেন না। তবে তিনি চটকা বা সারিগান গাইতে যান কেন? এগুলি ভগ্নপ্রধান, সুরপ্রধান নয়। মেয়েলী কণ্ঠে এসব গানের বাক্যবিন্যাস খুব কঠিন।

রত্না সরকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম। বেশ কিছুদিন ধাবণ তিনি আকাশ-বাণীতে গাইছেন। শৃঙ্গ লোকসঙ্গীতই তিনি করেন। অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন, যেতারে ততটা পারেন নি। তবে ক্রমশ তিনি আকাশ-বাণীর সময়বাঁধা আড়ষ্ট পরিবেশের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। গত ৩রা জানুয়ারী ও ১৩ই জুনের প্রোগ্রামে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ববঙ্গের গানের আবেগ ও গায়কীতে তিনি সিদ্ধকণ্ঠী। কিন্তু তথাপি বলতে হয় কোন কোন সময় তাঁর গলা বন্ধ বেশি পরিমার্জিত মনে হয়। গানের নির্বাচন তাঁর আরো সাবধানে করা উচিত। “লোকে বলে, বলে-রে ঘরবাড়ি ভাল। নায় আমার” একটি বিশেষ চণ্ডের গান—যা তাঁর কণ্ঠে তেমন রূপ পায় না।

কল্যাণী মজুমদার করেন লোকগীতি ও কীর্তন। মানসী পাল করেন লোক-গীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত। বীণা ঘোষ করেন লোকগীতি ও আধুনিক। কাঁদের গলা মিষ্টি ও সুবোলা, কিন্তু লোকসঙ্গীতের গায়কীর অভাব অর্থাৎ স্পেসালাইজেশনের দিকে এঁদের নজর কম। এরকম আরো আছেন—আজ আর নাম বাড়াবো না।

কিন্তু এঁদের সবাইকে একটা অনুরোধ করবো লোকসঙ্গীতে মেয়েলী গান বলে বিশেষ এক শ্রেণীর গান আছে বিয়ে কিংবা ব্রত-পার্বণে যা মেয়েরা আগে গাইতেন। যেমন বিয়ের গান। আজকাল বিয়ের সময় কেউ গায় না। কিন্তু ব্রত বা বিয়ের অন্ত্যেস্তান উঠে গেলেও গান বেঁচে থাকে। বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হওয়া থেকে আরম্ভ করে কলে বিদায় পর্যন্ত প্রতি পর্যায়ে

অসংখ্য গান-আছে—যার মধ্যে আমাদের সমাজে নারীজীবনের বিচিত্র প্রাণস্পর্শী চিত্র আছে। সুরের দিক দিয়েও সাধারণ ধারার থেকে তার একটা বিশেষ পাখ্য পাওয়া যায়—যা আমাদের লোক-সঙ্গীতে একান্ত করে নারীদের দান। সেসব গান কি আকাশবাণীর গায়িকার সংগ্রহ করতে পারেন না? কিংবা ব্রতের গান? কেউ কেউ মনে করতে পারেন, তা একঘেয়ে কিন্তু আমাদের কাছে তা অত্যন্ত মূল্যবান।

এবার কয়েকটি পুরুষ কণ্ঠের আলোচনা করবো। প্রথমেই যে নামটি আমার মনে এলো তিনি হলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি একজন প্রাচীন শিল্পী, কবি জসিমুদ্দীনের সময়কার। অনেকদিন যাবৎ তিনি আকাশবাণীতে গাইছেন। অতীতে আমি তাঁর প্রশংসা করেছি। কিন্তু গত ২০শে আগস্টের সকালে ও রাত্রের প্রোগ্রামে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, আকাশবাণীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের তিনি অন্যতম। এই বিকৃতির যুগে যে তিনি তাঁর কণ্ঠের বিশুদ্ধতা বজায় রেখেছেন—এটা সত্য অন্য শিল্পীদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত। সন্তোষ-বাবুর একটা বৈশিষ্ট্য হলো ভাটিয়ালী ও ভাওয়াইয়া দুটোতেই সমান দখল। তাঁর কণ্ঠের এই ‘ফ্লেক্সিবিলিটি’ বা স্থিতি-স্থাপকতা একটি বিরল জিনিস। তা ছাড়া তিনি অত্যন্ত সংযত, অপ্রয়োজনীয় অলঙ্করণের লোভ তিনি সংবরণ করতে জানেন—যা অনেকেরই নেই। সন্তোষবাবু নজরুল-গীত এবং রাগসঙ্গীতও করে থাকেন। এখানে নিশ্চয়ই আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে অন্য গান গেয়েও তো লোকসঙ্গীতের গায়কী রক্ষা করা যায়। নিশ্চয়ই যায়। আত্মসম্মান আধুনিক গান ও ইসলামী গান লোকসঙ্গীতের চেয়ে বেশি করেছেন। শচীনদেব বর্মণ রাগ-প্রধান বাংলা গানেই প্রতিষ্ঠিত হন প্রথম। আমাদের বক্তব্য শৃঙ্গ—জিনিসটা ভীষণ কঠিন। তা ছাড়া শিক্ষিত লোকসঙ্গীত গায়ক যারা, তাঁদের রাগসঙ্গীতের প্রথম পাঠ নেওয়া শৃঙ্গ উচিত নয়, অবশ্যকর্তব্য বলেই আমি মনে করি। রাগসঙ্গীত, কীর্তন ও লোকসঙ্গীত অভ্যন্তর কাছাকাছি ও সমধর্মী জিনিস। মাত্রাজ্ঞান ও সঙ্গীত-চেতনা না থাকলেই ভারসাম্য রক্ষা করা কঠিন। লোকসঙ্গীত-চেতনা লোকজীবনের পরিচিত ও প্রত্যক্ষ স্রুতি থেকেই আসে। সেই চেতনা পরোপরি ছিল বলেই শচীনদেব বা আত্মসম্মান মূলে ভুল করেন নি।

এক্ষেত্রে একটি নতুন আকর্ষণীয় নাম অংশমান রায়। অনেকদিন আগেই তাঁর একটি গান “সাঁঝে ফোটে ঝিঙা ফল—সকালে ফলিন গো” আমাদের চমক লাগিয়ে

দিয়েছিল। শৃঙ্গই মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই তিনি করম, ভাদু, ভুস অঞ্চলের লোক। রাঁচি, ছোটনাগপুরকেন্দ্রীক আদিবাসীর পরম্পরাগত এই বিশিষ্ট ধারাকে পরোপরি বাংলা লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা—এ বিষয়ে প্রশ্ন আছে। কিন্তু সে আলোচনায় না গিয়েও একথা বলতে পারি, এঁরা আজ বাংলার চিরস্থায়ী বাসিন্দা এবং গানগুলি বাংলাতেই রচিত ও গীত। এই বাংলা রচনাগুলির এক অদ্ভুত আশ্বাদ আছে। বাংলা দেশের সাঁওতাল, ওঁরাও বা মন্ডাদের অবস্থিতির কথা আমরা প্রায় ভুলেই থাকি। কাজেই তাঁদের অপরিপূর্ণ গানগুলি যদি আকাশবাণীর লোকসঙ্গীতের আসরে আমরা শুনতে পাই, তবে মস্ত বড়ো উপকার হবে। এ বিষয়ে অংশমান রায় মহাশয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কয়েকদিন আগে তিনি একটানা ভাদু গাইলেন—চমৎকার লাগলো। অংশমানবাবু অন্যান্য অঞ্চলের, যেমন—পূর্ববঙ্গের লোক-সঙ্গীতও গান। তাঁর গলা ভাল, যদিও স্টাইল তেমন হয় নি। তিনি আবার আধুনিক গাইতে শুরুর করেছেন, তাই ভয় হয়, যে বিষয়ে তিনি আশ্বিত্য, সে জিনিসটা না হারিয়ে ফেলেন।

অমর পাল এবং বিষ্ণুপদ দাস সম্বন্ধে অতীতে অনেক বলেছি। দীর্ঘকাল ধাবণ তাঁরা লোকসঙ্গীতের মর্যাদা রেখেছেন ও বাড়িয়েছেন। তবু আজ সামান্য সমালোচনা করবো।

ভাটিয়ালীর বিলম্বিত বিস্তারের অকৃত্রিম জপটি অমর পালের কণ্ঠে যেমন ধরা পড়ে—আর কোন শিল্পীর কণ্ঠে তেমন পড়ে না। সেই কণ্ঠে যদি কৃত্রিমতা আসে তখন দুঃখ হয়। গত ১৫ই জুলাই রাতে তিনি ‘নদী-রে দিনের সুর্য্য ভূমি আমার’—এই গানের টানে কৃত্রিম স্টাশট দেওয়ার চেষ্টা করেছেন—যা তাঁর কাছ থেকে আশা করা নি।

বিষ্ণুপদ সম্বন্ধেও কিছু বক্তব্য আছে। অতীতে আমি কয়েকবার বিষ্ণুপদের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রশংসা কলসেও একটি কথা বলাছিলাম। “বিষ্ণুপদ দাস পালে হাওয়া বহাতে ততটা পারেন না, যতটা পারেন জোরে বৈঠা মারতে।”

দুঃভয়ের, ছন্দপ্রধান গানের দিকে তাঁর ঝোঁক বেশি। গ্রামেব জীবনে রঙ-ঠাট্টা-মসকরার একটা বিশেষ স্থান আছে। সে ধরনের গান পল্লীপ্রাণের সজীবতারই সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু আজকের শহরের বিকৃত রূচি দর্শকের কাছে যদি কেউ গায় “গনডায় আমার বিষয়। বিষয় করে” তখন তাঁরা তার মধ্যে তাঁদের তরল রুচিরই প্রতিধ্বনি খুঁজে পান না। আকাশবাণীতে দর্শকেরা সামনে থাকেন না—সেখানে শিল্পীর অনেকটা স্বাধীনতা

আছে বটে কিন্তু ছন্দপ্রাথ্য, হৈ-হজা এবং চটকা ধরনের গানের সংখ্যা এতো বেশি যে, গভীর আরেকবার অবকাশ তাতে নেই। সেই পরিবেশে ভাঁকে তাঁর গানের নির্বাচন সাবধানে করতে অনুরোধ করবো। আরেকটা কথা, যদিও তিনি পূর্ববঙ্গের লোক, তবু ভাওয়াইয়ার স্টাইল তাঁর গায় চমৎকার আসে। তিনি সৌন্দর্যকে কেন স্পেশালাইজ করেন না! বর্তমানে আকাশবাণীতে ভাওয়াইয়া গায়কের সংখ্যা খুব কম। উত্তরবঙ্গে গান এমন জীবন-যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের দেহতন্ত্র বা টেকবী ভাব কিছুই সেখানে ঢুকতে পারে নি। বিজ্ঞপ্তির কণ্ঠে সে সব গানই আমরা শুনতে চাই। ভঙ্গী দিয়ে শব্দ নয়, ভাব দিয়ে জয় করুন।

শশাঙ্কমোহন সিংহ এক স্বল্প স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছেন। তাঁর “কংস নদীর”...গীতিমালায় মৌলিকতা আছে। কিন্তু উচ্চারণ এমন অস্পষ্ট যে, সেই সুন্দর বর্ণনামূলক গানের অধিকাংশ কথাই বোঝা যায় না। সেগুণি কি তাঁর নিজের রচনা? জানতে ইচ্ছা হয়। কারণ পূর্ববঙ্গের আলেখ্যমূলক গানের ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে এতে সুন্দর সমকালীনতায় টেনে আনা হয়েছে। শশাঙ্কবাবু প্রাচীন গায়ক কিন্তু ক্রমশই তিনি গলার সাবলীলতাকে যেন ইচ্ছা করে বিকৃত করছেন, যা

অন্যদিকে দাঁড়িয়েছে। ভঙ্গী আর মূদ্রা দোষে পার্থক্য অনেক। আরেকজন উল্লেখযোগ্য প্রাচীন-গায়ক শ্রীরেন দাস। তাঁর গলার গ্রাম্যতা অপূর্ব। তাঁর গলার উদাত্ত ভাব ও অলঙ্করণ ময়মনসিংহ, হরিপুরা, শ্রীহট্ট অঞ্চলের এক বৈশিষ্ট্য বহন করে। গানের নির্বাচনেও তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। “খসম আইয়া লইয়া গেল” পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের ছবি থাকা এ ধরনের গানেরও প্রয়োজন খুব।

রাজেন্দ্রনারায়ণ বর্মণকে অতীতে প্রশংসা করিছি। তিনি তাঁর আঞ্চলিক স্টাইলটি চমৎকার বজায় রেখে চলেছেন। কিন্তু তাঁর গানের নির্বাচন সম্বন্ধে একটা কথা আছে। গ্রামের লোকে যা গায় তাই লোকসঙ্গীত নয়। রচনা, সুরে ও ভঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের এক বিশেষ আছে। হরিপুরার সাধক মনমোহনের কিছু রচনা আছে, যাতে ওস্তাদ আলীউদ্দীন খাঁর বড় ভাই সাধক আবতাবুদ্দীন খাঁ সুর সংযোজন করেছেন—যেমন, “তিন তারের এক বীণা বাজারে।” এই গানগুলি রচনার পরিপাট্যের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের সুরোরোপ ভিন্ন পর্যায়ে পড়ে। লোকসঙ্গীতের পর্যায়ে নয়।

রথীন্দ্রনাথ চৌধুরী (১৬ই মে, '৭০), আশিসকুমার গুপ্ত (২২শে ডিসেম্বর, '৬৯) —এ দু'জনেরই কণ্ঠে ভাওয়াইয়ার আশাপ্রদ প্রতিশ্রুতি পেলাম। আরো কিছু লোক-

সঙ্গীতশিল্পী আছেন, যাদের সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করবো। আজ বিশেষ করে যাদেরকে সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই, তারা হলেন, আমার মতে লোক-গীতির খাঁটি প্রতিনিধি। এঁদের গলা শুনলেই মাটির গন্ধে মন ভরে ওঠে। মনে হয় যেন সবে গ্রাম থেকে এসে গান ধরেছেন। জীবনের চালচলনে ও সুরে কোথায়ও বিচ্ছিন্নতা নেই। এঁদের কাউকে চিনি না কিন্তু মনে হয় কত চিনি। বন্দাবনদাস বৈষ্ণব, নরেন্দ্রদাস বাউল, সুধীরদাস বাউল, দুর্লভচন্দ্র সুব্রহ্মচার্য, দীনবন্ধুদাস বাউল, মাখনলাল সরকার, বিমলেন্দু বিশ্বাস, নারায়ণচন্দ্র দাস, কেশবলাল বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীদেরই প্রথম অধিকার লোকসঙ্গীতের আসরে। ‘শহুরে’ লোকসঙ্গীত গায়ক-গায়িকার নিঃপ্রাণ, গুমোট পরিবেশে গুঁরা যেন দমকা মেঠো হাওয়া। যেমন গত ৩০শে মার্চ রাতে যারা বন্দাবনদাস বৈষ্ণবের গান শুনছেন, তাঁরাই আমার সঙ্গে একমত হবেন। এঁদের সম্বন্ধে আমার ভাবনা নেই। এঁরা স্থান-ভ্রষ্ট হবেন না। শহরের “ভদ্র” পরিবেশের আধুনিক-আধুনিকাদের শতকরা ৭৫ জনকে ছাটাই করে এই সব গায়কের আরো স্থান করে দেওয়া উচিত লোকসঙ্গীতের স্বার্থে। সঙ্গীতের আসরটা কারখানা নয় যে, ছাটাই চলবে না। কিন্তু করবে কে? সর্বের মধ্যেই যে ভূত!

দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥ দেশদেশের জলখাবার ॥

রক্তবিশিষ্টে অতিষ্ঠা
পাকুল সেনগুপ্ত

দেশদেশের জলখাবার

এই নিদারুণ খাদ্য সমস্যার দিনে সস্তার
মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্য তৈয়ারীর
এমন অভিনব সংগ্রহ ইতিপূর্বে বাঙালার

ছিল না বললেই হয়। বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক রন্ধন-প্রক্রিয়ার বহুবিধ প্রকরণ এই গ্রন্থে আছে। প্রবীণ ও নবীনাদের পক্ষে অপরিহার্য বইটির ভূমিকা সুলেখিকা আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন—“দেশদেশের জলখাবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। শব্দ নবীনা গৃহিণীরাই নয়, প্রবীণা জননী, ভাগিনী, গৃহিণীরাও এর থেকে পুষ্টি উপকৃত হবেন। শ্রীমতী সেনগুপ্ত যে উৎসাহে, যে পরিশ্রমে ও যে নিষ্ঠা ও নিপুণতার সঙ্গে ভারতের সমস্ত প্রদেশ থেকে জলখাবার শিল্পের বহুবিধ প্রদর্শিত সংগ্রহ করে সেগুণি অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করে সহজ সরল ভঙ্গীতে বন্ধুকে দিয়েছেন তা বাস্তবিকই বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।”

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ! মূল্য : ছয় টাকা
বঙ্গুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

১১ ১১১১১১ ১১১১১১১১ ১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১ ১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১ ১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১ ১১ ১১১১১১১ ১১১১১১১১



জার্মান থিয়েটার

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শ্রদ্ধকই হচ্ছেন প্রথম বড় ওপেরার রচয়িতা। পরবর্তীকালের ওপেরার ওপর তাঁর রচনার প্রভাব সুপরিষ্কট। জার্মানিতে ১৭১৪ খৃস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। হ্যাডেলেরও আগে তিনি ওপেরা লিখতে শুরু করেন। ওপেরা সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার পর তাঁর ধারণা হয় যে, ইটালীয়ান ওপেরা ছল পথে পরিচালিত হচ্ছে। এরপর তিনি তাঁর বিখ্যাত ওপেরা 'ওরফিও এন্ড ইউরিডাইস' রচনা করেন—আজও এই ওপেরাটি অসাধারণ জনপ্রিয়। এর কথা ও সুরের অন্তত সমন্বয় সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শ্রদ্ধক ছিলেন ভাগনারের অগ্রদূত। ইটালীয়ান ওপেরার বাঁধাধরা এবং চিরাচরিত নিয়মাবলীর ভেতর আবদ্ধ না থেকে তিনি ওপেরাকে নতুনভাবে প্রাণরসে মণ্ডিত করেন।

শিল্পের ক্ষেত্রে যারা সংস্কারক, তাঁদের যাত্রাপথ কখনও সূত্থের হয় না। ট্যাডিশনকে অমান্য করে ওপেরার নব-রূপায়ণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধককে অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয়েছিল। কিছুদিনের জন্য তিনি ভিয়েনায় বসবাস করেছিলেন। তারপরে চলে গেলেন প্যারিসে। এখানে তাঁর পূর্বতন ছাত্রী মারী আঁতোয়ানে তাঁর কাছে যথেষ্ট উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ান। প্রথমটায় প্যারিস শ্রদ্ধককে বিরাটভাবে অভিনন্দন জানায়। তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল সঙ্গীতজগতের হারিকিউলিস। রাস্তায় তাঁকে চলতে দেখলে পথচারীর দল তাঁর অনুসরণ করতে শুরু করতো। জন-সভায় তিনি উপস্থিত থাকলে সবাই উচ্চরবে হৃৎধ্বনি করতো। কিন্তু এ জন-প্রিয়তা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আসলে প্যারিসের অন্তরের যোগ ছিল পুরানো রীতির অনুশাসনে রচিত ইটালীয়ান পদ্ধতির ওপেরার সঙ্গে। ফলে কিছুদিন বাদে শ্রদ্ধকের বিরুদ্ধবাদীর দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এরা ইটালী থেকে পিচিচিনিকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন।

ইনি ছিলেন সে যুগের ইটালীয়ান ওপেরার একজন শ্রেষ্ঠ এক্সপোনেন্ট। পিচিচিন প্যারিসে আসবার পর ওখানে দুটি পরস্পর-বিরোধী দল গড়ে উঠলো। একদল শ্রদ্ধকের ভক্ত, অপর দল পিচিচিনের। এদিকে মারী আঁতোয়ানেও ছিলেন শ্রদ্ধকের দলে, অপরদিকে ফরাসী সম্রাটের রক্ষিতা মাদাম দ্য বারি পিচিচিনের স্বপক্ষে।

এতসব বাধা সত্ত্বেও শ্রদ্ধকের প্রতিভা কিন্তু অবরুদ্ধ হয়ে থাকে নি। ১৭৯৯ সালে শ্রদ্ধক তাঁর বিখ্যাত Iphigenie en Tauride প্রডিউস করলেন—সারা প্যারিস শহরে এই ওপেরাটি বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করলো। এর দু বছর বাদে পিচিচিন একই বিষয়বস্তু নিয়ে একটি ওপেরা রচনা করেছিলেন, কিন্তু শ্রদ্ধকের সঙ্গে তুলনায় পিচিচিনের ওপেরাটি নিম্নপ্রভ হয়ে গেছিল। তবে এখানে একটা কথা বলা দরকার—পিচিচিনের ওপেরাটির অসাফল্যের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এর প্রাইমা ডোনা। তিনি পিচিচিনের ওপেরার দ্বিতীয় প্রদর্শনীর সময় মত্ত অবস্থায় গান করতে এসে কেলেকারী শুরু করে দেন। এই প্রাইমা ডোনার একজন প্রতিদ্বন্দী গায়িকা এই প্রদর্শনী সম্পর্কে মজাদার মন্তব্য করে বলেছিলেন—“This is not Iphigenie en Tauride, but Iphigenie en Champagne.”

ইফিজেনীই শ্রদ্ধকের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে ছিল—পরবর্তীকালে তিনি প্রচুর অর্থ এবং বশ উপার্জন করেন।

কাল মারিয়া ফন্ডেবার—শ্রদ্ধকের পরই এর নাম মনে আসে। জার্মানীর ওল্ডেনবুর্গ অঞ্চলে অয়াটিন শহরে ১৭৮৬ সালে ভেবারের জন্ম, মৃত্যু হয় ১৮২৬ খৃস্টাব্দে। ভেবারের বাবা ছিলেন এক ভ্রাম্যমাণ দলের অভিনেতা—এক সময় তাঁর যথেষ্ট টাকা-পয়সা এবং প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর এক আত্মীয়া কন্সটান্সকে মোটেসার্ট বিয়ে করেছিলেন। ভেবার জন্ম থেকেই পঙ্গু ছিলেন—চার বছর বয়স হবার আগে তিনি হাঁটতেও পারতেন না। তাঁর প্রধান শিক্ষক ছিলেন আবে ফগ্‌লার। এই ফগ্‌লারকে নিয়ে ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং এক সময়ে একটি চমৎকার কবিতা রচনা

করেছিলেন। মোটেসার্ট অবশ্য ফগ্‌লারকে বলতেন কোয়াক। ফগ্‌লার গর্বভরে বলতেন যে, তিনি তিন সপ্তাহে একজন কম্পোজার এবং ছ' মাসে একজন গায়ক তৈরি করে দিতে পারেন। মিয়ারবেয়ারেরও শিক্ষাগুরু তিনিই। ফগ্‌লার প্রায়ই বলতেনঃ “এই দু'জনকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে দেবার আগে যদি আমার মৃত্যু হোত, তার থেকে পরিতাপের বিষয় আর কিছু থাকতো না।” এই দু'জন বলতে তিনি ভেবার ও মিয়ারবেয়ারের কথাই ভেবেছিলেন। সত্যিই এই দুই শিষ্য সম্বন্ধে তাঁর গর্ব করবার অধিকার ছিল বৈকি!

১৮১৬ খৃস্টাব্দ থেকে ভেবার ট্রুসডেনে এসে বসবাস করতে থাকেন। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত ওপেরা 'ডেয়ার ছাইস্টউজ' লেখেন। ১৮২১ খৃস্টাব্দে এই ওপেরাটি প্রথম মঞ্চস্থ হয় এবং সারা জার্মানিতে এর খ্যাতি ছাড়িয়ে পড়ে। এমন কি এর পরে এর জনপ্রিয়তা ইউরোপের অন্যান্য দেশেও বিস্তৃত হয়। ১৮২৬ খৃস্টাব্দে ভেবারের “ওবেরন” ওপেরা লন্ডনের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হোয়ে লন্ডনবাসীদের হৃদয়-মন জয় করে ফেলে। লন্ডনে ‘ওবেরনের’ প্রথম অনুষ্ঠানের পরেই ভেবার মারা যান।

ট্রুসডেনে ফিরে যাবার দিন দুই আগে স্যার জর্জ স্মার্টের বাড়িতে একদিন রাতে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। শোপার মত তিনিও অনেকদিন থেকেই টি-বি রোগে ভুগছিলেন।

লন্ডনেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়—কিন্তু ছ' বছর বাদে ভাগনারের উদ্যমে তাঁর শবদেহ ট্রুসডেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মিয়ারবিয়ার—জেকব মিয়ারবিয়ারকে বিভ্রান্ত কারণে ভাগনার এবং সন্মান অপছন্দ করতেন। ভাগনার তাঁকে দেখতে পারতেন না, কারণ মেয়ারবিয়ার জাতে ছিলেন ইহুদি—ভাগনারের ইহুদি-বিশ্বেষের কথা তো কারোরই অজানা নয়। সন্মান বিরক্ত হয়েছিলেন অন্য কারণে। তিনি মনে করতেন যে, মেয়ারবিয়ার সঙ্গীত রচনা করতেন প্রধানত জনসাধারণকে খুশি করবার জন্য, শিল্প সৃষ্টির দিকটা তাঁর কাছে গোঁপ হয়ে গিয়েছিল। মেয়ারবিয়ারের প্রথম দিকের রচনাগুলোকে সন্মান উচ্চগ্রেণীর মনে করতেন এবং পরের দিকের লেখা ওপেরা-গুলোকে নিন্দাস্তরের বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সন্মানের এই মতের সঙ্গে পরবর্তীকালের সঙ্গীতজ্ঞেরা একমত হতে পারেন নি।

১৭৯১ সালে বার্লিনে মেয়ারবিয়ারের জন্ম হয়। মেডেলশনের সঙ্গে অনেক দিক থেকেই তাঁর মিল ছিল। দু'জনেই

সাম্প্রতিক বসুমতী

জাতে ইহুদী, দু'জনেরই বাবা ব্যবসাদার এবং ধনী। ওপেরা লিখে মেয়ারবিয়ার যথেষ্ট টাকা উপার্জন করেছিলেন। তাঁর মা যেন খানিকটা সঙ্কোচের ভঙ্গীতেই বলতেন—He is a musician, but not of necessity. প্রথমটায় তিনি জেন্ডেলশানের গুরু, সেনটারের কাছে কিছুটা শিক্ষা নেন, তারপর ট্রুমডেন চলে যান তবে কপলারের কাছে শেখবার জন্য। প্রথমটায় ছিলেন পিয়ানো বাদক, তারপর ওপেরা রচনায় মনোনিবেশ করেন। এরপর ইটালীতে রসিনির সঙ্গে ওপেরা রচনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'একবার বিজয়ী সম্মান অর্জন করেন। তাহলেও রসিনির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

মিনা মসন নামে একজন কাজিনকে বিয়ে করে মেয়ারবিয়ার প্যারিসের স্থায়ী বাসিন্দা হন। লক্ষপতি হয়েও তিনি বিলাসীর জীবন যাপন করতে চাইতেন না, বাড়িতে একটিমাত্র চাকর রাখতেন। সব সময়েই তিনি পরিশ্রম করতেন। বলতেন, আমি যে শিল্পী, এটাই আমার সব থেকে বড় পরিচয়। দরিদ্র সঙ্গীত-শিল্পীদের থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে আমি ধনী অপেশাদারী শিল্পী হতে চাই না। প্যারিসে তাঁর শোপ্যার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়—শোপ্যার তিনি একজন প্রধান গুরুগাহী হয়ে পড়েন। বিখ্যাত সমালোচকেরা বলেন—Mayerbeer's Operas contain many passages of supreme beauty, and the best of them would well bear revival.

কোন কোন দেশের থিয়েটারের আলোচনায় ওপেরাকে বাদ দিয়ে আলোচনা করলে সেটা আংশিক আলোচনা বলে বিবেচিত হবে। এই তালিকায় স্থান পাবে জার্মান, ফ্রান্স এবং ইটালী, কারণ, ঐ সব দেশে থিয়েটারের একটি প্রধান অঙ্গ ওপেরা বা ড্রামা ইন্ মিউজিক। ইংল্যান্ডের ক্ষেত্রে এ যুক্তি খাটে না, কারণ, ইংরাজী ওপেরার ট্যাডিশন এখন পর্যন্ত গড়ে উঠতে পারে নি। আমাদের দেশেও জাত ওপেরা কখনও সৃষ্টি হয় নি। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সামান্য প্রাথমিক কাজ করে গিয়েছেন মাত্র। তবে আমাদের দেশে ওপেরা না থাকলেও সঙ্গীতপ্রধান নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল স্বাধীনতা-পূর্বকাল নাট্যমঞ্চে। আজকালকার বাংলা নাটকে গানের অভাবটাই বেশি চোখে পড়ে।

ভাল ওপেরা লেখবার মত শক্তিশালী নাট্যকারই বা আমাদের দেশে কোথায়? ওপেরা কেন ভাল কাব্যনাট্যই বা শিশিরোত্তর যুগে কণি রচিত হয়েছে?

এক সময় আমার মনে হোত আধুনিক যুগে রচিত কাব্যনাট্য মণ্ডসফল হতে পারে না। কিন্তু বিদেশে টি এস এন্সলটের কয়েকটি কাব্যনাট্যের মণ্ড-রূপায়ণ দেখে আমার সে ভুল ভেঙে যায়। ১৯৬৮ সালে পূর্ব-বার্লিনে ব্রেশটের কয়েকটি ওপেরা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—এর থেকে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় যে, আধুনিক যুগেও ভালভাবে রচিত ওপেরা দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করতে পারে।

আর আজকাল মৌলিক নাটকই বা কোথায় রচিত হচ্ছে। হয় অনুবাদ নাটক, না হয় ভাবানুবাদ। এ তো একটা দিক মাত্র—না হচ্ছে কোন ঐতিহাসিক নাটক, না কোন পৌরাণিক বা সামাজিক, অথবা কাব্যনাট্য। আর তথাকথিত বেসব মৌলিক নাটক মণ্ডস্থ হচ্ছে, তার ভিতর ইজম্-এর ছড়াছড়ি। আর এর

অন্য সরকারের অর্থ অপচয়ও কম হচ্ছে কি? বছরের পর বছর নাটক-কলা আকা-জেমী অর্থ সাহায্য করছেন আমাদের দেশের বিভিন্ন নাট্যসংস্থাদুলকে—এতে ফার কি উপকার হচ্ছে? বছরের পর বছর বেসব নাট্যসংস্থা অর্থ সাহায্য পেয়েও নিজেকে পাবে দাঁড়াতে পারে না, তাদের পেছনে এভাবে অর্থের অপব্যয় করে খসল লাভটা কি হচ্ছে? বরং এসব টাকা দিয়ে দেশের অন্য পাঁচটা কাজ করলে অনেক বেশি উপকার হবে। গিরিশ-যুগে শিশির-যুগেও তো সরকারের সাহায্য ব্যতীয়েকেই নাট্যমণ্ড চলেছে—আজকেও সেইভাবেই চলুক না। ইজম্-এর কৃষ্টি না হয় কিছুদিন বন্ধই থাকলো—এ কৃষ্টিতে দেশটা তো জাহান্নামে যেতে বসেছে।

[কমণ]



চুল হবে দীর্ঘ, ঘন,
চিকন, চিরনির বশ।
চুলের গোড়া যুঁহ
সবল এবং মস্তিষ্ক
দৃষ্টি রাখবে—

বেঙ্গল কোসমিক্যাল-এর
পারফিউমড
তিল অয়েল

কসমোটিক ডিভিসন

বেঙ্গল কোসমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী • মাদ্রাস



উৎপল দত্ত



মাধবী মুখার্জী



মৃণাল সেন

অভিনন্দন

মৃণাল সেন পরিচালিত হিন্দী ছবি 'ভুবন সোম' ১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছে। এই সফলের জন্য আমরা গ্রীসেনকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মৃণাল সেনের পরিচয় এতদিন বাংলা ছবির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল: 'ভুবন সোম' তাঁর প্রথম হিন্দী ছবি। এই ছবি চিরাচরিত হিন্দী ছবির জগতে একটি ব্যতিক্রম, সাহিত্যিক বনফুলের ছোট গল্প এবং অল্প কয়েকজন শিল্পী নিয়ে কম টাকায় এই ছবিটি নিও-রিয়ালিজম-ধর্মী। 'ভুবন সোম'-এর স্বর্ণপদক লাভে মৃণাল সেনের পরিচালন-দক্ষতার যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে একটি দৃষ্টান্তকে তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দী ছবির জগতে শিল্পের

মামে অশ্রুভাবে হলিউডের অনুকরণ ও যে অপসংস্কৃতি চলছে তাতে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের মর্যাদা বিপন্ন হয়েছে, আর একচেটিয়া ফিল্ম কারবারীদের দাপটে ছোট প্রযোজকদের সরে দাঁড়াতে হয়েছে। 'ভুবন সোম'-এর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে হিন্দী চলচ্চিত্র জগতে বাস্তববাদী বিষয়বস্তু নিয়ে এবং কম বাজেটের ছবি করার উৎসাহ সৃষ্টি হতে পারে। এই পুরস্কার লাভে মৃণাল সেনের খ্যাতি বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে সারা ভারতের চলচ্চিত্র জগতে পরিব্যাপ্ত হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'ভুবন সোম'-এর প্রযোজনায় সংশ্লিষ্ট-প্রাণিতর পরিচয় হয়েছে। তার জন্য প্রযোজক অভিনন্দনীয়।

বাংলার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জী 'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে অভিনয়ের জন্য শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে 'উর্বশী' পুরস্কার লাভ করেছেন। মহানগর,

চারুলতা, ২২শে শ্রাবণ ইত্যাদি ছবিতে অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম; দর্শকসমাজ ইতিমধ্যেই তাঁকে বাংলার চলচ্চিত্র অভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠার স্থান দিয়েছেন, দিল্লীর পুরস্কার কমিটি সেই জনমতকে স্বীকৃতি দিলেন। এই স্বীকৃতিতে আমরা খুশী হয়েছি এবং শ্রীমতী মুখার্জীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য উৎপল দত্তের 'ভরত' পুরস্কার এবং শ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ছবিরূপে 'দিবারাত্রির কাব্য' নির্বাচিত হওয়া বাস্তবিকই আনন্দের কথা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এই চিত্ররূপ দেখে পরিচালকের শিল্পবুদ্ধির জন্য আমরা প্রশংসা করেছিলাম।

এবারের রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কারে কেউ কেউ বাঙালীর সজ্ঞানী ক্ষমতা ইত্যাদি বলে অনর্থক বাঙালী-য়ানা দেখাবার চেষ্টা করছেন। এতে বাঙালীর প্রশ্ন কেন ওঠে বৃষ্টি না। এরূপ মানসিকতা সংকীর্ণ জাতীয়তার পরিচায়ক।

১৯৬৯ সালের প্রতিযোগিতা ছবিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত 'ভুবন সোম' ও 'দিবারাত্রির কাব্য' ভাল ছবি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিনয়ের ও পরিচালনার পুরস্কার লাভ হয়েছে। বলা যেতে পারে, এবারে বিচারে শিল্পবুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে খুব যে একটা ভাল ধারণা আছে এমন নয়। ইতিপূর্বে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবিগুলি পর্যালোচনা করলে এই ধারণা ভুল বলা চলবে না। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার কমিটি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক নয়—এমন কথাও শোনা যায়। অভিন-



দাণ্ডাহিক বসুদত্ত

যোগ উঠেছে, এত বকমের পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ফিল্ম এডিটিং-এর জন্য পুরস্কার নেই কেন? ছবির ভাণ্ডা নির্ভর করে এডিটিং-এর ওপর, কিন্তু প্রযোজকের মোটা টাকা পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু ফিল্ম এডিটরের কোন স্বীকৃতি থাকে না। অভিনেতা-অভিনেত্রীর পুরস্কারকে 'ভরত' ও 'উর্বশী' নামে অভিহিত করার ব্যাপারেও আপত্তি উঠেছে। ভরত ও উর্বশী—দুটি নামই একালের বাস্তবতার বাইরে, কিছুটা গ্ল্যামারকে প্রঙ্গণ দেয়। আমরা গ্ল্যামারের বিরুদ্ধে। এই পুরস্কার-গুলিকে এমন নামে চিহ্নিত করা উচিত, যাতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ঐতিহ্যের স্মারক হয়। যেমন, দাদাভাই ফালকে, হীরলাল সেন, মধু বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখের নামে এই পুরস্কার-গুলি চিহ্নিত হওয়া উচিত। সূচনা যুগের অভিনেত্রীদের মধ্যে যারা জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁদের নামেও পুরস্কার থাকা দরকার। স্বর্ণের উর্বশীর নাম মা ধরে মর্তের মানবীর নাম ধরা বোধ হয় বেশি ঐতিহাসিক হবে। রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার কমিটি এই প্রস্তাব ভেবে দেখতে পারেন।

—সুজন।

১৯৬৯ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি

রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার

গত ৩০শে আগস্ট দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালে নির্মিত সারা ভারতের নির্বাচিত ছবি এই পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগী ছিল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা এই তিন কেন্দ্রে আঞ্চলিকভাবে গৃহগত সুপারিশের পর কেন্দ্রীয়ভাবে বিচার করা

হয়েছে। চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট মহলে এই পুরস্কারের জন্য বিশেষ আগ্রহ রয়েছে, কারণ ছবির প্রচার এবং নগদ অর্থ দু'দিক থেকেই লোভনীয়। নিম্নলিখিত ছবিগুলি পুরস্কার লাভ করেছে—

শ্রেষ্ঠ ছবি: 'ভুবন সোম'—পরিচালনা মৃণাল সেন, স্বর্ণপদক এবং ২০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় ছবি: 'দিবারাত্রির কাব্য'—পরিচালনা বিমল ভৌমিক ও নারায়ণ চক্রবর্তী। জাতীয় সংহতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছবি: কে এ আব্বাস পরিচালিত 'সাত হিন্দুস্থানী'।

শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য ভরত পুরস্কার পেয়েছেন উৎপল দত্ত (ভুবন সোম); শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর উর্বশী পুরস্কার পেয়েছেন মাধবী মুখার্জী (দিবারাত্রির কাব্য)। শ্রেষ্ঠ পরিচালক পুরস্কার পেয়েছেন মৃণাল সেন (ভুবন সোম)। শ্রেষ্ঠ প্রযোজক গায়কের পুরস্কার পেয়েছেন শচীন দেববর্মণ (আরাধনা), শ্রেষ্ঠ প্রযোজক গায়িকার পুরস্কার পেয়েছেন কে বি সুন্দরম্বল (তামিল ছবি—'ধুনাইতন')। শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন পাঞ্জাবী ছবি 'নানক নাম জাহাজ হ্যায়' ছবির সংগীত পরিচালক এস মহীন্দর। সাদা কালোর ফটোগ্রাফী: কে কে মহাজেন (সারা আকাশ), রঙীন ফটোগ্রাফী: মার্কাশ বাচলে (শান্তি নিলয়)। শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্য লেখক: এস আর পুন্ডানা কানাকল ('গেজে পুজে' কানাড়ী), শ্রেষ্ঠ গীতিকার: কায়ফী আজমী (সাত হিন্দুস্থানী)।

আঞ্চলিক পুরস্কার: উত্তর বেঙ্গ-বরুয়া (অসমীয়া), নতুন পত্র (বাংলা), কানকু (গুজরাটি), সত্যকাম (হিন্দী), গেজে পুজে (কানাড়ী), আদিমাকাল (মালয়ালম), তাম্বাদী মাটি (মারাঠী), অদিনা মেঘ (ওড়িয়া), নানক নাম জাহাজ হ্যায় (পাঞ্জাবী), ইরু কোদুকল (তামিল), আদর্শ কুদুম্বম (তেলেগু)।

প্রাধানিক ও তথ্য চিত্র বিভাগে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছে: বি ভি গগের 'অমৃত শেরগীল'। শিক্ষা: কে এল কান্দপুর্ পরিচালিত 'জাইফ'। এ্যানি-মেশন ছবি 'আম্বেলা'।

নাটকের কথা

'তারা তিনজন'

১১ই সেপ্টেম্বর মৃত্ত অঙ্গনে 'পপলস্ ভয়েস' তাঁদের দ্বিতীয় পর্বায়ের নাট্যার্থী নিবেদন করছেন সন্ধ্যা সাতটায়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক এরিথ মারিয়া রেমার্কের শ্রী কমরেডস অবলম্বনে 'তারা তিনজন' নাটকটি পরিচালনা করেছেন ব্রীজমন্ত ভট্টাচার্য।

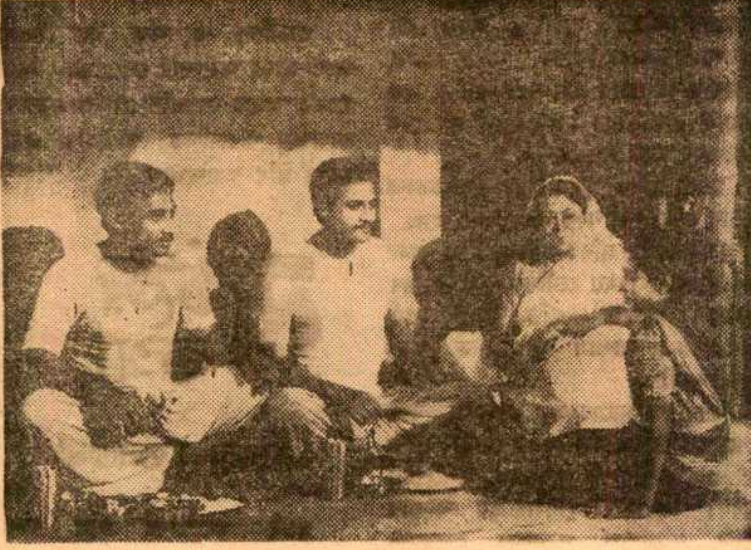
মিষ্টকথা

বৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

গত ২৩শে আগস্ট, রবিবার, রবীন্দ্র সরোবর মধ্যে দক্ষিণ কালকাতা বাস্বে সমিতির বাৎসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' মঞ্চস্থ হয়। নাম-ভূমিকায় পাণ্ডালী বন্দ্যোপাধ্যায় অনবদ্য নৃত্যকুশলতার স্বাক্ষর রাখেন। অর্জুনের ও মদনের ভূমিকায় চিত্রাঙ্গদে



চিত্ত বসু পরিচালিত 'শেষপর্ব' ছবিতে মিষ্ট গঙ্গোপাধ্যায়



শচীন অধিকারী পরিচালিত 'শপথ নিলাম' ছবিতে সমিত ভগ্ন, শূভেন্দু চট্টোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী।

অভিনয় করেন মধ্যমীয়া মীনাক্ষী বসু ও নীলা মজুমদার। কুরূপার গানে মিতালি রূপ চিত্রাঙ্গদার মর্মবেদনা পরিস্ফুট করেন। তাঁর কণ্ঠের 'দে তোর আশ্রয়' ও 'রোদন ভরা এ বসন্ত' গান দুটি প্রশংসনীয়। বরুণ ঘোষালের দরাজ কণ্ঠের ফ্রাট গলার অর্জুনের গানগুলি সকল শ্রোতার কাছে পরম প্রীতিপ্রদ হয়। সুরেন্দ্র-পার গানে উমা মজুমদার চিত্রাঙ্গদার আবেগ উচ্ছ্বাস ও অন্তর্বেদনাকে রূপায়িত করেন। অর্জুন ও চিত্রাঙ্গদার সংলাপ পাঠে অবিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন প্রদীপ সান্যাল ও ছন্দা ঘোষ। নৃত্য পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় পাঞ্চালী বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার নিদর্শন রাখেন। গুণগীতাংশে ও নৃত্যে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন মঞ্জু ভট্টাচার্য, রুমা ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী, কল্পনা দে, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর, বঙ্গবীর, মঞ্জুবা বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি, সন্মিতা সেন, তপতী, মহামায়া, মাধবী, সন্মিতা, নন্দুজেন্সা, তর্পমা ও ডেরা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবলা সংগতে ভানু গুহ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন।

উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবাসী মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ নক্ষত্র রায়-চৌধুরী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রবীন্দ্র ভারতীর অধ্যাপক ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায়। উভয়েই সমিতির সমাজসেবামূলক কার্যধারার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সংবাদ কল্যাণ

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে শেক্সপীয়র

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের নাট্যকর্ম সম্পর্কে ধারণা করতে হলে এক কথাটি মনে রাখা দরকার যে, এই নাট্যকর্মে রয়েছে সামাজিক কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা। নাট্যগোষ্ঠী হচ্ছে বৃহত্তর সামাজিকগোষ্ঠীরই অংশ, বাদের সামনে রয়েছে বর্তমানের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মানবের ইতিহাসে এক মহান বিপ্লবসাধনের দায়িত্ব : শোষণ এবং অভাব, ভয় ও অজ্ঞতা থেকে মানুষকে মুক্ত করা, স্থায়ী শান্তির অবস্থা সৃষ্টি করা, সমাজের সদস্যদের অবোধে ও পরিপূর্ণভাবে ব্যক্তি বিকাশে সমর্থ করে তোলা, জগতের যে অংশে তাদের বাস সেখানে মানবতার আদর্শকে রূপদান করা। নাট্যকর্ম বাস্তব জগতের এই পরিবর্তনকে প্রকাশ করে, প্রকাশ করে যে, এই জগৎ পরিবর্তনীয়, জনগণকে জগতের পরিবর্তন ও পরিবর্তমানতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, জগৎকে বারো পরিবর্তিত করে তাদের চেতনা বিকাশিত করে।

অতীতের মহান নাট্যকর্মে এই নাট্যকর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে দুটি কারণে। এই নাট্যকর্মে পাওয়া যায় অতীতের মহান মুহূর্তগুলির শিল্প-সম্মত নিদর্শন, এমন সব পরিবর্তনের নিদর্শন, যা আমাদের সময়ের পরিবর্তনের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, পাওয়া যায় দাস প্রভুদের রাষ্ট্র কর্তৃক বিধর্মীদের সমাজ দমনের ছবি, নবীন বুদ্ধোন্মীয়া কর্তৃক সামন্ততান্ত্রিক জড়ত্ব ও মধ্যযুগীয় মতান্ধতা জয় এবং বুদ্ধোন্মীয়া বিপ্লবের কাল। এই নাট্যকর্মে তুলে ধরে বর্তমান মানবের কাছে অতীতের মানবের মহান ধ্যান-ধারণা।

আঠারো শতকের শেষদিক থেকেই জার্মান মধ্যে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনীত হয়ে আসছে। বর্তমানেও জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রে অভিনীত হচ্ছে। শেক্সপীয়রের নাটকের পরম্পরাগত জনপ্রিয়তার সঙ্গে এদেশে ব্যক্তি হয়েছে নতুন একটি দিক।

গত দেড় দশকের মধ্যে জি, ডি, আরের বিভিন্ন মধ্যে বারো বারই শেক্সপীয়র অভিনীত হয়ে এসেছে। তুলনীয় বার অভিনীত হয় একমাত্র জার্মান ক্লাসিক, রুশ ও স্পেনের নাটক আরো কম, ফরাসী নাটক আরো কম, প্রাচীন ক্লাসিক শেক্সপীয়রের তুলনায় এতই কম যে উল্লেখযোগ্য নয়।

স্বভাবতই শেক্সপীয়রের জীবনী বছরে শেক্সপীয়রের নাটকের ওপরে সাধারণ সময়ের চেয়েও বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে নাটক অভিনীত হয়েছিল তেইশটি, ১৫ বার; ১৯৬৩-৬৪ বর্ষের শুরুর হবার সময় থেকেও বলা চলে; আগেকার কালের দৃশ্যসজ্জায়, তাছাড়া শেক্সপীয়রের নাটককে ভিত্তি করে সঙ্গীতনাট্যও। সবচেয়ে বেশিবার অভিনীত হয়েছে এই নাট্যকর্মে : কমেডি অব এরস (১১ বার), রোমিও ও জুলিয়েট (৭ বার), হ্যামলেট (৮ বার), কিংজেন (১ বার), চতুর্থ হেনরি (২ বার), তৃতীয় রিচার্ড (৫ বার)।

বলা বাহুল্য, সকল প্রয়োজনার শিল্পমান সমান উন্নত ছিল না। বহু প্রখ্যাত নাট্যগোষ্ঠীও অনেক সময়ে নাট্য-প্রয়োজনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন।

শেক্সপীয়রের চারশো বছর পরে চেষ্টা করা হয়েছে শেক্সপীয়রের নাটককে এমনভাবে উপস্থিত করতে, যাতে যে সময়ের ভিত্তিতে নাট্যকর্মে রচিত তার সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায়—বর্তমানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখানো নয়, বর্তমানে স্থাপন করা নয়। আমরা নিজেদের



শুশেন্দ্র রায়চৌধুরী পরিচালিত 'তিনয়নী মা' ছবিতে সৌরেন ঘোষ, কমল সিং ও দেবপ্রিয়া (মাদ্রাজ)।

চোখে দেখি, নিজেদের কানে শুনি—
আমরা যারা বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের
মানুষ, আমরা যারা সমাজতন্ত্রের নির্মাণ-
কারী। আমরা দেখি ও শুনি দূর
অতীতের সেই কালের মানুষের কাজ
আবেগ ও ধ্যান-ধারণাকে, যে কাণকে
সাধারণত বলা হয় রেনেসাঁস। আমরা
সমালোচনা করি এই মানুষগুলির চিন্তা,
অনুভূতি বস্তু ও কাজকে আর তা করতে
গিয়ে আমরা প্রয়োগ করি আমাদের জ্ঞান।
তাদের আমরা বুঝতে চেষ্টা করি—যে সব
স্বপ্নের মধ্যে তারা পড়েছিল, যে সব
সিদ্ধান্ত তাদের করতে হয়েছিল, যে সব
অবস্থার মধ্যে তাদের বাঁচতে হয়েছিল—
সব কিছুর মধ্য দিয়ে। এই স্বপ্নগুলো
এবং এই অবস্থারগুলো তাদের ইচ্ছা-
অনিচ্ছার ওপরে নির্ভর করে নি, বা
শেক্সপীয়র তাঁর খুশিমতো তৈরি
করেন নি। তিনি শুধু সেগুলো
বাস্তবতা থেকে জড়ো করেছিলেন ও
সংহত করেছিলেন—কেন না তিনি ছিলেন
সীমাহীন বাস্তববাদী। শেক্সপীয়রের
রচনাবলী আমরা গ্রহণ করি এ কারণে
নয় যে, তাঁর চরিত্রগুলোর মধ্যে আছে
অনন্যতা, পরিস্থিতির মধ্যে অসাধারণত্ব,
আবেগ ও ধ্যান-ধারণার মধ্যে প্রচণ্ডতা, এ
কারণেও নয় যে, সেখানে আছে
অলৌকিকত্ব আবার একই সঙ্গে চিরন্তন
বিশ্বজনীন মানবতা। আমরা প্রমাণ করতে
চেষ্টা করি যে, এসবের উদ্ভব শেক্স-
পীয়রের সময়ের স্বপ্ন থেকে, মধ্যযুগ
থেকে, আধুনিককালের বিপুল অভ্যুত্থান
থেকে। এই স্বপ্নগুলো শেক্সপীয়র
উদ্বোধন করেছেন নির্মম বাস্তবতার সঙ্গে

এবং তারই মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে
উপস্থিত করেছেন এমন সমস্ত উপকরণ,
যা থেকে তাঁর চরিত্রগুলির স্বার্থকে প্রণী-
স্বার্থ হিসাবে চিনতে ও বিচার করতে
পারি, আরো বুঝতে পারি অতীতে কি
হারিয়েছে এবং কেন। মঞ্চে তাঁর নাটক
উপস্থিত করার সময়ে আমরা চেষ্টা করি
এই উপকরণকে ব্যবহার করতে, তারই
মধ্য দিয়ে তুলে ধরি সম্পর্কগত অনন্যতা,
যাতে নাটকের সর্বশেষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের
নাট্যমঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকের ভিতরে
প্রবেশ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপায়
হচ্ছে ঐতিহাসিক উপস্থাপনা ও
সমকালীন বিশ্লেষণ—ঘটনার রূপায়ণ ও
চিরকালীন নয়।

শেক্সপীয়রের এই উপস্থাপনার
মধ্যে শিক্ষামণ্ডিত অনুষ্ঠান ও চরিত্রা-
ভিনয় যে সম্ভবপর হবে তাতে অবাক
হবার কিছু নেই। দৃষ্টান্ত হিসাবে
কয়েকজন প্রখ্যাত ও নবীন অভিনেত্র
নাম করা চলে : য়ুটা হফম্যান (ভায়োলা,
থিয়েটার ডার ফ্রয়েন্টশাফ্ট), হোস্ট
শুলৎসে (ড্রেসডেন), ফ্রিডরিখ—ভিল-
হেলম য়ুগে (ফ্যালকনরিজ প্লাউয়েন),
ইওয়ার্থিম বেনোকে ও ওল্টার গ্রাবট
(ড্রেসডেন ও লাইপৎসিক), গার্ড মিখেল,
মুর্গেন হেনৎশ ও আর্গো ভাইৎসনীভস্কি
(হ্যামলেট, রোস্টোক, কার্লমার্স-স্টাট ও
পটসডাম), ফ্রীডো জোলটার (ক্রাডিয়াস,
ডায়চেস থিয়েটার, বার্লিন), একেহাউ-
শাল ও হিলমার থাটে (কোরিওলেনাস ও
অফিডিয়াস, বার্লিনার আয়েম্বল)।

প্রায় দশো বছর ধরে জার্মান নাট্য-

শিল্পে শেক্সপীয়রের স্থান শঙ্ককের ও
মান নির্ধারণের। জার্মানীর নবীন
রাষ্ট্রেও এখনো তাঁর সেই একই স্থান।

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১৫ই আগস্ট চন্দননগরে এক
অনুষ্ঠানে হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রাঙ্কনে বিমান ও নানারকম শব্দ সৃষ্টি
করে রণক্ষেত্রের অবস্থা ফুটিয়ে তোলে।
এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল
গিরীন্দ্র স্মৃতিসংঘ। এবার শারদীয়
উৎসব উপলক্ষে এইচ, এম, ডি রেকর্ড
কোম্পানী নাটকেতা ঘোষের পরিচালনার
'ঠাকুরমার ঝুলি' রেকর্ড করেছে, এই
রেকর্ডে অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বিভিন্নভাবে
অংশ গ্রহণ করেছে।

সাহায্যাতুষ্ঠান

সঙ্গীত শিক্ষায়তন রবিশীর্ষের
নিজস্ব গৃহ-নির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে
আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে
“বিদায় অভিশাপ” নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ
করা হবে। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন
সুচিত্রা মিত্র ও স্মিথেন চৌধুরী। নৃত্য
পরিচালনার আছেন রামগোপাল
ভট্টাচার্য। আলোকসম্পাতে ও আবহ-
সঙ্গীতে আছেন যথাক্রমে তাপস সেন ও
দীনেশ চন্দ্র।

সাপ্তাহিক বসুমতি

গ্রাহক হইবার নিয়মাবলী

তিন মাসের কম গ্রাহক প্রণীভুক্ত করা
হয় না। চাঁদা সর্বদাই অগ্রিম দেয়।

চাঁদার হার

ভারতে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৮.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৯.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪.৫০ পঃ

বিদেশে জাহাজে (সডাক)

বাৎসরিক—	৪০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	২০.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	১০.০০ পঃ

বিদেশে বিমানে (সডাক)

বাৎসরিক—	১৭০.০০ পঃ
ষান্মাসিক—	৮৫.০০ পঃ
ত্রৈমাসিক—	৪২.০০ পঃ

প্রতি সংখ্যা (নগদ মূল্য) ৩০ পয়সা

খেলাব রাজার রাজা



শান্তিপ্রিয় বঙ্গোপাধ্যায়

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

যা ভাবা গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।

সি. কে. নাইডুকে দেওয়া হলো না ভারতীয় দল পরিচালনার ভার। পার্ভেজির নবাব অনেক আগেই ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তখনো অসুস্থ। অসুস্থতার জন্যে খেলতে পারেন নি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, আর সেই জন্যেই যেতে পারবেন না ইংল্যান্ড সফরেও।

তাই দেখা দিয়েছিল নতুন অধিনায়ক নির্বাচনের প্রস্ন। সি. কে. নাইডুকে যাতে অধিনায়ক না করা হয় তার জন্যে একদিকে যেমন চলাছিল যত্নবহু অন্যদিকে তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুবরাজেরও অধিনায়ক হবার সম্ভাবনা দিন দিন কমে যাচ্ছিল। কারণ সি. কে. নাইডুর সমালোচনায় সোচ্চার যারা, তাঁদের সেই অর্থোত্তিক আক্রমণের সামনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার যুবরাজের দুর্বল এবং অসহায় মতি আরো বেশি করে প্রকট হয়ে উঠলো। যার ভারতীয় দলের সাধারণ সদস্য হিসেবে মনোনীত হবার যোগ্যতা নেই তাঁকে সরাসরি দলের অধিনায়ক করা যে সাজে না—এ কথা বঝতে কারো অসুবিধে হলো না।

সেই জন্যেই বোধহয় যুবরাজকে সরিয়ে রেখে ডেকে আনা হলো আর একজন মহারাজকুমারকে। ইংল্যান্ডগামী ভারতীয় দলের অধিনায়ক মনোনীত হলেন ভিজিয়ানগুয়ানাগ্রামের মহারাজকুমার।

একই সংগে ভারতীয় দলের অন্য খেলোয়াড়দের নাম ঘোষণা করা হলো। তাঁরা হলেন,

সি. কে. নাইডু, ওয়াজির আলী, মহম্মদ নিসার, বিজয় মাচেস্টে, পি. ই. পাল্লিঙ্গা, লাল্লা অমরনাথ, মহম্মদ হুসেন, বাঁকা জালানী, এম. জে. গোপালন, এল. পি. জয়, এস. মুস্তাক আলী, আমীর ইলাহী, সি. রামস্বামী, কে. আর. মেহারোমজী, স্টুটে ব্যানার্জী ও ডি. ডি. হিন্দেনকার।

ব্যাটিং-বোলিং সব দিক দিয়ে বিচার করলে ভারতীয় দলটি মোটামুটিভাবে ভালোই হয়েছিল। বিশেষ করে পরে অমর সিং, জাহাঙ্গীর খান ও দিল্লীর হুসেনের ঝগদানের ফলে ভারতীয় দলটি বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

তবে ইংল্যান্ডের দর্শকদের যা সব



॥ অমর সিং ॥

কলকাতা টেস্টে অমর সিং-এর অসুস্থ হবার পেছনে ছিল সি. কে. নাইডুর বিরুদ্ধে যত্নবহু।

থেকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছিল তা হলো ভারতীয় খেলোয়াড়দের অফুরন্ত উৎসাহ আর উদ্দীপনা। মাঠে এবং মাঠের বাইরে তাঁদের সেই উৎসাহ, উদ্দীপনার ছোঁয়া লেগেছিল অনেকেরই মনে। ক্রিকেটকে ভালোবেসে খেলার এমন আনন্দ তাঁরা অনেকদিন যেন অনুভব করেন নি।

অবজারভার পণ্ডিতা তো লিখেই বসলো,

....“the Indians possess in abundance at least one desirable quality, which is an over-enthusiasm for cricket, reaching a point of exuberance....”

“All too many of our players go on to a ground as if the playing of cricket was a painful duty to be carried out at all costs. For most of them cricket has been an everyday affair for years. There is nothing left to quicken their pulses at the sight of a classic ground or a big crowd. But for Indians, who are really club cricketers out on a holiday, cricket has not lost its glamour....”

কথাটা এক দিক থেকে নির্মমভাবে সত্যি হলেও, ভারতীয় খেলোয়াড়রা যে প্রশংসা পেলেন তা তাঁদের প্রাপ্য ছিল ঠিকই। তবে সেই পাওয়ারকে আমরা আরো বেশি করে পেতে পারতাম যদি

মাসিক বঙ্গমতী

সি. কে. নাইডুর ওপর পড়তো ভারতীয় পরিচালনার ভার।

এ কারণ ভারতীয় দলের নেতৃত্বদে ছিলেন জন মহারাজকুমার। রাজা-মহারাজের স্বভাবলব্ধ স্বাভাব্যবোধকে টেয়ে উঠতে পারেন নি ভারতের অধিকারিক ভিজিয়ানওয়ান গ্রামের মহারাজকুমার। দলের খেলোয়াড়দের সংগে তাঁর সম্পর্ক মধুর হয় নি। অনেক সময় তাঁর ব্যবহারে তিত্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন দলের খেলোয়াড়রা।

আর তারই জের টেনে ঘটে গিয়েছিল এমন কয়েকটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা, যার তুলনা মেলা ভার। মহারাজকুমারের সবচেয়ে বড় অসুবিধে ছিল, তিনি ভালো খেলতে পারতেন না। কিন্তু তাঁর সেই দুর্বলতার জন্যে তিনি লক্ষিত জে ছিলেনই না, বরঞ্চ দলনেতা হিসেবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে এবং অধিকার বজায় রাখতে চাইতেন সব সময়। ফলে খেলোয়াড়দের সংগে ভারতীয় দলের অধিনায়কের সম্পর্ক বেশ মিত্র হয়ে উঠলো।

সাই হোক ১৯০৬ সালের ইংলন্ড সফরে ভারতীয় দল মোট ২৮টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ভারত জিতেছিল ৪টি খেলায়। হারলো ১২টিতে আর ১২টি খেলা শেষ হয়েছিল অমীমাংসিতভাবে। এ ছাড়া আরো ৩টি সাধারণ খেলায় অংশ গ্রহণ করে ভারত। তার মধ্যে একটিতে হার, একটি জিত আর বাকী খেলাটি ড্র হয়।

হিসেবের দিক থেকে এই ফলাফল খুব একটা আশাব্যঞ্জক না হলেও ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা ব্যক্তিগতভাবে কুড়িরোছিলেন সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা।

ব্যাটিং-এ সি. কে. নাইডু, হাজার রান করলেও সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বিজয় মাচেস্টে। ৪০টি ইনিংস খেলে মাচেস্টে করেছিলেন ১৭৪৫ রান। ইনিংস প্রতি যার গড় হিসেবে দাঁড়িয়েছিল ৫১.০২ রান।

মুস্তাক আলী দশকদের পাগল করা খেলা খেলে সকলকে তাক লাগিয়ে

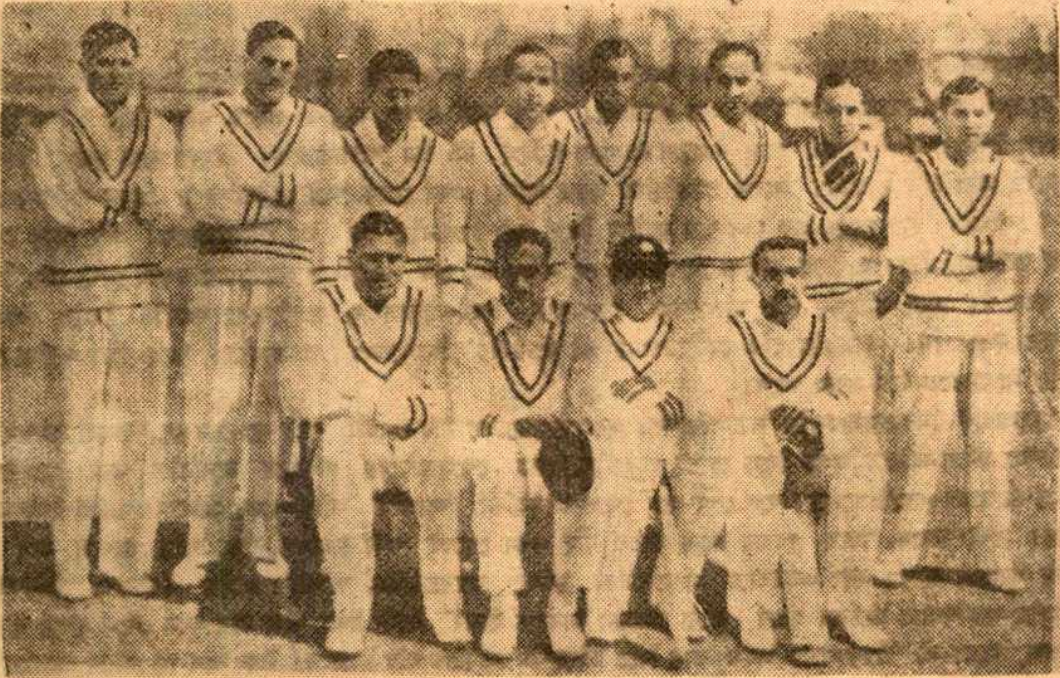
দিয়েছিলেন। হিন্দেলকারের খেলায় যে সতেজ নৈপুণ্য দেখা গিয়েছিল, প্রথম টেস্টে আঙুলের হাড় ভাঙায় তার পরি-সমাপ্ত ঘটে। কিন্তু সকলকে নিরাশ করেছিলেন ওয়াজির আলী, জয়, পালিয়া আর আমীর ইলাহী।

ভারতীয় দলের আক্রমণধারার প্রধান স্তম্ভ ছিলেন মহম্মদ নিসার। ১৯০৬ সালের ইংলন্ড সফরে নিসার দখল করেছিলেন মোট ৬০টি উইকেট। শেষের দিকে অমর সিং তাঁর সংগে যোগ দেওয়ায় ভারতের শক্তি বেড়ে গিয়েছিল অনেক বেশি।

স্লো বোলার হিসেবে সি. কে. নাইডু আর মুস্তাক আলী সকলের নজর কেড়েছিলেন। কিন্তু উইকেটের পেছনে দিলওয়ার হুসেন যেভাবে খেলেছিলেন তার তুলনা মেলা ছিল ভার।

সেই সব অতুলনীয় কীর্তিনৈপুণ্যের কথা বরান্তরে আলোচনা করা হবে।

[চলবে]



॥ ১৯০৬ সালের ইংলন্ডগামী ভারতীয় দল ॥

বাঁ দিক থেকে বসে আছেন—মহম্মদ নিসার, সি. কে. নাইডু, ডি জি, বিজয় মাচেস্টে। দাঁড়িয়ে আছেন—সুটে কানাজী, হিন্দেলকার, অমরনাথ, গোপালন, মুস্তাক আলী প্রমুখ।



জীবন

ব্যাংকের এশীয় ক্রীড়ায় যোগদানের জন্যে ভারতীয় হাঁক দল গঠনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে ৪০ জন খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়েছিল। ধাপে ধাপে ৩ জন আর ৮ জনকে বাদ দিয়ে দ্বিতীয় দফার প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দেবার জন্যে আহ্বান জানানো হয়েছে ২৯ জন খেলোয়াড়কে। এদের মধ্যে থেকে ১৮ জনকে মনোনীত করা হবে ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে। এখন থেকে অক্টোবর মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত তো কোচিং ক্যাম্প চলবেই। তার পরেও এক মাস ধরে তালিম নিতে হবে মনোনীত ১৮ জন খেলোয়াড়কে। যাই হোক ২৯ জনের বাছাই তালিকার দিকে তাকালে এ কথা বোঝা যায় যে, এবার কর্তৃপক্ষ তরুণ খেলোয়াড়দের ওপরই বেশী জোর দিয়েছেন। তাই বোধ হয় তাঁরা ভারতের দুই অলিম্পিক খেলোয়াড় মহীন্দরলাল ও সার্বসেসের বলবীর সিংকে বাদ দিতেও ইতস্তত করেন নি। ভারতীয় হাঁক ফেডারেশনের এই মনোভাব নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয় কি না দেখতে হবে সবার আগে।

খেলোয়াড় নির্বাচকমন্ডলীর সভাপতি ২৯ জন খেলোয়াড়ের নাম ঘোষণা করে বলেছেন যে, আগামী ১৯৭২ সালের অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দিকে চেয়েই ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের এইভাবে মনোনীত করা হয়েছে। বিশ্ব হকিতে ভারতের একাধিপত্যের যুগ শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন আগেই। অলিম্পিকের প্রাঙ্গণেও ভারত হারিয়েছে পূর্ব সুনাম। সেই সম্মান ফিরে পাবার জন্যে ভারত যদি এখন থেকেই চেষ্টা চালাতে শুরু করে তাহলে সেই প্রচেষ্টার প্রশংসা করতেই হবে। এবং একইভাবে গ্র্যান্ডস্লটিক, কুস্তি, ভারোত্তোলন, ফুটবল প্রভৃতি বিভাগের উন্নতির জন্যে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে সচেতন হবার জন্যে আহ্বান জানাতে হবে। একটা কথা আর ভুলে গেলে চলবে না যে, যুগ বদলাচ্ছে, আর এই পরিবর্তনের সংগে তাল দিয়ে ক্রীড়া-কর্মকর্তারাও যদি নিজেদের ঠিক পথে না চালান—তাহলে তাঁদের লাঠি ঘোরাবার দিনও ফুরিয়ে যাবে। আজ আর আমরা বসে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গণে ভারতের অসম্মান মুখ বদনেনে সত্য তব্বো না। সব প্রতিকূলে গর্জে ওঠার দিন এসেছে আজ। সুতরাং সাবধান...

—শান্তিপ্রিয়

সি. ফুটবল ম্যাচ

অবস্থি...বৃষ্টি আর বৃষ্টি!
সে ভেসে যাওয়া কলকাতার জল থৈ-থৈ
কান শব্দবাদের বারবেলায় (সওয়া
নাট্যের) কথা ছিল আই. এফ. এ
ক্লাবের আসর বসার।

পুরো বাংলা দেশের বরাতে এখন
নিয়ম দশা। তাই বাংলা দেশের খেলার
জা ফুটবলও বাদ যায় নি এর আওতা
থেকে। টেনে-হিঁচড়ে তাই কোনরকমে
চলছে ফুটবল খেলাগুরুদো। একক
শীপের আসর এখনো শেষ হলো না,
সুপার লীগ দূর অস্ত, তবু তারই
থেকে এক ফাঁকে আরম্ভ হয়ে গেছে
ই. এফ. এ শীপের খেলা।

এবারের আই. এফ. এ শীপের
খেলা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়েছে।
দ-প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন কেউ
কউ। তবু সব ফাঁড়া কাটিয়ে লক্ষ লক্ষ
একর বিনিময়ে ইরাক আর পশ্চিম
জার্মানী থেকে দুটো দল কলকাতায়
মালছে আই. এফ. এ শীপে খেলতে।

এই দুটি বিদেশী দলের জন্যে লক্ষ
লক্ষ টাকা খরচ হবে। কিন্তু এর বিনি-
ময়ে আমরা কি পাবো? এই মূহুর্তে
সই চিন্তাই সব চেয়ে বড় হয়ে দেখা
য়েছে। ভেবে পাই নি, আমাদের
তো গরীব দেশের কেন এই
বলাসিতা।

লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দুটি
বিদেশী দলকে আই. এফ. এ শীপে
খেলতে না আনিয়া সেই টাকায় যদি
গরীব কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ খেলো-
য়াড়দের শিক্ষা এবং আর্থিক সাহায্যের
ব্যবস্থা করা হতো তাহলে মনে হয়
আমাদের দেশের ভবিষ্যতের অনেক
নামী অথচ দুস্থ খেলোয়াড় উপকৃত
হবেন! আর তাতে বাংলা দেশের
ফুটবল খেলার মান বাড়তো-বই কমতো
না।

আর একটা কথা—অতীতের দিক পাল
আর বর্তমানের প্রচণ্ড রকমের আর্থিক
অনটনের সম্মুখীন দুস্থ খেলোয়াড়দের
আর্থিক সাহায্য দেবার জন্যে সরকার
এবং আই. এফ. এ কর্তৃপক্ষের কাছে
আর বার আবেদন জানিয়েছি। কিন্তু
সি বিষয়ে আজো তাঁরা কিছু করলেন
না।

কিন্তু এইভাবে চুপ করে থাকাটা
আমাদের জাতীয় কলঙ্ক এ কথাটা
আর কারো মাথায় ঢুকছে না।

[৭০৪ পৃষ্ঠায় চতুর্থ]



৥ পরোক্ষ ৥

শোনা যাচ্ছে ওয়েস্ট ইন্ডিজগামী
ভারতীয় দলের অধিনায়ক পদে পরোক্ষের
নির্বাচনের সম্ভাবনাই সব থেকে বেশী।

ক্রিকেট মনেও প্রতি

ক্রিকেট খেলায় হ্যাটট্রিক করাটা
নিশ্চয়ই গর্বের বিষয়। আর টেস্ট
ক্রিকেটের আসরে একই দিনে দুটি
হ্যাটট্রিক করা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর
ব্যাপার। এই ঘটনার নায়ক হলেন
অস্ট্রেলিয়ার মাথুউজ। দক্ষিণ
আফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট
করে সংগ্রহ করে ৪৪৮ রান। দক্ষিণ
আফ্রিকা ব্যাট করতে নৈমই
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে।
ফলো-অন থেকে রেহাই পাওয়াটাই
তখন তাঁদের কাছে মস্তবড় সমস্যা।
ফলো-অনের হাত থেকে রেহাই পেতে
তখনও ৩৪ রান দরকার আর হাতে
রয়েছে তিনটি উইকেট।

এমন সময় বল করতে এলেন
মাথুউজ। আর তিনটি বলে পরপর
তিনটি উইকেট দখল করে হ্যাটট্রিক
করে বসলেন। ফলে দক্ষিণ
আফ্রিকাকে ফলো-অন করতে হলো।
ফলো-অন করতে নৈমই বিপর্যয়,
মাত্র ১৫ রানে শেষ হয়ে গেল তাঁদের
ইনিংস। আর এবারও মাথুউজ
হ্যাটট্রিক করলেন। আর সব চাইতে
বড় কথা হলো যে, মাথুউজ দুটি
হ্যাটট্রিক ছাড়া আর কোন উইকেট
পান নি।

পরোক্ষ নাগ

বেলাকোবা, জলপাইগাঁড়।

সম্মানসম্পন্ন

প্রত্যেক বছরের মত এবারও
গঙ্গাবক্ষে দীর্ঘ সাতার প্রতিযোগিতার
আসর বসেছিল মন্দিরাবাদে। ৭২
কিলোমিটার সাতারে সবার আগে
এসেছিলেন পরমেশদাস ঘোষ আর ১৯
কিলোমিটার সাতার প্রতিযোগিতায়
প্রথম স্থান লাভ করেছেন সুনীল
মিষ।

১৯ কিলোমিটার সাতারে পুরুষ-
দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে
রত্নরাণী ধর, বাণী দাস ও গৌরী দাস
মহিলাদের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়
ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন।

ভারতের ৫-০ খেলায় হারিয়ে
পশ্চিম জার্মানী চ্যালেঞ্জ রাউন্ডে
আমেরিকার বিরুদ্ধে খেলার যোগ্যতা
অর্জন করেছিল। ফাইনালে কিন্তু
পশ্চিম জার্মানী আমেরিকার বিরুদ্ধে
দাঁড়াতেই পারে নি। আমেরিকাও
৫-০ খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে
হারিয়ে ডেভিস কাপ লাভ করলো।
এবার নিয়ে আমেরিকা ২২ বার ডেভিস
কাপ জয় করেছে।

আন্তর্জাতিক এ্যাথলেটিক ফেডা-
রেশন দক্ষিণ আফ্রিকাকে আন্তর্জাতিক
প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসর থেকে সাসপেন্ড
করেছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার
প্রতিযোগীরা ব্যক্তিগতভাবে প্রতি-
যোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে।

ব্যাংককের এশীয়ান গেমস্-এ
যোগদানের জন্যে ভারতীয় হকি দল
গঠনের তেজস্ক্রিয় শুরুর হয়ে গেছে।
প্রথমে ৪০ জন খেলোয়াড়কে প্রাথমিক-
ভাবে মনোনীত করা হয়েছে। তারপর
দফায় দফায় ৩ জন ও ৮ জনকে বাদ
দিয়ে এখন মোট ২৯ জনকে শিক্ষা
শিবিরে যোগদানের জন্যে আহ্বান
জানানো হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখ-
যোগ্য বিষয় হলো যে, এবার তরুণ
খেলোয়াড়দের ওপরই বিশেষভাবে নজর
দেওয়া হয়েছে। এমন কি অলিম্পিক
খেলোয়াড় মহীন্দরলাল ও সার্ভিসেসের
বলবীর সিংকেও ২৯ জনের বাছাই
তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কীড়া সম্পাদক সমীপে

গত ২০।৮।৭০ তারিখের সাপ্তাহিক বঙ্গমতীতে প্রকাশিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ফুটবল দল দেখলাম। কিন্তু আমার মতে, লেখক ভাল করে বিচার না করে বা সব বড় খেলোয়াড়দের নাম ভুলে গিয়ে একটি দল গড়েছেন—সেটি মোটেই সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দল নয়। অবাক হয়ে দেখলাম, তিনি বিগত দিনের দুর্ধর্ষ সব খেলোয়াড়ের নাম এ দলে আনেন নি, যথাঃ—ওসমান, কে দত্ত বা পূর্ণ দাস গোলে, ব্যাক—পি. চক্রবর্তী, তাজমহম্মদ, জুমা খাঁ বা বি বোস। হাফে—অনিল দে, বীরেন সেন, মাসুম, অজিত নন্দী, গোবুল, চন্দন সিং প্রমুখ। ফরোয়ার্ডে—আপ্পারাও, সোমানা, হাফিজ রাসিদ, মজিদ, লক্ষ্মীনারায়ণ, সূর্য চক্রবর্তী, ফকরী, কিট্টু, নায়ার, সালে, সত্তার, লায়েক, মঈন প্রমুখ।

বোশ কথার মধ্যে না গিয়ে আমি এখানে ৪টি ভারতীয় দল গঠন করে দিচ্ছি। এবার আমার নির্বাচন আপনারা বিচার করুন।

আমার গড়া দল

১৯২০ থেকে আজ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ দল

ওসমান (মহামেডান), পরিতোষ চক্রবর্তী (ইস্টবেঙ্গল-মোহন), অজিত নন্দী (ইস্টবেঙ্গল), নূর মহম্মদ (বড়-ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান), মাসুম (মহামেডান)।

ডেফেন্ডেশ (ইস্টবেঙ্গল), আপ্পারাও (ইস্টবেঙ্গল), হাফিজ রাসিদ (মহামেডান), মজিদ (ইস্টবেঙ্গল), সামাদ (ই-বি-মার ও মোহনবাগান)।

আমার গড়া সর্বশ্রেষ্ঠ দল ১৯৪০ খৃঃ থেকে ২টি।

১ নং কে- দত্ত, তাজ মহম্মদ, পরিতোষ চক্রবর্তী, অনিল দে, বীরেন সেন, মহাবীর, ডেফেন্ডেশ, আপ্পারাও, সোমানা, আমেদ, সালে।

২ নং দা ১৯৪০-এর পরবর্তীকালে ভল্লাবাজ; বি বোস, এস মাল্লা; গোবুল, চন্দন সিং, নূর মহম্মদ (হায়দরাবাদ); মৈন, লায়েক (হায়দরাবাদ), নায়ার, সত্তার, ফকরী।

১৯৫৫ খৃঃ পরবর্তীকাল। তিন ব্যাক

প্রথার পর

খগরাজ, অরুণ ঘোষ, জার্নাল সিং (সালান), চন্দ্রশেখর (বম্বে), কোম্পিয়া,

এবারে বিশ্বকাপের খেলার আগে অনেকে ইংল্যান্ড জয়ী হবে বলে মনে করেছিলেন। এমন কি ইংল্যান্ড সম্বন্ধে অনেক বড় বড় কথা বিভিন্ন পত্রিকায় দেখেছি। পশ্চিম জার্মানীর কাছে ইংল্যান্ডের হেরে যাওয়াটা অনেকে দুঃখিতা বলে মনে করেছেন। কিন্তু কেন? যেহেতু ইংল্যান্ড ১৯৬৬ সনে বিশ্বকাপ জয় করেছিল। ১৯৬৬ সনের আগে

তেমন অসুবিধা হয় নি। তৃতীয় প্রত্যেকটি খেলায় ইংল্যান্ডের অনুকূলে। সমর্থনের ওপর খেলা হার-জয়ের অনেকটাই নির্ভর করে। উদাহরণ হিসাবে বাংলাদেশের সন্তোষ ট্রাফার কথা বলতে চাই। সেবারে বাংলা ভালো খেলেও মহীশূরের কাছে হার স্বীকার করেছিল কারণ রেফারী মহীশূরকে অনেক সাহায্য করেছিলেন। কোন রেফারী ইচ্ছা করলেই পেরেছিল?

আমার মতে

বিশ্বকাপের খেলার কিছুই খেলতে পারে নি। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে, কি করে ইংল্যান্ড বিশ্বকাপ জয় করেছিল। প্রথমত পোলে আহত হওয়ার ব্রাজিল দল কিছুই খেলতে পারে নি। পোলে সুস্থ থাকলে ব্রাজিল দল কি করতো বলা যায় না। দ্বিতীয়ত ইংল্যান্ড নিজের ইচ্ছা মত গ্রুপ ভাগ করেছিল। কাজেই সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলতে

শ্রীরাজা পেভা

নানাভাবে একটি দলকে সাহায্য করতে পারেন। এমন কি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলার (১৯৬৮) রেফারী ইংল্যান্ডের সাহায্য করেছিলেন। ইংল্যান্ড খুব যে একটা আহামরি দল নয় তা এবারের বিশ্বকাপের খেলা দেখলেই বোঝা যায়। এবারে এমন কি পেরু এবং যুক্তরাষ্ট্র পর্যন্ত ইংল্যান্ডের চেয়ে ভালো খেলেছে ব্রাজিল ফাইনালে এবারে যে রকম খেলেছে, ১৯৬৬ সনের ফাইনালে ইংল্যান্ড কি সে রকম কিছু খেলে

ইউসুফ খাঁ (হায়দরাবাদ), প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী, মেওয়ালাল, কিট্টু (জুলফিকার), বলরাম।

আমার দল গড়ার সময় রক্ষণভাগের খেলোয়াড়েরা রক্ষণ ও আক্রমণকার্যে কে কতটা সহায়তা করতে পারতেন, তার উপর নির্ভর করা হয়েছে।

আশা করি, আমার পত্রখানি প্রকাশ করবেন।

—শঙ্কর মিত্র,

এন.সি. সরকার স্ট্রীট,

কলিকাতা-৫৭।

প্রশ্ন-উত্তর

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাই-গড়ি)

উত্তর—প্রশ্ন-উত্তর বিভাগটি তো বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। জায়গার অভাবে কম করে প্রকাশ করা হচ্ছে।

কিশু সেনগুপ্ত (জামসেদপুর-৭)

উত্তর—খোলাখুলা বিভাগের পাতায় সংখ্য বড়ানোর হাত তো ভাই আমার নেই। আপনারা এ বিষয়ে সম্পাদিকা কাছে চিঠি লিখতে পারেন।

খেলার রাজার রাজা আপনার ভাগে লাগছে জেনে উৎসাহিত হলাম।

[৭০০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

দুঃখের কি করে! যাদের এ বিষয়ে সবার আগে চিন্তা করার দরকার তা এখন ভারতের বাইরের দল এনে চমক সৃষ্টি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন আর শুধু সেই জন্যেই পূর্বে ঠিক আগে বাংলা দেশের ফুটবল রসিকদের গাটের কাড়ি বেশ খসবে। কারণ বিদেশী দলগুলো, কুপায় আই-এফ-এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই খেলাগুলো এরা চ্যারিটি হিসেবে হবে বলে শোনা যাচ্ছে তা ছাড়া আরো কতকগুলো প্রদর্শন খেলা তো হবেই। আর বাংলা দেশে কীড়া-রসিকরা সব কিছু ভুলে সব আগের খেলার মাঠে ছুটবেনই...!

অস্থায়ী সম্পাদক—বিজনকুমার সেন

বঙ্গমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বঙ্গমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জাতীয় ধ্যান-ধারণার ও ঐতিহ্যের ধারক-বাহক মনীষীদের স্মৃতি বহন করে চলেছে “বসুমতী প্রকাশনী বিভাগ”।

ই কয়েকটি নিদর্শন—

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা :

(মূল, ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদ সম্বলিত)

২ ভাষা অনুবাদ—সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণময়।
কল্পনা। স্ক্রল বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—২-০০ টাকা।

গীতা গ্রন্থাবলী :

(পঞ্চবিংশতি গীতার সমাহার)

মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যেমন
রত্নের সার, এই গীতাগুলি তেমনি সর্বশাস্ত্রের
সার। হারীত, দেবী, যম, বৈষ্ণব, তুলসী, অবধূত,
কৃষ্ণ, ষড়্ভুজ, হংস, মন্দির, গীতাসাত্ত, পিতৃ, পৃথিবী,
সী, রাম, পরাশর, শাস্তি, শিব, ভগবতী, বোধ্য,
গোব, উত্তর রাস, শ্রীমদ্গীতাসার—এই পঞ্চবিংশতি
সমাবেশ প্রতিটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির অবশ্যপাঠ্য
সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১২ খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকা, নৃসিংহতাপনী।

২ খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সম্বাস, নীলরুদ্র,
আরুণ্যেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আশ্ব, ঘটচক্র,
শিকা, বৃদ্ধবিদ্যাবাদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত,
দেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩ খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্যমুণ্ড তৈত্তিরীয়,
বৃদ্ধা, শাঠ্যায়নীয়, যোগতত্ত্ব, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন,
ব্রহ্মপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম,
যজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়,
রতাপনীয়, কোষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা,
অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—প্রতি
টাকা।

ছান্দোগ্য-উপনিষদ :

বদের তাণ্ড্যশাখার ছান্দোগ্যব্রাহ্মণের অন্তর্গত।
ত ও বঙ্গানুবাদ। মূল শ্রুতি ও শ্রুতির অনুবাদ।
র মহাভাষ্য, শাক্তর ভাষ্যের সরল অনুবাদ।
পানগর্ভ ভূমিকা সম্বলিত বৃহদায়তন গ্রন্থ। ৮১২
য় সম্পূর্ণ। শাস্ত্র প্রচারোদ্দেশ্যে এখনও নামমাত্র মূল্যে
ইতেছে। মূল্য—৬-০০ টাকা।

সাংখ্য-দর্শন :

মহাশি কপিলকৃত, উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনাদিত।
সাংখ্যদর্শন সর্ব দর্শনের সার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।
মূল্য—২-০০ টাকা।

বৈবেশিক দর্শন :

মহাশি কণাদ প্রণীত। বোর্ড বাঁধাই। মূল্য—৩-০০
টাকা।

শ্রীশ্রীভক্তমালী গ্রন্থ :

পরমভক্ত শ্রীমৎনাভাজী হিন্দী ভাষায় ভক্তমাল
গ্রন্থ রচনা করেন, শ্রীঃ প্রিয়দাস তাহার টাকা রচয়িতা।
লগ্রন্থ ও টাকা অবলম্বনপূর্বক শ্রীমান কৃষ্ণান বাবাজী
বক্তভাষায় এই অপূর্ব ছন্দোমধুর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।
এই গ্রন্থ পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভগবন্তজিরসে অন্তঃকরণ
আপ্নত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থসমূহের মধ্যে ভক্তমাল অন্যতম
শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মূল্য—৬-০০ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুশাস্ত্রম্ :

(বিবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে গুরু-শিষ্যের কর্তব্য-
কর্তব্যাদি, দীক্ষা প্রণালী, গুরুপূজা, স্তোত্র, পুরস্চরণ
প্রভৃতির অপূর্ব সঙ্কলন।)

গুরুগীতা, গুরুতন্ত্রম্, দীক্ষাপদ্ধতি, শ্রীগুরু, মন্ত্রমালা
প্রভৃতি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল্য—৩-০০ টাকা।

যোগশাস্ত্র :

শিবসংহিতা, ঘেরঙসংহিতা, বৃদ্ধসংহিতা, অষ্টাবক্র-
সংহিতা, ঘটচক্রনিরূপণম্, দত্তাত্রেয়প্রোক্ত যোগরহস্যম্,
পরশরপ্রোক্ত যোগোপদেশ। দুপ্তাপ্য সাতখানি যোগগ্রন্থের
সমাবেশ, কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৫-০০ টাকা।

হঠযোগ প্রদীপিকা :

(যোগশাস্ত্রের হঠযোগ সাধন গ্রন্থ মূল ও সরল
বঙ্গানুবাদ। শ্রীমৎ স্বাত্মরাম যোগীন্দ্র প্রণীত ও শ্রীমৎ
জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পাদিত।) মূল্য—৩-০০ টাকা।

কল মশলা'ই তো
ব্যবহার করলুম
কিন্তু সঠিক—

কুকুমী

তুলতা হয় তা!

15 SEP 1970



কুকুমী
গুঁড়ো মশলা

সবার রুচিকেই
পরিতৃপ্ত করে।

কুকুমী পিঠের ঘাচ
ও রুণীর
পাখা নির্ভরে
ব্যবহৃত হয়।

কুকুমী ভারতে
সর্বোচ্চ বিক্রি
গুঁড়ো মশলা
এবং পেছনে
মোটামুটি ১২০
বৎসরের
অভিজ্ঞতা।

অন্তর্গত
কুম্ভচন্দ্র দত্ত (স্পাইস)
প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৭
মিল-কাশীপুর

